সূচীপত্র

Reokashmir
রেকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বৈশাখে প্রকাশিত হইবে

প্রতিধ্বনি।

সুসাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস।

বর্তমানে যে ক'জন খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিক নতুন ভাবনা ও বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিগন্তকে বহু প্রসারিত করেছেন, **শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য** তাঁহাদেরই একজন। "পূর্বাশা" "নিরুক্ত" প্রভৃতি সাময়িক পত্র সম্পাদনায় তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর আজও উজ্জ্বল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সংপাঠক হিসাবে তাঁর উপলব্ধিকে তিনি ভাষায় বিবৃত করেছেন কয়েকখানি প্রকাশিত গ্রন্থে। আমাদের সমাজ-জীবনে আজ নানা অন্যায় ও দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকদের সত্যভাষণে তার অধিকাংশই অনুক্ত। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সাহিত্যের সত্যে বিশ্বাসী, সে বিশ্বাসকে তিনি প্রকাশে অপারগ নন। তাই তাঁর সাহিত্য কালজয়ী।
দাম—৩·০০

অন্যান্য প্রকাশিত উপন্যাস: **এপিসোডিক**—সুনীলকুমার ঘোষ ৩·৫০। **অতসী**—প্রবোধবন্ধু অধিকারী ৪·০০। **বৃহন্নলা**—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ৪·৫০। **সেদিন চৈত্র মাস**—দিব্যেন্দু পালিত ৩·৫০। **মেঘ**—সুবোধকুমার চক্রবর্তী ২·৫০।

বসুচৌধুরী। ৬৫-এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯।

গ্রন্থাগারে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থপীঠের বই

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
স্বর্ণরেণু ৪·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু
গহিন গাঙ গহন বন ৪·৫০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিয়ের ফুল ৩·০০

বরবুচি
স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি ২·৫০

প্রভাত দেবসরকার
কত রঙ ৪·০০

মায়া দাস
কী হেরিলাম নয়ন মেলে ২·৫০

জ্যোতির্ময় রায়
ভেঙেছে দুয়ার ২·৫০

পশুপতি ভট্টাচার্য
স্বপ্ন-যমুনা ৩·০০

একত্রে দুখানি জমাটি রহস্য-উপন্যাস
অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের **তারকার মৃত্যু কালরাত্রি** ১·৮০

॥ নবযুগধর্মী নতুনতর নাটক ॥
সুশীল মুখোপাধ্যায়ের **বাঁধ** ২·৫০
শক্তিপদ রাজগুরুর **মেঘে ঢাকা তারা** ২·৫০
গঙ্গাপদ বসুর **অংশীদার** ২·৫০
শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের **কাঞ্চনরঙ্গ** ২·৫০

গ্রন্থপীঠ ২০৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা ৬

গন্ধর্ব

বিমল কর লিখেছেন
দেশাত্মবোধের পূর্ণাঙ্গ নাটক : শংখ
অশোক রুদ্রের নাটক জালিয়াৎ
মঞ্চে আলোক সম্পাত
শিক্ষাদর্শন সংগীত নাট্য আকাডেমীর
অধ্যাপক তমাল ঘোষ
১৮ সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা ১২

নতুন ধরনের সিনেমা সাপ্তাহিক

প্রতি শুক্রবার নিয়মিত বেরচ্ছে

বোম্বের নিজস্ব প্রতিনিধি
শচীন ভৌমিক
বোম্বাই চিত্রসংবাদ ও চিঠিপত্রের উত্তর দেন

অশোক ঘোষাল
কলকাতার সিনেমা জগতের খবর লেখেন

সুপ্রিয়া চৌধুরী
আত্মজীবনী 'আমার কথা' লিখছেন

স্বপ্রতিষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক
বিমল মিত্রর
ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে
এ ছাড়াও প্রতি সংখ্যায় থাকে
গল্প, নানা ধরনের নতুন নতুন ফিচার, প্রচুর সিনেমার ছবি, কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পুনা পরিক্রমা, কবিতা, গান ও স্বরলিপি, মহিলা মহল ফ্যাশন প্রভৃতি।

খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীরা এপ্রিল মাস থেকে লিখবেন।

দাম মাত্র ৪০ নয়া পয়সা
কার্যালয় : ৭৯।৫বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৬

৩০ বর্ষ ॥ ২৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৩ চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
Saturday, 6th April, 1963

সাহিত্যের শপথ

জাতীয় সংকটের সূত্র কেবল হিমালয় সীমান্তে নয়, জাতির অন্তস্তলেও। দেশের সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়রা অনুভব করেছেন, চৈনিক কম্যুনিস্ট অভিযান একটি বিপদ সংকেতমাত্র, এই আক্রমণ যে সর্বগ্রাসী মতবাদের ধ্বজাবাহী সেই ছলনাময় মতবাদের মোহাচ্ছন্নতা থেকে জাতীয় চিন্তাভাবনাকে সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখা দেশপ্রেমী শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর প্রাথমিক ও আবশ্যিক কর্তব্য। শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে এই কর্তব্যবোধ স্বতই জাগ্রত হয়েছে, কোন ব্যক্তি, দল কিম্বা গোষ্ঠীর নির্দেশ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। কলকাতায় বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন মণ্ডপে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন সে হিসেবে সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা রুচি ও প্রকৃতিতে সাধারণত নিঃসঙ্গ সাধক, আত্মমগ্ন, প্রচারকুণ্ঠ এবং পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। তবুও তাঁরা সংকটের পীড়নে পরস্পর ভাবনার বিনিময়ে সমবেত হয়েছেন, সংকটের মূল কারণ নির্ণয়েও সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন, সংকল্প গ্রহণ করেছেন কম্যুনিজমের সর্বগ্রাসী আধিপত্য কখনই তাঁরা স্বীকার করবেন না–ভয়ে না, প্রলোভনেও না। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীন সাহিত্যের এই বলিষ্ঠ ঘোষণা বাংলার শীর্ষ-স্থানীয় এবং মননশীলদের উদ্যোগেই রচিত ও প্রচারিত হয়েছে: রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ - বিবেকানন্দের ঐতিহ্যবাহী বাঙালী মনীষার সঙ্গত সার্থক স্বাক্ষর তাই সুস্পষ্ট স্বাধীন সাহিত্য সমাজের এই অবিস্মরণীয় উদ্যমে। জাতীয় ইতিহাসের আর এক সংকটকালে গোখেল বলেছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে তাই-ই আগামীকালে সারা ভারতের ভাবনা। সন্দেহ নাই, স্বাধীন সাহিত্য সমাজের ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি, সংকল্প ও প্রয়াস সেই সর্বভারতীয় চিন্তার উৎস এবং কেন্দ্রবিন্দু।

যে সংকটের পীড়ন থেকে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্ভব তার সঙ্গে আজই আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে নি। কম্যুনিজমের জবরদস্তি অন্তহীন দুর্ভোগ ও দুর্গতি সৃষ্টি করে, ভয়াবহ নৈতিক বিপর্যয় ও বুদ্ধিবিকার ঘটায়, ঘরে ও বাইরে তার অসংখ্য নিদর্শন আমরা পেয়েছি। স্বৈরাচারী শাসক অথবা পরমত-অসহিষ্ণু ধর্মতন্ত্র এককালে শাসনবারণ ও নিগ্রহ নিপীড়নের যথেচ্ছ ব্যবহারে মানুষের অপরিসীম দুর্গতি ঘটিয়েছিল। তবুও অতীতের কোন স্বৈরাচারী শাসন-দমন ব্যবস্থাই কম্যুনিজমের মত নিশ্ছিদ্র নিয়ন্ত্রণের জাঁতাকলে মানুষকে পিষ্ট করে নি। কম্যুনিজমের প্রকৃতিই এমন যে সে বহুকে, জীবনসৃজনধারার বৈচিত্র্যকে কিছুতেই সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। এক ছাঁচে ঢালা জীবন, এক-বগ্গা চিন্তা, এক এবং অদ্বিতীয় দল ও দলপতির নির্দেশে ওঠা বসা—মনুষ্যত্বের অবমাননা ও পীড়নের এই সর্বাধুনিক যন্ত্রের তুলনা ইতিহাসের আর কোন যুগেই পাওয়া যায় না। অথচ ইতিহাসের এমনই নির্মম পরিহাস যে এই মানবধর্ম-বিরোধী বিকৃত, বিভীৎস মতবাদই মানব-মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে দেশে দেশে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর চিন্তা মোহাচ্ছন্ন, বিচারক্ষমতা পঙ্গু করতে সক্ষম হয়েছে।

আশার কথা, ইতিহাস থামে নি: কম্যুনিজমের স্বরূপ, তার শঠতা ও ক্রূরতা কম্যুনিস্ট মহানায়কদের আদি পীঠস্থানেই প্রকট হয়েছে, বুদ্ধিজীবী-দের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে আমাদের কালে সবচেয়ে বড় বাধা, সব-চেয়ে নিষ্ঠুর নীতিজ্ঞানহীন শত্রু এই সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদ এবং তার ধারক-বাহক-অনুচরেরা। কম্যুনিস্ট প্রচারে প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পী সাহিত্যিকরা অনেকেই কিছুকাল আগে পর্যন্তও ভেবেছেন আমাদের কালে সভ্যতার সংকট, সংস্কৃতির সংকটের জন্য দায়ী আর যাই হোক কম্যুনিজম কখনই নয়। কম্যুনিজমের বাস্তব ত্রুটি-বিচ্যুতি, অনাচার, অত্যাচার ও বিকারের অসংখ্য প্রমাণ সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট আদর্শের মনগড়া ছকের দোহাই দিয়ে অনেক মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক তাঁদের কল্পিত প্রগতির সদ্‌গতি সন্ধান করেছেন। এখনও এই ছলনা এবং আত্ম-প্রতারণার বিরাম নেই। কম্যুনিজমের প্রভাবাধীন বুদ্ধির এই বিকার এবং অপচয়ের বিরুদ্ধেই স্বাধীন সাহিত্যের, মোহশূন্য মুক্তবুদ্ধির অভিযান।

আজ দ্বিধামুক্তচিত্তে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা, একালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকটের জন্য দায়ী সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদের দুনিয়াজোড়া আধিপত্য-বিস্তারপ্রয়াস। চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণ যে সংকট সৃষ্টি করেছে তা কেবল সীমানা এবং এলাকা নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিরোধজাত নয়। তা যদি হত তাহলে ভারতের মাটিতেই কম্যুনিস্টপন্থীরা দলে দলে আক্রমণকারীর স্বেচ্ছাদাসত্ব বরণে তৎপর হত না। কম্যুনিস্ট মতবাদের অন্ধ আনুগত্য স্বদেশের স্বাধীনতার চেয়ে বৈদেশিক শক্তির স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, দেয় কেন না সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদ তার আধিপত্য বিস্তারের জন্য সুকৌশলে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীবিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেশে দেশে কম্যুনিস্টপন্থীদের স্বাধীন বিচারশক্তি নষ্ট করে, সুস্থ মানবিক মূল্যবোধ অসাড় করে ফেলে। এই ভয়াবহ বিষের প্রভাব বন্ধ করার জন্যই স্বাধীন সাহিত্য সমাজের সর্বশক্তি নিয়োগে উদ্যোগী হওয়ার সংকল্প। সীমান্ত সংকট সমাধানের জন্য যেমন সামরিক প্রস্তুতি তেমনি নৈতিক সংকট ও বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীন প্রয়াস।

এই সংকটে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধি-জীবীদের ভূমিকা স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমী সংগ্রামী জনতার পুরোভাগে। সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট মতবাদ কেবল জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণ করে না, শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ সৃজন প্রয়াস কম্যুনিস্ট জুলুম-তন্ত্রের প্রথম শিকার। পার্টিসত্যই একমাত্র সত্য। তার উপরে, নিচে, পাশে আর কোন সত্যের ঠাঁই নেই, সত্যানু-সন্ধানের চেষ্টা ও চিন্তা পর্যন্ত মারাত্মক অপরাধ ফলিত কম্যুনিজমের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসের এই বিকট বিকার-গ্রস্ত তাড়নায় কত শিল্পী-সাহিত্যিকের কণ্ঠ যে রুদ্ধ হয়েছে, কত বুদ্ধিজীবীর জীবন যে নষ্ট হয়েছে তার লেখা-জোখা নেই। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য কানাকড়িও নয় তার সঙ্গে প্রকৃত মানবধর্মী সৃজনী প্রতিভার যোগ-সাধন কল্পনা করাও অসম্ভব। সাহিত্যের স্বচ্ছন্দ গতি প্রকৃতি, মুক্তবুদ্ধির নির্ভীক অনুশীলন যে-মতবাদ কখনও স্বীকার করে না, মানবাত্মার বিচিত্র বহুমুখী ব্যাকুল প্রকাশকামনাকে শাসনযন্ত্রে অহরহ পিষ্ট করে সে-মতবাদের একাধি-পত্য প্রসারচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথবদ্ধ হওয়া শিল্পী সাহিত্যিক মাত্রেরই পবিত্রতম কর্তব্য।

মৃত সৈনিকদের উদ্দেশে

দিনেশ দাস

না, না! আমি বন্ধু আনন্দিত নই।
যদিও পৃথিবী তার সবুজ সোনার বৃন্তে বসন্ত ফোটালো—
লক্ষ পাতার কুঁড়ি পান করে সকালের আলো:
ফুলের আলোয় আর
তোমরা সৈনিকবন্ধু জাগবে না—শুনবে না বসন্তবাহার।

স্থির হিমালয়:
দেহে তারা প্রতিবেশী, মনে নয়:
ড্রাগন-নখরে তারা হেনেছে আঘাত
কণ্ঠ শুধু করে প্রতিবাদ:
কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে যখন—
হৃদয় করেছে প্রতিরোধ।

হে বন্ধু! ঘুমিয়ে আছ পাথরের প্রশান্ত কবরে।
আমি জাগি ঘুরি ফিরি তোমাদের পাশে—
যেন কোন্ দূরের মানুষ, আগন্তুক
আমার মতই একা শূন্যের আকাশে।

বসন্ত এসেছে তবু মনের গহ্বরে সে যে কোথায় লুকালো,
বিস্মৃত বৎসরগুলো শুধু ছায়া ফেলে কালো কালো।
আশার মসৃণ কণ্ঠে পড়েছে দড়ির ফাঁস:
কিসের, কাদের জন্যে গান—আজ শুধু দীর্ঘশ্বাস:
সময়ের কালোঝড়ে কী হবে কবিতা?
নশ্বর প্রান্তরে শুধু কুঁড়িগুলি ভেঙে যাবে—
ফোটাফুল ছায়াতে মেলাবে॥

কাঁকুলিয়া রোডের বেহালাদার—কে

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

ও বেহালাদার, তুমি এ সব কঠিন তান
ছড়ে ছড়ে টেনো না এখনই।
হিমাদ্রি-পর্বত যার ত্রিকোণ গাঁথুনি,—সেই নিরাকৃতি ধ্বনি
ব্যক্ত করবে আজই? কিছু উহ্য রাখো,
কিছু রাখো অসম্পূর্ণ, দূর।
ও বেহালাদার,—হাল্‌কা জীবনের উৎসবেই
চালুবে তুমি এই সব সুর!

ও বেহালাদার, আছে মৃত্যু আছে, দুঃখ আছে, আছে অন্ধকার।
কার হাত ধরে আমি সমস্ত বাধা এড়িয়ে
সে প্রশস্ত তীর্থে হবো পার?
কার হাত ধরে আমি সহস্রেক সিঁড়ি ভেঙে
সহসা দেখবো সর্বপীঠ
ঝিলিমিলি মিনারের জানালায়?
উহ্য রাখো, তুলে রাখো তোমার সংগীত।

ও বেহালাদার, আমি দেখেছি সমস্ত গেলে
ঘাসের সবুজ রং থাকে,—
ভেলভেট-মোলায়েম হাওয়া, ছপছপে অন্ধকার
ছোঁয় এসে নিভৃত আত্মাকে।
মীনাক্ষী-মন্দির যার চৌকোণ গাঁথুনি,—
সেই নিরাকৃতি ধ্বনি
চিরকাল থাকে। তুমি ছড়ে ছড়ে সব তান
টেনো না এখনই॥

তাদের বাজাতে দাও,- কিনারে শব্দের মিলে
তারাফুল ঝরায় না যারা,—
শব্দের পায়ের নিচে কান পেতে
কোনোদিন শোনে নি নিঃস্তব্ধতার ধারা।
কৃত্রিম ফুলঝুরি দিয়ে তাদের সাজাতে দাও
জীবনের অলীক রাত্রি-কে।
বেহালাদার,—তুমি ছড়ে টান দিয়ো,
যদি ফুল দেবে মৃত্যুর যাত্রীকে॥

সম্প্রতি তিব্বতে চীনাদের সৈন্যসমাবেশের বহর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই সংবাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে ২৩শে মার্চ তারিখে পণ্ডিত নেহরু লোকসভায় একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন যে, তিব্বতে চীনারা নতুন সৈন্য আমদানী করেছে, নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ চলছে। চীনা সৈন্যবাহিনীর সেবায় বহুসংখ্যক তিব্বতী গ্রামবাসী ও ভারবাহী পশু নিযুক্ত করা হচ্ছে। সীমান্তে চীনা সৈন্যের ঘন সমাবেশ বেড়েই চলেছে। তাছাড়া চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষের মুখে যে-ধরনের কথা শুনা যাচ্ছে তাতে চীনারা নিজেদের মনোমতো সময়ে নতুন করে ভারতের উপর আক্রমণ চালাতে পারে এরূপ আশংকা করার কারণ আছে। গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আক্রমণের পূর্বে চীনা কর্তৃপক্ষের কথাবার্তা ও চিঠিপত্রে যে-সব ছিল আবার সেই রকম শুনা যাচ্ছে। ভারতীয় সৈন্যদের দিক থেকে অন্যায় আচরণ হবে এবং আত্মরক্ষার জন্য তার প্রতিরোধ করার অধিকার চীনাদের আছে এই ধরনের কথা বলা শুরু হয়ে গেছে। পণ্ডিতজী বলেন যে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় যে চীনারা এইরকম প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা নিজেদের পরিকল্পিত আক্রমণের জন্য পথ পরিষ্কার করে রাখছে।

চীনারা তো কোনোদিনই বলেনি যে তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। এমনকি যে চীনারা যুদ্ধ করেছে, চীনা সরকারী মহল তাদের সৈন্য বলে পর্যন্ত কখনো উল্লেখ করেনি। সব সময় তাদের সীমান্ত-রক্ষী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তারা যা কিছু করছে সবই আত্মরক্ষার জন্য। আবার সেই রকম আত্মরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে এ কথা যখন চীনাদের মুখে শুনা যাচ্ছে তখন আবার একটা বড়ো রকমের আক্রমণের আশংকা অসংগত নয়।

কিন্তু চীনারা একতরফা যুদ্ধবিরতির সঙ্গে যে-সব শর্ত লাগিয়েছে সেগুলি যদি ভারত সরকার মেনে নিয়েই চলতে থাকেন তাহলে চীনাদের দিক থেকে আক্রমণ করার কোনো অজুহাতই থাকে না। চীনারা যখন বলছে যে, ভারতীয় সৈন্যরা অন্যায় 'প্রোভোকেটিভ' আচরণ করবেন, তখন মনে হয় যে চীনারা আশংকা করছে যে ভারত চীনাদের আদিষ্ট একতরফা যুদ্ধ-বিরতির সব শর্ত অনির্দিষ্ট কাল মেনে চলবে না, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত কিছু কিছু লঙ্ঘন করতে শুরু করবে। তখন চীনাদের বাধ্য হয়ে 'আত্মরক্ষা' করতে হবে। কতকগুলি অঞ্চল—যেখানে পূর্বে ভারতীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলি ডিমিলিটারাইজড থাকবে বলে চীনারা হুকুম দিয়েছে। গত কয়েক মাস ভারত সরকার মোটামুটি সেই হুকুম মেনে চলেছেন। কারণ সামরিক দিক থেকে তার অন্যথা করা হয়ত যুক্তিযুক্ত হতো না। কিন্তু চীনাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির সঙ্গে অনির্দিষ্ট শর্তাবলী ভারত সরকার কখনো বৈধ বলে মেনে নিতে পারেন না। চীনারা ভারতীয় সামরিক কর্তৃত্ব যে-সব জায়গা থেকে হটিয়ে দিয়েছে সেখানে ভারতীয় সামরিক কর্তৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অধিকার ভারত কখনো ছাড়তে পারে না। সুতরাং হয় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে অথবা যুদ্ধের দ্বারা সেই অধিকারের স্বীকৃতি লাভ ভারতকে করতেই হবে। চীনাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী মেনে নেওয়ার অপমান তা না হলে দূর হবে না। 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি' ভারত সরকার যে মেনে নিয়েছেন তার একটা প্রধান কারণ এই যে, ঐ প্রস্তাবগুলি যদি চীন মেনে নেয় তাহলে চীনের আদিষ্ট একতরফা যুদ্ধবিরতির ভিত্তিতে অন্তত নড়ে যায় এবং চীনাদের সামরিক জয়লাভের গৌরবটাও কিছু ক্ষুণ্ণ হয়। আবার ঠিক এই জন্যই চীনারা 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি' মানতে রাজী হচ্ছে না। চীনারা 'ইন্ প্রিন্সিপল' 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি' মানতে রাজী আছে। কায়রোতে যাঁরা সাম্মিলিত হয়েছিলেন, যেহেতু তাঁদের

উদ্দেশ্য ছিল চীন ও ভারত সরকারকে আপস-মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত করানো এবং চীন যখন নিজেই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে অনেক দূর পেছিয়ে গেছে ও ভারতের সংগে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে প্রস্তুত, তাহলে চীনারা 'ইনপ্রিন্‌সিপল্‌' কলম্বো প্রস্তাব-গুলি' মেনে নিল এটা পৃথিবীকে মানতে হবে—এই হলো চীনাদের 'অভীপ্সিত ইন প্রিন্‌সিপলস্‌ মানার অর্থ। সেই জন্যই চীনা সরকার বলছেন ভারত সরকারের এখন আর চীনাদের সংগে আলোচনা বৈঠকে যোগ দিতে আপত্তি করার কোনো কারণই নেই। 'কলম্বো প্রস্তাবগুলির' ব্যাখ্যা নিয়ে যে-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, আলোচনা বৈঠকে তার মীমাংসা হতে পারে। আর তাতেও যদি ভারত সরকার রাজী না হন তাহলেও চীনা সরকার অপেক্ষা করতে পারেন কারণ যুদ্ধ-বিরতির পরে চীনারা যতদূর পেছিয়ে গেছে তাতে ভারত যদি যুদ্ধবিরতির অন্য শর্ত-গুলি মেনে নিয়ে চলে তাহলে সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা নেই, অতএব আলোচনা বৈঠক দেরিতে হলেও কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ ভারত সরকার যদি যুদ্ধে বিজয়ী চীনা সরকারের হুকুম মতো চলেন তাহলে মিটমাটের পথে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু ভারত সরকার চীনা সরকারের হুকুমমতো চলতে রাজী কেমন করে হবেন? চীনাদের একতরফা আদিষ্ট শর্ত এবং 'কলম্বো প্রস্তাবগুলি'র মধ্যে যে-পার্থক্য সেইটুকু অন্তত আদায় না করতে পারলে ভারত সরকারের আদৌ দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। চীনারা এখন বুঝেছে যে ভারত সরকার তাদের শর্ত মেনে নিয়ে চুপচাপ থাকতে পারবে না। সেজন্য চীনারাও তাদের হাতে যে-সব সুবিধা আছে বা যার দ্বারা ভারতের উপর চাপ দেওয়া যায়, সেগুলি একেবারে ছাড়ছে না। এখনো তিন হাজার ভারতীয় যুদ্ধবন্দী চীনাদের হাতে রয়েছে। ভারত সরকারকে এদের সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়। এদের চীনারা কী অবস্থায় রেখেছে দেখার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রসকে ভারত সরকার অনুরোধ করেছেন, কিন্তু চীনা কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক রেড ক্রসকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের দেখতে দিচ্ছেন না। এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই। তাহলেও তার জন্যে চীনাদের অবৈধ দাবি মানা যেতে পারে না। যুদ্ধ হলে যুদ্ধবন্দীও হবে এবং তার জন্য শত্রুর সংগে বাদ-বিসংবাদও এড়ানো যাবে না।

যাই হোক চীনারা বুঝেছে আগে যা-ই হয়ে থাক ভারতের স্বার্থের বিরোধী এবং ভারতের পক্ষে অপমানজনক কোনো শর্ত ভারত সরকার মেনে নিতে পারবেন না। পূর্বে যেখানে ভারতীয় সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল এরূপ অঞ্চল সম্পর্কে যদি চীনাদের একতরফা ডিমিলিটারাইজেশনের শর্ত চালু করা হয়ে থাকে তবে সেটা অনির্দিষ্টকাল অলঙ্ঘিত থাকবে না ভারত সরকার সেখানে তার ন্যায্য অধিকার শীঘ্র হোক বা বিলম্বে হোক প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হবেন – একথা চীনারা বুঝেছে। সেই জন্যেই চীনাদের নতুন করে এই সমরোদ্যোগ। চীনারা বুঝেছে যে, ভারত সরকার অনির্দিষ্টকাল 'কলম্বো প্রস্তাব-গুলি'র দিকে চেয়ে বসে থাকতেও পারবেন না। সেই জন্যে আগে থাকতেই চীনারা প্রস্তুত হচ্ছে: যাতে ভারতের দিক থেকে কিছু করার সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়ামাত্রই চীনারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

এখন ভারতবর্ষ আগের চেয়ে অনেক সতর্ক হয়েছে এবং চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তার প্রস্তুতিও ক্রমশ এগুচ্ছে। সুতরাং চীনাদের যদি আক্রমণ করার পরি-কল্পনা থাকে তবে তার আগে তারা যথেষ্ট তোড়জোড় করবে। সেইরকম তোড়জোড়ই চলছে এবং চীনারা আক্রমণ করতে পারে—এরূপ সম্ভাবনার কথা সরকার দেশবাসীকে জানিয়েছেন। কীভাবে কোথা দিয়ে সেই আক্রমণ আসতে পারে সে বিষয়ে সরকার যা জানেন তা সব প্রকাশ করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। চীনা আক্রমণ হলে তার প্রতিরোধ করার কী ব্যবস্থা হচ্ছে তারও সব কথা প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু দেশবাসীকে একেবারে অন্ধকারেও রাখা ঠিক নয়। অতীতে অনেক সরকারী আশ্বাসবাক্য প্রচারিত হয়েছে কিন্তু কার্যকালে সেগুলি অনেকক্ষেত্রেই অসার বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেই জন্য মানুষের মনে সত্যকারের এই বিশ্বাস জন্মানো দরকার যে, চীনারা আক্রমণ করলে এবার তারা সহজে নিষ্কৃতি পাবে না।

যুদ্ধের সব কলাকৌশল সাধারণের বোধ-গম্য হবে না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মন আশ্বস্ত হতে চায়। সেটা হচ্ছে বিমান শক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে। তিব্বতে ঘাটি করে যুদ্ধ করতে চীনারা যে-সুবিধা পাচ্ছে সেটা নষ্ট করতে হলে বিমানশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। ভারত বিমানশক্তির প্রয়োগ করলে চীনারাও করবে এবং সম্ভবত চীনারা তার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি এখনো সাধারণের নিকট খুব স্পষ্ট নয়। বর্তমানে ভারতের নিজস্ব যে বিমান বহর আছে তার দ্বারা বিমান যুদ্ধে চীনাদের কাবু করা যাবে কিনা সন্দেহ। তাহলে ভারতের বিমানশক্তি কিভাবে বাড়ানো হচ্ছে এবং পরিপূরক হিসাবে অন্য কোথা থেকে বিমানশক্তির সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এবং পাওয়া গেলেও তা কীভাবে নেওয়া হবে এ সব প্রশ্নের উত্তর সাধারণের নিকট স্পষ্ট নয়। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে হলে, এসব বিষয় পরিষ্কার করে তাদের জানাতে হবে। এগুলো দূরপাল্লার প্রশ্ন নয়। পণ্ডিতজী পার্লামেণ্টে যে-বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে সাধারণ লোকে বুঝবে যে, চীনারা এক মাস দু মাসের মধ্যে অথবা তাদের সুবিধা মতো যে কোনোদিন আবার আক্রমণ শুরু করতে পারে। দূর-ভবিষ্যতের জন্য কী প্রস্তুতি হচ্ছে সেটাও অবশ্য চিন্তার ও জানবার কথা, কিন্তু এখনকার সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে সেটা আরো বেশী জরুরী প্রশ্ন, যার উত্তর আর একদিনও অস্পষ্ট থাকা উচিত নয়।

২৯-৩-৬৩

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় ৮৩৪ পৃষ্ঠায় ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কম্পানির **'লেক্স'** সিগারেটের বিজ্ঞাপনে **প্রতি ২০টির মূল্য ৭০ নঃ পঃ** পড়িতে হইবে।

ভ্রূণাক্ষরে

ভ্রূণাক্ষরে। রসজ্ঞ বন্ধুজন হিতোপদেশ দিয়েছিলেন এই কেমন-কেমন নামটা শিরসি মা লিখ। বরং বল, ঘুণাক্ষরে। তাতে অর্থের হেরফের যা হত, তা অবিশেষ, অথচ জোড়া জোড়া ভুরু অবাক-ধনুক হত না। তবু সহৃদয় সুপারিশসমূহ খারিজ করে 'ভ্রূণাক্ষরে'ই শিরোধার্য রাখলুম। শ্লীল নাকগুলি সেক্সের গন্ধ পায় যদি পাক।

ভ্রূণাক্ষরে, অর্থাৎ অবয়বে যা পুরন্ত হয়নি; যা প্রাণের অপূর্ণ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি মাত্র—দিনের পর দিন ছিল ঠান্ডা হিমঘরে। কড়ার করেছিলুম তাদের সাকার করব। কথার খেলাপ হয়েই চলেছিল। এই পর্যায় বস্তুত কমসম বুঝে পড়ে দিয়ে খেলাপ-কথার বকেয়া মেটানো। সেই বৈরাগীর কথা মনে পড়ছে যে ধরটর ছেড়ে একেবারে বেরিয়ে পড়ার আগে খাঁচা খুলে একের পর এক পোষা পাখি উড়িয়ে দিয়েছিল।

"আর লিখছেন না না?"

"লেখা তেমন দেখিনে কেন আর?"

অনুরাগী কৌতূহল কুশসম বেঁধে। জবাবদিহি দিতে দিতে জান যায়। লিখিনে, কথাটা একেবারে কাঠগড়ায় হলপ করা সত্য কি? লিখি তো, মনে মনে, অজস্র অক্ষরে। লিখেছি তো আগে। থাকেনি। পউষের ঝর্ঝর পীত-পাতা বনস্থলীতে কত কথা লেখে, তা কি থাকে? কিংবা শার্সিতে বৃষ্টির বিগলিত লেখা?

শুধু লিখতে নয়, বিঁধতেও জানা চাই। লেখাকে আমি ছেড়েছি না লেখা ছেড়েছে আমাকে, এই তালাকি মামলায় হাকিম চূড়ান্ত রায় আজও দেননি। অপেক্ষায় আছি।

তার আগে রথের মেলায় দেখা সেই মেয়েটির কথা টুকে রাখি। হাতে একটা টিনের বাঁশি মেয়েটি রোগা-রোগা শেষ-মেলায় একলা হয়ে এক পাশে ছিল। তার বাবা তাকে বসে গেছে, এখানে বসে থাক, বলে গেছে, আমি ফিরব। কখন ফিরবে, মেয়েটি সেই ম্রিয়মাণ অপেক্ষায় ছিল।

ওই মেলার শবরী মেয়েটির সঙ্গে আমার লেখার মুখের আদলে কোন মিল আছে কিনা জানি না। কোন দিন কোথাও তাকে 'ফিরব' এই অরক্ষিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছি কি?

রাইটার্স নোটবুকে? প্রথমবারে—প্রথম বলেই—গৌরচন্দ্রিকাটাই ঝুলে-বহরে কিঞ্চিৎ বড় হয়ে পড়ল, সুতরাং রোমন্থন দন্ডটিকে এবার রেহাই দেওয়া যাক। হলদে পাতায় জড়ো করে রাখা বাসী হরফগুলো খুঁটে খুঁটে কাজ নেই, বরং টাটকা টাটকা দু-একটি অনুভূতি পরিবেশণ করি।

*

পক্ষকালের বেশি নয়, তবু দক্ষিণে-ঘটানো চুরি-করা দুটি ছুটির দিন স্বপ্নস্মৃতির মত মনে হয়। মহাবাহু মহানগর আমাকে সবলে তুলে সেখানে উৎক্ষেপ করেছিল।

মোল্লার দৌড় বহুকাল ছিল ডায়মন্ড-হারবারের মসজিদ, বড়ো জোর আরও দু-পা বাড়িয়ে বড়জোর কাকদ্বীপ। এধারে কার্নিং ওধারে নামখানা। রবারের নল পরানো গাড়ির কৌপীন জুতো তার চেয়ে দূরের নাগাল পায় না।

সাহসের লাগি ঠেলে কৌতূহলের পক্ষ তুলে আর একটু দক্ষিণে নৌকো ভাসিয়েছিলুম।

না, সিংহল সমুদ্র কিংবা মালয় সাগর—কিংবদন্তীর সেই অস্পষ্ট ধূসর জগৎ নয় তার চেয়ে কাছাকাছি ছেঁড়াখোঁড়া পুরোনো মায়ার ক্রিস্টের মত তটভূমি। অধুনা ভঙ্গ বঙ্গদেশের মানচিত্রটি স্মরণ করুন। প্রকৃতি সেখানে খেলা ছিল, উন্মাদ বেদেনীর মত ঝুরি খুলে শত শত স্রোতের কালনাগিনী নিয়ে নিয়ত তার খেলা। আবার কখনও নারিকেলবাড়িতে নীলপল্লবে সে স্থির এবং আয়ত্ত। দিগ্বিদিক থেকে উড়ে-আসা হাজার-হাজার মুসাফির পাখি। অলস রোদে চড়ায়-চড়ায় কুমীরের কাপুরুষ পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

না, অতদূরে যাইনি। অসুর-অরণ্যের দেওয়ান বাঘের হুংকারে রোমাঞ্চিত হবার সাধ এবারের মত শিকেয় তোলা রইল।

তবু যে রাত্রে হঠাৎ-হাওয়ায় চওড়া নদীর বাঁকের খরখরে স্রোতে আমাদের নৌকো বিষম দুলেছিল সবেধন নির্ভর লণ্ঠনটাকে আমরা কিছুতে নিবতে দিইনি। দেবতার গ্রাসের করাল দাঁত আর করাত জিভ দুই-ই দেখতে পেয়েছিলুম, সেই সত্যবু রাত্রিও ভোর হল। দেখলুম সংকীর্ণ কিন্তু সস্নেহ খাঁড়িতে আমাদের নৌকো বাঁধা। অশেষ ধর্ষণে অবসন্ন পাল কাঠের পাটাতনে লুণ্ঠিত। দিগন্তে বড় গাঙের আভাস। মহোল্লাসে শিশুসূর্যের কাটমুন্ডু চিবিয়ে ছিন্নমস্তা নদী রক্তের ফিনকি তুলছে।

পা টিপে টিপে তখন ডাঙায় নেমেছি। নরম মাটি, মানুষের পায়ের দাগ বিরল।

কতদিনের চর এটা? করে জেগেছে?

মাঝিরা পিছে-পিছে উঠে এসেছিল। সঠিক জবাব কেউ দিতে পারল না। কত দিনের, কে জানে। কেউ বলল, কত আর—বিশ-পঁচিশ বছরের হবে। প্রতিবাদ করে কেউ বলল, না-না, অন্তত পঞ্চাশ বছর আগেকার।

এখনও পত্তন হয়নি?

হয়েছে, হচ্ছে, হবে। প্রকৃতির খাসমহল এখনও সরকারের খাস, কৌমারহর কৃষিও এল বলে। উর্বর ভূগোল আজ একে তৈরি করেছে, কালে-কালে বন্ধ্যা ইতিহাসের হাতে তুলে দেবে।

সেই ইতিহাস যতক্ষণ এগিয়ে না আসে, ততক্ষণ এই মাটিকে একটু দেখি। যেটুকু জানা আমার জরুরী তা তখনই জানা হয়ে গিয়েছিল।

জ্ঞানাবধি শুনেছি এই বুড়ী-দাই দুনিয়ায় আমরা বড় দেরিতে এসেছি, যখন ওর তিনকাল গেছে মুহ্যমান এককাল মোটে বাকী। নতুন জাতের প্রাণ কোলে তুলে ও আর নাচাবে না, পুরোনো কটিকেই বড়জোর আরও কিছুকাল নেড়েচেড়ে রাখবে।

আমরা যখন এসেছি তখন সব রেডিমেড, সব শীতল অমেধ ধাতুপিণ্ডের মত গুরুতের অনড়, ধ্রুব অতএব অক্ষম—আঁটসাঁট ইঁটকাঠের সভ্যতার ইন্দ্রিয়বোধে অসাড়।

কিন্তু কলকাতার ঈষৎ দক্ষিণে পরমাশ্চর্য প্রান্তরে এ কী নিষিদ্ধ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলুম!

যে-প্রকৃতি অ-যুবতী-জরতী, যাকে সংহৃত-ঋতু বলে জানি, অসংবৃত জনান্তিকে সে তবে এখনও অবিরত, লোকলোচনের আড়ালে তার আদিমতা স্বগত? তার রগে-রগে গর্হিত ইচ্ছা সোৎসাহ স্রোত হয়ে ফুঁসে ওঠে, রোজ সকালে সবুজ-তরমুজ সূর্য জবাই করে সে তার উৎসারিত হৃদ্‌রক্ত পান করে।

প্রকৃতি আজও প্রসূতি।

এই সত্যের আকস্মিক সাক্ষী নগরপোষা এই জীব অতঃপর ফিরে এসেছে নগরে। কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা বহন করে। ফিরে যাবে। যখন ধোঁয়ায় ধুলোয় আক্রান্ত তার কষ্ট হবে, তখনই সে আবার সেখানে যাবে। কয়েক মাইল ভাঁটি নয়, যেন কয়েক আলোক-বর্ষের উজানে। সেখানে এখনও তিল তিল মাটি দিয়ে তৈরী হয় বদ্বীপ জমি চিরে চিরে নিপুণ অঙ্কুর ফুটে ওঠে।

গরমে ছিমছাম বাটার স্যাণ্ডাল

গরমের পথে ঘোরাফেরা সবচেয়ে ভালো স্যাণ্ডালে। স্যাণ্ডাল কেমন না-জুতো, না-চটি, পা-ঢাকা নয়, আবার পা-খোলাও নয়। গরমের তেজ থেকে বাঁচাবে, আবার হাওয়াও খেলাবে। পথিকের প্রিয় তাই বাটার স্যাণ্ডাল। হাজার রোদেও তাজা, ফিটফাট গঠন, উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যাণ্ডাল।

Bata

শিল্পীর স্বাধীনতা

সত্যজিৎ রায় (signature)

প্রশ্ন : শিল্পী কারা?

উত্তর : যাঁরা রসসৃষ্টি করেন তাঁরা শিল্পী।

প্রশ্ন : যাঁরা রসগোল্লা সৃষ্টি করেন তাঁরাও কি শিল্পী?

উত্তর : না। তাঁরা কারিগর।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা কী বস্তু?

উত্তর : যে অবস্থায় বাইরের নিষেধ থাকে না সেই অবস্থার নাম স্বাধীনতা।

প্রশ্ন : অন্তরের নিষেধ যদি থাকে?

উত্তর : অন্তরের নিষেধ আমরা মানতে পারি, না মানতেও পারি, সেখানে আমাদের স্বাধীনতা আছে।

প্রশ্ন : শিল্পীর স্বাধীনতা কাকে বলে?

উত্তর : যিনি নিজের রুচি সংস্কৃতি এবং ইচ্ছা অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করেন তাঁকে আমি স্বাধীন শিল্পী বলি।

প্রশ্ন : মনে করুন, কেউ যদি লোভের বশবর্তী হয়ে বড়লোকের স্তুতি বচনা করে, তাকে কি স্বাধীন শিল্পী বলব?

উত্তর : স্বাধীন বলতে পারো, শিল্পী না বললেও চলে।

প্রশ্ন : শিল্পীকে আইন মেনে চলতে হয়। তাতে তার স্বাধীনতার হানি হয় না?

উত্তর : ভাল আইন স্বাধীনতা হরণ করে না, উচ্ছৃংখলতা দমন করে। কিন্তু এমন কয়েকটি রাষ্ট্র আছে যেখানে শিল্পীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অধিকার নেই, রসসৃষ্টি করবার অধিকার নেই, সত্য কথা বলবার অধিকার নেই। আমাদের দেশেই ইংরেজের আমলে এ অধিকার ছিল না, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। এমন আরো উদাহরণ আছে।

প্রশ্ন : কিন্তু রাষ্ট্রকে বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচানো কি রাষ্ট্রপতিদের কর্তব্য নয়?

উত্তর : অবশ্য। যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় মানুষ বিশেষ আইন তৈরি ক'রে নিজের স্বাধীনতা নিজে খর্ব করে। সেটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, অস্বাভাবিক অবস্থা। রোগ হলে গায়ে ইন্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে রোগ সারাতে হয়।

প্রশ্ন : তাহলে দাঁড়ালো কি? শিল্পীর স্বাধীনতা বস্তুটা কী?

উত্তর : শিল্পীর স্বাধীনতা অতি সাধারণ বস্তু। স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষ যে-সব স্বাধীনতা ভোগ করে তারই একটা। যদি কোনো শিল্পী স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন ক'রে উচ্ছৃংখলতা করেন, অশ্লীলতা করেন, তাঁকে শাসন করার জন্যে আইন আছে। যদি কেউ রাষ্ট্রবিপ্লব প্রচার করেন তাঁকে শিল্পী বলব না প্রচারক বলব, অপপ্রচারককে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী চিরদিনই স্বাধীন। যে দেশে রাষ্ট্রীয় মতবাদ শিল্পীর স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে সে-দেশে প্রকৃত শিল্প তৈরি হয় না। খাঁচায় বন্ধ পাখি ডিম পাড়ে না।

সদা সতর্ক থাকুন—ভারতের প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন

ফাদার দাতিয়েন
ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

বিহার-ফেরৎ

খেয়েছি ছাতু, দেখেছি রাঁচি, থেকেছি বিহারে নিঃসন্দেহ মৎস্যহীন সুদীর্ঘ তিন বছর। পড়োশী ছিল পিঁজরাপোলের হাড়।জিরজিরে ষাঁড়।

জায়গাটা ছিল স্বাস্থ্যকর, দৃশ্যও ছিল মনোজ্ঞ, ভাষা ছিল রাষ্ট্রভাষা। পালিয়েছি..

ফিরেছি কলকাতায়, পাঠানকোট-এক্স-প্রেসে; নেমেছি হাওড়ায়, ঠেলতে ঠেলতে

জুতো পরি না আমি পরি চটি।

ঘুরেছি পথ, দুর্গো-পুজোর ভিড়ের [illegible] স্রোতে—কুলিদের অবাঞ্ছিত [illegible]। বেরিয়েছি। অবিশ্বাস্য ঠেকলেও [illegible]। বাঁ হাতে স্যুটকেস, ডান হাতে [illegible]

কেনা 'আশ্চর্য মলমের' এক কৌটো, বিদ্যা-সাগরের এক বর্ণপরিচয়, এক ঠোঙা চানাচুর আর ইঁদুর-মারার ওষুধের এক শিশি। কাজে লাগবে না। না লাগুক...ওরা তো আমার নয়া পয়সা কাজে লাগাতে পারবে বেশ। বুটপালিশদের অবশ্য নিরাশ ক'রে বিদায় দিতে হল: জুতো পরি না আমি, পরি চটি।

বাবলু সরকার

"আপনি না আমাদের নতুন ফাদার?"

মাথা নাড়লাম সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে, আর ভদ্রতার খাতিরে প্রতিপ্রশ্ন করলাম, "এবার তোমার নামটি জানতে পারি কি?"

ওর নিজের নাম কেন, বাবার নাম, মায়ের নাম, দাদু দাদা দিদিদের নাম, আর ছোট্ট বোনের ভাল নাম, স্কুলের নাম আর ডাক-নামের রহস্যোদ্ঘাটন করার গুরুতর কোনো বাধা না দেখে, সেণ্ট পিটার্স হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান বাবলুকুমার সরকার নিঃসঙ্কোচে জানাল ওর চোদ্দ বাঙ্গাল পুরুষের বংশক্রম, বাড়ির ঠিকানা আর কুকুরের কুলজি...

আমি শুধু "চমৎকার...চমৎকার..." ব'লে উৎসাহ দিতে থাকলাম, যদিও ওসবের চমৎকারিত্ব ঠিক যে কোথায়, ভেবে উঠতে পারছিলাম না।

নতুন ফাদার

"আপনিই না কি আমাদের নতুন [illegible]

জাতে বেলজি, কিন্তু পরমেশ্বরের আশীর্বাদে, পরমেশ্বরের অকল্পনীয় আহ্বানে, নূতন-অভিষিক্ত খ্রীষ্টযাজক—ফাদার।

ঘুরেছি খুব, হাতিঘোড়া আর উত্তরপথে, জ্ঞানের অন্বেষণে। ধর্ম দর্শন নীতির গ্রন্থাগারে—আর, হায়, [illegible]—পড়েছি আর লিখেছি খুব। পড়তে পড়তে ঘুমিয়েছি, লিখতে লিখতে পায়ে ফেলেছি মাথার ঘাম। চাকরির আশায় নয়, ভগবানের ডাকে। অনেকে জানে না, বাবলু কিন্তু জানে। বাবলু তো ছোটবেলা থেকেই ফাদারদের আলখাল্লার সঙ্গে পরিচিত: গির্জার উপা-সনায় কিম্বা বিদ্যায়তনের নীতিশিক্ষণে—ফাদার; ছোট বোনের দীক্ষাস্নানে কিম্বা দিদির বিবাহসংস্কারে—ফাদার; ঠাকুরদার

পকেট উজাড় করে দিলাম...

রোগশয্যায় কিম্বা ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিতে—ফাদার।

পকেট উজাড় ক'রে দিলাম বাবলুর প্রসারিত হাতে। কে বলেছিল লাগবে না কোনো কাজে?...বর্ণপরিচয়টা ছোট বোনকে দেব হাতে-খড়ির উপহার," বাবলু বলল, চানাচুর রোমন্থনের আলস্যমিশ্রিত ভঙ্গিতে, "আর আপনার

সেই আশ্চর্য মলমটা না, ইঁদুরের ওষুধের সঙ্গে মিশিয়ে বানাব ঘুড়ির মাঞ্জা।"

ক্রিকেট-ক্যাপ্টেন

বাবুলের সঙ্গে প্রথম থেকেই জমল বেশ।

"ভাল কথা...ক্রিকেট জানেন?...ফাদার স্টিফান তো পয়লা নম্বর খেলোয়াড়......আমাদের ফার্স্ট ইলেভেনের ক্যাপ্টেন ছিলেন। আর জানেন, সেঞ্চুরি করেছিলেন সে দিন সেণ্ট লরেন্সের মাঠে।" জানালাম, ক্রিকেট খেলতে জানি বটে, তবে সত্যের খাতিরে এটাও আমাকে স্বীকার করতে হল বাংলা দেশে আমার চেয়ে বেশ দুয়েকজন ভালো ব্যাটস্ম্যান আছে। কিণ্ডারগার্টেনে অবশ্য লাট্টু ঘোরাবার প্রতিযোগিতায় পেয়েছিলাম একটা কাপ্, আমার খেলোয়াড়-জীবনে প্রাপ্ত ওই একটিমাত্র কাপ্—এখনও আছে সুদূর সেই বেলাজিরামের এক গ্রামে, পৈত্রিক গৃহের এক তাকে, বৃদ্ধ মায়ের স্নেহাচ্ছন্ন সংরক্ষণে। আর গুলিও খেলতে পারতাম মন্দ নয়।

কাজেই বাবুলকে বললাম, আমি ফাদার স্টিফানের স্থলাভিষিক্ত বলেই ওরা যদি আমাকে খেলার দলের ক্যাপ্টেন করতে চায়, আমি বরং হব লাটিম-টীমের ক্যাপ্টেন। আর যদি ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন হওয়া আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন...বাবুলকে স্মরণ করাতে বাধ্য হলাম ক্রীড়া-জগতে নিষ্ক্রীড় ক্যাপ্টেনের জন্যও বিকল্প ব্যবস্থার অনুমোদন আছে।

নেট্ প্র্যাক্টিস

"তাহলে খেলোয়াড়দের যোগাড় করে আনি, কেমন?... আড়াইটের সময় খেলা, মাক্কেনবাবুর মাঠে। আসবেন তো ঠিক?"

"আসব ঠিকই", উত্তর দিলাম যন্ত্রচালিত নিরুৎসাহ কণ্ঠে, পাঠানকোট-এক্সপ্রেসে পাঁচ-ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তির পর ন্যায়োপার্জিত দিবানিদ্রার আশা ছেড়ে।

"কোন্ টীমে যোগ দেবেন...তোতন মিস্তির না সুধাংশুর?..." জানালাম ও দুজনের মধ্যে আমার সত্যি সত্যি কারও প্রতি পক্ষপাত নেই—ওরা যতক্ষণ আমাকে নিয়ে স্থৈর্যশীল আর দীর্ঘসহিষ্ণু।

বাবুলের মুখমণ্ডলে অঙ্কিত অবজ্ঞা-মিশ্রিত এক বিতৃষ্ণার রেখালেখা দেখে বুঝলাম, সেণ্ট তেরেজার গির্জায় আর সেণ্ট পিটার্স স্কুলে আমি যদি একান্তই আমার পূর্বসূরী ফাদার স্টিফানের সাফল্য আর জনপ্রিয়তার উত্তরাধিকারে উৎসুক, আমাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে ক্রিকেটের প্রতি আমার এই জন্মগত নির্বেদ।

এইভাবে কর্মক্ষেত্রে নামামাত্রই উপলব্ধি করলাম আমার যাজকীয় ট্রেনিং-এর মহতী পরিপূর্তির পথে অন্তরায়—নেট্ প্র্যাক্টিস।

ট্রামে-বাসে

সংবাদে বলা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন অ্যাগ্রিকালচারের উপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা নিরাপদ নয় এবং তাহা স্বাস্থ্যেরও অনুকূল নয়। খুড়ো

বলিলেন—"সেই জন্যেই কালচারাল অনুষ্ঠান, অভিযানাদির ওপরে অতিরিক্ত নির্ভরশীল হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ!!"

গবাদি পশু যেগুলি কোন কাজে আসে না, সেইগুলির সংখ্যা খুব বেশী এবং শুনিলাম সরকার এই পশু-বৃদ্ধি সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিতেছেন না।—"সমস্যা সত্যিই কঠিন। কাজে লাগে না এমন পশু খুঁজে বের করা শক্ত বই কি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

সরকার আশ্বাস দিয়াছেন—কলিকাতা শহরে মাছের অভাব অবশ্যই মিটিবে।—"সরকার বাহাদুর নিঃসন্দেহে

সদাশয়, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—এই নিয়ে ক'বার হল?"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রখ্যাত ইংরেজ চলচ্চিত্র অভিনেতা ট্রেভর হাওয়ার্ড নাকি সাংবাদিকদের কাছে বলিয়াছেন—'আমি ক্লান্ত। এখন শুধু একটি বাসনা নিয়ে আছি। নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমোবার বাসনা।'—"বাসনা তাঁর চরিতার্থ হয়ত হবে, কেননা তাঁর নিজের দেশে সরস্বতী পুজো নেই এবং কাজে কাজেই সেই সারারাত মাইক চালাবার রেওয়াজ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ও[illegible] জেনারেল [illegible] দশ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।—"ব্যাপারটা অবশ্য খুব [illegible] হ্যাঁ, কিন্তু একটু খেয়াল রাখার ব্যবস্থাও এই সঙ্গে হচ্ছে কি?"—বলে শ্যামলাল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে কিশোরদের মনে দেশপ্রেম, শৃঙ্খলাবোধ ও সুনাগরিকত্বের আদর্শ সঞ্চারের জন্য যে জাতীয় শৃঙ্খলা প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার অধীনে আসিবে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ স্কুল ছাত্র। বিশু খুড়ো বলিলেন—"সুসংবাদ সন্দেহ নেই। ছাত্রদের একটা হিল্লে যা হোক হবে কিন্তু এই সঙ্গে অভিভাবকদের জন্য অনুরূপ কোন প্রকল্পের ব্যবস্থা না হলে যে সবই বানচাল!!"

উড়িষ্যা রাজ্যে নাকি এক কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষের উপর নিরক্ষর আছে—জানাইয়াছেন সেখানকার শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসরস্বতী প্রধান।—"তা হলে স্বং স্বং আর কোথায় করব"—সখেদে বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে নাকি জনগণকে কম কেরোসিন ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এতে ট্রেড সিক্রেট কিছু নেই, সমস্যা সমাধানের মেড ইজি নোট মাত্র!!"

রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত 'ক্ষুধা হইতে জনগণের মুক্তি' সপ্তাহ সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অথচ অনেকেই, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, এই সংবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নহেন। এতে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রচার ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটিই সূচিত হচ্ছে!"

নিউ ইয়র্ক টাইমস কাগজে নাকি বলা হইয়াছে যে চীন বহির্মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা করিতে পারে।—"সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কটার কি তালাক দেওয়া হবে"—প্রশ্ন করে শ্যামলাল।

১৯৬০/৬৪ সালে বোম্বাইর মহালক্ষ্মীতে নাকি বিদ্যুৎ আলোকিত মাঠে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে।—"বিদ্যুৎশক্তির অভাব এখানে বাধা হবে না, কেননা ঘোড়া একটি বোবা অ্যানিম্যাল, তাছাড়া যাঁরা ব্যবস্থা করছেন তাঁদের সঙ্গের সঙ্গে শিবরাত্রির সলতের মতো "সজেন" শব্দটা এখনো টিম্‌টিম করছে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

'কথায় ও কাজে দেশের সেবা করুন'—জরুরী অবস্থার একটি স্লোগান। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ব্যবস্থাটা 'হাফাহাফি' হোক অর্থাৎ কাজের বদলে কথাটা থাক; সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি-র ব্যবস্থা তো শাস্ত্রসম্মত!!"

বিধান সভার বাজেট অধিবেশনের শেষের দিকে বিষম বিশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করিয়া সংবাদদাতা বলিতেছেন—বৃহস্পতিবার সভাকক্ষে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে।—"আবহ বার্তায় এর কোন পূর্বাভাস না থাকলেও, বঙ্গোপসাগরে একটা 'ডিপ্রেশনের' কথা অনেকেই জানেন, সুতরাং ঝড় যে অনিবার্য তা আর বিচিত্র কী"—বলে শ্যামলাল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন আশ্বাস দিয়াছেন — বাংলায় দুর্ভিক্ষ হইতে দিব না। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা শুনে সত্যিই আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু এই সঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করব, দুর্ভিক্ষের 'পদধ্বনির' টেপরেকর্ডটি ইরেজ করার ব্যবস্থার কথাও যেন চিন্তা করা হয়!"

এক সংবাদে শুনিলাম বাশিংটনে নাকি এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা রোগ বীজাণু বিনষ্ট করে।—"এ ব্যাপারে প্রশংসার দাবি রাশিয়া অবশ্যই করতে পারেন, অন্য অনেক ধরনের চমৎকার বস্ত্রের পোশাকে শিবের অসাধ্য নানা রোগের প্রাদুর্ভাবই বরং আমরা বরাবর দেখে আসছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

চণ্ডীগড় হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে শুনিলাম পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, মদ্যপান বন্ধের উপায় হিসাবে তিনি ক্রমাগত করভার বাড়াইয়াই চলিবেন

এবং তাহাতেই মদ্যপায়ীরা বাধ্য হইয়া মদ ছাড়িবে।—"ভুল স্যার, ভুল। করভার সামলানো আর কিছু মাথার ভার, মানে মাথা ধরা সারাবে কী দিয়ে"—[illegible] বলিয়া উঠিলেন।

ঢং ঢং ঢং...।

তিনি অস্ফুটে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে গুণতে লাগলেন, চার, পাঁচ...দশ-এগারো-বারো।

ঘরের দেওয়ালে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল যেন চুপি চুপি। একটা ফেনিলোচ্ছল উচ্ছাস যেন সেই শব্দে চাপা পড়ে রয়েছে। একটি উন্মত্ত হাসি যেন এই অন্ধকারে থমকে রয়েছে। প্রাণের চির আবদ্ধ, চির অচেনা সেই হাসি থমকে রয়েছে ঘরের এই অন্ধকারে, নির্বাক দেওয়ালে, বাইরের সীমাহীন স্তব্ধতায়। একটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। একটি মুহূর্তের, স্রোতমুক্ত তরঙ্গে রাশি রাশি আনন্দধারায় ফেটে পড়বার জন্যে। একটি বিস্মিত আনন্দস্ফুট ধ্বনি রুদ্ধ হয়ে আছে যেন সর্বত্র, বেজে উঠবে বলে।

আর এ সবই আবর্তিত হচ্ছে ও'র বুকে। গোকুলচন্দ্রের বুকে, নিঃশব্দে আবর্তিত হচ্ছে। সেই আবর্তকে শান্ত করবার জন্যেই যেন বুকের ওপর দু'হাত চেপে রেখেছেন। কিন্তু পারছেন না। বরং একটা উত্তেজনা বোধ করছেন। তাই নিঃশ্বাস দ্রুত, অসহজ হয়ে উঠছে। ঘুম তো দূরের কথা, এই শীতার্ত পৌষ রাত্রিতে ও'র সর্বাঙ্গে যেন উষ্ণ তরঙ্গ বইছে। ঘেমে উঠছেন বা। উন্মত্ত হাসি এবং আনন্দস্ফুট ধ্বনি ও'র গলাতেই এসে থমকে রয়েছে। একলা ঘরে, চুপি চুপি উচ্চারণ করলেন, 'বারোটা! বারোটা বাজল! শুভেন আসবে ভোর ছটার সময় আমাকে নিতে। আমাকে নিয়ে যেতে সেইখানে...সেইখানে...যেখানে সেই একবার গেছলাম। তারপর তারপর...।'

বুকের ওপর থেকে দু' হাত তুলে নিয়ে মুখের ওপর চাপা দিলেন গোকুলচন্দ্র। যদিও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তবু চোখ ঢাকা দিলেন হাত দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে রইল। আর রুদ্ধ নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ও'র প্রাণের মধ্যে সেই বাতাসে ভাসা ওষুধের গন্ধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে [illegible] অন্তর্হিত

ফুটে ওঠে, সেই ওষুধ গন্ধবিধুর হাস-পাতালের প্রাঙ্গণ ও'র চোখের ওপর ভেসে উঠল। কত বছর যেন! আট, আট আর পঞ্চাশ, আটান্ন। পঞ্চাশ বছর আগে হাসপাতালের ইঁট বাঁধানো প্রাঙ্গণে সেদিন সকালে শুকনো পাতা ছড়িয়েছিল। [illegible] বছরের গোকুল বিধবা মায়ের হাত [illegible] ঢুকল সেখানে। চোখে অনবরত জল কাটছে। দৃষ্টি অস্পষ্ট ঝাপসা। তাই বারে বারে ভ্রূ কুঁচকে, চোখের ভিতরের প্রতিটি শিরা উপশিরা অতিরিক্ত টান টান করে, বড় বড় চোখে গোকুল দেখছিল সব কিছু। ওষুধের গন্ধ নাকে ঢোকা মাত্র মায়ের হাত আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছিল। অস্পষ্ট ছায়া হলেও, মানুষগুলোকে অসুস্থ আর রুগ্ন বলে চিনতে পারছিল। যন্ত্রণা কাতর অস্পষ্ট একটা দূরাগত গোঙানি বুকের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল। মাথার ওপরে প্রকাণ্ড গাছটা থেকে টুপ টাপ পাতা পড়ছিল খসে। মনে আছে, ও'র কপাল ছুঁয়ে, গা বেয়ে একটা পাতা পড়েছিল। গোকুল সেটা ধরতে যাচ্ছিল। আর তখুনি আকাশের ওপর হাত তালির মতো শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখেছিল, এক ঝাঁক পায়রা

গাছ থেকে হাসপাতালের ইমারতে গিয়ে বসল। যতোই ভিতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততোই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল পায়রার বক্‌বকুম। আর অবাক হয়ে ভাবছিল, হাসপাতালে পায়রা থাকে। ওদের ভয় করে না?

পরমুহূর্তেই প্রকান্ড ইমারতের উঁচু খাঁজে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলেছিল মা, ওখানে পায়রা দেখা যাচ্ছে, না?

মা তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছিস?

—পাচ্ছি। ওরা নড়ছে, তাই। হাসপাতাল থেকে ওদের তাড়িয়ে দেয় না?

কিন্তু মায়ের তখন কী যেন মনে হচ্ছিল। তিনি আর এক হাত দিয়ে গোকুলের কাঁধ ধরে গায়ের কাছে চেপে ধরেছিলেন।

হয়তো, গোকুল যে পায়রাগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল, তাতে আশা এবং ভয়ের আবেগে মায়ের গলাটা ধরে এসেছিল।

শুধু বলেছিলেন, না।

গোকুল আবার বলেছিল মা, হাসপাতালের বাড়িটা লাল।

—হ্যাঁ।

—ওই যে ফুলটা ফুটে আছে, ওটা হলদে কল্যাফুল না?

—হ্যাঁ।

—আকাশটা ঠিক দিদির পুজোর কাপড়ের মতো নীল, ঠিক না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা।

গোকুলের মনে হচ্ছিল, মায়ের গলাটা ক্রমেই সরু হচ্ছে, খাদে নেমে যাচ্ছে। গান গাইলে এক এক সময় যেমন হয়। গোকুল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। 'মা তখন বলেছিলেন, চল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ওই বাঁ দিকের ঘরটায় যাব।

হাসপাতালের 'চক্ষু বিভাগের' ঘরের দরজাটার সামনে গোকুল একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিছন ফিরে, মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মা, বড্ড ভয় করছে।

মা মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, ভয় কী! আমি আছি না।

মায়ের হাতের তলা দিয়ে, হাসপাতালের পাতা ঝরা বকাভ ইঁটের প্রাঙ্গণ গোকুল দেখতে পাচ্ছিল। ঝাপসা চোখে, গাছের ন্যাড়া ডালে পায়রাদের খুঁজেছিল। আর কেন যেন ওর শিশু প্রাণটা এক বিচিত্র আত্মরতায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল।

মা বলেছিলেন, চল, দেরী করিস না। ভয় কী! তোর চোখে কেবল তো ওষুধ দিয়ে দেবে।

গোকুল আস্তে আস্তে ঢুকেছিল সেই ঘরটায়। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ বসেছিল সেখানে। কিন্তু সকলেই প্রায় বয়স্ক। গোকুলের বয়সী কেউ না। আর গোকুল বেশ বুঝতে পারছিল, সকলেই চোখ দেখাতে এসেছে সেখানে। ডাক্তারবাবু বসেছিলেন চেয়ারে। আর আশ্চর্য! গোকুল অবাক হয়ে ভাবছিল, চোখের ডাক্তার, তাঁর চোখেও আবার চশমা কেন? কিন্তু ডাক্তারের মুখটা কেমন লাল মতো। কী ভীষণ বড় গোঁফ। গোকুল চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপরে অন্যমনস্ক হয়ে কখন বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, বাইরের রোদে একটা ছায়া ঘনিয়ে আসছে যেন। দিদির কাপড়ের মতো আকাশটা, জল ন্যাকড়া দিয়ে মোছা স্লেটের মতো হয়ে উঠছিল। পাতা ঝরা ন্যাড়া গাছটা হিজিবিজি দেখাচ্ছিল। মনে মনে বলছিল, ওষুধ দিলে আবার সব ঠিক দেখতে পাব। লাহাদের বাগানের সেই ফুলগুলো, ময়ূরটা, লাল থাম আর পাড়ার শেষে, গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর সেই ছোট ছোট ফুলগুলো, দিদি নাকে নাকছাবি করে পরে, আমি যেগুলো এখন একদম দেখতে পাই না, সেই—

—গোকুলচন্দ্র দত্ত—।

চমকে উঠেছিল গোকুল। মাকে আবার চেপে ধরেছিল। মা গলা তুলে বলে উঠেছিলেন, এই যে!

—নিয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবুর গলা। মা হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু গোকুলের চোখের পাতা টেনে টেনে দেখে শব্দ করেছিলেন, হুম্! তারপর শুইয়ে দিয়ে টর্চ লাইট জেলে দেখেছিলেন। এবং আলোর চকিত ঝলক সরে যেতেই, গোকুল আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু শুনতে পাচ্ছিলেন ডাক্তারের গলা, হুম্! আপনার ছেলেকে আজ চোখে একটু ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। তাতে কয়েক ঘণ্টা চোখ মেলতে কষ্ট হবে। আলাদা ওষুধ দিয়ে দেব, আবার কাল সকালে চোখে দিয়ে দেবেন।

কথা শেষ হবার আগেই গোকুল চোখের ওপর স্পর্শ অনুভব করেছিল। চোখের পাতা ফাঁক হয়েছিল, আর যেন তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো বিন্দু বিন্দু ওষুধ পড়েছিল। তীব্র একটা যন্ত্রণায় গোকুল চীৎকার করে উঠেছিল, উঃ, জ্বলে যাচ্ছে, মা, জ্বলে যাচ্ছে।

মা হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন। বুকের কাছে মুখটা তুলে নিয়েছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, একটু কষ্ট হবে বাবা, তারপরে সব ভাল হয়ে যাবে।

কিন্তু কষ্ট অসহনীয় বোধ হচ্ছিল। এত অসহনীয় যে, মাথার শিরগুলো ছিঁড়ে পড়বে যেন। অজ্ঞান হয়ে যাবে বুঝি। তীব্র যন্ত্রণায় চোখ বুজে, অর্ধচৈতন্য অবস্থায়, প্রায় মায়ের কোলে চেপেই বাড়ি ফিরেছিল। গলির কাঁচা নর্দমা, আর ভিতু ময়রার দোকানের গন্ধে টের পেয়েছিল, বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। বাড়িতে এসে, ঘরের মাটির মেঝের ওপর পড়ে চীৎকার করে আবার কেঁদেছিল গোকুল, মা, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে।

মা আর দিদি, দুজনেই বলেছিলেন, একটু, একটু সয়ে থাক গোকুল, সেরে যাবে। তারপরে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল

গোকুল। ব্যথা একটু একটু করে কমে গিয়েছিল। আর মনে আছে, স্বপ্ন দেখছিল। পাশে স্যাকরাদের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। মাঝারি বাতাস। ঘুড়িটার কোনদিকে একটু কাম্নিক নেই। সেই একেবারে নীল, রৌদ্র মাখা আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। বিশ্বকর্মা পুজো বুঝি আসন্ন। লাটাই ধরে, ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে গোকুল লাফিয়ে লাফিয়ে গাইছে, ঝিঙেফুল, কাঁকুড় কাঁকুড়, ও গেঁড়ি বউ মোনসা ঠাকুর!... গাইতে গাইতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেছিল, রাত হয়ে গিয়েছে। ঘর অন্ধকার। চোখ দুটি তখনও টন টন করছে। আর মনে পড়ে গিয়েছিল, সকালবেলার কথা। মা আর দিদির গলা বাইরে শোনা যাচ্ছিল। আরও নানান শব্দ, এমন কি স্যাকরাদের বাড়ির ঠুক ঠুক। গোকুল ডেকেছিল, মা।

মা তাড়াতাড়ি ঘরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যথা কমেছে?

গোকুল বলেছিল, একটু একটু আছে। বাতি জ্বালনি কেন?

—বাতি?

মা চমকে উঠে বলেছিলেন, বাতি? বাতি কেন? এখন যে বেলা দুটো, গোকুল।

গোকুল চকিতে উঠে বসেছিল। দু চোখ মেলে চারদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল, বেলা দুটো? তবে এত অন্ধকার কেন? মা, এত অন্ধকার কেন?

মা চীৎকার করে গোকুলকে প্রায় ছোঁ মেরে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, গোকুল! গোকুল, অন্ধকার কেন? এই দ্যাখ আমি আমি—।

—দেখতে পাচ্ছি না, মা, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মা গোকুলের চোখের অন্ধকারে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন। আর দিদির কান্নার শব্দও গোকুল শুনতে পাচ্ছিল তখন।

দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং করে একটি শব্দ বাজল। রাত্রি সাড়ে বারোটা না একটা, বুঝতে পারলেন না গোকুলচন্দ্র। চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে এনে আবার বুকের ওপর রাখলেন। নিঃশ্বাস আবার দ্রুত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরে সেই আবর্তই পাক দিয়ে উঠছে। সেই সহর্ষ উত্তেজনার উচ্ছ্বাস অশান্ত করে তুলছে। পঞ্চাশ বছর আগের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি তাঁকে ব্যথায় ডুবিয়ে দিতে পারছে না। হতাশায় অবশ করে ফেলতে পারছে না। বরং পঞ্চাশ বছর আগের সেই শেষ আলোর ঝলক, মহান সঙ্গীত শিল্পী গোকুলচন্দ্রের প্রাণের মধ্যে [illegible] যেন রুদ্ধ হাসির বেগে [illegible] স্বদেশীয় অন্তরে উপচে পড়বে [illegible]

ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

সমরেশ বসুর

সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

অ য় না ন্ত

এ যুগের মহান্ধকার যে-যৌবনকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু মৃত্যুহীন আত্মার ও বিবেকের সংগ্রামে যারা জয়ী হয়েছে, তাদের ঘনিষ্ঠ জীবনরহস্য লেখক উদ্ঘাটিত করেছেন। দাম—৬॥০

কথাকলি : ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—৯

চিন্ময় বঙ্গ

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন

জাতীয় সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য বা চিন্তাধারা বিস্মৃত হওয়ার ফলে যে সংকীর্ণ কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি হয়, তা-ই পরে হীন প্রাদেশিকতার বিষে পরিণত হয়। এই সংকীর্ণতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় : জাতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া এবং আপন ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ করে না রেখে তাকে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত করে দেওয়া। এবংমানসে মহামনীষী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থভুক্ত অমূল্য প্রবন্ধগুলিতে অতীত বাংলা দেশের চিন্ময় রূপটি বা বহুব্যাপ্ত গৌরবময় রূপটি বিভিন্ন প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে বহু পরিশ্রমে উদ্ধার করে বর্তমানের বাংলা ও বাঙালীর সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থটি আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে আত্মবিস্মরণের গ্লানি ও লজ্জা থেকে মুক্ত করে নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

তৃতীয় মুদ্রণ । দাম ৪·০০

চণক-সংহিতা

কালিদাস রায়

'চণক-সংহিতা' গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের সংকলন নয়; অম্ল-মধুর কয়েকটি রসরচনা এর অন্তর্ভুক্ত। রম্যরচনা বললেও বোধ হয় এর সঠিক চরিত্রটি প্রকাশ পায় না। প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি মৌল অভিজ্ঞতার সঙ্গে এইসব রচনায় যুক্ত হয়েছে প্রবীণ লেখকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি। সমাজ-জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা যেমন তাঁর লেখনীতে বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করেছে, তেমনি ফুটেছে তাদের জীবন্ত ও সরস করে তোলার পরিবেশনদক্ষতা। এই গ্রন্থটি প্রবীণ কবি ও রসজ্ঞ প্রাবন্ধিক কালিদাস রায়ের এক ভিন্নতর পরিচয়।

দাম ৩·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

বুকের ওপর দু' হাত চেপে, ফিসফিস করে বললেন, আবার! আবার!

নিজেকেই সম্বোধন করে বললেন; গোকুল আবার, আবার সেই পাতা ঝরা সকাল ফিরে আসছে। আঃ! কী আশ্চর্য! সেই পায়রা ওড়া সকাল, কলাফুল ফোটা সকাল তোমার চোখের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। কাল সে বেরিয়ে আসবে। এই গাঢ় অন্ধকার থেকে ভেসে উঠবে। তাই শুভেন আসছে।

হ্যাঁ, তাই শুভেন আসছে। প্রতিধ্বনিত হল ও'র ভিতরে। আর স্পর্শ দিয়ে অনুভব করা শুভেনের চেহারা ও'র সামনে ভেসে উঠল। স্পর্শ দিয়ে অনুভব করা সেই শক্ত চওড়া বুক, পুষ্ট কাঁধ, নিটুট চিবুক, দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটের কোণে ভ্রম্ধালু হাসি, সুইডেন থেকে ফেরা চক্ষু বিশারদ ডাক্তার শুভেন। গোকুল অনুভব করেছেন, ওর ঋজু শরীরের একটি অনায়াস দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। গলায় পরম আত্মবিশ্বাস, যখন বললে, আমার স্থির বিশ্বাস আপনার দৃষ্টি এখনও আছে, বরাবরই ছিল। আপনার চোখ দেখে, এই-ই আমার সিদ্ধান্ত। আমি ঈশ্বর নই, তা হলে বলতাম নিশ্চিত ফিরিয়ে দিতে পারি আপনার দৃষ্টি। নিতান্ত মানুষের হাত, তাই দিয়ে আমার কাজ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও আপনার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, এখনও তা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

শুনতে শুনতে স্তম্ভবাক দিশেহারা গোকুল মূঢ় বিস্ময়ে থতিয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর নয়, যেন সেই মাত্র চকিত অন্ধকার ও'কে চিরতমসা আবৃত করে দিল। যেন হতচকিত সংশয়ে, দুঃসহ অন্ধকারে, অন্ধ চোখে হাতড়াতে লাগলেন, আর সভয়ে চুপি চুপি উচ্চারণ করলেন, দেখতে পাব? আবার দেখতে পাব?

শুভেনের গলায় তেমনি দৃঢ় প্রত্যয়, দৈববাণীর মতো বেজে উঠেছিল, পাবেন। আমার সকল বিদ্যাবুদ্ধি তাই বলছে, আপনি দেখতে পাবেন।

পঞ্চাশ বছরের গাঢ় অন্ধকারের যন্ত্রণা সেই মাত্র যেন ও'কে প্রথম অস্থির করে তুলেছিল। বলেছিলেন, সব দেখতে পাব?

—সবই, আর দশজনের—।

শুভেনের কথার ওপরেই, যেন আপন মনে কবিতার মতো আবৃত্তি করে বলে উঠেছিলেন, সেই, সেই যে রোদ চিকচিকে আকাশ, আর গাছ, আর পায়রা শালিক চড়ুই, আর সব মানুষ, আর...?

—সবই।

শুভেনের দৃঢ় স্বরের মধ্যেও আবেগের ছোঁয়া লেগেছিল, সবই। যখন আপনার চোখের বন্ধ দরজা আমি খুলে দিতে পারব—।

—তখন, আমার তানপুরা সেতার হারমোনিয়াম তবলা—?

—নিশ্চয়ই!

—আর তখন, শুভেন, তখন গঙ্গারধারের সেই ছোট ছোট রং বেরংএর ঘাসফুল-গুলো—?

কথা শেষ হবার আগেই একটি অশ্রুরুদ্ধ গলার ডাক শুনতে পেয়েছিল? গোকুল।

চমকে উঠেছিলেন গোকুল। দিদির উপস্থিতি টের পাননি। টের পেয়ে সহসা স্বপ্নভাঙা স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, দিদি!

দিদির হাসি ছোঁয়ানো কান্নারুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, গোকুল আমাদের সেই গঙ্গারধার আর নেই, শোভাবাজার, নিমতলা, বাগবাজার সব পীচের রাস্তা, বাঁধানো রক হয়ে গেছে। ঘাস গজাবার মাটি আর নেই।

—ও!

একটা চকিত ব্যথায় শান্ত হয়ে উঠেছিলেন গোকুল। তাঁর চোখের রুদ্ধ দুয়ার সর্বগত অন্ধকারের মধ্যে একটি ঘাস ফুলের দীপ ফুটে উঠেছিল। সবুজ ঘাসে রোদ লাগা লাল সাদা নীল নীল ঘাস ফুল। যেন লুকোচুরিতে ধরা পড়া মিটি মিটি হাসি তাদের মুখে। এই বন্ধ্যা বিধবা দিদি তখন নাকছাবি করে পরতেন। সবুজ ডগা-সুদ্ধ তুলে দিত গোকুল। কিন্তু এখন আর দিদি ফুলের নাকছাবি পরবেন না। এখন আর কলকাতার গঙ্গার ধারে ঘাস গজাবার মাটি নেই।

শুভেনের গাঢ় স্বরে শোনা গিয়েছিল, কিন্তু পৃথিবীতে এখনও অনেক ঘাস আছে, সেখানে অনেক ঘাস ফুল ফোটে। আমরা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। আপনি দেখতে পাবেন মামাবাবু।

মামাবাবু! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ে গিয়েছিল, দিদির ছোট মেয়ে, তাঁর নিজের ছোট ভাগ্নী তাঁর সব থেকে বেশী স্নেহের সুগতারই বন্ধু হিসেবে চক্ষুবিশারদ শুভেন তাঁদের পরিবারে এসেছে। মনে পড়েছিল ওদের ক্লাসে লেকচার দিতে এসেছিল শুভেন। সুগতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগেরই ছাত্রী। পরিচয় পেতেই শুভেন ছুটে এসেছিল গোকুলচন্দ্রকে দেখতে, পরিচিত হতে। সঙ্গীতশিল্পী গোকুলচন্দ্রের ও [illegible] আবাল্য ভক্ত। গোকুলচন্দ্র [illegible] শিল্পী। [illegible] বলেছিল, শুভেনের [illegible] [illegible]

অন্ধকার, তোমার অন্ধকারের শিখায় আমি দেখেছি পূর্ণ জ্যোতি" আমি বারে বারে শুনি।

কিন্তু সেই সব নয়। আরও কিছু। তাঁর অনুভূতির আলোয় আরও দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর পরম স্নেহের সুগতার হৃদয়গতির মুখোমুখি এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে শুভেন। তাই ওর গলাতেই যেন নতুন সুরে বেজে উঠল, 'পৃথিবীতে এখনও অনেক ঘাস আছে, এখনও অনেক ফুল ফোটে।' আছে, আছে! ফুটবেই তো! দিদির দিন গিয়েছে, কলকাতার ঘাটে আর মাটি নেই। কিন্তু রূপনারায়ণের ধারে এখনও মাটি আছে। সুগতার নাকছাবি পরার কাল এসেছে। ঘাসফুলেরা তাই এখনও ফোটে। কিন্তু—।

আবার সকল অন্ধকার কাঁপিয়ে বাতাস লেগেছিল গোকুলের প্রাণে। তেমনি ভয়ে ও আশায় চুপিচুপি গলাতেই বলেছিলেন, দেখবে পাব? পাব?

শুভেন বলেছিল, আপনি আমাকে অপারেশনের অনুমতি দিন।

দিদি বলে উঠেছিলেন, কিন্তু শুভেন, আবার কাটাকুটি করতে গিয়ে—।

কথার মাঝ পথেই শুভেনের দৃপ্তিসিক্ত কথা শোনা গিয়েছিল, নতুন করে আর কী হারাবার আছে মা। আমি বলছি নিজের ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ও'র চোখের ওপরেই আমার সকল শিক্ষা সার্থক হবে। তবু যদি আমি হেরে যাই, যদি যাই, পরিবর্তন কিছু হবে না।

শেষের কথাগুলো বলতে যেন শুভেনের কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু গোকুল সেসব আর ঠিক মতো ভাবতে পারছিলেন না। তাঁর সর্বব্যাপী অন্ধকারের পটে একটি রোদে চাসা সকাল ঝিরঝিরি রেখায় ফুটেছিল। বহু যুগযুগান্তের ফেলে আসা বন্ধুর মতো সে যেন বিস্ময়ে নিঃশব্দে হাসছিল। তিনি শুধু বলছিলেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!..

আবার ঘড়িতে ঘণ্টা বেজে উঠল। কিন্তু স্মৃতি সায়রের ডুব সাঁতারে উজানবাহী দীন গোকুল। সময়ের ঘণ্টা ও'র কানে গেল না। সেদিনের মতোই এখনও উচ্চারণ করলেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এই চির অন্ধকারের কপাট শুধু মৃত পর্দায় ঢাকা। এক লহমায় সেই পর্দা খুলে যাবে। আলোক-স্নাত বিচিত্র পৃথিবী আবার ভেসে উঠবে। উঠবে, তাই তো শুভেন আসছে। আর [illegible]! তাঁর বুকের দুরন্ত আবর্ত থেকেই [illegible] উঠে আসছে শুভেন। এই অন্ধকারের, [illegible] [illegible] দেওয়ালে দেওয়ালে, [illegible] পত্রে এ [illegible] সকল প্রাণে, সর্বত্র [illegible] [illegible] হানিকে প্রবল বেগে ছুটিয়ে [illegible]

তাঁর মনে পড়ল, 'কভু বাঁধ দেখা নাহি দিত্তে, তবু সহিতো। ধরা দিয়ে, ধরা নাহি দিলে, বড় যাতনা॥'

যখন এই গান রেকর্ড করেছিলেন, তখন তাঁর অপার অন্ধকারের বুকে সেই শেষ সকালের আলোর ছবি ভেসে উঠেছিল। আট বছর বয়সের সেই শেষ আলোকে উদ্দেশ করেই যেন গেয়েছিলেন। কিন্তু সে শেষ আলো নয়। আজ আর তা পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা নয়। আট বছরের সেই সকাল যেন তাঁর সঙ্গে দুয়ারবন্ধ খেলা খেলেছে। আজ তাঁর দুয়ার খোলা খেলা আসন্ন। আজ তবু সেই সকালই থিরবিজুরি বেখায় ফুটে আছে। যেখান থেকে এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারেব পবিক্রমা।

সর্বব্যাপী অন্ধকাব, দুঃসহ। মনে আছে, সেই ভযংকর নিষত অন্ধকাবেব মধ্যে কী একটা আতঙ্ক যেন দেখতে পেত আট বছরেব গোকুল। শিশু প্রাণে যে-অন্ধকাবকে বড় ভয ছিল, সেই অন্ধকাব ওব চাব পাশে একটা অশরীবী বিভীষিকাব বাজত্ব বচনা কবেছিল। সামান্য শব্দে উৎকর্ণ হত। বাতাসেব শব্দে চমকে উঠত। ভয পেয়ে বাবে বাবে সমানে পিছনে হাত বাড়িয়ে অন্যে হাতড়াতো। অস্ফুটে জিজ্ঞেস কবত, কে? কে?

তাবপবেই মনে হত গাঢ় অন্ধকারের মতো সহসা স্তব্ধতাও সীমাহীন। তখন মাটিতে কোমর ঘসটে ঘসটে পেছিয়ে যেত যতদূব পারা যায়। তারপরে দেযালে ঠেকে যেতে হত। আর চীৎকার করে ডাকতো, মা! মা।

কাজ ফেলে মা আসতেন ছুটে।—কী হয়েছে গোকুল?

—কাছে এস। আমার একলা ভাল লাগে না।

মা কাছে এলে, তাঁকে দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধবতো গোকুল। মুখটি গুঁজে দিত বুকেব মাঝে। দিয়ে নিঃশব্দে পড়ে থাকতো। কথা বলতো না। মাও কথা বলতেন না। কেবল ওব গায়ে মাথায় হাত বুলিযে দিতেন। কিন্তু মায়ের অনেক কাজ, গোকুল জানতো। মাকে শোলার ওপবে রাংতা কেটে বসিয়ে চাঁদমালা আর টোপর সাজাতে হয়। জরি আব পুতি সেলাই করতে হয কাপড়ে। দোকানীরা এসে নিয়ে যায়। সময মত এসে মাল না পেলে টাকা দিতে চায় না। দোকানীরা টাকা না দিলে খাওয়া জুটবে না। মাটির দেওয়াল দেওয়া টালির ঘর আর একটু উঠোন, মাথা গোঁজবার সেই ঠাঁইটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মা দিদি, দুজনকেই কাজ করতে হত।

কিছুক্ষণ পর আবার মন শান্ত হত। গোকুল বলতো, আচ্ছা, এবার তুমি যাও মা। মা বলতেন, যাব। তোর যদি এখন ঘুম আসে, ঘুমো না।

—ঘুম যে আসে না। আচ্ছা মা, এখন বেলা কত?

—তিনটে বুঝি হবে।

—তা হলে স্যাকরাদের বাড়ির দেয়ালে আমড়া গাছের ছায়া পড়েছে এখন, না?

—হ্যাঁ।

ছায়াটা তেমনি ছাতা মাথায় দেওয়া লোকের মতন দেখায়?

—হ্যাঁ।

গোকুল ছায়াটা মনে মনে দেখতো। তারপরে হঠাৎ বলতো, মা, চোখ বুজলে তুমি কিছু দেখতে পাও?

মা হাসতেন কি না কে জানে। গলায় একটা শব্দ হত। বলতেন, পাই। তোকে দেখতে পাই।

—আমিও তোমাকে দেখতে পাই মা। দিদিকে দেখতে পাই। আমি সব দেখতে পাই। কিন্তু—।

একটা কথা মনে হলেই চুপ করে যেতো। মা বলতেন, কী রে?

গোকুল বলত, মা আমি একলা থাকলে মনে হয়, কারা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি টের পাই, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায়, একটু একটু শব্দ হয়। আঙুলের হাড় মটকালে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। আর জান, হাই দিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। ওরা কারা মা?

মা বলতেন, ওঁরা দেবতা।

—দেবতা কী মা? ভগবান তো?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার ভয় করে কেন?

—ভয়ের কিছু নেই গোকুল। ওঁরা তোকে ছোঁবে না, কিছু করবে না। তোর জন্য যে ওঁদের কষ্ট হয়, তাই তোকে দেখতে আসে।

—কষ্ট হয়?

—হ্যাঁ।

সেই অশরীরী ভগবানের উপর হঠাৎ অভিমান হত গোকুলের। বলত, তবে ওরা আমাকে অন্ধ করে দিল কেন?

মায়ের কোনো জবাব পাওয়া যেত না।

—মা, ভগবান তো সব পারে, তবে আমাকে অন্ধ করে দিল কেন?

মায়ের কথা শোনা যেত না। স্পর্শের মধ্য থেকেও মনে হত, মা যেন কাছে নেই। গায়ে ঝাঁকানি দিয়ে বলত, গোকুল, বল না মা।

মায়ের নিচু ভাঙা ভাঙা গলা শোনা যেত, ওঁদের জিজ্ঞেস করিস। আমি তো জানি না বাবা।

গোকুল বুঝতে পারতো, মা কাঁদছে। তাই আর সে-কথা জিজ্ঞেস করতো না। এবং একলা একলা অনেকদিন, অন্ধকারের সেই শব্দের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেছে, 'আমাকে কেন অন্ধ করেছ? কেন?'

কোনো জবাব পেত না। কিন্তু একদিন [illegible] ফিসফিস করে ওইরকম জিজ্ঞেস করছিল, তখন সহসা মিষ্টি গলার গান ভেসে এসেছিল,

আমি অন্ধকারেই থাকি,
তুমি আঁধার রাতেই এস।

বাইরে থেকে দিদি গাইছিলেন। তবু উৎকর্ণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোকুল। মনে হয়েছিল, যেন, তারই কথার জবাব দিয়ে দিদি গেয়ে উঠেছিলেন। আর নিজেও গুনগুন করে গেয়েছিল,

অন্ধকারেই বসন্ত কলি,
তুমি গোপনে এস বর্গ।

এ কথার মনে কী তা তখন জানতো না। কিন্তু একটি অস্পষ্ট অর্থবহ, সুরের দোলায় যেন তাকে ঘুমপাড়ানির মতো দোলা দিয়েছিল। কেন যেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গানটি গাইতে ভাল লাগছিল। আর গাইতে গাইতে মেঝের ওপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপরে যখনই সেই শব্দের

উদ্দেশে আক্রোশ করতে মুখ তুলেছে, তখন আর জিজ্ঞেস করতো না। গুনগুনিয়ে উঠতো 'আমি অন্ধকারেই থাকি...।'

বন্ধুরা কেউ আর আসত না। গোকুল তাদের সঙ্গে বাইরে যেতে পারত না। ছুটোছুটি করতে পারত না। প্রথম প্রথম মনে থাকত না, তার পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত। বন্ধুরা এসে ডাকলে, সহসা ঘুম ভাঙা চমকে ছুটে যেত। আর মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ত মাটিতে, চৌকাটে। কপাল ঠুকে যেত দেওয়ালে। কেটে ছড়ে আঘাত পেয়ে চমক ভেঙেছে। মা কিংবা দিদি এসে জড়িয়ে ধরতেন। বন্ধুরা বিব্রত। আঘাতের ব্যথায় কান্না পেত না গোকুলের। দুঃসহ অন্ধকারের যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে উঠতো।

মা বলতেন বন্ধুদের, তোরা আর ওকে অমন করে ডাকিস না। ও কি আর বাইরে যেতে পারে? কাছে এসে বসে গল্প করিস।

কিন্তু বসে গল্প করার বয়স সেটা ছিল না। বন্ধুরা তাই আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছিল। সব থেকে নিকটতম বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন দিদি আর মা। আর দিদি শুধু গান গাইতেন বলতেন। যখন চোখ ছিল, তখনও বলতেন। যখন ছিল না, তখনও। কিন্তু দিদির গানই চুপ করে শুনতে ভালবাসত গোকুল। বাসত নয়, আজও বাসে। আজকের সুবিখ্যাত এই অন্ধ-গায়ক গোকুল দত্ত ছাড়া আর কে জানে, তার দিদির গলায় কী আশ্চর্য সুরের জাদু লুকিয়ে আছে। আর দিদি বলতেন, 'আমার এ ছাই গলায় গান ভাল হচ্ছে না। গোকুল, তুই গা। তোর গলাটাই মিষ্টি।'

'—যাঃ।'

'—হ্যাঁ রে। দেখিস নি, তুই গান গাইলে সাহাদের বড়কর্তা কেমন হাঁ করে শোনে।'

হ্যাঁ, দেখতো গোকুল। তখন দেখতে পেত। সেই পাথর বাঁধানো রকের ওপর ছড়ি হাতে বসে থাকতেন লাটু সাহা। ডেকে বলতেন, 'এই, এই ব্যাটা, সে গানটা কর দিকিন, "মন তুমি কৃষি কাজ জান না।" গা, তোনার মুড়কি খাওয়াব।'

গাইবার আগেই অবিশ্যি জিভে জল এসে পড়ত। কিন্তু জিভের ঝোল টেনে টেনে গান শেষ করতো। তার পরেই নগদ রানী-মার্কা এক পয়সা। এবং একছুটে তিনু ময়রার দোকানে।

শুধু লাটু সাহা নয়। তিনু ময়রা স্বয়ং ছিল একজন শ্রোতা। আর নিতাই স্যাকরা সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরকে বাতি দেখাবার সময় দেখতে পেলেই বলত, 'সেই দু কলি একবার গেয়ে দে তো গোকুল।'

গোকুল গাইতো, 'হরি নামের লুট পড়েছে, লুটে নে রে তোরা। লুট পড়েছে হরি প্রেমের, লুটে নে রে তোরা।'

কিন্তু দিদির সঙ্গে ও-সব গান ছিল না। দিদি হঠাৎ পিছন ফিরে, চিবুকে আঙুল রেখে গেয়ে উঠতেন,

না না না, ও বাঁশী শুনব না
ও বাঁশীর বিষ প্রাণে সহে না।

দিদির কাছেই শেখা কলি গাইতো গোকুল,

শুন শুন সখী, রাখ এ মিনতি
এ বাঁশীরে দুষো না।
এ বাঁশীর প্রাণ সদা আনচান
রাধা বিনা নাম জানে না॥

দিদি— না না না, সহিতে পারি না
বাঁশী শুনে কুল রহে না রহে না।

গোকুল— কী হবে সখি কুল রেখে শুনি
শ্যামেরে, ভজ মনে।
শ্যাম যদি রহে আপেরে রহিবে
পীরিতি ধরম মনে॥

[illegible]

পথে পথে, রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে। যেন একটা গান গান খেলা। চোখের দৃষ্টি হারাবার পর, একটা ব্যথার চমকে কিছুকাল সে-সব বন্ধ ছিল। আবার শুরু হয়েছিল। গোকুল নিজেই কবে একদিন অন্যমনস্ক হয়ে শুরু করেছিল। দিদির স্তব্ধতা তাতে ভেঙেছিল। কিন্তু গানের কথোপকথনের চপলতা আর তেমন জমতো না। গোকুল দেখতে পেত না দিদির কোমরে হাত দিয়ে চিবুকে আঙুল রেখে সেই বিচিত্র ভঙ্গি। দিদিও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন ভাইকে না দেখাতে পেরে।

গোকুল গানের মধ্যে জিজ্ঞেস করে উঠতো, দিদি, নাচছিস তো?

দিদির গলায় থিতিয়ে যাওয়া সুরে শোনা যেত, হ্যাঁ।

দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে সহসা জবাব পেত না। তখন বুঝতে পারতো দিদি কাঁদছে। গোকুলের নিজের গলায়ও উচ্ছ্বসিত কান্না থমকে থাকত। সেই স্নেহের এবং বেদনার অনুভবের ভিতর দিয়ে, তার নিকষ অন্ধকারে পৃথিবী যেন আর এক বিচিত্র রূপে প্রতিভাত হত। সেই পৃথিবীর হাসি-কান্নার চেহারা যেন আলাদা। কিন্তু গোকুল কাঁদত না। নীরব হয়ে যেত, আর সেই পৃথিবী তার বিস্মিত মনের চারপাশে আবর্তিত হয়ে ফিরত। তখন বলতো, দিদি, আয় সে গানটা গাই।

—কোন্‌টা?

গোকুল ধরতো,

আমি শয়ানে থাকি বা স্বপনে থাকি
দিবানিশি তোমা হেরে মোর আঁখি
তবু চিনিতে কেন পারি না।

দিদি গুনগুন করে সুর দিতে দিতে বলতেন, থামিস না, গেয়ে যা।

গোকুল গেয়ে যেত,

আঁখি জলে ভাসি কি গৃহকাজে থাকি
প্রাণে মনে মম তুমি মাখামাখি
তোমা বুঝিতে কেন পারি না!

গেয়ে যেত। যেতে যেতে নিজেরই আর থামতে ইচ্ছে করত না। সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাবার সেই যেন এক পরম সান্ত্বনা হয়ে উঠেছিল। পরম আশ্রয়। আর তারই ভিতর দিয়ে একটি সচেতনতা আসছিল, তার কোন কথা শুনলে মা আর দিদির কণ্ঠ হয়। কান্না পায়। তাই মুখে নীরব হয়ে উঠছিল, কিন্তু মুখর হয়ে উঠছিল ভিতরটা। তাই দুঃসহ অন্ধকারের কান্নাটা লুকোতে শিখেছিল।

মনে পড়ছে, লাহা বাড়ির গানের আসরের কথা আবার তার মনে পড়েছিল তখন। পাথর বাঁধানো মেঝে সেই বিরাট হলঘর। দেয়ালে বড় বড় ছবি। মেঝেতে গদীর ওপর [illegible] চাদর আর তাকিয়া। বড় বড় [illegible] আসর

বসান গানের। গোকুল বলেছিল, মা আমি লাহাদের বাড়িতে গান শুনতে যাব।

মা যেন একটু সংকুচিত হয়ে বলেছিলেন, যাবি? কিন্তু কার সঙ্গে যাবি?

—কেন, দিদির সঙ্গে?

—দিদি বড় হয়েছে, ওর সেখানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না।

দিদি বড় হয়েছে! সেও এক আশ্চর্য অনুভূতি। অদেখার মধ্যেও গোকুল অনুভব করেছিল, দিদি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছেন। সেটা বড় হওয়া কি না জানতো না। মনে হত দিদি যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু দিদির সঙ্গে না গেলেও মা ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই প্রথম হাতে লাঠি উঠেছিল গোকুলের। দিশা-দর্শন যষ্টি। মা কাউকে না কাউকে ধরে, অনুরোধ করে পাঠিয়ে দিতেন লাহাদের বাবুবাড়ির মহলে। আবার কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যেতেন। চোখ হারাবার পর প্রথম যেদিন গিয়েছিল, সেইদিন লাট্‌ লাহার ছেলে হারু লাহা বেশ গোলাপী আমেজে ছিলেন। বলেছিলেন এই যে গোকুলচাঁদ চোখ খেয়েও গানের আসরে এসেছিস! ব্যাটা সুরদাস না হয়ে যায় না।

আসরের কেউ কেউ হেসেছিলেন। কিন্তু গোকুলের বিশ্বাস হারু লাহাকে সবাই চিনতেন না। তিনি নিশ্চয়ই স্নেহ করেই বলেছিলেন। কারণ তিনি নিজে যে গায়ক ছিলেন।

সেখানে যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সময় কেটে যেত গোকুলের। ভৈরবী-পূরবী-মল্লার, খেয়াল-ঠুংরি-গজল টপ্পা-শ্যামা-কীর্তন, সব দিয়ে মোড়া আর এক পৃথিবীর ভূগোল নানান সীমায় বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল তার অন্ধকারে। আর এক পৃথিবী। চোখের দেখা সমারোহে আগে তেমন করে ধরা পড়ে নি। অদেখার ভিতর দিয়ে তার নানান সীমান্ত চোখের চেনা হয়ে উঠেছিল। যেন এক অচেনা জগতের নানা প্রান্তে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল। আর যত যাচ্ছিল, ততই ভালবাসাবাসি ততই চেনাচিনি, ততই আবিষ্কার। বাড়ি ফিরে গিয়ে, দিদির কাছে শুয়ে সেই আবিষ্কারের আনন্দ উপচে পড়ত।

—খাম্বাজ?

দিদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, খাম্বাজ কী রে?

—খাম্বাজ জানিস নে? সুর! একটা সুর। শুনবি? এই এমনি—।

বলে, গুনগুনিয়ে খাম্বাজ রাগিনী শোনাতো।

কিন্তু সেই সময়েই হঠাৎ একদিন, মায়ের কথা শুনে, একটা ভয়ংকর ভয়ে, তীব্র যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার আবার বীভৎস হয়ে উঠেছিল। মা ভেবেছিলেন, গোকুল ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি দিদিকে ডাক দিয়েছিলেন, শুভি।

—বল।

—কালোচৌধুরির রাজী হয়েছে, এই মাঘেই সে কাজ সারতে চায়, জানিস তো?

দিদির নিশ্চয় লজ্জা করছিল কথা বলতে। তাই শুধু শব্দ করেছিলেন, হুঁ।

কালোচৌধুরির শ্যামবাজারে মুদী দোকান। তার সেজ ছেলে অম্বিকার সঙ্গে দিদির বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। এই বাড়িতে এসে অম্বিকা থাকতে রাজী হয়েছিল। ঘরজামাই না, প্রাণকর্তা হিসেবেই।

মায়ের গলা শোনা গিয়েছিল কিন্তু শুভি, আমি আর বেশী দিন নেই। বেশ বুঝতে পারছি, আমার হয়ে এসেছে।

দিদির ভাঙা স্বর শোনা গিয়েছিল মা।

মায়ের গলা হঠাৎ বুজে হয়ে এসেছিল, শুভি, গোকুলের তুই ছাড়া আর কেউ—।

—মা, তুমি বলবে, তবে বুঝব?

অন্ধকার ঘরে আর দুজন জানতে পারেন নি, তাঁদের চোখের জলের শরিকানায় আর একজন ভাসছে। সেই মুহূর্তে গোকুলের বড় ইচ্ছে হয়েছিল, মাকে স্পর্শ করে। পারে নি। কিন্তু সেইদিন থেকে জমাট অন্ধকারের গায়ে একটি তীক্ষ্ণ ধার ছুরি যেন তার বুক লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। মাকে ছিনিয়ে নেবে বলে। সেইদিন থেকে তাই মায়ের কাছে কাছে বেশী থাকতে চেয়েছিল।

তবুও পারে নি। মাঘ মাসে দিদির বিয়ে হয়েছিল। চৈত্রমাসে মা মারা গিয়েছিলেন। গোকুলের মনে আছে, তাদের উঠোনে স্যাকরাবাড়ির সেগুন গাছের শুকনো পাতা খড় খড় করে উঠছিল। লাহাদের বাড়ির পায়রাগুলো ভর দুপুরে ডাকছিল। গোকুল মায়ের পাশে বসেছিল ঘরে।

গোকুল মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিল।

মা সহসা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন আঃ। আঃ।

দিদি বলেছিলেন, কী হচ্ছে মা?

—গোকুলকে ডাক।

গোকুল মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিলেন।—

—কী বলছ মা?

মা যেন ফিসফিস করে বলেছিলেন, গোকুল যাচ্ছি, আমি গেলুম।

দিদি হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিলেন। গোকুলকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা

শুধু এ-দেশে নয় সব দেশেই ধর্ম তার তালুক মুলুক হারায় যখন তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায়। আসলে কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটা তার প্রকৃত পরিচয় বাতলায় না। ধর্মনিরপেক্ষ আমরা 'সেকুলার' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে নিয়েছি, এবং এই সেকুলার শব্দের অন্য এক অর্থ 'প্রোফেন'—'হিয়েটিক্যাল'ও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সেকুলার শিক্ষা-পদ্ধতি ধর্মবৈরী এমনকি ধর্মঘ্নও হতে পারে।

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যায়তন ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না। করলে বরঞ্চ ভালো হত। ধর্ম তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বা জিতে যেত। কিন্তু সে সুযোগ ধর্ম পায় না—তার জয়াশা অতি, অত্যল্প হলেও। কার্য-ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে, অবহেলা করে-এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করে না। তার ভাবখানা অনেকটা এই:—ধর্ম বাদ দিয়ে যদি শিক্ষা দীক্ষা সব-কিছুই হয়, ছাত্রেরা পরীক্ষা পাশের পর যদি কাজকর্ম করে দু'পয়সা কামাতে পারে তবে ধর্ম অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর।

এক ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন আঁক কষে ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন সৌরজগৎটা কি ভাবে চলে তখন কে এক ধার্মিকজন শুধালে, 'কিন্তু তোমার সিস্টেমে তো ভগবান নেই।'— উত্তরে বৈজ্ঞানিক বলে-ছিলেন, 'ওঁকে বাদ দিয়েই যখন সিস্টেমটা নিটোল ত্রুটিহীন, তখন তাঁকে লাগাবার কি প্রয়োজন?' কিন্তু ঐ বৈজ্ঞানিকটি ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ ধর্মভীরু ছিলেন বলে আস্তে আস্তে যোগ করলেন, 'কিন্তু দরকার হলে তাঁকে টেনে আনতাম বইকি।' সে দরকার অদ্যাবধি হয়নি। সেকুলার শিক্ষাপদ্ধতি ধর্মের সেই কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তাটুকুও স্বীকার করে না।

বেদের বড় বড় দেবতা, ইন্দ্র বরুণ, এঁরা যে লোপ পেলেন তার কারণ এ-নয় যে, কোনো বিশেষ যুগে এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ধর্ম সংস্কারকগণ জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। আসলে মানুষ আস্তে আস্তে দেখতে পেল, প্রকৃতি তার নিয়ম অনুযায়ী চলছে। বৃষ্টি বর্ষণ, ফসল-উৎপাদন, [illegible] ইত্যাদি যাবতীয়

...[illegible] না থেকেও সমাধান হয়। যে [illegible] কথা [illegible]। দীর্ঘদিন [illegible] হলে তাঁরা এখনো [illegible] করে থাকেন, বিশ্বাসী মুসলমান এখনো [illegible] জেতার জন্য মৌলাআলীর [illegible] দিয়ে বর্না দেয়। (১) [illegible]কে কে যেন শুধিয়েছিল, 'মন্ত্রোচ্চারণ করে এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'অবশ্যই যায়। তবে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক খাইয়ে দিলে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকে না।'

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, ইন্দ্র বরুণ চলে যাওয়ার পরে কালী হনুমান এলেন কি করে? কুরান হদীসে যখন স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লা মানুষকে তার ন্যায্য হক্কাহক (হক্+না+হক, অ+হক্) ইন্সাফের সঙ্গে বিতরণ করেন, মধ্যস্থতা করার জন্য উকিল ধরে কোনো লাভ নেই, তখন মানুষ নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদরপীর কিংবা পুত্রলাভের জন্য সোনা গাজীর শরণাপন্ন হয় কেন?

উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন, অনার্যদের স্বধর্মে আকর্ষণ করার জন্য আর্যরা অনার্যদের অনেক দেবদেবীকে আপন ধর্মে স্থান করে দেন। অনার্যরা অনুন্নত। তারা ঐসব দেবদেবীর সহায়তায় তখনো বিশ্বাস করে। যারা করে করুক, ক্ষতিটা কি? বদর পীর মৌলাআলীর বেলাও তাই। এবং সবচেয়ে মোক্কম 'যুক্তি'—পুরুত মোল্লাদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্তঃ তো আর পুজোপাটা করেন না, আল্লাকে যে-সাধক নূর বা জ্যোতিরূপে অনুভব করে আপন ক্ষীণ জ্যোতি শিখা তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন—'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতিঃসমুদ্রেই'—তিনি তো আর মোল্লা ডেকে শীর্ণী চড়ান না। তাই ঘেটু-মনসা মৌলাআলী সোনা গাজীর দরকার। সত্যপীর তো আরো শহর-পসন্দ, জনপদবল্লভ—উভয় ধর্মেরই বিশ্বাসীজনকে পাওয়া যায়। মোল্লা পুরুত দুজনারই সুবিধা।

সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে, এস্থলে, আরেকটি প্রশ্ন তুলি। তবে কি আজ আর বেদাধ্যয়নের কোনো প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আছে। ঋষি কবিরূপে বেদে যে মধুর এবং ওজস্বিনী ভাষায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন সেটি বড়ই মূল্যবান। বুদ্ধি দিয়ে যেটা বুঝেছি সেইটে কবিমনীষীর প্রসাদাৎ তখন হৃদয় দিয়ে অনুভব করে সম্যক অনুপ্রাণিত হই। অনুভূতির হৃদয়াবেগ তখন ধ্যানলোকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি সঞ্চারিত করে।

এরই তুলনায়—যদিও এর চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের—একটি উদাহরণ দি। তিক্ত অভিজ্ঞতার পর বুদ্ধি দিয়ে বুঝলুম, দুরাশা করে শুধু বঞ্চিত হতে হয়। তখন যদি কেউ এসে আবৃত্তি করে,

> আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
> তাই ভাবি মনে

তখন কেমন যেন সেই নিরাশার মাঝখানেও অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করি।

ফ্রান্স যখন অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প তখন 'মার্সেইয়েজ' গীতি কী অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণাই না তাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছিল!

[illegible]

...[illegible] বলেন 'আল্লার [illegible] কথা [illegible]', তখন যদি কুরান শরীফের [illegible] সূরা পড়তেন তবে কি [illegible] সান্ত্বনা পেতেন না?

> ৯৩ অধ্যায়
> উবস্
> (অদ্—দুহা)
> মক্কায় অবতীর্ণা
> (একাদশ পংক্তি)
>
> আল্লার নামে আরম্ভ—তিনি করুণাময়, দয়ালু।
>
> উষালগনের আলোর দোহাই,
> নিশির দোহাই ওরে,
> প্রভু তোরে ছেড়ে যাননি কখনো
> ঘৃণা না করেন তোরে।
> অতীতের চেয়ে নিশ্চয় ভালো
> রয়েছে ভবিষ্যৎ
> একদিন তুই হবি খুশী লভি
> তার কৃপা সুমহৎ।
> অসহায় যবে আসিলি জগতে
> তিনি দিয়েছেন ঠাঁই
> তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দুঃখ যা ছিল
> মুছায়ে দেছেন তাই।
> পথ ভুলেছিলি তিনিই সুপথ
> দেখায়ে দেছেন তোরে॥
> সে কৃপার কথা স্মরণ রাখিস।
> অসহায় জন, ওরে—
> —দলিসনে কভু। ভিখারী-আতুর
> বিমুখ যেন না হয়।
> তাঁর করুণার বারতা যেন রে
> ঘোষিস জগৎময়॥
>
> সত্যেন দত্তের অনুবাদ

সত্যেন দত্তের অনুবাদে আরম্ভ, 'মধ্য দিনের আলোর দোহাই নিশির দোহাই ওরে।' অথচ আরবীতে 'অদ্-দুহা' অর্থ 'উষা।' ইংরেজি অনুবাদের সর্বত্রই 'আর্লি আওয়ার অব দি মর্নিং।' হয়তো সত্যেন দত্ত ভেবেছিলেন, আরবের মধ্যাহ্নসূর্য অতুলনীয়। আল্লা যদি কোনো নৈসর্গিক বস্তুকে সাক্ষী ধরে দোহাই দেন, তবে তিনি মধ্যাহ্ন সূর্যকেই নেবেন। আমাদের মনে হয় উষা নেওয়া হয়েছিল এই অর্থে যে রাত্রির অন্ধকার যতই সূচীভেদ্য এবং নৈ রা শ্য জ ন ক হো ক না কেন, উষার আলো প্রভাসিত হবেই হবে। আল্লা এস্থলে বলছেন, সেটা যে রকম সত্য, আমার বাক্যও তেমনি ধ্রুব।

যাঁরা কুরান শরীফকে 'মেটাফরিকালি' ও 'সিম্বলিকালি', (অর্থাৎ দ্বিতীয় 'পক্ষে') রূপকে, ব্যাখ্যা করেন (যেমন পরবর্তী যুগের ওমর খৈয়ামের মদকে ভগবৎ-প্রেম অর্থে ধরেন, কিংবা ভারতচন্দ্র চৌরপঞ্চাশিকা 'কালী পক্ষে'ও অনুবাদ করেছেন) তাঁরা বলেন, এখানে 'প্রভাতসূর্য' (উষস্, অদ্-দুহা) [illegible] মুহম্মদের (দ) [illegible] রূপে [illegible]। [illegible]

[illegible]

---

(১) [illegible] মিশরে ক্রমাগত কয়েক বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে একবার বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। শহরের কাজী (চীফ জাস্টিস) সে নামাজের ইমাম (প্রধান) হবেন। ইনি ছিলেন মারাত্মক ঘুষখোর। নামাজে যাবার পথে হঠাৎ বৃষ্টি নামলো। কাজী যখন আল্লাকে শুকুরীয়া (ধন্যবাদ) জানাবার জন্য মিম্বরে (পুলপিটে) উঠলেন তখনই, সঙ্গে সঙ্গে, বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। টীকাকার বলছেন, 'টিটকারির ভয়ে কাজী মসজিদের পিছনের দরজা দিয়ে পালালেন।'

ভারতবর্ষ ও চীন

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮)

গতবারের নিবন্ধের শেষে আমি লিখেছি যে, চীনের এই আক্রমণ সুপরিকল্পিত এবং অনেক আগে থেকেই এর জন্য শুধু সে নিজের দেশের মধ্যেই আয়োজন করেনি, আমাদের দেশের মধ্যেও সে তার আয়োজন করেছে। পৃথিবীতে কম্যুনিজম এমন একটি ইজম বা বাদ বা ধর্ম যার নির্দেশ হল ছলে কৌশলে-বলে মিথ্যায়-ছলনায় যে কোন উপায়ে হোক নিজেকে কোন রকমে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। তাই চীন করেছিল। শুধু ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাহায্যে নয়, আমাদের দেশের একদল বিদগ্ধ আখ্যাধারী আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী এবং অর্থ সম্মানলোলুপ বুদ্ধিজীবী লোকেরাও তাতে সাহায্য করেছে। এ সব লোক ভারতবর্ষে চিহ্নিত হয়েই আছেন। রাজনীতিক সাহিত্যিক শিল্পী অভিনেতা গায়ক—কাদের মধ্যে এরা নেই। কিছু সংখ্যক লোক এর মধ্যে আছেন, যারা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন বা করেছিলেন যে, চীনের বর্তমান রাষ্ট্রতন্ত্র ভারতবর্ষের মানুষের সহোদর বন্ধু এবং কম্যুনিজমেই মানুষের সংসারের কল্যাণ। বর্তমান সরকারকে প্রথম প্রথম অনেকে কখনও দুর্যোধন, কখনও দুঃশাসন বলে উপমা দিতেন। এ সমস্ত অবস্থার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে কিছুটা সংশয়, কিছুটা সঙ্কোচ কিছুটা [illegible] প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলেও কথাগুলোর বদল করেন নি। পার্লামেন্টে শ্রীকৃষ্ণ মেননকে পদত্যাগ করতে হয়েছে এই অপবাদে; অনেকে স্তব্ধ হয়েছেন, অনেক পুরোপুরি উল্টো কথাও বলছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যেও ভেদ ঢুকেছে। ১০।৩।৬৩ তারিখে একজন বলে গেলেন, একজন তরুণ, তিনি সাহিত্যানুরাগী, লেখকও বটেন—মানসিক যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেছেন। তবে এই আক্রমণের পরিণতি ঠিক বর্তমানে যা ঘটেছে তা না ঘটলে তারা যে কি করতেন, তা বলা কঠিন। দেশে জনসাধারণ সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র হাতিয়ার কাস্তে কোদাল খন্তা নিয়ে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে এক সঙ্গে চীন ও কম্যুনিজম জিন্দাবাদ বলে স্বাগত সম্ভাষণ করবেন। তারাও যে আনন্দে নৃত্য করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে তাদের মত পরিবর্তনের অনুতাপ প্রকাশের পালা এবার কোন কারণই থাকত না এবং তারা তা করতেনও না। তবে ভ্রান্তিও হতে পারে। নিশ্চয়ই হতে পারে।

সে যাই হোক; হয় তো ভ্রান্তিই বটে। কিছু লোকের তো বটেই। কিন্তু বাকী সব? এরা পণ্ডিত মানুষ, অবশ্য নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিত—যারা কম্যুনিস্টদের মতই মত ও পথের কোন সামঞ্জস্য বা সমতার প্রয়োজন আছে মনে করেন না। অসৎ অসাধু উপায়ে যে লক্ষ্যে পৌঁছুবার—সেটা সৎ হলেই হল বলে দোহাই পাড়েন। কিন্তু এর মধ্যে যে গান্ধীবাদী মানুষও রয়েছেন। প্রশ্নটা উদ্যত খড়্গের মত সামনে ঝলসে ওঠে সময়ে সময়ে। সে ঝলসানো আলোর ধারে ভারতবর্ষের ইতিহাসের খৃষ্ট পূর্বাব্দ কাল থেকে গত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিদ্যুত রেখার মত ক্রুর বঙ্কিম এক আঁকা বাঁকা রেখা চকিতভাবে জেগে উঠে যেন একটা বিচিত্র ইঙ্গিত দিয়ে যায়। [illegible] এই উপমহাদেশে দেশাভ্যন্তরে বহু রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে, বহু বংশের অভ্যুত্থান বিলয় ঘটেছে, তাতে এই বিরাট মহাদেশের স্বাধীনতা, বিপন্ন হয়নি, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা ক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ যতবার হয়েছে, যে আক্রমণে রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজ বিধান সংস্কৃতির ধারা খণ্ডিত বিপর্যস্ত হয়েছে, ততবারের সেই শোচনীয় ঐতিহাসিক সংঘটন ঘটেছে—এমনই লজ্জাকর আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। গ্রীক বীর আলেকজেন্দারের সময় পুরুর প্রতি বিদ্বেষবশে তক্ষশীলাধিপতি অম্ভী মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে বৈদেশিক ইসলাম অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় পৃথ্বীরাজ বিদ্বেষী জয়চাঁদ এবং পলাশীতে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় সিরাজ উচ্ছেদকামী এবং ক্ষমতালোভী মীরজাফর রাজবল্লভ রায়দুর্লভ প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের ইতিহাসে বিশেষরূপে চিহ্নিত ঘটনা।

বর্তমান চীনের গুণগানের মধ্য দিয়ে এবং কম্যুনিজমের পরমামৃতের কথা

প্রচারের মধ্য দিয়ে যারা এ দেশের সকল সংস্কৃতি, সকল সাধনাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবার উন্মত্ততাকে তারস্বরে প্রচার ক'রে এলেন, তা কি বিভীষণের ধর্মানুরাগের মত পবিত্র? রামায়ণে রাবণ—রামপ্রিয়া সীতাকে হরণ করেছিল: পরনারী হরণ এবং ধর্ষণের মহাপাপ থেকে রাবণকে বিরত করতে চেয়েছিলেন বিভীষণ। বিনিময়ে রাবণ করেছিলেন পদাঘাত। তখন বিভীষণ অধর্ম পক্ষ ত্যাগ করে ধর্মপক্ষকে আশ্রয় করেছিলেন তিনি। রাজ্যলোভ তাঁর ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি লংকার সিংহাসনে বসলেন রাবণ বধের পর, সেই মুহূর্তে তিনি হয়ে গেলেন বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু এ'রা?

এ'রা যাই হোন, ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্গুলী নির্দেশে বলে—বাহিরের শত্রু এবং বহিরাগত বিপদের অপেক্ষা ভিতরের এবং শত্রু হিসাবে ভয়ংকর এবং আভ্যন্তরীণ বিপদই কঠিনতম বিপদ। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সর্বাপেক্ষা কলংকময় ও ঘৃণ্যতম গ্লানিকর অপরাধ বিশ্বাসঘাতকতা। এ কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই আছে, জন্তু জগতে চুরি আছে, লুণ্ঠন আছে, অবাধ হত্যাকাণ্ড আছে, হিংসা আছে, গুপ্ত আক্রমণ আছে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নেই। বুদ্ধিবিকাশের চরম গৌরব এবং ন্যায়নীতি ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের পরমতৃষ্ণার এটি বিপরীত দিক। বিদ্বেষ, স্বার্থবোধ ও হিংসা লোভের তাড়নায় ও প্রশ্রয়ে বুদ্ধি পরিণত হয় বিশ্বাসঘাতকতায়। জন্তুর বিদ্বেষ আছে—স্বার্থবোধ সর্বস্ব সে, হিংসাই তার ব্যষ্টি সম্পত্তি, লোভ তার মস্তিষ্ক এবং দৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হবার মত বুদ্ধি তার যথেষ্ট নয় এবং প্রখরও নয়। আবার বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রান্তির পরিণামও বটে। পূর্বেই বলেছি সে কথা।

ভ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত দেব—ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে। সম্ভবত এতেই পরিষ্কার হবে, ভ্রান্তি কোনটা, বিশ্বাসঘাতকতা কোনটা। পূর্বেই বলেছি—বিভীষণ সীতা হরণের প্রতিবাদে পদাহত হয়ে রাবণের সঙ্গে রাক্ষস পক্ষ ত্যাগ করে এমন কি রামকে সাহায্য করেও বিশ্বাসঘাতকতার পাপে পাপী বলে চিহ্নিত হতেন না যদি তিনি রাবণের মৃত্যুর পর সাহায্যের প্রতিদানে লংকার সিংহাসনে উপবেশন না করতেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভ্রান্তির ছাপ অজস্র। একটি সর্বজনজ্ঞাত দৃষ্টান্ত চিতোরের মহারানা সংগের শেষ জীবন ও কানোয়ার যুদ্ধ। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ। উত্তর পথ দিল্লী পাঞ্জাব রাজপুতানা অঞ্চলে তখন পাঠান শক্তি দুর্বল—বিলাসে ব্যভিচারে বিকৃত। ইতিহাসে রয়েছে—দিল্লীর সুলতান তখন নামে মাত্র সুলতান। এই সময় "Doulat Khan, the most powerful noble of the Punjab, who was discontented with Ibrahim Lodi because of the cruel treatment he had meted with his son, Dilwar Khan and Alam Khan an uncle of Ibrahim Lodi and pretender to the throne of Delhi, went to the length of invitting Babar to invade India."

বাবর এলেন সসৈন্যে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল—পানিপথের যুদ্ধে বাবর তাঁর স্বল্প সৈন্যের শৃঙ্খলার গুণে, নিজের বীর্য ও পরিচালনার গুণে ইব্রাহিম লোদীর প্রায় লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাভূত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন।

মহারাণা সংগ তখন সমগ্র রাজপুতানার এবং কিছু আফগান শক্তির নেতা। দেশে এই বিদেশী বাবরের অভিযানে তিনি ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ দর্শকের মত সরে থাকলেন। রাজনৈতিক বুদ্ধিতে তিনি ভ্রান্তিকে আশ্রয় করলেন। ভাবলেন—ইব্রাহিম বা বাবর যেই জয়ী হোক—সে এই যুদ্ধে দুর্বল হবে। তখন তিনি তাঁর বান্ধবদের নিয়ে তাকে পরাজিত করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবেন। কিন্তু কানোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বাবরের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন—তখন বাবরের সৈন্যদল ৮০৩০ হল। কিন্তু ১২০০০ সৈন্য নিয়ে ইব্রাহিম লোদীর লক্ষাধিক সৈন্যকে পরাজিত করার স্মৃতি ও সাহস তাদের সাহায্য করল। এবং সে যুদ্ধে রানা সংগ পরাজিত হলেন। কিছুদিন পরই জীবন দিয়ে এই ভ্রান্তির মূল্য তিনি পরিশোধ করলেন।

এরেই বলি ভ্রান্তি। এখানে কুটিল স্বার্থের চক্রান্ত ছিল না। তাঁর ধর্ম পক্ষপাত অসৎ ও অন্যায়ের বা বিদ্বেষের কোন কারণ ছিল না।

• • •

ভারতবর্ষ একটি দেশ নয় সে একটি উপমহাদেশ। ভারতবর্ষের জাতি ও জীবনধারা একটি দেশ ... শুধু ইতিহাসের দ্বারাই ধৃত নয়, পুরাণ ও ইতিহাস দুটির দ্বারা ধৃত এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় রজ্জুতে সে ঘেরা নয়, পুরাণের ধ্যানের স্বর্ণসূত্রের দ্বারা সে গ্রথিত হয়ে একত্রিত। ভৌগোলিক সংস্থানে ভারতবর্ষ উত্তরে হিমালয় হিন্দুকুশ ও উত্তর-পশ্চিমের সুলেমান প্রভৃতি পর্বতমালা এবং হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত থেকে দক্ষিণমুখী পর্বতমালা বেষ্টনীর মধ্যে পশ্চিমে দক্ষিণে সমুদ্রবেষ্টিত এই বিশাল ভূখণ্ড আশ্চর্যভাবে অবিচ্ছিন্ন একটি দেশ বা উপমহাদেশ। মধ্যস্থলে বিন্ধ্যপর্বতমালা সত্ত্বেও অবিচ্ছিন্ন অবিভাজ্য মানব জীবনও সভ্যতার পক্ষে। এক্ষেত্রে হিমালয় তার এই অবিভাজ্যতা ও অবিচ্ছিন্নতার একটি অঙ্গ। প্রকৃতির এই নির্দেশেই হিমালয়ের জলধারাগুলির প্রায় সবগুলিই ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডের মধ্যেই প্রবাহিত। গঙ্গা যমুনা এবং [illegible]
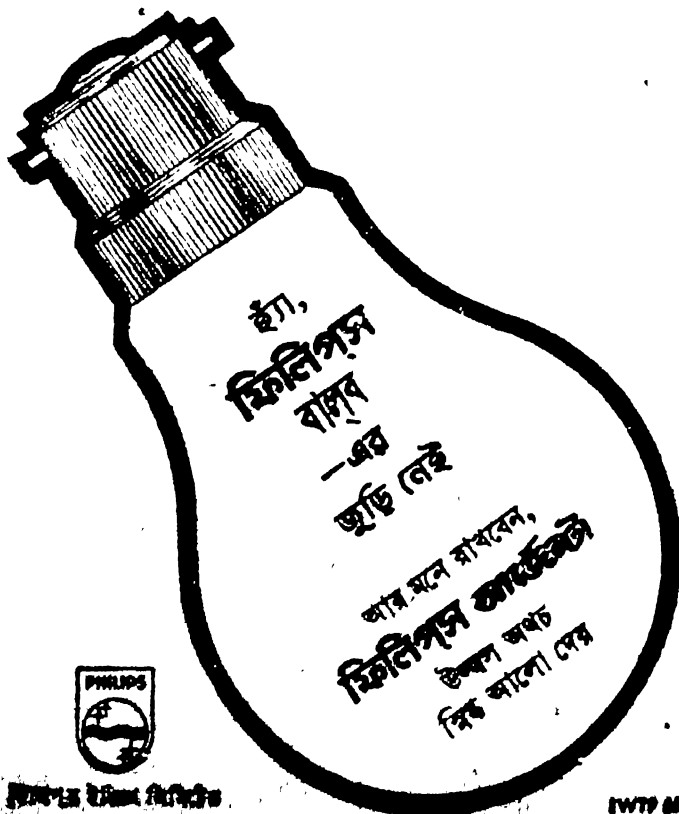
ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত কিন্তু দুটি বিশাল নদ সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র যথাক্রমে পশ্চিম এবং পূর্বমুখী হয়ে উত্তর সীমান্ত রেখায় প্রবাহিত হয়েও অবশেষে দক্ষিণমুখী হয়ে ভারতের মৃত্তিকাতেই প্রবাহের মুখ ফিরিয়েছে। উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর শীর্ষে এই হিমালয়ের অবস্থিতিই ভারতবর্ষের মরু অঞ্চলের প্রভাব ও গতিকে রুদ্ধ করে রক্ষা করেছে। হিমালয়ের দিকে তাকালেই মনে হয় যে, এক মহাবিরাট তুঙ্গশীর্ষ পুরুষ যেন বাহুবেষ্টন করে শ্যামল কোমল মৃত্তিকা-ময়ী এক ভূমিপ্রকৃতিকে চির আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রেখেছে। এর মধ্যে যে প্রাণপ্রকৃতি স্থান পেয়েছে তার স্বভাব ধর্ম এক এবং অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে এর মধ্যে যে প্রাণপ্রকৃতি তা একটি নয়। বহু বিচিত্র এবং ভিন্নের সমাবেশে গঠিত, কিন্তু পৃথক হয়েও এক এবং অভিন্ন। ভারতবর্ষের মানুষের বৈচিত্র্যের দিকে তাকালেই তার প্রমাণ মিলবে। উত্তর শীর্ষে কাশ্মীরের শৈব গৌরকান্তি অমরনাথের দিকে দক্ষিণ প্রান্তের রক্ষী কন্যাকুমারী মালা হাতে নিয়ে বরণোদ্যত। অমরনাথ এই মহাতাপিনী কুমারীর দিকে সতৃষ্ণ সানুরাগ দৃষ্টিতে তার আবৃত করছেন। পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকার শ্যামল কিশোর-কৃষ্ণ উত্তর পূর্ব প্রান্তে বর্তমান লোহিত বিভাগের পৌরাণিক মহাভারতের কালের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর বরমাল্য গ্রহণ করতে [illegible] এসে পশ্চিমের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের গ্রন্থি দিয়ে বন্ধন করেছেন। বর্তমান দরং জেলায় প্রাচীন শোণিতপুরের অধিপতি মহাবাহু বাণের কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ দ্বিতীয় গ্রন্থি। মহাভারতের অন্যতম নায়ক তৃতীয় পাণ্ডব মণিপুরে এসে চিত্রাঙ্গদার এবং নাগরাজের কন্যা উলুপীর পাণিগ্রহণ করে পশ্চিম পুরুষের বা বংশ বৃন্দের সঙ্গে পূর্বকে বন্ধন করেছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে অবরুদ্ধ ব্রহ্মপুত্রকে প্রভুকুঠার নামক স্থানে মুক্ত করেছেন ভার্গব পরশুরাম। হিমাচল প্রদেশে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগের পর রুদ্র বসলেন তপস্যায়। তার ধ্যান ভঙ্গ করতে মদন হিমাচল কন্যা উমাকে সম্মুখে রেখে রুদ্রকে বিদ্ধ করলেন পুষ্পবাণে; ধ্যানভঙ্গে কুপিত রুদ্রের রোষানলে মদন ভস্মীভূত হলেন। উমার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে রুদ্র উমার বরমাল্য গ্রহণ করে ভস্মীভূত মদনকে অতনুরূপে সঞ্জীবিত করলেন—কামরূপে। সতী অঙ্গ পড়ল পূর্ব প্রান্তে; দেবী কামাখ্যা নীল পর্বতে বিরাজিতা। প্রাগ জ্যোতিষপুরে নরকাসুরকে সংহার করে ভগদত্তকে সিংহাসন দিলেন মহা-ভারতের মহানায়ক। রামায়ণের রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাস পর্বে কোশল থেকে দণ্ডকারণ্যে এলেন। লঙ্কার দুর্ধর্ষ রাক্ষস রাবণ করলে সীতা হরণ; আকাশ পথে নিয়ে যাবার সময় সীতার অশ্রুজল পড়ল কোন হ্রদের জলে কোন নদীর জলে, অলংকারগুলি পড়ল অরণ্যে পর্বত শিখর প্রান্তরে, চিহ্নিত হল স্থান-গুলি, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে দক্ষিণে পদ-যাত্রায় সমস্ত দক্ষিণাপথ অতিক্রম করে রামেশ্বরমে গিয়ে শিবপূজা করে সেতুবন্ধনে সমুদ্র ব্যবধান অতিক্রম করে লংকাদ্বীপে উঠে সীতাকে উদ্ধার করলেন। তার আগে মাল্যবান পর্বতে ঋক্ষরাজ এবং বানররাজের সঙ্গে মিতালী স্থাপন করেছেন। উত্তরাপথ থেকে রামেশ্বরম পর্যন্ত প্রসারিত এবং অকৃত্রিম হৃদয়ানুরাগের সঙ্গে গৃহীত হল—সীতার নারীত্বের আদর্শ রামচন্দ্রের পুরুষত্বের আদর্শ, তার পিতৃভক্তি তার প্রতিজ্ঞা পালন, তার পত্নীপ্রেম ভ্রাতৃপ্রেম—তার মানবপ্রেম—সামগ্রিকভাবে মানবিকতার আদর্শ। ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি তাঁর বীর ধর্ম পালনের আদর্শ। কোশল হতে রামেশ্বরম পর্যন্ত যে কত সহস্র মন্দিরে রামসীতা লক্ষ্মণ আজও বিরাজিত পূজিত, তার সংখ্যা নির্ণয় করতে গিয়ে সসম্ভ্রমে নিরস্ত হচ্ছি। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় মন্দিরে সীতারাম—ভরত লক্ষ্মণ বিরাজিত এবং সেখানে অহরহই রামায়ণ গীত হচ্ছে। মহা-ভারতের পঞ্চপাণ্ডব বনবাসের সময় ঘুরেছেন সমগ্র ভারত। তার আগেও ঘুরেছেন বারনাবাতের দাহ্যগৃহ থেকে রক্ষা পেয়ে। অর্জুন ঘুরেছেন একক। এরই

মধ্যে মহাভারতের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতবর্ষে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা ন্যায় ও নীতি পরায়ণতা, তাঁর প্রজ্ঞা ভারতবর্ষের সঙ্গে স্বর্গলোকের সেতু রচনা করে বাস্তব জীবনকে এক স্বপ্ন স্বর্গ রচনায় সমাহিত করে এক বিরাট তপস্যা রাজ্যে পরিণত করেছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। তার বাস্তববুদ্ধি ও বোধ কল্পনার আবেগের দ্বার বার বার আচ্ছন্ন হয়ে নিষ্ঠুর আঘাতে আহত হয়েছে। তবুও সে এই কল্পনার অনুভূতি ও উপলব্ধিকে কখনই মিথ্যা বলে মনে করতে পারেনি। এইখানেই সে একজাতি একপ্রাণ এইখানেই তার ঐক্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচারের ভূমিকায় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন

"We have consequently to approach the history of India in a different spirit, and adopt a different scale of values in order to appraise her culture and civilization. The war and conquests the rise and fall of empires and nations, and the development of Political ideas and institutions should not be regarded as the principal object of our study, and must be relegated to a position of secondary importance. On the other hand more stress should be laid upon philosophy, religion, art and letters the development of social and moral ideas, and the general progress of those humanitarian ideals and institutions which form the distinctive feature of the spiritual life of India and her greatest contribution to the civilization of the world." (The History of Culture of Indian people Vol. 1 Page 43)

ভারতের চারটি প্রান্ত এবং এই উপমহাদেশ তুল্য মহাদেশের মানুষের মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলেই মনে প্রশ্ন জাগবে। অন্ধ যদি সে হন কান পাতলে প্রশ্ন জাগবে। আকৃতি অবয়ব বর্ণ ভাষা, বেশভূষা, আহার রুচি এর মধ্যে কোথায় ঐক্য—কিসের ঐক্য? এমন কি উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ভারত দিগন্তের আবহমণ্ডল এবং ভূমি প্রকৃতিতে এত পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যভেদ যে, সাধারণ অর্থে যে সব কারণে একদেশ ও একজাতি নির্ণয় করা যায় তা ভারতবর্ষে নেই। আছে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য। শুধু ঐক্যই নয় অখণ্ডতাও বিদ্যমান। এ কথা পূর্বেই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংস্থান ও অবয়ব আকারের কথা বলতে গিয়ে সংক্ষেপে বলেছি। পৃথিবী প্রকৃতির যে সংগঠন—তার বা পৃথিবী প্রকৃতির যিনি সংগঠক তাঁরই নির্দেশে গঠিত হয়েছে এ অখণ্ডতা। তার জন্য হিমাচলোদ্ভূত দুটি বিশাল জলধারা হিমাচলের বুক চিরে জন্মিয়ে একটি পশ্চিম ও একটি পূর্ব মুখে প্রবাহিত হয়েও ভারতের সীমান্ত নির্দেশ করে দক্ষিণমুখী হয়ে ভারতভূমির বুকের উপর দিয়ে সরস আশীর্বাদ ঢেলে দিয়ে সাগরসংগমে পৌঁচেছে। সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র। এবং ঐ বহুমণ্ডলের এই বৈচিত্র্য এই দেশ বা বিভিন্ন ছয় ভাগে বিভক্ত হয়ে ষড়ঋতু পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে বিদ্যমান। ঋতু পর্যায়ের বৈচিত্র্য এবং ঋতুর তারতম্য অবশ্যই আছে কিন্তু ষড়ঋতুর অস্তিত্ব সারা ভারতবর্ষেই স্বীকৃত। এ মানব মানস কল্পনার স্বীকৃতি শুধু নয়, বাস্তবেও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে পণ্ডিতেরা বলেন—No kind of man originated on the soil of India, all her human inhabitants having arrived originally from other lands but developing within India some of their saliant characteristics and then passing on outside India.

এ কথার অর্থ ভারতবর্ষ মানব সাধনার তপস্যা ক্ষেত্রই দাঁড়ায়। থাক এ কথা এখানে। নৃতত্ত্ববিদগণের অভিমত অনুযায়ী আটটি বিভিন্ন মানব জাতির শাখা বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসেছে। Dr B S Guha বলেছেন ছয়টি শাখা। কিন্তু তার সঙ্গে আরও কয়েকটি ভাগ করেছেন।

(Dr. Guha has signalized "six m[illegible]n races with nine sub types.)

আজও এরা বাস্তব ও ভৌগোলিক ভারতে
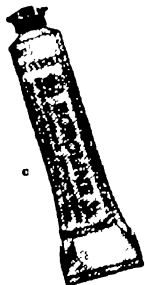
বর্ণ অবয়ব পরিচ্ছদ বৈশিষ্ট্য ভাষা এবং রুচি নিয়ে বসবাস করছে, স্বাধীন ভারতে ভাষার পার্থক্য হেতু এবং আচার ইত্যাদির পার্থক্য হেতু স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিরোধ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যা নাকি আজ ভারতবর্ষের ঐক্যকে বিঘ্নিত করছে। রাষ্ট্রনেতারা আজ ঐক্যের সূত্র যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

অতীত কালে, পুরাণের কালে, একবার প্রচণ্ড বিরোধ বেধেছিল উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের মধ্যে। মহাভারতে আছে বিন্ধ্যপর্বত উত্তর দক্ষিণের মধ্যে এমনই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল যে সূর্যের রথ-পরিক্রমা স্তব্ধ হয়েছিল। আকাশের সূর্য দেবতার গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে নয়। তার গতি রুদ্ধ হয়নি। গতি রুদ্ধ হয়েছিল মহাভারতের সংস্কৃতি দীপ্তিময় পৌরাণিক সূর্যের। দক্ষিণ সেদিন দ্বার রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তর ভারতের ঋষি অগস্ত্য সেদিন স্বকীয় মহিমায় সেই বাধার বিন্ধ্যাচলকে [illegible] করে এই সংস্কৃতির সূর্যের গতিপথ অবারিত করেছিলেন সুদূর দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত। ভৌগোলিক ভারতের শত-পার্থক্য সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবাসীর মন সেদিন পৌরাণিক রামায়ণ মহাভারতের সংস্কৃতি সূর্যের দ্বারা আলোকিত এবং অখণ্ড মহাভারতবর্ষে উত্তরণ করেছিল। সেইদিন থেকে বস্তুত ভারতবর্ষের মানুষেরা বহির্লোকে ভিন্ন হয়েও অন্তর্লোকে তারা অখণ্ডনীয় এবং পরম ঐক্যে গ্রথিত এক মহাভারতবর্ষের অধিবাসী। বর্ণে অবয়বে আকারের ভাষার বৈচিত্র্য বহু পার্থক্য সত্ত্বেও তারা পরস্পরের অভিন্ন, পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে এই মহাভারতবর্ষ আশ্চর্যভাবে অক্ষয় বা কালজয়ী গৌরবে আজও [illegible]। বহু সহস্র বৎসরে কোশল মগধ বা বৈশালী ধ্বংস হয়েছে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়ে আজ সেই পুরাতন স্থান ও নিদর্শনগুলি প্রত্নতত্ত্বের গণ্ডিভুক্ত কিন্তু স্তরের পর স্তর মৃত্তিকা পড়েছে তার উপর এবং প্রতি স্তরেই মানুষেরা তাকে নতুন করে গড়ে তাকে নূতন নূতন রূপের মধ্যে চিরপুরাতন বা সনাতন মহাভারতকে জীবন্ত করে রেখেছে। নানান উত্থান পতনের মধ্যে ইতিহাসের কালে প্রাচীন রাজবংশগুলি এবং তাদের ঐশ্বর্যময়ী প্রাসাদ ও নগরীগুলি ধূলিসাৎ হয়েছে, কিন্তু তীর্থ ও মন্দিরময় ভারতবর্ষ কালজয় করে বিরাজিত রয়েছে। দূর অতীতকালে এক প্রদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্য প্রদেশের পরিচয় এই মহাভারতীয় পথে ও মহাভারতীয় আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে। পাটলীপুত্র বর্তমান পাটনা এবং বারাণসী ও প্রয়াগের তুলনামূলক বিচার করলেই এর অন্তর্নিহিত সত্যটি উপলব্ধ হবে। পাটলীপুত্রের মৌর্য সম্রাটের প্রাসাদ ও রাজসভা—অনেক খননকার্যের পর আবিষ্কৃত হয়েছে— এমন বিপুল বিরাট প্রাসাদ নগরী মাটির তলায় প্রোথিত হয়ে গেল, খননসাপেক্ষ হয়ে রইল। কিন্তু বারাণসী প্রয়াগ মহাভারতের মহাতীর্থ ও মহানগর কখনও হারায় নি। ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্য-সমৃদ্ধি এই বিচিত্র স্থানগুলিকেই অধিক পরিমাণে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। মহাভারতীয় এই কেন্দ্রগুলিতেই প্রাচীনকালের শিল্প আজও পর্যন্ত জীবিত আছে। এবং আরও একটা কথা প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরের সংযোগ ও পরিচয় এই মহাভারতীয় পথেই বলতে গেলে [illegible] আনা—হয়তো তার চেয়েও [illegible]। বাকী চার আনা বস্তুত জীবনের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বাস্তব ভারতবর্ষের পথে। সেই প্রাচীনকাল থেকে উড়িষ্যার সমুদ্রতটে মহাভারতের যে কোটি কোটি মানুষ এসেছে পরিচয় করে গেছে— [illegible] আবিষ্কার করে গেছে। [illegible] উড়িষ্যায় এসেছে [illegible] এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে ও [illegible]। উড়িষ্যা প্রদেশে রাজবংশের উত্থান পতনে বা ওড়িষ্যায় অন্তর্বিপ্লবে কাশ্মীর বা কামরূপ বা কন্যাকুমারীকার অঞ্চলে উৎকণ্ঠা বা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেনি, তারা এ সংবাদে জানতে চেয়েছে নীলমাধব জগন্নাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণ [illegible] উপদ্রুত হয়েছে কি না। সমগ্র ভারতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ বা ইতিহাসের কালের গণনা মোটামুটি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল থেকেই করা হয়। উত্তর ভারতে ইতিহাসের রাজবংশ—রাজধানীগুলি আজও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয় এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু অমরনাথ বদরীনাথ—হরিদ্বার অযোধ্যা বৃন্দাবন মথুরা পুষ্কর কুরুক্ষেত্র বারাণসী প্রয়াগ গয়া এগুলি প্রত্নতত্ত্বের বিষয় নয়। এগুলি আছে। বারবার ভেঙেছে। যতবার ভেঙেছে ততবার গড়েছে। কোনদিন বা দিনেকের জন্যও এই স্থানগুলিতে সুদূর দূরান্তরের যাত্রী সমাগমে ছেদ পড়েনি। হয়তো বা তীর্থগুলির মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে এক এক যুগের এক একটি মন্দির বা নিদর্শন চাপা পড়েছে— এবং তার উপরের স্তরে আবার গড়েছে। অর্থাৎ লৌকিক

বাস্তব ভারতবর্ষে কালে কালে অনেক কিছু ঘটেছে—অনেক ধারা উঠেছে মিলিয়েছে কিন্তু অলৌকিক মহাভারতবর্ষে সেই একটি ধারা নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত। এ কখনও শুষ্ক হয় নি। এতে কখনও ছেদ পড়ে নি। বরং নব নব ধারার উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীনধারা থেকে তার প্রবাহও হয়তো বিপুল এবং বিশাল হয়েছে, কিন্তু আবার সে ধারা সেই প্রাচীনধারার সংগে মিশেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রামায়ণ ও মহাভারতের যে ধারা ভারতের ইতিহাসের ঊষাকালে, তা থেকে বৌদ্ধ এবং জৈন সংস্কৃতির ধারা নির্গত হল। এবং কিছু-কালের জন্য এই ধারা এমনই দুরন্তগতি দুস্তর পরিধিতে প্রবহমানা হল যে—পৌরাণিক ভারতবর্ষ বা মহাভারতবর্ষের ধারায় ছেদ পড়বে বলে মনে হল। কিন্তু পরবর্তীকালে অবশ্য বেশ কয়েক শত বৎসর পরে মহাভারতের বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে অহিংসা বিনয় প্রভৃতির অনুশাসনগুলি অংগীভূত হয়ে গিয়ে তার পালা শেষ করলে। এখানে আরও একটি বক্তব্য এই যে, বৌদ্ধ-ধর্মের এবং জৈনধর্মের অভ্যুত্থানের মধ্যে মহাভারতীয় ধারাই বিবর্তন পন্থায় নূতন একটি উত্তরণে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিল। তার কারণ বুদ্ধের বাণীগুলির অধিকাংশই মহাভারতের বাণীরই পালিভাষায় নবরূপ! সেগুলি পরমবুদ্ধের জীবনসাধনায় ও তপস্যায় মহিমান্বিতরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠে সেদিন এই মহাভারতের প্রয়োজনেই প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করি গৌতম-বুদ্ধের বিশ্ববিশ্রুত বিস্ময় ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী শ্লোকটি।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং
সাধুনাং জিনে।
জিনে কদারিযং দানেন
সচ্চেন অলীকবাদিনং।

মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বে রয়েছে—

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং
অসাধু সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন
জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্।

এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শ্রীযুক্ত প্রবোধ-চন্দ্র সেন মহাশয় অনেক আলোচনা করেছেন। তাতে তিনি মনস্বী উইন্টার নিৎসের একটি উক্তি তুলে ধরেছেন—

"The collection (Dhammapada) has come to conclude some sayings which were originally not Buddhist at all, but were drawn from that inexahustible source of Indian gnomic wisdom, from which they also found their way into Manus Law book, into the Mahavarata the text of the Jains and into the narrative works such as the Panchatantra." (Hist. of Ind. Literature Vol. 11. P. 84).

আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে—ভারতবর্ষে মহাভারতীয় অর্থাৎ সাধারণ অর্থে হিন্দুধর্মের প্রসার ও প্রভাবেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণধর্ম বা ভারতীয় জনগণের জীবনধাতুর স্বরূপ। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সেই দিক থেকে সর্বপ্রকার গ্লানিমুক্ত এবং জৈব-জীবনের ক্রোধ হিংসা থেকে সমুত্তীর্ণ।

মহাভারতীয় সংস্কৃতি কোন এক বিশেষ ধর্ম নয়। ব্যাপক অর্থে হিন্দুধর্ম বলতে আপত্তি থাকার কারণ থাকতে পারে এবং ধর্ম বললে বহু জনে নাসিকা কুঞ্চন করতে পারেন বলে ধর্মও বলব না। বলব মহা-ভারতীয় সংস্কৃতি বা দর্শন। এর মধ্যে বহু ধর্ম বহু দেবতা নিরাকারবাদ, সাকারবাদ, শূন্যবাদ, বহু আচার বহু খাদ্য বিচিত্র বিচার আশ্চর্য উদারতায় স্থান পেয়েছে। কোন বিরোধ সেখানে নেই। এক বিবাহ, বহু বিবাহ, কঠোর বৈধব্যপালন, বিধবাবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, নারীর পুনর্বিবাহ, ক্ষেত্রজ-পুত্র সবই স্থান পেয়েছে। মহাভারতে তারা বিধর্মী বিদেশী বলে পরিগণিত হয় নি। কেবলমাত্র তারা সসম্ভ্রমে পরম আন্ত-রিকতার সংগে মেনে নিয়েছে রাম-সীতা-লক্ষণ-ভরত-হনুমান-জটায়ুর মহৎ আদর্শ-গুলিকে শ্রেষ্ঠ এবং কল্পলোকের পরম সত্য বলে, সেখানে পৌঁছুনোর জন্যই তাদের ভারতের তপস্যাভূমিকে আপনাদের জীবনা-সন ও মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছে। মহা-ভারতের কৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাই। আদর্শ মেনেছে আর এই চরিত্র-গুলিকে ইষ্ট না-হলেও পরমপূজ্য বলে গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে এই মহা-ভারতীয় ধর্মে অহিংসা, প্রেম ও করুণার উপলব্ধির মধ্যে যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করলেন তাঁকেও মহাভারতীয় সংস্কৃতি দশঅবতারের নবমতম বলে মেনে নিয়েছে। মহাবীরকেও সে অবজ্ঞা করে নি।

আর এক দেবতা দম্পতি। শিব এবং শক্তি। শক্তির দেহ একান্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে গ্রন্থন করে রেখেছে।

যারা এ'দের মেনেছে তাদের যে কোন আচার যে কোন ধর্ম বৈশিষ্ট্য হোক না কেন, মহাভারতীয় সংস্কৃতির এবং মহাভারতের মধ্যে তারা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যেই একজাতি একপ্রাণ একতা। একস্বপ্ন। মহা-ভারতের উপসংহারের মত। স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন। মানুষ একদা স্বর্গরাজ্যের বা রামরাজ্যের সৃষ্টি করবে।

বাহির থেকে বারবার অভিযান এসেছে। তাদের মধ্যে এ দেশে যারা থেকে গেছে এই মহাভারতের আশ্চর্যস্বপ্নে এবং তার পৌরাণিক পরমোজ্জ্বল মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাকে মেনে নিয়ে গ্রহণ করে তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট কটাহ, [illegible] কটাহ চাপানো রয়েছে মহাভারতের বিরাট অনির্বাণ জীবনযজ্ঞ হোমানলের উপর; সেই কটাহে আদিযুগ থেকে বহিরাগত মানুষের দল এসে আপন আপন জীবনধাতু ঢেলে দিয়েছে। সংমিশ্রণ হচ্ছে।

প্রথম এই সংমিশ্রণে বাধার-সৃষ্টি হল ইসলামের অভিযানে বা আগমনে। তারা এতে মিশল না।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে গেল। মহাভারত তাও খণ্ডিত হল বই কি। ঐতিহাসিক মহেঞ্জদড়ো—পেশোয়ারই শুধু ভারতবর্ষের গণ্ডি থেকে খণ্ডিত হয় নি—সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের অনেক তীর্থও গেছে।

কিন্তু এই সংমিশ্রণ হল না কেন?

এবং আরও একটা প্রশ্ন জাগে এই যে, ভৌগোলিক এবং ইতিহাসের ভারতবর্ষের মধ্যে যে মহাভারতের কথা উল্লেখ করেছি সে মহাভারত তো ইসলাম অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত অটুট ছিল, সেখানে তো অভিযান হয় নি—তবু এমন কোন ঐক্যবন্ধ সংগঠন সেদিন গড়ে উঠল না কেন যা এই ইসলাম অভিযানকে বাধা দিতে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে!

ইসলামের অভিযানের প্রথম লক্ষ্য ছিল রাজ্য নয়—লুণ্ঠন এবং এই লুণ্ঠনের সর্বোত্তম ক্ষেত্র সে আবিষ্কার করেছিল ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে অর্থাৎ রাজার প্রাসাদে বা কোষাগারে নয়—সে-ক্ষেত্র তারা আবিষ্কার করেছিল পৌরাণিক ভারতবর্ষ বা মহাভারত অর্থাৎ দেবমন্দিরে। দেবমন্দির-গুলি যুগ যুগ ধরে সঞ্চয় করেছিল অপরিমেয় ঐশ্বর্য মানুষের দেওয়া পুজো থেকে।

তবু যে মহাভারতের গৌরব আমরা করি যেখানে আমাদের আত্মার ঐক্য নিহিত আছে বলে ভাবছি সেখান হতেই বা আমরা এমন সংগঠন সম্ভবপর করে তুলতে পারিনি কেন?

* * *

কেন পারিনি, কেন সম্ভবপর হয় নি—সে বহু বিশ্লেষণ ও বহু গবেষণা সাপেক্ষ। তবে মোটা কথা এই যে, জীবনে যে বাস্তবতা এবং বস্তুসম্পর্ক অতি প্রত্যক্ষ এবং মহাসত্য, যা ইতিহাসের আমলে এসে বাস্তব-পরীক্ষায় বাস্তবতাবোধের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে এই পৌরাণিক আদর্শ এবং পৌরাণিক সম্পর্কবন্ধন পুরাতন ও ক্ষীণবল হয়ে পড়েছিল অবশ্যম্ভাবী রূপে। আদর্শ এবং এই কাল্পনিক সম্পর্কের আবেগ ও [illegible] ক্রমশ মরে গিয়ে ধর্মপালন ও অন্ধ [illegible] আচারনিয়মে এসে পরিণতি লাভ করেছিল। [illegible] ঘটেছে সম্রাট [illegible] কিন্তু তা যে কেবল-[illegible]

[illegible] দিগ্বিজয়ের পশ্চাতে সামরিক বল না-হোক [illegible] সাম্রাজ্য ও সমারোহ গৌরব ছিল তাও বিবেচ্য। দ্বিতীয়বার আর একবার কিছু হয়েছিল সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়ে। তারপর গুপ্তবংশের সময় একবার দিগ্বি-জয়ের মধ্য দিয়ে বাস্তবতা ও রাজনীতির সূত্রে নানা বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত ভারতকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা হয়েছিল।

ইসলামের আমলে এ গ্রন্থি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু নানা ব্যর্থতার জন্য বিশেষ করে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে এ গ্রন্থি বারবার খুলে গেছে, ছিঁড়ে গেছে।

তারপর এসেছিল ইংরেজ। সে দুটি জিনিসই নিয়ে এসেছিল। এক তার বিপুল সামরিক শক্তি ও সংগঠন, দ্বিতীয় তার অতিবাস্তব বিজ্ঞানবাদী ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে দুটিরই অভাব ঘটেছে।

ভারতবর্ষ প্রাচীন আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে তার সামরিক শক্তির সংগঠনকে উপেক্ষা করে এসেছে। অস্ত্রের যুগে নিরস্ত্র থাকবার এই প্রচেষ্টা আদর্শমূলক হলেও অবাস্তব। আদর্শ জীবন বিকাশের মহত্তম কল্পনা তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাকে রক্ষা করবার মত শক্তি যদি না থাকে তবে সে আদর্শ নিরর্থক এবং ব্যর্থ।

অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদী শিক্ষাও পূর্ণরূপে জাতিগত হয়ে উঠতে পারে নি। ভাব-ভাবনা-ভাষা—জীবনপ্রকাশভঙ্গী আজও পরস্পর বিরোধী। আজও একদল অতি পুরাতনকে আকড়ে রয়েছেন, একদল অতি উগ্র আধুনিক অতিক্ষুধার্তের মত বিদেশের যে-কোন উচ্ছিষ্ট নির্বিচারে গ্রহণ করতে উদ্যত আগ্রহে প্রমত্ত। একদল মধ্যপন্থী অতিবিবেচকের মত অতীতের তেলকে নূতন কালের জলের সঙ্গে মেশাতে চাচ্ছেন।

দেশ আজও দরিদ্র। দারিদ্র্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। ফলে তার পীড়নে আত্মকলহের বিরাম নেই। উদরের অন্ন এবং জীবন-প্রাধান্যের জন্য আমরা ব্যক্তি ব্যক্তির

প্রতি এবং প্রদেশ প্রদেশের প্রতি বিদ্বিষ্ট। যে বিপুল সমৃদ্ধি ভারতবর্ষের হলে আমরা সুখী একটি যৌথ-পরিবারের মত একস্বার্থে প্রবৃদ্ধ হতে পারি তাও আজও সৃষ্টি হতে পারে নি।

ভারতবর্ষের কটাহের তলায় নতুন করে আগুন জ্বালাবার আয়োজন হয়েছে; আজ বহু জাতির বহু জীবনধাতু ফুটতে শুরু করে নি, গলাতে আরম্ভ হয় নি। হলে মিশবে। না-হলে কি হবে ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

তার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই বিশ্বাসঘাতকতার সর্বনাশা উপাদান আছে সে সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক না-হলে হয়তো তার স্বভাবধর্ম অনুযায়ী একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা কটাহটাকেই চৌচির করে দিয়ে ১৯৪৭ সালের সদ্যোপ্সত খামার একটি ছেদ টেনে দেবে। তার ফলে যে চীন আজ শিষ্টতার ও ন্যায়বিচারের নকল ধ্বজা উড়িয়ে পিছিয়ে গেছে সেই চীনই সেদিন লালঝাণ্ডা উড়িয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে মুক্তিদাতা ও পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা নিয়ে হিমালয় বেয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়বে।

সমাপ্ত

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৮ ॥
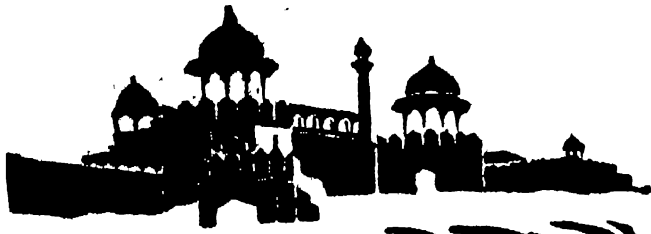
মিস্টার রিকোর্ড অব্ গুরুগাঁও

ওরা তিনজনে সোজা পাহাড়ের উপর দিয়ে ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার পর্যন্ত এসে পাহাড়ের গা বেয়ে পশ্চিমদিকে সদর-বাজারে নেমে এলো। দেখলো যে, তারা পৌঁছবার আগেই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অগ্রণী দল পৌঁছে গিয়েছে। লাইনডুরি গার্ড ও রসদ গার্ডের দল ইতিমধ্যেই নিজেদের নির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত হয়েছে। আর জমাদার দফাদার, উর্দিমেজর, কোত দফাদার, বাবুর্চি, খানসামা, ভিস্তি, মেথর ও ডুলি বাহকেরা কলের মতো যে-যার কাজ করে যাচ্ছে, গোলমাল নাই, বিশৃঙ্খলা নাই। ওরা অবাক হয়ে দেখে যে, লাইনডুরি গার্ডের দল ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের তাঁবু খাটিয়ে ফেলল, চেয়ার টেবিল আলমারি দিয়ে তাঁবুটি সাজালো, পাশে স্নানাগারের জন্য স্বতন্ত্র আর একটি তাঁবু খাটালো। তারপর পাশাপাশি কর্নেল, লেঃ কর্নেল, মেজর প্রভৃতির তাঁবু খাটিয়ে গেল আর প্রত্যেক তাঁবুর কাছে একটি করে নিশান পুঁতে দিল, যাতে সেনাপতিরা এসেই নিজ নিজ তাঁবু বুঝতে পারে। বাসস্থানের তাঁবু খাটানো শেষ হওয়া মাত্র রান্নার তাঁবু পড়লো। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা খাটিয়ে ডাইনিং হল তৈরি হল, তার মধ্যে মস্ত এক টেবিলের চারধারে পড়লো খান কুড়ি চেয়ার। এ কাজ শেষ হওয়া মাত্র লাইনডুরি গার্ড ঘোড়া থাকবার স্থান তৈরি করতে লেগে গেল। সারি সারি ঘোড়া থাকবার নিয়ম, কাজেই সারি সারি খোঁটা পুঁতে প্রত্যেক খোঁটায় একগাছা মোটা লম্বা দড়ি বাঁধলো। ঘোড়াসোয়ার এসে পৌঁছলেই ঘোড়াগুলো নিয়ে বাঁধবে। ওদিক রসদ গার্ডের দল রেজিমেন্টের বেনিয়ার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ডাল আটা, ঘি নুন সংগ্রহ করলো। ডিম ও গোস্ত হিন্দুস্তানী বেনিয়ারা ছোঁয় না, সেসব জোগাড় করবার ভার মুসলমান বাবুর্চিদের উপরে।

জীবনলালেরা সদর বাজারের রতনলাল হিন্দুস্তানীর পানের দোকানে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে সব দেখতে থাকে। জীবন ও গুরুবচন সিং অগ্রণী দলের এসব কাজ দেখতে অভ্যস্ত, বিস্ময়বোধ করে স্বরূপরাম। দিল্লী শহরে দেখেছে সিপাহী পক্ষের আচরণ অব্যবস্থার চরম, দেখেছে সবাই সকলের চেয়ে বড়, তাই কেউ কারো কথা শোনে না। সেখানে গদর শুরু হওয়ার পরে কদিনই বা ছিল সে, তখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল অরাজকতার কৃষ্ণপক্ষ। আর আজ দেখলো, অবশ্য এ কয়দিনও দেখেছে, তবে আজকের মতো এমন স্পষ্টভাবে দেখেনি, কেমন নিঃশব্দে কলের মতো কাজ হয়ে যাচ্ছে। ভাবে কি চমৎকার বন্দোবস্ত। তার মনের কথার প্রতিধ্বনি করে গুরুবচন বলে ওঠে, দেখো ভাই জীবনলাল কোম্পানী কেন জিতবে জানো?

কেন তুমিই বলো।

বন্দবস্ত! এই যে বন্দবস্ত দেখছ, শুধু এই জন্যেই জিতবে। নইলে সিপাহী পক্ষেও বাহাদুর আদমি বড় কম নাই, কিন্তু বন্দবস্ত বলে তাদের কিছু নাই।

স্বরূপ তার কথায় সমর্থন জানিয়ে দিল্লীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে।

দেখো না কেন, গুরুবচন বলে, সাহেবদের ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় খানা চাই, ছোট হাজরি, লাঞ্চ, টিফিন, ডিনার। তাতেও আবার কেমন বন্দবস্ত। পরিষ্কার কাপড়-পরা খানসামা ধোয়া কাপড়ে ঢাকা ট্রে সাজিয়ে খানা নিয়ে আসবে তা গোলা বৃষ্টিই হোক আর ঝড়বৃষ্টি হোক। আর আমাদের লোটা মাজতে আজতে লড়াই ফতে হয়ে যায়।

জীবন বলে, সাহস বটে ঐ খানসামা বাবুর্চির।

নিশ্চয়! আমরা তো হাতিয়ার নিয়ে অগ্রসর হই, মরতেও পারি মারতেও পারি। আর ওরা মৃত্যুর পথে নিরস্ত্র এগিয়ে যায় মনিবের খানা নিয়ে, পালাবার উপায় নাই, খানা নষ্ট হওয়া প্রাণ নষ্ট হওয়ার চেয়েও মারাত্মক।

আর সাহস, ঐ যারা কামানের গোলা কুড়িয়ে আনে দু' আনা বকশিশের লোভে, বলে জীবনলাল। দুমদাম চারদিকে গোলা পড়ছে, ওরা নির্বিকার। তপ্ত গোলা ঠাণ্ডা

হওয়ার আগেই বস্তায় ভরে টেনে নিয়ে আসে।

গোলাগুলোকে ওরা কি নাম দিয়েছে জানো? দিল্লিকা লাড্ডু, বলে ওঠে জীবনলাল।

এমন সময়ে ওরা দেখতে পায় দুইজন ইংরেজ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, একজন সৈনিক, অপরজন অসামরিক ব্যক্তি। ওরা দাঁড়িয়ে উঠে স্যালুট করে।

সৈনিকটি শুধায়, তোমরা কর্নেল ব্রিজম্যানের তাঁবু কোথায় জানো কি?

জীবন বলে, আমরা তাঁরই রেজিমেণ্টের রেসালাদার। কর্নেল থাকেন হিন্দুরাও কুঠিতে।

Very good! ইনি মিঃ ক্রিফোর্ড, গুরুগাঁও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, কর্নেল ব্রিজম্যানের বন্ধু। এ'কে তাঁর কাছে এখনি পৌছে দাও।

গুড বাই স্টফর্ড।

গুড বাই ক্রিফোর্ড। হঠকারিতায় কিছু করে ফেলো না।

উত্তর দেয় না ক্রিফোর্ড। ইঙ্গিতে ওদের অনুসরণ করতে বলে ছুটতে থাকে হিন্দুরাও কুঠির দিকে।

জীবনলালেরা ভাবে এত তাড়া কিসের।

ব্রিজম্যানের কামরায় তখন ঘোড়সোয়ার বাহিনীর মেজর রীড আর গোলন্দাজ বাহিনীর মেজর জোন্স উপস্থিত ছিল, ব্রিজম্যানকে নিয়ে তিনজন। ওদের পিছনে ফেলে রেখে ক্রিফোর্ড ঘরে প্রবেশ করলো, তৎক্ষণে ওরা দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা শুনতে পেলো।

হ্যালো ক্রিফোর্ড, গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং ব্রিজম্যান।

হঠাৎ কোথা থেকে?

গুরুগাঁও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলাম। সেখানে তুমুল বিদ্রোহ আর থাকা নিরর্থক, তাই স্টফোর্ডের সঙ্গে চলে এলাম।

বেশ করেছ। এখন দিল্লিতে আমাদের লোকের দরকার। তারপরে শুধালো, আশা করি তোমার পারিবারিক সব কুশল।

আদৌ কুশল নয়, অত্যন্ত দুঃসংবাদ। পরিবারের মধ্যে আমি আর আমার বেগম। দিল্লিতে বিদ্রোহ ঘটবার কয়েক দিন আগে মিস ক্রিফোর্ড এসেছিল দিল্লীতে বেড়াতে, ছিল পাদ্রী জেনিংস দম্পতির বাড়িতে। তারপরে—

তারপরে আর বলতে হবে না ক্রিফোর্ড, সব বুঝেছি।

কিছুই বোঝনি ব্রিজম্যান। মৃত্যুর চেয়েও শোচনীয় কিছু কি নেই?

কি বলতে চাও তুমি।

ক্রিফোর্ড গর্জন করে ওঠে, মারবার আগে তাকে বেইজ্জত করা হয়েছে।

কুণ্ঠিতভাবে ব্রিজম্যান বলে, খবর হয়তো ভুল।

না, না, আমাকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করো না, আমার খবর পাকা।

কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পরে ব্রিজম্যান বলল, এসো আমাদের সঙ্গে দিল্লী অধিকারে হাত লাগাও, শান্তি লাভ করবে মিস ক্রিফোর্ডের আত্মা।

দিল্লি অধিকারে শান্তি পাবে মিস ক্রিফোর্ডের আত্মা! ধিক!

তবে তুমি কি করতে চাও ক্রিফোর্ড?

প্রতিশোধ চাই।

অপরাধী কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

অপরাধীকে খুঁজতে হবে কেন? মিস ক্রিফোর্ডের সমবয়সী যে-কোন মেয়েকে দিল্লীর প্রকাশ্য রাজপথে বেইজ্জত করতে হবে। তবেই শান্তি পাবে এলিনার আত্মা তবে শান্তি পাবো আমি। এই হচ্ছে আমার ন্যূনতম প্রতিহিংসা।

কি বলছ তুমি ক্রিফোর্ড। এ কি খৃীষ্টানের মতো কাজ।

খৃীষ্টানের মতো কাজ পড়ে পড়ে মার খাওয়া, মেয়েদের বেইজ্জত হতে দেখা। কি বলো। আর খৃীষ্টানীতে কাজ নাই।

আচ্ছা সে-সব পরে চিন্তা করা যাবে, আপাততঃ শান্ত হও, বসো।

শান্ত হব, বসবো। অবশ্যই শান্ত হব, বসবো। ব্রিজম্যান এক এক সময়ে মনে হয়েছে বুঝি পাগল হয়ে যাবো, ইচ্ছা হয়েছে আত্মহত্যা করে সব জ্বালার অবসান ঘটাই। তখনি মনে হয়েছে, না মরা চলবে না, মৃত্যুর পরে এলিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কী বলবো তাকে। যখন সে শুধোবে অপরাধীর দণ্ড হয়েছে কি—তখন কী বলবো তাকে। না, ব্রিজম্যান, ভয় পেয়ো না, আমি মরবোও না, উন্মাদও হব না, দিল্লীর রাজপথে দিনের প্রখর আলোয় সহস্র চক্ষুর সম্মুখে সেই প্রতিহিংসা অনুষ্ঠিত হবে, সেই ভরসায় সেই বিশ্বাসে সেই আশ্বাসে আজো বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকবো।

এবার ব্রিজম্যান স্নেহের সঙ্গে বলল, আচ্ছা, পরে পরামর্শ করা যাবে, এখন এসো বিশ্রাম করবে। এই বলে তাকে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

॥ ৯ ॥

নিশীথ রাতের বাদল ধারা

রাত্রে ঘুম আসে না, ক্যাণ্টনমেণ্টের পেটা ঘড়িতে ঘণ্টার পরে ঘণ্টা বেজে যায়, থেকে থেকে পদচারণরত প্রহরীর চ্যালেঞ্জ চমকে চমকে ওঠে, দমকা বাতাসে ভেসে আসে মৃতদেহের পূতিগন্ধ, সেই সঙ্গে আসে শৃগাল আর শকুনের উৎকট কাড়াকাড়ির কর্কশ রব, ঘুম আর আসে না। রাত্রি দশটার পরে আলো না জ্বালতে কড়া নিষেধ, আলো নিভিয়ে দিতেই মশার কামড় তীব্রতর হয়ে [illegible] ঘুম হয় না আবার পাশাপাশি দুখানা চারপায়ার উপরে শুয়ে স্বরূপরাম ও জীবনলাল চুপ করে পড়ে থাকে। কখনো অসহ্য হলে এপাশ ওপাশ করে, তাতেই বুঝতে পারা যায় দুজনেই জাগ্রত।

স্বরূপজী, জেগে নাকি?

এর মধ্যে কি ঘুম সম্ভব? তুমি?

আমারও সেই অবস্থা।

এইরকম মাঝে মাঝে দুজনে প্রশ্নোত্তর চলে তারপরে আবার সব নীরব।

ঘুম না আসবার আরও কারণ আছে। ক্রিফোর্ডের বিবরণ শুনবার পরে দুজনের মনেই আলোড়ন শুরু হয়েছে। দিনের বেলায় হাজার কাজের মধ্যে চিন্তাটা চাপা পড়েছিল, রাতের বেলায় ভীষণ ফণা তুলে নাগিনী নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে।

দুজনেরই মন বিহ্বল, দুজনেই তীব্র চিন্তাস্রোতে ভাসমান, তবে এক রেখায় নয় সমান্তরাল ধারায়।

অনেক দিন পরে আজ পান্নার কথা মনে পড়েছে জীবনের, সেই চিন্তার কাছে আজ সে আত্মসমর্পণ করেছে। এতদিন পান্নার কথা মনে পড়েনি বললে অন্যায় হবে, পড়েছে এবং শত কাজের মধ্যে তার স্মৃতি জোনাকির টুকরোর মতো খণ্ড খণ্ডভাবে দেখা দিয়েছে, চমকে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছে, আজ হঠাৎ কেন জানি না মিস ক্রিফোর্ডের দুঃখের শিখায় পান্নার মুখমণ্ডল দীপ্যমান হয়ে চোখে পড়লো। পান্নারও তো এমনটি হতে পারতো এই ভাবনাতেই কি? কিম্বা সব দুঃখই তলে তলে এক সুতোয় গাঁথা এইরকম কোন সম্ভাবনায়? পান্না ক্রিফোর্ড মিলিত সত্তা অচপল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে। ঘুম আসবে কি করে? পান্নার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে অনেকবার সে মনের মধ্যে হাতড়িয়ে দেখেছে পান্নার সঙ্গে অগোচরে কি ভালোবাসার সুতো গাঁথা হয়ে গিয়েছে? নতুবা এতবার তাকে মনে পড়ে কেন? সুখে-দুঃখে মনে পড়ে কেন? কামানের মুখে আবদ্ধ হয়ে মনে পড়ে কেন? শত্রুসৈনাকে চার্জ করবার সময়ে মনে পড়ে কেন? স্বপ্ন-ভেদ করে পান্নার স্মৃতি সূচী চালনা করতে থাকে কেন? তার ধারণা হয়ে গিয়েছিল পান্নাকে সে ভালোবাসে। সে যদি নিতান্ত অনভিজ্ঞ না হত, তবে বুঝতে পারতো পান্নার প্রতি তার মনোভাব ভালোবাসার কাছাকাছি হলেও ভালবাসা নয়। জীবন ভালবাসার নদীতীরে এসেছে, কিন্তু এখনো নিজের ঘাটটি খুঁজে পায়নি। নদী পেলেই জলে নামা যায় না, তার জন্যে একটি ঘাটের প্রয়োজন। প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতায় অনেকেরই এমন ভুল হয়ে থাকে। ভুল ঘাটে নেমেও ফিরে আসতে হয়, ঘাটের জল খেয়ে তবে ফিরে আসে নিজের ঘাটে। পান্না প্রেমের নদী, ঘাট নয়।

স্বরূপেরাম প্রথম পদক্ষেপেই প্রেমের ঘাট পেয়ে গিয়েছে - সে ঐ তুলসীবাঈ। ভাবছে ঠিক হল ঘাটে পদক্ষেপ করবামাত্র ঘাট গেল ধসে, সে ভাসলো অতলে। তুলসীর স্মৃতি এক মুহূর্ত তার মন ছাড়ে না কিন্তু আজ তা নূতন তেজে ভাস্বর হয়ে উঠল মিস ক্রিফোর্ডের শোচনীয় মৃত্যুর সমিধ নিক্ষেপে। তার মনে পড়ল সেদিন যমুনার চরে হাকিম আসানুল্লা বলেছিল, মৃত্যুই তো সবচেয়ে শোচনীয় পরিসমাপ্তি নয়, বলেছিল লালকেল্লায় যারা তাঞ্জাম চেপে যায় তাদের মতো হতভাগিনী আর কেউ নেই। বলেছিল, তুমি যার জন্যে শোক করছ সে যদি কোতল হয়ে থাকে তবে সে তো বেঁচে গেল। তার মনে হল বাঁচেনি ঐ মিস ক্রিফোর্ড। অমনি হঠাৎ বুকের মধ্যে মোচড়

ব্যক্তি। তবু যে সম্ভব হল তার কারণ, যে বর্ণ ভেদ এক্ষেত্রে দুস্তর বাধা, রাত্রির অন্ধকার আমূলে লোপ করে দেয় সেই ব্যবধান।

এতদিন পরে একজন সমবেদনাসম্পন্ন শ্রোতা পেয়ে অনর্গল বেরিয়ে আসে মনের কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে ক্লিফোর্ড, কখনও বলে ওঠে এলিনাও ঠিক এই কথা বলত, ঠিক এই রকম তার স্বভাব ছিল, তোমার তুলসীর মতোই ছিল সে সুন্দরী আর স্নেহশীলা। এলিনার কথা জিজ্ঞাসা করতে হয় না স্বরূপকে, উপযাচক হয়ে বলে যায় ক্লিফোর্ড নিজে। দুজনের চোখে জল গড়ায়, কেউ সাহস করে না হাত তুলে মুছতে, সহৃদয় অন্ধকার ঢেকে রাখে সেই করুণ লজ্জার ধারা।

ওদিকে অনর্গলভাবে বয়ে যায় রাতের প্রহরের স্রোত, খেয়াল থাকে না তাদের। পুব দিকে যমুনার আকাশে আলোর ঘুম ভাঙে, একবার তাকায় আবার চোখ বোজে, বনের রেখার উপরে স্পষ্ট তার তুলি ক্রমে প্রকট হয়ে ওঠে, লালকেল্লার প্রাচীর গম্বুজ ধূসর আলখাল্লা পরে দেখা দিতে থাকে; পাহাড়ের উপরে ইংরেজ শিবিরে প্রহরীর চ্যালেঞ্জের ভাঁজে ভাঁজে শোনা যায় হাজার রকম পাখীর ডাক। মানুষ দেখা যায়, চেনা যায় না সেই প্রদোষের প্রথম আলোয়।

এতক্ষণ দুজনে একমনে নতমুখে কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে এই প্রথম দুজন দুজনকে দেখতে পেল। অমনি লজ্জায় ধিক্কারে অনুশোচনায় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ক্লিফোর্ড। এ কী করছিল সে! একজন অপরিচিত নেটিভের কাছে বলছিল ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের কথা। ভূমিকা বা উপসংহার কিছুই না করে চলে যায় সে কুঠির দিকে। কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে যায় স্বরূপ। কী হল! যে আলোয় বর্ণভেদ, সেই আলো যে দেখা দিয়েছে।

(ক্রমশ)

হুগলির চণ্ডীমণ্ডপ

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উগ্র রঙের সালু কাপড়ে সজ্জিত টিউব-লাইটে উদ্ভাসিত ও "লারে লাপ্পা"-নিনাদিত আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপের ধারে-কাছে এলেই এ কথা বুঝতে আর বেগ পেতে হয় না যে, মাত্র কয়েকটা দশকের মধ্যে "প্রগতির" সিধা সড়কে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছি। দেব-উপাসনার জন্য এখন আর পরিচ্ছন্ন পূত ভূমির প্রয়োজন নেই; রাস্তার মোড়ে বা পার্কের কোণায় সংবৎসররক্ষিত ডাস্টবিন-গুলি সাময়িকভাবে সরিয়ে ফেলে দেবীর আরাধনার আসন অনায়াসেই পাতা যেতে পারে। দুর্গাপূজার দিনক্ষণটা এখনও, অশেষ কৃপায়, পাঁজি দেখে মিলিয়ে নেওয়া চলছে সত্য কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর যে ধ্যানমূর্তি শাস্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে, অধুনা তা এতই নিষ্প্রভ এতই সেকেলে যে তার আকর্ষণ যুবজনচিত্তে সিনেমা-পসারিনীদের দেহহিল্লোলের উন্মাদনার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বর্তমান লেখক কুমারটুলির কুম্ভকারদের ঘরে ঘরে গিয়ে একথা শুনে এসেছেন যে, সাবেক ছাঁচের দুর্গা প্রতিমার এখন আর কিছুমাত্র চাহিদা নেই। এখন "ফিলিম-ইস্টার"দের জাস্তব আবেদন না ফোটাতে পারলে দুর্গা-প্রতিমা বাজারে অচল। প্রশ্নের রাজশেখর বসু মহাশয় একদা পাড়ার বারোয়ারী দুর্গা-পূজায় তাঁরা [illegible] হিসাবে দেবী [illegible] দাবি করবার সাহস (অথবা ধৃষ্টতা) [illegible] হয়েছিলেন। সেই মান্ধাতাগন্ধী প্রগতিবিরোধী প্রস্তাবকে আর একটা উৎকৃষ্ট হাসির গল্প বলে মনে করেছিলেন আধুনিক শক্তি-সাধকেরা। আর, "লারে লাপ্পা"র সর্বগ্রাসী কবল থেকে নিস্তার পাবার ভীরু বাসনাকে ঈষৎ সোচ্চার করবার গুরু অপরাধে অনেককে যে পাড়া ছাড়তে হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত, বঙ্গ-সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা শহরেও কিছুমাত্র বিরল নয়। অভাগা বঙ্গভূমে এ প্রথা এখন প্রায় প্রতিষ্ঠিতই বলা চলে যে দুর্গাপূজা নামক বাৎসরিক মহামারীর দুই আবশ্যিক অঙ্গ— কর্ণবিদারী কোলাহল আর চপল চাকচিক্য। এই ঘোর "প্রগতির" যুগে, যথাক্রমে শান্তি ও ভক্তির স্থান এরাই সবলে অধিকার করেছে।

আমাদের মতো অনগ্রসর মধ্যযুগীয়দের তবে উপায় কি? দেবোপাসনায় ভক্তির প্রয়োজনীয়তা, দেবীমূর্তিতে শুচিতার দুরাশা যাঁরা এখনও মনে মনে পোষণ করেন? অধুনা সংখ্যালঘু হলেও গুনতিতে তাঁরা হয়তো একেবারে নগণ্য নন।

আশার কথা, এই অনাচার দূরব্যাপী হলেও এখনও সর্বব্যাপী হয়নি! কলকাতা শহরে শাস্ত্রোক্ত দুর্গাপ্রতিমা আজও কিছু কিছু দেখা যায়। আর দেখা যায়— অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে বাংলার গ্রামে যেখানে সর্বার দেবীরা এখনও স্বর্গের দেবীতে পরিণত হননি। গ্রামীণ বাংলার দুর্গোৎসবের কথা সাধারণভাবে না বলে এই প্রবন্ধে আমি হুগলি জেলার মাত্র দুটি গ্রামের উল্লেখ করব এই কারণে যে, এ বিষয়ে এ-দুটি গ্রামের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। একথা আগেই বলেছি যে, দেব-আরাধনার জন্য শুচিতার প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে পরিচ্ছন্ন পূত ভূমির। এই সনাতন ঐতিহ্যটি অতি দীর্ঘকাল এই দুটি গ্রামে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসৃত হয়ে এসেছে।

মফস্বলের ধনীগৃহে দুর্গাপূজা সাধারণত ঠাকুর-দালানেই অনুষ্ঠিত হয় এবং একাদি-ক্রমে শতাধিক বৎসর একই ঠাকুরদালানে এ অনুষ্ঠান চলে এসেছে এ রকম দৃষ্টান্ত বাংলার পল্লীতে বিশেষ বিরল নয়। কিন্তু ইঁটের তৈরী এইসব ঠাকুরদালানের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশে দুর্গাপূজার স্থান নির্দিষ্ট ছিল খড়ে-ছাওয়া চণ্ডীমণ্ডপে, সংবৎসর যেগুলিকে এই শুভ উৎসবের জন্য শুচিতার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার আঁটপুর গ্রামে ও বলাগড় থানার শ্রীপুর গ্রামে এ-রকম দুটি সাবেক চণ্ডীমণ্ডপ এখনও কোনো গতিকে টিকে আছে। দুর্গাপূজার জন্য ব্যবহৃত খড়ে-ছাওয়া এ-রকম স্বতন্ত্র চণ্ডী-মণ্ডপ বাংলাদেশে আজও কটি অবশিষ্ট আছে জানি না। শুনেছি, নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগর গ্রামে আর একটি আছে কিন্তু সেটি নিশ্চিহ্ন হতে নাকি বেশী দেরি

খোদাই-কাঠের কৃষ্ণ-গোপিনী : শ্রীপুর

নে: হুগলি জেলার চণ্ডীমণ্ডপ দুটিও কালের প্রহারে জীর্ণ। একদা যেসব ভূস্বামীর বদান্যতায় এগুলি নির্মিত হয়েছিল তাঁদের বংশধরেরা অধুনা হৃতবৈভব। এই পুরাকীর্তির যথাযথ সংস্কার তাঁদের সাধ্যের বাইরেই বলা চলে। ফলে বঙ্গ-সংস্কৃতির এই অমূল্য সম্পদ দুটি যে আর কতদিন আত্মরক্ষা করতে পারবে বলা শক্ত।

আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি আনুমানিক ২৭০ বছরের পুরাতন। আধুনিক "প্রগতিশীল" পাঠকের কাছে আশ্চর্য শোনালেও একথা সত্য যে, এই চণ্ডী-মণ্ডপটিতে এত দীর্ঘকাল ধরে একাদিক্রমে বাৎসরিক দুর্গাপূজা হ'য়ে আসছে। প্রতিমা-মণ্ডপটির সামনে খড়ে-ছাওয়া আর একটি সুপরিসর আটচালা ছিল যেটিকে নাট-মন্দির হিসাবে ব্যবহার করা হত। ১২৭১ বঙ্গাব্দের প্রবল ঝড়ে এটি ভূমিসাৎ হয়। [illegible] এটির সংস্কার [illegible]। এখন সেই [illegible]

নাটমণ্ডপ নির্মিত হয়েছে। লুপ্ত আট-চালাটিতে ব্যবহৃত খোদাই কাঠের কারুকৃতি-গুলির কিছু কিছু নমুনা আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে শুনেছি।

আটপুরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আট-চালাটির প্রতিষ্ঠাতার নাম কন্দর্প মিত্র। কন্দর্প মিত্রের পরিবারের একাংশ এখনও আটপুরে বসবাস করেন। তাঁদের নিকট রক্ষিত একটি প্রাচীন পুঁথি থেকে জানা যায় যে বঙ্গাধিপ আদিশূরের নিমন্ত্রণে যখন পাঁচজন কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আসেন তখন যজ্ঞরক্ষার জন্য যে পাঁচজন ক্ষত্রিয় তাঁদের অনুগমন করেছিলেন তাঁদের অন্যতম কালিদাস মিত্রই এই মিত্র বংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা। কালিদাস মিত্রের নবম পুরুষ ধুইরাম মিত্র ২৪ পরগণার বাঁড়িশার বসতি করেন ও তাঁর বংশধরেরা "বাঁড়িশার মিত্র" নামে পরিচিত। এই পরিবারের এক অংশ হুগলি জেলার কোন্নগরে বাসস্থাপন করেন ও সেখানকার মিত্র পরিবার হিসাবে খ্যাত হন। কোন্নগরের পরিবারের কন্দর্প মিত্র [illegible] ১১৩০ বঙ্গাব্দে আটপুরে আসেন ও এ অঞ্চলের তৎকালীন প্রতাপ-শালী নৃপতি ভুরিশ্রেষ্ঠরাজের অধীনে উচ্চ-পদে বহাল হন। তাঁরই উপার্জিত অর্থে ও প্রচেষ্টায় আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

একথা মনে করবার কারণ আছে যে, কন্দর্প মিত্রের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপটি গঠন-সৌষ্ঠবে অপেক্ষাকৃত হীন ছিল; এটির সংস্কার ও পরিবর্ধনের জন্য দায়ী তাঁর পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র, দানশীলতা ও ভগবদ্-ভক্তির জন্য যিনি আটপুরের মিত্র বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। কৃষ্ণরাম ১১২৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও অতি শৈশবেই তাঁর পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। এই অসহায় অবস্থা থেকে একাধিক জ্ঞাতিশত্রুর বৈরিতা অতিক্রম ক'রে, বর্ধমান রাজের দেওয়ান হিসাবে বাৎসরিক বহু লক্ষ টাকার উপার্জন ক্ষমতায় কৃষ্ণরামের উত্তীর্ণ হ'বার কাহিনী রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের যাবতীয় জমিদারী নিজের নামে ইজারা নিয়ে কৃষ্ণরামের বৎসরে নাকি কয়েক লক্ষ টাকার সংস্থান হ'ত। এই টাকা যে সদুপায়ে অর্জিত এবং দেওয়ান হিসাবে কৃষ্ণরাম যে বিশ্বাসভঙ্গ করেননি তার প্রমাণ স্বরূপ এ কথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মৃত্যুকালে মহারাজা কীর্তিচন্দ্র তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসাবে কৃষ্ণরামকেই নিযুক্ত করে যান।

কৃষ্ণরামের প্রভূত উপার্জনের অধিকাংশই দান ও দেবসেবায় ব্যয়িত হয়েছে। আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালাটির নির্মাণে, সেকালের দ্রব্যমূল্যের অল্পতা সত্ত্বেও যে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর আর এক কীর্তি আটপুরের বিখ্যাত গোবিন্দ জীউর মন্দির। কি স্থাপত্যে, কি পোড়ামাটির বিপুল অলংকরণে এ মন্দিরটি হুগলি জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয় তো বটেই, তুলনামূলকভাবে অধিকতর প্রখ্যাত বিষ্ণুপুরের অনুরূপ মন্দিরগুলির থেকেও বিশেষ হীন নয়। এটি তৈরি করতে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল। এ হিসাব যে কাল্পনিক নয় তা এখনও মন্দিরটি দেখলেই বোঝা যায়।

সাধারণ পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, সেকালের সস্তার বাজারেও সামান্য দুটি চালাঘরের পিছনে বহু সহস্র টাকা খরচ হয় কি করে। আটপুরের নাটমণ্ডপ-আটচালাটি এখন আর বর্তমান নেই; কিন্তু অবশিষ্ট চণ্ডীমণ্ডপটি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। যাঁরা দেখেননি, তাঁদের একটু বুঝিয়ে বলবার অবকাশ আছে।

আটপুর ও শ্রীপুর—হুগলি জেলার এই দুটি গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ [illegible]

গঠন-প্রকরণে এ দুটির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। আটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি পূর্বমুখী ও এটির আচ্ছাদিত এলাকা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ ফুট ও প্রস্থে কুড়ি ফুটের মতো হবে। সামনে প্রশস্ত শান-বাঁধানো চাতাল; উপরে উঠে আসবার পাকা সিঁড়ি আছে। এই ইঁট-সিমেন্টের ব্যবহার যে পরবর্তী কালের তাতে সন্দেহ নেই, কেন না সাবেক চালাটির মেঝে, দেওয়াল ও সামনের বারান্দা, চিরাচরিত গ্রাম্য প্রথায়, নিশ্চয়ই মাটির তৈরি ছিল। মাটির তৈরি সুগঠিত দেওয়াল—যা পল্লী বাংলার সর্বত্রই গৃহ-নির্মাণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে—তা যে ইঁট-চুন-সুরকির দেওয়ালের থেকে দু' তিন গুণ বেশী দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে একথা শহর অঞ্চলে খুব সুবিদিত নয়। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণে এই দীর্ঘ-স্থায়িত্বের জন্য সেকালে মূল্যবান গৃহের বেলাতেও মাটির দেওয়ালের ব্যবহারকে কখনও অবিবেচনার কাজ বলে মনে করা হয়নি।

চণ্ডীমণ্ডপটির উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে, চালের বক্র রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়াল উঠেছে কিন্তু সামনের দিক সম্পূর্ণ অবারিত। সেদিকে, চালের ভার বহন করবার জন্য ছ'টি কি আটটি কাঠের স্তম্ভ আছে, যেগুলির আপাদমস্তক সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজে মণ্ডিত। এই ক'টি স্তম্ভেই অবশ্য এই বিরাট আটচালার সমস্ত ভার রক্ষিত হয় না। সেজন্য স্তম্ভ-শীর্ষ থেকে আড়াআড়ি অনেকগুলি কাঠের বরগাকেও কাজে লাগানো হয়েছে। সর্বনিম্ন সারির বরগাগুলির উপর খাড়া কাঠের খুঁটির সঙ্গে নিবদ্ধ আর এক সারি সমান্তরাল বরগা আছে ও তারও ঊর্ধ্বে, ঠিক ছাতের নীচে, আর এক সারি। এই লম্ব ও সমান্তরাল কাঠের কড়ি-বরগার সমারোহকে আধুনিক নির্মীয়মান রি-ইন-ফোর্সড্ কংক্রিটের বাড়ির ইস্পাতের ফ্রেমের মতো মনে হয়। এই সমস্ত-ব্যবস্থাটিকে শক্তিশালী করবার জন্য প্রধান প্রধান জোড়-গুলির মুখে সহায়ক আলাদা কাঠের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেগুলিকেও অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত করে, স্থূলে ব্যবহারিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ করা হয়েছে এক অপূর্ব শিল্পলোকে। বস্তুত, আটপুর অথবা শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপ দুটির প্রধান আকর্ষণই হল এই কাঠ-খোদাইয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগরি যার অফুরন্ত নিদর্শন কি থামগুলিতে, কি কড়ি-বরগায়, কি সহায়ক টুকরোগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ছড়ানো রয়েছে। সহজেই বোঝা যায় বহু সুদক্ষ দারুশিল্পীর বহু বর্ষ মাসের নিরবিচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফল [illegible] এই [illegible]ই যে [illegible]

কাষ্ঠনির্মিত কালীমূর্তি : আটপুর

নির্মাণের মোট খরচের একটা বৃহৎ অংশ তাতে সন্দেহ নেই।

এই দোচালাগুলির খড়ের চালের ভিতরের দিকের সংরক্ষণ ব্যবস্থাটিও উল্লেখযোগ্য। সাধারণ কুঁড়ে ঘরে দুটি বাঁশের মাচার উপরে চালাগুলি বিন্যস্ত থাকে; নীচে থেকে খড়ের আচ্ছাদনের কর্কশতা চোখে পড়ে। দেব-উপাসনার পূত কক্ষে এই দৃষ্টিকটুত্ব দূর করবার জন্য অসামান্য ধৈর্যে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে ছাতের ভিতরের দিকটি ঘনসন্নিবিষ্ট রঙিন কাঠি দিয়ে একেবারে ঢেকে দেওয়াই সাবেক রীতি ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূর-পুচ্ছেরও ব্যবহার হয়েছে একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রতি দশ বারো বছর অন্তর খড়ের চাল পরিবর্তনের সময় এই অঙ্গসজ্জাটির ক্ষতি হয়েছে বারংবার। আটপুরের চণ্ডী-মণ্ডপটিতে এই সজ্জা সেজন্য এখন অনেক হীনপ্রভ আর শ্রীপুরেরটির চালা, মায়-[illegible]

ছাওয়া হয়েছে বলে এই বিশেষত্বটি সেখানে আর উল্লেখযোগ্য নয়। এবিষয়ে নদীয়া জেলার উলা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপটি একদা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল বলে মনে হয়। "উলার মুস্তোফী বংশ" পুস্তকে গ্রন্থকার শ্রীসুজননাথ মুস্তোফী মহাশয় লিখেছেন
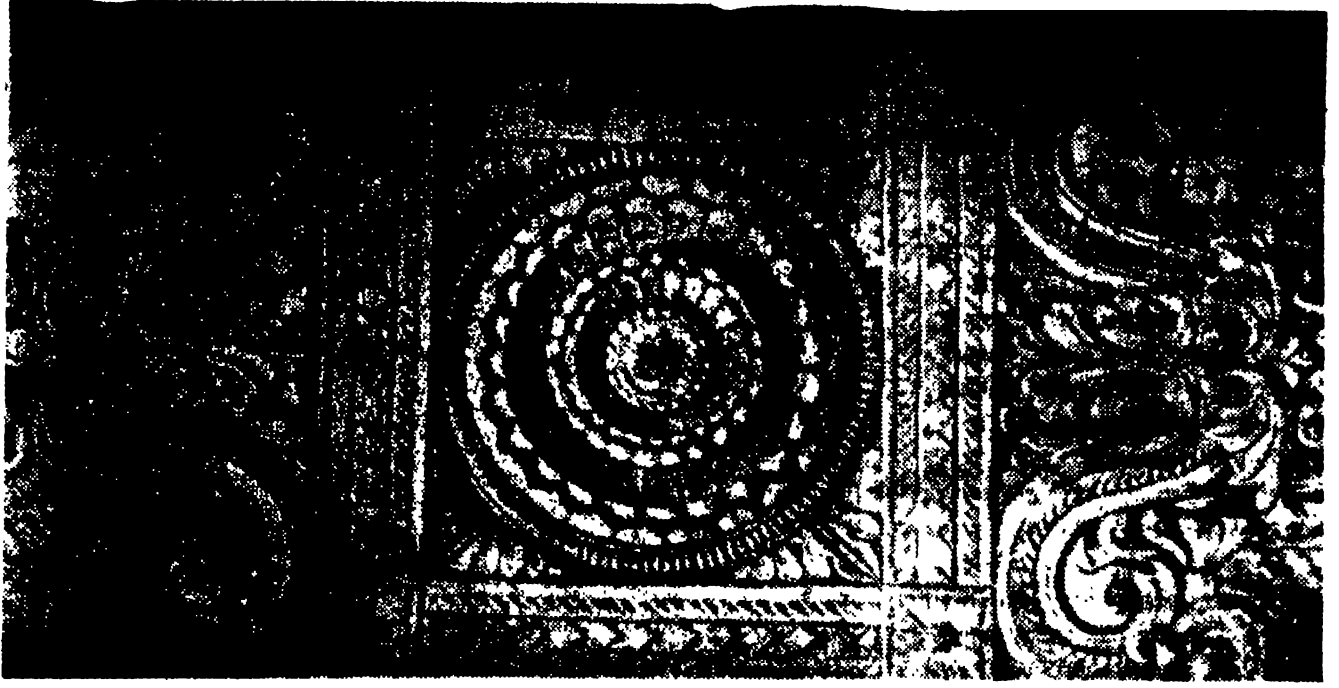
বরগার অলংকরণ : আটপুর

—"এই গৃহের চালের ভিতর দিকে সরু সুতের ন্যায় সূক্ষ্ম বেতের কারুকার্য ছিল। তন্মধ্যস্থিত অশ্ব ও ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকের এবং রঙিন সরু বাঁশের শলা বা কাঠির দ্বারা নির্মিত চিকের আচ্ছাদন দ্বারা চালের ভিতরের দিকের খড় ঢাকা ছিল। ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের ঝড়ে চাল উড়িয়া যাওয়ায় ঐ সকল কারুকার্য নষ্ট হইয়াছে" —(পৃ: ৯০—৯১)। সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ-রকম একটি প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের ছাতের কারিগরির প্রশংসায় বলেছেন—"চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে আর নয়ন মন ফিরাইয়া আনা ভার হইত। আমি বালক, সৌন্দর্যপ্রিয়, আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। শেষে আমার রক্ষকেরা আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বলপূর্বক লইয়া চলিল" —(সাহিত্য : ভাদ্র, ১৩২০)। এই কারুকার্য-গুলির চমৎকারিত্বের নিরিখ হিসাবে উলা বা বীরনগর গ্রামে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দুর্গাপূজার সময় প্রতিমা-দর্শনার্থী জনতা নাকি অধিকাংশ সময় ছাতের অপরূপ শোভার দিকেই তাকিয়ে থাকত। অতএব, দেবী স্বপ্নাদেশ দেন যে
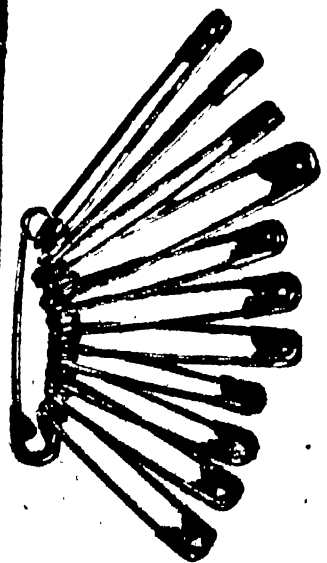
পুজোর ক'দিন যেন চণ্ডীমণ্ডপের চালা ঢেকে দেওয়া হয়।

আটপুর ও শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপ দুটির ছাতের অলংকরণের আজ সামান্যই অবশিষ্ট আছে। থাম, কড়ি বরগা প্রভৃতিতে সাবেক খোদাইয়ের কাজও কিছুটা মলিন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। তবু একথা অক্লেশেই বলা চলে যে এত উৎকৃষ্ট দারুশিল্প শুধু বাংলা দেশে কেন ভারতবর্ষেও বিরল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ-কারুকর্মটির অনুশীলন এখন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। বর্তমান লেখক হুগলি জেলার প্রায় সর্বত্র খোঁজ করেও এই শিল্পীগোষ্ঠীর কোনো উত্তরসাধকের সন্ধান পাননি। ঢাকার মসলিনের মতো, মুর্শিদাবাদের বালুচরী শাড়ির মতো অথবা বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া বীরভূম হুগলির পোড়ামাটির নকশী টালির মতো প্রথম শ্রেণীর এই কাঠখোদাই শিল্পটিও হয়তো চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। আবার কোনো দিন উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতায় এটিকে পুনরুদ্ধার করা যাবে কিনা কে জানে।

শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপটি ঠিক কবে নির্মিত হয়েছিল বলা শক্ত তবে এটি যে আনুমানিক ২৫০ বছরের পুরাতন একথা বলা যায়। "উলার মুস্তৌফী বংশ" পুস্তকের রচয়িতা শ্রীসুজননাথ মুস্তৌফীর মতে "উলার মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দন হইতেই মুস্তৌফী বংশের শ্রীপুর শাখার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ১১১৪ বঙ্গাব্দে রঘুনন্দন উলা ত্যাগ করিয়া পূর্বতন জেলা বর্ধমানের (বর্তমানে হুগলি) ভাগীরথী তীরস্থ তৎপূর্বে বেণীপুর থানার (বর্তমান বলাগড় থানার) শ্রীপুর গ্রামে বসবাস করেন। উলা হইতে নূতন স্থানে গিয়া যাহাতে পরিবারবর্গের মনোকষ্ট না হয় সেজন্য তিনি উলা হইতে কারিগর লইয়া গিয়া মুস্তৌফী-বাটির অনুকরণে গড়বেষ্টিত বাটি, দীঘি ও চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। আজও সেসব শ্রীপুরে বিদ্যমান আছে"—(পৃঃ ১১৫-১৬)। শ্রীপুরে বসতি পত্তনের পাঁচ বছর পরে রঘুনন্দন সেখানকার চণ্ডীমণ্ডপটি নির্মাণ করান, এ-রকম অনুমান যদি করা যায় তাহলে সেটির প্রতিষ্ঠাকাল দাঁড়ায় ১১১৯ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক আড়াই শো বছর আগে। এই দীর্ঘকাল এ মণ্ডপটিতে প্রতি বৎসর দুর্গাপুজো হয়ে আসছে কোনো ছেদ পড়েনি।

কি আটপুর কি শ্রীপুরে চণ্ডীমণ্ডপগুলির অলংকরণে একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। ছাতের অলংকরণের কথা আগেই বলেছি। কড়ি বরগা ও থামগুলিতে খোদাই নকশার কথা এবার বলি। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য পরিস্ফুট করবার সুবিধার জন্য কাঠাল-কাঠ চিরকালই সমাদৃত। এই চণ্ডীমণ্ডপ দুটিতে সেজন্য কাঠ বলতে কাঠাল-

স্তম্ভশীর্ষের সজ্জা : শ্রীপুর

কাঠই ব্যবহার করা হয়েছে। থামগুলির মধ্য অংশ গোল কিন্তু মূল ও শীর্ষদেশ চতুষ্কোণ এবং লতাপাতা ও নানাবিধ জ্যামিতিক নকশায় এগুলির আপাদমস্তক আবৃত। এই কারুকৃতিগুলি বিশেষ করে থামের নীচের দিকে যেগুলি আছে সেইগুলি, গত আড়াই শো বছরের রোদ-বৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে কেন না থামগুলি চণ্ডীমণ্ডপের খোলা দিকটিতে অবস্থিত বলে অনেকটা অনাবৃত। তবুও স্তম্ভশীর্ষের কারিগরি শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপটিতে এতোই অপূর্ব যে তার তুলনা মেলা ভার। এই প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত একটি ছবি হয়তো একথা প্রমাণ করতে সাহায্য করবে। কড়ি-বরগা ও সহায়ক কাঠের টুকরোগুলি মণ্ডপের চালার নীচে ঢাকা জায়গায় নিবদ্ধ বলে এদের অলংকরণ এখনও সজীব আছে। কড়ি-বরগাগুলি সাধারণত পদ্মফুলের অনুকৃতি ও লতাপল্লবের জ্যামিতিক নকশায় অলংকৃত। একদা রঙের প্রয়োগে এই শিল্পকর্মগুলিকে আরও চিত্তাকর্ষক করা হয়েছিল মনে হয়; রঙের পলস্তারা এখনও এখানে সেখানে

নজরে পড়ে। তবে সামগ্রিক ভাবে, চণ্ডী-মণ্ডপ-শোভার শেষ কথা হল স্তম্ভশীর্ষের সহায়ক কাঠের টুকরোগুলি; যেগুলিকে সুনিপুণ দক্ষতায় খোদাই করে দেবদেবী-মূর্তি বা নানাবিধ সামাজিক কর্মে রত নরনারীর মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এক এক খণ্ড নিরবয়ব কাঠকে সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমেত মূর্তিতে পরিণত করা যে কী অসীম নৈপুণ্য ও ধৈর্যসাপেক্ষ তা সহজেই অনুমেয়। এই মূর্তিগুলির বিষয়বস্তু নির্বাচনেও যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ-গোপিনীর মূর্তির পাশেই করালবদনা কালীর অথবা রাধাশ্যামের যুগলমূর্তির পাশেই মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিকৃতি আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটিতে উৎকীর্ণ আছে, যদিও এ দেবালয়ের রচয়িতা কৃষ্ণরাম মিত্র ছিলেন বৈষ্ণব। সামাজিক নরনারী মূর্তিগুলিও যে অপূর্ব সৌকর্যে বিধৃত তার যথাযথ বর্ণনা করতে হলে এক পৃথক প্রবন্ধ লেখাই সমীচীন। আঁটপুরের মণ্ডপটিতে ময়ূর কোলে নিয়ে একটি মেয়ের মূর্তি আছে। বর্তমান লেখকের মতে, কেবলমাত্র এইটি দেখবার উদ্দেশ্যেই বহু দূরে ভ্রমণও নিরর্থক নয়।

সৌভাগ্যক্রমে আঁটপুর ও শ্রীপুরের চণ্ডীমণ্ডপ দুটি দেখতে বহু দূরে ভ্রমণের প্রয়োজন নেই, যথাক্রমে এ-দুটি জায়গা কলকাতা থেকে আনুমানিক মাত্র কুড়ি মাইল ও চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। আর, এ-প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকার অধিকাংশই যে কলকাতা শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা এরকমই আমার ধারণা। হাওড়া ময়দান রেল স্টেশন থেকে মার্টিন কোম্পানীর ট্রেন চেপে আন্দাজ আড়াই ঘণ্টায় আঁটপুর স্টেশনে পৌঁছানো যায়। চণ্ডীমণ্ডপ ও রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির (সেটিও বিশেষ দ্রষ্টব্য) সেখান থেকে দু-তিন মিনিটের পথ পায়ে হেঁটেই যাওয়া চলে। শ্রীপুরে যেতে হলে হাওড়া-কাটোয়া লাইনের বলাগড় স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশায় আরও দেড় মাইল কি দু'মাইল যেতে হবে। উৎসাহী পাঠক যদি রেলের টাইম-টেবিলে কিয়ৎকাল মনোনিবেশ করেন তবে দেখতে পাবেন যে এ দুটি দর্শনীয় স্থানের যে কোনো একটিতে কলকাতা থেকে একদিনের মধ্যেই গিয়ে ফিরে আসা সম্ভব।

আজকে যখন চারিদিকে দেশপ্রেম জাগ্রত, তখন এ-প্রবন্ধ যদি মুষ্টিমেয় পাঠককেও বঙ্গ-সংস্কৃতির এই দুটি অমূল্য সম্পদ পরিদর্শন করবার জন্য প্রলুব্ধ করে তবে এ-লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবার কারণ ঘটে। দেশপ্রেম মাটি, পাথর বা গাছ-পালার প্রতি প্রেম নয়। জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী তার সংস্কৃতির জন্য। সেই মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সংস্কৃতির এই ছোট বড় নিদর্শনগুলি। এগুলি মর্মে গাঁথা হলে তবেই বহু বিঘোষিত দেশপ্রেম হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থায়ীভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে। আজ তাই সব থেকে বেশী প্রয়োজন ভারতীয় কৃষ্টির যাবতীয় বিকাশের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটানো, যাতে দেশ-হিতৈষণা দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থেকে উৎসারিত হয়।

এ-কাজ একের নয় বহুর। যে যেভাবে পারেন যদি সততার সঙ্গে এ-কাজে হাত দেন তা হলে দেশপ্রেমের বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসকে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গত, হুগলি জেলার কথাই বলি। রামমোহন, রামকৃষ্ণ অরবিন্দের জন্মভূমি এই জেলায় বঙ্গ সংস্কৃতির বহু অমূল্য সম্পদ এখনও অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে, দেশবাসী সেগুলির খবরও জানেন না। অথচ এই জেলার প্রায় বিশটি কলেজে অনেক শত অধ্যাপক অধ্যাপিকা কাজ করেন। বছরে দুবার দীর্ঘ ছুটি সমেত তাঁদের অবকাশ একেবারে নগণ্য নয়। লেখাপড়ার সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত এই শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এবিষয়ে একটু মনোযোগী হন তাহলে এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি ভাল ভাবেই নিষ্পন্ন হতে পারে বলে বর্তমান লেখকের বিশ্বাস।

এই খেদোক্তি মৌচাকে ঢিল মারার কাজ করবে কিনা জানি না। "দেশ" পত্রিকার দপ্তরও রাশি রাশি প্রতিবাদপত্রে আকীর্ণ হবে কিনা সেকথা সম্পাদক মহাশয়ই বলতে পারবেন। আমার সবিনয় নিবেদন—"এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।"
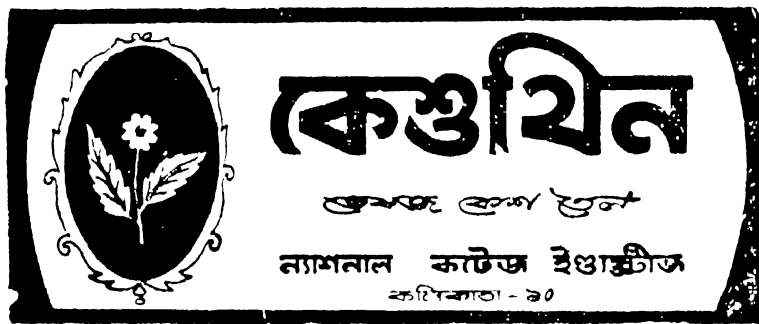
(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

॥ আটত্রিশ ॥

যা আন্দাজ করেছে তাই—চারদিন গর-হাজির থাকার দরুন সাহেব বরখাস্ত। দীনু পাটোয়ার নতুন রাখাল রেখেছে। তবে ভাটি অঞ্চলে শিক্ষিত মানুষের অকুলান বলে গোমস্তার কাজ এখনো খালি। শুধুমাত্র সেইটুকু হতে পারে। মাইনে গোমস্তাগিরি বাবদে ছিল তিন। দু-রকমের কাজ একসঙ্গে—ধরে নিলাম তাই পাইকারি দর। এখন এই চাকরির জন্য কত হওয়া উচিত, তুমিই বল সাহেব। সাড়ে-তিন-কি বলো? কাগজ-কলমের কাজ হল বাবুভেয়ের কাজ—দর কিছু বেশিই হবে। মাইনে ঐ সাড়ে-তিন সাব্যস্ত রইল।

সাহেব বলে, পুরানো পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেন পাটোয়ারমশায়। এখানে থাকব না, চাকরী সকালবেলা এসে করে যাব।

দিব্যি হল। টাকাপয়সা যা ছিল সুধামুখীকে মণিঅর্ডার করে একেবারে শূন্য হাত। আবার কিছু নগদ এসে পড়ল হাতে। সকল দিকে চমৎকার। নিজ রোজগারের ভাত—ঠেক্কে ঠেক্কে থাকতে হবে না, মুরারি বর্ধন কখন এসে ধরে ফেলে!

পচাক এসে বলে, চাকিয়ে বুকিয়ে চলে এলাম। শোব আপনার ঘরে, যেমন যেমন বলবেন করে যাব। চাটি করে চাল ফুটিয়ে নেবো—এদের বাড়িতেও নয়। সীমানার বাইরে পথের ধারে জামরুলতলায়।

বাড়ি আজ ওদেরই বটে! ফোঁস করে পচা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে : জীয়ন্তে মড়া হয়ে ওদের বাড়ি পড়ে আছি। গতর থাকলে আমিও আলাদা চাল ফুটিয়ে নিতাম। ওদের ভাত না গিলে আমার যে উপায় নেই!

সেই ব্যবস্থা। জামরুলতলায় পরদিন সাহেব ভাত চাপিয়েছে। তিনটে মাটির ঢেলা উনুনের তিনটে ঝিক, তার উপরে মেটে হাঁড়ি। পুকুরঘাটে স্নান করে সুভদ্রা কলসি নিয়ে হেলতে দুলতে ফিরছে। কাঁখের কলসির মতো দেহের কানায় কানায় ভরা যৌবন—চলনের সঙ্গে সে যৌবনও ছলকে ছলকে পড়ে যেন। সাহেবকে দেখে থমকে [illegible] দেখে।

কি হচ্ছে ঠাকুরপো? রান্না করছ ওখানে?

হুড়কো পার হয়ে ঘাসবন মাড়িয়ে জামরুলতলায় চলে আসে : রান্নার বিদ্যেও জানা তোমার? ঠাকুরপোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে বড় ভাগ্যধরী। ঠাকুরপো বেঁধে বেড়ে খাওয়াবে, সে মেয়ে বিনুনি বেঁধে আলতা পরে খাটে বসে পা দোলাবে। মাটিতে পা ছোঁয়াতে হবে না। তোমার সংসারে আজ আমার নেমন্তন্ন ভাই। রান্না হলে পাত্তা পেতে বসে যাব।

সাহেব জবাব দিল না, শুকনো ডাল-পাতা খুঁটে খুঁটে উনুনে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা বলে কি রাঁধছ গো?

ভাত, কাঁচকলা-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

উঃ, যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া একেবারে! সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল : হবে আর কোন ছাই পাবে কি কোথায়? আমাদের বাড়ি পাত পাড়বে না, এমনি খেয়েই চলবে বুঝি বরাবর?

সাহেব বলে, মন্দ হল কিসে? দু-দুখানা তরকারি। তার উপরে কাগজিলেবু আর কাঁচালংকা তুলে এনেছি একজনের বাগান থেকে। ও কি জল আমি ইচ্ছে করে কম দিয়েছি, ফ্যান গালবার হ্যাঙ্গামে যাব না তো! ও কি, ও কি, ও কি—

হুড়হুড় করে কাঁখের কলসি উপুড় করে দিয়েছে সুভদ্রা। ভাতের হাঁড়ি জলে ভরতি। ঢেলার উনুন ভেসে গেল জলস্রোতে। সুভদ্রাও সেই সঙ্গে খিল খিল করে হাসে। হাসিতে ভেঙে পড়ে।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে যায় : বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঠাকুরপো। বর্ধন-বাড়িতে থেকে জঙ্গলে বসে রান্না করে খাবে, লোকের চোখে কি রকম ঠেকবে বলো তো! হবে না। খাবে যেমন এই ক'দিন খেয়ে যাচ্ছ।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাহেব বলে, বড়বাবুর ঐসব কথার পরে, এ বাড়ির ভাত গলা দিয়ে নামবে না।

সুভদ্রা বলে সদু-ঠাকুরঝি ভাত আনবে না আমি নিজের হাতে এনে দেবো। তবু যদি আটকে যায় হাত বুলাব গলার উপর। ঠিক নেমে যাবে তখন।

বলতে বলতে লঘু কণ্ঠ কঠিন হয়ে ওঠে : বড়বাবু যখন বাড়ি থাকে, ঠিক সেই সময়টা ওর চোখের উপর দিয়ে ভাত বেড়ে আনব। আমি এ বাড়ির কেউ নই, ওদের দয়ার ভাত

খাচ্ছি—তার একটা ভাল রকম বোঝাবুঝি হওয়া দরকার।

কিন্তু বোঝাবুঝিটা আমায় দিয়ে কেন বউঠান?

তা ছাড়া মানুষ কোথা আমার? মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাই পর্যন্ত নেই। বরের ঘাড়ে ভূত চেপে বাড়ি-ছাড়া করেছে—

দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, ভুল বললাম। ভূত নয়, ভগবান চেপেছে। মরুকগে ছাই। কিন্তু তোমায় সামনে করে বড়বাবু বলেছে, তোমাকেই নিত্যি দু-বেলা খাইয়ে তবে সে কথার খণ্ডন হবে। দিক তুলে পিঁড়ি থেকে, দেখি কত বড় ক্ষমতা! এ জিনিস তো অন্য কাউকে খাইয়ে হবে না ভাই।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অধীর কণ্ঠে সুভদ্রা বলে, উঠলে না এখনো?

দু-হাতে হাঁড়িটা তুলে আছাড় মেরে ভেঙে দিল, আধ-সিদ্ধ ভাত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বলে, রাগের পুরুষ, ঢের রাগ দেখানো হয়েছে। চলে এসো বলছি—

এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে, খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরল। সাহেব স্তম্ভিত। দাঁড়াতে হল হাতকড়ি-পরানো এক চোরের মতোই। ফিক করে সুভদ্রা হেসে পড়ে: দেখ, তুমি আমার হাত ধরেছ বলে চেঁচাব বলেছিলাম। উলটোটা হয়ে গেল। তোমার বদলে আমাকেই ধরতে হল শেষটা। ধরিয়ে তবে ছাড়লে—তুমি কম লোক! চেঁচাও তুমি এবারে—

সৌদামিনী বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, কি করছ ছোটবউ [illegible] জল নেই বাড়িতে। কলসি নিয়ে ওখানে কি তোমার?

সুভদ্রা হাত ছেড়ে দিয়েছে। সাহেব বলে, সদু-দিদি কি ভাবল বলুন দিকি?

সুভদ্রা সহজভাবে বলে, কি করে বলি। তোমার রূপে মজে গেছি, তা-ও ভাবতে পারে। শ্বশুর চোর, ভাসুর ফেরেব্বাজ, বর পলাতক। সে বাড়ির বউ নষ্টদুষ্ট হবে, অবাক হবার কি।

কালীঘাট থাকতে কথকতা শুনত খুব সাহেব। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ হত, তা-ও শুনত। পুরাণের ঘটনা মনে আসে। কোন জাঁদরেল ঋষি বা রাজা তপস্যায় যখন বড় বেশি এগিয়ে যান, রম্ভা-মেনকা-উর্বশীরা আদা-জল খেয়ে লাগে তপোভঙ্গের জন্য। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলেই সিদ্ধি। সাহেবের সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউ সুভদ্রা। চেহারা সকলে ভাল ভাল করে সেই চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। কালীঘাটে একটা মেয়ের মুখে এসিড ঢেলে দিয়েছিল—প্রণয়ের রেশারেশি ব্যাপারে। বেঁচে উঠল মেয়েটা, কিন্তু মুখের দিকে তাকানো যায় না। প্রণয়ীরা তখন সব ভেগে পড়ল। সাহেব ভাবছে তার মুখেও কেউ অ্যাসিড ঢেলে চেহারা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে যেত।

সেই দুপুরে ভাতের থালা সুভদ্রা নিজে নিয়ে এলো। জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে গেলাস দিয়ে পরিপাটি করে আগে ঠাঁই করে গেছে। ঘরের ভিতরে নয়—বাইরের দাওয়ায়। কাছারি থেকে মুরারির আসার সময় হল—ভাগ্যবশে যদি এসে পড়ে, নয়ন ভরে দেখবে। প্রকাণ্ড বগিথালা, ভাতও প্রচুর, মোচার আকারে ঠেসে ঠেসে বাড়া। বাটিতে বাটিতে রকমারি তরকারি সাজিয়ে এনেছে। ভাতের থালা নামিয়ে চতুর্দিকে বাটিগুলো সাজিয়ে সুভদ্রা ডাক দেয়: চলে এসো ঠাকুরপো—

সেইমাত্র স্নান সেরে সাহেব উঠানে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। সুভদ্রা বলে, দুটো তরকারি আমি বেঁধেছি। আর সব সদু-ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির রান্না আগে খেয়েছ। আমার কোন দুটো চেখে বলে দেবে।

সাহেব আঁতকে ওঠে: সর্বনাশ, এত ভাত কে খাবে?

বসে পড় না তুমি। ভাত বেশি নয়, আগে থাকতে চেঁচিও না।

সামনের উপর সুভদ্রা চেপে বসল। কালীঘাটের সুধামুখী এমনি বসতে যেত, রাগ ক'রে উঠত সাহেব। ভাত ফেলে উঠে পড়বার ভয় দেখাত। আজকে অনেক দিন পরে এত দূরের মুলুকে এসে আবার সেই ব্যাপার।

বিড়বিড় করে সুভদ্রা বলছে, এ পোড়া বাড়িতে কোন জিনিস কাউকে প্রাণভরে খাওয়াবার জো আছে! বড়জা যেখানেই থাকুক ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে। মুখ মিষ্টি মানুষটা হাড়কপ্পুষ। নিজের হাতে ভাত বেড়ে মাছ তরকারি ভাগ করতে বসবে—অন্যের উপর ভরসা হয় না পাছে সে বেশি দিয়ে ফেলে। যত আঁটিসাটি পরের বেলা—নিজের পেটের একগাদা পুষ্যিপাল তাদেরই কেবল গণ্ডে-গণ্ডে গেলাবে। বদহজমে সবগুলো সলতে

হয়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়বে না। তোমার ভাত বাড়ার সময় বড়দিকে ঘে'সতে দিইনি। খাওয়ার সময় এই যেমন আছি, তখনও এমনি আগলে বসে ভাত-ব্যঞ্জন সাজিয়েছি। টাঁস টাঁস করে মুখের উপর বলি, সেজন্য ভয় করে আমায়। স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলতে পারল না, ছটফট করে বেড়িয়েছে।

সাহেব সকাতরে বলে, কিছু ভাত তুলে নেন বউঠান। মা-লক্ষ্মীকে ফেলা-ছড়া করতে নেই। লাগলে আবার চেয়ে নেব।

চাইতেই হবে তোমার। সে আমি জানি। আরম্ভ করে দাও, তখন বুঝবে।

কথা কানেই নেয় না। কেমন এক রহস্য-ভরা হাসি হাসছে সুভদ্রা। ভাত ভেঙে নিবে সাহেব হাসির কারণ বুঝতে পারে। ভাত অল্পই, বাড়া-ভাতের ভিতরে সাত-আট খানা মাছের দাগা। মাছ ভাতের তলে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে।

সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বলে, এত মাছ খেতে হবে?

সুভদ্রা বলে, দুই ভাই ওরা, সমান দুই শরিক। ছোট শরিকের প্রাপ্য নিতে পারিনে বলে বটঠাকুর আস্পর্ধা পেয়ে যাচ্ছেন। ওদের দশ দশটা ছেলেমেয়ে কতগুলো করে খায় হিসাব করো দিকি।

সাহেব বলে, সেই দশখানা মুখের খাওয়া আমার দিয়ে খাইয়ে শরিকানা বজায় রাখবেন?

দশই বা কেন! তার উপরে ও-তরফের বট্‌ঠাকুর নিজে রয়েছেন। আমাদের হা-ঘরে মানুষটা একবেলা ভাতে-ভাত খেয়ে ভিনগাঁয়ে পড়ে রয়েছে। তার হিসাবটাও ধরবে এই সঙ্গে।

সাহেব বলে, এতজনের খাওয়া একলা পেটে সামাল দিতে পারব না। মরে যাব বউঠান, রক্ষে করুন।

আমার যে একজনই তুমি ভাই। একলার বেশি কোথা পাই?

গলাটা কেঁপে উঠল বুঝি সুভদ্রার। সঙ্গে সঙ্গেই সুর বদলে তাড়া দিয়ে ওঠে: মাছ কখানা মেলে রেখেছ কোন আক্কেলে শুনি? বড়গিন্নি দেখতে পেলে পুটপুট করে বট্‌ঠাকুরের কাছে লাগাবে। ছুতো পেয়ে সে মানুষ চেঁচিয়ে জানান দেবে। যে কলঙ্ক এড়াতে চাইছ সেইটেই ঘটে যাবে। কিনা, ভালবাসার মানুষকে চুরি করে মাছ খাওয়াচ্ছি। ভাত চাপা দিয়ে দাও, যেমন করে নিয়ে এসেছি। আস্ত এক-একখানা মুখের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করো। পুরুষমানুষ হয়ে এটুকুও না পারবে তো বাসি বাইটার কাছে ঘোরাঘুরি কি জন্যে? বাড়ি ফিরে মাথায় ঘোমটা টেনে আমাদের মতন বউ হয়ে বোসোগে।

ফিসফিসানি কথা—পচা বাইটার কিন্তু কান [illegible]। ঘরের মধ্য থেকে সে বলে, খেতে [illegible] ? রোগা মানুষ আমারও যে ক্ষিধে পেয়ে গেছে। আমার ভাত কে এনে দেয়!

সুভদ্রা অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: রোজ যে-মানুষ এনে দেয়, তাকে ডাকলেই তো হয়। আমি কবে দিয়ে থাকি, আমায় কেন ঠেশ দিয়ে বলা?

সদয় হয়ে নিজেই ডেকে দেয়: ঠাকুরঝি, অ সদু-ঠাকুরঝি, ভাতের জন্য মূর্ছা যায় এদিকে মানুষ। কখন ভাত দেবে?

সৌদামিনী সাড়া দেয় না। কোথায় কোন কাজে আছে, বাড়ির ভিতরেই নেই হয়তো। পচা বাইটা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে: যমের দুয়োর থেকে ফিরে এলাম, তা বলেও কারো দয়ামায়া নেই। রোগা মানুষটা না খেয়ে পড়ে আছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে। কানে শুনেও সাড়া দেবে না।

সুভদ্রা টিপ্পনী কাটে: দুয়োর থেকে ফিরে আসতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? ঢুকে পড়লেই তো হত।

ক্ষেপে গিয়ে পচা বলে, হারামজাদীর কথা শোন একবার। জন্মের পরে বাচ্চাকে মধু খাওয়ায় তোকে বোধহয় নিমপাতা বেটে খাইয়েছিল।

নিঃশব্দে হেসে হেসে সুভদ্রা যেন পরমানন্দে উপভোগ করছে। সাহেবকে বলে, দোষ কিন্তু তোমারই ঠাকুরপো। এ যাত্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা তুমি ছাড়া কারো সাধ্য হত না। মানুষটার কষ্টের জন্য দায়ী তুমি। নিজে কষ্ট পায়, বাড়িসুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করে মারে।

পচা গজরাচ্ছে: এত কথা কিসের—সদুকেই বা ডাকাডাকি কেন? মুঠোখানেক ভাত নিজে এনে দিলে হাতে কুড়িকুষ্ঠ হবে নাকি?

হাতেও পারে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। ভাললোকের সেবায় পুণ্য। পাপীর সেবা মানেই তো পাপকে জিইয়ে রাখা বেশিদিন ধরে।

আর যাবে কোথায়! অসুখ থেকে উঠলে কি হয় মুখের জোরটা দিব্যি আছে। রেগে রেগে উঠল: ওরে আমার পুণ্যির বস্তা! চোখে দেখতে হয় না আমার এমনিই সব টের পাই। শোন তবে লো রাই, কুলের কথা কই -

আর হাসিতে ফেটে পড়ে এদিকে সুভদ্রা। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে, চালাও না, চালিয়ে যাও শ্বশুর-ঠাকুর—

সাহেবকে বলে, শুনে নাও ঠাকুরপো, কী সমস্ত বিশেষণ আমার!

সাহেব ধমকের সুরে বলে, শ্বশুর গুরুজন—তাকেই বা আপনি কেন অমন করে বললেন?

সুভদ্রা পাড়াগাঁয়ের চলতি মোটা রসিকতা করে একটা: আর লোকের শ্বশুর গুরুজন, আমাদের ইনি গরুজন।

হাসতে হাসতে হঠাৎ যেন আগুনে ধরে যায় সুভদ্রার কণ্ঠে। বলে, দশের মধ্যে মুখ তুলতে পারিনে। বাইটাদের বউ বলে চোখ টেপাটেপি করে। ঐ মানুষের ছেলে হওয়ার
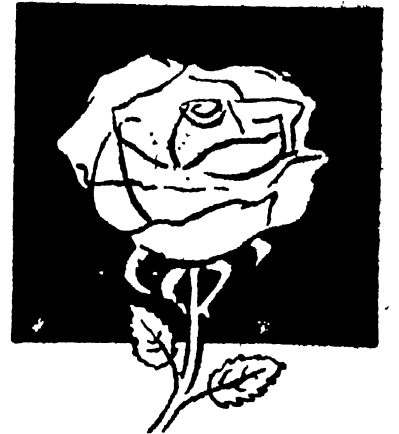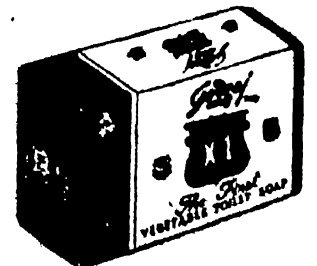
[illegible] তোমার ছোড়দা দেশান্তরী হয়ে [illegible] চোখেই তো দেখে এসেছ ভাই। অত [illegible] কাছারির নায়েব বটঠাকুর খরচা করে [illegible]কোঠা-বানিয়েও বাড়ির নাম বর্ধন-[illegible] করে তুলতে পারলেন না, সেই চিরকেলে [illegible]টা-বাড়ি রয়ে গেল। মানুষটা মরে পুড়ে [illegible] না হলে কলঙ্কের মোচন নেই।

[illegible] যাচ্ছিল সুভদ্রা এক সুরে। হঠাৎ সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, বলতাম না এত সব ঠাকুরপো। মুশকিল হয়েছে, গাঁদালিপাতার ঝোল রান্না হয় নি। ঐ ছাড়া কবিরাজ আর কোন তবকারি দেবে না। সদু-ঠাকুরঝির খেয়াল ছিল না—বাগানে বাগানে এখন সে গাঁদালি-পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঝগড়াঝাটি গালি-গালাজে ভুলে আছে, নইলে ক্ষিধে-ক্ষিধে করে পাগল করে তুলত। যতক্ষণ ঠাকুরঝি না আসে, আমায় এমনি চালিযে যেতে হবে।

গালির স্রোত অবিশ্রান্ত চলেছে। নির্বিকার সুভদ্রা। এক-একবাব বড অসহ্য হয়ে ওঠে, দু-হাতে সেইসময কান চাপা দেয়। হাসি-ভরা মুখে মৃদুকণ্ঠে গল্প করছে সাহেবের সঙ্গে, খাওয়ায় ফাঁকি দিয়ে উঠে না পড়ে সতর্ক চোখে সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে। একবার মনে হল, গালির তেমন যেন আর বাঁধন নেই। সৌদামিনী এখনো ফিরল না—বুড়োমানুষের দম ফুরাল নাকি?

ভাণ্ডার সুভদ্রার জোগানোই থাকে। মুখ টিপে একটুখানি হেসে ঘরের মধ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, শোন ঠাকুরপো, কচি মেয়ে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলাম। শাশুড়ি বেঁচে নেই, ভালবেসে শ্বশুর নিজে এই সোনার চুড় পরিয়ে দিল। বলে, শাশুড়ির হাতের জিনিসটা, তোমাব নাম কবে রেখে গেছে ছোটবউমা। ভাবি, সত্যিই বা! বড়দির কাছে পরে টেব পেলাম, সমস্ত মিথ্যে, বউ-পবিচয় হবে বলে টাটকা সিঁধ কেটে এনেছে। কোন আটকুড়ো বাড়ির অপযা জিনিস—বাড়ির উঠানে পা দিতে না দিতে তাই হাতে পরিয়ে দিল। বাঁজা নাম আমার সেইজন্যে ঘুচল না।

এত কুৎসা-গালিগালাজে যা হয় নি—নিজের এই কথায সুভদ্রা-বউয়ের চোখ দুটো ছলছল কবে আসে। বলে, বাসি বাইটার কি! দুই বেটার বউ—একটাব যেমন হল না, আব একজনে তেমনি গণ্ডায গণ্ডায উশুল করে দিচ্ছে। বছব বছর দিযে যাচ্ছে। হাঁস-মুরগির মতো। বলব কি ভাই—অন্ধকারে দরদালানে পা ফেলতে ভয় করে। কোনটা কোন্ দিকে পড়ে আছে—পা চাপিয়ে না বসি। আর আমার নিজের ঘর—সে ঘরে জগঝম্প পেটাও, টাঁ কবে উঠবার কেউ নেই।

পচাব গর্জন উঠল: ফেরত দিয়ে দে হাবামজাদি আমার গযনা। নিবেট সোনার জিনিস, একগাদা পাথব বসানো। আমার বুড়ো বয়সের তবু একটা সম্বল। অপয়া যদি তো হাতে নিযে ঘুরিস কেন বে? ভোগ-ব্যাভাব করবি, মুখে এদিকে শতেক নিন্দে—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব কতদিন রাখতে পাবিস হাতে। না দেখে ছাড়ব না।

আর সুভদ্রা এ-সব কথায নেই, সৌদামিনীকে দেখতে পেযে চুপ কবে গেছে। বান্না-ঘবে সে গাঁদালিব ঝোল বাঁধুক, ক্রোধের জেব অন্তত ততক্ষণ অবধি চলবে। সাহেবকে নিযে পডল আবাব। বলে, কী তুমি ভাই, গলা দিযে যে ঢুকতে চায না, গলাব নলি নিবেট বুঝি তোমার? মাছ তো তিন-চারটে বাকি। বড়গিন্নি আসছে—যা থাকে মুখে পুবে ফেল। শিগগিব, শিগগিব—। জিভ দিযে টাকবায ফিবিয়ে এনে খুশি মতন এব পব জাবর বেটো।

সুভদ্রাকে বাঁচানোব জন্য কবতে হল তাই সাহেবকে। মিছে কথা—কোথায বডবউ! ফাঁকিজুকি দিযে খাইযে সুভদ্রা হি হি কবে হাসে। থালা শেষ হল তো সুভদ্রা তাড়া-তাড়ি জামবাটি ভরে দুধ গবম কবে নিযে আসে। দুধেব মধ্যে মর্তমান কলা আর নলেন-পাটালি।

বলে তাকিযে কি দেখ ঢকঢক করে চুমুক দিযে যেল। হিসেব কবে দেখ, বড়গিন্নিব দশ বাচ্চায মিলে বত সেব দুধ টানে। তার উপবে বড ঠাকুবেব গোঁফ ভিজিযে ক্ষীর খাওয়া আছে। আমি সেখানে কী পেলাম?

আব, ঘবেব বাক্যবাণ অবিশ্রান্ত বাইরে এসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। গাদালি-ঝোল ভাত এসে পড়লে তবে সেটা বন্ধ।

সিঁধের কথা উঠল।

পচা বলে, সাত রকম সিঁধের কথা বললি তুই—মোটে সাত?

সাহেব বলে, আমি কি জানি আর কি বলব। বলাধিকারী বলেছেন। কথা তাঁরও নয়। পুরানো সংস্কৃত নাটকের বর্ণনা।

ছিল তাই হয়তো সেকালে। এখন সিঁধ আর সাতের মধ্যে নেই। সাত কেন, সত্তরেও কুলাবে না। এক এক দলের কাজ এক এক কায়দায়। আজেবাজে লোকে তফাত ধরতে পারে না। অনেক দলের আবার হাতে-লেখা নিজস্ব বই থাকে। গোড়ায় কোন মস্ত মুনিঋষির মুখ থেকে [illegible] [illegible] [illegible]

দেন। এ-দল ও-দলের মধ্যে কাজের ফারাক হবেই, যার চোখ আছে সে বলে দিতে পারে। আমার একদিন ছিল তাই, কাজ দেখে কারিগর বুঝতে পারতাম। এখন নজরের জোর নেই, খবরাখবরও রাখতে পারিনে আর তেমন।

নিশ্বাস ছেড়ে পচা বাইটা আপন মনে হুঁকা টানতে লাগল। মুখ তুলে আবার বলে, বটুক-দারোগা সবে নতুন এসেছে। আমার কাজকর্মের কথা শুনেছে—পিছনে লাগেনি তখন অবধি, ভাব রেখে চলে। এই সোনাখালিরই এক বাড়ি সিঁধ—দারোগা নিজে হন্দমুন্দ দেখে শেষে আমায় ডাকাল। তাতিয়ে দিচ্ছে : তোমার গাঁয়ের উপর অন্য কারিগর ঢুকল আস্পর্ধাটা বোঝ বাইটা।

সাহেবও অবাক এতবড় আস্পর্ধার কথা শুনে। নিয়ম হল, এক চোরের গাঁয়ে অন্য চোর ঢুকবে না। এই সুখে চোরের গাঁয়ের লোক রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। দুয়োর খুলে রাখলেও ক্ষতি নেই।

জবাব হয়ে সাহেব বলে, আপনার গাঁয়ে এসে সিঁধ কাটে—এমনটা হয় কি করে বাইটামশায়?

পচা বলে বলছি তো সেই কথা শোন। অন্যায় করেছে ঠিক কিন্তু আমিই তার বিহিত করব। দারোগা ঢুকে পড়ে উপর-ওয়ালার পশার বাড়াবে কেন সেই নিমিত্তের ভাগী হতে যাই?

বটুক দাস প্রস্তাব করলেন, কারিগরের নামটা বলো বাইটা দুয়ে মিলে সায়েস্তা করে দিই।

পচা অবাক হয়ে পড়ে : আমি কি করে জানব বলুন। টের পেলে কি হত দিতাম?

দারোগার কাছে ঘাড় নেড়ে এলাম। কিন্তু কাজের ধারা দেখে পচা বুঝেছে কারিগর মুন্সি আকুন্দি ছাড়া কেউ নয়। দোচালা বাংলাঘর তার ভারি পছন্দ বাড়ির সাত আটখানা ঘর সমস্ত গ্রাই চৌরিঘর সে বাঁধে না। সিঁদেরও হুবহু সেই চং-বাংলাঘর আড়াআড়ি যেমন দেখতে হয়।

আকুন্দির কাছে গিয়ে পড়ল : আমার পড়োশির উঠোনে কোন্ সাহসে তুমি চলে হও?

আকুন্দি বলে, সে জায়গায় তুমি ঢুকবে না, অন্য কেউ ঢুকতে পাবে না—মজা হল দেশ গৃহস্থর। রাজরাজড়ারা গড় বানিয়ে থাকত, সেইরকমটা হয়ে দাঁড়াল। দল তো আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাব সেখান-কার কারিগর এসে ঠিক এই কথা বলবে। সিঁধকাঠি তবে তো গাঙের জলে বিসর্জন দিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

[illegible] পচা বলেছিল, বাইটা আর [illegible] কারিগর এক হল নাকি?

আকুন্দি [illegible] পচাকে মনে মনে [illegible] তখন চুপ করে রইল। [illegible]

মক্কেলের দাওয়ায় রাতারাতি ফেরত রেখে গেছে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ পচা এক প্রশ্ন করে বসে : জবাব দে সাহেব, দেখি জ্ঞান-বুদ্ধি তোর কেমন। সিঁধকাটা সারা, অপর যা-কিছু করণীয়, সমস্ত হয়ে গেছে। এবারে কারিগর নিজে তুই সিঁধে ঢুকবি। কিভাবে সেটা—মাথা আগে দিবি না পা?

গুণীরা এই নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। মতভেদ আছে, সুবিধা-অসুবিধা উভয় দিকেই। প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে আছে, সিঁধের গর্তে চোর মাথা দিতে যাচ্ছে, সর্দার হাঁ-হাঁ করে ওঠে : পরের ঘরে পা দুটোই ঢুকবে আগে। পচা বাইটারও সেই মত—সকল অঙ্গের আগে পা চালান করে দেওয়া। ঢোকার আগে নানান রকমে তুমি পরখ করে নিয়েছ তা হলেও এক-একটা ঘাগি গৃহস্থ থাকে ধাপ্পায় তাদের ভোলানো যায় না। চোর ধরবে বলে বাপে-বেটায় ধরো সিঁধের পাশে ঘুণ হয়ে বসে আছে। উঠছে পা উঁচু হয়ে—উঠুক, উঠতে দাও। বেশ খানিকটা উঠে গেছে—দুই পা দু জনে চেপে ধরল অমনি 'কালী' 'কালী' বলে।

সেই উৎকট অবস্থাটা মনে মনে কল্পনা করে পচা বাইটা খিকখিক করে হাসে। বলে,

গৃহস্থ চোরের পদধারণ করে আছে, ঘরের ঠাকুর ঘরে এলে যেমন হয়। কত বড় ইজ্জত দেখ ভেবে সাহেব।

একচোটে হেসে নিয়ে পচা বলে, গৃহস্থ পা এঁটে ধরেছে, বাইরে থেকে ডেপুটি ওদিকে কারিগরের মাথা ধরে টান। ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলতে না পারে। পাহারাদার খোঁজদার—যারা সব এদিক-ওদিক ছিল, তারাও ধরেছে ডেপুটির সঙ্গে। কারিগরকে নিয়ে যেন দড়ি-টানাটানি—একবার বাইরের দিকে খানিকটা আসে, ঢুকে যায় আবার খানিকটা ভিতর দিকে। পা আগে দিয়েছিল তাই রক্ষে—এতক্ষণ ধরে এই কান্ড চলছে, কারিগরের তবু নিশানাদিহি হয় নি। মুন্ডু বাইরের দিকে মুন্ডু না দেখতে পেলে মানুষ চেনে কি করে? ধরা যাক, শেষ পর্যন্ত হেরেই গেল এরা—গৃহস্থর টানের চোটে কারিগর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ঠেকানোর কোনরকম উপায় নেই। তখন কি করতে হবে বল্।

কোন জবাব দিতে গিয়ে বেকুব হবে, ওস্তাদের খিঁচুনি খাবে—সাহেব একেবারে চুপচাপ রইল। পচা নিজেই তখন বলে দেয় আর সর্বনাশ—কানে শুনেই সাহেবের আপাদমস্তক হিম হয়ে গেল।

কথার কথা নয়, কাপ্তেন কেনা মল্লিক

সত্যি সত্যি তাই করেছিল। না করে উপায় ছিল না। ঈশ্বর মান্না পুরানো লোক, মল্লিকের দলের পাকা সিঁধেল। এ হেন কারিগরকেও একবার সিঁধের মুখে ধরে ফেলল, পা ধরে হিড়হিড় করে ভিতরে নিয়ে তুলছে।

হেসোদা'র এক কোপে মুণ্ডু কেটে নিয়ে দৌড়। খাও কলা গৃহস্থ। উল্টে রক্তাক্ত কাটা-ধড় নিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা। দলের একজন গেল, দুঃখের ব্যাপার নিশ্চয়ই—কিন্তু মানুষটা চিনলে গোটা দল ধরেই টান পড়ত, অন্ন যেত বহুজনের। ঐরকম অবস্থায় পড়ে বিবেচক কারিগর নিজেই কত সময় বলে, গায়ের বলে পেরে উঠবি নে তোরা, মুণ্ডু নিয়ে সরে পড়্—

সাহেবের মুখ ছাইয়ের মতন সাদা। ভাব দেখে পচা খুশিই বরঞ্চ। বলে, আমারও এ-সব গরপছন্দ। মল্লিকটা চোর নয়, ডাকাতও নয়—দোঁআশলা একরকম। আমাদের কাজ হল—মাল বেমালুম সরে আসবে, মানুষের গায়ে কাঁটাখানাও বিঁধবে না। সে মানুষ দলের হোক আর মক্কেলেরই হোক।

সাহেবের দু-গালে মৃদু মৃদু চাপড় মারে: গুম হয়ে রইলি কেন? ধরে নে কিছুই হয় নি, মক্কেলের ঘরের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। নির্গোলে তুই তো সিঁধে ঢুকে গেছিস—তারপর?

সাহেব সসঙ্কোচে বলে, সেকালের কায়দা একটু-আধটু বলতে পারি—পুঁথিপুরাণে যা আছে। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শুনতাম। সিঁধে ঢুকে পড়ে শর্বিলক সকলের আগে ঘরের দরজা খুলে দেয়—নির্গমের পথ।

পচা ঘাড় দুলিয়ে বলে, এখনো তাই। তার আগেও কিন্তু কাজকর্ম আছে।

সাহেব বলে, আগ্নেয়কীট ছাড়ল, দীপ-শিখার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে পাখার ঝাপটায় পোকা আলো নিভিয়ে দেয়। তারপরে বীজ ছড়িয়ে দেয় ঘরের মেজেয়। চোরের ভয়ে আর রাজার ভয়ে ধনবান লোকে মেজেয় পুঁতত। সেইখানকার বীজ ফটফট করে ফুটে যাবে।

হেসে উঠে সাহেব কথাটা ফলাও করে দেয়: রাজা আর চোর দুটোরই ভয় তখন। রাজা মানে যদি জমিদার-চকদার দারোগা-চৌকিদার বলেন, বেশি ভয় এখনো তাদের নিয়েই।

পচা সায় দিয়ে বলে, আমরা যদি হই ট্যাংরা-পুঁটি তারা রাঘব-বোয়াল। সাবেকি বীজ ছড়ানোর নিয়মটা আজও ঠিক চালু রয়েছে—আমরা ছড়াই মটরকলাই।

ঘরে ঢুকবার প্রণালীটা পচা সবিস্তারে বোঝাচ্ছে। পা থেকে উঠতে উঠতে আস্তে আস্তে গোটা দেহটা উঠে গেল। সোজা উঠে দাঁড়াতে নেই, উঠতে গিয়ে ঠকাস করে হয়তো মাথায় ঘা লাগল, কিম্বা মাথার ঘায়ে একটা কিছু পড়ে গেল আওয়াজ করে। গুটিসুটি হয়ে বসবি একটুখানি। মুঠোখানেক মটর-কলাই ছড়িয়ে দিয়ে কান পাতবি। আওয়াজ সূক্ষ্ম বটে কিন্তু কারিগরের কানে ফাঁকি [illegible] না। [illegible]

[illegible] তোরঙ্গ খাটবিছানা—প্রতিটি জিনিষের আলাদা আওয়াজ। ঘরের কোন দিকে কি রয়েছে, মোটামুটি আন্দাজে এসে গেল। কলাই আর এক রকমের আছে, সাদা রং করা। ছড়িয়ে দে তাই এবারে। অন্ধকার ইতিমধ্যেই চোখে সয়ে এসেছে, সাদা জিনিস দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কতটা উঁচুতে কোন মাল তা-ও এবার বোঝা গেল। ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভয়ে লেগে যা এইবারে।

সাহেব অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। গভীর রাত্রে পচা বাইটা নিঃশব্দে তক্তাপোশ থেকে নেমে তার গায়ে হাত দিল: চল্—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সাহেব বলল, কোথা?

পচা খিঁচিয়ে ওঠে: গুরু ধরেছিস তো তর্ক করবি নে। বলছি যেতে, তাই চল্।

দূর বেশি নয়, বেশি হাঁটবার তাগত হয়নি এখনো পচার। কোন দিন হবে কিনা কে জানে! গোটা দুই বাঁশবন পার হয়ে পরামাণিকদের বাড়ি। সেই বাড়ি ঢুকে পড়ল।

ফিসফিসিয়ে পচা বলে, টিপে টিপে হাঁটনা এবারে—বেড়ালের চলাচল। বেড়ালের পায়ে তুলোর গদি। কেমন করে ইঁদুর ধরে দেখেছিস ঠাহর করে? গর্তের পাশে চুপটি করে আছে। গদির গুণে ইঁদুর টের পায় না। যেই বেরুল ঝাঁপিয়ে অমনি টুঁটি কামড়ে ধরে। চোরের পা-ও সেইমতো চতুর। হাঁটছিস, তার শব্দ নেই। পাঁই-পাঁই করে দৌড়চ্ছিস উঁচুনিচু মাঠ-জঙ্গল ভেঙে—তিল পরিমাণ শব্দ হবে না, হোঁচট খাবিনে। পায়ের তলায় তোরও যেন এক বিঘত পুরু গদি। দেহের সর্ব অঙ্গ সামনে এনে ফেলতে হবে, হুকুমের গোলাম—যাকে যেমন বলবি সেই মতো তামিল করে যাবে। এই যেদিন হবে—জানবি বিদ্যা রপ্ত হয়েছে কিছু। বড় কঠিন বিদ্যা—সেই জন্যে বড় বিদ্যা বলে।

শর্বিলকের কথা সাহেবের মনে পড়ে যায়। হাজার দুই বছর আগেকার মহাগুণী সেই চোর! চলনে বিড়াল, ধাবনে মৃগ, ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বাজপাখি। মানুষ সজাগ কি সুপ্ত শুঁকে শুঁকে ধরে ফেলে কুকুরের মতো। সরে পড়বার সময় সাপ। ম্যাজিকের মতন পলকের মধ্যে চেহারা ও পোশাক বদলে ফেলে। নানান ভাষায় কথা বলে—স্বয়ং বাগ্‌দেবী যেন চোরের সজ্জায়। রাত্রিবেলা দীপের মতো উজ্জ্বল, সঙ্কটে ঘোড়ার মতো অবিচল। ডাঙায় ঘোড়া, জলে নৌকো, স্থিরতায় পর্বত। যখন ঘিরে ফেলেছে তখন সে গরুড় তুল্য। খড়গোসের মতন চটুল চোখে চারিদিক সে দেখে নেয়। [illegible]

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ সতের ॥

মুস্তাংগ যে তলে তলে কম্যুনিস্ট চীনের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে, এ খবরটা প্রথমে দেন একটা জাপানী পর্বত অভিযাত্রীদল। কিন্তু সে সংবাদে নেপালী শাসকেরা তখন বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।

এই জাপানী অভিযাত্রীরা ১৯৫৪ সালে মানাসালু পর্বত শিখরে উঠবার জন্য মুস্তাংগে (পশ্চিম নেপালে) গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁদের কাছে নেপাল সরকারের অনুমতিপত্র ছিল। অকস্মাৎ একদিন তারা বিস্মিত হয়ে দেখলেন কয়েকজন চীনা ভাষাভাষী অফিসার 'এই অভিযাত্রীদল কার হুকুমে এই অঞ্চলে ঢুকেছে' এ সম্পর্কে তাঁদের কাছে কৈফিয়ত তলব করছে। অভিযাত্রীরা জানতে চাইলেন যে এই প্রশ্নকর্তাদের পরিচয় কি? চৈনিক ভাষী অফিসাররা জানাল তারা মুস্তাংগের রাজার কর্মচারী। তখন এই জাপানী অভিযাত্রীরা জানালেন তাদের কাছে এই অঞ্চলে প্রবেশের জন্য নেপাল সরকারের হুকুমনামা আছে। "এ কথার উত্তরে, অভিযাত্রীদলের নেতা সুস্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছেন "মুস্তাংগের তথাকথিত ঐসব রাজকর্মচারী রূঢ়ভাবে আমাদের জানান যে এই এলাকা মুস্তাংগ রাজার এলাকা। কাঠমাণ্ডুর হুকুম এখানে খাটবে না। মুস্তাংগ কাঠমাণ্ডুর শাসন মানে না।" তারপর অভিযাত্রীদলকে মুস্তাংগ রাজের হুকুমনামা নিতে বাধ্য করা হয়।

১৯৫৬ সালে মুস্তাংগ অঞ্চল থেকে চীনারা দুজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিককে ধরে নিয়ে যায়। চীনারা বলে যে, তিব্বতে অনধিকার প্রবেশের জন্যই এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা দৃঢ়ভাবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন যে, নেপালের এলাকা থেকেই তাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর এক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বৃটিশ এবং নেপালের কূটনৈতিক চাপে চীন শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই সময় থেকেই কাঠমাণ্ডুর টনক নড়ে ওঠে। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, মুস্তাংগে তিব্বতী এবং চীনা অনুপ্রবেশ শুধু যে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই নয়, ঐ পথে কম্যুনিস্ট চীন পোখারার নিকটবর্তী অঞ্চলের দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের হাতে বিস্তর মারণাস্ত্রও তুলে দিয়েছে। এই সব সংবাদে কাঠমাণ্ডু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তিব্বতী ও চীনা হানাদারদের ক্রমাগত আক্রমণ থেকে নেপালী নাগরিকদের ধনপ্রাণ রক্ষা করার জন্য কাঠমাণ্ডু অবশেষে তিব্বত সীমান্তের খুব কাছে, মুস্তাংগে একটা শুল্ক ঘাটি স্থাপন করলেন। সীমান্তের সুরক্ষার দায়িত্বও এই ঘাটির উপর ন্যস্ত করা হল। এই ঘাটির প্রশাসনের ভার বাগলুং জেলার শাসকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। এই "হস্তক্ষেপে' কম্যুনিস্টরা এবং মুস্তাংগের চীনবন্ধু রাজা ভয়ানক আপত্তি তুলল। তরা কাঠমাণ্ডুকে এই বলে শাসিয়ে দিল যে কাঠমাণ্ডুর এই সাম্রাজ্যবাদপন্থী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য মুস্তাংগ শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সংগ্রাম করবে। এই সময় নেপালের এক কম্যুনিস্ট নেতা আস্ফালন করে বলেছিলেন মুস্তাংগকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয় কম্যুনিস্টরা দু হাজার মুক্তিযোদ্ধা পাঠাবে বলে তাকে আশ্বাস দিয়েছেন।

এই অবস্থায় কাঠমাণ্ডু মুস্তাংগের শুল্ক ঘাটি উঠিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। কলকাতার হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন :

What happened as a result is described in a Kathmandu news message dated May 19 1957 which states

The Nepali customs post at Mustang had to be withdrawn because of alleged threats by the vassal Chief of Mustang who is under the sovereignty of the Nepalese King Thakur Prasad Thakali the officer-in-charge of the post reported to the Nepali Government that despite orders from the District Governor of Baglung the Raja or the vassal chief of Mustang not only refused to allow the customs post to function within his jurisdiction but also refused to acknowledge the authority of the Baglung District Governor who is exercising Nepali authority over the Mustang vassal — (Hindusthan Standard, Calcutta, July 2, 1960)

নেপালের কর্তৃত্ব অস্বীকারের এই দুঃসাহস মুস্তাংগের রাজার কি করে হল? সেটা বোঝা দরকার। মুস্তাংগ নেপালের অধিকারে থাকলেও এর ভৌগোলিক অবস্থান এমনই দুর্গম যে কাঠমাণ্ডুর পক্ষে ওখানে কখনোই প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। নেপালের সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তাই মুস্তাংগকে কার্যত একটি করদ রাজ্য বলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। নেপালের মানচিত্রের উপর চোখ না বুলোলে এর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাবে না। কাঠমাণ্ডুর উত্তর-পশ্চিমে পোখারার ছোট্ট উপত্যকা। দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। কাঠমাণ্ডু এবং পোখারার মধ্যে দুর্ধর্ষ কয়েকটি পর্বত থাকায় চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তা বানানো সম্ভব হয় নি। বিমানপথে এই দুই উপত্যকার সংযোগ সম্প্রতি বছর কয়েক স্থাপিত হয়েছে। বিমানে এখান থেকে ওখানে যেতে সময় লাগে আধঘণ্টা। পোখারা

থেকে ধবলগিরি ও অন্নপূর্ণা পর্বতে যেতে মোনাংভোট নামে একটা গ্রাম পড়ে। মুস্তাংগ এই মোনাংভোটেরও উত্তরে, নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত। মুস্তাংগের সংযোগ লাসার সঙ্গে অনেক অনায়াস সাধ্য। চীনা কম্যুনিস্টরা এই সুবিধাটুকু কাজে লাগিয়েছে। ১৯৫০ সালে তিব্বতকে কুক্ষিগত করার পর থেকে চীনা কম্যুনিস্টরা নেপালে "পা রাখার জায়গা" করার জন্য মুস্তাংগের রাজার সঙ্গে দহরম মহরম করতে সুরু করে। চীনা কম্যুনিস্টদের উস্কানি এবং আস্কারাই মুস্তাংগকে নেপালের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে দুঃসাহসী করে তুলেছে। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মুস্তাংগ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠার কারণ কি এই যে, প্রয়োজন হলে ওখানে আশ্রয় গ্রহণ করে চীনের হাত শক্তিশালী করে তোলা যাবে? এদের ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত!

শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা যখন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন (১৯৫৪ সালে) নেপালে কম্যুনিস্ট তৎপরতা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট নেপাল সরকারের কাছে পৌঁছেছিল। সেই রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, নেপালকে 'রক্তিম' করে তোলার জন্য চীনের কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিস্টরাও হাত মিলিয়েছেন। কাঠমাণ্ডুর একজন বিশেষ সংবাদদাতা তখন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি ফাঁস করেছিলেন:

"There is reason to believe that as many as 15,000 Chinese Communists fully armed and trained in mountain and guerilla warfare are concentrated at Lhasa. These have been supplemented by about 1,500 Indian Communists of whom a vast majority are BENGALEES, and about 1,00 drawn from the Andhra, Madras and Kerala Provinces."

বলাই বাহুল্য, মুস্তাংগকেই এঁরা মূল

তাৎপর্য কি নেপালের হাজার হাজার বর্গ-মাইলের উপর দাবী জানিয়ে রাখা নয়? শ্রীকৈরালা জানান, হিমালয়ের এই পুণ্যক্ষেত্রে নেপালীরা কম্যুনিস্ট শাসন কখনই বরদাস্ত করবে না। নেপালের উচিত ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও নিবিড় করে গড়ে তোলা, কারণ নেপাল ও ভারত একই পথের পথিক। গণতান্ত্রিক আদর্শে উভয়েই বিশ্বাসী।

দুঃখের বিষয় নেপালের শাসকবর্গ মাতৃকাপ্রসাদের এই সময়োচিত পরামর্শে কান দেননি।

১৯৫৯ সালের মুস্তাংয়ের ঐ ঘটনার পর চীনারা আরও কয়েকবার ঐ অঞ্চলে হামলা চালায়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে নেপালী দৈনিক "স্বতন্ত্র সমাচার জানায় চীনারা মুস্তাংগের দোয়াবালাই ধ্বোতে চীনী পতাকা গেড়েছিল নেপালী রাজকর্মচারীরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্যে সেই পতাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ঐ সংবাদপত্র আরও জানায়, ৪০।৫০ জন চীনা কম্যুনিস্ট ফৌজ ঐ অঞ্চলের খাবতা সিব। নামে এক জায়গায় সশস্ত্র অভিযান চালায়। অনবরত এইভাবে ছোটখাট আক্রমণ চালিয়ে 'বিশ্ব বিবেকের তল্পীবাহক' চীন নেপালী সরকারকে উত্যক্ত করে অবশেষে সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় বসতে তাকে বাধ্য করে।

২১শে মার্চ ১৯৬০, পিকিং-এ নেপাল এবং চীনের সঙ্গে এক সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভদ্রলোকের যেমন এক কথা সুকুমার রায়ের হযবরল-র নেড়ার গানের (লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ) যেমন একটিই মাত্র কলি অথবা উদোর দর্জির ফিতেয় যেমন একটিই মাত্র মাপ (৩৬ ইঞ্চি ছাতিও ৩৬, গর্দানও ৩৬)—তেমনি চীনের কূটনৈতিক বেহালাতেও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম সুর কুড়ি কিলোমিটার। নেপাল চীন সীমান্ত চুক্তিতেও চীন ভারতের সঙ্গে খেলা চালাকিটা নতুন করে খেলল। উভয় পক্ষকেই সেনাদলের জায়গা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে।'

এই চুক্তির চতুর্থ অনুচ্ছেদ যা বলা হয়েছে এখানে তা উদ্ধৃত করা হল। এটা পড়লেই পাঠক পাঠিকা অনায়াসে বক্তব্য বুঝতে পারবেন।

'The contracting parties have decided that in order to ensure tranquality and friendliness on the border each side will no longer dispatch armed personnel to patrol the area on its side within 20 kilometers of the border but only maintain its administrative personnel and civil police there.'

এবং এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর যথারীতি ভাই ভাই ধ্বনি উচ্চারিত হল।

তারপর? তারপর চীন কর্তৃক যথাস্থানে পুনরায় আক্রমণ। কাঠমাণ্ডুর এক সংবাদদাতার ভাষায়:

Within about six month (since the Kharta Sika incident), on June 27, behind the baffle wall of the Nepal-China Border Agreement signed in Peking on March 21, the Chinese Reds have repeated their performance in the most daring way"—(Hindusthan Standard, Calcutta, July 2, 1960)

২৮শে জুন পিকিং সরকারীভাবেই কাঠমাণ্ডুকে জানিয়ে দিল তিব্বতী বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করবার জন্যই চীনা ফৌজকে নেপাল সীমান্তে পাঠানো হয়েছে কাজ মিটে গেলেই তাদের সরিয়ে আনা হবে। পিকিং এর এই নোটে কোথাও দুঃখ প্রকাশ নেই মার্চ মাসের চুক্তি ভংগের জন্য ভাষায় দ্বিধা বা সংকোচ নেই।

২৯শে জুন মুস্তাংগে কর্তব্যরত নেপালী রাজকর্মচারীরা নেপাল সরকারকে জানালেন চীন যে শুধু মার্চ চুক্তিই ভঙ্গ করেছে তা নয় নেপালের এলাকাতেও ঢুকে নিরস্ত্র নেপালী সামরিক ও বেসামরিক অধিবাসীদের হত্যা করেছে এবং গুলির চোটে অনেক লোককে ধরে নিয়েও গিয়েছে।

বাধ্য হয়েই নেপালকে তখন মুস্তাংগ এলাকায় সৈন্য পাঠাতে হল এবং অবস্থা ঘোরাল হয়ে উঠছে দেখে কম্যুনিস্ট চীন খানিকটা সংযত হল। পিকিং কৈফিয়ৎ দিল একজন নেপালী অফিসারকে তিব্বতী ভেবে গুলী করে মেরেছে এবং এর জন্যে খেসারৎ দিতে পিকিং কাঠমাণ্ডুকে [illegible] করতে উদ্যত হল।

ক্রমে চীন ভারতকে কোণঠাসা করবার প্রচেষ্টায় নেপালের উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যোগী হয়ে উঠল। নেপালের উপর চীনা প্রভাবের আগ্রাসী ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে। বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের প্রতি কম্যুনিস্ট চীনের ভক্তি উথলে পড়ছে। নেপালের বৈষয়িক উন্নয়নে সাহায্যের নামে সেখানে চীনা কারিগরদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। চেংটু থেকে লাসা পর্যন্ত ভারী ভারী সামরিক যানবাহন চলাচলের জন্য যে পাকা সড়ক চীনারা বানিয়েছে সেটাকে তারা নেপাল সীমান্তে কুটি পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন তারা কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে তার সংযোগ সাধনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে একটা চুক্তিও নেপাল এবং চীনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই রাস্তা নির্মাণ ত্বরান্বিত করার জন্য চীন নেপালের উপর কূটনৈতিক চাপ দিচ্ছে। ভারত মহাসাগরে পৌঁছবার বাসনা চীন তীব্রভাবেই পোষণ করে। লাসা কাঠমাণ্ডু সড়ক নির্মাণে চীনের এত আগ্রহের কারণ বুঝতে তাই দেরি হয় না।

(ক্রমশ)

ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর

কিছুকাল আগে কথা-প্রসঙ্গে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসের কথা উল্লেখ করেছিলাম, আজ সে-সম্বন্ধে কিছু বলব। এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসগুলি জাপানের এক বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। ইওরোপে এরকম ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস কতগুলি আছে জানি না, আমেরিকায় এখানকার কয়েকটি স্টোরস-এর শাখা অন্তত আছে জানি। এশিয়ার মধ্যে সম্ভবত শুধু হংকং-এ এদেরই দু-একটি ব্রাঞ্চ আছে শুনেছি। আমাদের দেশে অন্তত নেই, সেটা জানি; কলকাতার নিউ মার্কেটকে এর শিশু-সংস্করণ বলা যেতে পারে। এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলিতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় ও আরামবিলাসের সব রকম জিনিসই পাওয়া যায় দামও বিভিন্ন রকমের—সর্বশ্রেণীর লোকেরই সুবিধা-জনক। এক একটি বিরাট বড় সাত-আট তলা বাড়ি নিয়ে এই এক-একটি স্টোর। উপরে সাত-আটতলা ছাড়াও মাটির নিচে বেসমেণ্ট-এ একটি বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটি তলা থাকে, সেখানেও নানা-রকম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এক-একটি তলায় একটি বা একাধিক বিভাগ। যেমন শিশুদের বিভাগ, পুরুষদের বা মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিভাগ, কিমোনো বিভাগ, ফার্নিচার, বিছানা, কাচের ও চীনামাটির জিনিস, প্লাস্টিকের জিনিস, জুয়েলারী, কামেরা, টেলিভিশন, ইত্যাদি। এক-এক জায়গায় এক-একটি জিনিস যে কত অসংখ্য পরিমাণে পাওয়া যায় তা বলে শেষ করা যাবে না। জিনিসপত্রের স্টক কিছু বেশী হয়ে গেলেই, বা ডিজাইন পুরোন হয়ে গেলে অথবা ঋতু পরিবর্তনের সময় এইসব স্টোরগুলো প্রায়ই bargain sale দিয়ে দেয়, [illegible] জিনিসপত্র অনেক সুবিধা দামে

আমাদের মনে হয়, পচা পুরোন ব্যবহারের অনুপযোগী জিনিস অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে বিক্রি করা, বা অনেক সময় বেশী দাম লিখে তাকে কমিয়ে কম দামে পুরোন স্টক বিক্রি করা। কিন্তু এখানে ঠিক সেরকম নয়, অনেক ভাল ভাল সুন্দর ও নতুন জিনিসও sale-এ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, সেসব জিনিস পুরোন হলেও ক্ষতি নেই, অর্থাৎ পুতুল, খেলনা বা চীনা-মাটির জিনিস—ভাঙাচোরা বা খুঁতযুক্ত নয়—এরকম জিনিসও প্রচুর পরিমাণে sale-এ পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের এতে খুব উপকার হয়। অবশ্য সহজে কেউ স্বীকার করতে চায় না যে, সে কোন জিনিস সেল্ থেকে কিনেছে, সেদিকে এদের ভ্যানিটি খুব আছে। শুধু টোকিও শহরেই এরকম ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস বোধহয় চৌদ্দ-পনেরটি আছে, জাপানের অন্যান্য শহরে আরও কয়েকটি আছে। এদের জিনিসপত্র সাজান দেখতেই এত সুন্দর লাগে যে, যে-কোন একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরসে সারাদিন কাটিয়ে দেওয়া যায়, তা সত্ত্বেও এর সব কিছু সম্পূর্ণ খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয় না। এর যে-কোন একটি সেকশনে গেলেই চোখ ও মন দুই-ই আটকে যায়। ঋতু ও বিশেষ বিশেষ পর্ব অনুযায়ী এই ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরগুলি বিভিন্নভাবে সাজান হয়। Show windowগুলি সে সময় বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে। শীত আসার সূত্রপাতে গরম কাপড়-চোপড়ের বাহার যেমন শুরু হয়, বসন্তের প্রাক্কালে তেমনি প্রস্ফুটিত চেরী-ফুল ও অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা জামা-কাপড়ের সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়। এই কিছুদিন আগে, প্রচণ্ড শীতের সময় এখানে Ski-ing season হয়ে গেল।

ভিতরেও কয়েকটি জায়গা—তুষার-ঢাকা Ski-ground-এর মডেলে ভর্তি ছিল। একটা অংশে Ski-এর সরঞ্জাম বিক্রি হচ্ছে, সেখানেই আবার এক জায়গায় ডেমন-স্ট্রেশনও দেওয়া হচ্ছে। আশেপাশে অসংখ্য দর্শকের ভিড়। এই কয়েকদিন আগে এখানে ওহিনা-মাৎসুরী নামে ছোট ছোট মেয়েদের এক পুতুল উৎসব হয়ে গেল, তার জন্যও সব ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস-এ পুতুলের সমারোহ দেখার বস্তু। এই ওহিনা-মাৎসুরী সম্বন্ধে পরে বলব।

জাপানের খেলনা পৃথিবী বিখ্যাত। এদেশের খেলনা শুনেছি সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দামে সস্তা। কোন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের খেলনা বিভাগে গেলে শিশুর ত কথাই নেই, বয়স্ক লোকেদেরও লোভ সামলান কঠিন হয়। দম-দেওয়া বা ব্যাটারীচালিত কলের পুতুল সব। কোথাও ছোট্ট খোকা হামাগুড়ি দিচ্ছে, কোথাও ভালুক ড্রাম বাজাচ্ছে, বুড়ো Butler বোতল থেকে সরবৎ ঢালছে বা cooking range-এর সামনে রান্না করছে, কোথাও লেডী টাইপিস্ট "Miss Friday" টাইপ করছে—তার আওয়াজও ঠিক টাইপ করার মতই, আবার টাইপিস্ট-এর মাথাও নড়ছে। কোথাও মোটরগাড়ি, পুলিস ভ্যান, জেট এরোপ্লেন, লোকোমোটিভ এঞ্জিন, তাদের বিভিন্ন রকম আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। একদিকে আবার প্লাস্টিক বা Vinyl-এর বহু বিচিত্র পুতুল, বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন পোশাক-পরা। এইসব আধুনিক খেলনা ছাড়াও আর একদিকে দেখা যায় জাপানের বিখ্যাত ঐতিহ্যবাহী পুতুল। যথা গেইসা, কাবুকী বা নো-অভিনয়ের পোশাক-পরা পুতুল, যা জাপানের ঐতিহ্যের পরিচয় দেয়। এইসব পুতুল,

বহু বিচিত্র পুতুল, বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন পোশাকে সজ্জিত

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥
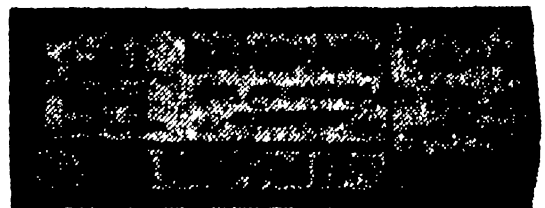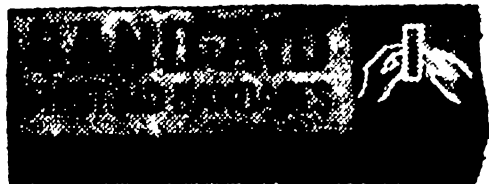
বাজার ঘুরে দেখলাম, শীতের শাকসব্জি যাই যাই করছে, গরমের দিনের পটল, কাঁচা আম, ঝিঙে গৃহস্থের নাগালে আসেনি। নটেশাক পর্যন্ত ৪০ নয়া পয়সা কিলোগ্রাম। উচ্ছে এখন অভিজাত সব্জি—১ টাকা কিলো; বেগুন নামে বেগুন হলেও কৌলীন্য বজায় রাখতে কসুর করে না। ইঁচড়, সজনে ডাঁটা, ঢ্যাঁড়স—তারও দাম শুনলে মাথায় হাত দিতে হয়। এখনও তাই বাঁধাকপি আর টোম্যাটোই বাজারের থলির বেশীটা পূর্ণ করতে পারে। হয়তো বা আর কয়েকটা দিন গেলে এরাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে।

টোম্যাটোর রান্নাঘরে প্রবেশ অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের ঘটনা। আলুর মত টোম্যাটোও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। তবে আলু ইউরোপের খাদ্যতালিকায় ঢুকেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে, টোম্যাটো তার অনেকদিন পরে। আলুর সম্বন্ধে শোনা যায়, রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ওয়াল্টার র‍্যালে বা ফ্রান্সিস ড্রেক প্রথম আমদানি করেন। ইটালিতে টোম্যাটোর খোঁজ পাওয়া যায় ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে—কিন্তু তরকারি হিসাবে নয়, ধনীর উদ্যানশোভা হিসাবে। ইটালীয় ভাষায় এসে এর নাম হলো Pomi d'oro অর্থাৎ সোনার আপেল। তারপর শখের বাগানে কাচের ঘরের অলংকার হিসাবে আজকের এই আটপৌরে টোম্যাটো স্থান পেল ইউরোপের বহু জায়গায় স্পেন, ফ্রান্স ইংল্যান্ডে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, ইকুয়েডর বোলিভিয়া থেকে আমদানি করা টোম্যাটোর বীজ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। তবে খাদ্য হিসাবে তাকে বিশ্বাস করা হতো না। উদ্ভিদবিদদের হিসাবে টোম্যাটো Solanaceae পরিবারভুক্ত। এই গোষ্ঠীতে কয়েকটি বিষাক্ত ফল আছে বলে টোম্যাটোকেও বহুদিন পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখা হতো। তারপর আস্তে আস্তে আস্থা এল টোম্যাটোর উপর। ইউরোপ ঘুরে টোম্যাটো ফিরে গেল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। আজ সেখানে সে পরম প্রিয় খাদ্য। উপকারের দিক থেকে হিসাব করলে টোম্যাটোর অনেক গুণ। খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনে টোম্যাটোর সমকক্ষ সব্জি বা ফল কমই আছে। আমাদের দেশেও অল্প-দিনের মধ্যে টোম্যাটো এত সমাদর লাভ করেছে তাও বোধ হয় ঐ ভিটামিনের জোরেই। পুষ্টির প্রয়োজন হিসাবে ভিটামিনের আবিষ্কার ও স্বীকৃতি প্রায় টোম্যাটোর খাদ্যতালিকায় স্বীকৃতির সমসাময়িক। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে Eijkman লক্ষ করলেন, মুরগিকে কলে-ছাঁটা পালিশ করা চাল খাইয়ে রাখলে তারা মানুষের বেরি-[illegible]

দেখা গেল, ঠিক ধানের খোসার তলায় যে চালের আবরণ তা খাওয়ালে উপসর্গের উপশম হয়। ঐ আবরণে এমন কি আছে যার অভাবে রোগ হয় আর যা শরীরের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়? তিনি পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন Thiamine (থিয়ামিন) বা ভিটামিন বি১। বোধ হয় ভিটামিনের চমকপ্রদ ইতিহাসের প্রথম পদক্ষেপই থিয়ামিন। এইভাবে [illegible] আবিষ্কার হলো। ভিটামিন এ সি, ডি ই পর্যন্ত বি ভিটামিনের এক বৃহৎ পরিবার। মানুষের সুস্থ শরীরধারণের জন্য ভিটামিন অপরিহার্য কিন্তু পরিমাণ প্রয়োজন অতি সামান্য।

টোম্যাটোতে অনেক ভিটামিন আছে। তবে মধ্যে 'এ' ভিটামিন ও 'সি' ভিটামিনের পরিমাণই বেশী। 'এ' ভিটামিন সাবধানে রান্না করলে নষ্ট হয় না, 'সি' ভিটামিন খুব সহজে নষ্ট হয়। এজন্য কাঁচা টোম্যাটো বা কাঁচা টোম্যাটোর রস নিয়মিত খেলে শরীরের ভিটামিনের প্রয়োজনের অনেকটা পাওয়া যায়। দৈনিক আধ পেয়ালা টোম্যাটোর রস একজন প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে যথেষ্ট। অথচ স্বল্প আয়ের সংসারেও মৌসুমী টোম্যাটো ঠিক সাধ্যের বাইরে নয়। কাঁচা টোম্যাটোর চাটনি বানিয়ে বা স্যালাড করে পরিবেশন করা যায়। টোম্যাটো ছোট কুচি করে কেটে লেবুর রস (লেবুও সি ভিটামিনের [illegible]

ধনে পাতা, নুন চিনি সহযোগে টোম্যাটোর চাটনি অতি উপাদেয়। কখনও বা শসা কুচিয়ে মিশিয়ে দেওয়া যায়, কখনও বা পুদিনা পাতা দিয়ে রকমফের হয়।

রান্না করা টোম্যাটোর ভিটামিন কিছুটা নষ্ট হয় তবু স্বাদ আর উপকারিতা সংযোগ করে প্রায় সব ব্যঞ্জনেই টোম্যাটো ব্যবহার করা যায়। টোম্যাটো সস, বা রান্না করা চাটনি সংরক্ষিত করে ভবিষ্যতেও কাজে আসে। টোম্যাটো সস অনেকে অনেক নিয়মে প্রস্তুত করেন। আমি একটি সহজ প্রণালী দিচ্ছি।

উপকরণ

এক কিলোগ্রাম টোম্যাটো, সম্ভব হলে কিছু কিসমিস, ৫০০ গ্রাম চিনি, এক বোতল সিরকা (ভিনিগার)। রসুন [illegible] ৫০ গ্রাম, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম লবণ।
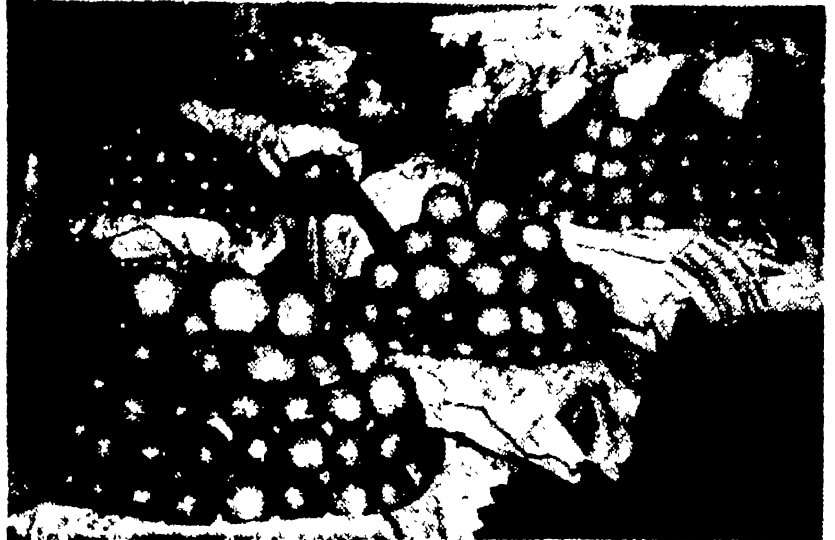
আপেল নয়, কমলালেবুও নয়। কাঁচা-পাকা টোম্যাটো

প্রণালী

১। ভিনিগারে আদা ও রসুন বেটে নিন।
২। কিসমিস [illegible] ভিনিগারে বাটুন।
৩। টোম্যাটো টুকরো করে নিন। তাতে বাটা মসলা, কিসমিস, লবণ, লঙ্কা, চিনি ও বাকি ভিনিগার দিন।
৪। উনুনে বসিয়ে পাক করুন, গাঢ় হলে নামিয়ে মোটা কাপড়ে ছেঁকে বোতলে ভরে রাখুন। যদি সস পাতলা থাকে তবে আরও

একটু ঘন করে তবে ভরে রাখবেন।

বোতল যেন শুকনো থাকে আর যে পাত্রে রান্না হবে সেটি খুব পাতলা না হয়।

এখন বাজারে পমফ্রেট মাছ আসছে অনেক, দামও অপেক্ষাকৃত সস্তা। পমফ্রেট মাছ টোম্যাটো দিয়ে রান্না করে দেখুন, ভালই হবে।

উপকরণ

চার কোয়া রসুন, তিনটে বড় শুকনো লঙ্কা, চায়ের চামচের এক চামচ জিরে, ½ পেয়ালা ভিনিগার, একটু হলুদ, লবণ।

সামান্য চিনি (স্বাদের তারতম্য হিসাবে চিনি দেবেন)। ৫০০ গ্রাম টোম্যাটো, এক কিলোগ্রাম পমফ্রেট মাছ। রান্নার জন্য তেল।

প্রণালী

১। মাছ কেটে টুকরো করে ভেজে রাখুন।

২। ভিনিগার দিয়ে হলুদ, জিরে এবং লঙ্কা পিষুন।

৩। পরপাত্রে তেল দিন, তেল গরম হলে রসুনের কোয়াগুলি দিন।

৪। টুকরো কাটা টোম্যাটো, মসলা, বাকি ভিনিগার, চিনি ও লবণ দিন।

৫। আস্তে আস্তে মসলা আঁচে বসতে থাকুক।

৬। জল প্রায় মরে গেলে মাছ দিয়ে মিনিট পাঁচেক রাখুন।

৭। আস্ত কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে গরম পরিবেশন করুন।

এভাবে পমফ্রেট ছাড়া অন্য মাছও রাঁধা যায়। রুই, ভেটকি ইত্যাদি মাছেও খুব ভাল স্বাদ হয়।

মাংস রান্নায় টোম্যাটোর ব্যবহার প্রশস্ত। যে সময়ে টোম্যাটো বাজারে দুষ্প্রাপ্য তখন আগে তৈরি করে রাখা টোম্যাটো সসে খুব চমৎকার কোফতা রান্না করা যায়।

উপকরণ

৭৫০ গ্রাম মাংসের কিমা, তিন কাপ ফুটন্ত জল, টোম্যাটো সস, একটি ডিম, ½ কাপ দুধ, একটি পেঁয়াজ কুচিয়ে ভাজা, নুন আর গোলমরিচ, কিছু পাউরুটির গুঁড়ো এবং ঘি।

প্রণালী

১। একটি পাত্রে রুটির গুঁড়ো আর দুধ মেশান, ৩০।৪৫ মিনিট ভিজুক।

২। পেঁয়াজ মেশান।

৩। একটি ডিম ফেটিয়ে ঢেলে দিন। মাংসের কিমা, লবণ ও গোলমরিচ দিন।

৪। ভাল করে মেখে গোল করে গড়ে নিন।

৫। বাদামী বাদামী করে ঐ গোলক ভেজে রাখুন।

৬। তিন পেয়ালা ফুটন্ত জলে ভাজা মাংস-গোলক ছেড়ে দিন।

৭। ৪৫ মিনিট পাক করুন।

৮। জল কমে গেলে এক পেয়ালা টোম্যাটো সস দিন। আবার অল্পক্ষণ আঁচে রেখে পরিবেশন করুন।

পুর ভরা টোম্যাটো আমিষ নিরামিষ দুই হতে পারে। আমিষ হলে মাছ বা মাংসের পুর দেবেন। নিরামিষে আলু সিদ্ধ ও মটর কিংবা সব রকম সবজি সিদ্ধ করে চটকে দিতে পারেন। বড় বড় ও বেশ শক্ত টোম্যাটো দরকার। নরম তুলতুলে বেশী পাকা হলে অসুবিধা হবে। পুর ইচ্ছামত প্রস্তুত করবেন। তারপর—

১। টোম্যাটোর মাথা কেটে রাখুন।

২। ভিতরের শাঁস বের করে ফেলুন।

৩। পুর দিন।

৪। উপরে একটু রুটির গুঁড়ো ছড়িয়ে, কেটে রাখা টোম্যাটোর মাথা ঢাকনার মত ঢেকে দিন।

৫। সাবধানে ভেজে পরিবেশন করুন।

টোম্যাটোর ব্যবহারে সবচেয়ে অসুবিধা— টোম্যাটো সহজে পেকে তুলতুলে হয়ে যায় ও পচে যায়। মোম গলিয়ে বোঁটার কাছে সামান্য ঢেলে দিলে ২।৩ দিন ভাল রাখা যায়। টোম্যাটো অনায়াসে জন্মায়। যেখানে সামান্য জমি আছে সেখানেই সহজে টোম্যাটো উৎপাদন করা যায়। জমির অভাবে মাটি ঢেলে বা বস্তা দিয়েও হয়। তবে প্রচুর সূর্যালোক প্রয়োজন, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতের সবটাই হলেও ঠাণ্ডা দেশে অনেক সময় শীতের হাত বাঁচিয়ে টোম্যাটোর চাষ করতে হয়। টোম্যাটোর জন্য বেশী

✽ চিত্র প্রদর্শনী ✽

সমাজে শিল্পীর সংগে পৃষ্ঠপোষক শিল্পরসিকের সংযোগ ঘটার সময় থেকে ক্রেতার চাহিদা ও রুচি, চিত্রণ ও ভাস্কর্যের রূপ প্রকাশের ঢং-কে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। যুগে যুগে এর ব্যতিক্রম হয়েছে কেবল দান্তি(?), মাইকেল এঞ্জেলো, রেমব্রান্ট, সেজান প্রভৃতি মহারথী শিল্পীদের ক্ষেত্রে। এ ধরনের যুগাবতার অসাধারণ শিল্পীর উদ্ভব কালে কালে মাত্র কয়েকটিই হয়ে থাকে এবং প্রায়শ তাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত সাধারণভাবে কুশলী ভাল-মন্দ শিল্পীর ভিড়ে ভরে যায় শিল্পজগৎ। বর্তমান কালে তার ব্যতিক্রম হওয়া দূরে থাক, সেই অতি সাধারণ ও প্রতিভাহীন শিল্পীর জনতা বেড়ে চলেছে ভয়াবহভাবে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের ঢং ভারতীয় শিল্পীদের বেশ প্রভাবান্বিত করে চলেছে। বোম্বের শিল্পিকুলকে এই ঢং-এর শিল্পান্দোলনে অগ্রণী হতে দেখা যায় এবং সেখানকার ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা সেই ধরনের শিল্পের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে প্রচুর। ঐ ধরনের যোগাযোগ পরে দিল্লিতেও সংঘটিত হয়েছে তথাকথিত মডার্ন আর্টের পত্তন, ইউরোপীয় শিল্পান্দোলিত শিল্পকলার। এ দলের মাত্র কয়েকজন প্রতিভাশালী শিল্পী ছাড়া আর সকলের রচনা থেকে স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বাদ

টাউন — শিল্পী : ওমপ্রকাশ শর্মা

কম্পোজিশন — শিল্পী : ওমপ্রকাশ শর্মা

শ্রীওমপ্রকাশ শর্মার ১৮টি তেলরঙা ছবির কলিকাতার অশোকা গ্যালারীতে একক প্রদর্শনী, সেই বাঁধিগত শিল্পরুচি ও শিল্প-ধারণা নিরপেক্ষ রচনাকে মুখ্যত ঘোষণা করছে। ইউরোপের আধুনিক শিল্পের মুখ্য শিল্পীদের রচনাশৈলী ও ঢং-এর নানা অংশকে মিলিয়ে মিশিয়ে যা এ পর্যন্ত এ দেশীয় মডার্ন আখ্যাধারী শিল্পীদের শিল্পে বিকাশলাভ করেছে, তা এখনও সম্পূর্ণ পরিপাক অবস্থায় আসেনি বলা চলে। সাধারণ ফরমুলাজাত বিকৃত-রূপধর্মী ও অ্যাবস্ট্রাক্ট এই ছবির সংগ্রহ দেখে মনে হল যে, শিল্পীর রং ও নকশার সংগতির ধারণা ও অভিব্যক্তি ক্ষেত্রের উপর ভাল, যদিও বেশ খানকয়েক ছবি অপরিণত সৃষ্টির ছাপ বহন করছে যেমন ২নং 'টেম্পাস্', ৬নং ল্যান্ডস্কেপ ৭নং পেন্টিং ইন ব্লু, ১১নং অ্যালোন ১৭নং কল অব দি নাইট ইত্যাদি। ৩নং ছবি-টু 'ফিগারস্' মোটাভাবে চাপানো হলুদ রঙের জমিতে দুটি কাঠের পুতুলের মত মানুষের মূর্তির অবতারণা মোটেই মনোজ্ঞ হয়নি এবং ১০নং 'ক্যাপচারড'-এ মেড রঙের জমিতে গাঢ় বাদামী রঙের জালবোনা নকশা চিত্রণের দিক থেকে নিরর্থক মনে হল। মন্দ্রিয়ান-এর ঢং-এ সাজান বহু চৌকোনার নকশার ৫নং ছবি 'টাউন' কিছুটা উপভোগ্য।

"তাড়াতাড়ি শেষ কর, রাজু। আবার তোমার স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে"
"রাজুকে নিয়ে যে কি করব ভেবে পাই না। আজকাল ও এমন ক্লান্ত ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সীতা। এমন কি দুধ পর্যান্ত খেতে চায় না।"
"বোধহয় ওর কর্মশক্তির অভাব হয়ে পড়ছে, কমলা। তুমি ওকে রোজ দু পেয়ালা করে বোর্ণ-ভিটা খেতে দাও দেখি। আমাকেত' ডাক্তারবাবু সবসময়ই তাই বলেন।"
"ভাগ্যিস — সীতার পরামর্শ নিয়েছিলাম। আমার রাজু দিনে দিনে স্ফুর্ত্তিতে মেতে উঠ্ছে—বোর্ণ-ভিটাকে ধন্যবাদ।"
"এখনও স্কুল বাস আসতে দেরী আছে, রাজু। তুমি বেশ আজকাল তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে যাও।"
এত উৎসাহ ওর আগে দেখি নি!
BOURN-VITA
শক্তি ও উৎসাহের জন্য
Cadbury's
BOURN-VITA
THE IDEAL FOOD DRINK
MADE BY CADBURY'S SPECIALISTS IN FOOD DRINKS FOR 100 YEARS
প্রস্তুতকারক
Cadbury's
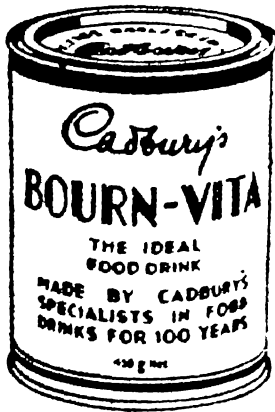
* বিশ্ববিচিত্রা *

গর্দভের আদিস্থান মরুভূমি ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হলেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকেও যে তারা বেশ বরদাস্ত করতে পারে, ছবিতে বরফের ওপর গড়াগড়ি দেওয়া থেকেই সেটা উপলব্ধি করা যায়। এবার ইওরোপের প্রচণ্ড শীতে অন্যান্য জন্তুদের অধিকাংশ কষ্ট পেলেও গর্দভরা ঠাণ্ডাটা স্বাভাবিকভাবেই মানিয়ে নেয়

বংশানুক্রমে নকল দাঁত

বৃটেনে এমন কতক লোক আছে যারা দাঁতের যন্ত্রণা যে কি তা জানে না। দাঁতের কোন রোগে তাদের ভুগতে হয় না, হবেও না কোনদিন।

এরা anodontia—অর্থাৎ যার কোনদিন দাঁত জন্মায়নি—নামক এক দুর্লভ ব্যাধিগ্রস্ত। শিশুকাল থেকেই তারা নকল দাঁত ব্যবহার করে আসছে। দন্ত চিকিৎসকদের কাছে প্রকৃতির এই খেয়াল একটা রহস্য। এর কোন কারণ তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি। তবে এইটুকু শুধু তাঁরা জানেন যে এ ব্যাধি বংশ [illegible] দেখা দেয়।

শৈশবে দুধের দাঁত যথাসময়ে না [illegible] মাড়ি এক্স-রে করে এই রোগ নির্ণয় করা হয়।

এই রোগে আক্রান্ত [illegible] পাঁচ বছর বয়সের বালক কিছুদিন [illegible] তৃতীয়বার দাঁত বাঁধায়। [illegible] যতদিন না বন্ধ হয় ততদিন প্রতি দু বছর অন্তর তাকে নতুন দাঁতের সেট লাগিয়ে যেতে হবে

তার প্রথম সেটটি হারিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় সেটটি মাস কয়েক মাত্র লাগাবার পর একদিন [illegible] সেটি [illegible] পড়ে যায়।

এই ছেলেটির এক বোন এবং ভাই আছে যাদের স্বাভাবিকভাবেই দন্তোদ্গম হয়েছে কিন্তু তার এক জেঠার দাঁত ওঠেনি এবং ঠাকুরদার দাঁত উঠেছিল [illegible]।

আংশিক anodontia-ও দেখা যায়—যে ক্ষেত্রে কয়েকটি ছাড়া প্রায় সব দাঁতই ওঠে। খেতে অসুবিধে না হলে বা মুখের চেহারায় বিকৃতি না ঘটলে এদের সাধারণত নকল দাঁতের দরকার হয় না।

জঞ্জাল বিক্রী করে লক্ষপতি

জঞ্জালের সঙ্গে ভাঙা লোহা, টিন এবং অন্যান্য বহু প্রকারের সামগ্রী থাকে যা বিক্রী করে লক্ষপতি হওয়া যায়। এ ব্যাপারে আমেরিকার জঞ্জাল ব্যবসায়ীরাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

বিরাট কারখানায় জঞ্জালের মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি জিনিস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা করে বেছে নেবার ব্যবস্থা আছে। নিউ-[illegible] [illegible] ও [illegible] ভাঙা [illegible] [illegible]

[illegible] হয়। বিরাট [illegible] যন্ত্রের সাহায্যে [illegible] পুরানো ভাঙা মোটর গাড়িকে [illegible] দেখা যায় সে [illegible] একটা [illegible] ভরে নেওয়া যায়।

কানাডায় ভাঙা লোহা [illegible] সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী [illegible] পরিত্যক্ত মাল নিয়েই বেশী কারবার করেন। তার সবচেয়ে [illegible] ছিল পুরোনো [illegible] [illegible] কারখানার [illegible]। কারখানার যাবতীয় [illegible] পর্যন্ত [illegible] নিয়ে [illegible] পরিণত করে প্রচুর অর্থ তিনি লাভ করেন।

[illegible] বছরে এক কোটি টন [illegible] [illegible]। এই [illegible] [illegible] জমা [illegible]।

[illegible] এখন এই স্তূপকে [illegible] [illegible], [illegible] তেল, সাবান, কৃত্রিম রবার, সার এবং এক ধরণের দানাজাত [illegible] প্রভৃতির কাজে লাগাচ্ছেন যা নাইলন তৈরির মৌল রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করা হয়।

কিছুকালের মধ্যেই লিগনিন বছরে প্রায় ছ'শ কোটি টাকার ব্যবসা ফাঁপিয়ে তুলতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এমন কি ধূলার স্তূপও অর্থ লাভ ঘটিয়ে দিতে পারে।

বৃটেনে লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত স্পলডিং-এ অবস্থিত বীট থেকে চিনি তৈরির কারখানাটি, গত পঁচিশ বছরে বিশোধনের জন্য প্রেরিত বীট থেকে দশ লাখ টন ধুলো বের করে। এই বিপুল পরিমাণ ধুলো পৃথিবীর সেরা কৃষিক্ষেত্রগুলি থেকে [illegible] বলে অতি উত্তম মাটি।

এতদিন এই সম্পদশালী মাটির কোন চাহিদা ছিল না। ফলে একর জমি জুড়ে বছরে কয়েক হাজার টন করে জমেই যাচ্ছিল। সম্প্রতি স্থানীয় কৃষকরা এর মূল্য বুঝতে পেরেছে। একটি প্রতিষ্ঠান বাগান তৈরিতে কাজে লাগাবার জন্য দশ হাজার টন এই ধুলো কিনে নিয়েছে।

হৃদ্‌যন্ত্রে অস্ত্রোপচার

হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে দেশে-বিদেশে মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রোপচারের অধ্যাপক ডাঃ রুডল্‌ফ্‌ৎসেন-কার যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান শীঘ্রই এমন একটি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরী করতে সক্ষম হবে যেটি রোগ, বয়স ও আঘাতের দরুণ যাদের হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক কাজ করতে অসমর্থ, তাদের শরীরে লাগিয়ে দিলে দীর্ঘ সময় ধরে হৃৎপিণ্ডের জরুরী কাজ চালিয়ে যাবে।

তিনি বলেছেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান এই দশকে আশ্চর্য এগিয়ে গেছে। তাই আজকাল এমন সব অস্ত্রোপচার সম্ভব যা কয়েক বছর আগেও একেবারেই অসম্ভব ছিল। এখন তাই জন্ম থেকে যাদের হৃৎপিণ্ডের কোন ধমনীর গোলযোগের দরুণ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ঠিকভাবে হয় না, তাদের হৃৎপিণ্ডে সাফল্যজনক অস্ত্রোপচার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রকম একশত রুগীকে অধ্যাপক রুডল্‌ফ্‌ অস্ত্রোপচার করে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। অথচ পূর্বে জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যে যাদের হৃৎপিণ্ডের এই বিকৃতি ধরা পড়ত, তারা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যেত। তাদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের "শর্ট-সার্কিটের" ফলে রক্তে খুব অল্প পরিমাণে অক্সিজেন জমা হত অথবা একেবারেই হত না এবং তার ফলে তারা দমবন্ধ হয়ে মারা যেত। এদের শরীর নীল হয়ে যায়। পূর্বে এই রকম বিকৃত হৃৎপিণ্ড নিয়ে যারা জন্মাত তারা কয়েকমাস টিকে গেলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতো না কিম্বা নড়াচড়া করতে পারত না। বর্তমানে সাফল্যজনক অস্ত্রোপচারের পর স্বাভাবিকরূপে এরা বেঁচে থাকে, নিয়মিত কাজকর্মও করতে পারে।

আজকাল বিজ্ঞানের কল্যাণে কৃত্রিম "খুচরো দেহাংশ" দিয়ে, হৃৎপিণ্ডের ত্রিশটি প্রয়োজনীয় অংশ পাল্টানো যায়। প্লাস্টিকের তৈরী কৃত্রিম বস্তু দিয়ে অথবা রোগীর দেহের অন্য অংশ থেকে জৈব তন্তু নিয়ে আজকাল হৃৎপিণ্ডের ধমনী, এমন কি মহাধমনী পর্যন্ত পাল্টে দেওয়া চলেছে। যাদের দেহে কম রক্ত সরবরাহ হয় অথবা যারা ধমনীর কম্পনরোগাক্রান্ত, তাদের দেহে আজকাল ছোট্ট একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যাকে বলা হয় "হৃৎপিণ্ডের গতি-নিয়ন্ত্রক", লাগিয়ে দেওয়া হয় যেটি হৃৎপিণ্ডকে নিয়মিত কম্পিত করে-ও তার ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলি যথাযথ সংকুচিত হয়। হৃৎপিণ্ড বিশেষজ্ঞদের কাছে "স্টালিন" নামে হৃৎপিণ্ডকে [illegible] [illegible]

* আলোচনা *

মাননীয়েষু,

কিছুদিন আগে "দেশ"-এর আলোচনা-স্তম্ভে শ্রীআশীষকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন : "আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের কমিউনিজমের প্রতি দুর্মর আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ তথ্য ও যুক্তি দ্বারা অসমর্থিত একটা অন্ধ কুসংস্কার—রাশিয়ায় সাধারণ মানুষের খাওয়া-পরার সমস্যা নেই, তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত, সেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য নেই।...এ ব্যাপারে "দেশ"-এর আগামী কোনো সংখ্যায় শিবনারায়ণবাবু ও অধ্যাপক অম্লান দত্তের প্রবন্ধ দেখতে পেলে খুবই সুখী হব।"

এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবসর আমার এখন নেই। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা শুধু বলব।

রুশ দেশে গত কয়েক বছরে অনেকখানি আর্থিক উন্নতি ঘটেছে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। এ কথাটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।

কিন্তু রুশভক্তের দল সমস্ত ব্যাপারটা যেভাবে উপস্থিত করে থাকেন সেটা ভুল। বলা হয়ে থাকে যে, বিপ্লবের আগে রুশ দেশ এদেশেরই মত দরিদ্র ছিল; বিপ্লবের পর আর্থিক উন্নতির পথ খুলে গেল এবং আজ ওদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর ভিতর উচ্চতম। অতএব বিপ্লবোত্তর কম্যুনিস্ট রুশের পথই আমাদেরও গ্রহণ করা কর্তব্য। এই যুক্তিতে তথ্য ও সিদ্ধান্ত দুই-ই ভুল।

একথা সত্য নয় যে, বিপ্লবের আগে রুশ দেশ আমাদের দেশেরই মত দরিদ্র ছিল। এ বিষয়ে একটি তথ্য পাঠকের সামনে উপস্থিত করাই যথেষ্ট। আজ ভারতবর্ষে মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ আট কোটি টনের কাছাকাছি। ১৯১৩ সালে রুশ দেশে খাদ্য-শস্যের পরিমাণও আট কোটি টনেরই মত। অথচ ১৯১৩ সালে রুশ দেশের মোট জন-সংখ্যা আজকের ভারতের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। অর্থাৎ প্রাকবিপ্লব রুশ দেশে মাথা পিছু খাদ্যশস্যের উৎপাদন আজকের ভারতের তুলনায় মোটামুটি তিন গুণ।

এ কথাও সত্য নয় যে, রুশ দেশে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছে কম্যুনিস্ট বিপ্লবের পর। ওদেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের শুরু উনিশ শতকের শেষ ভাগে। প্রায় একই সময়ে (রুশ দেশের খানিকটা আগে) জার্মানীতে দ্রুত শিল্পোন্নতির আরম্ভ। এ বিষয়ে ইদানীং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ-গণের লেখায় নতুন আলোকপাত হয়েছে। উদাহরণত একটি প্রবন্ধের উল্লেখই যথেষ্ট। 'Economic Development and Cultural Change' কাগজের ১৯৬১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় গোল্ডস্মিথের একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরে রুশ দেশে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার তদানীন্তন জার্মানীর তুলনায় সম্ভবত উঁচু ছিল। জার্মানীতে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সফল হয়নি; তৎসত্ত্বেও সে দেশে পরবর্তী কালে দ্রুত আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। এ সিদ্ধান্ত বোধহয় অবাস্তব নয় যে, রুশ দেশে কম্যুনিস্ট বিপ্লব না ঘটলেও শিল্পোন্নতির পথ বন্ধ থাকত না। (প্রসঙ্গত পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, জারীয় সরকারের পতন কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ফলে নয়। জারের পতন ঘটে ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে। তারপর নতুন সরকার গঠিত হয়। কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটে ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসে।)

এ কথাও সত্য নয় যে, আজকে সোবিয়েত দেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান, অথবা শিল্পোৎপাদন, অথবা আর্থিক উন্নতির হার পৃথিবীতে সর্বোচ্চ। সোবিয়েত দেশের তুলনায় সাধারণ জীবনযাত্রার মান আমেরিকা, সুইডেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বহু দেশেই অপেক্ষাকৃত উন্নত। ১৯৬০ সালে সোবিয়েত দেশে মোট শিল্পোৎপাদন আমেরিকার তুলনায় শতকরা ষাট ভাগ অথবা আরও কম ছিল। সোবিয়েতের তুলনায় কম্যুনিস্ট (যুগো-শ্লাভিয়া) ও অ-কম্যুনিস্ট (জাপান, জার্মানী) একাধিক দেশেই আর্থিক উন্নতির হার ইদানীংকালে বেশী বই কম নয়।

আবারও বলি, সোবিয়েত দেশে উন্নতি ঘটছে—এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নতি আশা করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর আরও বহু দেশে উন্নতি ঘটছে। বহু দেশের কাছ থেকে আমরা শিখব, কিন্তু আমাদের পথ আমরাই সৃষ্টি করে নেব—এ মনোভাবেই স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয়। সোবিয়েত দেশের গত প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর আর্থিক ইতিহাস থেকে শিক্ষা এবং সাবধানবাণী দুই-ই গ্রহণ করার আছে। এই সময়ে সে দেশে শিল্পের অনেকখানি প্রসার ঘটেছে। উদাহরণত বলা চলে যে, ১৯১৩ বা ১৯২৮ সালের তুলনায় ১৯৬০-এ ইস্পাত উৎপাদন সেখানে পনের-গুণের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য ভারী শিল্পেরও প্রচুর প্রসার ঘটেছে। এটা সম্ভব হয়েছে নানা কারণে। তারিফ করতে হয় অংশত ওদেশের প্ল্যানিং ব্যবস্থাকে, অংশত ওদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে; অন্যান্য কারণও আছে। অপরপক্ষে স্ট্যালিনী আমলে সোবিয়েত কৃষি-ব্যবস্থার দুর্দশা থেকে আমাদের সাবধানবাণী গ্রহণ করবার আছে। ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যু; তার আগে চল্লিশ বৎসরে খাদ্যশস্যের ওদেশে উৎপাদন বেড়েছে আট কোটি থেকে মাত্র সওয়া আট

কোটি টনে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের ভারতবর্ষে গত দশ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ও হার স্ট্যালিনী আমলের তুলনায় অনেক বেশী।

রুশ দেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা এখানে সম্ভব হল না বলে মার্জনা চাইছি। আগ্রহী পাঠককে শুধু বিনীতভাবে এইটুকু জানিয়ে রাখতে পারি যে, এবিষয়ে আমার একটি পুস্তক এখন যন্ত্রস্থ: প্রকাশক ওয়ার্ল্ড প্রেস লিমিটেড। পাঠক এখানে যা পেলেন না, তা হয়তো কিছু পরিমাণে এই পুস্তকে পাবেন।

একটা গল্প দিয়ে শেষ করি। ইয়োরোপে এক নরওয়েজিয়ান মহিলার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ঘটে। তিনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মের উৎসাহী সমর্থক। আফ্রিকায় মিশনারীদের কার্যকলাপ নিয়ে কথা হচ্ছিল। উনি বললেন যে খৃষ্টান ধর্মের ফলেই ওদের দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে; কাজেই অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এ-ধর্ম গ্রহণ করা ভালো হবে। আমি বলেছিলাম যে, ইয়োরোপের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি তবে ধর্ম গ্রহণ না করেও। কমিউনিজম সম্বন্ধেও একই কথা। মনে রাখতে হবে যে, খাঁটি কমিউনিস্ট মাত্রই মিশনারীবিশেষ। কমিউনিজম এবং 'প্ল্যানিং' সমার্থক নয়, কমিউনিজম একটা গোটা দর্শনের নাম, আমাদের যুগের অত্যন্ত অসহিষ্ণু একটা ধর্মের নাম। কমিউনিস্ট দেশগুলির কাছ থেকে আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু আছে কিনা অথবা আমরা "প্ল্যানিং" গ্রহণ করব কিনা এটা একজাতের প্রশ্ন, আর কমিউনিস্ট-লেনিনবাদের দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব কিনা, এটা ভিন্নজাতের প্রশ্ন। এই দ্বিতীয়টিতেই গণতান্ত্রিকের প্রধান আপত্তি।

অম্লান দত্ত

কলকাতা,
২২।৩।৬৩

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন,

জনপ্রিয় দেশ পত্রিকায় "শিল্পীর স্বাধীনতা" প্রবন্ধমালা পাঠকমহলে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু গত ৩০ বর্ষ ২ চৈত্র, সংখ্যাটির রচনাটি অপূর্ব। পাঠ করলে চীনের নগ্ন, কুৎসিত, সমাজজীবন, তার স্বরূপ, শিক্ষা দীক্ষা, মেয়েদের চুল ছাটাইয়ের পরাধীনতা, এমন কি বড়ো বয়সে সরকারী "সুখ শিবিরে" থাকার মত শিক্ষাব্যবস্থার নির্বাসনের সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়। "শিল্পীর স্বাধীনতা" সিরিজের জন্য দেশ-পত্রিকার সম্পাদককে ও এক বিশেষ প্রবন্ধটির জন্য শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। চীনের বীভৎস নগ্নরূপ প্রকাশের জন্য এই ধরনের আরও লেখা ছাপা দরকার।

নমস্কার ইতি

ধীরেন কর গুপ্ত

কলিকাতা-৪

ভ্রম সংশোধন

গত ৩০ বর্ষ ২১ সংখ্যায় এই বিভাগে প্রকাশিত 'হাসনোহানা' সম্পর্কিত পত্রের লেখক আমীনুর রসিদ চৌধুরী "পুষ্পোদ্যান" (লেখার নার্শারী)-এর লেখক শ্রীঅমরনাথ রায়কে 'পরলোকগত' বলে যে উল্লেখ করেছেন তা ঠিক নয়। শ্রীরায় সুস্থদেহে যথাপূর্ব নিজের প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা নিয়ে আছেন। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলন

মার্কাস স্কোয়ার-এর মাঠে ঘাস কম, ধুলো বেশী; কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার দিকে ঝড় হাওয়া দিচ্ছিল; যাত্রা নাটকের দিন লোকারণ্যও দেখেছি এবং ভীত হয়েছি। মনে সন্দেহ জেগেছিল সাহিত্য সম্মেলনের তিনটি দিন নির্বিঘ্নে কাটবে কি না। প্রকৃতি বাদ সাধতে পারে, অপ্রকৃতিস্থরাও বাধা হতে পারে। বলতে কি, ২৮শে মার্চ সম্মেলনের প্রথম দিনটি থেকেই মনের সব সন্দেহ ঘুচে গেল। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সুসজ্জিত সুন্দর মণ্ডপে শ্রোতারা নীরবে এসে বসেছেন, সংখ্যায় কয়েক হাজার (বোধ করি পাঁচ ছ' হাজার)। ওপরে সভামঞ্চে বাংলাদেশের খ্যাতনামা বহু সাহিত্যিক এবং তারই মধ্যে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত কয়েকজন অবাঙালী অতিথি। আমেদাবাদ থেকে এসেছিলেন শ্রীউমাশংকর যোশী স্বনামেই যিনি সর্বভারতীয় সাহিত্যমহলে সর্বজন পরিচিত এবং সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন কা না সুব্রহ্মণীয়ম মাদ্রাজ থেকে এসেছেন এই বিশেষ সম্মেলনে যোগ দিতে সানন্দে আরও ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ রাও হিন্দী সাহিত্যের একজন গুণী কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন শ্রীহীরালাল চোপরা উর্দু সাহিত্যে যার গবেষণা [illegible] বিদ্বানমণ্ডলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। প্রথম দিনের সম্মেলনের প্রারম্ভপর্বের ছবিটি দেখেই মনে হয়েছিল গত কয়েকদিনের দুশ্চিন্তা যেন নিতান্তই দুর্বলতা। আকাশের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করলাম কোনো রকম কালিমা কোথাও নেই।

সম্মেলনের সূচনা করলেন আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তিনি এই সাহিত্য সম্মেলনের নিমন্ত্রণ-কর্তা। তাঁর স্বাগত-ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট। ফরমায়েস মতন যে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয় সে-কথা অসঙ্কোচে জ্ঞাপন করে শ্রীসরকার কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সাহিত্য ও শিল্পের ভয়াবহ পরাধীনতার কথা উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্র হওয়া সাহিত্যের ধর্ম নয় এবং যে-ব্যবস্থা সাহিত্য ও শিল্পকে—মানুষের চিন্তা ও সৃষ্টিকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়—সেই ব্যবস্থার দীনতাকে তিনি ধিক্কার দেন।

অতঃপর সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, অমৃত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। চিন্তার স্বাধীনতাই সাহিত্য সৃষ্টির মূল উৎস। এই স্বাধীনতাকে কোনোক্রমেই বিকিয়ে দেওয়া যায় না বলে তিনি অভিমত জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন দিবস। শ্রী কা না সুব্রহ্মণীয়ম বক্তৃতা করছেন। মঞ্চে শ্রীঅশোককুমার সরকার, শিবরাম চক্রবর্তী, উমাশঙ্কর যোশী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

সম্মেলনের প্রারম্ভিক পর্বে শ্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁর একটি ভাষণ সভায় পাঠ করা হল। পরে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের পক্ষ থেকে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এই সমাজের বক্তব্য নিবেদন করেন (প্রসঙ্গত বলা উচিত, বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে স্বাধীন সাহিত্য সমাজ আলোচ্য সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছিলেন)। কেন এইরূপ একটি সম্মেলন

শ্রীবালকৃষ্ণ রাও

স্ট্যালিনের আচরণ ও ক্রুশ্চফ-এর অভিযোগ তার প্রমাণ। যদি ভারতকে তার স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মনকে অক্ষুন্ন রাখতে হয় তবে তাকে আজ অতিরিক্ত রকমে যত্নশীল হতে হবে।

উমাশঙ্করের পরবর্তী বক্তা হিসাবে শ্রীঅম্লান দত্ত তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় এই কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, চিন্তার স্বাধীন প্রবণতা মানুষের সহজাত এ কথা মনে করা ভুল। স্বাধীন চিন্তা করার জন্য মানুষকে যুগে যুগে সংগ্রাম করতে হয়েছে। কখনও সে জয়ী হয়েছে, কখনও পরাজিত হয়েছে। তবু চিন্তার স্বাধীনতাকে সে বিসর্জন দিতে পারে নি। মানুষের সর্বপ্রকার প্রশ্ন ও সন্দেহ, জিজ্ঞাসা এবং সত্যানুসন্ধানের ভিত্তিই হল চিন্তার স্বাধীনতা।

শিল্পী সাহিত্যিকের সৃজনকর্মের জন্যে চিন্তার স্বাধীনতা অপরিহার্য। স্বাধীন চিন্তার অধিকারকে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার—এমন মনে করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। যাঁরা এ দুটিকে জড়িয়ে নিতে চান তাঁদের উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার। সভ্য সমাজে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব, যদি না দেশময় গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া যায়। হিটলারের জার্মানীতে এ-রকম হয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়াও এইভাবে হাঙ্গেরীতে গুপ্তচর ছড়িয়ে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার শেষ বক্তা ছিলেন তরুণ ও পরিচিত কবি শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পোশাকি বক্তৃতার কোনো আড়ালই তাঁর আলোচনায় ছিল না। [illegible], আন্তরিক আবেগ [illegible] আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে [illegible]। [illegible]

এইটিই তার মূল্যে বক্তব্য ছিল যে, চিন্তার স্বাধীন বিকাশের পথে যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে সবার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই স্বাধীন সাহিত্য সমাজের উদ্দেশ্য। তিনি আরও জানান, তারুণ্য চির-কালই চঞ্চল ও বিদ্রোহী। তারুণ্যের এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগ নিয়ে কমিউনিস্টরা সব সময় তাদের দলে টানে।

৩০শে মার্চ, তৃতীয় দিন, আলোচনার বিষয় ছিল : সংস্কৃতির সংকট ও লেখকদের কর্তব্য। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীবালকৃষ্ণ রাও।

হিন্দী সাহিত্যের প্রতিনিধি শ্রীবালকৃষ্ণ রাও ভারতীয় সংস্কৃতির সাম্প্রতিক বিকাশের ধারা ব্যাখ্যা করে বলেন, নিজের চোখে নিজের দেশকে দেখবার মানুষের যে সহজাত প্রবণতা তা আমরা অনেকটা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক সংকটের এটা অন্যতম কারণ। একনায়কত্বের অধীন বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা ব্যক্ত করে শ্রীরাও বলেন, সে সব দেশের সংকট আরও অনেকগুণ বেশী মর্মান্তিক।

স্ট্যালিনের অধীনে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক

> **অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন**
>
> **ব্যয়বাহুল্য বর্জন করুন**
>
> **জাতীয় প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করুন**

[illegible]

[illegible] দিয়েছে যে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন এই প্রসঙ্গে শ্রীরাও সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথাও বলেন। শ্রীরাও বলেন, সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শিল্পী-সাহিত্যিক-দেরও কিছু করবার আছে। চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে এই কর্তব্য পালন করা অসম্ভব হয়।

এই অধিবেশনের অন্যতম বক্তা শ্রীবুদ্ধদেব বসু বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা শুনে আসছি যে, চীন আমাদের বড় বন্ধু, তাঁরা খুব সজ্জন, খুব উদার। চীনের নগ্ন আক্রমণে ভারতে অনেকেই তাই বিস্মিত ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু চীনের এই আক্রমণ সকলের নিকট অপ্রত্যাশিত ছিল না।

শ্রীবসু বলেন, রাজনীতি নিয়ে দেশের রাজনীতিজ্ঞগণ চিন্তা করবেন, সামরিক সমস্যা নিয়ে সামরিক বিভাগের লোকদেরই ভাববার কথা। কিন্তু সাহিত্য সভারও এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার যুক্তি আছে। কেননা, সাহিত্যচর্চা করতে হলেও

শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র

বেঁচে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কম্যুনিস্ট শাসনে দেখা যায় লেখকদের পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয় অথবা করুণভাবে মৃত্যু বরণ করতে হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীবসু জনৈক তরুণ কবির সমালোচনায় রাষ্ট্র-নায়ক ক্রুশ্চফের তীব্র মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করেন।

পরিশেষে শ্রীবসু সমবেত শ্রোতাদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, পরাধীনতার আমলে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা এই সব প্রশ্নের বিচার করতাম আজ তা পরিহার করতে হবে। সামরিক স্বৈরতন্ত্র অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক গুণ বেশী সর্বগ্রাসী।

উড়িষ্যার কবি ও ঔপন্যাসিক শ্রীনিত্যানন্দ মহাপাত্র বলেন, একথা ঠিক নয় যে, ভারতীয় সংস্কৃতি আজ এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। দীর্ঘ দিন যাবৎই আমাদের সাংস্কৃতিক সংকটের সেটাই অকাট্য প্রমাণ। সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে শ্রীমহাপাত্র বলেন, যে কোন সময় যে কোন অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার মানসিক প্রস্তুতিই প্রকৃত সংস্কৃতি। তিনি বলেন, নিরন্তর প্রহরা ব্যতীত স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। আমাদের উত্তর সীমান্তে যে বিপর্যয় ঘটেছে আমাদের সাংস্কৃতিক সঙ্কটের তাহাই অকাট্য প্রমাণ। লেখকের কর্তব্যের কথা বিশ্লেষণ করে শ্রীমহাপাত্র বলেন, লেখকের বিবেক যদি স্বাধীন এবং পরিচ্ছন্ন না থাকে তবে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না। তিনি বলেন, একনায়কত্বের অধীনে মানুষের বিবেক পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না।

তরুণ সাহিত্যিক শ্রীআলোক সরকার-এর মূল বক্তব্য ছিলঃ শিল্পী হিসাবে চৈতন্যের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব শিল্পীরই।

বিবেকানন্দ : জীবনী, চিন্তা ও কর্মের পরিচয়

বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন। প্রকাশক—বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ (২৪ পরগনা।) মূল্য—দুই টাকা।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ—তামসরঞ্জন রায়। প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয়। ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—চার টাকা।

PATRIOT-SAINT VIVEKANANDA Edited By—Tarini Shankar Chakravorty. Published by Swami Vivekananda Birth Centenary Celebrations Committee, Muthiganj, Allahabad-3. Price—Rupee one only.

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন। ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪। মূল্য—এক টাকা।

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী প্রকাশন। ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড কলিকাতা-১৪। মূল্য—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পুস্তক পরিচয়

ছেলেবেলার বিবেকানন্দ—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা-৯। মূল্য—দুই টাকা।

"বিবেকানন্দ-শত-দীপায়ন" একটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ। এই গ্রন্থে স্বামীজীর এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আদর্শের উপর লিখিত কয়েকটি শিক্ষামূলক ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত। ভারতীয় এবং প্রবাসী ভারতীয় কয়েকজন চিন্তাশীল লেখক এই স্মারক গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লিখেছেন। ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষাতে লিখিত গ্রন্থের মোট তিপ্পান্নটি প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠকরা স্বামীজীর জীবনদর্শন ও অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন। স্বামী মেধাচৈতন্য রচিত সংস্কৃত শ্লোকমালায় (বঙ্গানুবাদ সহ) স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের দেবগূঢ় রহস্যটি উদ্ঘাটিত। ভক্ত পাঠকদের কাছে এই শ্লোক গাথার মূল্য গভীর। শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ রচিত "বিবেকানন্দচরিতম্" সংস্কৃত রূপক নাট্য আলোচ্য পুস্তকের একটি বিশিষ্ট রচনা। এস এন কুলকার্নী শ্রীধর ভাস্কর বর্ণেকার অধ্যাপক কে আর যোশী প্রমুখ পণ্ডিতদের সংস্কৃত প্রবন্ধে স্মারক গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ একটি সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ। কিন্তু তথ্যার্পিত জীবন-চরিতের চেয়ে এর মূল্য বেশী। লেখক তাঁর গ্রন্থে শুধু স্বামীজীর জীবনের নানা ঘটনা ও তথ্য পরিবেশন করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি এই লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা প্রকাশ করবার জন্যই বিশেষভাবে যত্নবান হয়েছেন। এবং এই এই লক্ষ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি স্বামীজীর জীবনের কয়েকটি প্রধান ও অপ্রধান ঘটনা গ্রন্থটিতে থরে থরে সাজিয়েছেন। রচনাটি প্রেরণাদীপ্ত, ভাষা সুললিত।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু, ডঃ রাধাকৃষ্ণন, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, রোমাঁ রোলাঁ, ভগিনী নিবেদিতা, বিনয়কুমার সরকার, ডঃ পি এস নাইডু স্বামী নিখিলানন্দ প্রমুখ কয়েকজন মনীষীর রচনা "Patriot-Saint Vivekananda" পুস্তকটিতে সঙ্কলিত। তা ছাড়া স্বামীজীর নিজস্ব কয়েকটি রচনা—গদ্য ও পদ্য—এই স্মারক-গ্রন্থে সংযোজিত। আমেরিকায় [illegible] স্বামীজীর একাধিক ছবি ও তাঁর [illegible]

সতীনাথ ভাদুড়ী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু এবং বিমল কর প্রভৃতিরা কেন নিয়মিতভাবে শিশু-সাহিত্য রচনা করেন না?

এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য যে, আলোচিত গ্রন্থটি শিশুসাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রকাশনার তালিকায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, জন্তু-জানোয়ারদের কেন্দ্র করে তিনি এক আকর্ষণীয় জগৎ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। ছাপা, বাঁধাই এবং চিত্রগুলি নিন্দনীয় হওয়ায় গ্রন্থটি তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে।

৫৪৭।৬২

কবিতা

জনমত (কবিতা সংকলন) সম্পাদক : শ্যামল বসু। অধিনায়ক। ১০।৫৭-এ; দেশপ্রাণ শাসমল রোড। কলকাতা-৩৩। ৩০ নঃ পঃ।

চৈনিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত দেশাত্মবোধক কবিতার কৃশ সংকলন। সংকলনে কবিতার সংখ্যা চৌদ্দ। পুরোভাগে আছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ। কবিতার অধিকাংশ ইতোমধ্যে অপ্রধান হয়েও দেশপ্রেম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠাই দেশাত্মবোধক কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য বর্তমান সংকলনে সফল হয়েছে। কবিতাগুলি স্বদেশের প্রতি প্রেমের স্বাদে ভরপুর। চীনের প্রতি ঘৃণায় বিকারে পূর্ণ।

প্রাপ্তি স্বীকার

সাত রং সাত আকাশ—শান্তিভূষণ রায়।
সেই বন্ধ্যা রূপসী—বানু ভৌমিক।
সাহিত্য-সমীক্ষা—গোপাল ভৌমিক।
যন্ত্রণার অনুভব—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়।
Rain in Indian Life and Lore—Edited by Sankar Sen Gupta.
Nineteenth Century **Bengal and** Fifteenth Century Europe—David Kopf.
A History of Political **Philosophy**—Narayan Das Konar.
মূর্ছনা—নিরঞ্জন।
বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গ খেয়াল—শ্রীসত্য-কিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভগবৎ প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়)—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ।
সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী—মণি বাগচী।
মানবী ও পৃথিবী—দেবকুমার মুখোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গ (২য় খণ্ড)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।
ব্রতি—গৌর দাস।

তারু মুখার্জি প্রোডাকশন্স-এর "সং ভাই" (পরিচালনা : তারু মুখোপাধ্যায়) ছবিতে রেণুকা দেবী, সুখেন ও সন্ধ্যারানী

বর্তনসাধনের জন্যও শ্রীবর্হির প্রস্তাবকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করে তোলার প্রশ্ন [illegible] রয়েছে। এ ব্যাপারে স্বর্ণপদকবিজয়ী ছবির প্রযোজকদের সহযোগিতা থাকলে ফিল্ম সোসায়েটি শ্রেণীর সংস্থাগুলি এই সুপ্রস্তাবটি অবিলম্বেই বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারেন।

[illegible] ছবিটির নাম : তেরে ঘরকে সামনে [illegible] পরিচালক ও সংগীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

হৃদয়ের ক্ষত

তথাকথিত হিন্দী ছবির নায়িকাদের মধ্যে হঠাৎ করে মুক্তিহীন হয়ে পড়ার একটি অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ করি। বিশেষ করে প্রণয়ীকে ভুল বোঝার ব্যাপারে ওরা মুক্তির পরিচয় দিতে সদা অপারগ। [illegible] প্রোডাকশন্স এর "[illegible]" ছবির নায়িকা কিন্তু ওদের দলের নয়। যুক্তি ও হৃদয়ের প্রসারতার জন্য সে নিজেকেই যে শুধু দুঃখের হাত থেকে বাঁচিয়েছে তা নয়, তার সমাজ-লাঞ্ছিত প্রণয়ীকেও আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে এবং তাকে নব-জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। কাহিনীটিতে সহজ সরল আবেগের সুর আছে, মানবিকতা আছে, মধ্যবিত্ত ঘরের ভ্রাতা-ভগিনীর মধুর সম্পর্কের স্পর্শ রয়েছে। কাহিনীর নায়িকার চরিত্রে যে মহত্ত্ব রয়েছে তাও অস্বাভাবিক নয়। মহৎ হতে গিয়ে সে বহু ছবির নায়িকার মত "অবাস্তব বাঁচাতে গিয়ে নায়ক আকস্মিকভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বে নায়িকার একমাত্র ভ্রাতাকেই হত্যা করে ফেলেছিল। তাকে কারাবাসও করতে হয়েছে। এর ফলে তার জীবনের উপর অঙ্কিত হয়ে রইল একটি কলঙ্কচিহ্ন। সমাজ তাকে ঘৃণা করল। কিন্তু সব কিছু জেনেও নায়িকা তাকে অবজ্ঞা করতে পারল না। সে দেখেছে নায়কের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব। দেবীত্বের বলে নয়, যুক্তি ও হৃদয়ের শক্তিতেই সে ক্ষমা করে নেয় তার ভ্রাতৃহন্তা প্রণয়ীকে। চিত্র-কাহিনীর এই প্রসাদগুণের জন্যই ছবিটি মনকে আকর্ষণ করে। কাহিনীর দুর্বলতা যে মোটেই নেই তা নয়। কোন কোন অংশে ঘটনার আকস্মিক ও অযৌক্তিক যোগাযোগ লক্ষণীয়। জনমনোরঞ্জনের অর্থহীন উপকরণও আছে। কিন্তু এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মূল কাহিনীসম্পদের জন্য ছবিটি চিত্তগ্রাহী। বাঙালী দর্শকদের কাছে কাহিনীটির গুণের জন্য ছবিটি আদরণীয় হবে।

প্রযোজক [illegible] রসবোধ ও [illegible] শক্তির সঙ্গে পরিচ্ছন্নভাবে ছবিটি [illegible]।

ছবির প্রধান আকর্ষণ [illegible] এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয় হিন্দী ছবিতে খুব কমই দেখা যায়। নায়িকা [illegible] অভিনয়ও সংবেদনশীল। চরিত্রটিকে তিনি মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় সু-অভিনয় করেছেন উষা কিরণ, মদন পুরী, মনমোহন কৃষ্ণ ও [illegible]।

ছবির সংগীত পরিচালনা মনোগ্রাহী। ছবির একাধিক গান জনপ্রিয় হবে। [illegible] কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক। [illegible] এ ছবিটির আলোকচিত্রগ্রহণ খুবই উঁচুদরের।

ভ্রাতৃপ্রেম

প্রযোজক-পরিচালক তারু মুখোপাধ্যায়ের প্রথম চিত্রপ্রয়াস সংলাপহীন ছবি "ইঙ্গিত" যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা চিত্রনির্মাতার দ্বিতীয় উপহার "সং ভাই" (তারু মুখার্জি প্রোডাকশন্স) দেখে কিছুটা হয়ত নিরাশ হবেন।

ছবির মূল কাহিনী। প্রযোজক-পরিচালকের রচিত। মামুলী। গ্রামের পটভূমিতে কাহিনী বিস্তৃত। কী-ভাবে দুই সং ভাই জন্মাল, কী-ভাবে তারা বড় হল এবং বড় হয়ে তাদের মধ্যে সাময়িক মনান্তর ও পুনর্মিলন কেমন করে ঘটল তাই মূল উপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ছবির এই কাহিনীতে কয়েকটি অপরিণত চরিত্র ও কয়েকটি বহু ব্যবহৃত উপাদান ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই। তবে সহোদর না হয়েও দুই ভাইয়ের মধুর সম্পর্ক, দুই জায়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার চতুর্থ ছাব "বিপত্তি"র নায়ক-নায়িকা অরুণ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার

পলাতক

রাজকমল কলামন্দিরের "পলাতক" **ছবিটির চিত্রগ্রহণ** সমাপ্ত। যাত্রিক পরি-**চালক-গোষ্ঠীর** এই নতুন চিত্র-প্রয়াস **অবিলম্বেই মুক্তি** পাবে বলে জানা গেল। **গত সপ্তাহে** ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে **সংগীত পরিচালক** হেমন্ত মুখোপাধ্যায় **ছবির আবহ-সুর** রচনা করেন। ছবির **শব্দপুনর্যোজনার** জন্য যাত্রিক-গোষ্ঠী আগামী সপ্তাহে বোম্বাই রওয়ানা হচ্ছেন। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার সন্ধ্যা রায় অনুভা গুপ্তা, রুমা গুহঠাকুরতা, অসিতবরন ভারতী দেবী, জহর রায় জহর গাঙ্গুলী রবি ঘোষ অনু-রাধা গুপ্ত ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। 'পলাতক' ভি শান্তারামের প্রথম বাংলা ছবি।

মিনার্ভায় "তিতাস একটি নদীর নাম"

আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে লিটল থিয়েটার গ্রুপের ভূমিকাটি যে স্বতন্ত্র, তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ "তিতাস একটি নদীর নাম"। মিনার্ভায় মঞ্চস্থ লিটল থিয়েটার দলের এই নতুন নাট্যোপহার এক বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক প্রত্যয়ে চিহ্নিত।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের অসাধারণ কাহিনী "তিতাস একটি নদীর নাম" যে নাট্যরূপ পেতে পারে, মঞ্চস্থ হতে পারে তা হয়ত অনেকেই ভাবতে পারেন নি। লিটল থিয়েটার দল এই অসাধ্য কাজটি সাধন করেছেন।

"তিতাস একটি নদীর নাম" বাংলা মঞ্চ-শিল্পের দিগন্তবিস্তার ঘটিয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মঞ্চে এর আগে আর যা কোনদিন দেখা যায়নি তা-ই রূপ নিয়েছে [illegible] নদী বয়ে চলেছে। তারই পারে ধীবরদের বাস। তাদের গোষ্ঠীজীবনই রূপ নিয়েছে মিনার্ভার স্থাণু মঞ্চে। কিন্তু ওই মঞ্চই নাটকের অভিনয়-স্থল নয়। অভিনয়ের আসর সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। মঞ্চের একটি শাখা প্রেক্ষাগৃহের মধ্যস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মঞ্চ-শাখার পথ ধরে শিল্পীরা মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান, আবার বেরিয়ে আসেন। এই পথের উপরেই তাঁরা অভিনয় করেন। কিন্তু ওই পথেই শুধু তাঁদের গতিবিধি নয়। হঠাৎ করে তাঁরা হয়ত বেরিয়ে আসেন প্রেক্ষাগৃহের কোন একটি কোণ থেকে, এদিক থেকে এবং ওদিক থেকে। সারা প্রেক্ষাগৃহে পরিব্যাপ্ত এই অভিনয়—আসর এক অদ্ভুত শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। কোথাও তার ছন্দপতন নেই। নাটকের বিচিত্র মানুষদের এই বিচিত্র আনাগোনার ছন্দে দর্শকরাও কেমন যেন বাঁধা পড়ে যান। দর্শকরা ওদের ভিড়ের মধ্যে কখন অজ্ঞাতে যেন মিশে যান। এবং ওদের সুখ দুখ হাসি কান্নার অংশীদারও বুঝি হয়ে পড়েন।

অভিনয়—আসরের এমন সার্থক পরি-কল্পনা এর আগে বাংলা নাটকে দেখা যায়নি। "তিতাস একটি নদীর নাম"-এর মত নাটকে এই অভিনয় মঞ্চের পরিকল্পনা যেন আরও সার্থক ও যুক্তিসংগত হয়ে উঠেছে। কারণ এই নাটকে একটি সম্প্রদায়কে দেখানো হয়েছে। মঞ্চের অভিনয় আসরে ওদের সকলকে ধরে রাখা সম্ভব হত না। বহু-জনকে নিয়ে এই নাটক। একটি সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই এতে উপস্থিত। বাংলা রঙ্গমঞ্চে এটাও এক অভিনব ঘটনা।

নাট্যরূপকার-পরিচালক উৎপল দত্ত এই নাটকে একটি অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের সহজ সরল গোষ্ঠীগত জীবন-যাত্রাটিই দেখাতে চেয়েছেন। নৈর্ব্যক্তিক নাট্যোপকরণই এই নাটকের মূল উপজীব্য। তিতাসের পারের ধীবরদের জীবনে দুঃখ আছে, বঞ্চনা আছে; ওরা কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, নিজেদের কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ওরা শান্তি পায়, বিশ্বাসে কেউ আঘাত করলে ওরা নির্মম হয়ে ওঠে। ওদের মধ্যে অসত্যকে অস্বীকার করে কেউ লাঞ্ছনা ভোগ করে, কেউ তার প্রিয়াকে হারিয়ে পাগল হয়ে যায়, কেউ হয়ত তার ঘরণীর মন পায় না। অন্যদিকে এক স্বার্থান্ধ কুচক্রী দিনে দিনে তিলে তিলে ওদের শোষণ করে চলে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেয়। এক বৃদ্ধ আকুল হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে কবে তার পাগল ছেলে তাকে বাবা বলে ডাকবে। পাগলের নিরুদ্দেশ দয়িতা আত্মপরিচয় গোপন করে দয়িতের কাছেই আবার ফিরে আসে। পাগল তার বাবাকে বাবা বলে ডাকে পৃথিবী থেকে বিদায় [illegible]

(উপরে বাঁয়ে) 'স্বাপের নাম টিয়ারঙ' ছবিতে সন্ধ্যা রায়, (ডাইনে) 'ভ্রান্তি বিলাসে'র একটি দৃশ্যে রবি রায়চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়, (মাঝখানে, বাঁয়ে) 'ছায়াসূর্য' ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর, (ডাইনে) 'মহাতীর্থ কালীঘাটে'র বহির্দৃশ্য গ্রহণ-কালে পরিচালক তপন রায়, কৃষ্ণা ও অমরেশ দাস (নীচে) "স্বাপের নাম টিয়ারঙ" ও 'ভ্রান্তিবিলাসে'র আলোকচিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত

এবারকার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন সুচিত্রা মিত্র (বাঁয়ে) এবং হিমাংশু দত্তর সুরে অজয় ভট্টাচার্যের গান গেয়ে শোনান জয়শ্রী চক্রবর্তী

ফটো—দেশ

গুণী সংবর্ধনা

ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (ডি-জি) সত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে তাঁকে এক জনসভায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হচ্ছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে সংবর্ধনা কমিটি গঠিত হয়েছে। সংবর্ধনা-সভায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। চলচ্চিত্র ও মঞ্চের নেতৃস্থানীয় শিল্পীরা এতে যোগদান করবেন।

মস্কোর মঞ্চে রামায়ণ

গত দুই বছরেরও বেশী কাল ধরে মস্কোর সেণ্ট্রাল চিলড্রেন্স থিয়েটারে 'রামায়ণ' অভিনীত হচ্ছে। ভারতীয় মহাকাব্যের এই নাট্যরূপ দিয়েছেন লেখিকা ও প্রাচ্যবিদ শ্রীমতী নাতালিয়া গুসেভা ও পরিচালনা-প্রযোজনা করেছেন ভালেন্তিন কোলেশফ।

সোভিয়েত মঞ্চে রামায়ণকে সার্থকভাবে উপস্থিত করার জন্য কোলেশফ ও তাঁর সহকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় চিত্রকলা দেশভূষা লোকশিল্প লোকনাট্য ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যগুলি অনুশীলন করেন। মস্কোস্থিত ভূতপূর্ব ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের পত্নী শ্রীমতী মেনন এবং প্রবাসী ভারতীয় বন্ধুরা তাঁর প্রযোজনার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন।

সোভিয়েত দর্শকদের মধ্যে এই নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। গত দুই বছরে অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় মস্কো গেছেন। তাঁরা এই অভিনয় দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। জওহরলাল নেহরু এঁদের অন্যতম। দর্শকদের মন্তব্যের খাতায় লেখিকা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী এই নাটক দেখার পর মন্তব্য করেছেনঃ "এই অপূর্ব অভিনয় দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত। এই নাটকটি আমাদের দেশের প্রতি আপনাদের সুগভীর ভালবাসার প্রমাণ।" ভারতীয় লোকনাট্য সমিতির সম্পাদক লিখেছেনঃ "মস্কোর রঙ্গমঞ্চে রামায়ণের অভিনয় দেখে আমি একজন ভারতীয় হিসাবে আনন্দিত।"

বোম্বাই সমাচার

গত সপ্তাহে রাজ কাপুর নেফা অঞ্চলে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সেখানে তিনি তাঁর নির্মীয়মাণ ছবি 'সংগম"-এর দু-একটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবেন। ছবির প্রযোজক-পরিচালক-নায়ক রাজ কাপুরের সঙ্গে রয়েছেন আলোকচিত্রশিল্পী রাধু কর্মকার, শব্দযন্ত্রী আলাউদ্দিন খাঁ এবং কণ্ঠশিল্পী মুকেশ। রাজ কাপুরের ইচ্ছা, ছবির স্যুটিং-এর কাজের অবসরে তিনি ভারতীয় জওয়ানদের গান শুনিয়ে আনন্দ দেবেন। তাই তিনি মুকেশকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। মুকেশের গানের সঙ্গে রাজ কাপুর তাঁর একাধিক জনপ্রিয় ছবির কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয় জওয়ানদের সামনে পরিবেশন করবেন।

প্রযোজক-পরিচালক মেহবুব খান গত সপ্তাহে তাঁর আগামী ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। ছবির নাম মেরা ওয়াতন। কাশ্মীরের বিখ্যাত মহিলা কবি হাব্বা খাতুনের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে ছবির কাহিনী রচিত। সায়রা বানু এই মহিলা কবির ভূমিকায় অভিনয় করছেন। ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন রাজেন্দ্রকুমার। ছবিটি ইস্টম্যান কলারে তৈরী হবে। নৌশাদ আলী সংগীত পরিচালক। কাশ্মীরে ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে।

সম্প্রতি বোম্বাই-এর শিবাজী পার্কে প্রযোজক শশধর মুখার্জির "লীডার" ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। পার্কের বেশ কিছুটা অংশ নিয়ে স্যুটিং-এর জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়। ছবির এই স্যুটিং দেখার জন্য প্রযোজক জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দিনের বেলায় বিপুল জনতার সামনে স্যুটিং গ্রহণ করা হয়। স্যুটিং-এ অংশ নিয়েছিলেন দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, জয়ন্ত ও জানকী দাস। রাম মুখার্জি ছবিটি পরিচালনা করছেন। নৌশাদ হলেন সংগীত পরিচালক।

প্রযোজক-পরিচালক অমরজিতের "তিন দেবিয়াঁ" ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন এস ডি বর্মন। ছবির নায়িকা থাকবেন তিনজন। দেব আনন্দ হলেন নায়ক।

বাহার ফিল্মস-এর পরবর্তী ছবির নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন ধর্মেন্দ্র ও নন্দা। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। কৃষাণ-শামজদ ছবিটি পরিচালনা করছেন।

একলব্য

খেলাধুলোর ব্যাপারে একাধিক ক্রীড়াবিদের মৃত্যু গত সপ্তাহের খেলাধুলোর ক্ষেত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং দুঃখজনক সংবাদ।

মার্চের ২৪ তারিখে দিল্লিতে জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপের ১৮০ কিলোমিটার রেসের সময় মিলিটারী লরীতে চাপা পড়ে রেল দলের সাইকেল চালক প্রকাশ সিং সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান; আর চারজন সাইকেল চালক হন আহত। পরের দিন মিলিটারী হাসপাতালে আহতদের মধ্য থেকে আর একজন মারা যান। ইনিও রেল দলের সাইকেল চালক, নাম এম কানিয়াপ্পান।

এইদিন লস এঞ্জেলস থেকে খবর আসে ফেদার ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা ডেভী মুর হোয়াইট মেমোরিয়াল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মার্চের ২১ তারিখে সুগার র‍্যামোজের সঙ্গে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের সময় মুর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। দশম রাউণ্ডের সময় র‍্যামোজকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কিছু সময় পরে পরাজিত মুষ্টিক ডেভী মুর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে না। চার দিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধের পর মুষ্টিযোদ্ধা ডেভী মুরের জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

এক দিন যেতে না যেতে আসে আর একটি মৃত্যু সংবাদ। এটিও মুষ্টিযুদ্ধের বলি। ব্যাংককে ব্যান্টম ওয়েটের পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের পঞ্চম রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিযোদ্ধার পদাঘাতে পাকস্থলীতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে থাইল্যাণ্ডের ২২ বছর বয়স্ক মুষ্টিযোদ্ধা একাচিং সিং গাংও হাসপাতালে মারা যান। এখানে বলা প্রয়োজন থাইল্যাণ্ডের পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধে লাথি মারা এবং হাঁটু ও কনুই দিয়ে আঘাত করা আইনসিদ্ধ ঘটনা। গত বছরও এইভাবে থাইল্যাণ্ডের আর একজন মুষ্টিযোদ্ধা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

*

জাতীয় সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপে রেলওয়ের দুই সাইকেল চালক প্রকাশ সিং ও এম কানিয়াপ্পান-এর মৃত্যু নিয়ে পরে আলোচনা করছি। আগে মুষ্টিযোদ্ধা ডেভী মুর-এর মৃত্যু নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

২৯ বছর বয়স্ক নিগ্রো মুষ্টিক ডেভী মুর আমেরিকার নিগ্রো মজুরের সপ্তম এবং কনিষ্ঠ পুত্র। ১৯৫২ সালের হেলসিংকি অলিম্পিকে মুর আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন। অলিম্পিকের পর হন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা। নাইজিরিয়ার হোগান কিডকে হারিয়ে ১৯৫৯ সালে মুর ফেদার ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। একুশ তারিখের রাত্রিতে কিউবার শরণার্থী মুষ্টিযোদ্ধা সুগার র‍্যামোজের কাছে হার স্বীকার করবার পূর্ব পর্যন্ত মুরই ছিলেন ফেদার ওয়েটে বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা। মুরের মারের হাত ছিল খুবই তৎপর, চালাক ও বুদ্ধিদীপ্ত। মুষ্টিযুদ্ধ রসিকদের কাছে মুর খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর ডাকনাম ছিল 'স্প্রিংফিল্ড রাইফেল'। ওহায়োর স্প্রিংফিল্ডে জন্মের জন্যই এই নামকরণ। তাঁর ৬৬বার মুষ্টিযুদ্ধে ৫৮বার বিজয়ী হয়েছেন। মাত্র একবার হয়েছেন নক আউট। আর এবার বিশ্বসংসার থেকে চিরদিনের জন্য নক আউট হয়ে গেলেন।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত কিউবার উদ্বাস্তু মুষ্টিযোদ্ধা সুগার র‍্যামোজের ঘুষি ডেভী মুরের যতটা ক্ষতি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করেছে রিং এর দড়ি। পড়ে যাবার সময় মাথার পেছন দিকে দড়ির প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং সেই আঘাতই নাকি শেষ পর্যন্ত হয় মুরের মৃত্যুর কারণ। লড়াইয়ের চলচ্চিত্র দেখেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পেশাদার বক্সিং-এর প্রাক্তন ফেদার ওয়েট চ্যাম্পিয়ন ডেভী মুরের মৃত্যুর পর পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের বিরুদ্ধে আবার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। অনেকে পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব করেছেন। অনেকে আইনের নাগপাশে পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধকে একটি বিধিবদ্ধ নিয়মের আওতায় আনবার কথা বলেছেন। অনেকে প্রচার করছেন মুষ্টিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ অর্থহীন। তাঁদের মতে মুষ্টিযুদ্ধে যত মানুষ মরে তার চেয়ে অনেক বেশী মরে অন্যান্য খেলাধুলোয়। তবে মুষ্টিযুদ্ধ বন্ধ হবে কেন? কড়া আইনের নাগপাশে একে বাঁধবারই বা প্রশ্ন ওঠে কি?

গত বছর ঠিক এই সময় মুষ্টিযুদ্ধের পীঠস্থান নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ওয়েল্টার ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের পেশাদার চ্যাম্পিয়নশিপে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা এমিল গ্রিফিথের মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বেনী কিড প্যারেট ইহলোক ত্যাগ করেন। ডেভী মুরের মত বেনী কিড প্যারেটও প্রতিদ্বন্দ্বীর মুষ্ট্যাঘাতে মাথায় আঘাত পান এবং কয়েক-দিন অচৈতন্য অবস্থায় কাটাবার পর

ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে ফেদার ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ের সময় সুগার র‍্যামোজের মুষ্ট্যাঘাতে ডেভী মুর রিংয়ের রোপের উপর পড়ে গেছেন। ডাক্তারদের অভিমত মাথার পেছন দিকের দড়ির আঘাত মুরের মৃত্যুর প্রধান কারণ। ছবিতে মুরের পেছন দিকে দড়ি দেখা যাচ্ছে
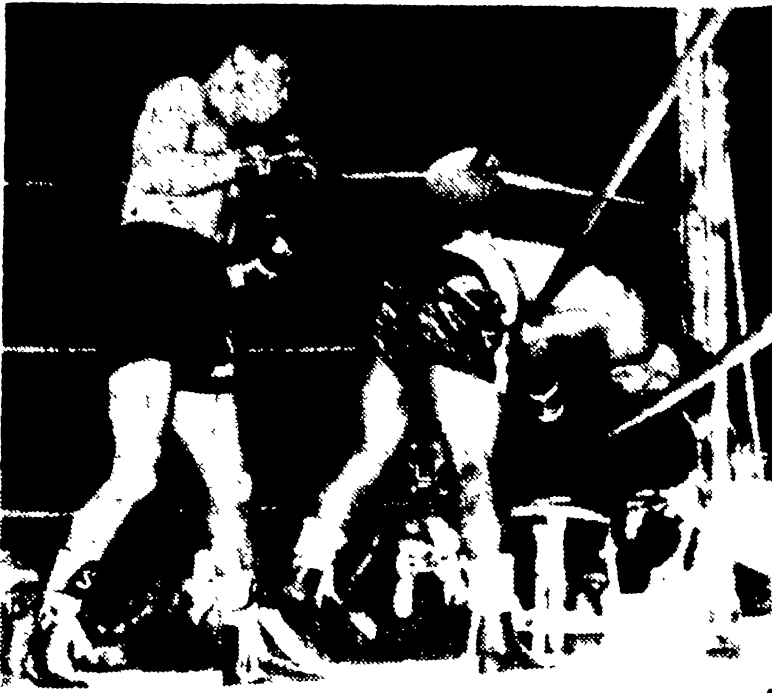
সুগার র‍্যামোজ (দাঁড়িয়ে) ও ডেভী মুরের মুষ্টিযুদ্ধের আর এক দৃশ্য। এখানে মুর ঘুসির আঘাতে রোপের উপর ঝুঁকে পড়েছেন

জভেন্ট হাসপাতালে মারা যান। তবে কিড প্যারেটের মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল কিন্তু অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে ওয়ায় ডেভী মুরের মাথায় অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়নি। কিড প্যারেটের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর দেখা যায়, অত্যধিক মুষ্ট্যাঘাতে মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে প্যারেট মারা গেছেন।

*

মুষ্টিযুদ্ধের সময় আঘাতজনিত কারণে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু মুষ্টিযুদ্ধের অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। আমেরিকান মুষ্টি-যুদ্ধের হিসাববিদ্ মিঃ নাট ফ্লেচারের হিসাবমত ১৯০০ সাল থেকে আরম্ভ করে ৭৩ বছর পর্যন্ত ৪৫০ জন মুষ্টিযোদ্ধা লড়াইয়ের সময়ে বা পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রফেশনাল ও অ্যামেচার মুষ্টিযুদ্ধ নিয়ে এই হিসাব। তবে মুষ্টি-যুদ্ধের ইতিহাসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে কিড প্যারেটই মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম বলি।

ডেভী মুরের মৃত্যু দ্বিতীয় ঘটনা। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ের সময় মৃত্যু-বরণের একাধিক ঘটনা আছে। ১৯৪৭ সালে ক্লিভল্যাণ্ডে ওয়েল্টার ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সুগার রে রবিনসনের ঘুষির চোটে জিমি ডয়েলের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। আরও বহু আগে ১৮৯৭ সালে লণ্ডনে ব্যাণ্টম ওয়েটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ইংলণ্ডের ওয়াল্টার ক্রুট মারা গিয়েছিলেন আমেরিকার জিমি ব্যারীর ঘুষির চোটে। চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই ছাড়া অন্যান্য মুষ্টিযুদ্ধে মৃত্যুর ভূরি ভূরি ঘটনা আছে। এর মধ্যে ১৯৩৩ সালে হেভী ওয়েট মুষ্টিক প্রাইমো কারনেরার প্রতিদ্বন্দ্বী আর্নি স্কাফের মৃত্যু এবং ১৯৩০ সালে ম্যাক্স বেয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্র্যাঙ্ক ক্যাম্পবেলের প্রাণহানির ঘটনা উল্লেখযোগ্য। অন্যে পরে কা কথা-কিউবার মুষ্টিযোদ্ধা এই সুগার র‍্যামোজের হাতে ডেভী মুরের জীবনলীলা সাঙ্গ হবার আগে আরও একজন মুষ্টিযোদ্ধা র‍্যামোজের হাতে মারা গিয়েছেন। তাঁর নাম জোস ব্লাংকো। ১৯৫৮ সালে হাভানায় ব্লাংকো মারা যান। একা র‍্যামোজই দু-দুজন তরুণ মুষ্টিযোদ্ধার মৃত্যুর কারণ হলেন।

নাট ফ্লেচারের হিসাবমত মুষ্টিযুদ্ধে এ পর্যন্ত চার পাঁচ শ লোক মারা গেছেন। কিন্তু কতজন পাগল হয়েছেন, কতজনের স্মৃতি লোপ ঘটেছে, কতজনের মুখের হাড়-গোড় চেহারা ভেঙে [illegible] কর্ণমূল ফেটে [illegible] [illegible] মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে [illegible] মুষ্টিযুদ্ধের [illegible] উঠবেন।

স্বীকার করি, অন্যান্য খেলাধুলাতেও বিপদের ঝুঁকি আছে। ফুটবল এবং রাগবী খেলাতেও কম লোক মারা যায় না। ঘোড়-দৌড় এবং মোটর রেসিং এ মৃত্যুর সংখ্যাও বিপুল। এবং এই দুটিই ভীতিজনক স্পোর্টসের আওতায় পড়ে। কিন্তু এ-সব স্পোর্টসে মৃত্যু আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয় এবং এ-সব স্পোর্টসে একজনের প্রতি আর একজনের নৃশংস অত্যাচার নেই।

কিন্তু মুষ্টিযুদ্ধের মূল কথাই হল শারীরিক ক্ষমতায় ঘুষির উপর ঘুষি চালিয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা। ঘুষির আঘাতে জর্জরিত হলেও পরিত্রাণ নেই, নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লেও মুক্তি নেই। অবশ্য শারীরিক ক্ষমতাই মুষ্টি-যুদ্ধের শেষ কথা নয়। এর সঙ্গে কলা-কৌশলও আছে আছে অনুশীলন ও সাধনা। তবু সভ্য দুনিয়ার খেলার ব্যাপারে একজন আর একজনকে মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করছে, তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, আর

অগণিত দর্শক সেই দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছে—এ যেন একেবারেই বে-মানান।

যে কালে ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে মানুষকে ফেলে দিয়ে রাজকীয় খেয়ালের ক্ষুধা মেটানো হত, কিংবা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবার জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুষ্টিকের হাতের 'গ্লাভসে' লোহার ছুঁচালো কাঁটা পরিয়ে দিয়ে রাজার মেজাজের মাসুল জোগানো হত, সে কাল বহু যুগ আগে পার হয়ে গেছে। কিন্তু সভ্য জগতের খেলাধুলোর মধ্যেও যদিও সেই পৈশাচিক খেলার ছিঁটেফোটা ছাপ থাকে তবে মানুষের সভ্যতার বড়াই করা শোভা পায় না। মুষ্টিযুদ্ধ বিশেষ করে, পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের মধ্যে এখনো সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এখনো ষাঁড়ে মানুষের সেই রক্তক্ষরা লড়াইয়ের আয়োজন, সেই আদিম প্রবৃত্তি এবং বিকৃত রুচিরই পরিচয়।

আশার কথা, মুষ্টিযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং নৃশংসতা সম্পর্কে চিন্তাশীল মানুষ ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছেন। গত বছর থেকেই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থে আন্দোলন সফল হয়নি। এবারও যে পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে আন্দোলনকারীরা সফল হবেন তারও লক্ষণ নেই। পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের পীঠস্থান আমেরিকা। সেই আমেরিকারই এক ক্রীড়া সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছেন গত বছর আমেরিকায় [illegible] খেলায় ২৬ জন এবং [illegible] এবং বেসবল [illegible] খেলায় ৬ মারা গেছেন। [illegible] মুষ্টিযুদ্ধে মারা গেছেন [illegible] মুষ্টিক।

[illegible] মুষ্টিযুদ্ধের [illegible] খেলাধুলোর [illegible] লোক মনে [illegible] মুষ্টিযুদ্ধের [illegible]

[illegible] মুষ্টিযুদ্ধ [illegible] বিরুদ্ধে এই [illegible] যুক্তি হিসাবে উপস্থিত [illegible] ভাবে ক্রীড়া পরিষদের সাম্প্রতিক [illegible] করা [illegible] ভাবে ক্রীড়া সংস্থা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে [illegible] ক্লেশ সহ্য করা, মারধোর এবং [illegible] খুনির ইন্ধন যোগায় সে অনুষ্ঠানকে [illegible] খেলাধুলোর মর্যাদা দেওয়া চলে না।

পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় যুক্তি: এ থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয় এবং বহু মুষ্টিযোদ্ধার এইটাই জীবিকা। কথাটা ঠিক অস্বীকার করতে পারছি না কিন্তু এটাও তো সবার জানা কথা যে, বিশ্বের অদ্বিতীয় মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই জীবনে লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করেও আজ নিঃস্ব। আর শুধু মুষ্টিযুদ্ধই কি অর্থ উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন? খেলাধুলোর অন্যান্য বিষয়েও তো প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে এবং কোন কোন খেলায় মুষ্টিযুদ্ধের

টেমস নদীর উপর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বোট রেসের দৃশ্য। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ডান দিকে) পাঁচ লেংথে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। এবার নিয়ে ১০৯ বারের মধ্যে অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়েছে ৪৮ বার

[illegible] অর্থ [illegible]

*

[illegible]

[illegible] ভারতীয় সাইকেল চালনায় রেসের প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। প্রকাশ সিং এর স্ত্রী ও দুটি ছেলে বর্তমান। বড়টির বয়স আট ছোটটির ছয়। মৃত্যুকালে প্রকাশ সিং-এর বয়স ছিল ৩৫ বছর।

৩০ বছর বয়স্ক মাদ্রাজের অধিবাসী এম [illegible] ছিলেন [illegible] রেলের কর্মী। তিনি স্ত্রী এবং মাত্র ৫ মাসের একটি সন্তান রেখে গেছেন।

অতঃ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে প্রকাশ সিং এবং [illegible] স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? ভারতীয় রেল সংস্থার নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে। ভারতীয় সাইক্লিস্ট ফেডারেশনের দায়িত্বের কথাও অস্বীকার করা যায় না।

[illegible] পরি এ বিষয়ে জাতীয় সরকারেরও একটা দায়িত্ব আছে। ১৮০ কিলোমিটার সাইকেল রেসের সময় যেভাবে মিলিটারী [illegible] এদের দুর্ঘটনা ঘটেছে তারও [illegible] তদন্ত হওয়া দরকার। তদন্তে

আর পি রাম

এ মুস্তাফী

এস বসু

এন বিশ্বাস

এস কুণ্ডু

এস ঘোষাল

জি চক্রবর্তী

এ দাস

কে ভট্টাচার্য

এম পি পারমার

এস সোম

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

✻ সূচীপত্র ✻

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাস (নিউদিল্লী)

কত রকম ভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন

টাটার
ও ডি কোলোন

TELY-30 BEN
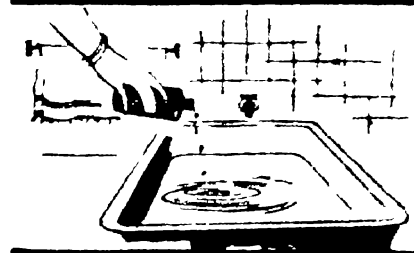
তাছাড়া ওডিকোলোন আপনি আরো কত অজস্র রকমেই না ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ঘরে অবশ্যই একশিশি ওডিকোলোন রাখবেন। সব ভাল দোকান থেকেই তিনটি মনোমত সাইজের শিশিতে টাটার ওডিকোলোন কিনতে পারেন। ব্যবহার করতে শুরু করলে আপনি নিজেই অবাক হবেন ওডিকোলোন ছাড়া এতোদিন আপনার কাটল কি ক'রে।—

টাটার তৈরী

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ২৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩০ চৈত্র ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ
SATURDAY, 13th APRIL 1963

স্মরণে

উনিশ বৎসর পূর্বে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক প্রফুল্লকুমার সরকার লোকান্তরিত হন। বর্ষবিদায়ের এই দিনটি তাই আমাদের কাছে পরম বেদনার স্মৃতি বিজড়িত। প্রফুল্লকুমার কেবল আমাদের একান্ত আপনজন নন, জাতীয় জাগরণের সন্ধিক্ষণে বাঙালীর মুক্তি সাধনার একজন বিশিষ্ট হোতারূপে বাংলার মনস্বী সন্তানদের পুরোভাগে তিনি আপন প্রতিভা ও নিষ্ঠাবলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। প্রফুল্লকুমারের মহৎ জীবনসাধনার ধারা বাংলার নবজাগৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সন্নিবিষ্ট। আনন্দবাজার পত্রিকার জন্ম এবং আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যও প্রফুল্লকুমারের এই স্বদেশ হিতব্রতী কর্মসাধনার সার্থক সৃষ্টি। প্রফুল্লকুমারের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যে যদিও আজ আমরা বঞ্চিত তবুও এই আমাদের সান্ত্বনা ও গৌরব যে তাঁর আদর্শ, তাঁর অবন্ধ্য কর্মের প্রেরণা আজও আমাদের দুর্বহ কর্তব্য পথের অমূল্য পাথেয়।

সার্থকজন্মা আদর্শনিষ্ঠ এই মানুষটি জীবনের প্রারম্ভেই দেশ জাতি ও সংস্কৃতির মূলমন্ত্র আবিষ্কারে ও উদ্‌যাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রথমে আত্মানুশীলন ... ডন সোসাইটির মাধ্যমে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস। প্রফুল্লকুমার দৃঢ়ব্রত কর্মী পুরুষ, নিভৃত ধ্যানধারণায় কালাতিপাত স্বভাবতই তিনি শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন নি। একদিকে গভীর জ্ঞান পিপাসা, আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণে তদগতচিত্ত, অন্যদিকে প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও উদার সমাজ হিতৈষণা, প্রফুল্লকুমারের চিন্তা ও চরিত্রের এই অপূর্ব সমন্বয় তাঁর জীবনসাধনাকে বিশিষ্ট শ্রী এবং সর্বতোমুখী সার্থকতা মণ্ডিত করেছে।

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক প্রফুল্লকুমার প্রকৃতপক্ষে ছিলেন দেশহিতে উৎসর্গিতপ্রাণ স্বাধীনতার যোদ্ধা, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচারক ও রূপকার। প্রফুল্লকুমার কেবল প্রচলিত অর্থে সংবাদপত্রসেবী নয়; কী সাহিত্য সেবায়, কী জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক ঐতিহ্য রচনায় প্রফুল্লকুমার সকল ক্ষেত্রেই স্বাদেশিকতার ভাবসাধনার পথিকৃৎ।

আজ যখন চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণে বিপন্ন দেশের বুদ্ধিজীবিগণ বিজাতীয় ভাবধারার বিষময় প্রভাব প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন তখন স্মরণ করা প্রয়োজন যে, মনস্বী প্রফুল্লকুমার বহু-কাল পূর্বেই এই ভাবনৈতিক বিকারের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন পরাধীন জাতির ভাবদাসত্ব

একটা ব্যাধিবিশেষ। এক সময় পাশ্চাত্ত্য সংশয়বাদ ও প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতি আমাদের শিক্ষিত সমাজকে পাইয়া বসিয়াছিল। এখন আবার মার্ক্সবাদ আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদের নিকট উহাই জ্ঞান রাজ্যের শেষ কথা, সমাজ সাহিত্য ধর্ম রাষ্ট্রনীতি সবকিছুই এই একমাত্র কষ্টিপাথরে ঘষিয়াই তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যত কিছু সুন্দর বা মহৎ জিনিসই হউক না কেন, এই বিচারে না টিকিলে তাহার কোন মূল্যই স্বীকার করেন না। এই রূপ ভাবদাসত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাঁহারাই জাতীয় ভাব বা স্বাদেশিকতাকে ক্ষুদ্র জিনিস বলিয়া মনে করেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি প্রেমও ইঁহাদের নিকট বড় কথা নহে। বিশ্বের 'সর্বহারাদের' মুক্তি ভিন্ন অন্য সমস্ত জিনিসকেই ইঁহারা তুচ্ছ মনে করেন। ...বিশ্বপ্রেম, সর্বমানবপ্রীতি এ সমস্তই খুব বড় আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি প্রীতি যাহাদের নাই, তাহারা বিশ্বপ্রেম সর্বমানবপ্রীতির মূল্য বুঝিবে কী রূপে?" প্রফুল্লকুমারের এই তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট তিরস্কারবাণী যেমন তাঁর প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচায়ক তেমনি সুষ্ঠু ও প্রাণবন্ত এই বাণীর যথার্থ তাৎপর্য বর্তমান জাতীয় সংকটকালে।

প্রফুল্লকুমারের চিন্তা ও চরিত্রের পবিত্র, গভীর ভাবোদ্দীপক প্রভাব আজও আমরা তাই কৃতজ্ঞচিত্তে অনুভব করি, তাঁর জীবনাদর্শের প্রতি আমাদের স্বতঃ উৎসারিত, দ্বিধাহীন আনুগত্যের অঞ্জলি দান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করি তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

নববর্ষ

বাঙালীর নববর্ষ শুরু পয়লা বৈশাখ। খ্রীষ্টীয় নববিধানে বর্ষারম্ভ পয়লা চৈত্র, বিলাতি নববর্ষের আবির্ভাব পয়লা জানুয়ারি। বাঙালীর কল্পনা, আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় নববিধান কিংবা বিলাতি বিধানের নববর্ষ উদ্বো-ধন কোনটাও জোড় মেলে না। বৈশাখ, "হে রুদ্র বৈশাখের" প্রথম দিনটির সঙ্গে বাঙালীর লৌকিক সামাজিক ও সাং-স্কৃতিক সম্পর্ক অনেক কালের।

কালের ধারায় অবশ্য অনেক কিছু হারিয়ে যায় অনেক কিছুই আমরা হারিয়েছি হারাতে বসেছি, কিন্তু তবুও পয়লা বৈশাখের বর্ষবোধন উৎসবকে একেবারে হারাতে চাই না। কারণ বৈশাখে নববর্ষ বোধনের বাঁশীতে যে সুর বাজে সে ত আজকের নয়। স্মরণ বিস্মরণের অনেক সিঁড়ি বেয়ে, পয়লা বৈশাখের দিন এ বসে উজ্জ্বল অগ্নিস্নাত দিনটির বাঁশীতে যে সুর তার সঙ্গে আমাদের অনেক কালের পরিচয়। সে-পরিচয়ের স্বাক্ষর বৈশাখী প্রকৃতির তাপদগ্ধ তপোমগ্না রূপে সে পরিচয়ের অজস্র নিদর্শন আমাদের কাব্যে সঙ্গীতে, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের সমারোহে।

এবারের বৈশাখী নববর্ষ ঘরে ও বাইরে সংকটের গভীর ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। তবু আশার কথা, সংকটের পীড়নে দেশ ও জাতি বিহ্বল হয়নি, সংকটমোচনের জন্য সংকল্পসাধনে উদ্যোগ এবং উদ্যম অব্যাহত আছে। দেশ ও জাতির শক্তি ও সর্ববিধ সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য সব রকম ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকারের উপর নির্ভর করে আমাদের ভবিষ্যৎ। "নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা," মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত দেশবাসীর কণ্ঠে আবারও উচ্চারিত হোক নববর্ষ দিবসে এই সুপবিত্র সংকল্প।

কংগ্রেসী দলের কর্মকর্তারা কে ডি মালব্যকে
বিচার করে দেখেছেন।

এবং রায় দিয়েছেন
'প্রায় নির্দোষ'।

শ্রীঢেবর খাদি বোর্ডের সভাপতির পদ গ্রহণ করেছেন

খাদি বোর্ড

সমুদ্র হইতে উদ্ধার

Kutty
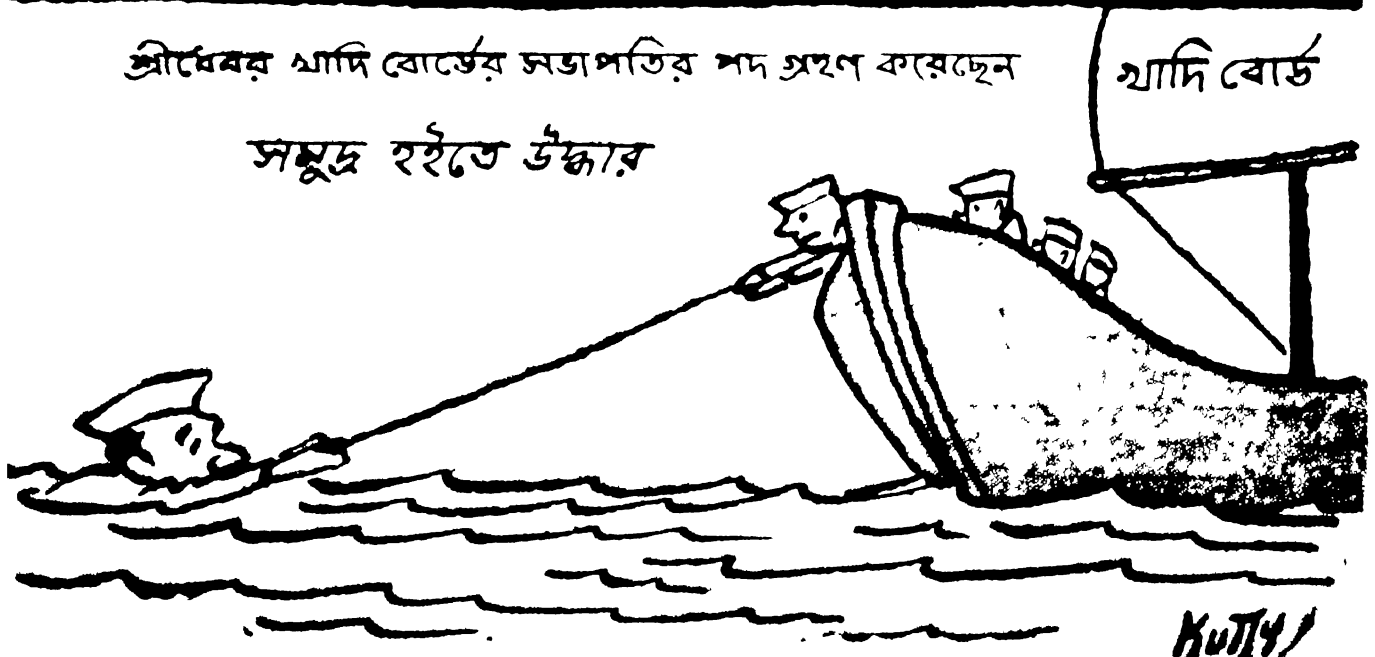
চীনারা তিব্বতে আরো বেশী বেশী করে সৈন্য জড়ো করছে ও অন্যবিধ সামরিক তোড়জোড় চালাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সীমানা লংঘনের অপবাদ দিয়ে ভারত সরকারকে সম্প্রতি যেরকম কড়া কড়া "নোট" পাঠাচ্ছে তাতে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভারত সরকারের আশঙ্কা হচ্ছে, চীনারা সম্ভবত একটা নূতন আক্রমণের উদ্যোগ করছে। পণ্ডিত নেহরু স্বয়ং পার্লামেন্টে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। পণ্ডিতজী বলেন, চীনারা যে কোন দিন আবার একটা বড় গোছের আক্রমণ শুরু করতে পারে, তার জন্য ভারতবর্ষকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইত্যাদি। এর পরেই পিকিং সরকার ঘোষণা করেন যে, চীনাদের হাতে অবশিষ্ট ভারতীয় বন্দীদের (চীনাদের হিসাব অনুসারে ৩২১৩) অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে—দলে দলে ছাড়া হবে ১০ই এপ্রিল থেকে—অর্থাৎ এই লেখা প্রকাশিত হবার আগেই ছাড়া শুরু হবে। এ পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে চীনা সরকার তাঁদের ঘোষিত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করছেন।

যারা নূতন আক্রমণ করার জন্য উদ্যোগ করছে বলে আশংকা করা যাচ্ছে তারা সেই সময়ে তাদের হাতে বন্দী কয়েক হাজার শত্রু-পক্ষীয় সৈন্যকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে—এটা সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছে নিশ্চয়ই বেখাপ্পা লাগবে। তবে এ ক্ষেত্রে আক্রমণের পরিকল্পনা এবং বন্দীমুক্তিদানের মধ্যে একেবারেই কোনো সামঞ্জস্য কল্পনা করা যায় না, তা নয়। চীনারা ভাবতে পারে যে যাদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে ভারত সরকার তাদের এখনই সামরিক কাজে লাগাতে পারবেন না, সুতরাং তাদের ছেড়ে দেওয়াতে চীনাদের আপাতত কোনো সামরিক ক্ষতি নেই। অন্য পক্ষে এমনও হতে পারে যে, চীনারা বিশ্বাস করে যে এই বন্দীদের মধ্যে কিছু লোকের মাথায় তারা এমন কিছু কিছু ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তারা চীনের প্রতি শত্রুভাব নিয়ে দেশে ফিরে আসছে না। যদি কেবল এই রকম লোককেই তারা বেছে বেছে ছাড়ত তবে এদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী হত না এবং সেজন্য তাদের পরীক্ষা করে দেখাও ভারত সরকারের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হত। একসঙ্গে সকলকে ছেড়ে দিলে তাদের মধ্যে চীনা-প্রভাবান্বিতদের (যদি কেউ থাকে) আবিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হবে। আর এই কয়েক হাজার লোককে পরীক্ষা করে দেখা যে, তাদের কারো মগজে চীনা বীজাণু ঢুকেছে কিনা—এ কাজ করতে গেলেও এদের আপাতত কোনো কাজে লাগানো যাবে না। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আবার একটা নূতন আক্রমণের মতলব থাকলেও বাস্তব সামরিক লাভক্ষতির দিক থেকে দেখলে চীনাদের পক্ষে ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দিয়ে এতোগুলি মানুষকে পোষণের ভার থেকে মুক্তি পাওয়া কিছু বেখাপ্পা কাজ নয়। এক দিকে সামরিক দিক দিয়ে বিশেষ কোনো ক্ষতির ভয় নেই—অন্য দিকে বিপুল প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ। ভারত-বাসীদের চিন্তায় একটা গোলমাল লাগিয়ে দেওয়া এবং পৃথিবীর লোকের কাছে নিজেদের উদারতা জাহির করা—এই দুই লক্ষ্যের উপর চীনাদের দৃষ্টি নিশ্চয়ই আছে। সকল গভর্নমেন্টই এরূপ চেষ্টা করে। কারো চেষ্টা সফল হয় কারো হয়ত হয় না।

আসল দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে যাকে বলে "ইনিশিয়েটিভ", সেটা গোড়া থেকেই চীনাদের হাতে। আক্রমণ করা থেকে শুরু করে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, নিজেদের ঘোষিত যুদ্ধবিরতির শর্ত বলবৎ রাখা, বন্দীদের মুক্তিদান সমস্ত ব্যাপারেই "ইনিশিয়েটিভ" চীনাদের হাতে। চীনারা যা করে ভারতের দিক থেকে তার প্রতিক্রিয়া মাত্র হয়। এখন পর্যন্ত ভারত সরকার চীনাদের হাত থেকে কোনো সময়েই "ইনিশিয়েটিভ" কেড়ে নিতে পারেন নি।

"কলম্বো প্রস্তাবাবলী" পুরোপুরি মেনে নিতে ভারত সরকার রাজী হলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে, কলম্বো প্রস্তাবগুলি ভারত মেনে নিতে রাজী হল, এখন যদি চীন রাজী না হয় তবে চীনারা বেকায়দায় পড়বে—এইভাবে "ইনিশিয়েটিভ"টা ভারতের হাতে আসবে। ভারত যেভাবে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নিতে রাজী হল চীন সেরূপ হল না, বরং তাতে অনেক রকম কিছু-[illegible] হল না। "ইনিশিয়েটিভ" চীনাদের হাতেই রয়ে গেল। যাঁরা কলম্বোতে মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যে দু-এক-জন আগে থেকেই ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন তাঁরাই এখনো আছেন। চীনারা "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নিতে রাজী হয়নি বলে অন্য কেউরা যে চীনাদের উপর বিশেষ বিরক্ত হয়েছে বা ভারতের প্রতি তাদের মনোভাব আগের চেয়ে বিশেষ অনুকূল হয়েছে—এরূপ কোনো প্রমাণ নেই।

চীনারা একটা কথা রটিয়েছিল যে, কয়েকটা বিষয়ে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"র মর্মার্থ চীনা ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আলাদা আলাদারূপে ব্যাখ্যা করা হয়। অনেকদিন পরে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এ কথা ঠিক নয় কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে সিংহলের প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র আর যেসব কথা বলেছেন তাতে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" সম্পর্কে চীনা সরকারের বিন্দুমাত্র অপ্রশংসা নেই—ভারত ও চীন সরকারের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে এই পর্যন্ত। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর উপর দাঁড়িয়ে যাই হোক একটু "ইনি-শিয়েটিভ" ভারত সরকারের লাভ হত, যদি কলম্বোতে যাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা পিকিং-এর প্রত্যাখ্যানে বিরক্ত হয়ে তাঁদের বিরক্তি ব্যক্ত করতেন। বিরক্তি ব্যক্ত করা দূরের কথা চীনা যে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" প্রত্যাখ্যান করেছে, সেটুকু পর্যন্ত কনফারেন্স-ওয়ালারা খোলাখুলি বলতে পারছেন না। সুতরাং কলম্বো প্রস্তাবাবলী'র ফাঁস লাগিয়ে "ইনিশিয়েটিভ" টেনে আনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বরঞ্চ তাতে একটু ক্ষতিই হয়েছে। এতে করে এটা প্রমাণ হল, চীনারা যাই করুক তাতে "নিরপেক্ষ" রাষ্ট্র-গুলি চীনকে কিছু বলতে পারে না। এর দ্বারা চীনের আরো পায়াভারী হবে, তার অহংকার আরো বেড়ে যাবে।

ভারত চীন বিবাদটি দি হেগ-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে পাঠাবার প্রস্তাব ভারত চীনা সরকারের নিকট করেছেন। সালিসের দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি করার প্রস্তাবও ভারত সরকার করেছেন। এগুলি ভারত সরকারের শান্তিপ্রিয় মনোভাব এবং সদিচ্ছার নজির বলে আমরা প্রচার করতে পারি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এসব প্রস্তাবের কোনো মূল্য নেই। চীনারা এসব প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না। ভারত সরকার যদি চীনাদের মতো সুবিধাজনক অবস্থায় থাকতেন তা হলে ভারত সরকারও সালিস বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মামলা দায়ের করার প্রস্তাবে রাজী হতেন না। হাজার হাজার বর্গমাইল ভূমির সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন যেখানে বিবাদের বিষয়, সেখানে সালিস বা আন্ত-

র্জাতিক বিচারালয়ের বিচার মেনে নিতে ভারত সরকার স্বভাবতঃই আগ্রহশীল—এ কথা বলা যায় না।

আসল কথা হচ্ছে—চীনা সরকার রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব বাহাদুরি দেখাতে পারছেন তার ভিত্তি হচ্ছে সামরিক সাফল্য। সামরিক ক্ষেত্রে "ইনিশিয়েটিব" চীনাদের হাতে রয়েছে বলে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের "ইনিশিয়েটিব" কাজ করছে। ভারত সরকার সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব" নষ্ট বা খর্ব করতে পারছেন না, সেজন্য চেষ্টা করছেন যদি রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে "ইনিশিয়েটিব" অর্জন করা যায়, যাতে সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব" অকেজো হয়ে যায়। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর মাধ্যমেই হোক বা সালিস বা আন্তর্জাতিক কোর্টে মামলা করার প্রস্তাব চীনাদের স্বীকার করিয়েই হোক, কোনোরকমে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব"টা খর্ব করা যায় কিনা, ভারত সরকার সেই চেষ্টা করছেন।

কিন্তু এসবের দ্বারা কোনো কাজ হবার আশা নেই। আমাদের কোনো রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক তির্যক চালে ভুলে চীনারা সামরিক ক্ষেত্রে তাদের "ইনিশিয়েটিব" খর্ব হতে দেবে—এরূপ কোনো আশা নেই। "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"তে যা আছে তার চেয়ে কিছু বেশী ছেড়ে দিতেও বোধ হয় চীনারা পারে, কিন্তু সেটা চীনাদের একতরফা মতে হওয়া চাই অর্থাৎ তাদের সামরিক ইনিশিয়েটিব" অক্ষুন্ন থাকা চাই। কারণ তারা দেখছে, সামরিক "ইনিশিয়েটিব" যদি অক্ষুন্ন থাকে তা হ'লে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও ইনিশিয়েটিব" বজায় রাখা যায়।

কলম্বো প্রস্তাবাবলী" বা সালিসের কথা বা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে মামলা নেওয়ার প্রস্তাব এ সবই কালহরণের জন্য। এগুলির দ্বারা কোনো কাজ হবে না যতদিন না পর্যন্ত সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের ইনিশিয়েটিব' খর্ব করা যায়। ততদিন পর্যন্ত চীনাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত ভারত সরকারকে মেনে নিয়ে চলতে হবে তাই হচ্ছে। "কলম্বো প্রস্তাবাবলী", সালিস, আন্তর্জাতিক বিচারালয়—এইসব কথার দ্বারা কেবল মূল সমস্যা থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। সে মূল সমস্যা হল—সামরিক ক্ষেত্রে কী উপায়ে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব' খর্ব করা যেতে পারে। চীনারা আবার যে কোনো সময়ে আক্রমণ করতে পারে তার প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে—লক্ষ্য হিসাবে এটা শুধু অসম্পূর্ণ নয়, বিভ্রান্তিকর। চীনারা আপাততঃ আবার আক্রমণ নাও করতে পারে তাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত যদি ভারত সরকার মেনে চলেন অর্থাৎ ভারতীয় সৈন্য যদি চীনাদের কবলিত বা চীনাদের আদেশে "ডিমিলিটারাইজড্" ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করার চেষ্টা না করে তবে ভারত সরকার যেদিন ইচ্ছা আলোচনা বৈঠকে আসুন, চীনারা অপেক্ষা করতে রাজী আছে—এ কথা চীনা সরকার বলে দিয়েছেন। সুতরাং চীনাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে—এ ধ্বনির বিশেষ কোনো মূল্য নেই। আসল প্রশ্ন হচ্ছে—চীনাদের আরোপিত একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত আর কতদিন মেনে চলা হবে? চীনাদের কবলিত ভারত-ভূমি থেকে চীনাদের বিতাড়িত করার জন্য আমরা কী ব্যবস্থা করছি? অর্থাৎ সামরিক ক্ষেত্রে চীনাদের "ইনিশিয়েটিব" খর্ব করার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে কিনা?

৭-৪-৬৩

জন্য ক্ষুধার অন্ন, যোগ্যতা অনুপাতে কাজ এবং অযোগ্য মানুষকে যোগ্য করে তোলার প্রশ্নকেও উপেক্ষা করা চলে না। উপেক্ষিত হয়ও নি। গত কয়েক শো' বছরে মানব-সভ্যতা পাশাপাশি দুটো যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। এক—অভাব থেকে মুক্তির জন্য, আরেক—অপরের অধিকার থেকে মুক্তির জন্য। প্রথমটার সাময়িক পরিণতি যদি হয় ওয়েলফেয়ার স্টেট, দ্বিতীয়টির—গণতন্ত্র। মানবিক অধিকার তথা চিন্তার মুক্তির জন্যে দেশে দেশে এবং যুগে যুগে কিভাবে মানুষকে আন্দোলন, বিপ্লব এবং সামাজিক যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এসে গণতন্ত্রে পৌঁছতে হয়েছে তার কথা পরে। তার আগে প্রশ্ন, অভাব থেকে মুক্তির জন্যেও কি সব-দেশই সচেষ্ট নয়? জাতীয় চরিত্র আর দক্ষ নেতৃত্ব যেখানে সহায় সেখানে উন্নতি আসছে দ্রুত। সম্পদে ঐশ্বর্যশালী যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়ার কথা থাক্। স্বল্প পুঁজিতেও সংসার সাজিয়েছে এমন দেশ আজকের পৃথিবীতে কম নেই।

কিন্তু যেখানে সমস্যা বিস্তর, জাতীয় চরিত্র সন্দেহাকুল, নেতৃত্ব অদক্ষ, সেখানেই কমিউনিজম এসে বলছে, আমার পথে চলো, আমার পথই মুক্তির পথ; 'যাহারা আমার মধ্য দিয়া ঈশ্বর সমীপে উপনীত হয় ঈশ্বর কেবলমাত্র তাহাদিগকেই মুক্তি দান করেন।' অনেকে হয়তো সে-অভয়বাণী শুনে মুগ্ধ হয়। চিকিৎসক দক্ষ হলেও তিনি যখন বলেন, রোগ সারাতে ছ'মাস একবছর লাগবে, তখন যেভাবে মানুষ মোহান্তের কাছে মাদুলি নিতে ছুটে যায় তেমনি-ভাবে অনেকে ছুটে গেছেন। অনেকের অতটা আস্থা নেই, তাই ভেবেছেন, যদি সত্যিই তার দু'একটা দাওয়াই কাজে লাগে নেবো না কেন? নিয়েছেনও কিছু কিছু। কিন্তু আজ দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর পরেও সভয়ে আবিষ্কার করতে হয় যে কমিউনিজম রোগ-হরণ করতে গিয়ে সুস্থতাও হরণ করতে চায়।

স্বীকার করি, কৃতিত্ব সে কিছু কিছু দেখিয়েছে। কিন্তু কম বয়সের কৃতিত্বটাই সব নয়।

চার বছরের ছেলে তবলায় চাঁটি দিয়ে সুন্দর গৎ ফোটায় এমন দৃষ্টান্ত দেখেছি। কিন্তু বড় হয়ে সে ছেলে বিখ্যাত সঙ্গীত-বিশারদ হবে এ ভবিষ্যদ্বাণী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছে। অন্যদিকে, আইনস্টাইন স্কুলশেষের অঙ্ক পরীক্ষায় একটা বড়োসড়ো শূন্য পেয়েছিলেন বলেই যদি কেউ বলে বসতো ও বয়সে অঙ্কে যার এই হাল সে তো গণিতে গাধা হয়ে দাঁড়াবে তা হলে তার গণনা ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়াতো না কি? সুতরাং গণতন্ত্র আর কমিউনিজমের মধ্যে প্রতিযোগিতার শেষ ফলাফল জানতে এখনও অনেক বাকী।

উপরন্তু গণতন্ত্রকে যাঁরা বৃদ্ধের ভূমিকায় উপস্থিত করতে চান তাঁরা ভুলে যান যে, গণতন্ত্র একদিক থেকে কমিউনিজমের চেয়েও বছর কয়েকের ছোট। মাত্র ১৮৯৩ সালে নিউজীল্যাণ্ডে মেয়েরা ভোট দেবার অধিকার পায়, বৃটেনে ১৯১৮ সালে, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে। অ্যাডাল্ট সাফ্রেজ ও ব্যালট বাক্স সর্বত্রগামী হতে শুরু করেছে এই তো সেদিন। আর ভারতীয় গণতন্ত্র বয়সের বিচারেই সাবালক হয় নি। তবু অনেকে যে বিশ্বাস করেন কমিউ-নিজমের তাবিজ হাতে বাঁধলেই দারিদ্র্য ঘুচে যাবে রাতারাতি, তাতে আপত্তি করি না। শুধু আশা করবো, কমিউনিজমের পতাকা যে দেশে সগর্বে উড়ছে সেখানে পাস্তেরনাকের মত কোন সাহিত্যিক যদি হতাশ হয়ে প্রশ্ন করেন, এত রক্তস্রোত বইয়ে, এত স্বাধিকার খুইয়ে কি পেলাম, কি হলাম, তা হলে অন্তত সেটুকু মাতৃ-ভাষায় উচ্চারণ করার স্বাধীনতাও দেওয়া হবে।

গ্রাম্য বাউল একতারা বাজিয়ে গান গায় আর ঝুলি এগিয়ে দিয়ে ভিক্ষে চায়। তাকে দু' মুঠো চাল যদি কেউ দেয় বা দেবার

প্রতিশ্রুতি দেয় খুশী হবো নিশ্চয়ই। কিন্তু তার হাতের একতারাটা সে কেড়ে নিতে চাইবে কেন? কোন্ অধিকারে? কোন্ যুক্তিতে? যে-কবিতা শুনিয়ে যৌথ-খামারে গমের ফলন বাড়ানো যায় না সে-কবিতা বরবাদ হবে কেন রাষ্ট্রনায়কের অঙ্গুলিসঙ্কেতে? ক্রুশ্চফ নাকি একটা বিষয়েই ইডেনের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন, পিকাসোর ছবি অর্থহীন। কিন্তু সেই যুক্তিতেই পিকাসোর কোন শিষ্যকে ক্রুশ্চফ কেন কুড়ুল হাতে গাছ কাটার জন্যে পাঠাতে চাইবেন? গণতন্ত্র তার আপন দেশের যাবতীয় অন্যায়, অবিচার, অসাম্যের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। অথচ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে প্রতিবাদ দূরে থাক মনের স্বাধীনতাও থাকবে না কেন?

সমাজের যেখানে যত ক্লেদ গ্লানি অন্যায় অবিচার সে সবই শিল্পের স্বাক্ষর পাবে শুধু কমিউনিজমের পথকে প্রসারিত করার জন্যে। আর যে মুহূর্তে কমিউনিস্ট পার্টি গদিতে আসীন হবে সেই মুহূর্ত থেকে শিল্পীর দুচোখে ঠুলি বেঁধে কণ্ঠলগ্ন ঘুঙুর খুলিয়ে নিতে হবে। আজকের রাশিয়ায় লেখক স্তালিনের রাশিয়ায় গলদ ছিল অনেক। বাইরের জগতের স্তালিনবাদী [illegible] মত [illegible] রাশিয়ায়। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা শুনতে চেয়েছিলাম সোভিয়েত দেশেরই লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের রচনায়। কিন্তু হায় [illegible] সংবাদপত্রের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] যায় [illegible] সব [illegible] না চাইলে [illegible] বুঝে [illegible] এ [illegible] বিচার [illegible] একজন যদি সত্যই মিথ্যা দিয়ে সমস্তকে [illegible] প্রলাপ [illegible] ভয় পাবার তো কথা নয়। অসত্য হলে দেশের মানুষ তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। তাই সন্দেহ হয় স্বচ্ছ কাচের গায়ে [illegible] কল্পনার রঙ চড়ান [illegible] তার [illegible] পিঠে [illegible] লাগিয়েছেন।

কমিউনিজম যে আত্মরক্ষার বুলি আওড়ায় সেটা আসলে অজুহাত। দলগতভাবে নেতৃত্বের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই দেশসুদ্ধ লোকের স্বাধীনতা হরণ করার প্রয়োজন হয় সেখানে। অথচ এই চিন্তার স্বাধীনতা বা মানবিক অধিকার আদায় করতে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে লড়তে হয়েছে। ক্রীতদাসকেও দুটুকরো রুটি দেওয়া হতো কিন্তু রুটি খেয়েই সে বাঁচতে চায় নি। ম্যাগনা কার্টার ফলে কারও বেতন বৃদ্ধি

পাবে ভাবেনি ইংলণ্ডের লোক তখন মানবিক মর্যাদার জন্যে বিক্ষোভ দেখাতে হয়েছে। পাপের হাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে রিফর্মিস্টরা। সতীদাহ আর গৌরীদানের বিরুদ্ধে আন্দোলন আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। অনেক রক্তাক্ত বিপ্লব পার হয়ে উইমেন্‌স্‌ সাফ্রেজ। এত যুদ্ধ, এত দুঃখ সহ্য করে যে স্বাধীনতা মানুষ আদায় করতে পেরেছে তা হারাতে আমাদের সম্মতি থাকার কথা নয়। কিন্তু সকালসন্ধ্যা অমানুষিক পরিশ্রমে উপার্জন করা দশ টাকার নোট-খানাকে কত সহজেই না মানুষ হাতছাড়া করতে রাজি হয়, কেউ নোট-ডবল করার বিদ্যে জানে বললেই।

অথচ চিন্তার এবং জ্ঞানের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে যুদ্ধ চলে আসছে তা এখনো শেষ হয় নি। যতখানি স্বাধীনতা শিল্পের জন্যে প্রয়োজন তা এখনো সর্বত্র আদায় করা যায় নি। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এখনো সাহিত্যের বিচার হয়, সরকারী কর্তাব্যক্তিদের অভিমত এখনো গ্রাহ্য হয়, পুরস্কার এখনো লোভ দেখায়, রাজনীতি এখনো শিল্পীকে শাসন করতে চেষ্টা করে। শিল্পপথের এই সব জীর্ণপ্রায় প্রাচীরকে যখন নির্মূল করে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে, তখন যে-মুক্তির আনন্দ আমরা উপলব্ধি করেছি তা ভুলতে রাজি হবো কেন?

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং অধুনাতম কর্ম-প্রচেষ্টার প্রতি তার মৌলিক অধিকারের শপথকে সোভিয়েতে রাশিয়া যতখানি শ্রদ্ধা করে সোভিয়েতের কর্মযজ্ঞকেও আমরা ততখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখবো। সেই বিরাট দেশের অসংখ্য মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাওয়া যে-কোন তত্ত্ব বা অভিজ্ঞতাকে নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য কিনা বিচার করে দেখবো। কিন্তু মনের মুক্তিকে কোন মূল্যেই বিকিয়ে দিতে চাইবো না। সবদিক থেকে অক্ষত আর অরক্ষিত আছে বলেই চিন্তার স্বাধীনতাকে অনেকের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে। ক্ষুধার্তের কাছে অন্নের পরিমাণটাই প্রাথমিক বটে, কিন্তু গ্রাস দুই আহারের পরই যদি দেখা যায় এক-বিন্দু নুন দেওয়া হয় নি, অন্ন থাকলেও তা হয়ে উঠবে পাঁচটি ও শান্তি হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের স্বাধীনতা এই লবণের মত। জীবনযাপনের জন্যে যা খুবই অপরিহার্য।

যুদ্ধের পর ইউরোপে সামান্য একটু টফির জন্যে হাজার হাজার নারী নিজেদের বিক্রয় করেছিল, তার কারণ এ নয় যে টফির প্রতি তাদের লোভ দুর্দম। তার কারণ এই যে বছরের পর বছর তারা এক চামচ চিনিও পায় নি, মিষ্টত্বের স্বাদ কেমন তা তারা ভুলে যেতে বসেছিল। তাই যে কোন মূল্যকেই ভেবেছে সুলভ মূল্য। একটা টফির অভাব থেকে যা হয়েছে, প্রাণস্পর্শী সৃষ্টির হৃদয়-গ্রাহী উপভোগের—বিবেক ও বুদ্ধির স্বাধিকার লুপ্ত হলে যা হতে পারে, তুলনায় তা আরো ভয়াবহ। আমি আশ্রয়হীন হলেও আমার চারপাশে কেউ মজবুত চার-দেয়ালের ঘর বানিয়ে দিলেই খুশী হবো না, যদি দেখি তার কোথাও একটা জানালা নেই। আমি জানালাটাও চাইবো, ঘরখানাও। দান হিসেবে নয়, অধিকার হিসেবে।

জানি, গণতন্ত্র অন্ততঃ জানালাটা কেড়ে নিয়ে চার দেয়ালের মধ্যে আমাকে ঠেলে দেবে না। যদি বা ভুল করে কোনদিন সত্যিই ঠেলে দেয়, জানি, আমার কালিকলমের আর্তনাদ বাইরের পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার ...

॥ ২ ॥

সহৃদয় দারোয়ান

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বুকে কাঁপছিল [illegible] [illegible] আমার [illegible] ভাববেন সেই কষ্ট ভেবে। [illegible] তো

স্যুটকেস কাঁধে করে আগে আগে যাচ্ছে

আমাকে চেনেনই না, না কি 'জীবন' পত্রিকায় উনিও গ্রাহক?.. পড়েছেন কি কিস্তিতে প্রকাশিত আমার সেই 'সাম-সপ্তাহের' অনুবাদ?... আর যদি না পড়ে থাকেন?... ধরুন, আমাকে ওঁর যদি ভালো না লাগে,...উনি যদি তখনই বিশপ্-কে ফোন [illegible] জানিয়ে দেন ঐ অপরূপ বক্তা [illegible]।

[illegible] আমার স্যুটকেস কাঁধে [illegible] আগে আগে যাচ্ছে। পিছনে আমি—[illegible] উদ্দেশ্য প্রাপ্তি।

প্রথমে ওর হাত থেকে স্যুটকেসটাকে ছাড়াতে [illegible] সেবা [illegible] করতে। [illegible] অভ্যেসই বড়ো [illegible] কান্তিপ্রতিম ফাদারকে সাহায্য করার আনন্দ।

যীশু-প্রণাম

সেন্ট জোসেফ গার্লস-স্কুলের কম্পাউন্ডে প্রাইমারি সেকশানের মেয়েরা খেলছিল—খেলছিল রুমাল-চোর, অভিনিবিষ্ট চিত্তে। হঠাৎ আমাকে সিঁড়িতে উঠতে দেখে, একটু ইতস্তত করে পরস্পরের মধ্যে কি যেন চুপি চুপি বলাবলি করতে লাগল। তারপর কচি গলার ঐকতানে 'যীশু প্রণাম, ফাদার' বলে চিৎকার করে ফাটাল আকাশ আর কাঁপাল গীর্জার জানালার কাচ।

বাঙালী খৃষ্টীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য অতি অল্প। আমাদের খৃষ্টান মেয়েরা রাঁধে, নাচে শাড়ি-সিঁদুর-শাঁখা পরে, গান করে, গাল পাড়ে, বাসায় খিচুড়ি আর ছড়ায় পরচর্চা—ঠিক ওদের অখৃষ্টান পড়োশিনীর মতো। তবে হ্যাঁ...ওই 'যীশু-প্রণাম, ফাদার' বলে অভ্যর্থনা। কথাটার উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট, উৎপত্তিস্থান অনিশ্চিত, কোনো এক ফাদার—কোর-বাইবেল-সুলভ-বঙ্গভাষায় দীক্ষিত অনামা এক বিদেশী পাদ্রি—ওর আনুমানিক প্রবর্তক। থাক্...'যীশু-প্রণাম' সমাসের ভাষাতাত্ত্বিক ঔচিত্যের—আর তাৎপর্যের—প্রতিপাদন করতে তো বসি নি... বড় মধুর লাগে কানে।

রুমাল চোর

[illegible] বোধ করলাম ক্রিকেট [illegible] আমি যদি কোনো দিন

বাবুদের অপ্রীতিভাজন হয়ে উঠি, বাচ্চা মেয়েরা তো আছেই। ওদের সংগে ভাব করব...রুমাল-চোর নিশ্চয়ই পারব। রুমাল-চোর...অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি আমার রুমালটি নিরুদ্দেশ..কোথায় পড়ে হারিয়েছে পাঠানকোট-এক্সপ্রেসের লাইনে। কি জ্বালা! মাফ করুন..আমার জবানীতে 'কি জ্বালা' আবেগধ্বনিটা 'ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তথাস্তু'র-ই নামান্তর। এবার তাহলে বড় ফাদারের সংগে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎকারে কপালের স্বেদ-বিন্দুটুকুও মোছার উপায় নেই।

সিনেমা পত্রিকা

দারোয়ান চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মৃদু জানান দিল দরজায়..আর আমি ঢুকলাম—কম্পিত পদক্ষেপে—বড় ফাদারের বাসমন্দিরের গর্ভ-গৃহে। দেখলাম তাঁকে দেখেই ভালো লাগল খুব তাঁকে ভালবেসে ফেললাম এক নিমেষে। দীর্ঘোন্নত দেহ, সহানুভূতিপূর্ণ সস্মিত চোখ, টাক-পড়া করোটিকা, আর . আর হস্ত-থেকে-কোলে-সদাপতিত একটি সিনেমা পত্রিকা। বললেন স্বাগতম, তাহলে আপনিও ক্রিকেট-খেলোয়াড় ?" হতভম্ব হয়ে হ্যাঁ না কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, বলার সুযোগ দিলেন না: সব

বাই দি বাই, ফাদার উত্তমকুমার-সুচিত্রার শেষ ফিল্মের নাম জানেন?

শুনেছি আডাইচের সময় বাজেনবাবুর মাঠে অর্পন তোতন মিস্ত্রির দলের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান আর আমি নিজে একাধারে সভাপতি প্রধান অতিথি গড্‌লাক্। বাই দি বাই ফাদার উত্তমকুমার আর সুচিত্রার শেষ ফিল্মের নাম জানেন? যে বাঁশি ভেঙে গেছে' গানটা শ্যামলের না হেমন্তের, জানেন? যা ভেবেছিলাম তা-ই সিনেমা পত্রিকা আপনাকে পড়তেই হবে। না আমাকে ভুল বুঝবেন না এই পঁচিশ বছর ধরে আমি বেন-হুর ছাড়া একটা বইও দেখিনি তবে নতুন নতুন সব বইয়ের ঠিকানা রাখি আপনিও রাখবেন, এই বিংশ শতাব্দীর ছেলেমেয়েদের বুঝতে বড়ই কাজে লাগবে।"

বড় ফাদার

বড় ফাদার তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন—শুনতে পেলাম কোতো হাঁটুর মচকে-ধরা মালাইচাকির মট্-করে শব্দ—আর বললেন 'আমি এবার ভগবানের নতুন অভিষিক্ত সাক্তকের আশীর্বাদের প্রার্থী।" এই অনপেক্ষিত নম্রতা-প্রদর্শনের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, আশিসের মন্ত্র উচ্চারণ করলাম উদ্বেলিত কণ্ঠে, "পিতা, পুত্র ও আত্মা—সেই ত্রিনীতি-পরমেশ্বরের আশীর্বাদ আপনার উপর বর্ষিত হোক; করুণাময়ের কৃপা আপনার সহায় থাকুক আজ ও কাল আর চিরকাল।" তিনি উত্তর দিলেন "আমেন"; তারপর টেবিলের কোণের উপর ভর দিয়ে তাঁর গুরুভার শরীরটাকে তুলে নিলেন। এবার আমিই আনতজানু হয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম।

বুঝলাম এই অমায়িক স্নেহপূর্ণ বড় ফাদারের তত্ত্বাবধানে সেন্ট তেরেজার গীর্জায় আর সেন্ট পিটার্স স্কুলে আমার ভালো লাগবে খুব। স্থির করলাম, আজ থেকে খেলায় স্থায়ী সদস্য হব তোতন মিস্ত্রির হাট্রিমাটিম্‌টিম-টীমে।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ আট ॥

নেপালের মত সিকিম ও ভুটানের শিয়রেও চীনা ড্রাগন ধারাল থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের মতে সিকিমের চুম্বি উপত্যকায় ও সন্নিহিত অঞ্চলে চীন যে বিরাট সৈন্য সমাবেশ করেছে তার সংখ্যা হবে আশি হাজারেরও উপর। আর ভুটান ও লাসার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় চীন অন্তত দু লক্ষ সৈন্য ছড়িয়ে রেখেছে।

এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি গ্রাম, প্রতিটি মঠ সৈন্য শিবিরে পরিণত হয়েছে। চীনারা আজ দ্রুত সমরোপকরণবাহী রাস্তা বিমান ঘাঁটি তৈরি করেছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেছে। একজন পর্যবেক্ষক জানাচ্ছেন:

Finally, just across the border there are an estimated 200,000 Chinese troops, with a key headquarters between Lhasa and Bhutan. Every village and monastery has been requisitioned to garrison them and they are rapidly building a network of roads airfields, underground installations and anti-aircraft emplacements. (The Chinese Quarterly, No. 12 Oct.-Dec. 1962 p. 200)

চীনারা অনেক [illegible] থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সময় বুঝে ভারত ভুটান বা সিকিমের উপর আক্রমণ চালাতে সুবিধা হয় এমন সব স্ট্র্যাটেজিক জায়গাতে সরে গিয়ে চীনারা সুদৃঢ় সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলছে। তাওয়াং থেকে সরে গিয়ে, ওরই উত্তরে ৎসোনা জঙে চীনারা শক্ত এক সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছে। ওয়ালঙ থেকে সরে রিমাতে গিয়ে চীনারা ভবিষ্যৎ আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করেছে। এই দুটো ঘাঁটি এমনই যে, এ দুটো থেকে নেফা বা ভুটানে যুগপৎ আক্রমণ চালানো যায়। বিনোবাজীর 'বিশ্ববিবেকের' প্রলাপ জপে চীনা কম্যুনিস্টদের ভারতীয় স্যাঙাৎরা তরে যাবার চেষ্টা করতে পারে, নেহরুজীর উক্তি বিশেষকে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তিও ছড়াতে পারে, কিন্তু তাতে চীনা আক্রমণের আশংকা বিন্দুমাত্রও দূর হবে না। কারণ চীনা কম্যুনিস্টরা সন্ত বিনোবার অযাচিত উপদেশ অপেক্ষা কমরেড মাও-এর অমোঘ নির্দেশেই চালিত হয়ে থাকে।

মাও সে-তুঙ ১৯৩৮ সালের ৬ই নভেম্বর, ইয়েনানে পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটিতে বলেছিলেন, "বন্দুকের নলের ভিতর দিয়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেড়ে ওঠে: প্রত্যেকটি কম্যুনিস্টকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। যুদ্ধই সব কিছুর নিষ্পত্তি করে দেয়।' মাও বলেছেন:

"Every Communist must grasp the truth political power grows out of the barrel of a gun.. .. Whoever has an army has power, for war settles everything... .. The theory of war and strategy is the core of everything."

মাও এর এই উক্তির যুক্তিসম্মত পরিণতি হচ্ছে এই: যতক্ষণ কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হচ্ছে, ততক্ষণ যুদ্ধ। প্রথম আক্রমণে সাফল্য লাভ করেও চীনারা জেতা জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে বলে বিনোবাজী তাদের মহৎ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। যে সব ভারতীয় জওয়ান মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নেফায় এবং লাদকে আত্মাহুতি দিয়েছেন বিনোবাজী তাঁদের আত্মদানের মধ্যে হিংসার প্রকাশই দেখেছেন, মহত্ত্ব খুঁজে পেলেন চীনের সামরিক পশ্চাদপসরণের কূট চালকে তিনি বিশ্ব বিবেকের চাপের জয় বলে ঘোষণা করেছেন।

এ সম্পর্কে মাও সে-তুঙ কী মত পোষণ করেন দেখা যাক। তিনি বলেছেন, বড় শত্রুর সঙ্গে লড়তে গেলে যার শেষ লক্ষ্য শত্রুর বিনাশ সময় বুঝে যেমন এগুতে হবে, তেমনি আবার পিছিয়েও আসতে হবে।

যারা গোঁয়ারের মত শুধু এগিয়ে যাওয়ারই পক্ষপাতী, মাও তাদের সম্পর্কে বলেছেন:

"But the other view, so-called 'desperadoism' which advocates "advance without retreat" is also incorrect.... We should have the courage to retreat in order to preserve our forces and strike the enemy again when new opportunities arise —(On the protracted war, 1938).

বিনোবাজী এবং মাও সে-তুঙের উক্তি বিশ্লেষণ করে দেখলে নেফা এবং লাদক থেকে চীনাদের সাময়িক পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে আমরা দুটো বিপরীত ছবি পাই। বিনোবাজীর কথা অনুসারে চীনারা অতর্কিতে ভারত আক্রমণ করে হঠকারিতা করেছে। এবং যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পেরেছে কাজটা অন্যায় হয়েছে, অমনি বিবেকের দংশনে অস্থির হয়ে তারা পিছিয়ে গিয়েছে।

মাও সে তুঙের মত অন্য। সাময়িকভাবে পিছিয়ে [illegible] প্রকৃত রণকৌশলেরই একটা অপরিহার্য অংশ। মাও বলেছেন শত্রু যদি সতর্ক হয়ে পড়ে তবে অপেক্ষা করতে হবে। এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে শত্রুর মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। [illegible] মনে রাখতে হবে শত্রু যখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সে অসাবধানতার সম্পূর্ণ [illegible] এই সময় অতি সহজে তাকে আক্রমণ করে [illegible] করা যায়। পরিকল্পিত পশ্চাদপসরণ [illegible] একটি চৈনিক [illegible] মাও এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন:

We should allow the enemy to advance and should not grudge the temporary loss of a part of our territory. For temporary and partial loss of territory is the price for the recovery and permanent preservation of our entire domain. (Mao Tse-tung: an anthology of his writings. A Mentor Book, p 137).

"আমাদের শক্তি অটুট রাখা" মাও অনেক জায়গায় বলেছেন "এবং শত্রুকে নিধন করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।"

মাও এর আরেকটি উক্তি: সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রথম লড়াই ফতে কর। তারপর চুপচাপ শত্রুর গতিবিধি, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য কর। তার দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য প্রস্তুত থাক। গোঁয়ারের মত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক নয়। অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। সুযোগ আসবেই। মাও অকপটে বলেছেন:

. win victory in the first battle by all means. We should strike only when we are positively sure that the enemy's situation, the terrain, the people and other conditions are all favourable to us and

ভুটানের সংহতিতে ফাটল ধরাবার জন্য চীন বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নেপালের ক্ষেত্রে চীনের এই নীতি কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও সিকিম ও ভুটান থেকে চীন ভারতের প্রভাব এখনও দুর্বল করে তুলতে পারেনি। নেপাল বা ভুটান অপেক্ষা সিকিমের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ অনেক নিবিড়। প্রকৃতপক্ষে ১,৮০০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট এই পার্বত্য রাজ্যটি ভারতের উপরই সমস্ত বিষয়ে নির্ভরশীল। এর জনসংখ্যা এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। তার মধ্যে নেপালীর সংখ্যাই হবে প্রায় এক লক্ষ। বাকিটা হচ্ছে লেপচা, ভোটিয়া আর তিব্বতী। নেপালী অধিবাসীরা নেপালের রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত। সিকিমে ভুটানের মত পুরোপুরি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্যাটারসনের মতে সিকিমের রাজা তিব্বতী বংশোদ্ভূত এবং এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃটিশ সরকারের আনুকূল্যে সিকিমের রাজা গদিতে বসেন। কম্যুনিস্ট চীন সিকিম এবং ভুটানের ব্যাপারে ভারতের দায়িত্ব মেনে নেয়নি। চীনা সম্প্রসারণবাদীরা এই দুটো দেশকেও নিজের বলে দাবি করেছে। তাদের ভাষায় এ দুটো দেশ 'তিব্বতের পাঁচ আঙ্গুলেরই দুটো আঙ্গুল।

ভারত অবশ্য সিকিমের ব্যাপারে চীনের আপত্তিতে কর্ণপাত করেনি। তাকে নিজের আশ্রিত রাজ্য বলেই মেনে নিয়েছে। সিকিমের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিব্বত বিশেষজ্ঞ স্যার চার্লস বেল সিকিম সম্পর্কে বলেছেন:

"A dagger thrust at the heart of India.--(Tibet Past and Present).

ভারতের শিল্প সমৃদ্ধ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং তিব্বতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে সিকিম। সিকিমের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল সিকিমী কংগ্রেস পার্টি প্রথমে সিকিমকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার নীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে সিকিমের রাজনীতি এমন এক ঘূর্ণ্যাবর্তে পড়ল যে ভারত সরকার রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে সায় দিতে পারলেন না। মহারাজার অনুরোধে সৈন্য পাঠিয়ে 'আইন ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখলেন। সিকিমী জনসাধারণের একটা অংশ তখন থেকেই ভারতের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মহারাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য সাময়িকভাবে একজন দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল ভারতেরই পরামর্শে। এর পর মহারাজার উপর বিক্ষুব্ধ রাজনীতিকেরা নির্দিষ্ট এক সংবিধান এবং দায়িত্বশীল সরকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলেন। তার ফলে মহারাজা শাসনভার ত্যাগ করে কার্যত অবসর নিলেন এবং রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মহারাজকুমার।

বর্তমানে চীন গোপনে গোপনে সিকিমের বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছে এবং 'হিমালয়ের সংযুক্ত রাষ্ট্র' গঠনের টোপ ফেলে কিছু লোককে দলে টানতে সমর্থ হয়েছে। জনৈক পর্যবেক্ষক লিখছেন:

Now the situation has been made more dangerous with China's new proposal for a Confederation of Himalayan States. The President of Sikkim's most powerful political party, Kazi Lhendup Dorji of the Sikkim National Congress Party never in the slightest inclined towards China, told me that China had advanced these proposals in several ways, e.g. through Nepalis visiting or residents in Sikkim through Communist sympathisers indirectly, he himself (The China Quarterly, Oct-Dec, 1962, p 198)

এই পর্যবেক্ষকটির মতে সব থেকে বিপদের কথা এই যে কাজী লেন্ডুপ দোর্জির মত লোকও যিনি কখনোই চীনকে সমর্থন করেননি আজ ভাবছেন সম্ভবত বিশ্বাসও করেন চীনের এই প্রস্তাবই সিকিমের জনসাধারণের কাছে একমাত্র আশার বস্তু এবং সেই কারণেই তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চীন সামরিক ক্ষেত্রে আক্রমণ বর্তমানে স্থগিত রেখেছে বটে কিন্তু ভারতের সুরক্ষা বানচাল করে দেবার জন্য স্ট্র্যাটেজিক দেশগুলোতে—বিশেষ করে সিকিম এবং ভুটানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আক্রমণ সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর প্রতিরোধ সময়মত করতে না পারলে, একদিন আমাদের পক্ষে মহা বিপদের কারণ হয়ে উঠবে।

সম্প্রতি কিছুদিন হল জানা গিয়েছে চীন কনফেডারেশন অব হিমালয়ান স্টেটস্-এর টোপ ভুটানেও ফেলেছে। জর্জ প্যাটারসন চায়না কোয়ার্টারলি পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'কনফেডারেশন অব হিমালয়ান স্টেটস সম্পর্কিত চীনের প্রস্তাবটির বিষয়ে আমি ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর (শ্রীজিগমে দোরজির) সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে, যদিও চীন তাঁর কাছে প্রস্তাবিত কনফেডারেশনের কথা পাড়েনি, তাঁর সরকারের কাছে পেড়েছে, এবং তাঁর সরকার একথার উল্লেখ তাঁর কাছে করেছেন। তিনি কয়েকটি কারণে তাঁর সরকারকে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ না করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণগুলো এই। ভারতের কাছ থেকে ভুটান প্রকৃত সাহায্য পাচ্ছে, চীন বা ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার

মত সৈন্য ভুটানের নেই এবং এই কনফেডারেশনে নেপালের অবশ্যম্ভাবী প্রাধান্য।'

নেপাল সম্পর্কে ভুটানের ভয় পাবার সংগত কারণ আছে। নেপালী জনসংখ্যার চাপে ভুটানের অধিবাসীদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হয়েছে। ভুটানের আয়তন ১৮,০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ। ভুটানের নেপালী বাসিন্দারা দাবি করছে এই জনসংখ্যার শতকরা ৬৪জনই নেপালী। ভুটানীরা একথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। তাদের হিসাবে নেপালীদের সংখ্যা শতকরা পঁচিশের বেশি হবে না। নিরপেক্ষ লোকেদের ধারণা, প্রকৃত সংখ্যা এই দুটো সংখ্যার (২৫ আর ৬৪) মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সেই কারণেই ভুটানীদের নেপালী প্রাধান্য সম্পর্কে এত ত্রাস। নেপালের সংস্রব এড়িয়ে চলতে চায় বলেই ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারকে চীনের এই প্রস্তাব গ্রহণ না করতেই পরামর্শ দিয়েছেন।

'কিন্তু', প্যাটারসন লিখেছেন, 'ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর এই মনোভাব ভুটানীরা সমর্থন নাও করতে পারে। ভারতের চাপে তিব্বতের সঙ্গে বহুদিনকার ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে দিতে হয়েছে বলে ভুটানীদের মধ্যে অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চীন এই বিক্ষোভকে উস্কে দেবার জন্য ভুটান থেকে চোরাপথে চালানী মাল চড়া দামে কিনে নিচ্ছে।'

শুধু তাই নয় ভুটান সরকারে নেপালীদের প্রতিনিধি নেই এই কথা বলে চীনারা নেপালীদের উস্কে দিয়ে ভুটানে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করছে। যে ১৩০ জন গ্রামের মাতব্বর নিয়ে ভুটানের রাজতন্ত্রী সরকার গঠিত তাদের মধ্যে কিছু লোককে চীনারা হাত করেছে, এমন খবরও পাওয়া গিয়েছে। একজন পর্যবেক্ষক জানাচ্ছেন:

Several Bhutanese headmen are reported to have gone to Tibet, and are being used by the Chinese in their future plans for Bhutan There are three thousand Tibetan refugees moving about the country infiltrated by Chinese sympathisers Finally, just across the border there are an estimated 200 000 Chinese troops .. ... -- (The China Quarterly, Oct.-Dec., 1962, p 200).

এই হল ভুটানের বর্তমান চিত্র। ভুটানের সুরক্ষার উপর আসাম ও ডুয়ার্সের সমৃদ্ধতম চা-অঞ্চলের সুরক্ষা নির্ভর করছে। ১৯৬১ সালে চীন ভুটানের সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার ছল করে ভুটানে এসে বসতে চেয়েছিল। ভারতের তৎপরতায় তাদের সে চাল ব্যর্থ হয়েছে। এখন আবার নতুন একটা চাল চেলে বাজিমাৎ করার সুযোগ খুঁজছে। আমাদের দেখতে হবে, সে সুযোগ চীন যেন কখনোই না পায়। (ক্রমশ)

একটি সনেট

গোবিন্দ চক্রবর্তী

যা, সূর্য হলুদ হ'ল—ঘরে যা এবার।
এখনো ভ্রূ কুঁচকে দেখি বেশ যে তাকাস!
ভাল না ত' দুঃসাহসী অত বিশ্বাস –
ওরে চিল, মূঢ় চিল, তেরছা পাখার!
আমি বলি, যা বলি শোন—পুরো জেরবার
হওয়াটা করুণই খুব। বেপরোয়া তাস
ভেঁজে যা লাভ ত' এই ছোঁ মেরে পালাস
আর চোঁচা ধাওয়া করে ছোঁড়ারা পাড়ার।

কোথায় সম্পন্ন কোন্ ভাবি কীর্তিমান
ডেল্‌ফিতে অভিষিক্ত অ্যাপোলোর পাশে!
ঢের-ঢের বাহাদুর অপেল-বাগান
চুর-চুর হয়েছে না, চূড়ান্ত বাতাসে?
ঘরোয়ানাটুকু ছাড়া কীট, ইঁড়িগান
আর কী সুন্দর আলো জ্বলে সার্কাসে॥

অনিঃশেষ দুপুর

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বলেছিলে যেখানে শেষ হবে
সেখানে আজ গাছ দুলছে বিশাল
পাতা উড়ছে দক্ষিণে পশ্চিমে

আম কুড়োতে গ্রামের ছেলে এলো;

বাড়ি উঠছে অঢেল, ঢেউ তোলা
চুনকামের গন্ধে সারা দুপুর
কেমন যেন ছুরির নীল [illegible],
লাল সুরকি বাড়িভাঙা হাওয়া

বলেছিলে যেখানে শেষ হবে
সেখানে আজ মেঘবরণ আলো
দুটো পাখির সংসার ভোর বেলা
ঝর্নাময় পাহাড়ে একবার
অনেকবার বুকের মাঝখানে –

বলেছিলে এখানে শেষ হবে।

করুণার অভিশাপ

আবদুল মজিদ

তুমি ওর হত্যাকারী, তুমি ওর সুদৃঢ় দুই হাত
করেছ উৎপাটন, দীর্ঘ, শ্রমক্লান্ত করুণের দানে
তুমি প্রতিহিংসাবশে তুমি ওর অস্ত্রের আঘাত
ফিরিয়ে দিয়েছ শক্ত প্রতিঘাতে করুণ জীবনে।

বিবর্ণ নয়নে ওর বস্তু নেই। অধুনা [illegible]
তোমার দস্তুর দয়া কুরে কুরে খেয়েছে কখন
সত্তার গভীরে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি পশ্চাগামী
অন্ধকারে আজো তবু ঘৃণিত সুখের অন্বেষণ।

স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা নেই শুধু তার প্রসারিত হাতে
হীনতম অন্ধকারে বিরচিত যন্ত্রণা নরক,
তোমার দয়ার কড়ি নিরুদ্দিষ্ট তমসার স্রোতে,
দিও না দিও না আর ক্ষুদ্রকণা কড়ি, কপর্দক।

সম্পূর্ণ অন্ধের মতো তুমি ওর আর্ত কণ্ঠস্বরে
প্রতারিত। দেখলে না দস্যুতার ছলাকলা, পাপ—
তোমার অন্তরে ছিল রক্তজমা ওষ্ঠাধরে
ছিল না ঘৃণার শুধু, ছিল করুণার অভিশাপ॥

সমর-সংগীতের রাগ

মহাশয়,

১৭ই ফাল্গুনের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 'নট' রাগের পুনঃ প্রচলন সম্বন্ধে লিখেছেন। নট ছাড়া আরও দুটি যুদ্ধ-রাগ অধুনা অল্পাধিক প্রচলিত—কল্যাণ এবং আড়ানা। এই দুটি রাগের শাস্ত্রীয় রূপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

কৃপাণপাণিস্তিলকং ললাটে।
সুবর্ণবেশঃ সমরে প্রবিষ্টঃ॥
প্রচণ্ড মূর্তিঃ কিল রক্তবর্ণঃ।
কল্যাণরাগঃ কথিতোমুনীন্দ্রৈঃ॥

কল্যাণরাগের হাতে কৃপাণ তার ললাটে তিলক, তিনি রক্তবর্ণ, প্রচণ্ড মূর্তি - সোনার বেশ পরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

রণে প্রবিষ্টঃ স্মরচারুমূর্তিঃ।
বীরে রসে ব্যাপ্ত রোমহর্ষঃ।
পাণৌ কৃপাণঃ কিল রক্তবর্ণঃ।
আড়ানা রাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ

আড়ানা রাগ রক্তবর্ণ মদনের মত সুন্দর তার মূর্তি তার হাতে কৃপাণ তিনি রণে প্রবেশ করেছেন এবং বীররসের ব্যঞ্জনায় তার রোমহর্ষ হচ্ছে।

আধুনিক কলাকারেরা সংগীতের মাধ্যমে এই রসরূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন কি না সে কথা ছেড়ে দিলেও আধুনিক শ্রোতাদের সে রাগের রসরূপের সঙ্গে আরও বেশী পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই রাগ-রাগিণীর রসরূপ নিয়ে আরও বেশী আলোচনা প্রয়োজন। ইতি

যশোদাকান্ত রায়
পোঃ কোণ্ডাগাঁও,
মধ্যপ্রদেশ

পরীক্ষায় পাস-ফেল

সবিনয় নিবেদন,

আপনারা যথার্থই বলেছেন, 'পরীক্ষার পাস-ফেলের হার দেখে শিক্ষকের যোগ্যতা অযোগ্যতা, কৃতিত্ব এবং অকৃতিত্ব বিচার করার ব্যবস্থা নীতি হিসাবে প্রশংসনীয় মনে করা যেতে পারে কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির বাস্তব ত্রুটিগুলোও বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন' (দেশ, ১৬ চৈত্র, ১৩৬৯)। যে প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করা হয়েছে সেই প্রসঙ্গ, অর্থাৎ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর নিঃসংশয় সিদ্ধান্তপ্রসূত পাস ফেল সম্পর্কিত পরিকল্পনা, অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ হলেও শিক্ষার মান উন্নয়নে উদ্যত পাঞ্জাব সরকারের উক্ত পরিকল্পনার কঠোর ব্যবস্থার গুণপনায় তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যার আলয়ের পরিবর্তে শিক্ষার কারখানায় পরিণত হবার আশঙ্কা আছে।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষার পাস-ফেলের দায়ভাগ সম্পূর্ণভাবে বর্তাবে শিক্ষকদের উপর এবং সেই দায়-ভাগের হিসাব অনুযায়ী শিক্ষকদের ভাগ্যে কোথাও জুটবে পুরস্কার কোথাও তিরস্কার এবং কোথাও দণ্ডবিধান। শিক্ষা বিষয়ে বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে শিক্ষা-দোকানদারির মাধ্যমে এমন স্থূলভাবে প্রকট করে তুলবার দৃষ্টান্ত বোধ হয় বিরল। অদূর ভবিষ্যতে পাস করা (কৃতী?) ছাত্রছাত্রীর 'উৎপাদন' বৃদ্ধির জন্য বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা সেকথা জানবার জন্য অনেকে হয়ত এখনই কৌতূহলী হচ্ছেন। অপরদিকে বৃত্তির পবিত্রতে শিক্ষাব্রতে নিয়োজিত হবার ঔৎসুক্য এখনও যে কজনের মধ্যে আছে, তাঁদের বোধ হয় ব্রতী হতে নিবৃত্ত করবে শিক্ষকতার পদ 'নিরাপদ' করবার জন্য পূর্বোক্ত পরীক্ষা-ফল-বোলপত্রার শর্তাবলী।

ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষায় পাস-ফেলের কৃতিত্ব অকৃতিত্বের সম্পূর্ণ দায়ভাগ শিক্ষক-দের উপর বর্তানো অসংগত। বর্তমানে শিক্ষালাভে অমনোযোগিতা কিংবা শিক্ষা-দানে অনবধানতার মূল কারণ সমগ্র দেশের অব্যবস্থিত চিত্ত। ঐ অব্যবস্থার কথা অনবহিত হয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে অবলম্বিত যে কোনও ব্যবস্থাই নিরর্থক। সামগ্রিকভাবে দেশের জীবনপ্রবাহ থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন রেখে কোনও শিক্ষা-নীতিকেই যথার্থভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অবিধিগুলো দূর করতে হলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে বিক্ষোভগুলো জমে উঠেছে, সেগুলোও প্রশমিত হওয়া দরকার।

শিক্ষা কেবল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরি

পদ্ধতিতেও শিক্ষার একটি অবিসম্বাদিত ভূমিকা আছে। যদি সত্যই শিক্ষার মান উন্নয়নের সাধু উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি যথার্থই শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হতে হয়, তাহলে শিক্ষার উক্ত মহান ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে শিক্ষার সাঙ্গীকরণে সমর্থ একটি শিক্ষাপ্রকল্প প্রণয়ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কি জন্য এবং কোন পথে আমরা শিক্ষা দেব, সেটা নিরূপণ না করে পরীক্ষায় পাস-ফেলের দায়ভাগ নিখুঁতভাবে হিসাব করতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের দুর্দশাকেই শুধু জাইয়ে রাখা হবে। ইতি—

দিলীপকুমার দাস
কসবা, কলিকাতা-৪২

বাংলা ভাষায় জাপানী শব্দ

মহাশয়,

'যুযুৎসু' শব্দটি অনেকের মতেই দেখছি জাপানী। কিন্তু শব্দটি যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাভারতে দেখতে পাই মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম যুযুৎসু। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে এক বৈশ্যার গর্ভে জাত। সুতরাং শব্দটি যে সংস্কৃত তাতে কোনো ভুল নেই। আবার যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এই অর্থে শব্দটির ব্যুৎপত্তি দাঁড়ায় যুধ্ + সন্ + উ। তবুও পুরাণেরে নামের সঙ্গে জড়িয়ে শব্দটিকে অকারণে বিদেশী প্রমাণ করার কোনো অর্থ হয় না। ইতি—

অঞ্জলি দত্ত (মল্লিক)
হেতমপুর : বীরভূম

হাসনুহানা

সবিনয় নিবেদন,

পঞ্চাশ বছরেরও আগে একটি ফুল যখন প্রথম দেখি তার নাম শুনি সেটি ছিল হাসনুহানা (অর Lady of the Night)। জাপানী ফুল তার নাম: বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এর জাপানীত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ হয় নি। উক্ত অলীব এ সম্বন্ধে গবেষণা দেখে মনে হল কেমন যেন লাগছে। কিন্তু স্বাভাবিক কুঁড়েমি বশত এর মধ্যে যাচাই আর করা হয় নি। পরে আরও আলোচনা দেখে তা করলাম।

রবীন্দ্রনাথের "ভোর হল যে শ্রাবণ শর্বরী তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনার মঞ্জরী" এই হেনা বা মেহেদীর বেড়া অনেকেই দেখেছেন তবে ছাঁটা কাটা বেড়ায় মঞ্জরিত হাসনু হয়ত অনেকে দেখেন নি: ফুলগুলি সাদা (সাধারণত) এর botanical নাম LYTHRACEAE LAWSONIA INERMIS (সাদা হলে ALBA)।

হাসনুহানা রাতে ফোটে আর গন্ধ দেয়। ফুল ধবধবে সাদা নয়, কিছুটা সবুজ মত, গড়ন অন্যরকম; পাতা, বেলপাতা আর জামপাতা যতটা 'একরকম' অনেকটা সেই-রকম। এক:—এর botanical নাম SOLANACEAE CESTRUM NOCTURNUM। ফুলগাছটি আমাদের দেশে সম্ভবত জাপান থেকে জাপানী নাম সুদ্ধ এসেছে : জাপানীতে* HASU= Lotus; NO-of, HANA-flower—ফুলের পদ্ম—জাপানী ধরনের সেটা শ্রেষ্ঠ ফুল বা স্থলপদ্ম গোছের ভাব হলে হতে পারে (আমাদের 'স্থলপদ্মে'র ঐ নাম কেন জানি না।)

শান্তিনিকেতনে 'কিমোনো' আছে—জাপানী ভদ্রলোক, অভিধান, উদ্ভিদবিদ্যার বই এবং ঐ দু' রকম ফুলও আছে—তবু অভিধানে শুধু অশ্বডিম্ব পাওয়া গেল দেখে আমিও যেমন আশ্চর্য হচ্ছি পরিচিত এক জাপানী অধ্যাপকও সেইরকম আশ্চর্য হলেন।

ফুলটি আমাদের কাছে ঐ নামে পরিচিত হলেও জনৈক উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্-এর মতে এর আদিভূমি West Indies। জাপানের সব জায়গায় বোধ হয় হয় না—[illegible] বিশেষ লোকের না দেখা [illegible] কিছু [illegible] যায় না।

যে কটি উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত বই পেলাম প্রত্যেকটিতে HASU NO HANA পেলাম অন্য কোন বানান নয়। [illegible] মহাশয় ঐরকম লিখেছেন [illegible] তাঁর লেখা দীর্ঘায়িত হওয়া সম্ভব—ফার্সী ভুল করে লিখবেন [illegible] নয়।

বাংলাদেশের ৫/৬টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ফার্সীর গবেষণা ছাড়া জাপানী উদ্ভিদবিদ্যা এবং আরো অনেক কিছু নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে [illegible] বিশ্ববিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কিছুই [illegible] জানতে পারে। ইতি

হেমেন্দ্রনাথ রাহা
কলিকাতা ৯

* Kenkyusha's New Japanese English Dictionary Published : Tokyo
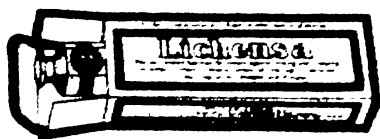
ধর্ম ও কম্যুনিজম্

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রুশে প্রলেতারিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সভার আলোচ্য বিষয়বস্তু—কিংবা কর্মসূচী-এজেন্ডাও বলতে পারেন ছিল—ছিল মাত্র একটি। ভগবান আছেন কি নেই? বিস্তর তর্কা-তর্কির পর স্থির হল, জনমত নেওয়া হক, প্লেবিসিট্ করো।

আজকের দিনের ভাষায় আমরা যাকে বলি 'বিপুল ভোটাধিক্যে' ভগবানের পরাজয় হল। 'বিপুল' কেন- ভগবান অতিকষ্টে পেলেন শতকরা মাত্র একটি ভোট। ভগবান থাকলেও বোঝা গেল তাঁর পার্লামেন্টারি ডিপার্টমেন্ট অতিশয় কাঁচা, তাঁর এজেন্টরা সত্যসত্যই মথুরা চলে গিয়েছেন, তাঁর মাইক ইত্যাদির সুব্যবস্থা তাঁর ছিল না, তাঁর টাউটরা উভয় পক্ষের পয়সা খেয়ে শেষটায় ভোট দিয়েছে গণ্ডায় আণ্ডা ফেলে দুশমন কাফিরদের সঙ্গে। তবুও হয়তো তিনি আরও দুচারখানা বেশী ভোট পেতেন যদি পোলিং বুথের একটু দূরে সামান্য কামুফ্লাজ করে কিঞ্চিৎ ধান্যেশ্বরী গমবাক্স ভদ্‌কার ব্যবস্থা রাখতেন। এসব কোনো তদবীরং না করে আজকের দিনে ভোটের আশা! হুঃ! তাঁর ডিপজিটও মারা যায়। সে নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনো ক্ষোভ নেই। কারণ তাঁর ম্যানিফেসটোতে ছিল তিনি ধর্মাচারিগণকে মৃত্যুর পর স্বর্গরাজ্য দেবেন। অর্থাৎ পোস্ট-ডেটেড্ চেক অন এ নন-একজিসটিং ব্যাঙ্ক! তবে এস্থলে নিছক সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে: গডের দুশমনরাই যে শুধু এই ক্রিটিক তুলেছিল, তা নয়, এর কম সে কম কুড়ি বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আস্তিক স্বামী বিবেকানন্দ নিউ ইয়র্কে বসে তাঁর শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেছিলেন 'অন্ন' 'অন্ন' যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

তা সে যাই হোক. ভগবান দশচক্রে ভূত হয়ে রুশ থেকে বিদায় নিলেন।

'উন্মাদ, উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ!' পাঁড় আস্তিকরা অবশ্য বলবেন। 'ভোট দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব অথবা তদ্বিপরীত প্রমাণ

গোকুলচন্দ্র মুখে হাত চাপা দিলেন আবার। তাঁর স্মৃতিচারণের ভিতর দিয়ে ঘড়িতে আবার ঘণ্টা বেজে গেল। কিন্তু প্রহর শোনা তাঁর হল না। গলায় থমকানো রুদ্ধ হাসির দুর্বার কান্না কশাঘাত করে উঠল। মনে মনে বললেন কাল আমি আবার সেইখানে যাব, যেখানে তোমাকে শেষ দেখেছিলাম। সেই হাসপাতালেই কাল আবার আবার—। কিন্তু মা তোমাকে আর দেখব না।

মনে আছে উঠানে মাকে বার করা হয়েছিল। দিদি গোকুলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। নিতাই স্যাকরা বলে উঠেছিল দ্যাখ, ছুঁড়ি কাঁদিস কেন? দ্যাখ্, আমার মা নেই তোর দিদিমা নেই। মা বাপ কি কারুর চিরকাল থাকে?

সেই মুহূর্তে গোকুলের ভিতরে কে যেন আপনি আপনি বলে উঠেছিল, মনে হয়, চিরদিন কেউ থাকে না।

থাকে না। অথচ কাল অন্ধকারের দেয়াল ভেদ করে আট বছর বয়সের সেই আলো ঝলকানো সকাল ফুটে উঠবে। তখন মাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। ওই আগামীকাল শুধু রুদ্ধ হাসি নয় আগামীকালের এক আলোর অন্ধকারের কল্লোলে ভেসে উঠবে। আগামীকাল আগামীকাল! আর কতক্ষণ! শেষ রাতের আবেশ টের পাচ্ছেন গোকুলচন্দ্র। শেষরাতের একটি বিশেষ গন্ধ আছে যেন। রাত পোহালেই শুভেন এসে উপস্থিত হবে। নিয়ে যাবে তাঁকে—তারপর—।

তাই সেই দুঃসহ অন্ধকার, যুগ যুগের অন্ধকারে লেগেছে উজান বাতাসের তাড়া। পাতার পর পাতা চলেছে খুলে অন্ধকারের ইতিবৃত্ত।

মনে আছে, মা মারা যাবার পর মনে হয়েছিল ·আর একবার চোখ হারিয়েছে। আর একবার অন্ধকারের ভয়ংকর আতঙ্ক তার চারপাশে ভিড় করে এসেছিল। নড়তে চড়তে ভয় করত। মনে হয়েছিল, গলায় শব্দ নেই জিহ্বায় কথা নেই। চিরতরে বাকরোধ হয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে একজনকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত। জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে দিতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তার জন্যে দিদিকে ডাকতে [illegible] হত। মা থাকতে দিদিকে মনে হত এক রকম। জামাইবাবুর সঙ্গে দিদিকে [illegible] আর একরকম। দিদির কথা [illegible] সবকিছুর মধ্যেই কী একটা পরিবর্তন এসেছিল। ডাকতে [illegible] গেছে [illegible]।

কিন্তু [illegible]। দিদি বলতে বলতে উঠে আসতেন। জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে আসতেন। বারে বারে জিজ্ঞেস করতেন, কী হয়েছে গোকুল অমন চুপ করে কী ভাবিস?

গোকুল চমকে উঠতো। যেন অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়তো। বলতেন, কিছু না এমনি।

দিদি কাছে বসতেন। গায়ে হাত দিতেন। গোকুলের মনে হত তার বুকের ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে আসতে চাইছে। তাই বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠতো। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শক্ত হয়ে থাকতো।

মাঝে মাঝে শুনতে পেতেন দিদি জামাইবাবুকে বলছেন আঃ। আস্তে বল, গোকুল শুনতে পাবে।

জামাইবাবু বলতেন, তোমার ভাইয়ের জন্য দেখছি বোবা হয়ে থাকতে হবে।

দিদি ধমক দিতেন চুপ কর না।

কৌতূহল এবং সংকোচে কাঁটা হয়ে যেত গোকুল। ভাবতো কী বলছে জামাই-বাবু? কখনো কখনো শুনতো দিদি জামাইবাবু ফিসফিস করে কথা বলছেন। চুপি চুপি হাসছেন। কিন্তু দিদির ধমকটা ঠিকই ছিল আস্তে। গোকুল শুনতে পাবে।

গোকুল বুঝতে পারতো [illegible] তার একটা জগত তৈরী হচ্ছে। সেখানকার খবর গোকুল আর কখনও পাবে না। সেখানে ওর

চির প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠত।

তারপর সেই কথাটাও ওর অন্ধকারের গায়ে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। শরীরের দাগের মতো। সে আছে, কিন্তু বাজে না। আবার একদিন গান করতে ইচ্ছে করেছিল। দিদিও যোগ দিতেন। তবে সময় পেতেন না। জামাইবাবু বাড়ি থাকলে কখনও গান গাইতেন না। গানের মাঝখানে জামাইবাবু এসে পড়লে দিদি থেমে যেতেন। ধড়ফড়িয়ে

গোকুল ভয়ে ভয়েই বলেছিল, আমি গোকুল।

শুনতে পেয়েছিল গলার স্বর হঠাৎ গম্ভীর। ওর গলায় নেশার আমেজ ছিল। বলেছিলেন, আ! কানা গোকুলে? আবার এসেছিস

কানা গোকুলে! ওই নামটাই আস্তে আস্তে লোকেরা চালু করেছিল। গোকুল বলেছিল, হাঁ।

—হুম্! ওস্তাদরা কেউ আসে নি।
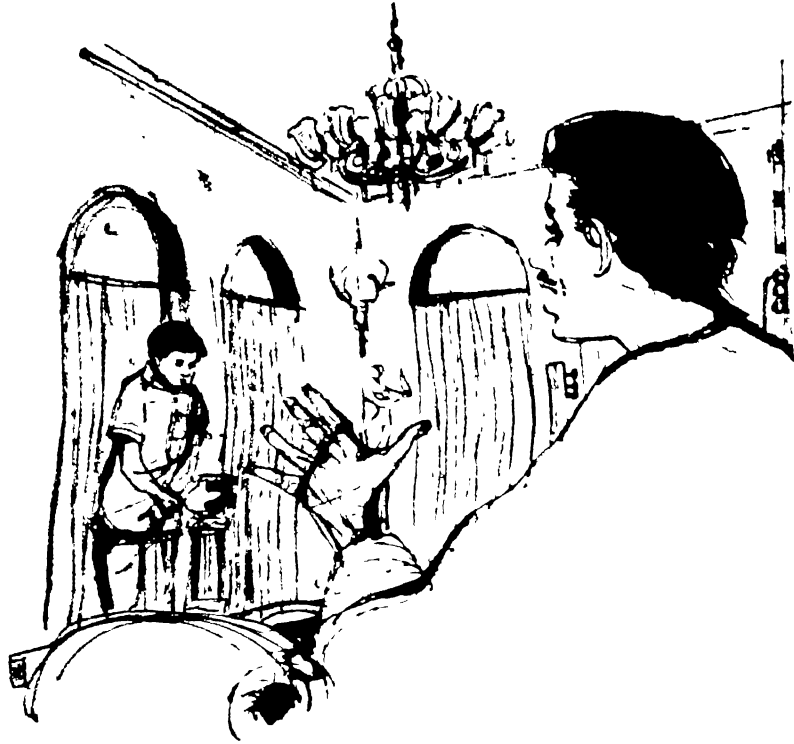
সব শালা আজ পেঁচো বড়ালের বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে

উঠে পড়তেন। সংসারের কাজও যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

আবার একদিন সাহাবাড়ির মজলিশ মহলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকদিন পরে গিয়েছিল। কিন্তু সে-দিনটি কখনও ভুলবে না। সামনে একটা বাগান পার হয়ে যেতে হত। স্যাকরাবাড়ির একটি ছেলে গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যা ছিল। ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল গোকুল। হালকা মিষ্টি গন্ধ, বেল জুঁই আর গন্ধরাজের। লাঠির দিশায় গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ ছিল না। ভেবেছিল, কেউ নেই, আসর বসেনি।

তখনই হঠাৎ তানপুরার তারেই বোধহয় স্খলিত ঝংকার শোনা গিয়েছিল। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার ঝংকার উঠেছিল। যেন কেউ আনমনে তারে টোকা দিচ্ছিল। পরমুহূর্তেই বেশ একটু চমকে ওঠা ঝাঁঝালো গলা শোনা গিয়েছিল, কে ওখানে? কে?

আসর আজকাল ভেঙে দিয়েছি।

—ও।

—হাঁ, সব শালা আজকাল পেঁচো বড়ালের বাড়িতে গিয়ে জুটেছে।

হারু সাহার গলার বেশ মত্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। আবার বলেছিলেন, ওস্তাদ না ছাই, মেয়েমানুষের মুখ দেখলে ব্যাটারা সব ভুলে যায়, বুঝলি?

—হুঁ।

—হাঁ, মেয়েমানুষ নিয়ে দলাদলি, ওসব আমার ভাল লাগে না। আর মেয়েমানুষের জাতটা—কী বলব—।

বলতে পারেননি হারু সাহা। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিল গোকুল। তারপর তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ার মৃদু শব্দ। গোকুল অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু হারু সাহার শেষদিকের গলার স্বরে মনটা কেমন বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে বলেছিল, তা হলে আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন হারু সাহা।—বাড়ি যাবি? তোর চোখ নেই, আর দ্যাখ আমার চোখ থাকতেও আমি অন্ধ। বোস না, বোস, কী করবি বাড়ি গিয়ে? তোর সঙ্গেই কথা বলি। আচ্ছা, তুই গান গাইতে পারিস রে?

থরথর করে ঘামছিল গোকুল। অস্ফুটে বলেছিল সে কিছু নয়।

—যা হোক ধর না একটা। আয়, এগিয়ে এসে বোস।

আমন্ত্রণ অমান্য করার সাহস ছিল না গোকুলের। আস্তে আস্তে এগিয়ে গদির সামনে গিয়ে, গদির নিচে গালিচায় বসেছিল। ভয় পাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিল, হে ভগবান, আমি কী গাইব।

হারু সাহা ততক্ষণে হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল চালিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ধর, ধরে ফ্যাল্।

গোকুল তবু সংকুচিত দ্বিধায় বলেছিল, কী গাইব?

—যা তোর ইচ্ছে।

—ওই, সেই, 'অব্ ম্যায় ক্যায় জানু, পিল কাহা চাহে'টা গাইব?

হারু সাহা যেন চমকে উঠে বলেছিলেন, এ তো নজরুল মিত্রের গান, ঠুংরি! তুই জানলি কোত্থেকে?

—এখানেই শুনেছিলাম।

—আচ্ছা? সেই 'যব মেরে পিল তেরী হাথ্ পর'? শিখে নিয়েছিস?

—একটু একটু।

—গা গা, গা দিকিনি।

গোকুল ভয়ে ভয়ে ধরেছিল। এবং এক সময়ে, ভয় পার হয়ে, গানের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। খেয়াল করে নি, কখন থেকে হারমোনিয়ামে রীডে একটা টানা সুর বেজে চলছিল আবার তবলায় ঠেকাও পড়ছিল। হারু সাহা একলাই সেই দ্বিবিধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গান শেষ হতে হারু সাহা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করেছিলেন। গোকুল ভয়ে লজ্জায় বসে বসে ঘামছিল। তারপরে হঠাৎ স্পর্শ অনুভব করেছিল। হারু সাহা তার হাত ধরে টেনে গদিতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আয়, বসবি আয়।

গোকুলের আপত্তির কোনো অধিকারই ছিল না। পরমুহূর্তেই হারু সাহা প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলেন, অ্যাঁ? অ্যা রে ব্যাটা কানা গোকুলে, তুই যে সত্যি সত্যি সুরদাস হবি রে। প্রায় পাগল করে দিয়েছিস, অ্যাঁ? এখানে শুনে শুনে শিখেছিস?

—হাঁ।

—তাজ্জব। আর জন্মে যেন আমি কানা হই। নজরুলের ঠুংরি তুই এমনি করে গাইতে পারিস? বাঃ। ঠিক আছে, তুই রোজ আসবি, বুঝলি? আমাদের মালী গিয়ে তোকে রোজ নিয়ে আসবে।

সেই শুরু হয়েছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন হারু লাহা। তার পিছনে কারণ কোনো মেয়ে। যে মেয়ে, হারু লাহার ভাষায় বিশ্বাসঘাতিনী। কিন্তু গোকুলকে নিয়ে, দুজনের মজলিশও জমে উঠেছিল বেশ। মনে আছে, তবলা বাজানো শিখিয়েছিলেন ওকে হারু লাহা। তাল চিনতে, বুঝতে শিখিয়েছিলেন। শব্দ করে করে, স্বরলিপি বুঝিয়েছিলেন।

তবু সহজে হয় নি। সেই একদিন হারু লাহা গান ধরেছিলেন। গোকুল তবলা ধরেছিল। হঠাৎ এক সময়ে গান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঠাস করে একটা চড় পড়েছিল গালে। গোকুল চমকাবার আগেই আর এক গালে আর একটা। তারপরেই হারু লাহার চাপা ক্রুদ্ধ স্বর, শুধু কানা নয়, ব্যাটা তাল কানা তুমি! ছন্দ আর মাত্রা কি গিলিয়ে খাওয়াতে হবে? গোটা গানটাই মাটি!

বলেই মালী হরিকে ডেকে বলেছিলেন, ব্যাটাকে দিয়ে আয় বাড়িতে। আর নিয়ে আসিস না।

গোকুল চোখের জল বাড়ি ঢোকবার আগেই মুছেছিল। দিদিকে বলে নি। রাত্রে আবার লুকিয়ে কেঁদেছিল। যদিও বাইরের বারান্দায় বেড়া দিয়ে তখন তার থাকবার আলাদা জায়গা হয়েছিল। তবু শব্দ করার উপায় ছিল না। ঘর থেকে দিদির টের পাবার ভয় ছিল। কিন্তু মার খাবার জন্যে কাঁদে নি গোকুল। আর যেতে পাবে না সেই দুঃখে কেঁদেছিল। কেন ভুল হয় সেই ভেবে কেঁদেছিল।

কিন্তু পরদিনই আবার মালী হরি এসেছিল। চল ডেকেছেন।

আদেশ মত গিয়েছিল। এবং তার পরেও মারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে দুজনে বাঁধা পড়েছিলেন। সে-বন্ধন তাদের বয়সের ফারাক দূর করেছিল। অন্ধত্বের বাধা সরিয়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে পাড়ায় এবং পাড়ার বাইরে, কলকাতার কোনো কোনো মহলে গোকুলের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। সব থেকে আশ্চর্য নাম ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেটা সব থেকে বেড়ে উঠেছিল সেটা টিটকারি অপমান। কানা গোকুলেও নাকি গানের ওস্তাদ হয়ে উঠল!

তখনই, আর একটা দিন, সে দিনটির কথাও ভোলা যায় না। গোকুল দাওয়ায় বসেছিল। জামাইবাবু হঠাৎ বাড়ি ঢুকে ঠক করে কী একটা বসিয়ে বলেছিলেন, তোমার জন্যেই নিয়ে এলাম হে গোকুল। মাল পুরনো, কিন্তু ওস্তাদ লোক দিয়ে দেখিয়ে এনেছি। একবার হাত দিয়ে দেখ।

গোকুল হাত দিয়ে দেখেছিল। হারমোনিয়াম! তার জন্যে হারমোনিয়াম! খুশির প্রাবল্যে কথা বলতে পারে নি গোকুল। যদিও বুঝতে পারছিল, নড়বড়ে জং পাওয়া রীড এখানে ওখানে কাঠের চলটা উঠে গিয়েছে। তবু তার নিজের জামাইবাবু এনে দিয়েছেন!

বেশ খানিকক্ষণ পর হারমোনিয়ামের গায়ে হাত রেখে বলেছিলেন, অমন করে নিয়ে এলে?

অম্বিকা বলেছিলেন হ্যাঁ। না এনে আর কী করব বল। লাহারা তো আর চাইলে একটা দেবে না। ওদিকে দেখছ তো, তোমার দিদি দুটো বিয়োলো আর দুটোই মেয়ে। এবার আমিও কানা হয়ে যাব। তাই দশজনে বললে, কিনে দিতে, যা হোক ঘুরে ঘুরে দশজনকে গান শুনিয়েও যদি কিছু রোজগারের ধান্দা হয়। বুঝলে না, নিজের পেটটা তো তোমার চলা চাই।

শুনতে শুনতে গোকুলের বুকে হঠাৎ নিশ্বাস আটকে গিয়েছিল। এই ইঙ্গিতটা পাড়ার দু-একজন আগেও দিয়েছিল। ভিক্ষে! হারমোনিয়াম গলায় নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবার কথা বলছিলেন জামাইবাবু।

কী বলবে, সহসা ভেবে পাচ্ছিল না গোকুল। কিন্তু তার আগেই দিদির তীব্র স্বর বেজে উঠেছিল, বটে! সেই জন্যেই বুঝি সাত সকালে বেরিয়ে গেছলে শালার হারমোনিয়ামের দরদে! কিন্তু মনে রেখ আমার হাত এখনও পচে নি, জরি পুঁতির কাজ এখনও করতে পারব। তবু গোকুল কোনদিন ভিক্ষে করতে যাবে না।

জামাইবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। চীৎকার করে উঠেছিলেন, বেশ তবে আমি চললুম কানা ভাইয়ের সঙ্গেই সংসার কর। দেখ কত ধানে কত চাল।

বলে দুমদাম করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গোকুল ডাক দিয়েছিল দিদি।

দিদি তখনও ঝোঁকে বলেছিলেন তাই দেখব। তবু অমন পাপ হতে দেব না।

—কিন্তু দিদি—

গোকুল আবার ডেকেছিল। তখন দিদির রুদ্ধস্বর শোনা গিয়েছিল, তুই কিছু ভাবিস না গোকুল, তুই কিছু বলিস না।

—কিন্তু দিদি, এভাবে তো আর চলেও না। জামাইবাবু তো কিছু অন্যায় বলে নি। আমার তো একটা কিছু করতে হবে।

—করিস। আগে আমি মরি তারপরে।

গোকুলচন্দ্র প্রায় অস্ফুটে ডেকে উঠলেন, দিদি! দিদি!

ডেকেই আবার মুখে হাত চাপা দিলেন। পাশের ঘরেই শুয়ে আছেন দিদি। আজ রাতে কি তাঁর চোখেই ঘুম আছে! তাঁরও প্রতিটি মুহূর্ত এমনি জেগেই কাটছে নিশ্চয়। এমনিতেই এ ঘরে সামান্য শব্দ হলে শুনতে পান। তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন। গোকুল যে বুড়ো হয়েছেন সে কথাটাও ভুলে যান দিদি। ভাবেন উনি বুঝি খাট থেকে পড়ে গেলেন। তাই তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিলেন। আর আস্তে
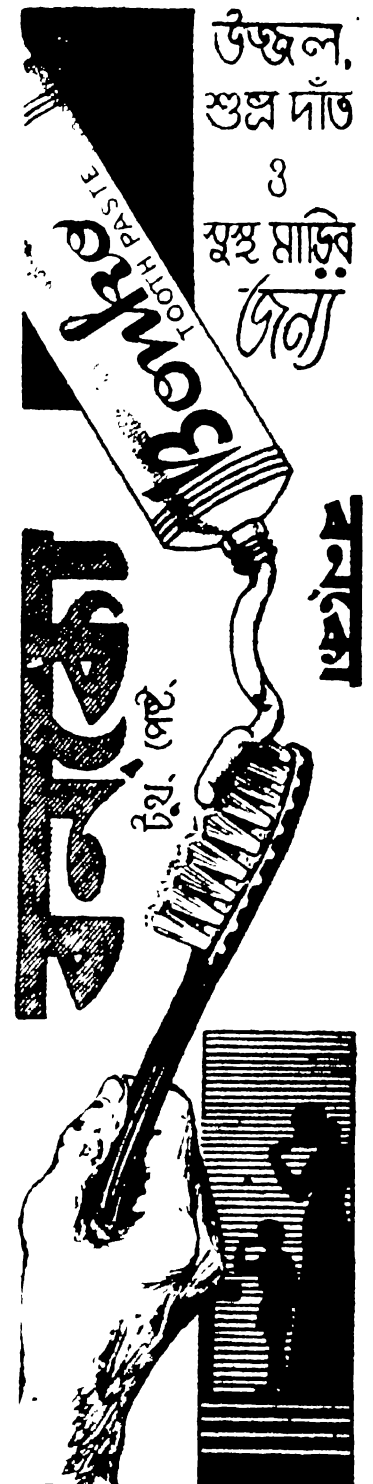
আস্তে বাঁ দিকে কাত হলেন। মনে মনে বললেন, ওই তো, ঘরের ওই কোণেই তো সেই হারমোনিয়মটা আজও আছে। ওইখানেই, রেলিং দেওয়া বড় তক্তপোশের ওপর গোকুলের সব সঙ্গীতের যন্ত্র থরে থরে সাজানো রয়েছে। কালো মখমলের পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে সব। তার মধ্যেই সেই হারমোনিয়মটাও আছে। পাশেই গোকুলের পিয়ানো রয়েছে। কিনেছিলেন তিনি। শিখেওছিলেন। এখন ওটা ছোট ভাগ্নী সুগত্রারই পুরো দখলে প্রায়। তিনি জানেন পিয়ানোর ওপরে তার একটি আবক্ষ প্লাস্টিক মূর্তি আছে। একজন সঙ্গীতভক্ত ভাস্কর তৈরী করে দিয়েছেন। এই বাড়ির প্ল্যান যে এঞ্জিনীয়ার করেছিলেন, তিনি গোকুলচন্দ্রের থাকবার জন্যে এই ঘরটিও বিশেষভাবে তৈরী করিয়েছিলেন। পাথরের টালি পাতা মস্ত বড় ঘর। প্রত্যেকটি টালিতে দিক নির্ণয়ের জন্য বিশেষভাবে খাঁজ কাটা আছে। বিভিন্ন দিকের টালিতে বিভিন্ন খাঁজ। গোকুল হাঁটতে গেলেই টের পান।

তাতে কি! আপনাদের লাহিড়ীমশায় যে মাল খেয়ে নর্তকীঠাকরুণকে নিয়ে পড়ে থাকেন?

গোকুল প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন, ছি! বাঙলা দেশের অতবড় লোক সম্পর্কে অমন করে বলতে নেই।

—হু-উ-বে বাবা! এদিক নেই ওদিক আছে। পদ্মলোচনের মত কথা দেখছি। ডেকেছি, তাই না কত!

লীলার চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনে-ছিলেন গোকুল। তাঁর বুকের ভিতরটা ব্যথায় ও অপমানে দপ্দপ্ করছিল। তবু তাঁর সকল অন্ধকার লুটোপুটি করছিল বাইরের ঝড়ের মতোই।

কিন্তু পরদিনই লীলা আবার সেই হাসি এবং সাবলীলতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। আর আস্তে আস্তে ইন্দ্রাণীতে একটা আলোচনার গুঞ্জন উঠেছিল। গুঞ্জনের মধ্যে হাসি আর বিদ্রূপই ছিল আসলে। লীলা আর কানা গোকুল! শুনেছ, কানা গোকুলেও ঘোল খাচ্ছে।

একদিন অন্ধকার উইংস-এর পাশ থেকে গোকুল স্পষ্ট শুনতে পেয়ে-ছিলেন দুজনের কথা। লীলা আর হেরম্ব। হেরম্ব ইন্দ্রাণীর যুবক অভিনেতা। ওরা বোধ হয় গোকুলকে দেখতে পায় নি।

হেরম্ব বলেছিল কানা গোকুলকে নিয়ে নাকি খুব মেতেছ?

লীলা বলেছিল তোমরা তো সবই মাতামাতি দেখ। [illegible] মত হেকে যাওয়া পুরুষ [illegible]।

হেরম্ব—বটে? জানা গেল না কারণ?

লীলা—গাছ [illegible] না কাচা দেখলেই বোঝা যায়।

তারপরেই তো একদিন [illegible] বুকের কাছে দাঁড়িয়ে লীলা [illegible] জানিয়েছিল, আমার বাড়িতে আপনাকে একদিন যেতে হবে। আমার বন্ধুরা আপনার গান শুনতে চেয়েছে।

—তোমার বন্ধু?

—কেন আমার বন্ধু থাকতে নেই? কল-কাতার অনেক বড় বড় লোক আমার বন্ধু, জানেন?

—তাই বুঝি? কিন্তু সে বড় বড় লোকে-দের কি আমার গান শুনতে ভাল লাগবে?

লীলা মিঠে রসানের ঠাট্টা করে বলেছিল, ও বাবা, আপনার খুব গুমোর দেখছি। বলে, আপনার গান শোনবার জন্যে সব পাগল! বিশ্বাসই করতে চায় না যে, আপনাকে ডাকলে আমার বাড়িতে যাবেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সবাই তো বোঝে, আপনার জন্যেই আজকাল আমার গানে এত নাম। আমার বন্ধুরা চায়, আপনি আমার বাড়িতে বসে গাইবেন, আমিও গাইব, নাচব আপনার গানের সঙ্গে। যাবেন তো?

গোকুল যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কী বলবেন, বুঝতে পারছিলেন না।

লীলা শরীরের কাছে আরও ঘন হয়ে এসেছিল। গোকুলের নিশ্বাস আবার ঘন হয়ে আসছিল। লীলা গায়ে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমাকে আপনি ভালবাসেন না?

বলতে বলতেই লীলার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল তাঁর চিবুকে। ফিসফিস করে বলেছিল, যাবে না?

গোকুলের মনে হয়েছিল তার অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ একটা ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি যেন দেখছিলেন, দুটো কালো পাখা ঝাপটা খেয়ে কাঁপছে। কোনো রকমে অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলেন, যাব, যাব।

আর পরমুহূর্তেই, আবার, আবার লীলার ঠোঁট তাঁর নীচের ঠোঁট স্পর্শ করে-ছিল। শুনেছিলেন, তবে কাল, কাল তো থিয়েটার বন্ধ। কাল আমার গাড়ি যাবে বিকেলে তোমাকে আনতে, কেমন? যাচ্ছি।

লীলা চলে গিয়েছিল। গোকুল যেন থর-থর করে কাঁপছিলেন। একটা তীব্র সুখ, একটি ভয়ংকর উচ্চকিত যন্ত্রণার আঘাতে নুয়ে পড়ছিল। চোখে জল আসছিল তাঁর। মনে মনে বলছিলেন অন্ধকার, হে অন্ধকার, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

লীলার বাড়িতে, ওর বিলাসকক্ষেই সেদিন অন্ধকারের যাত্রা নির্দেশ করেছিল। গোকুল যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গে থাকত সাকরাবাড়িরই একটি বেকার যুবক। জামাইবাবু নিজেই যেতে চাইতেন, গোকুলকে সব জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে। বলতেন, 'এখন তো তোমার কল্যাণেই আমার কল্যাণ হে। আমার উচিত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা।' কিন্তু গোকুল তা [illegible] সাকরাবাড়ির ছেলেটিই সকল [illegible] সঙ্গী ছিল।

[illegible] লীলার বাড়ি যাতায়াত [illegible] পূর্ণিমার কোটালের [illegible] মধুচক্র জমে উঠেছিল। [illegible] বড় চাকরে [illegible] ছিল [illegible] সম্মান [illegible] প্রতিষ্ঠিত [illegible] তাকেই তোষামোদ করত। তাকেই খুশী করার চেষ্টা করত। [illegible] তার বুকের কাছ ঘেঁষে বসে থাকত লীলা। তিনি সুর ধরলেই সুর। তিনি সুর ধরলেই নাচের ঝংকার বেজে উঠত লীলার পায়ে।

সেই রাত্রি-বাসরের শত শত রজতমুদ্রা পারিশ্রমিক হিসেবে লীলা তাঁকেও দিতে চাইত। গোকুল শিউরে উঠে হাত ফিরিয়ে নিতেন। বলতেন, অমন কথা বলো না। আমি আসি তোমার কাছে। তুমি যে-দক্ষিণা দেবে, তাই আমার পাওনা। সো তো টাকা নয় লীলা।

লীলার স্পর্শ ঘন হয়ে উঠত। উৎসব শেষে কতদিন নিজের হাতে গোকুলকে খাইয়েও দিত।

তারপর, তারপরেই তো এসেছিল সেই বীভৎস দিনগুলো। লীলার বাড়িতে যাতায়াত করছিলেন বটে। দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে উন্মত্ত করেছিল ঠিকই। কিন্তু সেই পরিবেশ তাঁর ভিতর থেকে মেনে নিতে পারছিল না। যে-অন্ধকার লীলার বাড়ি যাত্রা নির্দেশ করেছিল, সেই অন্ধকার থেকেই একটি প্রতিবাদ পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর গান উচ্ছ্বসিত গলার ভর করছিল। মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যেতেন। গান গাইতে পারতেন না। হাসতে পারতেন না।

লীলা জিজ্ঞেস করত, কী হল?

গোকুল সঙ্কুচিত হয়ে বলতেন, তুমি বড় বেশি খাচ্ছ লীলা। গান বেসুরো হয়ে যাচ্ছে তোমার।

বুঝতে পারতেন, ঘরের সবাই চুপ হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারতেন, পরমুহূর্তেই একটা চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। লীলা বলত, আচ্ছা আচ্ছা, আর খাব না, তুমি ধর।

কিন্তু টের পেতেন, লীলা সঙ্গে সঙ্গেই আবার গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। আর ওর ভক্তরা উল্লসিত হয়ে উঠছে। কেউ কেউ চাপা গলায় বলেই উঠত, দূর! এত শাসন ভাল লাগে না।

বুঝতে পারতেন, লীলা উঠে যেত তাদের কাছে। তাদের হয়তো মুখের সামনে গেলাস ধরে সান্ত্বনা দিত সে। তারপর একদিন চীৎকার করে গোকুলকে বলেছিল ও সব গেরস্ত পীরিত আমার ভাল লাগে না বাপু। দশ জনের সঙ্গে বসে তোমার মুখ চেয়ে থাকলে আমার চলবে না।

কিন্তু গোকুল সহ্য করতে পারছিলেন না। বুঝতে পারছিলেন, সর্বনাশটা কোথায় হয়েছে। লীলাকে ছেড়ে থাকতে পারছিলেন না। অথচ লীলার সঙ্গে কোনো দিক দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। ওই পরিবেশে মিশতে পারছিলেন না লীলার সঙ্গে। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চিন্তা তো বাতুলতা ছিল। সুতরাং, যে সুত্র ধরে গিয়েছিলেন, সেই গানের উৎসাহ নিবে গিয়েছিল। একদিন আবিষ্কার করেছিলেন, ঘরে তিনি একলা। অন্য ঘর থেকে হাসি গান হল্লা ভেসে আসছিল।

কে যেন চীৎকার করে বলেছিল, কানাটাকে ভাগিয়ে দিলেই তো হয়! আমরা কেন আলাদা ঘরে বসব?

তবু সন্ধ্যা হলে তাঁর অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা স্পর্শহীন শক্তি তাঁকে ঠেলে নিয়ে যেত সেখানে। থমকে গেলে, তাঁর পায়ে সে আঘাত করে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। আর তাঁর সামনেই লীলা অপরের আলিঙ্গনে বন্দিনী হয়ে উঠত। টের পেতেন তিনি। শুনতেন, লীলার আপত্তি শুনে পুরুষের মত্ত স্বর গর্জিয়ে উঠছে, আরে বাপু, আর যাই হোক, কানা তো। দেখতে তো পাচ্ছে না।

হয় তো দর্শনের চুম্বনের মধ্যে লীলার গলা শোনা যেত কিন্তু টের তো পান। বলতে বলতে দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ত।

গোকুল শিলীভূত স্তব্ধতায়, মুহ্যমান হয়ে বসে থাকতেন।

একেবারে শেষের দিনটি ভয়ঙ্কর। হঠাৎ লীলার আর ওর মাতাল বন্ধুরা তাঁকে জোর করে মদ খাওয়াতে চেয়েছিল। লীলা বলেছিল, একটু অভ্যেস কর। নইলে তোমার দ্বারা কিছু হবে না।

কয়েকজন জোর করে গোকুলের মুখে বোতল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চিত করে শুইয়ে বুকের ওপর চেপে বসেছিল। গোকুল চীৎকার করতে পারেন নি। একটা তীব্র গর্জন আর কান্না তাঁর প্রাণের মধ্যে ফুলে উঠেছিল। জোর করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ওরা হাসতে হাসতে তাঁর সারা গায়ে মদ ঢেলে দিয়েছিল। কে একজন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল উঠোনে। আর উল্লসিত হাত-তালি পড়েছিল।

চমকে উঠলেন গোকুলচন্দ্র। মনে হল, সাঁড়ির নিচে কিসের শব্দ হল। তাঁর ঘরের মধ্যে যেন অস্পষ্ট পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি চোখ বুজে আছেন। সর্বাঙ্গ শক্ত আড়ষ্ট। নিশ্বাস আটকে রয়েছে গলার কাছে। বাড় পেড়াচ্ছে নাকি? নিম পাড়াটায় শালিক চড়ুইয়ের ঝটাপটি শোনা যাচ্ছে যেন। কিন্তু কিন্তু তাঁর অন্ধকারের সেই অদৃশ্য সব তাঁকে এখনও পাক দিয়ে ফিরছে। সে যে আজ হিসাব নিকাশ করতে এসেছে।

মনে আছে, লীলার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিলেন সর্বাঙ্গে মদাসক্ত আলুথালু বেশে। কিন্তু সেই শেষদিন নয়। তারপরেই বাসনা ডিহুজ্ঞাদের অঙ্গনে এসেছিল। চলে গিয়েছিলেন।

কেবল শ্রীজীব লাহিড়ী বলেছিলেন, চলেই যাবে?

—হ্যাঁ।

লাহিড়ীমশায় বলেছিলেন, লোকে চার দু'টো চোখ থাকলেও যা করতে পারে না, তোমার একটা চোখও না থাকে, তুমি তাই করছ। তোমাকে আমার কিছু বোঝাবার নেই। একদিন তুমি বুঝবে, এইটুকু ভরসা। যাও।

চলে গিয়েছিলেন সন্দে। কিন্তু স্থির হতে পারছিলেন না। যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে দেখেছিল। তখন লীলার বন্ধু-সহচরদের মতো হতে চেষ্টা করেছিলেন। মদ আর নির্বিচার ভোগ। তবু, শান্তি ফিরে আসছিল না। বরং তাঁর সেই দুঃসহ অন্ধকার জগত কণ্টকাকীর্ণ দেওয়ালে ঘিরে আরও ছোট হয়ে, চেপে ধরেছিল। দুরন্ত আগুন ছিল সেই ঘেরাওয়ে।

থাকতে পারেন নি, আবার ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। এসে শুনেছিলেন, ইন্দ্রাণীর দল নিয়ে লাহিড়ীমশায় দেশে

দেশে নাটক করতে বেরিয়ে পড়েছেন। লীলাও সংগে গিয়েছিল। শুনে একটা স্তব্ধতা বোধ করেছিলেন গোকুল। আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। মনে হত, তাঁর অন্ধকারের মধ্যে কী এক সুর যেন ধ্বনিত হচ্ছে। সেই অস্পষ্ট সুর আর কথা শোনবার জন্যে তিনি দিনের পর দিন চুপ করে বসে থাকতেন।

কিছুকাল পরে খবর পেয়েছিলেন, ইন্দ্রানীর দল ফিরে এসেছে। লীলাও ফিরে এসেছে। কিন্তু আসাম থেকে ভয়াবহ কালা-জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছে। শুনেছিলেন, কিন্তু গোকুল তাঁর উৎকর্ণ স্তব্ধ মগ্নতা থেকে চকিত হলেন না। হতে পারলেন না।

গোকুল ফিরে এসেছেন শুনে, শ্রীজীব লাহিড়ী তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। এসে তিনিই বিশদ খবর দিয়েছিলেন, লীলার জীবনটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। কালাজ্বর যে কী ভীষণ! বেচারীকে একেবারে কালো [illegible] করে ছেড়ে দিয়েছে। গায়ের চামড়া গেছে কুঁচকে। পেত্নীকেও অত খারাপ দেখায় না। হা মুখটা পর্যন্ত বেঁকে গেছে।

গোকুল আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। উৎকণ্ঠিত বাথায় বলে উঠেছিলেন, এখন কী উপায় লাহিড়ী মশায়?

—উপায় আর কী। শুনেছি ডাক্তাররা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু সহজে আর আগের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীজীব বলেছিলেন, চিরকাল কিছুই থাকে না। তোমার কথা প্রায়ই বলত মেয়েটা। আর তাই, লীলা তোমাকে বলতে বলেছিল, পার তো তুমি তাকে একবারটি দেখতে যেও।

—আমি যাব?

—কেন যাবে না? অসুবিধে থাকলে আমার সংগেই যেতে পার এখন। যাবে?

—চলুন।

গিয়েছিলেন গোকুল। কিন্তু সে বাড়ি নয়। অন্য বাড়ি, কম ভাড়ার ছোট্ট ঘুপসি ঘর।

শ্রীজীব লাহিড়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন আছিস রে লীলা?

বহুদূর থেকে যেন সানুনাসিক স্তিমিত গলা ভেসে এসেছিল, ভাল নয়।

—গোকুল এসেছে।

বলতে বলতেই শ্রীজীবের গলায় বিস্মিত উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল, ও কি লীলা, অমন ছটফটিয়ে উঠতে যাচ্ছিস কেন?

লীলার রুগ্ন উত্তেজিত রুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, ওকে একটু ডেকে দিন লাহিড়ী মশায়, একটু কাছে ডেকে দিন। গোকুল বিস্মিত হতে গিয়ে, সহসা ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে, অবশীভূতের মতো তিনি লীলার কাছে [illegible]। তারপর তিনি [illegible] মানুষ। তৎক্ষণাৎ লীলার কঙ্কালের মতো হাত তাঁর হাত আঁকড়ে ধরেছিল। অস্ফুট রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠেছিল, গোকুলবাবু এসেছ?

গোকুল কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলেন, গলায় তাঁর স্বর নেই। লীলার হাত ধরে, আস্তে আস্তে তিনি ওর পাশে বসেছিলেন। কিন্তু লীলা শান্ত হতে পারছিল না। সে গোকুলের হাত নিয়ে, তার নিজের মুখে গায়ে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে বলে উঠেছিল, দেখ গোকুলবাবু, আমাকে দেখ, আমাকে দেখ।

গোকুল তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে লীলার মুখ চেপে দিয়ে ফিসফিস করে উচ্চারণ করেছিলেন, দেখেছি, তোমাকে দেখেছি। গোকুলের সর্বব্যাপী অন্ধকার লবণাক্ত জলে টলমল করে উঠেছিল।

লীলার অশ্রুরুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, দেখেছ, আমাকে দেখেছ?

গোকুল তেমনি গলায় বলেছিলেন, সব দেখেছি লীলা সব।

—মামা! মামা!

আস্তে আস্তে ডাক শুনে চমকে উঠলেন গোকুলচন্দ্র। কে কে?

—আমি সুগতা। ওঠ, সময় হয়ে গেছে। ওর গলায় খুশি চাপা থাকছে না।

চমকে উঠে গোকুল দুই চোখে হাত দিলেন। তাঁর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। এদিকে বাড়ি প্রভাত সুগতা তাঁকে ডাকছে। সময় হয়ে গিয়েছে!

উঠে বসতে গিয়েও চোখের জল গোপন করতে পারলেন না। সুগতার অবাক গলা শোনা গেল, একি মামা, তোমার চোখে জল কেন?

জল কেন? গোকুল হেসে উঠলেন। সহসা যেন তাঁর সব আবার মনে পড়ল, আর আনন্দে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলেন। বললেন, জল কেন? জল আবার কেন রে? খুশীতে প্রাণের খুশীতে।

সুগতা হেসে উঠে বলল সত্যি মামা, আমার কিন্তু আজ কাঁদতেও ইচ্ছে করছে জান?

বলতে বলতেই ওর হাতের গরম জলে ভেজানো তোয়ালে গোকুলের মুখের ওপর এসে পড়ল। ঘষে ঘষে মুখ মুছিয়ে দিতে লাগল।

গোকুল বললেন, করবেই তো। আনন্দেই তো চোখে জল আসে মা।

সুগতা তাড়াতাড়ি গরম জলের গেলাস গোকুলের মুখে ধরে বলল, কিন্তু আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি মুখ ধোও। মা এসে পড়ল বলে চা নিয়ে। ওদিকে শুভেনবাবু এসে পড়েছেন। নিচে বসে আছেন।

গোকুল জল কুলকুচো করে, সুগতার সামনে ধরা পাত্রে ফেললেন। বলে উঠলেন, শুভেন এসেছে? ডাক, শুভেনকে ডাক।

শুভেনের গলার স্বর বেজে উঠল দরজার কাছে, আমি এসেছি।

গোকুল হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, এস, এস বাবা, আমার কাছে এস।

শুভেন খাটে এসে বসল। গোকুল তার কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিলেন।

দিদির গলা শোনা গেল, চা এনেছি গোকুল।

গোকুল যেন ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, রাখ গো দিদি, চা রাখ এখন। একটু বস আমার কাছে। সুগতা তুই কোথায়।

—এই যে।

—আয়, কাছে আয়, বোস।

বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। কিন্তু হাসি লেগেছিল মুখে।

শুভেন বলে উঠল, সময় নেই আর মামাবাবু।

গোকুল উচ্চারণ করলেন, সময় নেই, জানি বাবা, সত্যি সময় নেই।

বলে শুভেনকে আরও কাছে আকর্ষণ করে প্রায় চুপিচুপি গলায় বলে উঠলেন,

শুভেন, আর সময় নেই। রাগ করো না যেন, কিছু মনে করো না, এই সামান্য চোখের পর্দা সরিয়ে কিছু দেখবার আর দিন নেই।

বলতে বলতে অনুভব করলেন, ঘরের সবাই বিস্মিত থেকে যেন পাথর হয়ে গেল।

সুজতা অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল, মামা

—হ্যাঁ মা।

দিদি ডেকে উঠলেন, গোকুল।

—দিদি!

শুভেন ডেকে উঠল, মামাবাবু।

—বাবা!

শুভেনের গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন গোকুল, এই চোখের দরজা খুলে আমি আর কী দেখব বল। আমার যেটুকু, তা যে আমার সব দেখা হয়েছে। আমার অন্ধকারে যে সব দেখেছি!

গোকুলের চোখে জল এসে পড়ল। কিন্তু সংকুচিত হলেন না। মুছলেন না। ডাক দিয়ে বললেন, দিদি, তোমাকে আজ ছাড়ব না। কাছে এস। আজ, দিদি আজ তুমি সেই গানটা গাও।—আমি অন্ধকারেই থাকি, তুমি আঁধার রাতেই এস।

দিদির বৃদ্ধ গলা শোনা গেল, গোকুল।

—গাও দিদি, লক্ষ্মীটি গাও।

বৃদ্ধা দিদি তাঁর ভাঙা ভাঙা সরু-গলায় গান ধরলে,

আমি অন্ধকারেই থাকি
তুমি আঁধার রাতেই এস।—

গোকুল অনুভব করলেন, শুভেন তাঁকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরেছে। সে কানের কাছে মুখ এনে বলল, মামাবাবু, আপনি যে ঘাস ফুল দেখতে চেয়েছিলেন?

গোকুল আবার চুপিচুপি গলায় বললেন, দেখছি, দেখতে পাচ্ছি শুভেন। সাদা-লাল-নীল ঘাস ফুল, তাতে শিশির পড়েছে, রোদে চিকচিক করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে কত ঘাস ফুল। আমি তাদের গন্ধ পাচ্ছি।

দিদির গলা আরও মৃদু শোনাচ্ছিল,

অন্ধকারেই বসত করি,
তুমি গোপনে এসে বস॥

রেডিয়োতে ঘোষণা শুনছি—এবারের [illegible] ২০৮ বৎসরের [illegible] জার্মানিতে দেখা যায়নি। [illegible] যাই যখন এমন শীতের প্রচণ্ড [illegible] মধ্যেও এদের এই উৎসবের বিপুল আয়োজন আর উদ্দামতা। [illegible] উৎসব আর জার্মান [illegible] সারা শীতকাল [illegible] বহির্মুখী শীতের [illegible] রাইনল্যান্ড অর্থাৎ [illegible] সেই উৎসব [illegible] Silvester [illegible] মধ্য দিয়ে যে [illegible] বৎসর [illegible] বৎসরের উৎসব [illegible] ধরা দেয় যেন Fasching এর উৎসব। এদেশের মানুষের জীবনে Fasching বা কার্নিভালের স্থান আর প্রভাব যে কী ব্যাপক তা না জানলে জার্মানদের জীবনের এক বিরাট অংশ অচেনা থেকে যায়।

অনেকেই হয়ত জানেন যে জার্মানীর রাইনল্যান্ড অর্থাৎ Koeln থেকে আরম্ভ করে Mainz (মাইনৎস) পর্যন্ত রাইন নদী তীরের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল শুধু জার্মানী কেন সমগ্র পৃথিবীর এই কার্নিভেল উৎসবের মক্কাভূমি। যদিও দক্ষিণ জার্মানীর বাভেরিয়া অঞ্চল অস্ট্রিয়া ইটালী স্পেন ফ্রান্স আর দক্ষিণ আমেরিকার মত বিপুল ক্যাথলিক সম্প্রদায় অধ্যুষিত ভূখণ্ড জুড়েই কার্নিভেলের উদ্দাম উৎসব। তাই কার্নিভেলে নর-নারীর পারাবারবিহীন গান শুনতে পাওয়া যায় সেখানে—

"De biggest bacchanal is
in Trinidad Carnival,
All you got to do when
de music play
is take your man
and break away,
Regardless of colour,
creed or race
Jump up and shake
your wais'
So jump up there man,
dis is Trinidad
We don't care who
say we bad

উপরের শেষ লাইনটির মধ্যে রয়েছে প্রায় সমগ্র পৃথিবীর কার্নিভেল উৎসবের প্রকৃত চিত্র। সত্যি এমন ব্যাপক উদ্দাম আর উন্মত্ত ফেস্টিভেল আর দ্বিতীয়টি নেই। আর সুরার এমন বন্যা বর্ষার প্লাবনকেও হার মানায়। সেখানে পুরুষ আর নারীর কোন ভেদাভেদ নেই মাতাল হয়ে ওরা গভীর উল্লাসে ডুবে যাবে ভুলে যাবে সারা বৎসরের সারা জীবনের দুঃখকে। মুখোশ পরচুল আর বিচিত্র পোশাকের আড়ালে

ক্লাব সংঘ বা সমিতির মত বিশ্ববিদ্যালয় আর ছাত্রাবাসগুলিও ফাসিং-এর উৎসব উদযাপন করে। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে বড়জোর ছাত্রছাত্রী মাত্র ২৫০। সেই সাথে আরো কয়েকশ আগন্তুক। চারদিনের উৎসবে ৭৫০০ বোতল বীয়ার আর সেই অনুপাতে হুইস্কি থেকে আরম্ভ করে আর সব প্রকার উপকরণই খরচ করা হয়। রাইনল্যান্ড অঞ্চলের তুলনায় এ অবশ্য কিছুই নয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ফাসিং এর ফেস্টিভেল যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। এ উৎসব ঐতিহ্যবিহীন নয়। কবে কোথায় এর প্রথম উৎপত্তি কেউ তা বলতে পারে না। কেবল যুগে যুগে দেশ কাল সমাজভেদে উৎসব বিভিন্ন রূপ

পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বন্ শহরের কার্নিভাল উৎসবে ডাঃ আদেনাউয়ার। মুখোশ পরা অন্য কেউ নয়, স্বয়ং চেন্সেলার অভিনন্দন জানাচ্ছেন কার্নিভালের প্রধান নায়ক নায়িকা জুটিকে (Karnevalsprinzenpaar) যাদের মত এই প্রধান নায়ক-নায়িকা জোড়াকে প্রত্যেক শহরের কার্নিভাল কমিটিই বৎসরের কার্নিভাল উৎসবের উদ্বোধনে নির্বাচন করে নেয়।
ফটো : UFA

অন্যান্য কারণ সেখানে দেহ মাংস বা [illegible] কোন ভূমিকা নেই আছে শুধু [illegible] মুক্তির জন্যে দেহের [illegible] দেওয়া kiss the flesh good bye [illegible] লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্ট পাওয়া যায়

And nowhere do professed Christians kiss the devil good bye with more gusto than in Brazil and Trinidad. রিও ডি-জেনেরো শহরের এ বছরের কার্নিভালের ফলাফল মোট ২৮০০ জন হতাহত। ৫৭ জনের আত্মহত্যা ৫ জন খুন ২১৯ জন অগ্নিদগ্ধ ২১৯ জন আক্রান্ত ৩০৯ জন কেবল ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে আহত এবং ৩৫১৭ জন নানাভাবে সামান্য আহত। জার্মানীর হিসাবটা আমার ঠিক জানা নেই। তবে এখানকার ফাসিং-এর উৎসবে মদ্যপানের ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি। এখানকার বিভিন্ন

নিয়েছে। যদিও এখানে বহু ছাত্র-ছাত্রী [illegible] জিজ্ঞাসা করে কোন সঠিক উত্তর পাইনি। সবাই বলে কার্নিভালের আসল মহিমা আর বৈচিত্র্যতত্ত্ব জানতে হলে রাইনল্যান্ড আর বায়ার্ন অঞ্চলে গ্রামের বুড়ো বুড়ীদের কাছে যেতে হবে। বুড়ী ঠাকুমাদের মুখে অনেক গল্প শুনতে পাবে। তার কারণ, প্রাচীনকাল থেকে এটা গ্রামের সংস্কৃতির সাথে জড়িত। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্বেই এর ব্যাপকতা দেখা যায় নতুন বৎসরের উৎসবে আর প্রকৃতির নবজন্মে, হয়ত ফসল উৎপাদনের সাথেও এর বীজ নিহিত আছে। যদিও আরো ঘনিষ্ঠভাবে কার্নিভালের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় ইতালীতে, প্রাচীন রোমের Saturnalian' উৎসবের সাথে। এখনো ইতালীর ভেনিস শহরের কার্নিভালের খ্যাতি জগৎ জোড়া। তারই ক্রমবিকাশ ঘটে পরবর্তীকালে উত্তরাঞ্চলের দিকে। ভিয়েনা, রাইনল্যান্ড,

শোয়াব অঞ্চলের কোন গ্রামের কার্নিভ্যাল হিসেবে স্থানীয় হান্সেলে (Hansele) বেশ পরিচ্ছদে প্রতীকমান ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিস্কুট আর লজেন্স বিতরণ করে যাচ্ছে। এদের বলা হয় শ্নুপ্‌ফেন (Schnupfen)। ফটো : Ilse Schell

ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল, জার্মানীর রাইনভূমি আর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে। পূর্ব আর উত্তর জার্মানীতে সংস্কৃতিগতভাবে মানুষের জীবনে আর উৎসবে কার্নিভ্যালের কোন স্থান নেই। শুধু ফূর্তির সাথে যতটুকু সম্বন্ধ। এখন অবশ্য সারা জার্মানীর মত চেকোশ্লোভাকিয়া আর পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও ছেলেমেয়েরা তথাকথিত ফাসিং বা কার্নিভাল উৎযাপন করে কেবল মদ, মেয়ে আর নাচের তাগিদায়। এর সাথে ধর্ম বা সংস্কৃতির কোন যোগাযোগ নেই। তাইত এদেশের ধর্মযাজকেরাও দুঃখ করে বলেন— ধর্মের সমস্ত মহিমা বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে কার্নিভাল বর্তমানে কেবল একটা যৌন উৎসবে পরিণত হয়েছে। যাঁর আত্মসমালোচনায় বিমুখ নয় এমন কয়েকজন ছাত্র সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছে ছাত্র ছাত্রীদের এই কার্নিভালের [illegible] পরিণতি যৌন উৎসবে।

অথচ কার্নিভাল কথাটির মধ্যে রয়েছে একটা গভীর তত্ত্ব। কথাটা ঠিক কোথা থেকে এসেছে তা সঠিক মানুষের জানা নেই। তবে মধ্যযুগীয় ল্যাটিন ভাষাতে

শোয়াব অঞ্চলের oberndorf শহরে Fasnet বা কার্নিভ্যালের উৎসবের দিনে Schantleরা দল বেঁধে শহরের পথে বেরিয়েছে। পরনে এদের বিচিত্র পোষাক, মুখে কাঠের মুখোশ। কারো কারো এই মুখোশ ৬০০ বছরের পুরনো। পথ দিয়ে যাবার সময় শান্টলেরা কমলা লেবু ও লজেন্স বিলিয়েও যায়।

ফটো : Ilse Schell
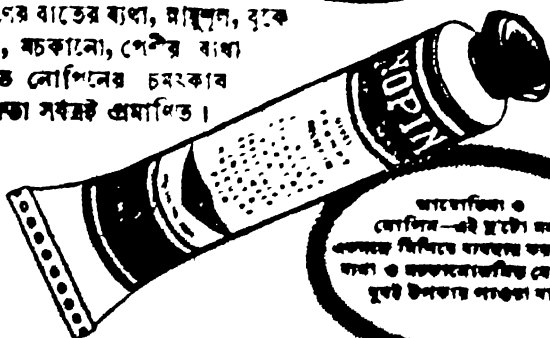
carnem levare অথবা carnelevarium শব্দ পাওয়া যায় যার অর্থ to take away meat অথবা to remove meat, যার উদ্দেশ্য ৪০ দিন ব্যাপী (ঈস্টার পর্যন্ত) অনশন সময় শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তের সর্বশেষ পানভোজনের লৌকিক উৎসব [illegible] 'কথাটির অনেকগুলি ব্যাখ্যা হতে পারে। ৪০ দিনের অনশন কালে মাংস একেবারে বর্জনীয় অর্থাৎ দৈহিক সুখ সম্ভোগের অবসান। এই সময় দেহসুখের [illegible] খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানুষেরও [illegible] এই বেদনাকে অনুভব করার জন্য। দেহকে একেবারে ভুলে যেতে চায়। আর একটা অর্থ হতে পারে এই উৎসবে দেহ লৌকিক ব্যক্তির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবিহীন-সমাজের সমস্ত বন্ধন আর সংস্কারের বাইরে আত্মার আনন্দ। অবশ্য এ উৎসব একান্তভাবেই ক্যাথলিকদের।

এই উৎসবের উদ্বোধনী দিন তারিখ নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা আছে। অবশ্যই দেশ ও স্থানান্তরের জাতীয় সংস্কৃতিগতভাবে কার্নিভ্যালের উদ্বোধনী সময় বিভিন্ন। তাই [illegible] কার্নিভ্যাল শুরু হয় ৬ই জানুয়ারী, অথচ রাইনভূমিতে একাদশ মাস অর্থাৎ নভেম্বরের একাদশ দিবসে, এগারোটা এগারো মিনিটে। তারপর এই উৎসব একটানা ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহের রবি, সোম, মঙ্গলবারে চরমে পৌঁছায়। সাধারণ-

১০) বাধ্য হয়ে কার্নিভ্যালের এই সীমাহীন উন্মাদনার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল।

তাইত দেশে দেশে কালে কালে ইউরোপের প্রচুর সাহিত্যে কার্নিভ্যালের প্রত্যক্ষ ছাপ দেখা যায়, কার্নিভ্যালের গভীর ভূমিকা রয়েছে এদেশের প্রাচীন নাটকে গানে আর লোকনৃত্যে। জার্মানীতে যত আমুদে লোকসঙ্গীত রয়েছে, তার বেশীরভাগ কার্নিভ্যাল থেকে উৎপত্তি। এমন কি ইহুদীদের Purim উৎসবের মধ্যেও রয়েছে কার্নিভ্যালের প্রচ্ছন্ন ছায়া। কোন কোন ক্ষেত্রে ফাসিং সমাজ সংস্কারের ভূমিকাও গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে শোয়াবল্যান্ড বা শোয়েবিশ্ অঞ্চলের (স্টুটগার্টের দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চল) কার্নিভ্যালের Fastnacht (অনশন রাত্রি) বা Fasnet-এর (আঞ্চলিক কথাভাষায়) উৎসব উল্লেখযোগ্য। শোয়াব অঞ্চলের মানুষেরা চরিত্রগত-ভাবে জার্মানীর অন্য অঞ্চলের চাইতে বেশ আলাদা। এঁরা একদিকে যেমন ধার্মিক সত্যপরায়ণ, বিনয়ী এবং হিসেবী তেমনি অন্যদিকে খুব রক্ষণশীল। তাই আমাদের দেশের ছোট শহর বা গ্রামের মত এখনও বেশ পরনিন্দা, পরচর্চা চলে। তবে এরা এই নিন্দাচর্চাটা সারা বছর না করে বছরের এই ফাসেনাট্ বা কার্নিভ্যালের সময় বেছে নিয়েছে। এই সময় যে রকম ইচ্ছে, নানা রঙের পোশাকে সঙ্ সেজে (এদের বলা হয় Schantle বা শান্‌টেলে, আমাদের সঙ্ কথার সাথে উচ্চারণগত মিল পাওয়া যায়) হোটেলে রেস্তোরাঁয় বা কোন জনসমাগমে নিজের জানামত কোন্ বাড়ির কর্তা কি কাণ্ড করেছেন কার বউ কি কুকীর্তি করল—সেসব হাঁড়ির খবর নানানভাবে রসিয়ে প্রচার করে বেড়াবে। এই সময় কারো কিছু বলবার অধিকার নেই। যদি কেউ সেই শান্‌টেলেকে চিনেও ফেলে তবু তার নাম বলতে সে পারবে না। নাম বলে দেওয়াটা মারাত্মক অপমানজনক। সমাজের নোংরামি দূর করার এই প্রথাটি এঁরা কার্নিভ্যালের সময় বেছে নিয়েছে। এক সময় কলকাতার জেলেপাড়া সং-এর সঙ্গে এদেশের এই প্রথার কিছুটা মিল পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বহুস্থানে কেবল নাচ-গান নয়, অতীতের রোমের কার্নিভ্যাল স্পোর্টস এর মত খেলাধূলা ও ঘোড়দৌড়ও কার্নিভ্যালের অঙ্গীভূত। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বহুস্থানে ঘোড়ায় চড়া, মেরী-গো-রাউন্ডস এবং ফেরিস হুইলস খেলায়, সেই সাথে মেলার সমাবেশে কার্নিভ্যাল উদ্‌যাপিত করা হয়।

এখানে ছেলেমেয়েরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আমাদের দেশে ফাসিং হয় কি না। আমার চোখের সামনে তখন এ-দেশের ছেলে-মেয়েদের ফাসিং-এর দৃশ্য ভেসে ওঠে। ফেব্রুয়ারী মাস আরম্ভ হলেই বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রাবাস ফ্যাক্টরী নাচের দোকান আর ক্লাবগুলিতে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় ফাসিং এর কাল্পনিক হল তৈরী করবার জন্য। এক-একটা বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে নাচের হল রচনা করা হয়। ছাত্রাবাসে ব্রেখ্‌ট-এর তিন পেনিগের অপেরা বল, আর্ট কলেজের সিনেমার বল, আর্ট স্কুলের ল্যাটিনা মাগিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সেখানে বিভিন্ন আলো আর আঁকাবাঁকা ভাঙাচোরা ছোটখাটো ঘর আর অলিগলি তৈরি করা হয়—যেখানে ছেলেমেয়েদের বন্ধুর অভিসারের চরম সুযোগ থাকে। আর হলের দেয়ালে দেয়ালে যার যে রকম ইচ্ছে ছবি আঁকার অধিকার থাকে। সেখানে নর নারীর দেহ সম্পর্কিত যত প্রকারের অবদমিত ছবি মনের ভেতর লুক্কায়িত থাকে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে ছেলে-মেয়েদের যৌথ তুলির আঁচড়ে। একটি দেয়ালে সেখানে বড় বড় হরফে [illegible] লেখা দেখেছিলাম [illegible] কোন স্থান নেই, [illegible] নেই। সন্ধ্যার নাচের হলে ঢোকার দুই ছেলেমেয়ে একত্রিত হবে [illegible] রঙের বন্যায় ভেসে যাওয়া অর্ধনগ্ন দেহের মাংসপিণ্ডগুলি আস্তে দুলে উঠবে আস্তে আস্তে রাত্রি গভীর হবে বিরাট হলটা অন্ধকার হয়ে আসবে প্রচণ্ড উন্মাদনার বাজনার যন্ত্রগুলি আর ছেলেমেয়েদের চীৎকার ক্রমশঃ থাকবে বিকৃত উল্লাস—তার পরের বর্ণনাটুকু থাক। গত বৎসর এক ভদ্রমহিলা বলছিলেন—আমার বাবা পূর্ব জার্মানীতে ধর্মযাজক। উনি যদি এখানে আসতেন তবে আপনার মত উনিও অবাক হয়ে যেতেন। তবে একটা কথা, ওদের ফাসিং-এ সর্ব রকমের অশ্লীলতার পরেও যে "ফ্যান্‌-টাসী"র পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রশংসনীয়।

ডেলী টেলিগ্রাফের সর্বশেষ মন্তব্য—"The full effects begin to make themselves felt in Trinidad a few months after carnival and are reflected in a perceptible increase in the birth-rate towards the end of the year."

খবর নিলে, জার্মানীর জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবটা হয়ত এভাবেই পাওয়া যাবে।

॥ ১০ ॥

ক্যানিবান (১)

একদিন সকালবেলা কর্নেল ব্রিজম্যানের কাছে জীবনলালের ডাক পড়লো। ব্রিজম্যান বলল, জীবন, গতকল্য সিপাহীদের কামানের গোলা হিন্দুরাও কুঠি পর্যন্ত এসে পৌঁচ্ছেছিল।

জীবন বলল, আমি রেসালা (cavalry) নিয়ে সবজিমণ্ডির দিকে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে শুনলাম।

ব্রিজম্যান বলল, অনেকগুলো আস্ত গোলা আজ সকালে আমাদের ভিস্তিঅলা আর খানসামারা সংগ্রহ করেছে। কয়েকটা আস্তগোলা গড়িয়ে গিয়ে কুঠীর তয়খানায় (underground cellar) নাকি ঢুকেছে।

জীবন বলল, ওদের বলছি ভিতরে ঢুকে কুড়িয়ে নিয়ে আসুক।

পয়সা পাবে বলে ওরা ভিতরে ঢুকেছিল, কিন্তু তখনি ভয় পেয়ে পালিয়ে চলে এসেছে।

ভয়! কিসের ভয়? শুধায় জীবন।

তা ভালো করে বলতে পারে না। আচ্ছা ওদের ডাকো তো।

ঘরের বাইরে দীদার বক্স আর হাজি মিঞা অপেক্ষা করছিল। তারা ভিতরে এলে ব্রিজম্যান জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছিল ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলো তো রেসালাদার সাহেবকে।

দীদার বক্স আর হাজি মিঞা দুজনেই দীর্ঘকাল কোম্পানীর ফৌজে আছে, ব্রিজ-ম্যানের রেজিমেণ্টের সঙ্গেই আছে, দীদার বক্স ভিস্তিঅলা, হাজি মিঞা খানসামা। তারা বলে অনেক লড়াই, অনেক গদর অনেক হাঙ্গামা দেখেছে, ভয়ডর তাদের নাকি আর নাই। ব্রিজম্যান বলল তোমরা ভয় পেলে কেন?

দীদার বক্স বলে, ইয়া আল্লা! ভয়? ভয় কেন পাবো? আমি কত মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার দেখেছি, ডরভয় আমার নাই।

হাজি মিঞাও কম যায় না।

রেসালাদার সাহেব, কামানের গোলা [illegible], আমি [illegible] মাথায় নিয়ে সামি হাজির [illegible] নম্বর মৌলও যাচ্ছি। ভয়ডর পাবে আমার দুশমন।

দীদার বক্স বলে হাজি ভাই মনে আছে তো, সেদিন ভিস্তির মুখ খুলে দিয়ে এমন তোড়ে জল ছুটিয়ে দিলাম যে এক শালা সিপাহী পা পিছলে পড়ে গেল।

আরে সে বুদ্ধি তো আমি দিলাম তোমাকে।

সে তো দিলে লেকিন কাজটা কেন্ কিয়েছে।

হাজি মিঞা বলে, কাজ তো সবাই করতে পারে বুদ্ধি দিতে পারে কয়জনে?

উভয়ের এই আপোসে বাগ্‌বিতণ্ডার সঙ্গে ব্রিজম্যান পরিচিত। সে বলল তোমরা দু'জনেই সমান বাহাদুর, এখন বলো কি হয়েছিল।

উভয়ে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আপাতত তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল, কাজেই আসল ঘটনা বর্ণনায় আর বাধা রইলো না।

ব্রিজম্যানকে লক্ষ করে দীদার বক্স শুরু করলো তহ্‌খানায় আমি পহেলা ঢুকেছি।

হাজি মিঞা বলে আরে আমি তোমাকে রাস্তা ছেড়ে দিলাম তবে তো পহেলা ঢুকলে

হাজি ভাই ঝুটা বলো না তুমি তো আমাকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে।

দীদার ভাই, রাস্তা সরু, একজনকে তো আগে যেতে হবে আগে পানি পরে খানা। আমার কি দোষ?

ব্রিজম্যান বলে, তোমাদের কারো দোষ নেই, এখন বলো ভিতরে কি দেখলে?

কুছ্ না হুজুর।

তবে পালিয়ে এলে কেন?

উভয়ে এক সঙ্গে বিস্ময়ে বলে ওঠে, ইয়া আল্লা? ভাগকে আয়া? কভ্‌খনো না। ভাগ যাতা মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার। হাম লোগ কভি ভাগা নেহি।

ছুটে বাইরে তো চলে এলে? তবেই হ'ল।

হুজুর আগে তো বাহার এলো হাজি ভাই।

আরে দীদার ভাই, আমি তো পিছাড়ি [illegible] যাবার এরাদা।

জীবন শুধায়, হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

ভয়? দুজনে এক সঙ্গে তারস্বরে অস্বীকার করে। ভয় পাবে মারাঠা ডাকু, শিখ গাঁওয়ার, দুশমন সিপাহী। ডরভয় তারা অনেকদিন বিসর্জন দিয়েছে।

ভিতরে কোন শব্দ শুনলে কি?

এবারে ঠিক বলেছেন হুজুর। এক আবাজ।

দীদার বক্স প্রতিধ্বনি করে বলে, এক আবাজ।

কিছু দেখতে পেলে কি?

বাপরে বাপ। ভিতরে বিলকুল অন্ধেরা। হুবু।

তিন চার সিপাহী ছিপকে আছে।

হাজি মিঞা পিছিয়ে থাকবে কেন? বলে,

হুজুরের পাঁচটা ছটা সিপাহী হবে। ইয়া দাড়ি।

ইয়া মুচ।

জীবন বলে, তোমাদের চোখের তো খুব তেজ, বিলকুল অন্ধেরার মধ্যে দাড়ি মুচ দেখতে গেলে।

বিলকুল সফেদ তাই তো নজর হ'ল।

জীবন বলল, বেশ আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসছি, তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

জীবন বলে হাজি মিঞা, এবারে ভিতরে যাওয়ার পালা।

হাজি বলে, আমি আগে বাইরে এসেছি, তাই তুমি আগে ভিতরে যাবে।

জীবন বলে, তোমাদের কাউকে আগে যেতে হবে না, আমি যাবো আগে, তোমরা পিছনে পিছনে আসবে। কেমন?

দুজনে এক সঙ্গে বলে ওঠে, বহুৎ খুব। তারপরে বলে একটা চেরাগ নিয়ে আসি, ভিতরে বিলকুল অন্ধেরা।

তারপরে উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দুজনে ছুটে চলে যায় বোধ করি চিরাগ আনতেই বা।

জীবনলাল হেসে ওঠে।

ব্রিজম্যান বলে, ওরা আর ফিরবে না।

জীবন বলে আমি দেখে আসছি ব্যাপারটা কি হয়েছে।

একটা কিছু অস্ত্র নিয়ো।

অস্ত্র নিতে হবে বই কি। এক আধজন সিপাহীর লুকিয়ে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

জীবনলালকে তহ্‌খানায় ঢুকতে উদ্যত দেখে স্বরূপ ও গুরুবচন সিং সঙ্গে যেতে রাজি হল। চলো আমরাও যাই।

জীবন বলল, ভিতরে অল্প জায়গা তার উপরে অন্ধকার, তিনজনে ঢুকে শেষে কি নিজেরা মারামারি ক'রে মরবো। তাছাড়া ভিতরে সিপাহী আছে মনে হয় না।

স্বরূপ বলে, আমারও তাই মনে হয়। ইংরেজের নামে সিপাই কাঁপে। সেই সিপাই যে সাধ করে এখানে এসে লুকিয়ে থাকবে, বিশ্বাস হয় না।

গুরুবচন বলল, সিপাহী না হোক জানোয়ার তো হ'তে পারে।

জীবন হেসে বলে, জানোয়ার না হোক পাখী নিশ্চয় হবে, খুব সম্ভব বাদুড়।

বলো কি বাদুড় নিয়ে এত কাণ্ড।

হ'তেই হবে স্বরূপজী। ভিতরে ঢুকে-ছিল কারা ভুললে চলবে না, বলে হেসে ওঠে জীবনলাল।

দীদার বক্স ও ফজ্লি মিঞার কথা মনে পড়ে স্বরূপের। বলল এ দুটি জীবনে [illegible] হে। কখনো দেখিনি।

এর পরেও এদের জুড়ি দেখতে পাবে না।

তা বটে চেহারা দেখেই অবশ্য এদের চমৎকারিত্ব। দীদার বক্স যেমন লম্বা তেমনি রোগা তেমনি মিশকালো আর ফজ্লি মিঞা যেমন মোটা তেমনি বেঁটে বড়টা তেমনি টকটকে লাল।

স্বরূপের কথা শুনে গুরুবচন বলে ওই ওরা ফৌজে না এসে পার্শী থিয়েটারে গেলে অনেক বেশি রোজগার করতে পারতো।

ইতিমধ্যে জীবন তৈরি হ'য়ে নিয়েছে। অতটুকু ঘরের মধ্যে বন্দুক ও তলোয়ার চলবে না বলে হাতে নিয়েছে পিস্তল আর কোমরে গুঁজেছে নেপালী কুকরি ছোরা।

স্বরূপ বলল, আমরা দুজন দরজার কাছেই আছি, দরকার হলেই ডাক দিয়ো।

তহখানার ভিতরে নামবার সিঁড়িতে আগাছা জন্মে গিয়েছে। দু'হাত দিয়ে আগাছা ঠেলে সরিয়ে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে নেমে গেল জীবন-লাল। প্রথম কিছুক্ষণ ক্ষীয়মান আলোতে বিলীয়মান তার মূর্তি দেখা গেল তারপরে একবার মোড় ঘুরতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

সশস্ত্র স্বরূপ ও গুরুবচন সিঁড়ির মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো [illegible] পাহারা করে। [illegible] সিঁড়ি [illegible] ঈশানকোণে বের

মানুষও নয় সিপাহীও নয় খুব সম্ভব একটা নেকড়ে।

নেকড়ে! বলো কি এলো কোথা থেকে? চমকে ওঠে গুরুবচন।

স্বরূপ বলে, আমার মনে হচ্ছে খুব কাছেই ছিল। মেটকাফ সাহেবের বাড়ির প্রকাণ্ড হাতার মধ্যে একটা চিড়িয়াখানা ছিল। সাহেব পালালে সিপাহীরা সেগুলোকে ছেড়ে দেয়। আমার মনে হচ্ছে তারই একটা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

আর গুলো সব গেল কোথায়?

ঠিকানা দিয়ে যায়নি গুরুবচন সিং। তাদের খোঁজ না হয় পরে করবো, এখন তোমার হাতের বন্দুকটা দাও।

বন্দুকটা এগিয়ে দিতে দিতে গুরুবচন শুধায় একাই যাবে?

সঙ্গী নেওয়া চলবে না, জায়গা খুব অল্প, হাতে বন্দুক থাকলে আর ভয় কিসের?

আবার সে ভিতরে চলে যায় বন্দুক নিয়ে।

কয়েক মিনিট পরেই বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় ওরা মাটির নীচে বলে সে আওয়াজ যেন ভীমের হুঙ্কারের মতো গম্ভীর। ওরা যখন আশা করছে জীবনের প্রত্যাবর্তন তখন ভিতর থেকে আর একটা আওয়াজ উঠল যার সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কিছু তারা কখনো শোনেনি। হিংস্র শ্বাপদের ক্রোধের সঙ্গে মানুষের বুকফাটা হাহাকার, বজ্রগর্ভ কালবৈশাখীর মেঘের গর্জনের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে একটা অতিকায় সত্তা [illegible] তা তার তুলনা হলেও হতে পারে। প্রখর দিনের আলোয় একাধিক ও অস্ত্রসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এ ওর দিকে চায়। কি করবে ভেবে পায় না। তখনি আবার সেই গর্জনই নৈসর্গিক না অতি প্রাকৃত ভিতরে যাওয়া উচিত কিনা প্রভৃতি চিন্তায় যখন ওরা ন যযৌ ন তস্থৌ দেখতে পেলো লম্বা লম্বা পা ফেলে এক সঙ্গে তিন চারটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল জীবনলাল। তার কাপড়ে রক্ত, কপালে ঘাম, মুখমণ্ডল অনিশ্চিত আতঙ্কে মসি ঢালা।

কিসের শব্দ জীবন ভাই?

জানি না বলে ব'সে পড়লো একখানা পাথরের উপরে।

ওরা দেখল বন্দুক নেই তার হাতে। জীবনের মতো দুর্দান্ত সাহসী পুরুষের হাত থেকে বন্দুক খ'সে পড়ে যে ভয়ে, তা অনৈসর্গিক না হয়ে যায় না।

জানোয়ার না আর কিছু?

উত্তর দিল না জীবন। সাময়িকভাবে তার কথা বলবার শক্তি লোপ পেয়েছে। অর্থহীন বিভ্রান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ অন্ধকার তহখানার গুহা মুখে।

ঐ অদৃশ্য জীবকে জয় না করা অবধি ফিরবার অধিকার আমার কোথায়?

জীবন ও স্বরূপের মধ্যে যখন কথা চলছিল সেই সময়ে গুরুবচন ঘরে গিয়ে এক বোতল Rum নিয়ে এলো। বেশ খানিকটা Rum খেয়ে নিয়ে চাঙ্গা হ'য়ে উঠল জীবন। তখন ওরা প্রশ্ন শুরু করলো।

কি হয়েছিল বলো তো।

জীবন শুরু করে। তহখানায় ঢুকে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত ক'রে নিতে চেষ্টা করছি এমন সময়ে বাঁ দিকে শুনতে পেলাম নিশ্বাসের শব্দ। ততক্ষণে চোখ সতেজ হ'য়ে উঠেছে, ঠাহর ক'রে দেখে মনে হল কি একটা জানোয়ার গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে। হয়তো বা নেকড়েই হবে। গুলি ছুঁড়লাম।

সে শব্দ আমরা শুনেছি, বলে স্বরূপ।

তখন ভাবলাম কি করি, আর একটা গুলি করবো না টেনে নিয়ে উপরে যাবো, ভয়েছে বলেই মনে হলো। এমন সময়ে ঘরের দূরের অন্ধকার কোণ থেকে উঠল গর্জন যার মতো আগে কখনো শুনিনি।

আমরাও শুনেছি সেই শব্দ

জীবন বলে, প্রথম মুহূর্তে মনে হ'ল আরো একটা নেকড়ে লুকিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধকারের মধ্যে ঘনতর অন্ধকারের মস্ত একটা পুঁটুলি। তারপরের মুহূর্তেই মনে হ'ল—না, এতো নেকড়ের আওয়াজ নয়, এমন কি কোন পরিচিত জন্তু জানোয়ারের গর্জনও নয়। এ কিরকম আওয়াজ! এ যেন শব্দের জল-স্তম্ভ, কোন্ পাতাল ভেদ ক'রে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

থামে জীবন। আবার একটু পরে আরম্ভ করে, তোমাদের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ভয় পেলাম, জীবনে এই প্রথম ভয়। মা আমাকে চিনেছিল। বলতো তোর যে একেবারে ডাকাত ছেলে। সত্যি জানতাম না ভয় কাকে বলে। সেদিন যখন কামানের মুখে বেঁধে রেখেছিল তখনো ভয় পাইনি। আজ আমার এই প্রথম ভয়।

গুরুবচন বলে, চলো না তিনজনে মিলে দেখি, ভূতপ্রেত নিশ্চয়ই নয়।

স্বরূপ বলে, পাহাড়ে জায়গা, নিশ্চয় কোন জানোয়ার হবে। গুলির আওয়াজে, সঙ্গীর মৃত্যুতে ভয় পেয়ে গর্জে উঠেছে। সেই ভালো, চলো তিনজন এক সঙ্গে যাই।

জীবন বলে, না তা হয় না, আমাকে একলাই যেতে হবে।

কেন বলো তো?

কেন বুঝলে না? ঐ ভীষণ আওয়াজ চ্যালেঞ্জ করেছে আমার পৌরুষকে। প্রথম দফায় ঘটেছে আমার পরাজয়, ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি। এই তো যথেষ্ট অপমান। এর পরে তোমাদের নিয়ে যদি অগ্রসর হই তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।

এই স্বল্পকালের পরিচয়েই ওরা দুজন চিনেছে জীবনকে, জেনেছে যে বাগ্রাদলের বীরত্ব করা ওর স্বভাব নয়। তবু এ কথা তো বলতে পারে না নিশ্চিত বিপদের মুখে এগিয়ে যাও। তাই চুপ ক'রে থাকে। বিপদের মুখে বন্ধুকে এগিয়ে দেওয়ার ভাষা তারা জানে না। হয়তো সে রকম শব্দও নেই মানুষের অভিধানে। হয়তো সস্নেহ করমর্দন বা আলিঙ্গনই তার একমাত্র ভাষা।

অবশেষে স্বরূপ বলে, যদি যাওয়াই স্থির ক'রে থাকো তবে ভালো দেখে একটা বন্দুক নিয়ে যাও।

না বন্দুকে কাজ হবে না, অন্ধকারে লক্ষ্য ফসকে যাবে। তার চেয়ে একখানা তলোয়ারে অনেক বেশি কাজ হবে।

গুরুবচন কোন কথা না বলে নিজের নতুন তলোয়ারখানা এনে তার হাতে দিল। বিপদের মুখে এগিয়ে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ সম্ভাষণ উপযুক্ত অস্ত্র।

জীবন উঠে দাঁড়ালো।

ওরা বলল, তুমি বাইরে না আসা অবধি আমরা এখানেই থাকবো। আর তেমন যদি প্রয়োজন বোঝো ডেকো।

সেই অন্ধকার গুহামুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে জীবন বললো, ঘণ্টা-খানেক পরেও যদি বাইরে না আসি তবে তোমরা লোকজন নিয়ে গিয়ে আমার মৃতদেহ বাইরে নিয়ে এসো। তারপরে ওদের সঙ্গে নিবিড় করমর্দন ক'রে খোলা তলোয়ার হাতে অটল পদক্ষেপে তলিয়ে গেলো অন্ধকারের মধ্যে।

॥ ১১ ॥

ভবিতব্য (২)

তহখানায় প্রবেশ করার সেই অন্ধকার [illegible]
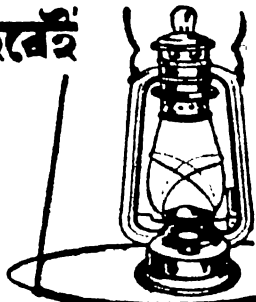
কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে। সেবারে অন্ধকারকে যেমন একটু ঘনতর মনে হয়েছিল, এবারে আর তেমন তো মনে হচ্ছে না। আর একটা কোণের দিকে তাকায়। ঘরটা বেশ প্রশস্ত, সে কোণটা আরও দূরে। সেখানেও কিছু চোখে পড়ে না। তবু কেমন যেন তার মনে হয় ঘরটা শূন্য নয়, তাকে ছাড়া আরও কোন একটা সজীব সত্তার উপস্থিতিকে যেন সে অনুভব করতে পারে। কার যেন নিশ্বাস, কার যেন বুকের স্পন্দন, কার যেন চোখের দৃষ্টি মনের ইচ্ছা দিয়ে ঘরের অনেকটা যেন পূর্ণ। কিন্তু চোখে তো কিছু পড়ে না। অথচ সেই আওয়াজ, সেই ঘনতর অন্ধকারের বোধ এতো মিথ্যা নয়।

হঠাৎ কানে এসে নিশ্বাসের শব্দ। বেশ স্পষ্ট। না ভুল হতেই পারে না। নিয়মিত ছন্দোযুক্ত স্পন্দন। নিশ্বাসজীবী প্রাণীর ঐ তালে সুপরিচ্ছন্ন। চোখ দিয়ে আগা গোড়া ঘরটা জরিপ করতে করতে বাধা পায় সেই জায়গায় যেখানে পড়ে ছিল মৃত জানোয়ারটার দেহ। জীবনের মনে হয় সেখানকার অন্ধকারটা যেন আগের চেয়ে স্ফীততর এবং নিশ্বাসটাও আসছে সেখান থেকেই। জানোয়ারটা বেঁচে উঠল নাকি [illegible] যেতো। তবে স্ফীততর মনে হচ্ছে কেন?

মৃতদেহের কাছে আর একটা জানোয়ার এসে দাঁড়িয়েছে নাকি? এত নিঃশব্দে যে টের পায়নি। ঐ জানোয়ারটাও কি টের পায়নি জীবনের অস্তিত্ব? এই রকম নানা চিন্তার স্রোত দ্রুত ছায়া সঞ্চার ক'রে যেতে লাগলো তার মনের মধ্যে। আবার কি গুলি করবে? না তার আগে বন্দুকের কুঁদো মেঝেতে ঠুকে দেখা যাক।

ঠক্ ঠক্ ঠক্।

নাঃ, কোন সাড়া নেই

আবার সে ঠুকলো, ঠক্ ঠক্ ঠক্।

এবারে উঠলো আবার সেই পূর্বশ্রুত উৎকট আওয়াজ। জীবনের মনে হল আগের বারের মত। তেমন যেন ভীষণ নয় তবু বেশ ভয়াবহ। এখনি আক্রান্ত হবে আশংকা করে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু কেউ এসে পড়লো না তার গায়ের উপর। তার বদলে উঠল আবার সেই করুণে ভৈরবে মিশ্রিত আওয়াজ। তার বিশ্বাস হল আওয়াজ যারই হোক তা অতিপ্রাকৃত কিছু নয়, তারই মতো রক্তমাংসের জীবের। রক্তমাংসের জীব যখন তখন বন্দুক তলোয়ারের ক্ষমতার মধ্যে। নিজেকে বেশ স্বাভাবিক বোধ করলো জীবন।

এ কেমন ধরনের জানোয়ার আওয়াজ করে অথচ আক্রমণ করে না। ঐ মৃত পশুটার বন্ধু নয় তো! না এখন আর গুলী চালাবো না, তার আগে একবার আলো জেলে দেখে নেওয়া আবশ্যক।

তিন লাফে সে বাইরে এসে উৎকণ্ঠিত বন্ধুদের কাছে পৌঁছল—মশাল, মশাল, শিগগির একটা মশাল জেলে হাতে দাও।

কি দেখলে?

মুশকিল, দেখলে আর মশাল চাই কেন? শিগগির দাও।

গুরুবচন জ্বলন্ত মশাল এনে দিলো জীবনের হাতে। যেমন তিন লাফে বাইরে এসেছিল তেমনি তিন লাফে সে ভিতরে গিয়ে পৌঁছল। ঘনতর রহস্যভারে পীড়িত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্বরূপরাম ও গুরুবচন সিং।

এবারে মশালের আলোতে গুহার সব অন্ধকার দূর হল, তবু সব রহস্য দূর হল না। সে দেখতে পেলো, হাঁ, যা মনে করেছিল তাই, একটা নেকড়ে ম'রে পড়ে আছে, অন্ধকারেও গুলি ব্যর্থ হয় নি, একটা গুলিতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার গায়ের উপরে পড়ে ওটা কি! আর একটা নেকড়ে নাকি? ওটা মরেছে বলে তো মনে হয় না, নড়ছে যে। এমন সময়ে জীবনের পায়ের শব্দ ও আলোর আভা পেয়ে সেই জানোয়ারটা মুখ তুলে চাইলো তার দিকে। কী মুখ! ভয়ে কেঁপে উঠে দশ পা পিছিয়ে যায় জীবন! এ কি মুখ! কার মুখ! সে ভাবে এ তো নেকড়ে নয়, অথচ নেকড়ে ছাড়া

আর কী বা বলা যায়। সে আরও খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়, মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে জীবটার মুখের দিকে, তার মনের মধ্যে একসঙ্গে বিস্ময় জুগুপ্সা ভয় মোচড় দিয়ে দিয়ে ওঠে। সে দেখে আর ভাবে, এ কি বনের জন্তু, না বনমানুষ। মুখখানা গোলপানা যেন মানুষের মুখের একমেটে খসড়া কপালের একটু অংশ আর নাক ও চোখ বাদে সমস্ত ঘন লোমে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে যখন হাঁ করছে দেখা যাচ্ছে সূচলো তীক্ষ্ণ দাঁতের সার। জানোয়ার ছাড়া আর কি হবে! অথচ জীবটা যখন তাকায় তার দিকে তখন চোখের চাহনিতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা জন্তু-জানোয়ারে সম্ভব নয়। মনুষ্য সুলভ চৈতন্যের অতি ক্ষুদ্র একটি কণিকা [illegible] কবুণারে সিঞ্চিত হয়ে মাঝে মাঝে চকচক করে ওঠে তার দুই চোখে। জীবটা মৃত নেকড়ের বুকের উপরে দুই [illegible] থাবা ছাড়া আর কি দেখা যাচ্ছে তীক্ষ্ণ, [illegible] ও দুটো পা ছাড়া আর কি [illegible] ঘন লোমে আচ্ছন্ন, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আলোর দিকে, জীবনের দিকে।

একটু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জীবন ভাবে এখন কি কর্তব্য, উপরে গিয়ে ওদের ডেকে নিয়ে আসবে, তারপরে সবাই মিলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে ওটাকে বাইরে। এ ছাড়া আর করবার আছেই বা কী। গুলি করে মারবার কথা ভাবাই যায় না। ওর চোখে যে মানুষের চাহনি। পশু যদি মানুষের মতো তাকাতে পারতো তবে পশু হত্যা করতো কোন্ পাষণ্ড! কিন্তু মানুষ কি মানুষ মারে না! মারে বই কি। তখন মানুষ যে তাকায় পশুর চাহনি নিয়ে।

জীবন ভাবে, আচ্ছা দেখাই যাক না একবার বন্দুকটা তুলে কি করে ও। বন্দুক তুলতেই জীবটা প্রাণপণ বলে আঁকড়ে ধরে মৃতদেহ। জীবন বোঝে ওর ধারণা হয়েছে একবার যখন নেকড়েটা মারা হয়েছে তখন আবার তাকেই মারা হবে তাকে ছাড়া আর কাউকে যে মারা যেতে পারে ভাবতে পারে না ঐ অদ্ভুত জীবটি। এখন জীবন আর এক রকমের পরীক্ষা করে। পায়ের কাছে [illegible]

[illegible] একটা কিন্তু তখনি জীবনের [illegible] চোখের দিকে ঐ [illegible] মানুষের [illegible] আদিম চাহনি [illegible] মানুষ [illegible]।

জীবন ভাবে মানুষে পশুতে মিলিয়ে সৃষ্টি-কর্তার এ কি অনাসৃষ্টি ব্যাপার। জীবন দেখে যে, মশালটা নিবতে শুরু করেছে, সম্পূর্ণ নিববার আগে যা হয় কিছু করা আবশ্যক, কেন না ঐ অদ্ভুতের সঙ্গে আর এক মুহূর্তও সে থাকতে পারবে না অন্ধকারে। তখন সে বাঁ হাতে মশালটা ধরে এগিয়ে গিয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মৃত নেকড়েটাকে মারে এক ঠেলা। অমনি এক কাণ্ড ঘটে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিকট রব তুলে চার হাতপায়ে তেড়ে আসে জীবটা। ভয়ে কৌতূহলে জুগুপ্সায় মশাল ফেলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বাইরে ছোটে জীবন, পায়ের শব্দ বোঝে জীবটা আসছে তাকে তাড়া করে।

জীবনকে দেখে সবাই এগিয়ে যায় [illegible] সংবাদ ও [illegible] ছাড়াও [illegible]। শুধায় কি হলো?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই ওরা [illegible]

জীবন পিছন ফিরে দেখে [illegible] দুটো! [illegible] এলো কোথা থেকে [illegible] এ দুটোর মধ্যেই মিশে ছিল [illegible] চোখে পড়ে নি বুঝতে পারে জীবন। [illegible]

সবাই ভয়ে পিছিয়ে যায় [illegible] কেউ [illegible] সবাই অবাক হয়ে যায়, পশুর মতো চার পায়ে [illegible] আগাগোড়া ঘন লোমে আচ্ছন্ন, পশুর মতো দাঁত নখ [illegible] পশু, নয় কোথায় যেন একটা ক্ষীণ রক্তের সম্পর্ক আছে মানুষের সঙ্গে। [illegible] ভালো করে বুঝতে পারে না ও দুটো কি? মানুষ যা অতীতে ছিল, না যা ভবিষ্যতে হবে!

[illegible] শুনে কর্নেল ব্রিকম্যান আসে, কি হয়েছে?

কর্নেলকে দেখে সবাই জায়গা ছেড়ে দেয় জীব দুটোকে একনজরে দেখেই ব্রিকম্যান বলে ওঠে, Wolfboy! কি আশ্চর্য একেবারে দু' দুটো!

তারপর জীবনদের দিকে তাকিয়ে বলে এ এক বিরল জীব। একবার পুনার কাছে এক পাহাড়ে ধরেছিলাম একটা। অল্পদিন পরেই মরে গেল। মানুষের ঘরে এরা টেঁকে না। যাই হোক, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। কিন্তু খুব সাবধানে, ওরা যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত। মানুষের বুদ্ধি পশুর হিংস্রতা দুই পেয়েছে ওরা। খুব সতর্ক হয়ে ওদের handle করবে।

শিকলে বাঁধা পড়ে অদ্ভুত জীব দুটো।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

ভারতীয় সঙ্গীতের উপেক্ষিত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এমন কয়েক জন প্রধান ব্যক্তির নাম আমরা বিস্মৃত হয়েছি যাঁরা আমাদের বর্তমান সঙ্গীতকে সংগঠিত করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। এযুগেও তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা কম হয়নি, সরকার ব্যয় করেছেন প্রচুর, স্থানে স্থানে অ্যাকাডেমী প্রভৃতি স্থাপিত হয়েছে কিন্তু যাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই তাঁদের কৃতজ্ঞতার ঋণ আজও পরিশোধ করা হয়নি। এর প্রধান কারণ, যে দেশে যে কাজটুকু করা উচিত ছিল সে দেশে সেই কাজের কথা ভাবা হয়নি। উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গবেষণা অনেক বেশী পরিমাণে হওয়া উচিত ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান বিস্তৃতি এই অঞ্চলেই ঘটেছে অথচ এই দুই প্রদেশের সাঙ্গীতিক তথ্য কমই উদ্ঘাটিত হয়েছে। দিল্লী, জৌনপুর, লখনউ কাশী, গোয়ালীয়র

এইসব অঞ্চলের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। বহু সুরকার সঙ্গীতজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তি এইসব স্থানে সঙ্গীত সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন,—সে সব প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোকপাত করবার প্রয় [illegible] এ পর্যন্ত [illegible] হয়নি। এ ছাড়া [illegible] সম্বন্ধেও প্রচুর গবেষণা [illegible] মুসলমান [illegible] এই অঞ্চলে [illegible] সঙ্গীত [illegible] ছিল যেগুলি ক্রমে ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে গেছে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া দরকার।

কিছুকাল হল আকাশবাণী একটি চমৎকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সেটি হল বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীতের প্রচার। যাঁরা সঙ্গীত সম্বন্ধে কাজ করেন তাঁদের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা অসামান্য। উদাহরণ স্বরূপ একদিন গুজরাটের প্রচলিত গানগুলি শুনতে শুনতে এমন কয়েকটি গীতরূপের পরিচয় পেলুম যার উল্লেখ বেশ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা ছিল এই গানগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠান থেকে জানা গেল যে আকৃতির কিছু পরিবর্তন হলেও সেই নামগুলি এখনও রয়ে গেছে। দুঃখের বিষয় আকাশবাণী এই অনুষ্ঠানগুলিকে নেহাৎ "ফীচার" হিসাবে দেখেন। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকলে তাঁরা মূল বক্তব্যগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করতেন এবং সঙ্গীতগুলি স্বরলিপি করে রক্ষা করতেন। আমরা আকাশবাণীকে অনুরোধ করব এখন থেকে তাঁরা এ বিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন করুন এবং বুলেটিনের আকারে চিত্র, স্বরলিপি সহ প্রচারগুলি প্রকাশ করতে থাকুন। মামুলি 'বেতার জগৎ' গোছের পুস্তিকা ছাড়া আকাশবাণীর অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত করবার সুযোগ রয়েছে। অথচ, এদিকে তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না।

উত্তর প্রদেশের পক্ষে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বহুতর গবেষণার ভার গ্রহণ করা সুবিধাজনক এই কারণে যে ওই অঞ্চলের বহু [illegible] ফার্সীতে অভিজ্ঞ [illegible] এই দুটি ভাষায় এমন অনেক গ্রন্থ পাওয়া যাবে যার থেকে ইতিহাসের প্রচুর উপাদান মেলা সম্ভব। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ এই পাঁচটি শতাব্দীর ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে জানতে গেলে ফার্সী উর্দু এবং উক্ত প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি ছাড়া তথ্যনিরূপণের কোন উপায় নেই। এই যুগের সংস্কৃত গ্রন্থগুলি প্রায়ই প্রাচীন সঙ্গীতের পুনরাবৃত্তিতে ভরা। প্রচলিত সঙ্গীত সম্বন্ধে অবহেলা এবং অনুল্লেখ মধ্যযুগের সংস্কৃত সঙ্গীত সাহিত্যকে নিতান্ত দরিদ্র করে রেখেছে। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যকে [illegible] আমাদের [illegible] নির্ভর হবার নয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ [illegible] দু তিনজন ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে যাঁদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প এঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করব গোয়ালীয়রের রাজা মান এর নাম। রাজা মানকে বর্তমান ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনিই একটি সম্মেলন আহ্বান করে তৎকালীন সঙ্গীতের রূপগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং ধ্রুবপদের বিশিষ্ট রূপটি অনুমোদন করেন। শুধু তাই নয় বহু মিশ্ররাগও তিনি নির্ণয় করেন যেগুলি প্রচুর পরিমাণে গাওয়া হয়ে এসেছে। রাজা মান তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলি যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই মানকুতূহল গ্রন্থটি বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় কিনা জানি না। ফার্সী তর্জমা না থাকলে মানকুতূহল সম্বন্ধে জানাই শক্ত হত। যিনি এই গ্রন্থের তর্জমা করেছিলেন তিনি রাজা মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মোগল দরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েও তিনি তাঁকে ভারতীয় সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে তাঁর সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষাশেষিই রাজা মানের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

আর একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন নায়ক বখশু। ইনি রাজা মানের সহযোগী ছিলেন। বস্তুত বখশুর সহায়তায় ধ্রুপদের সংগঠনকার্য বহুল পরিমাণে সহজ হয়েছিল। বখশু বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। কেবলমাত্র গায়ক হিসাবেই এঁর প্রতিষ্ঠা নয় সঙ্গীত জগতের একজন চিন্তানায়ক বলেও এঁর স্বীকৃতি ছিল। তিনি বহু ধ্রুপদ রচনা করেছিলেন। সেইগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। অথচ রাজা মানের মৃত্যুর পর তিনি একাই নবসৃষ্ট ধ্রুপদকে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত

করেছিলেন। যথশুব সময়কার ধ্রুপদের সঙ্গে পরবর্তীকালের ধ্রুপদের তুলনা করবার মত কোন উপাদান আর পাওয়া যায় না। ধ্রুপদের বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করবার মত সম্বল আমাদের কমই আছে। এইসব নায়কদের কীর্তিগুলি বিলুপ্ত না হলে এই দশা ঘটত না।

জৌনপুরের সুলতান হোসেন শর্কীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গীতের অনেক কিছু জড়িত কিন্তু তাঁর সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সুলতান হোসেন খেয়াল গানের উদ্ভাবন করেন এমন কিম্বদন্তী দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত আছে। পুরোপুরি সত্য না হলেও খেয়ালের শ্রীবৃদ্ধি তিনি নিশ্চয়ই করেছিলেন নতুবা এমন একটি কথা প্রচলিত থাকত না। তিনি চুটকলা নামক এক প্রকার কাব্যসংগীত প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি সাধরা (সাদ্রা ?) নামক এক শ্রেণীর গীতের প্রবর্তন করেন। এটি বীররসেও প্রযুক্ত হত। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আদর্শ বলে গণ্য হত। তিনি বারোটি মিশ্র শ্যাম এবং চার প্রকার মিশ্র তোড়ী রচনা করেন। জৌনপুরী রাগটিও তাঁরই পরিকল্পনা বলে শোনা যায়। বহলুল লোদীর সঙ্গে বহু যুদ্ধের পর পরাজিত হয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হন। নতুবা হয়ত তাঁর সাঙ্গীতিক কীর্তির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যেত।

এই কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদ্ ছাড়া আরও অনেক গায়ক বাদক আছেন যাঁদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানা প্রয়োজন। তানসেন পুত্র বিলাস খাঁ শাজাহানের দরবারের শ্রেষ্ঠ নায়ক কবিরায় জগন্নাথ, লাল খাঁ গুণ সমুদ্র এবং ঔরংগজীবের প্রিয়গায়ক খুশহাল খাঁ গুণ সমুদ্র—এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান অনেক পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল তাহলে গল্পের বদলে ইতিহাস নির্ণয় করা যেত। হরিদাস স্বামীর সংগীত জীবন সম্বন্ধেও গল্পই বর্তমান, ইতিহাস নেই। একজন শেখের নাম আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত। ইনি হচ্ছেন বাহাউদ্দীন জ্যাকেরিয়া মুলতানী। তিনি অনেক রাগের শুদ্ধরীতি নির্ণয় করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। বস্তুত অনুসন্ধান যদি বৈজ্ঞানিক রীতিতে আরম্ভ হয় তাহলে এ যুগেও এঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু পাওয়া সম্ভব। উত্তর ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস মন্থন করে বর্তমান সঙ্গীতের আদিরূপ যাঁরা নির্ণয় করে গেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তথ্য উদ্ঘাটন আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলে গণ্য করা উচিত।

একটি চিঠি

মহাশয়,

প্রকৃতই বাংলা দেশে বি মিউজ ডিগ্রী এখনও সাধারণ লোকের কাছেই শুধু অপরিচিত নয় শিক্ষা বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনেকের কাছে অজ্ঞাত। এর যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। সঙ্গীতের ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য নিঃসন্দেহে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন আছে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে কি প্রযোগের ক্ষেত্রে এবং কি উপপত্তিক ক্ষেত্রে সর্বদিকেই ডিগ্রী কোর্সটি উচ্চতর শিক্ষার একটি সোপান মাত্র, শুধু মাত্র তার গভীরতার পরিমাপটুকুই নির্দেশ করে। সুতরাং যথার্থভাবে এই বিদ্যার ভিতর প্রবেশ করতে হলে যে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের প্রয়োজন অপরিহার্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র বি-মিউজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ না থাকার জন্য তাদের সমস্ত আগ্রহ এবং উচ্চ আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে রয়েছেন, ফলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষার কোর্সটিকে একটি স্বতন্ত্র দিক হিসাবে গ্রহণ করতে চাইবে না এবং পাঠবিধিও সাধারণের কাছে আবার সংকুচিত হবে। এমন অবস্থায় এর বিস্তৃতির জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের প্রবর্তন করা হলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে এবং সংগীতের মানও যথেষ্ট উন্নত হবে। আর বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে বি মিউজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের যাতে অন্তত বাংলা সাহিত্যে এম এ পড়ার সুযোগ পায় এবং তার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে অনুরোধ করব।

গোপীগোপাল দত্ত
চুঁচুড়া

মনোজ বসু

• উনচল্লিশ •

আগে আগে পচা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফিসফিসিয়ে বলে, ফাঁকা জায়গা এড়িয়ে চলবি। ফাঁকায় যমরাজ হাঁ করে আছেন—ফাঁকা না ধোঁকা। সাপে গর্ত খোঁড়ে, আমরা অতদূর অবশ্য পেরে উঠিনে—যাচ্ছেও ঠিক তাই। গাছতলার অন্ধকার আড়াল-আবডাল খুঁজে নিই।

অপথ কুপথ ভেঙে। ঘরকানাচে এসে থমকে দাঁড়াল: এইখানটা মনে কর্ সিঁধ কাটতে হবে। বেড়ার ওধারে খাট তক্তাপোশ বাক্স-পেঁটরা নেই পরিষ্কার মেঝে। খোঁজদার দেখেশুনে এই জায়গা পছন্দ করে গিয়েছে। কি করবি এবারে সাহেব?

সাহেব থতমত খেয়ে বলে কাটতে লেগে যাব— আবার কি!

এমনিভাবে বসে? হয় হয় কী বোঝালাম তবে এতক্ষণ ধরে! বাড়ির কেউ যদি বেরোয় সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বে একটা লোক ঐখানটায় বসে বসে কি করছে। পথ চলতি লোকেও দেখতে পাবে।

হতভম্ব হয়ে সাহেব বলে তবে কি করব?

ফাঁকাটা মেরে দিবি সকলের আগে। পাতাশুদ্ধ বড় ডাল এনে পুঁতে দিলি, তার আড়ালে বসে বসে কাজ। লোকে কারিগর দেখতে পাবে না দেখবে গাছ একটা।

কিন্তু বাড়ির লোকে জানে, ফাঁকা জায়গা—গাছগাছালি নেই ওখানে।

আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে, সেটা মনে রাখিস। তখন অত তালিম করে দেখার হুঁশ থাকে না।

কানাচ ধরে দুজনে উঠানে এসে পড়ল। রাত ঝিমঝিম করছে নিষুতি বাড়ি। দাওয়ার ধারে গিয়ে পচা বলে উঠে পড়। বেড়ায় গিয়ে কান পাত। বিদ্যায় পরীক্ষা হবে।

শীর্ণ হাতের একটা আঙুল ঠোক করে বাপের সুরে পচা বলে, ধড়াস-ধড়াস করছে যে বুকের ভিতরটা। আঁ, বাড়ি ফিরে চল্ তাহলে। কাজ নেই।

[illegible]

লাইনের নতুন মানুষ নাকি? কলকাতার মতো জায়গায় রাস্তায় কাজ করে বেড়িয়েছি ভিড়ের কামরায় শুয়ে বসে বোলের কাজ করেছি। গৃহস্থ-বাড়িতে রাতের কাজও একবার হয়ে গেছে গ্রামময় সোরগোল তুলে। জগবন্ধু বলাধিকারী হেন মানুষ কাজ দেখে তাজ্জব। তিনিই তো আপনার হদিস দিয়ে দিলেন।

মুখে এই বলছে মনে মনে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছে। এত বড় ওস্তাদের সামনে পরীক্ষা—ধুকপুকানি আসে বই কি! কিন্তু বুকের ভিতরের খবর এ-মানুষ টের পান কি করে? সে-ও কি কানের গুণে?

পচা বলে ভয় নেই। মন্তোর পড়ে দিচ্ছি, নিদালি মন্তোর। জেগে থাকলে ঘুমে ঢলে পড়বে। কাঁচা ঘুম হলে ঘুম গাঢ় হবে। আমি দাঁড়িয়ে পাহারায় আছি। গুরু কাড়ালি যখন গুরুর উপর ভরসা রাখিস।

পায়ের [illegible] একটু মাটি তুলে নিয়ে পচা বাইটা মন্ত্র পড়ছে। পুজোআচ্চার মতন অং বং নয়। তড়বড় করে পড়ে যাচ্ছে। বাংলা ঠিকই কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পারা [illegible] মাটি ছুঁড়ে দিল ঘরের দিকে। [illegible] গেছে। ভয় করিস নে [illegible] কি নিয়ে আসতাম সঙ্গে করে

লজ্জা পেয়ে সাহেব দাওয়ায় উঠে বেড়ার গায়ে কান পেতে দাঁড়াল। পচা বাইটা সুড়ুৎ করে সরে আবার এক গাছতলায়। গিয়ে কেবল দাঁড়ানো নয় গুঁড়ির গায়ে জোঁকের মতন লেপটে আছে। সেই গাছতলায় দৈবাৎ কেউ এসে পড়লেও মানুষ বলে ঠাহর পাবে না গাছের গুঁড়ি ভাববে। কাজ সেরে সাহেব সেখানে এল। বাড়ির সীমানা ছেড়ে ওস্তাদ-সাকরেদ দ্রুতপায়ে বেরিয়ে পড়ল।

অগণ্য বাঁশঝাড় জোনাকি ফুটছে নিভছে, নিবিড় অন্ধকার জায়গাটা। সেইখানে এসে দাঁড়াল। আসল পরীক্ষা এইবারে: ঘরে ক'জন?

[illegible], দু-জন।

ঠিক [illegible] বাপ?

সাহেব দৃঢ় স্বরে বলে হাঁ দু রকমের নিশ্বাস ঘরের মধ্যে। এতক্ষণ ধরে শুনে এলাম। দু রকম ছাড়া তিনরকমের নয়, একরকমও নয়। তবে মানুষ নয় দুজনাই একটি ওর মধ্যে বিড়াল। বিড়াল ঘুমুলে ঘু উ-উ—একটা শব্দ হয়। পাটোয়ার-বাড়ি অনেকগুলো পোষা বিড়াল—শব্দটা ওখান থেকে চিনে নিয়েছি।

ভারি প্রসন্ন পচা। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, সাবাস বেটা! মানুষ একজনই [illegible]।

মানুষ হয়ে ঢুকে যখন দুয়োর দিল, বাঁশতলা থেকে আমি তাক করে ছিলাম তোকে আজ প্রথম আবার বলে। কী মানুষ, দেখি বলতে পারিস কি না।

মেয়েমানুষ। সধবা।

পচা প্রশ্ন করে, পুরুষ নয় কেন? সধবাই বা কেন বলছিস?

পাশ ফিরলেই চুড়ির আওয়াজ। বিধবা বা পুরুষ হলে হাতে চুড়ি থাকত না।

ভাল, ভাল। ঠিক বলেছিস। উল্লাসে ডগমগ হয়ে পচা বলে, সেই লোকের বয়সটা কী রকম বলতে পারিস? ছোটমেয়ে না ভরভরন্ত যুবতী, না থুথুড়ে বুড়ি? পারবি নে বলতে। দু-দিনে চার-দিনে দু-মাসে চার মাসে কেউ পারে না। যতখানি বলেছিস, তাই তো তাজ্জব হয়ে গেছি। খাটতে হবে বাবা, বড় কঠিন সাধনা। তুই ঠিক পারবি। অন্তিম বয়সে আজ আমার বড় আহ্লাদ—ছেলের মতো ছেলে একটা পেয়েছি এতদিনে।

এত প্রসন্ন যে পয়লা পাঠ সঙ্গে সঙ্গে

আরম্ভ হয়ে গেল—শুভ এই নিশিরাত্রি থেকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পচা বাইটা নিজ হাতে দরজায় খিল দিয়ে তক্তাপোষের উপর জুত করে বসল। সাহেবকে দেখিয়ে দেয়ঃ দেখুন—

সকলের বড় শিক্ষা হল নিশ্বাস থেকে মানুষ চেনা। বেড়ার ঘর হলে বেড়ার উপর কান রেখে নিশ্বাস শোনে, পাকা দালান-কোঠা হলে দুয়োর-জানলার ফুটোয় কান পাতে। দুয়োর-জানলা নিশ্ছিদ্র করে এঁটেছে তো সিঁধ কাটা ছাড়া উপায় নেই। শুধুমাত্র নিশ্বাস পরখের জন্যে সিঁধ—কারিগর হেন ক্ষেত্রে পা নয়, মাথা কিছু-দূর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝিম হয়ে থাকবে। নিশ্বাস শুনবে ঘরের লোকের। ক'জন মানুষ নিশ্বাসের ফারাক থেকে গুণতি হয়ে যাবে। কার ঘুম কি রকম, গাঢ় না পাতলা—বুড়ো মানুষের ঘুম পাতলা, জোয়ান যুবা ও ছেলেপুলের গাঢ় ঘুম। এত সমস্ত বিচার—সর্বশেষে ঘরে ঢোকে। পরের ঘরে অমনি উঠে পড়লেই হল না।

আরও আছে। ছেলেপুলে নিতান্ত কাঁচা-কাঁচা থাকলে বিপদ—ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠে অন্যের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। কাঁচা বয়সের চনমনে মেয়ে-বউর ঘুম অতি পাতলা। বয়সের দোষে ছটফট করে, উঠে বসে এক-একবার বিছানার উপর। ন্যষ্টদুষ্ট হয় তো আরও গোলমাল। এমন মেয়েমানুষ যে ঘরে আছে—মুরুব্বিরা বলেন, হীরামুক্তোর পাহাড় পড়ে থাকলেও সেখানে ঢুকবে না।

বহুদর্শী প্রাচীনদের কথা কারিগরে বর্ণে বর্ণে পালন করে। তবে বাঁধা সড়ক হল সাধারণ দশজনার জন্য। আসল গুণী যারা তাদের কথা আলাদা। কোন নিয়ম বাঁধতে পারে না তাদের। অবস্থা বিশেষে নিজের পথ দেখে নেয়। নিষিদ্ধ পথেই বরঞ্চ সহজে কাজ হাসিল করে। যেমন এই সাহেব শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদের দেওয়া কাঠি প্রথম হাতে পেয়েছে। কাঁচা বয়সের বউ-মেয়ের গা ছুঁতে মানা—সাহেব কিন্তু অবাধে আশালতার পাশে শুয়ে গায়ের গয়না ধীরেসুস্থে একটা একটা করে করে খুলে নিল। আশালতাই হাত বাড়িয়ে কান বাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে কাজের সুবিধা করে দিয়ে যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। আর এক বাড়ির কথা বলি—

নামধাম বলা যাবে না, মহামানী গৃহস্থ। কাঁচা বাড়ি, তবে মাটির উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা চন্দ্রসূর্য অবশ্য দেখতে পান, কিন্তু নরলোকের কেউ না দেখে সেজন্য কড়াকড়ির অন্ত নেই। গিন্নি-ঠাকরুনের বয়স সত্তর উত্তীর্ণ হবার পর তবে কর্তা অনুমতি দিয়েছেন—এখন তিনি মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দায়ে-বেদায়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে একটা দুটো কথা বলেন। এমনি বাড়ি। বাড়ির জামাই শ্বশুর বাড়ি এসেছে আজ ক'দিন। মেয়ে অতএব সাজসজ্জা করে গয়নাগাটি যেখানে যা আছে অঙ্গে চাপিয়ে বরের কাছে শোয়। খোঁজ-দার দেখেশুনে গিয়ে আদ্যোপান্ত বলেছে। ঐ গয়নার বোঝা থেকে মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব মুক্তি দিতে হবে।

এক প্রহর রাত না হতেই নিসিকুটুম্বরা ঘরের কানাচে আস্তানা নিয়েছে। খেয়েদেয়ে জামাই ঘরে এসেছে, শুয়ে উসখুস করছে। বউ আসেই না। অনেক পরে বাড়িসুদ্ধ খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তখন বউ মৃদু পায়ে আসছে। কাচনির বেড়া বলে সুবিধা—বেড়ায় চোখ কান দুটো ইন্দ্রিয়ই পেতেছে সাহেব। ভারি লজ্জাবতী মেয়ে তো—বরের কাছেও মুখ খুলতে পারে না, লজ্জায় ভেঙে পড়ছে। খোঁজদার উল্টোরকম বলে-ছিল কিন্তু। আলো নিভিয়ে দিল। খানিক-ক্ষণ পরে ঘুমচ্ছে দুজনে বিভোর হয়ে। যেখানটা সিঁধ হবে জায়গা নির্দিষ্ট করা হচ্ছে—শাঁই হাতে নিয়ে ডেপুটি তৈরি—ইসারা পেলেই পৌঁছে দেয়। সে ইসারা আসে না কিছুতেই। [illegible] কতক্ষণ ধরে আছে [illegible]। ডেপুটি নিজেও একবার সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে শুনে এল—স্বামী-স্ত্রী [illegible] করছে ঘরে [illegible] নেই। তবু কিন্তু বেড়া ছেড়ে সাহেব নড়ে না, সেই এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। হুকুমহাকাম দেয় না কিছু।

অবশেষে একসময় সাহেব এসে ডেপুটির হাত ধরে টানে: সিঁধ হবে না, কাঠি বরঞ্চ পাহারাদারের জিম্মায় দিয়ে চলে এসো। কাজ হবে না এবাড়ি, আয়োজন বিফল—ডেপুটি ভাবছে এইসব। কিন্তু সাহেবের মুখে রহস্যময় হাসি [illegible] হয় না। ডেপুটিকে পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে—যেন দুটো মূর্তি [illegible] গাছের গুঁড়ি। অনেক-ক্ষণ কাটল। খুট করে মৃদু একটু আওয়াজ হয়ে ঘরের দরজা খুলে যায়। দরজা ভেজিয়ে রেখে নিশিরাত্রের অন্ধকারে বাড়ির মেয়ে যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল। খোঁজদার ঠিক খবরই দিয়েছে বটে—নষ্ট মেয়ে নাগরের কাছে গেল। এ সময়টা ভয়ডর থাকে না। কিন্তু অন্য কেউ না জানুক, স্বর্গের অন্তর্যামী আর মর্তের চোর এ দুয়ের চোখে পড়বেই। মুকিয়ে ছিল সাহেব এরই জন্যে—টুক করে ঘরের ভিতর গিয়ে বালিশের তলা থেকে মাল নিয়ে যথাপূর্ব দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলো।

এক কণিকা ধুলোমাটি গায়ে লাগল না। কানের গুণে টের পেয়েছে, জামাই আর মেয়ের মধ্যে একটা ঘুম মেকি। ঘুমের ভান করে আছে মেয়ে, বরের ঘুম এঁটে এলে বেরিয়ে পড়বে। এত গয়না বাইরে আনতে

সাহস হয়নি—কে আর জানবে, বালিশের নিচে [illegible] রেখেছে। ঘোড়ার গায়ে সাহেবের [illegible] ধরে রাখার [illegible] ঠিক বলে দিয়েছে।

[illegible] কারিগর হলে যেন ক্ষেত্রে সর্ব-[illegible] বসিয়ে বসে। ঘরের মানুষ ঘুমন্ত জেনে যেই মা সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছে, পরিত্রাহি চেঁচিয়ে মেয়েটা পাড়া মাথায় করত। মুরুব্বিদের এইজন্যেই বারণ : কচি-শিশু, রোগি, বুড়োমানুষ, লুচ্চাপুরুষ আর নষ্টমেয়ের ঘর সতত এড়িয়ে চলবে।

অনেক পরের বৃত্তান্ত এ সমস্ত। সাহেবকে পচা নিশ্বাস পাঠের কথা বলছে। নির্ভুল যে পড়তে পারে, সেই কারিগরের ভাবনার কিছু নেই। পা আগে যাবে না মাথা, তার জন্যে সে বিতর্ক নয়। সিঁধের গর্ত থেকে সোজা মাথা তুলে বীরের মতো সে ঘরে উদয় হবে।

সাহেব মাঝখানে বলে উঠল, নিদালি মন্তরটা ভাল করে শুনি একবার।

বনাধিকারীর কাছে প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্র শুনেছে। চোরচক্রবর্তী পুঁথির পদ্যও জানে। ভাটি অঞ্চলের নিজস্ব নিদালিটা পরামানিক-বাড়ি পচা গড়গড় করে পড়ে এলো; সেটা ভাল করে একবার শুনে দেখে সাহেব। শুনে মুখস্থ করবে, দরকার হলে লিখে নেবে কাগজে। বলে, ধীরে ধীরে বলে যান বাইটামশায় কথাগুলো শুনি।

নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি
নাকের শোয়াসে তুললাম মণ্ডপের ধুলি।
ঘরে ঘুমায় কুকুর-বিড়ালি
জলে ঘুমায় রউ,
নিদালি-মন্তোরের গুণে
ঘুমাইয়া থাক গিরস্তর বেটা-বউ।

অতি-সাধারণ ছড়া একটা। পচা বলে, নাকের নিশ্বাস টেনে মণ্ডপের (মন্ডপের) ধুলো তিনবার তোলবার কথা। আমি যা পারের নখে তুলেছিলাম। সেকালের মুরুব্বিরা নাকেই তুলতেন—অকর্মা অপদার্থ আমরা, সে বুকের জোর কোথা পাব? শ্বাসের টানে ধুলো ওঠে না, মন্তোরও খাটে না তার জোরে!

সাহেব বলে, তাই হল তো মুস্কিল?

পচা বাইটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বলে, মানে নিয়ে কিন্তু কথা নয়। মন্তোরের মধ্যে তেমন কিছু নেই, হাতিয়ার করে রাস্তার মানুষকে শোনাতে পারি। পড়াটাই আসল, পড়ার একটু হেরফের হলে মন্তোরে কাজ হবে না। বড় শক্ত কাজ। তেমন গুণী-লোক এখন কম। সেইজন্যে বলি, মন্তোরে ভরসা না রেখে ক্রিয়াকর্মের উপর জোরটা বেশি দিবি তুই।

মাসখানেক ধরে দিবানিশি ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারই চলল। সাহেব কোথায় থাকে কি করে দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়ার দায়টাই বা কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, এ সব খবর অন্য কেউ জানে না। একলা পচা বাইটাই জানে বোধহয়। পচার ঘরে সে শোয়। অনেক রাত্রে আসে, তারপর দরজা বন্ধ করে ফুসফুস-গুজগুজ চলে দুজনে। কৌতূহলী সুভদ্রা লুকিয়ে চুরিয়ে শোনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কানদুটো পাকাপোক্ত নয়, বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারে না।

একদিন রাত্রে বড় জ্যোৎস্না। পাখিগুলো পর্যন্ত দিনমান ভেবে বাসার মধ্যে ডেকে ডেকে উঠছে। কামিনীগাছ থোপা থোপা সাদা ফুলে ভেঙে পড়েছে—ডালপাতা প্রায় অদৃশ্য। ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি আমোদ করেছে। সাহেব আসছে—সুভদ্রা-বউ তক্কে তক্কে ছিল—চিলের মতো ঝাপটা মেরে তার হাত এঁটে ধরে। চোরের হাতে হাতকড়ি পড়লে যেমন হয়—টেনে নিয়ে চলল হিড়-হিড় করে। সর্বনেশে ব্যাপার। পরিষ্কার দিনমানের মতন চারিদিক ফটফট করছে—নামেই শুধু রাত্র। সাহস কেড়ে কেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সুভদ্রা! আর সাহেবের এমন অবস্থা—টানাটানি করে হাতখানা ছাড়িয়ে নেবে সে ভরসা হয় না। শব্দ পেয়ে বাড়ির কেউ হয়তো জেগে উঠবে। দেখতে পেলে এ বাড়ি থেকে চিরকালের মতো বিদায়। মুরারি বর্ধন চাচ্ছেও তাই। হৈ-হল্লা করে সাহেবের সঙ্গে ছোটবউ সুভদ্রারও ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে পূজনীয় ভাসুরঠাকুর।

সাহেবের এত সব চিন্তা, বউটার তিল-পরিমাণ ভরভয় থাকে যদি! হেসে হেসে সর্ব অঙ্গে দোলন দিয়ে বলে, চোর ধরেছি গো। নিত্যি নিত্যি আসা-যাওয়া, আজকে তোমার রক্ষে নেই ঠাকুরপো।

হাত ছাড়ুন বউঠান কেউ দেখে ফেলবে।

বেপরোয়া সুভদ্রা সকৌতুকে মুখ নাচিয়ে বলে, দেখলে আমার কি! অবলা মেয়ে-মানুষের সাত খুন মাপ। বলে দেব, তুমিই হাত ধরে টেনেছ। পুরুষেরাই দোষ করে। আমাদের এই

উল্টো রীত, মেয়ের টানে পুরুষকে—সে, কেউ বিশ্বাস করবে না। ফাঁকা উঠোনের উপর তুমিই তো দেখার সুবিধা করে দিচ্ছ। অন্য কেউ না হোক বাসি বাইটা দেখছে ঠিক চেয়ে চেয়ে।

ফিক করে হেসে বলে, দেখলে কী-ই বা! চোরাই কাণ্ডবাণ্ড—চোরের বাড়ি সেটা বেমানান কিসে? চোরে চোরে লেগে গেছে—চোর বউরে আর চোর শ্বশুরে। বাসি বাইটা বরাবর পরের মাল চুরি করে নিজের ঘরে তুলেছে, এবারে তার মালটা চুরি করে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

সাহেব শিউরে উঠে বলে, ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি আমায়?

সেই তো ভাল। ঢুকিয়ে নিয়ে একবার দরজা দিতে পারলে কারও আর নজর যাবে না। ও কি ভয়ে যে মুখ শুখাল তেমার। বাঘের গুহা নয়—আমার ঐ কেঠাঘর যেখানে আমি থাকি।

শিকার কামড়ে ধরে বাঘ কমিয়ে যেমন হিড়হিড় করে নিয়ে যায় সুভদ্রা তেমনি চলল। মেয়েমানুষের কোমল হাতে সাড়াশির আঁটুনি—কুমিরের কামড়ের মতই সে মুষ্টি খুলে পালাবার উপায় নেই। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] মাথাওলা সেইখানে নিয়ে বসল। [illegible] দোকানের [illegible] দেখালো। বারাণ্ডার উপর [illegible] কাঁথার ডালা পাশে। ঘুম নেই তো [illegible] চুখে হতে পারে নিরালা বারাণ্ডায় [illegible] মতন এই চাঁদের আলোয় বসে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। [illegible] কাঁথা ফেলে উঠে পচা বাইটার ঘরের অন্তরালে ওত পেতে দাঁড়াল।

সেই কাঁথার ডালা হাতড়ে ছবি বের করে একটা। কাপড়ের উপর চিকন কাজ। বলে, তুমি ভয় পেয়ে গেলে ঠাকুরপো। বড় দুপারে মেয়েমানুষের কোন্ মতলব না জানি। সাধ্বী স্বামীর সতী নারী আমি [illegible] পাপ [illegible] ছবিটা আজকে শেষ করেছি। কাকে দেখাই বলো? এ বাড়ির মেয়েলোক বোঝে রাঁধাবাড়া আর ছেলেপিলের নাওয়ানো-খাওয়ানো, পুরুষে বোঝে টাকাকড়ি বিষয়আশয়। তোমায় সেইজন্য ধরে নিয়ে এলাম।

সাহেব পুরো বিশ্বাস করে নি। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমিই যে সমঝদার লোক, জানলেন কিসে?

জানিনে তো—জানব কেমন করে? এসব কবো না তাই—ভালো জিনিস একটা শেষ হলে কাউকে না দেখিয়ে সোয়াস্তি হয় না। মন আনচান করে—

কাপড়ের সেই ছবি সুভদ্রা মেলে ধরল সাহেবের চোখের উপর। বলে, খেটেছি কত দেখ। সুতোর রং মিলিয়ে মিলিয়ে সব, সুতোর ফোঁড়—চোখদুটো আমার অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এ বাড়ি যারা আছে এ জিনিসে হাত ছোঁয়াবে ভাবতে গেলেই গা-ঘিনঘিন করে। ভালমন্দ তোমার কিছুই জানি নে, চেহারায় দেখতে পাই সোনার পদ্ম। তাই কেমন ইচ্ছে হল। বোঝ না বোঝ, অমন হাতে ছবি আমার নোংরা হয়ে যাবে না।

শিল্পীমানুষ বটে সুভদ্রা-বউ। কালী-ঘাটের দরিদ্র মাতাল পটুয়ারা পট এঁকে এক পয়সা দু-পয়সায় বিক্রী করে। সাহেব দেখেছে সে বস্তু। হাল আমলে ফ্যাসান হয়েছে—বাবুলোকে মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে গলিতে ঢোকেন, এক পয়সার পট দরাজ হাতে একআনা মূল্যে কিনে নিয়ে যান। সুভদ্রাও দেখি জাত-পটুয়া একটি। ফুলবাবু তাকিয়া ঠেশ দিয়ে গড়গড়া টানছে, বাবরি চুলে টেড়ি, কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে ফরাসের উপর, একটা টিয়াপাখি খাঁচায় করে বাবুর কাছে বেচতে নিয়ে এসেছে। কাপড়ের উপর সুতোর বুনানিতে তুলেছে এই সব।

কেমন হয়েছে?

কী সুন্দর, মরি মরি! আপনার ক্ষমতা দেখে অবাক লাগে বউঠান।

খোশামুদির কথা নয়, শতকণ্ঠে তারিপ করবার মতো। কাছে এনে, কখনো বা দূরে সরিয়ে, অনেকভাবে দেখে সাহেব। দূরে নিলে কে বলবে সুতোয় বুনে তোলা। কাগজের উপরে এ'কেছে মনে হয়।

আনন্দে ডগমগ সুভদ্রা। বলে, তুলি ধরে কাগজেও এ'কেছি ঠাকুরপো। ঘরে কোন ঝামেলা নেই—না ছেলেমেয়ে, না কেউ। আমার মতো ভাগ্যবতী কে! দিন রাতের সময় কাটতে চায় না—কি করব ছবি আঁকি বসে বসে। গাদা গাদা এ'কেছি।

সাহেব বলে, ছোড়দা জানেন?

মাস্টার মানুষ ছেলে ঠেঙিয়ে খায়। যেটুকু ফাঁক, ভগবানের নাম নিয়ে পরকালের কাজ করে। তার কি গরজ এসবে? লজ্জার মাথা খেয়ে তা-ও একবার গিয়েছিলাম দেখাতে। একেবারে কাঁচা বয়স তখন—বড় আনন্দ করে দেখাচ্ছিলাম। তা বলল কি জানো ঠাকুরপো—বাইডম্ম জিনিস কি জন্যে আঁকতে যাও, আঁকবে তো ঠাকুর-দেবতাদের আঁকো। আঁকবার সময়টাও অন্তত তাঁদের চিন্তা মনে আসবে। বলি সেটা কি ধর্ম-কর্মের বয়স, ঠাকুরদেবতা আসবে কেন তখন?

বলতে বলতে সুভদ্রা থেমে পড়ে। কথায় যেন হঠাৎ আগুন ধরে গেল। বলে, তারপরে আর দেখাইনে। পা'বোই বা কোথা, ফুল-হাটায় তেড়ে ধরে দেখাতে যাব নাকি? ঠাকুরদেবতা এখনো আসে না। কি করেছেন তাঁরা আমার, কেন আঁকতে যাব?

দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে গেল - কান্না সামলাতে না কি করতে? সাহেব অবাক। মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এলো নিজের আঁকা 'এক গাদা ছবি নিয়ে। পালকি চড়ে সমারোহ করে বিয়ের বর আসছে। গৃহস্থবাড়ির উঠানে বাচ্চা ছেলেপুলের কুমির-কুমির খেলা। হরি-সংকীর্তনের আসর। যাত্রার আসর। বাসরঘরের বরকনে—মেয়েরা বাসর জাগছে। যা সমস্ত চোখে দেখেছে, ছবিতে ধরে রাখতে চেয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ের সাধারণ এক বউয়ের মধ্যে এমন গুণ লুকানো আছে, কে ভাবতে পারে?

ছবি দেখাতে দেখাতে মনের মেঘ কেটে গেছে। মুখ টিপে হেসে সুভদ্রা বলে, তোমার ছোড়দা'র হাতে উল্কি আছে—

সাহেব সংগে সংগে বলে বাঁ-হাতে আছে। আপনি এ'কে দিয়েছেন বুঝি? দিব্যি ছবিটা—

বড্ড ধারালো চোখ তোমার ঠাকুরপো। অন্যের চোখে পড়বে খানিকটা ধ্যাবড়া কালির পোঁছ। মানুষটার গায়ের রঙ আর ছবির রঙে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

সাহেব বলে, ঠাকুরদেবতায় মন নেই বলছেন, কিন্তু সেই উল্কির ছবি কেষ্ট-ঠাকুরের। মুখে মুরলী, ত্রিভংগ হয়ে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মানুষটা সাধ করে আমায় এমন খুশি হবে বলে করে দিলাম। বিয়ের অল্প দিন পরে সে এক দিন গিয়েছে' বিয়ে তো করোনি ঠাকুরপো। ও মানুষকেও সেই সময়টা যেন পাগলামিতে পেয়েছিল। বলল যে ঠাকুর তোমার পছন্দ তাই এঁকে দাও। তোমার ছোড়দা কেষ্টঠাকুরই তখন, আমি শ্রীরাধিকা। মুরলীর ডাক লাগে না, ধুতু-ফেলার একটু আওয়াজ পেলেই যেখানে থাক কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে পড়ি। আমার কেষ্টঠাকুরের হাতে কেষ্টমূর্তিই ভালো সূচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছবি করে দিলাম। এত যত্নে ফোটাচ্ছি, ওই যেন আমার নিজেরই গায়ে বিঁধছে। নতুন বয়সের বর বউ কিনা তখন—সে এক কাণ্ড!

থেমে একটু দম নিয়ে সুভদ্রা আবার বলে তোমার ছোড়দা-ও পাল্টা শোধ নিয়ে দিল আমার উপর। ছবি নয়, ছবি-টবি আসে না ও-হাতে—বুকের মাঝখানটায়, পরিষ্কার অক্ষরে লিখে দিল, শ্রীরাধাকৃষ্ণ রামসীতা হরগৌরী। ঠাকুর-ঠাকরুন জোড়ায় জোড়ায়। আজও আছে। তুমি আমায় খারাপ বলে সন্দেহ করলে, একবার তখন ঝোঁক হয়েছিল বুক খুলে দেখিয়ে দিই। কিন্তু সাহস হল না ভাই। চোখ তোমার বড্ড ধারালো, বুকের নিচেটাও দেখে ফেল যদি। সেখানটা খালি, ধু-ধু করছে তেপান্তরের মতো—

কথা ঘুরিয়ে প্রলুব্ধ কণ্ঠে সহসা বলে ওঠে, তোমার হাতে দিই না উল্কি করে। এমন ধবধবে হাতের উপর ছবি কাকে বলে দেখিয়ে দেবো। কাপড়ের ছবিটা তোমার পছন্দ, এটাই পুরোপুরি তুলে দিই। ধরো

ধরে মনের মতন করে আঁকব—তাই করি ঠাকুরপো, অ্যাঁ?

সবুর মানে না। এক ছুটে রঙ নিয়ে এসে তখনই বসে যায় আর কি? সাহেবের হাত ধরে নিয়ে নিরিখ করে দেখছে।

হাত সরিয়ে নিয়ে সাহেব বলে, আমায় নয় বউঠান। ছোড়দার বাঁহাতে এঁকেছেন, ডানহাতেও আর একটা এঁকে দিন। কথা দিচ্ছি, আমি এনে হাজির করে দেবো। কেষ্টঠাকুর করেছেন, এবারে মহেশ্বর। সত্যিই ভোলা-মহেশ্বর মানুষটি।

উঁহু, হনুমানজী। রাম-ভক্তিতে হনুমানকে ছাড়িয়ে যায়। ধরা পাই তো লেজওয়ালা হনুমান আঁকব এবারে।

হাসতে গিয়ে সুভদ্রা জ্বলে ওঠে। বলে, তিন তিন জোড়া দেবদেবী লিখে বুক আমার নামাবলী করেছে। পেলে তাকে লেখাগুলো নষ্ট করে দিতে বলি। রঙ ঢেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধ্যাবড়া করে দিক। আপনা ধরে আমিও কত চেষ্টা করেছি—নিজে নিজে হয় না। মানুষটাকে যারা পর করে দিয়েছে, তাদের নাম রাত্রিদিন বুকে করে রাখতে বুক আমার জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কী যে যন্ত্রণা ঠাকুরপো—

ফস করে বলে বসে, তুমি করে দেবে তো বলো—

সাহেবের মুখ শুকাল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। বলব উন্মাদ—কাণ্ডজ্ঞান নেই লোকলজ্জা নেই। পাগলা-গারদের বাইরে কেন রাখে এদের? বলা হয় মুকুন্দর উপর। [illegible] মাস্টারমশায় পরিবার [illegible] ছেড়ে সব পড়ছে [illegible] না পারে তো পিটুনি দিয়ে [illegible] রেখে যাক।

[illegible] সুভদ্রা [illegible] দু-চোখে হাসছে। বলে ঠাট্টা করলাম একটা। সাধু-[illegible] সতীসাধ্বী বউ [illegible] পেলাম আর কি! কিন্তু [illegible] বসে রইলাম, রাত সকালে [illegible] দারোগা-পুলিশ ভয় করা [illegible] চোখ আমি বেশি ভয়ের লোক।

সাহেব আমতা-আমতা করে বলে ভয় কেন হবে? উল্কি পরা আমি ভালবাসিনে।

ভয় নয়, তবে ঘেন্না। তোমার মতন ফর্সা মানুষ নই। কাছে বসে সূঁচ ধরে কাজ করব, ছোঁয়াছুঁয়িতে ধবধবে রঙ ময়লা হয়ে যাবে, সেই ঘেন্না তোমার। জানি, জানি। চোর কিনা তুমি—গায়ের উপর চিহ্ন রাখতে চাও না। এক চিহ্ন—জেল থেকে লোহা পুড়িয়ে চোর দেগে দেবে। তার পাশে আমার হাতের ছবি মানাবে কেন?

সাহেব এতটুকু হয়ে গিয়ে বলে, মিছামিছি আপনি ঝগড়া করছেন বউঠান—

ঝগড়া কে বলেছে, হাসিমস্করা এতটুকু। জানো ঠাকুরপো, দৃষ্টিতে আমার অভিশাপ আছে। যার কাছে আবদার করে একটা কিছু বলতে যাই, সে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ। পাষাণের মতন অসাড় আর কঠিন। যেমন এই তুমি হয়ে গেলে। এটা কিছু নতুন নয় আমার জীবনে।

এই কদিনে সাহেবকে কী চোখে দেখেছে, নিশিরাতে সুভদ্রা-বউ তার সামনে ভেঙে পড়ে। বলে পাষাণের কাছে লজ্জা নেই—খুলে বলি আজকে তোমায়। বিয়ে যখন হয়, কিছুই বুঝিনে—পুতুল-খেলার বয়স তখন আমার। খেলার মন নিয়ে হাতে উল্কি এঁকে দিলাম, ও-মানুষ আমার বুকে লিখল। তারপরে একদিন দেখি বিশ্ব-সংসার রঙে রঙে ভরে গেছে। হায় আমার কপাল—মানুষটি তার মধ্যে কবে যে পাষাণ হয়ে গেছে টের পাইনি। লজ্জা-অপমান না মেনে পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তার উপর—[illegible] বিড়বিড় করে। [illegible] যায় অবধি। কি [illegible] পড়ছ গো? বলে মন চঞ্চল হয়ে আসে [illegible] সেই বাড়ই। রাতের বেলা ভয়ের জায়গায় রাম রাম বলে অমবা পথ চলি ঠিক তাই। আমি [illegible] পোড়-খাওয়া [illegible] কিন্তু এ [illegible] যে রাম নামে ডরায় না। উপদ্রব অসহ্য হলে উনি শেষটা একদিন ঘরবাড়ি ছেড়ে [illegible]।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, বংশীর কাছে যে শুনলাম—

কথাটা সুভদ্রাই শেষ করে দিল: শুনেছ ধর্মের কলকাঠি আমি নেড়েছি। আমার বুদ্ধিতে বাড়ি ছেড়েছে। দু-জনে একদিন বাসা করে ধর্মভাবে সংসার করব, সেই আমার মতলব।

সাহেব সায় দিয়ে বলে, সকলে তাই জানে। বাইটামশায় অবধি সেই কথা বলেন।

আমি হতে দিয়েছি তাই। পাপের নামে নাক সিঁটকে সকলকে অকথা-কুকথা বলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঘুরে বেড়াই। জীবনে কিছুই তো পেলাম না ঐ একটু মিথ্যে ছাড়া। আমার পুণ্যের জাঁহাবাজ বউ আমি [illegible] দড়ি দিয়ে ঘোরাই। দেমাক নিয়ে মাথাখাড়া করে আছি, নইলে তো কোনকালে মরে যেতাম।

হাসি-মস্করার কথা, অতএব হাসতে লাগল সুভদ্রা খিলখিল করে। কিন্তু সাহেব যে আর পারে না ছুটে পালাবে। বুঝি জল এসে যায় চোখে। তার সেই চিরকালের রোগ।

(ক্রমশ)

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম আর বাপমার ইচ্ছাতে ছেলেমেয়ের নাম। ওপর-ওয়ালার দিকে তাকিয়ে বৈকুণ্ঠ ধর যেদিন ছেলের নাম রাখলেন শ্রীধর সেদিন অন্ত-র্যামী ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হেসে ছিলেন। শ্রীধর বড় হয়ে উঠল [illegible] তোতলামিটা [illegible] উপর শিরোধি [illegible] [illegible] [illegible] সফল [illegible] [illegible] ধাপে ধাপে সে আপিসের [illegible] [illegible] শ্রীটিই ধধধরধর [illegible] [illegible] কোন কাজেকর্মে [illegible] শ্রীধর [illegible] দরকার হলেই [illegible] বিনয় [illegible] কেউ [illegible] টিটকিরি [illegible] বলত—ধধধরধর বাবুকে ধর। এখানে কে-[illegible] ধরই কারুর [illegible] না। এ দুর্নিয়ম একই লোকের বা একই জিনিসের এক নাম থেকে গন্ডগোলটা রীতিমত ঘোরতর করে তুলেছে। রোজ চাল খাচ্ছি কিন্তু তাই বলে রেঙ্গ তা মারলে মারা যেতে হবে। শুনতে যতই কাছাকাছি ঠেকুক, মৌলালি পেরিয়ে যে ইটালী আর সাত সমুদ্দুর তের নদীর পর-পারের ইটালী পাশাপাশি নয়। এ ছাড়াও আর এক ইটালী আছে তাতে 'দ'র গন্ধ মেশান আছে। "দ" অর্থে এখানে দ্রাবির। এ ইটালীর স্থান দোসের পাশে। আরও আছে পটল। Pluck the Patol—মানে তন্ কট। কিন্তু এক কিলো দু কিলো তোলার যে পটল তার শেষ নেই। বছর বছর তা গরমের সময় ঘুরে আসছে। গঙ্গার পরপারে যে হাবড়া (দেশীয় উচ্চারণে) আর এ পারে এবং ওপারেও অজস্র যে (বড়) হাবড়া। [illegible] কেউ এক নয়। তাছাড়াও আছে তরুণ-কান্তি ঘোষের হাবড়া। সর্বশেষ: বড়া [illegible] গেল সেই অর্থে কাঁদা-হা-বড়া, [illegible]। ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে একবার [illegible] [illegible] [illegible] মাস্টারমশায়ের নাম এক। [illegible] একজন [illegible] [illegible] একজন [illegible] সোজা [illegible] স্রেফ গুলতানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অচিরে এই নাম-[illegible] [illegible] একজন [illegible] যতীনবাবু দ্বিতীয়জন সাদাযতীনবাবু ও তৃতীয় [illegible] শুধু J K M নামে চলতে লাগলেন। এখন সায়েন্স কলেজে আমাদের দুই ধীরেন। একজন মাছ-ধীরেন অপর-জন [illegible] (কিম্বা) পোকা ধীরেন নামে চলছে।

নবদ্বীপ হালদার রাধিকার কুলভঞ্জন গেয়েছিলেন—

খাস কুল টোপা কুল খাস নারকুলে কুল,
এত কুল খেয়ে বঁধুর পেট ডাকে
কুলকুলকুল।

এখানকার এ কুল হৃদয়ের একুল ও কুল নয়। কুলকুল অলকানন্দা—মন্দাকিনীর কলকলকল্লোলিনীর কলোচ্ছ্বাস [illegible] কুলকুল।

তিনরকম পানের জাত বিচার করাও সম্ভব। লিকুইড, সলিড এবং গগনীয় পান। জলীয় পান হল লিকুইড ফায়ার। যা খেয়ে মন মাধ্যাকর্ষণের বাধা স্বচ্ছন্দে পেরিয়ে প্লুটোনিক হয়ে যায় বিনা রকেটে। দ্বিতীয় পান হল ঠোঁট রাঙাবার সামগ্রী। এর মধ্যেও রকমফের আছে—মিঠে, ছাঁচি, বাংলা। আর বিনয়কৃষ্ণ পান এ সব কোন পানই খান না। নিজে খানদানী পান শুধুই ধূমপান করেন। এ গ্যাস—পান।

অন্য সব জিনিসের চেয়েও মারাত্মক গোল বেধেছে এই বাঘ (বাগ) নিয়ে। যে বাঘই বলি না কেন—দেখবেন এ বাঘ সে বাঘ নয়। বাঘের যে এত জাত-গোত্র আছে তা জীববিদ্যায়ও জানা ছিল না। জাত বাঘ হল রয়েল বেংগল টাইগার, সুন্দরবনের রাজা।

—একজন গাঁট্টায়, একজন বাঁশিতে—আর একজন স্রেফ গুলতানে—

রয়েল বেংগলের ধারে কাছে আসতে পারে না অন্য সব বাঘরা—এই যেমন নেকড়ে, চিতে। রেওয়ার রাজার ছিল অন্য রকমের বাঘ—সাহেব-বাঘ। গায়ের রঙ সাদা ধবধপে। এদের দেখতে দেশের বাইরে থেকে আসত অগণিত ভ্রমণামোদীর দল। কলকাতায় বলে চাইলে বাঘের দুধ পর্যন্ত মেলে। কিন্তু আর নয়। সেদিন গেছে। এখন বলতে হবে 'যেত'। এটা নকলনবিশীয়ানার যুগ। বড়-বাজার থেকে বাঘের দুধ আনতে গেলে ঠকতে হবে—যা পাবেন তা আসলের নামান্তর। তাতে হয়তো ছাগল-গরুর

[illegible] পাউন্ড ছিলো। কলকাতার অনেক বাঘ আছে কিন্তু তারা পাঠাগারের তাকে আশ্রয় নিয়েছে বইএর পাতার মধ্যে। আর কলকাতার চিড়িয়াখানার বাঘ ইতিমধ্যেই [illegible] শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে—দুনিয়ার সর্ববিষয়ে একটা কেমন বৈদান্তিক নির্লিপ্ততা এসে ফেলেছে। এদের মানুষ দেখে দেখে কেমন অরুচি হয়ে গেছে। শুধু দেখেই? মানুষের ব্যবহারেও। বাঘের নালিশ অনেক—কান করলে শুনতে পাবেন। মানুষ নামক জন্তুরা চিড়িয়াখানার ট্রানজিস্টার বাঘের কানের কাছে এনে কানুনের খেয়াল শুনিয়ে যায়। আর সারকাসের বাঘরা?

—আমরা নিত্য পাই বাঘের মাসীকে

আকারে বাঘ—একেবারে [illegible] [illegible] [illegible]

এ ছাড়া অন্য বাঘ হল শালিমারবাগ, নিশাতবাগ, গোলাপবাগ। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু হাজারিবাগে ধরলো তিলাইয়া, মাইথন, রাঁচী, রাজগীর।

বাঘকে আমরা পাই কতটুকু? আমরা নিত্য পাই বাঘের মাসীকে। এ কিন্তু ভারি অন্যায়। মাসীর পরিচয় বাঘের নামে কেন হবে? হওয়া উচিত তার উল্টোটা। মাসীর পরিচয়ে বলা উচিত বাঘকে "বেড়ালের বোন-পো।"

এই কলকাতাতেই মনুষ্য দেহ ধারণ

* চিত্র প্রদর্শনী *

পাশ্চাত্ত্যে ও আমেরিকার দেশগুলিতে যেমন বিশিষ্ট শিল্পীদের রচনা শিল্প-সংগ্রাহক ক্রেতাদের সামনে উপস্থিত করবার জন্য শিল্পব্যবসায়ীদের আর্ট গ্যালারী আছে, কলিকাতা শহরে ইদানীং সেইরকম কয়েকটি আর্ট গ্যালারী খোলা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নতুন কেমোল্ড (Chemould) এর গ্যালারীতে শ্রীমতী প্রভার একক প্রদর্শনী সম্প্রতি খোলা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পসংস্থার দ্বারা আয়োজিত হাট-বাজার প্রায় ছবির প্রদর্শনীতে সাধারণ দ্রষ্টা নানা রঙ এর নকশা ও বস্তুর জঞ্জালে পড়ে দিশাহারা হন তো বটেই শিল্পরসগ্রাহী প্রবীণ [illegible] ও [illegible] অনেক সময় শিল্প ডিস্পেপসিয়ায় আক্রান্ত হন। [illegible] আর্ট গ্যালারী শুধু যে ক্রেতা বিশেষের [illegible] শিল্প [illegible] ও উপলব্ধির সুযোগ পেয়ে থাকেন।

শ্রীমতী প্রভা [illegible] শিল্পী-দের মধ্যে [illegible] এই প্রথম শ্রীমতী প্রভা [illegible] প্রবীণ শিল্পী শ্রী[illegible] কাছে শিক্ষালাভ করেছেন [illegible] ইউরোপের শিল্পীদের [illegible] অনুসরণ করে আমাদের দেশের অনেক চিত্রকর [illegible] কাল [illegible] ক্যানভাসের উপর [illegible] দ্রবীভূত রংকে ছড়িয়ে দিয়ে নানাপ্রকার ছোপ তৈরি করে ছবির বিচিত্র রূপ তৈরি করতে তৎপর হয়েছেন। এতে করে বাস্তব রকমারি খেলা দেখান সম্ভব হলেও ক্যানভাসের সঙ্গে রঙের বন্ধন বেশীকাল স্থায়ী থাকবে কিনা বলা শক্ত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রঙ ফলিয়ে ছবিকে দীর্ঘায়ু করবার চেয়ে কারিগরির দক্ষতা দেখানই আজকাল বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। দ্রবীভূত তেলরংকে গড়িয়ে দিয়ে ক্যানভাস-এর উপর পাতলা স্তর বানিয়ে শ্রীমতী প্রভা গাছপালা, কুটির কয়েকটির সমাবেশে পটভূমি করে নানান ভঙ্গিমায় দাঁড়ান নারী মূর্তির প্রাধান্য দিয়ে বেশীর ভাগ ছবি এঁকেছেন। রঙ ও রেখার

বিশ্রামরতা নারী — শিল্পী : প্রভা কালে

ব্যবহারের কৌশলে পটভূমি ও বিষয়বস্তুকে সাজিয়ে সুসংগত করবার দক্ষতা শিল্পী দেখিয়েছেন। [illegible] জটিল নকশা বানিয়ে [illegible] চিত্রকরণের ভান এর রচনায় নেই। সহজভাবে [illegible] তাঁর রুচি ও ক্ষমতার [illegible] অভিব্যক্ত করে [illegible] অনেকেই মন ধরবে এবং [illegible] স্থান দেওয়া [illegible] সাজাবার উপযুক্ত। ত্রুটির মধ্যে দেখা যায় যে, সব নারী মূর্তিগুলি প্রায় এক ছাঁচে ঢালা এবং এক ধরনের মুখাবয়ববিশিষ্ট। ফলে অনেকগুলি ঐ ধরনের ছবির একত্র সমাবেশ একঘেয়েমি এনে দেয়। কিন্তু কয়েকটি ফুলের ছবি ও ল্যান্ডস্কেপ থাকায় প্রদর্শনী দর্শনীয় হয়েছে। ভারি রঙ চাপিয়ে করা ১নং এর ল্যান্ডস্কেপ বেশ সাফল্যময় প্রচেষ্টা।

আনডনটেড শিল্পী : রবীন মণ্ডল

পাতলা হলদে রঙের ফ্রকের উপর করা মা ও মেয়ের ছবি (১১নং) অনেকের নিশ্চই ভাল লাগবে। পটভূমির রঙ কালো রেখায় বাঁধা সাদা ইমপাস্টোর কুটীরগুলির পাশে দাঁড়া মা ও মেয়ে সব মিলে বেশ সুসংহত হয়েছে। ১৫নং-এর ছবি বাথ-এ মাত্র দু-তিনটি রঙের বাহার দিয়ে সুঠাম নারী মূর্তির সমাবেশ প্রশংসনীয়। শ্রীমতী প্রভা কালে তার শিক্ষক [illegible] অনেকের শিল্পের ঢঙ এর প্রভাবকে সম্পূর্ণ [illegible] ভবিষ্যতে শিল্পরচনা করতে সক্ষম হবেন এ আশা করা যায়।

*

গত ৩০শে মার্চ আর্টস অ্যান্ড প্রিন্টস গ্যালারীতে শ্রীরবীন মণ্ডল-এর একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। এই প্রদর্শনী ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত খোলা ছিল। শিল্পীর দেওয়া রচনার নামগুলি বিশেষ বিবরণী-মূলক বিষয়কে নির্দেশ করলেও তাকে প্রাধান্য না দিয়ে কেবল চিত্রণের মুখ্য গুণের বিচারে দেখলে ছবিগুলির উপভোগে দর্শককে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে না। নকশাকে ভালভাবে সাজানো ও রঙের বাছাই ও তার প্রয়োগ-কৌশলে এই শিল্পীর রচনা বেশ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ছবির কম্পোজিশন প্রায় বেশীর ভাগই মানুষের আকৃতির আভাস দেওয়া কাল্পনিক নকশায় তৈরী এবং এই মূর্তিগুলির ভঙ্গি প্রায় লম্বভাবে ঋজু। গাঢ় প্রায় কালো রঙের রেখা দিয়ে ঘের রঙীন নকশায় খোঁচাটে নীলের প্রয়োগ যেন বেশী দেখা গেল কিন্তু তার জন্য এক রঙের একঘেয়েমি আসেনি। মাঝে মাঝে রাখা অন্য ছবির ফিকে লেবু রঙের সবুজ কিংবা হলদে অথবা [illegible] এ ভাব ছবি সাজানো বেশ বৈচিত্র্যময় হয়েছে। মূলত রঙকে ধরে রাখার জন্য রেখার অবতারণা করায় [illegible] বেশী পরিস্ফুট হয় [illegible] অর্কেস্ট্রাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। নূতন রূপের সন্ধানী এই শিল্পীর কাজে নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাসের ব্যঞ্জনা পাওয়া গেল। সব মিলে ছবির সমষ্টি চিত্তাকর্ষক হলেও শিল্পী যদি তাঁর কয়েকটি নিকৃষ্ট রচনাকে এই প্রদর্শনীতে স্থান না দিতেন তা হলে এর মান আরো উচ্চাঙ্গের দেখাত (যেমন ২নং, ১০নং, ১৩নং এবং ১৬নং ছবি)।

৯নং ছবি ফরবিডন ওয়ারল্ড"-এর নাম যে বিষয়েরই ইঙ্গিত করুক, তাকে বাদ দিলেও ছবিটি বেশ সাফল্যময় রচনা এবং লাল রঙের রকমারি আভা দিয়ে সাজানো এটি মিউরাল-এর গুণসম্পন্ন হয়েছে। মিউরাল এর মত দেখতে হয়েছে আরো কতকগুলি রচনা (যেমন ৫নং, ৮নং ও ১৪নং)। একই আমেজে গড়া ৬নং আনডনটেড" ছবির কম্পোজিশন বেশ বলিষ্ঠ পরিকল্পনা। ১২নং "টিলার অব দি সয়েল"-এ বিষয় রঙ ও রেখার সঙ্গতি দ্রষ্টার চোখ ও মনকে খুশী করার মত হয়েছে। তেলরঙা হলেও সব ছবিতেই রঙ গুয়াস-এর মত অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছে। জানি না, সেটা শিল্পীর ইচ্ছাকৃত রঙ ফলানোর ফল কি না। কিন্তু তেলরঙের যে পরিচিত বিশেষ রূপ, তাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রয়োগ-কৌশলে ব্যবহার করলে রঙ আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

শ্রীমণ্ডল এই প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্র-রচন ক্ষমতার যে পরিচয় দিয়েছেন তার উত্তরোত্তর সাফল্য আমরা আগামী দিনে আরো দেখতে পাব বলে আশা রাখি।

গ্রাকারকে দু'বছর আগে আদালতে হাজির করা হয় গত মহাযুদ্ধের সময় বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের অপরাধে।

সামান্য অপরাধের জন্যও দীর্ঘদিন পর অপরাধীকে ধরে আইন প্রমাণ করে যে তার নাগাল থেকে পার পাওয়া যায় না।

নিউ জীল্যান্ডের অকল্যান্ডে ১৯৬১-র অক্টোবরে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯২৪ সালে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর অপরাধে। কিন্তু লোকটির ভাগ্য ভাল। মধ্যের সাঁইত্রিশ বছরে পুলিস-সাক্ষীদের সকলেরই মৃত্যু হওয়ায় অভিযোগ নাকচ হয়ে যায়।

কালিফোর্ণিয়ার (যুক্তরাষ্ট্র) এক বাস-চালক আইরিশ সুইপের একটি বড় পুরস্কার পেতে আয়ারে গিয়ে জেতার টাকা আনার সিদ্ধান্ত করে। মাঝপথে রোড দ্বীপে সে তার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যায়।

বন্ধুরা তাকে ভোলেনি। পুলিসও নয়। বারো বছর আগে এক চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যতম আসামী বলে তাকে ওরা চিনতে পারে। ফলে বাজির বিজেতাকে কারাগারে যেতে হয়।

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। সত্যই কি তাই? স্বর্গ কি তা জানি না। আমাদের মনের সব-সাধনার পূর্ণ রূপকেই তো আমরা স্বর্গ বলে মনে করি। জননী ও জন্মভূমি তার চেয়েও বড়। মাতৃত্বের এই মহীয়সী মহিমা কতটা কবির কল্পনা, কতটা স্বর্গের স্বপ্নের মতই মানুষের মনের আবেগের প্রকাশ বলতে পারি না। চোখের সামনে দেখেছি সমাজ, সংসার, পরিস্থিতি, মাতৃত্বকে নির্দয়, নির্মম, কঠিন হৃতবুদ্ধি করে তুলেছে।

নিরুপমাকে আমি যখন দেখেছি তখন তার ফেলে-আসা জীবনের বিভ্রান্তি তাকে পাথরে পরিণত করেছে। প্রাণে মানুষের স্পর্শ পৌঁছোনো দুরূহ। সন্ত্রস্ত, সভয় দৃষ্টি, অশান্ত ব্যাকুলতা তার মনে কিসের জন্য? সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। অত্যাচারের নাগপাশ থেকে মুক্তি চায় আর চায় অপমানবিহীন দুমুঠো অন্ন। এ ছাড়া তার কোন উচ্চাভিলাষ নেই। একদিন কিন্তু এই নিরুপমাই পল্লবঘন পল্লীগ্রামের ছোট্ট মেয়ে ছিল, আশা ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন ছিল। বাপমাকে হারিয়ে যেদিন সে দূর দেশে দিদির কাছে এসেছিল আশ্রয় পেতে সেদিনও তার আশার অবসান হয়নি। অবসান হলো কয়েক বছর পরে। প্রৌঢ় ভগ্নিপতি উদ্ভিন্ন যৌবনা ষোড়শীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। নিরুপায় নিরুপমা কোথায় এ লজ্জা গোপন করবে বুঝে উঠতে পারেনি। প্রত্যাখ্যানের সাহস সঞ্চয় করতে করতেই অঘটন ঘটে গেল। দিদি যেদিন টের পেলেন সে সন্তানসম্ভবা, তাকে শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে সপত্নীরূপে বরণ করলেন, না হলে সমাজে তাঁর মান থাকে না। সেদিন থেকে শুরু হলো নিরুপমার নিদারুণ নির্যাতন। শুধু দিদি নয় আশ্চর্যের বিষয় ভগ্নিপতিও দিদির আজ্ঞানুসারী হয়ে গেলেন। নীরবে অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন নিরুপায় নিরুপমার কোনও সম্বল রইল না। মাতৃ-হৃদয়ের সকল স্নেহ সুধারসের উৎস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো। সে ঠাকুরের পায়ে মিনতি জানালো যেন আর একটি নূতন লাঞ্ছিত জীবনের শুরু না হয়। প্রার্থনা ঠাকুর রাখলেন। নিরুপমা মৃত সন্তান প্রসব করলো। তারপর? তারপর সে মুক্ত, বন্ধনহীন। একমাত্র লক্ষ্য সে মানুষের মত দাঁড়াবে, যত সামান্যই হোক উপার্জন করবে, অপমান গঞ্জনা থেকে রেহাই পাবে। তাই সে এসেছে ২৩।১ বি বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে সারোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতিতে। হাতের কাজ শিখছে, সেলাই শিখছে, তাঁত বুনছে। অনভ্যস্ত অপটু হাত ভেঙে যাওয়া মন, ভুল হচ্ছে ত্রুটি হচ্ছে তবু, তবু আবার নূতন করে আরম্ভ করছে কারণ ফিরে যেতে সে আর পারে না। সমিতির কর্মীরা তাদের স্নেহ দিয়ে, যত্ন দিয়ে উৎসাহ দিয়ে ভরে তুলতে চাচ্ছেন নিরুপমার জীবনে নূতন প্রতিষ্ঠাকে। দুদিকেরই কঠিন পরীক্ষা। এরকম কত পরীক্ষা আসছে যাচ্ছে, কত অনাদৃত, অসহায় মেয়ে অঞ্জলি পূর্ণ করে নিয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রসাদে।

এ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা বহু বছর আগে অনুভব করেছিলেন স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সহধর্মিনী সরোজনলিনী। মেয়েদের অজ্ঞানতার অন্ধকার অসহায় পরনির্ভরতা তাঁকে আকুল করে তুলেছিল। বিধবাদের জীবন তখন বিষময় ছিল। তাদের লাঞ্ছিত, অপমানিত সত্তাকে সমাজ সগৌরবে উপেক্ষা করে চলেছিল। এসব সমস্যার কিছুটা অন্তত সমাধানের আগ্রহে তিনি মহিলা সমিতির পরিকল্পনা করলেন। একা একজন অনেক কিছু করতে পারে না। সকলে একত্র হলে পরস্পরের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ পেলে, নানা বিষয়ে আলোচনা করলে হয়তো একটা উন্নততর ভবিষ্যতের সূচনা হবে এই তাঁর আশা ছিল। ১৯১৩ সালে—ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে তিনি পাবনায়

কলকাতার বাইরে একটি সমিতির অধিবেশন

জামদানী বোনাই কাজ ও ছাপার কাজ
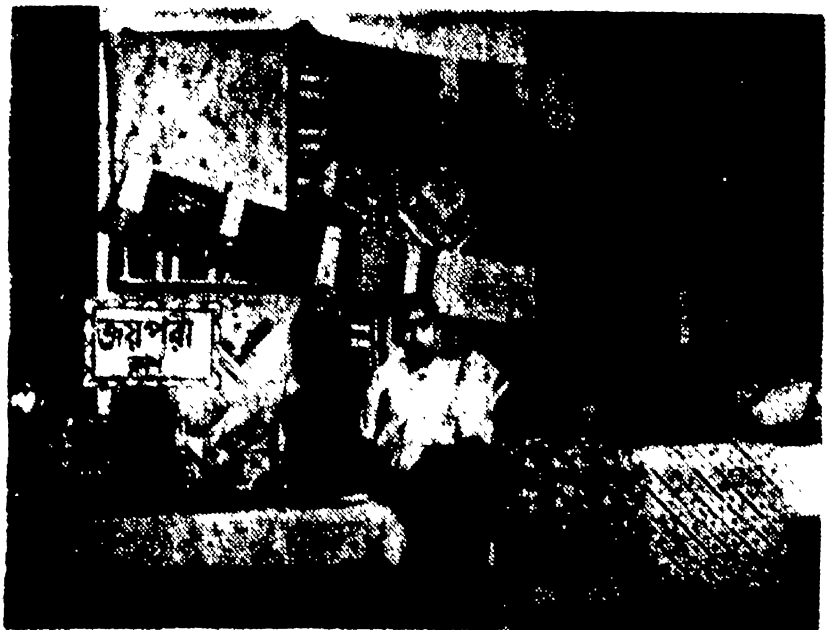
প্রথম মহিলা সমিতির পত্তন করলেন। পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশে, বিশেষত কলকাতার বাইরে স্ত্রীশিক্ষার কি অবস্থা ছিল কল্পনা করুন। ছোট মেয়েদের স্কুলে পাঠাবার কথা উঠলে বর্ষীয়সীরা বিদ্রূপ করে বলতেন 'মেয়েমানুষ কি আবার চাকুরি করবে নাকি?' লেখাপড়া শিখলে মেয়ে বিধবা হয় এরূপ একটা ধারণাও বহুলোক পোষণ করতেন। কিন্তু সরোজনলিনী তাতে দমেন নি। একটির পর একটি মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা হ'য়ে চললো বাংলা দেশের জেলায় জেলায়। সমিতিতে নূতন নূতন ব্যবস্থা হয়ে চললো। মেয়েরা হাতের কাজ শিখতো, নানা শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা শুনবার সুযোগ পেত রান্না বান্না বা গৃহস্থালীর কথাও বাদ যেত না। এ পরিকল্পনায় সরোজনলিনীর প্রথম বাধা হ'লো শিক্ষয়িত্রীর অভাব। ভাবলেন কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করলে শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা তো হবেই, বিভিন্ন সমিতিগুলির মধ্যে একটা

সংযোগের সুবিধা হবে, উপরন্তু কলকাতারও নারীকল্যাণের অনেক কাজ করা যাবে। তাঁর এ ইচ্ছা সফল হবার আগেই অকালে ইহলোক ত্যাগ করতে হ'লো। সরোজনলিনীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গঠিত হ'লো সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। ফেব্রুয়ারীতে অ্যাসোসিয়েশনের সূত্রপাত হয়।

বহু মহিলা সমিতির মধ্যে কার্যকলাপের সংযোগ রক্ষা করা ছাড়া আরও নূতন নূতন নারীকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছেন সমিতির কর্মীরা। মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই ওদের লক্ষ্য। কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা দেখলাম। পরম উৎসাহে হাতের কাজ শিখছে স্বল্পবিত্ত মেয়েরা। কেউবা ঘরে বসে

বাঁশের কাজ, কুলোর উপর আলপনা ও মাটির পাত্রের উপর চিত্রাঙ্কন

মেয়েদের তৈরি কার্পেট

সংসারের [illegible] দু'পয়সা [illegible] উদ্দেশ্যে হাতের কাজ শিখছে কেউবা শিক্ষয়িত্রী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য পড়াশুনা করছে আবার কেউবা কাজ শেখার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ দিয়ে উপার্জন আরম্ভ করে দিয়েছে। বয়স্কদের জন্য লেখাপড়া শেখারও ব্যবস্থা আছে। অনেক সময় এমনও হয় শুনলাম যে, কারিগরী শিক্ষার জন্য যতটুকু লেখাপড়া জানা দরকার তাও হয়তো মেয়েদের শিখবার সুযোগ হয় নি। তাদের কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আবার কিছু লেখাপড়াও শেখানো হয়। কারও বা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা অথচ সাহায্য করার কেউ নেই, তারাও আসে নানা বিষয়ে পড়ার সাহায্য পেতে।

হাতের কাজ যারা শিখছে তাদের নিপুণতা দেখে আশ্চর্য বোধ হয়। মনে হয় এখানে আরও কতশত নিপুণাশিল্পীর সুযোগের অভাবে প্রতিভার প্রকাশ হয় না। কাঁসাপিতলের উপর জয়পুরী খোদাই করা কাজ কুলোর উপর এবং মাটির পাত্রের গায়ে আলপনা দিয়ে ঘরসাজানোর সরঞ্জাম দেখলাম। যে কোন নিপুণ কারিগরের কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে এরকম সুন্দর জিনিসও আছে। মেয়েদের পরিচালিত ক্যান্টিন আছে তাতে অল্প খরচে খাবার বিক্রিও করা হয়। শিশু বিভাগটি ভারী সুন্দর। উজ্জ্বল সুন্দর মুখ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান গাইছে খেলা করছে শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে [illegible] করছে। এখানে যে [illegible] আছে তার কর্মকর্ত্রী শিক্ষক ও হয় এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাড়ার।

মা ও শিশুদের জন্য পরিচালিত ক্লিনিক একটি আছে। পুরীতে বিধবা আশ্রমও সরোজনলিনী অ্যাসোসিয়েশনের একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। মহিলামঙ্গলের প্রায় সকল দিকই কর্মীদের লক্ষ্য। সম্প্রতি আরও একটি নূতন পরিকল্পনা হ'য়েছে। পৃথিবীর বহুদেশে, এমন কি অনেক অনগ্রসর দেশেও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনা এসেছে। সুগৃহিণী সংসারের কত বড় সহায় তা কারও অজানা নেই। দেশবিদেশে সুগৃহিণী গড়বার দায়িত্ব যেমন সমাজ-সংস্কারকরা সযত্নে হাতে তুলে নিয়েছেন, তেমনি এ'দের পরিকল্পনাও সুগৃহিণী গড়বার প্রয়াস। বিদেশের মহিলা, সমিতি থেকে আর্থিক সহায়তার সাহায্যের সুসংবাদ এসেছে। শীঘ্রই একটি চলমান গ্রামীণ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থা হবে। এরা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ঘরণীদের শেখানো হবে কি করে সুগৃহিণী হ'তে হয়। আজকের সঙ্কটে মেয়েদের জীবনে সুগৃহিণী হওয়াই হয়তো সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

সরোজনলিনীর মেয়েদের ব্রতচারী নৃত্য

* ট্রামে-বাসে *

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মন্ত্রী মহাশয় তাঁর এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, হালে বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধিই মৎস্য-মূল্য বৃদ্ধির কারণ। —"কথাটা যদি সত্য হয়, তাহলে গিন্নীর বদলে মাছের ল্যাজা-মুড়ো নিয়ে ধেই ধেই নৃত্য করার জন্য আদর্শ স্বামীর অভাব অন্তত বাংলা দেশে হবে না" —খুড়ো আজ মাসাধিক কাল মৎস্যমুখী হন নাই, সেখবর আমরা আগেই পাইয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে শ্যামলাল বলিল—"বছরের বারোটা মাসই চৈত্র মাস বলে যদি পাঁজিতে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা হলেও মৎস্য মূল্য রোধের একটা ব্যবস্থা হয়ত হতে পারে।"

চীন পাকিস্তানের নিকট হইতে ৭০,০০০ গাঁট তুলা ক্রয় করিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"পাকিস্তানের কানে

গোঁজার মজুত উদ্বৃত্ত তুলো এবারে চীনে গেল, সেখানেও যে কানে দিয়েছি তুলোর চাহিদা সম্প্রতি খুব বেড়ে গেছে।

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম বিলাতের শিশুদের জন্য নাকি মাছের পাউডার ব্যবহারের ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী আয়ুর্বেদীয় ভাষায় মন্তব্য করিলেন—"পাউডারটার উপকারিতা, ভক্ষনাৎ ন তু মর্দনাৎ। তবে এ খবর আমাদের কোন কাজেই আসবে না। কেননা কথায় বলে—মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা! আমাদেরও তাই, মাছই নেই, তার আবার পাউডার।"

বৃটেনে এপ্রিলের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে করভারের কর্থঞ্চিৎ সুবিধা হয় বিবেচনায়, বৃটেনে বিবাহের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। পরিসংখ্যানে বলা হইয়াছে সেখানে প্রতি ১৫ মিনিটে একটি করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। —"করভার লাঘবের জন্য কর-পীড়ন"—সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

বিদ্যুৎশক্তির ব্যয় সংকোচ সম্পর্কে পূর্ত মন্ত্রণালয় হইতে সার্কুলার দেওয়া হইয়াছে—অযথা আলো জ্বালাইবেন না। শ্যামলাল বলিল—"এই সঙ্গে উপনিষদের প্রার্থনা জুড়ে দিলে সার্কুলারটা আরো জোরদার হত,—আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও!!"

পুরুলিয়া হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানকার কোন এক অঞ্চলে জনৈক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত 'ক্ষুধা হইতে মুক্তি সপ্তাহের' অবিসম্বাদিত মুক্তির সংবাদ বুঝি শুনলাম।"

জাপানের এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে 'কৃত্রিম রক্ত' আবিষ্কৃত হইয়াছে। — কিন্তু তার জন্যে জাপান যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের কলকাতার মাছ-বাজারে কৃত্রিম রক্ত আবিষ্কার বহু আগেই হয়েছে"—বলেন সহযাত্রী।

প্রসঙ্গত আতপ চাউলে সিদ্ধ চাউলের গন্ধ ও স্বাদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে আনার জন্য নাকি ব্যবস্থা হইতেছে। — এটা অবশ্য নূতন। কাঁকর সংযোগে আমরা ভারিক্কি চাল করেছি গন্ধ আনিতে পারিনি। তবে আশা করি হয়ে যাবে, চর্বিতে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতের গন্ধ যাঁরা এনেছেন তাঁদের হাতে আতপ চালে সেদ্ধ চালের গন্ধ তো নস্যি'—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

হায়দ্রাবাদ হইতে একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের সংবাদে প্রকাশ সেখানে উর্দু পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে নাকি উত্তরপত্রও
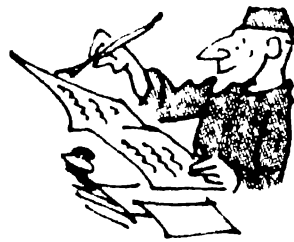
পাওয়া গিয়াছে। —'মনে হয় এই ব্যবস্থা 'মেড ইজি নোট' বা 'সাজেসশন'-এর চেয়ে ঢের ভালো"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

এক সংবাদে প্রকাশ, সুতা আমদানী করিতে না দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের বোল্টিং শিল্প বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"এটাকেই কি বলে হিটিং বিলো দি বেল্ট?"

বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য শ্রীহরিবিবক্ষু কামাখ্যা আমাদিগকে 'আমলীল' হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু আমাদের আদর্শ মা ফলেষু, বলে আমরা আমের বদলে আম-দরবারটার কথাই ভাবছি!!"

ওয়েলস-এর এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে কোন এক অফিসে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১২০ এবং পুরুষ কর্মী মাত্র একজন। পুরুষ কর্মীটি মেয়েদের হই-হুল্লোড়, হাসি, মস্করায় অতিষ্ঠ হইয়া বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু

তা-ও মঞ্জুর হয় নাই। শ্যামলাল বলিল—"আমাদের দেশে অতটা অবশ্য হয় না, বরং ১২০ জন পুরুষ কর্মীর হাসিহুল্লোড়ে 'একাকিনী শোকাকুলা'কে দেখেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু সে কথা থাক। উপস্থিত পরিবেশে বুড়ী ছুঁয়ে ফেলাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। সুতরাং "

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, উদ্বাস্তু সমস্যা বলে দেশে কিছু নাই, যা আছে তা হইল "বাড়তি ঝঞ্ঝাট।" খুড়ো বলিলেন—'কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়, উদ্বাস্তুর চেয়ে বাস্তু ঘুঘুর সমস্যা দেখি বেশি।'"

শ্রী পি এল বসু বলিয়াছেন—এমেচার মুষ্টিযুদ্ধে বর্বরতা নাই। —"বাক-যুদ্ধেও তাই। মাঠে-ময়দানে, ট্রামে-বাসে এমেচারদের বাকযুদ্ধে হেনা করেঙ্গা তেনা করেঙ্গা থাকলেও তা বর্বরতা নয়। কিন্তু মুশকিল হল পেশাদার বাকযোদ্ধাদের নিয়ে, এই যেমন ধরুন " কিন্তু শ্যামলাল হঠাৎ জিভ কাটিয়া থামিয়া পড়িল, পেশাদার বাকযোদ্ধাদের নাম বলিল না, বলিল না শিবিরগুলির নাম!

খেলার মাঠের গ্যালারীর মূল্য লইয়া সরকারের সঙ্গে হেডওয়ার্ড কোম্পানীর দর কষাকষি চলিতেছে। —"কিন্তু ময়দানের গাছের ডালের দরটারও রফা নিষ্পত্তি এখন থেকেই হওয়া দরকার" —বলেন খুড়ো।
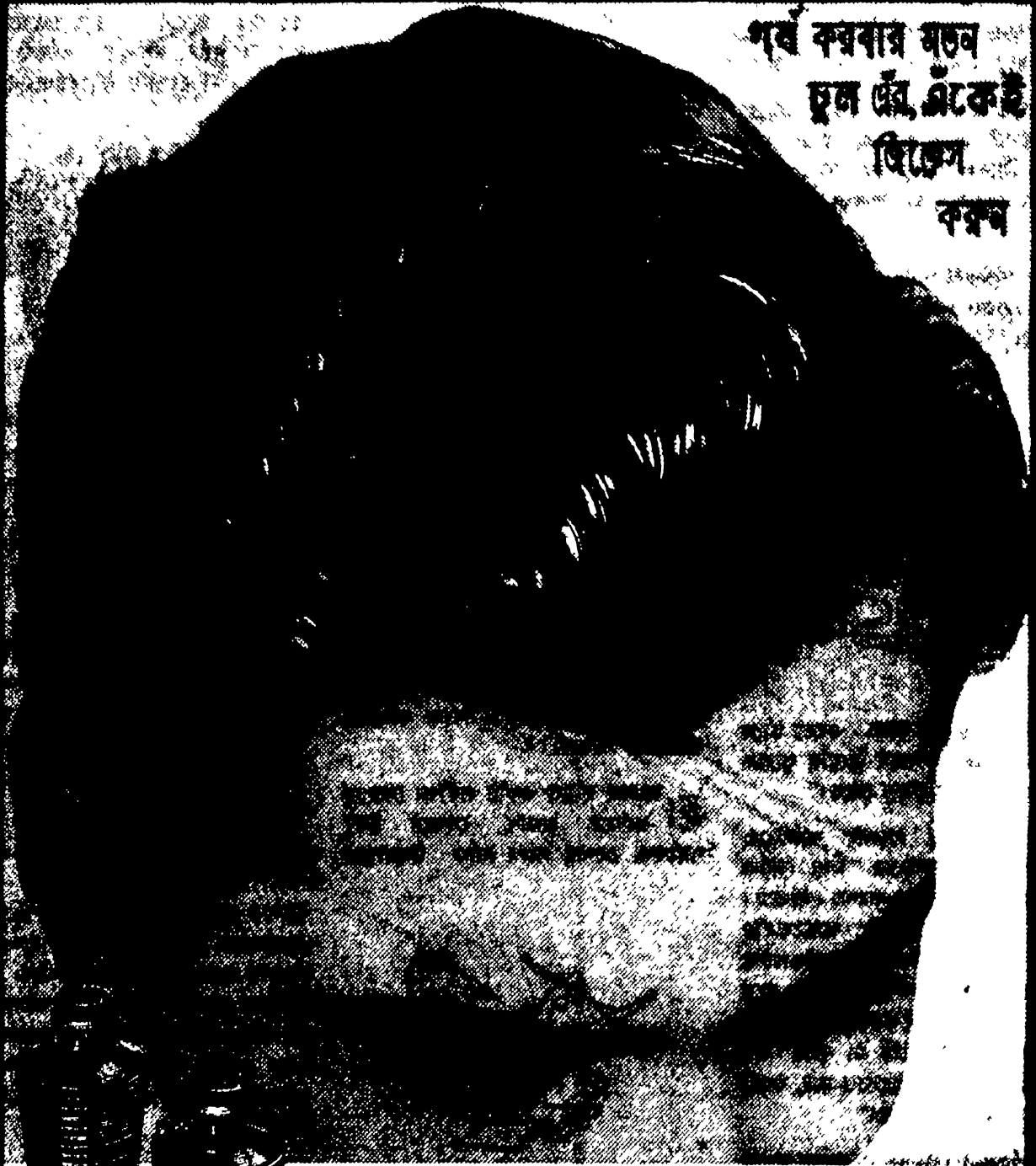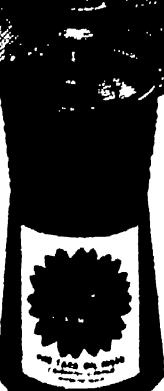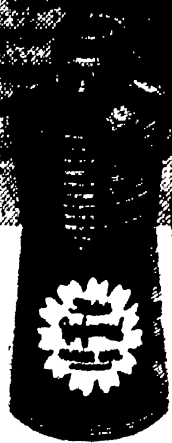
রবীন্দ্র-গবেষণা ও পুরস্কার

রবীন্দ্রভারতী সমিতি (নিখিল ভারত রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতি) রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে যে-সব আয়োজন করেন, তার অন্যতম একটি আয়োজন রবীন্দ্রনাথের স্মরণে পুরস্কার প্রদান। রবীন্দ্র-চর্চা ও গবেষণার স্বীকৃতি-রূপে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এক বছর বাদে একবার অর্থাৎ প্রতি দুই বৎসরে একবার এই পুরস্কার দেওয়াই বিধি। ১৯৫৯ সালে প্রথমবার ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী উক্ত পুরস্কার পান।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

১৯৬২ সালে (দ্বিতীয়বার) শ্রীপুলিনবিহারী সেন পুরস্কৃত হয়েছেন। উক্ত পুরস্কারের সম্মানদক্ষিণা তিন হাজার টাকা।

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রভারতী প্রাঙ্গণে এই পুরস্কার প্রদানের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। ইন্দিরা দেবীর পক্ষে তাঁর আত্মীয় শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর রবীন্দ্র পুরস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীপুলিনবিহারী সেন নিজে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, তবু এই প্রসঙ্গে যৎসামান্য উদ্ধৃতি দিই:

"ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁহার মাতা। ইংরেজী ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি তাঁহার মাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিলাত গমন করেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিমলায় অকল্যান্ড স্কুলে এবং পরে কলিকাতা লরেটো হাউস কনভেন্টে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৯২ সালে তিনি ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা সহ বি এ পাশ করেন। ইংরেজী ভাষায় প্রথম

বিদায়

স্থান অধিকার করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্মাবতী পদক প্রাপ্ত হন।

১৮৯৯ সালে কলিকাতার বিখ্যাত চৌধুরী-পরিবারের দ্যুতিমান সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত সবুজপত্রে ইন্দিরা-দেবী একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

আজীবন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের সংগীতের পরিবেশপুষ্ট ইন্দিরাদেবী প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় প্রকার সংগীতেই দক্ষতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রসংগীতের আদিযুগের গানগুলির ভাণ্ডারী ছিলেন তিনি। আনন্দ-সভা সংগীতসম্মিলনী প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি বাংলাদেশে সংগীতের প্রচার এবং শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দিরা-দেবী শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে আসেন। শান্তিনিকেতনে সংগীত-ভবনের সহিত প্রণেত্রীরূপে তিনি বহুদিন যুক্ত ছিলেন। বিশ্বভারতীর স্বরলিপি-সমিতির সভানেত্রীরূপে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ভুবনমোহিনী পদক প্রদান করেন। ১৯৫৩ সালে বাংলা দেশের পক্ষ হইতে তাঁহার সংবর্ধনা হয়। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৭ সনের বার্ষিক সমাবর্তনে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'দেশিকোত্তমা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গুরুদেবের স্নেহের পাত্রী ইন্দিরাদেবী—রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্র জীবনের বহু তথ্য তিনি 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' ও 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন। গুরুদেবের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের সংকলিত প্রায় সমুদয় পত্রই ইন্দিরাদেবীকে লেখা।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ (১২ই আগস্ট, ১৯৬০) শুক্রবার তিনি পরলোকগমন করেন।"

শ্রীপুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষকরূপে সবিশেষ পরিচিত। ইতিপূর্বে শ্রীসেন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছেন। তা ছাড়া আনন্দ-পুরস্কার, সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক এবং বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রীসেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগের সঙ্গে বহুকাল যুক্ত ছিলেন, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ।

অভিনন্দনের উত্তরে সেদিন শ্রীসেন বলেন, যা ছিল প্রত্যহের নিত্যকর্ম তা যে একদিন বিশেষভাবে স্বতন্ত্র করে সমাদর লাভ করার হেতু হতে পারে তা কোনো দিন কল্পনাও করি নি। আমাদের মত সামান্য লোক যে বিস্মৃত—রবীন্দ্ররচনা সংকলনে ও তার সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের কাজে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিল তাতেই

পুলিনবিহারী সেন

মন নিজস্ব অর্পিত ছিল গবেষণার গৌরব দাবি করবার কথা ভাবিনি। —পুরস্কার অপ্রত্যাশিত বলেই তাঁর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অবশ্য বেশি।

যাঁরা বিস্তারিত সংবাদ রাখেন তাঁরা জানেন যে, অনেক কাজ হয়ে থাকলেও এখনো রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত, বহু চিঠিপত্র ব্যক্তিগত সংগ্রহে আবদ্ধ,—যা, কোনোরকমে কালানুক্রমী করে নয় সুগ্রথিত করে প্রকাশের প্রয়োজন, তবে রবীন্দ্রজীবনের যে বহুমুখিতার কথা আমরা সর্বদাই বলি তার স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত হতে পারবে। আর, রবীন্দ্ররচনা ও রবীন্দ্র-জীবনী সম্বন্ধে যে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন, বহু কর্মী অনন্যমনা হয়েও একজীবনে তা শেষ করবার আশা করতে পারেন না।—কুড়ি বৎসর আগে যে অবস্থা ছিল এখন তা নেই। এখন এ কাজে অনেক উৎসুক-কর্মী অগ্রহান্বিত; আশা করি এ কর্তব্যকে তাঁরা কেবল গবেষণা বলে গ্রহণ না করে, ব্রত বলেই পালন করবেন।'

আমাদের পক্ষ থেকে আমরা রবীন্দ্র-ভারতী প্রতিষ্ঠান ও পুরস্কারপ্রাপকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

জীবনী গ্রন্থ ঃ অসাধুতা

[illegible],

গত ২ই মার্চ, ১৯৬৩-র সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (সংখ্যা-১৯) 'সাহিত্যে অসাধুতা' নামে শ্রীযুক্ত অরিন্দম পালের চিঠি পড়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনের এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। প্রসঙ্গটি আধুনিক কালের একজন নামকরা জীবনী রচয়িতা সম্পর্কে।

রামকৃষ্ণমিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসবে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। সময় ডিসেম্বর ১৯৫২ সাল। ঐ ম্যাগাজিনে আমার একটি রচনা (প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত) স্থান পায়। নাম 'নিবেদিতার জীবন ও কার্যাবলী।' রচনাটি ঐ সময় যুগান্তরের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ১৯৫৭ সালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি তখন শ্রীযুক্ত মণি বাগচি রচিত 'নিবেদিতা' নামক জীবনী গ্রন্থটি আমার হাতে আসে।

বইটি পড়ে বিস্ময়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। ঐ গ্রন্থের ৪৯, ৫১, ৫২, ৯৪, ১০১ পৃষ্ঠার অংশবিশেষ যথাযথরূপে আমার রচনাটি থেকে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং স্বীকারোক্তি নেই। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৩৬২, অর্থাৎ ১৯৫৫। আমরা প্রবন্ধের রচনাকালের তিন বছর পরে। নেওয়া অংশগুলো আমি উধৃত করে দিচ্ছি:

১॥

"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?"

"পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

"জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল—"ভক্তি।"

দীর্ঘ ঊনত্রিশটি বৎসর পার হইয়া মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর জীবনে আসিয়া পৌঁছিল বিবেকের অভ্রান্ত ইঙ্গিত—জাগ্রত সত্তার অভ্রান্ত উত্তর। রাত্রির স্তব্ধতাকে মথিত করিয়া, নিদ্রাতুর পৃথিবীর ঘুমঘোরকে ধিক্কার দিয়া মার্গারেটের সুপ্ত চেতনায় আঘাত হানিতেছে সন্ন্যাসীর সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর—"জাগো, জাগো মহাপ্রাণ! জগৎ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে, তোমার নিদ্রা যাইবার অবসর কোথায়?"

(নিবেদিতা: পৃঃ ৪৯)

আমার রচনাটি শুরু হয়েছিল এইভাবে 'আনন্দমঠ' থেকে উধৃতি দিয়ে। (রজত জয়ন্তী সংখ্যার ৫২ পৃঃ)। সংখ্যাটি আমার কাছে এখনো আছে। সম্ভবত নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়েও পাওয়া যাবে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে ক্রিয়াপদগুলি আমি চলতি ভাষায় লিখেছি স্বামীজীর বাণী আমার রচনায় ইংরেজীতে উদ্ধৃত।

এর পর আরো আছে—

২॥

জন্মান্তর হইল মার্গারেটের।

একই দেহে দুইবার জন্ম।

১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আয়ার্ল্যাণ্ডের কোলে মার্গারেটের জন্ম। আর ১৮৯৮ সালের ২৫ই মার্চ ভারতের মাটিতে নিবেদিতার জন্মলাভ। পূর্বজন্মের পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড। নিবেদিতার স্রষ্টা বিবেকানন্দ। (পৃঃ ৫১)

৩।

তিনি স্বয়ং অর্ঘ্য।

ফুল হইয়া তিনি ভবতারিণীর চরণে তিলে তিলে শুকাইয়া যাইবেন। ধূপ হইয়া পলে পলে নিজেকে জ্বালাইয়া করিবেন তাঁহার আরাধনা। দীপ হইয়া দিনে দিনে নিঃশেষে বাতাস দিবেন নিজের অস্তিত্বকে।

তিনি নিবেদিতা।

নিবেদিতা আসিলেন ভারতবর্ষে। পরাধীন, অশিক্ষায় তমসাচ্ছন্ন সে ভারতবর্ষ। নিবেদিতার মনে পড়িল তাঁহার জন্মভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডকে। সে দেশও এমনি পরাধীন, এমনি উৎপীড়িত। নির্যাতিতের তো কোনো জাতি নাই। তাহার একটি পরিচয় সে দুঃখী সে হতভাগ্য। আর এই হতভাগ্যের দুঃখ দূর করাই তো তাঁহার আবাল্যে স্বপ্ন।" (পৃঃ ৫১—৫২)

৪॥

১২ই নভেম্বর: দীপাবিতার রজনী। নিবেদিতার জীবনেও একটি স্মরণীয় দিন। শহরের এখানে ওখানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শহরের একটি ক্ষুদ্র গলিতে নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়।

এ আলোর জ্যোতি অনির্বাণ।

নিবেদিতার জীবনব্যাপী সাধনার আজ শুভ উদ্বোধন।

৫॥

অসহ্য গরমে তাঁহার শঙ্খশুভ্র মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিত। মাঝে মাঝে দুই হাত মাথায় চাপিয়া ধরিতেন। শিক্ষয়িত্রীদের কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিবেদিতা উত্তর দিতেন—

"মাথায় বড় কষ্ট।" কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে ডুবাইয়া দিতেন।

স্কুল তো আরম্ভ হইল। অভিভাবকেরা মেয়ে দিতে চাহেন না। হিন্দুর মেয়ে যাইবে বাইরে পড়িতে? তাও আবার মেমসাহেবের কাছে? দুই-একটি করিয়া মেয়ে আসে। সেই শঙ্খশুভ্র মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু আবার বিঘ্ন। অর্থাভাব।

(পৃঃ ১০১)

আমার রচনা থেকে নেওয়া এই অংশগুলি ছাড়া পরলোকগতা সরলাবালা সরকারের 'নিবেদিতা' গ্রন্থ থেকে অনেক অংশ এইভাবে উধৃতি চিহ্ন এবং লেখিকার নামোল্লেখ ব্যতীত এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ঐ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা বীণাপাণি বসু রায় নিবেদিতাকে দেওয়া স্বামীজীর আশীর্বাদ-বাণীর সুন্দর অনুবাদ করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত মণি বাগচি রচিত 'নিবেদিতা' গ্রন্থের আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় এই অনুবাদটি উধৃতি চিহ্ন এবং লেখিকার নামোল্লেখ ব্যতীত স্থান পেয়েছে।

শ্রীযুক্ত মণি বাগচীর লেখা সম্পর্কে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জেনেছিলাম যে, তাঁরা নাকি এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অথচ 'নিবেদিতা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে হুবহু সেই একই নজির দেখতে পেলাম।

তখন বয়স অল্প থাকায় সহজ সরল সহায়তা এবং বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত কম ছিল। তাই সেদিন প্রতিবাদ জানাবার মত পথ খুঁজে পাইনি। আপনার পরিচালিত সাহিত্য সংবাদ বিভাগে শ্রীযুক্ত অরিন্দম পালের চিঠিটি দেখে পূর্বস্মৃতি মনে পড়ে গেল। শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিযোগ জানাবার জন্য নয় বাংলা সাহিত্যে অসাধুতার নিদর্শন হিসেবেও এই চিঠি আপনার বিভাগে প্রকাশের দাবি রাখে। চিঠি দীর্ঘ এবং ঘটনাটি অনেকদিন পূর্বের, তথাপি আপনার বিচারবোধ এবং সাহিত্যনিষ্ঠার উপর ভরসা করে এই চিঠি আপনার কাছে পাঠালাম। এসম্পর্কে আপনি এর আগেও আলোচনা করেছেন।

নমস্কার জানবেন। ইতি—

অধ্যাপিকা অনীতা গুপ্ত

রবীন্দ্র সংগীত : সংগীত-আদর্শের চর্চা
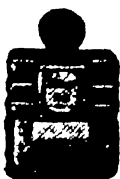
রবীন্দ্র সংগীত সাধনা—সুবিনয় রায়। **গীতবীথি প্রকাশনী**, ১৯৫বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭। চার টাকা।

লেখক রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষক হিসাবে সুপরিচিত। যথানিয়মে রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার সুযোগ তাঁর হয়েছে বলেই রবীন্দ্র শিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ অধ্যাপনার অভিজ্ঞতার সাহায্যে রবীন্দ্র সংগীত সম্বন্ধে হিতকারী এবং প্রয়োজনীয় আলোচনার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন। পুস্তকটি তত্ত্ববিষয়ক এবং ঐতিহাসিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। লেখক জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্র সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে ও তার যথাযথ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কতকগুলি মূলগত সাংগীতিক আদর্শ ও পদ্ধতি প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই অনুসরণ করে চলতে হয়। রবীন্দ্র সংগীত অনুরাগীদের বিশেষত শিল্পী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামনে এই সকল চর্চাপদ্ধতি ও আদর্শকে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই প্রচেষ্টা। তিনি প্রধানত চর্চার দিকটাই অবলম্বন করেছেন। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতের অনুশীলন, গায়কী, যন্ত্রসংগীত সহ [illegible] এবং স্বরলিপি এই বিষয়গুলোর আলোচনা করেছেন।

[illegible] সম্বন্ধে এইধরনের সকল [illegible] আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ কথা ঠিক যে কেবল [illegible] সংগীত সম্বন্ধে প্রযোজ্য এমন নয় সাধারণ কাব্যসংগীত সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সংগীতের মূল সূত্রগুলি অজানা থাকলে [illegible] সুরকারের রচনা সার্থকতার সঙ্গে গাওয়া সম্ভব হয়। লেখকের মধ্যে গোঁড়ামি নেই—খোলা মন নিয়ে তিনি যে সব আলোচনা করেছেন সেগুলি কাব্যসংগীতকে সাধারণ ভাবে বোঝাবার জন্য প্রয়োজন। রবীন্দ্র সংগীতকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও এই পুস্তকটি সাধারণভাবে বাংলা গানকে প্রকাশ করবার কাজে লাগবে। পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত কণ্ঠস্বর অলংকার শ্রুতি, উচ্চারণ, শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়গুলি যে নৈপুণ্যের সঙ্গে বলা হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, লেখক শিক্ষার্থীদের বা শিল্পীদের মূল ত্রুটিগুলি কোথায়, তা বিচক্ষণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এবং দোষমুক্তির উপায়গুলি দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই পুস্তকটি রচনা করেছেন, তা সাফল্যযুক্ত হয়েছে, এ-কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়।

এ সম্পর্কে একটি বক্তব্য এই যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সংগীতের আলোচনা লেখকের মনে যতটা অধিকার করেছে, বাংলা গানের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সংগীতের মূল্যায়ন ততটা করেনি। রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ, সে যুগের বাংলা গানের প্রভাব তাঁর ওপর বড় কম পড়েনি। সেই রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া শিক্ষার্থী শিল্পী এবং শিক্ষক প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্তব্য। এই পরিচয়ের অভাবে রবীন্দ্রনাথের অনেক পুরানো গান যথাযথভাবে গাইতে শোনা যায় না। এ সম্পর্কে একটি সাবধান আলোচনা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করি। ৪৪৪।৬২

সাহিত্য প্রবন্ধ

ঘরে বাইরে সাহিত্য চিন্তা—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য জগৎ। ২০৩।৪ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রথিত লেখকের সম্প্রতিককালে

লিখিত আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি সাহিত্য-তত্ত্ব এবং সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কিত। একই বিষয় নিয়ে আর একখানি বই গ্রন্থকার অনেকদিন আগে লিখেছিলেন 'শিল্পলিপি' নাম দিয়ে। 'শিল্পলিপি' এবং আলোচ্য বইখানি পড়লে পাঠক অধ্যাপক দাশগুপ্তের সাহিত্য সম্পর্কিত ধারণার পূর্ণ পরিচয় পাবেন।

আলোচ্য বই-এর প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত। সাহিত্য সম্পর্কিত যে প্রসঙ্গগুলি বই-এর মধ্যে আলোচিত হয়েছে সেগুলি যে দীর্ঘকাল ধরে লেখককে ভাবিয়েছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এই মনন-চিন্তনের ফলে প্রবন্ধগুলির উপস্থাপনা-ভঙ্গীর মধ্যে একটা প্রত্যয় এবং আন্তরিকতার ভাব দেখা যায়।

তবে প্রবন্ধগুলি লঘু চালে লেখা। সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা প্রবন্ধটিতে লেখক একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। কিন্তু যুক্তি-প্রমাণগুলি মূল সমস্যার তুলনায় লঘু। উপস্থাপনরীতিও তদনুরূপ। এটা ইচ্ছাকৃত মনে হয়।

'পাণ্ডিত্য' হলেও অন্তত এই আলোচনাগুলিতে লেখক 'পাণ্ডিত্য' রীতি অনুসরণ করবেন না এমন একটা সংকল্প আলোচনাগুলির মধ্যে প্রকট। ফলে বিষয়গুলির গভীরতা কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজকাল Serious রচনার দিকে সাধারণের বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দিয়েছে। সমালোচনা যদি লিখতে হয়, বড় জোর arm chair criticism, তার চেয়ে গভীর কিছু নয়। আসলে আমাদের মনের seriousness চলে গিয়েছে, তাই serious রচনাকে 'পাণ্ডিত্য' এবং 'ছাত্রপাঠ্য' বলে অপাংক্তেয় করছি। এই সময় দেশে যে কয়জন লোকের চিন্তাশক্তি আছে তাঁদের উচিত arm chair Criticism জাতীয় রচনাকে প্রশ্রয় না দেওয়া।

৫৬৮।৬২

উপন্যাস

কত রঙ। প্রভাত দেব সরকার। গ্রন্থপীঠ, ২০৯, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। চার টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রভাত দেব সরকারের সাহিত্য-কীর্তি সুবিদিত। তাঁর রচনার একটি বিশেষ গুণ, বিষয় নির্বাচন সাধারণ হলেও, সেইসব বিষয়কে তিনি সহজেই তাৎপর্যমণ্ডিত ক'রে তুলতে পারেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের যথাযথ রূপায়নে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'কত রঙ' তাঁর সর্বাধুনিক উপন্যাস, এবং এই উপন্যাসেও তাঁর গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

'কত রঙ' একটি বিশেষ জীবন বা একটি বিশেষ পরিবারের কাহিনী নয়, এর মূলে কেন্দ্রে আছে একটি অফিস। এই অফিসে বিচিত্র চরিত্রের ও স্বভাবের মানুষের মিলন ঘটেছে। মূল চরিত্র সুধীরবাবুর দৃষ্টিতে লেখক এইসব চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। সততা নামক গুণ মানুষের হৃদয় থেকে ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছে, স্বার্থের খাতিরে মানুষ আজ যে-কোনো শর্তেই আত্মবিক্রয়ে প্রস্তুত, লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি বোধ হয় এই। চতুর্দিকের এই হীন মনোবৃত্তি সংবুদ্ধিসম্পন্ন সুধীরবাবুকে ক্রমশ পর্যুদস্ত ক'রে ফেলে। যুদ্ধের পরবর্তী কালে কলকাতায় দ্রুত যে-সব অফিস গ'ড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন কল্যাণকামী উদ্দেশ্য নিয়ে তারই একটি— শ্রমিক-কল্যাণ অফিসে তিনি যোগদান করেন। কর্মে তার সততা আর পাঁচজনের দৃষ্টিশূল হ'য়ে ওঠে। কি পুরুষ কি মহিলা—সকলেই চায় ছলে, বলে কৌশলে গুছিয়ে নিতে। চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েন সুধীরবাবু ও শেষ পর্যন্ত চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

উপন্যাসটি প্রভাতবাবুর অনুরাগী পাঠকদের ভালো লাগবে।

৪৮৭।৬২

দুয়োরাণী। ধনঞ্জয় বৈরাগী। কথাকলি। ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯। ২·৫০ নঃ পঃ।

কিছু কিছু উপন্যাস আছে যা অনায়াসে পড়া হয়ে যায়—খুব তলিয়ে কিছু খুঁজতে হয় না এবং মনের পরে কোন দাগ রেখে যায় না—এ ধরনের উপন্যাস পড়ার একমাত্র উপকারিতা আলস্যমোচন এবং কিছু চরিত্র ও জীবনের মুখোমুখি খানিকক্ষণ নিরুপায় বসে থাকা যার সংগে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা বোধ করতে হয় না। প্রচুর পয়সা আছে, প্রচুর বিলাসব্যসন আছে, অথচ হৃদয়ে অন্তঃসারশূন্য— যারা টেনিস খেলার বিকেলে পার্টিতে ফুল ফোটাবার এবং চারিত্রিক উত্থান-পতনের মত বাস্তব জীবনেও প্রেম বা প্রেমের অভিনয় করে— তাদের সংখ্যা সমাজে নিশ্চিত মুষ্টিমেয়। 'দুয়োরাণী'র লেখক ধনঞ্জয় বৈরাগী এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের মধ্যে থেকে প্রধানত দু'টি পুরুষ আর দু'টি নারীকে বেছে নিয়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন। যে বাড়ি, পারিপার্শ্বিক, চিন্তা ও চরিত্রের সম্মুখীন এই উপন্যাসে হলাম, সমাজের অধিকাংশ লোকের সংগে তাদের জীবনের কোনো যোগ নেই। আর তা ছাড়া এই ইঙ্গবঙ্গ-সমাজের উপর ভিত্তি করে আগেও অর্থাৎ অতীতে একসময় বাংলা সাহিত্যে কিছু সাধারণ বইও লেখা হয়েছিল, এখনকার দিনের কোনো লেখক অতীতকালের কোন বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামাবেন—তাঁর লিখিত উপন্যাসে পাঠকের মন জয় করতে চাইবেন—পাঠকেরা তাতে সন্তুষ্ট হবে কেন? এখনকার লেখকদের মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাম খুব অপরিচিত নয়, উপন্যাস রচনায় স্বাভাবিক হাত যখন তাঁর আয়ত্তে, তখন তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র এবং প্রতিপাদ্যকে এমনভাবে নির্বাচন

করুন যাতে নবদিগন্তের আভাস কিছুটা মেলে, অন্তত মনের খোরাক কিছু জোটে, নইলে উপন্যাস রচনার সার্থকতা কোথায়?

৪৭৫।৬২

এস নীপবনে : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : বুক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড : ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : চার টাকা।

মানুষ কি পরিবেশ এবং ঘটনার অনিবার্যতা এড়াতে পারে না বলেই অন্যের সঙ্গে কৃত্রিম একটা সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিনিয়ত সেই মিথ্যেটাকে খুঁচিয়ে দেখে আর আত্মহননের যন্ত্রণায় জ্বলে? সাধারণত হয়তো এমন হয় না। কিন্তু এ গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র প্রীতির বেলায় তা-ই হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোন একটি চরিত্র অথবা একটি কাহিনীর ক্রমপরিণতির বর্ণনা এ-উপন্যাসে প্রাধান্য পায় নি। মোটামুটি একটি পরিবেশ এবং কিছু ঘটনার আয়নায় নিজেদের মনকে দেখছে সবাই। অন্তত প্রীতি আর হেমন্ত। অবনী কিছুটা ব্যতিক্রম। কবি এবং পঙ্গু অবনী নিজের কল্পনায় স্বতন্ত্র একটি স্বপ্নের জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। সে জগৎও তাকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিতে পারেনি। স্বপ্ন তাকে বাঁচায়নি। আত্মহত্যায় সে শান্তি খুঁজেছে।

অস্থির-কেন্দ্রবিন্দু, হতাশ বুদ্ধিজীবীদের প্রতিভূ হেমন্ত। জীবনে কোন অবলম্বন নেই। বিশ্বাস নেই। সব কিছু যাচাই করতে গিয়ে পেয়েছে শুধু ব্যর্থতা। হেমন্তরা আমাদের বড় বেশী চেনা। তবু উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে শ্মশানের পটভূমিকায় সুরের প্রভাবে হেমন্তর আত্মদর্শন কারও কাছে অস্বস্তিকর লাগতে পারে।

যে প্রায় নির্মম এবং নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে চরিত্রগুলিকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেখক তা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ।

১১৫।৬২

অচেনা আকাশ। নগেন দত্ত। শিক্ষা ভারতী ১।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৯। চার টাকা।

বর্তমান সমাজজীবনের বিবিধ কলুষতার মধ্যেও বেঁচে থাকার দুর্মর ইচ্ছা কিছু মানুষকে সৎ করে তোলে। এই সততা আবার কিছু মানুষের মনে দুষ্ট প্রবৃত্তির ইন্ধন জোগায়। মোটামুটিভাবে এইরকম একটি বিষয় নিয়ে শ্রীযুক্ত নগেন দত্ত তাঁর 'অচেনা আকাশ' উপন্যাসের কাহিনী রচনা করেছেন।

'অচেনা আকাশ'-এর চরিত্রগুলি আমাদের চেনা। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন শুরু করেও অবস্থার স্রোতে কোনো-কোনো মানুষ নীচতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, ধনশালী ... শান্তিবাবু—বিদ্যাধরী আশ্রমের সেক্রেটারী, কল্যাণব্রত আসলে যাঁর অর্থ উপার্জনের উপায়। অন্যদিকে দেখা যায় কঙ্ক ও সুস্মিত, তপন ও প্রমীলার মতো সাধু চরিত্র, ডলি বা করুণাবাবুর মতো অসহায় মানুষ।

নগেনবাবু মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। তবু রচনায় আরো কিছু সংযম দেখানো যেত। মলয়ের অন্তর্ধান তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

৪৮০।৬২

সভ্যতার ইতিহাস

বঙ্গে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিস্তার— স্বামী শংকরানন্দ। অভেদানন্দ একাডেমি অব কালচার ৭০ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৫। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে স্বামী শঙ্করানন্দ দীর্ঘকাল ধরে নিজস্ব একটি অভিমত পোষণ করে আসছেন। সংক্ষেপে তাঁর অভিমতটি এই : প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতা ঋক-বৈদিক সভ্যতার একটি স্তর মাত্র। সিন্ধুসভ্যতার যুগেই, অথবা তারও আগে, বেদাচারী আর্যরা এদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং বেদাচার-বিরোধী বিভিন্ন জাতি-উপজাতিকে তাঁরা দাস-দস্যু ইত্যাদি বলতেন। সিন্ধুসভ্যতার সামাজিক আচার, রীতিনীতি ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে বঙ্গসংস্কৃতির উপর। বাংলার শৈব, তান্ত্রিক ও অন্যান্য লোকধর্ম লোকাচার লোকশিল্প প্রভৃতির নিদর্শন উল্লেখ করে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাদৃশ্য দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বঙ্গসংস্কৃতি সিন্ধুসংস্কৃতিরই বিচিত্র প্রকাশ বলে মনে হয়।

স্বামী শঙ্করানন্দের ইতিহাস-অনুরাগ ও গবেষণা-নিষ্ঠা আন্তরিক হলেও তাঁর অভিমত ও ইতিহাস-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী কোন ঐতিহাসিকের কাছে গ্রাহ্য হবে বলে মনে হয় না। আধুনিক নৃবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান অথবা ইতিহাসবিজ্ঞান—কোন বিষয়েরই নির্ধারিত ও সর্বজনগৃহীত সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ কোন মূল্য লেখকের কাছে আছে বলে মনে হয় না। সেইজন্য ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁর প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদন-পদ্ধতি দুইই অবৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক বলে প্রত্যাখ্যাত

হবার সম্ভাবনা। যদি লেখকের বিদ্যানুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত পথে পরিচালিত হয়, তাহলে তা সার্থক ও ফলপ্রসূ হতে পারে। (৫৩২।৬২)

সংকলন

চিহ্ন ১ [সম্পাদকের নামের স্থান শূন্য] ব্যবস্থাপনায়: নীহার গুহ, সুধীর ঘোষ (দামের জায়গায়) পঞ্চাশ নয়া পয়সায় বিনিময়ে (এই রকম ছাপা আছে)।

প্রথম সংখ্যা। মলাটটি অদ্ভুত ভালো লেগেছে। কিছু কবিতা আছে। কিছু গল্প আছে। একটি ছোট প্রবন্ধ। কিছু কাব্যানুবাদ। অ্যালান গীন্সবার্গ নামক একজন মার্কিন 'বিট' কবি যাঁকে তাঁর বন্ধু ছবি-আঁকিয়ের সংগে কলকাতায় ঘুরতে যত্রতত্র দেখা যেত—তাঁর 'ক্যাডিশ' কাব্যগ্রন্থের কাব্যাংশ অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। অনুবাদককে লিখিত উত্ত কবির একটি পত্রও বর্তমান সংখ্যায় সন্নিবদ্ধ। অনুবাদকের নিজস্ব কবিতা এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুপুরে রোদ্দুরে' কবিতাটি এই সংখ্যার আকর্ষণ। রতন ভট্টাচার্য, দেবী রায়, সমীর রায়চৌধুরীর গল্প কৌতূহলোদ্দীপক। 'চিহ্ন' তার প্রথম আত্মপ্রকাশেই বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছে।

সপ্তক (সমকালীন সাহিত্য সংকলন) প্রকাশক: শফিক উদ্দিন খান। ১৭।২ সিদ্দিক বাজার। ঢাকা। এক টাকা।

পূর্ব-পাকিস্তানের সদ্যস্ফুট কয়েকজন তরুণ সাহিত্যকারের কবিতা ও গল্পের প্রথম সংকলন পুস্তিকা সপ্তক। এই সংকলনে কবিতা লিখেছেন সেবাব্রত চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, শহীদ কাদরী, দেবব্রত চৌধুরী, আল মাহমুদ এবং একটি গল্প লিখেছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। প্রতিটি কবিতায় প্রতিশ্রুতির ছাপ আছে। কিন্তু গল্পটিতে যে পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন লেখক, তাতে আমাদের পুরোপুরি সায় নেই। এই পরিচ্ছন্ন সংকলনটি সাহিত্য-পাঠকের কৌতূহল জাগাবে।

ব্রতী (খৃষ্টি জয়ন্তী সংখ্যা)। সম্পাদক—সমীরকুমার ঘোষ। ১৫১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ৭৫ নয়া পয়সা।

বাঙলায় খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের মুখপত্র 'ব্রতী'র এটি অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যা। খৃষ্টধর্ম সংপৃক্ত প্রবন্ধ ও আলোচনা পত্রিকাখানিতে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সাধারণ গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধাদি সংযোগে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সর্বসাধারণের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা আছে।

বিবিধ

প্রাকচর্যা—ডাঃ অরুণকুমার শীল। ৮৪এ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৭৫ নঃ পঃ।

দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় প্রতিরক্ষায় জন্য যেসব ব্যবস্থা হচ্ছে তার মধ্যে জনসাধারণের 'ফার্স্ট-এড' সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্তই দরকার। ডাঃ অরুণকুমার শীল নিজে সিটি কলেজ অ্যাম্বুলেন্স কোরের কোর সার্জন। সে হিসেবে আহতদের প্রাক-চর্যা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সন্দেহাতীত। প্রাক্-চর্যা ব্যাপারে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেসব অসুবিধা অনুভব করেছেন তার দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থগুলি রচিত। যতদূর জানি ফার্স্ট-এড সম্পর্কে বাঙলায় এই প্রথম গ্রন্থ এবং বিশেষ করে দেশের বর্তমান অবস্থায় এটি বিশেষভাবেই কাজে লাগবে। হঠাৎ কোন আঘাত পেলে বা আহত হলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের কি করণীয় সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভে গ্রন্থখানি প্রভূত সহায়ক।

প্রাপ্তি স্বীকার

আ মা দে র ছে লে মে য়ে — সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

য়ারা মুকুর—জগদানন্দ বাজপেয়ী।

Ideals of Indian Education & Culture (Acharya Swami Pranavananda Memorial Volume, Samvat 2019)

রজনীগন্ধার আয়ু—বিজনকুমার ঘোষ

এক জীবন অনেক জন্ম—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

সুধা হালদার এবং সম্প্রদায়—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পথ চলিতে—প্রীতিময়ী কর।

জিজ্ঞাসা তিব্বতের প্রাণপুরুষ—শ্রীবিষ্ণুপদ কীর্তি।

নবম ভ্রমণ (৩য় খণ্ড)—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক—সত্য গুপ্ত।

দুঃস্বপ্ন সংগ্রাম—অমরেন্দ্র—দ্যোতন মুখোপাধ্যায়।

কত ছাট কত ঘাট—ইন্দুভূষণ ঘোষাল।

সিনেমার প্রভাব

'তরুণ-তরুণীদের উপর সিনেমার প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনার জন্য সম্প্রতি আমেদাবাদে অল ইণ্ডিয়া সোশ্যাল অ্যাণ্ড মরাল হাইজিন কনফারেন্স একটি সভা আহ্বান করেন। সভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, শুধুমাত্র সিনেমাই তরুণ মনের উপর অসুস্থ প্রভাব বিস্তার করে এমন মনে করা ভুল। এই প্রসঙ্গে তিনি জন-সংযোগের আরও অন্যান্য মাধ্যমগুলির কথাও উল্লেখ করেন।

যাঁরা সিনেমাকেই সমাজের সকল প্রকার নৈতিক অবনতির উৎস মনে করে থাকেন, শ্রীরেড্ডীর কথায় তাঁরা যে খুব সন্তুষ্ট হবেন এমন মনে হয় না। আজকের সমাজে তরুণ-তরুণীর নৈতিক অধঃপতনের জন্য সিনেমাই একমাত্র দায়ী—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত নয়।

কিন্তু তাই বলে একটি অপ্রীতিকর সত্যকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। এমন ছবিও আমরা অনেক সময় দেখি, তরুণ-তরুণীর মনের উপর যার প্রভাব মোটেই শুভ হতে পারে না। বলা বাহুল্য, বাংলা ছবি এই অপরাধে কদাচিৎ অভিযুক্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে হিন্দী ছবিরই দুর্নাম বেশী। সব হিন্দী ছবি নয়, তথাকথিত আমুদে হিন্দী ছবি—ক্রাইম ও যৌন উপকরণই যার মূল অবলম্বন।

সম্প্রতি কোন একটি হিন্দী ছবি নিয়ে শুধু রাজ্যসভায়ই নয়, লোক-সভাতেও তর্কের ঝড় বয়ে গেছে। এই ছবি কী করে সেন্সরের ছাড়পত্র পেল, সে প্রশ্নই কোন কোন সভ্য উত্থাপন করেছেন। তাঁরা ছবিটিকে "অশোভন ও অভব্য" আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সমাজ-জীবনের উপর সিনেমার প্রভাব সর্ব ক্ষেত্রেই শুভ এমন মনে করার কারণ নেই। এ ব্যাপারে সরকার ও চলচ্চিত্রসেবী ও ব্যবসায়ীদের নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে। কর্তব্য যত শীঘ্র সম্পাদিত হয় ততই মঙ্গল।

"চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য উপলক্ষে আহূত সাংবাদিক বৈঠকে বৈজয়ন্তীমালা

ফটো—দেশ

[illegible]

নেফা সীমান্তে ভারতের শিল্পী

"আপনারা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেন, আমরাও করি; আপনারা করেন বন্দুক দিয়ে, আমরা ক্যামেরা দিয়ে। আপনারা বন্দুক চালান আমাদের দেশকে, সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে। বার বার আপনাদের এই কথা বলে যাচ্ছি, কখনও নিরাশ হবেন না। কখনও মনে করবেন না, আমাদের জন্য আপনারা যে আত্মত্যাগ বরণ করে চলেছেন আমরা তা বিস্মৃত আছি। যখনই প্রয়োজনবোধ করবেন, আমাদের ডাকবেন। আমরা বার বার আসব।" সীমান্তে ভারতীয় জওয়ানদের এই কথাগুলি বলে এসেছেন জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা রাজ কাপুর।

কিছুকাল পূর্বে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শিল্পীদের কাছে এই আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের আনন্দ-বর্ধনের আয়োজন করেন। শ্রীনেহরুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ কাপুর কয়েকজন শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রতি নেফায় গিয়েছিলেন। রাজ কাপুরের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কৌতুকাভিনেতা আগা, কণ্ঠশিল্পী মুকেশ, যন্ত্রশিল্পী ভি বালসারা (কলকাতা), নৃত্য-শিল্পী মধুমতী ও মনোহর দীপক এবং অভিনেতা বিশ্ব মেহরা উল্লেখযোগ্য।

তিন দিন শিল্পীরা জওয়ানদের সামনে বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। জওয়ানরা শিল্পীদের গান ও কৌতুক-নকশা শুনে এবং

সরোজ-দীপ্তির "উত্তরায়ণ" (পরিচালনা: অগ্রদূত) ছবির একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

নৃত্য দেখে খুবই আনন্দলাভ করেন। শিল্পীরা শুধু বিচিত্রানুষ্ঠান পরিবেশন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। শিল্পীদের অনেকেই জওয়ানদের সংগে তাঁবুতে একসংগে বসে গল্পগুজব করেছেন খাওয়া-দাওয়া করেছেন এবং রাত কাটিয়েছেন।

রাজ কাপুর নিজের উদ্যোগেই শিল্পীদের সীমান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সীমান্তে শিল্পীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ কাপুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সংগীতশিল্পী ডি বালসারা এক বিবৃতিতে বলেন আমাদের দেশের আরও অনেক শিল্পী সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের আনন্দদানের জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁদের যাওয়ার খরচ বহন করবেন কে?

শিল্পীদের কাছে আমরাও আবেদন জানিয়েছিলাম, তাঁরা যেন সীমান্তে গিয়ে জওয়ানদের মানসিক প্রফুল্লতা বর্ধনের জন্য আমোদ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। আমরা বিশ্বাস করি, শিল্পীরা আগ্রহের সংগেই এই কাজে অগ্রসর হবেন। দেশের সংকটজনক পরিস্থিতিতে সকল শ্রেণীর শিল্পীরা জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ ও দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে বিনা পারিশ্রমিকে বহু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা যথেষ্ট দেখিয়েছেন। এর পর এমন আশা করা উচিত নয় যে, তাঁরা নিজেদের খরচে সীমান্ত-অঞ্চলে যাবেন। এ ব্যাপারে সরকার অথবা জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান যদি অগ্রণী হয়ে আসেন তবে শিল্পীরাও নিশ্চয়ই সানন্দে সীমান্ত-অঞ্চলে গিয়ে জওয়ানদের আনন্দদানের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। আমরা তা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি।

এ সপ্তাহে বহুপ্রতীক্ষিত বাংলা ছবি "দ্বীপের নাম টিয়ারঙ" মুক্তিলাভ করছে। চিত্রযুগের এই ছবিটি রমাপদ চৌধুরীর জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে তৈরী। গুরু বাগচী এর পরিচালক। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। নিরঞ্জন রায়, সন্ধ্যা রায়, দিলীপ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সিপ্রা সেন, দীপা চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ চৌধুরী, অমিত দে প্রভৃতি এ ছবির প্রধান শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুর রচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

একটি হিন্দী ছবিও এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম ভরোসা (বাসু ফিল্মস—মাদ্রাজ)। কে শংকর পরিচালিত এ ছবির বিভিন্ন মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন গুরু দত্ত, আশা পারেখ, মেহমুদ, শুভা খোটে, ওমপ্রকাশ, ললিতা পাওয়ার ও কানাইয়ালাল। রবি ছবির সংগীত পরিচালক।

রৌদ্ররেখা

গত সপ্তাহে রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদারের নতুন ছবি "রৌদ্ররেখা"র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীতরফদার। প্রথম দিনের শুটিং-এ ছবির তিনজন প্রধান শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা হলেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়।

হাই হিল

রাজীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" সম্প্রতি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। প্রণয় এবং হাসির উপাদান এ ছবির মূল উপজীব্য। রূপী গঙ্গোপাধ্যায় ও বিধায়ক ভট্টাচার্য যথাক্রমে ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। দিলীপ মিত্র ছবিটি পরিচালনা করেছেন। প্রধান চরিত্রচিত্রণে রয়েছেন সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় অনুপকুমার, কমল মিত্র, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা চট্টোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা রায়। এ ছাড়া [illegible] মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী ও নবদ্বীপ হালদার—এই তিনজন [illegible] শিল্পীকে ছবিতে দেখা যাবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সংগীত পরিচালক।

রাধা ফিল্মস স্টুডিয়োতে আর্ট ফিল্মস-এর "রৌদ্ররেখা"র প্রথম চিত্রগ্রহণের পূর্বে (বাঁয়ে) ছবির অন্যতম আলোকচিত্রশিল্পী জ্যোতি লাহা ও সত্যম রায়, (ডাইনে) ছবির প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদার ফটো—দেশ

বাদশা

অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠী রাধা ফিল্মস স্টুডিয়োতে শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর "বাদশা" ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এ ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন বিকাশ রায়, সন্ধ্যারানী, অসিতবরন এবং নবাগত কিশোর শিল্পী শঙ্কর ও শুভাশিস। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

বৈজয়ন্তীমালার "চণ্ডালিকা"

কলকাতায় গত সপ্তাহে রঞ্জি ইনডোর স্টেডিয়ামে বৈজয়ন্তীমালা ও তাঁর সহশিল্পিবৃন্দের পাঁচ দিনব্যাপী "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন কলা-কেন্দ্রম সংস্থা।

অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগের দিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বৈজয়ন্তীমালা বলেন, গুরুদেবের "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্য পরিবেশন করার সাধ আমার অনেকদিন ধরেই ছিল। গত আড়াই বছর এ নিয়ে আমি অনেক খেটেছি। এতদিনে আমার স্বপ্ন সফল হল। গুরুদেবের জন্মস্থান কলকাতায় আমি "চণ্ডালিকা" পরিবেশন করার সুযোগ পেয়েছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

"চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে বৈজয়ন্তীমালা তাঁর দুই সহকর্মী রবিশঙ্কর ও তাপস সেনের সহযোগিতা ও দানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

পরের দিন শুরু হল "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যাভিনয়। নাম-ভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালা ভরত-নাট্যমের আঙ্গিকে নৃত্য পরিবেশন করেন। দ্রুতলয়ে কমনীয় ছন্দে যখন তিনি নেচেছেন, অথবা বেদনার মুহূর্তে তিনি যখন মন্থর দেহভঙ্গিতে বিলম্বিত লয়ে তাঁর নৃত্যকলা প্রকাশ করেছেন তখন দর্শকরা অভিভূত হয়েছেন। কিন্তু যখনই তাঁর সহশিল্পীরা লোকনৃত্যের আঙ্গিকে অকারণে দীর্ঘায়িত সমবেত নৃত্যাংশ পরিবেশন করার জন্য বার বার মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন তখনই দর্শকের মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নির্মীয়মাণ "রাধাকৃষ্ণ" (পরিচালনাঃ অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) ছবিতে নবাগতা [illegible] [illegible] ও [illegible]

নৃত্য-নাট্যের আবেগ-মুহূর্তে রবিশঙ্কর রচিত আবহ-সুর দর্শকের মন আকৃষ্ট করে রেখেছে। এই অংশে সুরকার প্রধানত সেতার ও বাঁশীতে বেহাগ, দরবারী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ ব্যবহার করে সুরের যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু সমবেত লোকনৃত্যের সঙ্গে তিনি যে "একেট মিউজিক" ব্যবহার করেছেন তা নতুনধর্মী। এই "একেট মিউজিক"-এ চমক আছে। কিন্তু তা "চণ্ডালিকা"র অন্তর্লীন ভাবরসের বিরোধী। যেখানে প্রকৃতির উদ্দেশ্যে মেয়েরা কাঁদছে "ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না", সেই মুহূর্তটি বেদনার। এই অংশে সুরকারের "একেট মিউজিক" সেই করুণ মুহূর্তের রসটি গ্রাস করে ফেলেছে। "স্টান্ট"-ধর্মী এই মিউজিক-এ প্রকৃতির [illegible]

"স্যাভিজম"-এর সুরটিই তরল ধ্বনিতে ফুটে উঠেছে। যে ধরনের "একেট মিউজিক" এই নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে সিনেমার অথবা তথাকথিত মঞ্চ-মেলোড্রামার তা অবশ্যই ফলপ্রদ। কিন্তু "চণ্ডালিকা" নৃত্য-নাট্যের ক্ষেত্রে এই মিউজিক পরিত্যাজ্য।

বৈজয়ন্তীমালার "চণ্ডালিকা" ব্যালের আঙ্গিকে পরিবেশিত। ব্যালেতে গান সাধারণত পরিহার্য। কিন্তু সুরকার এই নৃত্যনাট্যে একাধিক রবীন্দ্র-সংগীতের সুর ব্যবহার করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা"র মর্মরূপ ও পরিবেশটি এতে প্রকাশ পেতে পারত। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা যাদের জানা নেই তাঁরাও এই সুর-মাধুর্যে অকথিত বাণীর রসটি আস্বাদন করতে পারতেন।

বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যকুশলতার ফলে তাঁর "চণ্ডালিকা" একটি উপভোগ্য নৃত্যানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে সন্দেহ নেই। তাঁর সহ-শিল্পীরাও সংগীতের তালে তালে সুন্দর নেচেছেন। তাপস সেনের আলোকনিয়ন্ত্রণ পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। বিশেষ করে প্রকৃতির মার মায়াশক্তি ব্যবহারের সময় শ্রীসেন আলো আঁধারের জাদুখেলা দেখিয়েছেন। এম আর আচরেকারের দৃশ্যসজ্জা ও শিল্প সম্মত হয়েছে।

কিন্তু নৃত্যনাট্যটির এইসব সংস্করণ শিল্পসৌষ্ঠবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা"র ভাবসম্পদটি হারিয়ে গেছে। চণ্ডালিকা"র একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে সুর আছে; এর মধ্যে চিরন্তন মানবিক অনুভূতির এমন এক প্রসাদগুণ আছে যা অনিবার্যভাবে ভাবগ্রাহীর মনকে আকর্ষণ করে। "চণ্ডালিকা"র মহৎ ও মরমী রস বৈজয়ন্তীমালার নৃত্যনাট্যে সামগ্রিক রূপ নিতে পারেনি। রসটি তাঁর নৃত্যনাট্যে অননুভূত।

নৃত্যনাট্যটি দেখার পর রসজ্ঞ দর্শকের মনে হবে, এই "চণ্ডালিকা" বৈজয়ন্তীমালার রবীন্দ্রনাথের নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের নামটি এই নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সেভাবে ঘোষণা করার প্রয়োজন কি? "চণ্ডালিকা"ই বা বৈজয়ন্তীমালা কেন নির্বাচন করলেন? এই প্রশ্নও তাঁদের মনে জাগতে পারে।

তবে একজন যশস্বিনী অবাঙালী নৃত্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের রচনার নৃত্যনাট্যরূপ দিয়েছেন। তিনি দুই কৃতী বাঙালীর সাহায্য নিয়েছেন। বাঙালীমাত্রই এতে আনন্দবোধ করবেন এবং আশা করবেন বৈজয়ন্তীমালা রবীন্দ্র রচনার নৃত্যনাট্যরূপ দানের কাজে ভবিষ্যতেও সমান আগ্রহশীল থাকবেন।

মিনার্ভার মঞ্চস্থ "তিতাস একটি নদীর নাম" নাটকের একটি দৃশ্যে শোভা সেন, নীলিমা দাস ও দীপিকা ভট্টাচার্য ফটো—দেশ

সুরঙ্গমা নিবেদিত "নবীন"

"যাদের রসবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাইনে আমরা চাই নবীনকে'। রবীন্দ্রনাথের "নবীন'-এ এই রসবেদনার উন্মেষ ও উত্তরণের মর্মসুরটি বিধৃত।

"নবীন" কথার সুতোয় গাঁথা অনুভূতির একটি মালা। কথার সঙ্গে এতে রয়েছে কিছু গান। এই কথা ও গানের সঙ্গে নৃত্যের ছন্দ মিশিয়ে দিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক নৃত্য-গীতাভিনয়ের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন সুরঙ্গমার শিল্পীবৃন্দ। [illegible] মজুমদারের পরিচালনায় গত রবিবার রবি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

নৃত্য-গীতাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনার ভাবরূপটি অবিকৃত ছিল। শিল্পীর মঞ্চে বসেই 'নবীন' এর গানগুলি গেয়েছেন গানের আগে রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যঞ্জক কথাগুলি পাঠ করে শুনিয়েছেন। কথা ও গানের সঙ্গে নেচেছেন নৃত্যশিল্পীরা। নৃত্য-গীতাভিনয়টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের রসচেতনার আবিষ্ট করে রাখে। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুরঙ্গমার শিল্পীরা এই নৃত্য-গীতাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। নীলিমা সেন, ক্ষমা ঘোষ, মন্দিরা চৌধুরী শিবানী সর্বাধিকারী, প্রসাদ সেন, ধ্রুব পান্ডা, বাসুদেব ভট্টাচার্য

[illegible]

শ্রীবিন্দু পিকচার্স-এর "বাদশা" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবির নামভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকৃতির গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। নৃত্যাংশে দক্ষতার পরিচয় দেন পূর্ণিমা ঘোষ, শিখা গুহ, মালা গুহ, সোনালচাঁপা দাশগুপ্ত, পূর্ণিমা বর্ধন, চৈতালী বসু, অনুরাধা পাল, অঞ্জলি সেন, সোমা মজুমদার, শুভ্রা সেন ও সৌমেন্দ্র ঘোষ। নৃত্য পরিকল্পনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন নন্দীয়া সিং ও সুকৃতি চক্রবর্তী।

আলোকসম্পাত (মঞ্চবিদ্যুৎ) এবং বিশেষ করে নৃত্যশিল্পীদের রূপসজ্জা খুবই প্রশংসনীয় হয়।

"অ্যারিনা স্টেজ"এ নাট্যাভিনয়

সুখ্যাত হিন্দীনাট্যসংস্থা অনামিকা সম্প্রতি "অ্যারিনা স্টেজ"-এ নাট্যাভিনয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। "অ্যারিনা স্টেজ"-এর বৈশিষ্ট্য হল : এতে অভিনয়-শিল্পী ও দর্শকদের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধানের কোন অবকাশ নেই। সাধারণত অভিনয়-মঞ্চে আলোকসম্পাত ও মঞ্চপরিকল্পনার মাধ্যমে যে "ইলিউশন" অর্থাৎ বাস্তবের মায়া-অনুকরণের যে ব্যবস্থা করা হয়ে থেকে, "অ্যারিনা স্টেজ"-এ তা সম্পূর্ণ বর্জিত। "অ্যারিনা স্টেজ"-এ অভিনয়-স্থলের চারিদিক ঘিরে একটু উঁচু জায়গায় দর্শকরা বসেন। তাঁদের সামনে এসে শিল্পীরা অভিনয় করেন। অভিনয় ছাড়া অন্য কিছুর আশ্রয় নেওয়ার উপায় নেই তাঁদের। শুধু অভিনয়—মঞ্চসজ্জা নয়, আবহ-সঙ্গীত নয়, আলো-আঁধারের মায়াজাল নয়। "অ্যারিনা স্টেজ"-এর এটাই বৈশিষ্ট্য। পুরাকালে বিদেশে "অ্যারিনা স্টেজে"ই নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হত। ও রাসলীলা প্রভৃতি অভিনয় "অ্যারিনা স্টেজ"-এ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কিন্তু সম্প্রতি বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় 'অ্যারিনা স্টেজে'র যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে তার আঙ্গিক অনেকটা ভিন্ন ধরনের। অনামিকা সংস্থা আধুনিক অ্যারিনা স্টেজে'রই অনুসরণ করেছেন।

থিয়েটার রোডে তাঁরা 'অ্যারিনা স্টেজ'টি তৈরী করেছিলেন। দর্শক-বেষ্টিত অভিনয়-স্থলে শিল্পীদের প্রবেশের পথ তাঁরা রেখেছিলেন চারটি। এই পথ ধরেই শিল্পীরা অভিনয়-স্থলে যাতায়াত করতে থাকেন। অভিনয় শুরু হওয়ার পর মণ্ডপে কোন দর্শকের প্রবেশের উপায় ছিল না। কারণ দর্শকের আগমন-নিষ্ক্রমণের পথেই শিল্পীদের আনা-গোনা। দৃশ্য পরিবর্তনের সময় শিল্পীরা নিজের হাতেই সেটের জিনিসপত্র সরিয়ে নেন এবং নতুন সেটের ভিন্ন আসবাবপত্র হাতে করে আবার নিয়ে আসেন। দর্শকের চোখের সামনেই এই সব কিছু ঘটতে থাকে। এক মিনিটের জন্য সব অন্ধকার। আলো জ্বলে উঠতেই দেখা যায় শিল্পীরা অভিনয়-স্থলে উপস্থিত।

"অ্যারিনা স্টেজ"-এ শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে সহজেই একাত্মতা গড়ে ওঠে। দর্শকরা শিল্পীরা এক হয়ে মিশে যান।

মঞ্চবিহীন অভিনব এই নাট্যাভিনয়ের জন্য সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন অনামিকা সংস্থা এবং বিশেষ করে শ্যামানন্দ জালান। শ্রীজালানই এই "অ্যারিনা স্টেজ" গঠনে অগ্রণী হয়েছিলেন। "অ্যারিনা স্টেজে" [illegible] "[illegible]" হিন্দী নাটকটির

"ছপতে-ছপতে" ব্যঙ্গাশ্রয়ী প্রহসন-নাটক। রুমানিয়ার একটি কমেডি নাটক অবলম্বনে এটি রচিত। এর হিন্দী নাট্যরূপ দিয়েছেন উমা গুপ্তা। "শেষ সংবাদ" নামে বাংলাতেও এই নাটকটি খুব জনপ্রিয় হয়।

শ্যামানন্দ জালান, উত্তমরাম নাগর, বিমল লাঠ, বিশ্বনাথসিংহ যাদব, শান্তিলাল জৈন শশী খান্না, অমৃতভূষণ, সত্যেন্দ্র সিং, রাম-গোপাল আগরওয়ালা, ভি এস আগরওয়াল দয়াশঙ্কর মিশ্র, বনওয়ারীলাল নিমানি গোবিন্দ ফতেপুরিয়া ও দেওয়ানচাঁদ রাঠৌরিয়া প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন।

সুপরিচালিত এই নাটকের দুয়েকটি প্রয়োগ-কর্ম, (যেমন রেডিওর বক্তৃত শোনানোর ব্যবস্থা) খুবই প্রশংসনীয়।

স্টেজ-পরিকল্পনা এবং মণ্ডপ-সজ্জায় যথাক্রমে জি সি জৈন ও অমলেন্দু সেন শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অনিল সাহা'র আলোকসম্পাত পরিচ্ছন্ন। অভিনয় শুরু হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত সঙ্গীতাংশ (রবি কিচলু রচিত) সুশ্রাব্য।

নাট্যসাহিত্য সম্মেলন

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের চার দিনব্যাপী অধিবেশন ১২ই এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে। অধিবেশন-স্থল : বিশ্বরূপা প্রাঙ্গণ। এবারকার সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত অধিবেশন চলবে।

নাট্যজগৎ সংবাদ

গত ৩০শে মার্চ বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার চতুর্থ গিরিশ পুরস্কার নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারের যোগ্যতা কোন দলই দেখাতে পারেননি বলে জানা গেল। দ্বিতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন 'নাট্যরূপ দল'। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাবেন যথাক্রমে বাদল সরকার ও বিনয় মুখোপাধ্যায়। এ বাদে বারোজন শিল্পী প্রশংসাপত্র পাবেন।

থিয়েটার সেন্টার সম্প্রতি ১৯৬১ ও ৬২ সনের একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হল : ১৯৬১ (একাঙ্ক) : প্রথম— [illegible]

শান্তিপুরে শিল্পীমহল)। (পূর্ণাঙ্গ): প্রথম—"হাজিরাটির গন্ধ" (থিয়েটার গাইবার); দ্বিতীয়—"গৃহপ্রবেশ" (ইউনিটি থিয়েটার কয়ার); তৃতীয়—"রং তুলি" প্রতাপপুরে মিলন মন্দির)। ১৯৬২ একাঙ্ক): প্রথম—"বিদ্যাসাগর" (মৌসুমী); দ্বিতীয়—"ওরা এগিয়ে গেছে" (সংহতি); তৃতীয়—"ম্যানিক" (স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া টাফ অ্যাসোসিয়েশন)। (পূর্ণাঙ্গ): প্রথম—আগন্তুক" (বার্নপুরে রূপায়ণ)" দ্বিতীয়—নাটক আর নাটক থাকে না" (ঋত্বিক); তৃতীয়—"এক পেয়ালা কফি" (সংহতি)।

শিলিগুড়ি রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাকেন্দ্র গীতিচরন"-এর চতুর্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হয়।

দেশের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে "গীতিচরন"-এর ছাত্র-ছাত্রীরা জনগণের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার জন্য কবিগুরুর দেশাত্মবোধক উদ্দীপক সংগীত পরিবেশন করেন।

প্রত্যেকটি গান সংগীত ও উদ্দীপনা-ব্যঞ্জক হয়, বিশেষ করে করবী মিত্রের একক গান "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক সকলকে অভিভূত করে।
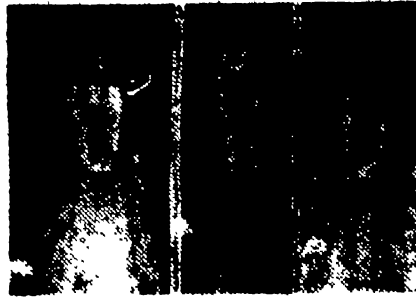
রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানের পর অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর সুদীর্ঘ সংগীত-জীবনের সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত এক সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে কবিগুরুর সংগীতসৃষ্টির সুর-সংযোজনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আলোচনান্তে শ্রীঘোষ পর পর তিনখানা রবীন্দ্রসংগীত ও সবশেষে "কঙ্কাল আমি তারে......" গানটি গেয়ে শোনান।

অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী প্রসাদ সেন, অমিয়াংশু মুখোপাধ্যায় ও অদিতি সেনগুপ্তা, রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন।

নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রবসন কলেজ অব ড্রামাটিকস-এর মঞ্চে নৃত্যানুষ্ঠানের পর শার্না, রথ ও করালিন

গতবারের মত এবারেও গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী নাইজিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রবসন কলেজ অফ ড্রামাটিকস-এর মঞ্চে একটি ভারতীয় নৃত্যের মনোরম অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। নৃত্যানুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মঞ্জুশ্রী সরকার (চাকী)। বিভিন্ন দেশের সতেরটি ছাত্রী এতে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় নৃত্যের অঙ্গসজ্জা, বিভিন্ন পোশাক, পুষ্পাভরণ—বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনৃত্যের বৈচিত্র্য ও লাবণ্য আন্তর্জাতিক দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের সংগীতাংশে দেশী ও বিদেশী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন।

একলব্য

কলকাতার হকি মরসুমের বারো আনা পার হয়ে গেছে। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন মীমাংসিত হতেও বেশী দেরি নেই। লীগ কোঠার শীর্ষস্থান অধিকারী এবং গতবারের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দুটি খেলা বাকি রেখে বোম্বাইতে গোল্ড কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়েছে। গত-বারের লীগ রানার্স ইস্টবেঙ্গলের বাকী আছে দুটি খেলা। বলা বাহুল্য এবারও এই দুটি দলকে কেন্দ্র করে লীগ খেলার আকর্ষণ। তবে মোহনবাগান এখনও পর্যন্ত একটি পয়েন্টও নষ্ট করেনি ১৭টি খেলায় বিজয়-গৌরব নিয়ে বোম্বাই যাত্রা করেছে, কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দুটি খেলায় কাস্টমস ও গ্রীয়ারের কাছে একটি করে পয়েন্ট নষ্ট করে বসে আছে। দুই দলের মধ্যে এখন সম-খেলায় পয়েন্টের পার্থক্য দুই। দুটি দলকেই বি এন রেলের সঙ্গে খেলতে হবে। বাকি খেলাটিতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের এই খেলাটির উপরই চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভর করছে—যদি বি এন রেলের বিরুদ্ধে দুই প্রধানের জয় ধরে নেওয়া যায়।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব থেকে মোহনবাগানকে বিমুখ করা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে একরকম অসাধ্য। কারণ মোহনবাগানকে দুবার পরাজিত করা ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আর দুবার পরাজিত না করতে পারলে ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভেরও কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্ট-বেঙ্গলের জয় ধরে নিলেও চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার জন্য দু' দলকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য সে খেলায় আবার পরাজিত করতে হবে মোহনবাগানকে। আগেই বলেছি, বি এন রেলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের জয় ধরে নিয়েই এই হিসাব। লীগ কোঠায় তৃতীয় স্থানাধিকারী বি এন আর ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে একটি পয়েন্ট বেশী নষ্ট করেছে শক্তিহীন রাজস্থানের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয়ের ফলে। না হলে প্রথম ডিভিসনে এই বছর নবাগত বি এন রেলের অবস্থাও ছিল উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ।

*

হকি লীগের ২০টি দলের মধ্যে লীগ কোঠার নীচের দুটি দলকে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামতে হবে। দ্বিতীয় ডিভিসনের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী আগামী বছর থেকে খেলার সুযোগ পাবে প্রথম ডিভিসনে। প্রথম ডিভিসনের একটি দলের ভাগ্য ইতিমধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে। ক্যালকাটাকে আগামীবার থেকে আবার দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলতে হবে। এ পর্যন্ত ক্যালকাটা একটি পয়েন্টও লাভ করতে পারে নি। পারবে বলেও আশা নেই। এই বছরই ক্যালকাটা প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। একদিনকার সুলতানের মত এক বছর খেলেই তাদের আবার রেলিগেশনের বিধানে পড়তে হয়েছে। প্রথম ডিভিসন থেকে আর কোন দল দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবে তা নিয়ে ভবানীপুর ও আদিবাসীর মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। যত দূর মনে হয়, আদিবাসীকেই হয়ত নেমে যেতে হবে।

দ্বিতীয় ডিভিসন হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ ও রানার্সের প্রশ্নের অনেক-দিন নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ডিভিসনে অপরাজিত থাকার গৌরব নিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে মেসার্স ক্লাব। জ্যাভেরিয়ান্স ক্লাব পেয়েছে রানার্সের সম্মান। আগামী বৎসর দু দলকেই প্রথম ডিভিসনে খেলতে দেখা যাবে।

প্রথম ডিভিসন হকি লীগে এবার গোলের বহর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর আগে কোন মরসুমে এত গোল হয়েছে বলে মনে পড়ে না। লীগের খেলা শেষ হতে এখনও বেশ দেরি আছে কিন্তু ইতিমধ্যে ২২ বার লীগের খেলায় হ্যাটট্রিক হয়েছে। এত হ্যাটট্রিকের বহরও কোন মরসুমে দেখা যায়নি। ১৭টি খেলায় মোহনবাগান ৮০টি গোল করেছে। মোহনবাগানের অলিম্পিক-খ্যাত খেলোয়াড় যোগীন্দর সিং ৪ বার করেছেন হ্যাটট্রিক। ইস্টবেঙ্গলের ইনাম-উর-রহমান এবং ইস্টার্ন রেলের এন হক দুবার করে হ্যাটট্রিক করেছেন। ক্যালকাটার বিরুদ্ধে বি এন আর-এর ১৫ গোল, ইস্ট-

টোকিওতে ব্যান্টমওয়েট [illegible] চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন
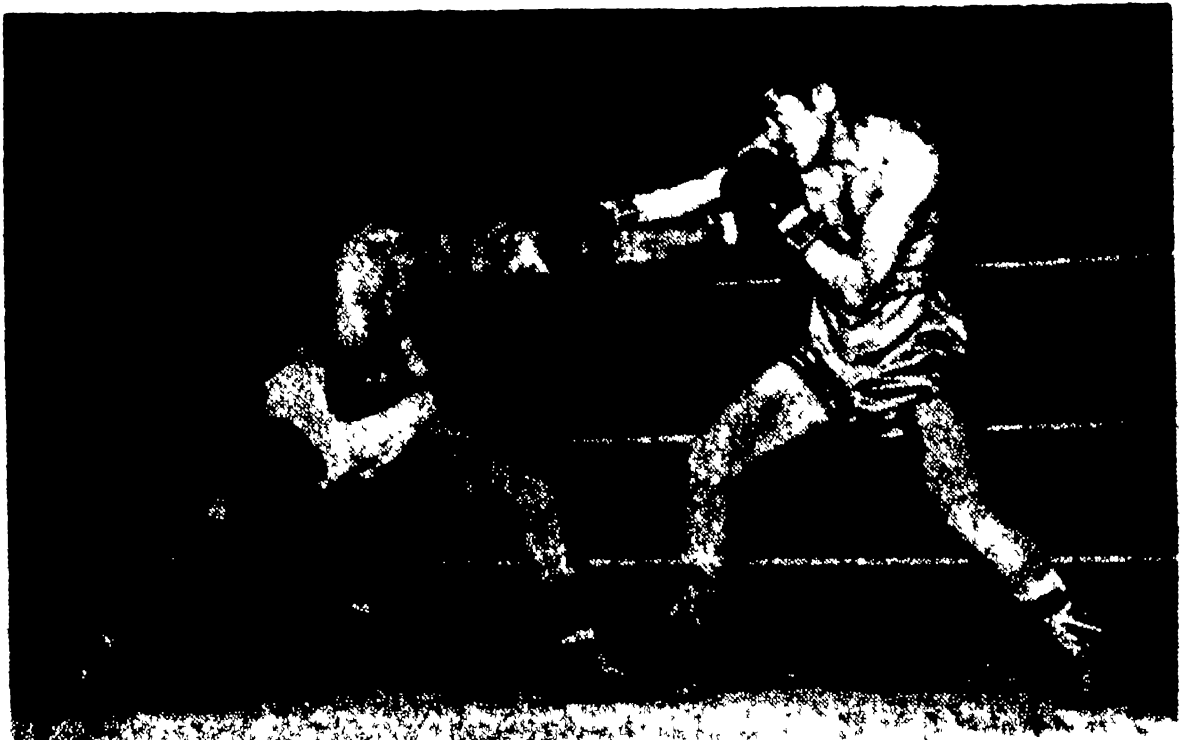
খেলোয়াড়ের ১০ গোল এবং আদিবাসীর বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ১০ গোলে জয়লাভের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ৬, ৭, ৮, ৯ গোলে জয়ের ঘটনার অভাব নেই।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এত গোল এবং এত হ্যাটট্রিকের কারণ কি? খুবই সহজ উত্তর—হকির মান অত্যন্ত নিম্নমুখী। যাদের খেলার মান আছে তাঁদের প্রায় সকলেই জড় হয়েছেন দু' তিনটি ক্লাবে। বাকি ক্লাবগুলি হয়েছে অত্যন্ত শক্তিহীন। কথা উঠতে পারে—মহমেডান স্পোর্টিং বা কাস্টমসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দলগুলির বেশী গোল না করবার কারণ কি? সেটা ক্লাবের ঐতিহ্য। ক্লাবের ঐতিহ্য থাকলে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় খেলোয়াড়ের সঙ্গে ক্লাবের জামার রংও প্রতিপক্ষের চোখে বিভ্রম সৃষ্টি করে। কাস্টমস এবং গ্রীয়ারের কাছে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট নষ্ট করার এও এক কারণ। কাস্টমস এবং মহমেডান দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের কষ্টার্জিত জয়ের কারণও ভিন্ন নয়।

যাই হোক, হকি লীগের আকর্ষণ অত্যন্ত মন্দীভূত। শুধু তিনটি খেলার জন্যই লোকের আগ্রহ। হকি রসিকদের দৃষ্টি এখন বেটন কাপের দিকে। বেটন কাপের খেলারও তোড়জোড় চলছে। আগামী সপ্তাহ থেকে খেলা আরম্ভের কথা।

*

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট সফরকে কেন্দ্র করে ইংলেণ্ড এবার যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল এখনও সমুদ্রের বুকে রয়েছে। ইংলণ্ডের মাটিতে পা দেয়নি, কিন্তু টেস্ট খেলা দেখার জন্য পাঁচটি টেস্ট কেন্দ্রের পরিচালকরা ভূরি ভূরি টিকিটের আবেদন পাচ্ছেন। এর প্রধান কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার ধারা। ইংলণ্ডের ক্রিকেট সমালোচকদের ধারণা দু বছর আগে অস্ট্রেলিয়া সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যে প্রাণবন্ত ক্রিকেটের নজীর রেখে গেছে, ইংলণ্ডেও যদি তেমন খেলতে পারে তবে আধুনিক ক্রিকেট নেতিমূলক খেলার ধারা কাটিয়ে উঠতে পারবে। খেলা হবে দর্শক-চোখের তৃপ্তিদায়ক। কারণ, অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পর ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজও যদি আকর্ষণীয় হয় তবে সারা বিশ্বে নিশ্চয়ই তার প্রভাব পড়বে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ইংলণ্ডে কাটাতে হবে প্রায় সাড়ে ৪ মাস। সাড়ে ৪ মাসে মোট ৩৩টি খেলার ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী পাঁচটি টেস্ট এবং দুটি নক আউটের খেলা। প্রথম শ্রেণীর মোট খেলা ২৪টি।

মে মাসের পয়লা তারিখ থেকে ইংলণ্ডে ক্রিকেট মরসুমের সূচনা। এইদিনই উস্টারশায়ারের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম খেলা। তবে এর আগে দুটি অ-প্রধান খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

ইংলণ্ডে টেস্ট কেন্দ্র ছয়টি। লর্ডস, ওল্ড ট্রাফোর্ড, লীডস, এজবাসটন, ওভাল ও টেন্ট ব্রিজ। এর মধ্যে টেণ্ট ব্রিজে এবার কোন টেস্ট খেলার ব্যবস্থা নেই। টেণ্ট ব্রিজ ও এজবাস্টনে টেস্ট খেলা হয় পর্যায়ক্রমে। নিচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পূর্ণ সফর তালিকা দেওয়া হল:—

২৪শে এপ্রিল—ডিউক অব নরফোকের একাদশ (অরুণ্ডেল) [sic order: see below]

২৪শে এপ্রিল—কর্নেল এল সি স্টিভেন্সের একাদশ (ইস্টবোর্ন)
২৭শে এপ্রিল—ডিউক অব নরফোকের একাদশ (অরুণ্ডেল)
১লা মে—উস্টারশায়ার (উস্টার)
৪ঠা মে—লেস্টারশায়ার (লিস্টার)
৮ই মে—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (কেম্ব্রিজ)
১১ই মে—ল্যাংকাশায়ার (ওল্ড ট্রাফোর্ড)
১৫ই মে—ইয়র্কশায়ার (মিডলসবরো)
১৮ই মে—এম সি সি (লর্ডস)
২২শে মে—নক আউট প্রতিযোগিতা বনাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (অক্সফোর্ড)
২৫শে মে—সারে (ওভাল)
১লা জুন—গ্লামোরগান (কার্ডিফ)
৬ই জুন—ইংলণ্ড (প্রথম টেস্ট—ওল্ড ট্রাফোর্ড)
১৫ই জুন—সাসেক্স (হোভ)
২০শে জুন—ইংলণ্ড (দ্বিতীয় টেস্ট—লর্ডস)
২৬শে জুন—হ্যাম্পশায়ার (সাউদাম্পটন)
২৯শে জুন—এসেক্স (সাউথ এণ্ড)
৪ঠা জুলাই—ইংলণ্ড (তৃতীয় টেস্ট—এজবাস্টন)
১৩ই জুলাই—লিস্টারশায়ার (লিস্টার)
১৭ই জুলাই—ডার্বিশায়ার (চেস্টারফিল্ড)
২০শে জুলাই—মিডলসেক্স (লর্ডস)
২৫শে জুলাই—ইংলণ্ড (চতুর্থ টেস্ট—লীডস)
৩১শে জুলাই—সারে (ওভাল)
৩রা আগস্ট—গ্লামোরগান (সোয়ানসী)
৭ই আগস্ট—ওয়ারউইকশায়ার (এজবাস্টন)
১০ই আগস্ট—ইয়র্কশায়ার (শেফিল্ড)
১৪ই আগস্ট—নর্দাম্পটনশায়ার (নর্দাম্পটন)
১৭ই আগস্ট—নটিংহামশায়ার (টেণ্ট ব্রিজ)
২২শে আগস্ট—ইংলণ্ড (পঞ্চম টেস্ট—ওভাল)
২৮শে আগস্ট—কেণ্ট (ক্যাণ্টারবারি)
৩১শে আগস্ট—এ ই আর গিলিগানের একাদশ (হেস্টিংস)
৪ঠা সেপ্টেম্বর—ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্স একাদশ (গ্রেভসেণ্ড)
৭ই সেপ্টেম্বর নক আউট প্রতিযোগিতা (লর্ডস)

*

পুনায় ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের জোনটার ফাইনালে ভারত ৪—১ খেলায় পাকিস্তানকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠতে [illegible]। ভারত ইচ্ছে করলে পাঁচটি খেলাতেই জিততে পারত কিন্তু আগেই জয় পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় পঞ্চম [illegible] আর প্রতিযোগিতা করেনি। [illegible] আলীকে একটি খেলায় সুযোগ [illegible] হয়েছিল। পাকিস্তানের ১৮ বছর [illegible] তরুণ খেলোয়াড় জুলফিকার রহিম এই খেলায় আখতার আলীকে পরাজিত করায় পাকিস্তান একটি খেলায় বিজয়ী হয়।

সত্য কথা বলতে ক্রিকেট, হকি বা ফুটবল খেলায় উন্নতি করার মতো টেনিসে পাকিস্তানের উন্নতি উল্লেখযোগ্য নয়। অবিভক্ত ভারতের নাম করা খেলোয়াড় ৪৬ বছরের ইফতিকার আমেদ এখনও পাকিস্তানের অপরিহার্য টেনিস খেলোয়াড়। সুতরাং নতুন প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলেনি। তবে জুলফিকার রহিমের কাছে আখতার আলীর পরাজয়ে ধারণা করবার কারণ আছে যে, পাকিস্তান টেনিসেও নতুন রক্তের সন্ধান চলছে।

পুনার ডেকান জিমখানা ক্লাব লনে ডেভিস কাপের খেলার আয়োজন করা ভারতীয় টেনিসের নতুন কর্মকর্তাদের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। অল্প কিছুদিন আগে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রী এস এ চিদম্বরম ভারতীয় টেনিসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। বিখ্যাত খেলোয়াড়

কলকাতা হকি লীগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় গোলের মুখের দৃশ্য —ফটো দেশ
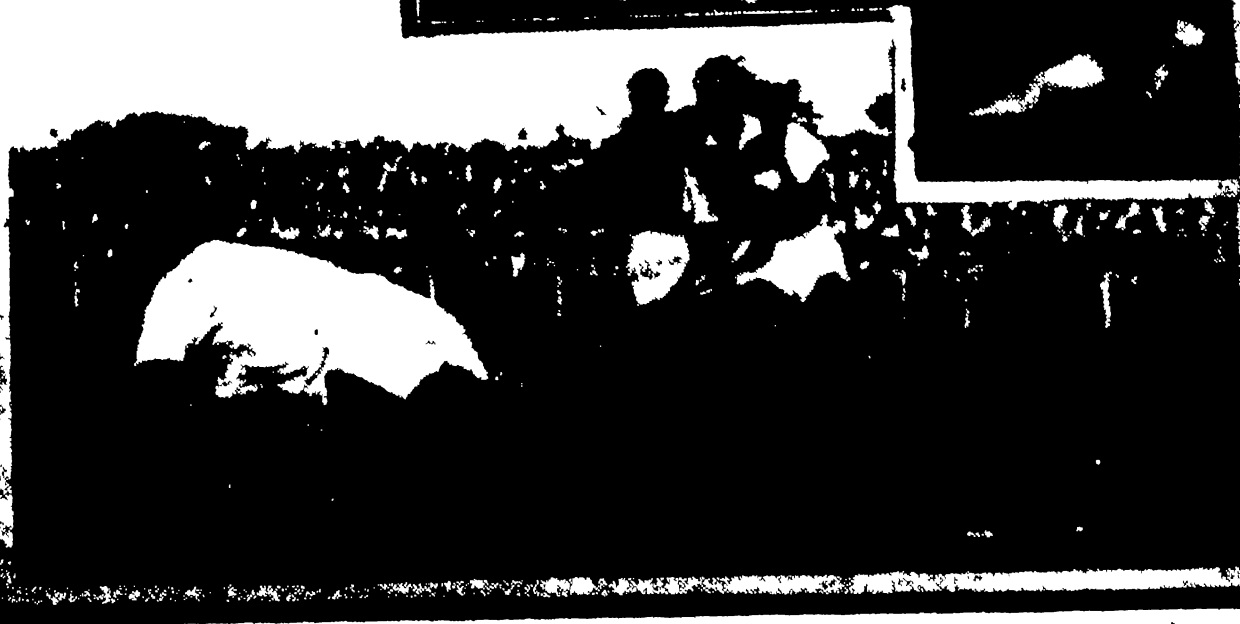
সমন্বিত মিশ্র হয়েছেন সম্পাদক। অপেক্ষাকৃত ছোট শহরে অপেক্ষাকৃত বড় খেলার ব্যবস্থা করে সেই খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলাই এ'দের উদ্দেশ্য। না হলে দিল্লি কলকাতার বদলে পুনায় ডেভিস কাপের আয়োজন করা হবে কেন? বড় বড় শহরে ক্রীড়ারসিকদের দৃষ্টি বড় খেলার দিকে। ছোট খেলায় তাঁদের মন ভরে না, পয়সাও খরচ করতে চান না। পয়সা খরচ করতে হলে যাচাই বাছাই করেই তা খরচ করেন। কিন্তু ছোট শহরের ক্রীড়ামোদীরা অল্পতেই সন্তুষ্ট। পুনায় প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যেও আড়াই হাজার দর্শকসমাগম তার প্রমাণ। টেনিসের এই দৃষ্টান্তে যদি অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন ছোট ছোট শহরে মাঝে মাঝে করা হয়, তবে জনপ্রিয়তা এবং অর্থ উপার্জনের দিক দিয়ে তার সাফল্য অনিবার্য।

যাই হোক, ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইন্যালে বিজয়ী ভারতকে এখন সেমি-ফাইন্যালে মালয়ের সঙ্গে খেলতে হবে। এপ্রিলের একুশ তারিখ থেকে কুয়ালালামপুরে খেলা আরম্ভের কথা। মালয়ের বিরুদ্ধে জয়ের পর ভারত পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে জাপান ও ফিলিপাইনের খেলার বিজয়ী দেশের সঙ্গে।

ভারত ও পাকিস্তানের খেলার ফলাফল:

জয়দীপ মুখার্জি (ভারত) ৬—৩, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে মুনীর পীরজাদাকে (পাকিস্তান) পরাজিত করেন।

রামানাথন কৃষ্ণন (ভারত) ৬—০, ৬—৩ ও ৬—০ গেমে পরাজিত করেন এস কুতুবুদ্দিনকে (পাকিস্তান)।

জয়দীপ মুখার্জি ও আখতার আলী (ভারত) ৩—৬, ৫—৭, ৬—৩, ৬—৪ ও ৬—২ গেমে ইফতিকার আহমদ ও মুনীর পীরজাদাকে (পাকিস্তান) পরাজিত করেন।

জুলফিকার রহিম (পাকিস্তান) ৬—৮, ৬—২, ১—৬, ৭—৫ ও ৬—৩ গেমে আখতার আলীকে (ভারত) পরাজিত করেন।

জয়দীপ মুখার্জি (ভারত) ৬—২, ৬—৩, ও ৬—৪ গেমে সৈয়দ কুতুবুদ্দিনকে (পাকিস্তান) পরাজিত করেন।

*

মুষ্টিযুদ্ধে আরও তিনটি জীবন বলির খবর এসেছে। পোর্টোরিকোর ১৯ বছর বয়স্ক আমেরিকান সৈনিক ফ্রান্সিসকো ভ্যালেন্সকুয়েজ সেন্ট মাইকেল স্কুলের ছাত্র আর্ল জনসনের সঙ্গে লড়বার সময় মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলশায়ী হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আর কিছুতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে না। হাসপাতালে স্থানান্তরের পর ৩০ মিনিটের মধ্যে ভ্যালেন্সকুয়েজ মারা যান। ভ্যালেন্সকুয়েজ মিডলওয়েটের মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন।

ব্রিসবেনের এক খবরে প্রকাশ, ১২০ মাইল দূরে সিয়ামপিপাতে এক পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্ক জনসনের মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হয়ে ২৬ বছর বয়স্ক মুষ্টিযোদ্ধা লেস্টার সিমস মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে সিমস অচৈতন্য হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি মারা যান। ৪ দিনের মধ্যে কুইন্সল্যান্ডের মুষ্টিযুদ্ধে এটা দ্বিতীয় মৃত্যু। এপ্রিলের ৪ তারিখে এখানে অ্যামেচার মুষ্টিযোদ্ধা এড্রিজও বার্বেলিরও জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে এক মুষ্টিযুদ্ধে মাথায় আঘাতের পর।

আমেরিকান সৈনিক ভ্যালেন্সকুয়েজের মৃত্যু কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কারণ সৈনিকদের মুষ্টিযুদ্ধের প্রধানত নিরাপত্তার জন্য ভ্যালেন্সকুয়েজ শিরস্ত্রাণ পরে রিংয়ে নেমেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাননি। দুজন ডাক্তারও রিং-এর পাশে ছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে ভ্যালেন্সকুয়েজ ভূতলশায়ী হবার পরই ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা আরম্ভ করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর জীবন ফিরে পাওয়া যায় না।

ডেভী মুরের মৃত্যুর পর পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তা প্রশমিত হতে না হতে আরও তিনজন মুষ্টিযোদ্ধার মৃত্যু এই কথাই প্রমাণ করে যে মুষ্টিযুদ্ধকে আইনের নাগপাশে বেঁধে দেবার প্রয়োজন আছে।

খেলাধুলায় মহিলা

মুকুল

পুষ্প ভট্টাচার্য

বাংলার লাঠিকে আজ অনেকেই ভুলতে বসেছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বাংলার সঙ্ঘ-সমিতিতে লাঠির কদর ছিল সব চেয়ে বেশী। বিশেষ করে যেসব সঙ্ঘ, সমিতি, ক্লাব, আখড়ার পেছনে ছিল জাতীয় ভাবধারার অনুপ্রেরণা সেখানে ডাম্বেল, বারবেল, মুগুর ও দৈহিক কসরতের সঙ্গে লাঠির মহড়া চলত সমান তালে। ডাম্বেল ভেঁজে, মুগুর ভেঁজে দেহকে মজবুত করে গড়ে তোলা হত, মাটি মাথায় সাধনায় শরীরকে করা হত শক্ত। লাঠির চর্চায় আয়ত্ত হত আত্মরক্ষার কলাকৌশল।

আজও বাংলার কোন কোন সঙ্ঘ-সমিতির ছেলেমেয়েদের মধ্যে লাঠিখেলার চর্চা আছে, কিন্তু সার্বিকভাবে লাঠির সে কদর আর নেই। হয়তো উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে। অনেকে হয়তো মনে করেন, লাঠির প্রয়োজনই হয়তো ফুরিয়ে গেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ফলে নানা মারণাস্ত্র আবিষ্কারে লাঠি হয়ে পড়েছে সেকেলে হাতিয়ার। কোনরকম যুক্তিতর্কের মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলা যায়, হঠাৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং জাতির পুরনো ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য লাঠি খেলার প্রয়োজন আজও আছে। সব চেয়ে বড় কথা লাঠির অনুশীলনে মনে যে আত্মবিশ্বাস আসে সেই আত্মবিশ্বাসের ফলে বড় বিপদও অনেক সময় ছোট হয়ে যায়। যে দেশের খবরের কাগজ খুললে এখনো নারীহরণ, নারীর উপর অত্যাচারের সংবাদ চোখে পড়ে সে দেশে লাঠির প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, স্বীকার করি কিভাবে?

'খেলাধুলায় মহিলা' স্তম্ভে এর আগে যেসব মেয়ের কথা লেখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লাঠি-ছোরা খেলায় প্রতিষ্ঠা অর্জন না করেছেন, এমন নয়। তবে আর পাঁচ-রকমের খেলাধুলার সঙ্গেই তাঁরা লাঠির চর্চা করেছেন। কিন্তু আজ যে মেয়েটির কথা লিখছি, তিনি আর সব খেলাধুলা ফেলেও লাঠিকেই শুধু মুঠিতে আঁকড়ে রাখেননি লাঠি-খেলাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন অন্যান্য খেলাধুলার উপরে।

ওর নিজের কথায়: শুধু প্রাধান্য বললে কম বলা হবে। অন্যান্য মেয়েরা ছেলেবেলায় নানারকমের পুতুল পছন্দ করে। আমি এই লাঠিখেলাকেই শৈশবজীবনের পুতুল হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম।

আর তাই কাঁধে নেওয়া লাঠিই ওর জীবনে এনে দিয়েছে বহু গুণীজনের আশীর্বাদ আর সুধীজনের খ্যাতি।

মেয়েটির আদি বাড়ী ছিল ত্রিপুরা জেলার বুড়িচং গ্রামে। কাজের প্রয়োজনে বাবা জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। সেখানেই মেয়েটির জন্ম। মাত্র ৮ বছর বয়সে বিভূতিরঞ্জন দত্তর কাছে ওর লাঠি-ছোরা খেলার হাতেখড়ি। বিভূতি দত্ত ছিলেন বিপ্লবী অমৃতলাল হাজরার মন্ত্রশিষ্য। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুৎসু, বক্সিং, বাক্সিং প্রভৃতি খেলাধুলায় পারদর্শী।

সাম্প্রদায়িক কলহের বিষবাষ্প ঢাকার আকাশবাতাস যত বিষাক্ত করে—নারায়ণগঞ্জের হাজরা ক্লাবের প্রতি যুবক-যুবতীর তত আকর্ষণ বাড়ে। একদল ছেলেমেয়ের মধ্যে ওখানে পুষ্প ভট্টাচার্যের বিশিষ্ট ভূমিকা।

ওর হাতে লাঠি ধরবার সময় শনশন আওয়াজ তোলে, ছোরায় বিদ্যুৎ খেলে। এক-গাদা লোহার চকতি বেঁধে চুলের দ্বারা যখন ভার তোলে তখন দর্শকরা অবাক হয়।

পয়লা বৈশাখ হাজরা ক্লাবের খেলাধুলোর বার্ষিক প্রতিযোগিতায় ওর কাছ থেকে লাঠি ও ছোরা খেলার প্রথম পুরস্কার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ৯ বছরের মেয়ের চুলে করে ১২৫ পাউন্ড ভার তোলা দেখেও সবাই অবাক হয়ে যায়। এর পর প্রতি ক্লাবের কুচকাওয়াজে ওর প্রদর্শনীর ডাক, লাঠি ও ছোরা খেলার মহড়ার ব্যবস্থা।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে আজন্মের বাসস্থান ছেড়ে ওদের কলকাতায় চলে আসতে হয়। ছন্নছাড়া জীবনে খেলা-ধুলোয়ও সাময়িক বিরতি পড়ে।

ইন্টালী নির্ভীক সমিতি পুষ্প ভট্টাচার্যের খেলাধুলোর জীবনের আর এক স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৫০ সালে বিভূতিরঞ্জন দত্ত এই সমিতির লাঠি ও ছোরা খেলার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পুষ্প ভট্টাচার্য আবার পুরোদমে অনুশীলন আরম্ভ করে নির্ভীক [illegible] নিখিল বঙ্গ লাঠি প্রতিযোগিতায় ওর হাতে আসে মেয়েদের বিভাগের প্রথম পুরস্কার। কলকাতার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে একটা অজানা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু যখন বিভূতিদা বললেন ওর উপর সমিতির সম্মান এবং তাঁর নিজের মান নির্ভর করছে তখন ও যেন নতুন প্রেরণা পেল। লাঠি নিয়ে মঞ্চে [illegible]

[illegible] বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি [illegible] না। প্রতি বছরই এই সমিতি সমারোহের সঙ্গে নিখিল ভারত লাঠি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। ১৯৫২ সালের প্রতিযোগিতায় বহু নাম-করা প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনীর মধ্যে পুষ্প ভট্টাচার্য আসরে নেমে পড়ল। বলা বাহুল্য মেয়েদের লাঠি ও ছোরা খেলা দুটি বিষয়েরই প্রথম পুরস্কার এল পুষ্পের হাতে। তারপরই দেখা দিল এক মহাসমস্যা। সে সমস্যা বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির কর্তৃপক্ষকে ভাবিয়ে তুলল।

আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক বড় লাঠির 'হাড়োয়া' প্রতিযোগিতায় মেয়েদের অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল না। পুষ্পের দাবি—যখন ইভেন্ট "ওপেন টু অল" তখন আমিই বা এতে যোগ দিতে পারব না কেন? খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। আবার লাঠিখেলায় পুরুষ-মেয়ের একসঙ্গে প্রতিযোগিতা অসঙ্গতও বটে! এতদিন কোন মেয়েই সাধারণ বিভাগে প্রতিযোগিতা করবার জন্য এভাবে এগিয়ে আসেনি। চিরাচরিত বিধির বাঁধ ভাঙা কি
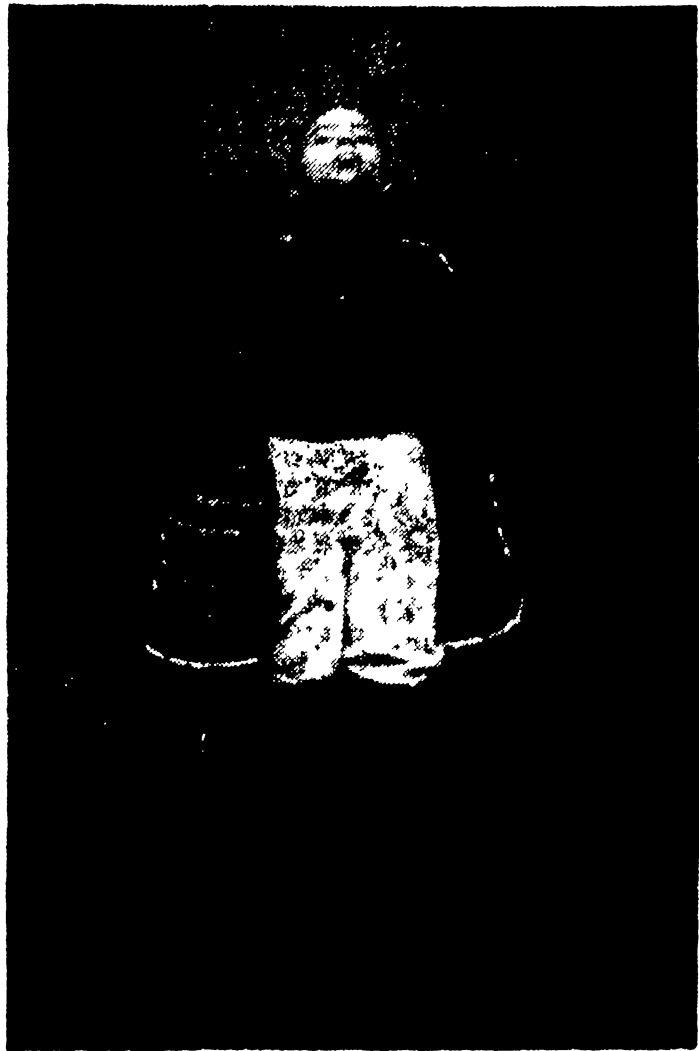
পুষ্প ভট্টাচার্যের চুলে ভার তোলার দৃশ্য

[illegible] ইভেন্টে [illegible] অংশ গ্রহণের আইনত অধিকার আছে 'অল'এর মধ্যে সেও একজন।

শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলল। পুষ্প ভুলে গেল সে মেয়ে সে [illegible] প্রতিনিধি। [illegible] মাটির [illegible] পুরুষের মত এই মাটির উপর তারও সমান অধিকার। তাই 'হাড়োয়া' খেলায় পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে পুরুষের মতই অমিত বিক্রমে লাঠি নিয়ে আসরে নেমে পড়ল। চারিদিকে আরম্ভ হল করতালিধ্বনি। পঞ্চাশজন পুরুষের মধ্যে একমাত্র নারী। সাবাস মেয়ে!

প্রতিযোগিতা-শেষে ফলাফল জানবার জন্য সবাই উৎকর্ণ। মাইকে ঘোষকের কণ্ঠস্বর: প্রথম—"পুষ্প ভট্টাচার্য"। এবার করতালির আরও জোর আওয়াজ।

এর পর ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কলকাতায় এবং কলকাতার আশেপাশে বহু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে পুষ্প। [illegible] ১৯৫৩ সালে ইডেন উদ্যানে [illegible] ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় [illegible] লাঠিখেলায় প্রথম [illegible]। ১৯৫৫ সালে একই ক্রীড়াঙ্গনে [illegible] উৎসব আয়োজিত প্রদর্শনীতে চুলের দ্বারা ৩২০ পাউন্ড ভার তুলে পেয়েছে দর্শকদের অজস্র ধন্যবাদ।

নানা প্রদর্শনীতে যারা ওর চুলে করে ভার তোলা দেখেছেন দেখেছেন বেনেটি, [illegible] বেনেটি খেলার কলাকৌশল তারা সত্যিই অবাক হয়েছেন।

সাঁতার ভলি বাস্কেটবল বা ব্যাডমিন্টন খেলা পুষ্পের মন কোনদিন আকর্ষণ করেনি। তবে মাঝেসাঝে অ্যাথলেটিকস স্পোর্টসে নাম দিয়েছে, প্রাইজও কিছু কিছু হাতে না এসেছে, এমন নয়। এখন আর ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, খেলাধুলোর উপরও প্রায় ইতি পড়েছে। এখন শান্তি-নিকেতনে বি টি-র শিক্ষার্থী। তবে বি টি-র নানা ধরনের শিক্ষাদীক্ষার সময় লাঠি-ছোরার কথা মনে পড়ে। মনও চঞ্চল হয়ে ওঠে। পুরনো স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় অতীত অধ্যায়ের প্রাণখোলা খেলাধুলোর কথা।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—নির্মল দত্ত

৩০ বর্ষ ॥ ২৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৬ বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Saturday, 20th April 1963.

সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে

হিন্দীওয়ালাদের মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। লোকসভায় সরকারী ভাষা সম্পর্কিত যে বিল আনা হয়েছে তার প্রস্তাবিত বিধান হল ১৯৬৫ সালের ২৬ জানুয়ারীর পর হিন্দীই হবে মুখ্য সরকারী ভাষা। সরকারী কাজকর্মে ইংরেজীর ব্যবহারও চলতে দেওয়া হবে বটে কিন্তু হিন্দীর সম মর্যাদাসম্পন্ন সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে নয়। এককথায়, হিন্দীকে দেওয়া হবে পূর্ণ রাষ্ট্রিক মর্যাদা এবং সরকারী কাজকর্মে হিন্দী ব্যবহারের বিধান হবে অবশ্যপালনীয় অপরপক্ষে হিন্দীর অনুচর হিসেবে (সহযোগী নয়) ইংরেজীতে সরকারী কাজকর্ম চালানোর অনুমতি দয়া করে দেওয়া হলেও ইংরেজীকে সরকারী ভাষারূপে সংবিধানগত মর্যাদা বা স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

ইংরেজী হটানেওয়ালারা কিন্তু এতেও খুশী নন। কারণ তাঁরা চান ইংরেজীকে পুরোপুরি বরবাদ করা হোক। এঁদের তরফ থেকেই হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার উগ্র সমর্থনে লোকসভায় বীভৎস হট্টগোল সৃষ্টি করেছেন। হিন্দীপ্রেমীদের উন্মত্ততা দেশে যে কী বিষম বিপর্যয় ঘটাতে পারে আবারও তার কিছু শংকাজনক নিদর্শন পাওয়া গেল। সরকারী ভাষা বিলের বিরুদ্ধে সংগত প্রতিবাদ হওয়া উচিত অহিন্দীভাষীদের পক্ষ থেকে। কারণ এই বিল হিন্দীর নয়, অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে। ইংরেজীকে সহযোগী সরকারী ভাষা গণ্য করা হবে এবং অহিন্দীভাষীদের সম্মতি ছাড়া কখনই ইংরেজীকে হটিয়ে হিন্দীর রাষ্ট্রিক একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হবে না কেন্দ্রীয় সরকার বহুবার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের উদ্দেশ্যেই সরকারী ভাষা বিল রচিত এবং গৃহীত হওয়ার কথা যাতে ১৯৬৫ সালের পরও সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর মর্যাদা স্বীকৃত হয়। অথচ বিলের বিধান এমন সুকৌশলে রচিত যার ফলে হিন্দীর রাষ্ট্রিক মর্যাদা এক ধাপ উঁচুতে উঠছে আর ইংরেজীকে নামানো হয়েছে এক ধাপ নিচুতে।

লোকসভার সদস্য শ্রীফ্রাঙ্ক অ্যান্টনী অযথা বলেন নি, এই সরকারী ভাষা বিল বিশ্বাসভঙ্গ এবং অহিন্দীভাষীদের প্রতি প্রতারণার সামিল। প্রায় চার বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন ১৯৬৫ সালের পরেও যতদিন প্রয়োজন ইংরেজী চালু থাকবে ভারতের সহযোগী অথবা বিকল্প ভাষা হিসেবে। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ইংরেজী কত দিন চালু থাকবে সে-বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত দেওয়ার অধিকার অহিন্দীভাষীদের, হিন্দীভাষীদের নয়। অর্থাৎ ইংরেজী বরবাদ করা বা হটানোর জন্য হিন্দীওয়ালাদের জিদ জবরদস্তি কখনও গ্রাহ্য করা হবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস উপরওয়ালাদের দয়ার দান নিশ্চয়ই নয় যে তাঁরা ইচ্ছা করলেই এই প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাস নাকচ করতে পারেন। অহিন্দীভাষীরাই দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি কোন ভাষা পূর্ণ সরকারী মর্যাদা পাবে কিংবা পাবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি অহিন্দীভাষীদের।

আশ্চর্যের বিষয় যে, সরকারী ভাষা বিল যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা অহিন্দীভাষী জনসাধারণের সুস্পষ্ট ইচ্ছার মর্যাদা রক্ষা করেন নি সুবিধা অসুবিধার প্রশ্নও বিবেচনা করেন নি হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পই তাঁদের কাছে প্রধান্য পেয়েছে। সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে পূর্ব প্রতিশ্রুতি কেন ভঙ্গ করা হচ্ছে সে বিষয়েও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও কারণ দেখান নি। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে এমন অশোভন নীতিগত বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। উগ্র হিন্দীপ্রেমী ইংরেজী হটানেওয়ালাদের চাপে এবং ভয়েই গভর্ণমেন্ট পিছু হটেছেন মনে করা যায় একাধিক আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে হিন্দী মাত্র একটি হিন্দীভাষীরা দেশের জনসমষ্টির সংখ্যালঘিষ্ঠ উপরন্তু ভাষা হিসেবেও হিন্দী অন্য কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার চেয়ে নিকৃষ্ট। কাজেই ভাষার সমৃদ্ধি এবং ব্যবহারিক গুণাগুণ বিচারে হিন্দীকে মুখ্য সরকারী ভাষা গণ্য করার দাবি একেবারেই অচল। কেন্দ্রীয় কর্তারা তবুও এই অচলকেই সচল করার জন্য আইন প্রণয়নে উৎসাহী। সন্দেহ নাই উৎকট হিন্দীপ্রেম কেন্দ্রীয় কর্তাদের বিচারবিবেচনা শক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দীপ্রেমীদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, সরকারী ভাষা বিলে হিন্দীকে ইংরেজীর উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে, হিন্দীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা স্বীকৃতির জন্য এমন বিধান ইতিপূর্বে কখনও করা হয় নি। সরকারী ভাষা বিলের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তি থেকে অহিন্দীভাষীরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন, ইংরেজী হটানোর বন্দোবস্ত এবার রীতিমত সরকারী আইনের বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি পাচ্ছে। পূর্ব প্রতিশ্রুতিভঙ্গ অতএব আকস্মিক নয়, সুপরিকল্পিত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রথম পর্ব—সরকারী ভাষা বিলে ইংরেজীকে হিন্দীর সমপদস্থ সহযোগী সরকারী ভাষা গণ্য করা হয় নি। প্রস্তাবিত বিধানে যেন নিতান্তই দয়া করে বলা হয়েছে হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর ব্যবহারও চলতে পারে (may continue to be used in addition to Hindi) কিন্তু কতদিন চলতে পারে সে প্রশ্নের উত্তরেও মস্ত বড় ফাঁকি—১৯৬৫ সাল থেকে দশ বছর পরে ইংরেজীকে একেবারে বরবাদ করার অভিসন্ধিমূলক বিধান। প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় আশ্বাস সুকৌশলে ব্যর্থ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন সহযোগী সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী কতদিন চালু থাকবে সে-বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত দেবেন অহিন্দীভাষীরা। সরকারী বিলে এই সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিধান প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত আশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ এই বিধানের নির্দেশ ১৯৬৫ সাল থেকে দশ বছর পর একটি পার্লামেন্টারী কমিটী বিবেচনা করবেন হিন্দীই তখন ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষা হবে কি না।

প্রথম ধাপ হিন্দীকে মুখ্য সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং ইংরেজীকে সহযোগী ভাষারূপে সংবিধানগত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা। দ্বিতীয় ধাপ দশ বছর পরে সরকারী কাজে ইংরেজী ব্যবহারের সামান্য সুযোগ পর্যন্ত প্রত্যাহারের জন্য আইনগত প্রস্তুতি। সরকারী ভাষা বিলের বাস্তব তাৎপর্য এই। বিলের বিরুদ্ধে উগ্র হিন্দীপ্রেমীদের কপট ক্রোধে অহিন্দীভাষীরা নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হবেন না। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসকমণ্ডলী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন, দেশের বৃহত্তম জনসমষ্টি অহিন্দীভাষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ করে হিন্দীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। এই বহুভাষী দেশের ঐক্য এবং সংহতি রক্ষার জন্য সরকারী ভাষা বিল প্রত্যাহারের কিংবা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত সংশোধনের দাবি করা কর্তব্য।

দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০

আগামী ২৫ বৈশাখ অন্যান্য বৎসরের মত এই বৎসরও "দেশ" পত্রিকার বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হবে।

বাংলা দেশের যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় স্বাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারণ করে গিয়েছেন, তাঁদের সাহিত্য-কর্মের এই বিশেষ দিকটির বিষয়ে দেশবাসীকে নূতন করে অবহিত করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

রামমোহন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন যুগে প্রবন্ধে কাব্যে সংগীতে ও উপন্যাসে দেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় কিভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে গিয়েছেন সে বিষয়ে একাধিক মনীষী প্রাবন্ধিকের রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংবলিত একাধিক তথ্য-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

দর ঃ ৮০ নঃ পঃ

রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ১.৩৮ নঃ পঃ

ইরাকের গদি থেকে কাসেমের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। কাসেমের কর্তৃত্বের অবসান যারা ঘটায় তারা কম্যুনিস্টবিরোধী নাসেরপন্থী। কায়রোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যারা সিরিয়াকে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তারা কোনো সময়েই নিজেদের কর্তৃত্ব কোনো সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি. ইরাকে কাসেমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়ার নাসের-বিরোধীরা আরো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবিলম্বে নাসের অনুরাগীরা তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। এবার মিশর সিরিয়া এবং ইরাক মিলে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক গঠিত হলো। আরব ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এই রাষ্ট্রের আকর্ষণী শক্তি অনেক বেশি হবে। কিন্তু সেই আকর্ষণী শক্তি কি এমন হবে যে [illegible] রক্তপাত এড়িয়ে সন্ধিস্থাপন সম্ভব হবে? আরব জগতের বর্তমান এবং গত কয়েক বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে সেরূপ ভরসা হয় না। সেজন্য আরব ঐক্যের কথা নিয়ে বেশী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে না। আরো অনেক মারামারি কাটাকাটির সংবাদ শোনা বাকী আছে। অবশ্য দোষটা কেবল আরব জাতিগুলির নয়। যতদিন পারবে বিদেশী স্বার্থ আরব জগতের অভ্যন্তরের দুর্বলতার সুযোগ নেবে। আরব জগতের দুটি প্রধান সম্পদ তেল এবং স্ট্র্যাটেজিক পজিশন। এ দুটি সম্পদের ভাগ কিন্তু সকল আরব রাষ্ট্রগুলির ভাগে সমান পড়ে নি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নয়নের পরিমাণেও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ আছে। এরূপ ক্ষেত্রে শান্তির পথে ঐক্যের সাধনা অত্যন্ত দুষ্কর.

✻

কঙ্গো থেকে ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ইউ এন-এর সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার এখনো হয়ত কঙ্গোতে আছেন। তবে ভারতীয় "কম্ব্যাটান্ট" সৈন্য বোধ হয় সবই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এটা সুসংবাদ সন্দেহ নেই। বোম্বাইতে ফিরে আসার পরে সৈন্যেরা বিশেষভাবে সম্বর্ধিত হন। দেশের লোকদের কাছ থেকে এ সম্মান নিশ্চয়ই তাঁদের প্রাপ্য। কঙ্গোতে তাঁরা শৌর্য ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন সেটা উচ্চ-প্রশংসালাভের যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সৈন্যেরা কী কাজ করে এলেন সে সম্পর্কে দেশের সাধারণ মানুষেরা কী বুঝল? বিদেশে আমাদের একদল সৈন্যকে পাঠানো হলো। তাঁদের ইউ এন-এর কাজে পাঠানো হলো। কিন্তু তাঁরা যে কাজটা করে এলেন তার তাৎপর্যটা দেশের সাধারণ লোক কী বুঝল? কোনো একটা অভিযানের কী ফললাভ হলো তা যদি দেশের লোকেরা বুঝতে না পারে তবে এমন অভিযানে দেশের সৈন্য পাঠানো কি উচিত? কটাঙ্গা কঙ্গো থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করেছিল, সেটা ঠেকানো গেছে কিন্তু যে কঙ্গো থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনা হলো সেই কঙ্গোর আভ্যন্তর অবস্থা এখন কিরূপ? সেখানে কি শান্তি স্থাপিত হয়েছে? কঙ্গো কি সত্যই কঙ্গোলীজদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে? আডোলা সরকারের প্রকৃত শক্তি এবং স্বরূপটা কতটুকু? কঙ্গোতে ভারতীয় সৈন্যরা শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে কাজ করে এসেছেন বলে আমরা আনন্দ করছি। ইউ এন-এর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসাপত্রও পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কঙ্গোলীজরা কী ভাবছে? তারা কি ভাবছে যে ভারতীয় সৈন্যেরা কঙ্গোতে একটা মহৎ কার্য সম্পন্ন করে দিয়ে গেলেন? কঙ্গোতে নূতন করে একটা সৈন্যবাহিনী গঠন করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই সৈন্যবাহিনীর শিক্ষার জন্য আডোলা সরকার বেলজিয়াম ইটালী নরওয়ে এবং ইজরায়েলের সাহায্য চেয়েছিল। আশ্চর্য এই যে যে দেশের সৈন্যেরা কঙ্গোতে এতো ভাল কাজ করে এলো—[illegible] কঙ্গোলীজ পার্টি গঠিত এবং সদ্য কঙ্গোলীজ সরকার সে-দেশের সাহায্য চাইলেন না। এই থেকে সন্দেহ হয় যে ভারতীয় সৈন্যেরা ইউনাইটেড নেশনস্-এর তরফে কঙ্গোতে যে-কাজ করেছেন সে কাজের দরুন ভারতের প্রতি কঙ্গোলীজদের শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব বাড়ে নি। সুতরাং কঙ্গোতে কয়েক সহস্র ভারতীয় সৈন্য পাঠানো এবং সেখানে তাঁদের দিয়ে যুদ্ধ করানো ভারতের পক্ষে লাভজনক হয় নি। এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশে ভারতীয় সৈন্য

পাঠানোই বোধ হয় উচিত নয়। চীনাদের সংগে গোলমাল বাধতে কংগো থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে আনার জন্য যদি চাপ না পড়ত তাহলে ভারত সরকার কংগো থেকে ভারতীয় সৈন্যদের কতদিনে ফিরিয়ে আনাতেন কে জানে! মিশর ও ইজরেল সীমান্তে শান্তিরক্ষার জন্য গাজায় বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় অফিসার এবং সৈন্য বহু বছর যাবৎ রাখা হয়েছে। এ'দেরও এখন দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা উচিত।

*

লাওস-এ আবার যুদ্ধ বেধেছে। গত বছরের জেনেভা চুক্তি অনুসারে লাওস নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য। জেনেভা সম্মেলনে যে চৌদ্দটি রাষ্ট্র যোগ দেয় তারা লাওস-এর নিরপেক্ষতা "গ্যারাণ্টী" করেন অর্থাৎ লাওস-এর "নিরপেক্ষতা" রক্ষার দায়িত্ব তাঁরা নেন। "নিরপেক্ষ পন্থী" প্রিন্স সুভন্না ফুমা প্রধানমন্ত্রী হলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো সংহত নিরপেক্ষ-ভাবাপন্ন সরকার তিনি গড়ে তুলতে পারেন নি। সামরিক শক্তি ত্রিধা বিভক্ত হয়েই রইল এবং ক্রমশ কম্যুনিস্টপন্থীদের হাতেই সামরিক শক্তি বাড়তে লাগল। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, আগেই "নিরপেক্ষপন্থী" জেনারেল কং লী দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়ে কম্যুনিস্টদের শক্তি বাড়াবার সুযোগ দিয়েছিলেন। পরে কম্যুনিস্টরা নিরপেক্ষ পন্থীদের মারতে লাগল। অবশেষে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে ভিয়েৎমিন এবং চীনা সৈন্য লাওস-এর কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যোগ দিল। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যে-ইণ্টারন্যাশনাল কমিশন আছে (এই কমিশনের চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভারত সরকারের প্রতিনিধি এবং অপর দুজন সদস্য কানাডা ও পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধি) তাকে কস্তুত নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল। এ সব জায়গায় গোলমাল, নানা অজুহাতে সে সব জায়গায় কমিশনকে যেতেই দেওয়া হয় নি। প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না কুমার যখন টনক নড়েছে তখন সামরিক শক্তিতে কম্যুনিস্টরা প্রবলতর হয়ে পড়েছে। ভিয়েৎমিন ও চীনা সৈন্য এসে যোগ দেওয়াতে কম্যুনিস্ট পক্ষ এখন এতো শক্তিশালী হয়েছে যে, অন্যপক্ষে আমেরিকানরা বেশ বেশী রকম সাহায্য করতে অগ্রসর না হলে পুরো লাওস কম্যুনিস্টদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। সামরিক অবস্থার পরিবর্তন না করে কেবল রাজনৈতিক চাপের দ্বারা সমস্যার সমাধান অর্থাৎ লাওসকে একটি প্রকৃত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না। চতুর্দশ রাষ্ট্রের সম্মেলনের যুগ্ম চেয়ারম্যান হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বৃটেন। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ত লাওস বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যত্র কোথাও খোলাখুলি এমন যুদ্ধ চান না, যাতে নিজেদের জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। ভিয়েৎমীন ও চীনা সৈন্য যদি লাওস-এ এসে থাকে এবং তাদের যদি অন্যভাবে সরানো না যায় তাহলে আমেরিকা লাওস-এর যুদ্ধে কিছুটা সাক্ষাৎভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়নও বেকায়দায় পড়বে। সেজন্য ভিয়েৎমিন ও চীনা সৈন্যদের লাওস ত্যাগের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন চাপ দিতে ইচ্ছুক হতে পারে কিন্তু সেটা মস্কো ও পিকিং-এর সম্পর্ক এখন কিরূপ, অনেকটা তার উপর নির্ভর করে এবং সেই সম্পর্ক যে বর্তমানে ঠিক কী রকম তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। চতুর্দশ রাষ্ট্রের সম্মেলনের বৈঠক ডাকার কথা কেউ কেউ বলেছিল। কিন্তু অবিলম্বে সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু করা আবশ্যক। লাওসকে সত্যকারের 'নিরপেক্ষ' রাষ্ট্র করতে হলে আগেকার চালে চললে কোনো কাজ হবে না। প্রিন্স সুভান্না ফুমা ভালো মানুষ। কিন্তু লাওস-এ বোধ হয় তার চেয়ে বলশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন।

কম্যুনিস্ট চীনের চেয়ারম্যান শ্রী লিউ সাও চি ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনে গেছেন। সেখান থেকে তিনি কাম্বোডিয়া এবং বর্মাতেও যাবেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিস্ট চীনের প্রভাব বিস্তার করার যে প্রচেষ্টা চলেছে শ্রীলিউ-এর সফর তারই অঙ্গ। ইন্দোনেশিয়াকে যেমন আমেরিকা তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নও প্রচুর সাহায্য দিয়েছে এবং দিচ্ছে। চীন নিকটতর হলেও চীনের চেয়ে রাশিয়ার প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার উপর বেশি ছিল। ওদিকে ইন্দোনেশিয়ার শক্তিশালী কম্যুনিস্ট পার্টি মস্কো এবং পিকিং-এর মধ্যে কম্যুনিস্টতাত্ত্বিক বিতর্কে পিকিং-এর সমর্থক। আবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ন এবং ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি পরস্পরের মধ্যে ভাব রেখে চলেন। শ্রীলিউ-এর আগমনে ইন্দোনেশিয়ান সরকার মস্কোর চেয়ে পিকিং-এর দিকে একটু বেশি ঝুঁকতে পারেন। অবশ্য তার চেয়েও চীনাদের বেশী চেষ্টা হচ্ছে কী করে ভারতের প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসীদের মন প্রতিকূল করা যায়।

ভ্রূণাক্ষরে

বিংশ শতকেও ফুলের বেসাতি সত্যিই যদি পীনাল কোডের ধারা-উপধারার আওতায় পড়ত তবে আমি কবে সোপর্দ হয়ে যেতুম। নইলে চণ্ড চৈত্র ছিল, মহা মহা সব মারী ছিল, উত্তরস্যাং দিশি দিবানিশি অনিশ্চয কী-হয় কী-হয় ভয় ছিল, সে সব ছেড়ে আমি কিনা শব্দ, শৈলী, মিল ইত্যাদি অবক্ষয়ী নেশায় মেতেছি। নীরোর এই নাছোড় ভূত নামানো দেখছি সহজ কর্ম নয়।

গতবারে আমার বক্তব্য ছিল : শব্দ এখনও কল্পদ্রুম। ঠিকমত তোয়াজ করলে সে আজও প্রার্থিত ফল দেয়। কয়েকটি উদ্ভট এবং ব্যবহার বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তও দাখিল করেছিলুম। চতুর্বর্গের একটি বর্ণ, অর্থেই শব্দ মজে আছে। মদীয় প্রস্তাব, মোক্ষ নামক অপর একটি বর্গও তার চাই।

এ কথার মৌলিক কপিরাইট দাবি করি নে। খতিয়ে দেখছি, কবিরা এ কাজে বহুকাল রত এবং পারদর্শী প্রয়োগে সাতিশয় অভ্যস্ত। অংশকে পূর্ণের, বা পূর্ণকে অংশের বিকল্প বলে চালানো - এসব নাকের বদলে নরুন ট্রিক ডালভাতচর্চ্চার মত রোজানা হয়ে গেছে।

তবে কি ট্রান্সফার্ড এপিথেট? উদোর বিশেষণ বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে মুখবদলের মজা? নিদ্রাহীন লোক না লিখে নিদ্রাহীন রাত লিখলে ইনসমনিয়ার রূপটি যে আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে এই রহস্য আবিষ্কার?

আরও আছে। বিশেষণ একাই যে সর্বনাশ ঘটাতে পারে তা নয়, পারে ক্রিয়াপদও কর্তৃকারকের হেরফের ঘটিয়ে। কল্পনা করুন অনুভূতির সেই তন্ময় স্তর যেখানে ইন্দ্রিয় নিচয় ডিভিজন অব লেবারের আইন আর মানে না, এ ওর কাজ করে দিয়ে আপন অধিকার ছড়িয়ে দেয়। চোখ শোনে কান দেখে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ প্রথম আলোর চরণধ্বনি শুনতে পেতেন কি, তাঁর চোখে বাঁশি কে বা বাজাত কে? আর, রক্ত যেখানে পাথির রবে বাজে, আমরা কি সেই আলোক-আলোকে উত্তরণের ছাড়পত্র পেতুম? একমাত্র ওই বাক্যেই চিল ডানা থেকে রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে থাকে। মস্তিষ্কের যে কোষে, মর্মের যে গভীরে সারাংসার বোধগুলি বিম্বিত হয়, সেখানে "আসলে সবই সমান"—ধ্বনি আর আলোক একাকার।

*

"আকাশ নিবিড় করে
দাঁড়াসনি ভিড় করে।"

মিলে জরজর-তনু দুটি ছত্র। অমিত্রাক্ষরের যুগ গেছে কবে, গদ্যকবিতার হুজুগও কেটেছে সবে, এবং কিমাশ্চর্য কাণ্ড, দু-দুটো রাহুগ্রাস থেকে খালাস সমিল ছন্দ ফের সহাস।

উদ্ধৃত ছত্র দুটির প্রতি দৃকপাত করুন। "আকাশ নিবিড় করে/দাঁড়াসনি ভিড় করে"—ধ্বনির পিছে পিছে ধ্বনি। পায়ে পায়ে সপ্তপদী কেন, একেবারে অষ্টপদী-গমন। "রজনীগন্ধা বাস বিলালো/সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো।" যতীন বাগচির এই পংক্তি দুটি প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অঙ্গের মিলনাকুল মিল কেবল অন্ত্যিক নয়, এবং অন্ত্যানুপ্রাসিক। কিংবা স্মরণ করুন "গগনে ছড়ায়ে এলোচুল/চরণে জড়ায়ে বনফুল"। মিলনের দুটি রেখা একটি অপরটির সম্পূর্ণ অনুবৃত্ত।

এরই পাশাপাশি একটি সাম্প্রতিক কবিতায় যখন 'সূর্যপাঠ' শব্দটিকে 'সংগীত'-এর সঙ্গে মিলিত হতে দেখি তখন ঝুঁকি নেওয়ার সাহসকে বলি সাবাস। সূর্যপাঠ সংগীত—এ-মিল ঈষৎ/নির্ভার, নির্বাচন শুধু স্বরধ্বনির রেশমি সুতোয় গ্রথিত।

মিলনের ছবলাপ দেখতে হলে যেতে হয় ছড়ার আখড়ায় সেকালের এবং একালের। সেকালে অবশ্য দুটিকে মেলানো নিয়ে খেলায় কুলকুলজি বিচারের রেওয়াজ ছিল না। কণ্ঠী বদলেই কাজ হত। কণ্ঠী 'দোলে' আর সঙ্গে নিলে 'দিল' মিল ঈষৎ বজায়টক হয়নি বলে কোনও ঘটক খুঁতখুঁত করত না। কিছু কিবা সঙ্গে 'ফাঁকি' একটিমাত্র অন্ত্যধ্বনির মিল একটি দোতুলপাত্রে দুজন সুজনের শয়ন। 'আমি/তুমি গেল'/ নিল" জুড়ি গাড়িতে দুটি আলাদা মাপের ঘোড়া কোনক্রমে জুতে দিলেও গাড়ি গড়গড় গড়াত।

"রাধবীকে গান শোনাতে
ডাকতে হয় সতীশকে
হৃদয়খানা ঘুরে মরে
গ্রামোফোনের ডিস্কে।"

মিলের ফুর্তি ছিপি ফুঁড়ে বেপরোয়া ছিটকে উঠছে, শোনা যাচ্ছে তার হাওয়ায় টুপি-ওড়ানো অট্টহাস।

"তাই বসেছি ডেস্কে আমার
ডাক দিয়েছি চাকরকে
কলম লে আও, কাগজ লে আও
কালি লে আও ধাঁ করকে।"

কড়ায় খই ফুটছে। কিংবা জোড়াজোড়া টাট্টু আস্তাবলের শানে অস্থির খুর ঠুকছে। "আয়োজন"/"প্রায় ওজন"· "বার্লিনে"/ "পার্লিনে", "ফরমাসে"/"শর্মা সে"; "দর নিয়া"/ ক্যালিফর্নিয়া"।—একটি মূল গায়েন, অন্যটি দোহার। একটি মুরুব্বি, পরেরটি মোসাহেব, কথার সায় কথায়, শ্রুতিমাত্র ধ্বনির প্রতিধ্বনি।

মিলের হর্ষ যেমন রবীন্দ্রনাথেই সবচেয়ে বেশি ভাবতে খেদ হয় কয়েকটি বিমর্ষ মিলের কারণও তিনি। —'কী হয়েছে বাম্নী? হারিয়ে গেছি আমি।' যতবার পড়েছি ততবার বিপন্ন বোধ করেছি, এ-মিলকে উৎকর্ষের আগমার্কা দিতে বেধেছে। হারিয়ে-যাওয়া মেয়েটিকে কবি যে "বাম্নী" বই কোনো নাম খুঁজে এনে দিতে পারলেন না, সে তো নিছক 'আমি' শব্দটির সঙ্গে মেলাবেন বলে। যেন নমো নমো করে মন্ত্র পড়ে দুটি লাইনের আইবুড়ো নাম খণ্ডালেন। কিংবা প্রথম ছত্র ওই 'রাঙামাটির' গৌরব গানটিতে বিখ্যাত ধুয়া "মন ভুলায় রে।" মন ভুলুক, তাই বলে সে কি ছাই হবে "চুলায় রে"-তে গিয়ে। না দিয়ো"-র সঙ্গে "বাঁধিয়ো" অবশ্যই অসামান্য। কিন্তু তার পরেই ধাঁধিয়ো! এ কি সেই মিল, হায় যা রবীন্দ্ররুচি নিয়েই জেনেছি, হবে ওষ্ঠ আর অধরের মত পরস্পরসম্পৃক্ত?

[পরিশিষ্ট : মিলনান্ত কথা নিয়ে এই লঘুগুরু, বাগাড়ম্বরের হেতু, সেদিন কোন কবিবন্ধু কানের কাছে একটি ইংরাজী ছড় আওড়ালেন। প্রথম লাইনের শেষে ছিল 'সিডনি' দ্বিতীয়টির "কিডনি"। অপেক্ষ করছিলুম তৃতীয়টির অন্তে কী। সেই গোয়েন্দা গল্পের কৌতূহলে-কাঁটা সমস্যা—হু-ডান-ইট? এবং গোয়েন্দা-গল্পে "কার-কাজ" প্রশ্নের যে মীমাংসা ঘটে, এই অন্ত-সন্ধান ধাঁধাতেও তাই হল, ঘুণাক্ষরে যাকে সন্দেহ করিনি, অপ্রত্যাশিত সেই এল 'সিডনি' আর 'কিডনি'-র পিছে তাক-লাগানো didn't he?"—চমক তো নয় মিলের ধমক। শুনে আমি শিবনেত্র।

উৎসাহিত হয়ে উদ্ভট একটি মিল নিজেও উদ্ভাবন করেছি—"লিপস্টিক" আর 'মিষ্টি'। নির্ঘাত বিশ্বাস, এ দুটিও মেলে সেই থেকে মানিকজোড়কে জনে-জনে ফিরি করে ফিরছি। বলা বাহুল্য, এ-যাবৎ কাউকে জপাতে পারিনি। ইতি।]

আগুনের আয়নায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমরা তখন মাঠে ছিলাম। তখন
দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
ধান কাটার সময়। আমরা
দিনের পর দিন
মাসের পর মাস
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি ভেঙেছি।
লাঙল ঠেলেছি। বীজ বুনেছি। জল টেনেছি। তখন
সেই হাড়ভাঙা খাটুনির ফসল ঘরে তোলার সময়। তখন
ধান কাটার সময়। আমরা
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর ভাবছিলাম যে,
এবারে আমরা ছুটি পাব। এবার
ফসল মোটেই খারাপ হয়নি। এবার
ফসল ঘরে তোলার সময়। এবার
হেমন্তের আকাশের নীচে আমাদের আসর বসবে।
গানের প্রাণের আসর বসবে। গ্রামে
অবসরের আসর বসবে। আমরা
মাঠে দাঁড়িয়ে সেই অবসরের স্বপ্ন দেখছিলাম। মাঠের
পাকা ফসল কাটতে কাটতে সেই স্বপ্ন দেখছিলাম।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
স্বপ্ন দেখবার সময়।

আমরা তখন কলে-কারখানায় কাজ করছিলাম। রাম
হাপরে হাওয়া দিয়ে আগুনটাকে তাতিয়ে তুলছিল। শ্যাম
তপ্ত লাল লোহার পিণ্ডটাকে নেহাইয়ের উপরে ঠেসে
ধরেছিল। যদু
হাতুড়ি পিটছিল সেই লোহার উপরে। আর
রামশ্যামযদুর
ফুসফুস ঠিক হাপরের মতই ওঠানামা করছিল। আমরা
কলে-কারখানায় কাজ করছিলাম তখন। কেউ
স্পিনিং মিলের হাতলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেউ
করাতকলের ঘুরন্ত চাকার দাঁতে
শালের গুঁড়ি তুলে ধরছিলাম। কেউ
বেলচায় কয়লা তুলে
আগুনের পেটের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। আমরা
কলে-কারখানায় কাজ করছিলাম। কেউ
ক্রেন চালাচ্ছিলাম। কেউ
ইঞ্জিন। কেউ
কনভেয়র বেল্টের উপরে নজর রাখছিলাম। কেউ
বয়লারের আঁচের উপরে। আমরা
কাজ করছিলাম। আর
স্বপ্ন দেখছিলাম যে, আমাদের জীবন
আরও সহজ আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। আমরা
কাজ করতে-করতে স্বপ্ন দেখছিলাম।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
স্বপ্ন দেখবার সময়।

আমরা কেউ হাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেউ মাঠে।
কেউ দাঁড়িপাল্লায় মাল ওজন করে দিচ্ছিলাম। কেউ
দাঁড় টানছিলাম। কেউ লক্ষ্য রাখছিলাম
বেলাভূমির দিকে। আমরা
হাজার কাজে মগ্ন ছিলাম তখন। আমরা
কেউ ফসল কাটছিলাম। কেউ
বয়লারে কয়লা দিচ্ছিলাম। কেউ হাসপাতালে
রোগীর পাশে জেগে ছিলাম। কেউ
ইস্কুলে, কেউ লোকো শেডে,
স্টীল-মিলে, কেউ করাত-কলে,
জাহাজঘাটায়, পথের মধ্যে,
কারও হাতে গাঁইতি, কারও কোদাল, কারও
বেলচা, কারও লাঙল। আমরা
হাজার কাজে মগ্ন ছিলাম তখন। আমরা
হাটের মানুষ, মাঠের মানুষ, শহর কিংবা গ্রামের মানুষ,
গঞ্জ, জাহাজঘাটার, কলের অথবা কারখানার মানুষ—
মগ্ন ছিলাম। কাজের মধ্যে মগ্ন থেকেই আমরা তখন
খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম একটা।
কেননা তখন হেমন্তকাল। তখন
স্বপ্ন দেখবার সময়।

মা! আমার মা!
ঠিক তখনই তুমি ডাকলে।
আমরা যখন কোটি মানুষ কাজের মধ্যে মগ্ন ছিলাম।
আমরা যখন কোটি মানুষ তোমার কাজের যজ্ঞশালায়
মগ্ন ছিলাম।
তোমার খেতে-খামারে, তোমার কলে-কারখানায়,
তোমার গ্রামে, তোমার শহরে,
তোমার সমুদ্রে আর পাহাড়ে
যখন কাজের মধ্যে মগ্ন ছিলাম আমরা।
আর কাজ করতে করতেই যখন খুব সুন্দর আর সহজ
একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।
মাগো! আমার মা!
ঠিক তখনই তুমি ডাকলে।

আমরা চেয়ে দেখলাম, আগুন জ্বলছে! আগুন!

আগুন! আগুন! আগুন জ্বলছে, আগুন!
মাগো! আমার মা!
দ্যাখো, আমরা দেরি করিনি। দ্যাখো,
তোমার ডাক শুনে আমরা ছুটে এসেছি। আমরা
হাটের মানুষ, মাঠের মানুষ, শহর, গঞ্জ, গ্রামের মানুষ,
গাঁইতি, লাঙল, বেলচা, নেহাই, বাটালি, তুরপুনের মানুষ
তোমার কর্মধর্মযজ্ঞশালার কোটি-কোটি মানুষ।
দ্যাখো, আমরা সেই আগুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।
দ্যাখো, আমরা সেই আগুনের আয়নায় মুখ দেখছি আমাদে
মাগো! আমার মা!
ঊর্ধ্বে তোমার আকাশ, পায়ের নীচে তোমার মাটি।
দ্যাখো, সেই আকাশের নীচে,
সেই মাটির উপরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা।
দ্যাখো, সেই লেলিহান আগুনে[illegible] থেকে
জ্বালিয়ে নিচ্ছি আমাদের মশাল
তোমার হাটের, তোমার মাঠের, তোমা[illegible]শালার
কোটি মানুষ:
মাগো, আমার মা!

শিল্পীর স্বাধীনতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শিল্পীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আমার দুটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একটি শোনা আর একটি দেখা।

আগে শোনা গল্পটি বলি।

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট। '৪৬ সনের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর দেশের নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। ভারতবর্ষ ভারত আর পাকিস্তানে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এই উপলক্ষে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর একটি বিশেষ প্রোগ্রাম দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যায় সেই অনুষ্ঠান লর্ড মাউণ্টব্যাটেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মুসলীম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আলী জিন্না বক্তৃতা করবেন।

ওই দিন ওই সময়ে যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানও নির্ধারিত ছিল। বাজাবেন ওস্তাদ বন্দু খাঁ। সারেঙ্গী বাদক। সঙ্গীতের আসরে সারেঙ্গী বাদক তেমন মর্যাদার আসন পান না। গায়ক বাদকদের অনুচর সহচর হিসাবেই প্রায় তাদের পরিচয়। কিন্তু বৃদ্ধ ওস্তাদ বন্দু খাঁ আপন সাধনায় ও সিদ্ধিতে সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডীকে অতিক্রম করে গেছেন।

কুলীন। সুরশিল্পীদের মধ্যে তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধ্রুপদীয়াদের বড় বড় আসরেও তাঁর ডাক পড়ে। গীতরসিকেরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর সারেঙ্গী শোনেন।

সেদিন সারাদিন সুরের রাজ্যে বিভোর হয়ে আছেন বন্দু খাঁ। কোন দিকে কোন খেয়াল নেই। সুরই ধ্যান সুরই জ্ঞান। রাজ্য ভাঙা-গড়ার কোন খবর রাখেন না। আপন যন্ত্র নিয়ে রেডিয়ো স্টেশনে যথাসময়ে ঢুকলেন বন্দু খাঁ। দীন দরিদ্রের বেশ। ফকির দরবেশের সগোত্র। তবু তাঁকে অভ্যর্থনা করে বড় একখানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু গান বাজনার আবহাওয়া কোথায়। সারা অফিস চঞ্চল। অফিসাররা পায়চারি দিয়ে ছুটোছুটি করছেন। বন্দু খাঁ জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার?' শুনলেন প্রোগ্রাম পিছিয়ে গেছে।

তিনি বললেন 'কেন?'

জানেন না? জিন্না সাহেব আসছেন যে?'

সারেঙ্গীর ছড়ে হাত রেখে আত্মমগ্ন বুদ্ধ খাঁ বললেন, 'জিন্না সাহেব? তিনি কোন ঘরানার?'

এক জাতের শিল্পী আছেন চিত্র, ভাষা সুর—সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের যাই হোক না কেন তাঁরা বন্দু খাঁর ঘরানার। তাঁরা জাত শিল্পী, স্বভাব মুক্ত।

দ্বিতীয়টি দৃশ্য। নিজের দেখা।

কিছুদিন আগে সাহিত্যসভা উপলক্ষে মফঃস্বলের এক শহরে গিয়েছিলাম। দুদিন ধরে অধিবেশন। সাহিত্য শিল্প নিয়ে নানা বক্তৃতা আলোচনা সমালোচনা হল। তারপর এক পুরোন বন্ধু তাঁর বাড়িতে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন। তিনি তখন ওখান-কার সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। অনেকদিন পরে দেখা। কিছুতেই ছাড়লেন না, এক বেলা বাড়িতে কয়েদ করে রাখলেন।

শোখীন মানুষ। ফুলের শখ আছে। নানা রঙের, নানা আকারের গোলাপের চাষ করেছেন। সব দেখালেন। ছবি আঁকার শখ আছে। ড্রয়িং-রুমের দেয়ালে দেয়ালে সেই সব ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন।

তাঁর স্ত্রীও শিল্পী। চারুকলার নিদর্শন দেখলাম অতি শোভন গৃহসজ্জায় আর রন্ধনশালায়। নৈশ ভোজের আসরে তিনি পঞ্চ ব্যঞ্জনের আয়োজন করলেন। স্বাদে গন্ধে বর্ণে তার পঞ্চাম ব্যঞ্জনা। 'বাসনার সেরা বাসা যে রসনায়' তা নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

খাওয়ার পরে ফের খানিকক্ষণ গল্প। যাঁরা আমাদের দুজনেরই পরিচিত তাঁদের খোঁজ খবরের আদান প্রদান চাকরি জীবনের সুখ-দুঃখের কথাও হল। কথায় কথায় বললেন, কয়েদীদের খবরদারি করতে গিয়ে তিনিও এক ধরনের কয়েদী হয়ে রয়েছেন। সাহিত্য টাহিত্য সব গেছে।

হঠাৎ তিনি হেসে বললেন, 'আপনি যে ঢুলতে আরম্ভ করেছেন দেখছি। চলুন আপনাকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। আপনার গাড়ি তো সেই বারোটায়। চলুন একটু বেড়িয়ে আসি। একটা মজার জিনিস দেখাব আপনাকে।'

ওঁর স্ত্রী বললেন, 'কেন ভদ্রলোককে নিয়ে টানাটানি করছ। সবাই তো আর তোমার মত নয়। ওঁকে বরং পাশের ঘরে বিছানা পেতে দিই। একটু ঘুমিয়ে নেবেন।

কিন্তু আমিও ঘুমুতে গেলাম না, বন্ধুও আমাকে ঘুমুতে দিলেন না। তিনি তাঁর গাড়িতে আমাকে তুলে নিলেন। যিনি রথী তিনিই সারথি। বন্ধুটি নানা বিদ্যায় সব্যসাচী এদিকে চেহারাটিও মধ্যম-পাণ্ডবের।

অন্ধকার রাত্রি। বাঁধানো রাস্তার দুদিকে গাছগুলি আঁধারের বর্ম পরে দাঁড়ানো। যেন ওরাও কারারক্ষী। বললাম 'কোথায় চলেছেন?' তিনি হেসে বললেন, 'চলুনই না। জেলখানাটা দেখে যাবেন। আমাকে দেখলেন আর আমি যাদের নিয়ে বাস করি তাদের একবার দেখবেন না?'

পথে বন্দুকধারী প্রহরী পথ আটকাল, 'কে?'

বন্ধু ইংরেজীতে বললেন, 'বন্ধু।'

কয়েক মিনিটের মাত্র পথ। গাড়ি থেকে নেমে আমরা ফটকের ভিতরে ঢুকলাম। বন্ধুর অধস্তন অফিসাররা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

দীর্ঘ প্রাচীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বন্ধু বললেন, 'ভয় নেই আপনার। হাতে-পায়ে শিকল বাঁধা বিকট বিদ্রূপ কিছু দেখতে হবে না। ওঁরা [illegible] [illegible]। [illegible]।'

[illegible]

শব্দ শোনা গেল। তা ছাপিয়ে উঠেছে উচ্চ গ্রামের পার্ট।

তারপর আমরা গিয়ে যাত্রার আসরে হাজির হলাম। একপাশে সারি সারি চেয়ারে কয়েকজন অফিসার বসেছিলেন। তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিলেন। আমি বন্ধুর পাশে বসে সেই নতুন যাত্রা দেখতে লাগলাম। যাত্রা যারা দেখছে তাদেরও দেখলাম। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে হাজার দেড়েক কয়েদী সাগ্রহে তাদের সহবন্দীদের অভিনয় দেখছে।

প্রায় পঞ্চম অঙ্কের দর্শক আমরা। তবু দুটি-একটি দৃশ্য দেখেই বুঝতে পারলাম নাটকটি সামাজিক। যারা সমাজবিরোধী গর্হিত কাজের জন্যে দণ্ডিত হয়েছে তারাই অভিনয় করছে সামাজিক নাটকের। জয়ধ্বনি দিচ্ছে ধর্মের নীতির, প্রেম প্রীতির ভালোবাসার। কেউ সেজেছে স্বামী, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে, কেউ হয়েছে স্ত্রী। কেউ বাপ, কেউ ছেলে, কেউ পড়শী, কেউ বন্ধু, কেউ বা ষড়যন্ত্রী হীনচেতা। বাউল সন্ন্যাসীও দু-একজনকে দেখলাম। তাদের কণ্ঠে বিবেক।

মনে হল চুরি জোচ্চুরি, রাহাজানি, নারী-ধর্ষণ—শত অপরাধে অপরাধীর দল আজ এই মুহূর্তে সব অপরাধ ভুলেছে। ভুলে গিয়েছে দীর্ঘ হ্রস্ব কার কত মেয়াদের কারা-দণ্ড। আজ এই মুহূর্তে ওরা শুধু স্রষ্টা আর ভোক্তা—শিল্পের একই সুবিশাল সিংহাসনের অংশীদার।

মনে হল এই ঐক্যের অনুভূতি শিল্প যেমন করে আনে তেমন আর কেই বা আনতে পারে? শিল্প যেমন করে মিলায় তেমন আর কেই বা মিলাতে পারে?

সব মত সব পথকে সব ভেদ বিভেদকে শিল্প তার আপন রসে দ্রব করে নেয়। তার চেয়ে বড় রাসায়নিক আর কেউ নেই।

শিল্প যেখানে সমুচ্চ, যেখানে সে মহৎ, যেখানে সে ধর্মের সমকক্ষ কি উত্তরাধিকারী সেখানে তার একটি মাত্র মন্ত্র—মিলন মন্ত্র। সেখানে তার একটি মাত্র তন্ত্র—মানবতন্ত্র।

শিল্পী অবশ্যই স্বাধীন। সে স্বাধীনতা কেমন? সমাজবদ্ধ পরিবারবদ্ধ ব্যক্তি যেমন স্বাধীন তেমনি স্বাধীন। ব্যাকরণবদ্ধ ভাষার ছন্দোবদ্ধ কবি যেমন স্বাধীন তেমনি স্বাধীন, তাঁর স্বেচ্ছাচারের মধ্যে আরো অনেকের ইচ্ছা সাধ আহ্লাদ প্রতিফলিত। সাধারণ মানুষ বেদনায় মূক। শিল্পী বেদনায় মুখর। সে তাঁর একার বেদনা নয়। তাঁর কণ্ঠধ্বনি হাজার হাজার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

শিল্পীর স্বাধীনতা লাভ কখনই সহজ নয়। সে পথ ক্ষুরধার আর দুর্গম।

শুধু কি রাজ ভয়ই তাঁর একমাত্র ভয়? তা নয়। লোক ভয় অর্থ যশ প্রতিপত্তি হারাবার ভয় লোভ মোহ মদ—আত্মপ্রসাদ মত্ততা—কোন ভয়ই কম বিভীষণ নয়। মৃত্যুর ফাঁদ ভুবন ভরে পাতা। এই মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর আজীবন সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম গাথার নামই শিল্প।

শিল্পীর আপন ব্যক্তিত্ব আর রচনা বিভিন্ন নয়, অভিন্ন। যা নেই ভারতে তা নেই

তারতে। শিল্পীর নিজের মধ্যে যা নেই তা তাঁর রচনার মধ্যে কী করে থাকবে? তাঁর সমস্ত দুর্বলতা সবলতা নিয়ে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে সশরীরে উপস্থিত। তিনি যতই লুকোচুরি করুন, ছদ্মবেশ পরুন তাঁর পালাবার পথ নেই। তাঁর বাণীই তাঁর জীবন। সর্গে সর্গে গাথা তাঁর প্রতিদিনের উত্থান-পতনের মহাকাব্য।

কিন্তু মহাকবি কজন? অযুতে নিযুতে একজন। আমরা সব ক্ষুদ্র কবি যশঃ প্রার্থী। আমরা সংগ্রাম করিনে, করলেও কদাচিৎ করি। আপোস করি সন্ধি করি প্রতিমুহূর্তে।

কিন্তু যিনি মহৎ শিল্পী তিনি মহৎ যোদ্ধা। তাঁর সংগ্রাম ভিতরের ও বাইরের। আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁর সংগ্রাম বিরামহীন। সে সংগ্রাম কখনো আপনার মধ্যে, আপন মাধ্যমের সঙ্গে, কখনো সমাজের সঙ্গে, রাষ্ট্রীয় শাসনের সঙ্গে, দলের সঙ্গে, আপন দেশ-কালের সঙ্গে কখনো বা।

সেই সংগ্রামে তাঁর অসাধারণ আত্মাহুতির কথা আমরা সাধারণ মানুষ ভাবতেও পারিনে। ভাবতে পারিনে কিন্তু অভাবনীয়ের আকাঙ্ক্ষা করি। তার চকিত স্পর্শে সঞ্জীবিত হই, উদ্দীপিত হই। অভাব বোধে পীড়িত হই, লজ্জিত হই, যন্ত্রণায় ছটফট করি। সেই অপূর্ণতার যন্ত্রণা আর আত্ম-গ্লানির মধ্যে পূর্ণতার স্বাদ গন্ধ স্পর্শ। সেই একটি কি দুটি ক্ষণ। কিন্তু তাই জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ।

মহানদীর জন্যে মহাসমুদ্র। আমরা সব ছোট ছোট উপনদী শাখানদীর দল। এও অহংকারের কথা হল। আমাদের মধ্যে বেশির ভাগই মজা হাজা বিল, ডোবা, খাল, নালা বদ্ধ কূপ।

তবু প্রত্যেকেই জলাশয়। মহাশয় না হতে পারি কিন্তু প্রত্যেকেই মহৎ সম্ভাবনার আধার। বলা যায় না কখন কী হবে। কার মধ্যে কখন প্লাবন আসবে, বন্যা ছুটবে। শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের স্বর শোনা যাবে কখন কে জানে।

এই জন্যেই সমস্ত সম্ভাবনার দ্বার খোলা রাখা চাই। এই জন্যেই চাই মুক্ত ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের মুক্তি।

কিন্তু সেই মুক্তি কি শুধু আত্মপ্রকাশের? শুধু কি রেখায় রঙে, ভাষায় সুরে প্রকাশের অধিকার? প্রকাশের আগে চাই বিকাশ। ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সেই বিকাশ সহস্র বাধায় বাধাগ্রস্ত, খণ্ডিত, আচ্ছন্ন।

শিল্পী আরও দশজনের সঙ্গে তাঁর আপন সাধনার ধারাকে মিলিয়ে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সেই প্রকাশের বাধার, বিকাশের বাধার অপসারণে নিযুক্ত। মাত্র সংখ্যায় তিনি একক। আসলে অন্যদের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর মুক্তি তাই [illegible] মধ্যে [illegible] মধ্যে [illegible]।

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা
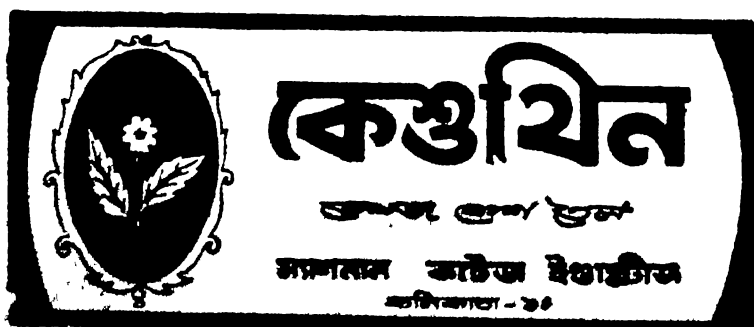
ফাদার দ্যতিয়েন

ক্লাস ঘরে

অবিস্মরণীয় এই ১লা ফাল্গুনে আমার হল এক নতুন অভিজ্ঞতা বেত হাতে, ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে ফেরানো পিঠ; সামনে, অষ্টম শ্রেণীর কুড়ি জোড়া পর্যুৎসুক চোখ...। প্রস্তাবনাসূচক সারগর্ভ এক মস্ত বক্তৃতা
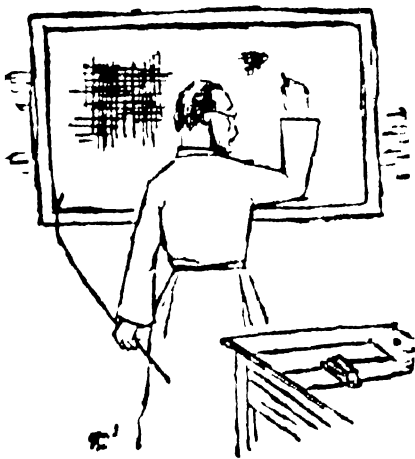
বেত হাতে, ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফেরানো পিঠ

প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলাম "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী সমাজে অধ্যয়ন তপস্যা ও অধ্যাপনা ব্রতের দায়িত্বদুরূহ মাহাত্ম্য"। গুলিয়ে গেল সব...বক্তৃতা রইল ফাইলে। তখন আর করি কি? ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আশায় সবার কাছে জানতে চাইলাম ওদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনা। বুঝলাম: বাবলু ঘণ্টা বাজিয়ে চালাবে দমকল, সলিল লাল পাগড়ি পরে চড়বে লালবাজারের ঘোড়া—সুরেশ হবে "বাবার মতো বাবুর্চি।" আর নন্টু?...নন্টু একটু যেন লজ্জিত হয়ে বলল, "ফাদার হব"। প্রশ্ন করলাম, "ফাদার হবে কেন?" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বলল, "আর আপনিই, ফাদার, ফাদার হলেন কেন?..."

সত্যি তো, ফাদার হলামই বা কেন? জানি, ফাদার হওয়ার প্রথম অর্থ: ভগবানের ডাকে সাড়া দেওয়া। কিন্তু আমাদের এই বসুন্ধরায় এত সাধুসন্ত ব্যক্তি থাকতে, উনি আমাকেই বা মনোনয়ন করলেন কেন?...... আর তাছাড়া তো উনি স্বর্গ থেকে নেমে আসেন নি আমার কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাক শোনাতে। ভগবান যাঁদের মারফতে আমাকে ডাক দিয়েছেন তাঁরা হলেন আমারই পূজনীয় পিতামাতা—আর আমাদের গ্রামের গির্জার ফাদার।

ফাদারের ওখানে

ফাদারগোষ্ঠীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল চতুর্থ জন্মদিনে। মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন গির্জায়; আমরা দুজনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে জানিয়েছিলাম প্রার্থনা: চেয়েছিলাম দিদিমার আরোগ্য, পরিবারের শান্তি আর বিশ্বসংসারের সর্ব-কল্যাণ। তারপর ফাদারের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম, দরজায় কড়া নাড়লাম জন্মদিনের আশীর্বাদের যাচক হয়ে। ফাদার আমার গাল টিপে আদর ক'রে নাম, ধাম, বয়স প্রভৃতি অনেক সার্থক ও নিরর্থক প্রশ্ন করে-ছিলেন—আর মায়ের মুখ খুশিতে লাল হয়ে উঠেছিল। ওখানে থেমে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে ভালোই হত। মা কিন্তু থামলেন না, বললেন, "খোকা 'প্রভুর প্রার্থনা' মুখস্থ করেছে; আপনার কাছে আবৃত্তি করতে চায়...।" বলা বাহুল্য ঐ ধরনের বিদঘুটে ইচ্ছা পোষণ করার প্রলোভন আমাকে স্পর্শই করে নি জীবনে। আবৃত্তি করলাম লক্ষ্মী ছেলের মতো, কিন্তু সর্বনাশ ...ফাদার অনেক বলে দিলেও প্রার্থনাটা পদে পদে বেধে গেল। মায়ের সেই গর্বস্ফীত মুখ তখন লজ্জায় দু হাতে লুকোনো। ফাদার কিন্তু চোখের কোণে হাসি টেনে শুধু বললেন, "ভদ্রলোক, তুমিও বোধ হয় হবে একদিন ভগবানের যাজক...।" এমনি ক'রে আমার পার্থিব অস্তিত্বের চার বছর অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই আমাদের গ্রামের বৃদ্ধ যাজকের মুখে প্রথম শুনলাম ভগবানের আহ্বান। জানলাম ভগবান আমাকে আর ছাড়বেন না ডাকতে ছাড়বেন না...আর বুঝলাম, এইবার মন ঢেলে আমার সেই 'প্রভুর প্রার্থনা'টা ঘষে মেজে চানকে নেওয়া দরকার।

যাজকের অপেক্ষায়

আমাদের গ্রামের ফাদার একবার করে প্রতি বছর প্রতিটি ঘরে যেতেন লোকগণনা করতে। গির্জার দেওয়ালে টাঙানো ছিল এক বিজ্ঞাপন; আপনারা আগে থেকেই জানতেন

আমরা দুজনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে জানিয়েছিলাম প্রার্থনা:

আপনাদের আলখাল্লা-পরা যাজক কোন্ কোন্ সপ্তাহে কোন্ কোন্ পাড়ায় পায়ের ধুলো ঝাড়তে যাবেন...দিন কিন্তু জানতেন না—আর তাতেই অসুবিধা। ফাদার অবশ্য যদি সোমবারই আসতেন, বেঁচে যেতাম; আর শনিবারে এলে, ততদিনে বাঁচবার সাধ আর কারো থাকত না। বাড়িতে প্রতিদিন আমাদের ধরে রাখবার জন্য মা তাঁর পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে চড়-চাপড় ভাগ করে বিলিয়ে দিতেন পক্ষপাতহীন ভাবে; বকুনি দিয়ে চেঁচিয়ে শাসিয়ে ভেঙ্গে যেত

তাঁর স্বর—আমাদের পায়ে যদি কাদা লাগে ...জামা যদি ছি'ড়ে যায়...কিম্বা ফাদার আসেন যদি আমাদের কারও অনুপস্থিতিতে...। একদিকে লাভও ছিল বটেঃ সেই প্রাতঃস্মরণীয় সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই মা পাততেন টাটকা দই, গড়তেন টাটকা মিষ্টি, ভাজতেন টাটকা মাখনের ফ্রাই—ফাদার যদি আসেন...।

• ভগবানের ডাকহরকরা

আর বাবা । বাবা ছিলেন ডাক্তার; বাবার সুস্পষ্ট প্রকাশিত ও প্রচারিত মত এই যে—চিকিৎসক হওবার মতো আব কোনো উৎকৃষ্ট গৌরবান্বিত আদর্শ জীবিকা নেই। কথাটা তাঁর মুখে কতবার না শুনেছি আমরা কিন্তু সব সময়ই তিনি যোগ দিতেন "যাজক হওযা অবশ্য আরও বড়, মহত্তর; কিন্তু সেটা তো জীবিকা-ই নয়—জীবনের আহ্বান।" মায়ের কাছে শুনেছি ভগবানের কাছে বাবা রোজই প্রার্থনা করতেন তিনি যেন আমাদের পরিবারের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করেন যাজকবৃত্তির জন্যে।

আমি ফাদার হলাম কেন?. ভগবানের ডাকে আর আমার বাবা-মা—ভগবানের ডাকহরকরা।
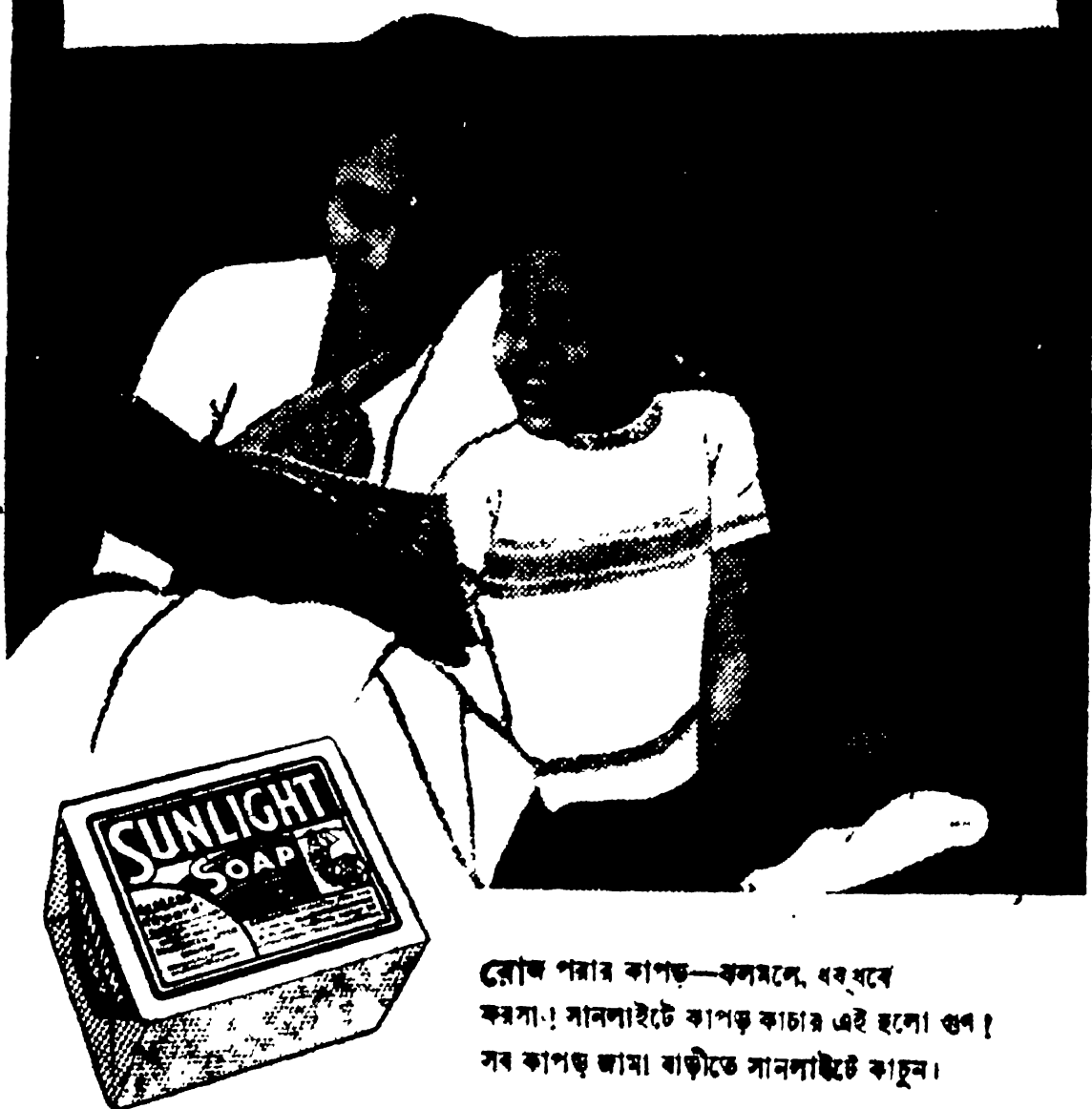
তোমার অনুমতি নিয়ে

রাজলক্ষ্মী দেবী

তোমার অনুমতি নিয়ে আমি তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাইছি। এখনই গল্প শোনার সময়। আকাশে সরু হাঁসুলির মতো চাঁদ। নারকেলগাছেরা চুপচাপ। এখন রূপকথা শোনার সময়।

একটি রাজকন্যাকে থাকতেই হবে। এই রাজকন্যা যে বাড়িতে থাকত, তার নামটা ছিল বটে স্বর্ণাসন। স্বর্ণাসনের মেয়ে পদ্মা কিন্তু ফুলের মত সহজ আর সুন্দর, স্বর্ণ তার আসন হতে পারত শুধু, আভরণ হবার যোগ্যতাও বোধহয় সেই নিষ্প্রাণ নির্জীব পীত জড়পদার্থকে দেওয়া চলে না। এমনি পদ্মফুলের মতো সজীব আর লীলাময়ী এই পদ্মা।

কী বলছ? স্বর্ণাসন বলে বাড়িটা আমরা একবার গিরিডির পথে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছিলাম? হ্যাঁ ঠিকই মনে পড়েছে তোমার। সেই থেকেই ওই নামটা আমার মনের মধ্যে একটা আসন হয়ে বসে আছে, যার মধ্যে সুন্দর আর সকরুণ একটা গল্পকে আমি বসাতে পারি, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিশিরের মতো কান্না, অনেক কান্না, অনেক কান্না।

পদ্মাকে কলেজে স্কুলে পড়তে হয়নি, কারণ স্বর্ণাসনের সেই বিরাট বাড়ির মালিক, তার বাবা, পছন্দ করতেন না, মেয়েরা রাস্তার ধুলো মাড়িয়ে খোলা রোদে পুড়ে কিংবা বিশ্রী কুৎসিত ঘোড়ার গাড়িতে চেপে একটা ইটকাঠের বাড়িতে গিয়ে চেয়ারে টেবিলে বসে পড়াশোনা করবে। ও-সব তাদের মানায় না। পদ্মার মত মেয়েকে মোটেই মানায় না। পদ্মার মত মেয়েরা তাদের বাগানের সবুজ ঘাসের ওপর চারপাশে ফুলগাছদের নিয়ে বসবে, ভোরের মিষ্টি রোদে তারা বই খুলে ঘাসের ওপর শোবে। তারা প্রকৃতি আর ফুলের কাছ থেকে এক আশ্চর্য লালিত্য গ্রহণ করবে।

সন্ধ্যায় নীল শেডের বাতি জ্বালিয়ে পদ্মা ইতিহাস এবং কাব্যকাহিনী পড়বে। তার জন্য যে অধ্যাপক আসবেন, তাঁর চলনে বলনে ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য আর কাব্যিক সুষমার সমন্বয়। পদ্মা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাবে। তাকে বীণা শেখাতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সপ্তাহে দুদিন আসবেন। মধ্যরাত্রে ঘুম না এলে পদ্মা বসে বসে বীণায় গম্ভীর আর ললিত সুর মন্থন করবে।

পদ্মার কি কোনো বান্ধবী থাকা দরকার? যদিও স্বর্ণাসন, তার একমাত্র অভিজাত মালিক এবং পদ্মার মত স্বপ্নশরীরিণী মেয়ের জন্যে আর কিছু থাকা অসম্ভব আর সব কিছুই স্থূল এবং বাস্তব, তাই চরিত্রায়ণের অযোগ্য, তবু গল্পের খাতিরে আমি পদ্মার এক বান্ধবী রমাকে সৃষ্টি করলাম। পদ্মা তার কাছেই মনের কথা বলবে। এর মাধ্যম ছাড়া পদ্মার [illegible]কে আমি [illegible] করব না।

তা পদ্মপাতায় শিশিরবিন্দুর মত সর্বদাই টলমল করছে।

রুমা স্বর্ণাসনের পাশেই একটা ছোট একতলা বাড়ির মেয়ে। সে বাড়িকে স্বর্ণাসনের মত নিখুঁত প্রাসাদের পাশে একেবারে মানায় না। কত বছর চুনকাম হয় নি, দরজা জানালায় বার্নিশ পড়ে নি। তবু তার মধ্য থেকেই বিস্ময় হয়ে বেরিয়ে আসে রুমা। রুমাদের অনেক বোন, অনেক ভাই। রুমা তাদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল সবচেয়ে মুখর। রুমা পদ্মাকে একটু অর্ধবিলীন স্বপ্নের মত ভালবাসে।

এখনই কোনো মন্তব্য করবেন না। তুমি ভাবছ ওদের দুটিকে নিয়ে আমি একটা ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী তৈরি করতে চাইছি না। কারণ, পদ্মা এবং রুমা পাশাপাশি থাকলেও পদ্মা দৃষ্টির অগোচরে এবং কল্পনায় একমাত্র হয়ে প্রতিভাত হবে। তাই পদ্মা যখন সামনে থাকবে তখন রুমাকে কেউ দেখবে না। আবার রুমা যখন পদ্মাকে দেখবে, তখন সে আর কাউকেই দেখবে না। রুমাকে আমি গল্পের উপেক্ষিত হিসেবে, শুধুমাত্র গল্পকে আকার দেওয়ার খাতিরে তৈরি করেছি। সে আমার পাত্রপাত্রীদের কেউ নয়।

দুটি ছেলে সেই বাড়িতে স্বর্ণাসনের বাড়িতে—মাঝে মাঝেই আসত যেত। ধরা যাক, তাদের স্বর্ণাসনের মালিকই বলেছিলেন আসাযাওয়া করবার জন্যে। মাঝরাতে পদ্মার বীণায় তিনি একটা একাকিত্বের বাঞ্ছিত সুর টের পেয়েছিলেন। ধরা যাক, রুমার মত উজ্জ্বল আর সাংসারিক মেয়ে জানত যে, তারা কেন আসে যায়। কিন্তু পদ্মা সব কিছু ঠিকমত বুঝত না, বুঝতে চাইত না।

এই দুটি ছেলের নাম আমি রাখতে চাই আদিত্য আর তিমির। কেন জান? আদিত্য দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ। তার পদ্ম-পলাশের মতন চোখে একটা শান্ত আশ্বাস মাখামাখি হয়ে আছে। সে খুব সুন্দর কথা ভেবে ভেবে বলতে পারে। সে কথা শুনতে ভালবাসে। পদ্মা স্বর্ণাসনকে কোনোদিন যে সব কথাই শোনাতে পারবে নি, আদিত্যকে দেখলে অনায়াসে সেই সব কথা স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। আদিত্য পদ্মার হৃদয়কে আস্তে আস্তে তার স্বপ্রকাশ শেখাতে চায়। তিমির কালো, তার কোঁকড়া চুল কালো, তার অদ্ভুত সাদা চোখে চোখের মণি আরও কালো। তার চোখে আছে একটা ঝলমলে ব্যগ্রতা। তিমির শান্ত হাসে, তিমির বেশী কথা বলে না। কিন্তু পদ্মা যখন তিমিরের চোখ দেখে, তখনই সে তিমিরের মনের অস্পষ্ট সব কথা অবিকল বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, তার মনে হয় তিমিরও তার হৃদয়ের অস্পষ্ট সব কথার অন্ধকারে এইমাত্র অবগাহন করে এসেছে। তিমির পদ্মাকে একটা রহস্যের আস্থা প্রদান করতে চায়।

আদিত্য ইংরাজী সাহিত্য পড়েছে। তিমির কী পড়েছে, কেউ জানে না কিন্তু সে অদ্ভুত বেহালা বাজায়। পদ্মার মধ্য-রাত্রের বীণা যে সব সুরের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে ফিরে আসে, তিমিরের বেহালা সেই সব সুরকে এক দুর্দান্ত বর্বরের মত ধরে নিয়ে আসে, বন্দী করে মুহূর্তের পর মুহূর্তের মুষ্টিতে। আদিত্য কিছু করে না তার বিরাট এক জমিদারি আছে। তিমিরও কিছু করে না-তার এক বিরাট কোলিয়ারী আছে। তারা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, আর স্বর্ণাসনের মেয়ে এই পদ্মাকে নিয়ে।
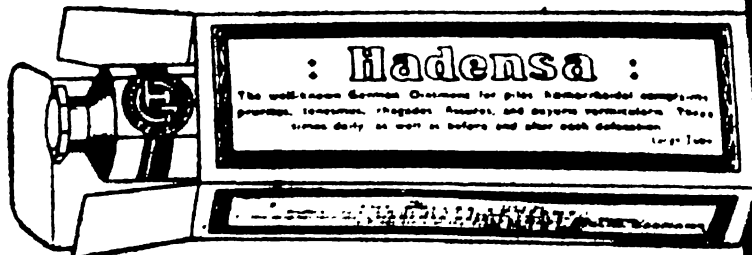
গল্পটা একটু অবাস্তব হচ্ছে। কিন্তু

আগেই বলেছি, এখন রূপকথা শোনার সময়। পদ্মার মত মেয়ের জন্যে এ ছাড়া আর কোনও পরিবেশ ভাবা চলে না। তুমি আর আমি একবার ডিঙি নৌকায় গঙ্গায় ভেসে বেড়িয়েছিলাম, মনে পড়ে। তুমি ঠিক সেইদিনের মত তোমার পা আমার গল্পের স্রোতে নামিয়ে বসো। আমি আজ মাঝি হয়ে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ দিয়ে তোমাকে একটা অনুভব বোঝাতে চেষ্টা করি। আদিত্য লাল রং ভালবাসে, রুমা তা জানে। তাই যে বিকেলে আদিত্য আসে, সেই বিকেলে রুমা পদ্মাকে লাল শাড়ি পরতে বলে। যে বিকেলে তিমির আসে, সেই বিকেলে রুমা পদ্মার জন্যে গাঢ় নীল আর কালো শাড়িগুলি বেছে দেয়। আদিত্য এলে পরে চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া ওঠে গল্প আর হাসির আওয়াজ পাওয়া যায়। তিমির যেদিন আসে, সেদিন হয় বেহালা বাজে আর নয়ত একটা বিষণ্ণ নিস্তব্ধতা সমস্ত ঘরটাকে জুড়ে থমথম করতে থাকে। আদিত্য আর তিমির একদিন আসে না। কারণ ওরা দুই বন্ধু। ওরা এই ব্যাপারটাকে একটা [illegible] মত গ্রহণ করেছে যদিও দুজনের পক্ষেই জটিল হল এই [illegible] যদি তুমি পদ্মাকে [illegible] আদিত্য বলেছে তুমি সব পারো। জটিলতা [illegible] তুমি পছন্দ কর না। তিমির শুধু অদ্ভুত হেসেছে [illegible] বলেছে —'এখনই [illegible] পদ্মা [illegible] [illegible] আদিত্য বলেছে তুমি হয় তো [illegible] [illegible] তুমি [illegible] [illegible] করি। [illegible] [illegible] তার [illegible] [illegible] এসেছে। [illegible] [illegible] আদিত্য এই হচ্ছে প্রেম। তুমি প্রেমের কী জানো।

আদিত্যকে [illegible] দেখিয়েছে। আদিত্য কোনও উত্তর দিতে পারে নি।

এইবার তোমার কাছে একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। গল্পটাকে আমি দুটো পরিণতি দিতে চাই আর এই ধরনের পরিণতির ইশারা তুমিই আমাকে দিয়েছিলে কোন একটা জাপানী ছবি দেখে এসে। সেই ছবির বক্তব্য ছিল যে ভাগ্য একটা দাবার ছক পেতে বসে আছে এবং যে দিকেই তুমি যাও—যে পরিণতিতে ছক সাজানো রয়েছে সেই পরিণতিতেই তুমি ফিরে আসবে। একটু পথের অদলবদল হয়ত বা হতে পারে কিন্তু পথের শেষ অনিবার্যভাবে বিনির্দিষ্ট।

পদ্মার মনে কখনো আদিত্য, কখনো তিমির ছায়া ফেলেছে এবং সেই মন স্বচ্ছ আয়নার মত, কিছুই সে ধরে রাখে না। সে তাই রুমাকে বলেছে—'আমি ঠিক জানি না, ওদের মধ্যে কে আমাকে সত্যি ভালবাসে। আর এটাও জানি না যে, আমি কাকে ভালবাসি।' রুমা আদিত্যকে পছন্দ করলে পদ্মার তিমিরকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু তিমির যখন আদিত্যর নামে অসহিষ্ণু হয়, তখন পদ্মার আদিত্যকে হঠাৎ অনেক বেশী মহৎ মনে হয়।

এই রকম করে অনেকদিন, আরও অনেকদিন কেটে যেতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন তিমির তার মুক্তোর মত কালো দুই চোখের দৃষ্টিতে পদ্মার দুই চোখকে দীর্ণ করে দিয়ে বলল, পদ্মা—'কাল তোমাকে মন ঠিক করে বলতেই হবে, কাকে তুমি ভালবাসো। কাল থেকে শুধু সে-ই এ বাড়িতে আসা যাওয়া করবে। অন্যজন এ বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতন চলে যাবে।'

পরের দিন আদিত্যর আসার দিন। পদ্মা আদিত্যকে বললো, 'তিমির আমাকে বলেছে চূড়ান্তভাবে মন ঠিক করতে। কিন্তু আমি পারছি না—কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমার যে তোমাদের দুজনকেই সমানভাবে ভাল লাগে।" আদিত্য পদ্মার মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্নেহভরে তাকালো। "বেচারী, বেচারী পদ্মা। কেন তুমি আরও অনেক সময় পাবে না? তোমার যে মন এখনও শতদল হয়ে ফুটে ওঠে নি, তার ওপর আমরা এখনই কেন নিষ্ঠুরের মতো ফুল তুলতে হাত বাড়িয়েছি?"

আদিত্য ভাবল : ওর মনকে দ্বিধা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে তাহলে কি আমি সরে যাব? তিমির যে ধৈর্য হারিয়েছে!

অথবা

আদিত্য ভাবল : না, আমাকে থাকতেই হবে। তিমির যে-ভাবে পদ্মাকে সবলে গ্রহণ করতে চাইছে, তাতে পদ্মার সুখ হবে না।
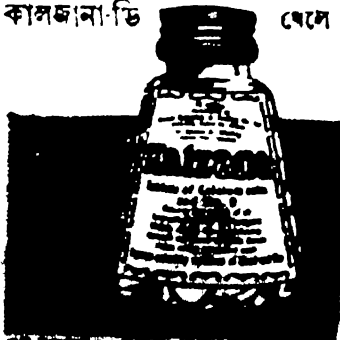
তাকে নিজের মন ঠিকভাবে বুঝতে দেবার জন্যে সময়ের দরকার ছিল। সময় যদি না পাই, অন্তত অন্য বিন্দুরে উল্টো টান হয়ে লেগে থাকি, ওর মনকে দিক নির্ণয় করতে সাহায্য করি।

তুমি এখন গল্পটা কিছু কিছু আন্দাজ করতে পারছ। তোমাকে একটু বিবন্ন, একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। তুমি জানো এরকম গল্পের একটাই পরিণতি হয়। কিন্তু আমি বলতে চাই, যে পথেই যাও, সেই পরিণতিতেই তোমায় পৌঁছোতে হবে।

— প্রথম গল্প —

পদ্মা রুমাকেই তার দ্বিধামোচনের জন্যে আশ্রয় করল। রুমার মনে কোনো দ্বিমত ছিলো না। আদিত্য সুন্দর, আদিত্য যোগ্য, আদিত্য উদার। রুমা তিমিরের অন্ধকার মন আর ছায়ার মত নড়াচড়াকে ভয় পায়, রুমা এমন কি তার বেহালার মর্মস্পর্শী সুরকেও ভয় পায়, কারণ তা তাকে অবিচ্ছিন্ন বিষাদে ঢেকে দিয়ে যায়।

তারপর আদিত্যর সঙ্গে পদ্মার বিয়ে হল। পদ্মা স্বর্ণাসন ছেড়ে কোথাও গিয়ে সুখী হবে না তা আদিত্য জানত। তাই আদিত্য স্বর্ণাসনে চলে এল। কিছুদিনের জন্যে পদ্মার মনে হল, এই বেশ। তারপর তার মনে হল আদিত্য শুধু তার জন্যেই অমায়িক নয় রুমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেও সে সমভাবে সজাগ থাকে। মহত্ত্ব তার পক্ষে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি মাত্র, এক অন্ধকূপ হৃদয় থেকে বিশেষ একটি মানুষের জন্যে উৎসারিত প্রস্রবণের মত বিস্ময়কর নয় তার এই উদারতা এই স্নেহশীলতা। তাতে পদ্মার ঈর্ষা হল না পদ্মা ঈর্ষার ধরাছোঁয়ার বাইরে। পদ্মা শুধু অলসভাবে চিন্তা করল তিমিরের যে রুমার প্রতি অসহিষ্ণুতা ছিল তার পিছনের মনোভাব কি ছিল না আরও গভীর?

তারপর পদ্মা দেখল স্বর্ণাসনের জীবনে আদিত্য এমন মিশে গেছে যে, পদ্মার কাছে জীবন ঠিক আগের মতই সহজ মনে হয়। আদিত্য পদ্মাকে অবাধ মুক্তি এবং প্রচুর অবকাশ দিতে পারে, কারণ পদ্মার প্রতি ভালবাসা আদিত্য তার বিভিন্নমুখী মৌচাক মনের একটি কোষে সুন্দরভাবে পুরে রেখেছে। পদ্মার জন্যে আদিত্য প্রতি মুহূর্তের আহ্বান নব-নব্য প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নতুন আবেগ। যেন সে হৃদয়কে রাজার বেশে চুরি করে এখন সাধারণ সভাসদের পোশাকে ঘোরাফেরা করাই পছন্দ করছে। তার অধিকারী গৌরব কোথায়, তার প্রজ্বলিত আকর্ষণ? তার সঙ্গে সব কথাই ফুরিয়ে ফেলার পর সে হয়ে গেল এক সাধারণ মানুষ। কথায় অতীতকে সে জীবনে মাড়িয়ে আনতে চায় না। তখন পদ্মা—যা করবে না ভেবেছিল—তাই করল। তিমিরের ঠিকানায় সে এক চিঠি লিখল। লিখল—

আমরা তোমার সঙ্গের প্রত্যাশী। যদি আগের কথা সব ভুলে গিয়ে মাঝে মাঝে এ বাড়িতে এসে গল্প কর—তোমার আশ্চর্য বাজনা শোনাও—তাহলে খুব আনন্দিত হব।'

তিমির তার বেহালা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর কখনো সে পদ্মার কাছে যাবে না। চিঠি পেয়ে তার দুই চোখ ছলছল করল। সে বেহালাকে একবার চুমো খেয়ে আছাড় দিয়ে গুঁড়ো করল। তারপর স্বর্ণাসনের দিকে পা বাড়াল।

আদিত্য সহাস্যে অভ্যর্থনা করল তাকে। 'আমি জানতাম, তুই আসবি। জীবনকে খেলোবাড়ের মত নেওয়া উচিত। মনের হৃতস্বাস্থ্যকে উদ্ধার করে আবার তুই জীবনে নতুন সম্পদ খুঁজে পাবি। এই হৃদয়বৃত্তির নিয়ম।'

'সকলের হৃদয়ের জন্যে এক নিয়ম খাটে না, আদিত্য।' তিমির গম্ভীর হয়ে বলল—'আমি তবুও এসেছি, কারণ এক ভয়াবহ অচিন্তনীয় দাবির কাছে আমাদের সমস্ত প্রতিজ্ঞা পরাভূত হয়ে যায়।'

তারপর থেকে তিমির আসে। বেহালা বাজে না, বীণাও না। আদিত্য কথা বলে না, পদ্মার পাণ্ডুর মুখ দেখে। আর স্বর্ণাসনের দেয়ালে, দেয়ালে কত কান্না, অনেক কান্না, অনেক কান্না।

এখন দ্বিতীয় গল্পটা বলার আগে ধরে নেওয়া যাক, প্রথম গল্পটা এক রাত্রে (সেই রাত্রে) ঘুমিয়ে পদ্মা স্বপ্ন দেখেছিল। পদ্মা যেন খাবি খেতে খেতে ঘুমের সমুদ্র থেকে উঠে এল। 'না, না'—নিজেকে সে বলল—'আমি বুমার কথা শুনবো না। আমি জানি, আদিত্যকে না, তিমিরকেই আমার দরকার।'

দ্বিতীয় গল্প

পদ্মা নিজেকে প্রস্তুত করে বসে ছিল। তিমির ঘরে ঢুকে শুধু তার মুখ দেখল। কোনো কথার দরকার হল না। তিমির হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে হুহু করে কেঁদে উঠল। 'তুমি আমাকে বাঁচালে, পদ্মা। পদ্মা, আমার পদ্মা, তোমার দয়ার অন্ত নেই।'

তারপর পদ্মার সঙ্গে তিমিরের বিয়ে হল। তিমির স্বর্ণাসনে নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট পাবে, পদ্মা তা জানত। তাই স্বর্ণাসন ছেড়ে, বুমাকে বিদায় জানিয়ে পদ্মা তিমিরের সঙ্গে চলে গেল শত শত মাইল দূরে কোন এক জনমানবহীন কোলিয়ারীতে। সেখানে অনেক নিঃশব্দ চাকরবাকর (তিমিরের কড়া মেজাজের জন্য সবাই তাকে ভয় পায়) আর বিরাট নির্জন অট্টালিকা। তিমিরের বেহালা সেখানে তার তীব্রতম সুরগুলি অনায়াসে খুঁজে আনে। পদ্মা শুধু শোনে, তার বীণা বাজাবার ইচ্ছে আর কখনোই হয় না। কিছুদিনের জন্যে পদ্মা সেই সুরের মুখর গুপ্রতম নিজের ক্ষীণতম অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে ভাবল, এই বেশ। তারপর তার মনে হল, যেন সে একটা ছায়ার শরীর হয়ে গেছে। যেন সে নিজের হৃদয়ে হাত ঢুকিয়ে আর কোনোই উত্তপ্ত কুসুমিত স্পর্শ পাবে না সেখানে শুধু ছাই, শুধু ঝরা পাতা। সে হাঁফ ধরল—সে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ চাইল।

পদ্মা দেখতে পেল, তিমিরের ঈর্ষা সর্বব্যাপী। তিমির, এমন কি, পদ্মার বীণাকে সহ্য করতে পারে না। পদ্মার লালশরীরকে তিমির আদিত্যের স্মৃতির মত ঈর্ষা করে। তিমির পদ্মার মনের কোণা থেকে কোণা অবধি নিজের একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করে রাখতে চায়। তিমির যেন এক বিশাল প্রস্রবণের মতো প্রেম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বাঁচতে হলে তারই মধ্যে পদ্মাকে নিশ্বাস নিতে হবে, সাঁতার কাটতে হবে। অথচ তার আবেগের ঘায়ে প্রতিমুহূর্তে পদ্মার হাত পা এলিয়ে যাচ্ছে। পদ্মার জন্যে তিমির কোথাও একটা খোলা জানালা রাখে নি—রাখে নি কোথাও একটু নিজের বলতে টুকরো অবসর। অথচ পদ্মা এখন কথা বলতে চায়, এই নির্বাক অনুভব তার হৃদয়ের ওপর এক বিপুল প্রস্তরখণ্ডের মতো চেপে বসে আছে।

তখন পদ্মা, অনেক দিন ভাবার পর, একদিন রাত্রের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফেরত ট্রেন ধরল। স্বর্ণাসন তার লক্ষ্য। সেখানকার প্রত্যেক দেয়ালে, প্রত্যেক ফুল গাছে এবং জানালায় তার আশৈশব মুক্তিকে ফিরে পাওয়া যাবে। সেখানে রুমা আছে, সে তার কথা বলার সঙ্গিণী। সেখানে স্বর্ণাসনের মালিক তাঁর একবুক স্নেহ নিয়ে একা থাকেন, আর সেখানে আদিত্য নিয়মিত এসে তাঁকে সহায়তা আর সাহচর্য দিয়ে যায়। এই সব-কিছুর মধ্যে নিজেকে পদ্মা আবার ফিরে পেতে চাইছিল।

কিন্তু পদ্মা স্বর্ণাসনে পৌঁছবার আগেই স্বর্ণাসনের ঘণ্টা সশব্দে বেজে উঠল। তিমির তার আগেই এসে পৌঁছেছে। পদ্মাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, পদ্মাকে তার চাই। যখন পদ্মা এল, তখন তারা তিনজন পাশা-পাশি বসে আছে। বাবা, আদিত্য আর তিমির।

আশ্চর্য, পদ্মা দ্বিধা করল না। পদ্মা আদিত্যর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'না, আমি ফিরে যাবো না। বাবা যাই বলুন, আদিত্য—তুমি জানো, যে প্রেম মুক্তি দেয় না তা দুঃসহ। আমি স্বর্ণাসনে আশ্রয় চাইছি।'

'তিমির, তুমি কিছুদিন এখানে থাকো।' স্বর্ণাসনের মালিক বললেন 'পদ্মার ম... একটু এই পরিবেশে স্বাভাবিক ... ও।'

'পদ্মা—' তিমিরের আর্তস্বর একটা তার-ছেঁড়া বেহালার মত বেজে উঠল, 'এই তুমি আমাকে দিলে শেষ পর্যন্ত? আমি যে তোমাকে একেবারে পরিপূর্ণভাবে সব দিয়েছিলাম। দেওয়ারও কি সীমারেখা টানতে হয়?'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। আদিত্য বলল—'জীবনকে খেলোয়াড়ের মত নেওয়া উচিত মনের হৃতস্বাস্থ্যকে উদ্ধার করে আবার তুই জীবনে নতুন সম্পদ খুঁজে পাবি। এই হৃদয়বৃত্তির নিয়ম।' তারপর—'পদ্মা, আমি চললাম, আমি আর আসব না। তোমার জীবনে আমি এখন প্রক্ষিপ্ত।'

তিমির বসে বসে পদ্মার পাণ্ডুর মুখ দেখতে লাগল। স্বর্ণাসনের মালিক আদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। আর স্বর্ণাসনের দেয়ালে, দেয়ালে কতো কান্না, অনেক কান্না, অনেক কান্না।

ভ্যাকিউয়াম

কবি এবং বৈজ্ঞানিকে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত সে-কথা আমরা জানি। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'অহো হো। কী সুন্দর সূর্যোদয়।' বৈজ্ঞানিক গম্ভীর কণ্ঠে টিপ্পনী কাটলেন, 'হস্তীমূর্খ! সূর্যের আবার উদয়, অস্ত কি? পৃথিবীটা ঘুরে যাওয়াতে মনে হল সূর্যোদয় হয়েছে।'

কিন্তু কোনো কোনো স্থলে উভয়েই একমত পোষণ করেন।

কবি গাইলেন,

কে বলে সহজ, ফাঁকা যাহা তারে
সহজ কাঁধেতে সওয়া
জীবন যতই ফাঁকা হয়ে যায়
ততই কঠিন বওয়া॥'

বৈজ্ঞানিকও উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে'—'নেচার এবহর্স ভ্যাকিউয়াম।'

ধর্মের উচ্ছেদ যাবাই কামনা করেন তাঁরাই এ তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারেন। প্রাচীন যুগের চার্বাকপন্থী বা তার পরবর্তী যুগের মক্কার কাফিরদের কথা হচ্ছে না। এ যুগের কথা বললেই এ যুগের লোক সাড়া দেয়। এ যুগে ধর্মের প্রধান শত্রু টোটেলিটেরিয়ান স্টেট, একচ্ছত্র রাষ্ট্র—'দুশমন রাষ্ট্র' বললে জিনিসটা আরো পরিষ্কার হয়। তা সে রাষ্ট্র ফাসিস্টই হোক আর কম্যুনিস্টই হোক।

হিটলার বা স্তালিনের ভাবখানা অনেকটা এই: 'কী! আমার রাষ্ট্রে আমি ভিন্ন অ-ন্য কার মুরদ যে আমার কথার উপর কথা কইতে যাবে? আপন রাষ্ট্রের প্রতি, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি—অবশ্য আখেরে সেটাও আমি দখল করবো—তোমার আচরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-দর্শনে তোমার আদর্শ ঠিক করে দেব আমি।' এ যেন বাইবেল বর্ণিত যেহোভার তীব্র তীক্ষ্ম আদেশ, 'আমা ভিন্ন তোর অন্য কোনো উপাস্য দেবতা থাকবে না।'

এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠলো সেটা প্রধানত ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্পী-দার্শনিকের সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। আর বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা জীবনদর্শন নিয়ে চিন্তা করেন কমই। গবেষণার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা পেলেই তারা সন্তুষ্ট। আইন-আদালত নিয়ে যাদের কারবার তারা গোড়ার দিকে কিছুটা আপত্তি জানান বটে কিন্তু দেশের ডিক্টেটর একবার—জোর করে, ভয় দেখিয়ে যে করেই হোক—যদি 'আইনত' পাস করিয়ে নিতে পারেন যে তিনিই সর্ব আইনের মূলাধার, তা হলে এদের আর আইনত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। মিলিটারির বেলাও হুবহু তাই। ডিক্টেটর যখন দেশের সর্বোচ্চ সামরিক উর্দি পরে তাঁর সেনাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ান তখনই সেনানায়করা শপথ নেন যে তাঁর কোন আদেশ তাঁরা লঙ্ঘন করবেন না। সকলেই জানেন, হিটলারকে নিধন করার জন্য বড় বড় সেনাপতিরা যখন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন তখন তাদের প্রধান অন্তরায় ছিল এই শপথ।

শেষ পর্যন্ত যখন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতনের ফলে ধর্ম ভূগর্ভে আশ্রয় নেয়, তখন ধর্মবৈরী ডিক্টেটররা সম্মুখীন হন পূর্ববর্ণিত ঐ 'ভ্যাকিউয়ামের' সম্মুখে। এতদিন ধরে ধর্ম মানুষের জীবনে বৃহৎ এব অংশ জুড়ে বসেছিল, এখন ধর্ম চলে যাওয়াতে সে-জায়গাটা যে ফাঁকা হয়ে গেল সেটা পূর্ণ করা যায় কি প্রকারে?

হিন্দুর ধর্মজীবনে বাধ্যবাধকতা অত্যন্ত (তাও ব্রাহ্মণের); তার বাধ্যবাধকতা সামাজিক জীবনে। মুসলমান এবং খৃষ্টানের ঠিক তার উল্টোটা। তারা সমাজে স্বাধীন, কিন্তু ধর্মে

প্রচুর বাধ্যবাধকতা।[১] ডিক্টেটর বনাম ধর্মে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং এখনো চলছে সেটা প্রধানত খৃষ্টান দেশেই সীমাবদ্ধ বলে আমরা সেইটে নিয়ে আলোচনা করব। তবে এদেশের হিন্দু পাঠকেরা খৃষ্টধর্মের চেয়ে ইসলামের সঙ্গে বেশী পরিচিত বলে তার থেকেও কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নেব।

খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের সর্বপ্রথম মূল সিদ্ধান্ত—ইমান। অর্থাৎ তোমার বিশ্বাস—faith কি? তুমি যদি বলো, ঈশ্বর নেই—জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা যে রকম বলে—কিংবা বলো, ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু দেব দেবীও আছেন অসংখ্য, কিংবা বলো যীশুতে বিশ্বাস না করেও মোক্ষলাভ সম্ভবে তা হলে তুমি শুধু পাপী না, তুমি অখৃষ্টান (খৃষ্টান দৃষ্টিবিন্দু থেকে 'কাফির') হয়ে গেলে। ডিক্টেটররা এ সবেতে যে খুব বেশী আপত্তি করেন তা নয়, তাদের আপত্তি, তুমি যখন বলো, কর্তব্য নির্ধারণার্থে তুমি ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উপর নির্ভর করো, তখনই তাদের আপত্তি। হিটলার স্তালিন বলেন, তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করে দেব আমি। বাইবেল কুসংস্কারাচ্ছাদিত, বুর্জোয়ানির্মিত, প্রলেতারিয়াশোষক গ্রন্থ। আসল কেতাব 'মাইন কাম্‌পফ্‌' কিংবা 'ডাস্‌ কাপিটাল।' বিশ্বাসী খৃষ্টান যে রকম স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না, যীশু কোনো ভুল করে থাকতে পারেন, বিশ্বাসী কম্যুনিস্ট ঠিক তেমনি কিছুতেই স্বীকার করবেন না, মার্ক্স-লেনিন প্রচারিত ডাইলেক্টিকা মেটিরিয়ালিজমে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে।

কিন্তু এই ইমান বা faith ভিতরকার জিনিস—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইমান চলে গিয়ে ভ্যাকিউয়াম সৃষ্ট হল, কি না, হলপ করে কিছু বলা যায় না।

আসল শিরঃপীড়া ধর্মের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে। সেখানে যে ভ্যাকিউয়ামে তৈরি হয় সেটা ভরাট করা যাবে কি দিয়ে?

আবালবৃদ্ধ-নরনারী যায় রবিবারে চার্চে। বুড়োরা যাক্—মরুকগে, কিন্তু জোয়ানদের নিয়ে করা যায় কি? ঠিক ঐ সময়েই লাগিয়ে দাও—কুচ-কাওয়াজ, মার্চ। হিটলার-পন্থীরা দাঁড়াও চক্রাকারে। নেতা মাঝখানে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করবে 'হাইল (জয়তু!)!' জোয়ানরা সমস্বরে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দেবে 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ফের 'হিটলার!' ফের 'হাইল!' ইত্যাদি। টকটকে লাল মুখ যতক্ষণ না নীল হয়ে যায়। গির্জাতেও তো ঐ রকমই হয়। পাদ্রীসাহেব মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীরা উত্তর দেয় দুই চারিটি শব্দে কিংবা শুধু 'আমেন' (তথাস্তু) বলে।

ক্রিসমাস, ঈস্টারের উপাসনা জম্বর ভারী রকমের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পার্টি-ডে ন্যুরনবের্গে। সপ্তাহব্যাপী মোচ্ছব! ঝাড়া চারটি ঘণ্টা হিটলার দক্ষিণ বাহু উত্তোলিত প্রসারিত করে দাঁড়ালেন বেদী—খুড়ি—প্ল্যাটফর্মের উপর। বিশ্বাসী দল ঝাঁকে ঝাঁকে তার সামনে দিয়ে মার্চপাস্ট করলেন। কী উত্তেজনা, কী উৎসাহ! বিদেশাগত 'কাফির' (অর্থাৎ এখনো যে নাৎসী-ধর্ম গ্রহণ করেনি) ও বে-এক্তেয়ার—ইস্তেক জর্মনীর দুশমন ইংরেজের রাষ্ট্রদূত হেন্ডারসন। অবশ্য পাঁড় কাফির এসব পরবে আসে না—যেমন ফরাসী রাষ্ট্রদূত মসিয়ো ফ্রাঁসোয়া পঁসে। তিনি ফাঁড়া এড়াবার জন্য ঐ সময় ছুটি নিয়ে চলে যেতেন স্বদেশে, জমিদারি তদারক করতে।...রুশ দেশেও এসব 'পরব' হয়।

ধর্মের আরেক অঙ্গ কৃচ্ছ্রসাধন—উপবাস। প্রবর্তিত হল 'আইন-টপ্‌ফ্‌-গেরিস্ট'। সপ্তাহে একদিন খাবে শুধু এক পদের খানা। মাংস, আলু, ফুলকপি, চর্বি সব-সুদ্ধ মিলিয়ে ঘাট। 'অর দ্যভ্‌র্‌' দিয়ে আরম্ভ করে 'সের্ভার' পর্যন্ত অষ্টাদশপদী খানা মানা। (কিন্তু বিপদে পড়লে আমরা, ধর্মভীরুজনও 'ডুবে ডুবে জল খাই' ঠিক তেমনি প্রচুর নাৎসী প্রেশার কুকারের মত একটি পাত্রে তিন খোপে তিন রকমের খাদ্য রান্না করে খেল—কারণ বলা হয়েছে, 'আইন টপ্‌ফ্‌—' অর্থাৎ 'এক হাঁড়িতে' রান্না খাদ্য—এক হাঁড়িতেই তো রান্না হয়েছে, আপত্তি আর কি? হিটলারের কর্তাভজা শিষ্য পার্টি সেক্রেটারি আরেক কাঠি সরেস। হিটলার 'মীটলেস্‌', তিনি 'কাটলেস্‌'। অর্থাৎ নিরামিষাশী হিটলারের সঙ্গে নিরামিষ ঘাট খেয়ে হুজুরের সম্মুখে 'ধর্মরক্ষা' করে আপন ঘরে গিয়ে খেতেন তিনখানা শুয়োরের 'কাটলেস্‌' (কটলেট্‌)!

খৃষ্টান যায় জেরুজালেমে যীশুর কবর দেখতে, মুসলমান যায় পীরের দর্গা জিয়ারৎ করতে, বৌদ্ধ যায় তথাগতের অস্থিদন্তের আধার দেখতে—(হিন্দুর এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা, কারণ সে মৃতদেহ দাহ করে) এসব তীর্থযাত্রায় প্রচুর পুণ্য।

এদের সবাই হার মানে রুশের কাছে। হাজার হাজার নরনারী নাকি দুরন্ত শীতে রেড স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—লেনিন-স্তালিনের 'মামি' দেখবে বলে। আর 'মামি' যে কাস্কেট যা গোরস্তানের চেয়ে দুশমনের উপর বেশী দাগ কাটবে তাতে কি সন্দেহ?

এ বিষয়ে কম্যুনিস্টরা আমাদের হারিয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্তত আরেকটি রিচুয়ালে তারা সর্বাগ্রণী:—

ক্যাথলিক তারা পাদ্রীর সামনে আপন পাপ স্বীকার করে (কন্‌ফেশন), জৈন-বৌদ্ধ বর্ষাশেষের পর্যুষণে আপন আপন দুষ্কৃতি স্বীকার করে, মুসলমান সর্বজনসমক্ষে আল্লার কাছে তওবা করে ক্ষমা চায়।

রুশদেশের দেশদ্রোহীরা ধরা পড়লে এই কনফেশনের ধুন্দুমার লেগে যায়। কে কত বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই নিয়ে লেগে যায় কাড়াকাড়ি। সবাই সমস্বরে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার করে, 'না, না, আমি সবচেয়ে পাপী, আমি সর্বনিকৃষ্ট।'

এ সম্বন্ধে একটা চুটকিলাও হালে শুনেছি। রুশ প্রত্যাগত জনৈক বাঙ্গালীর কাছ থেকে।

আর পাঁচটা দেশের মত রুশও পণ্ডিত-গোষ্ঠী পাঠালে মিশরে প্রত্নতত্ত্বের চর্চা করতে। খুঁড়তে খুঁড়তে তাঁরা একটা 'মামি' পেয়ে গেলেন। খ্রুশ্চফ খুশী হয়ে শুধোলেন, 'ওটা কত দিনের পুরনো?' পণ্ডিতরা নিরুত্তর। খ্রুশ্চফ শাসালেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা ম্যাদ। উত্তর না দিতে পারলে সাইবেরিয়া।' পরদিন সব পণ্ডিত ম্যাদ-শেষের পূর্বেই হাজির। চোখেমুখে খুশী উপচে পড়ছে। খ্রুশ্চফ বললেন 'হু?' পণ্ডিতেরা সমস্বরে 'চার হাজার দু শ বৎসর।' 'বেশ, কি করে জানলে?' পণ্ডিতেরা ঐকতানে 'মামি স্বীকার করেছে (কনফেশন)।'

* * *

এরকম প্রচুর উদাহরণ আমি টায় টায়, দফে দফে পুরো ফর্মা দিতে পারি। কিন্তু রচনাটি ইতিমধ্যেই, আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় বেসামাল হয়ে গিয়েছে।

সর্বশেষে নিবেদন:

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যেন মনে না করেন, আমি ঐসব ধর্মের কর্মকাণ্ড (রিচুয়ালের) এবং নাৎসী-কম্যুনিস্টদের কর্মকাণ্ড সব কটাকে একই মূল্য দি। কম্যুনিস্টরাও যেন বিরক্ত না হন যে আমি তাঁদের 'বিজ্ঞানসম্মত' 'র‍্যাশনাল' কর্মকাণ্ড 'ধর্মের আফিঙে' মাখানো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে তাদের প্রতি অবিচার করেছি। আমি শুধু প্যারালেল দেখিয়েছি।

এস্থলে সেই ফরাসী প্রবাদ বাক্য স্মরণ করি:—'প্লু সা শাঁজ, প্লু সে লা মেম শোজ্‌।' 'যতই সে বদলায়, ততই তাকে আগের মত দেখায়।'

কিন্তু এহ বাহ্য।

ধর্ম তবে কি?

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ তাই আমেরিকা থেকে তাঁর শিষ্যদের একাধিক চিঠিতে লেখেন, হিন্দুর ধর্ম ও খৃষ্টানের সমাজ নিয়ে নূতন হিন্দু জীবন গড়তে হবে। বঙ্কিমও এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বহুবিবাহনিরোধ ব্যাপারে বলেছেন, এ জিনিস খারাপ, ধর্ম দিয়ে প্রমাণ করেই বা লাভ কি? হিন্দু চলে সামাজিক লোকাচার মেনে।

❋ আলোচনা ❋

শিল্পীর স্বাধীনতা

মহাশয়,

ভারতে কম্যুনিষ্ট চীনা আক্রমণের পর আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত "শিল্পীর স্বাধীনতা" পর্যায়ের প্রবন্ধগুলির মধ্যে গত ২রা চৈত্র সংখ্যার শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুর লেখা প্রবন্ধটি অপূর্ব (শ্রীযুক্ত ধীরেন বরগুপ্তের মতে) বটেই তার চেয়েও অনেক বেশী। এরূপ নির্ভীক সমালোচনা এবং চীনা সমাজজীবনের নগ্ন স্বরূপ প্রকাশ ইতি-পূর্বে আর কেহই করেন নাই বা করিতে সাহসী হন নাই। এজন্য আপনাদের উভয়কেই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। চীনা কমিউনে রাত্রির বিশ্রামের জন্য প্রত্যেক পরিবারের পৃথক ব্যবস্থা কিছু আছে কিনা শ্রীযুক্তা বসুকে জানাইতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্তা বসুর প্রবন্ধ পড়িয়া "দেশ" পত্রিকার পাঠকমণ্ডলী প্রভূত উপকৃত হয়েছেন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় নয় কি? বেতারের মাধ্যমে শ্রীযুক্তা বসুর এ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা প্রচারের সাহায্য করিতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

দেশের বর্তমান সংকট ও অগ্নিপরীক্ষার সময়ে দেশদ্রোহী চীনা গুপ্তচরদের অবাধ অপপ্রচারে বাধা সৃষ্টি করাই দেশবাসীদের একান্ত কর্তব্য। নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি—

শ্রীগণেশচন্দ্র মৈত্র
বেলপুকুর, নদীয়া।

সেই রহস্য

সবিনয় নিবেদন,

গত ২২শে সংখ্যা দেশ পত্রিকায় শিলিগুড়ির সাপ্তাহিক "সৈনিক" পত্রিকার সম্পাদকীয় হইতে "সেই রহস্য" এই শিরোনামায় যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এই নিবন্ধে চীনাদের ও চীনাপন্থী কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপের আর একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হইল।

পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলে চীনারা যে মারাত্মক জাল বিস্তার করিতেছিল তাহার আভাস পূর্বে কিছু পাইলেও তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ভাগ্যক্রমে এই অবস্থা চরম পরিণতি লাভের পূর্বেই রহস্য উদ্ঘাটিত হইল।

এই প্রসঙ্গে ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। নেপাল আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী ও ধর্মীয় কারণে নিকট আত্মীয়ও বটে। নেপালীর ভারতে প্রবেশের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুযোগের আশ্রয় লইয়া চীনারা নেপালী কম্যুনিস্টদের দ্বারা তাহাদের কূটপরিকল্পনাকে রূপ দিতেছে। ইতিমধ্যে তরাই অঞ্চলে বহুসংখ্যক নেপালী বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পাকাপাকি বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আপাতত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সৃষ্টি করাই উঁহাদের উদ্দেশ্য।

এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিশ্চয়ই সরকারের অজানা নাই। আশা করি সরকার এই আগাছাগুলি সম্পর্কে সচেতন হইবেন। ইতি—

অরুণকুমার মৈত্র
নদনদ।

হাসনোহানা

মহাশয়,

হাসনোহানা নিয়ে কিছু আলোচনা সম্প্রতি দেশ পত্রিকার পাতায় দেখলাম। ২রা মার্চ তারিখে শ্রীরাজেশ্বর মিত্র "হিনা" সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরী থেকে উদ্ধৃত করে ইঙ্গিত করেছেন যে হিনা হাসনোহানাই বটে। কিন্তু হিনা যে কখনও হাসনোহানাকে বলা হয় নি আমি সে কথাই বলতে চাই।

সুগন্ধ মেহেদীর (Lawsonia inermis) ফুলে থাকে চারটি পাপড়ি, যে কথা শ্রীমিত্র হিনার সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন (তাঁর উদ্ধৃতি "হিনা চাহারবর্গী......" ইত্যাদি)। আমাদের হাসনোহানার (Cestrum nocturnum) ফুলে পাপড়ি পাঁচটি, চারটি নয়।

একটি পুরানো উর্দু কবিতাতে বলা হয়েছে—হোশ আতা হ্যায় ইনসানকো ঠোকর খানেকে বাদ, রঙ্গ লাতী হ্যায় হিনা পত্থরমে ঘিস জানেকে বাদ।

অর্থাৎ

মানুষের জ্ঞান হয় ঠোকর খাবার পরে
হিনা রঙীন হয়ে ওঠে পাথরে পিষে যাবার পরে

হিনা তাহলে মেহেদীই দাঁড়াচ্ছে সন্দেহ নেই, কারণ মেহেদীর পাতা পিষে হাত ও পা রং করার কথা সর্বজনবিদিত অথচ হাসনোহানা থেকে কোনো রং পাওয়ার কথা জানা নেই। মুঘল আমল থেকে যে হিনা (মেহেদী) কদর পেয়ে আসছে সমাজে, তার সঙ্গে হুসেন শব্দ কি করে যোগ হলো তা নিয়ে বিশেষ সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। উত্তর প্রদেশ লক্ষ্ণৌ দিল্লির উর্দু কলকাতার উর্দুর চেয়ে নিঃসন্দেহে বেশী খাঁটি, সুতরাং ধরে নিতে পারা যায় বাংলায় প্রচলিত হাসনোহানাকেই কলকাতার উর্দুভাষীরা নিজের মনের মত করে হুসেন-ই-হিনায় রূপান্তরিত করে নিয়েছে। পশ্চিমী উর্দুভাষীদের হাতের কাছে হাসনোহানা শব্দটিই ছিল না। ফার্সী আরবী ও উর্দু অভিধানগুলির নীরবতা—যা শ্রীমুক্তরা আলী স্বয়ং উল্লেখ করেছেন—এই সম্ভাবনার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঠিক এমনি ভাবেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশের প্রবাসী বাঙালীরাও কি কিছু কিছু হিন্দী ও উর্দু শব্দ নিজেদের সুবিধে মত কেটে ছেঁটে বাংলা করে নেন নি, যা কোন বাংলা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না?

অপরপক্ষে ৩০শে মার্চ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীজ্যোতিভূষণ চাকীর চিঠিখানি পড়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে শব্দটি জাপান থেকেই আমদানি হয়েছে। বিশেষ করে সুনীতিবাবুর মতামত প্রণিধানযোগ্য। সুতরাং শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীসুবল মিত্রের অভিধানে লিখিত হাসনোহানা শব্দের মূল উৎস সম্বন্ধে সন্দেহ করা বোধ হয় উচিত নয়।

আলোক চট্টোপাধ্যায়
সাসারাম—বিহার।

॥ ১২ ॥

"যুদ্ধকে সুখকর করতে গেলেই পরাজয়ের পথ প্রশস্ত হয়"

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত বর্ষা দেখা দিল, বর্ষণ শুরু হল পাহাড়ে প্রান্তরে যমুনার চরে শাহজানাবাদের প্রাকার প্রাসাদ সৌধ মিনার গম্বুজের শিরে শিরে, পার্বত্য সংজ্ঞাহীন শুষ্ক নির্জনতার উপরে। আর সে কি বৃষ্টি! আকাশের ছাদ যেন চৌচির ফেটে গিয়ে মুষলধারে জল পড়ছে। বৃষ্টির ঘন চাদর এমন হয়ে ঝুলে পড়েছে যে পাহাড় থেকে শাহজাহানাবাদ অদৃশ্যপ্রায় কেবল কখনো একটা ঝাপসা বস্তুর মত চোখে পড়ে। এতদিনের দারুণ শুষ্ক তাপ একদিনে অন্তর্হিত হল। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দিল নতুন সমস্যা। তখন আবার মনে হতে লাগলো গ্রীষ্মই বোধ করি ভালো ছিল এত সমস্যা তার ছিল না। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল হাজার হাজার ছোট-বড় নানা আকারের ব্যাঙ আর তাদের খাদক শত শত সাপ। মানুষের চোখে সব সাপই বিষধর। পশুর মৃতদেহগুলো শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে গিয়েছিল, এবারে ফুলে ফেঁপে হয়ে উঠল জলের স্রোতে তার ক্লেদ আর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মশা-মাছি তো কমলই না, বরঞ্চ তাদের সংখ্যা স্ফীত করে তুলল হাজার হাজার জ্ঞাত অজ্ঞাত কীট পতঙ্গ। অবস্থা শেষে এমন হল যে খানার টেবিলের উপরে মশারি খাটিয়ে খেতে বসতে হতো। তাতেও রক্ষা নেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে মাছি, এক হাতে মাছি তাড়াতে তাড়াতে মুখে তুলতে হয় খাদ্যের গ্রাস। তৎসত্ত্বেও কখনো কখনো মুখের মধ্যে চলে যায় মাছি, তখন দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বমি করে ফেলতে হয়। যারা ঘরে আশ্রয় পেয়েছিল আর যারা তাঁবুর আশ্রয়ে ছিল তাদের অবস্থা প্রায় সমান, ফাটা ছাদ আর ছেঁড়া তাঁবু রুখতে পারে না জলের তোড়। রাত কেটে যায় চারপাই এদিকে ওদিকে টানাটানি করে। ফৌজী লোকের কবিত্বের চোখ থাকলে দেখতে পেতো যে, বর্ষার প্রভাবে কিছু সৌন্দর্যও দেখা দিয়েছে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শ্যামল তৃণাঙ্কুর মাথা তুলল, বাবলা বনের কাঁটা ঢেকে গেল সবুজ পাতায়—সমস্ত পাহাড়টার উপরে রাতারাতি কোমল সবুজের প্রলেপ টানা হয়ে গেল। কিন্তু এত সৌন্দর্য দেখবার, এত কবিত্ব করবার সময় তাদের ছিল না—অবিশ্রান্ত বর্ষণের মতোই অবিশ্রান্ত সিপাহীদের আক্রমণ। দিনে রাতে অষ্টপ্রহর যখন তখন বিনা নোটিশে বিউগল বেজে উঠছে ঘোড়সোয়ার ছুটছে গুড়ুম কামান ডাকছে কড়কড় বন্দুকের মুখ উগরে দিচ্ছে রাতের বেলায় অগ্নির পিচকিরি দিনের বেলায় ধোঁয়ার ফোয়ারা, যত্রতত্র এসে পড়ছে কামানের গোলা, থেকে থেকে ঘোড়ার হ্রেষা দ্রুত তরঙ্গে ছুটে যায় শব্দের বিদ্যুতের মতো। কখনো খানার টেবিল থেকে ছুটতে হয়, কখনো বা কষ্টার্জিত নিদ্রার সুখশয্যা থেকে। খানার টেবিলে বাঁ পাশে রাখতে হয় ভরা বন্দুক, রাতের বেলায় চারপাইয়ের ডান পাশে রাখতে হয় খোলা তলোয়ার। কী জীবন! যুদ্ধ সুখের নয়। যুদ্ধকে সুখকর করতে গেলেই পরাজয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

যুদ্ধ এমন প্রাত্যহিক হয়ে উঠলেও দুটি দিন বিশেষ গুরুতর হয়ে উঠেছিল। ২৩শে জুন পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ পূর্ণ হল। কিছুদিন আগে থেকে মুখে মুখে রটে গিয়েছিল যে, ঐদিনে খতম হবে কোম্পানীর রাজগী। জ্যোতিষীরাও নক্ষত্রের হালচাল দেখে কথাটা সমর্থন করলো। বাদশা ফৌজকে পেট ভরে মিঠাই খাইয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রের মন্তরের চেয়ে প্রবল হল এনফিল্ড বন্দুক আর ফৌজী শৃঙ্খলা। আবার বকর-ইদের দিনেও প্রবল আক্রমণ চালালো সিপাহী পক্ষ। তারা সব্জিমণ্ডি পর্যন্ত চড়ে পড়েছিল আর একটু হলেই কোম্পানীর ফৌজের পিছনে গিয়ে পড়তো—তাহলেই সঙ্কট দেখা দিত। কিন্তু রীডের

ঘোড়সোয়ার ও ফক্সের গোলন্দাজ সংকট উদ্ধার করে দিল। তারপর কিছুদিন উভয় পক্ষের শিবিরেই অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা।

কিন্তু মৃত্যুর তো একটা মাত্র দ্বার নয় হাজার হাজার দরজা। সিংহদ্বার বন্ধ করলে খিড়কি দিয়ে ঢোকে। খিড়কি বন্ধ করলে ঢোকে জানলা ঘুলঘুলি দিয়ে। কম্পানী শিবিরের হাসপাতাল সর্বদা পূর্ণ সর্দি-গর্মীর রুগী কমতেই কলেরার রুগী বাড়লো। সেই সঙ্গে বাড়ে আহত ও নিহত-প্রাণের সংখ্যা। ৫ই জুন কলেরায় প্রাণত্যাগ করলো কমান্ডার-ইন-চীফ স্যার হেনরি বর্নার্ড। এবার কমান্ডার-ইন-চীফ হল মেজর জেনারেল রীড (পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তি নয়। লোকটা একে বৃদ্ধ তার রুগ্ন দিন বারো নামে মাত্র কাজ চালিয়ে সিক লিভ্ নিয়ে চলে গেল পাহাড়ে। এবারে কমান্ডার-ইন চীফ ব্রিগেডিয়ার আর্চডেল উইলসন। মীরাটের বিদ্রোহ দমনে তৎপরতা দেখাতে না পারলেও দিল্লী আসবার পথে হিন্দন নদীর যুদ্ধে সিপাহী ফৌজকে পরাজিত করে কিছু মর্যাদা লাভ করেছিল কোম্পানীর ফৌজের চোখে। ওদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ব্রিগেডিয়ার নেভিল

চেম্বারলেন। পাঞ্জাব থেকে জন নিকলসন না এসে পৌঁছা অবধি সাইত্রিশ বৎসর বয়সের এই যুবক সৈনিকটিই ছিল কোম্পানী ফৌজের প্রাণ। এ হেন অবস্থায় জীবনলালের রেসালার উপরে ভার পড়লো কোম্পানী শিবিরের আগাগোড়া পাহারা দেওয়ার।

স্বরূপরামের হাতে কাজ না থাকলে তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে জীবন আর গুরুবচন। এ অঞ্চল স্বরূপের নখদর্পণে। ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে জেনে নেয় প্রত্যেকটি কুঠি আর ইমারতের ইতিহাস, জেনে নেয় পাহাড়টার ভূগোল।

স্বরূপ বলে, ভালো ভাবে ঠাহর করে দেখো, পাহাড় একটা নয় দুটো মাঝখানে অনেকখানি ছেদ আছে বলে দক্ষিণ দিকেরটা সব সময়ে চোখে পড়ে না। এই ফাঁকটার মধ্যেই পাহাড়ীপুর, তেলিওয়ারা কিষেণগঞ্জ, ঐ পশ্চিমে সব্জিমণ্ডি আর একটু পশ্চিমে রোশেনারা বাগ। আর এবারে দেখো সব্জিমণ্ডি থেকে আরম্ভ হয়ে দ্বিতীয় পাহাড়টা একটু পূর্বে হেলে বরাবর চলে গিয়েছে মাইল তিনেক দূরে যমুনা নদী পর্যন্ত।

ওরা মন দিয়ে শোনে কখনো বা চোখে দূরবীন লাগিয়ে স্বরূপের বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবের মিলিয়ে নেয়। জীবনলাল শুধোয়, সবই তো বুঝলাম কিন্তু দিল্লীর এই সমতল মাঠের মধ্যে ডাঙর ভেলার মতো পাহাড় দুটো নিতান্ত খাপছাড়া নয় কি?

স্বরূপ বলে খাপছাড়া মনে হলেও আসলে খাপছাড়া নয়—এ দুটো হচ্ছে আরাবল্লী পর্বতের প্রসারিত বাহুর শেষ দুটো আঙুল।

গুরুবচন বলে ওঠে, তাজ্জব কি বাৎ! কোথায় আরাবল্লী পর্বত আর কোথায় দিল্লী।

জীবন শুধোয় তুমি এত কথা জানলে কি করে?

তোমাদের তো গল্পে গল্পে বলেছি দিল্লী কলেজের ছাত্র আমি জিওগ্রাফি পড়তে হতো। প্রোফেসার লেমিংটন জিওগ্রাফি পড়াতেন, তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলাম আমি। ছুটি পেলেই ঘোড়ায় চড়ে দিল্লীর চারদিক দেখবার জন্যে বের হতেন সঙ্গে নিতেন আমাকে। তোমাদের যা বলছি তাঁর কাছে শেখা।

জীবন বলে হঠাৎ হাসলে কেন?

স্বরূপ বলে, একটা কথা মনে পড়লো বলে। প্রোফেসার লেমিংটনের ভূগোল বর্ণনা মেনে নিতাম, তিনিও মেনে নিতেন পাহাড়ের উপরকার কুঠিগুলো সম্বন্ধে আমার বর্ণনা। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনে, কখনো আর মিল হলো না।

কি বলো তো?

হিন্দুরাও কুঠীর দক্ষিণে ঐ যে পাথরের স্তম্ভটা দেখেছ ওটাকে তিনি বলতেন প্রাচীনকালের কোন রাজার বিজয়কীর্তি।

তাছাড়া আর কি হবে?

স্বরূপ বলে ভীমের গদা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করবার পরে ভীমসেন গদাটা এখানে পুঁতে রেখেছেন, তারই কতকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এ কথা এদিকের সবাই জানে।

তারপর একটু থেমে বলে লেমিংটন কিছুতেই মানবেন না। শুধু গদাটাকে নয় স্বয়ং ভীমসেনকে অবধি তিনি উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। বলেন, ওসব পৌরাণিক কাহিনী কাল্পনিক।

স্বরূপ শুরু করে চেয়ে দেখো পাহাড়টার শিরদাঁড়ার উপর দিয়ে সোজা দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গিয়েছে অনেকগুলো ইমারত কুঠি মসজিদ। সব দক্ষিণে ভীমের গদা, তারপরে হিন্দুরাও কুঠি, তারপরে পাশাপাশি পীরগায়েব মসজিদ আর অবজারভেটারি। এবারে প্রায় মাইলখানেক ফাঁকা তারপরেই ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার। ব্যস, তারপরে পাহাড়ের উপর দিয়ে যমুনা পর্যন্ত চলে যাও আর কিছু নাই। তবে ঐ ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে যমুনার দিকে তাকালে আধমাইলটাক দূরে দেখতে পাবে দিল্লীর এসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট মেটকাফ সাহেবের কুঠি।

এইভাবে কথা বলতে বলতে যখন তারা অবজারভেটারি ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে এমন সময় সব্জিমণ্ডির দিকে বিউগল বেজে ওঠে। সিপাহী আক্রমণ করেছে। আক্রমণের সঙ্কেত বাজলে যে যেখানে থাকুক

সকলকেই সাহায্যে যেতে হবে। ছুটলো ওরা তিনজন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে।

আবার পরদিন রোদে বেরিয়ে প্রশ্নোত্তর চলে তিনজনের মধ্যে।

পাহাড় আর শহর মুখোমুখি. মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দক্ষিণ দিকে দুয়ের মধ্যে আধ মাইলের ব্যবধান. উত্তর দিকে ব্যবধান তুলনায় অনেক বেশি। কাশ্মীর দরবাজার কাছে Ludlow Castle আর কুদশিয়াবাগ চোখে পড়বার মতো। এ দুটো ছেড়ে দিলে পাহাড় ও শহরের মাঝখানে যে সব ছোটখাটো অফিস বাড়ি আর পুরনো কবর দরগা প্রভৃতি আছে সকলেরই এখন পরিত্যক্ত অবস্থা। সামরিক পরিভাষায় গিরি-পুরীর মধ্যবর্তী এই বেওয়ারিশ জমিটা নোম্যান্সল্যান্ড। শহর শাহাজানাবাদের যমুনার ধার থেকে কাশ্মীর দরবাজা হয়ে শাহ বুরুজতক আবার শাহ-বুরুজ থেকে কাবুল দরবাজা হ'য়ে লাহোর দরবাজাতক—এই দুটো অংশই পাহাড় আর বৃটিশ শিবিরের মুখোমুখি। ৮ই জুন থেকে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষে যত সংঘর্ষ হয়েছে সমস্তই এই জায়গাটার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোম্পানী পক্ষের এত সৈন্য নেই যে ঘুরে গিয়ে শহরের পিছনে আক্রমণ করে. আর সিপাহী পক্ষের এমন রণ শৃঙ্খলা নেই যে পাহাড়ের পশ্চিমে গিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করে বৃটিশ শিবির। তবে দুই পক্ষেই মিত্র নূতন সৈন্যসমাগম হচ্ছে—দুই পক্ষই নিশ্বাসরোধ করে চরম পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে।

এক একদিন ভোরবেলা বৃটিশ ফৌজ চমকে জেগে উঠে শোনে ব্যাগপাইপে বাজছে অতি প্রসিদ্ধ 'cheer boys cheer'—সুর। ঐ আসছে আমাদের ফৌজ। কিন্তু তখনি ভুল ভেঙে যায়, ফৌজ আসছে, সেই সুপরিজ্ঞাত গানের সুরও বাজছে তবে তারা সিপাহী ফৌজ, তাদের লক্ষ্য লালকেল্লা। ফ্ল্যাগস্টাফ টাওয়ার থেকে দূরবীন লাগিয়ে ওরা দেখতে পায় যমুনার উপরে যে নৌ-সেতু আছে তার উপর দিয়ে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য সৈন্য পার হচ্ছে পদাতিক, ঘোড়-সোয়ার গোলন্দাজ, তাদের হাতে কোম্পানীর অস্ত্র গায়ে কোম্পানীর ইউনিফর্ম, ব্যাগ পাইপে কোম্পানীর শেখানো গানের সুর 'cheer boys cheer', আর মুখে তুমুল গর্জন বাদশাহ জিন্দাবাদ, কোম্পানী মুরদাবাদ। মনে মনে সবাই হতাশ হয়ে পড়ে, মুখে প্রকাশ করে না। ওরা নিয়মিত খবর পায়, শাহাজানাবাদে আছে রজব আলী ওদের গুপ্তচর সে পাঠিয়ে দেয় বৃটিশ ছাউনিতে খবর। জলন্ধর, নসিরাবাদ, নিমচ কোটা গোয়ালিয়র ঝাঁসি, রোহিলাখণ্ড থেকে নূতন নূতন রেজিমেন্টের আগমন বার্তা পৌঁছায় কোম্পানীর গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা কর্নেল হডসনের কাছে। তবে কেবলই যে সিপাহী পক্ষের ফৌজ আসে এমন নয়। কখনো কখনো পাঞ্জাব থেকে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে কোম্পানীর ফৌজ আসে মুলতান থেকে, পেশোয়ার থেকে কাশ্মীর থেকে দূর থেকে শোনা যায় ব্যাগ পাইপের সুর 'cheer boys, cheer'। তখন পাহাড়ের উপর থেকে খালি চোখেই ওরা দেখতে পায় শাহাজানাবাদের প্রাচীরের উপরে কাতারে কাতারে সিপাহী পশ্চিমদিকে তাকিয়ে ফৌজের সংখ্যা অনুমান করতে চেষ্টা করছে। তবে দুই ফৌজের আগমনে প্রভেদ বিস্তর। সিপাহী ফৌজ আসে বন্যার তোড়ে, কোম্পানীর ফৌজ আসে ঝিরঝিরে স্রোতে। তবে মন্দর ভালো এই যে এই ক্ষীণ স্রোতটিকে বন্ধ করতে পারেনি সিপাহী পক্ষ অবশ্য কোম্পানী পক্ষও পারে নি যমুনার সেতু দখল করতে। বার দুই চেষ্টা হয়েছে আগুনের ভেলা ভাসিয়ে দিয়ে সেতুটাকে পুড়িয়ে দেওয়ার, কিন্তু স্রোতের খেয়ালে ভেলা সেতু পর্যন্ত পৌঁছয়নি, আগেই চড়ায় আটকে গিয়েছে। জীবনলাল ব্রিজম্যানের মুখে অনেকদিন শুনেছে সিপাহী পক্ষ গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দখল করতে পারলে পাঞ্জাবে যাতায়াতের পথ বন্ধ হবে কোম্পানী ফৌজকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে। আরও শুনেছে, সিপাহী পক্ষে শক্তিশালী জেনারেল বেণ্ট খাঁন এই পাহাড়টাকে

অরক্ষিত রাখতো না। পাহাড়টা না পেলে এত কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বৃটিশ ফৌজ কি এখানে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারতো। ব্রিজম্যান বলেছিল, যেদিন পাহাড়টা অধিকার করলাম সেইদিনই বুঝলাম আজ হোক বা দু'দিন পরে হোক দিল্লী আমরা অধিকার করতে সক্ষম হবই। ব্রিজম্যান বলেছিল, যতদিন না কানপুর, এলাহাবাদ, কলকাতা থেকে আরও ফৌজ না এসে পৌঁছয় এই পাহাড় আঁকড়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর নেই।

মেজর জোনস ও মেজর রীডকে ব্রিজম্যান বলেছিল যে, শীঘ্রই কানপুর থেকে জেনারেল হুইলার, লখনৌ থেকে জেনারেল হেনরি লরেন্স আর কলকাতা থেকে এলাহাবাদ কানপুর হয়ে জেনারেল হ্যাভলক ও জেনারেল নীল এসে পৌঁছবে।

জোনস আর রীড সাগ্রহে শুধোয়, কতদিন লাগবে?

ব্রিজম্যান বলে, কম্যান্ডার ইন-চীফের ধারণা খুব বেশি দেরী হয় তো দিন দশেক।

রীড বলে, কিন্তু পূর্বদিক থেকে কোন খবরই যে আসছে না, এটা শুভলক্ষণ নয়।

ব্রিজম্যান বলে, cheero man! No news is good news.

সত্য সত্যই দিন দশেক পরে পূর্বদিক থেকে খবর আসে ফকিরবেশী গুপ্তচরের হাতে। লোকটা এক টুকরো ডাককরা ময়লা কাগজ দেয় জেনারেল উইলসনের হাতে। ফরাসী ভাষায় লিখিত সংবাদ। চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় উইলসন তারপর ADC-কে হুকুম করে এখনি বৃটিশ পতাকা অর্ধনমিত করো।

সহসা অর্ধনমিত পতাকা দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয় কোম্পানী ফৌজ। মেজর কর্নেল, ব্রিগেডিয়ার সবাই দ্রুত পদক্ষেপে যায় জেনারেলের শিবিরের দিকে, কি হল?

ওদিকে দিল্লী-প্রাকারে শত শত দর্শকের কণ্ঠে ওঠে জয়োল্লাস—কোম্পানী রাজ মুরদাবাদ, বাদশাহ জিন্দাবাদ।

কম্যান্ডার-ইন-চীফের তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে জীবন, গুরুবচন সিং আর স্বরূপরাম দেখতে পায় যে, ব্রিজম্যান, রীড, জোনস, এডওয়ার্ডস নরম্যান, ডেলি, সিডনি বর্টন, হডসন প্রভৃতি দশ বারোজন জঙ্গী সাহেব সমবেত হয়েছে। নেভিল চেম্বারলেন গুরুতর আহত অবস্থাতেও এসেছে। এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে আছে এলেক্স টেলর আর বেয়ার্ড স্মিথ আর আছে ফৌজের পাদ্রী মীক সাহেব। সকলকে সমবেত দেখে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে জেনারেল আরম্ভ করলো বন্ধুগণ, নিদারুণতম সংবাদ বহন করে দূত এসেছে। সে খবর এমনই নিদারুণ যে অনাবশ্যক ভূমিকা করে তার গুরুত্ব লাঘব করবো না। তাছাড়া ছোট এক টুকরো কাগজে যে সংক্ষিপ্ততম বাক্য কটি এসেছে তাতে ভূমিকার স্থান নেই। এত ক্ষুদ্র পত্র এত বড় দুঃসংবাদ বোধকরি আর কখনো বহন করে আনে নি।

মুহূর্তকালের জন্য থামলো উইলসন, অশ্রুসংবরণ করে নিল, তারপর আবার আরম্ভ করলো। পত্রলেখক মেজর হুবার্ট আমার পূর্বপরিচিত ব্যক্তি জেনারেল নীলের ফৌজের অন্তর্গত। হুবার্ট লিখছে লখনৌ এ বিপন্ন হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও কিছু সিপাহী আশ্রয় নিয়েছে রেসিডেন্সিতে তারা এখন অবরুদ্ধ। কিছুদিন আগে গোলার আঘাতে নিহত হয়েছে স্যার হেনরি লরেন্স। কানপুরের সংবাদ আরো শোচনীয়। জেনারেল হুইলার কিছুদিন যুদ্ধ চালায় নানা সাহেবের ফৌজের সঙ্গে। তারপরে নানার ছলনায় মধ্যবর্তী ঘাটিতে জলপথে যাত্রার সময়ে সকলে নিহত হয়। শ্বেতাঙ্গ রমণী ও শিশুদের একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। জেনারেল নীলের ফৌজ কাছে এসে পড়েছে জানতে পেরে তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। জেনারেল হ্যাভেলক ও জেনারেল উট্রামের সৈন্যবাহিনী দু'এক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তখন আমাদের সকলকে মিলে লখনৌ গিয়ে অবরুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের উদ্ধার করতে হবে যাতে কানপুরের শোচনীয় ঘটনার আবার না পুনরাবৃত্তি ঘটে। দিল্লী যাওয়ার সংকল্প পরিত্যক্ত হল। এদিক থেকে ফৌজ পাঠাবার আর উপায় নেই দিল্লীর দিকে। ভগবান তোমাদের সহায় হোন। হুবার্ট।

এতক্ষণ বিরাট তাঁবু নিঃশব্দ ছিল, এতগুলি লোকের নিঃশ্বাসে যেটুকু শব্দ হওয়া আবশ্যক তাও হচ্ছিল না। পত্রখানা পড়া শেষ হলেও ভঙ্গ হল না গৃহের নিস্তব্ধতা।

তখন আবার উইলসন বলল, পরশু রবিবারে অন্যায়ভাবে নিহত নরনারীর আত্মার জন্য প্রার্থনা হবে।

এই বলে তাকালো রেভারেন্ড মীকের দিকে। মীক চোখের দৃষ্টিতে সমর্থন জানালো। তখন সকলে নীরবে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে নিজ নিজ শিবিরের দিকে রওনা হল। তখনো উঠছে দিল্লী প্রাকারে কামান গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে জনতার জয়োল্লাস ইতিমধ্যেই তাদের কাছে পৌঁছেছে লখনৌ ও কানপুরের সংবাদ।

॥ ১৩ ॥

কুন্তী অভাব

জীবনলাল পিছন ফিরে চমকে ওঠে, বলে আরে এটা আবার কখন এসে দাঁড়ালো?

স্বরূপ বলে, তাইতো ক্যালিবান যে!

দুজনেই দেখতে পায় কখন তাদে

অগোচরে সেই Wolfboy বা মানুষবাঘাটা এসেছে, তারা কিছুই জানতে পারেনি!

ব্রিজম্যান শেক্সপীয়রের নাটক থেকে ধার করে নিয়ে এই অদ্ভুত জীবটির নামকরণ করেছিল ক্যালিবান। সকলেই এখন ক্যালিবান বলে, যারা ইংরাজি জানে না বলে কালিবান্।

জীবন বলে, এখন একে নিয়ে আমি কি করি বলো তো।

স্বরূপ বলে, কি আর করবে যেমন আছে থাক না, উপদ্রব তো করে না।

তা অবশ্য করে না, কিন্তু এ যে এক দায় হল। আমি খাওয়ালে তবে খাবে, আমাকে ছাড়া আর সকলকে দেখলেই তেড়ে যাবে।

তোমাকেও তো এক সময় তেড়ে যেত।

যেতো বইকি, আঁচড় কামড় দিতো।

এখন তো আর দেয় না, তেমনি আর কিছুদিন পরে অন্যদেরও দেবে না। তবে কি জানো জীবনলাল, এসব জীব মানুষের সংস্পর্শে বেশি দিন বাঁচে না, ছোটটা দু' তিন দিন পরেই মারা গিয়েছে, এ-ও যে দীর্ঘকাল টিঁকবে মনে হয় না।

স্বরূপ আর জীবন কথা বলতে বলতে চলে, পিছনে পিছনে চারপায়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে চলে ক্যালিবান। হিন্দুবাও কুঠির তহখানা থেকে দুটো Wolfboy আবিষ্কার করেছিল জীবন, ছোটটা তিন দিনের দিন মারা যায়। বড়টা এখন Caliban নামে পরিচিত হয়ে গেল। জীবনের ঘরের দরজার সম্মুখে একখানা চটের উপরে সারাদিন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকতো। প্রথম কিছুদিন কিছুই খায়নি, খাদ্য দিতে গেলে থাবা তুলে দাঁত খিঁচিয়ে খ্যাক খ্যাক শব্দ করতো, নয়তো ভ্রূক্ষেপই করতো না, যেমন খাদ্য তেমনি পড়ে থাকতো। অবশেষে খিদের তাড়নায় একটু আধটু স্পর্শ করতো তা-ও যখন জীবন স্বহস্তে দিতো, কেবল তখনই। খাদ্য নিয়ে অনেক পরীক্ষা করে জীবন আবিষ্কার করেছিল যে, কাঁচা মাংস

স্যার হেনরি লরেন্সের মৃত্যু, পিতৃস্থানীয় ভৈরব চাটুজ্যের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তার মনে দুঃখ ও উদ্বেগের ঢেউ তুলে দিয়েছিল। তাই যখন স্বরূপ বেড়িয়ে আসতে আহ্বান করলো খুশী মনে সে রাজি হয়েছিল। এই সংবাদে বুঝেছিল যে, যে একটা মাত্র বাঁশ দিয়ে ঘাটের সঙ্গে সে বাঁধা ছিল তা গেল ছিঁড়ে, এখন সে নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। হাঁ, মাঝখানে একবার পান্নার মোহময় দ্বীপে ভিড়েছিল বটে, কিন্তু সেটা তো দ্বীপ বই নয়, তার চারদিকেই জল। নিজের সমস্যা নিয়ে যখন বিব্রত এমন সময়ে বুকালে হাল ভাঙা পালছেঁড়া নোঙর-হস নৌকো বলে ডাকে। ঐ যে ওখানে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে।

বার দুই ডাকলো, সাড়া দিল না স্বরূপ। তখন কি আর সাড়া আছে তার মনে। তুলসীর অপমৃত্যুর দুঃখ, আর তাকে স্বৈরিণী ভাববার দুঃখ তপ্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার মনের তন্তুগুলোকে টানছে তপ্ত জল গড়াচ্ছে দুই চোখে। সেই যে সে বাগ্র কোন্ পিশাচের প্রেরণায় তুলসীকে স্বৈরিণী ভেবেছিল, অজ্ঞাত শাহজাদার বিলাসশয্যা বিহারিণী ভেবেছিল, তুষার-নির্মল তুলসীকে এমন ভাবা পিশাচের প্রেরণা ছাড়া হতেই পারে না, সে দিনের পর থেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেনি নিজেকে। চোখের জলের গোপন প্রবাহে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে তার। পাপ গিয়েছে, স্মৃতি তো যায় না। সেই স্মৃতির হীরকে আলো পড়তেই কিরণ অঙ্গুলি মনের মধ্যে নির্দেশ করে যেখানে রক্তসমুদ্রের সাদা ফেনার উপরে নিষ্কলঙ্ক নীহারে গঠিত তুলসী মূর্তি। স্বরূপ এতদিনে বুঝেছে প্রেমের লক্ষণ। মৃত্যুতে যেখানে আকর্ষণ নিবিড়তর, স্মৃতি মধুরতর রূপ উজ্জ্বলতর হয় সেখানে প্রেমের যথার্থ আশ্রয়। তুলসীর হাসি, তুলসীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা, অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতবর্ষণ করতে থাকে তার মনে। কত কথা কল্পনা অঙ্কুরে তুলে তাকে শাসায়' কেন পিতৃগৃহ থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, আর গেলই যদি না, কেন রাখলো তাকে মাঝি পাড়ার কুটিরে, নিজের সঙ্গে রাখলেই কি এই দোষ হতো।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুললো স্বরূপ।
কি হয়েছে ভাই শুধায় জীবন।
শুনে কি লাভ হবে?
তোমার বোঝাটা হাল্কা হবে।
চুপ করে থাকে স্বরূপ।

স্বরূপজী দুঃখের কথার ভাগ নাও, মনটা শূন্য হোক।

ভাই জীবন, শূন্য মনের মত ভারি আর কিছু আছে?

বেশ শূন্য ভারি যদি মনে করো এসো দুজনে বহন করা যাক।

তা বটে।

জীবনের যুক্তিতে নয় তার আন্তরিকতায় বিচলিত হ'ল স্বরূপ। তখন তুলসীর নাম আর পিতৃ পরিচয় বাদ দিয়ে সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে, অতিশয় সন্তর্পণে, কাঁটার পথের পথিক যেমন সতর্কে পা ফেলে তেমনিভাবে বিবৃত করলো স্বরূপ।

চোখ ছল ছল করে ওঠে জীবনের, মনে মনে ভাবে সৌভাগ্যবতী নারী এমন একনিষ্ঠ প্রেমের অধিকারিণী। বুঝতে পারে এ নারী পান্নার ছাঁচে গড়া নয়। পান্নাকে দেখবার পরে তার ধারণা হয়েছিল নারীর একটিই ছাঁচ আছে, সেই ছাঁচটিই তার হৃদয় হরণ করেছিল। এখন বুঝলো আরো ছাঁচ আছে। তার মনে হল পান্না দুপুরে বেলকার হীরক খণ্ড আকাশের সমস্ত আলো কুড়িয়ে নিয়ে রশ্মি রাশি নিক্ষেপ করছে আকাশের দিকে। নিরাবরণতাতেই তার রহস্য। আর এ নারী ঘরের প্রদীপ। দেয়ালের আবরণ, পর্দার আবরণ, ধূমের আবরণ, আবরণের অন্ত নাই। আর যত আবরণ তত সুন্দর, তত মধুর, তত রহস্যময়। মনে মনে ছবি আঁকতে চেষ্টা করে এই রমণীর।

দুজনে প্রাণপণে চোখের জল চেপে বসে থাকে, পরস্পরের দিকে তাকাতে সাহস পায় না পাছে একজনের চোখের জল অন্যে দেখে ফেলে আর একজনের চোখের জল। চোখের জল সাথী খোঁজে।

দুজনে তাকিয়ে থাকে দূরে দূরে জলা কুণ্ড [illegible] এর দিকে। [illegible] জলভরা চোখ। [illegible] রাজার মৃত্যু হলে [illegible] এখানে এসে বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন এ রাজ্যের জল স্পর্শ করবেন না ছিল তাঁর পণ। [illegible] দেবতা [illegible] পুষ্পের [illegible] আদেশ করেন [illegible] জলে পুষ্করিণী গড়ুক। এই সেই কুণ্ড [illegible] ও। [illegible] জলভরা চোখ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আর তাকিয়ে আছে ঐ অর্ধ নর অর্ধ পশু বনমানুষের চোখ। ওর সমস্ত দেহের মধ্যে ঐ চোখ দুটো যা কিছু মনুষ্য শুধু। বোবা [illegible] প্রান্ত কাঁপে ঐ চোখের দৃষ্টি আর জিজ্ঞাসা। ঐ চোখ যেন নীরবে শুধায়, বাপু কি বলো তো? প্রিয়জনের অভাব ঘটেছে? আমার দিকে চেয়ে দেখো না কেন, আমি রাজার ছেলে বনবাসী সেজে আছি, মানুষ হয়ে জন্মে পশুর অভিনয় করে যাচ্ছি, আমার চেয়েও কি দুঃখ তোমাদের বেশী।

বড় বড় নিমগাছের শাখা প্রশাখায় বাতাস মন্ত্র পড়তে থাকে, ঘুঘুর একটানা ডাক রাশি নামিয়ে দিয়ে মাপতে চেষ্টা করে অতল স্পর্শ শূন্যতা, আলোছায়া আপোসে তরুতল ভাগ করে নেয়। সমস্ত মিলে একখানি সজীব ছবি। ফিরবার কথা মনে পড়ে না ওদের।

(ক্রমশ)

মনোজ বসু

—চল্লিশ—

আচ্ছা বিপদ হল দেখ। পচা বাইটার কাছে সাহেবের না এসে উপায় নেই, কিন্তু সুভদ্রা বউ কোনখানে ওত পেতে আছে কে জানে। ছোঁ মেরে হুট ধরবে এঁটে হিড়হিড় করে টানবে। সে রাত্রে বারান্ডা অবধি গিয়ে ছাড় হয়েছিল, টানাটানি করে ঘরেই পুরে ফেলবে হয়তো এবার।

বর্ধন-বাড়ির অদূরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ দেখে তিনটে মানুষ। কাছা-কাছি এলে চিনল মুরারি বর্ধন এবং আগে-পিছে কাছারির দুই পাইক—মহাদেব সিং আর ভীম সর্দার। চেক-কিস্তি চলছে সদর কাছারি সামনে। খাজনাকাড়ি কষে আদায়ের সময় এই। সোনাখালি তালুকের মালিক চৌধুরি কর্তা চলে আসছেন দিন কয়েকের মধ্যে কাছারিবাড়ি চেপে বসে নিজে তিনি আদায়পত্রের তদারক করবেন। বরাবরই আসেন এই সময়টা। বকেয়া বাকি বেশি দেখলে বকাঝকা করেন : পান খেয়ে খেয়ে নিজেরা পেটা মোটা করে বসে আছ—আদায় হবে কি। পান অর্থে ঘুষ। বুড়ো চৌধুরি আবার গুণগ্রাহীও বটে—আদায় ভাল হলে দরাজ বখশিস। মুরারি নায়েব দু-তিন বার পেয়েছে, এবারও প্রত্যাশা রাখে। দোর্দণ্ডপ্রতাপে কাজকর্ম চলেছে, কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে বেশি রাত্রি হয়। নায়েব-গোমস্তাকে লোকে তো ভাল চোখে দেখে না—রাত্রিবেলার চলাচলে তাই বেশি সতর্ক হতে হয়। মহাদেবের হাতে পাঁচ-হাতি লাঠি, ভীমের কাঁধে পাকা-বন্দুক।

ভীম সর্দারের আগে নজরে পড়েছে। হাঁক দিয়ে ওঠে : কে ওখানে?

সাহেব বলে, আমি। নায়েব মশায় আমায় খুব চেনেন।

এই ছোঁড়াটাই পক্ষ নিয়ে ভাদ্রবউ অপমান করেছিল। মুরারি জ্বলে উঠল সাহেবকে দেখে। [illegible] দিয়ে বলে, যা যা—চিনিনে তোকে। [illegible] আমার পুত্রঠাকুর কিনা, তাই [illegible] হবে। পাঁচের উপর কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সাহেব বলে, গৃহস্থবাড়ি কাজ ধরেছি, মরসুম সারা করে তবে তো যাব। রাগ করেন কেন, বাইরে বাইরে তো থাকছি এখন শুই গিয়ে বাইটামশায়ের কাছে।

কেন্নোর মাথায় টোকা। মুহূর্তে মুরারি একেবারে গুটিয়ে যায়। দু-দুজন নিম্ন কর্মচারী, কাছারির পাইক—তাদের সামনে কথা বাড়াবে না। খাচ্ছে একটা মানুষ, তার ভাতের থালার সামনে গিয়ে ঝগড়াঝাটি করেছিল—ধানচালের এই আবাদ অঞ্চলে সেটা অতিশয় নিন্দার ব্যাপার। অন্তরালে এরাই গিয়ে হাসাহাসি করবে : নায়েব কী কসুর রে—অতিথকে দুটো খেতে দিয়েছে বলে ভাদ্রবউয়ের সঙ্গে ধুন্দুমার।

সাহেবই বলতে বলতে চলেছে, শুয়ে থাকি আপনার বাবার কাছে। তাঁরই কথায় বড়বাবু। বুড়ো মানুষের কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাত্তিরবেলা উঠতে গিয়ে হয়তো বা আছাড় খেয়ে পড়লেন। আমায় তাই বললেন, দিনমানে কাজকর্ম, রাত্রে তো কিছু নয়। পাটোয়ার-বাড়ি থেকে রাত্রে এসে আমার কাছে শুবি। খাওয়াদাওয়া সেরেই বেরোই, শুধুমাত্র শুয়ে থাকা ওখানে।

শুনতেই পায় না আর মুরারি দু-কানে বুঝি ছিপি-আঁটা। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পাইক দুটো ফিরে গেল। হনহন করে মুরারি ভিতরে চলল, ফিরেও তাকায় না। পচার কামরায় সাহেব ঢুকে পড়ে। আর কিসের ভয়, আর কি করতে পারে বউঠান?

কৌশলটা চালু হল এবার থেকে—মুরারির পিছন ধরে আসা। কাছারির আশেপাশে সাহেব অপেক্ষা করে। মুরারি বেরিয়ে পড়লে পিছু নেয়। দূরে দূরে থাকে, বাড়ি ঢুকবার মুখে দ্রুত এসে একত্র হয়।

গুরু-শিষ্যে চুপিসারে কথাবার্তা। পচা নিজের কথা বলছে।

[illegible] হল কি—[illegible] টের পেয়ে ডাকাত [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible]

পড়েছে সামনে, বিষম তুফান। কুমির-কামটে গাঙে গিজগিজ করছে, সে জলে পা ঠেকানো রক্ষে নেই। খেয়ানৌকো শিকল করে শুধু তালা এঁটে মাঝিমাল্লা ঘুমুচ্ছে নৌকোর উপর—

পচার প্রশ্ন : কী করলাম বল্ দিকি তখন?

সাহেব বলে, তালাটা খুলে ফেললেন কায়দাকৌশল করে। কিম্বা ভেঙেই ফেললেন।

ঘুমুচ্ছে ওরা নৌকোর উপর—জেগে উঠবে যে! জেগে উঠে চেঁচামেচি করবে। ডাকাত নই, চোর আমরা—সেটা খেয়াল রাখিস।

দেমাক করে জোর দিয়ে পচা বলে, আমরা চোর, বুদ্ধির ব্যাপারি। গায়ের জোরে নয় কলকৌশলে কাজ। কী করলাম বল ভেবেচিন্তে।

ভেবে সাহেব কূল পায় না, চুপ করে থাকে।

মোরগ-ডাক ডেকে উঠলাম। তাই শুনে পাড়ার যত মোরগ ডাকতে লাগল। এক সাঙাত বাগানে ঢুকে কাক ডাকল। এ-গাছে ও-গাছে কাকে অমনি কা-কা করে উঠল রাত পুইয়েছে ভেবে। মাথায় বোঝা তুলে তখন আমরা খেয়ার মাঝিকে ডাকছিঃ পাইকার ব্যাপারি—পাঁচ ক্রোশ গিয়ে হাট ধরব। নৌকো শিগগির খুলে দাও। দুপুররাত্রি এমনি কায়দায় সকাল করে নিয়ে হাসতে হাসতে পার হয়ে চলে গেলাম।

জন্তু জানোয়ার পাখপাখালির ডাক ভাল করে শিখে নিতে হয়। শিয়ালের ডাক সর্বাগ্রে। ভাব করতে হয় জীবজন্তুর সঙ্গে, কাজের দায়ে সময় বিশেষে জন্তু হতে হয়। ডাক আবার সকলের মুখে আসে না। বংশীটা পারে ভাল। সে নীলা কিন্তু কদর বোঝে না, হেলাফেলার জিনিস মনে করে।

সাহেবকে নিয়ে সেই একরাত্রে কর্মকার বাড়ি গিয়েছিল। শিক্ষা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে পচা এখন হামেশাই বেরিয়ে পড়ে। কঠিন বিদ্যা—শুধুমাত্র মুখের উপদেশে হয়

চেনা—বাজে লোকের ক্ষমতা নেই, গুণী কারিগরেই পারবে শুধু।

আদর করে সাহেবের পিঠ ঠুকে দেয়। নিতান্ত আপন জনের মতো প্রশ্ন করে : বড্ড কাজের ছেলে তুই বাছা, বাপ কি কাজ করে?

জবাব কি আছে সাহেবের' দুনিয়ার সকল লোক ভাগ্যবান—বাপ মা ভাই বোন জাতি-কুল শতেক রকমের পরিচয় তাদের। সাহেবের পরিচয় শুধু মাত্র সে নিজে। লোকে নাকি মরার পরে বায়ুভূত হয়ে ভাসে, জীবন থাকতেই সাহেব মাটির উপর নিরালম্ব ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পচা বলে, তুই না বলিস, আমি ঠিক বলে দিতে পারি। মহাগুণী তোর বাপ। গুণীর বেটা নইলে এইটুকু বয়সে এত ক্ষমতা সম্ভবে না। হয় সে হাকিম দারোগা নয়তো পয়লা নম্বরের বাটপাড়। মাঝামাঝি মানুষ কখনো নয়।

শিকড়বাকড় লতাপাতা শিক্ষা এর পরে। বনে বাদাড়ে নিয়ে গিয়ে পচা বাইটা নানা রকমের গাছগুল্ম চেনায়। পচা পেয়েছিল গুরুর কাছ থেকে। তিনিও আবার তাঁর গুরুর কাছ থেকে। এমনি হয়ে আসছে। পুলিস অশেষ চেষ্টা করেও হদিস পায়নি। গুণী জনকয়েকের মাত্র জানা—তাদের পেটে সাঁড়াশি ঢুকিয়েও কথা বের করা যায় না। একরকমের পাতা জঙ্গল থেকে তুলে ছায়া-ছায়া জায়গায় শুকিয়ে রাখে। ঘরে ঢুকে কিছু পাতা খাটের তলে রেখে আগুন ধরিয়ে দাও—যে খাটে মক্কেলরা শুয়েছে। আগুনটা নিভিয়ে দাও এবারে ধোঁয়া বেরোক, ধোঁয়া তাদের নাকের ভিতরে যাক। মধুর আলস্যে সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, স্নায়ুতন্ত্রীতে ঝিমঝিম বাজনা বাজে যেন। আরও আছে—সেই পাতার বিড়ি কারিগরের মুখে। দ্রুত হাতে কাজ করে যাচ্ছে তীক্ষ্ন কান রয়েছে মক্কেলের নিশ্বাসের ওঠানামায়। পতলা

ঘুম বুঝলে বিড়িতে টান দিয়ে পরিমাণ মতো ধোঁয়া ছাড়বে নাকে। সর্বস্ব লোপাট হয়ে গেল, সারাক্ষণ মক্কেল মিষ্টি স্বপ্ন দেখে। সাহেব ঠিক এমনিটাই করেছিল জড়ুনপুরে আশালতার পাশে শুয়ে।

সিঁদকাঠির দাবি এবার সাহেবের। পচা বলে, কাঠি বুঝি ইচ্ছে করলেই ধরা যায়! ধরলে কি আর হাত পুড়ে যাচ্ছে—সে কথা নয়। কিন্তু ওস্তাদ সাগরেদের হাতে তুলে দিল, সে কাঠির দাম অনেক। সে কাঠির ঘা যেখানে মারবি, মা-কালীর দয়ায় ঝুরঝুর করে সোনাদানা খসে আসবে। কান দেখেছি তোর সাহেব, হাত দুখানা একবার পরখ করে দেখতে দে। উতরে যাস তো কাঠির কথা তখন বিবেচনা করা যাবে।

কাঠি অভাবে খন্তা। পচা বলে, খেলতে জানলে কানাকড়িতে খেলা যায় রে বেটা। কাঁচাঘরে ছোটখাট একটু কাজ—খন্তাতেই হয়ে যাবে। গুরুপদ ঢালিকে দিয়ে খোঁজ এনেছি।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, কোন গুরুপদ? হাঁরে হাঁ, সেই লোক। সর্দার হয়ে [illegible] নিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। [illegible] সে [illegible] পিছনে। সেও সাগরেদ আমার খবর পেয়ে এসেছিল। [illegible] করে দিল ডেপুটি হয়েও সে [illegible] সঙ্গে ঘুরবে।

পঞ্চমী তিথি শুক্লপক্ষ। [illegible] চলেছে পচা [illegible] সাহেব [illegible] মধ্যে [illegible] হয়। [illegible] পরিচ্ছন্ন [illegible] সাফসাফাই হয়েছে। সবাই [illegible] - অবশ্য [illegible] গুরুপদই। [illegible] সেইটা বড় সুবিধা। সাপ [illegible] চোরের সাহেব সম্পর্কে চালচলন একেই রকম [illegible] বোধ হয়। চোরকে সাপ কিছু [illegible] না। অথচ সাপের ভয়ে বাইরের লোক কেউ [illegible] না।

গুরুপদও এসে গেল। কিছু [illegible] ও মুড়িমাখা [illegible] এনেছে [illegible] হয়ে [illegible] বলায় চেকাতে [illegible] যায়। [illegible] কাজের আগে [illegible] রীতকর্ম এইসব।

গুরুপদর দিকে চেয়ে সাহেব সকৌতুকে বলে, তিলকপুরের কাজে তো এসব হাঙ্গামা ছিল না। সর্দার আমাদের বলেও নি কিছু।

পচা বলে সকলে সব সময় মানে না। কিন্তু মানা ভালো। মুরুব্বিরা দেখেশুনে মাথা খাটিয়ে তবেই এক একটা বিধান দিয়ে গেছেন। এর পরে তুই না-ও যদি মানিস শিক্ষানবিশি আমলে শিখে বুঝে নিবি তো সমস্ত।

কাপড় ছেড়ে ল্যাঙট পরে নিয়েছে ইতি-মধ্যে সাহেব। প্রয়োজনের বেশি এক ইঞ্চি বাড়তি কাপড়চোপড় থাকতে নেই, কোন প্রান্ত কেউ ধরে ফেলে বিপদ ঘটাতে পারে। ডেপুটি গুরুপদরও সেই পোশাক। সাহেবের গায়ে ডলে ডলে সে তেল কলা মাখাচ্ছে। কেউ চোর ধরে ফেললে সড়াৎ করে পিছলে বেরুবে, ধরে রাখতে পারবে না।

প্রক্রিয়াগুলো পচা বাইটা চুপচাপ দেখে যাচ্ছে। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে হাত দুটো এগিয়ে ধরে বলে মালসাটা একবার এদিকে আনো গুরুপদ, আমার হাতে একটু মাখাও।

সাহেব অবাক হয়ে বলে আপনি কেন? আপনিও নেমে পড়বেন -

পচা [illegible] কারবার [illegible] বয়স গেছে মন তবু চনমন করে। কাজ না-ই পারি মাখতে একটু দেয় কি কেমন বেশ সোঁদা-সোঁদা গন্ধ

[illegible] হয়ে এখন [illegible] ভাবছে। চাঁদটুকু ডুবে গেলেই হয়।

[illegible] ক-খানা ঘর [illegible] মধ্যে কোন ঘর [illegible] ঘরের কোনখানে [illegible]

[illegible] ঘরের [illegible] ঠিক করেছে। [illegible] চারিদিকে [illegible]।
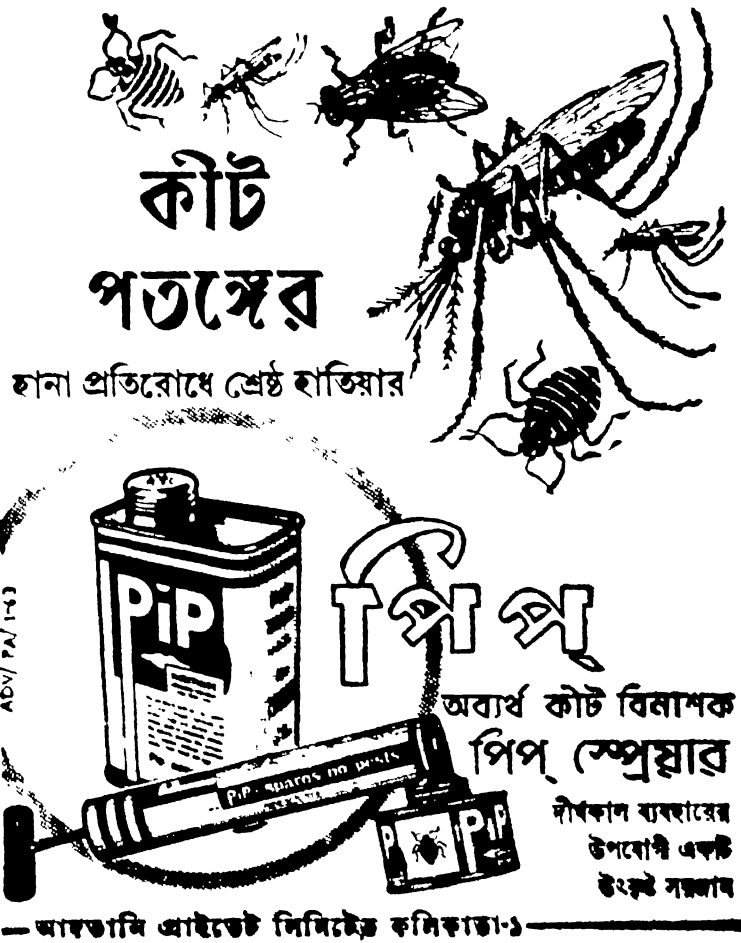
খুঁটিয়ে [illegible] গুরুপদ যাবতীয় খবর মগজে রেখেছে। তবু কিন্তু কারিগর কাজের মুখে নিজে পাকচক্কোর দিয়ে বুঝে সমঝে আসবে। সাহেব ঠিক করে একটু মাটির ঢিল ছুঁড়ল উঠানে। তারপরে চেলা-কাঠ একখানা। সাড়া নেই। মাথার উপর দিয়ে বাদুড় এক ঝাঁক পতপত করে উড়ে গেল কোনদিকে। পা টিপে টিপে এবারে ঘরের কাছে বেড়ায় ঘা দিল মৃদু হাতে। বেড়ায় কান রাখল।

পচার কাছে এসে সবিস্ময়ে বলে, সন্ধ্যা-রাত্রি কিন্তু গাঢ় ঘুম শুনে এলাম। কান ভুল করেছে, এমন তো মনে হয় না।
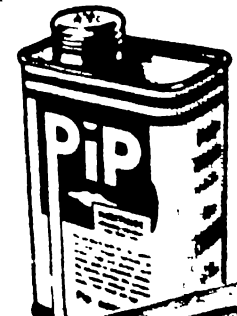
ঘাড় কাত করে পচা সায় দেয়: এমনিই হবে। খাওয়াদাওয়ার ঠিক পরেই এসেছি। ভাত-ঘুম এখন—ঠেসে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লেই ঘুম এসে যায়। বৃষ্টি না খরা ঠান্ডা না গরম, শীতকাল না গ্রীষ্মকাল—এতসব বিচারের দরকার পড়ে না ভাত-ঘুমের অবস্থায়। তবে ঘুমের পরমায়ু অল্প একটু পরেই পাতলা হয়ে আসবে। নতুন কারিগর তোদের এই সময়টা কাজ খানিক এগিয়ে রাখা ভাল। শেষ ওঠানো সময় বুঝে হবে।

হুকুম দিল: লেগে যা সাহেব কালী-কালী বলে। কানের কথা অমান্য করিসনে। রাতের বেলা চোখ ভুল করে বলে কান এই সময়টা বেশি রকম সজাগ।

তিলকপুরে সিঁধের ব্যাপার ছিল না। হাতে কলমে সিঁধের কাজ এই প্রথম। পচা বাইটা অনতিদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি সমস্ত দেখে যাচ্ছে। কয়েকটা ডাল ভেঙে এনেছে সাহেব, ডাল মাটিতে পেতে দিয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে এনেছে, কেউ বলে দেয়নি। ঠিক এমনিটাই চাই। কাজের আদ্যন্ত ভেবে নিয়ে তবেই সাহেব খন্তা হাতে নিয়েছে।

কাচনি অর্থাৎ ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। বেড়ার নিচে গবরাট (বাঁশের ফালি আড়-ভাবে পাতা, যার উপরে বেড়া রয়েছে।) মাটির ডোয়াপোতা। খন্তায় ডেঙন মাটি খুঁড়ছে ধীরে ধীরে—অত্যন্ত নরম হাতে। ডেপুটি গুরুপদকে নির্দেশ দিয়েছে, দু-হাতে অঞ্জলি পেতে সিঁধের নিচে [illegible] ধরে আছে, মাটি পড়ছে হাতের উপর। অল্পসল্প বাইরে যা পড়ছে সে মাটি আলেগোছে ডাল-পাতায় পড়ে, তাতে কোন শব্দ নেই। বাতিল হাঁড়ি একটা জোগাড় করেছে, হাতের মাটিতে হাঁড়ি ভরতি করে সন্তর্পণে দূরে নিয়ে চলেছে যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। দেখে দেখে পচা চমৎকৃত হয়। সার্থক বটে তার শিখানো, উপদেশের কণিকমাত্র অপচয় হয়নি।

সিঁধ কেটে দেয়াল একেবারেই ফাঁক করতে নেই, কিছু বাকি রেখে দেবে। মেটে দেয়াল হলে চার পাঁচ ইঞ্চির মতো, ইটের গাঁথনি হলে একখানা ইট। এ লাইনের [illegible] মুরুব্বিদের এই অভিমত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাহেবও তাই করছে [illegible] বেড়ায় এদিক-সেদিক কান পেতে বেড়ায়। ক্ষণকাল তারপরে চুপচাপ বসে আবার যায় বেড়ার ধারে। অর্থাৎ গতিক সুবিধের নয়। রোগির নাড়ি দেখে পেট টিপে বুকে নল বসিয়ে ডাক্তার যেমন মুখ বাঁকায়, তেমনি অবস্থা। সিঁধটুকু শেষ করা এবং মাল পাচার করা—সবসুদ্ধ বড়জোর আধ ঘণ্টার ব্যাপার কিন্তু এমন শোনা গেছে, এরই অপেক্ষায় বসে রাত কাবার হয়ে গেল, কাজ বরবাদ। দেয়াল কেটে ফিরে যাওয়া মানে সে মক্কেলের বাড়ি অন্তত আর বছর খানেকের ভিতর আসা চলবে না। আজকেও তাই না ঘটে।

পচার কাছে গিয়ে বলে, কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন আপনি চলে যান, আমি আর গুরুপদ থাকি।

পচা [illegible], পুলকিত কণ্ঠে বলে, আমি যাচ্ছি তোরাও চলে আয়। আজকের মতন হয়ে গেল। ঘরে না-ই ঢুকলি, এমনিতেই বুঝে নিয়েছি।

রাত থমথম করছে। ফিরে চলেছে জঙ্গলে সুঁড়িপথে। উচ্ছ্বসিত হয়ে পচা বলে তোর বাপ বলেছিলাম দারোগা-হাকিম নয়তো [illegible]। ওসব কিছু নয় [illegible] এইবারে সঠিক হদিস পেয়েছি।

সাহেব চমকে ওঠে : আজ্ঞে?

[illegible] কচ্ছপ [illegible] কচ্ছপের বেটা [illegible] —[illegible] চলতে লাগল কচ্ছপের চলনের মতন।

[illegible] [illegible] [illegible] দেখলে [illegible] [illegible] এমন পারে না।

চলে এমনি প্রত্যহ। হাতে-কলমে কাজ করে ঘাঁতঘোঁত বুঝে নেওয়া। প্রতি কাজেই গুরুপদ ডেপুটি। পচা বলে দিয়েছে, সেই কোন আমলে আমার সঙ্গে নেমেছিল— চুলই পাকল আর কিছু হল না। সাহেব ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মরবার আগে শিখে নিয়ে যাও কিছু। ওপারে যমের বাড়ি গিয়ে খেলা দেখিও। পচা যেমন যায় না — লম্বা [illegible] নেই। কাছাকাছি হলে [illegible] কখনো [illegible] কিছুক্ষণ দেখে চলে আসে।

একদিন গুরুপদ হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, মক্কেলের [illegible] সাহেবকে আটকে ফেলেছে।

কখনো [illegible] ঘরের মানুষ জেগে পড়বে, এমনধারা [illegible] সাহেব কেন করতে যাবে? উত্তেজনায় পচা [illegible] হয়ে বলল : তুমি আবার যাও গুরুপদ, ভাল করে খবরাখবর আনো। সাহেবকে আটক করবে এ কখনো হয় না। হতে পারে—ছ্যাংড়া বয়স তো — সে-ই তাদের নিয়ে একটু খেলাচ্ছে।

কিন্তু খবর সত্যি। সাহেব তার নিজের দোষে আটকা পড়েছে। নিঃসংশয় হয়ে তবেই [illegible] ঢুকেছিল। মাটিতে বিছানা—মশারি

টাঙিয়ে স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ঘুমুচ্ছে। পুরুপদ খোঁজ এনেছে, দুটো ছেলের মধ্যে বড়টাকে শাশুড়ির ঘরে দিয়ে কোলের বাচ্চা নিয়ে বউ শোয়। আজ দুপুরে পাট-বিক্রির টাকা পেয়েছে, সে টাকা ঘরেই আছে, ঘর থেকে বেরুতে পারেনি এখনো।

সিঁধ থেকে ঘরে উঠে সকলের আগে দরজায় খিল খুলতে হয়। মুচ্ছ কটিকের সময়েও এই নিয়ম। খিল খোলা রইল এই মাত্র—দরকার হলে যাতে দরজার প্রশস্ত পথে পালাতে পারো। দরজা ভেজানোই থাকবে, বাইরের আলো এসে নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। সাহেব যাচ্ছিল সেই দরজার দিকে। বাচ্চাটা গড়িয়ে কখন মশারির বাইরে এসেছে—পা পড়ল গিয়ে বাচ্চার ঘাড়ে। একবার ক্যাঁক করে উঠেই নিশ্চুপ।

কী সর্বনাশ! মুহূর্তে সাহেবের কেমন সব ওলটপালট হয়ে যায়। কাজ ভুলে বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়েছে, বয়স পিছিয়ে গিয়ে সাহেবই যেন এই অজানা বাড়ির শিশু। তাকেও খুন করতে গিয়েছিল—হাত দিয়ে গলা টিপে নয়, হয়তো বা এমনি ধারা গলার উপর পা চাপিয়ে।

ধকল কাটিয়ে বাচ্চা গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। মরেনি তবে। হুঁশ পেয়ে সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে নামিয়ে রাখে। মা জেগে পড়েছে : আরে মশারির বাইরে যে দুলদুল' পুরুষের ব্যস্ত কণ্ঠ : কাঁদে কেন, কামড়াল নাকি কিছুতে? মশারির বাইরে এসে মা বাচ্চা কোলে করে বসেছে। বাপ দেশলাই হাতড়াচ্ছে : বালিশের তলায় রেখেছিলাম যে, গেল কোথা?

একটি লহমা—যত কিছু করণীয় তার ভিতর। বিছানার ওদিকটা দরজা—সাহেব যেখানে এসে পড়েছে। দরজা খুলে উঠানে লাফিয়ে পড়া যায়—তার পরেই দৌড়। কিন্তু ক'টা খিল না-জানি দরজায়, হুড়কো-ছিটকিনি আছে কিনা—এইসব করতে করতেই তো পিছন থেকে জাপটে ধরবে। পুরুষলোকটা হাত তিন-চারের মধ্যে। পেয়েও গেছে দেশলাই। বেড়ার কাছে মাটির প্রদীপ, কাঠি জ্বেলে প্রদীপ ধরাল। সাহেব আর নেই।

সিঁধের দিকে নজর পড়ে পুরুষ চেঁচিয়ে ওঠে : চোর এসেছে রে—চোর, চোর! ভয় পেয়ে বউটাও হাউহাউ করে। বাড়ির লোকজন সব উঠে পড়ল পাড়ার লোক ছুটোছুটি করে আসে। বিষম সোরগোল। সিঁধের মুখে আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। অন্ধিসন্ধি খুঁজছে।

একজন বলে চোর বুঝি ঘরের মধ্যে বসে আছে ধরা দেবার জন্য। সিঁধের পথে বেরিয়ে গেছে কখন। বাচ্চা নিয়ে পড়লে তোমরা—অমন অবস্থায় আর কি করবে? চোর সেই ফাঁকে পিঠটান দিয়েছে। জিনিসপত্র কি গেল দেখ এইবারে।

না, যায়নি কিছুই। ছেলের কান্নায় পালাবার দিশা পায় না, ফুরসত পেল কখন? অবোধ বাচ্চাই আজ চোর ঠেকিয়েছে। ক্ষতি লোকসান যখন হয়নি, চোরের পিছনে ছোটবার তত বেশি গরজ নেই। ছোকরারা এদিক ওদিক দেখে বেড়াচ্ছে। মাতব্বর মশায়রা দাওয়ায় চেপে বসেছেন, হুঁকো ঘুরছে হাতে হাতে, বকমারি চুরির গল্প হচ্ছে। কোন চোরের নাকি পান্তাভাত ছাড়া অন্য কিছুতে লোভ ছিল না ভাতের লোভে রান্নাঘর সিঁধ কেটে ঢুকত। এমনি সব গল্প।

গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ বোধকরি দাওয়ায় জড় হয়েছে ঘরের ভিতর বউ একলা। ছেলে এক-একবার ফুকরে ওঠে—প্রদীপ কাছে এনে বউ ঠাহর করে করে দেখছে, দুধ খাওয়াচ্ছে বুকের মধ্যে নিয়ে। কেন যে সাহেব খোকার মতন দু-হাতে তুলে নিতে গেল—দরজা খুলে অথবা সিঁধের গর্ত দিয়ে দিব্যি ঐ সময়টা বেরিয়ে যেতে পারত। যত গণ্ডগোলের মূলে কাদার মতন প্যাচপেচে বিশ্রী মনটা। মা-কালী, ভালোর জন্য সকলের দরবার—আমি কোন ছোটবেলা থেকে মন্দ হবার জন্য মাথা-খোড়াখুঁড়ি করছি, সে জিনিসেও কৃপণতা তোমার!

মশারির ভিতরে সাহেব। পুরুষ বেরিয়ে এসে প্রদীপ ধরাচ্ছে, সাহেব তখন ওধার দিয়ে টুক করে ঢুকে গেল। আত্মরক্ষার এছাড়া উপায় নেই। সারা ঘর এবং তারপরে সারা বাড়ি চোর খুঁজে বেড়াল, সেই চোর তখন নরম তোষকের বিছানায় পাশবালিশ আঁকড়ে জামাইয়ের মতন আরাম করে পড়ে আছে। মশারিটা তুলে দেখবার কারো হুঁশ হল না।

ছেলে কোলে নিয়ে বউ—ছেলে ছাড়া আর কিছুই সে এখন দেখতে পাবে না সরে পড়বার মাহেন্দ্রক্ষণ এই। পুরুষ ফিরে এসে এটা-ওটা দিয়ে সিঁধের মুখ বন্ধ করবে দরজা দিয়ে ছেলে-বউ নিয়ে শোবে। ছিলের শেষ নয় সাহেব, দিব্যি তো খানিকটা গড়িয়ে নিয়েছ এইবার—

সুবিধা আরও হল। দুধ খাইয়ে ছেলে কাঁধের উপর শুইয়ে বউ উঠে পড়ল পায়চারি করে ঘরের এদিক-ওদিক, দুপদুপ করে পিঠের উপর থাবা দিয়ে ঘুম পাড়ায় এদিকে যখন পিছন করেছে—সড়াৎ করে সিঁধের গর্তে নেমে পড়ো। ইঁদুর যেমন ঢুকে যায়, সাপ ঢোকে, শিয়াল ঢোকে মানুষ কেন পারবে না? (ক্রমশ
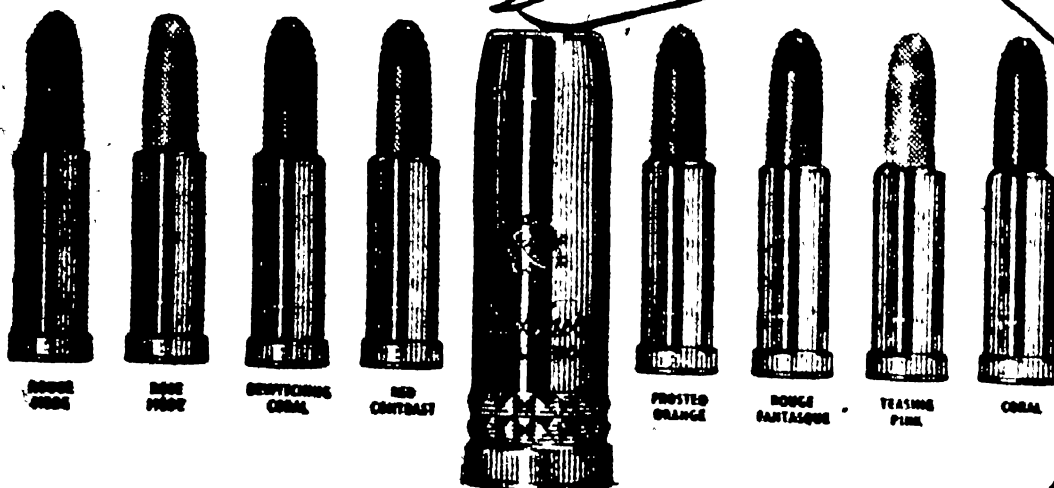
গুপ্তিপাড়ার মন্দির

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পোড়ামাটির অলংকরণ :

শ্রীরামচন্দ্র মন্দির

পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতির অনেকগুলি অমূল্য নিদর্শন হুগলি জেলায় ইতস্তত অনাদরে পড়ে রয়েছে যেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালী সমাজ কিছুমাত্র অবহিত নন। অনতিবিলম্বে এই কারুকার্য সম্পদগুলির মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। হুগলি জেলার উত্তর সীমায় গুপ্তিপাড়ার মঠ নামে পরিচিত যে চারটি মন্দির আছে তাদের মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র ও রামচন্দ্রের মন্দির দুটি নানা দিক থেকেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, পোড়ামাটির নিপুণ অলংকরণে রামচন্দ্রের মন্দিরটি যে হুগলি জেলার শ্রেষ্ঠ মন্দির সে বিষয়ে বর্তমান লেখকের কোনো সন্দেহ নেই। অথচ এগুলির দিকে এখন অবধি কোন যত্নশীল গবেষক বা কুশলী আলোকচিত্রশিল্পীর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়নি। উপক্রমণিকা-জাতীয় এই প্রবন্ধ যদি কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে সেই গুরুভার-কার্যে উৎসাহিত করে তবেই এই রচনা সার্থক হয়েছে মনে করবার কারণ ঘটে।

গুপ্তিপাড়ার চারটি দেবালয়ের মধ্যে তিনটিতেই বৈষ্ণব বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। প্রধান সর্বোচ্চ মন্দিরটিতে বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধিকা, দ্বিতীয়টিতে কৃষ্ণচন্দ্র ও তৃতীয়টিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মূর্তি স্থাপিত আছে। চতুর্থ মন্দিরটির দেবতা শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান। বিগ্রহের [illegible] এ-মন্দিরটি পূর্ব-ভারত [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] পোড়ামাটির অলংকরণ অপর তিনটির থেকে এতই উচ্চস্তরের যে হুগলি জেলার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকীর্তিটি সম্পর্কে প্রবন্ধের শেষের দিকে পৃথকভাবে আলোচনা করাই সমীচীন হবে।

স্থাপত্যের দিক থেকে মন্দিরগুলি বাংলার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী চালাঘরের অনুকরণে নির্মিত, যদিও সবক্ষেত্রে ঠিক একই প্ল্যান অনুসরণ করা হয়নি, কিছু ইতরবিশেষ আছে। এই "চালা-স্থাপত্য" বাংলাদেশে কয়েকটি প্রধান রূপ নিয়েছে। সবচেয়ে সরল যেটি—তার আকৃতি সাধারণ দো-চালা কুঁড়ে ঘরের থেকে বিশেষ ভিন্ন

বৃন্দাবনচন্দ্র ও রাধিকা

নয়। এ ধরনের "দো-চালা" স্থাপত্যের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে বেশী নেই, কেননা স্থপতিদের সম্ভবত এই নিতান্ত সাদামাটা রূপটি কখনই খুব পছন্দ হয়নি। এ রীতির বিকল্প হিসাবে আর একটি শৈলী উদ্ভাবিত হয়েছে, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দির। চালাঘরের আকৃতির পাশাপাশি দুটি গৃহকে একত্র সংলগ্ন করে "জোড়-বাংলা" স্টাইলটির সৃষ্টি হয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে নির্মিত দেবালয়ের সংখ্যা বাঁকুড়া বা হুগলি জেলায় অপ্রতুল নয়। কোন্ বিশেষ কারণে জানি না, হুগলি জেলার অধিকাংশ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির এই শৈলীতে রচিত। গুপ্তিপাড়ার শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মন্দিরটিও এই স্থাপত্যরীতির অন্তর্গত। "চালা-স্থাপত্যের" আর দুটি বিশিষ্ট রূপ "চার-চালা" ও "আট-চালা" নির্মাণশৈলী। প্রথমটিতে চারদিকের ঢালু [illegible] চাল সাধারণত এসে শেষ হয় কেন্দ্রীয় একটি চূড়ার যেটি চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ বা অষ্টকোণ ইত্যাদি হতে পারে। গুপ্তিপাড়ার শ্রীরাম-চন্দ্রের মন্দিরটিকে আট-কোণা শিখরবিশিষ্ট চৌচালা স্থাপত্যরীতির [illegible] বার [illegible] অধিকাংশ [illegible] শ্রেণীর। "আট-চালা" রীতির সর্বজনবিদিত নিদর্শন কালীঘাটের মন্দির। এক্ষেত্রে পর পর দুটি চার-চালার মাঝখানে, চতুষ্কোণ [illegible] একটি [illegible]

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির : গুপ্তিপাড়া
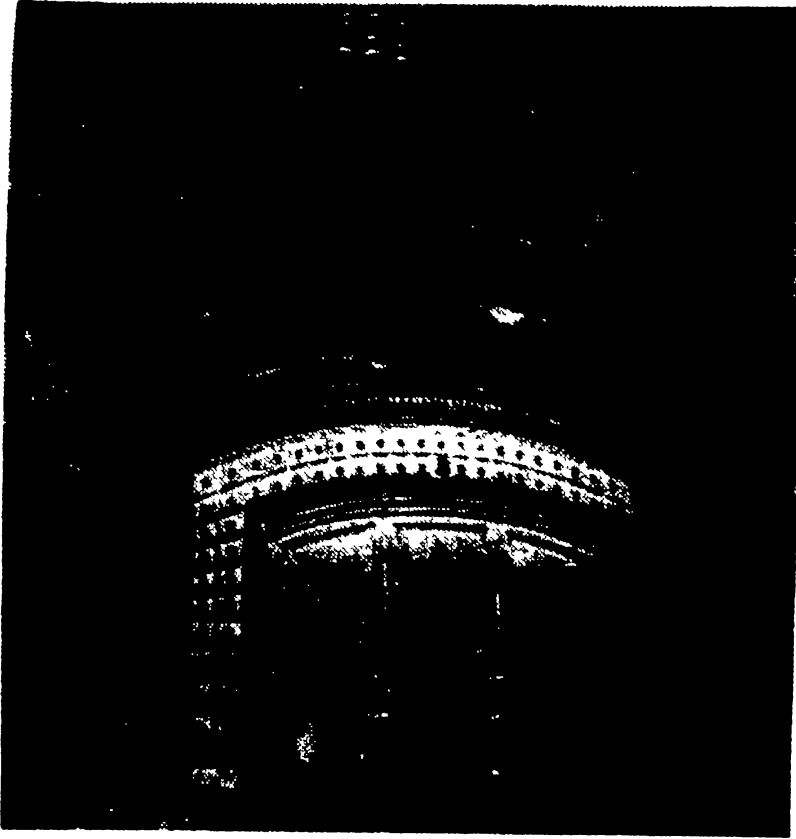
গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির সমেত পশ্চিম বাংলার অগণিত দেবালয় এই শৈলীতে রচিত।

"চালা-স্থাপত্যের" বিকাশ বিশেষ করে বাংলাদেশেই কি করে সম্ভব হল এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসন সাহেব বলেছেন—"The Bengalis, taking advantage of the elasticity of the bamboo, universally employ in their dwellings a carvilinear form of roof which has become so familiar to their eyes that they consider it beautiful." মনে হয়, খড়-বাঁশের তৈরি কুঁড়ে ঘরে যা শোভন, ইঁট-পাথরের স্থাপত্যে তার আরোপ তাঁর মনঃপূত ছিল না। কিন্তু যে কোনো অঞ্চলের স্থাপত্যশৈলী সহজবোধ্য কারণেই যে পূর্বতন নির্মাণ রীতিকে অনুসরণ করে বিকশিত হবে এ কথা তিনি জানতেন বলে পরক্ষণেই ভ্রম-সংশোধন ক'রে লিখেছেন—"Beauty depends to such an extent on association that strangers are hardly fair judges in a case of this sort"

এ বিষয়ে সেজন্য কোনো সংশয়ই নেই যে, বাংলার 'চালা-স্থাপত্য" স্থানীয় বহুল-ব্যবহৃত কুঁড়ে ঘর থেকেই উদ্ভূত এবং ইঁট পাথরের উপাদানেও কিছুমাত্র দৃষ্টিকটু নয়। ভারতীয় স্থপতিদের কাছে যে এই রীতিটি একদা যথেষ্ট সুদৃশ্য মনে হয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ এ কথার উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুঘল আমলে বাংলাদেশের এই নিজস্ব শিল্পপদ্ধতিটি দিল্লী লাহোর ও ডিগ ভরতপুর প্রভৃতি রাজপুত অঞ্চলেও বিশেষ সমাদর ও সম্মানের স্থান অধিকার করতে পেরেছিল। এই সব স্থান পরিদর্শনের সময় অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের পক্ষে সেখানকার স্থাপত্যে দূর বাংলাদেশের প্রভাব আবিষ্কার করা এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়।

বাংলাদেশে 'চালা স্থাপত্য" প্রচলিত হবার আর একটি কারণ আছে। দীনেশ-চন্দ্রের মতে—বাঙ্গালা প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। একথা বলায় সেজন্য হয়তো ভুল নেই যে পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মধ্যে সংখ্যায় কৃষ্ণের মন্দির বেশী। এই কৃষ্ণকে বাঙালী গীতার উদ্গাতা পার্থ-সারথি-জ্ঞানে পূজা করেন না। বাঙালীর কাছে কৃষ্ণ ননীচোরা, নাড়ুগোপাল, গোপী-বল্লভ, মুরলী মনোহর। কোমল কান্ত এই রূপটিতে শ্রীকৃষ্ণ উপাসকের মমতায় বিধৃত, বাৎসল্যে সিঞ্চিত। পূজ্য ও পূজকের মধ্যে ভীতি বা বিস্ময়ের ব্যবধান নেই; দেবতা যেন একেবারে পরিবারেরই একজনে পরিণত হয়েছেন। তাঁর আহার নিদ্রার ব্যবস্থা, তাঁর সকালের মুখ-ধোওয়া থেকে রাত্রের বেশ-পরিবর্তন অবধি সব কিছুই পরিবারের নির্ভরশীল শিশুর মতো। এত ঘনিষ্ঠ, এত আপন, এত ব্যক্তিগত বিগ্রহের বাসস্থানের কথা যখন বাঙালী চিন্তা করেছে তখন নিজের কুঁড়ে ঘর থেকে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় তাকে নির্বাসিত করবার

শ্রীরামচন্দ্র মন্দির : গুপ্তিপাড়া

শ্রীরামচন্দ্রের এই অপরূপ কারুকার্যখচিত মন্দিরটি নির্মিত হয়ে থাকবে। মধুসূদনানন্দের আমলে রচিত হয়েছিল বলে এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব। আশ্চর্য এই যে, দুই শতাধিক বৎসরেও পোড়ামাটির অলংকরণগুলি সামান্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। ভারতীয় পুরা কীর্তি রক্ষণ আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ার মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তারও পূর্বে প্রায় পৌনে দুশো বছর ধরে মোহন্তরা যে এ-দেবালয়গুলির বিশেষ যত্ন নিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

এ মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান। মূর্তিগুলি কাঠের তৈরি—যেমন বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের কৃষ্ণমূর্তিও কাঠের। বাংলা দেশে রাম-সীতার মন্দির আর নেই বললেই চলে। সেদিক থেকেও এ-দেবালয়টি অভিনব। গুপ্তিপাড়া মঠের মোহন্তরা রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ে উত্তর ভারতের সাধকদের যথেষ্ট প্রভাব আছে; আগে হয়তো আরও বেশী ছিল। তাঁদেরই প্রভাবে গুপ্তিপাড়ার মতো বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্রেও যে হিন্দীভাষী অঞ্চলের দেবতার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য।

মন্দিরের অলংকরণ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কথা হল কারিগরির সূক্ষ্মতা, যা প্রথম দৃষ্টিতে সহজেই চোখে পড়ে। [illegible] প্রবেশপথের ঠিক উপরের [illegible] "পোড়ামাটির" উল্লেখ করা যেতে পারে। এই স্বল্প পরিসর জায়গাটুকুতে [illegible] ভঙ্গিতে সুন্দর একটি অকৃত্রিম [illegible] গোপিনী মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের শিল্পীরা, অন্তত শ্যাম রায় [illegible], মদনমোহন ও শ্রীধরের মন্দিরে রাশি রাশি দেবদেবী, জটিলতর, সার্বিক ও সামাজিক "মোটিফের" ব্যবহার করে উচ্চতর শক্তি ও মুন্সীয়ানার যে পরিচয় দিয়েছেন, গুপ্তিপাড়ায় তা অনুপস্থিত। অবশ্য গুপ্তিপাড়ায় গোপিনী মূর্তি ছাড়া অন্য মূর্তি যে নেই, এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু জগদ্ধাত্রী হর-পার্বতী ইত্যাদির মূর্তি আছে এবং তার থেকে অনেক বেশী পরিমাণে আছে রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্যের বাহুল্য। বৈষ্ণবভাবের পোষক যে মূর্তিটি বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে উপবিষ্ট কৃষ্ণের প্রসারিত বাম উরুর উপরে রাধিকা আসীন ও শ্রীমতীর চিবুক কৃষ্ণকর-ধৃত। অনুরূপ ভঙ্গির পাশাপাশি দণ্ডায়মান রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিও আছে। কিন্তু চুলবাঁধা, পাশা খেলা, ফরাস সেবন, কন্যা সম্প্রদান, সার্কাসের দৃশ্য প্রভৃতি লোকচিত্র একটিও নেই—যদিও এ-জেলারই আনুমানিক একই সময়ে নির্মিত আটপুরের গোবিন্দ জীউর মন্দিরটিতে এ-জাতীয় সামাজিক চিত্রের প্রতিলিপি যথেষ্ট রয়েছে; বিষ্ণুপুরের তো কথাই নেই।

এ-মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব, প্রবেশ-খিলানের ভিতরেই যে বারান্দা, তার দেওয়ালগুলিও পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত, যেমন আছে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের মন্দিরে। এই উৎকৃষ্ট কারুকীর্তিগুলিকে না জানি কোন্ অর্বাচীন গোলাপী রঙের প্রলেপে আবৃত করে প্রায় নষ্ট করেছে। মন্দিরের বাইরের দক্ষিণের দেওয়ালেও এই একই ভ্রান্তি প্রকট।

কারিগরির মুনশীয়ানায় বা চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যে বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলির মতো সম্পদশালী না হলেও গুপ্তিপাড়ার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরটি পরিচ্ছন্ন পোড়ামাটির সজ্জার জন্য অনায়াসেই পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ "টেরাকোটা" মন্দির বলে পরিগণিত হতে পারে।

চৈতন্যদেবের সময়ে বা তাঁর অব্যবহিত পরে অগ্রসর শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপ শান্তিপুরের বা গুপ্তিপাড়ার যে কৌলীন্য, যে গৌরব ছিল, আজ তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। সে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা থেকে পিছিয়ে পড়া এই মন্দিরগুলি বাঙালীর ঐতিহ্যের যে-ধারাটি এখনও প্রবহমান রেখেছে, কদাচিৎ-আগত দর্শকের মনে তা স্মৃতিবেদনারই উদ্রেক করে। তবুও অনুমান করি, গুপ্তিপাড়ার এই মঠ বাঙালীমাত্রেরই দ্রষ্টব্য। অন্তত ছুটির দিনে চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগান বা ডায়মণ্ডহারবার দর্শনের থেকে যে বেশি দ্রষ্টব্য, তাতে সভয়ে বলি, বর্তমান লেখকের কোনো সন্দেহ নেই।

[হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে হাওড়া থেকে গুপ্তিপাড়া স্টেশনের দূরত্ব আনুমানিক পঞ্চাশ মাইল। স্টেশনে সাইকেল রিকশার অভাব নেই। গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে পাণ্ডুয়া অবধি এসে ডানহাতি পাণ্ডুয়া-কালনা সড়কে ন' মাইল দূরে ইঞ্চুরা হয়ে বরাবর পাঁচটালা পথেও কলকাতা থেকে গুপ্তিপাড়ায় আসা যায়।]

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেও চীন আমাদের এতটুকুও নিশ্চিত করে নি, কারণ তাদের ছলনাপূর্ণ ব্যবহার। কলম্বো প্রস্তাব সম্বন্ধে তাদের কোন গরজই দেখা যাচ্ছে না অথচ পণ্ডিত নেহেরু চীনা প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়েছেন যে, কলম্বো প্রস্তাব ভারত বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছে আর সেইভাবে চীন মেনে না নেওয়া পর্যন্ত ভারত কথাবার্তা বা আলোচনার পর্যায়ে যেতে পারে না। কলম্বো প্রস্তাবের নাকি ব্যাখ্যায় বিভ্রাট ঘটেছে। চীনা কূটনীতির চালই অদ্ভুত। তার উপর আবার চীনা পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে অনবরত ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ চলেছে। তারা আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়বেন কি করে? "ভারত যদি আমাদের প্ররোচিত করে তবে আর আমরা তার উত্তর দেওয়া ছাড়া কি করতেই বা পারি?" একেবারে নিরুপায় ভালোমানুষির সুর। ঠিক এমনি সুরেই ২০শে অক্টোবরের আগে নয়াচীনের কমিউনিস্ট শাসকরা কথাবার্তা চালিয়েছিলেন। কাজেই সেইভাবেই একটা আকস্মিক আক্রমণ যদি আসে তবে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

এদিকে চীনা সৈন্যসমাবেশের খবর, তাদের সড়ক তৈরির খবর, ভারবাহী পশুসংগ্রহের খবর সব সমানে আসছে। সম্প্রতি পাকিস্তানের সঙ্গে এক চুক্তিতে পাকিস্তান কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত ভারতের কাশ্মীর এলাকার ১৩০০০ বর্গমাইল স্থান চীনকে দান করা হয়েছে। অবশ্য এই এলাকার সম্বন্ধে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের মীমাংসা হয়নি।। এই এলাকাতেও বিপুল চীনাবাহিনী সমাবেশ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তিব্বতে বিমানঘাঁটি হচ্ছে। দলে দলে তিব্বতীদের চীনারা ওদের সহায়তার জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক সমস্ত সংবাদই আমাদের সংশয়কে দৃঢ়তর করে তুলেছে। প্রয়োজন ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির। সামরিক প্রস্তুতি তো আছেই, আর অসামরিক দেশরক্ষাও আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যে দেশের জনসাধারণ সংকটে অচল, বিপদে ধৈর্যশীল সে দেশকে শত্রুও সম্মানের চোখে দেখে, অগ্রসরের প্রতি পদক্ষেপ তাদের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সম্প্রতি W V S-এর এক কর্মীসমাবেশে পশ্চিম বাংলার অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তা পি কে সেন অসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকদের উৎসাহের বিশেষ প্রশংসা করেন। বিপদে দায়িত্বও মেয়েদের যেমন অনেক, সে দায়িত্ব প্রতিপালনের নিষ্ঠা ও আগ্রহ তেমনি যথেষ্ট। ২৬শে মাঘ তারিখের দেশে আমরা W V S-এর প্রশংসনীয় কার্যাবলীর কথা আলোচনা করেছি। অসামরিক প্রতিরক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ এদের নবতম প্রচেষ্টা। ২৪৭ লোয়ার সার্কুলার রোডে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। সপ্তাহে দুদিন করে শিক্ষা দেওয়া হবে। এক একটি শিক্ষার্থী দলের শিক্ষার মেয়াদ হবে পাঁচ সপ্তাহ বা দশ দিনের ক্লাস। প্রত্যেক দলে ২০টি মহিলা থাকবেন। শিক্ষাদান ব্যবস্থা সপ্তাহে ৬ দিনই থাকবে। আপন আপন সময় ও সুযোগ অনুসারে শিক্ষার্থী মহিলারা দিন বেছে নিতে পারবেন। শিক্ষার প্রথম সোপান প্রাথমিক শুশ্রূষা, অল্পবিস্তর অগ্নিনির্বাপণে সাহায্য করা ইত্যাদি শিক্ষার্থী মাত্রকেই আয়ত্ত করতে হবে। তারপর যার যেমন ক্ষমতা বা সুবিধা সেই অনুসারে বিশেষ বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং-এর শেষ পরীক্ষা হচ্ছে কার্যকরী অভ্যাস বা বিমান আক্রমণ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির অনুকরণ অনুষ্ঠান করে প্র্যাকটিস করা। শিক্ষান্তে অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন অনুসারে ও কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা অনুসারে দেশের সঙ্কটে বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন।

অসামরিক প্রতিরক্ষায় গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধে W V S একটি সুন্দর পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। পুস্তিকাটি যদিও তাঁদের সভ্য ও কর্মীদের জন্যই, কিন্তু এই পুস্তিকায় এমন অনেক তথ্য আছে যা প্রত্যেক গৃহিণীর জানা প্রয়োজন। সঙ্কটকালে প্রত্যেক ঘরণীর অবশ্য জ্ঞাতব্য কি?

১। এয়ার রেড শেল্টার বা বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় কোথায় নেওয়া যেতে পারে,

২। অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিকটতম 'পোস্ট'টি কোথায়,

৩। প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের টেলিফোন নম্বর, সহজ রাস্তা ইত্যাদি,

৪। অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস-এর সাহায্য কি করে পাওয়া যেতে পারে,

৫। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ কি করে করতে হবে,

৬। অগ্নিকাণ্ড হলে সাহায্যের জন্য কি সংকেত ব্যবস্থা আছে,

৭। কাছাকাছি জলের আধার, পুকুর ইত্যাদির খবর,

৮। হাসপাতাল কোথায়,

৯। পুলিস থানা কতদূরে।

অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর শ্রী পি কে সেন W V S-এর কর্মীসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন

হাতের কাছে পাওয়া যায় এভাবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস মজুত করবেন

১। বালতি ও টিনভরা জল

২। কিছু বালি,

৩। জল দেবার নল ও পাম্প

৪। পানীয় জল,

৫। প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স,

৬। কাচের দরজা জানলা সম্ভব হ'লে সরিয়ে ফেলবেন আর না হ'লে কাগজের টুকরো বা কাপড়ের টুকরো কাচের গায়ে আটকে রাখবেন যাতে যদি কাচ ভাঙে তবে ছোট টুকরো এদিক ওদিক ছড়িয়ে না পড়ে,

৭। ব্ল্যাক আউট যদি হয় তবে ভালভাবে সেটা পালন করা দরকার,

৮। বাইরে কি ঘটছে তার সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সঙ্কটকে বিশেষ বিপজ্জনক করে তোলে।

এরপর গৃহিণীরা দেখবেন যাতে যে পাড়ায়, মহল্লায় বা ফ্লাট বাড়িতে বাস করেন তার মধ্যে যতটা সম্ভব সঙ্ঘবদ্ধভাবে থাকা যায়। একত্র হ'য়ে পরিকল্পনা করে নেবেন নিজেরা কে কি দায়িত্ব নেবে। যদি কোনো অঞ্চলের ভয় থাকে তবে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা আগে থেকে রাখবেন। আশ্রয়ে কম্বল মাদুর, গরম জলের বোতল, ব্যাগ খাবার জল, টর্চ লেখাপড়ার বই কাগজ ছোট ছেলেদের জন্য খেলনা, তুলো সব জোগাড় করে রাখবেন। ছোট ছেলে-মেয়ের মা তাদের অন্তত একবার করে খাবার বন্দোবস্ত হাতের কাছে রাখবেন। এর উপরেও সম্ভব হ'লে গরম পানীয় যেমন চা, কফি ইত্যাদি ও শুকনো খাবার রাখলে ভাল হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা গেছে আগুনে প্রায় শতকরা আশী ভাগ জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। এজন্যই যেভাবেই আগুন লাগুক না কেন তারজন্য সবরকম প্রতিকারের প্রস্তুতি রাখা দরকার। কাপড়ে আগুন ধরলে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিলে অনেক সময় আগুন নিবে যায়। এ ছাড়া কম্বল, বালি জল দিয়ে আগুন নিবানো যায়। অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা হ'লে যা সহজে জ্বলে ওঠে এমন জিনিস সরিয়ে ফেলবেন। কোথাও গায়ে আগুন লাগলে প্রথম উপায় খুঁজে দেখা দরকার কেউ আটকে আছে কিনা। আগুনের নিবারণে সাহস দরকার সত্য কিন্তু সে সাহসের সঙ্গে নিজের সাবধানতাও ভাবতে হয় ও যতটা সম্ভব সাবধানভাবে চলতে হয়। W. V. S-এর এই পুস্তিকাটির মূল ভিত্তি গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের W. V. S কর্মীদের অভিজ্ঞতা। আমাদের হয়তো আজ প্রয়োজন হয় নি কিন্তু যে কোনও দিন প্রয়োজন হ'তে পারে, এজন্য এ অভিজ্ঞতার সুবিধা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য W. V. S. ধন্যবাদার্হ।

অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজে হোমগার্ড বা গৃহরক্ষী দলেও মেয়েদের অংশ গ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহরক্ষী দল পুলিসের বিকল্প নয় পুলিসের সাহায্যকারী। দেশের জরুরী অবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার, জনসাধারণের নিরাপত্তা নির্দেশনায় পুলিস হয়তো লোকবলের অভাব বোধ করে। সেই অভাব পূরণকল্পে হোমগার্ডের সংগঠন। হোমগার্ড দলে ১০০টি মেয়েকে নেবার পরিকল্পনা আছে। ২২।২৩ থেকে ৪০।৪৫ বৎসর বয়সের যে কোন সুস্থ মহিলা যিনি কিছু লেখাপড়া জানেন তিনিই গৃহরক্ষী বাহিনীতে যোগ দেবার উপযুক্ত। আপাতত প্রথম শিক্ষার্থী দলের জন্য ২৫টি মেয়েকে নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ২০টির শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এল। মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার চেয়ে স্বল্পমেয়াদী কারণ ছেলেদের অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় যা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এক একটি গৃহরক্ষী মেয়ে বহু দায়িত্ব বহন করতে পারেন। অহেতুক আতঙ্ক থেকে শুরু করে মুনাফাবাজি পর্যন্ত সবরকম সামাজিক বিপর্যয় আছে সবক্ষেত্রেই সমান সাহায্য করতে পারেন গৃহরক্ষী মেয়ে। গৃহরক্ষী দলের কর্তৃপক্ষ চান যে এক একটি গৃহরক্ষী যেন এক একটি পুলিস স্টেশন। যে বিপদই হোক সব সময় চেষ্টা করবে সাহায্য করতে। কারণ সে শিক্ষা পেয়েছে কি করে সাহায্য করতে হয়। অপেক্ষাকৃত আইন কানুন পর্যন্ত গৃহরক্ষী-দের জানতে হয় কারণ বহুক্ষেত্রে আইন বাঁচিয়ে কাজ করারও প্রয়োজন হয়। আজকের সঙ্কটে বহিঃশত্রুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সংশয় আশঙ্কা দেশের মধ্যেও দেখা দিতে পারে। হয়তো বা এজন্য পুলিসকে নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়তে হতে পারে। হোমগার্ড তখন এগিয়ে আসবে—বন্যা হক, ঝড়বৃষ্টি হক, বাড়িঘর ধসে পড়ুক—সব কিছুর জন্যই সে নির্ভীক, অবিচলিত নিষ্ঠায় কর্তব্য করে যেতে প্রস্তুত। সম্পূর্ণ অবৈতনিক হোমগার্ডবাহিনী সমাজসেবা ও স্বদেশ প্রেমের প্রতীক।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ উনিশ ॥

উটের গ্রীবার মত সরু একফালি যোজক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগসূত্র টিমটিম করে রক্ষা করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রখানি টেনে এনে একবার মনোযোগ দিয়ে এই যোজকটির অবস্থান লক্ষ্য করুন। এই অংশটিই সীমানা পুনর্বিন্যাসের ফলে বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাতে এসেছে। এই অংশটুকুই পশ্চিম দিনাজপুরের নবগঠিত ইসলামপুর মহকুমা।

অনেকে অবাক হয়ে ভাবতে পারেন নেফা লাদক [illegible] নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল নেপাল ভুটান, সিকিম পরিক্রমা করে তা আবার পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে ফিরে এল কেন?

এই প্রশ্নের সদুত্তর পাবার জন্যই, আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের মানচিত্রটি ভাল করে একবার দেখুন। এই যোজকটির দক্ষিণে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর, উত্তরে দার্জিলিং জেলা, [illegible] পাকিস্তানের [illegible] দিনাজপুর ও রংপুর [illegible] শিলিগুড়ি মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি [illegible] আছে। আর পশ্চিমে রয়েছে নেপালের একটি অঞ্চল, পশ্চিমে [illegible] শিলিগুড়ি [illegible] পাকিস্তানের সীমান্ত [illegible] আর নেপাল শিলিগুড়ি [illegible] প্রবাহিত হয়েছে মেচি নদী [illegible] সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের দিনাজপুরের [illegible] তেঁতুলিয়া থেকে মেচি নদীর সীমান্তবর্তী নেপালের মোরাং জেলার [illegible] ১৪ মাইল। মাত্রই ১৪ মাইল। [illegible] আর শিলিগুড়ির মধ্যে [illegible] রেল স্টেশনটি এই সংকীর্ণতম ভূখণ্ডে অবস্থিত।

আর এই ১৪ মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে গিয়েছে আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ এবং মোটরপথ অর্থাৎ জাতীয় সড়ক। আসাম ও উত্তরবঙ্গের যাবতীয় সামরিক ও বেসামরিক সরবরাহ একমাত্র এই পথের উপরই নির্ভরশীল। প্রতিবেশী যদি বৈরী হয়ে ওঠে, শত্রুতা সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে, কিম্বা কম্যুনিস্ট চীনের ভারতীয় বন্ধুরা অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপে যদি লিপ্ত হয়ে ওঠে তবে তারা সর্বাগ্রে উটের এই ক্ষীণ গ্রীবাটি ছিন্ন করে উত্তরবঙ্গ ও আসামের সঙ্গে বাকি ভারতের সংযোগ নষ্ট করে দিতে পারে বলে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা আশঙ্কা করেন।

শ্রীনেহরুর মত শান্তিবাদী লোকও এখন মনে করছেন, চীন আবার ভারত আক্রমণ করতে পারে। সামরিক পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আকার ব্যাপকতর হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইসলামপুর-শিলিগুড়ি এই যোজকটিই যে উত্তরবঙ্গ ও আসাম তথা সমগ্র ভারতেরই "জীয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি" সে বিষয়ে আমার অন্ততঃ কোন সন্দেহই নেই। এই 'লাইফ লাইন'টির সুরক্ষা সম্পর্কে সরকারী কি বেসরকারী সামরিক কি বেসামরিক সকল স্তরেই তীব্র সচেতনতা এবং কঠোর সতর্কতা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহেলার পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে, এই কথাটি সব সময় মনে রাখা দরকার।

সম্প্রতি এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যার জন্য ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষকেরা যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করছেন। বর্তমানে চীন নেপাল এবং পাকিস্তানে খাতিরের যে ত্রিভুজ রচিত হয়েছে, তা ভারতের ভাগ্যাকাশে অশুভ মেঘের গভীর ছায়া ফেলেছে। নেপালের যোগীগোপায় নির্মিত সর্বাধুনিক বিমানক্ষেত্রটির সামরিক গুরুত্ব অসাধারণ বলেই বিবেচিত হয়েছে। এবং এই বিমানক্ষেত্রটি সম্পর্কে চীন যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে। ২৪শে মার্চ ১৯৬৩ থেকে ঢাকা কাঠমাণ্ডু বিমান পথে যাত্রী যাতায়াত শুরু হয়েছে। পাকিস্তান এবং নেপালের মধ্যে টেলি-সংযোগ স্থাপনের জন্য অফিসিয়াল স্তরে প্রথম পর্যায়ের কথাবার্তা ১২ই মার্চ শেষ হয়েছে। এই বৈঠক কাঠমাণ্ডুতে বসেছিল। পাকিস্তান এই প্রকল্পে কিছুর টাকা, বেশ কয়েক কোটি ঢালবে বলে প্রস্তাব

করেছে এবং এই প্রস্তাব নেপালের সরকারী মহলে "বেশ আকর্ষণীয়" বলেই মনে হয়েছে। প্রথমে ঢাকা এবং কাঠমাণ্ডুর মধ্যেই তার সংযোগ স্থাপিত হবে এবং পরে এই সংযোগ সম্প্রসারিত হবে পশ্চিম পাকিস্তান পর্যন্ত। নেপালের বাণিজ্য চলাচলের জন্য পাকিস্তান চট্টগ্রাম বন্দরও তার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তিন বছর আগে নেপালের সঙ্গে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই মধ্যে নেপাল ও পাকিস্তানের গলায় গলায় বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। এই আশনাই-এর ঘটক হচ্ছে চীন।

বঙ্গোপসাগরে কিছুদিন আগে চীনা সাবমেরিনের আবির্ভাব-এর উদ্দেশ্য যে কলকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা, সে বিষয়ে পর্যবেক্ষক মহল এখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ খবর রাখেন তাঁদের কারো কারো মতে সেখানে অদূর ভবিষ্যতেই কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত

জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন
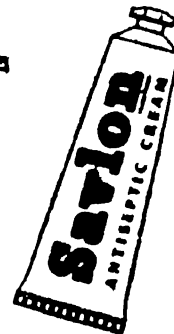
হবে এবং রেঙ্গুন বন্দরটি চীনা নৌবহরের একটি শক্ত ঘাটি হয়ে উঠবে। চীনা ড্রাগন ভারতকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরার কোনও আয়োজনই বাদ রাখছে না।

নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিও ভারতের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। জাতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর রাজা মহেন্দ্র ডাঃ তুলসী গিরিকে প্রধানমন্ত্রিত্বে বসিয়েছেন এবং ডাঃ কে আই সিং নেপালের রাজনীতিতে আবার প্রভাব ফেলতে শুরু করেছেন। ভারত এই দুই ডাক্তারেরই চোখের বালি।

সম্প্রতি আরও একজন "মহাপুরুষ" রাজা মহেন্দ্রের উপদেষ্টামণ্ডলীতে যোগ দিয়েছেন। "যাঁর সম্পর্কে", কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেছেন, "উদ্বিগ্ন বোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে।" এই রহস্যময় ব্যক্তিটির সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে আমি যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি তা এই:

ইনি জাতে নেপালী। কার্সিয়াং থেকে কিছুটা পশ্চিমে, নেপালে, ইলম্-এ এর বাড়ি। কিন্তু এর রুজি রোজগার যা কিছু, সবই দার্জিলিং জেলায়। সিভিল সাপ্লাই-এর ঠিকেদারি করে কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি অঞ্চলে বিষয় সম্পত্তি বিলক্ষণ করেছেন। এই অঞ্চলে ওঁকে সবাই একডাকে "খার্সাং কো মৈলা" বলে চেনে। এই নেপালী কথাটির বঙ্গার্থ হচ্ছে "কার্সিয়াং-এর মেজোবাবু।"

যে করিডরটি আমাদের "জীয়নকাঠি মরণকাঠি" তারই সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কার্সিয়াং-এর এই মেজোবাবুটির প্রভাব নাকি অপরিসীম। এই অঞ্চলের অধিবাসী কারা? ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ মিমিচ উপজাতির লোকেরাই এই অঞ্চলের ভারতীয় প্রজা। বিবাহের সূত্রে পাকিস্তান এবং নেপাল—ইসলামপুরের সবু এই করিডোরের দুই ধারে প্রতিবেশির সঙ্গেই এদের অধিকাংশেরই ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। এই অঞ্চলের কাছেই নেপালের ভদ্রপুরের হাট। সেই হাটে কয়েকটি বেশ বড় চালের কল রয়েছে। গত বছর আমাকে এই অঞ্চলের ফাঁসিদাওয়া, খড়িবাড়ি, অধিকারী প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছিল। তখনই দেখেছিলাম, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য ঐ অঞ্চলের কয়েকটি থানার পুলিসকে কত মুশকিলের মধ্যে কাজ করতে হয়। এবং সেই কারণেই এই অঞ্চলের ধান চোরাপথে অনায়াসে ভদ্রপুরের মিলে চালান হয়ে যায়।

যেখানে আমরা ধানচালের চোরা চালানই বন্ধ করতে পারিনে, সেখানে দেশের স্বার্থ-বিরোধী ষড়যন্ত্র অবাধে চলবে, তার আর আশ্চর্য কী? পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট চীনা-পন্থী কম্যুনিস্ট নেতারা এই অঞ্চলে কিছুকাল আগে খুবই ঘোরাফেরা করেছেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে "বিদেশী বন্ধু" ছিলেন, এমন দৃশ্যও অনেকে চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন।

অকস্মাৎ রাজা মহেন্দ্র "কার্সিয়াং-এর মেজোবাবুকে" সমাদর করে ডেকে নিয়ে গেলেন কেন, কেনই বা এই মহাপুরুষটি তাঁর কাছে এত মূল্যবান হয়ে উঠলেন, এ রহস্যের কিনারা করা দরকার। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা এই বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন। নেপাল বা পাকিস্তান আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হলে এ প্রশ্ন হয়ত উঠত না। চীন-নেপাল-পাকিস্তানী খাতিরের ত্রিভুজ দেখে ভারত যদি অস্বস্তি বোধ করে, উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, তবে তা কি খুব দোষের হবে?

বিশেষ করে শত্রু যখন শিয়রে এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে তাদের সৈন্য সমাবেশ আমাদের চাইতে তারা অনেক সুবিধাজনক জায়গায় করতে পেরেছে। এদিক থেকে হিমালয়ও আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ বাম। কারণ অসুবিধাজনক গিরিশ্রেণী আমাদের সামনে পড়েছে। এই কারণেই আমাদের পক্ষে কি নেফায়, কি কেদারক্ষেত্রে, কি লাদকে সৈন্য ও সমরোপকরণ বহনের উপযুক্ত পথ সংযোগ স্থাপন করতে কালঘাম ছুটছে।

তিব্বত বিরাট এক সম-মালভূমির উপর অবস্থিত হওয়ায়, এবং ভারত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত চীনারা অনেক আগে থেকে নেওয়ায়, তাদের পক্ষে হিমালয়ের সমান্তরাল পাকাপোক্তভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আমাদের চেয়ে আগে এবং অনেক সহজে সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকেও চীন ভারতের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় আছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে যে-সব খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে পর্যবেক্ষকদের অনেকেই একটা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, চীনারা রেল এবং মোটর পথ ওদের অগ্রগামী ঘাটির খুবই কাছাকাছি নিয়ে ফেলেছে। আর আমরা, প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাকসর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ মেননের অপার কৃতিত্বে, এ বিষয়ে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছি।

নেফা রণাঙ্গনের কথাই ধরা যাক। ওয়ালঙ থেকে সরে চীনারা রিমাতে গিয়ে শক্ত ঘাটি তৈরি করেছে। যদি ওয়ালঙ আর রিমার সামরিক অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে ওয়ালঙে আমরা যে অবস্থায় আছি, তার চেয়ে চীনারা রিমাতে ঢের বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। দিল্লি থেকে আকাশ পথে ওয়ালঙের যা দূরত্ব, কোন কোন ওয়াকিবহাল ব্যক্তির মতে, পিকিং থেকে রিমার সেই দূরত্ব অন্তত ১০০ মাইল কম। ওয়ালঙ থেকে শিলিগুড়ি যতদূর, রিমা থেকে চুংকিং-এর দূরত্ব (প্রায় ৫০০ মাইল) প্রায় তাই। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে ওয়ালঙে রেলসংযোগ নেই, মোটরের পথে সংযোগ গত যুদ্ধের সময়েও ছিল না। রিমা এবং চুংকিং-এর মধ্যে রেল ও মোটর পথের সংযোগ চীনারা দুরস্ত করে তুলেছে। চুংকিং থেকে শিলিগুড়ির আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, শিলিগুড়িও চীনা আক্রমণের প্রত্যক্ষ আওতার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ি আর ওয়ালঙের যোগাযোগ ব্যবস্থা সামরিক সীমান্তের সমান্তরাল চলেছে। এ সম্পর্কে একজন পর্যবেক্ষক লিখছেন:

....Siliguri itself is close to a threatened frontier, and the line of communication from Siliguri to Walong runs parallel to the frontier.—(The Stateaman, Calcutta, March 26, 1963).

কলকাতা থেকে ওয়ালঙের দূরত্ব যত, ক্যাণ্টন আর রিমার দূরত্ব তার চাইতে অনেক কম। কলকাতা আর তেজপুরের মধ্যে রেল বা মোটর পরিবহণ ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে, তাতে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের ধারণা, কলকাতার শিল্পাঞ্চল থেকে তেজপুরে প্রয়োজনীয় মাল পাঠাতে যত সময় লাগে, তার চাইতে অনেক কম সময়ে চীনের শিল্পাঞ্চলের মাল ওদের অগ্রবর্তী ঘাটি ৎসোনাজঙে পৌঁছে যায়। একথাও মনে রাখা দরকার তেজপুর নেফার অগ্রবর্তী ঘাটি নয়, সে ঘাটি আরও দূরে।

চীনারা হিমালয়ের ওপিঠে পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল পেতে ফেলেছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামে আমরা এখনও পর্যন্ত মীটারগেজ রেলপথ সম্বল করেই বসে আছি। খেজুরিয়াঘাট থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রক্ষিপ্ত একটি ব্রডগেজ রেলপথ সম্প্রতি যদিচ স্থাপিত হয়েছে, তবু যতদিন পর্যন্ত না ফরাক্কায় রেল-ব্রীজ বা বাঁধ তৈরি হচ্ছে, ততদিন এই রেলপথটিকে প্রকৃতপক্ষে দর্শনধারী হয়েই থাকতে হবে।

স্টেটস্ম্যান পত্রিকা (কলিকাতা সংস্করণ, ২৬শে মার্চ, ১৯৬৩) জানাচ্ছেন:

In recent years China has paid more attention to the building of strategic roads than India has. A highway or a broad guage railway parallel to the Himalayas along the entire length of the mountains is not available to the Indian Army, while the Chinese have such a road whose carrying capacity exceeds that of a metre guage railway and which is not burdened with civilian traffic.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সীমান্তের সুরক্ষা, বিশেষ করে সীমান্তের সুরক্ষা দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তর-বঙ্গ ও আসামের সঙ্গে বাকি ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা। ফরাক্কার সেতু নির্মাণ এই দুর্বলতা দূর করার যেমন একটা উপায়, তেমনি আরেকটা উপায় হচ্ছে ইসলামপুর-শিলিগুড়ির এই সংকীর্ণ করিডরটি, উটের গ্রীবাটি শক্তহাতে রক্ষা করা। এই করিডরটি আমাদের "লাইফ লাইন", আমাদের "জীয়ন-কাঠি মরণ-কাঠি". এ কথা আমরা যেন মুহূর্তের জন্যও না ভুলি।

(ক্রমশ)

একটি অবাঞ্ছিত আইন

তারাপদ লাহিড়ী

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক্‌স্ট্রা অর্ডিনারী সংখ্যায় একটা প্রস্তাবিত আইনের খসড়া মুদ্রিত হয়েছে। আইনটা পাশ হলে তার নাম হবে "পশ্চিমবঙ্গীয় নাটকানুষ্ঠান আইন" (West Bengal Dramatic Performance Act)। প্রস্তাবিত আইনের যে খসড়া গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে এমন সব বিধান আছে যা শিল্প, সাহিত্য, নাটক প্রভৃতির অনুরাগী নাগরিকবৃন্দকে চিন্তিত ও শংকিত করে তুলবে।

দুঃখের বিষয়, ১০ই ডিসেম্বর তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হলেও আইনের ধারাগুলি সম্ভবত চিন্তাশীল লোকদের নজর এড়িয়ে গেছে। সংবাদপত্রসমূহও এই প্রস্তাবিত আইনের বিস্তারিত বিবরণের প্রতি এ যাবৎ পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির দিক থেকে প্রস্তাবিত আইনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিধানমণ্ডলীতে পেশ হওয়ার পূর্বেই এ বিষয়ে যথোচিত আলোচনা হওয়া উচিত মনে করি।

অবাঞ্ছিত বা আপত্তিজনক নাটকাদির অনুষ্ঠান বন্ধ করবার জন্য বহুদিন থেকেই একটি সর্বভারতীয় আইন চালু আছে। সেটি হচ্ছে—১৮৭৬ সালের ড্রামাটিক পার্ফর্মেন্স আক্ট।" এটি কেন্দ্রীয় আইন—সারা ভারতে প্রযোজ্য। প্রস্তাবিত আইনের "উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা" প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে "এলাহাবাদ হাইকোর্ট একটি মোকদ্দমায় এই রায় দিয়েছেন যে, ১৮৭৬ সালের আইনটি সংবিধান বিরোধী। অতএব পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য ঐ আইন বাতিল করে নূতন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।" বলা বাহুল্য কলিকাতা হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেন নি। কাজেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় দেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ বেসামাল হয়ে উঠলেন কেন তা বোধগম্য নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সাংবিধানিক আপত্তি বাঁচিয়ে ১৮৭৬ সালের ঐ আইনটির অনুরূপ আর একটি আইন তৈরী করতেন —তাতে বিশেষ কিছু বলবার ছিল না। তাতে বোঝা যেতো রাজ্য সরকার সাংবিধানিক জটিলতা পরিহারের জন্যই নূতন আইন করলেন। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। নূতন যে আইনের খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রয়োগক্ষেত্র এত ব্যাপক এবং ফল এত সুদূর প্রসারী যে ঐ আইন পাশ হলে থিয়েটার যাত্রা, প্রহসন, গান, বাজনা, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক ইত্যাদি সব কিছু সরকারী অনুমোদনের চোলাই যন্ত্রের মাধ্যমে পরিস্রুত হয়ে না এলে তা দেশের মাটি ছুঁতে পারবে না।

১৮৭৬ সালের যে আইনটি আজও চালু আছে তাতে বলা হয়েছে যে, যদি প্রকাশ্য-স্থানে (public place) এমন কোন নাটক বা নাট্যাংশের অভিনয়ের আয়োজন হয়—যা নারকারজনক, বা অপরের মানহানিকারক বা যা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করে, কিংবা শ্রোতা ও দর্শকদের নৈতিক অবনতি ঘটাতে পারে—তাহলে রাজ্য সরকার ঐ নাটক বা নাট্যাংশের অভিনয়াদি নিষিদ্ধ করতে পারবেন (৩ ধারা)। ঐ ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, কোন ঘেরা জায়গায় বা গৃহাভ্যন্তরে যদি পয়সার বিনিময়ে (অর্থাৎ টিকেট করে) জনসাধারণকে অভিনয়াদির দর্শন শ্রবণের অধিকার দেওয়া হয় তবে সেই জায়গা বা গৃহ "প্রকাশ্যস্থান" বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া ঐ আইনে আর একটা বিধান আছে যে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে কোন বিশেষ এলাকায় "সাধারণের আমোদপ্রমোদের স্থানে" (in place of public entertainment) নাট্যাভিনয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারবেন (১০ ধারা)। ঐ দুই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আদেশ অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে—সর্বোচ্চ শাস্তি তিন মাসের কারাদণ্ড।

অবাঞ্ছিত এবং আপত্তিজনক নাটকাদির অভিনয় নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ১৮৭৬ সালের আইনে রাজ্য সরকারের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—সেটুকু ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে থাকা উচিত—একথা স্বীকার করে নিয়েই প্রস্তাবিত আইনের বিধানগুলির আলোচনা করা যাক।

প্রস্তাবিত আইনে "ড্রামা" কথাটির সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে:

"Drama includes a melodrama, tragedy comedy, farce play, opera,

অধিকতর সুখী জীবনের ৩টি আদর্শনীতি

interlude and any other scenic, musical or dramatic entertainment."

সুতরাং প্রস্তাবিত নূতন আইন অনুসারে যত রকমের আমোদানুষ্ঠান জানা আছে তার প্রায় বারো আনাই "ড্রামা" বলে গণ্য হবে। "কর্ণকুন্তী সংবাদ", "গান্ধারীর আবেদন", "বিদায় অভিশাপ" প্রভৃতি সবই "ড্রামা"। যাত্রা (opera), কবিগান, তর্জাগান, কীর্তন, জলসা-সবই 'ড্রামা' কারণ এগুলি সঙ্গীত-বিষয়ক আমোদ (musical entertainment)। ক্যারিকেচার বা হাস্যকৌতুকও "ড্রামা"। এমন কি দেবতা মন্দিরের ভজন বা সংকীর্তনও বোধহয় বাদ পড়ে না। ওগুলি সবই ত musical entertainment-এর মধ্যে এসে যায়। নিছক যন্ত্রসঙ্গীতও বাদ পড়ে কি?

এর পর "পার্ফর্মেন্স" শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে :—
"Performance means the performance of any pantomine or drama"

১৮৭৬ সালের কেন্দ্রীয় আইনে ঐ শব্দ দুইটির কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নি। শুধু কোন "play, pantomime or other drama" উল্লিখিত মত নিষিদ্ধ করবার অধিকার রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে এর পরেই আসল খড়্গের ঘা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই আইন অনুসারে লাইসেন্স গ্রহণ না করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোথাও (at any place) কোন "পার্ফর্মেন্স" করা যাবে না (৩ ধারা)। লাইসেন্স-দানের কর্তা হবেন—কলকাতায় জন্য পুলিস কমিশনার বাহাদুর ও মফঃস্বলের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর (৪ ধারা)। যে স্থানে অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে সেই স্থানের মালিক বা দখলীকার ব্যক্তি ঐরূপ লাইসেন্সের প্রার্থনা করে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত দেবেন। প্রত্যেক দরখাস্তের সাথে দক্ষিণাও দিতে হবে—যেটার পরিমাণ দুই শত টাকা পর্যন্ত হতে পারে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিস কমিশনার ঐ স্থানে ঐরূপ "পার্ফর্মেন্স" হওয়া আপত্তিজনক মনে করলে লাইসেন্স দেবেন না। দরখাস্ত অগ্রাহ্য করবেন—(অবশ্য অগ্রাহ্য করার কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে)। আপত্তিজনক মনে না করলে লাইসেন্স দেবেন (৫ ধারা)।

সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় মধ্যে যে কোন স্থানে থিয়েটার, যাত্রা প্রহসন, হাস্যকৌতুক, গানবাজনা, জলসা, কীর্তন যা কিছু করতে হলেই লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্স চাইতে হলেই দক্ষিণা দিতে হবে—যার পরিমাণ ২০০, টাকা পর্যন্ত হতে পারে। লাইসেন্সের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলেও ঐ দক্ষিণার টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। "at any place" কথাগুলির দ্বারা ... উৎসব, সাংস্কৃতিক সম্মিলনী প্রভৃতিতে, ... প্রভৃতির উদ্দেশে উপলক্ষ্যে, এমন কি ছেলেমেয়েদের বিবাহোপলক্ষে নিজে বাড়ীর মধ্যে কিছু আমোদ আহ্লাদ গানবাজনা, ক্যারিকেচার প্রভৃতি করতে হলেও লাইসেন্স চাই। (দক্ষিণা দরখাস্ত এবং লাইসেন্স অর্জনে ব্যয় ও ভোগান্তি কিরকম হবে তা অনুমেয়) শুধু তাই নয়। রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" বা দ্বিজেন্দ্রলালের "শাহজাহান" যদি একই জেলার হাজারটা জায়গায় অভিনীত হয় তবে হাজারখানা পৃথক লাইসেন্স নিতে হবে হাজার বার দক্ষিণা দিতে হবে। কারণ লাইসেন্সটা হবে "স্থানভিত্তিক"—"বিষয়-ভিত্তিক" নয়।

যে কেন্দ্রীয় আইন চালু আছে, তাতে শুধু কোন বিশেষ এলাকায় জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপরে দেওয়া আছে এবং তাও শুধু "সর্ব-সাধারণের আমোদ-প্রমোদ স্থানে" যেসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে তারই জন্য। নূতন আইনে সেই ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিয়ে যে কোন স্থানে যে কোন প্রকারের প্রমোদানুষ্ঠানের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

শুধু লাইসেন্স নিয়েই নিস্তার নেই। লাইসেন্স ত শুধু "স্থানের" জন্য। এর পর থাকে বিষয়বস্তু। ওর জন্য আবার পৃথক "মঞ্জুরী" (sanction) নিতে হবে। কোন "পার্ফর্মেন্স" হতে গেলেই তার বিষয়বস্তুর বিবরণ অথবা script অথবা সংক্ষিপ্ত মর্ম লাইসেন্সিং অথরিটির কাছে আগেভাগে দাখিল করে নির্দিষ্ট ফরমে "মঞ্জুরীর" জন্য দরখাস্ত করতে হবে। এর জন্য আবার পৃথক দক্ষিণা দিতে হবে—যার পরিমাণ ৫০, পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে দরখাস্তকারী হবেন "পার্ফর্মেন্সের" উদ্যোক্তা। লাইসেন্সিং অথরিটি যদি মনে করেন যে ঐ বিষয়বস্তু "আপত্তিজনক অনুষ্ঠানের" (objectionable performance) পর্যায়ে পড়ে তবে মঞ্জুরী দেবেন না (অবশ্য সেজন্য দক্ষিণার টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে না) (৬ ধারা)। এক্ষেত্রেও আইনের ভাষা হচ্ছে—

"A person desiring to hold any performance or cause or permit any performance to be held shall make : , . . .an application."

অর্থাৎ কিছুই বাদ পড়ে না। শেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথের বহুখ্যাত নাটক করতে হলেও মঞ্জুরী নিতে হবে, নূতন (অপ্রকাশিত) কোন নাটক করতে হলে পাণ্ডুলিপি দাখিল করে মঞ্জুরী নিতে হবে। জলসা, সঙ্গীত সম্মিলনী, সংস্কৃতি সম্মিলনী প্রভৃতির ব্যাপারে প্রোগ্রাম এবং প্রত্যেক piece-এর বিবরণ দাখিল করে মঞ্জুরী নিতে হবে।

বাড়ীতে পূজো বিবাহাদি বিশেষ উপলক্ষে গান-বাজনার উৎসব—এসব কিছুই বাদ দেওয়া হয় নি। শিল্পী যে "স্টেজে" গিয়ে উপস্থিত মত কিছু গাইবেন বা অভিনয় করবেন বা হাস্যকৌতুকের স্কেচ পরিবেশন করবেন তার উপায় নাই। কারণ সর্বক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর অগ্রিম মঞ্জুরী চাই। আর চাই পৃথক পৃথক performance-এর পৃথক পৃথক উদ্যোক্তা হলে তাদের প্রত্যেকের পৃথক স-দক্ষিণা দরখাস্ত! "আপত্তিজনক অনুষ্ঠান" বা objectionable performance অর্থে বলা হয়েছে—যাতে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে তার দ্বারা "বলপ্রয়োগ" (violence) বা "সাবোটেজের" দ্বারা সরকারের কর্তৃত্বের উচ্ছেদ বা হানি ঘটানোর প্ররোচনা সৃষ্টি হতে পারে। কিংবা নরহত্যা, সাবোটেজ বা বলপ্রয়োগাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠানের প্ররোচনা ঘটতে পারে অথবা নাগরিকবর্গের একাংশের প্রতি বলপ্রয়োগাত্মক কার্য করবার জন্য অপরাংশের মনে প্ররোচনা জাগতে পারে। কিংবা যার দ্বারা কোন লোকের ধর্মবোধের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় কিংবা যা শালীনতা বর্জিত বা অশ্লীল, তা সবই "আপত্তিজনক অনুষ্ঠানের" আওতায় পড়বে। কোন নাটক, সঙ্গীত, প্রহসন বা স্কেচ এই সব দোষের মধ্যে কোন দোষে দুষ্ট কি না তার বিচারক—কলিকাতার ক্ষেত্রে পুলিস কমিশনার, বাহাদুর এবং মফস্বলের ক্ষেত্রে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর। মুদ্রিত এবং প্রকাশিত পুস্তক সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ না হলেও পুলিস কমিশনার বা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, তার মধ্যে ঐরূপ আপত্তিকর দোষ আছে তবে তিনি তার মঞ্জুরী দেবেন না। ভিন্ন ভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের রুচি, রসবোধ এবং অভিমত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হবে—এটাই স্বাভাবিক। এবং সেইজন্য এমন ঘটতে পারে যে, যে বই, গান বা স্কেচ এক এলাকার হাকিমের হাত থেকে মঞ্জুরীর ছাপ নিয়ে বেরিয়ে এল। অন্য এলাকার হাকিম তাকে মঞ্জুরী দিলেন না। তা ছাড়া একটা জেলায় ২০০টি ক্লাব বা সংঘ যদি একই বই বা স্কেচ এর ২০০টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় "অনুষ্ঠান" (performance) করতে চায় তবে সেই একই বই বা স্কেচের জন্য একই লাইসেন্স-কর্তার দরবারে ২০০খানা পৃথক দরখাস্ত দিতে হবে—এবং প্রত্যেক দরখাস্তের জন্য পৃথক দক্ষিণা দিতে হবে। প্রস্তাবিত আইনে আপত্তিকর কোন বই বা বিষয়বস্তুর "পার্ফর্মেন্স" একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ক্ষমতাও রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে (৮ ধারা)। লাইসেন্স বা মঞ্জুরী ছাড়া কোন পার্ফর্মেন্স অনুষ্ঠিত হলে বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত কোন বিষয়বস্তুর "পার্ফর্মেন্স" হলে যে জায়গায় ঐ রকম অনুষ্ঠান হবে তার মালিক দখলীকার ঐ অনুষ্ঠানের যাঁরা উদ্যোগ করবেন বা উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁরা এবং যে সব শিল্পী, গায়ক, বা অভিনেত্রী সেই "পার্ফর্মেন্স" অংশ গ্রহণ করবেন তাঁরা—এই সকলেই আইনত দণ্ডনীয় হবেন। সর্বোচ্চ শাস্তি ৬ মাস কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড। (কেন্দ্রীয় আইনে বর্তমানে যে শাস্তি বিহিত আছে, তার দ্বিগুণ)।

প্রস্তাবিত আইনের উল্লিখিত বিধানগুলি ভালোভাবে অনুধাবন করলে এই ধারণাই দৃঢ় হবে যে, দেশে নাটক, যাত্রা, সঙ্গীত প্রহসন প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই আইন পাশ হলে দেশে প্রমোদ-অনুষ্ঠান পনেরো আনা পরিমাণে হ্রাস পাবে—এরূপ আশঙ্কা অমূলক নয়। লাইসেন্স ও

মঞ্জুরীর ডবল হাঙ্গামা ঘাড়ে নেওয়ার মত সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি অধিকাংশ ছোটখাট সংঘ ক্লাব প্রভৃতিরই থাকবে না। দেশের অধিকাংশ প্রমোদানুষ্ঠান এই সকল সংঘ, ক্লাব প্রভৃতির উদ্যোগেই হয়ে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের মালিকানাভুক্ত স্থান বা গৃহ প্রমোদানুষ্ঠানের জন্য সহজে পাওয়া যাবে না। "কে জানে লাইসেন্স আছে কি না, মঞ্জুরী আছে কি না —সুতরাং 'শৃঙ্গীনাং শস্ত্রহস্তেন"—এই হবে স্থানের মালিকদের মনোবৃত্তি। দণ্ডের ঝুঁকি শুধু শুধু কে ঘাড়ে নেব? শিল্পীরাও সহজে প্রমোদানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হবেন না। এখানেও ঐ একই ভয়। নূতন নাটক সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হবে। নাটক লিখবার পর তা অভিনয়ের মঞ্জুরী পাবে কি না তা যখন জানা নাই—তখন এই অনিশ্চয়তার আবহাওয়ায় নাটক লেখার উৎসাহই নিভে যাবে। তাছাড়া, কোন বিষয়বস্তু সত্য সত্যই অশ্লীল কি না, অপরাধের প্ররোচনা দেয় কি না—এর নির্ধারণ ত প্রশাসনিক মাপকাঠিতে হয় না।

এর সঠিক বিচার একমাত্র সূক্ষ্ম সাহিত্য বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করতে পারেন। সকল পুলিস কমিশনার বা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের যে সেই পরিমাণ সাহিত্যবোধ থাকবেই—তার নিশ্চয়তা কোথায়? সাহিত্য কিংবা শিল্প খড়্গের তলায় মাথা তুলতে পারে না। সাহিত্য, শিল্প ও কলাবিদ্যা প্রাগ্রসরতার প্রধান শর্তই হচ্ছে স্রষ্টার স্বাধীনতা। দরজায় তলোয়ার হাতে করে দাঁড়িয়ে থেকে সাহিত্যিককে দিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করানো যায় না। আমরা "মগজধোলাই সাহিত্যের" নিন্দা করি। সেই আমরাই এ কি করতে যাচ্ছি?

প্রস্তাবিত আইনে দাক্ষিণ্য যে একেবারে নেই, তা নয়। লাইসেন্স বা মঞ্জুরীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে সেসন জজের কাছে আপীল করা চলবে। কোন বিষয়বস্তু রাজ্য সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলে হাইকোর্টে আপীল করা চলবে। তা ছাড়া রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে কোন কোন 'প্রাইভেট পার্ফর্মেন্সকে' বা কোন বিশেষ শ্রেণীর পার্ফর্মেন্সকে শর্তাধীনে এই লাইসেন্স ও মঞ্জুরী গ্রহণের দায় থেকে রেহাই দিতে পারবেন। এই দাক্ষিণ্যটুকু প্রস্তাবিত আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে যে এ দাক্ষিণ্য মূল্যহীন। ৮ ধারামতে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার সম্পর্কে হাইকোর্টে আপীলের অধিকার থাকা অবশ্য উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু লাইসেন্স বা মঞ্জুরীর ব্যাপারে সেসন জজের কাছে আপীল এমন কিছু কার্যকরী প্রতিষেধ (Safeguard) হবে [illegible] একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লাইসেন্স বা মঞ্জুরীর দরখাস্ত করতে হবে [illegible] দরখাস্ত অগ্রাহ্য হলে—সেসন জজের কাছে আপীল সাধারণত ৩।৫ মাস [illegible] এ সব আপীলের নিষ্পত্তি হতে। সুতরাং ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানের সময় [illegible] যাবে। উদ্যোক্তাদেরও ধৈর্যের মাত্রা [illegible] হয়ে যাবে। [illegible] আপীলাদালতে পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করতে চাইবে।

প্রাইভেট পার্ফর্মেন্স [illegible] বিশেষ শ্রেণীর পার্ফর্মেন্সকে রেহাই দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের উপরে ক্ষমতা অর্পণ করে যে বিধান করা হয়েছে তার উপরে বেশী ভরসা রাখা চলে না। আইনের মধ্যে 'ছাড়' (exemption) সম্পর্কে "আইনের নির্দেশ" (Statutory provision) থাকা এক কথা। আর "ছাড়" করার অধিকার রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত করা অন্য কথা। রাজ্য সরকারের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ হবে প্রশাসনিক স্তরে। আদৌ কোন ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রয়োগ করা হবে কি না, এবং করা হলেও কোন্ কোন্ শর্তাধীনে করা হবে তা নিরূপণের সম্পূর্ণ ভার রইল প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপরে। ফলে ব্যাপার সেই একই দাঁড়াচ্ছে। সরকারী সার্টিফিকেটের স্ট্যাম্প-মারা শিল্পেরাই শুধু রঙ্গশালায় পা ছোঁয়াবে পারবে। এটা অগণতান্ত্রিক। আমাদের সুপ্রীম কোর্টও বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মচারীদের হাতে বিপুল পরিমাণ স্বাবিবেচনানির্ভর (discretionavy) ক্ষমতা ন্যস্ত করার নিন্দা করেছেন।

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্প্রসারণ গণতন্ত্রের সাফল্যের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কোন্ দেশে গণতন্ত্র কত দূর সফল হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়—সেই দেশের মানুষ কি পরিমাণে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে—তাই দেখে। সাহিত্য ও শিল্পকলার কণ্ঠে শিকলজড়ানোর সর্বপ্রকার চেষ্টা পরিহার করা উচিত। শান্তি, শৃংখলা ও শালীনতার খাতিরে যতটুকু নিয়ন্ত্রণ আরোপ অপরিহার্য সাহিত্য ও শিল্পকলার উপরে তার বেশী নিয়ন্ত্রণ চাপানো দেশের কৃষ্টিগত উৎকর্ষের পক্ষে হানিকর। প্রস্তাবিত আইনের ৮ ধারায় পার্ফর্মেন্স নিষিদ্ধ করার যে ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপর অর্পিত হয়েছে—তার বেশী আর কোন নিয়ন্ত্রণ প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয়।

আইনজীবী হিসাবে আর একটা কথা বলতে চাই যে, এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজির তুলে যে সাংবিধানিক জটিলতা পরিহার করবার অজুহাতে এই নূতন আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, নূতন আইনের ফলে সেই সাংবিধানিক জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই আইনে যেভাবে অভিনয়, গান-বাজনা প্রভৃতির উপরে খাঁড়া চালানো হয়েছে, যেভাবে বিপুল পরিমাণ স্বাবিবেচনানির্ভর ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তা সংবিধানসম্মত বলে মনে হয় না।

* ট্রামে-বাসে *

সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীটি আসনই লাভ করিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—“নির্বাচনের দিন বর্ধমান শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ১০৪ ডিগ্রি এবং তারপরের দিন কোন কোন অঞ্চলে মৃদু ভূমিকম্পের কম্পনও অনুভূত হয়েছিল। তাপমাত্রা আর ভূমিকম্পের সঙ্গে কংগ্রেসের জয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা তা আমাদের পক্ষে বলা শক্ত।”

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় একটি বিতর্ক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন নাকি বলিয়াছেন যে, মন্ত্রি সংখ্যা হ্রাস নহে, বৃদ্ধি করাই উচিত। —“নিশ্চয়, নিশ্চয়। এটা শুধু ইংরেজী আদর্শগত ‘মোর দি মেরিয়ার’ নয়, উপনিষদেও উক্ত হয়েছে নাল্পে সুখমস্তি।”

করভার হ্রাস নয়, প্রয়োজন হইলে আরো বৃদ্ধি করা হইবে, একথা নাকি বলিয়াছেন আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—“উপনিষদে নাল্পে সুখের উদাহরণ সত্ত্বেও আমাদের শুধু বলতে হয় —হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর আমারে দিয়েছ শুধু পথ!!”

রাজ্যসভা ও লোকসভা মিলাইয়া এ পর্যন্ত নাকি ১৯৬২ সালেই সরকারী আশ্বাসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,০০০টি।—“প্রবাদটি আবার সন্দেহাতীত-ভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হল অর্থাৎ চিঁপিটক সিদ্ধ হল না”—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—অংশ গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ও শ্রী এস কে পাতিল। শ্যামলাল বলিল—“অধিবেশনটা বুধবার বন্ধে না হলে সরকারী অর্থভাণ্ডার টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থে পুষ্ট হতে পারত, দেশাই মশাই কী যে করলেন!!”

২৫শে বৈশাখ হইতে সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র ও নোটিস বাংলায় লেখা হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। —“নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। কিন্তু মুশকিল এই যে, অনেক অফিসারদের আবার হয়ত ‘অ-য় অজগর আসছে তেড়ে’ থেকে শুরু করতে হবে”—বলেন বিশু খুড়ো।

উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের পর কমিউনিস্ট পার্টির জনৈক মুখপাত্র নাকি বলিয়াছেন যে, পরাজিত হইলেও তাঁহাদের মোরাল ভিক্টরী হইয়াছে। প্রসঙ্গত আমাদের জনৈক সহযাত্রী পূর্ব ময়মন-সিংহের একটি গল্প শুনাইলেন। —“সেখানে মেদিনী নামক এক গ্রামের কুস্তিগীরেরা কুস্তিতে হেরে মাটিতে চিৎপটাং হলেও একটা ঠ্যাং নীচে থেকেই বিজয়ীর পিঠের ওপর তুলে ধরত, দর্শকদের বুঝতে দিত সে

হারেনি। স্থানীয় লোকেরা তাদের ‘মেদনীর খেউড়াল’ (খেলোয়াড়) বলে হাসি-তামাশা করত।”—মোরাল ভিক্টোরির সঙ্গে ‘মেদনীর খেউড়ালের’ মিল আছে কিনা জানি না।

এক সংবাদে প্রকাশ, বিগত পনর বছরের মধ্যে আই এ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি মাদ্রাজে, তারপর উত্তর প্রদেশে এবং তারপর পাঞ্জাবে। বাংলার স্থান অনেক নীচে।—ইডলি বা চাপাটি ভাতের চেয়ে মস্তিষ্কপ্রদ কিনা তার কোন পরিসংখ্যান এখনো নেওয়া হয়নি”—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কোন মন্ত্রী আইন সভার জনৈক বিরোধী দলের সদস্যকে মারপিটের ভয় দেখাইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে পাকিস্তান হইতে। শ্যামলাল সংক্ষেপে বলিল—“একেই বলে কড়াপাক!”

শ্রীটি টি কে শীঘ্রই অস্ট্রেলিয়া সফরে যাইতেছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—“তাঁর যাত্রা শুভ হোক।

কিন্তু কৃষ্ণমাচারীজী বড় দুঃসময় বেছে নিয়েছেন। কাকতাড়ুয়া ছাড়া এখন আর অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না অস্ট্রেলিয়া। তাই ভাবছি কাকতাড়ুয়া দেখে না......!”

রাশিয়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, “লুনিক ৪” নাকি চন্দ্রের ভিতরদিক পাঁচ হাজার মাইলের নিকটবর্তী হইয়াছে। —“আমাদের মনে ‘নিকট সত্তা রসাতল’-এর কথাই জাগছে, জ্যোতির্বিদ্যায় কী বলে সে বিদ্যে আমাদের নেই”—বলেন বিশুখুড়ো।

কলম্বো প্রস্তাব-এর ভাষ্য দিল্লি এবং পিকিং দুই স্থানেই প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু চীন বলে দুইটি ভাষ্য নাকি দুই রকম। কলম্বো অবশ্য প্রতিবাদে জানাইয়াছে যে, একই ভাষ্য দুই স্থানেই পাঠানো হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—“কী জানি, ইংরেজীতে লেখা আড়াআড়ি লাইন-গুলো অনুবাদের পর খাড়া হয়ে হয়ত অন্য অর্থমূলক হয়ে পড়েছে।”

লোকসভায় সাইপ্রাস হইতে খচ্চর আমদানির প্রসঙ্গে বেশ হাসাহাসি হইয়াছে। সৈন্যদের মালপত্র বহনের জন্য খচ্চরের প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন যে, আপাতত সাইপ্রাস হইতে খচ্চর আমদানি করিলেও ভারতে খচ্চর

উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—“ভারতীয় খচ্চর নিশ্চয়ই নোবল অ্যানিমেল সুতরাং খচ্চর না বলে এগুলিকে অশ্বতর বলাই ভালো। সংসদ সদস্যগণ কথাটা ভেবে দেখবেন!!”

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ময়দানের তিনটি ঘেরা ফুটবল মাঠের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বুধবার হইতে।—“মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা—ভালোই হল। কিন্তু আগে বলেছি, আবারো বলি, ময়দানের গাছগুলির কর্তৃত্বও যেন সরকার গ্রহণ করেন। স্টেডিয়াম তো আর হবে না, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।”

বিলাতের সংবাদঃ মহিলা উপরওয়ালা-দের হুকুম তামিল করিতে আপত্তি আছে কিনা এই প্রশ্ন কোন কর্মপ্রার্থীকে করা হইলে উত্তরে প্রার্থী জানাইয়াছে—নিশ্চয় আছে। অন্যান্য অনেক প্রার্থীই নাকি এই আপত্তি করিয়াছেন।—“তার মানে প্রার্থীরা বিবাহ করেন নি এবং বলতে কি বিবাহের ছেলে বড়ও করেন নি। করে থাকলে আর এত বড় দায়ের কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ট্রাক ড্রাইভার

কল্যাণ বসু

ফিরছিলাম দুর্গাপুর থেকে বাইরোড। রাত হয়েছিল। শ্রীরামপুরের নিকটে একটি ছোট কালভার্টের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে হাজারো গাড়ির ভিড়। ব্রীজের দুধারে মুখোমুখি হেডলাইট নিবিয়ে দাঁড়িয়ে দুটি ট্রাক; কেউ কারো পথ ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নয়।

একজন অন্তত পিছু হটে না এলে পথ পরিষ্কার হবে কি করে? আমাদের এপাশের ট্রাকের ড্রাইভারকে বললাম, 'ড্রাইভার সাব, আপনি না হয় থোরা মেহেরবানি করে একটু পিছনে সরে আসুন।'

ট্রাকের চালক আমাদের কথা শুনে বললে, 'নাহি সাব, ইসে ইজ্জত কি বাত।'

মানে বুঝলাম সারারাত এমন কি সারা-দিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকবে তবু আগে যেতে দিয়ে ইজ্জত হারাবে না। যাই হোক, আমাদের কথার মান রেখে ড্রাইভার সাব তাঁর ট্রাকের হেডলাইট জ্বালিয়ে কিছুটা পিছিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে লরির কনভয় চলতে শুরু করল। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল কিন্তু ট্রাকের শেষ নেই। বিরাট বিরাট ট্রাকগুলি হেডলাইট জ্বালিয়ে, চোখ অন্ধ করে দিয়ে, শব্দ তুলে সাঁতসাঁত বেরিয়ে যায়। আমরা পথ পাই না।

ট্রাক ড্রাইভার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে 'সাব, আপনাকে তখনই বলেছিলাম এরা কি 'ইনসান' আছে? এরা জানবার। এরা সারারাত ধরে চলবে আর আমরা খাড়া থাকবো।'

আমি বললাম, 'ড্রাইভার সাব থোরা মেহেরবানি করে আপনও এগিয়ে পড়ুন; আমরা পিছনে আছি।' যাইহোক, ওপাশের অল্প একটু বিরতির মাঝে আমাদের কনভয় শুরু হল। ওপাশে এসে দেখি যত ট্রাক পার হয়েছে তখনও দ্বিগুণ দাঁড়িয়ে গ্রান্ড-ট্যাঙ্ক রোডে।

*

..চায়ে চুমুক দিয়ে ট্রাক ড্রাইভারটিকে বললাম, 'মনে হয় কলকাতা থেকে প্রতিদিন পাঁচ-ছশো ট্রাক চলাফেরা করে, তাই না?"

ট্রাক ড্রাইভার তখন সিঙ্গাড়াটি চামচ দিয়ে আধখামা করছিলেন। চাটনি সহযোগে গালে পুরলেন, চায়ে চুমুক দিয়ে আওয়াজ তুলে বললেন—'কি বললেন, পাঁচ-ছশো! কমসেকম পচিশ হাজার ট্রাক হররোজ কলকাত্তাসে যানা আনা হয়।'

আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই। এত ট্রাক কলকাতা থেকে যাতায়াত হয় জানতাম না তো। আপনারাই কি জানেন? শুনলাম আজকাল ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে ট্রাকেই সারা ভারতে যে কোন স্থানে মালপত্র প্রেরণ করা হয়। ট্রেনে প্রেরণে যথেষ্ট বিলম্ব হয়, অসুবিধা হয় আদান প্রদানের কাজে। কিন্তু ট্রাক আপনার বাড়ি থেকে মালপত্র তুলে

দেখলাম ধুলিধূসর রুক্ষ চুল, গলায় মাফলার জড়ানো

বাড়িতেই পৌঁছে দেবে। অবশ্য মূল্য কিছু অতিরিক্ত পড়ে।

আমি দেখছিলাম ট্রাক ড্রাইভারটিকে। লম্বা, ধুলিধূসর রুক্ষ চুল, গলায় মাফলার জড়ানো। কালো স্ট্রাইপের শার্ট খাকী প্যান্টের ওপর ঝোলানো। চোখে-মুখে ক্লান্তি, রাত্রি জাগরণের চিহ্ন স্পষ্ট। অথচ চোখ দুটি স্বচ্ছ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কিছুদিন হতে ট্রাক ড্রাইভারদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা হয়েছিল। গ্রান্ডট্যাঙ্ক রোডে ওই দানব ট্রাকগুলি যখন পাশ কাটিয়ে যায় তখন কোন্ না ছোট গাড়ির চালকের স্টিয়ারিং ধরা হাত অল্প একটু কেঁপেছে। ওরা মদ খায়। মাতাল হয়ে চালায় শুনি। ওরা যদি কোন কিছু বাধা পায়, মানে না। সোজা তার উপর গাড়ি উঠিয়ে দেয়, শুনি আমরা। পথের মাঝে খানাখন্দে ওই ট্রাক-ড্রাইভাররাই ট্রাক উলটে মারা যায়, আমরা শুনি। যম যন্ত্রণাতীর মতো হাঁকার, এসব আমাদের জানা। আরো যা জানা [illegible] জানার জন্য আমার মন কৌতূহলী [illegible]। আমি ঘোরাফেরা করছিলাম ওদের আড্ডায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। হাওড়া পুলের আশেপাশে, বিবেকানন্দ রোডের ধারে, চিৎপুরের পাশে, বড়বাজারের মাঝামাঝি আসাযাওয়া হল। ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে মারোয়াড়ী ও শিখেদের একচ্ছত্র অধিকার দেখি। কিছু বাঙালী ব্যবসায়ী আছেন। ট্রান্সপোর্টের অফিসগুলিতে রেটের কোন বলাই নেই। সাধারণত এই সব জায়গায় ঘোরাফেরার সময়ে নিজেকে লেখক হিসেবে বিন্দুমাত্র পরিচয় দেওয়া যায় না. কারণ লেখকের কাছে কোন কিছু অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে এসে মানুষ মাত্রই কিছু বাড়িয়ে বলবেন। অতএব আমার কিছু আসবাবপত্র ট্রাকে করে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত দেওয়ার প্রয়োজন।

কয়েকটি রেটকার্ড ও কার্ডের আমার ব্যাগ অধিকারী হল। হাওড়া ব্রীজের মুখোমুখি একটি ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে পথে নেমেছি। একজন ট্রাক ড্রাইভার ডাকলেন—"শুনিয়ে।"

—ফিরে দাঁড়ালাম—

"আপনার সামান কোথায় নিয়ে চলবেন?"

হেসে বলি, লক্ষ্ণৌ।

সে আর একটু কাছে এগিয়ে এল। চুপি চুপি বললো, 'আমি আপনার সামান ঘর থেকে উঠিয়ে নেবো। শর্দাপিয়া দেবেন।'

একজন ট্রাক ড্রাইভার পিছন থেকে ডাকলেন, শুনুন

ট্রান্সপোর্ট আফিসের ক্লার্কটি জানালো পাঁচশো টাকা। ড্রাইভার জানালো একশো টাকা! স্বভাবতই একটু কৌতূহলী হলাম। বললাম—'আপনার সাথে কথা আছে। আসুন একটি দোকানে বসে চা খাই আপত্তি নেই তো!

"চলিয়ে।"

চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি। একটি ছোট লরি পিছন থেকে হর্ন দিল। সে অবজ্ঞাসূচক একবার পিছনে চাইলে—একটা শব্দ উচ্চারণ করে বললে—'শালা উল্লুর তাগ্! কেন জ্বালাচ্ছিস।'

আমি বলি, 'সে কি মশাই, পথ ছেড়ে দেওয়া তো আমাদেরই কাজ।'

সে বললে—'বেংগল বডি ট্রাককে রাস্তা ছোড়কে দেবে পাঞ্জাব বডিট্রাকের ড্রাইভার? দেখ লড়িয়ে! শালা, গুঁড়া হয়ে যাবে।'

আশ্চর্য কথা শুনি। বলি 'সে আবার কি জিনিস। পাঞ্জাব, বেংগল বডি, কি সেটা?'

সে বললে, 'ওই দেখুনে পাঞ্জাবমেড বডি, যেগুলি আপনারা বলেন দৈত্য। আরো আছে হাফ পাঞ্জাব বডি। কলকাতার রাস্তায় যে লরি চলের থাকে সেগুলি বেংগল বডি।'

এরপর চিৎপুর রোডের পাঞ্জাবী দোকানে এসে আমরা বসলাম। চা ও সিগারেটে যথোপযুক্ত আপ্যায়ন হল।

সে একটু লজ্জিত হয়ে বললো, 'এসব কেন, এসব কেন?'

আমি বলি, 'লিজিয়ে, খাইয়ে। কেয়া হুয়া?'

সে চায়ে চুমুক দিয়ে বললো, 'এখানে চায়ের দাম কত? দুয়ানা, নেহি? কিন্তু গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোডের সরাইখানা এক কাপ চায়ের দাম আট আনাসে দেড় রূপিয়া যাচ্ছে।'

"কি বলছেন? সে কি চা?"

'হা, সে চা পিলে নিদ আসবে না। ট্রাক চালাতে চালাতে আপনার যদি নিদ আসে, কোন সরাইখানার রুকে বোলে দেখুন—'দেড় রূপিয়াকে চা বানাও।' বাস, নিন্দটিন্দ সব ছুটে যাবে।' ওই সরাইখানার চাওয়ালারাই তো হামাদের জিম্মাদারী।'

"দেড় টাকার চা খুব স্ট্রং বুঝি?"

"না, খুব কড়া কিছু নয়। তবে নানা মসলার বানায়। চা পিয়ে আপনি রাত ভোর 'ডেরাইভ' করতে পারেন। আঁখ বিলকুল পাথর হয়ে যাবে।"

একটু থেমে বললে—'আফিম-টাফিম থাকে বোধ হয়।'

"আপনাদের খুব ঘুরে বেড়াতে হয়, তাই না?"

"জরুর......সারা হিন্দুস্তান ঘুমেছি। কোত জায়গাসে মাল নিয়ে এলাম। দিয়ে এলাম। এই-তো সেদিন আসাম থেকে এক সার্কাস পার্টির তিনঠো হাঁথি নিয়ে এলাম ট্রাকে চড়িয়ে।"

"তিনটে হাতি নিয়ে এলেন?"

"কেন! কি আছে। আমার পাঞ্জাব বডি টারাক তিনঠো কেন পাঁচঠো হাঁথি আনতে পারে।...হাঁথির বাপ আছে।"

আমি হেসে ফেলি। বলি,—"তাই বুঝি তোমরা মদমত্ত হস্তীর মতো ট্রাক চালাও। ট্রাক চালাতে হলে আকণ্ঠ মদ বুঝি পান করতেই হয়! এত অ্যাকসিডেন্ট হয় কেন?'

মুহূর্তে সে গম্ভীর হয়ে গেল। বললো—"তোমরা কি মনে কর? সরাব পিয়েই আমরা আকসিডেন করি? এ কথা তুমি জান না, অনেক টারাক ডেরাইভার সরাব ছোঁয় না। আর সরাব না পিলে শরীরে তাগৎ আসবে কি করে। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সরাই-খানায় লোভ কম? মেয়েগুলো ডেরাইভার-দের ধরার জন্য ওৎ পেতে আছে। কত কষ্টে হামরা নিজেদের জান বাঁচাই জান? আক্সিডেন কেন হয় বলতে পার?"

"কেন?"

"ট্যারান্সপোট সাবদের জন্য—আমরা ডেরাইভাররা যত জলদি টিরিপ খতম করি না, ওরা আমাদের আরো জলদি চলতে হুকুম দেয়। জলদি টিরিপ হলে ওরা পয়সা যাদা কামাবে। হামাদের নোকরিও ঠিক থাকবে, বাল-বাচ্চা বাঁচবে। হামরা রাতে ঘুমোই না, দিনভি না। এসপেশাল চা পিয়ে পিয়ে রাতভোর ঠিক চালাই, দিনভোর চালাই। তবু সাব, হামরাও মানুষ আছি, হামাদেরও নিদ আসে। নিদ এলেই লড়িয়ে দিই। হামরাইতো খতম হই।...সাহেব সরাব পিই; সরাব না পিলে চালাতে পারি না ঠিক। গায়ে তাগৎ আসে না। তবু হামাদেরও জানের মায়া আছে! হামাদেরও বিয়ে-শাদী, বাল-বাচ্চা আছে! আমরা বেহুঁশ হয়ে হাঁকাই না।...একথা যারা বলে তারা কুছু জানে না।"

একটু থেমে বললো—"হামাদের এক একটা ট্যারাকের দাম কোত জানেন—পঁচিশ-তিশ হাজার রূপিয়া। হামার গাড়ি লোলাণ্ড আছে—যাদা দাম। ই গাড়িকে কটসে লড়িয়ে দিতে পারি?...সাব, আপনার সামান কোথায় উঠিয়ে লেবো ঠিকানা দিন। জলদি পৌঁছিয়ে দেবো।'

আমি একটু থেমে বলি—'আপনি যে আমার জিনিসপত্রগুলি লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দেবেন আমায় রসিদ দেবেন? ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর কর্তারা জানবেন তো?'

ট্রাক ড্রাইভার চিৎকার করে উঠলেন—'আমি আপনাকে লিখে দেবো। সবাই কি কর্তারা জানবে। সব কামের হিসাব দিতে হবে নাকি। রাস্তায় কোত খরচা আছে... পুলিসকে কুছু খানা খাওয়াতে হয়। এ সব পয়সা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী দেয়? হামাদের পথে কোত বিপদ হয়—জানেন সাব—আজ পোনরা বরষ টারাক হাঁকাই, তার আগে পাঁচ বরষ ক্লিনার ছিলাম। টারাক সাফ করেই ড্রাইভার বনতে হয়।'

আমি জানতে চাই সকল ট্রাক চালকের এই রকম পরিবর্তন হয় বুঝি?

'হামেশাই'—একটু থেমে বললে,—

"আমাদের জীবনে কি আছে বলো সাব। আজ এখানে, তিনদিন পরে অন্য কোন শহরে। দিল্লী, বোম্বাই, আগ্রা, কলকাত্তা দৌড়াতে হচ্ছে। সারা হিন্দুস্থান ঘুরছি। যা কিছু দোস্ত বল, আসিস্টেন বল সবই ওই ক্লিনার। যা কিছু দুখ বল, আনন্দ বল ওই ক্লিনারই হামাদের সাথী।

"ড্রাইভার সাব তুমি শাদী করেছ?"

সে হেসে বললে—"শাদী তো হয়েছে, কিন্তু ঘর যানার টাইম কোথায় হয়। এই শালা রুপিয়া কামাতে এসে। টাবাকের আওয়াজ শুনে বহু হামার জানলায় এসে খাড়া হয়—আমি জানি—শুনতে পাই কেরোয়ারীর আওয়াজ, দেখতে পাই আঁখি পানি, শ্বাস নিলে ওর গায়ের গন্ধ পাই। বুঝি তার কষ্ট। তবু আমি টাবাক নিয়ে দৌড় লাগাই।...এ দুনিয়া রুপিয়ার সাব। বহুৎ জরুরৎ রুপিয়ার।'

আমি বললাম,—"তোমাদের ইন্টার-প্রভিন্স যাতায়াতকারী পাঞ্জার বড় ট্রাকের পিছনের সিটে একটি মানুষের ভালোভাবে শোবার মতো স্থান আছে আমি দেখেছি। বহুকে সাথে রাখ না কেন?'

সে জিভটিভ কেটে বললে—'নেহি সাব, আয়সা কাম নেহি হোতা, হামার বহু গাঁও মে আছে। হামার বুড়া বাপ মা আছেন, ভাই-বাহিন আছে, হামার লেড়কা আছে—এই, এইটুকু। হামার বহু সংসার দেখে। আমি তাকে কি করে আনবো। রুপিয়া কামাই। ভেজ দিই—বাস। ওরা সুখেই আছে।" হঠাৎ কথা থামিয়ে ড্রাইভারটি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। (তোমাকে এতসব কথা বলছি কেন! তোমার বাড়ির ঠিক না বল। কাভের কথন এস। তোমার জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ।) আমি ওর মুখে লেখা কথাগুলি পড়তে পারলাম।

তখনো নানা প্রসঙ্গে চলতে উঠতে লাগল। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। চোখের দিকে তাকিয়ে বললে—'হামার সময় হয়েছে এখন উঠবো। পাটনায় ফেটাসে টিপিন দিতে হবে আজই।' তারপর হেসে ফেললো। বললো—"তুমি আসলে হামার কাছে গল্প শুনতেই চাও মনে হচ্ছে। 'সামান' লক্ষৌ পৌঁছে দেওয়া তোমার ঝুটাবাৎ।

আমি স্বীকার করলাম। তাকে আশা দেওয়ার জন্য মাপ চাইলাম। বিল মিটিয়ে দিয়ে পথে নামলাম।

পথে নেমে ও আমার হাতটা চেপে ধরল—'তুমি কাহানীকার আছো! হামাদের সাথে কয়েকবার বেরিয়ে পড় সাব, অনেক জিনিস দেখতে পাবে। হামাদের নিয়ে লিখো।'

তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বিবেকানন্দ রোড ধরে পশ্চিমমুখো এগিয়ে গেল।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আজও যখন আমরা চলি, ওই ভয়ংকর ট্রাকগুলি দেখে সভয়ে ব্রেক চাপি। ওদের ওপর প্রসন্ন হতে পারি না। ওরা কিন্তু আপন মনে চলে, সারা ভারত চলে। কয়েকটি ঘণ্টার আশ্রয়, বাসা বাঁধে—মরূদ্যান। পথের ধারের সরাইখানাগুলিতে। দানাপানি খেয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম শেষে নব উদ্যমে চলা শুরু হয় এক সাথে। গতি ওদের পায়ে বাঁধা। ওরা যেন মরুভূমির বুকে আরব ব্যবসায়ীর দল—আধুনিক যুগের ক্যারাভান।

সাহিত্য পুরস্কার ঃ ১৩৬৯

কেউ কেউ বলেন, সাহিত্যের স্বীকৃতি স্বদেশে হলে যত বিদেশে হলে তত নয়। কারণ, যিনি যে-দেশে যে-সমাজে বসে তাঁর সাহিত্যরচনা করছেন তার যোগ্য বিচার সেই সমাজের মানুষ যতটা করতে পারে অন্যে ততটা নয়। এই যুক্তি একেবারে বাতিল করা যোমহয় উচিত হবে না। সম্প্রতি দেখলাম, কলকাতার কয়েকটি পত্রিকা প্রতি বৎসরের মতন এবারও তাঁদের সাহিত্য-পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। এই পুরস্কারকে সরকারী পুরস্কার অপেক্ষা হীন মনে করার কারণ নেই। প্রসঙ্গত বলা উচিত, গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার কয়েকটি দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা স্বদেশীয় সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ কয়েকটি পুরস্কার দিয়ে যাচ্ছেন।

এ বছরে—অর্থাৎ ১৩৬৯ সালের পুরস্কার নিম্নলিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে :

'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকার তরফ থেকে প্রফুল্লকুমার পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী ও সুরেশচন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীকালিদাস রায়। প্রত্যেকটি পুরস্কারের সম্মান-দক্ষিণা ১০০০্ টাকা।

"অমৃতবাজার" ও "যুগান্তর" পত্রিকার তরফ থেকে মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার পুরস্কার শ্রীবুদ্ধদেব বসু। এই পুরস্কার দুটিও সম্মান দক্ষিণা ১০০০্ টাকা করে।

"মৌচাক" পত্রিকা শিশু-সাহিত্যের জন্যে এবারে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে পুরস্কৃত করেছেন। পুরস্কার-এর সম্মানমূল্য ৫০০্ টাকা।

"উল্টোরথ" মাসিক পত্রিকা কবিতার জন্য পুরস্কার দেন। বর্তমান বছরে শ্রীউমা দেবী উক্ত পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কারের সম্মানমূল্যেও ৫০০্ টাকা।

আমরা পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকেই অভিনন্দন জানাই।

হাসির লেখা

কেউ কেউ আমায় বলেছেন কিংবা বলা যায় উপদেশ দিয়েছেন, অত কথা লেখেন মশাই, একটু-আধটু হাসির বিষয় লেখেন না কেন। সাহিত্য কি হাস্যরস বাদ দিয়ে? বাংলা সাহিত্যের এই গোমড়ামুখ দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে। দয়া করে মাঝে মাঝে এমন কিছু লিখবেন যাতে দু দণ্ড মন খুলে হাসতে পারি।

আমার প্রতি কোনো কোনো পাঠকের [illegible] উপদেশ আমি সবিনয়ে পাঠ করেছি। [illegible] কথা নেই, [illegible] থেকেই [illegible] উপদেশ এবং

বিদুর

দৈবঔষধ দুইই সবিনয়ে হাত পেতে নিতে হয়, তারপর আড়ালে ফেলে দিতে হয়।

আমায় যাঁরা হাস্য-রসের যোগান দিতে বলেছেন মাঝে মাঝে, তাঁদের উপদেশ কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষে আড়ালে আবর্জনায় ফেলে দিচ্ছি না; পরিবর্তে এক প্রতিষ্ঠ হাস্য-রসিকের লেখা থেকে কথা ধার নিয়ে কিছু উপদেশ বিতরণের চেষ্টা করছি।

প্রথমত বলি এই হাস্যরসিক ব্যক্তিটির নাম জর্জ মাইকস। হাস্যরসাত্মক শিল্পী হিসাবে বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি একটি ইংরেজী (বৃটিশ) সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি হাস্যরসাত্মক লেখা লিখে যাচ্ছেন।

তাঁর যে লেখাটির সারাংশ আমি গ্রহণ করতে মনস্থ করেছি তার শিরোনামা এই রকম : "কি করে কোনও লেখককে চটাতে হয় ?" বলা বাহুল্য এটি তাঁর এবং আমার উপদেশমূলক লেখা।

মাইকস প্রথমে বলেছেন : আমার এবার-কার বক্তৃতার বিষয় হবে—কি করে লেখকের জীবন অসহ্য করে তোলা যায়। কাজটা একেবারেই কষ্টকর নয়। কোনো পাঠক যেন মনে না করেন, আমি একা আমার আর কতটুকু সাধ্য! একাই একশোর মতন কাজ করা সম্ভব।

আমার উপদেশ হচ্ছে পাঁচটি।

(ক) প্রথম উপদেশ ॥ সরাসরি নিজে গিয়ে লেখকের সঙ্গে দেখা কর। লেখকদের কাছে গিয়ে হামলা করলে তারা তোমায় হঠাতে চাইবে। তুমিও সহজে হটবে না। তবে কি, লেখকদের কাছাকাছি গেলে তোমার নিজেরই খারাপ লাগবে। লেখকমাত্রই দর্শককে হতাশ করে।

(খ) দ্বিতীয় উপদেশ ॥ যদি লেখকের সঙ্গে সশরীরে গিয়ে দেখা করা না যায় তবে চিঠি লেখা শুরু কর। সব রকম চিঠিই লেখা যায়। তবে সেই সব চিঠিই জুতের হবে যদি সেই লেখকের কোনো বই থেকে দু-চারটে ভুল, দু-একটা প্রশ্ন তুলে তোমার চিঠিটা কায়দা করে লিখতে পার। চিঠিতে প্রশংসা থাকতে পারে, নিন্দা থাকতে পারে, থাকতে পারে রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এমন কি লম্বা-চওড়া উপদেশ। গালাগাল যদি দিতে চাও তাও দিতে পার তবে সামলে। তেমন তেমন জায়গায় সরাসরি কিছু টাকা চেয়ে পাঠাতে পার। সাহায্য অথবা [illegible] দেখিয়ে। তবে লোক বুঝে—এবং লেখকের বইয়ের কাটতি বুঝে, তোমার অর্থের পরিমাণ স্থির করতে হবে।

(গ) তৃতীয় উপদেশ ॥ তোমার পাণ্ডুলিপি—মোটা মোটা পাণ্ডুলিপি—লেখকটিকে রেজিস্ট্রি করে পাঠাতে শুরু কর। পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যে-চিঠিটা লিখবে—তাতে লিখে দিও, "আমি, আপনার মতন করে লেখবার চেষ্টা করেছি। দয়া করে শুধরে দেবেন।". লেখকরা যখন অন্যকে তাঁর মতন করে লিখতে দেখেন তখন তাঁদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

(ঘ) চতুর্থ উপদেশ ॥ যে-লেখককে তুমি চটাতে চাও তাকে বার বার কোনো সভায় বক্তা করে নিমন্ত্রণ জানাও। দমে গেলে চলবে না। কেননা, যে-লেখক সভায় বক্তৃতা করতে আসে সে বেচারী একবার এসেই বুঝতে পারে সভার উদ্যোগকারী থেকে সভাপতি সবাই তাকে অপমান করেছে। আরও উত্তম হয়, যদি লেখকটিকে সভায় ডেকে—এমন এক সভাপতি ছেড়ে দাও, যিনি প্রথমেই তাঁর ভাষণ শুরু করবেন এবং সভা সমাপ্তির সামান্য আগে ভাষণ শেষ করবেন।

(ঙ) পঞ্চম উপদেশ ॥ স্বাক্ষর সংগ্রহ। তোমার বই ছবি চিঠি অটোগ্রাফ খাতা যা আছে— একে একে সবই লেখকের কাছে নিয়ে গিয়ে ধর, এবং বল—এটাতে আপনার একটা সই দিয়ে দিন। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে সই চাওয়া। টুকরো কাগজের মজা এই যে সেটা থাকে না এবং লেখক তা বিলক্ষণ জানেন।

মাইকস-এর এই উপদেশ কটি, আমার ধারণায় যে কোনো লেখককে রীতিমত বিপর্যস্ত করতে পারবে। এবং আমার উপদেশ বাঙালী পাঠকরা ইচ্ছে করলে একবার হাতে-কলমে এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। (তবে সত্যিই যেন কোনো পাঠক এমন কাজ না করেন।)

আর বলা ভাল এর কোনো উপদেশই যেন আমার প্রতি প্রয়োগ করা না হয়। কেননা স্বভাবতই আমার আবার অন্য রকম উপদেশ আছে যা লেখকদের দেওয়া যায় শুধু।

সাহিত্যে অসাধুতা ঃ আরও একটি নিদর্শন

মাননীয় বিদুর সমীপেষু,

গত ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৩-র সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় "সাহিত্যে অসাধুতা"র আরেকটি দৃষ্টান্ত পাঠ করে বিস্মিত হলাম। আমরা জীবনী গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মণি বাগচির আরও কয়েকটি অসাধুতার নিদর্শন আপনার বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠালাম।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] [illegible]

মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ ১৩৬৪ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখের রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৬৫ সনে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মণি বাগচীর লিখিত "বাংলা সাহিত্যের পরিচয়" গ্রন্থের মধুসূদন সম্পর্কিত অধ্যায়ের ১৪৪ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত বাগচী ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের অনেক অংশ উদ্ধৃত চিহ্ন ব্যতীত এবং প্রবন্ধকারের নামোল্লেখ ব্যতীত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলিত ভাষায় লিখিত ক্রিয়াপদগুলি শ্রীযুক্ত বাগচী সাধুভাষায় রূপান্তরিত করেছেন।

ক ॥ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: "মধুসূদনের স্বরূপ পরিচয় নিহিত আছে তাঁর জীবনব্যাপী কবি-প্রস্তুতি ও কাব্য সাধনার ইতিহাসে। তিনি সমস্ত জীবন ধরে নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিষ্ঠালাভ হবার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর সমস্ত ভুল ভ্রান্তি, পিতা মাতার অবাধ প্রশ্রয়, উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারিতা, মাত্রাহীন ভোগবিলাস ও ... খেয়ালী মেজাজ, পাণ্ডিত্য আত্মপ্রত্যয় ও করুণ আত্মনিবেদন—সবই তাঁর কবি পরিণতির সোপান। তিনি নবযুগের কবিপ্রতিভাকে বাংলা সাহিত্যে রূপ দেবার জন্য যে মহাযজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন, এ সবই তার সমিধ ও ইন্ধন।" (রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা: পৃঃ ৫ ও ৮ দ্রষ্টব্য। ৩০শে চৈত্র, ১৩৬৪)

মণি বাগচী: "মধুসূদনের স্বরূপ পরিচয় নিহিত আছে তাঁহার জীবনব্যাপী কবি প্রস্তুতি ও কাব্য সাধনার ইতিহাসে। তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া নবযুগের শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিষ্ঠালাভ হইবার সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি, পিতা-মাতার অবাধ প্রশ্রয় উচ্ছৃঙ্খল অমিতাচারিতা, মাত্রাহীন ভোগবিলাস ও ... খেয়ালী মেজাজ, সুগভীর পাণ্ডিত্য ... আত্মপ্রত্যয় ও করুণ আত্মনিবেদন—সবই তাঁহার কবি পরিণতির সোপান। তিনি নবযুগের কবিপ্রতিভাকে বাংলা সাহিত্যে রূপ দিবার জন্য যে মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন এ সবই তাঁহার সমিধ ও ইন্ধন।" (বাংলা সাহিত্যের পরিচয় পৃঃ ১৪৪: প্রথম সংস্করণ দ্রষ্টব্য।)

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত প্রবন্ধের ... কয়েকটি অংশ শ্রীযুক্ত বাগচী নিজের নামে বলে চালিয়েছেন।

শুধু তাই নয় আরও আছে। শ্রীযুক্ত কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত নবীনচন্দ্র সেনের "প্রভাস কাব্যের (৪র্থ সংস্করণ: ১৩৬৩) একাধিক অংশ (পৃঃ ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য) শ্রীযুক্ত মণি বাগচী উক্ত গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠায় বেমালুম নিজের বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন।

খ ॥ কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়: "ঊনবিংশ শতকের যুগবৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য প্রবণতার স্বাক্ষর তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ মানবীয় আদর্শ, মানবের রহস্যময় অন্তরের সন্ধান, মানুষের সত্য সৌন্দর্যময় বাস্তব-জীবনের ইতিহাস প্রধান। ইংরেজশাসনের পূর্বে যে মঙ্গলকাব্য, সেখানে অন্ধ বিশ্বাসে মনুষ্যত্বকে খর্ব করিয়া দেবত্বকে স্থান দেওয়া একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।"... ("প্রভাস" কাব্যের ভূমিকা পৃঃ ৯-১০, ৪র্থ সংস্করণ ১৩৬৩)

মণি বাগচী: "ঊনবিংশ শতকের যুগবৈশিষ্ট্য এবং সাহিত্য প্রবণতার স্বাক্ষর তাঁহার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ মানবীয় আদর্শ, মানবের রহস্যময় অন্তরের সন্ধান, মানুষের সত্য সৌন্দর্যময় বাস্তব জীবনের ইতিহাস প্রধান। ইংরেজশাসনের পূর্বে যে মঙ্গলকাব্য, সেখানে অন্ধ বিশ্বাসে মনুষ্যত্বকে খর্ব করিয়া দেবত্বকে স্থান দেওয়া একটি আকর্ষণের বস্তু ছিল।" (বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, পৃঃ ১২৫, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৫)

বিভিন্ন উদ্ধৃতির ফলে চিঠিটি কিছুটা দীর্ঘ হল। কিন্তু তথাপি আপনার বিভাগে প্রকাশের জন্য এই চিঠি না পাঠিয়ে পারলাম না।'

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
শিবপুর, হাওড়া

কলংকিত জীবন ও প্রেম : একটি ছোট উপন্যাস

নিশিপদ্ম—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাক সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

রাত্রির হাটে যারা দেহ বিক্রি করে, তাদের ব্যবসার জমিতে ভালবাসা যেন আগাছা। এই নিষ্ফলা আগাছা ওরা নির্মমভাবে উপড়ে ফেলে দেয়। ওদের জীবনের পাঁকে কখনও প্রেমের পদ্ম ফোটে না। পতিতা কাঞ্চন-মালার জীবনে কিন্তু প্রেমের "নিশিপদ্ম" ফুটেছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন নাতি-দীর্ঘ উপন্যাস "নিশিপদ্ম"। কাঞ্চনমালা ও তার পাপ-ব্যবসায়ের বিষফল কন্যা মুক্তা-মালার কাহিনী লেখক এই গ্রন্থে রচনা করেছেন। কাঞ্চনমালার অন্ধকার জীবনে দিনের আলোর মতই এসেছিল এক অতিথি। দেবদূতের মত। তার কীর্তন শুনে পতিতা হল প্রেমিকা। প্রেমাস্পদরূপে সে তাকে পায়নি। কিন্তু গুরুপদে তাকে বরণ করে বহু যন্ত্রণা সয়ে সে মুক্তি নিল পাপের জীবন থেকে।

মুক্তামালাও যেন একটি নিশিপদ্ম। অন্ধকারের পঙ্ক থেকে তার জন্ম। তার জীবন পবিত্র হলেও জন্মপরিচয়ের কলঙ্ক তাকে পদে পদে বিড়ম্বনার সম্মুখীন করেছে। তা ছাড়া তার শোণিতকণায় রয়েছে ব্যাভিচারের বীজ। তাই সুন্দর সুস্থ জীবন চাইতে গিয়েও সে ভুল করল।

রসসিদ্ধ কাহিনীকার এই দুই রমণী-চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যে গল্পটি পাঠকদের শুনিয়েছেন, তার স্বাদ আলাদা। বৈষ্ণব প্রেমসাধনার সহজিয়া মরমী রসের স্পর্শ এই কাহিনীতে যেমন রয়েছে তেমনি এতে আধুনিক নাগরিক জীবনের উন্মার্গ-গামিতার রূপটিও বিধৃত। দুই পরস্পর-বিরোধী জীবনধারার রূপ, রঙ ও রসে সমৃদ্ধ এই উপন্যাস তারাশঙ্করের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হবে।

অল্পপরিসর এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের নিজস্ব রচনাশৈলীর ছাপটি সুস্পষ্ট। মুক্তামালার চরিত্র-কল্পনাটি সুন্দর, অভিনবও বলা চলে। কিন্তু কলঙ্কিত জন্ম-পরিচয়ের জন্য তার যে-সব দুর্ভোগ, তার মধ্যে নতুনত্ব নেই। ছাত্রীজীবনে এ ধরনের পিতৃপরিচয় হীনা মেয়েদের যে লাঞ্ছনা সইতে হয় তা আজকালকার মামুলী চলচ্চিত্রের কাহিনীতেও দেখা যায়। তবে মুক্তামালার জীবনের পরিণতি যুক্তিসম্মত ও বিশ্বাস-যোগ্য। কিন্তু কাহিনীর শেষে যে উদার-হৃদয় সংগীতজ্ঞ মহাপুরুষের সংস্পর্শে যে এসেছে, তার চরিত্রটিও পাঠকদের অতি-পরিচিত। আর নৃত্যপটিয়সী রূপে মুক্তা-মালার যশোলাভ শিল্পসম্মত কিনা, তা নিয়ে বিচারের অবকাশ আছে। (১০০।৬২)

সমুদ্র অনেক দূর—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৬। দাম—৩, টাকা।

মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী রচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে বহুবার সিদ্ধকাম আজকের পাঠকমাত্রই তা জানেন। এ ছাড়া, আজকের বাংলা সাহিত্যের সফল কয়েকজন লেখকের মধ্যেও এ-লেখক যে রচনায় সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কী পরিমাণে সার্থক তাও কারো অবিদিত নেই। তাঁর বর্তমান উপন্যাস 'সমুদ্র অনেক দূরে'-এ এই দুদিক থেকেই তাঁর সুনামকে অক্ষুন্ন রেখেছে কিংবা এক কথায় বলা যায়, যে বিশেষ দুটি গুণের জন্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাঠক মহলে সর্বাধিক পরিচিত, এ উপন্যাসে তার যথাযথ সমন্বয় ঘটেছে বলে এ গ্রন্থটিকে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে।

বর্ণনা দিয়ে এর কাহিনী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব, কেননা এ উপন্যাস শুধুই কাহিনী নয়। লেখকের সাহিত্য কর্মের সঙ্গে যার পরিচয় আছে তিনিই এ কথা স্বীকার করবেন। বধূর ভালবাসা আর নবনারীর প্রেমে কোনো দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। তবু যে এ দুয়ের সংঘাতে সুদাস ও নৃপতির মধ্যে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটে গেলো তার কারণ প্রথমটা সত্য হলেও দ্বিতীয়টা সত্য নয়, মোহমাত্র। জীবন এবং সংসারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা লেখকের মনে যে কী প্রবল এমন নিষ্ঠুর কাহিনীর কঠিন আবরণ ভেদ করেও তা সহজ আলোর মতো পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। এবং এইজন্যই এ উপন্যাস কারো কাছে শুধুমাত্র একটি কাহিনী বলে মনে হবে না তার চেয়েও বেশী, পাঠকমাত্রই কাহিনীর মর্ম কথাকে একটি চরম সত্য বলে স্বীকার করবেন। ৫১৩।৬২

গল্প সংকলন

মানুষের রঙ। বিরাম মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সম্বোধি পাবলিকেশন্স প্রা লিমিটেড, ২২ স্ট্রাণ্ড রোড, কলকাতা-১ ছ' টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

আর একটি সংকলন গ্রন্থ। লেখক বাইশ জন—যাঁদের কৃতী লেখক বলতে দ্বিধা নেই আদিতে আছেন তারাশঙ্কর, অন্তে সমরেশ বসু। গল্পগুলি গুণের বিচারে সম পর্যায়ে না হলেও মোটামুটি সুখপাঠ্য। আরো দু'তিনজন সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন অনায়াস কারণে, কিন্তু হননি এবং "স্থানাভাব"-এর যুক্তি দেখিয়ে সম্পাদক যথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন ('স্থানাভাব' কথাটি প্রায় বাদ্যাভাবের মতো শোনায়; যোগ্যতা সত্ত্বেও যাঁরা বঞ্চিত হ এ ব্যাপারে তাঁদের জন্য দুঃখ হয়।) পরবর্তী কথা : যেসব কারণে একটি সংকলন গ্র

বিবিধ

ইতস্ততঃ—এককলমী। প্রকাশক—ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—৬·০০।

কৌতুক, বিদ্রূপ, হাস্যরস সাহিত্যের চিরন্তন উপাদান। অবস্থা বিশেষে তারা কখনও কখনও তিক্ততা সৃষ্টি করলেও মোটের ওপর এসব উপাদান ব্যাপকভাবে সাহিত্যকে সরস করেই তোলে। বলা বাহুল্য এর কোনোটাই সহজে বা অনায়াসে তৈরি করা সম্ভব নয়। লেখকের মন ও মেজাজের ওপর সাহিত্যের এ-দিকটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

এককলমী যখন সাময়িকপত্রের পাতায় তাঁর ইতস্ততঃ প্রকাশ করতে শুরু করেন তখনই তা পাঠকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তার কারণ এই নয় যে সাময়িক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু কৌতুক, বিদ্রূপ বা হাস্যরসই তিনি পরিবেশন করেছেন। আজ আর কোনো পাঠকেরই অগোচর নয় যে ইতস্ততঃ সামাজিক বা অন্য নানা রকমের সংবাদকে আশ্রয় করে লঘু হাস্যরসের মাধ্যমে সত্যই সমাজসংস্কারকের মতো তার গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সুতরাং চকিত পাঠেই এর মূল্য ফুরিয়ে যায় না বহুক্ষণের জন্য তা পাঠককে চিন্তান্বিতও করে রাখে। অসংখ্য রচনা থেকে বাছাই করে লেখক এ সংকলন প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য বাঙালীর ঘরে ঘরে এ গ্রন্থ অবশ্যই সমাদর পাবে। আধুনিক সমাজের দর্পণই নয় সমাজের দুষ্ট ক্ষতগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনেও এ-গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন আছে আধুনিককালের প্রতিটি বাঙালীর। ৫৬২।৬২

প্রাপ্তি স্বীকার

দুই বাড়ী—শৈলেশ দে।

নতুন নগর—বিশ্বনাথ রায়।

শঙ্খ-হৃদয়—প্রবোধচন্দ্র পাল।

কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা—করুণাসিন্ধু দে।

দীপশিখা দ্যুতিময়—বিনয় মিত্র।

মনোবিদ্যা—ইন্দ্রকুমার রায়।

আনন্দের পাঁচালী—স্বস্থানন্দ।

দিন যাপন—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।

রূপান্তর—শ্রীনীরোদকুমার সরকার।

জীবন জিজ্ঞাসা—আইনস্টাইন অনুবাদক শৈলেনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপকথায় কলি — শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)।

পত্রালী—অতুল্য ঘোষ।

জেলে তিন বছর ও তারপরের বিপ্লব সংগ্রাম—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)।

[illegible]

চলচ্চিত্রের পুরস্কার

নতুন দিল্লিতে এ-সপ্তাহে চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হচ্ছে। দশ বৎসরেরও অধিককাল যাবত কেন্দ্রীয় সরকার চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ করে আসছেন। এই পুরস্কার ভারতের চলচ্চিত্র-কলার উৎকর্ষসাধনে কতখানি সহায়ক হয়েছে সে প্রশ্ন প্রতি বছরেই বিদগ্ধ চিত্রামোদীদের মনে নতুন করে জাগে।

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণের অল্প কয়েকদিন আগে বাংলা-দেশের চিত্রসমালোচকরা তাঁদের বিচারে '৬২ সনের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্রগুলির নাম ঘোষণা করেছেন। ছায়াছবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটি এবং বি-এফ-জে-এ'র দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। যে-ছবি চিত্রসমালোচকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারে তার স্থান দ্বিতীয়। বি-এফ-জে-এ'র বিচারে যে-ছবি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারে সে-ছবি আঞ্চলিক প্রশংসাপত্র লাভেরও যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

চিত্রসমালোচকদের বিচারকে কেউই হয়ত উপেক্ষা করবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারও উপেক্ষনীয় নয়। তবে দুটি সংস্থার বিচারের এই মেরুপ্রমাণ ব্যবধানটি কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করার মত। কোন্ সংস্থার বিচার ন্যায়সঙ্গত, এই আলোচনা এ ক্ষেত্রে অবান্তর। তবে বিচারশীল চিত্রানুরাগীদের এই দু'টি অন্তত অনুধাবন করতে অসুবিধে হবে না যে, চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার এমন এক নীতি গ্রহণ করেছেন যার সঙ্গে চিত্রসমালোচকদের রসজ্ঞান ও শিল্পবিচারের মৌলিক বিরোধ রয়েছে। অবশ্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জনে কী-ধরনের ছবি অগ্রাধিকার পেতে পারে সে-সম্বন্ধে চিত্র প্রযোজক ও পরিচালকরা অবহিত আছেন। কারণ সরকারী নীতি তাঁদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এই সরকারী নীতি চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম কিনা তা অবশ্য ভিন্ন প্রশ্ন। তবে সুধীজন এমন কোন পুরস্কার নীতিকে সমর্থন জানাতে কুণ্ঠা প্রকাশ করবেন যার বিধানে সত্যিকারের শিল্পসমৃদ্ধ ছবি যথা-যোগ্য মর্যাদালাভে বঞ্চিত থেকে যায়।

[illegible] [illegible] "পলাতক" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবির একটি দৃশ্যে রুমা [illegible]ঠাকুরতা ও অনুপকুমার

"লরেন্স অব অ্যারেবিয়া" ছবির নাম-ভূমিকায় পিটার ওটুল

"অস্কার"-বিজয়ী "লরেন্স অব অ্যারেবিয়া"

[ডেভিড লীন পরিচালিত "লরেন্স অব অ্যারেবিয়া" ছবিটি ১৯৬২ সনের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। ছবির পরিচালক ডেভিড লীন শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালনার জন্য "অস্কার" পেয়েছেন।]

আরবরা তাঁকে বায়ুদেবতার অবতার রূপে দেখতেন। চার্চিলের মতে তিনি ছিলেন 'বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।" জীবনীকার রিচার্ড অ্যালডিংটন কিন্তু তাঁকে ইতর অমার্জিত অর্ধ-সমকামাসক্ত, আত্ম-প্রচারবিলাসী ভণ্ড—(আরব-অভ্যুত্থানে যাঁর ভূমিকা ছিল নগণ্য)—হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। নাম তাঁর টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স। ১৯৩৫ সালে মারা যাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে বহু উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। তাঁকে নিয়ে তর্কের শেষ নেই শেষ নেই আলোচনার।

বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তাঁকে আরবে পাঠানো হয়েছিল। মাত্র তিন হাজার আরব সৈন্য নিয়ে তিনি কেমন করে তুর্কীদের পরাজিত করেন প্রখর সূর্যতাপ-দগ্ধ মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে কী করে তিনি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন এবং ডামাস্কাস অধিকার করেন তা আজ উপাখ্যানের সামগ্রী।

লরেন্সের কাহিনী নিয়ে এই প্রথম ছবি তৈরী হল। স্যাম স্পিগেল ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। পরিচালনা করেছেন "দি ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াই"—খ্যাত ডেভিড লীন। পনের মাস ধরে ছবির চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। ছবি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে এক কোটি ডলারেরও বেশী। ছবিতে লেগেছে দেড় হাজার উট ও পাঁচ হাজার ঘোড়া। কিন্তু এই জাকজমকপূর্ণ ছবির প্রধান আকর্ষণ একটি জটিল চরিত্র। তিনি হলেন লরেন্স।

তিনি শুধু সমর-কুশলীই ছিলেন না, শক্তিশালী লেখক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর রচিত "দি সেভেন পিলার্স অব উইজডম" বইটি বহুপঠিত। লরেন্স ছিলেন মরু-প্রেমিক। মরুভূমি তিনি [illegible]।

মন্দাকিনী প্রোডাকশন্স-এর "নিশাচর" (পরিচালনা : ভূপেন রায়) ছবির একটি দৃশ্যে সুস্মিতা সান্যাল ও গীতালি রায়

পারত, আকাশীর জন্য দর্শকের মন আকুল হতে পারত। কিন্তু না এই রসের আস্বাদন দর্শকের ভাগ্যে ঘটেনি।

ছবিটির এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ এর চিত্রনাট্য। নিরর্থক উপাদান এতে প্রাধান্য পেয়েছে, অবহেলিত থেকে গেছে অপরিহার্য নাট্যোপকরণ। চিত্রনাট্যে একাধিক ছোট উপকাহিনী সংযোজিত। এই সব কটি উপাখ্যানেরই পরিণতি আছে। কিন্তু পরিণতির পূর্বে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছবিতে তা অনুপস্থিত। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার যে নির্মম প্রতিজ্ঞা আকাশী একবার গ্রহণ করেছে, সাময়িকভাবে সে যেন তা বিস্মৃত হয়েছে। তার জীবনে নতুন নেশা এসেছে ঠিকই। কিন্তু পিতৃহন্তার সঙ্গে একই দ্বীপে যখন সে বাস করছে তখন তার মনে মাঝে মাঝে প্রতিহিংসার স্ফুলিঙ্গ দেখা যেতে পারত না কি পরে যখন সে হঠাৎ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে এবং ছবিতে একাধিক বেদনাদায়ক ঘটনা রূপ নেয়, তখন মনে হয় এর সব কিছুই যেন আকস্মিক, এবং প্রস্তুতি-নিরপেক্ষ। প্রস্তুতিবিহীন ঘটনা ও উপাখ্যান ছবিতে আরও অনেক আছে—যার মধ্যে আকাশীর নির্দেশে টিয়ারং দ্বীপবাসীদের সমীরণের বিবাহ-উৎসব বর্জন, কোম্পানীর বন্দুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও গাছে আগুন লাগানো এবং সমীরণ ও তমসীর প্রণয় ও পরিণয়ের ঘটনারাজিই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। যমনী, ফিরুজো ও মদনকে ঘিরে আবেগসমৃদ্ধ যে ত্রিকোণ নাট্যোপাখ্যান রচনার অবকাশ ছিল চিত্রনাট্যে তার সদ্ব্যবহার হয়নি। আলতা ও আকাশীর উপকাহিনীও আশানুরূপ নাট্যদ্বন্দ্বের অভাবে কিছুটা বিবর্ণ।

রাজীব পিকচার্স-এর "যাই হিজ" (পরিচালনা : দিলীপ মিত্র) ছবিতে অনুপকুমার ও মঞ্জু মজুমদার।

ছবিতে অপ্রয়োজনীয় নাচ-গানকে প্রাধান্য না দিয়ে চিত্রপরিচালক গুরু বাগচী চিত্রনাটকের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করার ব্যাপারে আরও বেশী যত্নবান হতে পারতেন। অবশ্য চিত্রকাহিনীর পটভূমিকা ও পরিবেশ রচনায় তিনি যে কল্পনাশক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তে দর্শকের মনে আবেগসঞ্চারের সাফল্যও তিনি অর্জন করেছেন। দৃশ্যবিন্যাসেও তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। নাট্যকাহিনী-বিন্যাসের দিক দিয়ে পরিচালক সর্বাঙ্গীণ কৃতকার্যতা দেখাতে না পারলেও কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপনে তাঁর রসবোধ লক্ষনীয়। অবশ্য ছবির শেষাংশে ফিরুজোর পুত্রশোক ও তার জীবনের ট্র্যাজেডির বিন্যাসটি আরও পরিমিত হতে পারত। টিয়ারং বাসীদের দ্বীপ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরের অংশটুকু অকারণে দীর্ঘায়িত।

ছবিতে 'দ্বীপের নাম টিয়ারং''-এর কাহিনীর গতি মন্থর হওয়ার কথা নয়। ছবিটি মন্থরগতি হত'ও না যদি একাধিক অনাবশ্যক ঘটনা ও পরিণতিহীন চরিত্র এতে স্থান না পেত। উদাহরণ স্বরূপ সোমেনের চরিত্রটি উল্লেখ করা যেতে পারে। ছবিতে এ চরিত্রের ভূমিকা কী পরিণতি কী রসের দিক থেকে এর সার্থকতাই বা কোথায়? অথচ এদের নিয়ে অনর্থক কতগুলি ঘটনা ছবিটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যেমন যুদ্ধ যে লেগেছে এই তথ্যটি দর্শকদের জানাবার জন্য সমীরণের মুখের কথা এবং টিয়ারং-এর উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়ো জাহাজই যথেষ্ট ছিল (এক্ষেত্রে সমীরণের ব্যাডমিণ্টন খেলার ব্যবস্থা এবং যুদ্ধের সংবাদ শোনার জন্য খেলা ফেলে চলে যাওয়ার ঘটনাটি অবান্তর।। এর জন্য যুদ্ধের কতগুলি আঁকা ছবি দেখাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ-সব নানা কারণেই ছবিটি শ্লথগতি হয়ে পড়েছে।

'দ্বীপের নাম টিয়ারং' যে শুধুই পরিবেশ প্রধান কাহিনী নয়, মূলত নাট্যধর্মী, এবং এই কাহিনী বিন্যাসে প্রয়োগ-কর্মের চমক দেখাবার জন্য আবেগহীন বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত রচনার অবকাশ যে সামান্য, পরিচালক যদি এ সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকতেন তবে ছবিটির আবেদন আরও বাড়তে পারত। তবে এই ছবিতে প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনার কাজে তিনি যে সাহস ও কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন তা সাধুবাদার্হ।

ছবির মধ্যে ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যা রায়, নিরঞ্জন রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, [illegible] ও দিলীপ

(উপরে, বাঁয়ে) 'মহানগর' ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ভিকি রেডউড (ডাইনে) 'মহানগর'—এর পরিচালক সত্যজিৎ রায় (মাঝখানে, বাঁয়ে) অনুরাধা গুহ, মণীষ চক্রবর্তী, শীলা পাল ও মাধবী মুখোপাধ্যায়কে স্ক্রিপট পড়াচ্ছেন সত্যজিৎ রায় (ডাইনে) ত্রিবেণীতে গৃহীত 'সংগম'এর একটি দৃশ্যে বৈজয়ন্তীমালা (নীচে) প্রযোজক-পরিচালক-নায়ক রাজ কাপুর ও বৈজয়ন্তীমালা।

ফটো—

আনন্দময়ী চিত্রপীঠ-এর "মহাতীর্থ কালীঘাট"-এর (পরিচালনা : ভূপেন রায়) একটি দৃশ্যে নবাগত শঙ্কর, উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পা

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করবেন শান্তি বসু ও বড় গোলাম আলী খান। কথক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করবেন মায়া চট্টোপাধ্যায় ও করুণা সরকার। যন্ত্র সংগীতে থাকবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। তৃতীয় অধিবেশনের আকর্ষণ চিন্ময়ী মুখোপাধ্যায়, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা পট্টনায়ক, ভীমসেন যোশী ও আমীর খাঁর গান এবং মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীপিকা গুপ্তের নৃত্য। প্রথম ও শেষ দিন সন্ধ্যা সাতটায় অধিবেশন শুরু হচ্ছে। দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যা ছ'টায়।

রবীন্দ্র মেলার উদ্যোগে রবীন্দ্র কাননে (বিডন স্কোয়ার) আগামী ২৫শে বৈশাখ থেকে দশদিনব্যাপী রবীন্দ্র মেলার বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। নৃত্য-গীত-নাটক-আবৃত্তি এবং বক্তৃতাদির মাধ্যমে রবীন্দ্র প্রতিভার একটি মনোজ্ঞ ও সর্বাঙ্গীন পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে মেলা সচেষ্ট। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষেও মেলার তরফ থেকে এই দুইজন মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্যোক্তা পরিষদ আগামী ৪ঠা মে নূতন সদস্য গ্রহণ এবং পুরাতন সদস্যদের নূতনীকরণের শেষ তারিখ ধার্য করেছেন। যাবতীয় তথ্য মেলার কার্যালয়ে (৩এ, বিডন স্কোয়ার, কলি-৬) পাওয়া যাবে।

গত সপ্তাহে ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীর ভবনে বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত খেয়াল গায়ক ওস্তাদ লতাফৎ হোসেন খাঁ খেয়াল গান করে সকলকে মোহিত করেন। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ তবলা বাদক নিখিল ঘোষ তবলা সঙ্গত করেন এবং তবলা-লহরা বাজিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। উভয়ের সঙ্গে পণ্ডিত রামনাথ মিশ্র সারেঙ্গী বাজান।

সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলা শিশির-নাট্য-প্রতিযোগিতায় "অঙ্গন" নাট্যসংস্থা (খড়্গপুর) কর্তৃক চিত্তরঞ্জন পাল রচিত 'ন্যাশনাল পার্ক' নাটকটি মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরে মঞ্চস্থ করা হয়। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সহ অপর নয়টি বিভাগে 'ন্যাশনাল-পার্ক' প্রথম স্থান অধিকার করে। পরিচালনায় অরুণকুমার মাইতি, আলোক-সম্পাত, সঙ্গীত ও মঞ্চ-সজ্জায় যথাক্রমে রতন দাস, বাসুদেব দাশগুপ্ত ও এস এস মাইতি স্ব স্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি নাটকের জন্য নাট্যকার চিত্তরঞ্জন পাল প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে অংশগ্রহণ করেন অরুণকুমার মাইতি (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা), অসিত সিংহ রায় বিভূতি ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বরঞ্জন বসু, জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র, আনন্দময় ঘোষাল, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য, ক্ষীরোদলাল চক্রবর্তী, পীযূষ রায়, অনিল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু ঘোষ, বাদল ঘোষ; এন পি দত্ত, চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা মজুমদার (শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী), আলো দাসগুপ্ত, প্রভৃতি।

বার্লিন চলচ্চিত্র-উৎসবে 'সাত পাকে বাঁধা'

আর ডি বনশল প্রযোজিত এবং অজয় কর পরিচালিত 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিটি বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদন করেছেন ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন। আগামী জুন মাসে বার্লিনের উৎসব শুরু হচ্ছে।

'মিত্রা'র শুভ-উদ্বোধন

'মিত্রা' একটি নতুন চিত্রগৃহের নাম। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের যে স্থানটিতে এতদিন ছিল 'চিত্রা' সেখানেই জন্ম নিয়েছে মিত্রা। ১লা বৈশাখের শুভপ্রভাতে 'মিত্রা'র উদ্বোধন করেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বোম্বাই সমাচার

লাডকে ভারতীয় জওয়ান এবং সামরিক কর্মচারীদের বীরত্ব ও সমর-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চেতন আনন্দ হিন্দী ও ইংরেজীতে একটি ছবি তৈরী করছেন। হিন্দীতে ছবিটির নামকরণ হয়েছে "হকিকত্", ইংরেজীতে "রিয়ালিটি"।

মণি ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অজন্তা আর্টস-এর মুঝে জিনে দো হিন্দী ছবির চিত্রগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। চম্বলের ডাক ও-অঞ্চলের পটভূমিতে তৈরী এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন প্রযোজক সুনীল দত্ত, ওয়াহীদা রেহমান, আনোয়ার হোসেন দুলারী ও রাজেন্দ্রনাথ। জয়দেব ছবির সুরকার।

প্লে-ব্যাক কণ্ঠশিল্পী হিসাবে অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী মুখার্জি এইচ এস কিদ্দাস-এর "টার্জন অ্যাণ্ড জেলাইলা' ছবির জন্য একটি গান গেয়েছেন। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির সুরকার। এ শামসেরের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ এ-ছবির দুটি প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন আজাদ ও চিত্রা।

এ-মাসে কাশ্মীরে প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্ত তাঁর "কাশ্মীর কী কলি" ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। বহির্দৃশ্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে শাম্মী কাপুর ও শর্মিলা ঠাকুর বাদে পদ্মা দেবী, নাজির হোসেন, প্রাণ মদনপুরী ও মুকরী রয়েছেন। কাশ্মীরে সাতটি গানের দৃশ্য গৃহীত হবে। ছবির কাহিনী রচনা করেছেন রতন বসু। ও পি নায়ার সঙ্গীত পরিচালক।

একলব্য

সম্প্রতি প্রাগের নিউ স্পোর্টস হলে অনুষ্ঠিত ২৭তম বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে জাপান ও চীন সমস্ত বিজয়ীর পুরস্কার ভাগযোগ করে নিয়েছে। দলগত ও ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার মোট ৭টি পুরস্কারের মধ্যে জাপানের ঘরে গেছে চারটি আর চীনের ঘরে গেছে তিনটি পুরস্কার। দলগত বা রাষ্ট্রগত প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিজয়ীর পুরস্কার সোয়েদলিং কাপ লাভ করেছে চীন, আর মহিলাদের বিজয়ীর পুরস্কার কর্বিলন কাপ লাভ করেছে জাপান। ১৯৬১ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতার মত এবারও সোয়েদলিং কাপের ফাইন্যাল খেলায় জাপানকে চীনের কাছে ৫—১ ম্যাচে হার স্বীকার করতে হয়। কর্বিলন কাপের ফাইন্যালে জাপান ৩—০ ম্যাচে রুমানিয়াকে হারিয়ে উপর্যুপরি ৪ বার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। বিশেষভাবেই বলবার মত চীনা ও জাপানের পুরুষ টিম ফাইন্যালের আগে পর্যন্ত একটি ম্যাচও হারেনি আর মহিলা টিম সমস্ত প্রতিযোগিতায় একটি ম্যাচও না হেরে বিজয়ী হয়েছে। যেখানে সোয়েদলিং কাপে ৫০টি এবং কর্বিলন কাপে ৩০টি দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেখানে এই কৃতিত্ব নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের এক অভিনব নজির।

অবশ্য বিশ্ব টেবল টেনিসে জাপান ও চীনের নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের পরিচয় এই প্রথম নয়। ১৯৫২ সালের ভারতের মাটিতে যেবার সর্বপ্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসে সেবারেই জাপ খেলোয়াড়দের প্রতিভার পরিচয় মেলে। কয়েক বছর জাপানের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের পর ১৯৫৯ সালে ডর্টমণ্ডের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় চীনের খেলোয়াড় জাং কুয়ো তাং বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করেন। পিকিংয়ে ১৯৬১ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন চীনেরই আর এক খেলোয়াড় চুয়াং-সে-তুঙ্গ, যিনি এবারও বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্ব প্রতিযোগিতার মোট ৭টি বিষয়ের মধ্যে মেয়েদের কর্বিলন কাপের ফাইনালে রুমানিয়া মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে রুমানিয়ার মেরিয়া আলেকজান্ড্রা এবং মহিলাদের ডাবলসের ফাইনালে ইংলণ্ডের দুই প্রতিযোগিনী ছাড়া বাকী ৪টি বিষয়ের ফাইনালে জাপান ও চীনের খেলোয়াড়দেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেছে। ইউরোপ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের উপরে এশিয়ার খেলোয়াড়দের এই নিরঙ্কুশ প্রাধান্যের পরিচয়।

বিশ্ব টেবল টেনিসে জাপ খেলোয়াড়দের প্রথম সাফল্যে ইউরোপের বহু খেলোয়াড় [illegible] কটাক্ষ করেছিলেন। জাপানী [illegible] অবাধ বিজয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে খেলার আগে উত্তেজক ওষুধ খাবার-অভিযোগ ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয় খেলোয়াড়দের কটাক্ষ ভিত্তিহীন, মাৎসর্যের তাড়না ছাড়া কিছু নয়।

প্রাগের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের খেলোয়াড়রা বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। সোয়েদলিং কাপের খেলায় দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ও হল্যাণ্ডকে ভারত পরাজিত করেছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের কাছে তাদের ৫—০ ম্যাচে হার স্বীকার রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয়। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাতেও ভারতের গৌতম দেওয়ান, পি হলদেনকার, জয়ন্ত ভোরা এবং রতীশ চাচাদ প্রথম বা দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা থেকেই বিদায় নিয়েছেন।

টেবল টেনিসের জগৎ বিখ্যাত খেলোয়াড় ভিক্টর বার্ণা রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার অধীনে যখন ভারতের কোচ হিসাবে এসেছিলেন তখন শিক্ষা সমাপ্তির পর বলেছিলেন, টেবল টেনিসে ভারতে যত সম্ভাবনাময় শিশু খেলোয়াড় আছে এত আর কোথাও নেই, সুতরাং কয়েক বছরের মধ্যেই আন্তর্জাতিক টেবল টেনিসে ভারতের সাফল্য অনিবার্য। কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? ভারতের শিশু খেলোয়াড়দের সম্ভাবনা কি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল? না উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাব?

প্রাগের বিশ্ব প্রতিযোগিতার সকল খবর হাতে এসে পৌঁছয়নি। কে কোন পদ্ধতিতে খেলেন কার খেলা দর্শক চোখে রঙ ধরালো তার কোন বিবরণ পাইনি। পরে

[illegible] ২৭তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে যোগদানকারী ৫২টি দেশের প্রায় ৬০০ খেলোয়াড়ের মধ্যে [illegible]টি দেশের খেলোয়াড় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন

পোর্টোরিকার ১৯ বছর বয়স্ক মিডলওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা ফ্রান্সিসকো ভ্যালাস্কোয়েজ গত ৬ই এপ্রিল আর্ল জনসনের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধের তৃতীয় রাউণ্ডে মুষ্টাঘাতে আহত হয়ে ভূতলশায়ী হবার পর সাহায্যকারীদের দ্বারা বাহিত হয়ে অ্যাম্বুলেন্স যোগে হাসপাতালে যাচ্ছেন। ভ্যালাস্কোয়েজ হাসপাতালেই মারা যান

এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। আজ ফাইনাল খেলাগুলির ফলাফল দিচ্ছি।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল—চুয়াং সে-তুঙ্গ (চীন) ২১-১৬, ২১-১৫, ১০-২১ ও ২১-১৮ পয়েন্টে লি-ফু জাংকে (চীন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—ওয়াং চিং-লিয়াং ও চাং সি-লিং (চীন) ২১-১৮, ২১-১৪ ও ২১-১১ পয়েন্টে চুয়াং সে তুঙ্গ ও স্যু-ইন সেংকে (চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনাল—মিস কিমিও মাৎসুজাকি (জাপান) ২১-১৪, ২১-১৩, ২০-২২, ১৫-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে মেরিয়া আলেকজাণ্ড্রুক (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল—মিস মাৎসুজাকি ও মাসাকো সেকি (জাপান) ২১—১৬, ১৫—২১, ২১—১৫ ও ২১—১৬ পয়েন্টে ডায়না রো ও মেরি স্যাননকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল—কোজি কিমুরা ও কানুকো ইটো (জাপান) ২১—১৮, ২১—১৪ ও ২১—১১ পয়েন্টে কেই-চি-ও মাসাকো সিকিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

*

হকি মরসুম শেষ না হতেই কলকাতার ফুটবল খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। অবশ্য কলকাতার ফুটবল খেলা বলতে যা বুঝায়—এ লেখা সে খেলা নয়। এটা অফিস ও পাওয়ার লীগের খেলা।

কাশীর পাশে ব্যাসকাশীর মত কলকাতা ফুটবল লীগের পাশে পাওয়ার লীগের খেলা। এ খেলায় উৎসাহ উদ্দীপনা নেই, দর্শকদের মধ্যে ফলাফল নিয়ে উত্তাপ নেই। জেতার গৌরব নেই হারারও নেই অগৌরব। অবশ্য অন্ততঃ অফিস লীগের খেলায় কিছুটা উৎসাহ উদ্দীপনা আছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে লীগ এবং আই এফ এ শীল্ডের খেলাকে কেন্দ্র করেই কলকাতার ফুটবল মরসুমের যত কিছু উত্তাপ ও উন্মাদনা। লীগের খেলা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ময়দানে উৎসাহ উদ্দীপনার সাড়া মেলে না।

লীগের খেলা আরম্ভ হতে এখনো কিছু দেরী আছে। কিন্তু কাপের খেলা শেষ হতেই প্রতি বছর ফুটবলের শুরু। তার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্লাবে ক্লাবে এখন শুধু ফুটবলেরই আলোচনা। ময়দানের কান খাড়া করে চললেই ফুটবলের খবর কানে আসে। কার কতটা শক্তি বাড়ল কার শক্তি কতটুকু কমল এই নিয়েই গবেষণা। পাড়ায় পাড়ায় এসে সমর্থকগণের পক্ষে খেলার দল একদলের জয়ধ্বনি দিয়ে তার সুবুদ্ধির প্রশংসা—ইস্টবেঙ্গল কার ছেড়ে গেছে বলে আর এক দলের দুর্বলতা ও বলরামের দুর্বুদ্ধির নিন্দা। মহমেডান পাগলাদের মোহ কাটল কি না তারও সমালোচনা ও দুর্বুদ্ধির বিচার সমর্থকদের বিচারও দৃষ্টি বিভ্রম। মোহনবাগানের সমর্থকদের দলেই কলকাতা ফুটবলের বড় ভূমিকা। এখানে ভাল খেলা দেখার চেয়ে প্রিয় ক্লাবের জয়ই বেশী কাম্য।

অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য এক একটি বড় ক্লাবের পেছনে বিপুল দর্শকের সমর্থন আছে বলেই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ফুটবলের এত জনপ্রিয়তা। তাই বলে সমর্থকদের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন হবে কেন? এই মোহই ফুটবলের মধ্যে প্রতি বছর নানা অশান্তি টেনে আনে এবং নাগরিক জীবনেও তার ছোঁয়া লাগে। ফুটবল মরসুমের আগে তাই সব পক্ষের কাছে আবেদন, সবাই যেন একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ফুটবল মাঠে যান, পরের ভাল ও নিজের মন্দ স্বীকার করার মত উদারতা থাকে, যেন থাকে রেফারীর সামান্য ভুলচুককে ক্ষমার চোখে দেখার মানসিক ঔদার্য।

*

এবার ফুটবল ... পরিবেশেই এবার ফুটবল

পশ্চিমবঙ্গের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (বাঁদিকে) ও রানার্স—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা, যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আয়োজিত লীগ প্রথার এই প্রতিযোগিতায় কলকাতা, ২টি খেলায়, যাদবপুর ১টি খেলায় বিজয়ী হয়। বিশ্বভারতী সব খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করে

খেলা আরম্ভ হবে। প্রথমতঃ সাধারণ দর্শকদের গ্যালারীর ব্যবস্থাপনায় ইজারাদারী প্রথার বিলোপ ঘটেছে। রাজ্য সরকার স্বহস্তে মাঠের গ্যালারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, নতুন করে ঘেরা মাঠের ভাগ বাঁটোয়ারা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পোর্টস সাব কমিটির ব্যবস্থায় মোহনবাগান ক্যালকাটা মাঠের [illegible] অংশীদার হয়েছে। মোহনবাগান [illegible] মোহনবাগানের স্থান দখল করেছে এরিয়ান্স ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব। এরিয়ান্স মহমেডান মাঠে এরিয়ান্সের জায়গায় এসেছে হাওড়া ইউনিয়ন ও রাজস্থান ক্লাব।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে ক্যালকাটা মাঠে, ক্যালকাটা ক্লাবই সব একচ্ছত্র অধিপতি ছিল সেখানে মোহনবাগান [illegible] আসনের কিছু ভাগ। ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে নিজেদের আসন নিজেই সম্পূর্ণ [illegible] হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল [illegible] হওয়া [illegible] বাড়ছে। [illegible] স্পোর্টিং ইউনিয়নের [illegible] মাঠে সভ্য আসন [illegible] এই তিনটি [illegible] ইউনিয়ন ক্লাবই [illegible] মহমেডান [illegible] পুরনো [illegible] দখল করেছে। [illegible] ক্লাব রাজস্থান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন ঘেরা মাঠের বাইরের তাঁবুতে থেকেই কিছু কিছু আসন দখল করছে ঘেরা মাঠে।

ব্যবস্থাটা বেশ খাপছাড়া বলেই মনে হয়। তিনটি ঘেরা মাঠে প্রথম ডিভিসনের পনেরোটি ক্লাবের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। কিন্তু পনেরোটি ক্লাবের মধ্যে দু-তিনটি ক্লাবই বা এই বিশেষ সুযোগ পাবে কেন? জর্জ টেলিগ্রাফ, বি এন আর, বাটা, বালী প্রতিভা, ইস্টার্ন রেল পুলিস, নবাগত পোর্ট কমিশনার্স, উয়াড়ীর সভ্যরা ঘেরা মাঠের কোনই সুখ-সুবিধা পাচ্ছে না। স্বভাবতই তাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্য সরকারের স্পোর্টস সাব-কমিটির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুযোগ-সুবিধায় বঞ্চিত ক্লাব প্রতিনিধিদের গোপন [illegible] হয়ে গেছে বলেও শুনেছি। অবশ্য [illegible] ও সত্য অর্থের অভাবে সব ক্লাবের পক্ষে সভ্য আসনের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব না। কিন্তু যাদের পক্ষে সম্ভব এবং যারা [illegible] ঘেরা মাঠের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের সুযোগ দেওয়া হল [illegible] স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং রাজস্থান ক্লাবের মত আরও দু-তিনটি ক্লাবের জন্য ঘেরা মাঠের কিছু কিছু সভ্য আসনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। সেটা সম্ভব না হলে আগ্রহী ক্লাবদের মধ্যে লটারী প্রথায় আসন ভাগ করা যেত। তাহলে ক্লাব [illegible] প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠত না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পোর্টস সাব কমিটি এবং আই এফ এর বিরুদ্ধে [illegible] এই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ [illegible] কথায় কান [illegible] বলছে যেহেতু [illegible] এর সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায় [illegible] এবং স্পোর্টস [illegible] শ্রীজগন্নাথ কোলে [illegible] স্পোর্টিং ইউনিয়নের এই বিশেষ সুযোগ [illegible] রাজস্থানের [illegible] প্রধান [illegible] আই এফ এর নানা দুর্নীতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী মুখর। দুর্মুখের মুখ বন্ধের জন্যই তাদের সন্তুষ্টির ব্যবস্থা। হাওড়া ইউনিয়ন সম্পর্কেও প্রায় এক কথা। হাওড়া ইউনিয়নের অন্যতম পরিচালক শ্রীহেমন্ত দে আই এফ এর প্রভাবশালী সদস্য।

অবশ্য একলা আই এফ এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নতুন নয়। যদিও এই অভিযোগ [illegible] উচিত নয়, বিশেষ করে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ যখন আই এফ এর সভাপতির পদে আসীন রয়েছেন। বস্তুতঃ রাজ্য সরকারের স্পোর্টস সাব কমিটি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন কেন? আর একটু বিচার বিবেচনা করে ঘেরা মাঠে বিভিন্ন ক্লাবের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলে হয়তো এই অভিযোগ উঠত না। চতুর্থ ঘেরা মাঠ প্রস্তুত করে ঘেরা মাঠে আসন লাভে বঞ্চিত ক্লাবদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দেবার এখনো সময় আছে এবং চতুর্থ ঘেরা মাঠ তৈরীর প্রস্তাবটিও বহু দিনের। আশা করি, রাজ্য সরকার যখন গ্যালারীর দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন তখন চতুর্থ ঘেরা মাঠ সম্পর্কেও একটা ব্যবস্থা করবেন।

✻

কলকাতার ফুটবল লীগ থেকে প্রোমোশন রেলিগেশন অর্থাৎ উঠা-নামার প্রথা রদ করবার জন্য আই এফ এর কিছু সংখ্যক সদস্য উঠে পড়ে লেগে গেছেন। ক্লাব প্রতিনিধিদের ঘরোয়া সভায় ইতিমধ্যেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভাও ডাকা হয়েছে প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার জন্য। বলা বাহুল্য, যাঁরা লীগ থেকে 'উঠা-নামা' প্রথা উঠিয়ে দেবার জন্য আগ্রহী তাঁরা দলে ভারী, আই এফ এর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। অবশ্য এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলেও কিছু নেই। প্রায় সবাই একজনের বশংবদ, তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে আই এফ এর পরিচালনা। সুতরাং তিনি ইচ্ছে করলেই প্রস্তাবটা পাশ হয়ে যাবে, আর লীগ থেকেও উঠা-নামা প্রথা রদ হবে।
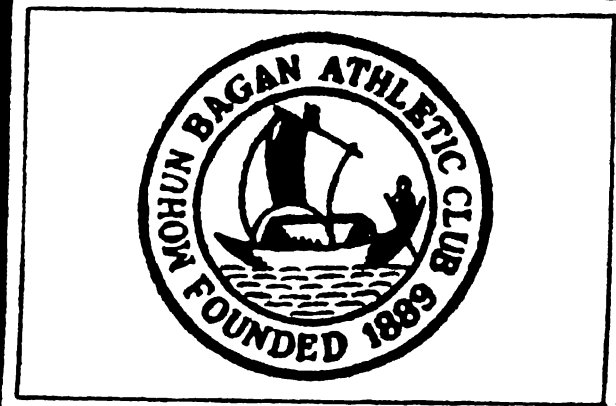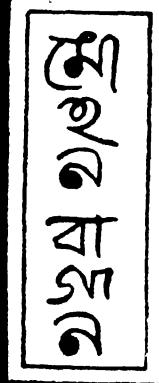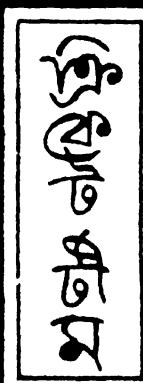
লীগ থেকে উঠা-নামা প্রথার বিলোপ ঘটলে খেলা যে 'ছেলে খেলায়' পরিণত হবে, আশা করি, যুক্তি দিয়ে একথা বোঝাবার প্রয়োজন নেই। লীগ থেকে প্রমোশন রেলিগেশন উঠিয়ে দেবার স্বপক্ষে দুটি যুক্তি। এক নম্বর—বর্তমানের জরুরী অবস্থা। দুই নম্বর—খেলার ফলাফল গড়াপেটা করা।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দুই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করা শক্ত নয়। দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থা ফুটবলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে স্বীকার করার অর্থ বাস্তবকে অস্বীকার করা। খেলার ফলাফল গড়াপেটা করার অভিযোগও নতুন নয়। আর উঠা-নামা প্রথার লোপ হলে ফলাফল গড়াপেটা হবে না এ কথাই বা কে বলবে? অতীতেও হয়েছে। দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার ভয় না থাকায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাব্য দলকে পয়েন্ট বিক্রীর আরও বেশী সুযোগ আসবে। সে দুর্নীতি আরও মারাত্মক। প্রাণের ভয়, অর্থাৎ নামবার আশঙ্কায় দুই দলের যোগসাজসে খেলার ফলাফল গড়াপেটা করার চেয়ে শক্তিশালী দলকে পয়েন্ট ছেড়ে দেওয়া আরও নিন্দনীয়। তার ফলে চ্যাম্পিয়নশিপেরও আকর্ষণ কম হবে। প্রমোশন-রেলিগেশন বহির্ভূত লীগে চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়েই যা কিছু উত্তেজনা। সেই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভও যদি সহজলভ্য হয় তবে লীগের আকর্ষণ থাকবে কোথায়?

গত বছরের কথাই ধরা যাক। গতবার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ২৭টি করে খেলায় ৩৯টি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল। দু'দলেরই একটি করে খেলা বাকী ছিল। শেষ খেলায় মোহনবাগান এরিয়ানের সঙ্গে এবং ইস্টবেঙ্গল বালী প্রতিভার সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে। চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারণের জন্য দুই দলকে আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এরিয়ান এবং বালী প্রতিভা, প্রথমের দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম চালায়। কারণ দুই দলেরই নেমে যাবার ভয় ছিল। যদি ভয় না থাকত একদলের পক্ষে পয়েন্ট ছেড়ে দিয়ে একটি দলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভকে সহজতর করার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হত না। প্রোমোশন রেলিগেশন ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত লীগের আকর্ষণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং এশিয়ান গেমের জন্য ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের বহু খেলোয়াড় কলকাতার বাইরে থাকা সত্ত্বেও লীগের আকর্ষণ কম হয়নি। উঠা-নামার বিধান না থাকলে খেলার কি হাল হত সহজেই কল্পনীয়।

তাই আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা আজ যদি নিজ নিজ ক্লাবের অবতরণের ভয়ে লীগ খেলা থেকে উন্নয়ন ও অবনমনের নিয়ম লোপ করেন তবে ফুটবলের সর্বনাশই ডেকে আনবেন।

*

লীগ খেলা সম্পর্কে আরও দুটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। একটি, প্রতি অর্ধে ২৫ মিনিটের পরিবর্তে ৩০ মিনিট করে খেলার ব্যবস্থা। আর সপ্তাহে একদিন অফিস লীগের খেলার জন্য নির্দিষ্ট করা।

দুটি প্রস্তাবকেই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার স্থায়িত্বকাল প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে ৯০ মিনিট, পাঁচ মিনিট বিরতি। আন্তর্জাতিক ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই আমাদের প্রধান প্রধান নক আউট প্রতিযোগিতা, যেমন আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স ও ডুরান্ড কাপে প্রতি অর্ধে ৩৫ মিনিট করে মোট ৭০ মিনিট খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ৭০ মিনিট খেলার ব্যবস্থা, শীত প্রধান দেশের ৯০ মিনিট খেলারই সমতুল। লীগের খেলাও যদি ৫০ মিনিটের পরিবর্তে ৬০ মিনিট করা হয় তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার সময় আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রম-[illegible] দেখা না দেবারই সম্ভাবনা।

তবে লীগে ৬০ মিনিট খেলার ব্যবস্থা করবার অসুবিধাও আছে। বিরতির ৫ মিনিট সময় ধরে ৬৫ মিনিটের ব্যবস্থা করতে হলে অন্তত বিকেল পাঁচটার সময় খেলা আরম্ভ করতে হয়। এবং খেলোয়াড়দের অন্তত খেলা আরম্ভের আধঘণ্টা আগে মাঠে পৌঁছানো দরকার।

অধিকাংশ খেলোয়াড়ই হন অফিসের কর্মী বা কলেজের ছাত্র। সাড়ে চারটার সময় মাঠে হাজির হতে হলে তাঁদের সাড়ে তিনটে বা পৌনে চারটার সময় অফিস বা কলেজ থেকে ছুটি করতে হয়। প্রতি খেলার দিন ঠিক সময়ে অফিস বা কলেজ থেকে ছুটি পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। শুধু খেলোয়াড়ই নন, দর্শক এবং সমর্থকদের কথাও ভাবতে হবে। খেলা পরিচালনা করাই রেফারীদের একমাত্র পেশা নয়, ওটা শখের জিনিস। অফিস থেকে তাঁরা ঠিক সময়ে ছুটি পাবেন তো? দর্শকরা সময়ে মাঠে হাজির হতে না পারলে খানিকটা খেলা দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, বঞ্চিত হবেন আসন লাভ থেকে। হয়তো সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেলা দেখতে হবে।

তবে যে কোন নতুন ব্যবস্থারই কিছু কিছু অসুবিধা আছে। যখন ৫৫ মিনিটের খেলাকে আমরা মানিয়ে নিয়েছি তখন ৬৫ মিনিটের খেলাকেও মানিয়ে নিতে পারব যদি অফিসের মালিকরা খেলোয়াড় ও দর্শকদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হন।

সপ্তাহের একটি দিন শুধু অফিস লীগের খেলার জন্য নির্দিষ্ট করাও খুবই উত্তম প্রস্তাব। এ ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন ক্লাবের যে সব খেলোয়াড় অফিসের চাকুরে তাঁরা অফিসের সব খেলায় যোগ দিতে পারেন না বা যোগ দিতে হলে দিন তারিখের পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। আই এফ এ এবং অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের পক্ষেও খেলার দিন তারিখের সামঞ্জস্য করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণ একটি অফিস ক্লাবের একাধিক খেলোয়াড় একাধিক সাধারণ ক্লাবে নিয়মিত খেলে থাকেন। ক্লাবের খেলার দিনে যাতে অফিসের খেলা না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সব সময় দৃষ্টি রাখা সম্ভবও হয় না। যদি অফিসের খেলার জন্যই একটি দিন নির্দিষ্ট থাকে তাতে সব পক্ষেরই সুবিধা। অফিস কর্তৃপক্ষ সেই দিনটির জন্য খেলোয়াড়দের হাল্কা কাজের ব্যবস্থা রেখে একটু আগে ছেড়ে দিতে পারেন। নির্দিষ্ট দিন তারিখ আগে থেকে ঠিক থাকলে তাঁরাও খেলা দেখবার জন্য মাঠে হাজির হতে পারেন। ছুটিছাটার ব্যবস্থার মধ্যেও একটা সামঞ্জস্য করা যায়। তবে এই দিনটি শুক্রবার হলে বোধহয় ভাল হয়। খেলার পরদিনও হাল্কা ডিউটি থাকে, পরের দিন পূর্ণ বিশ্রাম।

মোটের উপর সপ্তাহের একটি দিন শুধু অফিস লীগের খেলার জন্য নির্দিষ্ট থাকলে সব পক্ষেরই সুবিধা।

দেশী সংবাদ

৮ই এপ্রিল—আজ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চাবন লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করিবার জন্য যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা হইল—(১) দুই বৎসরে মধ্যে দেশের সেনাবাহিনী দ্বিগুণ করা, (২) বিমানবাহিনী সম্প্রসারণ ও আধুনিক-করণ, (৩) সমস্ত বাহিনীর চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎপাদনের বনিয়াদ শক্তিশালী করা এবং (৪) যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ।

৯ই এপ্রিল—বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডি আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, ভিভিয়ান বস্ তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কোম্পানী আইন সংশোধনের জন্য সরকার শীঘ্রই একটি বিল আনিবেন। যৌথ সংস্থাসমূহের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অসদুপায় গ্রহণের যে ঝোঁক দেখা যাইতেছে তাহা রোধ করিবার জন্য বিলে বিধান থাকিবে।

১০ই এপ্রিল—বিদ্রোহী নাগারা গত রাত্রিতে রাঙ্গাপাহাড় রেলস্টেশনের নিকটে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উপর গুলি চালাইলে জনৈক [illegible] ও আঞ্চলিক বাহিনীর একজন লোক [illegible] মোট ৬জন নিহত এবং বহু লোক আহত হ[illegible]। বে-সরকারী মহলের মতে হতাহতের সংখ্যা আর[illegible] বেশী।

আগামী [illegible] জুলাই হইতে শিয়ালদহ-বনগাঁ ও শিয়ালদহ-[illegible]ঘাট লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। কলিকাতা স্টেট-ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এই রেলপথের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবেন।

১১ই এপ্রিল—কলিকাতার সিরাজুদ্দিন অ্যান্ড কোম্পানীর নিকট হইতে ১০ হাজার টাকা গ্রহণ এবং রাজ্য স[illegible]কারের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠা[illegible]কে লাইসেন্স দান সম্পর্কে আজ লোকসভায় [illegible]সামের নির্বাচিত পি এস পি সদস্য শ্রীহেম বড়ুয়[illegible] খনি ও জ্বালানি মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্যের [illegible]রুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন।

বুধবার সন্ধ্যায় [illegible] এক[illegible] সশস্ত্র ডাকাত এক[illegible] [illegible]কের দারোয়ান ও জমাদার সমেত চার [illegible] উপর রিভ[illegible] প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্র[illegible] লইয়া চড়াও হয় এবং উহাদিগকে মারা[illegible] আহত করিয়া ৬০,০০০ টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

১২ই এপ্রিল—[illegible] [illegible] [illegible] বন্দী ভারত-মায়ানমার সীমারেখা পার হইয়া নেফায় প্রবেশ করিলে [illegible] উপজাতির লোকেরা তাহাদিগকে সম্বর্ধনা জানায়। বুধবার চীনারা ভারতীয় রেডক্রস প্রতিনিধিদের নিকট এই যুদ্ধবন্দীদের সমর্পণ করে।

১৩ই এপ্রিল—আজ সকাল ১১-১৫ মিনিটে শিলিগুড়ি-কাটিহার শাখায় [illegible] স্টেশনে একটি [illegible] ট্রেনের ১৫টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। এই দুর্ঘটনায় একজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়।

১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পরেও

হিন্দী ছাড়া সহযোগী সরকারী ভাষা হিসাবে ইংরেজী চালাইয়া যাইবার জন্য সরকারী ভাষা বিল উত্থাপনের সময়ে আজ লোকসভায় এক তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। অবস্থা এমন চরমে ওঠে যে, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড বিভাগের লোকের সাহায্যে মার্শাল শ্রীমনিরাম বাগড়ী (সমাজতন্ত্রী) ও স্বামী রামেশ্বরানন্দকে (জনসঙ্ঘ) বলপূর্বক সভাকক্ষের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়।

১৪ই এপ্রিল—নির্ভীক সাংবাদিক ও পরম বৈষ্ণব স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের ১১তম তিরোভাব দিবস উপলক্ষে আজ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যে স্মৃতিবাসরের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে বিভিন্ন বক্তা এই মত প্রকাশ করেন, প্রফুল্লকুমারের সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা নির্ভীক সাংবাদিকতার যে উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, সেই মহান ঐতিহ্য উক্ত পত্রিকা আজও বহন করিয়া চলিয়াছে।

বিশিষ্ট পণ্ডিত, ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিত রাহুল সংস্কৃতায়ন আজ বেলা ১১-৭৫ মিনিটে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের জন্য দার্জিলিং এর ইডেন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

৮ই এপ্রিল—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব [illegible]-খোয়াং শহরটি নিরাপত্তা[illegible] ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রত্যেকটি রেলওয়ে স্টেশনে সেনাদল মোতায়েন করা হইয়াছে এবং নিয়মিত ট্রেন চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীদের লইয়া আসা হইয়াছে।

মধ্য লাওসের জার্স সমতলভূমি [illegible] পূর্ব [illegible]-খোয়াং শহর[illegible] [illegible] [illegible] হস্তচ্যুত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ নিরপেক্ষ [illegible] এবং তাহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে [illegible] বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

৯ই এপ্রিল—[illegible] হইবার [illegible] [illegible] ক্যান্সারের বীজ ঢুকাইয়া দিলে [illegible] পরবর্তী জীবনে তাহার আর ক্যান্সারের আশঙ্কা থাকিবে না। খ্যাতনামা [illegible] চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডঃ [illegible] এই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি প্রকাশ করিয়া চিকিৎসা জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন।

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল—সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে ঐক্য পরিকল্পনা লইয়া আলোচনার ফলে স্থির হইয়াছে যে ঐ তিনটি রাজ্য লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং সৈন্যবাহিনীও থাকিবে একটি।

[illegible]

১০ই এপ্রিল—অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের চীফ রিপোর্টার সর্দার জালী কুরেশীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন লাই নাকি বলিয়াছেন যে, ভারত যদি সীমান্তে সৈন্য পাঠায় তাহা হইলে চীন পাল্টা আঘাত হানিবে।

কুখ্যাত আইখম্যানের দক্ষিণহস্ত বলিয়া কথিত শ্রী এরিক রাজকোভিক আজ দক্ষিণ সুইজারল্যান্ডে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সুইস সরকার তাহাকে তৎক্ষণাৎ সুইজারল্যান্ড ছাড়িয়া যাইবার নির্দেশ দেন।

১১ই এপ্রিল—বুধবার পূর্ব পাকিস্তানে চট্টগ্রামের পাহাড়গুলি অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটী রেল-শ্রমিকদের উপর পুলিস গুলি চালায়। ৪ জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় বলিয়া কলিকাতায় বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়।

১২ই এপ্রিল—লাওসের দূত [illegible] আজ ব্যাঙ্ককে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, দুই ব্যাটেলিয়ান চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্য গত ২৮শে মার্চ হইতে উত্তর লাওসের [illegible] শহরটি দখল করিয়া রহিয়াছে।

পাকিস্তানে নিযুক্ত বৃটিশ হাই কমিশনার স্যার মরিস জেমস ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীম্যাককনটি গতকাল হঠাৎ করাচী হইতে ঢাকায় আসেন এবং সন্ধ্যায় আবার করাচী প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকায় তাঁহারা প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ও পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ভুট্টোর সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করেন। কাশ্মীর সম্পর্কে আসন্ন পাক-ভারত আলোচনার সম্পর্কে তাঁহারা ঢাকায় আগমন করেন বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলের অনেকে মনে করেন।

১৩ই এপ্রিল—সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের শাসন পরিষদের সভাপতি শ্রী আলি সাবরি চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত কলম্বো প্রস্তাব লইয়া চীনা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য ১১ই এপ্রিল পিকিং অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

[illegible]

১৭ই এপ্রিল—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কে [illegible] সরকারের বর্তমান নীতি-[illegible] ভারতকে সাহায্যদানের ব্যাপারে মার্কিন সরকার এবং বিশ্বব্যাঙ্ক উভয়েই এখন নূতন করিয়া কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বৃটিশ পার্লামেন্টের ইস্টারের ছুটির পূর্বেই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে গোপন ব্যাপারটি ফাঁস হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান ও তাঁহার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাকে এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক আলোড়নের সম্মুখীন হইতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮৫৪১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

* সূচীপত্র *

* সূচীপত্র *

পরিবারের জন্য
মায়েদের পছন্দ
ডালডা
ডালডা
খেজুরগাছ মার্কা
বনস্পতি
■ ডালডা সবচেয়ে সেরা ভেষজ তেল থেকে তৈরী।
■ এতে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের উপযোগী ভিটামিনও রয়েছে।
■ প্রতারণা-প্রতিরোধক সিল করা টিনে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্যাক-করা।
■ মনে রাখবেন ডালডা কখনও আল্গা বিক্রী হয় না।

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—প্রণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

Saturday, 27th April 1963

৩০ বর্ষ । ২৬ সংখ্যা । ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার ১৩ বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

সামাজিক অপরাধ

অনেককাল আগে একটি বিলেতী ব্যঙ্গচিত্র দেখেছিলাম। ভোটের মরশুম ইংল্যাণ্ডে। এক বুড়ো ভোটার কাকে কোন দলকে ভোট দেবেন স্থির করার জন্যে সোজা ডেথ্ রেজিস্ট্রারের সামনে এসে বলছেন, মশাই খাতাখানা খুলে দয়া করে বলবেন কি গত মাসের মৃত্যুসংখ্যা কি রকম? টোরিদের হাতে বেশী লোক মরছে না আগে আরও কম মরেছে?

ছবিটা ব্যঙ্গের, প্রশ্নটা বোধ করি ততোধিক, নির্মম বিদ্রূপের। প্রকৃতপক্ষে সরকারী সুশাসন আর কুশাসনের প্রকৃত উত্তরটি খুঁজতে হলে আমাদেরও কর্পোরেশনের ঘাটবাবুর কাছে যেতে হবে। দুর্ভিক্ষ মহামারী মড়ক এর জন্য যত নিন্দা বাড়ার, যত লজ্জা, [illegible] আমাদের মতন প্রজাপুঞ্জের নয়।

খবরের কাগজের পাতা ওলটালে প্রায়শই দেখা যায়, নকল ওষুধ ভেজাল খাদ্য স্বাস্থ্যহানিকর পচা চাল আটা সব—এমন কি ইনজেকসানের দু ফোঁটা জলও বিশুদ্ধ নয়—ইত্যাদি সংবাদ বড় বড় করে ছাপা হয়েছে। এ-দেশে গত বিশ বাইশ বছর ধরে এ ব্যাপার নিবা লোকে ডাকাতির মতন প্রকাশ্য অপরাধ হয়ে দেখা দিয়েছে। কে না জানেন যে, আজ বাড়িতে অসুখ হলে অত্যন্ত সন্তার ওষুধটাও মানুষ বিশ্বস্ত দোকান থেকে কিনতে চায়, এবং কেনার পরও তার মনের খুঁতখুঁতুনি সহজে যায় না। সংসারী মানুষের এ-কথাও জানা আছে, যে দুধটি তিনি বোতলে করে বয়ে আনেন, যে ঘি তেল আটা তিনি সন্তানদের খাদ্যের জন্য এনে দিচ্ছেন—তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দিহান। তথাপি তাকে নিতান্ত অসহায় হয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় এই জিনিসগুলি প্রাণরক্ষার জন্য কিনতে হয়।

সভ্য সমাজে 'সামাজিক অপরাধ' বলে একটি কথা আছে। কথাটির অর্থ সবাই জানেন। সমাজ জীবন এবং মানব জীবনের পক্ষে যা ক্ষতিকর তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জনাই মানুষ এই নৈতিক অপরাধটির কথা তুলেছেন, আইন করে দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। সভ্য দেশগুলি প্রায়শ 'সামাজিক অপরাধ'কে প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু এ দেশের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের সরকার অনেক বিষয়ে এত নিশ্চিন্ত, এত শিথিল-হস্ত যে, কোনো কোনো সামাজিক অপরাধকে যেন দমন করার কোনো উৎসাহই পান না।

সরকারীভাবে বহুবার খাদ্য ও ঔষধের নিম্নমান, ভেজাল কারবার সম্পর্কে স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে জাল ওষুধের কারবার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কলকাতায় এমন কথাও ঘোষণা করেছেন যে, কারখানায় ব্যাপকভাবে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেবার উপকরণ তৈরী হচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লীতে স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন, দিল্লীতে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে বটে, তবে তাতে হাজার হাজার নরনারীর দেহে বিষক্রিয়া ঘটেছে বলে কোনও সংবাদ তিনি পান নি।

উপমন্ত্রী মহাশয়ের বোধ করি ধারণা ভেজাল যদি সত্যও হয়, বিষক্রিয়া অসম্ভব। স্বাস্থ্য-দপ্তরের কাণ্ডারীর হাতে এ-রকম জবাব অপ্রত্যাশিত এবং যুক্তিহীন। সাধারণবুদ্ধি মানুষও জানে, প্রাণীদেহ তার ক্ষতিকারক উপাদানে সব সময়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভেজাল তা যা শরীরকে অসুস্থ করে, প্রাণ ধারণের মত পুষ্টি না জুগিয়ে তাকে দুর্বল ও অকেজো করে তোলে। এ-সব নিশ্চয় উক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জানা, তথাপি তিনি স্বীকার করতে নারাজ।

উপমন্ত্রী মহাশয়কে প্রশ্ন করা হয়েছিল—এই অপরাধের জন্যে বিকল্প শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে না কেন? জবাবে তিনি বলেছেন, বিকল্প শাস্তি ব্যবস্থার বদলে—১৯৫৪ সালে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ নিবারণ আইন সংশোধন করা হবে—। এই আইনে কারাদণ্ডের বিধান আছে।

আমরা স্বীকার করি কারাদণ্ড যে-কোনো সভ্য সরকারের দণ্ড দানের একটি প্রচলিত বিধি। কিন্তু এই দণ্ডদানের হেরফের আছে, কারাদণ্ডের বিনিময়ে কেবলমাত্র অর্থদণ্ডও হয়ত আছে, হয়ত অপরাধীকে রাজবিচারের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করানোর মধ্যে অনেক পিচ্ছিল পথ আছে, সর্বোপরি সমাজের সেই দুর্নীতি ত রয়েছে যেখানে অর্থবান অপরাধী দণ্ডের ছোঁয়া গায়ে লাগতে দেয় না।

শুধুমাত্র দণ্ড, কেবলমাত্র শাস্তি বোধ করি এ-ধরনের অপরাধ নিবারণের একমাত্র পথ নয়। কঠিনতম দণ্ডও যেমন কোনো কোনো সময়ে মানুষকে পাপাচারে নিবৃত্ত হতে বাধ্য করে, তেমনি সৎ বোধ ও নৈতিক বোধও অন্যায়কারীকে কখনও কখনও বিবেকী করে তুলতে সমর্থ হয়। গত বিশ বাইশ বছরে আমাদের জাতীয় চরিত্র কত কলুষিত, নৈতিক অধঃপতন কত মর্মান্তিক হয়েছে তা বোধ করি এখনও না দেখলে না বুঝলে সমস্ত দেশটাই কর্মে চিন্তায় জীবনে ও সমাজরক্ষায় একটি ভেজাল জাতি হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য হয়ে থাকবে।

এ-কথা যিনি মনে করেন, আইন মানুষকে বিবেকবান করে, আদালত মানুষকে নীতিশিক্ষা দেয়—তিনি ভুল করেন। পৃথিবীর এমন কোনো আইন নেই এমন কোনো আদালত নেই যা মনুষ্যজাতিকে ধোলাই করে পুণ্যবান করে তুলতে পারে। এ অসম্ভব।

তবে সম্ভব কিসে? কেমন করে সম্ভব তার একটিমাত্র উপায় দেখিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা বরং মনে করি, প্রচলিত দণ্ডবিধানকে আরও সুপ্রযুক্ত করা হোক, আরও বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা ও শর্ত বাঁধা হোক যাতে আইন অপরাধীকে তার কুক্ষিগত করতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে আমরা মনে করি—সমাজের এই ঘৃণিত বিষাক্ত ক্ষতটি আরোগ্য করে তোলার কাজে নৈতিক-চিকিৎসার শরণাপন্ন হতে হবে। এ-কাজটি অতি দুরূহ, রাতারাতি হবার নয়, কিন্তু বিশ বছরের দূষিত রক্তের সংক্রমণ থেকে জাতিকে বাঁচাতে হলে অন্য কোনো পথ নেই। নৈতিক চাপ সৃষ্টি এবং বিবেকবোধ জাগ্রত করার কাজে নেতা ও জনসাধারণের সমান দায়িত্ব রয়েছে। সরকারের দায়িত্ব? অবশ্যই আছে। আর সে-দায়িত্ব কেবল সরকারী প্রচার-বিজ্ঞাপনের মধ্যে সীমায়িত নয় যে এ-কথা যেন সরকার মনে রাখেন।

দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০

আগামী ২৫ বৈশাখ অন্যান্য বৎসরের মত এই বৎসরও "দেশ" পত্রিকার বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হবে।

এ ছাড়া, স্বামী বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলালের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনটি বিশেষ প্রবন্ধ এবং বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র ও পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি সহ স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ও সাময়িকপত্র সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ এই সংখ্যার উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

এই বিশেষ সংখ্যাটি যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ হবে, তাঁরা হলেন— প্রবোধচন্দ্র সেন, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী পুলিনবিহারী সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয় ঘোষ, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অজিত দত্ত, দিলীপকুমার বিশ্বাস, ভবতোষ দত্ত, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, তারাকুমার মুখোপাধ্যায় বিজিতকুমার দত্ত, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, রাজ্যেশ্বর মিত্র, দীপ্তি ত্রিপাঠী প্রভৃতি।

দাম : ৮০ নঃ পঃ

রেজিস্ট্রি ডাকযোগে ১০৮ নঃ পঃ

বৈদেশিকী

নূতন চীনা আক্রমণের সম্ভাবনার বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু পার্লামেন্টে সম্প্রতি আর একটি উক্তি করেছেন। কিছুদিন আগে চীনা আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি যা বলে ছিলেন তাতে আশংকার ভাবটাই বেশী প্রকাশ পেয়েছিল। দু-তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে—এনিথিং মে হ্যাপেন্—এই ধরনের কথা তিনি তখন বলেছিলেন। তাঁর এবারকার উক্তির মর্ম সাধারণ মানুষের পক্ষে ধরা আরো কঠিন। পণ্ডিতজী বলেছেন যে, কতকগুলি রাজনৈতিক ঘটনা ও কারণ থেকে মনে হয় না যে, চীনারা শীঘ্র নূতন আক্রমণ চালাবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, অন্য কতকগুলি কারণ আছে যাতে এরূপ আক্রমণ মোটেই অসম্ভব নয়। এই সম্ভব-অসম্ভবের ওজনে কোনদিকের পাল্লা ভারী বেশী বা সে সম্বন্ধে সরকারী আন্দাজটা কী তার একটা ইঙ্গিত পেলেও হত। তা হলে কেবল সামরিক ক্ষেত্রে নয় কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও চীনাদের সাফল্যের প্রমাণ যোগানো হবে।

আসলে বিপুল বাগ্‌বিস্তার সত্ত্বেও ভারত সরকারের পলিসিটা যে ঠিক কী এবং কোন লক্ষ্যের দিকে তার গতি তা-ই দেশবাসীর কাছে অকপটভাবে স্পষ্ট করে বলা এখনো হচ্ছে না। চীনারা আক্রমণ করবে কি করবে না সে প্রশ্নের একটা দিক তো চীনারা নিজেরাই পরিষ্কার করে দিয়েছে। তাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত যদি ভারত মেনে চলে তবে আপাতত সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ যে এলাকায় ভারতীয় সৈন্যের পুনঃপ্রবেশে চীনাদের আপত্তি, সে এলাকায় যদি ভারতীয় সৈন্য না যায় তবে সংঘর্ষ হবে না। আর যদি চীনাদের একতরফা আরোপিত শর্ত না মেনে সে এলাকায় ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হয়, তবে চীনা 'সীমান্তরক্ষীরা আত্মরক্ষা' করবে অর্থাৎ আবার চীনা আক্রমণ শুরু হবে।

ভারতীয় সৈন্যদের কখন কোথায় কত দূরে পাঠানো হবে সেটা সামরিক দিক থেকে বিচার করে ঠিক করা হবে সামরিক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যেরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করবেন সেরূপ করা হবে—ভারত সরকারের পক্ষে এ কথা বলা অবশ্য অযৌক্তিক নয়। তবে কেবল সামরিক কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুসারেই হোক বা তার সঙ্গে অন্য কারণেই থাক, কার্যত দেখা যাচ্ছে যে ভারত সরকার এখন পর্যন্ত চীনাদের একতরফা আরোপিত শর্ত মেনেই চলেছেন। এই অপমানকর অবস্থায় কিছুটা উপশম হত, অন্ততপক্ষে সরকার ভাবছেন ভারতের কিছুটা "মুখরক্ষা" হত—যদি চীনাদের দিয়ে "কলোম্বো প্রস্তাবাবলী" স্বীকার করিয়ে নেওয়া যেত। সে আশা এখনো ভারত সরকার ছাড়েন নি এবং সে-জন্য যতরকম সম্ভব ধরাধরিও চলছে।

কিন্তু চীনাদের দিয়ে কলোম্বো প্রস্তাবাবলী স্বীকার করাতে পারলে যে মুখরক্ষাটুকু হবে তার মূল্য কতটুকু? বরঞ্চ তাতে ভারতবর্ষের দূরপ্রসারী ক্ষতিরই সম্ভাবনা, কারণ কলোম্বো প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে নিষ্পত্তির আলাপ-আলোচনায় রাজী হওয়ার মানেই হচ্ছে-কার্যত ঐ সীমানাই মেনে নেওয়া মুখে যাই বলা হোক। তার অর্থ—চীনারা যে ১৪ হাজার বর্গমাইল ভারতভূমি দখল করে বসে আছে সেখানে তাদের স্থায়ী অধিকার প্রকৃত প্রস্তাবে মেনে নেওয়া হবে। চীনারা যদি এখন কলোম্বো প্রস্তাবাবলী' স্বীকার করেও নেয়, তা হলে সেটা চৈনিক 'উদারতা" বলেই প্রচারিত হবে। তাতে চীনাদের অর্জিত সামরিক প্রেস্টিজ্ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সুবিধা—যেগুলো সামরিক সাফল্যের দরুণ তারা পেয়েছে সেগুলোর কোনোটারই বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। ক্ষতি ভারতবর্ষের যা হয়েছে তাই থেকে যাবে। সুতরাং 'কলোম্বো প্রস্তাবাবলী' সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেওয়াই উচিত। চীনারা যখন এতোদিনেও কলোম্বো প্রস্তাবাবলী মেনে নিতে রাজী হয় নি তখন ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করায় কোনো বাধা নেই। বরঞ্চ বলা যায় যে চীনারা কলোম্বো প্রস্তাবাবলী এতদিন না মানাতে ভারত সরকার নিজেদের একটা ভুল সংশোধনের সুযোগ পেয়েছেন।

সেই সুযোগ গ্রহণ না করে চীনাদের দিয়ে কলোম্বো প্রস্তাবাবলী মানাবার জন্য ধরাধরি করাটাই ভুল হচ্ছে। কোনোদিন চীনাদের কাছ থেকে ইনিশিয়েটিভ' কেড়ে নেওয়ার আশা যদি আমরা করি, তা হলে 'কলোম্বো প্রস্তাবাবলী'র বন্ধন থেকে আগে মুক্ত হওয়া দরকার। তার মানে এ নয় যে, এখুনি চীনাদের হটাবার জন্য লড়াই শুরু করে দিতে হবে। সামরিক ক্রিয়া কখন কী করা উচিত হবে সেই সামরিক কর্তৃপক্ষ [illegible] বিচার করে [illegible] সরকার সেই কথাই [illegible] প্রস্তাবাবলীর বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে রাখলে অন্তত কূটনৈতিক ভারত সরকারের কর্মের স্বাধীনতা বাড়বে। তখন হয়ত সত্যই একটা পলিসি এবং তার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারবে। এখন তো চীনাদের তরফ থেকে ক্রিয়া এবং আমাদের তরফ থেকে প্রতিক্রিয়া এই অবস্থা চলছে।

*

সত্যই "বিচিত্র এ দেশ"। তা না হলে

পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু "ইনটারনাল এভিডেন্স" দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, পশ্চিমবঙ্গে যে রাষ্ট্রদ্রোহী পুস্তিকাদির প্রচার চলছে সেটা চীনাপ্রেমী কম্যুনিস্ট-দেরই কুকর্ম? অন্য দেশ হলে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হত যে, তিনি পুস্তিকাগুলির লিখিত বিষয় থেকে শুধু "ইনটারনাল এভিডেন্স" উপস্থিত করছেন কেন? এইসব পুস্তিকাদির রচনা মুদ্রণ ও প্রচার নিশ্চয়ই মন্ত্রবলে হচ্ছে না। মানুষেই রচনা করছে, মানুষেই ছাপাখানায় ছাপাচ্ছে এবং মানুষের দ্বারাই বিলি হচ্ছে এবং এসব কাজ নিশ্চয়ই দু-একজন মাত্র লোকের সাহায্যে হচ্ছে না। এদের খবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিভাগ কি এতোদিন কিছু সংগ্রহ করতে পারেন নি? এদের কাউকে কি ধরা যায় নি? অনুরূপ পরিস্থিতিতে এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি কেবল ইনটারনাল্ এভিডেন্স" উল্লেখ করে পার পেতেন? এতোদিনে তাঁর বিভাগ এক্সটারনাল্ এভিডেন্স"ও কেন যোগাড় করতে পারে নি—এ প্রশ্নের জবাব তাঁকে দিতে হত না? লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ব্যাপার সম্পর্কিত বক্তৃতা পড়লে মনে হয় শ্রীলালবাহাদুর যেন কোনো একটা সাহিত্যিক প্রশ্নের আলোচনা করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি তাঁর বিভাগের কর্মদক্ষতার যে কী পরিচয় দিলেন সে খেয়াল তাঁর নেই।

নিরদিশে মূল্যে সার্টিং, সুটিং ও পপলিন পাওয়া যায়।

এর চেয়েও বিচিত্র হচ্ছে—যে ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কম্যুনিস্ট পার্টির 'সরকারী নীতি'র উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন কম্যুনিস্ট পার্টির 'সরকারী নীতি' (চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে) এবং সেই নীতি যে কম্যুনিস্টরা মেনে নিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী নীতির" প্রশংসা পণ্ডিতজীর মুখেও শুনা গিয়েছিল সুতরাং তার প্রতিধ্বনি লালবাহাদুরজীর মুখ থেকেও শুনা যাবে—এটা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু এক সময়ে ভুল বুঝবার অবকাশ যদি থেকেও থাকে এতোদিনে তো সে ভুল ভাঙা উচিত ছিল। সেই সময়ে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" প্রস্তাবে চীনের প্রতি দোষারোপ এবং তাই নিয়ে পার্টির মধ্যে ভাঙাভাঙি দেখে যাঁরা এটাকে একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ 'ঐতিহাসিক ঘটনা' বলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের উচ্ছ্বাস কি এখনো তেমনি আছে? তাঁরা কি এখনো বিশ্বাস করেন যে কম্যুনিস্ট পার্টি কম্যুনিস্ট পার্টির চীনাপন্থীদের কথা বাদ দিচ্ছি—কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" অংশটাও কি সত্যি সত্যি চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতকে শক্তিশালী করতে চায়?

কম্যুনিস্ট পার্টি সম্প্রতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় সেটা নিশ্চয়ই পড়েছেন। সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বা সেই প্রস্তাব যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কিছুই বলবার নেই? সেই প্রস্তাব কি ভারত এবং ভারত সরকারকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে অথবা ভারতবর্ষ যাতে দুর্বল থাকে, দেশী এবং বিদেশী কম্যুনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি যাতে তার না বাড়তে পারে সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে?

কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" এবং চীন-পন্থী অংশের মধ্যে তফাত কি প্রিন্সিপল্-এর, না ট্যাক্‌টিক্স-এর, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় একটু চিন্তা করে দেখতে পারেন। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" অংশে চীনের বিরুদ্ধে যে আসল অভিযোগ, সেটা হচ্ছে এই যে, চীনারা যা করছে সেটা সময়োচিত কাজ হচ্ছে না; কারণ, তার ফলে ভারতে পশ্চিমা-দের প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদি তা না হত, অবস্থা যদি এইরকম হত যে, চীনের সামরিক শক্তির সহায়তায় ভারতে কম্যুনিস্ট গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে, তা হলে কম্যুনিস্ট পার্টির "সরকারী" অংশও চীনাদের কার্যের নিন্দা করত না। তিব্বতের স্বাধীনতানাশকে যেমন তিব্বতের 'মুক্তি' বলে কম্যুনিস্টরা গ্রহণ করেছেন, তেমনি ভারত আক্রমণকারী চীনা সৈন্য-বাহিনীকেও তারা 'মুক্তিফৌজ' বলে সংবর্ধনা জানাতেন।

এক দিকে 'পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বকে বাঁচাতে হবে' বলে চিৎকার এবং অন্য দিকে পণ্ডিত নেহরুর গবর্নমেন্টের প্রত্যেকটি কার্য যার দ্বারা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে চীনাদের অথবা কম্যুনিস্ট রুকের অসুবিধা হতে পারে তার বিরুদ্ধাচরণ এই হচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টির 'সরকারী' নীতির মর্ম। কম্যুনিস্ট পার্টির সাম্প্রতিক প্রস্তাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে পার্টির 'সরকারী' এবং চীনা পন্থী অংশের মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই পার্থক্য হচ্ছে 'ট্যাকটিকস' এবং 'টাইমিং' নিয়ে। এ ছাড়া অবশ্য আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে পিকিং এবং মস্কোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্ব ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাই বলে মস্কোর দিকে যাঁরা ঝুঁকেছেন তাঁরাই ভারত চীন বিরোধে ভারতের বন্ধু, এমন মনে করার মতো ভুল আর কিছু হতে পারে না। তাত্ত্বিক তর্কে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টিকে 'প্রগতিবিরোধী' বলে যিনি নিন্দা করবেন তাঁকেই ভারতের বন্ধু বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়। এক কম্যুনিস্ট যখন অন্য কম্যুনিস্টকে "প্রগতিবিরোধী" বলে নিন্দা করেন, তার অর্থ এই ধরতে হবে যে, প্রথমোক্ত কম্যুনিস্টের মতে শেষোক্ত কম্যুনিস্টের কার্যের ফলে কম্যুনিজম্-এর বিস্তার বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। কম্যুনিস্টরা পিকিং সরকারকে কী বলে সমালোচনা করছেন তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, তাঁরা ভারত সরকারের কোন্ নীতি বা কোন্ কার্যের সমর্থন অথবা বিরুদ্ধতা করছেন, সেইটাই লক্ষ করার বিষয়।

২০-৪-৬৩

মন ও প্রাণ : এক অন্তহীন বিতর্কের অংশ

বুদ্ধদেব বসু

'বরং খেয়াল করো যা-কিছু শোণিতে-মাংসে মর্মাহত নয়—
মশকিনের অপস্মার, আগ্নেয় হুগ্‌নোর-ছন্দ, বদ্দার চুম্বন:
অবশেষে যেখানে চাকার দাঁত থেমে যায়, অন্তিম অন্বয়
খুঁজে পায় গতির তরঙ্গ আর স্তব্ধতার নীলাভ গুঞ্জন—
অন্তরাত্মা সেখানে অর্পণ করো।'

'কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি।'

চলো সেই জানালায়, প্রান্তে যার উতরোল হাজার বড়ওয়ে—
ানী, গুন্ডা, পেবাম্বুলেটরে শিশু, শবযাত্রা, মাতাল খালাসি,
এবং তুমি যে-বস্তু হাতে পেয়ে ফেলে দাও বাঁচার আগ্রহে—
নপথের যা-কিছু ক্ষণিক—সব দল বেঁধে উজ্জ্বল অপ্সরা
মে এসে বৈভব বিলিয়ে দেয় অবিচল চক্ষুময় কাচে।'

প্সরা পারে না দিতে স্পর্শতাপ, তার বাহু আলিঙ্গনে ভরা।'

ালিঙ্গনে সপ্তস্বর্গ, অথচ হয়নি শ্লথ এমন কে আছে?'

নেছি, নির্বাণে শান্তি—কিছু নেই। ভেবে দ্যাখো বৃন্তের ক্ষমতা,
ব টান কাটাতে বিলুপ্ত ক'রে দেয় ওরা ভিত্তি ও কিরীট!
চ যা কামাতুর মাংসে বেঁধা, তাতে নেই ক্লান্তি বা অন্যথা,
-কাঁটায় ম্রিয়মাণ মানুষের বিত্ত শুধু ঘণ্টা ও মিনিট।—
মি তাই জপি সেই উষ্ণ বুক, যার তলে হৃৎপিণ্ড দোলে।'

'সার কদর্য পুঁটুলি হবে, যা তোমার আগুনের ভাঁড়
ত্যাগী খাদক জঞ্জালমাত্র—যা আজ ফুৎকারে ওঠে জ্ব'লে:
নকি স্মৃতিও নাড়ে না যাকে—ঠাণ্ডা কাঁটি কয়েক হাড়,
া, মূক, জান্তব অস্তিত্ব শুধু—হৃৎপিণ্ড তখনও সচল।
াতে আস্থা রাখো?'

'তবে কেন তার কণ্ঠ স্মরণ তোলে প্রতিধ্বনি?
দৃষ্টিবিকিরণ কেন তবে ট্রাফিকের সংকেতে সচ্ছল
বে এ-সব সে তো বুদ্ধি নয়—সে আমার উজ্জ্বল ধমনী
আমার শোণিতস্পন্দন।'

'কিন্তু আছে দিগন্ত, সুদূরতর দূর।
া গন্ধের এক সমুদ্রগর্জন হাওয়ায় কানে এসে লাগে।
রণ যৌবনে ঝাঁপ দেয় অর্ধোর্ধ্ব অন্তঃপুর—
ক ভুলে গেলে?'

'মনে পড়ে এক রাত্রি—অমল দাঁতের দাগে
লে উজ্জ্বলতর নিশ্বাসে নাকের পাশ হ'য়ে আছে লাল,
া মেঝের তলে অন্ধকারে গহ্বরপথ গলে যায় ধীরে—
-বিন্দু আদরে আরক্ত আরো। সেই রাত্রি ক্রমশ বিশাল
হ'য়েছে দিগন্ত, দূর:—জানো?'

'তবু আজ তুমি অন্য তীরে
আছো আকাঙ্ক্ষায়।'

'অন্তত আড়াল নেই, কাচের জানালা
াছি অভ্যন্তরে।'

'অভ্যন্তরে? সে তো এক ব্যর্থ শব্দকো
আক্ষরিক, পুনরাবৃত্তিময়। যত নাড়ো, কিছুতে খোলে না তালা,
শুধু ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ফের বন্ধ হয়। সেখানে আপোশ
চলে অবিরল, বিসংবাদী প্রশ্নে ও উত্তরে। যদি চাও শিখে
নিতে ভাষা, যা তোমারই হৃদয়ের উচ্চারণ, করো না স্মরণ
তবে ভগ্নজানু, দীর্ণস্তন, ছিন্নবাহু কোনারক-সুন্দরীকে,
ঈষৎ নিতম্বে কিংবা নিথর উদরে যার প্রাণের ক্ষরণ
ধ'রে আছে যা-কিছু হারানো, নষ্ট—এবং যা দ্বারপথে চাবি—
সব ক্ষণস্বপ্ন, সব ইন্দ্রিয়কম্পন যেন বাঁধা প'ড়ে প্রেমে
এক স্থির, স্বচ্ছ স্বর্গ হ'য়ে আছে।'

'কিন্তু আজও যার কথা ভাবি
সে মন্দিরে রূপসী—পাষাণ নয়—আর ঘরে আছি তার প্রেমে।'

শিল্পীর স্বাধীনতা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পীর স্বাধীনতা-প্রসঙ্গে আমি কথা-শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নটাই শুধু আমার অনুশীলনের বাইরে। কথা-শিল্পীর স্বাধীনতার সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বাধীনতার যোগ যেখানে, সেখানে প্রশ্নটিকে নিয়ে আলোচনা করা কঠিন কাজ নয়। জাতি যদি যথার্থ স্বাধীন হয় সে জাতির শিল্পীও সমভাবে স্বাধীনতা ভোগ করবে এর মধ্যে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? প্রশ্ন শুধু ঐ 'যাথার্থ্য' নিয়ে। স্বাধীনতার স্বরূপের সঙ্গে এই 'যাথার্থ্য'র প্রশ্ন ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত। আমি বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারাকে প্রতিফলিত না করে আমার বক্তব্যের সঙ্গে কোশলের কণ্টকজাল না জড়িয়ে আপাতত আমার মতামত-প্রকাশের স্বাধীন পথই গ্রহণ করলাম।

আমার কোনো কোনো সাহিত্য-সহযোগী বলে থাকেন, সাহিত্যের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির কোনো যোগ নেই। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমি কথাশিল্পীকার মানুষ আর মানুষের জীবন আমার উপজীব্য বিষয়, মানুষ মানুষের সমাজ, আর মানুষের সমাজ নিয়ে যে রাষ্ট্রনীতি আবর্তিত, তার সম্বন্ধে চিন্তা না করে আমার উপায় কী আছে? পরোক্ষে হোক প্রত্যক্ষে হোক রাষ্ট্রনীতি আমার বিচার্য-বিষয় হয়ে দাঁড়াবে—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মানুষ আর তার সমাজ আর তার পরিবেশ নিয়ে ভাবলো।

কথাটা আমি সংক্ষেপে শেষ করবো বলে সোজাসুজি আমার বক্তব্যে আসতে চাই। আমার রচনার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে আমার স্বাজাত্য নেই, আমার স্বাজাত্য চিত্র-স্রষ্টাদের সঙ্গে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ফটো যাঁরা তোলেন, তাঁদের সঙ্গে আমার নীতিগত বিরোধ আছে। জীবনের যথাযথ প্রতিফলনকে রস-সাহিত্য বলতে আমি নারাজ। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঠিক, রস-সাহিত্যের পরিচিতি জীবনকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। জীবনের রূপ, জীবনের সমস্যা আমরা পরিহার করবো কেমন করে? বরং এটুকু বলা যেতে পারে—জীবনটা রস-সাহিত্যের উপকরণ মাত্র; তার বেশী কিছু নয়! আমি 'জীবন' বলতে এক্ষেত্রে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার দিকেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করছি।

এই বাস্তবতার সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির যোগা-যোগের কথা অস্বীকার করা যায় কীভাবে? বাইরে থেকে যদি এমন আঘাত আসে যাতে করে আমাদের স্বাধীন চিন্তা পর্যুদস্ত হয়ে যেতে পারে—তাহলে, সে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা সচেতন হবো বই কি।

কিন্তু শিল্পীর এ স্বাধীনতার স্বরূপ? আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আমি প্রশ্নটাকে দু-ভাগে বিচার করতে পারি। প্রথম যে স্বাধীনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি বিজড়িত। দ্বিতীয় যে স্বাধীনতার সঙ্গে আমার সৃষ্টির পরিবেশ বিজড়িত যে-পরিবেশের ওপর রাষ্ট্রীয় নীতির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নেই।

প্রথম কথাটাই ধরা যাক। সাহিত্যিক একটি বিশেষ প্রেরণার বশে তাঁর সাহিত্যকে সৃষ্টি করেন, এ-প্রেরণার ব্যাপারে তিনি খাঁটি। খাঁটি না হলে তাঁর সাহিত্য যে জীর্ণপত্রের মতো অচিরেই পথের ধূলায় ঝরে পড়বে। আর যা শুধু 'ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলায়' অথবা দু'দিনের জন্য কিছু রঙ বিকীর্ণ করে বিবর্ণতায় বিলীন হয়ে যায়—তা নিয়ে এ-সব আলোচনার স্বাধীন পথ রুদ্ধ করে লাভ নেই। মোটকথা এটাই ধরে নেবো সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে একটা বিশেষ প্রেরণা থাকে। এই প্রেরণা নানাভাবে আসতে পারে। কীভাবে আসবে সাহিত্যিক নিজেই হয়ত সে বিষয়ে সম্যক সচেতন নন। এক কথায় তাঁর সাহিত্য-কর্ম তাঁর এমন এক বিশেষ প্রেরণার বশে যার ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। আমি সচেতন নিয়ন্ত্রণের কথাই বলছি। এখন কথা হচ্ছে, তার এই প্রেরণাপুষ্ট সাহিত্যকর্ম প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির সপক্ষে যেতে পারে আবার না-ও যেতে পারে। যদি না যায় তাহলে রাষ্ট্র তার দৃঢ় মুষ্টি কতোখানি প্রসারিত করবে, বা তার করা উচিত—এটাই প্রশ্ন। নয় কী?

রাজতন্ত্র উত্তর প্রকাশ করবে একভাবে, গণতন্ত্র অন্যভাবে সাম্যবাদ ভিন্নতররূপে। এ বিষয়ে ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিতে পারে বর্তমানকালের ভিন্ন দেশের ভিন্ন রাষ্ট্রনীতিও আমাদের শিক্ষা দিতে পারে। এদিক থেকে কোন রাষ্ট্রনীতি কতোখানি উদারতা প্রদর্শন করেছে সে-কথার থেকেও বড় কথা যে কোনো রাষ্ট্রনীতিই তার মতবিরোধী রচনার ইচ্ছা করলে কণ্ঠরোধ করতে পারে। উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই,
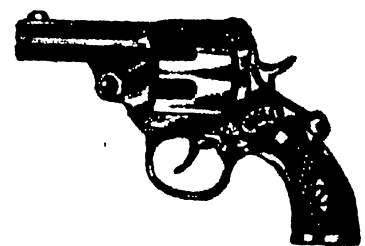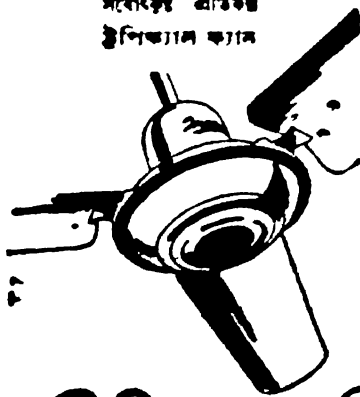
সর্বদেশে অতীতে ও বর্তমানে নিষিদ্ধ বই ছিল এবং আছেও।

তাহলে? স্বাধীনতা সংরক্ষণের প্রশ্নটা কতখানি ব্যাপক? শিল্পী-হিসাবে আমার প্রেরণা যদি খাঁটি হয় তাহলে আমার বইয়ের পর বই 'নিষিদ্ধ' করলেও আমার কণ্ঠরোধ করা সহজ হবে না, সাহিত্যের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

তবে আমার ভয়টা কীসের? রাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন বাকীটা আপাততঃ স্থগিত রেখে সুবিধার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমার রচনার পরিবেশ। বরং বলা যাক, রচনার পরিবেশ ও পরিমণ্ডল। এখানেও প্রেরণার কথা তোলা যেতে পারে। প্রেরণা যদি খাঁটি হয় তাহলে প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করা তার পক্ষে কঠিন নয় অনুকূল পরিমণ্ডল সংগঠন করাও তার পক্ষে দুরূহ কোনো ব্যাপার নয়। এটা সহজভাবেই বলা চলে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন, উভয়কেই একসঙ্গে একবারে বিচারের ক্ষেত্রে টেনে এনে বলছি—প্রেরণার তরঙ্গই যদি শিল্পীর জীবনে ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে মরে যেতে থাকে, তাহলে?

এই আঘাতের প্রশ্ন শিল্পীর জীবনে আজ মুখ্যাংশ গ্রহণ করছে বলেই স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে আমরা এতো বিব্রত। এবং সেদিক থেকে প্রশ্নটার অনিবার্য রূপ অত্যন্ত জটিল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আমাদের একটা প্রাপ্য আছে অবশ্যই প্রাপ্য আছে সাহিত্যশিল্পী হিসাবে। আমি সাহিত্যশিল্পী সত্ত্বার প্রাপ্তব্য স্বাধীনতার কথাটুকুকেই আলোচনার কেন্দ্রীভূত বিষয় করে রাখতে চাই এ নিবন্ধে।

সাহিত্যশিল্পীরূপে সত্য প্রকাশে যে আনন্দ পাই তার থেকে বঞ্চিত অথবা [illegible] থেকে। যাঁরা আমার সত্যকে দমন করেন, যাঁরা আমার সাহিত্যের সহযোগী তাঁরা যখন ব্যবহারিক সফলতাকে মানদণ্ড করে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উচ্চ-নীচতার শ্রেণীভেদ করেন গুণগ্রাহিতার প্রচণ্ড অভাব যখন চারিদিক থেকে বিষবাষ্প উদ্গীরণ করে তদুপরি ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য যখন তার করাল বাহু দিয়ে আমাদের নিষ্পেষিত করতে থাকে, সামাজিক দিক থেকে নটনটীমুখিন সমাজ নটনটীকে মাথায় স্থান দিয়ে আমাদের সত্তার দিকে যখন অবহেলিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে—তখন মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ইচ্ছা করে তারস্বরে বলে উঠি ধ্বংস হোক ধুয়ে-মুছে সব নিঃশেষ হয়ে যাক, আবার শুরু হোক এই ধ্বংস স্তূপ থেকে নতুন জীবন।

নতুন জীবনের স্বপ্ন চিরকাল সাহিত্য-বিদ্রোহীরাই ত দেখে থাকে? আমরা এ-জীবনের সাধনা দিয়ে না হয় সেই স্বপ্নকেই ত্বরান্বিত করি। আমরা স্বপ্ন দেখবো প্রথমে, আর সেই স্বপ্নকেই ত বাস্তবে রূপ দেবে মানুষ। কিন্তু হায়, আমাদের টিঁকে থাকার দ্বন্দ্বে আমরা যে কোথায় হীনবল হয়ে পড়েছি, সে খবর কী আমরাই জানি? আত্মদ্বন্দ্বে আমরা অস্থির, বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের আভাষ আমরা দেবার চেষ্টা করছি কতটুকু যে মানুষ আমাদের সপক্ষে থাকবে?

সত্যি কথা বলতে কী, সত্যিকারের অধীন আমরা নিজেদের কাছে। নিজেদের বদ্ধমূল ধারণার দাসত্ব থেকে নিজেদের যতদিন না আমরা বন্ধনমুক্ত করতে পারছি বৃহত্তর মানুষের স্বার্থে ততদিন আমাদের স্বাধীনতা স্বমহিমায় কিছুতেই দেদীপ্যমান হয়ে দেখা দেবে না। এই 'বদ্ধমূল ধারণা' একটা কথার কথা মাত্র নয়। 'অবজেক্টিভ রচনার একটা মূল্য আছে স্বীকার করি, কিন্তু সাবজেক্টিভ রচনার কি কোনো দাম আছে?' আমার ধারণা যথার্থ প্রেরণা সঞ্জাত রচনা 'সাবজেক্টিভ' হতে বাধ্য। আর, যা প্রেরণা-সঞ্জাত নয়, তা সাহিত্যই নয়।

আমি ব্যক্তিগত জীবনে যেভাবে ঘাত-প্রতিঘাত ও বৈচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি, তাতে করে, বলতে বাধা নেই, আমি Have not দের দলে এবং সেজন্য স্বাভাবিক কারণেই আমার মানসিক প্রবণতা এমন একদিকে যার নাম দিতে পারি—'সাম্য'। সেই সাম্য অবশ্য যা মানুষকে সমান অধিকার দেয় মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সমাজে যা স্থিতি স্থাপকতা আনয়ন করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সে তথাকথিত সাম্যবাদ পর সম্পদের দিকে রক্তলোলুপ থাবা বাড়িয়ে দেয় যে সমাজে অপরের সংস্কৃতিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আপন সংস্কৃতিকে বোঝার মতো মাথার ওপর চাপিয়ে দেয়—সে সাম্যের দলে আমি কেউ নেই।

এবং সব থেকে বড়ো কথা আমার রচনা তার সাক্ষ্য দেবে আমি বিশ্বগ্রাসী Totalitarianism-এর বিরুদ্ধে। পৃথিবী-সুদ্ধ যে যেখানে আছে সুদূর দ্বীপ কি পার্শ্ববর্তী জনপদে সবাইকে আমি এক কাপড় এক জামা এক রীতিনীতির খোলস পরাতে চাই না। আমার "সাম্য" বৈচিত্র্যের মধ্যে যে পরম মানবিক ঐক্যের সূত্রটি বিরাজমান, তাকে গিয়ে আবিষ্কার করবে,—আমার সাম্য সেই আত্মিক ঐক্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

এই আত্মিক ঐক্য আমার ভারতবর্ষের দান। এদিক থেকে ভারতীয় ভাবধারা আমার রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় কাজ করে চলেছে। আমি ধর্ম-অনুশাসনের গোঁড়ামি মানি না, শ্রেণীভেদ মানি না, জাতিভেদ মানি না, এবং ধর্ম-আচার-অনুষ্ঠান যদি কোথাও মনুষ্যত্বের অবমাননা করে

পর্যবেসিত হয়, সেখানে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করি। সেদিক থেকে হিন্দুত্ব আমাকে প্রভূত সুবিধা দান করেছে। চার্চে অথবা মসজিদে যাওয়ার মতো মন্দিরে যেতে হয় না, পুজা-অর্চনা করতে হয় না, তবু আমার হিন্দুত্ব সমান বজায় আছে।

এদিক থেকে দেখতে গেলে আমি নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী। অথচ আমি অন্তরে ঐক্য-সন্ধানী বলে আমার জাতীয়তাবোধের সঙ্গে আমার আন্তর্জাতিকতাবোধের কোন বিরোধ নেই। শিল্পী বলেই আমার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। একজন রাষ্ট্রনীতিকের জাতীয়তা ও আন্ত-র্জাতিকতা-বোধের বিরোধ থাকতে পারে, শিল্পীর তা থাকে না। অবশ্য সে শিল্পীর মন যদি বহির্মুখিতাতেই আপন জীবন-বোধের সীমারেখা না টেনে অন্তর্মুখিন হবার চেষ্টা করে ক্রমশ। কলকাতার একজন সাধারণ ভারবাহী শ্রমিকের সঙ্গে সিচেলাস বা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের শ্রমিকের মূলগত কোনো অনৈক্য আমি দেখতে পাই না। হরিপদ কেরানীর সঙ্গে বিলাতের জনস্টন কেরানীর অবস্থা বা মানসিকতার কি কোনো বিশেষ তারতম্য আছে? হয়ত আছে, কিন্তু এক যায়গায় তাদের মিলও আছে। যেখানে তাদের মিল, সাহিত্যিক হিসাবে আমার দৃষ্টি পড়বে সেখানেই। এই জন্যই বলছিলাম আমাদের জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনো প্রভেদ নেই।

কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সমাজ-ব্যবস্থার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনুধ্যানও ব্যাহত হতে পারে। ফলে সৃষ্টিতে বাধা পড়বেই। অবশ্য বাধা পড়লেই যে 'গেল গেল' রব তুলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই কারণ মানুষের সমষ্টিগত যে কোনো তরঙ্গ উঠুক না কেন সচেতন শিল্পীর হৃদয়ে তা এসে সাড়া জাগাবেই। এবং কোনো অধীনতার নাগপাশই সেই সাড়াকে শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত করতে পারবে না। এটা মাত্র আশারই বাণী। যথার্থ সাহিত্য-শিল্পী চিরকাল থাকবে মানুষের সপক্ষে, তাকে থাকতেই হবে, থাকাটাই তার স্বধর্ম। যে 'ইজম্'ই আসুক না কেন, তাতে যদি মানুষ নিপীড়িত হয়, তাহলে শিল্পীর কণ্ঠ মুখর হয়ে উঠবেই, তাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

তবু শিল্পীর স্বাধীনতার সপক্ষে কথা বললাম কেন? শিল্পীর ব্যবহারিক জীবনের কথা ভেবে। সর্ব স্বাধীন দেশে সাহিত্য-শিল্পীর বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সে কাজটা [illegible] হচ্ছে কই? [illegible], [illegible] যদি আমার [illegible] হয়, তাহলে [illegible]

স্নেহাধিকা মারী করেল-কে অধমর্ণ
গুণমুগ্ধের উৎসর্গ

টুটুদের ওখানে

সকালের ডাকে এসেছে এক চিঠি, বড়ো শোক-স্মারক এক ছোট্ট চিঠি ঃ "শ্রদ্ধেয় ফাদার, আজ আমাদের টুটুর পরলোকগমনের দ্বিতীয় বার্ষিকী; ভগবানের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা জানাতে ভুলবেন না। ইতি—টুটুর মা।"

অনেক দিনের কথা। টুটুরা থাকত তখন কলকাতায়, মোহনবাগান রো-এ। একদিন শুনলাম, কি জানি কোন্ সূত্রে, টুটু না কি আমার কথা শুনেছে, আমার লেখা পড়েছে, আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

টুটু শয্যাশায়ী...অনেক দিন থেকে ভুগছে। ওর বাবা-মা হাসপাতালে পাঠান নি ওকে। টুটুর সেই যক্ষ্মা রোগটা যখন—বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতেও—আরোগ্যাতীত, তাঁরা স্থির করলেন, চিকিৎসার অভাবের ক্ষতিপূরণ তাঁরাই করবেন, অক্লান্ত শুশ্রূষায়—বাড়িতে।

গেলাম তবে, টুটুর মায়ের অনুরোধে, কাজের ফাঁকে, টুটুদের ওখানে। টুটু বলল, "আমি, জানেন, কনভেন্টে পড়েছি... আপনার কাছে যীশুর কথা শুনব।"

টুটু বাইবেলের গল্প শুনত, বই পড়ত, নিজের কথা প্রায় বলতই না। একদিন কিন্তু, এমনি, হঠাৎ, কোনো ভূমিকা না ক'রে সে বলল, "আমার একটা গল্প আছে... কাউকে বলি নি, মাকেও না। মৃত্যুর আগে আপনাকে বলতে চাই...শুনবেন?"

"শুনব।"

টুটুর গল্প

ম্যাট্রিক পড়তাম তখন; বয়স ছিল ষোল; সবাই ডাকত টুটু বলে। আমার ছিল এক বন্ধু; পুতুল ছিল তার নাম। না ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই নি আমি; এমনিই প্রথম থেকে ও আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। আমার আর ওর বাবা ছিলেন ক্লাস-ফ্রেণ্ড, ভর্তি করলেন দুজনকে, ক্লাস ফাইভে, বীডন স্ট্রীটের হোলি চাইল্ড ইস্কুলে।

কত-না ভালবাসতাম, ওকে...বাসতাম? সত্যি বাসতাম? বোধ হয় বাসতাম না... বাসতে শিখি নি তখনও। ভীতু ছিলাম... প্রায় মিশতাম না কারো সঙ্গে; আর মেয়েরাও তো আমাকে কেয়ারই করত না। আসতাম যখন, রিক্শা করে, মাইয়ের বর্মীজ টিফিন-বাক্স হাতে, দূর থেকে কেউ ডাকত না আমায়, আসতই না দেখতে।

ক্লাসের আগে, ক্লাসের পরে, দল পাকিয়ে গল্প করত তারা। এগিয়ে যেতাম ত্রস্ত পদক্ষেপে, বলতে পারতাম না কিছুই...আর যা বলতাম, গ্রাহ্যই করত না কেউ। পুতুল কিন্তু যে-মুহূর্তেই আমায় দেখত, আসত দৌড়ে, দূর থেকে 'টুটু......টুটু'...... চেঁচিয়ে। ভুলে যেতাম অন্যদের অনাদর—একনিমেষে। বন্ধু আমার...পুতুল আমার... কত ভাল ছিল সে—যে-টুটুকে ভালবাসত না কেউ, তাকে যে বাসতে পেরেছিল ভাল... না, আমার থেকে একটুও সুন্দরী সে ছিল না, বুদ্ধি ছিল তার অনেক বেশি। ক্লাসে ছিল ফার্স্ট, লিখত ভাল, পড়ত ভাল, আঁকত বেশ। দিদিমণি ক্লাসেই আমাদের পড়ে শোনাতেন ওর লেখা। আর আমি?..... আমি তো বাংলায় ছিলাম মন্দ নয়, হিস্ট্রি পারতাম, ভূগোল পারতাম, অঙ্কটা পারতাম না, বুঝে আসতাম ওর কাছেই।

না, আমার থেকে সুন্দরী নয়..... কিন্তু ওর ছিল চোখে মুখে কথা, ঠোঁটে ফুটত মিষ্টি হাসি। পুতুল ছিল যেন সবার সম্পদ......দুঃখ লাগত বুকে......আমারই যখন বন্ধু সে—আর আমার যে আর বন্ধু ছিল না—তাই চাইতাম আমি, কাড়বে না কেউ তাকে। কাড়ত কিন্তু। কাড়ত সবাই। প্রতিমুহূর্তে।

ছুটির দিন, পুতুল যে-দিন আসত আমাদের বাড়ি, আমার ঘর সাজাতাম ওরই রুচি মতো, ফুলদানিতে রাখতাম নিউ মার্কেটে কেনা গোলাপের এক তোড়া। কত যত্নে, কত ছলে-বলে পাড়ার সব মেয়েকে—আর ছোট্ট বোনকেও—দূরে রাখতাম .... পুতুলের কাছ থেকে দূরে। ওরা কেউ চুরি করে যদি তাকে। পরস্পরকে শোনাতাম কবিতা, পরস্পরে-উৎসর্গিত কাব্য.....। আর দিদিমা মানিক জোড়কে দেখে ফোকলা মুখে মৃদু মৃদু হাসত।

তখন—জানেন, ফাদার—ছিলাম সুখী... ভা—রি সুখী।

অভিশপ্ত সন্ধ্যায়

সে বছর, স্কুলের কোনো উৎসবে, আমরা মঞ্চস্থ করলাম 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। আমরা... অর্থাৎ আমাদের ক্লাসের সব মেয়ে—কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে। না, এতে অবশ্য কোনো চক্রান্ত ছিল না, শুধুই চিকিৎসকের পরামর্শ, আর আমার স্বাস্থ্যের প্রতি বাবার মাত্রাতীত দুর্ভাবনা। পুতুল সাজল শ্যামা.....,আর আমি 'সখীগণ'-এর মধ্যেও স্থান পেলাম না, কোনোরকমে ঠাঁই পেলাম দর্শকদের ভীড়ে।

নাটমঞ্চের সঙ্গে সুদ্ধোই আভনেতাদের যাচ্ছিলাম অভিনন্দন জানাতে; আমাকে ওরা—এমন কি পুতুলও লক্ষ্যই করল না আদৌ। রমা যেখানে উত্তীয়, চম্পা যেখানে কোটাল, মিনু যেখানে বজ্রসেন, সেখানে টুটু—শুধু টুটু—কে?......

পুতুল যেদিন হল শ্যামা, সেই দিন কাদায়, সেদিনই প্রথম বুঝলাম আমাদের দুজনের বন্ধুত্বের শালকাঠে ঘুণ ধরে এসেছে বাসা বাঁধতে . ।

নামলাম সবাই উৎসব-ভোজের ঘরে।

যে টেবিলে শ্যামারা সব বসল সেখানেও আমার মিলল না ছাড়পত্র। মিলল না কোনোখানে। অবশেষে জায়গা পেলাম বাচ্চা মেয়েদের টেবিলের এক কোণে । খেলাম খাওয়ার আনন্দ ছাড়াই—খায় যেমন রাস্তার লোক রাস্তার ধারের দোকানে, অচেনার অস্বস্তিতে।

ভোজের পরে হল নাচ দুজনে দুজনে নাচ বিলেতী কায়দায়। বিলেতী নাচের আমার বড় শখ কত না নেচেছি বাড়িতে কি স্কুলে, গ্রামোফোনের বাজনার তালে তালে প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে। সবাই আমাদের বলত স্কুলের নাচের বেস্ট জোড়া। সেদিন কিন্তু প্রাণের বন্ধুটি আমার সঙ্গে একটিবারও নাচল না টুটুর সঙ্গে নাচল না শ্যামা।

এত আঘাত . এত দারুন আঘাত......। পুতুল আসলে আমাকে ভালবাসত না ..... ভান করেছিল বাসার শুধু ভান ... ভালবাসার ভান। আর সমবেদনা . হ্যাঁ, তা-ই হবেঃ বন্ধুহীন সহপাঠিনীর প্রতি সমবেদনা। নাচলাম না কারও সঙ্গে, শুধু রইলাম ঘরের এক কোণে লুকিয়ে। খারাপ লাগছিল সব কিছু খারাপ লাগছিল নিজেকে। খারাপ লাগছিল আমার নতুন কেনা ফ্রকটা, শখের ফ্রক, মা যেটা কিনিয়েছিলেন, আজকের উৎসবের উদ্দেশে পার্ক স্ট্রীটের এক শৌখিন দোকানে।

কাটালাম সেদিন আমার জীবনের দীর্ঘতম নিদ্রাহীন রাত হাতড়ে হাতড়ে পুতুলকে খুঁজেছিলাম আমার ভগ্ন হৃদয়ের সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে .... আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় ডাকছিলাম বিগত বন্ধুত্বের ধসে যাওয়া স্মৃতিবাহিনীকে।

পরের দিন পুতুল যখন স্কুলে এল মেক আপ-এর অর্ধমোচিত কাজল চোখে, পুতুল যখন চম্পা-কোটালের হস্ত ধরে অভ্যাস মতো 'টুটু টুটু' ডাকল এগুলাম ওর দিকে ইতস্তত করে অনিশ্চিতির চোরাবালিতে। হায় প্রেমের কথা সে বলতে শিখেছে কোত্থেকে, অপ্রেম যার অন্তরে? পুতুলের সাজানো সব কথায় বিশ্বাস করেছিলাম, ঠকেছিলাম..। আমার মিথ্যে আশা [illegible] তখন, উৎসবের ঐ সন্ধ্যায় ঘুচে গেছে [illegible]—মিলিয়ে গেছে বুদ্বুদ, সাবান-[illegible] [illegible] ব্যথা রেখে।

"এইটে শেষ করতে আমার কতদিন লেগে গেল। তবুও আবার ভুল করে ফেল্লাম।"

"আজকাল কিছুই যেন ঠিকমত করে উঠতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যাই।"

"ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই, প্রেমা। রোজ দু' পেয়ালা করে বোর্ণ-ভিটা খেয়ে দেখছ কি? আমাকে ডাক্তারবাবু তা বলেন এবং ওতে আশ্চর্য্য ফল দেয়।"

"সত্যিই কি চমৎকার পরামর্শই দিয়েছিলে! প্রতিদিন ঠিক দু'পেয়ালা করে—এখন তফাৎটা বেশ বুঝতে পারছি।"

"আশ্চর্য্য সত্যি, তোর মা দিনে এত কাজ করে উঠতে পারে।"

এত উৎসাহ
আগে কখনও
বোধ করি নি!

শক্তি ও
উৎসাহের জন্য

BOURN-VITA

প্রস্তুতকারক
Cadbury's

তাপ

নিখিল সরকার

বৈশাখের গোড়াতেই খরাটা পড়েছে। খরা [illegible] নয় যেন কঞ্চির মতন কতগুলো লিকলিকে সাপ হিসহিস শব্দ তুলে চারদিকে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। ওদের উষ্ণ নিশ্বাসে এরই মধ্যে সব [illegible] জ্বলে পুড়ে যাবে। জীবন সেদিকে [illegible] লম্বা করে একটা নিশ্বাস ফেলল। এই সাতসকালেই দিনের যা [illegible] যেমন এক ক্লান্ত অসহ্য দৃষ্টিতে এবার সে সামনের দিকে তাকাল।

সুরেন হাতির দোকানের সামনে দুটো কুকুর ছানা ঝিম মেরে শুয়ে আছে। বেলা আবার ওদের গায়ে এসে পড়েছে এই মাত্র। [illegible] না পেয়ে ওরা ক্রমশ সরে সরে শীতল ছায়া বেছে নিচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে জীবন ম্লানভাবে সামান্য হাসল। হাত পাঁচেক দূরে রোদটা তখন ওদেরও চেয়ে চেয়ে দেখছে। অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি এগিয়ে আসছিল। আর একটুর মধ্যেই ধরে ফেলবে বুঝি।

ওরা কজন তেঁতুল গাছটার তলায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছিল। তখনও ওদের মধ্যে কেউ কেউ মুড়ি খাচ্ছে। গল্প করছে। এই কিছু-ক্ষণ আগে জীবন মুড়ি খাওয়া শেষ করেছে। এখন আরাম করে একটা বিড়ি টানছিল। এখনও ঠান্ডা ঠান্ডা একটা নরম ভাব আছে এখানে। অথচ সামনের চিক চিক করা রোদের দিকে তাকালে, এখনই যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন। কেবলই তেষ্টা পায় এ-দিনে।

জীবন আবার চোখ তুলল। সুরেন হাতির দোকানের বাঁ দিকেই কিছুটা জায়গা, একটু [illegible]। কটা [illegible] গাছ সেখানে। বাঁশবরণ [illegible] দিয়ে জায়গাটা ঘের দেওয়া। [illegible] তাই [illegible] দেখাচ্ছে। [illegible] গাছও আছে। কিছু [illegible]। আর [illegible] কটা [illegible] ছোট মতন ঝোপ। এই জঙ্গলের পাশেই আরো কটা [illegible] পাচ্ছিল জীবন। এই সব [illegible] সমস্ত উলটে [illegible] বসে বসেই জীবন [illegible]

[illegible] মাঠটা ক্রমশই বাড়ছে। থেকে থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধানে তিরতির করে কচু পাতা কাঁপছিল শুধু। এখান থেকে জীবন এখন দেখতে পাচ্ছে কটা শালিক উড়তে উড়তে এসে এই মাত্তর বাবলার ডালে পা রাখল। শব্দ করল। খুঁটে খুঁটে কি যেন খেল। পরস্পর পরস্পরকে আদর করল। তারপর লাফাতে লাফাতে ওরা এখন ওই জঙ্গলের অন্তরালে চলে গেছে।

এখান থেকে অনেকক্ষণধরে সে অল্প অল্প করে গাছ গাছালির একটা গন্ধ পাচ্ছিল। ঘ্রাণটা যেন এখানে সর্বত্র ছড়ানো। জীবন জোরে জোরে কয়েকবার গন্ধটা আস্বাদন করল। এখন তা শুকিয়ে ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কটা কাক বহুক্ষণ থেকে মাথার ওপর ডালে বসে ডাকছে। জীবন ছোট মতন একটা [illegible] কুড়িয়ে নিয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাক কটা চিৎকার করে এখন আরও একটু দূরে গিয়ে বসল।

জীবন দৃষ্টিটাকে এবার নদীর দিকে প্রসারিত করে ওদের [illegible]টাও দেখল। [illegible] পাশেই হারাধনদের নৌকো। এখনও [illegible]। আর কতগুলো চুপচাপ [illegible]। আরো কিছু দূরে একটা [illegible] নৌকো। জেলেরা [illegible] মাছ মারে আসে। ওরা [illegible] বিরাট জাল [illegible]। দুটো কুচো ছেলে [illegible] করছে। কিছু কুকুরও [illegible]।

মাছের গন্ধ পেয়ে অনেক গাঙচিল নেমে এসেছে ডাঙায়। কিছু মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। আর কতগুলো জলের ওপর পড়ে, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খেতে খেতে কিনারে চলে আসে, আবার উড়ে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে জলের ওপর খুশীতে সাঁতার কাটে। ওরা যেন আজ কোন এক ভোজ বাড়িতে এসে জড়ো হয়েছে। আশপাশে কিছু কাকও ছিল।

আবার যেন তেষ্টা পাচ্ছে তার। জীবন হিসেব করল আজ মাসের কত। কিন্তু বারবারই কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। কেবলই তার মনে হচ্ছিল, আজ মঙ্গলবার। কিন্তু হিসেবের গিঁটটা কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। বুকের তলায় আর একবার কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পায় জীবন। ঠিক এমন সময়ই হারাধন মাঝি তার এখানে এসে বসল। জীবন তাকে হারাধনদা বলে ডাকে। এক সময় ওর বাবার নৌকোতে হারাধন কাজ করত। এখন সে অন্য নৌকোর মাঝি হয়েছে। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ

হারাধনের দিকে চোখ তুলল জীবন। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ গো দাদা আইজ মাসের কত কউ ত?"

"কেন? আইজ ত মাসের ছ।"

"আগের মঙ্গলবার ত চৈত্র সংক্রান্তি গেল যাইচে তাউ নয়?"

"হ্যাঁ।"

"আর আইজ এক মঙ্গলবার, মংগলে আট তার থেকে এক বার দিলে হয় সাত। কিন্তু গণনায় কইছিল আইজ ছ তুমিও কওছ ছ।" জীবনের গলার স্বরে তখনও একটা সংশয় স্পষ্ট। "ঠিকই ত কইছি তর যে গোড়াতেই ভুল্লা।" হারাধন ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু করে হাসতে থাকল।

জীবন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কোথায় তার ভুলটা। মনে মনে আরো একবার হিসেব করল। চুপ করে থাকল কিছু সময়। কিন্তু না হলে না তাকে নিয়ে। মাথাটা আরো গরম হয়। বিরক্তি বাড়ে। জীবন বিস্ময়ের চোখ ধরা দৃষ্টি নিয়ে তাই হারাধনের মুখের ওপর চোখ রাখল। বলল, "কি রকম?"

"কি রকম কি, আইজ ত সমবার।"

"সমবার?" জীবন আরও অবাক হওয়ার চোখ নিয়ে হারাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"হুঁ হুঁ সমবার।" হারাধনও একদৃষ্টে জীবনকে দেখছিল।

"তাউ কউ, মাথাটা একবারে খারাপ হইচে।" জীবনের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল ক্রমে। এতক্ষণ ভুলটার কারণ বের করতে পেরে ঈষৎ খুশী হয়েছে যেন সে।

একটা কাক জোড় পায়ে লাফিয়ে মুড়ি নিয়ে পালাচ্ছিল। আরও কটা তার দেখাদেখি মাটিতে নেমে এসেছে। হারাধন দু-মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। পরে জীবনের দিকে চোখ রাখতে রাখতে বলল, "তর আর দোষ কি, যে জ্বরে পরথুন্ (পড়েছিলি), একদিনে সেটা ত কাহিল করইয়া দেয়।"

জীবন ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে। "আর দুদিন ঘরে রইলে ত পারতু।" হারাধন টেনে টেনে বলে।

"না না, ঘরে থাইলে খাবু কি! আর তুমি ত জান গো দাদা ঘরে থাইলে যেন দম আটকি যায়।" দু মুহূর্ত নীরব থাকে জীবন। একটা ঢোক গিলে গাছের দিকে দৃষ্টি ফেলতে আবার বলল, "পিঞ্জরায় পাখি দেখছ ত, অর মতন খালি ছটপট করে।" কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন।

"তা আমানে হইলি ত জলের পোকা ঘরে রইতে কি আর মন লাগে।" জীবনের ঘরে না থাকার কৈফিয়তটা হারাধনের যেন মনের মতন হয়েছে। তাই প্রসন্ন মনে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। তারপর জীবনের চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, "দে দুটো বিড়ি দে।"

জীবন দুটো বিড়ি বের করে একটা হারাধনের দিকে এগিয়ে দিল। অন্যটা নিজে ধরাল।

ভাটা হয়ে গেছে। আর এক সোল জল কমলেই হারাধন তার নৌকো ছাড়বে। যাবে মরাগাঙিয়া। হারাধন বিড়িটায় একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল "আইজ কতদিন নু থেকে। কেমন কাঁঠাল পাকা গরম পড়ছে দেখছু ত?" ধীরে ধীরে বিড়িটা টানতে থাকে জীবন। আরও কটা দিন তুই ঘরে রইলে পারতু তর শরীরটা বড় পাঁশুটে (পাংশে) হইচে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হারাধন আস্তে আস্তে বলল।

জীবন বিড়িটা ফেলে দিল। কেমন এক ঘোলাটে তেতো স্বাদ লাগছে জিভে। হারাধনের মুখের দিকে স্থির শান্ত পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কদণ্ড। তারপর মৃদু হেসে বলল "ওকথা আর কইনু নি।" কেমন যেন এখন অন্যমনস্ক, পীড়িত দেখাচ্ছে তাকে।

হারাধনও জীবনের মুখের দিকে চেয়ে ক মুহূর্ত কি ভাবে। কিছুটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে কি খুঁজল যেন। তারপর সামান্য হেসে বলল, "জীবন একটা কথা কইবু, ক রাগ করবু নি?"

"তোমার কথায় কবে রাগ করচি, কইতে পার?" বলতে বলতে মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল তুলে নিল জীবন। হাতে নিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করে।

"এবার ঘরে একজনকে লিয়ায়, তর বুড়া মা ত আর পারে নি। সেদিন না কীর্তিবাসের কাছে গেলি, সেঠি তর মা বুসিইয়া (বসে) থাইল। আমাকে দেখইয়া কাঁদতে লাগল বুড়ি", হারাধন চুপ করে। জীবনকে ভাল করে লক্ষ করতে থাকে। এরই মধ্যে জীবন

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে। চোখে মুখে তা ক্রমশ ফুটে উঠছে। বিড়িটা টান দিতে গিয়ে হারাধন টের পেল, কখন যেন সেটা নিবে গেছে। পোড়া বিড়িটায় আর একবার আগুন ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে কটা টান দিল। পর একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "তাউ কই কি এবার একটা বে থা কর জীবন।" এতক্ষণ যেন ভেবে নিচ্ছিল হারাধন কি ভাবে বলবে কথাটা। গলার স্বরে তাই একটু মন্থর ভাব ছিল।

হাতের ডালটা ফেলে দিয়ে জীবন হাসল। তেঁতুলের কটা শুকনো পাতা কাঁপতে কাঁপতে এসে মাথায় পড়ল। জীবনের এ হাসির তলায় কোথায় যেন সামান্য একটু বেদনার ছায়া ছিল। এ প্রসঙ্গটা আপাতত আর ভাল লাগছিল না তার। এখানেই সে আলোচনাটা শেষ করে দিতে চাইছিল। দু মুহূর্ত নীরব থেকে কি যেন ভাবল সে। তারপর হারাধনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল "আর তুমার লোকা যে ছাড়বে প্রায় দু সিকি ভাটা ত হইয়া গেল। পরে যাইতে কষ্ট হবে কিন্তু।"

"ঐ ত চালাকি করছ" বলতে বলতে হারাধন উঠে পড়ে। সত্যিই এ বেলায় নৌকো ছাড়তে না পারলে অনেক কষ্ট হবে। কথায় কথায় সময় একটু নষ্ট করে ফেলেছে।

জীবনের গলাটা আবার যেন আঠা আঠা হয়ে আসছে। আজ খুব তেষ্টা পাচ্ছে তার। রোদটা এখন হাত দুয়েকের মধ্যে এসে গেছে। এখনই আকাশের দিকে তাকালে ভয় লাগে। এতটা পথ যেতে আজ খুব কষ্ট হবে। বাতাস আগুনের ছোঁয়া পেয়ে এরই মধ্যে যেন তেতে উঠেছে। জীবনের নৌকায় এখন দুটি করে লোক উঠছে। ভাটা শেষ হয়ে জোয়ার এলেই ছাড়বে।

"আইজে বড় কষ্ট হবে যাইতে" নিরঞ্জন শান্ত জলের দিকে চেয়ে বলল।

"তা ত হবেই, বাতাসটা যে পড়িয়াল (পেড়ে গেল)।" কথা বলতে জীবনের অল্প কষ্ট হচ্ছিল। তবু নিরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বলল "একটা কাজ করত, এক ঘটি জল লিয়ায় তেষ্টায় গলা শুকি যায়ঠে।" নিরঞ্জন ঘটি নিয়ে চলে গেলে জীবন গাঙের দিকে তাকাল দেখল হারাধনের নৌকোটা ততক্ষণে অনেকটা দূরে চলে গেছে। হারাধনের কথাগুলো দিয়েই যেন এখন তার মনের কাজ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে নিরঞ্জন জল নিয়ে এসেছে। প্রথমটায় খেয়াল করে নি। পরে ঘটিটা নিজের হাতে নিয়ে মুখের ওপর তুলে ধরল। ঢোঁক ঢোঁক করে জল খেল অনেকখানি। ঘটিটা মাটিতে রাখতে রাখতে নিরঞ্জনের দিকে চোখ রেখে বলল, "একবার খোলটোলাটা ভাল করুইয়া দেখবু, জল উঠেঠে নাকি।"

"যাই।" বলে নিরঞ্জন ঘটিটা হাতে নিয়ে [illegible]।

[illegible] ক্ষ্যাপাদের লোক

কুনটা?" একজন বুড়ো লোক জীবনের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে কতগুলো কাচের চুড়ি। ওর মধ্যে কতগুলো কালো কারুকরা চুড়ির দিকে জীবন এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। কিছুটা যেন সে অভিভূত। বুড়োর কথাটা তার কানে যায় নি। এমনই ডুবোমন হয়ে সে চুড়িগুলো দেখছিল। কিছুক্ষণ পর বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জীবন শুধলো, "এ চুড়িগুলো ত খুব সুন্দর গো বুড়ার পো, কত দিয়া কিনল?"

"বেশি লেয় নি মাগথলু অনেক। শেষকালে মাত্র ছ আনা দিচি।" বলে এই কৃতিত্বের জন্যে বুড়ো হাসতে লাগল।

"চুড়ি গা ত বেশ কিনেছ বুড়ার পো, চোখ আছে বুড়ার। তা বুড়ি পছন্দ করবে ত?" বলে নিরঞ্জন হাসতে থাকে বুড়োর দিকে চেয়ে।

"ঠাট্টা মশকারী বাদ দিয়া কউ না, কুনটা ছাড়ব?"

"কিরে নিরঞ্জন অখনও গেলা না, ভাটা যে শেষ হইয়া গেল।" গলায় ঈষৎ বিরক্ত ভাব ছিল।

"আইস গো বুড়ার পো।" নিরঞ্জন [illegible] নড়তে না দেখে।

বুড়ো চলে গেলে জীবন এখন কেমন অন্যমনস্ক হলে। বেশী দিনের কথা নয়। [illegible] জীবন। মাত্র ও পাঁচটা বছর। দেখতে দেখতে এই কটা বছর কি করে যেন একটা একটানা আচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে চুপিচুপি কেটে গেল। জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাথে সাথে একটু যন্ত্রণাও অনুভব করল এখন।

জীবনের বাপ ছিল এ ঘাটের মাঝি। সেরা মাঝি। একটু বয়স হতেই বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকতো জীবন। বাপ বলত, "দেখ জীবন এসব কাজের ভার চোখ খোলা চাই। কান মন সজাগ না রাখলে বিপদ আসিয়া যখন তখন ঝাঁপাইয়া পড়তে পারে। দেখতে

হয় শিখতে হয়। আমানে হইলি গিযে চোদ্দপুরুষের নু মাঝি। তর মত বয়েসে আমি এই নৌকার হাইল ধরি। তর ঠাকুর্দা আমার হাতে ছাড়াইয়া দিয়া দেখত। অখনই ত বে শিখবার সময়।"

এ সব কথা কেন যেন জীবনের ভাল লাগত না। এতে মোটে পয়সা নেই। অথচ কী পরিশ্রম। কি হবে ঘাটের মাঝি হয়ে? তারওপর প্রায়ই ওর বাপ ওকে বকাবকি করে। একটু ভুল করলে রেগে আগুন। জীবনের ভাল লাগে না এসব। সেদিন এত-গুলো লোকের সামনে কটা চড় মারল, বিচ্ছিরি সব গালিগালাজ দিল, কি না—পালটা ঘুরোতে সামান্য দেরি হয়েছিল। তার পরদিন থেকেই জীবন আর নৌকোয় উঠে নি। আর ঠিক সেই সময়টায়ই চন্দন-নগরের মেলা সবে শুরু হবো হবো করছিল। নৌকোয় না যাওয়ার জন্যে জীবনকে অবশ্য বাপের হাতে মার খেতে হয়েছিল। তবু সে নৌকোয় গেল না। কিছু পয়সা জমা করবার একটা ফন্দি হঠাৎ ওর মাথায় এল। বুদ্ধিটা হারাধনই তাকে দিয়েছিল। মেলায় বসবে ঠিক করল।

তারপর সত্যি সত্যিই মেলায় জীবন একদিন কাচের চুড়ি, পেতলের রঙ করা আংটি, ছেলেমেয়েদের খেলনা, ঝুমঝুমির একটা দোকান নিয়ে বসল। আর সেই মেলাতেই একদিন লগেন [illegible] সংগে তার আলাপ। ওর বাবাকেও চেনে লোকটি। শুধু চেনেই না, এক সময় যে ওদের মধ্যে পরিচয়টা নিবিড় ছিল জীবন তা বুঝতে পারল। লগেন জেঠারা লাটে থাকে। হারা-ধনের বাড়ির কাছাকাছি। হারাধনই সংগে করে জীবনের দোকানে তাদের নিয়ে এসেছিল। সংগে লগেন জেঠার মেয়েটিও এসেছিল।

'কি গো তুমি আমাদের পরাণের বেটা না?'

'হ্যাঁ' জীবন মাথা দুলিয়েছিল। চোখে মুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। পেছনে হারাধন ছিল। হারাধনই এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে লগেন জেঠা বলেছিল, 'অমন নামকরা বাপের বেটা হয়ে শেষকালে এ ব্যবসা কেন?'

জীবন উত্তরে কিছু বলল না। মাথা নীচু করে থাকল।

'আরে সন্ধ্যা, এসা (এদিকে) আয়। অকে একটু তুমার ওদিকে বসতে দাও না। আর হাঁটতে পারচে না ও।'

জীবন বসবার জায়গা করে দিল।

'বাপু, অকে ভাল দেখ্ইয়া খানকতক চুড়ি দাও ত। চুরি পরবার খুব সখ হইচে অর। তা তুমি অকে চুড়ি পরাও আমি আর একটা জিনিস লেইসি। যাব আর আইসবো। আয় হারাধন।'

ওরা চলে গেলে জীবন সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। এই প্রথম পরিপূর্ণভাবে সে ওকে ভাল করে দেখল। হারাধনদা অনেক আগেই ওর কথা কয়েকবার বলে-ছিল। একেবারে মিথ্যা বলে নি সে।

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গ তখনও লজ্জা জড়ানো। চোখ নীচু করে সে বসেছিল। জীবন ওর দিকে চেয়ে সামান্য দুর্বল [illegible] মুখখানা [illegible] ফুলের [illegible] হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা [illegible] মাথা নিচু করে ছিল। আস্তে আস্তে নরম গলায় বলল, 'যেটা ভাল হবে সেটাই দাও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন পুলক ভরা চোখে সন্ধ্যাকে দেখল। তারপর ঠোঁটের ডগায় সলজ্জ একটু হাসির দাগ ফুটিয়ে বলল, 'আমার দোকানের সব ভাল।'

সন্ধ্যা অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে জীবনের চোখের ওপর স্নিগ্ধ নরম চোখ রেখে ধীরে ধীরে বলল [illegible] বলতে বলতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সামান্য হেসে চুড়িগুলো দেখতে থাকে। একটু পরে কটা চুড়ি বের করে আনল। দু মুহূর্ত কি ভেবে জীবনের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'পরিয়ে দাও।'

জীবন ওর চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে চুড়ি কটা হাতে নিয়ে হাত স্পর্শ করল। সন্ধ্যার চোখে তখন কেমন একটা ভীরু ছায়া কাঁপছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ও জীবনের দিকে চেয়ে সামান্য অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। জীবন লজ্জা পেল। তখনও সে ওর হাতটা ধরে রেখেছে। এবার ছেড়ে দিল। বলল, 'এটা ত তুমাকে ভাল মানিবে না।' জীবন কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক।

'তবে যেটা মানিবে সেটাই দাও।' সন্ধ্যা তখন মুচকি মুচকি হাসছিল।

'বাতাসটা যে বুঝিয়েল মাঝিদা।' হীরা কথাটাই বলল।

হীরার কথা কানে যাচ্ছিল না জীবনের। তখনও সে নির্বোধ বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে হীরার দিকে তাকিয়েছিল।

কইঠ অর কত দেরি ছাড়তে? বাতাসটা যে পড়িয়া গেল। হীরার গলার স্বরে যেন কিছুটা রুক্ষ।

একটু একটু করে অতীতের ধূসর ঠেলে সবিস্ময় যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জীবন তখনও চোখ দুটো তার [illegible] করেছিল। হীরার দিকে চেয়ে এখন কেমন যেন সামান্য রুষ্ট বিরক্ত হল। হীরা যেন ওকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে।

জীবন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার দৃষ্টি এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। [illegible] এতক্ষণে তার পা ছুঁয়েছে। এবার উঠে পড়ল। আর একটা ছাতার তলায় [illegible] বসতে বসতে হীরার চোখের ওপর চোখ রেখে [illegible] থেকে একটা বিড়ি বের করে [illegible] ধরল। পরে কেমন যেন [illegible] বলল, 'হাঁ পড়িছে [illegible] [illegible] [illegible] থাইম।'

[illegible] এখন থেকে এক পেয়ার বেশী হইচে [illegible] হীরা কথাটা বলল।

কিছুসময় চুপ করে থেকে জীবন কি যেন ভাবল। পরে স্বাভাবিক শান্ত অথচ কঠিন গলায় বলল, 'ভাল করইয়া সব দেখ্ইয়া টেখ্ইয়া নিছু ত?'

'হুঁ।'

'চল তাইলে।'

নৌকো এর মধ্যে ভরে গেছে লোকে। গরমটা এই ভরদুপুরে তির তির কাঁপছে। অনেকে ঘামছিল ভেতরে। জীবনের কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

নৌকোর নোঙর তুলে ফেলল হীরা। তারপর লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জলের মাঝে নিয়ে আসছিল নৌকোটা। এমন সময় [illegible]

জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি মরাগাঙিযার লোকা?'

'না, সেটা তো অনেক আগে ছাড়্‌ইচে।'

'এটা যাবে কাইকে?'

'কাকদ্বীপ। আরে ভাব কিগো তুমি উঠ্‌ইযা আইস না। ওঠিনু কচুবাড়িযার খেয়া পাব।' কানাই লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল।

দু' মুহূর্ত কি চিন্তা করল লোকটা। পরে বলল 'তবে একবার ধারে লাগাও না, সাথে মাইযা মানুষ আচে।'

'পা চালি আসতে কও।' লগিটা টেনে নিতে নিতে মধু বলল।

বিড়ি টানছিল জীবন। বাঁ হাতে হালটাকে একটু ঘুরিয়ে দিল। বিড়ির শেষ টানটা দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে যেই সামনের দিকে চোখ ফেলেছে জীবন মুহূর্তের মধ্যে যেন সে কেমন স্তব্ধ জড় হয়ে গেল। হীরা জীবনের চোখের দিকে চেয়ে বলল 'অমন চুপ করইযা রইল [illegible] [illegible] যে হাইলটাকে একটু ঘুরাও না।'

জীবন এবার হীরার চোখে চোখে তাকাল। সমস্ত লজ্জা পেয়েছে যেন সে। হীরা তার কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল 'তুমার [illegible] কি ভাল নাই আইজ?'

'না না ঠিক আছে।' সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল জীবন। তারপর মধুর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল 'অনেককে এ পাশটায় ঘুরইযা বসাতে।'

'কা[illegible]কে'

'ওই যে পরে যানে (যাবা) উঠল।'

'তুমি না হয় ডাকিতে ভর দিয়া বস গো।'

জীবন সামনের দিকে চাইল। এ মেয়েটার আর একটি মেয়েলোক বসেছে। মুহূর্তে সে তাকে চিনতে পেরেছিল। এখন সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল জীবন ও জলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চুপ করে কি যেন একটু গভীরভাবে ভাবছে। জীবন দীর্ঘ করে একটু নিশ্বাস ফেলল তারপর একটু একটু করে সেখান থেকে কাতর দৃষ্টিটা সরিয়ে আনল। সত্যি বড় দুর্বল লাগছিল তার নিজেকে। আরো কটা দিন ঘরে থাকলে পারত। মাথাটা এখনও সময় সময় ঝিম ঝিম করে।

'কি গো মাঝি ভাই আইজ যে নৌকা মোটে নড়তেই চায় না।' ভেতর থেকে একজন বলল।

'হুঁ, যাইতে খুব কষ্ট হবে আইজ। বাতাসটা যে একবারে পড়িয়াল।' কানাই জবাব দিল।

আস্তে আস্তে নৌকো এগোচ্ছিল। ভেতর থেকে একজন হাসতে হাসতে বলল 'এতবড় [illegible] ওই পচুকে মাঝি, আর সময়টাও [illegible] আইজ কপালে কি

লোকটির এ মন্তব্যকে উপহাস করছিল। পরে ধীরে ধীরে বলল মশায় এ পথে বোধ হয় নোতুন?'

পরে বুড়ো জীবনদের—জীবনের ঠাকুর্দা, বাবা ও জীবনের প্রশংসা করছিল।

লোকটা একেবারে চুপ করে গেল। জীবন খান থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। আর একবার চোখ ফেরাল ওদিকটায়। দেখল কটি বউ তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়োর থার সঙ্গে যেন ওকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে। তারও চোখমুখ একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। জীবন একসময় চোখ ত করল। তার কেন যেন এখন একটা কথাই নে হচ্ছিল মেয়েটির দৃষ্টিতে গভীর এক ভিযোগ বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবন যেন ক্রমশ আরো ম্লান দুর্বল হয়ে আসছে। তার চোখের সামনে মেলার ছবিটা ন এই মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠছিল ক্রমে ম।

মেলা থেকে আসার পর কিছুই ভাল লাগছিল না তার। মনের মধ্যে শুধু তখন কটা বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি ফরফর করে উড়ছিল। যন্ত্রণা ছড়াচ্ছিল। রথের মেলায় আসবার জন্যে সন্ধ্যাকে সে বারবার করে বলে দিয়েছে। সন্ধ্যাও আসবে বলে মাথা নেড়েছিল। তবে এবার আর অত দূরে নয়। মেলাটা বসবে ওদের বাড়ির কাছেই।

জীবনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা তার কথা রাখে নি। তারপর একদিন কি মনে করে জীবন ওদের বাড়ি গেল। তখন বর্ষাকাল। বিকেলের দিকে আকাশে প্রচুর কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। বাতাস ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। ঠিক সেই সময়ই জীবন ওদের বাড়ির গোড়ায় পা রেখেছিল।

ঘরে কে আছ গো?' গলার স্বরটা অল্প অল্প কাঁপছিল জীবনের।

'কাকে খুঁজেন?'

লগেন জেঠাকে।'

সে তো ঘরে নাই। দেশ চলিছে।'

'তুমি কে গো?'

'চিনবে নি আমাকে আমি পরানের বেটা।'

একটু পরেই দরজা খুলে মুখ বাড়াল সন্ধ্যা। তুমি—' সন্ধ্যার হাসি হাসি মুখেও সেদিন প্রচ্ছন্ন একটা বিস্ময়বোধও ছিল।

'ঐদিক হারাধনদার দোকানে আসছিলি বড্ডয় ঝড় উঠল তেমন দৌড় উঠইসা পড়লি। জীবন সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল।

ভালই করছ গো মরিব গো। তু যা ঝড় আইল।' কেমন যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সন্ধ্যা।

তারপর সন্ধ্যা জীবনকে নিয়ে এসে একটা ঘরে বসিয়েছিল। জীবন কোন কথা বলতে পারছিল না। কেমন একটা লজ্জা, সংকোচ এসে আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। জীবন দেখল, ঘরের এক কোণায় এক বয়স্কা রমণী বসে বসে কি যেন করছে। চোখ তুলে বারবার তাকে দেখছিল। কিন্তু ভাল করে চিনতে পারছিল না। সন্ধ্যাকে ভাঙা ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল তার পরিচয়। সন্ধ্যা তখন একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মুখে শাড়ির আঁচলটা নিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল।

কথার উত্তর দিতে দিতে জীবন সন্ধ্যার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। মেলায় তুমি যে কি চুড়ি পচন্দ করাইয়া দিলে গো।' সন্ধ্যা ঠোঁট কামড়ে হাসছিল।

কেন

কদিন পরই যে মট করইয়া ভাঙিয়াল।' সন্ধ্যার গলায় ছেলেমানুষি চপলতা ছিল।

জীবন ওকে দেখছিল। বুড়ি সন্ধ্যার ঠাকুমা তখন ঘরের এক কোণায় বসে দোক্তা গুঁড়ো করছে। পাশের ঘরে কে যেন অস্পষ্ট স্বরে কথা বলছে। জীবন সন্ধ্যার
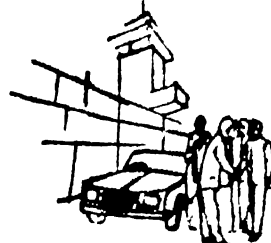
চোখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে একসময় বলল, তুমি তো মেলায় যাও নি।

সন্ধ্যা এখন শান্ত জড়ানো চোখে দু' মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থাকল। পরে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'যাইতে দিল নি।' সন্ধ্যাকে তখন বড় করুণ ব্যথিত দেখাচ্ছিল। একটু পরে ও সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। জীবন সেদিকে কিছুটা আহত কাতর চোখে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসছিল।

টেনে টেনে এখন একটা নিশ্বাস নিল জীবন। অবাধ্য ছেলের মতন ওদিকটায় চুপি চুপি আবার তাকাল। তখন ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুটো নিবিড় কালো চোখ ওকে নীরবে লক্ষ করছিল।

মন্থর গতিতে নৌকোটা এগোচ্ছে। শরীরটা এখন যেন সামান্য বেজুতে লাগছে জীবনের। নিরঞ্জনরা ক্লান্ত হাতে দাঁড় টেনে টেনে এইমাত্র থেমেছে। বিড়ি ধরিয়ে অল্পক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল ও আর হীরা। মধু কানাই ওরা তখনও থেকে থেকে নরম-গরম দাঁড় মারছিল। জলের ওপর তার মৃদু শব্দ ফুটছিল।

একটা ছবি এখনও জীবন মনের তলায় সবার অলক্ষে লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে সংগোপনে নিভৃতে তা দেখে। আজও এই অলস মুহূর্তের একফাঁকে জীবন তা প্রত্যক্ষ করে।

হারাধনকে দিয়েই খবরটা পাঠিয়েছিল জীবন। সন্ধ্যার বাবা বলেছিল 'পরাণের ঘরে মাইঝি দুবে সে তো ভাল কথা। কিন্তু বড় অভাব সে ঘরে।

'জোয়ান মরদ এখন তো বেশ দুটো পইসা আয় কারতে লেগেছে। এতে ভয় কিসের তুমার। আর অভাবের কথা কও সে তো সব ঘরেই আছে খুড়ো। তাছাড়া জীবনের পইসা জমা করবার একটা নেশা আছে।

'তা নাইলে হইল কিন্তু টাকা দিতে পারবে তো।

একটু কমসম করে ইয়া কইলে পারতে পারে।

'দেখ এই তোকে কইলি, তিনশ টাকা দিতে হবে। মাইঝি টার তরে সামান্য গয়না-গাটি খরিদ করব।'

'আর কিছু কম কর খুড়া, তুমার তো খুব একটা অভাব নাই।'

'আরে কয়লাপাড়ার অনন্ত দাসের বেটার তরে কইথুল, অনে (ওরা) পাঁচশ টাকা দিবে।'

হারাধন ফিরে এসে পুরো ছবিটা জীবনের হাতে তুলে দিয়েছিল। মনে আছে, জীবন সেদিকে চেয়ে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তারপর ছবিটা তখন [illegible] সযত্নে তুলে রেখেছিল। [illegible] করতে পারছিল,

ম.।কথা ?

জীবনের চিন্তায় মৃদু ধাক্কা লাগল। চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কানাই-এর মুখের দিকে তাকাল।

'হায় চায়া দেখ।'

জীবন কপালে বাঁ হাত রেখে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার দিকে দৃষ্টি ফেলল। জীবনরা ওই কোণটাকে ঠাকুর-কোণ বলে। কী যেন সে তন্নতন্ন করে খ‍ুঁজল ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে একজন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'না না আকাশ পরিষ্কার। ওটা কিছু না, হালকা মেঘ।'

অনেকক্ষণ পর জীবন চিলের মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির চোখজোড়া নামিয়ে আনে। তারপর ইতস্ততভাবে বসা যাত্রীদের লক্ষ করে বলল, 'তুমানে সে-পাশে সর‍্ইয়া বস গো।'

ভেতরে বসা একজন বুড়ো মতন লোক, জীবনের দিকে এতক্ষণ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কি কিছু দেখলু নাকি ?'

না—, তবে মনে হয়ঠে—।' বলতে বলতে আবার জীবন ঠাকুর-কোণের দিকে সন্ধানী চোখ দুটো মেলে ধরল। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জলের ওপর দৃষ্টি ফেলল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেন এইমাত্র দেখতে পেল সে, জলের তলায় তখন বাতাসের একটু একটু শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছে। কারো কথা তখন কানে যাচ্ছিল না জীবনের। এখন যেন সে আর এক মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে দেহের সমস্ত জড়তা সে কাটিয়ে উঠেছে। আরো কিছু সময় কান নাক সজাগ রেখে বাতাসের গন্ধ নিল। সবে একটু একটু বাতাস উঠেছে।

'আরে ওসব কিছু হবে নি। খালি খালি ভয় পাউঠু।' একজন যাত্রী হেসে হেসে বলল।

'হবে নি তুমানকে কে কইল, হইতেও তো পারে।'

জীবন মেয়েদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। পরে, একটু বিরক্ত হওয়ার গলায় বলল, 'তুমানাকে কইলি না একটু সর‍্ইয়া (সরে) আসতে, কথা কি কানে যায় নি ?'
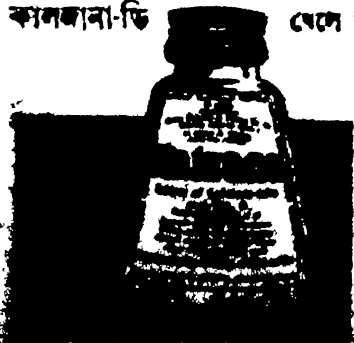
জীবন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আর একবার দেখল, সেই বউটি তখনও ঘোমটার অন্তরাল থেকে তাকে দেখছে। সেদিকে স্বল্পসময় চোখ স্থির রেখে একসময় দৃষ্টি আনত করে সে। বাতাসের গন্ধটা যেন ক্রমশ আরো উগ্র হয়ে বারুদের মতন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর স্থির থাকতে পারল না জীবন। সময় থাকতে থাকতে সব ঠিকঠাক করে রাখা ভাল। তারপর যা হয়। মনে মনে জীবন কোন এক দেবতার কথা স্মরণ করল। কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করল। তারপর একজনের হাতে হালটা ধরতে দিয়ে পরনের গামছাটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিল। নিরঞ্জনের দিকে সাংকেতিক দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন একটা ভেবে নিল। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল 'দেবাশের ওখানটায় তুই বইস, নিরঞ্জন। দাঁড় আর মারতে হবে নি রে। পাটাতনের কাঁচির কাছে যা তো দেখি।'

'কি হইল গো তুমানদের?' ভেতর থেকে হাসতে হাসতে একজন যাত্রী মুখ বের করে।

'অখনও হয় নি গো হবে।' শুধু কঁচিটা হাতের মধ্যে ঠিক করে নিতে নিতে জবাব দিল।

কয়েকজন যাত্রী এখন অবাক হয়ে দেখল আকাশের ঠাকুর-কোণায় একটুকরো কালো মেঘ জমা হয়েছে। ভেতরে ততক্ষণে কথা-বার্তা কমে এসেছে। জীবন চেয়ে দেখল, মেয়েদের চোখে তারের একটা ছায়া দীর্ঘ হয়ে ক্রমে ক্রমে সরে যাচ্ছে। সবাই একটু সরেচের বসল। সময়টা খারাপ। বলা যায় না।

জীবন বিড় বিড় করে কি যেন বলল। তারপর কটা পয়সা কপালে ঠেকিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল। যাত্রীদের দিকে চেয়ে বলল 'আধঘণ্টার ভিতরে একটা ঝড় আইসবে গো। তুমানকের ভয় নাই। জীবনের হাতে যতক্ষণ হাইল আছে ততক্ষণ কুন ভয় নাই গো' এই কইয়া দিলি জীবন ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় বিশ্বাসের গলায় যেন কথাগুলো বলে গেল। দৃষ্টিটা কেমন বলিষ্ঠ শক্ত।

পুরুষদের মধ্যেও যেন এতসময় পর একটু ভয় নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে এসে তার ডানা বিস্তার করছে। যাত্রীদের মধ্যেও আর কথা নেই। কেউ কেউ অবশ্য তখনও ভাবছে ছোকরা মাঝি আর এতবড় গাঙ, কি হবে ঠাকুরই জানেন।

জীবনের এখন অন্য কোন দিকে মন ছিল না। ভাবছিল ঝড়টা এরকম সময় উঠল যে নৌকো তখন মাঝখানে। লোক ভরতি নৌকো। এর আগেও যে কয়েকবার ঝড়ে না পড়েছে সে, তা নয়। তবু আজকে যেন অন্য-রকম লাগছিল।

জীবনের এখন চোখ কান আরো সজাগ তীক্ষ্ণ। শিকারী বাঘের মতন চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে যেন জ্বলছে।'

[illegible] বাতাস উঠেছে।

কালো মেঘখণ্ডটা এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি। জীবন জলের দিকে তাকাল। জলের রঙটা এখন আরো ঘোলাটে গভীর কালো। কান খাড়া করে বাতাসে এগিয়ে আসার উল্লাস শুনল জীবন।

'তুমানে ডর করনি গো। যে যেঠি বসি আচ, ঠিক সেঠি বসইয়া (বসে) থাউ। কুন ভয় নাই, মাথা লাড়ব নি।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জীবন। বাপের শেখানো কথাটি স্মরণ করল। বিপদের জন্যে একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল ওর বাপ। জীবন এখন মুহূর্তের মধ্যে অন্যগা বিক্ষিপ্ত মনটা একই জায়গায় শক্ত করে বেঁধে রাখল।

'আরে তুমানে কাঁদর কেনি? বইসি নি ভয় নাই।' ধমকের সুরে কনাই বলল।

একজনের কান্না দেখে আরো অনেকে [illegible] ভেতরে কান্না শুরু করে দিল।

জলের ঢেউগুলো এখন বাড়ছে। জীবন সেদিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে পরমুহূর্তে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'নিরঞ্জন, দেনান শক্ত কর্‌ইয়া ধর্‌ইয়া রাখবু, বাতাসের সাথে সাথে হাত-দেড়েক সলাক (ঢিল) দেবু।' তারপর ফুলন্ত জলের দিকে চেয়ে বিপদের সাংকেত জানায়: ই ই. উ.. উঃ। শব্দটা চারদিক প্রতিধ্বনি তোলে। অন্যদিক থেকেও অস্পষ্টভাবে ওইরকম সঙ্কেত শুনতে পাচ্ছে জীবন। আবার মুখে হাত দিয়ে শব্দ করে। হে ই উ উঃ। অনেক দূরে অন্য একটা নৌকা দেখতে পেল ওরা। এতক্ষণ বিন্দুর মতন ছিল। এখন তা কিছুটা বড়ো হয়েছে। জীবন এবার হুড়হাড় করে অন্যদের দিকে উদ্দিগ্ন চোখ রেখে সাথে সাথে [illegible] পাউরুটি ঘুরিয়ে দিল।

[illegible]

বলতে বলতে একটা ঢেউ নৌকোটাকে দোল দিল। তারপর আর একটা। নৌকোটা যেন পুরো দমে নাচবার পূর্বমুহূর্তে পা ঠুকে ঠুকে নিচ্ছিল। শরীরের জড়তা অবসাদ ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

জল ফুলছে। বাতাসের শব্দটা এবার যেন বৃদ্ধের বুকভরা শ্লেষ্মার মতন ভারী হয়ে ছটফট করছে। গোঙাচ্ছে। কজন ছেলেমেয়ে ভয়ে কান্না জুড়ে দিল। সবার মুখেই আতঙ্কের ছায়াটা এখন গাঢ়, গভীর। মুহূর্তে কিছুলোক নির্বাক, স্তব্ধ।

অকস্মাৎ জীবনের দৃষ্টি পড়ল সামনের দিকে। দেখল সবার চোখে ভয় থরথর করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ওই বউটির চোখে মুখে একটা হাসি স্পষ্ট, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবন প্রথমটায় কেমন অবাক হলো। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এ হাসির তলায় যেন মেয়েটির প্রচ্ছন্ন একটা অভিযোগ, অভিমান আছে। এরই জন্যে যেন সে প্রতীক্ষা করছিল। তিল তিল করে সংসারের কোন বেদনাকে সে এতদিন জমিয়ে রেখেছিল। এখন বুঝি আর পারছে না। আর কিছু ভাবতে পারছিল না জীবন। মেয়েটির হাসি যেন ওকে নির্মম-ভাবে উপহাস করছিল। জীবন দৃষ্টি সরিয়ে আনল। এরই মধ্যে মনের দড়িকে সে সামান্য ঢিল দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে শক্ত করল।

'আরে, কইঠি ত তুমানুকের ভয় নাই, তবু খালি খালি চকার—।' কথা শেষ না হতেই একটা ঝুঁকা বাতাস এসে নৌকোটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হালটাকে ঘুরিয়ে দিল জীবন।

নিরঞ্জনও দেবান হাত দেড়েক সলাক দিয়েছিল। আচমকা প্রথম বাতাসটা কাটিয়ে দিল। জলের ঢেউও তখন তালগাছ প্রমাণ। সমস্ত আকাশটায় এখন মুহূর্তে কে যেন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। জীবন শক্ত মুঠিতে হালটাকে ধরে রাখল। নৌকোটা তখন মাতালের মতন টলছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রাখছে নৌকোটাকে। হিসেব চুল পরিমাণ ভুল হলে ।

ভাবতে চায় না জীবন আর। তার নজর এখন তীব্র, শাণিত। 'চার কড়া দিচ দে দেবান।' আর একটা বাতাস আসার আগেই জীবন চেঁচিয়ে উঠল। 'আর একটু দে, আর একটু বস।' আবার চটকা হাওয়াটা কাটিয়ে দিল নিরঞ্জন।

নৌকোটা কাত হয়ে গেছে। একটা ধার তখন জল থেকে আর মাস্তর এক কড়া ওপর। আরো একটা চটকা বাতাস এল। প্রায় সবাই চীৎকার করে উঠল। একটা আতঙ্ক শুধু সব সুতোর সঙ্গে ঝুলছে তখন।

কয়েকজন বমি করতে শুরু করেছে। নৌকোর ওপর দিয়ে একটা ঢেউ ভয় দেখিয়ে চলে গেছে। জীবন প্রাণপণে হালটাকে ধরে থাকল। পাশাপাশি দুটো ঢেউ-এর মাঝে পড়ে গিয়েছিল নৌকোটা। যথাসাধ্য ঢেউগুলোকে বশে রাখবার চেষ্টা করল। ওই হাসিটা মাঝে মাঝে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চাইছিল। জীবন তার বাবার মন্তরটা মনে মনে স্মরণ করল। কে একজন ভয়ে উঠে পড়েছিল। জীবন চীৎকার করে উঠল, 'কে মাথা তুলেরে? বারবার ধরাইয়া কইঠি, কানে পশে না?' মুহূর্তে নৌকোটা টাল খেল। হীরা ধমক দিয়ে বসিয়ে দিল লোকটাকে। মোচার খোলার মতন নৌকোটা তখন ঢেউ-এর মাথায় মাথায় উঠানামা করছে।

'কেউ নড় নি গো তুমানে।' আর একবার সাবধান করে দেয় জীবন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘের বুক চিরে বৃষ্টি নামল। আতঙ্কের পরদাটাকে কে যেন এখন টেনে টেনে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কালো মেঘগুলো ক্রমশই পাতলা হচ্ছে। রঙটাও চাল ধোওয়া জলের মতন হয়ে এসেছে।

'আর ভয় নাই গো তুমানের।' জীবনের গলায় আশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। চারদিকে তাকিয়ে এবার সে দেখল, তাদের নৌকো লোহাচরের কাছে এসে গেছে। সবাই একটু একটু করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এখন জীবনের মনে হলো চোখ দুটো তার জ্বালা করছে। হাতটাও কেমন অবশ অবশ। ঘোড়ামারা পেরিয়ে তারা কাকদ্বীপের ছোট নদীতে পড়েছে ততক্ষণে।

বিষণ্ণ ক্লান্ত বৃষ্টিভেজা দৃষ্টিতে জীবন আর একবার শেষবারের মতন ওদিকটায় চোখ ফেরায়। কারো চোখে মুখে আর আতঙ্কের ছায়া নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার রোদ ঝরে পড়ছে। রোদে রোদে পৃথিবী আবার ভেসে যাচ্ছে। জীবন শুধু দেখল এখন, সেই বউটি তখনও ঘোরলাগা ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। একটু আগেও পলকে তার চোখে মুখে যে হাসি দেখেছিল জীবন, এখন আর তা নেই। বরং চোখ দুটো কেমন ভেজা ভেজা, করুণ। জীবন কিছু বুঝতে পারল না। শুধু টের পেল, এখন সে সামান্য দুর্বলতা, ব্যথা অনুভব করছে। বুকের হাড়ে একটা যেন ফোড়া হয়েছে। সেটা বেদনায় টনটন করছে।

নৌকো কিনারে লাগল। যাবার সময় ভাড়া মিটিয়ে সবাই তাকে সাধুবাদ জানিয়ে নেমে গেল। ওই বউটি তখনও নামতে বাকি। সবার শেষের যাত্রী। ওর সঙ্গের লোকটি ততক্ষণে মাটিতে নেমে গেছে। আর একবার মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে জীবনের দিকে তাকাল। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। চোখ দুটো তার ছলছল করছে যেন। তারপর একটা নিশ্বাস ছাড়ল দীর্ঘ করে। জীবনের গায়েও এসে সে বাতাস স্পর্শ করল। ফোড়ার বেদনাটা এই মুহূর্তে অনেক বেড়ে গেল যেন।

স্তব্ধ দৃষ্টিতে সেও তার দিকে তাকিয়ে থাকল ক মুহূর্ত। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল জীবনের। 'আর খাড়া রইলে, যে?' নীচে থেকে তাড়া দিল লোকটি। বিষণ্ণ পায়ে বউটি ধীরে ধীরে হেঁটে গেল কিনারে। তারপর নামতে গিয়ে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট গলায় কি যেন একটা বলতে চাইল। হাতটা বাড়াতে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি করে ধরে ফেলল জীবন।

হাতটা এত গরম। অথচ জীবনের হাতটা যেন ঠাণ্ডায় এখন ভয়ানকভাবে জমে আসছে। হাতের এই উষ্ণতা যেন এখন জীবনকে নতুন করে বাঁচাতে চাইল। জীবন যেন এই মুহূর্তে কেমন বিমূঢ়, অবাক। তার এক-জোড়া বিহ্বল বেদনায় ডুবোনো বিষণ্ণ চোখ স্থির, অপলক। বউটি অনুচ্চস্বরে কি যেন বলতে চাইল। ঠোঁট দুটো শুধু থর থর করে কাঁপল। নীচে থেকে লোকটি হাত বাড়িয়ে দিল।

ওরা চলে গেছে, জীবন সেদিকে তাকিয়ে [illegible]

॥ ১৭ ॥

সুন্দর নূরের জন্য সবই

জীবনলাল হিন্দুরাও কুঠিতে পৌঁছতেই এসে উপস্থিত হল রিজমানের আরদালি। সেলাম করে বলল যে, কর্নেল সাহেব সেলাম জানিয়েছেন। জীবন নিজের ঘরে না ঢুকেই চলল রিজমানের অফিসের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে দেখতে পেলো যে বাইরে ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছে। ভিতরে ঢুকে সেলাম করে দেখলো যে রিজমান বসে আছে চেয়ারে, পিছনে দাঁড়িয়ে মেজর জোনস্ আর সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি মেয়ে। সেই মেয়েটার আর জীবনে চোখাচোখি হতেই যেন পূর্ব পরিচয়ের চাহনি বিনিময় হল, তবে সে সংবাদ রিজমান ও জোনসের চোখে পড়লো না।

জীবন, এই আওরতকে আমাদের সব উঁচা দরে এনেছে। [illegible] সন্দেহ করছে, [illegible] হাউস বাড়ীর কাছে ঘুরছিল।

মেয়েটি বলল উঁহু সাহেব আমি গোয়ালিনী, দুধ বিক্রি আমার পেশা, না ঘুরলে দুধ বেচবো কি করে।

রিজমান বলল, কিন্তু যেখানে আমাদের লোক সেখানে ঘুরছিলে কেন?

সেখানে লোকজন বেশি [illegible] সেখানেই। বনের গাছপালা কি দুধ কিনবে।

তার সপ্রতিভ উত্তরে জোনসের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে, হয়তো রিজমানের মুখেও অনুরূপ হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু দুজনেরই মুখে প্রচুর দাড়ি গোঁফ থাকায় বাইরের লোকে দেখতে পায় না।

সিপাহীদের কাছে বেচো না কেন?

সিপাহীদের কাছে! মেয়েটি বিস্ময়ে চমকে ওঠে, মাথার উপরে চমকে ওঠে দুধের কলসটা।

জীবন বলে, বহিন তোমার দুধের ভাঁড়টা নামিয়ে রাখো পড়ে যাবে।

দুধের ভাঁড় মাথা থেকে নামাতে নামাতে সে বলে, দুধ বেচবো সিপাহীদের কাছে! ওরা পয়সা কেড়ে নেয়।

কেন? শুধায় রিজমান।

কেন কি! [illegible]

[illegible] অপ্রত্যাশিত কথা [illegible]

হাতের তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালাতে ইচ্ছা করে।

দুধের ভাঁড় নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই তার সতেজ উন্নত মহিমা সুপ্রকট হল। পরনে পাটকিলে রঙের ঘাগরা যার প্রান্ত ঘিরে মৌমাছি বসা ফুলের নক্সার ঘের দেওয়া, গায়ে কমলা রঙের [illegible] ছিল, হাতের [illegible] ভিতরের উচ্ছ্বসিত যৌবন যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বুকের উপর দিয়ে [illegible] পড়েছে বেগুনী রঙের [illegible] কমলা, বেগুনী রঙে [illegible] এমন [illegible] অনেকখানি [illegible] চাঁপা [illegible] উঁচু করে [illegible] এই ঘরের মধ্যে [illegible] সৌন্দর্য না [illegible] আছে ও

জমিতে আসো কেন? বিপদও তো আছে—বলে ব্রিজম্যান।

সাহেব ঘরে বসে থেকেও দেখেছি বিপদ কম নয়।

কেমন?

সিপাহীরা ক্ষেপে উঠে আমার বাপকে খুন করে ফেলে সে তো ঘরের মধ্যেই। আবার গোরা আদমি দিল্লী ছেড়ে পাহাড়ের দিকে আসবার সময়ে আমার বাপের মৃতদেহ দেখে এমন ক্ষেপে উঠল যে পশ্চাত্তাপ না ক'রেই আমার ভাইকে খুন করে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে খুন হল আমার মা। এ সমস্তই তো ঘটেছে সাহেব ঘরের মধ্যে। সাহেব, ভূমিকম্পের সময়ে আকাশের তলার চেয়ে ছাদের তলায় বিপদ বেশী বই কম নয়।

মেয়েটি বলে যায়, জোন্স্ আর জীবন লাল বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে শোনে আর জেরা করে যায় ব্রিজম্যান। সকলেই ভাবে মেয়েটি ক্রমেই অধিকতর রহস্যময় হয়ে উঠছে। পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার সংগে যথার্থ রহস্যের রস ক্রমে গাঢ়তর হয়।

সিপাহীরা তোমার বাপকে খুন করতে গেল কেন?

খুন করবে না? কি যে বলো, সাহেব, আমার বাপ যে ইংরেজ ছিল।

ইংরেজ ছিল! বিস্মিত হয়ে ওঠে সকলে।

জোন্স্ ভাবে তাই বলো। ইংরেজের রক্ত না থাকলে কি এমন smart, এমন চটপটে হয়।

আর তোমার ভাই ও মাকে গোরার দল খুন করলে কেন?

করতেই হবে। পাল্টা জবাব দেবে না? তারা যে দেশী আদমি। আমার মা ছিল কাশ্মীরের মেয়ে।

জানতে পারি কি, কি ছিল তোমার বাপের নাম?

Mr Nights

Very sorry, Miss Nights, I am realy sorry.

না সাহেব, আমাকে মিস্ নাইটস বলে জেনে আর মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়ো না।

মৃত্যুর পথে এগোবে কেন?

কেন নয়? আমার গায়ে ইংরেজের রক্ত আছে যে! সেটুকু বের না ক'রে দেওয়া পর্যন্ত সিপাহীরাজ কায়েম হয় কি করে?

তোমার উপরেও অত্যাচার হয়েছিল নাকি?

হয়নি? দেখবে?

এই বলে সে কাঁচুলির হাতা গুটিয়ে ফেলে চিক্কণ বাহুর উপরে নীলাভ দাগ দেখায়—চাবুকের দাগ।

আরো দেখবে?

এই বলে বিনা ভূমিকায় ঘাগরা সরায়, [illegible] হয়ে পড়ে নিটোল সুডোল পুষ্ট [illegible]-পড়ে এমন মসৃণ, জড়িত উরুদেশ। সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিনা নোটিসে ঘটল যে, ব্রিজম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে পালাবার সময়টুকু পর্যন্ত পেলে না। শিক্ষায় সে ঘোরতর puritan, রুচিবাগীশ, তার উপরে সম্মুখে বিনা অনাবৃত বরনারীর উরু। উপায়ান্তর না দেখে ব্রিজম্যান চক্ষুমুদ্রিত ক'রে ফেলল আর জোন্সের উদ্দেশ্যে বলল জোন্স্, Will you see for me!

পাশের ঘর থেকে জোন্স্ বলল—ব্রিজম্যান I am safe here!

উভয় সংকটে পড়ে ব্রিজম্যান বলে ওঠে I can not leave my seat of duty, neither can I look at that thing! my God! what a dilemma! উঠতেও পারি না দেখতেও পারি না, ভগবান এ কি সংকটে ফেললে।

তখন আবার গৃহান্তরিত জোন্সের উদ্দেশ্যে বলে Jones, please, see for me।

জোন্স উত্তর দেয় Sorry Bridgeman Mary will be cross।

তবে এখন কি করি পরামর্শ দাও।

জোন্স বলে সামরিক প্রয়োজন মনে করে দেখো।

সামরিক প্রয়োজনে জানু পর্যন্ত দেখতে রাজি আছি কিন্তু এ যে উরু, তায় আবার অনাবৃত।

হতাশা প্রকাশ পায় ব্রিজম্যানের কণ্ঠস্বরে।

জোন্‌স্‌ বলে, দুঃখিত কিন্তু আমি পারবো না, Mary will be cross।

তখন হঠাৎ মনে পড়ে যায় জীবনলালের কথা নিমজ্জমান ব্যক্তি কাষ্ঠখণ্ড দেখতে পায়।

গীবন, গীবন Save me? তোমরা তো হিন্দু তোমাদের দেবীমূর্তিগুলোর তো প্রায় ঐ রকম বেসামাল পোশাক, তাতে তোমাদের ভক্তির তো অভাব হয় না দেখেছি। Will you see for me।

Gladly will I do Sir, বলে জীবন।

ব্রিজম্যান বলে ওঠে no, no, not gladly see it only dutifully, only as an order from your superior Officer, so do not see it lastfully rather see the thing as a painful duty and report।

মেয়েটি যখন সেলাম করে বাইরে যাচ্ছে, ব্রিজম্যান বলল; তোমার নামটি কি জানতে পারি? মিস নাইটস্ বলে ডাকতে তো ইচ্ছে করে না।

মেয়েটি বলল, আমার নাম রুমোলী।

অদ্ভুত নাম তো। কে দিল এই অদ্ভুত নাম, তোমার বাপ, না মা? শুধায় ব্রিজম্যান।

অনেকে লোকে বলে রুমোলী।

আরো অদ্ভুত। হঠাৎ তারা এমন নাম দিতে গেল কেন?

তবে শোনো। না থাক।

থাকবে কেন; বলো।

আমায় হয়তো তোমরা ঘর ছেড়ে পালাবে সাহেব। তার চেয়ে আমি যাই।

না, না, নামের ইতিহাসে এমন আর কী থাকবে। বলে যাও।

তবে শোন। আমার মা ছিল কাশ্মীরী নর্তকী। লালকেল্লায় শাহাজাদাদের কাছে ছিল তার যাতায়াত। বয়স হলে আমিও যেতে শুরু করলাম মার সঙ্গে। আমার বয়সের আরো অনেক মেয়ে যেতো। শাহাজাদাদের যাকে পছন্দ হতো তার দিকে ছুঁড়ে দিতো রুমাল। আমার ভাগ্যেই বেশিদিন পড়তো রুমাল। তাই লোকে ডাকে আমাকে রুমোলী বলে।

একে ভাগ্য বলছ! এ যে নিতান্ত লজ্জাজনক ব্যবসা! বলে ব্রিজম্যান।

সাহেব, ফাঁসির আসামীর গলায় যে লোকটা দড়ি পরায় তার ব্যবসার চেয়েও কি লজ্জাজনক।

সে তো অপরের মঙ্গলের জন্য জল্লাদের কাজ করে।

আমি তো আমার ছাড়া কারো অমঙ্গল করিনে।

নিজের আত্মাকে অপবিত্র করছ কেন?

ভোগ করে তো দেহ, আত্মা অপবিত্র হতে যাবে কেন?

তোমার তো পয়সার অভাব ছিল না; তবে এ কাজ করতে কেন?

কে বলছে পয়সার জন্যে করতাম! ভালো লাগে বলে করতাম।

আর কোন উত্তর খুঁজে পায় না ব্রিজম্যান; তাই শুধু বলে, ছিঃ ছিঃ।

ছিঃ ছিঃ কেন সাহেব? এ কাজ সুখের জন্য করবার চেয়ে পয়সার জন্যে করা বুঝি ভালো?

তুমি তো এখনি বললে, সুখের আঙুর খাট্টা।

সেই বলে কি আঙুরের চাষ কমেছে সংসারে?

নাগরদোলার ঘূর্ণনে নূতন নূতন রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে রুমোলীর ব্যক্তিত্বে। রূপ, সাহস বাক্‌পটুতা, দুর্ধর্ষ বিক্রম পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম ধর্মনীতি; আর তার সঙ্গে এই নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়পরতা। ক্ষণে ক্ষণে চমকে চমকে ওঠে ব্রিজম্যান ও জোনস্। কর্তব্যবুদ্ধিহীন দৈনিক দুজনে ইন্দ্রিয়পরতার অনুকূলে এর ওকালতী শুনে হতভম্ব হয়ে যায়। ইংরেজের রক্ত আছে যার ধমনীতে তার কিনা শেষে এমন মতিগতি। কোম্পানীর রাজত্ব থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? শেষে কিনা নিছক সুখের জন্য ইন্দ্রিয়পরতা? পয়সার জন্যে হলেও না হয় বোঝা যেতো। দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতে। পয়সার চেয়ে সুখ তো বড় নয়।

জীবনের মনে প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন-রকমের হয়। লজ্জা নয়; বিস্ময়। এক মেয়ে দেখেছিল পান্না, ভেবেছিল ঐ বুঝি বে-আব্রুর চরম, তখনো অজ্ঞাত ছিল রুমোলী। নিষ্ঠাবতী পান্না পাপটাকে পাপ বলেই মনে করে—বিশেষ তার কাছে সেটা কুলাচার, তবু তাকে যথাসম্ভব ঢেকেঢুকেই রাখে। আর এ কী? এই রুমোলী। পাপবোধ বলে একটা অনুভূতিই নাই তার মনে। বলে কিনা বাধ্য হয়ে নয়, পয়সার জন্যে নয়, সুখের জন্য যায় শাহাজাদাদের কাছে। এ যে দিনের আকাশের তারা শত সহস্রের দৃষ্টির সম্মুখে কেমন নির্লজ্জ নির্বিকার। জীবনের যদি তত্ত্বদর্শন থাকতো তবে বুঝতে পারতো পাপবোধ নেই যার মনে, লজ্জা পেতে যাবে সে কেন?

রুমোলীকে বেরিয়ে যেতে দেখে ব্রিজম্যান বলল মিস নাইটস—

অশুচি ইতিহাসবাহী রুমোলী নামটা বের হল না তার মুখ দিয়ে।

মিস নাইটস্ যদি কিছু মনে না করো তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—

কর্নেল ব্রিজম্যানের ভাষায় শিষ্টতা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে—যার ধমনীতে পবিত্র

"আপনার ভবিষ্যতের কর্মসূচী কী?"
"একটি সাহিত্যপত্র — বেঁচে থাকা।"
—ইয়েভতুশেংকো

৩৩ বছর আগে এক ১৪ই এপ্রিলের সকাল বেলা মায়াকভস্কি মারা যান। তাঁর বয়স তখন ৩৭। মৃত্যুর দুদিন আগে "সবার উদ্দেশে" তিনি একটি চিঠি লিখে যান। তাতে অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল "ইয়েরমিলভকে বল দুঃখের কথা, ছড়াটা তুলে নিল করে গাল দেওয়া উচিত ছিল।" এর কিছু আগে মায়াকভস্কি "স্নানঘর" (প্রকৃত অনুবাদ হওয়া উচিত "ধোলাই") নাটকটি লেখেন। নাটকটিতে তিনি ধোলাই দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট সমাজের নতুন শোষকদল ব্যুরোক্রাটদের। এখনকার মতো তখনও সরকার ও সাহিত্যিককুলের কাপ্তেনরা মায়াকভস্কিকে ছেড়ে কথা বলেন নি। নাটকটি মঞ্চস্থ করতে মায়াকভস্কিকে বেশ বেগ পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত বহু বাধা পার হয়ে মায়ারহোল্ড যখন তা মঞ্চস্থ করেন মায়াকভস্কি তখন প্রেক্ষাঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে দেন কয়েকটা ছড়া। তার সবকটিই সরকারী ও সাহিত্যিক ব্যুরোক্রাটদের প্যান্টের ভিতরে ছুঁচোবাজির মতো কাজ করে। তার একটি হল এইরকমের: "ব্যুরোক্রাটদের ঝাড়কে এক মুহূর্তেই ধোলাই দেওয়া যায় না। সে পরিমাণ স্নানঘর বা সাবান কোনটাই নেই। তার ওপর ব্যুরোক্রাটদের সাহায্য করে ইয়েরমিলভের মতো সমালোচকদের কলম...।" এর ফলে শুরু হয়ে যায় মায়াকভস্কি নিধনযজ্ঞ। ঐ ছড়াগুলো শেষ পর্যন্ত সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হন মায়াকভস্কি। এবং তার কিছু পরেই নিজেকে গুলী করে শেষ করে দেন।

প্রকাশ্যে না হলেও পরোক্ষে অনেকেই ইয়েরমিলোভকে মায়াকভস্কির মৃত্যুর অন্যতম [illegible] করেন। পরে নাকি ইয়েরমিলোভ [illegible] আত্মীয়স্বজনের পাশ [illegible]

রক্ষার জন্যই। স্বভাব যায় না মলে। তাই এই সমালোচকপ্রবর এখন আবার তাঁর সদন্তীরূপটি খুলেছেন এরেনবুর্গের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক সমালোচনায়, এরেনবুর্গ তাঁর আত্মকথায় স্তালিন বিরোধী কথা বলেছেন বলে। এবং এক্ষেত্রেও তিনি ইয়েরমিলোভ যে আসলে সুবিধাবাদী সেটাই প্রমাণ করেছেন। এরেনবুর্গের আত্মকথা বেরুচ্ছে বহু আগে থেকেই। ইয়েরমিলোভ এতদিন সে বিষয়ে মুখ খোলেন নি। তার কারণ হয়ত খ্রুশ্চেভের পরোক্ষ সমর্থন ছিল বইটির প্রতি। হঠাৎ আজ খ্রুশ্চেভ আর তাঁর পার্টি ভোল পাল্টে খড়্গহস্ত হয়েছেন সোভিয়েত সাহিত্য ও শিল্পে খোলা হাওয়া বওয়াতে শুরু করেছিলেন যাঁরা তাঁদের প্রতি। অনেকেই বলছেন সরকার ও পার্টি

সলঝেনিৎসিন স্তালিন আমলের সোভিয়েত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের যে বর্ণনা [illegible] তাকেও খ্রুশ্চেভ উৎসাহ দিয়েছেন। [illegible] হঠাৎ প্রথমে ইয়েরমিলোভ [illegible] আদর্শের জিম্মাদার ইলিচিভ, [illegible] সবশেষে খোদ খ্রুশ্চেভ বলে [illegible] এরেনবুর্গ সুবিধাবাদী। স্তালিনের [illegible] তিনি কেন চুপ করেছিলেন? যদিও এ প্রশ্নের উত্তর আগে দেওয়া উচিত খ্রুশ্চেভ নিজের এবং সেই সঙ্গে সারা সোভিয়েত দেশবাসীর। খ্রুশ্চেভ নিজে বলেছেন যে, স্তালিন মারা যাবার সময় তিনি কেঁদেছিলেন, যদিও স্তালিনের বহু ত্রুটির কথা তিনি জানতেন। অথচ তাঁর সাকরেদ ইলিচিভ এরেনবুর্গকে এই বলে দোষ দিচ্ছেন যে এরেনবুর্গ স্তালিনের ত্রুটি জেনেও তাঁর প্রশংসা করেছেন স্তালিন বেঁচে থাকতে। খ্রুশ্চেভ বলেছেন, এরেনবুর্গকে সে সময় কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। অথচ ভুলে গেছেন খ্রুশ্চেভ নিজেও স্তালিন বেঁচে থাকতে কোনো অসুবিধায় পড়েন নি একমাত্র সেই "এই খোখোল্* গোপাক নাচো" স্তালিনের এই উক্তিটি শোনা ছাড়া। বরং তিনি পার্টির কর্তাদের মধ্যেই ছিলেন। পুরোনো পত্রিকায় ছবিতে দেখা যাবে—যে লেনিন-স্তালিন মসোলিয়ম থেকে খ্রুশ্চেভ আজ স্তালিনের দেহ সরিয়ে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলেন সেই মসোলিয়মেই খ্রুশ্চেভ স্তালিনের শবানুগমন করছেন। এরেনবুর্গের আত্মকথা বেরুতে শুরু করার এতদিন পরে খ্রুশ্চেভ বলছেন, এরেনবুর্গ তাঁর লেখায় স্তালিন আমলের যে ছবি এঁকেছেন তা অত্যন্ত একদেশদর্শী এবং বিকৃত। অথচ খ্রুশ্চেভ নিজে স্তালিনের যে ছবি তুলে ধরেছেন এরেনবুর্গের লেখার চেয়ে তা সহস্রগুণ ভয়ংকর এবং একদেশদর্শী। যদিও তিনি মাঝে মাঝে বলেছেন, এত সব সত্ত্বেও স্তালিন ছিলেন প্রকৃত কমিউনিস্ট (হাজার

মায়াকভস্কি

এই আকস্মিক আঘাত হল সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এক দুঃখকর কাহিনী। এবং কিছুকাল পরে কি এর পরিণতি ঘটবে আবার কারো কারো সম্পূর্ণ নীরবতায় এমন কি আত্মহত্যায়? অথচ স্তালিনের মৃতদেহ সরানোর কালে "স্তালিনের উত্তরাধিকারীদের" নিন্দে করে ইয়েভতুশেংকো যে কবিতা লিখেছিলেন [illegible]

* ইউক্রেনের লোকদের প্রতি [illegible] [illegible]

হাজার নিরপরাধ লোকের প্রাণ নিয়েও যে কী করে প্রকৃত কমিউনিস্ট থাকা যায় তা তিনি বলেন নি, কিম্বা হয়ত সেটাই প্রকৃত কমিউনিস্টের লক্ষণ) কিন্তু স্তালিনের দুষ্কার্যগুলোর কোনো বিবরণ তিনি কোথাও দেননি। এবং পাছে "স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ" কথাটা তাঁকে উচ্চারণ করতে হয় তাই তিনি বলেন "ভোল্গা অঞ্চলের যুদ্ধ"। স্তালিনের দেহাপসরণ আর স্তালিনগ্রাদ নামের অবলুপ্তিকালে এবং তার কিছুকাল পর পর্যন্ত এরেনবুর্গ, ইয়েভতুশেংকো, সলজেনিৎসিনের স্তালিন বিরোধী লেখাকে খ্রুশ্চভ নিজের কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এখন আর এ জাতের জিনিস তিনি সহ্য করতে চান না। কারণ এই প্রক্রিয়ার পরিণতি কসে তা তিনি জানেন না। এবং এর মধ্যে খ্রুশ্চভকে পার্টি, সরকার, সংস্কৃতি জগৎ ও সেনাবাহিনীর বহু স্তালিনপন্থীর কাছ থেকে কম ধমক খেতে হয়নি। অন্য সময় হলে খ্রুশ্চভ হয়ত এদের ধমকের প্রত্যুত্তরে তাঁর লেখকের চাবুক তুলতেন। কিন্তু তার আগের কয়েকটি ঘটনা খ্রুশ্চভের পালে টান ধরিয়েছে। তাই যে চাবুকটা তোলা উচিত ছিল স্তালিনের ঐ উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশে সেটা পড়ল কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক শিল্পীদের ওপর। বাহাত্তর ছরের বৃদ্ধ এরেনবুর্গও বাদ গেলেন না। স্তালিনপন্থীরা প্রথমে খ্রুশ্চভকে একরকম ধরে বেঁধেই নিয়ে গেলেন একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে। সেখানে বিশেষভাবে কয়েকটি তথাকথিত ফর্মালিস্ট এবং এবস্ট্রাক্ট ছবি ও মূর্তি তাঁকে দেখান হল (তার অন্তত একটি, কাল্কের "ন্যুড", সে প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া উচিত ছিল না, কারণ সেটি গত ৩০ বছরের আগে আঁকা,—আর মস্কোর শিল্পীদের প্রদর্শনীতে শুধু গত ৩০ বছরের কাজ দেখানর নিয়ম)। স্তালিনের চেলারা খ্রুশ্চভকে বললেন, এই নাও, এই সব দেখ এবার ঘোষণা কর জেহাদ। খ্রুশ্চভ এখন ধরে আনার জায়গায় বেঁধে আনার কাজে লাগলেন। ক্যুবায় তিনি যা করেছেন তার কিছু ক্ষতিপূরণ তো দিতে হবে? তারপর আছে চীনের সঙ্গে ঝগড়া। কিছু আগেই চীনের কমিউনিস্ট কর্তারা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে তেড়ে গাল দিয়েছেন খ্রুশ্চভকে। বলেছেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর তাঁদের পুরো আস্থা আছে যত নষ্টের গোড়া ঐ রিভিশনিস্ট খ্রুশ্চভ। তাছাড়া দেশের ভেতরেও কৃষির অবস্থা খ্রুশ্চভের প্রতিশ্রুতির অনুপাতে ভালো হয়নি। মাংস মাখনের দাম তো আগেই বাড়াতে হয়েছে। এত সব উজ্জ্বল কীর্তির পর খ্রুশ্চভ আর স্তালিনের চেলাদের কাছে কী করে মুখ তোলেন। তাই লোক চোখে অনেকটা নতি স্বীকার করে নিয়েই চীনের প্রতি তাঁকে হাত বাড়াতে হল (যদিও সেই হাত বাড়ানর মুহূর্তেও চীন তাঁকে কড়া ভাষায় গালমন্দ করছিল)। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় চীন-সোভিয়েত আলাপের জন্য যে কয়টি সর্ত চীন দিয়েছে তা যদি খ্রুশ্চভ মেনে নেন, তবে অনেক বড় বড় ব্যাপারে তাঁর এতদিনের নীতি যে ভুল ছিল তা স্বীকার করা হয়ে যায়। চীনের সর্তগুলো এখনো যেমন স্বীকার করা হয়নি তেমনি অস্বীকারও করা হয়নি। তবে অন্তত একটি শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে—আলবেনিয়ার সঙ্গে কূট-নৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নই শোনা যাচ্ছে আগ বাড়াচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্রুশ্চভ কী করবেন তা এখন বলা মুশকিল। হয়ত সে ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বে অনুসৃত পথেই চলবেন - এবং তাঁর কাছে যা অনেক কম গুরুত্বের ব্যাপার সেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি স্তালিন-পন্থীদের জায়গা ছেড়ে দিলেন চীনের সঙ্গে রেষারেষিতে নিজের মতামত জাহির করবার জন্য।

যাহোক, প্রসঙ্গ ঘটনা হল এই। প্রথমে দেশের শিল্পীদের সমালোচনা হল। তাতে এরেনবুর্গ, শস্তাকোভিচ, কানেংকভ, কর্নেইচুক প্রভৃতি বড় বড় লেখক, সুরকার, বৈজ্ঞানিক খ্রুশ্চভকে প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। তখন

করে এসে হঠাৎ অবস্থা বুঝে এ'দের সবার নিন্দেয় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। তার ফলে চাকভ্স্কি পুরস্কৃত হয়েছেন সারা ইউনিয়ন সাহিত্য সঙ্ঘের কর্মকর্তার পদ পেয়ে।

ইয়েভ্তুশেংকোদের বিরুদ্ধে সমালোচনার প্রধান কথাটা কী? দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অকালপক্কতা ইত্যাদি। সযৌক্তিক সমালোচনার বদলে অভদ্র গালাগালই তাতে বেশি। তাঁরা "অশিক্ষিত"—এসব কথাও বলা হয়েছে। বেশ বোঝা যায় এসব পশ্চাতেই তাঁদের প্রতি ঈর্ষাবান ব্যর্থ লেখকদের কটূক্তি। একজন বলেছেন, ইয়েভতুশেংকোদের বই কেন বহু সংখ্যায় বের হয়, অথচ অন্য কবিদের নতুন সংস্করণ হয় না! বক্তার বোধহয় খেয়াল হয়নি যে এতে আসলে স্বীকার করা হল—ইয়েভ্তুশেংকো প্রভৃতিরা তিখনোভ, সুর্কভ, প্রকোফিয়েভ, ইসাকভ্স্কি এমন কি সত্যিই ভালো কবি ত্ভার্দভ্স্কির চেয়েও বেশি জনপ্রিয়। ইয়েভ্তুশেংকোর বই এক লক্ষ কপিতে বের হওয়া সত্ত্বেও একদিনে শেষ হয়ে যায়।

কঠিন হয়—একবার বেশি তো দিতে যাচ্ছিস নে। আমার যিনি গুরু, তাঁর কি দক্ষিণা দিতে হয়েছিল শুনবি?

পচা বাইটার গুরুর যিনি গুরু, সেই পিতামহ-গুরুটি বিষম খুঁতখুঁতে। বললেন, মাটির উপরে নরম চলাচলের আমি দাম দিইনে। ওতে পরীক্ষা হয় না।

বাইটার গুরু কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আজ্ঞা করুন।

মাটির উপরে নয়, গাছের মাথায় চড়ে চুরি করে আসবি। মিহি কাজ তাকেই বলে—হাত পায়ের উপর পুরোপুরি দখল না হলে কেউ তা পেরে উঠবে না।

বড় এক জামগাছের তলায় শিষ্যকে নিয়ে উপরমুখো দেখান: মগডালের উপর পাখির বাসা। ঠাহর করে দেখ, বাসায় বসে পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। গাছে চড়বি, গাছের মাথায় চলে যাবি, হাত বাড়িয়ে পাখির পেটের নিচে থেকে ডিম পেড়ে নিয়ে আসবি। পাখি টের পাবে না, উড়ে যাবে না। যেমন ছিল তেমনি ঠিক থাকবে।

সাহেব পরমোৎসাহে বলে ওঠে, আমিও করব তাই। সেকালের মুরুব্বিরা পেরেছেন, তো আমরাই বা কেন পারব না! দিনমানে কাল বাসা খুঁজে রাখব, পাখি যেখানে ডিমে বসেছে।

পচা বলে, পাখির ডিমে আমার কী গরজ! ওটা তো কথার কথা। মান-ইজ্জতের ব্যাপার—সাগরেদ হয়ে তুই আমার মান রাখলি। তোর কাছে দাবি আমার।

দাবির কথাটা শুনে সাহেব স্তম্ভিত হয়ে যায়। ক্ষেত্র এই বাইটা-বাড়িই। বউয়ের অন্য কেউ নয়—ছোটবউ সুভদ্রা। বউয়ের হাতের চুড় দুটো খুলে এনে দিতে হবে। গয়না দিয়ে শ্বশুর বউ পরিচয় করল, প্রথম উপহারের সেই জিনিস ফেরত চায় আবার।

বলে ডাকহাঁক করে মুখের উপর বলে দিয়েছি—তুই তো ছিলি সেদিন, একদিন ভাত খাচ্ছিলি ঐ দাওয়ায় বসে। বললাম, চুড় ক'দিন হাতে রাখতে পারিস দেখে নেবো। রেখেছে তুই, হাত নেড়ে আজও ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। চক্ষু আমার জ্বালা করে সাহেব।

একটুখানি ইতস্তত করে সাহেব বলে, আগেভাগে জানান দেওয়া হয়েছে,—ডাকাতে চিঠি ছেড়ে ডাকাতি করতে যায়, এ যেন তেমনি হয়ে গেল খানিকটা।

কাঁচা কাজ করে ফেলেছি এখন সেটা বুঝি। বয়সের দোষ মেজাজ ঠিক থাকে না। ও গয়না বারো মাস দিনরাত্তির পরে থাকবার কথা নয়, কিন্তু হারামজাদীর সেই থেকে আতঙ্ক হয়ে গেছে, বাক্সয় রেখে সোয়াস্তি পায় না।

অনুতপ্ত বাইটা। গুরুর মুখে সাহেব এসব শুনতে পারে না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, হাতে পরে থাকুক আর যা-ই করুক, মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়েছে নির্ঘাৎ ও-চুড় চলে আসবে। আমি দায়ী রইলাম।

বাইটার দন্তহীন মাড়ি হাসির উচ্ছ্বাসে হাঁ হয়ে পড়ে: জোর তো আমার সেই। শুয়ে পড়ে চিঁ-চিঁ করি—কোন অঞ্চল থেকে গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে হঠাৎ তুই এসে পড়লি। আমি যেন নতুন জন্ম পেয়ে গেছি বাপধন। ছোটবউয়ের গয়না এনে দক্ষিণা শোধ করবি, তোর উপরে আমার হুকুম হইল।

সুভদ্রার নজর সব সময় সাহেবের উপর। যখন সে পচা বাইটার কাছে বেড়ার গায়ে দুটি চোখ হাঁ করে আছে টের পাওয়া যায়। এবারে সাহেবও নজর রাখছে। সেই রাত্রে কোঠাঘরে ঢুকে সুভদ্রা দরজা দেয়, সাহেব সাঁ করে জানলার পাশে এসে বড় বড় মানকচু-পাতার অন্তরালে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিব্যি এক লুকোচুরির খেলা—বাইরের অন্ধকারে ঠিকমতো জায়গা নিয়ে নির্বিঘ্নে অনেকক্ষণ ধরে নিরীখ করে দেখা চলে। শ্বশুরের শাসানিতে বউটা সত্যিই শঙ্কিত হয়েছে। ঘরে ঢুকে সকল দিক তন্নতন্ন করে দেখে নিয়ে তবে খিল আঁটবে।

দেখা যাচ্ছে সাহেব রাতের পর রাত। গোড়ায় গুরুকে দিয়েছিল: কাজ হবে না ভেবে গুরুকে মিথ্যা আশা দিয়েছি। মজবুত গাঁথনির নতুন দেয়াল কোঠা কোঠাঘরে ঢোকা অসম্ভব। একলা একজনের পক্ষে তো বটেই। তার উপরে এই রকম সাবধানী। চুড়জোড়া যেন রাক্ষসীর প্রাণ-ভোমরা। শোবার সময় রূপকথার রাক্ষসীর মতোই কৌটোয় পুরে সন্তর্পণে বালিশের তলায় রাখে।

দেখতে দেখতে শেষটা বুদ্ধি খুলে যায়। এমন সোজা কাজ হয় না। কারিগর যেখানে সাহেব এবং মক্কেল সুভদ্রা, সেখানে ভয়ের কি আছে? দৈবাৎ যদি দেখে ফেলে, কথা জোগানোই আছে: উঁকি তুলবেন তো বসুন, [illegible] সেইজন্যে এসেছি। তারপরে এটা ওটা বলে কাটান দেওয়া। মেয়েমানুষ ভোলাতে কি লাগে!

গৃহস্থঘরের মেয়ে-বউদের নিয়ম সকলকে খাইয়েদাইয়ে নিজেরা তারপরে গল্প গুজব করে [illegible] অনেকক্ষণ ধরে খায়। সুভদ্রা বউ আলাদা গোত্রের। কাজের মতন একসময় রান্নাঘরে ঢুকে থালায় চাট্টি বেড়ে নিয়ে খেয়ে-দেয়ে চলে আসে। নিষ্প্রয়োজনে কথাটি বলে না কারো সঙ্গে।

আজও তেমনি খেয়ে ফিরছে, সাহেব নিঃসাড়ে পিছু নিল। সাহেব যেন ছায়া সুভদ্রার—সামনের দিকে আলো থাকলে পিছনে যে ছায়া পড়ে। সতর্ক বউ দরজায় তালা এঁটে গিয়েছিল, তালা খুলে ঘরে ঢুকল। কমজোরি হারিকেন-লণ্ঠন, লণ্ঠনের জোর বাড়িয়ে দিয়ে হাতে তুলে নিল। এবং রোজ যেমন করে—লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘরের চতুর্দিক দেখে বেড়াচ্ছে।

ঠিক পিছনে লেপটে আছে সাহেব—ছায়া বই কিছু নয়। ঈশ্বরের ভুলে দুটো চোখই সামনের দিকে—পিঠের উপরে যদি

চোখ নেই, একলা মানুষের কাছে লুকিয়ে থাকা শক্ত হবে কেন? সুভদ্রা ঘুরছে, সাহেবও ঠিক-ঠিক ঘোরে তেমনি। ছায়ার সরে বেড়ানোর শব্দ হয় না, সাহেবেরই বা হবে কেন? তা-ই যদি হবে, কী ছাই শিখল এত বড় ওস্তাদের কাছে!

নিচু হয়ে সুভদ্রা তক্তাপোশের তলাটা দেখে, ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা কেউ। নেই—পরিচ্ছন্ন ফাঁকা জায়গা। সুভদ্রার সঙ্গে সাহেবেরও দেখা হয়ে গেল—জায়গা পছন্দসই বটে। অতএব সে-ই ঢুকে পড়ল এবার। একেবারে নিশ্চিন্ত। সুভদ্রাও নিশ্চিন্ত হয়ে দরজার খিল আঁটে, ছিটকিনি আঁটে, হুড়কো দিয়ে দেয়। দরজার আংটা ধরে টেনে দেখে অনেকবার। চোর না ঢুকতে পারে।

দরজা এঁটে গায়ের কাপড়-চোপড় ফেলে সুভদ্রা লঘু হচ্ছে। এই রে:, তক্তাপোশের তলে সাহেবের বুক ঢিবঢিব করছে। এতক্ষণ যা ভাবেনি, একটা নতুন বিপদ চোখে পড়ে তার। ঘরের মধ্যে সাহেব, সুভদ্রা বোধহয় টের পেয়ে গেছে। যেরকম চতুর, ঢুকে করে দেখে নিয়েছে কখন। সৈন্যের মতো তলোয়ার খুলে তৈরি হচ্ছে আক্রমণের জন্য? সেই মুলতুবি কাজ—বুকের নামাবলীতে কালি ঢেলে ধ্যাবড়া করতে বলবে? নিজের ইচ্ছেয় ফাঁদে ঢুকে পড়েছে, যা খুশি এখন করতে পারে। কপালে সাহেব হাত দিয়ে দেখে, ঘাম ফুটেছে সত্যি সত্যি।

না, শুয়ে পড়ল সুভদ্রা। সর্বরক্ষে যে রক্ষা! লণ্ঠনের জোর কমিয়ে দিয়েছে। সন্দিগ্ধ হয়ে সাহেব এইবার মনের ঘাড়ে কড়া চাবুক কষিয়ে দেয়ঃ এটা কিরকম হল ওহে কবিবর? সুভদ্রা নারী কি পুরুষ বুড়ি কি যুবতী এটা তোমার জানবার বিষয় নয়। মক্কেল মাত্র—জীবন্ত প্রাণী, এইটুকু খেয়াল রাখতে হচ্ছে কাজের কায়দা ঠিক করবার জন্যে। চুড় দুটো টিনের ট্রাঙ্ক কিম্বা কাঠের তাকেও থাকতে পারত, না থেকে রয়েছে সুভদ্রা-বউয়ের দুটো হাতে। এই মাত্র তফাত। নজর থাকবে শুধুমাত্র বস্তুর উপরে, তার বাইরে নয়। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মহাভারতে একদিন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ পড়েছিল, অবিকল সেই ব্যাপার। নজর যখন শুধুমাত্র গয়নার উপর—তার বাইরে আর কিছু দেখছে না, লক্ষ্যভেদ তখনই।

যেমনটি হবার কথা—চুড় খুলে কৌটোয় ভরে সুভদ্রা পরম যত্নে বালিশের নিচে রেখেছে। তক্তাপোশের তলে সাহেব কান পেতে নিশ্বাস শোনে। নিদালি বিড়ির প্রক্রিয়াও আছে অল্পস্বল্প। অপারেশনের পূর্বমুহূর্তে অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর

এবার ছা-বাচ্চারা, বড়বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাও। যে নিয়েছে, সে তোমার ভালই তো করল গো!

মজা দেখছে বুড়ো। বলবেই এখনি। আসাই ভুল এ-মানুষের কাছে। ভরসা এখন সুভদ্রার একটি মানুষ—কেউ যদি পারে তো সেই একজন। নিরিবিলি চাই একবার তাকে। সুভদ্রা ছটফট করছে, নিজের খুশিমতো সাহেব বাইটার ঘরে আসবে, ততক্ষণ সবুর মানে না। আসেও ইদানীং মুরারির সঙ্গে ব্যূহ রচনা করে, সুভদ্রা যাতে নাগাল না পায়। দিনমানে পাওয়া যাবে না, জানা আছে। রাত্রির অন্ধকারে বউমানুষ একলা বেরিয়ে পড়ল। যেতে হয় তো চলে যাবে, পাটোয়ার-বাড়ি অবধি, সেইখানে আচমকা গ্রেপ্তার করবে।

সাহেবের সেই বাড়ি বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ানোর কাজ। এ জিনিস বরাবর বজায় রেখে যেতে হবে। মোড় ঘুরে দেখে সুভদ্রা-বউ। যেন পাতাল ফুঁড়ে সুভদ্রার আবির্ভাব। সাহেবের একখানা হাত মুঠো করে সে জড়িয়ে ধরে: চুড়জোড়া কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। কে নিয়েছে তা-ও জানি।

সাহেব হকচকিয়ে যায়। চোর ধরে হাতে যেন হাতকড়ি পরিয়েছে। কণ্ঠে জোর নেই, কোনরকমে বলল, কে?

আবার কে। অন্তর্জলীর মুখে এসেও স্বভাব গেল না। নিজে যা আদর করে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, তাই আবার চুরি করল। দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় —তাই আছে ওর কপালে। গুরুজন মান্য ব্যক্তি—আমি কিছু বলব না। কিন্তু ফিরে জন্মে বাসি বাইটা কুকুর হয়ে আধ-হাত জিভ মেলে রাস্তায় রাস্তায় হা-হা করবে। করতেই হবে—অন্যায়ের এমনি শোধ যাবে না।

মুখের কাছে মুখ এনে কাতর দুই চোখ মেলে সুভদ্রা বলে, তুমি উদ্ধার করে দাও ঠাকুরপো।

সর্বরক্ষে বাবা, দোষ বাইটার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

অবাক হয়ে সাহেব সুভদ্রার কথারই পুনরাবৃত্তি করে: উদ্ধার আমি করব?

কেউ যদি করে দেয়, সে তুমি। আর কাকে বলব? সুভদ্রা কেঁদে পড়ল: বাড়ির মধ্যে সকলের সব আছে আমার কি আছে বলো। ভাসুরের কথা সেদিন নিজের কানে শুনলে—বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখেছে যেদিন ইচ্ছে বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়াবে। স্বামী থেকেও নেই। পুজোর ছুটিতে আসছে তো বাড়ি—দেখো কী অবস্থা। ঘরে যেন জলবিছুটি মারে, ছটফট করবে: কখন পালাই কখন পালাই। কিছু নেই আমার ভাই-থাকবার শুধু গয়না দু-চারখানা। দুর্দিনের সম্বল। ছেলেপুলে নেই গয়না নেড়েচেড়ে দিন কাটে। তার মধ্যে সেরা জিনিসটাই চলে গেল আমার।

মুকুন্দ আসছে নতুন খবর সাহেবের কাছে। কবে বাড়ি আসছেন ছোড়দা?

আসছে বৈশাখের আম খেতে। নিজের হাতে পোঁতা কলমের গাছে এবারে আম ফলেছে। এককালে বাগবাগিচার শখ ছিল —গাছের উপর বড় দরদ। আর এই যে এক অবলা মেয়েমানুষ, বাপ-মা নেই ভাই নেই দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর—

কি বলতে চেয়েছিল সুভদ্রা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে কথা শেষ করতে পারে না। টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। দু-চার ফোঁটা সাহেবের হাতের উপর পড়ল।

একটু সামলে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলে, ছুটিছাটায় আসে কখনোসখনো। কিছু যদি বলতে গিয়েছি—লজ্জার কথা কী বলি ঠাকুরপো, বলতে গেলেই জবাব হল: ভগবানের নাম করো, কদিনের তরে জীবন! বর-বউ একঘাটে পাশাপাশি শুয়েছি, তা মনের [illegible]

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

বাজেটোত্তর বাজারে 'বিলাসিতার' মান কোথায় পৌঁছেছে আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, কারণ 'বিলাসিতা' নেহাত আপেক্ষিক ব্যাপার। আপনার আমার কাছে যা বিলাসিতা, ধনীর সংসারে হয়তো সেটা আটপৌরে সাধারণ। আজ যেটা আমাদের

বাঁশের ফ্রেমে নেওয়ার দিয়ে তৈরি আরামকেদারা

নাগালের বাইরে কাল হয়তো সেটা নিত্য-প্রয়োজন। বিজলীবাতির ইতিহাসই ধরুন না। কয়েক বছর আগেও বড় শহরে বিজলীবাতি ও পাখা সম্পন্নদের ছিল। আর আজ অনেক ছোট ছোট ফ্ল্যাটেও দেওয়ালের গায়ে বৈদ্যুতিক আলো না জ্বললে বিস্ময় হয় পরে। আবার এদেশে রান্নাঘরের ধোঁয়া ভরা কালিতে মলিন অন্দরের মধ্যে নারীদের জীবন হাবুডুবু খাচ্ছে তখন হয়তো পাশ্চাত্য দেশের গৃহিণী বিজলীচুল্লিতে রান্না চাপাচ্ছে—ঘড়ি দেখে নামিয়ে নেবে। উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কাঁটা আছে তাতেই কোন ভাবনা নেই। এই সময়টুকুতে আরও পাঁচটা কাজ সেরে নিতে পারে তারপর সন্ধ্যা অবসর জুড়ে তার অবসর। যাক—এ সব তো আমাদের কাছে সুদূরপরাহত। যা আছে তা নিয়েই যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করতে হবে।

নিজের মনের মত করে সাজানো একটু আশ্রয় কে না চায়? তাকে কি আমরা বিলাসিতা বলবো? অবশ্য যার অট্টালিকা আছে সে হয়তো কোচ কার্পেট দিয়ে চোখ ঝলসানো আয়োজন করবে। সৌন্দর্য কিন্তু ছোট একটি সামান্য ঘরকেও ঘিরে বিরাজ করতে পারে। রুচিবোধের অধিকার তো কেবল বিত্তবানের নয়। আজকের এই দেশ-জোড়া আর্থিক বিপর্যয়েও সারাদিনের ক্লান্ত দেহমন, পরিশ্রান্ত চোখ ঘরে এসে শান্তি পেতে পারে। এমনি একটি পরিবেশ গৃহ-কর্ত্রীরা অনেক অর্থ ব্যয় না করেও রচনা করতে পারেন। অনেক ঘরে দেখবেন ধুলো-ময়লা জমে থাকে—দরজায়, জানালার কাঁচে, দেওয়ালের ছবিতে, বাতির শেডে, পাখার ব্লেডে। ঝুলতে থাকে ছেঁড়া পর্দা, ঘরের কোণে ঝুল, চেয়ারের ঢাকনা এলোমেলো, পেতলের ফুলদানি পালিশবিহীন কাঠের আসবাব দাগেভরা নিষ্প্রভ—এর কোনটাই কি অর্থাভাবের পরিচায়ক?

গৃহসজ্জায় প্রধান সহায় রং। মানুষের মনে রং-এর প্রভাব অদ্ভুত। একবার আমেরিকার একটি হাসপাতালে রোগীদের অপেক্ষা করবার ঘরের দেওয়াল ছিল ধূসর রং-এর। রোগীরা রোজই বলতেন বড় ঠাণ্ডা, অপেক্ষা করতে কষ্ট হয়। অথচ ঘরটি ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত—সমভাবে ৭০° ডিগ্রী ফারেনহাইট। নালিশ শুনে শুনে কর্তৃপক্ষের কি খেয়াল হলো ঘরের রং পাল্টে দিলেন করলেন ফিকে লালচে রং। আর কোন রোগী নালিশ করে নি। ঘরের উত্তাপ অবশ্য ছিল ঐ ৭০°। আবার এক বিজ্ঞাপন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার কথা শুনলাম। তাঁদের কোন একটি বিশেষ প্রশ্ন-পত্র সামান্যসংখ্যক সাদা, নীল, সবুজ, লালচে সব রং-এ ছেপে ছড়িয়ে দিলেন নানা ধরনের লোকের মধ্যে। উত্তর এলে দেখা গেল সাদা কাগজে ছাপা পত্র ফেরত এসেছে সব-

নেওয়ারের চেয়ার ও কাটা গাছের টুকরো দিয়ে তৈরি টেবিল

চেয়ে কম নীল তার চেয়ে বেশী, সবুজ আরও একটু বেশী আর লালচে রং-এর কাগজ এসেছে অনেক। বর্ণবিবেত্তারা আবার এও বলেন যে বর্ণের প্রভাবের সঙ্গে অবচেতন মনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার একটা নিবিড়

[illegible] had confirmed his [illegible]ary impressions" and the [illegible] he had drawn in his mind [illegible] "great and gigantic" coun-[illegible]—(Indian Press Digest, Feb. 1956, p 107).

তিনি এও বলেছেন :

....he had not gone to China either to preach or to be preached .... but rather .... to be impressed ....

পরিষ্কার বক্তব্য। কারো কিছু বলবার নেই। তিনি মোহিত হবার জন্য চীনে গিয়েছিলেন, মোহিত হয়েই ফিরে এসেছেন। সম্ভবত একটু বেশি রকমেই তিনি "ইম্প্রেসড" হয়েছিলেন। তিনি কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন, চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিরোধী দলের কোন সুযোগ নেই (অস্তিত্বই নেই, এ কথা বলেন নি), সংবাদপত্র সরকারের সমালোচনা করে না, (একথা জানান নি যে, সে অধিকারই সংবাদপত্রের নেই)। পিকিং-এর ভারতীয় দূতাবাস তাঁকে জানিয়েছিল, বাইরের দুনিয়ার খবর চীনারা কিছু পায় না।
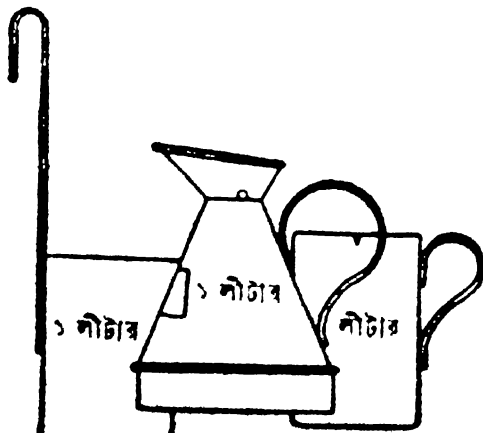
হাজারে একজন কি দুজন) ওরই মধ্যে সব কিছু খোলা মনে এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এবং তাদের চোখে চীনের মতলব ধরাও পড়েছে।

এ'দেরই একজন, ভারতের প্রখ্যাত জনসংখ্যা বিশারদ ডাঃ শ্রীপতি চন্দ্রশেখর লিখছেন, "অপরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য প্রচারের প্রশ্নেও চীন কখনও সৎ হতে পারে না। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি জানা নয়, এটাকে লোকচক্ষে হেয় করা।"—(অনুবাদ শ্রীনিরঞ্জন হালদার)

ডাঃ চন্দ্রশেখর বলেছেন, "চীনের জনসাধারণকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়া চীনের পক্ষে আকস্মিক নয়, এটা ইচ্ছাকৃত।"

ডাঃ চন্দ্রশেখরের কথায় :

While Chinese politicians and offi-

cials have in the past talked incessantly of "cultural interflow" between the two countries, there is very little knowledge in China of India, her problems, or her achievements. As the Chinese newspapers, magazines; and other mass media is government-controlled this ignorance can only be understood as deliberately imposed on the people by their totalitarian regime.—(Red China : An Asian View, Praeger Paperbacks, p 206)

ডাঃ চন্দ্রশেখর জানাচ্ছেন, "চীনের সংবাদপত্রে ভারত সম্পর্কে যেটুকু সংবাদ থাকে ভারতীয় সংবাদপত্রে চীন সম্পর্কে তার চেয়ে ঢের বেশি খবর থাকে। আমাদের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হলেও চীনের বক্তব্য এদেশে ভালভাবেই প্রচারিত হয়। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে ধন্যবাদ, স্বদেশের বাইরে তাদের আনুগত্য এবং আন্তর্জাতিকতার প্রতি অচলা ভক্তি, (তাদের এই নীতি কেউ মানুক বা না মানুক এটা সকলেরই জানা আছে।) ভারতে চীন কম্যুনিস্টদের মত প্রকাশ করার মুখপাত্রের অভাব ঘটতে দেয় নি। কিন্তু চীন দেশে কম্যুনিস্ট ছাড়া আর কারো বক্তব্য বরদাস্ত করা হয় না।

"সংবাদের অভাব বা মাঝে মাঝে চীনা দৈনিকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুরভিসন্ধিমূলক সংবাদ ছাপানো নিশ্চয়ই 'সাংস্কৃতিক বিনিময়ের' প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়।

চীন দেশে ভারত সম্পর্কে কোন্ ধরনের খবর ছাপা হয় তার উদাহরণ দিয়ে ডাঃ চন্দ্রশেখর বলেছেন :

Major national events have been ignored and some obscure utterances of inconsequential Indian Communists highlighted A new factory in formerly Communist Kerala (under India's Five-Year Plans) received more publicity as a Communist' achievement than other and much more important happenings elsewhere in India

এই সব বিকৃত তথ্য প্রচারের ফলে ভারত সম্পর্কে চীনে অদ্ভুত সব ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ চন্দ্রশেখর এই সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কয়েকটা নমুনা পেশ করেছেন। যেমন চীনা কম্যুনিস্টদের ধারণা, ভিলাইতে রাশিয়ানরা এসে ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছে এবং ভারতে ওইটিই একমাত্র ইস্পাত কারখানা।

তিনি লিখছেন, 'আমি পিকিং-এর এক ছাত্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভারত ও ভারতের নেতাদের সম্পর্কে সে কি জানে। 'যদি আমার ধারণা ঠিক হয়,' সে বলেছিল, 'দুটো ভারতবর্ষ আছে। উত্তরে ধনতান্ত্রিক ভারতবর্ষ, পণ্ডিত নেহরু তার প্রধানমন্ত্রী, এবং তিনি আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। (এটা অবশ্য তিব্বত বিদ্রোহ ও কথা।) এবং দক্ষিণের অংশ হচ্ছে কেরল, সেখানে মিঃ নাম্বুদ্রিপাদ হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণের সরকার আমাদের মতই জনগণের সরকার।' আমি যখন ছাত্রটিকে জানালাম যে, আমি দক্ষিণ থেকেই এসেছি, তখন সে মহোল্লাসে আমার করমর্দন করল এবং সহ কমরেড হিসাবে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নিয়ে গেল। এ ঘটনা একটি নমুনামাত্র। চীন পরিদর্শনের সময় লক্ষ্য করেছি যে, এই ভুল বা মিথ্যা সংবাদ জানা কোন পৃথক ঘটনা নয়। বিভক্ত কোরিয়া ও ভিয়েতনামের মত করেই জনসাধারণ ভারতবর্ষকে ভাবতে শুরু করেছে। এটা কল্পনা হতে পারে। কিন্তু সে কল্পনা চীনে বর্তমান।"

ডঃ চন্দ্রশেখর যে রকম মুক্ত মন এবং স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে চীনে বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর মস্তিষ্কটি সর্বদা জাগ্রত রেখে বিশ্লেষণ ক্ষমতার দ্বারা তাৎপর্যগুলো হৃদয়ঙ্গম করবার প্রয়াস পেয়েছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় সুপাচ্য চৈনিক খাদ্যের উপর অধিকাংশ সময়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকায় বেশির ভাগ ভারতীয় উপোসী ইনটেলেকচুয়ালই সে পথ অনুসরণ করবার সময় পান নি। তাই তাঁদের গিল্টি করা চকচকে বিবরণগুলো চীন সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র তাঁদের স্বদেশবাসীর সামনে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং স্বদেশবাসীর চোখে তাঁরা আজ উদর সর্বস্ব ভাড়াটিয়া প্রচারকের স্তরে নেমে এসেছেন।

ডঃ চন্দ্রশেখর লিখেছেন 'অসংখ্য ভারতীয় প্রতিনিধি দল চীন দেখে চীন সম্পর্কে মনোহর ধারণা নিয়ে দেশে ফিরেছেন। কিন্তু যে-সব চীনা প্রতিনিধিদল এদেশে এসেছিলেন, তারা দেশে ফিরে আমাদের কোন কৃতিত্ব সম্পর্কে রিপোর্ট দেন নি। অন্তত চৈনিক সংবাদপত্রে তাদের কোন বিবরণ প্রকাশিত হয় নি।

ভারতীয় ইনটেলেকচুয়ালদের চীন ফেরতা ঔদার্যিক বিবরণ যে আখেরে দেশের ক্ষতিই করেছে, সে সম্পর্কে আজ কারোরই আর সন্দেহ নেই।

ডাঃ চন্দ্রশেখর বলেছেন :

What is worse, the average Indian citizen has been misled by the reports of Indian visitors to China for, with very few exceptions these visitors have presented only one side of the Chinese picture We have heard only of China's achievements—such as they are—without any reference to the enormous human price paid for them—(Red China : An Asian View, p 208).

চীনের উন্নতির কথাই শুধু ঢাক পিটিয়ে চালান হয়েছে আর এর জন্য যে মূল্য দিতে হয়েছে অগণিত মানুষের জীবনের মূল্য সেই কথাটিই চেপে যাওয়া হয়েছে। (ক্রমশ)

পি-১১ নিউ হাওড়া ব্রিজ অ্যাপ্রোচ রোড, কলিকাতা-১

সংবাদে প্রকাশ, ভাষা বিল বিতর্ক চলিতে থাকার সময়ে হিন্দীপ্রেমী একদল বিক্ষোভকারী বিক্ষোভ দমনে রত পুলিসের বিরুদ্ধে শেম্ শেম্ ধ্বনি তোলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অজান্তে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করার ভুল ধরা পড়ে এবং তাঁরা তখন শেম্-এর বদলে "ধিক্কার" শব্দ ব্যবহার করেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ইংরেজী ভাষা বিরোধী দলের মধ্যে দু-একজন 'ডক্টর' আছেন বলে জানি। কিন্তু 'ডক্টর'-এর বদলে এখন কী শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে সেইটেই জানিনে।"

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার একমাত্র উপায় গম খাওয়া—এ কথা নাকি বলিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। কিন্তু গমের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কী খাইব—এ প্রশ্নের জবাব দেয় আমাদের শ্যামলাল—"কেন পাকা হত্তুকী।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাছের দর বাঁধিয়া দেওয়ার কথা চিন্তা করিতেছেন। —"এবং বাঁধাবাঁধি হবে বিনি সুতোয় আর গেরোটা হবে ফসকে সুতরাং এবার বাজারনন্দের আর রক্ষা নেই।"—বলেন এক সহযাত্রী।

বাজারে ধান ছাড়ার ব্যাপারে চাষীদের অনিচ্ছা—একটি সংবাদশিরোনামা। —"ধান ছড়াতে পাচ্ছে না কাকেরা উড়ে এসে জুড়ে বসে এই আশংকাতেই বুঝি চাষীরা ধান ছাড়ছে না।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

সর্বশ্রী চাবন ও কৃষ্ণমাচারীর মধ্যে মতবিরোধের অভিযোগ যাহারা করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে কৃষ্ণমাচারী বলিয়াছেন- 'আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত বিবাহিত এবং আপনারা জানেন, বিবাহিত জীবনে মতবিরোধ অনেক সময়েই হয়, কিন্তু আবার মতের ঐক্য হইতেও দেরি হয় না।'- 'শ্রীকৃষ্ণমাচারী 'এক ঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি তাই হয় না' গানটা শুনিয়ে দিলে হয়ত আর কোন অভিযোগই কোনদিন হবে না। বাংলা বুঝতে অসুবিধে হলে দম্পতীকলহের পরিণাম যে লঘুক্রিয়া সে কথাও বলতে পারতেন।"—বলে শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তর নাকি 'নদীপ্রবাহ' গঠনের কথা চিন্তা করিতেছেন; এই প্রকল্পে খালের সাহায্যে নদীগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করার [illegible] হইবে।—"[illegible] [illegible]

[illegible]

* ট্রামে-বাসে *

এক সংবাদে প্রকাশ, ফরমোজাতে ইঁদুরের সংখ্যা মানুষের চার গুণ বেশী। ইঁদুরগুলি বছরে ৪০,০০০ টন চাউল খাইয়া ফেলে।—"আমাদের দেশে

ইঁদুর না থাকলেও গর্তের অভাব নেই। সেইসব গর্তপথে কত হাজার টন চাউল যে উধাও হয় তার পরিসংখ্যান নেওয়া হয়নি।"—বললেন জনৈক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার পরামর্শ দিয়াছেন—ক্ষুধা দূরীকরণ সংকল্প হইতে হইবে।— ক্ষুধা

দূর করার একমাত্র উপায় তারস্বরে গান ধরা সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং মাতরং।"' মন্তব্য করলেন অন্য এক সহযাত্রী।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী নাকি বলিয়াছেন যে তিনি মধ্য ভারী প্রশাসনই পছন্দ করেন। শুনে জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন "এক মনস তার আবার ধুনোর গন্ধ।"

এক সংবাদে বলা হইয়াছে কোন কোন শিল্পপতিদের অসহযোগিতার ফলে বাঙ্গালীর সন্তানদের কর্মসংস্থানে সংকট দেখা দিয়াছে।— এটা কোন নূতন কথা নয়, গোঁয়ো যোগীরা কোনদিনই ভিখ পায়নি।"—বললেন অন্য এক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৩০৫ জন কর্মী উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"উদ্বৃত্ত হতে যাবে কেন, চ-বৈ-তু-হি-এর কাজে অর্থাৎ অর্থ না হলেও পাদপূরণে তাঁরা ত একদিন সার্থক হয়েই ছিলেন।"

[illegible] নাকি চীনের [illegible]

তলায় ডুবে ডুবে জল খেয়ে শান্তির প্রস্তাব করলে সেটা জোরদার হয়!!"

কেন্দ্রীয় সরকার রেওয়া [illegible] শ্বেত শার্দুল [illegible] করিয়াছেন। শ্যামলাল [illegible] সার্কাস জমবে ভালো। শ্বেত [illegible] আছেই, এখন সাদা বাঘ হলেই [illegible]

পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রক ও [illegible] হঠাৎ নাকি উপলব্ধি করিতে [illegible] করিয়াছে যে, নেপাল ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি উপযুক্ত স্থান।— ধোপার চাহিদাও নিশ্চয়ই আছে এবং পাকিস্তানের লক্ষ্মওয়ালা দোস্তেরও অভাব নেই; সুতরাং এটাই বা বাকী থাকে কেন!!"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কায়েদে আজম জিন্নার একটি স্মৃতিসৌধ করাচীতে নির্মিত হইবে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। শুনিলাম সৌধটি তাজমহলের অনুকরণে নির্মিত হইবে। আমাদের এক সহযাত্রী আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"শুধু তব অন্তরবেদনা চিরন্তন হয়ে থাক ।"

জনাব ভুট্টো নাকি পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসার শর্তে ভারতকে অস্ত্রসাহায্য দিবার পরামর্শ দেন এবং বলেন যদি তাহা না হয় তাহা হইলে পাকিস্তান এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইবে যাহার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া হইবে পাশ্চাত্ত্য শক্তির আঞ্চলিক সামরিক চুক্তিগুলির উপর। বিশু খুড়ো বলিলেন— 'পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ হয়ত মনে মনে বলছেন —তাই ত, খোকা আমার সে খোকা আর নেই ত!"

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি একটি মাতাল শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। জন্মের পর ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত নেশা তার কাটে নাই। শিশুটির

জন্মগ্রহণের দুই মাস আগে হইতে প্রসূতি নাকি সমানে মদ্যপান করিয়াছে এবং [illegible] [illegible] অবস্থায় শিশুটির [illegible]

[illegible]

রাত সাতটায় পাওয়া গেল তার লাস। গাছ থেকে ঝুলেছে।

ভাবুন তো, ইস্কুল থেকে ফিরে যাবার পথে, তার মায়ের স্নেহের আঁচল থেকে দূরে সেই আপন নির্জন কক্ষে ঘণ্টা তিনেক তার মনের ভিতর কী ঝড় বয়ে গিয়েছিল? অপমানের কাল নাগিনীর বিষ যখন তার মস্তিষ্কের স্নায়ুর পর স্নায়ু জর্জর করে করে শেষ স্নায়ু কালো বিষেই রূপান্তরিত করেছে তখনই তো সে দড়িগাছা হাতে তুলে নেয়। সে তখন সহ্য অসহ্যের সীমার বাইরে চলে গিয়েছে। আচ্ছা, সে কি তখন তার বিধবা মায়ের কথা একবারও ভাবেনি? কিন্তু, দয়াময়, আমাকে মাফ করো, আমি বিচারকের আসনে বসবার কে?

অতি গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মৌলিক কায়েত, আমার প্রতিবেশী হাতে যেন স্বর্গ পেল যখন তার সাদা-মাটা মেয়েকে বিয়ে করলে এক 'মহাবংশের' ঘোষ। —বিনা পণে। ছেলেটি গরীব এই যা দোষ কিন্তু ভারী বিনয়ী আর বড়ই কর্মঠ। প্রেসের কাজ জানে। আমরা হিন্দুমুসলমান সবাই শতহস্ত তুলে তাকে আশীর্বাদ করেছিলুম।

বিয়ের কিছুদিন পরে কি জানি কি করে ধরে নিয়ে এল এক পার্টনার। খুললো ছোট্ট একখানা প্রেস। হ্যাণ্ড-বিল বিয়ে-শ্রাদ্ধের চিঠি ছাপায়, কখনো বা মুন্সেফী আদালতের ফর্ম ছাপাবারও অর্ডার পায়। জল নেই, ঝড় নেই, দুই দুপুরেই বরাবর, সর্বত্রই তাকে দেখা যায় প্রুফের বোন্দা বগলে। হেসে বলে, 'এই হয়ে এল।' অর্থাৎ শিগগিরিই ব্যবসাটা পাকা ভিতে দড় হয়ে দাঁড়াবে। একটু যাকে দরদী ভাবতো তাকে বলতো, 'মা কে নিয়ে আসছি।' গরীব মা গাঁয়ে থাকে। হয়তো বা গতর খাটিয়ে দুমুঠো অন্ন জোটায়।

দশ বছর পর দেশে ফিরেছি। বাড়ি পৌঁছবার পরেই রাস্তায় সেই ছোকরা—না এখন বুড়োই বলতে হবে, অকালে—দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে। পরনে মাত্র শতচ্ছিন্ন গামছা। বগলে ছেঁড়া খবরের কাগজের বোন্দা। ছন্নের মত চেহারা। আমার কাছ থেকে সিগারেট চাইলে। আমি তো হতভম্ব। তার স্ত্রী আমার ছোটবোনের ক্লাস-ফ্রেণ্ড। আমি তার মুরুব্বী। সিগারেট দিলুম। সেটা ধরিয়ে আমার দেশলাইটা ফেলে দিলে নর্দমায়। এক গাল হেসে বললে 'মাকে নিয়ে আসছি।' মনটা বিকল হয়ে গেল। দশ বৎসর পর আমার শহর এই দিয়ে আমায় ঘরে তুলছে।

বোন, বললে 'প্রেস যখন রীতিমত পয়সা কামাতে আরম্ভ করেছে তখন তার পার্টনার তাকে দিলে ফাঁকি। একটা আদালত পর্যন্ত লড়েছিল। তারপর পয়সা কোথায়? পাগল হয়ে গেছে।'

তবু এখনো সে তার 'মাকে শহরে এনে পাকা বাড়িতে তুলছে।' মা কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের আর পাঁচটা বিধবা যে-রকম দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মরে।

আর মাধুরী? আমার বোন শ্বশুর বাড়ি থেকে এলে সে তাকে দেখতে আসে। আমি তখন মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে বৈঠকখানায় আশ্রয় নিই।

আর যে আত্মহত্যা করল না পাগলও হল না, তার অবস্থা যে আরও খারাপ।

সরকার আমাকে অনর্থক একটা টেলিফোন দিয়েছিল। তবে সেটা কাজে লাগতো মেজোর একটা [illegible]

সকল শ্রেণীর মানব যাত্রা করল সার্থকতার তীর্থে। ভক্ত চলেছে, চলেছে যাত্রীরা কিন্তু পথ ফুরোয় না। ভক্তের কাছ থেকে তারা প্রশ্নের সদুত্তর পায় না। রাত্রি নামল,—ক্লান্ত, অবসন্ন, হিংস্র, কুটীল মানব ভক্তের প্রতি বিশ্বাস হারাল, তারা তাদের অধিনায়ককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। কিন্তু তারপরেই এল তাদের অনুশোচনা এবং আত্মসমালোচনা। পথপ্রদর্শককে হারিয়ে যখন তারা বিভ্রান্ত তখন পূর্বদেশের বৃদ্ধ উপদেশ দিলে যাকে তারা মেরেছে তাকেই গ্রহণ করতে হবে প্রেমে। মৃত্যুম্বারাই সে সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবীত। আবার যাত্রা শুরু হল। আর তারা কোন সন্দেহ মনে স্থান না দিয়ে চলতে লাগল সব অবস্থার মধ্য দিয়ে। পথের অর্থ যেন তারা খুঁজে পেল তাদের অন্তরে। অবশেষে এক প্রত্যুষে তালীকুঞ্জতলে এক পর্ণকুটিরের দ্বারে এসে তারা শুনল কবি গান গেয়ে বলছে— 'মাতা দ্বার খোলো।' দ্বার খুলে গেল। মা বসে আছেন তৃণ শয্যায় কোলে তাঁর শিশু। সকলে জানু পেতে বসল ঘোষণা করলে— জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।"

কবিতাটিতে এমন কয়েকটি ভাবব্যঞ্জক অংশ আছে যা যন্ত্রসঙ্গীতে আশ্চর্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে তিমিরবরণ এই সব অংশই বহুবিধ যন্ত্রের সাহায্যে কেবলমাত্র মেলোডিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সঙ্গীতের প্রত্যেকটি বৈচিত্র্য অনুরূপ গাম্ভীর্যে রূপায়িত হয়েছে। একটি মহান কাব্য তাঁর অসামান্য প্রতিভায় মহান ধ্বনিসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর এই পরিকল্পনা যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতের নতুন পদক্ষেপের সূচনা করেছে।

এই পরিকল্পনায় একটি বিষয় কিছু অনৈক্য ঘটাতে পারে তবে সেটি খুব বড় অসংগতি নয়। সমগ্র বিষয়বস্তুটি পর্দায় স্লাইড দিয়ে দেখান হয়েছে। এতে হয়ত সঙ্গীত থেকে শ্রোতাচিত্ত কিছুটা সরে গেছে কিন্তু সঙ্গীতটি এমন সুসংবদ্ধ যে চিত্র ব্যতিরেকেও এটি অনায়াসে একটি উৎকৃষ্ট বাদ্যপ্রবন্ধ হয়ে উঠতে পারত। সম্ভবত আমাদের চিত্ত এখনও সম্পূর্ণ অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতানুগ নয় বলেই এইভাবে সামান্য চিত্তাকর্ষক উপাদান আনা হয়েছে।

এই যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থাপনাকেও আমরা প্রশংসা করি। কীভাবে বাদকেরা আসন গ্রহণ করবেন তাঁদের স্বরলিপিগুলি সুবিধাজনকভাবে রক্ষিত হবে—এই সমস্ত আঙ্গিকের প্রতিই তিমিরবরণের নিপুণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল।

ঈদৃশ প্রচেষ্টা ক্রমেই প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যে, প্রসারিত হয়ে যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতের একটি স্বকীয় মান নির্ধারণ করবে, এইটাই আমরা কামনা করি।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

মহাশয়

আন্তরিকতা আর আগ্রহের সঙ্গে 'ড্রাগনের দাঁতে বিষ' পড়তে পড়তে আমার এ-চিঠি লেখার কথা মনে হয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকেই আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছিল প্রাসঙ্গিক হবে কিনা সন্দেহ থাকায় এতোদিন সেইসব কথা তুলি নি। 'ড্রাগনের দাঁতে বিষ' আলোচনার ধারা লক্ষ করতে করতে আমার প্রসঙ্গ পেয়ে গেছি মনে হলো। আমার কথাটা ভারতের কম্যুনিস্টদের দার্জিলিঙ, সিকিম ইত্যাদি হিমালয় অঞ্চল নিয়ে চীনের সঙ্গে আঁতাত। বলে রাখি এর আগেই আমার ধারণা হয়েছে যে আমাদের পুলিস বাহিনী প্রকৃত সংবাদ পায় না।

আমি দেখেছি, বিরাট এক গাড়ি রেড রোড ধরে তীর বেগে যেতে যেতে হঠাৎ থেমেছে আর গাড়ি থেকে একজন বিদেশী নেমে পলাশী গেট-এর মুখ থেকে ফোর্টের ছবি তুলছে, আর তাই দেখে আমাদের একজন লালপাগড়ি-সেপাই কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বর্তে-যাওয়া হাসি হাসছে।

এবার আসল কথা। গত ১৯৬১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি দার্জিলিঙে ছিলাম। সেই সময় নেপালী ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে। নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় নেপালী ছেলেদের টিটকারি হজম করতে হয়েছে। মনে হয়েছে যেন বিদেশে এসেছি, মনে হয়েছে নেপালের জায়গা যেন জোর করে অধিকার করে বসে আছি। ভেবেছি এতো বিষ কে ছড়ালো। নিজের দেশে পরবাসী হলাম কি করে?

একদিন আমার চোখ খুললো।

দার্জিলিঙ থেকে সিকিম যাচ্ছিলাম। রংপোর ব্রিজের কাছে সিকিমে ঢোকার আগে সই করতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে উলটো দিক থেকে আসা একখানা জীপে একটা চেনা চেনা মুখ দেখলাম। তখন অত ভাবিনি। দিন তিনেক পরে একদিন বিকেলে সিঞ্চল লেক দেখে হেঁটে ফিরছিলাম ঘুম পর্যন্ত। ঘুম স্টেশনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি ফিরতি ট্যাক্সি ধরবো বলে—সঙ্গে একজন অধ্যাপক বন্ধু। হঠাৎ একটু দূরে একটা জীপ এসে দাঁড়ালো। ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে নামলেন রংপোয় দেখা সেই মানুষটি। পরনে লম্বা কালো কোট। গাড়ির দিকে চেয়ে দেখি, এঞ্জিনের মাথায় কম্যুনিস্ট পার্টির ফ্লাগ। আমার চোখ খুললো। মানুষটি আর কেউ নন—স্বয়ং জ্যোতি বসু। সঙ্গে সঙ্গে মনে সেই সব জ্বলন্ত প্রশ্ন। উনি এ অঞ্চলে কি করছেন? সিকিমে কেন গেলেন? আরো আশ্চর্য, আরো রহস্য, ওঁর গাড়ির পেছন দিকের সীটে দুজন দাড়িওয়ালা পূর্ব ইউরোপীয় কি করছেন? তাঁদের সঙ্গে অত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কেন? ওগুলো কী যন্ত্র? জয়ীপের? বেতার প্রেরক যন্ত্র? ছবি তোলার সরঞ্জাম? চিনি না। কিন্তু মানুষগুলোকে চিনতে কষ্ট হলো না। জ্যোতিবাবু ঐ কুয়াশার মধ্যে কুয়াশার মতনই নেমে কার জন্যে যেন অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমরা অপেক্ষা করতে পারলাম না। দার্জিলিঙে ফিরে অনেককে বলেছি। সবাই বিস্মিত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকেও বলেছি আমার কথা। আমার বিশ্বাস ১৯৬২ সালের অক্টোবরের আগে পর্যন্ত এই কম্যুনিস্ট নেতার আসল মতলবের হদিশ কেউ পাননি।

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন

৩০ চৈত্রের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীরমাপদ চৌধুরী 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শিরোনামায় আলোচনা প্রসঙ্গে এক স্থানে লিখেছেন, 'আইনস্টাইন স্কুল শেষের অঙ্ক পরীক্ষায় একটা গোড়াসড়ো শূন্য পেয়েছিলেন'। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন সম্পর্কে রমাপদবাবুর এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এ বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে আইনস্টাইন স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাষা প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার পরীক্ষাপত্রে অকৃতকার্য হয়েছিলেন কিন্তু গণিতে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। আইনস্টাইনের যে কোনো প্রামাণ্য জীবনী (উদাহরণস্বরূপ ক্যাথরীন ওয়েল্স পেরীয়ার লিখিত ও পত্রলেখক কর্তৃক অনূদিত 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' বইটি উল্লেখ করতে পারি) থেকে এই কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। মনে হয়, আইনস্টাইন সম্পর্কে সাধারণ-প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার বশে রমাপদবাবু এই উক্তি করেছেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা-৯

হুগলীর চণ্ডীমণ্ডপ

মাননীয়েষু,

গত ৩০ বর্ষ ২৩শে চৈত্র সংখ্যার দেশ পত্রিকায় শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হুগলীর চণ্ডীমণ্ডপ' প্রবন্ধ পাঠে অত্যন্ত তৃপ্ত হলাম। হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার আঁটপুর ও বলাগড় থানার শ্রীপুর গ্রামে সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের কথা যা উল্লিখিত হয়েছে তা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এত প্রাচীন দেবস্থান বাংলায় দুর্লভ। তবে উলা বা বীরনগর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় মুস্তোফী বাড়ির উত্তর-পূর্বদিকে যে অপূর্ব শিল্পকলা-মণ্ডিত একচূড় মন্দিরটি আছে তা আরও প্রাচীন। ২৮৪ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা। উলার চণ্ডীমণ্ডপও শ্রীপুর ও আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপের মত কারুকর্মের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। উপরন্তু এর কাদার গাঁথনি করা দেওয়ালে টালির উপর খোদাই করা যেসব দেবদেবীর মূর্তি সূক্ষ্ম নকশা আছে তাও উল্লেখযোগ্য। ১২৭১ সালের আশ্বিনের ঝড়ে উলায় ও আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপের চালা দুটি উড়ে যায় ও খড়ের পরিবর্তে পরে টিনের আচ্ছাদন দেওয়া হয়। তা হলে অনুমান হয় বাংলাদেশে এখন একমাত্র শ্রীপুরেই সাবেককালের খড়ের চালাওলা চণ্ডীমণ্ডপ বর্তমান। উলা বা বীরনগর' পুস্তকে শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তোফী মহাশয় লিখেছেন (পৃষ্ঠা—৬৭)—"মন্দিরের খিলানগুলি চূণ ও সুরকীর দ্বারা গাঁথা। কিন্তু ইহার দেওয়ালের গাঁথনি কাদায়। আজিও দেওয়ালের কোনস্থানে ফাট ধরে নাই।" এই গাঁথনির কাদা আবার অত্যন্ত পাতলা। পাতলা কাদার গাঁথনি দীর্ঘদিনেও যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে আধুনিক বঙ্গীয় স্থপতিদের স্বল্পতম মূল্যে গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা সমস্যার এক অতিমূল্যবান সমাধানের নির্দেশ দেবে আশা করি। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ প্রবন্ধে যে স্বাজাত্যবোধ যে সংস্কৃতিমনার পরিচয় রয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। বঙ্গীয় স্থাপত্যের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের আলোচনা শেষে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে যে আহ্বান জানিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত সব কিছুর আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে আমরা লেখালেখি করছি, কিন্তু স্থাপত্য-এর ঐতিহ্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। স্থাপত্যেরও যে ঐতিহ্য আছে, এটাও যে একটা ভাববার কথা, এরও যে একটা ভবিষ্যৎ আছে তা আমরা ভুলেই গিয়েছি। আমরা অন্ধের মত বিদেশী স্থাপত্য ও তার অলঙ্করণ পদ্ধতি অনুকরণ করে চলেছি। আমাদের স্থাপত্যের শ্রীমণ্ডিতরূপ যাদুঘরের চোদেওয়ালে ঘেরাটোপ পরে আর অরণ্যের মধ্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের তকমা এঁটে বিদেশীদের বিস্মিত করছে মাত্র। Gordon Sanderson J Beg, Bradfrod Leasly, F O Oertel প্রভৃতি মনীষী আমাদের মহান ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

গোবিন্দ মোদক

কলিকাতা-২৫

বিদুর

হেমেন্দ্রকুমার রায়

হেমেন্দ্রকুমার রায় পরলোকগমন করেছেন। সংবাদ শুনেছি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেতেই। শুনলাম, তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় প'চাত্তর। বন্ধু বললেন, পুরোনো দিনের মানুষ বলেই এতদিন টি'কে ছিলেন, তুমি আমি পারব না।

বয়সের দিক থেকে প'চাত্তর বোধ হয় কম নয়। পরিণত বয়সে যিনি চলে যান তাঁর জন্যে শোক করা প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ত মানায় না, তবু মানুষ স্বভাববশে বিষণ্ণ হয়, দুঃখ অনুভব করে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় কি আজকের মানুষ? আমার মনে পড়ছিল নিজেদের বাল্যকালের কথা। তখন বোধ হয় দেব সাহিত্য কুটির সর্বপ্রথম ছোটদের—মানে কিশোরদের জন্যে স্বতন্ত্র করে ছোট ছোট উপন্যাস বের করতে শুরু করেছেন। ধান-বাদের হুইলার স্টল থেকে খান চার-পাঁচ বই এনে দিয়েছিলেন বাবা। কি বাহার সেই সব বইয়ের, চোখ জুড়িয়ে যায়। দামও বুঝি আনা আষ্টেক। মনে পড়ছে তার মধ্যে এই দুটি বইও ছিল : 'যখের ধন' 'চালিয়াৎ চন্দর'। প্রথম গ্রন্থটির লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়; দ্বিতীয় গ্রন্থটির লেখক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন শৈলজানন্দ, ছিলেন বোধহয় বিভূতিভূষণও। বলা ভাল, তার আগে পড়েছি প্রেমেন্দ্র মিত্র-র সেই সব লেখা— ঝড়ের কালো মেঘ'-এর (!) মধ্যে যা যা ছিল।

সুকুমার রায় সুখলতা রাও—এ-সব পড়ার বয়েস অনেককাল [illegible] এসে ছিলাম। তার ফলে আমাদের [illegible] 'যখের ধন' এ নতুন অভিজ্ঞতা [illegible] রোমাঞ্চ, 'চালিয়াৎ চন্দর' এই [illegible] আনন্দ।

তখন থেকেই হেমেন্দ্রকুমার [illegible] পরিচিত। অর্থাৎ লেখক-এর সঙ্গে [illegible] যেমন পরিচয় ঘটে সেই রকম পরিচিত।

তারপর কতকাল কেটে গেল, [illegible] পুলের তলা দিয়ে কত যে জল বয়ে গেল কিন্তু হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর লেখা থেকে সরে গেলেন না।

বয়স বাড়লে মানুষ বোধ হয় কিছুটা হিসেবী হয়। আমরা হিসেবী হয়ে পড়লাম। হেমেন্দ্রকুমারকে ফেলে এলাম পিছনে। কিন্তু তিনি আমাদের ছোট ভাই, তাদেরও ছোটদের জন্যে, শেষে আমাদের ছেলেমেয়ের জন্যে সেই একই বৃক্ষতলে বসে থাকলেন। আজও কিশোরদের কাছে হেমেন্দ্রকুমার যত খ্যাত যত প্রিয় অত আর বোধ করি কেউ নয়। শিবরাম ছাড়া।

১৮৮৮ সালে তিনি জন্মেছিলেন কলকাতাতেই। কলকাতাতেই বসবাস করতেন। সাহিত্যের আসরে যখন প্রবেশ

জন্ম : ১৮৮৮ মৃত্যু : ১৮ই এপ্রিল, ১৯৬০

করেন তখন তাঁর পরিচয় ছিল অন্যরকম—শিশুসাহিত্যিক হিসেবে নয়। গান, কবিতা, গল্প উপন্যাস সবই লিখতেন তিনি। 'ঝড়ের যাত্রী' 'বেনো জল'—এ-সব উপ-ন্যাসের কথা আজও আমাদের স্মরণে আছে, [illegible] তাঁরা বোধ হয় আরও অনেক [illegible] মনে করতে পারবেন [illegible]

[illegible] সেকালের প্রত্যেকটি [illegible] সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ [illegible] সম্পাদনায় প্রকাশ [illegible] 'নাচঘর' পত্রিকা যার [illegible] ছিল নাট্য ও শিল্পকলা। [illegible] পত্রিকা বসুমশাল ও তার সম্পাদনায় [illegible]

এ-কথা আজ বোধ করি সকলেই ভুলে গেছেন যে, হেমেন্দ্রকুমার একদা ছিলেন ছবি আঁকিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যথেষ্ট।

ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শিশিরকুমারের সঙ্গেও। 'সীতা' নাটকের নৃত্যপরিচালক ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার। ওই 'সীতা' নাটকের গানও তিনি লিখেছিলেন। 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে' এ-গান কে না শুনেছেন?

শুধু কি সাহিত্যিক, সাংবাদিক সমা-লোচক হিসাবেও হেমেন্দ্রকুমার একদা খ্যাত ছিলেন, খ্যাত ছিলেন গীত রচয়িতা ও নাট্যরসিক হিসাবে।

অনেক পথ ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় নিয়ে শেষে এসেছিলেন শিশুসাহিত্যে। কেন? বোধ হয় নিজের কাছেই তাঁর মনে হয়েছিল, ওই একটিই বা বাদ থাকে কেন? কিন্তু ভাগ্যের এমনই ইচ্ছা যে, হেমেন্দ্র-কুমার যা সর্বশেষে গ্রহণ করেছিলেন সেই শিশুসাহিত্যই তাঁর স্মৃতিকে রক্ষা করবে।

পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন

গত ১৪ই এপ্রিল দার্জিলিঙে পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়ন পরলোকগমন করেছেন।

...কালে ওঁর বয়স হয়েছিল সত্তর। ...ছিলেন বাবং পণ্ডিত সংকৃত্যায়ন অসুস্থ অবস্থায় দার্জিলিঙেই ছিলেন। গত ১০ই এপ্রিল অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ১৪ই এপ্রিল তিনি লোকগমন করেন।

রাহুল সংকৃত্যায়ন বিশেষ পরিচিত ...। পণ্ডিত, ভাষাবিদ এবং ইতিহাস-লেখক হিসাবে তাঁর সবিশেষ খ্যাতি ছিল।

১৮৯৩ সালের ৯ই এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা করেন কাশী, লাহোর মাদ্রাজ এবং সিংহলে। ১৯০৯ সাল থেকে তিনি বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেন, এবং তিব্বত ও রাশিয়ায় একাধিকবার গিয়েছিলেন। সিংহলে এবং লেনিনগ্রাদে দর্শনশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হিসাবে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন।

রাহুল সংকৃত্যায়ন পর্যটক ও ভ্রমণকারী হিসাবে তাঁর অমূল্য অভিজ্ঞতা একাধিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর 'ভোলগা থেকে গঙ্গা' গ্রন্থটি বাঙালী পাঠকেরও কম পরিচিত নয়।

আমরা এই গুণী ও প্রবীণ গ্রন্থকারের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

জীবনী গ্রন্থ : অসাধুতা

মাননীয় বিদুর

গত ১৩ই এপ্রিল সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় অধ্যাপিকা অনীতা গুপ্তার 'জীবনীগ্রন্থ : অসাধুতা' শীর্ষক চিঠি পড়িয়া মনে হইল যে এই বিষয়ে আমারও কিছু বলা উচিত।

সম্প্রতি কয়েকজন স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী বন্ধুদের দ্বারা Marie Louise Burke বইখানির হিন্দী অনুবাদ করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হই। তদনুযায়ী মহোদয়াকে বইখানি অনুবাদের অনুমতির জন্য প্রার্থনা-পত্র লিখি। ঐ পত্রে প্রসঙ্গত শ্রীমণি বাগচীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম কেননা 'দেশ' পত্রিকায় তাঁহার দ্বারা উক্ত পুস্তকখানির সংক্ষিপ্ত অনুবাদের একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম।

ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটির সেক্রেটারী মহাশয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরের যথাযথ প্রতিলিপি (অংশত) নিম্নে দিলাম। ইহা হইতে ভারত অনুরাগী বিদেশীগণের শ্রীমণি বাগচী সম্বন্ধে মনোভাব পরিস্ফুট হইবে। প্রতিষ্ঠ এইরূপ একজন লেখকের সম্বন্ধে এই জাতীয় মন্তব্য পাঠ নিশ্চয়ই আমার মতোই সাহিত্যানুরাগী সকলেই গভীর বেদনা অনুভব করিবেন।

পত্রখানির অনুলিপি :

Vedanta Society of Northern California 2963 Webster Street San Francisco 23 March 12 1963

Dear Mr Chakrabarty,

We have received your letter of March 6 in expressed the desire to translate "Swami Vivekananda in America New Discoveries" into the Hindi language . . .

. . . . I am sorry to say that the Mr. Moni Bagchi, whom you have mentioned in your letter, did not wait to obtain permission from the Ramakrishna Math before publishing his translation. His book, moreover, is regretably full of mistakes.

Yours sincerely Edith B. Soule (Mrs. H. D. B Soule).

...

গ্যেটের স্মরণীয় রচনা : একটি প্রণয় কাহিনী

Kindred by Choice—য়োহান হেনাল্ফ্গাঙ্গ ফন গ্যেটে। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। ১৫, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য চার টাকা।

উপন্যাস মাত্র তিনটিই লিখেছিলেন গ্যেটে 'তরুণ হেবর্টেরের দুঃখ', 'হিলমহেল্মে মাইস্টেরের শিক্ষানবিশী এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং বর্তমান বইটি পুরানো তর্জমায় যার নাম ছিলো ইলেক্টিভ অ্যাফিনিটিস' অর্থাৎ স্বনির্বাচিত আসক্তি—রূপা অ্যান্ড কোম্পানীর [illegible] সম্প্রতি এবং সুলভ পেপারব্যাকে কলকাতাতেই প্রকাশিত হয়েছে। তরুণ হেবর্টেরের দুঃখ—সকলেই জানেন প্রকাশের [illegible] সমস্ত ইয়োরোপে ঝড় ও চাঞ্চল্য তুলে দিয়েছিলো 'স্টুর্ম উণ্ড ড্রাং' এর সবচেয়ে উজ্জ্বল ধারা সেন্টিমেন্টাল উচ্ছ্বসিত চঞ্চল বিষণ্ণ করুণ বয়ঃসন্ধিভারাতুর অথচ স্পর্শকাতর হেবর্টেরের মত্ত প্রেম আর তার আত্মহত্যা সমস্ত ইয়োরোপে তখন আত্মহত্যার প্রবণ [illegible] হয়েছিলো। রাশি রাশি লোক ওই বয়ঃসন্ধিভারাতুর নায়কের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে [illegible] সেন্টিমেন্টালভাবে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছিলেন। [illegible]

[illegible]

কোঠোর [illegible] চুকরো।

বলা বাহুল্য কিন্ড্রেড বাই চয়েস' কোনোদিনই হেবর্টেরের মতো পাঠকদের অধিকার ও কুক্ষিগত করেনি। এমন কি হিলহেল্ম মাইস্টেরের মতোও নয়। হিলহেল্ম মাইস্টেরের দু খণ্ডে সম্পূর্ণ মস্ত উপন্যাস—ফাউস্টের মতোই দীর্ঘদিন ধরে একটু একটু করে এই 'বিলডুঙ্স্রোমান'টি তিনি রচনা করেছিলেন, আছে তাতে একটি যুবকের হয়ে ওঠার বিবরণ তার কৈশোর, তার শিক্ষা তার ভ্রমণ—সব কিছু মিলে কেমন করে তাকে পূর্ণ মানুষ করে দিয়ে গেলো, তারই আখ্যান এটা, আছে তর্ক, তত্ত্ব আর অন্বেষণ, 'হ্যামলেট' সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ও [illegible] একটি ভাবনার ফসল। [illegible] শিক্ষানবিশীমূলক

উপন্যাস, আলেমান সাহিত্যে বারে-বারে যার অনুসরণে অনেক স্মরণীয় উপন্যাস লেখা হয়েছে। গোটের যথার্থ উত্তর সাঠিক টোমাস মানই 'মায়াবী পাহাড়' উপন্যাসে ও টোনিয়ো ক্রেগারে' এই 'বিলডুঙ্স্রোমান'-এর আদর্শটিকেই সামনে রেখেছিলেন। জেমস জয়েসের 'শিল্পী যুবকের প্রতিকৃতি'ও এই পর্যায়ের অনুসারী।

[illegible] আগেই বলেছি 'কিনড্রেড বাই চয়েস' [illegible] হিলহেল্ম মাইস্টেরের [illegible] ও বিখ্যাত নয় তা ছাড়া [illegible] তেমন কোনো বিখ্যাত [illegible] আলেমান সাহিত্যে হয় নি। [illegible] রচনাবলির মধ্যেও এটি প্রায় [illegible] আছে—যদিও [illegible] যে এর ভিতর দিয়ে যে [illegible] প্রকাশ পেয়েছে তা [illegible]। প্রথমে এর আখ্যান-[illegible] তিনি একটি ছোটোগল্প রচনা [illegible] ভেবেছিলেন পরে লিখতে [illegible] হয়ে গেলো ছোটোগল্পের [illegible] ঠিক কুলিয়ে উঠলো না। প্রথমে [illegible] হবে অন্য ধরনের একটি [illegible] এক তরুণীর প্রেমে পড়ে [illegible] কী রকম অসহায় ও [illegible] ফিরে পাবার চেষ্টা করলেন, তারই বিষণ্ণ বিবৃতি থাকবে গল্পটিতে—এটাই মনে মনে ঠিক ছিলো। কিন্তু পুনর্যৌবনলাভের এই ব্যর্থ চেষ্টার গল্পটি হঠাৎ তাকে সবলে দখল করে বসলো—উপন্যাসের আয়তন না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি রইলো না একটুও, আর পরবর্তীকালে ভিক্টোরীয় যুগে ১৮০৯ সালে প্রকাশিত এই বইটি পড়ে তাকে 'প্রথম আধুনিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়ে বসলো। শুধু তাই নয়, আরো পরে টোমাস মান স্মরণীয়ভাবে মন্তব্য করলেন, 'প্রতীচ্যের নৈতিক সংস্কৃতি বাণিচারের যে-সমস্ত উপন্যাস রচনা করেছে এই বইটি তাদের ভিতর সবচেয়ে দুঃসাহসী ও সবচেয়ে গভীর।' আর বায়রন যখনই এই 'বুড়ো খ্যাকশেয়ালের' কথা বলেছেন, তখনই একবার করে এই বইটি সম্বন্ধে বলে নিয়েছেন যে, এটি নাকি বিবাহ নামক সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো ঠাট্টা, 'পরিণয়ের পরিহাস এবং স্বয়ং মোকিস্টো নাকি এর চেয়ে ভালো লিখতে পারতো না।

বায়রন কেন এই কথা বলেছিলেন, তা বোঝবার জন্য আরেকবার এই উপন্যাসটির প্রথম ইংরেজী তর্জমার নামটি মনে করে নেওয়া ভালো, ইলেক্টিভ অ্যাফিনিটিস'। এটি

যে বিজ্ঞানের একটি সূত্র, তা বোধ করি বলা বাহুল্য। যদি ক খ কখনো গ ঘ-র সান্নিধ্যে আসে, এবং যদি ক গভীরভাবে ঘ-র প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, এবং খ যদি গ-র প্রতি তেমনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়, তা হলে নতুন কোনো সম্মেলনের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা থাকে। রসায়নশাস্ত্রে এই-সব নির্বাচিত আত্মীয়তা বা সংযোগ নিয়তি-নির্দিষ্ট ও অপ্রতিরোধ্য। গোটে চেয়েছিলেন রসায়নের এই সূত্রটিকে মানুষের বেলায় প্রয়োগ করতে। এবং প্রেমের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ আর কী আছে? ফলে দুটি পুরুষ ও দুটি নারী অর্থাৎ দুই দম্পতি কাছাকাছি এলো এই বইতে: এডুয়ার্ড, ওট্টিলি শার্লোটে, ক্যাপ্টেন। কিন্তু কাছাকাছি আসার পর এই দুই যুগল পরস্পরের স্বামী-স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো - কিন্তু যেহেতু তারা সভ্য মানুষ তাই এক দিকে যেমন প্রেমের কাছে নিজেদের একেবারে সমর্পণ করে দিতে পারলো না, তেমনি পরস্পর তাঁর এই অধিকারও অস্বীকার করা সম্ভব হলো না। এবং গোটে—উপন্যাসটির এই সংকটের মুহূর্তে—রসায়নের সূত্রটিকে ব্যবহার করলেন। ফলে এই পরিহাসময় খেয়ালী কাল্পনিক প্রণয়কাহিনীটি গোটের রচনাবলির মধ্যে সেই স্মরণীয় নিদর্শন হয়ে রইলো যাকে বলেছেন 'মর্কারি অভ ম্যাজেক্'।

লণ্ডনের জন কাল্ডার এর সঙ্গে ব্যবস্থা করে রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি সম্প্রতি গোটের উপন্যাসটির নতুন ইংরেজী তর্জমা বের করেছেন, এর আগে তাঁরা বের করেছিলেন তরুণ হের্টেরের দুঃখ। বই দুটিকে সুলভে নিজের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পেয়ে সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই খুশী হবেন। ৪২৫।৬২

দুটি উপন্যাস

রং বদলায়—বিমল মিত্র। প্রকাশক—অরুণ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা—৯। দাম—৩·৫০ নঃ পঃ।

নফর সংকীর্তন—বিমল মিত্র। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—২·৫০ নঃ পঃ।

বাংলা সাহিত্যে আজ আর উপন্যাসের সীমাসংখ্যা নেই। একই লেখক ক্রমাগত অনেক উপন্যাস নিয়ে পাঠকসাধারণের কাছে দাম কিনছেন বটে, কিন্তু সে সব রচনার উৎকর্ষকেই সাহিত্যিকের সাহিত্যিক দান হিসেবে স্বীকার করে নিতে অনেকেই কিন্তু কুণ্ঠা বোধ করবেন। তারই মধ্যে মাত্র যে কজন লেখক আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সাহিত্য রচনায় চেষ্টিত আছেন, সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠকরা তাঁদের চিনতেও ভুল করেন নি। বিমল মিত্র তেমন একজন সাহিত্যিক। বিভিন্ন উপন্যাসের মারফত আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের পাঠকরা তাঁর রচনা ও অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছেন। সুতরাং আজ যদি লেখকরা আর নতুন কোনো রচনায় নবতর কোনো বৈচিত্র্যকে আবিষ্কার করেন, তবে তাঁরা হয়তো তেমন চমৎকৃত হবেন না, কিন্তু তাঁরা যে গতানুগতিক ধারাচ্যুত বৈশিষ্ট্যের আস্বাদ পেয়ে মনে মনে অবশ্যই খুশী হয়ে উঠবেন তাতে আর সন্দেহ নেই।

রং-বদলায় বিমল মিত্রর এমনি এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী। শুধু অভিজ্ঞতাই বা কেন? অধুনাকালের বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্বকে নিয়ে কত না পরীক্ষার পর্ব চলছে। তার অনেকটা যেন চিন্তাসূত্রের নিরবচ্ছিন্ন মালাগাথা, কাহিনীর প্রয়োজন কেবল প্রয়োজন মাত্র। কিন্তু রং-বদলায় উপন্যাসে কাহিনীর অব্যাহত গতিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে লেখক পুরুষ মনস্তত্ত্বের স্বরূপোদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছেন। নারী হৃদয়ের প্রেমকে যথার্থরূপে চিনে নেওয়া একজন পুরুষের পক্ষে সহজ নয়, আর যদি সে নারী চপল চটুল না হয়ে হয় ধীর স্থির বিচক্ষণ তবে তাকে বুঝতে পারা বোধ হয় আরো কঠিন। কাজলকে তাই সুহাস বুঝতে পারেনি। ফলে কাজলকে মরে বুঝিয়ে দিতে হলো স্বামীকে সে সত্যিই ভালবাসতো, আর সুহাস ব্যর্থ হয়ে গেল বাকী জীবনে। [illegible] মতো অতিনাটকীয়তা যদিও আছে এ-উপন্যাসে তা হলেও এই সমস্যা-জড়িত কাহিনীতে বৈচিত্র্যও কম নেই। এ বিচিত্র অভিজ্ঞতা লেখকের মতো পাঠককেও কম কৌতূহলী করে না।

জীবনবৈচিত্র্যের আর এক রূপ বিমল মিত্রের নফর সংকীর্তন। উনিশ শতকের সে যুগে অভিজাত ও কলকাতার উচ্চবিত্তদের মধ্যে অভাবনীয় উপায়ে ভিতরে ভিতরে কেমন ঘুণ ধরে উঠেছিলো, তার বহুবিচিত্র কাহিনী বিমল মিত্র ইতিপূর্বেও সাহস বর্ণনায় আমাদের পরিবেশন করেছেন। এখানেও সে দীর্ঘশ্বাস শোনা যাবে কিন্তু এখানে রচনাশৈলীতে অভিনব এক আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন লেখক যা পাঠককে চমক দেবেই। অন্তঃস্রোতে যে গভীর আলোড়ন কতগুলো মানুষকে সর্বনাশের অতলে তাঁদেরে নিয়ে যাচ্ছে, নফরের আপাত চরিত্র-উদ্ঘাটনের সামান্য রেখাপাতে তা স্পষ্টভাবে পাঠকের মনকে স্পর্শ করার সুযোগ পায় না। তাই সর্বনাশের শেষ পর্বও যখন সমাপ্ত তখনই যেন ঘটনার অনিবার্য পরিণতিকে লক্ষ করে পাঠক বিস্ময় বোধ করেন। বিমল মিত্র সার্থক কাহিনীকার হয়েও যে কাহিনীকে উহ্য রেখে পাঠকের কৌতূহলী মনকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেন, নফর সংকীর্তন তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ হয়ে রইল। ২৫৩।৬২, ৩১৩।৬২
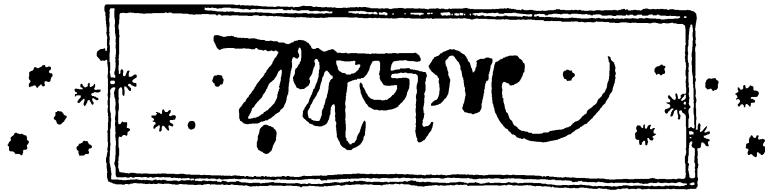
ফিল্ম সেন্সর

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্যবৃন্দ এবং বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক ও চিত্র-ব্যবসায়ীদের এক সভায় বর্তমান ফিল্ম সেন্সরের আইনকানুন ও তার প্রয়োগ-প্রণালী সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এবং ফিল্ম সেন্সরের যে আইনকানুন ও রীতিনীতি বলবৎ আছে, তা আরও কঠোর অথবা শিথিল করার প্রয়োজন নেই বলেই সভায় প্রায় সকলেই অভিমত প্রকাশ করেন।

ফিল্ম সেন্সরের যে বিধি-প্রণালী বর্তমানে অনুসৃত, তা শিথিল করার যে প্রয়োজন নেই, সে-সম্পর্কে বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই একমত হবেন। কিন্তু জঘন্য পাপাচার এবং উদ্দেশ্যমূলক অশোভন যৌন-উপকরণের যে-সব হিন্দী ক্রাইম ছবি সাধারণত আমরা দেখতে পাই, সেগুলির ক্ষেত্রে সেন্সরের আইন আরও কঠোর করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার। যাঁরা এই ধরনের ছবির নির্মাতা, তাঁরা হয়ত এই যুক্তি দেখাবেন যে, সম্প্রতি করভারে জর্জরিত সিনেমা-শিল্পকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে এমন ছবিই তৈরি করা দরকার, যা টিকিট-ঘরের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হবে। উল্লিখিত সভায় হিন্দী ছবির জনৈক বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন, বর্তমানে ফিল্ম সেন্সরের কাজ সন্তোষজনক ঠিকই কিন্তু অতিরিক্ত কর প্রবর্তনের পর টিকিট-ঘরের চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে কোন চিত্রপ্রযোজকই ছবি তৈরি করতে সাহস করবেন না।

এই ধরনের উক্তি মোটেই যুক্তিসম্মত নয়। সেন্সরের আইনে যা দোষনীয়, টিকিট-ঘরের বরাভয় লাভের জন্য সে-ধরনের উপকরণ কি সত্যিই অপরিহার্য? যাঁরা মনে করেন, সেন্সরের আইন ছায়াছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষতি করতে পারে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সেন্সরের কড়াকড়ির জন্য ছায়াছবির আর্ট যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে অন্য কথা। কিন্তু টিকিট-ঘরের আশীর্বাদ লাভের জন্য যাঁরা সেন্সর-আইনের কঠোরতার হ্রাস কামনা করেন, তাঁদের রুচি ও উদ্দেশ্যকে সমর্থন জানানো মোটেই সম্ভব নয়।

নিউ থিয়েটার্স এক্সজিবিটার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর "নির্জন সৈকতে" (পরিচালনা: তপন সিংহ) ছবির একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা ও ভারতী দেবী

রাধারানী পিকচার-এর "প্রেয়সী" (পরিচালনা : শ্যাম চক্রবর্তী) ছবিতে সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই)

প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল"

প্রস্তাবিত 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিল" নিয়ে নাট্যামোদী মহলে তর্কের ঝড় উঠেছে। ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যায় বিলটি প্রকাশিত হয়েছে। বিলটি পাশ হলে তার নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান আইন"। এই বিলটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য কলকাতার নাট্যামোদীরা সম্প্রতি একটি সভায় একত্রিত হয়েছিলেন।

সভায় ডঃ অজিত ঘোষ শ্রীবাসবিহারী সরকার শ্রীমন্মথ রায় শ্রীহরেন্দ্র রায়চৌধুরী শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণ দেন। প্রস্তাবিত বিলটি সম্পর্কে 'দেশ'-এ গত সপ্তাহে প্রকাশিত—'একটি অবাঞ্ছিত আইন' প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বিলটি অ-সংশোধিত অবস্থায় পাস হলে নাট্যাভিনয় ছাড়াও সংগীতানুষ্ঠান, যাত্রা, কীর্তন, হাস্যকৌতুক এবং এমন কী বিবাহ-বাসরে, বিদ্যালয়ে ও যে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উৎসবাদিতে আমোদ-অনুষ্ঠান, গান বাজনা প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, "ড্রামা" শব্দটির যে সংজ্ঞা বিলটিতে নির্দেশিত, তার আওতায় এ সব কিছুই পড়ছে। এবং এ সব কিছুর জন্যই লাইসেন্স ফী দিতে হবে।

বিলটি অপরিবর্তিত অবস্থায় পাস হলে অ-পেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলিকে এবং নাট্যাভিনয়-স্থানের মালিক অথবা দখলীকারকে লাইসেন্স ফী বাবদ যে টাকা

রয়েছেন। অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, নিভাননী, প্রেমাংশু বসু ও গীতা দে। সুররচনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

স্বস্তিক ফিল্মস-এর নাগ জ্যোতি হিন্দী ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। অনিতা গুহ, মহীপাল, ইন্দিরা, রত্নমালা ও সুন্দর ছবির প্রধান শিল্পী। শান্তিলাল সোনি ও সর্দার মালিক যথাক্রমে ছবির পরিচালনা ও সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন।

মেরে আরমান, মেরে স্বপ্নে

ললিতকলা মন্দিরের "মেরে আরমান, মেরে স্বপ্নে" হিন্দী ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'প্রতিশ্রুতি'র (বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত) কাহিনী অবলম্বনে হিন্দীচিত্রটি পরিচালনা করেছেন অরবিন্দ সেন। ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রদীপকুমার কুমারী নাজ অসীমকুমার প্রাণ আগা, জয়শ্রী গড়কার, মনোমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি। এন দত্ত সংগীত-পরিচালক।

হাই হিল

রাজীব পিকচার্স-এর 'হাই হিল' ছবিটি অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে। দিলীপ মিত্র পরিচালিত হাসি ও প্রেমের এই ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় সন্ধ্যা রায় ছবি বিশ্বাস, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, অনুভা রায় তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার জহর রায়, কমল মিত্র অনুপকুমার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার। তাঁর এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলি ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে গণ্য হবে বলে জানা গেল।

আকাশপ্রদীপ

কনক মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত শিবানী চিত্রমের 'আকাশপ্রদীপ' ছবিটির মুক্তিলগ্ন আসন্ন। প্রযোজক-পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজেই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বিশ্বজিৎ, অসিতবরন, বিকাশ রায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, নবকুমার, পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সান্যাল, শিপ্রা চক্রবর্তী ও সন্ধ্যারানী ছবির প্রধান শিল্পী। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরকার।

উত্তরফাল্গুনী

গত পয়লা বৈশাখ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য 'উত্তর-ফাল্গুনী'র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। প্রথম দিনের স্যুটিং-এ সুচিত্রা সেন ও ছায়া দেবী অংশ গ্রহণ করেন। সুচিত্রা সেন এ ছবিতে মা ও মেয়ের দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করছেন। ক্যাপস্টিক সেন তপন সিংহ অসিত সেন ছবিটি পরিচালনা করছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বিকাশ রায় দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবির দুটি বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।
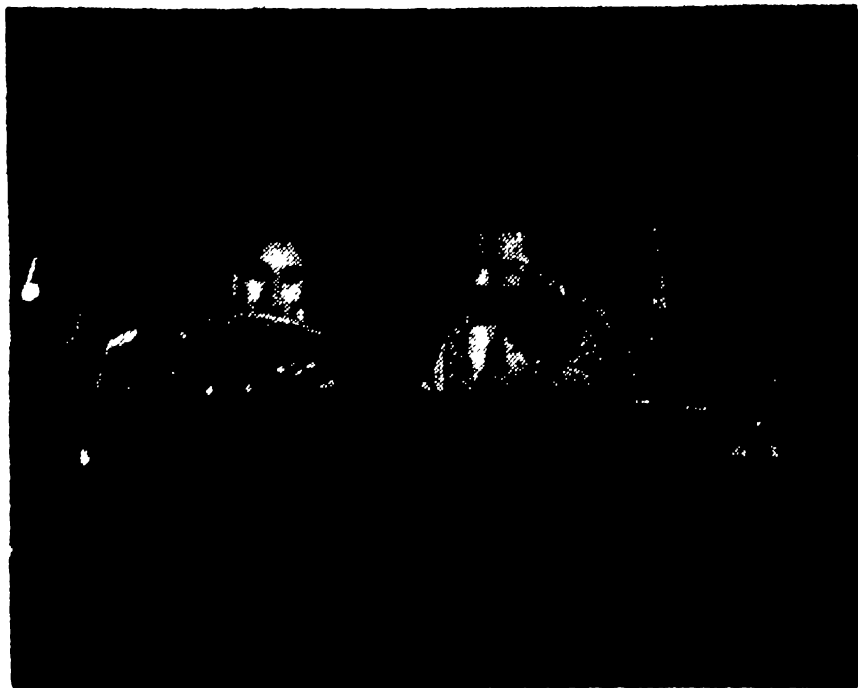
আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত রাজীব পিকচার্স-এর "হাই হিল" (পরিচালনা : দিলীপ মিত্র) ছবির একটি দৃশ্যে সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

রজনীগন্ধা

কে জি প্রোডাকশনস-এর প্রথম ছবির নাম 'রজনীগন্ধা'। গ্রেটা গার্বো অভিনীত জনপ্রিয় ইংরেজী ছবি 'কামিলা'র কাহিনী অবলম্বনে রজনীগন্ধার চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুচিত্রা সেন। কমল ঘোষ ছবিটি প্রযোজনা করছেন। অজয় কর ছবির পরিচালক।

অশান্ত ঘূর্ণি

সিলভার স্ক্রীন প্রোডাকশনস-এর "অশান্ত ঘূর্ণি"র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হচ্ছে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে। পিনাকী মুখোপাধ্যায় ছবির পরিচালক। 'অশান্ত ঘূর্ণি" একটি রহস্য-চিত্র। অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, রেণুকা রায় এবং নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাস ছবির প্রধান চরিত্রগুলির শিল্পী। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী ছবিটির আখ্যান-অবলম্বন। সংগীত পরিচালনা করবেন রাজেন সরকার।

বলিদান

জে জে ফিল্মস কর্পোরেশনের প্রথম হিন্দী ছবির নাম রাখা হয়েছে "বলিদান"।

(উপরে এবং মাঝখানে বাঁয়ে) সদ্যোমুক্ত "উত্তরায়ণ" ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী (মধ্যখানে ডাইনে) রূপনিকেতনের "শেষ প্রহর" (পরিচালনা : প্রান্তিক) ছবির সেটে শর্মিলা ঠাকুর ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় (নীচে) জেনিথ পিকচার্স-এর "বিভাস" (পরিচালনা : বিনু বর্ধন) ছবিতে অনুভা গুপ্ত ও উত্তমকুমার।

শ্রীমন্মথ রায় ও শ্রীজহর গাঙ্গুলী। অধিবেশনে অ-পেশাদার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে বলেন শ্রীসৌমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও শ্রীসুধী প্রধান। অতীত যুগের কয়েকজন কৃতী অভিনেতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন অধ্যাপক অশোক সেন, শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। নাট্য-সমালোচনা সম্বন্ধে বলেন শ্রীসুনীল ভদ্র। সভাপতি শ্রীমন্মথ রায় প্রস্তাবিত নাট্যানুষ্ঠান বিল সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরিশেষে শ্রীরাসবিহারী সরকার সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করেন এবং সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির সারাংশঃ (ক) কম্যুনিস্ট চীনের ভারত-আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগাবার জন্য যাঁরা দেশাত্মবোধক নাটক রচনা এবং অভিনয়ের আয়োজন করেছেন সম্মেলন তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। (খ) রবীন্দ্র-স্মরণী নামক জাতীয় নাট্যশালা তৈরির জন্য সম্মেলন আশা ও আনন্দ প্রকাশ করছেন এবং সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব করছেন যে, এই নাট্যশালা পরিচালনার ভার বে-সরকারী সভ্য নিয়ে গঠিত একটি স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত কমিটির উপর অর্পিত হোক। (গ) আকাদামি পুরস্কার ও রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদানের সময় শ্রেষ্ঠ নাটক রচনার জন্যও যাতে পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়, তার জন্য সম্মেলন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। (ঘ) বাংলা দেশের বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্মেলন বিশেষ-ভাবে অনুভব করছেন। (ঙ) সম্মেলন ১৯৬২ সালের নাট্যানুষ্ঠান বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

রূপকার গোষ্ঠী রাজা বসন্ত রায় রোড এক্সটেনশনস্থিত 'রসিকরঞ্জন সভা'র নব-নির্মিত মঞ্চে আগামী ২৯শে এপ্রিল থেকে পর পর কয়েক সোমবার তাঁদের বহু-প্রশংসিত দুটি নাটক 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী' ও 'ব্যাপিকা বিদায়' অভিনয় করবেন।

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে গত রবিবার সপ্তপর্ণী সংস্থা মহেন্দ্র গুপ্তের 'শাপমুক্তি' নাটকটির অভিনয়ের আয়োজন করেন। নাট্যপরিচালনা করেন নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত। সুঅভিনীত ও সুপরিচালিত এই নাটকের মুখ্য চরিত্রগুলিতে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, গায়ত্রী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ছন্দা দেবী, রেণু ঘোষ, শুভ্রিধারা ও মহেন্দ্র গুপ্ত অভিনয় করেন। দুর্গা সেন ও সত্য সেন যথাক্রমে সুর রচনা ও শিল্পনির্দেশে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

রাজধানীতে "সৈনিক"

থিয়েটার সেন্টারের মঞ্চসফল নাটক "সৈনিক" নিয়ে মুখোশ দল দিল্লি যাত্রা করেছেন। রাজধানীতে এই দেশাত্মবোধক নাটকের সপ্তাহব্যাপী অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। ২৬শে এপ্রিল সাপ্রু হলে নাট্যাভিনয়ের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু। প্রথম দুই রজনীর নাটকের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ ভারতীয় রেডক্রসের তহবিলে দান করা হবে। ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল দিল্লির জনসাধারণের জন্য ভারতীয় নাট্যসংঘ এই নাটক প্রযোজনার ব্যবস্থা করেছেন। রাজধানী থেকে ফেরার পথে জালন্ধর ও [illegible]

মহৎ দান

জনপ্রিয় চিত্রাভিনেতা বিশ্বজিৎ কলকাতার ছয় মাইল উত্তরে বন-হুগলীতে স্থাপিত বিকলাঙ্গ বালক বালিকাদের জন্য হাসপাতালের স্নায়ু সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসা কক্ষ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভারতের পরীক্ষামূলক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সোসাইটিকে দুই লক্ষ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শিল্পী তাঁর দানের প্রথম কিস্তি হিসাবে ইতিমধ্যেই ২০,০০০ টাকা দিয়েছেন। প্রস্তাবিত স্নায়ু সংক্রান্ত শল্যচিকিৎসা কক্ষটি বিশ্বজিতের পরলোকগতা জননী শ্রীমতী স্মৃতিময়ী চট্টোপাধ্যায়ের নামে হবে। এতে রোগীদের জন্য ৫০টি [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] চিকিৎসা হবে।

আসন্ন **রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও দক্ষিণীর** পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ১২ই মে সন্ধ্যা সাতটায় আশুতোষ কলেজ হলে শুভ গুহঠাকুরতার পরিচালনায় রবীন্দ্র সংগীতের এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। [illegible] ২[illegible] বৈশাখ সন্ধ্যা সাতটায় দক্ষিণী [illegible] শিক্ষার্থী সদস্য অভিভাবক ও অতিথিদের একটি প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লণ্ডনে **সম্প্রতি অমিয়রঞ্জন বিশ্বাস ও** রেখা বিশ্বাসের **প্রযোজনায় "আসর"** রবীন্দ্রনাথের শাপমোচন নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করে। অভিনয়ে বাঙালী অবাঙালী ও অভারতীয় শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। কমলিকার গান গাওয়ার জন্য সুইজারল্যাণ্ড থেকে আসেন বনানী ঘোষ।

নবীন কলামন্দির গত ১৪ই এপ্রিল মহাজাতি সদনে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে ভারতী বাসুর নৃত্য ভি বালসারার যন্ত্রসংগীত পান্নালাল বসুর কাওয়ালী গান ইলা বসুর গান ও সুশীল চক্রবর্তীর কৌতুক-নক্সা সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

আগামী ২৫শে বৈশাখ থেকে ৫ই জ্যৈষ্ঠ **পর্যন্ত বার দিনব্যাপী রবীন্দ্র মেলার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন রবীন্দ্র কাননে** (বিডন **স্কোয়ার) অনুষ্ঠিত হচ্ছে।** অনুষ্ঠানে [illegible]

ইন্দ্রাণী প্রোডাকশন্স-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" (পরিচালনা : নবগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে সন্তোষ গুহ রায়) ছবির একটি দৃশ্যে বিশ্বজিৎ, কল্যাণী ঘোষ ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয় [illegible] প্রসঙ্গ [illegible] ও [illegible] [illegible] হচ্ছে [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রাচীন [illegible] সব মূল্য [illegible] করা হচ্ছে। [illegible] তাঁর ও [illegible] কক্ষ [illegible] বাঁসা ও [illegible] প্রভৃতিও প্রদর্শিত হবে।

পরলোকে শ্রীনন্দলাল দাস

গত ১২ই এপ্রিল কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নাট্যকার শ্রীনন্দলাল দাস ৬৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের জীবনী অবলম্বনে তিনি কুশারী পরিবার নাটকটি রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন মঞ্চে নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়। ইনি 'কল্পনা রহস্য ফুলের তোড়া যুগাবর্ত" নামে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। কুমারটুলিতে তিনিই বাণীমন্দির সাহিত্য সভা' প্রতিষ্ঠা করেন

জে জে ফিল্ম করপোরেশনের "সুবর্ণরেখা"র বহির্দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে অভি ভট্টাচার্য জহর রায়, প্রবীপ নিয়োগী প্রভৃতির সঙ্গে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করছেন চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক

সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ধারক খেলায় টসে পরাজিত কালীঘাট ক্লাব। ফটো—দেশ

দেশী সংবাদ

১৫ই এপ্রিল—আজ লোকসভায় সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ভারত সরকার রেজিমেণ্টগুলির শ্রেণীগত নামকরণ নিরুৎসাহ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই কারণে বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট গঠন করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ত্রি-ভাষা সূত্র সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীদের লইয়া গঠিত রূপায়ণ কমিটি আজ যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহা হইল : উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আঞ্চলিক ভাষা অথবা মাতৃভাষা, হিন্দী অথবা যে-কোন ভারতীয় ভাষা এবং ইংরেজী ভাষায় যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে।

১৬ই এপ্রিল—অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই শেষ পর্যন্ত বহু সমালোচিত [illegible] বাধ্যতামূলক সঞ্চয় এবং অতিরিক্ত মুনাফাকরের ক্ষেত্রে কর প্রস্তাব যৎকিঞ্চিৎ সংশোধন করিয়াছেন। এই সংশোধনের ফলে অর্থমন্ত্রী মোট প্রায় ৩০ কোটি টাকা কর-ভার লাঘব করিয়াছেন।

জঙ্গী হিন্দীপ্রেমীদের ফের একবার সাবধান করিয়া দিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন, হিন্দীপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম অনেক বড়। বড় ভাষার দেশ ভারতে হিন্দী লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিলে বিরোধ বাধিয়া যাইবে। আখেরে হিন্দীরও তাহাতে সুবিধা হইবে না। কেননা দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া হিন্দীর অগ্রগতি অসম্ভব।

১৭ই এপ্রিল—স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশের কঠোরতা শিথিল করিবার জন্য কয়েকজন সদস্য যে দাবি জানাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে স্বর্ণ-নীতি অপরিবর্তনীয় এবং সম্ভবতঃ উহা আরও কঠোর হইবে।

প্রকাশ, কলিকাতা অঞ্চলের জাতীয় সঞ্চয় দপ্তর ও কলিকাতাস্থ কেন্দ্রীয় আবগারী দপ্তরের কয়েকজন অফিসার ও কর্মচারীকে ঘিরিয়া এমন একটি দুর্নীতিচক্র গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার ফলে কলিকাতার অন্ততঃ ৬।৭টি তেজক্রু [illegible] জাতীয় সঞ্চয় দপ্তরে টাকা জমা দিয়া জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট পান নাই, এমন কি তাঁহাদের প্রদত্ত টাকার কোন হদিসও মিলিতেছে না।

১৮ই এপ্রিল—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ লোকসভায় ঘোষণা করেন, পশ্চিম-বঙ্গের কলিকাতা, হাওড়া ও নদীয়া জেলায় রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারকার্য [illegible] করা হইতেছে এবং ইহা যে চীনপন্থী কম্যুনিস্টদের কুকীর্তি তাহাতে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের উপমন্ত্রী ডাঃ ডি. এস রাজু আজ লোকসভায় বলেন যে, ভেজাল মিশাইবার অপরাধের জন্য [illegible] ব্যবস্থা না থাকায় [illegible] সরকার ১৯৫৪ সালের খাদ্যে ভেজাল নিবারণ আইন সংশোধনের প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯শে এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, আজ কংগ্রেস সংসদ দলের সভায় এই মর্মে সতর্ক-

বাণী উচ্চারণ করেন যে, গায়ের জোরে এবং ভোটের জোরে হিন্দী চাপাইবার চেষ্টা করা হইলে সংঘর্ষ বাধিবে। তিনি একথাও বলেন যে, ১৯৬৫ সালের পর সরকারী কার্যে ইংরাজীর ব্যবহার চালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা রক্ষা করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আসন্ন শুভ জন্মদিবস হইতে রাজ্যের সরকারী নথিপত্রে যথাসাধ্য বাংলা ভাষা প্রয়োগ করিতে ব্রতী হইয়াছেন।

২০শে এপ্রিল—কলিকাতার [illegible] সিরাজুদ্দিন অ্যাণ্ড কোং-এর বিরুদ্ধে শুল্ক আইন অমান্য করার যে অভিযোগ আনা হয়, কংগ্রেসী সদস্য শ্রীঅংশুমান [illegible] তাহা তুলিয়া লইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে এক পত্র দিয়েছেন। শ্রীদেশাই আজ লোকসভায় [illegible] সেই পত্রের একটি নকল উপস্থাপিত করেন।

অন্য সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে গতকল্য সন্ধ্যায় [illegible] [illegible] কয়েকটি গ্রামের উপর দিয়া এক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বহিয়া যায় এবং উহার ফলে ২৬ জন নিহত ও ১৬৭ জন আহত হয়। প্রায় দশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। বহু সম্পত্তি ও গবাদি পশু বিনষ্ট হইবার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

২১শে এপ্রিল—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাশ্মীর সমস্যা [illegible] উপর [illegible] করে না।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৯ লক্ষ টাকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষা [illegible]।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই এপ্রিল—আজ [illegible] ফাউণ্ডেশন ভারতের গ্রাম [illegible] প্রতিষ্ঠানের [illegible] সহায়তাকল্পে মোট ১৫ লক্ষ ডলার [illegible] মঞ্জুরীর [illegible] [illegible] করিয়াছেন। এই ফাউণ্ডেশন [illegible] [illegible] [illegible] ব্যবহারের জন্য মোট ৭৯৯৬২০০ ডলার [illegible] [illegible] মঞ্জুর করিয়াছেন।

১৬ই এপ্রিল—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ জেড এ ভুট্টো গতকাল বলেন পাশ্চাত্য শক্তি-বর্গকে কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসার ব্যাপারে ভারতকে অস্ত্র সাহায্য দিবার পরামর্শ দেন। এবং এই সতর্কবাণী করেন যে যদি তাহা না [illegible] [illegible] [illegible] এমন একটি [illegible] [illegible] [illegible] হইবে, যাহার সুদূর প্রসারী

প্রতিক্রিয়া হইবে পাশ্চাত্য শক্তির আঞ্চলিক চুক্তিগুলির উপর।

১৭ই এপ্রিল—মিশর, সিরিয়া এবং ইরাককে লইয়া একটি নূতন সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে আজ সকালে কায়রোর কুব্বে প্রাসাদে একখানি দলিল স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই দলিলে একটি যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, যদি ভারতবর্ষের জন্মহার হ্রাস করা না হয়, তাহা হইলে এই শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই ভারতের লোক সংখ্যা সম্ভবত দ্বিগুণ হইবে।

১৮ই এপ্রিল—জাতীয় পঞ্চায়েতে ভাষণদান-কালে নেপালের রাজা মহেন্দ্র ভারতের সহিত নেপালের সম্পর্কের উন্নতির কথা সোচ্ছ্বাসযুক্তি-ভাবে উল্লেখ করেন। ১৪ই এপ্রিল এই পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং নেপালে ইহাই সর্বোচ্চ আইনসভা।

ইতালীর ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট পার্টির মুখপাত্র 'পপোলো'র লণ্ডন সংবাদদাতা আজ এই মর্মে এক সংবাদ দিয়াছেন যে, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিবার জন্য শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে।

১৯শে এপ্রিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ-নৈতিক ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীএভারেল হ্যারিম্যান গতকাল ওয়াশিংটনে বলেন যে, ভারতবর্ষকে মার্কিন সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হইলে নির্বুদ্ধিতার কাজ করা হইবে।

আজ করাচীর নির্ভরযোগ্য মহলে বলা হইয়াছে যে, চীনা সীমান্ত বাহিনী কারাকোরামের পশ্চিম দিকস্থ দুই হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা হইতে সৈন্যাপসারণ আরম্ভ করিয়াছে। পাক-চীন সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী ঐ অঞ্চল এখন পাকিস্তানের অধিকারে আসিয়াছে।

২০শে এপ্রিল—চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে চীনের [illegible] মনোভাব প্রচার করা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব [illegible] করা—এই দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া চীনা রাষ্ট্রপতি লিউ শাও-চি অকস্মাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত [illegible] স্বরূপ [illegible]।

[illegible] [illegible] প্রকাশ, কাশ্মীর সমস্যার [illegible] [illegible] [illegible] নেতা ভুট্টো যে নূতন [illegible] কথা [illegible] ভারত-পাক আলোচনার পঞ্চম বৈঠকের পূর্বে তিনি সম্ভবতঃ তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন। অন্য দিকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন নাকি এক নেহরু-আয়ুব বৈঠকের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন।

২১শে এপ্রিল—চীন-ভারত বিরোধের শান্তি-পূর্ণ মীমাংসাকল্পে ভারতকে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য পুনরায় আহ্বান জানাইয়া কম্যুনিস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী শ্রী চু এন-লাই বলেন যে, হিমালয়ের সীমান্ত বিরোধ যে এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, তজ্জন্য কম্যুনিস্ট চীন দায়ী নহে। একমাত্র ভারতবর্ষই দায়ী।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২০-২২৮০ ও ২৩-৮৫৪১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩০ বর্ষ

(১৪শ সংখ্যা থেকে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত)

ত্রুটি মার্জনীয়

গত সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় 'সাতরঙ' এর বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছিল তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাতরঙ'-এর প্রথম সংখ্যায় একটি সুবৃহৎ গল্প লিখ-ছেন। কিন্তু আসলে তিনি গল্প লিখছেন না, লিখছেন নতুন ধরনের একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। নাম : 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে'। এছাড়া আরও একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস থাকছে আশাপূর্ণা দেবীর। যেটির নাম : 'ততোধিক'। আর একটি বিশেষ আকর্ষণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা। তরুণ সাহিত্যিক আর. বিশ্বনাথন লিখছেন একটি গল্প। এছাড়া চিরঞ্জীব সেনের রোমাঞ্চ গল্প এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'একটি হত্যাকে ঘিরে' রুদ্ধশ্বাসে পড়বার মত। এর সঙ্গে প্রফুল্ল রায়ের 'দর্পণ' গৌরাঙ্গ-প্রসাদ বসুর 'সপ্তসিন্ধু', অসিত গুপ্তের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' শ্রীপান্থর 'রেসটিপ', স্বরেশ শর্মাচার্যের 'ক্যালোরিলিপি', সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঞ্চ' আশীষ বর্মনের 'খেলাধূলো', ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের 'শারীরিক' অর্ধেন্দু দে-র 'নিউরোটিক', দেবনারায়ণ গুপ্তের 'তাপসী প্রসঙ্গে' ইত্যাদি রচনাগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিনেমা ও থিয়েটার বিভাগে যা থাকবে তা আর শোনাচ্ছি না। সেগুলো দেখে পছন্দ করার জিনিস। প্রথম সংখ্যাটি ২৫শে বৈশাখ বেরুবে। ২৪০ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাখানির দাম মাত্র দেড় টাকা।

নতুন ধরনের   মাসিক পত্রিকা

৫/২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ট্রামে-বাসে—		৭৬
চিত্র প্রদর্শনী—		৭৭
সাহিত্য সংবাদ—বিদুর		৭৮
পুস্তক পরিচয়—		৮০
রঙ্গজগৎ—		৮৩
খেলার মাঠে—একলব্য		৯১
খেলাধুলোর মহিলা—		৯৪
সাপ্তাহিক সংবাদ—		৯৬

প্রচ্ছদ—শ্রীদিলীপকুমার দাস (নব্যশিল্পী)

ইউনাইটেড
ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ **দেশ** দেশ
দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ
দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ দেশ

সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০

এই সংখ্যায় থাকবে

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

পুলিনবিহারী সেন : রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িকপত্র

প্রবোধচন্দ্র সেন : বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা

দিলীপকুমার বিশ্বাস : সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ : বাংলা সাময়িকপত্রে স্বদেশচিন্তা

ভবতোষ দত্ত : ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় স্বদেশপ্রেম

প্রমথনাথ বিশী : মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ

অজিত দত্ত : রঙ্গলাল ও দেশাত্মবোধ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশচিন্তা

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : কবি হেমচন্দ্রের রচনায় স্বদেশপ্রেম

তারাপদ মুখোপাধ্যায় : বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা

বিজিতকুমার দত্ত : রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশচিন্তা

দীপ্তি ত্রিপাঠী : কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক নবীনচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু : স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা

রাজ্যেশ্বর মিত্র : দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

বুদ্ধদেব বসু : উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

দেশের রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলালের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রচিত তিনটি বিশেষ রচনা।

এ ছাড়া

গত এক বছরের উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে

দাম ৮০ নঃ পঃ । রেজিস্ট্রী ডাকে ১·৩৮ নঃ পঃ

পিকিং থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মিশরের মুখ্যসচিব শ্রীআলি সাবরী দিল্লিতে শ্রীনেহরুর সঙ্গে যা কথাবার্তা বলেছেন তার বিবরণ প্রকাশিত হবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। তবে শ্রীআলি সাবরী সাংবাদিকদের কাছে যা বলেছেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে, ভারত সরকার এবং চীনা সরকারের মধ্যে সরাসরি কথাবার্তার পুনরারম্ভ বোধহয় বেশি দূরবর্তী নয়। কলম্বো কনফারেন্সওয়ালাদের মধ্যে মিশরই ভারতের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহানুভূতির ভাব দেখিয়েছে, সেজন্য শ্রীআলি সাবরীর নিকট ভারত সরকারও বোধ হয় স্বীয় মনোভাব সব চেয়ে খোলাখুলি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং শ্রীআলি সাবরী যখন বলছেন যে, আগের চেয়ে তিনি এখন ঢের বেশি আশান্বিত যে আলাপ-আলোচনার শান্তিপূর্ণ পথে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে, দুই সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনার পুনঃপ্রবর্তনের আর বেশি বিলম্ব নেই। তার অর্থ এই যে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নেওয়ার ব্যাপারে চীনারা আর একটু এগিয়েছে যেখানে ভারত সরকারের পক্ষে মুখ বাঁচিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করা সম্ভব বলে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারা মনে করেন।

চীনা সরকার তো বরাবরই বলে আসছেন যে তাঁরা 'ইন প্রিন্সিপল' 'কলম্বো প্রস্তাবাবলী' মেনে নিয়েছেন। যে দুটি ব্যাপারে (লাদাকে চীনাদের দাবি লাইনের ওদিকে কোনো বেসামরিক ভারতীয় পোস্ট থাকতে দেওয়া এবং নেফায় চীনাদের দাবি-লাইনের ওদিকে কোনো ভারতীয় সৈন্য থাকতে দেওয়া নিয়ে) চীনাদের আপত্তি আছে সেগুলিও তারা আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত করতে চায়। চীনারা বলছে যে কলম্বো কনফারেন্সের মুখ্য কথা হবে এই যে, ভারত ও চীন সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনা "ডাইরেক্ট নিগোসিয়েশন"-এর দ্বারা বিপদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত সেরূপ নিগোসিয়েশনের পথ খোলার জন্যই কলম্বো কনফারেন্স দুই পক্ষের সৈন্যসামন্তের অবস্থান সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন। চীনারা বলছে সেসব নির্দেশের মধ্যে দুটি বিষয়ে তাদের আপত্তি আছে, এবং সে আপত্তিকে এখনি চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে ভারতকে বলা হচ্ছে না, সেগুলি বৈঠকে আলোচ্য বিষয় হবে।

ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, উভয়পক্ষের অবস্থান সংক্রান্ত সবকটি নির্দেশ মানলেই তবে ভারত ও চীনা সরকারের মধ্যে সরাসরি আলোচনার পুনরারম্ভ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—চীনাদের যে দুটি আপত্তি আছে সেগুলিকে যদি এখন তারা একটু ছেঁটে কেটে দিতে অথবা পুরোপুরি প্রত্যাহার করতেও রাজী হয় তাহলে কি বাস্তবিক তাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে এবং অখণ্ড "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"র ভিত্তিতে চীনাদের সঙ্গে মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই কি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর হবে?

যে-দুটি বিষয়ে চীনারা আপত্তি করেছে সেদুটি যদি তারা এখন ছেড়ে দেয় তাহলে তারা একতরফা যুদ্ধবিরতির যে শর্ত আরোপ করেছিল তার কিছুটা কাটা যাবে, কিন্তু চিন্তা করে দেখতে হবে যে, যুদ্ধে বিজয়ীপক্ষ যুদ্ধবিরতির সময়ে যেসব শর্ত আরোপ করে সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের সময়ে কি সেগুলি সব বজায় রাখতে কখনো জেদ করা হয়? একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত—সবগুলি চিরকাল বজায় রাখার কথা চীনারা নিশ্চয়ই ভাবে নি কিছু ছাড়তে হবে সেজন্য কিছু হাতে রেখেই তারা কাজ করেছে।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, "কলম্বো প্রস্তাবাবলী"র ভিত্তিতে যদি কথাবার্তা শুরু হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, আলোচনা যত দিন ধরেই চলুক মীমাংসা মোটামুটি ঐ বরাবরই হবে। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনা দ্বারা শান্তিপূর্ণ পথে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে এরূপ বলাটাই আসলে একটা বিরাট ফাঁকি। কলম্বো প্রস্তাবাবলীর ভিত্তিতে মীমাংসার আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার মানেই হচ্ছে চীনারা বলপ্রয়োগের দ্বারা যা করায়ত্ত করেছে তাতে চীনাদের অধিকার স্বীকার করে নিতে অগ্রসর হওয়া। যদি এমনও হয় যে, চীনারা গত অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যেসব জায়গা দখল করে সেগুলি তারা সব ছেড়ে দেয় এবং গত ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থানই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেই কি বলা যাবে যে চীনারা বলপ্রয়োগের দ্বারা যা লাভ করেছিল তা তারা ছেড়ে দিল? নিশ্চয়ই না। কিন্তু এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে লোকের মনে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে চীনারা ৮ই সেপ্টেম্বরের অবস্থায় ফিরে গেলেই যেন তাদের কাছ থেকে তাদের যুদ্ধলব্ধ ভূমি ফেরৎ পাওয়া হয়ে যাবে। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না।

৮ই সেপ্টেম্বরের আগেই তো চীনারা ভারতের ১৪ হাজার বর্গমাইল ভূমি বলপ্রয়োগের দ্বারা 'এগ্রেশন'-এর দ্বারা দখল করে নিয়েছে এবং রেখেছে। সেই অন্যায় দখলকে পাকা করা এবং ভারতকে দিয়ে তাই স্বীকার করিয়ে নেওয়াই হয়ত চীনাদের গত শরৎকালের অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৪ হাজার বর্গমাইলের দখল পাকা করার জন্যই আরো দু-তিন হাজার বর্গমাইল এগিয়ে আসা, তারপর স্বেচ্ছায় পিছিয়ে যাওয়ার 'উদারতা' প্রদর্শন এবং 'আলোচনার দ্বারা মীমাংসার' গৌরব ও কৃতিত্ব লাভ—এইটাই কি চীনাদের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য বলে প্রকট হচ্ছে না?

ভারত সরকারের নরমভাব দেখে চীনারা বুঝতে পারছে যে এখন যদি ভারতকে কোনোরকমে আলোচনার টেবিলে আনানো যায় তাহলে এখনই একেবারে কাগজে-কলমে না হোক কার্যত ৮ই সেপ্টেম্বরের লাইনই পাকা হয়ে যাবে। অর্থাৎ আগে চীনারা ভারতের যে ১৪ হাজার বর্গমাইল ভূমি দখল করে নিয়েছে তাতে চীনাদের অধিকার ভারত মেনে নেবে। সুতরাং "কলম্বো প্রস্তাবাবলীর" যে দুটি বিষয়ে চীনারা আপত্তি প্রকাশ করছে সেগুলি তারা ছেড়ে দিতেও পারে কারণ তাতে ভারতই ফাঁদে পড়বে। আরো মজা এই যে, চীনারা যদি তাদের সেই আপত্তি প্রত্যাহার করে তাহলে তারা সেটাকে আর একটা চৈনিক "উদারতার" দৃষ্টান্ত বলে প্রচার করবে।

চীন চেয়ারম্যানের ইন্দোনেশিয়াতে, কাম্বোডিয়াতে বর্মাতে ভ্রমণান্তে যেসব যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" সম্পর্কে চীন সরকারের মনোভাব ঐসব দেশের কর্তাদের নিকট কিছুমাত্র অযৌক্তিক বোধ হচ্ছে না। বিবৃতিগুলিতে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে ভারত ও চীন অবিলম্বে বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরাসরি আলোচনা আরম্ভ করবে। চীনারা নিশ্চয়ই ঐসব দেশের কর্তাদের বুঝিয়েছেন যে শীঘ্রই ভারত ও চীনের মধ্যে ঐরূপ আলোচনা আরম্ভ হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। পিকিং-এ যে-কথা শুনে এসে শ্রীমতী [illegible] মনে হয়েছে যে ভারত ও চীনের মধ্যে কথাবার্তার পুনরারম্ভ আসন্ন সে কথার আভাস চীনের চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণকালে ছড়িয়ে এসেছেন।

এখন যদি চীন "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" সম্পর্কে তার আপত্তি দুটি খাটো করে বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে তাহলে কলম্বো-কনফারেন্সওয়ালাদের চোখে চীনের দর অনেক বেড়ে যাবে। ভারতবর্ষে সরকারী প্রচারকগণ হয়ত ভারতের কূটনৈতিক "জয়ের" প্রশস্তি গাইতে শুরু করবেন, চীন "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" স্বীকার করে নিতে বাধ্য হোল ইত্যাদি বলে বাহাদুরির চেষ্টা। কিন্তু তাতে আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ যে ভুলবে তা মনে হয় না। চীনারা সর্ববিধ ক্ষেত্রে যে প্রেস্টিজ অর্জন করেছে সেটা আমরা কূটনীতির দ্বারা কাটিয়ে নিলাম এরূপ ভ্রান্তি আমাদের মধ্যে কারো কারো মনে সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু বাইরের কারো মনে সে ভ্রান্তি আসতে পারে না। "কলম্বো প্রস্তাবাবলীর" ভিত্তিতে মীমাংসার আলোচনায় ভারত সরকারকে যোগ-দেওয়াতে পারলে চীনের স্বার্থ বা সম্মানে কোনো অংশেই আঘাত লাগবে না। তাতে হবে এই যে, "এগ্রেশন" করে চীনারা যা নিয়েছে তাও তাদের থাকবে অথচ এগ্রেশনের বদনামও থাকবে না কারণ ভারত সরকার নিজেরাই চীনাদের সেই বদনাম ঘুচিয়ে দিচ্ছেন।

চীনারা "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" পুরোপুরি মানতে রাজী না হয়ে অনেকদিন ছিল সেই সময়টুকুর মধ্যে ভারত সরকার অনায়াসে নিজেদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন। "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসাবে পণ্ডিতজী এক সময়ে বলেছিলেন যে ভারতের স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও চীনারা যদি "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" স্বীকার করে না নেয় তবে ভারতের একটা কূটনৈতিক লাভ হবে কারণ তখন পৃথিবী, বিশেষ করে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারা বুঝবেন যে চীনই অন্যায় করছে। সেই "কূটনৈতিক লাভের" চেষ্টা ভারত সরকার করলেন না কেন? বোধহয় পণ্ডিতজী দেখলেন যে, কলম্বো প্রস্তাবাবলী না মানাতেও কলম্বো কনফারেন্সওয়ালাদের মধ্যে চীনের মান কিছুমাত্র কমেনি। সুতরাং চীন "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মানল না বলে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালাদের কাছে চীনকে হেয় করার চেষ্টা বৃথা, "কূটনৈতিক লাভের" যে আশার কথা লোকসভাকে শোনানো হয়েছিল তার কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ তো ছিল। অথচ সে সুযোগ গ্রহণ করার কথা দূরে থাক ভারত সরকারের চেষ্টাই হোল—অবশ্য পরোক্ষভাবে—কেমন করে "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" মেনে নিতে চীনকে রাজী করানো যায়। নিজেদের কোনো পজিটিভ পলিসি না থাকলেই এইরকম দশা হওয়া সম্ভব।

শ্রীবিজয় পাটনায়ক নাকি দিল্লীতে ছাত্রদের এক সভায় বলেছিলেন যে, ভারতীয় সেনাপতিরা চীনা সেনাপতিদের চেয়ে নিকৃষ্ট। এই উক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপট্টনায়ক বলেন যে ঠিক ঐরকম কথা তিনি বলেননি তিনি বলেছিলেন যে রণ-কৌশলে এবং সেনাপতিত্বে চীনারা ভারতীয়দের ছাড়িয়ে গিয়েছে—ভারতীয় জেনারেলরা চীনাদের দ্বারা 'আউট-ম্যানুভার্ড' এবং 'আউট-জেনারেল্ড' হয়েছেন। তবে আমাদের জেনারেলরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে যা শেখা উচিত শিখছেন। সেনাপতিদের সম্বন্ধে এরূপ কথা বললে যদি সৈন্যবাহিনীর "মরেলের" কোনো ক্ষতি না হয়, তাহলে আমাদের সরকারী রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে যদি কেউ বলে যে তাঁরা চীনাদের দ্বারা আউট-ম্যানুভার্ড হয়েছেন তাহলে আশা করি দেশের "মরেল" নষ্ট হবে না। তবে শ্রীপট্টনায়ক বলেছেন যে, আমাদের জেনারেলরা ঠেকে শিখেছেন, কিন্তু হায়!—আমাদের সরকারী রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে সেটুকুও জোর করে বলা যায় না।

২৭-৪-৬৩

কী বিচিত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কী বিচিত্র দেশ এই, নাম বুঝি উদাত্ত ভারত,
নয় ক্রীত, শৃঙ্খলিত; চিন্তায় ও প্রকাশে স্বাধীন,
রাষ্ট্রেরে নিশ্চিন্তে নিন্দে, নির্ভয়ে জানায় মতামত
মঞ্চে পত্র-পত্রিকায়। কী আশ্চর্য, বাম ও দক্ষিণ
দু পায়েই পথ চলে; দু দিকেই দৃষ্টি যুগপৎ
মোহমুক্ত। এদের সাহিত্য দেখ নয় বাঁধিগৎ,
নয় যৌথ ইস্তাহার; ব্যক্তিত্বে প্রেরিত, সর্বাঙ্গীণ
স্বপ্নে কল্পে ও বাস্তবে; দেয় না তো স্থির দস্তখৎ
দলের দলিলে, এরা উচ্চে তুচ্ছে সমস্তজনীন,
লেখনী সখের খনি, দণ্ডেরে না করে দণ্ডবৎ,
সমকালে বাস ক'রে রাখে কিছু উত্তরকালীন॥

এখনো স্ত্রী-পুত্র মানে, কী বিষম রুগ্ন পরিহাস,
ঘর বেঁধে সব নিয়ে ঘন হয়ে একসাথে থাকে,
গরুই লাঙল টানে, মানুষেরা খায় না তো ঘাস,
স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায় ছাঁটকাটে আলাদা পোশাকে।
সীমানার পরপারে প্রেম দিয়ে নগ্ন ছবি আঁকে,
পুষ্পিত পৃথিবী মানে, মানুষেতে রেখেছে বিশ্বাস।
সত্য এ বিচিত্র দেশ, এ বিচিত্র, সত্য সেলুকাস॥

[সোভিয়েট রাশিয়ার বহু-আলোচিত তরুণ কবি ইয়েভগেনি আলেকজান্দ্রোভিচ ইয়েভতুশেঙ্কোর দুটি কবিতা]

প্রতীক্ষা

॥ ১ ॥

আমার প্রেম আসবে

ছড়িয়ে দেবে দুই বাহু, আমাকে ঘিরে ধরবে তার মধ্যে,
বুঝবে আমার ভয়গুলি, লক্ষ করবে পরিবর্তন।

অন্ধকারের স্রোতের ভেতর থেকে, রাত্রির গভীর থেকে

ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত না থেমেই

ছুটে আসবে ওপরে, ভাঙা বারান্দা আর সিঁড়ি পেরিয়ে

প্রেমে ও প্রেমের সুখে জ্বলতে জ্বলতে;

জীর্ণ সিঁড়ি ভেঙে ছুটবে, কড়াও নাড়বে না।

আমার মাথা তুলে নেবে তার দু হাতে

আর যখন সে চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলবে তার ওভারকোট

নীল স্তূপ হয়ে সেটা মেঝের খসে পড়বে।

অবাক্তা

॥ ২ ॥

এরকম চলতে পারে না
শেষ পর্যন্ত এ এক ধরনের অবিচার।
সে বছর কিভাবে এই ব্যাপারটা চালু হলো?
জীবিতের প্রতি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য
মৃতের বেপরোয়া চাষ।
তাদের কাঁধগুলি ঝুলে পড়া, মাঝে মাঝেই মাতাল হ'য়ে পড়ে
আর একে একে চ'লে যায়,
শ্মশানে বক্তারা
ইতিহাসের কাছে জবাবাব বুলি আওড়ায়।
সে বস্তুটা কী যা মায়াকভস্কির কাছ থেকে ছিনিয়ে
ফিরে গেল তার জীবন?
কী এসে তার আঙুলের ফাঁকে রাখলো বন্দুক?
যদি তার সেই কণ্ঠস্বর নিয়ে, সেই চেহারায়,
যদি কখনো এরা তাকে উপহার দিতো তার জীব
অবস্থায় সামান্য বাঁকা জমিটুকুও।

মানুষ বাঁচে। মানুষ উৎপাত করে।
অবাক্তা এক মৃত্যুপরবর্তী খেতাব।

অনুবাদ : দীপক মজুমদার

নির্ভুল হতেই হবে', এমন অদ্ভুত শর্ত যদি কেউ আরোপ করেন, তাহলে আদৌ কিছু লেখা অথবা আদৌ কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। প্রসংগত
"দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি,
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি"—
রবীন্দ্রনাথের এই পংক্তি দুটি স্মর্তব্য। এই পংক্তি দুটিই আভাস দিচ্ছে যে, দরজাটাকে সর্বদাই খোলা রাখা দরকার। না-রাখলে শুধু মিথ্যাই যে ফিরে যাবে, তা নয়, সত্যও যাবে।

ওই দরজা আসলে চিত্তের দরজা। যুক্তির চাইতে বিশ্বাসই যাদের কাছে বড়, তাদের চিত্ত-দুয়ার প্রায়ই বন্ধ থাকে। বেছে-বেছে শুধু সেই কথাগুলিকেই তারা গ্রহণ করে, যেগুলি তাদের প্রিয় কথা, অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে-সব কথা সত্য। কিন্তু সত্য যে সর্বদাই তাদের বিশ্বাসের অনুগামী হবে এমন কোনও কথা নেই। প্রায়ই হয় না। তখন কী হবে? সত্যকে কি তখন দরজা থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে? [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রসঙ্গত [illegible] কথা মনে পড়ছে যার নাম [illegible] অনায়াসেই [illegible] সেঞ্চুরি'। হলে অন্যায় হত না।

নাভানার বই

কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ	১২·০০
বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা ॥ বুদ্ধদেব বসু	৮·০০
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা	৫·০০
ঘরে-ফেরার দিন ॥ অমিয় চক্রবর্তী	৩·৫০
পালা-বদল ॥ অমিয় চক্রবর্তী	৩·০০
কঙ্কাবতী ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩·০০
শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর ॥ বুদ্ধদেব বসু	৩·০০
নরকে এক ঋতু ॥ র‍্যাঁবো। অনুবাদঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য	৩·০০

[illegible]

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় ॥ দীপ্তি ত্রিপাঠী	৭·৫০
সব-পেয়েছির-দেশে ॥ বুদ্ধদেব বসু	২·৫০
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম ॥ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়	৩·০০
পলাশির যুদ্ধ ॥ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪·০০

[illegible]

উর্বশীর তালভঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রিয়দর্শিনী	৬·০০
প্রথম প্রেম (উপন্যাস) ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪·৫০
প্রথম কদম ফুল (উপন্যাস) ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১২·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প	৫·০০
এক অঙ্গে এত রূপ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩·০০
গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) ॥ অমিয়ভূষণ মজুমদার	৮·০০
সমুদ্র-হৃদয় (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
ফরিয়াদ (উপন্যাস) ॥ দীপক চৌধুরী	৪·০০
চিবরূপা ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৩·০০
মেঘের পরে মেঘ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৭৫
বসন্তপঞ্চম ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	২·৫০
মনের ময়ূর (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·০০
মীরার দুপুর (উপন্যাস) ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৩·০০
তিন তরঙ্গ (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৪·০০
চার দেয়াল (উপন্যাস) ॥ সত্যপ্রিয় ঘোষ	৩·০০
বধূপত্নী ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	২·৫০
বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) ॥ প্রতিভা বসু	৩·৫০

[illegible]

অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধসংগ্রহ

সাম্প্রতিক

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

আওয়াজ পেলাম।

করে হিন্দুমতে হচ্ছে না। হচ্ছে গান্ধর্ব মতে। এসব কিন্তু কালীঘাটেই হয়ে থাকে।'

'সেই ভালো। বিয়ে ত?'

'হ্যাঁ, বিয়ে বইকি। তবে মন্ত্র পড়ে নয়, কপালে এক তাল সিঁদুর লেপে।'

'তা হোক গে বিয়ে হলেই হল।'

'এ ধরনের বিয়ের নিয়ম কানুন ত আমি ঠিক জানি না। কালীঘাটে খবর নেয়া যাক।'

বলে আমি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলি, 'হ্যালো...কালীঘাটের সঙ্গে কনেকসন দিন না! কালীমন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে আমি কথা কইতে চাই..হ্যালো.. হ্যালো, পুরুৎমশাই! আজ একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন? গান্ধর্ব মতে।.. হ্যাঁ, আজই।...হবে ত? কি করতে হবে বলুন ত..হ্যাঁ...হ্যাঁ.. হ্যাঁ.'

'কী, বলছে কি লোকটা?' প্রমীলা জানতে চায়।

'বলছে আগে পঞ্চগব্য খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'কেন, প্রায়শ্চিত্ত কিসের?'

'কাজিন বিয়ে করা পাপ যে? তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?'

'তোমাকেও করতে হবে?'

'আমি ত বিয়ে করতে চাইছি না করতে বাধ্য হচ্ছি। তুমিই চাইছ বিয়ে করতে—পাপটা তোমার। তোমাকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'হোক পাপ। করব প্রায়শ্চিত্ত। কী প্রায়শ্চিত্তর শুনি?'

'হ্যালো, পুরুৎমশাই। প্রায়শ্চিত্তটা কী বলুন ত? পঞ্চগব্য খেতে হবে পঞ্চগব্য? ও, বিয়ের আগেই খাওয়া চাই।..'

'পুরুৎ মশাই, হ্যালো! পঞ্চগব্যটা কী জিনিস? দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় গোমূত্র ...পরিমাণ? এক এক ছটাক। মানে, পুরুৎ মশাই তোমায় এক ছটাক করে দই দুধ ঘি গোবর আর..আরেকটা কী যেন?'

'গোবর খেতে বলছে?'

'বলছে ত! বেশি নয়, এক ছটাক মাত্র। তা দই দুধ বাতাবির সঙ্গে মিশিয়ে কোন রকমে কোঁৎ করে গিলে ফেলবে, কী হয়েছে?'

'ওয়াক্!'

'ওমা! এখনি বমি করছ যে! বমি করলে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত হবে না, তা কিন্তু বলে দিচ্ছি। হ্যালো, পুরুৎ মশাই, খেতে গিয়ে যদি বমি করে ফেলে তাহলে? আবার খেতে হবে বলছেন? দু ছটাক করে এবার? মানে আপনি বলছেন যে, আধ পো পরিমাণ গোবর?'

'কী সর্বনাশ!' আঁৎকে ওঠে প্রমীলা।

'সর্বনাশটা কী? যে বিয়ের যে মন্ত্র হ্যালো, পুরুৎ মশাই! আর কী কী করতে হবে বলুন? বিবাহের পূর্বে কন্যার মস্তক মুণ্ডন বিধেয়? মানে, উনি বলছেন বিয়ের আগে তোমায় একেবারে ন্যাড়া হতে হবে। হ্যালো কী বললেন? নতুন ক্ষুরে মাথা মুড়িয়ে আর..হ্যাঁ..বলুন... নতুন চেলি পরতে হবে? গলায় রুদ্রাক্ষ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা?'

'আমাকে ভৈরবী সাজতে হবে নাকি?'

'কালীঘাটের বিয়ে যখন ভৈরবী না হলেও, ডাকিনী যোগিনী—কিছু একটা ত হতে হবে নিশ্চয়। যাকে উচ্ছুগ্যু করে বিয়ে যখন!'

'উচ্ছুগ্যু করে আমায় বলিদান দেবে নাকি?' প্রমীলা ভারী মুষড়ে পড়ে।

'হ্যালো, পুরুৎমশাই! বেশ, তাই কথা রইল। আমি সন্ধ্যার আগেই গিয়ে হাজির হচ্ছি—কনেকে সঙ্গে নিয়ে, হ্যাঁ। লাল চেলি পরিয়ে নিয়ে যাব—হ্যাঁ। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখবেন। নতুন ক্ষুর কিনে নিয়ে যাব। নাপিত যেন তৈরি থাকে।.... নমস্কার।'

'সত্যিই মাথা ন্যাড়া করে দেবে নাকি?'

'মস্তক মুণ্ডন বিধেয়, বললো, শুনলে না। তাতে কী হয়েছে? চুল আবার গজাতে কদিন? বিয়েটাত হয়ে যাক, দেখতে দেখতে চুল গজাবে। তুমি ততক্ষণে চান টান করে খেয়ে দেয়ে তৈরি হয়ে নাও। আমি বাজারে বেরিয়ে যাই। লাল চেলি, নতুন ক্ষুর, পঞ্চগব্য সব যোগাড় করতে হবে ত। দই দুধ এসব ত পাড়ার দোকানে পাব কিন্তু গোবর এখন কোথায় পাওয়া যায়? গোবরের অভাবে ঘুঁটে খেলে হয় কি না জিজ্ঞেস করা হল না।'

আমার তৎপরতা দেখে প্রমীলা লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

'সব যোগাড়যন্ত্র করে আমি ঠিক সন্ধ্যার আগেই ফিরব। তুমি তৈরি থেকো। বিনির [illegible] দুটো ক্লাস, একটার মধ্যে সে এসে পড়বে। তার সঙ্গে [illegible] বাজারে গিয়ে যদি পছন্দসই একটা চেলি কিনতে পারো তো ভালো হয় লাল চেলি হবে।

[illegible] চেলি ত [illegible] পাওয়া যায় না। ওখানে সব [illegible] শাড়ি। চেলি টেলি মেলে [illegible] বাজারে, যেখানে [illegible] জিনিস বেচে সেই দোকানেই এ সব পাবে। ওটা যদি তোমরা দুজনে [illegible] থেকে পারো। [illegible] প্রমীলা থাকে। নতুন ক্ষুর আর গোবর যোগাড় করাতেই আমার প্রাণ যাবে। নাপিত দেখতে পেলেই ক্ষুর পাব না। তাদের কাছে সব পুরানো ক্ষুর। ক্ষুর যে কোন বাজারে পাওয়া যায় জানি না। এর গোবরের জন্য হয়ত গোরুর পিছু পিছুই ঘুরতে হবে সারাদিন কলকাতায় গোরুর অভাব নেই অবশ্য, কিন্তু কখন যে কে দয়া করবেন দয়া করে গোবর ছাড়বেন কে জানে! তবে করবই আমি যোগাড় যে করেই হোক, কিছু ভেবো না।' যথাসাধ্য আশ্বাস দিয়ে আমি বেরিয়ে যাই।

ফিরে আসি সন্ধ্যার আগেই। সিঁড়িতেই বিনির সঙ্গে দেখা.....

'কী করছে ও?' ফিসফিসিয়ে আমি শুধাই।

'প্রমীলা? সে তার [illegible] গেছে। নিজের বাসায়!'

থেকে তিনি চারটি ছত্র যোগাড় করে ইংরিজি একটি কোয়ারট্রেন 'সৃষ্টি' করেছেন, ৩) ফরাসী অনুবাদ—কখনো মূল ফার্সীর অনুবাদ অর্থাৎ ফিট্‌সজেরাল্ড যে স্বাধীনতা নিয়েছেন অনুবাদক তা নেন নি, আর কখনো বা ফিট্‌সজেরাল্ডের ইংরিজি থেকে ফরাসী অনুবাদ, ৪) জর্মন অনুবাদ—একাধিক জর্মন অনুবাদ থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং ফিট্‌সজেরাল্ডের অনুকরণ এঁরা প্রায়ই করেন নি, ৫) আরবী অনুবাদ সরাসরি ফার্সী থেকে, তবে অনেক স্থলেই স্বাধীন। অনুবাদ করেছেন এক আরব কবি যদিও তিনি জাতে ইরানী।

এ ছাড়া সংকলনে কয়েকটি মূল্যবান অবতরণিকাও একাধিক ভাষায় সংযোজিত হয়েছে। বিখ্যাত জর্মন ফার্সীবিদ্ রোজেন, ফিট্‌সজেরাল্ড, আরব পণ্ডিত আলীর অল-তুগা, ইরানী পণ্ডিত হিদায়ৎ ও সঈদ নফীসী (ইনি কয়েক বৎসর ভারতে বাস করে গেছেন) এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পড়ে খৈয়াম-প্রেমী পাঠক মাত্রই মুগ্ধ হবেন। অবশ্য ফিট্‌সজেরাল্ডের অবতরণিকা পড়া হয় 'পুরাতত্ত্ব' হিসেবে।

আমরা যখন ফরাসী বা জর্মন কোনো নূতন ভাষা শিখতে যাই তখন আমাদের হাতে দেওয়া হয় যে পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকে ঘরের আসবাবপত্রের নাম, পিতা-মাতা-ভ্রাতার প্রতিশব্দ, স্টেশন-টিকিট-প্লাট-ফর্ম, খানাপিনা, বাগানের সাজসরঞ্জামের যাবতীয় জিনিসপত্র এদের নাম, লিঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বয়স্ক পড়ুয়া এবং আমরা সচরাচর একটু বয়স হওয়ার পরেই এ-সব ভাষা শিখতে যাই—সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ মনের খোরাক...—শিখি বটে গতানুগতিক ভাবে। আমি জানি একেবারে গোড়ার থেকেই মন এবং হৃদয়ের খাদ্য দেওয়া যায় না—কিন্তু কিছুটা পরের পরেই তো মৃন্ময় বিষয়বস্তু থেকে চিন্ময়ে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়। বয়স্কদের জন্য এরকম পাঠ্যপুস্তক বিলেতে আমি দু'একখানা দেখেছি। এ-স্থলে আমার মূল বক্তব্য এই আট বছরের বাচ্চা... ফরাসী শিখতে চাইলে তার পাঠ্যপুস্তক হবে এক রকম, আঠারো বছরের ছেলের শিখতে চাইলে হবে অন্যরকম।

যাদের কিছুটা ফরাসী বা জর্মন অথবা উভয়েরই কিছুটা শেখা হয়ে গিয়েছে—আর খৈয়ামে আসক্তি থাকলে তো কথাই নেই—তাঁরা এই সংকলনটি পড়ে আনন্দ তো পাবেনই ভাষা-শিক্ষার কাজেও অনেকখানি দ্রুত এগিয়ে যাবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খৈয়ামের সব চেয়ে পরিচিত চতুষ্পদীটি নিচ্ছি:—

ফার্সীতে আছে:

অর রুস্ত বুয়দ জ্ মগজে গন্দুমে নানী
অজ্ মৈ দো মোনী জ্ গুসফন্দী রানী
ও আনগে মন ও তো নিশসস্তে দর ওয়রানী
এয়েশী বুদ ওআ আন নুহদ-ই-হর সুলতানী

Here with a Loaf of Bread
 beneath the Bough
A Flask of Wine,
 a Book of Verse—and Thou
Beside me
 singing in the Wilderness—
And Wilderness is
 Paradise enow.

Pour celui qui possede
 un morceau de bon pain,
Un gigot de mouton,
 un grand flacon de vin,
Vivre avec une belle
 au milieu des ruines,
Vaut mieux que
 d'un Empire etre le
 souverain

Wein, Brot ein gutes Buch
 der Lieder ·
Liess ich damit selbst
 unter Truemmern mich
 nieder,
Den Menschen fern,
 bei Dir allein,
Wuerd' ich gluecklicher
 als ein Koenig sein ৩

মূল ফার্সীতে আছে:

হাতে (রুটি) যদি থাকে
গমের ময়দার (মগজ) রুটি (নান)
দুই মনী (দো মনী) মদ ও
ভেড়ার একখানা ঠ্যাং (রান)
তোমাতে আমাতে যেখানে বসেছি
সেই যদি ধ্বংসাবশেষের পরিপূর্ণও হয়
(তবেও) আনন্দ (আয়েশ) যা হবে
সে সুলতানের রাজ্যের (হবে) চেয়েও
বেশী।

ইংরিজিতে দেখা যাচ্ছে ভেড়ার ঠ্যাং বাদ পড়েছে (বোধ হয় অনুবাদক এটাকে বড্ড গদ্যময় মনে করেছেন), কবিতার বই যোগ করা হয়েছে, প্রিয়ার সঙ্গীতও বাড়ানো হয়েছে। সুলতানের রাজত্বের বদলে স্বর্গ-পুরী। কিন্তু একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। প্রথম ছত্রে আছে, 'বিনীৎ দা বাও'—পরে আবার সেটাই 'উইলডারনিস' হয় কি করে? (সত্যেন দত্ত বুদ্ধিমানের মত 'বিজন' ব্যবহার করেছেন, 'উইলডারনিস' ও 'বনচ্ছায়া' দুই-ই বিজন। কান্তি ঘোষ উইলডারনিস বর্জন করে স্বচ্ছ-মুক্ত হয়েছেন)।

ফরাসীটিতে আছে ভালো রুটি, ভেড়ার ঠ্যাংও, তবে মদের পাত্রকে গ্রাঁ (grand ফরাসীতে বিরাট অর্থে) বলা হয়েছে, 'দু' মনী বাদ পড়েছে এবং ফার্সীতে যেখানে শুধু 'তুমি' আছে, সেটা ফরাসীতে সুন্দরী তরুণী (belle) হয়ে গিয়েছে। অনুবাদ মোটামুটি আক্ষরিক।

জর্মনে মদ (Wein), রুটি (Brot) আর কবিতার বই (Buch) দুম্বা বাদ পড়েছে, তার বাও নেই—আছে ফার্সীর সরল অনুবাদ 'ভগ্নাবশেষের মধ্যে' (Truemmer)।

ইরানী চিত্রকর চতুষ্পদীটি বর্ণে অলংকৃত (ইলাসট্রেট) করার সময় যুবক-যুবতীকে বসিয়েছেন ... মাঝ-খানে বিধ্বস্ত প্রাসাদের অবশিষ্ট একটি দেউড়ির কাছে। দূরের পটভূমিতে ... অবস্থা দেখা যাচ্ছে ... সুলতান বসেছেন সিংহাসনে, সম্মুখে ... কিন্তু সমস্তটাই যেন কোন ... ভাসছে।

চিত্রকর ফিট্‌সজেরাল্ডের প্রভাবে পড়ে-ছেন—নিশ্চয়। যুবক-যুবতীর সম্মুখে ... আছে, তবে সেটা বিরাট ... নয়ই এবং

বঙ্গানুবাদ:

৩ বনচ্ছায়ায় কবিতার পুঁথি
পাই যদি একখানি
পাই যদি এক পাত্র মদিরা
আর যদি তুমি রাণী
সে বিজনে মোর পার্শ্বে বসিয়া
গাহো গো মধুর গান
বিজন হইবে স্বর্গ আমার
তৃপ্ত হইবে প্রাণ

সত্যেন দত্ত

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়
মৌন ভাঙি মোর পাশেতে
গাওয়ে তব মঞ্জু সুর
সেই তো সখী স্বর্গ আমার
সেই বনানী স্বর্গপুর।

কান্তি ঘোষ

সেটি ইটালিয়ান পদ্ধতিতে খড় দিয়ে প্যাঁচানো—ইরানে সে-রেওয়াজ আছে বলে জানতুম না—কিন্তু যুবকের হাতে দিয়েছেন একখানি পুস্তিকা—ফিট্‌স্‌জেরাল্ডের ফিরিস্তি-মাফিক—তবে তরুণী সে-মাফিক গান গাইছেন না। পায়ের কাছে আমাদের খোঁয়াই-ডাঙার বনো ফুল। তেরঙা ছবি, রেজিস্ট্রেশন খারাপ।

আমাদের কৈশোর যৌবনে বহু তরুণ-তরুণী ফিট্‌সজেরাল্ডের ওমর প্রায় কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। সে রেওয়াজ এ যুগেও হয়তো সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। যেটুকু স্মরণে রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে ফরাসী জর্মন অনুবাদ পড়লে ভাষাশিক্ষা দ্রুততর হবে, পাঠক আনন্দও পাবেন। হয়তো বা তারই ফলে আমরা অনেকখানা খৈয়ামের বাঙলা অনুবাদ পাবো।

পুস্তকে পাঁচ ত্রিশটি চতুষ্পদীর জন্য পাঁচ ত্রিশখানা তিনরঙা ছবি তো আছেই তার উপর এদিক ওদিক সর্বত্র ছড়িয়ে আছে 'নক্সার কারুকর্ম' আবছা তুলিতে আঁকা নানা প্রকারের অর্ধস্ফুট চৈতন্যের স্বপ্ন-প্রকাশ—কাব্য পড়ে চিত্রকরের প্রতিক্রিয়া-রূপ। ছবিগুলি রবি বর্মা স্টাইলে আঁকা—তবে তার চেয়ে ঢের বেশি কাঁচা। একটি ব্যাপারে কিন্তু সর্বচিন্তাশীল দর্শকই সন্তুষ্ট হবেন জামাকাপড় বাড়িঘর গাছ-পালা আসবাবপত্র প্রায় সবই খাঁটি ইরানী। অবশ্য বিদেশী প্রভাব কিছুটা যে পড়েনি তা নয় তবে সে সামান্য। বিদেশী বিশেষ করে ইয়োরোপীয় চিত্রকর যেরকম নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে কিম্ভূত বসথং 'হাসজারু' তৈরী করেন তিনি তার থেকে স্বচ্ছন্দেই মুক্ত। এবং তাঁর ছবিতে যে এক নূতন পরীক্ষার প্রচেষ্টা রয়েছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই চিত্রকর ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে উপক্রমণিকায় লিখছেন:

"At the end, I hope the Patrons of art find this gift amusing, and this could be an ideal Ideas (sic) for the young artists, and the old and experience (sic) artists could forgive some of the scenes which lacking the Proper Techniques (sic). I wish they call them to my attention I 'll be most grateful"—Akbar Taividi

এ পুস্তক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু মনোরম আলোচনা করা যেত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, এটির সঙ্গে শুধু আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।*

The Quatrains of Abol'fat 'h Ghiat-e-Din Ebrahim KHAYYAM of Nishabur Published by Tahir Iran Co., "Kashani Bros", Teheran, Lalezar-Istanbul Sq.

---

* খৈয়াম ও নজরুল ইসলামকৃত তাঁর অনুবাদ নিয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

বাংলা দেশে পরিবার পরিকল্পনা অভিযান অল্পই সাফল্য লাভ করেছে। এখন বছরে শতকরা ৩·৫ হচ্ছে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির মান। সারা ভারত জোড়া হিসাবে বছরে গড়পড়তা শতকরা ২·২ হতে চলেছে গত দশ বছর ধরে। আসামের অবস্থা বাংলা দেশের চেয়েও আশঙ্কাজনক। এই যে বিরাট জনসংখ্যা বিস্ফোরণ— Population explosion নানা বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত দেশে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারা পৃথিবীর অভূতপূর্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি জগতের বহু চিন্তাশীল অর্থনৈতিক ও সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেক দিন থেকে। অনেকে তো এতদূরও বলেন যে, পৃথিবীর সব সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা ধরিত্রীমাতার সন্তানসংখ্যাবৃদ্ধি আর এ সমস্যার সমাধান না হলে জগৎজোড়া মানবসমাজের কোনও সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। সারা পৃথিবীর জনসংখ্যাবৃদ্ধির মান আজ প্রায় শতকরা দুই। আবার এই জটিল সমস্যার সবচেয়ে পরিতাপের কথা জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অনগ্রসর দেশেই বেশী —এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা। এ সব দেশে দারুণ খাদ্যাভাব, অনশনে বা অর্ধাশনে বহুলোক দিন কাটায়। বাসগৃহ যথেষ্ট নয়, শিক্ষার প্রসার কম, স্বাস্থ্যের মান আশঙ্কাজনক, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার হয় নি, অথচ এই সামান্য সম্বল বা সংগতির উপর জনসংখ্যার চাপ বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষের মত আরও কোন কোন দেশ হয়তো উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে দেশের অভাব দূর করার চেষ্টা করছে, কিন্তু যেভাবে লোক বেড়ে চলেছে তার সংগে ভারসাম্য রক্ষা করে পরিকল্পনার প্রয়াস কি সম্ভব? খাদ্য বলুন, বাসস্থান বলুন, যত-কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যতসংখ্যক লোকের জন্য উৎপাদন করা আরম্ভ হচ্ছে লোক-সংখ্যা হয়ে পড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশী। হ্যারিসন ব্রাউন তো বলেছেন, সমস্ত ল্যাটিন আমেরিকা একশ বছর পরে একটি বিরাট বস্তিতে (slum) পরিণত হবে— শহরে এবং গ্রামেও। এশিয়ার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। এ শতাব্দীর শেষে হয়তো তার জনসংখ্যা দাঁড়াবে চার শো কোটিতে। সম্বল বা জীবনধারণের উপায় সে অনুপাতে বাড়া অসম্ভব।

ভারতবর্ষে এখনও শতকরা ৭০।৭৫ জন কৃষিজীবী। মাথাপিছু হিসাব করলে গড়পড়তা একজন কৃষক পায় এক একর বা তিন বিঘার মত জমি। জমির উর্বরতার অভাব, অনেক ক্ষেত্রেই অনুন্নত চাষ প্রণালী, সব মিলে জমির থেকে খাদ্য উৎপন্ন হয় অপেক্ষাকৃত কম। আজ আমাদের দেশের প্রত্যেক অধিবাসীকে-সম্যক পুষ্টিকর খাবার দিতে হলে খাদ্য উৎপন্ন হওয়া দরকার; যা হচ্ছে তার দ্বিগুণ। কিন্তু ভারতের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে খাদ্য উৎপাদন সমান তালে চলতে পারছে না। এমন কি বস্ত্র শিল্পের প্রসার ও জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট বাড়াতে পারছে না।

এদিকে ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ুবৃদ্ধি হয়েছে। সুখের কথা সন্দেহ নেই। কয়েক বছর আগেও আমরা জানতাম দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ু মাত্র ২৩ বছর। তারপর সেটা ৩৫ হয়েছিল। সর্বশেষে আদমসুমারির হিসাবে এখন প্রায় ৪২ বছর। তাও বিশেষজ্ঞরা বলেন, শিশুমৃত্যুর হার বেশী বলে গড়পড়তা হিসাব ৪২ না হয়ে আরও অনেক বেশী হত। কিন্তু আয়ুবৃদ্ধির সংগে জন্ম সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। না হলে এ ভার সহ্য করার শক্তি আমাদের কোথায়?

কিছুদিন আগে পর্যন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণে সম্বন্ধে রক্ষণশীল সমাজের আপত্তি ছিল অনেক। জন্মনিয়ন্ত্রণের সংগে sex-এর একটা যোগ থাকায় আলাপ-আলোচনাও লজ্জাকর মনে করা হতো। স্বাস্থ্যহীন, পুষ্টিহীন

শ্রীমতী আরতি দত্তর উদ্যোগে আয়োজিত বাঁকুড়া জেলার ও-না গ্রামে পরিবার-পরিকল্পনা শিবির

দুর্ভিক্ষ্য নিপীড়িত সংসারে শিশুর জন্ম দিতে পিতামাতা কুণ্ঠিত হতেন না, কিন্তু পরিবারের, দশের বা দেশের সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য নারীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনায় ছিল কঠিন নিষেধ। এ নিষেধের পরিণামে সমাজে যে কতদিকে কত বিষময় ফল ফলেছে তার হিসাব নেই। আমরা এতদিন সংস্কার বশে সে পরিণাম সব উপেক্ষা করে চলে এসেছি। তবে সুখের বিষয় এখন সে অবস্থা অনেকটা কেটে গেছে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি জগতের ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠতে পারে, একথা স্বীকার করতে পাশ্চাত্ত্য দেশেরও বহু সময় লেগেছিল। আজও কোনও কোনও ধর্ম বা রাজনৈতিক মতবাদে আপত্তির কথা শোনা যায়। এমন কি এ প্রান্তে চীন যে লোকসংখ্যার ভারে বিপর্যস্ত, যার হিংসাবৃত্তির একটি প্রধান কারণ লোকসংখ্যার চাপ সেও কমিউনিস্ট মতবাদের ধুয়া ধরে বলে জনসংখ্যাবৃদ্ধি তাদের পক্ষে অমঙ্গল নয়। চীনের ভাষায় শান্তির প্রতিশব্দ 'হো পিং' মানে 'সকলের জন্য খাদ্য'। আজ তাদের অশান্ত হিংস্র মনোভাবের কারণ কি তবে খাদ্যের অভাব

প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ধর্মযাজক অর্থনীতিক ম্যালথাস (Malthus) ইংলণ্ডে বলেছিলেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতিরোধ করতে হবে, না হলে মানুষের ভরণ পোষণের যত উপায় আছে তার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে মানুষের সংখ্যা। তখন এ কথা নিয়ে আপত্তির উচ্চ কণ্ঠ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য তখনও অনেকে উইলিয়াম পিট প্রভৃতি মনীষী ম্যালথাসের কথার সত্যতা উপলব্ধি করেন। তবে ঠিক এই সময়েই ইউরোপে যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও নূতন নূতন দেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগে জনসংখ্যা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও হয় নি। ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণীও তখনকার মত চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু গত শতাব্দী ধরে বিশ্বমানব পরিবার বৃদ্ধি এমনই এক বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এ দিকে আবার নূতন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন কৃষি প্রধান দেশে যেখানে খাদ্য শর্করাপ্রধান সেখানে জন্মসংখ্যা বেশী হয়। আয়ার্ল্যান্ডের কথাই

[illegible] আমরা।
তুমি বুঝি মহাবীর।
ছেলেটি নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, ইয়ার, তুমি কিছুই জানো না দেখছি। আমি কেন মহাবীর হতে যাবো।
তবে মহাবীর কে?
ছেলেটি এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ মহানিম গাছটার উঁচু এক ডালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে—ঐ দেখো মহাবীরজী।
জীবন দেখতে পায় মস্ত একটা হনুমান, বলে, ওটা তো হনুমান।
ছেলেটি বলে, যে হনুমানজী সেই মহাবীরজী, যো আত্মা সো পরমাত্মা।
জীবন বলে, মহাবীর তো বুঝলাম, আর পল্টন।
ছেলেটি সগর্বে বলে, আমি পল্টন।
তুমি একাই পল্টন। তবে এরা কারা?
আরে ইয়ার, আমি একা থাকি কিম্বা দলবল নিয়ে থাকি আমি সর্বদাই পল্টন, কারণ ওটাই আমার নাম।
চমৎকার। তা মহাবীর পল্টন করে কি, লড়াই করে নাকি?
তুমি কিছুই জানো না দেখছি। মহাবীর লড়বে কার সঙ্গে? একবার রামজীর হয়ে রাবণের সঙ্গে লড়াই করেছিল, তেমন বীর আর একালে কোথায়?
ছেলেটির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমৎকৃত হয় জানলাম। শুধোয়, তাহলে মহাবীর পল্টন এখন করে কী?
মহাবীরজী যা করে মহাবীর পল্টনও তাই করে।
মহাবীর তো সেকালে রামচন্দ্রের হয়ে লড়াই করেছিল বলে এখন পেনশন ভোগ করছে, এর ওর জিনিস কেড়ে খায়।
ছেলেটি হঠাৎ জীবনের পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলে, বাহবা, ইয়ার, ইয়ার। ঠিক সমঝা। মহাবীর পল্টনও ঐ কাজ করে।
জীবনের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সিপাহীদের মতো।
আর ঐ গাঁওয়ার আদমিরা সঙীনের খোঁচা মেরে কেড়ে খায়।
আর তোমরা?
জানতে চাও? এই বলে সে জোরে চাঁটি মেরে দলবলের উদ্দেশ্যে বল উঠল—ভাইসব, একবার এই রাহী আদমিকে দেখিয়ে দাও তো মহাবীর পল্টন কিভাবে কেড়ে খায়।
তখন একযোগে ঢোল করতাল ভেঁপু বেজে উঠল, আর পল্টনকে অনুসরণ করে সবাই গান ধরলো—

> ক্ষীর চমচম মালাইকারি
> যার দোকানে যা পাই কাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কিশোর বাহিনীর উদ্দাম নৃত্য।
কিছুক্ষণ পরে গান থামলে পল্টন শুধালো, এবার তো দেখলে আমরা কিভাবে কেড়ে খাই।
তারপরে ওর পিঠ চাপড়িয়ে দিয়ে বলে, সেরাদার, সঙীনের গুঁতোয় লোক পালায় আর আমাদের গান শুনে [illegible] হয়।
চমৎকার, বলে ওঠে জীবন, তা এমন সুন্দর গানটা বাঁধলো কে? মহাবীরজী তো গান বাঁধতে [illegible] না।
মহাবীরজী বাঁধতে যাবে কেন? এ গান বেঁধে দিয়েছে সরাব মিঞা।
সরাব মিঞা? বেড়ে নাম তো, লোকটা বুঝি খুব সরাব খায়।
আরে ইয়ার, এ শহর শাহজাহানাবাদে সরাব কে না খায়? কিন্তু এমন গান বাঁধতে পারে কয়জনে?
তারপরে হঠাৎ জীবনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, মুখ শুকনো কেন? খাওয়া হয়নি বুঝি?
জীবন বলে, আমি তো মহাবীর পল্টন নই যে গান শুনলে দোকানী খেতে দেবে।
পয়সা দিয়ে কিনে খেতে বাধা কি?
জীবন স্বীকারোক্তি করে, টাকা পয়সা সব খোয়া গিয়েছে।
এবারে পল্টন আপন মনে মুণ্ডির মাথা নাড়ে, বলে, রাহী আদমি, পথে আসতে রাহাজানি করে সব কেড়ে নিয়েছে। কেমন?
ঠিক ধরেছ তাই।
সিপাহী না গাঁওয়ার আদমি?
কেমন করে বুঝবো বলো! পোশাক

তা হলে ... বেগম ... ফিরে এসেছ?

আত্মগোপন করবার উদ্দেশ্যে জীবন বলে, কাঁসি থেকে?

এখন শাহাজানাবাদে গদর (অশান্তি) চলছে। এখানে আসতে গেলে কেন?

গদর চলছে বলেই তো এলাম। এখানে আমার এক বহিন থাকে, তারই খোঁজ নেবার জন্য এসেছি।

কি তোমার বহিনের নাম, শুনি।

ভাই আমার বহিন তো বড় লোক নয়, তার নাম বললে কি তোমরা চিনতে পারবে?

ভাই, তবে তুমি মহাবীর পল্টনকে চিনতে পারো নি। এ শহরে কার ঘরে কোন্ দিন কি রসুই হয় তা পর্যন্ত জানে মহাবীর পল্টন।

তারপরে সে নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বলল, লোকটা বলে কিরে! আমরা কার খোঁজ না জানি? ইমানী বেগম থেকে শুরু করে উমরা বেগম, খুরশিদ জান, তুলসীবাঈ, রুমালী বহিন কাকে না জানি? আর রাস্তা থেকে সেই আধমরা ফিরিঙ্গি মেয়েটাকে তুলে এনে রুমালী দিদির জিম্মা করে দিয়েছিল কে? আমরা কি না জানি? কাকে না জানি?

জীবন বলে ওঠে, রুমালীকে জানো নাকি?

শোন কথা একবার! রুমালী যে আমাদের দিদি হয়।

তোমাদের দিদি হয়! রুমালী যে আমার বহিন!

উল্লাসের সঙ্গে, বিস্ময়ের সঙ্গে পল্টন বলে ওঠে, তা এতক্ষণ বলোনি কেন ইয়ার। ... বলে দিলাম। রুমালী যে আমাদের দিদি।

জীবনও বিস্ময়ে বলে ওঠে, তোমাদের সকলেরই দিদি! বলো কি!

ক্ষতি কি? রুমালী যে আমাদের কহানা (পাতানো) দিদি!

তাই বলো, আপন দিদি নয়!

পল্টন বলে, আপন দিদির চেয়ে কহানা দিদির ঝাঁজ বেশি। হাতের চেয়ে হাতুড়ির আঘাতে জোর অনেক বেশি।

তারপরে দলবলের দিকে তাকিয়ে বলে, ওরে এই সাহেব রুমালী দিদির ভাই।

এতক্ষণ সবাই উদাসীন ছিল এবারে সকলে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নেয় জীবনকে।

তখন পল্টন বলে, ওকে দেখলে কি ওর পেট ভরবে? সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি, আর একবার গানটা ধর।

অমনি আবার ঢোল করতাল বেজে উঠে গান শুরু হয়—

ক্ষীর চমচম মালাইকারি
যাব দোকানে যা পাই কাড়ি।

পল্টন বলে, ওঠো দাদা।

কোথায় যেতে হবে ভাই?

চলোই না।

মহাবীর পল্টনের পিছু পিছু জীবন চলতে থাকে। কিছুক্ষণ চলবার পরে বেগমবাগের পশ্চিমে এক গলির মধ্যে এক হালুইকরের দোকানে সকলে থামে।

পল্টন ডাকে, এ ঘণ্টেওয়ালা ভাই, এ ভাই ঘণ্টেওয়ালা—

কি পল্টন সাহেব, খবর কি? বলে বেরিয়ে আসে মস্ত একজোড়া গোঁফওয়ালা আধবুড়ো একটা লোক।

আমাদের ... দাও তো।

—হালুইকর ... আসুন সাহেব, ভিতরে ...

জীবন পল্টনের উদ্দেশ্যে ... দেবে তো? না ... ?

তোমার তাতে দরকার কি ... পেয়েছ খেয়ে নাও। তোমাকে না ... নিয়ে গেলে রুমালী দিদি ... দেবে।

জীবন দেখে তর্ক বৃথা, তা ছাড়া খিদেটাও জোর পেয়েছে। হালুইকরকে অনুসরণ করে সে দোকানে ঢুকে পড়ে। বাইরে চলতে থাকে গান, ক্ষীর চমচম মালাইকারি।

জীবনকে একখানা জলচৌকির উপরে বসিয়ে এক লোটা জল রেখে হালুইকর বলে, সাহেব হাতমুখ ধুয়ে নিন।

তার হাতমুখ ধোয়া হলে শালপাতায় বরফি, পেড়া, কালাকন্দ, সামোসা প্রভৃতি অনেক রকম মিঠাই সাজিয়ে বলে, সাহেব পেট ভরে খেয়ে নিন।

খেতে খেতে জীবন বলে, সাহেব, এ যে জুলুম হচ্ছে।

হালুইকর বলে, কিছু না। ঐ মহাবীর পল্টন না থাকলে আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে জয়পুরের দিকে ফিরে যেতে হতো।

তারপরে ব্যাখ্যাচ্ছলে বলে, জয়পুরে আমার ঘর।

জয়পুর শহরে, শুধায় জীবন।

হাঁ সাহেব, খাস জয়পুর শহরে।

তা ব্যবসা বন্ধ করতে হতো কেন?

ঐ শালা সিপাহী লোকদের জন্যে ... তখন এসে হামলা করে ... বাদশার হুকুম, কখনো বলে, ...

জীবনের মনে পড়ে পাঞ্জাব মুখে যখন খাঁর মারাটা শুনেছিল বটে. শুনেছিল যে, সে দিল্লী রওনা হয়েছে। তবে সত্যসত্যই লোকটা দিল্লী এসে পৌঁচেছে দেখছি।

আর শাহাজাদারা?

তাদের বড় কেউ মানে না। তাদের না আছে ফৌজ, না আছে টাকা। কেন মানবে বলুন?

তা বটে, মন্তব্য করে জীবন।

হাত-মুখ ধুয়ে উঠে পড়ে জীবন। হাসানুইকর বলে, আপনি যখন মহাবীর পল্টনের দোস্ত, তখন আমারও দোস্ত। যখন ভুখ লাগবে চলে আসবেন।

এমনভাবে কতদিন চলবে আপনার ব্যবসা, শুধোয় জীবন।

আর বেশিদিন এভাবে চালাবার দরকার হবে না। এর মধ্যেই বড় বদলনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

কেমন?

অনেক সিপাহী এর মধ্যেই ভাগতে শুরু করেছে।

কেন?

না ভাগবে কেন? না পায় দরমাহা, না পায় খোরাক, আর একবার কোম্পানীর ফৌজ ঢুকে পড়লে মরতে মরবে তারাই।

তবে এখন আছে কারা?

যাদের এ-পার ও-পার সমান পানি। লড়াই করলে কোম্পানীর গোলাতে মরবে, আবার পালালেও কোম্পানীর ফাঁসিকাঠে মরবে। তারাই আছে। আমি বুড়ো তো অন্ত বুড়ো। খারাপ কাজের ফলটাও খারাপ। কি বলেন, সাহেব।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বলে জীবন।

কি ভাই হ'ল? বাইরে থেকে হাঁক দেয় পল্টন।

বাইরে এসে দাঁড়ায় জীবনলাল।

কি পেট ভরেছে তো?

উত্তরের অপেক্ষা না করে পল্টন বলে ওঠে, ভরতেই হবে পেট, পেড়াতে যদি না ভরে ওর গালের রুপার কিম্মতে ভরতেই হবে।

জীবন হেসে ওঠে। সেটাকে মস্ত প্রশংসা মনে করে দেয় মধ্যেম লাল—সে-ও হেসে ওঠে। তার গালের উপরে মিরি-গোবর্ধনের ... থাকে অক্তিন্দটা।

... এবার পেঁচিয়ে দিয়ে জানি ... বসিয়েছে কোঠিতে। এর পরে ... সিপাহীকে খবরে কি ... ।

... গলি পেরিয়ে মহাবীর ... সেই সঙ্গে জীবন চৌরাহার ... এসে পড়ে। এবারে সকলে ঢুকে পড়ে খুব সরু একটা গলির মধ্যে। এক জায়গায় এসে সকলে দাঁড়ায়। তারপরে খুব সরু আর খুব খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পল্টন ওঠে, সঙ্গে নেয় জীবনকে, বাকি সকলে অপেক্ষা করে নীচে। বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে পল্টন ও জীবন পৌঁছয় এক বন্ধ দরজার সম্মুখে। দরজায় ধাক্কা দিয়ে পল্টন চিৎকার করে বলে, রুমালী দিদি, বাইরে এসো, দেখো কাকে এনেছি সঙ্গে।

॥ ২ ॥

নিশীথ চিন্তা

দরজায় শব্দ শুনে রুমালী বেরিয়ে আসতেই পল্টন বলে উঠল, দেখো বহিন, কাকে নিয়ে এসেছি। তোমার ভাই বেওয়ারিশ মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দেখেই বুঝলাম যে, রাহী আদমি, শুধিয়ে জানলাম যে, তোমার ভাই, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

পল্টনের ঐ এক স্বভাব, যা বলবে, তার

... হাঁ, ... এখন থাক তো, ...

রুমালী ও জীবন ...

এখন দাদা আর বহিনের ... করে নেওয়াটাই কর্তব্য।

রুমালী বলল, দাদা হঠাৎ ... এলে যে!

জীবন বলে, আরে সেই জন্যেই ... পড়েছি, তুমি যে এর মধ্যে বাড়ি বদলেছ, তা কেমন করে জানবো?

বাড়ি কি আর ইচ্ছা করে বদলেছি? হাঁ, বাবা আর ভাই গত হওয়ার পরে সে খবর তো আগেই পেয়েছ, সিপাহীরা বাড়িটাও জবরদখল করে নিল তখন উঠে এলাম এই বাড়িটাতে। তারপরে তোমার সব ভালো তো?

জীবন বলে, এই শহরের দিনে কার খবর ভালো?

এবারে রুমালী বলে ওঠে, আগে হাত-পা ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপরে ধীরে-সুস্থে সব খবর দেওয়া যাবে।

সুযোগ পেয়ে পল্টন ... করে ওঠে, এতক্ষণ কথা কইবার সুযোগ ... ... করছিল। দিদি, কি ভাবো তুমি পল্টনকে, তোমার দাদাকে না খাইয়ে নিয়ে এসেছি,

ভাবতে পারলে। মহাবীর পল্টন আছে কি করছে?

তা কি আর জানিনে! পল্কের দোকানে গিয়ে হামলা করছে। কি দাদা, ক্ষীর, চমচম, মালাইকারি খেয়েছ তো?

না খেয়ে উপায় কি? ঘণ্টেওয়ালা ছাড়ে না।

ঘণ্টেওয়ালার দোকানে তোমাকে বুঝি নিয়ে গিয়েছিল? তা হলে নিশ্চয় তার বাপের দশার কাহিনীও শুনেছ?

শুনেছি বইকি। লোকটা গল্পও যেমন বলতে পারে, খাওয়াতেও পারে তেমনি। খুব খাইয়েছে। এখন বহিন তুমি একখানা চারপাই দাও, শুয়ে পড়ি, রাতে আর কিছু খাবো না।

একটু দাঁড়াও, আগে পল্টনকে বিদায় করে আসি।

তখন পল্টন আর রূমালী সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়ালো, জীবনের কাছ থেকে সামান্য দূরে। তারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলতে লাগলো, জীবন অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা একটা করে তারা ফুটে ওঠা লক্ষ্য করছিল, এমন সময়ে তার কানে প্রবেশ করল কয়েকটা পূর্বশ্রুত নাম, কুলিজ খাঁ, ঘউস মহম্মদ। জীবন সচেতন হয়ে ওঠে, ওরা তো বাদশার পক্ষের লোক, কিম্বা ঘণ্টেওয়ালার কথা সত্য হলে ওরাই এখন বাদশা পক্ষ। ওদের নাম এদের মুখে কেন? তবে কি তলে তলে যোগাযোগ আছে —তলে তলে এমন কোন সূত্র আছে যা জীবনের সম্মুখে প্রকাশযোগ্য নয়। অবশেষে জীবন কি একটা ফাঁদের মধ্যে পা দিল? রূমালী ও পল্টনের সঙ্গে তার কতক্ষণেরই বা পরিচয়, কতটুকুই বা সে জানে তাদের কিন্তু যখনি আবার মনে পড়ে, রূমালী ও পল্টনের সরল প্রসন্ন মুখ, দুর্যোগের কুয়াশা দূর হয়ে যায়। তবে, তবু, শত্রুপক্ষের ঐ দুই প্রধান সেনাপতির নাম কেন এদের মুখে?

আজকের মতো চলি জীওনলালজী, সেলাম।

ইতিমধ্যে পল্টন ভাইয়ের নামটা জেনে নিয়েছে বহিনের কাছ থেকে।

পল্টনের কথায় চমকে ওঠে জীবন, সেলাম, পল্টন, কাল কখন আসছ?

এই তো মুশকিলে ফেললে সাহেব। কালকেই যে আসবো আর আজ শেষ রাতে যে আসবো না, তা-ই বা কে বলল।

জীবন আর বেশি খোঁচায় না, পল্টনের সব কথাই রহস্যময়, সব কথাই অফুরন্ত, তাই সংক্ষেপে বলল, আচ্ছা, আজকের মতো এসো।

রামতীর্থ ব্রাহ্মী অয়েল

(পেটেন্ট নং ১) (রেজিস্টার্ড)

মাথাধরা ও চুল ওঠা নিরোধে একটি অমূল্য হেয়ার টনিক। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে, দৈহিক উন্নতি সাধন করে ও গভীর নিদ্রা আনিয়া দেয় এমন বহু মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় এই তৈল প্রস্তুত হয়। অঙ্গ সংবাহনের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী দ্রব্য। সকল ঋতুতে প্রত্যেকের পক্ষেই এই তৈল প্রয়োজনীয়। সর্বত্র পাওয়া যায়।

যোগাসন চার্ট

শ্রীরামতীর্থ যোগাশ্রম

দাদর, সেন্ট্রাল রেলওয়ে, বোম্বাই-১৪, ফোন: ৬২৮৯১

টেলি: "প্রাণায়াম", দাদর, বোম্বাই

কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করতে

রেজিঃ ট্রেড মার্ক

নতুন আরও উন্নত ধরণের ভ্যাকুলাক্স আপনার পেট পরিষ্কার করবে। পরিবারের সকলেই ব্যবহার করতে পারে।

ভ্যাকুলাক্স সুস্বাদু জোলাপ।

পল্টন চলে গেলে এবারে ভাই-বোনের বদলে জীবনলাল আর রূমালীতে কথাবার্তা শুরু হয়। রূমালী জানায় যে লড়াই শুরু হতেই সে সোজা মাঠ পেরিয়ে কাবুল দরজা দিয়ে শহরে চলে আসে, আর তার ধারণা হয়েছিল, জীবনলাল আজ আসতে পারবে না কারণ ঠিকানাটাও ভালো করে বলে আসা হয়নি। রূমালী জানায় যে সে ভেবেছিল, আবার [illegible] গিয়ে ঠিকানা জানিয়ে নিয়ে আসতে হবে জীবনকে।

জীবন বলল, লড়াইয়ের গতিক অন্যরকম হলে আজকে হয়তো আর আসা হতো না, কিন্তু তার [illegible] ছুটিতে এসে পড়ল [illegible] তখন ফিরে যেতে গেলেই কোম্পানীর সৈন্য বলে [illegible] গুলি ছোঁড়ে। তাই [illegible] সে তাকে পাকড়াও করল, যেন সে [illegible] সিপাহী। তারপরে সে জানায়, রূমালী আর তো পারছি না, একখানা চারপাই দাও, শুয়ে পড়ি।

রূমালী বলল, ভিতরে চলো। তুমি সম্মুখের এই ঘরটায় শোও, পিছনের ঐ ঘরটায় আমরা তিনজনে থাকি।

তিনজন আবার এলো কোত্থেকে? কথাটা বলে ফেলেই ভুল বুঝতে পারে জীবন। বলে ওঃ, তুমি, মিস এলমিরন আর তুলসীবাঈ।

মেয়ের নামটা বলল কে?

কেন, তোমার পল্টন ভাই।

তারপরে বলে, ও আরো অনেক গল্প শুনিয়েছে, খুরশিদ জান, উমরা বেগম, টমালী বেগম, নবাব মির্জা, এমন কত কি।

অনেক ইতিহাস শুনেছে দেখছি।

ইতিহাস এবং ভূগোল। [illegible]

এই বলে একরকম জোর করে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিয়ে তুলসীকে নিয়ে রত্নমালী ভিতরে চলে গেল।

সে রাত্রে ঘুম আসে না রত্নমালীর ঘুম আসে না তুলসীর ঘুম আসে না জীবনলালের।

রত্নমালীর ভালো লাগে না তুলসী আর জীবনের মধ্যে কথোপকথনের ভাবটা। অর্থাৎ কথোপকথনটা নয়, তার ভাবটা। কথাগুলো নিতান্তই লঘু, আর নির্দোষ কিন্তু তার ভাবটা কেমন যেন। সেগুলো যেন হৃদয়ের তপ্ত বালু খোলায় ভাজা। সেই জন্যেই লঘু, নির্দোষ খই এর মতো। সে ভাবে, হোক হাল্কা, হোক নির্দোষ, তবু ওরা পেয়েছে হৃদয়ের তাপের স্পর্শ, নইলে এমনভাবে অনায়াসে উচ্ছ্বাসে ফুটে উঠতে পারতো কি। এই স্বল্পায়ত জীবনে অনেক রকম কথা সে শুনেছে, বলেওছে অনেক রকম কথা, তাদের অনেকগুলোই শিষ্ট সমাজে উচ্চার্য নয়। দেহ সম্বন্ধেও

[illegible] চমকে দিত [illegible] এসেছে তার জীবনে, তা নিঃশব্দে [illegible] ‑য়ে যাবে মৃত্যুর ঠাণ্ডা কনকনে হাতছানিতে। শৈশব ও কৈশোরের উপান্তকালের কয়েকটি মুক্তোর মতো চকচকে দিনগুলোর স্মৃতি ছাড়া তার যেন এখন আর কিছুই সম্বল নেই, কিছুই সম্বল থাকবে না।

কিন্তু ঘুম কোথায়?

গাঢ় স্তব্ধতা যেন ঢেউ-এর মতো ভেসে ভেসে বেড়ায় সারা ঘরটায়। এক দেয়াল থেকে ধাক্কা মেরে ফিরে যায় অন্য দেয়ালে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের সারা শরীরে বুলিয়ে দেয় একটুকরো বরফের কনকনে ছোঁয়া। এই গাঢ় নিস্তব্ধতা জন্ম নিয়েছে শুধুমাত্র এই ঘরটাতেই। বাইরের মৌনতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, নেই কোন সংযোগ।

বিলাসের মনে হয়, সে যেন মাটির ছ'ফুট নীচে দাঁড়িয়ে আছে। এপাশে, ওপাশে মাথার ওপরে পায়ের নীচে শুধু বরফ আর বরফ।

সারা দেহ কেঁপে ওঠে বিলাসের। এই কাঁপুনি সে বহুবার অনুভব করেছে। দিনের কর্মব্যস্ততায়, রাত্রির স্বপ্নে। বহুবার মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙ্গে সে বিছানায় উঠে বসেছে। সারা শরীর শিউরে উঠেছে স্বপ্নের কথা ভেবে। স্বপ্ন দেখেছে একগাদা বরফের মানুষ তার ঘরে এসে জড়ো হয়েছে। টেবিলের পাশে, বুককেসের ধারে, কর্নার ল্যাম্পশেড আর দেয়ালের ফাঁকটায়, টেবিলের ওপর, ঘরের চারটে কোণে—শুধু চাপচাপ-বাঁধা তুষারের মানুষ, স্যাণ্টাক্লসের মত। সকলেই ওর দিকে চেয়ে আছে। শুধু চেয়ে আছে। ঠাণ্ডা আর কনকনে সব চাউনি।। বিলাসের সারা দেহটা হিমে নীল হয়ে গেছে। সে উঠে পড়েছে। বিছানা ছেড়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে ল্যাণ্ডিং-এ চটি আর ড্রেসিং-গাউন না পরেই। সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নামতে আরম্ভ করেছে শুধু পাজামায়। টাল সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়ে উলটে পড়েছে। তার-পর ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

কিন্তু এখন ঘুম কোথায়?

সমস্ত আত্মসংযমকে জড়ো করে বিলাস তাকায় ঘড়িটার দিকে। [illegible] জমাট অন্ধকার: ঘড়ি আছে, কিন্তু কাঁটা নেই। কাঁটাহীন ঘড়িটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে হাতটা আস্তে আস্তে কানের কাছে এনে ঘড়ির আওয়াজটা শোনবার চেষ্টা করে বিলাস। থপ থপ থপ। বিলাস চমকে ওঠে, আর যেন পায়ের আওয়াজ। কাঠের মেঝের ওপর দ্রুত আর থামানো পদধ্বনি। [illegible] জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখনি [illegible] সাহসও তার যেন হঠাৎ হারিয়ে [illegible]—নিজের পায়ের আওয়াজ শোনার ভয়ে। [illegible] মানসিক প্রতিক্রিয়া [illegible] ওঠে। [illegible] মাথার মধ্যে। [illegible]

[illegible] খুব জেগে। দরজাটা খোলাই থাকে পেছনে। হাঁটতে শুরু করে ল্যাণ্ডিং-এ। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

সিঁড়ির গোড়ায় কিসের যেন একটা ছায়া। না, ছায়া নয়। মূর্তি। একটা মানুষের মূর্তি। একটা জীবন্ত মানুষ সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসছে। মাথায় একগাদা চুল। হ্যাঁ, মানুষ। মেয়েমানুষ।

"হ্যালো, বিলু!"

কে যেন এক গেলাস ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ে দেয় বিলাসের মুখের ওপর। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সে মেয়েটার দিকে। মুখটা যেন কোথায় দেখেছে আগে। লম্বা চুল খড়ের রং-এর মত। কপালের ওপর ছোট্ট একটু ফ্রিঞ্জ। চোখ দুটো দেখতে দেখতে তার মনে হয় মাথার ভেতর আওয়াজটা যেন হমকা খেয়ে থেমে গেছে মেয়েটার গলার আওয়াজ শুনে। চিনতে পারে মেয়েটাকে সে। সোনিয়া পাশের ঘরে থাকে।

'হ্যালো সোনিয়া!' বিলাসের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে মরা একটা স্বর, যে স্বরকে কাটা যায় একটা ভোঁতা ছুরি দিয়ে।

"আজকে বুঝি সমাধি হল?" সোনিয়া একেবারে কাছাকাছি এসে গেছে। বিলাস ঘাড় নাড়ে।

"আমি সত্যই খুব দুঃখিত।" সোনিয়া আবার বলে।

বিলাস ভেবে পায় না কি বলবে। কয়েক-দিন আগেও হয়ত সে অনেক কিছুই বলতে পারত। কথার উত্তরে উপযুক্ত কথা বলতে তার কোনকালেই অসুবিধে হয়নি। প্রায় দশদিন আগে এমনিভাবে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা অনেক বিষয়ে অনেক কথাই বলেছিল।

বিলাস কিছু বলতে পারে না। শুধু তাকিয়ে থাকে মেয়েটার মুখের দিকে।

'কোথাও যাচ্ছো নাকি?' সোনিয়া জিজ্ঞেস করে।

বিলাসের খেয়াল হয়, বলে "বাইরে যাচ্ছি।"

"এত রাতে?"

বিলাস উত্তর দিতে পারে না। সোনিয়া তার একটা হাত ধরে একধাপ সিঁড়ি উঠে বলে—"চলো আমার ঘরে। এক কাপ কফি কিংবা একটু ওয়াইন খেলে নিশ্চয়ই একটু মনস্থির হবে। এত রাতে শুধু শুধু রাস্তায় ঘোরা ভালো না—বিশেষত বিদেশী ছাত্রের পক্ষে। পুলিস পিছু নেবে।"

বিলাস কোন উত্তর না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। তারা একসাথে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে। চাবি দিয়ে দরজা খুলে সোনিয়া বলে—"ঘরের অবস্থা দেখে যেন হেসো না। সময়ই পাই না পরিষ্কার করতে। [illegible]"

[illegible] খুলে [illegible] একটা [illegible] টেবিল [illegible]—[illegible]"

বিলাস বসে পড়ে [illegible] সোনিয়া আর একটা টুল [illegible] বিলাসের মুখোমুখি।

"কোটটা খুলেছো না কেন?" সোনিয়া জিজ্ঞেস করে।

বিলাস কোট খুলে সোনিয়ার হাতে দেয়। সোনিয়া ওটা ঝুলিয়ে আলমারির থেকে একটা বোতল আর দুটো গেলাস মেঝের ওপর রেখে আবার টুলে বসে পড়ে। বোতলটা এক হাতে তুলে অন্য হাতে ছিপি খুলতে খুলতে বলে—"লাক্রিমা ক্রিস্তি—দি টিয়ারস্ অফ্ ক্রাইস্ট।"

out of this powder box
comes the softest look
you've ever
worn
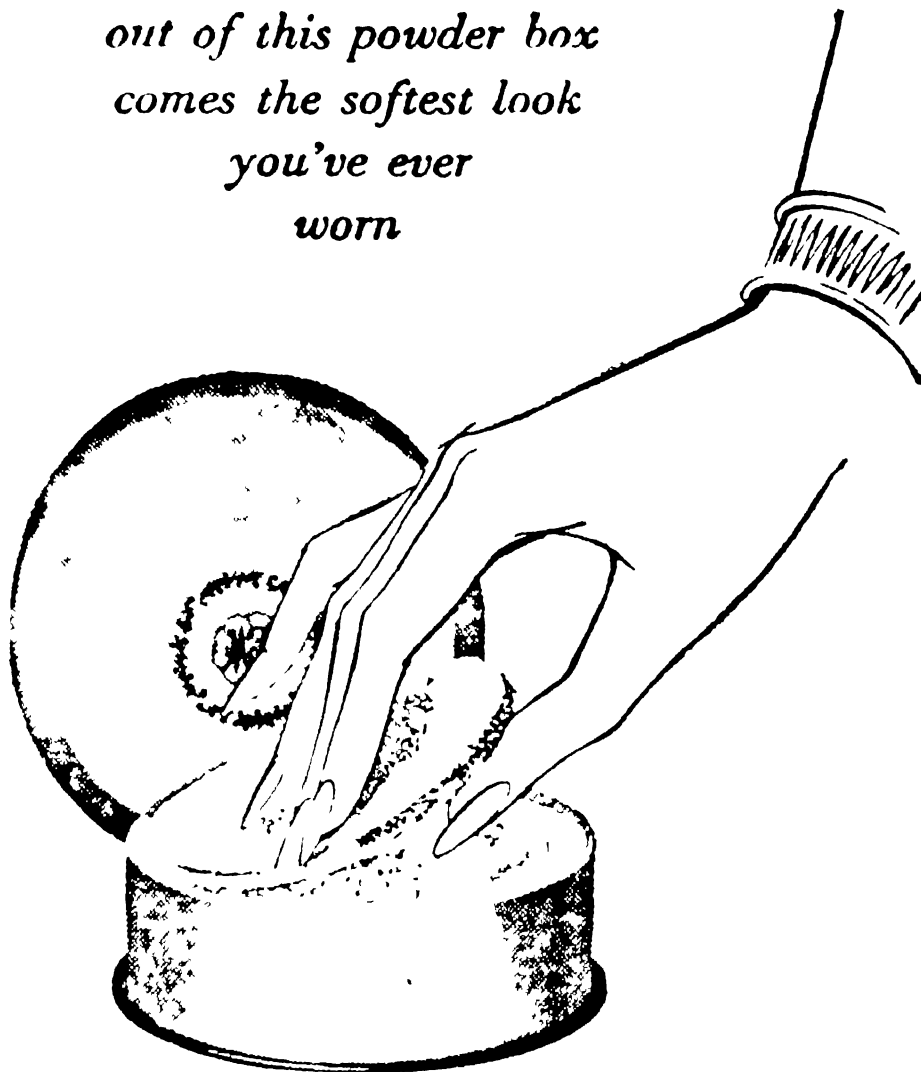
কথা—দেখা যাচ্ছে, একটা ব্যাপারে অন্তত শ্বশুরে বউয়ে মতদ্বৈধ নেই। ছেলে ইস্কুলে পাঠিয়ে ভুল করেছে, পচা শতকণ্ঠে স্বীকার করে। উপায় থাকলে পেটের বিদ্যা উগরে বের করে দিত। সুভদ্রাও সেই কাজে পরমানন্দে যোগ দিত শ্বশুরের সঙ্গে।

বেচারি মুকুন্দর দশা দেখে সাহেবও এখন চাদের সঙ্গে একমত। লেখাপড়া অতি পাজি জিনিস—মানুষের ভিতরে পদার্থ রাখে না। মিনমিনে মেনিবিড়াল করে দেয়। মুরারি লেখাপড়ার ধার ধারে না, সে কারণে নৃসিংহ হয়ে বিচরণ করে। পান থেকে ন খসুক তো একটুখানি, হুঙ্কারে বাড়ি সচকিত করবে। স্বামীর আতঙ্কে বড়বউ থরথরি কম্পমান। কম্পনের রীতিমতো হেতু আছে—এতগুলো সন্তানের জননী এবং বাড়ির গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও মুরারি সর্বসমক্ষে পায়ের চটি খুলে পটাপট ঘা বসিয়ে দেয়, দৃকপাত করে না। আর সেই মুরারির সহোদরভাই মুকুন্দ আকৈশোর চোখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেও বউয়ের পাশে যেন ফৌজদারি মামলার আসামি।

সুভদ্রা গর্জন করছে : ঝাড়ু মারি তোমার বিদ্যের মুখে। বটঠাকুরের কী লেখাপড়া, কিন্তু তোমার মতন বিদ্বান ভাইকে শতেক বার বেচতে পারেন কিনতে পারেন। জাঁক করে গলা ফাটিয়ে বলেনও তাই—

গলা ভিজে আসে পরক্ষণে। গর্জনের পর বৃষ্টি নামে বুঝি। বলে, বলাবলির কি, কাজেও তো তাই। আমাদের অংশের জমাজমি নিলামে তুলে কিনে নিয়েছে। কে দেখছে! এর পরে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করা ভাগ্যে আছে আমার।

মুকুন্দ আগের কথাটার জবাব দিল এতক্ষণে : দাদার মাইনে কত জান? আমার অর্ধেকেরও কম। দশ টাকা।

হোক দশ টাকা। দু হাত ভরে রমারম

ধর্ম-ধ্যান সাধুভাবে হবার জো নেই আজকাল।

হতে পারে খানিকটা সত্যি। মুকুন্দর কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে : কিন্তু নিয়তিকে মেনে নিয়ে হাত-পা ছেড়ে যদি বসি, মানুষের উপায় তবে কি রইল?

উপায়ও মঠাধিকারী বলেছেন। কাল বদলালো তো মাপের কাঠিও কেন বদলাবে না? পাপ-পুণ্য উলটেপালটে ফেল। সেকালে [illegible] পাপ ছিল, আজকের সেটা পুণ্য। [illegible] তেমনি করে নাও পাপ। [illegible] [illegible] ঠিক ঠিক তাই। [illegible] সম্প্রতি [illegible] দাঁড়িয়েছে। পাপপুণ্যে ধর্মাধর্মের [illegible]। সবুর করো, আরও নামবে। [illegible] সঙ্গে বেরুবে [illegible]। সবুর করো আরও খানিক।

পরমানন্দ সাহেব আবার টহল দিতে [illegible]।

ফিরে এলো [illegible] তখন, আকাশে [illegible] করছে। মৃদু কণ্ঠ-[illegible]—কান খাড়া করে থাকতে হয় [illegible]। কী কাণ্ড রে বাবা—[illegible]

ঘুমোয়নি। এই যে বলছিলে মাস্টারমশায়, পথ হেঁটে কষ্ট হয়েছে, ঘুমানোর দরকার। ছি-ছি, নতুন বিয়ের নববউকে হার মানিয়ে দিলে তোমরা!

মুকুন্দ বলছে, আর বেশি দিন নয়, বাসা করে থাকব দু-জনে। সুবিধামতো একটা বাড়ির জোগাড় হলে হয়।

সুভদ্রা চপল কণ্ঠে বলে, যে সে বাড়ি নয়—তেমহলা অট্টালিকা চাই আমার জন্যে। অমন গোটাকুড়িক দাস-দাসী। বাড়ি শুধু নয়, দাস-দাসীরও [illegible] দেখো।

মুকুন্দ বলে, ঠাট্টা করছ তুমি। [illegible] নেই বলে [illegible] লাগে। [illegible] নামযশ হয়েছে, টুইশানি পাব। ইস্কুলের পঁচিশ টাকার উপর সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলার টুইশানিতে আরও বিশ-পঁচিশ এসে যাবে।

সুভদ্রা শান্ত স্বরে বলে, না। সারাদিনের খাটনির পর রাত্রে আবার বাড়ি বাড়ি টুইশানি করে বেড়াবে, আমি তা হতে দেবো না। পাঠের আসর বসবে তখন। এক-গাঁ মানুষ জুটিয়ে নয়—সে আসরে আমি একলা। তোমার মুখে ধর্মকথা একা একা শুনব। পঁচিশ টাকা তো বাঁধা আছে, তার উপর পাঁচ-দশ হলে রাজার হালে চলে যাবে। না হলেই বা কি! দু-জনের একলা সংসার—খরচটা কিসের?

পথে এসো বাছাধনেরা! যা চেয়েছিল, ষোলআনাই তবে মিলে গেল। ভোর হয়ে আসে, পাখপাখালি ডাকছে। খুট করে দরজার শিকল খুলে দিয়ে সাহেব উল্লাসে লাফাতে লাফাতে পাটোয়ার-বাড়ির বাসায় চলল এবার। আর কাজ নেই, নিশ্চিন্তে এবার শুয়ে পড়বে।

ঘুমুতে ভাল লাগে, কোন এক কৌতুকী [illegible] [illegible] কোথায় ধরে [illegible]—[illegible] ফিরলেন [illegible] এসে [illegible] আগে।

আজগুবি অলীক কল্পনা আমার। দেবতা তো ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শীতল পদ্মপত্রের শয্যায় আরামের ঘুম ঘুমোচ্ছেন। এক অভাগিনী গ্রামবধূ এবং ততোধিক অভাগা ধার্মিক স্বামীটির জন্য কারো যদি নিশ্বাস পড়ে থাকে—ত্রিলোক-বিধাতা ভগবান নারায়ণ নন তিনি, নিশির কুটুম্ব এক চোর।

শিকারকাহিনী শেষ। দক্ষিণান্ত হয়ে গেছে,

গুরুপদ কামারশালের অদূরে অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায়। চোখ মেলে চেয়ে দেখবারই বস্তু। ফুঁসছে হাপর টানে টানে, আগুন জ্বলে ওঠে। লোহারের কালোকোলো দেহের উপরে লাল আগুন ঝিলিক খেলে যায়। প্রধান কারিগর যুধিষ্ঠির ডগমগে লোহা সাঁড়াশি দিয়ে একহাতে নেহাইয়ের উপর ধরেছে, অন্য হাতে ছোট হাতুড়ির ঘায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গড়নের রূপ দিচ্ছে। আর এক মরদ দু-হাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলে সর্বশক্তিতে ঘা দিচ্ছে, অগ্নিবর্ণ লোহা তারা কেটে ছিটকে ছিটকে পড়ে। আরও কিছু দিন পরে কাঠির জন্য রৈ-রৈ পড়ে যাবে—দুর্গাপুজো অন্তে কাঠি নিয়ে দলে দলে বেরুবে। এত ফরমাস আসবে, মাল জুগিয়ে পারা যাবে না। কাজ তাই এগিয়ে রাখছে। এখন এই অবধি থাকল, টাকা হাতে পেয়ে বস্তুটা একটু আধটু পিটিয়ে উকো ঘষে ঝকঝকে করে দিলে হয়ে যাবে।

কামারশালা আরও কত। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঢোকরার নামডাক সকলের বেশি। এই নাম পিতৃপুরুষ থেকে এসেছে, নিবারণ ঢোকরার আমল থেকে। খদ্দেরের অন্ত নেই। রাত্র-রাত্রি থেকে পহরবেলা অবধি নেহাই-হাপরের

লক্ষ্মণ নিহত। তুমুলে কান্নাকাটি শবদেহ ঘিরে।

জমেছে খুব, মগ্ন হয়ে সকলে শুনছে। চৌধুরি-কর্তা এক সময়ে চঞ্চল হয়ে নড়ে-চড়ে উঠলেন : কটা বাজল বল দিকি?

খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ করে ওঠে : সংক্ষেপে সারো মাস্টার। কর্তাবাবুর বাঁধা টাইমের খাওয়া। সাড়ে-নটায়। নিয়মের মধ্যে আছেন বলেই বলতে নেই দেহখানা অটুট রয়েছে।

মুকুন্দ বিপন্ন মুখে তাকাল। আঃ—বলে চৌধুরি-কর্তা খাজাঞ্চিকে নিরস্ত করেন : এ কি তোমার সেহা-কবচা—পান খাইয়ে খুশি করল তো বকেয়া-সুদ বাদ দিয়ে হিসাব সংক্ষেপ করে দিলে। চারাগাছ বড় হবে ফুলফল ধরবে—তার জন্যে সময় দিতে হবে বই কি'। চেপে খাটো করা যায় না এ জিনিস। কিন্তু আমি বলি কি মাস্টার—

চৌধুরি-কর্তার রায় শোনবার জন্য মুকুন্দ পাঠ বন্ধ করে তাকাল।

আমি বলছি, ঠাকুর লক্ষ্মণ শেলবিদ্ধ হয়ে মরে আছেন, হনুমান পাঠিয়ে তড়িঘড়ি বিশল্যকরণী এনে প্রাণ পাইয়ে দাও। উঠে বসুন। তক্ষুনি কিছু আর রণে যেতে পারছেন না। শোকটোক এখনো যাদের বাকি আছে সেই সময়টা হতে পারবে। আমি এই ফাঁকে দুটো মুখে দিয়ে আসি।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে মুকুন্দ বলে যে আজ্ঞে।

কর্তামশায় কারণটাও বুঝিয়ে দিলেন : লক্ষ্মণ মরে রইলেন, সে অবস্থায় কেমন করে খেতে যাই বলো। খাওয়া যায় না পাপ হয়। প্রাণটা সেজন্য আগে পাইয়ে দিতে বলছি। খাওয়াদাওয়া সেরে পরের কথা শুনব। বড্ড ভাল পাঠ হে তোমার।

মুরারির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাজে কটা?

ঘড়ি তো বেদির উপর—

চৌধুরি-কর্তাও তাই দেখেছেন। ঘড়ি মুকুন্দর পাশে ছিল, প্রয়োজন মতো সে সময় দেখবে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মুরারি ব্যাকুল হয়ে বলে যে ঘড়ি আপনি আমায় খেলাত দিলেন। কত দামের জিনিস —টাকার দামে বলছি নে। আপনি হাতে করে দিলেন সে যে হীরে জহরতের দাম—

চৌধুরি কর্তা বলেন টাকার দামেও ফেলনা নয়। কুরভোইজার ঘড়ি বনেদি জিনিস। জলচৌকির আশপাশে পড়ে গেল কিনা দেখ।

ঠাকুর লক্ষ্মণ রইলেন আপাতত মৃত অবস্থায়। ঘড়ির জন্য খোঁজ খোঁজ পড়েছে, তন্নতন্ন করে দেখা হচ্ছে। নেই কোথাও।

অপমানে জ্বলছেন চৌধুরি কর্তা। তাঁর কাছারিবাড়ি তাঁরই চোখের উপর জিনিসটা লোপাট। কিন্তু কণ্ঠস্বর [illegible] নেই। বলেন সবাই [illegible] চোর কেউ নই [illegible] পারি। [illegible] নিয়েছি [illegible] কেউ না কেউ। [illegible] চোপড় ঝেড়ে [illegible] বেরিয়ে পড়বে। [illegible]

হাঁ হাঁ করে ওঠে সবাই : [illegible] আপনি কেন জিনিস [illegible]

তৎক্ষণে চৌধুরি-কর্তা [illegible] ধরে নতগাত্র হয়েছেন। [illegible] মুরারির হাতখানা [illegible] কোমরের [illegible] ঘুরিয়ে দিলেন : [illegible] কোমরের গাঁটেও নেই। [illegible] এক এক করে সকলের [illegible]

খাজাঞ্চি উঠে [illegible] মুরারির [illegible] বলে এর পরে তুই—

[illegible] আপনি [illegible] মশায়ের [illegible] দেখবেন [illegible]

এমনি সময় এক কাণ্ড। জলচৌকির বেদি থেকে মুকুন্দ নেমে পড়েছে। [illegible] থেকে উঠানে নামল।

ও কি, কোথায় চললে মাস্টার?

হুঁ হুঁ [illegible] অর্থহীন অস্পষ্ট কিছু বলে মুকুন্দ পা চালিয়ে দেয়।

চৌধুরি কর্তা গর্জন করে ওঠেন : যেতে দিও না, নিয়ে এসো আমার সামনে। শিক্ষিত লোক, ইস্কুলের মাস্টার—ছি ছি'

খাজাঞ্চি বলে কোন বাপের বেটা, সেটা দেখবেন তো—

এইটুকু বলে ফেলেই জিভ কেটে চুপ হয়ে যায়। নায়েব মুরারি বর্ধনের বাপও যে সেইজন। চৌধুরি-কর্তা সদরে ফিরে গেলে মুরারি তো সর্বেসর্বা। হঠাৎ কি রকমে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশ)

ট্রানজিসটর্স ও বৈদ্যুতিন যন্ত্রের ক্ষুদ্রকরণ হেতু।

আড়াআড়িভাবে আঠারো ইঞ্চি একটি তামার চক্র বিদ্যুৎবাহীর কাজ করে। ট্রান-জিসটরাইজড না-ধর্মী বৈদ্যুতিক তার (cathode) জলের কিছুটা গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। দুটিতে মিলে ৪০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ শক্তি কাজে লাগায় যা বিদ্যুৎবাহ তারের দশ ফুট দূরে পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

এই বিদ্যুতিক-চুম্বক প্রভাবিত ক্ষেত্রের মধ্যে মাছ এসে পড়লে হয় তারা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে যাবে, অথবা তাদের স্নায়ুকেন্দ্র galvano-narcosia অভিহিত অবস্থায় পড়বে।

পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলে এই নতুন উদ্ভাবনটি মাছধরা ট্রলারের সঙ্গে যুক্ত করে সমুদ্রে মাছ ধরা সহজতর ও দ্রুততর করে তোলা সম্ভব হবে এবং ডুবুরীরাও জলের নিচের হিংস্র প্রাণীদের কাবু করার উপ-যোগী একটা যুৎসই অস্ত্র হাতে রাখতে পারবে।

ধর্ম কি?

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব দেশ পত্রিকার পঞ্চতন্ত্রে প্রশ্ন করিয়াছেন ধর্ম কি? উত্তরে লিখিতেছি।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্মলক্ষণম্‌॥
(মনুস্মৃতিঃ)

ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, চুরি না করা, শৌচ, ইন্দ্রিয়দমন, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং
সর্বেষাং চ হিতে রতঃ।
কর্মণা মনসা বাচা
স ধর্মং বেদ জাজলে॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব)

যিনি সর্বদা সকলের সুহৃৎ এবং যিনি কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা সকলের কল্যাণে নিরত থাকেন, হে জাজলি, তিনিই ধর্মকে জানেন।

সর্বস্তরতু দুর্গাণি
সর্বোভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ কামানবাপ্নোতি
সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥

সকলে বিপন্মুক্ত হউক, সুখ দেখুক, সকলের কামনা পূর্ণ হউক, সকলে সকল স্থানে আনন্দিত থাকুক।

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং
তৃপ্যতু সকলং জগৎ।

পরব্রহ্ম হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকল জগতের তৃপ্তি হউক। (এইগুলি ধার্মিকের কাম্য)

সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে আছে :

"সর্বে পাষণ্ডা বসেয়ুঃ। সর্বে হি তে সংযমং ভাবশুদ্ধিং চেচ্ছন্তি।" (৭ম শিলালিপি)

সকল ধার্মিক সম্প্রদায় থাকুন। কারণ তাঁহারা সকলেই সংযম ও ভাবশুদ্ধি ইচ্ছা করেন। (পাষণ্ড—ধার্মিক সম্প্রদায়)

"সারবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সর্বপাষণ্ডানাম্‌। যদ্ তস্য ত্বিদং মূলং যদ্ বচোগুপ্তিঃ কিমিতি। তথা আত্মপাষণ্ডে পূজা পরপাষণ্ডগর্হা চ নস্যাৎ। সর্বপাষণ্ডাঃ বহুশ্রুতাঃ কল্যাণাগমাশ্চ ভবেয়ুরিতি।" (১২শ শিলালিপি)

সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের শিক্ষার সার বৃদ্ধি হউক। এই সারবৃদ্ধির মূলে বাক্‌সংযম। ইহা কি? নিজধার্মিক সম্প্রদায়ের অতি প্রশংসা এবং অন্য ধার্মিক সম্প্রদায়ের নিন্দা করা উচিত নহে। সকল ধার্মিক সম্প্রদায়ই সুশিক্ষিত এবং কল্যাণকার্যের প্রবর্তক।

প্রথমোক্ত দশ লক্ষণযুক্ত ধর্মই মানবজাতিকে রক্ষা করে।

ধর্ম এবং হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

* আলোচনা *

এবং ধর্ম নষ্ট হইলে মনুষ্য-সমাজও বিনষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণগণ বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। তাহাদের উপাস্য গায়ত্রী। গায়ত্রী মন্ত্রের ভাবার্থ—মোটামুটি এইরূপ।

"আমরা বিশ্বস্রষ্টার বরণীয় জ্যোতিকে ধ্যান করি। যিনি আমাদের বুদ্ধিসমূহকে পরিচালিত করেন বা করিতে সমর্থ।"

বৈদিক উপাসক বিশ্বস্রষ্টার নিকট—স্বর্গ, মোক্ষ বা পার্থিব সুখ-সম্পদ কামনা করেন না, তিনি কেবল চাহেন নিজেদের বুদ্ধি যেন ঠিক পথে পরিচালিত হয়। মনুষ্যদের বুদ্ধি ঠিক পথে পরিচালিত হইলেই মনুষ্য-সমাজ সুখময় হয়।

মহামুনি বেদব্যাস বিশ্বস্রষ্টার নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলেন—

"রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো
ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা
যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ-
যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা-
দোষত্রয়ং মৎকৃতম্‌॥"

হে জগদীশ! তুমি অরূপ, আমি ধ্যানের দ্বারা তোমার রূপের কল্পনা করিয়াছি। হে অখিল গুরো। তুমি অনির্বচনীয়, আমি স্তবের দ্বারা তোমার অনির্বচনীয়তা দূর করিয়াছি। তুমি সর্বব্যাপী আমি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তোমার সর্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। তুমি আমার এই তিনটি দোষ ক্ষমা কর।

পূর্বোক্ত গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারা বুদ্ধি ঠিক পথে পরিচালিত হইলে একদিন ঋষি যাহা অনুভব করেন, তাহা তিনি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেন।

বেদাহমেতং পুরুষংমহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা
বিদ্যতেঽয়নায়॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন:—

"আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার অন্য পথ নাহি।"
(নৈবেদ্য)

আমি যাহা সনাতন ধর্মের সার বলিয়া বুঝিয়াছি—তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। নানা মুনির নানামত। আমি অবশ্য মুনি নহি। হইয়াও যে ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলাম, আশা করি সুধীবৃন্দ তাহা ক্ষমা করিবেন। ইতি—

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্তী
নিউইয়র্ক।

[illegible]

[illegible] তাহা ব্যবহার করিয়াছেন [illegible] অনুমতি প্রতিবাদ [illegible]; ইহা আমার অনুমোদন [illegible] করিয়াছে।

পরিশেষে নিবেদন : নানা কারণে আমাকে আবার একটি বছর 'সাহিত্যসেবা' করিতে হইবে। তাহার পর আমার নিষ্কৃতি। এই একটি বছর কোনোগতিকে আমাকে বরদাস্ত করিয়া লউন, এই প্রার্থনা।

সর্বশেষে আপনাদের ও কালীবাড়ির সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

শোকাতুর

সৈয়দ মুজতবা আলী

পুঃ। মনে পড়িল, আমার দ্বিতীয় শ্রীমান, [illegible] (বেহায়া নাম—ভোলা-নাম কবীর) কুর্তকিপাড়া (ঘোড়ামারা) কালীবাড়ির সম্মানিত নিত্য visitor, তার বয়েস আট।

মুখোমুখি

মহাশয়,

'দেশ' পত্রিকার চতুর্বিংশতি সংখ্যায় প্রকাশিত 'মুখোমুখি' রচনাটিতে শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ মহাশয় ভাষা-চিন্তা ও শৈলী-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কয়েকটি নূতন প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। তিনি মনে করেন, সব "আকৃতির যথাযথ প্রকাশ অচলিত বাদুরে শব্দের পুনর্বাসন দ্বারা অসম্ভব।" আকৃতি প্রকাশের এই সমস্যার নিরসনকল্পে তিনি প্রয়োজনমত শব্দের প্রচলিত অর্থের সংকোচন এবং প্রসারণে তাদের নতুন অর্থের দিগন্তগামী করে তুলতে চেয়েছেন। শব্দের এ-হেন নতুন অর্থধারিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি কবি জীবনানন্দ দাসের 'ভয়াবহ আরতি' এবং কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক 'উপজীব্য' শব্দটির বিশিষ্টার্থক ব্যবহারের প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রচলিত শব্দ এবং নতুন শব্দ সৃষ্টি করার প্রচলিত রীতি নতুন অর্থের দিগন্তগামী হয়ে উঠুক—এ সকলেরই কাম্য। কিন্তু সব সব অর্থের দিগন্তগামিতার নামে যথেচ্ছ শব্দ-ব্যবহার ভাষার ক্ষেত্রে একটি [illegible] কি প্রশ্রয় দেবে না? কোনো সূত্রের [illegible] যদি নতুন [illegible] বিপদে [illegible] এবং নীড় না দেওয়া যায়, তবে কি তা [illegible] বিদেশী কন্যার রূপ গ্রহণ করবে না? [illegible] শব্দ-স্পন্দকে [illegible]; [illegible]।

[illegible]

শব্দের 'শব্দার্থ না' এই মনোভাবের [illegible] প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। এই 'শব্দার্থ' [illegible] অনেকখানিই আধুনিক 'কবিকল্পের' সৃষ্টি। শব্দ যদি আবার নতুন করে আর এক বাধার সৃষ্টি করে, তা বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যতে এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সূচনা করবে।

সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডার থেকে নতুন শব্দ আহরণ করে বাংলা প্রত্যয়ের দ্বারা তাদের যুগোপযোগী করে নিতে পারলে আকৃতি প্রকাশের সমস্যার বোধ হয় সমাধান হতে পারে। এবং এ ক্ষেত্রেও লেখককে ভাষার শৈলী এবং শব্দের অর্থ, প্রত্যয়ের দ্যোতনা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; অন্যথায় ভাষা 'শব বিবাহের' প্রেতোৎসবেই মেতে উঠবে। এবং সাহিত্য হবে মৃতকল্প। ইতি

লক্ষ্মী ঘোষ

কলকাতা-৪।

শব্দ ও ছন্দ

মহাশয়,

'দেশে'র পর পর দুটি সংখ্যায় "মুখোমুখি" সন্তোষকুমার ঘোষ শব্দ এবং ছন্দ নিয়ে আলোচনা দেখে কিছুটা অবাক হয়েছি। ঔপন্যাসিকদেরও কি এ-সব কথা ভাবার সময় আছে? বড় একটা প্রমাণ তো দেখি না।

[illegible] খবর পাই, [illegible] কথা চলেছে। [illegible] ছোটখাটো পত্র-পত্রিকায় [illegible] মহলে শব্দের বিতর্ক [illegible] বন্ধ হয়নি। [illegible] দের মধ্যে মাত্র তিনটি [illegible] যায়।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা [illegible] পারে। অনেক শব্দ [illegible] হয়ে গেছে অচল পয়সা, [illegible] কুমার ঘোষ বলেছেন, [illegible] প্রচলিত শব্দকে নতুনভাবে [illegible] কিন্তু অসুবিধেও আছে। [illegible] সব মানুষকে চমকে দেওয়া, [illegible] মানুষকে কাল্পনিক করা। 'প্রতিমা' [illegible] স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে 'প্রতিমা' [illegible] আমার বহুকালের শখ, [illegible] উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি? [illegible] হবে চলেছিল কিন্তু তারা [illegible] তবু এ রকম চেষ্টা কেউ করতে [illegible] ভাষার কোন না কোন [illegible]

[illegible]কারণেই আমার কষ্ট হয় না। এ ছাড়া [illegible] একটা আছে : বড়দের এস্রা। হাই ব্রাউ- [illegible] বললে মাথা উঁচু, তেল পড়ের জায়গায় [illegible] বেশ হয়েছে। এ রকম বায়নার [illegible] যথার্থ অনুবাদ উপেক্ষার বোঝা [illegible]? [illegible] উপায়টি সম্বন্ধে [illegible] আমার নিশ্চিন্ত। ছবি অনুযায়ী [illegible]। [illegible] কথাটার মানে সুখে কেন? [illegible] না বললেও চলে কেননা [illegible] পাঁচ-বাঁধানো পথের সম্ভ্যাও [illegible]। ঐ ছবিটি শব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে [illegible]। তেমনি 'জ্যোৎস্না'র বদলে 'রাধার [illegible] কেন হবে না? 'আকাশে রাধার লজ্জা' [illegible] এখন লোকে 'আধুনিক কবিতা' বলে [illegible] দুর্বোধ্য ছুঁড়ে ফেলবে কিন্তু [illegible] লেখকরা যথাযথ ব্যবহার করলে— [illegible] কোন পল্লীগ্রামের হাট থেকে ফেরার [illegible] হাইব্রেও বলবে, রাধার লজ্জা বড় [illegible] করছে গো আজ! বাংলাদেশে [illegible] যাচ্ছেও হয় 'রান্না-ভাত-খাওয়া' বা [illegible]।

[illegible] লিখেছেন ছন্দ সম্পর্কে। [illegible] অদ্ভুত ব্যবহারের উদাহরণগুলি [illegible] আমার কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য ঠিক নয়। [illegible] কবিতা সমিল ছন্দে আবার ফিরে [illegible], তিনি বলেছেন, কিন্তু তা আসছে [illegible]। [illegible] কোথায় থাকা চলে গেছে, এখন [illegible], যাকে বলে গদ্যকবিতা, তা স্থিতও [illegible] পান। কিন্তু ছন্দ এবং মিল-এর [illegible] দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে মিল প্রায় [illegible] পড়েছে। আগে বিরহের কাব্যও মিল দিয়ে লেখা হতো। এখন ছন্দের অনেকাংশ খুবে আয়োগ, কোন জাত নেই : প্রাথমিক পয়ার গ্রহণ করে তার উপর যাচ্ছেতাই প্লাস্টিক সার্জারি চালাচ্ছেন কবিরা। আসলে কবিতা আসতে চাইছে মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি অথবা মানুষের মুখের ভাষা কবিতার কাছাকাছি থাক। ইংরেজ বা আমেরিকান কবিরা যে সম্পূর্ণ ছন্দ বাদ দিতে চাইছেন তার কারণ ওঁদের পয়ারের মতো এমন মুখের ভাষার কাছাকাছি এবং সর্বংসহ ছন্দ নেই।

তবে মিল এবং ছন্দ কবিদের খেলা। এখনো। ছন্দ-শত্রু কোন বীট-কবিকে আমি গঙ্গার পাড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া খাবার পর পুরোনো ছন্দের কবিতা আবেগে আবৃত্তি করতে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের যে উদাহরণগুলি তিনি দিয়েছেন ওগুলো নিশ্চিত তাঁর খেলাচ্ছলে। ওরকম আরো দু-একটা চমৎকারী মিল মনে পড়ছে :

রৌদ্র হয়েছে অতি তীক্ষ্ণ
তোর আঙিনা হয়নি যে নিকোনো

বা,

শ্রাবণে ডেপুটিপনা
এ তো কভু নহে সনা—
হন প্রথা এ যে অনা—
সৃষ্টি অনাচার।

মিলের নেশায় রবীন্দ্রনাথের যে গোঁজামিলগুলি উদাহরণ ছিল সে-রকম আরো অসংখ্য দেওয়া যায়। মিলের অনাসৃষ্টির তুলনা নেই। কোন কবিতার লাইনের শেষে যদি 'রাত্রি' দেখা দেয়— তা হলেই ভয়ে কাঁটা দেয় গায়, আবার পরের লাইনেই দেখে 'যাত্রী' যাত্রী কিংবা ধাত্রীও দেখতে পাওয়া যাবে। [illegible] সঙ্গে রবি, ছবি বা কবী ছাড়া আর কিছু ভুলেও মনেও পড়ে না। প্রেমের সঙ্গে এলেম কিংবা খেলাকেন। আর একটা আছে হেম—সেটা আগেও খুব চলতো না—আজকাল তো ১৪ ক্যারেট। এদুদিকে মিল না বলে কবিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ করা উচিত।

'লিপস্টিক'-এর সঙ্গে "মিষ্টি" মেলাবার জন্য তাঁর অত ভাবিত হওয়ার দরকার নেই। ওরা এমনিতেই বেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলেমিশে থাকে সবসময়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা

শিল্পীর স্বাধীনতা

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধগুলির পাঠক হিসেবে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রতিভা বসুর প্রবন্ধটির ওপর কয়েকজন আগ্রহী পাঠক নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। আমার বক্তব্য, যেখানে শিল্পী তার আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা হারায়, সেখানে শিল্প ও শিল্পীর অপমৃত্যু। কোনো দেশের শিল্পের ওপর সে দেশের রাজনৈতিক প্রভাব কিছুটা পড়বে, সেটা অনস্বীকার্য, কিন্তু তাই বলে শিল্পীর আত্ম-প্রকাশের কোন ক্ষমতা থাকবে না, সেটা চিন্তা করা যায় না। এই দৃষ্টি-ভঙ্গির

ওপর ভিত্তি করে শ্রীমতী বসুর প্রবন্ধটি কোন আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।
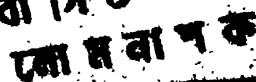
কিন্তু ২০শে এপ্রিলের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধটিও পড়লাম। তিনি দুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে প্রবন্ধের মূলগত অর্থকে অভিজ্ঞ শিল্পীর মত মূর্ত করে তুলেছেন। শিল্পীর সাধনায় অন্য কিছুর প্রভাব অত্যন্ত কেন একেবারে গৌণ হয়ে পড়ে। বাদ্দু খাঁ জাতের শিল্পীরা জিম্মা সাহেবদের হিসেব রাখেন না। শিল্পীর তন্ময়তা যেখানে ব্যাহত হয়, সেখানে শিল্পের অভিব্যক্তি পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। সমাজ-বিরোধী কার্য কলাপের কারবারীরা যদি সামাজিক নাটকের সার্থক শিল্পরূপ দিতে পারে সেখানে সে স্বাধীন বইকি! এই স্বাধীনতা সৃষ্টি ও তার স্রষ্টার স্বাধীনতা। যে দৃষ্টিভঙ্গী [illegible] তিনি এই শিরোনামের অর্থ করেছেন [illegible] সঙ্গে একমত হয়ে তাঁকে আমি সাধুবাদ জানাই। ইতি—

দিলীপচন্দ্র কুমার
খিদিরপুর

॥ ২ ॥

মহাশয়,

আপনাদের 'শিল্পীর স্বাধীনতা'—এই পর্যায়ের বিভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ [illegible] প্রায় অভিন্ন বক্তব্য নিঃসন্দেহে [illegible] দাবি রাখে। কিন্তু তবুও [illegible] [illegible]

এই [illegible] [illegible] 'শিল্পীর স্বাধীনতা' [illegible] তার আসল স্বরূপটি প্রকৃত মর্মজ্ঞ [illegible] [illegible] নীরবতার আত্মমগ্নতায় কোনো অভিযোগই সোচ্চার হয়ে ওঠেনি।

তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁরই 'লেখার' একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে 'আমার' কথা শেষ করি—

"সব [illegible] সব [illegible] সব [illegible] নিজেকে শিল্প তার আপন রসে পূর্ণ করে নেয়। তার চেয়ে বড় রসায়নিক আর কেউ নেই।'

কিংবা

"শুধু কি রাজ ভাই তার একমাত্র জয়?"

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
মানিকতলা

হাস্‌নোহানা

মহাশয়

শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুজতবা আলীর "পঞ্চতন্ত্রে" উল্লিখিত "হাস্‌নোহানা নিয়ে সম্প্রতি যে আলোচনার ঝড় আপনার পত্রিকায় উঠেছে তা' সত্যই হৃদয়গ্রাহী।

গত ২০শে এপ্রিল তারিখে শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, 'হিনা' মোটেই হাসনোহানা নয়। হিনা হল মেহেদী। যা ঘষে হাতে ও পায়ে রং করা হয়। তিনি হিনাকে হাসনোহানার থেকে পৃথক করতে একটি পুরোনো উর্দু কবিতা হাজির করেছেন। কবিতার অর্থ [illegible] অনবদ্য [illegible] করেছে এবং [illegible] যুক্তি অকাট্য প্রমাণিত হয়েছে।

[illegible] হল কবিতাটি নিয়ে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভুল করেছেন কবিতাটির উপস্থাপনায়। মূল কবিতাটি হল—রঙ্গ লাতী হ্যায় হেনা পথরপে পিস জানে কে বাদ, সুরখরু হোতা হ্যায় ইনসা ঠোকরে খানেকে বাদ। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থাপনায় দ্যাখা যাচ্ছে—হোশ আতা হ্যায় ইনসানকো ঠোকর খানেকে বাদ, রঙ্গলাতী হ্যায় হিনা পত্থর মে পিস জানেকে বাদ॥ "রঙ্গলাতী হ্যায় হেনা"র সাথে সুরখরু (সুরখ্=লাল; রু=রূপ বা চেহারা) হোতা হ্যায় ইনসা"র যে ভাবগত ব্যঞ্জনা মূল শেরে আছে তা ত নেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় উল্লিখিত শেরে। তবে কোথায় পেলেন তিনি? ইতি—

জীবন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্যামনগর

সিন্থলের যুগ

বসন্তের সীমানায়

রূপসী নারীতে পরিণত হবার প্রকৃতির পথে কি অপূর্ব সাধনা চলেছে? বয়ঃসন্ধিকালে গাত্রবর্ণের অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যক।

সেদিক থেকে লক্ষ লক্ষ জনগণের পরীক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য আশ্চর্য জি-১১০ সহযোগে প্রস্তুত ভারতের একমাত্র সাবান সিন্থল অপেক্ষা আপনার গায়ের ত্বকের যত্ন নিতে আর কি ভালো হতে পারে? স্বাভাবিক ত্বক থেকে বিশ্রী দাগ ও দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণু অপসারণ করে সিন্থল নিখুঁত গাত্রবর্ণ অম্লান রাখে।

সৌন্দর্য সাবান।
দেহ-প্রসাধনে দুর্গন্ধনাশকারী

অধিক সতেজতা ও নিখুঁত সৌন্দর্যরক্ষণের জন্য জি-১১ যুক্ত গোদরেজ সিন্থল ট্যালেট পাউডার ব্যবহার করুন। কমনীয় স্নিগ্ধ, দুর্গন্ধনাশক ও বিশুদ্ধ

গোদরেজ হেয়ার টনিকেও জি-১১০ যুক্ত থাকে।

• "হোয়াট ইজ জি-১১" নামে বিনামূল্যে শিক্ষামূলক পুস্তিকার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন,—গোদরেজ, বোম্বে ১২

• এল জীবনলাল কোং এর ট্রেডমার্ক

Godrej গোদরেজ সাবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাম

CT-G. 4/63 (24 cm x 16.50 cm) BEN.

[illegible] অন্য অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ জ্ঞান চাঁদ, [illegible] পুরস্কারপ্রাপ্ত শান্তিবাদী , এবং [illegible] ভারত শান্তি পরিষদের সহসভাপতি [illegible] শোখে সিং, কলকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি, আসামের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী পিকিং-এ উপস্থিত হয়েছিলেন। ভারত-চীন মৈত্রী সংঘ ৩৫জন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন। লোকসভার সদস্যও একজন ছিলেন। আর ছিলেন একদল ভারতীয় সাংবাদিক, মহিলা প্রতিনিধিদের একটি দল যুব ডেলিগেশন এবং একটি ট্রেড ইউনিয়ন ডেলিগেশন।

১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনের পর ভাবাবেগ চরমে উঠল। 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' মন্ত্রের সংগে যুক্ত হল 'আফ্রো-এশীয় সংহতির ধ্বনি। অক্টোবর মাসে চীনে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব ঘটা করে সম্পন্ন হল। শ্রীপৃথ্বীরাজ কাপুর এবং শ্রী বি এন সরকারের নেতৃত্বে একটি তারকার দলও প্রেরিত হল। চেয়ারম্যান মাও স্বয়ং দর্শন দিয়ে এদের মর্যাদা বৃদ্ধি করলেন। মাও চীন-ভারত ভলিবল ম্যাচ দেখেও অনুষ্ঠানটিকে ধন্য করেছিলেন। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে একদল চীনা মুসলমান হজ্জে যাবার পথে দিল্লিতে এলেন। দিল্লির হিন্দু মুসলমান, সরকার এবং কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে তাঁদের স্বাগত জানালেন।

আরও কয়েকটা বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলঃ একটি জুরিস্ট মিশন, অল ইণ্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক ল-ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী এম আর দাশগুপ্ত নেতৃত্ব করেছিলেন (এই দলের কয়েকজন সদস্য নয়াচীনের বিচারব্যবস্থার খুবই প্রশংসা করেছিলেন)। ওয়ারশতে পঞ্চম বিশ্ব যুব উৎসবে যোগদান করে একটি ভারতীয় দল বাড়ি ফেরার পথে চীন ঘুরে আসেন। আরেকটি দলে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য সি পি রামস্বামী আয়ার ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২জন অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে যান। কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক মিশনও যায়। ডাঃ এম এন অহুজা একটি মেডিকেল ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করেন। দশটি চীনা ছাত্র ভারতে পড়তে আসে এবং দশটি ভারতীয় ছাত্র সরকারী বৃত্তি নিয়ে পড়তে যায় চীনে।

উল্লেখযোগ্য চীন যাত্রীদের মধ্যে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী রাজকুমারী অমৃত কাউর সকন্যা ডঃ রঘুবীর, শ্রী কে সি কৃষ্ণাপ্পা, আচার্য নরেন্দ্র দেব শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রকুমার দেববর্মণ সস্ত্রীক শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ, শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি প্রভৃতির নামও আমার এই প্রসংগে মনে পড়ছে। আরেকজনের কথাও মনে পড়ছে আমার। তিনি হচ্ছেন ভারত সাধু সমাজের সভাপতি সন্ত তুকোড়জী মহারাজ। (কম্যুনিস্টদের নাম আমি এই তালিকা থেকে ইচ্ছে করেই বাদ রেখেছি)

একটা আশ্চর্য জিনিস হচ্ছে এই যাঁরা চীন দেখে এসেছেন ধ। তিনি ১৯৭২ সালেই যান, আর ১৯৫৮ সালেই যান তাঁদের মধ্যে শতকরা ৯৯জনই দেশে ফিরে এসেই লাগাম খুলে চীনের প্রশংসা করেছেন। এঁদের কথিত বা লিখিত সংবাদপত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই দুটো জিনিস সকলের মধ্যেই আছে। (১) এঁরা সকলেই বিশেষভাবে সমিতের এবং (২) তথ্য ও যুক্তির ধার এঁরা কেউ বড় একটা ধারেননি।

নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে এঁরা চীনকে সার্টিফিকেট দিয়ে গিয়েছেন। গান্ধীবাদীরা বলেছেন, হিংসাটুকু বাদ দিলে গান্ধীজীর আদর্শ চীনে যেভাবে রূপায়িত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন দেশে তা হয়নি। এমন কি সন্ত তুকোড়জীও ধর্ম সম্পর্কে চীনা কম্যুনিস্ট সরকারের মনোভাব দেখে [illegible] হয়েছেন।

করে থাকে। চীন সম্পর্কে এই ধরনের মনোহর চিত্র প্রচারের জন্য ভারত সরকারের দায়িত্বও কম নয়......আমাদের সরকার কোন কিছু না ভেবেই পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য কাজ করছে বলে মনে হয়। আমরা ভারতীয়রা বিদেশী কম্যুনিস্ট-দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন এবং তাদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েই রেখেছি। আর দেশী কম্যুনিস্টরা এই প্রতিফলিত গৌরবের লাভের অংশে ভাগ বসাচ্ছে।"—(শ্রীনিরঞ্জন হালদার অনূদিত ডাঃ চন্দ্রশেখরের 'আজকের চীন' থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৫০)

কোন পদ্ধতিতে বা মন্ত্রে চীন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 'বশ' করে ফেলেছিল, অর্থাৎ ধোঁকা দিয়েছিল, এই প্রসঙ্গে সেটা একবার পর্যালোচনা করে দেখা ভাল। আগেই বলেছি, চীন একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার ফিকিরে এই সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি আদান প্রদানের কূট চালটি দিয়েছিল। চীন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন পর্যবেক্ষক লিখেছেন :

For the Chinese, cultural exchanges are a means of achieving political ends, some specific and some general. The long-term aim is presumably to win India over to Communism, either through a gradual conversion of existing power structure or through a take-over by the Communist Party of India. For this purpose, China's relation with the Indian Communists and fellow-travellers are particularly important and much time and attention are paid to them. Indian Communists frequently visit China, whether individually or in formal delegations to State occasions, trade union conferences, Party meetings, etc. Moreover, the Chinese play a direct part in the internal developments within the Indian Communist movement which is now split between the 'pro-Russian' and the 'pro Chinese' group.—(The China Quarterly, July-September, 1961, p 87-88)

চীনের মতলবটি পরিষ্কার। ভারতকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করার হাতিয়ার হিসাবে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিটিকে সর্বতোভাবে মদত দেওয়া এবং এই-পার্টিটিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের তাঁবে রাখা। ভারতীয় কম্যুনিস্ট এবং সহযাত্রীদের রাষ্ট্র ক্ষমতা কি করে করায়ত্ত করতে হয়, সেই সব কৌশল হাতেকলমে শিখিয়ে দেবার জন্য অবাধে চীনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনেই এই 'সাংস্কৃতিক বিনিময়ের' কূট চালটি চীনা কম্যুনিস্টরা চেলেছিল। আমাদের সরকারের এই চালটি ধরে ফেলতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। তাই শেষের দিকে চীন, এমন কি সোভিয়েত রাশিয়ায় যাওয়ার ছাড়পত্রও ভারত সরকার আর নির্বিচারে মঞ্জুর করেননি।

চীন ফেরতা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা যে দেশটা সম্পর্কে এতো উচ্ছ্বসিত হয়ে

উঠলেন কেন? এরা সকলেই তো আর কম্যুনিস্ট নন। যে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য গিয়েছিলেন, তাঁরাও তো চীনকে যথেষ্ট আমড়াগাছি করেছেন। (যদিও এখন কেউ কেউ মন্ত্রীর গদীতে বসে পাল্টা সুর গাইছেন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্পীকার এবং বর্তমান মন্ত্রী শৈলকুমার মুখার্জির কম্যুনিস্ট মুখপত্র স্বাধীনতায় প্রকাশিত রচনার কথা। চীন বন্দনায় সে কি নির্লজ্জ ঘটা!)

বিষয়টা একটু তলিয়ে বোঝা দরকার। দুটো বিষয় অনুসন্ধান করে দেখলে আমার মনে হয় এ সম্পর্কে আমরা একটা স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছতে পারব। (১) চীনা সরকার কী এমন টেকনিক ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে চীনযাত্রী ভারতীয়রা গলে জল হয়ে ফিরেছিলেন? এবং (২) ভারতীয়দের মানসিকতা এমন কোনও সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল কি না যা চীন সম্পর্কে মোহিত হবার জন্য আগে থেকেই এদের মনকে প্রস্তুত করে রেখেছিল?

সংগৃহীত তথ্যগুলো থেকে দেখছি ভারতীয় প্রতিনিধিদের মন পাবার জন্য চীনা সরকার

(ক) তাঁদের সম্মান জানাবার জন্য [illegible] দারুন সমারোহ করেছিলেন। এ রকম সমাদর আমরা রাজা মহারাজার বেলাতেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কম্যুনিস্টরাই [illegible] সম্মান দিতে জানে।

(খ) [illegible] প্রচারের মাধ্যম [illegible] কেমন সূক্ষ্ম ও সহজ ভাবে ভারতীয় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অতিমাত্র প্রশংসা ছড়িয়েছিলেন [illegible] যেখানেই [illegible] প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি সহ [illegible] ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতের [illegible] ফলাও করে প্রচার করেছে যার ফলে [illegible] ধারণা হয়ে ছিল চীনা [illegible] নয় এবং চীনা কম্যুনিস্টরা সংস্কৃতির

বিশেষ করে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতর দিকটাই পছন্দ করে।

এবং (গ) তুরুপের তাস ছেড়েছেন রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস, ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ভারতীয় কবির বুদ্ধ প্রমুখ অবতারদের জন্মতিথি ঘটা করে পালন করে। ভারতীয়দের থেকে চীন ভারতীয় মহাকবিদের প্রতি বেশি ভক্তি দেখিয়েছে এবং এইভাবে চীন আমাদের জাতীয় অহংবোধটাকে বেশ করে চুমরে দিয়েছে। এই টেকনিকেই চীন ভারতীয় প্রতিনিধিদের মন গলিয়ে দিয়েছিল। এর পর তাঁদের সার-জল ঢালা মনের জমিতে চৈনিক প্রচারযন্ত্র যে বীজই বুনে দিয়েছে তাতেই বাম্পার ফসল ফলেছে

এবার দেখা যাক চীনে গিয়ে এঁরা কোন কোন বস্তু দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। (১) অতিথেয়তা (২) ভারত সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী (৩) জাতীয় অহং-এ সুড়সুড়ি (৪) পাশ্চাত্য দেশসমূহের তীব্র সমালোচনা (৫) শান্তিপ্রীতির মনোভাবের [illegible] (৬) চীনাদের অপরিসীম শৃঙ্খলাবোধ (৭) চীনে জীবনযাত্রায় [illegible] ও [illegible] (৮) শহর [illegible] রকম পরিচ্ছন্নতা (৯) বেশ্যাবৃত্তি, [illegible] উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতির উৎপাত বন্ধ করা (১০) নারীজাতির মুক্তি (১১) অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলিতে সমষ্টির অংশগ্রহণ এবং (১২) কাজে ঐকান্তিক আগ্রহ ও দক্ষতা। যে কোন পরিকল্পনার রূপ দেবার জন্য চীনা শ্রমিকদের [illegible] খাটানো হয়। [illegible] কমানো বা বেতন বৃদ্ধির দাবি [illegible]

[illegible] যে ছজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর রচনা ও চিঠি আমি বিশ্লেষণ করেছি তাঁরা সকলেই এই বারোটি বিষয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এবং এঁরা কেউই কম্যুনিস্ট নন। কম্যুনিস্ট বা ছাপমারা সহযাত্রীদের বিবরণ আমি ইচ্ছে করেই ধর্তব্যের মধ্যে আনিনি। তবুও একথা বলে রাখা ভাল, এই ছজনের বিবরণের সাথে কম্যুনিস্টদের বিবরণের তফাৎ খুব একটা বেশি নয়।

এ সব জিনিস চোখে দেখে অভিভূত হওয়া কেবল [illegible] ভারতীয়ের পক্ষে হয়ত অসম্ভব নয়। এঁরা ফিরে এসে যখন সিদ্ধান্ত নেন যেহেতু গণতন্ত্র বজায় রেখে ভারতের মত অনগ্রসর দেশে প্রার্থিত অগ্রগতি সম্ভব নয় বা আশানুরূপ উন্নতি যখন হচ্ছে না সেইহেতু কিছুদিনের মত অন্তত চীনের পথ অনুসরণ করাই আমাদের উচিত—তখন তার ফল ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাঁদের এই ধরনের সিদ্ধান্তের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাঁরা আদৌ সচেতন নন। আমি এই জাতীয় এক

ইনটেলেকচুয়ালকে এমন অদ্ভুত কথাও বলতে শুনেছি, 'ডেমোক্র্যাসিই আমি চাই, আমি গণতন্ত্রেরই ভক্ত, তবে কি জানেন, মাঝখানে একটু ডিক্টেটরশিপ হলে মন্দ হত না।" ডিক্টেটরী রাষ্ট্রব্যবস্থা যে গণতন্ত্রের কবর, আমাদের অধিকাংশ ইনটেলেকচুয়াল সে তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন বলে মনে হয় না।

চীন থেকে ফিরে এসে এই সব ভারতীয় প্রতিনিধিরা যদি তথ্য সহকারে ভারত ও চীনের বৈষয়িক উন্নতির তুলনামূলক একটি চিত্র এঁকে আমাদের উপহার দিতেন, তাহলে আমরা সত্য সত্যই উপকৃত হতাম। চীন এমন একটা দেশ, যাকে উপেক্ষা করা বা যার সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকা আমাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই 'চীন কোন উন্নতিই করতে পারেনি' একথা বলা যেমন মূর্খতা, তেমনি 'নয়াচীন ফুসমন্তরে যাবতীয় দুঃখ-ধান্দা মিটিয়ে দেশটাকে অমরাবতীতে পরিণত করেছে' এমন একটা ধারনা প্রচার করাও তেমনি আহাম্মকি।

চীন রাতারাতি তার দারিদ্র্য দূর করার প্রয়াসে রাষ্ট্রযন্ত্রের চাকায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গুঁড়িয়ে পরিবারের কাঠামোটাকে ভেঙে সমাজকে তচনচ করে ফেলল। এবং এত মূল্য দিয়ে এ পর্যন্ত তার নীট লাভ কি হয়েছে? সে দেশ থেকে চোর, ডাকাত, বেশ্যা, ভিক্ষুক তাড়িয়েছে, শহর গ্রামে পরিচ্ছন্নতা প্রতিষ্ঠা করেছে। আর নারী-জাতিকে মুক্তি দিয়েছে।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতিও সে দেশে হয়েছে। তবে কতটা, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ চীনা সরকার এক এক সময়, এক এক রকম হিসাব দিয়েছেন। 'সামনে বিরাট লাফ মারার' পর্যায়ে উন্নয়নের যে-সব অলৌকিক সংখ্যা ও তথ্য চীন সরকার সরবরাহ করেছিলেন (বিঘা প্রতি হাজার মন ধান এবং গ্রামের উনুনে ইস্পাত উৎপাদনের 'মনোহর

মন্ত্র নিরন্তর জপে তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আরেকটি মন্ত্রও তারা জপেছিল—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মন্ত্র। আমাদের সংস্কার এটাকেও অতি সহজে গ্রহণ করেছিল। আমরা ভেবে দেখিনি যে এটা আরও অবাস্তব। ভেবে দেখিনি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের মালিকানা একেবারে বদলে গিয়েছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার পশ্চিম ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলোর অধিকাংশই স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত রাশিয়ার উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তিব্বত লাল চীনের গ্রাসে। সমগ্র এশিয়াতে চীন আজ নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। ভারত আক্রমণ তারই বৃহত্তম সূচনা। এশিয়ার সংহতি, আফ্রো-এশিয়া ঐক্যের আওয়াজ যে ফাঁকা, গোটা জিনিসটাই যে ভুয়া, সে কথা, এই আঘাত খাওয়ার পরেও কি আমাদের বুদ্ধিজীবীরা হৃদয়ঙ্গম করবেন?

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

সংবাদে প্রকাশ, উগ্র হিন্দী-প্রেমী রামেশ্বরানন্দজী লোকসভার প্রাঙ্গণে ভাষা বিলটি অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার জন্য একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।—

"অহিন্দীভাষীদের এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই, এটা হিন্দী ছায়াছবির আউট-ডোর স্যুটিং মাত্র।"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

ভাষা বিল বিতর্কে ইংরেজী "শ্যাল" এবং "মে" শব্দের প্রকৃত অর্থ লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছিল।—"উঠবেই হবে; জনৈক অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত নাকি বি ইউ টি=বাট্ হলে পি ইউ টি=পাট্ কেন হবে না ইহার ব্যাকরণগত কোন সদুত্তর না পেয়ে ইংরেজী অধ্যয়ন ত্যাগ করেছিলেন। এখন বড় প্রশ্ন ইংরেজী বর্জনের "শ্যাল" আর 'মে' নিমিত্ত মাত্র।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে নাকি বলিয়াছেন যে, ১৪ ক্যারেট সোনা মাত্র, আসলে ইহা হইবে ৯ ক্যারেট।—"তারই বা প্রয়োজন কী, মর্কোকিং কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা করে দিলেই হয়, আর এ ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মতও বটে।"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

বিহারের প্রকাশ শাসানুগ মণী দিয়াছেন—পরিবার নিয়ন্ত্রণই হইল ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র উপায়।—"এই কি গো শেষ দান"—শ্যামলাল গান গাহিয়া উঠিল। তাহাকে যে কবে হইতে গানে পাইয়াছে তা জানি না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে, চীন যে সমুদ্রের দিক হইতে ভারত আক্রমণ করিবে না—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।—"পড়েছেন নিশ্চয়ই তবু নেহরুজীকে আর একবার একচক্ষু হরিণের গল্পটি পড়তে অনুরোধ করব।"—বলেন বিশু খুড়ো।

সমুদ্রের তলদেশে যে সঞ্চিত সম্পদ রহিয়াছে সেই সম্বন্ধে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্র হইতে ব্যাপক গবেষণা চলিতেছে।—"সেইসব সম্পদে নিশ্চয়ই আমাদের অধিকার থাকবে না, কিন্তু যে অমূল্য সম্পদটি গঙ্গাস্রোতে উজান বেয়ে এসে গাঙ্গেয় ইলিশ নামে খ্যাত হয় সেই সম্পদটির সামান্য একটু শরিকানার জন্য দরখাস্ত আমরা এখন থেকেই করে রাখছি।'—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা গম খাইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা আলু খাইতে পারেন।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা আলু খাই চাই না খাই, মুখ্যমন্ত্রী মশাই নিঃসন্দেহে দয়াময়।''

প্রসঙ্গত অন্য একটি মৎস্যগন্ধী সংবাদের কথাও মনে পড়িয়া গেল। শুনিলাম, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, মৎস্য বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক মৎস্য-ব্যবসায়ীকে লাইসেন্স লইতে হইবে। তবে এ ব্যবস্থা কবে হইতে কার্যকর হইবে তা তিনি বলিতে পারেন না।—"কিন্তু আমরা পারি—আজি হতে শতবর্ষ পরে!"—কবিতায় মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

আমদানি সম্পর্কিত কড়াকড়ি কিছুটা হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল এবং শুনিলাম, অতঃপর কিছু পরিমাণ স্কচ হুইস্কি আমদানি করিতে দেওয়া হইবে। শ্যামলাল গল্প শুনাইল—"কোন এক গেরস্ত তার ছেলেকে বাজার থেকে গাঁজা আনতে বলে দিয়েছিল। কিন্তু ছেলে গাঁজার বদলে চাল কিনে এনেছে দেখে বাপ রেগে আগুন, বললে, বা খেলে গোষ্ঠী বাঁচবে তা আনলি, নিয়ে এসেছ কসের চাল! বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্য সরকার সে-ভুল করেন নি, জনগণের wish কি জেনেছেন এবং গোষ্ঠী বাঁচার বস্তু হুইস্কিটিই আমদানি করছেন"!"

সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়াতে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাঝে মাঝে ব্যাপক ডাক্তারী পরীক্ষার ফলেই জনগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন এবং ফলে পরমায়ু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক আয়ুর ওপর ডাক্তারী পরীক্ষার কোন প্রভাবই নেই, ফলে পেঁচোর দৃষ্টিতে কত শিশুরই অকালমৃত্যু হচ্ছে।"

পশ্চিম পাকিস্তানের এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে জনৈক পীর গ্রামে গ্রামে এই কথা রটনা করিতেছেন যে, অচিরেই সেখানে এক ভূতের বিবাহ হইবে এবং বিবাহ উৎসবে ভোজনের জন্য গ্রামের সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বলি (কুরবানী) দেওয়া হইবে। তবে যে মায়েরা তাঁদের বাচ্চাদের লাল রঙ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিবেন তাহাদের বলি দেওয়া হইবে না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"নিঃসন্দেহে সবটি মতলবে ভূত। তবে লাল রঙের প্রতি এই প্রীতিতে মনে হচ্ছে এটা শুধু বিয়ে নয়, বিবাহের চেয়ে বড়।''

অস্ট্রেলিয়াতে নাকি আবিষ্কার করা হইয়াছে যে মৃদু আলো সারা রাত জ্বালাইয়া রাখিলে এবং গান [illegible] হইতে থাকিলে মুরগী বেশী ডিম দেয়।—লোড
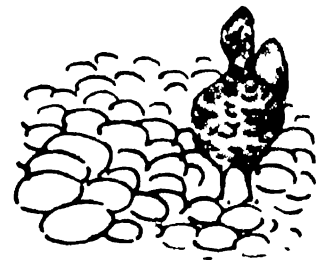
শেডিং-এর আশঙ্কা আছে বলেই আলোর ব্যবস্থা না করা ভাল। তবে রাগাশ্রয়ী গান না হয়ে অনুরাগাশ্রয়ী গান অর্থাৎ আধুনিক গান চলতে পারে।"—বলে শ্যামলাল।

খেলার মাঠে টিকিট বাবদ সাত লক্ষ টাকা আয়ের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংবাদে পড়িলাম। রাজ্য সরকার নাকি পরিকল্পনা করিতেছেন যে, এই সমস্ত টাকাই খেলা-ধূলার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইবে।—"শুধু যাঁরা খেলাধূলা দেখবেন তাঁদের বসার ব্যবস্থাটা আগে যা ছিল তা-ই থাকবে।"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

বিদুর

নাট্যানুষ্ঠান : নতুন আইন

অঙ্ক আর আইন দুইই ভয়ংকর, উভয় বিষয়েই আমার সমান ভীতি। যে শূন্য একেবারেই শূন্য—শূন্যগর্ভ—সেই শূন্য সংখ্যার কোন পাশে বসালে কি হয় তাও আমার কাছে বিভ্রান্তিকর। এক (১) সংখ্যাটির পাশে শূন্যকে বসিয়ে দিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের মতন লাফ মেরে সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়, শূন্যগর্ভ শূন্যে তখন মিলনঘটিত পূর্ণতা। কিন্তু এক সংখ্যার কোন পাশে শূন্য বসালে মিলনযোগে দশ হয় ? আমরা বলি ডান পাশ ? কিন্তু তাই কি ? এক সংখ্যাটিকে আমি মুখোমুখি দেখি, আমরা পরস্পরে মুখে মুখে চেয়ে আছি তার ফলে আমরা যা ডান "এক" সংখ্যার তা বাঁ হওয়া উচিত। কিন্তু সবাই জানেন বাঁ পাশে শূন্যকে স্ত্রীর মতন বসানো যায় না, বসালে বিয়োগান্ত পরিণতি।

বলতে কি ছেলেবেলা থেকেই অংকের এই ধাঁধায় এমন ধোঁকা খেয়েছিলাম যে ও পথে আর এগুনো গেল না। তেমনই আইনের ধোঁকা। শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে জুয়ো খেলা—সেটা খেলা; ওই মাঠের মধ্যেই একবার তে-তাস খেল পয়সা দিয়ে—সঙ্গে সঙ্গে পুলিসে ধরবে।

আমার ঠিক নাম মনে পড়ছে না কিন্তু বিরাট এক আইনজ্ঞ বলেছিলেন "যুক্তি দিয়ে আইন তৈরী হয় নি, হয়েছে অভিজ্ঞতা দিয়ে।" হয়ত কথাটা পুরোপুরি সত্য। কিন্তু তাও যেন কি রকম গোলমেলে। বাড়িতে চোর এল—তুমি চোরাই মাল সমেত চোরটিকে ধরলে। কিন্তু চোর ধরার উত্তেজনার রাগে কিংবা অনুরাগে একবার মাথাটি ফাটাও ত চোরের আদালতে তোমাকেই আগে লোহার খাঁচায় ভরবে। অথচ অভিজ্ঞতা বলে মানুষ এই রকমই, তার রাগ তার বশে থাকে না।

সম্প্রতি একটি আইন নিয়ে বিস্তর আলোচনা শুনেছি। ২০শে এপ্রিলের 'দর্পণে' এ বিষয়ে সুন্দর একটি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে : 'একটি অবাঞ্ছিত আইন'।

পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান আইন সম্পর্কে উক্ত লেখাটিতে আইন এবং আইনের ব্যাখ্যা যথাসম্ভব দেওয়া হয়েছে আমি ও পথে যাব না। অন্য কয়েকটি কথা তুলব।

ভূমিকা হিসেবে এটুকু এখানে বলা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কে একটি আইন তৈরী করতে চলেছেন। বিধানসভায় পেশ হবার পর তা অনুমোদিত হলে আইন হিসেবে প্রবৃত্ত হবে।

এই আইনটির মূল লক্ষ্য : পশ্চিমবঙ্গের নাট্যানুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করা। অন্তত আমার সে-রকম ধারণা হয়েছে। কেননা, আমি দেখছি গেজেটে প্রকাশিত আইনের খসড়াটির মাথায় এই ক'টি কথা লেখা আছে :

.... "for the better control of dramatic performances in West Bengal."

সরকারী উদ্দেশ্যকে আমি আপাতত না হয় সাধুবাদ দিয়ে গ্রহণ করে নিলাম। তাঁরা যখন বলছেন, নাট্যানুষ্ঠান অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য এই আইন তখন এটা ধরে নিতে হবে। কিন্তু তারপর এই প্রশ্নগুলি পর পর দেখা দেবে যে কি অর্থে সুনিয়ন্ত্রণ ? কেন সুনিয়ন্ত্রণ ? যে খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে কতটুকু সুনিয়ন্ত্রণ আছে—ইত্যাদি।

সরকারের মনে কি আছে আমি জানি না। তবে এমন কথা প্রসঙ্গতঃ শুনেছি যে সারা পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি [illegible] প্রতিষ্ঠান আছে, [illegible] সংস্থা যারা সারা বছরই একটি [illegible] করে থাকেন। এমন কথাও শুনেছি যে আজকাল কিছু শিল্পীর [illegible] শিল্পীর [illegible] এই পেশা থেকেই [illegible]। আবার এমন কথাও শুনেছি [illegible] অত্যন্ত অর্থ উপার্জন করে এবং [illegible] উচ্ছৃঙ্খল হয় ইত্যাদি।

[illegible] যায় না। [illegible] এই সব নাট্য প্রতিষ্ঠান [illegible]। [illegible] সরকার হঠাৎ একটি আইন তৈরীর কথা [illegible]। [illegible] সরকারী নিয়ন্ত্রণ [illegible] জরুরী এবং অপরিহার্য [illegible] সরকার এই আইন [illegible] এই সন্দেহ।

[illegible] এই নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না।

একথা সত্য যে [illegible] কোনো ধরনেরই [illegible] ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কোনো না [illegible] ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু সভ্য সমাজ এই নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয় যদি দেখে—

—"If it is effective as a means of preventing harm or injury to others, whether as individuals or as the general public or as the State"

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল আমি উক্ত নতুন আইনটির অন্যতম শর্ত 'সেন্সার-শিপের' কথা আলোচনা করছি না।

আমার হাতের কাছে [illegible]

কবি, কাব্য ও কবিকর্মের আলোচনা

রবীন্দ্রকথা : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য দু টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম এবং স্বদেশ-চিন্তার কয়েকটি দিক নিয়ে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এই বইটি লিখেছেন। প্রবন্ধগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। স্বল্পকথায় লেখক রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং জীবন, রবীন্দ্রকাব্যের দৃশ্যপট, জাতীয়তা ও রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, সংগঠক রবীন্দ্রনাথ, কেটি উপেক্ষিতা, রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাজচিন্তা, রম্যরচনা ও রবীন্দ্রনাথ—এই কটি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। আলোচনার পরিসর ক্ষুদ্র হওয়াতে লেখক উপরোক্ত বিষয়গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা না দিয়ে সাধারণভাবে রবীন্দ্রচিন্তার মৌলিক সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়-এর আলোচনা-পদ্ধতি সরল এবং সহানুভূতিপূর্ণ। সাধারণের কাছে আলোচনাগুলি ভালো লাগবে। ২৮৮।৬২

মধুসূদন ও উত্তরকাল : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ানা। মূল্য পাঁচ টাকা।

আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের সম্পাদক জানিয়েছেন যে, মধুসূদন সম্পর্কে উত্তরকালের অভিমতটি প্রকাশ করবার জন্যই এই গ্রন্থখানির পরিকল্পনা। কিন্তু সম্পাদক মশাইকে জিজ্ঞাসা করি, যে দশজন লেখকের রচনা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তাঁরাই কি উত্তরকালের প্রতিনিধি? অর্থাৎ এঁদের মধ্যে কেউ যদি কৃপাপরবশ হয়ে মধুসূদনকে পাস-মার্ক দেন তবেই কি বুঝব যে উত্তরকালের বিচারে মধুসূদন পাস করেছেন? মধুসূদনের দুর্ভাগ্য! উত্তরকালের দুর্ভাগ্য!

এই সংকলন গ্রন্থে যে রচনাগুলি সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে অশ্রুকুমার শিকদার রচিত 'মেঘনাদবধ : কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা' এবং আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত রচিত 'মধুসূদন ও আধুনিক মন' লেখা দুটি মোটামুটি ভালো। বিশেষ করে অশ্রুকুমার শিকদারের লেখাটির মধ্যে একটা বক্তব্য আছে এবং সে-বক্তব্যকে তিনি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অন্য প্রবন্ধগুলির বক্তব্য অস্পষ্ট, ভাষা ততোধিক অস্পষ্ট।

বাংলা গদ্য যে তথাকথিত "উত্তরকাল"-এর প্রতিভূদের হাতে কি বিকৃত এবং অপরিচ্ছন্ন রূপ পেয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই সংকলন গ্রন্থখানিতে। সুতরাং মধুসূদনের আলোচনার জন্যে নয়, বিকৃত-গদ্যের নিদর্শন রূপে সংকলন গ্রন্থখানি ভবিষ্যতে মূল্যবান দলিলরূপে গ্রাহ্য হবে।

এই গদ্যের একটু নমুনা দিই—

রথীন্দ্রনাথ রায় রচিত "মধুসূদনের পত্র-সাহিত্য" থেকে—

"আত্মোদ্ঘাটনের সুমসৃণ বাণীরূপ", "স্বল্পতম বিচ্ছেদের কাতরতাও আবেগ-নিবিড় মনের স্পর্শে এক দীর্ঘ-স্থায়ী আবেদনের বাণীবাহক", "দ্বিধা-হীন স্পষ্টভাষণ" (দ্বিধাযুক্ত স্পষ্টভাষণ বস্তুটির সঙ্গে লেখকের অবশ্যই পরিচয় আছে), "অনায়াসলব্ধ দুরাভিসার" (অর্থ কি?)।

আলোক সরকার রচিত "চতুর্দশপদীর ভূমিকা" থেকে—

"আবেগের স্বতঃস্ফূর্তিই......কবিতার অনন্য অভিলাস", "উজ্জ্বল উচ্চারিত" "শক্তির চীংকৃত অপব্যয়",

"আবেগ ও হৃদয়তার উজ্জ্বল সংরাগ যেমন এখানে দীপ্ত সঞ্চারিত, সেইরকম আবেগ অথবা হৃদয়তার প্লাবিত উন্মত্ততা অনুপস্থিত, বিচ্ছিন্নের একাগ্রতায় আবেগ এবং হৃদ্য অনুভবের প্রশান্ত পর্যবেক্ষণ।"

এই গদ্য যাঁরা লিখতে পারেন তাঁদের ইংরেজীতে বলে 'spoilt artistic child', এবং বাংলায় একেই বলে, আলোক সরকারের ভাষায়, "প্লাবিত উন্মত্ততা"। কথাটার মানে জানি না। তবে মনে হচ্ছে একটা বড় রকমের উন্মত্ততা। ৪০০।৬২

৪০০।৬২

বেদ মীমাংসা

বেদ-মীমাংসা—প্রথম খণ্ড সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ সংখ্যা—১৩ ১, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য দশ টাকা।

"বৈদিক যুগ" দিয়েই একদা ভারতবর্ষের ইতিহাসের উষাকাল শুরু হয়েছে। বেদের মাঝেই যেন ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম সমগ্রভাবে আত্মসচেতন হয়ে উঠল। প্রসঙ্গত এ কথা বলে রাখা ভাল যে এর চাইতেও প্রাচীন কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতি হয়ত এদেশে অনুপস্থিত ছিল না, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে কালক্রমে বৈদিক ঐতিহ্যের মধ্যে তা "জীর্ণ" হয়ে গেছে। একটা জাতির বহু সহস্রব্যাপী চিন্তা ও অধ্যাত্মচিন্তার ধারাকে এই বৃহদায়তন সাহিত্যের আধারে ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। যুগ-প্রাচীন সময় থেকেই বৈদিক ঋষিরা নিজের সম্পর্কে এবং বিশ্বের সম্পর্কে যে ধারায় চিন্তা করেছেন, সমাজের

"বিনোদ", "বিদ্যা" ও "বিনয়"

নতুন দিল্লিতে চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসবে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর বক্তৃতায় ছায়াছবির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, "বিনোদ", "বিদ্যা" ও "বিনয়"—এই তিন নিয়েই ছায়াছবি।

দর্শকের চিত্তবিনোদনই যে ছায়াছবির একমাত্র লক্ষ্য নয়, 'বিদ্যা' ও 'বিনয়' দানও যে তার সঙ্গে সংযুক্ত—এই অভিমতই ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর ভাষণে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। চলচ্চিত্র যদি দর্শককে সুশিক্ষা দেয়, 'বিদ্যা' ও 'বিনয়' দান করে তবে সুখেরই কথা। কিন্তু জনশিক্ষাদানই চলচ্চিত্রের সার্থকতার একটি অপরিহার্য শর্ত কিনা তা নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

চলচ্চিত্র আর্ট কিনা তা-নিয়ে আজকের দিনে আলোচনার শেষ নেই। আবার এ যুগে চলচ্চিত্রকে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এমন চলচ্চিত্রকারেরও অভাব নেই। তাঁরা নন্দনতত্ত্ব দিয়ে দর্শকের চিত্তবিনোদন ঘটিয়েছেন। ছায়াছবিতে আর্ট ও 'বিনোদে'র মেলবন্ধন যদি ঘটে তবে সে শিল্পসৃষ্টি নিঃসংশয়ে সার্থক।

কিন্তু 'বিদ্যা' ও 'বিনয়' দানের ভূমিকা গ্রহণ করে চলচ্চিত্র যখন উদ্দেশ্যধর্মী হয়ে পড়ে তখন তার গোত্রও পৃথক হয়ে যায়। আমাদের সমাজে যে ছবি লোকশিক্ষা দান করে, জাতীয় জীবনগঠনে সে-সব ছবির মূল্য অনস্বীকার্য। এই ধরনের ছবি যদি সরকারের আনুকূল্য ও আশীর্বাদ লাভ করে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু যে ছবি অন্তরঙ্গ রসে ও বহিরঙ্গ রূপে শিল্পসমৃদ্ধ, তা-ই সকল দেশের রসগ্রাহীদের কাছে আদরণীয়। যে ছবির রসোপকরণ উদ্দেশ্যনির্ভর, সে ছবি রসিকজনকে তৃপ্তি দিতে অক্ষম। অনাবিল রসের আনন্দই রসিকব্যক্তির কাম্য।

[illegible]

দীপান্বিতা প্রোডাকসন্স-এর "[illegible]" (প্রযোজনা-পরিচালনা : দিলীপ নাগ) ছবির মুখ্য নারীচরিত্রে কাজল গুপ্ত
ফটো—[illegible]

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ছবি

বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ভারতীয় চিত্র নির্বাচনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য চিত্র নির্বাচনের দায়িত্ব যে কত গভীর তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নতুন করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। যে ছবি তাঁরা বিদেশে পাঠাবেন সে ছবিই যে পুরস্কার পাবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু এমন কোন ছবি যদি বিদেশে পাঠানো হয় যা দেখে বিদেশী চিত্ররসিকরা ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশের সুযোগ পেতে পারেন, তবে তা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। ইদানীং কালে বিদেশে ভারতীয় ছবির [illegible] বেড়েছে। বিশ্বচলচ্চিত্রের মানচিত্রে ভারতীয় ছবি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্প্রতি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এমন কয়েকটি ভারতীয় ছবি পাঠানো হয়েছিল যেগুলি পুরস্কার তো দূরের কথা, সেখানকার দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টিও আকর্ষণ [illegible] পারেনি। বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকায় [illegible] ছবির যে সমালোচনা বেরিয়েছে [illegible] ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের গৌরব [illegible] পারেনি। অথচ পুরস্কার না [illegible] বিদেশে সম্মান পেতে পারে এমন [illegible]

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখে।

উজ্জ্বল-চরিত্রে উত্তমকুমারের অসাধারণ অভিনয় এ ছবির প্রধান আকর্ষণ। দুটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও স্বভাব, বিপরীতধর্মী মানসিকতা ও জীবনভাবনা উত্তমকুমার তাঁর অভিনয়-দক্ষতায় অপরূপভাবে প্রকাশ করেছেন। রতনের চরিত্রে এবং দেবাশিসের প্রবীরের আত্মদ্বন্দ্ব ও চিত্তচাঞ্চল্যের অভিব্যক্তিতে তিনি যে অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর শিল্পীজীবনের আর একটি স্মরণীয় কৃতিত্ব হয়ে থাকবে।

উত্তমকুমারের পরেই যিনি অভিনয়ে দর্শকের মন জয় করেন তিনি হলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এমন চিত্তাকর্ষক ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ যে, তিনি দর্শকদের অভিনীত চরিত্রটি সম্বন্ধে দ্বৈতবিচারের অবকাশই দেন না। তাঁর সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকের মনে রেখাপাত করে। প্রবীরের প্রণয়িনীর ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় সুন্দর এবং মার্জিত।

কয়েকটি বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে চরিত্রোচিত এবং কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, গীতা দে গঙ্গাপদ বসু, নিভাননী এবং প্রেমাংশু বসু। অন্যান্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায় ধীরাজ দাস, আশা দেবী, শৈলেন গাঙ্গুলী, ম্যাল্কম, শোভেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় ছবির আবহ-সুর রচনায় প্রশংসনীয় রস-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। যে সময়টিতে সতী প্রিয়মিলনের জন্য অধীর, সেই মুহূর্তের আবহ-সুরে তার আত্মনিবেদন ও প্রেম-ব্যাকুলতার ভাবটি সুন্দরভাবে অনুসরণ করেছে। ছবির দুটি গানের সুরারোপ চমৎকার। কিন্তু প্রয়োগের দোষে গান দুটি মনে দাগ কাটে না।

আলোকচিত্র গ্রহণের কাজে বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ অনিন্দ্যসুন্দর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রসম্পাদনা, যতীন দত্তের শব্দানুলেখন এবং সত্যেন রায়চৌধুরীর শিল্পনির্দেশ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

ছবির পর ছবি

সুবর্ণরেখা

জে জে ফিল্ম করপোরেশনের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "সুবর্ণরেখা" অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাচ্ছে। শ্রীরাধেশ্যামের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করেছেন ঋত্বিককুমার ঘটক। অভি ভট্টাচার্য, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, গীতা দে, বিজন ভট্টাচার্য, সীতা মুখোপাধ্যায়, স্বপন ও রুমা বসু ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত পরিচালনা করেছেন বাহাদুর খাঁ।

[illegible]

[illegible]

পাহাড়ীর, তরুণ রায়, দীপিকা দাস, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহরপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, অরুণ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভা সেন বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের শিল্পী। সুর-রচনায় রয়েছেন রবিশঙ্কর।

মালাচন্দন

প্রযোজক-পরিচালক ভানু মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি "মালাচন্দন"-এর চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। সন্ধ্যারানী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, গীতা দে, সুখেন, প্রবীরকুমার ও দীপ্তালি রায় ছবির মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন। আশিস ও ইন্দ্রনীল ছবির সুরকার।

ধন্য তুমি কামারপুকুর

গত সপ্তাহে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এ এল প্রোডাকশন্সের প্রথম নিবেদন "ধন্য তুমি কামারপুকুর" ছবির শুভমুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ছবির প্রধান চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন মলিনা দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কমল সরকার ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। চিত্র পরিচালনায় রয়েছেন কথক মঞ্চের এক কলাকুশলীগোষ্ঠী। বাঁশরী লাহিড়ী সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিদায়

গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে পোদ্দার প্রোডাকশন্স-এর "বিদায়" ছবির শুভমুহূর্ত উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রফুল্ল চক্রবর্তী ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও

'শান্তিবিলাস'-এর (উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিঃ) একটি দৃশ্যগ্রহণের পূর্বে শশাঙ্ক ঘোষ ও সবিতা বসুকে নির্দেশ দিচ্ছেন চিত্রপরিচালক মানু সেন

ফটো—দেব

পরিচালক। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সান্যাল দুই প্রধান শিল্পী।

মাসুল

এভারগ্রীণ ফিল্মস-এর প্রথম ছবি "মাসুল"-এর প্রারম্ভিক উৎসব গত সপ্তাহে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়। অরুণ দাশগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রবীন বসু।

বিশ্বরূপা পুরস্কার

গত ২২শে এপ্রিল বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের একটি বিশেষ সভায় সংস্থার মুখ্য সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রস্তাবিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্যানুষ্ঠান বিলটি যে-ভাবে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে, ঠিক সে-ভাবে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। জাতীয় নাট্যশালা পরিচালনার জন্য শ্রীসরকার একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ, বিশ্বরূপা, স্টার, মিনার্ভা ও রঙমহল নাট্যকার সংঘ ও অভিনেতৃ সংঘ, বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিষদ এবং আকাদমি কর্তৃক অনুমোদিত নাট্য সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে যাতে এই ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয় সে প্রস্তাবও তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। তা ছাড়া, বাংলার সংস্কৃতি ...

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন কলামন্দিরে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য সমবেত হয়েছিলেন নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু ও নির্মলা মিত্র

ফটো—দেশ

নিউ এম্পায়ারে জাদুখেলা

আগামী তেসরা মে থেকে নিউ এম্পায়ারে পি সি সরকার সপ্তাহব্যাপী জাদু প্রদর্শনী শুরু হবে। মোট চারশটি খেলা তিনি দেখাবেন। এই জাদু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন বীরেন ঘোষ।

সম্প্রতি এ-বি-টি-এ হলে সংগীত শিক্ষা-কেন্দ্র রাগেশ্রীর পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রথম বর্ষের ছাত্রী-দের গাওয়া সমবেত খেয়াল শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করে। পরিশেষে রবীন্দ্র-নাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সংগীতাংশ পরি-চালনা করেন শ্যামলেশ ঘোষ।

গত ২১শে এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতায় মুক্ত অঙ্গনে সুরকার ও সুগায়ক সুধীরলালের স্মরণ সপ্তবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন যথাক্রমে সুখেন্দু গোস্বামী ও চিন্ময় লাহিড়ী। ভাষণদানকালে তাঁরা সুধীরলালের সংগীত-প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। শনিবাসরের সম্পাদক নিখিল সেন তাঁর ভাষণে সুধীরলালের অমূল্য সুর-সম্পদগুলি রক্ষার জন্য শিল্পীদের নিকট আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করেন চিন্ময় লাহিড়ী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, নীতা সেন, দ্বিজেন চৌধুরী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যো-পাধ্যায়, মৃণাল গাঙ্গুলী, মৃণাল চক্রবর্তী তন্দ্রা মৈত্র, শ্যামলেশ ঘোষ প্রভৃতি।

"বিশ সাল বাদ" ছবির পর সংগীত পরিচালক-চিত্রপ্রযোজক হেমন্তকুমার তাঁর পরবর্তী ছবি "কোহরা"র কাজ শুরু করেছেন। বর্তমানে মডার্ন স্টুডিওতে বীরেন নাগের পরিচালনায় "কোহরা"র শুটিং চলছে। নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ ও ওয়াহীদা রেহমান। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে ললিতা পাওয়ার, তরুণ বসু, চাঁদ ওসমানী, মনো-মোহন কৃষ্ণ, মদন পুরী, দেবকিষণ ও অসিত সেন অভিনয় করছেন।

ভারতীয় চিত্রের মধ্যে নেপালে প্রথম শুটিং হবে এপ্রিল ফুল ছবির। জুন মাসেই প্রযোজক-পরিচালক সুবোধ মুখার্জি নেপালে ছবির কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করবেন। বিশ্বজিৎ ও সায়রা বানু এ ছবির নায়ক-নায়িকা। শঙ্কর জয়কিষণ সুরকার।

নেফা অঞ্চলের বমডিলা ও তেজপুরে ফুল বনে অঙ্গারে হিন্দী ছবির কয়েকটি বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। সুরজ প্রকাশ ছবিটি পরিচালনা করবেন। রাজকুমার মালা সিনহা, আশিসকুমার ও ডনি ওয়াকার ছবির প্রধান শিল্পী। কল্যাণজী আনন্দজী ছবির সুরকার।

প্রযোজক পরিচালক এস ডি নারাং কাশ্মীরে তাঁর বর্তমান চিত্রপ্রয়াস শেহনাই-এর একুশ দিনব্যাপী বহির্দৃশ্য গ্রহণের একটি কর্মসূচী তৈরি করেছেন। বিশ্বজিৎ ও রাজশ্রী ছবির নায়ক-নায়িকা। রবি সংগীত পরিচালক।

খেলার মাঠে

একলব্য

রাজ্য সরকার কলকাতা ময়দানের ঘেরা মাঠের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রধান প্রধান পরিচালকদের মধ্যে গেল গেল রব উঠেছে। তাঁদের বক্তব্য—খেলাধুলো রসাতলে গেল। খেলা থেকে অ্যামেচার স্ট্যাটাস চলে গেল, খেলার মধ্যে রাজনৈতিক ও সরকারী প্রভাব এসে পড়ল—অলিম্পিক চার্টার অনুযায়ী যেটা সংবিধান-বিরোধী।

সবারই জানা আছে, বাংলার খেলাধুলোর দুই প্রধান পরিচালক ছিলেন শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ও শ্রী এম দত্ত রায়। এঁদের খেলাধুলোর ডিক্টেটরও বলা যেতে পারত। দুজন ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ভিন্ন মতের জন্য দুইয়ের মধ্যে এখন আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ। ফলে, বাংলার ফুটবল ও ক্রিকেট ক্ষেত্রের পরিচালনা থেকে পঙ্কজ গুপ্ত বিতাড়িত। অন্যান্য খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব অতি সামান্য। সেই পঙ্কজ গুপ্তও রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘেরা মাঠের দায়িত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়ে খেলা থেকে অ্যামেচার স্ট্যাটাসের ইজ্জত নষ্ট হবার প্রশ্ন তুলেছেন।

স্বীকার করি, ভালো-মন্দর মিশিয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে শ্রীগুপ্তের দান এবং অবদানের অভাব নেই। এ কথাও স্বীকার্য, অলিম্পিক চার্টার অনুযায়ী অ্যামেচার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং সরকারী প্রভাব সংবিধান-বিরোধী।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বাংলার খেলাধুলো কি কোনদিন রাজনৈতিক এবং সরকারী প্রভাবমুক্ত ছিল? অলিম্পিকে দল পাঠাবার জন্যও কি সরকারী সাহায্য এবং সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হয়নি?

ক্রীড়াক্ষেত্রে পঙ্কজ গুপ্তের রাজত্বকালেই অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং মুসলীম লীগের অন্যতম স্তম্ভ খাজা নাজিমুদ্দিনকে আই এফ এ-র সভাপতি করা হয়েছিল। তখন কোন প্রতিবাদ ওঠেনি। মন্ত্রী থাকার সময়ে শ্রীভূপতি মজুমদারকে আই এফ এ-র সভাপতি করা হয়েছে। তখনও সরকারী প্রভাবের প্রশ্ন আসেনি। পরম ক্রীড়ামোদী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন বাংলার মন্ত্রিসভায় আসন পেলেন তখন তাঁকে অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতির পদে সাদরে বরণ করা হল। আবার শ্রীরায় যখন মন্ত্রিত্ব থেকে সরে গেলেন তখন অ্যামেচার ক্রীড়াসংস্থার পদ থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। খেলাধুলোয় এসব কি সরকারী প্রভাবের প্রমাণ নয়?

শুধু কি তাই? ময়দানের ঘেরা মাঠ এবং অন্যান্য মাঠের ভাগবাটোয়ারা ব্যবস্থা এতদিন পুলিশ কমিশনারই করে এসেছেন। পুলিস কমিশনারের অনুমতি ছাড়া চ্যারিটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি, কমিশনারের অনুমোদন ছাড়া চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের এক কানাকড়িও ব্যয় করা যায় নি। এ-ও সকলের জানা আছে, আই এফ এ-র সম্পাদক শ্রী এম দত্ত-রায় একবার পুলিসের অনুমোদন ব্যতিরেকে চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে লালবাজারের তদানীন্তন ডেপুটি পুলিস কমিশনার শ্রী পি কে সেনের নির্দেশে এম দত্ত রায়কে খেলা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। দর্শকদের কাছে বিক্রীত টিকিটের মূল্যও ফেরত দিতে হয়েছিল।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যেভাবেই হোক সরকারী এবং রাজনৈতিক প্রভাব খেলার মধ্যে চিরদিনই ছিল। তবে প্রতিবাদের কণ্ঠ আজ এমন উচ্চ গ্রামে কেন?

কারণ সুস্পষ্ট। এতদিন দুধে হাত পড়েনি। আজ সরকার নিজের ভাঁড়ে দুধ দোহন করতে এগিয়ে এসেছেন। হঠাৎ দুধের পিপাসা ঘোলে মেটাতে হলে দুঃখ স্বাভাবিক। তাই ক্রীড়াক্ষেত্রের মূল গায়েন এবং দোহারদের ধুয়োর সুর উচ্চ গ্রামে উঠেছে।

অবশ্য চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ ছাড়া সাধারণ খেলার অর্থে ক্রীড়া-পরিচালকদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু চ্যারিটির টিকিট বিলি-বাটোয়ারার ক্ষমতাটাই ছিল তাঁদের প্রভাব-বিস্তারের মারণাস্ত্র। তা ছাড়া পরের টাকায় পোদ্দারি করার প্রলোভনটাই কি কম, চ্যারিটির টাকাতেই— আই এফ এ-র আমীরী চালের চালচলন, মাসে মাসে সম্পাদকের মোটা মাইনা, রাহা খরচ গ্রহণ। অথচ আগে অবৈতনিক সম্পাদকের দ্বারাই অতি সুষ্ঠু-ভাবে আই এফ এ-র কাজকর্ম পরিচালিত হয়েছে। এখন টিকিট-পত্র যদি সরকার বিলি করেন, টাকাটা তাঁরা খরচ করেন তবে পরিচালকদের হাতে রইল কি?

• • •

রাজ্য সরকার ঘেরা মাঠের ভার গ্রহণ করার ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে, সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের গর্ভে। বহু ক্ষেত্রেই তাদের ব্যর্থতার ছবি প্রকট। এ ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা দেখা যেতে পারে যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং আন্তরিকতার অভাব থাকে। সূচনাতেই অর্থাৎ মাঠের ভাগ-বাটোয়ারার নূতন ব্যবস্থাতেই কিছু কিছু ভুলচুক হয়েছে। তৃতীয় ডিভিসনের একটি টিমের সঙ্গে প্রথম ডিভিসনের একটি টিমকে একটি খেলা মাঠে সমস্ত অধিকার দেওয়ায় এবং বাকি

দুটি খেলা মাঠে ছয়টি প্রথম ডিভিসন ক্লাবকে জুড়ে দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও আরম্ভ হয়েছে।

তবে সমস্ত নতুন ব্যবস্থারই প্রথম দিকে কিছু কিছু ত্রুটি থাকে। উদ্দেশ্য সাধু হলে সেটা দূর করে নিতে কষ্ট হয় না। নতুন ব্যবস্থায় সবচেয়ে ভাল বলা দুটি বড় ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের দুই মাঠে অবস্থান। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল শুধু বড় ক্লাবই নয়, পরস্পরের তীব্র ও চির প্রতিদ্বন্দ্বী। একে অপরের ভাল দেখতে পারে না, কারো কথা

ফুটবলের প্রস্তুতি—কারিগরের হাতের গুণে সুন্দর রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে খেলার বল। মরসুম এসে গেছে—বল তৈরীর জন্য কারিগরের হাতের বিরাম নেই

কারো সহ্য হয় না। এক মাঠে দুইয়ের অবস্থানের ফলে কলহ-বিবাদ বেড়েছে, [illegible] পেয়েছে, অনেক সময় দু দলের সমর্থক অহেতুক অশান্তির [illegible] ভাঙচুর। খেলার মাঠ [illegible] দুটি মাঠে দুটি ক্লাবের অবস্থান [illegible] ব্যবস্থা। এক বাড়িতে থেকে [illegible] বাড়িতে [illegible] যায়। [illegible] ইস্টবেঙ্গল ও মোহন-[illegible]

সরকারের উদ্দেশ্য যে মহৎ, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে এই সম্পর্কে যে প্রেস নোট প্রচার করা হয়েছে তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, খেলাধুলো থেকে সংগৃহীত অর্থের এক পয়সাও রাজ্যের শাসন খাতে ব্যয় করার পরিকল্পনা সরকারের নেই। খেলাধুলোর উন্নতি, শিক্ষাব্যবস্থা, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান এবং অক্ষম ও অশক্ত খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা হবে। আবার ক্রীড়া সংস্থাগুলির কাজ-কর্ম এবং খেলাধুলোয় হস্তক্ষেপ করাও সরকারের উদ্দেশ্য নয়। মোটের উপর খেলা-ধুলোর কাঠামো বজায় রেখে খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহারই সরকারের নীতি।

খেলার মাঠের কর্তৃত্ব যেমন [illegible] খেলোয়াড়ী [illegible] থেকে যে অর্থ উপার্জন করেছেন তার [illegible] খেলাধুলোর উন্নতির জন্য [illegible] পরিকল্পনা করা [illegible] হয়নি। [illegible] কিন্তু [illegible] দেওয়া [illegible] [illegible]

ক্লাবকে জুড়ে দেওয়া নিয়ে আগে একদিন আলোচনা করেছি। এ সম্পর্কে ভুক্তভোগী ক্লাবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলাম, তাদের সমস্যা সত্যিই কঠিন। বিশেষ করে মহমেডান মাঠে সাড়ে আট শ আসন প্রাপ্ত রাজস্থান ক্লাবের, ঘেরা মাঠের বাইরে থেকে ঘেরা মাঠে সভ্য আসন পেয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও রাজস্থান ক্লাব। ইস্ট বেঙ্গল মাঠে স্পোর্টিং ইউনিয়নের সভ্য আসনের কিছু আকর্ষণ আছে। শুধু ভাল খেলা দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু মহমেডান মাঠে রাজস্থানের সভ্য আসনের কি আকর্ষণ? যখন যে মাঠে ক্লাবের খেলা থাকবে, রাজস্থানের সভ্যরা সে মাঠে প্রবেশ অধিকার পাবে। আকর্ষণহীন মহমেডান মাঠে সাড়ে আট শ সভ্য আসন রেখে তাদের লাভ? সে আসনে সব সভ্যের স্থান সঙ্কুলান হবে না, উপরন্তু ঝামেলা বাড়বে। ক্লাব তাঁবু থাকবে পুরনো মাঠে। খেলার মাঠ থাকবে তাঁবুর পাশে, সভ্য আসন বে-পাড়ায়।

সাড়ে আট শ সভ্য আসন বিশিষ্ট নতুন গ্যালারী করার ঝুঁকি এবং খরচও কম নয়। প্রায় তিরিশ হাজার টাকার মত খরচ হবে। লোহালক্কড়ের অভাব, পাটাতন এবং বেঞ্চ তৈরির সেগুন কাঠের অগ্নিমূল্য। প্রায় সোনার দামের মত। ১৪ ক্যারাটের কাঠের বেঞ্চ তৈরী করলে সে বেঞ্চ ফুটবল দর্শকদের ভার সইতে পারবে না। তারপর বেঞ্চ ইত্যাদির নিরাপত্তার ভার কে গ্রহণ করবে? ময়দানের মাঠ থেকে গোলপোস্টই চুরি হয়ে যায় আর মালিকবিহীন সেগুন কাঠের বেঞ্চ পড়ে থাকবে?

মাঠের পুনর্বণ্টনের সময় সরকারের তরফ থেকে এ সমস্যাগুলো ভেবে দেখা হয়নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম ডিভিসনের চারটি ক্লাবের পরিবর্তে এখন সাতটি ক্লাবকে ঘেরা মাঠের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। যে তিনটি নতুন ক্লাবকে এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে তাদের দুটিকে যদি তাঁবু তৈরির সুযোগ দিয়ে মোহনবাগানের দক্ষিণ পাশে এবং একটি কালকাটা মাঠে স্থানান্তরিত করা হত তবে এমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। অবশ্যই ক্লাবগুলির সভ্যসংখ্যা সীমিত রাখার ব্যবস্থা রাখতে হত। সে ব্যবস্থা তো এখনো হয়েছে। না হলে রাজস্থান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়নের আসন-সংখ্যা [illegible] ?

[illegible] স্পোর্টস সাম-[illegible]

মুকুল

কণা বসু

...রী কণা বসু। খেলাধুলো মহলে নামটি মোটেই পরিচিত ছিল না। ...ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ভারতের ...কামন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সঙ্গে কাগজে ছবি ...বেরোনর পর অনেকেই কণা বসুকে চিনে ...ফেলেছে।

অবশ্য আরও ভালভাবে পরিচিত হবার ...জ্ঞা নিয়েই কণা হাতে তুলে নিয়েছে ...শের অস্ত্রের হাতিয়ার। বিশেষজ্ঞদের ...ত তার সম্ভাবনাও প্রচুর। আর কণার ...ইফেল শুটিং-এর ট্রেনার লক্ষ্মীশঙ্কর ...হার মত : রাইফেল শুটিং-এ ওর যদি এই ...গ্রহ বজায় থাকে তবে সারা ভারতে ...লোড়ন তোলা ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব ...। দৃঢ় মনোবল, অবিচল ধৈর্য, স্থির লক্ষ্য, ...সিক স্থৈর্য, শুটারের অবয়ব—মোটের ...র লক্ষ্যভেদে লক্ষপ্রতিষ্ঠ হতে ...সব গুণাবলী থাকা দরকার তা ...ই আছে কণার মধ্যে। আর ...ছে পারিবারিক যোগাযোগ। যেটা ...শু বয়স থেকেই ওর মনের উপর প্রভাব ...স্তার করেছে, রক্তে নেশা ধরিয়েছে।

...অবশ্য শিশু বয়স কণার এখনো পার ...নি। বয়স কেবল ষোলো। জন্ম ১৯৪৭-...। সাম্প্রদায়িক মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। ...ডাঙ্গা অঞ্চলের ৬২ নম্বর পিয়ারী-মোহন সুর গার্ডেন লেনের বাড়িতে মাতৃ-জঠরে থাকতেই যে কণা বন্দুক ও রাইফেলের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শুনেছে —ভূমিষ্ঠ হবার আগে সঙিন ও রাইফেলের পাহারায় যে কণার মাকে চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে প্রসবের জন্য নিয়ে যেতে হয়েছে, সেই কণাই এখন খেলাধুলোর প্রধান উপকরণ হিসাবে হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল রিভলবার।

শুধু কি তাই! খুব ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলোর সঙ্গে ওদের নিবিড় সম্পর্ক। কণার মামা ইস্টার্ন রেলের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ফণি মিত্র বাংলার ক্রীড়ামহলে সুপরিচিত। একাধারে মুষ্টিযোদ্ধা, অ্যাথলীট এবং ফুটবল খেলোয়াড়। তা ছাড়া রাইফেল চালনা শিক্ষার ক্ষেত্রে ফণিবাবুর কিছু দান আছে। রাইফেল শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য লক্ষ্যভেদের গোড়ার কথা

নামে তিনি একখানি বই প্রকাশ করেছেন। বইখানি 'দি গাইড বুক অফ মার্কসম্যান-শিপ'-এর বাংলা অনুবাদ এবং আমেরিকার ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত।

ঘরের ওই বই-ই কণার রাইফেল শুটিং শেখার প্রথম বর্ণপরিচয়। 'পাখীও না, পাখীর মাথাও না—শুধু চোখ।' ওই বই থেকেই লক্ষ্যভেদের এই মূলমন্ত্র গ্রহণ।

এগারো বছর আগে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে মামা ফণি মিত্র যখন কণার বড় বোন কল্পনাকে এনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ভরতি করে দিলেন তখন কণার বয়স পাঁচ কি ছয়। দিদির সাথে এক-আধবার ক্লাবে ঘোরাফেরা করা ছাড়া রাইফেল ছোঁড়ার সুযোগ ঘটেনি। চোখ খারাপ থাকায় কল্পনাকেও অল্পদিনের মধ্যে রাইফেল ছেড়ে দিয়ে বই-কলমকে আঁকড়ে ধরতে হয়। দিদির অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করার সাধ তখন থেকেই কণার মনে বাসা বাঁধে। দীর্ঘ দশ বছর পরে ১৯৬২ সালে ফণিদাদু কণাকে যখন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে ভরতি করেন তার এক মাসের মধ্যেই তার প্রথম পরীক্ষার সুযোগ আসে।

১৯৬২ সনের এপ্রিল মাস। টালিগঞ্জ শুটিং রেঞ্জে রাইফেল শুটিং-এর অল ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। কণা তখন সেন্ট্রাল ক্যালকাটার শুটার অসীম করের 'নবিস' শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের শ্রেণী বিভাগ হিসাবে আনকোরা আনাড়ী মেয়ে। কিন্তু আনাড়ীপনার মধ্যেও গভীর মনঃসংযোগ আর নিশানা দেখে অসীমবাবু কণার নাম দিয়ে দিলেন অল ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের জুনিয়র ইভেন্টে।

বাবা দেবেন্দ্রনাথ বসু কিছুই জানতেন না। ·২২ ওপেন সাইটে মেয়েদের প্রোনে কণা ফার্স্ট হয়ে এসে যখন বাবাকে এ কথা জানালো তখন বাবা মা দুজনই অবাক। নিজেরা মেয়ের সাথে তাঁরাও গেলেন টালিগঞ্জের শুটিং রেঞ্জে। পরলোকগত পুলিস-মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জির হাত থেকে প্রোনের প্রথম পুরস্কার পেয়ে কণা তো মহাখুশী। তারপর আরম্ভ হল জোর অনুশীলন। এবার শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন লক্ষ্মীশঙ্কর সাহা।

গত পুজোর আগে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের শিবিরে প্রদর্শনী শুটিং-এ ওর ১৫০ রাউন্ড গুলী ছোঁড়ার স্ট্যামিনা দেখে অনেকেই অবাক হয়ে গেল। দু' ঘণ্টার মধ্যে ১৫০ রাউন্ড গুলী ছোঁড়ার কথা। কিন্তু প্রোন, নীলিং ও স্ট্যান্ডিং—তিন পজিশনে মাত্র তিন ঘণ্টায় ১৫০ রাউন্ড গুলী ছোঁড়া [illegible]

লক্ষণ নেই—যেন পাকাপোক্ত রাইফেল-চালিয়ে।

তারপর থেকে সপ্তাহে তিন দিন করে সকালে নিয়মিত প্র্যাক্টিস। স্কুলে যাবার আগে রেঞ্জে আগমন, প্র্যাক্টিসের পর স্কুলে গমন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের রেওয়াজ। আর জাতীয় শুটিং-এর জন্য প্রতীক্ষা।

হঠাৎ খবর এল, দেশের জরুরী অবস্থার জন্য জাতীয় শুটিং বন্ধ থাকবে। কণার মনটা দমে গেল। অনুশীলনেও ভাটা পড়ল। দু' মাস পরেই ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে আবার খবর এল, জরুরী অবস্থার মধ্যে দিল্লিতে জাতীয় শুটিং-এর আসর বসবে। তবে ফুল কোর্স নয়, হাফ কোর্স। সময় মাত্র এক মাস। আবার জোর কদমে কণার অনুশীলন আরম্ভ হল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কণার বাবা, মা ও শিক্ষাগুরু লক্ষ্মীকান্ত সাহা কণাকে নিয়ে যাত্রা করলেন দিল্লির দিকে।

এপ্রিলের ৬ তারিখ। দিল্লির নিকলসন রেঞ্জে ভারতের জাতীয় রাইফেল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের বিরাট আসর। কণার জীবনের দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা। রথী-মহারথীদের সঙ্গে ওর রাইফেলের পাল্লা।

শুটিং আরম্ভ হল। ২০ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের জুনিয়র ইভেন্টে তিন পজিশনের এগ্রিগেটে কণা ফার্স্ট। মহিলাদের সিনিয়র ইভেন্টে তিন পজিশনের এগ্রিগেটে কণা সেকেন্ড। শোভিতা চ্যাটার্জীর পরেই ওর স্থান। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! সিংগল শুটিং-এ অসাধারণ প্রতিযোগী শুটিং শেষ করতে পারল না। ফলে সিংগলস-এর অন্তর্ভুক্ত হল। অর্থাৎ ঐ দিনের প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেল।

৯ই তারিখে আসল প্রতিযোগিতা। পাঞ্জাব, জম্মু, গুজরাট, মহীশূর, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যের বহু নামকরা শুটার এসে অংশগ্রহণ করেছেন। সবার দৃষ্টি সাত ও সতেরো নম্বরের লেনের দিকে। দুজনেই ভাল শুটার, অব্যর্থ লক্ষ্য। স্কোর কার্ডের ১০ নম্বর ও ৯ নম্বরেই বেশী গুলী লেগে, একটা আধটা লেগে ৮ নম্বরে। সাত নম্বরে বাংলার প্রখ্যাত রাইফেল-চালিকা শান্তি পরিচিতা শোভিতা চ্যাটার্জি। সতেরো নম্বরে পাঞ্জাবী অপরাধে পাঞ্জাবীর পোশাক পরা দীর্ঘদেহী মেয়ে কণা বসু। হঠাৎ কণার একটা গুলী ৪ নম্বর রিং-এ লাগতে সমবেত দর্শক হই হই করে উঠলো। অর্থাৎ এত ভাল হাতের এমন কাঁচা মার।

তবু মহিলাদের সিনিয়র ইভেন্টের থ্রি পজিশনের প্রোনে দ্বিতীয়, স্ট্যান্ডিং-এ তৃতীয়, নীলিং-এ স্থান নেই—এগ্রিগেটে তৃতীয়। প্রথম স্থান পেয়েছেন শোভিতা চ্যাটার্জি, দ্বিতীয় লখনৌয়ের [illegible] [illegible] অলীত, তৃতীয় [illegible] কণা বসু।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিণীর মধ্যে মাত্র এক পয়েন্টের পার্থক্য।

ছেলেমেয়েদের জুনিয়র ইভেন্টের থ্রি পজিশনের প্রোনে কণার প্রথম স্থান এবং যুগ্ম প্রতিযোগিতার মেয়ে হিসাবে সর্ব-প্রথম স্বর্ণপদক লাভের কৃতিত্ব। এছাড়া ছেলেমেয়ের জুনিয়র ইভেন্টের শুধু প্রোনে দ্বিতীয় আর মহিলাদের শুধু প্রোনে তৃতীয় স্থান। শায়িত অবস্থায় শুটিং-এও প্রথম স্থান পেয়েছেন শোভিতা চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন মাড়োয়াড়ের রানী সাহেবা। দুজনেই ভারতের নামকরা রাইফেল-চালিকা। তারপরই কণার স্থান।

এইভাবে দিল্লির জাতীয় রাইফেল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের আসর থেকে একটি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ—মোট ৬টি পদক নিয়ে কণা কলকাতায় ফিরে এসেছে। তাই বলে পড়াশুনায় কমতি নেই। প্রাট মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস টেনের ভাল মেয়ে হিসাবেই স্কুলে ওর সুনাম।

দিল্লির নিকলসন রেঞ্জে রাইফেল হাতে করে কণা বসু যখন আসরে নেমেছিল তখন অনেকেই ওকে পাঞ্জাবী মেয়ে বলে ভুল করেছিল। বর্ণ তপ্তকাঞ্চন, পরনে সালোয়ার পাঞ্জাবী, রাইফেলের মত দেহের লম্বা গড়ন, উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। ১১ পাউন্ড ওজনের রাইফেল ধরা শক্ত হাতে শক্তির দ্যুতি। বলা বাহুল্য, এমন মেয়ের হাতেই রাইফেল ভাল মানায়। রাইফেল রেঞ্জ কণা স্বর্ণ হাতে স্বর্ণ পদক দেবার সময় ভাবতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবনও বোধ করি একটু গর্ব অনুভব করেছিলেন।

মনের মত পড়ার বই

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমৃতস্যঃ পুত্রাঃ

সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আর বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর সৃষ্ট অপূর্ব সাহিত্য বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে অনন্তকাল। মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে আন্তরিকতায় তিনি মূর্ত করে রেখেছেন যা তুলনারহিত। অমৃতস্যঃ পুত্রাঃ তার অন্যতম বিশিষ্ট রচনা। দাম ২·৫০

নিকষিত হেম

সুবোধ ঘোষ

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন, নতুন ধারায় ভাবেন, নতুন স্টাইলে লেখেন, তাই তার সাহিত্যকর্ম অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়। নিকষিত হেম সুবোধ ঘোষের নবতম গ্রন্থ। দাম ২·৫০

বিমল করের

জননী

দাম ২·০০

চলতি সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট লেখকের গত দু বছরে লেখা ছটি কীর্তিপ্রভ ও সমৃদ্ধ গল্পের সংকলন। ছটি গল্প যেন ছটি ঐশ্বর্যশালী বধূ।

শৈলেশ দে-এর

স্বপ্নবাসর

দাম ২·০০

শৈলেশ দে বাংলা সাহিত্যে নতুন নাম কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর বহু উপন্যাসের মধ্যে একটিও চিত্রায়িত হচ্ছে, 'স্বর্ণ' নামে। উপন্যাসটি উপভোগ্য।

অন্যান্য উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
নবনীতা ২·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সীমাস্বর্গ ২·৫০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
চেনা চেনা মুখ ২·৫০

সমরেশ বসু
ছোট ছোট ঢেউ ২·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
বিদ্যুৎলতা ২·৫০

বিমল দত্ত
নায়ক নায়িকা ২·৫০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী ৫·০০
নতুনের অভিষেক ২·০০
বসুধারা ৪·০০
প্রিয়তমা ২·০০

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
গোধূলি লগ্ন ৩·০০

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস

৫/১এ কলেজ রো, কলিকাতা — ৯

২৭শে বৈশাখ-১৩৭০ বাং সাহিত্য সংখ্যা
১১ই মে-১৯৬৩ ইং

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

নববর্ষের প্রথম প্রকাশ—

কনটেম্পোরারী পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

প্রধান কার্যালয় : ১২ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

পরিবেশক : ইস্টার্ণ এজেন্সী, ১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। জিজ্ঞাসা, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯।

দেশ

সাহিত্য সংখ্যা

৩০ বর্ষ ॥ ২৮ সংখ্যা ॥ ৮০ নয়া পয়সা

শনিবার ২৭ বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

DESH

Saturday, 11th May, 1963
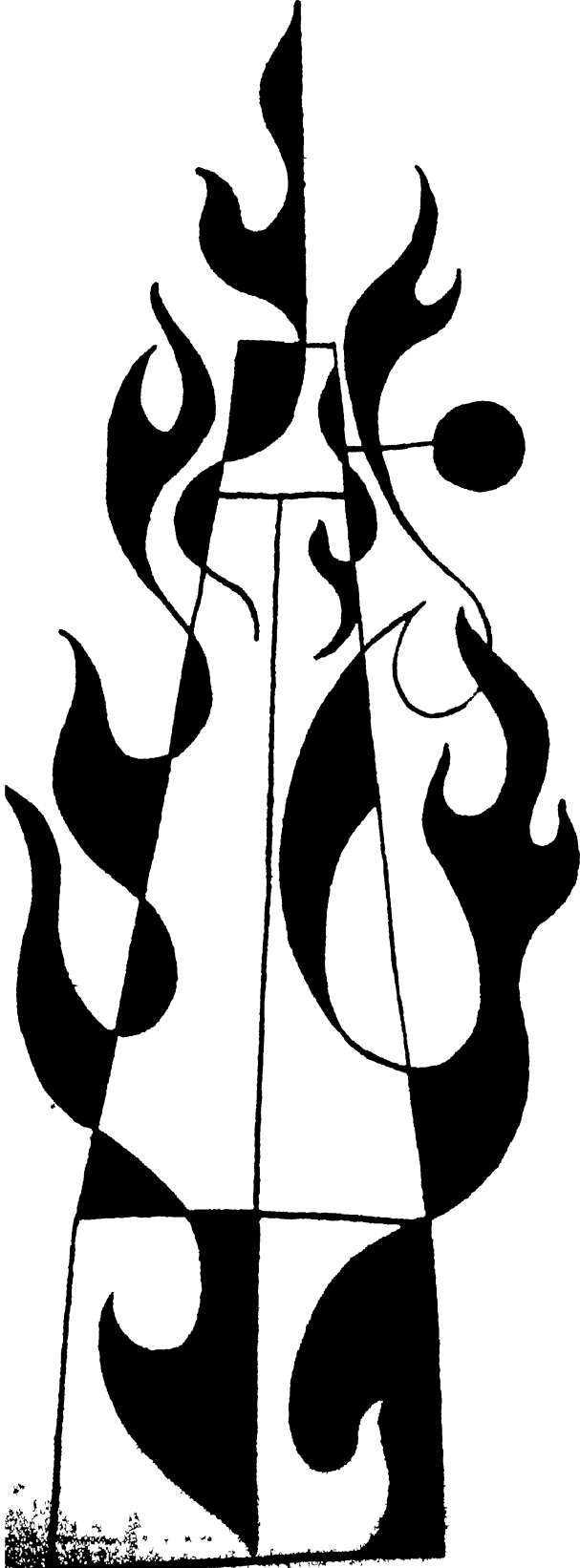
রবীন্দ্র-চেতনা

বৈশাখী কবিপক্ষ সকলেরই স্বপক্ষ, একান্তভাবে [illegible] আমাদের আবেগের ভাষা, অন্তর বেদনা, বিশ্বচিন্তা, [illegible] সবই প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ যেমন [illegible] আমরাও তেমন রবীন্দ্রনাথের। সূর্যস্নাত বৈশাখে [illegible] আবির্ভাব, তিথিটি তাই এমন স্মরণীয়, এমন উদ্দীপক।

ব্যাস, বাল্মীকি, হোমারের মতো রবীন্দ্রনাথ কোনো [illegible] মহাকাব্য রচনা করেননি। কালিদাস, মাঘ বা গ্যয়টের মতো [illegible] সৃজনী প্রতিভা কোন একখানি মাত্র বৃহৎ কাব্যগ্রন্থে বিশেষ[illegible] বিধৃত নেই। তবু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মহাকবি, মহাজীবনের রূপকার। নানা ভাষা নানা পরিজন মুখরিত এই বহুবিচিত্র [illegible] মহাদেশের তিনি একাধারে মর্মস্রষ্টা ও মর্মদ্রষ্টা। শুধু এক উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ নয়, রবীন্দ্রনাথ যেন একটি ভারতচিত্তবিস্তৃত বহু-বর্ণ গিরিশ্রেণী।

নবীন ভারতবর্ষের তিনি জাতীয় মহাকবি। বহু পর্বে বহু কাণ্ডে বিভক্ত এই মহা-ভারতের বিচিত্র, বেগবান আদর্শ ভাবৈশ্বর্যবাহী সংকল্পমালা তাঁরই স্বহস্তে রচিত। এ-মহাকাব্যের মহানায়ক হওয়ার যোগ্যতা এককভাবে কারও নয়, সমন্বিত প্রচেষ্টায় একসূত্রে গাঁথা সহস্র প্রাণের মেলায়, সকলেই এই রবীন্দ্র মহাকাব্যের ছোট বড় কুশীলব এই মহাচেতনারই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আমরা রবিস্পৃষ্ট তাই গর্বিত স্পন্দিত।

রবীন্দ্রনাথ বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, স্বাদেশিকতার আয়াস ও সাধনালভ্য সহজাত হয়েও স্বদেশপ্রেম অর্জনের অপেক্ষা রাখে, স্বদেশকেও তিলে তিলে নানা ভ্রান্তি ও ভ্রান্তির [illegible] সরিয়ে আবিষ্কার ও আয়ত্ত করতে হয়, শুধু জ্ঞানে ও কর্মে নয়, আবেগ ও ধ্যানেও মূর্ত করে তুলতে হয়। অক্ষ ও দ্রাঘিমা রেখায় চিহ্নিত এশিয়া খণ্ডে আমাদের এই ভৌগোলিক মৃৎপিণ্ডের মধ্যে এক প্রাচীন ঐতিহ্য-ঋদ্ধ নবীন হৃদয়ধ্বনি কবি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেই উজ্জীবিত অন্তরাত্মারই নাম দিয়েছিলেন ভারতবর্ষ।

যে-সংহতির উপর তিনি জোর দিয়েছেন তা ভারতবর্ষ [illegible] একটি মহাভারতের উপর প্রতিষ্ঠিত। গায়ের বা আইনের জোরে নয়, রাষ্ট্রস্নেহলালিত ভাষা বিশেষের মস্তকে রাজমুকুট পরিয়েও [illegible] সে-সংহতি আসে ভিতর থেকে, তাকে পেতে হয় ত্যাগে, [illegible] প্রেমে। প্রশাসনিক উপায়ে আদায়ীকৃত সংহতির চেয়ে [illegible] বড়ো, অনেক বেশি দৃঢ়মূল ও স্থায়ী সংহতির কথাই রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন। সেই ভাবসংহতির শুধু কথক নন, [illegible] নিবিষ্টমনা শিল্পীও রবীন্দ্রনাথ নিজে। তাঁর মহৎ [illegible] আমাদের স্বপ্ন, ভাবধারা ও কর্মোদ্যমে, কল্পনারঙীন [illegible] দৈন্যপারংগম বিপর্যয়-সহিষ্ণু আত্মবিশ্বাসে চিরকালের জন্য [illegible] প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের ভবিষ্যতের উপর গভীর আস্থা রেখে রবীন্দ্রনাথ বলে-ছেন, "যারা দস্যুবৃত্তি করছে, যারা মানুষের পথ আগলে [illegible] মানুষের ইতিহাসে তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ আশা দুরাশা নয়—বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হতে পারে না, তাহলে মানুষ বাঁচত না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ তবু তার বড়ো বড়ো কল্পনা মরেনি। কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণার দাস নয় সে, এখনো মানুষ [illegible]; এখনো তার মহত্ত্বের [illegible] [illegible]।" [illegible]

দীপিকা

—রবীন্দ্ররচনার দ্বিতীয় সংকলনগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক কবিতা একত্র সংকলিত হয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। নয়জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই সংকলন প্রস্তুত করেছেন।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'বিচিত্রা' গ্রন্থে যেসব রচনা প্রকাশ করা যায় নি, তার থেকে নির্বাচন করে বিবিধ রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এইজন্য 'দীপিকা' গ্রন্থটি 'বিচিত্রা'র পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যায়।

৭·৫০ । বোর্ড বাঁধাই ৮·৫০

লক্ষ্মীর পরীক্ষা

ছোটদের অভিনয়োপযোগী এই নাট্যকবিতাটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। ১·০০

গল্পগুচ্ছ । চার খণ্ডে সম্পূর্ণ

রবীন্দ্রনাথ-রচিত সমস্ত গল্প চার খণ্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছে একত্র গ্রথিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড ৪·০০, দ্বিতীয় খণ্ড ৪·৫০, তৃতীয় খণ্ড ৪·০০ ও চতুর্থ খণ্ড ৫·০০।

ছন্দ

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' গ্রন্থটির পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। গ্রন্থশেষে সংজ্ঞাপরিচয় পাঠপরিচয় পাণ্ডুলিপিপরিচয় দৃষ্টান্তপরিচয় সংযোজিত। ৮·০০

স্বদেশী সমাজ ৩·০০

পল্লীপ্রকৃতি ৪·৫০

লেখন

রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর হাতের লেখায় তাঁহার কবি-মানসের অপরূপ পরিচয়-লিপি। এই গ্রন্থের বাংলা ও ইংরাজি কবিতিকাগুলি সংখ্যায় আড়াই শতের অধিক, ইতিপূর্বে অন্য কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। জাপানী বাঁধাই, ৪·০০, শোভন সংস্করণ ১০·০০

স্ফুলিঙ্গ

লেখনের সগোত্র আরও বহু কবিতা যাহা রবীন্দ্রনাথের নানা পাণ্ডুলিপিতে, বিভিন্ন পত্রিকায়, ও স্নেহভাজন বা আশীর্বাদপ্রার্থীদের সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত ছিল, সেই ২৯৮টি কবিতাসমষ্টির সংকলন স্ফুলিঙ্গ। ৩·৫০, শোভন সংস্করণ ৫·৫০

চিত্রলিপি ১ ২০·০০

চিত্রলিপি ২ ১৮·০০

●

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ

আমাদের গুরুদেব শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সসম্ভ্রম ও অন্তরঙ্গ আলোচনা। ৩·৫০

গুরুদেব শ্রীরানী চন্দ

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। মানুষ-রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের কয়েকগুলি দিকের কথা, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। ৫·০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা ৭

বলা হয়েছে যে, সেদিন যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁদের কর্মক্ষেত্র যাই থাক, তাঁরা সর্বাগ্রে দেশকর্মী এবং সমাজ সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির চর্চা করেছেন, কিংবা জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন, তাঁদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা কোন কালে রাজনীতির সংগে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না তাঁরাও আজ সর্বতোভাবে নবভারতের জন্মদাতা হিসাবে গণ্য। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রমেশ দত্ত এঁরা সকলেই সরকারী কর্মচারী এবং সেই সরকার বিদেশী সরকার। বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী, তথাপি দেশসেবাকেই তিনি ধর্মচর্চার প্রধান অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন—"তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—সেই মন্দির কেবলমাত্র দেবমন্দির নয়—মানুষ যেখানে যে কাজে নিযুক্ত সেই কাজের মধ্য দিয়েই সে দেশমাতার সেবা করবে। বঙ্কিম বুঝেছিলেন—দেশের দাবি সর্বব্যাপী, সে কাউকে বাদ দেয় না। চাষী মজুর, দোকানী কেরানী, ডাক্তার কবিরেজ, ইঞ্জিনিয়ার মাস্টার জজ ম্যাজিস্ট্রেট কেউ বাদ যাবে না—সকলকেই আপন আপন কর্মমন্দিরে দেশের মুক্তি-ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। আনন্দমঠে বঙ্কিম উদাত্তকণ্ঠে যে প্রশ্ন করেছেন—দেশের জন্যে কি তুমি দিতে পার, তোমার পণ কি?—সেই চরম আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু সাধ্যসাধন করেই নিরস্ত হননি, অসাধ্যসাধন করেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে দেশময় যা ঘটতে লাগল তা অভূতপূর্ব। এক কালের সিভিলিয়ান সুরেন ব্যানার্জি গেলেন জেলে, সর্বজনপূজ্য অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন, সুবোধ মল্লিক লক্ষ টাকা দান করলেন, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ দিলেন। সমস্ত দেশ মুগ্ধনেত্রে দেখছে—মানী সঁপিয়াছে মান, ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ। তথাপি সবার কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ত্যাগ এবং দুঃখবরণের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট নয়। সমস্ত দেশ এবং জাতির শক্তি উদ্‌বুদ্ধ করতে হলে আরো স্থায়ী প্রেরণার প্রয়োজন। চাই মহত্তম কবি-প্রেরণা যা দেশময় এক ভাবাবেগের জোয়ার এনে দেবে। সেই কথাটি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যায়—এরই লাগি কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান ছড়াইছে দেশে দেশে। সেই কবির প্রয়োজন ছিল এবং রবীন্দ্রনাথই সেই কবি। দেশ এবং জাতির মর্মবাণী কবির লেখনীমুখে যেভাবে প্রকাশিত হয় এমন আর কারো মুখে নয়।

একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে, যাঁরা মহাকবি, তাঁরাই জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচয়িতা। এলিজাবেথীয় ইংলেণ্ডের ইতিহাস কেউ যদি রচনা করে থাকেন, তো সে সেক্সপীয়ার। আর আধুনিক ভারতের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস যদি কিছু থাকে, তো সে রবীন্দ্রকাব্য। এই কারণেই হোমারকে বলা হয়েছে গ্রীক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আর রামায়ণ মহাভারতের কবিকে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। সাধারণত ঘটনাপঞ্জিকেই আমরা ইতিহাস বলে জানি। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস হচ্ছে সেই বস্তু যা দেশের সঙ্গে আমাকে সম্যকভাবে পরিচিত করবে। সেই অর্থে কবি এবং সাহিত্যিকরাই প্রকৃত ইতিহাস রচয়িতা। তথাকথিত ঐতিহাসিক পঞ্জিকাকার মাত্র।

১৪ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ : হিন্দুমেলার যুগে

দেশকে যিনি অন্তরঙ্গভাবে জেনেছেন, দেশের মর্মমূলে যিনি পৌঁছেছেন সত্যকারের ইতিহাস রচনার অধিকার একমাত্র তাঁরই। রবীন্দ্রনাথ কি করে এই অধিকার অর্জন করলেন, সেই ইতিহাসটিও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। রামমোহন রায় দেশে যে নবজাগরণ এবং স্বদেশানুরাগের বীজ বপন করেছিলেন তার প্রথম অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে। একথা অনেকে আজ ভুলে গিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৩৭ সালে দ্বারকানাথের উদ্যোগে 'জমিদার সভা' স্থাপিত হয়। নাম জমিদার সভা হলেও সাধারণ অর্থে জমিদার বলতে আমরা যা বুঝি এটি কেবলমাত্র সেই বিত্তশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক এর সভ্য হবার অধিকারী ছিলেন। সভার মুখপত্রে বলা ছিল—

The Zamindary Association is intended to embrace people of all descriptions without reference to caste, country or complexion, and rejecting all exclusiveness, is to be based, on the most universal and liberal principles, the only qualification to become its member being the possession of interest in the soil of the country.

একথাও অনেকের জানা নেই যে, নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রয়োজন সর্বপ্রথম অনুভব করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে তিনি পত্রযোগে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। পরে ১৮৫১ সালে যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ উক্ত সংস্থার সম্পাদক নিযুক্ত হন। দ্বারকানাথ প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত 'জমিদার সভা'ও নবগঠিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এসে সংযুক্ত হল।

এর অনতিকাল পরে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা। ১৮৬৭ সালে রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় এবং নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে 'হিন্দুমেলা'র প্রথম অধিবেশন হয়। এখানেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রধানত তাঁর অর্থানুকূল্যেই এই মেলা অনুষ্ঠিত হত। হিন্দুমেলার সম্পাদক ছিলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্বদেশীভাবোদ্দীপক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের হাতে খড়ি হয়েছিল এই হিন্দুমেলায়। তাঁর সেই প্রথম স্বদেশী কবিতা—'দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর' তাঁর ষোল বছর বয়সের রচনা। হিন্দুমেলা সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেলার উদ্যোক্তারা প্রথমাবধিই এক অখণ্ড ভারত এবং এক ভারতীয় মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। কখনো কেবলমাত্র বাঙলা দেশ বা বাঙালী জাতির কথা বলেননি। হিন্দুমেলায় যে সব জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছিল, তা থেকেই একথা প্রমাণিত হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত-সন্তান', গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'লজ্জায় ভারত-যশ গাহিব কি করে', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'চল রে চল সবে ভারত-সন্তান'—এই সব কটি গানই ভারতকে উদ্দেশ করে রচিত। এই সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে হিন্দুমেলার পূর্বে কোন স্বদেশী সঙ্গীত বাঙলা ভাষায় রচিত হয়নি, এবং এর বেশির ভাগ সঙ্গীতই ঠাকুর পরিবারে রচিত।

হিন্দুমেলার পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে [illegible]

রবীন্দ্রনাথ এই সভার একটি কৌতুকময় বিবরণ দিয়েছেন। সরু এক গলির মধ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসত। এর কার্যকলাপ ভয়ঙ্কর রকমে গোপন রাখবার চেষ্টা হত। এমন কি এর একটা সাংকেতিক নামও ছিল—হা মু চু পা মু হা ফ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যেন, আমরা উড়িয়া চলিতাম...এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ ছিল উত্তেজনার আগুন পোহানো।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক। তাঁর প্রতিভার বিকাশে পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। মহর্ষি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে এমন কতক জিনিসকে মূল্য এবং প্রাধান্য দিয়েছিলেন যা পরিবারের আবহাওয়ায় অমিত শক্তির সঞ্চার করেছে নতুবা একটি মাত্র পরিবারের মধ্যে এমন বিচিত্র প্রতিভার সমাবেশ কোন মতেই হতে পারত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি এবং শিল্পী মনের পুষ্টি যেমন গৃহের এই আবহাওয়া থেকেই লাভ করেছেন, তাঁর স্বদেশানুরাগও তেমনি এই পরিবেশ থেকেই নিঃশ্বাসের মতো—সহজে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য—

আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটি স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।"

বলা বাহুল্য স্বদেশ ভাবের প্রথম পর্বে উৎসাহ যতখানি ছিল উদ্যোগ ততখানি ছিল না। তখনো পর্যন্ত দেশকে কল্পনার চোখে দেখেছেন—বাস্তবক্ষেত্রে চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। চাক্ষুষ পরিচয় হল তখন, যখন জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়ে গেলেন গ্রামাঞ্চলে। দেশের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় হল। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মহর্ষি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন (এ বিষয়ে বারান্তরে সবিস্তারে আলোচনা করা যাবে)। কিন্তু সব চাইতে দুঃসাহসিক এক্সপেরিমেন্ট হল তাঁর কবিপুত্রের হাতে জমিদারি পরিচালনার ভার অর্পণ করা। এই একটি কার্যের ফল রবীন্দ্রনাথের জীবনে তো বটেই সমগ্র দেশের জীবনে সুদূর প্রসারী হয়েছে। দেশের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়টির প্রয়োজন ছিল। দেশের মানুষ যে কতখানি অসহায় এদের দারিদ্র্য যে কি মর্মান্তিক স্বচক্ষে তা দেখেছেন। যিনি সমগ্র জাতির কবি হবেন, তাঁকে জাতির মর্মস্থলে পৌঁছাতে হয়। জাতিকেই যে জাতির ইতিহাস রচয়িতা [illegible] পথেই হয়েছিল। সুতরাং এই

সার্থক জনম আমার
~~[illegible]~~ জন্মেছি এই দেশে—
~~[illegible]~~ মাগো তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধনরতন
আছে কিনা রানীর মতন
(শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।)
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে—
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গান : রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি

অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যাবলী এর দ্বারা নানাভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রজাহিতের জন্যে তিনি তাঁর জমিদারিতে (বিশেষ করে কালিগ্রাম পরগণায়) যে কর্মসূচী অবলম্বন করেছিলেন উত্তরকালে তাই শ্রীনিকেতনে রূপ পরিগ্রহ করেছে। পাবনা কনফারেন্সের ভাষণ স্বদেশী সমাজে তিনি যে স্বাবলম্বী সমাজের চিত্র এঁকেছেন তাও এই অভিজ্ঞতারই ফল।

রাজনীতির মধ্যে নীতির অংশ যৎসামান্য। একমাত্র ভারতবর্ষেই গান্ধী রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র নৈতিক বলের দ্বারাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূলে যে নীতিটি প্রধানত কাজ করেছে সেটি হচ্ছে আত্মশক্তির উদ্বোধন। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের যেমন বুঝিয়েছিলেন যে, আমাদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের ব্যবস্থা সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমাদের নিজেদেরই করতে হবে শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও ঐ কথাই নিরন্তর বলেছেন। এই সময় কলকাতার শিক্ষিত সভায় তিনি যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন তারও মূল বক্তব্য ঐ—"ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইবার কোন ফল নাই আপন মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব।" রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেছেন। বারংবার বলেছেন, "ভিক্ষা স্বরূপে যতই অধিকার লাভ কর, অন্তরের লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইবে না।"

কংগ্রেসী রাজনীতিতে কোনকালেই বড় একটা আস্থা ছিল না; কিন্তু প্রথম দিকে কলকাতায় কংগ্রেসের যে কটি অধিবেশন হয়েছে তার সব কটিতেই তিনি যোগদান করেছেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে—আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে—এই সুপ্রসিদ্ধ গানটি রচনা করেছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে নিজেই সেটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। ঐ অধিবেশনেই সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান গাওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুর-সংযোগ করে গানটি গেয়েছিলেন।

সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান একমাত্র স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই করেছিলেন। স্বাধীনতার আন্দোলন পৃথিবীর নানা দেশেই হয়েছে; কিন্তু এমন সুসংযত সুসঙ্গত, সুপরিকল্পিত আন্দোলন আর কোথাও হয়েছে বলে জানি না। রাজনৈতিক আন্দোলনও যে কতখানি সুরুচি-মণ্ডিত হতে পারে, বাংলা দেশ ইতিহাসে তার একটি দৃষ্টান্ত রেখেছে। রাজনীতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাষায় এবং ব্যবহারে রূঢ়। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তারি একটি স্নিগ্ধ রূপ ছিল, কিন্তু সেটি তার দুর্বলতা নয় কারণ বৃটিশ সরকারকেও এর কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের এই শ্রী-মণ্ডিত রূপটি বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। বাঙালীর স্বদেশীপ্রীতিকে তিনি এমন একটি সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন যা একাধারে ঐক্যবোধ এবং একাত্মতার [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—
তবে একলা চলরে
যদি কেউ কথা না কয় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে
~~[illegible]~~ সবাই করে ভয় (~~ওরে ওরে ও অভাগা~~)
তবে পরাণ খুলে
ও তুই ~~[illegible]~~ মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলোরে।
যদি সবাই ফিরে যায় (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ না ফিরে চায় (~~ওরে ওরে ও অভাগা~~)
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলরে।
যদি আলো না ধরে (ওরে ওরে ও অভাগা)
যদি ঝড়বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে,
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলোরে

রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী সঙ্গীত : রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি

ছিলেন সে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ডের পরে। রাজশক্তির এমন নগ্ন এবং কুৎসিত প্রকাশ ইতিপূর্বে এদেশে দেখা যায়নি। মাত্র ছয় বৎসর পূর্বে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তিনি সম্মান গ্রহণ করেছিলেন; সেই সম্মান ঘৃণাভরে বর্জন করলেন। এই সম্পর্কে রাজপ্রতিনিধির কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি এখন ইতিহাসের সামগ্রী। চিঠির উপসংহারে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তার মর্ম হল—দেশের মানুষকে যারা সম্মান দিতে শেখেনি, তারা এসেছে আমাকে সম্মান দিতে! এদের দেওয়া সম্মানের মূল্য কি? রাজসম্মানকে [illegible] করে সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম যে উক্তি [illegible] এটি তারই সমতুল্য—মণি-মাণিক্য [illegible] নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রকাশে সে আমারে গৃহ করে দান।'

রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন, কিন্তু দেশের মুক্তি তাঁর নিত্য কাম্য ছিল। শিক্ষা প্রচার এবং সংগঠনমূলক কাজের মধ্যেই তিনি সেই মুক্তির পন্থা খুঁজেছেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা ভোগ করবার জন্যও প্রস্তুতি আবশ্যক। নতুবা স্বাধীনতা লাভ করেও অপ্রস্তুত হতে হয়। গল্পগুচ্ছের বোষ্টমীর যেমন অবস্থা—ছেলে যখন এসে পৌঁছেছে, মা তখনো পিছিয়ে আছে। "আমার গোপাল আসিয়া দেখিল, তখনো তাহার জন্য ননী তৈরী হয় নাই।" আমাদের স্বাধীনতার বেলায় ঠিক এই বিড়ম্বনাই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্বাহ্নেই এই সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। [illegible] তাতে কর্ণপাত করেনি। কিন্তু রবী[illegible] তাঁর আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত [illegible] দেশের জন্য অনেকেই অনেক ত্যাগ স্বী[illegible] করেছেন, বলা বাহুল্য, তাঁদের [illegible] প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথকেও নানাভাবে [illegible] স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু তার [illegible] জিনিসের ন্যায় তাঁর ত্যাগেরও [illegible] বৈশিষ্ট্য আছে। রাজনীতির সব চাইতে [illegible] প্রলোভন—নিত্য রোমাঞ্চ এবং বাহবার [illegible] রবীন্দ্রনাথ সেই প্রলোভনকে ত্যাগ [illegible] জনপ্রিয়তার লোভ সম্বরণ করেছেন। [illegible] সেবার কঠিনতম পথটি তিনি বেছে [illegible] ছিলেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে যে [illegible] ভূমিকা, তাতে কেউ বেশি নিন্দার [illegible] তাহাড়া আদৃ করের সম্ভাবনাও [illegible]

... বৃহত্তের প্রলোভন এড়িয়ে ... ক্ষুদ্র আকারে তাঁর সংগঠনের ... শুরু করলেন—শান্তিনিকেতনের ... গ্রামে, যেমন প্রথম যুগে করে-ছিলেন তাঁর জমিদারিতে—শিলাইদহ এবং পতিসর অঞ্চলে। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার ... বলে নিয়েছিলেন, আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরী হবে। বলেছেন, "সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তির মহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে ... নয়। দেশের যে অংশকে আমরা ... দ্বারা গ্রহণ করি, সেই অংশেই ... করি সমগ্র ভারতবর্ষকে।"

তাঁর দেশপ্রেমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য—জাতি বিদ্বেষ কখনও প্রচার করেননি। নিজের দেশকে বড় করতে গিয়ে অপর দেশকে ছোট করবার চেষ্টা কখনো করেননি। দেশের স্বাধীনতা সর্বান্তঃকরণে কামনা করেছেন, কিন্তু সকল দেশের প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। রামমোহনের আদর্শে পরিপুষ্ট তাঁর মন—সব দেশকেই আপন দেশ বলে জেনেছেন, সব মানুষকেই আপনজন মনে করেছেন। শেষ বয়সে তাঁকে আমরা বিশ্ব নাগরিকের ভূমিকায় দেখেছি, কিন্তু মনে রাখতে হবে—এ তাঁর সারা জীবনের আদর্শ। 'সব দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া'—এ কবিতা তিনি পরিণত বয়সে লেখেননি, যৌবনকালেই লিখেছিলেন। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর এই বিশ্বপ্রেমও স্বদেশ প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে ছেলে মাকে ভালবাসে না, সে মাসিকে ভালবাসবে এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার যে মা আপন ছেলেকে ভাল-বাসেন, পরে ছেলের প্রতিও তাঁর একটি বাৎসল্য ভাব থাকে। রবীন্দ্রনাথের বেলায় তাই হয়েছে—ভারতবর্ষকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বেসেছেন বলেই সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। তাই বলে বিশ্ব-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য কোন শর্ট-কাট্ পন্থাকে প্রশ্রয় দেননি। ১৯৩০ সালে জেনিভা শহরে এইচ জি ওয়েলসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ওয়েলসও ছিলেন শান্তিকামী। বিশ্বশান্তি সম্পর্কে দুজনের আলোচনা হয়েছিল। ওয়েলস বলেছিলেন, পৃথিবীতে জাতিগত ধর্মগত বৈষম্য তো আছেই, তার ওপরে আছে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন প্রথা, রীতি এবং সংস্কার। এই সমস্ত বৈষম্য লোপ করে দিয়ে যদি সমগ্র পৃথিবীতে একটি অভিন্ন কালচারের সৃষ্টি করা যায় তবেই মানব সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ যুক্তি রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয়নি। তিনি বলে-ছিলেন, প্রত্যেক জাতি তার আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেও অপরের সঙ্গে মিলতে পারে। অমিল থাকা সত্ত্বেও যে মিলতে পারা, রবীন্দ্রনাথের মতে তারই নাম সভ্যতা।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। আজকের পৃথিবীতে ... পদার্থটি এক ... প্রত্যেক দেশ আপন অনুকূলে মতসৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ইংরেজের সঙ্গে যখন আমাদের বিরোধ চলছিল, তখনও দেশে বিদেশে আমাদের স্বাধীনতার অনুকূলে মত গঠনের প্রয়োজন ছিল। সে কাজটি কেউ যদি করে থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে অর্থাৎ বক্তৃতা করে নয়, কেবল-মাত্র আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা। দেশে দেশে জ্ঞানীগুণীরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, যে দেশে এমন মানুষের জন্ম হয়েছে, সে দেশ কেমন করে পরাধীন থাকতে পারে! যারা সে দেশকে পদানত করে রেখেছে তারাই বা সভ্যতার দাবি করে কেমন করে? আমে-রিকান পণ্ডিত উইল ডুরান্ট রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন—You are the reason why India should be free. বিশ্বের দরবারে ভারতের দাবিকে তিনি কিভাবে তুলে ধরেছিলেন, এই উক্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

স্বদেশ প্রেমিক হয়েও উগ্র স্বাদেশিকতায় কোন কালে বিশ্বাস করেন নি। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, স্বাদেশিকতার মধ্যে জাতি-বৈরতা প্রচ্ছন্ন থাকে। বিদ্বেষের সমাপ্তি অপঘাতে, একথা বারংবার বলেছেন। পশ্চিম মহাদেশে তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম মহা-যুদ্ধের পরে ইয়োরোপ আমেরিকা ভ্রমণ করে হতাশ হয়েছিলেন। এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের পরেও এদের শিক্ষা হয়নি। জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষ যে কী গভীর দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী একথা তিনি জানতেন।

১৯২১ সালে দেশে ফিরে এসে সর্ব-মানবের মিলন ক্ষেত্র হিসাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতবর্ষকে বরাবর বলেছেন, মহামানবের সাগর তীর। বিশ্ব-ভারতীতে ক্ষুদ্রাকারে তাকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। মূলত এটিও তাঁর স্বদেশ প্রেমেরই নিদর্শন। ভারতবর্ষকে বড় করবার জনাই তার ভূমিকাকে বিস্তৃত করেছেন। একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, তাঁর আন্তর্জাতিকতা জাতীয়তাবোধ থেকেই উদ্ভূত অর্থাৎ তাঁর বিশ্বপ্রেম স্বদেশ প্রেমের পূর্ণতর প্রকাশ মাত্র। এই সূত্রে একটি কথার উল্লেখ না করলে এই আলো-চনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ বিশেষ একটি ভূমিকা গ্রহণ করবে, এই আশা রবীন্দ্রনাথ চিরকাল পোষণ করেছেন। সুখের বিষয়, স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্র আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। ... নীতিতে ...

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িকপত্র

পুলিনবিহারী সেন

সাধনা

কিশোরকাল থেকে আরম্ভ করে প্রবীণ বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল সাময়িকপত্রের সঙ্গে সম্পাদনা বা ব্যবস্থাপনা সূত্রে যুক্ত হয়েছিলেন তার প্রারম্ভিক বিবরণে (দেশ, রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯) 'ভারতী' (১২৮৪), 'বালক' (১২৯২) ও 'হিতবাদী'র (১৮৯১) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এরপর প্রকাশিত হয় 'সাধনা' মাসিকপত্র (অগ্রহায়ণ ১২৯৮—কার্তিক ১৩০২), বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনে যাঁরা স্বাক্ষর চিহ্নিত করতে অভিলাষী তাঁদের ধ্রুবতারা। কাগজটি যে-চার বৎসর চলেছিল তার প্রথম তিন বৎসর রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যত সম্পাদক-নাম গ্রহণ করেন নি, (১) কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে তিনিই ছিলেন এই পত্রের নিয়ামক ও ধারক; চতুর্থ বা শেষ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ স্বনামে সম্পাদনাভার স্বীকার করেন।

অল্পকালস্থায়ী এই পত্রিকাটি বিষয়-বৈচিত্র্যে, রচনার উচ্চমানে ও সম্পাদনা-কৃতিত্বে(২) বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি ধ্রুব আসন অধিকার করে আছে। কেবল যে বিচিত্র এবং প্রভূত রবীন্দ্ররচনার বাহন বলেই 'সাধনা' পত্র স্মরণীয়(৩) তা নয়; পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করে এমন বিষয় ও বিভাগ-বৈচিত্র্যে এবং সেই বিভাগগুলি পরিচালনের কৃতিত্বে সাময়িক পত্রিকা রূপে সাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনার যোগ্য। পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য, এই বিভিন্ন বিভাগের রচনাগুলিও অধিকাংশ আর কোথাও মুদ্রিত হয় নি, এইজন্য তার বিশিষ্টতা আধুনিককালের পাঠকদের দৃষ্টির অন্তরালবর্তী হয়ে আছে; প্রধান যে-সকল রচনা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে তাও [illegible] এখন আর 'সাধনা'র পরি-[illegible] বিবেচনা করি না, কাজেই [illegible] পত্রিকা হিসাবে 'সাধনা'র [illegible] ও [illegible] হিসাবে প্রকাশমান [illegible] আর বিশেষভাবে দৃষ্টি-[illegible]

কেউ বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করলে তিনি অবশ্যই তা বিচার করে দেখবেন, বিশেষত সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার পট-ভূমিকায়। 'সাধনা'র যে-সকল বিভাগ প্রচলিত ছিল সেগুলি রবীন্দ্রনাথই যে বাংলা সাময়িক সাহিত্যে প্রবর্তন করেছিলেন এমন নয়, অনেকগুলিই কোনো-না-কোনো

রবীন্দ্রনাথ, 'সাধনা-সম্পাদক' রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

পত্রিকায় পূর্বপ্রচলিত যথা 'গ্রন্থ-সমালোচনা' 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'(৪), 'সাময়িক সার-সংগ্রহ', (৫) স্বরলিপি, 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ'। কিন্তু যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা এই বিভাগগুলির সম্বন্ধে: স্বরলিপি ব্যতীত অন্য সব বিভাগগুলি হিতকারী ও মনোহর করে তুলবার জন্য, মুখ্যত রবীন্দ্র-নাথ স্বয়ং আত্মনিয়োগ করেছিলেন—বিভাগ-গুলি প্রধানত তাঁর রচনাতেই পূর্ণ।—'সাহিত্য' পত্রিকার 'মাসিক সাহিত্য সমা-লোচনা'র কথা অনেকেই অবগত আছেন—বোধ করি তার [illegible] একাও তা [illegible]

সঙ্গে 'সাধনা'র বিস্তৃত 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' মিলিয়ে পড়লে উভয়ের পার্থক্য ও গুণাগুণ স্পষ্ট হবে। বর্তমান সংকলনের পরিসরে 'সাধনা'র এই-সকল বিভাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই; 'সাধনা'র প্রকাশ বন্ধ হলে 'সাহিত্য'-সম্পাদক যে মন্তব্য করে-ছিলেন ('মাসিক সাহিত্য স মা লো চ না', অগ্রহায়ণ ১৩০২), তাই উদ্ধৃত করে এই সূচনা সমাপ্ত করি—

"সাধনা।—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক,—একত্র। পাঠকগণ বিজ্ঞাপনে দেখিবেন, "সাধনা" অতঃপর আর প্রকাশিত হইবে না। সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক হইয়া "সাধনা"কে সিদ্ধির পথে আনিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ হইতে "সাধনা" ত্রৈমাসিক হইবে শুনিয়া, আমরা মনে করিয়া-ছিলাম যে, বাঙ্গলা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু সহসা "সাধনা" বিলোপ হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "সাধনা" বিলুপ্ত হইল কেন, তাহার কোন কারণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। তথাপি মনে হয়, বাঙ্গালী পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইলে সাধনা বিলুপ্ত হইত না। যে দেশে "সাধনা"র মত উচ্চশ্রেণীর মাসিকও বিলুপ্ত হইবার অবসর পায়, সে দেশ নিতান্তই অত্যন্ত দুর্ভাগা।"

"দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি"

'সাধনা'-প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শিলাইদহে বাস করতেন—[illegible] সমাজ-পরিবৃত [illegible] এই [illegible]

সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

১৩০১-১৩০২ সাল।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাধনার আখ্যাপত্র

রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

নাহি ভরসে অদৃষ্টের,
নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি।
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে-অন্ন যখন কেহ কাড়ে
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

কবিতাটির এই অংশ যেন ছিন্নপত্রের কয়খানি চিঠির একত্র পদ্যানুবাদ, এই কথাগুলিই সেখানে চিঠির ধরনে ভাবায় বলা।

ছিন্নপত্রের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতে দেখি সোশ্যালিজম-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মনকে নিঃসংশয়ে হলেও স্পর্শ করেছে প্রজার দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার রূপে, যদিও তার [illegible] সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয় [illegible]। কথা রবীন্দ্রনাথের মনকে আন্দোলিত করছে সেকালে এদেশে যাঁরা দেশের মঙ্গল-চিন্তা করছেন তাঁরা সেই সব সম্ভাবনার বিষয়ে তেমনভাবে বিবেচনা করেছেন বলে তো বোধ হয় না। উদ্ধৃত পত্রের বৎসরাধিক কাল পূর্বেই তিনি সাধনা পত্রে (মাঘ ১২৯৮) সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেনার মত উদ্ধার ও আলোচনা করছেন 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগে—

'য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিস্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁ বলিয়াছেন বর্তমান কালে এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে হইবে অন্যদিকে সভ্যতার সমস্ত সুখসম্পদ [illegible] হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয়; এক পক্ষে উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।

"প্রাচীন সমাজে যখন হীনাবস্থার লোক সর্ববিষয়েই হীনাবস্থায় ছিল তখন এ সম্বন্ধে কোনো কথা উঠে নাই। কিন্তু আজকাল য়ুরোপে সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে আমরা সকলেই সমান রাজা কিন্তু আমাদের সমান রাজত্ব কই? তাহারা যে সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে এ কথা তাহারা প্রতিদিন বুঝিতেছে; এইজন্য সমস্যা প্রতিদিন গুরুতর এবং তাহার মীমাংসাকাল উত্তরোত্তর নিকটবর্তী হইতেছে।

"এতকাল এই সোশ্যালিজম্ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিস্ট পন্থই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-কাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে।

"ইহাতে সোশ্যালিজমের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। রোমান্ কাথলিক মণ্ডলীর অধিপতি স্বয়ং পোপ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসী মজুরদের সম্ভাষণ করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"ইহা একটা লক্ষণস্বরূপে ধরা যাইতে পারে। রোমান কাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বলকাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহান্তজী য়ুরোপের নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজমের আসন্ন উন্নতি ও শান্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাঁহারা এমন বালুকার পরে কখনই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।"

এর কিছুকাল পরে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগে আছে পুনরায় সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধে আলোচনা। "বিলাতী খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিস্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। অতএব সোশ্যালিজম্ মতটা কি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।" অতঃপর [illegible] লায়-এর বই থেকে সোশ্যালিজম তত্ত্বের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—

"...এককালে রাজা ও [illegible] কর্তা ছিল; তাহারাই [illegible] তাহারাই [illegible]

অর্থবণ্টন, এবং সম্পত্তি উপার্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে।

"কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজম্ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে: সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক্ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

"সোশ্যালিজম্ ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

"সোশ্যালিস্টরা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

"ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্, নয় মর্' সেও তদ্রূপ। যে নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমি সাধারণের মধ্যে নির্দিষ্ট হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

"তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভালো হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধর, সোশ্যালিস্ট বিধানমতে কোনো এক লোকের উপর সরকারী রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমসলা যোগ করিয়া তাহার কোনো লাভ নাই—কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না,—সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোনো লাভ নাই এবং ভালো রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভালো রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত সস্তায় কাজ করিতে পারে—অর্থাৎ নিকৃষ্টভাবে জিনিসটা ভালো করিবার দিকে তাহার কোনো দৃষ্টি থাকে না।

"স্বাধীনতার বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই [illegible] জানা বিষয়ে অধীনতা

লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট হইতে ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করিয়া সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অবসাদের মূল নিহিত রহিয়াছে।"

গৃহে ও সমাজে আত্মসম্মানের ও আত্ম-নির্ভরের কথা আরও সবিস্তারে প্রতিফলিত হয়েছে এর পরে ভারতী (১৩০৫) ও বঙ্গদর্শন (১৩০৮-১২) সম্পাদনকালের রচনায়। বস্তুতঃ সমগ্র জীবন ধরে নানা ভাবায় নানা প্রসঙ্গে কথিত এই আত্ম-শক্তি-উদ্বোধিনী বাণীই রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-নৈতিক মতের প্রধান কথা।

টীকা

(১) প্রথম তিন বৎসর সাধনার সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পত্র পরিচালনায় বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত "চিঠিপত্র", বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩। রবীন্দ্রনাথ যে প্রথমাবধিই কার্যতঃ সাধনার সম্পাদক ছিলেন, এই চিঠিতে তারও নিদর্শন লিপি-বদ্ধ আছে।

(২) "সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখক-দের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।"—পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র, ২৮ ভাদ্র ১৩১৭ 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে মুদ্রিত। রচনা-সম্পাদন প্রসঙ্গে তুলনীয় - ছিন্নপত্রাবলী ১১৭।

(৩) বস্তুতঃ সাধনার যুগকে অনেকেই রবীন্দ্রজীবনের সমৃদ্ধতম যুগ, সোনার ফসলের কাল বলে মনে করবেন। সংক্ষেপে এই সময়কার রচনার বৈচিত্র্য ও পরিমাণের আভাস দেওয়া যেতে পারে। ১২৮৪ থেকে ১৩৪৮ সালের মধ্যে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৯০টি গল্পের ৩৬টি সাধনায় বেরিয়েছিল ১২৯৮-১৩০২ এই কয় বৎসরে—"কলকাতা থেকে বন্ধুর ফরমাস আসত, গল্প চাই। গ্রাম্যজীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে-পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম চালালে বসলেই গল্প লেখা যায়।" 'আধুনিক সাহিত্যের অনেক-গুলি আলোচনাই মুদ্রিত হয় সাধনায়, যথা "বিদ্যাপতির রাধিকা" (চৈত্র ১২৯৮), "রাজ-সিংহ" (চৈত্র ১৩০০), 'বঙ্কিমচন্দ্র' (বৈশাখ ১৩০১), "বিহারীলাল" (আষাঢ় ১৩০১), "কৃষ্ণচরিত" (অগ্রহায়ণ ১৩০১), "ফুলজানি" (অগ্রহায়ণ ১৩০১), "সন্ধ্যাসংগীত..." "রামমোহন রায়" ... "শকুন্তলা" ... বরং সঠিক পাঠ: "আর্য-গাথা" (অগ্রহায়ণ ১৩০১), "সঞ্জীবচন্দ্র" (পৌষ ১৩০১), "কৃষ্ণচরিত্র" (মাঘ, ফাল্গুন ১৩০১), "যুগান্তর" (চৈত্র ১৩০১)—কয়েকটি রচনা বাংলার সাহিত্যসেবীদের পরলোকগমনে শ্রদ্ধাঞ্জলি—এই তালিকায় বিদ্যাসাগর চরিত ১ প্রবন্ধটিও গ্রহণীয় (সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২।—এ লেখাটি অবশ্য 'আধুনিক সাহিত্যে'র অন্তর্গত নয়, 'চারিত্রপূজা'র অন্তর্গত)। তদ্ব্যতীত সম-সাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের আলোচনা, 'গ্রন্থ-সমালোচনা'র সংক্ষিপ্ত পরিসরে যাদের যথোচিত বিচার সম্ভব নয়। "গুপ্তরত্নোদ্ধার" (জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত গুপ্তরত্নোদ্ধার যা প্রাচীন কবি সঙ্গীত সংগ্রহ গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে কবিওয়ালাদের গানের আলোচনা—'কবি সংগীত" নামে লোকসাহিত্য গ্রন্থের অন্ত-র্গত। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র কতকগুলি প্রধান কবিতা, যেমন সোনার তরীর বিম্ব-বতী, শৈশবসন্ধ্যা, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, হিং টিং ছট, পরশ পাথর, যেতে নাহি দিব, তোমরা এবং আমরা, বৈষ্ণব কবিতা, গানভঙ্গ, সমুদ্রের প্রতি, আকাশের চাঁদ, সোনার তরী, দুই পাখি, ঝুলন, ভরা ভাদরে, কণ্টকের কথা, নিরুদ্দেশ যাত্রা; চিত্রার সুখ, প্রেমের অভিষেক, এবার ফিরাও মোরে, নব-বর্ষে, মৃত্যুর পরে, অন্তর্যামী, সাধনা, সন্ধ্যা, ব্রাহ্মণ, পুরাতন ভৃত্য, জ্যোৎস্নারাত্রে, দুই বিঘা জমি প্রভৃতি ও বসন্তে নামে সঙ্গীত সাধনার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল; একই সঙ্গে চলেছে চন্দ্রনাথ বসুর মতের প্রতিবাদ নবীনচন্দ্র সেনেরও মন্তব্যের প্রত্যুত্তর 'জনকসভা', চৈত্র ১৩০১' শব্দতত্ত্ব আলোচনা স্বরবর্ণ অ, স্বরবর্ণ এ, টা টো টে, ভিজ্ঞাসা শব্দ।

সুবিখ্যাত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধও সাধনায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সাধনা পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চভূতের ডায়ারি, আবার ব্যঙ্গকৌতুকের অনেকগুলি রচনা, আর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ ও আলোচনা। 'সাধনা'র সোনার তরী ছাড়া এত বিচিত্র ফসল ফলে উঠত কিনা কে জানে? কাব্যরচনা বা পঞ্চভূত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা অবশ্যই পত্রিকা পূরণের জন্য রচিত নয় কিন্তু সাময়িক রাষ্ট্রনৈতিক 'আলোচনা' মনে হয় অনেকটা পত্রিকার কারণেই রচিত হয়েছিল, আর "মোটরগাড়ির স্টার্টার" ফরমায়েস না থাকলে গল্পগুলি শেষ পর্যন্ত সব রচিত হত কিনা তা নিয়ে জল্পনা করা চলতে পারে।

(৪) বাংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির আলোচনা।

(৫) বিদেশী পত্রিকাদি থেকে রচনার চুম্বক ও আলোচনা।

(৬) সম্প্রতি 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' পত্রিকায় শ্রীনন্দরাণী চৌধুরী এগুলি পুনর্মুদ্রিত করেছেন।

(৭) 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম খণ্ড; 'রবীন্দ্র-সরণী' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

(৮) সপ্ততিতম জন্মোৎসবে প্রতিভাষণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), "অবতরণিকা"।

(৯) ছিন্নপত্রাবলী

(১০) ছিন্নপত্রাবলী

(১১) ১৮৯৩ ২৫শে ফেব্রুয়ারির পত্র। ছিন্নপত্রাবলী।

(১২) রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথ বসুর কতকগুলি চিঠি ১৩২৫ আশ্বিন সংখ্যা সবুজ পত্রে ও ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(১৩) ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৫; রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী।

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য চন্দ্রনাথ বসুর লিখিত রবীন্দ্রনাথ ২১ শ্রাবণ, ১২৯৮ তারিখে পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১।

(১৪) "আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর মত", পৌষ ১২৯৮; "সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা", ফাল্গুন ১২৯৮, সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা চৈত্র ১২৯৮; কড়ায়-কড়া কাহন-কানা, পৌষ ১২৯৯; চন্দ্রনাথ বসুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব আষাঢ় ১২৯৯; সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯।

সামাজিক প্রসঙ্গে সাধনায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো কোনো প্রবন্ধের এখানে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে - সমুদ্রযাত্রা (প্রসঙ্গ কথা) ফাল্গুন ১২৯৯; 'বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' শ্রাবণ ১৩০১। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী), দ্বাদশ খণ্ড।

(১৫) "সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম সমালোচনা শুরু করি। [বস্তুতঃ অনেক পূর্ব থেকেই আলোচনা করেছেন।] তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গবর্ণমেন্টকে জুজুর ভয় দেখানোই আমরা বীরত্ব বলে গণ্য করতাম। আমাদের দেশে পলিটিক্যাল অধ্যবসায়ের সেই অবাস্তব ভূমিকার কথাটা আজকের দিনের তরুণেরা ঠিকমতো কল্পনাই করতে পারবেন না।" —রবীন্দ্রনাথ, "রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত", প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৬। কালান্তর গ্রন্থে মুদ্রিত।

সাধনায় প্রকাশিত রাষ্ট্রিক প্রসঙ্গে এই সকল রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী) দশম খণ্ডে মুদ্রিত আছে—

"মার্ক লেপেল গ্রিফিন", শ্রাবণ ১২৯৯; "ইংরেজ ও ভারতবাসী", আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০; "রাজনীতির দ্বিধা", চৈত্র ১৩০০; "ইংরেজের আতঙ্ক", পৌষ ১৩০০; "রাজা ও প্রজা", শ্রাবণ ১৩০১; "অপমানের প্রতিকার", ভাদ্র ১৩০১; "সুবিচারের অধিকার", অগ্রহায়ণ ১৩০১।

পরিশিষ্ট

১

সাধনার চতুর্থ বর্ষে (১৩০১-০২) রবীন্দ্রনাথ তার সম্পাদকতা গ্রহণ করে "আলোচনা" নামে একটি নতুন বিভাগের প্রবর্তন করেন—সাময়িক ঘটনা ও রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য। এগুলি এখনও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিতই আছে। ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে একটি "আলোচনা" নিম্নে উদ্ধৃত হল। দেশের সম্মান দেশের মানুষের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা-কল্পে এ রকম তীব্র সুরের রচনা সেকালে "সম্পাদকীয় স্তম্ভে" সুলভ ছিল না—বস্তুতঃ রচনাটি সমসাময়িক সম্পাদকদের লক্ষ্য করেই লিখিত। ইংরাজের হাতে "যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে সেই কাপুরুষ চাবুক খাইবার যোগ্য এ কথা আমাদের কোন সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না? বল বাড়ীর পদাঘাতের প্রতিরোধক আর কিছু নাই।"

চাবুক-পরিপাক

ইংরাজ গবর্নমেণ্ট তাঁহার ইংরাজ কর্ম-চারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কিরূপে নষ্ট করিতেছেন, কোন দেশীয় পত্রে তাহারই উদাহরণস্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

লুকস সাহেব সিন্ধুদেশের একটি সাব-ডিভিসনের হর্তাকর্তা। তাঁহার ভৃত্য সেই অঞ্চলের রেলওয়ে পুলিসের নিষেধ সত্ত্বেও রেলওয়ের বেড়া লঙ্ঘন করিয়াছিল। পুলিস ইন্সপেক্টর তৎসম্বন্ধে [illegible] করিয়া সাহেবের সেবককে [illegible] এবং পরিত্যাগ করে। সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টরকে চাবুক মারে, এবং পশ্চাতে দৌড় করায়, বাড়ি পর্যন্ত নিজের গাড়িতে ধাবিয়া যায়। আমাদের দেশীয় পত্রিকা এই উপলক্ষে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছেন—বলিতেছেন, তোমাদের চাকরদের তোমরা খারাপ করিয়া দিতেছ—তাহারা আমাদিগকে মারে, আমাদের বড়ো লাগে।

এরূপ সংবাদ এবং তৎসম্বন্ধে এরূপ ভাষা পাঠ করিলে আমাদের স্বজাতির প্রতি নিরতিশয় ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নত-শির লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ যে চাবুক খাইবার যোগ্য একথা আমাদের কোনো সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না—কেন হঠাৎ পিসিমা সাজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আহা উহু করিতে থাকেন? যাহার সম্মান-জ্ঞান নাই, তাহার অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে বলবানের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করা কি কোনো মর্ত্য গবর্ন-মেণ্টের সাধ্যায়ত্ত? গবর্নমেণ্ট কি কখনও প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন?

মনে করা যাক, পারেন; মনে করা যাক গবর্নমেণ্ট এমন এক আশ্চর্য আইন করিলেন, যদ্দ্বারা হেয় ব্যক্তিও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে আমাদের উপকারটা কি হইল? চাবুক হজম করিবার জন্য যে এক অসাধারণ পরিপাকশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেটার কি কিছু লাঘব হইল? গবর্নমেণ্টের সতর্কতা যখনই শিথিল হইবে, তখনি তো উন্নত প্রভুলোক হইতে আমাদের নতপৃষ্ঠে আবার চাবুক-বৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপমান চাবুক-পাতে নহে চাবুক খাইবার যোগ্যতায়; চাবুকধারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে চাবুক মারিতে নিরস্ত থাকিয়া সে অপমান দূর করিতে পারে না—সে অপমান দূর করা একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আদুরে ছেলের মতো আমরা নিজেদের কেবল আদর দিতেই জানি এবং পরের নিকট কেবল আবদার কাড়িতেই শিখিয়াছি।

আমাদের দেশীয় পত্রিকা নাকী সুরে নালিশ করিতেছেন যে, ইংরাজ গবর্নমেণ্ট তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদর দিয়া তাহাদিগকে চাবুক মারা শিখাইতেছেন—সম্পাদক মহাশয় একথা কেন ভুলিয়া যান যে, গবর্নমেণ্টের প্রতি অভিমান করিয়া এবং দেশের লোককে আদর দিয়া তিনি দেশের লোককে চাবুক খাইতে শিখ[illegible] ঘরের ছেলে পরের পদাঘাত অনায়াসে শিরোধার্য করিয়া [illegible] পাইবার জন্য কাঁদিতে বসিতে আসে, [illegible] পিতৃহীন [illegible] সেই পদাঘাত [illegible] হইতে বাঁচাইতে করিতে বসার চেষ্টা [illegible] রেজোলিউশন করিয়া [illegible] হইতে [illegible] করিয়া দেওয়া উচিত।

চাবুক খাইবার জন্য আমাদিগকে সহস্রবার ধিক—এবং চাবুক খাইয়া কান্না জুড়িয়া ও সকল [illegible] গবর্নমেণ্টের প্রতি রাগ করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক্‌!

জাতীয় আদর্শ

আমরা স্বজাতির নিকট হইতে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আশা না করি তবে তদপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সকরুণ সস্নেহ স্বরে বলিতে থাকি আহা আমরা বড়ো দুর্বল—আমাদিগকে যদি কেহ আঘাত করে, আমরা তাহার প্রতিঘাত করিতে পারিব না—আমা-দিগকে যদি কেহ অপমান করে, তবে আমরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম—অতএব যাহারা আমাদিগকে আঘাত ও অপমান করে তাহারা অতি পাষণ্ড; শুনিয়া আমরা এত সান্ত্বনা লাভ করি, নিজেদের প্রতি এত অধিক স্নেহরসার্দ্র হইয়া উঠি যে, আপন অক্ষমতার লজ্জা অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমরা স্বজাতির নিকট হইতে তিলমাত্র সামর্থ্য প্রত্যাশা করি না বলিয়া [illegible] সামর্থ্য প্রকাশের চেষ্টামাত্র [illegible] আমাদের জাতীয় সম্মানবোধের [illegible] উঠিতে পারে না। আমাদের জাতীয় আদর্শ সর্বদা উচ্চ রাখিতে হইবে—সেই আদর্শ হইতে লেশমাত্র স্খলন হইলে সুতীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা আত্মগ্লানি উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে, যে ব্যক্তি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া স্বজাতির লাঞ্ছনার কারণ হইবে, তাহার প্রতি অজস্র স্নেহ বর্ষণ না করিয়া তাহাকে আমাদের সমবেদনা লাভের অযোগ্য বলিয়া একবাক্যে তিরস্কৃত করিতে হইবে—তবেই আমাদের এই অগাধ অধঃপাত হইতে মাথা তুলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। হইতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট বেল কেশবলাল মিত্রকে মারিয়া ভালো কাজ করেন নাই, কিন্তু যে কেশবলাল মার খাইয়া ভূমে লুটাইয়াছিল, তাহার মতো অবজ্ঞার পাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। রাডীচি কোনো জমিদার-বিশেষকে অবমানিত করিয়া হঠকারিতা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে জমিদার উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্র না করিয়া সমস্ত উপদ্রব নতশিরে বহন করিয়াছিল, সে যৎপরোনাস্তি হেয়। এই সকল কাপুরুষেরা অপমান সহ্য করিয়া স্বজাতিকে হীন আদর্শ দেখায় এবং পর-জাতিকে স্পর্ধিত করিয়া তুলে।

অপূর্ব দেশহিতৈষিতা

অথচ আশ্চর্য এই যে, আমাদের সম্পাদক মহাশয়গণ জাতীয় আদর্শকে উচ্চে তুলিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পরজাতিকে সর্বদা মহত্ত্বের পথে অটল রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সতর্কতার বিশ্রাম নাই। ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা দেবতা—সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় একন্য আমাদের সম্পাদক-সম্প্রদায় দিবারাত্রি সজাগ হইয়া আছেন। তাঁহাদের মতে আমরাও দেবতা কিন্তু আমরা ভূতপূর্ব দেবতা—আমাদের পিতামহগণ দেবতা ছিলেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি—আমাদের নিকট কাহারো কিছু প্রত্যাশা করিবার আবশ্যক নাই। গর্ব করিবার বেলায় অতীত কালকে লইয়া গর্ব করিব এবং লাঞ্ছনা করিবার বেলায় পরকে লাঞ্ছনা করিব এবং নিজেদের জড়ত্ব ও অক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে সর্বসমক্ষে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহাকে স্নেহাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া দিব—অহংকার করিব অথচ আত্মোন্নতির চেষ্টা করিব না, অভিমান করিতে থাকিব অথচ অপমানের প্রতিকার করিব না, এইরূপ অদ্ভুত আচরণকে আমরা দেশহিতৈষিতা নাম দিয়াছি।

কুকুরের প্রতি মুগুর

পাশবতা সকল দেশেই আছে—কেবল তাহা নানা প্রকার শাসনে সংযত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়ের সহিত ব্যবহারে অনেক ইংরাজের পশুত্ব যে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় তাহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের দিক হইতে তাহাদের পক্ষে কোনোপ্রকার শাসন নাই। সেই জন্য তাহাদের আদিম প্রবৃত্তি, তাহাদের স্বাভাবিক রূঢ়তা নির্ভয়ে আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপের বাহিরে আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ অথবা উপনিবেশ স্থাপন-কালে য়ুরোপীয়েরা আপন অনিয়ন্ত্রিত বর্বরতার সহস্র পরিচয় দিয়া থাকে। .. যদি ইংরাজকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের পথে রক্ষা করিতে হয়, যদি তাহার অন্তর্নিহিত পাশবতাকে প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা আবশ্যক বোধ কর—তবে কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া, গবর্নমেন্টের দোহাই পাড়িয়া তাহা কদাচ হইবে না। বল ব্যতীত পশুত্বের প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। আমরা যখন অপমান কিছুতেই সহ্য করিব না, অন্যায় প্রতিকারের জন্য যখন প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না, তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে এবং আমাদিগকে সম্মান করিতে শিখিবে।

২

'অন্তর্যামী' কবিতার বর্জিত অংশ

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'অন্তর্যামী' ("এ কি কৌতুক নিত্যনূতন") কবিতা ১৩০১ সালে সাধনার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি 'চিত্রা' গ্রন্থে এখন যে আকারে পাই মূলতঃ তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ ছিল সেই বর্জিত অংশ সাধনা থেকে এখানে মুদ্রিত হল। কবিতাটি বর্তমানে যেখানে সমাপ্ত তারপরে এই অংশ ছিল।

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি এ জীবনে ভুবনে ভবনে
হইবে নিখিলজয়ী,
এবার তাহলে খুলে দাও ডোর
ছুটাও জগতে এ পরাণ মোর,
আঘাত করিয়া নিঠুর কঠোর
ছিঁড়িয়া বন্ধগা-বাধা।

না চাহি আরাম, নাহি বিশ্রাম
দুর্দমবেগে ছুটি উদ্দাম,
দেখাবে আমারে দক্ষিণ বাম
তব ইঙ্গিত-আধা।

আমি নির্ভীকে, লইয়ো আমায়
মর্ত্য প্রাণের প্রান্ত সীমায়—
জীবনমৃত্যু মিশেছে যেথায়
মত্ত ফেনিল স্রোতে।

লয়ে যেয়ো ছিঁড়ি অলসযুগের
আত্মঘাতক লূতাজাল-ঘের,
লয়ে যেয়ো, দেবি, গৃহজীবীদের
শাস্ত্র-শাসন হতে।

নির্বাক হয়ে চেয়ে রবে সব
বিপুল বিশ্ব, বিবিধ মানব,
কোথা হতে জয়শঙ্খের রব
বাজিবে তোমার মুখে।

কোথা হতে শুনি মাভৈঃ মাভৈঃ
চাহি চারিদিকে কই দেবী কই,
তোমার চরণ বিশ্ববিজয়ী
নাচিবে আমার বুকে।

সেই তালে তালে নাচিবে বজ্র,
প্রলয় নেশায় নাচিবে ভক্ত,
রুদ্র দিবস তিমির নক্ত
নাচিবে মুক্তকেশে।

মোহ-বন্ধনে হানিয়া অস্ত্র
ঘুচায়ে জীর্ণ মিথ্যাবস্ত্র,
আয় পাগলিনী প্রসারি হস্ত
বক্ষে, পাগলবেশে

কর অচেতন কর চুম্বনে,
কঠিন পীড়ন তব কঙ্কণে,
তব নির্দয় বাহুবন্ধনে
মুক্তি পাইব বুঝি।

তব কেশপাশে হইয়া অন্ধ
মরিব তোমারে খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যুগ যুগান্ত চরণপ্রান্তে
নূপুর বাজিছে ওই।

যেদিকে ফিরাই মুগ্ধ নয়ন
মনে পড়ে যেন তোমারি স্মরণ,
তোমারি হাতের লিপি পুরাতন
খুঁজে পাই চারিদিকে।

ঊষার আকাশে অরুণের লেখা
তব রাঙা পদ-কমলের রেখা
সন্ধ্যা-তারায় কি যে রেখা দেখা,
চেয়ে থাকি অনিমিখে।

অনন্তকাল বিশ্বমেলায়
তোমাতে আমাতে কিসের খেলায়
খেলায়ে ফিরেছি মনে পড়ে যায়
বাল্য স্বপন মত।

সে খেলাচিহ্ন কুসুমে পাতায়
বায়ু-হিল্লোলে নদীর গাথায়
আকাশেপাতালে যেথায় সেথায়
পড়ে আছে শত শত।

এ শ্যামল ধরা সুনীল গগন
ছিল আমাদের বাসর-ভবন,
কবে হয়েছিল প্রথম মিলন
আজি কি তা মনে পড়ে।

সে ফুল-শয়নে তোমার সুবাস
আজো বিরহীরে করিছে উদাস,
সে সুখ-পরশ বহিয়া বাতাস
আজিও সোহাগে করে।

শত জনমের তোমার সে হাসি
কার মুখে আজি বেড়াইছে ভাসি,
তাই দেখে' আজি কারে ভালবাসি
তাই ভাবি আজি মনে।

যে কথা স্বর্গে হয়েছিল বলা
সে কথা ধ্বনিছে আজিকার গলা,
কখন কোথায় ওগো চঞ্চলা
কি যে খেলা ত্রিভুবনে।

এমনি করিয়া মুগ্ধ এ দাসে
বাঁধিয়া গোপন ছলনার পাশে
শোক সোহাগেতে প্রেম পরিহাসে
খেলায়ে বেড়াবে বুঝি?
শত জনমের বিস্মৃতি মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী?
সকল জগৎ তব মায়ারথ
কোথা যেতে চাহ অয়ি।

আজি নির্জনে বসিয়া একাকী
পদপঙ্কজে মন বাঁধা রাখি
সুগভীর ধ্যানে মুদি দুই আঁখি
হেরিতেছি এক ছবি,

(পার্থের রথে ভদ্রা যেমন)
হেলায় রশ্মি করিয়া গ্রহণ
সুবর্ণ রথ করিছ চালন
পাশে আমি তব কবি—

নাহি জানি কোন্ যুগের সে কথা,
নিয়ে গিয়েছিলে কোথা হতে কোথা,
কত রণভূমি কত সে জনতা,
কর্মপ্রবাহ কত!

বাধা দিয়ে ওঠে শোক-আবর্ত
মহাসংঘাতে করে অংশ
দারুণ হিংসা সুখ প্রমত্ত
প্রলয়ন উন্নত!

স্বর্ণাক্ষরে সে কাহিনী লেখা ইতিহাসে,
যত কবি পড়ে তত মনে আসে
দুলে উঠে প্রাণ শোকে উল্লাসে
উৎসাহে অবসাদে।

আমি ছিনু সেথা, আমি ছিনু তারা,
সেই স্রোতোমাঝে হয়েছিনু হারা,
বাহি সে দিনের নির্ঝর-ধারা
আসিয়াছি কলনাদে।

সেই রামায়ণ, সে মহাভারত,
তার মাঝে তব গিয়েছিল রথ,
দুঃসহ দুখ, দুর্গম পথ
এসেছি বাহন করি।

কত না ঊর্মি-আকুল পাথার
তোমা সাথে আমি দিয়েছি সাঁতার।
মৃত্যু-পয়োধি হইয়াছি পার
চরণ বক্ষে ধরি।

তাই থেকে থেকে প্রাণ মেতে উঠে,
সুখ-বন্ধন দুই হাতে টুটে'
কটিকার মাঝে যেতে চায় ছুটে,—
কারে মনে পড়ে বুঝি?
কর্মের স্রোতে জল-তরঙ্গে
তোমারে বেড়াব খুঁজি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বুদ্ধদেব বসু

উপেন্দ্রকিশোর বিষয়ে প্রবন্ধ? তা সম্ভব নয়, অন্তত আমার পক্ষে নয়। আমার পক্ষে যা সম্ভব তা শুধু স্মৃতিমন্থন, শুধু ভক্তি-নিবেদন। তাঁর সঙ্গে লিপ্ত হ'য়ে আছে আমার সবুজ শৈশব, সবুজ নোয়াখালি, মশা, বাঁশবন পানা-পড়া পুকুর বৃষ্টি-পড়া দিন, হারানো বল খুঁজতে গিয়ে উজ্জ্বল-চোখ গোসাপের সঙ্গে দেখাশোনা, আর প্রথম কবিতার স্বর্গস্বাদ। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সাহিত্যিক নয় ব্যক্তিগত।

যখন দাঁত পড়ছে এবং আবার দাঁত উঠছে আমার জীবনের সেই সময়ে কী সৌভাগ্যে না তাঁর বইগুলো পড়েছিলাম! [illegible] আর মন ঘোড়ার মতো দৌড়ে চলেছে পাতার পর পাতা দিনের পর দিন [illegible] প'ড়েও [illegible] হয়নি কোনো একটি অক্ষর [illegible] মাধুরী। [illegible] পিছনে এক-এক কুকুর নিয়ে। কত কান্না, [illegible] কত [illegible] কাঁপুনি, কত করুণা আর কত আক্রোশ! আর কী [illegible] নিবিড় [illegible] অতুলনীয় ভালো লাগা! সেই [illegible] মফস্বল সিনেমাহীন রেডিওরহিত আদিযুগ, সামান্য ও সংকুচিত দৈনন্দিনতা। এরই মধ্যে একটি দাঁত-পড়ো-পড়ো বাঙালি শিশুর জীবন ছিলো উত্তেজনাময়, পতনে-উত্থানে উত্তাল, দেবতা ও দানবের দ্বারা রোমাঞ্চিত।

বলা যাবে না কত সম্পন্ন ছিলো আমার শৈশবজীবন, কত ভরপুর। ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, ছিলো টেনিসনের কবিতা ও এমন একটি আশ্চর্য বাক্স যার ভিতরে ব'সে কেউ একজন নানারকম সরু মোটা গলায় গান গায় ও অভিনয় করে; শাণিত পালকের কলমে আকাশের মতো নীল রঙের কালিতে শাদা কাগজের উপর ধীরে ধীরে অক্ষররচনার সুখ ছিলো। কিন্তু সুখের চরম ছিলো সেই দুটি বই—'ছোট্ট রামায়ণ' আর 'ছেলেদের মহাভারত'—বার-বার ফিরে এসেছি তাদের কাছে; যেমন মা, যেমন মাঝে-মাঝে খাওয়া আর ঘুমোনো—এও তেমনি অনতিক্রম্য।

আমার খেলা ছিলো তাসের বাড়ি বানানো, দেশলাইয়ের বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি বানানো, মেয়েদের সঙ্গে রান্নাবাড়াও খেলেছি, কিন্তু খেলাধুলোর নামে শরীরের যে-সব যোদ্ধৃ-জনোচিত ব্যবহার বালকেরা সাধারণত ক'রে থাকে, আমি তাতে পরাঙ্মুখ ছিলুম।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী চিত্র ॥ কুলদারঞ্জন রায়
শ্রীঅমূল্যকুমার সেনগুপ্তের সৌজন্যে

আসল কথা, আমার দেহ ছিলো দুর্বল (যেমন এখনও আছে), এবং আমার মনুষ্যত্ব ততদিন পর্যন্ত অস্ফুট ছিলো যতদিন না মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময়ে উপেন্দ্রকিশোর আমাকে তীরন্দাজ ক'রে তুলেছিলেন, আমার কাণ্ডর তীরে অনেক তাড়কা বিদ্ধ হয়েছে, যদিও সেই যুদ্ধের ফলে মাচা থেকে কচি কুমড়ো পড়ে যেতে দেখে গুরুজনেরা প্রীত হননি। সত্যি বলতে, আমাকে আঙুলে লাট্টু ঘোরাতে না-পারলেও, ধনুর্বিদ্যায় আমি বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলাম—কেননা তা না-হ'লে রাম লক্ষ্মণ বা অর্জুন হওয়া যাবে না; অর্থাৎ—শুধু পড়া নয়, ঐ রামায়ণ আর মহাভারত আমার জীবনের মধ্যে মিশে গিয়েছিলো, যা খেলছি আর যা ভাবছি তার অনেক-কিছুই সেখান থেকে আসছে। 'ছোট্ট রামায়ণ'টি পুরো মুখস্থ আমার—আউড়ে যাচ্ছি, অভিনয় করছি, ঘটনাগুলো আমারই জীবনে ঘটাচ্ছি, অতএব তীরধনুক ছাড়া কী ক'রে চলে?

কিছুদিন পরে আর-এক খেলা আমাকে পেয়ে বসলো—তা হলো কবিতা লেখা। আমি স্কুলে পড়িনি ছেলেবেলায়, আমার সারাটা দিন আমারই ছিলো; এই অবকাশের সুযোগে এক ক্রীড়াবিমুখ পাঠমুগ্ধ বালকের কাঁচা হাতের লেখায় ভ'রে উঠেছিলো অনেকগুলো মসৃণ কাগজের রুল-টানা খাতা, দপ্তরিকে ফরমাশ দিয়ে তৈরি। ততদিনে আমি মধুসূদন আর হেমচন্দ্র পড়ছি, কিন্তু আমার ঐ প্রথম প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে বীররস বা অমিত্রাক্ষর প্রবেশ করেনি; একবার একটি 'অভিমন্যুবধ' লেখার উদ্যম উদ্গত হয়েই মিলিয়ে গিয়েছিলো। শুধু একটি দীর্ঘাকার পদ্যরচনা আমি আরম্ভ ক'রে শেষ করতে পেরেছিলাম: তা একটি রামায়ণ। তখন আর 'ছোট্ট রামায়ণ' আমার নিত্যসঙ্গী নয়, কিন্তু আজ সেই খাতাটি খুঁজে পাওয়া গেলে বোঝা যেতো তার কতটা অংশ উপেন্দ্রকিশোর থেকে এসেছিলো, সম্ভবত অনেকটাই;—যা একেবারে মনের মধ্যে মিশে ছিলো হয়তো তা-ই, অদল-বদল উল্টে-পাল্টে, অচেতনভাবে, আমি উগরে তুলেছিলুম। আমার এই অনুমানের সপক্ষে

একটি তথ্য আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি: 'ছোট্ট রামায়ণে'র ললিতমধুর মুখবন্ধটি আজ পর্যন্ত আমি নির্ভুলভাবে আওড়াতে পারি না। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন—

বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বয় ধীরে।
সুখে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল চলে কুলকুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড়ো সুন্দর কথা, শুন মন দিয়া।

কিন্তু আমার স্মরণে যা মুদ্রিত হয়ে আছে, তা এই :

তমসার নীল জল চলে কুলকুল
বনে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল।
ঋষির কুটিরখানি গাছের ছায়ায়
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
সেথা মুনি বাল্মীকি লেখে রামায়ণ
সে বড়ো সুন্দর কথা শুন দিয়া মন।

হয়তো আমার সেই রামায়ণ এই ধরনের ভুল উদ্ধৃতি দিয়েই ভরিয়েছিলাম।

দশ কি পনেরো বছর আগে একটা কবিতার আরম্ভ আমার মনে আসে—

মনে পড়ে কবেকার "সন্দেশে"র রঙিন মলাট

কবিতাটা লেখা হয়নি, কিন্তু ঐ প্রথম পংক্তিটি ভুলে যেতেও পারিনি আমি. মাঝে-মাঝে যখনই মনে পড়ে আমি যেন ছেলেবেলায় ফিরে যাই। ডাক-পিওন আসতে-আসতে নিশানের মতো হাত নাড়ছে দূর থেকে, দেখতে পেয়ে ছেলেটা ছুটে গিয়ে তাকে ঝাপটে ধরলো; একমাস প্রতীক্ষার পরে আজ আবার মোড়ক ছিঁড়ে সুখে ডুবে যাওয়া। সেই 'সন্দেশ'! নানা-রঙিন মলাট থেকে সর্বশেষ ধাঁধাটি পর্যন্ত এমন কিছুই তাতে ছিলো না, যা শিশুর পক্ষে—অধিকাংশ স্থলে সাবালকের পক্ষেও—উপভোগ্য নয়; বিশেষত উন্মীলমান ইন্দ্রিয় ও মন নিয়ে শিশু যা-কিছু আকাঙ্ক্ষা ক'রে থাকে, এবং যা-কিছু তার বেড়ে ওঠার পক্ষে প্রয়োজন—তার বয়সোচিত পুলক ও পুষ্টি—সব যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে উপহার আনতো 'সন্দেশ', মাসে-মাসে সুদূর কলকাতার বহসাময় সুকিয়া স্ট্রীট থেকে। মলাটে লাল কালিতে ছাপা থাকতো 'প্রতিষ্ঠাতা 'উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্পাদক সুকুমার রায়, বি এসসি'। সহজ বুদ্ধিতে আমি বুঝে নিয়েছিলুম যে এই দু-জনের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ, এবং অধিকাংশ রচনা স্বাক্ষরহীন হওয়া সত্ত্বেও, আমার অনুমান করতে দেরি হয়নি যে আশ্চর্য ছন্দ-মিলের কবিতাগুলোর লেখক যেমন পুত্র, তেমনি 'পুরাতন লেখা' পর্যায়টিও স্বগত পিতার লেখনী থেকে বেরিয়েছিলো। মেরুজ্যোতি পিরামিড, পেঙ্গুইন পাখি, মাঙ্গো পার্ক আর্কিমিডিস— এই ধরনের প্রসঙ্গ থাকতো 'পুরাতন লেখা'য়; এই পুরাণকার বাংলা-দেশের শিশুদের সামনে বাস্তব পৃথিবী-টাকেও খুলে ধরেছিলেন। তাঁর হাত ধ'রে আমি ঘুরে এসেছি জগৎ; জগদানন্দ, জুল ভের্ন, 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' এর জন্য প্রস্তুত হয়েছি। অনেক শিখেছি, কিন্তু তা এমন আনন্দময় যে শিক্ষা ব'লে কখনো মনে হয়নি। তুলনায় স্কুল কী দরিদ্র, কলেজের মাস্টারমশাইরা কী নিস্তেজ! কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়ে যারা কলেজে পড়তে আসে তাদের সাধারণ জ্ঞানের অভাব ভয়াবহ। তারা হয়তো নাপোলেয়র নাম শোনেনি, বা বিষুবরেখা ভারতবর্ষের উত্তরে না দক্ষিণে না মধ্যভাগে সে-বিষয়ে তাদের ধারণা অস্পষ্ট, এমনকি 'মোনা লিসা' কী ব্যাপার তাও জানে না এমন ছাত্রও আজকের দিনে বিরল নয়। এ নিয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা হচ্ছিলো একদিন। "মনে হয় আমরা যেন শৈশবেই ভূগোল ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় মোটামুটি জেনে ফেলেছিলুম—কোনো চেষ্টা করতে হয়নি তার জন্য—নিশ্চয়ই আজকাল স্কুলগুলোর খুব অবনতি হয়েছে।" আমার কথা শুনে হাসলেন আমার সমবয়সী এক অধ্যাপক "ও সব কি আর স্কুলে শিখে-ছিলাম আমরা? শিখেছিলাম—মনে ক'রে দেখুন— সন্দেশ, 'মৌচাক', 'প্রবাসী' প'ড়ে। আপনি যেমন তা-ই, আমিও তেমনি।" আমাকে মানতে হলো তাঁর কথা সত্য। হয়তো ঐ ধরনের সুখপাঠ্য ও জ্ঞানদা পত্রিকা দেশে আর নেই ব'লেই আমাদের শিক্ষার ভিত্তিতে ফাটল ধরেছে। কিংবা

পত্রিকা থাকলেও প্রসঙ্গগুলি আর শিশু ও কিশোরদের আকর্ষণ করে না; তাদের অবকাশ নেই, রেডিও সিনেমা ময়দান প্রভৃতি বিবিধ বিনোদে তারা ছিন্নভিন্ন, এবং অনুরূপ উত্তেজনা তাদের দিতে পারে শুধু সেই ধরনের রচনা, যাতে কল্পনার অভাব গাঁজিকা দিয়ে মেটানো হয়, এবং থাকে কুটকির সারি ও বিস্ময়চিহ্নের আড়ালে ভাষার ও তথ্যের দারিদ্র্য লুকিয়ে রাখার চেষ্টা। কিংবা হয়তো যাকে আমরা এতদিন ধরে মানবিক বোধ ও বিদ্যা বলে—এবং সেইজন্যেই শিক্ষিতের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে জেনেছি, অধুনা আর অধিকাংশের কাছে মূল্য নেই তার; অধিকাংশ ছেলেরই উচ্চাশা হ'লো যন্ত্রবিদ বা বিজ্ঞানী হবার, এবং পিতামাতারাও বলতে শুরু করেছেন যে যন্ত্রবিদ্যা বা বিজ্ঞানেই যদি স্থান না পেলো তাহ'লে আর ছেলেকে 'পড়িয়ে কী হবে?' এই মানসতা দেশের মধ্যে আরো ব্যাপ্ত হ'লে এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যখন শিক্ষিতেরা পঞ্চপাণ্ডবের নাম সঠিক-ভাবে স্মরণে আনতে পারবেন না—আর, সত্যি বলতে, তাতে কোনো পঞ্চবার্ষিকী সংকল্প ব্যাহত হবার প্রত্যক্ষ কোনো কারণ নেই। পরোক্ষভাবে কতদূর পর্যন্ত ক্ষতি হ'তে পারে সে-কথা এখন তোলা যাবে না, অনেক বেশি সুখদায়ক উপেন্দ্রকিশোরে ফিরে যাই।

আমি 'টুনটুনির বই'কে ভুলে যাচ্ছি না—তা কি সম্ভব? যেমন দক্ষিণারঞ্জন যেমন সুকুমার রাওয়ের 'গল্পের বই' ও 'আরো গল্প'—এবং যেমন 'হাসিখুশি' ও 'খুকুমণির ছড়া', তেমনি 'টুনটুনি'ও অমর। 'অমর' কথাটি লিখেই একটু ভাবতে হ'লো, কেননা এমন বছর মাঝে-মাঝে আমরা অনেক কাটিয়েছি, যখন উল্লিখিত বইগুলোর মধ্যে কোনো-একটি বা কোনো-কোনোটি ছাপা ছিলো না—'বাজারে'র খামখেয়াল থেকে উপেন্দ্রকিশোরও নিস্তার পাননি। যে-কালে এ সব বই অপ্রাপণীয় সে-কালেও বাংলার ঘরে-ঘরে শিশুরা জন্মেছে এবং জন্মাবে—বড়ো হবে এবং হয়েছে—কী পড়েছে, কী পড়বে তারা, ঘুমের আগে মায়েরা তাদের কী প'ড়ে শোনাবেন? বিষম এই ভাবনা, কিন্তু মানতেই হবে যে ও-সব বইয়ের অস্তিত্ব না-জেনেও ভবসংসারে কৃতী হওয়া সম্ভব। অতএব নিষ্ঠুরের মতো বলা যাক যে 'টুনটুনির বই' বা 'খুকুমণির ছড়া'ও অপরিহার্য নয়—অপরিহার্য শুধু খবর-কাগজ ও পাঠ্যপুস্তক যেহেতু ও-দুয়ের প্রচার কোনো অবস্থাতেই বন্ধ হয় না। না, অপরিহার্য নয়—কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের প্রধান রচনাগুলিকে বলা যেতে পারে বিকল্পহীন; অর্থাৎ, এরা যা দিতে পারে অন্য কোনো বই তা পারে না; যদি কোনো মা-বাবা তাঁদের প্রায় অজ্ঞান [illegible], [illegible] [illegible] যত্নে

তার কারণ কি মূল কাহিনীর গৌরব নয়? বিশেষত মহাভারত—সেই সনাতন ও সর্বজনীন গ্রন্থ—তার আবেদন কি অমোঘ ব'লে ধ'রে নেয়া যায় না? তখনই উত্তর পেয়েছি – না, তা নয়, কর্ণের মৃত্যু বা জটায়ুবধের মতো ঘটনাও যেমন-তেমন ক'রে লিখলে সাড়া তুলবে না আমাদের হৃদয়ে। আমি ছেলেবেলায় দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতি অনেক উপাখ্যান পড়েছিলাম, যেগুলো ছোটোদের জন্য পদ্যে রচিত এবং স্কুলের প্রাইজের উপযোগী ক'রে মুদ্রিত; সেগুলো থেকে আমি কোনোরকমে কাহিনীটা শুধু অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, কিন্তু কাঁদিনি, সুখী হইনি, আওড়াইনি। কিন্তু আজও, অবসর পেলে, উপেন্দ্রকিশোরের স্বাদ নিতে আমি রাজি আছি। অর্থাৎ, ব্যাস যেমন দেবতুল্য, তেমনি উপেন্দ্রকিশোরও একজন কৃতী গণেশ।

শৈশবে, ছন্দের গুণে, অন্যকে হয়তো বেশি মুগ্ধ করেছিলো 'ছোট রামায়ণ' কিন্তু গদ্যের দিক থেকে একটি দুটি আমি দেখতে পাই। ঐ পুস্তকে দেখা যেতো ছেলেদের রামায়ণ ও উপেন্দ্রকিশোর উত্তর-কাণ্ড বর্জন করেছিলেন। মনে হয় সীতার পাতালপ্রবেশের দৃশ্য ... বর্ণনা ক'রে ছোটোদের মন ব্যথিত করতে চাননি।

কিন্তু উত্তরকাণ্ড হীন রামায়ণ রামায়ণের মহিমা ঠিক ধরা পড়ে না। কেননা অযোধ্যাকাণ্ড থেকে যা কিছু ঘ'টে এলো, তাকে গভীরতর অর্থ দিচ্ছে সর্বশেষ সীতা-বর্জন। এবং শিশুরাও বই প'ড়ে কাঁদতে ভালোবাসে—সেটা তাদেরই পক্ষে বেশি প্রয়োজন; সেই কান্নার অংশ কমাতে গেলে বরং তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু এদিক থেকে 'ছেলেদের মহাভারত' একেবারে সমালোচনার অতীত।

ভেবে দেখা যাক, শিশুদের জন্য মহাভারত লেখার কাজটি কী সুকঠিন। সেই মহারণ্যের মতো গ্রন্থকে শিশুদের পক্ষে সহনীয় একটি পরিচ্ছন্ন ছোটো বাগানে পরিণত করা—তার জন্য কি প্রয়োজন হয় না অনেক চিন্তা, অনেক পরিশ্রম, নির্বাচনের জন্য বিদগ্ধ রুচি ও সহজ রসবোধ? উপেন্দ্রকিশোর নির্ভুলভাবে মূল কাহিনীটি বেছে নিয়েছেন, কিন্তু তার কোনো প্রধান অংশ বর্জন করেননি, বইটি শেষ করেছেন যথোচিতভাবে যদুকুলের ধ্বংস এবং মহাপ্রস্থানে। আর এই মহাভারতের মূল কাহিনীর পারম্পর্য স্মরণে আনতে হ'লে, এটি এখনো বয়স্কদের সহায় ব'লে মনে হয়। কুরু-পাণ্ডবের গল্প সবটুকুই বলেছেন তিনি, কিন্তু বলেছেন অতি সংযত ও সুস্মিত ভাবে, তাই যেখানে তাঁর স্পর্শ যেখানে পঞ্চপাণ্ডব ও কর্ণের জন্মরহস্য বলছেন, অত্যন্ত হীন অংশগুলিকে কেমন ক'রে আনার যেন একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে তাঁর। কেমন সরলভাবে অনায়াসে তিনি বলেন, 'কুন্তী কর্ণকে হইয়াও তাঁহার প্রতি মায়ের কাজ করেন নাই, জন্মিবার পরেই তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন' বা 'অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদে অর্জুনের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা তোমরা কল্পনা করিয়া লও।' দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসন যত টানে, ততই লাল নীল হলদে সোনালি নানা রঙের কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।' 'হতভাগা' বিশেষণটিতে কী চমৎকার ভাবিছল।' 'বিচিত্রবীর্যের বিবাহের পর লেখকের মন্তব্য 'ভীষ্ম এমনি মহাপুরুষ ছিলেন।' তারা যেন শিশুদের মনের সঙ্গে সমান মাপে চলছে কোথাও তাদের বোধশক্তিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না অথচ আসল ব্যাপারে কোনো ফাঁকিও নেই। চরিত্রচিত্রণে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল শুভাশুভের উভয় দিকও প্রকাশ পেয়েছে ক্ষুদ্র পাঠকেরা কর্ণের মৃত্যুতে যেমন কাঁদবে, তেমনি মুগ্ধ হবে অর্জুনের বীরত্বে, অনুভব করবে গান্ধারীর বেদনা, যুধিষ্ঠিরের দুর্বলতা ও মহত্ব; মহাপ্রস্থানের দৃশ্যে অভিভূত না-হ'য়ে পারবে না। পূর্বস্মৃতি থেকে আমি অন্তত এটুকু বলতে পারি যে শৈশবে 'ছেলেদের মহাভারত' প'ড়ে আমি তার প্রধান চরিত্রগুলিকে যে-ভাবে জেনেছিলাম, পরবর্তী [illegible]

পড়ে সেই ঘটনায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়নি, শুধু অনেক বিস্তারিত হয়েছে।

ছোটদের মহাভারতে একটি 'গ্রন্থকারের নিবেদন' আছে, বঙ্গাব্দ ১৩১৮-তে লিখিত সেই ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করতে লোভ হচ্ছে। 'মহাভারতের আখ্যান বালক-বালিকাদের উপযোগী করিতে গিয়া, উহার স্থানে-স্থানে আবরণের প্রয়োজন হইয়াছে। মূল গল্প অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই কার্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এ বিষয়ে যদি কেহ কোনো ত্রুটি দেখিতে পান, দয়া করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।' তারপর: 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে আমি বিশেষভাবে ঋণী। লিখিবার সময় তাঁহার নিকট উৎসাহ পাইয়াছি, এবং পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত তিনি সংশোধন করিয়া দেওয়াতে, পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।' রবীন্দ্রনাথ কী-কী 'সংশোধন' করেছিলেন, কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ রচনা করে দিয়েছিলেন কিনা তা জানবার জন্য অনেক কিছু মূল্য দেয়া যায়। আর একটি কথা জানতে ইচ্ছে করে: কোনো পাঠক কি কোনো ত্রুটি দেখিয়েছিলেন সেই সময়ে? কিংবা কেউ কি লক্ষ করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে এই পুস্তকটি কী অসামান্য অবদান? বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যখন বলছেন 'সময় যেন পাচক, সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে, ইহাই সংবাদ' — তখন কি অনেক বয়স্ক পাঠক রোমাঞ্চিত হননি এই চিত্রকল্পে, এবং মুগ্ধ হননি উপেন্দ্রকিশোরের সংক্ষেপীকরণের নৈপুণ্যে? মূলে এই বার্তা অনেক বেশি দীর্ঘ ও সবিস্তার, খোপে-খোপে ভাগ-করা একটি ধ্রুপদী উপমা আছে সেখানে; উপেন্দ্রকিশোর যেন কত সহজে, তার মর্মকথাটি ছেঁকে তুলে নিয়েছেন। শিশুরা এটা নাও বুঝতে পারে এ-কথা ভেবে বর্জন করেননি এই শিখরস্পর্শী কল্পনা, এই প্রজ্ঞার উদ্ভাস। সৌপ্তিক পর্বের বীভৎসতার উপর তিনি টেনে দেননি 'আবরণ'; মৌষল-পর্বে যুদ্ধের চেয়েও আরো বড়ো প্রলয়ের আভাস দিয়েছেন; মহাপ্রস্থানের পথে প্রিয় পাণ্ডবেরা যখন একে একে পড়ে যাচ্ছেন তখন তাঁদের করুণা করেননি। সরলতার সঙ্গে সারবত্তার এই সমন্বয়ের জন্যই তাঁর 'মহাভারত' শিশু-সাহিত্যের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে; এবং এর সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কৃতি মিলিয়ে দেখলে তাঁর কাছে বাঙালির ঋণ অনেক বেশি বেড়ে যায়। বিশেষত আমরা—যাদের শৈশব তিনি মধুময় ক'রে রেখেছিলেন, আমাদের কাছে তিনি নমস্য; আমি অন্তত নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের বইগুলো প্রকাশিত হবার আগে

সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ভাবিয়া দেখিলে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমার যেরূপ মনে হয়, নিবেদন করিতেছি।

দুই বিষয়ের দুইটি মূল—শব্দ ও বর্ণ (আলোক), তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকতাই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সাত সুর, সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার সা রি গা মা স্থানীয়। প্রভেদ এই - সঙ্গীতের সাত সপ্তক, চিত্রবিদ্যার একটি মাত্র সপ্তক কিন্তু তাহা বলিলেই ছাড়ে কে? এ বিষয়ে অনেক বড় লোকের মস্তিষ্ককণ্ডূয়ন হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তদনুরূপ ফল হয় নাই। স্বরসপ্তক ও বর্ণসপ্তকের কম্পনসংখ্যাগুলিকে অনেক মোচড়াইলে তবে নাকি দেখা যায় যে ইহাদের অনুপাতগুলির কতকটা সাদৃশ্য আছে। সে সাদৃশ্য যে ঠিক কি রকম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত মোচড়ান আমরাও মোচড়াইয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক মোটামুটি কয়েকটা কথা সহজেই বুঝা যায়। সুর, গান্ধার পঞ্চম একসঙ্গে বাজিলে শুনিতে অতিশয় মিষ্ট হয় এই কারণ সপ্তকের ভিতরে এই তিন সুরের প্রাধান্য হইয়াছে। প্রথম কয়েকটি হার্মনিক এই তিন সুরেই সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরবোধ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে দেখা যায় যে এই তিন সুরই শিক্ষার্থিরা সর্বপ্রথমে আয়ত্ত করিতে পারে। সুতরাং ইহাদিগকে সপ্তকের তিনটি মূল সুর বলিলেও নিতান্ত অন্যায় হয় না। এ বিষয়ে আর একটি অকাট্য যুক্তি এই দেওয়া যাইতে পারে যে, এই তিন সুরের অন্তরগুলিকে অবলম্বন করিয়া সপ্তকের আর কয়টি সুরকে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যায় যে, স্বরসপ্তকের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম, ইহারা মূল সুর। সেইরূপ, বর্ণসপ্তকেরও প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম, অর্থাৎ লোহিত, পীত ও নীল, ইহারা মূলবর্ণ। আপত্তি হইতে পারে যে, মূলবর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। [illegible] বৈজ্ঞানিকেরা লাল, সবুজ ও

আমার এক প্রশ্ন এবং এক প্রার্থনা। প্রশ্ন এই,—বৈজ্ঞানিক এবং সাধারণ লোকের এরূপ দ্বন্দ্ব হইবার কারণ কি? যাঁহারা ইতিপূর্বে এ বিষয়টি তলাইয়া দেখেন নাই, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, বৈজ্ঞানিকেরা কি করিয়া বৈজ্ঞানিক হইল, আর সাধারণ লোকেরা (অন্তত এ বিষয়ে) কি করিয়া সাধারণ লোক থাকিয়া গেল একবার বিচার করুন। বৈজ্ঞানিকেরা আলোককে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার [illegible] খবর বাহির করিয়াছেন; চক্ষের [illegible] কোন্ অন্ধকার কুঠরীতে এক অদ্ভুত পর্দায় বাহিরের বর্ণসকলের প্রতিরূপ প্রকাশিত হয়; সেই পর্দায় লাল, সবুজ এবং ভায়োলেট বর্ণের কম্পনগুলির সহিত প্রবল সহানুভূতিসম্পন্ন তিন প্রকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "কি যেন" আছে, তাহার তথ্য লইয়াছেন। আর সাধারণ লোকেরা দোকান হইতে রঙ

বাদনু —

তোমার চিঠি পেয়েছি বাবা।
এখানে আর এখন বড় বৃষ্টি হয় না। রোজ
[illegible] স্নান করি। এ কয়দিন সমুদ্র
[illegible] এখানে কি জোর ছিল। যেদিন পূর্ণি-
[illegible] জোর ছিল সেদিন একটা খুব বড়
ঢেউ এসে আমাকে — এমনি করে
[illegible] দিয়েছিল। আর তার পরে আরেকটা
আরো বড় ঢেউ এসে — এমনি করে
[illegible] বালির উপর ঘসে দিয়েছিল।
সেদিন কিনা পূর্ণিমা ছিল, তাই এত জোর। সেদিন
হাজার লোক সমুদ্রে স্নান করেছিল। যখন
ঢেউ আসত তখন তাদের অনেকে —
এমনি করে বালি আঁকড়ে ধরে থাকত, আর
কেউ কেউ — এমনি করে ছুটে পালাত।
অনেকে সেদিন পয়সা, দুআনি এ সব সমুদ্রে
ফেলে দিয়েছে। তারা মনে করে যে সমুদ্রটা
একটা দেবতা; আর তাকে পয়সা দিলে সে খুসী
হয়। কেমন আছ বাবা, আমরা ভাল আছি। — বাবা

উপেন্দ্রকিশোরের চিঠি : পুত্র শ্রীসুবিমল রায়কে লিখিত

কিনিয়া আনিয়া মিলাইয়া দেখিয়াছে। অত গোলমালের ভিতরে তাহারা যায় নাই; কারণ, ইহাতেই তাহাদের কাজ চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা যদি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, তবে তাঁহারাও সাধারণ লোকই থাকিয়া যাইতেন। আর সাধারণ লোকের যদি অতটা কারখানা না করিলে না চলিত, তবে তাহাদের সাধারণ লোক থাকাই ভার হইত। আসল কথা আলোক মিলাইয়া যে ফল পাওয়া যায়, রঙ (পিগমেন্টস) মিলাইয়া সে ফল পাওয়া যায় না। লাল আর সবুজ আলোক মিশিয়া প্রায় সাদা রঙ হয়, কিন্তু লাল আর সবুজ রঙ মিলাইয়া ধোঁয়াটে রঙ হয়। উভয়ের কথাই সত্য। বাজারের রঙ কিনিয়া মিলাইয়া দেখিতে চাও তো লাল, হলদে, নীল, ইহারাই মূলবর্ণ। আলোক মিলাইয়া দেখিতে হইলে লাল, সবুজ, ভায়োলেট মূলবর্ণ।

সুর মধ্যম ধৈবত মিলিয়া মাইনর কর্ড হয়। এ হিসাবে এই তিনটি সুরের মৌলিকতা না ঘটুক, ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়. এই ঘনিষ্ঠতা এবং লাল, সবুজ, ভায়োলেটের মৌলিকতার কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায় কেবল ঐ ধৈবতটায় মুশকিল বাধাইয়াছে। ধৈবত না হইয়া যদি নিখাদ হইত তবে আর কথা ছিল না। কিন্তু এক কথা। ভায়োলেট নিখাদের স্থানীয় আর ইন্ডিগো ধৈবত-স্থানীয়। ইন্ডিগো রঙটার প্রকৃতপক্ষে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহা ভায়োলেটই, কেবল একটু বেশী নীল ঘেঁষা। মৌলিক বর্ণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিশ্বাস অনুযায়ী হিসাব করিলে দেখা যায় যে, নীল ও লাল মিশিয়া ইন্ডিগো, ভায়োলেট, উভয় রঙেরই উৎপত্তি—ইন্ডিগোতে নীলের ভাগ বেশী, ভায়োলেটে লালের ভাগ বেশী। বর্ণসপ্তকের এই সপ্তমটায় বড় বেশী জায়গা লইয়াছে বোধ হয় ইন্ডিগো-ভায়োলেটের ঢেউ হইয়াছে। এত জায়গা এখানে থাকিবার কি দরকার ছিল? এই স্থানটা বাস্তবিকই কেমন একটু যেন বেখাপ্পা। আশ্চর্য দেখুন, স্বরসপ্তকের ধৈবতের স্থানটাও কেমন একটু বেখাপ্পা। ওখানে দুটো ধৈবতের স্থান, তাহার একটা সাহেবেরা নিয়াছেন, একটা ভারতবাসীরা রাখিয়াছেন। কে জিতিয়াছেন, কে ঠকিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি কিছু বলিতেছি না। বোধ হয়, কেহই ঠকেন নাই।

সাধারণ হিসাবে দেখিতেছি, বর্ণসপ্তকের শেষভাগে লাল রঙ আবার দেখা দিয়াছে। বর্ণসপ্তকের পৌনঃপুনিকতা সম্ভব হইলে ভায়োলেটের পরেই আবার লাল রঙ দেখিতে আশা করা যাইত। বাস্তবিকই বর্ণসপ্তকের একটা প্রচ্ছন্ন অংশ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ হইলে বোধ হয় বর্ণেরও মন্দ্র এবং তার সপ্তক হইত, তবে তাহার চেহারা কি রকম হইত কল্পনা করা কিছু কঠিন।

ঢেউয়ের আর একটা দিক আছে; ইংরাজীতে যাহাকে ইন্টেন্সিটি বলে। বাংলায় ইহাকে প্রবলতা বলা যাইতে পারে। ঢেউয়ের গতিকে বিশ্লেষণ করিলে, তাহার ভিতরে একটা দোল এবং একটা দৌড় পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঢেউ যেমন অগ্রসর হয় তেমনি ঢেউয়ের একটা আড়াআড়ি ইতস্ততঃ গতি থাকে। এই ইতস্ততঃ গতিকেই দোল বলিলাম, ইহাতেই প্রবলতা। দোলের উৎসাহ বেশী হইবার অর্থ দোলটি অধিকতর স্থান ব্যাপিয়া হওয়া (দোলের প্রবলতা বৃদ্ধি পাওয়া)। এই প্রবলতার তারতম্যেই আলোক উজ্জ্বল অথবা নিষ্প্রভ হয়। শব্দ প্রবল অথবা মৃদু হয়। ইহার ফল চিত্রে আলোক এবং ছায়া, এবং সংগীতে [illegible]।

ছবি আঁকিবার সময় যে ভিন্ন ভিন্ন রঙ মিশ্রিত করিয়া স্বাভাবিক পদার্থের বর্ণের অনুকরণ করা হয়, তাহার অনুরূপ সংগীতে কি আছে? হারমনি তাহার অনুরূপ। আমাদের দেশীয় সংগীতে যেমন হারমনি নাই, আমাদের পটোদিগের চিত্রেও তেমনি রঙ স্বাভাবিক হয় না। হয়তো মানুষটি লাল কাপড় পরিয়া কালো রঙের গদা নিয়া সবুজ মানুষটিকে ঠেঙ্গায়।

চিত্রের পক্ষে যেমন স্থান, সঙ্গীতের পক্ষে তেমনি সময়। চিত্রেতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সংগীতে ভিন্ন ভিন্ন সুর ভিন্ন ভিন্ন সময় অধিকার করিয়া থাকে। সীমারেখা চিত্রের পক্ষে যাহা করে, তাল সঙ্গীতের পক্ষে তাহা করে।

কবিতা উভয়েরই সঙ্গিনী। বাস্তবিক ইহারা তিন ভাই বোন।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়

সৈয়দ মুজতবা আলী

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনার উপর দেশী বেদেশী কোন্ কোন্ মহাজন তথা কীর্তিমান লেখক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে-বিষয় নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে বহু বহু বৎসর ধরে আলোচনা গবেষণা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও একাধিক সজ্জন আছেন যাঁদের সন্ধান রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে অতি সহজে পাওয়া যাবে না, যদিও এঁদের প্রভাব থাক আর না-ই থাক, এঁদের সাহচর্যে যে রবীন্দ্রনাথ উপকৃত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে-একটি বিষয়ে অনুমতি পেলে আমি প্রথমেই বলতে চাই সেটি এই। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে ছাত্রাবস্থায় আমি রবীন্দ্রনাথকে ক্লাস নিতে দেখেছি সভাস্থলে সভাপতিরূপে, আপন প্রবন্ধ ছোট গল্প কবিতা নাট্যের পাঠকরূপে এবং অন্যান্য নানারূপে তাঁকে দেখেছি। আমার মনের উপর সব চেয়ে বেশী দাগ কেটেছে গুণীজনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন কখনো কখনো সূর্যাস্ত থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তর্কভাবের আদান-প্রদান আলোচনা। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনায় তাঁকে তাঁর সঙ্গীত সাহিত্যের (ক্রিয়েটিভ লিটরেচারের আঙ্গিকের (টেকনিক্যাল দিকের) আলোচনা করতে শুনিনি। যেমন 'বেলা'-র সঙ্গে 'খেলে' মিলের চেয়ে 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায়'-এর সঙ্গে 'উদাসী মন ধায়' অনেক ভালো মিল, কিংবা তার চেয়ে অনেক বড় সাধারণতত্ত্ব—লিরিকে কি গুণ থাকলে কবি এমনই শব্দের সঙ্গে শব্দ বসাতে পারেন যার ফলে পাঠক শব্দ অর্থ ধ্বনি সব-কিছু পেরিয়ে অপূর্ব নবীন লোকে উপনীত হয়। তাঁর বহু বহু গান শুনে মনে হয় এই যে অভূতপূর্ব শব্দ সম্মেলন, যার একটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করে অন্য শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব—আর্টে এই পরিপূর্ণ সিদ্ধহস্তের কৃতিত্ব আসে কি প্রকারে? তিনি কোন্ পদ্ধতিতে এখানে এসে পৌঁছলেন। কিংবা কোনো সুচিন্তিত পূর্ব পরিকল্পিত পদ্ধতি যদি না থাকে তবে অন্তত যে পরিপূর্ণতায় পৌঁছবার পথে নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে তিনি কি দেখলেন, [illegible] ?

বিষয়টি আমি খুব পরিষ্কার করে পেশ করতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে ভরসা আছে, যাঁরা শুধু পাঠক নন, কবিতা বা গল্প সৃষ্টি করেন তাঁরা আমার বক্তব্যটি অনুমানে অনুভব করে নিয়েছেন।

অবশ্য শুনেছি, পরবর্তী যুগে কবি যখন তথাকথিত 'আধুনিক' কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গদ্য কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন তখন নাকি তিনি ঐ নিয়ে বিস্তর আলোচনা তর্ক বিতর্ক করেন। তার বোধহয় অন্যতম কারণ, 'আধুনিক' কবিতার বহুলাংশ বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে বলে ওই নিয়ে আলোচনা করা সহজ;

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক পাথরের উপর অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

পক্ষান্তরে আমি পূর্বে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছি সেটা প্রধানত বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এমন কি সংগীতের রাগ রাগিণী, ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রসাদ গুণ এবং ঐ সম্পর্কে অন্যান্য নানা বিষয় তাঁকে আলোচনা করতে শুনেছি কিন্তু তিনি স্বয়ং যে তাঁর গানে শব্দ ও সুরের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে পৌঁছলেন সেটা কি পদ্ধতিতে হল, তার ক্রমবিকাশের সময় তাঁকে কোন্ কোন্ দ্বন্দ্ব কিংবা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোচনা করতে শুনিনি। আমি যে পাঁচ বৎসর এখানে ছিলুম, তখন তাঁকে বহু বহুবার সঙ্গীতরাজ দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা খোশগল্প করতে শুনেছি, কিন্তু যেমন মনে করুন, তাঁর প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত কাঁচা কথা-সুরের সম্মিলিত গান থেকে তিনি কি করে করে নিটোল গানের পরিপূর্ণতায় পৌঁছলেন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা শুনিনি। স্বর্গত ধূর্জটি প্রসাদ এবং শ্রীযুত দিলীপ রায়ের সঙ্গে তিনি সঙ্গীত নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন—এবং এখানকার শিক্ষক সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর সঙ্গে তো অহরহই হত—কিন্তু আমি এখানে যে বিষয়টির অবতারণা করেছি সেটি হত বলে জানিনে।

এবং এস্থলে আমার যদি ভুলও হয় তাতেও আমার মূল বক্তব্যের কোনো প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আমার মূল বক্তব্য: [illegible] সঙ্গে [illegible]।

রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পর ১৯০৫/৬ শান্তিনিকেতনে এসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনা করার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ এখানেই মোটামুটি পাকাপাকিভাবে বাস করেন। সে-যুগে তাঁদের ভিতর কতখানি যোগাযোগ ছিল বলতে পারি না, কিন্তু ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত—অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর দুজনাতে এক সঙ্গে বসে দীর্ঘ আলোচনা করতে কখনো দেখিনি। অথচ এ সত্য আমরা খুব ভালো করেই জানি, দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল তথা বহুমুখী প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাও রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাকে অতিশয় সম্মানের চোখে দেখতেন। শুধু তাই নয়, আমি আশ্রমে কিংবদন্তী শুনেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ নাকি একদা এক আশ্রমাচার্যকে বলেন, 'আমাদের সকলেরই পা পিছলেছে, কিন্তু রবির কখনো পা পিছলায়নি।' অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ প্রতি উৎসব দিনে কিংবা বিদেশ থেকে আশ্রমে ফিরলে সেখানে প্রবেশ করা মাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করতে আসতেন। সামান্য যে দু একটি

কথাবার্তা হত তা অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ছোট্ট একটি কবিতা কিংবা অন্য ঐ ধরনের কোনো-কিছু একটা লিখে কবিকে পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ভিন্ন অন্য কিছু রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করতে শুনিনি।

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যতা ছিল এ-কথা সকলেই জানেন। এঁরা দুজনাই জীবনের শেষের ভাগ শান্তিনিকেতনের স্থায়ী বাসিন্দারূপে ছিলেন। তা ছাড়া লেভি, উইনটারনিৎস, তুচ্চি ফরমীকি, স্টেন-কোনো, মর্গেন-স্টিয়েরনে, কলিন্স[১], বগদানফ[১] প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ভারতীয় তথা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু ঘণ্টা, বহুদিনব্যাপী প্রচুর আলোচনা করেছেন, কখনো বা সভাস্থলে (প্রধানত 'বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায়') কখনো স্বগৃহের বারান্দায়। আর্ট কি, রস ও অলংকার নিয়ে তিনি সর্বাধিক আলোচনা করেছেন শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে। নন্দলাল স্বল্পভাষী গুণী—বরঞ্চ অসিতকুমারের সঙ্গে ঐ নিয়ে তাঁর মুখর আলোচনা হত বেশী। অবশ্য এ-কথাও স্মরণ রাখা উচিত, আর্ট বলতে রবীন্দ্রনাথ কি বোঝেন নন্দলালই সেটি শুনেছেন বহু বৎসর ধরে এবং সবচেয়ে বেশী। এবং বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁকে উৎসাহিত করেছেন নন্দলালই। নন্দলালই তাঁকে একাডেমিক আর্টের মরুপথে তাঁর ধারা হারাতে দেননি।

কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা—ধর্মদর্শন কাব্য অলংকার এ নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন দুটি পণ্ডিতের সঙ্গে : স্বর্গত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন। আলোচনা বললে অত্যন্ত কমই বলা হল। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জগতে ঐতিহ্যগত ভারতীয় সংস্কৃতি কতখানি বিরাট জায়গা জুড়ে রেখেছিল সে-কথা আমরা সবাই জানি। বিধুশেখরের ছিল ঐ একমাত্র জগৎ। ক্ষিতিমোহন সেন সংসারে বাস করলেও দেশের গণধর্মের উৎপত্তি বিকাশের সত্য নির্ণয়ে তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। এই তিনজনের জীবন এবং রচনাতে বার বার মনে হয় এঁরা যেন অভিন্ন। অথচ যেন ত্রিমূর্তির তিনটি মুখ দেখছি। যেন দেশের উৎস থেকে তিনটি ধারা বেরিয়ে এসেছে অথচ তিনটি ধারারই আপন আপন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৃণার্থেও যেন একে অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করছে। এস্থলে আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি যে বিষয়টি আমার পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন কারণ এঁদের আলোচনা করতে আমি শুনেছি অপরিণত বয়সে ও পরবর্তীকালে, এবং আজও আমার সাহিত্যজ্ঞান

১ এঁদের ছাড়া আরো বহু পণ্ডিতের নাম করতে হয়। তাঁদেরই একজন কোষকার স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি যৌবনকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিনিকেতনেই বসবাস করেন। অনাজন ভগবৎ কৃপায় এখনো আমাদের মাঝখানে আছেন। গোস্বামীরাজ নিত্যানন্দবিনোদ। ইনি ১৯২০।২১ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ... [illegible]

এতই বংসামান্য যে, ত্রিমূর্তির এই লীলা-খেলা আমি প্রধানত অনুভূতি দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেছি, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিশ্লেষণ গবেষণা দ্বারা নয়।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন বাল্যবন্ধু, হয়তো বা সতীর্থ ছিলেন। উভয়েই কাশীতে সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষালাভ ও সংস্কৃত চর্চা করেন। উভয়েই শাস্ত্রী।

বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন উভয়েই অত্যুত্তম সংস্কৃত এবং পালি জানতেন।

এ স্থলে পালি ভাষার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হল। কারণ বৌদ্ধধর্মের তথা পালি ভাষার প্রতি সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতের অনুরাগ থাকে না। পণ্ডিত-জনোচিত জ্ঞান না থাকলেও রবীন্দ্রনাথও এ দুটি ভাষাই জানতেন। পরবর্তী যুগে সংহিতা পাঠের সুবিধার জন্য বিধুশেখর আবেস্তা শেখেন।২ ক্ষিতিমোহন গণ-ধর্মের সন্ধানে হিন্দী, গুজরাতী মারাঠী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করেন।

বেদ উপনিষদে তিনজনারই অবাধগতি।

কিন্তু সংহিতাই বিধুশেখরের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, বিশেষ করে ঋগ্বেদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুপ্রেরণা পেতেন উপনিষদ থেকে। এবং ক্ষিতিমোহনের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ ছিল ভারতীয় গণধর্ম তথা ক্রিয়াকাণ্ডের সর্ব প্রাচীন ভাণ্ডার অথর্ববেদের প্রতি। আমি একাধিক পণ্ডিতের মুখে শুনেছি, ক্ষিতিমোহন যতখানি শ্রদ্ধা সহ, মনোযোগ সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছিলেন ততখানি এ-যুগে অন্য কোনো পণ্ডিতই করেননি। সংহিতায় সুপণ্ডিত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুডার্সকে বলতে শুনেছি, অথর্ববেদ বড়ই অবহেলিত। তাঁর বিশ্বাস ছিল পরবর্তী যুগের বহু রহস্যের সমাধান অথর্ববেদে আছে। অরবিন্দও নাকি এই মত পোষণ করতেন।

বিধুশেখর যখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস নিয়েই আসেন যে, তিনি বৈদিক যুগের আশ্রমেই প্রবেশ করছেন। এখানে বেদমন্ত্র পাঠ হয় ব্রাহ্মণ সন্তান মাত্রই যজ্ঞোপবীতধারী আমিষ পাদুকা আশ্রমে নিষিদ্ধ ব্রহ্মচর্যব্রত সহ, ব্রত এখানে পালিত হয় এবং গুরু শিষ্যের সম্পর্ক অতি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যানুযায়ী। পাঠক এ যুগের ইতিহাস প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র জীবনীতে পাবেন।

---

২ বিধুশেখরের পালি ও আবেস্তাচর্চা, ক্ষিতিমোহনের পালিচর্চায় রবীন্দ্রনাথই প্রধান উৎসাহদাতা। হয়তো বা ভুল বলা হবে না, রবীন্দ্রনাথের আদেশেই বিধুশেখর আবেস্তা চর্চা আরম্ভ করেন।

বিধুশেখরের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এ-যুগে অল্পই জন্মেছেন। শুধু স্বপাকে ভক্ষণ, সন্ধ্যা আহ্নিক পালন তথা সগ্রন্থ বেদাধ্যয়নের কথা নয়,—বাহ্যিক শুচি অশুচিতে পার্থক্যও তিনি করতেন অনায়াসে অবহেলে, কিন্তু তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা ছিল অন্তর্জগৎকে পরিপূর্ণ শুচি শুদ্ধ পবিত্র করার। তাঁর আদর্শ ছিল তাঁর কল্পনার ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং তাঁর কল্পনার আচার্য—অনাসক্ত পূত পবিত্র।

ক্ষিতিমোহনও নিষ্ঠাবান বৈদ্য-সন্তান। কিন্তু তাঁর সামাজিক আচার-ব্যবহার ছিল অনেকটা বিবেকানন্দের মত।

আশ্রমে যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নেওয়া হত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের রীতিনীতি পালন করা কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী কিছুদিনের জন্য আশ্রম পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে দেখিয়ে দিলেন, এতদিন আশ্রমবাসীরা যে জীবন কৃচ্ছ্র-সাধনময় ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন সেটা বাস্তবিক বিলাস পরিপূর্ণ। আশ্রমের মেথর চাকর বিদায় দিয়ে তিনি এখানে যে বিপ্লবের সূত্রপাত করলেন সেটা এখনকার অনেক গুরুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল। ফলে গান্ধী সবরমতী চলে গেলেন। আশ্রমও ধীরে ধীরে তার রূপ পরিবর্তন করতে লাগল।

বিধুশেখর তবু তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদর্শ আকণ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন "হারিকেন লণ্ঠন যখন আশ্রম ব্যবহার করছে, বিজলিই বা করবে না কেন?"

বিধুশেখর বললেন "রেড়ির তেলে আমি সানন্দে ফিরে যাব। হারিকেন আর রেড়ির তেল প্রায় একই বিজলির তুলনায়। বিজলি অনাচারে বিলাস। তার সর্বশেষ সোপান স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

পাঠক কণামাত্র ভাববেন না, বিধুশেখর সংকীর্ণচেতা কূপমণ্ডূক ছিলেন। তাঁর প্রতি এর চেয়ে নির্মম অবিচার আর কিছুই হতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনে খৃষ্টান পাদ্রী এণ্ড্রুজ যাঁর অন্তরঙ্গ সখা, ব্রহ্মমন্দিরের আচার্যের আসনে বসে যিনি মুখে কণ্ঠে যখন ইমাম গজ্জালীর 'কিমিয়া সাদৎ' (সৌভাগ্য-স্পর্শমণি) আবৃত্তি করে ব্রহ্মজ্ঞানের পন্থা বর্ণনা করছেন, যিনি মৌলানা শওকৎ আলীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে আশ্রম ভোজনাগারে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি যদি সংকীর্ণচেতা হন তবে প্রার্থনা করি সর্ব-ভারতবাসী যেন এ রকম সংকীর্ণচেতা হয়।

বিধুশেখর না থাকলে যে রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি ব্রহ্মবিদ্যালয়কে অক্সফোর্ডে পরিণত করতেন তা নয়। বিধুশেখর ছিলেন প্রাচীন ভারতের মূর্তিমান প্রতীক। তাঁর সংস্পর্শে থাকলে রবীন্দ্রনাথ আপন কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন হতেন।

এবং যখনই তিনি বিধুশেখরকে—তা সে যত অল্পই হ'ক না কেন—আপন মতে টেনে আনতে পারতেন তখনই তাঁর মনে হত তিনি যেন ঐতিহ্যাবদ্ধ প্রাচীন ভারতকে, তার ধর্ম থেকে তাকে বিচ্যুত না করে বর্তমান সংসারের বিশ্বনাগরিকরূপে তার প্রাপ্য আসন নির্দিষ্ট করে দিতে পেরেছেন।

এই বিশ্বনাগরিক হওয়ার জন্য বিশ্বভারতীর সৃষ্টি।

পূর্বেই বলেছি, আশ্রম যতদিন বারো বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্র নিত না ততদিন ব্রহ্মচর্যাদর্শ সম্মুখে রাখা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হল (ইস্কুলের সঙ্গে কলেজও যুক্ত হল) তখন পূর্ণবয়স্ক কিশোর ও যুবকেও গ্রহণ করতে হল। এই বিশ্বভারতী নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের প্রধান উৎসাহদাতা ও সচিব ছিলেন বিধুশেখর ও ক্ষিতিমোহন (সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ, চিত্রে নন্দলাল)। রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন এই শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য প্রতীচ্যের পূর্ণজ্ঞানীরা একত্র হবেন [illegible] বিধুশেখর সংস্কৃত থেকে উদ্ধৃত করে দিলেন, "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"

বিধুশেখরের [illegible] নেই। এক দিন [illegible] সমস্ত [illegible] অর্থনৈতিক অবস্থাই [illegible] এবং [illegible] প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রছাত্রী [illegible] বিধুশেখরই [illegible] গ্রন্থ মিলিন্দ পঞ্হ [illegible] উচ্চ [illegible] এই [illegible] পারবেন।

কিন্তু হায় এই সব ছাত্রছাত্রীর অনেকেই যে ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করে না। এমন কি এদের ভিতর নাস্তিক চার্বাকপন্থীও এক-আধ জন ছিল। খ্রীষ্টান মুসলমানও ছিল এদের কেউ কেউ সমবেত উপাসনায় যেদমত্

উচ্চারণ করতে অনিচ্ছুক। খৃষ্টান ছেলেটির আপত্তি ছিল না কিন্তু সেই চাষীছেলেটি তাকে বোঝালে খৃষ্টানের সর্বপ্রার্থনা যীশুর মারফতে পাঠাতে হয়, বেদমন্ত্রে তা হয় না, মুসলমানকে আল্লা-রসুলের দোহাই দিলে। খৃষ্টান ধাঁধায় পড়লো, মুসলমান বললে, পাঁচ রেকৎকে সাত রেকৎ করতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু খবর পেলে তার পিতা অসন্তুষ্ট হবেন।

নাচার অধ্যক্ষ বিধুশেখর সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিলেন পাদ্রী এণ্ড্রুজের হাতে।

এণ্ড্রুজ আবেগ-ভরা কণ্ঠে বিশ্ব-মানবিকতার শপথ নিয়ে বেদমন্ত্রের সার্বজনীনতা ব্যাখ্যা করলেন। আস্তিক নাস্তিক সকলেই সসম্ভ্রম নতমস্তকে তাঁর বক্তব্য শুনলো। কিন্তু তাদের মত-পরিবর্তন হল না।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে বাধ্য করলেন না।

ক্ষিতিমোহন সমাজে সংস্কারমুক্ত ছিলেন বলে কেউ যেন মনে না করেন—তিনি শুচি অশুচির পার্থক্য করতেন না। কিন্তু তাঁর কষ্টিপাথর মনু এমন কি কাশ্যপ থেকেও তিনি আহরণ করেননি। বেদ থেকে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটি আয়ুর্বেদ। একে তিনি বেদকুলোদ্ভব তদুপরি তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে ছিলেন। আহারবিহার তিনি শুধু আয়ুর্বেদসম্মত পদ্ধতিতেই করতেন।

প্রাচীন অর্বাচীন নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। উপনিষদের বাণীর সন্ধান তিনি অহরহ পাচ্ছেন আউল-বাউলে। আবার আউল বাউলের আচার-আচরণ তিনি পাচ্ছেন অথর্ববেদে। তাঁর সম্মুখে বহু পন্থা তিনি সব কটিতেই বিশ্বাস করেন।

তিনি ছিলেন বিধুশেখর ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে সেতুস্বরূপ—এণ্ড্রুজ যে রকম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মাঝখানে সেতুস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অসম্ভব আদর্শে বিশ্বাস করতেন না, আবার সখা বিধুশেখরের নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে তাঁকে সমর্থন করতে পারলে আনন্দিত হতেন। বিশ্বভারতীর আদর্শ, তার ধ্যান-লোকের ঐতিহ্যের সন্ধানে বিধুশেখর শরণ নিতেন ঋগ্বেদের আশ্রমের পালপার্বণের জন্য মন্ত্র সন্ধানে ক্ষিতিমোহন যেতেন অথর্ববেদে।

আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদানের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তার মূল্য যতই হোক না কেন, বিধুশেখর ক্ষিতিমোহন যে মূলধন তাঁদের গুরুদেবের পদপ্রান্তে রেখেছিলেন তারই উপর নির্ভর করে চিন্ময় মৃন্ময়—ধ্যানে এবং কর্মকাণ্ডে—অদ্যকার ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিশ্বভারতী। অন্য যাজনতন্ত্রে যে যতই পরিকীর্তিত হোক না কেন, এঁদের কাছে বিশ্বভারতী চিরঋণী।

বাংলাসাহিত্যে স্বদেশচেতনা

প্রবোধচন্দ্র সেন

স্বদেশচেতনা একটি আপেক্ষিক বস্তু। পরদেশ-চেতনার ভূমিকার উপরেই স্বদেশচেতনার প্রতিষ্ঠা। প্রত্যেক সভ্য-দেশের ইতিহাসেই তার সাক্ষ্য মিলবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসও তার ব্যতিক্রম নয়। পারসীক এবং যবন অর্থাৎ গ্রীকদের সংস্পর্শেই ভারত-চেতনার প্রথম উদ্ভব। ভারত বা ভারতবর্ষ নামের উদ্ভব কিন্তু তখনও হয়নি। কিন্তু হিমালয় থেকে সিংহল পর্যন্ত সমগ্র দেশ এক নামে অভিহিত হয়েছে তখন থেকেই। সমগ্র দেশের তৎকালের দেশী নাম জম্বুদ্বীপ, বিদেশী নাম হিন্দুক অর্থাৎ ইন্ডিয়া। জম্বুদ্বীপ নাম পাওয়া যায় অশোকের লিপিতে। [illegible] নাম হিন্দুক। সমগ্র দেশকে এক নামে [illegible] স্বদেশচেতনার প্রথম লক্ষণ। ভারতবর্ষে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে যবন কুষাণ শক প্রভৃতি বিদেশিদের আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু তার পরোক্ষ ফল হিসাবে স্বদেশচেতনা হয় গভীরতর। এই গভীরতর স্বদেশচেতনার প্রমাণ পাই সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে, কালিদাসের কাব্যে এবং মহাভারতে। কবি হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্তিটিতে গঙ্গার থেকে কামরূপ এবং নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত বিভিন্ন জনপদের উল্লেখ আছে। অশোক-লিপির ন্যায় সমুদ্রগুপ্তের এই লিপিটিও ভারত চেতনার সুস্পষ্ট নিদর্শন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় হরিষেণও ছিলেন একাধারে কবি ও যোদ্ধা। হরিষেণ ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাদণ্ড নায়ক। কালিদাস যেন বারবার ভারতভূমির [illegible] [illegible] হতেন না। [illegible]

[illegible] হিমালয়ের উত্তরে অলকা পর্যন্ত উত্তর ভারতের একাংশের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনা কোথাও আছে কিনা জানি না। অতঃপর কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের এক অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনাই হিমালয়কে ভারতীয় চিত্তে চিরকালের জন্য অনন্যসাধারণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রঘু-বংশ কালিদাসের পরিণত জীবনের শেষ রচনা। এই কাব্যে ভারতবর্ষের বর্ণনা পাই তিনবার। চতুর্থ সর্গে আছে রঘুর দিগ্বিজয় কাহিনী। এই কাহিনীতে পাই পারসীক ভূমি থেকে প্রাগ্জ্যোতিষ ও কামরূপ এবং হিমালয় থেকে কেরল পর্যন্ত ভারতভূমির সুনিপুণ বিবরণ। ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার বর্ণনা উপলক্ষে কালিদাস আবার সমগ্র ভারতের বিভিন্ন জনপদের বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর ত্রয়োদশ সর্গে লঙ্কা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ভারতভ্রমণ [illegible]। এ ভ্রমণ কিন্তু পুষ্পক রথে আকাশপথে। ভারতবর্ষের বর্ণনায় কালিদাসের যেন ক্লান্তি ছিল না। কালিদাসের ন্যায় গভীর ভারতচেতনা প্রাচীন [illegible] কবির আর কারও ছিল না। এই হিসাবে কালিদাস ছিলেন বাল্মীকি ও ব্যাসের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। রামায়ণ-মহাভারতেই ভারতবাসীর কাছে স্বদেশের চিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিপূর্ণ মহিমায়। সে চিত্র শুধু সমকালিক বা আঞ্চলিক চিত্র নয়, [illegible] চিত্রও বটে। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন "মহাভারত" নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ।

এইজন্যই তিনি অন্যত্র বলেছেন রামায়ণ ও মহাভারতের "সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।"

রামায়ণ-মহাভারতের মত পুরাণগুলিতেও ভারতচেতনা উজ্জ্বল গাঢ়বর্ণে প্রকাশ পেয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

অর্থাৎ সমুদ্রের উত্তরে এবং হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত যে ভূভাগ, তারই নাম ভারতবর্ষ। এখানেই ভরতসন্তানদের বাস। দেবতাদের মধ্যেও ভারতবর্ষের এই গৌরব-গীতি প্রচলিত আছে যে, "ভারতভূমি হচ্ছে স্বর্গ ও ধর্মাদি অপবর্গলাভের মার্গস্বরূপ; সেই ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা ধন্য কেননা তাঁরা দেবত্বের অধিকারী"। এই রচনা যাঁদের তাঁদের ভারতচেতনা কত গভীর ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহাভারত ও পুরাণগুলি বর্তমানে আমরা যে রূপে পাই এগুলি সে রূপ লাভ করেছিল গুপ্তযুগে ও তার কিছু পরবর্তী কালে। অর্থাৎ এগুলি কালিদাস ও তাঁর উত্তরকালের ভারতচিত্তের প্রতিরূপ।

পরবর্তী কালে যাঁদের ধ্যানে ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে দেখি কবি শংকরাচার্যের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। কালিদাস ছিলেন কবি, আর শংকরাচার্য ছিলেন মুখ্যত জ্ঞানী ও কর্মী, যদিও তাঁর কবিখ্যাতিও উপেক্ষণীয় নয়। কালিদাস ভারতবর্ষকে পেয়েছিলেন কল্পনায় ও হৃদয়ানুভূতিতে। শংকরাচার্য ভারতবর্ষকে পেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং তাকে রূপ দিয়েছিলেন কর্মে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম উপলব্ধির চরম প্রকাশ ঘটেছিল তার প্রস্থানত্রয়ে—উপনিষদে গীতায় ও বেদান্ত-দর্শনে। এই তিনটিই পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল শংকরাচার্যের হাতে। তাঁর ভারত-উপলব্ধি কর্মের মধ্যে যে রূপ গ্রহণ করেছিল, আধুনিক কালের পক্ষেও তার তাৎপর্য কম নয়। তাঁর জন্ম সুদূর দক্ষিণে কেরল প্রদেশে, মৃত্যু সুদূর উত্তরে হিমালয় পর্বত-মালার অভ্যন্তরে কেদারনাথে, আর কর্মক্ষেত্র সর্বভারতে। তিনি সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করেন এবং চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন— পূর্বে পুরীতে, পশ্চিমে দ্বারকায়, উত্তরে বদরিকায় এবং দক্ষিণে মহীশূরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরিতে। এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তৎকালের পক্ষে এ কাজ যে কত মহৎ ও কত দুরূহ তা আজ অনুমান করাও কঠিন।

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন— "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা • সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

ভারত-উপলব্ধির আর-একটি প্রধান উপায় তীর্থযাত্রা। প্রিয়দর্শী অশোক যেদিন ধর্ম-যাত্রায় বহির্গত হয়েছিলেন সেদিন থেকে যুগ যুগ ধরে কত অসংখ্য নরনারী যে কামরূপ থেকে হিংলাজ এবং বদরিকা থেকে কুমারিকা পর্যন্ত পর্যটন করে এই পুণ্য-ভূমিকে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

এই যে বহু শত বৎসরের অবিচ্ছিন্ন ধারা-বাহিক ভারতচেতনা, তা সহসা ছিন্ন হয়ে গেল তুর্কি মুসলমানদের আক্রমণের আঘাতে। তার কারণ সে সময়ে এই ভারত-চেতনা অনেকখানি দুর্বল হয়ে এসেছিল নানা কারণে। তার একটি কারণের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

স্বদেশচেতনা নির্ভর করে দুটি প্রধান উপলব্ধির উপরে—এক স্বদেশের ভৌগোলিক স্বরূপ-উপলব্ধি আর দুই, স্বদেশের ঐতিহাসিক স্বরূপ-উপলব্ধি। ভারতবর্ষে কোনো কালেই স্বদেশের ভৌগোলিক রূপের উপলব্ধি দুর্বল ছিল না। তুর্কি-আক্রমণের সময়ে এই ইতিহাসবোধ যে কতখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল তার পরিচয় আছে অলবেরুনির ভারত বিবরণ গ্রন্থে।

ভূগোলবোধ থেকে যে স্বদেশপ্রীতি জাগে তা শান্ত কর্মপ্রেরণাহীন। আর ইতিহাসবোধ থেকে যে দেশপ্রীতি জাগে তা বেগবান, কর্মপ্রেরণাময়, তার গতি অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। দুর্বল ইতিহাসবোধের ভারতচেতনা গতিহীন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল [illegible] তুর্কি মুসলমানদের মধ্যে একদিকে ছিল ধর্মবোধের সংহতি [illegible] অপর দিকে ছিল [illegible] ইতিহাস-চেতনার কর্মপ্রেরণা। তাই তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হয় নি। [illegible] থেকে [illegible] মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে স্বদেশচেতনার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়, যা পাওয়া যায় তাও অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। বলতে গেলে একমাত্র তীর্থভ্রমণ ও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ভারতবোধের একটু ক্ষীণ আভাস কোনো প্রকারে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই ক্ষীণ বোধের মধ্যে কর্মপ্রেরণার লেশমাত্রও ছিল না।

ঔরঙ্গজেবের ভারতব্যাপী মহাসাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষকে দার উল ইসলামে পরিণত করার প্রচেষ্টা শিবাজি এবং প্রথম বাজিরাও প্রমুখ কয়েকজন মরাঠা নায়কের মনে ভারত-বোধের সক্রিয় প্রেরণা কিছু পরিমাণে জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সে বোধ ছিল ইতিহাস-চেতনাহীন, তাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন। ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে অন্ধ-শক্তির তাড়নায় প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়েছে, কোনো সুপরিকল্পিত লক্ষ্যের [illegible] হয় নি। তার পরে এল

প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করিয়া তার তেজ।

যে তেজ সে এদেশে বিকীর্ণ করেছে সে শুধু বিজ্ঞানলব্ধ শক্তির তেজ নয়, সে তেজ ইতিহাসবোধজাত সক্রিয় স্বদেশচেতনার তেজ। ইংরেজের এই স্বদেশচেতনা প্রাচীন ভারতীয় স্বদেশচেতনার মতো শান্ত নিষ্ক্রিয় নয়। তার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। সে তেজ ইউরোপীয় ইতিহাসের সমুদ্রমন্থনজাত উচ্চৈঃশ্রবার তেজ। আমরাও সে তেজের অধিকারী হয়েছি ইংরেজের যুগেই।

স্বদেশচেতনা ও স্বদেশপ্রীতি এক বস্তু নয়। স্বদেশচেতনা জাগে স্বদেশের ভৌগোলিক পরিচয় ও স্বদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যবোধ থেকে। এর উদ্ভব পরদেশের ভূগোল ও সংস্কৃতির পার্থক্যচেতনা থেকে। আর স্বদেশপ্রীতির উদ্ভব স্বদেশের রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কামনা

থেকে। পর রাষ্ট্রের সংঘাতে এর বিকাশ। রানী এলিজাবেথের আমলে স্পেনের রাজশক্তির সংঘর্ষে ইংরেজের স্বদেশপ্রীতি যে প্রবল আকার ধারণ করেছিল তার ছাপ আছে শেক্সপীয়রের রচনায়। ইংরেজের জাতীয় সঙ্গীতও তার অন্যতম নিদর্শন। এই স্বদেশপ্রীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে, নেপোলিয়নের আঘাতে। ইউরোপের অন্য দেশগুলিতেও স্বদেশপ্রীতির জাগরণ ঘটে নেপোলিয়নের আঘাতেই।

এই স্বদেশপ্রীতি ভারতবর্ষেও দেখা দেয় ঊনবিংশ শতকেই—প্রথমে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের যোগে এবং পরে ইংরেজের সহিত সংঘর্ষের ফলে। আধুনিক স্বদেশপ্রীতির এই পর্যায়েরই নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে। শুধু নিদর্শন নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপক রচনাবলী। তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব এই প্রবন্ধে।

আধুনিক ভাবাত্ত স্বদেশচেতনার জন্ম রাজা রামমোহন রায়ের মনোভূমিতে। তাঁর কলকাতাবাস এবং গ্রন্থ প্রকাশ (১৮১৫) শুরু হয় এমন সময়ে যখন ফরাসী বিপ্লব ও তৎপরবর্তী আলোড়নের ফলে ইউরোপে স্বদেশপ্রীতির প্রকাশ প্রবল আকার ধারণ করে। ইউরোপীয় ইতিহাসের ঢেউ যে রামমোহনের মনকেও ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তাঁর চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে সে কথা আজ সকলেরই জানা। স্বাধীনতার লীলাভূমি ফ্রান্সের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। নেপলসের নবলব্ধ স্বাধীনতা যখন অস্ট্রীয় সেনাদলের পদদলিত হল তখন এই দুঃসংবাদে রামমোহন এতই বিচলিত হয়েছিলেন যে ওই সংবাদপ্রাপ্তির দিনে তিনি একটি উৎসব সভা বর্জন করেন (১৮২১)। এই উপলক্ষেই তাঁর লেখনী থেকে নির্গত হয় এই স্মরণীয় উক্তিটি

Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.

পক্ষান্তরে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি যখন স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা লাভ করল তখন সে সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে তিনি স্বগৃহে একটি উৎসব ও ভোজসভার আয়োজন করেন। স্বদেশের রাষ্ট্রীয় মুক্তি সম্বন্ধেও তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ পাই তাঁর এই উক্তিটির মধ্যে—

The present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions among them ...

purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise .... It is I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage.

(স্থূল লিপি লেখকের)

অর্থাৎ—হিন্দুদের বর্তমান ধর্মব্যবস্থা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূল নয়। জাতিভেদপ্রথা এবং হিন্দুসমাজের অসংখ্য বিভাগ-উপবিভাগ তাদের মনকে দেশপ্রীতির অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেছে। তা ছাড়া, ধর্মগত সংখ্যাতীত উৎসব-অনুষ্ঠান (মানে, বারো মাসে তেরো পার্বণ) এবং পবিত্রতা বাঁচিয়ে চলার বিধি-বিধান (মানে "ছুঁৎমার্গ") এই সমাজকে যে-কোনো কঠিন কর্মসাধনার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য করে তুলেছে। তাই মনে করি অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক সুবিধালাভের জন্য হলেও হিন্দুধর্মের কিছু সংস্কারসাধন অত্যাবশ্যক।

দেখা যাচ্ছে রামমোহনের ধর্মসংস্কার এবং সমাজসংস্কার প্রচেষ্টার পেছনেও ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং দেশপ্রীতির প্রেরণা। কিন্তু রামমোহনকে সে কালে ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই তাঁর দেশপ্রীতির বেগ কতখানি তা বোঝবার উপলক্ষ ঘটে নি। তবে ১৮২৩ সালে সরকার যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন তখন তিনি তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেন এবং সরকারী আইনের প্রতিবাদে "মীরাৎ-উল আখবার" নামক সংবাদপত্রখানি বন্ধ করে দেন। এই উপলক্ষে তিনি যে সব অভিমত প্রকাশ করেন ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এ কথা ঠিক যে রামমোহন রচিত বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির প্রবণতাদানের কোনো প্রত্যক্ষ উদাহ দেখা যায় না। বস্তুত এরকম প্রেরণা দেবার সময় বা উপলক্ষ তখনও আসে নি। তবু স্বীকার করতে হবে যে বেদান্ত-গ্রন্থ থেকে গৌড়ীয় ব্যাকরণ পর্যন্ত রামমোহনের সাহিত্যসাধনা পরিচালিত হয় তাঁর অন্তরের শান্ত ও সুগভীর স্বদেশচেতনার প্রবাহে। সম্বাদকৌমুদী নামক সাপ্তাহিক পত্রখানিও এই স্বদেশচেতনারই অন্যতম প্রকৃষ্ট ফল। স্বদেশপ্রীতির রূপমূর্তি প্রকাশের সময় তখনও আসে নি। তা এসেছিল আরও অনেক পরে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ইতিহাসের খাত বেয়ে।

বিপ্লবমন্ত্রের ও স্বদেশপ্রীতির দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু সুবিখ্যাত ফিরিঙ্গি শিক্ষক ডিরোজিও। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় তিনি নিজেও মেতেছিলেন, এদেশের ছাত্র-সমাজকেও মাতিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। স্বদেশপ্রীতির সুবাসেও তাঁর কবিহৃদয় আমোদিত হয়েছিল। "কবীর অব জঙ্গীরা"

নামক তাঁর বিখ্যাত ইংরেজি কবিতাটিতেই বোধ করি স্বদেশপ্রীতির সুর প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। এ দেশকেই তিনি তাঁর স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই স্বদেশপ্রীতির ধারা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁদের ইংরেজি-বাংলা উভয়বিধ রচনার মধ্যেই তার পরিচয় আছে। কিন্তু স্বদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চেয়ে ইউরোপের সভ্যতা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধেই তাঁদের জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ছিল গভীরতর। তাই তাঁদের দেশপ্রীতি তৎকালীন সমাজচিত্তে যথোচিত পরিমাণে বেগ ও গতিদান করতে সমর্থ হয় নি।

এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, রামমোহনের অনুবর্তীদের স্বদেশপ্রীতির প্রেরণাই অধিকতর ফলপ্রদ ও স্থায়ী হয়েছে। রামমোহনের অনুবর্তীদের অগ্রণী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষালাভ হয় রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে। সে শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই সর্বপ্রথমে স্মরণীয়।—

"আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

এই যে স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষানুরাগ, তার স্ফুরণ ঘটে দেবেন্দ্রনাথের ছাত্রাবস্থাতেই। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি 'সর্বতত্ত্বদীপিকা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য মাতৃভাষার চর্চা। 'বঙ্গভাষা ভিন্ন এ সভাতে অন্য ভাষায় কথোপকথন হইবেক না'—এই ছিল এ সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই প্রবল ইংরেজি শিক্ষার যুগে সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয় কেবলমাত্র বাংলা ভাষাতেই আলোচনা করতে হবে এই সংকল্প যেমন দুঃসাহসিকতা তেমনি দূরদর্শিতারও পরিচায়ক। তাঁরই পুত্র রবীন্দ্রনাথ যে পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরেও মাতৃভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র বাহন বলে মেনে নেবার প্রস্তাব করেছিলেন, তা বিস্ময়ের বিষয় নয়।

বলতে গেলে এই সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৩২) থেকেই বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির বোধসঞ্চারের সূত্রপাত হয়।

এই সর্বতত্ত্বদীপিকার আদর্শেই পরবর্তীকালে (১৮৩৯) প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা, দৃঢ়তর ও প্রশস্ততর ভিত্তিভূমির উপরে। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম কীর্তি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা। এই পাঠশালার প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান সহকর্মী অক্ষয়কুমার দত্তের একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি।

"আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা

পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহন করিতেছি এবং খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমাদের কর্তব্য স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা। নতুবা দার কিয়ৎকাল গোণে ইংরেজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না—তাহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাহারদিগের ধর্ম এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্বোধিনী সভা এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।'

এই উক্তির মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা তথা তত্ত্বোধিনী সভার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরবর্তী কালে এই আদর্শের প্রেরণাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তত্ত্বোধিনী সভার অপর কীর্তি তত্ত্বোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা (১৮৪৩)। পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন অক্ষয়কুমার। তিনি কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পত্রিকাচালনা করেছিলেন তা তাঁর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতেই সুপ্রকাশ। দীর্ঘ কুড়ি

বৎসর ধরে স্বদেশপ্রীতির ব্রত উদ্‌যাপন করে তত্ত্ববোধিনী সভা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু পত্রিকাটি আরও সুদীর্ঘকাল ধরে দেশের চিত্তে স্বদেশপ্রীতির দীপ্তিকে অনির্বাণ রাখার ব্রত পালন করে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথেরও স্বদেশপ্রীতির প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে এই পত্রিকাতেই।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁর সহচর ও সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর (১৮২৬-৯৯) নামই সর্বাগ্রগণ্য। তাই এখানেই রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রীতির একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি শান্ত স্থির-দীপ্তিতে দীপ্যমান, তার কোনো দাহিকাশক্তি ছিল না। কিন্তু রাজনারায়ণের স্বদেশ-প্রীতির শিখা শুধু যে তাঁর জ্যোতিতে প্রকাশমান ছিল তা নয় তার দহনশক্তি ছিল নিত্য উদ্যত। শুধু তাঁর চরিত্রের মধ্যে নয় তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেও তাঁর দেশাভি-মানের শুভ্রজ্যোতি ও দহনপ্রবণতা সমান তেজে সক্রিয়। তাঁর চরিত্র ও রচনার এই উদ্দীপনা ও উত্তেজনাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না। তাঁর রচনাবলীর বিশদ পরিচয় না দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে দুজন মনস্বীর দুটি উক্তি উধৃত করছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতি গ্রন্থে রাজনারায়ণের স্বাদেশিকতা সম্পর্কে বলেন—

দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত।'

নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার (১৮৬৭) মূলেও ছিল রাজনারায়ণেরই একটি পরিকল্পনার প্রেরণা। হিন্দুমেলাই সক্রিয় দেশপ্রীতি প্রচারের প্রথম প্রতিষ্ঠান। এই হিন্দুমেলার এক অধিবেশনেই বালক রবীন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে প্রথম স্বরচিত কবিতা-পাঠ করেন (১৮৭৫)। কবিতাটি ছিল বালক বয়সের তীব্র দেশপ্রেমের প্রেরণায় পরিপূর্ণ, নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। হিন্দুমেলার ওই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন তৎকালীন দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা ও নায়ক রাজনারায়ণ বসু স্বয়ং।

রাজনারায়ণের দেশপ্রেম শুধু ভাবসর্বস্ব ছিল না। তার প্রকাশ ছিল কর্মের মধ্যেও।

শুধু হিন্দুমেলার কর্মপ্রণালীতে তৃপ্ত না হয়ে তিনি 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্তসভারও নায়কত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে এই সভাকে 'স্বাদেশিকের সভা' নাম দিয়ে তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন—

"জ্যোতিদাদা একটি গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"

'জ্যোতিস্মৃতি' গ্রন্থে এই সভার ও তার দীক্ষানুষ্ঠানের যে বর্ণনা আছে তা এই।

"যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় (রাজনারায়ণ) লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন।...লালরেশমে জড়ানো বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু-কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃতভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।"

খোলা তলোয়ারের কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেননি, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য তরবারি ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক। মৃতভারতকে নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করতে হলে ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান ও ক্ষাত্রশক্তি দুয়েরই সাধনা প্রয়োজন।

বোধ করি এই গুপ্তসভায় ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের এই গানটি রচিত হয়।

তোমারি তরে মা, সঁপিনু এদেহ
 তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
 এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু, অক্ষম দুর্বল,
 তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
 তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবী শোণিতে আমার
 কিছুই তোমার হবে না
তবু, ওগো মাতা, পারি তা ঢালিতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
 নিভাতে তোমার যাতনা
যদিও জননী, যদিও আমার
 এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা, একটি সন্তান
 জাগি উঠে শুনি এ বীণাতান॥

রাজনারায়ণের কাছে এই দীক্ষা গ্রহণের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনে কখনও শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। রাজনারায়ণের দেশপ্রেম সম্পর্কে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক মনস্বী বিপিনচন্দ্রের অভিমতটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

'রাজনারায়ণবাবু যে দু-তিনখানা বই লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।......বাংলাদেশে রাজনারায়ণবাবুর শিক্ষাদীক্ষাই সর্বপ্রথমে স্বাদেশিকতার স্রোত আনিয়াছিল।

রাজনারায়ণবাবুর স্বাজাত্যবোধ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রবল ছিল। যখন রাজ-নারায়ণবাবুর বয়স ষাটের কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও চুল সাদা হইয়া উঠিয়াছে, শরীরটাও [illegible]

সেই শরীর লইয়া, আমার সঙ্গে প্রথম দেখার দিনেই কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—'আমি বেশিদিন বাঁচিব এমন আশা ত করি না। কিন্তু মরিবার আগে আমার দেশের একটা শত্রুকেও যদি নিজের হাতে নিপাত করিয়া যাইতে পারিতাম ত বে জন্মটা সার্থক হইল বলিয়া মনে করিব।'. ....

রাজনারায়ণবাবু বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমাধির উপরে তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই কথাগুলি যেন অঙ্কিত থাকে।—

'স্বদেশীয় লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সংশোভিত হইবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতিসমূহের মধ্যে গণ্যজাতি হইবে। এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।'

এই কয়টি কথার ভিতরেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চরিত্রের ও সাধনার মূল প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানেই আমরা তাঁহার গভীর এবং আমরণসাধ্য স্বজাতি-প্রীতির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হই। [illegible] আধুনিক [illegible]-সম্প্রদায়ের তিনিই প্রধান গুরু ছিলেন। তাঁহার 'গ্রাণ্ড ফাদার অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম' উপাধি সর্বতোভাবে সার্থক ছিল।—বঙ্গবাণী ১৩২৯ কার্তিক (পরবর্তী কার্তিক সংখ্যা প্রবন্ধের ব্যাপারে উদ্ধৃত)।

রাজনারায়ণের রাজনীতিসাধনা ও সাহিত্য-সাধনা ছিল অভিন্ন। এই দীক্ষাগুরুর প্রেরণা পরবর্তীকালের বহু কর্মী ও সাহিত্যসাধকের মধ্যে চারিত্র্যে [illegible] সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাঁরা তাঁর কাছ থেকে কিছু না কিছু প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে জামাতা কৃষ্ণকুমার মিত্র, দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণকুমারের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার (১৮৮১) নামকরণের মধ্যে পূর্বোক্ত সঞ্জীবনী গুপ্তসভার ('হামচু পামু হাফ') কোনো পরোক্ষ প্রেরণা ছিল কি না জানি না। দেশের শত্রুনিপাতব্রতে ব্রতী হয়ে অরবিন্দ যে গুপ্ত কর্মপ্রণালীর আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মধ্যে উক্ত গুপ্তসভার বা মাতামহ রাজ-নারায়ণের কোনো পরোক্ষ প্রেরণা ছিল কিনা তাও জানবার উপায় নেই।

রাজনারায়ণের সহপাঠী মধুসূদন এবং ভূদেবও স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মধুসূদন যে তাঁর সাহিত্য সাধনায় নানাভাবেই রাজ-নারায়ণের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন সে কথা সর্ববিদিত। মধুসূদনের দেশপ্রীতির নিদর্শন আছে তাঁর রচনার মধ্যেই। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের (১৮৫৮) প্রস্তাবনাতেই পাই এই উক্তি।—

"দেখ গো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর,
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়"

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাঁর দেশপ্রীতির বহু নিদর্শন আছে। 'পরিচয়' নামক কবিতাটিতে ভারতভূমির যে বর্ণনা আছে তা গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ। অতঃপর শেষ দুই লাইনে বলেন—

সে দেশে জনম মম: জননী ভারতী
তেঁই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে'

এই কাব্যের শেষ কবিতার শেষ দুটি লাইনও স্মরণীয়।—

এই বর, হে বরদে মাগি শেষ বারে—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।

এই গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটিতেও (১৮৬২)। 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে' ইত্যাদি লাইনগুলি হৃদয়কে মুগ্ধ করে না, এমন বাঙালী কয়জন আছে?

ভূদেবের (১৮২৭-৯৪) স্বদেশপ্রীতি ছিল গভীর, ব্যাপক ও সত্যোপলব্ধির স্থির ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনই এই অবিচল দেশপ্রেমের স্থির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। ভূদেব সাহিত্যের প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা, এবং 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', এই দুখানি গ্রন্থ। এই তিনটিই তাঁর গভীর স্বদেশোপলব্ধির নিদর্শন। হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত-সংগীত' কবিতা প্রকাশিত হয় 'এডুকেশন গেজেটে' (১৮৭০)। এই উত্তেজনামূলক কবিতাটি প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট ভূদেবের কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু তাতেও তাঁর দেশপ্রীতির প্রকাশ নিরস্ত হয়নি। ভূদেবের দেশাত্মবোধের গভীরতা ও তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁর স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রের সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন

ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি তথাপি মুসলমানেরাও আর ইঁহার পর নহে। ইনি উঁহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইঁহার পালিত সন্তান।

এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরটি স্তন্যপালিত দুইটি সন্তানে কি ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ হয় না? অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত্রমতেই হয়। অতএব ভারতনিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্বের মত বিবাদ চলিবে? আমরা কি চিরকালই জাতিবিরোধে আপনাদিগকে সর্বস্বান্ত এবং অপরের উদর পূরণ করিব?

এই উক্তির মধ্যে কি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। এর দ্বিতীয় বাক্যটি অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বানবাণী—

এস অভিষেকে এস এস [illegible]
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।

মধুসূদন রাজনারায়ণ ভূদেব—এই তিনজনের পরেই নাম করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের। জন্মকালের হিসাবে তিনি তাঁদের পরবর্তী। কিন্তু কর্মকালের হিসাবে তিনি তাঁদের সমকালীন। বিশেষত ভূদেবের সমকালীন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ ভূদেবের [illegible] [illegible] গভীরতর না [illegible] হতেও পারে কিন্তু ক্রিয়াশীলতা ও প্রেরণা[illegible] শক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা নেই। [illegible] উনবিংশ শতকের [illegible]

[illegible]

প্রেরণা[illegible] স্বীকার করে নিয়েছেন।

এ স্থলে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশানুরাগের সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচ্য।

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে দেশানুরাগের প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে এই শতকের অপেক্ষাকৃত গৌণ লেখকদের সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার।

এঁদের মধ্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তকেই অগ্রণী বলে স্বীকার করতে হয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার-প্রমুখ তৎকালীন সাহিত্য নায়কেরা স্বদেশচেতনার নিজেরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, অপরকেও উদ্বুদ্ধ

করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে প্রয়াস মুখ্যত চিন্তার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সেই স্বদেশ-চেতনাকে চিন্তা থেকে হৃদয়ের ক্ষেত্রে, গদ্য-প্রবন্ধ থেকে কাব্যের ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করেন। বস্তুত তিনিই বাংলার প্রথম দেশপ্রেম-উদ্বোধক কবি। তাঁর দেশপ্রেমের কবিতার তৎকালীন সমাজের হৃদয়ে যে নূতন প্রেরণা দেখা দিয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে তা অভাবিতপূর্ব। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ তিনি সঞ্চার করেছিলেন, দেশের যে অতীত গৌরবস্মৃতি জাগ্রত করেছিলেন এবং দেশের বর্তমান দুর্দশায় যে বেদনাবোধে সকলের হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিলেন, সেই ঝরনাধারাই কালক্রমে গভীর ও বিশাল আয়তন ধারণ করে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অন্তত এই জন্যও ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই হিসাবে তিনিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখি। বাংলা সাহিত্যের উষাকালেই যে কবির লেখনী থেকে

> 'দেশের কুকুর ধরি
> বিদেশের ঠাকুর [illegible]
> চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।'
> কিংবা
> স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে
> ভারতের জন্য দেহে
> [illegible]

ইত্যাদি ধরনের [illegible] নিহিত হয়েছে তিনি কি উপেক্ষণীয় হতে পারেন? এবং [illegible] পড়ে আমাদের বাল্যকালে যখন ঈশ্বর গুপ্তের

> জান না কি জীব তুমি
> জননী জন্মভূমি—
> যে তোমায় হৃদয়ে [illegible]।'

ইত্যাদি রচনাটি পড়েছিলাম তখন আমাদের বালক হৃদয় কি ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

দেশপ্রেমের আদি কবি বলে ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশচেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে অধিকতর আলোচনা সম্ভবপর নয়।

অতঃপর যে-সব কবির রচনা বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেমের ধারাকে খরতর ও গভীরতর বেগে প্রবাহিত করেছিল তাঁদের মধ্যে কবি রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যান, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী ও নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ, এই তিনখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করেই নিবৃত্ত হব।

সে যুগের সংগীত-রচয়িতারাও দেশ-প্রেমকে সর্বজনের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে কম সহায়তা করেননি। অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও অগ্রণী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। হিন্দু মেলার আরম্ভকাল (১৮৬৭) থেকেই দীর্ঘকাল ধরে দ্বিজেন্দ্র-নাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাথ, স্বর্ণকুমারী, সরলাদেবী প্রমুখ অনেকেই যে অজস্র সংগীতধ্বনিতে বাংলার চিত্তাকাশকে মুখরিত করে তুলেছেন তার পরিমাপ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারত সন্তান' গানটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এটিই ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়-সংগীত বলে গণ্য হবার অধিকারী। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটিকে সেই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এটি হিন্দু-মেলার অধিবেশনে উদ্বোধন-সংগীতরূপে গীত হত। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের

> 'কত কাল পরে বল ভারত রে
> দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।'

এবং মনোমোহন বসুর

> 'দিনের দিন সবে দীন,
> ভারত হয়ে পরাধীন।'

এই দুটি গানও এক সময়ে দেশের সর্বত্র গীত হত। বস্তুত বাংলার দেশপ্রেমের সাহিত্যে এই জাতীয়-সংগীতগুলির প্রভাবই বোধ করি সর্বাধিক। এগুলি সম্বন্ধেও স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত আলোচনার সার্থকতা আছে। এ ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিই সংখ্যায় এবং ভাবের গভীরতা ও বৈচিত্র্যে [illegible] সকলের উপরে স্থান [illegible] অধিকারী।

অতঃপর জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কেও সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। কলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় (১৮৭২) থেকে নাট্যাভিনয় দেশপ্রেম প্রচারের অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে উঠল এবং প্রচুর জনপ্রিয়তাও অর্জন করল। এর মূলে ছিল হিন্দুমেলার প্রেরণা। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' নামক অকিঞ্চিৎকর নাটিকাটিই এ ক্ষেত্রে অগ্রণীর খ্যাতিলাভ করেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল পথপ্রদর্শক হচ্ছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর 'পুরুবিক্রম' ও 'সরোজিনী' নাট্য-সাহিত্যে যে বীররসাত্মক স্বদেশপ্রেমের ঢেউ তোলে তার প্রভাব চলে দীর্ঘকাল। রঙ্গমঞ্চের যোগে এই যে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা, তার পরিণতি ঘটে উপেন্দ্রনাথ দাসের "শরৎ-সরোজিনী" এবং "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে। এই দুই নাটকে শুধু যে দেশ-প্রেমের উন্মাদনা-সঞ্চারের প্রয়াসই ছিল তা নয়; অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির প্রবর্তনাও ছিল। এই প্রবর্তনার প্রভাব কতখানি ছিল তার কিছু পরিচয় আছে বিপিনচন্দ্র পালের আত্মকাহিনীতে। নাট্যশালার এই উন্মাদনাকে দমন করার জন্য সরকারকেও অবশেষে আইনের আশ্রয় নিতে

হয়েছিল। ফলে রঙ্গালয়ের যোগে দেশপ্রেম প্রচারের প্রয়াস ক্রমে অবসন্ন হয়ে আসে। পরবর্তী কালে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে আবার রঙ্গমঞ্চে স্বদেশপ্রেমের ঢেউ লাগে। সে কালে দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ অনেকেই খ্যাতি অর্জন করেন।

এ স্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে কাব্যে গানে ও নাটকে এই যে স্বদেশপ্রেমের প্রবল বন্যা দেখা গেল, তার অনেকখানি ছিল কৃত্রিম, সাময়িক হুজুগের প্রকাশমাত্র। অনেকাংশেই তা সত্যোপলব্ধির আন্তরিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তখনকার দিনে ম্যাটসিনি-গ্যারিবলডির আমদানি-করা কাহিনী এই কৃত্রিম উত্তেজনার বাষ্পবেগ জুগিয়েছে। এই উত্তেজনা শুধু সাহিত্যে নয়, সভাসমিতির বক্তৃতা এবং আন্দোলনেও প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে যাঁরা চিন্তাশীল, যাঁরা সত্যই দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারলেন 'ভালো নয়, ভালো নয়, নকল সে শৌখিন দেশপ্রেম'। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। প্রতিবাদ করতে হয়েছে হেমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথকেও। হেমচন্দ্র লিখলেন—

পরের অধীন দাসের জাতি,
নেশন আবার তারা,
তাদের আবার এজিটেশন,
নবুন উঁচু করা।

রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে লিখলেন—

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
রয়েছে বেশ কানে,
কী যেন করা উচিত ছিল
কী করি কে তা জানে।
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারত মাতা করেন প্রোন,
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
গেলেন কোন্খানে।

বস্তুতঃ রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত স্বদেশসাধকদের অবিরাম প্রয়াস সত্ত্বেও দেশের জাগরণ অসম্পূর্ণই থেকে গেল। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকেও তাই রবীন্দ্রনাথকে ক্ষোভ করে বলতে হয়েছিল—

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে,
পরি তারি বেশ।

এমন কি, বিংশ শতকের প্রারম্ভে এসেও তাঁকে বলতে হয়েছিল—

[illegible]

[illegible] প্রকাশিত হল [illegible] স্বামী বিবেকানন্দের [illegible]— উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত'। তাঁর এই মহাবাণীর মুখপত্র হল 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত'। উদ্বোধনেই প্রকাশিত হল ভারতীয় নবজাগরণের এই অমরমন্ত্র—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

এই মহাবাণীতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েই বিংশ শতকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর মরদেহ ত্যাগ করলেন এই সময়েই। কিন্তু তাঁর অমরবাণী তাঁর কণ্ঠের দুর্জয় আহ্বানধ্বনি তখনকার দিনের যুবকবৃন্দের চিত্তে যে আলোড়ন, নবজাগরণের যে মহাস্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিল, তার স্মৃতি আজও যেন [illegible]

[illegible]

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।
[illegible]

যে কবি একদিন খেদ করে বলেছিলেন—

'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।'

দেশের একেবারে নূতন রূপ দেখে সেই কবিকেই আজ মুগ্ধহৃদয়ে বলতে হল—

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেল
সোনার মন্দিরে।

এই সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-চেতনায় নূতন অধ্যায় শুরু হল। তার জন্য প্রয়োজন নূতন প্রকাশ রচনা।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সম্মুখীন হননি, সমকক্ষের সহজ অধিকারে তার দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারণ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজি ও বাংলা রচনায় এর বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষের বিদ্রুপের উত্তরে ডাঃ টাইটলারের সংগে বিতর্ক প্রসংগে তিনি সগর্বে বলেছিলেন:

"If by the 'Ray of Intelligence' for which the Christian says, we are indebted to the English he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with respect to Science Literature or Religion I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own which distinguishes us from the other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners."

(রামমোহনের ইংরেজি রচনাবলী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭১—৭২)। রোমান বিশপ আম্বে

পরে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত) ও 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র, প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূবিবরণ, পুরাণের প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিকতা, ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার প্রভৃতি অগণিত বিষয়ে অসংখ্য মূল্যবান ও অনেক ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

এদেশের প্রাচীন জ্ঞানসম্পত্তির প্রতি মনোযোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাকে স্বদেশানুরাগের অঙ্গরূপে গণ্য করতেন। ১৭৮২ শকাব্দের ২৫শে মাঘ দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে লিখছেন: "তুমি চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পার। ইংরাজী ভাষার ঠনঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি দেওয়াতে বিস্তর হানির সম্ভাবনা।" ১৭৯৮ শকাব্দের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী 'স্বদেশানুরাগ' নামক এক প্রবন্ধে বলেন: "আমাদের দেশের অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি সামান্য পত্র ইংরাজীতে লিখেন এবং বাঙালীর সভাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এমন কি আমরা সামান্য কথোপকথনে বার আনা ইংরাজী ও চারি আনা বাঙলা শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। যে ভাব একটি বাঙলা শব্দ দ্বারা অনায়াসে প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার পরিবর্তে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার

আকস্মিক আঘাত করবার বা সহজে বিদেশী শাসকের মুখাপেক্ষী হবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ-নিরোধ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বটে কিন্তু তার পূর্বে বিস্তারিত শাস্ত্রালোচনার দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বা বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। এই বিচার-প্রসঙ্গেও একাধিকবার তাঁর শাস্ত্রকার-গণের ও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এর নিদর্শন: "হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! তুমি যে সকল কর্মকে ধর্মলোপ-কর, জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নির্দেশ করিয়াছ, যাহারা সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্বত্র সাধু ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে। আর তুমি যে কর্মকে বিহিত ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ অনুষ্ঠান [illegible] হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি [illegible] পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পাপভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় [illegible]। [illegible]

তত্ত্ববোধিনী যুগে যে আত্মনির্ভরতার [illegible] হিন্দুসমাজ অবলম্বন করেছিল, সেটাই ছিল তাঁদের দেশানুরাগের ভিত্তি। প্রসঙ্গত ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু এর [illegible] আরও কিছুকাল বাঙালীর [illegible] সক্রিয় ছিল। বস্তুত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাবকাল (১৮৪৩) থেকে বঙ্গদর্শনের আরম্ভকাল (১৮৭২) পর্যন্ত সময়কে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী যুগ নাম দেওয়া যেতে পারে। তত্ত্ববোধিনী সভার কোনও সক্রিয় রাজনীতি ছিল না। ঊনবিংশ শতকে আধুনিক অর্থে

সন্ধির পর্ব। এই পর্ব, নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের প্রথম পর্বে রামমোহনের যুগ থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্বে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

স্বদেশচিন্তার উদ্বোধনপর্ব

কাব্য যেমন কেবল বাক্যের যোগফল নয় তার অতিরিক্ত কিছু, ইতিহাসও তেমনি কেবল সনতারিখের ক্রম ও গ্রন্থি নয়, তার চেয়ে আরও কিছু বেশী। তারিখ মিলিয়ে দেখলে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের 'দিগ্দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'বঙ্গদূত' পত্রিকার বয়োজ্যেষ্ঠ কিন্তু এই জ্যেষ্ঠতা সত্ত্বেও স্বদেশচিন্তায় তাদের অগ্রজ বলা যায় না। এমন কি স্বদেশবাসী গঙ্গাকিশোরের 'বেঙ্গাল গেজেটি'-কেও (১৮১৮) নয়। স্বদেশচিন্তার আগেই বাংলা সাময়িকপত্রের এবং বাঙালী-পরিচালিত সাময়িকপত্রের জন্ম হয়েছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী' যখন প্রথম সংখ্যাতেই (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে লিখল যে স্বদেশের জনকল্যাণই পত্রিকার আদর্শ এবং স্বদেশবাসী যে সব অন্যায়-অভিযোগ বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশ করে প্রতিকার করতে অক্ষম হবে, তা স্বচ্ছন্দে 'কৌমুদী'তে প্রকাশ করা চলবে, তখন বোঝা গেল এদেশে স্বদেশচিন্তার বীজবপণ শুরু হয়েছে। দরিদ্র দেশবাসীর বিনা বেতনে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় চাই, জুরীর দ্বারা বিচার চাই, হিন্দুদের শবদাহের জন্য বিস্তৃত শ্মশানঘাট চাই, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের জন্য, বিশেষ করে স্ত্রীলোক ও শিশুদের সুচিকিৎসার জন্য ভাল হাসপাতাল চাই—'কৌমুদী'র এই সব দাবির উৎস হল স্বদেশচিন্তা। এর পাশাপাশি দেশবাসীর কাছেও আবেদন-নিবেদন চলতে থাকল—চিকিৎসাবিদ্যা বিজ্ঞান ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার অনুশীলন স্বদেশের স্বার্থে প্রয়োজন। বিলাস ব্যসনে অযথা অর্থের অপব্যয় না করে স্বদেশের গঠনমূলক কাজে সদ্ব্যয় করার জন্য দেশীয় ধনিকদের কাছে আবেদন এবং অবশ্য প্রসঙ্গত দেশকল্যাণের কথা। পরিবর্তনের [illegible] আঠার শতকের বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি-দালাল গোমস্তাদের সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ও প্রগতিচিন্তার অন্ধকূপে ধীরে ধীরে উদার স্বদেশচিন্তার সূর্যকিরণ প্রবেশ করছে।

এই সূর্যালোকে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকারের দিগন্ত পর্যন্ত দেশবাসীর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত হলেও এই উদ্ভাসের তাৎপর্য আছে। 'গৌড় দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রসঙ্গে রামমোহন-পরিচালিত 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় ১৮২৯ সালে (১৩ জুন ১৮২৯) লেখা হল : 'যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।"

নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি

১৮২১-২২ সালেই রামমোহনের সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় বাংলা দেশের নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভবের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসকদের কাছে অভাব অভিযোগ পেশ করার সময় একাধিকবার মধ্যবিত্ত কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য এই শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কৌমুদীতে সামাজিক বিশ্লেষণ বিশেষ কিছু করা হয় নি। বঙ্গদূত পত্রিকায় বোধ হয় সর্বপ্রথম মধ্যবিত্তশ্রেণীর
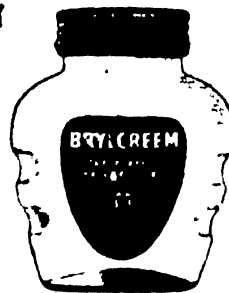
স্বাদেশিকতাবোধের ক্রমোন্মেষে যে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় তারই আভাস পাওয়া যায়। তা ছাড়া অভিনব ভঙ্গিতে 'বঙ্গদূতে'র মধ্যবিত্ত-বন্দনা থেকে একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলা সাময়িকপত্রে স্বদেশচিন্তার পরিপোষণে ও পরিবেশনে এই মধ্যবিত্তের ভূমিকাই হবে প্রধান।

স্বদেশচিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসেও দেখা যায়, প্রধানত এই নবজাত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীই তার উদ্গাতা। 'বঙ্গদূতে'র বন্দনা-কালে এই মধ্যবিত্তের সংখ্যা ও পরিধি খুবই সংকীর্ণ ছিল। দ্বাদশ বছর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে (১৮১৭-২৯) বঙ্গদূতের বন্দনা লিখিত হলেও, 'ইণ্টেলি-জেন্সিয়া' বা বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বলতে যা বোঝায় তার প্রসার ও পরিপুষ্টি তখনও হয় নি, সবেমাত্র তার মূল কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর এই মূল কেন্দ্রটি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, স্বদেশচিন্তার ধারায় উৎকেন্দ্রতার লক্ষণ ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। এই উৎকেন্দ্রতার উপদ্রব কাটতে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ

নয়। ভাঙার কাজেও অসাধারণ নৈপুণ্য ও দূরদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। কোন্‌টা ভাঙতে হবে, কখন কোন্‌ সময় ভাঙতে হবে, কি উপায়ে বা পদ্ধতিতে ভাঙতে হবে, সব জানা চাই, বোঝা চাই। সমাজগঠনের উদ্দেশ্যে এই ভাঙার কাজে সামান্য ভুল হয়ে গেলে মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। সমাজের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই ভুলের কোন ক্ষমা নেই। মৃতপ্রায় সামাজিক ধ্যানধারণা ও প্রথাসংস্কারকে অবলুপ্ত করার অত্যুৎসাহে যদি রাতারাতি গঙ্গাজলি করার চেষ্টা হয়, তাহলে সেই মৃত সংস্কার ও প্রথাগুলিই শেষে ব্রহ্মদৈত্যের মতো সমাজের স্কন্ধে চেপে অখণ্ড প্রতাপে দৌরাত্ম্য করতে চায়। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিউটনীয় বিধান সমাজের ক্ষেত্রে শতগুণ বেগে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 'সোসিওলজিকাল ল' হল অ্যাকশন-রিঅ্যাকশন 'ইকুয়াল' নয় আন-ইকুয়াল ও অপোজিট। উনবিংশ শতকের তিরিশের ইয়ং বেঙ্গলের রিঅ্যাকশন হল পঞ্চাশ বছর পরে—কৃষ্ণমোহনের [illegible] হিন্দুইজম্‌'-এর জবাব হল শশধর তর্কচূড়ামণির [illegible] হিন্দুইজম্‌'। এমন কি আদিব্রাহ্মসমাজপন্থী রাজনারায়ণ বসুও এই সময় 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদনে (১৮৭২) অগ্রসর হন। স্বদেশচিন্তা উত্তর থেকে দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত প্রচণ্ডবেগে দোলা খেয়ে [illegible] পথের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, ভূদেব-বিবেকানন্দ এই প্রবাহ-পথের সন্ধান দেন। আর যে মধ্যবিত্ত স্বদেশ-চিন্তার উদ্বোধক ও প্রবর্তক তাঁরাও তখন নাবালকত্ব উত্তীর্ণ হয়ে সাবালক হয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধি পুষ্ট হয়েছে, বিবেক মোহমুক্ত হয়েছে। 'এজ অফ রিজন' সাত সমুদ্র তের নদী পারের টম্‌ পেইনের কেতাব থেকে স্বদেশের সমাজ-জীবনে প্রতিভাত হচ্ছে। 'বঙ্গদূত' পত্রিকার মধ্যবিত্ত-বন্দনা এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাধীনতা লাভের ভবিষ্যদ্বাণীও সার্থক হতে চলেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রাতঃকালেই এই স্বদেশচিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখা গেল স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে। বাংলা সাময়িকপত্রও সেই চিন্তায় মুখর হয়ে উঠল। স্বদেশচিন্তা যখন বিদেশচিন্তার [illegible] হয়ে খাঁটি সোনা হল, এদেশের মাটির চিন্তা ও মানুষের চিন্তা হল তখন স্বাধীনতাও মাটির মধ্যে এসে গেল মাত্র ৩০-৩৫ বছরের মধ্যেই ভারত [illegible] স্বাধীন হল।

সাময়িকপত্রে এই স্বদেশচিন্তা ধারার প্রতিচ্ছবি

এই স্বদেশচিন্তার ধারা বাংলা সাময়িক-পত্রে ১৮৩০-৩১ সাল থেকে ১৮৯৫-৯৬ সাল [illegible] একটি বৃহৎ পুস্তকের আকার ধারণ করবে। কাজেই সেরকম বিবরণ থেকে আমরা আপাতত বিরত থাকব, এবং মূলে প্রতি-পাদ্যের খাতিরে অতি সংক্ষেপে কেবল অপরিহার্য উপকরণের সাহায্য নেব।

উন্মত্ত পা শ্চা ত্য মু খা পে ক্ষি তা র অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ স্বদেশচিন্তা যখন একশ্রেণীর শিক্ষিত পরগাছাদের মধ্যে উন্মার্গ হল, তখন আরও বহু সাময়িক-পত্রের মধ্যে দু'খানি বাংলা পত্রিকা এই বিজাতীয় চিন্তাধারা ও ভাবোন্মত্ততার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করল—কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) এবং তত্ত্ববোধিনী সভার বিখ্যাত মুখপত্র 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। কয়েক বছরের মধ্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিকল্পিত 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) পত্রিকাও এই বিজাতীয়তাবোধের [illegible] প্রতিরোধে অগ্রণী হল।

[illegible] তাঁর নিজস্ব কবিত্বশক্তি দিয়ে [illegible] ও ছড়া লিখলেন। সেগুলি লোকের মুখে মুখে জনপ্রবাদের রূপ ধারণ করল। যেমন:

[illegible]

কাপ্তেন সকল-শিষ্যদের লক্ষ্য করে প্রভাকরে লেখা হল:

শুনিলে টাকার শব্দ কুকুরের মত
পাছে পাছে ছুটে আসে যারা।
বাবু যা করেন বলে
তোমাদের পদতলে,
পাপের সহায় হয়ে পড়ে থাকে তারা
বঙ্গদেশে সব লোক নয় দণ্ডিহারা,
পশুকে সাহস করে পশু বলে যারা।

অতঃপর ভারতমাতাকে দুঃখ করে কবি লিখলেন:

কেন মা ভারত বৃথা কর হাহাকার
ঘুচিবে না দুর্দশা তোমার।
তোমাকে তুষিতে যারা,
মনুষ্যত্ব হারা তারা,
পশুর অধম হয়ে করে বাহাদুরি,
বড়ই দুর্ভিক তারা নাই মা নিস্তার!
হায় মা পুলিশে মুখ ঢাকে না অধবার।

শাসন ও শোষণ বিজাতীয় শাসনের বাস্তব সমালোচনা করতে 'সংবাদ প্রভাকর' কখনও কুণ্ঠিত হয়নি। বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত যতরকমের চারিদিকে তোষবৃত্তি বিদেশী শাসকের সান্নিধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল, প্রভাকর দিনের পর দিন সেগুলিকে নির্মম বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করেছে। সাময়িকপত্রের এই কশাঘাতে বিভ্রান্ত ইংরেজীশিক্ষিতদের স্বদেশী সত্তা ধীরে ধীরে জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

স্বাদেশিকতাবোধ ইয়ং বেঙ্গল ও নব্য ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তাঁদের সৎসাহস, সততা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। কিন্তু বিজাতীয় ভাব ও পুঁথিগত 'প্যাট্রিয়টিজম' ছিল তাঁদের জাতীয়তার মূল উপাদান। তাই দেশের সাধারণ বৃহদংশের মানুষের কাছে তার হৃদয়হীন বুদ্ধিসর্বস্ব কৃত্রিমতা অত্যন্ত অনাকর্ষণীয় মনে হত। ১৮৫৭-৫৮ সালের 'জাতীয় বিদ্রোহে'র পর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বিজাতীয় ভাবমিশ্রিত কৃত্রিম জাতীয়তার অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই ধরা পড়েছে। ১৮৬০ সালের পর থেকে স্বদেশ-চিন্তার ভিত্ স্বদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা দেয়। বিদ্রোহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, আধুনিক শিক্ষার প্রসার হয়েছে, এবং তার ফলে শিক্ষিতদের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তাঁদের বুদ্ধিও তেমনি পরিণত হয়েছে। স্বদেশচিন্তার গঠনমূলক কাজে তাঁরা মনোনিবেশ করেছেন।

এই সময় রাজনারায়ণ বসু বাংলাদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত জাতীয় ভাব সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে একটি সভা স্থাপন করেন এবং তার একটি অনুষ্ঠানপত্রও প্রচারিত হয়। এই সভা ও অনুষ্ঠানপত্র থেকে নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার' ও হিন্দুমেলার (জাতীয় মেলা ও চৈত্র মেলা নামেও পরিচিত) জন্ম হয়। প্রত্যেক বছর মাঘ মাস থেকে চৈত্রসংক্রান্তির মধ্যে এই জাতীয় মেলার সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ১৮৬৭ সালে এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয় এবং প্রায় ১৮৮০-৮১ সাল পর্যন্ত মেলাটি নিয়মিত চলে। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই জাতীয় মেলার প্রাণস্বরূপ। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে গণেন্দ্রনাথ বলেন যে, ধর্মকর্মের জন্য নয়, বিষয়সুখের জন্য নয়, আমোদপ্রমোদের

জন্যও নয়, স্বদেশের জন্য ও ভারতভূমির জন্য সকলকে মিলিত করাই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য। মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল— অর্থনীতি রাজনীতি শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে পরের উপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে শিক্ষা দেওয়া। মেলার প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই জাতীয় সংগীতটি গাওয়া হত:

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যস্মৃতিতে লিখেছেন:

'বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হল। কলিকাতার প্রান্তবর্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসর বৎসর তিন চারদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী,

জম্বু-বৃক্ষে যেমন জম্বু-ফলই শোভা পায়, সেইরূপ ফরাসিস জাতির ফরাসী-ভাবই শোভা পায়, ইংরাজ জাতির ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালী জাতির বাঙ্গালী-ভাবই শোভা পায়।... আম্র-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, অম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক; জম্বু-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু আম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সেইরূপ ইংরাজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত; বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষা করা বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাস্পদ।

স্বাদেশিকতা ও স্বদেশচিন্তার সমস্যাটি সুন্দরভাবে এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দেশের ইংরেজীশিক্ষিতরা প্রথমে আম্রবৃক্ষে জম্বুফল ফলাতে চেয়েছিলেন, ভাবভূমিতে ইয়োরোপীয় ভাবাদর্শের প্রাসাদ গড়ে তার মিনার থেকে কেতাবী প্যাট্রিয়টিজ্‌ম-এর আহ্বান হেঁকে দেশবাসীর জাতীয়তাবোধ জাগাতে চেয়েছিলেন।

স্বদেশ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তাই হল 'স্বদেশ-চিন্তা'।

উনবিংশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকে স্বদেশচিন্তার এই বলিষ্ঠ ধারা বাংলা সাময়িকপত্রে প্রবাহিত হতে থাকে। পূর্বোক্ত রচনা ও আলোচনাগুলি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" থেকে উদ্ধৃত, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী তখন বয়সের দিক থেকে প্রায় প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছে, তবু তার স্বদেশচিন্তায় কোথাও এতটুকু দুর্বলতার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। যেমন বলিষ্ঠ যুক্তি তেমনি সত্য-প্রকাশের সৎসাহস। এই সময়কার তরুণ সাময়িকপত্রের মধ্যে উল্লেখ্য হল—সুলভ সমাচার ১৮৭০, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন ১৮৭২, ভারতী ১৮৭৭, আনন্দবাজার পত্রিকা সাপ্তাহিক, ১৮৭৮ বঙ্গবাসী ১৮৮১, সঞ্জীবনী ১৮৮৩। বাংলা সাময়িকপত্র সম্বন্ধে সরকারী স্বরাষ্ট্র-বিভাগের গোপন রিপোর্টে (১৮৭৩-১৯০০) দেখা যায়, উনবিংশ শতকের অষ্টম দশকের মাঝামাঝি সাপ্তাহিক "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সর্কুলেশন হয়েছিল ২০,০০০ কপি এবং অন্যান্য সাপ্তাহিকের মধ্যে "বঙ্গ-নিবাসী" ৮০০০ কপি, "সময়" ৪০০০ কপি, "হিতবাদী" ৩০০০ কপি, দ্বি-সাপ্তাহিক "বঙ্গামিত্র" ৪০০০ কপি এবং মাসিক "ভারত শ্রমজীবী" ৪০০০ কপি বহুলে প্রচারিত ছিল। লক্ষণীয় হল, এই সময় "সংবাদ প্রভাকর" ও অন্যান্য যে দুই-একখানি দৈনিক পত্রিকা ছিল তার কোন-টাই ৫০০।৬০০ কপির বেশী বিক্রি হত না। এইদিক থেকে এই সময়টাকে বাংলা সাপ্তাহিক-পত্রের স্বর্ণযুগ বলা যায়। অধিকাংশ পত্রিকারই স্বদেশচিন্তার সুর একরকম, পূর্বোক্ত তত্ত্ববোধিনীর সুরের সঙ্গে তার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের স্তর এই সময় যে শুধু প্রসারিত হয়েছিল তাই নয়, সুস্থ স্বদেশচিন্তারও বিকাশ হয়েছিল তাদের মধ্যে, এবং সেই স্বদেশচিন্তার বিকাশে বাংলা সাময়িকপত্রের সংগ্রামও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেই দেখতে পাই বাংলা সাময়িকপত্রের এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম আশ্চর্য ফলপ্রসূ হয়েছে। প্রথম দশ বছরের মধ্যেই "স্বদেশী আন্দোলনের" উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যে বোধ হয় সর্ব-প্রথম এদেশের স্বাভাবিক স্বদেশচিন্তার নির্ভীক সংবদ্ধ প্রকাশ হয়। বাংলা সাপ্তাহিকপত্রের স্বর্ণযুগ তখনও অতিক্রান্ত হয় নি। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" ১৯০৪ এবং অরবিন্দ ঘোষের ইংরেজী "বন্দেমাতরম্" ১৯০৬, এই সময়ে [illegible] প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা। তাছাড়া 'যুগান্তর' (১৯০৬ "স্বরাজ" (১৯০৭) প্রভৃতির মতো সাপ্তাহিকের [illegible] প্রতি-পত্তি ছিল। [illegible] এই বিখ্যাত লেখাটি ছাপা হয়:

[illegible] সঙ্কটময় যুগ [illegible]।

[illegible] স্বদেশচিন্তা তখন আত্মপ্রকাশ করত এই ভাবে:

ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরাজ প্রাণে প্রাণে বুঝে; আর বুঝে বলিয়াই সে প্রকাণ্ড আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায়; গোটাকত ফৌজ, তোপ, লাল পাগড়ীর ভড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে শঙ্কান্বিত করিতে চেষ্টা করে। ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গবর্নমেণ্ট প্রাসাদ, ঐ লাল পাহারা, আলোকমালোকিত রাজপথ, বড় বড় গোরা বারিক, ও [illegible] একটা ভান, [illegible] বলা যায়। [illegible] বিস্তারিত [illegible] [illegible] ঐ

দেশের সংসারজীবন, ব্রতআচার, রঙ্গরস, আলোড়ন-আন্দোলন—সবকিছু নিয়ে একটি সংহত দেশচেতনা আর কেউ ফোটাতে পারেন নি। তাঁর বহু কবিতায় বাংলাদেশের তথ্য ও ঘটনা ভিড় করে এসেছে। কবিত্ব হিসাবে যাই হোক দেশের একটি বৃহত্তর রূপ তাঁর মানসনেত্রে ফুটে উঠেছে এগুলি তার প্রমাণ। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে কোনো কোনো কাব্যে কলকাতার কথা থাকলেও এ-রকম করে নিশ্চয়ই কেউ কলকাতা শহরের বন্দনা করেন নি—

> ধন্য ধন্য কলিকাতা ধরেছে কলির ছাতা
> ধন্য তব নব ব্যবহার।
> হইতেছে কত রঙ্গ নাহি মাত্র তালভঙ্গ
> বঙ্গদেশ পদে নমস্কার॥
> —শারদীয় পর্ব

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'—এই উক্তি ঈশ্বর গুপ্তের। পদ্য-পংক্তিটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর পরিমিত যতিবিন্যাসে এবং অনুপ্রাসে পংক্তিটি এমন একটি ছবি ফুটিয়ে তুলেছে, যা তাঁর আগের কোনো কবির দ্বারাই সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের শুধু ভৌগোলিক অস্তিত্বই নয়, তার সঙ্গে বাঙালী স্বভাবের চিরন্তন রঙ্গপ্রিয়তার যে

...পটি ঈশ্বর গুপ্ত ধরে দিতে পেরেছেন তার তুলনা বিরল। এই চেতনাতেই যথার্থ স্বাদেশিকতার স্ফুরণ। রঙ্গলাল ও অন্যান্য কবিদের কাব্যে যে দেশচেতনা স্পষ্টতর রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, ঈশ্বর গুপ্তই তার পথিকৃৎ।

আজ আমরা উন্নাসিকতা সহকারে বলি ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশচেতনা সংকীর্ণ এবং প্রাদেশিকতাদুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষীও আমাদের এই অভিযোগ থেকে একেবারে মুক্তি পান নি। এ কথা আমরা অনেক সময়েই স্মরণে রাখি না যে চিত্তের শতদল অকস্মাৎ একদিনে সম্পূর্ণ ফোটে না সে একটি একটি করে দল উন্মোচিত করে। পল্লীমুখী দৃষ্টি যে নগরমুখী হয়েছে এবং একটি বৃহৎ জনসংসর্গে আমাদের একালের জীবনযাত্রা নবরূপ ধারণ করছে, এ কথা আমাদের সাহিত্যে জানালেন কে? বাংলা কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তই তাকে প্রথম প্রতিফলিত করলেন। আবার মাতৃভাষা যে দেশকে একচিত্ত করে তুলছে সে সম্বন্ধেও তিনিই অবহিত হয়েছিলেন। স্বভাবতই বাংলাদেশই তাঁর লেখনীতে রূপ পেল। দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব অনুভব করতে আরম্ভ করলাম। এই চেতনাই ক্রমবিস্তার লাভ করে সর্বভারতকে স্পর্শ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে। ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গচেতনা দিয়ে তাঁর শুভ আরম্ভ ঘটালেন কিন্তু ভারতচেতনাও তাঁর সময়ে এসে গিয়েছিল, তার প্রমাণ—

> জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
> ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
> তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
> মিছে কেন মর ভার বয়ে
> —ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

ভারতবর্ষকে জননী সম্বোধন বাংলা কাব্যে এই প্রথম। দেশকে দুভাবে অনুভব করতে হয়—স্থানে এবং কালে। তবেই দেশপ্রেম সম্পূর্ণতা লাভ করে। ঈশ্বর গুপ্ত দেশকে স্থানের দিক দিয়ে অনুভব করিয়ে দিয়েছিলেন। অতীত ইতিহাসের ধ্যানে ভবিষ্যতের স্বপ্নে দেশজননীর আর একটি পবিত্র জ্যোতির্ময় রূপ দেশপ্রেমিকের চোখে প্রকাশ পায়। ঈশ্বর গুপ্ত যখন কবিতা লিখছেন সে সময় মাতৃভূমির সেই রূপটি তেমন করে রচিত হয় নি।

স্বদেশ সম্পর্ক—স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের মানুষ স্বদেশের প্রকৃতি—সবকিছু সম্পর্কেই ঈশ্বর গুপ্তের এমন একটি সুকুমার পুলকবোধ ছিল যা তাঁর মনটিকে অক্ষুণ্ণ চেতনার স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে দেশাত্মবোধ ধর্মবোধেরই একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত উদাত্ত কণ্ঠেই বলেছেন—

> প্রকৃতির পূজা ধর পুরুষকে প্রণাম কর
> প্রেমময়ী পৃথিবীর পায়
> বিশেষত নিজস্থান প্রীতি রাখ সবিশেষে
> মুগ্ধ জীব যার মোহমায়।
> ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি
> স্বর্গভোগ উপসর্গ প্রায়।
> শিবের কৈলাসধাম শিরপর্ণ বটে নাম
> শিবধাম স্বদেশ তোমায়॥
> —স্বদেশ

পৃথিবী কথাটার প্রচলন তখনও হয় নি ... তিনি বলেছেন প্রেমময়ী পৃথিবীর ...

মধুসূদন ও দেশাত্মবোধ

প্রমথনাথ বিশী

১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মধুসূদন অনেকদিন পরে মাদ্রাজ থেকে দেশে ফিরে এলেন। তারপরে প্রায় এক বৎসরের মাথায় দেখা দিল সিপাহী বিদ্রোহ। যদিচ বিদ্রোহের আসল রূপ প্রকট হ'ল পশ্চিমোত্তর ভারতে তবু তার প্রথম গোটা দুই স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল হাতের কাছে বহরমপুরে ও বারাকপুরে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মধুসূদনের চিঠিপত্রে এই স্ফুলিঙ্গের বা দাবানলের কোন উল্লেখ নাই। মাইকেলের চোখ কান জাগ্রত ছিল তবু না ধরা পড়লো তাতে স্ফুলিঙ্গের চমক বা দাবানলের গর্জন। পরবর্তীকাল সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে যে দেশাত্মবোধের সূচনা আবিষ্কার করেছে মধুসূদন কি সে বিষয়ে অচেতন ছিলেন, কিম্বা মধুসূদনের কাল ঐ ঘটনার মধ্যে তেমন কোন অর্থ দেখতে পারনি বলেই ব্যাপারটা তাঁর মনের উপর দিয়ে ফস্কে চলে গিয়েছে? শেষেরটাই সত্য বলে মনে হয়। শুধু মধুসূদন কেন সেকালের অনেক মনীষী যাঁদের আমরা দেশাত্মবোধের উৎস স্বরূপ মনে করি সিপাহী বিদ্রোহকে একটা অবাঞ্ছিত হাঙ্গামার বেশি মনে করতে পারেন নি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে একদিকে যেমন কালক্রমে দেশাত্মবোধে বিবর্তন ঘটেছে তেমনি আর একদিকে পরবর্তীকাল নিজ মনোভাব প্রক্ষেপ করেছে পূর্ববর্তীকালের উপর—একেই বলা হয়ে থাকে Reading History backward। মধুসূদনের দেশাত্মবোধের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমাদের সমাজে বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

মানুষের ইতিহাস কতকগুলি Irony-র সমষ্টি। এই সব Irony-র লীলা অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণই ঐতিহাসিকের প্রকৃত কর্তব্য। ভারতীয় ইতিহাসের উনবিংশ শতকের প্রধান Ironyটি বড় শিক্ষাপ্রদ। একদিকে জন-কোম্পানী এই বৃহৎ দেশকে ক্রমেই কঠিনতর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে আর একদিকে [illegible] অনবধানে এমন সব কার্যের [illegible] যার দূরপ্রসারী ফলে দেশ [illegible]

[illegible] ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সমর্থন ও উৎসাহদান। আরও একটি Irony, এই যুগে বিদেশীর কণ্ঠেই ভারতভূমি সর্বপ্রথম মাতৃ সম্বোধন শুনলো—যদিচ ডিরোজিও জন্মসূত্রে ছিল না। ডিরোজিওর মৃত্যু ১৮৩১ সালে। কাজেই তার আগেই কোন সময়ে ভারতকে মাতৃ সম্বোধনে 'স্বদেশ আমার' কবিতাটি লিখিত হয়েছিল হিন্দু মেলায় গীত 'জাতীয় ভাবোদ্দীপক' সংগীতগুলি রচনার অনেক আগে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত রচনার আরও অনেক আগে। জন্মে বংশে ধর্মে ভাষায় যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই এ দেশের, তবু কিনা এদেশ হ'ল তার কাছে স্বদেশ। তখন এদেশের লোক হয় এ বিষয়ে অচেতন ছিল, নয় ইংলণ্ডের গৌরবে এমনি অভিভূত ছিল যে স্বদেশ সম্বন্ধে গৌরববোধ করতে শুরু করেনি। ডিরোজিওর কাব্যে যে দেশাত্মবোধ দেখতে পাই মধুসূদনের কাব্যের দেশাত্মবোধ তা থেকে ভিন্ন নয়—এ দুই আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন উনবিংশ শতকের শেষে বিশেষ করে বিংশ শতকের গোড়াতে দেশাত্মবোধের যে রূপ দেখতে পাই তা থেকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই প্রভেদটা ঘটলো কখন? ঐ সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বলেই মনে হয়। ঐ ঘটনাটাই দেশাত্মবোধ বিবর্তনের প্রধান কারণ। আগে বলেছি যে সিপাহী বিদ্রোহ দেশাত্মবোধক সংগ্রাম নয় তবে তার ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায়, শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এবং শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধে এমন গূঢ়সত্ত পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে ডিরোজিওর 'স্বদেশ আমার' দেশাত্মবোধ শেষে রক্তারক্তি বাড়বে 'শক্তি' দেশাত্মবোধে পরিণত হয়েছে। ডিরোজিও ও মাইকেলের দেশাত্মবোধে জাতি বৈরের স্থান নাই। দেশের প্রাচীন গৌরবে গর্ববোধ আছে বর্তমানহীনতায় বেদনা বোধ আছে, কিন্তু ইংরেজ শাসন বা ইংরেজ শাসক বা ইংরাজ জাত সম্বন্ধে জাতিবৈরের ভাব নাই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ ডিরোজিও, মাইকেল ও ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় মনে মনে ইংরেজ ছিল।

॥ ৩ ॥

[illegible] ইংরেজের [illegible]

সাহেব পাড়ায় বাস করতেন, বলতেন বামুনে পাড়ায় থাকি গাঁয়ের মধ্যে বামুন পাড়া শ্রেষ্ঠ, শহরের মধ্যে সাহেব পাড়া। যখন তিনি মারাত্মক অসুখে ভুগছিলেন কোন ভক্ত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিল তিনি রাজি হননি। সাহেবের চালে যে' প্রথম যৌবন থেকেই [illegible] উৎকট আশা পোষণ করতেন। ইংলণ্ড যাওয়ার জন্যেই [illegible] দিলেন, বিবাহ অবশ্যও। [illegible] বলেছিলেন, যাই বলো ইংরেজের মেয়ের কাছে বাঙালীর মেয়ে লাগে না। বিয়ে করলেন প্রথমবারে ইংরেজের মেয়ে দ্বিতীয়বারে ফরাসী মেয়ে। [illegible] কাব্য লিখলেন ইংরাজিতে; ইংরেজ জাতে স্থান পেতে হবে এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা, অনেকটা প্রায় সফল হয়ে ছিল, 'পৃথিবী' বানান লিখেছিলেন 'প্রিথিবী'। [illegible] তাঁর অভিমান [illegible] উপায় ছিল না। এহেন লোকের দেশাত্মবোধ জাতিবৈরের হওয়া সম্ভব নয়, [illegible] তবে তাই বলে মধুসূদনের মনে দেশাত্মবোধ ছিল না বা তার গভীরতা কম ছিল এমন মনে করা উচিত হবে না। মধুসূদনের দেশাত্মবোধ অকৃত্রিম ও গভীর।*

মধুসূদনের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে মনে রাখবার মতো প্রথম বিষয় এই যে, দেশ বলতে কখনো তিনি ভারত বুঝেছেন কখনো বঙ্গদেশ।

শুনগো ভারত ভূমি,
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যাজ ঘুমঘোর,
হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

---

* তাই বলে রাম রাবণের লড়াইয়ের মধ্যে ইংরাজ ও ভারতবাসীর [illegible] আভাস দর্শন কিম্বা সুন্দ উপসুন্দের লড়াইয়ের মধ্যে পুত্রদুঃখ বা কোন [illegible] উচিত হবে না। [illegible]

কোথা বাল্মীকি ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।

আবার—

রেখো মা দাসেরে মনে
এ মিনতি করি পদে।
কিন্তু কোন্ দুখে আছে,

হেন অমরতা আমি
কহগো, শ্যামা জন্মদে।

একটি ভারতভূমির প্রতি অপরটি বঙ্গ-ভূমির প্রতি। শুধু তাই নয়। প্রথমটির মধ্যেই দ্বিতীয়টি বর্তমান।

অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

মধুসূদনের দেশ ভারতভূমি কাজেই তার অংশরূপে বঙ্গভূমি। অথবা বঙ্গভূমির প্রতি কবিতাটির শিরোদেশে তিনি 'my native land, good night' বায়রনের এই উক্তি উদ্ধার না করে পারেন নি। বায়রন দেশত্যাগের সময়ে লিখেছিলেন। তিনিই বা কি কম, দেশত্যাগের সময়ে তিনিই বা কেন না লিখবেন। এ [illegible]

বলা বাহুল্য, রঙ্গলাল এ-সব আদর্শই আহরণ করেছিলেন ইংরেজি কাব্য থেকে। মধুসূদনের মত তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বুৎপন্ন ছিলেন না, মাইকেলের প্রতিভাও তাঁর ছিল না, তবু তিনিই প্রথম ইংরেজি কবিতার প্রধান গুণগুলি লক্ষ করে তাদের বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন।

রঙ্গলাল স্কুল-কলেজে পড়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে-শিক্ষায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। সম্ভবত ১৮৪৩ সালে, মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে, তাঁকে হুগলী কলেজ ছেড়ে দিতে হয়। শুধু নিজের চেষ্টায় তিনি ইংরেজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন এবং ইংরেজি কবিতার অনুবাদে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তিনিই প্রথম ইংরেজি কবিতার পরিচ্ছন্ন রুচি ও উন্নত ভাবের আদর্শকে বাংলা কবিতায় সঞ্চারিত করবার সচেতন প্রয়াস করেন। এবিষয়ে কবির নিজের উক্তি স্মরণীয়, "আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।"

এই "বিশুদ্ধ প্রণালী"র অর্থ উন্নত রুচিবোধ। এর আগে কবিওয়ালারা তো বটেই, ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ংও এই 'বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনার কথা চিন্তা করেননি। ভারতচন্দ্রের আদর্শই তখনও বাংলা কবিতায় সক্রিয় ছিল। এ-আদর্শকে পুরোপুরি বর্জন করে কি গঠনে, কি রুচিতে, কি বিষয়-নির্বাচনে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রঙ্গলালই প্রথম করেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কেবল ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন না, কবিওয়ালাদের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব (ছাতুবাবু ও লাটুবাবু) যখন একটি 'কবি'র দল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁরা সে-দলে গান 'বেঁধে' দেওয়ার জন্য রঙ্গলালকে নিযুক্ত করেন; কাজেই নিজে কবিওয়ালা না হয়েও 'কবির' দলের বাঁধনদার ছিলেন বলে তিনি বাংলা কবিতার প্রাচীন ধারার সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করেছিলেন বলা চলে। রঙ্গলালের এই দ্বিমুখী প্রীতির মধ্যে একটি আপাত-বিরোধ দেখা গেলেও, রঙ্গলালের প্রবল দেশপ্রেমের মধ্যেই এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি তাঁর দেশ এবং দেশের ভাষা ও সাহিত্য এরূপ গভীরভাবে ভাল-বেসেছিলেন যে, এ-সাহিত্যের প্রাচীন ধারাটি তিনি নিজে গ্রহণ না করলেও তাকে নিন্দনীয় বলে মনে করতেন না, বরং তার প্রতিও যথেষ্ট প্রীতি অনুভব করতেন।

রঙ্গলালের এই স্বদেশী কাব্যপ্রীতির একটি উদাহরণ তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ'। ১৮৫২ সালের এপ্রিল মাসে বীটন সোসাইটির এক অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত বাংলা কাব্য বিষয়ে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তুলনায় বাংলা কবিতার নিন্দা করা হয়। নানা দিক থেকে বাংলা কবিতার অপকর্ষ দেখিয়ে বক্তা বলেন,

"While on this subject, we are compelled to admit the truth of a charge often urged against the Bengali poets., All their writings and more especially their panchalis or songs are inter-larded with thoughts and expressions grossly indecent."

এই [illegible]

এই মত প্রকাশ করলেন যে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এমন কিছু নেই, যা কোনো শিক্ষিত বা মার্জিতরুচি ব্যক্তিকে তৃপ্তি দিতে পারে। এইসব উক্তির প্রতিবাদে ১০ই মে তারিখে বীটন সোসাইটির অধিবেশনে রঙ্গলাল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং পরে পুস্তকাকারে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে রঙ্গলাল কেবল গভীর সাহিত্যবোধের পরিচয় দেননি, মাতৃভাষা ও স্বদেশী সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ প্রীতিরও পরিচয় দিয়েছিলেন। রঙ্গলালের মধ্যে এই প্রীতি যে কতদূর আন্তরিক ও গভীর ছিল, প্রবন্ধটি থেকে উৎকলিত নিচের উদ্ধৃতিতে তা পরিস্ফুট হবে।

“এরূপ কাহার মনে ছিল যে কলিকাতার স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান লোকেরা একত্র বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ হে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না বাঙ্গালা কবিতা যাহাতে সভ্য সমাজে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন উর্বরা ভূমি আছে বীজ আছে উপায় আছে কেবল কৃষকের আবশ্যক অতএব গাত্রোত্থান করুন উৎসাহ সলিল সেচন করুন পরিশ্রমরূপ হল-চালনা করুন দ্বেষ প্রভৃতি জঙ্গল কণ্টক বৃক্ষ উৎপাটন করুন তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনার-দিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যক পূর্ণ ক্ষেত্র [illegible] বিদেশী ফসল ফলাইতে যান অথচ বিবেচনা করেন না যেরূপ সকলসম্পন্ন আম্রমুকুল উদয় হয় না সেইরূপ বাঙ্গালি কর্তৃক ইংরেজি কবিতা অথবা ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয় যদি বলেন বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরেজি কবিতা রচনা করিয়াছেন সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর হইয়াছে, হইবেক না কেন অশনের শব্দের অন্তে কি অন্য শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরেজি কবিতা রচনাকল্পে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদ্যপি সেইরূপ আয়াস, সেইরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্তি হইতেন, তবে তাঁহারা অনায়াসে বাঙ্গালী কবি হইতে পারিতেন এবং তাহা হইলে কতদূর [illegible]”

...style is affected."

রঙ্গলালের রচনা রীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব থাকলেও পরিচ্ছন্নতা এবং উন্নত রুচি আছে, ঐতিহাসিক বিচারে এ-প্রশংসা সামান্য নয়, কারণ রঙ্গলালের পূর্ববর্তী আধুনিক যুগের অন্য কোনো কবি সম্বন্ধে একথা বলা যায় না।

...যে গভীর স্বদেশী সাহিত্য প্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তৎকালীন বাঙালী সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকের মনেই রেখাপাত করেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। কারণ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ সে-যুগের দু'জন ধনী ব্যক্তি এই প্রবন্ধটি পড়ে নির্দোষ এবং উন্নত ভাব-

...অনুরোধে ... উপাখ্যান। কিন্তু কাব্যখানির রচনা আরম্ভ হবার পর ১৮৫৫ সালে এঁদের অন্যতম একজন, ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল পরলোকগমন করায়, মর্মাহত হয়ে রঙ্গলাল কাব্যটিকে কিছুকাল অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রাখেন। পরে ১৮৫৮ সালে কাব্যটি

[illegible] বিস্তার প্রবাহিত, এবং [illegible] সঙ্গে ওতপ্রোত। [illegible] কাব্য 'কর্মদেবী'র বিষয়ও রাজপুত ইতিহাস, যদিও এখানে রাজপুত নারীদের সতীত্বের মহিমাই দেখানো হয়েছে। এ কাব্যেও স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে রঙ্গলালের পরাধীনতা-বোধের পরিচয় ছড়িয়ে আছে। যেমন এ কাব্যের নায়ক ভাট্টজাতির রাজা সাধু যখন শুনতে পেলেন যে মুসলমান বণিকের একটি বিরাট দল বিপাশা নদীর তীরে ছাউনি ফেলেছে, তখন তিনি তাদের আক্রমণ করে পরাজিত করলেন। বণিকরা বললেন, আমরা বাণিজ্য করতে এসেছি, দেশ জয় করতে আসিনি, আমাদের উপর সন্দেহ কেন? উত্তরে সাধু বললেন,

> "পূর্বে এই পুণ্যভূমি বাণিজ্যের ধনে
> ধনবতী হয়েছিল বিখ্যাত ভুবনে॥
> দিগ্দিগন্তের হতে বাহিয়া সাগর।
> এদেশে আসিত কত বণিক নিকর॥...
> কে করিল পুণ্যভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ?
> কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ?...
> হাতের মঙ্গলরতে হয়ে এস ব্রতী।
> বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি॥...
> এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
> করিলেন প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে॥"

রঙ্গলালের প্রকাশ্য ইংরেজপ্রীতি সত্ত্বেও উপরের পংক্তিগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নেই একথা কে বলতে পারে?

রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী'ও রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। চতুর্থ কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী' 'উৎকল-দেশীয় বীর রসাত্মক আখ্যান বিশেষ' অর্থাৎ সেটিও উড়িষ্যার ইতিহাসের একটি রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা। রঙ্গলালের অন্যান্য যে সব কাব্য অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে, তার মধ্যে রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত 'ঊষা' নামে 'মারবার দেশীয় উপাখ্যান'টিও অন্যতম।* এই সকল কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা না থাকলেও ভারতের নরনারীর বীরত্ব, সতীত্ব, বুদ্ধি, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতি মহৎ গুণের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে বলে পরোক্ষভাবে সকলগুলিই দেশপ্রেমের বাণী বহন করেছে বলা যায়। সেইজন্যই 'শূরসুন্দরী' প্রকাশের অল্পদিন পরে রমেশচন্দ্র দত্ত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত তাঁর বাংলা সাহিত্যের বিবরণে বলেছিলেন "His পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্মদেবী and শূরসুন্দরী are full of spirited descriptions of war and peace....and the poet has served his country [illegible] embalming [illegible]

annals of Rajasthan in admirable verse."

রঙ্গলালের কাব্যবিচারে এ কথা সর্বদা স্মরণীয় যে তিনি সেই প্রাথমিক যুগে তাঁর রচনা দ্বারা "served his country well"।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের অল্পদিন পরে এটি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হয় এবং ১৮৬৫ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পাঠ্য হওয়ার ফলে তৎকালীন স্বদেশপ্রেমের আবেগ প্রচারে বইটি যে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল এ অনুমান অসঙ্গত নয়। কেননা দেখা যাচ্ছে সমকালীন কাব্যপাঠক সমাজে বইটি গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "পদ্মিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎপরিমাণে গুরুর পদবী অতিক্রম করিয়া কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কবিতা এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবৃন্দের বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। আমাদের যৌবনকালে যে সকল শক্তির প্রতিভা আমাদিগকে স্বদেশানুরাগে প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"

এ হল সাহিত্যিকের কথা। রঙ্গলালের কবিতা যে সে-যুগে দেশসেবাকর্মেরও প্রাথমিক প্রেরণা নির্দেশ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিপিনচন্দ্র পালের উক্তিতে। Freedom Movement in Bengal—নামক প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন "এ সময় বোধহয় পদ্মিনী-উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথমে জাতীয় স্বাধীনতার বাণী উদ্গীরিত করিয়াছিলেন। রাজপুত ও মুসলমানদিগের যুদ্ধের একটি ঘটনা লইয়া এই কাব্য রচিত হয়। রাজপুত দেশপ্রেমের উহা একটি গৌরব স্তম্ভস্বরূপ। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে নব্য বাঙ্গালা রঙ্গলালের উদ্দীপনাময় কাব্য হইতে জাতীয় স্বাধীনতার নূতন মন্ত্র গ্রহণ করিল। আমাদের ব্রিটিশ প্রভুগণ এই সকল নূতন শিক্ষা হইতে তাঁহাদের রাজনৈতিক অধিকারের খর্বতা সাধন হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা এ পর্যন্ত করেন নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক হইতে আমরা স্বচ্ছন্দে রঙ্গলালের কবিতা পাঠ করিতে পারিতাম—শিক্ষা বিভাগ ইহাতে কোনও আপত্তি করিতেন না।"*

রঙ্গলাল বড় কবি ছিলেন না। শুধুমাত্র কাব্যগুণ বিচারে আধুনিককালে তাঁর কবিতা উচুশ্রেণীর বলে গণ্য হবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু তিনিই প্রথম সচেতনভাবে বাংলা কাব্যকে তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠকের কাছে আদরণীয় করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ব্যক্তিগত খ্যাতি-লাভের চেয়ে নবীন শিক্ষিত সমাজে বাংলা কবিতার গৌরব প্রতিষ্ঠার দিকেই বেশী লক্ষ্য রেখেছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "উপস্থিত কাব্যের স্থলে স্থলে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবহারী জ্ঞান না করেন। আমি ইচ্ছা পূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি, যে হেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন, তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বাঙ্গালি কবিতা বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তদ্ভাবের প্রেরিত দর্শক সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।" রঙ্গলাল বাংলা কাব্যে যে পরিচ্ছন্নতা, সদ্রুচি ও উন্নত ভাবের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরবর্তীকালে সকল কবিই সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কাব্যে উন্নত চরিত্র সৃষ্টির গৌরবও রঙ্গলালেরই প্রাপ্য, এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টিতে পদ্মিনী চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কোনো কোনো সমালোচকের এ অনুমান ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। বিশেষত, ঐতিহাসিক কাব্যের যে-আদর্শ এবং স্বদেশপ্রেমের যে প্রেরণা রঙ্গলালের রচনায় প্রথম অংকুরিত হয়েছিল, তারই প্রভাব হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' ও নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল ঐতিহাসিক বিচারে এ-সত্য স্বীকার করতে হবে। তাই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রঙ্গলাল কবিত্বে প্রাধান্য না পেলেও তাঁর প্রভাবকে সামান্য বলে মনে করা চলে না।

দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশচিন্তা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "আমার জীবন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'বোধহয়, শিশিরবাবু গদ্যে "অমৃতবাজার পত্রিকায়" এবং আমি পদ্যে "এডুকেশন গেজেটে" প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি।' দেশের কথা ভাবিয়া আমিই প্রথম অশ্রুবর্ষণ করি এ কথাটি দেশপ্রেমিকের মুখে বড় ভাল শুনায় না। আর আত্ম বাদ দিয়া আত্মজীবনী হয় না জানিয়াও নবীন সেনের এই উক্তিটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। অবকাশরঞ্জিনীর (১৮৭১) দুই-একটি কবিতার প্রসঙ্গেই তিনি নিজেকে এই গৌরব দান করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের কোন কবিতাই "এডুকেশন গেজেটে" ১৮৬৬র পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান" মুদ্রিত হয় ১৮৫৮ সালে এবং 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে'—এই কাব্যের অন্তর্গত। এটি বাদ দিলেও মাইকেলের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র 'ভারত-ভূমি' সনেটটি উপেক্ষা করিতে পারি না। নবীন সেন "আমার জীবনে" লিখিয়াছেন—'"চতুর্দশপদী কবিতাবলী" স্মরণ হয় আমার "এডুকেশনে" লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়।' বস্তুত ঐ গ্রন্থ ১৮৬৬ সালেই প্রকাশিত হয় এবং ইতালীয় কবি Filicaja-র 'Italia O Italia' সনেটের অনুসরণে লিখিত 'ভারত ভূমি' সনেটটি ১৮৬৫ সালের রচনা বলিয়া ধরিতে পারি।

গদ্যে শিশিরকুমার ঘোষ দেশের কথা প্রথম লিখিলেন এ কথাও সত্য নয়। বাংলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রথম সার্থক নিদর্শন দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ নাটক" (১৮৬০)। ইহার পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত অবশ্য দেশপ্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সে কবিতা ঐ যুগের স্বদেশচিন্তাকে তেমন প্রভাবিত করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 'বাংলাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা' বলিয়া লিখিয়াছেন—ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত [illegible] না হইলেও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও [illegible]।' সিপাহীবিদ্রোহের [illegible] মেলা [illegible]

দেশবাৎসল্যের আদি বাংলা গান' বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। কিন্তু এ গান হিন্দুমেলার যুগে বা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে গীত হয় নাই। তবে ঈশ্বর গুপ্তের কয়েকটি পদ বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির ইতিহাসে অবশ্য স্মরণীয়—

কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

অথবা

[illegible] মায়ের কোলে সন্তান জননী [illegible]
কে কোথায় এমন দেখেছ

ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি-নবীশ না হইয়াও এই রকম স্বদেশপ্রীতির কবিতা লিখিয়া বাঙালীর মান রাখিয়াছেন। কারণ patriotism আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়াছেন। ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার Travels of a Hindoo (১৮৬৯) গ্রন্থে লিখিলেন

'the vocabulary of the Brahmins have no word for patriotism . In the whole corpus of that literature there is not one shirt-stirring war-song like the "Bannockburn" or the Battle of the Baltic'

কথাটি বড় মিথ্যা নয়। ইংরেজি-শিক্ষিত রঙ্গলালকৃত "পদ্মিনী উপাখ্যান" (১৯৫৮) কাব্যের পূর্বে সমস্ত বাংলা সাহিত্যে স্বদেশের কথা বলিতে বোধহয় চার লাইনের বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সে চার লাইন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে" কোথায় আছে তাহাও আমাদের বড় মনে থাকে না। আর 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী' কথাটি এক সংস্কৃত পদের অনুবাদ। আর যদি জিজ্ঞাসা কর, বাংলা দেশে পরাধীনতার দুঃখ প্রথম কে কবিতায় প্রকাশ করিলেন, তাহা হইলে যাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে হয় তিনি ইংরেজীভাষী জন্মসূত্রে অ-ভারতীয়—হেনরি ডিরোজিও। তাঁহার

My country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast;
Where is that glory, where that reverence now ?—

[illegible]

করিয়া ('স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী') ডিরোজিওকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রথম স্বদেশপ্রেমিক কবির স্থান দিয়াছেন। তবে ঈশ্বর গুপ্ত ডিরোজিওর এই কবিতাটি পড়িয়া 'জননী ভারতভূমি, কবিতাটি লিখিয়াছেন এমন বলিতে পারি না। অতএব আমাদের স্বাদেশিকতা দেশী সামগ্রী একথা বলিতে বড় বাধা দেখি না।

ডিরোজিওর মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই ত্রিশ বৎসরে বাঙালী ইংরেজকে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে এবং গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে কোন্দল করিতেও শিখিয়াছে। দেশের নানা দাবি লইয়া উৎকৃষ্ট ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাসও এই সময়ের মধ্যেই হইয়াছে। সংবাদপত্রে ইংরেজের অন্যায় ইংরেজকে দুকথা শুনাইয়া দিবার সাহসও এই কালেই হইল। কিন্তু এই রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের বড় সম্পর্ক ছিল না। ব্ল্যাক অ্যাক্ট লইয়া যে আন্দোলন তাহা শহরের শিক্ষিত জনের আন্দোলন। ঐ আন্দোলনের সময় সিপাহী বিদ্রোহ চলিতেছে। কিন্তু সে জাতিবৈর বাংলা কাব্যে বা গানে প্রতিফলিত হইল না। সিপাহী বিদ্রোহ লইয়া শিক্ষিত বাঙালী এক স্বদেশী সাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন না। কিন্তু ঐ বিদ্রোহের পর ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যে আর-একটি বিদ্রোহ দেখা দিল, তাহা এক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল। নীল বিদ্রোহে কলিকাতার শিক্ষিত বাঙালী গ্রামের চাষীর পক্ষ লইয়া ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই বাংলা দেশের প্রথম স্বদেশী আন্দোলন। এই স্বদেশীর মূলে দেশের দুঃখে দুঃখবোধ। ইহার মধ্যে রাজনৈতিক অভিমান নাই, রাজনৈতিক অধিকারের দাবি নাই। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, ইংরেজ বণিকের অত্যাচারের অবসান ঘটাইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলায় যে ভাব, নীল আন্দোলনেও সেই ভাব। দেশের [illegible]

জন্য মনোমোহন বসু গান লিখিয়াছেন:
ফুলদ দ্বীপ হতে, [illegible]
[illegible]
[illegible] ছিল যেথে,
দেশের লোকের ভাতো খোসা [illegible] পেতে,
হায় গো, রাজা কি কঠিন।

"নীলদর্পণ" এই "সার শস্য গ্রাসের" প্রতিবাদ। এই নাটকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর দুর্দশার কথা বিধৃত হয় নাই। দীনবন্ধুর প্রতিভার মহত্ত্ব এই যে তিনি এই দুর্দশার কথা লইয়া যথার্থ নাটক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। "নীল-দর্পণ" উদ্দেশ্যমূলক রচনা হইয়াও সার্থক নাটক। কথাটি আচার্য সুশীলকুমার দে সুন্দর বুঝাইয়াছেন: ''"নীলদর্পণ" কেবল নীলকরদের সাময়িক উৎপীড়নের কাহিনী নয়, ইহার মধ্যে বাংলার দীন-দুঃখীর প্রাত্যহিক পল্লীজীবনের যে নিখুঁত ও করুণ চিত্র বাস্তব অনুভূতি ও সমবেদনায় অঙ্কিত হইয়াছে, এবং তাহা দ্বারা যে সনাতন জীবন সত্য জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে কেবল তাহারই একটি চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য আছে।' ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কনের কোন কৌশলে নাটকের উৎকর্ষ সে প্রশ্ন যেন "নীল-দর্পণে"র উৎকর্ষ বিচারে গৌণ বলিয়া মনে হয়। নাটকখানি একবার পড়িয়া বা দেখিয়া প্রথম মনে হইবে এইখানে দীনবন্ধুর প্রতিভা গভীর সহানুভূতির প্রতিভা। সহানুভূতির ধর্মই প্রকাশিত হওয়া। এই সহানুভূতিতে চিন্তা ও ভাব একত্র হইয়া এক উজ্জ্বল জীবনদৃষ্টিতে পরিণত। একটি জাতি চিন্তায় বড় ভাবে বড় কিন্তু বড় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারিল না, এমন হয় না।

দীনবন্ধুর এই সহানুভূতি সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন: 'সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র।' বঙ্কিমের মতে "নীলদর্পণ" এই তীব্র সহানুভূতির ফল: 'তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগা দুঃখের ন্যায় প্রতীয়-মান হইল কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনী মুখে নিঃসৃত করিতে হইল।' দীনবন্ধু তাঁহার এই নাটকে প্রত্যেকটি চরিত্রকে এমন স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিয়া-ছেন কারণ তিনি তাঁহার এই সহানুভূতির আলোকে প্রত্যেকটি চরিত্রকে স্পষ্ট দেখিয়াছেন।

"নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন দীনবন্ধু ঢাকা বিভাগে ইন্সপেক্টিং পোস্টমাস্টার। [illegible]

... প্রথম ... ইতিহাসে কাহারও ... এমন আলোড়ন হয় নাই। ... আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক নাট্যকার এরিস্টফেনিস্ "বেবিলো-নিয়ান্স্" নামে এক নাটকে এথেন্সের ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং ক্লিয়নের নির্মম সমালোচনা করিয়া বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এরিস্টফেনিসের শাস্তি হইল না। "নীলদর্পণে"র মামলায় পাদ্রী লং দণ্ডিত হইলেন এবং নাটকটির প্রচারে সহায়তা করিবার অপরাধে সীটন-কার সাহেব অপদস্থ হইলেন।

১৮৫৯-এর ১লা মে যখন বাংলার প্রথম ছোট লাট হ্যালিডে অবসর গ্রহণ করিলেন তখন নীল বিদ্রোহ শুরু হইয়া গিয়াছে। এপ্রিল মাসে বারাসতের এক নীলকর অভিযোগ করিলেন যে, নীলচাষী নীল চাষ করিতে চায় না। তিনি আরও অভিযোগ করিলেন যে, ইংরাজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাষীর এই অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দিতেছেন। সরকার ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দোষ বলিলেন।

নভেম্বর মাসে নদীয়ার এক নীলকর সরকারকে জানাইলেন যে, তাঁহার এলাকার প্রজারা ক্রমে উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে এবং অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে সরকার নীল চাষের বিরোধী। অন্যদিকে রায়তেরা নীলকরদের উৎপীড়ন সম্বন্ধে সরকারের কাছে নালিশ করিতেছেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ তখন দুইদলে বিভক্ত। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট ইডেন প্রজাবন্ধু, নীলকরের জুলুম বন্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর নদীয়ার বিভাগীয় কমিশনার গ্রোট নীলকরের বন্ধু, রায়তের ঔদ্ধত্য নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর। ভাল ইংরাজ ও মন্দ ইংরাজের এই দ্বন্দ্বে ভাল ইংরাজ জিতিলেন। নূতন ছোটলাট পিটার গ্রান্ট প্রজার প্রতি সহানুভূতিশীল। দীনবন্ধু যখন "নীলদর্পণ" লিখিতেছেন বা লিখিবার কথা ভাবিতেছেন তখন ছোটলাট ১৮৬০-এর ১১ নম্বর আইন পাশ করিয়া এক ইন্ডিগো কমিশন নিয়োগ করিলেন। অনুমান করিতে পারি গ্রান্টের ন্যায়পরায়ণতায় আস্থাবান হইয়াও দীনবন্ধু এই ১১ নম্বর আইনে বিক্ষুব্ধ হইলে পীড়িত বোধ করিলেন। এই আইনে নীলকর নীল চাষের চুক্তিভঙ্গকারী রায়তের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনিতে পারিত। দীনবন্ধু তাহার ... যে নীলকর ইজারত ... টানিয়া লইয়া যাইতে ... বিচারক সাহেব ... । ...

চার্লস উড যে ১১ নম্বর আইনের [illegible] করিয়া পত্র দিয়াছিলেন তাহা দীনবন্ধু জানিতেন কিনা বলা শক্ত। অক্টোবর মাসে যখন ঐ আইন রহিত হইল তখন "নীল-দর্পণ" প্রকাশিত হইয়াছে। দীনবন্ধু জানিতেন যে এই আইন রহিত হইলেই নীলকরের দৌরাত্ম্য বন্ধ হইবে না। 'নীলদর্পণে'র কাহিনী নীলকরের উৎপীড়নের কাহিনী। এই নাটক প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসে নায়েব এক নীল মামলার পরে বলিলেন : 'নীলকর বেটাদের জুলুমে মুলুক খাক হইয়া গেল।' দীনবন্ধুর নাটক এই নিদারুণ জুলুমের ছবি। গোলক বসু নীলকরের জন্য নীল-চাষ করেন, কিন্তু এবার তাঁহাকে যতখানি জমিতে নীলচাষ করিতে বলা হইয়াছে তত-খানি জমিতে ঐ চাষ করিলে তাঁহার আর বৎসরের ধান হয় না। তাঁহার পুত্র নবীনমাধব নীলকরের অত্যাচার হইতে প্রজাকে রক্ষা করিতে তৎপর এবং সেই কারণে নীল-করের বিরাগভাজন। নবীনমাধবকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নীলকর তাঁহার পিতা গোলোক বসুর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা ফৌজদারী মামলা আনিল। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি রায়তের নীলচাষে বাধা দিয়াছেন। দীনবন্ধু এখানে ১১ নম্বর আইনের কুফল স্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন। গোলোক বসু হাজতবাসের গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন। নবীনমাধব নীলকরের কাছে অপমানিত হইয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন এবং সাহেবের আক্রমণে প্রাণ হারাইলেন। পুত্রের মৃত্যুতে মা উন্মাদ হইলেন এবং উন্মাদ অবস্থায় কনিষ্ঠ পুত্র বিন্দুমাধবের স্ত্রী সরলতার গলায় পা দিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্বিগুণ শোকে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

গোলোক বসুর প্রতিবেশী সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে নীলকর লাঠিয়াল দিয়া ধরিয়া নিলে নবীনমাধব তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। কিন্তু ক্ষেত্রমণি গৃহে ফিরিয়া অন্তর্দাহের মধ্যেই প্রাণ হারাইল। সাহেবের আমিন ও দুঃস্বভাবা পদী ময়রানী ক্ষেত্রমণি হরণের সহায়ক।

"নীলদর্পণে"র মূল কথা যেমন সত্য ইহার কাহিনীও তেমন সত্য। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর "ভারত-সংস্কারক" পত্রিকায় (৭ নভেম্বর ১৮৭৩) এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হয় যে 'নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলীর মিত্র পরিবারের দুর্দশা "নীল-দর্পণের" উপাখ্যানটির [illegible] ক্ষেত্রমণি-হরণের ন্যায় ঘটনাও [illegible]
[illegible]

[illegible] সাহেব অপহরণ করিয়াছিল। পত্রিকায় এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল সাহেবকে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। হার্শেল সাহেব অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে এইরূপ নারী-হরণ সত্যই হইয়াছিল। দীনবন্ধু নীল-করের অত্যাচার বর্ণনা করিতে যাইয়া মিথ্যার আশ্রয় লন নাই।

এই হরমণি-অপহরণের কাহিনী "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় হিলস ঐ পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনিলেন। বিচার শেষ না হইতেই হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হয় (১৪ জুন ১৮৬১)। ঐ জুন মাসেই "নীলদর্পণের" ইংরাজী অনুবাদ ছাপিবার অপরাধে ম্যানুয়েল সাহেব গ্রেপ্তার হন। ১৯শে জুলাই সুপ্রীমকোর্টে ইংরাজী "নীলদর্পণ" প্রকাশ করিবার অপরাধে পাদ্রী লং অভিযুক্ত হন। নাটকের ভূমিকায় দীনবন্ধু নীলকরদের সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদকদ্বয় তোমাদের প্রশংসায় তাহাদের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছে, তাহাতে অপর লোক যেমন বিবেচনা করুক তোমাদের মনে কখনই ত আনন্দ জন্মিতে পারে না যেহেতু তোমরা তাহাদের এরূপ করণের কারণ বিলক্ষণ অবগত আছ। রজতের কি আশ্চর্য আকর্ষণ শক্তি। [illegible] মুদ্রালোভে অবজ্ঞাস্পদ জুডাস, খৃষ্ট ধর্ম-প্রচারক মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টকে করাল পাইলেট করে অর্পণ করিয়াছিল; সম্পাদক যুগল সহস্র মুদ্রালোভ পরবশ হইয়া উপায়হীন দীন প্রজাগণকে তোমাদের করাল কবলে নিক্ষেপ করিলেন।' [illegible] ইংলিশম্যানের সম্পাদক [illegible] এই [illegible] ভিত্তিতে মানহানির মামলা রুজু করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি সমস্ত নীলকর সমাজের উদ্যোগেই 'নীলদর্পণের' প্রকাশককে সমুচিত শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন। মূল নীলদর্পণে দীনবন্ধুর নাম ছিল না। ইংরাজী 'নীলদর্পণে'ও প্রচারক বা অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম ছিল না। পাদ্রী লং লেখক ও অনুবাদকের নাম গোপন রাখিয়া সমস্ত দোষ নিজে লইলেন এবং একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতে উপস্থিত থাকিয়া জরিমানার এক হাজার টাকা দিয়া অতিরিক্ত আর একমাস কারাবাস হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন। এই মামলার এক বৎসরের মধ্যে ম্যাকারথার নামে এক নীলকর স্যার জন পিটার গ্রান্টের নামে এক মানহানির মামলা আনেন। তিনি তখন ছোটলাটের পদ [illegible] বসিয়া সুপ্রীম কোর্টের [illegible] [illegible] বার্নিজ [illegible] [illegible]

সম্পর্কিত। দীনবন্ধু একখানি নাটক লিখিয়া সমস্ত ইংরাজ সমাজে এক অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বস্তুত "নীলদর্পণ" লইয়া সমগ্র বাংলা দেশে যে স্বাদেশিকতার সঞ্চার হইয়াছিল তেমন আনন্দমঠ লইয়াও হয় নাই। আনন্দমঠের বন্দেমাতরম মন্ত্র ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় ২৫ বৎসর পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙালীকে উদ্দীপিত করে। ইহা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশময় এক আলোড়নের সৃষ্টি হয় নাই। ইহার বিষয়বস্তু জানিয়া সরকার চঞ্চল হয় নাই, ইংরাজ বণিক সমাজ অস্বস্তি বোধ করে নাই, গ্রামের চাষী ও শহরের শিক্ষিতজন ইহার মধ্যে বিদেশীর কোন অত্যাচারের অবসানের সম্ভাবনা দেখে নাই। "আনন্দমঠ" "নীলদর্পণ" হইতে মহত্তর সৃষ্টি এবং উহার ভাব বাঙালীকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে "নীলদর্পণ" তেমন করে নাই। কিন্তু "নীলদর্পণ" তবু আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এই গ্রন্থ প্রথম বিদেশীর অত্যাচারের

এক মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকিয়া তাহার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল। বাস্তবিক পক্ষে "নীলদর্পণ" শুধু রাজনৈতিক সাহিত্য নয়, ইহা দীনবন্ধুর এক সার্থক রাজনৈতিক কর্ম। ১৯০৫ সালে যাঁহারা বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া বিলাতি কাপড় পোড়াইতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইত ইঁহারা স্বদেশী করিলেন। দীনবন্ধু এই অর্থে "নীলদর্পণ" লিখিয়া বাংলাদেশে প্রথম স্বদেশী করিয়াছিলেন। লং সাহেব যদি তাঁহাকে আদালতে আসিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিরস্ত না করিতেন তাহা হইলে তিনিই স্বদেশী করিয়া প্রথম জেলে যাইতেন। ইতিহাসের এক বিচিত্র বিধানে বাংলাদেশে ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বদেশী করিয়া যিনি প্রথম জেল খাটিলেন তিনি এক ইংরাজ ধর্মযাজক।

"নীলদর্পণে" দীনবন্ধুর স্বদেশচিন্তার মূল কথা এই যে, দেশসেবার অর্থ দেশের আপামর জনসাধারণের সেবা। যিনি গ্রামের চাষীর দুঃখ বুঝিলেন না তিনি দেশের কথা জানিলেন না। দীনবন্ধুই প্রথম বাঙালীকে দেশের কথা ভাবিতে শিখাইলেন। তিনি প্রথম শহরের শিক্ষিত মানুষকে গ্রামের চাষীর দুঃখ বুঝাইলেন। তিনি প্রথম বিদেশী বণিকের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ রাজপুরুষের নিন্দা করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ-চালিত সংবাদপত্রের হীনমনতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। আবার ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিকের অন্যায় উৎপীড়নের কথা বলিতে যাইয়া তিনিই প্রথম তাহাদের বাঙালী সহায়কদের লোভ ও কাপুরুষতার এক স্পষ্ট চিত্র বাঙালীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন। এই নাটকেই প্রথম বাঙালী দেশসেবক সাহেবের বুকে পদাঘাত করিল। উপেন্দ্রনাথ দাসের "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকে (১৮৭৫) এক বাঙালী ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করিতেছে এই দৃশ্য দেখিয়া পুলিস নাট্যকার ও অভিনেতাদের গ্রেপ্তার করে এবং রঙ্গমঞ্চে অনুরূপ রাজদ্রোহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ড্রামাটিক পারফরমেন্সেস্ কন্ট্রোল অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করেন। "নীলদর্পণ" নাটকে উড সাহেব রাজপুরুষ নয় এবং নবীনমাধবের আক্রমণে তাহার প্রাণান্ত হইল না। কিন্তু ইংরাজের গায়ে হাত তুলিবার সাহস যে এক গ্রামবাসী সাধারণ মানুষের থাকিতে পারে দীনবন্ধু তাহা এই নাটকে বুঝাইলেন।

অবশ্য মোটের উপর "নীলদর্পণ" অত্যাচারের কাহিনী, বিদ্রোহের কাহিনী নয়। "আনন্দমঠ" বাঙালীর পৌরুষের কথা, "নীলদর্পণ" বাঙালীর অসহায়তার কথা। পৌরুষের [illegible] উন্মাদনা আছে। [illegible]

অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাল ইংরাজের নিকট আবেদন। "আনন্দমঠ" বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়াও ইংরাজকে মিত্র রাজা বলিয়া গ্রহণ করিল।

দীনবন্ধুর এই স্বদেশীর সঙ্গে ১৯০৫-এর স্বদেশীর মিল না বুঝিলে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের আসল কথাটি বুঝিব না। ১৯১০ সালে লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকায় স্যার ভ্যালেন্টিন্ চিরল কতগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, স্বদেশী কতগুলি ইংরেজি-পড়া যুবকের হুজুগমাত্র—ইহার সঙ্গে দেশের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। চিরল সাহেব যে এ কথা মিথ্যা জানিয়াও ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের মূল প্রেরণা রাজনৈতিক নয়—অর্থনৈতিক। ঐ আন্দোলনে বাঙালী বলিল বিলাতি কাপড় পরিব না, দেশী কাপড় পরিব। বিলাতি কাপড় পরিলে ইংরাজ পুষ্ট হইবে, আমি অনাহারে মরিব। নীল আন্দোলনে বাঙালী বলিল নীল বুনিব না, ধান বুনিব। নীল বুনিলে ইংরাজ বণিকের টাকা হইবে, আর আমি অনাহারে মরিব। দুই আন্দোলনই ইংরাজ বণিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১৮৬০-এর "নীলদর্পণে"র স্বদেশী আর ১৯০৫-এর স্বদেশীর মধ্যে সংযোগের সূত্র হইল ১৮৭৩-৭৫এ "মুখার্জিস ম্যাগাজিনে" প্রকাশিত ভোলানাথ চন্দ্রের ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি। ভোলানাথ চন্দ্র লিখিলেন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন না করিলে স্বদেশের উন্নতি নাই। দীনবন্ধু নীলকুঠির দৌরাত্ম্য বন্ধ করিতে চাহিলেন, ভোলানাথ ম্যানচেস্টারের দৌরাত্ম্য বন্ধ করিতে চাহিলেন। দীনবন্ধু বলিলেন, লোভী নীলকর ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা পায়, ভোলানাথ বলিলেন, ম্যান্‌চেস্টারের লোভী বস্ত্র ব্যবসায়ী ইংরাজ সরকারের শুল্কনীতির সহায়তা পায়। ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনের মূল কথাও এই। যে আন্দোলনের আদিপর্বে "নীলদর্পণে" লেখা হইল সে আন্দোলন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের বিলাসমাত্র ইহা বোধহয় চিরল সাহেব ছাড়া আর কেহ বলেন নাই। ১৮৬০ হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাঙালীর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বই পড়া রাজনীতির গন্ধ নাই। বিদেশীর লেখা বই দেখিয়া স্বদেশের উন্নতি বিধান করা এ কালের ফ্যাশান। পেন, বার্ক, মিল পড়িয়া গত যুগের বাঙালী কিছু লেখে নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু সেকালের স্বদেশীর মূলে স্বদেশ। স্বদেশটা যে বিদেশ নয় একথা সে যুগে একটি বাঙালীকেও বুঝাইতে হয় নাই।

"নীলদর্পণে"র অভিনয়ের ইতিহাসে ইহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন দেখিতে পাই। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুকে 'রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। অবশ্য যে নাটক লইয়া রঙ্গনাট্যশালার উদ্বোধন তাহা 'নীলদর্পণ" নয় 'সধবার একাদশী।" কিন্তু বাগবাজার এমেচার থিয়েটার নেশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করিয়া 'নীলদর্পণ" নাটক অভিনীত হয় (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২)। তখন হিন্দু মেলার যুগ হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ" ও "ভারত সংগীত" এডুকেশন গেজেটে ছাপা হইয়াছে (১৮৭০) এবং বাঙালীর স্বাদেশিকতার মধ্যে কিঞ্চিৎ রৌদ্র-রসের আবির্ভাব হইয়াছে। অভিনয় সম্বন্ধে অমৃতলাল বলেন : 'লোকের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। প্রত্যেক এক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'কে নিজের মনের মত করিয়া স্টেজের উপর গাড়িয়া তুলিল। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী উড সাহেবের ভূমিকায় এবং অমৃতলাল বসু সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন। কিন্তু দীনবন্ধু নাকি এই অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। বোধহয় গিরিশচন্দ্র এই অভিনয়ের মধ্যে ছিলেন না সম্ভবত তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেন নাই। ১৮৭৩-এর ২৯শে মার্চ গিরিশচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে "নীলদর্পণ" কলিকাতা টাউন হলে অভিনীত হয়। অভিনয় কালে যখন তোরাপ রোগ সাহেবকে আক্রমণ করে দর্শকদিগের মধ্য হইতে দীনদয়াল বসু লাফ দিয়া স্টেজে উঠিয়া সাহেবকে প্রহার করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। বাংলা রঙ্গমঞ্চে জাতিবৈরের এই সূত্রপাত। স্বদেশী যুগে ১৯০৮ সালে স্টার, মিনার্ভা ও কোহিনুর থিয়েটারে একই সময় "নীলদর্পণ" অভিনীত হয়। ইহার কিছু পরেই বাংলা সরকার এই নাটক রাজদ্রোহমূলক বলিয়া ইহার অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৬০ সালে যে নাটক কেবল এক ইংরাজ সম্পাদকের পক্ষে মানহানিকর ছিল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা ইংরাজ সরকারের পক্ষে [illegible] বলিয়া বিবেচিত হইল। [illegible]

[illegible] কিন্তু পরাধীনতার [illegible] সুন্দরের সাধক কবির ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন। মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে দেশকে তাঁরা অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সৌখিন চারণের শিঙা বজ্রনির্ঘোষে বেজে ওঠে।

হেমচন্দ্র প্রধানত চারণ-কবি। এই চারণ-গীতির মর্মমূলে রয়েছে ঐতিহ্য-চেতনা। এই অতীত-চারণায় স্পষ্টতঃ প্রাচীন ভারতের তিনটি গৌরবের প্রতি অঙ্গুলি-সংকেত করা হয়েছে—ভারতের অতুলনীয় অতীত ঐশ্বর্য, জ্ঞান-গরিমা ও শৌর্য। ঐশ্বর্যে অতীত ভারত ছিল 'দেবেন্দ্র ভবন', 'রত্নগর্ভা ভূমি'—জ্ঞানের নৈপুণ্যে ভারতের 'জয় কেতু মহাতেজে উড়িত' :

অমর বাল্মীকি ঋষি সুমধুর স্বরে।
রাখিয়াছে তব যশ ত্রিভুবন ভরে॥
বেদব্যাস মহাঋষি ভারত রচিয়া।
প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া॥
সরস্বতী বরপুত্র কবি কালিদাস।
তব যশ রঘুবংশ করিলা প্রকাশ।
ভবভূতি তব নাম অনাদ্য অক্ষরে।
গাঁথিয়া থুইয়া গেছে মানব অন্তরে॥

[বীরবাহু কাব্য]

কবিকে সর্বাপেক্ষা অনুপ্রেরিত করেছে প্রাচীন ভারতের শৌর্য মহিমা। বলবীর্য পরাক্রমে, দোর্দণ্ড প্রতাপে সাহস ঐশ্বর্যে প্রাচীন ভারত ছিল 'জ্বলন্ত অনল সদৃশ'। বীরের জাতি ভারতবাসী ক্ষাত্রশক্তির মূর্ত প্রতীক। দুর্বলতা ও ভীরুতাকে এদেশ কখনও প্রশ্রয় দেয়নি, যুদ্ধে কখনও পরাঙ্মুখ হয়নি, শত্রুভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি। সুযোগ উপস্থিত হলেই এদেশে এক সঙ্গে সহস্র দামামা বেজে উঠেছে, লহমায় মুক্ত কৃপাণ ঝলক দিয়ে উঠেছে, কোটি সৈন্যের বীরদাপে প্রকাণ্ড মাটি কম্পিত হয়েছে। হিন্দুর হাঁক 'হর হর' শব্দে সে এক মহাভয়াল কাণ্ড :

সমর হুঙ্কারে কাঁপিত অচল
নক্ষত্র অর্ণব আকাশ মণ্ডল।

[ভারত ভিক্ষা]

অতীত ভারতের এই শৌর্য-দীপ্ত চিত্র হেমচন্দ্রের হৃদয়ে অশেষ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে এবং রচনায় রুদ্র কঠোরতা, প্রচণ্ড উত্তাপ ও উৎসাহ বিস্তার করেছে। কবির রচনার একটি মহৎ অংশ বীরত্বের মহিমা কীর্তন, স্থায়ীভাবে উৎসাহ। হেমচন্দ্র 'বীর ধর্মে' জাতিকে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেছেন, প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়েছেন 'প্রাচীন ভারতের ক্ষাত্রশক্তির গৌরব কাহিনী' : 'বীর্য যার ধরা তার বিধির নির্ণয়'।

এই দিক থেকে হেমচন্দ্র শক্তি-মন্ত্রী; তাঁর অন্তরে মন্ত্রদীক্ষা, কণ্ঠে বীর্যের গান। শক্তি-সম্পাতে বীরাচারী সাধকের ন্যায় তাঁর হৃদয় শক্তি-স্পন্দনে নিরন্তর স্পন্দিত ও উদ্দীপনায় [illegible]।

[illegible]

[illegible] 'মা নিষাদ' শ্লোক [illegible]—সেখানে শক্তির ভূমিকা কি? [illegible] এই যে, ভারতবর্ষ চিরকাল অহিংসা, প্রেম, ক্ষমা ও দয়াকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে এসেছে, ভারতবর্ষের মূলনীতি ও প্রাণ-শক্তি অদ্রোহ। কিন্তু ভারতবর্ষ এও জানে, আসুর শক্তির আঘাতে যে-কোন মুহূর্তে নীতি বিপন্ন হতে পারে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞে চিরকাল বাধা সৃষ্টি করে এসেছে অসুর। তাই যজ্ঞরক্ষার জন্য ভারতবর্ষ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্রশক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছে। ক্ষাত্রশক্তি দৈত্যশক্তির সংহারক, যজ্ঞের ধারক, নীতির পরিপোষক; ভারতের নীতি ক্ষাত্রশক্তির রক্ষাকবচে রক্ষিত। এই দুয়ের মিলনেই ভারতীয় জীবনের পূর্ণতা। হেমচন্দ্রের শৌর্য-এষণা এই পরিপূর্ণতাকেই প্রার্থনা করেছে। কবি বুঝেছিলেন, মন্ত্রশক্তি দেবত্বকে জাগ্রত করে, ক্ষাত্রশক্তি সেই মন্ত্রশক্তিকে বর্বরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। জপ, তপ, যোগ, আরাধনার শক্তিকে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু হিংস্রতা ও লোভ যেখানে উত্তাল, সেখানে তপঃশক্তির চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি, ক্ষাত্রতেজ ও অস্ত্রদীক্ষা। বজ্রনির্ঘোষে তাই কবি বলেন,

এখন সেদিন না হক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গরসে হওরে উন্মদ,
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ
জগতে যদ্যপি বাঁচিতে চাও।

[ভারত সংগীত]

প্রাচীন ভারতের গৌরব কীর্তন যেমন চারণ কবির রচনাবলীর একদিক, তেমনই আর একদিক—দেশের অধঃপতন ও দৈন্য-দুর্দশার জন্য সুগভীর মর্মন্তুদ আক্ষেপ। ঐতিহ্য-উজ্জ্বল ভারতের অবীর্যে ও অধঃপতনে কবি হৃদয় ছিন্নতন্ত্রী বীণার মত আর্তনাদ করে উঠেছে। ধিক্কারে ও আত্ম সমালোচনায় অধীর কবি জাতির প্রতি কঠিন অপভাষ প্রয়োগ করেছেন:

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি।
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি
আর কি ভারত সজীব আছে!

[ভারত-সংগীত]

এমনকি বর্তমানের পতন লক্ষ্য করে [illegible] 'কুলাঙ্গার' 'পিশাচ' বলতেও [illegible] হননি:

[illegible]
[illegible]

করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের ভারত-নিন্দা স্বদেশ প্রেমেরই আর একদিক। এ তিরস্কার প্রকৃতপক্ষে জাতির নিন্দা নয়, আত্মধিক্কার জাগিয়ে জাতিকে স্বগৌরব সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়াস। মানুষ যাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে, তার সামান্য স্খলনও অসহনীয় মনে হয়। প্রেমপাত্রের দৈন্য ও গ্লানি প্রেমিকের নিজেরই দৈন্য ও গ্লানি। তাই ধিক্কার-বাক্য হয় কঠিন। মৌখিক সৌজন্য প্রকাশের প্রশ্নও সেখানে ওঠে না। কবি ভারতবর্ষকে একান্ত করে ভালবেসেছেন বলেই ভারতের পতন তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করেছে এবং তিরস্কার মৌখিক মধুর বাচনের সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। গভীর প্রেমের এই এক চিহ্ন।

এ শুধু তিরস্কার নয় রক্তাক্ত হৃদয়ের ক্রন্দন বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের আক্ষেপঃ

১। আজি এ ভারতে কেন হাহাধ্বনি!
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী!
[পদ্মের মৃণাল]

২। হায় বসুন্ধরে তোমার কপালে
এই কি ছিল মা পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে ...
পুরাতে নারিল মনের আশা।
[ভারত বিলাপ]

এ সকল স্থলে শোকাপহত হৃদয়ের ক্রন্দন অতি গভীর। নৈরাশ্য বিক্ষোভ, অন্তর্জ্বালা সবকিছু মিলে একটি সকরুণ ঐকতান সৃষ্টি করেছে। এ যেন প্রিয় বিরহে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মাথা কোটা, চুল ছেঁড়া, বক্ষে করাঘাত করা। শোকের এই বহিঃপ্রকাশ আধুনিক রুচিবোধে বিগর্হিত মনে হতে পারে। কিন্তু বাঙালী শোক প্রকাশে চিরকাল এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে এসেছে। প্রিয়-বিচ্ছেদে শোকার্ত বাঙালীর হাহাকার ক্রন্দনের দৃশ্য যে চোখে দেখেনি, তার পক্ষে এর মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব নয়। হেমচন্দ্রের অনুভূতি অতি গভীর, প্রকাশের আবেগও তাই প্রাণোচ্ছল ও মর্মস্পর্শী। লোক-হৃদয়ে ঘা দিয়ে জাগ্রত করাই ছিল তার রচনার লক্ষ্য। একটি কবিতায় তিনি বলছেন:

গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত
নিদ্রাগত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও;
রহস্য রোদন কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।
[বৃদ্ধ শ্বরে]

'রহস্য, রোদন কিম্বা উৎসাহই' হেম-রচনার মূল উপকরণ। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে 'শিক্ষিত বাঙালীর কবি' বলেছেন; তাঁর মতে, গুপ্ত কবি খাঁটি বাঙালী, গুপ্ত কবির পরে আর খাঁটি বাঙালী কবির আবির্ভাব হয়নি। উক্তিটি অর্ধ সত্য। শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি হলেও অনুভূতির তীব্রতায়, [illegible] দুঃখ-শোক-দুঃখ-বিক্ষোভের [illegible]

স্টাইনেল-পোপের শিষ্য। স্টাইনেলের পৌরুষ-দৃপ্ত শ্লেষ কিংবা পোপের উগ্র শ্লেষ হেমচন্দ্রে ছিল না। গুপ্ত কবির শ্লেষের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা হেমচন্দ্রে না থাকলেও বিদ্রূপ সৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বর গুপ্তেরই উত্তর সূরী অর্থাৎ খাঁটি বাঙালী। বাঙালীর হাস্য-কৌতুকে একটা স্বকীয়তা আছে : সে স্বকীয়তা আবেগের উচ্ছলতায়, ভাবের অকৃত্রিমতায় ও খানিকটা স্থূলতায়। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ও 'রসের ভূক' রচনায় বাঙালী জাতিসুলভ সেই স্বকীয়তা রক্ষিত হয়েছে। এই বিদ্রূপাত্মক 'বিবিধ কবিতা'র ভিতর হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ অন্য খাতে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বলেছি, দেশপ্রেমিক কবির ভূমিকা সমালোচকেরও বটে। যখন ফাঁকি ও মেকির শূন্যগর্ভ আস্ফালন প্রবল হয়ে ওঠে, উপকারের নামে স্বার্থসিদ্ধির ছলনা প্রকট হয়—তখন কবির লেখনীতে সমালোচনা তীব্র হয়ে ওঠে। এই সমালোচনা ঋজুপথে অগ্রসর না হয়ে বাঁকা পথে চলে, তির্যক কটাক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রধূমিত হয়।

এতে হাস্যের অন্তরালে থাকে জ্বালা, বক্তব্যের অন্তরালে থাকে আক্রমণ ও আঘাত, রসালো উক্তিতে প্রচ্ছন্ন থাকে রদ-দংশন। গ্রাম বাংলার ভাষায় একে বলা হয় "রগড়"। "রগড়" কথাটির অর্থ "মজা" ও মাজা (-ঘষা) দুইই; অর্থাৎ এতে একই সঙ্গে থাকে মধু ও হুল। হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের প্রকাশে এই রগড়ের ভূমিকা সামান্য নয়। ফাঁকা ও ফাঁকির ধাপ্পা বোঝাতে গিয়ে কবে রসের রাশ হাতে নিয়েছেন। বিদেশীর অহমিকা ও আত্মম্ভরিতায়, স্বার্থের কূটজাল বিস্তারে ভালমানুষীর মুখোশ ধারণে—কিংবা দেশীয় লোকের স্তাবকতায় স্বার্থান্বেষণায় কবি যে মর্মজ্বালা অনুভব করেছেন, তারই প্রকাশ ঘটেছে কবির রগড়ে কবিতায়।

এই কবিতাগুলো সমসাময়িক ঘটনাবলীকে ভিত্তি করে লেখা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আগমন করেন। হেমচন্দ্র এই উপলক্ষে "ভারত ভিক্ষা" রচনা করেন। "ভারত ভিক্ষা" অবশ্য রগড় নয়। এটা রাজ-তোষণ বা স্তাবকতাও নয়, আত্ম-মর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত স্বদেশপ্রেমিকের গর্ব, হতাশা ও প্রার্থনা। বিশ্বজয়ী ব্রিটিশের "রুল বৃট্যানিয়া রুল দি ওয়েভস্" সঙ্গীত শ্রবণে কবিপ্রাণ নিজের অতীত গৌরবকে স্মরণ করে উদ্দীপ্ত হয়েছে :

> ভারতের বেদ ভারতের কথা
> ভারতের বিধি ভারতের প্রথা
> খণ্ডিত সকলে পূজিত সকলে
> ফিনিক সিরীয় যুনানী মণ্ডলে
> ভরিত অমূল্য মণিক যথা।
>
> [ভারত ভিক্ষা]

কিন্তু পরমুহূর্তেই বিষাদ—নিবিড় দেউটি" "দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী", আজ তারা আনত হতে চলেছে নূতন দেবতার পদতলে। কবির আহ্বানে ক্ষোভের ব্যঞ্জনা :

> ভারত নক্ষত্র পরিয়া গলায়
> রাজধানী মুখে ধাবিত হও।

কিন্তু ভারত আজ পরাধীন হলেও কবি বৃটিশকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর", "এ জাতি কখন জঘন্য নহে।" "ভারত ভিক্ষা" দুর্বল ভিখারীর ভিক্ষা নয়, এ ভিক্ষা অশ্রুতে অনুতাপে মিশানো গৌরবদৃপ্ত ভিক্ষুর ভিক্ষা। এ ভিক্ষায় "অরমহং ভোঃ"—এই দৃপ্ত ঘোষণা। "ভারত ভিক্ষায়" জ্বালা আছে, আঘাত নেই। বিদ্রূপও নেই।

কিন্তু যুবরাজের আগমন উপলক্ষে হেমচন্দ্র রচনা করেছেন "বাজিমাৎ"। মর্যাদাক্ষুণ্ণ কবি সেখানে নিজ মনোভাব প্রকাশ করেছেন মারাত্মক বিদ্রূপে। ভবানীপুরের সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় বাসভবনে হিন্দু পুরমহিলাদের দিয়ে যুব-রাজকে অভ্যর্থনা জানান। জাতের স্বার্থ-[illegible] এই হীন প্রয়াসে কবি বিদ্রূপ [illegible]

... কবি বলেন,

> খেতে থাকো মুখুয্যের পো, খেতো ভালো চোটে।
> তোমার খেলায় বাং হলো হরী
> গোবরে শালুক ফোটে॥......
> ধন্য হে মুখুয্যে অয়া বলিহারি যাই।
> বড় সাপটা দরে সাং করিলে
> খেতাব সি, এস আই॥ [বাজিমাৎ]

"সাবাস হুজুক আজব শহরে"— এমনি আর একটি হুজুগ। স্যার রিচার্ড টেম্পল তখন ছিলেন বঙ্গের ছোটলাট। তিনি কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে প্রতিনিধি-নিয়ন্ত্রিত কর্পোরেশনে পরিণত করতে চেষ্টা করেন. ... সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু সরকারী এই নীতি যে নিজেদের শাসন কায়েম করারই একটা চেষ্টা কবির তা অজানা ছিল না। ভোট যে "হুজুং" একথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন :

> ছেলাম টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
> ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে
> মিউনিসিপাল বিলে॥

এ সম্পর্কে কবির শেষ কথা, 'মিউনিসিপেল মঞ্চ দেখে আক্কেল গুড়ুম।'

"ইলবার্ট বিল"-এর প্রতিক্রিয়ায় কবির "নেতার ... সিভিলিয়ানগণ বিচার ... হলেও ইউরোপীয়দের ... দণ্ডবিধানে তাঁদের অধিকার ছিল না। লর্ড রিপন তৎকালীন আইন-সচিব স্যার কোর্টনি ইলবার্টকে দিয়ে এ বিষয়ে একটি সংশোধনী খসড়া প্রস্তুত করিয়ে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করান। এতে ইউরোপীয় সমাজ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। সাধারণ শিষ্টাচার ভুলে তাঁরা লর্ড রিপনকে অপমান করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এই সকল ব্যাপার নিয়ে হেমচন্দ্র যে ব্যঙ্গ করেছেন, তাতে দেশ প্রেমিক কবির অন্তরের জ্বালার প্রকাশ অতি স্পষ্ট। দেশীয় লোককে যত মর্যাদাই দেওয়া হোক, ইংলিশম্যান যে "নেটিবের" কাছে নত হতে পারেন না, সে কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে :

> গেল রাজ্য গেল মান ডাকিল ইংলিশম্যান
> ডাক ছাড়ে বানসন কেশুরিক, মিলার—
> নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার-নেভার।"
> [নেভার নেভার]

'হায় কি হলো ?' কবিতায় বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই ব্যঙ্গে বিক্ষোভ আক্ষেপ বিদ্রূপ সব ভাব এক সঙ্গে প্রকট হয়েছে। লর্ড রিপনের বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা ব্যর্থ, কারণ,

> সফেদ কালো মিশ খাবেনা
> সমান হওয়া পারে,
> নাচের পুতুল হয় কি মানুষ
> হুকো উঁচু করে ?

আবার জাতীয় অধঃপতনের জন্য গভীর খেদ :

> পরের অধীন দাসের জাতি
> 'নেশন' আবার তারা।
> তাদের আবার 'এজিটেশন'—
> নুন উঁচু করা !
> [হায় কি হলো ?]

এই প্রসঙ্গে কবি এদেশের একটি চিরন্তন ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। এদেশের রাজনৈতিক চেতনায় যতটা না দেশ প্রেমের আকৃতি, তার চেয়ে অনেক বেশি 'পার্টি পলিটিক্সের'। কবি বলেন,

> হায় কি হলো—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে
> পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত রাজ্য পরে।

হেমচন্দ্রের বিদ্রূপাত্মক রচনাবলী সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও কতকগুলি দিক থেকে তাদের চিরকালীন আবেদন অস্বীকার করা যায় না। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, মুখোশধারী ... মানুষ, খোশামুদে, ... দুর্নীতি, ...

হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধমূলক রচনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে জাগে, উনিশ শতকের শেষার্ধে দেশব্যাপী জাগরণের যুগে কবির বিশিষ্ট দান কি? দেশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য-স্মরণে নতুনত্ব ছিল না। রঙ্গলাল থেকেই কাব্যে তার প্রকাশ দেখা গেছে। হেমচন্দ্রের প্রকৃতির সুর বেজেছে চৈত্র মেলার অপূর্ব সঙ্গীতে। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনাতেও কবিকে মৌলিক বলা চলে না; ঈশ্বর গুপ্তের রগড় অনেক বেশি তীব্র ও বলিষ্ঠ।

দেশ প্রেমের এই খতিয়ান কষতে গিয়ে স্বভাবতই কবির 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কথা মনে পড়ে। মহাকাব্যের লক্ষণ বৃত্রসংহারে কতখানি আছে, তার বিচার করবেন কাব্য-বিচারকগণ; কিন্তু বৃত্রসংহার যে স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশপ্রেমের স্বাদে পূর্ণ—একথা কেউ অস্বীকার করবেন না। বৃত্রসংহারের মূল প্রতিপাদ্য বিজেতা, শক্তিমত্ত, অতি স্পর্ধিত ভোগপ্রমত্ত দৈত্যের কবল থেকে হৃত স্বর্গরাজ্যের উদ্ধার। ঊনবিংশ শতকের পর-পদানত, হৃত গৌরব ভারত সেই স্বর্গরাজ্যের প্রতীক, ক্ষুব্ধ পরাজিত দেবতা—হৃতমান ভারতবাসী। পরাধীন ভারতবাসীর অন্তরে স্বদেশের উদ্ধার মানসে যে বিক্ষোভ জ্বালা ও যন্ত্রণা তারই প্রকাশ দেখা যায় কাব্যের সূচনায়—পাতালগহ্বরে পরাজিত দেবগণের মন্ত্রণায়। স্বদেশের উদ্ধার কল্পনায় যে বিভিন্ন মত ও পথের চিন্তা দেশবাসীর হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল কাব্যের সূচনায় তারও আভাস রয়েছে। [illegible] সে দুর্দিন [illegible] [illegible] অন্ধকার [illegible] মধ্যে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অগ্নিশিখা।' এ [illegible] দেশের, [illegible] মোচনের চিন্তা কেবল পুরুষের চিত্তকে অধিকার করেনি, নারীসমাজও মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, 'পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই':

> স্বদেশ স্বাধীন চিত্ত স্বাধীন প্রকাশ
> স্বাধীন বিলাস চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস
> স্বর্গ গৃহেতে বাস পরবশ আর
> দুই তুল্য জীবিতের দুই তিরস্কার।
> ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি [illegible]
> যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ।
>
> [বৃত্রসংহার—৫ম সর্গ]

এই পারবশ্যের গ্লানি-মোচনের উপায় কি? দেবগণের মন্ত্রণায় বিচিত্র উপায়ের কথা বলা হয়েছে। দেবসেনাপতি স্কন্দ অনলমূর্তি দেব বৈশ্বানর, প্রখরতেজা দেব দেব ভাস্কর—সকলের মুখেই যুদ্ধের অনলগর্ভ বাণী, বীর্য প্রকাশের প্রয়াস। কবি নিজেও শক্তি-মন্ত্রে বিশ্বাসী। বীর্য-প্রকাশ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তা কবির মনেও জেগেছে [দ্রষ্টব্য ভারত-সঙ্গীত]। কিন্তু ব্যর্থ বীর্যের প্রকাশ, যদি সে বীর্য ত্যাগশুদ্ধ না হয়। কবিবর হেমচন্দ্র এই আদর্শ তুলে ধরেছেন সমগ্র বৃত্রসংহার কাব্যে। শুধু তাই [illegible] [illegible] দিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক [illegible] [illegible] নিদর্শন

আত্মদান। বাক্যের আড়ম্বর নয়, বাহুবাস্ফোটের আস্ফালন নয়, দেশোদ্ধারে প্রয়োজন,—খাঁটি প্রেমিকের রক্ত, ত্যাগীর অস্থি। পুরাণের দধীচি সেই প্রেমিক, সেই হিতব্রতী, সেই ত্যাগীর জ্বলন্ত আদর্শ। সুরকন্যাগণ একবাক্যে এই দধীচির প্রশংসা করে বলেছিলেন:

> জীব উপকারে জীব জগতে [illegible]।
> রত পর-উপকার, স্বার্থ-পরিশূন্য,
> কল্পনা, কামনা, চিন্তা পরের [illegible],
> কিবা কীটে, কি পতঙ্গে সদা দয়াশীল
> মুনীন্দ্র কৃপার সিন্ধু—বীর-চূড়ামণি
>
> [বৃত্রসংহার—১৩ সর্গ]

দধীচি সত্যই জীব-চূড়ামণি। দেবকার্যে জীবন উৎসর্গ করতে হবে জেনে বিষণ্ণ,

শোকার্ত শিষ্যদের কাছে তিনি নিজ মুখে বলেছিলেন :

> হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী
> জগত কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
> নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম পালনে
> নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।
> [ঐ—১৩ সর্গ]

দধীচি এই হিতব্রত পালন করেছেন 'দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।' দেশহিতব্রতে এই ত্যাগীর প্রয়োজন ছিল—আর সে প্রয়োজনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কবি হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র এখানে শুধু স্বদেশ প্রেমিক নন, তিনি দ্রষ্টা। তপঃসুপ্ত স্থিতধী বীরের পূতাস্থি দ্বারা যে অমোঘ অস্ত্র নির্মিত হবে—

> অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়
> সর্বত্র সকল কাজে সর্বসংহারক।
> [ঐ—১০ সর্গ]

—এই গূঢ় সত্য তিনি মর্মতলে অনুভব করেছিলেন। এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন 'আনন্দমঠে'র 'সন্তানদল'। এই আদর্শে স্বদেশপ্রেমের হোমানলে আত্মাহুতি দিয়েছেন এই দেশের দামাল ছেলের দল—ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন, গান্ধীবুড়ী। হাজার বীরের আত্মদানে, সহস্র দধীচির পূতাস্থি ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। তাঁরা আত্মদান করেছেন, আমরা জীবন পেয়েছি—তাঁরা কণ্টকে রক্তক্ষত হয়েছেন আমরা ফুল হয়ে ফুটেছি, তাঁরা অস্থি দিয়েছেন আমরা স্বাধীন হয়েছি। দেশহিতব্রতে এই আত্মদানের প্রয়োজন প্রথম অনুভব করেছিলেন হেমচন্দ্র। বৃত্রসংহার কাব্যের দধীচি পুরাণ সত্যের নবীন আলেখ্য দধীচির প্রয়োজন যুগে যুগে কি স্বাধীনতা লাভে কি স্বাধীনতা রক্ষণে কি হিংস্র দানব শক্তির প্রতিরোধে।

আর একটি দিক থেকে কবির হেমচন্দ্রের দেশ আরাধনার প্রসঙ্গ স্মরণীয়। স্বদেশপ্রেম হেমচন্দ্রে একটা ক্ষণিক বিক্ষোভ মাত্র নয় এ তাঁর অন্তর্নিহিত একটি উপলব্ধির প্রকাশ। জন্মভূমি তাঁর কাছে জগতের সার। এই জন্মভূমির একটি সর্বগ্লানিমুক্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর মূর্তিও তিনি কল্পনা করেছেন। দেশকে শুধু স্বাধীন করা নয় দেশকে তিনি দেখতে চেয়েছেন 'সর্বসুখসম্পন্ন' রূপে। প্রাচীন ভারতের মহিমময় চিত্রাঙ্কনে সেই আশার রঙ প্রতিফলিত হয়েছে। 'আশাকানন' সাঙ্গরূপক কাব্যেও এই ভবিষ্যৎ স্বপ্নাশার রূপায়ণ রয়েছে :

> ভারত জননী যেন পুনর্বার
> বসিয়াছে সিংহাসনে,
> ফুটিয়াছে যেন তেমতি আবার
> পূর্ব তেজ হাস্যাননে,
> যেন তাহারে নব আর্যজাতি
> কিরীট কুণ্ডল তুলি,
> পরাইছে পুনঃ ভূষণ উজ্জ্বল
> ঝাড়িয়া কলঙ্ক ধূলি।

স্বদেশজননীর সর্বসুখকর ভুবন-মোহিনী মূর্তির সর্বোৎকৃষ্ট রূপ কবি দেখেছেন পরমা প্রকৃতির সর্বশেষ রূপ 'মহালক্ষ্মী' মূর্তির ভিতর। 'দশ মহাবিদ্যা' কাব্যে কবি সেই আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। মহাশক্তির ক্রমোন্নত দশটি বিন্যাস রূপ, কবির দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের দশটি স্তর। পরিপূর্ণতার সর্বশেষ স্তর 'মহালক্ষ্মী'; এই স্তরে জননী 'সুমোহিনী', 'তুষ্টিদের জীবন :

> পদ্মাসনা করে পদ্ম
> সতী সর্ব সুখসদ্ম
> দয়াতে ভুবনে ভর
> জীবনদুঃখ হরিছে।

দেশজননীর এই রূপটিই কবির সাধের স্বপ্নমূর্তি। এই মূর্তিতে কবি দেশকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেবীর দশভুজা রূপের মধ্যে দেশের সার্থকতম প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির রবীন্দ্রনাথ এই ভারত স্বর্গের কল্পনা করেছিলেন। হেমচন্দ্রও সেই সাধের কল্পনা করেছেন। প্রেম প্রীতির অন্তরের সামগ্রী [illegible] একটি সর্বগ্লানিমুক্ত [illegible] প্রতিষ্ঠিত দেখতে [illegible] ছিল দেশকে সর্বসুখসম্পন্ন রূপে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এ [illegible]

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক রচনার আবেদন কম হয়ে যায়নি। হেমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় [illegible] বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন 'নদীগর্ভে প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিবে। প্রতিভাশালী লোকের ঝঙ্কার বেদনার উপর তরঙ্গ তুলিয়া তাহিকে উদ্বোধিত করে।' হেমচন্দ্রের মরকণ্ঠ নীরব হলেও তাঁর 'সহসা রোদন কিম্বা উৎসাহের ঝঙ্কার চিরকাল প্রেরণা সঞ্চার করবে। কালের বুকে সুদিন ও দুর্দিন চক্রের মত আবর্তনশীল। সুদিনে হেমচন্দ্রের বাণী প্রেরণা দেবে ভারতকে 'সর্বসুখসম্পন্নরূপে' গঠন করতে, আর দুর্দিনে কবির আক্ষেপ 'ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?' জাতিকে জাগ্রত করবে মানের গৌরবে।' 'বিশ্বকর্মার শিল্পশালা' আজও ভারতে গঠিত হয়নি, যার দানবশক্তির প্রতিরোধকল্পে অপেক্ষায় দধীচির আত্মদানের [illegible]

জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়েছে। আমরা জানলাম, জাতি হিসাবে আমরা প্রাচীন এবং চিন্তার-কর্মে আমরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি-সমূহের অন্যতম। এরই সঙ্গে জানতে পারা গেল, এই প্রাচীন জাতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। রাজপুতদের ইতিবৃত্ত আবিষ্কৃত হল, তাঁদের বীরত্ব-কাহিনী আমাদের রক্তের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করল।

এরই প্রত্যক্ষ ফল জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ-চেতনা। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য-গরিমাই দেশকে দেশবাসীর কাছে বরণীয় করে তুলল। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর যুগের প্রায় প্রত্যেকেরই জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ-চেতনার মূলে আছে ঐতিহ্য-সচেতনতা। ঐতিহ্য-চেতনা থেকেই দেশের ইতিহাস-জিজ্ঞাসারও সূত্রপাত। এই যুগের শিক্ষিত লোকের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা কি রকম প্রখর ছিল, তা কারও অজানা নয়। এই ইতিহাস-জিজ্ঞাসা স্বদেশ-চেতনা-প্রসূত বলে মনে করি।

২

স্বদেশ-চেতনা আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্বের পর থেকে দানা বাঁধতে শুরু করেছে বলে বাংলা ভাষায় স্বদেশ-চেতনা কথাটি আমরা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। স্বদেশ-চেতনা অর্থে আমরা বুঝি দেশ বন্দনা অথবা স্বাধীনতার মহিমা কীর্তন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এই স্বদেশ-চেতনা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা লক্ষ্য করতে গিয়ে আমরা এমন সব রচনা স্মরণ করি, যা আবেগধর্মী এবং যে-রচনার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মহিমা জ্ঞাপন। এইসব রচনা অবশ্যই স্বদেশ-চেতনাপ্রসূত। তবে স্বদেশ-চেতনা কথাটি ব্যাপকতর। স্বদেশ-চেতনার ব্যাপক অর্থ দেশের মঙ্গল কামনা, দেশের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতূহল। এক কথায়, দেশ সম্পর্কে উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা ও উপেক্ষার পরিবর্তে ঔৎসুক্য এবং প্রীতি। দেশের রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এই ব্যাপক দেশ-চেতনার একটি দিক মাত্র, সব দিক নয়। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই যদি স্বদেশ-চেতনার একমাত্র লক্ষণ হয়, তা হলে যে দেশ পরাধীন নয়, সে দেশবাসীর স্বদেশ-চেতনা প্রকাশের অবকাশ কি? ভারত-বর্ষের পরাধীনতাকে অবলম্বন করে ভারতবাসীর স্বদেশ-চেতনার স্ফুরণ হয়েছিল। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন; তাই বলে কি বর্তমান ভারতবাসী স্বদেশ-চেতনা-রহিত? একথা ঠিক, [illegible]

[illegible]

ফেলেছি যে, কথাটি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিশব্দরূপে চালু হয়ে গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-চেতনাকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। 'আনন্দমঠ' একশ্রেণীর দেশব্রতীকে স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত আবেগ-প্রধান বটে, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা এবং আবেগধর্মী ভাষায় বাংলা দেশের শ্রী-সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশ-চেতনার একমাত্র পরিচয় নয়। দেশের ব্যাপক মঙ্গল সাধনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বঙ্কিমচন্দ্র দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এত গভীরভাবে, স্পষ্টভাবে এবং ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছিলেন, যা তাঁর যুগের অথবা পরযুগের খুব কম লোকই করেছেন। সর্বোপরি দেশবাসীর কাছে দেশহিতব্রতের আদর্শ এবং সাধারণভাবে একটা উন্নত সমুজ্জ্বল জীবনাদর্শ তিনি দাঁড় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই যুগের বাঙালীর একটা স্পষ্ট জীবনাদর্শের বড় প্রয়োজন ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম কথার আতস-বাজী নয়, যুক্তিহীন আবেগের প্রলাপ নয়, তাঁর দেশপ্রেম একটা গভীর জীবন-দর্শন থেকে উৎসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম দেশপ্রীতিকে মানব-জীবনের বৃহত্তর কর্মপরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশপ্রেম যে মানব-জীবনের আরও বহু-প্রকার বৃত্তির মধ্যে একটি দেশপ্রেম যে সাময়িক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত নয়—এই কথাটি স্পষ্টভাবে, সুন্দরভাবে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের বৃহত্তর এবং গভীরতর জীবনসাধনার কাছে গৌণ হয়ে গিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন ইংরেজ জাতির এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি সাধারণভাবে সুপ্রসন্ন ছিল। অনেক জায়গায় তিনি ইংরেজ শাসনের প্রশস্তি রচনা করেছেন—

> "আর এক্ষণে রাজকার্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে—আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদের রাজরক্ষা ও রাজ্যপালনবিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা একদিকে উন্নতিরোধক। তেমনি আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতায় যেমন একদিকে ক্ষতি তেমনি আর একদিকে উন্নতি হইতেছে।"

এখানে সাধারণের চোখে স্পষ্টই একটা বিরোধ রয়েছে। একদিকে স্বদেশ-চেতনা আর একদিকে ইংরেজ শাসনের স্তুতি—এ দুটি পরস্পর বিরোধী ভাব একই লেখকের মধ্যে কি করে সম্ভব? এটাই

[illegible] up thanks to the Supreme [illegible] of the events of this universe, for having unexpectedly delivered this country from the long continued tyranny of its former Rulers, and placed it under the Government of the English; — a nation who not only were blessed with the enjoyment of civil and political libety, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free enquiry into literary and religious subjects, among those nations to which their influence commands."

এখানে ইংরেজ জাতি এবং ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ, এক সময় ইংরেজ বিদ্বেষই স্বদেশ-চেতনার প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্তত সে মাপকাঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেশপ্রেমিক ত দূরের কথা, দেশদ্রোহী বলতে হয়। আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম মিলন-ভিত্তিক। ইংরেজের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখেও যে দেশকে ভালোবাসা সম্ভব, পরদেশ এবং পরজাতিকে ঘৃণা না করেও স্বদেশ এবং স্বজাতিকে ভালোবাসা যায়, তার পরিচয় বঙ্কিম সাহিত্যে আছে এবং আছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমের অনুকূল। বিদ্বেষ সংকীর্ণ, প্রেম উদার। পরজাতি এবং পরদেশকে আমরা যতখানি অস্বীকার করব, ঠিক ততখানি আমরা বিশ্বপ্রেমের আদর্শ থেকে চ্যুত হব। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম বিশ্বকে অস্বীকার করে স্বদেশকে একান্ত করেনি, স্বদেশ-চেতনাকে তিনি বিশ্ব-চেতনায় রূপান্তরিত করেছেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে। এবং সেই কারণেই ইংরেজের সঙ্গে দেশের মিলনধর্মী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাম্য ছিল।

অনেকের ধারণা, বঙ্কিম ইংরেজের চাকরি করতেন বলে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করবার পক্ষে তাঁর বাধা ছিল। এ-ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ছোট করা হয়। তদুপরি এ-ব্যাখ্যা ভুল। কোন কোন মহলের ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন। কোনপ্রকার বাদ-বিবাদের প্রশ্ন এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তবে বঙ্কিমচন্দ্র মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, নির্জীব বাঙালী জাতি একমাত্র ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসে সজীব হতে পারে। 'জাতিবৈর' প্রবন্ধটিতে তিনি ইংরেজ-বাঙালীর সম্পর্ক কিরকম হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইংরেজ-বাঙালীর বৈরভাবকে তিনি নিন্দনীয় মনে করেননি। তিনি বলেছেন, যতদিন বাঙালী ইংরেজের তুল্য না হয়, ততদিন এই বৈরভাব অক্ষুণ্ন থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে—

> "জাতি বৈর স্পৃহনীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহনীয় নহে। দ্বেষ, মনের অতি কুৎসিত অবস্থা; যাহার মনে স্থান পায় তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙালী ইংরেজের প্রতি বিরত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন।"

ইংরেজের অনিষ্ট কামনা অনুচিত। কারণ, ইংরেজ আমাদের জাতি-চরিত্র গঠনের প্রেরণা। প্রেরণাকে বিনষ্ট হতে দেওয়া অসঙ্গত। আবার, ইংরেজের একান্ত বশম্বদ হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ,

> "ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে, যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেননা গায়ের জ্বালা থাকিবে না।"

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য জাতীয় উন্নতি। সেই উন্নতির উপায়-স্বরূপে বলেই ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর মধ্যপথের সম্পর্ক তিনি আবিষ্কার করেছেন। এই মধ্যপথের সম্পর্ক তিনিই আবিষ্কার করতে সক্ষম, যিনি চরমপন্থী নন এবং যিনি নিরলস উদ্যমে স্বদেশের এবং স্বজাতির উন্নতি কামনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের প্রতি প্রসন্নচিত্ত ছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালিকে ইংরেজের [illegible] করে তিনি [illegible] [illegible] [illegible] প্রতি বিরত থাকুন, কিন্তু এই বিরতি [illegible]

বাঙ্গালীকে ইংরেজের অনুকরণ করবার নির্দেশও বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন—

"অনুকরণ মাত্র কি মন্দ? তাহা কখন হইতে পারে না।......বাঙ্গালি ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কি চেয়েছিলেন বাঙ্গালী ইংরেজের ছাঁচে ঢালাই হক? কখনই না। তিনি চেয়েছিলেন বাঙ্গালী ইংরেজের চিত্ত-ধর্ম অনুকরণ করুক। যেখানে ইংরেজ যথার্থই আমাদের চেয়ে বৃহৎ এবং মহৎ সেই বৃহৎ এবং মহৎকেই বাঙ্গালী গ্রহণ করুক। ইংরেজের বাহ্যিক অনুকরণ বঙ্কিমচন্দ্র কি চোখে দেখতেন তা কারও অজানা নয়। লোকরহস্যে বা অন্যত্র তার আভাস পাওয়া যায়। যেমন

"একদা প্রাতঃসূর্যকিরণোদ্ভাসিত কদলী-কুঞ্জে শ্রীমান্ হনুমান বাবু সেবনার্থ পরি-ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমত সময়ে দৈবযোগে বুট কোট পেণ্টালুন চেন চশমা চুরুট চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্যবাবু তথায় উপস্থিত। হনুমান-চন্দ্র দূর হইতে এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন "কে এ? আকার ইঙ্গিতে বোধ হইতেছে নিশ্চয় কিষ্কিন্ধ্যা হইতে আসিতেছে। এরূপ পদালঙ্কৃত বেশ গমন চর্বন প্রভৃতি অন্য কোন দেশে অসম্ভব। এ আমার স্বজাতি এবং স্বকীয়। অতএব ইহাকে আমি অবশ্যই আদর করিব।'

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সমর্থক কেন তা স্পষ্ট-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 'আনন্দমঠ' এর চিকিৎসক

"এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই আমরা লোক-শিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরাজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।"

এ নির্দেশ সত্যদ্রষ্টার নির্দেশ যিনি দেশ এবং জাতির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ত্রিমূর্তিকে আপন চিত্তপটে প্রত্যক্ষ করেছেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটা মত স্বতঃসিদ্ধের মত চালু হয়ে গিয়েছে। সেটি এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশ-চেতনা বঙ্গকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিষয় ছিল ভারতবর্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশ। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পরিধি ব্যাপক, বঙ্কিমের চিন্তার পরিধি সংকীর্ণ। এই মতটিকে অন্যায়ভাবে প্রচলন করতে দাঁড়াবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাদেশিক, জাতীয়-

[illegible] এই মতকে [illegible] বলে স্বীকার করেন তাঁরা। [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের সময় [illegible] অপরিচিত অথবা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট।

একথা ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস বাংলা দেশের ইতিহাস অবলম্বনে লেখা। আবার একথাও ঠিক, তাঁর কতক-গুলি উপন্যাসের পটভূমিকা ভারতবর্ষের ইতিহাস। সুতরাং এর দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস' 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন 'ভারতকলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি'।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাঙ্গালী লেখক। স্বভাবতই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর মমতা কিছু বেশী থাকা উচিত। তথাপি নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর মন আদৌ শুচি-বায়ুগ্রস্ত ছিল না। আজ যে ভাষা-সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আমরা চরম নীচতা ও দীনতার পরিচয় দিচ্ছি, অনুরূপ সমস্যা বঙ্কিমের সময়ও ছিল। এই সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত তিনি এইভাবে দিয়েছিলেন—

> "এমন অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারত-বর্ষ বুঝিবে কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম বঙ্গকেন্দ্রিক—একথার তাৎপর্য কি? একমাত্র বঙ্গদেশের উন্নতি কি তাঁর কাম্য ছিল? অথবা তাঁর ধারণা ছিল বাংলা দেশ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র? এ-কথার উত্তর পেতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা-বোধের স্বরূপ কি তা আলোচনা করা প্রয়োজন। জাতীয়তা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অবশ্যই একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। সে জাতীয়তা কোন্ প্রকৃতির? বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কোথায়ও জাতীয়তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেননি, তবে প্রাচীন ভারতবর্ষে জাতিগঠন কেন হয়নি তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে 'জাতীয়তা' সম্পর্কে তাঁর ধারণার আভাস পাওয়া যায়।

> "আর্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতি-ভেদে পরিণত হইল। বাহ্লীক হইতে পৌণ্ড্র পর্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মক্ষিকা-সমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা [illegible] পরিপূর্ণ হইল। [illegible] [illegible]

[illegible] জাতির, এবং কোথায়? [illegible] থাকিবে।”

এতেই প্রমাণ হয় বঙ্কিমচন্দ্র “এক-জাতীয়ত্ব” বলতে সমগ্র ভারতবাসীকে বুঝেছিলেন। সেই “একজাতীয়ত্বের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্রী সকলেরই স্থান আছে। তবে সে আদর্শ “একজাতীয়ত্ব” গড়ে উঠতে পারেনি। গড়ে উঠুক বা না উঠুক ‘একজাতীয়ত্ব’ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং জাতীয়তা সম্পর্কে বঙ্কিমের মনে যে আদর্শ ছিল সে কেবল বঙ্গকেন্দ্রিক নয়, হিন্দু-কেন্দ্রিকও নয়। সমগ্র ভারতবর্ষকে নিয়ে, যাবতীয় ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে ‘এক-জাতীয়ত্বের’ প্রতিষ্ঠা। সকলকে একসূত্রেই গেঁথেই সে জাতিগঠন। একেই অন্যভাবে রবীন্দ্রনাথ ‘মহামানব’ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথে যা ‘মহামানব’, বঙ্কিমে তাই ‘একজাতীয়ত্ব’। বস্তু এক ভাষা পৃথক।

এই ‘একজাতীয়ত্বের’ কথা বঙ্কিমচন্দ্র আর এক জায়গায় স্পষ্টতরভাবে বলেছেন—

> “ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, এক পরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেননা, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।”

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বাঙ্গালীর কল্যাণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাম্য হলেও তা ভারত কল্যাণেরই নামান্তর। ভারতের উন্নতির সোপানস্বরূপ বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী সকলকে নিয়ে ‘সাধারণ মিলনভূমি’র কথা স্বাধীন ভারতে নূতন ভাবে আমরা চিন্তা করতে শুরু করেছি। সে ‘মিলনভূমি’র চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে এসেছিল বহু আগেই।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জাতীয়তার মধ্যেই একটা সংকীর্ণতা আছে। এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। ‘[illegible]’ প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতার আভাস স্পষ্টভাবেই দিয়েছেন।

[illegible]

রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশচিন্তা

বিজিতকুমার দত্ত

॥ ১ ॥

রমেশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনা করবার কারণ বলেছেন এইভাবে,

> পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বস্তুত উনিশ শতকের লেখকবৃন্দ দ্বিবিধ দায়িত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা রচনাকর্মকে কেবল আনন্দের সামগ্রী মনে করেন নি। বরং নীতিশিক্ষার যে আদর্শ, সাহিত্যেরও যে তাই লক্ষ্য এই সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। সেই কারণে সাহিত্যরচনার মাধ্যমে তাঁরা জাতিকে জ্ঞানে, শিক্ষায়, স্বদেশচর্চায়, ভাষায়, শিল্পে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজের সংস্পর্শে জাতির চিত্ত যখন অনুপ্রাণিত হল তখন নিজেদের দৈন্য নিশ্চয়ই আমাদের পীড়িত করেছিল এই পীড়ন নিয়ে বেশিদূর চলা যায় না। আমাদের অভাববোধ যখন জেগে উঠল তখন তার পূরণের জন্য নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই অভাব মেটানোর জন্য মনীষিবৃন্দ যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন সেখানেই রয়েছে তাঁদের যথার্থ স্বদেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে উনিশ শতকে যাঁরাই দেশগড়ার কাজে নেমেছিলেন তাঁদের সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল গভীর দেশপ্রীতি। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির ঢেউ যখন ভারতবর্ষের তটে আঘাত করল তখন একদিকে আমরা অন্ধ আনুগত্য ত্যাগ করতে উদ্গ্রীব হলাম অন্যদিকে নূতন সংস্কৃতির নিরিখে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছি। রামমোহন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' [illegible]

'হিস্টারি অফ দি মারহাট্টাস' ও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জেমস টডের 'অ্যানালস অফ রাজস্থান' বার হবার পর বাঙালি ভারতবর্ষের বীরত্বের ইতিহাস কথঞ্চিৎ জানতে পারলে। এ দুটি গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষিত বাঙালি দেশীয় শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পেলে। এটা সেযুগের পক্ষে স্মরণীয় বস্তু। কেনন পলাশির যুদ্ধের গ্লানি বাঙালিকে পীড়িত করেছিল। অথচ নিজেদের, শৌর্যবীর্যের কাহিনীর ইতিহাস তার জানা ছিল না। সেই কারণ এই দুটি গ্রন্থে শিবজীর ইতিহাস ও রাজপুত জাতির গরিমা প্রত্যক্ষ করে বাঙালি ভারতবাসী রূপে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষ্মণসেনের পরাজয় কাহিনী অত্যন্ত খেদের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছিল। অন্যান্য লেখকও নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বেদনা অনুভব করেছিলেন। বীরত্বের প্রতি নবোদিত উৎসাহে নিজেকে বাঙালি অন্যান্য বীরজাতির সমকক্ষ দেখতে চেয়েছিল। স্বদেশ প্রেমের উৎস থেকে এই বীরত্বস্পৃহা উৎসারিত। মধুসূদনের সাহিত্যকর্মে এই চেতনার রেখাপাত ঘটেছিল। সকলেই জানি রাবণের সেই স্মরণীয় উক্তি 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে।' এ ছাড়াও ইন্দ্রজিৎ-কে যখন সমস্ত লঙ্কাবাসী সৈনাপত্যে বরণ করে নিল তখন যেভাবে 'বন্দী' রাজপুরীকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল তা সমস্ত জাতিকে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করেছিল। বীরধাত্রী লঙ্কাপুরীকে শোকাবেশ পরিহার করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এই আহ্বান আসলে মধুসূদনের সময়ের শিক্ষিত বাঙালির ধ্যান ও ধারণার প্রতিধ্বনি। মধুসূদন মেঘনাদবধে যেভাবে স্বদেশচেতনার কথা জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র তাকেই আরও জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইলেন বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী উপন্যাসে সে উদ্যোগ করলেন। কিন্তু ইতিহাসের অভাবে সে চেষ্টা তেমন সার্থকতা পেল না। তথাপি বীরেন্দ্রসিংহের মহৎ ত্যাগ ও আদর্শ-কামনা বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত নিষ্ঠা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমশিষ্য রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতা ও মাধবীকঙ্কণে এই [illegible] বীরত্ব [illegible] করলেন।

বঙ্গবিজেতায় রাজা টোডরমল্লের কাহিনী বর্ণনা করবার ইচ্ছে থাকলেও রমেশচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন। বাঙালি বীর সুরেন্দ্রনাথের (ইন্দ্রনাথ) কাহিনীকে। বাঙলাদেশে যে সময়ে মোগল-পাঠান বিরোধ দেখা দিয়েছিল সে বিরোধের অবসানের পর মোগলদের মধ্যেই যে আত্মকলহ ছিল সে প্রসঙ্গ বর্ণনার মধ্যে রমেশচন্দ্র ইন্দ্রনাথ কাহিনী জুড়ে দিলেন। কারণ ইতিহাসের অভাবে উপন্যাস রচনা করে রমেশচন্দ্র আত্মশ্লাঘা বোধ করেছিলেন। স্বদেশচেতনার অন্যতম লক্ষণ আত্মমর্যাদাবোধ। এই আত্মমর্যাদাবোধ আসে তখনই যখন নিজেকে আর পাঁচটা জাতির সমকক্ষ মনে করতে পারি। বাঙালিও যে শৌর্যবীর্যে হীন নয় এইটি প্রমাণ করবার দায়িত্ব আসে তখন। টোডরমল্লের বঙ্গবিজয়ে ইন্দ্রনাথ অন্যতম সাহায্যকারী ছিল। বীরত্ব প্রদর্শন করে সে বাঙালির গৌরব বাড়িয়েছিল। রাজা টোডরমল্লের স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্র এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করলেন। বঙ্গবিজেতায় যা ছিল অস্ফুট মাধবীকঙ্কণে তাই স্ফুটতর হল। মাধবীকঙ্কণে নরেন্দ্রনাথ মোগল-রাজপুত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। রাজপুত চারণ কবিদের গীতের মধ্যে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম নরেন্দ্রনাথ শুনেছে পেল তা আসলে রমেশচন্দ্র সমস্ত বাঙালিকে শোনাতে চেয়েছিলেন। জন্মভূমির প্রতি সম্ভ্রমবোধ এবং জন্মভূমির ঐশ্বর্যে গৌরববোধ চারণকবি শুনিয়েছে। রমেশচন্দ্র নরেন্দ্রের জবানিতে শিক্ষিত বাঙালির ক্ষোভের দিকটিকে বেদনা করুণ-সুরে বলেছেন,

> স্বদেশেও মহাবল পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে। তাহারা ধন দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরাবলীর কন্দরে ও উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিণী গঙ্গামন্দী তাহার গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা প্রজা সকলেই যত সুখে নিদ্রা যাইতেছে। জগতে তাহাদিগের নাম নাই, বীরজাতির মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র [illegible]

নিবেদন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র স্বদেশের গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে চাইলেন। নিজভূমিতে পরবাসী হয়ে থাকার মধ্যে যে হীনতা ও হীনমন্যতা আছে সেকথা উনিশ শতকে বাঙালী বুঝতে পেরেছিল। দেশের প্রতি এই প্রীতি-পক্ষপাত থেকে জন্মায় প্রকৃত দেশচর্চার সূচনা। এই দুটি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বাঙালির যে বীর্যের কথা বলেছেন তা রচনার শৈথিল্যের জন্য অনেকটা প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে। তবে এ দুটি উপন্যাস থেকেই তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার, ধ্যান-ধারণার একটা পরিচয় লাভ করতে পারি। যে ত্রুটি লক্ষ্য করি সেইটি প্রথম পদক্ষেপের অনভ্যাসজনিত ভুল-ভ্রান্তি।

কিন্তু মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাতে রমেশচন্দ্র যথার্থ দেশচর্চার ইঙ্গিতটিকে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে ন্যস্ত করলেন। শিবজীর পতনবন্ধুর-অভ্যুদয়ের পথটিকে লেখক সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সাহায্যে বর্ণনা করলেন। শিবজী যেভাবে অশিক্ষিত মাওয়ালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রণনিপুণ করে তুললেন তা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। রমেশচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

At Geneva after visiting the endless works of sculpture, I went to the top of the hill and there stood before me massive and simple tomb of one of Italy's greatest sons, Joseph Mazzini. That immortal patriot, along with the statesman labour and the soldier Garibaldi, planned and effected the independence of Italy only the other day, and we heard of the battles of Solferino and Magenta being fought when we were in school.

তারপর তিনি বলেছেন, কৃতজ্ঞ ইটালি এই তিনজন দেশনেতাকে স্মরণে রাখবার জন্য রাস্তা, শহর, পার্ক ইত্যাদিতে তাঁদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। উনিশ শতকে রমেশচন্দ্র কৃতজ্ঞতা দিয়ে স্মরণ করলেন শিবজীকে। শতধাবিচ্ছিন্ন ইটালি এবং জার্মানী ম্যাটসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডির ও বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দেশগড়ার স্বপ্ন এঁরা সকলেই দেখেছিলেন। মনোবলের চূড়ান্ত রূপ দেখি গ্যারিবল্ডির জীবনে। রমেশচন্দ্রও শিবজীর মনোবলের প্রশংসা করেছেন। উপরোক্ত চিঠি থেকে জানতে পারি ছাত্র অবস্থায় রমেশচন্দ্র এঁদের কথা শুনেছিলেন। বস্তুত এই দেশনায়কবৃন্দ শিক্ষিত বাঙালির চিত্তকে স্পর্শ করেছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের জীবনীগুলিই তার প্রমাণ। নবীনচন্দ্র তাঁর রঙ্গমতী কাব্যে এঁদের জীবনকথাই [illegible] মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রে এদের জীবনাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। [illegible] শিবজীর মধ্যে দেশ-[illegible] স্বপ্ন [illegible]। এই [illegible] [illegible]

আক্রমণের বৃত্তান্ত রমেশচন্দ্রের রচনাকর্মে এততা উজ্জ্বল এততা আবেগদীপ্ত। মোগল সেনাপতি হয়েও জয়সিংহ শিবজীর প্রশংসা করেছেন।

> শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয়, ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পথ পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌবনতেজে বোধ হয়, ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে শিবজী। আপনার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।

শিবজীর স্বপ্নকে অবলম্বন করেই যে এককালে মহারাষ্ট্র ও বাঙালির মধ্যে রাখী-বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল সেকথা কারও অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ শিবজী-উৎসবে শিবজীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখেছিলেন। রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাস বেরিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের অনেক আগে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাশক্তির বিশালতা রমেশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু তিনিও যেভাবে রঘুনাথ হাবিলদারের রণদেব মূর্তি অঙ্কন করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহবাহিনী শ্রী-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন শত্রু কর্তৃক শিবজীর সৈন্যরা পর্যুদস্ত তখন রঘুনাথ হাবিলদারের অসমসাহসিকতা সে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। দেশচর্চায় এই শৈর্য ও সাহসের প্রয়োজন ছিল। উনবিংশ শতকে কয়েকটি নাটকে বাঙালির হীনবীর্যতার কথা ব্যঙ্গের আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারত-উদ্ধার" কাব্যে বাঙালির বীরত্বকে ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে কশাঘাত করেছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র ঔপন্যাসিকগণ বাঙালি এবং ভারতবাসীর শৌর্যবীর্যের যথার্থ রূপটি জাতির সামনে তুলে ধরলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে যুদ্ধবর্ণনায় যে বাস্তব রূপ অঙ্কন করলেন তাও বইয়ের জগতের নয়। কিম্বা স্কটের অনুকরণ নয়। প্রকৃত দেশপ্রেরণা ছিল বলেই তিনি যুদ্ধের দৃশ্যগুলিকে জন্মভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি পাঠান সেনাপতি রহমৎ খাঁর বীরত্বের দৃশ্যগুলি। রমেশচন্দ্র এই চরিত্রটিকেও সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। প্রথমে শিবজীর শত্রুর প্রশংসা একটা সংশয়ের অবকাশ এনে দেয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা পাঠান বীরত্বকে শিরোপা দিয়েছেন বরাবর। বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন ওসমানকে। রমেশচন্দ্র রহমৎ খাঁকে। শিবজীর বন্দী হয়েও রহমৎ খাঁ পরাজয় মেনে নিলে না। রহমৎ খাঁ মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হল। তার নির্ভীক উক্তি শিবজীকে মুগ্ধ করে। শিবজী রহমৎ খাঁকে মুক্তি দিলেন। এতে বঙ্কিমের এবং রমেশচন্দ্রের প্রতিভা স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[illegible] ঔপন্যাসিকের প্রতি এই [illegible]

দৃষ্টির কারণ কি আমাদের মনে হয় মোগলের বিরুদ্ধে পাঠানদের সংগ্রামকে বাঙালি লেখকরা একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। মোগলদের দ্বারা শাসিত হওয়ার ফলে মোগলদেরই আমরা প্রতিপক্ষ মনে করেছি। পাঠানদের সংগ্রামের মধ্যে বিজিতের উত্থান প্রত্যাশিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে স্বদেশচেতনা জাগ্রত হল তা পাঠানবীরদের কর্মপ্রেরণার মধ্য দিয়ে কথঞ্চিৎ স্ফূর্তি পাবার চেষ্টা করছে। আরও একটি কথা। 'নির্বিঘাত' সংগ্রহে পাঠান জাতি সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বেরিয়েছিল তাতেও পাঠানদের প্রতি প্রশংসা উদ্গীত হয়েছে। বীরত্ব এবং "অতিথি সৎকার" পাঠান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র সেই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করেছিলেন।

মহাবাষ্ট্র জীবন প্রভাতে রমেশচন্দ্র আরও একটি দুরূহ ব্রতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাও স্বদেশাত্মবোধেরই ফল। সেইটি এই। রমেশচন্দ্র যখন তাঁর উপন্যাসগুলি রচনায় ব্রতী হলেন তখন বাংলা দেশে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয় নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষী তখন ইতিহাস গবেষণার সূত্রপাত করেছেন মাত্র। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে অবশ্য বলতে হয় এঁদেরও আগে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এঁরাই বাঙালিকে ঐতিহাসিক গবেষণায় দীক্ষিত করেছেন। এঁদের ইতিহাস চর্চার মূলসূত্রটি কি? সম্ভবত 'মিথ্যাশ্রয়ী ইতিবৃত্তের মুখরতাকে তিরস্কার করে যথার্থ ইতিহাসের স্থাপন'। শিবজী সম্বন্ধে ডফ যে বইটি লিখলেন তাতে পক্ষপাতদুষ্টতা ছিল। শিবজী সম্বন্ধে প্রশংসা থাকলেও ডফ সুযোগ পেলেই শিবজীর অবিমৃষ্যকারিতা এবং নিষ্ঠুরতার দিকগুলিকে উদ্ঘাটিত করেছেন। ভূদেব, রমেশচন্দ্র সেই মিথ্যাভাষণের জীর্ণতা থেকে শিবজীকে উদ্ধার করলেন। ভূদেবের মধ্যে সে প্রচেষ্টা ক্ষীণ ছিল। কেননা তিনি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' রোমান্স রচনায় প্রয়াসী ছিলেন। রমেশচন্দ্রই শিবজীকে স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ কাজ ঐতিহাসিকের। তিনি রচনা করেছেন উপন্যাস। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের সত্যবস্তু উপন্যাসের পাত্রে পরিবেশনে আগ্রহী ছিলেন। কেবল আগ্রহই নয় এঁরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করতেন। রমেশচন্দ্র যে নিপুণতায় চন্দ্ররাও জুমলাদার কাহিনীটিকে শিবজী কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন তার মূলে বোধ করি এই প্রেরণা। চন্দ্ররাও-কে শিবজী হত্যা করেছিলেন। ডফ এই ব্যাপারটিকে বাড়িয়ে দেখিয়েছেন। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্যকে [illegible]

মধ্য দিয়ে শিবজীর স্থির বুদ্ধির পরিচয়টিকে প্রকাশ করে দিলেন। জীবন-প্রভাতে জয়সিংহ এবং শিবজীর সংলাপগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র একে আরও ব্যাপক এবং সুদূর-প্রসারী করে দিলেন। 'জীবনসন্ধ্যায়' রাজপুত ঐশ্বর্য বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] রাজপুতদের জাতিবিরোধ [illegible] চিত্রিত করেছেন। এর প্রয়োজন ছিল। [illegible] তাঁর দৃষ্টি কাড়তে এই বিরোধকে প্রকট করে দিয়েছেন। এই বিরোধের বিষময় ফল জাতির সামনে তুলে ধরবার প্রয়োজন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে কখনও প্রকাশ্যে কখনও আড়ালে এই বিরোধ জেগে উঠত। ধর্মগত কিংবা শ্রেণীগত বিরোধ ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। অথচ স্বদেশচেতনা তখনই সার্থক হতে পারে যখন তা সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ লাভ করতে পারে। রাণাপ্রতাপ সিংহ, তিলক সিংহ, দুর্জয় সিংহের মধ্যে সাহসের অভাব ছিল না। দেশ-প্রেমের জ্বলন্ত আদর্শ তাঁদের কর্মে উৎসাহ দিত, কর্তব্যে এঁরা ছিলেন অটল। কিন্তু জাতিবিরোধের রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করল। ফলে একটা মহৎ জাতির পতন সূচিত হল। জয়সিংহ তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে শিবজীকে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন। শিবজীর মধ্যে ছিল সহিষ্ণুতা, চাতুর্য, বীর্য, সাহস ও স্বজাতির প্রতি অপক্ষপাত আচরণ। স্বদেশপ্রেমের এইটি গোড়ার কথা। রমেশচন্দ্র তাকেই স্পষ্ট, উজ্জ্বল করে দেখালেন।

কিন্তু স্বদেশপ্রেম বলতে কেবলমাত্র বীরত্ব উন্মাদনাকেই বোঝায় না। জাতিগঠনের প্রয়োজনও রয়েছে। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে সেই প্রচেষ্টা কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও ক্ষীণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বঙ্গবিজেতা এবং মাধবীকঙ্কণে রমেশচন্দ্র অপরিমিত লালসার বিকৃত রূপ প্রদর্শন করলেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে ছিল জমিদার সতীশচন্দ্রের স্বার্থ-পরতা। "পাপপথে সর্বদাই ভয় সরল ধর্ম-পথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক"—এই ধ্রুব-বাক্যের উদাহরণ সতীশচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্র। দেশসেবায় চাই আত্মত্যাগ এবং স্বার্থবিসর্জন। এই আত্মত্যাগের ও স্বার্থ বিসর্জনের পরিচয় পাই ইন্দ্রনাথের চরিত্রে। আর পাপপথের কলঙ্ক লিপ্ত হয়েছে সতীশচন্দ্রের আচার-আচরণে। শেষ পর্যন্ত সতীশচন্দ্র তার লোভের পরিণাম বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন ফেরার পথ ছিল না।

দেশভক্তি অনেক সময় উত্তাপ উত্তেজনাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, যদি না তা দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশচন্দ্রের [illegible]

তাতে দেখতে পাই তাঁর ধর্ম ও উদার মানব-নীতির উপর স্থাপিত। শিবজী ধর্মনিষ্ঠ। কিন্তু ধর্মকে তিনি অবহেলা করেন নি। ধর্মবোধের জন্যই শিবজীর চরিত্র গড়ে উঠেছিল। যে ধর্ম বিভেদকে বড় করে না সকলের প্রতি সমদর্শী হতে শেখায় শিবজী সে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল। কেবল ধর্মবোধ নয় রমেশচন্দ্রের কয়েকটি নারী চরিত্র যে ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছে তাতে করেও তার চরিত্রশক্তির উপর আস্থা [illegible] কথা জানতে পারি। সমাজবোধ, সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে খুব উল্লেখের নয়। কিন্তু রঘুনাথ হাবিলদারের জন্য তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা আমাদের মুগ্ধ করে। রঘুনাথ যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হল তখনই আসন্ন মিলনের ক্ষণটি উপস্থিত হয়েছিল। যশোবন্তের পত্নীর কাহিনী অবশ্য টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য শশিচন্দ্র এই কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি কবিতা রচনা

করেছিলেন। রমেশচন্দ্র ক্ষাত্রবীর্যের মহিমা এই নারীতে দেখতে পেয়েছিলেন। শিবজীর মাতৃভক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। কর্তব্যের জন্য জনকের আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে দীনতা নেই। রমেশচন্দ্র শিবজীর মাতৃভক্তির [illegible] [illegible] [illegible]

উদ্গীত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতপ্রীতি কেবল রোমান্স-রস পরিবেশন করার জন্যই আসে না। বরং অতীতের সুখ-দুঃখ বিরহমিলনস্পর্শে জীবনকে বর্তমানের পারে স্থাপন করে তারা জাতিকে আত্মস্থ হতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে টোডরমল্লের [illegible] [illegible]

নৈতিক গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্র এই বিচারসভাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে করে অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিবিড় মমত্ববোধ দিয়ে রমেশচন্দ্র এই দৃশ্যগুলি প্রকাশ করেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] ... অতীতের গৌরবের দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে [illegible] সচেতন করেছিলেন। এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা [illegible] হয়। মাধবীকঙ্কণে আছে এই রকম দৃশ্য [illegible] বর্ণনায়। দেশ যখন পরাধীন থাকে তখন স্বভাবতই "ছোটো ইংরেজে"র দংশন তীক্ষ্ণ হয়। রমেশচন্দ্র নিজেও এই দংশন অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে দেশের মহিমাকে এইভাবে স্পষ্ট করে তুলতে হয়।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ভীলদের প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। ভীলরা রাজপুতদের কাছে পদানত। নিজ বাসভূমে পরবাসী তো বটেই। এমন কি তারা সমতল-ভূমি ছেড়ে পার্বত্যভূমি আশ্রয় করেছে। এই বিজিত জাতির করুণ আলেখ্য রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তেমন প্রাধান্য না পেলেও রমেশ-চন্দ্র ইঙ্গিতে তাদের কথা বলেছেন। তাকেই বিস্তৃত রূপ দিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী বিদ্রোহ উপন্যাসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকেও এই প্রসঙ্গ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

সংসার সমাজ গ্রন্থ দুখানি একালের ইতিহাস। এ দুটি উপন্যাসে তিনি বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেছেন। একদিকে প্রাচীন প্রথা নিয়মকে অস্বীকার করে রমেশচন্দ্র যেমন ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছিলেন তেমনই অন্যদিকে শিক্ষার ফলে যে সকল প্রাচীন প্রথা অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। এ-বিষয়ে অবশ্য বিদ্যা-সাগরের প্রেরণাই মূলে ছিল। রমেশচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর স্নেহ করতেন। দেশচর্চায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন অসামান্য ঘটনা। কিন্তু রমেশচন্দ্রই প্রথম সাহিত্যে তাকে প্রকাশ করলেন। এইখানেই দেখি রমেশচন্দ্রের মূল্য ও স্বচ্ছ দৃষ্টি।

॥ ২ ॥

[illegible]

হয়? হৃদয় কোন কথায় অধিকতর আলোড়িত কোলাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্যের অপূর্ব বীরত্ব কথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ব পাতিব্রত্য কথা, হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, একথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

[illegible] বিদেশ [illegible]। [illegible] ইংরেজি [illegible] ও [illegible] হয়েছিলেন। [illegible] বাংলা সাহিত্যের [illegible] সাহিত্যে [illegible] ইউরোপের [illegible] সাহিত্যের [illegible] অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইংরেজ [illegible] যুবকেরা পাশ্চাত্য সাহিত্য-রস আকণ্ঠ পান করেছিলেন। আচারে, সাহিত্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সর্বতোভাবে পাশ্চাত্যরীতিকে স্বীকার করাটাই তদানীন্তন কালের শিক্ষিত যুবকদের বিশেষত্ব ছিল। যে গভীর আবেগে তাদের চিত্তভূমি বিলোড়িত হয়েছিল তার ফল যে সব সময় ভাল হয়েছে এমন বলি না। কিন্তু তাঁরা যে ধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত করলেন তা অদৃষ্টপূর্ব এবং অভূতপূর্ব। যেখানে তাঁরা সার্থক হয়েছেন সেখানে [illegible] হয়েছে, [illegible] তাঁরা [illegible] হয়েছেন সেখানে [illegible] লেখক এবং চিন্তানায়কেরা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিনা স্বদেশীভাবে [illegible] ভাষা জিতে পারে না। আর তাতে জাতীয় গৌরবও প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা আমাদের কেবল বহির্মুখী করেনি, যে শিক্ষা অন্তর্মুখী করেছিল। আমাদের সাহিত্যের অভাবমোচনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলাম। ইলিয়াদ ইনিয়াদ নেই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এপিকের রস পরিবেশন করবার চেষ্টা করলেন। সেক্সপীয়র নেই সত্য কথা। আমরা চেষ্টা করলাম নাটক সৃষ্টি করতে। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের মূলে নিশ্চয়ই এই অভিমান ছিল। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস নেই। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স-উপন্যাস রচনা শুরু করলেন। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে জাতিগত প্রেরণা এল। স্বদেশপ্রীতির অন্যতম ফলশ্রুতি হল এই। প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করা হল। চিন্তায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর এলেন। রমেশচন্দ্র 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন,

> অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমাদের নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙালীর ন্যায় ফিরিতাম, অদ্য আমাদের নিজের একটু ধন-সম্পত্তি হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান আহরণ-কারী। এখন আমরা দর্প করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, বাৎসল্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। ধনের সহিত একটু শক্তি হইয়াছে,—রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য সম্বন্ধে বল, প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের একটু স্পর্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের স্তুতিবাদক নহি। দেশীয় আচার ব্যবহারে বীতরাগ নহি, দেশীয় ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্মে অবহেলা করি না। * * এটি উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ।

১৩০১ সালে রমেশচন্দ্র যে কথাগুলি প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, সে কথা তাঁর সম্বন্ধেও খাটে। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন বার হলে বাঙলা দেশ ব্যাপকভাবে জাতীয় উদ্দীপনাতে আন্দোলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, শিক্ষিত বাঙালি এক [illegible] ইংরেজিতে সব, কিন্তু [illegible] এবং [illegible] [illegible]

বাঙ্গালার পাঠক [illegible] প্রয়োজন কি?

অন্য দল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদের ভাষায় যেরূপ প্রথা, তাঁহাদের লিপিচাতুর্য্যের আবশ্যকতা নাই।

সুতরাং যাঁরা বাঙলা ভাষায় সেযুগে চর্চা করছিলেন তাঁদের পথ রাজপথ ছিল না। বাঙলাভাষা যে জাতির সর্বজনগ্রাহ্যরূপ এ বোধ সকলের মধ্যে জন্মায় নি। সকলেই মনে করতেন কয়েকজন লোক শিক্ষিত হলেই আপনা আপনি অন্যান্য লোকেরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ "ফিল্টার ডাউনে"র ব্যবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতাচ্ছলে বলেছেন,

> এতকাল শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উজ্জ্বল দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা, তাঁহাদিগের ছিদ্রগণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কি দুস্তর বাধা অতিক্রম করেছিলেন তা একালে বোঝা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলাভাষা ও সাহিত্য রচনায় একাই ব্রতী হলেন না। রমেশচন্দ্র যে ধন-সঞ্চয়ের কথা ও শক্তির প্রসঙ্গ এনেছিলেন তার মূলে ছিল বঙ্কিম অনুগামী সাহিত্যিকগণ। রমেশচন্দ্র এঁদের অন্যতম। জার্মান দার্শনিক লাইবনিৎস তাঁর ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, জাতীয় চেতনা জাগলেই ভাষার মধ্যে জাতীয় সম্পদ লক্ষিত হয়। স্বদেশচর্চার ফলে আমাদের মধ্যে যে জাতীয় প্রেরণা জাগল তার প্রকাশ লক্ষ্য করি ভাষায়। কেবল ভাষায় নয় জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে। রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তিনি ঋগ্বেদের অনুবাদে ব্রতী হলেন। এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালির অগ্রসরমান অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি ঘটল। উইলিয়ম জোন্সের উৎসাহ ও প্রেরণায় যার শুরু, বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে যে প্রেরণা জাতিকে উৎসাহিত ও সংস্কৃত ভাষা চর্চায় কৌতূহলী করে তুলল, রমেশচন্দ্রে এসে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হল। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যমের কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। রমেশচন্দ্র একদিকে সংস্কৃত জটাজাল থেকে ঋগ্বেদকে মুক্ত করে বাঙলা-দেশে প্রচারিত করলেন অন্যদিকে রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে ভারতীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য বিদেশে পৌঁছে দিলেন। ভাবতে অবাক লাগে একটি ব্যক্তির মধ্যে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি অনুরাগ এসে মিলেছিল। [illegible] বিদেশী ও দেশী এই [illegible]

কথিত পাণ্ডিত্যাভিমানীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উৎসাহ এবং অন্তরের প্রেরণায় তিনি এ কাজে অগ্রসর হলেন। তিনি যে সার্থকতা পেয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের অনুবাদের মূলে ছিল ঐতিহ্যনিষ্ঠা। জাতীয়তাবোধ কেবলমাত্র একটা idea নয়। তা ধ্যানগম্য বটে। তবুও কতকগুলি বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করেই সে ধ্যান রূপায়িত হয়। ঋগ্বেদের অনুবাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যজাতির সঙ্গে সাধর্ম্য স্থাপিত হল। যে সমস্ত সভ্যতার চূড়া দেখে আমাদের বিস্ময় জাগে ঋগ্বেদ তার একটি চূড়া। রমেশচন্দ্র এই ঋগ্বেদ অনুবাদ করে প্রাচীন সভ্যজাতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করলেন। কেবল তাই নয় এই অনুবাদের ফলে বাঙলাভাষাও শক্তিশালী হল। যে পণ্ডিতবৃন্দ রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা জানতেন না পণ্ডিতের আইন অমান্য করেই বাঙলাভাষার যাত্রা শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সময় থেকে সেই আইন অমান্য আন্দোলনের শুরু। রমেশচন্দ্র প্রমুখ মনীষিবৃন্দ জাতির উদ্বোধনের দিনে এইভাবে জাতিকে গৌরবান্বিত করে তুললেন। ইলিয়াদের যে প্রসঙ্গ দিয়ে এই অংশের সূত্রপাত করেছিলাম তাও যে আমাদের আছে তা প্রমাণ করলেন রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে। রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদ সম্বন্ধে সেকালের Bengalee পত্রিকার এই মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য

Modern India, as it seeks to give effect to the lessons which it has learnt from the West, draws nearer to its own ancient traditions and habits of life.

নবজীবন পত্রিকায় "ঋগ্বেদের দেবগণ" প্রবন্ধগুলিতে রমেশচন্দ্র এই সমস্ত দেবতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মূল্য নির্ধারণ করবার প্রয়াসও পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের এ কাজে উৎসাহী ছিলেন। বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র গুরুর শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

কেবল ঋগ্বেদ অনুবাদই নয় তিনি পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্রও সংকলিত ও অনুবাদ করেছিলেন। এ সকল কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি আনন্দ পেতেন। বস্তুত কর্মে ও সাহিত্যে রমেশচন্দ্র দেশসেবার আদর্শটিকেই বড় করে ধরেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা Literarture of Bengal, এই গ্রন্থটি রচনা করে রমেশচন্দ্র প্রমাণ করলেন বাঙলাসাহিত্যও অবহেলার বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পর রমেশচন্দ্রের গ্রন্থই সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সেকালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র স্মরণীয় নাম ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। রমেশচন্দ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করে অন্যান্য কবিদের প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে বাঙালি তার অতীত ইতিহাস জানতে পারল। উইলিয়ম হান্টার এই বইটির সমাদর করেছিলেন। সে সময়ের Englishman কাগজে বইটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। দেশাত্মবোধ থেকেই যে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেকথা Englishman কাগজে উল্লিখিত ছিল।

ইংলিশম্যান কাগজের একটি মন্তব্য

It will surprise many to learnt that Bengali has a literature worth writing about.

সেকালে Times পত্রিকাও গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিল

The conspicuous merit of his book is its frank acknowledgement that no literary success which an Indian can make in English or any exotic tongue, is to be compared as regards its value to his countrymen with first class work in his own language. It is this instinct of literary patriotism which animates the best Bengali writers, and which has written a century created a prose literary language for Bengal.

এই যীর্ষ উদ্ধৃতিতে literary patrio-

tism কথাগুলি লক্ষণীয়। বস্তুত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার মূলে গভীর দেশাত্মবোধ ক্রিয়াশীল হয়। ইতিহাসকে গ্রীক ঐতিহাসিকেরা Guardian Deity বলেছেন। রমেশচন্দ্র ইতিহাস রচনার দ্বারা আমাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করলেন।

॥ ৩ ॥

রমেশচন্দ্রের ইকনমিক হিস্টরি অফ্ ইণ্ডিয়া গ্রন্থ দুখানি সুপরিচিত। ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌রা আজও এই বই দুখানিকে আকর গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে হয় রমেশচন্দ্রের এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টার কথা আমরা স্মরণে বিশেষ রাখি নি। তাঁর Peasantry of Bengal বইখানি এককালে বাঙলা দেশে আলোড়ন এনেছিল। ১৮৭২ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ এই বিশ বছরের আয়োজনে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, লালবিহারী দে এবং রমেশচন্দ্র এই চারজনে বাঙলা দেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা জানালেন। সকলেই নিজের চিন্তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করলেও এই মনীষীদের চিন্তাধারার মধ্যে একস্থানে ঐক্য ছিল। সে হচ্ছে সকলেরই বাঙলার নিরন্ন ও দরিদ্র প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি। সঞ্জীবচন্দ্রের Bengal Ryot (১৮৬৪) বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ বা গোবিন্দ সামন্ত (১৮৭৪) এবং রমেশচন্দ্রের দি পেজান্ট্রি অফ্ বেঙ্গলে (১৮৭৫) বাঙলা দেশের রায়তদের নিরানন্দ অবস্থা শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নীলকর ও পাবনার ঘটনায় ভূমি ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এই সময়েই সকলের নজরে আসে। রমেশচন্দ্র যখন এই বই লিখলেন তখন স্বভাবতই তাঁর গ্রন্থ সমাদর পেল।

দি পেজান্ট্রি অফ্ বেঙ্গল রমেশচন্দ্রের স্বদেশচর্চার অন্যতম নিদর্শন। মনে রাখতে হবে তখনকার দিনে সরকারের কাজের সমালোচনা করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এই বইটির মাধ্যমে রমেশচন্দ্র লক্ষ লক্ষ কৃষকের বেদনাকে মূর্ত করে তুললেন। রমেশচন্দ্র জানতেন এই বই ছাপা হলে তিনি ইংরাজ সরকারের অপ্রীতিভাজন হবেন। তথাপি তিনি বই ছাপালেন। এই বইটিতে তিনি সরকারকে রায়তদের মধ্যে যে জাগরণ এসেছে তার প্রতি লক্ষ্য করতে বলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র উৎসাহ বোধ করেন নি। যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি হয়েছিল তিনিও সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চেয়েছেন। তবে তার স্বরূপ আলাদা। পূর্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সরকার ও জমিদারদের মধ্যে বোঝাপড়া। রমেশচন্দ্র চেয়েছেন রায়ত ও জমিদারদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। জমিদারদের অত্যাচারের কথা স্মরণে রেখেই রমেশচন্দ্র একথা বলেছিলেন। জমিদারদের অধীনে রায়তদের অনন্তকালের বন্ধন মোচনের প্রয়াসী ছিলেন রমেশচন্দ্র। সেই কারণে তিনি বলেছেন,

> Our rulers will not, cannot, once more degrade the raiyat to his pristine position of servitude under the zamindars—the only other measure then to heal the ill-feeling between two classes, and to put a stop to the mass of litigation that is eating into the very vitals of an agricultural population, is to raise the status of the raiyats. Let the rates of rent now payable be carefully ascertained after an extensive survey, and let such rates be declared fixed for ever.

[illegible]

জানতেন তাঁর এই মন্তব্য "a nest of hornets"দের উত্তেজিত করবে। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আশঙ্কাই ঠিক হল। কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টে এই বইটির বিরুদ্ধে সমালোচনা করলেন। তিনি আখ্যা দিলেন রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারা "বিপ্লবধর্মী"। এখনকার দিনে বিপ্লব কথাটি আমরা শিথিলভাবে প্রয়োগ করে থাকি। সেকালে রমেশচন্দ্রের চিন্তা যে বিপ্লবধর্মী আখ্যা পেয়েছিল তা থেকেই বুঝতে পারি এই বইটির গুরুত্ব কতখানি ছিল। কৃষ্ণদাস পাল রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত শিক্ষা সম্পর্কেও কটাক্ষপাত করেছিলেন। তিনি [illegible] কলকাতার [illegible] যুবক যাঁরা সিভিলিয়ান হিসেবে [illegible] এসেছেন তাঁরা কতগুলি নূতন চিন্তা নিয়ে দেশে ফেরেন। কৃষ্ণদাস পাল এও লক্ষ্য করেছিলেন যে এই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ যুবকদের চেতনাই কার্যকরী হচ্ছে। এ'দের মধ্য দিয়ে যেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্বপ্নই প্রকাশ পাচ্ছে। কৃষ্ণদাস পাল যে আশঙ্কা করেছিলেন তা সত্যি। উদার মানবিকতাবোধ দেশচর্চার অন্যতম ফলশ্রুতি। রমেশচন্দ্র নিজেও Literarture of Bengal গ্রন্থে হিন্দু কলেজকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের রচনাকর্মের এই প্রাথমিক পর্যায়ে যে রূপ দেখি তা পরবর্তী কালে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হলেও রায়তদের দুর্দশা সম্বন্ধে পরবর্তী কালেও তিনি সচেতন হয়েছিলেন। কৃষকদের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে তিনি অক্লান্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদেশের কৃষক"-এ কল্পিত পরাণ মণ্ডলের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৫৯ সালের দশ আইনের সমালোচনা করেছিলেন, লালবিহারী গোবিন্দ সামন্তের বেদনাময় জীবনকে করুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রমেশচন্দ্রও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার দুর্নীতিবিচ্যুতি এবং প্রজাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কাহিনী উদ্ঘাটিত করলেন।

কেবলমাত্র বাঙলার কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিই যে রমেশচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল তাই নয়। তিনি গোটা ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি নিয়েই আলোচনা করেছেন। "ভারতী" পত্রিকায় ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল (১৩০৯) প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র স্পষ্টত সরকারকে দরিদ্র চাষীদের প্রতি সুবিচার করতে বলেছেন। রমেশচন্দ্রের বক্তব্য একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিযোগ্য।

> ১৮৮০ এবং ১৯০০ সালে ফেমিন কমিশন যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত করেন, তাহাতেও বড়লাট বাহাদুর দক্ষিণ ভারতের দীন অসহায় কৃষক ভূম্যধিকারিগণের উপর গভর্ণমেণ্টের দাবি সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্পষ্ট, সরল, এবং বোধগম্য সীমা নির্দিষ্ট করিলেন না। বড়লাট বাহাদুরের এইরূপ বিচারে আমরা নিতান্তই ক্ষুন্ন হইয়াছি। কারণ কৃষিজীবী ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং কতটুকু তাহাদের নিজের থাকিবে, ইহা স্পষ্ট জানা এবং বুঝিতে পারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আবশ্যক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও এত নহে। রাজার দাবির অনিশ্চয়তা কৃষিকার্যকে একেবারে নির্জীব করিয়া ফেলে এবং এই সর্বনাশী অনিশ্চয়তা ভারতবর্ষের সকল কৃষিচেষ্টায় সর্বনাশ করিতে থাকিবে। যদি না এরূপ কোন ভবিষ্যৎ শাসনকর্তার অভ্যুদয় হইতেছে, যিনি প্রজাদিগের আরও একটু নিকটভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগের জন্য আরও একটু যথার্থ সহানুভূতি দেখাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া কৃষকদিগের বোধগম্য ভাষায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন, যে জমি উৎপত্তির কতখানি মাত্র গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে দাবি করিতে পারেন, কতটুকু নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের থাকিবে, রাজস্ব কর্মচারী বা বন্দোবস্তী কার্যকারকেরা তাহা স্পর্শও করিতে পারিবে না,—ততদিন পর্যন্ত আমাদের মঙ্গল নাই। সেদিন ভারতবর্ষের পক্ষে একটি শুভদিন যেদিন এরূপ বাণী ভারতবর্ষের কৃষকদিগের প্রতি উচ্চারিত হইবে। ভূপৃষ্ঠে অন্য কোন প্রজার ইহার ততটা আবশ্যক নাই।

রমেশচন্দ্রের রায়তদের সম্বন্ধে কি পরিমাণ সহানুভূতি ছিল এই উদ্ধৃতিটিই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। শেষের কয়েকটি ছত্রে রমেশচন্দ্রের যে আবেগ স্ফূর্তি পেয়েছে, তা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের। দেশচর্চায় এই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে।

বাঙালি লেখকবৃন্দের মধ্যে সম্ভবত রমেশচন্দ্রই প্রথম ভারতবর্ষের অর্থনীতির ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে কেবল সাহিত্যিকদেরই আহ্বান করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাস রচনা করতে। রমেশচন্দ্র তাকেই আরও ব্যাপকতর ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন। উনিশ শতকে যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল তাকে [illegible] [illegible] করেছিলেন যে সকল জাতীয় [illegible]

মধ্যে রমেশচন্দ্রের স্থান কোন অংশে ন্যূন নয়। যে দুরূহ পরিশ্রম ও অক্লান্ত নিষ্ঠা নিয়ে তিনি Economic History of India গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা একালের গবেষকদেরও ঈর্ষার বস্তু। একথা মনে রাখতে হবে স্বদেশচর্চা, দেশপ্রেমের উত্তাপ ও উত্তেজনাতেই নিঃশেষিত হয় না। রমেশচন্দ্র গভীর নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করেছিলেন তাতে বাঙালি গৌরববোধ করতে পারে। এই বইটি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর ভবতোষ দত্ত বলেছেন,

> মোটের উপর রমেশচন্দ্রের আর্থিক ইতিহাস ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের তীব্র এবং নির্ভীক সমালোচনা। যে মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বরাজ অধিবেশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যে মনোভাব নিয়ে দাদাভাই নওরোজি বা ডিগ্‌বির রচনা, রমেশচন্দ্রে তাঁরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ। স্বদেশী আন্দোলনের ও কংগ্রেসের নূতন চরমপন্থী দলের যে অর্থনৈতিক ধর্মবোধের প্রয়োজন ছিল, রমেশচন্দ্র সেটা উপস্থিত করলেন তাঁর ইতিহাসের মাধ্যমে।

ডক্টর দত্ত রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের ত্রুটির দিকগুলি উল্লেখ করেও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রমেশচন্দ্রের গ্রন্থই জাতীয়তার চেতনার প্রেরণা স্বরূপ হয়ে। বস্তুত রমেশচন্দ্রের গ্রন্থে যে ইংরেজ সমালোচনা তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে সে যুগে তা বিরলদৃষ্টি। গ্রন্থটির বিস্তৃত পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। সে কাজ যোগ্য ব্যক্তি করবেন। প্রথম খণ্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্ম থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস টানা হয়েছে। বাঙলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণগুলি থেকে সাম্রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন রমেশচন্দ্র। একথা ঠিক রমেশচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করেছেন। একালের দৃষ্টিতে তা সমর্থনযোগ্য নয়, এও সত্য কথা। কিন্তু একটি প্রসঙ্গ সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। রমেশচন্দ্র জমিদারী ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন সত্যি কথা। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি জমিদারের যে আদর্শ কর্মপন্থা মাঝে মাঝে বিবৃত করেছেন তাতে মনে হয় তিনি জমিদারী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন রূপটি অক্ষত থাকবে এই আশা করেছিলেন। এ কথা মানি এ দৃষ্টিতে পশ্চাৎগামিতার পরিচয় আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি রমেশচন্দ্র সম্ভবত এ দিকটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির সমন্বয়সাধন রমেশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। তিনি যে জমিদারগোষ্ঠীর প্রত্যাশা করেছিলেন তা বাস্তবে আর কোনও দিন দেখা যাবে না। রমেশচন্দ্র কিছু পরিমাণে আদর্শবাদের দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। এ কথা আরও সত্য মনে হয় যখন দেখি রমেশচন্দ্র "পেজান্ট্রি অফ বেঙ্গল" এ জমিদারী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে লিখেছেন,

> ধনবান জমিদারপুত্র হইয়াও মনে তাহার অহংকার ছিল না; উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন, কখন কখন কৃষকদের সহিত বাস করিতেন; সদাই কৃষকদের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময় গোশালায় গাভীসকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরগুলির পার্শ্বে ইতস্তত বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্য সন্তোষ, আনন্দ, দুঃখ, [illegible] ও ক্লেশে তাহাদিগের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলোকন করিতেন; দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগযুগান্তরে প্রজাদিগের অপরিবর্তিত অবস্থা [illegible] করিতেন।

যে ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র এ মন্তব্য করেছেন সে ইন্দ্রনাথের যুগ শেষ হয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আদর্শ জমিদারও আর এখন [illegible] নয়। সম্ভবত রমেশচন্দ্র একথা [illegible] তাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন [illegible] তাবার [illegible] করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের সম্পদকে যে প্রকাণ্ড একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেছিল সে সম্বন্ধে লেখক অবহিত ছিলেন। কোম্পানীতে নিযুক্ত হত তাদেরই নির্বাচিত কর্মী। ভারতবর্ষের আয় থেকে তারা মাল কিনত এবং নিজেদের লাভের জন্য তা ইউরোপে বিক্রি করত। তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য ভারতবাসীদের থেকে নির্মমভাবে কর আদায় করত। তারপর রমেশচন্দ্র বলেছেন,

The East India Company's trade was abolished in 1833, and the Company was abolished in 1858 but their policy remains.

ভারতবর্ষ থেকে দুঃখ কণ, ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাবদ যে হারে অর্থ দেওয়া হয় তাও রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন। ব্যঙ্গ করে রমেশচন্দ্র বলেছেন,

Verily the moisture of India blesses and fertilizes other lands

রমেশচন্দ্রের গ্রন্থ রচনা করবার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরবার জন্য। যে কর আদায় হচ্ছে তা যাতে ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই ব্যয় হয় সেকথা রমেশচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় আয় যদি সম্প্রসারিত হয় জনসাধারণের মধ্যে তবেই জাতি হিসাবে সে বেঁচে থাকতে পারে।

The proceeds of taxation are spent among the people, and for the people A nation is impoverished if the sources of its wealth are narrowed, and the proceeds of taxation are largely remitted out of the country.

লেখকের এই উক্তির মধ্যে রয়েছে যথার্থ দেশপ্রীতি। দেশ বলতে জনসাধারণ। জনসাধারণের কল্যাণবিধান দেশচর্চার মূলমন্ত্র। রমেশচন্দ্র সেই কল্যাণকামনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। একথা ঠিক, ভবতোষ বাবু তাঁর প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন, অর্থাৎ কংগ্রেস মডারেটপন্থীদের মতই দেশের শাসনে ভারতবাসীর অধিকার তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার যুগে এই ছিল যথেষ্ট চাওয়া। ইংরেজ শাসনকে অস্বীকার করবার প্রেরণা আসে আরও অনেক পরে। ভারতবাসীর সহযোগিতায় ভারতবর্ষ শাসিত হোক। সিভিল সার্ভিসে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, ডাক ও তার বিভাগে, পুলিসে, হাসপাতালে উপযুক্তভাবে ভারতবাসী চাকরি পাক। রমেশচন্দ্র তাই চেয়েছিলেন। ইংরেজের চাকরিতে রমেশচন্দ্রের আপত্তি ছিল না। কিন্তু

We do not wish them to monopolise all the higher services to the virtual exclusion of the children of the soil.

রমেশচন্দ্র ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন বর্তমান অর্থনৈতিক পটভূমিকায়। যেকথা আগে বলেছি তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রামীণ সমাজ আদর্শরূপে গণ্য। কিন্তু তিনি এও বুঝেছিলেন যে তারও যথার্থ রূপ বর্তমান কালে স্থাপন করা যাবে না। বিদেশী সরকারের দ্বারা যে গ্রামীণ সমাজ উৎখাত হয়ে গেল তাকে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নূতন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত হোক এই ছিল রমেশচন্দ্রের অর্থনীতির আলোচনার অন্যতম সূত্র। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার বিষময় ফল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

Isolation does not strengthen the Empire, it leads to ill-judged, unwise, and hasty measures of legislation, and spreads dissatisfaction and discontent among the people It leads to sudden and bewildering changes in the policy of the Indian Government as a result of party Government in Great Britain It impoverishes the nation and weakens the Empire

রমেশচন্দ্রের রচনাবলীতে স্বদেশচর্চার স্থান কতখানি ছিল উপরোক্ত আলোচনা থেকে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে। কর্মজীবনেও তিনি নানাভাবে স্বদেশের সেবা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন,

> তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্তার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে [illegible] তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশহিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই ক্ষমাশীলতার লক্ষণ।

[illegible]

কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক নবীনচন্দ্র

[illegible] ত্রিপাঠী

শিল্পে আবেগ ও চিন্তার ঐশ্বর্যে নবীন সেনের স্বদেশপ্রেম গঠিত। একদিকে উচ্ছ্বাসের প্রবল কোমলতা অন্যদিকে আদর্শ, বিশ্বাসের দুর্বলনিষ্ঠা। না, দুর্দশ নয়, [illegible] নবীন সেনের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। এবং কবির প্রাণপ্রাবল্যের তরুণ আমাদেরও প্রবাহিত করে নিয়ে গেছে আদর্শ ও ন্যায়ের কঠিন পর্বতশৃঙ্গে—প্রতিহত হয়ে সরে গিয়েছে,—আবার নতুন শক্তি সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে দ্বিগুণ উৎসাহে।

যুগটাই ছিল উদ্দীপনাময়। একের পর এক ঘটনায় প্রাক-কংগ্রেস যুগের জাতীয়তা-তখন নিজস্ব রূপ নিচ্ছে। যেমন ১৮৪৯ সালে বেথুন প্রস্তাবিত 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' প্রত্যাহৃত হল (অর্থাৎ ইয়োরোপীয়দের বিচার মকদ্দমার নেটিভ বিচারকেরা করতে পারবেন না, করতে থাকবেন সুপ্রীম কোর্টের শ্বেত বিচারপতি) ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে বাঙালী শিক্ষিতদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হল। ১৮৫৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ঠিক ঐ দিনই ব্যারাকপুরে সিপাহীবিদ্রোহের সূচনা। যদিও শিক্ষিত বাঙালী তখন এ বিদ্রোহে নিস্পৃহ থেকেছে এবং স্বাধীনতাবোধ বা জাতীয়তাবোধ তখনো ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ নেয় নি, তবু একথা বলতেই হবে স্বাধীনতার এক দুর্মর ইচ্ছা সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রকম্পিত করে গিয়েছিল। ১৮৫৮ সালে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যার ধ্বনি শুনি, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?'

সিপাহীবিদ্রোহে শিক্ষিত বাঙালী চুপ করে থাকলেও নীলবিদ্রোহে (১৮৬০) থাকে নি। হরিশ মুখার্জির 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজ এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক [illegible] আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু "জাতীয় [illegible] সভা"র প্রস্তাব করেন। [illegible] হয়ে নবগোপাল [illegible] এবং [illegible] মেলা অথবা [illegible]) আয়োজন করেন। [illegible] নবীন সেন [illegible]

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দমোহন বসু এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। তার আগে শিশিরকুমার ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি ও মতিলাল ঘোষ ইণ্ডিয়া লীগ স্থাপন করেন। যাই হোক, মোটের উপর বেশ বোঝা যাচ্ছে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত একটা স্বপ্ন-ভঙ্গের ফলে ক্রমে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল।

আবার ঠিক এই সময়েই ভারতের ইতিহাসের বিচিত্র তথ্য আবিষ্কৃত হতে লাগল। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী আমরা জানলুম আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য কত মহান। ম্যাক্সমূলার বেদকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। কানিংহাম, টড, গ্রান্ট ডাফ যথাক্রমে শিখদের ইতিহাস, রাজপুত ইতিহাস ও মারাঠাদের ইতিহাস লিখলেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও নতুন একটা সাড়া জেগেছিল। একদিকে শিবনাথ শাস্ত্রী-দুর্গাচরণ দাস-আনন্দমোহন বসুর হাতে ব্রাহ্মধর্মের পুনরুজ্জীবন অপরদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের হাতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়। সামাজিক আচার প্রভৃতি নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখতে শুরু করেছিলেন 'সামাজিক প্রবন্ধ' 'আচার প্রবন্ধ' ইত্যাদি আবার মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কাল্টিভেশান অব্ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করলেন।

সাহিত্যে স্বদেশ প্রেমের জোয়ার এক ধারাবাহিক প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি যা সে যুগের মানুষের কাছে ছিল বিচ্ছিন্ন ও একক চেষ্টা। কারণ নবীন সেন এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই তাঁদের আত্মজীবনীতে বলেছেন দেশপ্রেম তখন কোথাও ছিল না। কিন্তু এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি ১৮৫৮ সালে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যার শুরু, ১৮৬৮-৭০এ হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীতে" বিস্তারিত, ১৮৭৪-৭৫এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "পুরুবিক্রম" বা "সরোজিনী" নাটকে যে [illegible] ১৮৭৫এ নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধে" তা [illegible] ১৮৭৮ সালে [illegible] "[illegible]" যে [illegible] ১৮৮৬ সালে [illegible] ১৮৮৬ সালে [illegible]

প্রথমদিকের সাহিত্যিকদের [illegible] মোটামুটিভাবে প্রাক্-কংগ্রেস জাতীয়তা-বোধের দুটি দিক,—১) সাংস্কৃতিক, ২) রাজনৈতিক। সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ এবং রাজনৈতিক দিক থেকে মডারেট পন্থা বা আবেদন-নিবেদনের পালা—এই দুই ছিল সে যুগের স্বদেশ প্রেমের রূপ।

নবীনচন্দ্রের উক্তি উদ্ধৃত করি—

"আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখবার পূর্বে স্মরণ হয় স্বদেশ প্রেমের [illegible] বাংলার কাব্য কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর 'ভারত সঙ্গীত' আমার স্বদেশ-প্রেমাত্মক বহু কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়।"

(আমার জীবন ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ১৭৭)

মনে হয় নবীনচন্দ্রের এই উক্তি সত্য নয়। হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র তার আগে (১৮৬৮ সালে সম্ভবত) 'অবকাশ রঞ্জিনী'র খণ্ড কবিতাগুলি লিখেছেন এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনাও শুরু করেছেন যদিও গ্রন্থাকারে 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭১ সালে এবং 'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৭৫ সালে।

ইতিহাসের দিক থেকে যদি বিচার করি তবে দেখব নবীনচন্দ্রের স্বদেশ প্রেমের পিছনে ছিল সংবাদ প্রভাকরের প্রেরণা; [illegible] কবির অনুসরণে কবিতা লিখতে শুরু করেন। [illegible] ভারতের [illegible] ভিক্টোরিয়ার কাছে [illegible]

[illegible]

কিন্তু পরবর্তীকালে [illegible]

[illegible]

ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম, আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়,
আর্য্যবংশ কীর্তিচয়—
কেন দেখিলাম? আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?

অবকাশরঞ্জিনীর ছত্রে ছত্রে এই অন্তর্দাহ—স্বাধীনতার জন্য এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। চট্টগ্রামের কোন ছাত্রের পরীক্ষার সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে, কাশীতে বুড়ামঙ্গলের মেলায় আমোদ করতে গিয়ে কবি এক মুহূর্তে বিস্মৃত হতে পারেন নি দেশের অতীত গৌরব তথা বর্তমান দুর্দশার কথা। কখনো খেদ করে বলেছেন,—

এই নহে আর্য্যাবর্ত
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার,
তাহাদের বীর্য্য-বল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তৃণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার,
আমাদের অশ্রুজল, ভিক্ষা পাত্র সার!
(আর্য্যদর্শন, অবকাশরঞ্জিনী, ১ম ভাগ)

কখনো শ্লেষ করে বলেছেন,—

আসিয়াছ শঙ্কে! [illegible]
কিন্তু ইংরেজের [illegible]
([illegible], ঐ)

কখনো পরিহাস,—

শান্তি,—শান্তি দিবে, কিন্তু নাহি আর
স্বাধীনতা-সুখ কাড়িতে বিদ্রাম,
(বাঙ্গালীর বিবসায়, ঐ)

কিন্তু কবিতা হিসেবে এগুলি জনপ্রিয় নয়। আসল কথা স্বদেশপ্রেম নবীনচন্দ্রের কাছে ছিল ধর্মের মত গভীর। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ যুগের কাব্যলক্ষণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—

"........ but a tremendous urge for the national uplift must have worked deeply in their sub-conscious" ...... (Studies in the Bengal Renaissance P. 261)

এ কথা নবীন সেন সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

হতে পারে তাঁর কাব্যে বুদ্ধির চেয়ে আবেগ-প্রাবল্য বেশী, হতে পারে তাঁর কাব্যে অসংযমের অমিত প্রাধান্য, কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলী জুড়ে একটি অনুভূতিপ্রবণ স্বদেশপ্রেমিক চিত্তই আছড়িয়ে পড়ে যায় তরঙ্গে তরঙ্গে পরাধীনতার জ্বালা—আর দেশপ্রেমের উন্মাদনা। রানী ভবানীর কণ্ঠে তাই তাঁর কণ্ঠ মিশে যায়,—

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে তীব্র অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতর।

মোহনলালের সঙ্গে তিনিও গর্জন করে ওঠেন,—

দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন
যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর?

কখনো সুগভীর বেদনায়,—

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব! করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ-রজনী!

....

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু জলে?
যাও তবে, যাও দেব! কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কাজ এখন তা আর! ফিরিয়া আবার?
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ভবানীর উক্তি কি ভগ্নদূতবাণীর মত শোনায় না,—

কেন দিয়ে থাল পাটি আনিবে কুমীরে?
প্রদানিবে স্থির গৃহে স্বহস্তে অনল?

নবীন সেনের কাব্যে দেবতা নেই, দৈত্য নেই, পদ্মিনী নায়িকার প্রেম-বিরহ-শোকাশ্রু নেই। কিন্তু তাঁর কাব্য পড়তে পড়তে হৃদয়ের শোণিত উচ্ছলিত হয়—মৃন্ময়ী জন্মভূমি চিন্ময়ীরূপে হয়ে প্রত্যক্ষ হন। এইখানেই নবীন সেনের প্রতিভা। আদর্শকে তিনি অন্তরঙ্গ দান করতে পারেন। দেশপ্রেম তাই তাঁর মধ্যে এমন ঘনীভূত —এমন সজীব।

বঙ্কিমচন্দ্র নবীন সেনের দেশপ্রেম সম্বন্ধে বলেছিলেন,—

"নবীনবাবুর যখন স্বদেশ-বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছ্বসিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না। সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়-শূন্য তেজময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসা-প্রার্থিত ক্রোধ দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর......।"

এখানে প্রশ্ন দেশপ্রেম বীর রসের অন্তর্গত এবং বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ। উৎসাহ কি করে ঢেকে চেপে প্রকাশ পেতে পারে? তার মধ্যে আবেগ থাকবেই— সে আবেগ যদি অপরের মনে তরঙ্গ তোলে তবে তা সার্থক সৃষ্টি। নবীনচন্দ্র তা পেরেছেন। তাঁর 'অবকাশরঞ্জিনীর' খণ্ড খণ্ড দেশাত্মক চিন্তাগুলি পলাশীর যুদ্ধে একটা সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে। বাঙালী সেনার প্রতি মোহনলালের প্রতিরোধ আহ্বান অংশটি উদ্দীপনা ও আন্তরিকতায় বাংলা সাহিত্যে একটি স্মরণীয় অংশ। 'কালের সাক্ষী' কবি পলাশীর যুদ্ধে যে মহাদৃশ্যের উন্মোচন করেছেন তা হোল ভারতের ভাগ্য-চক্র—যে ভাগ্য বারবার আত্মজনের বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যুদস্ত হয়েছে।

নবীন সেনের কবিকল্পনা শুধু ব্যর্থতার ইতিহাস আঁকে নি—শুধু সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রচার করে নি। 'কালের শিক্ষক' কবি সমাধানের পথও নির্দেশ করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন আজ আমাদের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে যে অবনতি তার মূল আছে সুদূর অতীতে—সেই অনেকের প্রাচীন ইতিহাসে—আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বে—ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতরের সংঘর্ষে। গৃহভেদ, জাতিভেদ, রাজ্যভেদ, ধর্মভেদকে তাই তাঁর আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বর্জন করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এক মহা ঐক্য। আজকের দিনে যে National integration এর কথা আমরা বলি তাঁর স্বপ্ন দেখে গেছেন নবীনচন্দ্র। তাঁর আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানলব্ধ মহাভারতের মূলমন্ত্র,—

শুনিলাম—এক জাতি মানব সকল;
এক বেদ—মহাবিশ্ব অনন্ত অসীম;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব হৃদয়;
একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম সাধন;

(রৈবতক—সপ্তম সর্গ)

অন্যত্র,—

শিখাব একত্ব মর্ম
এক জাতি, এক ধর্ম
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,—

(ঐ, সপ্তদশ সর্গ)

এ বিষয়ে নবীনচন্দ্রের বক্তব্য স্মরণ করি,—

"বুঝিলাম অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই নাম মহাভারত।...বুঝিলাম তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না।"

('আমার জীবন,' ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২২)

নবীন সেনের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ স্বদেশপ্রেম প্রশান্তি লাভ করেছে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে।

NEW
Pepsodent
You'll wonder where the yellow went
NEW
Pepsodent
TOOTHPASTE

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

রাজ্যেশ্বর মিত্র

স্বদেশপ্রেম মানবহৃদয়ের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি, কিন্তু পরিবেশ অনুযায়ী তার স্বরূপ বিভিন্ন। স্বাধীন দেশের অধিবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম যে আকারে থাকে, পরাধীন দেশবাসীর হৃদয়ে ঠিক সেই আকারে থাকে না। দুর্বল সন্তানের প্রতি মার স্নেহ যেমন প্রবল আবেগ এবং অনুকম্পামিশ্রিত পরাধীন দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম অনেকটা সেই প্রকার। স্বাধীন দেশের লোক জাতির ত্রুটিকে ক্ষমা করে না। তার স্বদেশপ্রেম বলিষ্ঠ এবং বিচারনির্দিষ্ট। পরাধীন দেশবাসী জাতির ত্রুটিকে গভীর স্নেহে আবরিত করে এবং গুণের উন্মেষকে প্রবল উদ্দীপনায় প্রচারিত করে। রুক্ষ ভূমিতে যারা বাস করে, তারা যেমন সামান্য তৃণ শষ্পকেও আদরের সঙ্গে রক্ষা করে, তেমনি পরাধীন দেশের লোক তাদের সামান্য আত্মনির্ভরশীলতাকে বিপুল গৌরব প্রদান করে। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তৎকালীন অপরাপর মনীষী, যাঁদের রচনার স্বদেশপ্রেম প্রধান বস্তু, তাঁদের রচনার অনুশীলনে এই কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা ছিলেন সেই যুগের লোক, যে যুগে পরাধীনতার অভিশাপ অসহায় জনচিত্তকে জর্জরিত করে তুলেছে, কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করবার মত প্রচুর ক্ষমতা অর্জিত হয়নি। এই অপারগতার সান্ত্বনাস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ রচয়িতাগণ কাব্যে, সঙ্গীতে স্বদেশের স্বপ্নগত পরিকল্পনাকে হৃদয়াবেগের উজ্জ্বলতায় রূপায়িত করেছেন। এই থেকেই ভারতমাতার বিবিধ পরিকল্পনার অভ্যুদয়। যে মহাবীর্য থেকে আমাদের জাতি বঞ্চিত, তার সমস্ত মহিমা দেশমাতৃকার উপর আরোপ করে আমরা প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছি। দ্বিজেন্দ্রলালের অমর সঙ্গীত "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ"—বাঙলার অতীত কীর্তির স্মরণে মুখর। মহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে কবি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই যুগের স্বদেশ-সঙ্গীতে যাবতীয় রূপমাধুর্য দেশ-জননীর উপর প্রতিফলিত। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি। সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি"—এই চিন্তারই প্রতীক। ঐ গানগুলি পরাধীনতার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে, তার কারণ আরাধ্য দেবতার মত আমাদের কাম্য গুণগুলি আমরা এইসব গানের মাধ্যমে দেশের উপর আরোপ করেছি। এই সঙ্গীতগুলি যেন অর্চনার স্তুতিমন্ত্র, যার প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তকে শুভভাবে জাগ্রত করা।

যদিচ জনসাধারণ এই সঙ্গীতগুলিতেই স্বদেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন তথাপি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমগত যে মূল চিন্তা, তা এইগুলিতে বিধৃত হয়নি। দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যে তথা দ্বিজেন্দ্র-হৃদয়ে যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, তা কেবল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ নয়; তার মধ্যে ছিল বিচার, বিশ্লেষণ এবং আত্ম-সমালোচনা। এই বিবেকবান স্বদেশচিন্তা যে কেবলমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালেরই ছিল এমন নয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মনোভাবকে যেরকম অকুতোভয়ে প্রকাশ করেছেন, তেমনভাবে প্রকাশ করবার পৌরুষ অনেকেরই ছিল না। সত্যভাষণের এই দৃঢ়তা দুর্লভ। "কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ। গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ॥" বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে দেশবাসীর প্রতি এই উচ্চারণ, এ কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষেই সম্ভব ছিল। নানা কারণে দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটক সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে মানবতা এবং স্বদেশীচিন্তার যে বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সাফল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বদেশী যুগে গণ-মানসে তাঁর নাটক যে প্রেরণা প্রদান করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলে তাঁকে সাধুবাদ না দিয়ে পারা যায় না। প্রতাপ সিংহ, মেবার পতন, নাটকে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনের বহু গ্লানির উল্লেখ করেছেন। সে-যুগে সেই ত্রুটিগুলি তেমনভাবে দেখিয়ে দেবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। হিন্দুত্বের [illegible] কারণ, তাঁর মত সূক্ষ্ম [illegible] চিন্তা দিয়ে খুব কম ব্যক্তিই বিচার করে দেখেছেন। স্বদেশের [illegible] দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে [illegible] তথা হিন্দুর সমাজ-জীবন বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে তাঁর [illegible] [illegible] আদৌ অধিকার করেনি। তাঁর আষাঢ়ে, মন্দ্র, আলেখ্য—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থই বস্তুধর্মী অথচ এই বাস্তব চিত্রগুলি উপযুক্ত কবিতাতেই প্রকাশ পেয়েছে। আষাঢ়ে—কাব্যগ্রন্থটিকে কবি "গুটিকতক হাসির গল্প" বলেছেন। কিন্তু, এই হাসি করুণ রসে অভিষিক্ত। বাঙালী জীবনের ব্যর্থতাকে তিনি নিপুণ ব্যঙ্গে ধিক্কৃত করেছেন। আলেখ্য কাব্যগ্রন্থে চাষী এবং নেতা দুই-এরই চরিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। এই বর্ণনা যেমন সত্য বিশ্লেষণ তেমনি বাস্তবানুগ। এযুগেও আমরা তথাকথিত নেতা-সম্বন্ধে তাঁর কথাই বলতে পারি—

> স্বদেশভক্তি কস্মিনকালেও নষ্ট
>
> কার্পেটমোড়া ত্রিতল কক্ষে বসে থেকে
>
> মা মা বলে নাকিসুরে কান্না
>
> নিয়ে যাও সে-ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে
>
> মা সে শৌখীন মাতৃভক্তি চান না।

যে-কোন ইলেকশনের প্রাক্কালে নেতা কবিতাটি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে দ্বিজেন্দ্রলাল পেশাদার উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজ-নীতিকদের কেমন নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ঠিক তেমন করেই তিনি দেখে-ছিলেন কীভাবে দরিদ্র শ্রেণী শোষিত হয়ে আসছে। তাদের আশ্বাস দিয়ে তিনি দৃঢ়স্বরে বলতে পেরেছিলেন:—

> ওরে ও ভাই চাষী? ওরে ও ভাই তাঁতি?
>
> পড়িস মাক মরে; [illegible] এসব ফাঁকি
>
> তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের কন্ধ যারে
>
> করবে তোদের উপর [illegible] খাঁটি?
>
> সারিবদ্ধ হয়ে একবার মাথা তুলে
>
> দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজাভাবে,—
>
> দেখবি এই যে স্পর্ধা—চূর্ণ হয়ে যাবে।
>
> উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষে যদি তোরা
>
> এদের সামনে কেন মাথা [illegible] রাখি?
>
> সমস্বরে বল "এই সকলেরই মাটি,
>
> কারো চেয়ে কারো বেশী নাই ক দাবী।"

এই বক্তব্যের কঠোর সত্য তিনি বহু কবিতায়, নাটকে, গানে প্রকাশ করেছেন। কোথাও [illegible] তিনি দেখেছিলেন কল্পনা দিয়ে নয়, পরিষ্কার বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে। [illegible] [illegible] বিরুদ্ধে অভিযান [illegible] দ্বিজেন্দ্রলালের মত দৃঢ়তা নিয়ে আর কেউ করেননি, কারণ এই দুটি উপাদানে [illegible] আমাদের দেশে

জাতির সম্ভাবনা কত অধিক, তা তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে অবিদিত ছিল না।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে একথা সর্বাগ্রে মনে রাখা কর্তব্য যে, যা তিনি নিজে দেখেননি বা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেননি, তা একবারও বলবার চেষ্টা করেননি। কৃত্রিমতা তাঁর চরিত্রে আদৌ ছিল না এবং এই স্বভাবটি তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। সহজ, সরল এবং তেজস্বী মানুষ ছিলেন তিনি। কৈশোরে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছিলেন। চাকুরীর ব্যাপারে বার বার ইংরেজ ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধ ঘটেছে। লাটসাহেবকে তিনি খাতির করে কথা বলেননি। বাংলা বিহারের নানা স্থানে তিনি ঘুরেছেন। ইতর ভদ্র নানা জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। তাদের তিনি যাচাই করে দেখেছেন। তাঁর পূর্বে আরও অনেক উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী ছিলেন, যাঁরা সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁরাও কিছু কিছু রাজরোষের পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল দস্তুরমত নাকাল হয়েছিলেন। রাজরোষ যে কী বস্তু, তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বস্তুত তাঁর জীবনে প্রভূত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ছিল, যার ফলে তিনি তাঁর দেশের বিবিধ চরিত্রে আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তখন এম-এ পড়েন। এক শনিবারে গিয়েছেন গড়ের মাঠে ক্যালকাটা ইণ্টারন্যাশনাল এক্‌জিবিশন দেখতে। সেখানে এক ভদ্রমহিলাও এসেছেন কয়েকজন সহচরীকে নিয়ে। সুযোগ পেয়ে কতকগুলি ফিরিঙ্গী ছোকরা লাগল তাঁর পিছনে। ভদ্র-মহিলার অসহায় অবস্থা দেখামাত্র দ্বিজেন্দ্র-লাল তাদের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু প্রতিবাদে বিশেষ কিছু হল না। কোনক্রমে ভদ্রমহিলাকে গাড়িতে তুলে দেবার পর ফিরিঙ্গীদের দলবদ্ধ আক্রমণে তিনি দস্তুরমত আহত হলেন। অবশেষে যেসব বাঙালী ভদ্রমহোদয় দূরে থেকে ব্যাপারটা দেখছিলেন, তাঁদের মঙ্গলবুদ্ধি জাগ্রত হল এবং তাঁরাও যুদ্ধস্থলে এগিয়ে এলেন। বেগতিক দেখে ফিরিঙ্গীর দল রণে ভঙ্গ দিল। তাদের যে দলপতি ছিল, সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের সাহস ও তেজস্বিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে করমর্দন করে বিদায় নিয়েছিল। এর পরেও একবার ট্রামে এক সাহেবের সঙ্গে অভদ্র আচরণ নিয়ে তাঁর বিবাদ বেধেছিল; সেবারও তিনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কিন্তু ততটা অগ্রসর হতে হয়নি। তাঁর নিজের দেহে যথেষ্ট শক্তি ছিল বলে জাতিকে ক্ষমতা অর্জন করবার জন্য তিনি বারবার আহ্বান জানিয়েছেন, আর বাঙালীর ভীরুতা কার্যক্ষেত্রে বারবার লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তাকে কঠিন ভাষায় বিদ্রূপ করেছেন।

বিলাতে প্রবাসকালে তিনি ইংরেজদের জাতীয় জীবন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর বিলাতের পত্রগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র—এই তিনটি স্তর সম্পর্কেই তাঁর বর্ণনা সরস এবং চিত্তাকর্ষক। প্রতি পদেই তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করেছেন এবং কেবলমাত্র ইচ্ছার দৃঢ়তা থাকলেই আমাদের জাতীয় জীবন কত উৎকৃষ্ট হতে পারত, তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশের কৃষকদের মনোভাব সম্বন্ধে বহুদিন পূর্বে তিনি যা বলেছিলেন, তা আজও অনেকখানি সত্য। এখনও "আমাদের কৃষকেরা কি গরীব, কি দুরবস্থাপন্ন! যেদিন যাহা পায়, প্রায় সেই দিনই তাহা ব্যয় করে। সঞ্চিত অর্থ নাই; আত্মরক্ষার বাসস্থান নাই; তৃণাবৃত কুটীরে শতধাছিন্ন বিছানায়, শতগ্রন্থিময় বসনে বহু সন্তানের পিতা সেই কৃষক দীন-ভাবে কোনপ্রকারে জীবনযাপন করে।" দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন যে "সর্বস্থানে সর্বস্বান্ত" এই দুরবস্থার মূলে। এদের সমস্যা যে জাতীয় হতে পারে, তা এদের ধারণাতেই আসে না।

এরা অভিজাত বাস্তুজনমী এবং মধ্যস্বত্বভোগী উপকারিতায় অবিশ্বাসী। দুর্ভিক্ষ হলে তারা কেবল বিধিনির্বন্ধের দোষ দেয়, নিজের অদৃষ্টকেই অভিশাপ দেয়। বর্তমান স্বদেশী শাসনে কৃষকদের কিছুটা সুবিধা হয়েছে বটে এবং যুগধর্মে এদের মধ্যেও কিছুটা বিক্ষোভ মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কিন্তু একসঙ্গে চেতনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি। দেখা গেলে আপনা থেকেই আমাদের সমাজ-জীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিত। বহুকাল পূর্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল উন্নত প্রথায় কৃষিকর্মের প্রস্তাব জানিয়েছিলেন। তিনি নিজেও কৃষিবিদ্যাই শিক্ষা করেছিলেন। দেশের কৃষিকর্ম সম্বন্ধে পরিবর্তনের চিন্তা তাঁর অনধিকার চর্চা ছিল না বা ভাবালুতা নয়। স্বদেশের উন্নতিকল্পে খুব বড় পরিকল্পনা বা ব্যয়সাধ্য প্রয়াস সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্য ছিল না, তিনি বারবার এই কথাই বলেছেন যে, আমাদের যা আছে, তাকেই যদি আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তা হলে আমাদের দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর হয়। এর জন্য যে গুণ-গুলি দরকার, সেইগুলি আয়ত্ত করবার উপদেশই তাঁর সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে-ও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রত্যয়।

বিলাত থেকে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রী অর্জন করে ফিরে এসে তিনি পেলেন সামান্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি। এর কারণও তাঁর চরিত্রের তেজস্বিতা। যে যুগে লাট-সাহেবকে দেখলে চাকুরিপ্রার্থী বাঙালী গদগদ হয়ে পড়তেন, সে যুগে চাকরির ইণ্টারভিউয়ে লাটসাহেবকে তিনি বিশেষ প্রাধান্যই দিলেন না। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশী বেদনা তিনি পেয়েছিলেন সেই সময়ে তাঁর প্রতি সমাজের ব্যবহারে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁকে আলাদা করে রাখলেন। বিলাতে যাবার জন্য তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করবার পরামর্শ দেওয়া হল। যে সমাজের হিতার্থে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভূত

[illegible] করে আনতাইলেন, সেই সমাজেই তাঁকে একঘরে করবার সিদ্ধান্ত করল। সমাজের এই সংকীর্ণতা সম্বন্ধে তিনি এর আগেই আলোচনা করেছিলেন। বিলাত থেকে একটি চিঠিতে তিনি এবিষয়ে তাঁর মন্তব্য জানিয়েছেন—"অনেকেই সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না, এ আশঙ্কার কারণ কি। সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই তো সমাজ। সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে কি ক্ষতি আমারই কেবল? তাহার নহে? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া হীনবল হইল না? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি কি সমাজকে পরিত্যাগ করিলাম না? অবশ্য ক্ষতি আমার অধিক, কিন্তু পরিণামে সমাজেরই ক্ষতি। এইভাবে নূতন সমাজ গঠিত হইবে, নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে।" এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তিনি "একঘরে" নক্শা রচনা করেন। প্রাচীনপন্থীরা এই বিদ্রূপে আরো জ্বলে উঠলেন। এক ভদ্রলোক কলেজ স্ট্রীটের এক দোকান থেকে বইটি চেয়ে নিয়ে সেখানেই পড়তে আরম্ভ করলেন। পড়া শেষ করে তিনি এমনি চটে গেলেন যে, স্থান কাল ভুলে সেই দোকানেই বইটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে পা দিয়ে থ্যাঁৎলাতে লাগলেন। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। এইসব কঠিন আঘাতের ফলেই সমাজ ক্রমে তার ছিদ্র বুজতে পেরেছে এবং ব্যাপকতর হয়ে বর্তমান উদারনীতিতে আস্থা স্থাপন করেছে।

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে যখন থেকে তিনি ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড এগ্রিকালচার বিভাগে সেটল্‌মেন্টের কাজে নিযুক্ত হন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচিন্তা কতখানি বাস্তবধর্মী ছিল তা এই যুগের দ্বিজেন্দ্রলালকে না জানলে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। জরীপের কাজে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে তিনি বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন; তারপর সেটলমেন্ট অফিসার হয়ে আসেন বর্ধমান এস্টেটের সুজামুঠা পরগণায়। এইখানে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন আগেকার অফিসারেরা জরীপে জমী বেশী পেলেই খাজনাও বেশী ধার্য করে দিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ব্যবস্থা সঙ্গত বিবেচনা করলেন না। প্রজার সঙ্গে যখন প্রথমে জমী বন্দোবস্ত করে দেওয়া হত তখন মেপে দেওয়া হত না। আন্দাজ করে জমীর পরিমাণ লিখে দেওয়া হত। সেই জমীই জরীপে তার চেয়ে বেশী প্রতীয়মান হওয়া খুবই সম্ভব। তার জন্য প্রজার কাছে বেশী খাজনা চাওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়। সুতরাং জমিদার তাঁর [illegible] বেশী [illegible]

[illegible] কম হবার বদলে তিনি প্রজাদের খাজনা কমিয়ে দিলেন। এই ব্যাপারে জমিদারী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল। জজের কাছে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হল এবং জজ তাঁর ব্যবস্থা পাল্টে প্রজাদের খাজনা বাড়িয়ে দিলেন। লেফটেনান্ট গভর্নর স্যর চার্লস ইলিয়ট নিজে একটি তদন্তের অছিলায় এসে দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রচুর তিরস্কার করলেন। হুজুরের অন্যায় ধমক মেনে নেবার মত লোক ছিলেন না দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনিও লাট সাহেবের মুখের ওপর বলে এলেন যে তিনি যা করেছেন তা বাংলা দেশের সেটল-মেন্ট আইন অনুসারেই করেছেন। লাটসাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেটলমেন্ট ম্যানুয়েলে সেটলমেন্ট অফিসারদের কর্তব্য বিষয়ে একটি দীর্ঘ মন্তব্য যোজনা করলেন এবং দ্বিজেন্দ্র-লালের প্রমোশন রহিত করে দিলেন। ইতি-মধ্যে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হল। হাইকোর্ট জজের রায় উলটে দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রায়কে সমর্থন করলেন। এ ছাড়া আর এক আপীলে স্যর চার্লসের মন্তব্যটি বিশেষভাবে নিন্দিত হয় এবং অবশেষে এটি সেটলমেন্ট ম্যানুয়েল থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই সময় থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর রাজরোষ স্থায়ী হয়ে বসে। ঊর্ধ্বতন একজন ইংরেজ অফিসার তাঁর প্রতি বিশেষ সদয় ছিলেন বলে তাঁর চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়নি নতুবা সেটাও অপ্রত্যাশিত ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালও এই ব্যবহারের জবাব দিলেন তাঁর এক প্রকাশ্য বক্তৃতায়—অনেস্টি ইজ নট দি বেস্ট পলিসি। এই সময় থেকেই ডি এল রায়ের সাহেবি পোশাক খসে পড়ে গেল—তিনি হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল: আর সুজামুঠার লোকে তাঁর নাম দিলে—দয়াল রায়।

এর পর থেকে তাঁর কাব্যে এক গাম্ভীর্য নেমে এসেছে। মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলিতে বারবার দেশের দরিদ্র সাধারণের মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে; বাংলা, বিহারের অপূর্ব গ্রাম্য সৌন্দর্যের রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জরীপের কাজে প্রতিদিন গ্রামের পর গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, চোখের ওপর দেখেছেন কেমনভাবে তারা থাকে, কেমনভাবে তারা শোষিত হয়। তাঁর আলেখ্য কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা তাঁর অভিজ্ঞতার উপলব্ধি থেকে রচিত। [illegible]

নরনারীর পদস্খলনের কাহিনী শুনেছেন। তাদের জীবনের ব্যর্থতা, বেদনা তাঁর অগোচর ছিল না। তাঁর কাছে সামান্য রূপোপজীবিনীও ছিল মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত। নিজের দেশকে বাস্তব চোখে দেখে এই বিশ্বাসই তাঁর হয়েছিল যে বহু সমস্যা, বহু ব্যর্থতা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট, এছাড়া কিছুটা ভাগ্যনির্দিষ্ট। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি প্রকৃত সাহিত্যিকের নিরাসক্ত উদার দৃষ্টিলাভ করেন যা বলিষ্ঠ স্নেহে ক্ষমায় স্নিগ্ধ, মধুর এবং পবিত্র।

তাঁর কর্মজীবন সুখের হয়নি। সরকার তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেও কঠিন দৃষ্টি রেখেছিলেন। গুপ্ত রিপোর্টের ফলে তাঁকে কোন কোন রচনার জন্য কৈফিয়ৎও দিতে হয়েছে। এইসব কৈফিয়ৎ লিখতে তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু, চাকরির খাতিরেও তিনি সরকারের মনস্তুষ্টি বিধান করেননি। তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তার দরুণ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করলেও পরোক্ষভাবে নাকাল করতে ছাড়েননি। অসন্তোষনিবন্ধন তাঁর ছুটির দরখাস্ত বার বার নামঞ্জুর হয়েছে। খুলনা থেকে বহরমপুর, বহরমপুর থেকে কালনা সেখান থেকে গয়া, এইভাবে অল্প কদিনে তাঁকে বদলী করে সরকার তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অবস্থাতেই গয়াতে তিনি 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ' গানটি রচনা করেন। এই গানটি গাইতে গাইতে তিনি বিশেষ উত্তেজনা অনুভব করতেন যার ফলে তাঁর রক্তপ্রেসার বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত রক্তপ্রেসারই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বদেশী যুগে সরকারী কার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যখনই তিনি কলকাতায় এসেছেন তখনই গান লিখেছেন শোভাযাত্রায় এবং সভাস্থলে সেগুলি গেয়েছেন। তাঁর বন্ধুরা এ বিষয়ে তাঁর মত নির্ভীক ছিলেন না। তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কিছু রচনা তাঁকে নষ্ট করে ফেলতে হয়। এর জন্য তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। তিনি জানতেন সরকার তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং যদি চরম ব্যবস্থাই গৃহীত হত তাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষুব্ধ হতেন না। চাকরির মোহ তিনি অনেক পরিমাণেই ত্যাগ করেছিলেন। চাকরি ছেড়ে দেবার জন্যও তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তার জন্য তিনি সরকারকে দোষারোপ করতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ছিল খুবই স্পষ্ট। শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পেতে হবে এটা স্বাভাবিক। সুতরাং সে শাস্তি তিনি প্রাপ্য বলেই মনে করতেন; কিন্তু তাঁর কাছে অসহ্য ছিল সেকালকার নেতাদের ভণ্ডামী যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে দেশের কাছে হাততালি কুড়াবেন অপরপক্ষে শাস্তি গ্রহণের বেলায় নানা ওজর আপত্তি পেশ করবেন। এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব একটি পত্রে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে :—

'আমরা অপরাধী হই—বেশতো জেল দিতে হয় দাও—এই বলে সদর্পে জেলে যাব না দেখি। কিন্তু চোখ রাঙিয়ে তারপরেই চাবুক খেয়ে পড়ে গিয়ে উড়ে বেড়ানোর মত এই কান্না হাইকোর্ট আপীল, এক হুজুরের কাছ থেকে আর এক হুজুরের কাছে দরবার—এই যদি স্বদেশীর কাজ হয় ত কাজ নেই বাবা। তার চেয়ে চন্দ্রের পরিধি থেকে আগে ভাগেই সরে দাঁড়ানো ঢের ভালো।'

দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে একটি কথা বড় সত্য। যা তিনি বলতেন, সেইটুকুই করেছেন। [illegible] অসাধ্য ছিল সেদিকে হাত বাড়াননি। বাস্তব হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই সব বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা না করলে দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের স্বদেশচিন্তার স্বরূপকে উপলব্ধি করা যাবে না। বর্তমান সমালোচকদের অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যে উচ্ছ্বাসের আধিক্য সম্বন্ধে অভিযোগ করেন, কিন্তু তাঁরা দেখেন কবির জীবনের সঙ্গে সমন্বয়ভাবে পর্যালোচনা করে তাঁর বক্তব্যকে [illegible] করেননি। [illegible] উচ্ছ্বাসের কিছু আধিক্য আছে [illegible] কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] স্বদেশ [illegible] কবিতা এবং গান রচনা করেছেন [illegible] এই সব ক্ষেত্রেই [illegible] মনোভাবসম্পন্ন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বাধীনতার [illegible] ভক্ত।

একবছরের উল্লেখযোগ্য বই

১৫ বৈশাখ, ১৩৬৯—১৪ বৈশাখ, ১৩৭০

রবীন্দ্ররচনা

গল্পগুচ্ছ (৪র্থ খণ্ড)	৫.০০	বিশ্বভারতী
ছন্দ	৮.০০	বিশ্বভারতী
দীপিকা শোভন ৮.৫০ সাধারণ ৭.৫০		বিশ্বভারতী
বীরপুরুষ	১.৩০	বিশ্বভারতী
লক্ষ্মীর পরীক্ষা	১.০০	বিশ্বভারতী
স্বদেশী সমাজ	৩.০০	বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রচর্চা

আমাদের গুরুদেব	৩.৫০	সুধীরঞ্জন দাস	...	বিশ্বভারতী
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ	১২.০০	কাজী আবদুল ওদুদ	..	[illegible]
কবি মানসী	১২.৫০	জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	ডি এম লাইব্রেরী
গুরুদেব	৫.০০	রানী চন্দ	...	বিশ্বভারতী
পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ	৩.০০	সুকুমার সেন	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ	৮·০০	[illegible]	...	এ মুখার্জি
রবীন্দ্র চিন্তন [illegible]	৬·০০	[illegible]	...	বুকল্যান্ড
রবীন্দ্র কথা	২·০০	[illegible] মুখোপাধ্যায়	...	[illegible] এ পি
রবীন্দ্রদর্শন অন্বীক্ষা	৬·০০	ডঃ সুধীর নন্দী	...	[illegible] পাব্লিশার্স
রবীন্দ্রনাথ	৫·০০	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	ডি এম লাইব্রেরী
রবীন্দ্রনাথ (কবি ও দার্শনিক)	১২·৫০	ডঃ [illegible]	..	[illegible] বুক হাউস
রবীন্দ্র নাট্য প্রসঙ্গ : কাব্য নাটক	৬·০০	ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত	...	স্ট্যান্ডার্ড পাব্লিশার্স
রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা	১২·০০	[illegible] ঠাকুর	...	বুকল্যান্ড
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য	১০·০০	ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত	...	বুকল্যান্ড
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারশ্য ও ইরাক ভ্রমণ	৫·৭৫	কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	আই এ পি
রবীন্দ্র নির্দেশিকা	১০·০০	নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী	...	ক্লারিয়ন পাবলিশার্স
রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী	৪·০০	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...	জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র শিশুসাহিত্য পরিক্রমা	৫·০০	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	...	নবারুণ
রবীন্দ্র-সরণি	১০·০০	প্রমথনাথ বিশী	...	মিত্র ও ঘোষ
রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে	১০·০০	বিশু মুখোপাধ্যায়	...	এম সি সরকার
রবীন্দ্র সাহিত্যের অভিধান (২য়)	৫·০০	হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল	...	
সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ	৫·০০	বুদ্ধদেব বসু	...	এম সি সরকার

কবিতা

অতীন্দ্রিয় আলোরেখা	২·০০	মণীন্দ্র রায়	...	সুরভি প্রকাশনী
অন্ধকার উদ্যানে যে নদী	২·০০	তরুণ সান্যাল	...	কথা শিল্প
অন্য দ্বীপ দ্বীপান্তর	১·৫০	[illegible]	...	মানস প্রকাশনী
অভিজ্ঞান শকুন্তলম (অনুবাদ)	৩·৭৫	[illegible] দাস	...	[illegible] পাব্লিকেশনস
আনন্দ ভৈরবী	২·০০	প্রমোদ মুখোপাধ্যায়	...	এম সি সরকার

ঝিঁঝিঁ ঝরার শব্দে	২·০০	শান্তি লাহিড়ী	...	সাহিত্য প্রকাশ
সন্ধ্যার জানালা	৩·২৫	মতি মুখোপাধ্যায়	...	আলফাবিটা
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত (বিদেশী কবিতার অনুবাদ সঙ্কলন)	১২·০০	শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত	...	নতুন সাহিত্য ভবন
সাত রং সাত আকাশ (অনুবাদ)	৩·০০	শান্তিভূষণ রায়	...	এশিয়া পাবলিশিং
সোনালি ডানার চিল	২·০০	অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	গ্রন্থজগৎ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

এই বিশ্বের কথাসাহিত্য	১৪·০০	আসত গুপ্ত	...	কথাকলি
ঘরে বাইরে সাহিত্য চিন্তা	৫·০০	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	...	সাহিত্য জগৎ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ	১০·০০	ডঃ সুশীল রায়	...	জিজ্ঞাসা
প্রবন্ধ সংগ্রহ (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)	৭·৫০	ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত	...	জিজ্ঞাসা
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য	২·০০	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	ভারতী লাইব্রেরী
বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্ব)	৮·০০	তারাপদ ভট্টাচার্য	...	এস গুপ্ত ব্রাদার্স
বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস	১৪·০০	সজনীকান্ত দাস	...	মিত্রালয়
বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস	৮·০০	ডঃ বিজিতকুমার দত্ত	...	মিত্র ও ঘোষ
বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার	১৬·০০	ভূদেব চৌধুরী	...	মডার্ন বুক এজেন্সি
বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা	৪·০০	তামসরঞ্জন রায়	...	জেনারেল প্রিন্টার্স
ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস	১৫·০০	সুকুমার সেন	...	গ্রন্থ প্রকাশ
ভাষাতত্ত্বের কথা	৬·০০	অতীন্দ্র মজুমদার	...	নয়া প্রকাশ
মধুসূদনের কাব্যালঙ্কার ও কবিমানস	৬·৫০	ডঃ সুবোধরঞ্জন রায়	...	মডার্ন বুক এজেন্সি
মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা	৪·০০	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	...	মডার্ন বুক এজেন্সি
সাহিত্য সংস্কৃতির সময়	৪·০০	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	...	নব সাহিত্য
সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে	১২·৫০	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মডার্ন বুক এজেন্সি

সংকলন

অনেক দিনের অনেক কথা	৪·০০	সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত	...	সুরভি প্রকাশনী
চিত্র বিচিত্র	৭·০০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	কথাকলি

বৈষ্ণব সাহিত্য, পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য

গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ	১৫·০০	বিমানবিহারী মজুমদার	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
দাশরথি রায়ের পাঁচালী	১৫·০০	হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত	...	,,
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি	৩·৫০	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	...	ভারতী বুক স্টল
চৈতন্য পরিকর	১৬·০০	রবীন্দ্রনাথ মাইতি	...	বুকল্যাণ্ড
পদ্মপুরাণ (কবি বিজয়গুপ্ত)	১২·০০	জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
বিদ্যাপতি শিবগীত	৪·০০	সুধীরচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
শাক্ত পদাবলী চয়ন	৩·০০	কমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	...	এম এল দে
শ্রীধর্মমংগল (ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত)	২০·০০	পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রীভক্তি সন্দর্ভঃ (শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত)	২০·০০	শ্রীরাধারমণ গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত	...	কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়

ভ্রমণ ও অভিযান

অনালগার সন্ধানে	৩·০০	অমিতাভ চৌধুরী	...	গ্রন্থপ্রকাশ
একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে	৬·০০	দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত	...	কনটেম্পোরারী পাব্লিশার্স
এভারেস্ট ডায়েরি	৯·০০	ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দত্ত	...	অলকা পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
জাপানী জার্নাল	৩·৫০	বুদ্ধদেব বসু	...	এম সি সরকার
জাহাজ	৫·০০	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	..	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
দেবভূমি দক্ষিণ	৬·৫০	অমরকান্তি ঘোষ		এ মুখার্জি

দ্বারকার পথে পথে	৩·০০	মনিমোহন ঘোষ	...	বরেন্দ্র লাইব্রেরী
ধ্যানমৌন হিমাচল	৪·০০	সাধনচন্দ্র পাল	...	বিশ্বনাথ পাব্লিশিং
নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি	৫·০০	গৌরকিশোর ঘোষ	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
রম্যাণি বীক্ষ (উৎকল পর্ব)	৭·৫০	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	...	এ মুখার্জি
রাশিয়ার ডায়েরি (১ম ও ২য়)	১৪·০০			
	১২·০০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
রূপমতী নগরী	৪·৫০	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
হিমাচলম	৩·৫০	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	আই এ পি

নানা নিবন্ধ

আকাশ ও পৃথিবী	১০·০০	মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ	...	আই এ পি
উড়িষ্যার দেবদেউল	৫·৫০	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	...	কনটেম্পোরারী পাব্লিশার্স
একদা যাহার বিজয়সেনানী	৩·০০	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	...	এস গুপ্ত ব্রাদার্স
কবি কণ্ঠ	৫·০০	সন্তোষকুমার দে	...	বিচিত্রা প্রকাশনী
ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অব এস্থেটিক	৬·৫০	ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য	...	মিত্র ও ঘোষ
খেলাধুলোয় বাঙলার মেয়ে	৫·০০	মুকুল	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
চীনের ড্রাগন	৩·৫০	ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ	...	বঙ্গ সাহিত্য
ছন্দসূত্রে প্রবেশিকা	১·৫০	অম্বিকাচরণ দাস	...	বরেন্দ্র লাইব্রেরী
নয়া বাংলা	১·০০	সুধীরকুমার মিত্র	...	বরেন্দ্র লাইব্রেরী
নেফার মানুষ	৫·০০	নলিনীকুমার ভদ্র	...	আর্ট অ্যান্ড লেটার্স
বাংলার সাধক বাউল	৪·০০	ইন্দিরা দেবী		ভারতী বুক স্টল

॥ সন ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তক ॥

উপন্যাস

পান্থশালা—বিমল কর	৩·৫০
ছায়াতীর—জরাসন্ধ	৫·০০
আলোর ভুবন—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	৫,
কাল, তুমি আলেয়া—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১২·৫০
সীমন্তিনী সীমা—অবধূত	৪,
মুখোশ—নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৫·৫০
সোনার হরিণ—আশাপূর্ণা দেবী	৫·০০
পা বাড়ালেই রাস্তা—প্রেমেন্দ্র মিত্র	৫·০০
কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য়)—বিমল মিত্র	১৪·০০
নদী থেকে সাগরে—প্রশান্ত চৌধুরী	৮·৫০
স্পর্শের প্রভাব—ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৪·০০
চন্দনবাটী—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৫·০০
যাত্রাপথ—নরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪·৫০
মেঘ ও মৃত্তিকা—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৫·০০
সন্ধ্যার কুয়াশা—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৫·৫০
রাতের রজনীগন্ধা—নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৪·৫০
দাদাঠাকুর—নলিনীকান্ত সরকার	৫·০০
বাহিবলয়—মৈনাক	৮·৫০
রোশনাই—সমথনাথ ঘোষ	৪·০০
রাত্রিবিলাপ—নীহাররঞ্জন গুপ্ত	৪·৫০

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রসরণী—প্রমথনাথ বিশী	১০·০০
রবীন্দ্রকাব্যের পুনর্বিচার—শচীন্দ্রশ মুখোঃ	৬·৫০
বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস—ডঃ বিজিতকুমার দত্ত	৮·৫০
উজ্জয়িনী পান্থী রবীন্দ্রনাথ—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	৫·০০

গল্প

পঞ্চদশী—বাণী দেবী	৫·০০
গল্পপঞ্চাশৎ—মনোজ বসু	১০·০০
যখন পলাশ ফোটে—সমথনাথ ঘোষ	৩·০০
স্মরণীয় দিন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৬·৫০

রম্যরচনা

শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা—সৈয়দ মুজতবা আলী	৬·০০

ভ্রমণ

হিমালয়ের পথে পথে—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৬·৫০
হিংলাজের পরে—অবধূত	৫·০০

অনুবাদ

এপ ও এসেন্স—অলডুস হাক্সলে	৪·০০

গ্রন্থাবলী

কান্তকবি রচনাসম্ভার—রজনীকান্ত সেন	১০·০০

জীবনী

শ্রীনেহরু—যামিনীকান্ত সোম	১·৭৫

অতিকথা

যা কিছু পেয়েছি—ইভিনর রুজভেল্ট	৪·০০

কিশোর সাহিত্য

রূপকথার ঝুলি—মৌমাছি	৩·৫০

ধর্মগ্রন্থ

জ্ঞানেশ্বরী	১২·০০	প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী	...	মহেশ লাইব্রেরী
বেদ মীমাংসা	১০·০০			সংস্কৃত কলেজ

অনুবাদ সাহিত্য

অস্তগামী সূর্য (ওসামু দাজাই)	৪·৫০	কল্পনা রায়	..	রূপা অ্যান্ড কোং
আজকের চীন (ডাঃ এস চন্দ্রশেখর)	১·০০	নিরঞ্জন হালদার	...	পরিচয় পাব্লিশার্স
কিন্নর দেশে (রাহুল সাংকৃত্যায়ন)	৬·৫০			মিত্রালয়
গণতন্ত্র প্রসঙ্গ (টমাস জেফারসন)	৩·০০	সুধীর দাশগুপ্ত	...	পরিচয় পাব্লিশার্স
গণতন্ত্রের ইতিহাস (ফার্ডিনান্ড পেবুটকা)	১·০০	ভজন দাশগুপ্ত	...	পরিচয় পাব্লিশার্স
গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি (জন এইচ হলওয়েল)	০·৭৫	সুধীরকুমার বসু	...	পরিচয় পাব্লিশার্স
ছায়াময় অতীত (মহাদেবী বর্মা)	৪·০০	মল্লিকা দেবী	...	রূপা অ্যান্ড কোং
জীবন জিজ্ঞাসা (আইনস্টাইন)	৮·০০	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	রূপা অ্যান্ড কোং
তবাইয়ের তরুণী (সেলমা লাগেরলফ)	২·০০	কল্যাণীশর সিংহ		বিচিত্রা

দি টাইম মেশিন (এইচ জি ওয়েলস)	২·০০	নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	... অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
দ্বারকানাথ ঠাকুর শোভন ১০·০০ সাধারণ (কিশোরীচাঁদ মিত্র)	৮·৫০	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	... সম্বোধি
নবম তরঙ্গ (৩য়) (ইলিয়া এরেনবুর্গ)	৭·৫০	সত্য গুপ্ত	... ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
নটা বাঘ আর একটা মস্ত হাতি (কেনেথ অ্যান্ডারসন)	৫·৫০	চিত্তরঞ্জন লাহিড়ী	... অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
বাংলার লোককথা (লালবিহারী দে)	২·৫০	গোবিন্দ গুপ্ত	... চতুরঙ্গ পারিশার্স
বিদ্রোহী তিব্বত (ফ্রাঙ্ক মোরেস)	১·২৫	জয়ন্ত রায়	... পরিচয় পারিশার্স
রুদ্রপ্রয়াগের চিতা (জিম করবেট)	৪·৫০	জগন্নাথ বিশ্বাস	... অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
রুশ গল্প সঞ্চয়ন	৬·০০	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	... ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
শহরতলীর শয়তান (বারট্রান্ড রাসেল)	৪·৫০	অজিতকৃষ্ণ বসু	.. রূপা অ্যান্ড কোং
সত্যই ভগবান (ম. ক. গান্ধী)	৩·৫০	বীরেন্দ্রনাথ গুহ	... গান্ধী স্মারকনিধি

স্মৃতিকথা ও আত্মচরিত

দ্বিতীয় স্মৃতি	৫·৫০	পরিমল গোস্বামী	... [illegible] প্রকাশ
নিজেরে হারায়ে খুঁজি	২০·০০	অহীন্দ্র চৌধুরী	[illegible]
স্মৃতিচারণ (২য়)	৬·৫০	দিলীপকুমার রায়	.. [illegible]

অভিধান

বিবিধার্থ অভিধান	৬·৫০	সুধীরচন্দ্র সরকার	...	আই এ পি

সঙ্গীত

রবীন্দ্র সংগীত প্রসঙ্গ (২য়)	৫·০০	প্রফুল্লকুমার দাস		জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র সংগীতের নানাদিক	৪·০০	বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মিত্রালয়

নাটক

আগন্তুক	১·৭৫	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	ডি এম লাইব্রেরী
আনন্দমঠ (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র)	২·৫০	নাট্যরূপ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আর্ট এণ্ড লেটার্স
উত্তরণ	২·০০	নিখিল মুখোপাধ্যায়	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
এ কী অভিনয়?	২·৫০	জলধর চট্টোপাধ্যায়	...	সিটি বুক এজেন্সি
খরনদী স্রোতে	২·৫০	সুনীল দত্ত	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
গুরুভাব	১·৫০	বিধায়ক ভট্টাচার্য	...	সিটি বুক এজেন্সি
চার প্রহর	২·৫০	বীরু মুখোপাধ্যায়	...	আর্ট এণ্ড লেটার্স
ছায়াপথ	২·৫০	বিজন ভট্টাচার্য	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
দশ ভাগ ও আরও কয়েকটি	৫·০০	বনফুল	..	আই এ পি
দেশাত্মবোধক নাট্য সংকলন (১ম ও ২য়)	২·০০ ২·০০	[illegible] সম্পাদিত		জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
[illegible] : জীবন যৌবন	১·৫০	অমর গঙ্গোপাধ্যায়		জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

নাম নেই	২·০০	কিরণ মৈত্র	...	সিটি বুক এজেন্সি
নীলকণ্ঠের বিষ	২·৫০	মনোজ মিত্র	...	গন্ধর্ব প্রকাশনী
পতঙ্গ	২·০০	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	...	মিত্রালয়
পরীর ডানা	২·০০	সুকোমল বসু	...	শ্রীভূমি পাব্লিশার্স
পরোয়ানা	২·৫০	রমেন লাহিড়ী	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
পাশাপাশি	২·০০	স্বপনবুড়ো	...	ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং
বাঁধ	২·৫০	সুশীল মুখোপাধ্যায়	...	গ্রন্থপীঠ
বিবেকানন্দ	২·৫০	পরেশ ধর	...	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
মহাগুরু নিপাত	১·৫০	গঙ্গাপদ বসু	...	সিটি বুক এজেন্সি
মহারাজ প্রতাপাদিত্য	২·৭৫	আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ডায়মণ্ড লাইব্রেরী
মানব থেকে দেবতা	১·৫০	শম্ভুনাথ ভদ্র	...	চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
মেঘে ঢাকা তারা	২·৫০	নাট্যরূপ শক্তিপদ রাজগুরু	...	গ্রন্থপীঠ
লক্ষহীরা	২·৫০	মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	শ্রীগুরু
লোহার জাল	২·৭৫	ব্রজেন্দ্রকুমার দে	...	নির্মল সাহিত্য মন্দির
সংঘাত	২·০০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	সাহিত্যায়ন
সাহেব বিবি গোলাম (বিমল মিত্র)	৩·০০	নাট্যরূপ বৈদ্যনাথ ঘোষ	...	বাক সাহিত্য
সৈনিক	২·৫০	ধনঞ্জয় বৈরাগী	...	বাক সাহিত্য
স্বর্ণকীট ও জগুয়ান	২·০০	মন্মথ রায়	...	ডি এম লাইব্রেরী
স্বামী বিবেকানন্দ	২·৫০	অভিযাত্রী	...	শ্রীগুরু

ছোট গল্প

অতলান্তিক	৫·০০	আশাপূর্ণা দেবী	...	এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্স
অর্কিড	২·৫০	সুবোধ ঘোষ	...	আনন্দধারা
এংকোর	৩·০০	উৎপল দত্ত	..	সাহিত্যায়ন
কেউ তত লাজুক নয়	৪·০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	বর্তিক
কচিৎ কখনো	৩·৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	বাক সাহিত্য
গল্প পঞ্চাশৎ	১০·০০	মনোজ বসু	...	মিত্র ও ঘোষ
চন্দ্রমল্লিকা	২·০০	জ্যোতির্বিন্দু নন্দী	...	জ্ঞানতীর্থ
ছায়াকায়ার মায়াপুরে	২·০০	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	লেখাপড়া
জননী	২·০০	বিমল কর	...	বিশ্বাস পাব্লিশিং
জলভ্রমি	৩·০০	সতীনাথ ভাদুড়ী	...	বাক সাহিত্য
জোনাকি মন	২·০০	পবিত্রেশ মজুমদার	...	মণ্ডল বুক হাউস
দেহলি দিগন্ত	৪·০০	রমাপদ চৌধুরী	...	গ্রন্থপ্রকাশ
পণ্য কন্যা	৪·০০	অমিয়ভূষণ মজুমদার	...	নিউস্ক্রিপ্ট
পঞ্চরত্নী	৫·০০	শান্তা দেবী	...	মিত্র ও ঘোষ
প্রতিহারিণী	৪·০০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	...	মুকুন্দ পাব্লিশার্স
প্রেম ভালোবাসা ইত্যাদি	২·৫০	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আনন্দধারা
বনফুলের গল্পসংগ্রহ (প্রথমশতক)	৮·৫০	বনফুল	...	আই এ পি
বর্ণবর্ণিনী	৩·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	রূপা এণ্ড কোং
মন দেউলে দীপালোক	৩·৫০	দক্ষিণারঞ্জন বসু	...	কনটেমপোরারী পাব্লিশার্স
যখন পলাশ ফোটে	৩·৫০	মন্মথনাথ ঘোষ	...	মিত্র ও ঘোষ
রহস্যের অন্ধকারে	৪·০০	চিরঞ্জীব সেন	...	মুকুন্দ পাব্লিশার্স
শংখকঙ্কণ	২·৫০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	..	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
শ্রেষ্ঠ গল্প	৬·০০	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	আই এ পি
সাতটি রাত্রি	২·৭৫	বাণী রায়	...	ত্রিবেণী
সুধা হালদার ও সম্প্রদায়	৩·৭৫	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
স্মরণীয় দিন	৬·৫০	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	...	মিত্র ও ঘোষ
হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন	২·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ

উপন্যাস

অচেনা আকাশ	৪·০০	নগেন দত্ত	...	শিক্ষাভারতী
অনিলের পুতুল	৩·৫০	শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	...	মানস প্রকাশনী
অনেক আলোর অন্ধকারে	৪·৫০	পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য	...	সাহিত্যজগৎ

অন্য নন্দন	৪·০০	সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	গ্রন্থালয়
অন্তর্জলী যাত্রা	৫·৫০	কমলকুমার মজুমদার	...	কথাশিল্প প্রকাশ
অপাংক্তেয়	৪·০০	সুনীল চক্রবর্তী	...	ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ
অমিত্রাক্ষর ছন্দ	৩·০০	সৌরীন সেন	...	সাহিত্যায়ন
অয়নান্ত	৬·৫০	সমরেশ বসু	...	কথাকলি
অশ্বত্থঝোরা	৫·০০	শান্তা দেবী	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অসমাপ্ত চটান্দ	৫·০০	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	গ্রন্থপ্রকাশ
উর্বশীর তালভঙ্গ	৬·০০	প্রিয়দর্শিনী	...	নাভানা
এক জীবন অনেক জন্ম	৬·৫০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
এপার ওপার	২·৫০	ইন্দুনীল	...	কনটেম্পোরারী পাব্লিশার্স
এপিডেমিক	৩·৫০	সুনীলকুমার ঘোষ	..	বসু চৌধুরী
কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য় খন্ড)	১৪·০০	বিমল মিত্র	...	মিত্র ও ঘোষ
কত রঙ	৪·০০	প্রভাত দেবসরকার	...	গ্রন্থপীঠ
কন্যাসু	২·৫০	বনফুল	...	আই এ পি
কর্ণাট রাগ	৪·০০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	গ্রন্থালয়
কাচ	৩·০০	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	..	সম্বোধি
কাল তুমি আলেয়া	১২·৫০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	..	মিত্র ও ঘোষ
কালো চোখের তারা	৩·৫০	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
চোখের বাহিরে	২·৫০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	..	গ্রন্থশ্রী
চৌরঙ্গী	১০·০০	শংকর	...	বাকসাহিত্য
ছন্দ যদি মিল	৬·৫০	সংকর্ষণ বৈরাগী	...	[illegible]
ঝড়ের সংকেত	৩·৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	শ্রী ভারতী
তুমি তৃষ্ণার জল	৩·০০	শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়	..	[illegible]
নতুন পাঁচটি [illegible]	৩·৭৫	[illegible] চট্টোপাধ্যায়	.	[illegible]
দিন দুপুর রঙ	৬·৭০	[illegible] দেবী	..	[illegible]
দুপুর দাঁড়িয়ে বিকেল	৮·০০	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়	.	[illegible]
দেওয়াল (২য় খন্ড)	৮·০০	বিমল কর	...	ডি এম লাইব্রেরী
দেওয়ালের [illegible]	৭·০০	নরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য		[illegible]
নীলকণ্ঠী	৭·৫০	নরেন্দ্রকুমার মিত্র	.	গ্রন্থ প্রকাশ
নীলরেখা	৩·৫০	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়		বিহার সাহিত্য ভবন
নীল ঢেউ সাদা ফেনা	৪·০০	কুমারেশ ঘোষ		গ্রন্থগৃহ
পদ্মিনী	২·৫০	সুশীল রায়	.	আই এ পি
পরম্পরা	৪·৫০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	..	গ্রন্থপ্রকাশ
পরিবেশ	৬·০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	সাহিত্য জগৎ
পা বাড়ালেই বন্দর	৫·০০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	..	মিত্র ও ঘোষ
পাহাড়ী সন্ধ্যা	২·৫০	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	..	রীডার্স কর্নার
প্রমত্ত প্রহর	৫·০০	রাণী রায়	...	অর্চনা পাব্লিশার্স
বনপলাশির পদাবলী	৮·৫০	রমাপদ চৌধুরী	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
বন্ধনহীন গ্রন্থি	১·০০	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	...	দেবী
বসন্ত তিলক	৫·০০	সুবোধ ঘোষ	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
বিবাহের পূর্বপাঠ	১·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	...	শরৎ সাহিত্য ভবন
মনচোরা	৩·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আনন্দধারা
মনময়ূরী	৩·০০	শক্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	...	মানস প্রকাশনী
মনের বাঘ	৪·০০	গৌরকিশোর ঘোষ	...	ডি এম লাইব্রেরী
মসিরেখা	৯·০০	জরাসন্ধ	...	বাক্ সাহিত্য
ময়ূরের মন	১·৫০	সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ	..	তুলি কলম
মালদা থেকে মাকালবে	৩·০০	দীপক চৌধুরী	...	এম সি সরকার
মিলন মধুর রাতি	৩·২৫	প্রাণতোষ ঘটক	...	গ্রন্থ প্রকাশ
মেঘ	২·৫০	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	...	বসু চৌধুরী
মেঘ ও মৃত্তিকা	৫·০০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	মিত্র ও ঘোষ
যন্ত্রণার অনুভব	৩·০০	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	...	ঋত্বিক প্রকাশন
রক্তকমলী	৪·৫০	শক্তিপদ রাজগুরু	...	গ্রন্থ প্রকাশ
রজনীগন্ধার আয়ু	১·০০	বিজনকুমার ঘোষ	...	দেবী
রাঙা জবা চাঁদ	৪·০০	প্রতিভা বসু	...	আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
রাজচূড় ঈশ্বর	৫·০০	অচ্যুত গোস্বামী	..	মিত্রালয়
রোশনাই	৪·০০	মন্মথনাথ ঘোষ	...	মিত্র ও ঘোষ

শ্রাবণী	৯·০০	গৌরীশংকর ভট্টাচার্য	...	মিত্রালয়
সংঘমিত্রা	২·৫০	সংকর্ষণ রায়	...	গ্রন্থালয়
সন্ধ্যার কুয়াশা	৫·৫০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	মিত্র ও ঘোষ
সমুদ্র অনেক দূর	৩·০০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	ডি এম লাইব্রেরী
সূর্যশিখা	৩·৫০	মায়া বসু	...	গ্রন্থম
সে নহি সে নহি	১০·০০	চাণক্য সেন	...	ক্লাসিক
সোনারূপোর কাঠি	২·০০	কবিতা সিংহ	...	সুরভি প্রকাশনী
স্পর্শের প্রভাব	৪·০০	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	...	মিত্র ও ঘোষ

শিশুসাহিত্য

অচেনা প্রতিবেশী	১·০০	সতীকুমার নাগ	...	কলিকাতা পুস্তকালয়
অপরূপ রূপকথা	৩·০০	বুদ্ধদেব বসু	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
অশরীরী আত্মা	১·৫০	স্বপন বুড়ো	...	শরৎ সাহিত্য ভবন
অ্যান্ডারসেনের অমর গল্প	১·৫০	দেবদাস দাশগুপ্ত	...	বাক সাহিত্য
আবার ঘনাদা	২·৫০	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	আই এ পি
একদা যাহার বিজয় সেনানী	২·০০	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	...	জেনারেল প্রিন্টার্স
কবির গল্প শুনি	১·২৫	অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী	...	নয়া প্রকাশ
চলো যাই (ভ্রমণ কাহিনী)	১·৮০	ডঃ অমিয় চক্রবর্তী	...	শ্রীপ্রকাশ ভবন
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন	১·৮০	শিবরাম চক্রবর্তী	..	শ্রীপ্রকাশ ভবন
চাঁদে পাড়ি (উপন্যাস)	৩·০০	সুশীল ঘোষ	...	বাক সাহিত্য
ছেলেবেলার বিবেকানন্দ	২·০০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	...	সাহিত্য সংসদ
ছোটদের বৌদ্ধ গল্প	২·০০	সুলতা কর	...	সাহিত্য সংসদ
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	..	শ্রীপ্রকাশ ভবন
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	আশাপূর্ণা দেবী	..	শ্রীপ্রকাশ ভবন
ছোটদের ভালো ভালো গল্প	২·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়		শ্রীপ্রকাশ ভবন
ঝিলমিল রাজার দেশ	১·৭৫	সরলা বসু	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
টংলিং (উপন্যাস)	২·৭৫	লীলা মজুমদার	...	আই এ পি
টইটুই	২·০০	শৈলেন ঘোষ		শিশু সাহিত্য বিতান
ঢেউ কথা কয়	২·০০	সুভাষ সমাজদার	..	ভারতী বুক স্টল
তুই নাকি	২·০০	ননীগোপাল মজুমদার	..	চিনাকো
দণ্ডকারণ্যের বাঘ (উপন্যাস)	৩·০০	সাগরময় ঘোষ	...	বর্তিক
দুই পাহাড়ের মাঝের দেশ	২·০০	স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	..	সংযোগ
নীলকুঠির জংলায়	৩·০০	কানাই পাকড়াশী	..	মুকুন্দ পাবলিশার্স
নূতন পবন	২·০০	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
পিকনিক	২·০০	নমিতা বসু	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
পিকলুর সেই ছোটকা	২·৫০	গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	..	মুকুন্দ পাবলিশার্স
প্রেত পাহাড়ের সরোবর	২·০০	রথীন্দ্র সরকার	...	আনন্দধারা প্রকাশনী
বায়ুমণ্ডল (অনুবাদ)	১·৭৫	বিনয় মজুমদার	..	ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
বিদেশী গল্পগুচ্ছ (অনুবাদ	২·৭৫	বিমল দত্ত	...	অশোক পুস্তকালয়
বিদেশী ছড়া	২·০০	সুখলতা রাও	...	এম সি সরকার
বিলিতি ছড়া (২য় খণ্ড)	১·২৫	সুকমল দাশগুপ্ত	...	ইউনাইটেড বুক প্রিন্টার্স
ভোরের সূর্য (উপন্যাস)	২·০০	পরিতোষ মুখোপাধ্যায়	...	মুখার্জি বুক হাউস
বর্মাগিরির রহস্য	১·৫০	সুশীলকুমার গুপ্ত	...	লেখাপড়া
রত্নদ্বীপ	১·৮০	ক্ষিতি দাস	...	অশোক পুস্তকালয়
রূপকথার ঝুলি	৩·৫০	মৌমাছি	...	মিত্র ও ঘোষ
রেল নম্বর ২০৫	২·৫০	নির্মল গোস্বামী	..	গ্রন্থম
সাগর নদীর দেশে	৪·০০	দক্ষিণারঞ্জন বসু	...	মুকুল পাবলিশার্স
সিন্দবাদ সওদাগরের কাহিনী	১·৫০	পূর্ণ চক্রবর্তী	...	কলিকাতা পুস্তকালয়
সোনালি ছড়া	১·২৫	শৈবাল চক্রবর্তী	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা

শংকরীপ্রসাদ বসু

(১)

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তার আলোচনার অর্থ স্বামীজীর প্রায় সকল চিন্তার আলোচনা করা, কারণ ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের ধ্যান ও ধারণা উভয়েরই বিষয়। তিনি তাঁর সমস্ত ভাবনা ও অনুভূতির মূল উৎসরূপে এই ভারতকেই ধরেছিলেন। বিবেকানন্দই ভারতবর্ষ—একথা বহুকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বহু মনুষই অনুভব করেছেন ভারতবর্ষ তার অতীত ও বর্তমানের সমস্ত বেদনা নিয়ে বিবেকানন্দের মধ্যে সর্বাধিক প্রকাশিত।

শুধু একটা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তাকে প্রকাশ করতে হবে, যে চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের দেশনায়ক অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন তা এখনো সম্পূর্ণ উপলব্ধ বা কার্যকর হয়ে ওঠেনি এবং তারও চুয়ান্ন বছর পরে আধুনিক দেশনায়ক পণ্ডিত জওহরলাল বললেন,—আশ্চর্য, সেগুলি এখনো নূতন।

স্বামীজীর স্বদেশচিন্তার আলোচনায় তাঁর মূল বাংলা রচনাগুলির উপরে আমাকে নির্ভর করতে বলা হয়েছে। এই সব মূল বাংলা রচনার দ্বারাই স্বামীজী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। এখানে একটি কথা জানানো উচিত, স্বামীজীর ভাষণ ও রচনার যেসব অনুবাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ করেছিলেন, সেগুলি গত ৫০।৬০ বৎসর ধরে বহুভাবে পঠিত হয়ে এসে মূলের মর্যাদায় বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। 'কর্মযোগ' বা 'ভারতে-বিবেকানন্দকে' অনুবাদ বলে কে ভাবে? ইতিহাসবোধ-সম্পন্ন কোন্ বাঙালী জাতীয় চিত্তে এই সব গ্রন্থের বিপুল প্রভাবকে অস্বীকার করবেন? বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী শুদ্ধানন্দ উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী।

আলোচনার স্থান পরিমাণে অল্প। স্বামীজীর নিজস্ব বাংলা রচনার উপর নির্ভর করলে আমার সুবিধা হয় তাতে আলোচ্য বস্তুর পরিমাণ কমে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা' 'বর্তমান ভারত' পত্রাবলীর বাংলা চিঠি এবং বীরবাণীর কয়েকটি বাংলা কবিতা—সন্ন্যাসের পরে স্বামীজীর বাংলা রচনা। এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায় দুখণ্ডে স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, যাতে স্বামীজীর বাংলায় কথোপকথন বাংলা ভাষাতে রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে যদিও সঙ্কলক স্বামীজীর বাগ্‌রীতি রক্ষণের ব্যাপারে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন জানি না।

স্বামীজীর বাংলা রচনার পরিমাণ তাঁর 'বাণী ও রচনার' এক অষ্টমাংশেরও কম।

তাহলেও মূল বাংলা রচনায় নিবদ্ধ তাঁর স্বদেশচিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ এক প্রবন্ধে উপস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত। স্বামীজী এমন সংক্ষেপে সংহত আকারে বলতে বা লিখতে পারতেন এবং অল্প পরিসরে এত বেশী বক্তব্য উপস্থিত করতেন যে সে কথাগুলিকে সামান্য ব্যাখ্যাসহ উপস্থিত করলেই রচনাটা বিপুল হয়ে পড়বে। আমি তাই বিশেষ আলোচনার জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠতম পুস্তক বর্তমান ভারতকে নেব। তার আগে তাঁর দেশচিন্তার পরিধি সম্বন্ধে একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

স্বদেশ বলতে বিবেকানন্দের কাছে বলাই বাহুল্য মাটি বোঝাত না, বোঝাত মানুষ। কিন্তু মাটিও বোঝাত। 'ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র'—একথা বলবার সময় তিনি নিশ্চয় আবেগ-আপ্লুত দেশভক্তদের তুল্য ধূলিশয্যাশায়ী ছিলেন কিন্তু ঐ কথাটি যে বলেছিলেন তার কারণ বিবেকানন্দ জানতেন মানুষের উপরে প্রকৃতির প্রভাব অল্প নয়। ভারতের মাটি ভারতের প্রতিভার উপযুক্ত উন্মোচনের পরিবেশ দিয়েছে। দেহজীবী একজন মিস্ মেয়ো যেখানে শ্বাস টেনে নর্দমার গন্ধ পেয়েছেন, কথাটা গান্ধীজী আমাদের শিখিয়েছেন, সেখানে বিবেকানন্দ পেয়েছেন নন্দনগন্ধ।

কিন্তু এক সময়ে মিস্ মেয়োর ঘৃণার দৃষ্টি ও বিবেকানন্দের প্রেমের দৃষ্টি এক হয়ে গিয়েছিল তখন বিবেকানন্দের কাছেও ভারতভূমি থেকে মৃতদেহের শ্মশানগন্ধ ভেসে আসছিল।

বিবেকানন্দের আহত পৌরুষ গর্জন করে উঠল—ভারতবর্ষ একদা বড় ছিল—সে এখন বড় নয়—কিন্তু সে বড় হবে ভবিষ্যতে, যে কোনো সীমা ছাড়িয়ে।

কে বড় করবে?—কেন বিবেকানন্দ করবেন।—'আমি যদি না পারি', বিবেকানন্দ বললেন 'ভবিষ্যতে আমার থেকেও বড় কেউ এসে সে ভার নেবে।' কিন্তু ভারতবর্ষ বড় হবেই।
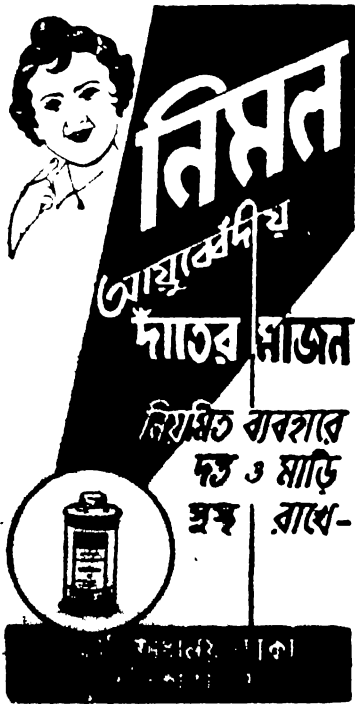
দেহত্যাগের দিন স্বামীজী বলেছিলেন, 'যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, সে বুঝত বিবেকানন্দ কি করে গেল।' যিনি বলেছিলেন তিনি জানতেন, আর একজন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নেই। এ পর্যন্ত তাঁর অহংবোধের সীমা। তারপরেই বৈদান্তিক বিবেকানন্দ বললেন, কিন্তু কালে কত বিবেকানন্দ হবে। অর্থাৎ আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দের কাছে 'বিবেকানন্দ' নিশ্চয় মানবাত্মার একটা বড় প্রকাশ, কিন্তু সেই মানব-প্রকাশকেই চরম বলবার মূঢ়তা কখনো তিনি দেখাতে পারেন না। অতএব 'কালে কত বিবেকানন্দ হবে।' বুদ্ধকে নমস্কার জানিয়ে এই বুদ্ধশিষ্য একদা বুদ্ধের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন—'বুদ্ধত্ব একটা অবস্থামাত্র তোমরা সকলেই বুদ্ধ হতে পার।' এবং এই বুদ্ধই বিবেকানন্দের কণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন মানবমহিমার মহত্তম বাণী—

'The Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I Am.'

বিবেকানন্দের মানবচিন্তা বা বিশ্বচিন্তার এই চরম রূপ। এরই পটভূমিকায় দেখতে হবে তাঁর ভারতচিন্তাকে। ভারত মহান এই চিন্তার ধাত্রীভূমি বলে।

ভারতের উত্থান বলতে স্বামীজী জাগতিক থেকে পারমার্থিক পর্যন্ত সর্বাত্মক উত্থান বুঝতেন। যুগপ্রয়োজনে তাঁকে জাগতিক উত্থানের কথাই বেশী বলতে হয়েছে: নিজেকে ভাল না বাসলে নিজের ভিতরের ভগবানকে ভালবাসা কঠিন। নিজেকে ভালবাসার অর্থ ভোগ। স্বামীজী বলতেন, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না।—ভিখারীর আবার দান! ইন্দ্রিয়হীনের আবার ইন্দ্রিয়-সংযম!

ভারতের সমস্যা কোনগুলি? স্বামীজীর জিজ্ঞাসা—কোনগুলি নয়? কি আছে দেশে—অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা না চরিত্র?

বিবেকানন্দ সমস্যাগুলির মূলে নাড়া দিলেন।

ব্যবহারিক দিকে তিনি জনশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। জনশিক্ষা যাদের জন্য, সেই জনগণ শিক্ষার দ্বারা প্রথমত নিজের অবস্থান সঠিক রূপে জানতে পারবে অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হবে, তারপরে তারা ঐ প্রয়োজন নিবারণের উপযুক্ত উপায় জেনে নেবে। তার মানে তাদের বৃত্তিশিক্ষা দিতে হবে, সেই সঙ্গে বহির্পৃথিবীর কিছু জ্ঞান। আধ্যাত্মিকতার জন্য সহজ ধর্মশিক্ষা দেওয়ারও দরকার। ধর্মশিক্ষা বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি বাড়াবার জন্য দেওয়া হবে না, মানুষের আশু প্রয়োজনের সঙ্গে চিরপ্রয়োজনের যোগসাধনই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিল্পশিক্ষার বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা আগেই বলেছি। স্ত্রীশিক্ষা, কলাশিল্পশিক্ষা বা উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনার আলোচনা স্থগিত থাক, কিন্তু ঐ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ রীতিমত প্রগতিশীল। জনশিক্ষার পথে প্রধান বাধা দারিদ্র্য। পাঠশালা করে দিলেও চাষী এত গরীব যে, মাঠ থেকে তার ছেলেকে অব্যাহতি দিয়ে পাঠশালায় পাঠাতে পারবে না। স্বামীজী বললেন, সে ক্ষেত্রে মহম্মদই পর্বতের কাছে যাবে। ম্যাপ, গ্লোব, চার্ট নিয়ে চলে যাও গরীবের কাছে, ইত্যাদি। বৈপ্লবিক সংগঠনের অনুরূপ পরিকল্পনা এখানে স্বামীজী গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষার ব্যাপারে আর একটি বিষয়ে তিনি জোর দিতেন, দুর্বলকে কিছু শেখাবে না। অশ্বিনীকুমার দত্তকে স্বামীজী বলেছিলেন, আপনি সবচেয়ে বড় কাজ শিক্ষাদানে নিযুক্ত। চাষী মুচি, মেথরের কাছে আপনাকে যেতে হবে। কখনো ছেলেদের কাঁদুনি শেখাবেন না। যেখানে শুনবেন ছেলেদের [illegible] শেখানো হচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে চাবকাবেন।

শেষ কথা, মানুষ হতে হবে শিক্ষার দ্বারা। শ্রদ্ধা সে পথের প্রথম ও শেষ কথা। শ্রদ্ধাবান নচিকেতা হলেন পরম আদর্শ।

(গ) সাহিত্য কলাশিল্প ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে স্থানাধিকারী। বাংলা চলিত ভাষাকে জীবনের ভাষা করে তুলতে তিনি পেরেছেন। রসিকতায়, গম্ভীরতায়, উন্মাদনা ও ওজস্বিতায় সে গদ্য হল সাহিত্যের সম্পদ।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভূমিকা সৃষ্টি থেকে সৃষ্টির রীতিনির্ণয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রমথ চৌধুরীর বহু আগে, চলিত ভাষার পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সকল যুক্তি কোনো এক অপূর্ব প্রতিভায় 'আত্মসাৎ' করে তিনি প্রচার করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মৌলিকত্বহারী সেই সব বক্তব্যে ছিল আশ্চর্য আধুনিকতা। নিতান্ত স্বামীজীর যুক্তিতে কতকগুলো কৌতুকপূর্ণ বা বাংলাদেশের একটা [illegible] বিবেকানন্দের [illegible] চলিত ভাষার পক্ষে কম [illegible] হয়েছিল যদি মানুষের প্রাণের কাছে থাকিবে [illegible] ভাষা দিয়ে তার কাছে [illegible] জ্ঞানবিজ্ঞান পর্যন্ত প্রচার করতে হবে ঐ চলিত ভাষাতেই।

[illegible] সাধুভাষাকে সহ্য করতে হয়েছিল [illegible] তাঁর সমসাময়িক যে সুরেশ সমাজপতি সবিস্ময়ে লিখেছিলেন —'সর্বত্র প্রতিভা সর্বগ্রাসী'—তিনিই স্বামীজীর চলিত ভাষা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে লিখলেন—এ যে বাঙালী ভাষা! স্বামীজীর চলিত ভাষার লেখা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হচ্ছিল, সেটা কারো কারো মতে—উদ্বোধনের উদ্বোধন সারা বছর, উদ্বোধনের [illegible]।

বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও স্বামীজীর [illegible] ছিল। এই মহাজ্ঞানী [illegible] স্বামী যদি বাংলা সাহিত্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের অভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন এ সাহিত্যে 'পচা নভেল নাটক' (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির কথা ভুলে গিয়ে) বা পিরীতির হাসান-হোসেন-মার্কা কবিতা ছাড়া (রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ভালো কবিতা তখন রচিত হয়ে গেছে যদিও, এবং মধুসূদনের মহাকাব্য, স্বামীজী যার গুণ-মুগ্ধ ছিলেন) কিছু নেই, তখন ঐ কথা-গুলিকে জ্বালাময় আত্মদংশন বলেই ধরব—কারণ সত্যই তো বাংলায় উচ্চতর জ্ঞান-

বিজ্ঞানের গ্রন্থ নেই। কেন নেই, স্বামীজী তাও বুঝতেন। বই লিখলে ছাপবে কে? কিনবে কে? অভাব দূর করবার জন্য নিজের বিরল অবসরের মধ্যে যতখানি সম্ভব কাজ করে গেছেন—তাঁর 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' জ্ঞানবস্তু পরিবেশনের সার্থক চেষ্টা দেখা যায়।

সাহিত্যের ব্যাপারে বিবেকানন্দের প্রগতির ভূমিকা কলাশিল্পের ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর। সাহিত্যে বাংলা দেশের প্রধান প্রতিভাসমূহের অবতরণ ঘটে গেছে সেই সময়ের মধ্যেই, সাহিত্যের গতিপথও নির্ধারিত হয়ে গেছে, কিন্তু শিল্পের ব্যাপারে সৃষ্টি তো নেই-ই, শিল্পের অবলম্বনীয় আদর্শ সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট ছিল না। এই পরিস্থিতিতে শিল্প সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহ এবং মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল স্বামীজীর মধ্যে। ভারতীয় শিল্পজাগরণে বিবেকানন্দের ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অনেকেই স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে আচার্য নন্দলাল বসু, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, ডঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতির নাম করা যায়।

এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন—শিল্প আন্দোলনকে তিনি কতখানি প্রত্যক্ষে প্রভাবিত করেছেন? উত্তর দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর প্রভাব যে সরাসরি নয়, তা স্বীকার্য। তাঁর প্রভাব পরোক্ষ কিন্তু পরোক্ষ হলেও গভীর। যে জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ভারতের নিজস্ব শিল্প সম্বন্ধে ভারতীয়দের মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যেতেই ভারতে এসেছিলেন, এবং বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার। নিবেদিতার শিল্পদীক্ষা ও স্বামীজী কাছেই, সাহায্য ভারতীয় শিল্পের মর্মলোকে তাঁর প্রবেশের সহায়তা করেছিল। ভারতীয় শিল্পের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা আনন্দকুমার স্বামী স্বামীজীর পরিচিত এবং শিল্পব্যাখ্যার ব্যাপারে নিবেদিতার আংশিক সহযোগী। অবনীন্দ্রনাথ যে হ্যাভেলকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর উপর নিবেদিতার প্রভাবের কথা আচার্য নন্দলাল স্বীকার করেছেন।

আবার বলি, নিবেদিতার সম্পূর্ণ শিল্পদীক্ষা স্বামীজীর কাছেই।

শিল্পসৃষ্টিতে স্বামীজীর প্রভাব নিয়ে যত আলোচনাই চলুক (এবং সে বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নয়), শিল্প-ধারণায় বিবেকানন্দ যে ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে পুরোগামী তাতে সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দই প্রথম (আমি যতদূর জানি, অবশ্য ভুল হতে পারে) ভারতীয় শিল্পের শ্রেয় আদর্শ নির্দেশ করে গেছেন। বিলেতী শিল্পের অন্ধ অনুকরণ থেকে দেশীয় শিল্পরীতির দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর ঋষি-নির্দেশ পরবর্তীকালে গৃহীত হওয়ার ফলেই ভারতীয় শিল্পের নবযুগ সম্ভব হয়েছে। স্বামীজীর অভ্রান্ত দৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দিই: যে ঠাকুরবাড়ি থেকে নব্য-শিল্পের যাত্রারম্ভ সেই ঠাকুরবাড়ির অন্যতম মনস্বী সন্তান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০১ সালের শেষের দিকে সাধনা পত্রিকায় রবিবর্মার ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছিলেন, কালীঘাটের পটদেখা অভ্যস্ত দৃষ্টি রবিবর্মার ছবির রসগ্রহণ করতে পারবে না। কয়েক বৎসর পরে স্বামীজী লিখলেন, ওসব রবি বর্মা ফর্মার ছবি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তুলনায় তিনি [illegible]পুরের [illegible] কালীঘাটের পটকেও ভাল বলেছেন।

[illegible] ভারতীয় শিল্পের নবযুগের [illegible]

[illegible] শিল্পের ব্যাপারে বিবেকানন্দ কেবল মতামত দিয়ে ক্ষান্ত ছিলেন না। [illegible] বাংলার ও ভারতের শিল্প একদিন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল [illegible] সর্বাঙ্গীণ জীবনকে সুন্দর ও শান্ত করে তুলত। আমাদের দেশের সেই শিল্পগৌরব বিদেশী শাসনে ও প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যে ইংলণ্ডের অনুকরণ করতে চেয়েছি শিল্পের ক্ষেত্রেও, সেই ইংলণ্ডের শিল্পসৃষ্টির কথা শুনলে স্বামীজী হাসিতে ফেটে পড়তেন। শিল্পের ব্যাপারে জাপান তাঁর কাছে অনেক বড় দেশ। স্বামীজীর মতে পাশ্চাত্যের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের সাধারণ জীবনে আর্ট আছে, পাশ্চাত্যে আর্ট ইউটিলিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বামীজী সমন্বয় চেয়েছেন।

জাতীয় জীবনের কোনো দিকই স্বামীজীর দৃষ্টি বহির্ভূত ছিল না। দেহে মনে বলিষ্ঠ জাতি তাঁর কাম্য ছিল। ধর্মকর্ম, জাতিভেদ, আহারবিহার, জীবনচর্চা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি যে বিপুল চিন্তার সম্ভার রেখে গেছেন, সে সকল নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে বলে আমি ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না, এখন 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং ভাবী ইতিহাসের সম্ভাব্য রূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক মনস্বিতার কিছু পরিচয় দেব।

(২)

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি ক্ষুদ্রাকার, বিবেকানন্দের জীবনের মতই সংক্ষিপ্ত এবং তাঁর জীবনের মতই ঋদ্ধ ও সম্ভাবনায় স্পন্দিত। এই গ্রন্থে স্বামীজী ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস মন্থন করে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে লব্ধ ধারণাকে সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন।

'বর্তমান ভারত' স্বামীজীর ঐতিহাসিক বিচার ও সিদ্ধান্তের মহামূল্য দলিল। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একসঙ্গে আর কোনও রচনায় এইভাবে উদ্ভাসিত করে তোলা হয়নি।

বাংলায় এই একমাত্র গ্রন্থ যা বিশ্ব-ইতিহাসের তথ্য নয়, বিশ্ব ইতিহাসের ভাষ্য। এখানে আছে মৌলিক ও স্বাধীন

ইতিহাসবোধ যা প্রাপ্ত তথ্যকে এবং ঐ তথ্যের উপর নির্ভরশীল রচনাদিকে কেবল বুদ্ধিতে বিচার করে না, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে আলোকিত করে তোলে।

বিবেকানন্দের লৌকিক মনীষা এবং অলৌকিক প্রজ্ঞার এই মহাগ্রন্থ কয়েক পৃষ্ঠায় রচিত হয়ে প্রমাণ করেছে, সৃষ্টির মহিমা তার আকারের পরিমাপের উপর নির্ভর করে না।

'বর্তমান ভারতের' স্টাইল ধ্রুপদী। মধুসূদন তাঁর কাব্যরীতিকে সফলভাবে গদ্যে ব্যবহার করতে পারলে সে রীতি দাঁড়াত, এখানে সেই রীতিকেই পাচ্ছি।

'বর্তমান ভারতের' গদ্যরীতি নিজস্বতাকে বহুলাংশে সাফল্য লাভ করলেও তা পরীক্ষামূলক স্তরে থেকে গেছে। বাংলা ভাষায় বাগ্মিতা আনা যায় না, ক্রিয়াপদের ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য এ ভাষার দম মরে যায় ভাবের ক্রমোচ্চ রূপকে ফোটাবার জন্য তরঙ্গায়িত আবেগ বাংলায় সৃষ্টি করা যায় না—এ আক্ষেপ স্বামীজীর ছিল তাই তিনি বিশেষণবহুল অতি গম্ভীর এক গদ্যরীতি সৃষ্টি করতে চাইলেন। 'বর্তমান ভারতে'র গদ্য তারই দৃষ্টান্ত, বিবেকানন্দের প্রতিভার অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু অনুকরণ দুঃসাধ্য, স্বামীজীও এই রীতি অতঃপর পরিহার করে তা স্বীকার করেছেন।

বোধ হয় একটু দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু সত্যই কি তাই? বিবেকানন্দের সাহিত্য-ভাবনা কি তাঁর দেশভাবনার অন্তর্ভুক্ত নয়?

'বর্তমান ভারতে'র আলোচনায় আমরা ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেব কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাস থাকবে পটভূমিকায়।

ভারত-ইতিহাস আলোচনা করে স্বামীজী দেখিয়েছেন ইংরেজ-অধিকার পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ভারত শাসন করেছে। বিশ্ব-ইতিহাসের পর্যালোচনাও তাঁকে একই সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছে—সেখানেও দেখেছেন ঐ তিন বর্ণের পর্যায়ক্রমিক শাসন।

সাধারণভাবে পৃথিবীতে গুণগত জাতি বা বর্ণ চারটি—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র। স্বামীজীর থীসিস—এই চার বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী শাসন করবে প্রথম দুই বর্ণের কাল শেষ হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের শাসন সমাপ্তিমুখী, চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের শাসন পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক সত্য।

শূদ্রশাসন বেশী বাধাপ্রাপ্ত হলে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আসবে, কিন্তু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার আগমনকে স্বামীজী অসম্ভব মনে করতেন না। সেক্ষেত্রে শূদ্রশাসন সকল মানুষকে হয়ত শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে উদ্যোগী হবে। ভারতবর্ষ সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন থাকতে শূদ্রশাসন সম্ভব নয় কারণ উপনিবেশসমূহ বৈশ্য-শাসনের রক্তভাণ্ডার। উপনিবেশহারা হলেই কোনো দেশের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক হওয় সম্ভবপর। শূদ্রশাসনকে অবশ্যম্ভাবী ঘোষণা করে স্বামীজী ঔপনিবেশিকতার মৃত্যু দিনের কথাই ঘোষণা করে গেছেন।

ভারত ইতিহাসের আদি অধ্যায়ে পুরোহিতশাসনের রূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পুরোহিতেরা রাজা-প্রজার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পুরোহিতেরা সভাবে আদি মস্তিষ্কজীবী। পরে হিন্দুদের মস্তিষ্কজাত

জ্ঞানদ্বারাই উন্নত সভ্যতার সূচনা। তারা অব-সরভোগী বলে মানসচর্চায় সমর্থ, এবং তার ফলেই বিদ্যার উন্মেষ, জড়ের উপর চেতনের অধিকার বিস্তারের সূচনা। ত্যাগ, তপস্যা ও বিদ্যায় পুরোহিতরা নমস্য।

পুরোহিতরা কিভাবে রাজশক্তিকে বশী-ভূত করেছিল? তার উত্তর, যে নৈসর্গিক জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব প্রাচীন মানবের পক্ষে ভীতি-বিস্ময়ের বস্তু, তাকে প্রথম বুদ্ধিবলে অধিগত করে পুরোহিতেরা। নৈসর্গিক শক্তিসমূহের দেব-নামকরণ ক'রে পুরোহিতরা জানাল, ঐ দেবতারা পুরোহিত-সম্পাদিত যজ্ঞের 'আহুতি গ্রহণেচ্ছু'। রাজারা দেবপ্রসাদের জন্য পুরোহিতদের দ্বারস্থ। তাছাড়া ইতিহাসে বাঁচতে হলে পুরোহিত-সাহায্য চাই,—নিজের নাম ও পিতৃপুরুষের নাম বজায় রাখার একমাত্র উপায় পুরোহিতের সাহিত্যপ্রতিভাকে নিজ বংশখাতে চালিত করা। এ ছাড়া বুদ্ধিমান পুরোহিতরা মন্ত্রণায় ও চক্রান্তে অপরিহার্য।

সুতরাং রাজারা 'বর্ষার বারিদের মত থেকে দেবকৃপা, প্রজাশাসনের তন্ত্র-মন্ত্র এবং অজস্র ধনবর্ষণ' করে পুরোহিতদের সূর্যবংশ চন্দ্রবংশাদি আখ্যা সংগ্রহে তৎপর।

একজন অগ্নিবর্ণের কথা লেখা হয়েছে পরবর্তীকালে, পুরোহিতদের স্নেহদৃষ্টি পূর্বকালে কত অগ্নিবর্ণের দুষ্কৃতিকে মুছে দিয়েছিল।

পুরোহিত শাসনের আরও দোষ—পুরোহিতের শক্তি মানসিক এবং সেটা আলো-আঁধারির জগৎ। সেই 'কুজ্ঝটিকা ও প্রহেলিকাময়' জগৎ সম্বন্ধে প্রবঞ্চনার কত সুযোগ। আর পুরোহিতদের শক্তি বস্তুশক্তির উপর নির্ভর করেনি বলে তারা তাদের জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখতে সচেষ্ট। ফলে, 'সংকীর্ণতা', 'অসরলতা', 'ঈর্ষা' ও 'অসহিষ্ণুতা'· ফলে অধিপত্য নাশের আশঙ্কায় মারণ-উচাটন-মন্ত্র তন্ত্রের উপর নির্ভরতা।

ভারতে পরবর্তী শাসন ক্ষত্রিয়দের। বৌদ্ধযুগ থেকে মুসলমানযুগ পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি।

পুরোহিত শক্তির সঙ্গে রাজশক্তির বিবাদ চলেছিল বৈদিককাল থেকে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিভায় নিজ জীবদ্দশায় শক্তিসাম্য বজায় রেখেছিলেন। তাঁর পরে বৌদ্ধ ও জৈন প্লাবন যখন এল তখন ক্ষত্রশক্তি ব্রাহ্মণশক্তিকে অভিভূত করে ফেলল। 'বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয় ও উদাসীন।' বৌদ্ধযুগে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি একচ্ছত্র সম্রাটগণের আবির্ভাব।

বৌদ্ধযুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়কালে বৌদ্ধ-বিরোধিতায় ক্ষত্রিয়দের সহায়তা করেছিল ব্রাহ্মণশক্তি, কিন্তু ক্ষত্রিয়-দের উপরে উঠতে পারেনি।' সুতরাং এ যুগও ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের।

তারপর মুসলমান রাজত্ব। 'মুসলমান রাজত্বে পৌরোহিত্যশক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব।' 'মুসলমান রাজত্বে রাজাই প্রধান পুরোহিত।' মুসলমানদের কাছে মূর্তি-পূজোকারী কাফের 'এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী।'। সেই কাফেরদের মধ্যে কাফেরতম পুরোহিতদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের মুসলমান শাসনকে স্বামীজী ক্ষত্রিয়শাসন বলে ধরেছেন। মুসলমান রাজারা 'বহু পরিমাণে মৌর্য, গুপ্ত, অন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি সম্রাটবর্গের গৌরব পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।'

ক্ষত্র-প্রাধান্যের মহিমা ঐহিক সভ্যতার বিকাশে ও পুষ্টিতে। এইকালে চারু ও কারুকলাসমন্বিত নাগরিক সভ্যতার উদয়।

আবার এই ক্ষত্রিয়াধিকারেই জ্ঞানকাণ্ডের উদয়। ভোগের পরে আসে ভোগবৈরাগ্য। বৈরাগ্যজাত আত্মতত্ত্ব ক্ষত্রিয়শাসনের দান।

সমাজের প্রাথমিক অবস্থায়, যখন সমাজ-গঠন ও শাসনের জন্য কেন্দ্রশক্তির প্রয়োজন, তখন ক্ষত্রিয়শাসন সুফলপ্রদ। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্র-শক্তির সঙ্গে জাগ্রত প্রজাশক্তির সংঘর্ষ বাধে। ক্ষত্রিয়শাসন প্রজার অধিকার স্বীকারে অনিচ্ছুক, স্বেচ্ছাচারী, শোষণকারী ও বিলাসী।

স্বামীজী বলেন, "চণ্ডাশোকের অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোক অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজা-রক্ষকের সংখ্যা আরংগজীবের ন্যায় প্রজা-ভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।"

ভারতের মুঘল ক্ষত্রশক্তিকে পরাভূত করে যে ইংরাজশক্তি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করল তার অধিকারকে স্বামীজী বলেছেন 'অভিনব'। বলবার কারণ এ শক্তি বাইরে ক্ষত্রশক্তি, আসলে বৈশ্যশক্তি। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে স্বামীজী দেখিয়েছেন, পৃথিবীতে প্রথম যথার্থ বৈশ্যশাসন ইংরাজের। আমেরিকার চিকাগো সম্বন্ধে স্বামীজী প্রথমদিকে বিভ্রান্ত ছিলেন, জীবনের শেষদিকে আমেরিকার প্রজা-তান্ত্রিক রূপ অপেক্ষা ধনতান্ত্রিক রূপই তাঁর কাছে বড় হয়ে ধরা পড়েছিল।

কয়েকটি বাক্যে তিনি ভারতে ইংরাজ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন—

'অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল-পুস্তকের ভারত-জয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাটগণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা, এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"

ইংরেজের এই বৈশ্যশাসন ভারত থেকে অন্তর্হিত হলেও সমগ্র জগতের এক বৃহৎ অংশে বৈশ্যশাসন এখনও বর্তমান। বৈশ্য-শাসনের গুণাগুণ সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বৈশ্যশাসন ধনকেন্দ্রিক। সে অর্থ পাছে রাজা হরণ করে তাই বৈশ্যশাসনে রাজবল সংকুচিত বা অপহৃত, এবং শূদ্রকুলেও অর্থ-সঞ্চারের বাসনা বৈশ্যের নেই।

বৈশ্যশাসনের প্রধান গুণ সে পৃথিবীতে ভাবের ও বিদ্যার বিনিময়ের পথ করে দেয়। বাণিজ্য অনুরোধে বৈশ্যকে সর্বত্র যেতে হয় বলে সে 'সভ্যতা বিলাস ও বিদ্যা' সর্বস্থানে নিয়ে যায়। ঐ জিনিসগুলি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়শাসনে 'সমাজ-হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত' হয়েছিল।

ভারতের ক্ষেত্রে ইংরেজ বৈশ্যশাসন ভারতবর্ষকে বহির্জগতের সম্মুখীন করেছে এবং শাসনঅনুরোধে সমগ্র ভারতকে এক-শাসনাধীন করেছে।

বৈশ্যশাসনের মন্দ রূপ সম্বন্ধে স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, 'এর ভিতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ।'

ভারতে অন্যান্য শাসনের সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের পার্থক্য স্বামীজী অন্যভাবেও উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন। যখন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে থাকে কোনো জাতি, তখন বিজয়ী ও বিজিতে সর্বাঙ্গীণ ব্যবধানের সৃষ্টি হয় না। রাজা শোষণ করেন কিন্তু প্রজার কল্যাণও করেন। তাছাড়া ঐ রাজশোষণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে সংঘটিত বলে সর্বাত্মক হয় না। সে শোষণ সর্বাত্মক হয় যখন বিজয়ী রাজা স্বদেশের প্রজানির্মন্ত্রিত কিংবা কোনো দেশের প্রজাতন্ত্রই যখন অন্য দেশকে পরাধীন করে। এই সব ক্ষেত্রে একটি জাতির স্বার্থে পরাধীন জাতিটির শোষণ। যেমন ইংরাজ জাতির স্বার্থে ভারতবাসীর শোষণ। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি ভারতসাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল বলে 'যেন তেন প্রকারেন ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে।'

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা এই পর্যন্ত তাঁর নিজকালে নিবদ্ধ, তিনি সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ-চিন্তায়।

স্বামীজীর মতে, আসেই বলেছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পালা শেষ—এবার শূদ্রের শাসন। পৃথিবীতে শূদ্রশাসন প্রবর্তিত হবেই হবে। সে শূদ্রশাসনের সব-টুকু স্বামীজীর মনোমত না হলেও পরম উদারতায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

কথা বাহুল্য হলেও বলছি, স্বামীজীর কালে কোনো দেশে শূদ্রশাসন প্রবর্তিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন কাল থেকে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত ভারতে প্রজাদের অবস্থার রূপ স্বামীজী সংক্ষেপে জানিয়েছেন।

সাধারণ প্রজার অবস্থা কোনোকালে আহামরি নয়—রামরাজ্যেও নয়। পুরোহিত প্রাধান্যকালে রাজা "রাজ্যরক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা, পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন।" পরবর্তী ক্ষত্রিয় যুগেও প্রজাশোষণ অব্যাহত।

এই দুইকালে স্বামীজী সব চেয়ে ক্ষতি দেখেছেন প্রজার আত্মবোধহীনতায়। কর-গ্রহণে, রাজ্যরক্ষায় প্রজার মতামতের অপেক্ষা নেই। যে দু একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত, সেখানেও "প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খল-রূপে প্রকাশ করিতেছে।" সমাজ চলিয়াছে ঋষিবাক্য বা শাস্ত্র সেখানে দেশকর্মে প্রজার "সহমতি বা 'সমবেত বুদ্ধিযোগের' কোনো সুযোগ ছিল না। প্রাচীন ভারতে বিক্ষিপ্ত স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্বের উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন যবন পরিব্রাজকের। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখেছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল বৌদ্ধ মঠে ও নানা সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের নিদর্শন পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি তুলনায় ... সামান্য ও বিক্ষিপ্ত যে এ সবের দ্বারা শাসনকার্যে প্রজার অধিকার প্রমাণিত হয় না।

শাসনকার্যে প্রজার অধিকার না থাকার জন্য প্রজা সব সময় পদদলিত রক্ষিত বা বঞ্চিত হওয়ার কারণে— তার আত্মরক্ষার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এই আত্মবোধহীন নির্বীর্য প্রজাশক্তি বহিরাগত সর্ব-... রোধ করতে সমর্থ হয়নি।

ক্ষত্রিয় যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রজার এই অবস্থা। বৈশ্য ইংরাজ শাসনে দুর্গতি চরমে পৌঁছল।

সাধারণ বুদ্ধিতে শূদ্রশাসন অপ্রতিরোধ্য কারণ জনসমষ্টির অধিকাংশই তারা— তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বাধা দেবার শক্তি কার? শূদ্রদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে বাধা, স্বামীজীর মতে এইগুলি—(ক) তাদের বিদ্যা নেই (২) স্বজাতিবিদ্বেষের জন্য তাদের মধ্যে একতা নেই, (৩) তাদের বাসনা চিরদিনই নিষ্ফল হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের অভাব, এবং (৪) পাশ্চাত্য দেশে শূদ্র-উত্থানের প্রধান বাধা সেখানকার গুণগত জাতি। কোনো শূদ্র সেখানে বিশেষ গুণ বা প্রতিভা দেখালে অন্য বর্ণগুলি ঐ শূদ্রকে নিজ বর্ণে গ্রহণ করে, ফলে তার গুণপনায় নিজ জাতি লাভবান হয় না।

শুধু 'ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল কিঞ্চিৎ বিনিদ্র', সেখানে সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম' প্রভৃতি দল শূদ্রপক্ষে বিপ্লবের ধ্বজা উড়িয়েছে।

স্বামীজী ভবিষ্যৎ দেখলেন,— 'শূদ্রকর্ম-সহিত' শূদ্রেরা পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করবে। 'শূদ্রকর্মসহিত' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই শূদ্রশাসনের গুণদোষ সম্বন্ধে স্বামীজী অবহিত। এই শাসনে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে, সামাজিক সাম্য আসবে, সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটবে। দোষ—উচ্চতর সংস্কৃতির নাশ এবং বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় বন্ধ।

স্বয়ং বিরাট প্রতিভাবান এবং উচ্চতর সংস্কৃতির প্রধান প্রতিভূ বিবেকানন্দ তথাপি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করে বলেছেন, মানুষ যেখানে তার ন্যূনতম দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, সেখানে সংস্কৃতি-বিলাসে তার অভিরুচি নেই।

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র বলেই ধরেছিলেন শূদ্রকর্মসহিত শূদ্র শাসন কথাটির মধ্যে তার প্রমাণ আছে এবং আরও প্রমাণ পাই প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলোর শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর নিম্নের মন্তব্যে—

"সব দেশেই লোটাকতক শক্তিমান পুরুষ যা করাচ্ছে তাই হচ্ছে ... কিন্তু ... প্রজাধিকার ... ঐ বাতে মাত ... পার্লামেন্ট দেখলুম সেনেট দেখলুম ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম রামচন্দ্র!

ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের একটা শিক্ষা হয় কিন্তু রাজনীতির নামে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে মোটা তাজা হচ্ছে, সে ঘুষের ধূম সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্য দেশে হয় রামচন্দ্র! যাদের হাতে টাকা তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে— জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধন-ধান্য আসবে।" [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য]

ভারতের সাধারণ মানুষের উপর বিবেকানন্দের অপার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। একদিন তাদের তৈরী শিল্পদ্রব্য বণিকের হাতে ... সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি করেছে অথচ তাদের কথা কেউ ভাবেনি। সেই "ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবীদের" প্রণাম জানিয়ে বিবেকানন্দ যে ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন সে ভারত বেরুবে চাষার কুটীর ভেদ করে জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।" মন্ত্রের মত কথাগুলি, ধর্মের মত সত্য। বিবেকানন্দ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত শক্তির অন্ধতা দেখতে চাইছিলেন না, চাইছিলেন সমগ্র সমাজ দেহের শক্তি, ভারতকে যুগে যুগে পরপদদলিত দেখবার কোনো ইচ্ছা ছিল না তাঁর, অথচ সেইটেই হবে অনিবার্য সত্য যদি ভারতবর্ষ সকলের ভারতবর্ষ না হয়।

ভারতের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন স্বামীজীর কাছে কোনো মহৎ রূপ উপস্থিত করে নি। জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি সে যুগে উকিলদের আখড়া মনে করেছিলেন, যেখানে বাবু ইংরেজিতে দেশশাসনের পিটিশন লেখা হয়। কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কিছু না করলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই— তিনি জানিয়ে দিলেন। জনসাধারণ মানে এখানে শ্রমজীবী শূদ্রসাধারণ।

জাতীয় আন্দোলনের আর একটি প্রকৃতি বোধ হয় স্বামীজীর কাছে ধরা পড়েছিল। তিনি অন্যান্য দেশে প্রজাশক্তির সঙ্গে বৈশ্য শক্তির ব্যবহারের রূপ দেখাতে গিয়ে বলছেন—

"এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইয়াছে।"

তীক্ষ্ণ মন্তব্য। পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটা সত্য, ভারতের ক্ষেত্রে সেটা কি মিথ্যা? ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দেশীয় বণিকদের উৎসাহ কি তিনি লক্ষ্য করেন নি বা অনুমান করেন নি? এই উৎসাহের কারণ বা ভবিষ্যৎ কি তিনি জানতেন না

কিন্তু তথাপি বিবেকানন্দ তৎকালীন বণিকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করে গেছেন। সাধারণ মানুষের উন্নতি যন্ত্রশিল্পের প্রসার ভিন্ন হয় না। শিল্পায়নকে শূদ্রবিপ্লবের পটভূমিকারূপে বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন।

এইখানে থেমে আমাদের চিন্তা করতে হবে। বিবেকানন্দ কি ভারতের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক শূদ্রশাসন সমর্থন করেছেন, শূদ্র-শাসন বলতে ঠিক যা বোঝায় তাকে? স্বামীজী বলেছেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কিন্তু সেটা তো অভাবের আদর্শ, স্বভাবের আদর্শ কি তাই? তিনি বলেছেন, যে ধর্ম বা ভগবান আমাদের খেতে দিতে পারে না সে ধর্মে বা ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না তাই বলে কি তিনি নাস্তিক ছিলেন—চারিদিকের শূন্য উদর-সমারোহের মধ্যেও?

শূদ্রশাসন মানবতাবাদী বিবেকানন্দের কাছে অগত্যা-আদর্শ, পূর্ণাঙ্গিক আদর্শ নয়, কারণ বিবেকানন্দ মূলে অধ্যাত্মবাদী। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র ভুললে চলবে না, বেদান্তভিত্তিক। সেখানে বস্তু-সমন্বয় নয়, চেতনার সমন্বয়। সমন্বয়ও ছোট কথা, একাত্মতা। মানুষ সেখানে এক, ক্ষুধায় নয় আত্মায়। বিবেকানন্দ আত্মায় মানুষকে এক দেখে ক্ষুধার ক্ষেত্রে, ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যাপারে,

পৃথক দেখে বিদ্রোহ করেছেন।

অধ্যাত্মবাদী বিবেকানন্দের কাছে ধর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ এনেছিল বিজ্ঞান। তার সম্মুখীন হলেন তাঁর অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে। বিবেকানন্দ মূর্তিপূজার বিরোধিতা করলেন না,—মূর্তি যতক্ষণ মানুষের ধর্ম-চেতনাকে জাগ্রত রাখে, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে বেদমন্ত্র বা হাতুড়ি কিছুই তুললেন না, কিন্তু মনে জানলেন, বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ মূর্তিকে স্বীকার করবে না, তাছাড়া মূর্তিপূজাও শেষ পর্যন্ত মূর্তিকে স্বীকার করে না, সন্ধান করে অমূর্ত চেতনার; পাশ্চাত্ত্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তাই প্রচার করলেন অদ্বৈত সত্যকে, যে অদ্বৈত বস্তুগতভাবে বিজ্ঞানের সন্ধানের বিষয়; বিবেকানন্দ অধিকন্তু জানতেন, ভারতবর্ষেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-চেতনার বিস্তারের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে ধর্মকে বাঁচতে হলে এই অদ্বৈতকে নিতেই হবে। বিজ্ঞানের আক্রমণ ছাড়াও বিবেকানন্দ ধর্মের বিরুদ্ধে আর একটি সম্ভাব্য আক্রমণ অনুমান করছিলেন,—বহির্মুখী ভো গ বা দে র আক্রমণ। বিবেকানন্দের পরমপ্রিয় শূদ্রশাসন এই ভোগবাদ বা জড়বাদের দ্বারা অধ্যাত্মবাদকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করবে; সফল শূদ্র-বিপ্লব প্রথম ক্ষুন্নিবৃত্তির আনন্দে জীবনের অন্যতর, গভীরতর, মূল্যকে অস্বীকার করবে। সেটা হবে মানুষের স্বরূপের অব-মাননা। বিবেকানন্দের কাছে মানুষের দেহের মূল্য অল্প নয়, তার সাক্ষাৎ প্রয়োজনকে তিনি প্রথমেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস ও আশা রেখেছেন মানুষের নিত্য-স্বরূপের উপর। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ এই—

"যদি এমন একটি রাষ্ট্রগঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু একি সম্ভব ?" [পত্র]

এটি যে সহজে সম্ভব নয়, এমনকি কার্যত অসম্ভব তা স্বামীজীই স্বীকার করেন। সেই অসম্ভব আদর্শকে সফল করবার জন্য তিনি ভারতবর্ষকে আহ্বান করেছেন।

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

বিবেকানন্দের একটি ভবিষ্যৎবাণী ইদানীং বিশেষভাবে উল্লিখিত হচ্ছে—"পরবর্তী অভ্যুত্থান আসছে রাশিয়া বা চীন থেকে, ঠিক কোথা থেকে আসবে তা আমি জানি না।" পরবর্তী অভ্যুত্থান দু জায়গা থেকেই এসেছে।

কথাটি "অভ্যুত্থান"—কিন্তু এই অভ্যুত্থানকে কি স্বামীজী সর্বাংশে শ্রেয় বলে মনে করে-ছিলেন ? তা যদি হত, তাহলে তিনি কলিযুগের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলতেন না, কলিযুগ হল সেই যুগ, যে যুগে অর্থই ভগবান।

বৈশ্যশাসনে অর্থ ভগবান, কিন্তু শূদ্র শাসনে অর্থ যে ব্রহ্ম। তারই নাম ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।

কতকগুলি ঐতিহাসিক লক্ষণ থেকে স্বামীজী রুশবিপ্লব অনুমান করেছিলেন। বিপ্লবাত্মক রচনাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয়, রুশ বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ (এ সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ সালে, আমার বিশ্বাস তার পূর্বেই তাঁর ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছিল), এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা থেকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা থাকায় তিনি পূর্বোক্ত অনুমান করতে পেরেছিলেন। রুশ সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে প্রজানির্যাতনের একটি শোচনীয় ঘটনায় স্বামীজীর মর্মপীড়নের কথা মহেন্দ্র-নাথ দত্ত "লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে" জানিয়েছেন।

আর চীনের বিপ্লব ?

স্বামীজী চীনকে প্রাচীন সভ্যতার আদি গুরু বলতেন। কিন্তু সে সভ্যতা ঐহিক। চীন ভোগবিলাসের গুরু। তদুপরি চীন যেখানে মহান সেখানেও সে আধ্যাত্মিক" নয়, "নৈতিক"। চীন কনফুছের চেলা।" নীতিবাদ অধ্যাত্মবাদে উন্নীত না হলে তা মানুষের লোকজীবনেই আবদ্ধ থাকে। ইহ-জীবনকেন্দ্রিক এই নীতিবাদের পন্থা পরিবর্তন করে একে বস্তুনীতিবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তদুপরি চীনের বিপুল জনসংখ্যা। 'বর্তমান ভারতেই' স্বামীজী লিখেছেন, "মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।" উল্টোপক্ষে যে জাপান ছিল শ্রমজীবী শূদ্র, সেই জাপান পাশ্চাত্ত্য বস্তু-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হচ্ছে, চীনের বিপুল জনসংখ্যার জন্য যা হওয়া সম্ভব নয়। এই শূদ্র-চীনের মধ্যে যদি একতা প্রবেশ করে, তাহলে বিপ্লব অনিবার্য, চীন কৃষি-নির্ভর হলেও। চীনের বিপুল জন-সংখ্যা, অনলস কর্মক্ষমতা এবং অনাধ্যাত্মিক, নীতি-নির্ভর সভ্যতার মধ্যে বিপ্লবসম্ভাবনা স্বামীজী দেখেছিলেন। অধ্যাত্মবাদী ভারতের জন্য সেই বিপ্লবকে দূরবর্তী মনে হয়েছিল তাঁর।

কিন্তু যদি সত্যই চীনের অভ্যুত্থান ঘটে, তাহলে সেই অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কিভাবে পর্যুদস্ত করবে তার আনুমানিক রূপ স্বামীজী আমেরিকায় পদার্পণের পরেই এক বক্তৃতায় খুলে ধরেছিলেন। ভারতের রক্তশোষক ইংরেজকে সতর্ক করে বলেছিলেন, যদি তোমরা ভূমিকা পরিবর্তন না কর, তাহলে হে ইংরেজ। ঐ চীনেরা ইতিহাসের প্রতিহিংসার মত তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

"Look at those Chinese, millions of them.... There will be another invasion of the Huns. They will sweep over Europe, they will not leave one stone standing upon another. Men, women, children, all will go...." [New Discoveries—M. L Burke]

চীনকে তিনি ইতিহাসের আশীর্বাদ বলেন নি, বলেছেন ইতিহাসের অভিশাপ—সে একটা মূঢ়, বিপুল, উন্মাদ শক্তি যা ইউরোপীয় বর্বরতার উপর নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের ভারসাম্য রাখবার জন্য।

ইউরোপের উপর চীনের সেই আক্রমণের ফলে "Dark ages will come again।"

স্বামীজীর যথেষ্ট পীতাতঙ্ক ছিল দেখা যাচ্ছে !

ভয়ংকর বৈদান্তিক বিবেকানন্দের কাছে "Dark age" হয়ত সম্পূর্ণ ভয়াবহ নয় কারণ আলোক ও অন্ধকারকে তিনি সমান সত্য বলে মনে করতেন, কিন্তু চীনের সেই ভয়াবহ আক্রমণের বীভৎস রূপের কথা শুনে শ্রোতারা চমকে শিউরে উঠে প্রশ্ন করেছিল—সে কবে ? কবে ?

স্বামীজী বলেছিলেন, হাজার বছর পরে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের কিছু আমেরিকান শ্রোতা সেই শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল, ১৯৬৩ সালের ভারতীয় পাঠকেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবছে হে ঈশ্বর, স্বামীজীর কালের হিসেবটা যেন সত্য হয় সত্যই যেন সেই অন্ধকার যুগ সাড়ে নশো বছর বিলম্বিত হয়।

ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে কিন্তু ইতিমধ্যেই চীনেরও "অভ্যুত্থান" হয়েছে; ইউরোপ আণবিক বাহুতে বলিষ্ঠ, দানবিক বাহু সেখানে সম্প্রসৃত, সুতরাং কোটি কোটি সন্তানের অন্ধ পিতার আলিঙ্গন এগিয়ে এসেছে ভারতের 'ধর্মক্ষেত্রে'র দিকে।

চীনের অভ্যুত্থান স্বামীজী দেখেছিলেন, কিছু বাদ না দিয়েই।

স্বামীজী তাই ডাক দিয়েছেন ভারতবর্ষকে—মনুষ্যত্ব পুর্ণশক্তিকে অব্যাহত ও সমন্বিত রাখবার জন্য।

"বর্তমান ভারতের" শেষাংশে রয়েছে বিবেকানন্দের সেই অপূর্ব আহ্বান।

সে ভারতবর্ষ আজ গভীর সংকটের সম্মুখীন। সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে সদ্য-স্বাধীন ভারতকে আজ যা করতে হচ্ছে, তার অনুরূপ প্রচেষ্টা স্বামীজী ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন। যুদ্ধের কর আজ চেপেছে জনসাধারণের উপরে। জনসাধারণের অনুচ্চ অভিযোগ—মূল্য করভার আমরাই বহন করছি। স্বামীজী ইউরোপের কথা বলছেন—

"সমস্ত ইউরোপময় ঐ কনস্ক্রিপসন—এক ইংলন্ড ছাড়া। এখন এই যে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব তুর্কিকে ভেঙে ইউরোপীয়া বানাচ্ছে, তাদের জন্ম হতে না হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত, সুসজ্জ ফৌজ, তোপ প্রভৃতি চাই। কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে ? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে,— আর শহরে

দেখবে কতকগুলো ঝাম্বাঝুম্বা পরে সেপাই।"

বিস্ময়কর এই, স্বামীজী আমাদের ইদানীন্তন দায়িত্বহীন সমালোচনার মুখেও ভাষা দিয়েছিলেন! কিন্তু ধীরে। স্বামীজী তারপরেই বলছেন—

'তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক।.. স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা, ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।

ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সাঁওতা, বুনোগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের ভুল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বৈকি দুর্দশা করবে—করে শিখবে—শিখে ঠিক করবে।"

[পরিব্রাজক]

বলছি বর্তমান ভারতের শেষে আছে তৎকালীন ভারত ও ভাবী ভারতের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর বাণী। পাঠ্য পুস্তকে এই অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বদেশমন্ত্র' অর্থাৎ সংগত নাম- সার্থকতর হত 'ভারতমন্ত্র' বললে। এখানে ভারতবর্ষকে তিনি [illegible] ও বর্ণাদি সর্ববিধ উন্মোচন করেছেন ভারতের উচ্চারণের অধিকার তাঁরই।

[illegible]

[illegible] একমাত্র [illegible] অংশে। [illegible] বিবেকানন্দের এই [illegible] উদাত্ত ও [illegible] সুমহিম ধ্বনি।

[illegible] —একটি [illegible] শক্তি [illegible] ভারত এই [illegible] একটি সাধনা [illegible] সর্বের [illegible] উচ্চারিত, [illegible] ভারতের [illegible] কিন্তু উক্ত [illegible] নানাপ্রকার [illegible]।

ভাবগাম্ভীর্য ও সুরমহিমার দিক থেকে বিবেকানন্দের এই রচনার একমাত্র তুলনা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা। দুয়েরই বক্তব্য প্রায় এক [illegible] গদ্য ও কবিতায়। 'ভারততীর্থ' কবিতা বলে [illegible] একটি অখণ্ড আবেগের প্রাধান্য 'ভারতমন্ত্রে' চিন্তার রূপটি স্পষ্টতর।

তবু শেষ পর্যন্ত 'ভারতমন্ত্র' আমাদের যেভাবে প্রবুদ্ধ করে তোলে এমন আর কিছুতে নয়, এটা বোধহয় আমার ব্যক্তিগত কথা। সেই ব্যক্তিগত কথাই বলি, এ দাবি ছিল বলবার পাঠকের।

বলেছি, রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার তুলনায় স্বামীজীর 'ভারতমন্ত্রে' চিন্তার রূপটি স্পষ্টতর। কথাটি একটু ব্যাখ্যা করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার শেষে বলেছেন—'এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার'; বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বল, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি তৎকালীন পরিবেশে অধিকতর সুপ্রযুক্ত, বিবেকানন্দের উক্তি সেখানে ঈষৎ বিস্ময় সঞ্চার করবে কারণ ছুৎমার্গের ভারতবর্ষে সকলকে ভাই বলবার দায়িত্ব বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সেই ব্রাহ্মণকে ভাই বলাবার দিকে ঝোঁক কেন?

এ ঝোঁকের হেতু আছে। 'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দের দৃষ্টি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। বর্তমানের ব্রাহ্মণ যেন চণ্ডালকে ভাই বলে কিন্তু ভবিষ্যতে চণ্ডাল যেন ব্রাহ্মণকে ভাই বলতে পারে। এমন একদিন আসবে যখন ব্রাহ্মণকে শূদ্র ভাই বলে গ্রহণ না করলে ব্রাহ্মণের ত্রাণ নেই। বিবেকানন্দ শূদ্র-উত্থান দেখতে পাচ্ছিলেন। সে উত্থান পুরাতন প্রভু ব্রাহ্মণদের হয়ত ধ্বংস করে ফেলবে। বিবেকানন্দ শূদ্রের জাগরণ ও সমাজিক সাম্য চান কিন্তু ব্রাহ্মণের উৎসাদন চাইবেন কেন—যেহেতু ব্রাহ্মণের দেবার অনেক কিছু রয়েছে। স্বামীজী স্মরণীয়।

বিবেকানন্দের কথা ইতিপূর্বে দক্ষিণ ভারতে [illegible] সেখানে [illegible] 'অব্রাহ্মণদের' আক্রমণ চলছে সর্ব[illegible] [illegible]।

বিবেকানন্দ আর্য ও তামিলদের মধ্যে ভেদ [illegible] প্রতিবাদ করেছিলেন। আজ দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সংস্কৃতি [illegible]।

'বর্তমান ভারতে' একটি নিরপেক্ষ মূল্য আছে [illegible] বর্তমান ভারতের অংশ [illegible] বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

'বর্তমান ভারতের' শেষে ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসধারা বিশ্লেষণ করে স্বামীজী যেখানে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর সামনে ছিল বর্তমানের ভারত ও ভবিষ্যতের ভারত। ঐ বর্তমানের ভারতের কাছে প্রচণ্ড বাস্তব হল, ইংরাজ বৈশ্যশাসন। বৈশ্যশাসন বহিঃসভ্যতা নিয়ে আসে, এনেও ছিল। তার ফলে নব সভ্যতাক্রান্ত ভারত পরানুবাদ, পরানুকরণে ব্যস্ত, ইংরেজের সুশাসনে পরমুখাপেক্ষী। এই শিক্ষিত বাবুর দল বীরভোগ্যা স্বাধীনতা চায়! যারা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছে ঐ 'কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ মূর্খ, নীচ জাতি' ওরা অনার্য, ওরা 'আমাদের কেউ নয়'? স্বামীজী এরই বিরুদ্ধে নির্ঘোষ তুলে বললেন, ঐ সাধারণ মানুষেরাই ভারতের দেহ—সে দেহ যদি 'কটিতটমাত্র' আচ্ছাদিত থাকে তবে সেই কটিমাত্র বস্ত্রেই সদর্পে ডাক দিতে হবে ভ্রাতৃত্বের।

কাপুরুষ কখনো স্বাধীনতা পায় না, পেলেও রাখতে পারে না। কাপুরুষ কে? যে পরের মার খেয়ে ঘরে এসে নিষ্ঠুর।—অত্যাচারিগণ মনে রেখো, অত্যাচার ও দাসত্ব একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ, স্বামীজী বললেন। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয় তার স্বাধীন হবার অধিকার নেই—তাঁরই কথা। তাই 'দাসসুলভ ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা' যাদের, যাদের মধ্যে 'সমস্ত এর কাপুরুষতা'—তাদের সতর্ক করে স্বামীজী বলেছেন, এর দ্বারা তোমরা স্বাধীনতা পাবে না।

শূদ্র-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্বামীজী ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন তিনি আশঙ্কা করছিলেন, যদি উচ্চবর্ণের সহানুভূতি ব্যতিরেকেই সে উত্থান ঘটে তাহলে উত্থানের বেগে উচ্চবর্ণকে ধ্বংস তো করবেই, অধিকন্তু ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদ উচ্চবর্ণের দ্বারা পুষ্ট এই সন্দেহে তারা ধর্মনাশা জড়বাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। অথচ স্বামীজীর কাছে ধর্ম সর্বস্ব, ভারতের প্রাণ আছে ধর্মে, বিশ্বের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান ধর্মদান,—সে ধর্মকে রক্ষার উপায় কি? স্বামীজী উচ্চবর্ণকে বলেছেন, যদি বাঁচতে চাও অত্যাচার
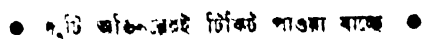
থামাও, মানুষের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার কর, অন্যদিকে জাগরণোন্মুখ জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতের নিত্য আদর্শকে—আত্মতত্ত্বকে।

এইজন্যই বলেছি 'বর্তমান ভারতের' স্বাভাবিক উপসংহার এই 'ভারতমন্ত্র'।

আবার এই 'ভারমন্ত্রের' মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতীয় মহাজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

প্রথমেই দিয়েছেন নারী জাতির আদর্শ। শাক্ত বিবেকানন্দ শক্তির আদর্শকে আগে রাখবেন, তাই স্বাভাবিক। নারী জাতির উন্নতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি নেই—তাঁর চিরপোষিত মত। তদুপরি তিনি জানতেন, জাতির ধর্মীয় আদর্শকে যথার্থভাবে বহন করে নারী—পুরুষ সেখানে বহির্মুখ ও ইহকেন্দ্রিক। নারীদের শিক্ষা দাও তবেই তাদের পথ নির্মাণ করে নেবে, স্বামীজী বলেছেন,—তিনি না বললেও যুগধর্মে নারীরা শিক্ষিত হবেই। কিন্তু সেই নারী যদি নবশিক্ষায় আদর্শভ্রষ্ট হয়, বিবেকানন্দের আশংকা, তাতে ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে।

নারীর সামনে তিনটি আদর্শ চরিত্র উপস্থিত করেছেন—সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী। অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার পঞ্চামৃতকথা নিবেদন করেননি।

সর্বাগ্রে সীতাকে এনেছেন কারণ স্বামীজীর নিঃসংশয় ধারণা সীতার তুল্য চরিত্র অতীতে আঁকা হয়নি ভবিষ্যতেও হবে না। আশ্চর্য, বিদ্যাসাগরেরও এই ধারণা এবং মধুসূদনের।

সীতার বন্দনায় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, অজ্ঞেয়বাদী বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকারী বিদ্যাসাগর এবং ধর্মান্তরিত মধুসূদন জোটবদ্ধ।

সীতার মূল মহিমা ত্যাগে ও সহনে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই মূর্তিমতী ত্যাগকে প্রণাম করবেন বিচিত্র নয় কিন্তু যিনি নারীর উপর চাপিয়ে-দেওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক ত্যাগাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই বিদ্যাসাগরও সীতা চরিত্রে এমন অনুরাগী, এবং মধুসূদন অসামাজিক রচনায় 'বীরাঙ্গনাদের' স্রষ্টা তিনি।

সীতার মধ্যে আছে নিঃশেষ আত্মবিলয়, সাবিত্রীর মধ্যে অনন্ত আত্মপ্রসারণ। প্রেম যে অমৃত, প্রেমের স্পর্শে যে মৃত্যুতেও জীবন সঞ্চারিত হয়, একথা সাবিত্রী প্রমাণ করলেন মৃত্যু-সংগ্রামে জয়ী হয়ে। সাবিত্রীর এই মৃত্যুঞ্জয়ের মহিমাকে উদ্ঘাটিত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্যে।

নারীর মধ্যে যে বীর্য, সাবিত্রী তারই দেবী।

আর একটি মৃত্যুঞ্জয় প্রাণকে বিবেকানন্দ বারবার নমস্কার করেছেন সেই কিশোর হৃদয়ের নাম নচিকেতা।

বিবেকানন্দ নিজ জীবনে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন। আর যেখানেই সেই সিদ্ধি দেখেছেন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'আমি আমাকেই নমস্কার করি'—আত্মবিৎ-এর উপলব্ধি।

দময়ন্তী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নায়িকা। দময়ন্তীর প্রেম-রচনায় ভারতীয় কবি কল্পনার লীলা ও অনুভূতির ঐশ্বর্যকে উজাড় করে দিয়েছেন। দেবতাকে বর্জন করে যে প্রেম মানবাভিমুখী, দময়ন্তীর সেই প্রেম, সে প্রেম অরণ্যে একই বস্ত্রের সিংহাসনে দয়িতের আসন রচনা করে।

সীতা—সাবিত্রী—দময়ন্তী : নারীর তিন আদর্শ।

এবার পুরুষের আদর্শ। তাদের উপাস্য হোক উমানাথ, সর্বত্যাগী শংকর।

কিন্তু উমাকে গ্রহণ করে যিনি উমানাথ, তিনি সর্বত্যাগী হলেন কি করে? স্বামীজীর উত্তর—সেই বিপরীতটা শংকরের জীবনে সত্য বলেই, তিনি আদর্শ। উমানাথ উমা-তপস্যায় ধরা দিয়েছিলেন, কুমার-সম্ভবের দেবতা তিনি, কিন্তু তবু তিনি সর্বত্যাগী। এমনকি তাঁর সম্বন্ধে 'ত্যাগ' বললেও যথেষ্ট বলা হয় না, বলা উচিত 'সংহার'—সংহারই সর্বোচ্চ ত্যাগ—সংহারের শ্মশানে তিনি বসে থাকেন অথচ সংহারের তরল বেদনাকে তুলে রাখেন কণ্ঠে, তাঁর সর্বত্যাগ একটি গ্রহণে আকীর্ণ—তিনি গরলে নীলকণ্ঠ।

সৃষ্টির মাধ্যমে প্রয়োজন যে প্রলয়ের সেই সংহারী শংকরকে উপাস্যরূপে স্বামীজী উপস্থিত করেছেনই কারণ অতঃপর তাঁর বক্তব্য 'তোমার বিবাহ তোমার ধন তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।'

'তোমার জীবন ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে'—কিন্তু কার সুখের জন্য—সমাজের? সে সমাজ তো আদর্শ সমাজ নাও হতে পারে! সে ক্ষেত্রে স্বামীজী বললেন, 'তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত', অর্থাৎ একটি উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্ট এই জীবন; এবং সমাজ যখন 'মহামায়ার ছায়ামাত্র' তখনই সেই সমাজের জন্য আত্মদান করবে মানুষ।

সমাজকে মহামায়ার ছায়া বলে স্বামীজী জানালেন, সৃষ্টি আকস্মিক কিছু নয়—অখণ্ড সত্যের ছায়ারূপ, মহামায়ার ছায়া-রূপে যা স্বয়ং অখণ্ড সত্যস্বরূপ।

'ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ...' অংশটি আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বামীজী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভারত-বাসী ভারতবর্ষে জন্মসূত্রে একজাতি নয়—একজাতি রক্তসূত্রে।

এর পরেই আছে বিপুল প্রাণের আহ্বান, এক অসাধারণ কাব্যের প্রবাহ, যা প্রতি উচ্চারণে নূতন—'বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।'

কিন্তু তবু প্রশ্ন—তোমার দেবদেবী তো আমার দেবদেবী না হতে পারে। উত্তর, তোমার দেবতাও তো ভারতেরই দেবতা—তাকেই নমস্কার কর। তবু প্রশ্ন—যদি দেবতা না মানি? উত্তর—তাতেও ক্ষতি নেই, তোমার জন্য আছে ভারতের সমাজ, ভারতের মৃত্তিকা—সেখানে সবার আসন।

মোক্ষই ভারতের শেষ আদর্শ। তার ক্রমপরিণত রূপকে স্বামীজী প্রকাশ করলেন শৈশবের শিশুশয্যা থেকে বার্ধক্যের বারাণসীর কথা বলে।

তারপরে—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। এই ভূগোল-পূজা কি বজায় থাকবে যদি ভারতবর্ষ আদর্শ ত্যাগ করে?

তার উত্তর আছে স্বামীজীর পরবর্তী প্রার্থনায়। সে প্রার্থনা তিনি করেছেন গৌরীনাথ ও জগদম্বের কাছে অর্থাৎ শান্ত মংগলের কাছে এবং ঐ শান্ত সত্যের ক্রিয়াত্মিকা রূপের কাছে।

স্বামীজীর সেই শেষ প্রার্থনা—'আমায় মনুষ্যত্ব দাও।' দুর্বল ও কাপুরুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না, তাই—'দুর্বলতা ও কাপুরুষতা দূর কর।'

তবু যে সম্পূর্ণ বলা হল না মনুষ্যত্ব একটা অ্যাবসল্যুট ব্যাপার মনুষ্যত্বের লক্ষণ নিয়ে তর্ক হয়, কিন্তু মানুষ হলে আর সন্দেহ থাকে না,—মানুষই মনুষ্যত্বের প্রমাণ।

স্বামীজীর একেবারে শেষ কথা—মা আমায় মানুষ কর।

বিবেকানন্দের ভারতবর্ষের সমগ্রত উদ্দেশ্য মানবধর্ম। কিন্তু সে ধর্ম ভূমিহীন নয়—তার ভিত্তি ভারতভূমিতে।

কোনো একটা ধর্মের মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু তার মধ্যে মৃত্যু ভয়ংকর—স্বামীজী বলেছেন। ভারতের পুণ্যভূমিতে যে জন্ম নিয়েও সে যেন নিখিল মানবের তীর্থ-ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়।

দেশাত্মবোধের মহত্তম উপলব্ধি ক্ষেত্র-রূপে এই ভারতমন্ত্রই যদি বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠতম কণ্ঠদীর্ঘ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তা কি দেশপ্রেমবশে?

রবীন্দ্রনাথ কি দেশপ্রেমবশেই 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' লিখেছিলেন? মরণের শান্তি পারাবারের সামনে দাঁড়িয়েও একই কথা বলেছিলেন ভূগোল-পূজার জন্যই?

বিবেকানন্দের আদর্শ [illegible] এই [illegible]

জাপানী মনীষী ওকাকুরা ও বাংলাদেশ

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জাপানের চিত্রকর, সাহিত্যিক, সমালোচক, দার্শনিক ও মানব-হিতৈষী প্রিন্স ওকাকুরা কাকুজোর নাম বাংলাদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিশেষ করে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার জন্মক্ষণে এই বিদেশী ভারত প্রেমিকের বাংলাদেশে আগমন যে ঐতিহাসিক ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। এদেশে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল জাপানের চিত্তদূতরূপে। লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা ও ই বি হ্যাভেল—এই দুজন বিদেশী ভারত-পথিকের সঙ্গে, ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে ওকাকুরার নামও চিরকালের মত যুক্ত হয়ে থাকবে। বর্তমান বৎসরটি (১৯৬৩) হল এই মনীষীর জন্মশতবার্ষিক বৎসর।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের য়োকোহামায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ওকাকুরা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামের শেষে ব্যবহৃত 'কাকুজো' শব্দটির অর্থই হল 'বৈদগ্ধ্য'। জাপানে ওকাকুরা পরিবারের বৈদগ্ধ্যের যে খ্যাতি ছিল তা ঐ পদবী ব্যবহারের মধ্যেই প্রমাণিত। বালক ওকাকুরার স্বভাবগত আকর্ষণ ছিল প্রাচীনের প্রতি। আট বৎসর বয়সেই তাঁর ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয়—আর চৌদ্দ বৎসর বয়সে উচ্চশিক্ষার জন্যে তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। যখন তাঁর বয়স ষোল তখন তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার আগেই আঠার বৎসর বয়সে তিনি পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রীর নাম মোটোকো ওখো। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ওকাকুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করে বেরিয়ে এলেন। অতীতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সহানুভূতি আর গভীর মমত্ববোধ তাঁকে এক পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে প্রণোদিত করল। এমন সময় জাপান সরকারের শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ডাক এল জাপানী সংগীত ও চিত্রকলা বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের কাজ নেবার জন্যে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাপান সরকার এই তরুণ, উৎসাহী ও বিদগ্ধ যুবকটিকে পাশ্চাত্ত্য শিল্পের ইতিহাস ও আন্দোলন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের [illegible]।

বৎসরকাল বিদেশ ভ্রমণের পর যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর উপর ভার পড়ল টোকিয়ো সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের পরিচালনার। পাশ্চাত্ত্য শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতাকে বাস্তবে প্রয়োগ করবার সুযোগ পেলেন এতদিনে। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৮—এই আট বৎসরকাল তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

কিন্তু এই সময়েই জাপানের শিল্পজগতে পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার দিকে প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলেই ওকাকুরার সঙ্গে পশ্চিম-প্রভাবিত শিল্পীদের মতান্তর ঘটে। কেননা পশ্চিমী আদর্শের অনুকরণ বহুদিন থেকেই ওকাকুরার মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া ইউরোপ-আমেরিকার শিল্পচর্চা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করার পর থেকেই তিনি আরো গভীরভাবে প্রাচ্য ও স্বদেশীয় শিল্পরীতির অনুরাগী হয়ে পড়েন। স্বদেশী শিল্পচর্চার প্রতি ঐ অনুরাগের ফলেই তিনি যে সরকারী পুরাতাত্ত্বিক সমিতির প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন হয়েছিলেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ সমিতির উদ্দেশ্যই হল প্রাচীন সংস্কৃতির ও শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করা। এই সব কারণে—ওকাকুরা যে পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলার প্রভাবের বিরোধিতা করবেন তা সহজেই অনুমেয়। শেষ পর্যন্ত শিল্প বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে উঠল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সময়। কর্তৃপক্ষ পাঠ্যসূচীতে পাশ্চাত্ত্য শিল্পকলাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন। আর পশ্চিম-বিরোধী ওকাকুরার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সেখানেই মতভেদ ঘটল। তার ফলেই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালকের পদে ইস্তফা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সর্বপ্রকার সংস্রব ছিন্ন করলেন।

সরকারী শিল্প বিদ্যালয় থেকে ওকাকুরার পদত্যাগ আধুনিক জাপানী চিত্রকলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জাতীয় শিল্পধারার প্রাচীন রীতি স্বাধীনভাবে চর্চা করার উদ্দেশে ওকাকুরা ঐ বৎসরেই এপ্রিল মাসে টোকিয়োর শহরতলী ইয়াঙ্কা অঞ্চলে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করলেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম নিপ্পন বিজুৎসুন (Nippon Bijitsum)। উনচল্লিশজন নবীন শিল্পী ওকাকুরা-প্রতিষ্ঠিত এই আকাদেমীতে যোগ দিলেন। ওদিকে দেশের নানা অঞ্চলের শিল্পীরা মিলিত হয়ে তখন গঠন করেছেন এক শিল্পী সংঘ—প্রিন্স নিজে যার সভাপতি। ওকাকুরার চিন্তাধারা ও তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনকে তৎকালীন জাপান সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই উক্ত সংঘের সহসভাপতির পদ অলংকৃত করার জন্যে আহ্বান এল তাঁর কাছে। এই আহ্বানই হল ওকাকুরার শিল্পসাধনার স্বীকৃতি। কিন্তু এই মানব-হিতৈষী পুরুষের আমন্ত্রণ শুধু মাত্র স্বদেশেই নয়—তাঁর আহ্বান দেশে দেশে। ইউরোপ-আমেরিকা ছাড়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চীন-ও তিনি ঘুরে এসেছিলেন। এবার বিংশশতাব্দীর শুরুতেই তাঁর ডাক এল ভারতবর্ষে যাত্রা করার জন্যে। আর তাঁর এই ভারতবর্ষ ভ্রমণের ফলেই পরবর্তীকালে তিনি 'Asia is one'—এই মন্ত্রের সাধকরূপে পরিচিত হলেন।

(২)

শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের পর জাপানের বিশিষ্ট মনীষী ও ধর্মযাজকগণ টোকিয়োতে একটি ধর্ম মহাসভা আয়োজন করতে উৎসুক হয়েছিলেন। এই সম্মেলন সার্থক করার উদ্দেশে তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতি কামনা করেন। সমগ্র জাপানবাসীর চিত্তদূতরূপে স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন ওকাকুরা ও বৌদ্ধ মঠসমূহের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ওডা। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ২১ নবেম্বর কলম্বো হয়ে ওকাকুরা মাদ্রাজে পৌঁছলেন—সেখান থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। ফেব্রুয়ারি মাসে রেভারেণ্ড ওডা এসে ওকাকুরার সঙ্গে মিলিত হলেন। জাপানে মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্যে স্বামীজীকে অনুরোধ জানিয়ে তাঁরা সেদিন বলেছিলেন যে বিবেকানন্দই একমাত্র ব্যক্তি য

উপস্থিতির উপর সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করছে। দুই বিদেশী সাধকের আন্তরিকতায় স্বামীজী অভিভূত হয়ে পড়েন আর ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি জাপান যেতে সম্মত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি—কেননা ঐ বৎসরটিই হল স্বামীজীর মর্ত্য জীবনের শেষ বৎসর। রেভারেণ্ড ওডা তো সম্মতি পেয়েই উল্লসিত মনে সম্মেলনের আয়োজনের জন্যে স্বদেশে ফিরে গেলেন আর ওকাকুরা রয়ে গেলেন বেলুড় মঠে—বিবেকানন্দের কাছে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁর দিন কাটে। কিছুদিন পর ওকাকুরা বুদ্ধগয়া পরিদর্শনে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এবং স্বামীজীকেও অনুরোধ জানালেন তাঁর সঙ্গী হতে। আগে থেকেই বিবেকানন্দের কাশী যাওয়া স্থির ছিল তাই তিনি সানন্দে ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া যেতে সম্মত হলেন। ভগিনী নিবেদিতা এই ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বুদ্ধগয়া-ভ্রমণ শেষ হলে ওকাকুরা বিবেকানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, আশা রইল জাপানে ধর্মসম্মেলনে আবার দুজনের সাক্ষাৎ ঘটবে। এবার ওকাকুরা গেলেন আলমোড়া—সেখান থেকে নেপাল পরিদর্শনের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু নানাকারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফিরে এলেন কলকাতায়। এবার তিনি অতিথি হলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। আর সেদিন থেকে জাপান-ভারতবর্ষের মৈত্রীর ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হল।

বুদ্ধগয়া ও আলমোড়া পরিভ্রমণের পর অক্টোবর মাস পর্যন্ত ওকাকুরা কলকাতায় ছিলেন। এই সময়ে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ঘটল—প্রথমত তিনি ঠাকুর বাড়ির সংস্পর্শে এলেন, দ্বিতীয়ত বিবেকানন্দের শিষ্যা ও রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা নিবেদিতার সংগে তাঁর পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হল—যার ফলে এদেশে বসেই ওকাকুরা Ideals of the East নামে বইটি লেখেন। এই বইয়েরই প্রথম ছত্র সেই বিখ্যাত উক্তিতে (Asia is one) যা সেকালে ভারতবর্ষের বহু প্রবীণ ব্যক্তি ও যুবককে আদর্শবাদে উদ্দীপিত করেছিল। নিবেদিতাই এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন। এরই মধ্যে ওকাকুরা অজন্তা ইলোরা দেখে এসেছেন আর বাংলাদেশের বিপ্লববাদী নেতাদের প্রেরণাদানের কাজও করেছেন। ওকাকুরা যে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহদাতা ছিলেন তার প্রমাণ পাই ১৯২৯ সালে ওকাকুরা-প্রসঙ্গে, জাপানে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের এক ভাষণে আর শ্রীঅরবিন্দের একটি উক্তিতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"He (Okakura) had immense inspiration for the young generation of Bengal in those days which immediately preceded a period of a sudden ebullition of national self-assertion in our country."

ঋষি অরবিন্দও বাংলাদেশের বিপ্লব-আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"ব্যারণ ওকাকুরার প্রেরণায় পি মিত্র ও মিসেস ঘোষাল (সরলাদেবী) এই আন্দোলন আরম্ভ করেন।"

ওকাকুরা'র জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বন্ধুত্ব লাভ। শুধু তাঁর জীবনে নয়—ভারত-জাপান এই দুই দেশের সাংস্কৃতিক মিলনের শুভ সূচনাও হয়েছিল এই ঘটনা থেকেই। জোড়াসাঁকোতে ওকাকুরার প্রথম বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় নিবেদিতার আগ্রহে—বিবেকানন্দের নরওয়ে-দেশী শিষ্যা মিসেস ওলিবুল কর্তৃক ওকাকুরারই সম্মানার্থে

প্রদত্ত এক ভোজসভায়। ওকাকুরা-স্মৃতি প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ভোজসভার শেষে নিবেদিতা তাঁকে ওকাকুরার নিভৃত-কক্ষে নিয়ে যান আর সেখানে এই বিদেশী-মনীষী সুরেন্দ্রনাথকে বিস্মিত করে দিয়ে যে প্রশ্নটি করেন তাহল—"আপনারা স্বদেশের কাজের কথা কিছু ভাবছেন কি ?" —এই হল দুজনের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত—তারপর ওকাকুরা যতদিন বেঁচে-ছিলেন ততদিন সুরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন অসীম স্নেহ আর অকুণ্ঠ ভালোবাসা। বিবেকানন্দের সঙ্গে বুদ্ধগয়া পরিদর্শনের সময় সুরেন্দ্রনাথও ছিলেন ওকাকুরার সঙ্গী। তারপর সুরেন্দ্রনাথেরই আমন্ত্রণে তিনি ঠাকুর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। সেই প্রথম আগমনের কথা অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'-তে লিখেছেন—"ওকাকুরা যখন প্রথমবার আসেন এদেশে, যতদূর মনে পড়ে কলকাতায় সুরেনের বাড়িতেই ছিলেন। সেবার খুব বেশী আলাপ হয়নি তাঁর সঙ্গে। মাঝে মাঝে যেতুম দেখতুম বসে আছেন তিনি একটা কৌচে। সামনে ব্রোঞ্জের একটা পদ্মফুল তার ভিতরে সিগারেট গোঁজা। একটা করে তুলছেন আর ধরাচ্ছেন [illegible] বেশী কথা তিনি কখনোই বলতেন না। বেঁটে খাটো মানুষটি সুন্দর চেহারা [illegible] চোখ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠিক যেন এক মহাপুরুষ। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সুরেনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] : He is fit to be a king"

জোড়াসাঁকোয় [illegible] এই [illegible] সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে 'গাইড' করে [illegible], অজন্তা-ইলোরা আর পাহাড় অমৃতসর তাজমহল আর আকবরের সমাধি দেখে এলেন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটেছে এবং এই পরিচয়ের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম জাপান ও চীন সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। পূর্বোক্ত ভাষণে তিনি বলেছেন—'যখন ওকাকুরার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হল তখন পর্যন্ত জাপান বা চীনের সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। এই মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য যখন আমার হল তখনই আমি ঐ দুটি দেশের সঙ্গে পরিচিত হলাম।" রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী চিন্তায় ওকাকুরা যে কতখানি সাহায্য করেছেন তা এখানে লক্ষণীয়। এই পরিচয় সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ আবার জাপান যাত্রার পরি-কল্পনাও করেছিলেন। ঐ সময়েই (১৬ই এপ্রিল—১৯০২) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী অবলা বসুকে বিদেশে এক চিঠিতে লিখছেন—"যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর (ওকাকুরার) সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে—অধ্যাপক মহাশয়কে (জগদীশচন্দ্রকে) তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক আছেন।" ওকাকুরার সাহচর্যে জাপানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে যোগ স্থাপিত হল—তা তাঁর রচনায় ও কর্মে নানাভাবে চিহ্ন রেখে গেছে। পরবর্তীকালে যখন তিনি জাপান যান (১৯১৬) তখন সেখানে পরলোকগত ওকাকুরার প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে—"সেদিন ওকাকুরার-বাড়িতে গিয়েছিলুম, সে জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগেছে। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে,

ওকাকুরাকে তার দেশের লোক তেমন করে চিনতেই পারেনি। সেটাতে এদের অগভীরতা প্রকাশ পায়। কেননা অনেক বড়ো বড়ো লোকের সংগে কথাবার্তা করে দেখলুম, ওকাকুরার মত কারো প্রতিভা দেখতে পাইনি।"

ভারত ত্যাগের পূর্বে ওকাকুরাকে আরেকটি স্মরণীয় ঘটনার সাক্ষী হতে হয়। যাঁকে স্বদেশে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর এদেশে আগমন সেই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু ঘটলো তাঁর জোড়াসাঁকোর বাস কালে। ওকাকুরার ভারতে আসার প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হল। সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় দেখি স্বামীজীর মৃত্যুর পর শোকান্বিতা নিবেদিতার পাশে সান্ত্বনা দানরত ওকাকুরাকে—নিবেদিতার বিরাম-হীন কান্নার উত্তরে বাক্যহারা স্তব্ধ ওকাকুরা। সুরেন্দ্রনাথের বর্ণনাটুকু অতুলনীয়—

"Nevertheless some charm in his (Okakura's) sympathetic silences apparently worked on the highly-strung Nivedita with greater potency than the words of wisdom poured on her by her fellow-disciples. — bringing her peace."

এই ঘটনার পর অক্টোবর মাসে ওকাকুরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরে গিয়েই তিনি টাইকান ও হিশিদা নামে দুজন শিল্পীকে পাঠালেন জোড়াসাঁকোতে। যাবার সময় তিনি অবনীন্দ্রনাথদের বলেই গিয়েছিলেন—'আমি জাপানে গিয়ে আমাদের দু-একটি আর্টিস্ট পাঠিয়ে দেব। তারা এদেশ দেখবে, নিজেরা ছবি এঁকে যাবে তোমরা দেখতে পাবে, তাদের কাজ—তাদেরও উপকার হবে তোমাদেরও কাজে লাগবে।' ওদিকে জাপানের সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হোরিসানকে তিনি পাঠালেন নব-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে—সংস্কৃত পাঠের উদ্দেশ্যে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রথম বিদেশী ছাত্র হোরিসান। পরবর্তীকালের বিশ্বভারতীর অংকুর সেদিনই জন্মলাভ করেছিল। এই সময় থেকে ওকাকুরার কর্মস্থল হল আমেরিকা মহাদেশে—আমেরিকার বোস্টন সংগ্রহশালায়। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে টাইকান প্রমুখ তিনজন শিল্পীকে নিয়ে উক্ত সংগ্রহশালার চীন জাপান চিত্রকলা বিভাগের পরিচালকের পদে তিনি যোগ দিলেন। আর এই বছরেই তাঁর অন্যতম বই 'Awakening of Japan' প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯০৪ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ—এই পর্বে বোস্টন সংগ্রহশালার কর্মীরূপে ওকাকুরা কখনও ইউরোপ, কখনও জাপান, আবার কখনও বা চীন দেশে পরিভ্রমণরত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি উক্ত সংগ্রহশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। পরবৎসর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে "মাস্টার অব্ আর্টস" উপাধি দানে সম্মানিত করল। ১৯১২ সালে আগস্ট মাসে চীন দেশ ঘুরে আবার প্রিয় ভারত-ভূমিতে ফিরে এলেন তিনি।

কিন্তু এবারে আসা খুবই অল্পদিনের জন্যে। মাত্র দুমাসকাল তিনি এদেশে ছিলেন। তখন তাঁর জীর্ণ শরীর, কঠিন রোগে ভুগছেন। জোড়াসাঁকোতেই অতিথি হয়েছেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিয়োতে বসে শিল্পসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলে। তাঁর চারপাশে সমবেত হয় অবনীন্দ্রনাথের নন্দলাল প্রমুখ তরুণ শিষ্যদল। নন্দলালদের তিনি আর্টের ট্রাডিশন অবসার্ভেশন ও ওরিজিনালিটি বোঝাতেন তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে। এবারে ওকাকুরার সংগে ভারতীয় শিল্পধারার আত্মিকযোগ আরো গভীর হল। তিনি জাপানের প্রাচীন শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যকে সাহস আর যুক্তির সংগে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন তাঁর জীবনের কর্মধারার মধ্যে দিয়ে। তাঁর মতে

চোখে পড়ার চেষ্টা নেই—তবুও কী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। * * * তোমার স্বর্গীয় চোখ দু'টির কী যাদুকরী শক্তি। * * *"

তাঁরা দু'জনে কাছাকাছি এসেছিলেন অল্প কয়েকদিনের জন্যে। এই অল্পদিনের নৈকট্যের ফলে যে পুষ্পবাস ফুটে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ওকাকুরার চিঠিগুলিতে। চিঠিগুলি যে মহিলাটির উদ্দেশে লেখা তাঁর নাম এখনো প্রকাশ করা যাবে না—আর পত্রলেখকও কোথাও উক্ত মহিলার নাম ধরে সম্বোধন করেন নি। তার পরিবর্তে যে সম্বোধনগুলি ব্যবহার করেছেন তাহল— 'আমার প্রিয় গোধূলিতে ভেসে আসা মধুগন্ধ' 'পদ্মবনের বধূ', চন্দ্রসুন্দরী' প্রভৃতি। ওকাকুরার কাছে এই মহিলা যেন— "কোনো এক দূরত্বের গহ্বরের পারে হৈমবতের তুষার বুকে পরম যত্নে লালিত ফুলে ভরা একটি জেড্ গাছ, শুভ্র ও প্রশান্ত।"

আগেই বলেছি, মহিলাটি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা। তাই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা ওকাকুরাকে কিরকম মুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় চিঠিগুলির পাতায় পাতায় রয়েছে। প্রতি চিঠিতে বারবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মহিলাটির রচনার। বাংলা ভাষা জানেন না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আর জানতে চেয়েছেন, কি করে সহজে বাংলা শেখা যাবে।

"ভয় হয় তোমার কবিতা বোঝবার আগেই হয়ত আমি মাটির নীচে বিশ্রাম লাভ করব— যেখান থেকে কেবল শুনতে পাবো আমার ওপরে গাছেদের দীর্ঘশ্বাস।"—বাংলা শেখার আশায় ওকাকুরা শেষ পর্যন্ত মহিলাটির কাছে বাংলা ব্যাকরণ চেয়ে পাঠিয়েছেন। এবং সেই ব্যাকরণ পৌঁছনোর পর অদম্য উৎসাহে বাংলা পড়তে শুরু করেছেন।—"তোমার কবিতা সব সময়েই আমার কাছে এক পরম বিস্ময়। আমার বলবার কথা তারাই যেন বলে দেয়। এবং আরো অনেক কিছু। কল্পনায় দেখতে ভাল লাগে—কেমন বসন্ত দিনের নিভে আসা আলোয় তোমার বাগানে বসে আছ তুমি কবিতার ভাবে বিভোর। আর শক্ত হরিণীটি তোমার মুখে শিশুর মত চোখ মেলে চেয়ে আছে। তার চোখ দুটিতেও কী গভীর বিস্ময়। তোমার শুভ্র বসনে ঝরে পড়ছে পুষ্পদল। তোমার ইচ্ছামত আরও কবিতা আমাকে পাঠিও। জানি তোমার কাছে আমি দাবি করছি বেশী কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারো আমার কাছে তোমার কবিতাগুলো কী [illegible]"

ভারতীয় রমণীর [illegible] এই [illegible] চিঠিগুলির [illegible] আমাদের মুগ্ধ করে। [illegible] থেকে লিখছেন— [illegible] আমি [illegible] [illegible] তোমার প্রিয় [illegible] [illegible]

[illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] দেখছি

বোস্টন থেকে ওকাকুরার চীন [illegible] কথা হচ্ছে—[illegible] লিখছেন [illegible] চীন যাবো বোধ হয় [illegible] সেইসাথে [illegible] [illegible] হাজার মাইল কাছেই পৌঁছে যাব।"

রবীন্দ্রনাথ [illegible] [illegible]

"সমুদ্রের পাড়ে বসে সমস্ত দিন ধরে সাগরের ঢেউ দেখছি।—আমি ভাবি তুমি হয়ত কোনদিন সমুদ্রের কুয়াশা ভেদ করে উঠে আসবে। তুমি আরও পূর্ব দিকে এগিয়ে আসবে কখনো? ধরো চীনে? মালয়ে? ব্রহ্মদেশে? রেঙ্গুন তো কলকাতার খুব কাছেই। না আমি বৃথাই স্বপ্ন দেখছি। তবু, এ স্বপ্ন কী মধুর"

নববর্ষের চিঠির উত্তরে ওকাকুরা বলছেন— "তোমার নববর্ষের অভিনন্দনপত্র পেয়েছি। তুমি সেদিন আমার জন্যে প্রার্থনা করেছ— একথা আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আমি তোমার অন্তরের এমন মধুর দাক্ষিণ্য পাবার মত কী ই বা করেছি— আর কী ই বা করতে পারবো? আমিও তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি। সত্যি কি চমৎকার হয় যদি এই প্রার্থনা যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মাঝ সমুদ্রে সাক্ষাৎ হয়— আর তাদের দুজনের মধ্যে প্রার্থনা বিনিময় হয়।"

তাঁদের দুজনের মধ্যে এই মহাসাগরের ব্যবধানের চেয়ে মৃত্যুর ব্যবধান [illegible] এগিয়ে আসছিল। ওকাকুরা শেষের এই [illegible] ব্যবধানের [illegible] আগেই [illegible] [illegible]

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
[illegible]
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস [illegible] সুতারকিন স্ট্রীট কলকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চাদর, বালিশের ওয়াড়,
টেবিল ঢাকনা
উজ্জ্বল
ও ঝকঝকে
সাদা

* সূচীপত্র *

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রকাশিত হয়েছে

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মনময়ূরী

সর্বাধুনিক রহস্য-উপন্যাস। অপূর্ব চার-রঙা প্রচ্ছদ। দাম ২·৫০

শক্তিপদ রাজগুরু

নূতন সীমান্ত

সর্বাধুনিক নতুন ধরনের উপন্যাস। দাম ৩·০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

ময়ূরের মন

এ কাহিনী [illegible] ও বর্তমানের আর [illegible] চিত্র নরনারীর। দাম ১·৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

উর্ণনাভ ৩·০০

উমেশচন্দ্র

রূপসী [illegible] ২·০০

শক্তিপদ রাজগুরু

অগ্নিস্বাক্ষর ২·৫০

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ভ্রান্তিবিলাস ১·৫০

[illegible]

শকুন্তলা ১·৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দূর বসন্ত ৩·০০

[illegible] মুখোপাধ্যায়

দুটি ফুল দুটি প্রাণ ৩·০০

[illegible] দেবী

মুখর রাত্রি ৩·০০

নবজন্ম ৩·০০

উমেশচন্দ্র

নকল রাজা নকল রানী ৫·০০

আলোক লগন ৩·০০

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

সম্প্রতি প্রকাশিত তিনখানি

শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য

নিবেদন ইতি

বিমল মিত্র

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মানুষকে দেয়নি কিছুই - আর, যদিও কিছু দিয়ে থাকে, তা হল উদ্‌ভ্রান্তি এবং লক্ষ্যহীনতা। কিন্তু নিয়েছে অনেক কিছুই। নিয়েছে তার শাশ্বত নীতিজ্ঞান প্রাচীন মূল্যবোধ পুরনো বিশ্বাস। হৃতসর্বস্ব মানুষ বিমূঢ় হয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে। ভেবেছে অর্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। মহৎ সব কিছুকে পরিত্যাগ করে হালকা আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়াই জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতার এই যে বিরাট অবক্ষয় তারই মহান চিত্রায়ণ 'নিবেদন ইতি'।

দাম : ৫·০০

বসন্ত-তিলক

সুবোধ ঘোষ

এক নকল জীবনের প্রহসন [illegible] হঠাৎ একদিন ঝড় তুলেছিল [illegible] তার আত্মস্ফুর্তির [illegible] অটল [illegible] যখন পারল না আক্রোশের [illegible] দিতে চাইল তাকে। আর তখনই [illegible] হয়ে প্রতিরোধ করেছিল সে নির্মম আক্রমণের [illegible] দিয়েছিল। এবং আশ্রয় নিয়েছিল এক [illegible] করেছিল এক পবিত্র স্থৈর্যকে। [illegible] গ্রন্থটি উপন্যাস-সাহিত্যে এক [illegible] সংযোজন।

দাম : ৫·০০

শঙ্খ-কঙ্কণ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ কাহিনীর মত ঐতিহাসিক [illegible] রোমান্টিক কাহিনী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একক এবং [illegible] বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই এ কথা জানেন। [illegible] প্রভৃতি কাহিনী অবিস্মরণীয়। 'শঙ্খ-কঙ্কণ' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনেরই তিনটি দীর্ঘ গল্পের সংকলন গ্রন্থ।

দাম : ২·৫০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

দেশ

৩০ ॥ ২৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
SATURDAY, 18TH MAY, 1963

বাংলার স্বরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বৎসর দুই পূর্বে। তখন স্থির হয়েছিল ১৯৬৩ সালের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্যকর হবে। কিন্তু নানা কারণে এতদিন সে কাজ খুব বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। ইংরেজীতে নথীপত্র, মন্তব্য ইত্যাদি রচনায় এবং প্রয়োগে যাঁরা এতকাল ধরে অভ্যস্ত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই সম্ভবত সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারে উৎসাহিত বোধ করেন নি। বাংলা টাইপরাইটার এবং শ্রুতিলিখন ব্যবস্থা অপ্রতুল [illegible] সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহারের উদ্যোগ অনেক পরিমাণে ব্যাহত [illegible] এখন দেখা গেল [illegible] সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করলে [illegible] কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারের [illegible] সব বাধা এবং অসুবিধা অপসারিত [illegible] বাধা। এবারের পঁচিশে বৈশাখ সেদিক দিয়ে বাংলা ও বাঙালীর [illegible] স্মরণীয় দিবস। রবীন্দ্র জন্মদিবসে বাংলা ভাষার মর্যাদা [illegible] সংশয় অনিশ্চয়তা এবং নিশ্চেষ্টতা [illegible] হয়েছে, [illegible] বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠালাভ প্রকৃতই একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে তাঁরা এ বিষয়ে অনেকদিনের দ্বিধা সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে হাতেকলমে প্রমাণ করেছেন সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার স্বচ্ছন্দে বিস্তৃত করা সম্ভব।

নতুন উদ্যোগমাত্রেই কার্যক্ষেত্রে ছোট বড় বাধার সম্মুখীন হয়। সরকারী কাজকর্মে ইংরেজীর বদলে বাংলা চালু করতে প্রথম পর্যায়ে সে রকম কিছু কিছু বাধা ও অসুবিধা ঘটবেই। ইংরেজী বহুকাল ধরে এদেশে সরকারী কাজকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাছাড়া ইংরেজীর মূলধন অনেক বেশী, অনেকদিন ধরে অনুশীলনের ফলে ইংরেজীর ব্যবহারিক দক্ষতা, প্রয়োগবৈচিত্র্য বহুদিক সুবিস্তৃত সুপ্রশস্ত হতে পেরেছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সেই ইংরেজীর ঐশ্বর্যের দিকে নজর রেখেই বলা যায়, ভাষার ঐশ্বর্য বাড়ে ভাষার সম্যক ও ব্যাপক ব্যবহারে। বাংলা ভাষার মূলধন ইংরেজীর সমতুল 'কিম্বা ইংরেজীর কাছাকাছি পর্যন্ত হতে পারে নি, তার প্রধান কারণ 'রাজ ভাষা' হিসেবে ইংরেজীর দীর্ঘকাল একাধিপত্য। রামমোহন - বিদ্যাসাগর - বঙ্কিম - রবীন্দ্রনাথের ভাষার মূলধন নিতান্ত সামান্য নয়, কিন্তু সে-মূলধন স্বচ্ছন্দে বিনিয়োগ ও বিবর্ধনের সুযোগ এতদিন পাওয়া যায় নি। সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ব্যবহারিক সমৃদ্ধির পথ নিঃসন্দেহে এবার উন্মুক্ত হল।

সবেমাত্র শুরু, এখনও অনেক কিছু করণীয় আছে ভাষাকে ব্যবহারিক প্রয়োজনমত গড়ে পিটে তৈরি করার কাজ দীর্ঘসময়সাপেক্ষ, বহুজনের সানন্দ সহযোগিতাও দরকার। সরকারী কাজকর্মে বাংলা প্রচলনে ইংরেজী শব্দ নির্বিচারে পরিহার করা নিশ্চয়ই সঙ্গত বা সম্ভব নয়। [illegible] সরকারের [illegible] ঠিক বাংলা শব্দ পাওয়া [illegible] ভাবপ্রকাশের জন্য ইংরেজী শব্দ [illegible] ইংরেজী [illegible] ইংরেজীর [illegible] ইংরেজী শব্দসম্ভার থেকে প্রয়োজনমত [illegible] করেই বাংলাভাষার ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত শুচিবাই ক্ষতিকর। ইংরেজী ভাষাও প্রাকদেবী মিনার্ভার মত একদিন রাতারাতি পূর্ণাঙ্গ আকারে শ্রী ও শক্তিমণ্ডিত হয়ে আবির্ভূত হয় নি। ইংরেজীর কাঠামো অ্যাংলোস্যাক্সন কিন্তু সেই নর্মান রাজত্বের সময় থেকে ইংরেজী প্রচুর শব্দ আহরণ করেছে অন্যান্য বহু য়ুরোপীয় ভাষার শব্দভাণ্ডার হতে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলা যদি ইংরেজী থেকে ঋণ নেয় তাতে হীনতার কিছু নেই। জীবন্ত প্রাণসর ভাষার ধর্মই হল নানা ভাষার সম্পদ স্বচ্ছন্দে আহরণ ও আত্মস্থ করা।

পরিভাষা সংকলন ও গঠন ব্যাপারে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা বাস্তব বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন বেশী, সে-কথা সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। হিন্দীর পরিভাষা রচনায় উৎকট গোঁড়ামি নানারকম হাস্যকর জঞ্জাল ও জট সৃষ্টি করেছে। বাংলার পরিভাষা রচনাতেও ইতিপূর্বে এইরকম কিম্ভুত কিমাকার দুর্বোধ্য শব্দ প্রচলনের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনমত ঋণ গ্রহণ অবশ্যই সঙ্গত। কিন্তু যে সমস্ত বিদেশী শব্দ বহুকাল ধরে বাংলা ভাষায় চলিত এবং বহুজনবোধ্য সেগুলি বর্জন করে নতুন নতুন দুরূহ শব্দ প্রচলনের কোনই অর্থ হয় না। যেমন, ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট, ডেপুটি, র‍্যাশন, কণ্ট্রাক্ট, স্কুল, চপ, কাটলেট, সার্ট, ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি বাংলায় বহু প্রচলিত শব্দের জাতকুল গোত্র বিচার করে এখন বাতিল করার চেষ্টা যেমন হাস্যকর তেমনি পণ্ডশ্রম। ওইগুলির বদলে দুর্বোধ্য শব্দ সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও সেগুলি কখনও সচল হতে পারে না।

পরিভাষার অনটন ও অসুবিধা ভাষার ব্যবহারিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। সজীব ও সচল ভাষা আপন শক্তিবলেই তার ভাবপ্রকাশক্ষমতা ও শব্দবৈচিত্র্য বিস্তৃত করে থাকে। রামমোহন -বিদ্যাসাগরের আমল থেকে বাংলা ভাষার বিবর্তন ও বিকাশের ধারা তার নির্ভরযোগ্য নিদর্শন। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসও সাক্ষ্য দেবে দেশ-বিদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-শস্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত [illegible] বিদেশী ভাষা [illegible] স্বচ্ছন্দে সহজ [illegible] ভাবে বাংলায় [illegible] [illegible] ভাষা [illegible] [illegible] প্রয়োজনে [illegible] উৎসাহ এবং উদ্যোগ [illegible] নব নব বাবায় [illegible] হবে [illegible] যেতে পারে।

সমস্যা এবং আছে। সরকারী কর্মকাণ্ডের পরিধি যেমন বিপুল তেমনি এর জটিলতা এবং বৈচিত্র্যও প্রচুর। উপরন্তু আইনকানুন ও বিবিধ কার্যবিধি বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ ব্যাপারে ভাষার ব্যবহার সুষ্ঠু, সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী ভাষায় বিবিধ শব্দার্থ এবং প্রয়োগবিধি দীর্ঘকাল ব্যবহারে কতকগুলি কঠিন নিয়মবন্ধ। ইংরেজী বাগর্থ সম্পর্কে সংশয় বা মতভেদ ঘটলে তা নিরসনের জন্য অনায়াসে নজীরের শরণ নেওয়া যায়; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিরূপণের জন্য অক্সফোর্ডের বৃহৎ অভিধান কিম্বা মার্কিন বিকল্পে ওয়েবস্টার। ব্যাকরণ এবং প্রচলিত ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও ইংরেজী ভাষার বিধিবিধান আটসাট। বাংলায় যতদূর সম্ভব এখনও এমন কোন পূর্ণাঙ্গ অভিধান ও ব্যাকরণ নেই যার নির্দেশ সুস্পষ্ট, নির্ভরযোগ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য। সরকারী কাজকর্মের সকল ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ার পক্ষে এটি একটি দুরূহ সমস্যা। বাংলাভাষার শব্দার্থগত এবং ব্যাকরণসম্মত সুষ্ঠু প্রয়োগের বিধিনিয়ম রচনার কাজে এখনই উদ্যোগী হওয়া উচিত, নতুবা সরকারী কাজকর্মে নানারকম বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা।

শতাব্দীর অপরাহ্নে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শতাব্দীর অপরাহ্নে মন,
হৃদয়, সময় যেন চুপ করে আছে।
উর্বর পৃথিবী, তবু যেন তার কাছে
কিছু আর পাব না এখন।
ভালোবাসা জন্ম হয় রক্তের ভেতর,
স্মৃতি বিস্মৃতিতে গিয়ে মেশে,
পরিচিত সব কণ্ঠস্বর
উধাও যেন-বা নিরুদ্দেশে
মৃত্যুর গহনে।
শুধু মৃত্যু ঝরে পড়ে মনে
যে-মন মৃত্যুরই মতো চুপ।
আমি এই শতাব্দীর অপরাহ্ন, অন্তিম, অরূপ॥

পাশা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শতাব্দী সহস্রবাক। ওষ্ঠাধারে ঝরে ধূমকেতু
সায়াহ্ন অচল। তারা দিয়ে গড়া এক সেতু
অদৃশ্যকালের।
বাতাস পেয়েছে স্পর্শ মেঘের পালের।

ভাবনায় নেই শেষ কথাঃ
ধূমকেতু, সায়াহ্ন-মেঘ, বন্য অধীরতা।

এসো ঝড় এসো ঝঞ্ঝা
তারা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে:
শতাব্দী তোমাকে বন্দী। হৃদয়ে-হৃদয়ে
বারবার হতাশ্বাসে কৃপণের মতো ভালোবাসা
দেউলে হবার খেলা—জীবনের পাশা॥

বহ্নিজ্বালা আকাশের নিচে

উমা দেবী

এখন শীতের দিন ফুলে ফলে রৌদ্ররসে ভরা
ছোট ছোট বেলাগুলি। রঙে রঙে বিচিত্রিত ধরা—
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্নময়।
ভেটকি চিতল মাছ রাঙা রাঙা টমাটো ও আপেল ডালিম
সাদা ফুলকপি আর সবুজ মটরশুটি ওলন্দাজ—তাজা তাজা শিম
রসনায় স্বাদুস্বাদ, চক্ষে চক্ষে বর্ণ মোহময়,
কমলানেবুর গন্ধে ভরপুর শীতের সময়।
মৌসুমী ফুলেরা ফোটে নানারঙা হাজার হাজার
নুয়ে পড়ে রূপভারে দীর্ঘগ্রীবা চন্দ্রমল্লিকার।

এখন শীতের ঋতু—হিমালয়ে দুর্দান্ত শীতের
আয়োজন। তুষারে শীতলতম বায়ু উত্তরের
নিষ্ঠুর শত্রুর মত—স্পর্শ তার ছুরির ফলায়
গোপন সুড়ঙ্গ খোঁজে হাড়ের তলায়।
এখন নিঃসঙ্গ শীত। পাহাড়ে পাহাড়ে
শিবিরের শ্রেণী। তবু গাঢ় অন্ধকারে
চক্ষুগুলি নিদ্রাহীন। হৃদয় সজাগ
ছুঁয়ে আছে লক্ষ-কোটি মানুষের দীপ্ত সূর্যরাগ।
তাই সে প্রদীপ্ত এত। বহ্নিজ্বালা আকাশের নিচে
জীবনের প্রগাঢ় যে স্বাদ তারা পায়—তার কাছে মনে হয় মিছে
এই মিঠে আরামের মধুর আমেজ।
প্রাণের যে তেজ
ধমনীতে ধমনীতে রক্ত হয়ে বয়,
সেখানে এ শীতঋতু বসন্তময়।
এ নক্ষত্র সে আকাশে অধিক উজ্জ্বল,
এ তিমির সেই দেশে আরো যে নিবিড়,
এ প্রেম সেখানে সত্যজ্যোতি-ঝলমল—
সেখানে একটি চিত্তে লক্ষ কোটি মানুষের ভিড়।

দক্ষিণ আফ্রিকার 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের 'অ্যাপার্টথাইড' নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বের জনমতের যেরূপ অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখা গেছে এরূপ খুব কম বিষয়েই হতে দেখা যায়। কিন্তু 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্ট তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হননি। বছরের পর বছর তাঁরা ইউনাইটেড নেশনসকে অগ্রাহ্য করে চলেছেন। 'অ্যাপার্টথাইড' নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরঞ্চ সেই নৃশংস নীতিকে চালিয়ে যেতে 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্ট যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারই অজস্র প্রমাণ জমে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বেশীর ভাগ অধিবাসীর, যারা সেই অশ্বেতকায়দের দাসের মতো অবস্থায় চিরকাল রেখে দেওয়ার পাপ-চেষ্টার বিরুদ্ধে, সমস্ত রকম প্রতিবাদ আন্দোলনের টুঁটি চেপে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। 'আইন' দিয়ে আইনের মর্যাদা নষ্ট করার উদাহরণ মানুষের অতীত ইতিহাসে এবং বর্তমানেও কিন্তু বিরল নয়, কিন্তু এ বিষয়ে আফ্রিকার 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের কীর্তিকে প্রায়-অতুলনীয় বলা চলে।

তবে এ অবস্থা বোধ হয় আর খুব বেশী দিন চলবে না, ফেটে পড়বেই। সম্প্রতি ইউনাইটেড নেশনস-এর একটি স্পেশাল কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে অবস্থা খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের নীতিগতি ক্রিয়াকলাপের যদি মৌলিক পরিবর্তন না হয়, তবে অচিরে একটা বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা দেখা দেবে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের 'অ্যাপার্টথাইড' নীতির প্রতিবাদে কয়েকটি রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। উপর্যুক্ত কমিটির মতে, পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষেই দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদন করা উচিত। কমিটি দেখিয়েছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকা তার মোট আমদানি ও রপ্তানির চার ভাগের তিন ভাগের জন্য আটটি দেশের উপর নির্ভরশীল। কমিটি বলেছেন যে, ইউনাইটেড নেশনস-এর জেনারেল অ্যাসেম্বলী এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের কর্তব্য হবে—সেই আটটি দেশকে বলা যে, তারা যেন দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেন্টকে 'উৎসাহ' না দেয়। এ কথার তাৎপর্য এই যে, এই আটটি দেশ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয় বা খুব বেশী রকম কমিয়ে দেয় তা হলে তার চাপ 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্ট সহ্য করতে পারবেন না। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্শ্ববর্তী বৃটেন এবং পর্তুগালের শাসনাধীন অঞ্চলগুলি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যাতে কোনো রকম সাহায্য বা সহযোগিতা না পান, সে সুপারিশও কমিটি করেছেন।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কারবার করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে অস্ত্র-শস্ত্র বেচে যারা লাভবান হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে সহসা দূরদৃষ্টি আশা করা যায় না। তা না হলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের দ্বারাই অনেক কাজ হতে পারত। এ কথা ঠিক যে, 'অ্যাপার্টথাইডের' দরুন দক্ষিণ আফ্রিকাকে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে এবং তাতে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে সায় দিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বিশেষ কিছু দুঃখিত হননি, বরঞ্চ তাই নিয়ে 'ন্যাশনালিস্ট' সরকার গর্ব করেছেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বৃটিশরাজের সম্পর্ক ছিন্ন করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'রিপাবলিক' বলে ঘোষণা করেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ ও ডাচ বংশোদ্ভূতদের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃত্ব এখন প্রধানত ডাচ বংশোদ্ভূতদের হাতে। ডাচদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহানুভূতি স্বভাবতই বৃটিশ বংশোদ্ভূতদের প্রতি, কিন্তু অর্থনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেন্টের সৌহার্দ্যের কিছুমাত্র কমতি নেই, দক্ষিণ আফ্রিকা কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার পরে ব্রিটেনের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক কিছুমাত্র শিথিল হয়নি, এমনকি আরো একটু ঘনিষ্ঠতর হয়ে থাকতে পারে। কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যাবার দরুন আইনের দিক দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে আগের তুলনায় যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই বিধিব্যবস্থা করা হয়। তার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার আগের চেয়ে বোধ হয় সুবিধাই হয়েছে। সুতরাং বৃটেন ইচ্ছা করলে দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্টের উপর যথেষ্ট চাপ দিতে পারত এবং এখনও পারে। কিন্তু কার্যত উল্টোই হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু না করার পক্ষে একটা সনাতন যুক্তি আওড়ানো হয়। সেটা হচ্ছে এই যে কোনো অন্যায়কারী রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক অসহযোগ করে কোনো লাভ নেই, কারণ যে দেশ যদি অসহ-

যোগিতা করে, তবে অন্যায়কারী রাষ্ট্র অন্য দেশের সহযোগিতা পাবে, শুধু মাঝখান থেকে বর্তমানে যারা কাজ-কারবার করে লাভবান হচ্ছিল তাদের ক্ষতি হবে। এরকম সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই যুক্তি যদি ধ্রুব সত্যের মতো মেনে চলতে হয় তা হলে তো যতদিন পর্যন্ত পৃথক পৃথক রাষ্ট্র থাকবে এবং তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ থাকবে ততদিন পর্যন্ত অন্যায়কারীর সঙ্গে অসহযোগের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করার চেষ্টা করাই যাবে না।

কিন্তু আসলে এ যুক্তিটাও অকাট্য নয়। কখনও কখনও অবস্থা এমন হয় অথবা এমন সময় আসে যখন একজন সরে এলেই যে অন্য কেউ অন্যায়কারীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে যাবে তা নয়। কোনো বিষয়ে পৃথিবীর জনমত এমন একটা অবস্থায় পৌঁছতে পারে যখন একজন যদি অন্যায়কারীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করে তখন অন্য কেউ লাভের লোভে তখনই তার জায়গা নেওয়ার জন্য অগ্রসর হতে দ্বিধাবোধ করবে। আজকের দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেকটা সেরকম বলা যায়। তা ছাড়া বিশ্বের জনমত বা আদর্শের কথা বাদ দিয়েও স্বার্থচিন্তার দিক থেকেও দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা না করার পক্ষে একটা বড়ো যুক্তি আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেণ্টের সঙ্গে খাতির রেখে আপাতত অর্থনৈতিক লাভ হতে পারে কিন্তু লাভের হিসাবের দিক দিয়েও এর মূল্য ও স্থায়িত্বের পরিমাণ কতটা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়রা, যারা সংখ্যায় শ্বেতকায় প্রভু-শ্রেণীর অনেক গুণ তাদের আর বেশী দিন দাবিয়ে রাখা যাবে না। তারা যখন স্বাধিকার পাবে, তখন তাদের পূর্বতন অত্যাচারী শত্রুর সহায়কদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রাখতে আগ্রহ বিশেষ থাকবে এরূপ আশা করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না।

আর এটা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায় মানুষদের সম্পর্কে কথা নয়। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার অত্যাচারিতদের জন্য সমস্ত আফ্রিকার অশ্বেতকায় মানুষের মন বেদনা এবং ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সংঘর্ষ আসন্ন বলে আশংকা করা হচ্ছে তাতে সমস্ত আফ্রিকা সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে শরিক হবে। আফ্রিকার কোনো কোনো গভর্নমেণ্ট নির্লিপ্ত থাকার চেষ্টা হয়ত করতে পারেন কিন্তু আফ্রিকার কোনো রাষ্ট্রেরই অশ্বেতকায় অধিবাসীদের মন এই ব্যাপার থেকে নির্লিপ্ত নেই এবং নির্লিপ্ত থাকবে না। তারা কখনই দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেণ্টের সহায়কদের প্রীতির চক্ষে দেখবে না এবং সহজে তাদের বন্ধু বলে গ্রহণ করতে পারবে না। আজ যাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সহায়ক বলে মনে হবে তাদের প্রতি সারা আফ্রিকার মানুষের মন বিরূপ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আফ্রিকার নূতন স্বাধীন হওয়া দেশগুলির সঙ্গে স্থায়ী লাভজনক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন ও রক্ষা করার আশা যারা করে, তাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার 'ন্যাশনালিস্ট' গভর্নমেণ্টের সহায়করূপে—তা সে সাক্ষাৎভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক—প্রতিভাত হওয়া মোটেই উত্তম বিষয়বুদ্ধির পরিচায়ক হবে না। ইউনাইটেড নেশনস্-এর স্পেশ্যাল কমিটির সুপারিশগুলি কেবল আদর্শবাদীদের বিবেচনার জন্য নয়।

✻

ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি শহরে ইন্দোনেশীয় যুবক এবং চীনা অধিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এরূপ সংঘর্ষ নূতন নয় এর আগেও দু-একবার হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার চীনা বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের গ্রামাঞ্চলে ব্যবসা করার এখন অধিকার নেই। এইসব বিষয় নিয়ে কম্যুনিস্ট চীন ও ইন্দোনেশীয় সরকারের মধ্যে একসময়ে যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়। পরে চীনা সরকার কূটনৈতিক কৌশল এবং অন্যান্য উপায়ে ইন্দোনেশিয়া ও চীনের সম্পর্কটাকে অনেকটা শুধরাতে সমর্থ হন। পিকিং মস্কো ঝগড়ায় ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি পিকিং এর দিকে। ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টরা চীন ও ইন্দোনেশিয়ার গভর্নমেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক যাতে ভাল থাকে তার চেষ্টা অবশ্যই করে আসছে। তবে পিকিং এর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার সময় প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়া আমেরিকার কাছ থেকে যে অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে পাচ্ছে এবং পাবে তার পরিমাণের কথাটা বিস্মৃত হন না। সুতরাং আমেরিকার সঙ্গে পিকিং এর যেখানে সাক্ষাৎ ঝগড়া সেখানে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেন কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে চীনের পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সহানুভূতি ভাব রক্ষা করে পিকিং এর মন রাখেন। সুতরাং চীন ইন্দোনেশীয় সরকারকে মার্কিন বিরোধী করে তুলতে না পারলেও অন্য ক্ষেত্রে পিকিং চীনের পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক সাহায্য লাভ করেছে এবং করছে এটা দেখা যাচ্ছে। তার প্রমাণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতবিরোধী প্রোপাগাণ্ডায় চীনাদের সফলতা। কিন্তু ভারতবিরোধী প্রোপাগাণ্ডায় চীনারা ইন্দোনেশিয়াতে বেশ খানিকটা সফলতা লাভ করেছে বটে, কিন্তু যেখানে ইন্দোনেশিয়াদের নিজের স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ সেখানে ভিতরে ভিতরে চীন-ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব, একটা টেনসন চলছেই। বস্তুত কম্যুনিস্ট চীনের সম্পর্কে ইন্দোনেশীয় সরকারের পলিসির বাহ্য রূপ এবং ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের মনোভাবের মধ্যে পুরো মিল নেই।

১২-৫-৬০

ফাদার দ্যতিয়েন ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

পর্ণশ্রী পল্লীতে

গিয়েছিলাম সেদিন পর্ণশ্রী পল্লীতে, 'সব পেয়েছি'র এক আসরে। লাগল বেশ। অচিনের গান, মমতার নাচ, ব্যায়াম, ম্যাজিক লাগল বেশ। আর ছিল পূর্ণিমার চাঁদ, ছিল স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া, ছিল চন্দ্রের মায়ের সন্দেশ : লাগল বেশ। তারপর...

তারপর আমার ডাক পড়ল। ডাকের সঙ্গে অনুরোধ। অনুরোধের সুরে আদেশ : "এইবার আপনাকে কিছু বলতে হবে।"

"আমাকে?"

"আপনাকেই।"

"কি বলব, বলুন দেখি?"

"যা কিছু...নিজেরই কিছু...ছেলেবেলার গল্প।"

কথা আছে সন্ন্যাসীরা নাকি সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের সব কথা ভুলে যান...ভুলে যান দেশের নাম, গাঁয়ের নাম, বাবা-মার কথা। কথাটা কিন্তু যথার্থ নয় : আমরা আসলে ভুলি না কোনো কিছু...ভুলি না মায়ের চোখ, মায়ের রান্না, মায়ের অগাধ ভালবাসা; মনে থাকে সবই—আর মনে রাখতেই আমরা চাই—কৃতজ্ঞচিত্তে। [illegible] কোন্ [illegible], বলুন, [illegible] কথা ভুলতে?...

[illegible] পর্ণশ্রী পল্লীর [illegible] আমার [illegible] এক [illegible]— [illegible] কথা।

ব্যতিরেকে এম· এ·, এম· এড·, সেণ্ট বার্বারা কলেজের অধ্যক্ষা"। পিসির সম্পূর্ণ পরিচয় অবশ্য এটুকুতে মিলত না। নিজে তিনি রান্না করতেন, বাগান করতেন, কাপড় কাচতেন, জামা বুনতেন...হ্যাঁ, নিজেরই জন্য বটে, উনি যে ছিলেন—ও'র আপন ভাষাতেই বলি—ওল্ড স্পিনস্টার, অর্থাৎ অবিবাহিতা বৃদ্ধা।

পিসি সুন্দরী ছিলেন খুব : ঘন ঘন চুল, টানা টানা চোখ...তবে হ্যাঁ, একটু 'স্বাস্থ্যবতী'ও বটে। বাবা বলতেন—আড়াই মন। আর বলতেন, স্টেশনে নাকি সেদিন পিসি ওঠামাত্রই ওজনযন্ত্র বিগড়ে গিয়েছিল, আর স্টেশনমাস্টার নাকি এসে পিসিকে ধমকিয়ে বলেছিলেন, "আমাদের এই পৃথিবীতে যখন এত লোকে অনাহারে মারা যায়, এদের তখন এত পুরুষ্টু হয়ে [illegible] বিশেষ করা [illegible] [illegible]

ধর্মমাতা

পিসি আমার ধর্মমাতা, [illegible] দীক্ষাস্নানের সময়ে [আমার [illegible] তিন দিন; না......মনে নেই একটুও, [illegible] শুনেছি, চেঁচিয়েছিলাম খুব] তিনিই আমাকে কোলে ধরেছিলেন, তিনিই আমার হয়ে যাজকমহাশয়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। আমি কি খ্রীষ্টের শিষ্য আর খ্রীষ্টমণ্ডলীর সদস্য হতে চাই?...আমি কি যীশুর বাণী অনুসারে পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি, আর প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম দেখাতে প্রস্তুত?...ইত্যাদি সব প্রশ্নের উত্তরে পিসিমা আমার হয়ে অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভুদেব!" আর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমার বাবা-মা আমার খ্রীষ্টীয় শিক্ষাদানে অবহেলা করলে, তিনিই, যাদুমোহাবেল [illegible] দিয়েছিলেন, তাঁর ধর্মমাতৃসুলভ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব [illegible] ক্ষেত্রে নামবেন।

ক্ষেত্রে নামতে হল না তাঁকে; তাঁর রইল শুধু ধর্মমাতার গৌণ আর লৌকিক দায়িত্ব : বড়দিনে, নববর্ষে, [illegible] ও আমার জন্মদিনে উপহার দান। বাড়িতে, আমার আলমারি-ভরতি খেলনা দেখলে বুঝতেন ধর্মমাতা পিসি তাঁর কর্তব্য পালন করে-ছিলেন অকৃপণ হাতে।

একটা প্রশ্ন

পিসি ছিলেন অনেক সংঘের প্রেসিডেন্ট, বিবিধ সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। অনাথদের [illegible] হাস-পাতালে, এমন কি [illegible] তাদের বড় বন্ধু-[illegible] সোনা [illegible] পিসির একটা [illegible]

[illegible]

চৌরিঙ্গায় কাটাতে হয়েছিল সুদীর্ঘ পাঁচ বছর। ইতিমধ্যে ঘটে ঠাকুরদার মৃত্যু; শয্যাশায়ী ঠাকুরমা যতদিন বাঁচলেন, পিসি ততদিন ঘরে থেকেই তাঁকে শুশ্রূষা করলেন —ফটকালির কথাটা কেউই ভাবল না।

লভ ম্যারিজ ?

"কিন্তু, পিসি, লভ্ ম্যারিজ ”

. পিসি হো হো করে বলে উঠলেন, "কোনো ছেলে বিয়ের প্রস্তাব করল না যে..."

"তুমি তো প্রস্তাব করতে পারতে।'

পিসির মতে পারা যায় না: প্রস্তাব করাটা নাকি ছেলেদেরই একচেটিয়া।

"কিন্তু, পিসি মনে কর একটি ছেলেকে তুমি সত্যি সত্যি ভালবাস তুমি কি তাকে ছেড়ে দেবে শুধু তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে ভুলে গেছে বলে ?"

পিসি আর হাসলেন না। তাঁর কপাল দেখলাম বলিরেখায় কুঞ্চিত, তিনি যেন এক কঠিন আঁক কষতে বসেছেন। বড়ই ভাল লাগল: বুঝলাম, আমার প্রশ্নের মধ্যে এমন-কিছু ছিল যার জন্য পিসির কাছে আমার মূল্য বেড়েছে খুব। চিন্তা সমাধা হলে পিসি বলতে লাগলেন চুপি চুপি—আমার যেমন অঙ্ক-ক্লাসের সবশেষের বেঞ্চিতে নিষিদ্ধ কথাবার্তা চালাতাম সামনের ছেলের পৃষ্ঠপটের আড়ালে। পিসি বললেন, তিনি

প্রস্তাব করাটা নাকি ছেলেদের একচেটিয়া

কোনো দিনই কোনো ছেলের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব করেন নি; আর তাতেই নাকি তাঁর সর্বজনীন জনপ্রিয়তার উৎস। বললেন, তাঁর সারা জীবনে একটিমাত্র ছেলে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চেয়েছিল; অবিলম্বে কিন্তু পিসি বুঝলেন ছেলেটা তাঁর প্রেমের যোগ্য নয়। বললেন তাঁর ঠাকুরদা, বাবা ও দাদাদের ছাড়া তিনি আর কোনো পুরুষকে ভালবাসেন নি।

"কিন্তু, পিসি, ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে তোমার যদি পরিচয় ঘটত তোমার কাছে উৎসাহ না পাওয়া সত্ত্বেও তারা যদি তোমার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা না ছাড়ত, শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব করত. ”

"যা ঘটে নি, সে বিষয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল। আসলে, অনাদি কাল থেকে ভগবান যেন জানতেন আমার সেই বন্যার ভোগের কথা, জানতেন—আর প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন—আমার সেই ওল্ড স্পিনস্টারের নিয়তি। মেয়েদের কাছে ভগবানের আহ্বান বহুবিধ। তাঁর ইচ্ছা নয় যে, আমি জননী কিংবা সন্ন্যাসিনী হয়ে তাঁকে সেবা করি; তাঁর ইচ্ছা সংসারের মধ্যেই নিঃস্বার্থভাবে ছড়িয়ে দিই তাঁর অপার আনন্দ।"

একটা ভুল

আমি তবু ছাড়লাম না—অত সহজে ছাড়তে শিখিনি তখনও বয়স তখন ছিল আট কি দশ..। বললাম 'কিন্তু পিসি আমার মতো একটি ছেলের মা হলে তোমার কি ভাল লাগত না ? ”

বলা মাত্রই বুঝলাম প্রশ্নটা ছিল ভুল; পিসির স্নেহময় দৃষ্টিতে পড়ল অনির্বচনীয় দুঃখের ছায়া। আমাকে তাঁর কোলে ডেকে বসিয়ে বাহুবন্ধনে তিনি অমন চেপে ধরলেন—কথা না বলে। আরামে বসেছিলাম, পাখির বাচ্চা যেমন পাখি মায়ের নরম নীড়ে। পাচ্ছিলাম পিসির আদর মাখা দুগ্ধ নিঃশ্বাসের স্পর্শ। ক্রমে ক্রমে আমার দুটি গণ্ড ভিজতে লাগল পিসির চোখের উষ্ণ জলের ফোঁটায়। পিসি ভাবলেন আমিও বুঝি কাঁদছি—তাতে অবশ্য না কাঁদার লজ্জার চেয়ে গর্বিত বোধ করলাম বেশ।

"ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন খোকা, ও কিছু নয় কিছু না । আমার শরীর তো ভাল নেই অনেক দিন পরে চোখের জল ফেলার এই সুবিধা পেয়ে ছাড়তে চাই নি। এখন বেশ স্বস্তি বোধ করছি।' বলে পিসি আমার মুখ মুছতে লাগলেন তাঁর হাতের রুমালে।

উপদেশ

সেদিন আমি দুটি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। এক, অবান্তর ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে নেই। দুই, মানুষ যতই নিন্দুক আর আমুদে হোক না কেন, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই, সবার অজান্তে, লুকিয়ে রয়েছে এক দুঃখ।

তাই এই উপদেশ দিলাম পাঠক পাঠিকাদের: ট্রামে-বাসে, রাস্তা-ঘাটে, যদি কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়, মনে ...

যথাযথ মৃত্যু

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কা[লটা] শীতকাল ছিল এবং সম্ভবত বখের আলী শিরীষ গাছের ঘন অন্ধকারে পুরোনো জীর্ণ রিক্সার হাতলে ভর করে স্টেশনের সিঁড়িতে যাত্রী দেখার ইচ্ছায় চোখ কচলাল। স্টেশন অতিক্রম করে রাত দুটোর ট্রেন চলে যাচ্ছে। বখের আলী দেখল বাবুরা এখন যথাযথভাবে সিঁড়ি ধরে নামছেন। শীতের দুঃসহ ঠাণ্ডা এইসব বাবুদের চোখমুখ বিবর্ণ করছে। আলী এসব দেখেও গাড়ি ছেড়ে অন্য অনেক প্যাডলারের মত সিঁড়ির মুখে ভিড় করল না। সে অত্যন্ত সুচতুর কায়দায় রুগ্ন শরীরকে টান টান করে রাখল এবং রুগ্ন চোখ দুটোকে ভয়ানক সতেজ করতে গিয়ে সামনে গাঢ় অন্ধকার দেখল। সে দেখল, অন্য অনেক প্যাডলার রিক্সা ভর্তি লোক নিয়ে ওর মুখের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে তবু সিঁড়ির মুখে আলোর নীচে গিয়ে দাঁড়াল না। অথবা রিক্সা টেনে যাত্রীদের সামনে গিয়ে হাজির হল না। বস্তুত বখের আলীর দীর্ঘ জীবন, হাঁপির টান এবং মৃত সাদা চোখ দুটো যাত্রীদের সন্দিগ্ধ করে তুলবে—সে এমন জানত। সে তাড়াতাড়ি শীর্ণ হাত দুটোকে যথাসম্ভব ছেঁড়া আস্তিনে ঢেকে অন্ধকার থেকেই বড় রুক্ষ অথচ বিনীত স্বরে ডাকল, আসেন হুজুর, আসেন। এ বান্দা হাজির।

বখের আলী যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কাশির আবেগটুকু সামলাতে পারল না। সে একজন ভদ্র যুবার মুখের উপরই [illegible] ছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখল, [illegible] করে সব যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। [illegible] রিক্সা [illegible]। [illegible]

দাঁড়ালে লাভ নেই। ওকে দেখলে যাত্রীরা বরং পীড়িত বোধ করবে। এইসব ভেবে সে অন্ধকারে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকল। সকল যাত্রীদের দামদস্তুর করতে দেখে অথবা চলে যেতে দেখেও অন্য কোন কথা বলতে পারল না। সে ফের বলল না, এ বান্দা হাজির। নসিবে থাকলে জুটবে—এমত ভাব নিয়ে সে অন্ধকারে মৃত চোখ দুটোকে উজ্জ্বল করে অপেক্ষা করতে থাকল।

রাত দুটোর ট্রেন চলে যাচ্ছে। পিছনের লাল আলোটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে গেল। অনেকক্ষণ লাল আলোটা এক-চক্ষু ভূত সেজে আলীর চোখের উপর নৃত্য করছিল। ভূতের নৃত্য দেখে সে শীতের তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাটুকু ভুলে থাকতে চাইল। তবু সে প্রচণ্ড শীতে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। ছেঁড়া গামছা দিয়ে কান দুটো ঢেকে নিয়েও শীতের তীক্ষ্ণতা ভুলতে পারল না। ওর শীর্ণ হাতে তখন শিশির ঝরল। সে শীতে জমে যাচ্ছে। সোয়ারী পেলে, রিক্সা টানলে শরীরের এ-ভাব থাকবে না। শরীর গরম হলে রক্ত গরম হবে এবং সে এ শীতেও তখন ঘামবে। অথচ সোয়ারীর দেখা নেই—দূরে গীর্জার ঘণ্টা বাজছে। কবরখানার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে। শিরীষ গাছে কাঠ-বেড়াল দুটো পর্যন্ত শীতে কট্ কট্ করল। ঠিক এই সময়েই একজন সোয়ারীকে মিসেস স্টেশনে রিক্সা খুঁজতে দেখে সে প্রাণপণে ডেকে উঠল, আসেন হুজুর, আসেন। এ বান্দা হাজির। [illegible] বলার পরও [illegible] না। [illegible]

যথাসম্ভব ভয়ানক হাঁপের টানকে দমন করল। শেষে বলিষ্ঠ যুবার মত ডাকল, আসেন হুজুর, ফিরে যাই। অন্য কিছু বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভয়ানক কাশির যন্ত্রণা বুক ঠেলে উঠে আসছে। সে অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য বার দুই বেল বাজাল। রিক্সা টেনে উপরে তোলার উদ্দেশ্যে বার দুই হাত পা শক্ত করল।

এই প্রচণ্ড শীতে আলীর হাত-পা ঠকঠক্ করছে। সে কোন রকমে রিক্সা টেনে উপরে তুলে বলল, চলেন হুজুর ফিরে যাই।

মহাজন ব্যক্তিটি বৃদ্ধ। চোখ দুটো ছোট ছোট এবং কোটরাগত। যেন দীর্ঘদিনের চুরির অভ্যাস বৃদ্ধের সমস্ত অবয়বে। দামী শাল জড়ানো শরীরে। পা খোঁড়া, হাতে লাঠি। মহাজন মানুষটিকে আলী চেনে যেন। এ শীতেও মহাজন মানুষটি বার দুই লাঠি হাতের উপর ঘোরালেন। এবং আয়েস সহকারে গাড়িতে বসে বললেন, কত নেব বল?

যদিও আলী দেখেছে, মানুষটি সেই প্রথম থেকে দর কষাকষি করে [illegible], যদিও যাত্রাটির [illegible] পয়সার হিসাব [illegible], তবু বখের আলী [illegible] মুর্শিদাবাদের পরিচয় দিল। বলল, হুজুর, আপনার [illegible] দেখায় না। কিন্তু মহাজন [illegible] বলে সে [illegible]। আলী [illegible] [illegible]।

[illegible]

শীত এবং রাতের এই কষ্টটুকুর কথা স্মরণ করে আলীর কথা বলার ইচ্ছা হল না। যেন বলার ইচ্ছা হুজুর, যথার্থ দাম থেকে চার আনা কম চেয়েছি, আপনি চার আনা আরও কমিয়ে দিলেন, হুজুর, নসিব মন্দ। তাও সে বলল না। শুধু কাশতে থাকল।

তিনি মুখ র‍্যাপার দিয়ে ঢেকে বললেন, তোমার ভয়ানক কাশি বাপু।

আলী এবারেও কোন জবাব দিল না। আলী চলছে। সে তার ভাঙা রিক্স নিয়ে, মুস্কিল সোয়ারী নিয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানীর ঝাঁপ বন্ধ হল। স্টেশনের শেষ যাত্রীটি চলে যাচ্ছে। রিক্সর ক্যাচক্যাচ শব্দ, আলীর কাসি এবং ভাঙা হুডের ছেঁড়া কাপড়ের পতপত শব্দে দোকানী ঝাঁপ ফেলে দিল। বৃদ্ধ মহাজন ব্যক্তিটি গলা-বন্ধ কোটের উপর কান, গলা, মাথা ঢেকে বসলেন র‍্যাপার দিয়ে। রাত, অন্ধকার এবং এই নির্জনতা ভাল লাগছে না বলেই যেন একটু কথাবার্তা চালু করলেন। কি নাম তোমার?

শীত বলেই সম্ভবত পথ এত নির্জন। এত নিঃসঙ্গ। ব্যাঙ ডাকছে না। অথচ রাতের বিচিত্র প্রাণীরা। আলীর কাসির শব্দ, রিক্সর ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ এবং বৃদ্ধের কোটরাগত চোখ আলীর শরীরের রও, মুখের রক্ত ভয়ানক সব দৃশ্যের অবতারণা করছে। বৃদ্ধ হুডটা তুলে দিলেন এবং এ সময়েই দেখলেন রিক্সটা প্রচণ্ড রকমের ঝাঁকুনি খেল। আলী রিক্স থেকে নামছে। আলী কথা বলছে না। সে রিক্সর পিছনে গিয়ে নুয়ে পড়ল। সে চেনটা তুলে দিয়ে বলল, হুজুর, আমার নাম বখের আলী।

—চালাতে না চালাতেই হুড পড়ে গেল' চেন পড়ে গেল!

বখের আলী বলল কিছু ডর পাবেন না হুজুর। ঠিক পৌঁছে দেব।

বৃদ্ধ বাবুটি গাড়ির ল্যাম্প আলোতে বখের আলীর চোখ দেখেন। চোখ দুটো ভয়ানক দুঃসহ বেড়ালের চোখের মত উজ্জ্বল অথচ সহসা চোখ দুটো দেখলে মনে হবে মৃত এবং সাদা এবং নিজের চোখ দুটোর চেয়েও ভয়ানক বীভৎস। তিনি আতঙ্কে উঠলেন, তিনি বললেন, আলী, তুমি ত গাড়োয়ানের মত রিক্স চালাচ্ছ। একটু জলদি না করলে যে চলবে না।

দুধারে কিছু শিরীষ গাছ এবং দেবদারু গাছ। দূরে কলোনীর ইতস্তত আলো। এখনও শহর দূরে। সদর জেলের আলো মাঠ অতিক্রম করে, দুবলী জেলের হোস্টেল অতিক্রম করে অনেকটা। কাপড়ের [illegible]

বস্তির একপাশে, ছোট্ট চালাঘরটার—মর্দমার পাশে আলী ছেঁড়া কাঁথার নীচে কাতরায়। ক্ষুতপিপাসায় ডুবে আলী দিনের যাত্রী পেল না। ওর কোটরাগত চোখ, ভয়ানক বুকের ব্যামো দেখে, ভাঙা পুরোনো রিক্স দেখে সোয়ারীরা হাঁটতে থাকল শুধু।

বৃদ্ধ বাবুটি বললেন, গাড়ি চালাচ্ছ, না মোট বইছ?

আলী তার শেষ সামর্থ্যটুকু দিয়ে গাড়ি টানতে থাকল। তার মনে হয়—সে রুগ্ন ঘোড়ার মত ছুটছে, ছুটছে। সে কথা বলল না। অথবা যন্ত্রণায় চিঁহি-চিঁহি করার বাসনাতে সে হাঁ করল না। কয়েকটা দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করার বাসনাতে মুখটা বড় করতে গিয়ে দেখল, বাবুটির গোয়ার্তুমি কমছে না। সে অন্যদিনের মত রিক্সর গতি কমিয়ে দিল এবং সোয়ারীকে অন্যমনস্ক করার জন্য সে তার কিস্‌সা আরম্ভ করল।—দুনিয়া বহুত পালটে গেল হুজুর।

—এখন ত তোমাদেরই রাজত্ব গো। দুনিয়া পালটে গিয়ে তোমাদেরই সুখ। তোমরা যখন-তখন লোকের গলা কাটছ। বৃদ্ধ বাবুটির মনে অন্য দুর্মুখ রিক্সা-ওয়ালার মুখের ছবি। বিশেষত দুর্মুখ কথাবার্তা স্পষ্ট উঁকি দিতেই দুঃসহ অপমান বোধে জ্বলতে থাকলেন তিনি।—জনগণের রাজত্ব। তোমাদের কি এখন কিছু বলবার জো আছে!

আলী ঘটনাটা দেখেছিল বলেই এখন আর কিস্‌সার কথাগুলো আবৃত্তি করল না। সে বলল, হুজুর, টগবগ করে রক্ত ফুটছে ত ফুটছেই। কাকে কি বলতে হয় ও শালা কি করে জানবে। তা ছোট-লোকের কথা মনে রাখবেন না, হুজুর। এখন প্রায় গাড়ি চলছে না বললেই হয়। আলী এইসব বলে কিছুক্ষণ বিশ্রামের আয়োজন করল যেন।

—তুমিও যেমন! ছোটলোকের কথা মনে রাখার আমার দায় পড়েছে।

—হুজুরকে টাকার গরম দেখাস!

—ওসব কথা থাক বাছা।

—আপনার মত নসিব...

—ওসব কথাও থাক বাছা। টাকার গরম দেখালে টাকা থাকে না। মা লক্ষ্মী রাগ করেন। যেন বলার ইচ্ছা বাবুটির, আমি ত বড় হয়েছি ছোট থেকেই। কাঁধে কাপড় নিয়ে ঘরে বিক্রি করেছি, হকারি করেছি, তা বলে ত লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিনি।

আলী রিক্স থেকে ফের নামল। চেনটা আবার পড়ে গেছে। বৃদ্ধ বাবুটি বিরক্ত হতে হতে হিসাব করলেন—এখানে তিন দিন। গাড়ি ভাড়া, মজুরের টাকা এবং সেলস [illegible] ... [illegible] ...। [illegible] [illegible] ... [illegible]

[illegible]
[illegible] প্রতি [illegible] বক্তৃতা এবং [illegible]
কিছু কিছু [illegible]। তিনি
এ সময় [illegible] দেখাতে [illegible]
টানলেন। তারপর বগলের নীচে টিপে টিপে
কি যেন দেখলেন। কি যেন [illegible] টাকার
জিনিস বগলের নীচে লুকিয়ে রেখেছেন।

[illegible] এখন [illegible]। [illegible] আলীর রিক্সা [illegible] কি [illegible] ঘোড়া [illegible] না। [illegible] মাঠ থেকে শীতের ঠাণ্ডা শুধু বরফের ছুঁচির মত ওদের দুজনকে স্পর্শ করছে।

—বুঝলে বখের আলী, সময় আর নসিবকে ফাঁকি দিলে তারাও তোমাকে ফাঁকি দেবে। তিনি উপদেশের ভঙ্গীতে কথাগুলো বললেন, বুঝলে বখের আলী, সময় আর নসিব কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। তোমার রিক্সটা এমন উঠছে পড়ছে হে কেন বাছা! ঠিকমত চালাতে না পারলে নিলে কেন?

—হুজুর, পথটাই খারাপ। তারপরও যেন ওর বলার ইচ্ছা, দেশে সকলে চুরি করতে আরম্ভ করেছে হুজুর। বাবু মানুষেরা বেশী চুরি করছে। এতগুলো কথা বললে সে অনেকক্ষণ বড় বড় শ্বাস নেবে। সে শুধু বলল, সকলে চুরি করছে হুজুর। দু সালেই পথটা ভেঙে গেল।

বাবুটিরও যেন বলার ইচ্ছা, যে চুরি করছে সেও সুখী, যার চুরি করছে সেও সুখী। এক হাতে নিচ্ছে, অন্য হাতে দিচ্ছে। কোন হিসাব নেই। লাগে টাকা দেবে। এখন আর গৌরীসেনদের টাকা দিতে হচ্ছে না। গৌরীসেনরা শুধু সেলস ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে মরছে। এতগুলো কথা তিনি ইচ্ছে করেই আলীর সঙ্গে বলেননি। ছোটলোকদের সঙ্গে বেশী মহরম ভাল নয় এমন একটি ভাব নিয়ে বসে থাকলেন। এবং সহসা যেন দেখলেন, গাড়িটা একেবারেই চলছে না। তিনি নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, চালাও চালাও। বড় আস্তে চালাচ্ছ। তুমি দেখছি আমাকে পৌঁছতে ভোর করবে। এবং এ সময়ে রিক্সার চেনটা পড়ে গেল। আলী বুঝল, বাবুর বিরক্তি ভয়ানক রকমের। সে তার কিস্সা আরম্ভ করল, জাফর আলী বখের আলী তফাৎ কত হুজুর! সব নামটা ত আপনাকে বলিনি! বললে এ গাড়িতেই চড়তে সাহস পেতেন না। মীর্জা জাফর আলীর নাম শুনেছেন! বইয়ে ওঁর নাম লেখা আছে। সে ভঙ্গিতে গদগদ হল।

বাবুটি উদাসীন। যেন এমন নাম তিনি এই প্রথম শুনলেন। বললেন, অঃ। মীর্জা জাফর আলী।

—হাঁ হুজুর সহজ কথা ভেবে [illegible] না। নাম আমার মীর্জা বখের আলী। কিন্তু কি করি [illegible]! [illegible] আমাদের [illegible] না। [illegible] এক [illegible]। [illegible]
[illegible]

[illegible] হুজুর। [illegible]
নবাবী চুগি পরে [illegible] গায়ে
[illegible], দুখসীপাড়ার [illegible] হাসতে হাসতে এস ডি ও অফিসে চলে যাই। সেদিন বাবুরা দাঁড়িয়ে [illegible] দেখাবে। আমি একটু হাসব বাবু।

—শুধু গল্পই করবে! রিক্স চালাবে না!

আলী নক্ষত্র দেখল এবং আকাশ দেখল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশতই সে যেন এখনও রিক্স টানতে পারছে। এখনও বেঁচে আছে। বাবুকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার কর্তব্যবোধে ফের শক্তিসঞ্চয় করতে পারছে। সে বলল, দেখেন একটানে এবার নিয়ে যাচ্ছি। বলে সে হ্যান্ডেলের উপর নুয়ে পড়ল।

গীর্জা অতিক্রম করে ইতস্তত কয়বী গাছের ছায়ায়, অর্জুন গাছের নীচে অথবা ভাঙা পথটার উপর আলীর কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ছাতিম গাছ দুটো অতিক্রম করার সময় ওর মনে হল সেই যুবক যুবতীকে। গতকাল এই ছাতিমের ডালে ওরা ঝুলেছিল। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আলীর বিক্সর আলো ফের ভুতুড়ে হয়ে গেছে। আলী এখানে একটু থামল। প্রতিদিনের মত সে চোখ তুলে দূরের মাঠ দেখল, অন্ধকার মাঠ অতিক্রম করে সাহেবদের কবরখানা দেখল। কবরের ঝোপে ঝোপে তেমনি সব জোনাকি পোকারা জ্বলছে। উড়ছে অথবা হেস্টিংসের প্রিয়তম কন্যার অবয়ব ধরে দূরের মাঠে পাশাপাশি খালের ধারে উড়ে উড়ে শীতের মাঠকে প্রদক্ষিণ করছে। এবং হাওয়া খাওয়ার নাম করে আলীর নিত্য পথ পরিক্রমা দেখছে। অথচ আলীর ফুসফুস হাওয়া টানতে পারছে না, সাদা মৃত চোখ দুটো শীতে নীল নীল হয়ে উঠছে। দূরের মাঠে ঝাউ গাছ, শহরের আলো, পাশাপাশি কোথাও সান্ত্রীর বুটের শব্দ আলীকে অন্যদিনের মত শঙ্কিত সচেতন করতে পারল না। তথাপি অন্যদিনের মত সেইসব শব্দের মধ্যে ডুবে যেতে পারল বলে খুশী হল। পলাশীর প্রান্তর থেকে জাফর আলী পালাচ্ছে। ঘোড়সোয়ার সৈন্যেরা পালাচ্ছে। হেস্টিংসের প্রিয়তমা কন্যা জোনাকির অবয়বে জ্বলছে নিভছে। ঘোড়সোয়ার সৈন্যগণ [illegible] বিক্ষিপ্ত [illegible] করে শীতের মাঠকে [illegible]। সে [illegible] দেখছে। আলী [illegible] এখানে এসে [illegible]
[illegible]

নিয়ে পড়ল এবং ছিন্ন ছিন্ন ভুখা বলে বাবুটিকে যেন ভুলিয়ে রাখতে চাইল।

ইচ্ছা করেই আলী আলো জ্বালাতে দেরী করছে।

এই অন্ধকারে তিনি নিঃসঙ্গ। এবং এই প্রেতাত্মার মত লোকটির উপস্থিতি ও উপরে ছাতিম গাছের ডালে ডালে পাতার আওয়াজ, নির্জন প্রান্তরে কবরের আলো যুগ্ম বাবুটিকে বার কয়েক প্রচণ্ড রকমের নাড়া দিল। আলী কি জানতে পেরেছে সব! সে কি নতুন ব্যবসাটার কথাও জানতে পেরেছে! বাবুটির কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকল। তিনি বগলের নীচে অন্ধকারে টিপে টিপে দেখলেন। তারপর তিনি ফের ধমক লাগালেন, বখের আলী, আলো জ্বালাতে কত সময় নেবে! এমন করলে আমি কিন্তু পুলিস ডাকব।

—হুজুর বড় ভয় পেয়ে গিয়েছেন। দূরে সিপাইএর বুটের শব্দ আসছে না! এখানে চোর-বাটপাড়ের ভয় নেই হুজুর। বখের আলী এই বলে দাঁড়িয়ে থাকল।—হুজুর, এই ছাতিম গাছে গতকাল দুজন মাগী-মরদ ঝুলেছে। (আলী মরার ইচ্ছায় কতবার কত ছাতিমের ডালে বিশমিল্লা বলে ঝুলে পড়বার জন্য প্রাণপাত করেছে অথচ—অথচ...) মেয়েটার শরীরে কত গহনা ছিল। পথে এতলোক যে আমরা এই পথে গাড়িই চালাতে পারিনি। কিছুই হয়নি বলে হুজুর ভুখা আছি। গতর দিচ্ছে না হুজুর। তবে ভয় পাবেন না, ঠিক পৌঁছে দেব।

—কি বলছ! আমি ভয় পাব! তুমি এমন কথা ফের বলবে না। তবে যথার্থই তোমাকে পুলিসে দেব। আজকাল এটা হল কি! সবাই ফোঁস করতে শিখেছে। কি কাণ্ড সব! কেবল পুলিসগুলোই দিন দিন ভদ্র হয়ে উঠছে। পাঁচেও খুশী, পাঁচ হাজারেও খুশী।

আলী আলো জেলে সিটে চেপে বসল। ওর পা দুটো ভেঙে আসছে। হাত দুটোর ভিতরে কোন উত্তাপ নেই যেন। রক্ত সমস্ত শরীরে কোন উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। আলী ভাঙা আরশিতে মুখও শরীর দেখে ভাবত, এমন একটা শরীর দীর্ঘদিন বাঁচে কি করে! দীর্ঘদিন বাঁচার পথকে অতিক্রম করছে কি করে! অথচ দীর্ঘদিনের বেঁচে থাকার অভ্যাস ওকে কোনদিনের জন্য মরতে দিল না। অথবা এমন কোন ঘটনাই ঘটল না। সেজন্য শরীর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, রক্ত উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারছে না জেনেও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলী কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে পারল না। [illegible] স্পর্শ করে [illegible] সে [illegible] যেমন [illegible]

পারছে না। গলাটা শুকনো। কাঠ। ওর জলতেষ্টা পাচ্ছে। চোখ দুটো চিংড়ি মাছের মত গোল গোল, চিংড়ি মাছের মত বের হয়ে চোখের পাশে যেন ঝুলে পড়বে। হ্যান্ডেলের উপর হাতের আঙুলগুলো শীর্ণ—সে টানতে পারছে না। পারছে না। এখন বাবুটি জোরে চালাবার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছে, পাশাপাশি কোথাও গাছের পোকা ফর ফর করে উঠল এবং সে দেখল টায়ারটা অদ্ভুত রকমের জীর্ণ শব্দ করে ফেঁসে গেছে। কপালে করাঘাত করার ইচ্ছায় ডান হাত তুলে পরীক্ষা করতে বুঝল—বৃথা। হাতটা তুলে এনে কপালে করাঘাত করার শেষ সামর্থ্যটুকুও যেন শেষ। সে নীচে কোনরকমে গড়িয়ে নামল।

বৃদ্ধবাবুটি চিংকার করে উঠলেন তোমাকে আমি শূলে চড়াব।

—হু-জু-র!

—আমি নামতে পারব না বাপু। হেঁটে যেতে পারব না।

—হু-জু-র হাঁটতে হবে না। ঠিক পৌঁছে দেব। দম ফেলবার ফুরসত চাই হুজুর।

—তুমি এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বখের আলী?

—হুজুর, হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। পাবে না। আমি পৌঁছে দিচ্ছি হুজুর।

—এমন করলে আমি তোমাকে এক পয়সাও ছোঁয়াব না।

বাবুকে অন্যমনস্ক করার জন্য সে পুনরাবৃত্তি করল, একটা কিস্‌সা শোনবেন?

ভিতরে ভিতরে বাবুটি এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে পারলে তিনি আলীর গলা টিপে ধরেন। পারলে তিনি আলীকে খুন করেন। আলী মশকারা করছে। আলী ফের কাশতে থাকল। রাতের শেষ ট্রেনের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু কাপড়ের মিল থেকে এখনও শব্দটা ভেসে আসছে। এতল্লাটে কোন কুকুর পর্যন্ত নেই। কোন পাখি অথবা কাঠবিড়ালীর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধকারে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। বখের আলীর বুকের শব্দ এবং গলার ঘড়ঘড় শব্দ বৃদ্ধ বাবুটিকে অবসন্ন করছে। অশেষ যন্ত্রণার মত রুগ্ণ কণ্ঠে বললেন, আলী তোমাকে আমি একটাকাই দেব। তুমি নিয়ে চল। লোকের আমি কত উপকার করেছি, তুমি আমার এ উপকারটুকু কর।

আলী হ্যান্ডেলের উপর মাথা রেখে বলল, একটু সবুর করেন হুজুর। ততক্ষণে কিস্‌সাটা বলি, আমার হাঁপের টানটা কমুক। আলী গল্প আরম্ভ করল। ওর [illegible] একটা অভ্যাস। সোয়ারী নিয়ে যখন সে টানতে পারেনি, যখন সে অক্ষম হয়ে [illegible] এই মসনদের গল্প বলেছে। সে [illegible] সোয়ারীকে এই মসনদের গল্প শোনাল। সে নিজের মসনদে চেপে সোয়ারীকে গল্প শোনাল কতবার। কতবার বলল, হুজুর, এ মসনদের আখের খুব খারাপ। মুর্শিদকুলী খাঁ বলেন, আলিবর্দি বলেন, সিরাজ বলেন কেউ তা থাকল না হুজুর। ব্যাভারটাই থাকে। হে হে করে এ সময়ে বখের আলী কাশল কি হাসল তিনি ধরতে না পারায় হাতের টর্চ জেলে মুখ দেখেই আঁতকে উঠলেন—আলীর মুখে রক্ত। চোখ দুটো সাদা এবং মৃত মানুষের মত মুখ করে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

—এই! এই! বৃদ্ধ বাবুটি চিংকার করে উঠলেন।

—হুজুর, এমন করলে কিন্তু রিক্সা ফেলে চলে যাব।

রাস্তার দুপাশে কিছু বাঁশের বন। তারপর শহরের প্রথম আলো। শহরের প্রথম ল্যাম্পপোস্ট। বাবনে বাদুড় নেই। অন্ধকারের মত বাদুড়েরাও যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। শীতকাল বলেই হোক অথবা রাতের গভীরতার জন্যেই হোক দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোর উত্তাপ ওদের টেনে নিতে সক্ষম হবে না। বৃদ্ধ বাবুটি বললেন যাক তবু শহরে উঠে যেতে পারছি।

আলী কোন জবাব দিল না। বৃদ্ধ বাবুটির ইচ্ছা হল লাঠি দিয়ে একবার আলীকে খোঁচা দিতে। লোকটা রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ত, না, যাবার ভান করে শুধু হেলে শরীরকে টান করে রিক্সা টানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। না, লোকটা বাজ পড়া মৃতের মত দাঁড়িয়ে অন্ধকারকে তামাশা দেখাচ্ছে। তিনি লাঠিটা কাছে নিয়েও খোঁচা দিতে সাহস করলেন না। আলী যদি সেই চোখ নিয়ে ফের তাকায়, যদি বলে থাকল সব—আমি চললাম হুজুর সুতরাং সুতরাং। তিনি প্রিয়জনের মত কণ্ঠ করে বললেন এ ঠাণ্ডায় এমন ছেঁড়া কোট গায়ে দিয়ে স্টেশনে আসা উচিত হয়নি। বুঝলে বখের আলী, বখের আলী, তুমি কথা বলছ না কেন? তুমি গল্প করছ না কেন? বখের আলী! আলী! আলী!

সহসা আলী ধনুষ্টংকারের রুগীর মত বেঁকে গেল এবং সহসাই বাবুটির মুখের উপর উপুড় হয়ে বলল, সেসব নবাবী আমলের কিস্‌সা আপনার কি ভাল লাগবে হুজুর!

বৃদ্ধ বাবুটি যখন দেখল, আলী বাজ-পড়া মৃত নয় অথবা বখের আলী সত্যি রিক্সা টানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিল না এবং বস্তুত বখের আলী যখন জীবিতই আছে তখন গল্প না শুনে যতটা সম্ভব শীঘ্র নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো দরকার। তিনি বলেন, অত প্রাচীন গল্প কি হালে আমলে ভাল লাগবে?

—সে [illegible] খাঁ [illegible] [illegible]। [illegible] হুজুর, ঘুলঘুলি দিয়ে নবাব যা দেখলেন, আমরা কটা লোক তা দেখতে পেলাম।

—কি দেখলেন! কি দেখলেন! তখন সোনা পাচার হত! বৃদ্ধ বাবুটি ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতায় বললেন, যাক, আমরা ল্যাম্পপোস্টের আলোতে এসে পৌঁছে গেলাম।

—আমি বলেছি হুজুর আপনার কোনও ভয় নেই। ঠিক পৌঁছে দেব। নবাব ঘুলঘুলি দিয়ে দেখলেন; লোকটা রোজ গঙ্গায় মাছ ধরতে আসে।

বৃদ্ধ বাবুটি কাটলেন, নবাবের বুঝি কোন কাজ ছিল না?

—ছিল হুজুর। কাজও করত, ঘুলি-ঘুলি দিয়ে মাছ ধরাও দেখত।

কথা বলতে যত কষ্টই হোক তখন যেন শরীরের কষ্ট থাকে না আলীর। আলী তার শেষ সামর্থ্যটুকু দিয়ে হেঁটে হেঁটে রিক্সা টেনে চলেছে। একটি ল্যাম্পপোস্ট, দুটি ল্যাম্পপোস্ট সে পার হল। সে একবার সার্কাস পার্টিতে সিংহ দেখেছিল। আলোগুলো অন্ধকারে সিংহের চোখের মত জ্বলছে। সে বলল, হুজুর, আপনি সিংহের ডাক শুনেছেন?

—আলী, তুমি ভয়ানক কথা বলতে পার।

—এ শীতে একটা বিড়ি খেতে পারলে বড় ভাল হত হুজুর।

বৃদ্ধ বাবুটি পকেট থেকে আলগা করে বিড়ি এবং দেশলাই দিলেন। আলী বিড়ি ধরাল। হ্যান্ডেলের উপর ভর করে বিড়িটা পরম নির্ভরতার সঙ্গে টেনে সদর জেলের পাঁচিল দেখল। পাঁচিলটার ভিতরের দিনগুলো ওর সবচেয়ে সুখের ছিল এমন ভাবল। শেষে বড়বাড়ির বাগানের কেয়া-ফুলের গন্ধ নেওয়ার সময় দেখল বড় বাড়ির একটি জানালা খুলে গেল। জানালায় যুবতীর মুখ। জানালার আলো নীচে গড়িয়ে নামছে। সেই আলো ধরে একজন যুবক তরতর করে উপরে উঠে কার্নিশ ধরে ধরে ঢুকে গেল।

বিড়িটা খাওয়াতে আলীর মনে হল, সে আরও একশ বছর বাঁচবে। সে বলল, হুজুর এবার আপনাকে ইস্কুলে নামিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।

বাস্তবিক পক্ষে আলী কোথাও থামেনি। একটি বিড়ি শীতের ঠাণ্ডায় যথার্থই একশ বছরের পরমায়ু দিয়েছিল। সারাদিন সারারাত পর এই বিড়ির ধোঁয়া ওর সমস্ত রক্তে ফের বেঁচে থাকার প্রাণপণ ইচ্ছার ধুনুচি জ্বালিয়ে ওকে পাগলা ঘোড়ার মত কদম দিতে সাহায্য করছে। সে হাঁটছে, হাঁটছে। বৃদ্ধ বাবুটি শরীর ছেড়ে বসে আছেন। শহরের আলো, ইতস্তত অন্ধকার পার্ক-ময়দান পার হয়ে তিনি চলেছেন। চলেছেন। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

ভিতর এক পয়সার গরীবদের দুঃখ ভুলতে পারলেন না।

বধের আলী তখন তার কিস্‌সা শেষ করল।

[আলীর কিসস্‌সা খুবই অস্পষ্ট। আলীর মুখে রক্তের কল। সে কাশতে কাশতেও শেষ পর্যন্ত গল্পটা করছিল। বৃদ্ধ বাবুটি শুনছিলেন। শোনার স্পৃহা না থাকলেও যেন শুনছিলেন। আলীব অস্পষ্ট কথার ভিতর থেকে তিনি অর্থ উদ্ধাব করেছিলেন : লোকটা রোজ মাছ ধবতে আসত, অথচ কোনদিন বঁড়শিতে খোট দেবার প্রয়োজন মনে করত না। ঘুল-ঘুলি দিয়ে নবাব রোজ দেখেন আর ভাবেন। একদিন অবশেষে নবাব পাত্রমিত্রসহ নদীব পারে এসে দাঁড়ালেন। সেদিনই সে প্রথম খোট দিয়েছিল এবং নবাবের পাগড়িটা বঁড়শিতে তুলে এনেছিল। এমত অপমানে নবাব গর্দান নিলেন লোকটির এবং ওব গৃহে গিযে দেখলেন স্ত্রী সুন্দরী, স্ত্রী পাথর খোদাই করে সব রমনীয় মূর্তি তৈরী করেছে। রমণীর পসরা খুলেছে। নবাবের আদেশে সুন্দরী স্ত্রী নবাবের মসনদ তৈরীর জন্য নিযুক্ত হল। মসনদের সৌন্দর্যে নবাব বিমুগ্ধ এবং উত্তেজিত। রমণীব শিল্পসত্তা নবাবকে গ্রাস করল। অভিষেকের বাৎসরিকে তিনি রমণীব ঘরে শয়ন করার বাসনা জানালেন। সে রাতে হতভাগ্য রমণী আত্মহত্যা করল। তারপর কত নবাব এল গেল। মসনদের আখের একটা দুঃস্বপ্ন।]

যেন সে শেষ কয়েকটি কথায় বলতে চেয়েছিল—: দুঃস্বপ্নের অংশীদার বস্তুত সে নিজেও।

বৃদ্ধবাবুটি দেখলেন, আলী হ্যান্ডেলের উপর পড়ে কাশছে। দম নিতে ফুরসত পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পঞ্চাশটা নয়া পয়সা ওর হাতে গুঁজে দিলেন। আলী উঠে একবার দেখল না। আলী ধীরে ধীরে হ্যান্ডেলের উপর নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। সে সামনে গাঢ় অন্ধকার দেখছে অনেক দিনের মত। অনেক দিনের মত সেরেও যাবে এমন ভেবে গামছা দিয়ে ঠোঁটের কস গড়ানো রক্ত মুছতে চাইল। অথচ হাতটাকে টেনে আনতে পারল না। আকাশ সমস্ত শরীরে বরফের কুচি ঢেলে দিচ্ছে যেন। সে শেষ-বারের মত আন্তরিক স্পৃহাতে শরীরকে শক্ত করার জন্য মাথা তুলতে গিয়ে দেখল, ঘাড়েও কোন শক্তি নেই। বৃদ্ধ বাবুটি লাঠিতে ভর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। নির্জন নিঃসঙ্গ পথে লাঠির শব্দ ঠ্যাঙাড়ে দস্যু-দের হাহাকার শেষে অন্ধকারে মিশে যাওয়ার মত। দূরে তিনটে ঘণ্টা পেটার শব্দ শুনল। সময় জেলে ঘণ্টি পড়ছে। সে ক্রমশ হ্যান্ডেলের দুপাশে ঝুলে পড়ছে যাচ্ছে।

একটি লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক স্মারক

রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতককে বাঙালীর নবজাগৃতির এক স্মরণীয় অধ্যায় বলা যেতে পারে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই বাঙালীর প্রথাসিদ্ধ জীবন-পরিবেশে ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছিল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতেই বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ স্বল্প-সন্তুষ্ট জীবনের তটভূমিতে নতুন চিন্তা ও চেতনার তরঙ্গ অভিঘাত সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় সেই বিচিত্র এবং অভিনব ভাবসম্পদ প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাসে রিক্ত-বিত্ত বাঙালীর ভাবজীবনকে আলোড়িত করে তোলে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার সান্নিধ্যে জাগ্রত জীবনবোধ রেনেসাঁস-ধর্মী চিন্তার জন্ম দেয়। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে নীতিবোধে এই নবীন চিন্তাধারা নব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। উনিশ শতকের সেই নবজাত জীবনচেতনাকে যাঁরা রূপ দিলেন, সেই অনন্য শিল্পিগোষ্ঠী রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র মধু-সূদনের সঙ্গে আরও একটি নাম সেভাবে না হলেও স্মরণীয়: তিনি উত্তরপাড়ার জয়-কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সেকালের বাংলা দেশে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্ভবত এমন কোনো সংগঠন ছিল না, যা এই উদারদৃষ্টি বলিষ্ঠ মানুষটির সাগ্রহ সহযোগিতায় সংবর্ধিত হয়নি। ১৮৪৫ সালে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারী তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, 'He has made a great step towards reformation amongst his countrymen. He is in advance of them.'

বস্তুতঃ ১৮০৭ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশে প্রত্যেকটি সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে জয়কৃষ্ণের উপস্থিতির সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসে।

১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক অ্যাডাম সাহেবকে এ-দেশের পল্লী অঞ্চলের শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধানের নির্দেশ দান করেন। বাংলা দেশের নানা পল্লী ভ্রমণান্তে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

We cannot, however, expect that the reading of the report should convey the impressions which we have received from daily witnessing the more animal life to which ignorance consigns its victims, unconscious of any wants or enjoyments beyond those which they [illegible] which the beasts of the [illegible] of any [illegible] the higher purpose for which existence has been bestowed.

সেই সার্বজনীন অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং নিশ্চেতন জীবনযাত্রার যুগে জয়কৃষ্ণ বাংলা দেশে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে যে অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন। জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে নিরক্ষর কৃষক-সন্তানদের মধ্যে মুদ্রিত রামায়ণ, মহাভারত, কাগজ-কলম-

উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার

স্লেট-পেন্সিল বিতরণ করে তাঁর এই প্রয়াসের সূচনা হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্যে তখন প্রত্যেক জেলায় তিনটি করে সমগ্র বাংলা দেশে ১০১টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জয়কৃষ্ণ তাঁর জমিদারি বোঁচি ও বাসস্থান উত্তরপাড়ায় বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন করেন। ১৮৪৬ সালে স্থাপিত স্থানীয় বিদ্যালয়টির ব্যয়বহনের জন্যে বার্ষিক দু' হাজার টাকা উপস্বত্বের জমিদারি সরকারকে দান করেন। হুগলী জেলায় তিনিই প্রথম ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে যে, তিনি এক দিনে [illegible] বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। [illegible] শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে সরকারী সাহায্যের জন্য তিনিই [illegible] শিক্ষা সমিতির কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন [illegible] কর্তৃপক্ষের [illegible]

১৮৫৪ সালে [illegible] শিক্ষাবিধি অনুসারে যে Grant-in-aid সাহায্যদান প্রথা প্রবর্তিত হয়, তার পরোক্ষ কারণ নিহিত আছে জয়কৃষ্ণ রচিত আবেদন-পত্রে। অনুরূপভাবে তদানীন্তন এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারীর নিকট লিখিত তাঁর অপর একটি পত্র বাংলা দেশে সার্কেল পণ্ডিত পদ এবং ছাত্রগণের পুরস্কারদান-প্রথা প্রবর্তনে সাহায্য করে। সে যুগে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। সমাজের সকল স্তরের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, স্ত্রীশিক্ষার অপরিহার্য পরিণাম বৈধব্য। স্ত্রীশিক্ষার অর্থ নারীকে স্বেচ্ছাচারের অধিকার দেওয়া। আশ্চর্যের বিষয়, সেই অচলায়তনিক গোঁড়ামির যুগে উত্তরপাড়ার মত একটি প্রাচীনপন্থী গ্রাম একটি মানুষের সকল প্রচেষ্টা এবং মুক্ত দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করে-ছিল। ১৮৫০ সালে উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই উদ্যোগেই প্রসারিত ক্ষেত্রে জয়কৃষ্ণ সমগ্র বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে ড্রিংকওয়াটার বেথুন সাহেবের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং কলকাতার বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁর সক্রিয় উৎসাহ এবং দশ হাজার টাকা সাহায্যদান করেন। এ ছাড়া সমকালীন বাংলা দেশে বিদ্যোৎসাহীদের অন্যতম হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য, কৃতী ছাত্রদের পুরস্কারদান, [illegible] দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ [illegible] সে যুগে সরকারিক 'এডুকেশন রিপোর্ট'র [illegible] ছিলেন। [illegible] সরকারি [illegible] [illegible]

গ্রন্থাগারে রক্ষিত কয়েক টি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ

প্রথম স্থান অধিকার করে Bengal Peasent life রচয়িতা রেভারেন্ড লালবিহারী দে ৫০০, পুরস্কার লাভ করেন। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখ্য ভূমিকা রয়েছে। বাঙলীর প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি আজীবন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ১২ বছর আগে ১৮৫৩ সালের ২৯শে জুলাই কলকাতা টাউন হলে তৎকালে প্রস্তাবিত India Bill এর আলোচনার জন্যে বাংলা দেশের চিন্তাশীলদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ-দেশে সম্ভবত সেই প্রথম দশ হাজার দেশবাসী স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে একত্রিত হয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেই অভূতপূর্ব জনসভার প্রথম বক্তা ছিলেন রামগোপাল ঘোষ এবং দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের জন্যে তৎকালীন শাসন পরিষদের কাছে যে আবেদন করেন, তাতে সংস্কারের ওপরে যাঁর আস্থা ছিল, তিনি তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনাটি মুখ্যত তাঁরই এবং উদ্যোক্তাদের অন্যতমরূপে তিনি সেজন্য ৫ হাজার টাকা এতে দান করেন। এই ভারতহিতৈষী সংস্কারকের জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। তাঁর জীবনকাহিনী তাই প্রেক্ষাপটরূপেই আলোচ্য।

জয়কৃষ্ণের জীবনকাহিনীর ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এখানে নেই, হয়তো তার প্রয়োজনও নেই। তাঁর বিচিত্র কীর্তিমুখর জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সাক্ষ্য উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী। আজকের চুনবালির ভাঙিধসা প্রৌঢ় অট্টালিকাটি জয়কৃষ্ণের কিংবদন্ত অনুচরের মতো তাঁর স্মৃতির অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে। এই প্রাসাদোপম হর্ম্যের সুদৃঢ় উন্নত স্তম্ভের কাঠিন্যে, দীর্ঘ প্রলম্বিত অলিন্দে সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে ভাগীরথীর অভিমুখী পথের বাতায়নে সেকালের অনেক হারানো ইতিহাস স্মৃতি হয়ে রয়েছে।

ইংরেজী ১৮৫৪ সাল। স্বদেশে, স্বগ্রামে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে জয়কৃষ্ণ পূর্ণ উদ্যমে ব্রতবান। সারা দেশে নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলি সে উদ্দেশ্যে সাফল্যের বিদ্যমান। কিন্তু জয়কৃষ্ণের মন পরিপূর্ণ তৃপ্তির গভীরে আচ্ছন্ন নয়। শিক্ষার প্রকৃত পূর্ণতায় বিশ্বাসী জয়কৃষ্ণের মনে হতে লাগলো যে, স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হলে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে আর অধ্যয়নের সম্পর্ক থাকে না। তার একটা কারণ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রন্থ কিনে পড়ার মত সম্পত্তি যে যুগে অধিকাংশের ছিল না। সুতরাং জয়কৃষ্ণ ঐ বছরেই ২৩শে আগস্ট বর্ধমান বিভাগের রেভেনিউ কমিশনারের কাছে আবেদন জানালেন উত্তরপাড়ায় একটি সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে। সে আবেদনে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ২৫০০, টাকা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে মাসিক ৩০ টাকা সাহায্যের অঙ্গীকার ছিল। সে সময়ে সরকার থেকে এইরকম কয়েকটি পঠনাগারে মাসিক কিছু পরিমাণ অর্থসাহায্য করা হত। বেশ কিছুদিন অপেক্ষার পর উত্তর এলো: সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারে সাহায্য করার প্রথা রহিত করে দিয়েছেন, কেবল স্থানবিশেষে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে।......

কোনো প্রতিকূল অবস্থাতেই হতোদ্যম হওয়ার মানুষ ছিলেন না জয়কৃষ্ণ। আপন আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে নিজেই গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। ১৮৫৭ সালে গ্রন্থাগার নির্মাণকার্য শুরু হল এবং ১৮৫৯ সালের ১৫ই এপ্রিল মোট আশি হাজার টাকা ব্যয়ে সে কার্য সম্পূর্ণ হল। গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্যে জয়কৃষ্ণ বার্ষিক ১১০০, টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি ও ২০০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ নির্দিষ্ট করলেন।

গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহের জন্যে একজন অধ্যক্ষ ও তার সহকারী দপ্তরী চাপরাসী নিয়োগ করা হল। তাঁদের বেতনের জন্যে নির্দিষ্ট হল বার্ষিক ৯০০, টাকা। এবং পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয়ের জন্যে বার্ষিক ১২০০, টাকা।

সুবৃহৎ ভিত্তির ওপর এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা: পূর্ব ও পশ্চিমে সতর্ক প্রহরীর মত সারি সারি বিশাল স্তম্ভ, সুউচ্চ সোপানশ্রেণী, মর্মরমণ্ডিত কক্ষতল: সমগ্র বাংলা দেশে কেবল গ্রন্থাগারের জন্যে এমন রমণীয় হর্ম্য আর ছিল না। গ্রন্থাগারের সামনে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং কুসুমোদ্যান। তার প্রান্তে কলনাদিনী ভাগীরথী। একতলে গ্রন্থাগার, দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষগুলি সম্ভ্রান্ত অতিথি-অভ্যাগতদের বাসের জন্যে সুরক্ষিত ছিল। তৎকালীন এক বিশিষ্ট সংবাদপত্র জয়কৃষ্ণ ও তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন:

His house on the river banks at Uttarpara though almost equal in

size to a palace was never occupied by the family; but was chiefly kept for the large library which he accumulated, and which like most libraries of native gentlemen contains not a few rare and valuable work. (The Saturday Evening Journal. 21st. June 1858)

সেকালের বাংলা দেশে প্রকৃত জ্ঞানান্বেষীর কাছে এই গ্রন্থাগারটি ছিল মধুচক্র। দেশী ও বিদেশী গ্রন্থপ্রেমীর দল নানা স্থান থেকে এসে সম্মিলিত হয়েছেন এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রে, উদ্যত প্রশ্নকে সমাধানে শান্ত ক'রে ফিরে গেছেন। তাঁদের চেতনায় এই গ্রন্থাগার ও তার পরিবেশ সম্পর্কে একটি অনন্য শ্রদ্ধাময় অনুভূতি সঞ্চারিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক জয়কৃষ্ণ ও তাঁর গ্রন্থাগার সম্পর্কে একজন বিদেশীর মনোভাব অনুভব করতে পারেন কানিংহামের "The coeruleans"

• • • "You are fond of books", he said to her one day. "If you would like to visit a curious library—the most interesting, I suspect, that you have ever been in come with me to-morrow and see what a native gentleman can be and can do."

Camilla was delighted at the proposal ... we reached the place at last by the shores of a historic river where a grand old devotee of learning has accumulated the precious outcome of a lifetime of skilful diligent and generous research. He told how year by year and decade by decade the work of accretion had gone steadily on and summoned from the strongholds where they lay immured, many a curious volume and precious Buddhist manuscript, which his zeal as a collector had gathered from the treasure-rooms of Benares or Cashmir or the monasteries of far Thibet ... "I like this scene, this place," camilla said with vehemence "better than anything I have seen in India." For my part, I could die happy, if I had created such a little oasis as this, for the benefit of weary pilgrims in time to come. (Cunnigham).

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার উইলিয়াম হাণ্টার কলকাতার কোলাহল ত্যাগ ক'রে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর স্নিগ্ধতলে বসে ক্রমান্বয়ে তিন বছর ধ'রে তাঁর প্রত্নতত্ত্বের গবেষণাগ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। Imperial Gazeteer of Indiaর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি এই গ্রন্থাগারের সাহচর্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন।

জীবনসংগ্রামে পরাজিত, ক্লান্ত কবি মধুসূদন যখন ভগ্নস্বাস্থ্য হ'য়ে প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী, অভাব-অনটন-পাওনাদারের হামলা, আত্মীয়স্বজনের অবহেলায় বিপর্যস্ত, বিপর্যস্ত

তখন অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে কিছুকাল বাস করার জন্যে পুরনো বন্ধু জয়কৃষ্ণকে পত্র লেখেন। উত্তরে জয়কৃষ্ণ জানালেন, 'you are always welcome'। ১৮৭০ সালের [illegible] কবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই গ্রন্থাগারে [illegible] জয়কৃষ্ণের পৌত্র [illegible] মুখোপাধ্যায়কে তাঁর একটি বক্তৃতার আয়োজন করতে বলেন। তাতে মেঘদূতের প্রথম শ্লোক, 'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ—' এবং ভারতচন্দ্রের 'কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট॥' আবৃত্তি করে কবি সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার সুকুমারিত্ব প্রমাণ করেন।

১৯০৯ সালের ৫ই মে শ্রীঅরবিন্দ মানিকতলা বাগানের বোমার মামলায় নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায় মুক্তি পান। তাঁর কারামুক্তির পর তিনি প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ দান করেন এই ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারের পূর্ব প্রাঙ্গণে। কারাগারের নিভৃতে তাঁর বাসুদেবদর্শনের রোমাঞ্চকর কাহিনী

১৭০৭ সালে হল্যাণ্ডে মুদ্রিত একটি সচিত্র ইতিহাস গ্রন্থের আখ্যাপত্র

সেই প্রথম ব্যক্ত হয়। 'উত্তরপাড়া ভাষণ' নামে সেই রচনা তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনের উল্লেখ্য স্মারক হিসেবে সংরক্ষিত।

জয়কৃষ্ণের জীবিতকালে বহু বিদেশী পর্যটক, লেখক, ঐতিহাসিক, রাজনীতিজ্ঞ প্রমুখ এই গ্রন্থাগারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এলীন ইডেন, স্যার রিচার্ড টেম্পল, স্যার স্টুয়ার্ট বেলি, মাকুইস অব ডাফরিন, মিস মেরি কার্পেন্টার প্রমুখ অন্যতম। তদানীন্তন লেখক ও চিন্তানায়কদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, কবি হেমচন্দ্র, বিপিন পাল, শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও গ্রন্থাগারের পরিচয় স্বল্প ছিল না। গত ১৯৫২ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তৎকালীন সভাপতি ডঃ এস আর রঙ্গনাথন্ এই গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা সভায় বলেন: 'উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর মত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলি জাতীয় সম্পত্তি। এখানে এমন অনেক পুস্তক রয়েছে, সারা ভারত সন্ধান করলেও যা মিলবে না।' তাঁর মন্তব্য যে অতিশয়োক্তি নয়, সমকালীন ইতিহাসে তার সাক্ষ্য রয়েছে—"Ootterpara collection, being a series of rare tracts and News-papers of the last century" (vide fly leaves—The Annals of Rural Bengal).

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর প্রারম্ভিক গ্রন্থসংগ্রহ ছিল ২০ হাজারের বেশী। এখনও এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুঁথি দলিলপত্র, প্রাচীন সাময়িকপত্র ও গ্রন্থসম্ভার দেখে রবীন্দ্রনাথের মতই মনে হয় যে মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল এখানে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থাগার থেকে রেফারেন্সের জন্য পুস্তক ও দলিলপত্র চেয়ে নেওয়া হয় ভারতের সর্বত্র। কিছুকাল পূর্বে গ্যাংটক প্রাসাদ থেকে সিকিম রাজ্যের হোম সেক্রেটারী একটি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে প্রদর্শনের জন্য 'জর্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (ভলুম ৫৯, ১ম ভাগ) এই গ্রন্থাগার থেকে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। গ্রন্থাগারে পুঁথি পাণ্ডুলিপির সংগ্রহও উল্লেখ্য। মহাভারত-তন্ত্র-পুরাণ-স্মৃতি অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন পুঁথিগুলি গ্রন্থাগারে আজও অনাবিষ্কৃত মহামূল্যের তাৎপর্যময়। তালপাতায় ও তুলট কাগজে লেখা তিব্বত, কাশ্মীর ও প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন পুঁথি এখানে সংখ্যায় [illegible] নয়। দুষ্প্রাপ্য [illegible], পুরনো [illegible] [illegible] [illegible]

পুস্তক সংগ্রহের বিচারে এ ধরনের গ্রন্থাগার ভারতবর্ষে খুব বিরল।

আধুনিক যুগে একটি জাতির সংস্কৃতি-রক্ষায় ও তার উদ্বর্তনে গ্রন্থাগার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বৃটেন ও নর্থ আয়ার্ল্যাণ্ডে মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে বই পড়ে। ১২ লক্ষ লোক প্রত্যেকে গড়ে প্রায় ২৫ খানা বই নেয়। ফলে দেশ ও জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্টতর হয় এবং উন্নততর নাগরিক জীবনের দায়িত্ববোধ জন্মায়। সেখানে বিদ্যালয়ে শিশু, হাসপাতালে রোগী, গবেষণার ছাত্র, গৃহস্থবধূ, কৃষক, শ্রমিক সকলেই গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হয়। বৃটেনে পাবলিক লাইব্রেরী থেকে যে-কোনো লোক যে-কোনো বই পেতে পারে। আমাদের দেশে
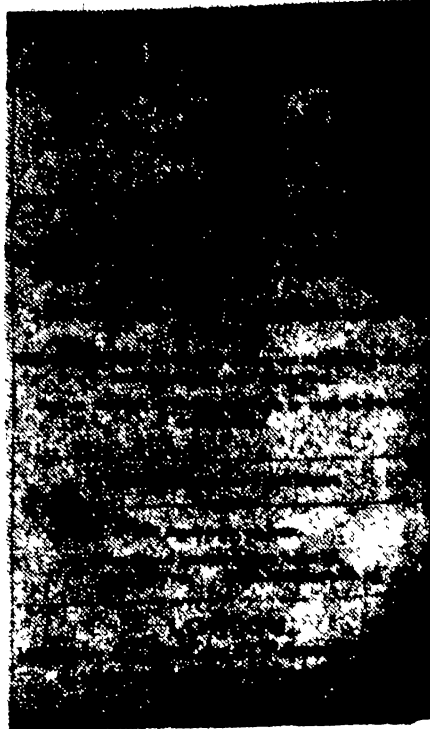
গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীনতম পুস্তক (১৬৫৮)

সে পরিস্থিতি সুদূরসম্ভব হলেও গত শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এই পাবলিক লাইব্রেরীর মাধ্যমে বাংলা দেশে সেই চেষ্টারই সূচনা হয়েছিল। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ভারতবর্ষের প্রথম 'Non Govt circulating library' (Cal. Review) পরে অবশ্য আর্থিক কারণে সেই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। দেশের সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থাগারে আর্থিক দুর্দিন দেখা দিল। বাংলা দেশের এক গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য এই গ্রন্থাগারটি দেশবাসীর অবহেলা ও বিস্মৃতির চিহ্ন সর্বাঙ্গে ধারণ করে আপনা ঐতিহ্য থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। অবশেষে স্থানীয় উৎসাহী তরুণ এবং সংস্কার-প্রয়াসীদের উদ্যোগে গত ১৯৫৮ সালে সরকার এই গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু জয়কৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয় এই গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্তৃত্বে আসেনি। গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলটি এখনও ভিন্নতর অর্থকরী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণে একটি গ্রন্থাগারের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দেশের সংস্কৃতিপ্রেমী শিক্ষিতসমাজ, ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকদের কাছে এখনও এই গ্রন্থাগার যথার্থ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। লাইব্রেরী আন্দোলনের অন্যতম নেতা উইলিয়ম এওয়ার্ট একদা বলেছিলেন : 'পাবলিক লাইব্রেরীর অর্থ সেই ধরনের গ্রন্থাগার যেটি :

"founded by the people supported by the people, enjoyed by the people."

উল্লিখিত নিরঙ্কুশ নির্দেশনার পথে বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থাগারটির সংরক্ষণ উন্নয়ন ও যথাযথ মূল্যায়নের নিমিত্ত মুখ্যত জনসাধারণের সহৃদয় সহযোগিতার উপরই নির্ভর। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে গ্রন্থাগারটি একদিন কৌতূহলী পাঠকের উপস্থিতিতে প্রাণচঞ্চল ছিল, আজ তা মৃত, অতীতের ফসিলে প্রায় রূপান্তরিত। গ্রন্থাগার সংস্কৃতি-কেন্দ্ররূপে গৃহীত হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই গ্রন্থাগারটির অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের একটি উজ্জ্বল সংস্কৃতির সাক্ষ্য বিলীন হয়ে যাবে। দেশ আজ বিরাট সমস্যার ভারে পীড়িত। বহিঃশত্রুর আক্রমণে স্বাধীনতা ও জাতীয়তার বিপর্যয় রোধে আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ সংকল্প রচনায় আগ্রহী। অতীতে তুর্কী বা মুঘল আক্রমণের কালে ফিরোজ তুঘলক বা মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের মত নৃশংস আক্রমণকারীর হাতে দেশের মূল্যবান গ্রন্থসম্ভার বিনষ্ট হয়েছে বলে ইতিহাসের পাঠক আমরা অন্তহীন আক্ষেপ করেছি, কিন্তু সেই বহিঃশত্রুর চেয়ে প্রবলতর অন্তঃশত্রু—আমাদের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের আক্রমণে এই মূল্যবান গ্রন্থরাজি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তা হলে উত্তরকালের কাছে আমাদের কৈফিয়ৎ

শিল্পীর স্বাধীনতা

মনোজ বসু

মনের ও কলমের স্বাধীনতা ছাড়া সাহিত্য হয় না। গ্রহবৈগুণ্যে আমার কলমের উপর আঘাত প্রায় গোড়া থেকেই। প্রথম উপন্যাস 'ভুলি নাই' সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা। এলিসিয়াম রোডে ডাক পড়ল : কেন লিখতে যাও এসব, কোথায় পেলে মালমশলা, সত্যি সত্যি কতদূর যোগাযোগ ওদের সঙ্গে? জেলা ও গ্রাম অবধি খোঁজখবর চলল। অতি দরিদ্র তখন রুজিতে টান পড়বার যোগাড়। নাটক 'নূতন প্রভাত' নিয়েও কিছু টানাটানি—অভিনয় নিষিদ্ধ।

তবু নিরস্ত হতে পারি নি। আখের বিবেচনা করে মনের রাশ টানতে এই বয়সেও শিখলাম না। স্বদেশের সংকটের মধ্যে দরজায় খিল এঁটে সাহিত্য লিখে যাব, সে নৈর্ব্যক্তিক মেজাজ আমার নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের উপাখ্যান নিয়ে আমার অনেক উপন্যাস ও গল্প—'সৈনিক' 'আগস্ট, ১৯৪২' 'বাঁশের কেল্লা' ইত্যাদি। সংগ্রামের পুরোভাগে তখন কংগ্রেস—বহুজনের দুঃখবরণ ও তপস্যা চোখের উপর দেখেছি। স্বভাবতই কংগ্রেস এবং সেইসব মানুষ লেখার মধ্যে এসে গেছেন। স্বাধীনতার পর দেশের পুনর্গঠন নিয়েও লিখেছি—গান্ধীজীর প্রকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি মনে দোলা দিল তাই নিয়ে উপন্যাস 'নবীন যাত্রা'। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং জাতীয় সংহতি নিয়েও উপন্যাস-গল্প আছে রাষ্ট্রকর্তারা উদ্যোগী হবার আগে লেখা সেসব। বিহার-পশ্চিমবঙ্গ একীকরণ চেষ্টা বিশেষভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়ে আমি বিপজ্জনক বলে উপলব্ধি করেছিলাম। অধিকাংশ লেখক-বন্ধু যে পথে গেলেন আমায় তার বিপরীত পন্থায় লিখতে হল। আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর সদয় হয়ে আমার সেই লেখা ছেপেছিলেন।

এতকাল পরে পুরানো কথা তুলে নির্লজ্জ আত্মপ্রচার নিতান্তই দায়ে পড়ে। কম্যুনিজম কেন আমার জীবনে ও সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য হয়নি তা বলতে গেলে কিঞ্চিৎ পটভূমিকার প্রয়োজন। আমার জাতীয়তা গর্বী মনসভূমিতে কম্যুনিজমের কোনক্রমেই স্থান হতে পারে না।

কম্যুনিজম বলে কথা কি—জীবনসন্ধানী শিল্পী কোন ইজমের নিগড়ে আবদ্ধ হতে পারেন না। সেটা আত্মহত্যার শামিল। অনেক শাণিত মেধার এই কারণে অশিক্ষায়া রকমের অপমৃত্যু দেখেছি। বিদেশে এবং চোখের উপর এই বাংলা দেশেই। লজ্জা ও অন্যায় লোভ সমাজ থেকে বিদায় নেবে, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভোগৈশ্বর্য সকলের জন্য অবারিত হবে, এ আকাঙ্ক্ষা সর্বযুগের। সকল সৎমানুষের। সেই সাধনায় সৃষ্টিশীল লেখকের সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ পদ্ধতি। রাজনীতিকের পথ আর শিল্পীর পথ এক নয়—লেখকের হাতের কলম কাঠি হবে কখনোই ইজমের ঢাক পেটাবে না।

কম্যুনিস্টদের কাজকর্ম আমার জাতীয় চেতনার উপর বারংবার রূঢ় আঘাত দিয়েছে। দেশের সংকটসময়ে তাদের ভ্রান্তনীতি বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। কথা ও ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রেই মিল খুঁজে পাইনি। চীনের বৃত্তান্ত এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। আমার জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

এগার বছর আগে চীনে যাই। ভারতের প্রায় সর্ব অঞ্চলের মানুষ—সাহিত্যিক সংবাদিক সমাজসেবী শিক্ষক আইনজীবী এবং নানাতন্ত্রের রাজনীতিক মিলে দল।

[illegible] সাহিত্যিক উমাশঙ্কর যোশী ছিলেন, বাংলা থেকে [illegible] সাহিত্য-অনুষ্ঠানে হায়দরাবাদে, তাঁর কাছে [illegible] (স্বাধীন সাহিত্য সমাজের নিমন্ত্রণে এই সেদিনও তিনি এসে গেছেন)। চীনের পথে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়, একত্র ছিলাম আমরা। বাইশটি দেশের মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন, তার মধ্যে ভারতীয় বলে আমাদেরই যেন বিশেষ সমাদর। বুদ্ধের দেশের মানুষ, হিমালয়-প্রাচীরের এপার-ওপার নিকটতম প্রতিবেশী, 'নিতান্তই আপনজন। যেখানে যাচ্ছি, 'হোপিন ওয়ানশোয়ে' শান্তি দীর্ঘজীবী হোক—আকাশ-বিদারণ এই ধ্বনি। এবং 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই'। আর কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হবে না, পৃথিবীর রক্ত-কলঙ্ক বিদূরণ করব—ক্ষণে ক্ষণে এই সংকল্প নেওয়া হচ্ছে। মুগ্ধ হলাম, প্রতিটি কথা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করলাম। আমি একা নই, দলের প্রতিটি মানুষ। আমি এসে বই লিখলাম। উমাশংকর যোশী এবং আরও অনেকে নিজ নিজ ভাষায় লিখলেন। তার আগে সর্দার পানিক্কর রাষ্ট্রদূতরূপে দীর্ঘকাল চীনে ছিলেন বিরাটকায় বই লিখে ফেললেন তিনি। কে নয়' পণ্ডিত সুন্দরলাল লিখলেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল চীন ঘুরে এসে বক্তৃতায় ও লেখায় উজ্জ্বল মূর্তিতে চীনকে তুলে ধরলেন দেশবাসীর সামনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট রাজনীতিক এবং হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের বার্তা সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতো বিদগ্ধ সাংবাদিক বই লিখে চীন-প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিলেন। চীনের কয়েকটি নেতা কলকাতায় এলেন, সরকারী কর্তারা তখন গালিচা দিয়ে প্রায় মুড়ে ফেললেন হাওড়া স্টেশনটা। বেশি দিনের কথা নয়, সেই বিপুল সমারোহ অনেকেরই মনে পড়বে। চৌ-এন-লাইকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়ে ঘটা করে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হল। ভারতের শত্রুর শিরে সেই দুর্লভ সম্মান আজও মুকুট হয়ে রয়েছে।

'সেই চীন আর এই চীন' সময়ক্রমে পলিসি পালটেছে এমন কথা এক্ষেত্রে বলা চলবে না। একই কম্যুনিস্ট শাসনতন্ত্র চালু সেখানে, রাষ্ট্রনায়কেরা সেই এক। অতএব সেদিনের আচরণ ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়। ভারত-চীন মৈত্রী নিতান্তই অভিনয়ের ব্যাপার। সে অভিনয় এমনি নিখুঁত যে [illegible] তিন [illegible] দেশের বুলি যেখানে [illegible], কোন সংশিল্পী তাতে আকৃষ্ট হতে পারেন না।

ইয়োরোপ ও এশিয়ার কতকগুলি জায়গায় আমি ঘুরেছি। কম্যুনিস্ট দুনিয়া ও গণতান্ত্রিক দুনিয়া উভয়ত্র। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে মুক্ত মন নিয়েই গিয়েছিলাম। কম্যুনিস্ট দেশে শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, সকল গণতান্ত্রিক দেশে এইরূপ প্রচার। মস্কোর লেখক-সংঘে সোজাসুজি সেই প্রশ্ন করি (বিস্তৃত বিবরণ আমার বইয়ে আছে)। লেখকমশায়েরা বেকবুল গেলেন, বললেন, স্বর্গসুখে আছেন তাঁরা। ঘটনা যা-ই হোক বিদেশী অতিথির কাছে অন্য কি বলা যায়? দুদিনের জন্য গিয়ে আমাদের পক্ষেও সত্যনির্ণয় অসম্ভব। পাস্তেরনাকের লাঞ্ছনায় স্তম্ভিত হয়েছিলাম, তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করে এ-দেশী কম্যুনিস্ট-কাগজের বেধড়ক গালি খেয়েছি। তবু হলপ করে বলতে পারব না, শিল্পীর সত্যিকার অবস্থা কী ঐ সমস্ত দেশে। সকলে যা শোনেন, আমিও তাই শুনি—এই পর্যন্ত।

কিন্তু বিদেশের অবস্থা সঠিক না জানলেও

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৩ ॥

পল্টনের হস্তক্ষেপ

অদৃষ্টের সঙ্গে তাস খেলতে বসেছে তুলসীবাঈ। অদৃষ্টের মতো পাকা খেলোয়াড় আর কে আছে? মানুষ যতই দক্ষ খেলোয়াড় হোক না কেন শেষ পর্যন্ত বাজি জিততে পারে না হতাশ হয়ে হাতের তাস ফেলে দিয়ে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না তার। আজ শুয়ে শুয়ে সেইসব সুদীর্ঘ ইতিহাস স্মরণ করছিল সে। গত দুমাসে অনেকগুলি রাত্রির নিদ্রা প্রহর আর অনেকগুলি দিনের কর্মহীন প্রহর এই চিন্তায় কাটিয়েছে আজও কাটছে।

সেদিন যখন মীর্জা নজফের হুকুমে তাঞ্জাম নিয়ে চলল তাকে ইমানী বেগমের কুঠিতে আর সেখানে যখন সন্দেহে আশ্রয় পেলো ভাবলো এবারের দান অন্তত তার জয়। কিন্তু এক দানেই তো খেলা শেষ হয় না। তখনো তার জন্যে বাকি ছিল অনেক।

ইমানী বেগম দ্বিতীয় আকবর শার পুত্রবধূ। বাদশাজাদা ও বেগম হওয়া সত্ত্বেও তিনি লালকেল্লায় থাকেন না, শ্বশুরের মৃত্যু হতেই লালকেল্লা থেকে চলে এসেছেন সীতারাম বাজারের কাছে গুলজারিবাগে। জায়গাটা শাহজাহানাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে আজমীর দরওয়াজার কাছাকাছি। সেখানে মস্ত কুঠিতে স্বাধীন ভাবে থাকেন নিজ নামে জায়গীর আছে স্বচ্ছন্দে চলে যায়। লালকেল্লার [illegible] আবহাওয়া তাঁর অসহ্য স্বামীর মৃত্যুর পরে মুখ শ্বশুরের মুখ চেয়ে কোন মতে ছিলেন লালকেল্লায়। তার পরেই চলে এসেছেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান শিষ্টাচারের বলে নিজের বাড়িকে গরীবখানা বলে। ইমানী বেগমের বাড়ি যথার্থই গরীবখানা। নিজের জন্য সামান্য খরচ করে উদ্বৃত্ত অর্থে তিনি গরীব দুঃখীকে পালন করেন, তাতে হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই। তাঁর দানশীলতার খ্যাতি শহরের সবাই জানে। সেই জন্যই তুলসী ইমানী বেগমের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল।

[illegible] ইমানী বেগমের কুঠিতে এসে পৌঁছতেই একজন বাঁদী এসে তাকে নিয়ে গেল বেগম সাহেবের কাছে। তিনি তখন তসবি জপছিলেন। তুলসী কুর্নিশ করে সমস্ত নিবেদন করলো। বেগম মন দিয়ে সব শুনলেন তারপরে বললেন, বেটী এ কোঠি তোমারও যেমন আমারও তেমনি তুমি স্বচ্ছন্দে যতদিন খুশি থাকো। এই খবর পেলে গেলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো তোমার পিতাজীর কাছে।

তারপরে তিনি বাঁদীকে ডেকে বলে দিলেন তুলসীমায়ীকে হিন্দু মহলে নিয়ে গিয়ে সেখানে সব বন্দোবস্ত করে দাও গে।

আবার তিনি তসবি জপে মন দিলেন।

তুলসী ভাবলো এবারে সে জিতলো।

তারপরে আবার দুদিন না-যেতেই যখন দরোয়ান তুলসীকে খবর এসে জানালো যে বাদশা তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন তাকে আপন কুঠিতে পৌঁছে দেবার জন্যে তুলসী আবার ভাবলো আর এক দানে জয় হল তার। সে হাসলো, অদৃষ্টও হাসলো।

বেগম সাহেবাকে কুর্নিশ করে বিদায় প্রার্থনা করলে তিনি সংক্ষেপে বললেন, আল্লা তোমার ভালো করুন বেটী।

তারপরেই আরম্ভ হল অদৃষ্টের খেলা। এতক্ষণ সে নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র ছিল।

তাঞ্জাম চলা শুরু করতেই পথের মধ্যে হঠাৎ হল্লা বেধে উঠল। প্রথমে গালাগালি তারপরে লাঠির ঠকাঠক, অবশেষে বন্দুকের দুড়ুম। প্রথমটা তুলসী ভেবেছিল এ হাঙ্গামার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। কিন্তু বন্দুকের শব্দের পরে যখন তার তাঞ্জাম মাটিতে নামলো তখন সে উঁকি মারতে বাধ্য হল। সে দেখতে পেলো বাদশার আহেদীদের সঙ্গে আর একদল আহেদীর মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছে লাঠি থেকে বন্দুকে পৌঁছেছে দুই পক্ষ। দেখলো যে তাঞ্জামের বাহকদের কেউ কেউ পালিয়েছে কেউ কেউ যোগ দিয়েছে হল্লায়। মড়ার মতো বসে রইলো সে তাঞ্জামের মধ্যে। এমন সময়ে একটি কচিমুখ তাঞ্জামের মধ্যে ঢুকে বলল, শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো।

তুলসী দেখলো তার বয়সেরই একটি ছেলে। বয়সের সমতায় সাহস পেলো, শুধালো, কেন?

ছেলেটি বলল বিনা ভূমিকায় তার হাত ধরে টান দিয়ে বলল কেন পরে হবে, এখন যা বলছি শোন, শীগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে।

তুলসী ভাবলো সামনে তো বিপদ দেখছি, পিছনেও না হয় বিপদ হবে, অতএব বেশি ভয়ের আর কি কারণ। সে দের হয়ে ছেলেটির পিছু পিছু ছুটলো। দুই পাশে দালানের সারি, কেউ দেখতে পেলো না।

ছেলেটি সতর্ক [illegible] রাস্তা এড়িয়ে গলি ঘুঁজির পথে ছুটেছে, তুলসীও ছুটেছে পিছনে। মহল্লা খারিকুয়া হয়ে, কুচা চাবিওয়ালা হয়ে, কুচা বেলিওয়ারান হয়ে, গলি রহমান হয়ে দুজনে চাঁদনীচকে এসে পড়লো।

এবারে ছেলেটি বলল, আর ছুটবার দরকার নেই।

কেন?

কেন আর কি! ওরা কি আর আমাদের পাত্তা করতে পারবে। কোথা দিয়ে কোথায় এসে পড়েছি দেখলে তো।

তুলসী বলে, তা বটে। এসব গলিঘুঁজি দেখা দূরে থাক কখনো নামও শুনিনি।

ছেলেটি বলে ঘরের মধ্যে খুকীটি হয়ে বসে থাকলে দেখবে কি করে? গলিঘুঁজি কি ঘর বয়ে গিয়ে দেখা দিয়ে আসবে?

তারপরে সে মন্তব্য করে, দুনিয়াতে রাজপথ আর কটা? গলিঘুঁজিই তো বেশি।

তুলসী বলে ওঠে এক রত্তি ছেলে দুনিয়ার কি খবর রাখো তুমি।

এক রত্তি ছেলে! জানো আমার বয়স পনেরো চলছে।

আর আমার পনেরো পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তুমি আমাকে দিদি বলবে।

দিদি না দিদিমা? আমার দিদি একজনই আছে তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।

তার নাম কি?

নাম কেন, [illegible] দেখতে পাবে, চলো না।

তুলসী ছুটবার উদ্যম করে, ছেলেটি মাথা নেড়ে বলে উঁহু, ছুটো না, তাহলেই লোকে সন্দেহ করবে। বেশ ধীরেসুস্থে গল্প করতে করতে চলো, তাহলে কারো সন্দেহ হবে না।

বড়বাজারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে কাটরা [illegible] মহল্লায় পৌঁছে তুলসী থমকে দাঁড়ালো।

আবার দাঁড়ালে কেন, শুধালো ছেলেটি।

তুলসী বলল, তোমার দিদির বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছ কেন? তার চেয়ে আমাদের বাড়িতে বাবার কাছে পৌঁছে দাও না কেন?

খুকী আর কাকে বলে!

তুলসী রেগে উঠে বলে, একশোবার খুকী খুকী বলো না। বাবার কাছে পৌঁছে দাও বলছি।

একশোবার বলবো, দুইশোবার বলবো, দশ হাজারবার বলবো, খুকী, খুকী খুকী, হল তো!

তুলসী ঘরে ঢুকে দেখলো একখানা চারপায়ার উপরে ভোর রাতের পাণ্ডু জ্যোৎস্না-খণ্ডের মতো নিদ্রিতা একটি মেয়ে। [illegible]

॥ ৪ ॥

"I sigh for Albion's distant share
Its valleyes green, its' mountains high",

তুলসীর মনে পড়ে।

চারপায়ের উপরে শায়িত মেয়েটি এমন নির্জীব আর নিশ্চল যে, বুঝতে পারা যায় না, নিদ্রিত কিংবা মৃত। পল্টন আর রুমালীর মধ্যে, দুটো নামই অদ্ভুত লাগে তুলসীর কানে, চাপাকণ্ঠে কথা চলতে থাকে।

পল্টন শুধায় জাগে নি?

রুমালী বলে না, যেমন এনেছিলি তেমনি পড়ে আছে নড়াচড়া নেই।

সন্দেহের কণ্ঠস্বরে পল্টন বলে তবে কি?

সন্দেহ নিরসনের কণ্ঠে রুমালী বলে, না বেঁচে আছে, নিয়মিত নিশ্বাস পড়ছে মাঝে মাঝে এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস।

ডাক্তার-বদ্যি ডাকলে হয় না?

রুমালী বলে সাহস পাইনে। কাকে বলতে কাকে ডাকবো, কি হাঙ্গামা বেধে উঠবে কে জানে।

ছেলেটির নিরুত্তর প্রমাণ করে যে আশঙ্কা অমূলক নয়। দুজনে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে। তুলসীও।

এবারে পল্টন বলে, কিছু খাওয়াতে পারো নি?

একফোঁটা জলও নয়। সাহস হয় না, পাছে হঠাৎ গলায় বেধে বিপদ ঘটায়।

কাপড় কাদের [illegible] দেখছি।

রুমালী বলে, [illegible] ফেলে দিয়েছিল যে।

পশুর হাতে পড়েছিল, বলে পল্টন।

না, ভাই, এর চেয়ে পশুর হাতে পড়াই ভালো ছিল। তারা বড়জোর দু-চার থাবা মাংস তুলে নিত।

দেখেশুনে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় তুলসীর। এই কদিনের মধ্যে সংসারের নখ-দন্ত দেখতে পেয়েছে সে, এতদিন যা ঢাকা ছিল কোমল থাবার মধ্যে আর তরুণ ওষ্ঠাধরের তলে। তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে সিপাহীর দল, মৃত্যুপথের যাত্রীদের বসে থাকতে দেখেছে, অসহায়ভাবে আবার বাদশার শবওযানায় মুক্তি পথে যাত্রা করে দেখেছে যে বাদশাজাদার লালসা পাইক বরকন্দাজরূপে পথরোধ করে দণ্ডায়মান। এ সমস্তই দুঃসহ। কিন্তু এর চেয়েও শোচনীয় যে আছে তার প্রমাণ ঐ নির্জীব ক্ষতবিক্ষত নারীদেহ। তার মুখ দিয়ে কথা সরে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে যে ঐ অপরিচিতার পরিণাম তার জন্যেও তো প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। সে ভারি একটি বেদনা একটি সমবেদনা বোধ করে মেয়েটির প্রতি।

দিন দুই পরে মেয়েটি চোখ মেললো একটু দুধ পান করলো কিন্তু না বললো কথা না দিল আত্মপরিচয়। ইতিমধ্যে তুলসীকে পক্ষপুটচ্ছায়ায় নিয়েছে রুমালী যেন সে একসঙ্গে মা আর বোন। এটা খাও, ওটা খাও, বাইরে যেও না, [illegible] দিয়ে, কত রকম [illegible] তুমি [illegible]

তুমি [illegible] কে?

মারে বোনে [illegible] এক নালী।

রুমালী বলে, বহিন আমি ওসব কিছুই নই, আমি সরাইখানার মালকী। কাউকে ধরে রাখতে পারিনে, দু দণ্ডের তরে আসে, তারপরে আবার চলে যায়।

তুলসী বলে রুমালীদি, পল্টনের দেখা-দেখি ও-ও রুমালীদি বলে ডাকতে শুরু করেছে, বলে তোমার সংসার সরাইখানাই বটে। কে আসছে, কে যাচ্ছে ঠিক ঠিকানা নেই।

তারপরে শুধোয় পল্টন তোমার কি রকম ভাই?

রুমালী হেসে বলে, তুমি আমার যেমন বহিন, পল্টনও আমার তেমনি ভাই।

তার মানে কিছুই নয়।

তার মানে অনেকখানি।

তুলসী বলে পাড় পাওয়া চোদ্দ আনা।

রুমালী জবাব দেয় চোদ্দ আনাই যে আশাতীত। ষোল আনার খোঁজ করতে গেলেই ঠকতে হয়।

প্রসঙ্গ পাল্টে তুলসী বলে পল্টনকে দিয়ে বাবাকে খবর পাঠাও নিয়ে যাক।

ইতিমধ্যে একদিন রুমালীকে দিয়েছে নিজের পরিচয় [illegible]। তখনি রুমালী বলেছিল যে, [illegible]

শান্ত হলেই পণ্ডিতজীকে খবর পাঠাবে, তিনি এসে নিয়ে যাবেন।

অবশেষে [illegible] সিপাহী মেয়েটি কথা [illegible]। [illegible] অসংলগ্ন প্রলাপ, ক্রমে তা সুসংবদ্ধ বাক্যে পরিণত হল। কিন্তু কিছুতেই পরিচয় দিতে রাজি হল না, বললো, আমার কলঙ্কের কাহিনীর আমাতেই অবসান হোক, আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত তা আর পৌঁছে দরকার নেই।

রুমালী বলেছিল, বহিন, হিন্দুস্থানময় অশান্তি, কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, পরিচয় দিলেও তাদের সন্ধান যে পাওয়া যাবে মনে হয় না।

তবে আর প্রয়োজন কি! না, বহিন, ও কথাটা জিজ্ঞাসা করো না। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমাকে যদি দিতে হয় প্রাণটাই দেব। কি করবে তুচ্ছ পরিচয় নিয়ে।

রুমালী বুঝলো যে, ইংরেজের মেয়ের প্রতিজ্ঞা দু' ফোঁটা চোখের জলে গলবে না। তাই সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শুধালো অন্তত নামটা বলো, ডাকবার প্রয়োজন হয় তো।

মেয়েটি বলল, আমাদের দেশের একটা নাম Albion। আমাকে মিস এলবিয়ন বলে ডেকো।

বেশ তাই হবে।

মিস এলবিয়ন ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো আর স্বাস্থ্যের সঙ্গেই ধাপে ধাপে ফিরে পেতে লাগলো দেহ আর ইন্দ্রিয়দের শক্তি। প্রথমে রসনায় স্বাদ এলো, বুঝতে পারলো জল আর দুধে প্রভেদ। তারপরে ত্বকে ফিরে এলো স্পর্শক্ষমতা, বললো রুমালীদি, বড় গরম লাগছে, মোটা চাদরটা সরিয়ে নাও। তারপরে নাসায় ঘ্রাণ এলো, চক্ষুতে সহজ দৃষ্টি। অবশেষে একদিন বিকালের দিকে সোৎসাহে সজোরে বলে উঠল, রুমালীদি, কাছেই কোথাও এসে পড়েছে কোম্পানীর ফৌজ।

কোথায় বহিন, শুধায় রুমালী।

শুনতে পাচ্ছ না ঐ যে কামানের গাড়ির গড়গড়, ঐ যে ঘোড়সোয়ারের খটখট, ঐ যে পদাতিক পল্টনের গটগট—ঐ যে, খুব স্পষ্ট।

রুমালী ভাবে বিকার। আবার বিকার আরম্ভ হল।

বিশ্বাস হচ্ছে না? ঐ শোনো ব্যাগপাইপে সুর বাজছে—"Cheer, boys, cheer"

এবারে সত্যিই শুনতে পায় রুমালী। বলে, তাই তো বটে।

তারও মন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এই কদিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতায় আশা করবার সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে, বলে—ঐ সুর তো সিপাহীর ব্যাগপাইপেও বাজে।

না, না, রুমালীদি, গোরা পল্টন ছাড়া [illegible]

মিস এলবিয়নের অনুমানই সত্য প্রমাণ হয়। সন্ধ্যাবেলা পল্টন ছুটতে ছুটতে এসে বলে, রুমালীদি, কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে সর্বাজিখাণ্ডির পাহাড়ে।

মিস এলবিয়ন এখন শয্যা ছেড়ে উঠতে পারে, হেঁটে চলে বেড়াতে পারে, তবে ঘরের বাইরে যেতে সাহস পায় না। সারাদিন সারারাত ঐ গোটা দুই তিন ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে কাটে। রুমালী যখন থাকে অনেক সময়েই সে থাকে না, রোজগারের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য হয়, তখন রুমালীর সঙ্গে গল্প করে। কিন্তু সে গল্পের পরিধি স্বকৃতনিষেধের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কিছুতেই দেবে না সে আত্মপরিচয়। ঐ একটি বিষয়ে সে অনমনীয়, আর সব বিষয়ে পুতুলের মতো কথা শুনে চলে রুমালীর। তুলসী এসে পড়বার পরে দিবারাত্রির একজন সঙ্গী পেলো সে, কারণ তুলসীরও বাইরেটা নিষিদ্ধ।

বাকি সময়টা কখনো শুয়ে কখনো একাকী বসে দেশের কথা চিন্তা করে। চিন্তা বললে ঠিক হবে না, চিন্তার মধ্যে একটা প্রয়াস আছে। তার নিষ্ক্রিয় মনের উপর দিয়ে ছায়াবাজির ছবির মতো সারা-জীবনের ঘটনা স্রোত বয়ে যায়। কেন্টের ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা গড়ানে প্রান্তরের মধ্যে একটেরে তাদের গ্রাম পিছনেই আরম্ভ হয়েছে পাইন বন। ঐ পাইন বনের কাছে মৃত্তিকার তরঙ্গ-চূড়ায় উঠে দাঁড়ালে দেখতে [illegible] যায় নীল সমুদ্রের [illegible] ডোভারের সাদা পাহাড়। ঐ [illegible] শৌখিন খেলা ছিল তাদের—তার আর [illegible] একমাত্র ভাই বিলের। বিল তার চেয়ে [illegible] বছরের বড় সত্য, কিন্তু স্বভাবটা এমনি সরল যে বয়সের ভেদ চোখে পড়তো না। তার উপরে আবার তার, এলিনার;—এলিনা এখন হয়েছে এলবিয়ন—এত দুঃখের মধ্যেও তার পায় হাসি। তার স্বভাবটা বয়সের তুলনায় এমনি গম্ভীর যে ভাইবোনের মধ্যে ৫।৬ বছরের বয়সের পার্থক্য কমে গিয়ে প্রায় কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। কি মধুর সেই দিনগুলি। স্মৃতির ভৃঙ্গারে অভিষেক করে তবেই না জীবন মধুর হয়ে ওঠে। তাই অতীতের এত মাধুর্য।

তারপরে এসে পড়লো একে একে করাল আঘাত। মা গেলেন মারা। বিল চলে গেল সিভিল সার্ভিস নিয়ে ইণ্ডিয়ায়। তারপরেই বাবা আবার করলেন বিয়ে। বিল লিখে পাঠালো, এখন আর বিল নয় মিস্টার উইলিয়াম ক্লিফোর্ড, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট অব্ গুরুগাঁও—এলিনা এখানে চলে এসো। ইণ্ডিয়ার সবই নূতন লাগে এলিনার চোখে, মাটি থেকে মানুষ অবধি সবই নূতন। গুরুগাঁওয়ের ক্ষুদ্র শ্বেতাঙ্গ সমাজটিও বেশ শিষ্ট। একবার সেখানে বেড়াতে এসেছিল মিশনারি পাদ্রী জেনিংস দম্পতি, মিস্টার ও মিসেস জেনিংস আর কন্যা মিস জেনিংস। মেয়েটি তার সমবয়সী, দুজনের মধ্যে
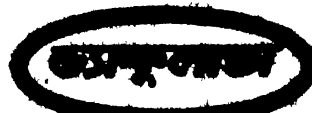
অল্পদিনেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওরা ফিরে যাওয়ার সময়ে এলিনাকে নিমন্ত্রণ করে গেল অবশ্যই যেন দিল্লীতে যায়, বলে গেল দিল্লী ভারতের ললাট। আমের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেই সে এসেছিল দিল্লীতে। তারপরে আর সে ভাবে না ভাবতে পারে না। মুসৌরীর পর্ণীর উত্তর দিকের জানলা খোলা নিষেধ। মনের ঐ দিকের জানলাও খুলবে না সে। মনটাকে ঐ দিক থেকে ফিরিয়ে আনতেই চোখের উপরে ভেসে ওঠে পাইনের বন, তরঙ্গিত ঘন সবুজ মাঠ, নীল সমুদ্রের বক্ষাংশ। কেমন সত্য, কেমন সজীব। আর সেই সঙ্গে নাসায় পায় পাইন বনের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধটি। ক্ষণেকের জন্য তার বর্তমানের গ্লানি ভুলিয়ে দেয় অতীতের জাদু। তার মন হুহু করে ওঠে।

এমন সময়ে শুনতে পায় রুস্তমজীর কণ্ঠস্বর—কি গো এলবিবন বিবি, আজ কি লাঞ্চ হবে না?

খানা বললেও চলতো, বলেও তাই তবে যখন ঠাট্টা করতে ইচ্ছা হয়, রুস্তমজী বলে লাঞ্চ, তুলসী আর এক পর্দা চড়িয়ে দিয়ে বলে 'লান্চ' না।

এলিনা বলে আবার লাঞ্চ কেন? খানা বললে কি চলতো না?

খানাখন্দ এড়িয়েই তো চলতে চাই, তাই বলি লাঞ্চ। এসো, ওঠো।

এত তাড়া কেন?

আজ যে তুলসীর বাবা আসবেন।

বিস্মিত হয় এলিনা। বলে তুলসীর বাবা! বলো কি—খবর দিলে কি করে?

আমার পল্টন ভাইয়ের অসাধ্য কি আছে? খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করেছে। নাও শীগগির ওঠো।

তবে আজ শহরের খবর পাওয়া যাবে।

যাবে বইকি। সেইজন্যই তো বলছি শীগগির চলো।

তুলসী কোথায়?

সে লাঞ্চের যোগাড় করেছে। চলো।

শহরের খবর পাওয়া যাবে। হয়তো কোম্পানীর খবর। হয়তো [illegible] খবর। আবার আশায় দুলতে থাকে এলিনার মন। আশা [illegible], [illegible] অন্ধকারে দেখে, অন্ধকার যত গাঢ় তার দীপ্তি তত প্রখর। (ক্রমশ)

অজ্ঞতার কৈফিয়ৎ

এই উপন্যাসে ফার্সি ও হিন্দুস্থানী অনেক শব্দ বয়েৎ, প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ সব ভাষায় লেখকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় মাঝে মাঝে ভুলভ্রান্তি হয়েছে। অনেক পাঠক সহৃদয়তাবশত সে-সব দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা লেখকের ধন্যবাদের পাত্র। গ্রন্থাকারে ছাপবার সময়ে যাতে সংশোধন হয় সেদিকে লেখকের দৃষ্টি থাকবে।

লেখক

ওয়াশিংটন আর ন্যু য়র্ক,—নতুন দিল্লি আর কলকাতা।

কদিনের আড়াআড়ি দু উপলক্ষ্যে দুটি দর্শনীয় পরব হয়ে গেল — ওয়াশিংটন এ চেরী ব্লসম ফেস্টিভাল আর ন্যু য়র্ক এ ঈস্টার প্যারেড। একটি সুশৃঙ্খল সুপরিকল্পিত নিয়মিত এবং সুনির্দিষ্ট অনুবর্তী [illegible] এবং বর্ণাঢ্য। দ্বিতীয়টি অপরিকল্পিত অনিয়মিত এবং অনির্দিষ্ট [illegible] না এইজন্য যে এই দুটি পরবের প্রকৃতিগত [illegible] এদের এই রূপগত [illegible] প্রসঙ্গই অপ্রাসঙ্গিক সেখানে তুলনা করার কথা বোধ হয় নেহাতই অবান্তর। একটি উৎসবের পত্তন হয়েছে উদ্দেশ্য নিয়ে স্মরণবার্ষিকী হিসেবে আর একটির [illegible] সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের পরিণতি হিসেবে উপলক্ষ্যের অনুষঙ্গ হয়ে।

ওয়াশিংটন-এর চেরী ব্লসম ফেস্টিভাল এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ৫১ বছর আগেকার একটি ঘটনা। ১৯১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জায়া এবং জাপানী রাষ্ট্রদূতের পত্নী রোপণ করেছিলেন দুটি চেরী গাছ, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রীতি-বন্ধনের প্রতীক হিসেবে। জাপান থেকে উপহার এলো দু হাজার জাপানী চেরী। সেই দু হাজার গাছ রোপণ করা হল পোটো-ম্যাক নদীর সঙ্গে ক্ষীণ জলরেখায় যুক্ত বিরাট হ্রদের মতো পোটোম্যাক টাইডাল বেসিন-এর ধারে এবং পাশের পোটোম্যাক পার্ক-এ। কয়েক বছর—বেশ কয়েক বছর পর সেবার বসন্তে শিশুগাছ যখন তরুণ, পুষ্পস্তবকের ভারে আনত, পোটোম্যাক পার্ক যখন ফুলের শোভায় অপরূপ, ফুলের প্রতিবিম্ব পড়ে পোটোম্যাক-এর জলে যখন গোলাপী রঙ ধরেছে, তখন স্কুলের ছেলেমেয়েরা একদিন সেখানে সেই প্রথম চেরী-রোপণের [illegible] [illegible] খানিকটা রাজনৈতিক করেছিল। তারপর প্রতি বছর বসন্তের সূচনায় চেরী গাছের এই পুষ্পিত রূপটি এমনই এক আকাঙ্ক্ষিত এবং দ্রষ্টব্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো যে, শেষ পর্যন্ত 'পুষ্পিত চেরী' হয়ে দাঁড়ালো বসন্তের অগ্রদূত। শুধু ওয়াশিংটন নয়, সারা যুক্তরাষ্ট্রই আজ এই চেরী ব্লসম ফেস্টিভাল-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'চেরী ব্লসম কুইন' তো বসন্তেরই রানী। ১৯৩৫ সালে প্রথম রানী নির্বাচনের পত্তন। তারপর থেকে এ উৎসব আজ পরিণত হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বিরাট আয়োজনে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে শাসনাধীন এলাকা

ওয়াশিংটনে বসন্তের সূচনায় প্রস্ফুটিত চেরী ফুলের শোভা

থেকে এবং ওয়াশিংটন থেকে একজন করে প্রিন্সেস্ অর্থাৎ রাজকন্যে নির্বাচিত হয়ে থাকেন, উৎসব উপলক্ষ্যে এঁদের থেকে নির্বাচিত হন রানী।

এবারকার উৎসব শুরু হয়েছিল ২রা এপ্রিল শেষ হয়েছে ৭ই। প্যারেড হয়েছিল শনিবারে। এই শোভাযাত্রাটাই সব না হলেও প্রধানতম আকর্ষণ। সপ্তাহকালের মজলিস খানা-পিনা, নাচের আসর, অভ্যর্থনাসভা নির্বাচন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ততটা নয় যতটা এই শোভাযাত্রার সঙ্গে। শোভা-যাত্রার বর্ণনা না দিয়ে শুধু এই কটা তথ্য পেশ করা যাক যে, ৬৫টি বাদক দল, সুসজ্জিত বিচিত্র সচল মণ্ডপের ওপর বিশিষ্ট সজ্জায় ভূষিত তরুণ-তরুণীর দল [illegible] 'ড্রিল টিম', এ ছাড়া মজাদার পোশাকে নানা ধরনের 'ক্লাউন', য়ু. এস. এবং রাজকন্যে ও রানীকে নিয়ে [illegible] সুন্দরীর ৫০খানা সজ্জিত গাড়ী নিয়ে গোটা শোভাযাত্রাটি পার হতে সময় লেগেছিল ২ ঘণ্টারও বেশী। দর্শকের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। অথচ এতটুকু গোলমাল নেই, কোনও বিধির ব্যতিক্রম নেই, শোভাযাত্রীদের বিন্যাসের মধ্যে এতটুকু স্থানচ্যুতি নেই, যাত্রাপথের নির্দিষ্ট সীমানার অতিক্রমণ নেই। বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল পোশাক, সচল মণ্ডপের বিভিন্ন সজ্জা-বৈচিত্র্য, ঐকতান বাদনের নির্ভুল সঙ্গীত নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর।

দিল্লীর প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রার কথা যদি মনে পড়ে তা হলে অন্যায় হবে না— পরিমাণ এবং বিস্তারগত প্রভেদের কথা স্বীকার করে অবশ্যই। কিন্তু প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও তেমনি অনস্বীকার্য। ফুলের শোভা, বসন্তের আগমন—এর মতো সুকুমার কাব্যময় বিষয়কে উপলক্ষ্য করে 'ড্রিল' বা খানিকটা সামরিক ধাঁচের 'ব্যান্ড'-বাজিয়ের দলের কুচকাওয়াজী চলন কতটা যথাযথ বা শারীরিক কসরত-এর উপযুক্ত সজ্জা এবং বর্ণোজ্জ্বল হলেও খানিকটা 'য়ুনিফর্ম' জাতের পোশাক এ উৎসবের পক্ষে কতটা শোভন এ প্রশ্ন বন্ধুর কাছে তুলে-ছিলাম। উত্তরে জেনেছি, এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল এবং গোষ্ঠীর ব্যান্ড-বাদন এবং কলাগত উৎকর্ষের প্রতিযোগিতামূলক বিচার হয়ে থাকে, কাজেই এই ধরনের সাজসজ্জা

এবং রীতির একটা কারণ আছে। পরে অবশ্য এ প্রশ্ন তুলিনি যে, এই ধরনের প্রতিযোগিতার উপলক্ষ হিসেবে এই উৎসবটাকেই বেছে নেওয়া ছাড়া কি গত্যন্তর ছিল না? অবশ্য এ ছাড়াও আরও অনেক কিছুই ছিল, যা বসন্তোৎসবেরই শামিল, তবে তার সংখ্যা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। যাই হোক, শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন দফা অনুষ্ঠানের আয়োজন যে অবিশ্বাস্য রকমের বিরাট এবং তার প্রস্তুতিও যে সেই অনুপাতে সময়, শ্রম এবং ব্যয় সাপেক্ষ তাতে সন্দেহ নেই। বছরের পর বছর ধরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এটা গড়ে উঠেছে: বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করতে হয়েছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়েছে, বহুরকমের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। তাই এর পিছনে রয়েছে দায়িত্বশীল নাগরিক কমিটি এবং তাঁদের সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট আয়োজন। কিন্তু, শুধু ওয়াশিংটন-এর এই চেরী-উৎসবই বা কেন, গোটা ওয়াশিংটন শহরটাই কি বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত আয়োজনের মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি? বিশেষ করে সরকারী দপ্তর এলাকার বিন্যাস বহু পূর্ব-প্রস্তুতির ফল।—নতুন দিল্লী?

কিন্তু ন্যু য়র্ক-এর ঈস্টার প্যারেডকে না বলা যায় পূর্ব-পরিকল্পিত, না বলা যায় পূর্ব-আয়োজিত। তাই এ শোভাযাত্রার কোনও বিন্যাস নেই, কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই যেন আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। ন্যু য়র্ক-এর যখন পত্তন হয়, তখন তাকেই বা নির্দিষ্ট আকারে বিন্যস্ত করার পরিকল্পনা কে করেছিল? সে-ও আপনা-আপনি বেড়ে উঠেছে। যেখানে চওড়া রাস্তা থাকা দরকার সেখানকার দু-ধারের বাড়িগুলোকে সরাবার উপায় নেই; যেখানে রাজপথ সরল হওয়া দরকার, সেখানে বাড়িঘরের জটিল বিন্যাসে পথকেও হতে হয়েছে বক্র-কুটিল। শহর কলকাতায় আদিপর্বে কোন্ বাস্তুকার তাঁর নকশা করেছিলেন? ন্যু য়র্ক-এ ফিফ্‌থ্ অ্যাভেন্যু আছে, টাইম্‌স্ স্কোয়ার আছে। কলকাতাতেও কি চৌরঙ্গী বা ন্যু আলিপুর নেই? তবু, বাগবাজার, বড়বাজার বা ভবানীপুর তো মিথ্যে নয়।

ঈস্টার প্যারেড উৎসব উপলক্ষে মার্কিনী ছেলেমেয়েরা কিছু রুটি, কিছু ডিম আর কিছু ভেড়ার মাংস টুকরিতে করে নিয়ে এসেছে গীর্জায়। গীর্জার ফাদার খাদ্য-সামগ্রীসহ ছেলেমেয়ে দুটিকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

ঈস্টার প্যারেডকে যে আয়োজিত শোভাযাত্রা বলা চলে না, তার কারণ, আগেই বলেছি, এটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটা আনুষঙ্গিক পরিণতি। আমাদের দেশে দুর্গাপুজোর রাতে পথে পথে নতুন পোশাক-পরা জনসমুদ্রের বল্গাহীন পথবিহারটাকে যেমন দেবীপুজোর আবশ্যিক অঙ্গ বলা চলে না, তেমনি ঈস্টার-এর পরবে, গির্জায় সমবেত উপাসনার পর ন্যু য়র্ক-এর প্রধান রাজপথে নরনারীর এই অসংবদ্ধ পথপরিক্রমণকেও ধর্মীয় আচারের অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠান বলা চলে না। তবে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, সেটা নিশ্চিত।

আর এই অপরিহার্য আনুষঙ্গিকতার কোনও নিয়ম বা রীতি মানার দায় থাকে না, তাই তার মধ্যে থাকে অবাধ আনন্দের অবকাশ থাকে দিল স্ফূর্তি। তাই চেরী-উৎসবের মতো ঈস্টার-এর দিনে এক পক্ষ প্রদর্শক অপর পক্ষ দর্শক নয়—এক দল নির্দিষ্ট ব্যবধানে থাকা পরিবেশক এবং অপর দল নিষ্ক্রিয় ভোক্তা নয়। এখানে সবাই দর্শনীয় এবং সবাই দর্শক। এখানে সবাই-কারই ঢালাও মজলিসের ফরাস-পাতা আসর বিছানো। ন্যু য়র্ক-এর স্বতঃ উৎসারিত, খুশি-ভরা পরিপাটি বেশভূষার বর্ণচ্ছটা এবং
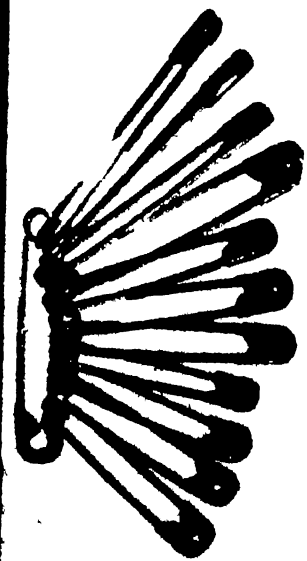
উল্লাসিত জনতার এই উদ্দেশ্যহীন সঞ্চরণ দেখে যদি দুর্গাপুজোর অষ্টমী-নবমীর রাত্রের কলকাতার কোনও রাজপথের দৃশ্য মনে পড়ে যায়, তা হলে অপরাধ হয় না। তেমনি নতুন পোশাকের বাহার, তেমনি উচ্ছলতা, তেমনি আলসামন্থর পরিবেশ, তেমনি নিশ্চিন্ত খোশমেজাজী ভাব—অবশ্যই পুজোমণ্ডপের উত্তেজনার ব্যাপারটুকু বাদ দিয়ে। তেমনি যানবাহনের নির্ধারিত পথের পরিবর্তন, তেমনি ট্যাক্সির দুষ্প্রাপ্যতা তেমনি পথের ধারে ধারে বেলুন আর আইস ক্রীম আর টুকিটাকি জিনিসের ছেলে ভোলানো পসরা, তেমনি পরিচিতের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া, চলতে চলতে দুটো হাসিমস্করা করা। ন্যু য়র্ক-এর সুপ্রাচীন গির্জায় সমবেত প্রার্থনার পর রাজপথে বার হয়ে এমন এক খুশির দিন—ছুটির দিনটিতে, বিশেষ করে শীতের প্রহারের পর বসন্তের মধুর বাতাসের প্রলেপে উজ্জীবিত হয়ে মানুষের পক্ষে যথাসময়ে ঘরে ফিরতে না চাওয়া, বারো মাস তিরিশ দিনের রীতিকে লঙ্ঘন করার প্রবণতা পাওয়া, চিরাচরিতের কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটানোর বিরল সুযোগটুকু যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করাটা নিতান্তই স্বাভাবিক পরিণতি। তাই এ প্যারেড্ কোনও পরিকল্পিত শোভাযাত্রা নয়, তাই তার শুরুও নেই, শেষও নেই। লোকে ফিফ্থ্ অ্যাভেন্যুর মতো রাস্তার মাঝখান দিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে হাঁটে, আলোর নির্দেশের দিকে নজর না দিয়েই রাস্তা পার হয় পথের মাঝে থেমে গিয়ে গল্পগুজব করে, যেখানে সেখানে জটলা বসায়, এলোমেলো ঘোরে, ঘুরতে ঘুরতে পরিশ্রান্ত হয়ে যে-কোনও সুবিধামতো জায়গায় বসে পড়ে। কলেজ স্ট্রীট্-হ্যারিসন রোডের মোড়, শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা বা রাসবিহারীর মোড় পুজোর পরবে কেমন দেখায়? অবশ্য প্রতিমা বিসর্জনের বা পুজোমণ্ডপের সমস্যাটা যে ফিফ্থ্ অ্যাভেন্যুকে ভোগ করতে হয় না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাংলা দেশে আমাদের টুপি নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার করে না। এ দেশে ওটা সত্যিকারের শিরস্ত্রাণ। ইস্টারের দিনে মেয়েদের টুপির অপরূপ বৈচিত্র্য একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। শীতের পোশাক প্রয়োজনের, বসন্তের পোশাক বাহারের। তাই পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে টুপির দিকে নজরটা একটু বেশী পড়ে—বিশেষ করে ইস্টার উপলক্ষ্যে এবং বর্তমানে এটা এই পরবের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছে, বলা যেতে পারে। পরবের বেশ কিছুদিন আগে থেকে বিজ্ঞাপন এবং 'শো-কেস'-এর মাধ্যমে দোকানীরা অদ্ভুত এবং কখনো কখনো বিদঘুটে ধাঁচের টুপির পসরা সাজিয়ে এই হ্যাট প্যারেড-এর পথকে [illegible] ইস্টারের এই [illegible] প্যারেড- [illegible]

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহানগরী নিউইয়র্কের একটি জনবিরল অঞ্চল

অভিহিত করাটা অকারণ মোটেই নয়।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। কলকাতার সঙ্গে ন্যু য়র্ক-এর সাদৃশ্য বা ওয়াশিংটন-এর সঙ্গে নতুন দিল্লির মিল শুধু এইখেই নয়। প্রাণ-চঞ্চলতা, বৈচিত্র্য, অসামঞ্জস্য—দোষ-গুণ সব কিছু মিলিয়ে কলকাতার যা রূপ তারই আরও সরেস রূপ হল ন্যু য়র্ক-এর। আর সরকারী কর্মচারী অধ্যুষিত নতুন দিল্লির প্রতিবিম্ব হল ওয়াশিংটন। একটা উচ্ছল আর একটা সংহত। একটার প্রাণপ্রবাহ ঝরনার মতো দিক্‌বিদিকে প্রসারিত—কখনো বা অপ্রয়োজনে অপচয়; আর একটার প্রাণস্পন্দন এত বেশী নিয়ন্ত্রিত, সঞ্চারিত, যে কখনো কখনো স্তব্ধ বলে মনে হতে পারে। রাজধানী হওয়ার মধ্যেই কি কোনও কূটনৈতিকসুলভ গাম্ভীর্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকে? শুধুমাত্র রাজধানী হয়ে ওঠাই যার অস্তিত্বের একমাত্র দোহাই, তার ক্ষেত্রে কথাটা সম্ভবত অনেকাংশেই খাঁটি।

এলাকায় এলাকায় দোকান-পাট, পাড়ায় পাড়ায় বাজার অলিতে-গলিতে রেস্টুরেন্ট, পানের দোকান, স্টেশনারী দোকান সেলুন, ড্রাইং ক্লিনিং—আর মুদিখানার ছড়াছড়ি থেকে এইটাই প্রকাশ পায় যে, কলকাতার জীবন প্রবাহ কোনও বিশেষ এক অঞ্চলে, বা বিশেষ এক গতিমুখে প্রবাহিত নয়, তার প্রসার সর্বত্র এবং সকল ক্ষেত্রেই। ন্যু য়র্ক-এর রূপটি কলকাতার আয়নায় ধরা পড়ে। আর রাজধানীর গাম্ভীর্য, তার 'পালিশ', নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট খণ্ডিত জীবনধারার চেহারাটি ধরা পড়ে ওয়াশিংটন-এর দর্পণে।

কলকাতার সঙ্গে ন্যু য়র্ক-এর সাদৃশ্যের সূত্রকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যেতে পারে। একেবারে সেই পত্তনের আমলে। হাডসন নদীর তীরে ম্যানহাটান অঞ্চলে যখন প্রথম বসতি শুরু হয়েছিল, তখন এর নাম ন্যু য়র্ক ছিল না। বসবাস

যখন শুরু হল তখন এ এলাকায় ওলন্দাজ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাধান্য। ন্যু য়র্ক পত্তনের পেছনে একজন ব্যক্তিবিশেষের নাম জড়িত হয়ে আছে, তিনি হলেন তখনকার ওলন্দাজ শাসন-সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল, পিটার মিনউইট। ১৬২৬ সালে এখানকার ন্যু য়র্ক এলাকাটি তিনি পত্তনির জন্যে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে কিনেছিলেন মাত্র কয়েক গিল্ডারের বিনিময়ে, যার বর্তমান মূল্য ৩৯ ডলার। কালক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হল আরও কিছু এলাকা, গড়ে উঠল ন্যু য়র্ক সিটি কর্মচঞ্চল হল ন্যু য়র্ক বন্দর। ন্যু য়র্ক রাজধানীর গৌরব লাভ করেছিল আমেরিকার স্বাধীনতার প্রথম যুগে, কয়েক বছরের জন্যে পরে নতুন রাজধানী গড়ে তোলা হল ওয়াশিংটন ডি সি-তে। কেন্দ্র-শাসিত এলাকা হিসেবে এখন তার স্বতন্ত্র স্থাপন।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ বাইশ ॥

উচ্ছ্বাস এবং তাচ্ছিল্য বাদ দিয়ে নিরাসক্ত মনে চীনের বৈষয়িক উন্নতির হিসাব-নিকাশ করা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, যদিও কাজটা কঠিন। কিন্তু চীনকে বুঝতে হলে এই পথেই অগ্রসর হতে হবে। কাজটা কঠিন এই কারণে যে, চীন এই কয় বৎসরে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছে তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা খুবই দুরূহ। চীনের সরকারী পরিসংখ্যানও প্রায়শই পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আমি এই প্রবন্ধে, ডঃ শ্রীপতি চন্দ্রশেখর এবং "নীল পিঁপড়ে" গ্রন্থের রচয়িতা ফরাসী সাংবাদিক মসিয়ে গিলে যে সব সরকারী পরিসংখ্যান তাঁদের রচনায় উল্লেখ করেছেন প্রধানত সেইগুলোই উদ্ধৃত করেছি। এই সব তথ্য সর্বতোভাবে নির্ভুল এমন দাবি আমার নেই, তবে এগুলো মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বলেই আমার ধারণা। ওয়াকিবহাল পাঠক যদি আরও ভাল তথ্য দিতে পারেন, তবে উপকৃত হব।

প্রথমেই কৃষির কথা ধরা যাক। চীনের কমুনিস্ট সরকার কৃষি সংস্কারে বিপ্লব এনেছেন, এ কথাটা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। এই কৃষি বিপ্লব সাধন করতে কমুনিস্টরা কি কি পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং আখেরে তার উদ্দেশ্য (যদি খাদ্য সমস্যার সমাধানই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে) কতটা সফল হয়েছে, সেইটাই বিচার করে দেখা যাক।

মূল চীনের আয়তন ৩৬ লক্ষ বর্গ-মাইলেরও বেশি, লোকসংখ্যা রাষ্ট্রপুঞ্জের জনসংখ্যা জরীপের হিসাবে ১৯৬০ সালে ছিল ৬৬ কোটি ৯০ লক্ষ। এবং চীনের জনসংখ্যা প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে দেড় কোটির মত বেড়ে চলেছে।

চীনা মানচিত্রে বর্ণিত দক্ষিণ-পশ্চিমে য়ুনান প্রদেশ থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হেইলুঙকিয়াং প্রদেশ পর্যন্ত একটা রেখা টেনে দেশটাকে দুটো ভাগ করে ফেললে দেখা যাবে পশ্চিম অংশে (তিব্বত এবং চামদো অঞ্চলকে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি) মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৪০ ভাগ জমি পড়েছে, এবং এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা গোটা চীনের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ। তাহলে দাঁড়াল এই, পূর্বাঞ্চলেই চীনের বেশির ভাগ লোক বাস করে। এই অঞ্চলে জমির পরিমাণ শতকরা ৫৮ ভাগ এবং লোকসংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ। পশ্চিমে পাহাড়, পর্বতময় মালভূমি এবং মরুভূমি এবং পূর্বে উর্বরা, নদীধৌত সমতল প্রান্তর ও ব-দ্বীপ। এই কারণেই এই অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। চীনে শতকরা ৮০ জনই কৃষক।

কৃষি সমস্যা চীনের আবহমানকালের সমস্যা। ক্ষুধা, এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মতই চীনের (এবং ভারতেরও) মেহনতী ব্যাধি। অনাবৃষ্টি এবং বন্যা পালা করে যুগ যুগ ধরে চীনে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী সৃষ্টি করেছে। তার উপরে চীনের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ বিপর্যস্ত হয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট নানা উৎপীড়নে আর অত্যাচারে। এবং ক্রমাগত যুদ্ধে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ, অরাজকতা, দস্যুর নিরন্তর আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, জাপানী আক্রমণ এবং এই সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাপ দুর্দশার মাত্রা ছাড়িয়ে দিয়েছে। গত এক শ বছরের চীনের ইতিহাস ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষতবিক্ষত। উপায়ান্তর না থাকায় চীন দেশের দুঃখী কৃষকেরা ভবিতব্যের হাতে নিজের অদৃষ্টকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছে।

এই পটভূমিতে চীনের ভাগ্যনিয়ন্তার গদীতে, ১৯৪৯ সালে, কমুনিস্টরা এসে অধিষ্ঠিত হল। এই সময় চীনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। খাদ্য সঙ্কট এমনই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, প্রতি ঘণ্টায় তার দাম বেড়ে চলেছিল।

চীনা কমুনিস্টরা গদীতে বসে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কোন্ পথ গ্রহণ করল, কত দূর সমাধান করতে পারল, এবং তার জন্য কী মূল্য জনসাধারণকে দিতে হয়েছে, এবারে সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯ এই দশ বছরে চীনা কমুনিস্ট সরকার চারটি পর্যায়ে কৃষি বিপ্লব সাধনের প্রয়াস পেয়েছে। প্রথম পর্যায়ে জনগণের আদালতে বিচারের নামে জমিদারদের কোতল করা হয়েছে। সরকারী হিসাবে ৫০ লক্ষ কিন্তু বাইরের পর্যবেক্ষকদের হিসাবে দুই কোটি ছোটবড় সামন্ত ও জমিদারকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এইভাবে যাবতীয় জমি নয়াচীনের কমুনিস্ট সরকারের হাতে আনা হয়েছে।

১৯৫১ সালেই মাও "চাষীর হাতে জমি" দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৫০ সালের ৩০শে জুন "মহান কৃষি সংস্কার আইন" চালু, ফলে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের অজুহাতে ভূস্বামী নিধন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। এই নরমেধ যজ্ঞে যে প্রগতিশীল চীনের সরকারী হিসাবেই ৫০ লক্ষ ভূস্বামীকে আহুতি দেওয়া হল, তাঁরা এক হিসাবে বেঁচে গেলেন, মরে সকল জ্বালা জুড়োলেন, যাদের হত্যা করা হল না, তাদের সংখ্যাও কম নয়, তাদের "সংশোধনের জন্য" পাঠানো হল শ্রম শিবিরের দাসত্ব করতে।

হাজার হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করার পর বঞ্চিত, শোষিত চীনা কৃষক এই প্রথম জমির মালিক হল। কিন্তু তার দুর্দশা ঘুচল কি? তাদের দারিদ্র্য দূর হল কি? ভারতে যে সব কৃষক নেতা নানা পরাক্রম তুলে চাষীদের সংগঠিত করার জন্য মন ভুলানো নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাঁদের আমি চীনের মধ্যে কম্যুনিস্ট প্রবক্তা লিউ শাও-চি-এর এই ঐতিহাসিক উক্তিটি স্মরণ করতে বলি। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, "গরীব লোকেদের দুর্দশা এবং দারিদ্র্য লাঘব করাই কৃষি সংস্কারের উদ্দেশ্য, একথা ঠিক নয়, কৃষি সংস্কারের মূল কারণ এবং উদ্দেশ্য অন্য কিছু।"

১৯৫০ সালের ১৪ই জুন প্রস্তাবিত কৃষি সংস্কার আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিউ শাও-চি এই কথাটি বলেছিলেন। তাঁর মতে :

"....the basic aim of agrarian reform is not purely one of relieving the impoverished peasants. It is designed to set free the rural productive forces from the shackles of the feudal landownership system of the landlord class in order to develop agricultural production and thus pave the way of New China's industrialization."

তাহলে মূল লক্ষ্য দাঁড়াল কৃষকের মুক্তি নয়, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির মুক্তি।

চীনের কৃষি সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল, চাষীদের মধ্যে ভূমি বণ্টন। ১৯৫৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কৃষি বিপ্লবের এই দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টনের কাজ খুব সহজে সম্পন্ন হয় নি। জমি পাবার জন্য চাষীদের কয়েকটি শর্ত পালন করতে হয়েছে এবং দাবিদারদেরই একমাত্র শর্ত বলে মেনে নেওয়া হয়নি। তার সঙ্গে "রাজনৈতিক আনুগত্য এবং আস্থা"—এই শর্ত দুটিও বাধ্যতামূলকভাবে [illegible] হয়েছিল। [illegible]

এসে গেল। কথাটা শুনতে খুব ভাল। কিন্তু তার পরিমাণ কত? সরকারী হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, মাথা পিছু প্রতি চাষী মাত্র কয়েক "মৌ" করে জমি পেয়েছিল। এক মৌ" জমি আমাদের হিসাবে এক একরের ছয়ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ আধ বিঘে মাত্র।

এই স্বল্প পরিমাণ জমি চাষীরা যদি বিচ্ছিন্নভাবে চাষ করে, তাহলে উৎপাদন বাড়ে না, সেটা লাভজনকও হয় না। তাই চীনা কম্যুনিস্ট সরকার জমি বণ্টনের সংগে সংগেই "কৃষি উৎপাদক সমবায়" গড়ে তোলার জন্য খুব জোর একটা প্রচেষ্টা চালান। সরকারী প্রচারযন্ত্র এবং পার্টির লোকজন প্রচারকেরা বলে বেড়াতে লাগল, "মুরগের মত ছোট্ট জমিতে" চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো কখনোই সম্ভব হবে না। বড়ো জমিতে গভীরভাবে চাষ, দরকার মত সার দেওয়া, যন্ত্রের ব্যবহার করতে যে ব্যয় হবে, তা বহন করা কোন চাষীর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সম্ভব নয় এবং সমবায় গড়লেই এই সব সুবিধা অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে।

সমবায় গঠনের অগ্রগতির দ্রুততার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, (এর কত ভাগ শুধুই প্রচার, তা জানা দুঃসাধ্য) তাতে সত্যিই তাক লেগে যায়। ১৯৫২ সালে চীনে কৃষি উৎপাদক সমবায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০। এই সংখ্যা ৫৩ সালে ১৪০০০, ৫৪-তে ৬ লক্ষ, এবং ৫৬ সালের বসন্ত কালের মধ্যেই ১৩ লক্ষে পৌঁছে গেল। (৫৬ সালের হিসাবে প্রাথমিক সমবায় এবং যৌথ খামারের হিসেব এক সঙ্গে ধরা হয়েছে।)

শেষ পর্যন্ত সমবায় গড়েও কম্যুনিস্টরা সন্তুষ্ট হল না। ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন, কৃষি বিপ্লবের তৃতীয় পর্যায়ে যৌথ খামারের নামে জমির মালিকানা চাষীর হাত থেকে সরকার আবার নিজের হাতে নিয়ে নিল। এই তারিখে কম্যুনিস্ট পার্টি "কৃষি উৎপাদনের উন্নততর (প্রাইমারী বা প্রাথমিক সমবায় বাতিল করে দিয়ে) সমবায় সংস্থার জন্য আদর্শ নিয়মাবলী" প্রকাশ করে। যে সব চাষী আগে-থেকেই সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে আছে, এই "নব বিধানে" তাদের জমি, উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো, যথা লাঙল, গরু প্রভৃতির ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করে "উন্নততর সমবায় সংস্থার যৌথ মালিকানার" কাছে অর্পণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

চাষীরা মাত্র ছয় বছরের মধ্যেই বুঝতে পারল, সরকার তাদের বিরাট এক ধাপ্পা দিয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই তাদের পায়ের [illegible]

চাষীরা বিনাবাক্যেই অদৃষ্টের নির্দেশ মেনে নিল।

চীনা কম্যুনিস্টরা তাতেও স্বস্তি পেল না। রাশিয়ার চাষীরা যৌথ খামারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা জানা ছিল। চাষীদের অসন্তোষ বিদ্রোহের আকারে পাছে চীনেও কোনদিন দানা বেঁধে ওঠে, তাই চীনা সরকার তার সুদূরতম সম্ভাবনার ভড়ও মেরে দিল। ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাস থেকে ব্যাপকভাবে চালু হল কমিউন। এইটিই চীনের কৃষি বিপ্লবের চতুর্থ বা সর্বশেষ পর্যায়। আগস্ট মাসের শেষ দিকে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরো এক বৈঠকে "গ্রামাঞ্চলে জনগণের কমিউন প্রতিষ্ঠা" করার এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই কমিউনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, সারা দেশে কৃষির সামগ্রিক উন্নতি, ধারাবাহিক-ভাবে দ্রুত উৎপাদন এবং ৫০ কোটি চাষীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিই এর উদ্দেশ্য। একে "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উত্তেজনা-পূর্ণ অগ্রগতি" বলে উচ্চ রোলে ঢাকঢোল পিটানো শুরু হল। বলা হতে লাগল, দেশের সর্বত্রই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কমিউন গজিয়ে উঠছে। "কম্যুনিস্ট মুখপাত্রদের কথায় বিশ্বাস করলে এই কথাই মানতে হয় যে নিজেদেরকে কমিউনের মধ্যে সংগঠিত করবার জন্য চাষীরা সব সময় নাকি পার্টির লোকেদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। তার মানে, নিজেদের স্বার্থের বিপক্ষে চীনা চাষীরা কমিউনে সংগঠিত হতে যে রকম আগ্রহ দেখিয়েছে, আজ পর্যন্ত কোন মেষশাবককে সে রকম আনন্দে হই হই করতে করতে বা স্বেচ্ছায় কসাইখানার দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় নি।"—(ডঃ চন্দ্রশেখর)

কমিউন প্রতিষ্ঠার নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তবে তার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, চাষীদের আয় কেড়ে নিয়ে তা দিয়ে শিল্পোন্নয়নে বিনিয়োগযোগ্য [illegible] এবং চাষীদের এক বিরাট [illegible] মজুর হিসা শিল্প-শ্রমিকে [illegible] সরকার চাষীদের আয় [illegible] নিয়েছেন একটা হিসেব [illegible] হদিশ পাওয়া যাবে। ১৯৫৬ সালে কম্যুনিস্ট শাসকেরা স্থির করেছিলেন যে, মোট কৃষি আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৭ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, চাষীরা পেয়েছে মোট কৃষি আয়ের শতকরা ৫৩·২ ভাগ। তারপর জনগণের কমিউন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মোট আয়ের

শতকরা ৩০ ভাগ মাত্র স্থানীয়ভাবে অর্থাৎ কমিউনের খাই খরচা মেটাতে ব্যয় হয় এবং বাকী ৭০ ভাগ সঞ্চয় ও লগ্নী করা হয়। চাষীর হাতে লবডঙ্কা। তারা তিন বেলা খেতে পাবে আর জমি চষবে—এই হল কমিউনের বিধান। এ বিধান যে না মানবে, তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে।

পারিবারিক সম্পর্কের বা বন্ধনের কোন স্বীকৃতি কমিউনের কাছে নেই। বাপ-ছেলে, স্বামী স্ত্রী এই ধরনের কোন সম্পর্কের মূল্য চীনা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র দেয় না। তার কাছে প্রতিটি মানুষ (কি পুরুষ কি স্ত্রী) রাষ্ট্রের প্রয়োজন মাফিক উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় মাত্র। পরিবারের মধ্যে বাস করলে মানুষ পারিবারিক কর্তব্য পালনে অনেক শ্রম ও সময় অপব্যয় করে। এই অপচয় বাঁচাবার জন্যই পরিবারকে ভেঙে স্ত্রী পুরুষকে "মুক্তি" দিয়ে কমিউনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
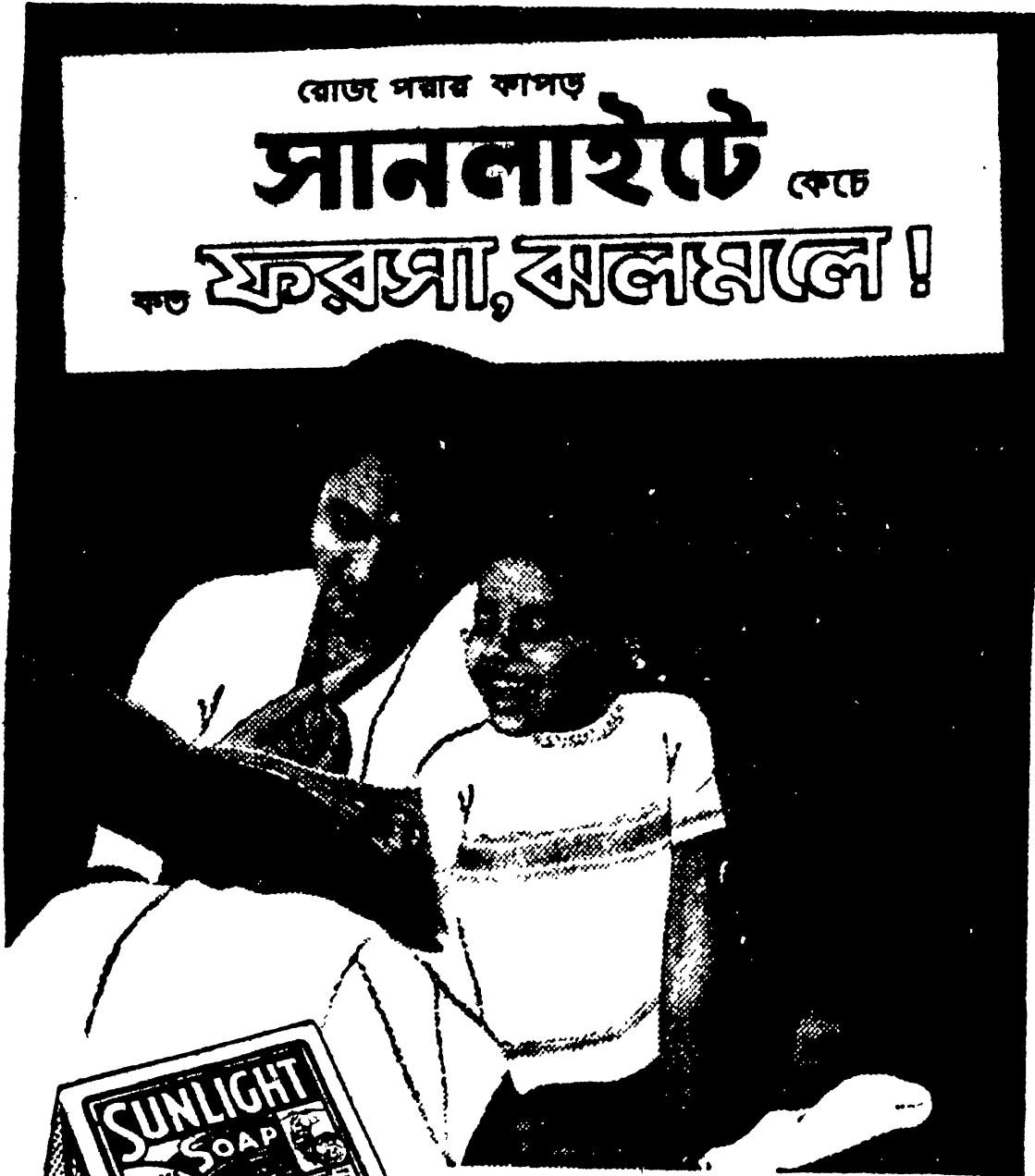
কমিউন গড়তেই কম্যুনিস্টরা গদগদ্ হয়ে ওঠে। কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার শেষ

খাপ যে সামাজিক ইউনিটটির কথা বলা হয়েছে, সেইটিই হচ্ছে কমিউন। সেই [illegible] [illegible] অনুযায়ী [illegible] বৃদ্ধির [illegible] একমাত্র টুথব্রাশটা ছাড়া [illegible] চাননি, বারোয়ারি টুথব্রাশ দিয়ে নিজের দাঁত মাজার কল্পনায় সম্ভবত তাঁর ও [illegible] বুর্জোয়া সংস্কার উদ্রেক হয়ে থাকবে, তাই ওটাকে আর কমিউনের সম্পত্তি করতে চাননি, এ ছাড়া আর সব কিছুই কমিউনের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। যাঁরা ভাবছেন, এটা আমার রসিকতা, তাঁদের অবগতির জন্য রাশিয়ার বিখ্যাত কম্যুনিস্ট কবি মায়াকোভস্কির কবিতার একটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি।

"O commune, everything I own is yours, except my tooth-brush."

বঙ্গার্থ : "অয়ি কমিউন, আমার টুথ-ব্রাশটি ছাড়া আর যা কিছু আছে, সেসব তোমারই, তোমারই।"

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরে (১৯১৮-১৯২০) সেখানেও কমিউন প্রতিষ্ঠার ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ১৯৫৮ সালে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বময় একথাটা ছড়িয়ে দিল যে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় জনগণের চীন সোভিয়েট রাশিয়াকেও টেক্কা দিয়েছে। তবে দেশ-ব্যাপী কমিউন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হয়েছে। চীনের সরকারী পরিসংখ্যান মারফৎ জানা গেল, ঐ বছরেই শেষের ছয়-মাসে গ্রামাঞ্চলে ২৬ হাজার কমিউনের উদ্বোধন হয়েছে। সরকারীভাবে একথাও ঘোষণা করা হল যে, অনুরূপ বিপ্লব শহরেও ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

এখন দেখা যাক, কমিউন বলতে আসলে কি বোঝায়? প্রকৃতপক্ষে কমিউন হচ্ছে, কম্যুনিস্ট প্রশাসনের কঠোরতম একটি রূপ। এই ব্যবস্থায় অনেকগুলো 'কালেকটিভ ফার্ম' বা যৌথ খামার এবং গ্রামকে সাংগঠনিক তথা প্রশাসনিক দিক থেকে একটি ইউনিটে সামিল করে ফেলা। এই ইউনিটটি কৃষি, বন, পশু পালন, মৎস্য চাষ, এবং শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দায়ী থাকবে। এইভাবে চাষী (কৃষি), শ্রমিক (শিল্প), ব্যবসায়ী (বিনিময়), ছাত্র (সংস্কৃতি ও শিক্ষা) এবং মিলিশিয়া বা সামরিক বাহিনীকে একটি সম্মিলিত নেতৃত্বের অধীনে আনা হল। এই নেতৃত্ব নামে সম্মিলিত হলেও এর চাবিকাঠি থাকল কম্যুনিস্ট পার্টিরই হাতে।

কমিউন প্রবর্তিত হওয়ার পর প্রচলিত সামাজিক এবং পারিবারিক কাঠামো ভেঙে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হল। চীনা সমাজে মেয়েদের চিরাচরিত ভূমিকা অর্থাৎ জননী, জায়া, দুহিতা, বিলুপ্ত হয়ে গেল। নারী জাতিকে "শৃঙ্খল মুক্ত" করে শ্রমিকে পরিণত করা হল। কম্যুনিস্ট মতাদর্শে [illegible] উঠল। চীনের [illegible]

[illegible] নতুন [illegible] মেয়েদের [illegible] অত্যন্ত প্রয়োজন [illegible] মেয়েরা [illegible] সংসার [illegible] ও পরিবারের [illegible] বৃদ্ধির [illegible] প্রধানত স্ত্রী ও মা নয়। একজন স্ত্রী যদি একশটি পরিবারের জন্য রান্না করে দেয়, তাহলে বাকী ৯৯ জন স্ত্রীকে সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত করে এনে মাঠে বা কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাই বাড়িকে সমষ্টিগত মালিকানা বা কমিউনের অন্তর্ভুক্ত করে নারীকে প্রচুর সংখ্যায় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৮ সালের শেষে, সরকারী হিসাবে, হোনান, হুনান, শানটুং, শানসী, কিয়াংসি এবং লাইয়োনিঙ প্রদেশের ১০ কোটি চাষী পরিবারের প্রায় ৯ কোটি নারীকে "পারিবারিক শৃঙ্খল" থেকে "মুক্ত" করে রাষ্ট্রের কাজে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজ বিশেষে স্বামী এবং স্ত্রীকে বসবাসের জন্য আলাদা করে দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

নয়াচীনের শিশুরা যাতে 'ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিক' হয়ে উঠতে পারে, বাপ মায়ের স্নেহ পাবার জন্য ব্যাকুলতা নামক "বুর্জোয়া আবেগ প্রবণতার" দ্বারা তারা যাতে আক্রান্ত হতে না পারে, কমিউনে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

[illegible] জন্য [illegible] হাত থেকে [illegible] কমিউনের ক্রেশ এবং [illegible] শিশুর বয়স এক [illegible] পর [illegible] লালপালন [illegible] শিশুকে ক্রেশে রেখে মাকে তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। চার বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত শিশুটি এখানে থাকে, তারপর তাকে ছয় বছর পর্যন্ত রাখা হয় নার্শারীতে। ৭ থেকে ১৬ বছরের শিশু থাকে বিদ্যালয়ের হোস্টেলে।

ডঃ চন্দ্রশেখর চীন ভ্রমণের সময় একটি কমিউনে গিয়ে তিনটে ক্রেশ [illegible] দেখেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা [illegible] তিনি বলেছেন : "শিক্ষয়িত্রী [illegible] কোণে রাখা পিয়ানোটি বাজাতে আরম্ভ করলেন। শিশুরা আপনা থেকেই গোল হয়ে বর্তমানের অতি পরিচিত গান গাইতে শুরু করল—'সমাজতন্ত্র খুব ভাল', 'কমিউনগুলো খুব ভাল', 'চেয়ারম্যান মাও আমাদের ত্রাণকর্তা।'

"আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এরা কি বাড়িতে এদের বাপ-মায়ের কাছে যায়?'

—'সাধারণত না।'

—'ছেলেমেয়েরা কি বাপ-মায়ের অভাব বোধ করে না?'

শিক্ষয়িত্রী জবাবে বললেন, 'আমার বিশ্বাস করে না। কারণ বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আমরা সরবরাহ

করি। অভাব বোধ তো করেই না, উপরন্তু যেন আরামেই থাকে।'

"ওরা সত্যি সত্যি বাপ-মায়ের অভাব বোধ করে কিনা, বাচ্চাদের ওখান থেকে আসবার সময় আমি সে কথাই চিন্তা করছিলাম।..." (—অনুবাদ নিরঞ্জন হালদার, আমন্ত্রণ চীনে পৃঃ ৩৪-৩৫)

[illegible] কমিউন [illegible] এসেছেন। [illegible] কমিউনের ডিরেক্টর তাকে [illegible], কম্যুনিস্ট অর্থনীতির মোট দুরূহতম সমস্যা—সমবায়ী খামারের কৃষি-শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ করা—কমিউন সেটা অতি সহজেই সমাধান করে ফেলেছে। ডিরেক্টর স্পষ্টই বলেছেন, "কমিউনে কোন শ্রমিককেই নগদ টাকা দেওয়া হয় না।" গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কমিউন তাদের ষোলটি গ্যারাণ্টি দেয়। তা রক্ষাও করে।

বয়স বা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কমিউন সবাইকে এই ষোল দফা গ্যারাণ্টি দেয়। (১) খাদ্য, (২) পোশাক পরিচ্ছদ : কমিউনের প্রতিটি সদস্যকে বছরে ১৮ ইয়েন (এক ইয়েন, আমাদের দু টাকার প্রায় সমান) মূল্যের কাপড় দেওয়া হয়। জাতীয় উর্দি অর্থাৎ নীল রঙের বয়লার স্যুট ছাড়া অন্য পরিধেয় নিষিদ্ধ। (৩) বাসস্থান : কমিউন সেই অঞ্চলের সব বাড়ির মালিক। বাসস্থান বণ্টনের একমাত্র অধিকারী কমিউনই। (৪) যানবাহন : বাসস্থান থেকে কাজের জায়গায় যেতে আসতে পয়সা লাগে না। কমিউনের কাজে কেউ বাইরে গেলে কমিউনই তার ভাড়া দেয়, এক ইয়েন রাহা খরচাও দেয়। (৫) প্রসূতি ব্যবস্থা : সন্তান সম্ভবা নারীকে ৪৫ দিনের ছুটি এবং তার পুষ্টির জন্য এক ক্যাটি লাল চিনি দেওয়া হয়। প্রয়োজনে প্রসূতিকে কমিউনের খরচে নিকটবর্তী শহরের বড় হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। (৬) অসুখ হলে ছুটি এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা। (৭) বার্ধক্যে অবসর : বৃদ্ধ ও অক্ষমদের কমিউনে কোন কাজ করতে হয় না, তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব কমিউনের। তবে যারা কাজ করতে চায়, তাদের হাল্কা ধরনের কাজ দেওয়া হয়। (৮) বিনামূল্যে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা। (কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ছাড়া আর কারো পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় না। শুধু গোর দেওয়া হয়) কবরটাকেও কাজে লাগাবার ব্যবস্থা কমিউনিস্ট চীন করে ফেলেছে। কবরে যাতে ভাল ফলের বাগান করা যায়, সেজন্য মৃতদেহ অন্তত দশ ফুট নিচে গোর দেওয়া হয়। (৯) অবৈতনিক শিক্ষা। (১০) শিশু পালন। (১১) বিনামূল্যে [illegible] বিনোদনের ব্যবস্থা। (১২) বিয়ের সময় [illegible] [illegible]

চুল ছাঁটাইয়ের খরচ। (১৪) গরম জলে স্নান করার জন্য বিনামূল্যে বছরে ২০টি স্নানের টিকিট। (১৫) মিথ্যাচার পোশাক সেলাই ও মেরামত এবং (১৬) বিনামূল্যে আলো : যেখানে বিজলী বাতি নেই, সেখানে বাতির তেল কেনার জন্য প্রত্যেককে বছরে এক ইয়েন দেওয়া হয়।

কমিউনে সামরিক কায়দায় শ্রমিকদের [illegible] করা হয়। এবং তারা যেন যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই আছে, এমন একটা উত্তেজনাপূর্ণ মানসিক [illegible] মধ্যে শ্রমিকদের সদাসর্বদা রেখে দেওয়া হয়। কম্যুনিস্ট নেতাদের মতে, এতে শ্রমিকদের কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে শ্রম নিংড়ে বের করা যায়। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর "পিপলস ডেইলির" সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে :

"In the communes, everyone should become a soldier. Young men eligible by age and all demobilized servicemen should be organised into militia, put under constant military training, and required to shoulder the mission assigned by the State."

"যেন যুদ্ধক্ষেত্রে আছ, এমনভাবে কাজ কর"—এই জিগীর তুলে এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সবগুলো প্রচারের মাধ্যমকে সক্রিয় করে চীন সরকার এমন একটা সামরিক হিস্টিরিয়া দেশের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে শ্রমিকদের দিনরাত খাটিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আটঘণ্টার বেশী কাউকে কমিউনে বিশ্রাম দেওয়া হত না।

ডঃ চন্দ্রশেখর চীনে গিয়ে একটি কমিউনে বাসও করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কমিউনে কিভাবে কাজ হয় তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাস্তার লাউড স্পীকারের শব্দে সকালে পুরুষ ও মেয়েরা জেগে ওঠে। শারীরিক যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়, তাই খোলা জায়গায় রোজ সকলকে আধ ঘণ্টা ব্যায়াম করতে হয়। তারপর প্রাতঃরাশের ক্যান্টিনে যেতে হয়। এরপর সবাই ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে কাজ করতে যায়। প্রতিটি গ্রুপ মাঠে বা কারখানায় নির্দিষ্ট কাজ করে। দুপুরে, যারা কাছে কাজ করে, তারা ক্যান্টিনে খেতে আসে, যারা দূরে কাজ করে, তাদের খাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুপুরের খাদ্য : ভাত, শাক সব্জীর তরকারী, মিষ্টি আলু আর কচিৎ কদাচ ছিটেফোঁটা শুয়োরের মাংস। খাওয়া শেষ হলে তারা আবার মার্চ করে কাজের জায়গায় ফিরে যায়। কমিউনে নিকৃষ্ট ধরনের খাদ্যই সরবরাহ করা হয়। সন্ধ্যায় সবার কাজ থেকে ফিরলেও বিশ্রাম নেই। [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] যেতে হয়। [illegible] মৌখিক [illegible] পিকিং-এর "পিপলস ডেইলির" [illegible] [illegible] কৃষি ও শিল্প [illegible]

উৎপাদনের একেবারে হালের পরিসংখ্যান, গ্রামের উনুন থেকে গতকাল কত টন ইস্পাত বেরিয়েছে তার খবর, 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ' ও তাইওয়ানের চিয়াং চক্রকে নির্বংশ করার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে তার মুখরোচক বিবরণ, (ভারত ও নেহরুর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের নতুন প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছে।—লেখক), বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদনে চীন কিভাবে ইংলণ্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে তার কাহিনী এবং অবশেষে পিকিং অপেরা শোনানো হয়। কিন্তু আজকাল অপেরার কাজ শুধু আনন্দ দেওয়া নয়, জ্ঞান দেওয়াও। এরপর দেশপ্রেমাত্মক কোন সিনেমা, অথবা বিপ্লবাত্মক কোন নাটক

কিংবা সাধারণ ব্যায়াম প্রদর্শনী। (একটা কথা মনে রাখবেন, কারো ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, বসে বসে সবাইকে এসব জিনিস দেখতেই হবে। কমিউনের আইনে দেখতে তারা বাধ্য)।

ভাবছেন কিরিক্তি শেষ হল, [illegible] রেহাই। এবার [illegible] একপক্ষে আছে মতামত [illegible] হাজরে দিতে হয়। [illegible] প্রোগ্রাম। আত্ম সমালোচনায় [illegible] কি পরিমাণে [illegible] এখানে [illegible] পরীক্ষা দিতে হয়। একের পর এক উঠে দাঁড়ায় সকলে, নিজেদের ভুল ত্রুটি এবং জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে [illegible]

বিশ্বখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক ভিক্টর হ্যুগো র চিত্রাঙ্কন কুশলতার একটি দৃষ্টান্ত—শায়িতা নগ্ন মূর্তি

মোটেই, আসলে ওগুলির সিরীয়াস সমালোচনায় তিনি লজ্জাবোধ করতেন।

ছবি আঁকতে তিনি চকোলেট, দুধ এবং কফি ব্যবহার করতেন বলে যা শোনা যায়, সেটা সম্ভবত কিম্বদন্তী। তবে ঝড় ঘনিয়ে আসা বোঝাতে কফির ব্যবহার, মোটা রেখা বোঝাতে ইচ্ছে করে নিবের মুখ ভেঙে ভোঁতা করে নেওয়া বা কুয়াশা বোঝাতে ছুরি দিয়ে ছবি ঠুকরে ঠুকরে দেওয়া কিম্বা ময়লা করে ফেলা—এসব তিনি করতেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ অথচ সরল টানে তিনি চমৎকার নগ্ন মূর্তি আঁকতে পারতেন। এমন চমৎকার রঙের ঘূর্ণি বা নগ্নদেহের মনোরম চিত্র তৈরি করতে পারতেন যা আজকালকার বহু আর্ট গ্যালারিতে বেশ মানিয়ে যাবে। জন ব্রাউনের ফাঁসী দ্বারা অবশ্য অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর আঁকা ফাঁসিতে লটকানো এক ব্যক্তির ছবির ক্ষেত্রে আলো ও ছায়ার ব্যাপারে তিনি মনীষী স্থানীয় চিত্রকরের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে তাঁর শিল্পকর্মে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রোমান্টিসিজমের প্রতি আনুগত্য এবং এক ঔপন্যাসিকের পলায়নপর মনের অনবদ্য সংযোগ।

সচল মহাদেশ

বিজ্ঞান মহলে আজ পঞ্চাশ বছর যাবৎ যে বৈজ্ঞানিক সূত্র নিয়ে বিতর্ক চলেছে এবং আজও যার সমাধান হয়নি, তারই একটা বার্ষিকী বিনা সোরগোলে সম্প্রতি হয়ে গেল। এই সূত্রটির নাম হচ্ছে পরিবর্তনশীল মহাদেশসমূহ এবং মতবাদটির জনক হচ্ছেন জার্মান ভূপদার্থবিদ আলফ্রেড ওয়েগেনার। এই বিষয়ে ১৯১২ সালে তিনি তাঁর চাঞ্চল্যকর পুস্তক "ডি কনটিস্টেন্যাঙ্কভের কনিটনেন্টে" বা মহাদেশগুলি উৎপত্তি প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানের এই হিসেবেই যে বইটির সর্বাধিক কাটতি হয়েছিল তা নয়, ভূপদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর সেই মতবাদকে একটি বিরাট আবিষ্কার বলা হয়।

আলফ্রেড ওয়েগেনারের সূত্র অনুসারে মহাদেশের বিরাট পরিবর্তন শুরু হয় পাঁচিশ কোটি বছর আগে। তাঁর মতে আসলে আদিকালে একটিমাত্র মহাদেশ ছিল, যার অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি। কোটি কোটি বছর আগে সেই মহাদেশ বরফের মত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। তাঁর বিশ্বাস ভাসমান বরফের চাঙড়ের মত সেই মহাদেশের ভাঙা টুকরোগুলো সেদিন থেকে ক্রমাগত পৃথিবীর ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সূত্রের সমর্থনে বলা যায় যে, ১৯১২ সালে ভূবিজ্ঞান পৃথিবীগাত্রের, উল্লম্ব (খাড়া) গতি স্বীকার করে নেয় এবং সেই প্রাকৃতিক আশ্চর্য ব্যাপারের ফলে ওজনের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর অন্তরতম স্থান থেকে তার মধ্যে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলি জেগে ওঠে বা ডুবে যায়। পৃথিবীর এই উল্লম্ব গতিই যখন স্বীকার করে নেওয়া হল, তখন তার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত হচ্ছে মহাদেশের টুকরোগুলির সমান্তরাল গতির সূত্র।

পৃথিবী গাত্রের বহু ভূতাত্ত্বিক, ভৌগলিক ও জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য আজও রহস্যে আবৃত। মহাদেশের এই গতির সূত্রকে যদি সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে এই রহস্যগুলি উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকার উপকূলভাগের ভূতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা হিসেবে ওয়েগেনার বলেছেন যে, একদা আমেরিকা অ্যাফ্রো-য়ুরোপীয় ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেইভাবেই কোনকালে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আন্টার্টিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার প্রমাণ হচ্ছে সুমেরু অঞ্চলে ও ভারতে একই রকম জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টার্টিকার একই জাতীয় কয়েক ধরনের সরীসৃপ ও একই জাতের একরকম ফার্ন পাওয়া যায়। ওয়েগেনারের মতে আমেরিকা পশ্চিমে সরে গিয়েছিল এবং আজও সরে চলেছে এবং তার দরুণ য়ুরোপ ও আফ্রিকা থেকে আমেরিকার দূরত্ব বেড়েই চলেছে। ওয়েগেনারের মতে এইভাবেই কোথাও পাহাড় জেগেছে, কোথাওবা পাহাড় বসে গিয়ে সমুদ্র দেখা দিয়েছে।

ওয়েগেনারের তত্ত্ব সকলে মেনে না নিলেও আজ নানা সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা গেছে যে সবাই মহাদেশগুলি সমান্তরাল গতিতে সরে গিয়েছে এবং আজও যাচ্ছে। ওয়েগেনার জীবিত থাকলে তাঁর সূত্রের [illegible] পারতেন। কিন্তু ওয়েগেনার ১৯৩০ সালে [illegible] [illegible]

চিত্র প্রদর্শনী

গত ১লা মে কলকাতার ইউ এস আই এস-এর প্রেক্ষাগৃহে আধুনিক মার্কিন গ্রাফিক আর্টস-এর একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। শিল্পী কর্তৃক ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত উপকরণে, হাতে ছাপাই ছবির একটির বেশী যে ছাপানো প্রতিলিপি তৈরি করা হয়ে থাকে—ওই ধরনের সবরকম প্রণালীতে রচিত শিল্পকে সাধারণভাবে গ্রাফিক আর্টস বলা হয়। তামা জিংক বা ওই জাতীয় ধাতব পাতে কঠিন ধাতুর শলা দিয়ে আঁচড় কেটে বা এসিডের দ্বারা কেটে বসান রেখার সাহায্যে নকশা ও ছবির নেগেটিভরূপ তৈরি করে তাতে কালি ও রঙের ছোপ ধরিয়ে কাগজে ছেপে রচিত হয় এচিং-এর প্রিন্ট। কাঠ ও লিনোলিয়ম এর ত্বকে ধারাল ছুরি চালিয়ে তৈরি রেখার সমন্বয়ে ছবি করে কালো বা অন্যান্য রঙের ছাপে যে প্রিন্ট প্রস্তুত করা হয় তাকে উড্-কাট বা উড্-এনগ্রেভিং বলা হয়। ফ্ল্যাট পাথরের উপর মোমখড়ি লাগিয়ে ছবির পরিসরটুকু আলাদা করে জলে ভিজিয়ে রঙ লাগানোর কেবল সেই স্থানে রঙ থেকে যাওয়ায়, কাগজে ছবির ছক উঠে আসে ঠিকমত। এই পদ্ধতিতে তৈরি হয় লিথোগ্রাফ-এর প্রিন্ট। এ ছাড়া কাচ সিল্ক ম্যাসোনাইট প্রভৃতির সাহায্যে নানা প্রক্রিয়ায় ছবির প্রতিলিপি আজকাল শিল্পীরা নিজ হাতে প্রস্তুত করে থাকেন।

পাশ্চাত্য দেশে গ্রাফিক আর্টকে বলা হয় গরীবশিল্প-সংগ্রাহকের শিল্পসম্পদ। কারণ নিজ হাতে প্রত্যেকটি প্রতিলিপি তৈরি করার ফলে সেগুলিতে শিল্পীর আসল যে কোন রচনার গুণ ও মান পরিপূর্ণভাবে থাকা সত্ত্বেও মূল্যের দিক দিয়ে অতি সুলভ হওয়ায় এ প্রিন্টগুলি সর্বসাধারণের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব। রেনেসাঁস যুগে প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী ডুরার-এর এনগ্রেভিং সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যান্ডের অমর চিত্রশিল্পী রেমব্রাণ্ট-এর এচিং, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত স্প্যানিশ শিল্পী গোয়্যার ও ফরাসী শিল্পী তুলুস লোত্রেক-এর লিথোগ্রাফ, শিল্পের মানে তাঁদের তেলরঙা ছবির সমতুল্য ও মূল্যবান ধরা হয়ে থাকে। গ্রাফিক আর্ট-এ রঙের ছাপ লাগানোর নানা কারিগরি ও ছাপপড়া কাগজের ত্বকে উঁচু-নিচু দাগ বসানোর কায়দা এই শিল্পশৈলীকে অন্যান্য চিত্রণ প্রণালী থেকে বিভিন্ন করে চিত্রাভিব্যক্তির অভিনব উপায়কে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ইউ এস আই এস-এর আয়োজিত গ্রাফিক আর্টস-এর এই প্রদর্শনীতে কাগজের ত্বকে চাপ দিয়ে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করার প্রভাব একেবারে অনুপস্থিত দেখা গেল। কেবল রঙ ও কালির ছাপের নানা প্রকার কৌশল বহন করছে প্রিন্টগুলি। কিন্তু কারিগরির মুন্সিয়ানা ঠিকমত দেখা বা কিন্তু দ্রষ্টব্যগুলিকে চকচকে সেলোফেনের পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় সে কারিগরীর মুন্সিয়ানা ঠিকমত দেখা বা বিচার করা প্রায় অসম্ভব। কারণ এই পর্দায় জোরালো আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ছাপানো ছবির ত্বককে দেখবার সুযোগ দিচ্ছে না। নকশায় আধুনিকতার আমেজ থাকলেও

সব মিলে প্রদর্শনীর চরিত্র প্রায় সাবেকী কালের রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (২নং মিল আয়রস্পাং-এর "মুন্ ... ম্যাসোনাইট ব্লক প্রিন্ট-এ ভাল লিথোগ্রাফের কাজ হয়েছে। (৫নং) মর্ট বারানক-এর রঙ্গীন উড্-কাট, (৮নং) হান্স গ্রাউবেইস ও (১১নং) রবার্ট ক্যারিওলার এচিং উপভোগ্য রচনা। লেনার্ড এডম্যানসান-এর রঙ্গীন এচিং (২১নং) "স্যায়ো" প্রায় ... ছবির সামিল জোরালো হয়েছে। ... গ্রুয়েবের-এর এচিং ও এক্সোলাইট (...

বেশ উচ্চাঙ্গের রচনা। (৩৭নং) আর্ট জেকবসান-এর রংগীন উড্-কাট "ব্লু টেবল" জাপানী ছবির মত। (৪০নং) গাব্রিয়েল লেভারম্যান-এর এনগ্রেভিং চোখে দেখা দৃশ্যের হুবহু নকলের দক্ষ প্রচেষ্টা। লিথোপ্রিন্টগুলির সবগুলির প্রায় রঙে অনুরূপে যদিও ইওরোপের [illegible] [illegible] আর্টিস্টরা [illegible] [illegible] ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। (৩৯নং) ডেভিস ব্রাউসের 'ফরেস্ট পণ্ড" বেশ কাব্যময় রচনা। ৪৪, ৪৬, ৫২, ৬৫ ও ৭২ নম্বরের লিথোগ্রাফগুলি, ৪৫, ৫৫ ও ৬২ নম্বরের এচিংগুলি; ৭১ ও ৭৫ নম্বরের উড্-কার্ট এবং ৭৪ নম্বরের উড-এনগ্রেভিং অতিশয় উচ্চাঙ্গের রচনা হওয়ায় এই প্রদর্শনীকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে।

কলকাতা শহরে কেবল গ্রাফিক আর্টের এতবড় প্রদর্শনী এর আগে বিশেষ দেখা যায় নি। শিল্পরসিক ও শিল্পানুরাগী দর্শকেরা এই প্রদর্শনী দেখে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে এ দেশে গ্রাফিক ছবির সমাদর বৃদ্ধি হবে শুধু ধনীদের নয় সাধারণ মধ্যবিত্তদেরও বাসগৃহের শোভাবর্ধন করবে।

॥ মনোজ বসু ॥

॥ তেতাল্লিশ ॥

ভীম সর্দার আর মহাদেব সিং দুই বরকন্দাজ দুটো হাত ধরে ফেলে হিড়হিড় করে মুকুন্দকে দাওয়ার উপর তুলল। একটু আগে বেদিতে বসে তন্ময় হয়ে পাঠ করছিল, চোর হয়ে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী লজ্জা কী লজ্জা! লজ্জা কাছারির নায়েব মুরারিরও। ভাইয়ের পাঠের প্রসঙ্গ কর্তার কাছে সে-ই তুলেছিল। তারপর খানা হল—খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আমার ক্ষমতা দেখেছেন, ভাইয়ের মুখে পাঠ শোনা একদিন। ধর্ম অর্থ দুই বর্গের মুরুব্বি আমরা দু-ভাই। বুড়ো মনিবের কাছে খাতিরটা বেশি হবে কিন্তু ব্যবহার সমস্ত। হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল।

মুকুন্দর গায়ে সাদা কামিজ তার উপরে ছিটের হাত কাটা ফতুয়া। বৈশাখের দিনও সকলকে একটা-কিছু গায়ে রাখতে হয়েছে চৌধুরী-কর্তার সামনে নিতান্ত খালি গায়ে থাকা চলে না বলেই। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে বোঝা নামাবে সেই চিন্তা। আর মুকুন্দ মাস্টার দেখ ডবল চাপান দিয়ে এসেছে। ফতুয়ার সবগুলো বোতাম আঁটা। গোড়ায় এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা হয়েছিল একটু। এখন চোখ ঠারছে : বেশি জামা পরে কি এমনি? পরেছে পকেটের দরকারে। ইঁদুরের অভাবে বমাল ফেলে না যেতে হয়।

চৌধুরি-কর্তা বললেন জামা খুলে ফেল।

মুকুন্দ দুটো হাত ফতুয়ার উপর চেপে ধরে। বোতাম খুলতে দেবে না। কিছুতে না। এর পরে তিল পরিমাণ সংশয় থাকে না। চোরাই ঘড়ি রেখেছে ফতুয়ার নিচে কামিজের বুক-পকেটের ভিতর।

নিজে খুলছে না তো দুই বরকন্দাজকে হুকুম দিলেন চৌধুরি-কর্তা। মাস্টারি করে, ছেলেপুলে মানুষ করার ব্রত নিয়েছে, মুখে ধর্মের খই ফোটে। দয়ামায়া নেই এই সব ভণ্ডের উপর।

এতগুলি লোকের মধ্যে সাহেবই কেবল [illegible] : কী আশ্চর্য, লোকটাকে এমন চোর বানাল! কিছুই জানেন না উনি, কিছু করেননি—

চৌধুরি কর্তা চোখ পাকিয়ে পড়তে থতমত খেয়ে সাহেব থেমে যায়।

ভীম সর্দার মুকুন্দর হাত দুটো পিছনে নিয়ে সজোরে এঁটে ধরে আছে, মহাদেব পটপট করে ফতুয়ার বোতাম খুলেছে। এর পরেই হাত ঢুকিয়ে দেবে সার্টের বুক-পকেটে—

হরি, হরি! পকেটই নেই যে। পকেট সুদ্ধ অংশখানেক কিসে যেন ছিঁড়ে খেয়েছে। জীর্ণ শতচ্ছিন্ন কামিজ—উপরে ফতুয়া চাপা থাকায় বোঝা যায় না। ডবল জামা পরার রহস্যটা মালুম হল এবার। শুধু ফতুয়া গায়ে ভদ্রসমাজে বিচরণ চলে না, অথচ কামিজের মধ্যভাগ দেখতে দেওয়াও চলে না। প্রাণের কষ্ট তুচ্ছ করে মানের দায়ে এই ডবল বোঝা চাপানো।

আর ঠিক এমনি সময়ে বিস্মিত মুরারি বলে, ঘড়িটা দেখছি আমারই পকেটে। কেমন করে এলো?

উড়তে উড়তে ঢুকে পড়েছে! [illegible] চৌধুরি খিঁচিয়ে উঠলেন [illegible] নিজে পকেটে পুরে সবসুদ্ধ [illegible] করলে। ধার্মিক শিক্ষিত মানুষটাকে [illegible] নিয়ে এসে অপমানের একশেষ [illegible] এমন সুন্দর পাঠ একেবারে মাটি! [illegible] দেরি হল—খাবোই না আজ [illegible]। উপোসে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক।

মুরারি বেকুব হয়ে গিয়ে খাজাঞ্চিকে বলে, ঘড়ি কেমন করে পকেটে আসে বুঝতে পারছিনে। নিজে আমি কখনো ভুলিনি, অত ভুলো মন নয় আমার।

অবমানিত মুকুন্দর দু-চোখে টপটপ জল পড়ছে। ফতুয়া হাতে তুলে সাহেব বলে, পরে নাও ছোড়দা। সে-ই পরিয়ে বোতাম সমস্ত এঁটে দিল।

খাজাঞ্চি বলে, অমনধারা কেন করলে মাস্টার? ছুটে পালালে, জামা খুলতে দেবে না কিছুতে—তাতেই তো সন্দেহ দাঁড়াল।

মুকুন্দর চোখের জল, সাহেবের জামা পরানো—চৌধুরি-কর্তা এতক্ষণ নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিলেন। জবাবটা তিনিই দিলেন : এই ছাড়া আর কি করবে? পালানো সামান্য

(স-১০৫১)

কথা—ছুটে গিয়ে কাছারির পুকুরে ঝাঁপ দিতেও পারত। যাক প্রাণ বাঁচে মান। মানই তো আমাদের জামাকাপড়ে—তার বড় কি আছে? তুমি আমি চোর আমরা সকলেই, কাপড় চোপড় আর ভালো ভালো কথার বাহারে রেহাই পেয়ে যাই।

সকলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সাহেব এসে মুকুন্দর হাত ধরল: চলো ছোড়দা—

খাজাঞ্চি বলে ওঠে পাঠ তো শেষ হয়নি।

চৌধুরি-কর্তা এবারও জবাব দেন: গলা দিয়ে বেরুবে না পাঠ। গলাটা মানুষের কিনা, গ্রামোফোন-রেকর্ড হলে কথা ছিল না।

কিন্তু লক্ষ্মণ যে মরা অবস্থায় পড়ে রইলেন—

বেঁচে ওঠা ঠাকুরের অদৃষ্টে নেই। [illegible] বাড়িতে [illegible] চৌধুরি [illegible] [illegible] [illegible] বিশ্বাস করতে পারিনে। [illegible] বছর আমি সোনাখালির মহালে আসি। কত-কাল ধরে আসছি। মুকুন্দর জীবনের কোন খবর জানতে আমার বাকি নেই। আসল সময়ে তবু তাকে চোর ভেবে বসলাম।

মুকুন্দর দিকে চেয়ে বললেন, পাঠ শেষ হতে রাত্রি হবে—শুধু-মুখে যেতে দেবো না বলে ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু কোন্ মুখে তোমায় খেতে বলি? খাবেই বা কেন? চলে যাও তুমি বাবা, আর আটকাব না।

মুকুন্দ আর সাহেব বেরিয়ে পড়ে। সাহেব বলে, দোষটা আমারই ছোড়দা, আমার দোষে তোমার হেনস্থা। খেলা করতে গিয়েছিলাম একটু। বড়দা একদিন মটঠাকুরকে ট্যাঙস-ট্যাঙস করে শোনাল আমারই কারণে। সেই রাগ পোষা ছিল। ঘড়িটা তুলে মুঠোয় রেখেছিলাম, কায়দা বুঝে তারপর বড়দার পকেটে ফেললাম। অপদস্থ হবে সকলের সামনে। ভেবেছি চৌধুরির ঘড়ি, [illegible] উপর জলচৌকিতে তিনিই রেখেছেন। [illegible] আমার [illegible] নয়। কিন্তু সে ঘড়ি বড়দাকে বখশিস দিয়েছেন, কেমন করে বুঝব।

নিশ্বাস ফেলে মুকুন্দ বলে, [illegible] বলে, দেখলে তো সাহেব? চোরের বাড়ি বলে পৈতৃক ঘরবাড়ি ছেড়ে ভাগনে বংশীর কাছে উঠলাম, সেখানেও কামাচ্ছো। সব ছেড়ে ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে আছি যার চেয়ে ভাল কাজ হয় না। তবু লোকের চোর ভাবতে আটকায় না।

সাহেব তিক্ত কণ্ঠে বলে, ভাববেই তো। নতুন অভিধানে কথার সব মানে পালটে গেছে। ক্ষমাধিকারী বলেন। শিক্ষক মানেই গরিব লোক। এ বাজারে গরিব হওয়া মানে মানুষটা এমন অপদার্থ, চোর হবারও ক্ষমতা নেই। চোর ভেবে তো সম্মানই করল তোমায়। তার উপরে সাধু নাম একটা আছে তোমার। সাধু মানেই ভণ্ড।—

বর্ধন-বাড়ির উঠান অবধি সাহেব সঙ্গে এলো। মুকুন্দ বাড়ির ভিতর চলে যায়। পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাহেব বাসায় ফিরছে। পচা বাইটার ঘরে আজ আর ঢোকা হল না। সিঁধকাঠি সেই ঝোপের ভিতর পড়ে আছে, মুকুন্দর সামনে তুলে আনতে পারে নি। দাম দিয়ে কাঠি আনা হয়েছে এইমাত্র, সে কাঠি ওস্তাদ এখনো হাতে তুলে দেয় নি। কাঠি হাতে দেখে, আর বড়ানন ও মা-কালীর দোহাই পেড়ে সাগরেদের বিজয়-কামনা করবে। আজকে আর হল না—নিয়মনীতি কাল এসে সারবে। আসা-যাওয়ার অসুবিধা নেই এখন, দিনে রাতে যখন খুশি আসে। [illegible] আগে যত-কিছু [illegible] যত-কিছু গোন-মার [illegible] যাচ্ছে। [illegible] আর ওত পেতে থাকে না, নিজের সুখ নিয়ে মত্ত আছে।

ঠিক দুপুরে বাতাসে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ফেরবার হয় না। এই নিয়েও খানিকটা চিন্তা। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, রোজ-গারের অবস্থা পড়ে গিয়ে তারা সব পর হয়ে পড়েছে। সাহেবই এখন আপন মানুষ—দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র আপন। প্রতিক্ষণ সাহেবকে ভাবছে। সাহেবের কাছে না বলা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। না আসে তো নিজেই তার খোঁজে বেরুবে।

দিনের আলো থাকতে পথ হাঁটতে পারে না। বয়সকালে তবু কিছু পারত, বুড়ো হয়ে এখন একেবারেই না। দিনমানের কড়া রোদে চোখ ঝলসে দেয়, মাটির পথ জলা জায়গা বলে ঠেকে। রাত্রির দুলেদ, দুলেদ দৃষ্টি খুলে যায়—খানাডোবা-পেঁচা-চামচিকের যে দস্তুর।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, সাহেব এলো না। পচা আর সবুর করতে পারে না, বেরিয়ে পড়ল। কষ্ট হচ্ছে বিষম। কী আশ্চর্য, পা-দুটো জড়িয়ে আসে। অপঘাতের আঘাতে একটা দিনের মধ্যেই আধাআধি বুড়ো হয়েছে যেন। বেড়া থেকে একটা বাঁশের খোঁটা খুলে, নিয়ে লাঠির মতন ভর দিয়ে চলে। বুড়ো বাইটা লাঠি ঠুক-ঠুক করে যাচ্ছে—হায় রে হায়, উত্তম-দুর্গমের মতো যে মানুষ একদিন জলে-ডাঙায় ঝিলিক দিয়ে বেড়িয়েছে।

খানিকটা দূরে গিয়ে মস্ত হাঁপ ধরে গেছে। পথের ধারে দূর্বাবন পেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার উপরে। কে মানুষটা আসে? যার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সে-ই। সাহেব। সাহেব, তুই এসে গেছিস বাবা? মা-কালীকে ডাকছি, তোকে এই পথে খেদিয়ে নিয়ে এলেন। আমায় বেশী কষ্ট করতে হল না।

সাহেব বসে পড়ে বাইটার মাথা কোলের উপর তুলে নিল।

তোরই খোঁজে যাচ্ছিলাম রে সাহেব। আজকে আমার বুক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

সাহেব কিন্তু মুচকি হেসে বলে কেন ওস্তাদ?

আমি আর বেঁচে নেই এখন মরে গেছি। নিশ্চয় মরেছি। বুকে একটা ধুকপুকানি থাকলেই বেঁচে থাকা হয় না রে। সইটা ক্ষান্ত থাকলে নক্করেন সুমুখ দিয়ে কখনো জিনিস পাচার হতে পারত না।

দম নিয়ে পচা আবার বলতে লাগল, বেক্সের মাটি খুঁড়ে ছোটবউমার সেই গয়না নিয়ে গেছে। তুই যা আমায় গুরুদক্ষিণা দিয়ে এলি। রাতে আমি ঘুমুইনে কাজ না থাকলেও ঘুম আসে না। খানিক খানিক চোখ বুজে ঝিম হয়ে থাকি কিন্তু কুটো-গাছটি নড়লে টের পেয়ে যাই। চিরকালের গরব আজ ভেঙে গেল সাহেব।

কেঁদে ফেলবে যেন বুড়ো, গলার স্বর তেমনি। সাহেব বলে কাজ [illegible] হয়নি ওস্তাদ। তা হলে কানে পড়ে যেত। দিনমানের কাজ—

পচা বাইটা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে পড়ে: বলিস কি রে?

সাহেব এক সুরে বলে যাচ্ছে, চৌকির উপর বসে বেড়া ঠেসান দিয়ে তামাক খান, সেই সময়টা কাজ চলেছে। এক দিন নয়, সাত-আট দিন ধরে।

তুই কি করে জানলি? তবে কি—

সগর্বে বুকে থাবা মেরে সাহেব বলে, আপনার মতন গুরু যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার অসাধ্য কি আছে? এটা কেমন দেখেন না, এ-রকম মিহি কাজ এক আপনি নিজে পারেন, আর যদি কেউ পারে সে আপনার সাগরেদ।' সৃষ্টিসংসারে এর বাইরে অন্য কেউ পারবে না। একটু একটু করে খোঁড়া হয়েছে সাত-আট দিন ধরে। কাজ দিনমানে সারা হল। আজ আপনার নিচে দিয়ে চোখের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম,

খুঁজে আপনি টের পেলেন না ওস্তাদ।
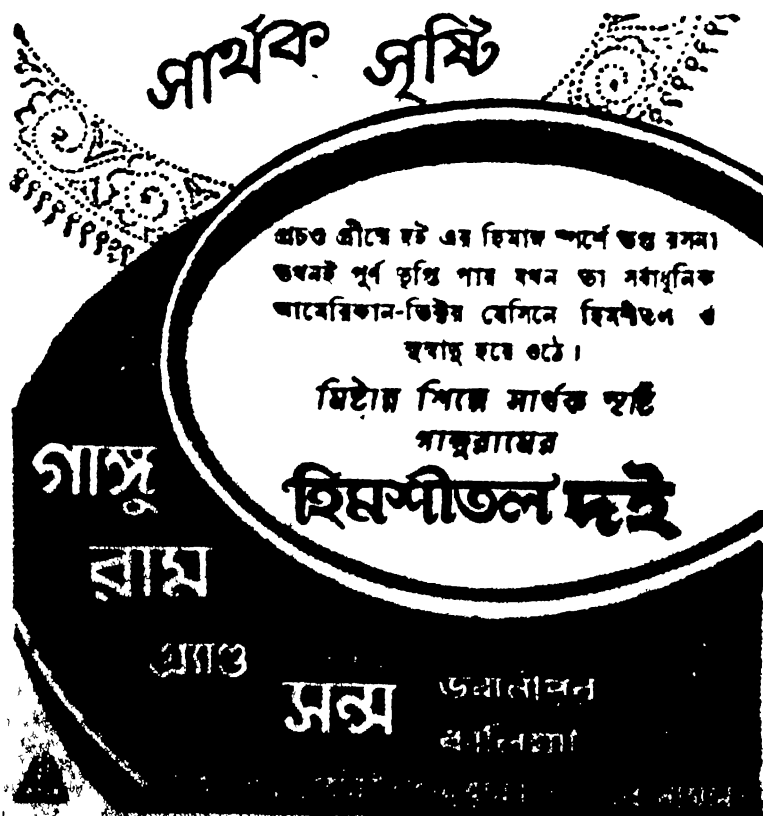
সেই থাকল একটা দিন ও একটা রাত্রি সাহেব নিজের হেপাজতে রেখেছে। এমন যে সন্ধ্যা বাইটা, তার মনেও সন্দেহের বাষ্প-টুকু আসে নি। এমন ধারা পরিপাটি নিখুঁত কাজ—সেকালের কথা জানিনে, এ কালের কটা কারিগর করতে পারে? বাহাদুরি দেখাবার, হয়ে গেল। গয়না সাহেব আবার পচার কাছেই নিয়ে যাচ্ছে। পথের উপর এই দেখা। আর নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের গড়া নতুন সিঁধকাঠি। পাঠ নেওয়ার কাজ ষোলআনা সারা বাইটা মশায় এবারে নিজ হাতে কাঠি তুলে দেবেন। শিরে গুরুর আশীর্বাদ আর হাতে গুরুদত্ত সিঁধকাঠি নিয়ে এদেশ সেদেশ চরে বেড়ানো এবার থেকে।

সাহেব বলে, কাঁচা মাটি দেখে ধরেছি মেঝের তলে মাল রয়েছে। ডিম সরানোর কথা ইঙ্গিত—ভাবলাম, এ কাজেই বা খাটো কিসে তার চেয়ে? লেগে পড়লাম আপনারই দোহাই পেড়ে। চৌকির উপর বসে আপনি তামাক খান আর গল্প করেন পায়ের কাছে বসে বসে শুনি আমি। সেই সময় এক হাতে পদসেবা করছি, আর এক হাতে চৌকির নিচে টিপিটিপি খুঁড়ে যাচ্ছি ছুরি দিয়ে। মাটি খুঁড়ি চলে যাবার সময় আলগা মাটি গর্তে ফেলে [illegible] যাই। কাল বিকেলে কাজ শেষ [illegible] এসে [illegible]। [illegible] টের পেলেন কিনা ঠিক কি।

[illegible] পচা [illegible] বলে ওঠে [illegible] আসনের নিচে [illegible] আমি তার তিলার্ধটুকু জানলাম না। মরি মরি হাত হয়েছে বটে একখানা! হাত না পাখির পালক!

সাহেব বলে খুশী করতে পেরেছি তবে? পাখির বুকের তলা থেকে ডিম আনার সামিল হল কিনা বলুন এবারে ওস্তাদ।

পচা উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে, তার অনেক বেশী। আমার কান অনেক বড় পাখির চেয়ে।

চুড়িজোড়া সাহেব গাঁজিয়ার মধ্যে ভরে কোমরে বেঁধে এনেছে। পচার হাতটা কাপড়ের উপর দিয়ে সেই জায়গায় ঘুরিয়ে দিল। বলে, পায়ে বাঁধা কাঠিও আছে। বাড়ি চলুন, ঘরে গিয়ে এসব বের করব।

যেতে যেতে পচাই বলে, গয়না তোরই এখন, আমার কোন দাবি নেই। দক্ষিণা পেয়ে গেছি। রাখতে যদি না পেরে থাকি, সে দোষ আমার। নিজের ক্ষমতায় জিনে নিয়েছিস। বিক্রি কর, দানসত্র করে দে, গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেল। যা খুশী করতে পারিস। বলবার কিছু নেই।

[illegible] আবার বলে, জিনিসটা ভাল রে। আমি বলি, বিয়ে করে বউয়ের হাতে পরিয়ে দিস। রেখে সে যত্ন করে।

পচা, বাইটার পিছনে সাহেব নিঃশব্দে ভাবতে ভাবতে চলেছে। উঠোনে পা দিয়ে সুভদ্রা-বউকে দেখতে পাওয়া যায়। কোঠা-ঘরের বারাণ্ডার উপর এদিক পানে তাকিয়ে আছে। হাতছানি দিল সাহেবকে।

সে সুভদ্রা নয় আর এখন। নির্ভয়ে চলে যাওয়া যায়। আরও কোন কোন রাতে মাস-কচুবনে দাঁড়িয়ে সাহেব শুনে এসেছে—স্বামীর সোহাগিনী বউ। সাহেবের সঙ্গে—এবং অনুমান করা যায়, বাড়ির সকলের সঙ্গেই মিষ্টিমধুর সম্পর্ক তার।

সুভদ্রা ডাক দিল, একটা কথা শুনে যেও ঠাকুরপো।

সাহেবও উত্তর দেয়: যাচ্ছি বউঠান।

পচার ঘরে ঢুকে পায়ে-বাঁধা সিঁধকাঠি খুলে রাখল। চুড়ি বের করল কোমরের গাঁজিয়া থেকে। বলে, দানসত্র করবার হুকুমও দিয়েছেন ওস্তাদ আমি তাই করব। যার গয়না তাকেই দিয়ে আসি। আদর করে আপনিই তো একদিন হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। [illegible] কক্ষনো ফেরত চান নি, [illegible] কথা। সেটা হয়ে গেছে। সর্বদা চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারেন নি। বউঠান জানে কাজ আপনারই। বউ [illegible] আপনার [illegible] আমার [illegible] করলেন। কাঁদিয়ে নিয়ে [illegible] আমার।

[illegible] ঘুরে [illegible] সাহেব মলিন মুখে [illegible]: [illegible] বউঠান [illegible] সেই থেকে কেমন [illegible] কাঁদছে যে এই [illegible]। সে [illegible] আজকে [illegible] দিন। এ দিনটার [illegible] মুখ দেখে যেতে ইচ্ছে করছে [illegible] কি হুকুম আপনার ওস্তাদ?

[illegible] নিয়ে সাহেব সুভদ্রা-বউয়ের কাছে গেল। বারাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়েছে।

সুভদ্রা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, কাছারিবাড়ি গেছে তোমার দাদা। চৌধুরি-কর্তা সকাল থেকে ডাকাডাকি করছে, দুপুরে বরকন্দাজ এসে গেছে। আমি মানা করলাম: কক্ষনো না, অমন হেনস্থা যেখানে থুতু ফেলতেও তাদের কাছে যাবে না। দুপুর-বেলা বটঠাকুর খেতে এসে বললেন, না গেলে বুড়োমানুষ বলে দিয়েছে নিজে সে চলে আসবে। এর পরেও গোঁ ধরে থাকলে মানব চটে যাবে, অন্তত বড়ভাইয়ের মুখ চেয়েও যেতে হবে একটিবার। কি করব ঠাকুরপো—বলে দিলাম, রোদ পড়লে সন্ধ্যার পর যাবে। দেখা দিয়েই চলে আসবে। অনেকক্ষণ গেছে, এখনো ফেরে না। ক'খানা লুচি ভেজেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেল।

সাহেব দুষ্টামি করে বলে, সেই একদিন নামাবলী মুছবার কথা হয়েছিল, মনে পড়ে বউঠান?

সুভদ্রা আকাশ থেকে পড়ে : ওমা, কবে? [illegible] নামাবলী ভাই?

[illegible] দেবদেবী আছেন। [illegible] হয়ে [illegible], ছোড়-দা এসে সব মুছে ফেলেন—ভুলে গেলেন সমস্ত কথা?

সুভদ্রা শিউরে উঠে মুকুন্দর কপালে ঠেকিয়ে বলে, ভুলেও ওসব উচ্চারণ করবে না, পাপ হয়। বেশ তো আছেন দেবদেবীরা আমার বুকখানা জুড়ে আছেন। তোমার ছোড়-দাকে বলব—তার নামটাও লিখে দেবে ঐ সব নামের নিচে।

যে জন্যে সাহেব এসেছে—হাসিমুখে চুড়-জোড়া বের করে ধরল : গয়না নিয়ে নিন বউঠান। কথা দিয়েছিলাম—দেখুন উদ্ধার করে আনলাম। নিন, পরে ফেলুন। ছোড়দা এলে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

বারান্ডার প্রান্তে রেখে দিয়েছে। তুলে নিতে আসছিল সুভদ্রা, এমনি সময় কাছারি-বাড়ির ফেরত মুকুন্দ উঠানে ঢুকল। ছেলেমানুষের মতো সুভদ্রা এক ছুটে তার কাছে চলে যায় : অত [illegible] কেন গো?

[illegible] চৌধুরি-কর্তা [illegible] হাত [illegible] থেকে শিখে এসে ওঁর ছেলে বিদেশির কারচুপি করেছে—আইনে-বাঁধা চুক্তি হয়েছে, মামলাতে পারছে না। ছেলে কাজ বোঝে, কারবার একেবারে বোঝে না। ম্যানেজার করে আমার উপর ঐ দিকটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন।

সুভদ্রা হেসে বলে, তুমিই যেন কত বোঝ! চিরটা কাল মাস্টারি করছ—

চৌধুরি-কর্তা চাচ্ছেন তাই। যারা রয়েছে তারা সব ঘাঘু লোক, সন্ত শ্রেণী রকম বোঝে। কম বোঝে এমনি সৎ মানুষ চান তিনি। আমার পাঠ শুনে মেতে গিয়েছেন। ম্যানেজারের কোয়ার্টার ওঁদের বাড়ির কাছাকাছি। হাত ধরে বললেন যে কদিন বাঁচি সন্ধ্যাবেলাটা একটু একটু ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনতে পাব সে-ও আমার বড় লাভের ব্যাপার। বুড়োমানুষ নাছোড়-বান্দা হয়ে ধরেছেন।

সাহেব উল্লসিত হয়ে বলে, কারখানার ম্যানেজার চৌধুরিদের ছোড়দা, শহরের উপর বাসা। বউঠানের কত সাধ, বাসা করে দুজনে তোমরা থাকবে।

মুকুন্দ বলে সেইটে জানি বলেই নিমরাজি হয়ে এলাম। দেখা যাক ভাল করে ভেবে-চিন্তে যুক্তিপরামর্শ করে—

কিন্তু যে লোকের সাধ মেটাবার জন্য ভাবনাচিন্তা নিতান্ত উদাসীন ভাব তার যেন, এত কথার একটিও বুঝি কানে গেল না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুভদ্রা : গিয়েছ সেই কখন! সেখানে এতক্ষণ বকবক করে এলে, বাড়ি এসেও তাই। হাত-পা ধুয়ে তাড়া-তাড়ি রান্নাঘরে চলে এসো। খাবার দিচ্ছি।

তাড়া পেয়ে মুকুন্দ জলের বালতির দিকে যায়। খাবার দিতে সুভদ্রা রান্নাঘরে ছুটল। সাহেব পিছনে ডাক দেয় : গয়না পড়ে রইল বউঠান। তুলে রেখে দিন।

ও, হাঁ—

মনে পড়ে গেল সুভদ্রার, কয়েক পা ফিরে এসে চুড়জোড়া বাঁহাতে তুলে নিল। এত সাধের গয়নাখানা—কোঠাঘরে যে সামাল করে রেখে আসবে তা নয়, দুটো আঙুলে ঝুলিয়ে অমনি রান্নাঘরে চলল। কত কষ্ট করে কত [illegible] [illegible] উদ্ধার করে আনা—[illegible] সাহেবকে [illegible] মুখের কথা বলল না, মুখের দিকে তাকালই না [illegible] করে। [illegible]

...সাধ হওয়া উচিত, উল্টে হাসির আলোয় সাহেবের মুখ চিকচিক করে। ওস্তাদের হাত থেকে আজকেই সিঁধকাঠি পেয়েছে—কাঠি ধরে ঘরে ঘরে নাকি মন্দ করে বেড়াবে। সে জোয়ার হবে না সাহেব। কাজ করতে পারা যায়, কিন্তু মন্দ করা বড় শক্ত।

ঠিক এই রাতে অনেক দূরে কালীঘাটের ফণী-আড্ডির বস্তিতে হুলুস্থুল কাণ্ড। রানী গলায়-দড়ি দিয়েছে—পারুলের বড় আদরের মেয়ে রানী। মাটকোঠার প্রান্তে যেখানটা পারুলের ঘর ছিল, সেখানে এখন দোতলা পাকা-দালান উঠেছে রানীর জন্য। উপরে এক কুঠুরি, নিচে এক কুঠুরি এবং সিঁড়ি। উপরের ঘর রানীর, নিচের ঘরে মা পারুল থাকে। রানীর এখন গা-ভরা গয়না—ছেলেবয়সের মতন ঝুটো গয়না নয়, আসল গিনি সোনার জিনিস। এত সুখ নিয়ে হতচ্ছাড়ি মেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল।

ছাতের কড়িকাঠ অবধি নাগাল পায় না, খাটের উপর তাই টুল বসিয়েছে। শাড়ির এক প্রান্ত কড়িকাঠে বেঁধে অন্য প্রান্ত পেঁচিয়ে নিয়েছে নিজের গলায়। পায়ের ধাক্কায় টুল উল্টে দিয়ে তারপর ঝুলে পড়ল। কয়েদির যেমন দস্তুর। খবরাখবর নিয়েছে—সরকার বাহাদুর ফাঁসিতে লটকান, সে পদ্ধতিও মোটামুটি এই।

কাজের কিন্তু খুঁত থেকে গিয়েছিল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে ঠিক মতো হাত পৌঁছয়নি, কড়িকাঠের বাঁধন আলগা হয়ে গেল। রানী বুঝতে পারেনি সেটা। সেই মুহূর্তে ঝুলে পড়া বাঁধন খুলে ধপ করে সে মেজেয় পড়ে গেল। গলায় ফাঁস এঁটে গিয়ে গোঙানি। বিষম গুমট আতঙ্ক হাওয়ার লেশমাত্র নেই। পারুল ঘরে শুতে পারেনি, সিঁড়ির ধারে রোয়াকের উপর মাদুর বিছিয়ে পড়েছিল। ঘরে না শুয়ে ভাগ্যিস ছিল আজ বাইরে। সশব্দে টুল এবং মানুষ পড়ে যাওয়া, পর মুহূর্তে দম-আটকানো গলার বীভৎস ঘড়ঘড়ানি—ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করে পারুল উপরে ছুটল। জানলা খোলা। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে, সে আলোয় সঠিক কিছু ঠাহর হচ্ছে না। জানলার গরাদের উপর পারুল মাথা-ভাঙাভাঙি করছে: রানী, ওরে রানী, কি হয়েছে? জবাব দে মা, দোর খোল—

সব ঘরের সকল মানুষ এসে পড়ল। দমাদম লাথি দরজার উপর। খিল ভেঙে পাল্লা খুলে পড়ে। এই আর এক ভুল রানীর। মরবার তাড়ায় শুধুমাত্র খিল এঁটেছে, হুড়কো দিতে মনে নেই। তা হলে সহজে হত না।

আলো কোথা? আলো নিয়ে এসো শিগগির... গলার ফাঁস খোল। খোলা যাচ্ছে না তো কেটে ফেল কাপড়ের ওখানটা—

স্পষ্টাস্পষ্টি কলহ নয় বটে—কথা-কাটাকাটি, মুখ আঁধার করে বেড়ানো, চোখের জল ফেলা ইদানীং লেগেই আছে মা ও মেয়ের মধ্যে। কিন্তু এত বড় কাণ্ড করে বসবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পারুল। ভারি চাপা মেয়ে—ভাবে যতখানি, বলে তার অতি সামান্য। গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছে ফনী আড্ডি মরে গিয়ে মলয়কুমার আঢ্য মাটকোঠার যখন নতুন মালিক হল। সাহেবদের দলের সেই ঝিঙে ছোঁড়াটা মলয়কুমার এখন।

ফণী আড্ডির তিন ছেলে—ঝিঙে সকলের ছোট। প্রথম পক্ষ গত হবার পর ফনী দ্বিতীয় সংসার করেছিল, সে বউয়ের ছেলেপুলে হয়নি। ফণী যতদিন বেঁচে ছিল, বউছেলেরা সামনে [illegible] করেছে—হাড়কঞ্জুস [illegible] হাঁড়ি ফেটে যায়, এমনি [illegible] পর এখন গদগদ অবস্থা—এমন [illegible] মানুষ হয় না। এবং চরম [illegible]—পুরো মাপের কাপড় পরেনি জীবনে, আটহাতি ধুতি হাঁটুর উপর তুলে ঘুরে বেড়াত, শীত-গ্রীষ্মে একটি মাত্র গলাবন্ধ সুতি কোট। না খেলে প্রাণরক্ষা হয় না—ঈশ্বরের এই বিদঘুটে নিয়মের জন্য যেটুকু নইলে নয় তাই খেয়েছে, বউ-ছেলেদের খাইয়েছে। বয়স হয়ে অনেকের ধর্মে মতি যায়, দানধ্যানে পয়সা নষ্ট করে। ফণী আড্ডি মরে

[illegible] দ্বিতীয় পক্ষের [illegible] ঠাকুরের প্রয়োজনে [illegible] : এক বছর রেখে গেছেন, শ্রাদ্ধটা ঘটা করে হোক। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আত্মীয় স্বজন ছাড়াও কালীঘাটের কাঙালি ডেকে লুচি-হালুয়া খাইয়ে দেবো।

বড়ছেলে শিউরে আপত্তি করে ওঠে : ক্ষেপেছ মা—

মৃতে ভূরিভোজনের নিয়ম, ঠাকুরমশায় বললেন। আত্মা তৃপ্তি পায়।

তেমন ছেঁদো আত্মা আমার বাবার নয়। খাওয়ানো দেখে ছটফট করবেন স্বর্গধাম থেকে। চাই কি, ভূত হয়ে নেমে এসে ঘাড় মটকে শোধ নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রাদ্ধ অতএব নমো-নমো করে সারা হল। আলিপুরের এক মোক্তার ফণীর ভগ্নিপতি। এক জায়গায় সকলকে ডেকে মোক্তার মশায় বললেন, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই—আজ না হোক, কাল তো হবেই। আমি বলি, নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগ-বাটোয়ারা করে নাও। আপোষে না করলে পরিণামে লাঠালাঠি, মামলামোকদ্দমা—আদালতের আমরাই ভাগাভাগি করে নেবো, তোমাদের ভাগ্যে মুলোর ডাঁটা।

তিনিই মধ্যবর্তী হয়ে বাঁটোয়ারা করতে বললেন। নগদ টাকার ব্যাপারে হাঙ্গামা নেই, সকলের সমান। সম্পত্তির সাড়ে তিন ভাগ—তিন ভাগ তিন ছেলের, আধা ভাগটা বিধবার। নিয়ম হল, ছোটজন সকলের আগে পছন্দ করবে। মোক্তার বললেন, কোন ভাগটা নিবিবে খিতে, ভেবেচিন্তে দেখ।

খিতে গরম হয়ে বলে, বড় হয়েছি পিসে-মশায়, খিতে-খিতে করবেন না। মলয়-কুমার—

মোক্তার একগাল হেসে বলেন, বড় বুঝি একদিনে হলি! কালও তো, কতবার খিতে বলে ডেকেছি।

বড় ভাই বলে, অতগুলো টাকা নগদ নগদ হাতে এসে গেল, বড় হতে তারপরে কি আর দেরি হয়? কিন্তু তোর পোশাকি নাম তো ষষ্ঠীকুমার, সাত জন্ম ধরে ভাবলেও বাবার মাথায় মলয়কুমার আসত না—

মেজভাই টিপ্পনী কাটে : নতুন সাবালক হয়ে মিষ্টি নাম নিল তার কি পছন্দ করে—

বড়ভাই বলে, তাই বুঝি? মলয়কুমার তবে নিতে গেলি কেন রে, ওর চেয়ে আরও মিষ্টি তো কত আছে! মিহিরকুমার, কিম্বা রসগোল্লাকুমার—

মোটের উপর খিতে বলা চলবে না আর এখন—বাবু মলয়কুমার আজ। [illegible] একটা একতলা বাড়ি এবং আলিপুরের [illegible]

[illegible] হয়ে [illegible] পাগল [illegible] করে। সেটোর পরে [illegible] যায়। পারুলে হঠাৎ মা হয়ে গেছে তার— ভাইঝির পড়ে যখন-তখন মা-মা করে পারুলের ঘরে ঢুকে পড়ে। ফিসিরফিসির গুজুরগুজুর দুজনে। ভবিষ্যতের নানা মতলব—মাটকোঠা ভেঙে পাকাকোঠা হবে এখানে—আজেবাজে ঘুণে-খাওয়া ভাড়াটেগুলোকে দূর করে তাড়াবে।

একদিন বলল, তোমার ঘর আর পাশের ঐ জায়গাটুকু রানীর নামে লিখে দেব ভাবছি। ওকে রাজি করাও মা, আমি বলতে গেলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে।

পারুল এতটুকু হয়ে বলে, আপন ভাল পাগলেও বোঝে। ঐ রকম একগুঁয়ে বাবা, ওর কথায় কিছু মনে কোরো না—

বড়ঘরের পাশে জিনিসপত্রে ঠাসা ছোট্ট ঘরটা দেখিয়ে পারুল আবার বলে, বড় হয়ে গেছে তো এখন, ঐ পায়রার খোপের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে থাকতে [illegible] আরও বিগড়ে যায়। সকলের দেখছে [illegible] সাজানোগোছানো ঘর –

এই জন্যে? মলয়কুমার [illegible] বলে, সোজাসুজি বললেই তো পারে। মন গুমরে থাকে কেন?

অতএব গোটা বস্তি ভেঙে দিয়ে দালান-কোঠা যেদিন হয় হবে, রানীর পাকাঘর এখনই চাই। বিবেচক পিতৃদেব নগদ টাকা রেখে গেছেন— হতে অসুবিধাও নেই। মাটিতেও থাকবে না রানী, তার ঘর দোতলায়। নিচের [illegible], পাশ দিয়ে সিঁড়ি। রানী এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে। ঘরের জানলা দিয়ে মায়ের মন্দির আদিগঙ্গা গঙ্গার পুল দেখা যায়। কত সুখ রানীর!

সেই সুখের ঘরে কটা দিন বসবাস করে রানী মরতে গেল। রাজপুরের বেশ্যাপাড়া।

(ক্রমশ)

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

এটাই আন্তর্জাতিক মহিলা সংহতির জন্ম কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হয়তো পৃথিবীর বহু শুভ-সূচনার সূত্রপাত এমনি করেই হয়। কানাডার অন্টেরিওতে হ্যামিলটন নামে একটি ছোট্ট জায়গায় থাকতেন শ্রীমতী হুডলেস। তিনি ছিলেন দেড় বছরের একটি সুস্থ, সবল, সুন্দর শিশুর জননী। বীজাণুদূষিত দুধ খেয়ে এই শিশুর মৃত্যু হয়। শ্রীমতী হুডলেস নিদারুণ শোকের মধ্যেও উপলব্ধি করলেন তাঁরই অজ্ঞতা-বশত এই অঘটন ঘটে গেল। তিনি ব্রত নিলেন পল্লীগ্রামের প্রত্যেক মাকে, প্রত্যেক মেয়েকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বাঁচাতে হবে। ১৮৯৬ সালে তিনি অন্টেরিওর কৃষি কলেজে এই মর্মে বক্তৃতা দিলেন। কৃষি কলেজের কর্তৃপক্ষ বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। প্রথমদিন ৩৫টি মহিলা এলেন। দ্বিতীয় দিন এলেন ১০১টি। আগ্রহ বেড়েই চললো। গৃহিণীপনাও যে শিক্ষার প্রয়োজন একথা আগে কেউ কোনদিন ভাবেনি। গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও আর পাঁচটা শিক্ষণীয় বিষয়েরই মত এ উপলব্ধির ফলে জন্ম হল প্রথম মহিলা সমিতি উইমেন্স ইনস্টিটিউট-এর।

আবার কানাডা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নরওয়ের মেয়েরাও তখন ভাবছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ হবার কথা। প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, পর্বতসংকুল দীর্ঘ উপকূল রেখা নরওয়ের গ্রামাঞ্চলকে কুণ্ঠিত, সংকুচিত করে রেখেছিল। চলাচলের পথ কঠিন, বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ কম, দারুণ শীত, দৈনন্দিন জীবন ধারণের ক্লেশ পল্লীর ঘরনীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ১৮৯৮ সালে ১০ই মার্চ নরওয়ের পল্লীরমণী সঙ্ঘ বা House-wives Association-এর পত্তন হয়।

নরওয়ের নেহাত প্রতিবেশী ফিনল্যান্ড। ১৮৯৯ সালে মার্থা অর্গানিজেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ আরম্ভ করে। ফিনল্যান্ডের তখন দুঃসময়। তদানীন্তন রুশ সাম্রাজ্য তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে উদ্যত। তার ভাষা, জাতীয় কৃষ্টি সবকিছুই বিপন্ন। মার্থা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো এই জাতীয় গৌরব বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। ক্রমে তাঁরা উপলব্ধি করলেন [illegible] সন্তান শিক্ষা দেওয়া, [illegible] [illegible] ও দেশের [illegible]

কুয়ালালামপুরে (মালয়) অনুষ্ঠিত এসোসিয়েটেড কান্ট্রি উওমেন অব দি ওয়ার্ল্ড-এর অধিবেশনে সমাগত সদস্যদের একাংশ

তোলা সকল জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার কথা। তারই উপর নির্ভর করে পরিবারের মঙ্গল। পরিবারের সমষ্টিই তো গ্রাম, শহর, দেশ মহাদেশ সারা বিশ্ব। মার্থা প্রতিষ্ঠান পল্লী অঞ্চলে রান্না সেলাই থেকে শুরু করে হাঁসমুরগী পালনও গৃহস্থরমণীকে শেখাতে লাগলেন।

ইংল্যান্ডে, জার্মানীতে ডেনমার্কে সর্বত্র যে কোন না কেন কারণে নারী সঙ্ঘের সূত্রপাত হতে লাগল। কোথাও বা রাজনৈতিক কারণে, কোথাও বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেরণায় গৃহস্থবধূ এগিয়ে এলেন পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। বিশ্বজোড়া সাড়া এল। শ্রীমতী হুডলেস যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন সফল করবার জন্য তিনটি অক্লান্তকর্মী মহিলা বদ্ধপরিকর হলেন। স্কটল্যান্ডে লেডি এবার্ডিন কানাডায় শ্রীমতী ওয়াট ও ইংল্যান্ডে শ্রীমতী জিমার একত্র হয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করলেন। বিভিন্ন দেশের সমাজসেবী মহিলাদের একটি সম্মেলন ডাকা হলো। বহু আলাপ-আলোচনার পর প্রতিষ্ঠিত হলো Associated country women of the world বা সংযুক্ত বিশ্বগ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘ। এই সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন শ্রীমতী হ্যানা সেন। তিনি সম্মেলনে সরোজনলিনী দত্তের মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা বললেন। ১৯১৩ সাল থেকে স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত পল্লীবধূ ও পল্লীবালার সকল রকম উন্নতির আশায় সমিতি প্রতিষ্ঠা শুরু করেছিলেন। [illegible] বহু পরে ১৯২১ সালে ইংলন্ডে ফিরে তিনি দেখেছিলেন ঠিক ভারতবর্ষের মহিলা সমিতির মত পল্লীনারীর [illegible] দেশে মহিলা-সংগঠনের কাজ চলেছে।

পৃথিবীর দূর দূরতম কোণেও পল্লী অঞ্চলে মেয়েরা একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিল—সুগৃহিণী হতে হলে, সংসার সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে

প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী ব্যাপক শিক্ষার আর পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা সবকিছুর আলোচনা করা।

শহরের মেয়ের সুযোগ-সুবিধা বেশী, সমস্যাও ভিন্ন। তাদের আন্তর্জাতিক

প্রতিষ্ঠান একটি আগেই গড়ে উঠেছিল। ১৮৯৩ সালে কাউণ্টেস এবারডিনের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মহিলা সংঘ ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন যুক্তভাবে কাজ আরম্ভ করে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন-এর বিভিন্ন দেশের জাতীয় মহিলা সংস্থার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল আজ পর্যন্ত বহু হিতসাধনে সমর্থ হয়েছে। ইণ্টার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইম্যান-এর সঙ্গে একটি গ্রামীণ সংস্থার একযোগে কাজ করার সুফল কতটা হবে এ নিয়ে অনেক দ্বিধা, অনেক আলাপ আলোচনাও কিছুদিন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কর্মীরা এ কথাই মেনে নিলেন যে, পল্লী অঞ্চলের গৃহস্থবধূর সমস্যা আর শহরের মেয়ের প্রয়োজনবোধ এক নয়।

আজ অ্যাসোসিয়েটেড কান্ট্রি উইমেন অব দি ওয়ার্ল্ড (এ সি ডবলিউ ডবলিউ)-এর সদস্য সংখ্যা ছয় কোটিরও বেশী। ৩৬টি বিভিন্ন দেশে শাখা হয়েছে। কার্যকরী সমিতির কার্যালয় লণ্ডনে। এ সি ডবলিউ ডবলিউর সদস্য দেশগুলিকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে—উত্তর ইউরোপ, দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে আছে মালয়, ফিলিপিন, সিংহল, ভারতবর্ষ পাকিস্তান লেবানন থাইল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, সারাওয়াক প্রভৃতি দেশ। এ সি ডবলিউ ডবলিউর যিনি সভানেত্রী তাঁকে বিশ্বসভানেত্রী বলা হয়। তিনজন সহ-সভানেত্রী আছেন। সাতটি বিভাগের জন্য সাতজন আলাদা সহ-সভানেত্রীও আছেন। বর্তমানে এশিয়ার সহ সভানেত্রী শ্রীমতী আরতি দত্ত। প্রতি তিন বছর অন্তর আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের নবম অধিবেশন হয়ে গেল। এ অধিবেশনে মাওরি মেয়ে আর মার্কিন দেশের খামারের ভাবক পল্লীবধূ আর ব্রিটেনের কৃষক কন্যা পাশাপাশি বসে আলোচনা করলেন—কি তাদের সমস্যা। এ সি ডবলিউ ডবলিউ প্রতিষ্ঠার পর বহু বছর কেটে গেছে -আজ তো শুধু গৃহস্থালী আর ঘরকন্নাই মেয়েদের জীবনের সব নয়। সে চায় পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা সংসারের সকল ক্ষেত্রে। ঘরকন্না ফেলে যেখানে নয়, কিন্তু জগৎজোড়া নারী-সমাজ সুষ্ঠু গৃহিণীপনা করেও আরও কিছু করতে চায়। সব আশা আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করে মেয়েরা ঘরে ফিরে যায়। ঘরে তার অনেক কাজ, তার নিকটতম পরিবেশকে সুন্দর করতে হবে, আর সুন্দর করতে হবে তার দেশকে, সমাজকে।

এই বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে এশিয়ার অনগ্রসর দেশের মেয়েরাও এক হয়েছেন। সিংহলে লংকা মহিলা সমিতি, মালয়ে জাতীয় মহিলা সংগঠন প্রভৃতি প্রশংসাযোগ্য কাজ করে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষে তিনটি সমিতি এ সি ডবলিউ ডবলিউর সদস্য। সর্বোজনমিলনী নারীমঙ্গল সমিতি, নিখিল ভারতীয় গ্রামীণ মহিলা সংঘ ও আসাম মহিলা সম্মেলন। নারী সমাজের বিশেষত পল্লীনারীর সর্বাংগীণ উন্নতিই প্রত্যেকের লক্ষ্য।

১৯৬১ সালে এ সি ডবলিউ ডবলিউর এশিয়া শাখার অধিবেশন হয়েছিল মালয়ের কুয়ালালামপুরে। মালয়ের জাতীয় মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রীমতী কৃপালনি মহাত্মা গান্ধীর বাণী স্মরণ করে সুন্দর বক্তৃতা দেন। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন "মানুষ যতরকম অন্যায়ের জন্য দায়ী তার মধ্যে বিশ্বমানব পরিবারের শ্রেষ্ঠতর অর্ধেকের অবমাননার মত জঘন্য, ঘৃণ্য পাশবিক অন্যায় আর কোনটাই নয়। আমি এ অর্ধেককে নারী জাতি বলবো, দুর্বল বা অবলা বলবো না। নারী মহত্তর; কারণ আজও নারীই আত্মত্যাগ, নীরব কষ্টসহিষ্ণুতা, বিনয়, বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রতিমূর্তি।" নারীর বিশ্বসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে হবে। তার জন্যও সে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবে; কারণ মহাত্মা গান্ধী আরও বলেছেন, নারীর আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার আর কারও হাতে নয়; তা নিজের হাতে। প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নয়, যেখানে সে কল্যাণী, সেখানে তার কল্যাণস্পর্শ আরও নিবিড় হবে, যেখানে তাকে দূরে রাখা হয়েছে সেখানে সে প্রবেশাধিকার পাবে তবেই তো তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মাধ্যমে ধন্য হবে,

বেলা শেষের গান

ধীরেশ ভট্টাচার্য

অবশেষে ঐ শেষ দিনটাও এসে পড়ল। ভবতোষবাবু মনে মনে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অনেকদিন থেকেই একটু একটু করে চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন তিনি ভেতর ভেতর যেন দুর্বল বোধ করছিলেন প্রথম যেদিন বিদায়ের নোটিসটা হাতে এল। বিদায় যে একদিন নিতে হবে, এ তো জানা কথা- যেমন মৃত্যুর অনিবার্যতা। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি না হয়ে সে সত্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে ভবতোষবাবু পেরেছেন? অথচ আজ চল্লিশ বছর ধরেই তো তিল তিল করে চাকরির এই পরিণতির দিকে এগিয়ে আসছিলেন তিনি।

চল্লিশ বছর! ভবতোষবাবু বিস্মিত হয়ে পেছনের দীর্ঘ ছায়াটার দিকে তাকান। হ্যাঁ চল্লিশ বছরই পূর্ণ হয়েছে। অথচ মনে হয় ক'দিনের কথাই বা। ঐ তো পরেশ ঘোষ 'রিটায়ার' করতে সেদিন তিনি আর একটা 'লিফ্‌ট' পেলেন। আয়েঙ্গার সাহেব সেবার তাঁর বাজেট-ড্রাফট দেখে ওই যে দিল্লিতে রেকমেণ্ড করেছিলেন, সেটাই বা ক'দিনের ঘটনা। এ অফিসে দাস সাহেব ছিলেন, রমন সাহেব ছিলেন, পি জি দত্ত তো তাঁকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন, আর খাস বিলিতী সাহেব ডাইট ডিমেলোর আমলে তাঁর চাকরিতে প্রথম অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট। মোটা তুলিতে আঁকা কালিগুলো এখনো মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা সব। আশ্চর্য, এর মধ্যেই চল্লিশটা বছর কেটে গেল।

অথচ চাকরিতে প্রথম যেদিন 'জয়েন' করেন সেদিনের স্মৃতিটা এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর। সুধাকান্তবাবুর পাশে বসে লেজারের খাতায় তাঁর প্রথম হাতে-খড়ি হয়। সুধাকান্তবাবু বড় বেশী পান খেতেন। ডিবা ভরতি পান বাড়ী থেকে সাজিয়ে এনে অফিসে ঢুকেই প্রথমে 'গ্রুপ-ইনচার্জ' মৃন্ময়বাবুর সামনে ডিবা খুলে ধরতেন। এ নিয়ে অফিসের ছেলেরা হাসাহাসি করত। সুধাকান্তবাবুও সহাস্যে বলতেন 'তোমরা ইয়ং জেনারেশন, বিলোলটিং। আমার মতন বুড়ো হও, তখন এর মর্ম বুঝবে।

সেই সুধাকান্তবাবু একদিন রিটায়ার্ড হলেন। মৃন্ময়বাবুও আর একটা 'লিফট্' পেয়ে বিদায় নিলেন। সুধীরবাবু বাত-ব্যাধিতে ভুগে ভুগে শেষে ইনভ্যালিড্ পেনসন্ নিতে বাধ্য হলেন। আর হরিচরণ আর্দালিটা ঐ যে জ্বর নিয়ে দেশে গেল, আর সে ফিরল না। চাকুরিজীবনে এমন অসংখ্য ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে করলে আজও স্পষ্ট চোখে ভেসে ওঠে তাঁর। মনে হয়, ঐ তো সেদিনের ঘটনা! অথচ এর মধ্যেই একটু একটু করে গোটা চল্লিশটা বছর কেটে গেছে, ঋতু-ঋতুর পট-পরিবর্তনের মত তাঁর জীবনের ওপর দিয়েও কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়ত্বের কালস্রোত একটার পর একটা বয়ে চলে গেছে তিনি কিছুই জানতে পারেন নি যেন বুঝতেও পারেন নি।

সেদিনের তরুণ ভবতোষবাবু প্রথম যেদিন এই সরকারী অফিসে প্রবেশ করেন, তারপর থেকেই অফিস আর তার দায়-দায়িত্ব, ঝামেলা, উত্তেজনা, উন্নতি, প্রমোশন, আর মোটা মোটা ফাইলের মধ্যে এমন ডুবে গেলেন যে জীবনের ওপর দিয়ে কখন যে এতটা ঋতু পার হয়ে গেল, তিনি যেন তা জানতেও পারেন নি। এ যেন সেই 'রিপ্-ভ্যান-উইঙ্কলে'র যুগ-যুগব্যাপী নিদ্রা, অথবা রাজা যযাতির সহস্র বৎসরের মোহগ্রস্ত যৌবন।

বস্তুত এই কথাগুলোই এতক্ষণ বসে বসে এলোমেলোভাবে ভাবছিলেন ভবতোষ-বাবু। তাঁর চোখের সামনে এতদিনের সহকর্মী বন্ধুরা কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে তাঁর দিকেই যে উৎসুক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তা তিনি দেখেও দেখছিলেন না। অফিস-প্রাঙ্গণে তাঁরই 'ফেয়ার-ওয়েল' উপলক্ষে ছোট একটা সভার আয়োজন হয়েছে। তিন-চারটে ডিপার্টমেণ্টের সহকর্মীরা চাঁদা তুলে এ ব্যবস্থা করেছে। এক দিকে সারি সারি কয়েকটা আসনে অফিসের বিশিষ্ট কর্মীরা উপবিষ্ট, তাঁদেরই মাঝখানের আসনটায় ভবতোষবাবু

নিজে বসেছেন; সামনে বড় একটা টেবিলের ওপর সহকর্মীদের চাঁদার প্রীতি-উপহার—একখানি দামী কাশ্মীরী শাল, রূপোর বাঁধান একটা বেতের ছড়ি, আর একখানি ভগবতগীতা।

ডেপুটি ইন্-চার্জ রথীনবাবু এতক্ষণ ভবতোষবাবুর চাকরিজীবনের কর্মকুশলতার প্রশংসা আর অবসরজীবনের সুখ ও শান্তি কামনা করে এইমাত্র উপবেশন করলেন এবং তার পরেই অ্যাকাণ্টস্ ব্রাঞ্চের হিমাদ্রি তপাদার ওঠে দাঁড়িয়ে জীবনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে চাকরিজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের তুলনামূলক এক সুচিন্তিত দার্শনিক আলোচনা শুরু করলেন। কিন্তু ভবতোষবাবু তখন কিছুই শুনছিলেন না, কিছুই দেখছিলেন না। তাঁর মনশ্চক্ষে তখন পেছনের স্মৃতিটাই বড় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জীবনের এতগুলো বছর কোন দিক দিয়ে যে কেটে গেল, তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না, জানতে পারলেন না। এতদিন তিল তিল করে এগিয়ে অথবা প্রতিটা দিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে স্মৃতি হয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যখন শেষ বিদায়ের নোটিসটাও পেয়ে গেলেন, তখন যেন চমকে উঠলেন তিনি। এ যেন অফিস থেকে বিদায় নয়, জীবন থেকে বিদায়! হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি যেন বুড়ো হয়ে গেছেন, তাঁর মাথার শুভ্র কেশ আর ষাট বছরের কুঞ্চিত দেহটা এইমাত্র জরা-আক্রমণে অক্ষম স্থবির হয়ে গেছে। এতকাল বয়সটা যেন এক মোহগ্রস্ত গতানুগতিকতার গণ্ডিতে বিধৃত ছিল, আজ সহসা মুক্তি পেয়ে সেটা লাফিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে। আজ চাকরি থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি—এই অফিস, এতকালের অভ্যস্ত জীবনের কর্মকাণ্ডে তাঁর আর কোন অধিকার নেই, বুঝি প্রয়োজনও নেই, তাই এই বিদায়-মুহূর্তে তাঁরই সহকর্মীরা শুভেচ্ছা ও প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ তাঁকে একখানি যষ্টি আর একখানি গীতা উপহার দিয়েছে এবং এ দু'খানি নিদর্শনই তাঁর আগামী দিনের নিঃসঙ্গতার যথেষ্ট প্রতীক! ভবতোষবাবু বিচলিত হন, বিমর্ষ হন। এতদিনের পরিচিত জগৎ হতে বিদায় নিতে গিয়ে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। দু' চোখের কোণে হয়ত এক ফোঁটা অশ্রুও চিকচিক করে।

একে একে সবার বক্তৃতা শেষ হবার পর এবার ভবতোষবাবুরও কিছু বলার পালা। এতকাল যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন তিনি, সুখে-দুঃখে যে সহকর্মীদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, বিদায়ের বেলা তাদের কিছু বলার নেই তার? ভবতোষবাবু উঠে দাঁড়ালেন, অতি কষ্টে দুর্বল দেহটা স্থির রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কী বলবেন তিনি? কতদিনের কত কথাই তো আজ মনে পড়ে তাঁর, সব কথাগুলো যেন এক সঙ্গে ভিড় করে আসে। কিন্তু কিছুই তিনি বলতে পারলেন না মুখ দিয়ে একটা কথাও সরল না। যেন কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে তাঁর, গলার স্বর ভেঙে গেছে, ভেতর থেকে একটা বোবা কান্না গুমরে গুমরে কণ্ঠনালীতে এসে আটকে গেছে। বুকে পিঠে কেমন ঘাম দিয়েছে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে—অন্ধকার—চারদিক অন্ধকার—ভবতোষবাবুর হাত কাঁপছে, পা টলছে, অতি কষ্টে টেবিলের ওপর ভর রেখে তিনি আস্তে প্রশস্ত আসনে বসে পড়লেন।
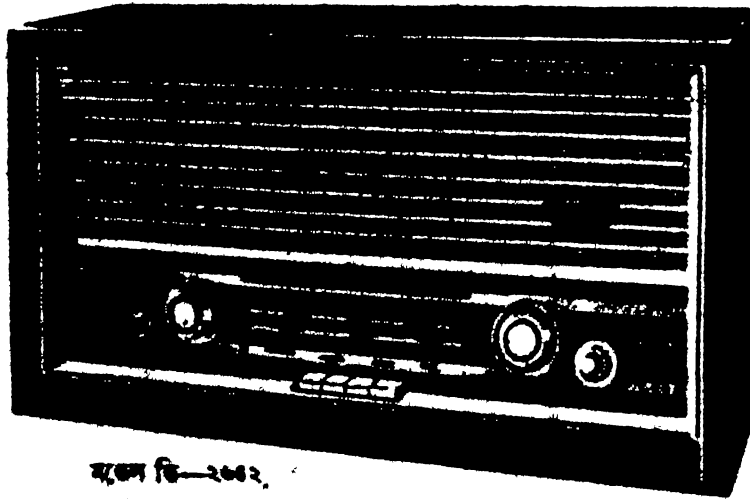
পরদিন ঘুম থেকে উঠে ভবতোষবাবুর প্রথমেই আগের দিনের কথাটা মনে পড়ল। না, শুধু আগের দিনের কথা নয় পেছনে চাকরিজীবনের গোটা চল্লিশ বছরের ইতিহাসটা যেন এক অখণ্ড সত্তা নিয়ে তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল। আজ তিনি মুক্ত, অবসরপ্রাপ্ত, পেন্সন-ভোগী। আজ আর অফিসের তাড়া নেই, ফাইলের স্তূপ নেই, দায় নেই, দায়িত্ব নেই—আছে শুধু অখণ্ড অবসর! এই অবসরের কথা মনে পড়তে যেন ভয় পেলেন তিনি। অবসর না তো, এক অখণ্ড নিঃসঙ্গতা! এতদিন স্তূপীকৃত ফাইলের মধ্যে ডুব দিয়ে অবকাশের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি, ভুলে গিয়েছিলেন প্রতিমুহূর্তের অর্থহীন শূন্যতা। আজ সেই টুকরো টুকরো শূন্যতাগুলিই জোড়া লেগে তাঁর চোখের সামনে এক ভয়াবহ মহাশূন্যতার সৃষ্টি করেছে। এখন—এই মুহূর্তে কি করবেন তিনি, কোথায় যাবেন, কোন্ কাজের [illegible] আবর্তে টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলি কাটাবেন, তা জানেন না। হঠাৎ [illegible]

দিয়েছেন তিনি, তবু অফিসের সহকর্মীরা ছাড়া আশেপাশে আর কারো সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি। হয়ত এতদিন এর প্রয়োজনও বোধ করেননি। আর নিজের সংসার? এই একই সংসারের মধ্যে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, আর একপাল নাতি-নাতনী মিলে কখন যে একটা আলাদা সংসার গড়ে তুলেছে, তা এতদিন দেখেও দেখেননি, বুঝেও বোঝেননি। আজ সেই সংসারের মধ্যেও তাঁর অনুপ্রবেশ অবরুদ্ধ, বেমানান।

একবার উঠে ভবতোষবাবু শিয়রের জানালাটা খুলে দেন। এক রাশ রোদ এসে লুটিয়ে পড়ে। একবার বেলার দিকে তাকান তিনি। অন্য দিন এ সময়ে অফিসে যাওয়ার তাগিদে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন হাঁক-ডাক দিতেন, স্নানের আয়োজন করতেন। আজ আর তার কোন প্রয়োজন নেই, উদ্বেগ নেই, চাঞ্চল্য নেই। তাই একবার উঠে ঘরের মধ্যেই কিছুক্ষণ পায়চারি করেন তিনি, পূব দিকের জানালাটার পাশে গিয়ে ফাঁকা আকাশটার দিকে তাকান, ইজি-চেয়ারটায় গা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল ভাবেন।

বিনা প্রয়োজনে এ ঘরে কেউ কোনদিন ঢোকে না। অমনিতে তিনি ভয়ানক রাশভারী লোক। অফিস না থাকলেও বাড়ি বসে ফাইল নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করেন, অফিস ছুটির পর রোজ বগলে করে ফাইলের গাদা নিয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু আজ তো সে প্রয়োজনও নেই, কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তাই নাতি-নাতনীদের একবার ডাকবেন নাকি ওদের নিয়ে একটু রঙ-তামাশা করবেন? না থাক কিছুই যেন ভাল লাগে না তাঁর। নাতি নাতনী নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করারও অভ্যাস নেই। ভবতোষবাবু সামনে ঝুলানো ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকান। পর পর দিনগুলো বসান আছে। কিন্তু তার মুহূর্তগুলো কী ভয়ংকর! সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুরে গড়িয়ে সন্ধ্যা, রাত্রি তারপর আবার সকাল দুপুর—যেন বৃত্তাকারে এক মহাশূন্যতার দিকে নিরুদ্দেশ গতি। এ গতির শেষ কোথায় ভবতোষবাবু জানেন না, তাঁর পরমায়ু দিয়ে নিশ্চয় এর হিসেব পাবেন না, কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, এই শূন্যতার বুকে তিল তিল করে পিষ্ট হতে থাকবেন। তাঁর স্নায়ুগুলি যেন আরো নিস্তেজ হয়ে পড়বে, জরায় সমস্ত দেহ স্থবির করে তুলবে, শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন রুদ্ধ হয়ে—

হঠাৎ কী ভেবে ভবতোষবাবু এবার উঠে দাঁড়ান। এই অর্থহীন চিন্তাগুলো যেন তাঁকে পাগল করে দেবে। ভবতোষবাবু আলনা হতে জামাটা তুলে নেন, চাদরটা কাঁধে ফেলেন, তারপর সহকর্মীদের দেওয়া মুক্তো-বসানো [illegible] হাতে নিয়ে [illegible] [illegible] থাকেন।

স্ত্রী দেখতে পেয়ে বলে, আজ আবার কোথায় চললে?

একটু ঘুরে আসি।

এত বেলায় আবার কোথায় ঘুরতে যাবে? তাড়াতাড়ি এস।

ভবতোষবাবু এ কথার কোন উত্তর দেন না।

রাস্তায় এসে ভবতোষবাবু যেন ইতস্তত করেন। এখন কোথায় যাবেন তিনি, কোন দিকে যাবেন? কোন গন্তব্যস্থল তো নেই, কোন উপলক্ষ্যও নেই। তবু অন্যমনস্কভাবে অফিসের দিকেই পা বাড়ান তিনি। আজ অফিস নেই, সেখানে কোন প্রয়োজনও নেই, তবু বরাবরের অভ্যাসমত এক পা এক পা করে ও পথেই এগোতে থাকেন।

খানিকটা পথ গিয়ে এক জায়গায় হঠাৎ ভবতোষবাবু দাঁড়িয়ে পড়েন। পথের ধারে ঐ যে বড় বাড়িটা উঠেছে, এটা তো কোনদিন লক্ষ করেননি তিনি। না, কালকেও না। চমৎকার ডেক প্যাটার্নের বাড়িটা! এ পথ দিয়েই তো অফিসে যেতেন তিনি, রোজ যাতায়াত করতেন, অথচ পথের পার্শ্বে এমন একটা বাড়ি ধীরে ধীরে গড়ে উঠল, তিনি তা কোনদিন লক্ষই করেননি! ভবতোষবাবু অবাক হন, তেমনি অবাক হন আরও কয়েক পা এগিয়ে ডান দিকের গলির মুখে ছোট ছোট বস্তিঘরগুলোর হঠাৎ এমন রূপান্তর দেখে। বাঃ! এমন সুন্দর বাড়িগুলো কবে এখানে উঠল, সামনে সাজান এমন দোকান-পসার? ভবতোষবাবু ভাবেন, হয়ত অনেকদিন আগেই এগুলো হয়েছে, তাঁর চোখের সামনেই তিল তিল করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু কোনদিন তিনি লক্ষ করেননি, তাঁর অফিসের যাতায়াতের অভ্যস্ত ব্যস্ততায় তাঁর পরিচিত পথটাকেও এমনভাবে কোনদিন তাকিয়ে দেখেননি তাই আজ সব কিছুই নূতন নূতন ঠেকছে। যেখানে একদিন ফাঁকা ময়দান মাত্র ছিল সেখানে কত নূতন নূতন ঘরবাড়ি উঠেছে, যেখানে একটা নর্দমা মাত্র ছিল, তৈরী হয়েছে নূতন [illegible] ভবতোষবাবু যেন সদ্য জাগ্রত বিপ ভ্যান উইংকলের মতই অবাক হয়ে এই অচেনা [illegible] দিকে তাকান। হঠাৎ এক নূতন অর্থ নিয়ে যেন ছোট বয়সে পড়া সেই কাহিনীটা মনে পড়ে তাঁর। জীবনের চল্লিশটা বছর যেন এক নেশার ঘোরে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই চল্লিশ বছরের ব্যবধানে যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশ-বিভাগ, স্বাধীনতা—এমন কত ঘটনা ঘটল, কত কিছু বিলুপ্ত হল—তিনি কিছু শুনেছেন, কিছু শুনেও শোনেননি, কিছু দেখেছেন, কিছু দেখেও দেখেননি। তাই আজ সব কিছুই নূতন করে দেখতে যেন অবাক লাগে তাঁর—চারিদিকের এই রূপান্তরটাকে, সাজানো বাড়িগুলোকে, পথের মানুষগুলোকে।

ইস্! যেন আগুন লেগেছে গাছের ডালে—।

সামনের গলিটার মোড়ে সারি সারি কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় থোক থোক লাল ফুল; গাছের নীচেও অনেক ফুল ঝরে পড়ে ফুটপাথের ওপর যেন লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। ভবতোষবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার সেদিকে তাকান। কই, এমনভাবে তো কোনদিন [illegible] তাঁর চোখে পড়েনি। [illegible]

ফাঁকে এত গাছপালাও আছে কলকাতায়? ঐ তো বাড়িটার পেছনে আমগাছটার সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে যেন মুকুল ধরেছে, সজনে গাছটার পাতায় পাতায় থোক থোক ফুল ধরেছে। এখন বুঝি বসন্তকাল? কলকাতার বুকেও বসন্ত আসে? পাতায় পাতায় ডালে ডালে সবুজের ছোঁয়াচ লাগে? ভবতোষবাবু একটু একটু এগিয়ে এখন এসপ্ল্যানেড এসে পড়েন। এসপ্ল্যানেড-কার্জন পার্ক—আরো এগিয়ে লাট সাহেবের বাড়ির সীমানা এবং ডান দিকের ফুটপাথ ধরে গেলে ভবতোষবাবুর পুরানো অফিস। কিন্তু সেদিকে আর এগোন না তিনি। বাম দিকের ফুটপাথ ধরে তিনি অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকেন—বুঝি রেডিও অফিসটার পাশ দিয়ে সোজা চলে যাবেন গঙ্গার ধার। আউট্রাম জেটিতে। কিন্তু না গঙ্গার ধার পর্যন্ত না গিয়ে কেন জানি তিনি ঢুকে পড়েন ইডেন গার্ডেনে।

বাঃ! প্যাগোডাটা তো এখনো আছে!

ভবতোষবাবু বিস্ময়-দৃষ্টিতে প্যাগোডাটার দিকে তাকান। ছোটবেলায় প্রায়ই তিনি এদিকে আসতেন। ছুটির দিনে, কখনো ইস্কুল পালিয়ে দল বেঁধে চলে আসতেন। এর নির্জন প্রান্তরে ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দৌড়ঝাঁপ করতেন ছুটোছুটি করতেন। কৃত্রিম লেকটার চারপাশে, কালভার্ট-টার উপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে কেমন এক রোমাঞ্চ জাগত। তারপর মাঝখানের এই চল্লিশটা বছর যেন সব কিছুই ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। হাইকোর্টের পেছনে ময়দান ঘেঁষে এমন যে একটা বাগান আছে তার অস্তিত্বটুকুও যেন ভুলে গিয়েছিলেন। তাই এই প্যাগোডাটার দিকে তাকিয়ে তাঁর পুরনো স্মৃতিটাই যেন আবার জেগে উঠল। জাপানী শিল্পের নিদর্শন এই প্যাগোডার দিকে তাকিয়ে ছোট বয়সে কেমন এক বিস্ময় লাগত, কোন্ এক অচেনা দেশের লোকগুলোর সঙ্গে যেন আত্মীয়তাবোধ জাগত ভূগোলে পড়া সমুদ্র বুকে সেই ছোট দ্বীপটা যেন ভেসে উঠত চোখের সামনে। আজও কী একটা জাপানী ছবির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। কোথায় যে দেখেছিলেন ছবিটা ঠিক মনে পড়ল না।

ভবতোষবাবু একটু একটু করে উদ্যানের ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেই নির্জন ঝোপ-জঙ্গলগুলো এখনো আছে। সেই কৃত্রিম লেকটা, কালভার্টটা, আশেপাশে আগাছা জঙ্গল, ফুলবাগান, বড় বড় দেবদারু গাছের নির্জন ছায়া—ভবতোষবাবুর ইচ্ছে হল সেই আগের মত—মাঝের এই চল্লিশটা বছর বাদ দিয়ে সেই কৈশোরের দিনগুলির মত এই নির্জনতার বুকে আবার ছুটোছুটি করেন। কিন্তু ছুটোছুটি করার আর বয়স নেই, তবু ভবতোষবাবু কেমন এক ব্যাকুলতা অনুভব করেন, কী এক কৌতূহলে

আকর্ষণে ঝোপ-জঙ্গলগুলোর ভেতর দিয়ে পায়চারি করতে থাকেন।

কৃত্রিম লেকটা পেরিয়ে বড় ঝাঁকড়া বকুলগাছটার নিকটে আসতে হঠাৎ যেন বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে যান ভবতোষবাবু। অদূরে জুঁই ফুলের ঝোপের আড়ালে ফাঁকা বেঞ্চিটায় বসে আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন ইশারা করে ভবতোষবাবুকে এগুতে বারণ করেন। থমকে দাঁড়িয়ে ভবতোষবাবু ভদ্রলোকের দিকে তাকান। ভদ্রলোক এবার মৃদু হেসে বলেন, ওদিক দিয়ে ঘুরে আসুন।

ভবতোষবাবু অবাক হয়ে জুঁইফুলের ঝোপটা ঘুরে ভদ্রলোকের নিকটে যেতে তিনি ফিসফিস কণ্ঠে বললেন, ইয়েলো বিলিমুন।

মানে? ভবতোষবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকান। তিনি আবার হেসে অঙ্গুলিসঙ্কেতে বকুলগাছের ডালে একটা হলুদ রঙের পাখির দিকে নির্দেশ করে বলেন, গাড়োয়াল দেশের পাখি। এ অঞ্চলে দেখতে পাবেন না। তবে বসন্তকালে নেমে আসে। এবার আজই প্রথম দেখতে পেলাম।

ভবতোষবাবু অবাক হন। একবার পাখিটার দিকে আবার ভদ্রলোকের দিকে তিনি তাকান। তাঁরই সমবয়সী, মাথায় মস্ত টাক, পেছনে ঘাড়ের কাছে শুভ্র গুচ্ছ চুল, কিন্তু চোখমুখ বেশ উজ্জ্বল, প্রসন্ন। ভদ্রলোক আবার বললেন, ভারী মিষ্টি গলা এ পাখির। যদি আপনাকে শোনাতে পারতাম—

ভবতোষবাবু আবার পাখিটাকে লক্ষ করেন। দেখতে ভারী সুন্দর পাখিটা! পালকে ছোপ ছোপ হলুদের ছিট, লেজটা লম্বা, ঘাড় বেশ চওড়া, আর ঠোঁটটা অনেকটা কাকাতুয়ার মত। কিন্তু কেমন ভীরু ভীরু, চঞ্চল, সন্ত্রস্ত।

ভদ্রলোক এবার আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, নাঃ, এ বেলা আর ওটি নামবে না। নতুন এসেছে কিনা, তাই ভয় এখনো কাটেনি। বিকেলের দিকে আবার আসবেন, তখন নিশ্চয় এর গান শুনিয়ে দেব। আমিও এর খাবার যোগাড় করে আনব। এগুলোর আবার ফাড়িং উচ্চুঙ্গার দিকেই ঝোঁক বেশী।

ভবতোষবাবু অবাক হয়ে বলেন, এগুলোর পছন্দ, অপছন্দের খবরও রাখেন নাকি?

রাখি না? ভদ্রলোক গর্বিত কণ্ঠে বলেন, শীত কমলে এ সময়েই তো দেশ-দেশান্তর থেকে কত রকমের পাখির আনাগোনা শুরু হবে—হলুদ রঙের পাখি, কমলা রঙের পাখি, ইয়েলো বিলিমুন, ময়না, কাকাতুয়া—নানা দেশের হাজার রকমারি পাখি। রিটায়ার্ড হবার পর পাঁচ বছর ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি এসব। অনেকে এখনই এসে গেছে আবো আসবার সময় হল বলে। আপনি ও বেলা আসবেন, একটা একটা করে চিনিয়ে দেব সব।

ভদ্রলোক এবার উঠে দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, নাঃ, বেলা হয়ে গেছে অনেক।

ভবতোষবাবুও চঞ্চল হন। উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হন তিনি।

ভদ্রলোক বলেন, আপনি কোন দিকে?

মৌলালি। আপনি?

আমি আপনার বিপরীত। নিমতলার দিক। তবে বিকেলে আবার দেখা হবে। আসবেন আরো নতুন পাখি চিনিয়ে দেব। বিলিমুনের গানও শুনতে পাবেন।

নিশ্চয়। ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে ভবতোষবাবু বেরিয়ে আসেন।

রাস্তায় এসে চারদিকের রোদের দিকে তাকিয়ে ভবতোষবাবু অবাক হন। সত্যি, অনেক বেলা হয়েছে তো! বেলা বারোটা সাড়ে বারোটার কম হবে না। এবার আর কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকেন তিনি।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে আর একটা কথা মনে পড়ল ভবতোষবাবুর। একটা বেলা কি করে কাটালেন তিনি? আজ সকালেই প্রতিটা মুহূর্তের হিসেবপত্তর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর, ... অনাগত দিনগুলোর প্রতিটা মুহূর্তের হিসেবপত্তর, ... তিনি—

অসমাপ্ত চটাজ

সবিনয় নিবেদন,

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "অসমাপ্ত চটাজ" 'দেশ'-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই আমার মতই আগ্রহ সহকারে পড়েছেন। "অসমাপ্ত চটাজের" পাত্র-পাত্রীদের সাক্ষাৎ মেলে হুগলী নদীর দু ধারের চটকলের হাজার হাজার শ্রমিকের মাঝে। তবু যাঁদের মনে "অসমাপ্ত চটাজের" চরিত্রগুলির বাস্তবতা সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাঁদের জন্য আমার কিশোর জীবনের এক শোচনীয় অভিজ্ঞতা বলতে বসেছি। সেদিনের এক বিক্ষিপ্ত ঘটনা আমাকে এমন এক রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যে, পরবর্তী জীবনে শুধু শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজ কেন, দৈনন্দিন জীবনেও ইউরোপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও ভাবতে পারি না, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিল আদৌ সম্ভব কিনা।

১৯৫০ সাল। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ইতিমধ্যেই জন্মলাভ করেছে। অনেকের মত আমার কিশোর মনও স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে উৎসুক। ঠিক এমনই সময় স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে হুগলী নদীর [illegible] একটি চটকলে সামান্য একটা চাকরি পাই। চটের [illegible] সাহায্যে [illegible] করবার জন্য [illegible] "[illegible]" এর যে [illegible] আছে, তারই সঙ্গে [illegible] ফুট এবং ইঞ্চি চিহ্নিত সরকারী মাপ দণ্ডটা। প্রতিদিন সকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐ মাপদণ্ডের সাহায্যে প্রতি ঘণ্টায় একবার মত জলের উচ্চতা লিখে রাখাই ছিল আমার একমাত্র কাজ। তাই অবসর সময়ে বই পড়েও যখন সময় কাটতো না, গল্প করতাম—কলের দরজার দরওয়ান অথবা কুলিদের (যাদের তখনও পর্যন্ত শ্রমিক নামকরণ হয়নি) সঙ্গে। তবে বেশীর ভাগ সময়টাই কাটতো দরওয়ানদের সঙ্গে—যেহেতু তাদের কাজের মাত্রা ছিল সবচেয়ে কম। কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, মিলের বড়সাহেব কেন 'চাবুক' হাতে নিয়ে শেডের ভেতর ঘোরাঘুরি করে। শুধু পুরুষ কুলি কেন মেয়েরাও সাহেবের সেই চাবুকের হাত থেকে রেহাই পেত না। তবু যখন [illegible] নিরুপদ্রব [illegible] আমায় [illegible] করে দিয়েছিল—[illegible] বা [illegible] [illegible] হাতে [illegible] সাহেবদের সামনে [illegible]—সন্দেহ করেছিলাম, [illegible] [illegible] আদৌ আছে কিনা। তারপর [illegible] [illegible]—

সমাজের বুকের ওপর শ্বেতাঙ্গের চরম বর্বরতা।

সেদিনটা ছিল সোমবার। সকাল প্রায় সাড়ে দশটা। মিলের অফিস সংলগ্ন যে ঘেরা বারান্দা আছে—সেখানে আরও দুজন দরোয়ানের সাথে আমিও জল-চৌকির ওপর বসে আছি। এমন সময় ধোপদুরস্ত এক বাঙ্গালী যুবক হাতে একটা ইংরাজী কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির। ভদ্রলোক বি এ পাস—সবে সবে কলকাতা থেকে আসছেন। অফিসঘরের বাবুদেরও দৃষ্টি পড়ে নবাগতের দিকে। ভদ্রলোকের চালচলনে তাঁদের বুঝে নিতে মোটেই অসুবিধা হয়নি যে তিনি চাকরিপ্রার্থী। আগন্তুকের প্রতি বিশেষ এক করুণায় কয়েকজনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল কিনা, আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। এমন সময়ে সেখানে আবির্ভাব ঘটে ওয়ার্কস্ ম্যানেজারের—যাকে সবাই ন্যুলো সাহেব বলতো, কারণ ওর ডান হাতটা অপেক্ষাকৃত খুব ছোট ছিল। চটকলের পাশেই সাহেবরা যেখানে টেনিস খেলে, সেখানে দেখেছি ন্যাটা খেলোয়াড় ন্যুলো সাহেবের সঙ্গে খেলায় আর কোন সাহেব পেরে উঠতো না। যাই হোক ন্যুলো সাহেব ঢুকেই গর্জন করে উঠলো—"বেরিয়ে যাও।" সাহেবের চীৎকারে অফিসে উপস্থিত সকলেই তাকিয়ে দেখলেন আমাদের দিকে। আর নিরীহ চাকুরিপ্রার্থী যুবকটি যে কি করবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অবশ্য পরের দৃশ্যটি আমাদের পক্ষে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। বিদ্যুৎগতিতে ন্যুলো সাহেবের বাম হাতের থাবা নেমে আসে নিরীহ ভদ্রলোকের ঘাড়ের ওপর—অমিত-বিক্রম ন্যুলো সাহেব ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাঁকে বাহিরের দরজার দিকে। কয়েক হাত দূরে সিমেন্টের মেজের ওপর সশব্দে ছিটকে পড়েন যুবকটি। আশ্রিত শান্তি ধারী ন্যুলো সাহেবের প্রকৃতির সঙ্গে অফিসের বাবুদের পরিচয় ছিল বলেই হয়তো সেদিন দেখেছি, এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটাকে দেখেও না দেখার ভান করতে। তারপর ন্যুলো সাহেব গটগট করে অফিসের মধ্য দিয়ে যখন বড়সাহেবের ঘরে গিয়ে

ঢুকলেন, আর সবাই মাথা নিচু করে বসে রইলেন টেবিলের পাশে। এই ঘটনার পর আমার আর সেখানে বসে থাকবার প্রবৃত্তি হয়নি। ইতিমধ্যে দরয়ান দুজন আহত ভদ্রলোককে ধরে তুলে নিকটবর্তী একটা জলকল নিয়ে গিয়ে সযত্নে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিয়েছে—আর আমি শুনেছি ক্রন্দনরত যুবকটিকে সারাক্ষণ অভিশাপ দিতে।

নিতান্তই দর্শকের ভূমিকায় এত বড় এক অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেদিনের সেই পাপের বোঝা খানিকটা লাঘব করার জন্যই আজ নুলো সাহেবদের দেশ থেকে 'দেশ' এর হাজার হাজার পাঠক পাঠিকার কাছে সেদিনের মর্মান্তিক দৃশ্যটা বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছি। অপরিণত বয়সে দীর্ঘ একবছর ধরে চটকলের শ্রমিক এবং বাবুদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই সাহিত্যিক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যতখানি না তাঁর "অসমাপ্ত চটাব্দের" সাহিত্যে মূল্যের জন্য, তার চেয়েও অনেক বেশী এই কারণে যে, তিনি চেষ্টা করেছেন সমাজের একশ্রেণীর অসহায় মানুষের জীবন ব্যবস্থা রূপায়ণ করতে, যাদের জীবনের "ট্র্যাজেডী" বাঙ্গালী সমাজের অনেকেরই হয়তো আগে জানা ছিল না। 'নুলো সাহেবের" বর্বরতা আজও আমাদের চটকলগুলোতে প্রশ্রয় পায় কি না জানি না?

শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য
হামবুর্গ, পশ্চিম জার্মানী

জমামরদ

মহাশয়,

১৬ই মার্চ সংখ্যা 'দেশ" পত্রিকায় "হাসিকান্না" (পঞ্চতন্ত্র) পড়লাম। স্বামীজীর রসরচনাটি অতি ভালো লাগল। এটি অন্তত আমার পড়া ছিল না। এজন্য আলী সাহেব আমাদের ধন্যবাদার্হ।

একটি বিষয়ে আলী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "জমামরদ" কথাটি মনে হয় "জওয়া মর্দ" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে "জওয়া" বিশেষণ (বিশেষ্য জওয়ানী) এবং "মর্দ" বিশেষ্য। "জওয়া মর্দ" মানে যুবক পুরুষ, এইটাই বোধ হয় স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, উর্দুতে এ প্রকারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। নমস্কার।

ইতি
প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী
জামসেদপুর

লেখকের জবাব

"দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

চক্রবর্তী মশাই নিরংকুশ লক্ষ্যভেদ করেছেন। আমরা সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। খোজাদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থের নাম "পনদিয়াদ-ই-জওয়ানমর্দী"—"মনুষ্যত্ব (মনুষ্য ধর্ম লাভের) উপদেশ।"

সৈয়দ মুজতবা আলী
শান্তিনিকেতন

ছাপরা কালীবাড়ি

সবিনয় নিবেদন,

গত ৪ঠা মে, ১৯৬৩ (৩০ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা। "দেশ" পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে "ছাপরা কালীবাড়ি" শিরোনামায় শ্রীযুক্ত রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র সিংহ প্রমুখ মহোদয়গণের যে চিঠিখানি প্রকাশিত হয়েছে সে-সম্পর্কে দু-একটি কথা জানাতে চাই।

চিঠিতে ভদ্রমহোদয়গণের আহত মনোভাব আমাকেও কাতর করেছে। কোন বাস্তব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে অদ্ভুত ব্যঙ্গ-রসিকতা করাটা আমরা কেউই সমর্থন করতে পারি না। ঐ গল্পটির পাঠে লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের সকল পাঠক স্বভাবতই মনে হয় যে আলী সাহেব [illegible] প্রতিষ্ঠানকে [illegible] এই ধরনের মন্তব্য [illegible]।

[illegible] মনে হয় 'রসিকতা' [illegible] [illegible] পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই আলী সাহেব [illegible] শ্রীরামপুর [illegible] ও "ছাপরা কালীবাড়ি" [illegible] নামের সাহায্য নিয়েছেন। কাল্পনিক বা non-existent প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাস্তব একটি প্রতিষ্ঠানের মিল ঘটে যাওয়াতেই এই বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটেছে। একে আকস্মিক Coincidence'ও বলা যেতে পারে। কিন্তু কাঠামোকে বাদ দিয়ে যদি আমরা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির কথা ভেবে দেখি তবে আলী-সাহেবের কথা তো একেবারে অবাস্তব বলতে পারি না।

সুনীল দাশগুপ্ত
ফুলিয়া নদীয়া

* ট্রামে-বাসে *

একটি সাম্প্রতিক সচিত্র সংবাদে জানা গেল (অবশ্য এ সংবাদ আগেও অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেকে তা জানেনও) রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বেদীটি নিমতলা ঘাটের প্রাচীরে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত বড় রকমের ফাটল দেখা দেওয়ায় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিশু খুড়ো মন্তব্য করিলেন—'তা হয়ত হয়েছে। কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা কবিগুরুর প্রতি কর্তব্যের কোন ত্রুটি করিনি আপার ও লোয়ার চিৎপুর রোডের নাম 'রবীন্দ্র সরণি' রাখার জন্য আমরা সঙ্কল্প করেছি: স্মৃতি-বেদী সংরক্ষণ নিশ্চয়ই যুগধর্ম নামের কেকলম-এর চেয়ে বড় নয়'।"

কবিগুরুর শুভ জন্মদিনে ২৫শে বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কাজকর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষা চালু হইতেছে—"অনেক অফিসারদের অ-র অজগর আসছে তেড়ে' কবে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে তা এখনও ঘোষণা করা হয় নি" মন্তব্য করে শ্যাঃ লাঃ অর্থাৎ আমাদের শ্যামলাল। সরকারী সহি-স্বাক্ষরে এই ধরনের নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ চোখে পড়িয়াছে বলিয়াই শ্যাম-লালকে শ্যাঃ লাঃ বলা হইল কেহ যেন মনে না করেন ইহাতে অভদ্রতার কোন ইঙ্গিত আছে।

একটি সাম্প্রতিক সংবাদ-শিরোনাম—'রাজপথ দিয়া হাঁটিলে আদালতে যাইতে হইবে।—"কিন্তু প্রজাতন্ত্র পথ

অর্থাৎ ফুটপাথের অবস্থা এমনি যে আকাশস্থ নিরালম্ব না হলে সে পথে চলা দুষ্কর"—বলেন এক সহযাত্রী।

ভারতের অন্যান্য কোন কোন শহরের মত কলিকাতার বাসে চাড়তে "কিউ"-প্রথা চালু করার অঙ্গ হিসাবেই হয়ত একদিন (কয়েকদিন কি না বলিতে পারি না) চৌরঙ্গী এলাকায় পুলিস বাস যাত্রীদের কিউ-এর নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারের কী হইল জানি না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—[illegible]

দিল্লী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মন্ত্রীরা নিজেরাই স্থির করেন ১লা এপ্রিল হইতে তাঁহারা বিদ্যুৎশক্তি ও জলের খরচা মাসে দুইশত টাকার বেশী হইতে দিবেন না। শ্যামলাল বলিল—"পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ঊর্ধ্বগতি রোধ করার প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা, কিন্তু মনে খটকা রয়ে গেল ঐ ১লা এপ্রিলের উল্লেখে"।

একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্বলিত সংবাদ—মাও-এর অবসর গ্রহণ আসন্ন? খুড়ো বলিলেন—'কিন্তু ইথে কী হইবে বল—! মা(ও)-এর পর মাসীর পালা তো আমরা জানি, এবং মায়ের চেয়ে মাসীর দরদের কথাও যে না জানি তা নয়'।

আচার্য বিনোবা ভাবে অচিরেই গঙ্গা সাগর যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন। ঝড়জলের এই দুর্যোগে তাঁহাকে গঙ্গা-সাগর যাইতে মানা করিলে আচার্যজী নাকি বলিয়াছেন—'আমিই তো সাইক্লোন'। বিশু খুড়ো সংক্ষেপে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করিলেন—'আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!'"

সংবাদে প্রকাশ, চীন নাকি "শান্তি দূত"দের চীনে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।—"স্থায়ী রেড লাইট দেওয়া আছে দেখেও সেইপথে চলার জেদ যে কেন এঁদের মাথায় চাপল সেইটেই মাথায় ঢুকছে না'—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

খড়দহ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে ঠিকা ঝিরা নাকি একটি ইউনিয়ন গঠন করিয়াছেন এবং সেই ইউনিয়নের মারফতে তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্ভাব্য নিয়োগ কর্তাদের জানাইয়া দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"দাউ টু ব্রুটাস আর বললাম না। কিন্তু ভাবছি, প্রায় ঘরে-ঘরে যে-সব বিকল্প ঠিকা ঝি আছেন তাঁরা একদিন ইউ-নিয়নে ভিড়ে গেলেই তো বারোটা বাজিয়ে দেবেন"।

আংরেজী হটাও-এর পরে আংরেজী বাঁচাও। রামেশ্বরজীর সংসদ প্রাঙ্গণে হিন্দী মঙ্গল যজ্ঞের পর বোম্বাইতে জনৈক যোগী নাকি ইংরেজী মঙ্গল যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়েছেন।—"যে-হারে ইংরিজি লেগেছে তাতে মনে হয় যজ্ঞের ঘি-তে ভাষাকে না ভাসিয়ে এঁরা [illegible]

পাক-ভারত আলোচনার ষষ্ঠ চক্র দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম।—"যাঁরা ভদ্রলোকের এক কথা—নীতিতে বিশ্বাস করেন তাঁরা

নিশ্চয়ই নূতন কোন কথা শোনার প্রত্যাশী নন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মোহনবাগান প্রমুখ ক্লাব রীতিমত পূজার্চনা করিয়া নূতন খেলার মাঠে প্রবেশ করিয়াছেন।—হে মা কালীতে আমরাও বিশ্বাসী। আসন্ন বনমহোৎসবের দিন রীতিমত বৃক্ষ পূজো করে খেলা দেখার ব্যবস্থা একটা লাগিয়ে দিলে মন্দ হয় না, বারোয়ারী বৃক্ষ পুজোয় চাঁদার অভাব হবে না'—বলেন জনৈক ক্রীড়ামোদী সহযাত্রী।

মেয়েদের কেশবিন্যাসে বাঁধাকপি স্টাইল প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া একটি বৈদেশিক সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—কয়েকদিন

আগে এক সংবাদে শুনেছিলাম, কাঁচা বাঁধা-কপি খেলে নাকি নেশা কাটে। মেয়েদের বেলায় বাঁধাকপি স্টাইলটা কিমবা বিষ-মোষধম কি না জানিনে।"

শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহে আরো কাটছাঁটের সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"শিল্পী এলাকায় রবীন্দ্র পল্লে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহে কাটছাঁট করা হবে না বলেই ভালো করাব, [illegible]"—[illegible]

বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

শুনেছি, আজকাল বঙ্গভাষার চর্চা সাধারণভাবে অনেক বেড়েছে। আমাদের বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিয়ে যে প্রতিষ্ঠান দুটি বসে আছেন—বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ—তাঁদের অন্যতম মূল নীতি বোধ করি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করা ও সহজে সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। মাতৃভাষার প্রতি সরকারী অনুরাগও ইদানীং বেড়ে চলেছে। এ সব লক্ষণ থেকে স্বাভাবিকভাবেই আমরা মনে করি বঙ্গভাষার সীমা এখন অধিকতর বিস্তৃত, তার চর্চাও পূর্বাপেক্ষা পরিণত।

বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা যাতে মোটামুটি স্পষ্ট হয় তাদের জ্ঞান কিছুটা গভীর হয় তার প্রতি দৃষ্টি রেখে আজকাল বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য-সূচীও শুনেছি বেশ ভারী করে তোলা হয়েছে।

এ-সব সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটছে যেখানে ছাত্রদের শোচনীয় অজ্ঞতা দেখে মনে হয় বঙ্গ সাহিত্যের এমন পীড়া বোধ করি [illegible] করা যেত না।

কথাটা আরও স্পষ্ট করি। সেদিন আমার এক অধ্যাপক বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে লাল পেন্সিলটা পকেটে পুরেই উদভ্রান্তের মতন আমার কাছে এসে হাজির। যথারীতি কি খবর কেমন আছেন ইত্যাদি দু'চারটি প্রাথমিক কথার পর বন্ধু বললেন মশাই খাতা দেখতে দেখতে [illegible] পড়েছি।

ছাত্রের পরীক্ষার খাতায় ভালমন্দ দুইই থাকে। মজার উদাহরণ খবরের কাগজে 'সংবাদ' হিসেবে ছাপা হতেও দেখা যায় প্রায়ই। মিথ্যে বলব না একদা আমি পরীক্ষার খাতায় ট্রিগনোমেট্রিতে খুব বড় রকম একটা গোলমাল পেকেছিলাম 'থিটাকে 'একটা কিছু কিম্ভূত কোণ' এই রকম এক বেয়াড়া জবাব লেখার জন্যে। মাস্টারমশাই কান মলে দিয়ে বলেছিলেন, তুই একটা গাধা।

কিন্তু এই গর্দভরাও সে বয়সে জানত বাংলা সাহিত্যে 'গোরা' বলে একটি উপন্যাস আছে, এবং তার লেখক রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সময়ে, আমি হলফ করে বলতে পারি, এমন ছাত্র খুব কমই ছিল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কিছু গল্প ও উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের পাঁচ সাতখানা বই পড়ে নি। আমরা পরীক্ষার্থী, প্রত্যক্ষ-[illegible] একেবারে না পড়েছি তা [illegible]

[illegible]

বিদুর

লেখা অনেকেই পড়েছি।

অথচ এখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সর্বপ্রকার গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও ছাত্রেরা তাদের শোচনীয় অজ্ঞতা দেখিয়ে চলেছে।

অধ্যাপক বন্ধু যা বললেন, তার মর্ম এই দাঁড়ায়: দশটি বাংলা বই নির্বাচন করতে বললে এ-কালের পরীক্ষার্থীরা (অধিকাংশই) সাধারণত সেই দশটি বইয়ের নাম লিখবে যা বাংলা সিনেমায় হালফিল দেখানো হয়েছে। শুনলাম, এই সব ছাত্রের কেউ কেউ লিখেছে—'দেবী' পুস্তকটি আমি কিনিব, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' উপন্যাসটিও আমার ভাল লাগে উহাও আমি কিনিব।'

ছাত্রদের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এর এক্ষেত্রে আমি ধরেই নিচ্ছি সব ছাত্রই এতটা বোকামি পরীক্ষার খাতায় নিশ্চয় দেখায় নি। তবু যথেষ্ট উদারতার পরও একটি কথা থেকে যায়। আর সেই কথাগুলি এই যে, আমাদের বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্যসূচী যতই কেননা ওপর ওপর গুরু করে করা হয়ে থাক, আসলে এর দ্বারা ছাত্রসমাজ লাভবান হচ্ছে না। তারা বঙ্গসাহিত্যের স্মরণীয় লেখকদের নাম হয়ত কানে শুনেছে, তার বেশী নয়।

বন্ধুর কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি তাতে আমার ধারণা হচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্র ছাত্রেরা মোটামুটিও পড়ে না; সঞ্জীবচন্দ্রও কেতাবের মধ্যে পড়ে আছেন, রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যসূচীতে যেটুকু আছেন তার বেশী ছাত্রদের মনোযোগ দাবি করেন না। শরৎচন্দ্রের আয়ুও ছাত্রদের কাছে ফুরিয়ে এসেছে, প্রভাতকুমার বাংলা সিনেমার কল্যাণে 'দেবী'-র লেখক হয়ে যেটুকু বেঁচে আছেন।

এরই মধ্যে বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' এবং তারাশঙ্কর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র লেখক হিসেবে ছাত্রদের বুঝি স্মরণে আছেন। আর যাঁরা আছেন তাঁরা হালের সাহিত্যে রোমহর্ষক কিছু লিখেছেন, কিংবা সিনেমায় হয়েছেন, কিংবা বহু বিজ্ঞাপিত।

আমার সবিনয় বক্তব্য এই যে গাদা গাদা মোটা মোটা বঙ্গসাহিত্যের ঠিকুজি লিখে যাঁরা বই বের করছেন সেই অধ্যাপকবৃন্দ কি তাঁদের ছাত্রদের সামান্য মাত্র উপকার করতে পারছেন!

বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ মমতা থাকলে শিক্ষকেরা অন্তত ছাত্রদের নিশ্চয় শিখিয়ে দেবেন যে, সিনেমায় হয় না, হয় নি এমন দশটি বাংলা গ্রন্থ নিশ্চয় বঙ্গমাতার আঁচলে সগৌরবে বাঁধা আছে।

নাট্যানুষ্ঠান বিল

বিদুর—সবিনয় নিবেদন,

এ সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে প্রস্তাবিত নাট্যাভিনয় বিল-এর ওপরে আপনি যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আপনি যে যুক্তিপূর্বক বিলের 'সেন্সরশিপ' প্রবৃত্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন তার জন্যে নাট্যরসিকেরা আপনাকে সাধুবাদ দেবেন।

আপনার মত আমিও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে কোন সরকারের 'সেন্সরশিপ' শিল্পস্রষ্টার স্বাধীনতাকে কোনো না কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ করে।

আপনার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও যথাস্থানে আমার অনুরোধ পৌঁছে দিতে চাই যে নাট্যকারকে যেন কারবারীর মত লাইসেন্স নিয়ে কারবার করতে বলার অসম্মানজনক আদেশ না দেওয়া হয়, সে ছাড়পত্র সরকারী বা বেসরকারী যে মহল থেকেই নিতে হোক না কেন। পত্রটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

ইতি—কিরণ মৈত্র,
সম্পাদক, নাট্যকার সংঘ

প্রবীণ ও সাম্প্রতিক লেখকদের কয়েকটি উপন্যাস

কন্যাসু। বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৭। মূল্য ২·৫০।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বনফুলই সম্ভবত একমাত্র লেখক যিনি উপন্যাসে ও ছোট গল্পে রূপ, রীতি ও আখ্যানের নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন ও করছেন। কন্যাসু তাঁর সাম্প্রতিক রচনা—এবং এই উপন্যাসেও দেখা যায়, লেখক বনফুল নূতনতর রীতির মাধ্যম অন্বেষণে তৎপর। কিন্তু রীতি-সর্বস্বতাই এই উপন্যাসের গুণ নয়। বস্তুত যদিও আঙ্গিকের অভিনবত্ব খানিকটা প্রাথমিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়ে মনে হয় এ লেখা ঠিক বনফুলেরই, অন্য কারো নয়। লেখকের কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রায়ই রচনার রীতির আঙ্গিক ভেঙ্গে দেন, কখনো 'ইউটোপিয়ার' আশ্রয় নেন কিন্তু কখনো তাঁর ব্যক্তিত্ব পাল্টায় না।

উপন্যাসটির কেন্দ্র চরিত্র ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিণত বয়সে যাঁর একমাত্র চিন্তা হল কনিষ্ঠা কন্যাটিকে পাত্রস্থ করা। তাঁর অবস্থা স্বচ্ছল—একটি গেঞ্জি কলের মালিক তিনি। চরিত্রটির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এককালে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু সেখানে আদর্শ ও আত্মসম্মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেন। গল্প যখন শুরু হয় তখন ব্রজেন্দ্রনাথ পাত্রানুসন্ধানে তৎপর। এই ঘটনাকে

কেন্দ্র করে নানা ধরনের চরিত্র ভিড় করে এসেছে। উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশাল সমাজচিত্রের আভাসও ফুটে ওঠে। ছক বাঁধা কোনো গল্প নেই—চরিত্রগুলি চকিতে আত্মপ্রকাশ করে—কিছু ঘটনা হয়ত অস্বাভাবিক ভাবেই ঘটে যায় তবু উপন্যাসটির গতি কখনো শ্লথ নয়, মৃদু একটা উৎকণ্ঠা সবসময়েই জাগিয়ে রাখে। পরিণতিও সুন্দর। দেখা যায় ব্রজেন্দ্রনাথ একটি সত্য ও আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর বন্ধুর স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করে গ্রামে চলে গেছেন।

কিন্তু এই উপন্যাস প্রধানত লঘু প্রকৃতির—গভীরতা কিংবা আত্মস্থচিন্তা-বর্জিত। যে সমস্যা এই কাহিনীর উপজীব্য সেই সমস্যার সমাধানও হয়েছে আকস্মিক-ভাবে। এবং সমস্যাটিও যথেষ্ট জোরালো নয়—যাকে অবলম্বন করে মানব চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করা যায়। দ্বিতীয়ত চরিত্রগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হঠকারী কখনো কখনও প্রায় উন্মাদ কিংবা ... স্বভাবিক মানুষ তার দোষ ত্রুটি ইত্যাদি নিয়েই একে অন্যের চেয়ে আলাদা। সেই সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরবার চেষ্টা কোথাও নেই। সম্ভবত সেই কারণেই এ উপন্যাসে লেখকের তীব্র শ্লেষ অনেকটা নিরর্থক প্রয়োগ বলে মনে হবে। ২৮৭।৬২

দুই নদী। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথকলি। ১, পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯। দাম দু টাকা। পঁচাত্তর নঃ পঃ।

উপন্যাসটির নায়ক নিরোৎসু একজন শিল্পী কিন্তু অবস্থার পাকে পড়ে তার জীবিকা হয়েছে ছিয়েতর এবং শিল্পও উপেক্ষিত হয়েছে। নায়িকা দুজন, অশোকা এবং প্রতিমা, যাদের প্রকৃতি এবং প্রেম ভিন্ন ভিন্ন খাতে বয়ে চলেছে একজনকেই লক্ষ্য করে। খানিকটা নাটকীয় ঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে কাহিনী এগিয়ে গেছে একটি অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে। শিল্পের দিকে হাত বাড়ানো ভাল কি মন্দ এই গুরু প্রশ্ন বাদ দিয়েও প্রশ্ন করা চলে যে এ কাহিনীর পরিণাম অবশ্যম্ভাবী কিনা। কিছু কিছু ঘটনা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, শিল্প সম্পর্কে গুরুগম্ভীর কথাগুলিও সবসময়ে ভাল লাগে না।

তবু শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নিজের গুণে এই যে তাতে একটি অন্তর্নিহিত জোর আছে। শিল্পের দিকে প্রত্যাবর্তন ... পথ ... সার্থকতার

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থগুলির কোনটিতেই সংকলকের নামের উল্লেখ না থাকায় এবং সংকলকের দায়িত্বগুলি যথাযথ পালিত না হওয়ায় এ গ্রন্থগুলির নামকরণের পিছনে যে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যই সক্রিয়— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

এ সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়, যখন দেখা যায় যে, যদিও এগুলি "সংকলন-গ্রন্থ", তথাপি এগুলির আয়তন অতিশয় ক্ষীণ (কিঞ্চিদধিক একশত পৃষ্ঠা মাত্র); এবং এতই ক্ষীণ যে, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংকলন-গ্রন্থ"টিতে মাত্র চারটির বেশী গল্পের স্থান সংকুলান করা সম্ভব হয়নি।

নামকরণের কথা বাদ দিয়ে পৃথক পৃথক-ভাবে গ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে আপত্তি ওঠে তা হল তারাশংকরবাবুর গ্রন্থটি সম্পর্কে। গ্রন্থটিতে যে চারটি গল্প স্থান পেয়েছে, যদিও সেগুলিকে "ছোটদের ভালো ভালো গল্প" বলে চালানো হয়েছে, তবুও সেগুলি (একটি বাদে) যথার্থ ছোটদের গল্প কিনা সে বিষয়ে বর্তমান সমালোচক প্রকাশকের (বা সংকলকের) সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারাশংকরবাবুর যদি সত্যিই ছোটদের জন্যে লেখা কোনও গল্প না থাকে তবু তাঁর নাম ব্যবহার করবার জন্যই তাঁর যে-কোনও গল্প—তা ছোটদের হোক আর না-ই হোক—ছোটদের বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টাটি আর যা-ই হোক সততার পরিচয় নয়। (অবশ্য ছোটদের গল্প তারাশংকর বাবুর না আছে এমন নয়।)

আশাপূর্ণা দেবীর খ্যাতি যদিও মূলত শিশুসাহিত্যের কাহিনী হিসাবে নয়, তবুও আলোচ্য গ্রন্থের দুটি গল্প—"কুপাকন" ও "কিছু না"—তাঁর খ্যাতির মুকুটে একটি নতুন সম্মানের পালক যোজনা করবে এবং সে পালকটি সার্থক শিশুসাহিত্য রচনার।

আলোচ্য গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে নিঃসন্দেহে লীলা মজুমদারের গ্রন্থটি সর্বোত্তম। যদিও এই গ্রন্থান্তর্ভুক্ত কোনও কোনও গল্প অপেক্ষাকৃত নিরেস, তবুও লেখিকার রচনা-ভঙ্গির সার্থক শিশুসাহিত্যশিল্পিসুলভ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অসামান্যতার প্রায় সব কটি গল্পেরই রসোত্তীর্ণতা এঁকে বাংলা শিশুসাহিত্যের আসরে একটি স্থায়ী আসন দেবে—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

(৮৪, ৮৫ ৮৩।৬১)

সাময়িক পত্রিকা

স্বাস্থ্যদীপিকা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—পৌষ-মাঘ ১৩৬৯)—১৩৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪০ নঃ পঃ

বাঙলা ভাষায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার অভাব মোচনার্থে বিশিষ্ট একদল চিকিৎসাবিদের উদ্যোগে এই পত্রিকাখানির আবির্ভাব। সমাজে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার আয়াস-সাপেক্ষ কাজে ব্রতী পত্রিকা-খানির উপদেষ্টা পরিষদে চিকিৎসক ছাড়া শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবীও আছেন। ব্যক্তি ও সমাজের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত প্রবন্ধ ও আলোচনার সমাবেশে পত্রিকাখানি যে একটি প্রয়োজনীয় প্রকাশন আলোচ্য প্রথম সংখ্যাতেই সেটি উপলব্ধি করা যায়।

প্রাপ্তিস্বীকার

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ।

ভারতের লোক সংস্কৃতি পরিচয়—শ্রীসাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্ত।

স্বপ্নে যা ভাবিনি—ডাঃ জ্যোতিষকুমার চৌধুরী।

রুদ্র প্রয়াগের চিতা। জিম করবেট। অনুবাদক জগন্নাথ বিশ্বাস।

তরাই-এর তরুণী সেজমা—সাগরবলয়। অনুবাদক লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কপোতাক্ষী থেকে ভাগীরথী—মদনমোহন মিত্র

নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড) নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী।

আমাদের গুরুদেব—শ্রীসুধীরঞ্জন দাস।

শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা—অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

মনের বাঘ—গৌরকিশোর ঘোষ।

অষ্টাদশী—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত।

একটি পেরেকের কাহিনী—সাগরময় ঘোষ।

ঈশ্বর সূত্র (অধ্যাত্মবিজ্ঞান)—স্বামী নিখিলানন্দ সরস্বতী

প্রথম ভালোবাসা—হরিৎশেখর মজুমদার।

দুই পাহাড়ের দেশ—স্মরজিৎ বন্দ্যো-পাধ্যায়।

শকুন্তলা—সতীন্দ্রনাথ লাহা।

ডাঃ দাসের এভারেস্ট ডায়েরী (১৯৬০) —ক্যাপ্টেন সুধাংশুকুমার দাস।

নিবেদন ইতি—বিমল মিত্র।

বসন্ত তিলক—সুবোধ ঘোষ।

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন—শিবরাম চক্রবর্তী।

এপার ওপার—ইন্দ্রনীল।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭ সংখ্যায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের 'কী বিচিত্র' কবিতায় মুদ্রাকর প্রমাদবশত একটি ভুল থাকিয়া গিয়াছে। কবিতাটির ১০ম পংক্তিতে "লেখনী সখের খনি" স্থলে "লেখনী সুখের খনি" হইবে।

চলচ্চিত্রের আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

মহারাষ্ট্র সরকার এ বছর থেকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন। বছরের শ্রেষ্ঠ মারাঠী চিত্র এবং শিল্পী, কলাকুশলী ও চিত্রকাহিনীকার এই সরকারী পুরস্কারের অধিকারী। উপহারদ্রব্যের সংগে নগদ অর্থও পুরস্কারস্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গেল।

আঞ্চলিক ভাষার ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধিকল্পে রাজ্য সরকারের এই সাধু প্রয়াসকে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবং মহারাষ্ট্রকে অনুসরণ করার জন্য তিনি ভারতের অন্যান্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছেন।

আঞ্চলিক ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের পৃথক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে কেউ অস্বীকার করবেন না। কেন্দ্রীয় সরকার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চলচ্চিত্রের যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন করেছেন, আঞ্চলিক ভাষার ছবি তার বহির্ভূত নয় সত্য। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের সুফল আঞ্চলিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার পরিধি সারা ভারতে বিস্তৃত বলে আঞ্চলিক ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট ছবি রাজধানী দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে না। প্রতি অঞ্চলের সব কটি শ্রেষ্ঠ ছবি কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভ্যরা দেখার সুযোগ পান না। আঞ্চলিক অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভ্যরা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য সাধারণত তিনটি ছবিই অনুমোদন করে থাকেন। আরও এমন একাধিক ছবি হয়ত থেকে যায় যেগুলিও আঞ্চলিক অ্যাওয়ার্ড কমিটির অনুমোদন পেতে পারত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের এক বিশেষ সার্থকতা রয়েছে। রাজ্য সরকারের নগদ অর্থ পুরস্কারের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের চিত্রনির্মাতারা উৎকৃষ্ট ছবি তৈরির কাজে অধিকতর উৎসাহ বোধ করবেন। চিত্রনাট্যকার শিল্পী কলাকুশলীরাও নতুন প্রেরণা পাবেন। ফলে আঞ্চলিক ছবির শিল্পমান উন্নতির পথটি প্রশস্ত হবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের উদ্দেশ্যটিও সার্থক হয়ে উঠবে।

ফণী মজুমদারের প্রযোজনা-পরিচালনায় নির্মীয়মান রংগম-এর 'আকাশদীপ' হিন্দী ছবিতে নন্দা

ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন

কেন্দ্রীয় সরকার ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সম্প্রতি [illegible] হয়েছেন এবং ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত [illegible] একটি খসড়া পরিকল্পনাও [illegible]। পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই করপোরেশন চলচ্চিত্রশিল্পকে সর্বাধিক [illegible] সুযোগ দেওয়া হবে। [illegible] সরকারেরও নিজস্ব অংশ [illegible] ভারতীয় ছবির [illegible] সম্প্রসারণের ব্যাপারে সরকারই [illegible] গ্রহণ করবেন। প্রস্তাবিত করপোরেশন [illegible] ভারতীয় ছবি রপ্তানির [illegible] একমাত্র সংস্থা হিসাবে বিবেচিত [illegible] চলচ্চিত্রের বহির্বাণিজ্য এই [illegible] নিয়ন্ত্রিত হবে।

[illegible] সরকারের আন্তর্জাতিক [illegible] শ্রীমানুভাই শাহ সম্প্রতি [illegible] চলচ্চিত্রসেবীদের নিকট প্রস্তাবিত ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন সম্পর্কিত এইসকল তথ্য প্রকাশ করেছেন। শ্রীশাহ এও বলেছেন যে স্বল্পবিত্ত চিত্রপ্রযোজকদের স্বাবলম্বী করে তোলাই এই করপোরেশনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি এই আশ্বাস দেন ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ যদি বেড়ে চলে তবে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম আমদানির ব্যাপারেও সরকার সচেষ্ট হতে পারবেন।

গত সপ্তাহে বোম্বাই, কলকাতা ও

[illegible] মুক্তিপ্রতীক্ষিত উত্তমকুমার ফিল্মস-এর 'ভ্রান্তিবিলাস' (পরিচালনা : মানু সেন) ছবির একটি দৃশ্যে [illegible] ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার ফটো—দেশ

মাদ্রাজের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবিত করপোরেশনের খসড়া পরিকল্পনা সম্পর্কে বাণিজ্যমন্ত্রীর সংগে বিশদ আলোচনার জন্য দিল্লিতে সমবেত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী নিজেই এই সভা আহবান করেছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত করপোরেশনের গঠনপদ্ধতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে চলচ্চিত্রসেবীরাও একটি খসড়া পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নিকট পেশ করেছেন।

* শুভমুক্তি *

চিত্রামোদীরা যে বাংলা ছবিটির প্রতীক্ষায় ছিলেন এতকাল সেই **নির্জন সৈকতে** (নিউ থিয়েটার্স এক্সজিবিটার্স প্রাইভেট লিমিটেড) এ সপ্তাহে মুক্তি-লাভ করছে। তপন সিংহ পরিচালিত এই ছবি কালকূটের একটি রম্য কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরী। শর্মিলা ঠাকুর, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, ভারতী দেবী, ছায়া দেবী রেণুকা রায় পাহাড়ী সান্যাল জহর গাঙ্গুলী রবি ঘোষ প্রভৃতি ছবির প্রধান চরিত্রের শিল্পী। কালীপদ সেন সুরকার।

একটি হিন্দী ছবিও বর্তমান সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটির নাম **গার্লস হোস্টেল** (মার অব ফিল্মস)। এই ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন [illegible] অজিত ও জনি ওয়াকার [illegible] ছবির পরিচালক ও [illegible]।

• চিত্র-সমালোচনা •

পাদুকা-পুরাণ

[illegible]

তারপর মল্লিকা যখন নিজের [illegible] স্বামী হবে বলে চন্দনের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তখন চন্দনও এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থী।

ইতিমধ্যে মল্লিকার মনে প্রণয় কলি ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। প্রেম কলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দু' হাত ভরে অঞ্জলি দিতেও তার দেরি হয়নি। এবং মল্লিকা যাতে অকালে ঝরে না যায় সেই মিনতিই শুধু সুগায়ক চন্দন জানায় তার গানে।

আলোচ্য কমেডি ছবিতে এই প্রণয়-পর্ব এই বাস্তা। ছবির প্রধান কৌতুক-উপকরণ ওদের নিয়ে নয়। মল্লিকার প্রণয়-প্রার্থী হাবুল ও তার সঙ্গীদের নিয়ে। হাবুলের দল ও চন্দন একই মেস-বাড়িতে থাকে। মল্লিকাদের পাশের বাড়িতে। বন্ধু-বর্গের সক্রিয় সহযোগিতায় হাবুল মল্লিকার পাণিগ্রহণের জন্য কীরকম মরিয়া হয়ে ওঠে ও কত রকমের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে

নতুন ছবি "গড়ে ওঠা শহর"-এর চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। প্রথম দিনের স্যুটিং-এ অংশ গ্রহণ করেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণকুমার। একটি শহর গড়ে ওঠার আড়ালে যে-সব বিচিত্র চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে তাদের কেন্দ্র করে চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

লব-কুশ

গত সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে চিত্রকলামন্দিরের প্রথম চিত্রপ্রয়াস 'লব কুশ'-এর শুভমুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই পৌরাণিক ছবিতে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। হরি ভঞ্জর তত্ত্বাবধানে ছবিটি পরিচালনা করছেন পাঞ্চজন্য-গোষ্ঠী। রথীন্দ্রনাথ ঘোষ সংগীত পরিচালক।

মল্লিকা

মুখার্জি পিকচার্স-এর প্রথম নিবেদন 'মল্লিকা'। গত সপ্তাহে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে ছবিটির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক অচ্যুত গোস্বামীর "আর এক অধ্যায়" অবলম্বনে চিত্রনাট্যটি রচিত। পরিমল ঘোষ ছবিটির পরিচালক। চিত্রপ্রযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। ছবির মহরত-অনুষ্ঠানের শিল্পী ছিলেন অনুরাধা গুহ।

দুটি কথা

"দুটি কথা" (চলচ্চিত্রম্) নামে আর একটি বাংলা ছবির চিত্রগ্রহণ গত সপ্তাহে শুরু হয়। সারথি-গোষ্ঠী ছবিটির পরিচালক। মদন দাস চিত্রকাহিনীকার। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন অরবিন্দ বসু।

কেমনে কহিব শ্যাম

গত সপ্তাহে ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে "কেমনে কহিব শ্যাম" (সৃষ্টি চিত্রম্) ছবির শুভ-মুহূর্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সৃষ্টি কুমার দাস ছবির কাহিনীকার প্রযোজক ও পরিচালক। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিকাশ মিত্র। রণেন দাস মতিলাল সংগীত পরিচালক।

কোম্পানী ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক মঞ্চস্থ 'টিপু সুলতান' নাটকের একটি দৃশ্যে সুমিতা বিশ্বাস ও গৌর ঘোষাল

"টিপু সুলতান" নাট্যাভিনয়

রঙমহলে সম্প্রতি ডিপার্টমেণ্ট অব কোম্পানি ল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর সদস্য ও কর্মীর সমভ্যরা সংগণ মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক টিপু সুলতান অভিনয় করেন। সম্মিলিত অভিনয়ের গুণে নাট্যাভিনয়টি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে এবং দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। নাটকের বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন গৌর ঘোষাল, অশোক মজুমদার, শ্রদ্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যাকেরিয়া, সুমিতা বিশ্বাস, রঞ্জিত সরকার, মাখন পাল চৌধুরী, রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন সেনশর্মা, বিনয় সরকার, মণি মৈত্র, নৃপেন মৌলিক, দিলীপ দে, সুশীল সরকার, চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি। দুটি শিশু-চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করে কাঞ্চন ও কমল। গৌর ঘোষাল ও শ্রদ্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পান। নাটকটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন অমর গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রী প বি মেনন এবং শ্রী এস ভেংকটরমণ ও শ্রী এইচ কে গাংগুলী।

দিল্লির সাপ্রু হল-এ 'সৈনিক' নাটকের অভিনয়ের শেষে উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন 'মুখোশ' দলের তরুণ রায় ও দীপান্বিতা রায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

"প্রহসন-মেলা"

থিয়েটার ইউনিটের উদ্যোগে দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে আগামী ২০, ২১

তারু মুখার্জি প্রোডাকশন্স-এর 'মালা-চন্দন' ছবির গানে কণ্ঠদান করছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

ও ২২শে মে তিন দিনব্যাপী এক প্রহসন-মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

দেশ বিদেশের বিখ্যাত প্রহসন অভিনীত হবে এই মেলায় : শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'চার দেয়াল' 'বিদুষী', 'পঞ্চশর' ও 'কৃপণের ধন' অভিনীত হবে। এই বহু-প্রশংসিত প্রহসনগুলির প্রথম তিনটি যথাক্রমে রুশ ফরাসী ও ইংরাজী প্রহসনের অনুকরণে রচিত। শুধুমাত্র প্রহসন নিয়ে নাট্য-উৎসব এই প্রথম।

"সৈনিক" এর জয়যাত্রা

দিল্লি কানপুর ও পাটনায় 'সৈনিক' নাট্যাভিনয় পরিবেশন করে মুখোশ দল সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এই দেশাত্মবোধক নাটকটি সর্বত্র সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। দিল্লির সাপ্রু হলে ২৬শে এপ্রিল নাট্যাভিনয়ের শেষে নাট্যকার-নাট্যপরিচালক-অভিনেতা তরুণ রায় ও 'মুখোশ'-এর অন্যান্য শিল্পীদের অভিনন্দন জানালেন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা পাটনায় অভিনয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছবির পর ছবি

(উপরে ও মাঝখানে) তপন সিংহ পরিচালিত "নির্জন সৈকতে" ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে শর্মিলা ঠাকুর, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল রুমা গুহঠাকুরতা ও জহর গাঙ্গুলী (নীচে) শ্রীধর পরিচালিত "দিল এক মন্দির" হিন্দী ছবিতে মীনাকুমারী ও রাজেন্দ্রকুমার

অতিথির আসন নিয়েছিলেন। উত্তরফাল্গুনী সফরের আগে মুখোশ দল থিয়েটার সেণ্টারে আরও কিছুদিন 'সৈনিক' অভিনয় করবেন।

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার

বেংগাল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠান আগামী ২৪শে মে ইনফরমেশন সেণ্টারে সম্পন্ন হচ্ছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও শ্রীঅশোককুমার সরকার অনুষ্ঠানে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন। এই অনুষ্ঠানে প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া ১৯৬২ সালের ভারতীয় ছায়াচিত্রের তিনজন শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পীকে পুরস্কার দেবেন।

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

প্রতিবারের ন্যায় এবারেও দক্ষিণী, সুরঙ্গমা, গীতবিতান, বৈতানিক, নবোদয়, উত্তর কলিকাতা (২), গুরুসদয় বাহিনী প্রভৃতি সুখ্যাত সংস্থা কর্তৃক গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের দ্ব্যধিক শততম জন্মদিন পালিত হয়। প্রত্যেকটি সংস্থাই রবীন্দ্র-সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য সংবলিত চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ওই দিন ভবতারণ সরকার বিদ্যালয়ের (বিডন স্ট্রীট) ছাত্রছাত্রীরাও রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করেন। উৎসবে মূকাভিনয় (অরুণাভ মজুমদার) ও রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' (নাট্যরূপ : জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় : পরিচালনা : রঞ্জিত সরকার) নাট্যাভিনয় দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে।

ওয়াদিয়া ব্রাদার্স-এর 'ম্যায় শাদী করনে চলা' (পরিচালনা : রূপ কে সোরি) ছবিতে সয়ীদা খাঁ

* বিবিধ প্রসঙ্গ *

ইতালির বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক কার্লো পন্টি ডাঃ ঝিভাগো প্রভৃতির চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। বার্ট ল্যাংকেস্টার ডাঃ ঝিভাগোর চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল।

রিটা হেওয়ার্থ বেশ কিছুকাল পরে যে ছবিটিতে আত্মপ্রকাশ করছেন তার নাম হল : অাই ওয়ান্ট মাই মাদার। 'লোলিটা'-খ্যাত সু লায়ন এ ছবিতে অন্য একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল।

১৯৪৮ সালে ফিল্মস ডিভিসন স্থাপিত হবার পর এ পর্যন্ত সংস্থার উদ্যোগে মোট ১,৮৭৪টি অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী হয়েছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ফিল্মস ডিভিসন ১৭৬টি ছবি তৈরি করেছেন। ১৯৬২ সালে দেশে ও বিদেশে ফিল্মস ডিভিসনের ছবি মোট ২৭টি পুরস্কার লাভ করেছে।

বোম্বাই সমাচার

পরিচালক ফণী মজুমদার সম্প্রতি রংগম নামে একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, এবং 'আকাশদীপ' নামক একটি ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনার কাজ শুরু করেছেন। অশোককুমার, নিম্মি, নন্দা, ধর্মেন্দ্র, মেহমুদ, শুভা খোটে প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। নরেশ ঘোষ ও চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে ছবির চিত্রনাট্যকার ও সংগীত পরিচালক।

প্রযোজক-পরিচালক সুবোধ মুখার্জির নতুন ছবি সাজ ঔর আওয়াজ-এর নায়িকা সায়রা বানুর একটি নৃত্যের দৃশ্য সম্প্রতি গৃহীত হয়। এই ছবির মাধ্যমে সায়রা বানু নৃত্যপটিয়সী শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবেন বলে নৃত্যপরিচালক বিশ্বাস করেন। নৃত্যদৃশ্যে সায়রা বানুর রূপসজ্জার পরিকল্পনা করেন তাঁর জননী নাসিম বানু। জয় মুখার্জি এই ছবির নায়ক। নৌশাদ সংগীত পরিচালক।

জিদ্দি ছবির প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী সম্প্রতি তাঁর ইউনিট নিয়ে উটকামণ্ড গেছেন। ছবির নায়কনায়িকা জয় মুখার্জি ও আশা পারেখকে এবং কৌতুকাভিনেতা মেহমুদকে নিয়ে সেখানে ছবির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। জিদ্দির কাহিনী রচনা করেছেন শচীন ভৌমিক। শচীন দেববর্মণ ছবির সুরকার।

কারদার স্টুডিওজ-এ দিল দিয়া দর্দ লিয়া-র পরিচালক এ আর কারদার সম্প্রতি ছবির একটি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য গ্রহণ করেন। দৃশ্যটিতে নেচেছেন শ্যামা, আর গান গেয়েছেন নায়িকা ওয়াহীদা রেহমান। দিলীপকুমার ছবির নায়ক। নৌশাদ সংগীত পরিচালক।

হিন্দী ও ইংরেজীতে একটি ছবি নিবেদন করবেন শ্রীমারায়। ছবির নাম তিনদা কোন? রাজ কাপুর, সায়রা বানু ও জয় মুখার্জি এ ছবির প্রধান শিল্পী। ছবির ইংরেজী সংস্করণে এ'রাই অভিনয় করবেন। শঙ্কর-জয়কিষণের ওপর সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

একজন অ্যাথলীটই তো সমস্ত লাফের বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করত। যে ভাল দৌড়ায় সব দৌড়ের পুরস্কার তার হাতে এসে যেত। অ্যাথলেটিকসের প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক ধরনের প্রক্রিয়া এবং পৃথক গুণাবলীর প্রয়োজন। এক একটি বিষয়ে বিশ্বের সেরা হতে হলে কত অনুশীলন, কত অধ্যবসায় এবং কত সাধনার প্রয়োজন, তাও কারো অজানা নয়। তাই বলছিলাম, তাইওয়ানের ইয়াং চুয়াং-কোয়াং ডেকাথলনে ৯১২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, অ্যাথলেটিক-বিশ্বে তা এক বিস্ময়ের ঘটনা। নিচে ইয়াং-এর ১০টি বিষয়ে নৈপুণ্যের খতিয়ান এবং প্রাপ্ত পয়েন্টের সংখ্যা দেওয়া হল:—

১০০ মিটার দৌড়—১০·৭ সেঃ (১০৩৪)
দীর্ঘ লাফ—২৩ ফুঃ ৬½ ইঞ্চি (৮৪২)
লোহার বল ছোঁড়া—৪৩ ফুঃ ৪½ ইঞ্চি (৬৯২)
উচ্চ লাফ—৬ ফুঃ ৩½ ইঞ্চি (৯৩৮)
৪০০ মিটার দৌড়—৪৭·৭ সেঃ (১০৪৫)
১১০ মিটার হার্ডলস—১৪ সেঃ (১১১৬)
ডিসকাস ছোঁড়া—১৩৪ ফুঃ ৬ ইঞ্চি (৬৫৪)
পোল ভল্ট—১৫ ফুঃ ১০½ ইঞ্চি (১৭১৫)
বর্শা নিক্ষেপ—২৩৫ ফুঃ ৫ ইঞ্চি (১০৪০)
১৫০০ মিটার দৌড়—৫ মিঃ ২·৪ সেঃ (২৪৭)

✻

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারত ৩—২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে [illegible] বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। ভারতকে এখন আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলের বিজয়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

এবার ডেভিস কাপের প্রথম খেলায় ভারত পাকিস্তানকে ৪—১ খেলায় পরাজিত করে। খেলা হয় পুনাতে। [illegible] পূর্বাঞ্চলের সেমিফাইনালে ভারত [illegible] পরাজিত করে ৪—০ খেলায়। শেষ সিঙ্গলসে ভারতের [illegible] কৃষ্ণন ২—০ সেটে অগ্রগামী থাকাকালে বৃষ্টির জন্য খেলা স্থগিত হয়। [illegible] টোকিওতে পূর্বাঞ্চলের ফাইনালের প্রথম দিনে ভারত এবং জাপান দুই দেশই একটি করে সিঙ্গলসে বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় দিনে ডাবলসের খেলায় বিজয়ী হয়ে ভারত ২—১ খেলায় এগিয়ে থাকে। বৃষ্টির জন্য দু'দিন খেলা মুলতুবী থাকবার পর শেষ দিনের দু'টি সিঙ্গলসের একটিতে ভারত এবং একটিতে জাপান বিজয়ী হয়। ফলে ভারত ৩—২ খেলায় এগিয়ে থেকে ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইনালে খেলবার অধিকার পায়।

ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে ভারত ও জাপানের এটি ছিল তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পূর্বাঞ্চল ফাইনালে জাপান কোনবারই ভারতকে পরাজিত করতে পারে নি। এর আগে যে দু'বার খেলা হয়েছে তার মধ্যে ১৯৫৬ সালে ভারত ৩—২ খেলায় এবং ১৯৬১ সালে ৪—১ খেলায় জাপানকে পরাজিত করেছে। এবারও ভারতের জয়লাভ অপ্রত্যাশিত ছিল না।

ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুনিপুণ খেলোয়াড় রামনাথন কৃষ্ণন, যিনি টেনিস-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর একবার মাত্র ফিলিপাইনের এম্পনের কাছে ছাড়া এসিয়ার কোন খেলোয়াড়ের কাছে জীবনে হার স্বীকার করেননি, তিনি সহজেই দু'টি সিঙ্গলসের খেলায় জাপানের চ্যাম্পিয়ন ওসামু ইশিগুরো ও আৎসুসি মিয়াসীকে পরাজিত করেছেন। তবে ভারতের অধিনায়ক কৃষ্ণন জাপ অধিনায়ক মিয়াসীকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করতে পারেননি। ডাবলসে ভারতের দুই তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিত লালের কাছে অবশ্য স্ট্রেট সেটেই জাপানের মিয়াসী ও [illegible]কে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু দু'টি সিঙ্গলসেই জয়দীপের পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় এসিয়ান [illegible] চ্যাম্পিয়নশিপের সময় [illegible] ইশিগুরোকে ভারতের [illegible] আলীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি ভারতের দু' নম্বর খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জীকে স্ট্রেট সেটে হারাবেন এটা কেউ আশা করেনি। জাপানের [illegible] খেলোয়াড় মিয়াসীর কাছেও জয়দীপ পরাজিত হয়েছেন। তবে স্ট্রেট সেটে নয়।

দেশে ফিরে এসে ভারতের অধিনায়ক কৃষ্ণ[illegible] চক্রবর্তী এবং [illegible] জাপানের খেলায় কিছুটা বিষ্ম[illegible] [illegible] পরাজয় সম্বন্ধে [illegible] বলেছেন, ইশিগুরো ও মিয়াসী [illegible] চেয়ে ভাল খেলোয়াড় [illegible] ফলাফলের [illegible] আলীর কাছে [illegible] পরাজয়ের [illegible] ইশিগুরো ও মিয়াসী জয়দীপের চেয়ে উন্নত ধরনের খেলোয়াড়। শুধু পরাজয়ই নয়, কলকাতায় ইশিগুরো ও মুখার্জির খেলার চেয়ে জয়দীপের খেলা অনেক উন্নত ছিল। এটা টেনিস-বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত।

মাঠের অবস্থা জয়দীপের স্বাভাবিক ক্রীড়াধারার প্রতিকূল হতে পারে, আবার জয়দীপের অনুশীলনেরও অভাব থাকতে পারে। মোটের উপর, টোকিওর পরাজয়ের পর নিজের দুর্বলতা সম্বন্ধে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে জয়দীপের তা শুধরে নেবার চেষ্টা করা উচিত। টেনিসে বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের নিতান্ত অভাব। দিলীপ বসুর পর যে তারকার দিকে চেয়ে আমরা আলোর আশা করেছিলাম তা যদি এত তাড়াতাড়ি নিষ্প্রভ হয়ে যায় তবে সেটা দুঃখের কথা হবে।

গতবার আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে ভারতকে মেক্সিকোর কাছে ৫—০ খেলায় শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। অন্তত এবার যাতে সেই শোচনীয় অবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, ভারতকে এখন থেকেই তার চেষ্টা করতে হবে।

নিচে ভারত ও জাপানের পূর্বাঞ্চলীয় ফাইনালের ফলাফল দেওয়া হল:—

প্রথম দিন—রামনাথন কৃষ্ণন ৭—৫, ৪—৬, ৬—০ ও ৬—০ গেমে জাপানের আৎসুসি মিয়াসীকে পরাজিত করেন। জাপানের ওসামু ইশিগুরো ৬—২, ৬—০ ও ৬—২ গেমে পরাজিত করেন ভারতের জয়দীপ মুখার্জীকে।

দ্বিতীয় দিন—ডাবলসের খেলায় ভারতের জয়দীপ মুখার্জী ও প্রেমজিত লালের কাছে জাপানের আৎসুসি মিয়াসী ও মিচিও ফুজি ৬—৪, ৬—২ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত হন।

তৃতীয় দিন—প্রথম খেলায় আৎসুসি মিয়াসী ৩—৬, ৬—৩, ৬—২ ও ৭—৫ গেমে ভারতের জয়দীপ মুখার্জীকে পরাজিত করবার পর দুই দেশ দু'টি করে খেলায় বিজয়ী হয়। জয়পরাজয়ের মীমাংসাসূচক পঞ্চম খেলায় ভারতের আর কৃষ্ণন জাপানের ওসামু ইশিগুরোকে ৬—২, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত করেন।

কলকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল ক্লাবের একাদশ অধিনায়ক। ১৫টি ক্লাবের মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং, জর্জ টেলিগ্রাফ, বালী প্রতিভা ও পোর্ট কমিশনার্সের অধিনায়ক ছবিতে অনুপস্থিত। ফটো—দেশ

মুকুল
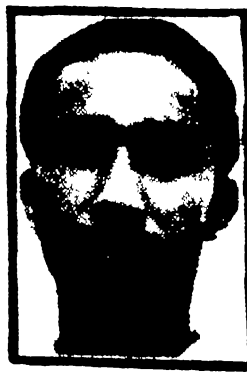
আইনের আঙিনায় আলখাল্লা পরে নিত্য যাঁদের যাতায়াত তেমন একজন বুদ্ধিজীবী আমাকে রেফারীশিপ পরীক্ষার আগে ফুটবলের আইন-বই পড়তে দেখে উপহাস করে বলেছিলেন—'খেলাধূলোর আবার আইন, তার আবার পরীক্ষা। কি আছে ওতে? গোলের মধ্যে বল গেলে গোল, গায়ে লাথি মারলে ফাউল, হাতে বল লাগলে হ্যান্ডবল। এত পড়াশুনা বা মুখস্থ করার কি আছে?"

কথাটা শুনে সেই বৃষ্টিবিন্দুর কথা মনে হয়েছিল। যে সাগরে পড়বার আগে সাগরে হারিয়ে যাবে বলে কেঁদে ফেলেছিল। সাগর তাকে অভয় দিয়ে বলেছিল, 'ভয় নেই ভাই আমার মধ্যে পড়লে তুমিও সাগর হয়ে যাবে।'

আইনের সমুদ্রে যাঁরা অহর্নিশি সাঁতার কাটেন তাঁদের কাছে ফুটবল আইনের ছোট্ট বই বৃষ্টিবিন্দু কোন শিশিরবিন্দুর সমান। কিন্তু আইনে পরিণত হয়ে ঐ বইটি যে আইনের সমুদ্র হয়ে গিয়েছে ভুক্তভোগীরা সেটা ভালভাবেই জানেন।

সবিনয়ে নিবেদন করছি রেফারীশিপ পরীক্ষায় পাস করেছি কিন্তু পুরো নম্বর পাইনি। এ পর্যন্ত কেউ পেয়েছেন বলেও আমার জানা নেই।

মাত্র ৩৮ পাতার একখানি ছোট্ট বই ইংরাজী ছোট টাইপে ছাপা। আইনের ধারা মাত্র ১৭টি। উপধারা ও ব্যাখ্যা অবশ্য প্রচুর। প্রয়োগ ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত কঠিন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা না, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশী। রেফারী হবার জন্য তিন রকমের পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক। বেশ শক্ত পরীক্ষা। একটি প্রশ্ন ভুল করার অর্থ খেলার ক্ষেত্রে একটি ভুল সিদ্ধান্ত করে গোলমালকে টেনে আনা। আর দর্শকদের দ্বারা নিগৃহীত হবার বাপ-ঠাকুরের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা। সুতরাং আইন সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রেফারীদের পক্ষে অপরিহার্য।

ফুটবলের আকারও যেমন গোল, তেমন এ খেলায় সবচেয়ে বেশী গন্ডগোল। ক্রিকেট এবং হকি বলের আকারও গোল। বোধ করি আকার ছোট বলে ক্রিকেট ও হকিতে গন্ডগোলের মাত্রা কম। আকার বড় বলে ফুটবলে গন্ডগোলের বেশী বহর। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ নিয়েও টানাটানি। অশান্তির তো অভাব নেই।

ফুটবল খেলায় রেফারিং-এ সুনাম অর্জন করেছে, এমন রেফারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। যেখানে দর্শকদের মধ্যে আছে ক্লাবমোহ, দর্শকরা আইন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, প্রিয় দলের পরাজয়ে অশান্ত, সেখানে রেফারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ থাকবেই।

স্বীকার করি রেফারীরা অনেক সময় ভুল করেন। কিন্তু ভুলের ক্ষেত্র ছাড়াও তো গোলমালের অভাব হয় না। যে পরিবেশের মধ্যে রেফারীদের খেলা পরিচালনা করতে হয় সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় চোখের নিমিষে বিরুদ্ধবাদীদের কর্ণবিদারী চীৎকারের কথা স্মরণ রেখে। এ ক্ষেত্রে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে তারাও তে

'ফুটবলের আইন-কানুন' এই পর্যায় ফুটবল খেলার আইনের ধারা ও তার ব্যাখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। তা ছাড়া প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও কিছু কিছু পর্যালোচনা স্থান পাবে। কেবল ফুটবলের আইন সম্বন্ধে কারো কিছু জানবার থাকলে এই বিভাগের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

মানুষ। মানুষ মাত্রেরই ভুল আছে। তবে দেখতে হবে এই ভুল মারাত্মক ধরনের না হয় এবং পক্ষপাতের সামান্যতম আভাসও যেন না থাকে।

রেফারীদেরও স্মরণ রাখা দরকার—ফুটবলের আইন খেলার মাঠে তাদের সম্রাটের সম্মান দিয়েছে। খেলার ফলাফল সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' কথাটা বোধ হয় ফুটবল রেফারীদের ক্ষেত্রে আক্ষরিকভাবে প্রযোজ্য। নিম্ন আদালতে মকদ্দমায় হেরে গেলে উচ্চ আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনার বিধান আছে সেখানে হারলে হাই কোর্ট আছে, সুপ্রিম কোর্ট আছে। কিন্তু ফুটবলের আইনে রেফারীরাই বিচারের সুপ্রিম কোর্ট। তারা যতক্ষণ না নিজেদের ভুল স্বীকার করে, ততক্ষণ খেলাধূলার পরিচালক সমিতির কিছুই করার নেই। অবশ্য পরিচালক সমিতি নিজেদের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান করে রেফারীর দোষত্রুটি সম্বন্ধে যদি কোন ব্যবস্থা করেন, সে পৃথক কথা। মোটের উপর ফুটবল আইন রেফারীর হাতে অগাধ ক্ষমতা দিয়েছে; খেলার সময় রেফারী মাঠের হর্তাকর্তা-বিধাতা।

যে আইন রেফারীকে এত ক্ষমতা দিয়েছে, যে আইনের বলে রেফারীর চূড়ান্ত বিচারকের সম্মান, সেই আইনের যাতে অপপ্রয়োগ না ঘটে, যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই রেফারীরা খেলা পরিচালনা করেন। তবু ভুল হয়, আবার বিনা ভুলেও ভুলের মাসুল গুনতে হয়। রেফারীদের কর্তব্য অনেকটা বিধবার একাদশী ব্রত পালন করার মত। ব্রত পালন করলে পুণ্য নেই, না করলে পাপ। রেফারীরা যদি সত্যি সত্যিই সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করে, কেউ তাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য বড় একটা এগিয়ে আসে না। কিন্তু ভুল করলে তার 'মুন্ডপাতের' জন্য লোকের অভাব হয় না।

অস্বীকার করবার উপায় নেই ফুটবল খেলায় যত গন্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তার অধিকাংশের মূলে থাকে রেফারীর দুর্বল পরিচালনা এবং আইন সম্বন্ধে দর্শকদের ভুল ধারণা। থ্রো-ইনের সময় অফসাইড হয় না এ কথা অনেকেরই জানা নেই। তাই থ্রো-ইনের সময় একজন খেলোয়াড় গোলের মুখে গিয়ে দাঁড়ালে 'অফসাইড' 'অফসাইড' চীৎকার ওঠে। কোনটা ডাইরেক্ট আর কোনটা ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক—এ সম্বন্ধে খেলোয়াড়রাও বহু ক্ষেত্রে কিক করবার সময় রেফারীর মতামত গ্রহণ করেন। দর্শকদের মত বহু খেলোয়াড়েরও ফুটবল আইন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই— আবার আইনের খুঁটিনাটি বিষয়ও বহু দর্শক এবং খেলোয়াড়ের নখদর্পণে। দুঃখের বিষয়, এদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে ফুটবল খেলায় অবিরাম অশান্তি।

* সূচীপত্র *

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

'উদাত্ত ভারত'

বেবন্ন

কবি বিজয়লালের সুনির্বাচিত সংকলন

(১৯১৬—১৯৬৭)

॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০ পৃষ্ঠা। দাম : আট টাকা ॥

নলেজ হোম

৫৯, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত শিয়ালদহ হইতে মাত্র ১৯ মাইল দূরে শ্যামনগর স্টেশনের অনতিদূরে কিরণনগরে প্লট বিক্রয় আরম্ভ হইল। মাসিক কিস্তি ও এককালীন টাকায় খরিদের সুযোগ আছে। আবেদনপত্র ও বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

দি ন্যাশনাল এক্সচেকার অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

৩।১, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট,
কলিকাতা-১।
ফোন নং ২৩—১৯০২

(সি ১৪৭৩)

চতুষ্পর্ণা

সদ্য প্রকাশিত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়

প্রবন্ধ

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের
Has Man A Future ?-র
বাংলা অনুবাদ।

উপন্যাস

সত্য ভট্টাচার্য ও কবিতা সিংহ

গল্প

স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

সুনীল চট্টোপাধ্যায় আলোক সরকার
শান্তি চট্টোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী
প্রভৃতি

প্রচ্ছদ

সুবন্ধু ভট্টাচার্য হিরেন্দ্ররঞ্জন সান্যাল

দাম : ৫০ নয়া পয়সা মাত্র

এজেন্সীর যোগাযোগ করুন
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা—৯

(সি ১৫৫৪)

শা হ জা দা

বারীন্দ্রনাথ দাশ

আওরঙ্গজেবের জীবনের এক অজানা প্রেমকাহিনীর পটভূমিতে বিরাট ঐতিহাসিক উপন্যাস। নয় টাকা

অচিনপুরের কথকতা

সমরেশ বসু

ভাগাহত যুবকের মর্মস্পর্শী কাহিনী। **বিভাস** নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হইতেছে। দাম ছয় টাকা

স্বর্গখেলনা

বিমল কর

নতুন উপন্যাস। চার টাকা

পতঙ্গ মন

দীপক চৌধুরী

নতুন উপন্যাস আড়াই টাকা

নতুন মুদ্রণে **সুবোধ ঘোষের** গ্রন্থসমূহ

মনভ্রমরা	সুজাতা	সীমন্তসরণি
৩য় মুদ্রণ। তিন টাকা	৮ম মুদ্রণ। আড়াই টাকা	৬ষ্ঠ মুদ্রণ। তিন টাকা

ক্যালকাটা পাবলিশার্স ॥ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাস (নতুন দিল্লী)

শনিবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
৩০ বর্ষ ॥ ৩০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
Saturday 25th May 1963

বিজ্ঞান চর্চার সংকট

কোন কোন বিদেশী অর্থশাস্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতি এখন দ্রুত ঊর্ধ্বগামী বিমানবন্দর থেকে এরোপ্লেন আকাশে উড়বার সময় এঞ্জিনের দৌড় শুরু হলে যে অবস্থা ঠিক যেন সে-রকম। শিল্পায়নের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত সমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় আমাদের শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ এবং পরিমাণ এখনও সামান্যই, তবুও বহুকাল পিছিয়ে-পড়া এ-দেশের যন্ত্র শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রতিক প্রসার এবং উন্নতি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তা বলে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত বোধ করা সঙ্গত নয়। আমাদের শিল্পায়নের বড় বড় পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ নানা দিক দিয়ে এখনও বিদেশের উপর নির্ভর। যন্ত্রকৌশল প্রয়োগের বিদ্যা প্রায় সবটাই আমাদের শিখতে হচ্ছে বিদেশ থেকে, নতুন নতুন যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হচ্ছে য়ুরোপ, আমেরিকা, রাশিয়ায়। আমাদের বিজ্ঞানীরা যন্ত্রশিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে আছেন, কবে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আসবে তার আশায়, নতুন বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নতুন নতুন প্রক্রিয়ার খোঁজখবর অথবা গুপ্ত সন্ধি জেনে নেবার জন্য। একথা ঠিক যে পিছিয়ে পড়া দেশের পক্ষে শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে উন্নত দেশগুলির উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর না করে উপায় নেই। কিন্তু সেটা প্রথম পর্যায়ে, চিরকালের জন্য নিশ্চয়ই নয়। যন্ত্রকৌশল, জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য বিদেশ থেকে আহরিত হোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্য স্বাধীনভাবে অনুশীলন করা চাই যাতে আমাদের দেশেরও নিজস্ব বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য এবং মূলধন গড়ে ওঠে। আমাদের বিজ্ঞানীরা, যন্ত্রশিল্পীরা এবং সরকারী, বেসরকারী শিল্পব্যবসার পরিচালকগণ এ বিষয়ে কতখানি সজাগ হয়েছেন বলা কঠিন।

এ কালের শিল্পসমৃদ্ধি, বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তি হল বিজ্ঞান, কেবল হাতে কলমে কল চালানোর জন্য ব্যবহারিক শিক্ষণ নয়, মূল অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক গবেষণাও। বিদেশ থেকে ভারী ভারী কলকব্জা এনে, যন্ত্রকৌশল শিখে এসে শিল্পপত্তন এবং হাতে হাতে নগদ লাভ গণনা করা এক কথা, আর নিজেদের চেষ্টায় কলকারখানায়, গবেষণাগারে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানের মূলধন বাড়ানো অন্য কথা। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাদের দেশ অনেক দূর পিছিয়ে আছে একথা নতুন নয়। চিন্তার কথা হল এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ এবং উদ্যমেরও অভাব। শ্রীদেশমুখ কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণাকর্ম সন্তোষজনক নয়। আমরা অবার ঐতিহ্যসচেতন জাতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠলেই আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, রমণ, কৃষ্ণন প্রমুখ গুটিকয়েক বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের নাম উচ্চারণ করে পুলকিত হই গৌরবান্বিত বোধ করি। দুঃখের বিষয় অতীত সাফল্যের নজীর দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রয়োজনমত অগ্রসর হচ্ছে না, গবেষণাকর্ম পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ গঠনের চেষ্টা ও নানা কারণে ব্যাহত হচ্ছে। এই স্পষ্ট অপ্রিয় সত্যকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

দিল্লিতে বিজ্ঞানকর্মীদের সভায় শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশ এ বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্ম পরিচালনায় আমাদের দেশে এখনও নামমাত্র ব্যয় হয়। আন্তর্জাতিক গড়হিসেবে প্রত্যেক দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা এক থেকে দুই ভাগ বরাদ্দ হয়ে থাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। ভারতবর্ষে হয় শতকরা একভাগের এক-চতুর্থাংশ। আমেরিকা শিল্পসমৃদ্ধ ধনী দেশ, সেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাবদ বার্ষিক খরচ জাতীয় আয়ের ২·৮ শতাংশ, রাশিয়ায় তিন শতাংশ। কমানিস্ট চীনের বৈষয়িক সামর্থ্য ভারতের তুলনায় অবশ্যই কম, কিন্তু সেখানেও আমেরিকানদের সংগৃহীত হিসাব অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাবদ ব্যয় বৎসরে ২৩০ কোটি টাকার সমান। অথচ ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-চর্চার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ মাত্র ৪০ কোটি টাকা! অঙ্কের হিসাবে অর্থের পরিমাণ দেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মের প্রকৃত অবস্থা পুরোপুরি বুঝতে পারা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞান-চর্চার জন্য বার্ষিক বরাদ্দের মোটা একটা অংশ যায় আমলাতান্ত্রিক তদারকী ব্যবস্থা পোষণে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কর্মের জন্য সম্ভবত মেলে মোট বরাদ্দ টাকার ছিটেফোঁটা মাত্র।

জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার, যেগুলি বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলির কাজকর্ম এবং পরিচালনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা। অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মোট বরাদ্দ বৎসরে দেড় কোটি টাকার বেশী নয়। এই সামান্য পরিমাণ টাকারও সদগতি হয় না বহুবিধ কারণে। প্রথমত উন্নত পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মের জন্য নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। এসব অনেক যন্ত্রপাতিই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বিদেশী মুদ্রা বরাদ্দে কড়াকড়ি এবং বিলম্বের ফলে গবেষণার কাজ ঠিকমত এগোয় না। গবেষণাকর্মে উৎসাহ এবং উদ্যমের অভাব ঘটে আরও নানা কারণে। বিদেশ থেকে যেসব বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী এদেশে অধ্যাপনায় ও গবেষণা-কর্মে সহায়তা করতে এসেছেন তাঁদের অভিমত আমাদের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কর্মী এবং ছাত্রদের বিদ্যা বড় বেশী পুঁথিগত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের, কলা-কৌশল প্রয়োগ এবং উদ্ভাবনের অভিজ্ঞতা খুবই সামান্য।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি। মেধাবী ছাত্র গবেষণায় উৎসাহী, অধ্যাপকরাও খ্যাতিমান, কিন্তু বাঁধা লাইনে ভারী ভারী বিলাতী পুঁথিপড়া এবং পড়ানো ছাড়া বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যলোকে নিজেদের উদ্যোগে প্রবেশ এবং আবিষ্কারের চেষ্টা নাই। পারমাণবিক বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা গবেষণাগারে আধুনিক পরীক্ষা-মূলক কাজের সুযোগ সামান্যই পায়, এরকম ঘটনা দুর্লভ নয়। অধ্যাপকমণ্ডলী অবশ্য এর জন্য সর্বত্র সর্বাংশে দায়ী নন। পাশ্চাত্য দেশে পারমাণবিক বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে অসাধারণ দ্রুতগতিতে, এর সঙ্গে তাল রেখে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্র, প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণাগারে এসব যন্ত্র, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রবর্তনের সুযোগ নেই। বিজ্ঞানের যে সমস্ত তত্ত্ব, তথ্য, প্রক্রিয়া এবং প্রয়োগকৌশল পাশ্চাত্য দেশে এক যুগ আগে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে বর্জিত, আমাদের গবেষণাগারগুলিতে চলছে তারই পুনরাবৃত্তি ও রোমন্থন। কালের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর না হতে পারলে বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সার্থক ও সুফলপ্রদ হওয়া অসম্ভব-প্রায়।

সিন্ধু শকুন

শিশিরকুমার দাশ

হে সিন্ধু শকুন শোন বিকেলের আলো
তোমার পাখায় এসে ঠোঁট রাখে, মেঘে মেঘে কালো
পাল তুলে সন্ধ্যা আসে, লুপ্ত হবে অন্ধকারে সব
হে সিন্ধু শকুন তুমি এখনও করনি অনুভব!

চাও চাও আমার চোখের দিকে, দেখ শান্ত তারা
আকাশেরও চেয়ে শান্ত, সময়ের কঠিন পাহারা
ভেঙে দিয়ে নিয়ে যাও দূর পাহাড়ের সেই গাছে
যেখানে আমার বধূ তৃষ্ণা নিয়ে আজো বেঁচে আছে—

সে এক অমর পাখি। একদিন এক গ্রীক বীর
আমাকে সমুদ্র থেকে বিঁধেছিল সুনিপুণ তীক্ষ্ণ তার তীর।
যখন আমার বক্ষ পড়েছিল সমুদ্রের জলে
বধূ শুধু বলেছিল, আমি জেগে রব নীল আকাশের তলে
আমি জেগে রব, রবে ছায়া, গাছ, এক ছোট ঘর
তুমি শুধু ফিরে এস, যুগান্তের জন্মান্তের পর॥

শীর্ষ মুহূর্ত

অনিরুদ্ধ কর

বড়ো কাছে এসেছিল প্রদোষের সান্ধ্যরেখালীনা
মুহূর্তের বিন্দুগুলি যা কিছু তখন ইতস্তত—
ঘুরতে ঘুরতে থেমে গিয়েছিল, যেন নাচের আসরে
চঞ্চল চরণস্তম্ভ সেইমাত্র অবলোকনের
জন্য থেমে গেল বহু অলীক মুদ্রায় যে বিশাল
অট্টালিকা গড়ে উঠবে কথা ছিল কিছুই হল না,
কৌতূহল ডাক দিল উন্মোচিত রহস্যের ঘরে।

মুখের রেখার পাশে নিঃশ্বাসের অনচ্ছ উষ্ণতা
পতঙ্গের মতো ওড়ে, ভিতরে ভীষণ তীব্র আলো
মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে।
প্রদোষের সান্ধ্যরেখালীনা
চঞ্চল বিন্দুর ঘূর্ণি থেমেছে অজ্ঞাতে ভয়ে দোলে
স্ফূর্তিপুঞ্জ, চতুর্দিকে সাংকেতিক নীরব সৌরভ।

সে

সুনীলকুমার নন্দী

'ও কে ও কে, ও কে গো', এই মধ্যনিশীথে
চমকে আলো জ্বাললে কেন, কই তো কিছু নেই—

হয়তো পাখির উড়াল ডানার পথিক হাওয়া। সে
তোমার আমার মধ্যে যেন ফেললো ছায়া কে?

ছম্ ছম্ ছম্ : আলোয় এ কী ছায়াও দেখি নেই—
স্বপ্ন পাখি, তবু তাকে মুছতে পারি নে।

হঠাৎ এসে শব্দ তোলে খাড়াই খাদে সে
শব্দ তোলে 'ও কে, ও কে' মধ্যনিশীথে।

শব্দ ফেরে অবিশ্বাসী হাসির কাঁপুনি:
অবাক, তুমি অন্ধকারের শব্দ শোনো নি!

থই থই থই অন্ধকারের আবছা গহনে
ছল্ ছল্ ছল্ শব্দ বাজে, বইতে থাকে সে

তোমার আমার মধ্যিখানে, খুঁজতে থাকে কী
নিশিপাওয়া স্বপ্ন, ও আর সইতে পারি নে:

জ্বালো আলো, হাত টেনে নাও, একটু আড়াল নি।

কোন প্রমাণ দেখা যাবে না, তা নয়। কিন্তু সেই কূটনৈতিক দক্ষতা যে দিকে চলছিল, সেই দিকেই যদি চলতে থাকে তবে সেটা একটা বন্ধ গলিতে ঢুকবে।

এক দিকে মার্কিন সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান বেশ কিছুটা সামরিক শক্তি সংগ্রহ করেছে, অপর দিকে "সিয়াটো"র অন্তর্ভুক্ত হয়েও ভারতকে বেকায়দায় ফেলার যখন দরকার তখন কম্যুনিস্ট চীনের সংগে দোস্তি করতে তার আটকায়নি, আমেরিকা তাকে ঠেকাতে পারেনি। এর দরুন পশ্চিমা মহলে যতটা ক্রোধ ও বিরক্তি উৎপাদন স্বাভাবিক ছিল তারও অনেকটা কায়দা করে ভারতের উপর দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কাশ্মীর সমস্যা মেটাবার আগ্রহ ভারতের নেই এই ধরনের ফলাও প্রচারের আড়ালে কম্যুনিস্ট চীনের দিকে পাকিস্তানী সরকারের দোস্তির হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা অনেকখানি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই কূটনৈতিক সাফল্যের একটা সীমা আছে এবং এখন অবস্থাটা সেই সীমার কাছেই প্রায় পৌঁছে গেছে। পাকিস্তানী সরকারের হাতের বাণ শক্তিশালী সন্দেহ নেই, কিন্তু বাণটি এইরকম যে প্রয়োগ না করা পর্যন্তই তার মূল্য, প্রয়োগ করলেই সেটা নিষ্ফল হয়ে যাবে। যা করব বলে ভয় দেখানো হচ্ছে তার শক্তি ততদিন, যতদিন তা দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে অর্থাৎ যতদিন সেটা কাজে করা হয় না; কাজে করার সংগে সংগেই সব উল্টে যাবে। যেমন কম্যুনিস্ট চীনের সংগে পাকিস্তান যেটুকু দোস্তির ভাব দেখিয়েছে তার দ্বারা পশ্চিমাদের ভয় দেখানো চলে, কিন্তু এর চেয়ে বেশী এগুতে গেলে পাকিস্তানের নিজেকেই হারিয়ে ফেলতে হবে।

অবশ্য এসব কথার এই অর্থ নয় যে, ভারত সরকার এতোদিন যে পথে চলে এসেছেন সেটা সবই ঠিক পথ। অপরিণামদর্শিতা কেবল পাকিস্তানী সরকারের একচেটিয়া গুণ নয়। কিন্তু দু' পক্ষের দোষগুণের চুলচেরা বিচার করে কোনো লাভ নেই। তার চেয়েও বড়ো কথা যেটা মনে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে এই যে, ভারত বা পাকিস্তানের স্বার্থ পরস্পরবিরোধীভাবে তো নয়ই, পরস্পরনিরপেক্ষভাবেও রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার অর্থ এই যে, কোন কোন বিষয়ে—এবং সেগুলি সবই মৌলিক বিষয়—ভারত সরকারের বা পাকিস্তান সরকারের কেবল ভারতীয় বা কেবল পাকিস্তানী দৃষ্টি নিয়ে চললে চলবে না এই সমগ্র উপমহাদেশের সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে স্ব স্ব রাষ্ট্রের কল্যাণ খুঁজতে হবে। যা উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর নয় সেটা একের পক্ষেও কল্যাণকর নয়—এই বোধ স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। এটা সহজসাধ্য নয় কিন্তু সহজ পথে সব পাওয়া যাবে এরূপ আশা করেও কোনো লাভ নেই।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনা ব্যর্থ হল সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটাও ঠিক দু পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সরাসরি আলোচনা ছিল না, অন্ততপক্ষে প্রেরণার দিক থেকে। প্রয়োজনের তাগিদ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেরণা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, বরঞ্চ সে দিক দিয়ে প্রধানত ইঙ্গ-মার্কিন তাগিদই ছিল গত নভেম্বর মাসের নেহরু-আয়ুব খান যুক্ত বিবৃতির মূলে।

এই ছ' মাসব্যাপী আলোচনায় মীমাংসার পথ পাওয়া গেল না। এখন একটা প্রস্তাব চলছে—মধ্যস্থের শরণ নিয়ে মীমাংসার চেষ্টা হোক। মীমাংসার উপায় হিসাবে মধ্যস্থতা কার্যকর হতে পারে, কিন্তু তার জন্য উভয় পক্ষের একটা বিশেষ ধরনের মানসিক ভাব থাকা দরকার। যে ক্ষেত্রে বিপদটা এইরকম যে, নিষ্পত্তির পরে আর দু পক্ষের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রাখা অত্যাবশ্যক নয়, সেখানে মধ্যস্থের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হওয়ার মতো মন হলেই হল। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনো একটা বিষয় নিয়ে বিবাদের মীমাংসাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, সেখানে পরবর্তীকালে সদ্ভাবই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। যেখানে বিবাদ নিষ্পত্তির পরে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত না হলে নিষ্পত্তিই অর্থহীন হয়ে যাবে সেখানে আসল মীমাংসা মধ্যস্থের সিদ্ধান্তের উপরে নয়, দু পক্ষের অনুকূল মানসিক ভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রেও মধ্যস্থের সহায়তা নিতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মীমাংসাকে সত্য করতে হলে তার আসল শক্তি দুই পক্ষের মনোভাব থেকে আহরণ করতে হবে।

কোনো কোনো সময় [illegible] মানুষ [illegible] [illegible] হয়েছে যে কেউ [illegible] কঠিন হয়ে [illegible] সময়ে দু পক্ষের মুখপাত্রগণ এরূপ কথা বলেন ও এরূপ ভঙ্গী সহকারে চলে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন যে তাঁদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও সেই অভ্যস্ত সুর বা ভঙ্গী ত্যাগ করে অন্যরকম কিছু বলা বা করা কঠিন। কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতারা এতোদিন একটা বিশেষ ভঙ্গী নিয়ে চলেছেন এখন যদি তাঁরা সেটার পরিবর্তন আবশ্যক বলে মনেও করেন কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার খাতিরে তা করতে সাহস করেন না যাকে "লোকমতের" ভয় বলা হয়। এ কথা ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে কোনো মধ্যস্থ মানলে মীমাংসার সুবিধা হতে পারে। কারণ, যে মীমাংসা রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের দায়িত্বে করতে ভয় পেতেন, সেটা মধ্যস্থের সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিতে পারা এবং স্ব স্ব দেশের লোকদের দিয়ে মানানো অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

ভ্রংশাক্ষরে

ফর্ম আর কনটেন্ট—শিল্পকর্মের আকৃতি বনাম প্রকৃতিগত তর্কে গতবার বিস্তর বাগবিস্তার করেছিলুম। সেই লেখা ছাপা হয়ে এল, তখন টের পেলুম অত প্রগলভতার দরকারই ছিল না, বরং কবিগুরুর তিনখানি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হত। উপদেশের চেয়ে উদাহরণ সর্বাংশে শ্রেয়। আকারের স্বাতন্ত্র্য প্রকারের সাজাত্যকে ঢেকে ঢুকে রাখে, তার প্রমাণ—নৈবেদ্য, খেয়া গীতাঞ্জলি। এই ত্রয়ী যে রক্তসম্পর্কিত সেটা নিঃসংশয়, কিন্তু একেরই যে ত্রিবিধ প্রকাশ, তা কি তৎকালে পাঠকমাত্রেই অনুমান করতে পেরেছিলেন? আমার ধারণা না। নৈবেদ্যে উচ্ছ্বাস কঠিনভাবে শাসিত, তাঁহে সমর্পিত কয়েকটি সনেটের সমষ্টি মাত্র। গীতাঞ্জলি গান, আরাধ্যের প্রতি অবোধ্য আবেগে শ্বসিত। খেয়ার মূলে আনন্দ কাব্যপাঠের। সেখানে বাক্সার দুলাল যে-বালিকার ঘরের সমুখ পথে চলে যাবে চলে গেছে, তার আকুল হাহাকারই ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হতে শুনেছি। মেয়েটি সেই নির্মম উদাসীনকে কী দিয়েছে, তা কেউ জানে না কিন্তু আমরা ঘরের সমুখে আঁক চাকার চিহ্ন দেখে জেনেছি। কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে কোন্ উদাসীন করে আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে চলে গেল তার আলো একবার ভেসে গেছে জলে অকারণে, একবার আকাশ প্রদীপ হয়ে জ্বলেছে, সেও অকারণে, সবশেষে দীপালিতে লক্ষ দীপের সনে পুড়ে পুড়ে ফুরিয়েছে। অনাবশ্যক অপচয়ের অর্থহীনতাকে তীব্র করে তুলেছে সেই এক জনের অধীরতা, বারবার ডেকে ডেকে যে বলেছিল, 'আমার ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা। দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।' একটি অসহায় অনুরোধের বেদনা সমস্ত কবিতাটিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এর সঙ্গে বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় এই সুনিশ্চয় ঘোষণা, আঘাত সংঘাত মাঝে এসে দাঁড়ানোর সাহস, উচ্চশির, ভয়শূন্য চিত্তের প্রার্থনার মিল আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণ। এখান থেকে গীতাঞ্জলির সুরনির্ভর নির্ভার অভিসার মনে হবে, ঢের দূর লোক লোকান্তরের।

কেন। তিন সঙ্গীর আন্তরিক একাত্মতা ঢেকেছে কিসে। স্পষ্টতই প্রকাশে। বিভ্রমের হেতু পোশাক, বিভ্রমের হেতু আধার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই এক দিন তিনকে একাকার করে দিলেন। ইংরাজী গীতাঞ্জলির কথা বলছি ফর্মের খোলস খসল, নিরলংকার তর্জমায় নিরাকৃত হল বলেই তো নৈবেদ্য খেয়া আর গীতাঞ্জলিকে অবাক আমরা আসলে এক বলে মেনে নিলুম। কাশের বনে শূন্য নদীতীরের মেয়েটিকে সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে সহজে সহ-অবস্থিত দেখলুম বলেই তো খেয়া আর গীতাঞ্জলির মূলে যে স্বাদ-স্বাতন্ত্র্য তাকে ভুললুম

*

ওয়ার্ডসওয়ার্থের টিকটিকিটির লেজ খসল এবার কথান্তরে যাওয়া যাক। শুধু তাঁর আসর বক্তৃতায় একটি কোটেশনকে লক্ষ্যই করবেন বলে শান দিচ্ছিলেন, তার স্তুতি ক্রমাগত ভাঁওচি দিচ্ছিল, কেন, কোটেশনটি ওঅর্ডস্বর্থের

এই প্রখ্যাত কবির সম্পর্কে আমার যা আপনা আপনি একটা প্রতিরোধ আছে একটা হেতু জানি উনি অপার সব কাব্যিকতারের উপাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। ফলত প্রয়োগের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক পৃষ্ঠা অধিকার করে থাকেন।

কিন্তু একমাত্র হেতু তাই নয় প্রকৃতি-রসিক বলে ওঅর্ডস্বার্থের প্রসিদ্ধিও। কবিত্ব এক যে নিতান্ত প্রাকৃতজন হলেও প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমার কোন প্রতিবাদ নেই। চাঁদ উঠুক ফুল ফুটুক কদমতলায় যে-কোন প্রাণী যেমন-খুশি তেমন নাচুক, তারিফ করব। আমার আপত্তি কেবল ছাপটা নিয়ে। ছাপ বড় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রণয়ে ছাপের চেয়ে বরং চাপাচাপি ভাল। প্রকৃতি তো আছেই থাকবেই, যে-পরিবেশে আছি যে পটভূমিতে নড়াচড়া করছি তার মত নিশ্চিত অবিচল, স্থির। যেমন আমার এই ঘরে ভরপুর হাওয়া আমার বিছানায় চলকে পড়া সকালের কয়েক চামচ রোদ। রয়েছে জানি কিন্তু সচেতনভাবে নয়, অন্তত আলোচনার বিষয়ীভূত তো কখনই তা নয়।

মূক সুখও সুখ, কিন্তু আমার বরাবরের সন্দেহ ওঅর্ডস্বর্থ এই অপার অনুচ্চার সুখের রহস্য জানতেন না। জানলে প্রকৃতির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার কাহিনীকে নিশানের ডগায় পতপত করে ওড়াতেন না, বরং গোপন কথাটি প্রকটিত হবার লজ্জায় অধোবদন হতেন। (হাক্সলীর 'ওঅর্ডস্বর্থ ইন দি ট্রপিকস' মনে পড়ে? হাক্সলী বলেছিলেন, ইংলন্ডের মনোরম লেক তালুক ওঅর্ডস্বর্থের নয়ন মনের দাই ছিল বলেই না তিনি নিসর্গে কেবল 'মধু বাতা ঋতায়তে, মধুং ক্ষরন্তি' ইত্যাদি মন্ত্র ধ্বনিত হতে শুনেছিলেন। পড়তেন কঙ্গোর জঙ্গলে তা হলে নিসর্গকে এমন হৃদয়-হরণ বলে ঠেকত না।)

অবহিত আছি বায় কিছুটা একপেশে হয়ে গেল। কেন না, এই চাপানের পরে 'প্রিলিউডের' উতোর আছে। যে কবিতাটিতে ওঅর্ডস্বর্থ প্রকৃতিতন্ময় নন; বস্তুত ভীত। সেখানে একটি পাহাড় কবিকে তাড়না করেছে তার সন্ধ্যা ভয়ংকরতায় তিনি পীড়িত।

সোনালেম মসলিন নয় নিসর্গকে তার দন্ত নিষ্ঠুর নখ-দাঁত তার আলো-কালো স্বরূপ সমেতই চিনে নিতে হবে। শুভে-অশুভে স্থাপিত যে দেবতার পাদপীঠ তিনিই উপাস্য হন ভয়ংকরকে সুন্দরের ছদ্মবেশ পরান না ভয়ংকরকে ভয়ংকর রূপেই গ্রহণ করব সঘন কৃষ্ণ অন্ধকারে অন্তত ক্ষণকাল তো দাঁড়াই, তবেই চিত্তের সার্থ সম্পূর্ণ সমগ্র হয় [illegible]

লক্ষ্মীর পাশাপাশি যাঁরা অলক্ষ্মীর রূপ মূর্তি গড়েছিলেন তাঁরা অকল্যাণকে কল্যাণে চোলাই করতে চাননি। শিব বিষ মঙ্গলের প্রতীক শিবের অঙ্গীকৃত এই কল্পনার মধ্যে মঙ্গল অমঙ্গলই প্রয়োজন এই সত্য স্বীকৃত।

এখানে একটি প্রশ্ন বাকী থাকে। ভয়াল কি কেবলই নেতিবাচক একটি সংজ্ঞা অর্থাৎ নঙর্থক নয়ন থীসিসটিরই কি অ্যান্টিথিসিস শয়তান না ঈশ্বরবিদ্রোহী অহংকৃত সেই দম্ভী গম্ভীর ভীমসত্তাকে বরখাস্ত করতে চাই না। সে কেবল নাহি-নাহি বলে না সে যে কী অলজ্জ-স্পষ্টভাবে তাও জানায়। শয়তানও একটি সদর্থক কল্পনা। অহংকার শুধু বিনয়ের অভাব নয় প্রবৃত্তি যেমন স্বরূপে স্বরাট, কঠিন এবং তার দিনের যমজ সহোদরমাত্র নয়। সত্য বলতে কি অন্ধকারই তো আদিম, আলোক যত প্রাচীনই হোক, সৃষ্টিতত্ত্ব বলে, যেদিন কোন সনাতন পুরুষের ইচ্ছায় তার আবির্ভাব ঘটেছে কিন্তু তারও আগে চরাচরলোকে অন্ধকারই একমাত্র হয়ে ছিল। বিজ্ঞানীরা বলেন, সাদা সর্ব-বর্ণের আধার, স্বচ্ছ রিক্ততাই নাকি কালো। এই বৈজ্ঞানিক সত্য কিন্তু শিল্পের সত্য নয়। সাদাকেই বরং দেখি নীরক্ত নিরাকার নির্বিকার; যেন গোহালে নিরীহ ধবলী। কালো তার বিকার, তার আসক্তি তার কর্কশ-রূঢ়তা নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহে মহিমময়িমায় প্রগাঢ় মজে আছে।

অতীত

রাজলক্ষ্মী দেবী

সেই সব ছেলেরা কোথায়?
কলেজের মাঠে, গঙ্গার তীরে
উৎসাহী মুখ।
দু'পয়সা ঠোঙা বাদামের ঝোঁকে
কাব্য অথবা রাজনীতি করা,
জলের মতন স্বচ্ছ দু' চোখে
অশোক অভীক যৌবন ভরা—
সেই সব ছেলেরা ছেলেরা ছেলেরা কোথায়?

সেই সব মেয়েরা কোথায়?
টান করে বাঁধা চুল আছে ঘিরে
সংবৃত মুখ।
ভূষণ-বিহীন ঋজু দেহদীপে
উচ্চাশা যারা রাখতো জ্বালিয়ে,
হৃদয়ের চোরা জনহীন দ্বীপে
বাঁধতো না তরী,—বাঁচতো পালিয়ে।
সেই সব মেয়েরা মেয়েরা মেয়েরা কোথায়?

যখন রাস্তার ধারে

কেতকী কুশারী

যখন রাস্তার ধারে একসঙ্গে জ্বলে ওঠে বাতি,
অথচ আলোর স্মৃতি ঘিরে থাকে বসন্ত-আকাশ,
বিকাল চায় না যেতে, ভালোবেসে সেধে হয় সাথী,
আস্তে আস্তে থেমে আসে দীর্ঘসূত্রী দিনের নিশ্বাস,

চীনা কালি দিয়ে আঁকা চেরা-চেরা নিষ্কম্প শাখায়
নম্র নীল জলছবি চিন্তাহীনতায় নেমে আসে,
ঘড়ি-টিক্‌টিক্ ঘরে দেওয়ালের রঙ বদলায়,
চেতনা নির্ভর হয়ে কর্মহীন শূন্যতায় ভাসে,

এমন সন্ধ্যায় যারা অল্প অল্প জ্বরের শিয়রে
ট্র্যাফিকের অবাস্তব গুঞ্জরন কখনও শুনেছে,
তারা জানে, যদিও বা মোহগ্রস্ত এমন প্রহরে
অনাবশ্যক খেদ দূরে করা সহজ হয়েছে,

তবুও সময় চিরে একরত্তি কাঁটার মতন
ক্ষীণ-হয়ে-আসা গন্ধ লেগে থাকে পুরোনো শিশিতে,
সে দৃষ্টি বারবার করে উৎকাতুর আলো-অন্বেষণ
একবার হয়েছে যার অন্ধকার ড্র্যাগন-নিশীথে।

তখন আপনার হাসি সংগোপন সমুদ্রসৈকতে
হাজার হাজার বার ভেঙে পড়ে স্বচ্ছ পূর্ণিমায়,
বুলায় পাল্লকস্পর্শ বালুকার পরতে পরতে
গ্লানিহীন কলস্বরে জ্বরতপ্ত পৃথিবী ভরায়।

'বনলতা সেন' নয়

বেলা দত্তগুপ্ত

হাজার
হাজার দিন আমি এই পথ হাঁটি দেখি।
সবাই দেখেছে তাকে
তোমরা, আমরা, আরও অনেকে
শেয়ালদা থেকে মৌলালীর পথ ধরে
যে ছোট মেয়ে প্রতিদিন চলে, ফেরে,
বুকে পিঠে জগদ্দল বোঝা বয়ে
নত হয়ে।

চুলে তার
বিদিশার নিশা ঘনাবে না কোন দিন;
রুক্ষ, তৈলহীন
বিবর্ণ একগুচ্ছ শণ
অকৃপণ বাতাস ওড়ায় অকারণ।

মুখে তার সত্যিই শ্রাবস্তীর কারুকার্য!
কিংবা গান্ধার শিল্পের!!
যন্ত্রণায় আহত, আয়ত চোখ,
নাক, মুখ শীর্ণ হতে হয়েছে শীর্ণতর;
যৌবন করেছে তারে ক্ষমা।
ঝড়ে, জলে রোদ্দুরে
ভিজে, পুড়ে
সে সচল টেরাকোটা
দেখেছি প্রতিদিন কী যন্ত্রণায় মরে!

একদিন,
ডানার রোদের গন্ধ মুছে ফেলা
সন্ধ্যা নেমেছে মৌলালীর মোড়ে;
লোক, জন, আপিস, কাছারী।
ট্রাম, বাস, ট্যাক্সীর ভিড়ে
কোন ফাঁকে সে
দাঁড়িয়েছে এসে একেবারে মুখোমুখি।
পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে
বলেনি সে—"এতদিন কোথায় ছিলেন?"
বলেছে—"কিছুই হয়নি বিক্রি,
বাবু, একটা শেলফ নেবেন?"

শিল্পীর স্বাধীনতা

[illegible]

মানুষের পূর্ণবিকাশের পথ উন্মুক্ত রাখা যদি সভ্যতার লক্ষ্য হয়—চিন্তায় ও বাক্যে মানুষের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। শিল্পী জগতে স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে আমার মনে হয় না। এই মানুষই যখন ছবি আঁকে যখন গান গায় বেহালায় 'ছড়' টানে কি গল্প কবিতা লেখে বা অন্য কোন শিল্পকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাকে আমরা শিল্পী বলে আখ্যাত করি। কে কতটা শিল্পী অঙ্কের হিসাব দিয়ে তা স্থির করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথকেও আমরা শিল্পী বলি আবার গাঁয়ের গহর কবি—কোনদিন যার রচিত একটি গান বা কবিতা মুদ্রণযন্ত্রের পেষণে কলঙ্কিত হয় নাই তাকেও শিল্পী বলতে আমাদের, অন্তত আমার, কুণ্ঠা প্রকাশের কোন হেতু আছে বলে বিবেচনা করি না। যা আজ যিনি শেয়ারের বাজারে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন কাল তিনি চমৎকার একটি কবিতা লিখে ফেলবেন না বা গোপনে রাত্রির নিঃসঙ্গতার ইতিমধ্যে লিখতে আরম্ভ করেন নি হলফ করে তা কে বলবে। মানুষই শিল্পী হয়—শিল্পবোধ প্রত্যেকের মধ্যে কাজ করতে পারে বৈকি। কাজেই চিন্তায় ও বাক্যে মানুষের স্বাধীনতার মধ্যেই শিল্পীর স্বাধীনতারও স্বীকৃতি রয়েছে। আর এ-ও সত্য একজন শিল্পী যতটা শিল্পী ততখানি সে মানুষ। সে দেবতাও না শয়তানও না। মানুষ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি সমাজের প্রতি স্বদেশের প্রতি তার যতটা দায়িত্ব রয়েছে শিল্পী হিসাবেও ততখানি দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে মানুষ হিসাবেই তাকে দণ্ডভোগ করতে হয়। শিল্পী এই বিবেচনায় সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষেত্রে আইনসভার অনাচারের [illegible] কেউ কোনদিন দণ্ডভোগ থেকে [illegible] পেয়েছে বলেও আমার জানা নেই। [illegible]

প্রস্তুতি দ্বারা যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্যত হবে শিল্পীও তার কবিতা কি অন্য ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করবে। এর অন্যথা ঘটবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আর পাঁচটি সাধারণ মানুষের মতো শিল্পীও কোন রাষ্ট্রিক সামাজিক বা অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা কি কুব্যবস্থার দরুণ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট, হৃষ্ট বা রুষ্ট হতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও শিল্পীর একটা আলাদা জগৎ আছে বৈকি। সেই জগতে সে তার সৃষ্টি নিয়ে তন্ময়। সেখানে তার দেশ নেই সমাজ নেই আত্মীয় নেই বন্ধু নেই। অথবা সব দেশই তার দেশ। সব মানুষই তার আত্মীয় বন্ধু। রূপের ধ্যানলোকে শিল্পী একান্তভাবে নিমগ্ন। কোন প্রচলিত আইনকানুন সমাজ ব্যবস্থা কি রাষ্ট্রীয় অনুশাসনের পক্ষে কি বিপক্ষে যদি সে কথা বলে সভা করে বই লেখে তবে নাগরিক হিসাবে যতটা করার সে করেছে। আমি বলব তখন সে শিল্পী নয়। তখন সে আর পাঁচজনের একজন। যদি কোন শিল্পী তার সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করে তখন আমি ঐ শিল্প কর্মকেও রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক রচনা বলেই অভিহিত করব। এবং এরকম শিল্পসৃষ্টির যে প্রয়োজন নেই সেকথাও আমি অস্বীকার করছি না। স্বদেশের স্বাধীনতা স্বদেশবাসীর কল্যাণ তো বটেই অপর দেশের স্বাধীনতা বা সেই দেশের মানুষের কল্যাণ যখন বিপর্যস্ত বা বিপন্ন হয় তখনও শিল্পী নীরব থাকতে পারে না। সেদিনও আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার ও তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের মত শিল্পীদের কণ্ঠ থেকেও প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়েছে। কিন্তু এই সততা ও সহানুভূতির পরেও শিল্পীকে এক সময় এমন এক রাজ্যে চলে যেতে হয় যেখানে সে মর্মান্তিকভাবে নিঃসঙ্গ। সেই রাজ্যে বসে সে নিজের মনে [illegible] হেসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান করে। এই [illegible] এই অভিমান আবেগ তার [illegible] প্রেরণা। কিন্তু [illegible]

শিল্পসৃষ্টি করতে বাধা হচ্ছে। এমন অবস্থা যেখানে ঘটে সেখানে শিল্পী কতটা শিল্পী থাকে সেটাই ভাববার কথা। যান্ত্রিক উপায়ে তিন ঘণ্টায় বাচ্চা বার করা হচ্ছে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফুল কেটান হচ্ছে। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও যদি যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার উন্মাদনায় মানুষকে পেয়ে বসে তবে মানুষের ও তার সভ্যতার পরিণতি কি [illegible] মতো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কে জানে একদিন সকালে [illegible] শুনব এমন একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়েছে যা প্রয়োগ করা মাত্র বনের সমস্ত পাখি [illegible] সেই যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা [illegible] নীরব করে দেওয়া যাবে। আশ্চর্যের কিছুই নয়। তবে আমার কথা হয়তো [illegible] এমন ব্যবস্থা হবে সেই দেশের [illegible] আকাশ ছেড়ে পাখিরা [illegible] আকাশে উড়ে যাবে। [illegible] তারা আর তখন পাখি থাকবে না। [illegible] ওপর [illegible]

পাকিস্তানে আম গাওয়ানোর দূরেকথা আমাদের বক্তৃতাও পীড়িত করে ততখানি কি তার চেয়েও বেশি পীড়িত করে যখন শুনি রাষ্ট্রীয়-শক্তির চাপে পড়ে কবিকে কবিতা লিখতে হয়, ঔপন্যাসিককে উপন্যাস লিখতে হয় ও চিত্রশিল্পীকে ছবি আঁকতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন: যে দেশে এমন রাষ্ট্রযন্ত্রের পত্তন হয়েছে সে-দেশের শিল্পীরা তাদের শিল্পীসত্তা ত্যাগ করে মানুষ হিসাবে আর পাঁচজন নাগরিক হিসাবে সেই রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না কেন? ভয়ে? প্রাণের ভয়? জীবিকা নষ্টের ভয়? শিল্পী যখন তার নিজস্ব জগত থেকে নির্বাসিত হয় তখনই তো তার মৃত্যু ঘটে। আর ভয়টা কিসের? এটা আমার মাথায় ঢোকে না। রুচির কথা! শিল্পীর স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়া আর বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির ব্যবহারের ভয়াবহতা আমার কাছে একরকম মনে হয়। তাই অপর দেশের শিল্পীর স্বাধীনতা হৃত বা বিপন্ন হয়েছে শুনেও আমরা নীরব উদাসীন থাকতে পারি না।

ফাদার দ্যতিয়েন ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

দিদিমা

না, আমি ছিঁচকাঁদুনে ছিলাম না...পা কাটলে কাঁদতাম না, পরীক্ষা খারাপ দিলেও কাঁদতাম না...তবে হ্যাঁ, প্রতি বছর একবার করে কাঁদতাম—স্বর্গীয় দিদিমার জন্মদিনে...।'

"আপনার কি সত্যি সত্যি দিদিমা ছিলেন?" ছুটো প্রশ্ন করল, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস না করে, "সন্ন্যাসীর আবার দিদিমা?"

"তা হবে না কেন...ওঁরা কি মানুষ নন?" ছোট ভাইকে ধমকে উঠল কমলা। তারপর অমর ছেলেবেলার এই দ্বিতীয় গল্পে যাতে আর ব্যাঘাত না ঘটে, "ফের যদি আরেকটা কথা বলিস, মারব এক চড়, অসভ্য কোথাকার"...বলে দিদিদিদির কলিরে নিল ঠিক করে।

দাদুকে চিনি নি আমি: আর ঠাকুরদা ঠাকুমার অস্তিত্বও আমার স্মৃতিতে দাগ কাটেনি: তিনজনেই মারা গিয়েছেন আমার অত্যন্ত ছেলেবেলায়। দিদিমার মৃত্যু কিন্তু ১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে—আমার বয়স তখন দশ।

ছোট ডাক্তার

মনে আছে সব...মনে আছে [illegible] দিদার সেই আর্নিং গোড়া অন্ধকার ঘর, মনে আছে আমার সেই দুঃসাহসী অভ্যাস [illegible]। দিদা আমাকে 'ছোট ডাক্তার' বলে [illegible]। আর আমি তাঁকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

তাঁকে—আর নিজেও খেতাম—তাঁর খাটের পাশাপাশি বসে পরীক্ষা করতাম দুজনে, কে অন্যের শেষ মুঠোটি যথাস্থানে প্রথম পৌঁছোতে পারবে...। ঐ ছেলেমানুষী প্রতিযোগিতার জন্য দীর্ঘদিন মন্দাগ্নি-রুগ্ন দিদা একটু বেশি খেতেন: আর আমি তাই কুড়োতাম ডাক্তারের অজস্র প্রশংসা। দিদা আবার বিদেশী ফল খেতে ভীষণ ভালবাসতেন, আমি তাঁর জন্য মাঝে মাঝে লেবু কিনতাম। কত আনন্দে আনাড়ি হাতে খোসা ছাড়িয়ে তাঁকে খাওয়াতাম, ফালি ফালি করে, নিজের তহবিলের জমানো পয়সায় কেনা সেই ফল...।

দিনরাত চিৎ হয়ে শোয়ার দরুন দিদা এক এক সময় অস্বস্তি বোধ করতেন। আমি তখন ডাক্তার সুলভ বিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে বলতাম উপুড় হয়ে শুতে। তারপর তাঁর

[illegible]

খাটের উপর উঠে, হাঁটু গেড়ে, তাঁর পিঠ মালিশ করতাম—আমার কচি হাতে যতটা ধরত জোর। অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতাম, দিদা ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তাঁর চুলে বাঁধতাম মায়ের সেলাইয়ের বাক্স থেকে চুরি করা রং বেরংয়ের ফিতে: তিনি কোনো আপত্তি কি অনুযোগ শোনাতেন না —শান্তশিষ্ট ভঙ্গিতে আমার সকল অত্যাচার সহ্য করে যেতেন, হাসপাতালের পরীক্ষা ভবনের গিনিপিগ-এর মতো। তিনি যখন যন্ত্রণায় ছটফট করতেন, আমি তখন অদ্ভুত অদ্ভুত জামা পরে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাষা বলে তাঁর চোখের কোণে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করতাম। আর আমার সেই চেষ্টা কোনো দিনই বিফল হত না...তিনি হাসতেন, সত্যিই হাসি পেত বলে নয়, তাঁর হাসি আমারও মুখে হাসি ফোটাবে বলেই।

আর শেখাতাম তাঁকে আধুনিক গান। তিনি অবশ্য গাইতেন ভাঙা হাঁড়ির মতো... বলতেন, "আমার অন্তঃশ্রুতিতে কিন্তু ঠিকই শোনাচ্ছে।" তাসও খেলতাম, আর জুয়ো: টাকার কাজ করত বাড়ির চারিদিকে কুড়িয়ে পাওয়া পোড়া দেশলাই কাঠি।

স্বর্গের পথে

দিদা কথা বলতেন কম, শুনতেন বেশি, বুঝতেন আরও বেশি; বুঝতেন, আমি ভান করে নয়, ভাল লাগত বলেই এত ঘন ঘন যেতাম তাঁর কাছে। তিনি আমাকে কোনো দিনই বকেন নি, উপদেশও শোনাতেন না, বলতেন, "ও সবের জন্য আরও লোক আছে...।" উপদেশ দিতেন না বটে, তবে প্রায়ই তুলতেন দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতার কথা।

আর বলতেন স্বর্গের কথা...যাদের এবং তাঁর নিজের মায়ের (অর্থাৎ আমার প্রমাতামহীর) সঙ্গে পুনর্মিলনের কথা। স্বর্গের স্বপ্ন প্রায়ই দেখতেন, আর হাসতেন, আমাকে আর মাকে ছাড়ার চিন্তা তাঁকে যেন একটুও দুঃখ দিত না। তিনি বলতেন, আমাদের দুজনের জন্য তিনি যাচ্ছেন জায়গা তৈরি করে রাখতে। তাই আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি তাঁর মৃত্যুতে কাঁদব না। কাঁদলাম না......সত্যি বলি, প্রতিজ্ঞা রাখলাম, কাঁদলাম না। কিন্তু স্বর্গীয় দিদার প্রতি-জন্মদিনে না-কাঁদার প্রতিজ্ঞা তো করি নি...। দিদা বলতেন, মৃত্যুর দিন ভগবানের দূত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাড়ি [illegible] [illegible] [illegible] মতো।

[illegible] [illegible] ডাকা হল: দিদা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিদার [illegible] [illegible] [illegible], ইহার অন্তরে [illegible]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্যানরূপ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কয়েকদিন আগে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'বিশ্বাস করো আর নাই করো' পর্যায়টিতে চোখে পড়লো একটি লোকের মুখ। লেখা আছে—'বিষাদের বিদূষক'। সে সার্কাসের ক্লাউন সেজে দর্শকদের বেদম হাসিয়ে আমোদ দিয়ে আসছে—কালে তার নামটাই স্ফূর্তির প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সার্কাসের বাইরে তার মতো বিষণ্ণ লোক আর একজনও ছিল না। তার মনের বিষাদ দূর কি করে হয়, তা জানবার জন্য এক ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার বললেন, 'তুমি সার্কাসের সেই বিদূষকের কাছে যাও, সে তোমাকে হাসিয়ে আমোদ দিতে পারবে।' লোকটি বললে, 'আমিই সেই ক্লাউন।'

কাহিনীটা বললাম এইজন্য—লোকটার জীবন ও জীবিকা, তার আর্ট-সত্তা ও তার বাস্তব জীবনের মধ্যে কোথাও একটা বিরোধ ছিল; তা না হলে এমন ট্রাজেডি ঘটবে কেন? অজকাল চলচ্চিত্র-জগতের তারকাদের জীবনকথা কাগজপত্রে খুব ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তাদের বৈভব, বিলাস, তাদের বন্ধনহীন জীবন—সর্বদেশের তরুণ-তরুণীদের চরম আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের জীবনের ট্রাজেডিও আজ আর অজানা নেই; তাদের মতন অসুখী, প্রেমে ব্যর্থ, সংসারে সমাজে অবাঞ্ছিত কয়জন আছে? তাদের জীবন ও জীবিকার মধ্যে দ্বন্দ্ব। জীবিকার জন্য দেউলিয়া হয়ে গেল! একেই বলে ট্রাজেডি। 'জলের মাঝারে বাস করি, তবু তৃষায় শুকায়ে মরি।'

আজ আমার মনে এই প্রশ্নই জাগছে—আর্টের সঙ্গে জীবনকে যদি ছন্দে গাঁথতে না পারলাম, তবে তো ঠকলাম! কিসের সাধনা করলাম গান গেয়ে, ছবি এঁকে, পাথর কুঁদে? দাসত্বর? আজ তো বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যন্ত্রমানব (robot), বিজলি-মস্তিষ্ক (electronic brain) সব কাজ করবার জন্য এগিয়ে আসছে। সর্বাধুনিক খবর—শিল্পী পিকাসো দীর্ঘকাল নিরীক্ষণের পর এক যন্ত্র বানিয়েছেন—আর আমাদের ছবি আঁকা হয়ে যাবে। [illegible] পারবে, কিন্তু পারবে না জীবনকে সরস করতে, মধুময় করতে। 'পারবে না তো ফুল ফোটাতে।'

[illegible]

দেয়, বক্সিং, কুস্তি (পুরাকালের গ্লাডিয়েটরদের লড়াই) মানুষকে 'আমোদ' দিয়ে আসছে। আনন্দ ও আমোদ-এর মধ্যে গুণগত ভেদ আছে, কেবল রূপগত নয়। সংগীতকে কি আজ আমরা সেই পর্যায়ভুক্ত করে রাখবো? জীবিকার সংগ্রামে জীবনকে যদি হারাই, তবে থাকলো কি—এ প্রশ্নের উত্তর কি পেয়েছি?

রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষে পক্ষকাল যাবৎ কলকাতা শহরে বহু অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীতশিল্পীরা গান গেয়েছেন। দু-চারটি আসরে তাঁদের গান শুনে মনে হয়েছে যে, এইসব শিল্পীদের ধারা অন্যান্য আধুনিক গানের শিল্পীদের থেকে একটু অন্য ধরনের।

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের নাম

তূমি ও ভূম —আমার দেহের দুই কোটিকে স্পর্শ করে আছে। এই দেহ-আশ্রিত প্রাণটাকে বাঁচাবার জন্য জীবিকার ধান্দায় ফিরতে হয়। এই জীবন-সংগ্রামে জীবনটা যায় শুকিয়ে, আসলে মৃত্যু হয় মনটার। সে তখন আর গান গায় না, সে তখন গান শেখায়।

মনে আরও প্রশ্ন জাগে : গান তো করি, গান তো শুনি—কিন্তু সে গান কি মনের বহিরাবরণ ভেদ করে চেতনার গভীরকে স্পর্শ করে? অথবা বাহ্যিক stimulus-এ দেহের মাংসপেশী স্পন্দিত হয়ে সাময়িক উত্তেজনা ও রসসৃষ্টি করে?

এই সমস্যার পূরণ কোথায় ও কিভাবে হতে পারে তারই উত্তর আমরা শুনতে চাই যাঁরা এই গীতভারতীর পদ্মবনে নিত্য মধু আহরণ করেন, তাঁদের কাছ থেকে।

গদ্যে ছেদ ও ছন্দ, কবিতায় ছন্দ ও সুর সংগীতে সুর ও রাগ-রাগিণী মানুষের ভাবের ভাষায় রূপ দেয়। ভাবুকের চোখে—

'সব কবিতাময় জগৎ চরাচর
সব গোড়াময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে,
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।'

এককালে, সব সাহিত্যই ছন্দে লেখা ও সুর করে 'গীত' হতো। গ্রীকরা তিনতন্ত্রী Lyre বাজিয়ে সুর করে দীর্ঘছন্দের মহাকাব্য ইলিয়ড, ওডেসী পড়তো। আমাদের রামায়ণ লব-কুশরা রাজসভায় গান করে শোনায়। তুলসীদাসের রামচরিতমানস সুর করে পড়া হয়, রামায়ণ-গান তো চলতি কথা। আমরা যাকে ভগবত 'গীতা' বলি, তার নামের মধ্যেই তো গীত রয়েছে, শতাধিক গীতা-র নাম তো পাই। এসব সুর করে আবৃত্তি হতো এতে রাগরাগিণী যোগে সংগীতরূপ দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি গীতালির মধ্যে ছন্দে পড়ার মতো কবিতা আছে। আর সংগীত নাম থাকলেই যে সেটা গানের বই হবে, তা ভাববারও কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের শৈশবসংগীত, সন্ধ্যা-সংগীত, প্রভাত-সংগীতের মধ্যে সংগীত নেই; 'ছবি ও গানের' মধ্যে গানও নেই, ছবিও নেই, কথার ছবি আছে ছন্দে।

রবীন্দ্রসংগীত বাঙালীর গর্বের ধন, তার ঐশ্বর্য। তাই তাঁর গানের মর্মকথা আবিষ্কার করা যায় কিনা দেখা যাক। কী তিনি বলতে চেয়েছেন, আর কী আমাদের দিয়ে গেছেন। আমার তো মনে হয়, কবির একটি গানের মধ্যে হৃদগত কথা ফুটে উঠেছে। গানটি সুপরিচিত হলেও আমি সেটা উদ্ধৃত করছি। কবির জীবনদর্শন সুত্রাকারে এই প্রার্থনাটি শব্দ ও বাক্যে যেন রূপ নিয়েছে—

"অন্তরের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।
তখন তারি আলোর ভাষায়,
আকাশ ভরে ভালবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী।
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
[illegible]
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়—
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি।"

এই গানের প্রত্যেকটি শব্দ, পংক্তি বিশ্লেষণ করে ও পরে পুনরায় সংশ্লেষণ দ্বারা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক তথা জীবনদর্শনের সামগ্রিক ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে।

একথা সকলেই জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ গান লিখতেন আপন মনে স্বচ্ছন্দে, করতে করতে, সুরের সঙ্গে ভাব ও ভাষা পাশাপাশি হয়ে রূপ নিত [illegible]। [illegible] তা [illegible] এই গান [illegible]—

এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ,
মিশায়ে আপন সুরে।

একদিন মনের গভীর থেকে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল—"আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে।" বস্তুবাদী বিদ্রূপের হাসি হেসে প্রশ্ন করবেন, কথা আবার ধোয়া যায় নাকি! আর ভুবনটাকে গানের ভিতর দিয়ে দেখা, সেটাই বা কি ধরনের অনুভূতি! দেখা যায় চোখ দিয়ে, শোনা হয় কান দিয়ে। সুতরাং এসব কবি-প্রলাপ।

তবে তত্ত্বকথাতেই অবতীর্ণ হওয়া যাক। ভাবুক বা সাধারণভাবেও চিন্তাশীলরা নিশ্চয়ই অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছেন যে, প্রত্যেকের জীবনসত্তার অন্তরালে আর একটি সত্তা আছে, যে অন্তত কর্ম থেকে নিত্য নিবৃত্ত হতে বলে। শুভকর্মে প্রবৃত্ত হতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু জীবনে এমনও ট্রাজেডি হয় যখন ভিতরের শুভবুদ্ধির প্রেরণাটি মূক হয়ে যায়; দেবতার হয় পরাজয়, দানবের হয় জয়।

অন্তরের মধ্যে এই দেবতা-দানবের সংগ্রামের মধ্যে ভাবুক রূপ দেখতে পায় আপনাকে দর্পণের মতো করে—

যে আমি যায় কেঁদে হেসে,
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে
অন্য আমি উঠতেছে গান গেয়ে।
ও-যে সচল ছবির মতো
আমি নীরব কবির মত
ওর পানে দেখছি আমি চেয়ে।
এই-যে আমি ঐ-আমি নই
আপন মাঝে আপনি যে রই
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি,
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে।

তত্ত্ববিদ্ বলে উঠবেন, এ যে রীতিমতো তত্ত্বকথা, কবি গানের মধ্য দিয়ে কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন—অদ্বৈত? দ্বৈত? দ্বৈতাদ্বৈত? কবি নিরুত্তর। তবুও বলেছেন—"অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে আমরা যখন বিচার করি, তখন আমরা মত নিয়েই বিচার করি, সত্যকে নিয়ে নয়।"

গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে [illegible]

পেলেও তার অন্তরালে আছে ধ্যানময় জীবন। একটি গানের কলি মনে পড়ছে—'থামেনেক আর গমনেতে আজি যামিনী যায় [illegible]।' আনন্দ-উল্লাসের উন্মাদনায় গানে মনে রাত [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] ভাবনায় আবির্ভাব হয় না। পারসী ছন্দে কবি নবিরুল উদ্দেশে, যাকে বলেছিলেন, 'অর্গোতেনেস্য দীর্ঘাহ দিয়ো যোগে প্রত্যোপকার।' সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তরালে কঠোর মনন, চিন্তন, ধ্যান যোগাসনে আসীন। ধ্যান বলতে কেবল তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞানের কথা মনে হয়। কিন্তু তা তো নয়। যে-কোনো বিষয়ে মন নিবিষ্ট হয়, সে-ই তো ধ্যান। বিজ্ঞানী ধ্যানস্থ আছেন তাঁর বীক্ষণাগারে, পণ্ডিত ধ্যানস্থ আছেন তাঁর গ্রন্থাগারে, ব্যাধ ধ্যানস্থ আছে মৃগদেহের লক্ষ্যভেদে, ব্যবসায়ী ধ্যানস্থ আছে লঙ্কা-মরিচের বস্তার উপর বসে। তারা সাধনা করছে বস্তুফলের আশায়। এরা রূপের জগতে থেমে গেল—

"চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো,
ধনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে
দলে দলে গো।"

এরা বলতে পারলে না—'অরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।' রূপ-অরূপ মিলে যে সত্য-সত্তার প্রকাশ তা উপলব্ধি করতে পারলো না।

ধ্যানের অন্তরালে আছে কঠোর মানসিক মেহনত; কিন্তু মনের এমন অবস্থাও হয়, যখন সে 'রসের প্লাবনে' আত্মসমর্পণ করে বলে ওঠে—

"আমার মনে সুরতরঙ্গ ডেকেছে বান
রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।"

তখন জ্ঞান নয়, যুক্তি নয়, মনন নয়—আকুলিত মনে সে বলে উঠে, 'রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।' অরূপরতন পাবার আশায় রূপসাগরে ডুব দিয়েছে, বলছে—

"এবার নীরব করে দাও হে, তোমার মুখর কবিরে
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি
একলা বসে শুনবো বাঁশি অকূল তিমিরে।"

ধ্যানে অদ্বৈত, রসে দ্বৈত ভাবনা। সেই দ্বৈতবোধ থেকেই বাঁশি শোনা যায়। কিন্তু কে বাজায় এই বাঁশি? কোথায় বসে কে বাঁশিতে ডাকছে, কী তার আবেদন! রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যে বাঁশি ও বীণার উপমা অগণিত। এ বাঁশির রূপ চোখে দেখা যায় না, এ বাঁশির ধ্বনি কানে শোনা যায় না। অথচ বলছি—'ওগো শোনো কে বাজায়।' আবার গেয়ে উঠছি—'ওগো কে যায় বাঁশরী বাজায়ে'। শুধু বাঁশি নয়, তাঁর পদধ্বনিও শোনা যায়।

"ঐ শুনি যেন চরণধ্বনিরে, শুনি আপন মনে।
তোমার [illegible] কি, [illegible] তার [illegible]
ঐ বুঝি আসে, আসে, আসে।"

চক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে, যা চরম দেখা।"...

"নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে।"

তাই বলেছেন—"আলোক যে দেখাটা দেখায়...সে কী অদ্ভুত জিনিস, তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না।"

সুস্থ সবল মনে বিকাশের জন্য চাই জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়।

"আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

প্রকৃতি বলতে কেবল যে দৃশ্যমান জড়-জগৎ বুঝায়, তা তো নয়। প্রকৃতি বলতে নারীকেও বুঝায়। নারীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কবিতা ও গান লিখেছেন। নারীকে দেখেছেন কত রূপে। সে সুন্দরী নারী, কল্যাণী নারী, আনন্দময়ী নারী, বিষাদিনী নারী, তপস্বিনী নারী। মনের নানা অবস্থায় দেহের নানা বয়সে মানসবিহারিণী, লীলাসঙ্গিনীর উদ্দেশে কত কী লিখেছেন। এখনেও 'গানের ভিতর দিয়ে' বৈচিত্র্যকেই সম্ভোগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ জীবন থেকে সুর ও ছন্দকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন না। সুরের জগতে তালভঙ্গ হলে স্বর্গ থেকে নির্বাসন হয় বলে যে কাহিনী 'শাপমোচন' গীতিনাট্যে কবি বর্ণনা করেছেন তা রূপক মাত্র নয়। পৃথিবীতে যত অশান্তি তার মূলে রয়েছে ছন্দছাড়া দৈত্যদানবের ও বেসুরো অসুরদের অশুভ চিন্তা। তালভঙ্গ হয়েছিল বলেই জীবনে এলো বিচ্ছেদ বিরহ ট্র্যাজেডি কঠিন তপস্যার তার মধ্যে দিয়ে পুনর্মিলন সম্ভব হয়। এখানে সেই টানাটানি কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা।" দুঃখ-আনন্দের চক্র ঘুরেছে তারই মাঝে গানের ডালি বহন করে চলতে পেরেছে যে মানুষ, সেই জিতলো। রাতের অন্ধকারও সত্যসুন্দর, দিনের আলো প্রাণবন্ত। কবি দুঃখকে মাথা পেতে স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযোগ করেননি সুখ-সম্ভোগকে আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পরিপন্থী বলে বিমুখ হননি। বিচিত্রের দূত কবি পরিপূর্ণ জীবনের গান গেয়েছেন নানা সুরে। তাই রবীন্দ্রসংগীত এমন করে সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের নরনারীকে তৃপ্তি দিতে, আনন্দ দিতে পেরেছে। সেই গানের ধারক ও বাহক যাঁরা, তাঁদের কণ্ঠ থেকে কেবল ধ্বনি শুনতে চাইনে, চাই তাঁদের মধুময়, ছন্দোময় জীবন থেকে উৎসারিত সংগীত—যে সংগীত

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

আসল কথা বলি—'ভিতরে রস না জাগিলে বাহিরে কি গো রস ঝরে।' গায়কের জীবন যদি রসনিমজ্জিত না হয়, তবে তার কণ্ঠ থেকে যে গান উৎসারিত হবে তা শ্রোতার কানে প্রবেশ করবে, মর্মকে স্পর্শ করবে না।

চেঙ্গিস খাঁর সমাধি

আনন্দ ভট্টাচার্য

"কবরের নীচে মৃত মানুষের গায়েও ভয়ে কাঁটা দেয় যে নাম, মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিদের তালিকা-শীর্ষে যে নাম শোভিত, ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই লোকটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মাও-সে তুং..."

বর্বর ও নির্লজ্জ চীনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ও জননেতা মাও-সে-তুং এ হেন যে বর্বরতম লোকটিকে আজকের এই বিশেষ সময়টিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, সেই লোকটি তাহলে কে হতে পারে?

'মহান গুরুর উদ্দেশ্যে' শিরোনামায় উপর্যুক্ত সংবাদটি সম্প্রতি (৯।২।৬৩ ইং) বিখ্যাত একটি বাংলা দৈনিকপত্রে আত্ম-প্রকাশ করায় রহস্যময় চীনাদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের বিষয় দেশবাসী রহস্যের জটিলতম গ্রন্থিতে আরও একবার বিস্মিত হয়েছেন। মাও-সে-তুং-এর সেই মহান গুরুটি আর কেউ নন, ইতিহাস-বিস্মৃত দস্যুরাজা চেঙ্গিস খাঁ!

স্বভাবতই, ইতিহাস পাঠক যে চেঙ্গিস খাঁকে বেমালুম ভুলে বসেছিলেন, তার বিষয় নতুন করে কিছু জানবার আগ্রহ—বিশেষ করে এমন একটি সময়ে, কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। তাই এই রচনায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেই নিষ্ঠুর অবতার চেঙ্গিসের বিষয় নতুন কিছু তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা হয়েছে।

ইতিহাসে মোঙ্গোলিয়ার নাম বিন্দুচিহ্নে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্ত, যতদিন চেঙ্গিসের আবির্ভাব হয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মোঙ্গল জাতি যুদ্ধবিদ্যা শিখছে, অশ্বারোহণে নিপুণতা লাভ করছে এবং বনে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়াচ্ছে—কিন্তু রাজ্যলিপ্সা, রাজ্যশাসন বা দুর্গবিগ্রহে তাদের বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না। শক্তিও না। চেঙ্গিসের পিতা এদের সুসংবদ্ধ করেছিলেন মাত্র—কিন্তু কোন কাজে লাগান নি। চূড়ান্তভাবে কাজে লাগিয়ে ইতিহাসের পাতায় রাতারাতি দুর্ধর্ষ নতুন যে এক জাতি জেগে উঠল

চেঙ্গিস খাঁ (কল্পিত চিত্র)

দাসরূপে সেটি হল চেঙ্গিস খাঁ পরিচালিত মোঙ্গল জাতি।

মোঙ্গোলিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের একটি পাহাড়ে সম্প্রতি চেঙ্গিস খাঁর একটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। গত সাত শতাব্দী ধরে মোঙ্গোলিয়ার এই স্থানটি আধুনিক সভ্য জগতের বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে ছিল—কারণ কতকগুলি মোঙ্গলীয় সাধু দিবারাত্র সজাগ প্রহরায় চেঙ্গিসের সমাধিটি মানবসভ্যতার কাছে অজ্ঞাত রাখার অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

এই সেদিন পর্যন্ত চেঙ্গিসের সমাধি সম্পর্কে মানুষের [illegible]

এবং যদিও কিছু সত্যতা থেকে থাকে তা নেহাতই কল্পনার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু রাশিয়ার অধ্যাপক কজলভ পূর্বেকার কাল্পনিক মতো বিশ্বাসী হতে পারেন নি। ফলে তিনি অনিশ্চিত কালের জন্য অনুসন্ধান কার্যে বেরিয়ে পড়লেন।

নিজের জীবন তুচ্ছ ও বিপন্ন করে রাশিয়ার এই অধ্যাপকটি কুড়ি বছর ধরে মধ্য এশিয়ার নিম্ন চারণভূমি ও দুর্গম গিরি কান্তার মরু মোঙ্গোলিয়ার শ্বাপদ বিপদসঙ্কুল পথে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছেন। মনে তাঁর দুর্জয় সঙ্কল্প—রহস্যময় চেঙ্গিসের রহস্য ভেদ করা—কল্পনাখ্যাত সমাধির আবিষ্কার করা! সঙ্গে তাঁর পথ-প্রদর্শকরূপে চেঙ্গিস বংশের এক জাতি অধস্তন মোঙ্গোলিয়ান। এবং গত ১৯২৭ সালে অধ্যাপক কজলভের কঠোর তপস্যার সিদ্ধি লাভ হয়েছে। তাঁর গবেষণা সফল হয়েছে।

এর আগের দিন পর্যন্ত চেঙ্গিস খাঁর কবর এবং তার বর্বর অভিযানের বিস্তারিত ইতিহাস জগৎবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু রাশিয়ান অধ্যাপকের নিরলস গবেষণার ফলে নির্মম হত্যাকারী, বর্তমান চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান ও প্রণেতা মাও-র গুরু চেঙ্গিসের বিষয় নতুন করে বহু কিছু জানবার ও জানাবার সুযোগ হয়েছে।

স্বল্পালোকিত চল্লিশ বর্গ ফুটের ঘরে চেঙ্গিসের আসল কবরস্থান! খাঁটি রৌপ্য নির্মিত শবাধারটি একটি পীতাভ কাঠের রত্নবিভূষিত বাক্সের তলায় সযত্নে রক্ষিত। 'মহান গুরুর' আকৃতির মাপে মূল্যবান একটি বস্ত্র দ্বারা শবাধারটি আচ্ছাদিত।

এ যেন অমূল্য ও রহস্যময় স্থানটিকে এবং এর প্রবেশ পথটিকে সাতজন লামা অপরিসীম ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে দিবারাত্র পাহারা দিয়ে থাকেন। এই সাতজন লামা প্রতি সাত ঘণ্টা অন্তর সাতবার ঘণ্টা বাজিয়ে পরিবেশটিকে জাগ্রত রাখেন।

প্রতি বছর ২১শে মার্চ মোঙ্গলের খাঁ বংশ অথবা চেঙ্গিসের বংশধরেরা এখানে এসে মিলিত হন এবং মহান প্রপিতামহের উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে ভেড়া বলি দিয়ে যান।

মোঙ্গোলিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটির নাম 'অর্ডস' এবং যে স্থানে নিষ্ঠুর মোঙ্গল দস্যুর স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে, সেই জায়গাটির নাম হল 'ইজেন হোরু'। এই সৌধটি নির্মাণ করতে পাঁচ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

সৌধটির নিচে, একটি বিরাট কক্ষে চেঙ্গিস খাঁ যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে [illegible]

থাপ, হাতীর দাঁতের সিংহাসন এবং অন্যান্য বহু অমূল্য জিনিসপত্র চেঙ্গিস খাঁ সাহেব অন্য দেশ-বিদেশে যুদ্ধ করার সময় লুঠ-তরাজ করে এনেছিলেন।

অপর একটি সংলগ্ন কক্ষে চেঙ্গিসের বিরাট একটি তৈলচিত্র লম্বমান। এই ছবিটির পাদদেশে একটি মূল্যবান চৌকিতে সযত্নে রক্ষিত ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বৃহদাকার বই। প্রহরারত প্রধান লামার বক্তব্য হল—এই বইটিতে চেঙ্গিসের শৈশব হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা হুবহু লিপিবদ্ধ আছে। প্রদর্শনী কক্ষটিতে আছে খাঁ সাহেবের বর্বর অভিযানসমূহের পথ সম্বলিত এবং পদানত দেশগুলির মানচিত্র। মানচিত্রে ভারত এবং ইউরোপীয় রাশিয়ার অধিকাংশই দেখান হয়েছে। এমন কি চেঙ্গিস খাঁ যে সব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নৃশংস যুদ্ধলীলা করতেন সেই সব অশ্বেরও দু-চারটি প্রস্তরমূর্তি এই সমাধির সামনে সযত্নে রক্ষিত।

এখানকার লামারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের মহান নেতার আত্মা প্রতি বছর তাঁর মৃত্যুদিনে একবার করে এখানে আসে এবং সমাধির আলোগুলি নিভিয়ে দেয়। তারপর ঐ আত্মা প্রধান লামাকে শবাধারের কাছে নিয়ে গিয়ে আগামী বছরের জন্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ভবিষ্যবাণী গোপনে কানে-কানে বলে অন্তর্হিত হয়।

এখান থেকে মাত্র দুমাইল ব্যবধানে চেঙ্গিসের প্রিয়তমা মহিষী রানী দাওলার সমাধিস্তম্ভ অবস্থিত! রাণী দাওলার সমাধিপ্রস্তরে লেখা আছে : 'রাণী দাওলার নশ্বর দেহ এখানেই চিরনিদ্রায় মগ্ন' রাজার শেষ দিনের সময় রাণী তাঁকে তাঁর আগে মেরে ফেলার জন্য কাতর অনুনয় করেছিলেন, যাতে আগামী জন্মে রাণী রাজাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অন্য দুনিয়ায় প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে পারেন। রাজা চেঙ্গিস খাঁ রাণীর অপূর্ব সুন্দর ইচ্ছাটিকে অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং একটি শাণিত ছোরা দিয়ে রাণীর বক্ষ আমূল বিদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করেন। রাণী দাওলা তাঁর প্রিয়তম দয়িতের বাহু-বন্ধনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অন্য জগতে রাজার অভ্যর্থনার জন্য চলে গেলেন। এবং রাজাও তাঁর ঠিক এক হপ্তা পরে রানীকে অনুগমন করেন।"

১১৫৫ খৃঃ অব্দে মোঙ্গোলিয়ার এই পাষাণহৃদয় চেঙ্গিসের জন্ম হয় আর জন্ম সূত্রেই সংগঠনী শক্তির বিরাট প্রতিভা নিয়েই মোঙ্গলবাসীদের প্রধান হতে পেরেছিলেন অনায়াসে। খাঁ সাহেব তাঁর অসাধারণ সংগঠনী শক্তি ও কৌশল বলে তাতার জনজাতি ও উপজাতিদের একত্র করেন। এরা সব এশিয়ার তৃণাঞ্চল স্টেপস্ [illegible] ও [illegible]।

সাধারণত এদের তাতারও বলা হয়ে থাকে। এরা চেঙ্গিসের অধীনে দলবদ্ধ হওয়ার আগে মেষচারণ ও সন্তান উৎপাদনেই নিজেদের তাবৎ শক্তি নিয়োজিত করে সঙ্কুচিত করে রাখে। চেঙ্গিস খাঁর পিতা এদের একত্রে সংগঠন করার প্রয়াস পান এবং শেষে তাঁর যোগ্য পুত্র তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম হন। পরে দেখা যায় যে, এই মোঙ্গলজাতি ইতিহাসের পাতায় বিভীষিকারূপে পরিচিত হয়।

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে নানান বিবাদে লিপ্ত ছিল। মিশর, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার অধিকাংশ স্থলে সালাদিনের বংশধরেরা রাজত্ব করছিল। চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল আর ভারতেও মুসলমান রাজাদের শক্তি দৃঢ় হয়ে ওঠেনি। এই সময় 'কুরুল-তাই' অর্থাৎ মোঙ্গল পরিষদ চেঙ্গিসকে "কেগান" অর্থাৎ তাদের সম্রাটরূপে নির্বাচিত করে। সম্রাটরূপে পূর্ণ মর্যাদা পাবার পরই চেঙ্গিস খাঁ তাঁর দলবল নিয়ে যুদ্ধ অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। সুযোগ বুঝে প্রথমেই তিনি সমস্ত চীন ও তাতার জয় করলেন। তারপর ক্রমে তাঁর অভিযান বাকী এশিয়া ও ইউরোপে নরহত্যা ও নারকীয় লুণ্ঠনের এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করে। তাই ইতিহাসের পাতায় একাধিক ঐতিহাসিক তাঁকে বহুবিধ বিশেষণে ভূষিত করে বলেছেন 'ভগবানের চাবুক' (The scourage of God), 'নিষ্ঠুর অবতার' (Ruthless incarnate) —'শক্তিমান হত্যাকারী' (Mighty man Slaughter), —বা 'সিংহাসন ও রাজমুকুটের একচ্ছত্র মালিক' (Master of thrones and crowns) !

নিষ্ঠুরের অবতাররূপী দস্যু চেঙ্গিস খাঁ গুণে গুণে জাতিনির্বিশেষে একটি

চেঙ্গিস বাহিনী ধাওয়া

একটি করে নর ও নারী অবলীলাক্রমে হত্যা করেছেন। এমনকি, সদ্যজাত শিশুক্রোড়ে কোন জননীও কোনদিন এই মহান গুরুর হাত হতে ভুলক্রমে রেহাই পায়নি।

১১৮৯ খৃঃ অব্দে চেঙ্গিস খাঁকে 'কেগান' ঘোষণা করার পর থেকে হঠাৎ-জাগ্রত বন্যজাতি এই মোঙ্গলদের পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধাভিযান আরম্ভ হয় এবং মাত্র ১২১১ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমস্ত চীন, তাতার ও এশিয়ার অর্ধেক অধিকারভুক্ত করে। চেঙ্গিস অতঃপর পশ্চিম এশিয়ার ও ইউরোপের বাকী দেশগুলি অধিকার করার মনস্থ করেন। মধ্য এশিয়ার এমন কোন সুলতানের দেখা কখনও মেলে নি যে চেঙ্গিসের বিরুদ্ধাচরণ করেছে—নিদেন পক্ষে প্রতিবাদও করেছে। ফলে, এই শক্তিমান হত্যাকারীর পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই তারা একে একে নিঃশব্দে আত্ম-সমর্পণ করেছে এবং চেঙ্গিস খাঁও তাদের নর-নারীদের পিঁপড়ের মত পিষে মেরে ফেলতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

৪৯ বায়ু মোঙ্গল সৈন্য অতঃপর আফগানিস্থানের ওপর টাইফুনের সৃষ্টি করল। আফগানিস্থানের রাজা জালালুদ্দিন অন্যান্য নরপতিদের মত নতিস্বীকার না করে চেঙ্গিস খাঁর গতিরোধ করার জন্য তৎপর হলেন। শৌর্যে, বীর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আফগানিস্থান সম্রাট মহম্মদ খাওয়া-রিসাম সাহের একমাত্র বীরপুত্র জালালুদ্দিন অতঃপর চেঙ্গিস খাঁকে একবার দুবার নয় বার বার বহুবার প্রতিহত করেন। চেঙ্গিস খাঁ বিস্মিত হয়েছিলেন—কিন্তু বন্য সৈন্যের দুর্বার গতির কাছে জালালুদ্দিন অতঃপর পরাজিত হলেন। কিন্তু দস্যুটির হাতে ধরা দিলেন না।

পালিয়ে গেলেন তিনি। চেঙ্গিসও ছাড়বার পাত্র নন। পাগলা কুকুরের মত তাড়া করলেন জালালুদ্দিনকে। বহু চরাই-উতরাই, পাহাড়-পর্বত, আর বন-জঙ্গলে খণ্ড যুদ্ধের পরও চেঙ্গিস খাঁ জালালুদ্দিনকে কাবু করতে পারলেন না। আহত জালালুদ্দিন শেষে ইন্ডাস নদীতে ঝাঁপ দিয়ে বাঁচলেন। অবাক বিস্ময়ে চেঙ্গিস খাঁ দেখলেন জালালুদ্দিন নদীর পরপারে নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন।

জঙ্গলী মোঙ্গল সম্রাট খাঁ বাহাদুর এই পরাজয়ে ক্রোধে আত্মহারা হলেও তরুণ রাজপুত্র জালালুদ্দিনের অসীম সাহসীকতায় ও বীরত্বে তিনি মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—'সাবাস এই বীরপুরুষ আর ধন্য তার পিতা যে এমন এক বীরের পিতা হতে পেরেছে।'

এর পরের চোটে 'এশিয়ার উদ্যান' ইরাণের ওপর চেঙ্গিস ফৌজ পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইরাণ ও নিম্ন এশিয়াকে রক্তের সাগরে ভাসিয়ে এই পঙ্গপাল সভ্যতার ধারক ও বাহক ইরাকের ওপর হামলা করে।

কিন্তু বাধা পেলেন তিনি। এই দ্বিতীয়বার। ইরাক সম্রাট আল-মুস্তাসিমের বিল্লাহ্ চেঙ্গিস খাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। স্তম্ভিত হলেন নির্মম হত্যাকারী চেঙ্গিস খাঁ। হয়ত ভাবলেন—'নাঃ, এত বাড়াবাড়ি ঠিক হচ্ছে না। এবার আমার থামা উচিত।' তিনি যে-ধরনের লোক তাতে এই ভাবনা ক্ষণিক তাঁকে বিচলিত করতে পারে। আসলে তিনি হয়ত থামতেন না। কিন্তু...

কিন্তু থামতে তাঁকে হলই। ঢাল-তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যেতে পারলেন না বাগদাদে। তদানীন্তন দুনিয়ায় বাগদাদ হল আরব দেশের রাজধানী ও প্রাণকেন্দ্র। তাই ভগবানের 'চাবুক' খাঁ সাহেব নিজের সম্মান বাঁচিয়ে ফিরে গেলেন নিজের রাজধানী [illegible]

আসার। তাঁর অধ্যুষিত দেশগুলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল—যদিও, তখনও চেঙ্গিসের চাবুকের ঘা আর রক্তাপ্লুত তলোয়ারের জমাট-বাঁধা রক্ত তাদের পিঠে আর পথে-ঘাটে শুকিয়ে যায়নি।

কারাকোরামে ফিরে যাবার পর সত্যি সত্যিই খাঁ বাহাদুর যেন বদলে গেলেন। এর পর তিনি আর যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে মাথা ঘামান নি—কিন্তু অধিকৃত রাজ্যগুলি নিপুণভাবে শাসন করেছেন। এবং দীর্ঘ দিন রাজসুখ ভোগ করার পর ইতিহাসের মুখে একটা গভীর কলঙ্করেখা লেপন করে, ত্রাসের দায় থেকে ১২২৭ খৃঃ অব্দে মুক্তি লাভ করলেন চেঙ্গিস খাঁ।

তখনকার পৃথিবীতে চেঙ্গিসের মৃত্যু সংবাদ একটা আনন্দের সংবাদ এবং সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। যেমন আজকের দিনে অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন আইখম্যানের ফাঁসির সংবাদে। চেঙ্গিসের মৃত্যুর পরও শতাব্দী ধরে তাঁর নামোচ্চারণ মাত্রই সবাইয়ের মনে ও দেহে ভয়ের কাঁটা দিয়ে উঠত। মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশ থেকে নিয়ে কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী সব দেশগুলি বলপূর্বক অধিকার করে নেন। যেখানেই তিনি গিয়েছেন অবর্ণনীয় অত্যাচার আর অকথ্য নির্যাতন সেই সব দেশবাসীর ভাগ্যে অনিবার্যরূপে দেখা দিয়েছে। মানুষের বসতি সমূলে উচ্ছেদ করেছেন—ধ্বংস করেছেন, সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ করেছেন, শস্যক্ষেত, রমণীয় ফল-ফুলের বাগান-গুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করেছেন অবলীলাক্রমে। শহরের পর শহরে উৎপাতের একশেষ করেছেন আর অগণিত শরক্ষেপে আচ্ছন্ন হয়েছে সেই সব দেশের আকাশ বাতাস আর নিরীহ জনগণ।

এমনকি মাতৃক্রোড়ে দুগ্ধপানরত কোন শিশুও এই নারকীয় যজ্ঞে বাদ পড়েনি। লক্ষ লক্ষ নরবলিতে পূর্ণ হয়েছে চেঙ্গিসের যুদ্ধাহুতি।

চেঙ্গিসের ভয়াবহ এইসব অভিযানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলি হয়েছে ইরাণ। এর শতাব্দীর সংস্কারলব্ধ যাবতীয় প্রগতি এবং বংশানুক্রমিক কালচার প্রচণ্ড-ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। এবং ইরাণের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী এই আক্রমণে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মোঙ্গলবাহিনীর এই অভিযানগুলিকে আধুনিককালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এবং চেঙ্গিসকে হিটলারের সঙ্গে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লোকটি এত অদ্ভুত ধরনের নির্মম ও নিষ্ঠুর হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানীগুণীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। চীনা পণ্ডিতদের নিজ সভায় আনিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাদি করতেন, চীনা ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিও দেখিয়েছেন। ইতিহাস পাঠে এবং রচনায় ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাই তিনি নিজে কি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা দেখবার জন্য বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়ে নিজের সমগ্র আশৈশব অভিজ্ঞতা ইতিহাস-বদ্ধ করিয়েছেন তদানীন্তন বহু শিল্পী ও ঐতিহাসিকদের একত্রিত করে। এমনকি, নিজের ব্যর্থতার কথাও ভুলে যান নি। জালালুদ্দিনের হাতে বার বার পর্যুদস্ত ও ব্যর্থতার কথা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা আগেই ব্যক্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয় পরাজয় ইবাকের বিষয় বলেছেন:

'সাম্রাজ্যবাদকে যে ধ্বংস করতে আসবে সে নিজেই এখানে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

"তারিখ-ই-জাহান-কুশ" পারসীর ঐতিহাসিক 'জুবাইনির' এমনই এক অবদান যাতে চেঙ্গিসের লোমহর্ষক ও নাটকীয় অভিযান অভিজ্ঞতার কথা অক্ষরে লেখা আছে।

আর ঐ চেঙ্গিস খাঁরই সমাধি নির্মিত হয়েছে ইজেন হোরড়তে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে। এবং এইখানেই রক্ষিত হয়েছে পাঁচ শো পৃষ্ঠার ঐ বৃহৎ ইতিহাসটি। আগামী জুন মাসে কম্যুনিস্ট চীন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে এই নিষ্ঠুর মোঙ্গল সম্রাটের ৮০১তম জন্মবার্ষিকী পালনের আয়োজন করছে।

লাল চীনের নির্দিষ্ট [illegible] সংখ্যক (প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক) [illegible] সমবেত হবে তাদের পার্টি [illegible] মাও-সে-তুং। মাও নিজে সমাধি [illegible] তাঁর মহান এই পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপে একটি মূল্যবান গালিচা দান করবেন।

যেটুকু দেখা যায় ওই জানলা দিয়েই। একটা জীবন দেখার পক্ষে হয়তো যথেষ্ট নয়, সব জীবনটুকু দেখাও যায় না। শুধু জীবনের খণ্ডিত রূপ, কল্পনার হাহাকারের রেশ, হাসি আর ক্রোধের উষ্ণ নিশ্বাসের শব্দ এপারে ভেসে আসে।

মাঝে মাঝে এও মনে হয়েছে জানলাটা বন্ধ করে দিই। উঠেও গিয়েছি দু-একবার, কপাটে হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত ভেবেছি, আবার ফিরে এসেছি। ওই বাতায়নের দাক্ষিণ্যটুকু আমার জীবনেরও যে অনেকখানি। কপাট বন্ধ হলে, রুক্ষ কঠিন পাষাণ-প্রতিম দেয়ালের চাপে আমি নিষ্পিষ্ট হব। আলোহীন, বাতাসহীন বুঝি বা শব্দহীন জগতে নির্বাসিত।

আমার এই উন্মুক্ত জানলা সম্বন্ধে গলির ওপারের বাসিন্দাদের কোন অনুভূতি আছে, এমন মনে হয় না। তা থাকলে ওরাই পর্দায় আরু টানত, কিংবা নিজেদের জানলা বন্ধ করে দিত সশব্দে। মনে হয়, নিজেদের জীবন, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অন্য কারো বিন্দুমাত্র কৌতূহল থাকতে পারে, এ বোধ ওদের ভোঁতা হয়ে গেছে। কিংবা বুঝি নিজেদের সুখদুঃখের আবর্তনে ওরা এতই মুহ্যমান, যে অন্য কারো দিকে চোখ তুলে চাইবার সময় আর স্পৃহা কোনটাই ওদের নেই।

কিন্তু আমি ওদের দেখি। ওদের ঠিক নয়, ওরা যেন পশ্চাদপট। আমি দেখি রমাকে। ও-বাড়ির জীবননাট্যের যে নায়িকা। যাকে কেন্দ্র করে ও-বাড়ির প্রতিটি মানুষ স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

রমা, রমা, রমা।

চুপিসাড়ে ভোরের আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া নিষুতি না হওয়া পর্যন্ত ও নাম যেন ও-বাড়ির বাসিন্দাদের জপমালা। প্রতি মুহূর্তে নামের ফুলকি বাতাসে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। আর সেই সঙ্গে তাঁতের মাকুর মতন মানুষটা অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি করছে। বিশ্রাম নেই, বিরতি নেই, সমাপ্তি নেই।

টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত কাগজ। বিচিত্র আয়তন, বিচিত্র বর্ণ। কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে অংশবিশেষ সাদা কাগজের ওপর আটকাতে হয়। সারা পৃথিবী মন্থন করে সংবাদ-সার। অলৌকিক কাহিনী, বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিরিখ, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার বিবরণ। এরই নির্যাস দিয়ে গ্রন্থ রচিত হবে। অবশ্য সে গ্রন্থের কোন পৃষ্ঠায় আমার নাম থাকবে না। সামান্য স্বীকৃতিটুকুও নয়। আমি নাম-পিয়াসী নই। আমার প্রয়োজন অর্থের। তাও পরিমিত কয়েক মুদ্রার। সেটুকু আমার জুটে যায়। জুটে যায় এই পরিশ্রমের বিনিময়ে।

কিন্তু এ কাজের [illegible] যায়। মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে উঠি। দেখি একসময়ে অনামনে রমার জীবনের কিছুটাও আটকে ফেলেছি সাদা কাগজে। জানি, সে জীবনের কোন মূল্য নেই গ্রন্থকারের কাছে। স্তিমিত স্ফুলিঙ্গ, নির্বীর্য এক কুমারীর প্রতিদিনের সুখদুঃখ হাসিকান্নার কোন আকর্ষণ নেই।

নিজের সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। তখনই উঠে জানলার কাছে দাঁড়াই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। আবার ফিরে আসি নিজের জায়গায়।

রমা।

এ কণ্ঠ শীর্ণ, হতশ্রী এক মহিলার। [illegible] মুখে শীর্ণ [illegible]। দেহের শেষ [illegible] বিন্দু কে যেন নিঙড়ে নিয়েছে। [illegible] শাঁখা, কনুয়ের কাছে মাদুলির সার। [illegible] কিন্তু [illegible] নয়। কোনোকালে [illegible] কাছাকাছি বয়সের সিঁদুর পরা। [illegible] হামাগুড়ি দেবার আগেই [illegible] ঘটে।

প্রথমে যে কণ্ঠ মোলায়েম, নিস্তেজ, কয়েকটা অক্ষর পরেই সে গলা কর্কশ, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

রমা, ও রমা, গেলি নাকি? [illegible] [illegible] না।

[illegible]

সুরে। ছেঁড়া ব্লাউজটা ঢাকবার জন্য ততোধিক ছেঁড়া একটা শাড়ির আঁচল অঙ্গে জড়িয়ে রমা বেরিয়ে পড়ে। হাতে বোতল।

ঠিক এই সময় আমার পথের ধারের টেপা-কলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয়। দাঁতন হাতে। সুতরাং ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটুকু ঘুমভাঙা অলস চোখে দেখতেই হয় আমাকে।

মুখ ধোয়া শেষ হবার আগেই রমা ফিরে আসে। হাতে খালি বোতলের বদলে ভরা বোতল। দুধে ভরা। চোখে জল ছিটোতে ছিটোতে চেয়ে দেখি। মনে হয় যেন চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে রমা পথে বেরিয়ে পড়েছে। স্বপ্নের ঘোর তাব তখনও কাটে নি।

শুধু আমি নয় পথ-চলতি আরও দু-একজন চেয়ে চেয়ে দেখে। রমা লাবণ্যময়ী নয়। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চোখ বোলানোর মতন সৌন্দর্যের ছিটেফোঁটা ভাব শরীরের কোথাও নেই, কিন্তু এমন অবহেলায় শতছিদ্র শাড়ি অঙ্গে জড়িয়ে পথে বের হতে এমন বয়সের মেয়েকেও সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই দোষ লোক গুলোর নয়। আমারও নয়। রমারও না।

তারপর দাওয়ায় বসে বলাইয়ের দোকানের হাতলভাঙা কাপে চুমুক দিতে দিতে আবার কণ্ঠস্বর কানে আসে।

হ্যাঁলা হলো তোর? সেই কখন থেকে বলছি দুধটা গরম করে দে। মণি আর টুনিটা যে কাঁকিয়ে গেল।

মণি, টুনির কাঁকিয়ে যাবার আওয়াজ কিন্তু কানে এল না। বোধ হয় চেঁচিয়ে কাঁদবার মতন পাঁজরের জোরও তাদের নেই।

কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই। সম্ভবত গরম দুধ মুখের কাছে এসে গেছে। আর কারো গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। অবশ্য গলার আওয়াজ শোনবার উপায়ও আর নেই। একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে রমা প্রাণপণে আছড়াচ্ছে কলতলায়। মাঝে মাঝে আছড়ানি থামিয়ে স্তূপীকৃত কাপড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয়, এ সংসারে এত ময়লা কি করে জমে, তাই বুঝি ভাবছে।

পর পর দু-কাপ চা খেয়ে উঠে পড়ি। বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকি। এই সময়টুকু জানলার ফাঁক দিয়ে রোদের ফালি এসে পড়ে। এক টুকরো সোনার পাতের মতন। স্যাঁতসেঁতে ঘরটাকে উত্তপ্ত আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে।

পুরোনো খবরের কাগজের পাতা উল্টে যাই। পাতার পর পাতা। লেবাননে সামরিক বিদ্রোহ, উগাণ্ডায় শৃঙ্গধারী গণ্ডারের আবির্ভাব, আরটিক রিজিয়নে প্রচুর শ্বেত-ভল্লুকের আত্মহত্যার হুজুগ, ইয়কোহামার আকাশে লোহিত নক্ষত্র।

বলি ব্যাপার কি তোর? কোনদিন কি সময়ে একটু ভাত পাবার জো নেই।

এবার নারীকণ্ঠের বদলে পুরুষ পুরুষ-কণ্ঠ।

ওই কণ্ঠের অধিকারী আমার পরিচিত। সার্থকনামা। পশুপতি বড়াল। কোন এক বেসরকারী অফিসের ফাইল-ক্লার্ক। ঢুকে-ছিলেন বেয়ারা হয়ে আঠারো বছর বয়সে, আজ পঞ্চাশে যাবতীয় ফাইলের তদ্বির-তদারকে ব্যস্ত। অফিসে এঁর স্বরূপ দেখি নি, কিন্তু বাড়িতে ইনি অপ্রতিহত প্রতাপ। বিশেষ করে শনিবার রাত্রে। মাঠের ঘোড়াদের চাটের চোট ভুলতে দেশী পানীয়ের আশ্রয় নেন। তারপর সারাটা রাত চলে অশ্বদের পিণ্ডদান। সেইসঙ্গে বাড়ির লোকেরাও বাদ যায় না।

পথে-ঘাটে দেখা হয়েছে। এক পাড়ার শুধু নয়, একেবারে মুখোমুখি বাস যখন, এটাই স্বাভাবিক।

দেখা হলেই ঘাড় কাত করে নমস্কার করেছেন।

এই যে ভাল আছেন? আপনাদের দেখলেও পুণ্য হয়।

কি রকম? প্রশ্নটার জাতিনির্ণয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারি নি।

পণ্ডিত লোক। দেখি তো সর্বদাই লেখা-পড়া নিয়ে আছেন। দিনরাত খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছেন। লিখছেন। আপনারাই তো দেশের গৌরব।

এমন একটা উপাধি কিভাবে ফেরত দেওয়া যায়, ভাববার আগেই পশুপতিবাবু আবার মুখ খুললেন আপনার কাছে যাব মশাই একবার। একটু দরকারও আছে। জানেন একসময়ে আমার নিজেরও পড়া-শুনার খুব বাতিক ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কত মজার মজার বই যে পড়েছি। আর এখন, নিশ্বাস ফেলবার জো নেই। সংসারের শুধু একটা উদর আছে, তার মুখ নেই, চোখ নেই, কান নেই।

হৃদয়ও নেই। ফিসফিসিয়ে বললাম।

কথাটা ভদ্রলোকের কানে যায় নি। তাও তিনি একগাল হেসে বললেন, যা বলেছেন মশাই। আপনাদের মত লোকের সঙ্গে কথা বলেও সুখ।

ভদ্রলোক এসেওছেন। ছুটির দিন সকালবেলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিংহনাদ ছেড়েছেন, কই, আছেন নাকি?

মনোযোগ দিয়ে সদ্য আটকানো লেখাগুলো পড়ছিলাম গম্ভীর কণ্ঠে লাফিয়ে উঠেছি, আরে আসুন, আসুন, কি ভাগ্য আমার।

পশুপতিবাবু তক্তাপোশের ওপর পা তুলে বসে আমার টেবিলের দিকে দেখতে দেখতে বলেছেন, কি আনন্দেই আছেন মশাই আপনারা। লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে থাকার মতন এমন আর আনন্দ আর পৃথিবীর কোথা কিছুতে আছে নাকি! আর আমরা চাকুরেরা ঘোড়ার মতন কেবল ছুটছি। মুখে দিয়ে ফেনা উঠে গেল তবু নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে

পশুপতিবাবু অন্তরঙ্গতার সুর মিশিয়েছেন।

আপনার সঙ্গে একটু দরকারী কথা ছিল মশাই।

হাত বাড়িয়ে একটা বিড়ি দিতে দিতে বলেছি, এসব ছোটখাটো জিনিস চলে তো?

পশুপতিবাবু ভ্রূ নাচিয়ে নাচিয়ে হেসেছেন, সব চলে মশাই, সব চলে। আমি সজ্জন ব্যক্তি, আমার কাছে ছোটবড়োর বাছ-বিচার নেই। কোন নেশাতে পেছপা নই, বুঝলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়েছি, বুঝেছি। একেবারে হাড়ে হাড়ে।

আপনার তো নানা জায়গায় যাওয়া-আসা আছে, বহু লোকের সঙ্গে জানাশোনা?

উত্তর দিই নি। উত্তরের উদ্দেশ্য না বুঝে কিছু বলাটাও সমীচীন হত না।

আমার মেয়ের জন্য একটা পাত্রের সন্ধান দিতে পারেন?

মেয়ে মানে রমা। প্রতি তিন মিনিট অন্তর যে নাম ইথারে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়ছে এধারে-ওধারে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় যাকে যে-কোন বেশে, যে-কোন অবস্থায় পথে দেখা যায়।

তবু অভিনয় করতে হল। বলেছি, আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ, আমার বড় মেয়ে রমা। একেবারে মাছের কাঁটার মতন গলায় বিঁধে আছে মশাই। না পারি ফেলতে, না পারি গিলতে। দিন, মশাই একটা দেখেশুনে। আমার বিশেষ কিছু চাই না। শুধু মেয়েটা খেয়েপরে বাঁচতে পারে, আর ছেলেটা নেশাখোর আর রেসুড়ে না হয়। ব্যস।

অবাক হয়ে পশুপতিবাবুর দিকে চেয়ে দেখেছি। তাঁর চোমরানো গোঁফ, রক্তিম চোখ, গালের বিরাট লোমশ আঁচিলটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভেবেছি, চরিত্রবান, সৎপাত্র পাত্র জামাই খুঁজছেন পশুপতিবাবু। রমা যাতে সুখী হয়। যে জীবনে সে অভ্যস্ত, তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।

কথা দিয়েছি। বলেছি, দেখব, নিশ্চয় দেখব। আপনি মেয়ের ছবিটা একবার দিয়ে যাবেন। অনেকের আবার এসব বাই আছে কিনা। মিলিয়ে দেখতে চান।

একজবার, পশুপতিবাবু গর্জন করে উঠেছেন, মিলিয়ে দেখবেন বই কি। বিয়ে কি একটা ছেলেখেলা। আমার বিয়ের সময় মশাই কুষ্ঠি মেলে নি বলে বাবা এক জাঁদরেল উকিলের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে বন্ধ করে দিলেন। আজ সেখানে বিয়ে হলে আমার এমন দৈন্যদশা হত কোন দিন।

পশুপতিবাবু কথা রেখেছেন। মেয়ের ছবি দিয়ে গেছেন। পথেঘাটে স্মরণও করিয়ে দিয়েছেন। আমিও সমানে ঘাড় নেড়ে গেছি।

কথাটা পশুপতিবাবু সম্ভবত মেয়েকেও বলে থাকবেন। হয় তো গৃহিণীকে বলেছেন

[illegible] কাকে কাকে দুলেছে কথাটা।

নয়তো, যে রমা কোনদিন [illegible] দিকে চোখ তুলেও দেখে না সে [illegible] করুণ দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল।

ঠিক দুপুরবেলা আমি যখন দরজার তালা লাগিয়ে মোড়ের হোটেলে খেতে যাই, রমাও বেরোয় হাতব্যাগে রাজ্যের কাপড়চোপড় ভরে। চৌরাস্তার কাছাকাছি যে সেলাইয়ের স্কুল আছে, রমা সেখানেই যায়। সারাটা দুপুর সেলাই করে। চারটে বাজার আগেই ফিরে আসে বাড়িতে।

অন্যদিন ঘাড় হেঁট করে হন হন করে চলে যায়। কোনদিকে দেখে না। এ পথে অন্য লোকও যে চলতে পারে, সে খেয়ালটুকুও করে না। সেদিন কিন্তু ফিরে ফিরে বার-দুয়েক দেখল। খুব অল্পক্ষণ। বোধ হয় এক নিমেষেরও কম। ফুলের পাপড়ির ওপর ভ্রমর বসলে পাপড়িটা যেমন থর-থরিয়ে একটু কেঁপে ওঠে, তেমনই করে তার চোখের দুটো পাতা কেঁপে উঠল। শীর্ণ, শ্বেতাভ গালে সামান্য রক্তের ছোঁয়া, না কি আমারই ভুল, রমাকে নিঙড়োলেও বোধ হয় একবিন্দু রক্তের খোঁজ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনে হল রমা রূপসী। সংসারের ভারি চাকার তলায় থেঁতলে যাওয়া দেহের কোথাও একটু সৌন্দর্যের' ম্লানি রয়ে গিয়েছে। এই বসন্তের থমথমে দুপুরে, প্রায় নির্জন পথে, সামান্য একটা সুযোগের অজুহাতে সেই রিক্তপ্রায় সৌন্দর্যের কণা একটা নিঃস্ব তরুণীকে অকৃপণভাবে সাজাবার প্রয়াস করেছে।

এতদিন রমার ছকটা আমার জীর্ণ, সহস্র-ছিন্ন বিছানার নিচেই ছিল. সেইদিন থেকে কাগজের চিরকুটটা আমার পকেটে রাখলাম। হৃদয়ের সান্নিধ্যে বলে নয়, রমার বিয়ের জন্য সত্যি চেষ্টা করব বলে।

আমার পরিচিতের পরিধি খুব বেশী নয়, তবু অনেককেই বলেছি। রঙয়ের প্রলেপ দিয়ে রমার শুকনো কাঠামোর ওপর কল্পনার তুলি বুলিয়ে, চলনসই একটা তরুণীর রূপের আন্দাজ দিয়ে দু-একজনকে বিগলিত করার চেষ্টা করেছি। যাদের সৌন্দর্যের খোঁজ দিতে পারি নি, তাদের বলেছি একটি মেয়ের ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের কথা। বিরাট একটা সংসারের চক্রনেমি, সে আভাস দিয়েছি।

ফলে দু-একজন রমাকে দেখতে এসেছে।

পশুপতিবাবু সেই সময় আমাকেও ডেকে-ছিলেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে থাকতে হয়েছে। মেয়ের সম্বন্ধে বেশ দু-একটা কথা [illegible] হয়েছে।

কিন্তু [illegible] কথা সম্ভব হয় নি। [illegible], ভদ্রলোকেরা আমার মুখে [illegible]

[illegible] দাঁড়িয়েছে, [illegible] উঠেছি সবচেয়ে আগে। রমা দেখতে এসেছিল তারাও উস-খুস করে উঠে দাঁড়িয়েছে। একজোড়া বাসি সিঙাড়া আর এক কাপ চায়ের লোককে তিড়িয়ে।

খোলা জানলার ধারে বসে বসে ভেবেছি। এ সাজ কি রমার ইচ্ছাকৃত। এ সংসারের হাজার যন্ত্রণাকে রমা ভালবেসে ফেলেছে বলেই বুঝি সে নিস্কৃতি চায় না এই নাগপাশ থেকে। দহনে সুখ, পীড়নে প্রীতি। অতলে তলিয়ে যাবার যে শান্তি তাই সে উপভোগ করছে তিল তিল করে। দু-হাতের অঞ্জলিতে গরল তুলে নিয়ে নির্বিচারে নিজের গলায় ঢেলে দিয়ে নীলকণ্ঠী হয়েছে।

না, এমনও হতে পারে, প্রতিদিনের রমাকে যে চোখ দেখে অভ্যস্ত, সে চোখ বিশেষ দিনের বিশেষভাবে সাজা রমাকে বরদাস্ত করতে পারে নি।

কিংবা, মনের গহনে বিশ্রী একটা চিন্তাও উঁকি দিল। হয়তো যে সংসার ইক্ষুদণ্ডের মতন রমার সর্বকিছু নিঙড়ে নিতে উন্মুখ, তারাই এইভাবে তাকে সাজিয়ে পাঠিয়েছে। যাতে না-পছন্দের তকমা সর্বাঙ্গে এঁটে আবার সে ছিটকে পড়ে সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে।

উদ্দেশ্য যাই হোক, রমাকে দেখতে আসার পাট চুকে গেল। কিন্তু পশুপতিবাবুর আসাযাওয়া কমল না।

হয়ে যাবে কি বলেন মশাই। এরকমভাবে দেখতে দেখতেই পছন্দ হয়ে যাবে একদিন। মেয়ে দেখতে তো আর খারাপ নয়। শরীরে গত্তি লাগে না এই যা। তা আর কোথা থেকে লাগবে বলুন? মাইনে তো ওই একশ ছাপান্ন টাকা, অথচ সংসারে ভিড়টা দেখেছেন?

সকাল-বিকাল কাংস্যকণ্ঠও কানে আসে। সামনের বাড়ি থেকে, এগারো ফুট সড়ক পেরিয়ে একেবারে জানলার মধ্যে দিয়ে মরমে।

ওই তো পেত্নীর মতন চেহারা, কে পছন্দ করবে শুনি। যদি ভূতপ্রেত দত্যিদানোর বিয়ের দরকার হয়, তাদের চোখে লাগতে পারে। আবার লোকের সামনে বেরোবার আগে সাজগোজের কি ঘটা! যমের অরুচি, যমের অরুচি।

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে এইটুকু অন্তত বুঝতে পারি রমাকে সাজিয়ে পাঠাবার পিছনে সংসারের কোন হাত নেই। অথচ কেন রমা এভাবে, এমন উৎকটভাবে সেজে বেরোয়?

এর উত্তর অনেক ভেবেও পাই নি। এর উত্তর যার কাছ থেকে পাবার কথা সে নিজে অবিচল, নিস্কম্প।

যখন গালিগালাজের ফোয়ারা ছোটে, তখন [illegible] যেন [illegible]। অনন্ত পারাবারের [illegible] [illegible] কাহিনীটা [illegible] সাঁটে সাঁটে আমি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে যাই।

রমাকে পথেঘাটে অনেকদিন যেন দেখি নি। অবশ্য ইদানীং আমারও অবকাশ কম। বই প্রেসে গেছে। তার দেখাশোনা, তদ্বির-তদারক সবকিছু আমাকেই করতে হচ্ছে।

সেদিন প্রুফের বান্ডিল বগলে নিয়ে বাস থেকে যখন নামলাম, আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ। বেতালা বাতাসও বইতে শুরু করেছে। দু-এক ফোঁটা বর্ষণ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছিলাম, হঠাৎ গলির মোড়ে এসে থেমে যেতে হল।

একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় রমা। একেবারে সাধারণ বেশ। হাতে কাপড়ের ব্যাগ। বোধ হয় সেলাইয়ের স্কুল-ফেরত। তার সামনে, একটু এগিয়ে চোখদুটো কুঁচকে দেখতে যাচ্ছিলাম, বিধি সদয়, এলোমেলো বাতাসে গাছের ডালপালাগুলো সরে গেল, রাস্তার বাতিটা লোকটার মুখে এসে পড়ল।

লোকটি আমার চেনা। অন্তরঙ্গ কেউ নয়, কিন্তু প্রায়ই দেখাশোনা হয়। যে প্রেসে বইয়ের তদারক করতে যাই, সেখানেই লোকটিকে দেখেছি। আলাপ হয়েছে কথা-বার্তাও। লোকটি মেশিনের তেল সাপ্লাই করে বেড়ায়। মাঝে মাঝে টাইপও ফেরি করে।

সম্ভবত রমাও আমাকে দেখেছিল কারণ সেই মুহূর্তেই সে লোকটির প্রায় বুকের এলাকা থেকে একটু সরে দাঁড়াল। স্বাভাবিক সুরের কথাবার্তা আরো খাদে নামল। প্রায় ফিসফিসানির সগোত্র।

সে রাত্রেই নির্যাতন চরমে উঠল।

সম্ভবত, রমার দেরি করে ফেরার জন্য সংসারের অবস্থা বানচাল হবার দাখিল হয়েছিল। বাচ্চাগুলোর তারস্বরে আবহ-সংগীতের ছোঁয়াচ। গৃহিণী অগ্নিশর্মা। পশুপতিবাবু উন্মাদ।

আশ্চর্য, সেই রুদ্রতানের বিরুদ্ধে রমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, যা আমি এতদিন এক নিমেষের জন্যও শুনি নি। মুখ বুজে, নির্বিচারে যে মেয়েটি কেবল অত্যাচারের অঙ্গারে নিজেকে পুড়িয়েছে, একটি প্রত্যুত্তর করে নি, মাথা তোলে নি, তার কথায় এত তেজ, এত দাহ এল কোথা থেকে।

হবে হবে, অত ব্যস্ত হবার কি আছে। আমি তো খেলা করতে যাই নি। তোমাদেরই কাজে গিয়েছিলাম। পথে ঝড়জলে আটকে গিয়েছিলাম, তা আর কি করব।

অবশ্য ইতিমধ্যে ঝড়ের [illegible] সঙ্গে বর্ষণও নেমেছে। তবে খুব বেশী নয়, অন্তত মানুষকে আটকে রাখবার মতন তো নয়ই।

কিন্তু বোধহয় শেষ, একদিন যে মেয়েটি মুখ বুজে অপমানের জুতো মুখে ধরে ছিল, তার মেরুদণ্ডে জোর এসেছে। এ জোর কে যোগাল, তাও বুঝতে পারলাম।

তা হলে শুধু লোকচক্ষুর অন্তরালে দাঁড়িয়ে ফুসফাসের কথা নয়, আশ্বাসও পেয়েছে রমা। এ নরক থেকে মুক্তির আশ্বাস।

এই শুরু, কিন্তু শেষ নয়। এরপর যতবারই ও বাড়িতে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, অত্যাচারের বন্যা, রমাও রুখে দাঁড়িয়েছে।

দুবেলা দু-মুঠো খেতে দাও বলে তো বিনাপয়সার দাসীবাঁদীর অধম করে রেখেছ। কোন্ কাজটা তোমাদের হচ্ছে না বলতে পারো? কি আটকে আছে?

আশা করেছিলাম পশুপতিবাবু একদিন এসে হাজির হবেন, মেয়ের স্পর্ধার ফিরিস্তি শোনাতে, কিন্তু তার বদলে এল নিখিল। নিখিল কুণ্ডু।

আসব স্যর?

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বিগলিত কণ্ঠে অনুমতি প্রার্থনা করল। খাতাপত্র সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম।

কি ব্যাপার, আপনি?

একটা প্রয়োজনে আসতে হল স্যর।

নিখিল গুটি গুটি তক্তাপোশের এক কোণে বসল।

বুঝলাম, রমা-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারই হবে। হয়তো নিজে পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছে না, তাই আমার সাহায্য চায়।

কিছু বললাম না। বসে বসে নিখিল কুণ্ডুকে দেখতে লাগলাম। সে বয়স যে রমার কাছাকাছি তাকে দেখতি এ কথা আন্দাজও ছিলাম না। জানি নিখিল সাহায্য এসেছে, মনের এমন অবস্থায় না স্বাভাবিক, নিজেকে সে উজাড় করে দেবেই।

দিলও তাই।

বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি স্যর। নিখিল একটা হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে, কি ভেবে আর ধরল না।

আমি তো তুচ্ছ মানুষ। আমি আর আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি। কণ্ঠে বদান্যতার সুর ফোটালাম।

পারেন স্যর, একমাত্র আপনিই পারেন। ও একমাত্র আপনার কথাই শুনবে।

এমন যে হবে, জানা ছিল, তবু ভাল লাগল। খুব পরিচিত, রোজকার দেখা পার্কে, বেড়াতে যেমন ভাল লাগে। সব স্রোতই সাগরমুখী, তার মধ্যে নতুনত্ব নেই, বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু তবু একটু বৈচিত্র্য ছিল। রমা একমাত্র আমার কথা শুনবে, এই কথায়।

এ পর্যন্ত অনেকবারের দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে, সন্ন্যাসীর রমার সঙ্গে কোন কথা হয় নি। সুযোগ হয়তো হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন

হয় নি। তাকে দেখতে দিয়ে, অন্য লোকজনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে অনায়াসেই মামুলি প্রশ্ন করা যেত, কিন্তু আমি তা করি নি।

তার কারণও ছিল। যে বেশে, যে কাজে রমা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাতে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, হাজার কূট-প্রশ্নের চলনসই কিংবা চমকপ্রদ উত্তর দিতে পারলেও তার উত্তীর্ণ হবার আশা সুদূরপরাহত।

আপনার কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব স্যার। নিখিল ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে।

মেশিনে তেল যোগান দেবার কাজ নিখিলের, কিন্তু বুঝলাম প্রয়োজনবোধে মানুষকে তৈলাক্ত করতেও সে পিছপা নয়।

ব্যাপারটা কি? অজ্ঞতার ভান করলাম।

রমাকে আমি বিয়ে করব।

বেশ তো। উত্তম প্রস্তাব। রমার বাবা অর্থাৎ পশুপতিবাবুর কাছে কথাটা পাড়ুন। আমি আর এ বিষয়ে কি করতে পারি।

আজ্ঞে, তাঁর কাছে তো বলবই। এ সপ্তাহের মধ্যেই বলব। তাতে খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

মনে মনে বললাম, আমারও অবশ্য তাই মত। পশুপতিবাবু আকাশের চাঁদই হাতের মুঠোয় পাবেন। এর আগে কোষ্ঠীর বাতাস দিয়ে যে কজনকে আমি তাড়িয়ে এনে রমার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলাম, পাত্র হিসাবে নিখিল তাদের চেয়ে অনেক ওপরে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে, এর আমার মধ্যস্থতার প্রয়োজনটা কি!

নিখিল কুণ্ডুকে সেই কথাই বললাম।

এবার নিখিল হাসল। দুটো চোখ কুঁচকে, পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে।

বাপ ঠিক আছে, মেয়েকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল।

ভুরু চেয়ারে সামনে সোজা হয়ে বসলাম। কথাটা যেন হেঁয়ালির মতন ঠেকছে।

মেয়ের মনের নাগাল না পেয়েই কি নিখিল কুণ্ডু মেয়ের বাপের মতামতের প্রত্যাশী। এতক্ষণ যে মনসাঙ্কটা সোজা সরল উত্তরে পরিণত হবার অপেক্ষায় ছিল, সেটাই বিশ্রী একটা হিজিবিজি আঁচড়ে রূপান্তরিত হল।

একেবারে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলাম। নিখিলের লজ্জাবেদুর দৃষ্টির ওপর চোখ রেখে।

ব্যাপারটা সব আমায় ভেঙে বলুন তো নিখিলবাবু, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আজ্ঞে বুঝবেন কি করে নিখিল কুণ্ডু তৎপর হল, মেয়েটাই যে ভীষণ বাঁকাচোরা। না চলবে সোজা পথে, না বলবে সোজা কথা।

কোন উত্তর দিলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম চেয়ারে হেলান দিয়ে। ঠিক বুঝেছিলাম, উৎসমুখ যখন খুলে গিয়েছে তখন ধারাবর্ষণ শুরু হবেই। শেষ না করে নিখিল কুণ্ডু উঠবে না।

কি বলে জানেন স্যার? আলাদা বাড়ি করা, শুধু তুমি আর আমি। বস্তি-বাড়ি হোক, কুঁড়েঘর হোক একেবারে আলাদা। কারুর সঙ্গে থাকব না।

ভ্রূ কোঁচকালাম। রোমান্টিক রমার এ চেহারার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। নারীর মন জটিল অরণ্য। কে জানত, ছন্নছাড়া সংসারে, পঙ্গপাল-কণ্টকিত জীবনের মাঝখানে বসে রমা এমন স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করছিল।

বেশ তো আলাদা বাসাই করুন না। আপনার তো রোজগারপাতি ভালই।

নিখিল একেবারে মাটিতে মিশিয়ে যাবার দাখিল কেন লজ্জা দেন স্যার। রাই কুড়িয়ে বেল। কটা টাকা আর মাসে হয়? সংসারটা কি কম। অথর্ব বাপ, মা, বিধবা বোন আবার অপোগণ্ড গোটাতিনেক ভাইবোন। খাবার মুখ অনেক স্যার, কিন্তু রোজগারের হাত এই একটি। আলাদা বাসা করলে, এদের দেখবে কে?

উভয় সংকটে পড়লাম। নির্লিপ্তভাবেই বললাম, এই কথাটা রমাকে বুঝিয়ে বলুন না।

বলছি তো স্যার। অষ্টপ্রহর বলছি। যখনই দেখা হচ্ছে এই কথাই বোঝাচ্ছি। সে রাতেও স্যর যেদিন আপনি চোখ কুঁচকে কুঁচকে আমাদের দেখার চেষ্টা করছিলেন, তখনও এই কথাটা বোঝাচ্ছিলাম।

একটু অপ্রস্তুত হলাম। ভেবেছিলাম দুজনে অন্তরঙ্গ কাহিনীতে এতটা মশগুল যে আমাকে বুঝি লক্ষই করে নি। এমনসব ব্যাপারে তৃতীয় ব্যক্তি অত্যাচারের সামিল।

প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই বললাম ঠিক আছে আমি দেখা হলে রমাকে বলব।

একটু ভাল করে বলবেন স্যার। বিয়েটা তো কেবল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, পারিবারিক কারণেও। নিরালা ভাঙা শুধু দুটিতে বাসা বাঁধলাম, অন্য সকলের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে, সেটা কি ঠিক। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বর যদি দিন দেন, ভাইগুলো মানুষ হয়, বোনটাকে পার করতে পারি, তখন আর আলাদা বাসা করাটা আটকায় কে?

কোন উত্তর দিলাম না। বসে বসেই দেখলাম, আরো বার দুই নমস্কার করে নিখিল কুণ্ডু বেরিয়ে গেল।

জানা ছিল, তবু জানলা দিয়ে দেখলাম এদিক ওদিক চেয়ে নিখিল পশুপতিবাবুর বাসায় ঢুকে পড়ল।

মনে দ্বিধা আর সংকোচ যথেষ্টই ছিল, তার চেয়েও বেশী ছিল মর্যাদাবোধ। রমার সঙ্গে আলাপ বলতে গেলে নেই-ই। পথে-ঘাটে শুধু দেখেছি, কিন্তু এই স্বল্প পরিচয়ের ওপর, তাও চাক্ষুস মাত্র, ভর করে তার ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়াটা সমীচীন হবে কি না, একথা প্রুফ দেখায় ফাঁকে ফাঁকে বহুবার ভাবলাম। ভেবে ভাবলাম-ই, কোন কূল-কিনারা পেলাম না।

তার মধ্যেই পশুপতিবাবু এসে হাজির। এক ছুটির দিন সকালে।

শুনেছেন তো ব্যাপারটা?

ঠিক কোন ব্যাপারের কথা বলছেন, জানা ছিল না, তাই দুচোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটিয়ে চেয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক জাঁকিয়ে বসলেন। ফতুয়ার পকেট থেকে কৌটো বের করে আমার সামনে খুলে ধরলেন। লাল সুতো বাঁধা খাকি বিড়ি।

মুখে আগুন ধরাতে ধরাতে নিজেই বললেন, আরে, রমার যে বিয়ে লাগছে। মেয়ে একেবারে লভ করে বিয়ে করছে।

পশুপতিবাবুর সঙ্গে উৎফুল্ল হবার ভান করে বললাম তাই নাকি, বেশ বেশ।

হঠাৎ পশুপতিবাবুর সন্দেহ হল। নাকটা সিঁটকে কি ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন আপনি তো সবই শুনেছেন। পাত্র তো আপনার খুব জানা।

নিখিল আমার সঙ্গে হৃদ্যতার ছবিটা পশুপতিবাবুর কাছে কত চড়া রংয়ে এঁকেছে, জানা ছিল না তাই মৃদুগলায় বললাম হ্যাঁ কিছু কিছু শুনেছি।

এ আর দোষের কি মশাই কি বলুন? পশুপতিবাবু আমার দিকে আরো একটু সরে বসলেন এ তো সব জায়গায় হচ্ছে আজকাল। আমাদের অফিসের ক্যাশিয়ার নিত্যগোপালবাবুর মেয়ে বাড়ির মাস্টারের সঙ্গে উধাও হয়নি? ফিরল তিন মাস পর। তারপর বিয়ের একটা হুড়ং হল। এ তো তার চেয়ে হাজার গুণে ভাল। কেমন কেলেংকারি তো আর করে নি। ভালবাসা আর অপরাধটা কি মশাই। আপনারা তো লেখাপড়া জানা লোক ঠিক বুঝতে পারবেন। বলে আমরা আজকাল পথে-ঘাটে আমাদের বুকটাই মাঝে মাঝে হুহু করে ওঠে।

পশুপতিবাবু আরো এগোলেন। একটা হাত রাখলেন আমার হাঁটুর ওপর, কি ব্যাপার, আপনি একেবারে স্ট্যাচু হয়ে গেলেন যে? ছেলেটা কি রকম বলুন? কোন নেশাটেশা নেই তো? আমি সব সহ্য করতে পারি মশাই কিন্তু ওই নেশাভাং আর রেস ও দুটো সইতে পারি না। অনেককাল গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে বললেন, মানে ওই আগুনে নিজে জ্বলেছি কিনা। মেয়েটার জীবনে এ অশান্তি আর আসতে চাই না।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পশুপতিবাবু, সশব্দে হেসে উঠলেন। ছাদ কাঁপিয়ে।

কিছুটা হাসির আওয়াজেই চমকে মুখ তুললাম। অনেকের এমন হয়। খুব জোরে হাসলে চোখে জল আসে। তাই বোধ হয় পশুপতিবাবুর দুটো চোখও চিকচিক করে উঠল।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘষে ঘষে পশুপতিবাবু চোখ দুটো মুছে ফেললেন। এবার আমিই বললাম, ছেলেটি ভাল। পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী। মেয়ে আপনার সুখীই হবে পশুপতিবাবু।

সেই আশীর্বাদই করুন আপনারা সকলে। ও গেলে জানি আমার সংসার একেবারে কানা হয়ে যাবে, কিন্তু উপায় কি বলুন। মেয়েকে তো চিরকাল ধরে রাখা যায় না।

পশুপতিবাবু উঠে যাবার পরে অনেকক্ষণ বসে বসে ভাবলাম।

পথে ঘাটে রমার সঙ্গে দেখা হওয়া হয়তো বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি তাকে উপদেশ দিতে যাব কোন সুবাদে? তার চেয়েও আরো জটিল মনে হল নিখিল কুণ্ডুর কথা। রমা আমার নির্দেশ শুনবে এমন ধারণাই বা ভদ্রলোকের হল কি করে?

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল।

বগলে প্রুফের তাড়া ছুটে বাস ধরতে যেতে গিয়েই বিপত্তি। চটির স্ট্র্যাপটা দেহ-রক্ষা করল। মোড়ের মাথায় এক মুচির হাতে চটিটা সমর্পণ করে অপেক্ষা করছি দেখলাম রাস্তা পার হয়ে রমা আসছে। হাতে প্যাকেট। কে জানে, নিজের বিয়ের সওদা করেই হয়তো ফিরছে।

রমা আর আমার মধ্যে ব্যবধান যত কমে এল ততই আমার সাহস গেল নিবে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর, দুটো ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। পা দুটোও অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করেছে। এমন অবস্থায় কথা বলতে গেলেই বিপর্যয় হত।

কিন্তু রমা এপারে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। প্যাকেটটা এক হাত থেকে অন্য এক হাতে নিল। মনে হল হয় কিছু সে বলতে চায়, নয় তো আমি যে কিছু তাকে বলব, এমন আঁচ করে থাকবে। নিখিলের কাছ থেকেই হয়তো শুনেছে।

মুচিকে পয়সা ফেলে দিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে রমার দিকে চোখ তুলে চেয়েই অবাক হলাম। রমার ঠোঁটের কোণে যেন হাসির রেখা। চোখের দৃষ্টিও আমার ওপর।

মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

এবার চোখ দুটো ফুটপাতের ওপর রেখে বলল, বলুন।

নিখিলবাবু আমার কাছে এসেছিলেন। নিখিল কুণ্ডু।

রমা নির্বাক। শরীরটা বুঝি একটু নড়ে উঠল।

বলছিলেন, আমি দম নিয়ে শুরু করলাম তুমি ওকে আলাদা বাসা করতে বলছ, কিন্তু এই সময়ে আলাদা বাসা করা ওর পক্ষে একটু মুশকিল। সংসারে ও'র দিকে অনেকেই চেয়ে আছে। প্রতিপাল্যের সংখ্যাও কম নয়। তাই বলছিলেন—

কথা আর শেষ করতে পারলাম না। সে দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে কথা শেষ করাও যায় না। দৃষ্টিতে ঘৃণা, ক্লান্তি আর বিদ্রূপের মিশেল। গালে, কপালে নীল শিরার জট প্রকটতর। ঝুলে পড়া নীরক্ত ঠোঁটে বেদনার ছোঁয়াচ।

রমা দাঁড়াল না। ঋজু, কঠিন একটা শরীরকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে গেল।

রমা চোখের সামনে থেকে যেতেই মনে পড়ল, একটু হয়তো অনধিকার চর্চাই হয়ে গেছে। আলাপের পরিধি এত অপরিসর, এর ওপর নির্ভর করে উপদেশ দিতে যাওয়াটাই হাস্যকর। বিশেষ করে এক তরুণীর ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে।

সে রাতে ফিরে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জানলার সামনে। তুমুল বচসা চলেছে সামনের বাড়ি। কানপাতার প্রয়োজন ছিল না। এমনিতেই প্রত্যেকটি কথা এ ঘরে ভেসে আসছিল তবু জানলার কাছ থেকে সরে আসতে পারলাম না।

প্রথমে নারীকণ্ঠ।

মেয়ে একেবারে মদ্দের পাঁচ পা দেখেছে। একবার বেরোলে আর বাড়ি ফেরার নাম নেই। এই শরীর নিয়ে আমি হেঁশেল ঠেলব না।

এবার পশুপতিবাবুর গলা। একটু খাদে নামানো।

সে ক'দিন আছে, দয়া করে দায় উদ্ধার করে দাও। সত্যিই তো, বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছে এখন হুট হুট করে বাইরে যাবার দরকারটা কি। কেনাকাটা কি আর আমি করতে পারি না না করিনি কোনদিন?

আশ্চর্য, কোন প্রত্যুত্তর নেই। সামান্য গলার শব্দটুকুও শোনা গেল না। অন্যদিন হলে প্রসারিত-ফণাভুজঙ্গীর ছোবলে মানুষ-গুলো উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠত, [illegible] নিস্তেজ। আজ কিন্তু [illegible] দুঃখী। নিজের দেহের কুশ্রীতা আত্ম-গোপনের চেষ্টায় অন্যমনা।

এরপর আর অনেকদিন রমার সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি নিজেও একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। দপ্তরীপাড়ায় ছুটোছুটি, প্রকাশকদের দোকানে দোকানে ধরনা, সমালোচনার জন্য কাগজওয়ালাদের কাছে ঘোরাঘুরি।

ইতিমধ্যে পশুপতিবাবু এসে নিমন্ত্রণ করে গেছেন। করজোড়ে বলেছেন, দয়া করে কন্যাদায় থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে। এক-দিন নিখিল কুণ্ডুর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কথা হয় নি। কারণ তিনি রথে, আমি পথে। তাঁর সকৃতজ্ঞ চাউনি দেখে অনুমান করেছি রমা একান্নবর্তী সংসারে গিয়ে উঠতে রাজি হয়েছে। নিখিলবাবুর হয়তো ধারণা, এটা সম্ভব হয়েছে আমারই জন্য।

জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে আগের মতনই চেঁচামেচির শব্দ কানে এসেছে। অবশ্য এক-তরফা। অন্য পক্ষ একেবারে নীরব।

সানাইয়ের সুর নয়, নিমন্ত্রিতদের ভিড়ও নয়, শুধু পশুপতিবাবুর ব্যস্ততা দেখে মনে হল, আজ রমার বিয়ে। লগ্ন প্রায় গোধূলিতে। তাই কাজকর্ম সেরে দুপুরের দিকেই বাড়ি ফিরে এলাম। পশুপতিবাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন, আগে থাকতে দাঁড়াতে হবে। একলা মানুষ আর কতদিক সামলাবেন।

ট্যাক্সি করে নিখিল এল। একেবারে নটবরবেশে। সঙ্গে জন পাঁচেক বরযাত্রী। কে একজন শাঁখেও ফুঁ দিল। তারপর সব কেমন চুপচাপ। অস্বস্তিকর নীরবতা।

রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়েছিলাম, পশুপতি-বাবু প্রায় ছুটে এসে পাশে দাঁড়ালেন।

[illegible] হয়েছে।

কি হল? আমার কথায় সামান্যও [illegible] যে রয়ে থাকে, তাই কিনা [illegible] হয় এসে পৌঁছেছেন।

কিন্তু ব্যাপার তার চেয়েও [illegible]। পশুপতিবাবু চাপা গলায় বললেন, রমাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সে কি কোথায় আর যাবে? দেখেছেন খুঁজে?

দেখেছি। বাড়িতে নেই। আপনি একটু মোড়ের দোকানটা ঘুরে আসবেন। শান্তি স্টোর্স-এ। একগাদা সেফটিপিনের কথা বলছিল, বোধ হয় নিজেই আনতে বেরিয়ে গেছে। কিছু বুঝতে পারছি না।

শান্তি স্টোর্স-এ রমা নেই। আসবার সময় সেলাইয়ের স্কুলেও একবার খোঁজ করে এলাম। সেখানেও নেই। আশ্চর্য কাণ্ড।

ফেরার মুখে পশুপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হল। উত্তেজিত, বিব্রত অবস্থা। মনে হল মাথার ঠিক রাখবার ওষুধও কিছু পান করেছেন।

পাড়ার কান আর নিজেদের মান বাঁচিয়ে, যতটা সম্ভব খোঁজাখুঁজি চলল। ওই জানলা দিয়েই দেখলাম, এক সময়ে হন্তদন্ত, অপ্রস্তুত নিখিল কুণ্ডু সবেগে বেরিয়ে গেল। পশুপতিবাবুর বাপান্ত করতে করতে।

ভয় ছিল, ভদ্রলোক হয়তো আমার ডেরায় এসে উঠবে। মনের কিছুটা ঝাঁজ মেটাতে। বলা যায় না, এ ব্যাপারে আমার অংশ আছে, এমন ভাবাও বিচিত্র নয়। কিন্তু না, সে সব কিছু নয়। কিছুক্ষণ পরেই সব নিঃশব্দে হয়ে গেল। দেখলাম পশুপতিবাবুর [illegible] কিংবা [illegible] বলে পশুপতিবাবুর মিথিয়ে দেবার আগ্রহ ছিল না।

পাছে পশুপতিবাবুর মুখোমুখি হতে হয়, সেই ভয়ে পরের দিন ভোরের আলো ফুটতেই বেরিয়ে পড়লাম। মোড়ে বলাইয়ের দোকানে এক কাপ চা খেয়ে সোজা চলে যাব প্রেসে।

পশুপতিবাবুকে আর লজ্জা দেব না। তাঁদের ছলনার অভিনয়টুকু যে ধরতে পেরেছি সেটা জানিয়ে আর লাভ কি। জলজ্যান্ত বিয়ের কনে রাতারাতি উধাও, এমন আজগুবি গল্প ছোট শিশুরও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা নয়। এরাই রমাকে সরিয়ে দিয়েছে। বিনামাইনের এমন দাসীকে হাতছাড়া করতে চায় নি। নিপুণ মাঝির মতন সারা সংসারের বজরাটাকে যে সামাল দিচ্ছিল, দুর্যোগের ঢেউ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিরাপত্তার কূলে নিয়ে যাচ্ছিল দেহ পাত করে, তাকে সরিয়ে দেবার মতন উদারতা এদের সংসারের নেই, থাকতে পারে না, এ তো জানা কথা।

চায়ের দোকানের সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। অন্যদিন রাতের অন্ধকার থাকতে দোকান খুলে যায়। তেলকলের ভোরের শিফটের মজুরেরা [illegible] চা খেয়ে যায়। আজ কিন্তু দোকান খোলে নি। [illegible]

[illegible] দিয়ে [illegible] উঠে বলল।

কিরে, [illegible] আসর [illegible] কি একদম? বলাই কই?

বলাইদা আর আসবে না বাবু।

আসবে না?

শোনেন নি কিছু? আপনার পাড়ারই তো ব্যাপার।

কিছুই শুনি নি, কিন্তু বনমালীর কথার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আর বুঝি অশ্রুত, অজ্ঞাত কিছু নেই। সব দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। বলাইয়ের চেহারাটা মনে করার চেষ্টা করলাম। সারা মুখে বসন্তের ক্ষত, সেই রোগের প্রকোপে একটা চোখও গেছে। বেঁটে, কুৎসিত চেহারা। নিখিলের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কিন্তু তবু এক জায়গায় বলাই নিখিলকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে।

নিখিলের মতন বলাইয়ের বুভুক্ষু, জনাকীর্ণ, সেবা আর শ্রমপ্রত্যাশী বিরাট সংসার নেই। পশুপতিবাবুর সংসারের প্রতিচ্ছায়া। খোলার বস্তিতে বলাই ছোট এক কামরার মালিক। সেই স্বল্পপরিসর নির্ঝঞ্ঝাট কামরার রমা রাজেন্দ্রাণী।

নিশিকুটুম্ব

মনোজ বসু

চুয়াল্লিশ

সাহেবকে আরো কয়েকটা দিন সোনাখালি থেকে যেতে হল। সুভদ্রা-বউ ছাড়তে চায় না : ছটফট কর কেন ঠাকুরপো? বউ যেন তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলছে, তেমনি ভাবখানা তোমার।

মুকুন্দ সেই সঙ্গে যোগ দেয় : আহা, থাকোই না। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই। যেমন রূপের দেহ, ভিতরেও মনটাও তেমনি রূপময়।

আবার দীননাথ পাটোয়ারও বলে, ধানের ক'টা মোটা লেনদেন আছে। এদ্দিন রইলে তো আরও ক'টা দিন থাকো। কাজগুলো সারা করে মাইনেপত্তোর চুকিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাও বাপধন। ধান নেবে না যখন, মাইনের সঙ্গে এক শালি ধানের দাম ধরে দেবো।

স্ফূর্তির চোটে সত্যি সত্যি নাচতে মন যায়। চলে যাচ্ছে সাহেব। গুরুপদর বাড়িটা একবার হয়ে যাবে, অনেক করে বলেছে। বাড়ি দূরবর্তী নয়, তিন-চার ক্রোশের ভিতরে। বিপদে আছে বেচারি তিলকপুরের সেই ব্যাপারটা নিয়ে। দারোগা বড্ড জ্বালাতন করছে। লঙ্কাকাণ্ড কবে হয়ে গেছে, আজও সেই লেজের আগুন নিভল না। সেই সমস্ত কথাবার্তাই হবে। এবং বউয়ের হাতের রান্না ভাত চাট্টি খাইয়ে দেবে বলেছে। অপূর্ব রাঁধে নাকি গুরুপদর বউ।

পথের মাঝখানে হঠাৎ বংশী। ফুলহাটা থেকে যোজন হেঁটে হেঁটেই আসছে। বংশী বলে, গুরুপদর কাছে যাচ্ছ তুমি? বাড়ি যেতে হবে না, এতক্ষণ সে ঘাটে চলে গেছে। আমিও সেখানে যাচ্ছি।

কেমন রহস্যদৃষ্টিতে তাকায় : ক'দিন থেকে তোমার কথাই ভাবছি। সাহেবকে যদি পাওয়া যেত! অনেক করে চেয়েছিলাম, মা-কালী তাই মিলিয়ে দিলেন। চলো—

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কোথায়?

[illegible]। [illegible] [illegible]। আর [illegible] [illegible]—খোনাই মিস্ত্রি। [illegible] [illegible] [illegible]।

পারিনে। বলি, এ আমাদের সাক্ষাত বংশী নয়, কোন বড়মানুষের বেটা, বড় দরের লোক—বংশীধরবাবু।

বংশী হেসে বলে নেমন্তন্নে যাচ্ছি, বাবু না হয়ে কি করি! জাঁকজমকের বিয়ে, আমরা সব বরযাত্রী। গুরুপদ, খোনাই আর আমি তিনজন ছিলাম, তোমায় নিয়ে গণ্ডা পুরল।

সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরেছে। টেনেই নিয়ে যায়। হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করে সাহেব বলে, আচ্ছা পাগল! বিয়েবাড়ি গন্ধে গন্ধে গিয়ে উঠব? মানুষ আজকাল ঘাঁদোড় হয়ে গেছে, ভোজের সময় তক্কেতক্কে থাকে। বিনি-নেমন্তন্নে গিয়ে বসলে পিটিয়ে পিঠ ভেঙে দেবে।

ঘাট অদূরে, দু-পা যেতেই পৌঁছে গেল। সেই লোকটা—খোনাই মিস্ত্রি, অপেক্ষা করছে। বলে, নৌকো এ ঘাটে পাওয়া গেল না বংশী। গুরুপদ বয়ড়াইতলার ঘাটে গেছে। আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে—

সাহেব জিজ্ঞাসা করে : নেমন্তন্ন কোথায় বংশী?

মামুদ আলি মোল্লার ছেলের বিয়ে।

বংশীর সঙ্গে খোনাই-এর চোখোচোখি হল। বুঝে নিয়ে খোনাই একগাল হেসে ঐ সঙ্গে জুড়ে দেয় : গ্রাম মাদুরপলতা। পুঁড়িভদ্রা থেকে ভেঘরার খাল নেমে গেছে, সেইখানটা।

সাহেব চমকে ওঠে : ওরে বাবা!

বংশী অভয় দিয়ে বলে, নৌকোয় যাচ্ছি, বাবা বলবার কি হল গো? বিয়েবাড়ির রশিখানেক দূরে নেমে গুটগুট করে গিয়ে উঠব।

অতএব বয়ড়াইতলার ঘাটে চলেছে। যেতে যেতে কথাবার্তা। খোনাই মিস্ত্রি বলছে, ভাল অবস্থা করে ফেলেছে মামুদ আলি। নতুন দালান দিচ্ছে। বড়লোক হাটে গিয়ে বিয়ের বাজার করল, [illegible] দেখে সকলের তাক লেগে যায়।

ফিকফিক হেসে বংশী বলে, [illegible]

[illegible] লাগে না।

ব্যাপার বুঝতে সাহেবের [illegible] হাসাহাসি চলছে তো চলছে। [illegible] এখন। নৌকো পেয়ে ভালই হল—গুরুপদর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফুলহাটার মালিক-কারীর কাছে যাবার মতলব। মাদুরপলতার মাঝপথে নেমে গেলে অনেক কম হাঁটতে হবে।

বয়ড়াইতলা এসে গেল। দূর থেকে গুরুপদকে দেখা যায়। ঘুরছে ঘাটের এমুড়ো-ওমুড়ো—ঘুরেই বেড়াচ্ছে। মাঝি-দাঁড়ি কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই, চুপচাপ ঘুরছে। এদের দেখে দ্রুতপদে কাছে এলো।

সাহেব পুলকিত স্বরে বলে, ওস্তাদের সঙ্গে কাজকর্ম হয়ে গেল তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে। চলে যাচ্ছি। তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম গুরুপদ।

গরুরপদর জবাবের আগেই বংশী প্রশ্ন করেঃ নৌকোর কি হল?

না, এঘাটেও নেই।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, কোথায় তবে?

নৌকোর ভার গরুরপদর উপরে। সে বলে, আছে কোথাও না কোথাও ঠিক বেব করে ফেলব বলি খোঁড়া নও তো কেউ। বাবুভেয়ে মানুষও নও। তবে আর কি! দাসপাড়ার ঘাটে যাই এবারে।

ঘোরাঘুরি হল দাসপাড়ার ঘাটে। সেখানেও নেই।

হাসখালি গিয়েই দেখা যাক তবে?

সাহেব বিরক্ত হয়ে বলে, নৌকো ঠিক করেছ—সে নৌকো কোথায় থাকবে, মাঝির সঙ্গে বলাকওয়া নেই? সেটেই তো এতক্ষণে প্রায় মাদুরপলতায় পৌঁছানো যেত।

কয়েকটা গাঁয়ে আরও কতকগুলো ঘাট ঘুরে মিলল অবশেষে নৌকো। জলোডিঙি ডাঙার সঙ্গে কাছি-কষা—মানুষজন নেই,

বোঠে রয়েছে অর্থাৎ ডিঙি বেঁধে কাছা-কাছি কোন [illegible]।

সর্বনাশ! [illegible] গুরুপদ [illegible] দিয়ে ডিঙি [illegible]। [illegible] ঝাঁপিয়ে [illegible] ও উঠে পড়ে। একটা বোঠে নিজে তুলে নিয়ে তাড়া দেয়ঃ হাত পা কোলে করে বইসে সব? বোঠে ধরো, জোরে জোরে মারো।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, [illegible] নেমন্তন্ন, ও ডাঙায় কি যাচ্ছ?

গুরুপদ বলল, না, ডিঙি [illegible] চলো তবে। ধরতে পারলে জেলেরা ডাঙায় নামিয়ে নিয়ে পুজো করবে।

সাহেব ভয়ের ভাণ করে বলে, বল কি গো—অ্যাঁ, ভালমানুষ হেঁটে হেঁটে চলেছি—খাতির করে এমনি নৌকোয় এনে তুললে! তোমার মাতব্বরিতে বড় ভয় গুরুপদ, সেই তিলকপুরের মতন না হয়।

যেমন ফিরে তার তেমনি মন্তব্যঃ বংশী দাঁত বের করে হাসেঃ দানধ্যান কি তীর্থধর্মের কাজে তো যাচ্ছেন বে, নৌকোর ন্যায্য ভাড়া মিটিয়ে দশের আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেরুবে।

সাঁ-সাঁ করে ডিঙি চলেছে। সাহেব বলে, আমি তোমাদের নেমন্তন্নে যাচ্ছিনে। ধর্মাধিকারী মশায়ের কাছে যাব, সেখান থেকে হয়তো বা দেশেঘরে একবার। আবার কবে দেখা হবে—দু-চারটে কথাবার্তার জন্য নৌকোয় উঠেছি। নৌকো ওপারে নিয়ে ধরলে, নেমে চলে যাব।

বংশী ঘাড় নেড়ে বলে, সেটি আর কি! একবার যখন তুলতে পেরেছি, ছাড়াছাড়ি নেই।

সাহেব কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে যাব তা হলে। সেটা তো ঠেকাতে পারছ না।

সাহেবের মনেপ্রাণে আপত্তি। ধর্মাধি-কারীকে বলেকয়ে যাবে চলে কালীঘাট। সুধামুখীকে দেখে আসবে। আর রানীকে। মন বড় টেনেছে। কিন্তু সকলের বেশি দরকার কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আসা। ইষ্টদেবী কালিকা। তার মধ্যে প্রধান হলেন কালীঘাটের দক্ষিণাকালী, আর বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী। কাজকর্মে হাত লাগানো কালীক্ষেত্রে পুজো দিয়ে আসার পর।

সাহেব বলে, ওই ছুঁড়ি তোর বিয়ে—এমন হয় না। তৈরি-টৈরি হয়ে আসি আগে—তারপর।

বংশী মিনতি করে বলে, এইবারটা মন রাখো ভাই সাহেব। বিয়ে-বাড়িটা সেরে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। ধোনাইয়ের সাচ্চা খবর, এক বাড়িতেই কাজ হয়ে যাবে। নইলে প্রাণে মারা পড়ব আমরা।

মামুদ আলির বাড়ি না গেলে এরা মারা পড়বে—জিনিসটা মাথায় ঢোকে না। সাহেব [illegible]।

বংশী বলে চলেছে, বউটা বরাবরই [illegible]। [illegible] হয়ে পড়েছে একেবারে। ছেলে-মেয়ে তিন তিনটে নিয়ে ঐ একগাদা। সেই [illegible] মাথায় হাত রেখে দিব্যি করিয়ে নিল—অসৎ কাজে আর নয়, ভাল হয়ে থাকব। ছিলামও ভাল। কাজের কথা কেউ বলতে এলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দিব্যি রাখতে দিল না। নেমন্তন্নের নাম করে বউকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েছি। সাজ পোশাকের বোঝা সেইজন্য আরো বেশি করে চাপাতে হল। মোটে যাতে সন্দেহ না হয়।

কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে আসে। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে বংশী বলে, জীবনে আর অসৎ পথ মাড়াব না ঠিক করেছিলাম। চাষবাস করব, খেটেখুটে গরিবভাবে থাকব। হতে দেবে তাই? [illegible] দারোগা থানার উপর ডাকিয়ে নিয়ে খোলাখুলি বলে দিয়েছে। বয়স হয়েছে, চাকরি ছাড়বে এইবার, দেশের বাড়ি দালানকোঠা তুলে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবে। শেষ কামড় সেই বাবদে—আমার নামে ধরেছে এক-শ টাকা। কত কান্নাকাটি করলাম—এক-শ'র একটা টাকা মাপ হল না। চাষবাস করে কালতু এক-শ কোথায় পাই? সময়ও সংক্ষেপ—নতুন ফসল ওঠা অবধি সবুর মানবে না। [illegible] দিতে হবে।

ধোনাই বলে, আমার নামে দশ। [illegible] এমনি দশ করে ধরেছে। বংশীর মতন দাগি নই, ধরাছোঁয়া পাচ্ছে না, সেইজন্য সস্তা। ছিলাম না দাগি, কিন্তু কদ্দিন আর? দাগি না হলে হক না-হক টাকা ধরতে পারে না যে।

গুরুপদ বলে, আমারও এক-শ। এক কাজের কাজি বলে বংশীর আর আমার এক অংক। সেই যে—তিলকপুরের পথ আমাদের দু জনের গায়ে। তুমি বেঁচে গেছ সাহেব, বিদেশি মানুষ বলে তোমার নিশানা পায়নি।

সাহেব আর জেদ করে না। দারোগা নিশানা না পেলেও তিলকপুরের দায়-দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় না। তার উপরে বংশীর এই হাত-ধরাধরি ও চোখের জল। [illegible] কাটকে গেছে, বংশী আর গুরুপদের নাম সেই নাকি ফাঁস করে দিয়েছে।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, তুষ্টু এমন কাজ করল? তারই জন্যে তো যাওয়া। [illegible] তার কপাল ফাটানোর শোধ তুলব—এলে মনে আমার সেই মতলব ছিল।

থানায় বংশীকে ডাকিয়ে বুড়ো দারোগা তুষ্টুচরণের নাম ফাঁস করে দিলেন—

সন্দেহের কিছু নেই। বাহাদুরি জাহির করছিলেম। বললেন, চাকরির শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আর বলতে কি! কতরকম মাথা খেলাতে হয়—তোদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তোদের উপর দিয়ে যেতে হয় আমাদের।

তুষ্টুচরণ এবং ভিন্ন ভিন্ন কেসের আরও তিন-চারটে আসামি এক লক-আপে। মামুলি কায়দাকানুন প্রয়োগ করে দেখা হয়েছে—কাজ হল না। তখন দারোগার নিজের আবিষ্কার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ—

রাত্রিবেলা, বাইরের লোকজন একটিও আর থানায় নেই। লক-আপের তালা খুলে সিপাহী সহ দারোগা নিজে এসে হুঙ্কার ছাড়লেন: চুনের ঘরে নিয়ে যাও ওটাকে।

যার দিকে আঙুল তুললেন, সে মানুষ তুষ্টুচরণ নয়। তুষ্টুর চোখের উপরে সেই আসামিকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল।

নাম চুনের ঘর কিন্তু এক কণিকা চুন নেই। আসামির পেটের ভিতরের কথা আদায় হয় সেখানে। একসময় রেওয়াজ ছিল চুনের বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে বেঁধে রাখত, নিঃশ্বাসের সঙ্গে চুন উঠে নাক-মুখ বোঝাই হয়ে যেত। এখন ঢের বেশি ফলপ্রদ পদ্ধতি বেরিয়েছে, সেকালের চুনের বস্তা বাঁধা বাতিল। ঘরের কেবল সেই পুরানো নামটা রয়ে গেছে।

হুকুম দিলেন: চুনের ঘরে নিয়ে যন্ত্রআদি চালাওগে। নরম হয়ে এলে খবর পাঠিও।

বলে দারোগা সম্ভবত বিশেষ কোন জরুরি কাজে বসে গেলেন। যন্ত্রআদি শুরু হয়েছে ওদিকে। সেই যন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ কানে এসে লক-আপের ভিতর তুষ্টচরণের রক্ত হিম হয়ে যায়। দমাদম লাঠি পড়ছে আসামির রেওয়ারিশ দেহটার উপর। লাঠি চার-পাঁচখানা অন্তত—তেমনিধারা আওয়াজ। আর সেই সঙ্গে বাবা রে মা রে—প্রাণান্তক চিৎকার। তারপর সমস্ত চুপচাপ। ক্ষণপরে সিপাহির ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা যায়: বড়বাবু, নড়েচড়ে না যে—

সে কি রে?

চটি ফটফট করে ছুটলেন দারোগা চুনের ঘরে: কী সর্বনাশ, একেবারে শেষ করে দিয়েছিস?

সিপাহি বলে, পাঁচ হাতের কাজ, পাঁচজনে পাঁচ দিক থেকে পিটেছে—সকলে হাতের ওজন রাখতে পারে না। এখন কি হবে, বলুন বড়বাবু।

হবে কচু। মকড় মারলে ধোকড় হবে। ঠিক ঠিক মরে থাকে তো কুয়ো সই করে দে, আবার কি! ও-মাসেও তো হয়েছিল একটা।

সুস্পষ্ট অবিকল কণ্ঠ-ধ্বনির নৈঃশব্দে, প্রতিটি শব্দ তুষ্টুচরণের কানে আসছে। পর-ক্ষণেই কুয়োর মধ্যে ঝপ করে একটা ভারী বস্তু পড়ার শব্দ।

দারোগার পরবর্তী হুকুম : চোরবেটাকে নিয়ে আয় এবারে। ওটাকেও শেষ করা যাক, কে আবার আদালতের হাঙ্গামায় যাবে।

খুন করার পরেই মানুষকে নাকি খুনে পেয়ে যায় কখনো কখনো। ক্রমাগত খুন করে যেতে ইচ্ছে করে। দারোগার তাই হয়েছে। এবারে তুষ্টুচরণের পালা।

চুনের ঘরে তুষ্টুচরণকে নিয়ে এলো, দু-পাশে দুই সিপাহি বজ্রমুষ্টিতে হাত এ'টে ধরেছে।

তিলকপুরে তোর সঙ্গে কে কে ছিল? বাঁচতে চাস তো বল্ খুলে সমস্ত—

বুড়ো দারোগা বংশীকে বলেন, আর হেসে খুন হন। অনেক কাল আগেকার আরও এক ঘটনা বললেন তিনি। ঠিক এইরকম ব্যাপার। সদরের নিকটবর্তী পাইকগাছা থানায় তখন তিনি। সদরে বেনামি চিঠি গেল, দারোগা অমুক আসামিকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। অগাস্ত সাহেব সেই সময় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সে লোকের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। বাদার একটা বড় দাঙ্গার ব্যাপারে সাহেব সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছিলেন, পাইকগাছার ঘাটে বোট বেঁধে হঠাৎ নেমে পড়লেন। দারোগাকে বলেন, অমুক গ্রামের অমুক মানুষটাকে খুন করে লাস গুম করেছ তুমি—

দারোগা হাসিমুখে সহজভাবে বললেন, এবেলাটা দয়া করে ঘাটে থাকতে আজ্ঞা হয় হুজুর বিকেলে জবাব দেবো।

জমাদার ঘোড়া নিয়ে ছুটল। গ্রাম থেকে মানুষটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে থানায় এনে হাজির করল।

দারোগা বললেন, এই লোক হুজুর, যাকে আমি খুন করে গাঙে ভাসিয়েছিলাম।

মানুষটা কসম খেয়ে বলে, খুনের কথা কি হুজুর, আমার গায়ে একটা আঙুল ঠেকায় নি কেউ। নির্দোষ বুঝে বড়বাবু একপেট খাইয়ে থানা থেকে ছেড়ে দিলেন, পরমানন্দে সেই থেকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছি।

খলখল করে হেসে বুড়ো দারোগা এবার বংশীর কাছে রহস্যভেদ করেন : বুঝলে না? বস্তার মধ্যে খড়, চার-পাঁচ জনে খড়ের বস্তায় লাঠি পেটাত। চেঁচামেচি কান্নাকাটি করত চৌকিদার একজন—কিস্তর মহড়া দিয়ে তাকে শেখানো। তারপরে কুয়োর জলে ভারী জিনিস কিছু ফেলে দেওয়া। খাতায় পাতায় করে, সেই জিনিষ আর কি!

ধাপ্পায় পড়ে বোকারাম তুষ্টু নাম বলে ফেলেছে, তাকে দোষ দিয়ে কি হবে? এইবারে দারোগা এদের সব নিয়ে পড়লেন। তিলকপুরের অপরাধী বংশী ও গুরুপদ মাত্র নয়—গোটা এলাকা ধরে টানাটানি। হাজতের হুকুম হবে।' ফৌজদারি কার্যবিধির একশ-দশ ধারা অনুযায়ী মামলা—চলতি কথায় দশধারা। ষোলআনা সাচ্চা আর কাটা মানুষ—দায়ে-দরকারে ঘটিটা কি কুড়ালখানা কিম্বা পরের ক্ষেতের কলা-কচু সবাই নিয়ে থাকে। কোন কারণে দারোগা বিগড়াল তো দিল এক দশধারা ঠুকে। অমুক অমুক লোকের রীতিপ্রকৃতি খারাপ, খাওয়া-পরা চালানোর কোন সাধু পন্থা নজরে পড়ে না—এমনিধারা সন্দেহের উপর মামলা। দেশ সুদ্ধ মানুষ সাক্ষি। শীত-কালে হাকিমেরা মফঃস্বলে বেরোন, মামলার শুনানি সেইসময়—গাঁয়ের উপর কোন এক অস্থায়ী ক্যাম্পে। জগৎবেড় জালে দিল তো সকলকে জড়িয়ে, যে পারে সে তদ্বির করে বেরিয়ে যাক। তদ্বির ঐ দারোগারই কাছে —নোট গুণে এবং টাকা বাজিয়ে তদ্বির করে এসো। যেমন এবারে বংশীর তদ্বিরে সাব্যস্ত হয়েছে এক-শ টাকা, খোলাই মিস্তির দশ। তদ্বির সারা হলে আসামির লিস্টি থেকে নাম তুলে নেবে। সেটা যদি সম্ভব না হয় সাক্ষিদের উকিলমোক্তার মারফত বেকসুর খালাস আদায় করে আনবে হাকিমের কাছ থেকে। পাকা ফৌজদারির খরচা সামান্য নয়—শোনা যাচ্ছে, পঞ্চাশ-ষাটটা নাম জড়িয়ে দিয়েছে।

বোঠে ফেলে বংশী খপ করে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে : মা-কালীর দিব্যি করে বলছি, মামলা ঠেকাতে যা লাগে তার উপরে সিকি পয়সার লোভ করব না। পুরো একশ টাকাও চাচ্ছিনে আমি। তিন বিঘে ধানজমি আর গাইগরুটার খদ্দের দেখে এসেছি। তাতে অর্ধেক আন্দাজ উঠবে। গুরুপদও ধারকর্জ করে কতক জোগাড় করে ফেলেছে। সবসুদ্ধ মোটের উপর শ-দেড়েক হলেই আমাদের হয়ে যাবে। তার উপরে যত কিছু তোমার। এই চুক্তি —বাংলা খাটাতে যাব কেন বলো।

বংশী বোঠে মারে, আর বিড়বিড় করে দুঃখের কথা শোনায়। গাইগরু বিক্রির বন্দোবস্ত করে এসেছে। আট আনা মূল্যে

এইটুকু এক সংলেবাছুর কিনে অনেক যত্নে এত বড়টা করল। বয়স হয়ে গিয়ে গাভিন হয় না, আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিন পরে এইবারে প্রথম বাছুর হল। বংশীর বউ বলে, হয়েছে আমার বাচ্চার কপালে—বাচ্চাছেলে দুধ খাবে বলেই গরুর দেবতা মাণিকপীর এতকাল বাদে বাছুর দিলেন। ঘরের গাইয়ের দুধ পেয়ে, বলতে নেই, ছেলে বেশ ইয়ে মতন হয়েছে। বাচ্চার ভরপেট হয়ে এক-একদিন বাপের পাত অবধি দুধ এসে পড়ে। গাই-বিক্রিব কথা বউকে ঘুণাক্ষরে জানানো যাবে না। কৌশলটা সে ভেবে রেখেছে। গাঁয়ের বাইবে কোনখানে গরু বেঁধে আসবে, সন্ধ্যার পর গরুর দড়ি খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে টাকা নিয়ে নেবে। গরু ফিরছে না—বউ জানবে হারিয়ে গেছে। কার ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল, ধরে নিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়েছে। লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজিও হবে কয়েকটা দিন—মনে মনে বংশী সমস্ত ছকে রেখেছে।

গুরুপদর হঠাৎ গর্জে উঠল : ঐ যে থানার থানায় দারোগা-জমাদার পুষে রেখেছে, ওরাই মানুষকে ভাল থাকতে দেবে না। ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে। ওদের বিদায় করুক, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি দেখো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কী বলছ তুমি চারি পো! সরল মানুষ ধোনাই মিস্ত্রি ঘোরপ্যাঁচের কথা বোঝে না। বলে, দারোগা পোষে তো চোর ঠেকানোর জন্যেই—

গুরুপদ বলে, আর দারোগা চোব পোষে চাকরি ঠেকানোর জন্য। তালুক-গাঁতি কিনবার জন্য, দালান-কোঠা দেবার জন্য। চোরের অনটন পড়লে চাপ দিয়ে ভাল গৃহস্থকে চোর বানিয়ে নেয়।

আঘাটায় ডিঙি বেঁধেছে, গাঁ নিশুতি হবে সেই অপেক্ষায় আছে। আহা-মরি কী চমৎকার রাত্রি! কৃষ্ণপক্ষ, তার উপর মেঘ থমথম করছে আকাশে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে থাকে। ধোনাই মিস্ত্রি [illegible] মজেলের বাড়ি হাজির করে দিল। মামুদ আলি লোকটা সত্যি পয়সা করেছে। চাষীর হাতে পয়সা এলে পর পর চার লক্ষণে প্রকাশ পাবে। উৎকৃষ্ট হালবলদ সর্বাগ্রে—সে এমন, কাজ ফেলে মাঠের যত চাষী আসবে বলদের গায়ে একবার করে হাত বুলিয়ে যেতে। বলদ হল তো ঘোড়া—হেঁটে বেড়ানো পোষাচ্ছে না আর তখন, ঘোড়ার পিঠে গমনাগমন। ঘোড়ার পরে বউ—একটা বউ সকলেরই থাকে, সেটা কোন ঐশ্বর্যের চিহ্ন নয়, বিয়ে বা নিকে করে যাও যতগুলো সম্ভব। এবং সর্বশেষ পাকাদালান।। মামুদ আলির চার দফাই হয়ে গেল। দালান দিয়েছে—একতলায় শেষ নয়, ছাতের উপরে দোতলার ঘর। সম্পূর্ণ হয়নি, দরজা-জানলা ও পলস্তারার কাজ বাকি। হতে হতে বিয়ে এসে পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ এখন দিনকতক। সিঁড়ি বাইরের দিকে, তারও ইটগুলো মাত্র বসানো হয়েছে। উঠতে পা্য়
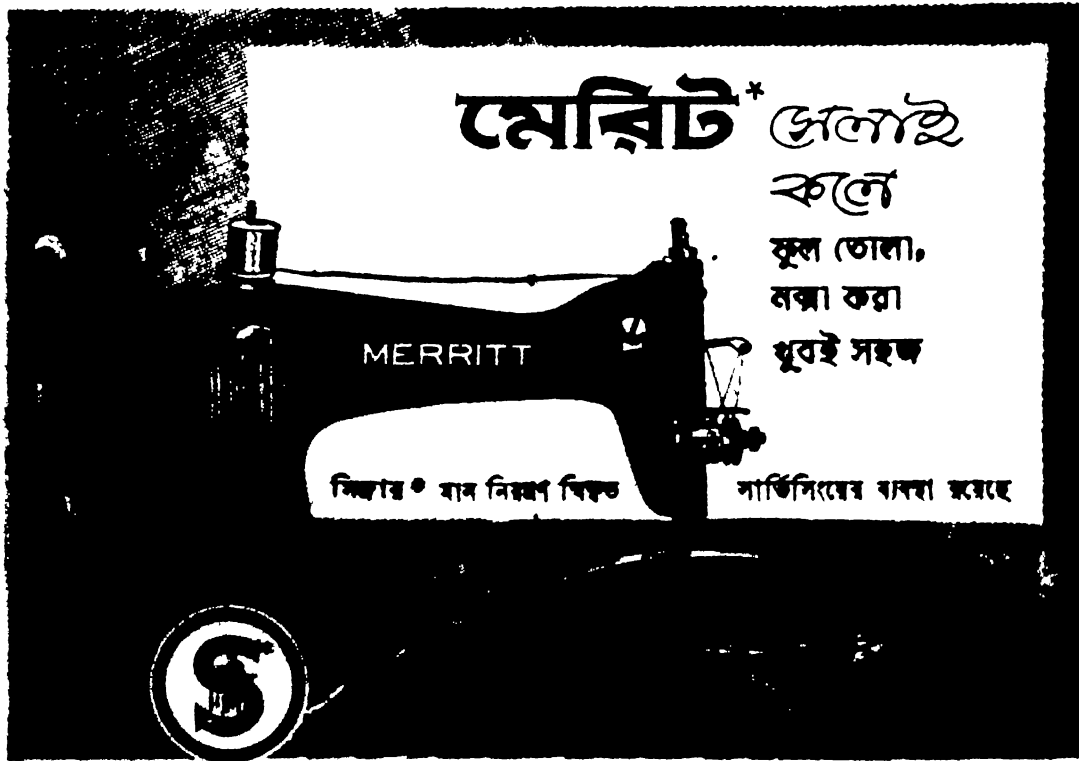
[illegible] পর্যন্ত। খোনাই মিস্ত্রি গাঁথনির কাজে ওস্তাদ, দিত, যাতির অনিবাণশিখা তার সমর্থণের।"

বংশী অবাক হয়ে বলে, কী বিয়েবাড়ি রে বাবা! দেড় পহরে হতে না হতে আলো নেভানো। ভেবেছিলাম, কতক্ষণ না নজর বয়ে বসে থাকতে হয়।

খোনাই বলে, ছেলের বিয়ে যে! দুপুরবেলা বর নিয়ে সব মেয়ের বাড়ি রওনা হয়ে গেছে। বউ এসে পড়বার পর তখন এবাড়ি বাজনাবাদ্যি হৈ-হল্লা খানাপিনা। অঢেল আয়োজন করেছে, পাঁচ-সাত গাঁয়ের স্বজাত ভিনজাত আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের নেমন্তন্ন।

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলে : রাতের কুটুম্ব আমাদের ভোজ সকল কুটুম্বর আগে--

ভাঁড়ার উপরের ঘরে। জিনিষপত্র কেনাকাটা করে সেখানে এনে রেখেছে। ওস্তাদে বলেন, আগে বেরুনো, পরে ঢোকা। মানে হল, ঢোকবার আগে বেরুনোর বন্দোবস্তটা নিখুঁত হয় যেন। দোতলায় উঠবার নামে তা-বড় তা-বড় কারিগরও আতকে ওঠে। কিন্তু সাহেব বেপরোয়া—অন্তত আজকের এই দিনটা। সাঙাতের কথায় এসেছে তাদেরই কাজে। বংশীর আবার এ-কথায় আপত্তি : আমাদের কাজ হল কিসে? কাজটা বড়ো দারোগার- তাঁরই দালানকোঠা হবে। ধরতে পারলে নিয়ে তুলবে তাঁরই কাছে তো—তিনি কি আর বিবেচনা করবেন না?

কিন্তু হলে হবে কি—সিঁড়ির উপর মানুষ শুয়ে আছে আড় হয়ে। তাতে কি ডরায়! চলনে বিড়াল, সরে পড়ায় সাপ। দুটো সিঁড়ি বাদ দিয়ে পুনশ্চ একজন। তাকেও পার হল। আরও কিছু গিয়ে চাতালের উপর একগাদা মানুষ পাশাপাশি। কাজের বাড়ি মানুষ অনেক জমেছে। বৃষ্টিবাদলার মধ্যে জায়গার অভাবে সিঁড়িতেই শুয়ে পড়েছে। এত ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভব --হনুমান না হলে হয় না। বেকুব হয়ে ফিরতে হল। খানিক দূরে এসে দেখে খোনাই মিস্ত্রি নেই। বায় কোথা খোনাইটা দল ছেড়ে?

বৃষ্টিও তেমনি লেগেছে। টিপটিপ করে পড়ছিল, মুষলধারে এলো। ভিজে জবজবে। অনতিদূরে গোয়ালবাড়ি কাদের। একদৌড়ে ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

বংশী সাহেবের গা টেপে : ভিতরে মানুষ।

গোয়াল লোকে যেমন-তেমন করে ঘেরে, দমু না বেরোলেই হল। মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজাল দিয়ে গেছে, আগুনে গনগন করছে। সেই আগুনে ঘিরে বসে কজনে হাত-পা সেঁকছে।

সেস ক্ষেত্রে টিপিটিপি সরে পড়া উচিত। কিন্তু সাহেবকে বজ্জাতি খুঁচিয়েতে পেয়ে [illegible] দিয়ে ওঠে : কারা ওখানে?

বংশী সন্ত্রস্ত হয়ে হাত টানছে পালাবার জন্য। সন্দেহের প্রশ্রয়ে মধ্যে নেয় না।

কি করো তোমরা?

মিনমিনে গলায় জবাব আসে : খোলাটে পাহারা দিচ্ছি।

সত্যি বটে, গোয়ালের ওদিকটায় গোলা, ধান তোলার খোলাট। গলার সুর আরও চড়িয়ে সাহেব ধমক দেয় : কে পাঠাল তোমাদের পাহারা দিতে? এসো, এদিকে চলে এসো, দেখে নিই—

লোকগুলো এক লম্ফে উঠে পড়ে দৌড়।

সাহেব হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, দেখলে, আমি কেমন বুঝতে পারি। আমরাই মজা করে হাত-পা সেঁকি এবার। বাদলা-রাতে ওরাও কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে।

বংশী তিক্তস্বরে বলে, বেরিয়েছে ঐ দারোগার ঠেলায়—আমি দিব্যি করে বলতে পারি। এলাকা জুড়ে জাল বেড় দিয়েছে। মুখ ঢেকে পালাল, নয়তো ঠিক চেনা মানুষ বেরুত। একই দশধারা মামলায় আসামি। ঘাটটা নাম জড়িয়েছে এবারে।

গনগনে আগুন দেখে গুরুপদর তামাকের পিপাসা পেয়ে গেছে। বলে, কলকে-তামাক পেলে দু-টান টেনে নিতাম, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে গো—

ডিঙিতে ফিরে দেখল খোনাই ইতিমধ্যে এসে গেছে। গুরুপদ সর্বাগ্রে নারকেল-খোসার নুড়ি পাকাতে লেগে যায়। তামাক টেনে চাঙ্গা না হবে বোঠেয় সে হাত দিচ্ছে না।

বংশী খোনাইকে প্রশ্ন করে : ডুব মেরেছিলে কোথা?

বোঠেয় ঘায়ে জল ঠেলতে ঠেলতে খোনাই বলে চিল পড়লে কুটোগাছটি না নিয়ে ওঠে না। সেই নিয়ম আমার, খালি হাতে ফিরিনে।

একটা চটের থলি পা দিয়ে ঠেলে দিল। হেই চকোর বংশী—আর দু-জন পরমাগ্রহে চেয়ে রয়েছে। বেরুচ্ছে একে একে হাত-করাত বাটালি, রেঁদা আগর, সরকালি—মহম্মদ আলির নতুন দালানে ছুতোরমিস্ত্রি কাজ করে কাজের শেষে যন্ত্রপাতি থলি ভরে রেখে যায়। পুরোনো কম্বা জিনিষ, বোঝ বোঝ ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার মতন কিছু নয়। অন্য বমাল না পেয়ে খোনাই-এর থলিতে নজর গিয়ে পড়ল।

খান দুই বাঁক এগিয়ে খোনাই আবার এক কাণ্ড করে। পাশখালির মোহানায় জেলেডিঙি বাঁধা। ভাটা লাগলে জাল ধরবে তত্ক্ষণ জেলেরা সুখ করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হেসোদা দিয়ে খোনাই কাছিতে দিল পোঁচ। বনবন করে নৌকো পাক খাচ্ছে, লোকগুলো তবু জাগে না। চৈত্রের গাজনে চড়কগাছে ঘুরছে, তেমনি একটা-কিছু ভাবছে হয়তো। গুড়োর উপর বেউটিজাল —জাল গাছি তুলে নিয়ে খোনাই জেলে-

ভাঁড়িতে সজোরে ধাক্কা দিল। চলো বাবু মাথ-পায়ের দুরন্ত টানে। এখন মেরে পড়লেও ঐ টান কাটিয়ে পিছু নিতে পারবে না।

সাহেব রাগ করে ওঠে : ভাল ওদের ভাতভিতি, সেই জিনিস নিয়ে নিলে তুমি?

ধোনাই হি-হি করে হাসে : বেঁচেবর্তে, সুতালাতালি ঘরে ফিরলে তবে তো জাত! সে আর হচ্ছে না। ডুবে মরবে ধ'রে পড়ে, ডুবে গিয়ে তবে যদি ঘুম ভাঙে!

হু'কো চলছে হাতে হাতে। দু-চার টান টেনে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে নেবার গরজ। ধোনাই সাহেবের দিকে হাত বাড়ায় : আমায় দাও—

হু'কোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে সাহেব তার দিকে দিল : হু'কো পাবে না, ছোটজাত তুমি—

সাহেব জাত-জাত করছে—আর দু-জন অবাক হয়ে গেছে। সেই সাহেব, একদিন যে তুষ্টু তোমাকে হিড়-হিড় করে দাওয়ার উপর তুলে ছিল। গুরুপদ বলে, কাজের মধ্যে জাতবেজাত কী আবার! ও জিনিস গাঁয়ে-ঘরে ফেলে এসেছি। ঘরে ফিরে গেরস্ত-মানুষ হয়ে কোঁপরদালালি করব—সেই সময় তুলে নেবো।

সাহেব বলে, জাত কাজের মধ্যেও আছে। গরিব মেরে ছাঁচড়া কাজকর্ম—সেই দিকে ধোনাই মিস্ত্রির ঝোঁক। ছুতোরের যন্ত্রপাতি হাতিয়ে আনল, জেলের জাল নিল। আমরা চোর, ধোনাই ছিঁচকে। ঘটিচোর বাটিচোর সেই দলের। হু'কো দিলে জল মরে যাবে, জল বদলে ফেলতে হবে।

কলকে স্পর্শ করে না ধোনাই। দুঃখ পেয়েছে, মুখ ফিরিয়ে ঝপাঝপ বোঠে মারছে। বংশী তার হয়ে বলে ওঠে : ভাল করেছে ধোনাই। গরিব না মেরে লাখপতি কোটি-পতি পাই কোথা এখন? মানুষ আলিকে মনে করে এলাম, সে তো ফেঁসে গেল। খালি হাতে ফেরার চেয়ে পাঁচটা টাকাও যদি আসে, খানিক তবু এগোল। তোমার নিজের কিছু নয়—কাঁকে কাঁকে আছ, দয়া করতে এসেছ, আমাদের দায় কেমন করে তুমি বুঝবে?

আগের কথার খেই ধরে বংশী আবার বলছে, পাঁচ টাকা না হয়ে পাঁচ সিকে হলেই বা, কে দেয়? এক-একটা দিন চলে যায় মাথায় যেন একটা করে মুগুরের ঘা দিয়ে। মাথার উপর দলধারা যদি না ঝুলত, হীরামাণিক মাঠে পড়ে থাকলেও বাক্স ফেলে ঘর থেকে বেরুতাম না। কী বলব সাহেব—কুটুম্বাড়ি গিয়েও এখন কাদুকে-কদুকে করি। চুল অজিরতে দিয়েছি দিয়েছে, সেটাও শরকেই বেলায়। একটা টাকার কোন না এক আনায় পয়সা উসুল হয়ে আসবে।

জলকলাই একটা ঘর জুটিয়ে দাও বাপো। তারপরে কে আর কাক-চিলের মতন ঠোক দিয়ে দিয়ে বেড়ায়! আর দশটা গৃহস্থের মতো আমরাও বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ব।

চোর-ডাকাত-ঠগীর ইষ্টদেবী কালিকা-ঠাকরুন নিজে নাকি অদর্শন থেকে ভক্তদলের কাজকর্মের চালনা করেন। কিন্তু আজকের ব্যাপারে দেবীর চাড় দেখা যাচ্ছে না. ঠান্ডা-ঠান্ডা রাত পেয়ে তিনিই বা ঘুমিয়ে পড়লেন।

আরও কয়েকটা জায়গায় নামল তারা ডিঙি থেকে। আশায় আশায় এগিয়ে যায়। এক উঠানে পা দিয়েছে কি, সাহেবের পিঠে যেন চাবুক পড়ে।

এসো, শিগগির বেরিয়ে এসো—। হাতের কাছে যাকে পেল, তাকেও টেনে বের করে আনে।

সকলে হকচকিয়ে গেছে। বংশী বলে, ভয় পেলে কেন সাহেব?

গৃহস্থ জেগে পড়লে টের পেতে মজা।

সে তো সব গৃহস্থ রে! কে কবে আমাদের ফুলচন্দন নিয়ে ডাকাডাকি করে?

সাহেব বলে, এরা তাই করত। আসতে আজ্ঞা হয় চোরমশায়রা। এসেই যখন পড়েছেন, দান করে যান কিছু।

কথা বড় মিছা নয়। বড়লোক কজন—দুনিয়াই তো এরা সব। দিনমানে দশের মাঝে অত বোঝা যায় না—বুঝতে দেয় না মানুষে, ঢেকেঢুকে সেরেসামলে বেড়ায়। রাত্রিবেলা আপন জনদের ভিতর খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ কথাবার্তা অসাবধান—নিরাবরণ। ঈশ্বরের খবর জানি নে, কিন্তু চোরের কাছে আসল অবস্থা চাপা থাকে না।

গাঙে-খালে অকারণ ঘুরে ঘুরে মন ভারী সকলের। সাহেবই কেবল হাসি-খুশি। তার কিছু খারাপ লাগছে না। এক সময় বলে উঠল, হারুন-অল-রশিদ ছিলেন বাগদাদের খলিফা। তাঁরই মতন হল। উজির-নাজির নিয়ে ছদ্মবেশে সারারাত ঘুরে প্রজাপাটকের খবর নিতেন। আমাদেরও তাই কিনা, বলো ভেবে। এই যত দেখছি, প্রজাপাটক আমাদের। দিনমানে ভিন্ন রাজা—রাত্তিরে নিশুত হলে মুলুক জুড়ে আমাদের রাজত্ব হয়ে যায়। যেখানে খুশি যাই—তাঁবোড় প্রজারা নিজের ইচ্ছের দেবে না তো রাজকর ইচ্ছে মতো নিজের হাতে তুলে নিয়ে আসি।

একটু চুপ করে থেকে বলে, যত প্রজা এই দেখে এলাম—নিতে পারা গেল না তো দিয়ে আসা উচিত। শুধুই নিলে রাজার রাজত্ব থাকে না, দিতেও হয়। ভাল ভাল খুশি [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।

এক রকমের গুটিখেলা—ঘাঁটি দিয়ে চিত-গুটিকে উপুড় আর উপুড়-গুটিকে চিত করা।

সাহেবের রূপরসে কারো কান নেই, নিজের ঝোঁকে সে বকবক করছে। আবার বিপদ, ক্ষিধে পেয়ে গেছে বিষম। ক্ষিধের দোষ নেই—জোয়ানপুরুষ, মরা নাড়ি কোনটার নয়। কোন দুপুরে চাট্টি মুখে দিয়ে বেরিয়েছে—এক মামুদ আলির বাড়ি হয়েই ফিরবার কথা, ক্ষিধে ঠেকাবার উপায় ভেবে আসেনি। এখন যত ভাবছে, পেটের মধ্যে তত দাউ দাউ করে ওঠে। ধোনাই মিস্ত্রি খাওয়ার গল্প করে : রাতের কাজে বেরিয়ে কাদের রান্নাঘরে ঢুকে এক খোরা পান্তা মেরে দিয়ে এসেছিল একবার। পান্তাভাত আর কাসুন্দি।

গুরুপদ চটে উঠল : সাহেব ঠিক বলেছে, সত্যি তুই ছোটজাত। নজর নিচু। সেই সেই রান্নাঘরে ঢুকলি, খেয়েও এলি। পান্তাভাত তবে কি জন্য খাবি, পোলোয়া-কালিয়া খেয়ে এলি নে কেন হতচ্ছাড়া?

ধোনাই অবাক হয়ে বলে, পোলোয়া-কালিয়া রেঁধে রাখে বুঝি— খেয়ে এসে তার গল্প করব?

সাহেব হাসতে লাগল : না খেয়েও গল্প হয় রে ধোনাই। পোলোয়া খায় তো বাবুভেয়েরা। মুখের গল্পে আমাদের সুখ।

গুরুপদও সাহেবের সুরে জোগান দেয় : সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আমার—সত্যি বই মিথ্যে মুখে আসে না! নজর ছোট, ঐ যা বললাম। গল্পের খাওয়া—তা-ও পান্তার উপর উঠতে পারে না।

বংশীও আসরে নামে। পোলাও না হোক,—পাঁচসাতখানা তরকারি এবং পিঠে-পায়সে চতুর্দিকে সাজানো বাড়া-ভাত সে খেয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি খেয়েছে, বানানো কথা নয়।

শিবাপুজো বলে আছে এক ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলা বনের ধারে গলবস্ত্র হয়ে শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। তার পরে থালায় ভাত বেড়ে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন সাজিয়ে কোন ফাঁকা জায়গায় রেখে গৃহস্থ শুয়ে পড়ে। বনের শিয়াল চুপিসারে এসে খেয়ে যায়। পুঁথিপত্রে চোর-পুজোর এমনি কোন বিধান থাকত যদি! না থাকুক, বংশীই শিয়াল হয়ে সেবার শিবাভোগ খেয়ে এসেছিল।

গাঙ ছেড়ে ডিঙি খালে ঢুকে পড়েছে। সরু জলপথ—এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর বোধন-তলার নিচে দিয়ে। গলা ছেড়ে দিয়ে মানুষ এপারে ওপারে দিব্যি গল্পগুজব করতে পারে। চুপ, একটি কথা নয়! বোঠে খুব নরম হাতে ধরো এবার—

(ক্রমশ)

Lacto Calamine

এখানে সবাই মনে করছেন শীত কেটে গ্রীষ্ম পড়লেই দূরে আকাশে আরেকটা কিছু আশ্চর্য কাণ্ড সোভিয়েতেরা ঘটাবেন। কেউ কেউ বলছেন এবার উড়বেন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী। শোনা যাচ্ছে এদেশের এক কসমেটিকস কারখানা সেই অপরিচিতার উদ্দেশে নানা প্রসাধন সামগ্রী পাঠিয়েছেন যা তাঁর মহাকাশে নিশ্চয় প্রয়োজন হবে। অনেকে ঠাট্টা করে বলছেন, ইঞ্জিনীয়াররা নাকি ঐ মহাকাশচারিণীর জন্য আরো বড় আকারের স্পুৎনিক বানাচ্ছেন কারণ রুশ প্রবাদে বলে মেয়েমানুষকে স্বর্গে পাঠাও—সে তার পোষাকও সঙ্গে নিয়ে যাবে।" শেষ মানে এখনে অবশ্য স্বামী নয়। আসল কথা হল প্লাইডল লাইট কথাটা মেয়েদের জন্য নয়। সম্প্রতি একটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী বই বেরিয়ে এসেছে। নাম তার 'মহাকাশ-যাত্রীরা।' বইটির লেখক পেত্রভ হলেন মহাকাশযাত্রীদের পরিচালক। মহাকাশ-যাত্রীদের চরিত্র, জীবনযাত্রা এবং তাদের কাজের সজীব চিত্তাকর্ষক ছবি পেত্রভ এঁকেছেন। শুধু মহাকাশযাত্রীদের কেন আরো অনেকেরই। যেমন সেই চাষী মহিলাটির। মহাকাশে ওড়ার আগের রাতটা মহাকাশযাত্রীরা কাটান কসমোড্রোমের কাছে যার ছোট্ট বাড়িটায়। বাড়িটি কিছুকালের জন্য তাঁর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছে। পেত্রভ বলছেন গাগারিনের যাত্রা-দিনের ভোর বেলাকার কথা। দুবছর আগের এরকমই এক এপ্রিল মাস। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাড়িটিতে এলেন তার প্রকৃত মালিক কাতুদিয়া আকিমভূনা—বার্ধক্যের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি। হাতে তাঁর সদ্যফোটা ছোট্ট টিউলিপের তোড়া। দাওয়ায় বসে তিনি অপেক্ষা করছেন কখন ঘুম ভাঙে গাগারিনের। তার বাড়ির ভাড়াটেদের পরিচয় তাঁর অজানা নয়। মহিলা ধীরে ধীরে আলাপ শুরু করেন লেখকের সঙ্গে। ভাবী মানুষ উড়োজাহাজ পেত্রভেও সে রাতে ঘুম [illegible] না।

[illegible] —'আমার ছেলেও [illegible] উড়োজাহাজ চালাত। ঐ ইউরোচ্কার মতোই। এমন কি ওর সঙ্গে চেহারারও মিল আছে। ওরকমই বেরিয়ে আসা কপাল, থ্যাবড়া নাক। ছেলে আমার যুদ্ধে মারা গেছে। কিন্তু, দেখ বাপু, ওকথা যেন আবার ইউরোকে বল না। ওকে ভয় পাইয়ে দিও না। কী বিরাট কাজে ও চলেছে। এতটুকু ভয়েও ওর ক্ষতি হতে পারে।" সকাল সাতটায় পেত্রভ গাগারিন আর তাঁর বদলী তিতোভকে জাগিয়ে দিয়ে সেই মহিলার টিউলিপের তোড়াটি দেন। গাগারিন সেটিকে রেখে দেন ফুলদানিতে। আর মহিলাকে বলেন, "চমৎকার ফুল। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, মনে করে এনেছেন বলে। ফুল এমনিতেই আমাদের প্রিয়, আজ তো বিশেষ করেই।"

প্রথম মহাকাশযাত্রী ইউরি গাগারিন

যাত্রার জন্য ঘর ছেড়ে বেরবার সময় গাগারিন ঐ ফুলের তোড়াটিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আদর করেছিলেন। লেখক বলছেন, তার ধারে পর গাগারিন অনেক ফুলই পেয়েছেন। কিন্তু ঐ তোড়াটি হল—মহাকাশযুগের প্রথম তোড়া।

পেত্রভের বইয়ের আরেকটি চরিত্রও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। যদিও বিশেষ কারণে লেখক তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেননি। ইনি হলেন সেই বহুসাধন পুরুষ, সব রকেট আর স্পুৎনিক নির্মাণের প্রধান কর্তা। বইটিতে তিনি সর্বদাই কেবল প্রধান নির্মাতা বলে অভিহিত হয়েছেন। তবে নাম না করলেও তাঁর চেহারা ও চরিত্রের একটা আভাস পাওয়া যায়। বইটি পড়ে আমার মনে হচ্ছে এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর চেহারা অনেকটা এই রকমের। লম্বা, শক্তসবল চেহারা, মাথায় একরাশ বড় বড় উস্কো-খুস্কো চুল, মুখটা লম্বা কিন্তু ভারী নয়, [illegible] ও [illegible] চোখ দুটি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ নাক। বয়স্ক এই লোকটির আবার আচার-ব্যবহার খুবই সহজ সরল সাধারণ। সবার সঙ্গেই আপনার হতে পারেন তিনি। ধীর স্থির। কথা বলার চেয়ে শুনতে বেশি ভালবাসেন। কিন্তু যে কোনো রুশের মতোই হাসিখুশী সহৃদয়। কাজের বেলায় অত্যন্ত কড়া। আর তাঁর নিজের কথানুযায়ী "গান গাইতে পারি না কিন্তু শুনতে ভালবাসি।"

প্রধান নির্মাতা যে গানের প্রতি তাঁর প্রীতির কথা জানিয়েছিলেন তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন পপোভিচকে মহাকাশযাত্রীদের এক জলসায় পপোভিচ তাঁকে নিমন্ত্রণ জানাতে। পেত্রভের বইয়ের একটি পুরো পরিচ্ছেদের বিষয় হল মহাকাশযাত্রীদের গড়ে তোলায় গানের প্রয়োজনীয়তা। লেখক বলছেন, মহাকাশ-যাত্রীদের কাজটা কষ্টকর। এবং সঙ্কট-জনকও। শুধু যাত্রাই নয়, তার দীর্ঘ প্রস্তুতিও। মহাকাশযাত্রীরা যে এসব কিছু করেন প্রফুল্ল চিত্তে এবং লক্ষ্য লাভে সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে তার কারণ গান। এছাড়াও গান তাঁদের করেছে একাত্ম, ঘনিষ্ঠ। মহাকাশ-যাত্রীদের প্রায় সবাই অন্তত দলে গলা দেবার মতো গান গাইতে পারেন। পেত্রভের মতে সংগীত মহাকাশযাত্রীদের জীবনের গভীরে স্থান করে নিয়েছে। মস্কোর নিকটবর্তী মহাকাশযাত্রীদের শহরটি ছেড়ে তাঁরা যখন অন্যত্র কাজে যান তখন তাঁদের অবশ্য সঙ্গী হয় টেপ রেকর্ডার। একবার গাগারিন নিজের গান লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাঁর গানের খুবই প্রশংসা করেন অন্যেরা। গাগারিন বলেন, "ভাল কিছু হয়নি। তবে দরদ দিয়ে গেয়েছি, সেটা ঠিক।" অন্য মহাকাশযাত্রীরাও গাগারিনের নিদর্শন মতো বহু গান রেকর্ড করেন। রাত হয়ে যায়। তখন নিকোলায়েভ হঠাৎ বলে ওঠেন, "এক সঙ্গে গান গাওয়াই হল, সবাই এক দল হয়ে ওঠার সূচনা।" অন্যেরা তাঁর কথা শুধরে বলেন, "শুধু দল নয়, মহাকাশযাত্রী-দল।" পেত্রভ মহাকাশযাত্রীদের সাংগীতিক রুচিরও নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর সাক্ষ্য অনুযায়ী গাগারিনের ভালো লাগে লিরিকাল গান। তিতোভের প্রিয় চাইকভ্‌স্কি আর স্ক্রিয়াবিনের রচনা। পপোভিচ উক্রেনীয় গানের অনুরাগী এবং প্রচারক। নিকোলায়েভ অনুরাগী ভল্গা-অঞ্চলের গানের। রুশ লোকসংগীত অবশ্য সবারই প্রিয়।

"মহাকাশযাত্রীদের কি অনেক কিছুর প্রয়োজন?" এই প্রশ্নের উত্তরে পেত্রভ মহাকাশযাত্রীদের বইয়ের তাকের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাস, ধাতুবিদ্যা, চারুশিল্প, ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা শাস্ত্র, রকেটবিদ্যা, আবহতত্ত্ব, খেলাধুলা, কবিতা, জ্যোতি-র্বিদ্যা, গণিত, মনোবিদ্যা, সাহিত্য, যন্ত্র-নির্মাণ, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বহু বিষয়ের বই তাতে আছে। এক আত্মীয় [illegible]

করেন, "মাকারেংকো, রেপিন, পাস্তনভ, স্তানিস্লাভস্কি......এ'দের বইয়ের সঙ্গে মহাকাশের কী সম্পর্ক?" তার উত্তরে মহাকাশযাত্রীদলের একজন ইয়েভ্গেনি আলেক্সেয়েভিচ বলেন, একবার রকেট নির্মাণের এক কর্মী কথায় কথায় পিকাসোর ছবির বিষয়ে তাঁর মত জিজ্ঞেস করাতে ইয়েভ্গেনিকে আমতা আমতা করতে হয়। কারণ ও বিষয়ে তাঁর বিশেষ কিছু জানা ছিল না। তার পর থেকে শুধু ইয়েভ্গেনি নন তাঁর সঙ্গীরাও বোঝেন যে মহাকাশযাত্রীদের সবাই সব বিষয়েই যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করেন। এবং তাঁরা সে ধরনের উপযুক্ত হবার চেষ্টা করতে থাকেন।

কিন্তু শুধু পড়াশুনো আর সংগীত বা ছবির প্রতি আগ্রহই কি সব? এসবের সঙ্গে প্রয়োজন আরো কিছুর। বিশেষ করে মনের প্রফুল্লতা। হাসি। হাসতে পারাটা অবশ্য এদেশের লোকের সহজাত প্রকৃতিদত্ত গুণ। কিন্তু কঠোর কষ্টকর ট্রেনিং-এর সময় সে গুণটি বজায় রাখা কঠিন। মহাকাশযাত্রীরা সে পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হয়েছেন। মহাকাশযাত্রীদের ট্রেনিং-এর একটি অত্যন্ত কষ্টকর অংশ হল সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্রে তালিম নেওয়া। এতে অতি জোর সহ্য করাটা অভ্যাস হয়ে যায়। ব্যাপারটা এতই ভয়াবহ যে প্রথমবার সেণ্ট্রিফিউগে ওঠার জন্য মহাকাশযাত্রীরা কেউই বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তাদের একজন ইভান বলেন, "আচ্ছা, আমিই উঠব।" কিন্তু তাঁর গলায় তেমন আশা ও উৎসাহের আভাস ছিল না। অবশ্য সেণ্ট্রিফিউগের চেয়ারে একবার বসার পর ইভানের সব দ্বিধা কেটে যায়। যতবারই চাপ বাড়ানর প্রস্তাব জানান হয় ততবারই তিনি বিনা দ্বিধায় রাজী হয়ে যান। তৃতীয় দফার চাপ ছিল খুবই বেশি। তাতে ইভানের সত্তর কিলোগ্রাম ওজন সাতশ কিলোগ্রামে দাঁড়ায়। এর চেয়েও বেশি হয়। রক্ত ভারী হয়ে ওঠে। মনে হয় সারা শরীরে যেন সীসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে আর পৃথিবীটা ডুবে গেছে সমুদ্রের তলে। সেণ্ট্রিফিউগ থেকে নামলে পর তাঁর সঙ্গীরা যখন তাঁকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করতে থাকেন ইভান তখন একগাল হেসে এক কথায় উত্তর দেন, "সহনযোগ্য।"

গাগারিন সেণ্ট্রিফিউগে প্রথমবার উঠে ঐ ভয়ানক অবস্থায় তাঁর চিকিৎসক-মহিলার দিকে চোখ টিপে হেসে উঠেছিলেন। পর্দায় তাঁর সেই চপলতা দেখে চিকিৎসক-মহিলা ধমকে বলেছিলেন, "শান্ত হয়ে বসুন।" গাগারিন তখনকার মতো গম্ভীর হয়ে যান কিন্তু সেণ্ট্রিফিউগ থেকে নেমে এসে বলেন, "কী কড়ারে বাবা, একটু ঠাট্টা করারও জো নেই।" চিকিৎসক তখন কড়া গলায় জানান, "গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় ওসব উচিত নয়।" গাগারিন বলেন, "কিন্তু তা যদি না মানি?" "তবে নির্ধারিত ট্রেনিং থেকে আপনাকে বাদ দিতে হবে। এরকম কাজের সময় কোনো চপলতা চলবে না" মহিলা বলেন। গাগারিন তখন হেসে বলে উঠেছিলেন, "কী করব—আমি যে সব সময় ওরকম।" এরপর মহিলা আর রাগ করে থাকতে পারেন নি।

গাগারিনের যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে কী হয়েছিল? পেত্রভ বলছেন, "সারাটা সকাল চেয়েছি গাগারিনকে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু বলতে......কোন দরকারী উপদেশ।" কিন্তু উপদেশের বদলে পেত্রভ বলে চলেন মজার মজার গল্প। গাগারিন নিজের তরফ থেকে আরো চুটকি গল্পের জোগান দেন। এমন সময় আসেন সেই রহস্যময় পুরুষ প্রধান নির্মাতা। পেত্রভ বলছেন, "দেখলাম তিনিও কিছু একটা বলতে চান, কিন্তু তা না করে তিনিও যোগ দিলেন হাসিঠাট্টায়।" গাগারিনের সেদিন সবকিছুতেই আনন্দ। যা দেখেন তাতেই—সূর্যোদয়, কাজের নিয়মাবলী, খেলার পোশাক, স্পেস স্যুট, হাসি ঠাট্টা, সংগীত... লেখকের ভাষায়—তিনি যেন আলো ছড়িয়ে চলেছেন। টেপরেকর্ডারে বাজছে মিঠে নরম সুরের সংগীত। সবাইকে তা খুশী রেখেছে। তা দেখে বিজ্ঞানীদের একজন
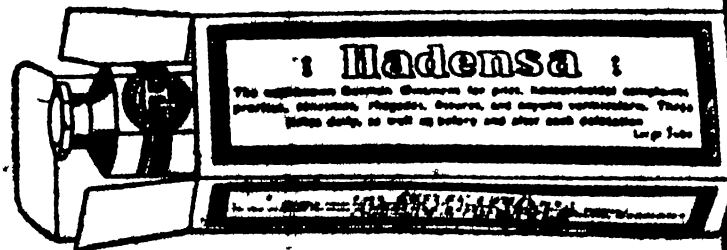
বলেছিলেন, "সত্যিও দেখছি আপনাদের সেবায় রত।"

যাত্রারম্ভের আগের একটি মুহূর্তে কিন্তু গাগারিনের মনে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা দেয়। রকেটের কর্মীদের একজন তাঁর বাবার মুখে হঠাৎ বলে ওঠেন, "ইউরি আলেক্সেয়েভিচ, এই বইটায় একটা সই করে দিন আপনার স্মৃতি হয়ে থাকবে সেটা।" উপস্থিত সবার কানে কথাটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর শোনায়। যেন গাগারিনের সঙ্গে আর দেখা হবে না। গাগারিনের মুখে মুহূর্তের জন্য ফুটে ওঠে দ্বিধা। জীবনে সেই প্রথম গাগারিনের মতো সপ্রতিভ লোকের মুখে জবাব জোগায় না। একটু পরে চাপা গলায় তিনি বলেন, "তার কি কোনো দরকার আছে?" গ্রন্থকার পেস্তভ তখন বলে ওঠেন, "কিচ্ছু না, তবু সই করে দাও। এখন থেকে অভ্যাস করা ভাল। এর পর তো তোমায় বহু লক্ষ অটোগ্রাফ দিতে হবে। এটাই হোক তাদের প্রথমটা।" গাগারিনও তাঁর হাসির আলো জেলে সই করে দেন একজনের একটা বইয়ে আরেকজনের ছোটর ছবিতে। তখনো গাগারিনের ছবির কার্ড বেরয়নি।

মহাকাশযাত্রীরা তাঁদের শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য অনেক কিছুই করে থাকেন। ব্যায়াম দৌড় ভলিবল, বাস্কেট বল ব্যাডমিন্টন ডাইভিং শাটিং স্কেটিং প্যারাসুট ঝাঁপ প্রভৃতির সঙ্গে পরস্পরের সমালোচনাটাকেও তাঁরা প্রথম দিন থেকে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছেন। এই সব সমালোচনা সভায় শিক্ষক পরিচালক থেকে মহাকাশযাত্রী– সবার দোষই আলোচিত হয়। কী ধরনের সমালোচনা হয়? মহাকাশযাত্রীদের একজন আলেক্সেই ছবি আঁকিয়ে। শিল্পের টানে কর্তব্য কাজের অবহেলা করায় তিনি নিন্দিত হন। গাগারিনের বিষয়ে পপোভিচ একবার বলেন 'কাল শিক্ষক যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন গাগারিন তখন থেকে থেকেই তার বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে গল্প করছিল ... এর পর হয়ত ক্লাসে 'নোটবুক' খেলাই শুরু হয়ে যাবে।" তিতোভও বাদ যান না। তাঁর দোষ দৌড়ের ট্রেনিংটাকে তিনি অবান্তর মনে করতেন এবং তাতে কোনো উৎসাহ দেখাতেন না।

এদেশের সব প্রতিষ্ঠানেরই একটি অবশ্য অঙ্গ হল দেয়ালপত্র। তাতে থাকে গল্প, কবিতা, সমালোচনা ও ব্যঙ্গচিত্র। মহাকাশযাত্রীদের কর্মস্থলে এই দেয়ালপত্রের উদ্ভব হয় এই ভাবে। বিলিয়ার্ডের ঘরে হঠাৎ দেখা গেল একটা বড় সাদা কাগজে নকল তৌলিয়াতে আঁকা। সেটা এসেছে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর নামে। "নেপচুন আর তার প্রতিবেশীরা তোমাদের কর্মীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, সেই সঙ্গে এই কামনা—এলক্ট্রোনিক্স বা [illegible] পর্যন্ত যেন পৌঁছে [illegible]

যাত্রীদের সই। দেয়ালপত্রের শিল্পী এবং পরিকল্পক হলেন আলেক্সেই আর্খিপভিচ। আলেক্সেইয়ের তুলি ও কলম মহাকাশযাত্রীদের ট্রেনিং পর্বের বহু ঘটনা ধরে রেখেছে। তেড়ে আসা বিরাট এক ডাক্তারী সিরিঞ্জ দেখে ভয়ে পালাচ্ছেন একজন মহাকাশযাত্রী। কেউ বা মূর্ছা যাচ্ছেন সেন্ট্রিফিউগের কল্পনায়। এই দেয়ালপত্রের নাম হল "নেপচুনের কণ্ঠস্বর।" আর তার প্রতিটিতেই থাকে কল্পী চেহারার এক বুড়ো, হাতে ত্রিশূল, মুখে ঝাঁকড়া ঘন দাড়ি। সমালোচনায় নির্দয়, প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ। গাগারিনের যাত্রার পর সাগরদেবতা গাগারিনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাঁরই সমকক্ষ হিসেবে এমন কি মর্ত্য সন্তানের কীর্তির সামনে একটু নত হয়েই। নেপচুনের হাতে ছিল রুশরীতিতে সাদর আতিথ্যের চিহ্ন রুটি ও নুনের পাত্র। কেউ সিগারেট না খাওয়ার প্রতিশ্রুতি ভেঙেছেন, কেউ বৃষ্টি পড়ছে বলে বাইরে দৌড়তে যাচ্ছেন না প্যারাসুট ঝাঁপের পর তিতোভ বিচ্ছেতেই আর মাটিতে চক্কর থামাতে পারছেন না বনে বেড়াতে গিয়ে মহাকাশযাত্রীরা আগুনের চারপাশে রাত কাটাচ্ছেন বহু ঘটনা, বহু ছবি। এরকম একটি ছবির নাম হল "সশ্রম কারাদণ্ড"। ছাদখোলা মোটর গাড়িতে একজন লোক, ঝাঁকড়া দাড়ির ফাঁকে কেবল চোখটুকু দেখা যায়। তার পাশেই সাদা জোব্বা পরা এক ডাক্তার। রাস্তার একটি মেয়ে। মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে "কয়েদী বুঝি?" আসলে লোকটি হলেন তিতোভ। নিঃসঙ্গ কক্ষ থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

মহাকাশযাত্রীদের অনেক কিছুই খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ ও সম্পূর্ণ শব্দহীন কক্ষে দীর্ঘকাল কাটান বিশেষ কষ্টকর। এতে প্রয়োজন অত্যন্ত দৃঢ় মন ও স্নায়ুশক্তি। বিশেষ করে যখন ঐ শব্দহীনতা আর শান্ত পরিবেশে হঠাৎ চোখ ঝলসে প্রচণ্ডবেগে একসঙ্গে চমকে ওঠে নানা রঙের তীব্র আলো, বেজে ওঠে প্রবল কর্কশ সাইরেন। এই কক্ষে প্রথম ঢুকতেও সাহসী মহাকাশযাত্রীদের মনে দ্বিধা দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন ভালেরি। কক্ষে ঢোকার সময় তাঁর হাতে ছিল একটা মাঝারি আকারের বাক্স। তাতে ছিল কতগুলো বই, যন্ত্রপাতি, কাগজ পেন্সিল ইত্যাদি। ঘরের তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, নানা কলকব্জার প্রতি নজর রাখার কাজ ভালেরি ঠিকভাবেই করে যান। একবার কলকব্জার কী একটা খারাপ হয়ে যেতে তিনি নিজেই তাঁর বাক্স থেকে সারাই যন্ত্র বের করে তা ঠিক করেন। একটি ফিল্মে দেখেছি পপোভিচ এই অবস্থায় বই পড়ছেন। হঠাৎ তীব্র আলো আর কর্কশ সাইরেন। পপোভিচ বই থেকে মুখ সরিয়ে হেসে উঠলেন। [illegible] [illegible] অবস্থায় একটি

খাতার পেন্সিল দিয়ে কী যেন লিখছিলেন। হঠাৎ অমন আলো আর শব্দের ঝড় উঠতে তিনি পেন্সিল তুলে শান্তভাবে সামনে চেয়ে অপেক্ষা করে রইলেন কখন তা থামে। শব্দ আর আলোর শক্ থামলে পর সমান শান্ত নিকোলায়েভ আবার লিখতে শুরু করেন। গাগারিন এই নিঃসঙ্গ কক্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন নানা বইয়ের সঙ্গে কয়েকটা হাসির বই। সৈনাবরা আড়াল থেকে দেখেছেন, তিনি প্রায়ই সে বইগুলোর নায়ক আর লেখকদের নানারকম সব প্রশ্ন করছেন আর হেসে নিজেই তার উত্তর দিচ্ছেন।

প্রথম মহাকাশযাত্রার জন্য গাগারিনকেই কেন বেছে নেওয়া হল তার উত্তরও পেত্রভ দিয়েছেন। পেত্রভের মতে মহাকাশযাত্রীদের যে কেউই একাজ করতে পারতেন। কিন্তু তবু প্রথম যাত্রার জন্য প্রয়োজন প্রথম আবিষ্কারকের গুণসম্পন্ন এক আদর্শ ব্যক্তি। পরে যাঁর সঙ্গে অন্য সবার তুলনা করা হবে। গাগারিনের এই গুনগুলোর প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়—গভীর দেশপ্রেম, যাত্রার সাফল্যে স্থির বিশ্বাস, চমৎকার স্বাস্থ্য, অসীম আশাবাদ, তীক্ষ্ম বুদ্ধি, জানার আগ্রহ, সাহস, দৃঢ়তা, নিখুঁত কাজ, শ্রমপ্রিয়তা, সহ্যশক্তি, সরলতা, বিনয়, অপরিসীম মানবিক সহৃদয়তা, চারপাশের সবার প্রতি মনোযোগ।

রাষ্ট্রীয় কমিশন ঠিক করেন মহাকাশে প্রথম যাবেন গাগারিন আর তাঁর বদলী হবেন তিতোভ। সে কথা তাঁদের জানানর সময় পেত্রভও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গাগারিনের দিকে তখন বহুলোকের দৃষ্টি। গাগারিন প্রথমটা যেন কথাটা বুঝতেই পারেন নি। এক সেকেন্ড পরেই তাঁর মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। তিনি হাঁ করে ঢোক গিলে নিঃশ্বাস টেনে নেন। কেঁপে ওঠে তাঁর চোখের পাতাগুলো। কিন্তু সেই বিহ্বলতায় তিনি একটুও লজ্জিত হন নি। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে গাগারিন শান্তভাবে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "এই বিরাট আস্থার জন্য ধন্যবাদ। কর্তব্যপূরণ করব।" গাগারিনের পর তিতোভও ধন্যবাদ জানালেন তাঁকে প্রথম মহাকাশযাত্রীর বদলী নির্বাচন করার জন্য। পেত্রভের মতে অন্যদের মতো তিতোভও প্রথম যাত্রায় যেতে পারতেন এবং তিনি তা খুবই চেয়েছিলেন। এখন কিন্তু তিনি আনন্দের উল্লাসে গাগারিনের পিঠ চাপড়ে ঠাট্টা করে বললেন, "ইউরি, প্রথম যাত্রাটা তোমার বদলীকেই দাওনা কেন!" গাগারিনের নির্বাচনে অন্য মহাকাশযাত্রীরা কী মনে করেছিলেন? লেখকের ভাষায় "তরুণ বৈমানিকেরা মহাকাশযাত্রী হয়েছেন বলেই যে তাঁদের মনের সব রকম মানুষী দুর্বলতা দূর হয়েছে তা নয়। তাঁদের অনেকেই মনে মনে আশা করেছিলেন তিনিই প্রথম উড়বেন। এখন কি তাঁদের খারাপ লাগবে না, কেউ কি ঈর্ষা বোধ করবেন না?" অন্য মহাকাশযাত্রীরা তখন রাষ্ট্রীয় কমিশন দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে। নির্বাচনের কথা জেনেই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন গাগারিনের ওপর। কেউ তাঁকে চেপে ধরলেন, কেউ তাঁর চুল টানলেন, কেউ বা তাঁকে দিলেন আপেল আর টফি—"কী জানি যদি মহাকাশে দরকার হয়।" প্রত্যেকের চোখেই আনন্দ। এমন কি গ্রিগরিও যদিও তাঁকে সবাই অত্যন্ত আত্মপর বলে জানে। ডেরায় ফেরার পথে মহাকাশযাত্রীদের বাসে গাগারিনকে নিয়ে বেশি কথাবার্তা হল না। তাঁকে তখন চুপ করে শান্তিতে থাকতে দেওয়া চাই। ভাববার অবকাশ দিতে হবে। কিন্তু গাগারিন চুপ করে থাকার পাত্র নন। তাঁর তখন কী একটা মজার কথা মনে পড়েছে এবং সেই মুহূর্তেই সেটা সবাইকে শোনান চাই। সে কথা শুনে মহাকাশযাত্রীরা সবাই আনন্দের অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। পেত্রভ বলছেন, 'সে সময় কেউ যদি তফাত থেকে আমাদের দেখত তবে ভাবত—এ এক মস্ত আমুদে দল। বিশ্বাস করা কঠিন হত যে এঁদেরই একজন প্রথম মহাকাশযাত্রী, আগামীকালই তাঁকে তাবার পথ আবিষ্কার করতে হবে।" তিতোভ ওড়ার আগে তাঁর বদলী নিকোলায়েভের সঙ্গে তাঁদের স্পেসহেলমেটটা মদের গ্লাসের মতো ঠেকিয়ে নেন। তখন থেকে এটা মহাকাশযাত্রীদের রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে।

অনেকে বলেন মহাকাশযাত্রীদের নিয়ে মাতামাতির কোনো মানে হয় না, তাঁদের কৃতিত্ব বেশি কিছু নয়। প্রধান কৃতিত্ব যে ঐ রহস্যময় পুরুষ প্রধান নির্মাতা আর তাঁর সহকর্মীদের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মহাকাশযাত্রীদের অসীম ধৈর্য ধরে অত্যন্ত কষ্ট সয়ে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয়। এমন কি জীবন বিপন্ন করেও। তাঁদের প্রশংসা যে অকারণ নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় পেত্রভের বইটিতে।

পেত্রভ তাঁর বইয়ে ভাবী মহাকাশযাত্রীদের নামও দিয়েছেন তবে অংশত। তাঁরা হলেন ইয়েভগেনি অলেক্সেয়েভিচ, ইভান, বরিস, গ্রিগরি, ভ্যালেন্তিন, ভ্যালেরি ভ্যাদিমির, দমিত্রি, আলেক্সেই আর্কিপভিচ। কিন্তু এমন নামের লক্ষ লক্ষ লোক এদেশে পাওয়া যাবে। বইটি রচিত নিকোলায়েভ আর পপোভিচের যাত্রার আগে। এ বইয়ে তাঁরাও অভিহিত হয়েছেন শুধু আন্দ্রিয়ান আর পাভেল নামে।

॥ ৫ ॥

পিতাপুত্রী

তুলসীর মনে পড়ে। মনে পড়ে পিতার সঙ্গে অনেকদিন পরে প্রথম সাক্ষাৎ। দেখা হবে আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। এমন সময়ে পল্টনের পিছু পিছু সুখানন্দ পণ্ডিত ঢুকে সম্মুখে তুলসীকে দেখে, তুলসী মা, তুলসী মা বলে বুকে জড়িয়ে ধরলো তাকে। তুলসী পিতার বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে নীরবে কাঁদতে লাগলো। সুখানন্দর চোখের জল পড়ছে তুলসীর মাথায়, তুলসীর চোখের জল পড়ছে সুখানন্দর গায়ে। এমনি ভাবে চোখের জলে গলে গিয়ে হাল্কা হ'য়ে এল দুঃসহ দুঃখ, এতদিনের দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ। কিছুক্ষণ পরে সম্বিত হলে তুলসী দেখলো ঘরে আর কেউ নেই, বেশ একটু স্বস্তি অনুভব করলো। রুমালীর ইঙ্গিতে সকলে অন্য ঘরে গিয়েছিল।

তুলসী বলল, বাবা ব'সো।

পাশাপাশি দু'জনে বসলো তক্তাপোশের উপরে। দু'জনেরই মনের মধ্যে অনেক কথা। দু'জনেই ভাবে তবে মুখে আসে না কেন? চোখের জল চোখ থেকে গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো সে কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে আছে। কথা যদি বা ফোটে তখন আর এক সমস্যা কোথা থেকে আরম্ভ করবে। এতদিনের কত অকথিত বক্তব্য। সকলেই প্রথমে বের হওয়ার উমেদার।

চোখের জলে কণ্ঠ আচ্ছন্ন হলেও চোখে তখন হাসি ফুটেছে, বৃষ্টির জলে মাটি সিক্ত, কিন্তু আকাশ প্রসন্ন। ক্রমে দু'একটা ক'রে কুশল প্রশ্ন আর উত্তর আরম্ভ হ'ল, দুর্যোগের রাত্রির অবসানে পাখির কুণ্ঠিত কাকলি।

বাবা ছুতি বুড়ী কেমন আছে?

সে কি আর আছে মা? কোন রকমে প্রাণে বেঁচে আছে। এই এক মাসে বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে।

ওর বয়স কত হ'ল বাবা?

কে হিসাব রাখে বল। কখনো বলে চার কুড়ি, কখনো বলে আড়াই কুড়ি। আমাকে একবার বলেছিল সাড়ে চার কুড়ি।

বুঝলি মা, ছুতি বুড়ি কুড়ির বেশি জানে না। তার উপরে কখনো সাড়ে চার, আড়াই, তিন বসিয়ে যাচ্ছে যেমন খুশি।

আর কাহাইয়া কেমন আছে বাবা?

আরে বাসরে! সে তো সব শুনে-তখনি লাঠি নিয়ে বের হয় আর কি, বলে সব শালা সিপাহীর শির ভাঙবে। আমি আর নয়ন থামাতে পারিনে।

বাবা, দাদা কি বলল শুনে?

আগে তো শুধু খানিকটা লাফালো স্বরূপ এসে তোকে নিয়ে গিয়েছে শুনে। তার পরে যখন শুনলো যে গালিব সাহেবের বাড়ি থেকে তোকে নিয়ে গিয়েছে সিপাহীরা, তখন থ মেরে গেল।

গালিব সাহেব আর আমি বললাম, বাবা, এদের দলেই শেষে যোগ দিলে! বেটা ভাঙবে তবু মচকাবে না। বলে কিনা, আমার বহিন বলে চিনতে পারলে নিয়ে যেত না, বলে কিনা সব নিষেধ করা আছে।

তার পরে কপালে হাত ঠেকিয়ে সুখানন্দ বলে, কে কার নিষেধ শুনছে—যে কাণ্ড চলছে শহরে।

আর স্বরূপদাদার কি খবর?

গালিব সাহেবের বাড়িতে এসে যখন শুনলো যে তোকে সিপাহীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে তখন গুম হ'য়ে ব'সে থাকলো খানিকক্ষণ, তারপরে সেই যে বের হ'য়ে গেল আর তার খবর পাইনি।

সাগ্রহে তুলসী শুধায়, তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল?

নারে, আমার কাছে আসবে কোন্ মুখে? এ কথা শুনেছি গালিব সাহেবের কাছে।

বাদশার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা হয় নি।

না হয়েছে ভালই। তাহলে নিশ্চয় একটা শুদ্ধোধনি কাণ্ড হ'য়ে যেতো।

তোমরাও খোঁজ করলে না স্বরূপদাদার। তার যে কেউ নেই, বাবা।

খোঁজ করেছিলাম বইকি। দেখলাম তার বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, শুনলাম সে নাকি কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ জানে না।

সুখানন্দ বলে, দিল্লী ছেড়ে যদি চলে গিয়ে থাকে ভালই করেছে। দিল্লীতে যে কাণ্ড চলছে।

তুলসী বলে, দিল্লীর বাইরেও এমনি কাণ্ড চলছে বলে শুনতে পাই।

তবু এদিক ওদিক স'রে থাকবার জায়গা আছে, দুনিয়াটা তো ছোট নয়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে দিয়ে তুলসী শুধায়, তার পরে কি হ'ল বলো।

তোকে হারিয়ে ভাবলাম এখানেই জীবনের শেষ, তারপরে বলে আর কিছু নেই। এমন সময়ে খবর পাওয়া গেল বাদশা দরবারে বসবেন। গালিব বলল, পণ্ডিতজী চলো, বাদশাকে কথাটা জানিয়ে আসা যাক। আমি বললাম, মীর্জা সাহেব, বাদশা তো আর তুলসীকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন

মাই, তিনি কি জানবেন, তিনি কি করবেন?

গালিব বলে, তবু তাঁর কাছে খবরটা পেশ ক'রে রাখা ভালো, বাদশা হচ্ছেন দীন দুনিয়ার মালিক।

তারপরে একে একে ধীরে ধীরে সব ঘটনা বিবৃত ক'রে অবশেষে মন্তব্য করে, তোকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে শাহী তাঞ্জাম রওনা হ'য়ে গেল দেখে দু'জনে—গালিব সাহেব আর আমি বাড়ি ফিরে এলাম, আমাদের আনন্দ আর ধরে না। এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো নয়ন। আমাদের হাসি মুখ দেখে আশ্চর্য হ'য়ে শুধালো, ব্যাপার কি? আমি উত্তর দেওয়ার আগেই গালিব সাহেব একটা বয়েৎ আওড়ালে, বলল, আকাশের তারা মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়লেও তারা ছাড়া আর কিছু নয়। বলল, দেখো, নয়নচাঁদ, বাদশার আজ দুনিয়া নেই কিন্তু দিল তেমনি আছে। তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন তুলসী মাইকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে।

বুঝলি মা, শুনে তোমার গুণধর ভাই কি বলে জানিস, পাঠাবে না? ওরাই ধরে নিয়ে গিয়েছিল এখন হজম করতে না পেরে দিল্ দেখাচ্ছেন!

হজম না করতে পারবার কি কারণ বাপু!

শুনবে! তবে শোন। তোমরা ভাবছ, তোমাদের আরজিতে তুলসীর মুক্তির হুকুম দিয়েছেন?

তবে আর কিসে?

বাদশা আর শাহজাদারা বুঝতে পেরেছে যে, তুলসী সিপাহীপক্ষের মেয়ে।

আমরা বলি, সিপাহীপক্ষ আর বাদশাপক্ষ কি আলাদা?

তোমরা কিছুই খোঁজ রাখো না, বলে নয়ন, বলে, বাদশা আর শাহজাদারা এখন সিপাহীদের হাতের পুতুল, সিপাহীদের হাতে বন্দী।

ছিঃ ছিঃ এমন কথা বললেও গুণাহ, শুনলেও গুণাহ।

সত্য কথা বলা, সত্য কথা শোনা যে গুণাহ্, তা এই প্রথম শুনলাম।

মীর্জা সাহেব একটি বয়েৎ বলে, মিথ্যা অনেক সময়ে সত্যের বোরখা পরে এসে ভোলাতে চেষ্টা করে, মুখ দেখবার উপায় না থাকলেও পায়ের দিকে তাকালেই স্বরূপ ধরা পড়ে যায়।

তবে তোমরা পায়ের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করো আমি চললাম। বলে চলে গেল নয়নচাঁদ।

আমরা ব'সে ব'সে গল্প করছি, কত-দিনের কত গল্প, তোর গল্পই বেশি, যখন খুব ছেলেবেলায় পাখিগুলোকে বলতিস ফুল আর ফুলগুলোকে বলতিস পাখি সেই সব গল্প। আমাদের মনে আর আনন্দ ধরে না। গলির মধ্যে মানুষের গলার আওয়াজ, পায়ের শব্দ শুনলেই উঠে উঠে গিয়ে দেখে আসি তাঞ্জাম এলো কি না। এমনি করে দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। কই আসে, ঐ আসে ক'রে দু'জনে বসে আছি। এমন সময় ঝড়ের মতো ঘরে ঢোকে নয়ন।

কিরে, কি হ'ল?

কি আর হবে! তুলসীকে লুটে নিয়ে গিয়েছে!

সে কিরে।

হাঁ, ইমানী বেগমের কুঠি থেকে আসবার সময়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

সে কি কথা! বাদশার তাঞ্জাম থেকে ধরে নিয়ে যাবে এত সাহস কার?

মীর্জা সাহেব বলে ওঠে, নিশ্চয় সিপাহী-দের কাণ্ড!

মিছা দোষ দিয়ো না সিপাহীদের।

যা শুনেছিস সত্যি তো?

নয়ন বলে তোমাদের কাছে থেকে বের হ'য়ে ইমানী বেগমের কুঠির দিকেই যাচ্ছিলাম। পথে সব খবর শুনলাম। বাদশার তাঞ্জাম যারা আক্রমণ করেছিল সব চেনা লোক।

আমি বললাম, চেনা হবে বইকি। শহরের কোন্ গুণ্ডা না তোর চেনা।

মিছে দোষ দিয়ো না বাবা, তারা মীর্জা আবু বখরের লোক।

বাদশার নাতি।

যেমন বাদশা তেমনি নাতি, বলে ওঠে নয়ন। তারপরে বলে ওঠে, এই বাদশা, বাদশা করা ছাড়ো তো।

মীর্জা সাহেব তার কথায় কর্ণপাত না করে বলে, ঘটনাটা হাকিম আসানুল্লা সাহেবকে এখনি জানানো দরকার পণ্ডিতজী।

নয়ন বলে যাও, তোমরা গিয়ে সেই বে-ইমানের কাছে সেলাম ঠোক গে। আমি চললাম লাঠির জোরে তুলসীকে উদ্ধার করে আনতে।

এই পর্যন্ত বলে সুখানন্দ মন্তব্য করে, বেটার সমস্তই মুখতারতী। বেটা করবে তোকে লাঠির জোরে উদ্ধার। উদ্ধার করা দূরে থাকুক, আজ এক মাসের মধ্যে খোঁজ পেল না কোথায় আছিস তুই। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে পল্টন বাবা গিয়েছিল। বাহাদুর ছোকরা বটে।

এমন কত কথাই না মনে পড়ে তুলসীর। সেই প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে মিলিয়ে পরবর্তী আরও দুই তিনটি সাক্ষাতের স্মৃতির। সে ভেবেছিল, বাবা এসেছে, আর কি এবারে সঙ্গে চলে যাবে। কিন্তু প্রস্তাবটা করতেই সুখানন্দ বলে, না, মা, এখনো কিছুদিন এখানে থাক। এখানে থাকলে কাকপক্ষীতেও খোঁজ পাবে না।

সে শুধোয় খোঁজ পেলেই বা কি?

চমকে ওঠে সুখানন্দ, বলে, কাক নয় রে কাক নয়, বাজ চিল, ছোঁ মারাই যাদের ব্যবসা।

বুঝতে পারে না, তুলসী, বলে, কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

সব কথা নাই বুঝলি, শুধু এই বুঝে জেনে রাখ যে, বিপদ এখনো কাটে নি। মীর্জা আবু বখরের লোক এখনো আমাদের গলির মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

বুঝলে কি করে?

ছোঁ মারা যাদের ব্যবসা তাদের দেখলে বুঝতে পারা যায়।

তবে কবে নিয়ে যাবে? অভিমানের সুরে শুধায় মেয়ে।

বাবা বলে, আর কিছুদিন চুপ করে থাক, হাঙ্গামাটা কেটে যাক। শুনেছি কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে।

আবার তখনি মনে পড়ে, বাবার সে কণ্ঠস্বর সে কি কখনো ভুলবে?

ও বাবা পল্টন, কোথায় গেলি রে?

তারপর হঠাৎ বলে ওঠে ঐ দেখো আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছি, সেই মিঠাইয়ের হাঁড়িটা কোথায় নিয়ে গেলি রে?

এক গাল হাসি নিয়ে পল্টন ঘরে প্রবেশ করে, হাতে মিঠাইয়ের হাঁড়ি।

পণ্ডিতজী বলে, খুব এক গাল হাসি যে, ব্যাপার কি?

পল্টন বলে, তবু ভালো যে একগাল মিঠাই নয়।

নয় কেন, বাবা, তোরা খাবি বলেই তো আনা। কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি?

একটু সামলে রেখেছিলাম।

কেন রে?

পাছে বাপ বেটিতে মিলে মনের দুঃখে সব খেয়ে বসে থাকো।

মনের দুঃখে আবার খাওয়া আসে নাকি?

আসে না। কি যে বলো? নিমতলার শ্মশানঘাট থেকে ফিরতি পথে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব ঘণ্টাওয়ালার দোকানে বসে যে পরিমাণ মিঠাই খায় কোন বিয়ে বাড়িতে তেমন খেতে দেখিনি। সেই দেখেই

তো আমি পরামর্শ দিয়েছি ষণ্টেওয়ালা ভাই, এ জায়গা ছেড়ো না। পারো তো গোরস্থানের কাছে আর এক দোকান খুলে দাও।

তার কথা শুনে সুখানন্দ নিজ মনে বলে উঠল, বাঃ বাঃ ছেলেটি বেশ কথা বলে।

এমন সময় রূপমালী ঢোকে। পল্টন বলে ওঠে, এই আমাদের রূপমালীদি।

রূপমালী প্রণাম করে সুখানন্দকে বলে, আগে খবর দিতে পারিনি, আপনার বাড়িটা খুঁজে বের করতে দেরী হল। তাছাড়া যে দুঃসময়, একটু সাবধানে খবরাখবর করতে হয়।

হয় বই কি, মা, খুব হয়।

তারপরে বলে, মা আর জন্মে তুমি আমার মেয়ে ছিলে নইলে আমার মেয়েকে এত যত্ন ক'রে রক্ষা করবে কেন?

পল্টন বলে, পণ্ডিতজী আগের জন্মের কথা উঠিয়ে এবারে এ জন্মের হাঁড়িটাকে ভুলো না।

নারে না, আমি ভুললেও তুই ভুলবিনে।

কেমন করে ভুলবো? বয়ে এনেছি, এখানো হাত ব্যথা করছে।

রূপমালী বলে, পেটে করে বইতে তো দিব্বি পারিস।

যা বলেছ দিদি, পেটে বইতে কোন কষ্ট নাই।

সুখানন্দ বলে তোমরা সবাই খাও মা, আমি দেখি।

বিদায় নেওয়ার সময়ে সুখানন্দ কয়েকটি টাকা দিতে উদ্যত হন রূপমালীর হাতে, খরচপত্র তো আছে, রাখো মা।

রূপমালী স্বাভাবিকভাবেই বলল দরকার হলে চেয়ে নেব। আপনি তো এখন যাতায়াত করবেন।

করবো বই কি, মা।

তখন বিদায় নিয়ে চলে যায়। পিতাপুত্রী দুজনের চোখেই জল পড়ে।

এলাবিয়ন বিবির কথা কেউ তুলল না, কাজেই সুখানন্দ জানতে পারলো না তার অস্তিত্ব।

এই একমাস কালের সব কথাই সুখানন্দ বলেছিল তুলসীকে, কেবল একটি কথা ছাড়া। সে কথাটি বলেনি কারণ বলা যায় না।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার যখন ঘনতর হয়ে উঠল তুলসীকে ভাজাম থেকে লুটে নিয়ে গিয়েছে সংবাদে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল বৃদ্ধ কবি গালিব আর নীরবে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলো সুখানন্দ। অনেকক্ষণ কাঁদবার পরে গালিব বলল, পণ্ডিতজী, একটু কাঁদো, বুকটা হাল্কা হোক।

আরও হাল্কা হবে! আর কত হাল্কা হবে মীর্জা সাহেব। তুলসী মা যাওয়াতেই কি বুক হাল্কা হয় নি।

গালিব বলে, এ যেন আমার তাকে হারানো।

সুখানন্দর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, যাকে আদৌ পাওয়ার কথা নয় তাকে হারানোর দুঃখ কেমন ক'রে বোঝাবো তোমাকে।

কান খাড়া করে শোনে গালিব, তার মনে হয় কি একটা রহস্যবিন্দু আছে সুখানন্দর মনে। জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না।

হঠাৎ সুখানন্দ বলে ওঠে, কলমের ডাল ভাঙলেও সমান কষ্ট হয় গাছের, কি বলো, মীর্জা সাহেব।

পণ্ডিতজী, জুড়ে গেলে কলমের ডাল যে গাছের আপন হয়ে যায়।

তাই তো বলছি, সমান লাগে।

এবারে গালিব সাহস সঞ্চয় করে শুধায়, বুঝতে পারে, সুখানন্দ কিছু বলতেই চায় কেবল প্রশ্ন করবার অপেক্ষা, শুধায় পণ্ডিতজী, অনেকদিন তোমার কথা শুনে মনে হয়েছে তোমার মনের মধ্যে কোথাও একটা খোঁচ আছে।

কি বিষয়ে খোঁচ মীর্জা সাহেব?

তোমার চেয়ে বেশী জানবে কে? তবে বোধ হয় তুলসী মাইকে নিয়ে কিছু একটা হবে।

বলি-কি-না-বলি দ্বিধায় কাঁপে সুখানন্দর মন। যে কথা কাউকে বলে নি, কাউকে বলতে হবে ভাবেনি, নিজের মনের মধ্যেও অনেকগুলি বছরের বিস্মৃতি চাপিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছিল আজ সেই কথা বলবে কি? আর বললেই বা কি ক্ষতি? দু' দুবার

হাত ফস্‌কে অতল জলে তলিয়ে গেল যে সে তো চিরকালের জন্যই গিয়েছে।

স্বপ্নে আবৃত্তির মতো সে বলে চলল, মীর্জা সাহেব, তুলসী আমার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

এতখানি রহস্য আছে ভাবতে পারেনি গালিব, অভিভূতের মতো বলে ওঠে, কুড়িয়ে পাওয়া?

সুখানন্দ বলে যায়, তিনমাসের একটি মেয়ে মারা যাওয়ার পরে আমার স্ত্রী পাগলের মতো হয়ে উঠল, দাও, আমার মেয়ে ফিরিয়ে দাও।

বলে যায় সুখানন্দ, একটি গরীব পরিবারের, তারা আমাদেরই স্বজাতি, একটি ঐ বয়সের মেয়েকে কিছু টাকা দিয়ে নিয়ে নিলাম। কানাঘুষায় বুঝলাম প্রতিপালনের প্রতিশ্রুতিতে তারাও পেয়েছিল মেয়েটিকে, আপন হ'লে টাকার লোভেও দিত না।

এই নাও তোমার মেয়ে, বলে দিলাম স্ত্রীর কোলে। সে বলে উঠল, এই তো আমার মেয়ে, সেই নাক, সেই চোখ, সেই কপাল।

বুঝতে পারে নি কি?

বুঝতে চায় নি, ভুল বুঝতে চেয়েছিল।
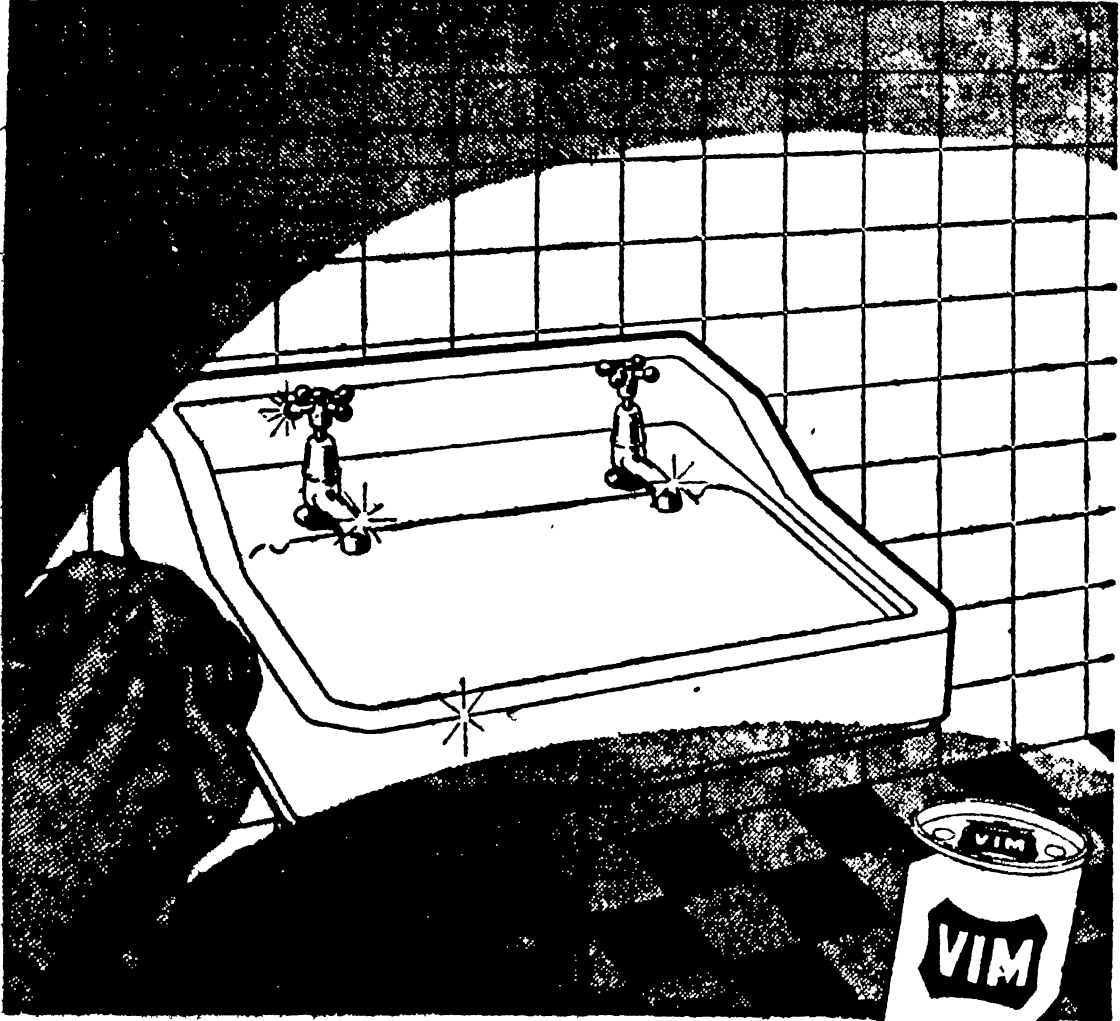
আর বন্দুক না বন্দুক কোনদিন ব্যবহারে প্রকাশ পায় নি, তারপরে শ্মশানে গিয়েছে পড়ে। ভেবেছিলাম, মীর্জা সাহেব, এ কথা প্রকাশের দায়িত্বও চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে।

তারপরে, এতক্ষণ পরে বৃদ্ধ সুখানন্দ ডুকরে কেঁদে উঠল, মীর্জা সাহেব, তুলসী আমার আপন মেয়ের চেয়ে অনেক বেশি। মীর্জা সাহেব, আপন মেয়ে জন্ম থেকেই আপন আর আমার এই কুড়িয়ে পাওয়া মাকে পলে পলে দিনে দিনে, বছরের পরে বছরে হাড় পাঁজরের সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে, শিরাতন্তুর সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে, জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গে জুড়ে নিতে হয়েছে। মীর্জা সাহেব, পথে যাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম পথ আবার তাকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। ওরে মা আমার!

বলে সেই অন্ধকার ঘরে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো বৃদ্ধ পিতা।

গালিব বাধা দিল না, চোখের জলে হাল্কা হোক মন। গুন গুন সুরে বারম্বার একটি গজল আবৃত্তি করে চলল সে—

কুড়িয়ে পেলাম গোলাপকুঁড়ি গাছের তলে
কুড়িয়ে পেলাম মুক্তা অমূল অতল জলে।
আকাশ পথে স্বপন বুড়ী
কুড়িয়ে পেল তারার নুড়ী,
কুড়িয়ে পাওয়া জুড়িয়ে দিল সব গরলে॥

এমন সময় দরজায় জোর ধাক্কা পড়ে। স্বপ্নের জাল চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গিয়ে রূমালী তুলসী এলবিয়ন বিবি ও জীবনলাল ধড়ফড় করে জেগে ওঠে। সবাই ভাবে কি হল? রূমালী ভাবে এলো নাকি? নীচের তলায় কয়েকজন মীর্জাপুরী মুসলমান ছিল, মহলাপাড় বয়ন তাদের ব্যবসা। তারা ডাণ্ডা হাতে বেরিয়ে আসে, বাহনজী, ডরো মৎ হামলোগ হ্যায়।

রূমালী ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখে—ফাকসা পরিদেশনা, ভোরবেলায় পথে জনপ্রাণী নেই। এবারে সাহস পেয়ে দরজা খোলে, সামনে দাঁড়িয়ে পল্টন।

কি বহিন, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি?

যেমন জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছিলে ভয় পাওয়ারই কথা, দরজা ভেঙে যাবে যে।

মীর্জাপুরী মুসলমানদের একজন এগিয়ে এসে শুধায়, পল্টন কোথায়?

আমি একাই পল্টন দেখতে পাও না?

ফালতু বাত ছোড়ো, সিপাহী লোগ আয়েগা কি নেহি?

পল্টন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, আয়েগা, তারপরে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, নেহি। দুয়ে মিলে দাঁড়ালো আয়েগা নেহি।

সবাই অবাক হয়ে তাকায় অর্থ বুঝতে পারে না। তখন পল্টন ব্যাখ্যা করে।

শুনলো না বহিন, পঠান মহম্মদ কুলিজ খাঁ বলো, আজ কোন শালা লোকের এদিকে হামলা করবার উপায় নেই।

কেন রে?

বখৎ খাঁর হুকুম।

হঠাৎ বখৎ খাঁর এত সুমতি হ'ল কেন?

বখৎ খাঁর এত সুমতি কি সাধে হয়েছে? বখৎ খাঁ খবর পেয়েছে, আজ কোম্পানীর ফৌজ চড়াও হবে সাহবুরুজের উপরে। ওখানকার কামানগুলো দখল না করতে পারলে তারা আর টিকতে পারছে না।

বেশ, তাহলে—

তাহলে আর কি! বখৎ খাঁর কড়া হুকুম সকলকে খাড়া তৈয়ার থাকতে হবে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রূমালী বলে ওঠে, যাক বাঁচা গেল।

বহিন, তুমি তো বাঁচলে, ওরা বাঁচলে হয়।

এমন সময় জীবনলালকে দেখতে পেয়ে পল্টন বলে ওঠে, রাতে নিদ হ'ল?

খুব ঘুমিয়েছি ভাই পল্টন, তার উপরে তুমি যা খাইয়েছিলে!

চলো আর একবার খাইয়ে আনি।

না ভাই আজ আর সময় হবে না। এখনি ফিরে রওনা হ'তে হবে।

মুহূর্তকাল আগেও সে ভাবে নি যে, এত শীঘ্র ফিরবে, কিন্তু যেমনি শুনলো যে, কোম্পানীর ফৌজ আজ শাহবুরুজ আক্রমণ করবে অমনি সে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঐ কয়েক শ গজ দূরে দুই দলে লড়াই চলবে আর সে নীরব দর্শকমাত্র হয়ে বসে থাকবে, এ হতেই পারে না। রূমালীর দিকে তাকিয়ে বলে, বহিন, সকাল বেলাতেই আমাকে বের হয়ে পড়তে হবে, অনেক দূরের পথ।

রূমালী ছাড়া আর কেউ জানে না যে, জীবন কোম্পানীর রেসালাদার।

রূমালী ও জীবন দুজনের মনেই এক-সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, যে জন্যে জীবনের এখানে আগমন তার তো কিছুই হল না। জীবনকে যে আটকানো যাবে না, যুদ্ধের বাজনায় তার ধমনী চঞ্চল হয়ে ওঠে, রূমালী তা জেনেছিল আগের দিনের অতর্কিত যুদ্ধে জীবনের ব্যবহার দেখে। জীবন অবশ্যই রওনা হয়ে যাবে তার আগে এলবিয়ন বিবির সঙ্গে দেখা করে নিক এই তার ইচ্ছা।

রূমালী বলল, ভাই, পথে তোমার কি কোম্পানীর ছাউনি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

কেন বলো তো?

এলবিয়ন বিবির খবরটা যদি পৌঁছে দাও।

খুব দিতে পারি। তবে তার আগে নামধাম জানা দরকার।

চলো না, এলবিয়ন বিবির সঙ্গে দেখা করবে।

দুজনে এলবিয়ন বিবির ঘরে প্রবেশ করে, রূমালী পরিচয় করিয়ে দেয়, আমার ভাই, কাল এসেছে, আজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। আর ইনি এলবিয়ন বিবি।

জীবন বলে, গুড মর্নিং মিস্ এলবিয়ন। আমার পথটা কোম্পানীর ছাউনি হয়ে গিয়েছে। তোমার যদি কোন খবর থাকে তো পৌঁছে দিতে পারলে আনন্দিত হব।

এলবিয়ন বিবির চোখে মুখে এক লহমার জন্যে ব্যাকুলতার আভা পড়ে, অনাবৃষ্টির ক্ষেতের উপরে চলতি মেঘের ছায়ার মতো,

কিন্তু তার পরেই মাংসপেশী কঠিন হয়ে ওঠে। সে প্রবর্তন ও পরিবর্তন এমনি স্পষ্ট যে, এড়ায় না রুমালী ও জীবনের চোখ।

নো, থ্যাঙ্কস, মিস্টার।

যদি তুমি অনুমতি করো তবে তোমার আত্মীয়স্বজনের খবর করতে বলতে পারি। কর্নেল ব্রিজম্যান, মেজর রীড, মেজর স্কট প্রভৃতির সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে আমার।

আবার ব্যাকুলতা ও কঠিনতার স্বতো-বিরুদ্ধ তরঙ্গ খেলে যায় মিস এলাবিয়নের মুখে।

নো থ্যাঙ্কস্। আই অ্যাম সরি টু রিফিউজ ইওর কাইন্ড অফার।

এবারে সে ঘর ছেড়ে যায়।

জীবন বোঝে ইংরেজের গোলায় ও ইংরেজ নারীর গো সমান। তবে তার ধারণা হয় এই মেয়েটি মিস এলিমা ক্লিফোর্ড ছাড়া আর কেউ নয়। রুমালীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, দেখো, আমার মনে হয় মিস্ ক্লিফোর্ড, অবশ্য স্বীকার করবে না। আমি গিয়ে বলি, দেখি কি ব্যবস্থা ওরা করতে বলে।

সতর্ক করে দিয়ে বলে ইতিমধ্যে তুমি লক্ষ্য রেখো ও যেন উধাও হয়ে না চলে যায়।

রুমালী বলে, কোথায় যাবে, আর এতদিন পরে কেনই বা যাবে। শুধায়, জীবন তুমি আবার কবে ফিরবে?

সৈনিকের গতিবিধি তো তার ইচ্ছাধীন নয়, তবে মনে হয় শীঘ্রই ফিরতে হবে। আবার খবর নিতে পাঠাবে ব্রিজম্যান।

এসো খাবে।

খেতে বসে জীবনের কেবলি মনে হতে থাকে ঐ তুলসীবাঈ যদি একবার ঘরে ঢুকতো। ভাবে খাওয়ার সময়ে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু না, খাওয়ার সময়েও এলো না তুলসীবাঈ। তার মনে গত রাত্রির হঠকারিতা, রুমালীর মনে গত রাত্রির সন্দিগ্ধ বিতৃষ্ণা দুয়ে মিলে আড়ালে রাখলো তুলসীকে। কাজেই দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বিদায় নেয় জীবন।

রুমালী বলে পল্টন আমার ভাইকে শহর থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দে।

এ আর এমন কঠিন কি। কলকত্তা দরবাজা দিয়ে বের হয়ে যমুনার চর বরাবর সোজা উত্তর দিকে আধ ক্রোশ গিয়ে তার-পরে যেদিকে খুশি যাও।

জীবন বলে, এ মন্দ পরামর্শ নয়।

রুমালী বলে তবে কলকাত্তা দরবাজা পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যা। দেখিস কেউ যেন সন্দেহ না করে।

সন্দেহ করলেই হল? সঙ্গে পল্টন আছে না।

পল্টন আর জীবন রওনা হয়ে যায়। কতক দূর গিয়ে গলির মোড় ঘুরবার আগে জীবন ফিরে তাকায় বাড়িটার দিকে। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পায় দেয়ালে মানুষপ্রমাণ উঁচুতে ঘুলঘুলির গোল ফ্রেমে বাঁধানো একখানি কাঁচ মুখে অতলস্পর্শ দুখানি চোখ। ভালো করে দেখবার আশায় ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রেমখানা শূন্য হয়ে যায়। হতাশ্বাসে মন ভরে ওঠে।

পল্টন বলে, জলদি চলো ভাই, আজ লড়াই হবে, দরবাজা বন্ধ করে দিতে পারে।

নাঃ, ফ্রেমখানা শূন্য পড়ে আছে। আশা-ভঙ্গের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলতে শুরু করে জীবন। কিন্তু তখনি মনে পড়ে চার চোখে মিলেছিল নিশ্চয়—নইলে ফ্রেম শূন্য হতে গেল কেন? তখনি অযাচ্য আনন্দে মন ভরে ওঠে। জোরে পা চালায় সে।

(ক্রমশঃ)

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

রাগরাগিণীর ধ্যানমূর্তি

এ পর্যন্ত অনেকে জানতে চেয়েছেন আমরা রাগরাগিণীর দেবময় বা ধ্যানমূর্তি নিয়ে আলোচনা করি না কেন। প্রশ্নটি অনেকবারই মনের মধ্যে উঠেছে। কিন্তু স্পষ্টভাবে মনোভাব জানাতে দ্বিধা করেছি কেননা এই বিষয়টির সঙ্গে অনেক গুণী শিল্পীর সেণ্টিমেণ্ট জড়িয়ে আছে। কিছু-কাল আগে বেতার জগতে প্রকাশিত একটি চিত্রের সমালোচনার পর আরও কয়েকজন রাগরাগিণীর ধ্যানরূপ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু চৈনিক আক্রমণের ফলে দীর্ঘকাল আমাদের প্রসঙ্গান্তরে ব্যাপৃত থাকতে হয়। এবার তর্বচ্ছি এ বিষয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করলে মন্দ হয় না। এ সম্পর্কে যে অভিমত দেওয়া হচ্ছে তা লেখকের ব্যক্তিগত ধারনার প্রকাশ এবং এর দায়িত্বও লেখকেরই এটা জানিয়ে রাখা উচিত।

রাগরাগিণীর দুরকম রূপ পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি নাদময় অপরটি দেবময়। নাদময় হচ্ছে সেই রূপ যা স্বরাদির যথাযথ প্রয়োগে প্রকটিত হয়। আর দেবময় হচ্ছে সেই দেবরূপ যাকে রাগরাগিণীর ওপর আরোপ করা হয়েছে। এক কথায় দেবময় রূপ হচ্ছে রাগ বা রাগিণীর ওপর যে রূপটি অধিষ্ঠান করে আছে সেই রূপটি।

নাদময় রূপ আমাদের রাগসঙ্গীতের চিরকালের রূপ। এই রূপটি ফোটাবার জন্যই আলাপাদির ব্যবস্থা। নাদময় রূপেরও একটি ঋতু এবং কাল আছে। সব সময় সব রাগের বিশেষ সত্তা ধরা পড়ে না। দেবময় রূপের পরিকল্পনা গত তিনশো বছরের মধ্যে হয়েছে। এ ব্যাপারটা বিশেষ রকমের ভাবগত। একটা রাগ শুনে একটি চিত্রের পরিকল্পনা—সুর থেকে চিত্রে উত্তরণ। এই চিত্রপরিকল্পনাগুলি রঙ ও রেখায় চিত্রে বিধৃত হয়েছে। এই চিত্রগুলিকে রাগমালা চিত্র বলা হয়। কতিপয় সঙ্গীতশিল্পী বা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক এই রাগমালার পরিকল্পনাকে সঙ্গীতে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গীতের দার্শনিক প্রতিষ্ঠার সমৃদ্ধিসাধন করলেন। রাগসঙ্গীতের ইতিবৃত্ত আলোচনা করে এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে যে, রাগরাগিণীর দেবমূর্তি এক জিনিস আর স্বরাদির প্রয়োগে রাগগায়ন অন্য জিনিস। রাগগায়নে যে রস-সঞ্চার হয় সে রস কোনও মূর্তির পরি-কল্পনায় সীমাবদ্ধ হতে পারে না। যেমন সকাল, সন্ধ্যা, রাত প্রকৃতির একটা বিরাট আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এক একজনের চিত্ত সেই আবেদনকে এক এক-ভাবে গ্রহণ করে, তেমনি রাগের আবেদনও বিরাট; এক এক শিল্পী তাকে এক এক-ভাবে গ্রহণ করেন বা তার প্রভাব এক এক-জনের ওপর এক একভাবে পড়ে। একটি বিশেষ মূর্তিতে তাকে আবদ্ধ করা বা তার ধ্যান করা সঙ্গীতচিন্তার সর্বোত্তম প্রকাশ বলে অনেকেই গ্রহণ করতে পারবেন না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মালব-কৌশিক বা মালকোশের যে দেবময় মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে তাতে দেখা যায় উক্ত রাগ আরক্তবর্ণ, রক্ত-যষ্ঠি ধারণ করে আছেন। বীরদের মধ্যেও তিনি বীর। বৈরিকপালমালায় শোভিত। কোন্ গায়ক এইরকম ধ্যানে তৃপ্ত হবেন? গভীর রাত্রে আমরা যে মালকোশ শুনি তা কি আমাদের হৃদয়ে এক বিরাট শারণ্যের সঞ্চার করে না? এই ধ্যানরূপে সন্তুষ্ট না হয়ে মালবকৌশিকের আর একটি রূপ পরিকল্পিত হয়েছে। সেই রূপ অনু-সারে মালকোশ রূপবান শান্ত যুবক, শৃঙ্গারে আসক্ত। কোনও চিত্রশিল্পী যদি কোনও বিশেষ রাগ শোনেন তাঁর পক্ষে সেই মুহূর্তে একটি বিশেষ রূপের পরিকল্পনা করা সম্ভব। চিত্র হিসাবে তার মূল্য আছে—শিল্পচিন্তার দিক থেকে তার বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু একজন সুরশিল্পীর চিন্তা এই ধরণের রূপকায়ের চিন্তা নয়, সঙ্গীতে সে ভাবের পরে ভাবের স্রোত প্রবাহিত করে; তাকে আকারে আবদ্ধ করতে যাওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়। ফাল্গুন মাসে হঠাৎ যখন দখিন হাওয়া আসে বা শ্রাবণ মাসে পূব

হাওয়া হঠাৎ বাষ্পটা মেরে যায়—তার অসংখ্য অনুভূতি। কোনও কবিই তার একটা বাঁধা ধরা রূপ দিতে পারেন নি। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এইরকমই ঘটে—সেখানে অনুভূতি-বৈচিত্র্যের শেষ নেই। তাই দেবময় রূপ সম্পূর্ণ চিত্রশিল্পীর পরিকল্পনা বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সে চিত্রের রূপায়ণে চিত্রশিল্পী সার্থক।

এ প্রসঙ্গে এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে সঙ্গীতচিন্তাকে বড় করবার জন্য মূলচিত্রশিল্পীর চিন্তা এবং কৃতিত্বকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করা হয়েছে। ধ্যানমূর্তি, দেবমূর্তি প্রভৃতি আলোচনা উপলক্ষ্যে কেউ রাগমালা চিত্রগুলির উল্লেখ করেছেন বলে জানি না অথচ এই চিত্রগুলি থেকেই তো দেবমূর্তির শ্লোক রচিত হয়েছে। যাঁরা মনে করেন সঙ্গীতশাস্ত্রের ঋষিরা দেবমূর্তির শ্লোক আগে রচনা করেছেন এবং চিত্রশিল্পীরা সেইগুলিকে পরবর্তীকালে চিত্রে রূপায়িত করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই কেননা প্রাচীন কোন সঙ্গীতশাস্ত্রে এইরকম শ্লোক পাওয়া যায় না। এই পরিকল্পনাই চিত্রশিল্পীর পরিকল্পনা এবং এই অনুমানই সমীচীন যে পরবর্তীকালে সঙ্গীতশাস্ত্রীরা চিত্রশিল্পীদের এই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি পর্যন্ত না দিয়ে সমস্ত গৌরব নিজেরা আত্মসাৎ করতে চেয়েছেন। ইচ্ছাকৃত অনুল্লেখই তার প্রমাণ। একমাত্র ফার্সী গ্রন্থ তুহ্ফাৎ-উল্-হিন্দ্ স্পষ্টভাবে প্রতিটি রাগমালা চিত্রের উল্লেখ করেছেন। সত্য ভাষণের গৌরব ১৬৬৬ সালের লেখা—এই বিরাট গ্রন্থের লেখক মীর্জা খাঁর প্রাপ্য।

সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রীরা মনে করেছিলেন এই সব দেবমূর্তির পরিকল্পনায় সঙ্গীতচিন্তার একটা খুব বড় আদর্শ স্থাপিত হল, কিন্তু সঙ্গীতকে যে ক্ষুদ্রতার সীমিত করা হল, সেটা তাঁরা ভেবে দেখেন নি। পূজার আদর্শে পরিকল্পিত দেবদেবীর সঙ্গে রাগরাগিণীর দেব-দেবীর অনেক তফাৎ। বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী—এঁদের মূর্তি চিরকালই এক। আর্টের পরিকল্পনা থেকে তাঁদের কামনাই এই আধিদৈবিক রূপ সৃজন করেছে। কিন্তু রাগরাগিণী কোনও প্রত্যক্ষ মূর্তিকে স্থাপন করতে চায়নি—তার মাধুর্য ইঙ্গিতে, আভাসে, হর্ষে, বিষাদে—বিচিত্র অনুভূতিতে। তাই নানা রাগ নানা সঙ্গীতে নানাভাবে ব্যক্ত। এক ভৈরবীরই বৈচিত্র্য—কত ভাবেই না এই রাগিণী গীত হয়ে থাকে।

তবে, যদি কেউ রাগরাগিণীর পরিকল্পিত দেবময় মূর্তি অনুসরণ করে আলাপ করতে চান—সেই মূর্তির ভাবরূপ তার সঙ্গীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাহলে তাও যে মহৎ প্রচেষ্টা তাতে সন্দেহ নেই কেননা সেও তো একটা উচ্চ আদর্শের প্রকাশ। আমি শুধু এইটাই বলতে চাই যে কোনও শিক্ষার্থীকে যেন এমন একটা ধারণা করিয়ে দেওয়া না হয় যে এই রাগের এইটাই রূপ আর কিছু হতে পারে না এবং কোন ওস্তাদও যেন এমন ধারণা পোষণ না করেন যে মুনিঋষিরা রাগরাগিণীর এক একটা বাঁধা ধরা চিত্রের নির্দেশ দিয়ে গেছেন—তার বাইরে আর কিছু চিন্তা করার নেই। এইরকম সংস্কারকে অন্ধ সংস্কার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যে রাগের যে যে পর্দা বাজে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত প্রয়োগে যে অনুভূতি জাগ্রত হয় তার রূপ প্রয়োগে যে অনুভূতি জাগ্রত হয় তার রূপ দেওয়াই সুরশিল্পীর ধর্ম। এই অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্য কোন কোনও ওস্তাদ চাঁকতে এমন কোনও কোমল পর্দাকে স্পর্শ করে যান যাদের প্রয়োগকে হয়তো তুমি সেই রাগের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়নি। তথাপি শ্রোতা নির্বাক বিস্ময়ে সেই সঙ্গীত উপভোগ করেন—নিষিদ্ধ পর্দার কথা তাঁদের মনেও উদয় হয় না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, রসসৃষ্টি আর আলংকারিকদের শেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে রসের কোনও রূপ নেই। এখানে [illegible]

চিত্রের রসকে আমরা কীভাবে স্বীকার করব? চিত্র বস্তুটি হচ্ছে সেখানে একটি "অবয়বে-কৃত" বস্তু। একে প্রত্যক্ষ করা যায়। এর সম্ভোগ একটি স্থায়ী রূপকে অবলম্বন করে ঘটে। কিন্তু, সঙ্গীত প্রবহমান স্রোতস্বতীর মত। সে চলেছে নানা রঙ্গে, নানা ভঙ্গে—আর চলেছে আমাদের মানসের গহনে। সেখানে যে রসের সম্ভোগ তা কোনও প্রত্যক্ষ রূপের সাথে কুলোয় না।

পূর্ব কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব-কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলনে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী সাহেবের গান শোনবার সুযোগ হল। এই প্রবীণ সঙ্গীতসাধক বহুদিন বাদে কলকাতায় এলেন। যে ব্যাধি থেকে তিনি আপাততঃ মুক্তিলাভ করেছেন তা যাকে আক্রমণ করে তার দেহেই বৈকল্যের ছাপ রেখে যায়। গোলাম আলী সাহেবও নিষ্কৃতি পান নি। তথাপি অসাধারণ মনোবলের সঙ্গে তিনি গাইলেন রাগ ইমন, পৌঁছে দিলেন কণ্ঠকে চড়ায় পঞ্চমে। কয়েকটি কঠিন কর্তব্য প্রদর্শন করে আমাদের প্রভূত তৃপ্তি সাধন করলেন। জানিনা এই দুর্বল অপটু দেহ নিয়ে আর কতদিন তিনি আসরে অবতীর্ণ হতে পারবেন। আমরা আশা করব মাঝে মাঝে তাঁকে যেন আমাদের মধ্যে পাই যতদিন তিনি আছেন। খেয়াল ছাড়াও তিনি কয়েকটি গীত গাইলেন যা অপূর্ব। গানের আসরে বড়ে গোলাম আলী সাহেবের কয়েকটি দুর্লভ গুণ আছে যা অধিকাংশ গায়কেরই নেই। তিনি কোন গানই অধিককাল ধরে বিস্তৃত করেন না—কোন শৈলীই একাধিকবার প্রদর্শন করেন না এবং তাল নিয়ে অযথা বাহাদুরি করেন না। তিনি একজন প্রকৃত সুরজ্ঞ, রসিক পুরুষ। তিনি দেশী সঙ্গীতকে ভালোবাসেন। প্রতি আসরে কিছু না কিছু কাব্যসঙ্গীত তিনি শুনিয়ে যাবেনই। আর তাঁর কণ্ঠে এইসব গানের তুলনা নেই। দুঃখের বিষয় তাঁকে কাওয়ালী বা তাঁর দেশীয় কাব্যসঙ্গীত গাইতে তেমন করে অনুরোধ করা হয়নি। উত্তর ভারতীয় কাব্যসঙ্গীতের কতিপয় ধরণ আছে যা হয়ত তাঁর পরে আর শোনাই যাবে না। তাঁর খেয়াল, ঠুংরী অবশ্যই ভাল লাগে, কিন্তু তাঁর কাব্য-সঙ্গীতের প্রতি আসক্তির জন্য আমরা তাঁকে বিশেষ সাধুবাদ দিই। তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করলেন তরুণ বাদক শঙ্করকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁর সঙ্গত মনোরমভাবে সঙ্গীতানুগ। এঁর মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা বর্তমান। তবে তাঁকে অনুরোধ করব তাঁর আদর্শ যেন বজায় করে যান। [illegible]

হাত মেলানোর রেকর্ড

উদ্ভট একটা কিছুর রেকর্ড করার খাতিরের দিক থেকে পাশ্চাত্য ছাত্রদের উৎসাহের অন্ত নেই।

সাম্প্রতিকতম একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন রেক্সহ্যাম টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র লান্স ডসন। করমর্দনে এই ছাত্রটি বৃটেনের হয়ে পৃথিবীর এক রেকর্ড করেছেন।

এ ব্যাপারে এতাবৎকাল পৃথিবীর রেকর্ড ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গত প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের। ১৯০৭ সালের জানুয়ারীতে হোয়াইট হাউসে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে একদিনে তিনি আট হাজার পাঁচশো তের-জনের সঙ্গে করমর্দন করেন। লান্স ডসন এই রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন।

গণনা করার জন্য গোয়াইলীন ডেভিস নামক এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে লান্স কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে একদিন বেরিয়ে পড়েন হাতের খোঁজে।

রাস্তায় যথেষ্ট লোক দেখতে না পেয়ে লান্স তার গণনাকারিকে নিয়ে দোকান এবং সিনেমা ঘুরে বেড়ান। শেষে একস্থানে বহু লোকের দেখা পাবার আশায় তিনি এক ফুটবল মাঠে উপস্থিত হন। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে খারাপ আবহাওয়ার জন্য ম্যাচ সেদিন বন্ধ।

বন্ধুরা লান্সকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, লান্স রেকর্ড করতে গিয়ে শেষে হাতই জখম করে ফেলবে। লান্স কিন্তু কারুরই নিষেধ গ্রাহ্য না করে এই রেকর্ড স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

দিনের শেষে ওর আঙুলগুলিতে ফোস্কা পড়ে যায় এবং কব্জি ফুলে যায়।

কিন্তু লান্স তার সংকল্প বজায় রাখে এবং সাড়ে দশ ঘণ্টা সময়ে সাড়ে বারো হাজার জনের সঙ্গে করমর্দন করে পৃথিবীর নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়।

এক্স-রে'র সাহায্যে হীরক চেনা

বিরাটাকার মণিমুক্তা, বিশেষ করে হীরকের সঙ্গে ভারতের পরিচয় বহু শতাব্দীর। পৃথিবীখ্যাত গ্রান্ড মোগল, কোহিনূর এবং ওরলোফ হীরক ভারতেই পাওয়া যায়।

সাতশ' সাতাশি ক্যারাট ওজনের গ্রান্ড মোগল আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে গোল-কুণ্ডার খনিতে পাওয়া যায়। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে [illegible] আবিষ্কৃত হবার সময় এই হীরকটি থেকে দুশ' আশি ক্যারাটে পরিণত করা হয়। [illegible] অবস্থিত দুশ [illegible] হীরক [illegible]

হীরকটি দক্ষিণ-ভারতের এক বিগ্রহের চোখ ছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট ওরলোফ রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দি গ্রেটের জন্য এই ১৯৯·৬ ক্যারাটের হীরকটি কেনা থেকে রোমানফদের রাজদণ্ডে সেটি বসান ছিল। সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ১৩০৪ খৃষ্টাব্দ থেকে অন্য যে-কোন হীরকের চেয়ে দীর্ঘতম ইতিহাস হচ্ছে কোহিনূরের যেটি শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের রানীর মুকুটে স্থায়িভাবে স্থান লাভ করে। মূলে ১৯১ ক্যারাটের এই হীরকটিকে কেটে ১০৮ ক্যারাটে পরিণত করা হয় মুকুটের মধ্যমণিরূপে মানানসই করে বসানোর জন্য।

মাপে এর তুলনায় নগণ্য হলেও একানব্বই বৎসর পূর্বে দয়ালপুরে পতিত উল্কাপিণ্ডে যে হীরক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্পর্কে জ্যোতির্রাসায়নিকদের কৌতূহল অত্যন্ত বেশী। ১৮৭২ সালের ৮ই মে ভূপৃষ্ঠে পতিত এই উল্কার ওজন ছিল দশ আউন্স। এর মধ্যে এক গ্রামের ৪।১০ ভাগ রয়েছে শিকাগোর ন্যাচরাল
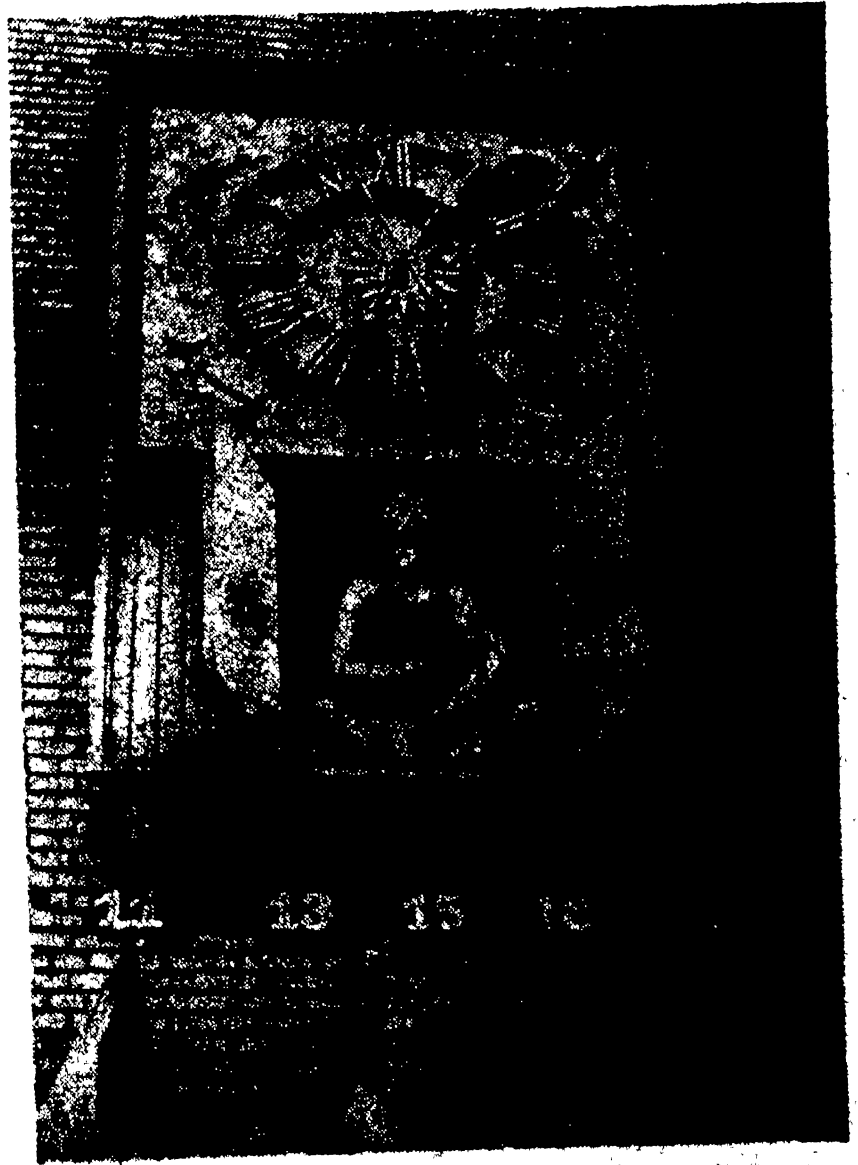
গীর্জা ওয়াইবেল—১ম নেপোলিয়নকে অপমান করার অপরাধে [illegible] আজ তাকে ফুলেনবর্কে [illegible] খোদাই করা মূর্তিতে দেখা যায়। দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে মূর্তিটি আবির্ভূত হয় এবং [illegible] দর্শকদের তাকে সেলাই করতে বলে। [illegible]

হিস্মী মিউজিয়মে আর বাকিটা রয়েছে লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে। শিকাগো মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানিক ডঃ মাইকেল ই লিপশুৎজকে ওই উল্কাখণ্ড থেকে এক গ্রামের এক হাজার ভাগ অংশ নিয়ে পরীক্ষা করার অনুমতি দেন।

ডঃ লিপশুৎজ এক্স-রে বিশ্লেষণ টেক-নিকের সহায়তায় ওই উল্কার অংশে দুটি বিভিন্ন মাপের হীরক স্ফটিক দেখতে পান—কয়েকটি বড় আকারের স্ফটিক এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারের অনেকগুলি। বড় আকারের স্ফটিকগুলিও শুধু চোখে দেখতে পাওয়াই দুষ্কর। ডঃ লিপশুৎজের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আকাশ থেকে পতনকালে উল্কার মূল দেহটি মহাশূন্যে কোন বস্তুর সংগে সংঘর্ষে হীরকের দানায় পরিণত হয়।

উল্কাজাত হীরকের কথা ১৮৮৮ সাল থেকে জানা গেলেও এক্স-রে পদ্ধতিতে আর মাত্র তিনটি উল্কাতে হীরক দেখা গিয়েছে। এক্স-রের পরীক্ষায় হীরক ধারণকারী এই তিনটি উল্কাপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বস্তুও জানা গিয়েছে।

অ্যারিজোনা উল্কাপিণ্ডে যে হীরক পাওয়া গিয়েছে সেটা তার অন্তর্গত গ্রাফাইটের সংগে ভূপৃষ্ঠের প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলেই রূপান্তরিত হয়েছে। রুশ দেশের উল্কা নোভো ইউরাই এবং ভারতে গোয়াল-পাড়ায় প্রাপ্ত অপর একটি উল্কায় যে হীরক পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সম্ভবত এক কোটি থেকে দু কোটি বৎসর পূর্বে কয়েক শত মাইল ব্যাসবিশিষ্ট অবস্থায় মহাশূন্যে সংঘর্ষের ফলে রূপান্তরিত হয়েছে। মহা-শূন্যের তথ্যানুসন্ধানে উল্কা কি দিয়ে তৈরি সে বিষয়ে অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অভিনব প্লাস্টিক ফেনা

বাড়িঘর নির্মাণের আধুনিক মালমসলা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মিউনিখে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী আছে এবং বর্তমানে সেখানে এক-রকম নতুন প্লাস্টিকের বিভিন্ন প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এই নতুন প্লাস্টিকের নাম 'স্টাইরোপার'।

বছর বারো আগে পশ্চিম-জার্মানীর লুডউইগসহাফেনের একটি প্রতিষ্ঠান এক-রকম প্লাস্টিক ফেনা আবিষ্কার করে। সেই কৃত্রিম ফেনময় বস্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে "স্টাইরোপার"। এই বস্তুটির মধ্যে নিরানব্বই ভাগ বায়ু থাকায় এর অপরিবাহী গুণ খুব সুন্দর এবং ওজনেও খুব হাল্কা। তা ছাড়া এটিকে যে-কোন আকার দেওয়া চলে। এত হাল্কা হওয়া সত্ত্বেও এটি প্রচণ্ড চাপ ও টান সহ্য করতে পারে।

এই কৃত্রিম ফেনময় বস্তুটিকে যে কত রকমভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা-ই এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। এটি দিয়ে গৃহকে যেমন তাপ ও শব্দরোধক করা যায়, তেমনিভাবে জিনিসপত্র প্যাক করা যায়, রেস্তোরাঁর আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করা যায়, এমনকি জাহাজের জীবনতরী ও বয়াও তৈরি করা যায়। আজকাল চাষের কাজেও জিনিসটিকে লাগানো হচ্ছে। মাটি মাটিতে এর ছোট ছোট টুকরো ছড়িয়ে দিলে, মাটি বেশ আলগা হয়ে যায় এবং ফলে শাকসবজী ও ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

স্টাইরোপের উপকারিতা লক্ষ্য করে পশ্চিম-জার্মানীর সবচেয়ে উঁচু তিনটি টেলিভিশন ও টেলিকমিউনিকেশনের দণ্ডকে স্টাইরোপারে মুড়ে তাপ ও শব্দরোধক করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক কুমেরু অভিযানে ইনসুলেশনের কাজে জাপানীরা স্টাইরোপার ব্যবহার করে আশ্চর্য সুফল লাভ করেছে।

পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অভিনব ব্যবস্থা

পাকস্থলীর ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। ছোট একটি বড়ি পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগে যারা ভোগেন তাদের খাইয়ে দেওয়া হয়। এই বড়িটি হলো একটি বেতারযন্ত্র। যন্ত্রটি পেটের ভিতরের তাপমাত্রা, চাপ, অক্সিজেনের পরিমাণ এবং অম্লত্ব সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এই বড়িটি পেটে খাদ্যের সংগে মিশে মলের সংগে নিঃসরিত হয় এবং গ্রহণ থেকে শরীর থেকে নির্গত হওয়া পর্যন্ত খাদ্য-পথের সকল স্থানের তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এক ফুট দূরত্বের মধ্যে এর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করা যায়, এক ফুট পর্যন্ত এর তেজস্ক্রিয় শক্তি বিকীরিত হয়। তবে এর অবস্থান এই তেজস্ক্রিয়ার জন্য এক্স-রে সাহায্যে নির্ণয় করা যায় না। এর সাহায্য তথ্য সংগ্রহ এবং অবস্থান নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ধরনের অ্যানটেনা নির্মিত হয়েছে। এই অ্যানটেনার সংগে একটি কলম জোড়া থাকে। কলমটি থাকে গ্রাফপেপারের একটি কাগজের উপরে এবং অ্যানটেনাটি থাকে তলপেটের উপরে। ঐ কলম বড়িটি যেমনই সরে যায় তেমনি কাগজে দাগ কেটে এর অবস্থান নির্ণয় করে ও তথ্য সরবরাহ করে। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, পাঁ[illegible]

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

সম্প্রতি সমাজকল্যাণ পর্ষদের ত্রয়োবিংশতিতম শাখা খোলা হয়েছে নেফাতে। নেফা বা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। নেফার পশ্চিমে ভুটান, উত্তরে তিব্বত ও চীন, পূর্বে বর্মা আর দক্ষিণে আসাম। এই সীমান্তে সেদিন চীনা আক্রমণ শুধু নেফাবাসী কেন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে চঞ্চল করে তুলেছিল। পূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ে ঘেরা এই সৌন্দর্যতীর্থ আজও আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে রেখেছে।

নেফা যুগ যুগান্ত থেকে ভারতবর্ষের পুরাণ, ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। কিছুদিন আগে নেফার লোহিত বিভাগে ভীষ্মকনগরের প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ভীষ্মকনগরের রাজা ভীষ্মকের কন্যা ছিলেন রুক্মিণী—শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নী। আধুনিককালে মীরজুমলা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করেন। এই অভিযানে সাথী ছিলেন ইতিহাস রচয়িতা সিহাবুদ্দিন। সিহাবুদ্দিনের রচনায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দুর্গমতার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে আবার সংগে সংগে সীমান্ত সুন্দরীদের রূপগুণের বর্ণনাও আছে।

নেফার ৩০ হাজার বর্গমাইল স্থানের কোথাও সমতল ভূমি নেই। অহোম রাজারা নেফার সংগে যোগ রেখেছিলেন সত্য কিন্তু সে যোগ নিবিড় ও ঘনিষ্ট হয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি, কারণ সীমান্তের পথঘাট ছিল দুর্গম ও বিপজ্জনক। গল্প আছে যে, একবার অহোম রাজা উদয়াদিত্য সিংহ সুবনসিরি বিভাগের দাফলাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। রাজার প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন দাফলাদের ধরা একটি হাতির ইঁদুরের গর্তে ঢোকার মতই কঠিন কাজ। এমনকি ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ও নেফা শাসন সহজ ছিল না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের নিকটতর ও মধুরতর হতে লাগলো। তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উন্নয়নের সব পরিকল্পনা দিয়ে নেফাবাসীকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলাই আজকের লক্ষ্য। সমাজ কল্যাণ পর্ষদ বা সেন্ট্রাল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর উদ্দেশ্যও তাই। নারী ও শিশুর সকল প্রকার কল্যাণমূলক তাঁদের সমাজ-

হাবিবপুর প্রকল্পের খাষপুর কেন্দ্রে বয়স্কা মেয়েদের একটি শিক্ষার ক্লাশ

সেবার ব্রত। সীমান্তের দুর্লংঘ্য পর্বতের দুর্গমতম কোণে তাঁরা পৌঁছোবার পরিকল্পনা করেছেন। কোন বাধাই আর বাধা নয়।

সমাজ কল্যাণ পর্ষদের সভানেত্রী শ্রীমতী আচাম্মা জন মথাই নেফা সফর করে এসে সেদিন কলকাতায় সংযুক্ত মহিলা পরিষদের এক সভায় বলেছিলেন, চীনের নিষ্ঠুর, নৃশংস আক্রমণের সব গ্লানি মুছে ফেলে নেফার অধিবাসী নূতন উদ্যমে নিজেদের গড়ে তোলার কাজে লেগে গেছে। এতদিন তাদের সব শিল্প সাধনার স্বাক্ষর সযত্নে থাকতো শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য, কারণ তাদের অভাববোধ ছিল অল্প, প্রয়োজন সামান্য, ব্যয় করবার সুযোগ সীমাবদ্ধ। জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে নেফাবাসীকে সর্বভারতীয় উন্নয়নের অংশ করে তোলার জন্য হ্যাণ্ডলুম বোর্ড ও হ্যাণ্ডিক্রাফটস্ বোর্ডও সহায়তা করছেন। হ্যাণ্ডলুম বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী পুপুল জয়াকর আর হ্যাণ্ডিক্রাফটস্

মানবতীর্থ দুধ বিতরণ কেন্দ্র। এখান থেকে প্রত্যহ ৪০০ শিশুকে দুধ দেওয়া হয়

পাথার ঢাকনি তৈরি করার কারখানায় মেয়েরা কাজ করছেন

বোর্ডের সভানেত্রী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ও তাই শ্রীমতী মাথাই-এর সঙ্গে সীমান্ত সফর করে এসেছেন।

আজ দেশের কল্যাণ পরিকল্পনায় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সে কল্যাণ পরিকল্পনার স্পর্শ প্রায় সারা দেশ জুড়ে আছে। বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন বিভিন্ন। পর্ষদের দায়িত্বও বিভিন্ন। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, উন্নতি পরাঙ্মুখ গ্রামাঞ্চল আমাদের বহুদিনের সমস্যা। এর উপর পুষ্টিহীনতা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার অভাব, অবহেলিত শিশু, জীবনযাত্রার নিম্নমান ইত্যাদিও আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির বিশেষ বাধা। এইসব বাধা ও সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সঙ্কল্প নিয়ে সর্বত্র কত অবৈতনিক সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজসেবার স্থান দেশের অগ্রগতির একটি বিশেষ পদক্ষেপ। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বিরাট একটি উপমহাদেশের বহুমুখী সমস্যার সমাধান বড়ই কঠিন কাজ। এখনও শতকরা ৭০।৭৫ জন ভারতবাসী গ্রামে বাস করেন। অথচ সমাজসেবার প্রতিষ্ঠান বেশীর ভাগই শহরে। কখনও বা কোন কোন প্রতিষ্ঠান আর্থিক অক্ষমতার দরুন বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেন। সম্পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থা অপেক্ষা বেসরকারী ব্যবস্থায় সরকারী আর্থিক সহায়তায় সমাজসেবার কাজ ভাল হয়। তা সত্ত্বেও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন। এ কেন্দ্রীয় পরিষদ সারা দেশজোড়া সমাজসেবার সমস্ত প্রচেষ্টাকে একসূত্রে গেঁথে তাদের [illegible] কাজ বাড়িয়ে দিতে পারেন। [illegible] উপদেশ ও [illegible] এইসব

কারণ সম্যক বিবেচনা করেই ১৯৫৩ সালের অগাস্ট মাসে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের পত্তন করেন। সমাজ কল্যাণ পর্ষদ স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন। প্রায় চার কোটি টাকা সমাজ কল্যাণ কার্যে ব্যয় করবার অধিকার দেওয়া হয় এই পর্ষদকে।

কেন্দ্রীয় বোর্ডের কার্যাবলীর পাঁচটি লক্ষ্য—

১। অবৈতনিক সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের পরিমাপ করা, ২। অবৈতনিক সমাজ সেবা সংস্থাগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া, ৩। সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা ও কার্য তালিকার মূল্য নির্ণয় করা, ৪। যেখানে কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের অভাব সেখানে প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করা, ৫। নানা সমাজ কল্যাণ কার্যাবলীর মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা করা।

দেশের দূরতম সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা কেন্দ্রীয় বোর্ডের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এজন্য প্রত্যেক প্রদেশে সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। প্রাদেশিক বোর্ড একদিকে প্রাদেশিক সরকার ও অবৈতনিক, স্বেচ্ছাসেবী, সমাজ কল্যাণ সংস্থা সকল ও অপরদিকে কেন্দ্রীয় পর্ষদের সংযোগস্থল। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির আবেদন পরীক্ষা করে প্রাদেশিক বোর্ড আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ডের কাছে পেশ করেন। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বোর্ডের বা প্রাদেশিক সরকারের নানা পরিকল্পনা কার্যকরী করতে সাহায্যও করেন। প্রাদেশিক উপদেষ্টা বোর্ড কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি উপসমিতি গঠন করেছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ১৬৬টি প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণ পর্ষদের আর্থিক সাহায্য লাভ করে। আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১,৪৭,৮৫৮ টাকা। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন প্রয়াসে ১৪টি জেলায় ১৪টি কল্যাণ পরিকল্পনা—কোঅপারেটিভ এক্সটেনশন প্রোজেক্ট শুরু করা হয়। এছাড়া ২৪-পরগণায় আরও তিনটি পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্য কর্মীদের শিক্ষাও দেওয়া হয়। ৫০টি গ্রামসেবিকা ২৫টি মিডওয়াইফ ও ৫০টি দাই পরিকল্পনার কাজের জন্য শিক্ষালাভ করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ৯৫০টি প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য পেয়েছেন। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা শিক্ষার অভাবে কোন কার্যকরী বিদ্যা আয়ত্ত করতে অসুবিধা বোধ করে। এজন্য সংক্ষিপ্ত শিক্ষার একটি ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে অল্পদিনে লেখাপড়া কিছু শিখে নিয়ে মেয়েরা হাতের কাজ বা অন্য কিছু শিক্ষা করতে পারে। এছাড়া চাকুরিজীবী মেয়েদের জন্য হস্টেল হয়েছে তিনটি। এই মহিলা আবাসগুলি শহরে উপার্জনরত মেয়েদের যে কত উপকার করছে তার সীমা নেই।

আগে আমরা একবার জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস-এর সহযোগিতায় পাখার ঢাকনি তৈয়ার কারখানার কথা আলোচনা করেছিলাম। এ কারখানাও প্রদেশিক সমাজ কল্যাণ পর্ষদের উদ্যোগ। মেয়েরা দৈনিক পারিশ্রমিকে কাজ করতে পারেন। পর্ষদের সভানেত্রী ডাঃ ফুলরেণু গুহ বলেছেন, শীঘ্রই তাঁরা উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করে পারিশ্রমিক দেবেন। (এই কারখানা সম্বন্ধে অনেক পাঠিকা সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁদের সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পরিষদের অফিস, ১১এ ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে খোঁজ করতে অনুরোধ করি।) এছাড়া তাঁতশিক্ষা ও হাতের কাজ (হ্যাণ্ডিক্রাফটস্‌ও) শিক্ষা দেবার কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। এপ্রিল ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ মার্চ পর্যন্ত ২৫টি মুখ্যসেবিকা, ১১৭টি গ্রামসেবিকা, ক্রাফট শিক্ষয়িত্রী ২ জন ও অম্বর চরকা শিক্ষয়িত্রী ১৫ জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথমে সমাজ কল্যাণ পর্ষদ স্থির করেন একান্ত অনগ্রসর স্থানগুলি ছাড়া আর কোনও নূতন প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে না। জাতীয় সঙ্কটের জন্য অনগ্রসর স্থানের প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য দেওয়া সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদ সমাজ কল্যাণ [illegible] একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। সামাজিক উন্নয়নের মুখপত্র এই পত্রিকা। [illegible]

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ তেইশ ॥

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল "১৯৮৪" নামে একখানা উপন্যাস লিখে-ছিলেন। ১৯৮৪ খৃঃ অব্দে, বিশ্বে কম্যুনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গেলে মানুষের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে, অরওয়েল ঐ উপন্যাসে তার একটা চিত্র এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন :

"In our world there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasements Everything else we shall destroy—everything. Already .. no one dares trust a wife or a child or a friend any longer But in the future there will be no wives and no friends Children will be taken from their mothers at birth as one takes eggs from a hen ... There will be no loyaltv except loyalty to the Party There will no love except the love of Big Brother"

ডঃ চন্দ্রশেখর এই উদ্ধৃতিটি তুলে দিয়ে মন্তব্য করেছেন, "চীনাদের কমিউন সম্পর্কে এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আর কি হতে পারে?"

একবার এক কমিউনের ডিরেক্টারকে ডঃ চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কেউ ইচ্ছে করলে এই কমিউন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে কি?"

এই রকম একটি প্রশ্ন শুনে ডিরেক্টার সত্যি সত্যিই অবাক হয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, 'কেউ এখান থেকে চলে যেতে চাইবে, একথা আমি কল্পনাই করতে পারি নে।"

মঁসিয়ে রোবের গিলে তাঁর "দি ড্র. আন্ট" বইতেও লিখেছেন, সরকারী ছাড়পত্র না নিয়ে চীনের জনসাধারণ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। সরকারী ছাড়পত্রের সংগে রেশন কার্ড দেওয়া হয়। কমিউনে অবিশ্যি রেশন কার্ড লাগে না। কারণ সবাইকেই ক্যান্টিনে খেতে হয়। সুতরাং 'অনুমতি' না নিয়ে কমিউনের বাইরে গেলে, কোথাও সে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে না। তা ছাড়া [illegible] প্রত্যেকের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, [illegible] সভার কোন সদস্য বা বাইরের [illegible] আছে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সে খবর পুলিসকে বা পার্টিতে জানিয়ে দেওয়া। কাজেই কারোর পক্ষে গা-ঢাকা দিয়ে কোথাও থাকা অসম্ভব। ধরা পড়ার সাজা হচ্ছে শ্রম শিবিরের "দ্বীপান্তরে" চালান যাওয়া। এ ঝুঁকি কে নেবে?

ডঃ চন্দ্রশেখর জানতে চেয়েছিলেন, "বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য কেউ কি কমিউনের বাইরে যেতে পারে?"

কমিউনের ডিরেক্টার জবাব দিয়েছিলেন, 'বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমতি দেবার ব্যবস্থা আছে। তবে এখনও পর্যন্ত এ ধরনের কোন অনুরোধ আমার কাছে আসে নি"

তার বোধ হয় প্রয়োজন হয় নি, কারণ রাষ্ট্রীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বন্ধুত্বের কোন স্থান রাখা হয় নি।

('But in the future there will be no wives, no friends.")

১৯৫৮ সালে চীনে কমিউনের সঙ্গে আরেকটি উপসর্গ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, যাকে বলা হয় "মহাবেগে দাও লাফ।"

পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোকে চীন

[illegible]

দেখাতে চেয়েছিল যে, কম্যুনিজম এমনই এক জাদুর খেল্ যা রাতারাতি ধুলো-মুঠিকে সোনা-মুঠিতে রূপান্তরিত করতে পারে। "কুড়ি বছরের কাজ একদিনে" করার অসম্ভব প্রতিজ্ঞাটাই "মহাবেগে দাও লাফ"-এর প্রবাদে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন নয়া-চীনের ডিক্টেটরেরা। কিন্তু "লাফ দেবার আগে দেখে নিও" এই প্রবাদটির কথা একেবারে বিস্মৃত হবার ফল চীনের অর্থ-নীতির পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে চীন তার অর্থনীতিকে যে বুনিয়াদে দাঁড় করিয়েছিল, "মহাবেগে লাফ" মারতে গিয়ে সেটিকে শুধু টলিয়ে দিয়েছে।

ফলে চীনের কৃষি-উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়েছে, শিল্প উৎপাদনে দেখা দিয়েছে গুরুতর সংকট। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯—এই দুটো সালই চীনের "মহাবেগে লাফ মারা"র বছর। পরিণাম চিন্তা না করে মহাবেগে লাফ মেরে চীন কোথাও যদি পড়ে থাকে, তবে পড়েছে অপরিণামদর্শিতার আস্তাকুঁড়ে।

১৯৫৮ সালে চীনের প্রচারযন্ত্র এশিয়ার লোকেদের চমকে দেবার মত এক ঘোষণা করল। জানাল যে, চীনের নতুন ব্যবস্থায় কৃষি উৎপাদন আগের বছরের প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। খাদ্যশস্যের ফলন হয়েছে ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন। ১৯৫৯ সালের কৃষি-উৎপাদনের যে লক্ষ্য ঘোষণা করা হল, তাতেও বিশ্বের তাবৎ বিশেষজ্ঞদের মুখে মাছি ঢুকে যাবার উপক্রম হল। এই লক্ষ্য ধার্য করা হল ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টনে। কমিউন প্রথা এবং "মহাবেগে দাও লাফ"-এর জয় গানে এখানের লালিমা(পুং)গণ মুক্ত-কচ্ছ হয়ে উঠলেন।

বাংলার একখানি কম্যুনিস্ট দৈনিকে একবার একটা ছবি বের হলঃ ঘনসন্নিবদ্ধ ধান (অথবা গম?) গাছের উপর দিয়ে দিব্যি চীনা কৃষক হেঁটে চলে যাচ্ছে। তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট কৃষি বিশেষজ্ঞরা চীনের কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে আমাদের কৃষি-উৎপাদনের তুলনামূলক হিসাব করে দেখাতে লাগলেন যে, আমরা যে-তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছি অথচ চীন কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই উন্নতির কি পরাকাষ্ঠাই না দেখিয়ে ছাড়ল।

সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষি-বিশেষজ্ঞগণও কিন্তু কম্যুনিস্ট চীনের কৃষি-সাফল্যের এই আকাশ-ছোঁয়া দাবি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের সে কথা বোঝাবার মত কোনও শক্তির অস্তিত্ব দুনিয়ায় ছিল কি না সন্দেহ। যাই হোক ছয় মাসের মধ্যেই জানা গেল চীনের কৃষি-উৎপাদনের বিঘোষিত পরিসংখ্যানে গরমিল আছে। শোচনীয় স্বীকারোক্তিটি করলেন চীনা সরকার স্বয়ং। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে তাঁরা জানালেন, হিসেবে "সামান্য" একটু গড়বড় হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন হবে না, ওটা হবে ২৫ কোটি টন, অর্থাৎ ফারাকটা "তেমন বেশি নয়", এইমাত্র সাড়ে বারো কোটি টনের। কিছুদিন পরে আবার জানান হল, এই সংখ্যাটাও ভুল। উৎপাদন আরও কিছুটা কম হয়েছে। আসলে উৎপাদন হয়েছিল ১৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টনের কাছাকাছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটাকেই গ্রাহ্য বলে ধরা হয়েছে।

চীন সরকার ১৯৫৯ সালে সাড়ে বাহান্ন কোটি টন খাদ্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য স্থির করে প্রচারের জয়ঢাক বাজিয়েছিলেন, নিজেরাই তা খুব তাড়াতাড়ি সংশোধন করে সেই লক্ষ্যকে একেবারে ২৭ কোটি টনে নামিয়ে আনেন। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টনের ঊর্ধ্বে তুলতে পারেন নি।

৬০, ৬১ এবং ৬২ সালে চীনে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হিসাব যথাক্রমে ১৬ কোটি, ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ এবং ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৫২ সালে চীনের শস্য-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চীন যতই প্রচারের জয়ঢাক বাজাক, এবং কম্যুনিস্ট শাসন ব্যবস্থার দক্ষতা সম্পর্কে যত মাহাত্ম্যই শোনাক, শস্য-উৎপাদন সে ১৯৫২ থেকে ৬২—এই দশ বছরে শতকরা আট ভাগের বেশি বাড়াতে পারে নি। সেখানে ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বজায় রেখে, এই একই সময়কালের মধ্যে কৃষি-উৎপাদন অন্তত শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করেছে। (আমি এখানে ১৯৫২ সালের হিসেব ধরি নি, ১৯৫১ সালের কৃষি-উৎপাদনের সূচক ১০০ ধরেই শতকরা ৩৫এ পৌঁচেছি। ৫২ সালের, সূচক ছিল ১৮ [illegible]

ভারতের খাদ্য-উৎপাদনের শতকরা পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায়।)

শস্য-উৎপাদনের বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় ব্যাপক খাদ্যাভাবের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কম্যুনিস্ট চীনকে পুঁজিবাদী ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, এমন কি জার্মানী প্রভৃতি দেশ থেকে ৩৪ কোটি ডলার মূল্যের (ডলারের মূল্য ৫ টাকা ধরলে ১৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়)· খাদ্য এক ১৯৬১ সালেই আমদানি করতে হয়েছে। কিউবা থেকে আনাতে হয়েছে ৭ লক্ষ টন চিনি। অবস্থাটা বুঝুন।

চীনের খাদ্যশস্য আমদানির যে সাম্প্রতিক বিবরণটি পাওয়া গিয়েছে তার হিসাবটা হচ্ছে এই রকম: ১৯৬০-৬১ সালে মোট আমদানি ২৭ লক্ষ টন এবং ১৯৬১-৬২ সালে ৬০ লক্ষ টন। ১৯৬২-৬৩ সালে (প্রস্তাবিত) আমদানির পরিমাণ ৩৪ থেকে ৩৯ লক্ষ টনে দাঁড়াতে পারে।

শোনা যাচ্ছে, চলতি খাদ্য বছরে চীনের শস্য উৎপাদনে উন্নতি হয়েছে। "মহাবেগে দাও লাফ"-এর আমলে যে সব আজগুবি পদ্ধতি এবং নিয়মকানুন কৃষির উন্নতির জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি গায়ের জোরে চালু করেছিল, অভিজ্ঞতার থাপ্পড় খেয়ে এখন সেগুলো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক খবরে জানা গিয়েছে, বহু বিঘোষিত কমিউনগুলো ধীরে ধীরে ভাঙা শুরু হয়েছে এবং চাষীদের "নিজের বুদ্ধিমত চাষ করার অধিকার" ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অগ্রপশ্চাৎ না দেখে "মহাবেগে লাফ মেরে" কম্যুনিস্ট শাসকেরা চীনকে দুর্দশার কোন চরমে পৌঁছে দিয়েছিল, মসিয়ে রোবের গিলে তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, সমগ্র চীনই এই মহা মন্বন্তরের কবলে পড়েছিল। আবহমানকাল ধরে যে সব প্রদেশে ফসল উদ্বৃত্ত হয়, তাদের অবস্থাও অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল না। গ্রামের চেয়ে শহরের দুর্দশাও কম ছিল না। সমগ্র চীনের শহরগুলোতে উচ্চপর্যায়ের শ্রমিকদের রেশন মাথাপিছু ৩০ পাউণ্ডে (দানা শস্য) নেমে গিয়েছিল। অন্যান্যদের ভাগে ১৫ পাউণ্ডের বেশি জোটে নি। ৩০ পাউণ্ড দানা শস্যের সঙ্গে সমপরিমাণ মাছ মাংস, চর্বি এবং চিনির সরবরাহ মিললে কারো অভাবে পড়ার কথা নয়, এতে একটা লোকের কুলিয়ে যাওয়াই উচিত। কিন্তু চীনের খাদ্যভান্ডার শোচনীয়ভাবে শূন্য হয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে দানাশস্য ছাড়া আনুষঙ্গিক দ্রব্যগুলো সরবরাহ করা অধিকাংশ সময়েই সম্ভব হয় নি। ১৯৬১ সালে, গোটা বছরে, সাংহাইয়ের লোকেরা মাত্র চার কি পাঁচ বার মাংস খেতে পেয়েছে। মাসে তাদের ১০০ গ্রাম করে মাছ এবং ঐ পরিমাণ চিনি সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৬২ সালে দুর্দশা আরও চরমে উঠল। সাধারণ লোকের রেশন সাংহাইতে মাত্র ১১ পাউণ্ডে নামিয়ে আনা হল এবং ঐ বছরই অক্টোবর মাসে খোলা বাজার বন্ধ করে দেওয়া হল। দেশব্যাপী অপুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৬১ সালে চীনে ৫০ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল।

কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচারযন্ত্র চাষীদের বনবাদাড় থেকে "প্রাকৃতিক খাদ্য" সংগ্রহ করে খেয়ে "সৎ ও বিপ্লবী নাগরিক হবার মহত্তর দৃষ্টান্ত" স্থাপনের জন্য "উদ্বুদ্ধ" করতে লাগল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন চালের ঘাটতি পূরণ করার জন্য যখন গম আর আলু খেতে অনুরোধ জানান, তখন এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার করে জনসাধারণের অসন্তোষকে উস্কে দেবার লোকের অভাব হয় না। তবু তো তিনি "পাহাড় পর্বত খাও" একথা বলেন নি। চীনের কম্যুনিস্ট প্রচারযন্ত্র এই শ্লোগানও তুলেছিল। মসিয়ে গিলে লিখছেন:

Last year, the Party organised a systematic quest for wild fruits, mountain and marshland plants that could "assuage hunger", as a Peking newspaper put it. From Manchuria in the North to Kwangsi in the South, hundreds of peasants from the communes went into wilderness to look for their food · wild game from the forests, fish from the ponds and lakes, and edible wild plants. "EAT THE MOUNTAIN" is now a slogan in Szechuan, which was once one of the granneries of China.

এখন চীনের জাতীয় নির্দেশ হচ্ছে "খাওয়া নিয়ন্ত্রণ কর।" এখন চীনে যে খাদ্যবন্টন দেওয়া হয় সাধারণ মানুষকে তাতে আধপেটা খেয়েই থাকতে হয়, আবার তারও উপর পার্টি থেকে কম খাওয়া কমাও। মসিয়ে গিলে লিখেছেন:

"Plan the eating" is now a national directive. Local cadres are perpetually engaged in propaganda to reduce food consumption and encourage "eating by the plan."

এই বিপর্যয়ের সবটা দায়িত্ব কম্যুনিস্টরা প্রথম দিকে প্রকৃতির কাঁধেই চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। পরে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, এই ব্যাপারে পার্টির কর্মিদের গোয়ার্তুমিও কম দায়ী নয়। পিপলস্ রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট কমরেড লিউ শাও-চি ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে যে ভাষণ দিলেন তাতে এই ত্রুটির কথা স্বীকার করলেন। পার্টির সরকারী ফরমুলা পাল্টে তিনি নতুন যে ফরমুলা পেশ করলেন তার নাম "মানুষের ভুল ও দুটি ভয়বহ বছর।"

প্রথম ভুলটি হচ্ছে (যার পরিণাম সাংঘাতিক হয়েছিল) সেই বিখ্যাত পরিসংখ্যানের ভুল। আমার মতে একে "পরিসংখ্যানের গল্প" বলাই উচিত। বাড়তি উৎপাদনের এই চৈনিক গল্প পৃথিবী সুদ্ধ লোককে ধোঁকা যেমন দিয়েছে তেমনি চীনকেও তার স্বখাত সলিলে ডুবিয়ে ছেড়েছে। পার্টির নেতারাও এই গল্পকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তারই ভিত্তিতে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নে "মহাবেগে লাফ" মেরেছিলেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন এই পরিসংখ্যান "সব ঝুট্ হ্যায়", ততক্ষণে তাঁদের "মহাপঙ্কে নিপতিতোহং" বলে আর্তনাদ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিরাট ভুল

করে বসলেন তার পরিণতি কত লোকের হতে পারে, চীনের কাছ থেকে সেই পরম মূল্যবান শিক্ষাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদেরই গ্রহণ করা উচিত। যে-রাষ্ট্রে গণতন্ত্র চার্বকধর্মী, এটা মনে রাখা বোধ হয় ভাল যে, সেখানে খামখেয়ালি রাষ্ট্রনায়কদের গোটা দেশকে এমন জাহান্নমে ঠেলে দেবার বাধা নেই।

দ্বিতীয় ভুলটি হচ্ছে, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির "মহাবেগে দাও লাফ"-এর মত হঠকারি পদ্ধতি গ্রহণ। বিশেষ করে, কৃষির ব্যাপারে যে মহাবিপর্যয় ঘটেছে, তার জন্য এই পদ্ধতির ত্রুটিই অনেকাংশে দায়ী। কমিউন প্রতিষ্ঠার পর পার্টির নির্দেশে কমিউনভুক্ত চাষীদের পশুর পর্যায়ে নামিয়ে এনে দিনরাত খাটানো হয়েছে। এক কমিউনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চাষীদের কাঁধে জোয়াল জুড়ে লাঙল চালানো হচ্ছে দেখে শ্রীচন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পশু দিয়ে লাঙল টানানো হয় না কেন? কমিউনের কর্তারা এই প্রশ্নে বিব্রত বা দুঃখিত না হয়ে পরম উপেক্ষায় জবাব দিয়েছিলেন, পশুগুলিকে খাদ্য হিসাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

এই রচনার সঙ্গে যে ছবিটি ছাপা হল, সেটি সম্প্রতি চীনের বাইরে (অবশ্যই গোপনে) এসেছে। কোয়াংটুং প্রদেশের এক কমিউনে মানুষকে কিভাবে পশুর মত জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এই ছবিতেই তা প্রকাশ। একটু দূরে (ডানদিকের কোণায় দেখুন) এক বন্দুকধারী সেপাই কাজকর্ম তদারক করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কম্যুনিস্টদের স্বর্গরাজ্যে কৃষক এবং শ্রমিককে কত তোয়াজেই না রাখা হয়েছে! স্বর্গের এই ছবি দেখার পর আমাদের দেশের ক'জন কৃষক স্বেচ্ছায় ঐ স্বর্গে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হবেন, জানতে ইচ্ছে করে।

কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় এসে প্রচলিত সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাই শুধু বদলে দেয় নি, আবহমানকাল ধরে চীনের চাষীরা কৃষিকার্যে যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, "মূর্খদের কুসংস্কার" বলে সেই সব অভিজ্ঞতা রাতারাতি খারিজ করে দিল। তার বদলে চালু করা হল পার্টি-হুজুরদের মস্তিষ্ক কণ্ডুয়নে প্রসূত "মার্ক্সিস্ট ফরমুলা" মাফিক কৃষিপদ্ধতি। এই পদ্ধতি নির্বিচারে সারা দেশে গায়ের জোরে প্রয়োগ করাও হল। মসিয়ে গিলে লিখেছেন:

.... these methods were extended (without discrimination or organisation) throughout China by incompetent officials. It took two years before their disastrous effects were discovered. In 1959, on the strength of false figures, the Central Committee went as far as to order a reduction of the areas on which food crops were cultivated only to discover in 1960 the gravity of its errors. Too late it was decided that the irrigation works had had disastrous consequences in vast areas in the North and in the North-East of the country in that they had brought about the salinisation and the alkalinisation of the soil. The operations had been hasty, badly done and over-ambitious.

প্রেসিডেণ্ট লিউ শাও-চি প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন এই দুর্দশা শুধু প্রকৃতি-সৃষ্ট নয়, মানুষই এর জন্য দায়ী।

তৃতীয় ভুলটি হচ্ছে এই, শিল্প উৎপাদনের না-হুঁই-কাগজে এক লক্ষ্য স্থির করে, সেই অসম্ভব লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য দেশের কৃষকদের এক বিরাট অংশকে শিল্প-শ্রমিকে পরিণত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। গিলের কথায়:

The consequences of forced industrialisation now add to the errors of a frenzied agricultural offensive. The loudly-boasted experiment of "village blast furnaces" lasted fortunately only one summer but brought chaos to the provinces. Moreover, now that the targets of industry had been doubled, millions of labourers have been taken away from agriculture, at a time when it has to support a considerably increased urban and industrial population, not to speak of the natural population increase ....

বিধানসভায় আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট সদস্যরা প্রায়ই একটা অভিযোগ করেন যে, এবং সেই অভিযোগ অনেকাংশে সত্যও, আমাদের সরকার কৃষিকে উপেক্ষা করছেন। কিন্তু চীনা কম্যুনিস্ট সরকার সে-দেশে কি করছেন, সেই খবরটা তাঁরা রাখেন কি? কৃষি উৎপাদনের আয়ই চীন দেশের বৃহত্তম আয়। কিন্তু কম্যুনিস্ট চীনের বাজেটে কৃষিখাতে লগ্নী মোট লগ্নীর চারআনা মাত্র বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। কৃষি-শ্রমিকদের থেকে চীনের শিল্প-শ্রমিকদের অনেক বেশি তোয়াজে রাখা হয়। "সাম্য", এই কথাটা শুধু বক্তৃতা দেবার জন্যই কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট কর্মীদের একথাটা জেনে রাখা ভাল।

নিদারুণ চোট খাবার পর চীনের কম্যুনিস্ট সরকার বর্তমানে তাঁদের "বৈপ্লবিক" করমুলাগুলো সংশোধন করতে শুরু করেছেন। "মহাবেগে দাও লাফ", একথাটা কেউ আর এখন লালচীনে উচ্চারণ করছে না। কমিউনগুলোও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঙতে শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য দেশকে, জনসাধারণকে যে অপরিমেয় খেসারত দিতে হবে, তার জবাবদিহি কম্যুনিস্ট পার্টিকে করতে হবে না, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় শাসকদের পক্ষে এই একটা মস্ত সুবিধে আছে। কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে "মহাবেগে লাফ দিতে" গিয়ে। কিন্তু তার হিসেব ... [illegible]
[illegible]

বাটাটাচী চত্তল্

সলিল ঘোষ

প্রখ্যাত মারাঠী সাহিত্যিক, লেখক ও নাট্যকার শ্রীপুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপাণ্ডে, মারাঠী রঙ্গমঞ্চে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী "বাটাটাচী চত্তল্"* নাটকের পুণে প্রেক্ষাগৃহে ৬০৩তম রজনী অভিনয়ের পর, আপাতত কয়েক মাস বিশ্রাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, অসম্ভব চাহিদা সত্ত্বেও, নাটকটির অভিনয় বন্ধ রেখে। দেশপাণ্ডে লিখিত ও একা বিভিন্ন সবকয়টি ভূমিকা অভিনীত তিন ঘণ্টার এই নাটকটির জনপ্রিয়তা, শুধু মারাঠী রঙ্গমঞ্চে নয়, এমনকি ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে (এর মধ্যে কলকাতার রঙ্গমঞ্চও ধরা হয়েছে) অভূতপূর্ব নিঃসন্দেহে বলা চলতে পারে। প্রতিটি অভিনয়ে একটি আসনও খালি থাকে না এবং টিকিট বিক্রি আরম্ভ হবার বহু আগে থেকেই লাইন লাগে, সঙ্গে সঙ্গে সব আসন বিক্রি হয়ে যায়, এমনকি পরে টিকিটের কালোবাজারও চলে। কিন্তু এটাই বড় কথা নয়। দেশপাণ্ডের তিন ঘণ্টার এই একক অভিনয়ের এমনই চাহিদা যে, শারীরিকভাবে যদি তা সম্ভব হত তাহলে একটানা ৫০০ রজনীর অভিনয় তিনি বম্বে ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এখনই করে ফেলতে পারতেন। এই একটি নাটকের অভিনয়ে এখন পর্যন্ত তিনি দেড় লক্ষ টাকার অধিক উপার্জন করেছেন।

নানা কারণে দেশপাণ্ডের এই নাটক ও অভিনয় ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। পুরো তিন ঘণ্টা, শতশত দর্শক যে এভাবে পেটে খিল ধরানো অট্টহাসিতে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারে তা ধারণার বাইরে। মারাঠী মধ্যবিত্ত সমাজ, ওদেরকে নিয়ে দেশপাণ্ডের পরিহাস, ঠাট্টা, তামাশা, শ্লেষ ব্যঙ্গ, শুনে এবং দেখে একেবারে আনন্দে মেতে ওঠে এবং সে আনন্দ যে কি তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দেশপাণ্ডের এই ঠাট্টা তামাশা ব্যঙ্গের মধ্যে কোনপ্রকার তিক্ততা, অশ্লীলতা নেই, উপরন্তু সহানুভূতি ও দুঃখ মিশ্রিত আছে। তাই বোধ হয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একইভাবে দেশপাণ্ডের এই নাটক উপভোগ করে।

দেশপাণ্ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর মতে এই নাটকের অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ কি? এটা কি নিছক হাস্যরসের জন্য, না সার্থক সাহিত্য রচনা বলে, কিংবা বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত নিপুণ অভিনয়। উত্তরে দেশপাণ্ডে বলেছিলেন, বড় কঠিন প্রশ্ন, তিনি নিজেই জানেন না কোনটা এর কারণ। কিন্তু এটা বললেন যে, আগে বাটাটাচী চত্তল্ বইটি পড়ে পাঠকরা তার হিউমার খুবই উপভোগ করত। কিন্তু শুধু বই পড়ে তারা যেন পুরোটা দেখতে পায়নি, আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেনি। বইয়ের সেই চরিত্রগুলির যখন অভিনয় করে দেখাতে আরম্ভ করলাম, তখন বইয়ের কথার সহিত চরিত্রগুলির এই চাক্ষুষ পরিচয়ে ওরা যেন আরও কিছু বেশী পেল। এর সবকিছুই তাদের জানা ও দেখা বহুকাল ধরে। এই কারণেই নাটকটির এত জনপ্রিয়তা।

ঠিক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি, "বাটাটাচী চত্তল্"-কে সেভাবে নাটক বলা চলে না। এটা হল, কতকগুলি Typical চরিত্র-চিত্রণ, Sketch-এর মত, কোন প্লট বা ড্রামা নেই। বিষয়বস্তু হল, একটি চত্তলের বিভিন্ন ঘরের বাসিন্দারা। সকলেই নিম্ন মধ্যবিত্ত, মহারাষ্ট্রের নানান অঞ্চলের নানান গোষ্ঠী বা গোত্রের লোক। এই সব মারাঠীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ নানান সমস্যা তুলে ধরেছেন, প্রধানত হিউমারকে আশ্রয় করে। এই চরিত্র-চিত্রণও হয়েছে অত্যন্ত নিখুঁত, কি Humourous dialogue, কি অভিনয়, কথাবার্তার ধরন, বিভিন্ন Mannerism-এ। এই কারণেই মধ্যবিত্ত

"বাটাটাচী চত্তল্" নাটকের অভিনয়ে মারাঠী [illegible]

---

* (বাটাটার বস্তি। চত্তল এক ধরনের বস্তির বাসগৃহ, যাতে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা, শ্রমিকরা, কম ভাড়াতে থাকে। এতে সকলের দ্বারা ব্যবহৃত সাধারণের জন্য বারান্দা বা অলিন্দের ধারে ছোট ছোট ঘর থাকে। এক-একটি পরিবারের, থাকা, রান্না খাওয়া ওই একই ঘরে হয়। স্নানের ঘর ও পায়খানা এক ধারে থাকে সকলের জন্য। প্রতি ঘরের জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা থাকে না)।

মারাঠীরা অভিনয়ে নিজেদেরকে দেখে এবং নিজেদের প্রতি হাসে। দেশপাণ্ডে, তাদেরকে কোন প্রকার তিক্ততাহীন নির্মল হাসার এই অবকাশ দিয়েছেন বলেই, তাঁর আজ এই জনপ্রিয়তা।

"বাটাটাচী চত্তল্" নাটকটি তিনটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম "মী উপাস্ করতো" (আমি উপোস করছি)। চত্তলের এক বাসিন্দা, উপোস করছেন কোন বিশেষ কারণে। এই উপোস করার ঘটনা উপলক্ষ করে অন্যান্য প্রতিবেশীদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তাদের এক-একজন এসে উপবাসকারীকে, কি বলল, কত রকম উপদেশ দিল এবং সব শুনে উপবাসকারীর মনে কি হচ্ছিল, এই সব সুন্দরভাবে দেখিয়ে চত্তলের ওই সমাজের লোকেদের জীবনের একটি বিচিত্র

চত্তল-এর দৃশ্য

ছবি তুলে ধরেছেন, দেশপাণ্ডে দর্শকদের সম্মুখে।

দ্বিতীয় অংশটির নাম "ভ্রমণ মণ্ডল"। চত্তলের বাসিন্দা, চারটি Typical চরিত্র ওদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র আনার জন্য একটি "ভ্রমণ মণ্ডল" স্থাপনা করল ছুটির সময় বাইরে ভ্রমণে যাবার আশায়। কাশ্মীর, দিল্লি, আগ্রা সব ভ্রমণের জল্পনা-কল্পনা বাতিল হয়ে, শেষকালে ঠিক হল পুণা যাবে বেড়াতে। বম্বের বাসস্থান চত্তল থেকে ঘোড়াগাড়ি করে, স্টেশন ট্রেনযাত্রা এবং পুণা পৌঁছান এই অংশের বিষয়বস্তু। পুণা ভ্রমণ আর হল না। পৌঁছেই পরের ট্রেনে ফিরে আসতে হল।

নাটকের সব বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় কথাবার্তা দেশপাণ্ডে একাই করেন। কোন প্রকার রূপসজ্জা নেই। খালি স্টেজে একটি পুরানো চেয়ার বা একটি বেঞ্চ রেখে দেশপাণ্ডে নানান চরিত্রের অভিনয় করে যান। বিভিন্ন চরিত্রের ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা এত বিভিন্ন যে, দর্শকদের সে সম্বন্ধে বুঝতে কোনই অসুবিধা হয় না। দেশপাণ্ডে একা অভিনয় করলেও, মনে হয় যেন মঞ্চভর্তি বিভিন্ন লোকের অভিনয় দেখছি, কোন সম্পূর্ণ নাটকে যেমন হয়। এইখানেই সাহিত্যিক দেশপাণ্ডের অভিনয় কৃতিত্ব। অথচ সব কয়টি ভূমিকাই তিনি একই পোশাকে করে যাচ্ছেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত মারাঠীর দৈনন্দিন পোশাক। মহিলাদের অংশও এইভাবেই অভিনীত। দেশপাণ্ডের অভিনয়, বাক্যালাপ, অঙ্গভঙ্গি Mime সব কিছুর মধ্যে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আছে যে মনেই হয় না, তিনি একলা এইসব dialogue মুখস্থ বলছেন আর অভিনয় করছেন। খুবই দ্রুত ও গতিশীল এই অভিনয়ের টেম্পো।

নাটকের শেষ অংশের চরিত্রগুলির বাক্যালাপ সঙ্গীতের মাধ্যমে। এখানেও কতকগুলি চরিত্র দেখাচ্ছেন, এক যুবক যার কবিতা লেখার শখ, চত্তলের এক মেয়েকে উদ্দেশ্য করে যেমন কথায় ভাব বুনছে এখানে বিভিন্ন চরিত্রের বাক্যাংশে বিভিন্ন শৈলীর গান দেশপাণ্ডে গেয়েছেন, মারাঠী মঞ্চের ঐতিহ্য অনুযায়ী। কোথাও মারাঠী লোকসঙ্গীত লাবণী, পোয়াড়া, কোথাও ক্ল্যাসিকাল কোথাও আধুনিক। দেশপাণ্ডের গানের গলাও খুব ভাল, একাধারে তিনি লেখক, অভিনেতা, সুগায়ক। এমন যোগাযোগ সহজে ঘটে না।

নাটকটি শেষ করছেন দেশপাণ্ডে একটি Soliloquy-র মাধ্যমে। তিনি জানাচ্ছেন যে, এই বাটাটাচী চত্তল্‌কে একদিন ভেঙে দেওয়া হল, এর সব বাসিন্দারা ছিটকে চলে গেল নানান দিকে। সেখানে উঠল নতুন অট্টালিকা, বড় বড় ফ্ল্যাট সম্বলিত, যার দরজা সব সময় বন্ধ। এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে চেনে না। তার খোঁজ রাখে না। 'কিন্তু চত্তলে সে রকম ছিল না, সেখানকার ... হলে ... না। ... ... দুঃখে ... বড়। এক ছেলে ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে যাবার আগে, সব ঘরের গুরুজনদের প্রণাম করে যেত। এখনকার ওই ফ্ল্যাটবাড়ির ছেলেদের মত নাক উঁচু হত না বা তাদের অভিভাবকদের মত একে অন্যকে অবিশ্বাস করত না। দেশপাণ্ডের এই নাটকের সর্বত্র প্রচুর হাসির খোরাক থাকলেও, ওর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে Pathos, দুঃখ। চত্তলের বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তা শুনে, ওদেরকে দেখে, হাসির সহিত করুণারও উদ্রেক হয়, দুঃখ লাগে চত্তলের জীবনকে। অত হাসার পরেও, নাটকটির শেষে মন বেদনা-ব্যথিত হয়ে ওঠে। চত্তলের ওই মারাঠীদের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

মারাঠী সাহিত্যে নাট্যকার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ৪২ বছর বয়স্ক শ্রীদেশপাণ্ডের অন্যান্য আরও কয়েকটি নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, গোগলের "ইন্সপেক্টর জেনারেল"-এর মারাঠী সংস্করণ "আমালদার" নাটকটি। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন নাট্যসংস্থা দ্বারা ২০০০ রজনীর অধিক অভিনয় হয়েছে এই নাটকটির। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর "তুঝা আহে তুঝা পাশি" নাটকের যার জন্য দেশপাণ্ডে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন। মারাঠী সাহিত্য-সঙ্ঘ এই নাটকটি একাদিক্রমে ২০০তম রজনী অভিনয় করে। এ ছাড়া অন্যান্য নাট্যসংস্থার অভিনয় ধরা হলে ১০০০ অভিনয়ের বেশী হয়েছে এই নাটকটির। এ ছাড়া, ব্রাউনিং ও এলিজাবেথ ব্যারেট-এর জীবনীর উপর লিখিত "সুন্দর মি হোনার" নাটকে দেশপাণ্ডে ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই অভিনয় করেন। সন্ত তুকারামের জীবনের এক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লিখিত দেশপাণ্ডের প্রথম নাটক সাফল্য অর্জন করেনি। "বাটাটাচী চত্তল" নাটকটি মহারাষ্ট্র সরকারের পুরস্কার লাভ করেছে।

ইংল্যাণ্ডের "ইম্পিরিয়াল রিলেশন্স ট্রাস্টের" বৃত্তিলাভ করে কয়েক বছর আগে দেশপাণ্ডে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। গত বছর আমেরিকাও ঘুরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে। শ্রীদেশপাণ্ডে বছরে ৫।৬ মাস রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত জড়িত থাকলেও, বাকী ৬ মাস ছুটিতে কাটান সস্ত্রীক দেশ ভ্রমণ করে, পড়াশোনা লেখার কাজে। এ বছরের শেষে তিন মাস তিনি কলকাতাতে কাটাবেন বলে আমাকে জানান। তিনি কলকাতার রঙ্গমঞ্চের সহিত, সাহিত্যিক, নাট্যকার অভিনেতাদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করতে চান। দেশপাণ্ডের স্ত্রীও সুঅভিনেত্রী। তাঁর নতুন ও এই মধ্যেই জনপ্রিয় নাটক "বাটাবাটাচী ... এর প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং দেশপাণ্ডের ... তাঁর সব কিছু দেখেন।

ছন্দাক্ষরে

॥ ১ ॥

৷ননীয়েষু,

কবিতার যতি-মিল নিয়ে সন্তোষ-মার ঘোষ একটি চমৎকার আলোচনার ত্রপাত করেছিলেন। কৌতূহলী পাঠকরা ারও একটু আশ করেছিলেন।

কবিতার ছন্দোবন্ধন স্বীকার করেছেন ৷-সব কবি, ছন্দ-মিল নিয়ে তাঁদের বিব্রত তে হয়েছে অনেক সময়; নিয়ে আসতে য়েছে বিচিত্র শব্দ, নেহাত অপরিচিত ব্দকেও হঠাৎ কাজে লাগাতে হয়েছে আকুল রে। সন্তোষকুমার এমন কয়েকটি পভোগ্য উদাহরণ দিয়েছেন। ছন্দ নিয়ে ন্নাসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকটাও ছিল ৷ম্প না, চমকপ্রদ মিলে তাঁর এক্সপেরিমেণ্ট ক্ষেত্র, সাফল্য উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু বিড়ম্বিত মলের দু-একটা উদাহরণও চোখে পড়বে। vith কীর সঙ্গে 'হুইস্কি' হাত-ধরাধরি রে চলে গেছে 'শর্করা-কে 'হরকরা' নেছে আগ বাড়িয়ে shelter শেলটার-কে য়েছে লুকে। 'আটটার উপর 'গাট্টা' পড়েছে ন্দরে। এদিকে আবার 'আধুনিক'-এর জন্য এসেছে কোথাকার 'রাধুনিক' 'জগদম্বার' ম্মানে 'কথম্ বা' 'কম বা' শেষ পর্যন্ত তৃম্বা'। 'বর্ষাপি' ফিসক্রাফিও তেমন ন্তরঙ্গ নয় তবু কবির হাতে প্রথম িচয়ের খাতিরে ওরা একত্র মেলে গেছে। ুস্কিল'কে 'ইস্কিল'-এ নিয়ে না গেলে কবি চ করেন' তার 'খিল্লাখিল' কবকে সত্তার সঙ্গে 'হমবা দুরাবস্থার সহ-স্থান দেখলে কবির দুরবস্থা কিছুটা নুমান মনে হয়।

আসল কথা আমাদের মিল-খোঁজা মন য় আরও মিল। আর মিল যে তাঁদের শাদেই হবে কবিরা এই কথাটি মনে াখেন। সে মিল নাই বা হলো প্রাচীন চাঙীন রে' ও 'লাবণ রে'-র মতো দুরগাম্ভীর কিংবা 'সুন্দরী ঝর্না' ও জ্যোৎস্নার মতো নিখুঁত কেতাবী। য়েছে হলুদ' আর 'মাথিরাঙে খুদ' হলে তা হরপার্বতী এমন কি একালের প্রগলভ রার 'কি বলবো' হলেও ক্ষতি নেই। এই মল-খোঁজা নিয়ে বোঝার থেকে বেচারা বির নিষ্কৃতি কোথায়? যদি দেখা যায় ীয়,

> মন উড়ুউড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু,
> ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
> আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো
> ছন্দটা নিয়ম'বাধুনিক
>
> (খাপছাড়া।২০)

যে 'আমার কবিতার চাঁদ আধুনিক' না লে কবির পলায়নের মানচ পথটা খিলবে। [illegible] মতো কবিও কেমন

মিল সন্ধান করে অবসন্ন। "নিমন্ত্রণ" নামক কবিতায় কোনও ব্যক্তিসম্প্রদায়-কে

> 'তাঁদের ভাগ্যে অবিলম্বে
> জুটুন কারাধ্যক্ষ'

বলে একটি জুতসই 'শুভকামনা' তো জানানো গেল, কিন্তু তারপর?

> 'এর পরে আর মিল মেলে না
> য র ল ব হ ক্ষ।'

আমাদের সুষম মিলের কাব্যে মাঝে মাঝে কবিদের এই সহাস্য পাশ-কাটানো কৌতুক হিসেবে চমৎকার। এতে ক্ষতিই বা কি? জয়দ্রথবধের দিন অর্জুন দ্রোণাচার্যকে পরাজিত না করে সবেগে এবং সহাস্যে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন তাতে তাঁর মূল উদ্দেশ্যসাধনের বিঘ্ন ঘটেনি।

নমস্কার জানবেন।

অমিয় বসু

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

সুনীলবাবু একটি আলোচনায় তাঁর একটি বহুকালের খটকার কথা জানিয়েছেন। খটকাটি হল : 'প্রতিম' শব্দটির স্ত্রীলিংগ হিসেবে 'প্রতিমা' ব্যবহার করা। তিনি একটি উদাহরণ নিয়েছেন "ছায়াপ্রতিমা বান্ধবী।" 'প্রতিম' শব্দটিকে আমরা গুণগত অর্থে ব্যবহার করি। 'পিতৃপ্রতিম' 'মধুপ্রতিম' প্রভৃতি শব্দে পিতা অথবা মধুর কথা নিয়ে ভাবি না। 'প্রতিম' শব্দটি কেবলই কাহার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে। শব্দটি স্ত্রীলিংগ বটে, কিন্তু আমরা 'দুর্গা প্রতিমা' যেমন বলি "কার্তিক ঠাকুরের প্রতিমা" ও তেমনি অবাধে বলি। আবার কখনো-সখনো 'প্রতিমা' শব্দটি রূপেরও প্রতীক হয়, যথা "সাক্ষাৎ প্রতিমা।" অতএব সুনীলবাবুর 'বান্ধবী' যেহেতু কায়াময়ী তার পক্ষে শারীরিক কারণেই সম্ভবত ছায়ার প্রতিমা হওয়া কঠিন। অবশ্যই কবিতাতে সবই চলে। চলে, কিন্তু ভাষার পরীক্ষা হিসেবে সম্মানিত হয় না।

সুনীলবাবুকে আরো জানাই সবিনয়ে যে, লেগ পুলের বাংলা "ল্যাং মারা" নয় এবং 'জ্যোৎস্না'র বদলে রাধার লজ্জা হবে না। হবে না; কারণ ভাষা যত পরিণত হয় শব্দের সংকোচক শক্তিও বাড়ে। একটি মাত্র শব্দের সিন্দুকে বিস্তৃত অর্থের রত্নাবলীকে যত বেশী রাখতে পারা যায় ভাষা ততই পরিণত হয়।

হারান কর

সিটি রোড, টিটাগড়।

গুপ্তিপাড়ার মন্দির

মহাশয়,

গত ৬ই বৈশাখ তারিখের "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "গুপ্তিপাড়ার মন্দির" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে কিছু নিবেদন আছে।

(১) প্রবন্ধের ১০ম অনুচ্ছেদে (পৃ, ১১১২) গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা তথ্য-সম্মত নহে। গুপ্তিপাড়া মঠের প্রতিষ্ঠাতার নাম সত্যানন্দ সরস্বতী। মঠের বিভিন্ন মকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্রে ও জনশ্রুতিতে ইনি সত্যদেব সরস্বতী নামে উল্লিখিত হন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে রচিত অভিরাম দাসের "পাটপর্যটন" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, পৃঃ ১১০) হইতে জানা

যায়, ইনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদগণের অন্যতম ভক্ত ছিলেন। সুতরাং প্রবন্ধের ১১শ অনুচ্ছেদে তাঁহাকে যে দক্ষিণ ভারতীয় ও অদ্বয়ানন্দ শান্তিপুরে আগত বলা হইয়াছে তাহাও তথ্যসম্মত নহে।

(২) প্রবন্ধের ১০ম অনুচ্ছেদে মঠের প্রতিষ্ঠা ৪০০ বৎসর পূর্বে এবং ১২শ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১২) সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। "পাটপর্যটন" পাঠে বোঝা যায়—এই গ্রন্থ রচনাকালে সত্যানন্দ জীবিত ছিলেন। সুতরাং মঠটি সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত হওয়া অসম্ভব। স্বর্গীয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের আবিষ্কৃত একখানি পুঁথি হইতে জানা যায়—পুঁথির রচনাকালে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মঠের ২য় দণ্ডী সেবায়েত গোমুখানন্দ সরস্বতী জীবিত ছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে গোমুখানন্দের গুরু সত্যানন্দ গুপ্তিপাড়া আগমনকালে যুবক ছিলেন এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে পরলোকগত হন। সত্যানন্দ ৩০ বৎসর বয়সে মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিলে ও তাঁহার মঠাধিকারকাল ৬০ বৎসর ধরিলে গুপ্তিপাড়া মঠ আঃ ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জোড়বাংলা মন্দির আঃ ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। তখন সম্রাট শাহজাহানের (খৃঃ ১৬২৭-৫৮) রাজত্বকাল, আকবর শাহের নহে।

(৩) ঐ অনুচ্ছেদে মঠ প্রতিষ্ঠাকালে অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়া শান্তিপুরের সংলগ্ন ছিল বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে তাহাও তথ্যসিদ্ধ নহে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যের—"বাহ বাহ বল্যা ঘন ঘন পড়ে গেল সাড়া। বামভাগে শান্তিপুর, ডাহিনে গুপ্তিপাড়া"—এই পয়ার হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে গুপ্তিপাড়া শান্তিপুরের বিপরীত ও গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল।

(৪) ঐ অনুচ্ছেদে "গুপ্ত বৃন্দাবন পল্লী" হইতে "গুপ্তিপাড়া" নামের উদ্ভব বলিয়া যে উক্তি করা হইয়াছে তাহাও ভ্রমাত্মক; কারণ, বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ১০০ বৎসর পূর্বে "গুপ্তিপাড়া" নাম যে প্রচলিত ছিল "চণ্ডীমঙ্গলের" উদ্ধৃত পয়ারই তাহার প্রমাণ।

(৫) প্রবন্ধের ১২শ অনুচ্ছেদে সত্যানন্দের বিত্তপ্রাপ্তি ও বিশ্বেশ্বর রায় কর্তৃক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ সম্পর্কে যে উক্তি করা হইয়াছে তাহাও তথ্যনির্ভর নহে। বৃন্দাবনচন্দ্রের অধিকাংশ জমিদারি বর্ধমান-রাজ কর্তৃক প্রদত্ত। বিশ্বেশ্বর রায়ের অর্থে জোড়বাংলা মন্দিরটি নির্মিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ রায়পুর পরগনার ভূস্বামী গুপ্তিপাড়া-নিবাসী রাজা বিশ্বেশ্বর রায় ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তিনি সত্যানন্দের নিকট শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহাকে দণ্ডীচারী ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। সত্যানন্দের দেহত্যাগের পর সেবায়েত গোমুখানন্দকে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার জন্য বিগ্রহসঙ্গে ধনীগৃহে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইয়াছিল। সত্যানন্দের বিত্তপ্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে এরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইত না।

(৬) ঐ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১৩) মোহন্ত আত্মানন্দ ১৯০১ সালে গদিচ্যুত হন ও ১৯৪৬ সালে মঠের অভিভাবকত্ব মোহন্তের হাতে অর্পিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আত্মানন্দ ১৯০০ সালে অপসারিত হন ও মঠের কর্তৃত্ব জেলা জজ নিযুক্ত ম্যানেজারের উপর অর্পিত হয়। ১৯৫২ সালে রেবতী চ্যাটার্জী স্কীমে সেবায়েত প্রতিনিধিত্বে মোহন্তের একমাত্র অধিকার স্বীকৃত হয়। এই স্কীমে জেলা জজের তত্ত্বাবধানে জমিদারি পরিচালনার ভার রিসিভার ম্যানেজারের উপর এবং দেবসেবা, মেলা, পার্বণাদি পরিচালনার ভার মোহন্তের উপর অর্পিত হয়। ১৯৬০ সালে জেলা জজের আদেশে ও মহামান্য হাইকোর্টের অনুমোদনে বর্তমান মোহন্ত শ্রীপাদ যোগেন্দ্রানন্দ আশ্রম মঠের ম্যানেজার-রিসিভার নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই মঠের অভিভাবকত্ব পূর্ণভাবে মোহন্তের উপর অর্পিত হইয়াছে।

(৭) প্রবন্ধের ১৩শ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১৩) মোহন্তদের যে পর্যায় দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক। সত্যানন্দের পর মঠের মোহন্ত হন যথাক্রমে গোমুখানন্দ চন্দ্রচূড় (?), বিশ্বেশ্বর, রামানন্দ আশ্রম, পরমানন্দ, সোমানন্দ, পূর্ণবোধানন্দ, পীতাম্বরানন্দ, ধ্রুবানন্দ (১ম), শ্যামানন্দ, মাধবানন্দ, আত্মানন্দ (২য় বার), মধুসূদনানন্দ, ধ্রুবানন্দ (২য়) বীরভদ্রানন্দ, কেশবানন্দ, সদানন্দ কৃষ্ণানন্দ, সচ্চিদানন্দ, মহানন্দ, কৃষ্ণানন্দ (২য় বার), পদ্মনাভ, পূর্ণানন্দ, জগদানন্দ জ্ঞানানন্দ, জগদানন্দ (২য় বার), খগেন্দ্রানন্দ, শ্রীপাদ যোগেন্দ্রানন্দ আশ্রম।

(৮) ঐ অনুচ্ছেদে দণ্ডী মধুসূদনানন্দকে বৃন্দাবনচন্দ্রের বড় মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং জগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা মেলার প্রবর্তক বলা হইয়াছে। ইহা ভ্রমাত্মক। বৃন্দাবনচন্দ্রের বড় মন্দিরটি দণ্ডী পীতাম্বরানন্দের মঠাধিকারকালে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী ধনী গঙ্গানারায়ণ সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির দণ্ডী পীতাম্বরানন্দের মঠাধিকারকালে আঃ ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। পীতাম্বরানন্দই জগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা মেলার প্রবর্তন করেন। তিনিই ১৩ চূড়া রথ নির্মাণ করান।

(৯) প্রবন্ধের ১৪শ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ১১১৩) [illegible]

রাজ হরিশচন্দ্র রায় কর্তৃক নির্মিত হয় বলা হইয়াছে। ইহাও ভ্রমাত্মক। রামসীতার মন্দির পীতাম্বরানন্দের আমলে শেওড়াফুলী-রাজ মনোহর রায় (মৃত্যু খৃঃ ১৭৪৩) কর্তৃক নির্মিত হয়।

উপসংহারে বক্তব্য—এইসকল ত্রুটি সত্ত্বেও প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়ার প্রাচীন সংস্কৃতির ধ্বংসোন্মুখ এই নিদর্শনের প্রতি যে সহৃদয় দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য তিনি সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অকুণ্ঠ ধন্যবাদভাজন। ইতি—

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য
এম এ সাহিত্যরত্ন
পোঃ গুপ্তিপাড়া, হুগলী

উপেন্দ্রকিশোর

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' ১৩৭০ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব বসুর উপেন্দ্রকিশোর প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধ ভালো লাগলো। বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের অবদান যে কতো বেশী ও কতো গভীর তা অনুভব করা আজকের দিনে খুব কঠিন নয়। আজকের শিশুদের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা কিংবা পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক থেকে আহরণ করে শিক্ষা লাভ করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অসংগত আকর্ষণের আধিক্য, বড়োদের ধৈর্য সময় ও লক্ষ্যের অভাব আর বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থার অসহনীয় অবহেলা আজকের শিশুদের এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলেছে। এখন শিশু-সাহিত্যের নামে চলে অভিভাবণের ফুলঝুরি কিংবা চুটকিলা (আলী-সাহেবের ভাষায়) যা শিশুমনের পক্ষে একান্তই অনুপযোগী। তার ফলে আজকের সমাজে ছোটরা কথা ফোটবার পর থেকেই পাকা হয়ে ওঠে, সত্যিকার জানবার বা শেখবার স্বাভাবিক বৃত্তিটি তার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধদেববাবুর বাল্যকালের কথা ছেড়ে দিলুম, আমাদের ছোটবেলাতেও আমরা যা পেয়েছি যা দেখেছি তার কথা ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়।

সেই স্নিগ্ধ মন ও নৈরাশ্যের মাঝে যার যার যাঁদের কথা মনে হলে মনে উৎসাহের সঞ্চার হয় তাঁরা হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আমাদের ছেলেবেলায় 'সন্দেশ' 'শিশু' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছলো কিন্তু বাড়ির পুরোনো বাঁধানো সংখ্যাগুলো দুঃখ থেকে [illegible] বোধ হয়। শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেববাবু ঠিকই বলেছেন : এঁদের লেখা [illegible] কালজয়ী ও শিশুদের [illegible] একেবারে কাছাকাছি। আজকের [illegible] যে কি করে [illegible] তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আজ অবধি এমন আর একটি বর্ণপরিচয়ের বই চোখে পড়ে নি যা 'হাসিখুশির' চেয়ে চিত্তাকর্ষক কিংবা আনন্দদায়ক। হারাধনের সেই দশটি ছেলের কথা কি কখনও ভুলবো?

উপেন্দ্রকিশোরের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় তাঁর সম্পাদিত যে-কোন বই দেখলেই বোঝা যায়। 'মহাভারত' সম্পাদনে তাঁর মুন্সিআনার কথা ভাবলে সত্যিই রোমাঞ্চ লাগে। অথচ আজকের শিশুদের ক'জন তাঁর সম্পাদিত রামায়ণ ও মহাভারত পড়বার সুযোগ পায়? সাধারণ জ্ঞান, ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদিতে আজকের শিশুদের কৌতূহল যে কী ভয়ানক কম ও জানবার আগ্রহের যে কী ভীষণ অভাব তা না-দেখলে বোঝা যায় না। প্রায় সব ক'টি ছোটদের পত্রিকা পড়াতে গিয়ে হতাশ হয়েছি : তথ্য-সমৃদ্ধ বা চিত্তাকর্ষক লেখার কি অবিশ্বাস্য অভাব! সাধারণ জ্ঞানের বই কিনে দিয়ে বেকুব বনে গেছি—তথ্যের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ ও বাসী খবরের আধিক্য আর অযত্নে সাজানো কথায় দিশাহারা হ'তে হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ের কথা তো ধরাই যায় না। এতো অবহেলা, এতো অপাঠ্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আকর্ষণ, এতো অসংবেদনশীল পরিবেশে আমাদের শিশুদের কি করে মানুষ করবো?

উপেন্দ্রকিশোরের বা যোগীন্দ্রনাথের মতো যাঁরা শিশুদের বোঝেন, বুঝতে চান বা বোঝাতে পারেন তাঁরা একটু সজাগ হলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। বিনীত

অশোককুমার দাস
কলকাতা

লণ্ডনে বাঙালী ছাত্র

সবিনয় নিবেদন

লণ্ডন ওয়াই এম সি এ হোস্টেলের কমনরুমে হঠাৎ পাওয়া ৪ঠা মের দেশ পত্রিকাতে শ্রীমহিমকুমার গুপ্তের 'লণ্ডনের চিঠি' পড়ে খুবই অবাক হয়ে গেলুম। ভারতীয় ছাত্র (বিশেষ করে বাঙালীর) সম্বন্ধে ও এদেশের মেয়েদের সম্পর্কে ওঁর এরূপ ধারণা যে কেন তা বুঝতে পারলুম না। বিশেষ করে "লণ্ডনের চিঠি" শিরোনামায় এ ধরনের বিকৃত কাল্পনিক কাহিনী লেখার কি উদ্দেশ্য সেটা আমার এদেশের অভিজ্ঞতা দিয়েও উপলব্ধি করতে অক্ষম হলুম। "লণ্ডনের চিঠি" নাম দিয়ে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াকে আমি এখানকার বাঙালী ছাত্রসমাজকে অপমান করা মনে করি। মিঃ গুপ্তের রচনা পড়ে মনে হয় যে, লণ্ডনের ছাত্রসমাজে "বিলাসের" মতন বাঙালী ছাত্রসংখ্যা ও "সোনিয়া"র মতন ইংরেজ মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। জানিনা উনি কতদিন লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে কাটিয়েছেন বা নিজে কতদিন ছাত্র হিসাবে লণ্ডনে ছিলেন, কিন্তু বাঙালী ও ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে এসে আমি যা দেখেছি ও বুঝেছি তাতে এদেশে সাধারণ বাঙালী ছাত্রদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা না করার কোন কারণ খুঁজে পাই না। কি অসুবিধা ও কি কষ্টের ওপর দিয়ে সাধারণ বাঙালী ছেলেরা এদেশে জীবন কাটায় তা আমি নিজে বুঝেছি, দেখেছি ও এখনও দেখছি। মিঃ গুপ্তের রচনা যে আমাদের দেশের আত্মীয়স্বজনের মনের মধ্যে লণ্ডনবাসী বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা জাগাতে সক্ষম হবে, সেটা আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

নমস্কারান্তে
বিধানচন্দ্র ঘোষ
লণ্ডন

বিন্দু
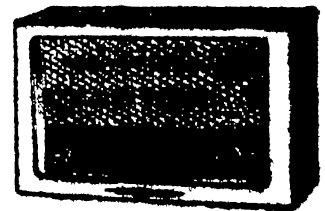
শিশুসাহিত্য

ছোটদের জন্যে লেখা কয়েকটি হালের বই আমার হাতে এসেছিল। ভাল করে দেখব, তেমন সুযোগ ছিল না, মনও বোধ হয় নয়। যাদের বই তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেড়ে নিল। কথাটা মনে পড়ল দুটো কারণে, প্রথমত, আমি ছোটদের বই সম্পর্কে এ যাবৎ একটি কথাও লিখি নি; দ্বিতীয়ত কিছু যদি লিখতে হয় তবে এখন, যখন কি না উপেন্দ্রকিশোরের জন্মশতবার্ষিক উৎসব আমরা পালন করছি।

অনেক জিনিস আছে যা মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই পায়, অজস্র পায়, কিন্তু পাওয়া জিনিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারে না, বলতেও পারে না। যেমন বলি আমার যখন ইজের পরে খালি পায়ে রেল কোম্পানীর মাঠে আম কুড়োতে যাবার বয়স তখন কি সেই মন ছিল যাতে বলতে পারব সুখলতা রাও-এর 'আরও গল্প' কেন বার বার পড়তাম? পারব না বলতে, কেন অত বার করে 'রাক্কস খোক্কস' পড়েছি। ঠিক ওই রকম অবস্থা হবে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, কি আছে ওই চারটি সুমিষ্ট পদে—

"বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে।
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল চলে কুল কুল।" ..

আমার পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয়, উপেন্দ্রকিশোর আমাদের ছেলেবেলায় কোন্ জিনিসটি দিয়েছিলেন। তবে এই বয়সে, বাড়িতে ছোটদের হাতে ওই একই বই তুলে দিয়ে যখন বলেছি, "বল তো কেমন লাগে?" তারা ছোট ছোট মুখ চোখ তুলে বলে 'খুব সুন্দর।'

ছোটরা যেমন করে মায়ের আদর কেড়ে খায়, বাবা-কাকার স্নেহ, তেমন করেই তারা মনের খোরাক পেলে আঁজলা ভরে তুলে নেয়। ঠিক কি নেয় সে প্রশ্ন করা উচিত নয়। কেননা, অত বোঝার বয়েস তাদের হয় নি।

উপেন্দ্রকিশোরকে আমি সেইভাবে ভাবতে ভালবাসি, একপাল ছোট টুকটুকে বাচ্চা এই মানুষটিকে চারপাশে ঘিরে বসে আছে, আর উনি দাওয়ায় বসে গুন গুন করে পড়ছেন:

মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।'

এই যে তমসা, মধুময় ছায়া, পাখির গান, ফুল ফোটা, কুল কুল জল বয়ে যাওয়া—এ সব নিয়েই উপেন্দ্রকিশোর বাংলা শিশু-সাহিত্যে মুনির মতন বসে আছেন। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা হুদের এই বাল্মীকির তপোবনে অসঙ্কোচ পায়ে ঢুকে পড়েছে—যেমন ভাবে আমরা ঢুকেছিলাম।

আমরা নিজেরা শিশুদের যা ভাবি, যেমনই ভাবি না কেন—শিশুদের কল্পনার সীমা স্বর্গমর্তকে হার মানায়; আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি—সবচেয়ে গম্ভীর কল্পনা থেকে সবচেয়ে অদ্ভুত কল্পনা দু' প্রান্তেই সমান অক্লেশে এদের মন ছুটতে পারে। দুটি উদাহরণ দেব: একটি আট বছরের ছোট্ট মেয়ে আমায় একবার বলেছিল, রোদ্দুর দিয়ে ভগবান

উপেন্দ্রকিশোর

হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছিল একদিন সে দেখেছে। আর-একটি উদাহরণ ধারণাতীত কৌতুককর, অন্য-একটি ছোট্ট মেয়ে আমায় বলেছিল, তার একটু আঠার শিশি দরকার। আঠা পেলে সে তার বাবার মাথার পাশে নিজের মাথাটা এঁটে নেবে। কেন—কেন—, আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম কেন খুকু? খুকু বলেছিল, তা হলে বাবার সঙ্গে সারা-দিন সে বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারবে। কি মজাটাই হবে তবে!

ছোটদের এমন মন—যার তল পাওয়া ভার—যার কোথায় কি বিচিত্র কুসুম ফুটে আছে আমাদের অজ্ঞাত, উপেন্দ্রকিশোর তাঁর মনের আশ্চর্য গন্ধে সেই কুসুমগুলি চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছেই সব পাওয়া যায়—বিস্ময়, কৌতূহল, চোখ ভরে দেখার মতন দৃশ্য, গানের সুর, শব্দের ঝঙ্কার, রঙ, লালিত্য এবং আরও না কত কি! শিশুর মন যা যা চায়, চাইতে পারে—তার পুঁজিতে সবই বুঝি জমা ছিল। দিয়েছেনও তাই—তাঁর সমস্ত প্রতিভা নিঃশেষ করে।

বাংলা সাহিত্যে খুব বড় রকম গোলমাল যে, উপেন্দ্রকিশোর শিশুসাহিত্যের সিংহ-দরজাটা নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন—আর তারপর একে একে সেই দরজা দিয়ে রথী-মহারথীরা সভাস্থলে এসে বসতে পেরেছেন।

ছোটদের আত্মীয় হয়ে অমন করে লিখতে আর ক'জনই বা পারলেন! হাতের কাছে রয়েছে 'টুনটুনির বই'। পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল এই অংশটা—"পীন্—পীন্—পীন্—পীন্ করে মশারাজ্যের মশা, বাপ বেটা ভাই-বন্ধু মিলে হাতিকে কামড়াতে চলল। মশায় আকাশ ছেয়ে গেল, সূর্য ঢেকে গেল। তাদের পাখার হাওয়ায় ঝড় বইতে লাগল। পীন্—পীন্—পীন্—পীন ভয়ানক শব্দ শুনে সকলের প্রাণ কেঁপে উঠল।" মশার এমন চেহারা ছোটরাই তাদের চোখ দিয়ে দেখতে পারে, আর সূর্য ঢেকে ফেলা আকাশ ছাওয়া মশককুলের এই যুদ্ধযাত্রা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকেও হার মানায়। শুধু কি কৌতুক, কল্পনার এমন অক্লেশ বিচরণ-সৌন্দর্য আর কে বুঝবে শিশু ছাড়া! একমাত্র শিশুদের জন্যেই নাককাটা রাজার জন্যে তিনি 'ডাক্তার' হাজির করেছিলেন, বদ্যি নয়। বদ্যিতে রসের পাক গাঢ় হত না যা ডাক্তারে হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোর-এর শতবার্ষিকীতে তাই মনে পড়ছে এ-কালের শিশুসাহিত্য। সেই রাম নেই, সেই অযোধ্যাও না। (রবীন্দ্র-নাথের উল্লেখ আমি বাদ রেখে যাচ্ছি।) সেকালে বহু রথী মিলে শিশুসাহিত্যের যে স্বর্গ জয় করছিলেন এখন আমরা তার এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়েছি প্রায়। দক্ষিণারঞ্জনএর তুলনা কোথায়? কোথায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের আর-একজন প্রতিদ্বন্দ্বী? অবনীন্দ্রনাথের 'রাজ কাহিনী'র সেই পরম আশ্চর্য ভাষা আর তো দেখি না! ". পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরনার ঝর্ঝর, আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেইসকল অন্ধকার বনে-বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মত কাল, বাঘের মত জোরালো, সিংহের মতন তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মতন সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরল প্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।" কোথায় এ যাদু কোথায় গেল?

১৩০৯ সালে 'রাক্কস খোক্কস'-এর ভূমিকা লিখতে বসে লেখক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন: "ছেলেরা গল্প ভালবাসে, কিন্তু গল্প শুনাইতে বুড়াবুড়ি আর মেলে না।" ষাট বছর পরে, এই ১৩৭০ সালেও কথাটা সত্য হয়ে থাকল। সংশোধন অথবা পরিমার্জন হিসাবে শুধু এটুকু বলা যায়, "আজকাল ছেলেরা বুড়ো হয়ে কিন্তু

শিশু হবে না। বড়োরাও যদি মনে শিশু হইতে না পারেন তবে ছেলেদের গল্প জমে না।"

পরিশেষে একটা কথা নিবেদন করব, হালফিল বাংলা শিশুসাহিত্যে ছবির দিকটাও তেমন জোরালো নয়। উপেন্দ্রকিশোর-এর সেই টুনটুনির পা তুলে জাগি মামার ছবিটা ভেবে দেখুন, ভেবে দেখুন সুখলতা রাও-এর 'আরও গল্পের' সেই প্রচ্ছদ, মনে করুন 'রাক্কস খোক্কস' বইয়ের মলাটের ছবি—এই রকম আরও সব পুরোনো অলংকারের কথা—মনে হবে এ-কালের শিশুসাহিত্য থেকে শুধু কল্পনার অলংকার বাদ পড়ে নি, শোভার অলংকারও বাদ পড়েছে।

এত সত্ত্বেও আমরা আশা রাখব, আশা করব বাংলা শিশুসাহিত্য যেন আবার তার পুরোনো গৌরব ফিরে পায়।

গ্রন্থ আমাদের সংগীতসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৪।৬৩

রবীন্দ্র সংগীত : দুটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা

রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা এবং সংগীত-রচনাকে বুঝতে গেলে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় এবং প্রাদেশিক সংগীতের সাধারণ ইতিহাসও জানা দরকার। গ্রন্থকার বিশেষ তৎপরতার সংগে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতসৃষ্টির বিবিধ তত্ত্ব এবং তথ্যের আলোচনা করেছেন। সঙ্গীতরচনার আদি-পর্বে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে বিকাশ ঘটেছিল তার বিবরণটি মনোজ্ঞ। অতঃপর রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির প্রভাব সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা করা হয়েছে। তবে ধ্রুপদ বা খেয়ালের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে লেখক যে মতের ওপর নির্ভর করেছেন তার যথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান এবং তা অভ্রান্তও নয়। ধ্রুপদের ঐতিহ্য সংগীতরত্নাকরে বর্ণিত "ধ্রুব" নামক গীতির মধ্যে বর্তমান। ধ্রুপদ প্রবন্ধ সংগীতেরই অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানেও প্রবন্ধসঙ্গীত লুপ্ত হয়নি। আমাদের কাব্য-সঙ্গীতও আসলে প্রবন্ধসঙ্গীত। গ্রন্থকার বাংলার কীর্তন, বাউল প্রভৃতি ধারার সংগে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্বন্ধ নিপুণতার সংগে নির্ণয় করেছেন। প্রতিক্ষেত্রেই বহু উদাহরণ সহযোগে বিষয়গুলি যাতে সুবোধ্য হয় সেদিকে যত্ন নেওয়াই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সৃষ্টির মধ্যে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, মন্ত্রাদিতে সুরারোপ প্রভৃতি বিষয়গুলি যোগ্যতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। অনুশীলনকারীর সুবিধার জন্য সরল ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের সারাংশ এবং সংস্কৃত মন্ত্রাদির অনুবাদও সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রধানত শিক্ষার্থীর ঔৎসুক্য মেটাবার জন্য রচিত হলেও সাধারণভাবে সঙ্গীতজিজ্ঞাসু ব্যক্তির কাছে আদরণীয় হবে। গ্রন্থকারের গ্রন্থশৈলী, সরল এবং বাহুল্যবর্জিত প্রয়োজনীয় আলোচনার আদর্শটি বিশেষ প্রশংসনীয়।

১১৪।৬৩

রবীন্দ্রসংগীতের নানা দিক — বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয় ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

গ্রন্থের লেখক-লেখিকা দুজনেই রবীন্দ্র-পরিবেশে বর্ধিত হয়েছেন। লেখিকা রবীন্দ্র-সংগীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্না। গ্রন্থে সাতটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধ-গুলিতে রবীন্দ্রসংগীতের অনুভব উপভোগ, রূপকল্প প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীতে রুচির প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশ ও সাম্প্রতিক বাংলা গান —এই দুটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রসংগীত তথা বাংলার সংগীত সম্বন্ধে লেখক-লেখিকার মুক্তমন এবং মুক্তদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসংগীত এবং বর্তমান বাংলার প্রচলিত আধুনিকসংগীত সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং সংগীত সম্পর্কে শিল্পী বা শ্রোতার সাধারণ মনোভাব নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলার সংগীত-সমাজে রবীন্দ্রসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন চিন্তাধারা রুচিগঠন এবং সংগীতের স্বাভাবিক বিকাশে নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করবে তার প্রয়োজনীয় আলোচনাদ্বারা এই

সংগীতের তাল ও ছন্দ

ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ—শ্রীসুবোধ নন্দী। ১৬।১এ মহারানী হেমন্তকুমারী স্ট্রীট, কলকাতা-৪। চার টাকা।

গ্রন্থের আদিতে গ্রন্থকার ভারতীয় সংগীতসাহিত্যে তাল সম্পর্কীয় ধারণার উল্লেখ এবং বিশ্লেষণ করেছেন। যে-সব ক্রিয়া বর্তমানে উত্তর-ভারতে প্রযুক্ত হয় না বা যেগুলির প্রয়োগ বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে লিখিত বিষয় থেকে বোঝা খুবই কঠিন। প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনা থেকে আমরা একটি অতি সাধারণ ধারণা করতে পারি মাত্র। গ্রন্থকার মার্গ এবং দেশী তালের উল্লেখ সহযোগে নিজে যেরকম ধারণা করেছেন সেইটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। পূর্বযুগের মাত্রা গণনা অর্থাৎ লঘু গুরু ইত্যাদি ভিন্ন ধরনের ছিল। পরে তা ছোট করে ভেঙে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান 'ফাক'-এর নির্দেশ কীভাবে এসেছে তাও অনুমান করা শক্ত। ভারতীয় সংগীতে তালের এই যে বিবর্তন এটি একটি বিরাট গবেষণার বিষয় এবং এ সম্বন্ধে কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। গ্রন্থকার

এইরকম চেষ্টা করেন নি। তিনি সংগীত শিক্ষার্থীদের ধারণার জন্য প্রাচীন এবং বর্তমান তালগুলির একটি বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ সহজবোধ্য এবং সুগম। এ ছাড়া কীর্তনের তাল, কর্ণাটক ঠেকা, মণিপুরী ঠেকা সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিবৃত করা হয়েছে। সংগীতের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সংযোগ সম্বন্ধেও একটি প্রয়োজনীয় আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার নিজে বিবিধ তালবাদ্যে অভিজ্ঞ এবং শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতাও তাঁর যথেষ্ট আছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন নিষ্পত্তির জন্য তিনি যে-সব উপাদান গ্রন্থে যোজনা করেছেন তাতে তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ৫০১।৬২

ছোট গল্প

কেউ তত লাজুক নয়—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—বর্তিক, ১।৩২ এর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬। দাম—৪·০০ টাকা।

ছোট গল্প রচনায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কতখানি সিদ্ধহস্ত তার পরিচয় বাংলা দেশের পাঠকরা বহুকাল আগেই পেয়েছেন। এমনকি তাঁর রচনাভঙ্গি এবং লেখার বৈশিষ্ট্য কি, আজ আর কারো কাছে তা অজানা নেই। বোধ হয় এখন বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণ এমনি এক-জন যাঁর রচনা হাতে এলে পাঠক তাকে না-পড়ে এড়িয়ে যেতে পারেন না।

'কেউ তত লাজুক নয়' বিভূতিভূষণের অধুনা প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। লেখকের চির-পরিচিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য এ গল্পগুলোর মধ্যে বর্তমান। সুতরাং পাঠকেরা আর একবার কয়েকটি সার্থক ছোটগল্প হাতে পেয়ে নিশ্চয়ই খুশী হবেন। তবু বলা প্রয়োজন, এখানে এমন দু-একটি গল্প আছে যাতে লেখক কিছু নতুন-এর আস্বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বলা যায় এ কাহিনীগুলো রচনার মূলে তাঁর কিছু কল্যাণময় উদ্দেশ্য ছিলো। যথা—ধর্মান্তর, নাম করা নভেল, মোদের গরব মোদের আশা। এগুলোকে প্রচলিত নীতি অনুযায়ী হয়তো যথার্থ গল্প বলা যাবে না, কিন্তু ভিন্নতর কোনো আবেদনে যদি এ গল্পগুলো পাঠকের মনকে ভাবিত করে, তবে বুঝতে হবে, এ-রচনাও সার্থক হয়েছে। ৯৭।৬৩

বড় গল্প

সোনা রূপোর কাঠি। কবিতা সিংহ। সুরভি প্রকাশনী, ১ কলেজ রো, কলকাতা ৯। দু' টাকা।

সোনা রূপোর কাঠি, সম্ভবত কবিতা সিংহের প্রথম বই। উপন্যাস নয়, একটি বড় গল্প, পুরো একশো পৃষ্ঠার পরিসরে লেখিকা প্রায় রুদ্ধশ্বাস একটি গল্প ব'লে গেছেন; নির্মম কত ঘটনা, কোথাও এতটুকু 'রিলিফ' নেই। গল্পটি ঘুরেছে তপতীকে কেন্দ্র ক'রে; তপতী, একজন সেবিকা (নার্স), তার কর্মজীবনে যে-সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে, মোটামুটি তারই বিবরণ। সেবিকা-জীবন বড় ভয়ঙ্কর জীবন, তার চতুর্দিকে ক্লেদ ও বঞ্চনা, মাঝে-মাঝে মনে হয়, সেবিকাদের মহৎ জীবনে (বইয়ের মধ্যে ফ্লোরেন্স নাটিংগেলের উল্লেখ আছে) পুরস্কার আসে বঞ্চনার রূপ ধরে, ক্রমশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া সে-জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রকম : বাবার মৃত্যুর পর তপতী এসে ওঠে তার মেজদি সুরমার বাড়িতে, কলকাতায়। সুরমার স্বামী রাধাবিলাস লোকটি ভালো, উৎকট ভবঘুরে। অকস্মাৎ বিপর্যয়ে সুরমাকে হ'তে হয় বাজোরিয়া নামক একজনের রক্ষিতা। তপতী বাঁচে নীলিমা নামক একজন সেবিকার কাছে আশ্রয় নিয়ে। তারপর বাধ্য হয়ে তপতীও ঐ জীবিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী তপতীর অভিজ্ঞতা [illegible]। [illegible] পর এক [illegible] [illegible]-ভাবে তার [illegible] (যে-

ভূমি হাসপাতাল) — হরিপদ কম্পাউণ্ডার, পিকুদের আসল মা, সুপ্রভা, অন্যান্য সেবিকাগণ এবং ডাক্তার দিবাকর সেন, সর্বোপরি নীলিমা। গল্পটির সর্বাঙ্গে যেন ওষুধ-ওষুধ গন্ধ ছড়ানো।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন। তাঁর বহুবিধ গুণ সত্ত্বেও কবিতা সিংহ গল্পটি এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে মনে হ'তে পারে, এটি একটি উঁচু পর্দায় বাঁধা কাহিনী, ইচ্ছাকৃত। মনে হ'তে পারে সেবিকারা দেহদানের ব্যাপারে প্রায়ই নির্বাচন বা অপেক্ষা মানে না। তপতী ও অন্যান্যদের উল্লেখ না করলেও চূড়ান্ত উদাহরণ নীলিমা : উপর্যুপরি চারবার যে ভ্রূণ-হত্যার সম্মুখীন হয়। ঘটনাগুলি যেন হঠাৎ এসে পড়ে, পাঠককে বারংবার অপ্রস্তুত হ'তে হয়।

জীবনে (যে-কোনো অভিজ্ঞতার জীবন) বোধ হয়, এতখানি আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা নেই; তা কিছুটা মন্থর এবং একই কারণে ক্লান্তিকর। আসলে এই প্রখর সম্ভাবনাময় কাহিনীকে আরও মূল্যবান ক'রে তুলতে হ'লে যে-সুবৃহৎ পরিসরের প্রয়োজন, মাত্র একশোটি পৃষ্ঠা তা মেটাতে পারেনি। তবু বলি, মহিলা লেখিকার পক্ষে এই সাহস এবং প্রয়াস শতবার প্রশংসার্হ।

জলভরা মেঘ—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবা প্রকাশনী, ৬৫।৩ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-১২। দাম—দুই টাকা।

এই নাতিদীর্ঘ কাহিনীতে সিনেমার নাম-করা অভিনেতাও অভিনেত্রীর প্রণয়ের কাহিনী বর্ণিত। উপাখ্যানটি মিলনান্ত। প্রণয়ী-যুগলের মধ্যে মামুলী পন্থায় বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন অভিনেত্রীর জননী।

লিখিত ঘটনাগুলির মধ্যে চমক আছে। বইটি পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু এর এমন কোন সাহিত্যমূল্য নেই যা মনকে স্পর্শ করে। গ্রন্থকারের পরবর্তী গ্রন্থে আরও পরিণত মনের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করি। ১০১।৬২

কিশোর সাহিত্য

[illegible] জাহাজ : বিশু মুখোপাধ্যায়। [illegible] প্রকাশভবন, এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ছোটদের জন্য লিখিত এই বইটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। [illegible] এই [illegible] কাহিনীগুলি [illegible]। [illegible] দু-টি রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে এই বইয়ে, [illegible]

চিত্রপ্রযোজক—অভিনেতা উত্তমকুমার—তাঁর প্রযোজিত 'ভ্রান্তিবিলাস' আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে ফটো—দেশ

ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্য

ফিল্ম এক্সপোর্টস করপোরেশন গঠিত হওয়ার ফলে চিত্রপ্রযোজকরা স্বস্তি অনুভব করবেন। বিশেষ করে স্বল্পবিত্ত চিত্রপ্রযোজকরা এই করপোরেশন দ্বারা যে খুবই লাভবান হবেন তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়-ক্ষেত্র সম্প্রসারণের কোন গঠনমূলক প্রয়াস এতকাল দেখা যায়নি। কিছুকাল আগে সরকার এক্সপোর্ট প্রোমোশান কমিটি নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে এই কমিটির পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয়নি।

বিদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চিত্রপ্রদর্শনের ব্যাপারে চিত্রপরিবেশকরা এখানকার চিত্রব্যবসায়ী ও চিত্রপ্রযোজকদের কাছ থেকে অবাধে নানা সুযোগ আদায় করে থাকেন। এবং বহির্বাণিজ্যের সুফল চিত্রপরিবেশকরাই ভোগ করেন।

নবগঠিত ফিল্ম এক্সপোর্ট করপোরেশন বিদেশে ছায়াছবির পরিবেশন ও ব্যবসায়িক প্রদর্শনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এক কথায় ভারতীয় ছবির বহির্বাণিজ্য এই করপোরেশন দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। চিত্রপ্রযোজকদের তরফ থেকে অথবা স্বয়ং করপোরেশন বিদেশে ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে চিত্রপ্রযোজকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবার এমন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা এর আগে আর দেখা যায়নি। সরকার নবগঠিত করপোরেশনের কাজে চলচ্চিত্র মহলের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। এবং এই আশা রাখি করপোরেশন দলগত স্বার্থের কুচক্রে বাধা না পড়ে সর্বশ্রেণীর চিত্রপ্রযোজকদের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রশংসনীয়ভাবে পালন করে যাবেন।

রাধারাণী পিকচার-এর নির্মীয়মান ছবি "প্রেয়সী"র (পরিচালনা : শান্ত চক্রবর্তী) একটি দৃশ্যাংশে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে কোন একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল মন্তব্য করেন সরকার প্রতি বছরে চলচ্চিত্রশিল্প থেকে কয়েক কোটি টাকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু প্রতিদানে চলচ্চিত্র-শিল্পকে সরকার যা দিচ্ছেন তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয় প্রসঙ্গত তিনি বলেন, কিছুকাল আগে তাঁর সভাপতিত্বে গঠিত চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির কতকগুলি প্রস্তাব আজও পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়নি।

শ্রীপাতিলের এই অকপট উক্তি প্রণিধানযোগ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লিখিত তদন্ত কমিটির কয়েকটি সুপারিশ কার্যে পরিণত করা কেন সম্ভব হল না সে প্রশ্ন স্বভাবতই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের মনে জাগবে। সরকার চলচ্চিত্রশিল্পের নানা সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমানে খুবই সচেষ্ট বলে আমরা জানি। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীপাতিলের উক্তি উপেক্ষণীয় নয়।

অবশ্য এমনও হতে পারে চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটির একাধিক সুপারিশ সরকার গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। আবার এটাও অস্বাভাবিক নয় যে নানা কারণে তদন্ত কমিটির কয়েকটি প্রস্তাব কার্যকর করে তোলা সরকারের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তবে প্রশ্নটি যখন উঠেছে তখন এ ব্যাপারে সরকারের নীরব থাকা মোটেই সমীচীন হবে না। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মন্ত্রীর বক্তৃতায় তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর 'বাদশা' (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে শিশু অভিনেতা শঙ্কর

এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বক্তব্যটিও আমরা জানতে পারব বলে আশা রাখি। চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি সরকারী মনোভাব সম্পর্কে চলচ্চিত্রসেবীদের মনে যাতে কোন সংশয় না জাগে অন্তত সেই কারণেও আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষের বিবৃতি অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে ভি শান্তারামের সেহ্‌রা (ইস্টম্যান কালার)। মরুভূমির পটভূমিতে উপজাতীয়দের রোমাঞ্চকর কাহিনী এ-ছবিতে রূপায়িত। সন্ধ্যা উলহাস প্রশান্ত মনোমোহন কৃষ্ণ ও ললিতা পাওয়ার ছবির প্রধান শিল্পী। প্রযোজক ভি শান্তারাম নিজেই ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

এ ভি এম ফিল্মস-এর "সাহি ফারমান" নামে আর একটি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। কে আনন্দ ছবিটির পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

ভাবমধুর দৃষ্টিনন্দন চিত্রকাব্য

কত ছবিই তো আমরা দেখি কত ছবির কথাই তো ভুলে যাই। কিন্তু এমন ছবিও আমরা দেখি যার স্মৃতি মন থেকে কোনদিনই মুছে ফেলতে পারি না। এমন কী যেন পেয়ে যাই এই ধরনের ছবিতে, যা আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। "নির্জন সৈকতে" (নিউ থিয়েটার্স এক্সজিবিটার্স প্রাইভেট লিমিটেড) ওই শ্রেণীর ছবি।

ছবি বলব? নাকি একটি সম্পূর্ণ রাগিণী? আশ্চর্য এর গীতিময়তা। এবং অবাক হতে হয় এর পরিমিতি দেখে। এতে অপ্রাপ্তী—অন্তরায় পর আক্ষেপ-সঞ্চারীর অকারণ বিস্তার নেই। "নির্জন সৈকতে"র কাব্যগুণ বুঝি আরও বেশী। এ ছবি যেন একটি কবিতা, হৃদয়ের স্বগতোক্তি। কিন্তু এই উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ নয়। এখানেও দেখি আর্টের সেই মহাগুণ—যার নাম পরিমিতি। আর্টের প্রতি এই পরম আনুগত্যের ফলেই ছবিটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে।

'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র পর কালকূটের "নির্জন সৈকতে" গল্পেও আমরা দেখি ভ্রাম্যমান কাহিনীকার নায়ককে। এ গল্পের পটভূমি পুরী। সেখানে বিচিত্র চরিত্রের কত মানুষ সারি বেঁধে এসে দাঁড়ায় তার চোখের সামনে। সে তাদের সুখ দুঃখের নির্লিপ্ত সাক্ষী। ওদের কাহিনী সে লিখবে তার গল্পে। লিখবে না শুধু রেণুর কথা। পুরীর নির্জন সৈকতে মনের মুক্তি খুঁজতে এসেছে রেণু। প্রেমের প্রতিদানে সে পেয়েছে শুধু প্রবঞ্চনা। যন্ত্রণায় সে তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে। মুখে তার হাসি নেই। অসহ্য কষ্ট সয়ে সয়ে কেমন যেন শান্ত স্তব্ধ হ'য়ে গেছে রেণু। রেণুর কথা লিখবে না নায়ক তুলে রাখবে তার মনের কোণে। এ যেন তার ভবঘুরে জীবনের পরম সঞ্চয়। রেণুও বঞ্চিত রইল না। ক্ষণিকের আতিথ্যের মধ্যেই সে খুঁজে পেল তার জীবনসঙ্গী।

ছবিতে আরও কয়টি চরিত্র রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মানসিকতা ও জীবন-বাসনার প্রতিভূ। অনতিপরিসর চিত্রনাট্যে পরিচালক চিত্রনাট্যকার তাদের জীবন্ত করে তুলেছেন, তাদের অন্তরের কথাটি আমাদের অন্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বহু চরিত্রের সঙ্গে সমপ্রাণতা ও আত্মীয়তার অনুভূতিই হচ্ছে শিল্পের রসাস্বাদ। শিল্পরসের এই আস্বাদন থেকে দর্শকদের বঞ্চিত করেননি পরিচালক। তিনি প্রতিটি চরিত্রের মর্মকথা চলচ্চিত্রের নিরুচ্চার ভাষায় মুখর করে তুলেছেন। চলচ্চিত্রের ভাষা এ ছবিতে ভাবকে অবলীলায় প্রকাশ করেছে। এই ভাষা লঘু নয়, এক মহার্ঘ শালীনতায় উদ্দীপ্ত। কিন্তু তার মধ্যে দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি। দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা। কৌতুকের শুভ্রহাস্যে ও দুটি-একটি ব্যঞ্জনার বিস্ময়ের চমকে অনায়াসে ছবিতে রসবস্তু গড়ে উঠেছে। জ্যোৎস্না রাতে দুই বিধবার সমস্বরে "এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল" গান করার মুহূর্তটি উল্লেখ্য। এ নিছক কৌতুক নয়, হাসি আর গানের মধ্যে কোথায় যেন ওতে এক টুকরো বেদনা লুকিয়ে রয়েছে। বিধবাদের চরিত্র যেভাবে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তাঁর অপরিসীম রসবোধের পরিচয় মেলে। ছবিটি দেখার কালে তাদের অন্তরের কান্নাটি যেন আমরা শুনতে পাই। শুধু তাদের কান্নাই নয়, সারা ছবিতে একটি অনুভবের করুণ সুর যেন ছড়িয়ে রয়েছে। কান পেতে তা শোনা যায়।

উদয়গিরির দেবালয়ের অলিন্দে বাঁশীর সুরে সুরে যখন রেণু প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে চলে, ওই সুখমুহূর্তটিও দর্শকের দুই চোখ সজল করে তোলে। দুঃখের পাষাণভার সরে যায়, অহল্যা যেন প্রাণ ফিরে পায়। রেণুর সুখ আমাদের চোখে আনন্দের অশ্রুকণা নিয়ে আসে। ছবির এই আবেগ জীবনরস সঞ্জাত, জীবনবোধের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। মেলোড্রামার জগদ্দল পাথরে জীবন এ ছবিতে নিষ্পিষ্ট নয়। জীবন এ ছবিতে সহজ, সরল; এর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকণা নিয়েই ছবির যা কিছু নাট্যরস।

রেখাঙ্কণের কৌশল যেমন শুধু বস্তুকেই আঁকে না তার অন্তরকেও প্রকাশ করে তেমনি নিখুঁত শিল্পকর্মের মত এই ছবিতে ছোট ছোট কয়েকটি মুহূর্তের অন্তরালে একটি ভাবলোক গড়ে উঠেছে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ভাবকণার সমীকরণ করাই যদি রস-সৃষ্টির ধর্ম হয় তবে বলব সে সৃষ্টির কাজে পরিচালক তপন সিংহ বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্র ও তাদের বিভিন্ন ভাবধারাকে একটি সংহত নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিয়েছেন তিনি ছবিতে। এ ঠিক নাটক নয়, নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা জীবনের চিত্রকল্প।

বিষয়বস্তু বিন্যাসেও শ্রীসিংহের বৈদগ্ধ্য দেখবার মত। জটিলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের এমন এক প্রসাদগুণ এ ছবিতে আছে যা দর্শকের মনকে সজাগ ও মুগ্ধ করে রাখে। রেণুর মনের নবজন্মের মুহূর্তগুলি তিনি অপরূপ ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন। দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদে কেমন করে মানুষের জীবনের দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত হয় তারও ভাবব্যঞ্জনা তিনি চমৎকারভাবে গড়ে তুলেছেন কোনারকের সূর্যমূর্তিকে কেন্দ্র করে। ছবির মধ্যে এসেছে বক্তব্যের অতিরিক্ত উপরিপাওনা যাতে প্রকাশ পায় জীবনদর্শন। পরিচালক যে ভাবাদর্শ ছবিতে অনুসরণ করেছেন তা থেকে ঈশ্বরবিশ্বাস বাদ যায়নি। আর এতে রয়েছে পরিপূর্ণ আশাবাদ —যা জীবনের বঞ্চনা, বিড়ম্বনা ক্ষয়-ক্ষতির কাছে নতি স্বীকার করে না। ছবির এই বক্তব্য—যা মনকে উন্নত করে কোথাও কোন মুহূর্তের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে নি।

পুরীর পটভূমিতে তোলা এই ছবির দৃশ্য সৌন্দর্য দর্শকের দৃষ্টিকে অভিভূত করে রাখে। দৃশ্যগঠনেও পরিচালক অসামান্য শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে ছবিটি একটি দৃশ্যকাব্যে পরিণত হয়েছে।

ছবি শুরু হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে। পুরীর গাড়ীর চাকা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই কাহিনীর গতি এগিয়ে চলে। হাওড়া স্টেশন এবং গাড়ীর যাত্রীদের দৃশ্য উপস্থাপনে পরিচালকের সচেতন বাস্তববোধ লক্ষণীয়। এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী যাত্রীদের দেখবার মত আবহসংগীতের পরিবর্তনটিও

ভি শান্তারাম প্রোডাকশন্স-এর 'সেহ্‌রা' (পরিচালনা-প্রযোজনা : ভি শান্তারাম) ছবির নায়িকা সন্ধ্যা

লক্ষ্য করবার মত। সংগীতের ব্যবহার এ ছবিতে সংযত শিল্পসম্মত। কোন কোন মুহূর্তে সংগীতের প্রয়োগ ছবিতে ভাব-মাধুর্য এনে দিয়েছে। "দেখ দেখ শুকতারা আঁখি মেলে চায়" রবীন্দ্র গানটি দিয়ে পরিচালক ছবিতে সুন্দর একটি ভাবমণ্ডল গড়ে তুলেছেন। "পথ দিয়ে কে যায় গো চলে" গানটি সুপ্রযুক্ত নয়। এই গানের প্রয়োগ কৃত্রিম মনে হয়েছে। হোটেল-মালিক যেন গানটি শোনাবার জন্যই রেডিওটি খুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অল্প অবকাশে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক ছবির চরিত্রগুলিকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু মনে হয়েছে রেণু বাদে আর সকলেই যেন নায়কের দৃষ্টিপথেই শুধু আনাগোনা করেছে, তার ভূয়োদর্শনের মানস-পরিক্রমার পথে যেন কোন আঁচড় কেটে যায় নি। কাহিনীকার-নায়কের মাধুকরীর ভাণ্ড শুধু রেণুই পূর্ণ করে তুলেছে, আর কেউ নয়। নায়ক নিরাসক্ত দ্রষ্টা বলে কি দেখা-শোনা-জানা চরিত্ররা তার মনে কোন দাগ রেখে যাবে না ?

রেণুর পূর্বপ্রণয়ের ঘটনাটি পরিচালক ফ্ল্যাশ-ব্যাকে প্রশংসনীয়ভাবে উপস্থিত করেছেন। ওই অংশের দৃশ্যগুলিতে কলকাতার নাগরিক জীবনের বাস্তব রূপটি পরিস্ফুট।

কাহিনীকার-নায়ক ও বেণুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় এমনিতে সাবলীল। কিন্তু কাহিনীকার-নায়কের চরিত্রের গভীরতা তাঁর অভিনয়ে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে পারত। যেখানে শিল্পী নায়িকাকে প্রেরণা দিচ্ছেন ও ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা বলছেন, ওই মুহূর্তে তাঁর অভিনয় প্রাণবন্ত।

শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত চরিত্রের অব্যক্ত বেদনা তাঁর অভিব্যক্তিতে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অভিনয়ের কমনীয়তা ও পরিশীলিত বাচনভঙ্গি বিশেষভাবে [illegible] সঙ্গে নতুন সুখের হিল্লোল জাগায় [illegible] তাঁর অভিনয়রীতি মনোগ্রাহী। পূর্ব-প্রণয়ীকে প্রত্যাখ্যান করার সময়েও তিনি অভিনয়শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিতে চারজন বিধবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, ভারতী দেবী ও সুমা গুহঠাকুরতা। প্রত্যেকেই এত স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন যে মনেই হয় না ও'রা ছায়াছবির শিল্পী। এ'দের মধ্যে কারোর নাম যদি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন ভারতী দেবী। যে মনোজ্ঞ অভিনয়ের প্রমাণ তিনি দিয়েছেন তা সত্যিই বিরল।

অল্প অবকাশে এক জীবনরসিকের চরিত্র নিপুণ দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন পাহাড়ী সান্যাল। তাঁকে এক নতুন ধরনের ভূমিকায় ছবিতে দেখা যাবে, এবং ভাল লাগবে। রবি ঘোষকে এক ওড়িয়ার চরিত্রে অতিমাত্রায় সপ্রতিভ মনে হলেও তিনি দর্শকের হাসিয়েছেন খুব। জনৈক গেরুয়াধারী বৈষ্ণবের চরিত্রে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় চিত্তগ্রাহী।

বেণুর পূর্ব-প্রেমিকের ভূমিকায় উপমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সাবলীল, চরিত্রানুগ। অন্যান্যদের মধ্যে সুঅভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী ও অমর মল্লিক। পার্শ্বচরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন রথীন ঘোষ, খগেশ চক্রবর্তী শাল্মু বর্মন প্রভৃতি।

এ ছবির মাধ্যমে সংগীত-পরিচালক কালীপদ সেন খুবই সুনাম অর্জন করবেন। 'থিম-মিউজিক" ছবির মর্মসুরটি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছে এবং ছবিটিকে সাংগীতিক মাধুর্যে ভরে তুলেছে। এমন রসস্নিগ্ধ রাগাশ্রয়ী আবহসুর অনেককাল শোনা যায় নি। মহাকালের ডঙ্কার ভাবদ্যোতক 'এফেক্ট মিউজিক" কোণারক ও উদয়গিরির ঐতিহাসিক পরিবেশে চমৎকার মানিয়েছে। এই মিউজিক-এর প্রয়োগ গভীর কল্পনা শক্তির পরিচয় দেয়।

বিমল মুখোপাধ্যায়ের আলোকচিত্রগ্রহণ এ ছবির প্রধান সম্পদগুলির অন্যতম। তাঁর হাতের ক্যামেরা ছবির "মুড"টি যেন সর্বক্ষণ অনুসরণ করেছে, ইনডোর-আউটডোরের বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে আলো-অন্ধকার প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছে। এ ছবিতে অন্ধকার আছে জ্যোৎস্না আছে। ক্যামেরার এমন সুষ্ঠু কাজ বাংলা ছবিতে কমই দেখা যায়।

কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রথমেই প্রশংসা পাবেন সুনীতি মিত্র (শিল্পনির্দেশনা), দেবেশ ঘোষ ও শচীন চক্রবর্তী (বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণ), এবং অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্যের শব্দগ্রহণ)। এ'দের প্রত্যেকের কাজ খুবই সন্তোষজনক। পুরীর ধর্মশালা, হোটেল ও ওড়িয়ার বাসগৃহের সেট তৈরিতে সুনীতি মিত্র শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

মিনাক্ষি দাসের নৃত্য উপভোগ্য। কেলুচরণ মহাপাত্রের নৃত্যপরিচালনা প্রশংসার দাবি রাখে।

"লেডি উইথ দি লিটল ডগ"

কলকাতার চিত্রামোদীরা সম্প্রতি বহুপ্রশংসিত রুশ চিত্র 'লেডি উইথ দি লিটল ডগ' দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন রুশ দূতাবাস কালচারাল ... ক্লাব অব কালচার ও ফিল্ম গ্রুপ

প্রাক্-বিপ্লব যুগের যশস্বী লেখক

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদারের নির্মীয়মান ছবি 'জীবনকাহিনী'র গানে কণ্ঠদান করছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ। হরিদাস ভট্টাচার্য চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। অনতিবিলম্বেই ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

ছায়াসূর্য

প্রযোজক আর ডি বনসালের "ছায়াসূর্য"র মুক্তিলগ্ন আসন্ন। পার্থপ্রতিম চৌধুরী ছবিটি পরিচালনা করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী রচিত কাহিনীর এই চিত্ররূপের প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর নির্মলকুমার বিকাশ রায়, মলিনা দেবী পাহাড়ী সান্যাল, কল্যাণী ঘোষ প্রভৃতি। ভি বালসারা সংগীত পরিচালক

হাসি শুধু হাসি নয়

তপন ও চক্রবর্তী প্রযোজিত ইন্দ্রাণী প্রোডাকশন্স-এর **"হাসি শুধু হাসি নয়"** ছবিটি অনতিবিলম্বেই মুক্তিলাভ করছে। এই কমেডি ছবির বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ, কল্যাণী ঘোষ জহর রায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্যামল মিত্র ছবির সংগীত পরিচালক।

বান্দিনী

প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায়ের নতুন ছবি **"বান্দিনী"** অবিলম্বে মুক্তি পাচ্ছে। জরাসন্ধর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এই ছবির মূল চরিত্রে অবতরণ করেছেন অশোককুমার, নূতন ও ধর্মেন্দ্র। শচীনদেব বর্মন সংগীত পরিচালনা করেছেন।

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের নাম শিল্প-রসিকদের কাছে অবিদিত নয়। অল্পকালের মধ্যেই ইয়ুথ কয়ার কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে গত ১৬ই মে থেকে কয়ারে তিন দিনব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংগীত ও লোকনৃত্য। কয়ার-এর শিল্পীদের সম্মেলক গান শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করে।

দ্বিতীয় দিনে কয়ার নিবেদন করেন রবীন্দ্রনাথের **"বাল্মীকি প্রতিভা"**। এই গীতিনাট্যের নামভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন অরূপ গুহঠাকুরতা। লক্ষ্মীর রূপসজ্জায় অংশ গ্রহণ করেন রুমা গুহঠাকুরতা। এই গীতিনাট্যের পরিচালনা, আলোকনিয়ন্ত্রণ, নৃত্যপরিচালনা ও রূপসজ্জার দায়িত্ব নির্বাহ করেন যথাক্রমে অরূপ গুহঠাকুরতা, তাপস সেন, অসিত চট্টোপাধ্যায় ও রুমা গুহঠাকুরতা এবং মদন পাঠক। তৃতীয় দিনে বিহারের লোকসংগীত পরিবেশন করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র। **"মগধ সংঘ"** নামে একটি সংস্থা তাঁরা গড়ে তুলেছেন। তা ছাড়া ওইদিন লোকনৃত্য ও ভারতনাট্যম পরিবেশন করেন সুস্মিতা ভট্টাচার্য। নাগা নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন অসিত চট্টোপাধ্যায় গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুপদ দাশের লোকসংগীত এবং মঘাই ওঝার ঢোলক-বাদ্য সেদিনকার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। ইয়ুথ কয়ারের তিন দিনব্যাপী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

* সাংস্কৃতিকী *

কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে ২০শে মে মহাজাতি সদনে **অভিনেতৃ সংঘের** সদস্যরা রবীন্দ্রনাথের মালিনী মঞ্চস্থ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অনুপকুমার, প্রেমাংশু বসু, চন্দ্রশেখর, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দাশগুপ্ত, সুশীল দে, মনোজ বিশ্বাস সুনন্দা দেবী, বাসবী নন্দী, কবিতা সরকার, তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, অণিমা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বোম্বাইয়ে বিগত ৮ই এপ্রিল রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় দুর্গাবাড়ী সমিতি। মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল শা উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

উৎসবে শ্যামল গুহর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "তাসের দেশ" নাটক মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে প্রথমেই উল্লেখের দাবি রাখেন সদাগরের ভূমিকায় শান্তু চট্টোপাধ্যায়। তা ছাড়া রুমা দত্ত, ... ভট্টাচার্য, ... চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ

(উপরে ও মাঝখানে) উত্তমকুমার ফিল্মস-এর 'ভ্রান্তিবিলাস' ছবির বিভিন্ন দৃশ্যে উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা বসু, তরুণকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (নীচে) কর্মরত তিনজন চিত্রপরিচালক—বাঁদিক থেকে—মানু সেন (ভ্রান্তিবিলাস), অগ্রদূতগোষ্ঠীর বিভূতি লাহা (বাদশা) এবং মৃণাল সেন (প্রতিনিধি)

ফটো—দেশ

ইন্দ্রাণী প্রোডাকশন্স-এর "হাসি শুধু হাসি নয়" (পরিচালনা : নবগোষ্ঠী) ছবিতে কল্যাণী ঘোষ

গুহ অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মনোজ্ঞ অভিনয় দর্শকের অন্তর জয় করে।

সোমা গাঙ্গুলী মেয়েদের নৃত্যাংশ রচনায় যথেষ্ট কল্পনার পরিচয় দেন। সংগীতাংশ আলোকসম্পাত, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা ছিল সুন্দর।

সম্প্রতি খ্যাতনামা মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় মূকাভিনয় প্রদর্শন করে এসেছেন। ইস্টার্ন রেলওয়ে ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুল রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় জেম রাউন হলে গত ১১ই মে তিনি আড়াই ঘণ্টাব্যাপী একক অনুষ্ঠান মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। শ্রীদত্ত এবার কয়েকটি নতুন মূক অভিনয় পরিবেশন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবহসংগীতে রবীন সরকার, আলোকসম্পাতে বিমল দাস ও রূপসজ্জায় অনন্ত দাস। অনুষ্ঠানে সংগৃহীত সমস্ত অর্থই জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করা হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আসন্ন বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গুরু দত্ত ফিল্মস-এর সাহেব বিবি ঔর গুলাম ছবিটি প্রদর্শিত হবে। উৎসবের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য ছবিটি কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে

টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের নির্মীয়মাণ ছবি উইনস্টন অ্যাফেয়ার-এর কয়েকটি দৃশ্য ভারতে গৃহীত হবে বলে জানা গেল। চলচ্চিত্রটি রবার্ট মিচামকে নিয়ে তোলা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের উদ্যোগে চণ্ডীগড়ে আগামী জুলাই মাসে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এক্জিবিশন-এর অন্তর্গত আকর্ষণ হিসাবেই চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

বোম্বাই সমাচার

দিলীপকুমারের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের এগারোজন শিল্পী জওয়ানদের আনন্দ দানের জন্য গত সপ্তাহে নেফা অঞ্চলে রওয়ানা হয়েছেন। শিল্পীদের মধ্যে মহম্মদ রফি ও আগা রয়েছেন।

মীনাকুমারী ও রাজ কাপুরকে একসঙ্গে দেখা যাবে এ-এল-আই প্রোডাকশন্স এর মেরে হাম সফর হিন্দী ছবিতে। সম্প্রতি ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। হৃষীকেশ মুখার্জি ছবিটির পরিচালক। রোশন সংগীত পরিচালক।

নবগঠিত কে-পি-কে মুভীজ ভগৎ সিং-এর জীবনী অবলম্বনে হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষায় ছবি তৈরি করছেন। ভগৎ সিং ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন মনোজকুমার।

পরিচালক এস সাদিকের পরবর্তী ছবিতে মীনাকুমারী ও প্রদীপকুমার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবেন। মুসলমান সমাজের কাহিনী নিয়ে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। মদনমোহন সুর রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ ও ওয়াহীদা রেহমানকে প্রযোজক মোহন সায়গলের পরবর্তী ছবিতে একসঙ্গে দেখা যাবে। ছবির নাম এখনও ঠিক হয়নি। কিন্তু চিত্রগ্রহণ নিয়মিত এগিয়ে চলেছে। নাজ, রাজেন্দ্রনাথ সবিতা চট্টোপাধ্যায়, মদন পুরী প্রভৃতি ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী। নরেন্দ্র সুরি চিত্র পরিচালক। কল্যাণজী আনন্দজী সংগীত পরিচালক।

হেমন্তকুমারের কণ্ঠে সম্প্রতি ছবির একটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানটি থাকবে বিশ্বজিতের মুখে।

প্রযোজক-অভিনেতা কিশোরকুমারের দূর গগন কি ছাঁও মে ছবির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত প্রায়। কিশোরকুমার এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। সুপ্রিয়া চৌধুরী ছবির নায়িকা। কিশোরকুমারের পুত্র অমিত গাঙ্গুলী ছবিতে একটি উল্লেখযোগ্য শিশু-চরিত্রের শিল্পী।

শ্রীনগরে প্রযোজক কে এস প্রকাশের আয়ী মিলন কি বেলা (ইস্টম্যান কালার) ছবির দৃশ্য বহির্ভাগে গৃহীত হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই ছবিটি মুক্তিলাভ করবে। রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রাবানুকে সর্বপ্রথম একসঙ্গে এই ছবিতে দেখা যাবে। মোহন-কুমার ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

একলব্য

বেটন কাপের ফাইন্যাল এবং প্রথম ডিভিসন হকি লীগের বাকি খেলাটি শেষ হবার সংগে সংগে কলকাতার হকি মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। ফুটবল লীগের খেলাও জমতে আরম্ভ করেছে।

শুধু কলকাতা কেন, ভারতের প্রধান প্রধান হকি প্রতিযোগিতার খেলাও বাকি নেই। আপনারা জানেন, এবার হকির তিনটি প্রধান প্রতিযোগিতার মধ্যে গোল্ড কাপ পেয়েছে পাঞ্জাব পুলিস, আগা খাঁ কাপ ঘরে তুলেছে নর্দার্ন রেল বেটন কাপ লাভ করেছে সেণ্ট্রাল রেল। আর কলকাতার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, বোম্বাইয়ের লীগ বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে ওয়েস্টার্ন রেল। এর আগে মাদ্রাজে আয়োজিত জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলায় ভারতীয় রেল দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। সুতরাং রেল দলগুলিরই এবার জয়জয়কার। জাতীয় হকির বিজয়ীর সম্মান সমেত আগা খাঁ কাপ ও বেটন কাপ রেলের ঘরে গিয়েছে। ওয়েস্টার্ন রেল হয়েছে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন, রানার্স সেণ্ট্রাল। বি এন রেল পেয়েছে কলকাতা হকি লীগের তৃতীয় স্থান। বেটনের সেমি ফাইন্যালে খেলেছে ইস্টার্ন রেল। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট সাঁতার, টেবিল টেনিস সমস্ত রকমের খেলাধুলাতেই রেলের খেলোয়াড়রা দিন দিন প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে। কিন্তু এবারকার হকিতে তাদের যেমন স্পষ্ট প্রাধান্যের পরিচয় মিলেছে এমন প্রাধান্য আগে দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল—মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনবারই ফাইন্যালে খেলার কৃতিত্ব সমেত দুবার বেটন কাপ জয় সেণ্ট্রাল রেলের কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রথমবারের ফাইন্যালে সেণ্ট্রাল রেল শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিসকে হারিয়ে বিজয়ী হয়। গতবারের ফাইন্যালে পরাজয় স্বীকার করে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে। এবার ইস্ট বেঙ্গলকেই ফাইন্যালে ২—০ গোলে হারিয়ে গতবারের পরাজয়ের শোধ তুলেছে এবং কলকাতার তিন শক্তিশালী দল মহমেডান স্পোর্টিং মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গলকে একে একে হারিয়ে লাভ করেছে বেটন কাপ।

বেটন ফাইন্যালে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে সেণ্ট্রাল রেলের জয় যোগ্যের যোগ্য পুরস্কার লাভ বলা যেতে পারে। যদিও দুটি গোলের ক্ষেত্রে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা আছে—তবু তুলনামূলক বিচারে ইস্ট বেঙ্গলের চেয়ে সেণ্ট্রাল রেল অনেক ভাল খেলেছে। অবশ্য আক্রমণ রচনার দিক দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল প্রতিপক্ষের তুলনায় কম আক্রমণ করেনি, বরং ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণের সংখ্যা কিছু বেশীই ছিল, কিন্তু ক্রীড়াধারায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল না, আর ছিল না ইস্ট বেঙ্গলের খেলায় প্রাণের সাড়া। কোয়ার্টার ফাইন্যালে বোম্বাই লীগ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্টার্ন রেল বা সেমি-ফাইন্যালে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের বিরুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল যে উন্নত ক্রীড়াধারার স্বাক্ষর রেখেছিল, ফাইন্যালে সেণ্ট্রাল রেলের বিরুদ্ধে তার আদৌ পরিচয় দিতে পারেনি। ফলে একই বছরে একসঙ্গে বেটন ও লীগ বিজয়ীর সম্মান লাভ আর সারা মরসুমে অপরাজিত থাকার সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। কলকাতার

বেটন কাপ

আর আর শক্তিশালী দলের মধ্যে মোহনবাগান কাস্টমস মহমেডান স্পোর্টিং বি এন আর— কারো খেলাই তেমন চোখে লাগেনি। ফলে বেটন কাপের খেলা তেমন জমেনি। নিচে সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হল:

প্রথম রাউণ্ড

রাজস্থান (১) : পাঞ্জাব স্পোর্টস (০)
এরিয়ান (১) (০) (২) (১) : হুগলী জেল (১) (০) (২) (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

মহঃ স্পোর্টিং (২) : রাজস্থান (০)
দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (২) : আর্মেনিয়ান্স (১)
মোহনবাগান (১) : পুলিস (০)
ইস্টার্ন রেল (২) : ২৪ পরগনা (০)
গ্রীয়ার (১) (১) : মণিপুর (১) (০)
পোর্ট কমিশনার্স (২) : খালসা ব্লুজ (০)
বি এন আর (৭) : উয়াড়ী (০)
রেঞ্জার্স (ওঃ ওঃ) : নর্থ ইস্টার্ন রেল (স্ক্র্যাচ)
কাস্টমস (৩) : ওঃ বেঃ পুলিস (১)
এরিয়ান (ওঃ ওঃ) : মীরাট ফ্রেন্ডস ক্লাব (স্ক্র্যাচ)

তৃতীয় রাউণ্ড

সেণ্ট্রাল রেল (১) : মহঃ স্পোর্টিং (০)
মোহনবাগান (২) : দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (০)
ইস্টার্ন রেল (২) : ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী (১)
গ্রীয়ার (ওঃ ওঃ) : নর্দার্ন রেল (স্ক্র্যাচ)
এম ই জি (৭) : পোর্ট কমিশনার্স (০)
বি এন আর (১) : রেঞ্জার্স (০)
ওয়েস্টার্ন রেল (৩) : কাস্টমস (১)
ইস্ট বেঙ্গল (২) : এরিয়ান (০)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

সেণ্ট্রাল রেল (১) (২) : মোহনবাগান (১) (১)
ইস্টার্ন রেল (১) (১) : গ্রীয়ার (১) (০)
এম ই জি (১) : বি এন আর (০)
ইস্ট বেঙ্গল (১) : ওয়েস্টার্ন রেল (০)

সেমি ফাইন্যাল

সেণ্ট্রাল রেল (০) (০) (২) : ইস্টার্ন রেল (০) (০) (০)
ইস্ট বেঙ্গল (৩) : এম ই জি (০)

ফাইন্যাল

সেণ্ট্রাল রেল (২) : ইস্ট বেঙ্গল (০)

★

কলকাতার ফুটবলের দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গল ক' বছর ধরে হকিতেও দুই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের খেলাকে কেন্দ্র করেই হকি মরসুমের যা কিছু উৎসাহ উদ্দীপনা। বাকি ক্লাবগুলির শক্তি ক্রমক্ষীয়মাণ।

আপনাদের অজানা নেই, এই দুই প্রধানের একটি খেলার উপরই প্রথম ডিভিসন হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার প্রশ্ন ঝুলে ছিল। কারণ ১৮টি করে খেলায় দুদলই সংগ্রহ করেছিল সমান পয়েন্ট। বলা বাহুল্য, বেটন কাপের ফাইন্যাল খেলার পরের দিন দুই প্রধানের এই বাকি খেলায় ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ১—০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়ে দিয়ে অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব সমেত লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।

হকি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে অবশ্য কোন নতুন সম্মান নয় বরং বেটন কাপে সেণ্ট্রাল রেলের কৃতিত্বের মতই গত ৪ বছরে ইস্টবেঙ্গলের লীগ অভিযান কৃতিত্বে ভাস্বর। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম লীগ বিজয়ীর সম্মান অর্জনের পর পরের বছর কাস্টমস ক্লাবের সংগে ইস্ট বেঙ্গল যুগ্ম চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান পায়। গতবার অল্পের জন্য চ্যাম্পিয়নশিপ হাতছাড়া হলেও লীগ এবং সারা মরসুমে থাকে অপরাজিত। আর এবার তো অপরাজিত থেকেই চ্যাম্পিয়ন-শিপ লাভ করেছে।

গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাবের এবারকার হকি মরসুমকে এক কথায় বলা যায়—অসন্তোষজনক সূচনার পর

প্রথম ডিভিসন হকি লীগের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব (বাঁ দিক থেকে দাঁড়িয়ে) বাল, কুশলকুমার (অধিনায়ক), আনিস-উর-রহমান, জারনেল সিং, চতুর্বেদী ও বলাকং সিং; (বাঁ দিক থেকে বসে) ইন্দার জিৎ সিং, ইনাম-উর-রহমান, কাপুর, বীর সিং ও কমওয়েল

ফটো—দেশ

নৈরাশ্যজনক পরিসমাপ্তি। যে মোহনবাগান প্রতিপক্ষ দলের গলায় গোলের মালা পরিয়ে ১৪টি খেলায় করেছিল ৭৯টি গোল, খেয়েছিল মাত্র একটি, সেই মোহনবাগান শেষ পাঁচটি খেলায় পাঁচটির বেশী গোল করতে পারেনি, খেয়েছে তিনটি, শুধু তাই নয়, ১৭টি খেলায় উপর্যুপরি জয়ের পর শেষ দুটি খেলায় বি এন আর ও ইস্ট বেঙ্গলের কাছে পরাজয় কিছুটা অপ্রত্যাশিত। সত্যি কথা বলতে কি এ দুটি খেলাতেই মোহনবাগান পরাজিত দলের মত খেলে হেরে গেছে। খেলার মধ্যে প্রাণের সাড়া মেলেনি। সব মিলিয়ে মনে হয়, কোথায় যেন কি গোলমাল ছিল।

বলা বাহুল্য, মোহনবাগানের বোম্বাই সফর মোটেই শুভ হয়নি। বোম্বাইয়ে গোল্ড কাপের খেলার সেমি ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিসের কাছে শোচনীয়ভাবেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল। সেমি ফাইন্যালে পরাজিত দুটি দলের খেলায় হার স্বীকার করেছিল নর্দার্ন রেলের কাছে। একই টীম আগা খাঁ কাপের খেলায় মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল। ফলে বোম্বাই থেকে খালি হাতেই মোহনবাগানকে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। কলকাতায় ফিরে এসে বেটনের খেলায় পুলিস ও দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট দলকে কোনভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হলেও কোয়ার্টার ফাইন্যালে সেণ্ট্রাল রেলের কাছে মোহনবাগান হার স্বীকার করে। লীগের বাকি দুটি খেলায় হার স্বীকার করে বি এন আর ও ইস্ট বেঙ্গলের কাছে। অথচ দলগত শক্তি অনুযায়ী মোহনবাগানের হকি মরসুম এমন নিষ্ফল হবার কথা নয়।

এ বছর লীগের খেলায় যত গোল হয়েছে, অন্য কোন বছর এত গোল হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ১০ জন খেলোয়াড় গোল করেছেন ৫২৬টি। হ্যাটট্রিকই হয়েছে ২৪ বার। যে ১৮জন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক করেছেন তাঁদের মধ্যে মোহনবাগানের যোগীন্দার সিং-এর হ্যাটট্রিকের সংখ্যাই চার। তিনি করেছেন সবার চেয়ে বেশী মোট ৩৫টি গোল। তারপরই ইস্ট বেঙ্গলের উঠতি খেলোয়াড় ইনাম-উর-রহমান—দুবার হ্যাটট্রিক সমেত ২৫টি গোল করেছেন। একটি হ্যাটট্রিক সমেত গোল সংখ্যায় তৃতীয় স্থানে আছেন বি এন রেলের জি ডি সিং। তিনি করেছেন ২৩টি গোল। খুব বেশী গোল করতে না পারলেও রেঞ্জার্সের আর পিটার্স ও ইস্টার্ন রেলের এন হক দুবার করে হ্যাটট্রিক করেছেন।

সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৪০ জন খেলোয়াড় নিয়ে লীগের ১৯টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ভবানীপুর ক্লাব সবচেয়ে কম, মাত্র ১৫ জন নিয়ে খেলেছে ইস্টার্ন রেল। মাত্র ১৭ জন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে ইস্ট বেঙ্গলের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ সে দিক দিয়ে কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাও আবার কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড়ের সাহায্য ব্যতিরেকেই ইস্টবেঙ্গলকে অনেকগুলি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। নিচে প্রথম ডিভিসনের লীগ টেবল দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে লীগে বিভিন্ন দলের অবস্থার আন্দাজ করা যাবে।

প্রথম ডিভিসন হকি

লীগ টেবল

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৯	১৭	২	০	৬১	৩	৩৬
মোহনবাগান	১৯	১৭	০	২	৮৪	৪	৩৪
বি এন আর	১৯	১৬	১	২	৫২	৭	৩৩
মহঃ স্পোর্টিং	১৯	১৪	২	৩	৩২	৮	৩০
কাস্টমস	১৯	১১	৪	৪	৪১	১১	২৬
ইস্টার্ন রেল	১৯	৯	৪	৬	৩৬	১১	২২
গ্রীয়ার	১৯	৬	৮	৫	২০	১৮	২০
রেঞ্জার্স	১৯	৭	৫	৭	২৫	২১	১৯
অঃ কোঃ পুলিস—							
	১৯	৭	৫	৭	২৪	২৫	১৯
খালসাহীরো	১৯	৫	৯	৫	১০	২১	১৯
পুলিস	১৯	৫	৮	৬	২২	২৫	১৮
পোর্ট কমিঃ	১৯	৫	৬	৮	২০	২৫	১৬

দল							
পাঞ্জাব স্পোর্টস—	১৯	৪	৮	৭	১২	২৮	১৬
উয়াড়ী	১৯	৪	৬	৯	১৭	৩৭	১৪
রাজস্থান	১৯	৩	৭	৯	১০	২০	১৩
এরিয়ান	১৯	৪	৫	১০	১৭	৩০	১৩
আর্মেনিয়ান্স—	১৯	৩	৬	১০	১৩	৩৮	১২
ভবানীপুর	১৯	৩	৫	১১	৬	৩৭	১১
আদিবাসী	১৯	৩	৪	১২	১১	৪৯	১০
ক্যালকাটা	১৯	০	০	১৯	৭	১০৪	০

*

গত ১৪ই মে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কলকাতা ময়দানের নতুন অঙ্গনে মোহনবাগান ক্লাবের নতুন তাঁবুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। ইডেন উদ্যানের দক্ষিণ দিকে এবং ক্যালকাটা মাঠের পশ্চিমে কিংসওয়ে সংলগ্ন জমিতে যেখানে মোহনবাগান ক্লাবের নতুন 'খেলা-ঘরের' ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে সেখানেই গড়া হবে ৬০×৭০ ফুট পরিমাণের নতুন তাঁবু।

দীর্ঘ ৭৪ বছর আগে, অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতার ফড়েপুকুর ও সার্কুলার রোডের মোড়ে পরলোকগত কীর্তি মিত্রের বাড়ির মাঠে মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম সূচনা। কীর্তি মিত্রের প্রাসাদোপম অট্টালিকা মো-হ-ন-বা-গা-ন-এর নাম অনুসারেই ক্লাবের নামকরণ। অল্প পরিসর জায়গায় ক্লাবের প্রয়োজন না মেটায় দু বছর পরে ক্লাবটি উঠে গিয়েছিল পরলোকগত মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার শ্যামপুকুর মাঠে। যে মাঠের বর্তমান নাম শ্যাম স্কোয়ার। কিছুদিন পরে ময়দানে খেলাধুলার জন্য ময়দানেই আস্তানা বাঁধার প্রয়োজন অনুভব করেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। ফলে ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী মাঠে (বর্তমানে বসুশ্রী ও আশুতোষ কলেজ মাঠ) প্রেসিডেন্সী কলেজের টেন্ট ব্যবহারের সুযোগ পায় মোহনবাগান ক্লাব এই মাঠে থাকতেই ১৯১১ সালে তাদের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে ঐতিহাসিক বিজয়লাভ। ১৫ বছর প্রেসিডেন্সী মাঠে থেকে ১৯১৬ সালে আবার মাঠ বদল। এবার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দিকের মাঠ যেটা প্রথমে মোহনবাগান মাঠ এবং পরে মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল মাঠ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। ৪৬ বছর পরে পুরনো আবাস ছেড়ে মোহনবাগান এসেছে নতুন আবাসে।

মোহনবাগানের নামের সঙ্গেই ক্রীড়ামোদীদের একটা মোহ জড়িয়ে আছে। একটু একটু করে ক্লাবের বিরাট ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, খেলোয়াড়দের ক্রীড়াদক্ষতা সমৃদ্ধ করেছে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্র তাদের বর্ণোজ্জ্বল ক্রীড়াছন্দে আলোকিত হয়েছে ভারতের ক্রীড়া গগন। বাংলা ও ভারতের ক্রীড়ারসিকদের মনের মধ্যেই যে ক্লাবের আস্তানা বাঁধা সে ক্লাবের নতুন আবাসের মূল্য বাহ্যিক দিক দিয়ে হয়তো মূল্যহীন। তবু ক্যালকাটা

মোহনবাগান ক্লাবের নতুন তাঁবুর ভিত্তি প্রস্তর। গত ১৪ই মে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ময়দানের নতুন অঙ্গনে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন ফটো—দেশ

মাঠেরও একটা ঐতিহ্য আছে। বহু ঐতিহাসিক ফুটবল সংগ্রামের পীঠভূমি ক্যালকাটা মাঠ। দেশ-বিদেশের বহু কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়ের পদধূলিপূত ক্যালকাটা মাঠ অতীত দিনের অদ্ভুত খেলার সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এক কথায় বলা যায় সবার পরম পবিত্র করা ক্যালকাটা মাঠ। গঙ্গার তীরের স্নিগ্ধ সমীর যার অন্যতম আকর্ষণ। এমন মাঠে আস্তানা বাঁধার একটু নৈতিক মূল্য আছে বৈকি।

বাংলার পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯১১ সালে গোল পোস্টের পিছনে দাঁড়িয়ে আই এফ এ শীল্ডের ঐতিহাসিক ফাইনাল খেলায় ব্রিটিশ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে মোহনবাগানের জয়ের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ দেখেছিলেন। আজকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মোহনবাগানের নতুন তাঁবুর ভিত্তি স্থাপন করতে এসে বাংলার খেলাধুলার ক্ষেত্রে দেখেছেন নতুন দিনের আলো। কথাটা তিনি শুধু মোহনবাগানকে উদ্দেশ্য করেই বলেননি। বাংলার সামগ্রিক খেলাধুলার ক্ষেত্রেই আগ্রহ ও উন্নতির পরিচয় দেখে কথাটা বলেছেন।

মোহনবাগান ক্লাবের নতুন তাঁবুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসবে অতীত ও বর্তমান খেলোয়াড়দের মিলন সানাইয়ের সুরে, অনুষ্ঠান অঙ্গনে আলপনা-আঁকা মাটির মঙ্গলঘটের উপর আমের পল্লব তার উপর সশীষ সবুজ ডাব—সব মিলিয়ে অর্ধচন্দ্র ও বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের পর ক্যালকাটা ও মোহনবাগানের অতীত দিনের খ্যাতকীর্তি খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলাতেও দর্শকরা লাভ করেন কলচালনায় লঘু পদের ছন্দ সুখ। হাসি ঠাট্টাও কম উপভোগ্য হয়নি। যেমন, মুখ্যমন্ত্রীকে যখন মোহনবাগানের খেলার জামা উপহার দেওয়া হয় তখন "খদ্দরের নয় কেন" বলে তাঁর উক্তি। কিংবা প্রদর্শনী খেলার আগে মুখ্যমন্ত্রী যখন বলে শট করলেন তখন অনুচ্চ স্বরে একজন বলে উঠলো—'ও এখনো পায়ের আড়ষ্টতা ভাঙেনি।' সবচেয়ে হাসির খোরাক যুগিয়েছে পূর্ববঙ্গের একটি ছেলে, হয়তো ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব সমর্থক হবে। তার উক্তি : (পূর্ববঙ্গীয় ভাষায়) এ কী! বারাণসীতে অধর্ম! আমরা শেয়ালদাকে 'শিয়ালদহ' বলি, মেল ট্রেনকে 'মেইল' ট্রেন বলি বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে বলি 'ব্যাঙ্গল ব্যাঙ্ক'। কিন্তু মোহনবাগান ক্লাব মোহনবাগান অ্যাথলেটিক লিখতে 'এথেলেটিক' লিখবে কেন? উচ্চারণের সময় জাত যাবে না? উচ্চারণ যে 'য়্যাথেলেটিক' হয়ে যাবে।

কথাটি অবশ্য বিনা প্রতিবাদের মধ্যে ডুবে যায়নি। সঙ্গে সঙ্গেই কোত্থেকে কে বলে উঠলো—যে লিখেছে তার মুখের ভাষাও যে ঐ রকমের। সবাই হেসে উঠল। ময়দানের মাঝে আনন্দে কেটে গেল ক্রীড়ামোদীদের একটি সুন্দর সন্ধ্যা।

(১) মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুর ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানের প্রদর্শনী খেলার আগে ফুটবলে শট করছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন; (২) শট করছেন মঞ্জুলা ভট্টাচার্য; (৩) নিজ দেহকে আয়ত্তে রাখতে না পারলেও বল আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করছেন অনিল দে; (৪) গোল ছেড়ে এসে বল ধরছেন ডি সেন; (৫) স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বল মারছেন এস মান্না।

—ফটো : 'দেশ'

মুকুল

গত সপ্তাহে ফুটবল আইন-কানুনের মুখবন্ধে বলেছি—"আইনের সমুদ্রে যাঁরা অহর্নিশ সাঁতার কাটেন তাঁদের কাছে ফুটবল আইনের চটি বই বৃষ্টিবিন্দু কেন, শিশিরবিন্দুর সমান, কিন্তু আইনে পরিণত হয়ে ঐ বই-ই যে আইনের সমুদ্রে পরিণত হয়েছে, ভুক্তভোগীরা সেটা ভালভাবেই জানেন।"

আইনের ধারা সম্বন্ধে ঘাটাঘাটি করার আগে কথাটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে, তাই এ সপ্তাহেও মুখবন্ধের জের টানতে হচ্ছে।

চেম্বার্সের অভিধান অনুযায়ী Law শব্দের অর্থ :

"a rule of action established by authority : that which is Lawful' Rule· "The description of a process for solving a problem."

অর্থাৎ উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট সংঘ সমিতি বা শাসন পরিচালকদের দ্বারা প্রণীত বিধিবন্ধ নিয়মাবলী এবং অনুশাসন-বিধি। ফুটবলের উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট সংঘ কে ? না, "ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।" কিভাবে ফুটবল খেলার আইন ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ নিয়েছে সে প্রশ্ন নিয়ে আজ আলোচনা অবান্তর। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনই যে বিশ্ব ফুটবলের সর্বময় কর্তা এবং সেই অ্যাসোসিয়েশনের রেফারীজ কমিটি আইন কানুনের রদবদল করার ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী সেটা সবারই জানা কথা। প্রতি বছরই এই কমিটির সব মাথা একবার করে মিলিত হয়ে আইন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁদের কাছ থেকেই নতুন আইনের বিধি-বিধান আসে ব্যাখ্যা আসে, আসে প্রয়োগের পরামর্শ।

তীক্ষ্ণ সাধারণ বুদ্ধিই নাকি আইনের মূল ভিত্তি। সাধারণ ক্ষেত্রে তো বটেই, খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও।

ধরুন, আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হল দু'শো টাকার বদলে আপনি আমাকে একটি ঘোড়া দেবেন। টাকাটা নিয়ে ঘোড়া দেবার সময় আপনি আমাকে একখানি ঘোড়ার ছবি দিলেন বা দিলেন একটি কাঠের খেলনা-ঘোড়া। আমি বললাম এ কি ! ঘোড়া কই ? আপনি বললেন, চুক্তিতে তো কি ধরনের ঘোড়ার উল্লেখ নেই, সুতরাং দু'শো টাকার বিনিময়ে ওটাই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি যদি আইনের আশ্রয় নিই, আপনার যুক্তি টিকবে কি ?

তখন শামলা-পরা আইনের কারবারীরা ঘোড়ার ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করবেন। ঘোড়ার সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ঘোড়ার সংজ্ঞা কি ? না, এক ধরনের বিশেষ জীব যার প্রাণ আছে যে দৌড়তে পারে যার আকৃতি বিশেষ ধরনের ইত্যাদি। আপনি যা দিচ্ছেন তা ঘোড়া নয়—ঘোড়ার ছবি বা খেলনা ঘোড়া।

তেমন ফুটবলের আইনেও প্রতিটি সংজ্ঞার চুলচেরা বিচার। আপনি মোহন-বাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে ইস্ট বেঙ্গলের গোল লক্ষ্য করে একটি তীব্র শট করলেন বলটি ক্রসবারে লেগে ফেটে গিয়ে গোলে প্রবেশ করল। রেফারী হিসাবে আমি কি সিদ্ধান্ত নেব ? গোল দেব ? না, গোল অগ্রাহ্য করব ? যদি গোল দিই ইস্ট বেঙ্গলের উগ্র সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়িয়ে নিতে চাইবে, যদি গোল না দিই মোহনবাগানের উগ্র সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়ানো মাংসের কাবাব বানাতে চাইবে। আমার অবস্থা হবে তখন মারীচের মত। হয় রামের হাতে, নয় রাবণের হাতে মার খেতে হবে।

যাই হোক আমার দুর্দশার অন্ত না থাকলেও ফুটবলের আইন কিন্তু আমার হাত পা বেঁধে দিয়েছে। আমি কোনভাবেই মোহনবাগানের সপক্ষে গোলের নির্দেশ দিতে পারব না। কেন ? না, যখন বলটির সব অংশ গোলে প্রবেশ করেছে তখন আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটি বিধিবদ্ধ "বল" নয়। বলের বিকৃত রূপ।

আইনে বলের সংজ্ঞায় মোটামুটি বলা হয়েছে—বলের আকার গোলাকার হবে এবং যার পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম বা ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। বল ফেটে গেলে নিশ্চয়ই সেটা গোলাকার থাকে না পরিধিরও ব্যতিক্রম ঘটে, আর বায়ু তো বেরিয়ে যাবই।

সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমাকে আর একটি নতুন বল নিয়ে যেখানটায় বল ফেটে গিয়েছিল সেখানে "ড্রপ" দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে।

ঠিক এমনিভাবে রেফারী বিপদে পড়বেন আরও বহু ক্ষেত্রে। ধরুন, বি এন রেলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজু এরিয়ানের গোলকিপার সনৎ শেঠকেও কাটিয়ে একেবারে ফাঁকা গোলে বল শট করলেন— অবধারিত গোল হবে, ভগবানেরও বাঁচানোর সাধ্য নেই। বলটি গোলে ঢুকছে এমন সময় এরিয়ানের উগ্র উড়ে মালী গোলের পেছন থেকে এসে বলটি থামিয়ে দিল। রেফারী হিসাবে আপনি কি করবেন ? যদি গোল না দেন তবে বি এন রেলের সমর্থকরা কি আপনাকে রেলের চাকার নীচে ফেলতে চাইবে না ? যদি গোলের নির্দেশ দেন, "আর্য" দলের সমর্থকরা দেবে আপনাকে অনার্যের অপবাদ। বড় নিরীহ ক্লাব কিনা, তাই নিরামিষ প্রতিবাদ! আপনার উভয় সংকট। কি সিদ্ধান্ত নেবেন ? ঠিক সিদ্ধান্ত কি হবে, আপাতত নাই বললাম। আইনের ধারা আলোচনার সময় বলা যাবে। এখন আপনিই ভাবতে থাকুন কি সিদ্ধান্ত নেবেন।

আর একটি ক্ষেত্র। ধরুন, মহমেডান স্পোর্টিং আর স্পোর্টিং ইউনিয়নের লীগের খেলা। স্পোর্টিং ইউনিয়ন, আই এফ এর সম্পাদক স্বয়ং যার মুরুব্বি। যে কারণেই হোক মহমেডান দলের খেলোয়াড়দের আপনার সম্বন্ধে ভাল ধারণা নেই। আপনি বাঁশী হাতে মাঠে ঢুকতেই একজন খেলোয়াড় বলে উঠলো—"এই শালা লোককো ফিন দেখো।" আপনি কি করবেন ? আপনি যদি কিছু না করেন, আপনার দুর্বলতা ধরা পড়বে, যদি কিছু করেন অর্থাৎ খেলোয়াড়কে সতর্ক করেন, আপনার বিরুদ্ধে হয়তো অযথা অপবাদ দেওয়া হবে সেক্রেটারীর টীমের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ এনে।

ধরুন, গালাগালির ব্যাপারটা উপেক্ষা করেই আপনি খেলা আরম্ভ করলেন। মহমেডান দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড "কিক অফে"র সময় সামনে বল না মেরে পাশা-পাশি বল মারল। একবার নয়, দু'বার। আইন-সম্মতভাবে "কিক অফ" না করায় আপনি তাকে "সতর্ক" করে দিলেন। আবারও আইনের ব্যতিক্রম ঘটায় আপনি খেলোয়াড়টিকে মাঠ থেকেই বের করে দিলেন। মহমেডান দলের অধিনায়ক বললেন—"খেলা তো এখনো আরম্ভ হয়নি, আমরা আর একজন খেলোয়াড়কে খেলার জন্য নামাব। কি করবেন আপনি ? বদলী খেলোয়াড় নামার অনুমতি দেবেন ? কি করবেন ভাবতে থাকুন। পরে সমাধান জানানো যাবে।

দেশী সংবাদ

১৩ই মে—জানা গিয়াছে, সিরাজুদ্দিন কোম্পানীর খাতায় উড়িষ্যার কয়েকজন মন্ত্রীর নামোল্লেখ সম্পর্কে "বিশেষ কোন মতভেদ" না থাকায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সিরাজুদ্দিন ঘটিত ব্যাপারে ঐ সকল মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে আরও তদন্ত করিতেছেন।

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব নির্বাচন কমিশনার এবং দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান শ্রীসুকুমার সেন অদ্য অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে শ্রীসেনের বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

১৪ই মে—কলিকাতা মহানগরীতে কলেরার দাপট সমানভাবেই চলিয়াছে। গত সপ্তাহে দুইশত জন কলেরা রোগে মারা যায়। এ বছর একটি সপ্তাহে কলেরা রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ইহাই সর্বাধিক। ঐ সপ্তাহে ৬২০ জন কলেরা রোগাক্রান্ত হয় বলিয়া প্রকাশ।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র আজ এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন, পূর্বাঞ্চলের কোন রাজ্যের খাদ্যের ব্যাপারে আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি বলেন পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাউল সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। চাউল সংগ্রহের ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতরক্ষা বিধি প্রয়োগ করিবেন।

১৫ই মে—আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে কাশ্মীর ও আনুষঙ্গিক সমস্যা লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ষষ্ঠ চক্রের আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু পাকিস্তান গণভোটের পুরাতন ধুয়া আবার তোলায় অপ্রত্যাশিতভাবে আলোচনার অবসান ঘটে।

দমদম বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য বহুদিন হইল গৌরীপুরে যে জমি কিনিয়া রাখা হইয়াছিল, অদ্য দুপুরে দুইটি 'বুল-ডোজার' ও এক বিপুল সংখ্যক পুলিস বাহিনী দখলকারীদের উচ্ছেদ করিয়া সে জমি উদ্ধার করিয়াছে।

১৬ই মে—সম্প্রতি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও সরবরাহে অনিশ্চয়তার ফলে শিয়ালদহ বিভাগের রাণাঘাট সেকশনের বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল নির্ধারিত সময়ে চালু করিতে অসুবিধা দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

দেশের চাউল পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল জানান যে আগামী ফসলের মরসুম পর্যন্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য দেশে যথেষ্ট চাউল মজুত রহিয়াছে এবং এইজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন প্রয়োজন নাই।

১৭ই মে—বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র বলেন সীমান্তের সমস্ত এলাকাতেই নূতন করিয়া চীনা সৈন্য সমাবেশ করা হইতেছে। তিনি বলেন চীনা সৈন্য সমাবেশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে ঠিক কোন অঞ্চলে ইহা ঘটিতেছে তাহা তিনি বলিতে অস্বীকার করেন।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল আজ এই মর্মে আশ্বাস দেন যে চাউলের ব্যবহারের উপর কোনরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করিবার ইচ্ছা সরকারের নাই। দেশের খাদ্যমন্ত্রী

এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথাও বলেন যে, দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।

১৮ই মে—অদ্য কলিকাতায় বিভিন্নসূত্রে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইতেছে।

নেফার উপর চীনের আক্রমণের সময় কর্তব্য কার্য পরিত্যাগ করার অভিযোগে ভারত সরকার কতিপয় সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করিয়াছেন। ২৭ জন গেজেটেড অফিসারসহ কেন্দ্রীয় সরকারের ১৬০ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

১৯শে মে—কলিকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গত দুই বৎসর যাবৎ একখানা নূতন বাসও কিনিতে পারেন নাই। আগামী দুই বৎসরের ভিতরেও নূতন বাস পাওয়া যাইবে এমন ভরসা নাই। কারণ এই সকল বাস কিনিতে যে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন, তাহা কর্পোরেশনের পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেন নাই।

নেফায় চীনা আক্রমণকালে কর্তব্য ত্যাগের জন্য যে সকল সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে তদন্ত হইবে সরকার তাঁহাদের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই চুনোপুঁটি পর্যায়ের। অসামরিক ও সামরিক বড়-কর্তারা বিলকুল বাদ পড়িয়াছেন বলিয়া রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই মে—রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ ৫ জন বৃটিশ এবং পাঁচজন মার্কিন কূটনীতিককে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ঐ সব ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারা এখনও মস্কোতে আছেন তাঁহাদের দেশত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মিডল ইস্ট নিউজ এজেন্সী কায়রোতে এক মুখপাত্র বলেন যে রাত্রে কায়রো হইতে আলেকজান্দ্রিয়া যাওয়ার পথে নীল নদের বদ্বীপে একখানি দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট ডাকোটা বিমান ধ্বংস হয়। উহার ফলে বৈমানিকগণসহ ৩২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ই মে—আফ্রো-এশীয় দেশগুলি শুল্ক ও পণ্যের অধীন বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তি সংস্থার বিকল্প একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করিতেছে। জেনেভায় বাণিজ্যমন্ত্রী সম্মেলনে অদ্যকার আলোচনায় ইহা স্পষ্টত বুঝা যায়।

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও কম্যুনিস্ট চীন উভয় দেশের মধ্যে আদর্শ সম্পর্কে মতভেদের ব্যাপারে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে। ৫ই জুলাই মস্কোতে এই আলোচনা আরম্ভ হইবে।

১৫ই মে—ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক মার্কিন মহাকাশ যাত্রী মেজর গর্ডন কুপার আজ ফেইথ—৭ নামে মহাকাশ যানে মহাশূন্যে যাত্রা করেন। তিনি বাইশবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তানের কুষ্টিয়ায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বন করায় কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কৃত করা হইলে অনেক ছাত্র মহকুমা অফিসার ও জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে প্রহার করে। এই ঘটনার পরে পুলিস ডাকা হয় এবং পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে ছাত্রগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়ার জন্য পুলিস কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে।

১৬ই মে—রুশ-চীন আদর্শগত বিরোধের অবসানকল্পে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার চারদিনের মধ্যেই চীন আবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং আধুনিক সংস্কারবাদিগণকে" প্রধান শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইয়াছেন পেনকোভস্কির প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হইয়াছে এবং গুলী করিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হইয়াছে। সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক পেনকোভস্কি বৃটিশ ব্যবসায়ী উইনির যোগসাজসে গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সামরিক আদালত তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।

১৭ই মে—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী জেড এ ভুট্টো গত রাত্রে করাচীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন ষষ্ঠ চক্রের আলোচনা শেষ হইবার পর ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কাশ্মীর সম্পর্কে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শেষ হইল।

মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপার নিরাপদে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিয়াছেন—কিন্তু তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি যখন একে একে বিকল হইয়া যাইতে লাগিল—তখন মহাকাশচারী কুপার স্বহস্তে মহাকাশ যান চালাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে যেভাবে অবতরণ করেন পর্যবেক্ষকদের মতে তাহা নিখুঁত ও নাটকীয়।

১৮ই মে—যে সমস্ত ভারতীয় নারী বিবাহ করিলে পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সেই সকল ভারতীয় নারী বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বালিদ্বীপের আগাং আগ্নেয়গিরি গত বৃহস্পতিবার হইতে আবার অনল উদ্গীরণ করিতে শুরু করিয়াছে এবং এবারও বহুলোক প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। গত ১৭ই মার্চের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ১৫ শত লোক প্রাণ হারায় এবং দেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মরুভূমির রূপ ধারণ করে।

১৯শে মে—কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব সম্পর্কে পাকিস্তানের মতিগতি বিন্দুমাত্র উৎসাহজনক নহে।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইয়াছেন, রুশ বিজ্ঞানীরা একটি কুকুরের একটি স্নায়ু অপসারণ করিয়া সেখানে বিদ্যুৎ-বাহ বা সূক্ষ্ম তার বসাইয়া দিয়াছেন। এ ধরনের চেষ্টা এই প্রথম সাফল্যমণ্ডিত হইল।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ● ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ● ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ● প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ● ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ● ২৩-৮০৪১। স্বত্বাধিকারী ● পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

পরিবারের জন্য
মায়েদের পছন্দ
ডালডা
ডালডা
খেজুরগাছ মার্কা
বনস্পতি
ডালডা সবচেয়ে সেরা
ভেষজ তেল থেকে তৈরী।
এতে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের
উপযোগী ভিটামিনও রয়েছে।
প্রতারণা-প্রতিরোধক
সিল-করা টিনে স্বাস্থ্যসম্মত
ভাবে প্যাক-করা।
মনে রাখবেন ডালডা কখনও
আলগা বিক্রী হয় না।
রান্নার খাঁটি, সেরা স্নেহপদার্থ

সূচীপত্র

(সি ১৮০৪)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—পি জি ভৌমিক (দিল্লি)

(সি-৯৯০৫)

[illegible] Naye Paise
Saturday, 1st June 1963

৩০ বর্ষ ॥ ৩১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

পরিকল্পনা প্রহসন

কল্পনায় পরিকল্পনায় ধুলো পরিমাণ। গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার পরিকল্পনা, দীঘা উন্নয়ন পরিকল্পনা, বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা, এবং এই রকম ছোটবড় বিচিত্র বহুবিধ পরিকল্পনার সিঁড়ি বেয়ে সবার উপর দেশজোড়া তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তার ঠিক নেই, কোন্‌টা জরুরী, কোন্‌গুলিই বা রয়েসয়ে প্রয়োজনাযোগ্য তারও বিচার-বিবেচনার সাক্ষাৎ মেলে না। জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র, জনগণতন্ত্রী গভর্নমেণ্ট, কাজেই সব পরিকল্পনা এবং উদ্যোগের উপর জনকল্যাণব্রতী সংকল্পের শীলমোহর। জনকল্যাণের জন্যই নাকি দপ্তরে দপ্তরে পরিকল্পনা রচনার প্রতিযোগিতা—নয়াদিল্লিতে কলকাতায় এবং রাজ্যে রাজ্যে। সরকারী কল্যাণব্রতীদের কল্পনা শক্তির বাহাদুরি আছে বৈকি; পরিকল্পনার ছাঁচে-ঢালা নিত্য নতুন স্কীম; স্কীম চালু করার জন্য অফিস, বড়, মেজ, সেজ ছোট আমলা, বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ফিটফাট বন্দোবস্ত, ঢালাও অর্থমঞ্জুরীর ব্যবস্থা এবং তারপর বর্ষে বর্ষে এই সব স্কীমের নাড়ী টিপে দেখা, "ধরি মাছ, না ছুঁই পানি" কায়দায় সরকারী সমীক্ষার ফলাফল ঘোষণা, যার সার সত্য হল এই সব বাছা বাছা পরিকল্পনা তাদের জন্মকাল থেকেই ধুঁকছে, এক পা এগিয়ে দু পা পিছিয়েছে। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারী পরিকল্পনা তেমনি রাজ্য সরকারী পরিকল্পনা—কারে ফেলে কারে দেখি।

গভীর জলে মৎস্য শিকার পরিকল্পনায় পেছনে টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে দশ বৎসর কিম্বা তারও বেশী—টাকা মানে সরকারী টাকা, জনসাধারণের রক্ত জল-করা টাকা। জাপানী জাহাজ, ড্যানিশ জাহাজ, মাঝি মাল্লা, মৎস্য শিকারী আর মোটা মাইনের দেশীবিদেশী বিশেষজ্ঞ জড়ো করে [illegible] মধ্যে আর সবই আছে, মাছের নামগন্ধ নেই। এই ব্যর্থতার জন্য বিশেষজ্ঞরা, দপ্তরের আমলা-চূড়ামণিরা যেমন তেমন কৈফিয়ত দিয়েই নিশ্চিন্ত। কারণ তাঁদের পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ত ভালই; সস্তায় প্রচুর মাছ সরবরাহের চেষ্টা হয়েছে, কাজ হয়নি বটে, কিন্তু সেজন্য কী আর করা যেতে পারে, কার দোষ- যখন শাস্ত্রেই আছে, "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?" দীঘা উন্নয়ন পরিকল্পনাও ওইরকম সময় এবং টাকার অঙ্কের হিসাবে ফড়িং-এর মত লাফিয়ে লাফিয়ে দীর্ঘছন্দে চলেছে, দীঘা তবুও "দূর অস্ত"—পথের বাধা, স্বচ্ছন্দ আশ্রয় দুর্লভ এবং সবচেয়ে শঙ্কার কথা দীঘাকে সমুদ্র গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারা যাবে কিনা তাও এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত। গভীর জলে মৎস্যশীকার পরিকল্পনার মত দীঘা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিধিলিপিও হয়ত মহাসমুদ্রে অনন্তশয়ন।

এলিয়টের কবিতায় জটিল সমস্যাপীড়িত রাষ্ট্রনেতার নিরন্তর স্বগত-চিন্তা -কী করা যায়, উপায় কী এবং অতঃপর রাষ্ট্রনেতার একমাত্র ভরসা কমিশন কমিশনের উপর কমিশন তার পরও কমিশন; সমীক্ষা, পরিকল্পনা, সুপারিস ও সিদ্ধান্তের সাতরঙা রামধনু রচনার ভোজবাজি। সেই ভোজবাজি আমাদের দেশেও সরকারী, আধা-সরকারী উদ্যোগের ভাঁজে ভাঁজে, খাঁজে খাঁজে। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনার কথাই ধরা যাক। বিরাট মহানগরী, বিপুল জনসংখ্যা, তার সমস্যা অগুনতি অভাব প্রচুর। সুতরাং এত বড় একটি এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করা সহজ নয়। সহজ কিছুই নয় তবে কথা কী, উন্নয়ন পরিকল্পনার এলাহী আয়োজন চলেছে শুধু এই আশ্বাস রোজ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করার কোন অর্থ হয় না। কলকাতায় যাতায়াতের জন্য গঙ্গা পারাপারের আরও সুবিধাজনক ব্যবস্থা চাই, শহরের চারপাশ দিয়ে [illegible] চলাচলের ব্যবস্থা হলে আরও ভাল; কলকাতায় জনবহুল অঞ্চলে রাস্তা পার হওয়ার জন্য ওভারব্রিজ, সেও ভাল। কিন্তু যে মহানগরীতে পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য, বাড়িভাড়া আকাশছোঁয়া, বেশ কয়েক লক্ষ লোকের আস্তানা রাজপথে সে-মহানগরীর কপালে সত্যি কী এত সুখ লেখা আছে? পরিকল্পনাবিশারদরা এ প্রশ্নের জবাবে প্রায় নিরুত্তর। কারণ আপাতত তাঁদের কাজ সমীক্ষা—কলকাতাকে, তার চারপাশের শিল্পাঞ্চলকে উল্টেপাল্টে খুঁটিয়ে দেখে, উপর নিচে সর্বদিকের হিসেব নিয়ে চমৎকার মানানসই উন্নয়নের একখণ্ড ছক তৈরী করা। কারণ আধুনিক নগর-উন্নয়নের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই হল এই রকম।

পরিকল্পনা বিশারদদের দোষ দিই না। দোষ কলকাতারই, কারণ নগর-পিতাদের দায়িত্বহীনতায়, দৌরাত্ম্যে, রাজ্যসরকারের গদাইলস্করী চালে কলকাতার নাভিশ্বাস উঠেছে অনেক-কাল। কলকাতার সবুর সইছে না, যদিও পরিকল্পনাবিশারদরা বলছেন, সবুর, সবুর, প্রথমে সমীক্ষা, তারপর পরিকল্পনা এবং তারপরও আছে। যে মহানগরীর মরণদশা, সব কিছু নড়বড়ে, ভাঙ্গাচোরা তার 'কায়কল্প' চিকিৎসা আধুনিক বিজ্ঞানমাফিক চালাতে টাকা চাই কোটি কোটি, চাই বিদেশী মুদ্রা এবং বিদেশ থেকে আমদানীর উপর নির্ভর বিস্তর যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম। অতএব উন্নয়ন পরিকল্পনা-মুখী হবেক রকম সমীক্ষার পর আছে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রতীক্ষা, বাহাত্তর ইঞ্চি জলের পাইপ বসানোর হালচাল দেখে যার পরিণাম ফল অনায়াসে অনুমান করা যায়।

কেবল কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা নয়। পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনার মধ্যে বিরাট বাস্তব অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে সরকারী আধা-সরকারী উদ্যোগের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে। গৃহসমস্যা সমাধানের জন্য জনকল্যাণব্রতী সরকার ব্যস্ত সমস্ত ভাবে যত্রতত্র বড় বড় ইমারত গড়েছেন কিন্তু সেগুলি ঠিকমত কাজে লাগে নি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনা, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রত্যেকটি বাবদ সরকারী অর্থ কম খরচ হচ্ছে না, তদারকীর বন্দোবস্ত জাঁপে ছোটাছুটি সবই রাজসূয় যজ্ঞের স্টাইলে তবুও উন্নতির আঁচড় পড়ছে সামান্যই পরিকল্পনা পরিণত হচ্ছে বহুবর্ণিত প্রহসনে।

এখনো আফ্রিকার যেখানে যেখানে রয়েছে তার অবসান সুনিশ্চিত। অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক, রোদেশিয়ার মুক্তির খুব বেশী দেরি নেই এবং দক্ষিণ আফ্রিকার "অ্যাপার্ট-হাইডের" বীভৎসতার সমাপ্তি কোন অগ্নিকাণ্ডে ঘটবে তা জানা না থাকলেও সেটাও বহুদূরবর্তী বলে বোধ হয় না। আদিস আবাবার সম্মেলনে ফল আর যাই হোক বা না হোক, এইসব অঞ্চলের মুক্তি-সংগ্রামের শক্তি খুবই বাড়িয়ে দেবে।

আদিস আবাবায় আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির যে এরূপ একটা সম্মেলন হতে পারল, এটা কম কথা নয়। কারণ, আফ্রিকার নূতন স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গিয়েছিল। এক দল প্রাক্তন ঔপ-নিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে একটা মোটামুটি সহযোগিতার সম্পর্ক রেখে চলার নীতি অনুসরণ করছিল, অন্য দল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশী বেপরোয়া নীতির পক্ষপাতী। এই দুই দল যে এক সম্মেলনে মিলিত হতে পারল এটা খুবই একটা বড়ো এবং আফ্রিকার ভবিষ্যতের পক্ষে আশার কথা। হয়ত দুই দলই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে, নিজ নিজ নীতির কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। যারা বেশী পশ্চিমা-ঘেঁষা এবং যারা বেশী বেপরোয়া—উভয়ের ভিতরই একটা অধিকতর সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ সম্ভবত জেগেছে। হয়ত উভয় দলই বোধ করছে যে, তা না হলে এক দলের পশ্চিমা এবং অন্য দলের কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন হয়ে পড়তে হবে।

আদিস আবাবার সম্মেলন আফ্রিকার স্বাধীন সত্তাকে স্পষ্টতর করার দিক দিয়ে একটা মহৎ চেষ্টা—এ কথা বলা যায়। কিন্তু এই চেষ্টাকে সার্থক করে তোলার পথে অনেক বাধা আছে। প্রথমত, আফ্রিকার স্বাধীন সত্তা বলতে একটি অখণ্ড ভাবমূর্তির কল্পনা করা কঠিন। আফ্রিকা বলতে প্রথমত মনে যে ভাব জাগে, সে হচ্ছে এই যে, আফ্রিকা নিগ্রোদের দেশ। নিগ্রো জাতির মধ্যে অবশ্য বহু বিভাগ আছে, কিন্তু মোটের উপর সমস্ত নিগ্রো জাতির একটা আলাদা সত্তা কল্পনা করা যায়। কিন্তু উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার আরব জাতির প্রাধান্য। নিগ্রো এবং আরব ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক মিশ্রিত জাতির গোষ্ঠী এবং উপজাতি আছে। তার উপর শ্বেত ঔপনিবেশিক অধিবাসীদের সমস্যা তো আছেই। তবে বিভিন্ন জাতির এই সংখ্যালঘুদের কথা ছেড়ে দিলেও আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত হিসাবে দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে—নিগ্রো এবং আরব। তার উপর [illegible]

[illegible]

আরব জাতির মধ্যে এশিয়ার কিন্তু আজ মিশর আরব জগতের রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে উঠছে অথবা ঐদিকে একটা প্রবল স্রোত বইছে। নাসের আজ অনেকের চক্ষে আরব

"শিব ঠাকুরের আপন দেশে"

আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম স্বাধীন রাজ্য ইথিওপিয়ার উপর আজ সারা পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে-দেশের রাজধানী আদিস আবাবায় আফ্রিকার তিরিশটি জাতির প্রতিনিধিদের শীর্ষ সম্মেলন বসে-ছিল কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের মধ্যে রাজ-নীতিক ও অর্থনীতিক জাতীয় ঐক্য সাধনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।

শ্রীমতী রাণু সান্যাল গত তিন বৎসর ইথিওপিয়ায় আছেন। আধুনিক ইথিওপিয়ার মানুষ, তাদের আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা, বিশেষ করে নারীসমাজের নানা সমস্যায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তারই ফলশ্রুতি এই 'শিবঠাকুরের আপন দেশে'।

লেখিকার কৌতূহলী সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিয়ে দেখা এক অজানা দেশের অপূর্ব ঘরোয়া কাহিনী আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

ঐক্যের প্রতীক কিন্তু "আরব ঐক্য" এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং ঘটনার স্রোত ঐক্যের অনুকূল বলে প্রতিভাত হলেও

[illegible]

তার গতি যে বাধাহীন নয় তার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। ভৌগোলিক হিসাবে মিশর আফ্রিকার অন্তর্গত এবং উত্তর আফ্রিকাতেও রাজনৈতিক প্রাধান্য আরব-জাতীয় রাষ্ট্রগুলিরই হবে। কিন্তু "আরব ঐক্য" যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে তো এশিয়া এবং আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলি মিলিয়ে হবে, বরঞ্চ ভাব, রূপ এবং রাজ-নৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে সেটা প্রধানত একটা "এশিয়ান ফ্যাক্ট" হবে। "আরব ঐক্য" যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে [illegible] কায়রো কেন্দ্র হলেও সিরিয়া, ইরাক, [illegible] জর্ডান, ইয়েমেন, কুয়েইত প্রভৃতি [illegible] আরব দেশ এশিয়ায় বিস্তৃত হলে [illegible] সুতরাং "আরব ঐক্যের" আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার স্বাধীন সত্তার বা একটি বিশেষ অখণ্ড ভাবমূর্তির সামঞ্জস্য করা সহজ নয়।

আজ বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির বন্ধন কাটানোর তাগিদ যখন প্রবল তখন ঐক্য হওয়া সহজ, কিন্তু যখন সেই শত্রুকে দূর করে দিতে পারা যাবে অথবা দূর করে দিতে পারা গেছে বলে মনে হবে তখন ঐক্য রক্ষা করার আসল সমস্যা দেখা দেবে। আদিস আবাবায় কনফারেন্সে যাঁরা মিলিত হয়েছেন তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ উপস্থিত হলে তা মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে কমিশন নিযুক্ত করা হবে—কনফারেন্সের এই প্রস্তাবটি খুবই দূর-দৃষ্টির পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে, আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্ভাব্য বিবাদের ইঙ্গিত-গুলি সম্পূর্ণ অদৃশ্য নয়। ইতিমধ্যেই তার অনেকগুলি দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সুতরাং এখন থেকেই রাষ্ট্রপ্রধানগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়েছেন এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু রাষ্ট্র-প্রধানরা সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং তার প্রতিবিধানের জন্য চেষ্টিত হয়েছেন, এ সত্ত্বেও যে-সব শক্তির দ্বারা বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে এবং হবে সেগুলিকে দমন করতে তারা সফল হবেনই—এ কথা জোর করে বলা যায় না। "এশিয়ান ঐক্য", "আফ্রিকান ঐক্য" প্রভৃতি বড়ো বড়ো আদর্শের কথা ঘোষণা করার এক এক সময়ে একটা হিড়িক পড়ে, সেটা যে একটা নিরর্থক তাও না। যখন ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় তখন নিজেদের মধ্যে পরে কী বিবাদ হবে না-হবে তার কথা না ভেবে ঐক্যের রব তোলায় কাজ সিদ্ধ হয়। কিন্তু সেই রব যা স্লোগানের দ্বারা নিজেদের সম্মোহিত করে রাখা বিপজ্জনক।

[illegible]

কথা বলে উদ্দীপনা অনুভব করা সহজ ছিল। আজ ঐ কথাগুলোর মধ্যে আর কোনো মন্ত্রশক্তি নেই। কথাগুলো যে সবই ফাঁকা ছিল তা নয় কিন্তু তার মধ্যে সত্য এবং বাস্তবতার পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা ভুল ছিল। মিথ্যা জেনেও যেমন এক দল মতলববাজ লোক অবোধদের কাছে মন্ত্র আওড়ায় তেমনি এইসব বুলিকে স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে লাগাবার চেষ্টা এখনো যে হচ্ছে না তা নয়। গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক স্লোগান আবিষ্কার এবং আওড়ানো হয়েছে, সেগুলোর অবস্থা আজ পচা ফুলের মতো। স্লোগান-বাজির দ্বারা কীভাবে অপরকে এবং নিজেদের প্রতারিত করা যায় তার প্রমাণ গত কয়েক বছরে এশিয়ার লোকেরা অনেক পেয়েছে। আদিস আবাবায় যাঁরা মিলিত হয়েছেন তাঁদের কাছে এশিয়াবাসীদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অজ্ঞাত নয়। সুতরাং আশা করা যায় যে, তাঁরা সাবধান হয়েই চলছেন।

২৬-৫-৬৩
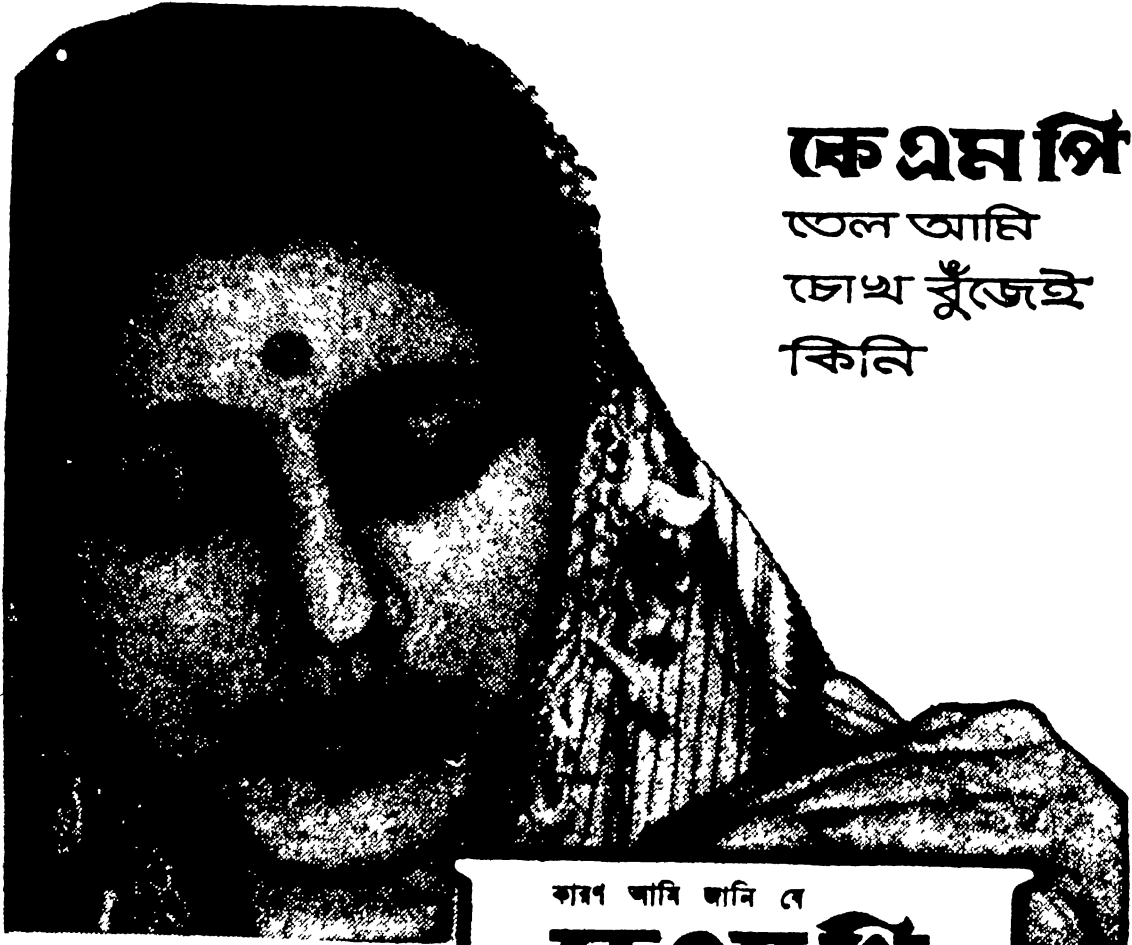
ঘুণাক্ষরে

"পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চান্দ্ তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে—অমাবস্যার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই; তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর—ইত্যাদি"

গতবারের বক্তব্যের সার্টিফিকেট যে হেমকান্তি রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে লিখে দিয়ে গিয়েছেন, স্মরণ ছিল না। অন্য মনে সেদিন 'গল্পগুচ্ছের' পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখ স্থির হয়ে গেল। মন বলল 'ইউরেকা'। সেই 'ইউরেকা'-কে তাই শিরস্ত্রাণ হিসাবে বেঁধে নিয়ে এবার আসরে প্রবেশ।

ওবারে আলোচনা বড় বিমূর্ত ছিল, দৃষ্টান্তগুলি সব ছিল পৌরাণিক। বলেই এই পরিশিষ্ট। সাবয়ব নমুনা দিয়ে বলবার কথাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা।

অন্ধকার চরিত্রের দুটি রূপ ধ্রুব সাহিত্যে লভ্য—শাইলক আর ইয়াগো। যদি প্রশ্ন করেন, এ-দুজনের কোন্‌জন একেবারে নিকষ কালো, বলব অবশ্যই ইয়াগো। তার অনিষ্টচিন্তা অতি-পরিশ্রুত, বলা যায় 'কামগন্ধ নাহি তায়।' ভেনিসের ইহুদী কুসীদজীবীর আক্রোশের হেতু ছিল। ইয়াগোর ছিল না। পিঁপড়ে পেলেই টিপে মারা, এ-কতকটা সেই শিশুসুলভ শুধু অকারণ পুলক। ক্ষত হয়ে ইয়াগো অপরের ক্ষতিসাধনে তৎপর হয়নি, আপন স্বভাবের আবেশেই সে পরক্ষতিব্রত একটি সুখনীড় নষ্ট করতে অগ্রসর। আপন ইষ্ট নেই তবু অন্যের অনিষ্টই তার অভিষ্ট, তার ক্রীড়্‌। এই ক্রীড়্ 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক্' রূপমন্ত্রের কাছাকাছি যায়, শুধু আর্ট শব্দটির আগে 'ডার্ক' বিশেষণটি বসিয়ে নিতে হবে।

❀

ওই আর্ট ফর আর্টস সেক বয়ানটির দাঁড়ি ধরে পরবর্তী প্রসঙ্গে দুর্গা বলে ঝুলে পড়ি। শ্লীল বনাম অশ্লীল। যার অতি সনাতন তুলনা গজকচ্ছপ লড়াই, একালের পরিভাষায় যার যুতসই বর্ণনা বোধ হয় চ্যারিটি ম্যাচ। একস্ট্রা টাইম খেলিয়েও মীমাংসা নেই, রেফারির বাঁশিতে ফুঁয়ের পর ফুঁ অবশ্য বাজে, কিন্তু শোনে কে!

অরুকোর ওয়াইল্ড নিরঙ্কুশ; ফোটো [illegible] 'এর বাচ্য' বলে আদৌ [illegible] [illegible] কিছু বই সুলিখিত, কিছু বই কুলিখিত, এইমাত্র আর কিছু নয়। তবু ধোঁকা সহজে কাটে না। শ্লীল-অশ্লীল বলে শিল্পে আদৌ কিছু যদি না রবে, তবে আজও কিছু-কিছু লেখা পাঠে পাঠক-পাঠিকার কর্ণমূলে রক্তিমা অন্য সাক্ষ্য দেবে কেন।

অশ্লীলতা সম্পর্কে খুঁতখুঁতে নাসাবাদ আসলে ইংরেজী রুচির ফল, হুবহু না হলেও কতকটা এই ধরনের কথা বঙ্কিম কোথাও বলে থাকবেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজী রুচি বলতে তিনি প্রধানত ভিক্টোরিয়ানা বুঝেছিলেন। নইলে প্রাচীনতর ইংরাজী রচনায় স্থূলতর রুচির ছাপ থরে-বিথরে ছড়ানো।

নিছক অশ্লীলতার জন্যেই যেখানে অশ্লীলতা একমাত্র তাই কি গর্হিত। এ-জাতীয় একটা ভাবমার্গী ধারণা আছে বটে, কিন্তু তা-ও সর্বাংশে গ্রহণীয় বলে বিবেচনা করিনে। উদ্দেশ্যের মোক্তারিতে সব সময় উপায়ের সাত খুন মাপ হয় না। সেই ফর্ম আর কনটেন্টের কথাটা আবার উঠে পড়ল লেবেলে রিরংসার ছাপ সেঁটে বোতলের গঙ্গাজল বেচব না। কিন্তু কুশ্রী কথা লেখার জন্যেই যিনি অনুচ্চার্য শব্দাদি ব্যবহার করেন তাঁকে হিসাবের মধ্যে ধরছি না, কেননা তাঁর প্রেরণা মূলত কৈশোরী সুড়সুড়ি মাত্র। তাঁর লেখা নিছক কয়েকটি অবদমিত তথা অপূর্ণ ইচ্ছার পূরণ তথা কণ্ডূয়ন। কিন্তু সাফ করবেন বলেই যিনি ময়লা ঘাটেন তাঁকেও কিছু সংযত-সাবধান হতে হবে। অন্যথা, শুধুই দুর্গন্ধ ছড়াবে।

অশ্লীলতার আশ্রয় কী—ভাব না ভাষা? নিশ্চয় ভাব তবু, যেহেতু ভাব ভাষারই সওয়ার অতএব ভাষাকেই এই আলোচনায় প্রাধান্য দেব। এ-প্রসঙ্গে পাদ্রী বা পুলিসের ফতোয়া নয় পাঠকের প্রতিক্রিয়াকেই লক্ষ্য করব। অর্থাৎ পাঠক কোন্ বস্তুকে কীভাবে নিলেন। পাঠান্তে তাঁর মনে কোনো বিকার ঘটল কিনা।

প্রলাপের মত লাগছে? একটা সংবদ্ধ অর্থ বের করতে কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেব।

"আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসোবসানা তরুণার্করাগম্
পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।"
'স্তনাভিরাম স্তবকাবনম্রা—'
শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা
স্তনাভ্যাম্—'

এ-সবই কহেন কবি কালিদাস। পণ্ডিত-মহাশয়েরা কিমোহে কিম্বাতে পড়েছেন, [illegible] [illegible], বিহ্বলিত বোধ করিনি। [illegible]

অনুরূপ আরও বহু শ্লোক জনে জনে পড়ে শোনাতে পারি। এই নির্বিকার নিরাসক্তির উৎস কোথায় ভাবতে ভাবতে সমাধানের যে চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি, তার নাম ধ্বনি অর্থকে যে সম্পূর্ণ অভিভূত করে রেখেছে এই ধ্বনি কঠিন, অনড়, নিপুণ মণিকারের হাতে বসানো পাথরের মত, কিন্তু অস্পন্দ সাড়া নেই, স্থাণু, সন্দেহ হতে পারে যে হয়ত-বা মৃত। মৃত না হোক, মূর্ছিত তো বটেই। মৃত বা মূর্ছিত অনাবৃত দেহ দর্শকের চিত্তে কোন প্রতিস্পন্দ সৃষ্টি করে না—ধ্রুব সাহিত্যের সুবিধাই ওই। ও-ভাষায় আমরা ভাবি না, ও-ভাষায় বলি না বলেই তার ধাক্কাও আমাদের বোধে ধরা পড়ে না, নিশ্চল স্থির থেকে আমরা ধ্বনিতে জড়িত শব্দ-সুষমা উপভোগ করি। তৎসম আদলে রচিত আধুনিক পদও এই সুবিধার অধিকারী। তাই রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে লেখেন 'উরুপরে কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়—আরও এগিয়ে জীবনানন্দ দাশ অলজ্জ ঘোষণা করেন, 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।" এই বাঁধুনির মধ্যে অস্থির, অস্বস্তিকর শব্দগুলি মগ্ন হয়ে আছে, আওয়াজ নেই।

মর্মরে রচিত বলেই স্থাপত্য কীর্তিগুলি; প্রস্তরে খচিত বলেই ভাস্কর্য এমন তুলনা রহিত রকম দুঃসাহসী হতে পারে তরঙ্গভঙ্গ তারও আছে, তবে অত্যন্ত শাসিত। তুলনায় চিত্র সজীবতর, চলচ্চিত্র আরও। রক্তোজ্জ্বল, মাংসল। (নীতিবাগীশ দেশে অনেকে জানেন, নৈশ ক্লাবে নগ্নিকা রমণীরা নিশ্চল। কানুনবিদেরা আবিষ্কার করেছেন ওতে দর্শকদের হৃৎকম্প ঘটে না, অতএব কোন পাতক অর্শেও না—সচলতাই তবে কি অশ্লীলতা? যা অচল তাই শ্লীল)!

শুধু তাই নয়: কোন বন্ধু বলেছেন, ফুল সুন্দর ডালে, যেখানে সে গন্ধে গন্ধে আমোদিত; কুৎসিত সে তুলে আনা ফুলদানিতে। নিছক ছুৎমার্গী বই কেউ কোণারকের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দৃশ্য-দুষ্টে বিরস ভাষ্যকে চিৎকার করবেন না, অথচ ওই মূর্তিরই কিছু কিছু যখন মিউজিয়ামে দেখি, তখন রসাবেশ সত্ত্বেও অস্বস্তিকর হওয়া অসম্ভব নয়। মূল থেকে বিচ্ছেদই এক্ষেত্রে অশ্লীলতা, রোমহর্ষের কারণ। পুরনো, প্রসিদ্ধ সেই কথাটি দিয়ে এ-প্রসঙ্গের ইতি করি—বনেরা বনে সুন্দর। কিন্তু লোকালয়ে প্রকাশ্য আলোকে কেবলই কি? কোনও সংস্কার বা সঙ্কোচের ধার যিনি ধারেন না, তিনিও সত্বরে দুহাতে মুখ ঢেকে বলবেন—নৈব-নৈব চ।

শিল্পীর স্বাধীনতা

কবিদের সম্পর্কে সক্রেটিস-এর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। তিনি বলেছিলেন, কবিরা "জ্ঞানী" বলে কাব্যরচনায় সক্ষম এমন মনে করার কারণ নেই। প্রশ্ন ওঠে, তবে এটা কি করে হয়, এই কাব্যরচনা ? জবাবে উনি বলেছিলেন, ওদের মধ্যে প্রেরণা পাবার স্বভাব আছে এক ধরনের, কিংবা প্রতিভা। (তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী ?)

সক্রেটিস যাকে প্রেরণা পাবার স্বভাব, কিংবা প্রতিভা বলেছেন, এ-যুগে তাকে কিছুটা সাধারণভাবে বলা হয়, শিল্পীর মন। অর্থাৎ সে-যুগ এবং এ-যুগ মূলে কথাটা স্বীকার করে নিয়েছে। সাহিত্য এবং শিল্প-সৃষ্টির একটি সত্য এই যে, একটি বিশেষ মানুষ তার স্বভাবজাত বিশেষ এক গুণ অথবা প্রতিভা থাকায় শিল্পসৃষ্টি করতে সক্ষম, অন্যে সে-প্রতিভা থেকে বঞ্চিত বলে অক্ষম।

কথাটা তুলতে হল, কারণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীকে তার ওই নিজস্ব স্বভাব এবং প্রতিভাটুকুর ওপরই নির্ভর করতে হয়। আর আমরা যাকে চলতি কথায় 'স্বতন্ত্র' বলি—লেখায় স্বতন্ত্র, দেখায় স্বতন্ত্র, বিচারে স্বতন্ত্র—এ সবই শিল্পীমাত্রেরই বিশেষ: বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ ধারণা, বিশেষ প্রতিভা। এই বিশেষ না থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র আর দামোদর মুখুজ্যে এক হয়ে যেতেন। স্নায়ুরাজ্যে এ-যাবৎ এমন কোনো অবিস্মরণীয় আবিষ্কার ঘটে নি যাতে একটি বিশেষ শিল্পীর অনুভব-ক্ষমতা অন্য এক শিল্পীর স্নায়ুকুণ্ডলে চালান করে দেওয়া যায়।

আমার নিজের বিশ্বাস, প্রত্যেকটি শিল্পীর সৃজন-কর্ম একান্তভাবে তার মনের কারখানায় ঘটে থাকে; প্রত্যেকটি শিল্পীই তাই স্বতন্ত্র, তার সৃষ্টিও বিশেষ। যিনি শিল্পী তিনি তাঁর মন খুঁজলে বুঝতে পারবেন—তাঁর মনের জগতে একটি "আমি" অত্যন্ত প্রবলভাবে তাঁকে চালনা করছে। এটা আমি দেখেছি, আমি এটা মনে করি, আমার ধারণা এই রকম—ইত্যাদি সেই "আমি"র কর্ম।

শিল্পীর "আমি"কে স্বীকার করে নিলে শিল্প; বাদ দিলে দিতে সরকারী ইস্তাহার। [illegible]

অসকার ওআইলড্ এক জায়গায় বলেছেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সবচেয়ে ঐকান্তিক প্রকাশ একমাত্র শিল্পের মধ্যেই আমাদের চোখে পড়ে। কথাটা আমি স্বীকার করি। আর ঠিক এই কারণেই, জনসাধারণ এবং সরকারকে মাঝে মাঝে শিল্পের খবরদারী করতে হাত বাড়াতে দেখি।

শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে আমার ধারণা তাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, দৃষ্টি স্বাতন্ত্র্য, বিচার স্বাতন্ত্র্য এবং বক্তব্যের স্বাধীন প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। অবশ্য, এ কথাও আমি স্বীকার করে নেব, শিল্পীর অবাধ স্বাধীনতা উদারপন্থীদের হাতেও কোথাও কোথাও ক্ষুন্ন হয়। হয় প্রকাশত না-হয় মুদ্রণ-আইন, না-হয় সরকারী নীতি সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে শিল্পীকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে পারে না। এমন ঘটনার সংখ্যা কিন্তু উদারবাদীদের দেশে অত্যন্ত অল্প, প্রায় আঙুলে

গোনার মতন। আমার বিশ্বাস সময়-কালে মানুষ যত বেশী সংস্কারহীন হয়ে আসবে—এই বাধা ঘুচে যাবে।

অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধা-বলী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন, শিল্পীদের সঙ্গে জাতির (অর্থাৎ জনসাধারণের) একটি

সম্পর্কে [illegible] বলে [illegible] দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের সঙ্গে শিল্পীদের যোগ "আত্মজের সঙ্গে মুক্তের যোগ।" আরও একটি মূল্যবান কথা বলেছেন, "আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টকে পাই তাই আর্টের কদর করি।"

শিল্পের ক্ষেত্রে যখন আমি শিল্পীদের স্বাধীনতা দাবি করি তখন এই জন্যেই করি যে, যেহেতু শিল্পীরা জাগ্রত তাই তাঁরা আমাদের ঘুম-চোখে যা চোখে পড়ে না তা দেখতে পান—এবং দেখতে পেয়ে আমাদের জানান (যদি অবশ্য আমাদের তন্দ্রা তখন ভেঙে আসার অবস্থা হয়ে থাকে তবে এই জানানটা কাজে লাগতে পারে)। আর শিল্পীর স্বাধীনতা দাবি করার দ্বিতীয় কারণ, যদি আমি আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টকে না পাই তবে আমার মন ভরে না। এই দুটি কথাই আমি অন্যরকমভাবে পূর্বে বলেছি, আবারও বললাম।

[illegible] সম্পর্কে আমার যা বলার, আমি তা কোথায় পাব, কোন সমাজ-ব্যবস্থায়, আমার অবশ্যই তা ভেবে দেখা উচিত। তাহলে বললে দেখব, যে সমাজ-ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিশেষ মানুষকে স্বীকার করে, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা, দৃষ্টির স্বাধীনতা, বিচার এবং বক্তব্যর স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে আমার পক্ষে সেই ব্যবস্থাই কাম্য। গণতন্ত্র, আমরা জানি, আমাদের এই স্বাধীনতাগুলি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর এও জানি কম্যুনিজম আমার কাছে এগুলি নিষিদ্ধ ফল করে রেখেছে। এ-ক্ষেত্রে মানুষ তার পছন্দ মতন জিনিসই চাইবে এটা স্বাভাবিক, এ নিয়ে কোনো মামলা চলে না।

কম্যুনিজম সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সামান্য। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল তখন আমি একেবারে মফস্বলাগত ছাত্র। মাত্র ক'মাস আগে কলকাতার কলেজে পড়তে

ঢুকেছি। [illegible] নিকটা [illegible], আমাদের সেটুকু কারও কারও ছিল। ইংরেজ রাজত্ব আমাদের সর্বনাশ করছে, লুটেপুটে খাচ্ছে—এ কথাটাই জানতাম। কে না জানত! কিন্তু তার বেশী কিছু আমরা জানতাম না। এ রকম অবস্থায়, আমার মনে আছে, যেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কাগজের টেলিগ্রাম-হাঁক শুনে একটা কাগজ কিনলাম, সেদিন, ঈশ্বর জানেন, আমি কী প্রচণ্ড খুশী হয়েছিলাম, সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। খবরটা ছিল, বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

একটা কথা পরিষ্কারভাবে আমার জানানো উচিত। মানসিক ও মানবিক কারণে আমি সব সময় সবলের অত্যাচার ও দম্ভ, নিষ্ঠুরতা ও পীড়ন ঘৃণা করে এসেছি। দুর্বল স্বাস্থ্যের মানুষের বোধ করি এই বিশেষ ক্ষোভটা সব সময়ই তীব্র হয়। নাজী জার্মানীর রথচক্র যেভাবে গুঁড়িয়ে চলছিল— দুর্বল রাষ্ট্রগুলি নতজানু হতে বাধ্য হচ্ছিল তাতে একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা জন্মেছিল জার্মানীর ওপর। বৃটেন যখন শেষ পর্যন্ত এই অত্যাচারকে রুখতে নামল, আমি খুশী হয়েছিলাম। অন্য কোনো কারণে নয়, মাত্র এই কারণে যে, একটি সবল নিষ্ঠুর শক্তি শেষ পর্যন্ত বাধা পেয়েছে।

তারপর ছ-সাতটা বছর— পুরো যুদ্ধটাই প্রায়—কলকাতায় বসে আমার কেটেছে, শেষের এক-দেড়টা বছর বাদে। আমি এই সময় কলেজে যেমন পড়ার নাম করে যাওয়া-আসা করেছি তেমনি কিছু কিছু ছোট কাজও করেছি পেটের দায়ে। তার মধ্যে একটা, এ আর পির চাকরি। কলকাতার বসে বসে লোক পালানো দেখেছি, বোমা পড়া দেখেছি দেখেছি একপাল লুব্ধ নেকড়ের মতন কালোবাজারীরা সামান্য কেরাসিন তেল থেকে শুরু করে চাল ডাল ওষুধ এমনকি মেয়েমানুষ নিয়ে কালোবাজারী করে চলেছে; দেখেছি সেই অবর্ণনীয় দুর্ভিক্ষ। চাকরির খাতিরে পথে পথে ক্ষুধায় মৃত মানুষকে, মুমূর্ষু মানুষকে খুঁজে সরকারী গাড়ির-গাড়িতে তুলে দিতে হয়েছে।......এ সবই আঠারো উনিশ কুড়ি একুশ বছর বয়সের ছেলের পক্ষে শোচনীয় অভিজ্ঞতা।

ঠিক এই সময় ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির দেহ স্ফীত হয়ে উঠছিল। কারণটা স্বাভাবিক। যে-কারণে য়ুরোপে বিবেকবান অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, ন্যায়-বিচার প্রার্থী মানুষ, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী মানুষ— দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে দলে দলে সোভিয়েটের গুণমুগ্ধ হয়েছিল— ঠিক সেই কারণে আমাদের মধ্যে অনেকে কম্যুনিস্ট [illegible] [illegible]

[illegible] ও অসহায় [illegible] ফেলতে পারি। তারা, যারা আমার চেয়ে [illegible] হয়ে চলে গেল তাদের মন আমার জানা। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আদর্শই তাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি যেতে পারি নি, কারণ রাজনীতি আমার ভাল লাগত না; তা ছাড়া কম্যুনিস্ট পার্টি তখন একের পর এক কতকগুলো বিসদৃশ কাজ করে যাচ্ছে। পোল্যাণ্ডের ভাগ বাটোয়ারা, হিটলার-স্ট্যালিন চুক্তি, সোভিয়েট দেশ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়া, আগস্ট বিদ্রোহকে নোংরা করে বর্ণনা করা, দুর্ভিক্ষের দিনে ভুখা-মিছিলের অনুপস্থিতি, কারখানার শ্রমিকমজুরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা—এ সবই এবং এই রকম কত কি তখন চলছিল। কম্যুনিস্টরা সবখানেই তাঁদের সংগ্রামের নীতি নিজেদের মতন করে বদলে নেন। প্রয়োজনীয় মিথ্যা, প্রয়োজনীয় কুৎসা তাঁদের সমরশাস্ত্রের আওতায় পড়ে। কোয়েসলার বলেছেন যে, জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে রাখার প্রয়োজনীয়তা বিরোধী দল ও শ্রেণীকে বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের সমগ্র সত্তাকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কম্যুনিস্ট চিন্তার অধীন। কথাটা স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

খুবই আশ্চর্যের কথা যুরোপে যে সব চিন্তাশীল মানুষরা একদা কম্যুনিজমের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও অনুরাগ নিয়ে সোভিয়েটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কম্যুনিজমের জন্য প্রাণপাত করতে রাজী ছিলেন— তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে-পরে একে একে মোহভঙ্গ হয়ে ফিরে আসছিলেন যেমন জিদ, যেমন কোয়েসলার, যেমন স্পেণ্ডার।

যে-বাঁশিবাকে স্বর্গ ভেবে শত শত আদর্শ-প্রাণ মানুষ তার কাছে নৈতিক আশ্রয় চেয়েছিল সেই বাঁশরী তাদের কি দিল? দিল কোনসেপ্টের যন্ত্রণা (নৃশংস), দিল মস্কো-বিচার (মর্মান্তিক প্রহসন), দিল গুপ্ত পুলিসের স্বৈরাচার (সন্ত্রস্ততার ব্যাধি), আর দিল দাস শিবির, নির্বাসন। মাও সে তুঙ তো তারই দোসর। শত পুষ্পের ছলনা জাল, মগজ ধোলাইয়ের কারখানা, দুর্ভিক্ষ, কমিউনের জীবন, আত্মবঞ্চনা আর যুদ্ধের শিক্ষা মাও সে তুঙের স্মরণীয় দান। চীনের ইতিহাস তাকে ভুলে যাবে না।

যুরোপের একদল মানুষ যখন কম্যুনিজমকে গ্রহণ করেও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার সর্বনাশা রূপ দেখে ফিরে আসছিল—তারও পরে আমাদের দেশে কম্যুনিজমের প্রসার। এর একমাত্র কারণ, আমরা [illegible] আগেই জানতে পারি নি কম্যুনিজমের অন্তর্গত কোথায় [illegible]

ঠেকেছে। বহুদিন আমাদের তা অজ্ঞাত ছিল। এরেনবুর্গের মতন মানুষও বুঝতে পারেন নি, মলোটভ আর রিবেনট্রপের মধ্যে চুক্তির ফলাফলস্বরূপ তাঁর প্যারি থেকে পাঠানো ফ্যাসি-নিন্দার সংবাদ ইজভেস্তিয়া ছাপবে না; কোয়েসলার ও অন্যান্যরা কল্পনা করতে পারেন নি, রিবেনট্রপ মস্কো বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করলে স্বস্তিকাঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত হবে, লাল সেনাবাহিনী নাৎসী-সংগীতের সুর বাজাবে। (রিবেনট্রপকে সোভিয়েট অর্ডার দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছিল বলে শুনেছি। "অর্ডার অফ দি রেভোলিউশন" কি ?)

আদর্শ প্রায় অনেক সময় ধর্মের মতন হয়ে ওঠে। ভালমন্দ বিচার করা যায় না, বা বিচার করতে বসলে সেই সব যুক্তি চলে আসে যা মোটেই মানবীয় নয়। যে-সব আদর্শবাদী যুবকরা, আমার কোনো কোনো বন্ধু কম্যুনিস্ট-আদর্শে দেহমন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা এই রকমই। তাঁরা প্রত্যেকটি ভ্রান্ত-পথকে কুযুক্তি দিয়ে সমর্থন করে গেছেন। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা, সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল, লক্ষ্যের জন্য যে কোনো পথ বেছে নেওয়া, ঘৃণা সৃষ্টির প্রাণপাত চেষ্টা, নিজমত সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও গোঁড়া হওয়া—এ সব আমার মনঃপূত নয়।

আর এক ধরনের যুক্তি, যা কিনা আগে জিদ-দের কেউ কেউ দেখিয়েছিল যে, রুশ সমাজতন্ত্রের যেটা প্রধান লক্ষ্য, বৈষয়িক উন্নতি—সকলকে খাওয়ানো পরানো, সে-ব্যবস্থা করতে বসে শিল্পচিন্তার কথা বাতিল করা যায়। বিশুদ্ধ শিল্প প্রকৃতপক্ষেই সেখানে অপ্রয়োজনীয়। এমন কথাও জিদকে বলা হয়েছিল, যে-নাটক দেখে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে শ্রমিকরা শিস দিয়ে সেই নাটকের কোনো গানের সুর বাজাতে না পারে, সে-রকম নাটকের দরকার নেই।

বৈষয়িক উন্নতির এই কৈফিয়ত অর্থহীন। রাশিয়াকে বৈষয়িক উন্নতিতে এসে পৌঁছতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। যে অভাব অনটন দারিদ্র্য ব্যাধি শোকের জন্য আমাদের এত অসহিষ্ণুতা, কম্যুনিস্ট রাশিয়া তাকে দু চার মাসে উপড়ে ফেলতে পারে নি। দীর্ঘকাল দুর্ভোগের পর এখন তার বৈষয়িক উন্নতি পণ্ডিতরা স্বীকার করে নেন, তাও সর্বক্ষেত্রে নয়। অনেক অ-কম্যুনিস্ট দেশও অনুরূপ, কোথাও কোথাও আরও অধিক বৈষয়িক উন্নতি করে চলেছে। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতির নাম করে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র শিল্প-সাহিত্যকে কোথায় নামিয়েছে তা তারাও ভাল করে জানে। জানে বলেই সেই সংস্কৃতির দুরবস্থায় একসময় বুঝি স্ট্যালিনও নিজ পাপে বিরক্ত হয়েছিলেন, '৫২-তে ম্যালেনকভ বলেছিলেন, আমি কিছু গোগলের স্যাটায়ারের মতন 'স্যাটায়ার' চাই। এমন কি এই মৃত্যুর শীতলতা দেখার পর স্ট্যালিন-পরবর্তী যুগ কিছু বিদেশী হাওয়া সোভিয়েট সংস্কৃতিতে ঢুকতে দিতে রাজী হলেন। বলা হল, ওহে লেখকরা তোমরা পূর্ণিমার রাতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুখে লৌহ-উৎপাদনের কচকচি বাদ দিয়ে প্রেমের কথাবার্তা বসাতে পার।

স্ট্যালিন কম্যুনিস্ট-রাশিয়ার সংস্কৃতিকে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তার বর্ণনা করেছেন একজন এই বলে : আমাদের সংস্কৃতির প্রত্যেকটি কলাকে মুছে তিনি আত্মবশ্যতার চন্দের মতন করেছিলেন।

স্ট্যালিন-পরবর্তীকালে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু হালে ক্রুশ্চভ তাঁর স্পষ্ট ভাষণে জানিয়ে দিয়েছেন যে, লেখক সাহিত্যিক শিল্পীদের কাছে সহাবস্থান নেই, এমন কিছু তারা করতে পারবে না যা পার্টি-বিরোধী।

আমি যে কেন কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় আমার মন বসাতে পারি না তা বোঝাই যাচ্ছে। "সমাজবাদী বাস্তবতা"র যে ফতোয়া ১৯৩০-এ কম্যুনিস্ট-রাষ্ট্র লেখকদের সামনে পেড়ে দিয়েছে, তার সোজা অর্থ—লেখক নিজের মতন করে দেখতে বা বিচার বিবেচনা করতে পারবেন না, সরকারী নীতির বা [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর লেখা, [illegible] তার দুঃখ দারিদ্র্য পাপ অস্বীকার করে কাল্পনিক সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা মনে করে কলম চালাতে হবে। আর সর্বদা পার্টির কথা মনে রেখে বিবেচনায় করতে হবে তাদের প্রতি যারা কম্যুনিস্ট নয়। আমি "সমাজবাদী বাস্তবতা"র বিকৃত ব্যাখ্যা করেছি বলে কেউ যদি মনে করেন তিনি যেন স্ট্যালিনী সোভিয়েট-সাহিত্য কিছু কিছু পড়ে দেখেন। আমাদের অপেক্ষাও বিবেকবান সেই রুশ-লেখকদেরই বেদনা আজ বেশী, যাঁরা মনে করেন তাঁরা তাদের মহৎ উত্তরাধিকার, যা গোগোল থেকে টলস্টয় পর্যন্ত চলে এসেছিল তা হারিয়ে গেছে। আবার বলছি, কি করে ভাবা উচিত, কি করে লেখা উচিত, কি লিখলে পার্টির কাজে আসবে—এই কটি মূল শিক্ষাই কম্যুনিস্টদের সরকারী লেখক-সংঘ দিয়ে থাকেন।

ব্যক্তি হিসেবে, গণতন্ত্রই আমার কাম্য; যৎসামান্য লেখক হিসেবে গণতন্ত্রই আমার এ-জীবনের আশ্রয়ভূমি। আমি যখন গণতন্ত্রের কথা বলি তখন এর নৈতিক দিক-গুলির সম্ভাবনায় বিশ্বাস রেখে তাকে বাঞ্ছনীয় মনে করি। গণতন্ত্র মানুষকে নৈতিকভাবে যে মূল্য দিয়েছে তার প্রতি আমার আকর্ষণ স্বাভাবিক। গণতন্ত্র, এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, গণতন্ত্র ব্যক্তি-মানুষকে আত্মস্বার্থ আত্মবোধ উদ্যম সুখ-শান্তির প্রচেষ্টার জন্য কর্ম বিচার বিবেচনা, সমালোচনার অধিকার এবং স্বীয় ভাগ্য গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছে। গণতন্ত্রের ভিত্তি যুক্তিবাদী, নৈতিক ও আত্মিক প্রাণীরূপে মানুষের উপর বিশ্বাস।

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এখনও ঘটে নি। আমরা যে নতুন জিনিসটি সদ্য পেয়েছি তার জন্যে আমাদের যথোচিত শিক্ষা ছিল না। নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নেব, আমাদের মধ্যে দোষ ত্রুটি অসংখ্য; আমরা নৈতিকভাবে এই গণতন্ত্রের অংশীদার হবার যোগ্য হয়ে উঠিনি; আমাদের দায়িত্বহীনতা লোভ ও লালসা, দুর্বলতা স্বার্থপরতা ইত্যাদি আমাদের চারপাশে বিষ-কাঁটার মতন ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি তার নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার না করে, নিজের [illegible] না বুঝে থাকে তবে তার দায় তার, গণতন্ত্রের নয়।

পৃথিবীতে অদ্যাবধি পূর্ণ নিখুঁতরূপে গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা যায় নি—। কিন্তু এই হল আমাদের লক্ষ্য যার [illegible] [illegible] হতে হবে।"

[illegible]-এর একটি কথা দিয়ে আমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সুখ

দিব্যেন্দু পালিত

সুখ নিয়ে আজ আর কেউ ভাবে না। অথচ এমন দিনও ছিল, যখন সুখই ছিল মানুষের সব; সুখের চিন্তায় কেটে যেত দিন রাত্রি। এক কথায়, আহারে সুখ, বিহারে সুখ, কর্মে সুখ—নিরন্তর হেঁটে চলেছে সর্বতোমুখী এক সুখের মিছিল।

ঐহিক সুখের এমন পরাকাষ্ঠা কে কবে দেখেছে!

ললিতও পুরোপুরি দেখেন নি। কিছু-কিছু শুনেছেন, আঁচ করেছেন বাকিটা। সেই অনুমানের মূল্যই বা কম কি। নিজের বাবাকে দেখেছেন। পিতামহকে আজ ঠিক স্মরণ হয় না; তবু অস্পষ্ট আভাসে যতো-টুকু মনে পড়ে, সে-স্মৃতিও নগণ্য নয়। আর কিছু না হোক, আজকের মতো শাক খেয়ে ঘিয়ের ঢেঁকুর তোলার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

নিজেকেও দেখছেন। হ্যাঁ, নিজের জীবন, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই জগৎ ও পারি-পার্শ্বিকের বিচার করা সহজ। তাই করেন ললিত করেছেন। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত (জন্ম: ১৮৯৭) সুখ তাঁর করায়ত্ত ছিল। অন্তত তাঁর বিবাহিত পুত্রের মতো, সুখী হবার উপায় জানবার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেলের বই তাঁকে পড়তে হয়নি। সুখ—কিংবা শান্তি তৃপ্তি যা-কিছু—চর্চার স্কুল তখনো তৈরী হয়নি; তা সৃষ্টি হতো মনের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে ও অল্প অল্প করে, গর্ভের ভিতর ভ্রূণ যেমন অবয়ব পায়।

অথচ, এরাও সুখী হতে পারত। হ্যাঁ, পারত। ললিত জানেন, পারত। পারত বুজোমি না থাকলে পারত, যদি অনাবশ্যক ধোঁয়ায় চোখ না-ধাঁধিয়ে, সাদা চোখে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করত। সুতরাং, সুখের খোঁজে নখ শানিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরু ছুটেও অনেকেই; তেমন কিছু হচ্ছে না। সুখ পলাতক।

মোদ্দা কথা, ললিত নিজেও এখন আর তেমন সুখী নন।

সুখ পলাতক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তাঁর একমাত্র চিন্তা; জাগরণের অতৃপ্তি দুঃস্বপ্নের মধ্যেও ছায়া ফেলে। মারী গুটিকার মতো, দেখতে পান তিনি, বিবেকবিদ্ধ মানুষগুলি ভীষণতর এক অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে ক্রমশ। কেউই আর সুখী নয়'

অথচ, এরাও সুখী হতে পারত। পারত, যদি দেহে ধর্মে বিপুলাকার হবার চেষ্টা না করে ঘরের সংকীর্ণ উঠোনে দাঁড়িয়ে তাকাতো আকাশের দিকে। বস্তুত, ক'জন আজ আকাশের কথা ভাবে! ভাবে না। নিজের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রতা, সীমাবদ্ধতা সবই ইতর সুখ এনে দেয়। 'আত্মসুখ [illegible]

প্রমীলার কথাই ধরা যাক। প্রমীলা : সুবীরের স্ত্রী : ললিতের পুত্রবধূ। তিন বছর হলো এসেছে এ-বাড়িতে। কৃতি পুত্রের সহধর্মিণী হবার জন্য উৎসুক বেশ কয়েকটি তরুণীর মধ্যে থেকে ললিত প্রমীলাকে নির্বাচন করেছিলেন অনেক ভেবেচিন্তে। বড়লোকের মেয়ে নয়। রূপ অবশ্যই ছিল; তবু রূপ দেখেও নয়। আসলে দেখেই বুঝেছিলেন ললিত, মেয়েটি সুখ দিতে জানে; এ-মেয়ে ঘরে ঢুকলে তাঁরা সকলেই সুখী হবেন। কিন্তু, ইদানীং মনে হচ্ছে, তাঁর ধারণা ভুল হয়েছে। প্রমীলা পারেনি।

প্রমীলা তাঁকে হতাশ করেছে, হাঁটতে হাঁটতে ভাবেন ললিত। ভাবলে কষ্ট হয়, তবু ভাবেন। চৈত্রের বিকেলের ক্রমশ ম্লান-হয়ে-আসা রোদ্রের নিচ দিয়ে হাতের ছড়িটা ঠুকতে ঠুকতে হাঁটেন। সাদার্ন অ্যাভি-নিউয়ের পরিচিত পথটি আজ আর তাঁর ভালো লাগছে না; চিন্তায় মাথা ভারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্তি অনুভব কর-ছেন।

বস্তুত, তাঁর মনে হচ্ছে প্রমীলা তাঁকে অপমান করেছে। এমন নয় যে প্রমীলা এ-বাড়ির রীতি-নীতি জানে না। বিয়ের পর প্রথম দিকে ললিত নিজে তাকে প্রকারান্তরে কিছু-কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, তখনই বুঝেছিলেন ললিত।। কিন্তু, তার পরিণতি কি এই?

এখন একা বসে সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করতে করতে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ললিত। গায়ে কেমন এক জ্বালা বোধ করেন। এ-সংসার তাঁর নিজের হাতে গড়া; নিজের বুদ্ধি, শ্রম, রক্ত ও মর্যাদার সর্বকিছু ক্ষয় করেছেন এর পিছনে। কাজ শেষ হওয়ার অর্থ কি নির্বাসন!

ব্যাপারটা অবশ্য তেমন কিছুই নয়। সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে হোমিওপ্যাথিক বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন ললিত। প্রমীলা এল।

প্রথমে টের পাননি ললিত। এ-সময়ে প্রমীলার এ-ঘরে আসার কথা নয়। সত্যি বলতে, কোনো জরুরী কাজ বা কথা না-থাকলে প্রমীলা বড়-একটা এ-মুখো হয় না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকান ললিত।

'কি বৌমা, কিছু বলবে?'

'খোকনের শরীরটা সকাল থেকে ভালো নেই। গা বেশ গরম; কাশছে।'

'টেম্পারেচার নিয়েছ?' ললিত নড়েচড়ে বসেন। এবং এই সময়েই তিনি লক্ষ করেন প্রমীলার মাথায় কাপড় নেই। এলো চুল।

প্রমীলা ঘাড় নাড়ে।

'কতো?'

'নিরানব্বুই।'

ললিত চিন্তিত হন। ভাবেন; অথবা, সময় নেন।

'নিয়ে আসব? এখন ঘুম ভেঙেছে।'

'এসো।'

প্রমীলা চলে যায়।

ললিতের খারাপ লাগে। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যেন কেমন গা-এলানো ভাব সর্বাঙ্গের অভাব। প্রমীলা খোকনকে নিয়ে ফিরে আসার পরও তিনি লক্ষ করেন এবং নিশ্চিত হন যে, মনের ভুলে ঠিক নয়; সম্ভবত জেনেশুনেই প্রমীলা মাথায় কাপড় দেয়নি। এটা শিষ্টাচার, ভদ্রতা; এবং এই সামান্য শিষ্টতা পালন করতে বিশেষ শ্রম বা যত্নের প্রয়োজন হয় না। প্রমীলার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

ললিত স্ত্রীকে বলেন। বৌমার আদব-কায়দা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। সুরমা : ললিতের স্ত্রী ব্যাপারটা বোঝেন। তাঁদের সময় ছিল অন্যরকম। বয়োজ্যেষ্ঠ গুরু-জনদের কথা আলাদা; এমন কি স্বামীকেও তাঁরা রীতিমতো শ্রদ্ধা করতেন। আলো ছিল বড়রকমের নিষেধ। শয়নকালে ব্যতীত মাথার কাপড় সম্পর্কে সব সময়েই তাঁরা থাকতেন সতর্ক। এখন হাওয়া বদল হয়েছে; এ-সব রীতি-নীতি মেনে চলা কেউই আর তেমন প্রয়োজন মনে করে না।

সুযোগ বুঝে পরদিন সকালে সুরমা প্রমীলাকে কথাটা বলেন। ফল ভাল হয়নি।

প্রমীলা নাকি ক্রুদ্ধ হয়েছে; সুরমার তাই ধারণা। প্রমীলা বলেছে, সংসারে পাঁচ-রকম ঝামেলার মধ্যে সব সময় শোভনতা বাঁচিয়ে চলা যায় না। ইচ্ছে বা সততা থাকলেও যায় না। বস্তুত, প্রমীলা ওর সাধ্যমত শ্বশুর, শাশুড়ীর মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করছে।

এইভাবে শুরু। প্রমীলার রোখ চেপেছে; এ-ব্যাপারে সে একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়, এটা বোঝা যায় আরো পরে। সেদিন বিকেলে ললিতের অনুমতি না নিয়েই পাড়ার জ্যোতিষ ডাক্তার খোকনকে দেখে যায়। শুনে ক্রুদ্ধ হন ললিত, কিন্তু কিছু বলেন না। কি প্রয়োজন? বিশেষত, এখন তিনি বুঝতে পারেন, প্রমীলার এতোর সাহসে এ-বাড়িতে ডাক্তার ঢুকবে না। প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই ব্যবস্থা করতেন। তাঁকে ডিঙিয়ে যে-ব্যাপারটা ঘটেছে, তাতে নিশ্চয় সুবীরেরও সায় আছে।

ললিত দুঃখিত হন এবং বিমর্ষ বোধ করেন। তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে এইরকম অশান্তির সৃষ্টি হবে জানলে তিনি সেদিন কোনো কথাই বলতেন না। বলার সময় তাঁর মনে নিশ্চয় অন্য অর্থ ছিল না। মেয়েরা হলো ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের শ্রী। ওদের কাছে এই সামান্য ভব্যতাটুকু আশা করা কি অন্যায়? বিশেষত, প্রমীলার মতো মেয়ের কাছে? প্রমীলা শুধু তাঁর সম্মানেই আঘাত করেনি; প্রমীলা তাঁর এতদিনের সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছে।

গভীর ব্যর্থতার বোধে হাতের পুতুল-কেড়ে-নেওয়া শিশুর মতো মূক হয়ে যান ললিত। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কেন না, তিনি বুঝেছেন—[illegible] [illegible] ব্যবহারে বৌমা ও সুবীর তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে, এ-সংসারে [illegible]

অধিকার তাঁর বা সুরমার নেই। কিংবা, আজ বলে নয়, এ-ধারণা তাঁদের মনে দীর্ঘ-কাল ধ'রে একটু একটু ক'রে প্রশ্রয় পেয়েছে; তারা সুযোগ খুঁজছিল। সুযোগ বুঝে, কি সাহস সুবীরের, বুঝিয়ে দিল : বাবা, খোকন আমার সন্তান, তার দায় দায়িত্বের চিন্তা আপনার নয়, আমার! আমি এখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।

খুবই স্বাভাবিক; ললিত ভাবেন। তার-পর থেকে কেমন অসহায় বোধ করতে থাকেন। রাগে রি-রি করে সর্বাঙ্গ। এ-সংসার তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি; নিজের বুদ্ধি ও শ্রম এবং রক্তের প্রতিটি বিন্দু খরচ করেছেন এর পিছনে। ইচ্ছে করলে তিনিও কি বলতে পারেন না, অনেক হয়েছে, সুবীর। তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, ডানা গজিয়েছে; এখন তুমি নিজের ইচ্ছে মতো যা খুশি করতে পারো। আমার আশ্রয়ে তোমার আর প্রয়োজন কি? এখন তুমি নিজের পথ দ্যাখো।

এ-কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা, কিছুক্ষণ পরেই, ললিতের মাথায় বজ্রঘাত হয়। তিনি ক্ষুদ্র হ'য়ে যাচ্ছেন; তাঁর ন্যায়, নীতি, আত্মসম্ভ্রম ও স্নেহবোধ লোপ পাচ্ছে। এ-সব তিনি ভাবলেন কি ক'রে?

প্রমীলা আজ তাঁর পুত্রবধূ হলেও, বস্তুত পরের ঘরের মেয়ে। তার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ভিন্ন হতে পারে। খুবই স্বাভাবিক যে গোড়ার দিকে, প্রায় সকলেই যেমন করে, প্রমীলাও আত্মগোপন ক'রে ছিল। কিন্তু সুবীর! সুবীর তো তাঁর রুচি ও আদর্শের ছায়ায় একটু একটু ক'রে বড় হয়েছে; তার আত্মজ্ঞান যা-কিছু ঘটেছে বাবার মাধ্যমে। নিজের হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে সুবীর একবারও ভাবল না তার বাবার কথা! কতোদূর শক্তি প্রমীলার যে তিন বছরের মধ্যে সুবীরের মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ একটি ছেলেকে হাতের মুঠোয় এনে সম্পূর্ণ বশ ক'রে ফেলল! মেয়েটি জাদু জানে। তিনটি বছর তার জাদুকরী মায়ার জাল ছড়িয়ে সুবীরের সমস্ত চেতনা লুঠ করে নিয়েছে। প্রমীলা পরের ঘরের মেয়ে; সুবীরও পর হ'য়ে গেল। ভাবতে গিয়ে ললিতের চোখ ফেটে জল আসে।

বিকেলের আলো ক্রমশ ঘোলাটে হ'য়ে আসছে। চৈত্রের হাওয়া ছুটেছে ঘাসের উপর দিয়ে। ললিতের পায়ের কাছে একটি বাসের টিকিট উড়ে আসে। খানিক বিশ্রাম পেলে ভালো হতো বোধ ক'রে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ান।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভেবে নিয়েছেন কোথাও একটা যাওয়া দরকার। না হলে মন ভালো থাকছে না। প্রাণ খুলে দুটো সুখ, দুঃখ, আমোদ, [illegible] কথা বললে স্বস্তি হবে। সুখে [illegible] হঠাৎ কোলা

মানুষের মুখের দিকে তাকালে কে উদ্বেগ-দুঃখ পলাতক। যাহোক ক্লান্তি অবশ্য আছে; চাঁকিতে-উধাও দ্রুতগামী ট্রামের জানলার আড়ালে যে-মুখটি দেখা গেল, তার কথাই ভাবা যাক। মেয়ে কি পুরুষ ঠিক বোঝা যায়নি। তবে ক্লান্ত।

ললিতের মনে হয় তীব্র এক ক্লান্তিতে তিনিও ক্রমশ অবশ হ'য়ে পড়ছেন। এ-ক্লান্তি আগে ছিল না, দেখা দিচ্ছে নতুন। বোধ হয় বয়সের জন্য। কিন্তু, বয়সের জন্যই কি।

আলো জ্বলে উঠেছে চতুর্দিকে। নাগরিক ভিড় ক্রমশ পাতলা হ'য়ে আসছে; বাবু চেহারার মেয়ে-পুরুষ হেঁটে যাচ্ছে আশ-পাশ দিয়ে। ঠিক সময়টা জানবার জন্য কোনো একজনকে খুঁজতে গিয়ে, ট্রাম স্টপে দাঁড়ানো যুবকটিকে চোখে পড়ে। হ্যাঁ, ঘড়ি আছে হাতে।

'সময় কত হল?'

'সাড়ে ছটা।' ব'লে যুবকটি আড়চোখে ললিতকে দেখে। খুব পরিচিত মুখ; বড় বেশি চেনা বোধ হয়। কোথায় দেখেছেন একে? স্মরণ করতে গিয়ে ললিতের হঠাৎ খেয়াল হয় যুবকটিকে তিনি প্রায়ই দেখেছেন। হ্যাঁ, এইখানে, দাঁড়িয়ে থাকে শেডের নিচে। তারপর মেয়েটি আসে। তারপর দুজনে ট্রামে ওঠে, না হয় হাঁটতে হাঁটতে চ'লে যায়। ললিত অনুমান করেন, ওরা বহুদূরে যায়। হঠাৎ এক ধরনের কৌতূহল অনুভব করেন ললিত। দেখলে হয় না ওরা কোথায় যায়, কতোদূরে যায়? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ললিত প্রস্তুত হ'তে থাকেন। ভালো। এই গোয়েন্দাগিরির ফলে যেমন তেমন [illegible] আজকের সন্ধ্যাটা কেটে যাবে। নইলে যাবে কোথায়? অন্তত রাত আটটার আগে বাড়ি ফিরলে সুরমা অখুশী হন। কারণ, ললিত বাড়ি ফিরলে সুরমাকেই তার দিকে একটু-আধটু নজর দিতে হবে। সেটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু।

সে যাই হোক, ইতিমধ্যে মেয়েটি শেডের কাছাকাছি এসে পড়লে উগ্র-কৌতূহলে ললিত মেয়েটিকে দেখেন। এত নিকট থেকে এর আগে কখনো তিনি দেখেননি। এখন মনে হয় মেয়েটিকে তিনি ভালো করেই চেনেন। খুব চেনা মুখের আদল। এত চেনা তবু পেটে আসছে, মনে আসছে না। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লেক টেরাসের বিলাস দত্তের মেয়ে না! ললিত একটু হাসেন। মেয়েটিও কি তাকে চিনতে পেরেছে? অসম্ভব নয়। বিলাস দত্তের বাড়ি তিনি গেছেন দু' একবার। সত্যি বলতে, সুধীরের বিয়ের সম্বন্ধ [illegible] এই বিলাসবাবুর [illegible] [illegible]

[illegible] উঠে। দুপুরবেলা [illegible]। এখন ট্রাম ছেড়ে দিলে প্রায় ছুটে ফুটবোর্ডে উঠে পড়েন ললিত। ক্লান্তভাবে এসে হাতিটা লেকধারের চৌকাঠ পার। দুপুরবেলাটি [illegible] বিরক্ত হয়েছে; ছুড়ে মুচকে লক্ষ করছে তাকে। মনে মনে হাসেন ললিত।

পরক্ষণেই মনে কেমন এক গ্লানি অনুভব করেন। ছি, ছি; এই বয়সে, এইভাবে দু'টি হৃদয়ের প্রিয় অনুভব নষ্ট ক'রে দিয়ে তাঁর কি লাভ হচ্ছে! ওরা নিশ্চয় তাঁকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে! যদি করে, কোনো অন্যায় করবে না। কাজটা অত্যন্ত গর্হিত, অন্যায় ও অশোভন। অনুশোচনায় গা রি-রি করে ললিতের।

পরের স্টপে নেমে পড়েন ললিত। নেমে আশ্বস্ত বোধ করেন। গায়ে ঘাম দিচ্ছে, যেন, অনুভবে মনে হয়, প্রতি রোমকূপ দিয়ে সুখের রস নির্গত হচ্ছে। এইমাত্র একটি পাপ করতে যাচ্ছিলেন, শরীরের যাবতীয় শিরা, স্নায়ু উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বেঁচে গেছেন। পৌরুষের প্রযোজন যোজনীয়া শুড়ে পাপ। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, তারা ক্ষমা করুক।

হাটিতে হাটিতে পিছন দিকে আবার পুরানো জায়গায় এসে দাঁড়ান ললিত। উপর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে নিঃশ্বাস নেন। গাছের আড়াল দিয়ে পরিচ্ছন্ন আকাশ দেখা যাচ্ছে। সুখী দুটি আরশুলার একটিকে ধারালো ব্লেড দিয়ে দু' টুকরো করার ফলে ছোটবেলায় বাবার কাছে মার খেয়েছিলেন, মনে পড়ল হঠাৎ। মারের কারণ সেদিন সমূহ স্পষ্ট না-হওয়ায় মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ললিত। এখন মনে হয়, বাবা ঠিকই করেছিলেন।

এইসব কথা যত মনে হয়, ততই সুখে চকচক করেন ললিত। আগেকার ধরন-ধারণ এখন অনেক পাল্টে গেছে ঠিকই, কিন্তু মূলে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তখন মেয়েরা বড় একটা বাড়ির বাইরে বেরুতো না; ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি দেখা দিত বিয়ের পরে। ইচ্ছে থাকলেও যখন-তখন মেলামেশা, দেখাশোনার অসুবিধে ছিল অনেক। সুরমার জন্য তাঁকে কি কম অপেক্ষা করতে হয়েছে! পুরনো বাড়ির দেওয়ালে বড় ঘড়িটার প্রতিটি টিক-টিক শব্দকে মনে হত সুরমার পায়ের শব্দ। সে-সব অসুবিধে নেই; কিন্তু, অপেক্ষা 'তোমাকে' আজও করতে হ'চ্ছে। পরিবর্তন, পরিবর্তন ক'রে যতই চেঁচাও, বস্তুত, পরিবর্তন তোমাদের কতোটুকু হয়েছে! হয়নি, হওয়া সহজ নয়।

সুধীর ক'দিন থেকে রাত করে বাড়ি ফিরছে লক্ষ করেন ললিত। আগে সাড়ে আটটা, নটার মধ্যে ফিরত; এখন দশটার আগে ফেরে না। সুরমাকে জিজ্ঞেস করে

কিছু জানা যায়নি। সুরমাও জানে না।

আগে আগে তিনি ও সুবীর একসঙ্গে রাতের আহারে বসতেন। কদিন তাঁকে আগেই খেয়ে নিতে হচ্ছে। পরে, ছেলের খাবার ব্যবস্থা করে সুরমা এ-ঘরে চলে আসেন, প্রমীলাই তদারকি করে। সুরমা উপস্থিত থাকলে সুবীর যেন একটু কম খায়; যেন খাবার সে-রকম গরজ নেই। লক্ষ করে সুরমা দূরে থাকাই সাব্যস্ত করেছেন।

সেদিন বাড়ি ফেরার পর সুরমা খেতে ডাকলে ললিত খান না। সুবীর ফিরে আসুক, দুজনে একসঙ্গে খেতে বসবেন। 'কি দরকার তোমার অপেক্ষা করার। তুমি খেয়ে নাও না বাপু', সুরমা ললিতকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। ললিত নিরুত্তর: যা ভেবেছেন, তা থেকে এক চুল নড়বেন না। সুরমা প্রমাদ গোনেন।

ন'টা বাজল, দশটা বাজল। সাড়ে দশটা নাগাদ ফিরল সুবীর। থালা সাজিয়ে সুরমা ডাকলেন, 'বৌমা, সুবীরকে ডাকো।'

ফিরে এসে শুকনো মুখে প্রমীলা বলল, 'উনি আজ খাবেন না, মা।'

'কেন?' ললিত হঠাৎ প্রশ্ন করেন।

'ক্লাবে পার্টি ছিল, খেয়ে এসেছেন।' ভয়ে ভয়ে বলে প্রমীলা।

ললিত চুপ করে যান। নিঃশব্দে আহার সারেন। আঁচিয়ে উঠে স্ত্রীকে বলেন, 'তোমার ছেলেকে বলো, আমি যতোদিন বেঁচে আছি, ততোদিন কোনোরকম বেচাল চলবে না। ক্লাব, পার্টি যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু বাড়িতে যতোক্ষণ আছে, বাড়ির মতো থাকতে হবে। সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

ললিত জানেন, সুরমা এ-কথা বলতে পারবেন না। সে-সাহস বা মনের জোর সুরমার নেই। সুতরাং একটু চেঁচিয়েই বলেন কথাগুলি; যাতে প্রমীলার কানে যায়।

অশান্তি, চতুর্দিকে অশান্তি। আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন ললিত, সুবীর তাঁকে ঘৃণা করছে: তাঁর সঙ্গে আহারে বসতে পর্যন্ত তার রুচি নেই। তিনি, সুবীরের বাবা, জন্মদাতা। বাঃ, চমৎকার সম্পর্ক! চেয়ারে বসতে গিয়ে হঠাৎ বুকে আঘাত লাগে ললিতের। ভাগ্য। এর চেয়ে সুবীর যদি তাকে দু চারটে রূঢ় কথা বলত, তিনি সহ্য করতে পারতেন। চোখে হাত দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকেন ললিত।

হেঁসেলের আলো নিবিয়ে সুরমা ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন। এত রাত্রে সেখানে যাওয়ার কথা নয়। শুয়ে শুয়ে ললিত খোকন কাশছে শুনতে পান, প্রায় বিষম-লাগা কাশি। অপেক্ষা করে করে ললিত উঠে পড়েন। আলো জেলে ওষুধের বাক্সটা বের করেন। বাক্সের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে, তার পিতামহের আমলের জিনিস। এই বই-পড়া ডাক্তারি-বিদ্যেই তিনপুরুষ ধরে এ-বাড়ির অসুখ বিসুখ তাড়িয়েছে: বড় ডাক্তার কালের এসেছে হাতে গুণে বলা যায়। তোমাদের ডাক্তারের কেরামতি তো দেখা গেল। পাঁচদিনেও খোকনের কাশি সারল না। তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ। গোঁয়ার্তুমি করে নিজেরাও ডুববে, [illegible] আয়ত্তে। এই [illegible] ফেলেছে।

ওষুধ নিয়ে ঠাকুর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান ললিত। তারপর উঁকি দিয়ে দেখেন। দেবতার বেদীতে হাত রেখে [illegible] মতো শুয়ে আছেন সুরমা; যেন আঘাত খেয়ে পড়েছেন। তাঁর বাহান্ন বছর বয়সে এই প্রথম অশান্তির ছায়া দেখছেন সুরমা। সুতরাং সে ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়েছে।

ললিতের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে; ভূলুণ্ঠিত সুরমার মধ্যে যেন নিজেকেই আবিষ্কার করেন তিনি। ঝড়, ঝাপটা, নানারকম দুর্যোগ এতখানি বয়স পর্যন্ত তাঁকেও কম সহ্য করতে হয়নি; এ-সবই জীবনযাপনের অংশ। তবু বাইরের দুর্যোগ থেকে সব সময়েই সুরমাকে তিনি আড়াল করে রেখেছেন; সুরমাকে সুখী, নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব করা তাঁর ধর্ম বলে জেনেছেন। ঋজু বৃক্ষের মতো আজও তিনি দাঁড়ালেন। কিন্তু আজকের দুর্যোগ বাইরের নয়; সুরমার রক্তে এর সৃষ্টি। সুরমাকে রক্ষা করার ক্ষমতা আজ তাঁর কোথায়!

অত্যন্ত অসহায় বোধ করেন ললিত। খোকন এখনো কাশছে মাঝে মাঝে। ফিরে গিয়ে নিজেই ওষুধটা দেবেন কি না এক মুহূর্ত চিন্তা করেন। কিন্তু, ওদের ঘরের দরজা বন্ধ, আলো নেবানো। তাঁর পক্ষে যাওয়া অনুচিত হবে। আবার ফিরে আসেন ললিত; সুরমার জন্য অপেক্ষা করেন।

দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করা ভালো, সুরমা। তা পুণ্যাত্মার ধর্ম। যেন সুরমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেন ললিত। তবু তোমার ঈশ্বর চিরদিনই শক্তিহীন অক্ষম, পাণ্ডুর। যতোক্ষণ বিশ্বাস আছে, তিনি আছেন। তিনি আছেন তোমার কর্মের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে, বোধ ও অনুভবের মধ্যে। তুমি কেন বিহ্বল হবে, কেন কাঁদবে, কেন ভেঙে পড়বে! সুবীরকে জন্ম দেওয়ার ভয়াবহ যন্ত্রণা তো তুমি সহ্য করেছিলে, সুরমা!

'সুরমা।' ললিত ডাকেন। গলার স্বর স্পষ্ট হয় না। তবু শুনতে পান সুরমা। দ্রুত উঠে আসেন। মাত্র এতটুকু সময়ের মধ্যে কি পরিবর্তন হয়েছে সুরমার!

'তুমি এখনো শোওনি?'

'না।' ললিত মুখ ফিরিয়ে নেন।

'কিছু বলছিলে?'

'এই ওষুধটা। খোকন বড় কাশছে। ওষুধটা দিয়ে এসো। যেন এখুনি খাইয়ে দেয়।'

'কিন্তু, ও তো ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে!'

'তা হোক, তবু দাও।'

ওষুধটা সুরমার হাতে দিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসেন ললিত।

কি করবেন বুঝতে পারেন না সুরমা।

এত রাতে আবার একটা কেলেঙ্কারী না করলেই কি নয়। স্বামীকে তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। কিংবা, বেশি বোঝেন বলেই এই মুহূর্তে দুর্বোধ্য লাগছে।

ভয়ে ভয়ে সুরমা সুবীরের ঘরের সামনে গিয়ে প্রমীলাকে ডাকেন। প্রমীলা সাড়া দেয় না। খোকন কাশল। আস্তে দরজায় টোকা দেন সুরমা, আবার ডাকেন।

বিশ্রী শব্দ ক'রে এইবার দরজাটা খুলে যায়। প্রমীলা বেরিয়ে আসে। বেশ বিরক্ত; ভ্রূকুটির ভাব লক্ষ করেন সুরমা।

'এই ওষুধটা উনি দিলেন। খোকনকে খাইয়ে দাও।'

মুখে বিরক্তির শব্দ করে প্রমীলা।

'আপনি তো জানেন, মা, খোকন ওষুধ খাচ্ছে।'

'তবু কমার লক্ষণ তো দেখছি না।'

'ওষুধ গেলার সঙ্গে সঙ্গে কোন রোগটা সারে!'

বিব্রত ও বিরক্ত হন সুরমা। তবু নরম হবার চেষ্টা করেন।

'শোন, বৌমা। গুরুজনদের অবাধ্যতা করাটা ভালো নয়। উনি নিজের হাতে দিলেন ওষুধটা বরং। এতে ফল ভালোই হবে।'

হাত বাড়িয়ে ওষুধটা নেয় প্রমীলা যেন ছিনিয়ে নেয়।

'আপনি তো সব ব্যাপারেই আমার দোষ ধরেন।'

সুরমা প্রস্তুত ছিলেন না। কিছু বলার আগেই তাঁর চোখের সম্মুখে সশব্দে দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছিলেন ললিত। পিছন ফিরে সুরমা লক্ষ করেন মুঠো আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ললিত। নিষ্পলক চোখ সুবীরের ঘরের দিকে।

'তুমি আবার বাইরে এলে কেন!' সুরমা স্বামীকে ধমক দেন।

ললিত শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। দেহ কাঁপছে।

'বৌমা'র কি সামান্য চক্ষুলজ্জাও নেই?'

'না। যতো চক্ষুলজ্জা সব তোমার, আমার। তোমাকেও ধন্য বলি! বুড়ো বয়সে যত ভীমরতি! যাও, যাও, শোওগে যাও।'

স্বামীকে ভিতরে টেনে দরজায় খিল দেন সুরমা।

'তোমার অত কি! ওরা যা ভালো বুঝছে করুক। শেষে কি একটা কেলেঙ্কারী না ক'রে ছাড়বে না!'

'স্পর্ধা!' নিজের মনে গজরান ললিত। আদব-কায়দা মানে না! রাত ভোর হোক। আমি নিজের হাতে কুলাঙ্গার ছেলের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।'

'তাই ক'রো। তা হ'লেই ষোলকলা পূর্ণ হবে।'

আলো নিবিয়ে দেন সুরমা।

রাতে ঘুম হয় না ললিতের। শুধু সে দিনই নয়; পর পর অনেক দিন। দিন, মাস কেটে যায়। অশান্তি, চতুর্দিকে অশান্তি। কমছে না, দিনে দিনে বাড়ছে। প্রতিপক্ষকে (হ্যাঁ, ললিত আজকাল ওদের প্রতিপক্ষই ভাবতে শুরু করেছেন।- না ভেবে উপায় কি?) নিষ্ক্রিয় দেখে ওরা যেন পেয়ে বসেছে। ঃ কী ভীষণরকম কোন্দলে স্বভাব বৌমার! সুরমার মুখের উপর একদিন স্পষ্ট বলে দিল, তার বাপ, মা তাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছে। শ্বশুর-বাড়িতে এসে এইরকম দিন রাত নরকবাস করতে হবে জানলে তাঁরা নিশ্চয়ই এ-বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিতেন না। বলে, বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে নিজেই ট্যাক্সি ডেকে, ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল। সুরমা হতবাক। ললিত বাড়ি ছিলেন না। সুবীরও ছিল না।

বাড়ি ফিরে সুবীরের কি হম্বিতম্বি। যা পারল, তাই বলল সুরমাকে। মুখের কোনো আগল নেই। সুরমা মূর্চ্ছা যান। কি ছেলেই পেটে ধরেছিল সুরমা! কি ছেলের জন্ম দিয়েছিলেন ললিত! কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার।

ক্রোধ সামলাতে না-পেরে ছেলেকে কাছে ডাকেন ললিত।

'আমরা তোমার খাই না পরি না, সুবীর। সে-রকম অবস্থা আসার আগেই যেন আমাদের মৃত্যু হয়। তবে তোমাকে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি। সময় থাকতে রাশ টানো। বৌমা শুধু আমার মুখেই চুনকালি দেয়নি, তোমার মুখেও দিয়েছে। সময় থাকতে শাসন করলে বৌমার আজ এতখানি সাহস হতো না।'

'বাঃ, চমৎকার!' সুবীর যেন অট্টহাসি হাসল। 'আমি জানতাম, এইরকম কথাই আপনি বলবেন। সব দোষ বৌমার, সব দোষ আমার। এক হাতে কখনো তালি বাজে না, বাবা।'

ললিত স্তম্ভিত। রাগে, অপমানে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। শেষে বলেন, 'বেশ। সবই যখন বুঝতে পারছ, তখন আমার আর কিছু বলার নেই। এ-বাড়িতে তোমাদের অসুবিধা হলে অন্য ব্যবস্থা দ্যাখো।'

সুবীরের ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফোটে। যেন বিদ্রূপ করছে। তারপর কিছু না বলে গটগট করে বেরিয়ে যায়।

পরের দিন বিকেলে সুবীর মাকে জানিয়ে দিল দু' তিন দিনের মধ্যেই সে অন্যত্র চলে যাবে। ফ্ল্যাট পেয়েছে। তবে, হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে সে এ-বাড়িতে আসবে। কোনো প্রয়োজন হলে সুরমা যেন তাকে খবর দেন।

ললিত শুনলেন। উত্তর দিলেন না।

'কিছু বলছ না যে!' সুরমা ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

'কি বলব?'

'খোকা কি তাহলে ঘরছাড়া হবে?'

'হোক। এখানে যখন ওর পোষাচ্ছে না, অশান্তি হচ্ছে, তখন ঘরছাড়া হওয়াই ভালো।'

সুরমা বোধহয় অন্য কোনো কথা আশা করেছিলেন।

'ছেলে [illegible] না! তা বলে তাড়িয়ে দিতে হবে?'

'দোষ!' ললিত [illegible]

আস্তে আস্তে নেমে আসেন পথে।

সুরমাও তাঁকে ভুল বুঝেছে। ললিত ভাবেন। সুরমা জানে না, যেখানে বছরের তিল তিল অভিজ্ঞতা, চিন্তা, স্নেহ, বাৎসল্য দিয়ে যে-মূর্তি তিনি একটু একটু করে নির্মাণ করেছিলেন, কেন আজ তা ভেঙে দিতে চান। সুরমা জানে না, সুবীরের উপর ললিতের অধিকার কারো চেয়ে কম নয়। সুবীর শুধু তাঁকে অবসন্নই করে তোলেনি, তাঁকে শূন্য করে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে থেমে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখেন ললিত। এখন শ্রাবণ। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। এই বিকেলেও আকাশ ছেয়ে গেছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে। দূর থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের ধ্বনি। আজ বোধহয় বিয়ের তারিখ।

সংসার কি অদ্ভুত! ভাবতে ভাবতে পরিচিত ঘাসের উপর বসে পড়েন ললিত। বর্ষার জল পেয়ে মাটি নরম হয়েছে, ঘাসগুলো তাজা হয়ে উঠেছে। সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঘাসের উপর ভিজে বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে সানাইয়ের সুর বাজতে থাকে ললিতের কানে। দীর্ঘশ্বাস চাপেন ললিত। আজ যাদের বিয়ে হবে, দুদিন পরে তাদের অস্তিত্বের পরিবর্তন হবে। তারা সুখী হোক।

আশেপাশে তাকান ললিত। কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাচ্চারা বুড়ি আয়াকে ঘিরে তেমনি ছুটোছুটি করছে। দ্রুত ধাবমান ট্রাম, বাসের চকিত জানলায় তেমনি ক্লান্তি, তেমনি খুশি। মূলে কোনো পরিবর্তন হয় না, তবু মানুষ বদলে যায়।

হঠাৎ ললিতের চোখ পড়ে ট্রাম স্টপে, শেডের নিচে। সেই যুবকটি এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক মনে পড়ছে না; তবু, যেন কাকেও দেখেছেন এখে। অপেক্ষায়? ব্যাপারটা তেমন বোধগম্য হচ্ছে না। বিলাস দত্তের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আষাঢ়ের শেষে। মাঝে কিছুদিন দুটিকে না-দেখে ললিত অনুমান করেছিলেন ওরা বিয়ে করেছে। কিন্তু, তাহলে আবার অপেক্ষা কেন? কার জন্যে অপেক্ষা? তাহলে কি তাঁর অনুমান ভুল! চোখে ধোঁয়া লাগে ললিতের। না এ-রকম হতে পারে না; হওয়া উচিত নয়।

যতোক্ষণ থাকেন, একভাবে যুবকটিকে লক্ষ করেন ললিত। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সংগে সংগে সময় আন্দাজ করছেন। যুবকটির পায়চারি করা ও ঘন ঘন ঘড়ি দেখার মধ্যে কেমন একটা কাতর ভাব ফুটে উঠেছে। ললিতের মায়া হয়। এমন কি হতে পারে যে যুবকটি জানেন না মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে! এমনও হতে পারে, মেয়েটি তাকে আজও অপেক্ষা করতে বলেছিল? না, তা কি করে সম্ভব! কৌতূহলে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন ললিত।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে ললিত দেখেন যুবকটি এগিয়ে আসছে। কেমন ক্লান্ত,

ভেঙে-পড়া ভাব। ললিতের ইচ্ছে হয় ডাকেন; কিন্তু অযাচিত আগ্রহের ফল ভালো হবে কি না বুঝতে পারেন না। শেষে সামলাতে না পেরে উঠে দাঁড়ান।

'এই যে, বাবা। শোন?'

'আমাকে?' যুবকটি ঘুরে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁ, তোমাকেই।' ললিত হাসেন। 'তুমিই, বললাম, রাগ করো না।'

যুবকটি ভুরু কোঁচকায়। 'কি ব্যাপার বলুন তো।'

'আগে বসো, বলছি। কি, বসো?'

'আমি আপনাকে চিনি না।'

'তা জেনেই ডাকছি।' অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেন ললিত। 'আমি পাগল নই। বসো, কথা আছে।'

কিছু বুঝতে না-পেরেই সম্ভবত যুবকটি ললিতের সামনে বসে পড়ে। কিভাবে কথা শুরু করা যায়, ললিত ভাবেন। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যুবকটি তাঁকে চিনতে পারেনি। ছি, ছি, কি কদর্য ব্যবহার সেদিন তিনি করেছিলেন। এই মুহূর্তেও হয়তো ছেলেটা তাঁকে ঘৃণা করছে। তা করুক। তিনি তাঁর কাজ করবেন। এখনো যদি কিছু না-জেনে থাকে, তাহলে তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। বোঝানো দরকার সহজ, সরল বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে গেলে তোমাকে ঠকতে হবে। এমনও হতে পারে সত্যি সত্যিই যুবকটি প্রতারিত হয়েছে।

'এদিকে তো তুমি মাঝে-মাঝেই আসো? মানে, প্রায়ই দেখি।'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ে।

'কি নাম তোমার? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে—'

'না না, আপত্তির কিছু নেই।' কেমন বিমর্ষ দেখায়। 'নাম সাধন। সাধন চৌধুরী।'

ললিত খুশি হন। 'থাকো কোথায়?'

'ভবানীপুর।'

'ও।' একটু থেমে প্রশ্ন করেন ললিত, 'মাঝে কিছুদিন তোমায় দেখিনি যেন?'

ছেলেটি ক্রমশ অবাক হচ্ছে।

'সব খবরই রাখেন দেখছি।'

'তা রাখি।'

'ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম মধুপুর। অফিসের কাজ।'

ললিতের চোখের সামনে আকস্মিক বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ে।

'বিয়ে করেছ?'

'না। এ-সব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

ছেলেটি, সাধন যেন কিছু আঁচ করতে বিস্ময়ের চোখে দেখে ললিতকে। ললিত হাসেন।

'বিজনবাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিল না?'

চুপ করে থাকে সাধন।

'তুমি হয়তো জানো না। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।'

প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষতে কষতে একটা বাস এসে থামল। সেদিকে তাকিয়ে ললিত বলেন, 'আমায় বিশ্বাস করো। আমি তাদের চিনি। তোমাকেও চিনি। কিন্তু, তুমি কিছুই জানো না, এইটেই আশ্চর্য!'

হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় ললিতের কথাগুলি ভেসে গেল। ঝড় আসছে। রাস্তার লোক-জন ছুটোছুটি করে যে যেদিকে পারে, আশ্রয় নিচ্ছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। উঠে দাঁড়িয়ে ললিত সাধনের হাত ধরেন। 'চলো।' ওই বারান্দায় নিচে দাঁড়াই। তুমি ভিজে যাচ্ছ।'

'আপনি যান।' সাধন হাত ছাড়িয়ে নেয়।

ললিত তার পিঠে হাত রাখেন।

'দুঃখ, কষ্ট, বঞ্চনা মানুষের জীবনে অনেক আসে, বাবা। তা বলে ভেঙে পড়ো না। তাহলেই সুখী হতে পারবে।'

চোখে, মুখে, সর্বাঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে। সাধন উত্তর দিল না। বৃষ্টিটা তাঁর শরীরের পক্ষে ভালো নয়। কোথাও আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন।

'কই, এসো!' বাজ পড়ার শব্দে নিকটের বারান্দার দিকে ছুটে গেলেন ললিত। ছেলেটা ভিজছে। বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে তারপর ললিত দেখলেন যতোদূর চোখ যায়, বৃষ্টির মধ্যে ভগ্ন, ক্লান্ত সাধন হাঁটিতে হাঁটিতে উত্তরের দিকে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষে আর দেখা গেল না।

এতক্ষণে ললিতের মনে হয়, তিনি ভুল করেছেন। কি প্রয়োজন ছিল গায়ে পড়ে এই সংবাদ জানানোর। বয়সটা খারাপ। আবেগের মাথায় হঠাৎ যদি কিছু করে বসে! এ-রকম ঘটনা কিছু নতুন নয়, অস্বাভাবিক নয়। হঠাৎ যদি আত্মহত্যা । না। মাথার চুল টেনে ধরেন ললিত। বৃষ্টির মধ্যেই আবার নেমে পড়েন পথে।

সাধনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন ললিত। গ্লানি, অনুশোচনায় দু' চোখ অন্ধ হয়ে আসছে। কি করলাম, হায়, কি করলাম।

না, না, এ-রকম হতে দেওয়া যায় না। বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা ঠোকেন ললিত। ঘুমোবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ঘুম আসছে না। যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন ললিত আত্মঘাতী হবার জন্যে ছুটোছুটি করছে সাধন। মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন ললিত। উঠে আলো জ্বালেন। দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। মাধব দত্ত লেনটা যেন কোথায়?

সুরমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

'ঘুম হচ্ছে না হজমের গোলমালে। একটু সোডা খেয়ে দেখবে?'

মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ললিত বলেন, 'আমার পোস্ট ডাইরেক্টরিটা কোথায়, সুরমা?'

ট্রামে-বাসে

ইন্দো-পাক আলোচনা প্রসঙ্গে কাশ্মীরের প্রশ্নে পাকিস্তান তৃতীয় পক্ষ লইয়া বেশ ভেল্কি খেলিতেছেন।—“কিন্তু দ্বিধা কেন? শরিয়তী মতে তৃতীয়পক্ষ তো চালু হতে বাধা নেই। ভারতের কথা আলাদা। এখানে এক পক্ষের বাহিরে গেলেই জানাজানি, কানাকানি, কোর্ট-কাছারি কেলেঙ্কারির অন্ত নেই”—বলেন বিশুখুড়ো।

জনাব ভুট্টো কী ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে শুনিলাম ভারতকে তিনি

“নাক-উঁচু” বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—“নৃতত্ত্বের দিক থেকে কথাটা ঠিক নয়। কিন্তু সে কথা থাক। পাকিস্তানের খাঁদানাকের প্রতি প্রীতি আর একবার বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল!!”
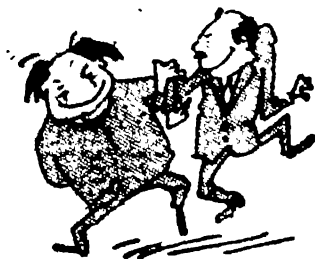
সংবাদে শুনিলাম সম্প্রতি জাপানের কোন একজন মন্ত্রী সংসদ ভবনে ঘুমাইয়া পড়েন। তাঁহার নাকও ডাকিতেছিল। তাঁহাকে জাগাইয়া দিলে তিনি

কিছুমাত্র লজ্জিত হন নাই। —“সত্যিকারের ঘুম হলে সত্যি সত্যি লজ্জার কিছু থাকে না। কিন্তু যাঁরা জেগে জেগে ঘুমোন, ধরা পড়লে সত্যিকারের লজ্জা তাঁদেরই”—বলে শ্যামলাল।

[illegible] সংবাদে প্রকাশ ইন্দোপাক [illegible] আলোচনা বানচাল হইয়া যাওয়ার পর [illegible] নাকি কেন্দ্র ইংরেজীতে [illegible] করিয়া দিয়াছেন। [illegible]

করি যাও নিজ কাজে”— তাহলে আলাপ-আলোচনায় “বিসর্জন” নাটক বেশ জমা বেঁধে উঠত—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।
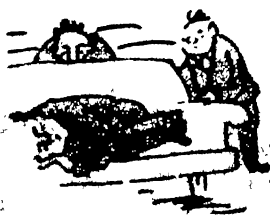
পাকিস্তান নাকি সম্প্রতি ভারতের ভিতর দিয়া ২৬ মাইল সড়ক দাবি করিয়াছে।—“কিন্তু মাত্র ২৬ মাইল কেন? তার চেয়ে গোটা গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোডটা চেয়ে বসলে তো একটা দাবির মতো দাবি হত”—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

আচার্য বিনোবা ভাবে নাকি বলিয়াছেন—ঈশ্বরই সব ভূমির মালিক, আমরা অছি মাত্র।—“কিন্তু সেক্ষেত্রে ভূ-দানের ব্যাপারে অছিদের অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন আপনা থেকেই যে এসে যায়”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

প্রস্তাবিত ন্যায্য মূল্যের মৎস্যের দোকানের কর্মভার মহিলাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব নাকি কতিপয়

মহিলা মৎস্য মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—“নেহাৎ মহিলা বলেই গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল বলতে পারছিনে, তবু অনুরোধ করব তাঁরা যেন মাছের ন্যায্য মূল্যের ব্যাপারে আমা [illegible] করেন, মৎস্য-চরিত্রও অনেকটা দেবাঃ ন জানন্তির মতোই!”

মহাকাশচারী গর্ডন কুপার বলিয়াছেন,—মানচিত্রে কমিউনিস্ট চীনকে যেমনি দেখা যায় তিনি ঊর্ধ্ব আকাশ হইতে ঠিক সেইরূপ দেখিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—“তবে ম্যাকমোহন লাইনটা মানচিত্রে ঠিক কিরূপ দেখা গেছে সে সম্বন্ধে কুপার কিন্তু কোন কথা বলেননি!!”

কুপার আরো বলেন—তিনি [illegible] [illegible] দেখিতে পাইয়াছি।—“কিন্তু দেখে ঠিক চিনেছেন [illegible] [illegible] [illegible]

সার্কুলার রোডের কয়েকটি বাড়িতে এখন [illegible] দুইটি করিয়া দিতে হইয়াছে।—“কিন্তু তাতে কী আর এমন হয়েছে, এ তো আর ট্রাম-বাসের সিঁড়ি নয় যে ঝাড়ুতে গেলে মাথায় বাজ পড়বে”—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি প্রবন্ধের শিরোনামা—“শ্যাওলাও খাওয়া চলে”।—“কেন চলবে না? ঠেলায় পড়লে বাঘে পর্যন্ত ধান খায়, শ্যাওলা তো শ্যাওলা”—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে একটি চক্ষু-ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে।—“খুবই উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু মনের দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে চোখের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত হয়, না চোখের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মন প্রভাবিত হয় সে কথা আমাদের জানা নেই। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গে “বাম”-চক্ষুর প্রভাব নাকি খুব বেশি। তেমন একটি চোখ জোড়া দেওয়ার ফলে যদি গোটা মনটাই বামে হেলে যায় তা হলে আশঙ্কার কথা। ব্যাঙ্কে চোখ জমা নেওয়ার আগে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আশা করি চোখ যাচাই করে নেবেন”—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে আমরা “সাইরেন স্যুটে” পরিহিত প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ মিঃ চার্চিলের ছবি দেখিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিল নাকি সব সময়েই এই স্যুটটি পরিতেন। তাঁর আশা ছিল সাইরেন স্যুট একদিন ফ্যাশন বলিয়া গৃহীত হইবে। কিন্তু একবার মস্কো সফরের পর চার্চিল নাকি ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছেন। —“কিন্তু সাইরেন স্যুট সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার যে কোন কারণ নেই তা একবার চীন বা পাকিস্তান সফরে গেলেই প্রমাণিত হবে। তবে এর সঙ্গে একটি “টিন হ্যাট” চালু করার ব্যবস্থাও করতে হবে, চীন-পাকে দর্জিপাড়া তৈরী হয়েই বসে আছে!!”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এক সংবাদে শুনিলাম, পাক সরকারী কর্মচারীদের ভারতীয় শাড়ী গ্রহণে নাকি বাধা সমুপস্থিত হইয়াছে। —“আমাদের কথা অবশ্য বিকোবে না, তবু বলি কসমারং মনুষ্যালাপ”—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রী [illegible] বলিয়াছেন,—চীন ও পাকিস্তানের [illegible] [illegible] করিবে না।—“খুবই [illegible] [illegible]

॥ ৬ ॥

"By Heaven, but this maid is fair
I never have seen the like of her"
Faust

জীবন যখন হিন্দুরাও কুঠিতে এসে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, শাহ যুবুজ আক্রমণে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা তার সফল হয়নি। সে ভেবেছিল যমুনার চর বরাবর চলে এসে মেটকাফ সাহেবের কুঠিতে পৌঁছে পশ্চিমে ফিরে কোম্পানীর ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু শহর থেকে বের হয়ে দেখলো যমুনার চর বরাবর সিপাহী পাহারা। বুঝলো যে, কোম্পানী পক্ষ থেকে আগুনের ভেলা ভাসিয়ে নৌ-সেতু পুড়িয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা হয়েছিল তারই প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সতর্কতা। তখন সে বাধ্য হয়ে নৌ-সেতু যোগে অপর পারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তারপরে খানিকটা উজিয়ে গিয়ে খেয়ায় নদী পার হয়ে অনেক ঘুরে কোম্পানীর ছাউনিতে এসে পৌঁছল।

হিন্দুরাও কুঠিতে আর কেউ জীবনের উপস্থিতি জানবার আগেই জানতে পেলো ক্যালিবান। উল্লাসে কৌতূহলে মেশানো এক বিচিত্র রবে হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠল, আর চার হাত পায়ে লাফিয়ে উঠে স্ফীতনাসার পরিচিত গন্ধ সন্ধান ক'রে এ ঘর ও ঘর করতে লাগল। তারপরে হঠাৎ বাইরে বের হয়ে জীবনকে দেখতে পেয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে ডেকে উঠল, সে ডাক কতকটা অভ্যর্থনার, কতকটা উল্লাসে কতকটা স্বস্তিতে মেশানো। এই চব্বিশ ঘণ্টাকাল সে অন্নজল ত্যাগ ক'রে, নীরবে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল।

তার ডাক শুনে গুরুবচন আর লছমণ বের হয়ে এলো, ব্যাপার কি? ক্যালিবান ডাকে কেন? এমন সময়ে তাদের চোখে পড়লো জীবনলাল সোজা চলে আসছে কুঠির দিকে।

তাকে দেখে এক মুখে গুরুবচন আর লছমণ আনন্দে চীৎকার করে উঠল— [illegible]

এইমাত্র ঘরে ঢুকলাম, এখনো বসতে পারিনি। তারপরে বলল, যদি কিছু খাদ্য থাকে দাও, খিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

তখনি ওরা চাপাটি, লাড্ডু আর এক লোটা জল নিয়ে এলো। আগে হাতমুখ ধুয়ে খুব খানিকটা জল পান ক'রে নিয়ে খেতে শুরু ক'রে দিল, বলল, তারপরে এদিকে খবর কি বলো?

গুরুবচন বলে, খবর বড় ভালো নয়। শাহযুবুজের কামান দখল করতে গিয়ে আজ আমাদের বড় ক্ষতি হয়েছে।

জীবন খেতে খেতে বলল, আমাদের কম পাল্লার কামান নিয়ে শাহযুবুজের কাছে যাওয়া ঠিক হয়নি।

সে তো সবাই জানি, কর্নেল সাহেবও জানে, কিন্তু একেবারে কমাণ্ডার ইন চীফের হুকুম, না করবার উপায় নাই।

ক্ষতির পরিমাণ কি রকম?

তা হতাহতে শ দুই।

এভাবে ক্ষতি বেড়ে চললে শেষ পর্যন্ত দিল্লী অধিকার করবার মতো ফৌজের অভাব দেখা দেবে।

অসম্ভব নয়, বলে গুরুবচন।

তবে?

খবরের মধ্যে এই যে, আজ বিকেলে কর্নেলের কাছে দু'খানা চিঠি এসে পৌঁছেছে, অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো।

জীবন বলে, অন্ধকার তো দেখতেই পাচ্ছি, এবারে আশার আলো কি শুনি?

জেনারেল নিকলসন ভারি কামান আর পেশবারী পল্টন নিয়ে দু' দশ দিনের মধ্যেই পৌঁছবেন।

জীবন স্বীকার করে, হাঁ, এ আশার আলো বটে। জেনারেল নিকলসন একাই একটা পল্টন। আর একখানা চিঠি কার?

কর্নেল গ্রেসন্যানের। [illegible]

[...]রে বেরিলি পৌঁছে জানিয়েছেন যে, [শী]ঘ্রই কিছু ফৌজ নিয়ে এসে পৌঁছবেন [ত]ার সঙ্গে আনবেন এমন একটা আশ্চর্য [অ]স্ত্র যার সামনে পড়লে সিপাহী কেন খোদ [শয়]তান অবধি হার মানবে।

এমন অস্ত্র তো আমার জানা নেই।

কর্নেল সাহেবদেরও জানা নেই, বলে [গু]রুবচন।

তুমি জানলে কি ক'রে?

[ক্রি]জম্যান, স্কট, রীড আর ক্লিফোর্ড [নি]জেদের মধ্যে আলোচনা করছিল শুনতে [পে]লাম।

ক্লিফোর্ডের উল্লেখে স্বরূপ বলে ওঠে, এতক্ষণ সে চুপ ক'রে শুনে যাচ্ছিল, সামরিক বিষয়ের মধ্যে কথা বলা সে পছন্দ করে না, বলে ওঠে, যে জন্যে গিয়েছিলে তার কি হ'ল? সে মেয়েটাকে ক্লিফোর্ডের বোন বলে কি মনে হ'ল?

জীবন উত্তর দেওয়ার আগেই গুরুবচন বলে, সত্য কথা বলতে কি ভাই, তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম আমরা, কর্নেল সাহেবও।

কেন?

কেন কি! ঐ ক্যাভালরি চার্জের মধ্যে কোথায় যে তুমি গেলে, কোথায় বা গেল তোমার ঘোড়াটা। কি আর ভাবো বলো। কর্নেলের হুকুমে অবজারভেটারি টাওয়ারে উঠে অনেকক্ষণ ধরে দূরবীন কষেও হদিস পেলাম না।

গুরুবচন বলে, একবার কর্নেল বললেন, জীবন নিশ্চয় শহরের মধ্যে চলে গিয়েছে।

আমি শুধাই ঘোড়াটার কি হ'ল তবে?

তাও তো বটে ঘোড়াটা গেল কোথায়? না, না, জীবন মরতে পারে না, কিছুতেই পারে না।

এবারে স্বরূপ বলে, সে সমস্যার সমাধান

তো হ'য়েছে। সেই মেয়েটার পরিচয় কিছু পেলে?

পরিচয় পেলাম না, কেননা ছিল না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি এলিনা ক্লিফোর্ড ছাড়া কেউ নয়।

এখন উপায়?

জীবন বলে, উপায় আর কি? কর্নেল পাঠিয়েছিলেন তাঁকে রিপোর্ট করবো, তারপরে যা করবার তিনি করবেন।

গুরুবচন বলে, তবে চলো যাই কর্নেলের কাছে।

না, ভাই আজ আর পা চলছে না, কাল সকালে রিপোর্ট করলেই হবে।

ইতিমধ্যে আহার শেষ হয়েছে। পাতে যা বে'চেছিল ক্যালিবানের সম্মুখে ধরে দিতে সে বার কয়েক শ‍ুকে দু' এক টুকরো রুটি খেল। জীবন আঙুল দিয়ে বার কয়েক তার মাথাটা চুলকে দিল, ক্যালিবানের মুখ দেখে মনে হ'ল সে ভারি আরাম পাচ্ছে।

এমন সময়ে স্বরূপ শুধালো, দিল্লী কেমন দেখলে জীবন ভাই।

কেমন দেখলাম? এক কথায় তো বলা যাবে না। ও যেন আমার অনেক জন্মের বাসস্থান।

স্বরূপ বলে, নিজ বাসস্থানের এমন প্রশংসা শুনে ভারি আনন্দ হচ্ছে। আর একটু খুলে বলো।

আজ মাপ করো ভাই, কাল বলবো, অবশ্যই বলবো।

এই বলে সে নিজ তক্তপোশে গিয়ে শুয়ে পড়লো, পায়ের কাছে মাটিতে পাতা একখান। চটের উপরে শুয়ে পড়লো ক্যালিবান।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় জীবনলালের, বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে গিয়ে মনটা ভারি প্রফুল্ল বোধ করলো, আরামে আনন্দে স্বাস্তিতে মেশানো কেমন একরকম ভাব। সারাদিনের ক্লান্তির বোঝা কখন যেন ঘুমের মধ্যে খুলে প'ড়ে গিয়ে শরীরট পাখির পালকের মতো হাল্কা হ'য়ে গিয়েছে আর সে যেন বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। এত আরাম এত আনন্দ আগে আর কখনো পায়নি। এই আকস্মিক অভিজ্ঞতার হেতু বুঝতে পারে না, অবাক হ'য়ে কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করে। একদিকে শরীরটা যেমন হাল্কা হ'য়েছে তেমনি আর একদিকে মনের মধ্যে জ্বলে উঠেছে আলো। চারদিক একেবারে আলোয় আলোময়। কোথা থেকে এলো এত আলো এমন বিমল যার প্রভা।

জীবন যদি বুঝতে পারতো তবে বুঝতো যে, এই আলোর পিচকারি আসছে কোন একটা ঘুলঘুলি থেকে যেখানে একজোড়া চোখ মুগ্ধ ব্যাকুলতায় তাকিয়ে ছিল বিদায় কালে। আবার কে বলতে পারে যে সেই চোখ জোড়াই ব্যাকুল প্রত্যাশায় তাকিয়ে নেই পথের মোড়ে যেখানে যে-কোন মুহূর্তে একটি মূর্তি জেগে উঠতে পারে। না, এত কথা বুঝতে পারে না জীবন। শুধু বোঝে যে, ঘরটা আলোয় আলোময়। যদি আরও বেশি বুঝতো তবে জানতে পারতো যে আলো আগেও জ্বলেছিল তবে এবারে কিছু বিশেষ আছে। পান্নার সঙ্গে পরিচয়ে জীবনের মনের মধ্যে আলো জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু পান্না সরে যেতেই ঘর আবার তেমনি অন্ধকার। পান্না প্রদীপ, তার শিখায় জীবনের ঘর আলোয় ভ'রে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে যে সে নিজেই প্রদীপ হ'য়ে জ্বলে উঠেছে। এ আলোর আর সরবার ভয় নাই।

অনভিজ্ঞ জীবন জানে না যে, প্রত্যেক মানুষ একটি প্রদীপ, তবে শিখার সঙ্গে সলতের যোগ না হওয়া পর্যন্ত সে নির্বাপিত। এমন হতভাগ্যের অভাব নেই, না, তাদের সংখ্যাই অধিক, যারা শিখার জ্যোতিষ্কের স্পর্শের অভাবে নির্বাপিত অস্তিত্ব যাপন ক'রে একদিন ভেঙে যায়। কিন্তু কখনো কখনো কারো কারো ভাগ্যে শিখায় সলতের শুভ যোগাযোগ ঘটে, জ্যোতির্ময় হ'য়ে ওঠে তারা। জানতেও পারে না কখন লেগেছিল শিখার সঙ্গে সলতেটি, অতর্কিতে চমকে ওঠে আলোয় ভরা ঘর দেখে। নির্বাপিত দীপ নিয়ে জীবন ঢুকেছিল দিল্লীতে, ফিরে এসেছে জ্বলন্ত দীপ নিয়ে। কোথায় লাগলো

[illegible] জলে উঠেছে। কেন ভালবাসা আর কার ভালবাসা।

এ সময়ে কেউ যদি জীবনকে জিজ্ঞেস করে, জুলনী নামে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে, তবে সত্যই বিস্মিত হতো জীবন, জীবনের কাছেও নিতান্ত ব্যাপারটা। প্রথম দর্শনে প্রেম হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রেমের প্রথম দর্শন যে প্রায়ই জানতে পাওয়া যায় না। কখন কোথায় চোখে চোখে ছোঁয়া লাগে, জ্বলে ওঠে আলো, যাদের চোখ তারা ভাবে বাইরে থেকে এলো আলো, চোখ থেকেও সে আলো ঠিকরে পড়তে পারে,

[illegible] দিয়েছে, দিয়ে, তাঁর [illegible] আত্মা তখনো আবদ্ধ [illegible]।

এই সব অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার কারণ খ্ুঁজতে খুঁজতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ যখন ঘুম ভাঙলো দেখলো গুরুবচন সিং দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে।

কি ব্যাপার ভাই গুরুবচন?

তুমি ফিরে এসেছ শুনে কর্নেল সাহেব খুব খুশী হয়েছেন, ডাকছেন।

চলো যাচ্ছি।

ক্যালিবান জেগে ব'সেছিল। তার মাথাটা

[illegible] পরে [illegible] মেয়েটিকে দেখে কি মনে হলো?

সত্যটার তো কোন উত্তর দেয় না, তবে বয়স ও পরোয়ার পরিচয় থেকে মিস ক্লিফোর্ড বলেই মনে হয়।

আমাদের ছাউনিতে আসতে রাজি হবে কি?

প্রস্তাব করেছিলাম, সঙ্কেতে না করেছিল।

মিস্টার ক্লিফোর্ড গেলে হয়তো রাজি হ'তো।

জীবন বলে ওঠে, এমন প্রস্তাব করবেন না। শ্বেতাঙ্গের পক্ষে এখন দিল্লী প্রবেশ অসম্ভব। আর তেমন অসম্ভব সম্ভব হলেও চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা, যারা সেই মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের প্রাণহানি সুনিশ্চিত।

ইউ আর রাইট, গীবন। না, ক্লিফোর্ডকে আদৌ জানানো চলবে না, তাহলে সে এখনই এমন এক কাণ্ড ক'রে বসবে, হয়তো একাই রওনা হয়ে যাবে দিল্লীতে।

অসম্ভব নয়, বলে জীবন।

কিন্তু গীবন, মেয়েটিকে এখানে আনবার কি উপায়?

আর একবার গিয়ে অনুরোধ করতে পারি।

আর একবার যাবে? বিপদ তো আছে।

দেশী লোকের পক্ষে তেমন কিছু নয়, বিশেষ নিরাপদ পথঘাট চিনে এসেছি।

তোরি গুড। তবে এবারে এক কাজ করো, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে যাও।

ব্যক্তি বিশেষের উল্লেখ থাকলে আর চিঠি ধরা পড়লে তার প্রাণহানির আশঙ্কা।

ব্যক্তি বিশেষের উল্লেখ থাকবে কেন? এইভাবে থাকবে যে To whom it concern. পত্রবাহক আমাদের বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ রেসালাদার। যদি কেউ স্বেচ্ছায় কোম্পানীর ছাউনিতে আসতে চায় তবে পত্রবাহক তাকে সাহায্য করবে।

এ রকম চিঠিতে কাজ হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু চিঠি সুদ্ধ ধরা পড়লে যে তোমার বিপদ।

সৈনিকের বিপদ কখন নেই!

কখন রওনা হবে?

বিকেলেই দিকে।

[illegible]

নেপথ্যে

মঞ্জুলিকা দাশ

মিলি, লিলি, দীপা বন্ধু সব বসে আছে যে।

—থাকুক। ট্রেন এক ঘণ্টা লেট আছে। চলো আমরা একটু ঘুরে আসি হাওড়া-স্টেশনটার এদিক-ওদিক।—

টিকিট ঘরের সামনে কালো রং সাদা রং-এর দুটো হাত একসঙ্গে টিকিট কাটবার জন্য অগ্রসর হতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুজনের ভেতরের বিস্ফারিত বিস্ময়টা অভূতপূর্ব আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে। এ ওকে বলেছে ঃ আরে তুমি যে!

ও একে বলেছে ঃ তুমি! হাত সরিয়ে নাও। দুটো ব্যান্ডেল কাটি।

—না না, সে কি, আমি চন্দননগরে যাব। শুধু আমি নই—মিলি, লিলি, দীপা বন্ধু—সব বসে আছে। তোমাকে কাটতে হবে না, আমিই কাটবো।

—না। আমিই কাটবো। চলো ব্যান্ডেল থেকে ঘুরে আসি। ব্যান্ডেলচার্চ, গঙ্গা,—গঙ্গার তটে......নির্জনতা। চাও তো নৌকো করে ঘুরিয়ে আনতেও পারি।

—পাগল! এক দঙ্গল নিয়ে।

—আমার মিলি যে তোমার আপন পিসতুতো দাদার বউ। সে আত্মীয়তা ভুলবার নয়।

[illegible]

আমি জানি না, বোকা মেয়ে সেই জন্যই তো আমাদের আরও বেশী করে যাওয়া উচিত। তুমি যদি চাও আমি বিদ্রোহে ফুঁসে উঠে চারিদিকের এই লোক-দেখানো লৌকিক বেরিয়ার ভেঙে ফেলতে পারি। তুমি যদি আমার সঙ্গে মিশতে চাও,—আমি যদি তোমার সঙ্গে মিশতে চাই,—কারও সাধ্য নেই সেই মেলামেশাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে একশা করে দিতে পারে।—

—কী সব বলছো অর্ণব!

অর্ণব উত্তেজনা সামলে নিল। শেষ পর্যন্ত চন্দননগরের টিকিটই কাটা হল সবগুলো।

—এ গুলো রেখে দাও তোমার কাছে।—

এষণা তার ব্যাগে টিকিটগুলো রেখে দিতে দিতে বলল, এ তোমার ওপর অন্যায় জুলুম করা হল। এইভাবে টিকিট কাটিয়ে।

—তুমি এরকম কথাবার্তা বলে আমাকে অপমান করো না এষা। তোমার জন্য আমি এমন কিছু করিনি। আমি তোমাকে বলিনি,—তুমি মাত্র আর কটি বছর অপেক্ষা করো,—বিদ্যা-বুদ্ধির চেয়ে এ যুগে টাকাকে সবাই সম্মান করে। নিউ ইন্সিওরেন্স নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আর ক'দিন বাদে যখন অর্ণব চ্যাটার্জিকে তার টাকার জন্য আত্মীয়-স্বজনেরা [illegible] সোসাইটি সমাদরে তোমায় [illegible] উপস্থিত হব—তখন তোমাকে [illegible]

এ ধরনের কথাবার্তা আজ নতুন নয়। অনেক দিন ধরে শুনে এসেছে এষণা। অর্ণবের সঙ্গে সে সহজভাবেই মিশতে চায়—মিশতে চেয়েছিলো বা মিশেছিলো—অর্ণবও সেই অবাধমেলামেশায় দীর্ঘদিন ধরে সহজ স্বচ্ছন্দ সায় দিয়ে এসেছিল। কিন্তু ইদানীং যেন সেই সহজ [illegible] কৌতূহলে এবং সন্দেহে দুজনেই [illegible] বিপন্ন হতে বসেছে। কিন্তু [illegible] তার মধ্যেও এষণার মনে একচুল ভুল পড়ে নি। তবে সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে অর্ণব যেন বড় বেশী সিরিয়াসলি নিয়েছে ব্যাপারটাকে।

সে যাই হোক, লিলি, মিলি বন্ধু দীপারা যেখানে বসে আছে তার ধার [illegible] না গিয়ে দুজনে হাওড়াস্টেশনের [illegible] নম্বর মার্কা প্ল্যাটফর্মগুলো [illegible]। অর্ণব যেন অকারণ ব্যাপারটাকে [illegible] কি এসে যায় বলো? [illegible]

[illegible]

৫

পশ্চিমের গাড়িটা ততোক্ষণে লার্শিটংএর আকস্মিক ধাক্কায় ঠোক্কর খেয়েছে বগিতে-বগিতে। হুইসিল বাজিয়ে ইঞ্জিনের দলা-পাকানো একরাশ কুন্ডলীকৃত ধোঁয়া উড়িয়ে চলন্ত বেগের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। এষণার এই কথায় যেন অর্ণবকে কেমন বিচলিত হতে দেখা গেল। অর্ণব এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললো—আমি দেখেছি এষা, জীবনে যারই সঙ্গে যে-ভাবে মিশতে যাই না কেন তারই সঙ্গে মেশার পথে বাইরের এমন বাধা এসে দেখা দেব, কি বলব। তুমি যাই বলো আমি সহ্য করতে পারব না অন্য কারও কটাক্ষ বা বিদ্রূপ।

—পাগল নাকি, কে তোমাকে কটাক্ষ করতে চায় শুনি? আর করলেই বা তা গায়ে মাখতে যাবে কেন?

—ড্যাম ইওর গায়ে মাখামাখি। শোন, তোমার নতুন কোন্ খবর আছে তাই বলো?

—আমার আবার কি খবর থাকবে? বরঞ্চ তোমার খবর বলো শুনি।

—বিশ্বাস করো এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—ও পথে অনেকদিন পা মাড়াই না।—

এষণা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে—একটা সুন্দরী মেয়ে দেখব তোমার জন্য—লেখাপড়া জানা তোমার পছন্দ মাফিক। কেন স্মৃতির কাঁটা নিয়ে বেঁচে থাকবে।—

—তুমি কি মনে করো আমি স্মৃতিপুজো এখনও করি?

অর্ণবের চেহারাটা দেখলে মনে হয় যেন গ্রীক স্থাপত্যের দেশ থেকে উঠে এসে মূর্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়িয়েছে।

এষণা মুগ্ধ দৃষ্টিতে অর্ণবের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। পেশল বাহু, দোহারা গড়ন, প্রেমে পড়বার মতো সুন্দর মুখভঙ্গী।

আজ পাঁচ বছর ধরে অর্ণবের সঙ্গে তার একনাগাড়ে পরিচয়টা দীর্ঘ কিনুনির মতো ঝুলে রয়েছে। চন্দননগর থেকে আই এ পাশ করে এষণা এক মাসের জন্য ম্যান্ডেভেলে গিয়েছিলো। পিসতুতো দাদার বউদি স্বরূপা। মৈত্রের ভাই হিসাবেই অর্ণব চ্যাটার্জি'র সঙ্গে এষণার আলাপ হয়েছিলো। অদ্ভুত খামখেয়ালী এবং বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ছেলে বলেই হোক কিম্বা অন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন প্রথমদিন থেকেই অর্ণব তার আকর্ষণে বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্যি আকর্ষণটা এষণার একতরফের নয়। একই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত হবার আকাঙ্ক্ষায় যেন চুম্বকের টানে দুজনে পরস্পরের কাছে আসন্ন হবার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

এক-একটি দৃশ্য আজও যেন মনে পড়ে। স্বরূপা বউদি নিশাচরের মতো [illegible]

এসে এষণার হৃদে ভাঙাতো। তার মাথার কাছে বসে থাকতো। স্বয়ংপ্রা বউদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যেতেন। বলতেন—তোমরা দুজনে কি এমন বক-বক করিস বাপু জানিনে!

অর্ণব মনে মনে বোধ হয় বলতো, কী যে বলি তুমি তার কি বুঝবে! যাই বলে থাকি না কেন এর স্বাদ বুঝি অতলান্ত। তোমাদের মত সাংসারিক বুদ্ধির মানুষেরা বুঝি তার তল পায় না।

এষণা শুধু হাসতো। বলতো, দ্যাখো না বউদি তোমার ভাই-এর কাণ্ডটা?

তখনও অর্ণব আর এষণাতে শুধু ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আলাপ হত।

এষণা বলতো, জানো অর্ণব আমার আর বি-এ পড়া হবে না।

অর্ণব জিজ্ঞাসা করতো কেন?

—আর্থিক কারণের জন্য।

—আর্থিক। আহা আমার যদি প্রচুর টাকা থাকতো তবে তোমাকে পড়াশোনার জন্য সাহায্য করতাম। আমার খুব সাধ ছিল রঞ্জিতা যদি আমার ঘরে আসতো তবে তাকে এম-এ পর্যন্ত পড়াতাম। তা যখন হল না তখন তোমাকেই না হয় পড়াবো।

আসল কথা, দুজনের সঙ্গে দুজনের যে এত মিল হয়েছিল তার পিছনে বিপুল সমবেদনার যোগসেতু ছিল যার ওপর দিয়ে পার হয়ে দুজনে দুজনের নিকট-সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলো এমন করে।

সে কথা থাক। রঞ্জিতার সঙ্গে কেমন করে তার আলাপ হয়েছিলো এবং আলাপের পরিণতিটা দ্রুত এমন ঘনসান্নিবদ্ধ হতে পেরেছিলো তার সম্পূর্ণ ইতিহাসটা এক এক করে বলেছিল অর্ণব। পাথরের সঙ্গে সুতো বেঁধে চিঠি ছুঁড়ে দেওয়ার থেকে আরম্ভ করে তিমিরাভিসার পর্যন্ত কোনো কিছু বাদ দেয় নি সে। কিন্তু সব আশার যখন গুড়ে-বালি হলো—ভিলাইএর এক বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে রঞ্জিতার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল তখন অর্ণবের আহত পুরুষত্ব এই পরাজয়ের তীব্র প্রতিবাদে ফুঁসে উঠতে ছাড়ে নি। এমন কি সেই আস্ফালন মৌখিক স্তর পার হয়ে স্টেশন থেকে ছিনিয়ে আনার মতলব করেছিল। কিন্তু এই মতলবে বাধা দিয়েছিলো তার বন্ধুরা। আর রঞ্জিতাকে হারিয়ে ভেতরে ভেতরে অর্ণব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো: রঞ্জিতা যেদিন আমাকে ভিখারী করে রেখে গেল সেইদিন থেকে অঙ্গীকার করলাম যেমন করে হোক রঞ্জিতার স্বামীর চেয়ে বেশ মোটা টাকা ইনকাম করব। সেই জন্যই তো ব্যবসায়ে নামা।—

বলার মাঝে সামান্য থেমে দম নিয়ে, চশমার কাচ রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে ফের বলতে শুরু করতো।—জানো, আজ যদি আমার টাকা থাকতো তা হলে রঞ্জিতার বাবা মা কি এমন করে তাদের মেয়েকে আমার

দু চোখের আড়াল থেকে সারাবার চেষ্টা করতো?

এষণা তাকে সান্ত্বনা দিতো না। কারণ দুঃখের সময় সান্ত্বনা সূচের চেয়েও তীব্র-ভাবে বেঁধে। সেই জন্য সমবেদনার স্বরে বলতো—কেন, তুমি নিজেকে অতখানি হীন মনে করবে বলো? নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হও। পরীক্ষাটা দিলে না কেন?

অর্ণব কৃতজ্ঞ নয়নে এষণার দিকে তাকিয়ে বললো—সেই জন্য তো তোমার কাছে আসি। পৃথিবীর কেউ আমাকে এমন দরদ দিয়ে কথা বলে না। পরীক্ষার কথা বলছো? পরীক্ষা আমি জীবনে দেব না। খাতায় পাশ করে কি হবে? আসল জীবনের পরীক্ষায় আমি হেরে গিয়েছি।—

রঞ্জিতার যে বর্ণনা অর্ণব দিয়েছিলো তাতে রঞ্জিতার মূর্তিটা তার কাছে খুব চেনা

[illegible] হয়ে গিয়েছে যেন. একনিমেষে একদম অর্ণবের পাশে রঞ্জিতাকে দাঁড় করিয়ে অর্ণবের জীবনের যে প্রাথমিক এবং প্রধান সুখ ছবিটা ভেসে গিয়েছে সেই ছবিটাকে স্পষ্ট করে দেখতে পায়।

সে কথা থাক। রঞ্জিতাকে জীবনে হারাবার পর প্রথম যখন প্রচণ্ড একটা ঘা খেল তখন অর্ণবের জীবনের মোড় খুব আশ্চর্যজনকভাবে ঘুরে গেল। কিন্তু এ মোড় অন্যদিকেও ঘুরতে পারতো। অর্ণব এই জন্যই বুঝি বলেছিলো—তোমাকে দেখার পর আর কোন মেয়ে সম্পর্কে কোন মোহ থাকে [illegible] বাড়ি [illegible] যায়, [illegible] বলেছিল। একদা উনি দিয়েছিল—আমার গর্ব এ তোমার অন্তর পক্ষপাতিত্ব। আসলে তুমি ওদের শাড়ির আবরণ আর প্রসাধনের স্তূপ ঠেলে কাছে যেতে পারো না। কাছে না গেলে, মানুষটিকে চিনবে কি করে।

—সবাইকে আমার চেনা আছে।—

রঞ্জিতার জন্য যে এই বাঁতিত্বক মনোভাব তা জানে বলেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চায় না এখন।

তবে যত দিন যায় তত যেন দুজনের [illegible] পর চন্দননগরে [illegible] পরিমাণ একটু বেশী চোখে লাগলো যে চন্দননগরে শুধু প্রায়ই সর ঘন ঘন দেখা যেতে লাগলো অর্ণবকে। চন্দননগরের বাড়ির আর সব আত্মীয়-স্বজনেরা যেমন অবাক হয়ে দেখতে লাগলো দুজনের মেলামেশার অবাধ ঘনিষ্ঠতা ঠিক তেমনি করে স্বরূপা মাঝেমাঝেও লক্ষ করতো তাদের দুজনের মধ্যে এই বাড়াবাড়ি রকমের সন্দেহজনক অন্তরঙ্গতাটুকু। অর্ণব এখনো তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারে নি,

স্বরূপা বউদির এই মাঝে মাঝে উঁকি দেওয়ার পিছনে আত্মিয়তার মনোভাব ছাড়া অন্য কোন শুভ মতলব ছিলো না। এখন অনেক মত স্বরূপরেখার মনে পড়ে আদি অন্ত সব।

—গাড়ির আবার সময় হয়ে যাবে না তো—

—না না অনেক দিন পরে দেখা। বলো তোমার খবর বলো।

—দীপা, পিসি, বন্দু—

কী যেন বলতে গিয়ে সামলে নেয় অর্ণব। তারপর খানিক বিরতি দিয়ে বলে—আচ্ছা এষণা, এমন অনেক কথা আছে যা বলা যায় না, না?

—কী এমন কথা? কাকে বলা যায় না?

অর্ণব কি জানে না অর্ণবের প্রতি-মুহূর্তের হাবেভাবে, কথায়বার্তায় মুখে যে রেখা অঙ্কিত হয়ে ওঠে তার প্রতিটি খাঁজ বা ভঙ্গী এষণার কাছে অতিস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এষণা জেনেও জানতে চায় না—বুঝেও বুঝতে চায় না। শুধু লক্ষ করে যায়। কথা শুনে যায়। অর্ণব সামান্য হেসে আলতো-ভাবে এষণার ডান হাতের পাঁচ আঙুলের এক আঙুল ছুঁয়ে নেয়। না না, কিছুতেই বলা যায় না। অথচ অন্তরে তার জন্য কত শুভ্রতম ভালবাসা রেখে দেওয়া যায়।

এষণা উৎসুক চোখে অসীম কৌতূহলে বিস্ময় হয়ে পলক মাত্র তাকিয়ে নেয়।

—তোমার খবর বলো।—

—আমি তোমাকে অনেকদিন আগে বলেছি ও পথে পা মাড়াই না। মাড়াব না। দুদিনে আলাপ হওয়ার পর জোঁকের মতো চেপে ধরতে চায় মেয়েরা।—

—শুধু উড়ে উড়ে বেড়াতে চাও। বসবে না কোথাও।—

—তোমার বুদ্ধি সে রকম কোনো—

—না না।

চোখের পাতাটা কেন সামান্য কেঁপে গেল এষণার। দাঁত দিয়ে জিব চেপে ধরলো খুব জোরে।

—আর যা কিছু করো না কেন ঘোমটা ফেলে বসে থেকো না।

ধক্ করে ওঠে এষণার বুকের ভেতরটা। তবে কি তাই? স্বরূপা বউদি যার জন্য উঁকি দিতো—চন্দননগরে আর যাচ্ছে না তবে কি তাই? আত্মিয়গোষ্ঠীরা সন্দেহের একটা [illegible] পাকাতো যার জন্য! [illegible] এষণার বুকের ভেতরে সেই [illegible] সেই [illegible] স্বরূপা বউদি [illegible] [illegible] এসেছিলেন [illegible] এই মাঝেও একটা কথা [illegible]

হয়ে মিশে যেতে চেয়েছিল। প্রথম আবিলতার ঘূর্ণি তো আত্মীয়-স্বজনের সান্নিধ্য মনই সৃষ্টি করে নিয়েছিল। অনেক-দিন আগে অর্ণব একবার বলেছিল—জানো, আমি তোমার সঙ্গে মিশি বলে স্বরূপা বউদি—প্রমুখ আরও অনেকে এর জন্য শুধু সন্দেহই করে না,—প্রকাশ্যে নানা কথা বলে। আমি দেখেছি এষণা, আমি যে কাউকে আমার সমব্যথী পাই না কেন সংসার আমাকে তা পেতে দেয় না।—

এষণা সেদিনের এই সন্দেহজনক উৎ-পাতকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু অর্ণব যে একে এত গুরুত্ব দেবে তা কেমন করে জানবে!

কখন পায়ে পায়ে চন্দননগরের গাড়ির প্লাটফর্মের কাছে পৌঁছেছে দুজনের কেউ জানতে পারেনি। চন্দননগরের গাড়িটা এর মধ্যে কখন ইন করেছে। অর্ণব বললো, গাড়ি এসে গিয়েছে আর কি। এবার আসি তবে এষা। চিঠি দিও। দেবে তো, একমাস আগে পোস্টকার্ডে সেই যে কি চিঠি লিখেছিলে—তাও পুরোটুকু স্বরূপাদিকে—সারারাত্রি সেদিন তুমি আমায় জ্বালিয়েছিলে। ঘুমাতে দাও নি।—

কথার ধরন ধারন দেখে লক্ষণ ভালো নয় বলে মনে হলো,—আর নতুন করে এ কথাও মনে হলো—সেদিনের সেই ছেলেমানুষ অর্ণব কৈশোর স্তর পার হয়ে যৌবনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য এষণা তাড়া-তাড়ি বললো—কেন, তুমি চন্দননগরের টিকিট কাটলে, যাবে না?

—না, আমার টিকিট কাটি নি।

—কেন, কাটলে না?

অর্ণব গম্ভীর মুখে বললো: তোমাদের চন্দননগরের বাড়িতে আমি যাব না এষণা।

—কেন?

—সেবার বড়দিনের ছুটিতে গিয়ে তোমার খোঁজ করেছিলাম বলে নানা সন্দেহজনক কটূক্তি আমাকে শুনতে হয়েছিল।

—ছি, বড়ো সেন্টিমেন্টাল তুমি। সেই জন্যই তো মানুষের মুখের ওপর দিয়ে আমাদের বন্ধুত্বকে বেশী করে দেখাতে হবে।

—বাব, একেবারে সোজাসুজি যাব এষণা। যেদিন যোগ্যতা অর্জন করবো। সবার চোখের সামনে দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াব।

পিসি, দীপা, বন্দু সবাইকে নিয়ে যখন গাড়ি ছেড়ে এলো [illegible] অর্ণব প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলো। এষণা বললো—এ কি, তুমি [illegible] যাবে না?

—না। [illegible] একটা কাজ আছে। [illegible]

এষণা কোন কথা খুঁজে না পেয়ে [illegible]—তুমি এলে পারতে।

অর্ণব বললো—না।

দীপা বললো—তুমি গাড়িতে [illegible] উঠতে পারো না?

পিসি বললো—এসো না!

অর্ণব তার উত্তরে রুমাল উড়িয়ে দিল।

প্লাটফর্মটা দেখতে দেখতে হাওড়া স্টেশনের বিরাট শরীরটা নিয়ে মিলিয়ে গেল। শুধু খোলা পুলের আলোটা দূর থেকে রূপ একটা স্বপ্নের মতো দেখালো।

ট্রেনের সশব্দ গতিরেখার সঙ্গে সঙ্গে এষণার চিন্তা দ্রুতগতিতে হেঁটে চললো।

সুগভীর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠে অর্ণবের কাছে মুখর হবার জন্য এষণাকে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু এষণা পারে নি। এষণার মন বড়ো দুর্বল আর নরম হয়ে পড়েছিল যার জন্য এষণা আঘাত দিতে পারে নি। সইতে কি পারবে অর্ণব চিরকাল যদি তার জীবনের প্রেরণা [illegible] মানুষের [illegible] কাছে মাটিতে না নেমে আসে—চিরকাল অর্ণবের নাগালের বাইরে দূর আকাশের তারা হয়ে থাকে—সইতে কি পারবে? অর্ণব পারবে না।

না, না, না। অস্থির হয়ে গেল এষণা এই মুহূর্তের কাছে,—[illegible] [illegible] শব্দ সার দিয়ে মিলিয়ে [illegible] না। এই মুহূর্তে এষণা অর্ণবের [illegible]-পূর্ণ চেহারাটা স্মরণ করে [illegible] তার রোমান্টারী [illegible] দিতে পারে। আজ [illegible] এই [illegible] [illegible] জন্য গিয়েছিল এষণা!

রহস্যময় চিত্র-চোর

বীরু চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ হয়ত আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সংবাদটি কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। প্যারিসের লুভর্ মিউজিয়াম থেকে একটি বিখ্যাত চিত্র-কে (খুব সম্ভব লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'মোনালিসা') কোন একটি বিশেষ কারণে সর্বপ্রথমবারের জন্য মার্কিন দেশের এক নগরে নিয়ে যাওয়া হয়। এটা অবশ্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য খবর ছিল না। কিন্তু বৈশিষ্ট্য হল তাকে যেভাবে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনভাবে বোধ করি নুরমাহল [illegible] হীরা [illegible]-মণি-মাণিক্যকে [illegible] মুসোলিনী-নেপোলিয়ন প্রভৃতি [illegible] প্রখ্যাত [illegible] নায়কদেরও সঙ্গে [illegible] নিয়ে যাওয়া হয়নি।

তা হলে এত [illegible] কারণ কি?

কারণটিও [illegible] আছেন। ইদানীং যত্র-তত্র বিশ্বের [illegible] কিছু কিছু [illegible] এক [illegible] অপহরণ শুরু হয়েছে।

কে জানে এই মুহূর্তে কোথায় কোনখানে কে একজন [illegible] দুনিয়ার [illegible] চুরি [illegible] ষড়যন্ত্র করছে কিনা। [illegible] মিউজিয়াম [illegible] অপহরণ [illegible] অথবা কোন [illegible] [illegible] বিখ্যাত কোন [illegible]।

এই সব শিল্প-চোরের কাউকেই [illegible] চলছে না। কেন না এ [illegible] দুনিয়ার সবকারী ও বেসরকারী [illegible] প্রায় কদলী প্রদর্শন করে [illegible] অনায়াসে ও নিখুঁত চাতুর্য অসাধ্য সাধন করে চলেছে। তাদের পরিকল্পনা ও চক্রান্তের কাছে বিশ্বের সংঘাতিকতম দুর্গম স্থান অর্থাৎ সর্বাধিক চোর প্রুফ মিউজিয়ামও তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়েছে। তাদের অগম্যস্থল বুঝি কোথাও নেই।

এককালীন এতটা অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ গত দেড় বছরের মধ্যে যতসংখ্যক কালজয়ী চিত্রকলা অপহৃত হয়েছে তার তুলনা স্মরণীয়কালের ইতিহাসে নেই। ইণ্টার-পোল (আন্তর্জাতিক পুলিসবাহিনী) স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড (ইংলণ্ড) এফ বি আই (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ফ্রেঞ্চ সুরেটি (ফরাসী) প্রভৃতি দুনিয়ার বড় বাঘা বাঘা পুলিস-বাহিনী সবাই এইসব রসিক চোরদের কার্যকলাপ দেখে-শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। এদের চুরির ধরনধারন বা তার [illegible] যে আবিষ্কার করতে পারেনি তা নয়- [illegible] হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এদের চুরির উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে গিয়ে। কি

ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন —গোয়া

[illegible]

[illegible] নয়। [illegible] লক্ষ লক্ষ টাকা [illegible] বিক্রেতার কাছে [illegible] কাণাকড়িও মূল্য নয়। প্রকৃত কোন শিল্পরসিক সংগ্রাহক কখনো এমন ছবি কিনবে না যা তাকে আজীবন লুকিয়ে রাখতে হবে। আর স্বর্ণগর্দভ ধরনের বেরসিক ক্রেতার কাছে বিক্রি করা হলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষেই শ্রীঘর বরণ করা। তারচেয়ে উক্ত চিত্রের প্রতিলিপি বিক্রয় করা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ।

এবারে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই উক্ত-ধূর্ততম চতুর চিত্র-চোরদের দুঃসাহসিক ও রহস্যময় কার্যকলাপের ব্যাপার আপনারা বুঝতে পারবেন।

১৯৬১ সালের ২০শে জুন, ইংল্যাণ্ডের লিড্স্-এর ডিউক ও ডাচেস্ তাঁদের পারিবারিক কতগুলি মূল্যবান শিল্পসামগ্রী নিলামে বিক্রয় করেন। তন্মধ্যে ছিল 'ডিউক অফ ওয়েলিংটনের বিখ্যাত তৈলচিত্রটি। সে চিত্রটি ১৮১৮ সালে সালামানকাতে ওয়েলিংটনের নিকট নেপোলিয়নের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই অঙ্কিত করেন প্রখ্যাত মাস্টার গোয়া। এটা ছিল একটি জাতীয় সম্পদ তথা অমূল্য। চিত্রটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ২৫×২০ ইঞ্চি। চিত্রটির দরও ওঠে চরম। অবশেষে নিউ-ইয়র্কবাসী দি রাইটসম্যান নামক জনৈক ক্রোড়পতি মার্কিন ভদ্রলোক ৩,৯২,০০০ ডলারে সেটিকে কিনে নেন। তারপরই শুরু হয় হুলস্থূল কাণ্ড। সারা ইংল্যাণ্ডবাসী ও তাদের পত্রপত্রিকা দেশের বিখ্যাত চিত্রটি দেশের বাইরে হাতছাড়া হওয়ার দরুন দারুণ [illegible] হাহাকার আক্ষেপ ও ক্ষোভ সহকারে আন্দোলন শুরু করে। ইংল্যাণ্ড [illegible]কে স্বাধীনতা দিয়েছে, তাও সহ্য হয়েছে। [illegible] তাদের বুকের ওপর [illegible] সৈন্যবাহিনী বসে আছে, তাও সহ্য [illegible] কিন্তু দেশের অতুলনীয় শিল্প-সম্পদটি দেশ ছেড়ে চলে যাবে এবং অতলান্তিক পার হয়ে চলে যাবে 'কৃষ্টিহীন' [illegible]দের হাতে এটা তারা কোনমতেই সহ্য করবে না। মোটামুটি এই হল জনমতের লিখিত বা বাচনিক প্রকাশ। কাজে কাজেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রতিবাদ জানালে হোয়াইট হাউসে। ফলে, ক্রেতা ক্রমশ

চিত্রটি ফেরত দিতে রাজী হল। অবশেষে কিছু সরকারী বাকি বেসরকারী অর্থে দেশের শিল্প দেশেতেই রয়ে গেল। অর্থাৎ লণ্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীতে যোগ্য মর্যাদায় দেওয়ালে অধিষ্ঠিত হল ডিউক অফ ওয়েলিংটনের তৈলচিত্রটি। কিন্তু হায়, বেশী দিনের জন্যে নয়।

'৬১ সালের ২১শে অগাস্ট রাত্রে দেখা গেল চিত্রটি যথাস্থানে নেই। অতি উচ্চ সম্মান সহকারে গ্যালারীর প্রধান হলে দুটি বিশিষ্টাকৃতি স্তম্ভের মাঝখানে দেওয়ালে বহুমূল্য লালপর্দার উপরে চিত্রটিকে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়েছিল। রাত দশটায় প্রহরী বদলের সময় নতুন প্রহরী এসে দেখলো ছবি নেই, শুধু দেওয়াল-জোড়া লালপর্দার হাহাকার বিরাজ করছে। প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর চলন্তপ্রহরীর পদক্ষেপ মুখরিত স্থান থেকে ছবি চুরি হতে পারে এ কথাটা প্রহরীর আদৌ মনে হয়নি। হয়ত পূর্বে যেমন বহুবার নিয়েছে এবারও তেমনি ফটো তোলার প্রয়োজনে চিত্রটিকে বুঝি বা সাময়িকভাবে অপসারিত করা হয়েছে।

সুতরাং প্রখ্যাত গোয়া-র প্রখ্যাত শিল্প-কৃতিটি যে প্রকৃতই অপহৃত হয়েছে বশ্বের সর্বাধিকতম চোর-প্রুফ আর্টগ্যালারী থেকে এ তথ্যটি আবিষ্কৃত হল পরদিন অর্থাৎ ২২শে তারিখে সকাল ন'টায়।

এরপর সবিস্ময়ে বৃটেনবাসিগণ শুনলো এই জাতীয় সম্পদরূপ চিত্রটি আদৌ কোন ইন্সিওর করা ছিল না। বৃটিশ সরকার এটিকে ইন্সিওর করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। কেননা এটি রয়েছে সবচেয়ে সতর্ক প্রহরার অধীন, যেখান থেকে অপহৃত হওয়া অকল্পনীয় ঘটনা, তা ছাড়া কোন চোরের পক্ষে ওটা নিয়ে বিক্রয় করা আরও অসম্ভব। এটা কোন হীরক নয় যে, আকৃতির সামান্য হেরফের করে প্রকৃত মালিকের নাকের ডগায় অনাবিষ্কৃতভাবে দেখানো চলে। চিত্রশিল্পের সামান্য পরি-বর্তনে তা তার পূর্ববৈশিষ্ট্য মুহূর্তে হারায় ও তা হয়ে পড়ে নগণ্য বস্তু। আর ১৫০ বছরের পুরনো নকশা কাটা নয়ন-মনোহর কাঠের ফ্রেম সম্বলিত ডিউকের মূর্তি-চিত্রটি যে-কোন স্কুলের বালকও একপলকে চিনে ফেলবে। তাই ইন্সিওর করার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা।

কিন্তু তবুও এটি অপহৃত হল। বৃটিশ জাতি হারালো তাদের প্রাণোপম 'ডিউক অব ওয়েলিংটন'কে আর ব্রিটিশ সরকার হারালো ৩,১২,০০০ ডলার মূল্যমানের অর্থ।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড অবশ্য যথারীতি [illegible]

নিচে নেমেছে তারপর দশ ফিট উঁচু বহিঃপ্রাচীর ডিঙিয়ে চলে গেছে। চিরাচরিত প্রথামত প্রহরী বদলকালে রাত দশটার জটিল অ্যালার্ম-পদ্ধতিকে বিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে ফল কি হল? কিছুই না। কে? এবং কেন? এ দুটি বিস্মিত প্রশ্ন পূর্ববৎই রয়ে গেল।

ন্যাশনাল গ্যালারীর ডিরেক্টর অজ্ঞাত চোরের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি প্রচার করে অনুরোধ জানালেন, সাবধান, চিত্রটিকে যেন খুবই সাবধানে নাড়াচাড়া করা হয়। ফ্রেমের ও চিত্রপটের অবস্থা কিন্তু খুবই সঙ্গীন। এটিকে যেন আর্দ্রতা আর জোরালো আলো থেকে দূরে রাখা হয় নয়ত অমূল্য বস্তুটির সাংঘাতিক রকম ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

প্রাক্তন ডিরেক্টর স্যার কেনেথ ক্লার্ক তো সাখেদে বলেই ফেললেন: এটি যে চুরি যাবে এ আর আশ্চর্য কি! খোঁজ করে দেখ, হয়ত কোন ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পথে যাত্রা করেছে।

কিন্তু অপরাপর বহু শিল্পবিশেষজ্ঞদের মতে এই রকম বিখ্যাত চিত্রাদির ব্ল্যাক মার্কেট সম্ভব নয়। মার্কিন দেশে কেন পৃথিবীর কোথাও তা সম্ভব নয়। কোন ধনাঢ্য উন্মত্ত ব্যক্তি এগুলিকে ক্রয় করে দেওয়ালে টিপে দিলেই খুলে আসা কোন গুপ্তপ্রকোষ্ঠে নিয়ে সাজিয়ে রাখে; এরূপ প্রচলিত কাহিনীগুলিকে কাল্পনিক গাল গল্প বলেই তাঁরা মনে করেন। লন্ডন এবং ইউইয়র্কের নামকরা নিলামদারদের মতও তাই, বিখ্যাত শিল্পের কালোবাজার চলে না।

অবশ্য আরো নানা ধরনের থিয়োরী প্রচারিত হতে লাগল। কারুর কারুর মতে কম্যুনিস্ট দেশের প্রচুর পয়সাওয়ালা ব্যক্তিগণ সরকারের হাতে ব্যক্তিগত যথাসর্বস্ব তুলে দেওয়ার বা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার চোর ভাড়া করা চোরের সাহায্যে এইসব অমূল্য শিল্পসম্পদকে কিনে নওয়াই সর্বাধিক লাভজনক বলে মনে করে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে, হিটলারের অনুচরবৃন্দ যেরকম করতো, হয়ত সেইভাবে রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ তাদের দেওয়াল সজ্জিত করছেন এগুলির দ্বারা।

কিছু কিছু কল্পনাপ্রবণ লোক এ ধারণাও করতে হয়ত ভালবাসেন যে, "মঙ্গল গ্রহের ক্ষুদ্র মানবেরা" "উড়ন্ত চাকীর" সাহায্যে এই সব পৃথিবী গ্রহের অমূল্য শিল্পবস্তুকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। (কিছুকাল পূর্বে এই ধরনের একটি চিত্রকাহিনী আপনারা দেখেছেন আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বাদুরের ম্যানহোক' নামক রেখাচিত্রের মাধ্যমে)।

ডিউক অব ওয়েলিংটন-ছবি নিরুদ্দেশ হবার কিছুদিন আগে সেণ্ট ট্রোপেজ-এ (ফরাসী রিভিয়েরায় অবস্থিত) অ্যানন-সিয়েড মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট-এ [illegible] চোর প্রায় ৫৭টি [illegible] নিয়ে চলে যায়।

লা চকোলেতিয়ের —মোদিলিয়ানী

সেটা ছিল ব্যাসটাইল-ডে, ১৪ই জুলাই, ফরাসী জাতীয় ছুটির দিন। ফরাসী পুলিস মনে করে যে, একটি বড় দল এই চৌর্যকর্মে নিয়োজিত হয়েছিল। অপহৃত ৫৭ খানা চিত্রের মধ্যে ছিল বোনার্দ-এর চারখানা, চার খানা দেরেইন্স-এর আর মাতিস-এর মস্টার-পিস দুখানা (জিপসি ও উয়োমান ইন দি উইণ্ডো)।

এ ঘটনার দু সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ২৮শে জুলাই ১৯৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পিটসবার্গ-এর শিল্পপতি মিঃ টমসন সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বাইরে যান কাজে। ভুলে চোরের অ্যালার্মটির সুইচ দিতে ভুলে যান। ফিরে এসে দেখেন দরজা হাট করে খোলা, অন্যান্য বহু জিনিসের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ডলার মূল্যের শিল্পকলা চুরি গিয়েছে। যা ছিল অপূরণীয় সম্পদ। [illegible] মাতিসের "উয়োম্যান ইন দি কার্টেন" নামক চিত্রটিকে মাঝখানে একটা গর্ত করে ফেলে রেখে গেছে। আর তাড়াতাড়িতে পিকাসোর "লেডি উইথ এ হ্যাট"কে প্রায় আধাআধি ছিঁড়ে রেখে গেছে। এক লক্ষ ডলার মূল্যের চিত্রটির এইভাবে সর্বনাশ সাধন করেছে সেই বেরসিক চোরটি লেজার এর 'কম্পোজিশান উইথ থ্রি সিস্টার' কে উপড়ে নিয়ে গেছে। পিকাসোর দুখানা নামী শিল্পকৃতি "গার্ল উইথ ফ্লাওয়ার" এবং "স্টিল লাইফ উইথ চেরীস্" অদৃশ্য হয়েছে টমসনের ইন্সিওর করা ছিল চার লক্ষ ডলারের—প্রকৃত মূল্যের অপেক্ষা অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি করে যে সর্বনাশ করে গেছে, তা সত্ত্বেও, টমসন এক লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেন চিত্রগুলি ফেরত পাবার জন্য —ফেরতদাতাকে কোন প্রশ্নাদি করা হবে না বা তার বিরুদ্ধে কোন মামলাও দায়ের করা হবে না। কিন্তু সে পুরস্কার নিতে কেউ আর এল না।

এর পরের ঘটনা ডিউক অফ ওয়েলিংটনের অপহরণ। দুনিয়াসুদ্ধ শিল্পরসিকরা ভয় পেয়ে গেলেন। আবার বুঝি কোথায় চোর হানা দেয়।

দিলও তাই। ফরাসী দেশে এইক্স-এন প্রভিন্সে, প্যাভেলিয়ান ভেনডোম মিউজিয়ামে রক্ষিত হয়ে ছিল সেজানে-র বহু শিল্পকৃতি। স্থানীয় সন্তান এই পূর্ব শিল্পীর সম্মানে প্রদর্শনী খোলা হয়ে ছিল। তথাকার নগরপিতাগণ ও শিল্প রসিক ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নানা দেশ থেকে চেয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল সেজানের বিচিত্র অসংখ্য চিত্র। ব্যক্তিগত সংগ্রাহক, সেন্ট লুইস মিউজিয়াম (আমেরিকা), ল্যুভর (প্যারিস) প্রভৃতি সব স্থান থেকেই ছবি আনা হয়েছিল। ১৬৬৪ সালে নির্মিত একটি মনোরম ভিলাতে প্যাভিলিয়ন [illegible] অবস্থিত। ভিলার সম্মুখে একতলা সমান উঁচু দুটি প্রস্তরমূর্তি দাঁড় করানো রয়েছে মূর্তি দুটির হাত তাদের মুখের উপরে অবস্থিত এবং স্থির দৃষ্টি আকাশের দিকে

নিবন্ধ। যেন আসন্ন ট্র্যাজিডিই ভাস্কর্য দুটির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

পাশ্চাত্য জগতের প্রতিটি মিউজিয়মই বিনামূল্যে তাদের সংগৃহীত সিজ্ঞানের চিত্র-শিল্প ধার দিয়ে প্রদর্শনীতে সহযোগিতা করেছিল। তবে পৃথিবীব্যাপী চুরির আতংকে অনেকেই আতংকিত হয়েছিলেন। দুশ্চিন্তার উত্তরে এইক্স-এর ডেপুটি মেয়র অভয় দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, প্রদর্শনীটিকে খুব কড়া রকমের পাহারায় রাখা হয়েছে।

এর তেত্রিশ ঘণ্টা বাদে প্রায় রাত তিনটের সময় মিউজিয়ামের অভ্যন্তরের কোয়ার্টারে মহিলা কিউরেটর নিদ্রিত ছিলেন. নিকটেই ঘিমচ্ছিল তাঁর কিপিং বধির টেরিয়ার কুকুরটি। চোরের দল যখন উঠোন পার হয়ে মিউজিয়ামের তিনতলায় উঠেছে এবং কার্নিসে বেরিয়ে গেছে, তার কোন কিছুই টের পায় নি ভদ্রমহিলা বা তার কুকুরটি।

পরদিন সকালে দেখা গেল, সিজ্ঞানের সর্বাধিক মূল্যবান আটটি চিত্র চুরি হয়ে গেছে। যার এক-একটির মূল্যই হবে কমপক্ষে

দশ লক্ষ ডলার। অপহৃতের তালিকায় "দি কার্ড প্লেয়ার" ছবিটিও বর্তমান। চিত্রটি প্রায় সর্বজনবিদিত। স্কুলপাঠ্য অসংখ্য পুস্তকে এর প্রতিলিপি আছে। একটি টেবিলের দুধারে বসে দুজন লোক তাস খেলছে। ৭০ বছর পরেও চিত্রটির উজ্জ্বল রঙ দর্শকের চোখকে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। বাস্তবতুল্য টেবিলক্লথ অঙ্কনের জন্য সেজানে ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। এ ছবিটিতে ছিল তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ছবিটি ধার দিয়েছিল প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়াম। সে চিত্রটিও উধাও হয়ে গেল। এর সঙ্গে শিল্প-দুনিয়া হারিয়েছে আরো দুটি খ্যাত পেইন্টিং "পোর্ট্রেট অফ মেরী সিজানে" (শিল্পীর ভগিনী) এবং "দি লেগ্ অফ মাটন্"।

জীবিত থাকলে এ ঘটনায় সিজানে ক্রোধে জ্ঞান হারাতেন। ভিলার সামনে দণ্ডায়মান প্রস্তর মূর্তিদ্বয় তেমনিভাবে আকাশের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। কি খুঁজছে কে জানে? না কি, নির্বাচিব এই নির্মম পরিহাস পূর্ব থেকে টের পেয়ে তারা মাথায় হাত দিয়েই ছিল!

দেশময় হাহাকারে আকাশবাতাস ভারী হয়ে উঠলো।

এরই কদিন বাদে। অতলান্তিকের এপারে মার্কিন দেশের লস এঞ্জেলস নগরী। সেখানকার এক বাড়ির পরিচারিকা ঘণ্টা-ধ্বনি শুনে সদর দরজা খুলতেই দেখে বড় একটি বাক্স হাতে একজন দীর্ঘকায় অপরিচিত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে।

—ফুল ডেলিভারী দিতে এসেছি, লোকটি বলল।

পরিচারিকা বাক্সটির দিকে হাত [illegible] লোকটি বাধা দিয়ে বলল, না। [illegible] সই চাই।

—বেশ তো আমি করে দিচ্ছি।

—না, লোকটি বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলে, তোমার মনিব বাড়িতে আছে?

—না, মিঃ রাইট বেরিয়েছেন। তাতে কি হয়েছে, আমি সই করতে জানি।

—বাড়িতে আর কেউ নেই।

—না। আমি একাই আছি।

ফুলের বাক্সে হাত ঢুকিয়ে অপরিচিত ব্যক্তিটি সহসা বার করে আনল একটি কালান্তক রিভলবার। পরিচারিকার দিকে তাক্ করে দুজনে ভেতরে ঢুকে, সদর বন্ধ করে দিল।

মিঃ রাইট যখন বাড়ি ফিরলেন, তখন তথাকথিত 'পুষ্প-দূত' চলে গেছে, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে তাঁর দেয়ালে টাঙানো বহু মাস্টারপিস চিত্রকলা।

পিকাসোর "সেবাস্টিয়ান" গেছে। গেছে তাঁর বিখ্যাত অধুনা অঙ্কিত 'লুকিং দু দি উইন্ডো'। এমেদিও মদিলিয়ানীর (EMEDIO MODIGLIANI) "লা চেকোলোভিয়ান" গেছে আর তার সহগামী

সেবাস্তিয়ান —পিকাসো

চিত্রগুলি ইন্সিওর করা ছিল মাত্র ২৪৬,১৬৫ ডলারের। প্রকৃত মূল্য পরিমাপ করা কারুর সাধ্য ছিল না। তবে মিঃ রাইটের মতে মোটামুটি ৬৭০,০০০ ডলারের মত।

যথারীতি পুলিস এল, ডিটেকটিভ এল। বাড়িসুদ্ধ জেরা করলে। সর্বত্র 'ডাস্টিং' করে আঙুলের ছাপ নিলে। সব ছাপই বাড়ির লোকের, একটি ছাড়া। অন্যান্য স্থানে তো পেলই এমন কি ফুলের বাক্সে যার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল সে ভদ্রলোক অতি পরিচিত। মিঃ রাইটের পাশের বাড়ির জনৈক পুরুষ বন্ধুর। যদি সে-ই না 'ফুল-ডেলিভারী' দিতে এসে থাকে তাহলে তার আঙুলের ছাপ এল কি করে ফুলের বাক্সে।

লোকটির নাম এডওয়ার্ড অ্যাসডাউন, জমি-জমার দালাল। গোপনে খোঁজ নেওয়া হল। নতুন বিয়ে করেছে। ইতিপূর্বেকার স্ত্রী ডাইভোর্সান্তে সন্তানাদি সহ ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়ে তথায় বসবাস করছে। মার্কিন পুলিস স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ও আন্তর্জাতিক শিল্পচুরির তদন্তে লিপ্ত জনৈক ডিটেক-টিভের কাছে 'কেব্ল্' করে দিল। প্রাক্তন মিসেস অ্যাসডাউনের প্রতি নজর রাখতে। কিন্তু "ডিউক অফ ওয়েলিংটন" অপহরণের ব্যাপারের সঙ্গে এদের কোন সংযোগ আবিষ্কার করা গেল না। লস এঞ্জেলেসের পুলিস এডওয়ার্ড অ্যাসডাউনের সপ্রতিভ হাবভাব দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিতই হল। গ্রেপ্তার তাকে করা হল না এই আশায় যে দেখা যাক যদি আরও কোন সূত্র পাওয়া যায় তার দ্বারা।

এদিকে একই সময়ে হাজার হাজার মাইল দূরে সিসিলিতে একই ধরনের ঘটনা ঘটলো। সিসিলির প্যালেরমো নামক স্থানে ব্যারন গ্যাব্রিয়াল অরটোলানি দি বর্দোনারো তাঁর ত্রিশ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বিশাল ভিলার দরজায় তালা লাগিয়ে দেশের বাড়িতে উইক-এণ্ড কাটাতে গেলেন। চাকরবাকররাও বাড়ি খালি রেখে যে যার ছুটি উপভোগ করতে চলে গেল।

ফিরে এসে ব্যারন আবিষ্কার করলেন তাঁর বহুমূল্য সব শিল্পকৃতি চিত্রাবলী অপহৃত হয়েছে। পুলিসে খবর গেল, ইন্টার পোল-এ খবর গেল। বিমানবন্দর ও সমুদ্র-বন্দরাদিতে কড়া পাহারা বসে গেল। কিন্তু সব নিষ্ফল। চোর নির্বিঘ্নে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অপরাপর ক্ষেত্রের মত এবারে

পুলিস বুঝতে পারলো কিভাবে চোরেরা দেয়াল টপকেছে, তারপর জানলা ভেঙে বাড়ি ঢুকে সব নিয়ে কোথা দিয়ে সরে পড়েছে—সমস্ত খুঁটিনাটি। কিন্তু কোথাও কোন আঙুলের ছাপ রেখে যায়নি।

ব্যারন শোকার্ত কণ্ঠে বললেন, এ চোরের দলে নিশ্চয়ই শিল্প-বিশেষজ্ঞ কেউ ছিল। কেননা বেছে বেছে সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলিই তারা নিয়ে গেছে। প্রায় দশ লক্ষ ডলার মূল্যের ছবি নিয়ে গেছে ওরা।

নিয়ে গেছে ষোড়শ শতাব্দীর মাস্টার জান দা মাবুজ (JAN DA MABUSE) অঙ্কিত "সেক্রেড ফ্যামিলি", টিশিয়ান (TITIAN) অঙ্কিত "ক্রাইস্ট ইন দি প্রেইটোরিয়াম", ভ্যান ডাইকের (VAN DYKE) "পোর্ট্রেট অফ এ উওমেন" এবং রেমব্রান্ট এর (REMBRANDT) "পোর্ট্রেট অফ এ উওমেন অ্যাট নাইট"। অপহৃত অপরাপর পেইন্টিং-এর শিল্পীগণ হলেন : বাসানো, (BASSANO) কারাচ্চি, (CARACCI আলবানি (ALBANI) এবং বালাদিনো (BALADINO))। এ ছাড়া আছে ১৬শ শতাব্দীর একটি চিনি রাখবার পাত্র আর ফ্লোরেন্সীয় জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি স্কুলের নানাবিধ অমূল্য শিল্পসামগ্রী।

আবার ফিরে আসা যাক লস এঞ্জেলেসে। না, তদন্ত করে দেখা গেছে সিসিলি দ্বীপের চুরির ব্যাপারে এডওয়ার্ড অ্যাসডাউনের কোন যোগাযোগ নেই। তবে মিঃ রাইটের বাড়ির চুরি সম্পর্কে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। বাড়িতে রিভলবারও পাওয়া গেল একটা। অ্যাসডাউন চুরির ব্যাপার প্রবলভাবে অস্বীকার করলো। তার নবপরিণীতা স্ত্রী গর্জে উঠলো, এডওয়ার্ডকে আমি ভাল ভাবে জানি। ও কখনো চোর হতে পারে না। সনাক্তকরণ প্যারেড করা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মিঃ রাইটের বাড়ির পরিচারিকা অ্যাসডাউনকে সনাক্ত করতে সমর্থ হল না। চুরির সময় নাকি সে সিনেমা দেখছিল। জেরার উত্তরে সে জানায় যদিও তার শিল্পকলা সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে তাহলেও চুরি? না, সে রকম বোকামী সে করতেই পারে না। শেষ অস্ত্র ছাড়লো পুলিস। 'ফুলের বাক্সে' তার আঙুলের ছাপ এল কি করে? কড়া সিগারেটে প্রচণ্ড কটি টান দিয়ে অবশেষে গম্ভীরভাবে স্বীকার করলে, হ্যাঁ আমিই চুরি করেছি।

তৈলচিত্রগুলিকে বিক্রি করবার কোন মতলব তার ছিল না। নেহাত দুনিয়াকে দেখাতে শুধু চেয়েছিল সেও চতুরতম একটি অপহরণ একা নিজেই পরিকল্পনা অনুসারে করতে পারে—চুরির একমাত্র উদ্দেশ্য নাকি তার এটাই ছিল।

অ্যাসডাউনের ফ্ল্যাটে একটি লুক্কায়িত স্থানে প্ল্যাস্টিকের মোড়কে পাওয়া গেল পিকাসোর "সেবাস্টিয়ান" ও "লুকিং থ্রু এ উইন্ডো" আর মদিলিয়ানীর "লা চকোলেতিয়ের"। "সেবাস্টিয়ান" চিত্রটি সামান্য জখম হয়েছে।

—আর ছবিগুলো কোথায়?

—চলুন দেখাচ্ছি।

হলিউডের এক বাস ডিপোতে রক্ষিত একটি স্যুটকেসের মধ্যে পাওয়া গেল আরো বাসাজভেলা আকর্ষণীটি।

পুলিস অ্যাসডাউনের বিরুদ্ধে অপরাপর শিল্পচুরির অভিযোগ আনলো না। আন্তর্জাতিক ধূর্ত শিল্পচোরেদের জন্ত কোন গুণই অ্যাসডাউনের নেই। যারা নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, যারা রক্ষিত ভিক্টোরিয়া ও তার আপন বহির ...

অনায়াসে সেয়া চিত্রটি নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় অথচ কোথাও কোন আঙুলের ছাপ রেখে যায় না, তাঁদের সঙ্গে কাঁচা চোর অ্যাস ডাউনের তুলনাই হয় না। ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণে যারা মাঝে মাঝে শিল্পকলা চুরি করে, আন্তর্জাতিক নিখুঁত চোর দলের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

যুগে যুগে উক্ত প্রথম ধরনের অপহরণ-কারীদের নিদর্শন আছে। যেমন, নিজ গ্রন্থকে কোন প্রকাশককে গছাতে না পারায় জনৈক জার্মান লেখক একবার মিউনিক মিউজিয়ামে রক্ষিত রুবেন্‌স্‌-এর (REUBENS) একটি চিত্রকে বিকৃত করে দিয়েছিল। জনৈক ইতালীয় বছর পঞ্চাশ আগে "মোনালিসা" চিত্রটিকে লুভর থেকে চুরি করে দু'বছরের জন্য লুকিয়ে রেখেছিল। কারণ? কারণ হল, সে ভেবেছিল মোনালিসা যখন তার দেশের মেয়ে তখন তার থাকা উচিত ইতালীতেই। ১৯৫৬ সালে একজন আয়ারল্যাণ্ডবাসী লণ্ডনের টেট্‌ গ্যালারী থেকে বার্থা মরিসটের (BERTHE MORISSOT) "জর-ডি'এট" চিত্রটি বগলদাবা করে জনৈক ফটোগ্রাফার ডেকে আনে, তাকে ঐ অবস্থার ফটো তোলবার জন্যে। কারণ হল: একটি উইলের শর্ত অনুসারে এ ছবিটি ডাবলীন মিউজিয়ামে যাবার কথা ছিল। কিন্তু লণ্ডন আদালত সেটা সম্প্রতি বাতিল করে দিয়েছে।

আরেক ধরনের চোর হল ইতালীর ৫৫ বছর বয়স্ক গিয়োভান্নি পেলিসি। রিভিয়েরা থেকে দুটি বিখ্যাত চিত্রের চুরির দায়ে গত ১৯৬১-র সেপ্টেম্বর মাসে সে ধৃত হয়। সে এবং তার দল পিকাসো ও মদিলিয়ানীর দুটি ছবি জেনেভাতে বিক্রি করবার প্রচেষ্টায় ধরা পড়ে যায়।

কিছু পুলিস অফিসার আশংকা করেন যে, পেলিসির গ্রেপ্তার ও দণ্ডদানের উদাহরণের দ্বারা অপরাপর 'মাস্টারপীস' চোরেরা হয়ত ভয় পেয়ে যাবে। এবং উপলব্ধি করবে যে, ছবিগুলি অপহরণ করার থেকে বরং সঙ্গে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁরা ভীত হয়েছেন যে এর ফলে না চোরেরা অপহৃত সেরা ছবিগুলি পুড়িয়ে ফেলে।

অন্যদল অবশ্য বলেন, তা হবে না। কেননা পেলিসির গ্রেপ্তারের অনেক পরেও সিসিলিতে ব্যারনের পেইন্টিংগুলি চুরি গেছে। এবং উক্ত অপহরণ কার্যটি পাকা আন্তর্জাতিক চোরের দলের দ্বারাই নিখুঁত-ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

কারো কারো ধারণা যে, অর্থ আদায়ের [illegible] এগুলি চুরি যাচ্ছে। শীঘ্রই অর্থ-[illegible] সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের [illegible] দেবে। ইতিমধ্যে লণ্ডন পুলিসের [illegible] একটি [illegible] [illegible] অর্থ-

ধরেও ফেলেছে দুস্কৃতকারীকে। ১৯ বছরের একটি টাইপিস্ট মেয়ে, মেহাত অ্যাডভেঞ্চার লালচেই মিথ্যা মিথ্যা ফোন করতো। চুরির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মেয়েটির জেল হয়ে গেছে। দৈনিকপত্রে 'আজগুবী' মূল্যের ছবিটি অপহরণের সংবাদ পেয়ে সে ফোনে জানাতো যে উক্ত চোরের দলের সে একজন সভ্যা। মাত্র ১৪০,০০০ ডলার দিলেই ছবিটি সে যথাস্থানে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবে। সে ফোনে আরও বলেছিল তাদের "১০০জনের একটি কমিটি" আছে। পরমাণবিক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনের জন্যই তারা একাজ করছে। উক্ত ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন মিউজিয়াম আরো অধিক সংখ্যক চোর-অ্যালার্ম-এর প্রবর্তন করেছেন, নিযুক্ত করেছেন আরও অধিক সংখ্যক প্রহরী। ফরাসী পুলিস লুভরকে মিউজিয়ামের অভ্যন্তরের বিশদ প্ল্যান সমন্বিত পুস্তিকা প্রকাশ বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। এর দ্বারা শিল্প-রসিকদের চেয়ে চোরেদেরই সুবিধা করে দেওয়া হয় সমধিক। সর্বাধিক বুকিদার প্রতিষ্ঠান লয়েডস্‌ অফ লণ্ডন এই সব চোরেদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেও প্রস্তুত নন। তবে আমেরিকার ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলি এ ইঙ্গিত দিয়েছে যে বর্তমানের অতি নিম্ন শতকরা ১৬১/২% ভাগ প্রিমিয়ামকে শিল্পকলার ইন্সিওরের ব্যাপারে আরও বাড়াতে তারা বাধ্য হবে।

গত বছর নিউইয়র্কের পার্ক-বার্নেট নামক নিলামদার প্রতিষ্ঠান রেমব্রান্টের একটি সর্বাধিক মূল্যের চিত্র বিক্রয় করেছে। একক-ভাবে কোন চিত্র ইতিপূর্বে দশ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়নি।

কে জানে এটিকে উধাও করবার প্রচেষ্টায় কোথায় কোনখানে কে বা কারা নিখুঁত একটি পরিকল্পনায় খসড়া তৈরি করে বসে আছে কিনা!

হাতে-পায়ে খিল ধরে বোয়েম মতো আলগা হয়ে আসছে। পেটে কিছু না পড়লে আমি বাপু শুয়ে পড়ব।

সকলের মনের কথাই মোটামুটি এই। গুরুপদ প্রস্তাব করে: কাজ কিছু ছেড়ে দেওয়া যাক।—খোরাকি খরচার মতন। খালিপেটে খাটা যায় না।

এদের মাল হাটে-বাজারে নেওয়া যাবে না। সংসারে খারাপ মানুষ আছে তো কিছু কিছু, মাথা-গরম ধর্মধ্বজী মানুষ—হল্লা তুলে তারা ধরিয়ে দিতে পারে। এ মালের জন্য আলাদা মানুষ—খলেদার বলে তাদের। খলেদার কলাও কাজকর্ম ধরলে তখন মহাজন। জগবন্ধু বলাধিকারী যেমন। গুরুপদর চেনা এক খলেদার কাছাকাছি থাকে—নবনী ধাড়া। নবনীকান্তর চোটার কারবার।—নিকারিরা মাছের ডালি মাথায় করে হাটে হাটে বিক্রি করে—টাকা প্রতি দৈনিক এক আনা সুদে নবনী মূলধনের যোগান দেয়। সেইটে প্রকাশ, আর এই গুপ্ত লেনদেন।

ডিঙিতে রইল সাহেব আর বংশী, গুরুপদ খোনাইকে নিয়ে চলল। খোনাইর কাঁধে বেউটিজাল, গুরুপদর হাতে চটের থলি। বাড়ি কাছাকাছি বটে, তাই বলে কি ঘাটের উপর? হাঁটতে হাঁটতে বেলা মাথার উপর এলো। তবু ভাগ্য, নবনীকান্ত বাড়ি আছে, সুদ আদায়ে বেরিয়ে পড়েনি। চোটার সুদ দিন-কে-দিন তুলে নিতে হয়।

গুরুপদবাবু যে! পথ ভুলে নাকি? আমি যে পয়সা দিই সে বুঝি ঘষা? বাজারে চলে না?

গুরুপদ আমতা-আমতা করে বলে, কাজ-কর্ম নেই—খালি হাতে এসে কি হবে?

চেহারায় তো তেলটি-ফুলটি। চাকরি-বাকরি নিয়েছ—লাটসাহেব মারা গিয়েছিল, সেই চাকরি নাকি?

হেসে ওঠে নবনী হি-হি- করে। বলে, ঘরে মুড়কি আছে—খাবে?'

অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু নৌকোর দুজনকে ফেলে খাওয়া চলবে না। এ-ও দলের নিয়ম। গুরুপদ বলে, দাও চাট্টি। এখানে খাব না, কোঁচড়ে করে নিয়ে যাই।

নবনীকান্ত বলে, কি এনেছ, দিয়ে দাও। দেখেশুনে রেখে আসি।

থলির মালপত্র বের করে। নবনী এক নজর দেখেই মুখস্থর মতো দাম বলে যায়, করাত সাত আনা, আগর আট আনা, ঘটিটির চার আনা, রুপোর পাঁচ আনা, একুনে [illegible]

[illegible]

কিনতে যাও—কম-সে-কম সাত-আট টাকা। হোক পুরানো, তা বলে কি—

নবনী তাড়াতাড়ি বলে, পুরো টাকাই দিতাম আমি। কিন্তু করাতের তিনটে দাঁত যে ভাঙা। তিন আনা হিসাবে তিন-তিরিক্কে ন-আনা বাদ দিয়ে দেখ, এবারে কত দাঁড়ায়।

ধোনাই মিস্ত্রির কাঁধের জালের দিকে আঙুল তুলে বলে, দেখি, হাতে দাও—

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, টাকা কেন—তারও উপরে দেওয়া যেত। পাঁচসিকে অবধি উঠে যেতাম। কতগুলো ঘর ছেঁড়া চেয়ে দেখ। ঘর পিছু দুটো করে পয়সা হলেও পাঁচ-ছ' আনা বাদ চলে যাবে।

ধোনাই এক টানে জাল ছিনিয়ে আবার কাঁধে তুলল : যা নিয়েছ, একটা বেলার খোরাকি হবে। জাল থাকুক, গাঙে-খালে মাছ মারব।

নবনীকান্তও এবার অতিশয় কড়া। বলে, নিতে হয় তো জাল সুদ্ধ নিয়ে নেবো। কথামা বাতিল লোহা নিয়ে পয়সা গুণে দেবো এত বোকা পাওনি। বয়স হয়ে গিয়ে ছেড়েও দিয়েছি এসব কাজকর্ম। ধর্মপথে থেকে চোটার সুদ যা দু-চার পয়সা আসে, তাতেই পেট চলে যায়।

থলি সুদ্ধ ঠেলে দিয়ে নবনী উঠে পড়ল। অন্দরের দিকে হাঁক দিয়ে ওঠে : তেল পাঠিয়ে দাও গো। বেলা হয়ে গেছে, চান করে ফেলি।

অর্থাৎ কথাবার্তার শেষ। বাঞ্ছা থাক মাল দিয়ে মূল্য নাও, নয় তো উঠে পড়ো এইবার।

গুরুপদ বিরক্ত মুখে বলে নিয়ে নাও। গরজ বুঝেছ, আর কি রক্ষে রাখবে তুমি! যা দিচ্ছ, সে-ও তো অনেক দয়া।

আজেবাজে মন্তব্য কানে না নিয়ে নবনী বলে, একুনে তা হলে কত দাঁড়াল, জুড়ে গেঁথে বলো।

গুরুপদ বলে, দাম ধরেছ তুমি। জুড়তে হয় ভাঙতে হয় তুমিই করো সব। যা দেবার দাও, বিদেয় হয়ে যাই।

টাকা ও রেজগিতে নবনী দাম দিয়ে দেয়। গুরুপদ তাকিয়েও দেখে না, মুঠো করে নিয়ে গামছার কোণে বাঁধল।

নবনী বলে গুণে দেখলে না?

জবাব ধোনাই মিস্ত্রি দিল : বেশী দেবার পাত্তর তুমি নও। কম হলে তো বলবে, সেইটেই উচিত দাম।

আজ্ঞাকে বড় লেগেছে গো! টেনে টেনে হেসে নবনী বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা [illegible]। দাম দিয়ে তো পাবার-পায়—[illegible] [illegible] এখন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], কোন ফিকিরে কোথায় [illegible] [illegible]। [illegible] চোর পেলে নির্দোষী [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] চোটার মতো কেটে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

মশায়, হাটে এর পরে কিছু থাকবে না। কথাবার্তা থাক এখন—পালিয়ে যাচ্ছে না কেউ, সারা রাত্তির ধরে যত খুশি আলাপ-সালাপ হবে।

খবরটা জানা ছিল না, এই রতনের ছেলের সংগে ধর্মদাস মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। নতুন কুটুম্ব এলে হাটে যাবে, দশগাঁয়ের মানুষের মধ্যে দু-হাতে খরচপত্র করে সচ্ছলতা দেখাবে, গৃহস্থ মানা করবে কিন্তু কানে নেবে না—এইসব হল দস্তুর। হাট ভেঙে যাবার আশঙ্কায় দুই বেয়াই হনহন করে বেরুল।

বংশী বেজার মুখে বলে, ও বেটা এসে জুটেছে—হাটের পথে পুটপুট করে আমাদের কুলের কথা বলবে। কুটুম্বর কাছে মুখ দেখানো যাবে না, সবে পড়ি এই ফাঁকে।

বসে ছিল ধোনাই মিস্ত্রি, ধপাস করে শুয়ে পড়ল মাদুরে।

কী হল ধোনাই?

ভাতের চেহারাই ভুলে গেছি বাবা। এক পেট ঠেসে তারপর যা বলো রাজি আছি। খাওয়ার ডাক এলে উঠব, তার আগে কাঁপ-কলে বেঁধেও কেউ উঠাতে পারিবে না।

গুরুপদরও সেই কথা : মুখ দেখাতে না পার বংশী, কোঁচার খুঁট খুলে ঘোমটা ঢেকে বসে থাকো। গুরুমশায়কে গুরু বলে, ডাক্তারবাবুকে ডাক্তার বলে—কারো কিছু হয় না, চোর বললে আমাদেরই বা লজ্জা কেন হবে?

মোটের উপর ভাত এবং খাবেই ধর্ম-দাসের বাড়ি। না খেয়ে নড়বে না। নিরিবিলি পেয়ে কাজকর্মের কথা হয়। কালকের রাতটা মিছা খাটনিতে গেল। আন্দাজি কাজের রকম এই। জুয়াখেলার মতন—প্রায়ই লাগে না, বিপদের ঝুঁকি পদে পদে। মুরুব্বিরা তাই পইপই করে মানা করেন। একখানা ভাল কাজ লাগাবার আগে অনেকদিন ধরে তোড়জোড় করতে হয়। উৎকৃষ্ট খুঁজিয়াল চাই—যে মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-বাড়ি, সে-বাড়ি। খোঁজখবর নেবে, ভাব জমাবে লোকের সংগে।

গুরুপদ ও ধোনাই মিস্ত্রি লাইনের পুরানো লোক—দুজনে দুই পারে চুঁড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু নৌকো বাওয়া রন্দাবসা কাজের কারিগরী—এত সমস্ত বাকি দুজনে হয় না। ডিঙিখানা অশ্ব-মেধের ঘোড়ার মতন এদেশ-সেদেশ ছোটাবার বসে। বড়াই মানুষ জোটাও তাহলে।

•

হাটের দুজন হাট করে ফিরে এলো। বেসাতি রান্নাঘরের পৈঠায় নামিয়ে রতন-মাণিক চেঁচামেচি করে : ও বংশী, ঘুমুলে নাকি তোমরা?

ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। সাড়া দিলে যদি আবার সেই আগের সুরের কথা আরম্ভ করে! ধর্মদাসের ভাই কেষ্টদাস কথায় কথায় ইতিমধ্যে বলেছে, রাতটুকু পোহালেই রতনমাণিক চলে যাচ্ছে, সরকারী মানুষের বসে বসে কুটুম-ভাতা খাবার সময় নেই। অতএব যেমন-তেমন ভাবে রাত কাটিয়ে দেওয়া।

কত জিনিস কেনাকাটা করলাম, একবার চোখে দেখবে না তোমরা? ডাকতে ডাকতে রতনমাণিক কাছে চলে এসেছে। বেসাতির জিনিস না দেখিয়ে কেন সোয়াস্তি নেই। বলে, নলেন-পাটালি পেয়ে গেলাম। ভাবি, কতদিন পরে একসংগে এতজনে মিলেছি—দুধ-পাটালি খাওয়া যাবে আমোদ করে। আর এক নতুন জিনিস—ফুলকপি। খুলনা থেকে এক দোকানদার নিয়ে এসেছিল, ডবল দাম ধরে দিয়ে তার কাছ থেকে কিনলাম।

ভালবাসার গদগদ অবস্থা। বংশী অবাক হয়ে দেখছে। নিজ এলাকার মধ্যে যে দফাদারকে দেখে, এখনকার রতনমাণিক সে মানুষ নয়। কথাবার্তার ধরন, এমন কি কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা। ধর্মদাসও তটস্থ হয়ে আছে—আদরযত্নের তিল পরিমাণ ত্রুটি না ঘটে। হাট থেকে ফিরে এসে খাতিরটা আরও যেন বেড়েছে। ধর্মদাস তো এই—ভাই দুটোও মুকিয়ে আছে। হাঁ করতেই কেষ্ট-দাস দৌড়ে পান-জল এনে দেয়, রামদাস কলকের আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে সমারোহ করে রান্না-বান্না হচ্ছে—ছ্যাকছোক আওয়াজ, ফোড়নের গন্ধ। হেসে ধর্মদাস বলে, এক হল কুটুম্বের বাড়িতে গেলে সুখ, আর হল কুটুম্ব বাড়ি এলে সুখ। শাকটা মাছটা তোমরা খাবে, আমরাও বাদ পড়ব না। কটা দিন সেই জন্যে আটকে রাখব, 'যাবো' বললেই ছাড় পাবে না।

কাল রাতে ও আজ দুপুরে ভাত জোটেনি—একবেলায় এখন তিন বেলার শোধ তুলে নিল। বৈঠকঘরে তোষক-বালিশ-চাদর এসে পড়েছে—চারজনের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। বিছানাপত্র সমস্ত দিয়ে বাড়ির লোকে সুনিশ্চিত শুধু-মাদুরে গড়াচ্ছে। আরামে চোখও বুঁজেছে—

রতনমাণিক ভিতর-বাড়ি শুয়েছে, পা টিপে টিপে সে এসে হাজির ঃ ঘুমুলে নাকি বংশী-ভাই? দুটো কথা বলবার জন্য সেই কখন থেকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি। বড়বাবু আবার আমার ফুলহাটা পাঠালেন। গিয়ে দেখি, বাড়ি-ছাড়া তুমি। কোথায় গিয়েছ, বউও কিছু জানে না।

বংশী বলে, বলেকয়ে সময় নিয়েই তো এলাম। বড়বাবুর সোয়াস্তি নেই। তাগাদার পর তাগাদা।

রতনমাণিক হেসে বলে, জলের তলের মাছ আর পরের হাতের ধন মুঠোয় না আসা পর্যন্ত সোয়াস্তি কিসের! কিন্তু সেজন্য নয়। একটা জিনিস বড়বাবু হুঁশ করিয়ে দিতে বললেন। তা ছাড়া আমার নিজেরও দুটো-একটা কথা—

বংশী আগের কথা ধরে বিরক্ত কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, আমাদের কি জমিদারি তালুকদারি আছে যে ইচ্ছে মতন সিন্দুক খুলে মুঠো মুঠো দিয়ে দেবো? রোজগারপত্তরে বেরিয়েছি। বললে, বাড়িছাড়া আমি—মেলার সব ছেড়েছুড়ে বাড়িই তো ছিলাম। থাকতে দিলে কই তোমরা? যা-কিছু পাই, নৈবিদ্যি সাজিয়ে তোমার বড়বাবুকে নিবেদন করে আসতে হবে।

রতনমাণিক প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে ঃ কথাই তো আমার তাই। শুধু বড়বাবুতে ফল হবে না। দুর্গা বলো কালী বলো সকল বড়-ঠাকুরের পুজোর সঙ্গে ষষ্ঠী-পুজো। ষষ্ঠীর নৈবিদ্যি বাদ না পড়ে, খেয়াল রেখো ভাই।

ঠাণ্ডা করবার জন্য বংশীকে রতনমাণিক বোঝাচ্ছে ঃ ভগবান হাত দিয়েছেন পা দিয়েছেন, কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি কেন বসে থাকতে যাবে? দু-হাতে কাজ করে যাও যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে। তবে হাঁ, বিচার-বিবেচনা থাকবে নিশ্চয় কাজের। বিবেচনায় ভুল করেই তোমরা ফ্যাসাদে পড়ে যাও।

দলগাছি আর ফিঙেপোতা দুই থানার পাশাপাশি এলাকা। রতনমাণিকের স্বার্থ দলগাছি নিয়ে। [illegible]

বেড়ায়। সদর থেকে হয়তো এলে বড়বাবু তখন আর চোখ বুজে থাকেন কি করে?

বংশী ক্লান্ত স্বরে বলে, বলছি দফাদার ভাই, জো-সো করে এবারটা ছাড়ান করে দাও। কোন ভালে আর নেই, গয়লগাছি ঝিনুকপোতা কোনদিকে জীবনে পা বাড়াব না।

রতনমাণিক গালে হাত দিয়ে বলে, এই দেখ—বললাম এক কথা, তুমি বুঝলে উল্টো। গয়লগাছিতে বিস্তর হয়ে গেছে, সকলে এবারে ঝিনুকপোতা ধরো। ঝিনুকপোতার দর্পচূর্ণ করে দাও। এই জিনিসটা হুঁশ করিয়ে দিতে বড়বাবু আমার ফুলহাটা পাঠালেন। তোমরা সব তার আগেই বেরিয়ে পড়েছ।

অনেকক্ষণ ধরে বিস্তর কথাবার্তা। পুলিশ আর চোর—পক্ষ হল দুটো। হামেশাই পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়। যত-কিছু গণ্ডগোল যথোচিত বুঝসমঝের অভাবে। ভোরবেলা রতনমাণিক চলে যাচ্ছে বংশীদের ডেকে ভুলে জনেজনের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। নিতান্ত মায়ের পেটের ভাই হলেও লোকে এত দূর করে না।

আরও খানিক বেলা হলে গৃহকর্তা ধর্মদাস কোথা থেকে খাসিছাগল টানতে টানতে এনে জিওলগাছে বাঁধল। বলে, চলে যাবেন—মাইরি আর কি! সরকারি মানুষ সেহাই মশায়কে ছাড়লাম বলে তোমাদেরও? এবেলা তো কিছুতে নয়। খাসি দিয়ে দুপুরবেলা চাট্টি সেবা হোক, তারপরে দেখা যাবে।

এতক্ষণ সন্দেহ হচ্ছিল হঠাৎ কণ্ঠস্বর নেমে গিয়ে শোনা যায় কি না যায়। গলা খাঁকারি দিয়ে ধর্মদাস বলে একটা কথা বলি ভুললে না। সকলকেই বলছি। ক্ষেত-খামারের কাজ মিটে গিয়ে ভাই দুটো বসে আছে। তোমরা সাথী করে ওদের নিয়ে যাও। বড্ড ধরেছে।

বংশী বলে এখন কোথা নিয়ে যাব? কাজ অন্তে ঘরে ফিরছি তো আমরা।

ধর্মদাস ফিক করে হাসল : কাজ নই, কামাও নই ভায়া। নিজের চোখ দিয়ে দেখি, নিজের কানে শুনি। যেটুকু যা বাকী ছিল, সেহাই মশায় খুলে বলল। ধাপ্পা দাও কেন?

ব্যাপার সমস্ত ফাঁস হয়ে গেছে। বংশী তবু কিছু ইতস্তত করে : এত বড় নামী গৃহস্থ তোমরা। কাজটা তো ভাল নয়—

নির্বিকার ধর্মদাস বলে, ভাল কি মন্দ কে জানতে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে দেখগে এই। ভালমন্দ তবে আর বলেছে কেন! ভা-না না-না করো কেন, সত্যি গুণের ভাই ওরা আমার। নয়তো বলতে যেতাম না। কেষ্ট-নগরের আমার আহা-মরি গুণের গলা। ... ... মানুষে কোন ছার, বলো পশু

অবধি মজে যায়। কিন্তু মজলে কি হবে, পয়সা তো দেবে না সে বাবদ।

চার সাঙাতে শলাপরামর্শ হল। বিধি-মতন কাজ করতে হলে মানুষ তো দরকারই। ছোকরা দুটো লাইনে একেবারে নতুন—কিন্তু কাজ করতে করতেই শিখবে মানুষে। আপাতত দারিত্বের কাজ নয়, বোঠে মারা থেকে শুরু। ডিঙি বাইবে, আর চোখ মেলে কাজ দেখবে। তাগুরে নেমে যণ্ডাজোয়ান পাহারায় দাঁড়াতে পারে দায়ে দরকারে। মায়ের নাম স্মরণ করে চলুক তবে কেষ্টদাস আর রামদাস।
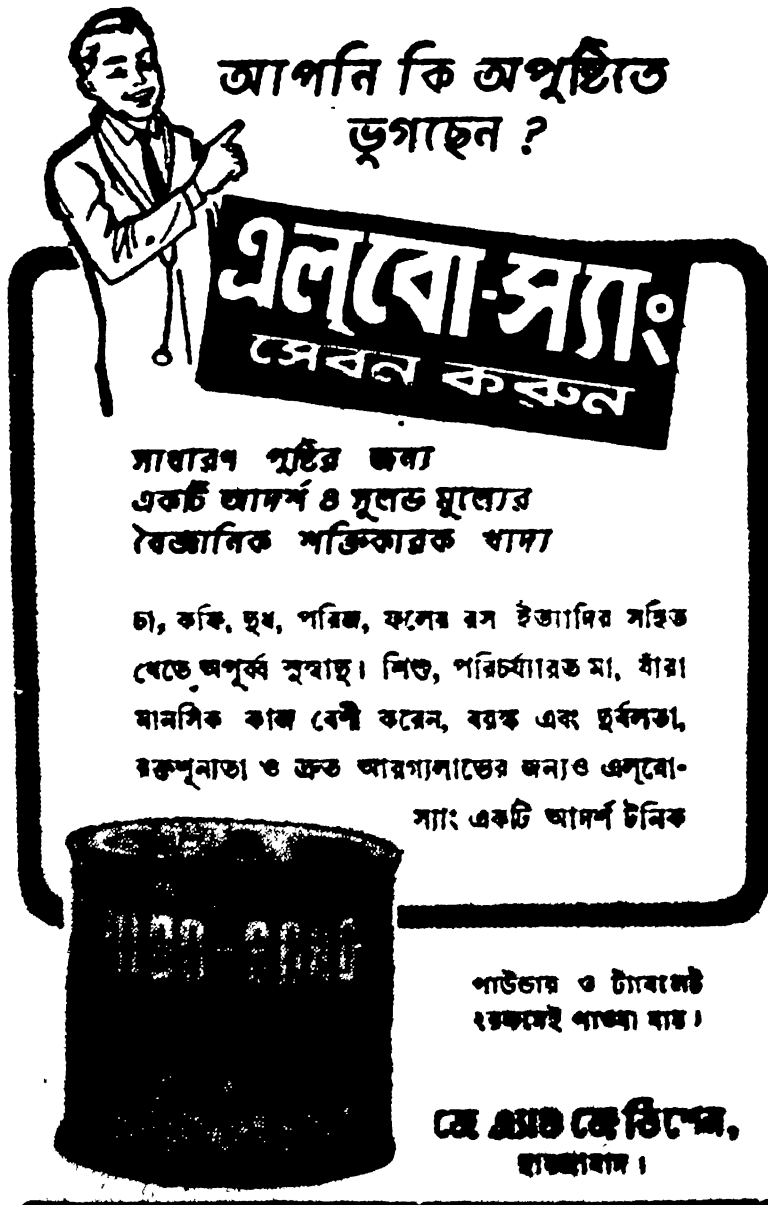
ছ-জন নিয়ে দলটা নেহাৎ মন্দ দাঁড়াল না। স্বচ্ছন্দে এবার নাবালে নেমে যাওয়া যায়। সেখানে গহিন নদী, ঘোর তুফান। কিন্তু ফসলে ভরা মাঠ—যার মানে হল গৃহস্থের গোলায় ধান বাক্সে টাকা। কাজকর্মের বড় সুন্দর ক্ষেত্র—লোক-মুখে শোনা আছে।

দূরের পথ, কিছু বন্দোবস্ত সেরে নেবার দরকার তাড়াতাড়ি। বাঁশ ফেড়ে ডিঙির উপর চালি করে নিল শোওয়া-বসার সুবিধার জন্য। দরমার ছই মগন হয়ে গিয়েছিল, তালিতুলি দিয়ে নিল। অস্ত্র নেওয়া হল হাতের মাথায় যা-কিছু পাওয়া যায়—রামদা লেজা সাবল লাঠি ছোরা। কাঠি তো অঙ্গের সাথী। কেষ্টদাস তার গোপীযন্ত্রটা নিয়েছে। পাপের ভারবোঝা যখন বেশি বেশি লাগবে, কৃষ্ণকথা গেয়ে বোঝা খানিক হালকা করে নেবে। হঠাৎ কি মনে হল—বোষ্টমপাড়ায় গিয়ে কণ্ঠী জোগাড় করে নিয়ে এলো একজোড়া।

সাহেব হেসে বলে, তা বেশ হল, কাঠি-সাবল-লেজার মতো এ জিনিসও সরঞ্জাম কাজের।

রাত দুপুরে ডিঙিতে উঠে পড়ল। শেষ রাত্রে জো এসে গেলে রওনা। জোৎস্না উঠে গেল, গাছপালার মাথা ঝিকমিক করছে। আজকে ক্ষতি নেই, কিন্তু আকাশের চাঁদ আরও কয়েকটা দিন এই রকম জ্বালাবে। তারপরে অমাবস্যা, পুরো অন্ধকার। পেঁচা ডেকে উঠল কোনদিকে। প্রথম বোঠে জলে পড়ল—ঝপ। বোঠের পর বোঠে—ঝপাঝপ ঝপাঝপ। স্রোতের আগে আগে ছুটেছে ডিঙি।

সকালবেলা গুরুপদ আর ধোনাই দুজনে দুপারে নেমে গেল। হেঁটে হেঁটে খোঁজদারি করে বেড়াক। সন্ধ্যার পর ফিরবে নৌকোয়। দরকার পড়লে দিনমানে ফিরতেও বাধা নেই। কোন পথ ধরে নৌকোর চলাচল, কোনখানে চাপান দেওয়া—আগের রাত্রে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। দোহাই যণ্ডামন ঠাকুর, দোহাই মা নিশিকালী, মুখ রেখো এবারে।

গোন-বেগোনের বাছবিচার নেই, ডিঙি চলবে। উজান মুখে টান কাটিয়ে এগুনো যাচ্ছে না, বোঠে মেরে মেরে হাত ব্যথা—গুণের দড়ি নিয়ে লাফিয়ে পড়ুক ওরা দু-ভাই। জলজঙ্গল কাঁটা-কাদা ঘুঁষিসে—যতক্ষণ দিনের আলো তার মধ্যে থামাথামি নেই।

পাড়ি বদর-বদর।

(ক্রমশ)

কান্তকবির একটি চিঠি

অসিত ভৌমিক

'নির্মল কর মঙ্গল করে মলিনমর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্, মোর মোহ-
কালিমা ঘুচায়ে।'

ভাঙ্গা গলায় অশীতিপর বৃদ্ধ সরোজরঞ্জন পাল মহাশয় গাইলেন। চোখ দুটো ছলছল্ করে উঠল। বললেন—'কান্তকবি আমার এই গান শুনে লিখলেন— "কবি যে সুরে গাইতেন আপনি সেই সুর আয়ত্ত করিয়াছেন। কবির রুদ্ধকণ্ঠ মৃত্যু-কবলে পতিত।" এই বলে কান্তকবি হাত-তালি দিতে আরম্ভ করলেন—তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে শুরু করল।'

কবি রজনীকান্ত তখন মেডিকেল কলেজের কটেজে অসুস্থ অবস্থায়। গলায় দুরারোগ্য ক্যানসার বাসা বেঁধেছে অস্ত্রোপচার হওয়ায় তিনি কথা বলতে পারেন না। সব কিছু লিখে দেখান। এতে তাঁর বড় কষ্ট হয়। তাই শুশ্রূষাকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বলেন—'দেখ সুরেন, আমার কথা বলবার শক্তি নেই, সব লিখে দেখাতে হয় কি ভয়ানক পরিশ্রম আর অসুবিধে, একজন একটা কথা বলে গেলে তার জবাব দিতে লাগে ১০ মিনিট লেখাটা ভয়ানক dilatory process কিনা।"

মেডিক্যাল কলেজে কান্তকবি অসুস্থ অবস্থায় আছেন শুনে মেদিনীপুরের কুমার সরোজরঞ্জন পাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কুমার সরোজরঞ্জনের গলা ভাল ছিল। তাঁর প্রিয় গান শুনে কবি উপযুক্ত মন্তব্য করেছিলেন। কুমার সরোজরঞ্জন পালের কথা আমরা "কান্তকবি রজনীকান্ত" রচয়িতা শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের লেখায় জানতে পারি। কুমার সরোজরঞ্জন কান্তকবিকে নানাপ্রকারে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন।

খড়্গপুর থানার ধারিন্দা পরগনার রাজা নারায়ণ পালের পুত্র কুমার সরোজরঞ্জন পাল আমার হাতে কান্তকবির এই স্মৃতিটুকু তুলে দিলেন। বললেন—"এ চিঠিটার একটা ইতিহাস আছে। কান্তকবির সঙ্গে যেদিন থেকে পরিচয় হয় সেদিন থেকে প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। একদিনের ঘটনা বলি। মেডিক্যাল কলেজে কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। সামনের একটা চেয়ারে বসে আছি। বাইরে আমওয়ালা হেঁকে যাচ্ছে—আম চাই—ই। কবি ইশারায় আমওয়ালাকে ডাকতে বললেন। আমওয়ালা আসতে তাকে ইশারায় জানালেন—কত করে?

আমওয়ালা উত্তর দিলো—টাকায় আটটা।

তিনি আবার ইশারায় দেখালেন—ষোলটা হবে?

—না। আমওয়ালার উত্তর।

—বারোটা?

—তাও না।

তখন তিনি আমওয়ালাকে চলে যেতে বললেন।

বড় দুঃখ পেলাম। কবির প্রতি সহানুভূতিতে মনটা ভরে উঠল। বাড়ি ফিরে এক ঝুড়ি আম কিনে চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলাম। মনে দ্বিধা ছিল, উনি এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধার দান কি করে নেবেন? আম পেয়ে খুশী হয়ে কবি লিখলেন—

শ্রীহরি

রাজকুমার,

কল্যাণের দান মাথায় করিয়া লইলাম। আপনার দয়া সংবাদপত্রে ঘোষণার যোগ্য।

[illegible]

কান্তকবি রজনীকান্তর স্বহস্তলিখিত চিঠি, কুমার সরোজরঞ্জন পালের সৌজন্যে প্রাপ্ত

আমি আম খাইয়া জীবনধারণ করিয়া আছি। সুতরাং আম পাইলে আমার কি আনন্দ হয় তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। আমি আর কিছু খাইতে পারি না, আম খাই। ভাত খাই বটে কিন্তু অতি কষ্টে।

আপনি বিকাল বেলা দেখা করিবেন প্রতিশ্রুত আছেন। ভুলিবেন না। আপনাকে দেখিবার জন্য আমার কয়েক-জন আত্মীয় মহিলা আসিবেন, তাঁহারা আপনার কথা শুনিয়া সকলেই বলিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ বালককে দেখিব।

৬ই এপ্রিল চিরকৃতজ্ঞ—

শ্রীরজনীকান্ত সেন

চিঠিটি কবির মৃত্যুর বৎসরেই লেখা। ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র রাত্রি সাড়ে আটটায় কবি আমাদের ছেড়ে চলে যান। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে রচিত একটি গান উদ্ধৃত করে নিবন্ধ শেষ করছি—

"আর, কাহারও কাছে, যাবো না আমি
তোমারি কাছে রব হে,
আর, কাহারও সাথে কব না কথা
তোমারি সাথে কব হে।
ঐ অভয়পদ হৃদয়ে ধরি
ভুলিব সব দুঃখ হে;
হেসে তোমারি দেওয়া বেদনা-ভার;
হৃদয়ে তুলি লব হে।"

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

কথিত আছে যে, আহারে নিজের রুচির উপর যদি বা নির্ভর করা চলে কিন্তু রূপ বা সাজসজ্জার জন্য যেতে হয় পরের রুচির কাছে। যা অপরের চোখে ভাল ঠেকবে, তাই হবে সাজের ধারা। আমরা কিন্তু স্বীকার করি না। অসুরোধে বরং ঢেঁকি গেলা যায়। সাজসজ্জাই বলুন, প্রসাধনই বলুন, সৌন্দর্য-বোধ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, অনেকটা শিল্পীর শিল্পরচনার মতই একান্তভাবে নিজস্ব। অবশ্য একান্ত নিজস্ব রুচিবোধও সার্থক হলে সকলের চোখেই ধরা পড়ে। রূপ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বলেই বিংশ শতাব্দীর রূপসীর ধরাবাঁধা মাপকাঠি নেই। যাকে দেখে নয়নমনের তৃপ্তি হয় সেই সুন্দর। তার সৌন্দর্য একটি সমগ্রতা, টুকরো টুকরো করে দেখবার অবকাশ নেই।

এই সমগ্রতার সৃষ্টি বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। সবচেয়ে সেরা উপাদান ব্যক্তিত্ব বা personality, অন্তরের নিভৃততম কোণের যে প্রাণসত্তা তার সাবলীল বিকাশেই সৌন্দর্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অঙ্গরাগ, প্রসাধন, বেশবাস, মুখাবয়ব, দেহবর্ণ—সব কিছুর উপরে তার অস্তিত্ব অনুভূত হয় অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধারণকেও অসাধারণ করে তোলে।

প্রসাধন আর অঙ্গরাগের নূতন নূতন আবিষ্কারে সমস্ত পৃথিবীর কত কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। এমনও দেশ আছে যেখানে জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ যায় "ফ্যাশন শিল্পের" পায়ে। ওদের সংগে টেক্কা দেবার চেষ্টা এ দেশে বাতুলতা বই নয়। আমাদের সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস হবে সহজ, সাধারণ, দৈনন্দিন। সৌন্দর্যের প্রধান সহায় সুন্দর স্বাস্থ্য, তার জন্য সৌন্দর্য-বিশেষজ্ঞের খাসকামরায় প্রয়োজন হয় না। সামান্য সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতে হলে কেবলমাত্র যত্নের প্রয়োজন। অতিরিক্ত মিষ্টি, ভাজাভুজি, তেলাক্ত খাবার যারা বেশী খায়, যাদের শারীরিক পরিশ্রমের অবকাশ কম তাদের যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় না, দেহবর্ণের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়, দৃষ্টি হয়ে ওঠে প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। টাটকা ফল, শাকসবজি, কাঁচা তরকারি, দুধ, হালকা রান্না খাবেন, প্রচুর আলোবাতাস প্রাণভরে গ্রহণ করবেন, দেখবেন শত অঙ্গরাগের চেয়ে উপকার পাবেন। শহরের কৃত্রিম জীবন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিয়মনীতি ভাল স্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তরায়। লক্ষ করে দেখবেন, যাঁরা রাত্রি জাগরণে অভ্যস্ত তাঁদের চোখের কোণে বিবর্ণ কালি, আর অতিরিক্ত অঙ্গরাগ সত্ত্বেও কত মলিন [illegible] সৌন্দর্য। আবার মাঠে-ঘাটে যে [illegible] রোদ জল [illegible], কত কষ্টে, তার

উজ্জ্বল তার রং। বলবেন, শহরের মেয়ের মুক্ত আলোবাতাস পাবার সুযোগ কতটুকু? তবু ভেবে দেখুন যতটা সুযোগ আছে তারই কি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়? আর শরীরের জন্যই যদি নিয়মিত কিছু কিছু করা যায় তো হলেও যথেষ্ট পরিশ্রম হয়।

শরীরের স্বাস্থ্য শুধু নয়, মনের স্বাস্থ্যও সৌন্দর্য পরিচর্যার সহায়। সদাপ্রফুল্ল কান্তির যে মাধুর্য তা কি অসন্তুষ্ট, অসুখী মন নিয়ে পাওয়া যায়? বলিরেখা বা wrinkles নিয়ে তো সারা পৃথিবীর মেয়েরা মাথা ঘামান, অথচ যে মেয়ে সারাক্ষণ ভ্রুকুটি করে থাকে তার বলিরেখা আটকাবার উপায় কোথায়? বয়স একটু বেশী হলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। তখন অতি সহজে বলিরেখা স্থায়ী হয়ে যায়। নাসিকা-কুঞ্চনের সামান্য অভ্যাস হয়তো বা কাকের পায়ের দাগের মত বলিরেখা নাকের দু পাশে এঁকে দিতে পারে। কাজেই কোন কারণে মেজাজ খারাপ হলেই জানবেন, আপনার মুখে তার ছাপ পড়ছে। একটু চেষ্টা করলেই এড়িয়ে যেতে পারবেন ছোটখাটো খিটিমিটি।

স্বাস্থ্যের পরই সৌন্দর্যসাধনায় পরিচ্ছন্নতার স্থান। নিত্যস্নানে শরীরের সব ময়লা ধুয়ে যায়। এ ছাড়া আরও দু'বার অন্তত মুখ ধোওয়া দরকার। যাঁরা [illegible]

লক্ষ করে থাকবেন, কত সহজে হাতে-মুখে কালি জমে। মাঝে মাঝে চুলও ধুয়ে ফেলবেন। তাতে চুল ভাল থাকে, আর চুলের গোড়া পরিষ্কার থাকলে ব্রণ প্রভৃতি চর্মরোগ কম হয়। যাঁরা নানারকম আধুনিক অঙ্গরাগ ব্যবহার করেন, তাঁরা তো অতি অবশ্য সময়মত অঙ্গরাগ তুলবার ক্রীম বা লোশন দিয়ে অঙ্গরাগ তুলে ফেলবেন। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না থাকলে অল্প-দিনের মধ্যে দেহের বর্ণ চাপা-থাকা ঘাসের মত ম্লান ও বিবর্ণ হয়ে যাবে। লোমকূপ-গুলিতে ময়লা জমে নানা অস্বস্তিকর চর্ম-রোগও হতে পারে। অঙ্গমার্জনায় মৃদু, কোমল ও স্নেহপদার্থবহুল সাবানের ব্যবহার প্রশস্ত। হাতে সময় থাকলে দু-একটা খুব সাধারণ জিনিস দিয়ে ত্বকের উন্নতি করা যায়। শীতকালে মুখ ও হাত-পা ফাটে, তখন 'সরময়দা' লাগানো ত্বকের পক্ষে উপকারদায়ক। সামান্য দুধের সর, দু-চার ফোটা দুধ, দু-চার ফোটা সরষের তেল দিয়ে তার মধ্যে অল্প ময়দা মিশিয়ে একটা কাই মত করে মুখে মাখুন। তারপর ঘষে ঘষে ঐসব ময়দা ঝরিয়ে ফেলুন দেখবেন কত ময়লা কেটেছে আর কত মসৃণ হয়েছে ত্বক। এতে চমৎকার মৃদু মালিশ বা massageও হয়। সরময়দা ছাড়া আরও নানারকম সহজ প্রক্রিয়া ছিল। সরষের খোল, মুসুরির ডাল, বেসম ইত্যাদি দিয়ে মেয়েরা নিত্য অঙ্গমার্জনা করতেন। [illegible] মেয়েরা কাঁচা হলুদ ব্যবহার করতেন। বর্ণের উন্নতিসাধনে তো বটেই, নানা চর্মরোগেরও প্রতিকার করে কাঁচা হলুদে। ভাল সরষের তেলের সংগে কাঁচা হলুদবাটা দিয়ে মালিশ করতে হয়। তারপর খোল ও মুসুরির ডাল-বাটা দিয়ে ঘষে তুলে ফেলা হয়। কাঁচা হলুদের মস্ত দোষ যে, [illegible]

লেগে যায়। কাজেই খুব সাবধানে মাখা দরকার। অল্প বয়সে মেয়েরা, এমন কি ছেলেরাও অনেক সময় ব্রণ নিয়ে বড় বিব্রত হয়। শিমুল গাছের কাঁটা মসুরির ডাল ভেজানো জলে চন্দনের মত করে ঘষে সামান্য দুধ মিশিয়ে লাগাবেন। অল্প দিনেই যথেষ্ট উন্নতি হবে। ছুলি ও মৃদু চর্মরোগে প্রথম অবস্থায় লেবু ঘষলে উপকার হয়। লেবু লাগালে দেহবর্ণেরও উন্নতি হয়। গ্রীষ্মে যাদের ত্বক কর্কশ ও শুকনো হয়ে ওঠে তাদের জন্য একটি চমৎকার জিনিসের কথা শুনেছি। মসুরির ডাল দুধে ভিজিয়ে রাখুন। পরে বেটে নিয়ে ঘি বা মাখন মিশিয়ে মুখে মাখুন। অনেকে নাকি কমলা-লেবুর খোসা বাদাম-বাটা ইত্যাদি মেলান। তা মেলানো সম্ভব না হলেও উপকার পাবেন। ঘাড় বা গলা যত্নের অভাবে বিবর্ণ হলে লেবুর রস সামান্য জল মিশিয়ে মালিশ করলে ফল হয়।

কৃত্রিম অংগরাগের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শোনা যায় অনেক। কিন্তু রুচিপূর্ণ-ভাবে সামান্য অংগরাগের ব্যবহার অনেক সময় সৌন্দর্য বর্ধিতই করে। অথচ পারি-পার্শ্বিকের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা না করে পাউডার-ক্রীমের প্রলেপে মুখের চেহারা বাজারে কেনা চীনে পুতুলের মত করে তোলা সৌন্দর্যবোধ নয় এ বিষয়ে অবশ্য কারও মনে সন্দেহ থাকতে পারে না। অথচ অনেক সময় ভুলে যাই, আমাদের শ্যামল বর্ণের কথা কালো চুলের কথা। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, চিত্রে সুন্দরীরা ছিলেন কখনও তপ্তকাঞ্চনবরণী কখনও বা শ্যামল বনানীর মত মাধুর্যময়ী। বহু বৎসর শ্বেতাংগদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেই বোধ হয় শ্যামলের মাধুর্য আমরা ভুলে গিয়ে শ্যামলতা সম্বন্ধে একটু সসংকোচ জড়তা এনে ফেলেছি।

অংগরাগের ব্যবহারের মত সাজগোজ সম্বন্ধেও আমরা অনেক সময় অন্ধ অনুকরণ করে ফেলি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সাজপোশাক আর শীতপ্রধান দেশের সাজ এক হতে পারে না। স্বাধীনতালাভের পর অবশ্য অনেক পরিবর্তনের সংগে মেয়েদের সাজপোশাকে পরিবর্তনও এসেছে। উঁচু গোড়ালি বা হাইহিল জুতো, বিলাতী ছাতা, খোলা-হাত জামা মোজা, ফুলদার জর্জেট প্রভৃতি অনেক কম দেখা যায়। এর পরিবর্তে এসেছে নানা ধাঁচের চটি জুতো, চোলি জামা, পুরোদস্তুর ভারতীয় শাড়ী, প্রাচীন নমুনার গয়না প্রভৃতি। দেশের জিনিস দেশী মেয়েদের যেমন মানায় তেমন বিলিতীতে কি করে মানাবে? ভারতীয় শাল গুজরাট ও বেনারসের কাজ-করা কাপড়, বাংলার গরদতসর, জয়পুরের পাথরের অলংকার, সাঁওতালী বা কটকের রুপোর গহনা দিল্লী চটিজুতো বা কোলাপুরী নাগরা অপেক্ষা কোনও পাশ্চাত্ত্য গহনা, কাপড় বা জুতো শ্রেষ্ঠ নয়। যখন বিদেশী সুন্দরীরা আমাদের চিরাচরিত খোঁপার ধাঁচে চুল বাঁধতে শুরু করেছেন, শাড়ীর অনুকরণে পোশাক তৈরি করাচ্ছেন, কাপড়ে আমাদের কল্কার ছাপ বেছে নিচ্ছেন, পায়ে খোলা চটিজুতো পরছেন তখন আমাদের যা একান্ত নিজস্ব তা ফেলে অনুকরণ নেহাতই হাস্যকর। এখানেই আসে রুচিবোধের দায়িত্ব। সে দায়িত্বের ভারও সম্পূর্ণ ব্যক্তি-গত বিচারের সংগে যুক্ত। রুচি সৃষ্টি করার দায়িত্বও আপনার আমার। অপরের নয়।

টুকিটাকি

রুপোর গহনা বিবর্ণ হয়ে যায় বলে অনেকে ব্যবহার করতে চান না। ফুটন্ত সাবান জলে একবার ডুবিয়ে তুলে নিয়ে একটি হাল্কা টুথ ব্রাশ দিয়ে মাজবেন। জল ঝরিয়ে শুকনো নরম কাপড় দিয়ে ঘসে নিলেই শুভ্র নির্মল রং ফিরে আসবে।

গুঁড়ো হলুদ জলে মিশিয়ে তাতে অপরিষ্কার মলিন সোনার গহনা যদি ১০।১২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে তারপর ব্রাশ ও সাবান দিয়ে আস্তে আস্তে ঘষে যায় গহনা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে যায়।

সিদ্ধ আলু দিয়ে হাত মুছলে হাত নরম হয়।

গরম জলে ১ চামচ সোহাগা দিয়ে মাথা ধুলে চুল ভাল থাকে।

চট পুড়িয়ে নারকেল তেল দিয়ে মাথায় ঘষলে চুল উঠে যাওয়া কমে।

কোনও পাথর বসানো গহনায় যদি ময়লা জমে এক টুকরো নরম চামড়ায় সোনার পালিশ খানিকটা ও ডি কোলোন দিয়ে গয়নাটা ঘষলে উজ্জ্বলতা ফিরে আসে।

অনেক সময় সবুজ নীল ইত্যাদি রং কাচবার সময় উঠে যেতে চায়। জলে ডুবিয়ে দেবার আগে যদি চায়ের চামচের দু চামচ এপসম সল্ট এমন কি বিকল্পে মাত্রার নুনই একটু গরম জলে গুলে আধবালতি ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে নেন এবং সেই জলে কাপড় ডোবান তা হলে রং উঠবে না।

আগে চিড়িয়াখানার লোক যেত দুবার। একবার বাবার হাত ধরে, ছেলের হাত ধরে আরবার। এখন দিনকাল পালটেছে, পালটেছে চিড়িয়াখানার চেহারা, বান্ধবীর হাত ধরে তৃতীয়বার ঘুরে এলেও কেউ অরসিক বলবে না।

হিন্দুস্থান যেমন আর শুধু হিন্দুর আস্তানা নয়, খৃস্টান-মুসলমান-শিখ-পারসিকেরও, তেমনি আদত অর্থ যাই থাকুক, চিড়িয়াখানা আজকাল "চিড়িয়া" ছাড়াও তাবৎ জীবজন্তুদের ঠাঁই। ফাউ হিসেবে মেলে ফুল আর লতাপাতার "মাই-ডিয়ারী" পরিবেশ। গাছের ছায়ায় দু দণ্ড বিশ্রাম নাও, কেয়ারি-করা ফুলের বাগানে ঢু মারো এবং ফাঁকে ফাঁকে মোলাকাত কর গণ্ডা গণ্ডা গণ্ডার আর বাঘ-সিংহ-হাতীর সঙ্গে। মিনিট ঘণ্টা তরতর কেমন করে পালিয়ে যাবে, টের পাবার জো-টি নেই।

হাল আরও মজা। খাঁচার দিন শেষ। ধীরে ধীরে জীবজন্তুদের— তা যত হিংস্রই হোক না কেন— ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে [illegible] তৈরী খোলা জায়গায়। তারা সেখানেই গজরায়, সেখানেই দাপাদাপি করে এবং কটমটিয়ে তাকায় দূরের মানুষগুলোর দিকে। "দাও ফিরে সে অরণ্য" বলে শহুরে যাঁরা ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, তাঁরা বন-বাদাড় আর গুহায় তৈরী এই আরণ্যক শোভায় মাঝখানে বাঘ-সিংহের অকুতোভয় পদচারণা দেখে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করেন। আর কাচ্চাবাচ্চাদের কথা তো আলাদাই। গোটা চিড়িয়াখানা তাদের কাছে এক আশ্চর্য রূপকথা।

নদীর সেরা গঙ্গা, পাহাড়ের সেরা হিমালয়, তেমনি চিড়িয়াখানার সেরা "হাগেনবেক"। সম্প্রতি জার্মানীর যেখানে এত চিড়িয়াখানা আছে সেখানে কার্ল হাগেনবেক্-এর তিরোধানের পঞ্চাশ বছর-পূর্তি উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই স্মরণ করেছেন।

গত বছর হামবুর্গে যখন যাই, গাইডকে বলি, দুটো জিনিস আমায় দেখাতে হবে। ছোটবেলা থেকে শোনা সেই "এলবটানেল"—এলব্ নদীর পাতাল-পুরীতে চলাচলের সুড়ঙ্গ আর দুনিয়ার বাড়া হাগেনবেক চিড়িয়াখানা। গাইড পিটার বললে—তথাস্তু।

বলা দরকার, চিড়িয়াখানাটির নাম তার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল হাগেনবেকের নামে। ইনিই আধুনিক "জু-বাগানের" জনক। ইনিই খোলা আরণ্যক পরিবেশে জীবজন্তুদের ছেড়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন, রূপ দেন এবং সব জায়গাতে তাঁর পরিকল্পনাই একে একে চালু হচ্ছে। আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানাতেও তাই। সেখানে ইদানীং গুটিকতক সিংহ-সিংহী খাঁচার বাইরে। তবে হাগেনবেক আর আলিপুরে আশমান-জমিন ফারাক। একটির তুলনায় আরটি হাতীর কাছে পিঁপড়ে।

ভিল নিয়ে গেল শহরের উপকণ্ঠে। মাইলের পর মাইল জোড়া বিরাট এই হাগেনবেক চিড়িয়াখানা এবং খোলামেলা বন-জঙ্গলের ভেতরে বাদ পড়েছে হেন একটিও জীবজন্তু নেই। হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে ঘুরতে আমি হয়রান, ভিলকে বলি, "আর পারি না"। ভিল বলে—"আখ্ সো", অর্থাৎ এই নাকি, ত হলে চল বাইরে যাই, সদর ফটকের সামনে গিয়ে খানিক বসি।

মুখে গেলাস "ট্রউবেন ক্রফট্" অর্থাৎ আঙুরের রস নিয়ে দুজনে বসলাম। আর কোথাও নয় চিড়িয়াখানার প্রবেশপথের সামনে, ঠিক যেখানটায় প্রতিষ্ঠাতা কার্ল হাগেনবেকের মূর্তিটা দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কি ভেবে ভিলকে বললাম কার্ল হাগেনবেক সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। জান তো কিছু বল!

কার্ল হাগেনবেক
(১৮৪৪—১৯১৩)

ভিল জবাব দেয়— না জেনে উপায় আছে! গাইডের কাজ করছি বাবা, গত পাঁচ বছর, তোমাদের তো চিনি। প্রশ্নের পর প্রশ্নে জ্বালিয়ে মারবে, তাই আগেভাগে তৈরী হয়ে নিই। আজ তৈরী। কার্ল হাগেনবেক এখন আমার ঠোঁটের ডগায়।

ক্লান্ত পা দুটিকে ছড়িয়ে আমি উত্তর জার্মানীর মিঠে রোদ উপভোগ করছি। ভিল তোতাপাখির মত হাগেনবেক-চরিত ততক্ষণে শুরু করে দিয়েছে।

কার্ল হাগেনবেকের বাড়ি এই বন্দরী শহর হামবুর্গের কাছেই। জন্ম ১৮৪৪ সালে, মারা যান উনসত্তর বছর বয়সে, ১৯১৩ সালে।

বাবা গটফ্রীড ক্লাউস হাগেনবেক ছিলেন মাছের বড় কারবারী। ১৮৪৮ সালে গটফ্রীডের একজন জেলে এলব নদীর খাড়িতে মাছ ধরতে গিয়ে পাকড়াও করে ছটি অতিকায় সীল। বাহাদুর সেই সীল মাছ-গুলোকে সে জমা দিল হুজুরের কাছে।

গটফ্রীড মাছের আকার দেখে তাজ্জব। বাপ রে, এত বড়! চটপট তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। দুটি বড় কাঠের চৌবাচ্চায় মাছগুলোকে ছেড়ে তিনি হামবুর্গের স্পীলবুডেন প্লাৎস-এ নিয়ে এলেন। আট সেন্ট দক্ষিণা দিয়ে হাজার

ক্রীড়ারসিনীর রাজহংস দম্পতী। ১৯৬০ সালে কার্ল হাগেনবেকের পুত্রের উপহারস্বরূপ হামবুর্গ থেকে [illegible]; আলিপুরে এরা এসেছে
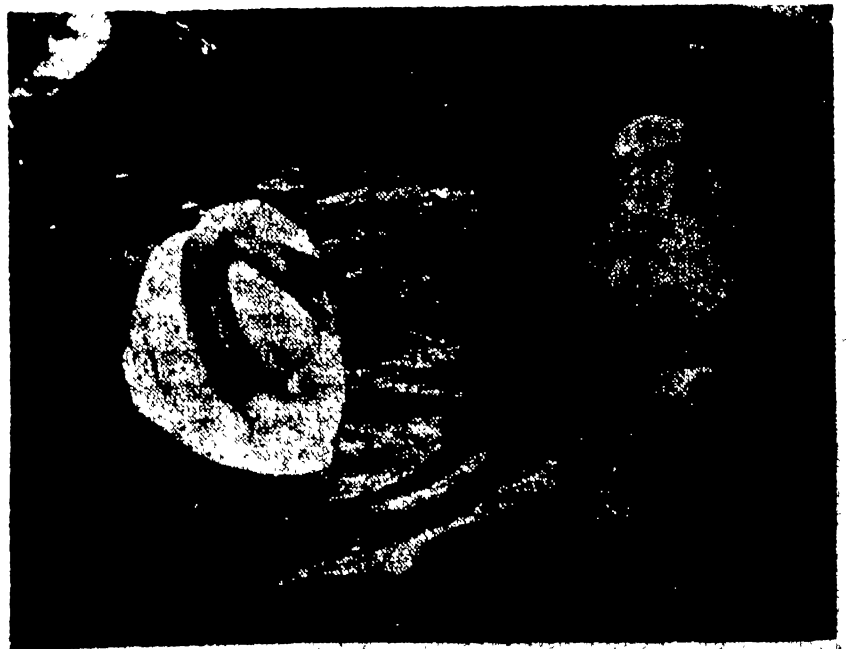
হাজার লোক রাজ্যসে সেই সীলগুলো দেখতে এল। এবং সেই দিন থেকেই দুনিয়া-জোড়া জীবজন্তু-ব্যবসায়ের সূত্রপাত এবং বলা যেতে পারে হামবুর্গের এই অতি-বিখ্যাত জু-বাগানের পূর্ব সূচনা।

কার্ল হাগেনবেকের বয়স যখন একুশ, তাঁর বাবা গটফ্রীড জানতে চাইলেন, ছেলে কোন লাইনে যাবে। মাছের কারবার, না পশুপাখি সংগ্রহে? কার্লের উত্তর স্পষ্ট—দ্বিতীয়টিতে।

তার কারণ অবশ্য আছে। কার্ল ইতি-মধ্যেই অ-বোলা পশুপাখিদের কাছে মন বিকিয়ে দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সময় কাটে, কুকুর, বেড়াল, গিনিপিগ ইঁদুরছানার সংগে। জলে হাঁস দেখলেই নিজে নেমে পড়েন, আদরে গলা জড়িয়ে ধরেন। পাখি উড়ে এলে খাবার নিয়ে এগিয়ে যান, বই ঘেঁটে ঘেঁটে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণীদের খবর আনেন। তাঁর বয়স যখন দুই, তখনই কোথা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসেন আট আটটি ইঁদুর ছানা। মা দেখেই আগুন। ছেলেকে ধমকে ছানাগুলোকে দিলেন ছেড়ে। কিন্তু এদিকে ছেলের কান্না আর থামে না। ওই ইঁদুরছানা তার চাই-ই চাই। শেষমেষ বাবা গটফ্রীড নিয়ে এলেন তুলতুলে কতক-গুলো গিনিপিগ। ছেলে শান্ত হল।

সেই কার্ল হাগেনবেক বড় হয়ে শেষ পর্যন্ত পশুপাখি সংগ্রহের ব্যবসায়ে নামলেন। গোড়ার দিকে যোগাড় হল ভাল ভাল হাঁস, ছুঁচো, বাঘ ভাল্লুক হাতি-ইত্যাদি। বিক্রির জন্যে আসে, কিন্তু যত-দিন না হাতবদল হচ্ছে, জমা থাকে হাগেনবেক সংগ্রহশালায়। কার্ল ঠিক করলেন, এদের খানিকটা শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া দরকার, মানুষের মত কিছু কায়দা-কানুন রপ্ত করানো দরকার। এদের সংগে মিশে থাকতে হলে এদের হাবভাবের ভাগী-দার হতে হবে। তা ছাড়া, পশুপাখিকে বশ মানানো যে কার্লের জীবনে একমেব আনন্দ।

কারবারে গোড়ার দিকে বেশ লোকসান গেল। তবে কয়েক বছরের ভেতর দু পয়সা ঘরে আসতে লাগল। কার্ল উৎসাহিত হলেন। সংগ্রহের বিস্তার ঘটল, নানা জাতের, নানা রকমের পশুপাখি ভিড় বাড়াল। খ্যাতি এত দূর গড়াল যে, জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার রাজারা, রুশ দেশের জার, জাপানের মিকাডো মরক্কোর সুলতান হাগেনবেক সংগ্রহশালা থেকে জীবজন্তু কিনতে লাগলেন। ১৮৮৭ সালে ব্যবসার খাতিরে কার্ল খুলে বসলেন বিখ্যাত সেই 'হাগেনবেক সার্কাস'—পশু-পাখির তাক লাগানো খেলা যার বৈশিষ্ট্য। সার্কাস ঘুরল সারা পৃথিবী। আমাদের ভারতবর্ষেও এসেছে একবার।

১৮৯৬ সালে আর এক ধাপ অগ্রসর। বার্লিনের ইম্পিরিয়েল পেটেন্ট অফিস কার্ল হাগেনবেককে একটি নতুন পেটেন্ট দিলেন। তাতে তিনি অধিকার পেলেন খোলা মাঠে কৃত্রিম গুহা-জংগলে নিরীতৈন জু-বাগান বানাবার। এবং আধুনিক চিড়িয়াখানার জন্ম ঠিক সেইদিন থেকেই। প্রাণীপ্রিয় পশু-পাখিদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার আনন্দে কার্ল হাগেনবেক সেদিন আত্মহারা।

তারপর চলল গবেষণা, কীভাবে ওদের স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায়। দর্শকদের সংগে নিরাপদ দূরত্ব রেখেও যাতে ওরা দৌড়ঝাঁপ করতে পারে, অবাধে সাড়া পায়, তার জন্যে কার্লের সে কী প্রাণপাত পরিশ্রম! অবশেষে তাঁর সাধনা সফল হল। ১৮৯৭ সালে কার্ল নিজে জমি দখল করলেন এবং সেইখানেই প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ববিখ্যাত হাগেন-বেক চিড়িয়াখানা।

তিন পুরুষ [illegible]

তাকিয়ে বলল—'তাসাকমু'। চল, এবার যাওয়া যাক। বিকেলে আমায় যেতে হবে লুবেক—টমাস মানের শহরে। রওনা হতে হতে ডিল আবার বলে—"আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, কার্ল হাগেনবেকের ছেলে হাগেনবেক জুনিয়ারও একজন নাম-করা পশুপক্ষিবিদ। চিড়িয়াখানায় আধুনিকী-করণে এই জুনিয়ারেরও দান কম নয়।"

আমি বললাম—সে আমি জানি। আমাদের দিল্লির চিড়িয়াখানার পরিকল্পনায় ওঁর হাত আছে। ১৯৫৬ সালে তিনি আসেন উপদেষ্টা হয়ে এবং তাঁরই নির্দেশমত পুরানা কিল্লার কাছে তৈরী হয়েছে খোলামেলায় চমৎকার জুলজিকেল গার্ডেন।

ডিল বললে— "তাই নাকি? এ খবর কিন্তু আমার জানা ছিল না। দিল্লি যদি কোন দিন যাই, তুমি তা হলে আমার গাইড হয়ো। কেমন, রাজী?"

—অমিতাভ চৌধুরী

বিশ্বচিত্রা

মানুষের এক পরম বিজয়

মহাশূন্য অভিযানে এ পর্যন্ত মহাকাশচারি ব্যক্তির চেয়ে যন্ত্রের কৃতিত্বটাই বড় করে ধরে আসা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর ছত্রিশ বৎসর বয়স্ক মেজর লেরয় গর্ডন কুপার সম্প্রতি ঘণ্টায় ১৭,১৫৭ মাইল গতিতে ৩৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট ধরে বাইশ বার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমার পর শেষে দারুণ যান্ত্রিক বিপর্যয় সত্ত্বেও মহাকাশযান ফেইথ-৭'কে নিজের হাতে চালিয়ে যেভাবে পৃথিবীতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন তা মানুষেরই শক্তির এক নতুন কীর্তি। মহাশূন্য অভিযানে যন্ত্রই আসল এই বদ্ধমূল ধারণাটি তিনি দূর করে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

যাত্রার কথা ছিল ২১ মে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেইথ ৭'কে মহাশূন্যে নিক্ষেপ নিয়োজিত ক্ষেপণাস্ত্র চালনার ২৭৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ডিজেল মোটরটি হঠাৎ বিকল হয়ে যাওয়ায় যাত্রা স্থগিত থাকে কিছুক্ষণের জন্য। ডিজেল মোটর ঠিক হয়ে যেতে দেখা গেল বারমুডায় অবস্থিত আকাশযানটির গতিনির্দেশ লক্ষ্য রাখায় গুরুত্বপূর্ণ রাডারটিতে কিছু গোলমাল ঘটেছে। বাধ্য হয়েই সেদিন কুপারকে নেমে আসতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের আগের পাঁচজন মহাকাশচারীর তুলনায় খর্বকায় (৫ ফিট, ৯ ইঞ্চি; ওজন ১৪৭ পাউন্ড) ঘুমকাতুরে এবং খুঁতখুঁতে স্বভাবের হলেও কুপার যাত্রার শুরুতেই অমন বাধা পেয়ে মুষড়ে পড়লেও একেবারে হতাশ হয়ে পড়েননি। ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলেন: "সত্যিই বেশ মজা লাগছে আমার।" মুষড়ে পড়ার কারণ, গত চার বছর ধরে মহাকাশ অভিযাত্রীর একজন হিসেবে তালিম পেয়ে নির্বাচিত হলেও, প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে তাকে 'ওয়েটিং লিস্ট'-এ রেখে দেওয়া হয়। কর্তারা কেমন যেন ভরসা পেতেন না।

পরদিন সকালে আবার তিনি ফেইথ-৭'এ চড়লেন। তার মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তেই দশতলা উঁচু নিক্ষেপ যন্ত্রটি ধীরে ধীরে দুলতে আরম্ভ করে। দেখতে দেখতে পাতলা আবরণ ভেদ করে ক্ষেপণাস্ত্র এটলাস থেকে তরল অক্সিজেনের বাষ্পের বাঁশীর [illegible] হতে থাকে। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মনিটর-[illegible] [illegible] [illegible] করে গাইরোস্কোপ [illegible] [illegible]। কুপারের শ্বাস-প্রশ্বাসের [illegible] [illegible] [illegible] যায়।

কক্ষপথে ভারতের উপর দিয়ে পরিক্রমা কালে একশ' মাইল উঁচু থেকে কুপারের তোলা হিমালয় পর্বতের দৃশ্য

প্যারাশুটে ফেইথ-৭'এর অবতরণ

নির্ধারিত সময়ের ঠিক চার মিনিট পর সকাল ৮ ৪-এ রৌপ্যোজ্জ্বল এটলাসের প্রধান ইঞ্জিন তিনটি বিদ্যুতের মতো আলো বিকীর্ণ করে সচল হয়ে ওঠে। ফেইথ-৭'এর উৎক্ষেপণ সন্দেহাতীতভাবে সফল হয়েছে বুঝা গেল। মহাকাশচারিদের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পভাষী কুপারকেও বলতে শোনা গেল: "চমৎকার! ভারি চমৎকার!" ভূপৃষ্ঠের অন্যতম সংযোগরক্ষাকারি শিরাও উল্লাস প্রকাশ করে উপদেশ দিলেন: "সত্যিই ভারি চমৎকার ট্রাজেক্টরি। কাহিনীর এখন মাত্র তো তুমি মাঝপথে।" কুপারের গতিবেগের কার্যসূচি ছিল সেকেণ্ডে ২৫,৭১৫ ফিট— সে জায়গায় উড়ে চলেছেন ২৫,৭১৬ ফিট গতিতে; যানটি নির্দিষ্ট দিকের ·০০০২ ডিগ্রি ছাড়িয়ে রয়েছে।

এমন চমৎকার উড়ে যাচ্ছে যে প্রাথমিক উল্লাস প্রকাশের পরই কুপার একেবারে ঝিমিয়ে পড়েন। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে হাওয়াই দ্বীপ ও কালিফোর্নিয়ার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় কক্ষ পথে ওড়ার সময় কিছুক্ষণ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। চৌদ্দ ঘণ্টা মহাশূন্যে কাটাবার পর নবম কক্ষপথে তাঁর সূচীতে ঘুমানোর নির্দেশ ছিল। ভূপৃষ্ঠের সংযোগরক্ষাকারি জন গ্লেন বলে উঠেন: "অন্য সব সংযোগরক্ষাকারিকে আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে ওরা যেন ছেড়ে থাকে।" কুপার তাঁর ক্যাপসুলের জানলায় পর্দা টেনে দিয়ে মহাকাশযানটিকে [illegible] [illegible] বহির্আকাশে উড়ে চলতে দিলেন। এমনি যারা ওড়ায় [illegible] [illegible] [illegible] মহাকাশচারির [illegible] [illegible] [illegible] অনুভূতি থাকে না, [illegible] [illegible] [illegible] খেয়ে উঠতে গেলেও। তন্দ্রাচ্ছন্ন কুপার সহজেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

দুটি কক্ষপথ পরিক্রমার পর ভূপৃষ্ঠের চিকিৎসকেরা [illegible] [illegible] [illegible] তথ্য থেকে কুপারের হৃৎস্পন্দন [illegible] মধ্যে ৬০ থেকে ১০০তে পৌঁছেছে [illegible]

বুঝতে পারেন তিনি উত্তেজনাপূর্ণ কোন স্বপ্ন দেখছেন। কুপার প্রথমে সেটা অস্বীকার করেন, কিন্তু ফিরে আসার পর বলেন একটা স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তবে সেটা কী তাঁর মনে নেই। বিশেষভাবে তৈরি শিরস্ত্রাণের সঙ্গে যুক্ত হেডফোনের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাঁকে জাগিয়ে না তোলা পর্যন্ত তিনি সাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেন। এর আগে একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে জেগে উঠে কুপার দেখেন তাঁর ওজনবিহীন হাত দুটো প্রসারিত হয়ে রয়েছে। তারপর থেকেই তিনি, পাছে কোন নিয়ন্ত্রণ সুইচে হাত লেগে যায়, সেটা রোধ করতে কাঁধের স্ট্র্যাপের সঙ্গে হাত দুটো বেঁধে তবে ঘুমাতেন।

উড়ন্ত অবস্থায় কুপারের মানসিক ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা জানার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া আরো নানা বিষয়ে পরীক্ষায় তাঁকে কাজে লাগানো হয়। পূর্ববর্তী মহাকাশচারিরা দেহের তাপ গ্রহণ করতে গুহ্যদেশে থার্মোমিটার লাগিয়েছেন—কুপারের শিরস্ত্রাণে এমনভাবে

অবতরণের পর ফেইথ-৭ থেকে কুপার বেরিয়ে আসছেন

থার্মোমিটার লাগানো হয় যাতে চোখ ঢাকা দেবার ঢুডটি নামালেই থার্মোমিটার মুখে ঢুকে যায়। একটা সুইচ টিপে জামার হাতা হাওয়ায় ফুলিয়ে রক্তের চাপ দেখার ব্যবস্থা রাখা হয়। প্লাস্টিকের ছোট থলি টিপে ঝলসানো গোমাংস ও অন্যান্য জল-নিষ্কাশিত খাদ্য বের করে একটা নলের থেকে জল মিশিয়ে তিনি খেতেন। তবে খেতে বা জল পান করতে তাঁর কিছুটা কষ্টও হয়।

দীর্ঘকাল মহাশূন্যে অবস্থান করলে মূত্রে ক্যালসিয়াম বেশী মাত্রায় জমে ওঠে বলে রুশ চিকিৎসকরা অভিমত প্রকাশ করায় কুপারের ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা ব্যাপারটার প্রতি লক্ষ রাখার ব্যবস্থা করেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এবং হৃদস্পন্দন নিচে থেকে টেলিমিটারের সাহায্যে জানবার বিশেষ ব্যবস্থা সংযুক্ত রাখা হয়।

এছাড়া ভবিষ্যতের মহাকাশচারিদের কাজে লাগার উপযোগী বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্যান্য ধরণের পরীক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়। শুধু চোখে বাইরের দৃশ্য দেখা সম্পর্কে পরীক্ষা করতে কুপার ফ্ল্যাশলাইট বাল্বযুক্ত ১০ পাউন্ড ওজনের ৫½ ইঞ্চি মাপের দুটি গোলক নিক্ষেপ করেন। তারপর তৃতীয় কক্ষপথ পরিক্রমা-কালে আফ্রিকার কাছে অন্ধকারে গিয়ে গোলক আর দেখতে পান নি। তাদের দেখা গেল চতুর্থ কক্ষপথ পরিক্রমার হাওয়াইয়ের কাছে। দৃষ্টি পরিমাপক আর একটি পরীক্ষায় কুপার বেলুন ছাড়েন কিন্তু বিস্ফোরণ ব্যর্থ হওয়ায় সে পরীক্ষা সফল হতে পারে নি।

চন্দ্রাভিমুখী মহাশূন্য যান থেকে পৃথিবীতে অবস্থিত দিগনির্ণায়ক আলো দেখা যায় কি না সে পরীক্ষায় কুপার ব্রুমফন্টিনের ৩০ লক্ষ ক্যান্ডেল পাওয়ারের আলো দেখতে পান। আশ্চর্যের বিষয় উজ্জ্বলতর আলোটি দেখবার আগেই কিন্তু তিনি নিকটবর্তী এক গ্রামের আলো দেখতে পান। তাঁর মহাশূন্যযানের জানালা কতদূর আলোর প্রবেশ হ্রাস করতে পারে সে তথ্য জানতে কুপার ফটোমিটার কাজে লাগান। বর্ণচ্ছটার সদৃশ রশ্মিচক্রের এক রহস্যজনক আলোকস্তরের এবং দিগন্তের তিনি বহু ছবি তোলেন। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মহাকাশযান থেকে দিগনির্ণয়ে দিগন্তের আলোর রেখা সহায়ক হতে পারে। ক্যাপসুলটি পরিক্রমাকালে কি পরিমাণ পারমাণবিক রশ্মিবিচ্ছুরণের সংস্পর্শে আসে তা মেপে দেখার জন্য গেইজার কাউন্টার রাখা হয়। বৈজ্ঞানিকরা দেখেছেন যে সাধারণ বুকে এক্স-রে'র চেয়ে বেশী রশ্মি বিচ্ছুরণ কুপারের দেহে ঘটেনি।

অন্যান্য পরীক্ষায় কুপার হাই-ফ্রিকোয়েন্সী সংযোজন ক্ষমতা মেপে দেখতে একটি ২৮ ফিট এরিয়েল খাটিয়ে দেন।

আটলান্টিকের ওপর দিয়ে যেতে জানা গেল তিনটির একটি ইনভার্টার অচল হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ক্যাপসুলটি নামিয়ে আনতে কুপার কোন স্বয়ংক্রিয় (অটোপাইলট) যন্ত্রের সহায়তা লাভ করতে পারবেন না। পৃথিবীময় একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা ছেয়ে যায়। একশ' সত্তরটি রাষ্ট্র তাদের দেশে কুপারের আকস্মিক অবতরণের পর তার নিরাপত্তার জন্য সচেতন হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় জন গ্লেন নিচ থেকে কুপারকে নির্দেশ দিতে থাকেন। কুপার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ডান হাতে ক্যাপসুল চালনার যন্ত্র ধরেন এবং বাম হাতে নিচে নিক্ষেপের রকেট ছাড়ার বোতাম টেপেন। বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য রকেট প্রক্ষিপ্ত হয়েছে কিনা, আলোক বিচ্ছুরিত না হওয়ায় সেটা তিনি দেখতে না পেলেও অনুভব করতে সক্ষম হন। কোস্টাল সেন্ট্রিতে টেলিমিটার সঙ্কেতে সেটা ধরা পড়ে এবং রকেট যে ছাড়া হয়েছে, জন গ্লেন কুপারকে তা জানিয়ে দেন।

পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে ক্যাপসুলটি ঝাঁপিয়ে পড়তেই পারমাণবিক কণিকার একটা পর্দা পড়ে সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পারমাণবিক কণিকা স্তরে পড়ে কুপার ক্যাপসুলকে আস্তে গড়িয়ে দিতে ছোট ছোট বিস্ফোরক ছোড়েন। স্তর থেকে বেরিয়ে তিনি ৪০,০০০ ফিট ঊর্ধ্বে হাতে করে 'ড্রোগ' প্যারাসুটটি ছেড়ে দেন। মুখ্য প্যারাসুটটি উন্মোচিত হয় ১০,০০০ ফিট ঊর্ধ্বাকাশে এবং কুপার একেবারে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে, কিয়ারসার্জের ঠিক উপরেই অবতরণ করেন। ক্যাপসুল ইঞ্জিনীয়ার যাঁরা অনবরত অনুযোগ করেন যে, মহাকাশচারিরা চুপচাপ বসে থেকে স্বয়ংক্রিয় পাইলটকে (অটো-পাইলট) কাজ করে যেতে দিলে তাঁরা অনেক ভালভাবে উড়তে পারেন, তাঁদের স্বীকার করতে হলো যে কুপার তাঁদের ভুল প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন।

কুপারের এই ৩৪ ঘণ্টা ২০ মিনিটব্যাপি কক্ষপথ পরিক্রমায় রেকর্ড অতিক্রম করেছেন গত বছর অগাস্ট মাসে রুশ মহাকাশচারি আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ (৯৪ ঘণ্টা) এবং পাভেল পোপোভিচ (৪৮ ঘণ্টা)। কিন্তু মহাকাশযান নিজের হাতে চালিয়ে নিরাপদে নির্ধারিত স্থানে অবতরণে গর্ডন কুপার এক নতুন রেকর্ড করলেন। জলনিষ্কাশিত খাদ্য ছাড়া সমস্ত পরিক্রমায় তিনি পান করেন চার গ্লাস আনারসের রস আর দু গ্লাস দুধ। কুপারের এই পরিক্রমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ চব্বিশ ॥

মহাবেগে লাফ দিতে গিয়ে চীন শুধু যে তার কৃষিকর্মেরই বারোটা বাজিয়েছে তাই নয়, শিল্প উৎপাদনকেও গভীর গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে। শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে তার ধকল সামলাতে চীনের অন্তত দশ বছর সময় লাগবে, চীনের অর্থনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এই মত পোষণ করেন। তার পঞ্চবার্ষিক যোজনার কাজও যথেষ্ট পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

আমেরিকার চীনা-অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ মিঃ এডউইন জোন্স সম্প্রতি এক প্রবন্ধে চীনা অর্থনীতির নানা অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে শেষ পর্যন্ত এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে বর্তমান সংকট থেকে মুক্ত হয়ে চীনের শিল্পোন্নয়ন আবার পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হতে অন্ততঃ দশ বছর সময় নেবে। তিনি লিখেছেন ১৯৮২ ৯২ সালের মধ্যে চীন শিল্পোৎপাদনে বৃটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যের উন্নত দেশগুলোর নাগাল ধরে ফেলবে বলে যে আশা চীনের রাষ্ট্রনায়কেরা পোষণ করতেন, এখন তাও দশ বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

The regime appears first of all to regard the third Five-Year Plan (1963-67) as a hiatus in which the agricultural base of the economy must be shored up against the pressures of population growth. It now concedes that this diversion of resources into agriculture and the loss of Soviet aid will delay the attainment of a self-sufficient industrial base and an independent technological capacity, originally scheduled for 1967, until 1972—(Edwin Jones, Peking's Economy: Upwards or Downwards?)

মঁসিয়ে রোবের গিলে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর "লে মঁদ" দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে চীনের শিল্পোৎপাদনের উপর "মহাবেগে লাফ মারার" শোচনীয় প্রতিক্রিয়ার বিশদ চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "গত ১৮ মাসে সমগ্র চীনে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আরও বহু কারখানা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী [illegible] অঞ্চলে সম্প্রতি কয়েক বছর যে-সব নতুন নতুন কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল, [illegible] দুর্দশাই চরমে উঠেছে। [illegible] যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নত নয় যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিকেরও অভাব। মাঞ্চুরিয়ার আনসান এবং মধ্য চীনের য়ুহান প্রভৃতি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। রুশ কারিগরদের সহায়তায় লোয়াঙ-এ ট্রাক্টর অথবা চ্যাঙচুন-এ মোটর তৈরির জন্য যে-সব পাইলট কারখানা গড়ে উঠেছিল এমন কি সেখানেও কাজকর্মে নানা গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে।"

সাংহাই-এর মত শহরেও, যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক এবং দক্ষ-তত্ত্বাবধায়কদের অভাব নেই, ব্যর্থতার রেকর্ড শোচনীয়। ১৯৬১ সালের শরৎ-হেমন্তে কলকারখানার স্বাভাবিক অবস্থার এক তৃতীয়াংশ কাজ মাত্র হয়েছিল। টায়ার প্রস্তুত কারখানা এবং সুতাকল থেকে বহু শ্রমিককে গ্রামে চালান করে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় শহরে বহু লোককে কাজ দিতে পারা যায় নি। এই সংকট থেকে ভারী শিল্পও ত্রাণ পায় নি। ক্যান্টন এবং দক্ষিণ চীনের অনেক কারখানায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

১৯৬১ সালে আনসান, পাওটৌও এবং য়ুহানের ইস্পাত কারখানার কোন কোন অংশ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। মেশিন-টুল কারখানাগুলোর উৎপাদন কমিয়ে দিতে হয়েছিল এবং ভারী শিল্প থেকে অনেক শ্রমিক ও কর্মীকে লঘু শিল্পে চালান করতে হয়েছিল। মঁসিয়ে গিলে বলেছেন, "মহাবেগে লাফ দেওয়ার" ইস্পাত, কয়লা ও অন্যান্য দু একটা শিল্পে কোন কোন জায়গায় উৎপাদন আশাতীত বেড়েছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই "লম্ফ" বিপর্যয়ই ডেকে এনেছে।

Steel production was claimed to have tripled to reach 18 million tons in 1960, with one-third of the total produced by Bessemers in small and medium plants, and coal production also trippled to 425 million tons in 1960, which about three-fifths of the total coming from newly-opened small and medium mines.—(Edwin Jones)

উৎপাদন, অন্তত ইস্পাত এবং কয়লা শিল্পে, এত বৃদ্ধি পেলেও এ রকম শোচনীয় সংকট ও দুটো শিল্পেই বা দেখা দিল কেন? এ প্রশ্নটা স্বভাবতই মনে আসতে পারে। মঁসিয়ে গিলের রিপোর্ট থেকেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গিয়েছে। গিলে এক কথায় বলেছেন:

Poor quality is another deplorable consequence of the Great Leap Forward.

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত চীনের এক সরকারী রিপোর্টে মঁসিয়ে গিলের এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেল। ঐ রিপোর্টটিতে বলা হয়েছিল: আধুনিক খনিগুলো থেকে যে কয়লা তোলা হচ্ছে তার

শতকরা মাত্র ৩৫ ভাগের মানই উঁচু, বাকিটা রদ্দিমাল। প্রধানত এই সব খারাপ মাল আসছে উপযুক্ত সাজসরঞ্জামবিহীন "গ্রাম্য" খনি থেকে। কোক-কয়লা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। ১৯৫৮-৬০ সালে যে পরিমাণ কোক-কয়লা উৎপন্ন হয়েছে তার সিকি ভাগ মাত্রই কাজে লাগানো গিয়েছে। ১৯৫৯ সালে "গ্রামের উনুনে" থেকে মোট পিন্ড লোহার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি পিন্ড উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মান না থাকায় স-সব মাল কাজে বিশেষ লাগে নি। ১৯৬১ সালের গোড়ায় চুঙ-কিঙ-এর এক ব্লাস্ট ফার্নেস যত পিন্ড লোহা উৎপন্ন করেছিল, তার অর্ধেকই ফেলে দিতে হয়েছিল। আনসান এ ইস্পাতের নল প্রস্তুত করার পর, তার মান দেখে সেগুলো আর কর্তৃপক্ষ বাজারে ছাড়তে ভরসা পেলেন না, আবার গলিয়ে ওগুলোকে ইস্পাতের ইংগটে রূপান্তরিত করা হল। হোনানের লোইয়াঙ ট্রাক্টর কারখানা আনসানের ইস্পাত কারখানায় প্রস্তুত বহু পার্টস ফেরত পাঠিয়ে দেয়। হয় ওগুলো নির্দিষ্ট মাপে মেলে নি, আর না হয় ওগুলোর মান নিকৃষ্ট—এই ছিল অভিযোগ।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে মানুষ এবং মেশিনের উপর বিরামহীন যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে মানুষের দফাই শুধু গয়া হয় নি, মেশিনপত্তরের পরকালও ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। গিলে লিখেছেন ঃ

On the one hand, the Great Leap Forward had strained the over-worked equipment and, on the other hand, had grossly neglected maintenance and repair.

যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য ১৯৬১ সালে লোইয়াঙের ট্রাক্টর কারখানাটিই বন্ধ রাখতে হয়েছিল। চুঙ-কিঙ-এর একটি ইস্পাত কারখানার পাইপ ব্যবস্থা এবং বয়লারে ১৪০টি ছেঁদা বেরিয়ে পড়েছিল। চীনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সংবাদগুলো পরে ছাপাও হয়েছিল।

খনি শিল্পের অবস্থাও খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। ১৯৬১ সালে, পিপলস্ জার্নালে" প্রকাশিত খবরে বলা হয়, শানটুং প্রদেশের ভাল ভাল খনিগুলোর অর্ধেকেরই বর্ষার আগে প্রয়োজনমত পাম্প সংগ্রহ করার সঙ্গতি ছিল না। পিকিং-এর 'লেবার ডেইলি" এই সময়েই একটি মারাত্মক খবর দেয়।

"at a period of deterioration in material conditions and in a period of moral oppression" the Peking Labour Daily reported that huge explosion took place in the principal mine of Fushum in Manchuria and halted production for five months — (Robert Guillain)

বিভিন্ন দলিলে এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে চীনে কয়লা কোক বিদ্যুৎশক্তি, তেল এবং কাঁচা মালের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় যন্ত্র-পাতি স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের ব্যাপারেও যথেষ্ট গাফিলতি ঘটেছে। একটা সংবাদে দেখা যাচ্ছে খনিশিল্পেও বেশ বড়রকমের সংকট ঘনিয়ে এসেছে। অনেক খনি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অনেক খনিতে আংশিকভাবে উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। আকর-লোহার ঘাটতি থাকায় মেটালার্জির কাজ ভালভাবে চলছে না।

ভোগ্যপণ্যের কথা না তোলাই ভাল। কম্যুনিস্ট অর্থনীতিতে ভোগ্যপণ্যের স্থান সবার নীচে সবার পিছে। চীনে শুধু যে খাদ্যাভাবই ঘটেছে তাই নয় নিত্য ব্যবহার্য আরও নানা সামগ্রী—সাবান থেকে ওষুধ, গৃহস্থালীর তৈজসপত্র, কাপড়, পটারি দ্রব্য, জুতো, কাগজ, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। বড় বড় শহরের দোকানের শো-কেসে এইসব জিনিস দেখতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সে জিনিস কেনার ক্ষমতা বহু লোকেরই নেই। কারণ চীনদেশে র‍্যাশন কুপনের বিনিময়ে এইসব জিনিস কিনতে হয়। যেখানে পেট ভরাবার মত খাদ্যই জোটানো ভার, সেখানে লোকের পক্ষে খাদ্য কুপনের বদলে অন্য জিনিস কেনা সম্ভবই হয় না। তাই নয়াচীনে শুধু খাদ্যের ব্যাপারেই নয়, সব কিছুর জন্যই র‍্যাশন প্রথা চালু করতে হয়েছে।

সাংহাইতে ১৯৬১ সালের শেষে দেখা গেল, নাগরিকেরা সারা বছরে মাথাপিছু পেয়েছে এক গজ করে কাপড় এবং এক জোড়া করে স্যান্ডাল। মঁসিয়ে গিলে জানাচ্ছেন ঃ

The shortage of consumer's goods adds to the effects of a reckless and haphazard financial policy, which had banked on the success of the Great Leap Forward. For the first time under the new regime, China is facing inflation, which means a considerable devaluation of its currency abroad

শুধু 'মহাবেগে লাফ মারা' নয় আরও একটি কারণে নয়াচীনে আজ অর্থনৈতিক সংকট এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই কারণটি হচ্ছে এই সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইওরোপের অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলো কর্তৃক একযোগে চীনকে সাহায্য দান বন্ধ

করে দেওয়া। মূলত সোভিয়েট সাহায্যের উপর নির্ভর করেই নয়াচীনে শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছিল। এখন রুশীদাদা "চীনী ভাই"-এর বেয়াড়াপনায় বিরক্ত হয়ে "মাসোহারা" বন্ধ করে দেওয়ায় চীনী ভ্রাদার এখন অথৈ জলে আকুপাকু করছে।

নয়াচীনে সোভিয়েট রুশিয়ার সাম্প্রতিক রপ্তানির যে হিসাব মস্কোর সূত্রে পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, চীনে কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে রুশিয়া আর কখনও এত কম মাল সেখানে রপ্তানি করেনি। ১৯৬০ সালে রুশিয়া যত মাল রপ্তানি করেছিল, ১৯৬১-৬২ সালে করেছে তার চাইতে শতকরা ৪৫ ভাগ কম এবং ১৯৫৯ সালের তুলনায় শতকরা ৫৫ ভাগ কম।

সোভিয়েট রুশিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুসারে রুশিয়া ১৯৫৯-৬০ সালে চীনে "পুরো কারখানা" খাতে ৩৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি খাতে ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার এবং বিবিধ খাতে (পেট্রোল, ধাতু, সামরিক সরঞ্জাম প্রভৃতি) ৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছিল।

রুশিয়া হঠাৎ হাত গুটিয়ে নেওয়ায় কলকারখানা তৈরির কাজ কোথাও মাত্র আরম্ভ হয়ে কোথাও বা অর্ধ সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে। রুশী এবং চেকোস্লোভাক কারিগরদের ফেরত নিয়ে যাওয়ায় এমন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যে, চীন পাইলট প্রোজেক্টগুলোর কাজও চালাতে পারছে না।

হলুদ নদীতে বাঁধ দিয়ে বিরাট এক জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনার কথাটাই ধরা যাক। এই নদীর সানমেন গিরিখাতের উপর বাঁধ তৈরি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, আটটা টারবাইন বসাবার কথা ছিল কিন্তু সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগররা একটা টারবাইন বসিয়েই উপরঅলার হুকুমে তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বদেশ কেটে পড়েছে। সোভিয়েট রুশিয়া আজ পর্যন্ত বাকি সাতটা টারবাইন চীনকে ডেলিভারি দেয়নি। চীন অভিযোগ করেছে যে, সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ারেরা যাবার সময় এই প্রকল্পের নকশাটিও গাপ্পা মেরে দিয়েছে। কম্যুনিস্টদের কারবারই আলাদা!

রুশিয়া এবং তার তাঁবেদার কম্যুনিস্ট দেশগুলো চীন থেকে মাল কেনা কমিয়ে দেওয়ায় চীনের বাণিজ্যিক আমদানীও বিলক্ষণ বিপাকে পড়েছে। ১৯৬১ সালের আগে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশ চীনের মোট রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৬৫ ভাগই কিনে নিত, এখন তারা অর্ধেকেরও কম কিনছে।

এইসব কারণে চীন এখন ঠিক করেছে যে, "কোনও স্যাঙাতের উপরই সে আর নির্ভর করবে না।" তার জাতীয় অর্থনীতিকে সে নিজের পায়ে দাঁড় করাবে। তাই চীন বর্তমানে তার অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাবে বলে স্থির করেছে এবং আওয়াজ তুলেছে, "কৃষিকর্মকে অগ্রাধিকার দাও।"

এতদিন পর্যন্ত চীনের লক্ষ্য ছিল, যেন তেন প্রকারেণ দেশে শিল্পের প্রসার করে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি কর এবং এইভাবে মার্কসীয় ধ্রুপদী পদ্ধতিতে দ্রুত সর্বহারা শ্রমিকের ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠা করে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সমাধা করে ফেল। তাই চীনের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল ভারী শিল্পকে। দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছিল লঘু শিল্পকে। তৃতীয় স্থানে ছিল কৃষি।

বাস্তবের রূঢ়তম আঘাতে চীনের কম্যুনিস্ট নায়কদের নতুন চৈতন্যের উদয় হল। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে সেন্ট্রাল কমিটি পিকিং-এ আবার নতুন করে "মহান" সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। পার্টির ইস্তাহারে বলা হল, "অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যাপক কর্মভার গ্রহণের জন্য চীনকে প্রস্তুত হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পরের বছরে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লিতে ঘোষণা করলেন, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অগ্রাধিকার পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে কৃষিকে "অর্থনীতির বুনিয়াদ" হিসাবে গ্রহণ করে পরিবর্তিত কর্মসূচীতে তার স্থান সবার উপরে রাখা হল, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল লঘু শিল্প এবং ভারী শিল্প নেমে গেল সবার নিচে। চৈনিক পরিকল্পনা এবং তুঘলকী খামখেয়ালী প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়াল।

মোটামুটি নয়াচীনের অর্থনৈতিক দুর্গতির একটা পরিচয় তুলে ধরা হল, এখন প্রশ্ন, এই ধাক্কা সামলাতে চীনের কতদিন লাগবে? শিল্পোন্নয়ন পিছিয়ে যাওয়ার গুরুতর প্রতিক্রিয়া সেখানে এখনই দেখা দিয়েছে। ১৯৫৮ সালে কৃষি শ্রমিকের একটা বিরাট অংশকে শিল্প কারখানায় টেনে

আনা হয়েছিল। তিন বছরের মধ্যেই উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। সরকারী নির্দেশে এখন প্রচুর সংখ্যায় শিল্পশ্রমিককে ক্ষেতে-খামারে পাঠান হচ্ছে। ১৯৬২তে দু কোটি লোককে শহর থেকে গ্রামে পাঠান হয়েছে। এক সাংহাই থেকেই গিয়েছে কুড়ি লক্ষ। কমিউনের শক্ত বাঁধন শিথিল করে চাষীদের উৎসাহ বৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। ১৯৬০ সাল পর্যন্তও "বৃহৎ উৎপাদক বাহিনীর" উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬১ সাল থেকে "ছোট ছোট উৎপাদক বাহিনী" সৃষ্টির আওয়াজ তোলা হয়েছে। "গ্রামের কারখানা" গড়ে তুলতে গিয়ে আবহমান কালের কুটির-শিল্পগুলিকে প্রায় খতম করে ফেলা হয়েছিল। এখন আবার সেগুলো পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে, এমন কি কৃষকেরা বেচা-কেনা করতে পারে এমন বাজারও খোলা হয়েছে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও ঘটানো হয়েছে—সীমিত ক্ষেত্রে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে প্রতি-চাষীর জন্য মাথাপিছু উৎপাদনের জন্যে একটা সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে চাষীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে—কেউ যদি নির্ধারিত সীমার উপরে উৎপাদন বাড়াতে পারে, তবে সেই বাড়তি ফসল সেই পাবে।

১৯৬২ সালে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য সর্বস্তরে অমানুষিক এক চেষ্টা শুরু হয়েছিল। এই বছর জানুয়ারী মাসে "পিপলস জার্নাল" পত্রিকায় চীনের রাষ্ট্র-নায়কদের এক জরুরী আবেদন প্রচারিত হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এই বছরের উৎপাদনের উপর সমগ্র দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এসব সত্ত্বেও ফলন আশানুরূপ হয়নি। উৎপাদন কত হয়েছিল, চীনা সরকার তার হিসাব প্রকাশ করেননি, তবে প্রত্যাশিত সাফল্য যে হয়নি, খাদ্য সংকটের তীব্রতা যে কমেনি, তা এই বছরের 'রেড ফ্ল্যাগ' পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় কাঁদুনি থেকেই বোঝা যায়।

শহর থেকে গ্রামে জোর করে লোক পাঠানোর নির্দেশে চীনে ব্যাপকভাবে ত্রাস এবং ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল—হংকংএ দলে দলে লোক পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ স্কুল ও কলেজের ছাত্রকে ক্ষেতে ও খামারে চাষের কাজে ঠেলে দেওয়ায় নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সৈন্য, পার্টি এবং পুলিসের চাপে এইসব বিদ্রোহ দৃঢ়ভাবে দমন করে দেওয়া হয়। তবু এই অসন্তোষের ধোঁয়া এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

জনসংখ্যার অসম্ভব বৃদ্ধি রাষ্ট্রনায়কদের একটা প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। পরিবার পরিকল্পনার জন্য নানা প্রচার ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। শহরে এই প্রচার অভিযানে কিছুটা ফল দেখা দিলেও গ্রামাঞ্চলে তা ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৬১ সালে মাও সে তুং ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারির কাছে স্বীকারই করেন যে, ১৯৫৬-৫৮ সালে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

চীনের শিল্পোৎপাদনের মন্থর গতি তার অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি ভারী শিল্পের উৎপাদন একেবারেই আধাআধি কমে যায়। ১৯৬১-৬২ সালে চীনা সরকার লঘু-শিল্পের পুনর্গঠন করে ভোগ্যপণ্য এবং রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু এই চেষ্টাতেও প্রার্থিত ফল পাওয়া যায়নি। শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মাল আমদানীর খাতে চীনের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আগামী তিন বছরে সোভিয়েট রুশিয়ার পাওনা দাঁড়াবে পঞ্চাশ কোটি ডলার, বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী বাবদ (যদি ধরে নেওয়া যায় ১৯৬২-৬৩ সালে চীন আর খাদ্য আমদানী করবে না) চীনের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে কুড়ি কোটি ডলার। চীন যদি বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পায়, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শিল্পের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সে দেখাতে পারবে। না হলে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তাকে একেবারে থেমে থাকতে হবে।

খাদ্য সঙ্কট মোচনের জন্য চীনকে ধনতান্ত্রিক কয়েকটি রাষ্ট্রের দুয়ারে ধর্না দিতে হয়েছে। শিল্প সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যও তার পক্ষে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির দ্বারস্থ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয় বলেই কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করেন। রুশিয়ার সাহায্যে চীনের শিল্পোন্নয়নের আশা দুর-পরাহত বলে চীনও মনে করছে। মস্কো-পিকিং-এর মধ্যে মতান্তর ঘটায় রুশিয়া চীনের প্রতি বিমুখ হয়েছে এবং সেই কারণেই সাহায্য দিচ্ছে না—একথা পুরো সত্য নয়। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিদেশে সাহায্য দেওয়ার ক্ষমতা রুশিয়ার কমে আসছে। আমেরিকার সঙ্গে মহাকাশ বিজয়ের পাল্লা দিতে গিয়ে রুশিয়ার অর্থ-নীতি আজ তার ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। কাজেই চীনকে রুশিয়ার মদতের আশা ছাড়তেই হবে। তাহলে কার উপর নির্ভর করবে চীন? বহু নিন্দিত 'সাম্রাজ্যবাদী' দেশগুলোর উপর?

প্রবীণ নেতাদের খামখেয়ালীর ফলে দেশে বিপর্যয় ঘটায় চীনের নবীনতর নেতৃবৃন্দ তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পার্টিতে প্রবীণ সদস্যের ('লং মার্চে' যারা যোগ দিয়েছিলেন) সংখ্যা, পার্টির মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র। শতকরা আশি ভাগ সদস্যই চীনের মুক্তির পর পার্টিতে যোগ দিয়েছে। শতকরা সত্তর ভাগই পার্টিতে এসেছে গত আট বছরে। পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে নবীন নেতাদের অসন্তোষ চীনের ইতিহাসে কি কিছু পরিবর্তন আনবে? (ক্রমশ)

আলোচনা

শিল্পীর স্বাধীনতা

মহাশয়,

আপনার "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত "শিল্পীর স্বাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি নিয়মিত পড়ে আসছি। আলোচনা বিভাগে এই প্রবন্ধগুলির উপর যে আলোচনা হয় তাও পড়ে থাকি। এই সূত্রে আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু তাঁর রচনায় চীনের মানুষের, বিশেষ করে গ্রামের মানুষের কমিউনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা ভয়াবহ হলেও আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষেরই আরেকজন শিল্পীর একটি রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

"জনবাদী চীন মেং গেঁহু, চাবল ঔর কপাস আদি কে উৎপাদন মেং বৃদ্ধি করনে কে লিয়ে নয়ে নয়ে প্রয়োগ কিয়ে জা রহে হ্যায়। দেশ কে উৎপাদন কো বঢ়ানে কে লিয়ে ইহা সব প্রকারকে বৈজ্ঞানিক প্রথয় কিয়ে জা রহে হ্যায়। ইহী কারণ হ্যায় কি আজ চীন মেং কোই ভুখো নহী মরতা। চিনী লোগ বড়ে সীধে সাধে ঔর পরিশ্রমী হোতে হ্যাঁয়। শিষ্টাচার কা এ বহুত ধ্যান রখতে হ্যায়। জব সে চীন মেং জনবাদী রাজ্য স্থাপিত হুয়া, চিনী জনতা নে দিন দুনী রাত চৌগুণী উন্নতি কী হ্যায়। বহা কী স্ত্রিয়োনে অপনে সৌন্দর্য্য মেং বৃদ্ধি করনে কে লিয়ে অপনে প্যারোঁ কো কাঠ মেং বাঁধ কর ছোটা করনা ছোড় দিয়া হ্যায় ঔর এ আর্থিক ঔর সামাজিক ক্ষেত্রো মেং কার্য্য করনে লগী হ্যায়। চীন মেং শিক্ষা কী বড়ী উন্নতি হো রহী হ্যায়।

অর্থাৎ, "জনবাদী চীনে গম চাউল এবং কার্পাস ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নতুন নতুন পরীক্ষা চলিতেছে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এখানে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী কাজে লাগান হইতেছে। এই কারণের জন্যই চীনে আজ ক্ষুধায় কেহ মরে না। চীনের লোক বড় সাদা সিধা এবং পরিশ্রমী। শিষ্টাচারের প্রতি এদের খুব লক্ষ্য থাকে। চীনে জনবাদী রাজ্য স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চীনের জনতার চরম উন্নতি হইয়াছে। চীনের স্ত্রীলোক আজ আর নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাঠে পা বাঁধিয়া পা ছোট করে না। সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রেও মেয়েরা কাজ করিতেছে। চীনে শিক্ষার বড় উন্নতি হইতেছে।"

এই উদ্ধৃতি পাঠ করে চীন সম্পর্কে কি ধারণা হবে আমাদের? যে রচনা থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেই রচনা এখনও আমরা পাঠ করি। (সরকারী কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত ১৯৬০ সালের প্রবীণ পরীক্ষার সরল হিন্দী পাঠমালা ২য় ভাগের ৩০ পৃষ্ঠায় "ভারতকা পড়োসী চীন" নামক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)

এ ধরনের পাঠ বন্ধ করে সত্য তথ্যপূর্ণ পাঠ নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় কি?

নমস্কারান্তে।

ইতি—

অজিতেন্দ্র সিংহ, নতুন দিল্লি-৩

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

আলোচ্য বছরের ৩রা জ্যৈষ্ঠের দেশ পত্রিকায় বিখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর "শিল্পীর স্বাধীনতা' লেখাটা পড়ে বিস্মিত হয়েছি। আজ থেকে এগারো বছর আগে মনোজ বসু চীন পরিভ্রমণ করে "চীন দেখে এলাম" বলে একখানা বই বের করেন। উক্ত বইয়ে মনোজ বসু চীন দেশের

মানুষের জীবনযাত্রা, আচার আচরণ, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আর এখন বলছেন—"সেদিনের আচরণ ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়, ভারত-চীন মৈত্রী নিতান্তই অভিনয়ের ব্যাপার।" আমার সাবনয় প্রশ্ন এই যে, বিদগ্ধ সাহিত্যিক হয়েও মনোজ বসু এই "ধোকা-বাজি" বা অভিনয় ধরতে পারেননি কেন? তার কলম তো স্বাধীন ছিল। তখন কেন তাঁর কলম কাঠি হয়ে কমিউনিস্ট চীনের ঢাক পিটিয়েছিল। যার জন্য ওই বই বহু প্রচারিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছে। লেখক বর্তমান জাতীয় সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে স্বকৃত দোষ স্খালনার্থে বলেছেন—"জঙ্গী চীনের প্রতি ঘৃণায় এবং মনঃক্ষোভে নিজে থেকেই বইয়ের প্রচার বন্ধ করেছি। বিষয়বস্তুর জন্য না সাহিত্য গুণেই বই পুরস্কৃত হয়েছিল। লেখকের উক্তিতে একথা স্পষ্ট—বইয়ের বিষয়বস্তু প্রধান নয়। তাহলে কি ধরে নেব ও বইয়ে অনেক বিষয়বস্তু সঠিক নয় বা হয়তো নেহাতই কল্পনাপ্রসূত! যেখানে একটা দেশের সঙ্গে আর এক দেশের সম্পর্ক অনেকখানি নির্ভরশীল এ ধরনের বইয়ের উপর, সেখানে বিষয়বস্তু প্রধান না হয়ে, সাহিত্যগুণ প্রধান! বিশেষত একথা রূঢ় হলেও সত্য যে, আলোচ্য সাহিত্যিকের সত্যদৃষ্টি এবং তীব্র অনুভূতি নেই যা দিয়ে একটা দেশকে পূর্ণভাবে দেখতে পারেন।

বিনীত

দিলীপ চক্রবর্তী,

চারঘাট

২৪-পরগনা

॥ ৩ ॥

সবিনয় নিবেদন,

মনোজ বসুর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পড়ে বেশ লাগল। এর একটা মরাল আছে; তা এই—দু চার দিন বা দু'চার মাস কোন দেশে থেকে সে দেশ সম্বন্ধে বই লেখা মারাত্মক ভুল।

বস্তুতঃ কোন দেশ সম্বন্ধে বই লিখতে হলে সে দেশে অন্তত পক্ষে দু' বছর, পাঁচ সাত বছর হলে আরও ভাল—থাকা দরকার। আর এই থাকা হোটেলে অথবা নিজেদের গ্রুপের মধ্যে হলে হবে না; থাকতে হবে সেই দেশের দু-তিনটে পরিবারের সঙ্গে ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশতে হবে। তবেই সে দেশ সম্বন্ধে বই লেখা যেতে পারে। লেখকরা ভবিষ্যতে এ কথাটা যেন মনে রাখেন। ইতি—

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

✻ সাহিত্য সংবাদ ✻

বিদুর

কবি নজরুল

১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুল ইসলামের চৌষট্টিতম জন্মদিন। তাঁর জন্মদিনের গাথা শোকে অথবা সুখে কিসে রচনা করব ভেবে পাই নে। মনে হয়, যে-মানুষটি জীবিত অথচ জীবনের শারীরিক লক্ষণগুলি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই, মানসিক দিকটি একটি অদ্ভুত অন্ধকারে ঢেকে আছে, তাঁর কাছে সবই নিরর্থক। নিরর্থক এই শ্রদ্ধা নিবেদন সম্মান প্রদর্শন। হয়ত আমার পক্ষে নীরব থাকলেই ভাল হত। কিন্তু মনে হল, জন্মদিনের প্রীতি শ্রদ্ধা নিবেদন সব সময় কবির ও তাঁর কাব্যের স্মরণে হতে পারে, সাথীকে যদি না পাই তবুও। নজরুলই লিখেছিলেন—

"[illegible] বাঁদ হও নিবে। বলো
রাজা হলে বাঁদ হবে—"

সত্যিকারের কবি নজরুল আমাদের হৃদয় লোকেই বাস করছিলেন। তাঁর জন্য আর আসন প্রয়োজন হয়নি। বাংলা দেশের সেই প্রাণচঞ্চল যুগ—[illegible] [illegible] যৌবন [illegible] ও [illegible] [illegible]—সে যুগ আপন [illegible] জীবনে [illegible] ও চঞ্চল হয়ে [illegible]ছিল, যে কালে যৌবন যৌবনেই [illegible] গুণাগুণ নিয়ে উপস্থিত ছিল—নজরুল সেই যুগের কবি। শুধু বিদ্রোহী কবি বললে তাঁকে ছোট করা হয়, বলা উচিত প্রাণ পাগল কবি—নিজের জীবনের অফুরন্ত শক্তিতে যিনি সর্বত্র চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন—আনন্দে হর্ষে বিদ্রোহে বিরহে।

নজরুলের মতন এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান মানুষ নাকি তাঁর তদকালীন বন্ধুরা কেউ দেখেননি। ও মানুষ যখন যেখানে আসত, যেন ঝড় আসত, সেই ঝড়ে কত কি যে এসে জমত—হাসি ঠাট্টা গান মজলিস স্বদেশ-কথা তা তাঁর বন্ধুদেরও জানা থাকত না। কিন্তু এমন নাকি কখনও হয়নি, নজরুলকে কারও খারাপ লেগেছে, কেউ বিরক্ত হয়েছে।

জীবনের এই উত্তাপ ও অস্থিরতা, স্বভাবের এই মাধুর্য ও মমতা, হৃদয়ের এই আবেগই নজরুলের কাব্য রচনার মূল উৎস। কাব্যের বহিরঙ্গ, প্রাণের কাতরতা অপেক্ষা কথার স্পর্শকাতরতা নিয়ে কবি কি কখনও বসে ভাবতেন? প্রয়োজন হয়নি তাঁর, প্রয়োজন হয়নি অত খুঁতখুঁতুনির, কৃত্রিম পালিশের। বুকে যা এসেছে কণ্ঠ দিয়ে গেয়েছেন, মনে যা এসেছে মুখে চিত্তে যেন লিখেছেন—

"কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা!
কে যেন চাহিছে মোরে, কে যেন কী নাই
যারে পাই তারে যেন আরও পেতে চাই।"

নজরুলের কাব্য-বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু তাঁর অন্যতম গুণমুগ্ধ পাঠক। একদা অনেক কবিতাই মুখস্থ করেছি। আজও কখনও কখনও তার অংশ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় সেই গানগুলি—'দুর্গমগিরি কান্তার মরু—', 'কে এল মোর ঘুম ঘোরে নম নম—' ইত্যাদি। যদিও আমরা প্রায়শ এমন কথা শুনি যে নজরুল ছিলেন বীররসের কবি, অসংযত আবেগের স্বভাবশিল্পী, কিন্তু তা সংগত নয়। কেননা, কবি নজরুলের কাব্যে বীররস এবং অসংবৃত আবেগ ছাড়াও অন্য অনেক উপাদানও আছে। স্নিগ্ধ প্রেম, আত্মগত দুঃখ, শান্ত শোক, উদাসীনের মত নম্রতা ও প্রেমিকের অভিমানও তাঁর কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। জীবনের যে-পর্ব অতিক্রম করে এলে এই কবির কণ্ঠ থেকে আমরা স্থিতধীর সঙ্গীত শুনতে পেতাম, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে

'রাজা হলে বাঁদ হবেরে'

কবি সেই পর্বেই নীরব হয়ে গেলেন। হয়ত অত মুখরতার পর এই নীরবতাই আরও বেশী [illegible] অনন্য নিভৃত এই কথাই বলেছিল যে, নীরব হয়ে থাকেন বলেই অত সরব তিনি হয়েছিলেন পূর্বে।

"হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভাল না বাসিতে হৃদয় শুকায়—
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয়—"

লোক-সংস্কৃতি ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

বিনয়—সবিনয় নিবেদন,

গত ১২ই ও ১৩ই মে [illegible] এক গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এখানে 'মুর্শিদাবাদ জেলা সাহিত্য ও বাউল' সম্মেলনরূপে দু'দিনব্যাপী এক অভিনব অনুষ্ঠান হয়ে গেল। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটা সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ সমাবেশ হলো দু-দিন। জেলায় অভূতপূর্ব ঘটনা হলো, বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় পঁচিশ জন জাত 'বাউল'কে সমবেত করা হয়েছিল। বাংলার লোক-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, বাঙালীর প্রাণ—'বাউল গান' এ দু-দিন দূরবাংলার এক ছোট শহরের পরিবেশকে যেন প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এই ধরনের 'বাউল সম্মেলন' মুর্শিদাবাদে প্রথম; কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টায় যেভাবে সাড়া পেলাম জনসাধারণের কাছে, তা আশাতীত।

সাধারণের মধ্যে চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাদের সম্মেলনের খরচের জন্য। 'বাউল'দের শুধুমাত্র আহারের ব্যবস্থা করতে পেরেছি, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হয়নি; তবুও তাদের উদারতা, লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আমাদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু আবেদন করেও সাড়া পাইনি সরকারী দপ্তরের। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে গণতান্ত্রিক দাবী নিয়ে আবেদন করেছিলাম জেলার উপযুক্ত সরকারী দপ্তরে কিছু অর্থের জন্য। বিলম্বিত উত্তর এসেছে সাহায্যের সুযোগ নেই বলে। অবাক হইনি; তবে প্রশ্ন জেগেছে এই চিন্তা করে যে, জাতির হৃদয়কে এভাবে পাথরচাপা দিয়ে শুধুমাত্র দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? বাংলার লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য যদি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ইতিহাস হয়েই থাকে, তবে জাতির বর্তমানকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? আশা করি আপনার চিন্তাশীল মনেও এ অনুভূতির আঘাত বাজবে; তাই 'সাহিত্য সংবাদে'র মাধ্যমে এই আবেদনটুকু রাখলাম। ইতি।

বিশ্বনাথ রায়
জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম : একটি উল্লেখযোগ্য দলিল

জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

চলার পথের সামান্য কিছু কিছু মতভেদ অনুসারে বিপ্লব আন্দোলনের যুগে যে কয়টি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছিল "অনুশীলন"-দল তন্মধ্যে অন্যতম। 'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন অবলম্বনে ব্যারিস্টার পি মিত্র অনুশীলন সমিতির পরিকল্পনা করেন। বাংলা দেশের বহু সংখ্যক স্বদেশ-প্রেমিক যুবকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহাদের সহযোগিতায় অতি অল্প-কালের মধ্যে অনুশীলন সমিতির বীজ সর্বভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সময়। তাঁহার কারাবাসের এই স্বল্প-ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) সমগ্র দেশে সুপরিচিত। সমস্ত পৃথিবীতে বিপ্লব আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট যে-সব কর্মী দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, মহারাজ তাহাদেরই একজন। বৈপ্লবিক দল সংগঠন ও এই সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের জন্য মহারাজ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং বিপ্লবী দল গঠনে কৃতকার্য হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগও লাভ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে মহারাজ তাঁহার ত্রিশ বছর জেল জীবনের কাহিনী যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও তথ্য সমৃদ্ধ। তাঁহার কারাবাসের এই স্বল্প-পরিসর বিবরণ হইতে ভারতের কারা-জীবনের দুঃখ কষ্ট, পুলিশি অত্যাচার উৎপীড়ন প্রভৃতি নানাবিধ বীভৎস এবং নারকীয় দৃশ্যের চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। অনুশীলন দলের সংগঠন, কার্য-প্রণালী, দলের সম্প্রসারণ এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বহু বিষয় এই পুস্তকে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত এদেশের তৎকালীন অন্যান্য সব বিপ্লবী দলের উৎপত্তি এবং প্রধান প্রধান দলের নেতৃস্থানীয়গণের নাম ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং তাহার পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লব আন্দোলনের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভারতের স্বাধীনতা-কামী বিপ্লবীদের মধ্যে বহু প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের নামের তালিকা এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের বিপ্লব-বাদীদের সংগ্রাম প্রচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের মোটামোটি ইতিহাস এবং সংগঠকদের নাম ও ভূমিকার কথা ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে বাংলা দেশে অনুশীলন দলের তৎকালীন আশ্রয় কেন্দ্র, বিপ্লব দলের কার্যে নারীদের ভূমিকা এবং বাংলার প্রত্যেক জেলার দুঃসাহসিক কর্মী ও দীর্ঘকাল যাঁহারা কারাবরণ করিয়াছেন এমন বহু সদস্যের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য গ্রন্থখানির আকর্ষণ আরও বাড়িয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রণয়নে এই গ্রন্থ অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে।

১৪০।৬০

ছোট গল্প

আর্কিড—সুবোধ ঘোষ। আনন্দধারা প্রকাশন : ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম দু টাকা পঞ্চাশ।

আর্কিড কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন যার মধ্যে অন্তত কিছু গল্প আছে ফিরে ফিরে পড়ার মতো, কেননা তাদের গুঞ্জন ও অনুরণন গল্প শেষ হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ থেকে যায়। এবং তার পরেও সেটা বড়ো কথা এবং অল্প কিছু বাংলা গল্প সম্বন্ধে যে-কথা প্রয়োগ করা যায় সেটা এই সংকলন সম্বন্ধে প্রযোজ্য : এই গল্পগুলি প্রাপ্তবয়স্ক। সুবোধ ঘোষের অধিকাংশ গল্পই তাই, তারা কোনো উচ্ছ্বাস বা ভাবুক ভাববিলাসকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে না। অত্যন্ত সচেতন ও স্বাবলম্বী তাঁর রচনা কোনখানে তাকে দাঁড়াতে হবে—এই জ্ঞান তাঁর আছে; আর এই জন্যই সম্ভবত তাঁর কোনো গল্পই পুনরাবৃত্তি পছন্দ করে না কিংবা পরের মুখে ঝাল খায় না। ইঙ্গিত-ময় মন্তব্য বহুস্তর কোনো উপমা, মানুষের মনের অসীম অন্ধকার ও রহস্য সম্বন্ধে অপরিমেয় কৌতূহল এবং সর্বোপরি এক তীব্র স্পর্শবোধ তাঁর যে-কোনো গল্পকেই এক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা ভূষিত করে থাকে। এই সংকলনের ভিতরকার অন্যূন তিনটি গল্প—"নিশিচক্রবাকী", "একতীর্থা" ও "জয়ন্তী"—মনে হয় তাঁর ক্ষমতা ও উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিতে পারে। তাঁর দৃষ্টি কোনো তুচ্ছকেই অবহেলা করে না, বরং তার ভিতরেও তাৎপর্য খুঁজে পায়; কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কীভাবে মানুষের গোপন জায়গাগুলি আত্মপ্রকাশ করে; ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কেমনভাবে তিনি সমস্ত জট ও প্রহেলিকাকে তীরভাগে পৌঁছে দেন—তা যে-কোনো সচেতন পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। আর্কিডের গল্পগুলি এইজন্যই প্রাপ্তবয়স্ক যে তারা যেমন ইঙ্গিত ও ভাবনাময়, তেমনি পাঠককেও তারা ক্ষমাহীন ও অনিবার্য ভাবে জাগ্রত ও চিন্তাশীল করে তোলে।

অত্যন্ত সুন্দরভাবে বইটি বের করা হয়েছে; প্রকাশক এইজন্য ধন্যবাদ পাবেন।

৪৮১।৬২

বড় গল্প

শঙ্খকঙ্কণ—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। দাম দু-টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার এমন-একটা স্বাভাবিক লাবণ্য আছে, যার তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। এই লাবণ্যের কারণ এই নয় যে তিনি এখনো অত্যন্ত অনায়াসে ও হালকা চালে "সাধু ভাষা" ব্যবহার করেন—বোধ হয় তার কারণ অন্যত্র নিহিত। 'লাবণ্য' কথাটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় লবণ যা ছাড়া কোনো রান্নাই খাদ্য হয় না। মনে হয় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষার এই লবণ আর কিছু নয়, তাঁর স্নিগ্ধ কৌতুকের বোধ যা তাঁর সমস্ত রচনাকেই উপাদেয় করে তোলে। এই কৌতুক তাঁর ভাষায় আদ্যো-পান্ত পরতে-পরতে মিশে আছে বলেই বোঝা

উপন্যাস

কাচ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সম্বোধি পাবলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ, ২২ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-১। তিন টাকা।

কবির লেখা উপন্যাস "কাচ" সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে এটাই বোধ হয় সর্বাগ্রে মনে পড়ে যাবে। অথচ এ-কথা কে না জানে যে "বৃত্ত", "কল্লোলেখা", "মৌচাক", রাত্রি বা সৃষ্টির মতো উপন্যাস রচনা করে সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিজেকে ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ছোটো উপন্যাসটি এত নির্ভার ও বাহুল্য বর্জিত যে তার সঙ্গে সম্ভবত কাব্যেরই আত্মীয়তা বেশি। কাহিনীর জটিলতা ও অকারণ ঘোরপ্যাঁচ রোমহর্ষক নানা রগরগে ঘটনা সাদা-কালো চরিত্র অবান্তর নানাবিধ বাহুল্য—এইসব কোনো কিছুই এই উপন্যাসে নেই—[illegible] যাঁরা [illegible] সব ঘটনা বহুল চরিত্র সংকুল [illegible] উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন তাঁরা এই বইটি পড়তে গেলে হয়তো হতাশ হবেন। স্ফটিক খণ্ডের মতো [illegible] এই উপন্যাসটি এক [illegible] প্রশ্নের সামনে কেবল দাঁড় করিয়ে দেয়। ভালোবাসার পরমায়ু কতক্ষণ [illegible] কি প্রেমের সংহার না কি তার পরেও আরো কিছু থাকে। ভালোবাসা কি শুধু একজনের মধ্যেই চরিতার্থতা পায় [illegible] একজনকে ভালোবাসার পরেও অন্য কাউকে ভালোবাসা যায় [illegible] সুরঞ্জন-সমিতার এই প্রণয় কাহিনী এই পরস্পর সম্পৃক্ত প্রশ্নগুলির সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে এবং এটাই তার প্রস্থানভূমি। কিছু ঈর্ষা [illegible] কিছু তুচ্ছ অথচ তাৎপর্যময় উল্লেখ [illegible] গুপ্তি গুপ্ত অথচ উদ্দেশ্যময় সংযোগ—এই সবের মধ্য দিয়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর মূল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন বলে উপন্যাসটি শেষ পর্যন্ত কবির লেখা বলে আত্মপরিচয় দেয়। ৯০।৬৩

শিশু সাহিত্য

দণ্ডকারণ্যের বাঘ। সাগরময় ঘোষ। বর্তিক, ১।৩২ এফ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬। দাম—তিন টাকা।

নিজের লেখার শক্তিকে গোপন করা যদি মানুষের অপরাধ হয়, তবে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাগরময় ঘোষ অবশ্যই অপরাধী। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর একাধিক সংকলনগ্রন্থ পাঠাগারে ও ব্যক্তিগত গ্রন্থসম্ভারে মূল্যবান যোজনা বলে বিবেচিত হচ্ছে। যদিও প্রতিটি গ্রন্থের ভূমিকাতে তিনি তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন, তবু লেখাকে নিজেকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা তাঁর সীমাবদ্ধ। সুতরাং লেখক হিসেবে তাঁর পরিচয় পেতে হলে পাঠককে একটি বিশেষ মৌলিক রচনার অপেক্ষায় বসে থাকতে হতোই। যদিও 'দণ্ডকারণ্যের বাঘ' কিশোর-সাহিত্য তথাপি তারই মধ্যে একজন সত্যিকারের সাহিত্যিককে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রথমেই স্বীকার করতে হবে কাহিনীটি [illegible] চিত্রকর্মক। কিন্তু তা-ও বড় কথা নয়। [illegible] পরিবেশন করার কৌশলটিও এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমটায় কয়েকটি মানুষকে লেখক রেখার [illegible] সম্পূর্ণভাবে এঁকে দিয়েছেন। এত স্পষ্ট যে মানুষগুলো যেন [illegible] আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে [illegible] হবিপদ, [illegible] লেখক [illegible] মাদ্রাজী ভদ্রলোক [illegible] পরই। একের পর এক আবার [illegible] পরিস্থিতি পার [illegible] অথচ [illegible] মুহূর্তগুলো [illegible] মুগ্ধ করে [illegible] যে গল্পটি [illegible] জন্য তার নেই [illegible]। কিন্তু এইটুকুতেই [illegible] পর্যন্ত গল্পকে [illegible] পরিণতির দিকে [illegible] যে কোনো [illegible] আশ্চর্য কৃতিত্ব [illegible] পরিণতির দিকে [illegible] সে সম্বন্ধে [illegible] ওই সাত বছরের ছেলে [illegible] কবিকে [illegible] আমার কাছে [illegible] অন্য কোথাও দিবো না। [illegible] ডামরেকো শুনলে হাসবে।'

[illegible] মতো অনেক কৌতুক-[illegible] অত্যন্ত আমাদের মুখের [illegible]। কিশোর সাহিত্যের [illegible] সুকুমার রায়ও অনেক উক্তি [illegible] উপহার দিয়েছেন। এখানে সাগরময় ঘোষ অন্তত দুটি জায়গায় কিশোর পাঠকদের [illegible] প্রবাদ আবিষ্কারে সাহায্য করবেন। এক—বাবুই-এর সেই চকিত উল্লাস 'ঠা ঠা!' দুই—পিল্লাই সাহেবের এক বাত—'সেই কথাই ত বলছি।'

অহিভূষণ মালিকের আঁকা ছবিগুলো সমগ্র কাহিনীটির অংগাংগী বলা যেতে পারে। মনে হয় এ ছবিগুলো না থাকলে গ্রন্থটি সম্পূর্ণই হতো না।

এ-বইটি প্রতিটি কিশোর-কিশোরীরই ভালো লাগবে তাতে সন্দেহ নেই। যদিও বইটিকে সর্বাংগসুন্দর করতে প্রকাশক যত্নের ত্রুটি রাখেননি, তথাপি সামান্য ক্ষতি স্বীকার করেও দাম কিছু কমালে তিনি অসংখ্য কিশোর পাঠক পাঠিকার সাতাকারের উপকার করতেন। ৫০৬।৬২

প্রাপ্তি স্বীকার

ভারতীয় দর্শন—ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী।

সর্পশক্ত সাধনা ও সহজ সাধনার যষ্টশিক্ত—শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী।

এর শেষ নাই—অমরেন্দ্র দাস।

বিনোবা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ।

যাঁরা মা হতে চলেছেন—ডাঃ রবীন্দ্রনাথ নাগ।

দুই মা—শ্রীসতীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

সহোদর—শ্রীপ্রেমরঞ্জন।

রক্তের স্বাক্ষর—সম্পাদনায় গণনাথ মণ্ডল ও সামসুল হক।

জীবন সৈকতে—হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নানান দেশের উপকথা—প্রদীপকুমার চক্রবর্তী।

স্বপন বুড়োর ছোটদের সরস গল্প।

শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটদের সরস গল্প।

এরা অভিযুক্ত আসামী—চিত্র গুপ্ত।

কো-র্ভোভিস (নাটক)—অমল সরকার।

মিলন মালা—রমেশ মজুমদার।

অশোভন মনোভাব

গতবারের ন্যায় এবারেও বি-এফ-জে-এ'এর ঐতিহ্যমণ্ডিত অনাড়ম্বর পুরস্কার বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল। চিত্রসাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ ছবির প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক শিল্পী ও কলাকুশলীদের কৃতিত্ব-পত্র দান করে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেন।

চলচ্চিত্রশিল্প মহলের কোন সাহায্য ও সহযোগিতা না নিয়ে চিত্র-সাংবাদিকরা এই পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। শিল্পীদের দিয়ে গান-বাজনা-অভিনয়ের কোন আমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয় না এই উৎসবে। চিত্রসাংবাদিকদের পক্ষ থেকে শুধু বছরের শ্রেষ্ঠ ছবির প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মান জানানোই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু শিল্পী ও কলাকুশলী চিত্রসাংবাদিকদের আমন্ত্রণে এবার সাড়া দেননি। অনিবার্য কারণে হয়ত অনেকের পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সকলেই কি ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছাতে পারেন নি?

চিত্রসাংবাদিকরা তাঁদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এই পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে চিত্রসাংবাদিকদের প্রয়াসকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা শুধু উপস্থিত থাকবেন এমন আশা করাটা অন্যায় নয়। যাঁরা বি এফ জে এ'-এর বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হননি, কোন একটি বছরের অনুষ্ঠানে তাঁদের অনুপস্থিতি আরও দৃষ্টিকটু। হয়ত আগের বছরে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছেন নয়ত পরের বছরে বা ভবিষ্যতে তাঁরা পুরস্কার পাবেন। কিন্তু যে সতীর্থরা পুরস্কার পেলেন তাঁদের অভিনন্দন জানাবার জন্য অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সেটাই তো শোভন।

কিন্তু এই শোভনতা এবার অনেক শিল্পী চিত্রপরিচালক কণ্ঠশিল্পী ও কলাকুশলী দেখাতে পারেননি। চিত্রসাংবাদিকরা শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কলা-কুশলীদের এই আচরণে শুধু মর্মাহতই হবেন।

বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য বোম্বাই থেকে আসেন (বাঁ-দিক থেকে) শশীকলা (গত বছরের হিন্দী ছবির শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—"আরতি") এবং গুরু দত্ত (শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—"সাহেব বিবি ঔর গুলাম")—তাঁদের সঙ্গে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় (গত সনের বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—"ভগিনী নিবেদিতা") ফটো—দেশ

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়—শ্রীরায় '৬২ সনের বাংলা বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠ পরিচালক (অভিযান) এবং শ্রেষ্ঠ সংলাপরচয়িতার (কাঞ্চনজঙ্ঘা) কৃতিত্ব-পত্র লাভ করেন ফটো—দেশ

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসো-সিয়েশন-এর পুরস্কার বিতরণ উৎসব

স্বাধীনতার পর ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্প দিনের পর দিন উন্নতি লাভ করছে। বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের পথপ্রদর্শক। গত দশ বছরে ছবিতে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্প তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

গত শুক্রবার কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টারে বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

গত বছর থেকে বি এফ জে-এ অ্যাওয়ার্ড পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। ৬২ সনের শ্রেষ্ঠ ছবির প্রযোজক, চিত্রপরিচালক শিল্পী ও কলাকুশলীদের এই সংস্থা কৃতিত্বপত্র দান করে সম্মানিত করলেন।

এবারকার অনুষ্ঠানটি নানা দিক থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এবারকার পুরস্কার বিতরণ উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডী। পুরস্কার বিতরণ করেন লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়। উৎসবে ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-শিল্পপতি শ্রী এস এস ভাসান (জেমিনি) ও প্রখ্যাত চিত্রপ্রযোজক পরিচালক শ্রীসোহ্‌রাব মোদী উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া বি এফ-জে-এ পুরস্কার স্বহস্তে গ্রহণ করবার জন্য বোম্বাই থেকে এসেছিলেন গুরু দত্ত,

বি-এফ-জে-এ প্রদত্ত কীর্তি-পত্র হাতে নিয়ে শশীকলা ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়
ফটো দেশ

শশীকলা, হেমন্তকুমার এবং ছন্দপরী প্রভৃতি।

কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্পের নেতৃস্থানীয় বহু শীর্ষ শিল্পী কলাকুশলী এবং শহরের [illegible] সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অনেকেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবে পৌরোহিত্য করেন বি এফ জে-এর সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। উৎসবের প্রধান অতিথি শ্রীঅশোককুমার সরকার অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সেন্সরের শ্রীভাসান। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন সরকার চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ ছায়াছবি নির্বাচনের কাজে চিত্রসমালোচক-দের অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছেন না। সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটিতে চিত্রসমালোচকদের স্থান থাকা উচিত।

শ্রীঅশোককুমার সরকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে একটি বাণী লিখে পাঠান। অনুষ্ঠানে এই বাণী পাঠ করা হয়। তাতে তিনি বলেন বাংলা ছায়াছবির ক্রমবর্ধমান উন্নতির মূলে বাংলার চিত্রসমালোচকদের দান অনস্বীকার্য। তাঁরা শুধু বাংলা দেশেরই নয় সারা ভারতের চলচ্চিত্রকলার অনুশীলনকে উৎকর্ষের পথে পরিচালনা করে আসছেন। বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি শিল্পী ও কলাকুশলী নির্বাচনে তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। পরিশেষে তিনি বলেন বি এফ জে এ'এর সভ্যরা ছায়াছবির গুণাগুণ বিচারে যে বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন তা শিল্পানু-রাগীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। চিত্রামোদীদের এই আস্থা বি-এফ-জে-এ অটুট রাখতে পারবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

শ্রীভাসান তাঁর ভাষণে বলেন, চলচ্চিত্র-শিল্প অর্থাৎ "ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি" কথাটি প্রায়ই উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রির পরিবর্তে তাকে প্রোফেশন অথবা জীবিকাই বলা উচিত।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ও শেষে বি-এফ-জে-এ'র তরফ থেকে বক্তৃতা দেন শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ, শ্রী বি ঝা ও শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ।

বি এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে প্রেস ফটো-গ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের নির্বাচিত বছরের তিনজন শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পীকে রৌপ্যপদক দান করেন। ওই সংস্থার পক্ষ থেকে সভায় ভাষণ দেন শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ।

অনুষ্ঠানের টুকিটাকি

শ্রীরেড্ডী তাঁর ভাষণে কলকাতার সংবাদ-পত্রের মালিকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। অবশ্য তিনি দুটি বিশিষ্ট দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের কথাই উল্লেখ করেন। বি-এফ-জে-এ-এর অনুষ্ঠান আরও জাঁক-জমকপূর্ণ কেন হল না, শ্রীরেড্ডী এই আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এবং প্রসঙ্গত বলেন, প্রতিষ্ঠাবান দুটি সংবাদপত্রের মালিকদের আর্থিক সাহায্যে এই অনুষ্ঠান আরও আড়ম্বরপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। শ্রীরেড্ডীর মন্তব্যের উত্তরে শ্রীঘোষ সভায় ঘোষণা করেন, শ্রীরেড্ডী উল্লিখিত দুটি বিশিষ্ট দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ বি-এফ-জে এ-কে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য এবং একাধিক পত্র-পত্রিকার মালিকরা সাহায্য ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সৌমেন্দু রায় ও বিমল মুখোপাধ্যায়—এই দুই আলোকচিত্রশিল্পীকে (যথাক্রমে "অভিযান" ও হাঁসুলীবাঁকের উপকথা" ছবির জন্য) বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেন প্রেস ফটোগ্রাফার্স অ্যাসো-সিয়েশন অব ইণ্ডিয়া

ফটো—দেশ

বি-এফ-জে-এ অ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন: (১) সত্যজিৎ রায়, (২) শশীকলা, (৩) সপ্তম স্থানাধিকারী "সওদাগর ভাই"-এর পরিবেশক এস এস ভাসান, (৪) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অভিযান), (৫) উদ্বোধন ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ গোপাল রেড্ডী, (৬) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী অনুভা গুপ্তা (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা), (৭) শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রশিল্পী দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (কুমারী মন), (৮) সরস্বতী মুখোপাধ্যায়, (৯) শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষ (অভিযান), (১০) পদ্ম দত্ত, (১১) তৃতীয় স্থানাধিকারী "কাচের স্বর্গ"র প্রযোজক প্রকাশচন্দ্র নাম, (১২) দশম স্থানাধিকারী "মেমসাহেব"র প্রযোজক-পরিচালক অরূপ গুহঠাকুরতা, (১৩) শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায় (আমার সংসার), (১৪) শ্রেষ্ঠ সংগীত-পরিচালক হেমন্তকুমার (বিশ সাল বাদ)

ফটো—অমল

অনুষ্ঠানটি আরও জাঁকজমকপূর্ণ কেন হল না, শ্রীরেড্ডীর এই মন্তব্যের উত্তরে শ্রীঘোষ বলেন, এই পুরস্কার বিতরণ উৎসব ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন-এর মত। ছাত্ররা যেমন কনভোকেশনে ডিগ্রী আনতে যায়, শিল্পী ও কলাকুশলীরা এই অনুষ্ঠানে সেভাবেই ডিগ্রী নিতে আসেন।

সভা শেষ হওয়ার আগে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য কলকাতার বহু শিল্পী ও কলাকুশলীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের অনেকেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত। যাঁরা পুরস্কার পেলেন না তাঁদের অনুপস্থিতিই আরও বিশেষ করে লক্ষ করার মত।

উৎসবে কলকাতার প্রায় সব বি-এফ-জে-এ পুরস্কার বিজেতারাই উপস্থিত ছিলেন। সত্যজিৎ রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, গুরু দত্ত, শশীকলা, হসরৎ জয়পুরী, হেমন্তকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, চারুপ্রকাশ ঘোষ, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। "ব্যালাড অব এ সোলজার" ও "দি আইল্যাণ্ড" ছবির পুরস্কার গ্রহণের জন্য যথাক্রমে স্থানীয় সোভিয়েট ও জাপানী দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বি-এফ-জে-এ নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি "টু উইমেন"-এর প্রাপ্য সম্মান-পত্র এম-জি-এম'এর পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন শ্রীহাফেসজী। তিনি শ্রেষ্ঠ বিদেশী অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেনের প্রাপ্য সম্মানপত্রও শিল্পীর তরফ থেকে গ্রহণ করেন।

এ সপ্তাহে উত্তমকুমার ফিল্মস এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'ভ্রান্তিবিলাস' মুক্তিলাভ করছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত রসরচনার ভিত্তিতে তৈরী এ ছবির দুটি দ্বৈত-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার বিধায়ক ভট্টাচার্য, সবিতা বসু, সন্ধ্যা রায় প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শিল্পী। মানু সেন ছবিটি পরিচালনা করেছেন। শ্যামল মিত্র সংগীত পরিচালক।

রেখা চিত্র'র কোবরা গার্ল হিন্দী ছবিটি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত এ ছবির দুই মুখ্য শিল্পী হলেন রাগিণী ও মহীপাল। নানাভাই ভাট ও এস এন ত্রিপাঠি যথাক্রমে ছবির পরিচালক ও সংগীত পরিচালক।

চিত্রনাট্যের বিস্তার। এক নৃত্যশিল্পীদলকে নিয়ে কাহিনীর শুরু। তাদের 'ক্যান ক্যান' নাচ ফরাসী আইন (ব্যাপারটা অবশ্যই কল্পিত) অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার সূত্রে নাটকটি গড়ে উঠেছে।

নৃত্য সংগীত এবং প্রধানত লঘু হাস্য-রসের মধ্য দিয়ে পরিচালক কাহিনীটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যে কাহিনীতে আবেগ আছে জীবনের দ্বন্দ্ব আছে—যন্ত্রণাও। নৃত্যশিল্পীদলের প্রধান নর্তকীর ভূমিকায় শার্লে ম্যাকলেনের সংবেদনশীল, স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় ছবিটির অন্যতম সম্পদ। আর তিনটি বিশিষ্ট ভূমিকায় মোরিস শেভালিয়ের ফ্র্যাংক সিনাত্রা ও লুই জুর্দার অভিনয়ও মনে রাখার মতো। ওয়াল্টার ল্যাং ছবিটির পরিচালক।

নিউ এম্পায়ারে পণ্ডিত রবিশঙ্কর

[illegible] ১লা জুন বৃহস্পতিবার [illegible] বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করবেন। [illegible]

একলব্য

আগামী বছর শীতকালে এম সি সি দলের ভারত সফরের ব্যবস্থা উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃপক্ষ আশা করছেন, এম সি সি দল ৮ সপ্তাহের জন্য ভারত সফরে রাজী হবে এবং ইংলণ্ডের সব শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়েই দল গড়বে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি শ্রী এম এ চিদম্বরম ভারতের বিভিন্ন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মতামত জানতে চেয়েছেন। সফরের জন্য এম সি সি যে প্রস্তাব করেছে সেটা গ্রহণ যোগ্য কিনা।

এম সি সি ৮ সপ্তাহের জন্য ভারত সফর করবেন। এই ৮ সপ্তাহে মোট খেলা হবে ১০টি। ৪ দিন ব্যাপী পাঁচটি আন অফিসিয়াল টেস্ট আর পাঁচটি সাধারণ খেলা। প্রতি টেস্টের জন্য এম সি সিকে ৮০ হাজার [illegible] টেস্টের জন্য ৫ [illegible] আরও [illegible]

[illegible]

[illegible]

আজ পর্যন্ত এম সি সি পূর্ণশক্তিসম্পন্ন দল ভারতে পাঠায়নি। তবুও আশা আছে, বড়দিনের সময় যদি ঘর ছাড়তে না হয় তা হলে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা ৮ সপ্তাহের জন্য ভারতে আসতেও পারেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট সাংবাদিক রন রবার্টস যিনি ১৯৬১-৬২ সালে এম সি সি দলের সঙ্গে ভারত সফর করে গেছেন তিনি এর আভাসও দিয়েছিলেন। কলকাতার টেস্ট খেলা হয়েছিল বড়দিনের বন্ধের সময়। টেস্টের আগে ইডেনে সার্ভিসেস দলের সঙ্গে এম সি সির তিন দিনব্যাপী খেলার প্রথম দিন রবার্টসের সঙ্গে প্রেস বক্সে আলাপ হল। পরের দিন তার দেখা নেই। শুনলাম বড়দিন করতে বিলেত উড়ে গিয়েছেন। তিন দিন পরে টেস্টের প্রথম দিন রন রবার্টসের সঙ্গে আবার দেখা। পরিষ্কার করে বললেন বড়দিনের সময় বিদেশে সময় কাটাতে হবে বলেই অনেকে দলের সঙ্গে আসতে চান না। ইংরেজ সাংবাদিকদের জন্য [illegible] ক্রীড়া সাংবাদিকদের আয়োজিত সংবর্ধনা সভাতেও রবার্টস কথাটা [illegible] এবং রন রবার্টস এবং আলেক্স [illegible] ছিলেন ১৯৬৪ সালে ভারতে শক্তিশালী এম সি সি দল ভারত সফর করবে সেজন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এম সি সি-র প্রস্তাবিত সফরের মূলে তাঁদের কিছুটা ভূমিকা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু আমাদের আপত্তি এই কারণে, আন্-অফিসিয়াল টেস্ট কেন? আর ৪ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার ব্যবস্থা কি ভারতের পক্ষে একটু মর্যাদাহানিকর নয়?

বিগত ইংলণ্ড সফরে ভারত যখন পাঁচটি টেস্ট খেলায় পরাজয় স্বীকার করেছিল তখন ইংরেজ সাংবাদিকরাই বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার অর্থ—সময়ের অপব্যয় করা। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের মাটিতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার লাভ করে আমরা তার প্রত্যুত্তর দিয়েছি। আজ আবার সেই মাটিতেই ৪ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার ব্যবস্থা কি যুক্তিসঙ্গত? বিদেশের মাটিতে টেস্ট খেলার সময় ভারত ৩ দিনের মধ্যে হার স্বীকার করেছে সত্য। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের চেনা মাটিতে ভারতের সঙ্গে ৪ দিনব্যাপী টেস্ট খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ১০টি টেস্ট খেলা পর পর অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় দুই দেশেরই সুনাম নষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় সমাপ্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নেতিবাচক ক্রিকেট খেলার বিরুদ্ধেও সর্বত্র সোচ্চার প্রতিবাদ। ভারতে এম সি সি ও ভারতের ৪ দিনব্যাপী পাঁচটি খেলার ফলাফলও যদি অমীমাংসিত থাকে তবে কি দুই দেশের সুনাম বাড়বে?

এম সি সির প্রস্তাবিত সফরকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আগ্রহের কারণ বুঝি।
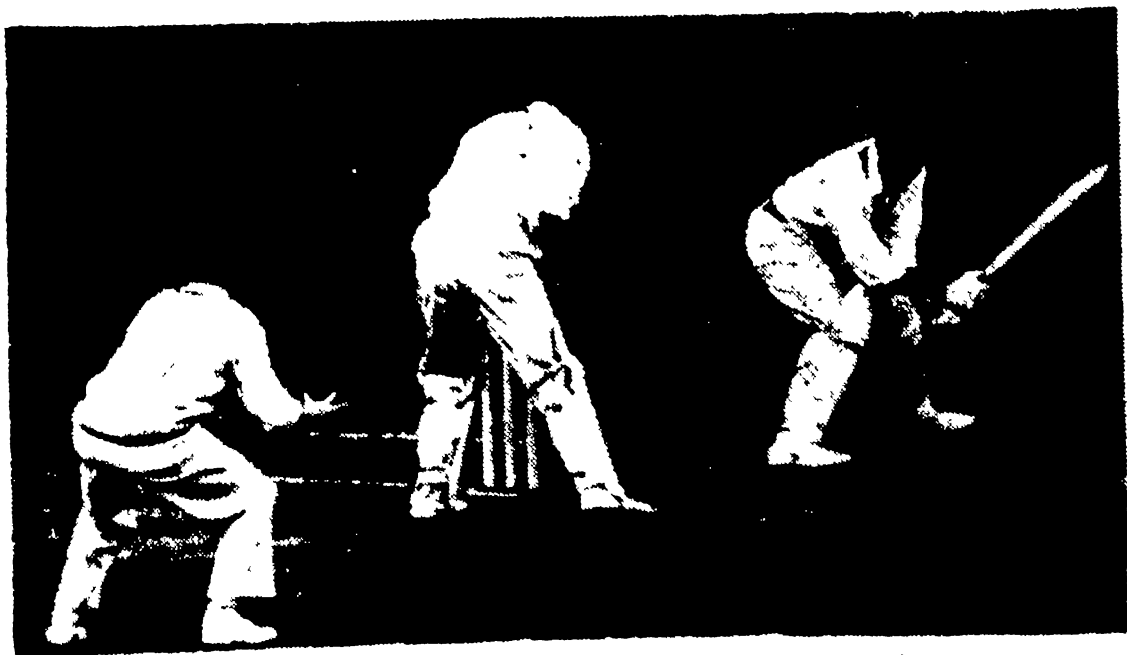
লর্ডস মাঠে এম সি সি ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কনরাড হান্ট ক্লিফোর্ডের একটি বল স্লিপের মধ্য দিয়ে সুইপ করছেন

কলকাতায় কয়েকজন গোলকিপারের বল ধরবার ভঙ্গী ফটো—দেশ

ইস্টবেঙ্গল ও জর্জ টেলিগ্রাফ দলের লীগের খেলায় জর্জ টেলিগ্রাফ দলের গোলের মুখে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি

ফটো—দেশ

সেকেণ্ডে দ্বিতীয় স্থান দখল করেন টাঙ্গানিকার জন স্টিফেন্স। আবার স্টিফেন্সের মাত্র ৪০ মিনিট পরে মারেথন স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছেন তৃতীয় প্রতিযোগী দক্ষিণ আফ্রিকার জন ল্যাং। এই সময় থেকেই ঐতিহাসিক পথের ম্যারাথন দৌড়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যায়। স্থানমাহাত্ম্য এবং অতীত স্মৃতিই হয়তো প্রতিযোগীদের মনে অনুপ্রেরণা এনে দিয়েছিল। তাই এমন তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি।

অ্যাথলেটিক বিশ্বের আর কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা। গত সপ্তাহে মস্কোর এক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়ার বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারিণী বর্শা ছুঁড়িয়ে তামারা প্রেস নিজ রেকর্ডকে আরও উন্নত করেছেন। মেয়েদের বর্শা ছোঁড়ায় তাঁর বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৫৮·৯৮ মিটার। এবার তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ৫৯·৮৯ মিটারে নতুন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হয়েছেন।

এই সপ্তাহে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ বছরের ছেলে ফিল সিনকফের ২৭ ফুট ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ লাফ বিশেষভাবে উল্লেখ করার ঘটনা। হিসাবমত সিনকফের নতুন বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা পাওয়া উচিত। কারণ, দীর্ঘ লাফে সোভিয়েট অ্যাথলীট ইগর তের-ওভানেসিয়ানের বিশ্ব রেকর্ড ২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। কিন্তু যেহেতু সিনকফের লাফের সময় হাওয়ার বেগ একটু বেশী ছিল সেহেতু তাঁর কীর্তি বিশ্ব রেকর্ডের অনুমোদন পাবে না।

ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর উন্নত অ্যাথলীট পোলভল্টের ব্রায়ান স্টানবার্গ সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ায় পোলভল্টে যে উচ্চতা অতিক্রম করেছেন আউট ডোর প্রতিযোগিতায় আজ পর্যন্ত আর কেউ সে উচ্চতা অতিক্রম করতে পারেননি। এখন ১৬ ফুট ২½ ইঞ্চি হচ্ছে পোল ভল্টে ফিনল্যান্ডের পেন্টি নিকুলার অনুমোদিত বিশ্ব রেকর্ড। গত মাসে আমেরিকারই আর এক প্রতিযোগী জন পেনেল ১৬ ফুট ৬½ ইঞ্চি লাফিয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন। ইতিমধ্যে ব্রায়ান স্টানবার্গ আরও একটু উপরে উঠেছেন। তিনি অতিক্রম করেছেন ১৬ ফুট ৭ ইঞ্চি। এখন টোকিও অলিম্পিকের প্রস্তুতি হিসাবে সারা বিশ্বে যেভাবে বিশ্ব রেকর্ডের ভাঙাগড়া চলছে তাতে ১৭ ফুটের কীর্তি স্থাপনের খবরের জন্যও হয়তো বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

*

ফুটবল মরসুমের সবে শুরু। কিন্তু এর মধ্যেই ফুটবলের উন্মাদনায় ময়দান সরগরম। জনপ্রিয় ক্লাবগুলির প্রতি খেলায় বিপুল দর্শকসমাগম এ বছরের বিশেষত্ব। অবশ্য জনপ্রিয় ক্লাবের ফুটবল খেলা দেখবার জন্য কোনবারই দর্শকের অভাব হয় না। তবু এবার যেন বাড়াবাড়ি একটু বেশী। অনেকে বলতে আরম্ভ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কপাল ভাল। [illegible] কোম্পানীর হাত থেকে ঘেরা মাঠের দখল গ্রহণ করবার পর থেকে দর্শক মাঠে ভেঙে পড়ছে। হকি খেলার সময়ও দর্শকের অভাব হয়নি। কলকাতার হকি লোকসানের মরসুম। প্রতি বছরই বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনকে লোকসানের জের টানতে হয়। কিন্তু এবার হকি খেলা থেকে রাজ্য সরকারের তহবিলে যে টাকা জমা পড়েছে তাতে হকি পরিচালনার সমস্ত খরচ তো পুষিয়ে যাবেই তাছাড়াও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। হকি থেকেই যখন এত টাকা এসেছে তখন ফুটবল খেলা থেকে কি পরিমাণ টাকা আসবে সহজেই আন্দাজ করা যায়। সুতরাং শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কপাল ভাল নয় রাজ্যের খেলাধুলারও কপাল ভাল বলতে হবে। কারণ সরকার খেলা থেকে সংগৃহীত সমস্ত টাকাটাই খরচ করবেন খেলাধুলার উন্নতি এবং খেলোয়াড়দের প্রয়োজনে। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কপাল ভাল না বলে সরকারের 'হাতযশ' বলা ভাল।

এক নজরে এবং অল্প কথার মধ্যে ফুটবল খেলার হালচাল এবং খবরাখবর জানবার জন্য নতুন পত্রলেখক ফুটবলের সাপ্তাহিক পর্যালোচনার জন্য 'দেশ'-এর দপ্তরে অনুরোধ জানিয়েছেন। এর আগে নিয়মিতভাবেই ফুটবলের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু গত বছর পর্যালোচনা করিনি। কারণ, 'দেশ' যখন পাঠকদের হাতে গিয়ে পড়ে তখন অবস্থার অনেক অদলবদল হয়ে যায়। তাতে লেখা মার খায়, সাপ্তাহিক পত্রিকার অসুবিধা এই। বেশ কিছুদিন আগেই লেখা শেষ করতে হয়। দৈনিকে থাকে রোজকার টাটকা খবর।

যাই হোক এখন থেকে ফুটবলের সাপ্তাহিক পর্যালোচনার চেষ্টা করা যাবে।

আগেই বলেছি, ফুটবল মরসুমের সবে শুরু; সুতরাং এর মধ্যে কলকাতা ও

মুকুল

আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, আইনের প্রয়োগ এবং মাঠের পরিবেশ—সব কিছুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে খেলা পরিচালনা করাই ভাল রেফারীর বৈশিষ্ট্য। এতে খেলা দেখে দর্শকরা আনন্দ পায়, খেলার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে পারস্পরিক সৌহার্দ্য। কিন্তু আর ভূমিকা নয়। এবার আইন নিয়েই ঘাঁটাঘাঁটি করা যাক্।

আইনের মতই আইনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত না জানা থাকলেও সব কিছুই অপরিষ্কার থেকে যাবে। তা ছাড়া আইনের ধারাগুলি ভালভাবে বোঝবার জন্য রেফারী সম্পাদক এবং খেলোয়াড়দের প্রতি যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার প্রয়োজন আরও বেশী। ধীরে ধীরে সমস্তই আলোচনা করা যাবে।

১ নম্বর আইন—খেলার মাঠ

খেলার মাঠ মাঠের আনুষঙ্গিক উপাদান এবং মাঠের মাপজোক এই লেখার সঙ্গে প্রকাশিত নকশা অনুযায়ী হবে:—

(১) **আয়তন**—ফুটবল খেলার মাঠ হবে সমকোণ চতুর্ভুজ; কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মাঠের লম্বা দিক চওড়া দিকের চেয়ে বড় হবে। লম্বা দিক ১০০ গজের কম বা ১৩০ গজের বেশী হবে না, আর চওড়া দিক ১০০ গজের বেশী বা ৫০ গজের কম হবে না। (আন্তর্জাতিক খেলার মাঠ কমপক্ষে ১১০ গজ এবং সবচেয়ে বেশী ১২০ গজ দীর্ঘ হবে আর প্রস্থ হবে কমপক্ষে ৭০ গজ, সবচেয়ে বেশী ৮০ গজ)।

(২) **দাগ টেনে মাঠ চিহ্নিত করা**—মাঠটিকে স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত করতে হবে। এই রেখা বা লাইন ৫ ইঞ্চির বেশী চওড়া হবে না কিংবা ইংরাজী 'V' অক্ষরের মত কোণ করে মাটি খুঁড়ে রেখা করা যাবে না। মাঠের দীর্ঘ অর্থাৎ লম্বালম্বি দু' পাশের দুটি রেখার নাম টাচ্ লাইন এবং অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি রেখা অর্থাৎ দুই গোলের দিকের প্রস্থ রেখার নাম গোল লাইন।

মাঠের চার কোণে চারটি পতাকা স্থাপন করতে হবে। পতাকার দণ্ড কিন্তু উচ্চতায় ৫ ফুটের কম হবে না, দণ্ডের মাথার দিকও সূঁচালো হবে না। ঠিক এই ধরনের আর আর দুটি পতাকা মাঠের মধ্য-রেখার (হাফ-ওয়ে লাইন) দুইপ্রান্তে এবং টাচ্ লাইন থেকে মাঠের বাইরের দিকে অন্তত এক গজ দূরে স্থাপন করা যেতে পারে।

খেলার মাঠকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে আড়াআড়িভাবে একটি মধ্যরেখা টানতে হবে, যার নাম 'হাফওয়ে লাইন'। বেশ পরিষ্কার করে মাঠের কেন্দ্রকে (সেণ্টার) চিহ্নিত করতে হবে আর কেন্দ্রবিন্দু থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকতে হবে একটি বৃত্ত।

(৩) **গোল-এরিয়া**—মাঠের দুই পাশে প্রতি গোলপোস্ট থেকে ৬ গজ দূরে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে মাঠের ভেতর দিকে দুটি লাইন টেনে নিয়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ৬ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল করে আঁকা তৃতীয় লাইনের সঙ্গে মিশে যাবে। গোল লাইন ও এই তিনটি লাইন দিয়ে বেষ্টিত দুই গোলের সামনের জায়গাটুকুকে বলা হবে গোল এরিয়া।

(৪) **পেনাল্টি-এরিয়া** মাঠের দুই পাশে প্রতি গোলপোস্ট থেকে ১৮ গজ দূরে গোল লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে মাঠের ভেতর দিকে দুটি লাইন টেনে নিয়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ১৮ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে আঁকা তৃতীয় লাইনের সঙ্গে মিশে যাবে। গোল লাইন ও এই তিনটি লাইন দিয়ে ঘেরা দুই গোলের সামনের জায়গাকে বলা হয় পেনাল্টি এরিয়া।

দুই গোল লাইনের মধ্যবিন্দু থেকে গোল লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে ১২ গজ দূরে দুই পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে একটি করে পরিষ্কার চিহ্ন আঁকতে হবে (সমকোণ করে কোন রেখা আঁকা চলবে না)। এই দুই চিহ্ন হবে পেনাল্টি কিক করার জায়গা। দুটি পেনাল্টি কিক করার জায়গা থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে দুটি চাপ আঁকতে হবে।

(৫) **কর্নার-এরিয়া** — প্রত্যেক কর্নার পতাকার দণ্ডকে কেন্দ্র করে এবং ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের ভেতরের দিকে চাপ আঁকতে হবে।

(৬) **গোল** প্রত্যেক গোল লাইনের মাঝ-খানে গোলপোস্ট স্থাপন করতে হবে। প্রতি গোল লাইনের উপর এমনভাবে দুটি সোজা খুঁটি পুঁততে হবে যাতে কর্নার পতাকা-দণ্ড থেকে দুটি খুঁটি সমান দূরে থাকে, আর দুই খুঁটির মাঝে থাকে ৮ গজ ব্যবধান (ভিতরকার মাপ)। মাটি থেকে ৮ ফুট উঁচুতে একটি সরল কসবার দুই খুঁটির দুই মুখের সঙ্গে এমনভাবে জুড়তে হবে

মাপজোক সহ ফুটবল মাঠের চিত্র

॥ বাংলা সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১ম
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ২য়
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৩য়
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ৪র্থ

প্রতি খণ্ড—ছয় টাকা

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস

স্বর্গাদপি গরীয়সী ১ম ৫৲
স্বর্গাদপি গরীয়সী ২য় ৪৷৷
স্বর্গাদপি গরীয়সী ৩য় ৬৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পথের পাঁচালী ৫৷৷ আরণ্যক ৫৲
অপরাজিত ৯৲ দেবযান ৫৲
আদর্শ হিন্দু হোটেল ৪৷৷ ঐ নাটক ২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কবি ৪৷৷ কালিন্দী ৭৲ উত্তরায়ণ ৫৷৷ অভিযান ৬৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲ তুচ্ছ ৪৷৷ আঁকাবাঁকা ৫৲
বিবাগী ভ্রমর [illegible] ৭৷৷ জলকল্লোল (নূতন মুদ্রণ যন্ত্রস্থ) ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৮৷৷ রবীন্দ্র-সরণী ১০৲

অবধূতের

মরুতীর্থ হিংলাজ ৫৲ উদ্ধারণপুরের ঘাট ৪৷৷

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮৷৷ ভাড়াটে বাড়ী ৩৷৷

মৈনাকের বিচিত্র উপন্যাস

ব হ্নি ব ল য়

শ্রেণী সংঘর্ষের নামে যে কুৎসিত স্বার্থ সংঘাত চলে—মুক্তির নামে যে ভয়ংকর দাসত্ব তারই সত্যকার একটি চিত্র।

॥ সাড়ে আট টাকা ॥

সমরেশনাথ ঘোষের উপন্যাস

রোশনাই

ইতিহাসের পুরাতন পর্যায়ে একটি সর্বকালের ছবি

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

বিমল করের উপন্যাস

পান্থশালা

শক্তিমান লেখকের নূতন শক্তির অপরূপ বিকাশ

॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

প্রশান্ত চৌধুরীর
নবতম ও বৃহত্তম উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে

এক বিচিত্র ও রুদ্ধশ্বাস কাহিনী—সত্যকার পিছন দিকের বিচিত্র চিত্র

॥ আট টাকা ॥

নলিনীকান্ত সরকারের

দাদাঠাকুর

জীবনকথা উপন্যাসের চেয়ে মনোরম—কাহিনীর চেয়ে চিত্তাকর্ষক

॥ পাঁচ টাকা ॥
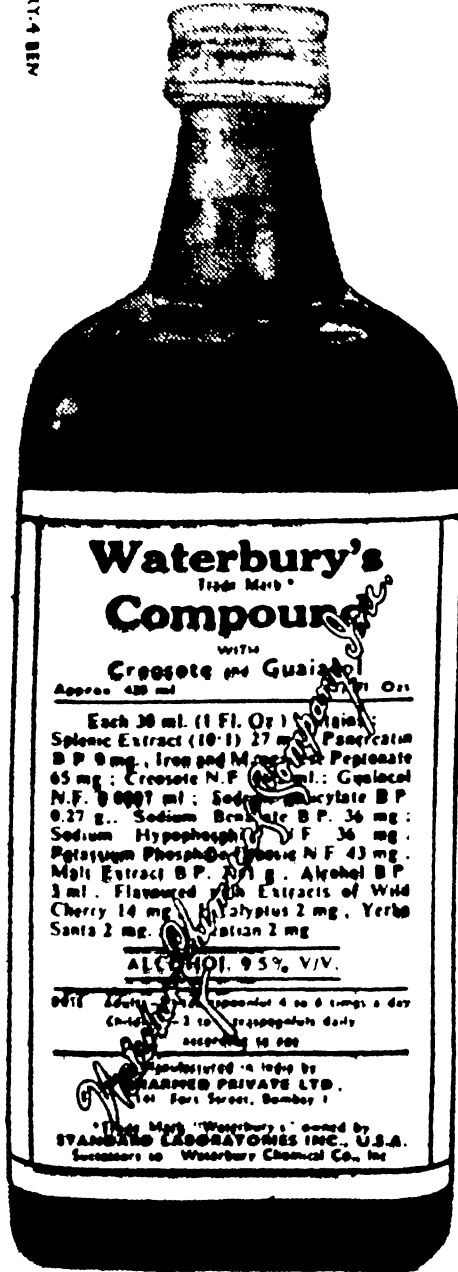
মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

ফ্লু থেকে সাবধান হউন

সেবন করুন
ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড
লাল লেবেল

শুধু প্রতিষেধকই নয়, নির্ভরযোগ্য টনিকও বটে !

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ডের ওপর বহু পরিবারের পুরুষানুক্রমে আস্থা ও নির্ভর স্থাপনের বহু বিশেষ কারণের মধ্যে চারটি হচ্ছে :

১ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড প্রতিষেধক এবং নির্ভরযোগ্য টনিকও। দেহে রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

২ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড অতি অল্প সময়ে ফলপ্রদভাবে কাশিকে তরল করে দেয়।

৩ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ডে ক্রিওসোট ও গুয়াকল থাকায় শ্বাসপ্রণালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

৪ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড খিদে বাড়িয়ে তোলে, হজমে সাহায্য করে, রক্ত পুষ্ট করে এবং দেহে খনিজ পদার্থের ঘাটতি পূরণ করে।

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড | লাল লেবেল

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী (সীমিত দায়িত্বসহ যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাপিত)

WCRY-4 BEN

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন্দ্র সেনগুপ্ত

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ৩২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Saturday, 8th June 1963

উপনির্বাচনের শিক্ষা

পার্লামেন্টারী নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয়ের নিশ্চিত সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ আবিষ্কার করা অসাধ্য ব্যাপার, বিশেষ উপনির্বাচনী দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয়ের। লোকসভার তিন তিনটে কেন্দ্রে উপনির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁরা কংগ্রেস দলের অথবা বলা যায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কর্ম-নীতির বিরোধী। আচার্য কৃপালনী, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া এবং শ্রীমিনু মাসানী জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত; এককালে এঁরা তিনজনই কংগ্রেস আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, কংগ্রেস সংগঠনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেস দলের সঙ্গে এঁদের বিচ্ছেদ ও বিরোধিতা ব্যক্তিগত নয়, গুরুতর নীতিগত কারণে। এঁদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাংশে সমর্থন না করেও বলা যায় এঁরা কংগ্রেস-বিরোধী হলেও নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধিমত জাতীয় স্বার্থরক্ষায় দৃঢ়সংকল্প। কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কতকগুলি কর্মসূচী ও পদ্ধতির প্রখর সমালোচক হিসেবেই এঁরা উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হয়েছেন। সে-বিচারে এই তিনটি উপনির্বাচনী ফলাফলের আদর্শগত তাৎপর্য অনেকখানি আছে কিম্বা থাকা উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুটা সংশয় পোষণ করাও অযৌক্তিক নয়। কারণ এই তিনটি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়টা প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট কিন্তু বিজয়ী তিনজন ত্রবলে এক সূত্রে আবদ্ধ নন, এক দল কিম্বা একই আদর্শ অনুসারীও তাঁরা নন। এঁদের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে এইটুকুমাত্র সাদৃশ্য এঁরা তিনজনই কংগ্রেসদল-গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের কতকগুলি কর্মনীতির বিরোধী।

আমরোহা, ফরাক্কাবাদ, রাজকোটের উপনির্বাচনের ফলাফল কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্রনীতি এবং চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের অসন্তুষ্ট মনোভাব অনেক পরিমাণে প্রতিফলিত করেছে। যাঁরা এই তিনটি উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা নীতির ত্রুটাবিচ্যুতি অসংকোচে সমালোচনায় নির্ভীক, স্পষ্টবাদী। নির্বাচনী প্রচারেও তাঁরা জাতীয় রাজনীতির বাস্তব সমালোচনাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা দলীয় আনুগত্য মেনে চললেও অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন যে জাতীয় রাজনীতি পরিচালনা দৃঢ়তর, আরও বাস্তবনিষ্ঠ হওয়া উচিত। সেদিক দিয়ে উপনির্বাচনের ফলাফল জাতীয় সংকটকালে কংগ্রেস-রাজনীতির ভিতরের দ্বিধাসংশয়ও অনেকখানি প্রতিফলিত করেছে। কংগ্রেস-রাজনীতির দ্বিধাসংশয় কংগ্রেস-সংগঠনকে কী পরিমাণ শক্তিহীন করেছে সে-বিষয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্ব কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীর। উপনির্বাচনের ফলাফল দলীয় শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধির চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণ গণ্য হতে পারে কি না সে-ও একটা প্রশ্ন। ব্রিটেনের মত উচ্চতম রাজনৈতিক ঐতিহ্য-সচেতন দেশে উপনির্বাচন এবং পরের প্রতিনিধি নির্বাচনের ফলাফল দেখে হাওয়ার গতি কোনদিকে তার মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের নির্বাচকমণ্ডলী এখনও অতখানি রাজনীতি-সচেতন হয়েছে কি না বলা কঠিন। তবুও কংগ্রেসের মত শক্তিশালী ও ক্ষমতাসীন দলের তিন তিনটে উপনির্বাচনে পরাজয় একেবারে আকস্মিক এবং সাময়িক ঘটনামাত্র গণ্য করা যায় না।

আমরোহা এবং ফরাক্কাবাদ উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে কতকগুলি কারণ দেখা যায়। আচার্য কৃপালনীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসদলীয় প্রার্থীরূপে শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমের শেষলগ্নে আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণ মেনন ও শ্রীমালব্যের অবাঞ্ছিত তৎপরতা, উপনির্বাচনী প্রচারে এবং ভোট ভিক্ষায় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কলাকৌশল, সব মিলিয়ে কংগ্রেসপক্ষ এই নির্বাচনে যে ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন তাতে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ কংগ্রেসের পক্ষে বিরূপ মনোভাবাপন্ন হওয়া বিস্ময়কর নয়। আমরোহা এবং ফরাক্কাবাদে কংগ্রেসের পরাজয়ের আনুষঙ্গিক কারণ অনেকের মতে নাকি শ্রীমোরারজী দেশাই-এর স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণনীতি, জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে আমলাদের জুলুম এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি। এই ধরনের কারণগুলি আমরোহা ও ফরাক্কাবাদের নির্বাচকমণ্ডলীকে সত্যিই কংগ্রেস-বিরোধী করেছে কিনা অথবা কতখানি করেছে বলা কঠিন। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে উপনির্বাচনে কংগ্রেসপক্ষে জাতীয়তাবিরোধী কম্যুনিস্টরা দোসর হওয়ায় অনেক ভোটার, এমন কি স্বভাবত কংগ্রেসের অনুরাগী ভোটারও কংগ্রেস-প্রার্থীর প্রতি বিরূপ হয়েছে। উপনির্বাচনী দ্বন্দ্বে কংগ্রেসের বিরোধিতা করেছে একযোগে সবগুলি অকম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদী দল আর কংগ্রেসের পার্শ্বচর রূপে আসরে নেমেছে কম্যুনিস্ট দল। চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণের পর জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্টের মধ্যে সামান্যতম যোগাযোগ, সাময়িক সুবিধার জন্য বোঝাপড়াও যে বেমানান, নীতিবিগর্হিত, আপত্তিকর—কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলী আশা করি এখন সেটা উপলব্ধি করবেন।

আমরোহায় সাম্প্রদায়িকতা, কম্যুনিস্টদের সর্দারী, ফরাক্কাবাদে আমলাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ যদিও বা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ গণ্য করা হয়, রাজকোটে কংগ্রেস প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ের পিছনে প্রত্যক্ষ দুষ্কর্ম। রাজকোট ছিল দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের দৃঢ় দুর্গ, সবচেয়ে নিরাপদ নির্ভরযোগ্য নির্বাচনী এলাকা। স্বতন্ত্র দলের শ্রীমিনু মাসানি এখানে সম্পূর্ণ নবাগত, তবুও তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসপ্রার্থী বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। এই পরাজয় কেবল ভোটের হিসাবে নয়, রাজনৈতিক বিচারেও কংগ্রেস দলের পক্ষে উদ্বেগজনক।

তিনটি উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে অবশ্য কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যুক্তিসংগত হবে না। কংগ্রেস এখনও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠতার বলে ক্ষমতাসীন জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের স্থান দখল করতে সক্ষম এমন কোনও বিকল্প দলেরও আবির্ভাবের সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় না। তিনটি উপনির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী যাঁরা জয়ী হয়েছেন তাঁরা লোকসভার সদস্যরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক বিষয়ে জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হবেন সন্দেহ নাই। বিরোধীপক্ষে এর প্রয়োজনও আছে, বিশেষত বর্তমান জাতীয় সংকটকালে লোকসভায় কম্যুনিস্ট পন্থীদের প্রভাব ও প্রাধান্য খর্ব করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেসের সুবৃহৎ রাজনৈতিক ভূমিকা ও সার্থকতা ফেক্তনা নিঃশেষিত হয়নি। তিনটি উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে কংগ্রেস-বিরোধীপক্ষের খুব বেশী আশান্বিত বোধ করার সময় আসেনি।

কেন বন্ধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কটি সিক্ত নম্র জ্যোৎস্না, আনন্দিত কটি উষ্ণ রোদ
কটি ঘন অন্ধকার, দূরেকটি-বা উদাসীন তারা—
বাঁচায়ে রাখিতে চাই জীবনের কটি মূল্যবোধ
চেতনার গভীরে ইশারা—
তারি জন্যে যত বন্ধ যত এই নির্জনে পাহারা॥

ব্যঞ্জন স্বাদান্ত নুনে, অতিরিক্তে। কাজলরেখায়
অর্থোজ্জ্বল চাহনিতে অলিখিত ভাষা জাগে কেন!
দেয়ালের পরিধিতে ঘর না ফুরায়
প্রান্তে বাঁচে এক ফালি সবুজ উঠোন।
ঘাসের আড়াল হতে বোকা ফুল চায় ইতিউতি,
কারো খোঁজে কারো করে স্তুতি—
বাঁচায়ে রাখিতে চাই জীবনের স্থির দৃষ্টিকোণ,
তারি জন্যে যত বন্ধ যত এই নীরব প্রস্তুতি॥

উদ্ভাসিত উত্তোরণে

করুণাসিন্ধু দে

রাত্রিদিন খুলে আছি নগ্ন দেহে ক্লীব অন্ধকারে,
শরীর বিলোপে ক্ষীণ, দুরারোগ্য ব্যাধির মতন
বাক্‌স্ফূর্তি ঘিরে রাখে নিজের বিগ্রহ ভস্মাধারে
উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্যে, ফুলে, গুপ্তচর মন্দিরে শমন
পূজারী ব্রাহ্মণ সেজে কত নামে শোনায় পাঁচালী
ভণ্ড, নিস্তরঙ্গ রক্তে: উদ্ভাসে-উল্লাসে, কিন্তু শ্বাসে
কুটিলা মন্থরা পোষে, তাতে সুখ সাধ গৃহস্থালী,
প্রার্থিত সম্পদ কেড়ে যেন দুষ্ট দুঃসময় হাসে।

অগত্যা অনন্যোপায়, শমীবৃক্ষে ঝুলানো শবের
বিজ্ঞাপিত ভয় ভেঙে, অস্ত্রের সন্ধানে আজ যাই।
সম্মুখ সমরে, যেন বৃহন্নলা মূর্ত পৌরুষের
খাপে ঢাকা দেহ খুলে সঞ্জীবনী রোদ্দুর জ্বালাই
দিকে দিকে উত্তোরণে। কুচক্রী পাপের ছলাকলা,
আস্ফালন ছিন্নভিন্ন পলাতক: গাণ্ডীব টংকারে
তন্দ্রাতুর মোহ টুটে, নির্গমের রক্তে এ কী দোলা,
প্রদীপ্ত ফাল্গুনী আসে, অন্ধকারে অমল উদ্ধারে।

আত্মনিবেদন

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

হয়ত ফুরাবে সব ফুযালে এ-মর্ম থেকে আত্মনিবেদন।
কি থাকে হৃদয় থেকে ঝরে গেলে মুকুলিত বাতাসের কণা,
ত্রিশূলে উঁচিয়ে আসে গোলাপের মর্ম থেকে ক্রোধে অন্ধকার ..
মনে হয় খেলাচ্ছলে মাথায় পৃথিবী তুলে উদাস বাসুকি
অসম্ভব দুলে উঠছে কি খেলা জেগেছে মনে খেলার অভাবে।
জানি না এখনো কোন করবী কি যূথিকার যুগল মূর্তি
আমারে ভোলাবে কিনা, অথবা ফিরায়ে নেবে শান্ত বাতায়নে।
নিবেদন ভুলে গেলে হয়ত বা তুষারের বৃষ্টি শুরু হবে।

হে কাল, দিও না ঐ শান্ত ফুলরাশি, ঐ হিম মোমকণা
অনেক মানুষ আছে ওরা জেনে, ওরা দীর্ঘ আয়ু ভালবাসে
একটি সন্তান থাক ছারেখারে স্তবে মৃত্যুর সাক্ষাৎ নিনাদে;
পদযুগ ধরে দীপ্ত কটি কণ্ঠা উন্মূলিত করে, কিন্তু তাকে
সযতনে নিপাত যাক। ক্ষোভ নাই যদি ঐরাবত ক্রুদ্ধ আসে
পদচাপে পিষ্ট করে শুঁড়ে তুলে ছুঁড়ে দেয় কন্টক ডিঙিয়ে।

ভারতের আরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু ভারত সরকার ঠিক কী চান এবং যাঁরা সাহায্য দিতে পারেন—তাঁদের মধ্যে মার্কিন ও বৃটিশ গবর্নমেণ্টই প্রধান—তাঁরা কী দিতে চান এবং কী শর্তে

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন

দিতে চান, সে সম্বন্ধে নানারকম সংবাদ গুজব এবং খবরের কাগজে জল্পনাকল্পনা চলছে। একাধিক মার্কিন এবং বৃটিশ বিশেষজ্ঞের দল ভারতবর্ষ ঘুরে গেছেন ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁদের আলাপ আলোচনাও হয়েছে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরাও এই ব্যাপারে নিয়ে বিদেশে কম যাতায়াত করেন নি। [illegible] ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা [illegible] আছেন। এর ওপর মন্ত্রীর সফর। শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী কিছুদিন [illegible] নিযুক্ত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে অবশ্য যা পাওয়া যেতে পারে সেটা খুব বেশী নয়। সবচেয়ে বেশী যে দিতে পারে সে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তারপর বৃটেন। শ্রী কৃষ্ণমাচারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকদিন তদ্বির করে এখন বৃটেনে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী আরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা, কো-অর্ডিনেশন রক্ষার জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। সামরিক সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁকে বিদেশী গবর্নমেণ্টের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্য পাঠানো হয়ত অযৌক্তিক নয়। তবে এ ব্যাপারে আরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচাবনকে আরো বেশী সামনে দেখতে পেলে বোধ হয় ভালো হতো। শ্রী কৃষ্ণমাচারী পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি খুব অভিজ্ঞ এবং 'স্মার্ট' লোক সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি আরক্ষা-মন্ত্রী

[illegible]ন নন এবং তাঁকে আরক্ষা-মন্ত্রী করা হলে সেটা দেশের খুব মনঃপূত হত কিনা সন্দেহ। সে যাই হোক, যিনি আরক্ষা-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত, এ বিষয়ে তাঁরই সামনে থাকা উচিত। কারণ, আরক্ষা ব্যবস্থার জন্য মন্ত্রী হিসাবে তাঁরই দায়িত্ব। শ্রীকৃষ্ণমাচারীর ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা আছে, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর কাজও করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'স্মার্টনেস্' বা ব্যবসায়ী বুদ্ধির চেয়ে বোধ হয় অন্য গুণের প্রয়োজন বেশী। 'চালাক চতুর' ভাব কুশলী তার্কিক বা ওকালতি বুদ্ধি—এসবের দ্বারা এখানে কার্যসিদ্ধি হবে না। তার চেয়ে 'সাদামাটা

লোক নিয়ে এ ক্ষেত্রে বেশী কাজ হতে পারে, যাঁর সংগে কথা বলে ভারত কী চায়, কতখানি আন্তরিকতার সংগে এবং তার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছে, সেটা বুঝতে লোকের দেরি হবে না। সেদিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, শ্রীচাবনের সংগে আলোচনায় বিদেশীদের মনে ভারতের ইচ্ছা এবং প্রয়োজনের রূপটা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারত এবং হয়ত অধিকতর সহানুভূতির উদ্রেকও হতো।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অভ্যাস অন্যরকম হয়ে গেছে। মিহি চালের অলঙ্কারে বড়ো বড়ো কথাকে সাজিয়ে বলতে পারার দক্ষতাকে আদর করাই আমাদের রেওয়াজ হয়ে গেছে। অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'পোজ্ মারা'ও একটা কাজ এবং তার জন্য ঐরূপ দক্ষতারও কিছু মূল্য আছে। কিন্তু সেইটাই একমাত্র কাজ নয় এবং আসল কথা নয়। কারণ দেখা গেছে যে, 'পোজ্ মারার' অতুলনীয় দক্ষতা সত্ত্বেও আসল কাজে ফাঁকি পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যেখানে কিছু না করা দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া বা ধোঁয়া সৃষ্টি করাই লক্ষ্য সেখানে 'পোজ্ মারো' চলতে পারে, কিন্তু যখন বাস্তব এসে টুঁটি চেপে ধরে তখন যে যত বেশী স্পষ্ট হতে পারে, সে তত বাঁচবার আশা করতে পারে।

স্পষ্ট হতে হলে কোনো বিষয়ের মূল কথাটাকে বা কথাগুলোকে অলংকার-বর্জিতরূপে তুলে ধরতে হয় যাতে দৃষ্টিটা তার উপরই নিবদ্ধ হতে পারে। বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে যেগুলো মূল কথা বা যেগুলো মূল কথা হওয়া উচিত, সেগুলো এখনো স্পষ্ট নয়। বিদেশী গবর্নমেন্টের সংগে ভারত সরকার অনেক বিষয়ে আলোচনা করতে বাধ্য

উৎপাদন ও সংযোগমন্ত্রী শ্রীটি টি কৃষ্ণমাচারী

হয়েছেন। সে আলোচনায় ভারত সরকার সাই বলতে চান বা না চান, যাঁদের সংগে আলোচনা হয়েছে তাঁরা ভারত সরকার কী চান বা ভারত সরকারের পলিসি কী, সে বিষয়ে একটা ধারণা করে নিয়েছেন তাঁদের তুলনায় ভারত সরকারের স্বদেশবাসীরা এখনো একটা কুয়াশার মধ্যে আছেন। কারণ মার্কিন বা বৃটিশ গবর্নমেন্টের সংগে ভারত সরকার যে গোপন আলোচনা করেন বা করতে বাধ্য হন তা জ্ঞাত হওয়া থেকেও ভারতবাসীরা বঞ্চিত। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে সামরিক সাহায্য যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা বিদেশী হলেও তাঁদের কাছে যেসব কথা প্রকাশ করতে হয়, সে-সব কথা স্বদেশবাসীর নিকট খোলাখুলি প্রকাশ করা যায় না। তবে এ কথা সামরিক কলাকৌশল বা 'স্ট্র্যাটেজি' সংক্রান্ত তথ্য সম্বন্ধেই খাটে, পলিসির মূল কাঠামোর সম্বন্ধে নয়।

যেরূপ সংবাদাদি কাগজে বেরুচ্ছে, তা থেকে মনে হয় যে, ভারত সরকার যে ধরনের বা যে পরিমাণে সামরিক সাহায্য চাচ্ছেন, পুরোপুরি সেই ধরনের বা সেই পরিমাণে সাহায্য মার্কিন বা বৃটিশ গবর্নমেন্ট দিতে রাজী হচ্ছেন না। তার কারণ কতটা টেকনিক্যাল, কতটা রাজনৈতিক, এ-সব বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে না। পাকিস্তানের সংগে ভারতের বিবাদ না মিটলে ভারত যতটা সাহায্য চায়, ততটা সাহায্য ভারতকে দেওয়া হবে না বলে পাকিস্তান চাপ দিচ্ছে এবং সে চাপ বৃথা হচ্ছে না—এই ধরনের নানা কথা রটছে। আবার এ কথাটাও কিছুদিন আগে শুনা গিয়াছিল যে, কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার প্রয়োজনীয়তার উপর মার্কিন সরকার জোর দিচ্ছেন বটে কিন্তু ভারতকে সামরিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারের সংগে ঐ প্রশ্নের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। আবার কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেলেই এবং পাকিস্তানের আপত্তি না থাকলেই যে ভারত সরকার যা চান সমস্তই আমেরিকা বা বৃটেন দেবে এমন কোনো কথা নেই।

ভারতবাসীর মুশকিল হয়েছে এই যে, ভারত সরকার যে কী চান, সেটাই এখনো দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট নয়। কী চাই -বুঝতে হলে কী চাই না সেটাও পরিষ্কার হওয়া দরকার। সামরিক সাহায্য নেওয়ার দুটো দিক আছে—একটা অদূরভবিষ্যতের অর্থাৎ 'শর্ট টার্মের' দিক আর একটা দূরের অর্থাৎ 'লং টার্মের' দিক। এ ক্ষেত্রে এই 'শর্ট টার্ম' ও 'লং টার্মের' সংজ্ঞা কী হবে, সেটা অনেকটাই বিশেষজ্ঞরা স্থির করবেন। কিন্তু 'শর্ট' বা লং টার্ম'-এর পরিকল্পিত
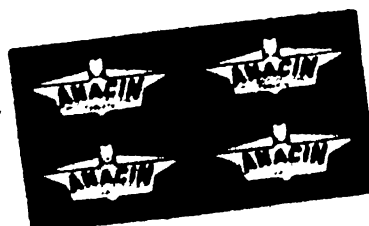
মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ কেনেডি

আয়োজনের উদ্দেশ্য কী তা সাধারণ মানুষেরও বোঝা দরকার। চীনাদের লং টার্ম উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে আমাদের সরকারী কর্তারা এখন স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মায় ভারত পর্যন্ত কম্যুনিস্ট চীনের আওতায় আসবে—এই হল পিকিং এর মতলব। সেই মতলব হাসিল করার জন্য চীনের বিপুল সামরিক শক্তি সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই সামরিক শক্তির উদ্দেশ্য স্মরণে রেখে ভারতের সামরিক শক্তির সংগঠন আবশ্যক এবং তার জন্য বিদেশী সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে —এইটা হল 'লং টার্ম'-এর দিক। কিন্তু সাধারণ মানুষ 'শর্ট টার্ম' এর কথা বেশী ভাবে এবং অনেক সময়ে শর্ট টার্ম' ও 'লং টার্ম' এর মধ্যে প্রভেদটা বুঝতে পারে না। সেটা সাধারণ লোকের ভুল সব সময় তাও বলা যায় না। কারণ শর্ট টার্ম এর ভয়ের গৌরবের কিছুটা এবং একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্তের কিছুটা পরিবর্তন করবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু চীনাদের সোয়ানো যায়নি। গত বছর চীনারা যে আর এগোয় নি, তার কারণ কি আমেরিকা ও বৃটেন থেকে সাহায্য আসছে সুতরাং আর এগুলে বিপদ, এই ভেবেই কি চীনারা আর অগ্রসর হয়নি? তাই যদি হয়, তবে বিদেশী সাহায্য যখন আসতে লাগল, তখন তার উপর নির্ভর করা গেল না কেন? নির্ভর করা গেলে চীনাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে তাদের আরোপিত একতরফা যুদ্ধ-বিরতির শর্ত মেনে নেওয়ার তো দরকার ছিল না। অথবা সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে তখন চীনাদের শর্তে যুদ্ধবিরতি স্বীকার না করে উপায় ছিল না। কারণ, যে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র আসতে আরম্ভ করেছিল, সেগুলো কাজে লাগিয়ে লড়াই করে চীনাদের হটাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই যদি হয়, তবে এখন যে বিদেশী সামরিক সাহায্য সম্পর্কে 'শর্ট টার্ম'-এর কথা বলা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য কী?

যুদ্ধ করে চীনাদের হটাবার কথা বোধ হয় ভাবাই হচ্ছে না। চীনারা যদি আক্রমণ করে তা হলে তাদের ঠেকানো যাবে এইটাই বোধ হয় শর্ট টার্ম সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্য। কিন্তু চীনারা যদি আগের চেয়ে আরো জোরে [illegible] ঠেকাতে হলে যে ব্যবস্থার দরকার সে ব্যবস্থা কত দূর হয়েছে? চীনাদের পরাজিত করতে হলে কি কেবল অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির আশ্বাসের উপর নির্ভর করা যায়? এখনো তো 'শর্ট টার্ম'-এর রূপটা ঠিক কী হবে তা স্থির হল না। আর পাঁচ বছর যদি চীনারা আক্রমণাত্মক ভাব কিছু না দেখায় তবে আলাদা কথা। কিন্তু দু মাসের মধ্যেও তো তারা কিছু করে বসতে পারে। লাদাকে বা নেফায় কিছু না করে ভুটান সিকিমেও তো কিছু করতে পারে। তখন কী হবে শর্ট টার্ম এর পরিকল্পনায় এর জন্য কী ব্যবস্থা আছে? চীনারা যদি কোনো জায়গায় অল্প বহরের আক্রমণ

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান

চালায় তা হলে কি সেখানে তাদের জয়ী হতে দেওয়া হবে না সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বাধা দেওয়া হবে? সেই অবস্থায় বিদেশী সাহায্যের সীমা কীভাবে নির্দিষ্ট করা হবে? সোজা কথা, তখন আমেরিকা বা বৃটেনকে কি কেবল সাহায্যদাতা হিসাবে দেখা হবে, না তাদের কূটনৈতিক ভাষায় মিত্র 'এলাই' বলে গণ্য করা হবে? কী করা উচিত বা অনুচিত সেটা বিচার্য বিষয় হতে পারে, কিন্তু আমরা কী চাইছি এবং কী করছি, সেটা আগে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

৩১।৫।৬৩

আহ্বান উপেক্ষা ক'রে উপর-তলায় জল খাবার জন্য উঠছি, এক বুড়ো পাকিস্তানী বেশী দামে ভারতীয় নোট কেনবার প্রস্তাব করল। সান্যাল মৃদু হেসে জানালে, ভারতীয় নোট নেই।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিচ্ছি, মাইকে ঘোষণা হ'ল কি যেন অস্পষ্টভাবে। পরে স্পষ্ট শুনলাম আমাদেরকে ডাকছে, কুটুস ভড়কে গিয়ে কাঁদছে ব'লে। প্লেনে উঠলাম, দেখলাম জল-ভরা চোখে কুটুস, একটু একটু ফোঁপাচ্ছেও। আমাদের দেখে বলল, 'ভয়!' আমরা ওকে ফেলে রেখে চলে গেছি ভেবেছিল। তারপর ওকে আমরা খেপাতাম, 'তোমার আসল বাপ-মা ফেলে পালিয়েছে করাচীতে, আমরা নকল।' প্রথমে কাঁদতো, পরে বুঝেছিল চালাকি।

পরদিন সকাল আটটায় নাবলাম মক্ষিকা-পরিপূর্ণ অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় এডেন বিমানবন্দরে। দুই ঘণ্টা প্রতীক্ষা করতে হবে। আমাদের পরিচয় হ'ল ইথিওপীয়া-যাত্রী আরও একজন শিক্ষকের সাথে, মহারাষ্ট্রীয়, নাম শ্রীসাঠে, সাথে রয়েছে স্ত্রী ও দশমাসের শিশুপুত্র। আমরা এয়ার-পোর্টের বাইরে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। দূরে বালুচর ধূসর পাহাড় ও সেটাকে ঘিরে উড়ন্ত ও দাঁড়িয়ে থাকা এরোপ্লেন নজরে এল। ধুধু হাওয়া, বালি ছিটোচ্ছে।

এডেন এয়ারওয়েজের ছোট প্লেন এল; গন্তব্য ক্রিবুটি। উড়লাম দূরের 'কন্টীর্ণ' চর ছেড়ে চেড়ে বিন্দু ও ক্রমে বিলীন হয়ে গেল। বেলা ১২টায় ক্রিবুটি ফ্রেঞ্চ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী, লোহিত-সাগরের তীরে। গরম অসম্ভব। আমাদের পরিবর্তন করতে হল না। বুক ধড়ফড়ানি। কিন্তু এয়ারপোর্টের কাছেই একটা ঠাণ্ডা ছিল এক গ্লাস বৃষ্টি হয়ে যাবার জন্য।

এখানে আরও দুজন একই পথের যাত্রী ওঁদের সাথে দেখা হ'ল: একজন মন্ত্রী নাম কে কে পুরবেজো আর একজন ক্যাডিগ শ্রীরামচন্দ্র শর্মা। সান্যাল বলল, বাংলায় প্রবাদ রয়েছে, 'যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামশর্মা।' শর্মা বললে, 'হাসতে কি কাঁদতে যাচ্ছি কে জানে।' দুজনের কারও সঙ্গে পরিবার নেই। বেশ জমে গেল এরা।

প্লেন এল কিন্তু কার্গো, ইথিওপীয়ান এয়ারলাইন্স (ই এ এল) ও 'লায়ন অফ জুডা' চিহ্নিত। বেলা তিনটেয় উড়ল। ঝাঁকুনিতে গায়ে বেদনা ধরে গেল। প্লেনে চড়ার আনন্দ সবাইয়ের ঘুচে গেল। বেশির-ভাগ যাত্রী বিশেষ ক'রে কয়েকজন কিশোর ছাত্র বমি করতে লাগল কাগজের থলের মুখ রেখে। আসবার সময় সান্যালের জনৈক বন্ধু মে অ্যান্ড বেকারের সেলস ম্যানেজার মিঃ সীতারাম আইয়ার আমাদেরকে এভোমিন ট্যাবলেট দিয়েছিল, তাই আমাদের বমি হ'ল

না। কিন্তু মাথায় যন্ত্রণা হ'তে লাগল, কুট্রুস তরে আমার বুকে মুখ গ'ুজল; সান্যাল বললে, 'মাথায় পাশের শিরা ছি'ড়ে যাচ্ছে যেন।' সাহেব বাচ্চাটার রক্তআমাশা হ'য়ে গেল। আমি এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে দিলাম। পাশের যাত্রীও ভারতীয়, গুজরাটি ব্যবসায়ী, নাম শান্তিভাই কান্তিলাল কি শান্তিলাল কান্তিভাই ঠিক মনে পড়ছে না। ভদ্রলোক ইথিওপীয়া সম্বন্ধে নানারকম খবরাখবর দিয়ে বকে চলাতে কষ্টের কিছু লাঘব বোধ হচ্ছিল।

ডিরে ডাওয়া এয়ারপোর্টে প্লেন নামল। একগাদা হাবশী মেয়ে কিচ মিচ করতে করতে উঠল প্লেনে। এদের বিশাল কালো চেহারা ও কোঁকড়ানো চুল দেখে বুকের ভেতর ঢিব ঢিব করতে লাগল। এখানেও দেখলাম ধূসর ও লাল পাহাড়; এখনও সবুজ চোখে পড়ল না। বিরাট প্রান্তর, জানি না কোথায় চলেছি।

প্লেন হাজার-বারো ফুট উপরে উঠে আবার নীচে নামতে লাগল। নীচের লাল ও সবুজ মাটির টুকরো নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র তালি দেওয়া 'নকশীকাঁথার মাঠ' যেন। (ক্রমশ)

শিল্পীর স্বাধীনতা

গৌরকিশোর ঘোষ

আমার কাছে স্বাধীনতা কথাটার একটা স্পষ্ট অর্থ আছে। সেই অর্থটি আমি যা বুঝি তা এই—মানুষের মধ্যে যে-সব সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, সেই সম্ভাবনাগুলির বিকাশের অন্তরায় দূর করা। এই সম্ভাবনা যেমন অনন্ত, তার বিকাশের পথে বাধাও অজস্র। প্রতিনিয়ত এই বাধা ঘোচাবার চেষ্টা মানুষকেই করতে হয়। শিল্পীকে তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য রক্ষার জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করতে হয়।

এই বাধা আবার দুই ধরনের। একটা ভিতরের বাধা, আরেকটা বাইরের। আমার অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, সংস্কার, আমার ভয়, আমার লোভ, আমার বিভ্রান্তি, আত্মসন্তুষ্টি আমার স্বাধীনতা হননের জন্য সর্বদা ওৎ পেতে বসে আছে। মানুষ হিসেবে শিল্পী হিসেবে এ-সবের সঙ্গে নিরত আমার লড়াই চলছে। এ লড়াই প্রচ্ছন্ন, এর পরিচয় আমার সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এর জন্য বিশেষ করে আমাকে কারও কাছে নালিশ ঠুকতে হয় না। সে আমার নিজের যন্ত্রণা।

কিন্তু যে বাধা বাইরে থেকে চাপে, সমাজ চাপায়, রাষ্ট্রীয় যন্ত্র চাপায়, তার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে। প্রতিপক্ষ প্রবল বলেই এর বিরুদ্ধে শিল্পীর সংগ্রামের চেহারাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে, লোকে ব্যাপারটা জানতে পারে।

সৃজনীশক্তি যে মানুষের সহজাত এ কথাটা প্রগতিশীল সভ্যতার কাছে এখন তর্ক করে বোঝাতে হয় না। মানুষের ইতিহাস নিজেই এ কথার প্রমাণ দেবার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। তবে পাশাপাশি এই সৃজনীশক্তির রূপভেদ ঘটে। তাই এখনকার কালে আমরা সবাইকে আর 'শিল্পী' বলিনে। যে-সকল ব্যক্তির প্রতিভায় চৌষট্টি কলার কোনটা না কোনটা বিশেষভাবে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে তাদেরই আমরা 'শিল্পী' এই সংজ্ঞাটির দ্বারা চিহ্নিত করেছি। মানুষের আদি সমাজে সকলেই নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করত, পিছিয়ে-থাকা সমাজে এখনও এ রীতি চালু আছে। কিন্তু সভ্যতর সমাজে গায়ক ও নর্তক স্পেশ্যালিস্ট—তাঁরা 'শিল্পী'।

মানুষের ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক ভাবনা, ধারণা এবং বোধের জন্ম দিয়েছে আর এই ভাবনা, ধারণা এবং বোধই ব্যক্ত হচ্ছে বিচিত্র সৃষ্টিকার্যে। ভাবনা ও ধারণা, যাকে ইংরাজিতে আইডিয়া বলে, কেমন করে যে স্ব-অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষকে ভবিষ্যতে প্রবেশ করতে পথ দেখায়, সে একটা আশ্চর্য রহস্য। কিন্তু সত্য। মানুষের ভাবনা, ধারণা এবং বোধই যুগে যুগে সমাজে ও রাষ্ট্রে, শিল্পে, সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে—যে বিজ্ঞান উৎপাদনের চরিত্র বদলে দেয়—রূপান্তর ঘটায়। তারই ফলে সভ্যতার পরিবর্তন ঘটে।

অর্থাৎ এত সব কাজের কাজী সেই একটি ক্রিয়া—মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ। মানুষের সৃজনী শক্তির অভিব্যক্তিই হচ্ছে সভ্যতা। সেই কারণেই, যখন মানুষের চিন্তার স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ বসে—সে নিয়ন্ত্রণ ধর্মের গোঁড়ামির জন্যই হোক বা ইতরের শাসানির জন্যই হোক—অথবা ভাবনা, ধারণা ও বোধের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ শুরু হয় তখনই সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে আসে। যেমন এখন এক নিদারুণ সংকট ঘনিয়ে এসেছে।

এ যুগের সভ্যতার সর্বপ্রধান বালাই হচ্ছে [illegible] মানুষ। এ সংকটের মূল কারণ ব্যক্তি তার অনন্যতা (আইডেন্টিটি) হারিয়ে ফেলছে, নিজের উপর আস্থা হারাচ্ছে,

মিশে যাচ্ছে [illegible] জনতা নামক এক পিণ্ডের মধ্যে। সং শিল্পীর পক্ষে এ এক ভয়াবহ অবস্থা। সৃজনীশক্তি যে-মানুষের সংস্কৃত, সে কিন্তু ব্যক্তি মানুষ, জনতা-পিণ্ড নয়।

শুধু যে ডিক্টেটরী (কম্যুনিস্ট বা অন্য যে কোন প্রকারের হোক) শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ ঘটেছে তা নয়, আক্ষেপের কথা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও ব্যক্তি তার অনন্যতা বা বা আইডেন্টিটি বজায় রাখতে পারছে না। ব্যক্তিকে নিজের ভাগ্য জয় করে নেবার যে মহৎ প্রতিশ্রুতি গণতন্ত্র একদিন দিয়েছিল, আজ দেখা যাচ্ছে, বহু ঘটনার প্রভাবে পড়ে, গণতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তি-মানুষও অসহায়ভাবে গড্ডল স্রোতে গা ভাসিয়ে ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে বসে আছে। সে আজ গ্রীক পুরাণের নায়ক ইউলিসিস।

যে গণতন্ত্রের ধ্বনি ছিল 'অব দি পিপ্‌ল, ফর দি পিপ্‌ল, বাই দি পিপ্‌ল', সেই গণতন্ত্রের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্মে এখন পিপ্‌লের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকায় গণতন্ত্র ক্রমশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফর দি পিপ্‌ল। আপন ভাবনাকে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তৈরি করার ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে না রেখে ব্যক্তি তা সমর্পণ করছে পেশাদার রাজ-নীতিকদের পায়ে। আর তারপর তাদের মর্জির ক্রীড়নক হয়েই থাকতে হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষকে। ভোট দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সম্রাট এবং পর মুহূর্তেই যে-কে-সেই। কেন্দ্রীভূত রাজনীতি এবং অর্থনীতি প্রবল ধাক্কা মেরে মেরে ব্যক্তি-মানুষকে ক্রমশ জনতা-পিণ্ডে পরিণত করে তুলছে এবং মানুষের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় গণতন্ত্রের এই বিপদটি সম্পর্কে সকলেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এ কথা বোঝা প্রয়োজন, আমরা ক্রমশ বড় বড় উৎপাদন যন্ত্রের দাসে পরিণত হচ্ছি। রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন কর্মে আমার ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারছি না, শুধু সম্মতি দিয়েই অবসর নিচ্ছি। এমন কি ব্যক্তিগত জীবনে আমি কোন বিষয়ে আমার নিজের মতামত গড়ে তোলার ফুরসৎও যে একটা পাচ্ছি না। সুসংগঠিত প্রচারের বিজ্ঞানসম্মত মাধ্যমগুলোর দক্ষতায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত মতগুলো আমার মানস চেতনায় প্রতিনিয়ত প্রভাব ফেলছে। অজ্ঞাতসারে আমার মতা-মতও কতকাংশে নির্ধারিত হয়ে উঠছে। অর্থাৎ নানা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পর-নির্ভরতা বেড়েই চলেছে।। স্বাধীনতাকামী ব্যক্তির পক্ষে অবস্থাটা অভিপ্রেত নয়। শিল্পীর পক্ষে তো নয়ই।

তবে কি ব্যক্তির স্ফূর্তির পথে বাধা সৃষ্টির দিক থেকে না। গণতন্ত্র তার একনায়কত্বের তুলনায় তুল্যমূল্য? ডিক্টেটারশিপ এবং ডেমোক্রেসি, এই দুই শাসনতন্ত্রের বা রাষ্ট্রব্যবস্থার একটিকে বেছে নেবার ভার আমাকে দেওয়া হয়, আমার রায় বিনা দ্বিধায় গণতন্ত্রের পক্ষেই যাবে, সে গণতন্ত্র যদি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক হয়, তবুও। যতদিন পর্যন্ত না গণতন্ত্রকে মূল থেকে সংগঠন করা যাচ্ছে, যতদিন পর্যন্ত না ব্যক্তিকে নিজস্ব জগত সৃষ্টির কর্মে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করাতে পারা যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপটিকে অন্তত বজায় রাখতে হবে।

কারণ প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রেও, ব্যক্তির অবক্ষয় ঘটতে থাকলেও, ব্যক্তি-মানুষই যে গণতন্ত্রের ভিত্তি এ কথাটি স্বীকৃত। তাই নিঃসংকোচে গণতন্ত্র সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয় প্রকাশ করার স্বাধীনতা, গণতন্ত্রকে পুনর্গঠনের স্বাধীনতা, এমন কি গণ-তন্ত্রকে নিকেশ করার স্বাধীনতাও গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মঞ্জুর করা হয়েছে।

রাষ্ট্র নয়, পার্টি নয়, কোন [illegible] ব্যক্তি-মানুষ—সব [illegible] কিছুরই [illegible] কেন্দ্র, সবার উপরে মানুষ সত্য [illegible] মানুষের জন্যই [illegible] প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের [illegible] সমাজের বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মানুষ সৃষ্ট হয় নি, এ কথা আমি [illegible] নির্ভয়ে ঘোষণা করতে পারছি! পারছি কারণ আমি এক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বাস করছি। একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থায়, আমি জানি, এই ঘোষণা বরদাস্ত করা হত না। সেখানে এই ঘোষণাকে পার্টি তথা রাষ্ট্র নামক বিমূর্ত এক ধারণার প্রতি রক্ত-মাংসে গঠিত এই ব্যক্তি-মানুষটির বিদ্রোহ বলেই সাব্যস্ত হত। এবং বিচারে এই [illegible]কে কঠোর সাজা দেওয়া হত।

একনায়কত্বকে আমি ব্যক্তিসত্তার ঘাতক বলেই মনে করি। তাই তার সম্পর্কে আমার এত ত্রাস। কম্যুনিজম মানুষকে মন-ভুলানো যত প্রতিশ্রুতিই দিক, একনায়কত্বই তার অনিবার্য পরিণতি। স্বাধীনতা আর একনায়ক—একের বিনাশেই অপরের প্রতিষ্ঠা।

'আজও হল না রে—' বিজয়কে সিঁড়ির মোড়ে দেখতে পেয়ে বেড থেকে উঠে এল তরঙ্গ। 'মাগটা [illegible] [illegible] কেউ এলে [illegible] সংগে কপড়-চোপড় দিয়ে [illegible]'

'[illegible] বেড়ে [illegible]'

তরংগর মুখ লাল হয়েছে [illegible] হল না। আজ সকাল [illegible] তরংগর অপারেশন হওয়ার কথা ছিল। এর আগে সব ঠিকঠাক করেও দুবার অপারেশন পিছিয়ে দিতে হয়েছে। কাটাছেঁড়ার নামে মাথায় রক্ত উঠে যায় তরংগর।

'না-না। ঐ যারা অজ্ঞান করে—'

'অ্যানাসথেসিস্ট।'

'তাদের ত সব নিয়ে গেল—'

সকালে ইনডোরে ঢোকা বারন। তার ওপর ফিমেল ওয়ার্ড—পেশেন্টের এখন-তখন কিংবা অপারেশন থিয়েটারে নেবার হলেই কেবল দরজায় দাঁড়াতে দেয়। 'সরে এস—'

ডাক্তার দেখলে বকুনি দিতে পারে। তরংগর আসতে সময় নিল, 'কত রক্ত গেল—বোতল বোতল।'

যে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তার ওপরে লেখা, 'সেপারেশন রুম।' ক'দিন আগে তরংগও এখানে এসেছিল। থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার [illegible] জামা পরানো—'সন্ধ্যার পাউডার মাখিয়ে ছোট চুল চিরুনি [illegible] সুন্দর করে দিচ্ছিল—অজ্ঞান করে [illegible] আগেই [illegible] [illegible] ধাঁ ধাঁ করে [illegible] [illegible] তরংগকে আবার বেডে ফিরিয়ে [illegible]

[illegible]

[illegible]

'ঐ একই—[illegible] বয়সীরা পটাপট মরে যায় [illegible]—'

এতদূর [illegible] আসেনি। শীতে [illegible] ঠাণ্ডা থাকে—হাসপাতালের ত আরও। বিজয়ের পায়ে জুতো থাকলেও তরংগর দাঁড়ান দেখে বুঝতে পারছিল। 'স্যাণ্ডেল পরনি? কত রকম ইনফেকশন—'

ওসব কথার ধারপাশ দিয়ে গেল না তরংগ, 'আচ্ছা, খুব দুঃখ হচ্ছে?'

বিজয় কিছু বলল না। পা থেকে মাথা অবধি দেখল একবার। তরংগকে তার দেওরপো বিজয়দের বাড়ি নিয়ে গেছে।

'অথচ আমরা দিব্যি টিকে আছি—!' দোতলায় দাঁড়িয়ে দুজনেই দেখতে পেল একখানা অ্যাম্বুলেন্স মাথা নীচু করে চুপচাপ গাড়ি বারান্দায় ঢুকছে, 'সব কটা ওয়ার্ড দেখ—বুড়োবুড়িতে ভর্তি। বারো নম্বরের ফরসা ঠাকুমা কাল বিকেলে চায়ের সংগে বিস্কুটের বায়না ধরেছিল—যেন্না! যেন্না!'

[illegible] চুল ছোট করে ছাঁটা—না হলে তরংগর বয়স এমন কিছু না হয়ত [illegible] একেবারে [illegible] পরান্ত [illegible] না বলে না থাকবার মত একটুখানি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের

'উপন্যাসে [illegible] না হলেও মনে হয় যেন লেখক নিজের কথা বলছেন। অর্থাৎ অনিল আর পুতুল যেন লেখক আর তাঁর স্ত্রী কিংবা পাঠক ও তাঁর স্ত্রী বা পাঠিকা ও তাঁর স্বামী, এমনকি সমালোচক বা তাঁর স্ত্রী হওয়া অসম্ভব নয়।' অনেকটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত '[illegible]' বলেছেন আনন্দবাজার। এমন সার্থক উপন্যাস তরুণ লেখকদের মধ্যে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম লিখলেন।

অনিলের পুতুল

মানস গ্রন্থাবলী। ৫১ ১ তবলা, সি ব্যানার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে তিন টাকা।

(সি ২২০২)

পড়ে আছে শাড়িতে। পেটে টিউমার হয়েছে তরংগর।

অনেক কিছু একসংগে বলতে যাচ্ছিল বিজয়। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'নাও শুয়ে থাকো গে—ওষুধপত্তর কিছু লিখে দিল ?'

তরংগর মুখ খানিক কালো হয়ে গেল। বেড ভাড়া রোজ তিন টাকা, সরকারী আর ফুলমণির জন্যে প্রায়ই দু' আনা চার আনা —তার ওপর অপারেশনের জন্যে রক্তটক্ত আর অন্যসব নিয়ে প্রায় শ'খানেকের ধাক্কা। দাদার হাতে পয়সা কোথায়। বউদির এ ছেলেটা এগিয়ে না এলে জীবনে তার হাসপাতালে আসা হত না। ভর্তির দিন ইস্কুলও কামাই গেছে বিজয়ের—তারপরে আবার দাঁড় করিয়ে রেখে এই গুচ্ছের কথা'— তাড়াতাড়িতে বলল 'কি সব টাবলেট খেতে বলেছে—'

অপারেশন বন্ধ রেখে অজ্ঞান করানোর জন্যে অ্যানাসথেসিস্টরা গেছে ফিল্ড হাসপাতালে বোতল বোতল রক্ত গেছে মাঝপথে এক্সপ্রেস-মেল থামিয়ে জংশন দিয়ে দিনরাত স্পেশাল গেছে। বাহাত্তর ঘণ্টা একটানা প্লেন একখানার পেছনে আর একখানা পর পর আকাশে উঠে কাত হয়ে উত্তরে উড়ে গেছে।

হাতছাড়া হল সোমবার। পংগপালের মত নেমে আসছে। ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। এসব কাজ বেশী বাড়ের ব্যাপার। তারপর এতক্ষণ কি হল, কাল সকালের আগে মরে গেলেও তা জানার উপায় নেই।

বেডে গিয়ে বালিশ উঁচিয়ে একখানা কাগজ নিচ্ছে তরংগ। এবারে এদিকেই আসছে।

কতদিনে তাহলে অপারেশন হবে। বেশী দিন পড়ে থাকলে পেট যদি দম দিয়ে পেকে ওঠে। তারপর যেভাবে ওরা আসছে তাতে ওদের দু'একখানা পাখি নেমে এসে দু'একটা যদি নীচে ফেলে—কোথায় থাকবে হাসপাতাল, অক্টারলোনির খুঁটি, মনুমেণ্ট বড় বড় বাড়ি—সব যে একখানার গায়ে আরেকখানা লেগে গড়াগড়ি খাবে। বিজয় পরিষ্কার বুঝল সে-অবস্থায় তরংগর অপারেশন মাথায় তুলে রাখতে হবে। সরে যাওয়ার সময় তরংগকে নিয়ে সরাও মুশকিলে দাঁড়াবে।

ডাক্তার ডাক্তার অপারেশনটা কোনরকমে হয়ে যেত।

'এই নে। মিকশ্চার দিয়েছে খেতে—'

'সে ডাক্তার দেখবে খন। তুমি শোও ত।'

'হ্যাঁরে—নপুর থেকে কোন চিঠি এসেছে ?'

বিজয় মাথা নাড়ল।

'কেউ এসেছিল ?'

'কে আবার আসবে ?'

বিজয়ের মুখ দেখে তরংগ থেমে গেল। 'চার মাস হল একটা খবর নেই— [illegible] চার বছরেও কেউ খোঁজ নেবে না। [illegible] উঠে চোখে জল [illegible] তরংগ ঘুরিয়ে [illegible], '[illegible] ওর কে কেমন আছেন।'

ওরা সবাই ত এক দেওরপোকেই দেখেছে বিজয়। বাকি যারা তারা কেমন একজনকে দেখে [illegible] বুঝে নিয়েছে বিজয়। [illegible] এত নতুন [illegible] কিছু ঘটে গেছে [illegible] একদম বিশ্বাস [illegible]। [illegible] ঠিক করে মুখটা [illegible]। [illegible] চেষ্টা করল বিজয়।

'ওরা কেমন রে ?'

বিজয় চমকে তাকাল। তরংগর দেওরপো-রা কেমন তা বিজয় জানবে কি করে। এই ত প্রথম দেখল।

'খুব গোঁয়ার গোবিন্দ ?'

বিজয় তখনও তাকিয়ে আছে। তরংগ তার হাতের ব্যাগটা নিয়ে আগে নুনের পুঁটুলিটা সরিয়ে রাখল, কোন রান্নায় যদি নুন দেবে 'কাল সারারাত দিদিমণিরা দৌড়োদৌড়ি করল—কত যে ব্যান্ডেজ গোল কি বলব তোকে—খুব খুনে ওরা ?'

কাদের কথা বলছে তরংগ—? কাল সকালে কাগজ না দেখলে ত বোঝা যাবে

মা কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কাল আবার ট্যাংক এনেছে।

'যারা এসেছে তারা সৈন্য ত। কিছু কড়া হবেই।'

'কারা পাঠায় রে এদের? কেমন তারা—?' তরঙ্গ কি ভেবে থেমে গেছে। বিজয় তাদের একজনকে দেখে সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে ভিড়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছিল সবার সংগে। সাঁ করে গাড়িতে বেরিয়ে গিয়েছিল। ছবিতে দেখেছে—সাদাসিধে।

বিজয়ের লজ্জা করছিল। তার কথায় তরঙ্গার মুখ যখন কালো হয়—আবার হাসিও ফোটে তখন আর একটু সাবধানেই কথা বলা উচিত ছিল। এখন অপারেশন পিছিয়ে গেল। ফিরে ব্লাড টেস্ট করে প্রেশার নিয়ে সব গুছিয়ে করে যে অপারেশন হবে তার ঠিক নেই।

'একটু মায়া দয়াও নেই? জোয়ান জোয়ান কত ছেলে একেবারে পটাপট—কত ইঞ্জেকশন নিয়ে গেল—' বলতে বলতে একটু থেমে পড়েছিল তরঙ্গ 'কাল বিকেলে যেটা কিনে দিয়ে গেলি—নতুন, দিয়ে দিলাম সেটা। দিদিমণিরা কি নিতে চায়! বললাম, আমার ত এখন লাগছে না—অপারেশনই যখন পিছিয়ে গেল।'

প্রায় জিবে কামড় দিয়ে নিজেকে থামাল তরঙ্গ। বউদি না হোক, দাদা শুনলে কি বলবে। টিউশনি, ইস্কুল থেকে যা আসছে তার কম ত বিজয় হাসপাতালে চলছে না। তা থেকে আবার খয়রাতি। একবার জ্বর উঠলে মুখের যদি লাগাম থাকে। সব বোঝে না তরঙ্গ সব জানেও না। কিন্তু সারা হাসপাতাল জুড়িয়ে দিদিমণিরা ডাক্তারবাবুরা কাল সারা রাত কাদের জন্যে অত ওষুধ, ইঞ্জেকশন, ট্যাবলেট ব্যাণ্ডেজ জড়ো করল। কেন করল সেটুকু ত বোঝে। বুঝে, সব একসংগে মনে এসে তার গুলিয়ে যায়। বুকের ভেতর কি ঠেলে ওঠে আর সংগে সংগে নাকে ঝাঁঝ নিয়ে চোখ ফেটে জল আসে। তবু বিজয়ের সামনে কথাটা বলে ফেলে খুব ভুল—

'বেশ করেছ। একটু শুয়ে থেকো তো'. হাসতে হাসতেই বলল বিজয়, 'বিকেলে আসছি নে। ওষুধ পৌঁছে দেব'খন।'

কাচুমাচু ভাবটা কাটতে সময় নিল না একদম 'কে আসবে?'

'দেখব'খন যদি পারি না হলে পুতুল বোধ হয়।'

'ইস্কুল করে আবার না-ই এলি'. একটুও দম নিল না তরঙ্গ, 'সেই ভাল, তোর বউকে পাঠাস—'

'আমারও ত ছুটি। বন্ধ চলছে না?'

'একটা কথা বলব—রাগ করবি নে? সবার পড়া হয়ে গেলে বউমার হাতে সকলের কাগজখানা পাঠিয়ে দিবি?'

হাসপাতালে এসে দুদিনের মধ্যে প্রথম

'ওরা পাঠিয়েছে।' একটি বুড়ো ছাত্র চুপ করে থাকতে পারল না, 'আগুনে পুড়ে এমনি নির্বংশ হবে ওরা—দেখবেন স্যার।'

ব্যাপারটা যা তাতে দেশ সুদ্ধ লোকের হাত না দেখালে যথেষ্ট ভাগ্যে কি লেখা আছে তা বোঝারও উপায় নেই। এরকম ব্যাপার শীগগিরি হয়নি—অন্তত কয়েক শ বছরে।

নরেন্দ্র বলল, 'শীতটা পড়ুক ভাল করে—পথঘাট বন্ধ হয়ে গেলে বাছাধনদের খাবারদাবার আসা বন্ধ হবে যাবে—তখন—।

'ভাল রকম শীতও পড়ছে না বলে বসন্ত হচ্ছে চারদিক—মেস্টারও টিকে নেওয়া হয়নি—' থেমে পড়তে হল বিক্রমকে। বলতে যাচ্ছিল 'কাপ্তেন বেশানের টিকের ওষুধ এদিকে—কিন্তু কথা ফুটল না মুখে—সবাই তার দিকেই হাঁ মেরে তাকিয়ে আছে। আর বসতে পারল না।

রেডিওটা খুঁচিয়ে সকালের চেয়ে বেশী কিছু জানা গেল না। খাওয়াদাওয়ার পর আলো জ্বালিয়ে পড়বার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ—টোপর পরিয়েও ডুমের গা থেকে শ্যামাপোকা সরাতে পারল না। মাথার পাশে জলের গ্লাস ঢাকা দিয়ে দড়াম করে খিল তুলে দিল পুতুল।

মেয়ে ঘুমোচ্ছে। মাঝখানে জায়গা করে সবে আসতে গিয়ে খাটের কিনারে থমকে থাকল বিজয়।

'এত দেরি করলে?'

'কি করব—রেডিও নিয়ে খুটখুট করছিলে—'

'কি হল জানব না?'

'নিশ্চয়—যেমন 'পশ্চিম কেমন আছে' হবে ত?'

বিজয়ের মনেই ছিল না। 'হাসপাতালে গিয়েছিলে—কেমন আছে? কিছু বলল?'

'বাওয়া মাত্তর' 'কপাল কোথায়'। কাজ না পেয়ে ঘুম হচ্ছে না—'

'দিয়ে আসনি? বাঃ!'

'কখন নেব? হাসপাতালে গিয়ে ত শুনলাম—'

বিজয় কিছু বলতে পারল না। চব্বিশ ঘণ্টা শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ। এর ভেতরে কিছু বলার কথা মনে থাকে!

পুতুল ভেবেছিল ইঞ্জেকশনের কথাটা পাড়বে। নাপর থেকে কেউ এসে খবর নেওয়ার নাম নেই—সেই যে চাপিয়ে দিয়ে গেছে—আর উনি ইদিকে হরিহরছত্র খুলে বসে আছেন, তা কে ভাবতে পেরেছে। বিজয়ের হৃৎপিণ্ড অন্ধকার মশারিতে দেখা যায় না—তবু কিছু বেগড়বাই হয়েছে বুঝে চুপ করেই ছিল পুতুল, 'আচ্ছা ওরা কেমন বল ত? এতদিন পাশাপাশি আছি—মুখে এত ভাল ভাল কথা, অথচ পেটে পেটে এতও ছিল—'

ওরা কেমন, দেশটা কেমন তা জানার জন্যে খুব বেশী হলে আলো জেলে ইস্কুল থেকে চেয়ে আনা ভূগোলের ম্যাপ বইখানা এখন খুলে বসতে পারে বিজয়—তার চেয়ে বেশী আর কি করার আছে।

গরমকালে সন্ধ্যেবেলা ইলেকট্রিক সাপ্লাইর হেড অফিসের সামনে ফুটপাথে বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে দু'একজন বুড়ো-বুড়িকে খালি গায়ে বসে হাওয়া খেতে দেখেছে—কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

'আমাদেরই মত ভাত খায়', একটু থেমে পড়ল পুতুল, 'শুনেছি ফেন গালে না—', এবার যা বলল তা বিজয় পাশে না থাকলেও এমনিভাবেই বলে যেত, 'আমাদের ইস্কুলে বাঁশপড় বিডারে চীনে মন্দিরের ছবি ছিল। একটা ঘণ্টা দুলছে কার্নিশে ঢং ঢং—আর শেষ হয় না বেজেই চলেছে। সে বইয়ের একটা গল্প এখনও ভোলেনি পুতুল। এক চীনে রাজা স্বপ্নে এক অপরূপ দেবপুরুষকে দেখে ঘুম ভেঙে যেতেই কথাটা তাঁর মন্ত্রীকে বলেছিলেন। ইনি বুদ্ধ ছাড়া আর কেউ নন। তক্ষুনি কয়েকজন ভিক্ষুকে নিয়ে আসার জন্যে লোক চলে গেল। একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে খোটান থেকে দুজন ভিক্ষু এলেন। তাঁদের জন্যে রাজা একটা বিহার বানালেন—নাম দিলেন, শ্বেতাশ্ব মঠ। খোটান কতদূরে। ইস্কুল ছাড়ার পর আর একদিনও ম্যাপ খুলে দেখেনি পুতুল।

বিজয় কিছু বলার আগেই একা একা বলে ফেলল পুতুল, 'শেষ অবধি [illegible] পড়বে সব—। এরকম [illegible]?'

'কি আর হতে পারে। এই পথে আগেও অনেকে এসেছে [illegible] শেষ অবধি [illegible] মিশে গেছে সবাই [illegible] কথা মুখে এল না বিজয়ের।

মানুষের মুণ্ডুশিকারের কি রকম মজা—পাহাড়ের চুড়ো থেকে হাতি ফেলে দিলে কেমন চীৎকার করে গড়াতে গড়াতে মরবে'—ব্যাপারটা কতখানি মজাদার! একদিন কাশ্মীরে বসে হুণ সর্দার মিহিরগুল হাতে কলমে এসব পরীক্ষা করে দেখেছিল।

তরপর অপারেশন বন্ধ রেখে অজ্ঞান করানোর জন্যে অ্যানাসথেসিস্টরা কিন্তু হাসপাতালে গেছে, বোতল বোতল রক্ত গেছে। মাঝ রাস্তায় এক্সপ্রেস মেল দাঁড় করিয়ে জংশন দিয়ে দিনরাত স্পেশাল গেছে। বারোশ ঘণ্টা একটানা একখানার পেছনে আর একখানা প্লেন পর পর আকাশে উঠে কাত হয়ে উত্তরে উড়ে গেছে।

'কাল কিন্তু সভা হবে—মনে আছে ত?'

বিজয়ের মনে ছিল। কদিন ধরে এই এক কথা নিয়ে এত জটলা হচ্ছে তার ভেতরে

মাথা কারও ঠিক থাকে, 'কানের দুলজোড়া দিয়ে দিও।'

'আহা! হাত খালি কতদিন—তার ওপর কান খালি হলে—'

'সত্যি! সুদ অনেক হয়ে গেছে—তাই না?'

'অন্তত ক'গাছা চুড়িও যদি ছাড়াতে—, তারপর পিসিমা এসে ইস্তক সুদও আর দেওয়া হচ্ছে না—'

প্রথমে কিছু বলতে পারল না বিজয়। ক'দিন হল শুনে আসছে রাণুদি গলার হার দেবে, ওষুধের দোকানের দত্তবাবুর বড়বউ গিনি দেবে, 'তুমি না হয় মেয়ের একটা দুটো আঙটি দিয়ে এস—'

'মুখে ভাতের? কথা তোলো না—'

বেশী দাম না। নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসে সোনাও দেওয়া হল বন্দোপণাও হল এই ভেবে বিজয়ের ইস্কুলের দু'চারজন তেরো চোদ্দ টাকা দামের একটা পাতলা পাতলা আঙটি দিয়ে গেছে।

অন্ধকারে পুতুলের মুখ দেখতে পেল না। মৃদু পুতুলী।

'আমি বন্ধ দিয়েছি কাল।'

'দিয়েছ? আমার কথাটা রাখলে না?'

'সবাই দিল ক্লাস টেনের ছেলেরা লাইন বেঁধে দিল।'

'তাদের কথা হচ্ছে না' পুতুল অন্ধকারের ভেতরেও বুঝতে পারল তার চোখের সামনে আরও অন্ধকার ক'দিন ধরেই দুলছে দুলতে দুলতে ঘুরছে। এই কি মাথাঘোরা না অম্বল না উর্ধবায়ু। সত্যি ক'দিন সবাই কি হয়ে গেল। কারও মাথার ঠিক নেই 'তোমার না আনিমিয়া'

'তারা পরীক্ষা করেই বন্ধ দিচ্ছিল—'

পুতুল আর একটা কথাও বলল না। এমন মানুষের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিজয় কথা দিয়েছিল বন্ধ দেবে না। ঠিক ছিল টিউটোরিয়ালে টাকা পেলে একটা কিছু কিনে এনে দেবে। সেও তো বন্ধেরই সমান। আয়নবাবু বোঝাতে গিয়ে সেদিন কেমন থুথু উঠে এসেছিল মুখে। কিছু এনে দিলে, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পুতুলও কিছু একটা দিতে পারবে সভায় গিয়ে।

'যুদ্ধ কেমন জান?'

পুতুল কিছু বুঝে উঠতে পারল না, 'সিনেমায় দেখেছি—'

'আমিও জানিনে। বইতে পড়েছি—

'চাল পাওয়া যেত না, কয়লার জন্যে লাইন—রাস্তা দাপিয়ে সারি সারি সৈন্য যেত—'

'আমিও যাব। এ আর ভাল লাগে না—'

'হয়েছে! মাঝরাতে যাত্রা করো না—'. পেছন ফিরে গলা অবধি কাঁথা টেনে নিল পুতুল। আন্দাজে একটা চালা অন্ধকারে হাত লাগিয়ে বুঝল এটা পুতুল—তার

ওপাশে মেয়েটা—বিছানায় শুয়ে রাস্তার বিড়ির দোকানের আলো দেখা যাচ্ছে। বুনো কি-একটা বেঁটে মত ছোট গাছ শিকড়-সুদ্ধ আলোর গায়ে টানিয়ে দিয়েছে। সবুজ পাতার ভেতরে লাখ লাখ শ্যামা-পোকা মিশে আছে। টিউটোরিয়ালের বুড়ো স্টুডেন্টটা আজ সন্ধ্যেবেলা বলেছে, এবার ওরা নির্বংশ হবে স্যার।

'কে নিচ্ছে তোমায়—এই ক্যাংলা শরীরে—', পুতুল জানে এখন তার মুখে যে কোন শব্দ ভারী। সারাবাড়ি ঘুমোচ্ছে।

'এখন নেবে—কতো-ও লোক দরকার—'

'বন্দুক চালাতে জান?'

'শিখিয়ে নেবে।'

'অন্যে যায় যাক্—তুমি থাকবে।'

পুতুলকে উঠে বসতে দেখে বিজয় অবাক হল।

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বেমক্কা উঠে বসাতে বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়তে হচ্ছে পুতুলকে।

এবকম উঠতে আছে? কখন কোথায় লেগে যায়—

'কোনদিন যুদ্ধ দেখিনি—কি বলব তোমায়—', উঠে-বসা পুতুলের চোখ একে-বারে বিড়ালের কায়দায় জ্বল জ্বল করছে, সেদিকে তাকিয়েই শেষ করে দিল, 'সারা গায় গোলাগুলি বেঁধে ঠিক ওদের ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ব—দেখে নিও তুমি—ভীষণ শব্দ করে সবকিছু একেবারে ফেটে যাবে—'

পুতুল শুনতে শুনতে শুয়ে পড়ছিল। পরিষ্কার বুঝতে পারল বিজয়ের বুকের ভেতরে বাতাস সর্দি ও কাশির মধ্যে পথ করে কথাগুলো পেঁচাতে পেঁচাতে বেরিয়ে আসছে। আস্তে তার বুকে হাত রাখল, 'বলাই' শোবার সময় এত অলক্ষুণে কথাও বলতে পার—'

'আর সহ্য হয় না—কাঁহাতক ভাল লাগে বল—', বিজয় ঠিক জানে না ট্যাংক কি-ভাবে আসে, অনেক ওজন হবে তবে ঠিক কত টন কত মণ তা জানে না। বইতে পড়েছে যখন আর কোন উপায় থাকে না—এইভাবে সারা গায়ে গোলাগুলি বেঁধে ঝাঁপিয়ে ওদের এগোনো বন্ধ করে দিতে হয়। সত্যি, আর সহ্য করা যায় না, যে করে হোক থামাতেই হবে। ওদের থামাতেই হবে।

'তাই বলে তুমি যাবে—?'

বিজয় বুঝতে পারছিল এর পর কি বলবে পুতুল। সেবারে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠে পথ্য করার দিন এরকম কি একটা কথা বলতেই পুতুল দিব্যি ঘুমোনো মেয়েকে উঠিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল, 'আমাদের কে দেখবে?' আজ কিন্তু কিছু বলল না।

বুকের ওপরে রাখা হাতখানা ঘন ঘন উঠছে পড়ছে দেখে পুতুলের ভয় হল, আবার সেরকম কিছু হল না ত। মৃগী ত ক বছরের মধ্যে আর হয়নি। তারপর বুকে কান পেতে শুনতে গিয়ে বলে ফেলল, 'তুমি ত আর সত্যি সত্যি যাচ্ছ না—', এখনো বিজয়ের গাল পাতলা করে একটা চুমো দেওয়ার চেষ্টা করল, [illegible] না [illegible] করছিল—' আদরে পুতুলের গলা জড়াজড় করছে।

বিজয় বুঝল পুতুলকে এখন তৎসম করে বললে নির্বুদ্ধি ভার্যা বলতে হয়। তবুও হয়ত বুড়োবুড়িদের সংগে সংধ্যা [illegible] কম্বল চাপা পড়ে আছে। লোহার [illegible] মালা পরানো ট্যাংকগুলো বুকে হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছে—পাথরগুলো গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ওজনে—আর কী শব্দ। বেওয়ারিশ, পেছনটা ভারী ওদিককার গোটা ছয় ঘোড়া গোলা-গুলির মধ্যে তালকানার মত মরিয়া হয়ে ছুটছে—পুরো কদমে—পাথরে পাথরে শব্দ তুলে। যে চরাতে এসেছিল সে আর নেই।

'তোমার মত কেউ না', বিজয়ের গলা ঘিরে হাতখানা আরও অনেকখানি গুটিয়ে ফেলল পুতুল।

ঠিক বুঝে উঠতে পারল না প্রথমে অন্ধ-কারে দেখাও যায় না কিছু। আগে প্রায়ই ঘুমের ভেতর সারাদিনের দু একটা কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তুলে ধরত পুতুল।

কেউ সারা গায়ে গোলাগুলি বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে না। কেবল সে-ই আগে আগে ছুটে যাচ্ছে। তার মত কেউ না। এত বোকা।

কিংবা, সে-ই কেবল যাচ্ছে—এত সাহসী—তার মত কেউ না।

পুতুলকে একটু আগে মত, স্বার্থপর, নির্বুদ্ধি মনে হচ্ছিল। সে নিজে বোকা না সাহসী তার কোনটাই বুঝে উঠতে পারল না বিজয়। ভাল ধাঁধায় ফেলল ত এখন।

তরপর অপারেশন পিছিয়ে গেল। আজ সারাদিন কি হয়েছে কিছু জানে না। পুতুলকে একটু ঝাঁকাতে অনেকখানি ঘুমের ভেতর থেকে বেশ কষ্টে বলল 'উঁ'—'

'কাল সকালে মনে করে কাগজখানা নিয়ে যাবে হাসপাতালে—পিসিমার জন্যে—'

পুতুল এবারও বলল, 'উঁ—'।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

একটি বিচিত্র ঘটনা

আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ডাক্তার মুখার্জিকে এমন আশ্চর্য পরিবেশে দেখতে পাব আশাই করিনি। স্বনামধন্য চিকিৎসক। যথেষ্ট টাকা রোজগার করেছেন, এখনও করতে পারেন কিন্তু প্র্যাকটিস আর করেন না। কিছুদিন আগেও দেখেছি তিনি উগ্র সাহেবী রীতিতে জীবনযাপন করতেন। কী এমন হল নিজেকে এমনিভাবে পালটে ফেললেন।

গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছিলুম বিকেলবেলা। এক জায়গায় এক হরিসভায় ভীড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। কীর্তন হচ্ছে। কীর্তনে বৈশিষ্ট্য ছিল। গায়ক পাকা কীর্তনীয়া—গানের ধরন-ধারণ শুনলেই বোঝা যায়। কীর্তনীয়া গাইছেন—

নবহরুচি মেহ সখি নীপমূলে পেখলু
নয়নমন ভুলল মধু ভ্রমং।
তরুণ তমাল কি এ কি এ দামিনী অম্বরে
লাখিতে নারিলু সখি শ্যাম কি এ গোরি"

এ যাকে বলে 'ক্লাত' গান। শশিশেখরের পদ। শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ। শ্রীমতী সখিকে বলছেন—নীপমূলে যেন নতুন মেঘ দেখলুম। আমার নয়ন, মন যেন ভ্রান্তিতে ভুলে রইল। এ কি তরুণ তমাল গাছ না এ আকাশের বিদ্যুৎ—সখি, আমি ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না তার বর্ণ শ্যাম না গৌর।" কীর্তনীয়া পর্দাটি বুঝিয়ে দিতে চিক্ আখর কাটলেন "দেখলাম গগন হতে মেঘ নেমেছে, কালিন্দীর কূলে যেন গগন হতে মেঘ নেমেছে।" মন্দিরের আড়ম্বরহীন সুর এই পরিবেশে ভারী মধুর লাগল। প্রায় নিবিষ্ট হয়ে গেছি এমন সময় চোখে পড়ল একটি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। দাড়িগোঁফের আড়ালে মুখের আদলটা স্পষ্ট ধরা পড়ে না। তথাপি মনে হল কোথায় এঁকে দেখেছি। বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে সন্দেহ রইল না ডাক্তার মুখার্জিই বটেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই সাহেব মানুষ ধুতি, পাঞ্জাবী পরে একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছেন।

আসর ফাঁকা হতেই ডাক্তার মুখার্জির কাছে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি চমকে উঠলেন—বললেন—"তুমি, চিনতে পারলে আমাকে? বললুম—অনেক কষ্টে। কিন্তু গোঁফদাড়ি রাখলেন কেন? "কেন আর, যাতে তোমরা সহজে চিনতে না পার।" আশ্চর্য হয়ে বললুম, "আমরা চিনলে আপনার ক্ষতি কি?" ডাক্তার মুখার্জি স্মিত হেসে বললেন—"বাকি জীবনটা এইভাবে লোকজনের আড়ালেই কাটিয়ে দিতে চাই হে—এমনি কীর্তন শুনে। চল

আমার আস্তানায় একটু চা খাবে।" উল্টোদিকেই একটি প্রাচীন বিরাট বাড়ির সংস্কার করা হয়েছে। ডাক্তার মুখার্জি তার তেতলার দুখানা কামরা ভাড়া নিয়ে আছেন। সঙ্গে আছে কেবলমাত্র তাঁর পুরাতন পাচক তথা ভৃত্য। বারান্দায় বসে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গঙ্গার দিকে চোখ রেখে ডাক্তার মুখার্জি বললেন—"তৃপ্তির সন্ধান আমরা সহজে পাইনা হে, কিন্তু—একবার পেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, কোথাও আর কোন নালিশ থাকে না।" কোন তৃপ্তির সন্ধান ডাক্তার মুখার্জি পেয়েছেন এবং কিভাবে পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করাতে যা জানলুম তা হচ্ছে এই—

ডাক্তার মুখার্জি এমনিতেই একটু কেতাদুরস্ত ছিলেন। ক্রমে পসার প্রতিপত্তি প্রচণ্ডরকম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পরিবারের জীবনধারা খুবই কৃত্রিম হয়ে দাঁড়াল। এমন কি ওঁদের ঘোরাফেরা আরম্ভ হল যেখানে সহজ বলে কোন জিনিস ছিল না সবই যেন মাপা-মাপা সাবধানতার সঙ্গে তৈরি। স্বাভাবিক বাঙালীর জীবন বলতে গেলে ভুলেই গেলেন। ক্রমে সরকারের দৃষ্টি তাঁর ওপরে পড়ল। আজ এ কমিশন কাল ঐ সংস্থা এইভাবে তিনি যখন আরও উঁচু ধাপের মুখে এসে পৌঁছেছেন তখন একদিন একটি বিচিত্র রোগীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। রোগীটি প্রচুর বিত্তশালী হলেও পরম বৈষ্ণব, জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। বরানগরের গঙ্গাতটে রোগীটি ব্যাধিতে কষ্ট পাচ্ছেন। ডাক্তার মুখার্জি যখন তাঁকে দেখতে যান তখন তাঁর চারদিকে নামকীর্তন চলেছে রোগীও মালা জপ করছেন। রোগীর কাছে এত হৈ-চৈ তাঁর ভাল লাগল না। তিনি রোগীকে নির্জনে থাকতে উপদেশ দিয়ে এলেন। দু'একদিন পরে দেখলেন রোগী বিষণ্ণ—কোন উন্নতি হচ্ছে না। রোগী তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন—"ডাক্তারবাবু, আমাকে কীর্তন শুনতে দিন। কীর্তন শুনলে আমি চোখের সামনে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাই। খোলা জায়গায় আকাশ বাতাস না পেলে আমি কী নিয়ে থাকব। যদি মরি গোবিন্দকে দেখতে দেখতেই মরব।" অগত্যা তাঁকে সেই অনুমতিই দিতে হল। আশ্চর্যের বিষয়—রোগীর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ব্যাধি তাঁর সারলো বটে কিন্তু মন এত প্রসন্ন হয়ে উঠল যে রোগের কষ্টও যেন তাঁর অন্তরকে ক্লিষ্ট করতে পারল না। ডাক্তারবাবু ক্রমেই এই রোগীটির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হত তিনিও যেন কীর্তনের মধ্যে একটা মধুর রস পাচ্ছেন—তাঁর চিত্তও যেন বহির্মুখী হয়ে উঠছে। তাঁর চোখের সামনেও যেন পদাবলী কীর্তনের এক-একটি পদ চিত্রের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বাড়িতে এলে তাঁর মনে হত তাঁর পরিবারের লোকেরা যেন এক একটি রোগী। তাদের শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে চাইলে তিনি ব্যথিত বোধ করতেন। তাঁর মেয়েদের গানে নাম আছে। এতদিন তিনি তাদের কত উৎসাহ দিয়েছেন; কত গণ্যমান্য অনুষ্ঠানে তাদের সুখ্যাতি শুনে গর্ব অনুভব করেছেন। কিন্তু, ক্রমে মনে হতে লাগল তাদের গান কেবল ড্রয়িং রুমের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় আর অতিথি অভ্যাগতদের হাততালিতে ধাক্কা খায়। এতদিনকার পুঞ্জীভূত সমস্ত মোহ যেন অন্তর্হিত হয়ে গেল। তাঁর মনে হল একটা বিরাট জীবনীশক্তি এই বিশ্বপ্রকৃতিতে বিলীন হয়ে রয়েছে। যতই অন্তরকে মেলে দিতে পারা যাবে ততই একটা আনন্দসত্তা সেই শক্তিকে আহরণ করে অন্তরকে সঞ্জীবিত করে তুলবে।

একদিন তাঁর পরম বৈষ্ণব বন্ধুটির মৃত্যু হল। নিঃসঙ্গ চিকিৎসক আর তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলতে পারলেন না। একদা যে সমাজ তাঁর পরম আরাধ্য ছিল সেই সমাজের সব কৃত্রিমতা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তবে কাউকেই ত্যাগ করলেন না। আত্মীয়দের কাছেই রইলেন কিন্তু তারাও বহুদূরে, তিনিও বহুদূরে।

আমাকে বললেন—তুমি সঙ্গীত চর্চা কর কিন্তু গঙ্গার ঘাটে ঐ যে লোকটা স্নান করে ভজন গাইছে, ওর সুরটা ব্যাকরণসম্মত না হলেও ওর সত্যিকারের আবেদনটা ধরতে পার কি? যেদিন পারবে সেদিন তোমার চোখে জল আসবে। সেদিন বিশ্বসঙ্গীতের মূল সুরের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে।"

সেই সন্ধ্যার পর থেকে ওই অনাসক্ত ব্যক্তিটির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। নানা অনুষ্ঠানে যাই, রেডিও শুনি, সমালোচনা লিখি—কিন্তু এমন কোনও শিল্পীর পরিচয় তো পাইনা যার গান শুনে মনে হয় মহান বিশ্বসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে।

সকলেই যেন প্রচারের জন্য মহাকৃত্রিম সমাজে প্রবেশ করতে ব্যগ্র আর সেই সমাজের হাততালিতে ধন্য হতে চায়। রেডিওর একটা অডিশনের জন্য কত সাধ্যসাধনা। খবরের কাগজে একটু নাম বেরুবার জন্য কত ব্যগ্রতা। কিন্তু এই সমাজের বাইরে বিশ্বপথিক যারা চলেছে তারা তো কিছু চায় না—কিন্তু তাদের গানকে প্রকৃতি নিজের আনন্দে পূর্ণ করে। ওই যে কীর্তনীয়া গান গেয়ে গেলেন তাঁর গান শুনে আমার চোখের সামনে নীপমূলে নবীন মেঘের উদয় হল। আমি বিহ্বল হয়ে গেলুম। ওই যে লোকটা স্নান করে উঠে ভাঙা গলায় ভজন গাইল তার কণ্ঠে আমি তুলসী দাসের কণ্ঠের আকুতি পেলুম। সেই স্নিগ্ধতা আমার প্রাণে শান্তির রসসিঞ্চন করলে। আনন্দ যখন আপনি এসে ধরা দেয় তখন সেই আনন্দই সব সার্থকতার সার।
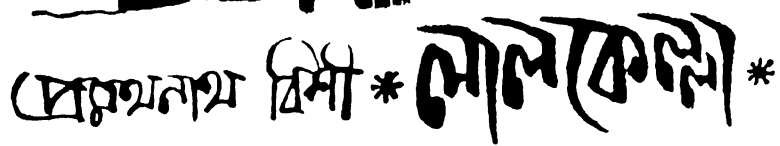
দরকার প্রাচীর পরিখা বুরুজ প্রভৃতি মেরামত করে যুদ্ধোপযোগী করে তুলবার জন্যে শিক্ষিত এঞ্জিনীয়ার। মহম্মদ আলি খাঁকে খুঁজে বার করলো, আগেও সামান্য পরিচয় ছিল দুজনের, দুজনেই বেরিলির লোক, তাকে নিযুক্ত করলো চীফ এঞ্জিনীয়ার। অনেক দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার পরে কিছু কাজ পেয়ে বেঁচে গেল আলি খাঁ।

সন্ধ্যা বেলায় খুরশিদ বাঈয়ের ঘরে গিয়ে সুবয প্রসাদকে আলি খাঁ বলল, এতদিনে একটা জঙ্গী আদমি এসেছে, এবারে কাজ হবে।

সুবযপ্রসাদ ফরাসের উপরে গড়াতে গড়াতে বলল, আরে ইয়ার, জঙ্গী আদমির কি অভাব ছিল? বাদশার তাঞ্জাম থেকে, ইমানী বেগমের কুঠির সামনে থেকে যারা আওরৎ লুট করে নিতে পারে তারা যে একেবারে জঙ্গী বাহাদুর।

আলি খাঁ বলে, এবারে তাদের বাহাদুরী বের হবে। বখৎ খাঁর কানে কথাটা উঠেছে,

অসাক্ষাতে বোঝার, এর পরে আমিই তো হবো বাদশা।

ঘউস মহম্মদের দেখেন অনুরূপ বুদ্ধি, বুঝতে পারে না তিনজনে একসঙ্গে কেমন করে বাদশা হবে? তবে কি হিন্দুস্থান বাটোয়ারা হবে?

একদিন জিজ্ঞাসা করেও বসেছিল মীর্জা মুঘলকে, আচ্ছা, শাহাজাদা, আপনি তো বাদশাহ হবেন, বহুৎ খুব। কিন্তু কোম্পানী মানবে কেন? তাদের সঙ্গে তো এখন ফৌজ।

আরে খাঁ সাহেব, তোমার মতো মুস্তফ যখন আমাদের পক্ষে কোম্পানীর হারতে কতক্ষণ?

তা বটে, তা বটে বলে দাড়িতে হাত বুলোয় খাঁ সাহেব।

নিমচী ফৌজ আর মীরাটী ফৌজ এখন যত না কোম্পানী বিরোধী, তার চেয়ে বেশি বখৎ খাঁ বিরোধী। শাহাজাদারা এই ব্যাপারে প্রশ্রয় দেন। কিন্তু এই বলে মনে করা উচিত হবে না যে, নিমচী ফৌজ আর মীরাটী ফৌজ একজোট। মীরাটী ফৌজ বলে, তারা সব আগে এসেছে, তাদের দাবী সকলের উপরে। নিমচী ফৌজ বলে সবচেয়ে বেশি দূর থেকে তারা এসেছে, তাদের দাবী সকলের উপরে। এই নিয়ে হয়তো দুই দলে লড়াই হতো কিন্তু বখৎ খাঁর ভয়ে, বখৎ খাঁর টাকা বেশি, ফৌজ বেশি, পদমর্যাদা সবচেয়ে ভারি, তাই তার ভয়ে দুই দলে অস্বাভাবিক মিত্রতা বজায় রেখে চলেছে। শাহজাদাদের চোখ আছে যাতে এই দুই দলে মিত্রতা না ঘটে আবার এই দুই দল না মিলে যায় বখৎ খাঁর দলের সঙ্গে। ছিদ্র-[illegible] সহায়। সেই নীতির রক্ষক শাহাজাদারা। শুধু তাই নয়, মীরাটী ফৌজ মীর্জা মুঘলের অনুগত আর নিমচী ফৌজ অনুগত মীর্জা আবু বকরের।

ব[illegible] লোকের মুখে মুখে একটা রসিকতা চালু হয়েছিল।

কি হে, লড়াইয়ের খবর কি?

লড়াই তো দুটো চলছে, কোনটার খবর চাও? ভিতরের, না বাইরের, কোনটার খবর জানতে চাও?

আগে ভিতরের লড়াইয়ের খবরটাই না হয় শুনি।

কালকে চাঁদনীচকে পূরণচাঁদ শাহের দোকানে এক দফা হয়ে গেল।

খুলে বলো।

মীরাটী ফৌজের এক সিপাহী গিয়ে পাগড়ীর কাপড়ের দাম করছে এমন সময়ে বখৎ খাঁর সিপাহী গিয়ে দেড়া দাম কবুল করলে।

এমন অদ্ভুত শখ কেন?

আরে ওদের যে টাকা বেশি।

তারপরে?

তারপরে আর কি? দুই সিপাহীর দুই

তলোয়ার বের হয়ে পড়লো। পুরবাসীর দরজা বন্ধ করে প্রাণ বাঁচায়।

প্রাণ বাঁচলো?

প্রাণ বাঁচলো, কিন্তু মাল বাঁচলো না।

কেমন?

তখন মীরাটী ফৌজ আর নিমচী ফৌজ মিলে খিড়কি ভেঙে সব লুট করে নিয়ে গেল।

তাহলে জিতলো ওরা।

দাঁড়াও, এখনি শেষ হয়নি। তখন লুটের ভাগ নিয়ে মীরাটী ফৌজের আর নিমচী ফৌজের তলোয়ার বের হল।

কিরকম ভাগাভাগি হল?

ভাগাভাগি ঐ লুট করাই সার। এর মধ্যে বখৎ খাঁর দলবল এসে সব মাল মাথায় করে নিয়ে গেল।

তবে মনে চোরের উপর বাটপাড়।

যা বলো।

[illegible]

[illegible]

[illegible] রজব আলি আর হাকিম আসানুল্লা। তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত থাকলে দুজনে সেলাম বিনিময় করে বিনা বাক্য ব্যয়ে সরে যায়। তৃতীয় পক্ষ না থাকলে দুজনে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে তখন রজব আলি শুধায় তারপরে হাকিম সাহেব দুনিয়ার হালচাল কেমন?

আসানুল্লা হাসিতে হাসির প্রত্যুত্তর দিয়ে বলে, দুনিয়া চলছে দুনিয়ার নিয়মে, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ কি?

এ কি উজীর সাহেবের মতো কথা হল?

আসানুল্লা বলে, আর এ কি বাদশার হেড গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন হল।

তখন দুজনে হেসে ওঠে। দুজনেই [illegible]।

এতক্ষণ উজীর ও গোয়েন্দার [illegible] চলছিল, এবারে কথা শুরু করে [illegible] মানুষ দুটো।

লড়াইয়ের গতিক তো ভালো মনে হচ্ছে না।

আসানুল্লা বলে, ভালো মনে হওয়ার কারণ কি কখনো ছিল রজব আলি সাহেব।

ভরসার মধ্যে ঐ বখৎ খাঁ।

আর তার চীফ এঞ্জিনীয়ার আলি খাঁ।

আর ঐ হেড গোলন্দাজ কুলি খাঁ।

কিন্তু তিনজনে কি করবে?

আসানুল্লা বলে তিনজনেই যথেষ্ট যদি বাকি সবাই লড়াই ভণ্ডুল না করে।

রজব আলি হেসে ওঠে। কথাটা এমন সত্য যে উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এবারে আসানুল্লা প্রশ্ন শুধায়, কোম্পানির ফৌজ কত হল?

[illegible]

[illegible]

হচ্ছে না বলে কি?

ঠিক কথাই বলছি।

তবে যে এরা বলে চার পাঁচ হাজারের বেশি নয়।

এরা মানে তো শাহজাদারা।

আর কারা।

তারা হচ্ছে আপনে মনে মিঞা মিঠঠু। তারা যা শুনতে ভালোবাসে, লোকে তাই এসে বলে তুমহারে মুঁহমে ঘী শক্কর।

জেনারেল নিকলসন আসছে পাঞ্জাব থেকে শুনছিলাম।

ভুল শোননি, বোধকরি দশ পনেরো দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

হঠাৎ বলে ওঠে, আমি হাকিম সাহেব, জরুরী কাজ আছে।

আসানুল্লা তাকিয়ে দেখে লোকজন চলতে শুরু করেছে তখন তারও মনে পড়ে যায় জরুরী কাজ। সেলাম বিনিময় না করেই দুজনে দুদিকে সরে পড়ে।

লড়াইয়ের গতিক মন্দ দেখে বেগম জিনৎ মহলের পক্ষ থেকে এবং শাহজাদাদের পক্ষ

থেকে চিঠি যেতে শুরু করে কোম্পানীর ছাউনিতে। অনেকগুলো চিঠি যায়, উত্তর আসে না একখানিরও। আসানুল্লা ও রজব আলির হাত দিয়েই যায় চিঠিগুলো, তবে তারাও ঠিক জানে না, কে কোন পক্ষের চিঠি পাঠাচ্ছে। গোয়েন্দা সব জানে নিজের ঘরের খবর ছাড়া। প্রদীপের তলে অন্ধকার।

মাঝে মাঝে সুখানন্দ যায় গালিবের বাড়িতে। বাদশার সান্ধ্য মজলিশ ভেঙে যাওয়ার পরে এইটিই তাদের আড্ডা। একদিন সুখানন্দ গিয়ে দেখে যে গালিব তক্তপোশের উপরে তাস ঠুকছে আর কি যেন লিখছে।

কি লেখা হচ্ছে মীর্জা সাহেব।

এই যে পণ্ডিতজী, আসুন।

কি লিখছেন, নূতন গজল নাকি?

ঠিক ধরেছেন, গজল লিখে বৃষ্টি নামানো যায় কি না তাই পরীক্ষা করছি।

দেবতারা কি এত বশংবদ হবেন?

মনে তো হয় না। এই কদিন এত গজল লিখেছি যে বন্যা হয়ে যাওয়ার কথা।

গালিব পড়ে—

আসমানে মেঘ নাই দরিয়ার কূল

আঁখির পানিতে মেছে আঁখির কাজল।

বাকিটুকু পরে শেষ করা যাবে। এখন কি খবর?

তারপরে নিজেই শুধোয় আর কেন তুলসী মাঈকে এবারে বাড়িতে ফিরে আসুন।

না, সাহেব, সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। আমার কুঠির কাছে নিত্য বেগানা লোকের আশা যাওয়া, তাই সাহস পাইনে।

নয়নকে খবরটা বলেছেন।

সর্বনাশ, তাহলে কি আর রক্ষা আছে। এখনি গিয়ে নিয়ে আসবে, আর তারপরে আবার নূতন করে সর্বনাশ শুরু হতে কতক্ষণ।

তবে এখনো কি তার ধারণা—

হাঁ সে জানে বাদশার তাঞ্জাম থেকে ওকে লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

তবু সে এখনো মনে মনে সিপাহীদের দিকে।

দুঃখের অশেষ দেশ, মীর্জা সাহেব কি আর বলবো। মনে মনে তার কি ধারণা, তার মনই জানে। মুখে বলে এ ঐ স্বরূপের কীর্তি তার ধারণা স্বরূপ এখানে শহরে লুকিয়ে বসেছে, তার লোকজন জুটিয়ে তুলসীকে লুট করে নিয়ে গিয়েছে।

নয়ন কি বোঝে না, এ অসম্ভব।

তবে আর মুর্খ কেন?

থাকুক তুলসী এখনো কিছুদিন লুকিয়ে থাকুক, সেই ভালো।

তারপরে শুধোয় হাকিম সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় কি?

দেখা হয় তবে কথা বড় হয় না। হাকিম সাহেব এখন চেনা লোক এড়িয়ে চলে, ওই আমিও আর দেখি না।

আমার বাড়িতে একদিন এসেছিলেন।

শুনেছি, কিছু কথা হল?

বললেন তার উপরে সিপাহীদের বড় অবিশ্বাস। উজীর তাই মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু সর্বদা চোখে চোখে রেখেছে। বলল, কোম্পানীর ফৌজকে যে হটাতে পারছে না সে দোষ যেন তারই।

তারপর শুধোয়, পণ্ডিতজী, আপনি তো ঘুরে বেড়ান। হাসান আকসারির সঙ্গে দেখা হয় কি?

দেখা হয়নি, তবে দেখলাম।

কি রকম?

সেদিন দেখি চাঁদনী চকে মোতিবাজারের চত্বরের মধ্যে আকসারি সাহেব দাঁড়িয়ে আছে পায়ের কাছে বসে আছে একটা লোক। পরে শুনলাম তার নাম সাদিক খাঁ, সে নাকি আকসারির চেলা।

তারপরে?

সাদিক খাঁ হিন্দুস্থানী ফার্সি মিশিয়ে বলে যাচ্ছে তার চোখ দুটো অর্ধেক খোলা, অর্ধেক বোজা—

গালিব মন্তব্য করে এই খোলা অংশ দিয়ে দেখছে পয়সা পড়ছে কি না।

পড়ছে বইকি, অনেক লোক জুটে গিয়েছে। সে বলছে হাঁসী জেলায় একটি মেয়ে তিনটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। ভূমিষ্ঠ হলেই তারা কথা বলতে শুরু করে। একজন বলল এ বছর বড় দুর্বৎসর অনেক অঘটন ঘটবে। আর একজন বলল যারা প্রাণে বেঁচে থাকবে তারাই সব দেখতে পাবে। তৃতীয় জন বলল এ বছর হিন্দুরা ... হোলিতে আগুন জ্বালাবে আর মুসলমানেরা ... পারবে, সারা ... জানোয়ার

এভারেস্টের জয় পরাজয়

অজিতকুমার দাশ

সম্প্রতি মাউণ্ট এভারেস্ট বিজয়ের দশম বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী কর্নেল হাণ্টের উদ্যোগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশীর্ষ মাউণ্ট এভারেস্টের হাতছানি দীর্ঘকাল ধরে এক শ্রেণীর মানুষকে ডাক দিয়েছে বিপদ বিঘ্ন তুচ্ছ করে তারা অজানাকে জানবার ও অপরাজেয়কে জয় করবার এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বারবার ছুটে গিয়েছেন। ১৯২০ সালে তিব্বত যখন পর্বত অভিযাত্রীদের প্রথম ছাড়পত্র দিল তখন থেকেই বহু বিদেশী জীবন মৃত্যুর সঙ্গে জুয়া খেলেছেন দেবতাত্মা হিমালয়ের দুর্বার আহ্বানে। এ পর্যন্ত পৃথিবীর শীর্ষস্থান জয় করবার উদ্দেশ্যে পনেরটি অভিযান হয়েছে। এর মধ্যে দুটি হয়তো বা তিনটি অভিযান সাফল্য লাভ করেছে। নিউজিল্যাণ্ডবাসী এডমণ্ড হিলারি ও ভারতের তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ করে ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৬ সালে একটি সুইস-দল এভারেস্ট অভিযানে অগ্রসর হন, কিন্তু সাফল্য লাভ করেন নি। এর পর একটি সোভিয়েত-চীন অভিযাত্রীদল যুগল চেষ্টায় এভারেস্টের চূড়ায় উঠে মাও-সে-তুং-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এসেছে বলে দাবি জানিয়েছে—অবশ্য অভিজ্ঞ অভিযাত্রীদের অনেকেই এই দাবিকে বিশ্বাস করেন না। এর মধ্যে কয়েকটি অভিযানে চরম বিপর্যয় ঘটেছে, এমন কি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে। ১৯২৪ সালে এভারেস্টের চূড়া থেকে মাত্র ৮০০ ফিট নীচে ম্যালরী ও আরভিং কুয়াশার আবরণে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছেন। এঁদের মৃত্যু যেমন করুণ তেমনি রহস্যময়। ১৯৫২ সালে সুইস অভিযাত্রীদল স্লিপিং ব্যাগ ও জল গরম করার স্টোভ ছাড়াই ২৮,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠে পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। অবশেষে গত ১লা মে সকাল ৮টায় নরম্যান ডাইরেন-ফার্থ এর নেতৃত্বে মার্কিনী দলের জিম হুইটেকার ও নেপালী শেরপা নওয়াং গোম্বু এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণে সমর্থ হন। সেই কাহিনীই এই প্রবন্ধে বিবৃত হয়েছে।

—সম্পাদক দেশ

আশা-আকাঙ্ক্ষা, জয়-পরাজয় ও চিরদিনের হিম-ঘর হিমালয়। বছরের পর বছর নিত্য নতুন অভিযাত্রীকে নিজের বুকে টেনে আনে। তারপর হঠাৎ রাগে, অভিমানে ফেটে পড়ে—রুখে দাঁড়ায়। কখনও চোকাঠের গোড়ায় পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তারপর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেয়। ভোলা মন। কখনও দেবিতে দুঃখ হয়। হঠাৎ পলায়ন-তৎপর বিজয়ী অভিযাত্রীদের পিছন থেকেই আঘাত করে। খুন করতে মন যদি বা না চায়, খোঁড়া করে দেয়।

এভারেস্টের বিশেষ করে রাগের সঙ্গত কারণ আছে। তারও একটা বক্তব্য আছে। কবে দশ বছর আগে প্রথম একবার ক্ষণিকের জন্য মাথা নোয়াতে হয়েছিল বলে কি মাথা বিক্রী হয়ে গেছে? বছর বছর বুড়ি ছুঁতেই হবে? বাহাদুরি দেখানো আর বাহবা দেবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

এভারেস্ট সার্থক অভিযানের প্রথম দশকের শেষে, একটু দেরিতে হলেও এভারেস্ট এই প্রতিবাদই তার নিজস্ব ধরনে পৃথিবীর কাছে নিবেদন করল। তারই ফলে বিজয়-উল্লাসের কণ্ঠরোধ করে দাঁড়াল উৎকণ্ঠা। গগনস্পর্শী হাসির শেষে নেমে এল সুদীর্ঘ, সুগভীর দীর্ঘশ্বাস।

১৯৫৩ সালে বেস ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গিয়ে এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং-হিলারী বিজয়-কাহিনীর বিশদ বিবরণ যোগাড় করেছিলাম। তারপর বারবার একাধিক অভিযাত্রীর দল বেঁধে হিমালয়ের গায়ে সুড়সুড়ি দেবার খবর সরাসরি সংগ্রহের জন্য ছুটে আসতে হয়েছে। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই প্রায়। আবার ১৯৬৩ সালে এলাম আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানের বিজয়বার্তার বড় খবর থেকে ক্ষুদ্রতম টুকিটাকি কুড়িয়ে নিতে।

দশ বছরে হিমালয় অভিযানে অনেক অভিনবত্ব এসেছে। তবে কিছু কিছু

পুরানো পথে মার্কিনী অভিযান

সুবিধে সাংবাদিকরাও ভোগ করছে। ১৯৫৩ সালে অভিযাত্রীদলের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর বা সাংবাদিকদের দৈনিক যোগা-যোগের কোনও পাকা ব্যবস্থা ছিল না। শেরপারা খবর নিয়ে নেমে আসত। পরে তিন-চার দিনের বা আরও বাসি খবর বহু হাত ঘুরে আমাদের হাতে আসত। বেশীর ভাগ দলেরই এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পের সঙ্গে ওয়াকি-টকি মারফত কথাবার্তার ব্যবস্থা থাকত না। এক ক্যাম্পের সঙ্গে বেস ক্যাম্পেরও যোগ সব সময় থাকত না। বেস ক্যাম্পের সঙ্গে কাঠমাণ্ডুর বেতারে যোগাযোগ খুব কমই থাকত। অতি-বুদ্ধি কোনও কোনও দল গোপনে কখনও কখনও যোগাযোগ হয়ত রাখতেন বা সাফল্য হলে সে খবর জানাবার জন্য সাঙ্কেতিক বার্তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতেন। এই জন্যই নেপালের সীমান্তে প্রথম এভারেস্ট বিজয়ের খবর বিলেতের রানীর কাছে আগে পৌঁছয়, সমস্ত পৃথিবী পরে জানে।

এবার ব্যবস্থা অনেক উন্নত। আমেরিকান-দের ওয়াকি-টকির ব্যবস্থা খুব ভাল। প্রত্যেক ক্যাম্পের সঙ্গে বেস ক্যাম্পের যোগাযোগ আছে। আর প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় বেস ক্যাম্প আর কাঠমাণ্ডুর সঙ্গে বেতার মারফত কথাবার্তা চলে, সংবাদ আদান প্রদান হয়। বেতারযন্ত্রের বেসরকারী ব্যবহারের জন্য সরকারী অনুমতি লাগে। অভিযান সুষ্ঠু পরি-চালনার সুবিধের জন্য নেপাল সরকার সে অনুমতি দিয়েছিলেন। সুতরাং রোজ বিকেলে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আবার পরের দিন সকালে

বেস ক্যাম্প থেকে খবর আসে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সাংবাদিকদের সেটা পরিবেশন করা হয়। তারপর আমরা ছুটি ইণ্ডিয়ান এম্‌ব্যাসীর ভারতীয় ডাকঘরে ব্যাপারটা যত সংক্ষেপে লিখলাম তত সহজে ও সুষ্ঠুভাবে হয় না। খবরটা কে আগে পাঠাতে পারে সে নিয়ে নানা কারচুপি রেষারেষি, রাগারাগি, সবই আছে।

১লা মে আমেরিকা দলের জেমস হুইটেকার এবং শেরপা নওয়াং গোম্বু এভারেস্টের চূড়ায় উঠে বিজয়ী হয়ে নিরাপদে নেমে আসে। ওরা ওঠে পুরোনো পথে, সাউথ কল দিয়ে।

দলে তো অনেকেই থাকে। কী দেখে শেষ আঘাতের ছোট্ট দুজনের দলটিকে বাছাই করা হয়। হুইটেকার আর গোম্বু কেন মনোনীত হ'ল, অন্যরা নয় কেন? এই প্রশ্ন করেছিলেন অভিযাত্রী দলের একজন সদস্য মিঃ জেমস উলম্যানকে।

অভিযানের নেতা ডাইরেনফার্থ

ইনি তেনজিং-এর জীবনীকার আর পাহাড়ের সম্পর্কে বই লেখার ওস্তাদ। অসুস্থ হয়ে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে এসেছেন। এঁর মারফতই খবরাখবর আসে। মিঃ উলম্যান বললেন, হুইটেকারের শারীরিক শক্তি ও অটুট মনোবলের জন্যই ওর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। পরে টাইম ম্যাগাজিনে পড়লাম যে দলের সবাই হিমালয়ে রওনা হবার আগে ওদের প্রত্যেককে একটি মনস্তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ দলের সামনে উপস্থিত হ'তে হয়। সবাইকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তুমি কি শিখরে উঠবে? কেউ বলেছিল,—সুযোগ পেলেই উঠব; কেউ বলেছিল—মনোনীত হ'লেই উঠব, কেউ বলেছিল—খুব আশা রাখি। আর হুইটেকার বলেছিল—উঠবই উঠব।

গোম্বুর বেলাও ঐ একই কথা। উলম্যান বললেন, গোম্বু এভারেস্টে ওঠার জন্য পাগল। এর জন্য সে যে-কোনও কষ্ট, যে-কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী ছিল। এত অধীর আগ্রহ কেন? এই 'কেন'র উত্তর পেতে আমার দেরি হ'ল না। গোম্বু হ'ল তেনজিং-এর আপন ভাগ্নে। আর কে না জানে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আজ একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে তেনজিং পরিবারের একটা অপূর্ব কৃতীর-

বউকে পেলে যা কাছে না থাকলে খুঁজে পেতে দেখা করে জিগ্যেস করতে হয়, "কর্তার সাফল্যে আপনার কেমন লাগছে?"

বিজয়ী আমেরিকান সদস্যদের দুজনের বউ এবার কাঠমাণ্ডুতে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন। একজন পশ্চিমী পথে (west ridge) বিজয়ী উইলিয়াম আনসোয়েল্ড-এর স্ত্রী জলিন, আর অন্যটি সাউথ কলের পথে দ্বিতীয় দলের অন্যতম বেরী বিশপের স্ত্রী লায়লা, যাঁর নাম Leila। আমার মতে হওয়া উচিত লীলা।

২৩শে সকালে প্রথম খবর এল যে, ওয়েস্ট রিজের দল এভারেস্টে উঠে অন্য পথে নামছেন বা নেমেছেন। সকাল ৯টায় বেস ক্যাম্প থেকে খবর আসবে। তার আগে আমেরিকান দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাশে কর্নেল গ্রেশামের বাড়িতে ভিড় জমে গেছে। কারণ ওঁর বাড়িতে বসানো বেতারযন্ত্রেই খবর আসবে। সাফল্যের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল আগের দিন। খবর এসেছিল ডঃ আনসোয়েল্ড ও ডাক্তার হর্নবিনকে পশ্চিম রিজ এর পথে বিজয়ী-যুগল। চূড়ার খুব কাছে দেখা গেছে। যখন বিজয়ী হবার খবর আসবে তখন উল্লাসে মাতামাতি শুরু হবে, সবাই জলিনকে ঘিরে রাখবে, কী বলে কান পেতে শুনবে। অতএব আমি জলিনকে আগেই পাকড়াও করে কাজ এগিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। বললাম মনে করুন তোমার স্বামী জিতেছেন যদি শোনেন তোমার কি মনে হবে? উত্তরে বললেন মনে হবে, নিপুণ সংযত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। কারও একার কাজ এটা নয়।

আমার মনে হল ওটা যেন পরীক্ষার প্রশ্নের তৈরী করা উত্তর। সমবেত প্রচেষ্টায় সম্ভব হলেও সবাই তো আর শেষ পর্যন্ত পৌঁছাবার কপাল বা সামর্থ্য রাখেনি। জলিন কি স্বামীর গর্বে এমন পারে তখন [illegible] বলছে না — '[illegible] গর্বিনী হাম।'

অবশেষে খবর এল। ভীষণ দুর্গম এবং সম্পূর্ণ অজানা পথে, যে পথে ওঠা সম্ভব এর আগে কেউ ভাবেইনি, ডঃ আনসোয়েল্ড ও ডাঃ হর্নবিন এভারেস্টের চূড়ায় উঠলেন। শুধু তাই নয়, এক পথে উঠে অন্য পথে নামার খবর এল। হিমালয়ের বুকে অনেক ডানপিটে অনেক দোরাত্ম্য করেছে। কিন্তু এই লোক দুটি যা করল তাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিল অপরিসীম। ওয়েস্ট রিজের পথ শেষের দিকটা খাড়া পাথর। শুধু পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, যেন পথকে আরও সঙ্গীন করে তোলার জন্য পাতলা বরফের আস্তর। ২২শে বিকেল সাড়ে ছটায় ওরা উপরে পৌঁছলো। ওদের পিঠে বোঝা ছিল খুব সামান্যই। যতটা সম্ভব হাল্কা রেখেছিল নিজেদের। কিন্তু

একটা জিনিস কাছে ছিল। ব্যাটারী দিয়ে চালিত টেলিফোন জাতীয় ওয়াকি-টকি, ওয়াক করার সময় টক করার কল। কিন্তু হিসাব করে কথা বলতে হবে; কারণ কথা বললেই ব্যাটারী খরচ; এবং ব্যাটারী শেষ হয়ে গেলে যখন প্রাণ বাঁচানো ডাক দেবার সময় হবে তখন হয়তো যন্ত্র নীরব হয়ে থাকবে।

চূড়োয় ওঠার তিনঘণ্টা আগে ওরা একবার নীচের ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নীচে ওয়াকি টকি ধরেছিল এই অভিযানের প্রথম বিজয়ী যুগলের অন্যতম জেমস হুইটেকার। সংক্ষেপে জিম। জিম যখন জানল যে বেলা গড়িয়ে গেছে অথচ তখনও বেশ কিছুটা ওঠা বাকী এবং শেষের পথটুকুই মারাত্মক। তখন বলেছিল 'আমার মনে হয় আর বিপদ ঘাড়ে না নেওয়াই উচিত ভেবে দেখ নেমে আসবে কি না"। উত্তর এল। ফেরার পথ বন্ধ। We have reached a point of no-return.

যে দড়ি ধরে নামতে হবে তা আর নেই। ফুরিয়ে গেছে। অতএব আমরা এগিয়ে চলছি। সবাই জানেন যে এরপর এরা যেভাবে উঠেছে এবং নেমেছে তা হিমালয়-অভিযানে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এগিয়ে যেতে হ'লে এমনভাবে এগুতে হবে যেন ফিরবার পথ না থাকে। burning desire হবে সেই জিনিস যা পিছনের সব পুড়িয়ে দেবে, ফেরার উপায় থাকবে না। তবে জীবনে আসবে সাফল্য স্বীকৃতি। এসব কথা পুঁথিতে পড়েছি উদাহরণও পেয়েছি। চোখের সামনে এই প্রথম দেখলাম।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের পাদদেশে পৃথিবীর সংকীর্ণ [illegible] সাফল্য লাভের জন্য যে [illegible] মুখোমুখি হয়েও কি সেই [illegible] সব সময় সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। স্বেচ্ছায় কত লোক point of no return-এ পৌঁছাতে পারে? আনসোয়েল্ড ও হর্নবিনই কি তা ই গিয়েছিল? সাউথ কলের পথে নামবার সময় ওরা এবং ওদের তিনঘণ্টা আগে বিজয়ী সাউথ কল যুগল চূড়োর নীচে ওদের ক্যাম্পের পথ হারিয়ে ফেলে। ২৮০০০ ফিট-এ স্লিপিং ব্যাগ ছাড়াই রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছে। এই লেখাটা লেখার সময় খবর এসেছে ওয়েস্ট রিজ দলের উইলিয়ম আনসোয়েল্ড এবং দ্বিতীয় সাউথ কল দলের বেরী বিশপের ওই রাতে অত উঁচুতে খোলা জায়গায় ফ্রিজিং পয়েন্টের ১৫ ফাঃ কম শীতে বিশেষ কিছু গায়ে না দিয়ে রাত কাটানোর ফলে ওদের দুজনেরই ঠাণ্ডায় কামড়ে পায়ের সব আঙুল জমে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে খসে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এখান থেকে হেলিকপ্টার পাঠাবার

হুইটেকারের দুই পুত্র পিতার সাফল্য সংবাদে মাকে জড়িয়ে ধরেছে।

ব্যবস্থা হচ্ছে। এ [illegible] বাঁচাবার শেষ চেষ্টায় [illegible] থেকে নতুন ওষুধ আসছে। এদিকে সময় বয়ে যায়।

আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভাসছে। ২৩শে সকালে যখন উইলিয়ম আনসোয়েল্ডের উপরে ওঠার খবর এল, তখন বেরী বিশপের বিজয়বার্তা পৌঁছয়নি। জলিন আনসোয়েল্ড লায়লা বিশপের হাতটি ধরে প্রায় সান্ত্বনার সুরে বললেন—আশা করি তোমার স্বামীও উপরে উঠেছেন। এবং আমাদের স্বামীরা নিরাপদেই নেমে এসেছেন।

স্বামীরা উচ্চতম শীর্ষে ওঠার পরও উৎকণ্ঠায় দিন কাটান তাঁদের স্ত্রীরা। বিজয়ের গর্বে যখন চতুর্দিকে মাতামাতি চলছে, ওদের তখন একমাত্র প্রার্থনা—ভগবান ও'দের নিরাপদে ফিরিয়ে দাও।

দশ বছর আগেকার কথা। তেনজিং-এর বিজয় কাহিনী লেখা শেষ হয়ে গেল। তখনও আরও কয়েকশত শব্দ প্রোডিউস করতেই হবে। তখন মিসেস তেনজিং-এর সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম যে, যখন তেনজিং-এর এভারেস্ট বিজয়ের খবর ও'র কাছে পৌঁছলো উনি কি ভাবলেন। মিসেস তেনজিং বললেন, 'সবাই এসে বলে, শুনেছেন তো তেনজিং এভারেস্টে উঠেছে। শুনে শুনে কানে তালা লেগে গেল। মুখ পোড়ারা শুধু বলে উঠেছে উঠেছে। [illegible] তো উঠবে বলেই গেছে। বলি লোকটা নেমেছে তো? নিরাপদে আছে তো জখম টখম হয়নি তো।" ২৩শে সকালে হাত ধরাধরি করে জলিন ও লায়লারও ঐ একই প্রশ্ন। একই প্রার্থনা নিরাপদে নেমে আসুক। কপাল দোষে ওই দুই মহিলার স্বামীই এই অভিযানের বিজয়ীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী আঘাত পেলেন।

লিখতে গিয়ে আরেকটা কথা মনে হচ্ছে। এবারের এভারেস্ট অভিযানের প্রথম বিজয়ী যুগল হলেন হুইটেকার ও গোম্বু। বিজয়ের খবর পৌঁছন মাত্রই হুইটেকারের স্ত্রীর সঙ্গে মার্কিনী সাংবাদিকরা দেখা করেছেন। কিন্তু দার্জিলিংবাসিনী

কাঠমাণ্ডু হাসপাতালে কুমারজনতে [illegible] আনসোয়েল্ড (বামে) ও শ্রীবেরী বিশপ

গোম্বুর স্ত্রী এখনও স্বদেশে অর্থাৎ আমাদের দেশে অজ্ঞাতেই আছেন। বলতে লজ্জা করছে গোম্বু যে বিবাহিত একথাও অনেকে জানতেন না। আমিও না। গোম্বুর সাফল্যের খবর আসার পর খবর নিলাম। তার কিছুদিন আগেই বিশেষ একটি ব্যাপারে একটি শেরপা কন্যার সংগে কলকাতায় আলাপ হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে এভারেস্ট বিজয়ের প্রচেষ্টার জন্য জাপানী একটি অভিযানের পক্ষ থেকে নেপাল সরকারের সম্মতি নিতে এসেছিলেন, মিঃ মিটা। তিনি আমায় একদিন একটা সওদাগরী অফিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে কাজ করে এককালের অতি কৃতী শেরপা সর্দার স্বর্গীয় গ্যালজেনের মেয়ে। গ্যালজেন জাপানীদের সার্থক মানাসলু পর্বতে অভিযানে সর্দার ছিল, পরে অন্য এক অভিযানে সে মারা যায়। জাপানী আলপাইন ক্লাব তাই তার মেয়েকে মিঃ মিটার হাত দিয়ে কিছু উপহার পাঠিয়েছে। কুমারী গ্যালজেন আমায় বললেন যে, গোম্বু বিবাহিত। স্ত্রীর নাম সীতা। সীতা দেবীর সংগে এখান থেকে দার্জিলিং-এ যোগাযোগ করার চেষ্টা করে সফল হয়নি। সীতার সিঁদুর কি গোম্বুর বিজয় ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে এবং আমেরিকান অভিযানের প্রথম সাফল্যে সাহায্য করেনি?

সত্যি এভারেস্ট অভিযান শুধু পর্বতের বুকে একটা সুসংগঠিত দলেরই একমাত্র প্রচেষ্টা নয়। তার পিছনে রয়েছে আরও বহুজনের আকাঙ্ক্ষা, উৎকণ্ঠা, প্রতিদিনের নীরব প্রার্থনা। প্রকৃতির সংগে পুরুষের সমানে পাল্লায় লড়বার ধৃষ্টতা। পুরুষদের হয়ে স্ত্রীদের ক্ষমা প্রার্থনা।

তবু ওরা যায়। বছরের পর বছর যায়। ওরা কেন যায়?

উত্তরটি এক কথায় দিল ১০ বছরের বেগন। উইলিয়াম আনসোয়েল্ডের ছেলে। যার সংগে বাবার খবর জানতে বেতারযন্ত্রের কাছে এসেছিল। বলল, It's pretty funny!" মজা পায় তাই যায়। বয়স্ক বিজ্ঞ অভিযাত্রীদের উত্তর ওর জানা নেই। তারা বলে, কেন যাই? ওই চূড়াটা ওখানে আছে বলেই যাই।

তুষার সীমার উপরে

• ধ্রুব মজুমদার •

ওডেল ১৯২৪
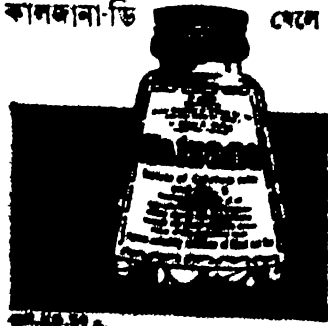
৭ ই জুন ১৯২৪। চার নম্বর শিবির থেকে ম্যালোরি আর আরভাইন গতকাল পাঁচ নম্বর শিবিরে উঠে গেছে। আজ হয়তো এতক্ষণে ওরা প্রাতরাশ সেরে ছয় নম্বরের পথে। যদি ভাগ্য ভাল হয় যদি আবহাওয়া ভাল থাকে তবে কাল হয়তো ওরা—।

আজও ওডেল আর শেষ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারল না। এভারেস্টের চূড়া ওডেলের কাছে আজও কেমন যেন সুদূর, মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বলে মনে হল। তাঁবুর ভেতর থেকেই এভারেস্টের চূড়া আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আবহাওয়া সকাল থেকেই পরিষ্কার। সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে চূড়োটা—মেঘমুক্ত আকাশে সম্পূর্ণ অচঞ্চল এবং নির্বিকার।

অথচ ওই পর্যায়েও শিব আর কতক্ষণ [illegible] ত্রিশ ঘণ্টা পড়ে [illegible] [illegible] মুহূর্তের জন্য ম্যালোরি ও আরভাইনের সফলতা সম্পর্কে ওডেলের মনে বিন্দুমাত্র সংশয়ও রইল না। মুহূর্ত পরেই মনে পড়ল ওই শীর্ষারোহী দলে ওডেলও থাকতে পারত। ওই দলে ওডেলেরই থাকবার কথা ছিল।

কিন্তু কণামাত্র ঈর্ষা বোধ করল না ওডেল। ম্যালোরির প্রতি ঈর্ষা বোধ করবার কথাই ওঠে না। প্রথম জুটির নেতা ছিল ম্যালোরি। সে জুটি পঞ্চম শিবির থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে তৃতীয় শিবিরে নেমে গিয়েছিল। ম্যালোরির তখনকার চেহারা দেখে কষ্ট হয়েছিল ওডেলের। ও জানত যে প্রথম জুটি ব্যর্থ না হলে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় জুটি শীর্ষে আরোহণের কোন সুযোগই পেত না। ও নিজে ছিল তৃতীয় জুটিতে কিন্তু তবু বিষণ্ণ না হয়ে পারেনি।—এভারেস্ট-শীর্ষের উপর যে ম্যালোরির অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য ওডেল তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। ম্যালোরি ছেলেটা গোঁয়ার এবং একরোখা। কিন্তু তবু ছেলেটার মধ্যে কী যেন আছে, যা একই সঙ্গে শ্রদ্ধা আর স্নেহ আকর্ষণ করে।

ওডেলের ইতিমধ্যে জামা-কাপড় পরা হয়ে গেছে। তাঁবুর ভেতর কুঁজো হয়ে জামা-কাপড় পরতে ওডেলের আর এখন কোন অসুবিধেই হয় না। অথচ গোড়ার দিকে এই অভ্যস্ত কাজটুকুর জন্যেই কী সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হত। ওডেল হিসেব করে দেখল, এই 'নর্থ কল' এর উপরেই অভিযানের দিনটি ছেড়ে দিয়ে ওর ষোড়শ দিন।

তাঁবুর ভেতরেই দু-চারবার শুয়ে-বসে শরীরটাকে একটু গরম করে নিল ওডেল। তারপর বাইরে বেরিয়ে এল। ওর হাত-ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজে চল্লিশ মিনিট। 'নর্থ কল'-এর উপর দিয়ে তখন হাড়-জমানো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে দেখল ওডেল। উচ্চতা অনুযায়ী আবহাওয়া চমৎকার।

সাহেবদের তাঁবু থেকে শেরপাদের তাঁবুগুলো একটু দূরে, একটা ঢালের আড়ালে সেখানে হাওয়া একটু কম তীব্র। ওডেলের পায়ের আওয়াজ পেয়েই একটা তাঁবুর ভেতর থেকে একটা হাসি-খুশি মুখ বেরিয়ে এল : গুড মর্নিং সাব। চা রেডি।

গুড মর্নিং লোবসাং। কোই তকলিফ হায় ?

থোড়া সাব সেমচুম্বীকো।—বলতে-বলতেই এক মগ গরম চা নিয়ে লোবসাং তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

হাতের দস্তানা খুলে চায়ের গরম মগটা দু হাতে চেপে ধরল ওডেল। দার্জিলিং ছেড়ে রওয়ানা হবার পরই এই দুজনের মধ্যে একটা অবিশ্বাস্য আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এ নিয়ে কিছু কিছু ঠাট্টা-টিটকারিও শুনতে হয়েছে ওডেলকে। কিন্তু ওডেল বিব্রত হয়নি।

—রেডি টু স্টার্ট, লোবসাং ?

—জী সাব, রেডি। সেমচুম্বী থোড়া বুখার।—হাসিতে লোবসাংয়ের চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল, দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল।

ওডেল লোবসাংকে বুঝিয়ে দিল যে, সেমচুম্বীর আজও বিশ্রাম। কাজ শুধু বেলা দুটো থেকে [illegible] চা খেতে শুধু

করা এবং সর্বদা অন্তত চার মগ গরম চা প্রস্তুত রাখা! উপর অথবা নীচে থেকে হঠাৎ কেউ যদি এসে হাজির হয়!

পরশু দিন সেমচুম্বী দ্বিতীয় জুটির সঙ্গে পঞ্চম শিবির থেকে নেমে এসেছে। নেতা নর্টন তুষারে অন্ধ, সমারভেলের দুটো পায়েই তুষারক্ষত,—সেমচুম্বীই ওদের ধরে ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল।

সেদিন বিকালে ম্যালোরি আর আর্ভাইন

হাতের দস্তানা খুলে চায়ের মগটা চেপে ধরল ওডেল।

শীর্ষে আরোহণের একটা নতুন ফন্দি নিয়ে তৃতীয় শিবির থেকে উঠে আসবার আগেই নর্টন ও সমারভেলকে নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেমচুম্বী ভয় পেয়েছিল, নেমে যেতে রাজী হয়নি। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে ওডেল বুঝেছিল, ক্লান্তি ছাড়া সেমচুম্বীর দ্বিতীয় কোন ব্যামো নেই। আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ম্যালোরির 'আইডিয়া'টা ওডেলের মনঃপূত হয়নি। অক্সিজেনের বোঝা নিয়ে পাহাড়ে চড়বার নানান অসুবিধা ছাড়াও পুরো ব্যাপারটাই ওডেলের কাছে কেমন যেন 'ডাকগার' মনে হয়েছে। ম্যালোরিকে দুবার-একবার নিরস্ত করবার চেষ্টা করে-ছিল ওডেল। ম্যালোরির রোখ তাতে আরও বেড়ে গেছে। ওডেল তাই আবারও নেপথ্যের ভূমিকাই বেছে নিয়েছে।

আজ ওডেল পঞ্চম শিবিরে যাবে। তারপর ঘটনা যেদিকে চালিত করে।

চতুর্থ থেকে পঞ্চম শিবিরের দূরত্ব—উত্তর-গিরিশিরার ডান ধার দিয়ে দু' মাইলের মতো। উচ্চতার পার্থক্য দু' হাজার ফুট। ২৩ হাজার থেকে ২৫ হাজার। পথটা ওডেল চেনে। এর আগে একদিন হ্যাজার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ও ঘুরে এসেছে পাঁচ নম্বর থেকে। পথে তুষার-ধসের ভয় নেই, ফাটলেরও বিড়ম্বনা নেই। কেবল খুব সন্তর্পণে পদক্ষেপ করতে হয়। স্লেটের মত আলগা পাথরগুলোর উপর গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ে থাকে। প্রতি পদক্ষেপেই পা ফসকাবার আশঙ্কা। আর একবার পা ফসকালেই তিব্বত থেকে একেবারে নেপালে। প্রায় ১৫ হাজার ফুট নীচে। কিন্তু নিজের শরীরটাকে আজ চাবুকের মতো মনে হচ্ছিল ওডেলের। এমনি সুস্থ, এমনি প্রফুল্ল। লোবসাংকে নিয়ে ওডেল যখন পাঁচ নম্বরে এসে পৌঁছল ঘড়িতে তখন একটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। লোবসাং আজ পঞ্চাশ পাউণ্ড মাল বয়ে এনেছে। রেষারেষি করে ওডেলও পঞ্চাশ পাউণ্ড এবং বারো আউন্স।

পঞ্চম শিবিরে ম্যালোরির কোন চিরকুট খুঁজে না পেয়ে ওডেল সামান্য হতাশ হল। সকালের দিকে এখানে আবহাওয়া কেমন ছিল, দুজনেই সুস্থ ছিল তো? কিন্তু সূর্য একটু ঢলে পড়লেই রাজ্যের ঠাণ্ডা এসে এখানে জুটবে। ওডেল তাড়াতাড়ি তাঁবু গোছগাছ করতে ব্যস্ত হল। লোবসাংকে বলল চায়ের তোড়জোড় করতে। বরফ গলিয়ে জলের তাপ হিমাঙ্কের উপরে তুলতে-তুলতেই হয়তো উপর থেকে শেরপা চারজন নেমে আসবে।

তাই এল। তবে তার আগে পুরো তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। গরম চায়ের মগ হাতে নিয়ে ওদের সঙ্গে গোল হয়ে বসল ওডেল। একটি একটি করে সব কথা জেনে নিল। আবহাওয়া ভাল ছিল এবং আছে। দুজন সাহেবই সুস্থ ছিল এবং আছে। ওদের হাতে ম্যালোরি একটা চিরকুটও পাঠিয়েছে। তাতে লেখা : আমরা ভাল আছি। আবহাওয়া ভাল। এভারেস্টের চূড়ো থেকে কাল আমরা সোজা চার নম্বরে নেমে যাব। সম্ভব হলে তিন নম্বরে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করো।—ম্যালোরি।

মুহূর্তের জন্য, কী করবে কী করা উচিত তা ঠিক করে উঠতে পারল না ওডেল। নীচে নেমে যাবে? কিন্তু উপরে যদি ওদের কোন-কিছুর প্রয়োজন হয়? থেকে যাবে? ম্যালোরি হয়তো চটে উঠবে।

শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়াই সাব্যস্ত করল ওডেল। চারজন শেরপার সঙ্গে লোবসাংকেও নীচে পাঠিয়ে দিল নিশ্চিন্ত নির্দেশ দিয়ে। লোবসাংএর উপর নির্ভর করা চলে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পঁচিশ হাজার ফুট উচ্চতায় এর আগে কেউ কোনদিন নিঃসঙ্গ রাত্রিযাপন করেনি।—করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করত না কেউ। ওডেল এইবার সেই অসাধ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত হল পাহাড়ের ছায়া ততক্ষণে দীর্ঘায়িত হয়েছে, আকাশে মেঘের রেশটুকুও নেই। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল ওডেল,—অজস্র পর্বতশীর্ষের মধ্য দিয়ে রংবোক হিমবাহের ক্ষীণরেখা আবছা আবছা দেখা যায় তারপরই চো ইউ আর গিয়াচুংকেঙের প্রাচীর, —এখন আর তেমন আকাশছোঁয়া নয় পুবে প্রায় একশো মাইল দূরে চিত্রার্পিতবৎ কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন স্বচ্ছন্দে মেঘের উপর ভাসছে। অস্তগামী সূর্যের উজ্জ্বল আভায় সোনালী আকাশটা অনেকক্ষণ ঝকঝক করতে লাগল।

পর্বতারোহীরা ভিন্ন ভাষায় সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে অভ্যস্ত। ফিরে এসে ওডেল

কবুল করেছে, অমন সূর্যাস্ত দ্বিতীয়বার দেখবার সুযোগ পেলে ও এভারেস্টের শীর্ষে আরোহণ তিন-তিনবার প্রত্যাখ্যান করতে রাজী আছে।

ওডেল বলেছে, সে রাত্রিতে ওর ঘুমিয়ে পড়তে সংকোচ হচ্ছিল এবং ঠিক কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা ও নিজেই জানে না। যখন ঘুম ভেঙেছে তখন সকাল হয়ে গেছে (পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই; ওডেল তখন সমুদ্রবক্ষ থেকে ২৫ হাজার ফুট উঁচুতে এভারেস্টের পঞ্চম শিবিরে!)।

*

সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই ওডেল আবার সেই পুরোনো ওডেল। চায়ের জন্য প্রথমেই স্টোভ জেলে বরফ চড়াল। জামা কাপড় পরাই ছিল। অবশেষে প্রাতরাশ সেরে জুতো পায়ে ওডেল যখন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়াল তার আগে পুরো দু ঘণ্টা সময় কেটে গেছে। পর্বতারোহী-মাত্রেই আজও বিস্মিত হন : মাত্র দু ঘণ্টা!

রুকস্যাকে পাউন্ড পাঁচিশেক খাবার পুরে নিল ওডেল, ওপরে যদি ওদের খাবারে টান পড়ে। তাঁবুর সামনেটা ভাল করে বেঁধে দিল, খুঁটিগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখল—এখানে-সেখানে দুটো-একটা পাথর চাপা দিয়ে তাঁবু দুটো ভাল-ভাবে সুরক্ষিত করল। ব্যস্‌ ওডেল এইবার রওয়ানা দিল ষষ্ঠ শিবিরের পথে। ঘড়িতে তখন ঠিক আটটা বেজেছে।

গোড়ার দিকটায় পথ তেমন দুর্গম নয় যদিও অত্যন্ত বিপদসংকুল। চড়াই ভাঙতে হয় না কিন্তু এগোতে হয় যেন দেওয়াল ধরে ধরে। পাহাড়ের গা প্রায় আগাগোড়া পঞ্চাশ ডিগ্রী কোণ নেমে গেছে। আর পায়ের তলায় সেই আলগা আলগা স্লেট পাথর, তার উপরে কুঁচি কুঁচি বরফ। ছড়ানো। তবে বরাত ভাল হাওয়া এখনও তেমন তীব্র নয়।

অতি সন্তর্পণে ওডেল এগোতে লাগল। বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত এগোল। অনুমান করল অন্তত চার ফার্লঙ পথ অতিক্রম করে থাকবে। আর উঠেছেও নিশ্চয়ই শ' সাতেক ফুট।

কিন্তু এর পর একটু অধৈর্য বোধ করল ওডেল। কিছুক্ষণ থেকেই ও বুঝতে পারছিল যে, গিরিশিরার এই ধারটা ধরে চললে ম্যালোরিরা কতদূর এগোল তা ও বুঝতে পারবে না। সব চাইতে ভাল হত যদি ছুরির ফলার মতো ওই উত্তরের গিরি-শিরাটার উপর দিয়ে এগোনো যেত। এভারেস্টের পুরো উত্তর দিকটাই চোখের উপর থাকত তা হলে। কিন্তু সে কি সম্ভব?—অভিজ্ঞ পর্বতারোহী ওডেলও একটু ইতস্তত না করে পারল না।

কথাটা একটু আগে খেয়াল হলে এত ভাবনার আর-কিছু থাকত না। একটা ভূতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহের জন্য একটু আগেই

বহুদূরে দুটো বিন্দু নড়াচড়া করছে

ওডেল প্রায় ওই গিরিশিরাটা পর্যন্তই উঠেছিল সেখান থেকে গিরিশিরার পথ ধরে এগোলেই হত। এই অতি সাধারণ কথাটা তখন মাথায় আসেনি বলে ওডেল একটু বিস্মিত হল। এখন এই একশো ফুট তো হাজার ফুটেরই সামিল—আর নিঃসঙ্গ অবস্থায় হয়তো বা মৃত্যুরই সমতুল।

পর্বতারোহীর শ্যেনদৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ওডেল। দুটো-একটা সম্ভাব্য পথ নজরে পড়ল কিন্তু দূর থেকেই ওডেল বুঝতে পারল ওসব পথে আরোহণ করা সম্ভব নয়। অবশেষে ফার্লঙ দুয়েক সামনে একটা বরফের নালা নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ওডেলের মনে হল "নাট গলি উইল গো।" পাহাড় পর্বতারোহণের পথ খুঁজবার ধরনটাই এই নমুনার। ঠিক পথটি নজরে পড়লে সব কর্টি ইন্দ্রিয় যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে। গিরিশিরাটার উপরে উঠে আসতে ওডেলের সময় লাগল পুরো দেড় ঘণ্টা। ইতিমধ্যে হাওয়ার বেগ একটু বেড়েছে। আর এমনই দুর্দৈব, অল্প অল্প মেঘ জমছে এভারেস্টের গায়। চলতেও এখন বেশ কষ্ট হচ্ছিল ওডেলের। পথ আর কেবল বিপদ-সঙ্কুল নয়, দুর্গমও। প্রতি পদক্ষেপে ওডেলকেও আট থেকে বারো বার শ্বাস নিতে হচ্ছিল। অবশেষে—বেলা তখন ঠিক বারোটা পঞ্চাশ—ওডেল দেখতে পেল বহু দূরে দুটো বিন্দু নড়াচড়া করছে। ওডেল দেখল, একটা বিন্দু একটু ঝুঁকে পড়ে অপর একটা বিন্দুকে দ্বিতীয় শিলাস্তরের উপর উঠে আসতে সাহায্য করছে। তারপরই অকস্মাৎ মেঘের যবনিকা নেমে এল।

মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আরও কয়েকবার ওডেল দেখতে পেল ওদের। ওরা লড়ছে। যে-কোন কারণেই হোক ওদের দেরি হয়ে গেছে। যেখানে সকাল আটটায় পৌঁছবার কথা সেখানে ওরা পৌঁছেছে বেলা একটায়। তবু ওরা হাল ছাড়েনি। ওরা লড়ছে এবং উঠছে।

মনে মনে ওডেল একটা মর্মান্তিক হিসেব কষে ফেলল। এই গতিতে শীর্ষে পৌঁছতে ওদের বেলা সাড়ে চারটে বেজে যাবে। ফিরতে ফিরতে রাত ঘনিয়ে আসবে। অন্ধকারে এ পথে নেমে আসা

শয়তানের পক্ষেও অসম্ভব। আর এই তুষার-ঝটিকার মধ্যে একটা রাত বাইরে কাটানো মানে—। হিসেবটা আর শেষ পর্যন্ত টানতে পারল না ওডেল।

এই অনিবার্য পরিণামটা বুঝবার পর ওডেল যদি সুড়সুড় করে নিজ নিরাপত্তায় ফিরে আসত তবে ওর দোষ ধরবার কিছু থাকত না। ওডেল ওডেলই থাকত। কিন্তু এক ওডেলই বোধ হয় ওডেলকে অতিক্রম করতে পারে।

ওডেল যখন ২৬ হাজার ৮শ' ফুট উঁচু ষষ্ঠ শিবিরে গিয়ে পৌঁছল বেলা তখন দুটো। তীব্রবেগে তুষার পড়ছে এবং হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৬৫ মাইল। এখানেও কোন চিরকুট খুঁজে না পেয়ে ওডেল একটু হতাশ হল। পাহাড়ে উঠবার কিছু কিছু সাজসরঞ্জাম কেবল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওডেল। তারপর দুশো ফুট পাহাড় বেয়ে একটা উঁচু জায়গায় উঠল। কিছুক্ষণ ইওডেল (সংকেতধ্বনি) করল। কিন্তু কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে নেমে আসবে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ এভারেস্টের উপর থেকে মেঘ কেটে গেল। কিন্তু কোথায়ও কোন সজীব চিহ্ন নজরে পড়ল না ওডেলের।

নেমে আসবার পথে ভূতাত্ত্বিক নমুনা হিসাবে আবার কতকগুলো পাথর কুড়িয়ে নিল ওডেল।

ম্যালোরির শেষ নির্দেশ অনুযায়ী ওডেল সেদিনই চতুর্থ শিবিরে নেমে আসে ষষ্ঠ শিবির থেকে।

*

৯ই জুন ১৯২৪। চতুর্থ শিবিরে প্রায় সবাই অসুস্থ। নোসাংও। পশ্চিম দিক প্রচণ্ড তুষার ঝটিকা উঠেছিল বেলা বাড়তে লাগল কিন্তু ঝড়ের বেগ কিছুমাত্র প্রশমিত হল না। সব তুচ্ছ করে ওডেল আবার রওয়ানা হল। শেষবারের মতো একবার দেখা কর্তব্য।

৪ নম্বর থেকে ৫ নম্বর। ৫ নম্বর থেকে ৬ নম্বর তারপরে আবার ৪ নম্বর। ২৩ হাজার ফুট থেকে ২৭ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করে আবার ৪ হাজার ফুট নেমে এসেছে ওডেল। একা—একই দিনে। উপর্যুপরি দুই দিনে একই বিস্ময়ের অবিশ্বাস্য পুনরাবৃত্তি।

নতুন করে ম্যালোরিদের কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেনি। সব যেমন যেমন রেখে এসেছিল আবারও ঠিক তেমন তেমনই দেখে এসেছে।

তবে একটা বিষয়ে পর্বতারোহীরা আজও সুনিশ্চিত। সুযোগ পেলে ওডেল ১৯২৪ সালেই এভারেস্ট-শীর্ষের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারত।

কমিউনিস্ট সমাজের সর্বত্রই স্লোগান। "দুনিয়ার প্রলেটারিয়েট এক হও", "কমরেডরা! কমিউনিজম গড়—ধরায় স্বর্গ আন।" তরুণ কমিউনিস্টরা রোমান্টিক হও—[illegible] কর প্রসবী—কাজাখস্তান হও ইত্যাদি। এক কমিউনিস্ট লেখক একটি সহজ সুন্দর স্লোগান দাবি করেছেন "অনেক বেশি হাসো"।

সম্প্রতি আমার স্ত্রী আমায় একটি হাসির বই উপহার দিয়েছেন। [illegible] বছর আমার [illegible] টাইপিস্ট [illegible] বইটিতে রয়েছে [illegible] ইউরোপের নানা হাসির গল্প ও ছবি। সম্পাদনা করেছেন [illegible] বিখ্যাত [illegible] "ক্রকোডিল"-এর [illegible] সম্পাদক [illegible] এবং [illegible] [illegible] কমিউনিস্ট পার্টির [illegible] ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত [illegible] কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিতে যে প্রধান কর্তব্যগুলো নির্ধারিত হয়েছে তাদের একটি হল কমিউনিস্ট নীতির মর্মানুযায়ী মানুষের শিক্ষা। যেহেতু এই শিক্ষার অন্যতম সর্বপ্রধান বাহন ব্যঙ্গ ও রসিকতার শিল্প সেহেতু ইত্যাদি ইত্যাদি" (সম্পাদক ঠিক এ কথাই লিখেছেন)। "কেন হাসব" এ প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বলেছেন কেবল হাসির একটি করুণ গল্প। গল্পটি এই :

ওরা বলে হাসিটা শিশুদের জন্য। বড়দের কাজ গোছানো, নালিশ করা, নিজের মাথায় পাকা চুলগুলো দেখানো, কিডনিতে কত চিনি জমল, তার হিসেব করা আর মরার কথা বলা। আমরা কিন্তু ওদের তোয়াক্কা না করেই হাসব, আর যদি মরি তবে মরব ষোল বছর বয়সের মতো।

আমার এক শিল্পী বন্ধু ছিল। সে মরে ঠিক ষোল বছর বয়সের মতো, যদিও পাসপোর্ট অনুযায়ী তার বয়স তখন ষাটের ওপরে। তার হাবভাব ছিল ছোকরাসুলভ। সন্ধ্যার আসরে সে-ই নাচত সবার চেয়ে বেশি। আর তার মুখে থাকত স্বচ্ছ উজ্জ্বল হাসি।

ওকে কেউ কখনই বিশ্বাস করত না। অল্প বয়সে তার খাওয়া জুটত না। সারাটা দেশ সে তখন চষে বেড়িয়েছে—কখনো করেছে দোকানের দালালী, কখনো বেচেছে রঙিন কার্ড, ট্রেনের যাত্রীদের ছবি এঁকেছে দুটো পয়সার জন্য, ফিরি করেছে পুরনো খবরের কাগজ। কিন্তু ওর দুরবস্থার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি—ওর মুখে যে সবসময় হাসি। ছেলেমেয়েরাও তার প্রায়ই থাকত অভুক্ত। কিন্তু তাদের কথাও কেউ বিশ্বাস করত না। কারণ ওরাও যে বাপের কাছ থেকে হাসতে শিখেছে। আছাড় খেয়ে বন্ধুটির নাক দিয়ে যখন রক্ত পড়েছে তখনো কেউ বিশ্বাস করেনি—ওর ব্যথা লাগছে। কারণ ওর মুখে যে হাসি।

ফ্যাসিস্টরা ওকে একদিন ধরে নিয়ে যায় ফ্যাসিবিরোধী বন্ধুদের সে লুকিয়ে রেখেছিল বলে। ছাড়া যখন পেল তখনো কেউ বিশ্বাস করল না কী অত্যাচার সইতে হয়েছে ওকে। কারণ বেরুল সে হাসিমুখে। আবার যখন এ ছেলে যাওয়াটাও ওর একটা [illegible]। [illegible] সম্ভব উচ্চাশে সে কখনো বিচলিত হয়নি। কারণ আপনারাই বলুন সম্ভব [illegible] কেউ যদি [illegible] একটা কেলেঙ্কারির কাণ্ড [illegible] সব সময় হাসে [illegible] কোনো গুরুগম্ভীর কাজ [illegible] কোনো [illegible] [illegible]

[illegible] ছবি আঁকত। ছোট [illegible] ছবি। [illegible] সবাই [illegible] সারাক্ষণ হাসছে। ভদ্রমহোদয়গণ সেসব ছবি দেখে মাথা নেড়ে বলতেন:

খুব সুন্দর কিন্তু বড় অগভীর।

কেবলই আনন্দ, সেটা কি সম্ভব? আমরা জানি প্রকৃত শিল্প হল বাস্তববাদী, গভীর তার মর্ম, গম্ভীর তার প্রকৃতি। একে শিল্প বলে না।

ওকে বলা হল [illegible] প্রকৃতির নাগরিকদের ছবি আঁকতে। সে বন্ধুদের সে লুকিয়ে রেখেছিল ফ্যাসিস্টরা যাদের গুলী করে মেরেছে তাদের ছবি আঁকতে। সে তা আঁকলও। কিন্তু সেখানেও তার সেই চপলতা। ছবির লোকেদের মুখে আবার সেই স্নিগ্ধ হাসি। তাদের কেউ হাসিমুখে আদর করছে বাচ্চাদের, কেউ ফুল তুলছে মাঠে। "এহে, [illegible]!" বলল কেউ কেউ। কেউ বিশ্বাস করল না যে সে তার বন্ধুদের সত্যিই ভালবাসে শ্রদ্ধা করে। অথচ, ওদের সঙ্গে ওর পরিচয় সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা বলল আসলে ঐ লোকেদের সঙ্গে ওর কোনো বন্ধুত্বই ছিল না। কারণ ও নিজেই যে বলেছে ওরা ছিল সিরিয়াস প্রকৃতির লোক মৃত্যুকে তারা বরণ করেছে নির্ভয়ে। নির্ভীক মানুষ কি সারাক্ষণ হাসে?

সবাই মানাগণ্য করল অন্য শিল্পীকে যার সবসময় গম্ভীর চাল। সারাক্ষণই তার ক্ষোভ, সে শিগ্গিরই মারা যাবে বলে। সর্বদাই সে জীবনকে এ'কেছে ঘন করে এমনকি কালো করেও। সারাক্ষণ তার আর্তি—মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তার নিজের তার শিল্পের।

কিন্তু এমনই কাণ্ড ঐ হাসিয়ে লোকটিই মারা গেল আগে। আর কেউ সেটা বিশ্বাস করল না। সারাক্ষণই যে হাসে সে কি কখনো মরতে পারে? গত পরশুই তো সে হাসছিল, এখনো কানে বাজছে তার হাসির আওয়াজ। ওর ঠাট্টা তামাশা কি এখনো শুনতে পাচ্ছ না? আর ওর সেই ছবিগুলো—বাচ্চাদের, আমুদে— সেগুলোও কি নাচছে না চোখের সামনে? উজ্জ্বল পাতলা ফ্রেমগুলোর নিশ্চিন্ত মনে খোশমেজাজে চমকাচ্ছে না কি তারা? কখনো যার মুখে একটা ক্ষোভের কথা শোনা যায়নি সে লোক মরবে কী করে? মরবে বরং ওর ঐ বিরসবদন সহশিল্পী—বাড়িতে বসে সারাক্ষণ তার নাকিকান্না।

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করে না যে লোকটা মরেছে। এমন কি আমিও না। কারণ চোখ

খুললেই দেখি ও সামনে দাঁড়িয়ে। খুশদিল, সজীব, উৎফুল্ল। পরনে সেই পুরনো কর্ডুরয় ট্রাউজার্স। লম্বা দাড়ি চিবুকের প্রান্তে। এক্ষুনি যেন হাতটা ধরে সে বলে উঠবে—

—আরে হাসো! দেখছ না, আকাশটা কী নীল! এস গান গাই। আর সে গান একেবারে ঐ নীল আকাশে উড়ে যাওয়া চাই।

আপনারাও তাকে দেখতে পেলেন তো? নিশ্চয় পেয়েছেন, তাই আপনাদের মুখেও হাসি। তাই তো বলি, কমরেডরা হাস। লোকের কানে সারাক্ষণ লেগে থাকবে তোমার হাসি। সেটা কি খারাপ?

গল্পটির লেখক বুলগেরিয়ান। বুলগেরিয়ার বিষয়ে আমার কোনই অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু রুশদের বেলায় বলতে পারি গল্পে বর্ণিত ঐ হাসিয়ে লোকটির মধ্যে রুশ চরিত্রেরও আদল আসে। প্রকৃতি আর মানুষের সৃষ্ট বহু ঝড়ঝাপটা বরফপাত রুশরা সয়ে গেছেন ঐ হাসির জোরে। এবং বছরের ছ-সাত মাসের প্রচণ্ড শীত আর বরফকে তাঁরা জয় করেছেন তাদের সঙ্গে হাসির সম্পর্ক পাতিয়ে। এবং তাদের ভালবেসে। রুশরা যখন ভারতে যান তখন দেশের বরফের জন্য মন কেমন করে।

রুশ হাস্যরসের সঙ্গে শীতের সম্পর্কের একটি উপভোগ্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন ভিনাডি ইউরিয়েভ। নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করে তিনি দেখেছেন শীতকে ভালবাসার কারণটা কী।
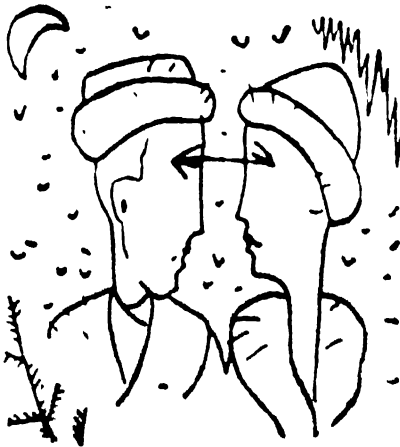
শীতের প্রেম

তিনি বলেছেন, শীত প্রেমিকদের খুবই প্রিয়। তার অন্যতম কারণ [illegible] মত শীতকালে প্রেমের জোরটার ভালো পরখ পাওয়া যায়। অন্য দেশের মতো এদেশের মেয়েরাও অভিসারক্ষেত্রে আসে অন্তত ঘণ্টাখানেক দেরি করে। শূন্যের নীচে ত্রিরিশ ডিগ্রিতে এক ঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে কেবল সেই ছেলেই যার

গ্রীষ্মের শিকার

ভালবাসাটা নিখাদ। ছেলেটির ঐ নাককান জমানো প্রতীক্ষাই হল তার সোহাগের সর্বাধিক প্রত্যক্ষ প্রত্যাভূতি। প্রণয়ী-পুরুষদেরও শীত পছন্দ। কারণ তাদের অনেকেই মনোরম ভাষায় হৃদয়ের প্রস্তাব জ্ঞাপনে অপারগ। বাঘা শীতে ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকার পর কাব্যরসের সব প্রচেষ্টাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঠোঁটগুলো এমনই জমে যায় যে কিছু বলতে গেলেই যেন কাঠে কাঠে ঠোকাঠুকি লাগে। তাই দুয়েকবার খটাখট আওয়াজ তুলে ছেলেটি প্রেমপূর্ণ জিজ্ঞাসু নয়নে প্রিয়ার দিকে তাকালেই মেয়েটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় তার সানন্দ সম্মতি।

স্কুলপর্ব বয়সের ছোটরা হল শীত-বুড়োর সবচেয়ে বড় ভক্ত। কারণ তখন ঠাকুমা দিদিমারা এত মোটা মোটা জামা পরান যে হাড়ের [illegible] করলেও লাগার এতটুকু ভয় থাকে না। দুষ্টুমিতে মার খাবারও আশংকা নেই। কারণ পার্কের কোণে বসে থেকে ঠাকুমা-দিদিমারাও জমে গেছেন, হাত [illegible]।

বক্তাদের কাছে শীত একটা জরুরী ব্যাপার। গ্রীষ্মকালে যে শ্রোতাদের সভাগৃহ ছেড়ে পলায়ন ঠেকান প্রায় অসম্ভব শীত-কালে তারাই সন্তুষ্টচিত্তে সভাগৃহের আরামী চেয়ারগুলোয় বসে ঢুলতে থাকেন। কেউ যদি মুহূর্তের তরে জেগে উঠে সতৃষ্ণনয়নে তাকান দরজার দিকে অমনি তাঁরই কোনো সহযোগী বলে ওঠেন, "বাইরে মাইনাস ত্রিরিশ ডিগ্রী"। তখনই তন্দ্রাভাঙা লোকটি আবার জাঁকিয়ে বসেন তাঁর চেয়ারে।

বুড়োরাও শীত ভালবাসেন কারণ গজ-গজ করবার একটা ভালো অজুহাত তাঁরা পান। আরে ছাঃ, এ-আবার শীত নাকি? ত্রিরিশ ডিগ্রী? আরে ছোঃ!" শীত পড়ত সেই আমাদের ছেলেবেলায়। শয়ে শয়ে লোক জমে মরে যেত। আর এখন? নাকের ডগাটাও ঠিক মতো চিনচিন করে না। আর বরফ? আরে আমাদের কালে বাড়িগুলো মাসের পর মাস থাকত বরফের নিচে। আর এখন! এখন যদি কেউ বাড়িতে বসে থাকে তবে বুঝতে হবে লিফ্‌টটা কাজ করছে না।"

নীতিবাগীশদেরও শীতকালটা পছন্দ। কারণ তখনো তাঁরা সাগ্রহে অনুধাবন করে চলেন সেই একই সব দৃশ্য নৈতিক অবনতির সমীক্ষায় যা গভীর তাৎপর্য-পূর্ণ। বাসের জন্য লাইন দিয়েছে লোকেরা। তাদের প্রত্যেকের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি। বাস যখন এল তখন তা লোকে বোঝাই। তাই লাইনের সবার তাতে ঠাঁই হল না। পরের বাসটার জন্য যারা পড়ে রইল তারা দোষ দিল ঐ ভাগ্যবন্তদের, যারা আগেই উঠেছে, বসেছে বাসে। তারাই তো এদের জায়গা করে দিল না। ওদিকে বাসের লোকেদের অভিযোগ—লোকেরা যদি একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তাহলেই আর বাসে এমন ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয় না। নীতিবাগীশ তা দেখে বিষাদ মুখে বলেন "সেই এক হাল। অথচ বলা হয় লোকেদের নাকি উন্নতি ঘটেছে!"

তাহলে কি বসন্তের কোনই কদর নেই রুশদের কাছে? ইউরিয়েভ তাঁর "গবেষণার" ফলে জেনেছেন বসন্তটাও প্রেমিকদের কম পছন্দ নয়। কারণ তখন খোলা জায়গাতেও দিব্যি চুমু খাওয়া চলে, ঠোঁট জমে যাবার ভয় থাকে না। বাচ্চারা তাদের শীতের জামাকাপড়ের খোসা ছাড়িয়ে হালকা বোধ করে। বক্তাদের কপালেও জুটে যায় বহু বৃষ্টি বাদলার দিন। বুড়োরা তাদের বুড়োহাড়গুলো সেঁকে নিতে পারেন রোদে। আর নীতিবাগীশরা? কোনো নীতিবাগীশ কখনো তাঁর মত পালটেছেন, এমন কথা কেউ কোথাও শুনেছে কি!

শুভময় ঘোষ

"ছেলের চিঠি পেয়ে কোথায় বেড়াতে এলাম
আর এখন কিনা সারাক্ষণ রান্নাঘরেই কাটাতে হচ্ছে!"
হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

মনোজ বসু

॥ ছেচল্লিশ ॥

ডাঙার মানুষ জলে জলে ভাসছে। জল কত দিন কে জানে, পাঁজি পুঁথি ধরে কে হিসাব করতে পেরেছে? দিন কুড়িক হতে পারে। এক মাস হলেও অবাক হবার নেই। বংশীর তো মনে হচ্ছে এক বছর। বাচ্চা ছেলের জন্য মন টানছে। বংশীর এক খুড়তুতো ভাইকে বাদাবনে বাঘে তাড়া করেছিল। জলে ঝাঁপ দিয়ে সে প্রাণ বাঁচাত। বংশীরও ঠিক তাই। তিন তিনটে মাস গিয়ে ঐ বাচ্চা কিন্তু কোলে কাঁখে নিয়ে ঘরবসত করবার জো নেই। বাঘ চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে ডাঙায় উঠলে কাক করে টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘ নয় পুলিশগাছির বড়ো দারোগা।

গাঙ-খাল পাঁচগ্রাম কত ঘুরল। দুই তীরে দুই চন্দ্রস্ত ছুটোছুটি করে খবর খুঁজছে। সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়। কে কী খবর যা হোক দুটো [illegible] তারপর [illegible] বেরুলো। [illegible] অমনি [illegible] উঠোন ঘরকন্নার [illegible] চোখাচোখি ঠোক ঠোক করে বেড়ায় যাতা [illegible] কিছুতে কিছু হচ্ছে না। ঘোর কি কাটে তা কোন রকমে ওঠে, এই পর্যন্ত।

শখ করে কাজে ছুটি নিয়ে নিল হয়তো কোন একদিন। অজানা গাঁয়ের হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটা করে বেড়াল। কোন বাড়ি যাত্রাগান খুব জমেছে, চাষীদের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে গান শুনতে বসল। দলটার মধ্যে সবচেয়ে স্ফূর্তি সাহেবের। কাজকারবার না হোক, প্রাণ ভরে দেখাশোনা হয়ে যাচ্ছে। রকমারি মানুষজন দেখছে, মাঠঘাট বনজঙ্গল দেখে বেড়াচ্ছে। পোড়া মাটি শহরের জায়গায় ছেলেবয়স কাটিয়ে এসেছে যা দেখে সবই যেন তাজ্জব লাগে। বংশী আর গন্ধপদ চটে যায়। পরের দায়ে এসেছে, নিজের ঘরে আহা-ওহো করে সন্তানের শোভা দেখবার পুলক হত না।

সিঁধকাঠি নতুন করে হল, যথানিয়ম বিধিব্যবস্থা ছাড়া কাজ হয় না। বুদ্ধিমন্তদের কঠিন নিষেধ অকারণ নয়। কপাল ভাল তাই বড় রকমের বিপদ আসেনি কিন্তু অপদস্থ হয়েছে অনেক। সিঁধ কেটে দেখা গেল বিশাল ছাপবাক্স গর্তের সমস্ত মুখটা জুড়ে। বাক্সর উপর মানুষ শুয়ে আছে, সে হাঁক দিয়ে উঠল: খস খস করে কি? কে ওখানে? বুদ্ধি করে পক্ষী কিচমিচ করে ইঁদুর ডাকল। [illegible] বিরক্ত স্বরে মানুষটা বলে, দেখছি কাল মজা, জাঁতিকল পাতব। ইঁদুর হয়ে বেঁচে এলো নয়তো ভোগান্তি ছিল সেদিন। আর এক রাতে আয়োজন করে পাকা দেওয়াল কাটতে গেছে, যন্ত্র ফিরে আসে যেন লোহার পিঠে লোহার ঘা পড়ে। কী ব্যাপার? সাবধানী গৃহকর্তা জানলার নিচে—চোরের [illegible] খোঁড়ার সম্ভাবনা—[illegible] মাটি দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। মাটি [illegible] সিমেন্ট। নাও, হল তো— [illegible] ঘাম পায়ে ফেলে এবার ভিটিতে ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। বিচক্ষণ খুঁজিয়াল থাকলে এমন হয় না। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মতো মানুষ ফলহাটার উপর—তাকে একটিবার বলে দেখলে না কেন বংশী? এক মাস দু-মাস এমন কি বছরও ঘুরে যায় ক্ষুদিরামের এক একখানা কাজ গড়ে তুলতে। গড়াপেটা সারা করে কারিগরকে জানান দিয়ে দেয়, কারিগর নিশ্চিন্তে নামিয়ে নিয়ে আসে। সে চুরি রীতিমতো এক শিল্পকর্ম। সকালবেলা পড়শিরা এসে মুগ্ধ হয়ে দেখে। কানে শুনে দূর-দূরান্তরের মানুষ দেখবার জন্য ছোটে। বুদ্ধি অধ্যবসায় আর পরিশ্রম যার পিছনে, তার বড় মর্যাদা। সে আপনি মহৎকর্মে প্রয়োগ করুন, আর চোরাই কাজে লাগান। আর এরা যা করছে—ছিঃ! কাজই তো নয় জুয়াখেলা।

দিন বার, শেষটা মরীয়া হয়ে উঠল। লাইনের যত-কিছু নীতি-নিয়ম, ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। সাহেব সকলের চেয়ে বেশি বেপরোয়া। ওস্তাদের ছাড়পত্র নিয়ে প্রথম

বাড়ার বেকুব হয়ে ফিরবে না, কিছুতেই নয়। আরও একটি বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—নতুন ছোঁড়া মুটোর একটি—কেষ্টদাস। কালে কালে সে সাহেবেরই দোসর হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

কানাইডাঙার গাঙ্গুলিবাড়ি। শ্রীমন্ত লক্ষ্মীকান্ত বলবন্ত—এমনি সব ভাইদের নাম। আরও একটি আছে—অনন্ত। গুরুপদর খবর। সাকুল্যে কতগুলো ভাই, সঠিক বলা যাবে না, একটা দিনে এর বেশি হয় না।

অনন্তর বয়স কম, এই বছর তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড়। হাকিমের পেস্কার। যে হাকিমকে নিয়ে কাজকর্ম, রোজগারের হিসাবে অনন্ত বার কয়েক কিনে ফেলতে পারে তাঁকে। গায়ের জামায় অজস্রকেস্ দিয়ে পাঁচ ছটা পকেট বানানো হয়, আদালত তিন পকেটে কুলায় না। কোর্টে যাবার সময় ফাঁকা পকেট, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরবার সময় রেজগির ভারে পকেটগুলো ছিঁড়ে ছাড়বার দাখিল। আইন-আদালতের জন্মকাল থেকে অলিখিত নিয়ম চলে আসছে কোন কাজের কি প্রকার তদ্বির। বাঁ-হাত ঘুরিয়ে পিঠের দিকে বাড়ানোই রয়েছে— পয়সা-দুয়ানি সিকি-আধুলি পড়া মাত্র হাত মুঠো হয়ে পকেটে ঢুকে পলকের মধ্যে আবার পূর্বস্থানে। যন্ত্রবৎ এই প্রক্রিয়া সমস্তটা দিন। হাকিম মুখ একটু বাড়ালে সমস্ত নজরে পড়বে। ছেলেরা আড়াল করে তামাক খায়—হুঁকোর ফড়ফড়ানি কানে আসছে, কিন্তু তাকিয়ে দেখতে নেই। এ-ও তেমনি ব্যাপার। এমনও হতে পারে, ঈর্ষা ও অনুতাপের বশে মুখ গুঁজে থাকেন হাকিম মশায়: হায় রে, বাঁধা-মাইনের হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার হলাম না কেন যাবতীয় লেখাপড়া কর্মনাশার জলে দিয়ে?

এ হেন পেস্কারের চাকরি অনন্তর। খুলনা থেকে কাল সে বাড়ি এসেছে কদিনের ছুটিতে। বাদার ইজারা নিয়েছে বড়ভাই লক্ষ্মীকান্ত, বন কাটার জন্য জনমজুর লাগিয়েছে। সদর থেকে অনন্তই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, টাকাকড়ির দায়ও তার উপরে।

গুরুপদ খোঁজ এনে দিল। ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে ডিঙির চালিতে সে শুয়ে পড়েছে। আর রইল বামদাস। দুজনকে ডিঙিতে রেখে কালী-নাম স্মরণ করে অন্যেরা বেরিয়ে পড়ল। পথ বাতলে দিয়েছে গুরুপদ, সেই পথে অদৃশ্য রূপে মা-জননী আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলো। কাজের সময় সিঁধকাঠিতে ভর কোরো মা, কাঠি হবে বজ্রের মতন। সিঁধের মুখে কুবেরের ভাণ্ডার জড় করে রেখো মা—

কী যেন ঠাণ্ডা মতন পায়ের উপর। সাপ? না, কোলাব্যাং একটা। লাফ দিয়ে এসে পড়ল, আবার চলে গেল। কুঠির দীঘিতে সোনাব্যাং ধরতে গিয়ে সাপই পায়ে উঠেছিল। সাপে ছোবল দিলেও এ সময়টা হুল্লোড় করবার জো নেই, নিঃশব্দে ধীর পায়ে সরে যেতে হবে। রান্নাঘরের কানাচে কাচনির বেড়ায় চোখ রেখেছে সাহেব আর বংশী। কানে শুনছে ভিতরের কথা, চোখে দেখছে ভিতরের মানুষ।

বড় সংসার, এক গাদা মেয়েলোক। গিন্নি যাকে বলা যায়, বয়স হলেও বেশ হাসি-খুশি মানুষটা।

নতুন বউকেও ভাত দিয়ে দাও নবি।

বাবুদের দাওয়ায় ঠাঁই হচ্ছে, বউ ঘরের মধ্যে বসে খেয়ে নিক।

নতুন-বউ সলজ্জে বলে, না দিদি, আগে খাব কেন? তোমরা যখন খাবে তখন। সকলে এক সঙ্গে।

[সাহেব বলছে, নাও না খেয়ে বাপু, বড়র কথা শুনতে হয়। আর কষ্ট দিও না। শীতটা বড্ড পড়েছে। খেয়ে নিয়ে এবার শুয়ে পড়োগে যাও।

বলছে সাহেব মনে মনে, ঘর-কানাচের ঝোপজঙ্গলে দাঁড়িয়ে।]

সেই বড়-জা হেসে হেসে নতুন-বউকে বলে, তোমার যে ভাই কাল থেকে চাকরি চলছে—আপিসের হাজরে। ছোটবাবু চারদিনের জন্য এসেছে—মিনিটের দাম হাজার হাজার ঘণ্টার দাম লাখ।

নমি মেয়েটা বলে, অংকে ভুল হয়ে গেল কিন্তু বড়বউদি—

এতো নাকি ধারাপাতের অংক যে পাঁচ দুনো দশ ছয় দুনো বারো হতেই হবে। ঐ বয়সে ওদের অংক আলাদা—

আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল থেমে গিয়ে নমির দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়তে বসল।

নমি বিধবা। আহ ন্যাড়া হাত—নরুণপাড় ধুতি পরনে।

সেই ছোটবাবুই বুঝি ঘরে ঢুকল। ছোটবাবু অর্থাৎ অনন্ত। সকলের অলক্ষ্যে নতুন বউয়ের দিকে চোরা চাউনি হানা—[illegible] ছাড়া কেউ নয়।

বড়বউ বলে দাওয়ায় পিঁড়ি পেতেছে ঠাকুরপো। সকলকে ডেকেডুকে বসে পড়ো গো। ভাত [illegible] না যাও।

ফিক করে হেসে বলে ভাবনা নেই ভাই, নতুন বউও রইল কি[illegible]।

অনন্ত পুলকিত কণ্ঠে নিশ্চিন্ত ভাব দেখায়: ভাবি [illegible] কি না তোমার নতুনের জন্যে। গিয়ে তো পড়ে পড়ে ঘুমুবে।

সেটা কাল রাতে বাড়ি শুদ্ধ লোক তো ঘুমুতে পারিনি। তুমি একলাই তবে বকবক করছিলে?

[ঘর-কানাচে সাহেব মনে মনে গরম হচ্ছে। দেওর-ভাজে ন্যাকা-ন্যাকা কথাবার্তা কতক্ষণ চালাবে শুনি? মশাও জো পেয়ে গেছে—মজা করে রক্ত খাচ্ছে, চাপড়টা দেবার উপায় নেই।]

অনন্ত বলছে, নমিতাকে নার্স-ট্রেনিং-এ ঢোকালে কেমন হয় বড়বউদি? হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে খাতির আছে। তাঁকে ধরলেই হলে যেতে পারে। দাদাদের মতামত, কারো অমত নেই। তোমরা কি বলো শুনি এবার নার্স হলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় হয় একটা।

নিজেই নমিতা গোলযোগ করে ওঠে সকলের আগে: আমি যাব না, কক্ষনো না। হাসপাতাল অনাচারের রাজ্যি, [illegible] কাণ্ডবাণ্ড সেখানে।

বড়বউ বোঝাতে যায়: তুমি নিজে ভাল থাকলেই হল ঠাকুরঝি। অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাছবিচার চলে না আজকালকার দিনে।

অনন্ত বলছে, এখনই পনের টাকা করে পাবি। পাশ করলেই হাসপাতালে নিয়ে নেবে, মাইনে সঙ্গে সঙ্গে ডবল। তিরিশ টাকা। তুই যা চালাক চতুর, পাশ করতে একটুও আটকাবে না।

বড়বউ চোখ বড় বড় করে বলে, তিরিশ টাকা—ওমা, সে যে এককাঁড়ি টাকা। ভেবে দেখ নমি, ইচ্ছাসুখে খরচপত্তর করবে, কারো কথার তলে থাকতে হবে না—

অনন্ত বলে, তিরিশেই শেষ নাকি, বাড়বে না মাইনে? তার উপরে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ—

ঘাড় নেড়ে নমিতা ঝেড়ে ফেলে দেয়: আমি যাব না। মেয়েলোকে খারাপ হয়ে যায় বাইরের কাজে বেরিয়ে—

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠে: লাথি-ঝাঁটা মেরে বাড়ি তাড়িয়ে দাও বউদি, পরের বাড়ি ধান ভেনে বাসন মেজে আমার একবেলায় ভাতের জোগাড় [illegible]। তবু আমি বাপের পা ছেড়ে নড়ব না।

বড়বউ মরমে মরে গিয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, এমন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কেমন করে ঠাকুরঝি? তোমারই ভবিষ্যৎ ভেবে বলা। ঘরবাড়ি তোমাদের, তোমাদের ভাইবোনের। পরের মেয়ে আমরা—তাড়াতে হয়, আমাদেরই তাড়িয়ে দেবে।

[ভাল জ্বালা হল দেখছি। সাহেব রাগে গরগর করছে: বলি, মশা কি ঘরের ভিতরের পথ চেনে না, বাইরেই যত উৎপাত? ভবিষ্যৎ মুলতুবি রেখে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় এবারে। ঘুমিয়ে পড়।]

বড়বউ ক্ষুব্ধ স্বরে অনন্তকে বলে, যে ক'টা দিন বাড়ি আছ ঠাকুরপো, নমির কথা কখনো মুখের আগায় আনবে না। খেতে বোসোগে যাও, ভাত নিয়ে যাচ্ছি।

বাবার মুখে অনন্ত খোঁচা দিয়ে বলল না: ঘেন্না ধরালি নমি। ব্যবস্থা একটা হতে যাচ্ছিল—কপালে দুঃখ থাকলে কে খণ্ডাবে?

কপালের দুঃখ তুমি কি শোনাচ্ছ ছোড়দা, অহরহ বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে। দুঃখের কপাল না হলে মায়ের পেটের বোনকে সরানোর জন্য তোমরাই বা অজুহাত খুঁজে বেড়াবে কেন?

নমিতা হাউহাউ করে কেঁদে পড়ল। বেকুব হয়ে অনন্ত পালাবার দিশা পায় না।

আবও খানিক পরে রান্নাঘরেব দাওয়ায় দুভেরা খেতে বসেছে। বড়বউ আর মজবউ পরিবেশন করছে। নমিতা জল দিবে গ্লাস এনে দেয়, নুন দেয় থালার পাশে পাশে। বাড়িতে একপাল বিড়াল—থালার বস্তু থাবা বাড়িয়ে টেনে নায়। বিড়াল তাড়ানো একটা বড় কাজ নমিতার। জোরজবরদস্তি করে নতুন জুটকেও ওদিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে।

সর্বশেষে বড়বউ বলে, ঠাকুরঝি তুমি ক খাবে?

নমিতা হেসে হেসে বলছে, হরির ভাত সোনার ডালনা রুপোর চচ্চড়ি—

বড়বউ ঢোক দিলে বলে, কত রকমের রান্নাবান্না—বলছিলাম, তুমি কি দুটো মুড়ি চিবিয়েই পড়ে থাকবে?

নমিতা বলে, সে-ও তো অনাচার। তোমাদের জেদে পড়ে করতে হয়। ভাতে আর মুড়িতে তফাত কতটুকু? চাল সিদ্ধ না হয়ে চাল ভাজা।

বড়বউ ভয়ে ভয়ে বলে, দিন দিন শুকিয়ে সলতে হয়ে যাচ্ছ। আয়না ধরে দেখ না তো—তা হলে টের পেতে। ভাতে মুড়িতে তফাত যদি না থাকে দুটি দুটি ভাতই না হয়—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নমিতা গর্জন করে ওঠে: দু বেলা ভাত খাব বিধবা হয়ে? জীবনে এই হল—মরণ হয়ে তারপরে ভাল থাকব, তাও হতে দেবে না তোমরা?

বড়বউ উত্তেজিত করে বলে, ভাল আমার বিধবা বো। উনিশ বছরের একফোঁটা মেয়ে—অমর ভেলার চেয়েও দু-বছরের ছোট। সাত-ছেলের মা সত্তর-বছুরে বুড়ি

কতজনা মাছ-মাংস খেয়ে দফা সারছে, উনি বিধবাগিরি ফলাতে এসেছেন। রাখো ওসব।

গলা খাটো করে বলে, তোমার মেজ-পিসিমা মাছ খেতেন। বউ হয়ে এসে আমি নিজের চোখে দেখেছি। গুরুজনের নামে মিছে কথা বলি তো মুখে যেন আমার পোকা পড়ে।

নমিতা হাহাকার করে উঠল যেন: বোলো না বড়বউদি, তোমার পায়ে পড়ি—কানে শুনলেও মহাপাপ। যার যা খুশি করুক, মরে গেলেও আমার দ্বারা অনাচার হবে না। আবার যদি বলেছ মুড়িও খাব না কিন্তু। ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল।

বিরক্ত হয়ে সাহেব উঠে পড়ল। কথা-বার্তা ও আহারাদি চলতে থাকুক, ততক্ষণ আর একটা চক্কোর দিয়ে আসবে। বেড়ার গায়ে বংশী একা রইল। ধোনাই মিস্ত্রি ও কেষ্টদাস পাহারাদার—ধোনাই বাড়ির সীমানায় পগারের পাশে, কেষ্টদাস খানিকটা দূরে। এক সাংঘাতিক খবর বলল ধোনাই—মুখে কাপড় ঢাকা একটা লোক এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে এই মাত্র বাড়ি ঢুকে গেল।

চোর তাতে সন্দেহ কি। [illegible] থানায় [illegible] এখন দশখানের [illegible]। এ কাজে মুনাফা দুদিক দিয়ে বেশ [illegible] দুরকমের চোর ছ্যাঁচোড় [illegible] উপরওয়ালা [illegible] আছে। ঐ মানুষ হতে পারে, [illegible] চোর একটা।

[illegible] নিয়ে এসো। সাহেব চলে [illegible]

সাহেব বলে [illegible]

[illegible]

কি ভেবে সাহেব ঘর কানাচে বংশীর কাছে যায় না পা টিপে টিপে সেই চোরের খোঁজেই চলল।

বেড়ার গায়ে বংশী মগন হয়ে আছে। নতুন বউ মুখে না, না করে আর গোগ্রাসে খেয়ে যায়, খাওয়া সেরে সে অনেকক্ষণ উঠে গেছে। পুরুষদেরও শেষ। অন্য বউরা বসেছে এবার। নমিতা পাথরবাটিতে মুড়ি-গুড় আর নারকেল-কোরা নিয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনেকখানি দূরে বসেছে।

[ওরে বাবা, কত খায় মেয়েলোকে! চটপট সেরে নাও মা-লক্ষ্মীরা। রাত পোহায়ে যায়,

আধ্‌লি বের করে ধরল: পানটান খেও ভাই। আমি এবারে আসি—

দাঁতে দাঁত রেখে সাহেব চাপা গর্জন করে: [illegible] নিয়ে তো চলেছ, আমার পানের বেলা আধ্‌লি?

কথা নেই বার্তা নেই, লোকটার লম্বা ঝুল-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পুঁটলি বের করে ফেলল। রুমালে বাঁধা গয়না।

লোকটা ব্যাকুল হয়ে ছিনিয়ে নিতে যায়: অবলা বেওয়া মানুষের জিনিষ—দায়ে পড়ে খবর পাঠিয়েছিল, বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি। হাতের আংটি খুলে দিচ্ছি—আমার নিজের জিনিষ। এই নিয়ে রেহাই দিয়ে যাও বাপধন।

ততক্ষণে অপর পকেট হাতড়ে বেরুল—নোট ভেবেছিল সাহেব, তা নয়—চিঠি একখানা। খামের চিঠি।

সাহেব বলে, অবলার প্রেমপত্তোর কখনো বুঝি পকেট-ছাড়া করো না? দলিল তোমার, কাজ হাসিলের অস্তোর—উঁ?

লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে: এ সব কি বলো তুমি?

না জেনে কি বলছি? আরও বলছি, কলকাতায় পালানোর জন্য ফুসলানি দিচ্ছ অবলা বেওয়া মানুষকে।

গলা কেঁপে যায় সাহেবের। বলল শখ একদিন মিটে যাবে। তখন তো গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে—আদি-গঙ্গায়, নয়তো বড়-গঙ্গায়।

লোকটা বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সাহেব বলছে, [illegible]

দেহে যেন দৈত্য ভর করে বসল হঠাৎ। পা তুলে সজোরে লাথি দেয়। ছাড়া পেয়ে লোকটা কৃতকৃতার্থ, একছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কী হয়েছে সাহেবের—আশার অতীত লাভ, হাতের মুঠোয় এত দামের জিনিস, তবু কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কেষ্টদাসের কাছে এসেও একটি কথা বলে না, হাত ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

চলেছে। খালের ঘাটে ডিঙি—পা
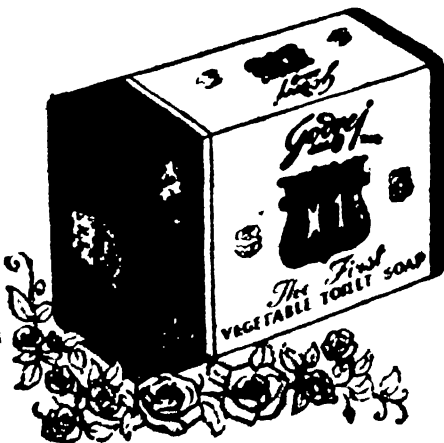
চলেছে সেইদিকে। হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, দেশলাই আছে কেল্টদাস? ধরা দিচ্ছি।

কেল্টদাস দেশলাই আর দুটো বিড়ি বের করল। একটা বিড়ি সাহেবের হাতে দেয়। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে সাহেব বলে, কাঠি ধরাতে বললাম, বিড়ি কে তোর কাছে চাইল?

কাঠি ধরিয়ে সেই চিঠি বের করে। প্রেমের চিঠি—পড়ার আগে জানলায় কান রেখেই সেটা বুঝে নিয়েছে। ডাকের চিঠি নয়, কারও হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। প্রেম-রসে কী পরিমাণ হাবুডুবু খেলে মেয়ে-লোক হয়েও এমন মরীয়া হয়ে ওঠে!

গোটা গোটা অক্ষর—সুধামুখীর তো এমনি লেখার ছাঁদ। সুধামুখী প্রথম বয়সে এক লম্পটকে এমনি লিখত—হতে পারে, দুই যুগ পরে তারই একখানা হাতে এসে পড়ল। সাংঘাতিক চিঠি—অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না তখন হয় তো মিনমিন করে বলা যায়। কিন্তু ধীরে সুস্থে কলমের অক্ষরে আসে কেমন করে এই সব কথা?

অসহ্য পারে মাথা একেবারে যখন বিগড়ে যায়। জীবনে হঠাৎ এক এক মুহূর্ত আসে মানুষ তখন পুরো পাগল। আর যাই হোক, হাসাহাসি কিম্বা লাঠালাঠি কোরো না পাগল নিয়ে। পারো তো চোখের জল ফেলো।

তুই যেতে পারিস কেল্টদাস। চিঠি ছাড়বার আগেই আমি গিয়ে পড়ব।

কেল্টদাস বলে, একলা কেন? থাকি না আমি সঙ্গে—

হ্যাডেনসা

নিশ্চিতভাবে আরও তাড়াতাড়ি আরও নিরাপদে

সারিয়ে দেয়।

'হ্যাডেনসা'-তে কোন অবাঞ্ছিত জিনিষ নেই এবং এতে কোন দাগও লাগে না।

কথার উপরে কথা! খুব যে আস্পর্ধা এই ক'দিনের মধ্যে।

তাড়া খেয়ে কেল্টদাস এতটুকু হয়ে গেল। সাহেবই তাকে লক্ষ্যের বেশি টানে। কাজে নিষ্ফল হয়ে মেজাজ তার এখন বিগড়ে আছে।

আবার সাহেব গাঙ্গুলি-বাড়ি ঢুকে পড়ল। ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেয়: টুক-টুক-টুক। সে মানুষটা যখন ঘরে ঢোকে, কায়দাটা অলক্ষ্যে দেখে নিয়েছে। টুক-টুক-টুক তিনবার, একটুখানি থেমে আবার টুক-টুক-টুক—

দরজা খুলে গেল। ফিসফিস করে প্রশ্ন: ফিরে এলে যে বড়?

সাহেব আলাদা রকম গলায় বলে, তুমিই তো টেনে আনলে। পিদিমটা জ্বালো একবার দেখি—

এমনি সুরে হুবহু এই কথাগুলোই [illegible] আগে [illegible]—আলো জেলে [illegible] নিয়ে সেই পুরুষের [illegible] হল। সাহেব জানলায় দাঁড়িয়ে [illegible] কথা শুনেছে। কলকাতা গিয়ে [illegible] দুজের অভিন্ন হয়ে থাকবার পরামর্শ। পরামর্শ পাকা হলে [illegible] প্রদীপ ধরে ক'খানা গয়না [illegible] কলকাতার বন্দোবস্তের [illegible] দেখে তৃতীয় ব্যক্তি সাহেবের বুঝতে বাকি থাকে না অতিশয় [illegible] এই প্রেম—ছিপে মাছ ধরার মতন সেই গভীর থেকে টাকাপয়সা গয়নাগাটি [illegible] টেনে টেনে তোলা হচ্ছে।

সাহেব বলছে, ছুটে এলাম তোমায় [illegible]—

[illegible] এতক্ষণ ধরে এই [illegible]

[illegible] যাচ্ছে। [illegible] সুরে বোঝা যায়। [illegible] উপর নমিতা [illegible] পড়ল।

[illegible] কড়া হয়ে [illegible]

[illegible] না মোটে [illegible]

[illegible] তোষকের নিচে দেশলাই। আলো জ্বালতে জ্বালতে নমিতা বলে কী মানুষ রে বাবা' এই তো গেলে—ভগুবর একটু যদি থাকে'

কথা শেষ হয় না, চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে পড়ে। মুখে ছাইয়ের মতো সাদা। ছোরা উঁচিয়ে ডাকাত গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। আলো পড়ে ছোরা চকচক করে উঠল।

ভয় সাহেবেরও। সর্বদেহ ঝিমঝিম করে ওঠে, আলনা থেকে চাদর তুলে নমিতার উপর ছুঁড়ে দেয়: গায়ে দাও আগে।

একটি শব্দ করেছ কি কচ করে মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যাব। এ কর্ম অনেক করা

আছে। তুমি তো পাঁচকে মেয়েমানুষ কত জোয়ানমরদ সাবাড় করেছি।

নমিতা কেঁদে পড়ে : ধর্মবাপ তুমি আমার—

সন্তানের মরশুমে পড়ে গেছে আজকের বাজার। ঐ লোকটাও বাপ বলেছিল, বাবা—বুকে দে ছুটে। ছেলে আর মেয়ে—কী পুণ্যেরই সন্তান দুটি। নমিতা আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, সাহেব তাড়া দিল : চোপ! কি আছে তোমার, বের করে দাও—

কিছু নেই। মিছে কথা বলছি নে। বাক্সর চাবি দিচ্ছি, খুলে দেখ। আড়াই টাকা কি এগারো সিকে আছে কোটোর মধ্যে। নিয়ে নাও সমস্ত, নিয়ে চলে যাও।

গয়নাপত্তোর?

বিধবা মানুষের গয়না কী থাকবে বাবা! চাবি দিয়েছি—সত্যি কি মিথ্যে, দেখ খুঁজে তন্নতন্ন করে।

খোঁজাখুঁজি কি—গোটা বাক্স উপুড় করে জিনিসপত্র ঢেলে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছু পুরোনো কাপড়চোপড় ছাড়া সত্যিই নেই আর কিছু।

সাহেব ফিকফিক করে হাসে, কী দুষ্টামিতে পেয়ে গেল হঠাৎ। বলে, মাল না থাক, মানুষটা তুমি রয়েছ খাটখানা জুড়ে। পুণ্যের শরীর, আচারবিচার নিয়ে আছ—

বাক্সের জিনিসপত্র পায়ে ঠেলে দিয়ে সত্যি সত্যি সে আলুথালু নমিতার দিকে এগোয় : দেখ তাকিয়ে একবার। চেহারাখানা পছন্দর নয়—বলো। না গো!

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নমিতা। সাহেব দাঁড়িয়ে পড়ে কঠিন কণ্ঠে বলল তা বটে, সেয়ানা চোর সে জিনিসও নিয়ে নিয়েছে—কিছু ফেলে যায়নি। রজনীকান্ত নয় সে জন—প্রাণকান্ত।

চিঠির উপরে নাম পেয়ে গেছে, সেই নাম বলল। রাগে রাগে সেই চিঠি ও গয়নার পাঁটলি তুলে ধরে দেখায় : তোমার রজনীকান্ত দিয়ে গেছে—

সেই মুহূর্তে এক কাণ্ড। নমিতা উঠে পড়ে যেন উন্মাদ হয়ে সাহেবের পা ধরতে যায়। থরথর করে কাঁপছে। বড় বড় দুটো চোখে ধারা গড়ায়।

দিয়ে দাও ধর্মবাপ আমার। গয়না না দেবে তো চিঠিটা অন্তত দাও।

তৎক্ষণাৎ সাহেব উধাও। বাড়ির বাইরে অনেকটা দূরে চলে গেছে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ—দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবে। নমিতার কান্নার চেহারা চোখের উপরে ভাসছে। দুশ্চারিণীর স্বৈরাচারের দেহটার উপর কেমন যেন সুধামুখীর ছায়া পড়েছে। মাকে খেয়েছে সাহেবের না হলে যে সুধামুখী একদিন নদীর কূল থেকে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। নমিতার মধ্যে সেই মা-সুধামুখী।

পায়ে পায়ে ফিরে চলল আবার গাঙ্গুলি-বাড়ি। কেষ্টদাসকে সরিয়ে দিয়েছে—দরজায় টোকা দিয়ে দেখুক হয় না কি হয়, কারণটা আগেভাগে দেখাতে চায়নি। সরে গিয়েছে ভাগ্যিস, নইতো এই গয়নার পাঁটলি ফেরত দেওয়া চাউর হলে সেও দলের মধ্যে নিন্দেমন্দ ও ঝগড়াঝাঁটি হত। ফেরত দিতে যাচ্ছে নমিতার ঘরে নয়, অনন্ত গাঙ্গুলি যে ঘরে শুয়েছে সেখানে—বন্ধ দরজার চৌকাঠের উপর। পাঁটলি রাখল, আর ঐ চিঠি। উঠুটুড়ে যাবে সেই শাকোর ইটের টুকরো চাপা দিয়ে দিল চিঠির উপর। সকালবেলা অনন্ত দোর খুলে বাইরে এসে দেখতে পাবে—পড়বে চিঠি খুলে, বিমূঢ় হতভাগী মেয়েটার সামান্য সম্বল গয়না ক'খানা তুলেপেড়ে রাখবে। তারপরে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে গিয়ে খুলনার হাসপাতালে নার্সগিরিতে ঢোকাবে। এবং রজনীকান্তের খোঁজ করে উত্তম-মধ্যম দেবে। হোক না হোক, ভাবতে দোষ কিসের? দামি মাল মুঠোয় পেয়ে বোকার মতন ফেলে দিয়ে গেলাম, কিন্তু নতুন একটা সুধামুখী আশাজন্ম হয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল, তার মজাটাই বা মন্দ কি! ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একটা সুধামুখী তবু কম হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে—জড়ুলপুরের আশালতার গয়নার দশধারার দায় মিটে যাবার পর—বংশীর কাছে চুপি চুপি সাহেব এইদিনের গল্প করেছিল। বেহিসাবি দুঃসাহসিক কাজ—যে মুরুব্বির কানে যাবে শতকণ্ঠে তিনি ধিক ধিক করবেন। মানা বলেছে : নষ্ট মেয়েমানুষ যে বাড়ি এবং সাচ্চো পুরুষের যেখানে আনাগোনা, কদাপি সেখানে যাবে না। হীরেমাণিক পড়ে থাকলেও না। সাহেব চুকল কিনা সেই লম্পটের ভেক ধরে। বাপের সকড়াও হল—

সাহেব দুঃখ করে বলছে মুখে মুখো সাপ দেখেছ বংশী, মানুষও তেমনি সব দুমুখো। বাইরে দেখতে একটা, ভিতর পেটে পেটে দুটো। অনাচারের ভয়ে সংসারে [illegible] আসল কারণ [illegible]। [illegible] চতুর্গুণ [illegible] নির্বিঘ্নে জুড়ে রয়েছে [illegible]। তাই দেখ এক গলার নলি [illegible] দুরকম কথা বেরোয়। [illegible] ডাকাতের সঙ্গে একরকম [illegible] পিরীতের জনের সঙ্গে অন্য। এক মুখ-ওয়ালা দেখলাম কাজলদীঘির একটি—শুনেছি বর্মাধিকারীর ব্রাহ্মণী ছিলেন তার একজন। যে কজন এমন আছেন আঙুলে গোনা যায়। ওরা নিশ্চয়ই এক—একদরে হয়ে থেকে সারাজীবন শুধু দুঃখই পেয়ে যান।

সমস্ত শুনে বংশীও দোষ দেয় : দোষ-দক্ষা সব করেছিলে নিয়মকানুনের কথা আমি ধরব না। কিন্তু চোর হয়ে তুমি যে পুলিশের কাজ করলে সাহেব। গাঙ্গুলি-বাড়ির জনের চোরটাকে ধরিয়ে দিয়ে এলে।

বংশী বলে কি—যে শুনবে সে-ই বলবে এমনি। চোরের কুলের কলঙ্ক। পুলিশের কাজ যদি বলতে হয়, এই একবারে তার শেষ নয়। কতবার হয়েছে জীবনে। আপনা-আপনি কেমন হয়ে যায়—জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোমানুষি মনের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চেষ্টা করেও সাহেব রোধ করতে পারে না। একবার তো রীতিমতো রোমহর্ষক কাণ্ড—খুনির-চোর ধরা। পুলিশের বাপের সাধ্য ছিল না, সাহেব গিয়ে পড়ে সেই চোর ধরল। (ক্রমশ)

যন্ত্রণাবোধ রহিত শিশু

তিন বছর বয়সের টিম বিশ্রীভাবে পড়ে যেতে বাঁ পায়ের দুজায়গা ভেঙে যায়। খানিক পরেই পায়ের আরও একটা হাড় ভেঙে গেল। ওই বয়সের যে কোন ছেলেরই যন্ত্রণায় চীৎকার করে কেঁদে ওঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু টিমের ক্ষেত্রে তা হবার নয়—কারণ ওর যন্ত্রণা বোধ বলতে নেই। কখন যে আঘাত লেগেছে সেটা সে জানেই না। আর তাই প্রত্যেক দিন রাত্রে টিম ঘুমাতে যাবার সময় ওর বাবা-মা ওকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে নেন ওর অজান্তে দেহের কোথাও আঘাত লেগেছে কি না।

লণ্ডনের শিশু চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ ডেভিড মরিস নির্দেশ দিয়েছেন যে "সতর্কীকরণ প্রক্রিয়া বাহিরেকে তাঁর সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে" সেটা মাকেই যোগান দিয়ে যেতে হবে সর্বক্ষণ ওর প্রতি দৃষ্টি রেখে।

ডাঃ মরিস বলেন: "সহজাত যন্ত্রণা বোধের এই অনুপস্থিতি বিশেষজ্ঞদের বিমূঢ় করে রেখেছে। কি এর কারণ আর প্রতিকারই বা কি সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই। চিকিৎসকরা এইমাত্র সুপারিশ করতে পারে যে শিশুটি নিজের থেকেই নিজেকে সাবধান রাখতে সক্ষম হওয়ার বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত ওর ওপর অতিরিক্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।"

সারা পৃথিবীর ভেষজ ইতিহাসে এই ধরণের মাত্র পঁয়তাল্লিশটি শিশুর খবর পাওয়া যায়। ডাঃ মরিস বলেন এসব কেসের সঙ্গে সাংঘাতিক কোন পীড়ার দরুণ দৈহিক এবং মানসিক অনুভূতির বিলোপ ব্যাপারকে যেন এক করে ধরা না হয়।

কোন রকম বেদনা অনুভব করার ক্ষমতা রহিত হয়ে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে, দেখা গিয়েছে আর সমস্ত বিষয়েই তারা অন্যান্য শিশুদের মতোই স্বাভাবিক। টিমের শ্রবণ দৃষ্টি ঘ্রাণ, স্বাদ শক্তি এবং স্পর্শানুভূতি আর পাঁচটা শিশুরই মতো। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে বরং টিম ওর বয়সীদের চেয়ে প্রখর। আরাম কিসে হয় বুঝতে পারে কিন্তু দৈহিক বেদনা বোধ নেই একেবারেই। আর তাই দেখা যায় যে সব কাজ করতে অন্য ছেলেরা ভয় পায়—ধাক্কা খাওয়া, পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙে বা কেটে ছড়ে যাওয়া বুঝতে পারে না বলে টিম অত্যন্ত দুঃসাহসী, ছুটোপাটি বা বিপজ্জনক কিছু করতে মোটেই ভয় পায় না।

ডাঃ মরিস টিমকে প্রথম দেখেন যখন ওর বিভ্রান্ত মা ওকে লণ্ডনের উলউইচে অবস্থিত মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে

আসেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি জানতে এসেছিলেন তাঁর ছেলেটি কেন অনবরতই নিজের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে এবং কাঁদে কেবলমাত্র কোন ব্যাপারে ব্যাহত হলে—কিন্তু বেদনার জন্য কখনও নয়। যেমন, হাড় বেরিয়ে না পড়া পর্যন্ত সে ভাব একটা আঙুল চিবিয়ে ফেলে নির্বিকারভাবে বিচ্ছিন্ন মাংস দেখে ছটফট করবে।

ডাঃ মরিস চিমটি কেটে এমন কি টিমের হাতে পিন বিদ্ধ করে পরীক্ষা করে কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পাননি। এরপর তিনি স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডাঃ এডওয়ার্ড কারমাইকেলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি বলেন: 'যতদূর বুঝতে পারছি শরীর দেহের কোনো বিবরা স্নায়ু পদ্ধতি বা যাকে 'বেদনার সড়ক' বলে অভিহিত করা হয় সেখানেও কোন ত্রুটি নেই।

তিনি বলেন "তবুও জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে নিজের প্রতি আঘাত হানতে যে লাল-বাতির সংকেত সহায়ক হয় নিঃসন্দেহে ওর দেহযন্ত্রে সেইটারই অভাব রয়েছে। বেদনার প্রকোষ্ঠের চৌকাঠেতেই একটা সম্পূর্ণ মানসিক জড়তা রয়েছে।"

যদিও এটা জানা আছে যে বেদনার ব্যাখ্যা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে; মস্তিষ্ক গভীরভাবে অন্য-সূত্রে নিমগ্ন থাকলে, [illegible] বাড়ানো যেতে পারে [illegible] চাপাও দেওয়া সম্ভব, [illegible] পরিণতও করা যায়, কিন্তু [illegible] সাময়িক বা অত্যন্ত বেশীমাত্রায় আবেগের চাপে ঘটে।

বেদনাবোধের ওপর অবচেতন মানসিক নিয়ন্ত্রণ অনেক সময়ে সন্তান প্রসবকালে, অত্যন্ত সাহসিক কোন কাজ করতে বা বিপদের মুখে আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

এই থেকেই বোঝা যায় এমন কি দন্ত চিকিৎসকের চেয়ারে বসেই যন্ত্রণাদায়ক দাঁতের কথা যেন ভুলেই যায় লোক। কিন্তু টিমের দৈহিক বেদনাবোধের স্থায়ী অক্ষমতার ব্যাখ্যা এ থেকে পাওয়া যায় না। এটা যেন প্রকৃতির তৈরি কাঠামোয় একটা মানসিক সুইচই লাগাতে ভুল হয়ে গিয়েছে।

ডাঃ মরিস বেদনাবোধহীন আরো দুটি শিশুর কথা জানেন। তাদের একজন হচ্ছে একটি মেয়ে যে বর্তমানে কৈশোরে পদার্পণ করেছে এবং সে নিজেই নিজেকে দেখাশোনা করতে পারে। অপরটি হচ্ছে একটি ছেলে

ঝড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও জার্মান লাইফবোট সোসাইটির সদস্যরা সমুদ্রে বিপদগ্রস্তদের উদ্ধারে নিজেদের জীবনও বিপন্ন করে। এই প্রতিষ্ঠানটি আজ ২৫টি আধুনিকতম বিপন্ন-উদ্ধার জলযান এবং ১১টি বেতার কেন্দ্র ব্যবহার করে। ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে এই সোসাইটি ১২,৫৮৫ জনের জীবন রক্ষা করেছে—শতবর্ষের সংখ্যাই ছিল ৬২৫ যাদের মধ্যে ১১০ জন ছিল বিদেশী। জাহাজডুবি থেকে লোক বাঁচাতে সোসাইটির ৩৭ জন সদস্য প্রাণ দিয়েছেন। ছবিতে উদ্ধারকারি জাহাজের অন্তর্ভুক্ত একটি নৌকার সাহায্যে নর্থ সী'র তীরে অগভীর জলে পাহারা দেবার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

যে স্কুলের সহপাঠিদের উস্কানিতে অবিশ্বাস্য উঁচু স্থান থেকে লাফ দিতো এবং বিচারবুদ্ধি জন্মাবার আগে দুটো পা-ই ভাঙে।

টিমের ভবিষ্যত কি হবে? ডাঃ মরিস বলেনঃ "আমরা হেতু ও আরোগ্যের উপায় বের করার চেষ্টা করে যাবো।

"ওর বাপ-মার পক্ষে এটা অবশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা, তবে আমি ছেলেটিকে স্বাভাবিকভাবে স্কুলে যেতে এবং অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে মিশতে উপদেশ দিয়েছি। ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য শিক্ষকদের অবশ্যই বলা হবে।"

এক অভিনব রাজনীতিক দল

গত ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইতালির সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী রাজনীতিক দলের তালিকায় একটি নতুন নাম দেখা যায়—"বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীন আন্দোলন"।

রোমান ক্যাথলিক ইতালিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ বলতে গেলে নেই। অসুখী ইতালীয় দম্পতির সংকট মীমাংসার একমাত্র পথ হচ্ছে পোপ নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত যাজক 'সেকরেড রোটার' কাছ থেকে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হওয়ার অনুমতি গ্রহণ করা।

কিন্তু 'ওয়েটিং লিস্ট' এত দীর্ঘ এবং খরচও এত বেশী যে বিবাহ বিচ্ছেদের আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। আর তাই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে আধুনিক আইন প্রয়োগ নিয়ে আন্দোলন দেখা দিয়েছে।

এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হলে, ইতালীয়দের বিশ্বাস, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তিন লক্ষের চেয়েও বেশী বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে।

স্বয়ংক্রিয় 'পাচক'

ক্ষুধার্ত পরিব্রাজকরা এবার থেকে 'স্লট-মেসিনে' নিজেরাই আহার্য প্রস্তুত করতে পারবে—এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রযুক্ত রেস্তঁরার পথপ্রদর্শকরা আশা করেন যে আগামী সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান জুড়ে একশটি 'নিজেই-রান্না কর' কাফে চালু করে দিতে পারবেন।

প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজ বা নৈশভোজে কি খাবেন সেটা ঠিক করে স্লট মেসিনে মুদ্রা ফেলে দিয়ে অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আহার্য রান্না হয়ে যায়। রান্না হয়ে গেলেই একটা লাল আলো জ্বলে উঠে জানিয়ে দেয়, আহার্য প্রস্তুত।

দাম পড়ে প্রাতঃরাশের জন্য সাড়ে তিন টাকা মধ্যাহ্নভোজন পাঁচ টাকা এবং ডিনার বা নৈশভোজ বাবদ ছ টাকা।

ফিচার ফুডস নামক এই প্রতিষ্ঠান 'নিজে রান্না কর' কাফে গ্যারাজ, তৃণাচ্ছাদিত বেড়াবার পথ গ্রাম্য ক্লাব প্রমোদ উদ্যান, কারখানা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ করছে।

জনপ্রিয় গায়কের নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে প্যাট বুন ডাইন-ও-ম্যাটস কারণ তিনি ফিচার ফুডসের একজন প্রধান অংশীদার।

ডাইন-ও-ম্যাটস চল্লিশজন লোক ব্যবহার করতে পারে এবং আহার্য রান্না হতে সময় লাগে নব্বই সেকেন্ড করে।

এই মার্কিনী ব্যবস্থায় লোক নিয়োগ ও রান্নার সরঞ্জামের দিক থেকে পয়সা বাঁচানোর সুযোগ পাওয়া যাবে।

তবে, এ পর্যন্ত যে পাঁচটি 'রান্না করার' স্লট মেসিন বসানো হয়েছে তার মধ্যে চার জায়গায় মেসিন এগিয়ে জনসাধারণের ঝোঁক আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ পঁচিশ ॥

নয়াচীনের অর্থনৈতিক অবস্থার একটা পরিচয় মোটামুটি আমরা পেয়েছি, এবার যে-শক্তির জন্য কম্যুনিস্ট চীনের এত বড়াই, যার জন্য ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করছে, সেই সামরিক শক্তির পরিচয়টা আমাদের জেনে রাখা ভাল।

কোনও দেশই তার সামরিক শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করতে চায় না। কম্যুনিস্ট দেশগুলোতে, বিশেষ করে রুশিয়ায় এবং চীনে তো এ বিষয়ে বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। তবে মজা এই, কোন দেশই হাজার চেষ্টা করলেও সব খবর গোপন রাখতে পারে না। প্রতিপক্ষ দেশগুলো একে অন্যের হেঁসেলের অনেক খবরই রাখে।

বিভিন্ন সূত্রে পশ্চিমী সামরিক পর্যবেক্ষকেরা কম্যুনিস্ট চীনের সামরিক শক্তি সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তারই ভিত্তিতে আমি চীনের ড্রাগনের বিধ্বংসী রূপটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। এই তথ্যগুলো ১৯৬১ সালের মে মাস পর্যন্ত আপ্-টু-ডেট্। এর পরেও নানা পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে।

চীনা ফৌজের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে সব খবর প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অনেকেরই দাঁতকপাটি লেগে যাবার কথা। কম্যুনিস্ট প্রচারযন্ত্র এই কথাই বোঝাতে চেয়েছে, চীনকে ঘাঁটিও না, 'শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে' চীনের আব্দারই মেনে নাও। নচেৎ চীন যদি সত্যিই বিগড়ে যায়, তাহলে তার কোটি সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে তোমাকে একেবারে পিষে মারবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে কম্যুনিস্টরা এক রকম এই 'জুজুর ভয়' দেখিয়েই চীনের কবলে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। ভারতেও কম্যুনিস্ট চরেরা হরবখত এই ধরনের প্রচার চালিয়ে সীমান্তের অধিবাসীদের মনোবল দুর্বল করে তুলে, প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে।

এমন একটা হাওয়া চীনাপন্থীরা এদেশে তুলে দিয়েছে যে, চীন যদি ইচ্ছে করে, তবে পাঁচ দিনে আসাম, সাত দিনে পশ্চিমবঙ্গ, চাই কি দিল্লি অব্দি তুড়ি মেরে দখল করে নিতে পারে। নিতেই যদি পারে তো গত নভেম্বরে আসাম দখল না করে, চীনা ফৌজ একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে পিছিয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে চীনাপন্থীরা ভগবান বুদ্ধের মত করুণা বিগলিত মুখে জবাব দেবেন, সে উদ্দেশ্য ওদের ছিল না।

—তবে কি উদ্দেশ্যে প্রভুরা এত কষ্ট করে বমডিলা পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন?

চীনাপন্থীরা জবাব দেবেন, ভারতের মাটি দখল করার জন্য নয়, ভারতকে চাপ দিয়ে 'শান্তিপূর্ণ আলোচনায়' বসতে রাজি করা বার উদ্দেশ্যেই চীন তার ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় দেখিয়ে দিল।

—শান্তিপূর্ণ আলোচনা যদি প্রভুদের এতই কাম্য, তবে তাঁরা কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করে আলোচনার পথ প্রশস্ত করছেন না কেন?

চীনাপন্থীরা এইবার কিঞ্চিৎ বিব্রত হবেন। তারপর যদি এ-প্রশ্ন করেন, চীন যদি এতই শক্তিমান, তবে সে হংকং-এ বৃটিশ অধিকার মেনে নিচ্ছে কেন? কেন ফরমোজা আক্রমণ করতে পারছে না? কুয়েময়ের দখল নিচ্ছে না কেন?

'সর্বশক্তির অধিকারী' চীনের দালালেরা এ-সব ক্ষেত্রে জবাব দেবার চেষ্টা বৃথা জেনে, পশ্চাদপসরণই শ্রেয় জ্ঞান করেন। এই সব ঘটনাই সামরিক পর্যবেক্ষকদের একটা বিষয়ে চোখ খুলতে সাহায্য করেছে যে, কম্যুনিস্ট চীন তার সামরিক শক্তির বড়াই যতটা করে আসলে সে ততটা শক্তিমান নয়।

এমন কি, ভারতের সঙ্গে এই সামান্য সময়ের যুদ্ধেই চীন তার যথেষ্ট দুর্বলতা

প্রকাশ করে ফেলেছে। চুশুলে এবং ওয়ালঙে সবটুকু ক্ষমতা ব্যবহার করেও চীন ভারতের প্রতিরোধ বিপর্যস্ত করে দিতে পারেনি। কামেং ডিভিসনে তার কম্যাণ্ডো ফৌজের অগ্রগতির সঙ্গে তার পরিবহণ, যোগাযোগ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা ভাল রাখতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হওয়াতেই অগ্রবর্তী বিচ্ছিন্ন গেরিলা দল সে-লা এবং বমডি-লা দখল করেও সে দখল বজায় রাখা নিরাপদ মনে করেনি। তাই তারা একতরফা যুদ্ধবিরতির ধাপ্পা মেরে ভারতীয় বাহিনীর পুনরাক্রমণ স্থগিত করিয়ে অনায়াসে নিরাপদ দুর্গে ফিরে গিয়েছে। চীনাদের এই ট্যাকটিক্যাল পশ্চাদপসরণকে চীনা-পন্থী দালালেরা এবং সর্বোদয়ের সন্ত বাবা চৈনিক মহত্ত্বের উদাহরণ হিসাবে সার্টিফিকেট দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছেন।

চীনা লালফৌজ যে-দেশেই যায়, সেই দেশেই তার পরাজয় হয়, কম্যুনিস্টরা একথা যতই প্রচার করুক, আমাদের জেনে রাখা ভাল, এই কথাটা শুধুই প্রচার, এর পিছনে তথ্যের সমর্থন নেই। অন্যান্য দেশের ফৌজের মতই চৈনিক লালফৌজও, অনুকূল পরিবেশে জিতেছে প্রতিকূল পরিবেশে শোচনীয়ভাবে হেরেছে। আর একটা কথা, নিজের দেশের ভিতরে তাদের যুদ্ধের মূল কৌশল, গেরিলা যুদ্ধ, যতটা সাফল্য অর্জন করেছে, বাইরের কোথাও আক্রমণ করতে গিয়ে এই রণকৌশল ততটা কার্যকরী হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীন দুর্বলতর শত্রুর বিরুদ্ধে লড়েছে। যেমন তিব্বতে। একমাত্র কোরিয়াতেই চৈনিক লালফৌজ সর্বপ্রথম (যুদ্ধশিয়ার মতে) আমেরিকার মত প্রথম শ্রেণীর একটি সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মওকা পায়। এই যুদ্ধের মোট ফলাফল লাল-ফৌজের গৌরব আদৌ বৃদ্ধি করেনি। তবে এই প্রমাণটা দিয়েছিল, চীন যদি তার বিপুল সৈন্য-সংখ্যার উপযোগী আধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ বা উৎপাদন কোনদিন করতে পারে (আজও তার এই অভাব প্রচুর আছে), তবে বিশ্বের মহা অশান্তির কারণ হবে উঠবে।

চীনের সৈন্যবাহিনী যতটা লোকবলে বলীয়ান, আধুনিক অস্ত্র বা সরঞ্জাম বলে ততটা নয়। কোরিয়াতে চীন সরঞ্জাম ও অস্ত্রের ঘাটতি, লোকের সংখ্যা দিয়ে পূরণ করার এক অমানুষিক নৃশংস পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ঠেলে দিয়ে চীন "মৃতের পাহাড়ের" চাপ দিয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছিল। চীনা রণ-নায়কদের কৌশল ছিল এই, লোক যখন আমাদের প্রচুর আছে, তখন আর ভাবনা কি, ঢেউয়ের পর ঢেউ জনস্রোত শত্রুর দিকে বইয়ে দাও, ওরা বন্দুক বা মেশিনগান থেকে গুলিগোলা ছুড়তে পারে, এক সময় ওদের গুলি ফুরোবে, তবু আমাদের লোক ফুরোবে না। শেষ পর্যন্ত জিত আমাদেরই হবে।

কোরিয়ার যুদ্ধের যে-সব ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় যে, ১৯৫১ সালের ১৬ থেকে ২১ মে, এই পাঁচ দিনে একটা রণক্ষেত্রে চীন এক লক্ষ সৈন্য বলি দিয়ে একটা জায়গার দখল নেবার চেষ্টা করেছিল। এই বছর, ৭ মার্চ আরেকটা জায়গায় এমনি এক প্রচেষ্টায় চব্বিশ ঘণ্টায় একুশ হাজার চীনা সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

ভারতেও চীনা সমর-নায়কেরা এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। কোরিয়ায় এই কৌশলে প্রথম দিকে কিছুটা সফলতা অর্জন করলেও চীন শেষ পর্যন্ত লোকক্ষয়ই করেছে, যুদ্ধ জিততে পারেনি।

চীনের সামরিক শক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক পাশ্চাত্য সামরিক পর্যবেক্ষক বলেছেন:

The Red Chinese armed forces can be likened to a huge dragon,

which sits and licks its lips in a self-satisfied manner, but only a few of its teeth and claws are sharp—many are missing. Nor can it walk very far, if at all. It is completely dependent on Russian fuel to enable it to spit fire.

The military hierarchy is ageing, lives in the past, is guerilla warfare minded, is cautious and reluctant to change with times.

Shortly, the armed forces, inspite of their size, have only limited offensive capabilities, but many defensive factors are in their favour. ('The Armed Might of Red China', By Major Edgar O'Ballance, published in The Military Review (U. S. A.), November, 1960.)

এইবার দেখা যাক, ড্রাগনের কটা দাঁত এবং নখ শক্ত আছে। আর তার সংহার-শক্তিই বা কত।

স্থলসৈন্য, নৌবহর এবং বিমান বাহিনীর মধ্যে চীনের লালফৌজের স্থলসৈন্য সংখ্যায় পৃথিবীর সব দেশকেই টেক্কা দিতে পারে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। চীনের সদাপ্রস্তুত স্থল বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদের মতে ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ। চীনে সামরিক শিক্ষা সবাইকেই নিতে হয়। কাজেই প্রতি বছর অন্তত ৫ কোটি লোক মিলিটারি তালিম পায়।

গৃহযুদ্ধের শেষে লালফৌজের (নিয়মিত সৈন্য, মিলিশিয়া নয়) সংখ্যা অন্তত ৪৫ লক্ষ ছিল। কম্যুনিস্টরা ক্ষমতা দখল করার পর সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই চীনকে কোরিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়। সেই সময় নয়াচীন তার লালফৌজের পুনর্গঠন করে। অনেক লোককে অবসর দেওয়া হয়, ছাঁটাইও চলে। মিলিশিয়া থেকে লোক এনে সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। তখন লালফৌজের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫০ লক্ষ।

১৯৫৫ এবং ৫৭ সালে আবার সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দেবার কথাটা ওঠে, কিন্তু কেউ আর ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি। নানা কারণে লাল ফৌজ ধীরে ধীরে এখন ৪৫ লক্ষে এসে ঠেকেছে।

এই ৪৫ লক্ষের মধ্যে কম্ব্যাটান্ট (যারা যুদ্ধ করে) ফৌজের সংখ্যা ২৫ লক্ষ, ১০ লক্ষের উপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট কোর (যারা সামরিক পরিবহনে নিযুক্ত), যোগাযোগ রক্ষাকারী ফৌজের সংখ্যা ৯ লক্ষের কাছাকাছি হবে। এদের মধ্যে বিমান ও নৌ বাহিনীর যোগাযোগরক্ষকদের হিসাবও ধরা আছে। স্থল বাহিনীর সদর হচ্ছে পিকিং। সদর দপ্তর আবার ইনটেলিজেন্স (সামরিক গোয়েন্দা), ট্রেনিং, প্ল্যানিং এবং এই ধরনের কয়েকটা চিরাচরিত দপ্তরে বিভক্ত। পশ্চিমী সেনা বিভাগের সঙ্গে তুলনা করে পর্যবেক্ষকেরা বলেছেন, তাদের তুলনায় চীনের দক্ষতাসম্পন্ন অফিসারের সংখ্যা অনেক কম। চীনের প্রয়োজনের তুলনায়ও কম। তবে চীন এই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করে চলেছে। "ফ্রণ্ট" হেড কোয়ার্টারেও অফিসারদের ঘাটতি আছে। গৃহযুদ্ধের পর লালফৌজের বিভিন্ন ফিল্ড আর্মিকে চীনের এক-একটা অঞ্চলে কর্তৃত্ব করবার জন্য প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই "ফিল্ড আর্মি"ই বর্তমানে "ফ্রণ্টে" পরিণত হয়ে চীনের মস্ত সামরিক প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থল বাহিনীর কম্ব্যাটান্টদের শতকরা ৯০ জনই ইনফ্যান্ট্রি। এই ইনফ্যান্ট্রি ডিভিসনগুলোই চীনের সামরিক ব্যবস্থার প্রধান বল। চীনে তিনটে ডিভিসনে একটা 'কোর' হয়। তিনটে কোরে একটা "আর্মি গ্রুপ" এবং বেশ কয়েকটা আর্মি গ্রুপ একত্র করে "ফ্রণ্ট" তৈরি হয়েছে।

স্থল বাহিনীর ডিভিসনেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এক ডিভিসনে ৭০০০ লোক থাকত। কিন্তু রুশদের প্রভাবে চীনারা ডিভিসনে লোকের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। এখন ১৪০০০ লোক নিয়ে ডিভিসন গঠিত হয়। ১৯৫৯ সালে লালফৌজের ১৫০টি এই রকম বড় ইনফ্যান্ট্রি ডিভিসন এবং আরও শ' তিনেক ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেণ্ট এবং ব্যাটালিয়ন সারা চীনে ছড়িয়ে ছিল।

চীনে সৈন্য বাহিনীকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বদলি করার রেওয়াজ নেই। তবু এই ৩০ লক্ষ সৈন্যের রসদ ও সরঞ্জাম জোগানো নিতান্ত সহজ কাজ নয়। একে বিরাট দেশ, তার উপর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিতিকিচ্ছি রকমের খারাপ। সরবরাহের সমস্যাটা খুবই জটিল হয়ে উঠেছে। স্ট্র্যাটেজিক জায়গাগুলোতে পৌঁছবার জন্য চীন অনেক ভাল রাস্তা বানিয়েছে, কিন্তু দেশের ভিতরের রাস্তা উন্নয়নের জন্য বিশেষ একটা নজর দেয়নি।

পরিবহনযোগ্য মোটর গাড়ির যথেষ্ট অভাব চীন দেশে আছে। বড় রাস্তা ছেড়ে একটু ভিতরে ঢুকলেই দেখা যাবে চীনারা মানুষ ও পশুর পিঠে, কিংবা লোকোর, কিংবা ঠ্যালাগাড়িতে মাল বয়ে নিয়ে চলেছে।

(ক্রমশ)

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া নাকি বলিয়াছেন যে তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হইতেন তাহা হইলে কয়েকটা বছর দেশের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন।—"তবু ভালো,

আমরা ভেবেছিলাম লোহিয়াজী প্রধানমন্ত্রী হলে কয়েকটা বছর হয়ত তিনি 'আংরেজী হটাও' আন্দোলন নিয়েই পড়ে থাকতেন"—বললেন বিশু খুড়ো।

আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন,—তিনি কোন গ্রুপ বা দলের নেতা নহেন। এমন কি তাঁর বাড়িতেও তিনি নেতা নহেন। —"নিজের বাড়িতে নেতা কেহই নন, কিন্তু

এত বড় সত্য কথা এক কৃপালনীজী-ই বোধ হয় বলতে পারলেন"—মন্তব্য করে-ন আমাদের শ্যামলাল।

বে[illegible]জী রহস্যচ্ছলে বোম্বাইতে ড্রাইভিংএর টেস্ট দিয়েছেন। প্রথমবারের পরীক্ষার ফল খুবে খারাপ হয় এবং দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় ৩৮ নম্বর পাইয়া ভাল-মন্দ দেখান। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু ৩৮ নম্বর নিয়েও হয়ত তিনি কলকাতার স্টেট বাসকে বশে আনতে পারবেন না অর্থাৎ কারণে [illegible] ফুটপাতে উঠে যাওয়া। [illegible]

চা-এর দোকানে ঢুকে পড়া বন্ধ করতে পারবেন না।"

১০ই জুন হইতে কলিকাতায় "পথচারী" সপ্তাহ পালন করা হইবে। আমাদের অন্য সহযাত্রী সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিলেন—"এবং মাত্র এক সপ্তাহের জন্য 'হকার্স বিতাড়ন' সপ্তাহ হয়ত পালন করা হবে।।"

জরুরী অবস্থায় মিতব্যয়িতার জন্য সরকারী ভবনগুলির ১৯৬৩-৬৪ সালে কোন চুনকাম করা হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্যাম-লাল গল্প শুনাইল: —"কোন এক ছাত্র চুনকাম-এর ইংরেজী লাইম ওয়ার্ক লিখে-ছিল। গৃহশিক্ষক শব্দটা শুদ্ধ না করে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসিত হলে নাকি তিনি অভিভাবককে বলেছিলেন— মশাই, মাত্র দশ টাকায় হোয়াইট ওয়াশ হয় না, লাইম ওয়ার্কই হয়' সরকারী ভবনগুলির অন্তত লাইম ওয়ার্কও হবে না এ কথা কিন্তু বলা হয়নি।"

মন্ত্রিসভা লালফিতার অবসান ঘটাইবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"চিরাচরিত এই প্রথার শোকাবহ মৃত্যুতে শোকের প্রতীক কালো ফিতে কতদিন পর খোলা হবে সে সম্বন্ধে সংবাদে কোন উল্লেখ নেই!"

শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—হানাদার চীন দেশ হইতে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত জনগণকে সৈনিকোচিত দৃঢ়তার সহিত কাজ করিতে হইবে। শ্যামলাল বলিল—"জনগণের দৃঢ়তা সৈনিকোচিত হবে কি না বলতে পারব না। কিন্তু তা যে সৈন্যাধ্যক্ষোচিত হবে তা হলফ করেই বলতে পারি। কেননা রণ করি চাই না করি, রণকৌশলে আমরা জেনারেল চৌধুরীকে বাই লেংথস্ মেরে বেরিয়ে যেতে পারি, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন!!"

সংবাদে প্রকাশ, শিলিগুড়ি ভারত হইতে প্রচুর সুপারি পাকিস্তানে পাচার হইয়া যাইতেছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী পূর্ব পাকিস্তানেরই একটি গ্রাম্য গীতির একটি চরণ গাহিয়া শুনাইলেন—"পান দিলে সুপারি লাগে, আয়ো লাগে চুন, খুবে খুবাইয়া খনে আমার পিরিতের আগুন গো......"

ভারতের [illegible] পাকিস্তানীরা ভারতের নাগরিক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ভারতীয় পত্নী গ্রহণে পাকিস্তানে বাধা সম্প্রতি হয়েছে বলেই এর আগে সংবাদ পেয়েছিলাম, অপহরণে বাধা আছে বলে শুনিনি, সুতরাং— —!!"

করাচীর একটি সমাজ-সেবা সমিতি নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেহ যদি আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ফোন নং...... -তে ফোন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পৃথিবীতে বাঁচিবার অধিকার সবারই আছে। উক্ত সমিতি পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার পরামর্শ দিয়া থাকে।— "খুবই ভালো কথা। কিন্তু দিল্ যেখানে দেওয়ানা সেখানে মরতে কেউ নোটিস দেয় না, বাঁচার সূত্র সন্ধানেও তার কোন কৌতূহল নেই। বরং সমাজসেবা সমিতি পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে যদি প্রচার-কার্য চালিয়ে যান তাহলে হয়ত অনেকেরই একটা হিল্লে হয়, নিজেরাও দু পয়সা কামাতে পারেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শহীদ সুরাবর্দী সত্তর বৎসর বয়সে বেরুটের একটি যুবতীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—

"এ সংবাদ আমরা অন্য এক সূত্রেও পেয়েছি। তবে আমরা শুনেছিলাম জনাব সুরাবর্দীর বয়সটা সত্তর নয়, বাহাত্তর!!"

লণ্ডনে ইংলন্ড শিক্ষায় পদ্ধতি সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্প্রতি জানানো হইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কোন এক বিশেষ ধরনের কৃত্রিম শব্দ করিয়া মৎস্যকুলকে আকৃষ্ট করা যাইবে। খুড়ো বলিলেন—"খুবই কথা নিশ্চয়ই [illegible] [illegible] আকৃষ্ট [illegible] অনেক [illegible] আনবেন, [illegible] না [illegible]

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

[illegible] ভিন্ন দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। [illegible] আহার ব্যাপারেও কত যে [illegible] আছে তার হিসাব নেই। কোথাও বা [illegible] নিরামিষ পরিবেশন হয় আবার কোথাও ব্যাপক মাংসাহারী ব্যবস্থা। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের দু একটা রান্না আমরাও প্রস্তুত করে দেখতে পারি কেমন হয়।

আমাদের যেমন মাছভাত কাশ্মীরে তেমন মাংসভাত। মাছের অভাব বাঙ্গালীকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কাশ্মিরীরা গায়ের জামা বিক্রি করে মাংস কিনে আনে। তাই মাংস রান্নার পারিপাট্যও অনেক। মাংসের পোলাও কাশ্মিরীদের প্রিয় খাদ্য।

উপকরণঃ—চাল—১ কিলো, মাংস—১ কিলো, ঘি—১৫০ গ্রাম, দৈ—১২৫ গ্রাম, মৌরি ও দারুচিনি, বাদাম—২।৪টি। ধনে গুঁড়ো, ছোট এলাচ, কেশর, একটু দুধ, আদা কুচি, আদা সোঁঠ, জিরে গুঁড়ো, নুন আর হিং সামান্য।

প্রণালী—১। মাংস ধুয়ে নিয়ে তাতে ঘি, দৈ, নুন, আদা কুচো, আদা সোঁঠ (শুকনো আদা গুঁড়ো) আর সামান্য হিং দিয়ে হাঁড়ি বা ডেকচির মুখ বন্ধ করে উনোনে চাপিয়ে রাখুন।

২। জল শুকিয়ে গেলে সামান্য জলের ছিটে দিতে দিতে কষে মাংস নরম করে নিন। তারপর ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিন।

৩। আন্দাজমত জলে একটি পুঁটুলিতে মৌরি ও দারুচিনি ঢিলে করে বেঁধে ছেড়ে দিন। জলে বেশ কিছু সময় সিদ্ধ হলে মশলায় সুগন্ধ বের হবে। ঐ পুঁটুলি তখন তুলে ফেলে দিন। খোসা ছাড়ানো বাদাম ও নুন দিন।

৪। জলে চাল ছেড়ে দিন। জল যতটা চাল তার দ্বিগুণ হলে আন্দাজ ঠিক হবে। জল প্রায় শুকিয়ে এলে ঘি, মাংস, ছোট এলাচ দিন, এক ছটাক দুধে সামান্য কেশর গুলিয়ে তাও দিন।

৫। এবার দমে চড়ান। ঢাকনা শক্ত করে বসিয়ে ময়দা দিয়ে এঁটে অল্প আঁচে বসান। ঢাকনার উপরও একটু আঁচ দিন। মিনিট দশ, পনেরো পরে পোলাও তৈরী হয়ে যাবে।

মাংসের কোফ্‌তা আমিষাহারী মাত্রেরই পরম মুখরোচক জিনিস। কাশ্মিরী কোফ্‌তার একটু অন্যরকম করে রান্না হয়। কোফ্‌তার আকারও গোল নয়— লম্বা অনেকটা ছোট পটলের মত গড়ন।

উপকরণঃ—কিমা—৫০০ গ্রাম, ঘি—৫০০ গ্রাম, দই—৫০ থেকে ১০০ গ্রাম। আদা কুচি, আদা সোঁঠ, জিরের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, [illegible] মশলার গুঁড়ো [illegible] [illegible], [illegible] লঙ্কাগুঁড়ো, সামান্য হিং ও নুন।

[illegible] কিমা [illegible] [illegible] [illegible] দিন,

২। যা কিছু মশলা এবং দই অর্ধেক করে নিয়ে কিমার সঙ্গে মেশান,

৩। তারপর পটলের মত লম্বা লম্বা করে কোফ্‌তা তৈরী করে যে হাঁড়ি বা ডেকচিতে তৈরী হবে তাতে ঘি গরম করে পাশাপাশি সাজিয়ে দিন,

৪। বাকি দই, সোঁঠ, নুন ও হিং দিন,

৫। খুব নরম আঁচে রাখুন। নিজে থেকে জল বেরিয়ে তৈরী হবে কোফ্‌তা। বেশী আঁচ যেন না হয় তাতে কোফ্‌তা ভেঙ্গে বা পুড়ে যেতে পারে,

৬। বেশ লাল হয়ে গেলে অল্প জল, জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ঢেকে দিন।

৭। নামাবার আগে গরমমসলার গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিন।

[illegible] আমাদের [illegible] [illegible] লাগবে জানি না, তবু [illegible] 'খোবানি' বলে তার [illegible] [illegible] দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে।

উপকরণঃ—কিমা—২৫০ গ্রাম, [illegible] ডাল—৫০ গ্রাম, চিনি—৩০০ গ্রাম, কয়েকটি বাদাম, ঘি, কেশর, ছোট এলাচ।

প্রণালী—১। কিমা ডালের সঙ্গে [illegible] করে সিদ্ধ করুন।

২। জল শুকিয়ে ঠাণ্ডা করে শিলে [illegible] নিন।

৩। ছোট ছোট নেচি কেটে একটি করে বাদাম ভিতরে দিয়ে খোবানী বা বাদামের আকারে গড়ে ঘিয়ে ভাজুন।

৪। একতারের চিনির রস করুন তাতে ছোট এলাচ দু একটি কেশরের পাপড়ি দিন।

৫। অল্প আঁচে রসটি রাখুন, বড়া ভেজে তার গায়ে কাঠি দিয়ে ফুটো ফুটো করে ঐ রসে দিন।

'খোবানি' ছানা দিয়েও করা যায়। ছানা শিলে বেটে এক চামচ এরোরুট বা ময়দা মিশিয়ে নেবেন।

মাংসের ভক্ত বলে কাশ্মিরীরা সব্জি খান না তা কিন্তু মোটেই নয়। শীতকালে 'করম শাক' বলে একটি শাক পাওয়া যায়। বরফে চারদিক যখন ঢেকে যায়। অন্য সব্জি তখন থাকে না। কোথাও কোথাও করমশাক পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় আগে থেকে শুকিয়ে রাখা তরকারি। কাজেই যখন শাক-সব্জির মৌসুম তখন তারা প্রাণভরে তরকারি খেয়ে নেন। ঢেঁড়স আর আলুর তরকারি একটি প্রকরণ খুব সহজ।

উপকরণঃ—ঢেঁড়স—২৫০ গ্রাম, আলু—২৫০ গ্রাম, আধচামচ ধনে গুঁড়ো, আধচামচ জিরে গুঁড়ো, আধচামচ হলুদ গুঁড়ো, একটু লঙ্কা গুঁড়ো, হিং, নুন, সরষের তেল।

১। ঢেঁড়স ডুমো ডুমো করে কেটে রাখবেন, আলুও টুকরো করে রাখুন।

২। তেল গরম হ'লে হিং ফোড়ন দিয়ে আলু সাঁতলে নিন।

৩। আলু সাঁতলানো হ'লে সরিয়ে রেখে তাতে ঢেঁড়সও সাঁতলান।

৪। ঢেঁড়স ও আলু মিশিয়ে দিন ও সামান্য জল দিন।

৫। ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো, নুন দিয়ে অল্প আঁচে ঢাকা দিয়ে রাখুন।

৬। সিদ্ধ হ'লে নামাবেন। ঝোল থাকবে না।

কাঁচামুগের ডালের একটা সুন্দর রকমফের কাশ্মিরী রান্নায় পাওয়া যায়।

উপকরণঃ—ডাল—২৫০ গ্রাম, হলুদ গুঁড়ো—আধচামচ, ঘি, আদা কুচি, জিরে গুঁড়ো একচামচ, সামান্য হিং, একটু চিনি বা গুড় এবং নুন।

১। ডালটা ধুয়ে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে রাখতে হয়।

২। জল ফুটলে ডাল ও তাতে সামান্য নুন দিন।

৩। হলুদ গুঁড়ো দিন।

৪। সিদ্ধ হ'লে কাটা দিয়ে মোলায়েম করে অল্প আঁচে রাখুন।

৫। চিনি (খুব অল্প) আদা কুচি ও হলুদ আর জিরে গুঁড়ো দিন।

৬। হাতায় করে ঘি গরম করে হিং ও জিরে ফোড়ন দিয়ে সেই হাতাসুদ্ধ ডালে ডুবিয়ে দিন ও ডাল পরিবেশন না করা পর্যন্ত ঢেকে রাখবেন।

কাশ্মিরী রান্নায় পেঁয়াজ বা রসুন ব্যবহারই হয় না। মশলা আলাদা করে তাওয়ায় ভেজে গুঁড়ো করে ছেঁকে বোতলে রাখা হয়। কাশ্মিরী রান্নায় সরষের তেল ব্যবহার হয়। সরষের তেল দিয়ে কাশ্মিরী প্রথায় ফুলকপি রান্না করে দেখবেন। চমৎকার হয়।

উপকরণঃ—একটি ফুলকপি, সরষের তেল, ধনে গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো এক চায়ের চামচের অর্ধেক, আদা কুচি, সোঁঠ, গুড়, হিং ও নুন।

১। ফুলকপি বড় টুকরো করে কাটুন।

২। তেল চড়িয়ে হিং ফোড়ন দিন। এবার কপির টুকরো দিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কষুন। আঁচ খুব বেশী রাখবেন না।

৩। অল্প জল দিয়ে সব মশলা দিন। সিদ্ধ হ'লে নামাবেন। শুকনো হবে।

টুকিটাকি

কাপড়ের উপর থেকে দাগ তোলায় লেবুর ক্ষমতা অসাধারণ। গৃহস্থ সংসারের লেবু একটি সাধারণ জিনিস, সর্বদা হাতের কাছে পাওয়াও সহজ।

যে কোন কাপড়ের উপর কালির দাগ পড়লে জলে মেশানো লেবুর রস লাগিয়ে দেবেন। কিছু পরে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। দাগ সম্পূর্ণ উঠে যাবে। পানের দাগও লেবুর রস দিলে উঠে যাবে, কিন্তু দাগ পুরোনো হ'লে আর ওঠে না।

চায়ের দাগ তুলতে হ'লে কাপড়ে লেবুর রস লাগিয়ে রোদে রেখে দেবেন।

কাপড়ের উপরে যে মর্চের দাগ পড়ে তাতেও লেবু কাজে লাগে। এক হাঁড়ি জল ফুটতে থাকবে, তার উপর দাগের জায়গাটি টেনে ধরে রেখে ফোঁটা ফোঁটা করে লেবুর রস ফেলবেন। তিন চার মিনিট পরে ধুয়ে নেবেন। দাগ না উঠলে আবার করবেন। খুব পুরোনো দাগ না হ'লে উঠে যাবে।

কষের দাগ তোলায় দরকার হ'লে দাগের জায়গায়, বেশ করে লেবু ঘষে রেখে তারপর গরম জলে ধুয়ে ফেলবেন। [illegible] ও [illegible] দাগ [illegible] পরিষ্কার হয়ে যায়।

✽ আলোচনা ✽

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন,
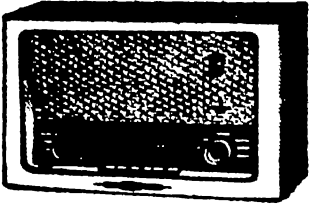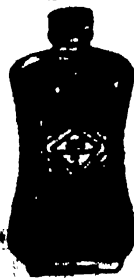
শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু আমার লেখা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করে (দেশ ১ জুন, ১৯৬০) আমায় সম্মানিত করেছেন। চক্রবর্তী মশায়ের প্রশ্নঃ "বিদগ্ধ সাহিত্যিক" হয়েও চীনের 'ধোঁকাবাজি' বা অভিনয় আমি ধরতে পারিনি কেন? আলোচ্য লেখার মধ্যে আমি কয়েকটি বিশিষ্ট নামের উল্লেখ করেছি—পণ্ডিত নেহরু, সর্দার পানিক্কর, পণ্ডিত সুন্দরলাল, মন্ত্রী শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। গুণীজ্ঞানী আরও বহুজনের নাম করতে পারি, কেউ তাঁরা ধরতে পারেননি। অতএব লজ্জার কি—মহৎ-সঙ্গেই তো আছি আমি।

আর এক প্রশ্ন ঃ কেন আমার 'কলম কাঠি হয়ে কমিউনিস্ট চীনের ঢাক পিটিয়েছিল'? আলোচ্য লেখায় আমি বলতে চেয়েছি, জীবনসন্ধানী শিল্পী কোন বিশেষ 'ইজম'-এর ঢাক পেটাবেন না। 'চীন দেখে এলাম' বইটাকে যদি ঢাক পেটানোই বলতে চান, সেটা চীন দেশ সম্বন্ধে, দেশটা কম্যুনিস্ট বলেই নয়।

'বিষয়বস্তুর জন্য নয়, সাহিত্য-গুণেই বই পুরস্কৃত হয়েছিল'—আমার এই উক্তি উদ্ধার করে চক্রবর্তী মশায় প্রশ্ন করেছেন ঃ 'তা হলে কি ধরে নেব ও বইয়ে অনেক বিষয়বস্তু সঠিক নয় বা হয়তো নেহাতই কল্পনাপ্রসূত।' চীন নিয়ে এই বাংলা দেশেই বহু গুণী লিখেছেন, অতএব বিষয়বস্তুর জন্য পুরস্কার, এমন কথা নিশ্চয় বলব না।

চক্রবর্তী মশায় আমার মধ্যে দুটো সংগুণের (সত্য দৃষ্টি ও তীব্র অনুভূতি) অভাব লক্ষ করেছেন। সামান্য ব্যক্তি আমি—শুধু দুটো কেন, কোন গুণই নেই আমার। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রশংসা করতেন, তাঁর মধ্যেও তবে তো গুণ দুটো নেই। উপায়?

ভূপেন্দ্রনাথ বসু মশায় একটি [illegible] জানতে চেয়েছেন ঃ "কোন দেশ সম্বন্ধে বই লিখতে হলে সে দেশে অন্ততপক্ষে দু-বছর, পাঁচ-সাত বছর হলে আরও ভাল —থাকা দরকার।" এটাও ঠিক বলে মনে হয় না। সর্দার পানিক্করের বৈদগ্ধ্য বিশ্বখ্যাত। রাষ্ট্রনীতিক হিসাবেও তাঁর [illegible]। ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে অনেক বছর তিনি চীনে ছিলেন, [illegible] [illegible]। চীনে, [illegible] [illegible] পানিক্কর ও

তাঁর বিদুষী মেয়ের অজস্র প্রশংসা শুনলাম বহুজনের কাছে। ফিরে এসে চীনের বিস্তর গুণগান করে তিনিও অতিকায় বই লিখেছেন।

মনোজ বসু

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৪ই মে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত মনোজ বসুর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করলাম। স্বাধীন সাহিত্য সমাজের প্রতি স্বাভাবিক অনুরক্তি বশত। কম্যুনিস্ট দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও শিল্পীর আদর্শ নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তার জন্যে তাঁকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু সেই সঙ্গে পত্রলেখক স্বাক্ষরিত 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজে'র অপূর্ব প্রস্তাবনাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে তিনি তাঁর লেখা 'চীন দেখে এলাম' বইটির সমালোচকদের যেভাবে সমালোচনা করেছেন আমি তার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। বইটি গোড়ার কথায় গুরুত্ব হয়তো কেউই দেয়নি। এবং তা একটি দুটি অধৈর্য পাঠকের বিক্ষিপ্ত মনের ব্যাপার হতে পারে। কিন্তু মনোজ

বসু সে দুঃখ ভোলেননি। এই কথা মনে করে অন্তত তাঁর দুঃখ ভোলা উচিত ছিল যে ঘটনাচক্রে এরূপ একটি বই-এর লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পাঠকবর্গ পূর্বের মতই তাঁকে যথাযোগ্য আসনে বসিয়ে রেখেছে। বইটি দগ্ধ করলেই কি বইটির প্রকাশজনিত প্রতিক্রিয়ার অপনোদন হত—না সে ক্ষতি লেখকের স্বীকারোক্তিতে পূরণ হতে পারে। 'স্বাধীন সাহিত্যে সমাজ'-এর অপূর্ব প্রস্তাবনাটির বিকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা নিজের ফ্যাসিজমাত্মক মা ভুলে অনেকে যদি প্রকৃতই বইটি প্রকাশের জন্য অনুতপ্ত হন তাঁর উচিত সৃজনশীল ক্ষমতার দ্বারাই ক্ষতি পূরণ করা।

তিনি ডি আই পিদের দোহাই দিয়েছেন (আনন্দবাজারে [illegible]) [illegible] রাজনীতিক—আর তিনি সাহিত্যিক। শিল্পীর স্বাধীনতার তাঁরই কথা—'রাজনীতিকের পথ আর সাহিত্যিকের পথ এক নয়—লেখকের হাতের কলম কাঠি হয়ে কখনই ইজমের ঢাক পেটাবে না।' সুতরাং ডি আই পিদের চীনা প্রশস্তি তৎকালীন রাজনৈতিক কূটনীতি বলে চালানো যেতে পারে এবং আজকেও যা বলা হচ্ছে তাও স্বাভাবিক মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি রাজনৈতিক পরিবর্তনশীলতার মত সহজ এবং ভঙ্গুর নয়। "পরনিন্দা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্তুতির দ্বারা নিন্দাকে নিন্দিত করেছেন। বিক্ষিপ্ত, বিচলিত মনোভাব লেখকের মানস ধর্মের সহজ পরিপন্থী—বারেকের জন্যে সাহস ভরে এ কথা আমার মনে করিয়ে দিতে হল। ইতি—

সুধাংশুকুমার বসু মল্লিক
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

ভ্রম সংশোধন

[গত সংখ্যার আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত একটি পত্রে মনোজ বসু প্রণীত 'চীন দেখে এলাম' গ্রন্থটিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ বলে ভুলক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'নরসিংদাস পুরস্কার' পেয়েছিল। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।]

দেশ সাহিত্য-সংখ্যা : ১৩৭০

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

রবীন্দ্র পক্ষে "সাহিত্য-সংখ্যা : ১৩৭০ দেশ" পত্রিকার প্রকাশ বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে, আমার মনে হয়, অবিস্মরণীয়। কেননা এই সংখ্যাটি বাঙালীর সাহিত্য চিন্তার এক মহৎ উপাখ্যান তুলে ধরেছে। তবু এই সংখ্যার সমস্ত রচনা ও বিষয়ের মধ্যে আরও দুটি বিষয়ের সন্ধান পাব আশা ছিল। এই বিষয়ে দুটিকে আমি "বাংলা সাহিত্যে জাতীয় সংহতির উপাদান ও রূপবিকাশ" এবং "কালীপ্রসন্ন সিংহ ও টেকচাঁদ ঠাকুরের স্বদেশ চেতনা" বলে উল্লেখ করতে চাই।

এ দুটো বিষয় ছাড়া "বিবেকানন্দ ও [illegible]" [illegible] সাহিত্য-সংখ্যা : ১৩৭০ [illegible]

একখানি অমর সংকলন গ্রন্থের মর্যাদাই পেত।

শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ"—প্রবন্ধে কয়েকটি হীরকখণ্ডের উপহার দিয়েছেন। তিনি লিখেছেনঃ—

"সমগ্র দেশ এবং জাতির শক্তি উদ্বুদ্ধ করতে হলে আরো স্থায়ী প্রেরণার প্রয়োজন। তাই মহত্তম কবি-প্রেরণা যা দেশময় এক ভাবাবেগের জোয়ার এনে দেবে।"

তিনি রবীন্দ্রনীতির উৎসের সন্ধান করতে বলেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির মূলে যে নীতিটি কাজ করেছে সেটি হচ্ছে আত্মশক্তির উদ্বোধন।"

শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহোদয়ের "রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র" তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা।

কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী।" বাংলাদেশে উপেন্দ্র-কিশোর আধুনিক বাঙালীর অন্যতম মানস-পথ্যকারক। তাঁর ভাব্য শিশুর মনের সঙ্গে সমান মাপে চলেছে শ্রীবসু সেই সত্যই প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর সমগ্র আলোচনার মূল সুরে উপেন্দ্রকিশোরের শিশুপ্রেমিক রূপটি জীবন্ত হয়ে ফুটেছে।

উপেন্দ্রকিশোরের স্বরচিত নিবন্ধ 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা' গভীর মননশীলতার নিটোল সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ তাই মন্তব্যেরও অতীত। সৈয়দ মজ্‌তবা আলী সাহেবের "রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মিদ্বয়" সহাজিয়া সুরের অপূর্ব মর্ম কথা।

শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা" এই সংখ্যার ভূষণ স্বরূপ। তিনি প্রাচীন যুগ থেকে ভারত চেতনার উৎস ও তার ধারা খুঁজে বের করেছেন।

"সাহিত্যে স্বদেশ চিন্তা ঃ রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর" নিবন্ধে শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস অপূর্ব মনোভঙ্গীর সাহায্যে 'ঊনবিংশ শতকীয় নবজাগৃতি', 'মানব কল্যাণের মহৎ আদর্শ" কোন খাতে প্রবাহিত হয়েছে তার নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্য-ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্যে তাঁর লেখাটি সমৃদ্ধ।

"বাংলা সাময়িক পত্রে স্বদেশ চিন্তা"—বিনয় ঘোষের মৌলিক চিন্তা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদী ধর্ম নিবন্ধের ছত্রে ছত্রে মুখর হয়ে রয়েছে।

এ ছাড়া 'ঈশ্বর গুপ্ত', 'মধুসূদন', 'রঙ্গলাল,' 'দীনবন্ধু', 'হেমচন্দ্র,' বঙ্কিমচন্দ্র 'রমেশচন্দ্র,' 'নবীনচন্দ্র' ও 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নিয়ে রচনাগুলির প্রতিটি নিজস্ব কণ্ঠ, নিজস্ব সুর ও নিজস্বভঙ্গীতে সার্থক সৃষ্টি।

ভেবেছিলাম "সাহিত্য সংখ্যা ঃ ১৩৭০ দেশ" ভালো লেগেছে শুধু এই কথাটিই আপনাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু লোভ

সম্বরণ করতে পারলাম না। বাংলা দেশে জাতীয় সংহতি' নিয়ে এখন যেসব বাড়াবাড়ি হচ্ছে তার উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে বলব বাংলার বিগত আড়াইশত বর্ষের ইতিহাসের সম্ভাব্য এবং স্বাভাবিক পরিণতিই হল 'জাতীয় সংহতি'।

সুধীর বিশ্বাস
জলপাইগুড়ি

চীন আক্রমণ ও দেশের মুক্তি

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

বেশ কয়েকদিন ধরে ভারতবর্ষের উপর চীন দেশের হামলাকে কেন্দ্র করে দেশ পত্রিকায় নানাধরনের লেখা ছাপা হচ্ছে এবং হয়েছে। এই সমস্ত লেখা অনুরাগী পাঠক মহলে যে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কথা হল যে চীন-হামলাজনিত প্রবল সংকটময় পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষেরই কিছু না কিছু কর্তব্য রয়েছে। এ কর্তব্যের গণ্ডি কেবলমাত্র সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে সূচিত নয় বরং আমার মতে এর ব্যাপকতা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত চিন্তার খাতে প্রবাহিত হয়ে সমষ্টির মিলনক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ যদিচ এখনও পর্যন্ত একটি অনগ্রসর দেশ এবং সাধারণ ভারতবাসী অশিক্ষিত জনগণের পর্যায়ভুক্ত কিন্তু তাহলেও অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে শিক্ষাকে ছাপিয়ে উঠেছে মানুষের জন্মগত ন্যায়বোধ এবং অন্যায়ের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ আর তার ফলে দেখা দিয়েছে সারা দেশব্যাপী জনজাগরণ। গভীর অবসাদে ভেঙে পড়া সাধারণ ভারতবাসীর জীবনে চীন আক্রমণের ফল স্বরূপ এসেছে নতুন উদ্যমে বেঁচে থাকার এক দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা। ভারতবাসীর সমাজ-জীবনের সংকুচিত গণ্ডিরেখা যখন একবার বিশালতা লাভ করেছে, বিশেষ করে সারা ভারতের চিন্তাশীল মানুষের আশু কর্তব্য তাকে আরও বেগবান করা দলীয় স্বার্থ-সিদ্ধির খাতিরে নয়, মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্মগত অধিকারে। ইতি

মানিক চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

দেশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ দেশের (২১শ সংখ্যা) "সাহিত্য সংবাদ" বিভাগে বিন্দুর মহাশয়ের "বঙ্গসাহিত্য ও ছাত্র সমাজ" শীর্ষক আলোচনা প্রসঙ্গে বিশাল ছাত্র সমাজের একজন হয়ে কিছু বক্তব্য নিবেদন করতে

চাই, তা 'দেশ'র পাতায় তুলে ধরলে কৃতজ্ঞ ও বাধিত হ'বো। আমি বিদুর মহাশয়ের সংগে একমত যে, বর্তমানে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ও তাদের সাহিত্য পিপাসাও দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং যেটুকু আছে, তাও আংশিক "সিনেমার কল্যাণে।" বিদুর মহাশয় সেকাল (তাঁর সমসাময়িক ছাত্র সমাজের) ও একালের ছাত্রদের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের ও সাহিত্য পিপাসার তুলনা করে বর্তমান ছাত্র সমাজের জ্ঞানের পরিধির যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে হয়তো অনেকেই বিস্মিত ও হতাশ হয়েছেন। কিন্তু এর জন্য সমস্ত দোষ ছাত্র সমাজের ওপর চাপানোর আগে সুধী ও বিদগ্ধমণ্ডলীকে আমি সেকাল ও একালের পাঠ্যসূচীর গুরুত্বভার, অর্থনৈতিক সমস্যা ও জীবন-সংগ্রামকে তুলনা করে দেখতে অনুরোধ করি।

বর্তমান উচ্চ মধ্যমিক শ্রেণীর (নবম, দশম, একাদশ) পাঠ্যসূচীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—বাংলা সাহিত্যের নামকরা দশটা বই (রাজর্ষি, কমলাকান্তের দপ্তর, রমামণী কথা চরিত কথা, সীতার বনবাস, কুরুপাণ্ডব, গল্পে উপনিষৎ, গাথাঞ্জলি, কাব্যমঞ্জুষা, সংকল্প ও স্বদেশ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও একটা সংকলন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া ইংরাজী, অংক সংস্কৃত বিজ্ঞান সমাজবিদ্যা, ক্রাফট ও অন্যান্য তিনটি কম্বিনেশন এই শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। হয়তো শিক্ষা অধিকর্তারা আশা করেছেন যে এতগুলো বই পাঠ করলে নিশ্চয়ই ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর হবে। কিন্তু কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের ওপর যাবতীয় পাঠ্যসূচীর ওপরও এতগুলো বাংলা বই-এর চাপ কি অত্যাচার নয়? এতে কি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান সম্ভব? তদ্রূপ স্নাতক-শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যসূচীর দিকে দেখুন—বাংলার চার বিখ্যাত সাহিত্যিকের নামকরা চারটি বই এই শ্রেণীর পাঠ্য। কিন্তু তাতে পূর্ণ সংখ্যা থাকে মাত্র ৪০। সাধারণ ছাত্র এতে ১৫।১৬ ও একটু ভাল ছাত্র ১৮।২০ এর বেশী পায় না। তৎপর ইংরাজী ও অন্যান্য দুই কম্বিনেশনের চাপে বাধ্য হয়েই ছাত্ররা বাংলার জন্য কম সময় ব্যয় করে থাকে। কারণ যে পরিশ্রম করলে তারা বাংলায় ১৭।১৮ পায় অন্য বিষয়ে ঐ পরিশ্রম করলে সহজে ৩৫।৩৬ পাওয়া যায়। এইজন্যই বোধ হয় বাংলায় অকৃতকার্যের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। স্বভাবতই এইজন্যই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি সীমিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু এর জন্য কি ছাত্ররাই সম্পূর্ণ দায়ী? বর্তমান পাঠ্যসূচী কি এর জন্য দায়ী নয়?

বিদুর মহাশয় তাঁর আলোচনার উপসংহারের দিকে একটা চিন্তনীয় বিষয়ের দিকে অংগুলিসংকেত করেছেন যে, 'গাদা গাদা মোটা মোটা বাংলা সাহিত্যের ঠিকুজী লিখে যাঁরা বই বের করছেন, সেই অধ্যাপকবৃন্দ' তাঁদের ছাত্রদের জন্য সম্যক উপকার করতে সক্ষম হননি। তবে এটুকুও ভেবে দেখতে হবে যে, পাঠ্যসূচীর সংস্কার না হলে তাঁদেরই বা করণীয় কি? তবে পরীক্ষা-বৈতরণী পারকে যদি আমরা ছাত্রদের উপকার বলে স্বীকার করি, তবে নিশ্চয়ই ছাত্রদের যথেষ্ট উপকার করছেন।

পরিশেষে বলতে চাই এই যে, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ছাত্রদের সীমিত জ্ঞান, সাহিত্য পিপাসার অভাব এর জন্য ছাত্র সমাজ সমগ্রভাবে দায়ী নয়; বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচীর কঠোর জীবন-সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক সমস্যাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। 'বিদুর মহাশয়' এই বিষয়ের উপর সময়োচিত আলোচনা করায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নমস্কারান্তে।

বিমলেন্দু দেব
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদুর

উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র

মুনিরা জাগতিক নিয়মে পুরুষ, কোনোক্রমেই তাঁদের স্ত্রীলোক করা যায় না; অথচ জগৎ সংসারে স্ত্রীজাতির চরিত্রের অনুরূপ কোলাহল তাঁরা যত করেন—এমন কেউ না। নানা মুনির নানা মত—এটা যেমন চলতি কথা, তেমনি অতি সত্য কথা। মেয়েরা একত্রে বসুক আর পৃথক বসুক কোনো বিষয়ে একের মতামত অন্যকে জানালে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করবে। একত্রে বসে আলোচনা করলে অচিরে তা হাট হয়ে যাবে। অর্থাৎ কি না, প্রতিভা অপেক্ষা প্রতিমা, প্রতিমা অপেক্ষা নীলিমা—কেউ কারুর চেয়ে ছোট হতে রাজী নয়।

মুনিদের স্বভাবও ওই রকম। আর সবাই জানেন মুনিরা সব সময় বড়; বড় থাকতেই চান, ছোট হতে কেউ রাজী না। মহাভারত খুঁজলে এমন মুনি অনেক চোখে পড়বে।

সম্প্রতি সাহিত্যের একটি পত্রিকায় দুই মুনির বাদ প্রতিবাদ চোখে পড়ছিল। এ'রা কেমন মুনি আমার জানা নেই, বিদেশী মুনিদের অত খোঁজ কে রাখে!

তর্কের বিষয়টা কিন্তু বেশ ভালই। উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রের গঠন বাঁধা ধরা ছিমছাম হওয়া উচিত, না কি এলানো শিথিল বিক্ষিপ্ত স্বপ্নের মতন অর্থহীন হলে ভাল হয়—এই নিয়ে তর্ক। বলছি অবশ্য তর্ক, কিন্তু তর্ক না বলে বলা উচিত দু-জনের অভিমত।

একজন বলছেন, উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্রের গঠন হবে হিসেব মতন। বেহিসেবী কারবার উপন্যাসকে সব সময় মাটি করে দেয়।

অন্যজন বলছেন, যে-উপন্যাসের কাহিনী আগে থেকে ছক করে কেটে নেওয়া হয়েছে, যার চরিত্রগুলি একবারে ইঞ্চি মাপা সে-উপন্যাস কখনো ভাল উপন্যাস হতে পারে না। কেননা পূর্ব-নির্ধারিত ষড়যন্ত্রের ফলে লেখক কাহিনী এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের মতন ব্যবহার করবেন।

ভিন্ন দুই মতের মুনিদের তর্ক-বিতর্ক এবার নিম্নরূপে লেখা যেতে পারে:

ক-মুনি। বিশ্বসংসারে সব গল্পই পূর্ব-পরিকল্পিত এবং গঠিত।

খ-মুনি। বিশ্বসংসারটাই যা পরিকল্পনা না করেই গঠিত হয়েছে।

ক। আপনি তবে কোনো রকম পূর্ব-চিন্তা বিশ্বাস করেন না?

খ। সব সময় নয়।

ক। দেখুন, একটা উপন্যাস লিখতে বসে লেখক যদি আগে থেকে সব ভেবে চিন্তে না নেয় তবে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে। আপনি কি মনে করেন না, কম্পাস না থাকলে নাবিকের পক্ষে জাহাজ ঠিক জায়গায় নিয়ে যাওয়া অসম্ভব?

খ। কম্পাস বলতে এখানে আমি বুঝি লেখকের বক্তব্য।

ক। তাই বুঝুন। ধরুন কোনো লেখকের বক্তব্য, যৌবন মানুষকে প্রতারিত করে। যদি এই বক্তব্য তিনি উপন্যাসে প্রকাশ করতে চান তবে কি তাঁকে একটি সুপরি-কল্পিত কাহিনী, সঙ্গত চরিত্র আগে থেকে ভেবে নিতে হবে না?

খ। আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি। জগতে একমাত্র 'ক্রসওয়ার্ড' পাজলের খেলায় আগে ছকের জবাব ঠিক করে নিয়ে পরে ধাঁধা সাজানো হয়। ডিটেকটিভ উপন্যাসেও হয়। কিন্তু ভাল উপন্যাসে এ-ধরনের পূর্ব-নির্ধারিত জবাব ঠিক করে রাখা উচিত না।

ক। রাস্তা না জানা থাকলে মানুষ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। অনেক ভাল লেখা একমাত্র এই কারণে নষ্ট হয়েছে।

খ। অনেক ভাল লেখা আবার লেখকের পূর্ব-সিদ্ধান্ত বা স্বৈরাচারের জন্যে নষ্ট হয়েছে। উদাহরণ দেব?

ক। প্রয়োজন নেই। আমরা দুজনেই নিজেদের মতকে কিছুর উদাহরণ দিতে পারব। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্র যদি না আগে থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভেবে রাখা যায়—তবে কি করে একজন লেখক তাঁর বক্তব্য দাঁড়িয়ে করতে পারেন?

খ। আমার মনে হয় এ-ব্যাপারে আমাদের উচিত দুটি জিনিস স্বীকার করা।

ক। কি কি জিনিস?

খ। 'সঙ্গত' শব্দটি আপনি আগে ব্যবহার করেছেন বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমিও ওই শব্দটি ব্যবহার করতে চাই। আপনি যাকে পূর্ব পরিকল্পিত গঠন বলছেন, আমার মনে হয় তাকে আমাদের বলা উচিত 'লজিক্যাল স্ট্রাকচার' অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত স্বাভাবিক সঙ্গত বিন্যাস। এই বিন্যাস যত বেশী সঙ্গত হবে তত সুগঠিত ও জীবন্ত বলে মনে হবে। জর্জ এলিয়েট .

ক। হ্যাঁ। উনি এ-বিষয়ে খুব পটু ছিলেন।

খ। কিন্তু আমরা হেনরি জেমস-এর কথা মনে রাখব। জেমস চেয়েছিলেন জর্জ এলিয়েটের মতন সুসংবদ্ধ পরিচ্ছন্ন স্ট্রাকচার', আর চেয়েছিলেন টুর্গেনিভের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা যেমন তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিতেই একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, কাহিনীকে গঠন করে নেয় তেমন করেই চরিত্ররা তাদের পরিণতির দিকে এগিয়ে যাক্। জোর করে লেখকের শাসন চাপানো মানে সেই চরিত্রের মৃত্যু।

ক। কথাটা মন্দ বলেন নি। কিন্তু মুশকিল কি জানেন চরিত্রের অন্তর খুঁজে তার গুণাগুণ ক্রমশ আবিষ্কার এবং সেই গুণাগুণের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে একটি চরিত্রকে এবং কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন। আপনি ভুলে যাবেন না চরিত্রের নিয়তি যদি তার অন্তরের গুণাগুণের ওপর এবং অন্যান্য ঘটনার সংঘাতের ওপরই নির্ভর করে তবে বেশীর ভাগ সময়েই এই চরিত্রগুলি মানুষের জীবনের মতন অনির্দিষ্ট এবং অজ্ঞেয় পথে ছুটে যেতে পারে। এরা যে কোনো সময় ফুরিয়ে যেতে পারে চরিত্রে অসম্পূর্ণতা এসে যাবে। এদের কি হবে লেখকও যেমন জানতে পারেন না—পাঠকও তাই।

এই ধরনের কথা-কাটাকাটি দীর্ঘ সময় হয়ত চলতে পারে। কখনও দেখা যাবে এরা যেন জংশন-স্টেশনের মুখে এসে রেল-লাইনের মতন একে অন্যের সঙ্গে মিলে যেতে বসেছেন, আবার সামান্য পরেই তফাত তফাত, দুজনে ব্যবধান রেখে সমানে ছুটছেন।

মনে হয় না এ-সব তর্কের কোনো শেষ আছে। মনে হয় না, একের মতামত অন্যে স্বীকার করে নেবেন। যেমন হেনরি জেমস-এর কথাই ধরা যাক। জেমসকে ঠিক যে-কারণে একজন অত সুখ্যাতি করলেন, অন্য এক বৃটিশ সমালোচক মোটেই তা স্বীকার করবেন না। তাঁর কথা, জেমস-এর মতন সচেতন হয়ে উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব তৈরি করে উপন্যাস লিখতে বসলে সেটা লেখকের পরিকল্পিত পরিণতিতে গিয়েই পৌঁছুবে। এবং ফরস্টার যা বলেছেন—"All that is prearranged is false—." এটাই সত্য।

অবশ্য এ-থেকে এমন যেন কেউ না মনে করেন, জেমসকে নিন্দা করাই উক্ত সমালোচকের উদ্দেশ্য। তাঁর বক্তব্য—ফ্লবেয়ার এবং জেমস-এর মতন লেখকেরা উপন্যাসের দীর্ঘ প্রবাহপথে এক-একটি শাখা নদী। প্রথম প্রথম মনে হয় এঁদের লেখাই বুঝি উপন্যাসের জগতে শেষ কথা, পরে বোঝা যায়—উপন্যাসের মূল ধারার মধ্যে এঁরা মিশে গেছেন, এঁদের কোনো কোনো বিশেষ গুণ বরাবরের মতন সর্বশ্রেণীর উপন্যাস লেখকদের জন্যেই শেষাবধি থেকে যায়।

ভ্রম সংশোধন

গতবার নজরুল-প্রসঙ্গ লেখাটিতে একটি ভুল হয়েছে। তাঁর একটি গানের চরণ আমি ভুল ভাবে লিখেছি। শুদ্ধ চরণটি এই রকম: "মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর— !"

রোজপেয়ার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT
SOAP
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্ধবে ফরসা কাপড় !
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন...

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস : দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

বনপলাশির পদাবলী। রমাপদ চৌধুরী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা—৯। আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

এই দীর্ঘ কিন্তু সুলিখিত উপন্যাসটি নানা কারণে পাঠকের বিশেষ অবধান দাবি করে, যেহেতু এই উপন্যাসটি রমাপদ চৌধুরীর সমস্ত রচনার ভিতর একটি নতুন দিকচিহ্ন—কেননা ধীরে ধীরে চোখের সামনে আমরা বনপলাশিকে কোনো বৃহত্তর ও গভীরতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখি—মনে হয় এই বনপলাশি ক্রমশ সমস্ত গণ্ডি অতিক্রম করে এমন এক বৃহৎ ভূখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেলো যেখানে মানুষের হিংসা দ্বেষ ভালোবাসা ক্ষুদ্রতা স্বার্থান্বেষণ ত্যাগ ও আদর্শ পরমজটিল ও রহস্যময় টানাপোড়েনে প্রাণ পেয়ে উঠে চিরকালকে স্পর্শ করে এলো। চিরন্তনের স্পর্শ-পাওয়া বিরল জাতের একটি বই। আয়তনই একমাত্র প্রমাণ নয়, এই উপন্যাসটি যে উচ্চাভিলাষী, তার প্রমাণ তার গঠনও। আর অদ্ভুত এর নায়ক, স্মরণীয় ও উদ্দীপক। কী বলবো আমরা গিরিজাপ্রসাদকে। শিল্পী—কেননা তিনি নতুন করে গড়তে চাচ্ছিলেন? যথার্থ ভালোমানুষ—কেননা তাঁর আদর্শ তাঁকে সমস্ত প্রতিরোধ ও দ্বন্দ্বের মধ্যেও অটুট রেখেছে? না কি ব্যর্থ পরাজিত ও অক্ষম—মানুষের [illegible] ও আদর্শের শোচনীয় পরাজয়ের প্রতীক? ব্যর্থ এই জন্য যে চেষ্টা করেও সকলের [illegible] [illegible] [illegible] কোনোটাকেই [illegible] [illegible] [illegible] অন্নদা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সবই তাঁর পরিচয়। আর [illegible] [illegible] বিষাদের সুর এমন [illegible] [illegible] [illegible] বহমান যা সমস্ত [illegible] রক্তপাত ও চোরাটানকে এক মহীয়ান মর্যাদা দিয়েছে।

এই উপন্যাসটি যে হেলাফেলার যোগ্য নয় বরং কোনো দীর্ঘ গীতিকাব্যের অনুষঙ্গবাহী এ-কথাটি এখানে স্পষ্ট করে বলা ভালো।

ছিলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক চরিত্র—হোসেন মিঞা শয়তান ও শিল্পী পদ্মা নদীর মাঝির জটিলতম ব্যক্তিত্ব। বনপলাশির পদাবলীর নায়কের অস্মিতার সঙ্গে তার তুলনা ও প্রতিতুলনা যে-কোনো সচেতন পাঠকের কাছেই অনস্বীকার্য বলে বোধ হবে। এই দুই বিপরীত চরিত্র—মেরুপ্রতিম ব্যবধান তাদের মধ্যে—দুই লেখকেরই মনোভঙ্গির পরিচায়ক। হোসেন মিঞার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র এবং তার উল্লাস, আর গিরিজাপ্রসাদের অভিপ্রায় ও আদর্শ এবং তার বিষাদ—হয়তো শেষ পর্যন্ত একই অন্ধকার, ব্যর্থ ও গোপন ভূখণ্ডে আলো ফেলে ও সংকেতের বিচ্ছুরণ ছড়ায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে-কালে শুষ্ক নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন, রমাপদ চৌধুরী সেকালে বিষণ্ণ স্নেহশীল ও আপ্লুত; আর এই বিষাদই সম্ভবত মূল সুর যা এই উপন্যাসটিকে গীতিকাব্যের সমধর্মী করেছে। এবং কবিতা দ্বারা আক্রান্ত বলেই মনে হয় পাঠকের মনে এর ছাপ দীর্ঘকাল ধরে থেকে যাবে। রমাপদ চৌধুরীর ভাষার সহজ লাবণ্য ও স্বতঃস্ফূর্ত গতি হয়তো এর আরেকটি প্রশংসনীয় কারণ যার জন্য এ-বই এমন দাগ কাটে।

মুদ্রণ পারিপাট্য ও সৌষ্ঠবের জন্য প্রকাশক সাধুবাদ পাবেন। ৬০৮।৬২

জয়নাল্ত। সমরেশ বসু। কথাকলি। ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৯। দাম ছ-টাকা পঞ্চাশ।

সমরেশ বসুর এই নতুন উপন্যাসটি আবারও তাঁর তারুণ্য ও স্পর্ধাকে নতুনভাবে প্রমাণ করে দিল। উদ্‌ভ্রান্ত ও লক্ষ্যহীনদের

এই সারির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে এক অনড় ও অবিচল কারাগার ও বধ্যভূমি এবং সেইজন্যই কোনো তীব্র স্পর্শবোধে ও হাহাকারে এই বইটির আদ্যোপান্তমুখরিত। চিন্ময় এই উপন্যাসটির মধ্যে ঘটনা ও সংঘাতের তীব্র সমাবেশ এমন একটি অদ্ভুত আবর্ত ও গতির সৃষ্টি করেছে, যা নানা কারণে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। হতাশ প্রতিরোধের এই আরব্ধ কাহিনীটি প্রথম মুহূর্ত থেকেই সংকটের সম্মুখীন হয়ে আছে, কিন্তু যেটা উল্লেখযোগ্য তা এই যে কোথাও তা তুঙ্গ চূড়া থেকে নিচে পা ফসকে পড়ে যায়নি। এই বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের ভিতরে মানুষের মনের ভিতরে আলো এসে পড়েছে দূর থেকে, যেন হাতড়ে জানতে চাচ্ছে দেখতে চাচ্ছে কোথায় কী আছে। এই তীব্র সন্ধান ও ময়না তদন্ত গড়ে উঠেছে পরিণামনিরাশ এক প্রেমের উপর—বালির স্তম্ভের মতো ঘুরে-ঘুরে যা ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। প্রেমের অতৃপ্তি ও ক্ষুধা, জীবনের শূন্যতা ও বিপর্যস্ত নির্মম নিয়তি-চেতনা ও যন্ত্রণা—এই সবের ভয়ংকর ও প্রচণ্ড সমাবেশের মধ্য থেকে তাই নরনারী-দের হাহাকার ও কাতর চীৎকার, তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। ইপ্সিতময় বইটির নামকরণ, কেননা অন্তিম মুহূর্তের ভীষণ ছায়াও আবছায়া বইটিকে আগাগোড়া এমন-একটি তীব্র রহস্য ও প্রহেলিকায় ঢেকে রেখেছে, জটিল ও তপ্ত কোনো কবিতা ছাড়া যার অন্য কোনো তুলনা হয় না—অরনান্ত ছাড়া আর কোনো নামে যাকে সম্ভাষণ করা অসম্ভব। আশা করি, বইটি আদৃত হবে।

১০।৬৩

বিদেশী সাহিত্য

Vagabonds : নুট হামসুন। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি। ১৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য আট টাকা।

'নুট হামসুন' এই নামটির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক শুধু একস্তর ও ছিন্নমূল নয়, একদা 'কল্লোল'-এর কালে তৎকালীন তরুণদের উপর তাঁর দূরস্পর্শী প্রভাব পরবর্তীকালেও ক্রিয়াশীল হয়েছিল। আর যদি সামগ্রিকভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যের কথা মনে করা যায়, তাহলে তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক আরো দূরস্পর্শী ও বহুস্তর বলে মানা না-করে উপায় থাকে না। হান্স অ্যাণ্ডেরসেন, হেনরিক ইবসেন, সেলমা লাগেরলোফ, ইয়োহান বোয়ের, পার লাগেরকভিস্ট এমনি কয়েকটি নাম উজ্জ্বল তারার মতো সারি-সারি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। এঁদের সঙ্গে যেমন, তেমনি নুট হামসুনের সঙ্গেও একদা আমাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। 'কল্লোল'-এ বেরিয়েছিল অচিন্ত্যকুমার-কৃত 'প্যান'-এর তর্জমা 'মীনকেতন'; তাঁর অন্য অনেক বইও পর-বর্তীকালে অনূদিত হয়েছিল বাংলায়, এমন কি এই 'ভ্যাগাবণ্ডস' সম্বন্ধে। কাজেই কলকাতায় ইংরেজী অনুবাদে এই বইটির নতুন প্রকাশে অনেকেরই নতুন ক'রে সেই পুরোনো দিনগুলিকে মনে প'ড়ে যাবে—অনেকেই নতুন ক'রে 'কল্লোল'-কালীন লেখকদের কথকতায় এই সংক্রামক লেখকটির স্পর্শ ও প্রভাব লক্ষ ক'রে চিন্তার কিছু-কিছু সূত্রও পেয়ে যাবেন। হামসুনের 'ক্ষুধা', 'মৃত্তিকার বিকাশ', 'মীনকেতন' এবং এই বইটিও বটে—সমস্তই অল্পবিস্তর আত্মজৈবনিক, কিন্তু তাদের পটভূমিকার উপর আলোছায়া ফেলেছে মধ্যরাতের সূর্য, দীর্ঘ উজ্জ্বল ইয়ুক্যালিপ্টাস ও বার্চগাছ, সমুদ্রের উপরকার কুয়াশা, আর স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ার সেই জগৎবিখ্যাত গ্রীষ্মপ্রদোষ। স্পর্শবোধে ভারাতুর এই সব বই, টোমাস মান একদা যাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার তরুণ চেতনায় হামসুনের বই কোন অর্থ বহন করে এনেছিলো তা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না; সম্ভবত নোবেল পুরস্কার এর আগে তাঁর চেয়ে যোগ্য কোনো লোক পান নি।' শেষ পঙ্‌ক্তিটিকে যদি অতিশয়োক্তি বলেও মনে হয়, তবু এই মন্তব্যের সমস্ত মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এক তিলও যে কমে না, এই কথাটিই এখানে লক্ষ করার।

নরোয়ের এক জেলে-গ্রামের সরল ও আদিম লোকদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এই তীব্র ও থরোথরো উপন্যাস; মানব প্রকৃতির মৌল রূপ প্রকাশ পেয়েছে এই বইয়ের নর-নারীদের মধ্য দিয়ে—প্রকাশ পেয়েছে মানুষের রক্তমাংস, ভালোমন্দ সং অসং পাপপুণ্য তার হৃৎপিণ্ড ও তার সর্বাঙ্গ, অর্থাৎ যেন মানুষ নামক প্রাণীর নির্যাস ছড়িয়ে আছে উপন্যাসটির আদ্যোপান্ত। এক দিকে আছে এডফার্ট—সরলতার প্রতি-মূর্তি, জ্বলন্ত শিখার মতো শুদ্ধ ও সং, হৃদয়ের প্রাচুর্যে যে ধনী; অন্য দিকে—তারই প্রতিতুলনার জন্য আছে অগাস্ত শিক্ষিত, এবং শিক্ষিত বলেই বিনষ্ট কৃত্রিম, মেধাবী, বুদ্ধিমান, লম্বা-লম্বা গল্প আওড়ায় প্রতিমুহূর্তে। আদিম মানুষের এই জীবন-যাত্রার উপর ছায়া ফেলেছে অরোরা বোরিয়ালিস: ক্ষীণ, রক্ত, ক্ষুধা এই সবের মধ্য দিয়ে চলেছে এই জেলেরা—কেউ হেরে গিয়ে মুষড়ে গেল, কেউ বা ভাঙল তবু মচকালো না; আর চিরকালের এই জীবন-নাট্যের অন্তরাল থেকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে শেষ-সূর্যের দীর্ঘ রক্তাভা—দীর্ঘ-স্থায়ী বিষণ্ণ, উদাস, ভারাতুর; স্পর্শময় ও সংক্রামক।

৭০।৬৩

শ্রী শান্তারাম প্রযোজিত রাজকমল কলামন্দিরের "পলাতক" (পরিচালনা: যাত্রিক) ছবিতে রুমা গুহঠাকুরতা
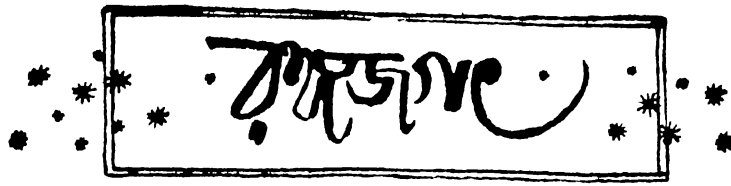
চলচ্চিত্র—শিল্প? না, জীবিকা?

সম্প্রতি বি-এফ-জে-এ'র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে জেমিনীর শ্রী এস এস ভাসান তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, চলচ্চিত্রকে ব্যবসায়িক অর্থে 'শিল্প' অর্থাৎ 'ইনডাস্ট্রি' নামে অভিহিত করা চলে না। তাঁর মতে, আর সব শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট বিক্রয়-মূল্য থাকে। চলচ্চিত্রের স্পষ্ট উৎপাদন-মূল্য হয়ত আছে, কিন্তু তার বিক্রয়-মূল্য অস্পষ্ট, অনিশ্চিত। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কলাফলটি ভবিতব্যের মতই দুর্জ্ঞেয়।

চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক ভবিষ্যৎ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে নিহিত বলেই শ্রীভাসান যাকে ইনডাস্ট্রি আখ্যা দিতে রাজী নন। তাঁর মতে, চলচ্চিত্র বহুজনের জীবিকা মাত্র। শ্রীভাসানের যুক্তি হয়ত এই ছায়াছবির বেচাকেনা চলে ভাগ্যের হাতে। ছায়াছবির ব্যবসা যেন ভাগ্যের সংগে লড়াই। এই পণ্যদ্রব্যটি কী দামে বিকোবে তা বিক্রেতার অজ্ঞাত। অতএব ব্যবহারিক অর্থে যাকে আমরা "ফিল্ম ইনডাস্ট্রি" বলি, আসলে তা বহুজনের "ফিল্ম প্রোফেসন"।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, চলচ্চিত্রের কোন সুনির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য নেই। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ, লোকরঞ্জন-ক্ষমতার উপরই চলচ্চিত্রের বিক্রয়-মূল্য নির্ভর করে। অন্য কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের সংগে চলচ্চিত্রের তুলনা চলে না। কিন্তু বহু পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ ও বহুজনের শ্রমের ভিত্তিতে চলচ্চিত্র নামক যে পণ্যবস্তুটি উৎপন্ন হচ্ছে, তার সুনির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য না থাকলেও তার খদ্দেরের সংখ্যা কম নয়। তাঁদের চাহিদা মেটাবার জন্যই এত অর্থ-ব্যয়, এত শ্রম। এই বিরাট ব্যবসায়-কর্মকাণ্ড ইনডাস্ট্রি নামে অভিহিত হল, না জীবিকা নামে—সেটা আজ বড় কথা নয়। চলচ্চিত্রের ব্যবসায়-সংকটই আজ বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেলে সংজ্ঞার বিভ্রাট আপনিই চলে যাবে।

'উইণ্টার লাইট': বার্গম্যান-এর নতুন ছবি

বিখ্যাত সুইডিশ চিত্রপরিচালক ইঙমার বার্গম্যান-এর নতুন ছবির নাম "উইণ্টার লাইট"। আণবিক যুদ্ধ নিয়ে এ যুগের মানুষের আতঙ্ক, এবং ভগবানে বিশ্বাস হারানোর ভয় "উইণ্টার লাইট"-এর ভাব-কেন্দ্রবিন্দু।

একটি গির্জার পটভূমিতে মাত্র চারটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে বার্গম্যান তাঁর ছবির কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

একজন খৃষ্টীয় যাজক ছবির প্রধান পুরুষ। ভগবানে তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন। আত্মবিশ্বাসও। যাজকের ধারণা, মানুষ-

রূপায়ণ চিত্রের 'দেয়া-নেয়া' ছবির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য বোম্বাই থেকে এসেছেন তনুজা—(বাঁদিকে) ক্যামেরা এসো-সোর্ট চিত্রপরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, তনুজা ও চিত্রপ্রযোজক শ্যামল মিত্র (ডানদিকে) ... ফটো—...

ধর্মিণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অনাগতও মৃত্যু ঘটেছে। এই

মানসিক ক্লেশের মুহূর্তে জনৈকা শিকারিণীর স্নেহ ও [illegible] তাকে উত্তেজিত [illegible] তোলে। অপর [illegible] এক ধীবর [illegible]

সদা [illegible]। তাকে [illegible] দেবার শক্তি যজমানের নেই। নৈরাশ্যের তীব্র যন্ত্রণায় ধীবর আত্মহত্যা করে। ধীবরের আত্মহত্যা যজমানের মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে। অবসাদ ও বিষাদের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

মননশীলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে বার্গম্যানের এই সর্বাধুনিক ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবিটি সম্পর্কে বার্গম্যান বলেছেন, "আমার একটি স্বপ্ন ছিল, এবং আমি ভেবেছিলাম, অন্য লোকের কাছেও তার মূল্য থাকবে। এজন্যই ছবির কাহিনী রচনা করেছি, এবং ছবিটি তৈরি করেছি। আপনাদের ভাব ও চিন্তার সঙ্গে আমার স্বপ্নের ঐকতান যখন গড়ে উঠবে, ছবি থেকে আমার ছায়া তখন আপনিই সরে যাবে।"

সুকল্যাণের চিত্র মেঘকন্যা এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। অনীতা ও মহীপাল ছবির প্রধান শিল্পী। এস এম ত্রিপাঠী পরিচালক ও সংগীত পরিচালক।

এ ছাড়া মুক্তি পাচ্ছে শক্তি সামন্ত পরিচালিত এক রাজ (এ জি ফিল্মস)।

• চিত্র-সমালোচনা •

ভ্রান্তি প্রহসন

অভিনেতা এবং প্রযোজক—এই উভয় ভূমিকায় সমান জনপ্রিয়তা অর্জনের রাজযোটক যোগ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম চিত্রোপহার "ভ্রান্তিবিলাস" দেখার পর বলতে পারি, উত্তমকুমার এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী।

চিত্রপ্রযোজক হিসাবে জনপ্রিয় হওয়া খুব সহজ নয়। এর জন্য চাই দূরদর্শিতা। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে শেকস্‌পীয়রের "কমেডি অব এরর্‌স"-এর ভিত্তিতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "ভ্রান্তিবিলাস" রচনা করেছিলেন। এতকাল এই রসোত্তীর্ণ

আন্দ্ মুক্তিপ্রতীক্ষিত বি আর ফিল্মস-এর "ধুন্ধ" (প্রযোজনা-পরিচালক : বি আর চোপরা) ছবিতে মালা সিংহ

প্রতি কোন চিত্রনির্মাতার নজর পড়েনি। কেউ বুঝতে পারেননি, "ভ্রান্তিবিলাস" অবলম্বনে একটি সুখভোগ্য কমেডি ছবি তৈরি হতে পারে। উত্তমকুমার তা বুঝেছিলেন। এই সুবিবেচনার সুফল তাঁর প্রাপ্য।

কৌতুক-কাহিনীতে অঘটনই ঘটনা। বাস্তবের অভিজ্ঞতা দিয়ে তার সব ঘটনার বিচার চলে না। যুক্তির অনধিকার চর্চা এ-ক্ষেত্রে শুধু রসভঙ্গই ঘটাতে পারে। "ভ্রান্তি-বিলাস"-এর কাহিনী সম্পর্কেও এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য।

দুই ব্যক্তির চেহারার অবিকল সাদৃশ্যকে কেন্দ্র করে ভ্রান্তিপ্রহসন যত সহজে গড়ে ওঠে ততটা বুঝি আর অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। "ভ্রান্তিবিলাস"-এর কৌতুক-রসের উৎস ওই একই উপকরণ—চেহারাগত সাদৃশ্য। এই কাহিনীতে দুই নায়ক দেখতে অবিকল একরকম, ওদের পরস্পরের দুই ভৃত্যও তাই। একই স্থানে অল্পকালের জন্য এই চার ব্যক্তির উপস্থিতিকে ঘিরেই কাহিনীর ভ্রান্তিবিভ্রাট। অন্তঃপুর-বাসিনীরাও এই ভ্রান্তিচক্রের হাত থেকে রেহাই পায় না। ভ্রান্তিবিপর্যয় বিবাহিত নায়কের অন্দরমহলে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছয় এবং তার স্ত্রী ও অবিবাহিতা শালিকাকে ভ্রান্তির গোলকধাঁধায় দিশেহারা করে তোলে। ভাগ্যদেবী যে অনেক সময় মানুষের ভ্রান্তিকে আশ্রয় করেই নিজের সৃষ্টি সম্পূর্ণ করে তোলেন তার প্রমাণ মেলে কাহিনীর সুখপরিণতিতে। ভ্রান্তিপর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের জীবনের শূন্য স্থান পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ছায়াছবিতে বিদ্যাসাগরের রচনার স্থান-কাল এবং পাত্র-পাত্রীর পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাই বলে মূল কাহিনীর রস থেকে চিত্রনাট্যের বিচ্যুতি ঘটেনি। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের মুহুর্মুহু হাস্যরোলই তার প্রমাণ। ছবির নানা কৌতুকপ্রদ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার কালে দর্শকরা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়েন।

কমেডি ছবি হিসাবে "ভ্রান্তিবিলাস" দর্শকদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতার সুখ-স্বাদ এনে দেবে। এতে হাসির উপকরণের সঙ্গে সাসপেন্স-এর উপাদান স্বাভাবিক-ভাবে মিশে গিয়েছে। এই দুয়ের যোগ-ফলে ছবিটিতে এসেছে আমোদের উপরি-পাওনা। তা ছাড়া প্রণয় এবং মেলোড্রামার আস্বাদও রয়েছে ছবিটিতে।

ছবির রূপসজ্জের প্রভাবে দুই উত্তম ও দুই ভানুকে দেখার অবকাশও দর্শকরা এর আগে পাননি। দুই দ্বৈত ভূমিকায় এই দুই শিল্পীকে নিয়ে রূপসৃষ্টির অনায়াস ক্ষমতা দেখিয়েছেন পরিচালক মানু সেন। দুটি দ্বৈত-ভূমিকায় চারটি চরিত্রকে নিয়ে কৌতুক পরিবেশন করতে গেলে যে সচেতন ও সতর্ক প্রয়োগ-বুদ্ধির প্রয়োজন, চিত্র-পরিচালক ছবিতে তার প্রমাণ রেখেছেন। অবশ্য এই সাফল্যের মূলে চিত্রনাট্যকার-সংলাপরচয়িতা বিধায়ক ভট্টাচার্যের দানও কম নয়।

তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, চিত্রনাট্যটি সর্বাঙ্গীণভাবে আরও সুগ্রথিত হতে পারত। চিত্রকাহিনীর বিন্যাসও সামগ্রিকভাবে আশানুরূপ সুসংবদ্ধ নয়। মেলার দৃশ্যটি ছবিতে অকারণে দীর্ঘায়িত। পুতুলনাচের দৃশ্যটি অবান্তর হয়ে রয়েছে। ছবির প্রয়োগ-কর্ম কোন কোন অংশে খুবই মামুলী। তা না হলে নায়িকার অসুস্থ কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটি গান গেয়ে ফেলত না। এবং একটি আসন্ন জীবন মুখোজ্জ্বলিকা স্বরূপ পরপুরুষে অহল্যার পতিত্যের উপাখ্যানও আমাদের শুনতে হত না। যুক্তির মাপকাঠিতে কমেডি ছবির বিচার চলে না। ছবির অসামান্য জনপ্রিয়তা তাই উপেক্ষণীয়।

ছোটখাটো এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছবির আমোদ-উপকরণ সম্ভোগে বাধা সৃষ্টি করে না। দর্শকের চিত্তবিনোদন কমেডি ছবির

হলো লক্ষ্য। লক্ষ্যভেদে ছবিটি সফল হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব পরিচালক মানু সেনের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লঘু উপাদান-নির্ভর হলেও "ভ্রান্তিবিলাস" তথাকথিত কমেডি ছবির পর্যায়ভুক্ত নয়। বিদ্যাসাগরের রচনার ভিত্তিতে তৈরি এ ছবির এমন একটি কাহিনীগত কৌলিন্য রয়েছে যা সাধারণ কমেডি ছবিতে দুর্লভ। ছবির এই গুণগত বৈশিষ্ট্য দর্শকমনে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রধান শিল্পীদের অভিনয় ছবিটিকে বহু পরিমাণে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। ছবির দুই নায়ক চিরজীব ও চিরঞ্জিতের দ্বৈত-ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দুটি চরিত্রের বিপরীত মানসিকতা ও সমস্যা এবং তাদের বিড়ম্বনা ও বিভ্রান্তি তিনি তাঁর অভিনয়ে নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। কৌতুক সৃষ্টির স্বচ্ছন্দ ক্ষমতাও তিনি এ ছবিতে দেখিয়েছেন।

চিরজীবের স্ত্রীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অত্যাশ্চর্য সুন্দর অভিনয় ছবিটির এক বিশেষ সম্পদ। এমন সাবলীল ও স্বাভাবিকরূপে তিনি অভিনীত চরিত্রের বিস্ময় ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন যে দেখে বিস্মিত হতে হয়। শিল্পীর কৌতুকাভিনয় লক্ষণীয়।

রূপনিকেতনের 'শেষ প্রহর' (পরিচালনা : প্রান্তিক) ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর

দুই ভৃত্যের দ্বৈত-চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও চমৎকার অভিনয় করেছেন। শুধু কৌতুক পরিবেশনেই নয়, চরিত্রাভিনয়েও তিনি সহজেই দর্শকের মন জয় করে নেন।

চিরঞ্জীবের শালিকার রূপসজ্জায় সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় স্বচ্ছন্দ, চরিত্রোচিত। ছায়া দেবী ও সবিতা বসু ছবির দুটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। তাঁরা সুঅভিনয় করেছেন। লীলাবতীর (করালী) অভিনয় প্রশংসনীয়।

এক স্বর্ণকারের ভূমিকায় বিধায়ক ভট্টাচার্য মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন। একটি [illegible] চরিত্রে তরুণকুমার অল্পক্ষণের জন্য দেখা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের মন জয় করে নেন। অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন অজিত চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, তমাল লাহিড়ী, রতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি রায়চৌধুরী।

ছবির টাইটেল-মিউজিক রচনায় সংগীত-পরিচালক শ্যামল মিত্র কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য মুহূর্তের এফেক্ট মিউজিক ছবির কৌতুক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। গানের সুরারোপ সুন্দর। কিন্তু গানগুলি সুপ্রযুক্ত নয় বলে মনে দাগ কাটে না।

আলোকচিত্র পরিচালনায় এবং চিত্রগ্রহণে প্রশংসনীয় কৃতকার্যতা দেখিয়েছেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা। সম্পাদনা (হরিদাস মহলানবীশ), বহির্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ (সুজিত সরকার) অন্তর্দৃশ্যে শব্দগ্রহণ

(নৃপেন পাল) এবং শিল্পনির্দেশনা (সুনীল সরকার) সন্তোষজনক।

পলাতক

ভি শান্তারাম প্রযোজিত রাজকমল কলামন্দিরের প্রথম বাংলা ছবি "পলাতক"-এর চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার কাজ শেষ হযে গেছে। ছবিটি অবিলম্বে কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। এক ছন্নছাড়া ভবঘুরের কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে "পলাতক"।

মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনুপকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, রমা গুহঠাকুরতা, জহর রায়, জহর গাঙ্গুলী, অসিতবরন, ভারতী দেবী, রবি ঘোষ, হরিধন, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা গুপ্ত ও অন্যান্য বহু শিল্পী।

মনোজ বসু রচিত মূল কাহিনী অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন যাত্রিক। সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জীবনকাহিনী

প্রযোজক-পরিচালক রাজেন তরফদারের "রৌদ্ররেখা" ছবির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন নাম হল : "জীবনকাহিনী"। অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায় বিকাশ রায়, তরুণকুমার, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। প্রবীর মজুমদার সংগীত পরিচালক।

বেদান্ত ভেনচার্স-এর "ধরমপত্নী" হিন্দী ছবির সেটে আলোকচিত্রশিল্পী শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ও অনুরাধা গুহ

প্রেয়সী

রাধারানী পিকচারের "প্রেয়সী"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত। সুবোধ ঘোষের এই জনপ্রিয় উপন্যাসের চিত্ররূপটি পরিচালনা করেছেন শ্যাম চক্রবর্তী। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী, পদ্মা দেবী, ভারতী দেবী, বিনতা রায় দীপিকা দাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরন, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার এবং সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই)। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

কালস্রোত

বি কে প্রোডাকশন-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য "কালস্রোত"-এর চিত্রগ্রহণ নিয়মিত এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমিতে ছবির কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে ফিরে এসেছেন। বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, অসিতবরন বিকাশ রায় সন্ধ্যারানী, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, রুপাতী ঘোষ, ভারতী দেবী রবীন মজুমদার ও পাহাড়ী সান্যাল। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

ইভা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠানের "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ"-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য ছবির পরিচালক মধু বসু তাঁর ইউনিট সহ দক্ষিণ ভারত অভিমুখে রওনা হয়েছেন।

বি কে প্রোডাকশন্স-এর 'কালস্রোত' (পরিচালনা : সুশীল মজুমদার) ছবিতে সুমিতা সান্যাল ও ললিতা চট্টোপাধ্যায়

নামভূমিকার শিল্পী অমরেশ দাসকে নিয়ে ত্রিবান্দ্রম মাদ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর ও কন্যাকুমারিকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হবে। "বীরেশ্বর বিবেকানন্দ" ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে রূপদান করছেন জহর গাঙ্গুলী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাংশু বসু, জীবন ঘোষ, বুদ্ধ গাঙ্গুলী, চিত্ত ঘোষাল ও মলিনা দেবী। সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বাগচী।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে : "সাত পাকে বাঁধা"

আর ডি বনসাল প্রযোজিত এবং অজয় কর পরিচালিত "সাত পাকে বাঁধা" ছবিটি আসন্ন মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিযোগী চিত্র হিসেবে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

ইণ্ডিয়ান রিভাইভাল গ্রুপের নৃত্যানুষ্ঠান

দি ইণ্ডিয়ান রিভাইভাল গ্রুপের শিল্পীরা তাঁদের চতুর্থ বিদেশ-সফরের পূর্বে গত রবিবার রঙ্গি প্রেক্ষাগৃহে একটি চিত্তাকর্ষক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের নাম ছিল "রীদম অ্যাণ্ড মেলডি"। ঘোষ সুন্দর এই নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলা দেশের শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য অনুষ্ঠানের প্রধান কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। নৃত্যের সঙ্গে ওই সব অঞ্চলের সংগীতও পরিবেশিত হয়। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি "ব্যালে" ওই সঙ্গে পরিবেশন করা হয়। এই সব নৃত্যাংশে কথাকলি ও অন্যান্য প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। "দেশের ডাক" নামে একটি দেশাত্মবোধক নৃত্যাংশ দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। চীনের ভারত-আক্রমণের পর দেশবাসীর মনে প্রতিরোধের যে দৃঢ় সংকল্প জেগে উঠেছে, এতে তাই প্রতিফলিত। শিল্পীদের নৃত্যছন্দ, কমনীয় দেহভঙ্গি এবং রূপসজ্জা দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রিভাইভাল গ্রুপ এই মনোরম নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন

করে কলকাতার রসিকজনের অভিনন্দন লাভ করেন।

বিশ্বরূপায় গুণী-সংবর্ধনা

৭ই জুন বিশ্বরূপা থিয়েটার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করছে। এই উপলক্ষে ৮ই জুন বিশ্বরূপা থিয়েটারে রঙ্গালয়ের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। উৎসবে গতবারের মত এবারেও তিনজন গুণীকে সংবর্ধনা জানানো হবে। এঁরা হলেন শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী নিভাননী দেবী।

সুন্দরমের নব প্রয়াস

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা সুন্দরম রঙমহলে আগামী ১৬ই জুন সকালে তারাশঙ্করের দেশাত্মবোধক নাটক "পথের ডাক" মঞ্চস্থ করছেন। বিশ্বনাথ চৌধুরী ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী যথাক্রমে নাট্যনির্দেশক ও সংগীত-পরিচালক। আগামী জুলাই মাস থেকে এই সংস্থা দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত-অঙ্গনে "ফিঙ্গার প্রিণ্ট" নাটকের নিয়মিত অভিনয় শুরু করছেন। তা ছাড়া আগস্ট মাসে এঁরা দুটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাটক দুটি হল: "চার দেওয়ালের গল্প" ও "দর্পণের চোখে"। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করবেন রবি ঘোষ, নির্মলকুমার জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি। নাটক দুটির আলোক-সম্পাত ও সুরারোপে থাকবেন যথাক্রমে তাপস সেন ও ভি বালসারা।

নাট্য-উৎসব

নৃত্যনাট্য প্রতিষ্ঠান ভারতীয় শিল্পী পরিষদ-এর ছয় দিনব্যাপী বার্ষিক উৎসব মহাজাতি সদনে ১১ই জুন থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীবিধুভূষণ মল্লিকের পৌরোহিত্যে মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই উৎসবের উদ্বোধন করবেন।

"শ্রীচৈতন্য" "রামলীলা", রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' ও "পরিশোধ" কবিতা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য "শ্রীকান্ত" "সপ্তপদী", 'তুর্কিনীর বিচার" প্রভৃতি উৎসবে মঞ্চস্থ হবে।

"ফিরিঙ্গী কবি"

রূপক (টালিগঞ্জ) আগামী ২৩শে জুন সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে উনবিংশ শতাব্দীর কবিয়াল আণ্টনি ফিরিঙ্গীর জীবনী অবলম্বনে রচিত "ফিরিঙ্গী কবি" নাটক মঞ্চস্থ করবেন। উমানাথ ভট্টাচার্য নাটকটি রচনা করেছেন। বলাই সেন নাটকটি পরিচালনা করবেন। সংগীত পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও সুনীতি মিত্র। নবকুমার লাহিড়ী, সুখেন দাস, সাধন সেনগুপ্ত, সুশীল দাস কুমকুম বসু ও লিলি চক্রবর্তী বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন।

অরোরা টকীজের রজত-জয়ন্তী উৎসব

মেদিনীপুরের গত ২৮শে মে অরোরা টকীজের রজত-জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মেদিনীপুরের পৌরপ্রধান ডা সামসুল বারি। অরোরা চিত্রগৃহের পক্ষ সভায় সময়োচিত ভাষণ দেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। অরোরার দুই কর্ণধার শ্রীঅজিত বসু ও শ্রীঅনুপম বসু অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার ব্যাপারে সদা তৎপর ছিলেন।

একলব্য

প্রতিরবঙ্গ সরকার কলকাতা ময়দানের ঘেরা মাঠের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর থেকে ক্রীড়াপরিচালকদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের মুখপাত্রদের সম্পর্কটা আর যাই হোক, অন্তত মধুর হয়নি। যদিও সরকারের তরফ থেকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, খেলাধুলার পরিচালনা এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার তাঁদের আদৌ ইচ্ছে নেই, তবুও ছিটেফোঁটা গোলমাল লেগেই আছে। সেদিন রাজ্য সরকারের প্রচার ও আবগারী মন্ত্রী এবং সরকারের স্পোর্টস সাব-কমিটির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীজগন্নাথ কোলে আই এফ এ-র সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে চলে আসায় দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের আভাসটা ভালভাবেই আন্দাজ করা গেছে।

আমরা কর্পোরেশনের ব্যাপার নিয়ে পৌরপিতাদের সঙ্গে প্রদেশপিতাদের এক হাত লড়াই দেখেছি। এখন মাঠের ব্যাপারে ফুটবল পালকদের সঙ্গে রাজ্য পরিচালকদের আর এক হাত লড়াই দেখতে বসেছি। দুই লড়াইয়ের প্রকৃতি প্রায় এক। কর্পোরেশনের ব্যাপারের সঙ্গে নাগরিকদের সুখ-সুবিধার প্রশ্ন জড়িত। মাঠের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ক্রীড়ামোদী নাগরিকদের আনন্দের প্রশ্ন। দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, স্বার্থের সংঘাত।

আগে বহুবের বর্গীছ ফুটবলের আকার কেমন ছেল এ নিয়ে কেমন বেশী গণ্ডগোল। তবে আগের উন্নতির লক্ষ্য ছিল নিছক খেলা। এখন দেখছি, শুধু খেলা নিয়েই গণ্ডগোল নয়—গণ্ডগোল ফুটবল খেলার আয়োজনে কর্তৃত্বের প্রশ্ন নিয়েও। এবং এর সঙ্গে একটু রাজনীতির ভেজাল মিশে গণ্ডগোল 'ক্যারাট' গোল্ডে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাণ্ডবল কি হ্যাণ্ডবল নয়, অফসাইড না অনসাইড—এই প্রশ্ন নিয়ে মাঠের দর্শকদের মধ্যে যখন হাতাহাতি তখন কর্তৃত্বের প্রশ্ন নিয়ে কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কথা কাটাকাটি। খেলার মাঠে রেফারীর সততা সম্পর্কে দর্শক যখন সন্দিহান সভার বিবরণে কর্তাদের কাণ্ডকারখানার খবর পড়ে পাঠক তখন ম্রিয়মাণ। তবে কি খেলাধুলার সুষ্ঠু পরিচালনা এবং উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাবে?

ভরসার কথা আই এফ এ ও সরকারের মুখপাত্রদের এই কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বে একজনের শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা আছে। তিনি একাধারে সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা এবং আই এফ এ-র সভাপতি। আবার মহাকাব্যের কথা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুদর্শন চক্র না ধরতে হয়। আর তা না ধরলে খেলার মাঠের ক্ষেত্রে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠা হবে বলেও মনে হয় না।

*

মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে আই এফ এ-র সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসায় অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই উচিত অনুচিত এবং নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু শ্রী কোলে মন্ত্রী হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। রাজ্য সরকারের স্পোর্টস সাব-কমিটির সদস্য হিসাবেও না। আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং কোন অধিকারে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য? না, আই এফ এ-র বেতনভোগী সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায় যে ক্লাবের প্রধান পরিচালক, সেই স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিনিধি হিসাবে আই এফ এ গভর্নিং বডির সদস্য। সুতরাং ধরে নিতে হবে, কাজটা অপ্রিয় হলেও অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রী কোলেকে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। যেহেতু তিনি একজন মন্ত্রী সেহেতু সভার কাজের ভালমন্দে তাঁর এক বিশেষ দায়িত্ব আছে। যদি কোনো অন্যায় ও অযৌক্তিক প্রস্তাব সভায় পাস হয় তবে তাঁকেও তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তখন পাঁচজনে বলবে, আমরাও বলব, একজন মন্ত্রী সদস্য থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এমন অন্যায় ব্যাপার সম্ভব হল। শ্রী কোলেকে অতীতে এমন অভিযোগের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। আই এফ এ-র সভাপতি এবং কংগ্রেস সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক সভায় পরিষ্কার করেই শ্রী কোলেকে বলেছেন—যেহেতু তুমি গভর্নিং বডির একজন সদস্য সেহেতু আই
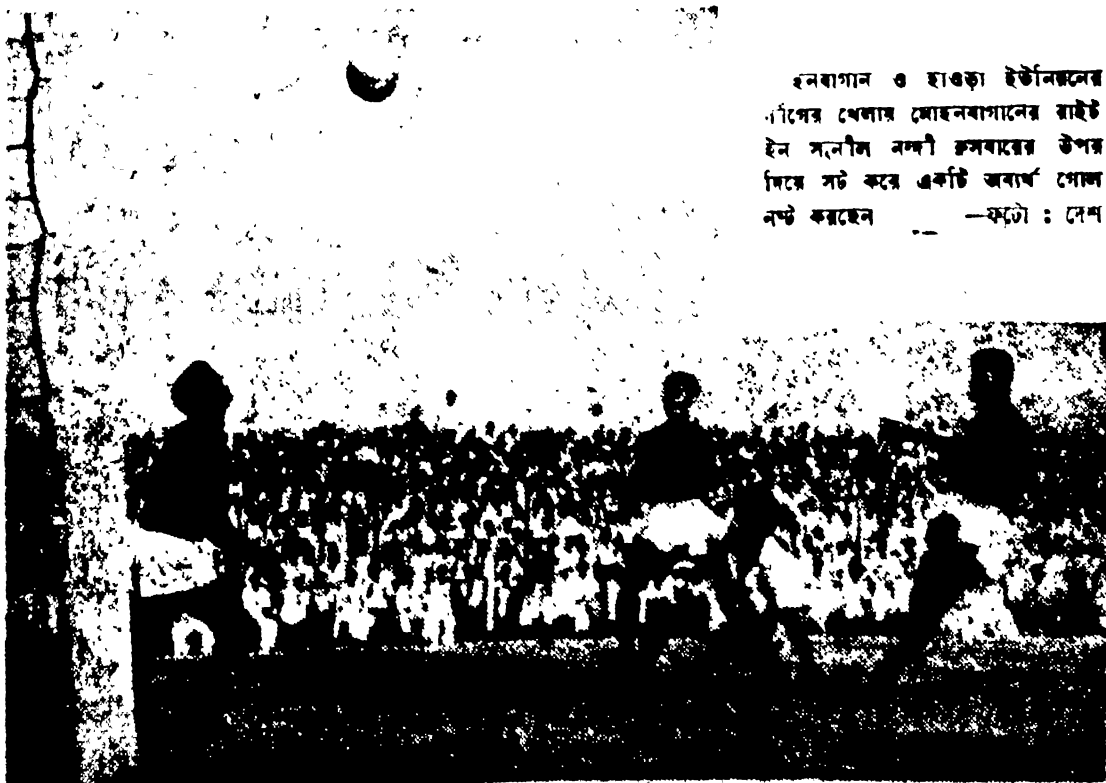
হনবাগান ও হাওড়া ইউনিয়নের ীগের খেলায় মোহনবাগানের রাইট ইন সুনীল নন্দী ক্রসবারের উপর দিয়ে সট করে একটি অব্যর্থ গোল নষ্ট করছেন —ফটো : দেশ

কলকাতায় আর কয়েকজন প্রখ্যাত গোলরক্ষকের বল ধরবার ভঙ্গী ফটো : দেশ

ইস্টবেঙ্গল ও বালী প্রতিভার লীগের খেলায় বালীর গোলরক্ষক এন চ্যাটার্জি ইস্টবেঙ্গলের লেফট আউট বালুর পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বল ধরতে চেষ্টা করছেন ফটো : দেশ

আকর্ষণীয় খেলা হয়ে গেছে। একটি খেলায় গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ও আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ২—০ গোলে ইস্টার্ন রেলকে পরাজিত করেছে। অপর খেলায় লীগ রানার্স ইস্ট বেঙ্গল ১—০ গোলে পরাজিত করেছে এরিয়ান ক্লাবকে। দুটি খেলাকে আকর্ষণীয় বলছি এই কারণে, ইস্টার্ন রেল যেমন প্রতি বছর মোহনবাগানকে বেগ দিয়ে থাকে এরিয়ানও তেমন ইস্ট বেঙ্গলের কাছ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয়। এই দুটি ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় সম্পর্কে দুই প্রধানেরই চিরদিনের আশঙ্কা।

তাই ইস্টার্ন রেল ও মোহনবাগানের খেলাটি দেখবার জন্য মাঠে যে বিপুল দর্শকসমাগম হয়েছিল, সেটা এই মরসুমে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী। মোহনবাগান আর একটি খেলায় হাওড়া ইউনিয়নকে ৩—০ গোলে হারাবার ফলে এ সপ্তাহে কোন পয়েন্ট নষ্ট করেনি। তাদের খেলাতেও দিন দিন উন্নতির পরিচয় মিলছে।

ইস্ট বেঙ্গলও পর পর পুলিস, বালী প্রতিভা ও এরিয়ানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস অনেকটা ফিরে পেয়েছে। ইস্ট বেঙ্গলের বর্তমান ক্রীড়াধারাও অপেক্ষাকৃত উন্নত।

গতবারের লীগের তৃতীয় স্থানাধিকারী হাওড়া ইউনিয়নকে এই সপ্তাহের দুটি খেলায় মোহনবাগান ও পোর্ট কমিশনার্সের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলকে যারা পরাজিত করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল, সেই জর্জ টেলিগ্রাফের কাছেই মহমেডান স্পোর্টিংকে মরসুমের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, যদিও ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে খেলার মত এ খেলায় টেলিগ্রাফ দলের জয়লাভের মূলেও ভাগ্যের সহায়তা আছে। এই সপ্তাহেই মহমেডান দল বাটার বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ায় জয়-পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে। তাদের আগের তিনটি খেলাই ড্র হয়েছিল। মহমেডান দলের মত ইস্টার্ন রেলকেও এ সপ্তাহে প্রথম হার স্বীকার করতে হয়েছে।

মরসুমের প্রথম খেলায় বাটার কাছে পরাজয়ের পর বি এন রেল দলের উপর্যুপরি চারটি খেলায় জয় প্রশংসার দাবি রাখে ও আরও প্রশংসার দাবি রাখে উয়াড়ীর বিরুদ্ধে খেলায় শেষ বার মিনিটে তাদের পাঁচটি গোল করার কৃতিত্ব। এই খেলায় বলরাম একাই পর পর তিনটি গোল করে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক করেছেন।

আগের পাঁচটি খেলায় মাত্র এক পয়েন্টের অধিকারী রাজস্থান এ সপ্তাহের দুটি খেলায় আর একটি পয়েন্ট পেয়েছে। সাতটি খেলায় পুলিসের পয়েন্টের ঘর এখনো শূন্য। ছটি খেলার মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়নের মাত্র একটি খেলায় হার এবং দশটি পয়েন্ট সংগ্রহ প্রশংসনীয়। বালী এবং উয়াড়ী এ [illegible] কোন পয়েন্ট সংগ্রহ করতে [illegible] খেলাকে [illegible] মাঠের [illegible] দেখে মন [illegible] [illegible] বাকিনি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ বিধুভূষণ মল্লিক একজন ছাত্র-খেলোয়াড়কে বিশ্ববিদ্যালয় 'ব্লু' উপহার দিচ্ছেন ফটো : দেশ

*

বিভিন্ন খেলাধুলোয় যে-সব ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফ থেকে বছর বছর তাদের 'ব্লু' বিতরণ করে উৎসাহ দেওয়া হয়। ছাত্র খেলোয়াড়দের পক্ষে 'ব্লু' পাওয়া একটা বড় সম্মানের কথা—খেলোয়াড়-জীবনের স্মৃতি-চিহ্নও বটে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছ থেকে তাঁরা যখন ব্লু গ্রহণ করেন, তখন তাঁদের আনন্দের কারণ স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বিধুভূষণ মল্লিক যখন খেলোয়াড়দের কাছে 'ব্লু' বিতরণের জন্য সভাভাগে হলে উপস্থিত হন, তখন ব্লুর অধিকারী অনেক ছাত্রকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ফুটবল দলের বারজন ছাত্রের মধ্যে 'ব্লু' নেবার জন্য মাত্র একজন উপস্থিত ছিলেন। শুধু কি ছাত্র? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের সহ-সদস্যরাও অনুপস্থিত ছিলেন। এমন কি স্পোর্টস বোর্ডের সম্পাদক যাঁর উপর অনুষ্ঠানের সভাপতি উপাচার্য ডঃ বিধুভূষণ মল্লিককে ধন্যবাদ অর্পণের ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল, তাঁরও দেখা পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া স্পোর্টস বোর্ডের গণ্যমান্য-দের মধ্যে আর যাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নাম লিখতে গেলে উপস্থিত সদস্য-দের নামের তালিকার চেয়ে সেই তালিকাই দীর্ঘ হয়ে যাবে।

এমন হবে কেন? কলকাতা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড—এক শ ছাব্বিশটি কলেজ যার অন্তর্ভুক্ত, তার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার জন্য কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের আগ্রহের অভাব হবে কেন? অনুমান, ময়দানে সেদিন একটি আকর্ষণীয় ফুটবল খেলা ছিল বলে অনেক ছাত্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। কথাটা সত্যি হলে সত্যিই পরিতাপের বিষয়। আর ছাত্র-খেলোয়াড়দের বেলায় না হয় কথাটা মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু স্পোর্টস বোর্ডের সদস্যদের উপস্থিত না হবার কারণ কি?

অবশ্য ব্লু বিতরণের দিনক্ষণ নির্বাচনে যে ত্রুটি রয়ে গেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কারণ, গ্রীষ্মের ছুটিতে সমস্ত কলেজই এখন বন্ধ। তারপর বিকেলে যখন ময়দানের বড় খেলার আকর্ষণ ছিল তখন ঐ সময়টাও ঠিক করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবু বলব ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা খেলাধুলোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে 'ব্লু' পাবার অধিকারী হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

*

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলোর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিগত বৎসরে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, সাঁতার, ওয়াটার-পোলো এবং নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সারাভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। কলকাতায় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হার স্বীকার করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। বিশ্ব-ভারতী, যাদবপুর ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে আয়োজিত আন্তঃ কলেজ হকি প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিজয়ীর সম্মান পায়। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নৌ-চালনা প্রতিযোগিতাতেও সব কটি বিষয়েও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং ক্লাবের নৌ-চালকরা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। আজমীরে আয়োজিত সাঁতার ও ওয়াটার-পোলো প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাঁতারু ও ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়দের দ্বিতীয় স্থান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এইসব খেলাধুলোয় প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ৬২ জন ছাত্র 'ব্লু' পেয়েছেন, নীচে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হল :—

ফুটবল—এস সমাজপতি, অধিনায়ক (আশুতোষ), কে দাস (আনন্দমোহন), এ কুণ্ডু (মণীন্দ্রচন্দ্র), এন জি ভট্টাচার্য (সুরেন্দ্রনাথ, কমার্স), এস মিত্র (সুরেন্দ্র-নাথ), বি ব্যানার্জি (আশুতোষ), আর গুহ (আশুতোষ), এ চ্যাটার্জি (সুরেন্দ্রনাথ, কমার্স), এইচ কর্মকার (মণীন্দ্রচন্দ্র), এস চ্যাটার্জি (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এ চক্রবর্তী (মণীন্দ্রচন্দ্র), এ বসু (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ)।

ক্রিকেট—এস রায়, অধিনায়ক (সেণ্ট জেভিয়ার্স), পি নন্দী (বিদ্যাসাগর), এম এ পারেখ (সি ইউ ল), আর বসু (সেণ্ট জেভিয়ার্স), এ বি রায় (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এস বসু (বি ই), এস চৌধুরী (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), সি গাঙ্গুলী (সিটি কমার্স), আর জিজিবয় (সেণ্ট জেভিয়ার্স), বি গুপ্ত (সেণ্ট জেভিয়ার্স), ডি ঘোষ (হেরম্বচন্দ্র) কল্যাণ সেন (আশু-তোষ) কে দত্ত (চারুচন্দ্র), সুব্রত রায় (চারুচন্দ্র)।

হকি—ডি ঘোষ, অধিনায়ক (সি ইউ ল), জি ঘোষ (সি ইউ ল), জে দেব (সি ইউ ল), এস দে (চারুচন্দ্র), এ ব্যানার্জি (সেণ্ট জেভিয়ার্স), বি রায়চৌধুরী (আশুতোষ), এস চ্যাটার্জি (বি ই), পি বসু (সিটি, কমার্স), জে সিং (আশুতোষ), এ সেন (বি ই), আর কুমার (আশুতোষ), আর জাজবয় (সেণ্ট জেভিয়ার্স), টি দাস (আশুতোষ), এস চৌধুরী (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ)।

সাঁতার—আবদুল মত্তালিব, অধিনায়ক (সিটি), এন কুণ্ডু (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), ডি পাল (সিটি), এস সেন (আশুতোষ), এস ভড় (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), কে রায় (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ)।

ওয়াটারপোলো—আবদুল মত্তালিব, অধি-নায়ক (সিটি), ডি পাল (সিটি), বি মুখার্জি (গোয়েঙ্কা কমার্স), এস দে (সিটি), এস মুখার্জি (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), জি দাস (সি ইউ এ), এস ভাও (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এ হাজরা (বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ), এস সাহা (বিদ্যাসাগর)।

নৌ-বাইচ—এস দত্ত, অধিনায়ক (আশু-তোষ), ডি পি কুণ্ডু (ইউনিভার্সিটি ল), বি মেহেরা (সেণ্ট জেভিয়ার্স), সি পি সিং দেও (সেণ্ট জেভিয়ার্স), জি গোপালন (ইউনিভার্সিটি ল), সুবীর দত্ত (প্রেসিডেন্সী) ও বি সেন (আশুতোষ কলেজ)। (৩।৬।৬৩)

মুকুল

গত সপ্তাহে ফুটবলের এক নম্বর আইন ও আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্তের ধারাগুলি প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে এক নম্বর আইন সম্পর্কে রেফারী, সম্পাদক ও খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ এবং দুই নম্বর আইন প্রকাশ করা হচ্ছে।

আগেই বলেছি, মূল আইনের ধারার মতই সংঘের সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন উপদেশ আইনের অঙ্গ। সুতরাং ফুটবলের আইন-কানুনের সঙ্গে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে হলে প্রতিটি ধারা, উপদেশ এবং সিদ্ধান্ত ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে।

এক নম্বর আইন সম্পর্কে রেফারীদের প্রতি উপদেশ

সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা দেখে-শুনে নেবার জন্য খেলা আরম্ভের সময়ের বেশ কিছু আগে মাঠে উপস্থিত হবেন। যদি খারাপ আবহাওয়ার দরুন কিংবা কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য মাঠের অবস্থা এমন হয় যে, সে মাঠে খেলা আরম্ভ করলে খেলোয়াড়দের বিপদ হতে পারে তবে খেলা আরম্ভ করবেন না। যদি মাঠের মাপজোকের দাগ ঠিকমত টানা না থাকে তবে সময় হাতে থাকলে দাগ টানিয়ে নেবেন।

মাঠের পতাকা-দণ্ডের উচ্চতা যেন কোনমতেই ৫ ফুটের কম না হয়। ছোট পতাকাদণ্ড খেলোয়াড়দের পক্ষে বিপজ্জনক।

ক্রসবারের বদলে দড়ি বা ফিতা বা এমন ধরনের কোন জিনিস ব্যবহার করতে দেবেন না।

গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত।

প্রত্যেক খেলা আরম্ভের আগে গোলের জাল পরীক্ষা করবেন। দেখবেন জাল যেন মাটির সঙ্গে ভালভাবে যুক্ত থাকে এবং জাল ছেঁড়া না থাকে।

সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ

খেলোয়াড়দের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কর্নার কিক করবার জন্য এবং কোনরকমের সংঘর্ষের বিপদ এড়াবার জন্য মাঠের টাচ লাইন ও মাঠের পরিবেষ্টনীর বেড়ার মধ্যে যথেষ্ট জায়গা রাখতে হবে।

১১৫ গজ লম্বা ও ৭৫ গজ চওড়া মাপের মাঠই সাধারণত খেলার পক্ষে পরম উপযোগী মাঠ। কিন্তু যে প্রতিযোগিতায় ক্লাবগুলি যোগ দিচ্ছে সেই প্রতিযোগিতার নিয়ম মানতে হবে।

স্কুল ছাত্রদের ফুটবল খেলার জন্য সবচেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৮০ গজ×৬০ গজ এবং ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের খেলার জন্য সব চেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৭০ গজ×৫০ গজ করবার সুপারিশ করা হয়েছে। ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের মাঠের গোলপোস্টের উচ্চতা ৬ ফুট করার সুপারিশ আছে।

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাব মাঠের মাপ ঠিকমত টানার জন্য দায়ী। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সম্পাদকের হাত হাতে থাকে তবে সেই হিসাবে দাগ টেনে নেবেন। [illegible] নির্ণয়ের সময় গোল লাইন এবং পেনাল্টি-এরিয়ার লাইনগুলো আবার স্পষ্ট করে টেনে দেওয়া উচিত।

হালকা রঙের পতাকা ব্যবহার করা যুক্তি-

গোল-এরিয়া ও পেনাল্টি-এরিয়া চিহ্নিত করবার জন্য গোল-লাইনের উপরে যে মাপ হবে সে মাপ প্রতি গোলপোস্টের ভেতরের দিকের প্রান্ত থেকে আরম্ভ করতে হবে।

গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

খেলার আইন-কানুন খুব ভালভাবে জেনে রাখুন। তা হলেই আপনারা সত্যিই ভাল খেলতে এবং খেলা থেকে পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারবেন। যদি রেফারীর ক্ষমতা এবং খেলার
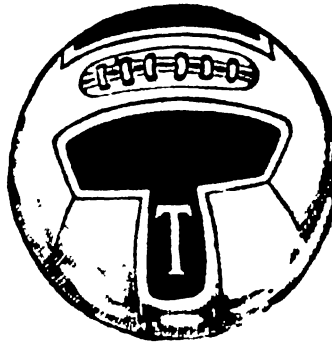
লেসযুক্ত বল। লেস বাঁধবার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে দুটি মুখ মিশে থাকে এবং লেস-এর বাড়তি অংশ বেরিয়ে না থাকে

আইন-কানুন সম্পর্কে সমস্ত খেলোয়াড়দের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকে তবে খেলার সময় গোলমালের সংখ্যা খুবই কমে যাবে। আইন-কানুন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবের জন্যই খেলোয়াড়দের সতর্ক করার প্রয়োজন হয়।

হাত দিয়ে বল ধরতে গিয়ে বা শট প্রতিরোধ করতে গিয়ে অনেক গোলরক্ষক অনেক সময় ইচ্ছে করে ক্রসবার ধরে ঝুলে পড়েন। ক্রসবারও নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। গোলরক্ষকের এই কাজ অন্যায় আচরণের পর্যায় পড়ে।

২ নম্বর আইন—বল

মূল আইন—বলের আকার হবে গোল। বলের বাইরের দিকের আবরণ চামড়া দিয়ে তৈরি করতে হবে এবং এমন কোন জিনিস ব্যবহার করা চলবে না, খেলোয়াড়দের পক্ষে যা বিপদের কারণ হতে পারে।

বলের পরিধি ২৭ ইঞ্চির কম বা ২৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন ১৬ আউন্সের বেশী বা ১৪ আউন্সের কম হবে না এবং রেফারীর অনুমোদন ছাড়া খেলার মধ্যে কোন সময়েই বল বদল হবে না।

আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্ত

(এ) যে কোন খেলায় ব্যবহৃত বলকে অ্যাসোসিয়েশনের বা যে ক্লাবের মাঠে খেলা হচ্ছে সেই ক্লাবের সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং খেলার শেষে অবশ্যই রেফারীর কাছে বল ফেরত দিতে হবে।

(বি) দুই নম্বর আইনে বলের বাইরের আবরণ সম্পর্কে চামড়া ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। ফুটবলের বাইরের আবরণে অন্য কোন জিনিস (রবার ইত্যাদি) কোনভাবেই ব্যবহার করা চলবে না।

(সি) আন্তর্জাতিক সংঘ আইন অনুযায়ী বলের ওজনের এই রূপান্তর অনুমোদন করেছেন :

১৪ থেকে ১৬ আউন্স=৩৯৬ থেকে ৪৫০ গ্রাম।

(ডি) যদি খেলার সময় বল ফেটে যায় কিংবা আকারের বিকৃতি ঘটে তবে খেলা বন্ধ করতে হবে এবং যে জায়গায় বল অকেজো হয়ে পড়বে সেখানে নতুন বল "ড্রপ" দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হবে।

(ই) যদি খেলা বন্ধ থাকা সময়ে (প্লেস-কিক, গোল-কিক, কর্নার কিক, ফ্রি-কিক, পেনাল্টি কিক কিংবা থ্রো-ইন) বল অকেজো হয় তবে নিয়মমত খেলা আরম্ভ হবে।

সম্পাদকের প্রতি উপদেশ

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাবের বল সরবরাহ করা উচিত। বল যেন হাওয়ার দ্বারা পূর্ণ থাকে। হাতের কাছে অতিরিক্ত বল মজুত রাখবেন।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

বল দুই রকমের—(১) লেসযুক্ত, (২) ভাল্ভ টিউবের। দুই রকমের বলই আইনসম্মত।

বলের রং—আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে সাধারণত ব্রাউন, অরেঞ্জ ও সাদা রঙের বল ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

লেসিং—এমনভাবে লেস বাঁধতে হবে যা খেলোয়াড়দের পক্ষে বিপজ্জনক না হয় বা যাতে বলের আকারের বিকৃতি না ঘটে।

বলের পাম্প—আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে ১৭ থেকে ১৮ পাউন্ড হাওয়ার চাপ থাকা উচিত।

স্কুল ছাত্রদের খেলার বল—৪ নম্বর সাইজ। যার পরিধি হবে ২৫ থেকে ২৬ ইঞ্চি এবং খেলা আরম্ভের সময় ওজন থাকবে ১২ থেকে ১৩ আউন্স।

প্রশ্ন

[ভেবেচিন্তে উত্তর ঠিক করে রাখুন। পরের সপ্তাহে উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা।]

(১) পেনাল্টি-এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

(২) গোল-এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

(৩) পেনাল্টি স্পট থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে যে বৃত্তের চাপ আঁকা হয় তার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

(৪) ধরুন, মাঠের চওড়া ঠিক ৫৫ গজ। ঐ মাঠের পেনাল্টি-এরিয়ার মাপ কত হবে?

(৫) বল মারার সুবিধার জন্যে কোন খেলোয়াড় মাঠের পতাকা খুলে ফেলল, রেফারী হিসাবে আপনি কি করবেন?

(৬) দুটি গোলপোস্ট চতুষ্কোণ কিন্তু উপরের ক্রসবার গোলাকার। নিয়মমত করা একটি শট ক্রসবারে লেগে গোলে প্রবেশ করল. ক্রসবার চতুষ্কোণ হলে বল হয়তো গোলে প্রবেশ করত না। রেফারী হিসাবে এ ক্ষেত্রে কি আপনি গোল দেবেন?

(৭) গোলের জালে সেট-খাটানো নেই বলে একটি দল আপনার কাছে আপত্তি জানালো। আপনি কি খেলা আরম্ভ করবেন?

(৮) গোলকিপার একটা ভাল শট "ফিস্ট" করবার পর বাহাদুরি দেখাবার বাসনায় ক্রসবার ধরে ঝুলে পড়ল, আর তখনই বিপক্ষের একটি শট ক্রসবারে লেগে ফিরে গেল। রেফারী হিসাবে আপনি কি করবেন? গোল দেবেন কি?

(৯) ক্রসবার ৫ ইঞ্চি চওড়া গোল-লাইন চওড়া ৩ ইঞ্চি। বল গোল লাইন অতিক্রম করে গেলে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

(১০) জলকাদার মাঠে একজন ব্যাক গোল কিক করলেন, বল পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে কাদায় আটকে গেল প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড় দৌড়ে এসে গোল করলেন। রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন?

*

ফুটবলের আইন-কানুনের আলোচনাকে স্বাগত জানিয়ে ইতিমধ্যেই কয়েকজন পত্রলেখক অনেকগুলি প্রশ্ন আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। আইনের কোন প্রশ্ন একটু জটিল ধরনের এবং যার মধ্যে কৌতূহলের কারণ আছে, শুধু সেইসব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হবে। সাধারণ নিয়ম-কানুন আইনের ব্যাখ্যার মধ্যেই পাওয়া যাবে। তা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে আমরাই কয়েকটি প্রশ্ন করে পরের সপ্তাহে তার সমাধান জানাব।

কারো কাছ থেকে একাধিক প্রশ্ন বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি, আমাদের অসুবিধা বুঝে পত্রলেখকরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

এ সপ্তাহে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে :—

(১) বিমলকান্তি ধর, শিলচর।

প্রশ্ন : ধরুন দু' দলে খেলা হচ্ছে। এক দলের ব্যাক নিজেদের হাফব্যাকের সীমানা থেকে বিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে জোরে শট করলেন। বলটা উপর দিয়ে গোলের দিকে যাচ্ছে। এই সময় ও'র পক্ষেরই সেন্টার-ফরোয়ার্ড যদি বল মাটিতে পড়ার আগে বিপক্ষের দুই ব্যাককে অতিক্রম করে যান তা হলে বল মাটিতে পড়ার পর কি তাকে অফসাইডে বলে ধরা হবে?

* উত্তর : আপনার প্রশ্নে একটু ভুল আছে। দুজন ব্যাককে অতিক্রম করার পরও তো সেন্টার-ফরোয়ার্ডের সামনে দুজন খেলোয়াড় থাকতে পারেন। তা হলে অফ্‌-সাইড হয় কিভাবে? অবশ্য আপনার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

আপনি হয়তো বলতে চান, আক্রমণকারী দলের কোন খেলোয়াড় যদি চলতি বলের আগে চলে যান এবং সেই অবস্থায় প্রতিপক্ষের মাত্র একজন খেলোয়াড় তার সামনে থাকেন বা একেবারেই কেউ না থাকেন তা হলে অফ্‌সাইড হবে কি না?

এটা সত্যিই বুদ্ধির প্রশ্ন। এমন ঘটনায় প্রায় সব সময়ই দর্শকদের মধ্য থেকে "অফ্‌-

ডালুথ্ টিউবের বল। এ বলে লেস বাঁধার বালাই নেই

সাইড" "অফ্‌সাইড" চীৎকার ওঠে এবং রেফারীরাও বহু ক্ষেত্রে ভুল করেন। কিন্তু অফ্‌সাইড আইনের সূত্র—এবং মূল সূত্রটি যদি জানা থাকে তবে দর্শক সমর্থক রেফারী কিংবা খেলোয়াড় কারো পক্ষেই ভুল হবার কথা নয়।

মূল সূত্রটি হচ্ছে :—যাকে অফ্‌সাইড বলে সন্দেহ করা হয় তার পূর্বের অবস্থান বর্তমান অবস্থান মোটেই নয়। অর্থাৎ তাঁর নিজের দলের কোন খেলোয়াড় বল খেলার সময় বা তাঁকে পাস করবার সময় তিনি (সন্দেহযুক্ত খেলোয়াড়) যদি অফ্‌সাইডে না থাকেন তবে পরে এগিয়ে গেলেও অফ্‌সাইড হবেন না—বলের আগে চলে গেলেও না। মীমাংসার বিষয়টি হচ্ছে, যে মুহূর্তে সন্দেহযুক্ত খেলোয়াড়ের পক্ষের একজন খেলোয়াড় বল খেলছেন, সন্দেহযুক্ত খেলোয়াড়ের সেই মুহূর্তের অবস্থান। আগেই বলেছি, তখন যদি তিনি অফ্‌সাইডে না থাকেন তবে পরে এগিয়ে গেলেও অফ্‌-সাইড হবেন না। ফুটবলের আন্তর্জাতিক সংঘ, অর্থাৎ "ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন" অফ্‌সাইড আইনের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

"Off-side shall not be judged at the moment the player in question receives the ball, but at the moment when the ball is passed to him by one of his own side. A player who is not in an off-side position when one of his colleagues passed the ball to him or takes a free-kick, does not therefore become off-side if he goes forward during the flight of the ball."

আশা করি, এখন আপনি বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

(২) প্রবোধ আচার্য, বাপুজীনগর, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

প্রশ্ন : (ক) হাতের ঠিক কোন্ জায়গায় বল লাগলে হ্যান্ডবল হয়? ইচ্ছাকৃত হ্যান্ড-বল কিনা সেটা রেফারীর পক্ষে বোঝবার উপায় কি?

(খ) ফাউলের সঠিক সংজ্ঞা কি? দু পক্ষের খেলোয়াড়ের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা-ধাক্কিতে কোন খেলোয়াড় পড়ে গেলে ফাউল দেওয়া হবে কি না?

(গ) অনেক সময় দেখা যায়, কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করেন যাতে শেষোক্ত খেলোয়াড় বলের গতি ঠিকভাবে নির্ণয় করতে না পারেন। এ আচরণ কি দূষণীয়?

* উত্তর : (ক) ফুটবল আইনে কাঁধের নীচ থেকে আরম্ভ করে আঙুল পর্যন্ত অংশকেই হাত বোঝায়। কিন্তু হাতে বল লাগলেই হ্যান্ডবল হয় না—বলে হাত লাগালে হ্যান্ডবল হয়। "লাগলে" আর "লাগালে" লক্ষণীয়। অর্থাৎ হ্যান্ডবল ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত সেইটাই বিচার্য বিষয়।

ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল সেটা বোঝবার ক্ষমতা রেফারীর অভিজ্ঞতা ও বিচার-বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভর করে। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল বোঝা কি খুব কঠিন?

(খ) ফুটবল আইনের ১২ নম্বর ধারা অনুযায়ী ফাউলের সংজ্ঞা বেশ বড়। মোটা-মুটি জেনে রাখুন প্রতিপক্ষকে ল্যাং-মারা বা ল্যাং-মারার চেষ্টা করা, প্রতিপক্ষের উপর লাফিয়ে পড়া, প্রতিপক্ষকে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা, প্রতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে চার্জ করা, প্রতিপক্ষকে ধরে বা আটকে রাখা, প্রতিপক্ষকে ধাক্কা মারা, হ্যান্ডবল করা প্রভৃতি ৯টি ক্ষেত্র ফাউলের আওতায় পড়ে। সব ক্ষেত্রে অপরাধী খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি কিক দেবার বিধান আছে। এ ছাড়া ফাউলের যে পাঁচটি ক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট ফ্রি কিকের বিধান রয়েছে—তা পরে আলোচনা করা যাবে।

অনিচ্ছাকৃত ধাক্কাধাক্কিতে কেউ পড়ে গেলে ফাউলের নির্দেশ দেওয়া হবে কেন?

(গ) আচরণ নিশ্চয়ই দূষণীয়। এ ক্ষেত্রে ইনডিরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দিতে হবে।

দেশী সংবাদ

২৭শে মে—কলিকাতা-কেন্দ্রিক রেলের চাকুরিতে পশ্চিমবঙ্গ ও সংলগ্ন বিহার-উড়িষ্যার প্রার্থী ইদানীং কম। অনেকে আবার আবেদন করিয়াও নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে হাজির হইতেছেন না। রেল তরফের একজন কর্তা ব্যক্তির মতে বেকার সমস্যা-পীড়িত এলাকায় ইহা একটা আজব ব্যাপার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সতেরটি রাষ্ট্রের ভারতীয় দূতগণ আজ নয়াদিল্লিতে চারদিনব্যাপী সম্মেলনে মিলিত হইয়াছেন। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সমস্যা ও ভারতের সহিত এই সকল দেশের সমস্যা লইয়াই সম্মেলনে আলোচনা হইবে।

২৮শে মে—বিহারের মধ্য দিয়া ৫০ হাজার টন নেপালী চাল পশ্চিমবঙ্গে প্রেরণের সুযোগ দিতে ভারত সরকার যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, বিহার সরকার তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কলিকাতার কোন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিসকে তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন একটি ফার্ম প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার প্রতারণা ও বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন।

২৯শে মে—ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাদের পূর্ব নীতি সংশোধন করিয়া এই শিল্পে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর উদারনীতি অনুসরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গত এক পক্ষকাল ধরিয়া চীনারা সিকিম সীমান্তে বেপরোয়াভাবে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। চীনারা এই অঞ্চলে এত বেশী সৈন্য ইতিপূর্বে আর কখনও আমদানী করে নাই। চীনা জেনারেলরাও ইদানীং এই অঞ্চলে সফর করিতেছেন।

৩০শে মে—গত মঙ্গলবার রাত্রে যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া গিয়াছে তাহার ফলে ত্রিপুরার প্রায় দশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঝড়ে [illegible] বিধ্বস্ত অঞ্চলের ১০টি বসতবাটী এবং সরকারী ভবনাদি ভূমিসাৎ হইয়াছে, না হয় গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

একমাত্র কলিকাতা বন্দরেই দুনম্বর ব্যবসায়ীরা আণ্ডার ইনভয়েসিং-এর পথে প্রতি বছর ৫০ হইতে ৬০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি দেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কাস্টমস মহলের অভিমত, চা, পাট এবং বিভিন্ন খনিজাত দ্রব্য রপ্তানির ব্যাপারেই এই কারসাজিটা সবচেয়ে বেশী চালু।

৩১শে মে—আগামী ৬ই জুন নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমরোহা, ফরাক্কাবাদ ও রাজকোট নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে আলোচনা হইতে পারে। এইসব নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে হাই-কমাণ্ড উদ্বিগ্ন ও বিচলিত।

কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীন-ভারত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য চীনের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ভারতের সম্মত হইবার পক্ষে চীনাদের কথায় ভারতের বিশ্বাসের অভাবই প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া ইনফার এক সংবাদ হইতে জানা যায়।

১লা জুন—যে-সব ভারতীয় সৈন্য এতকাল অতন্দ্র প্রহরীর মত পাক-ভারত সীমান্ত পাহারা দিতেছিল, তাহাদিগকে এখন সেখান হইতে সরাইয়া ভারত-চীন সীমান্তে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিভাগ—কর নির্ধারণ ও আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিজ হাতে তুলিয়া লইবার কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল।

চিনি মজুত রাখা, নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা বেশী দামে চিনি ও আটা বিক্রয় করিবার বিরুদ্ধে অদ্য কলিকাতার এনফোর্সমেণ্ট পুলিস শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাইয়া ১৫ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে।

২রা জুন—সিনকিয়াং প্রদেশে বিদ্রোহ এবং ভারত-সীমান্তগামী প্রত্যেকটি সরবরাহ প্রেরণ-পথ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই চীন লাদক ও নেফায় অস্ত্র সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের মালগাড়ির ওয়াগন ভাঙ্গিয়া হাজার হাজার টাকার সরকারী ও বেসরকারী মালপত্র লুণ্ঠিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে মে—দীর্ঘ সম্মেলনে যোগদানের পর আফ্রিকার ৩০টি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীগণ গতকাল হইতে আদ্দিস-আবাবা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন। এখন বুঝিতে পারা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগালের বিরুদ্ধে সমগ্র আফ্রিকার একটি নূতন আন্দোলন শুরু হইতে পারে।

[illegible] সাইগন হইতে [illegible] ওয়াশিংটনে [illegible] হইয়া [illegible] বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইয়াছেন।

২৮শে মে—কেনিয়ার গভর্নর শ্রীম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড আজ শ্রীজোমো কেনিয়াট্টাকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান। তিনি শ্রীকেনিয়াট্টাকে কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব শ্রীডীন রাস্ক বলেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে—কিন্তু অভ্যন্তরীণ শত্রুদের জন্য আমেরিকা একটি পা বাধায় আটকাইয়া গিয়াছে। উহা হইল ঃ বর্ণবৈষম্য।

২৯শে মে—মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে এক বিধ্বংসী ঘূর্ণিবাত্যা চট্টগ্রাম শহর [illegible] জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। এই ঝড়ের ফলে ১০ জন মৃত এবং কয়েক হাজার লোক গৃহহারা হইয়াছে। ঝড়ের গতি ছিল ঘণ্টায় ৮০ মাইল। সঙ্গে ছিল তুমুল বর্ষণ।

অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য বৃটেন ও রাশিয়া আজ লাওসের যুধ্যমান পক্ষত্রয়ের উদ্দেশে এক যুক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছে। আবেদনে বিবদমান পক্ষত্রয়কে বলা হইয়াছে যে, লাওসে শান্তি বজায় রাখার কাজে তাহারা যেন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেয়।

৩০শে মে—আফগানিস্তানের প্রচারমন্ত্রী সৈয়দ কাশেম রাসতিয়া বলেন যে, গতকাল তেহেরানে তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জেড এ ভুট্টোর সহিত উভয় দেশের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক এবং বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনের জন্য যে স্বাক্ষর করিয়াছেন, উভয় দেশের মধ্যে যে "রাজনৈতিক মতভেদ" আছে, তাহা সেই চুক্তির ভিতরে পড়ে নাই।

তেহেরানের সংবাদপত্রগুলিতে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইরানের শাহ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ইরানের সহিত ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেরই সম্পর্ক মধুর।

৩১শে মে—পূর্ববঙ্গে মঙ্গলবারের ঝড়ে কত লোক নিহত হইয়াছে, তাহা এখনও বলা যায় না। তবে বেসরকারী হিসাব মতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল ও খুলনায় মিলিয়া মৃতের সংখ্যা দশ হাজার হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। সরকারী হিসাব মতে একমাত্র চট্টগ্রাম জেলাতেই তিন সহস্রাধিক লোক নিহত হইয়াছে।

আজ লণ্ডনে কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সফরের ফলে ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে একটি বোঝাপড়া হইয়াছে এবং এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার নিকট হইতে সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে।

১লা জুন—আজ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ সোয়েকার্ণ এবং মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমানের মধ্যে এক বৈঠক হইয়া উভয়েই এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, প্রস্তাবিত মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাঁহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ এবং নিন্দাসূচক কোন মন্তব্য করিবেন না।

কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৭৩ বৎসর বয়স্ক শ্রীজোমো কেনিয়াট্টা আজ শপথ গ্রহণ করেন। কেনিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

২রা জুন—লাওস-সঙ্কট সমাধানের জন্য অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা শুরুর যে যৌথ আবেদন বৃটেন ও রাশিয়া জানাইয়াছিল, কম্যুনিস্টপন্থী প্যাথেট লাও তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা ও দ্বীপগুলিতে ঘূর্ণিবাত্যার ফলে মৃতের সংখ্যা দশ হাজার। ইহা ছাড়া প্রায় তিন লক্ষ লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ও গবাদি পশু ধ্বংস হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রী[illegible] ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা ঃ বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ [illegible] টাকা।
মফঃস্বল ঃ (সডাক) বার্ষিক—২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা [illegible] নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক ঃ শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬ [illegible] স্ট্রীট কলিকাতা-১।
টেলিফোন ঃ ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮০৮১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) [illegible]।

* সূচীপত্র *

Eight
new
fashion-fresh
colours!
CORAL

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রী পি কে বন্দ্যোপাধ্যায়

LUX
LUX
LUX
LUX

দেশ

৩০ বর্ষ ॥ ৩৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা।
শনিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
Saturday, 15th June 1963.

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

সংবিধানের নির্দেশ ছিল ১৯৬০ সালের মধ্যে বিনা বেতনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। সে-নির্দেশ পূরণ করা সম্ভব হয়নি; সম্ভব যে নয় কয়েক বছর আগেই তা জানা গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আশা এখন ১৯৭৫ সাল নাগাদ ৬—১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিনা বেতনে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে জনসংখ্যা বছর বছর বাড়তে থাকবে, প্রতি বছর গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ হবে। ফী বছর এই পঞ্চাশ লক্ষ হবে জনসংখ্যার মুখের গ্রাস সংগ্রহ করাই একটা বড় সমস্যা, তার উপর সকলের প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। জাতীয় উন্নয়ন সংকল্পের কর্মকাণ্ডে এ-সবই অবশ্য হিসেবের মধ্যে নিতে হবে। জীবন ও জীবিকা সংস্থানের জন্য শিক্ষাও অপরিহার্য। সব শিক্ষা এবং জীবিকা-গত যোগ্যতার বনিয়াদ হল প্রাথমিক শিক্ষা। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকল্পটা অতএব শখের নয়, হেলাফেলার বিষয়ও নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা অবশ্যই চলবে। চলা উচিতও।

বাস্তব অবস্থা বিবেচনাক্রমে লক্ষ্যটা আপাতত কিছু পরিমাণ খাটো করা হয়েছে। ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের সব ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা করা এখনি সম্ভব নয়। আপাতত তাই স্থির হয়েছে তৃতীয় যোজনাকালের মধ্যে আগামী দু বছরে ছয় থেকে এগার বছরের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। পরিকল্পনা কমিশনের মতে দেশে ৬ ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের শতকরা ছিয়াত্তর শতাংশকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আগামী দু বছরে করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশা ছিয়াত্তর নয় আশী শতাংশ ছেলেমেয়ের জন্য স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা যাবে। জাতীয় সংকটের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ থেকে ছ কোটি টাকা ছাঁটাই করা হয়েছিল কয়েকমাস আগে। এখন সে-টাকাটা আবার বরাদ্দ করা হয়েছে, রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে তৃতীয় যোজনাকালের অবশিষ্ট দু বছরের মধ্যে উপরোক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনে উদ্যোগী হতে।

কোন্ বয়সের কত লক্ষ ছেলেমেয়ের জন্য আগামী দু বছরে প্রাথমিক শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা সম্ভব সে-হিসাব মোটামুটি পরিষ্কার, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য মোট কী পরিমাণ টাকা খরচ হবে তারও আন্দাজ না-হয় পাওয়া গেল। কিন্তু শিক্ষা-উদ্যোগটা নিশ্চয়ই শুধু মাথা গুনতি এবং বরাদ্দ টাকা জমা-খরচের ব্যাপার নয়। যে-স্তরের শিক্ষাই হোক, এমন কী প্রাথমিক শিক্ষারও গুণ-গত মূল্য যাচাই করার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে কোন স্তরের শিক্ষারই মান এখনও উঁচু নয়, বরঞ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় যতটুকু উৎকর্ষ আগে ছিল তাও এখন ক্ষয়িত হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দশা আরও শ্রীহীন বিশৃঙ্খল। গোড়ার দিকে ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের মতে সবচেয়ে দুরূহ, সবচেয়ে মূল্যবানও। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটা এতকাল ছিল প্রায় মাধ্যমিক শিক্ষার লেজুড়, আর মাধ্যমিক শিক্ষা হল উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পাশ-পোর্ট। এখন অবশ্য প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে আলাদা ভাবে পরি-কল্পিত ও সংগঠিত করার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। সে কারণেই দরকার প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং গুণগত মূল্য ভালমত যাচাই করা।

দেশের অধিকাংশ লোক অক্ষর-জ্ঞান-হীন। তাই স্বতই মনে হতে পারে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় গ্রামের ও শহরের মত বেশী সম্ভব ছেলে-মেয়েদের অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন করা, যাতে দেশ থেকে নিরক্ষরতার কলঙ্ক মুছে যায়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু নিরক্ষরতা দূর করা নয়। অক্ষর-জ্ঞান অবশ্যই চাই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষণীয় বিষয়-সূচী, পাঠ্যক্রম সবই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন ও জীবিকার উপযোগী সুবিন্যস্ত হওয়া চাই। মাতৃভাষায় কিছু লেখা-পড়ার ক্ষমতা, সাধারণ অঙ্কের জ্ঞান, দেশের ভূগোল এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় এবং সেই সঙ্গে চাষবাস, পশুপালন, ছোটখাট যন্ত্রপাতি ব্যবহার-কৌশল শেখা - শিক্ষায় উন্নত দেশগুলিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এ-সবই শিক্ষণীয়। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় এখনও পুঁথি-গত বিদ্যার উপর ঝোঁক বেশী। প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিক যুগোপ-যোগী করতে আগে এর সংশোধন করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বভারতীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই রাজ্যে ছয় থেকে এগার বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিনা বেতনে সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হচ্ছেন। ভাল কথা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং শিক্ষা বাবদ কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার হিসাব করাই যথেষ্ট নয়। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বর্তমানে পড়া-শোনার যেরকম ব্যবস্থা তাতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সামান্যমাত্রই সাধিত হওয়া সম্ভব। কুশিক্ষা অথবা শিক্ষার ঠাটমাত্র খাড়া রাখা অশিক্ষার চেয়ে ভাল মনে করা যায় না। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতার মান শোচনীয়; শিক্ষকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে বিস্তর গলদ দূর-দূরান্তরে গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলগুলি নিয়মিত চলে না, চলে কি না সে-বিষয়ে পরিদর্শনের ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ, এ-সমস্ত অভিযোগ অনেককালের এবং অভিযোগগুলি অধিকাংশই সত্য। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই ব্যবস্থাকেই তিন-চার গুণ স্ফীত, বর্ধিত করার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-কর্তারা অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, এ-নয়, আরও অনেক কিছু করা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য—যেমন আগামী বছরের মধ্যে প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হবে—(১) প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির গবেষণা, (২) প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য গ্রন্থাদি রচনা এবং (৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ-শিক্ষাপ্রাপ্ত অধ্যাপক গোষ্ঠী গঠন। পরিকল্পনা মন্দ নয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং সে-শিক্ষার মান উন্নয়নের সঙ্গে এই পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হবে না। প্রাথমিক স্কুলগুলিতে লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা যাতে কিছুটা উন্নত, সুশৃংখল এবং আধুনিক প্রয়োজনোপযোগী করা যায় সেজন্য অবিলম্বে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনটা কেবল পরিমাণ ও সংখ্যার হিসাবে নয়, গুণ এবং যোগ্যতার বিচারে সার্থক হওয়া চাই।

অনশ্বর

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ফুলন্ত মাধবীলতা কিম্বা গাঢ় আকাশের রঙ,
সমুদ্রে বেগনী সন্ধ্যা, পাহাড়ের বহিমান ভোর,
তেমনি একটি দৃশ্য তুমি:
খানিক বিমুগ্ধ হয় মন
তারপর ফিরে আসে আপন আলোর
সহজ সীমায়।
ঝরে যায় সমস্ত কুসুমই,
আকাশের রঙ মোছে, সমুদ্র-পাহাড়
কতোক্ষণ থাকে মহিমায়?
তুমিও ত অন্ধকারে হও একাকার
থাকি শুধু আমি, আমি একা, অনশ্বর,
দর্শক এবং দৃশ্য সবকিছু বিস্মৃতির পর॥

সন্ধ্যা ভাঙার রঙ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বেপথু আকাশ। সন্ধ্যা ভাঙার
আগুনের বন্যায়
মেঘের পাহাড়ে মনের জটায়ু
ভাঙা ডানা ঝাপটায়।

সেই দিন নাও, সেই রাত নাও, ঘুমে ভারি চোখ দুটি
প্রতিদিনকার জীবন-মরণ হৃদয়ের সব ছুটি।

সূর্য তোমাকে পেরিয়ে-পেরিয়ে যাই
নয়ন তোমাকে ভাবে যেন পাই-পাই।
আসে কতবার স্মৃতির পাহাড় কামনার নানা রঙ
কাকে খুশি করে, কাকে চোখ ঠারে? বিদ্যুৎ-ভরা ক্ষণ
সন্ধ্যা ভাঙার রঙের আগুনে মেশে
চোখে তার জল ঠোঁটে তার হাসি আপন সর্বনাশে॥

স্থায়ী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

রেখেছিলাম পদ্মাতে নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি
অনেক পরে — দিতেই হবে
অনুভবে
[illegible] ধরবে কেবল পা দুখানি।

নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
সে দিতে চায় নির্ধনিকা
মরণপ্রিয় যেতেই হবে
অনুভবে
আভূমিতল থাকবে তোমার পা দুখানি।

হৃদয়পুর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এখানে ছিলো অন্ধকার
হৃদয়পুরে জ্বলিত তার
ডুবিয়াছিলো নদীর পার
[illegible]
কী কাজ তারে করিয়া পার
সতর্কিত বন্ধদ্বার
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর
হৃদয়পুরে জ্বলিল তার

এখানে ছিলো খেলা
চলিতেছিল মেলা
[illegible]
নয়ান ক্ষমাহীন
যাহার ভ্রু-কুটিতে
প্রহরা চারিভিতে
এখানে এইবেলা
ফুরালে ছেলেখেলা?

রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন এ মাসের পয়লা বিদেশযাত্রা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারো দিন থেকে তিনি বৃটেনে আসছেন। বৃটেনে তাঁর ন' দিনের সফর। তারপর তিনি দেশে ফিরবেন ২৪এ জুন। গত মাসে ডঃ রাধাকৃষ্ণন আফগানিস্তান ও ইরান ঘুরে এসেছেন। প্রায় ঐ সময়েই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানা যায়।

দু বছর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের যোগাযোগ এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। ইরানের শাহ-এর মধ্যস্থতায় দু পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট হয়েছে। অবশ্য পাকতুনিস্তানের প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো পক্ষই স্বীকার করছেন না যে তাঁরা নিজেদের কোট ছেড়েছেন। পাকিস্তান সরকার বলছেন যে পাকতুনিস্তান সমস্যার অস্তিত্বই তাঁরা স্বীকার করেন না। আফগানিস্তান সরকার বলছেন যে পাকতুনিস্তান দাবি সম্পর্কে তাঁদের কোনো ভাবান্তর হয় নি [illegible] পাকতুনিস্তান দাবির প্রতি তাঁদের [illegible] আছে। দেখা যাচ্ছে যে পাকতুনিস্তানের প্রশ্ন [illegible] মতান্তর [illegible] এক পাশে সরিয়ে রেখে দু পক্ষের [illegible] উপর জোর দিয়ে [illegible] একটা মিটমাট করে নিয়েছেন।

এই মিটমাট [illegible] ভারতীয় রাষ্ট্রপতির আফগানিস্তান ইরান সফর যে সমসাময়িক ঘটনা হয়েছে এটা সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে যদি এই সময়ে মিটমাট না হত তা হলে পাকিস্তান সরকারের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে যেতে পারত যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সফরকে পাক-আফগান মনোমালিন্য বৃদ্ধির কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাতে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মনেও একটা অস্বস্তির ভাব থাকত। সুতরাং শাহ্ যে এই সময় পাক-আফগানিস্তান বিবাদের একটা মোটামুটি মীমাংসা করে দিতে পেরেছেন সেটা খুবই ভালো হয়েছে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণন নতুন বিদেশে যাচ্ছেন না। বস্তুত তাঁর মতো দেশ-বিদেশে ঘোরার অভ্যাস এবং সুযোগ অল্প লোকেরই হয়েছে। অধ্যাপক হিসাবে, রাষ্ট্রদূত হিসাবে, 'ইউনেস্কো'র কাজে, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বহু বছর ধরে দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। পৃথিবীর এমন অল্প দেশই আছে যেখানে লোকেরা তাঁকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে করবে। আমেরিকায় বা বৃটেনে তো কথাই নেই। সেখানে তিনি সুপরিচিত। তবে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে এই প্রথম গেলেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মার্কিন সফর যে ভারতের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয়েছে এবং হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের [illegible] পাণ্ডিত্য ছাড়াও বিশেষ একটি "স্টাইল" আছে যার প্রভাব এবং আকর্ষণ অমিতশক্তিশালী পদের অধিকারীরাও অনুভব না করে পারেন না। ডঃ রাধাকৃষ্ণনের

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ কেনেডী

[illegible] তাঁদের মনে একটা যেন ত্রাসের মতো [illegible]। এরকম দক্ষ সফল "মাস্টারি" [illegible] ইতিহাসে অতি অল্প লোকই আয়ত্ত করতে পেরেছেন।

মস্কোতে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়ে যান শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। নিজের নানারকম যোগ্যতা ছাড়াও পণ্ডিত জওহরলালের ভগিনী বলে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর একটা বিশেষ মান বা "স্টেটাস" আছে। তা সত্ত্বেও তিনি মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়ে থাকা-কালীন স্তালিনের সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ-কারের সুযোগ পান নি। শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মীর পরে ডঃ রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় রাষ্ট্র-দূত নিযুক্ত হয়ে মস্কোতে যান। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর ভাগ্যে যে তাচ্ছিল্য জুটেছিল, ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে তা সইতে হয় নি। অবশ্য এই পরিবর্তনের মূলে ছিল সোভিয়েট গবর্নমেন্টের নীতি পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন। কিন্তু ডঃ রাধা-কৃষ্ণন এই পরিবর্তনের ফলভোগী মাত্র ছিলেন না, এই পরিবর্তন তাঁর দ্বারা

রেডিও শোনবার আনন্দ!
SIEMENS
INDIA
মাত্র
২৭০৲টাকা
আগের দাম : ৩৫৫৲ টাকা
সীমেন্স সুপার আর-এ ১০১ এ-সি/আর-এ ১০১ জি-ডব্লিউ
এ-সি/ডি-সি মেইনস্ মডেল ও টেবিল মডেল ট্র্যানজিস্টর

কিছুটা প্রভাবান্বিত এবং হতাশ্বিত হয়েছিল।

আমেরিকায় ডঃ রাধাকৃষ্ণন যে সমাদর লাভ করেছেন তার মধ্যে কেবল ভদ্রতা নয়, প্রেসিডেণ্ট কেনেডির দিক থেকে একটা গভীর শ্রদ্ধার ভাবেরও আভাস পাওয়া যায়। এই রকম প্রতিনিধির দ্বারা ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির কাজ হয় না, কিন্তু বৃহৎ মংগলের জন্য সহযোগিতার সেতু দৃঢ়তর হতে পারে। আশা করা যায় যে, সে দিক দিয়ে ডঃ রাধা-কৃষ্ণনের মার্কিন সফর ভারত-আমেরিকা তথা সাধারণভাবে পৃথিবীর পক্ষে মংগল-প্রসূ হবে।

আমেরিকা থেকে ডঃ রাধাকৃষ্ণন বৃটেনে যাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঠিক এই সময় বৃটিশ রাজনৈতিক জগতে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটছে যাতে ম্যাকমিলান সাহেবের কনজারভেটিভ গবর্নমেণ্টের ঘর প্রায় কাত হবার যোগাড়।

কয়েকদিন আগে বৃটেনে মিউনিসিপ্যালিটি-গুলির নির্বাচন হয়ে গেছে। তাতে বহু মিউনিসিপ্যালিটি যেগুলি কনজারভেটিভ-দের হাতে ছিল সেগুলি তাদের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। পার্লামেণ্টের বাই-ইলেকশনে এবং মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের ধারা থেকে বোঝা যায় যে জনমত এখন লেবার পার্টির অনুকূলে। অবশ্য ইলেকশন না করে এখনো প্রায় এক বছর কনজারভেটিভ গবর্নমেণ্ট থাকতে পারে এবং ইতিমধ্যে জনমতকে নিজেদের অনুকূলে আনার একটা জোর চেষ্টা এবং সেই অনুসারে ইলেকশনের তারিখ ঠিক করাই ছিল ম্যাকমিলান সাহেবের প্রধান চিন্তার বিষয়। কিন্তু একটা ব্যাপারে অকস্মাৎ কনজারভেটিভ গবর্নমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত বেশী ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সে ব্যাপারটা যুদ্ধমন্ত্রী শ্রীপ্রফুমোর পদত্যাগের সংগে জড়িত।

শ্রীপ্রফুমোর বয়স ৪৮ এবং তিনি বিবাহিত। কিছুদিন আগে ২২ বছর বয়স্কা "মডেল" মিস কীলার নামের সংগে তাঁর নাম জড়িত করে নানা কথা রটতে আরম্ভ করে। কথাটা পার্লামেণ্টেও ওঠে কারণ লণ্ডনস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের "নেভাল এটাশে"রও মিস কীলারের কাছে যাতায়াত ছিল। মিস কীলার যুগপৎ বৃটিশ গবর্নমেণ্টের যুদ্ধমন্ত্রী এবং সোভিয়েট গবর্নমেণ্টের একজন কূটনৈতিক এবং সামরিক কর্মচারীর প্রণয়সংগিনী থাকাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্ন ওঠে। শ্রীপ্রফুমো তখন প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে জানান এবং পার্লামেণ্টেও বলেন যে, মিস কীলারের সংগে তাঁর কখনো কোনো অবৈধ সম্পর্ক হয়নি। এই ব্যাপারের সংগে ডাঃ ওয়ার্ড নামীয় এক ব্যক্তির নাম উঠে। তিনি মিস কীলারের সংগে তার বন্ধুদের যোগা-যোগ ঘটান বলে রটনা হয়। ডাঃ ওয়ার্ড নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী এবং হোম সেক্রেটারীকে চিঠি লেখেন তাতে তিনি মিঃ প্রফুমো এবং মিস কীলারের অবৈধ সম্পর্কের কথা লেখেন। প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারী এবং হোম সেক্রেটারী কেউ নাকি ডাঃ ওয়ার্ডকে আমল দেন না। তখন ডাঃ ওয়ার্ড লেবার পার্টির নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসনকে এইসব কথা জানান। এই অবস্থায় শ্রীপ্রফুমো বাধ্য হয়ে প্রধান-মন্ত্রীকে জানান যে তিনি স্ত্রী এবং পরি-বারের মান বাঁচাবার জন্য পূর্বে মিথ্যা কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীপ্রফুমো সংগে সংগে মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

এই ব্যাপার নিয়ে বৃটেনের রাজনৈতিক জগৎ ভীষণভাবে আলোড়িত হচ্ছে।

বৃটিশ মডেল মিস কীলার ও তার প্রণয়সংগী পদত্যাগকারী যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ প্রফুমো

....

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত 'ড্রাগনের দাঁতে বিষ' এ সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না। আগামী সপ্তাহ হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে।

....

কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যেও ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে। লিবারেল পার্টির নেতা শ্রীম্যাকমিলানকে শুধু অর্থাৎ গবর্নমেণ্টকেই পদত্যাগ করতে বলছেন। বিরোধী দলের নেতা শ্রীহ্যারল্ড উইলসন বলেছেন যে, কারো ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে তাঁরা কোনো হল্লা করতেন না, কিন্তু এই ব্যাপারের সংগে যখন রাষ্ট্রের নিরাপত্তার একটা প্রশ্ন জড়িত আছে, তখন পার্লামেণ্টে এ বিষয়ের আলোচনা করার দাবি তাঁরা করেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টের এখন ছুটি চলছে, আগামী সপ্তাহে পার্লামেণ্টের অধিবেশন আবার আরম্ভ হবে।

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় বলা যায় না। এই সময়ে যদি গবর্নমেণ্ট পদত্যাগ করেন এবং নূতন নির্বাচন হয় তাহলে কনজারভেটিব পার্টির পরাজয় এবং লেবার পার্টির জয় সুনিশ্চিত। সুতরাং এই সময়ে পদত্যাগ না করে কীভাবে থাকা যায় শ্রীম্যাকমিলান সেই চেষ্টা করতে পারেন। বর্তমান হাঙ্গামাটা কোনো রকমে কাটিয়ে উঠতে পারলে একটা চেষ্টা হতে পারে হাওয়াটা কীভাবে একটু কনজারভেটিবদের অনুকূলে আনা যায়। কিন্তু যে কেলেঙ্কারী বেরুল তারপরে গদী আঁকড়ে থাকলে জনমত আরো বেশী কনজারভেটিবদের বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে। বরঞ্চ এখন পদত্যাগ করলে পার্টির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা কিছুটা থাকবে এবং রাজনৈতিক লাভালাভের দিক দিয়ে সেটা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক হবে—কনজারভেটিব পার্টির মধ্যে এই মতও নিশ্চয়ই কেউ কেউ দেবেন। যাই হোক, ম্যাকমিলান গবর্নমেণ্ট এখন পদত্যাগ না করলেও এই অবস্থায় তাঁদের দুর্বলতা অপ্রকট থাকতে পারে না। এই অবস্থায় বৃটেনে ভারতের রাষ্ট্রপতির আগমন হচ্ছে। এটা বৃটিশ গবর্নমেণ্টের পক্ষেও সুখকর নয় এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণনেরও অস্বস্তিবোধ হবে। ইতিহাসের ঘটনার স্রোত যে কোথায় কী কারণে কোন্ মোড় নিতে পারে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

১০-৬-৬৩

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে 'এভারেস্টের জয়-পরাজয়' প্রবন্ধের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল যে, ১৯৫৬ সালে সুইস অভিযাত্রী দল এভারেস্ট বিজয়ে সফল হননি। প্রকৃত তথ্য হল: ১৯৫২ সালে সফল হননি, ১৯৫৬ সালে সফল হয়েছিলেন। —সম্পাদক দেশ

স্বাধীনতা এক নয়। জন বানিয়ান কারাগারের কুঠুরীতে কঠোর বন্দি-জীবনের অধীনতার মধ্যেই পিলগ্রিমস প্রগ্রেস লিখেছিলেন। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তাঁর আন্তরিক সম্পদ। এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতাকে শিল্পী যদি নিজে বিপন্ন না করেন, তবে তাঁর পক্ষে যে-কোন বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও যথার্থ আর্টের সৃষ্টি অসম্ভব নয়।

ভয় সেখানে, যেখানে রাষ্ট্রের অথবা সামাজিক কোন সংস্কারের শাসনে ব্যক্তিত্ব এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্বই সহজ আগ্রহে, স্বাধীন সন্ধিৎসা ও অনুশীলনে এবং স্বচ্ছন্দ প্রসন্নতার সঙ্গে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ এবং প্রমাণ আছে যে, একনায়কের দেশে, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট এক-নায়কতার দেশে এমন ট্র্যাজেডি ঘটেছে।

মাননীয় ক্রুশ্চফ নিজেই অভিযোগ করে বলেছেন যে, আধুনিক এক হাজার সোভিয়েট লেখক বস্তুত এক হাজার 'ডেড-সোল' মৃত-আত্মা। আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট রাজনীতিকের প্রচারের প্রয়োজন হিসাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্রষ্টা লেখককে ব্যক্তিত্ববিহীন একটা প্রতিধ্বনি করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। সোভিয়েট লেখকের লেখায় রাষ্ট্রিক ইচ্ছা ও নির্দেশের ভজনা আর্ট হিসাবে যতই ব্যর্থ হোক না কেন, অন্তত দেশপ্রীতি তথা জাতি-প্রীতি হিসাবে তার কিছু সার্থকতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট-সাহিত্য নিতান্ত একটি কপট সৃষ্টি; সেটা বস্তুত দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতক প্রচেষ্টার নিদর্শন।

কার্ল মার্ক্স নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ মনীষী। কিন্তু তাঁর মনস্বিতা প্রায় এক-শত বছর আগের একটি চিন্তাক্রিয়ার ব্যাপার। মার্ক্সের অভিমত আজকের পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার কাছে নিতান্ত সেকেলে একটি আবেদন মাত্র। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের পক্ষে মার্ক্সীয় অভিমতের দাবি বস্তুত জীর্ণ অতীতের দাবি। দুঃখের বিষয়, মার্ক্সের পুঁথির লেখা অবলম্বন করে এবং লেনিনের নাম নিয়ে সেকালের কেতাবী ধর্মোন্মাদনার মত একটা রাজনীতিক মতবাদের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এই মতবাদ, এই কম্যুনিজম্ যেমন ব্যক্তির বাক্তিত্বের, তেমনিই শিল্পীরও চিন্তা ও কল্পনার স্বাধীন প্রকাশ সহ্য করতে চায় না।

হাজার বছর ধরে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর অ্যারিস্টটলের শাসন অপ্রতিহত ছিল। বিজ্ঞানের চরম সত্য অ্যারিস্টটল লিখে দিয়ে গিয়েছেন, তার বাইরে বিজ্ঞানের আর কোন সত্য নেই, থাকতেও পারে না—এই ছিল কয়েক শতাব্দীর ইউরোপের ধারণা। অ্যারিস্টটলের ধারণার প্রতিবাদ করে যে বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, স্পঞ্জ জড় পদার্থ নয়, জলজ প্রাণী; তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে চরম সত্য বলে মেনে নেবার ফলে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইউ-রোপের বিজ্ঞানে নতুন কোন আবিষ্কারের সাড়া জেগে উঠতে পারেনি। আজকের পৃথিবীর মানুষের পক্ষেও সন্দেহ করবার আর ভয় করবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে, মার্ক্সীয় অভিমতকে একটা চরম রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক সত্য বলে মেনে নিয়ে কম্যুনিজম্ও স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার অভিব্যক্তি স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

ফ্রান্সেও একদিন চিন্তার বিপ্লব এবং

ফ্রান্সের বিপ্লব ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রায় সব সভ্যদেশের চিন্তার উপর কিছু না কিছু আলোড়ন জাগিয়েছিল। কিন্তু সেটা কোন জাতি বা দেশের প্রতিভা ও মনীষার পক্ষে কোন ক্ষতির হেতু হয়নি। আমাদের রাজা রামমোহন রায়ও ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন করে সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসীর বিপ্লবের পক্ষ থেকে কোন সংঘবদ্ধ প্রচার অন্য কোন দেশের কানের কাছে একথা বলেনি যে, এইভাবে কবিতা লিখতে হবে, এই কথাই সাহিত্যের আসল কথা এবং এটাই খাঁটি আর্ট। কম্যুনিজমই একমাত্র মতবাদ, যা বিশেষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থের নির্দেশে ও ইচ্ছায় অন্য দেশেরও সাহিত্য-জীবনের উপর একটা শাসন জাহির করতে চেষ্টা করেছে। রাশিয়ার কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রবিপ্লব সত্যিই ইতিহাসের একটা নির্দোষ অভিনবত্বের ঘটনা হতো যদি অন্য জাতি ও দেশের উপর কম্যুনিজমের অভিযান পরিচালিত করবার চেষ্টা না হতো। অতীতের ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায়ে দেখা গিয়েছে কেতাবী ধর্মের প্রচার-উন্মাদনা অন্য ধর্মের দেশের উপর সশস্ত্র অভিযান না চালিয়ে পারেনি। কম্যুনিজম নামে এই কেতাবী রাজনৈতিক উন্মাদনাও ঠিক তেমনি এক-একটা পার্টি হয়ে অন্য দেশের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভিঘাতের বিপন্নতা ঘটিয়ে চলেছে। চীন আমাদের দেশকে আক্রমণ করেছে। শুধু দেখতে পাওয়া গিয়েছে চীনের হয়ে প্রশস্তি আমাদের দেশের কোন কোন মানুষের লেখা কাহিনী কবিতায় ও নাটকে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছে। এমন ঘটনাকে একটা অভিশাপের দুঃসাহস বলে মনে করে দেশের মানুষের মন এবং দেশের সাহিত্য-জীবন যদি সতর্ক না হয়, তবে খুবই ভুল করা হবে। জুপিটার যাকে হত্যা করতে চায় আগে তার বুদ্ধির বিনাশ সাধন করে। আজ পর্যন্ত যা দেখা গিয়েছে, তাতে এই ভয়ানক সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের দেশের কম্যুনিজমের প্রচারের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো শিল্পীর চিত্তের সহজ দেশপ্রেমের অগ্রহটির বিনাশ সাধন করা। জাতির ঐতিহাসিক জীবনের কোন মহত্বকে শ্রদ্ধা করা এমন কি গংগা-হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনাও নাকি শিল্পী-মনের অধোগতি। এবং স্টালিনকে কবিতায় মা বলে ডাক দেওয়াই প্রগতি।

কম্যুনিস্টের প্রচারিত এই ভয়ানক কপট প্রগতির মোহ কিছু-কিছু নিরীহ অথচ অসতর্ক শিল্পী ও লেখকের উদ্‌ভ্রান্তির হেতু হয়েছিল। সুলক্ষণ এই যে, তাঁদের মোহভংগ হয়েছে।। সবচেয়ে বড় আশার কথা এই যে, দেশের মানুষের মন সাবধান হয়েছে।

বিশারদ

যাকে আমরা মনেপ্রাণে পরম বিচক্ষণ ও প্রবল বিজ্ঞ বলে মনে করে, একদিন বিলক্ষণভাবে গ্রহণ করেছিলাম, তাকে যে এইভাবে বিস্মৃতির রসাতলে নিক্ষেপ করতে পারব—এ কথা কখনো মনে করি নি।

কংসারিমোহন প্রামাণিকের কথা মনে পড়ল আজ হঠাৎ। তার কথা মনে হওয়া মাত্র জীবন থেকে কুড়িটি বছর কেটে বাদ দিয়ে অনেকটা পথ পিছু হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেম সেই ডেরায়, সেই ডেনে।

সে এক মনোহর ডেরা আমাদের। কিন্তু তার চেয়েও মনোহর ছিল আমাদের এই নিত্যসঙ্গীটি—এই কংসারিমোহন। জীবনকে বড় সহজভাবে নিতে পেরেছিল কংসারি। জীবনে যে কোনো সমস্যা থাকতে পারে কিংবা কোনো সাধনা থাকতে পারে এ বোধ তার বুঝি ছিল না। সে সুখী ছিল এই জন্যে। সব জিনিসই তার কাছে ছিল জলের মত সোজা। পাঁচজনে যে জিনিস নিয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে সেই [illegible] সে [illegible] বলে দিত [illegible]।

[illegible] এবং তাকে আমরা বলতাম বিশারদ।

যুদ্ধ-সম্পর্কিত এই কঠিন কলরবের মধ্যে সেই মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুশিতে মন ভরে উঠছে। সেই ভয়ংকর যুদ্ধের নানাবিধ অশান্তি ও অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও দিনগুলি আমাদের কেটেছে কেমন মজায়।

সারাটা দুপুর আমাদের বেকার জীবন কাটত বেশ আনন্দে। যুদ্ধের হুংকার যতই ঘোরতর হয়ে উঠত, ততই ঘোরতরভাবে আমরা মেতে উঠতাম কংসারিকে নিয়ে।

কংসারি প্রামাণিক। মেদিনীপুরের ঘাটাল সাব-ডিভিশনে ওর বাড়ি। ভাগ্যকে খুঁজে বার করার জন্যে ও এসেছিল এই শহর-কলকাতায়। কিন্তু তার ভাগ্য বুঝি ছিল অন্য বন্দরে। যুদ্ধের বেশ পরে তার ভাগ্য এসে হাজির হল তার সম্মুখে।

কিন্তু কংসারি নির্বিকার, কংসারি নির্লিপ্ত। চৌকির উপর জোড়াসন হয়ে বসে সে হাঁটু দোলাত, আর মুচকি-মুচকি হাসে।

হেসে বলে, "[illegible] করে দখল এবার হিটলার। লোকটা যুদ্ধ জানে না।"

আমরা অবাক হয়ে গেলাম তার এই কথা শুনে। হিটলার তখন পৃথিবীর সেরা লড়িয়ে বলে খ্যাতি লাভ করেছে, তার কাছে চেকোস্লোভাকিয়া কাত হয়ে গেল, ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইন বেকুব বনে গেল আরও কত বড় বড় কাণ্ড করে একে একে সারা দুনিয়াকে তাক্ লাগিয়ে চলেছে হিটলার,—আর সেই হিটলার কিনা যুদ্ধ জানে না!

সত্যিই সে ছিল একজন বিশারদই। তাকে এই পদবীটা দেবার জন্যে আমরা ঘটা করে সভা করি নি অবশ্য। আমরা কজনে মিলে একদিন বিধবা বিবাহ সহায়ক সমিতির অফিস-ঘরে বসে তার কথা শুনতে-শুনতে হঠাৎ বলে উঠলাম—প্রায় সমস্বরেই বুঝি বলে উঠলাম—"সত্যি কংসারি, তুমি যেমন-তেমন লোক না তুমি সত্যিই একজন মান্য-গণ্য লোক। সত্যিই তুমি বিশারদ।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা সকলের এখন মনে নেই হয়তো। সেই ভীষণ প্রলয়কাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম আমরা। এটা আমাদের দুর্ভাগ্যই হোক আর সৌভাগ্যই হোক—এটা আমাদের ভাগ্য। সেই ভাগ্যের উপর বাড়তি ভাগ্যও একটা ছিল, সেটি হচ্ছে এই কংসারি। সে সময়ে কংসারিকে পেয়ে আমাদের জীবনের গ্লানি অনেক কমেছিল। যুদ্ধের পঞ্চব্যঞ্জনে নিত্য মসলার যোগান দিত এই কংসারি। এতে যুদ্ধের স্বাদটা আমাদের কাছে হয়ে উঠেছিল মুখরোচক।

অনেকদিন বাদে আজ আবার চারদিকে শব্দ শোনা যাচ্ছে—যুদ্ধ যুদ্ধ।

ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-সংক্রান্ত যাবতীয় বিভীষিকা যেমন ভেসে উঠছে চোখের সামনে বীভৎস মূর্তি নিয়ে, সেই-সঙ্গে আর-একটি মূর্তিও ভেসে উঠছে সেই চোখেরই সামনে। সে-মূর্তিতে কোনো বিভীষিকা নেই, সে-মূর্তিটি বীভৎসও নয়।

কংসারিকে আমরা প্রশ্ন করতে লাগলাম। নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে আমাদের বুঝিয়ে বলতে লাগল যুদ্ধের কূটকৌশলের কথা। কিভাবে লড়তে হয়, শত্রুকে ভড়কে দিতে হয় কিভাবে।

আশ্চর্য হয়ে শুনতাম তার কথা। শুনতে বেশ ভালো লাগত। এক-এক সময় কাটা
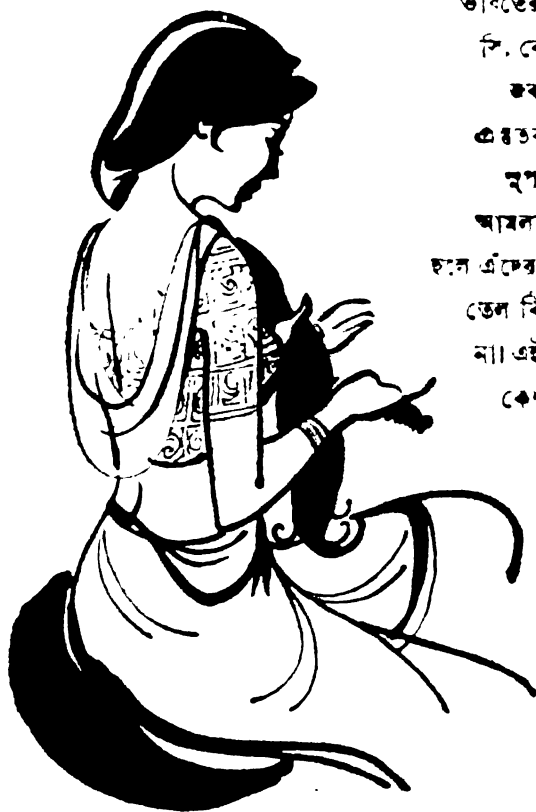
দিয়ে উঠত পারে। কংসারির বর্ণনায় নিখুঁত তত্ত্ব ও তথ্য থাকত এমনই।

আমরা তখন বেকার। বেকার লোকেরা সব সময় খুব ব্যস্ত থাকে, তাদের অবসর থাকে খুব কম।

আমরাও ছিলাম খুব ব্যস্ত, আমাদের অবসর একেবারে ছিল না বললেই হয়। সকাল দশটায় তাড়াহুড়ো করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতাম, বাড়িতে ফিরতে রাত দশটা এগারোটা বেজে যেত প্রায়ই।

সারাটা দিন কাটত একটা ডেরায়। এখানে জমায়েত হত বেকারেরা। এইজন্যে এর নাম আমরা দিয়েছিলাম বেকারি।

এই বেকারিতে রুটি-বিস্কুট সেঁকা হত না, এখানে ট্রেডল মেশিনে ছাপা হত হ্যান্ডবিল, লেটারহেড, পোস্টার আর বিয়ের ও শ্রাদ্ধের চিঠিপত্র। একতলায় এই ছাপাখানা। দোতলায় তিনটি ঘর। তার দুটিতে মেস হাউস, অন্যটিতে বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতির আপিস। এই আপিসের কর্মী ছিলেন মাত্র একজন, তাঁর নাম সদাশিব রক্ষ।

ছাপাখানার পার্টনার দুজন—ফণীন্দ্র মিত্র ও যতীন রক্ষিত।

মেস-ঘর দুটিতে ছজন প্রাণী। তার মধ্যে দুজন [illegible] বাইরে [illegible] দুজনেই [illegible] আর [illegible]। বাকি চারজনের মধ্যে একজন হল কংসারি প্রামাণিক।

বাইরে থেকে আমি এসে জুটতাম এখানে—প্রত্যহ নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে। জায়গাটার উপর প্রবল আকর্ষণ জন্মে গিয়েছিল। মনে হত, জীবনে হঠাৎ কোনো কাজ জুটে গেলেই সব মাটি: সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে তা হলে। এমন মনোরম জীবনটা তা হলে আর মনোহর থাকবে না।

এই আড্ডাটার উপর এতটা টানের কারণ অনেকটা ছিল কংসারি। তার কাছ থেকে যুদ্ধের খবর না শোনা পর্যন্ত সব কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকত। সকালের খবরের কাগজে টাটকা আর গরম গরম খবর পড়ে মন ভরত না। কংসারির মন্তব্যগুলো ঐসব খবরের সঙ্গে জুড়ে না নেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের আসল ছবিটাই চোখে ফুটে উঠতে চাইত না। নাকে-মুখে কিছু গুঁজে নিয়েই হন্তদন্ত হয়ে রওনা হতাম বেকারির উদ্দেশে।

সেদিন বড় বড় খবর বেরিয়েছিল কাগজে। ক্ষুদে জেনারেল রমেল আফ্রিকার একটা ভয়ংকর রকম সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সেনাপতিদের হতভম্ব করে দিয়েছে।

ছুটে গেলাম বেকারিতে। বিধবা-বিবাহ-আপিসের চেয়ারে পা তুলে বসে আছে কংসারি। আমাকে দেখেই হাসল, বলল, "ইডিয়ট।"

বেকুবের মত মুখ করে তাকালাম তার

মুখের দিকে। সে মুখ প্রশান্ত, সে মুখ শান্ত।

তার মুখের দিকে চেয়ে খুব রাগ হল। অনেকটা পথ হেঁটে এসে বেশ ক্লান্ত হয়েছি, তার উপর আমাকে দেখামাত্রই তার এই আচমকা সম্ভাষণটায় বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে-বসতে বললাম, "মানে?"

সে জিজ্ঞাসা করল, "কিসের মানে?"

তার এই প্রশ্নটায় আরও বিরক্ত হলাম, বললাম, "দেখ, কংস, যখন-তখন অমন বেয়াদপি ভালো লাগে না। হঠাৎ ইডিয়ট বললে কেন আমাকে?"

আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল কংসারি, ইডিয়টের মত হাসতে লাগল, বলল, "তোমাকে বললাম নাকি?"

"তবে?"

"বললাম রমেশকে—তোমাদের ঐ ক্ষুদে জেনারেলটিকে।"

রমেশের রণনৈপুণ্য দেখে পৃথিবীর রণ-বিদ্‌রা তখন স্তম্ভিত, আফ্রিকার রণাঙ্গনে তার বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল জাঁদরেল-জাঁদরেল সেনাধ্যক্ষরা, তাকে বিনা কংসারি—

কংসারি বলল "আরেকটা বেকুব। ভূমধ্য-সাগরের কিনার বরাবর না এগিয়ে তার উচিত ছিল—"

কংসারি থামল একটু দম নিয়ে নিল, তার পর বলল, "যুদ্ধে নামার আগে সে যদি ঐ এলাকার ম্যাপটা ভালো করে দেখে নিত তবে এই আহাম্মকি করত না। যুদ্ধের অ-আ-ক-খ না জেনেই একটা সেনাবাহিনীর পরিচালনা করা ঠিক না।"

বিপুল আত্মপ্রসাদে প্রীত ও স্ফীত হয়ে উঠল যেন কংসারি।

রোগা লিকলিকে তার চেহারা, বেশ লম্বা গড়ন তার। মুখের চোয়াল দুটো উঁচু, দাঁতে-দাঁতে চেপ দিলে চোয়ালের চওড়া ভেদ করে দুপাশের ঢেউ-খেলানো হাড়ের চেহারা দেখা যায়। উঁচু পাটির সামনের দুটো দাঁতের মাঝে অনেকটা ফাঁক যখন আত্মপ্রসাদের হাসি সে হাসে তখন দাঁতের ঐ ফাঁক দিয়ে গোলাপী রঙের জিভ খানিকটা বেরিয়ে আসে।

রমেশের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী টাটকা পড়েছি সকালের কাগজে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ঐ সেনানায়কটির কীর্তি ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, সকলেরই মুখে তার নাম। অথচ, আমাদের যুদ্ধ-বিশারদ বন্ধুটি সে-সব সংবাদে এতটুকুও খুশি না।

কংসারির উপর শ্রদ্ধা ছিলই, আজ তার এই কথা শুনে তার উপর শ্রদ্ধা আরও বাড়ল।

আমি এখন এখানে একা। সদাশিব তার

আপিসে এখনো আসেনি, ফণীন্দ্র আর যতীন হয়তো তাদের ছাপাখানার কাজ যোগাড় করার জন্যে এখনো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অতএব, এখন একা আমিই তার শ্রোতা।

অনেকক্ষণ ধরে কংসারি কি-যেন ভাবছে। মাঝে-মাঝে কুঁচকে উঠছে তার ভুরু, চোখের মণি-দুটো একটু নড়ে নড়ে উঠছে।

অনেক চিন্তার পর কংসারি একটু নড়ে বসল, দুটো পা চেয়ারে তোলা ছিল, একটা পা নামিয়ে বসল, তারপর বলল, "ব্যাপার কি জান অবিনাশ, জার্মানরা জাত হিসেবে খুব বড়ো, কিন্তু একটা জায়গায় তারা বড্ড উইক—তারা যুদ্ধ জানে না।"

খবরটা জানা ছিল না, তাই অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম তার কথা।

যুদ্ধ-জাতীয় জিনিসটা কাকে বলে, কিভাবে লড়াই করা দরকার, শত্রুকে কাবু করার জন্যে কি কি ধরনের আক্রমণ করা উচিত—এ-সব প্রশ্ন করলে কংসারি হাসত, তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত তার সোনালী [illegible] একটু উঁকি, কিন্তু কোনো উত্তর সে দিত না।

[illegible]

[illegible]

কিন্তু কিভাবে যে এমন [illegible] উঠল, [illegible] দেখলাম, [illegible] বিশেষজ্ঞ হয়েছে কি না—এ-সব কথা [illegible] জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। তবে সুযোগ পেয়েছি [illegible] দিয়েছে যে, [illegible] জানতে হলেই যে [illegible] করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। বুদ্ধি দিয়ে তা [illegible] করতে হয়, [illegible] বুদ্ধিতে না কুলোয়, তবে কূটবুদ্ধি লাগাতে হবে।

এসব কথার মানে আমরা বুঝিনি। কিন্তু এটা বুঝেছি যে, নিজে কূটবুদ্ধি জানি, তা জানান না দিয়ে অন্যে কিছু জানে না, তা ঘোষণা করেও নিজেকে বিজ্ঞ বলে জাহির করা যায়। জানিনে, হয়তো এই ব্যাপারটিকেই কংসারি কূটবুদ্ধি বলে উল্লেখ করে থাকবে।

বিধবা-বিবাহ আপিসে অনেক আবেদন-নিবেদন আসে। সদাশিব বেশ শান্ত প্রকৃতির লোক। তার এই আপিস-ঘরেই আমাদের বৈঠক বসে বেশি। সে কান পেতে সব শোনে, এবং এক-মনে পড়ে যায় চিঠিপত্র।

এক পাশে বসে বিড়ি টানছিল যতীন, হঠাৎ সে বলে উঠল, "কি হে, ভালো কোনো অ্যাপ্লিক্যাণ্ট পেলে নাকি? পেলে বোলো। ক্যাণ্ডিডেট আছে।"

সদাশিবের সঙ্গে যতীনের ভাব একটু বেশী। সেইজন্য সদাশিবের উপর দাবিও তার বেশী। যতীন বিয়ে করেছিল কিন্তু বউ-এর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ছাড়াছাড়ি হয়ে আছে। কিন্তু সেজন্যে সে একটুও যেন দুঃখিত না, একটুও মনমরা না। সংসারি যেমন পৃথিবীটাকেই একেবারে সহজভাবে গ্রহণ করেছে যতীনও তেমন তার এই দাম্পত্য-ট্র্যাজেডিটা নিয়েছে নিতান্তই সহজভাবে। সে মন্তব্য করে থাকে যে, কুমারী মেয়ে বিয়ে করেই সে ঠকেছে, কুমারীদের মনের মধ্যে কু-মতলব ঠাসা; এবার সে বিয়ে করবে বিধবা, তাদের শ্বেত বসনের মতই তাদের মনও শ্বেত হবে নিশ্চয়ই। অমনি সাদামাটা মেয়ে যদি সে পায়—

সুতরাং সদাশিবের কাছে প্রায়ই ও ঐ ধরনের আবেদন করে থাকে। আবেদন করে থাকে বটে, কিন্তু সে আবেদনের মধ্যে অনুনয়ও নেই, অনুরোধও নেই। তার আবেদনটাও নেহাত সাদামাটা।

কিন্তু সংসারির সমান এর আগে কখনো এ ধরনের রসিকতা সে করেনি। আজ তার হল ... কাঁস একটু যেন চমকে করে উঠল, একটু চড়া গলাতেই বলল, "কি বললে?"

যতীন অভ্যাসবশে তার দিকে চেয়ে বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিয়ে চটির তলা দিয়ে ঘষে দিয়ে বলল, "বললাম সদাশিবকে। বললাম, ভালো পাত্রী চাই। বললাম, একটা ক্যাণ্ডিডেট আছে।"

মুখটা যেমন লাজুক-লাজুক হয়ে উঠল সংসারির। যেমন নেকুর আর বোকা যেন হয়ে গেল সে হঠাৎ। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "সত্যি বলছি, আমি কিন্তু এখন বিয়ে করব না। নিজের পায়ে আগে একটু দাঁড়িয়ে নিই।"

সবাই অবাক হয়ে গেলাম। সদাশিব, যতীন আর আমি। আমরা এ-ওর মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে নিলাম। হাসিটা চেপে গেলাম, হয়তো গিলে ফেলতে লাগলাম হাসি। কিন্তু যতই গিলে ফেলতে লাগলাম, ততই যেন উদ্‌গার উঠতে লাগল হাসিরই। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, আমাদের এই নিশাচরটি এই আপিসে এসে এভাবে বসে থাকে কেন।

যতীন একটা বিড়ি বের করে তার মুখের দিকটা ফুঁ দিয়ে বিড়িটা উল্টে নিয়ে মুখে নিয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বলল, "তা

হয় না। নিজের পায়ে পরে দাঁড়িয়ো। সদাশিব, মেয়ে বাছো।"

লজ্জায় কুঁকড়ে গেল কংসারিমোহন। তার জন্যে আমরা মোহিনী বাছাই করছি, এই সম্ভাবনাতেই সে গদগদ হয়ে উঠল।

যতীন বলল, "তুমি বিশারদ। জীবনে মন্মথ না করেই মন্মথ-বিশারদ হয়েছ, এটা চাট্টিখানি কথা না। এমন বরাত কার কবে হয়েছে? তুমি তো ভাগ্যবান যুবক হে। বিবাহ-বিশারদ হীরালালের খবর দেখেছ তো? বেচারিকে বিশারদ হতে হয়েছে আঠারোটি বিয়ে করে—মুফত ও খেতাব সে পায়নি। মেয়ের বাপেদের ধাপ্পা দিয়ে দিয়ে টাটকা আইবুড়োটি সেজে গ্রামের পর গ্রামে গিয়ে যৌতুক আদায় করে নিয়ে তো বিয়ে করে চলেছিল। কতটা ঝক্কি সে নিয়েছিল মাথা পেতে বলো তো। পুলিস যদি ওকে ধরে না ফেলত, তা হলে বাহাত্তরটি বিয়ে না করে কিছুতে সে থামত না। আর, তুমি?"

কংসারি বলল, "মাইরি, আমার ভাল্ লাগে না।"

আমরা তিনজনে হেসে উঠলাম শব্দ করে, টেবিল চাপড়াতে লাগল যতীন। ঐ শব্দ শুনে মেস্-ঘর থেকে ছুটে এল আশিস, সুব্রত, হেমন্ত আর যাদবেন্দ্র।

সমস্ত বৃত্তান্ত তারা শুনল মনোযোগ দিয়ে। যতটা গম্ভীর হয়ে শোনা দরকার, তারা তার চেয়েও বেশী গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল টেবিল ঘিরে।

যাদবেন্দ্র বলল, "মন্মথ জানতে হলে বিয়ে করতে হবে। হিটলার আনম্যারেড, তাই মন্মথ সে জানে না। আমাদের বিশারদবাবুই তো বলেন জার্মানরা মন্মথ—"

সুব্রত বাধা দিয়ে বলল, "বিশারদবাবু যা বলেছেন, তাতে ভুল নেই। ও কথা নিয়ে টানাটানি কেন। এখন কথা হচ্ছে, এ'র একটা হিল্লে করা। এ-কাজে সদাশিববাবু আমাদের সহায় হতে পারেন আশা করি?"

সদাশিব কোনো উত্তর দিতে পারল না। সে একটা আপিস চালায়, দপ্তরের দলিল নিয়ে তো তামাশা করা চলে না।

সদাশিব মাথা নীচু করে বসে তার ফাইল ওল্টাচ্ছিল।

সুব্রত বলল, "সদাশিব যে একেবারে গবেষণায় বসে গেছে। অত কি গবেষণা করছ হে?"

সদাশিব মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "গবেষণা কি হে। ফাইল দেখছি।"

"ওই হল। ওর নামই গবেষণা। আজকাল ওকেই গবেষণা বলা হচ্ছে জান না?"

সদাশিব ও সব জানে না, সুব্রতর চাপে পড়ে তাকে কথা দিতে হল যে, সে এ ব্যাপারে সহায় হবার চেষ্টা করবে।

এই-যে বাড়িটা—এই-যে বেকারি—এটা সারাটা দিন নিশ্চল ও নির্জীব, নিরীহ আর নীরব হয়ে পড়ে থাকে। একতলার ঘরে মাঝে-মাঝে ঘটাং-ঘটাং শব্দ করে চলতে থাকে প্রেসের মেশিন, ছাপা হয় হ্যাণ্ডবিল বা অন্নপ্রাশনের চিঠি। ঐ শব্দটুকুই এই বাড়িটার হৃদ্‌স্পন্দনের ধ্বনি।

হঠাৎ সেই বাড়িটা হয়ে উঠল একটু সরগরম। বিয়ে-বিয়ে রব উঠল বাড়িটায়। প্রায় বিয়ে-বাড়ি হয়ে ওঠার মত হল এর অবস্থা।

নীচে ছাপাখানার সিসার অক্ষরগুলো মূর্তি ধারণ করে উঠল পাশাপাশি কেস-গারে বসে কয়েকটা বাক্য হয়ে ওঠার জন্য। ছাপার যন্ত্রটা দুধ-শঙ্খ-আঁকা কাগজে সেই বাক্যগুলির ছাপ তোলার জন্য লালায়িত হল।

ঠিক। তাই। ঐ অক্ষরদের আর ঐ যন্ত্রটার প্রতিনিধি হয়ে কালিমাখা হাত দিয়ে

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

পশ্চিমের খোলা দ্বার দিয়ে যেসব উপহার এসেছে আর আমাদের জাতীয় জীবনের সংগে বেমালুমভাবে মিশে গেছে, গৃহসজ্জার অংগ হিসাবে ঘরে নানা আধারে ফুল, ফল বা বাহারী পাতা সাজানোকে তার মধ্যে গণ্য করতে পারি।

ছোটো চেরীবৃক্ষে ফোটা ফুলের মেলা

আমাদের দেশে অতিকাল থেকে দেবতার উদ্দেশ্যে কুসুমসম্ভার নিবেদিত হতো, পত্রপুষ্পশোভিত উৎসব মণ্ডপ্রান্তে মাংগলিক আম্রপত্রর শুভ সূচনার ইংগিত ছিল, পুষ্পমালা ছিল সুন্দরীর অংগভূষণ কিন্তু ঠিক যেভাবে আজ ফুল সাজানো হয় সেটা বহুলাংশেই ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শের প্রভাব।

আমাদের দেশের ফুল পাতার আদর ছিল না, তা কিন্তু নয় তবে পুষ্পসজ্জার ধারা ছিল ভিন্ন। পত্রপুষ্প প্রীতির সংগে মানব-সভ্যতার, সংস্কৃতির, বিশ্বাস ও সৌন্দর্য-প্রীতির ইতিহাস জড়িয়ে আছে। প্রাচীর-চিত্রে, ভাস্কর্যে সর্বত্র নানা ফুল ফল পাতার কত শত নমুনা আমাদের দেশে আছে, যেমন আছে আসিরিয়া, মিশর বা ব্যাবিলনের স্মৃতিতে। রোমের যখন বিজয় সম্মান ছিল Laurel, Palm আমাদের জাতীয় পুষ্প কমল ছিল সৌন্দর্যের প্রতীক, সহকারশাখা নির্ভরতার নিদর্শন। মধ্যযুগে ইউরোপে গোলাপ ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি ও বাকসংযমের চিহ্ন। ভোজসভার ছাদে তাই গোলাপ লতা আঁকা হতো। ভোজের আসরে

বাজার থেকে মাছ তরকারির চেয়ে চড়া দামে কেনা ফুলপাতা গৃহিণীকে নূতন শিল্প-ধারার সন্ধানে এগিয়ে দিয়েছে। দেশ-বিদেশের, যুগযুগান্তরের পুষ্পরচনা-শৈলীর সঙ্গে যোগ যতই থাকুক, সৌভাগ্যের বিষয়, অন্ধ অনুকরণের অবকাশ নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশে বা প্রাচ্যের জাপান ইত্যাদি দেশে ফুলসাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে, ক্লাব আছে, পুরস্কার আছে, কিন্তু আমাদের শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই তার সৌন্দর্য সাধনার সুযোগও অন্য সকলের চেয়ে নিবিড়ভাবে নিজস্ব, তার ব্যক্তিত্বের একটি অংশ।

আমাদের বেল, গন্ধরাজ ইত্যাদি ছোট পিতলের ঘটিতে রাখলে ধরে একরকম কোমল সুবাসিত সৌন্দর্য আনে যার তুলনা নেই। বেলফুল পাতা ও ডাঁটাসুদ্ধ তুলে জলে রাখলে ৪।৫ দিন পর্যন্ত একটি দুটি করে ফুল ফোটে পাতাগুলিও টাটকা তোলা পাতার মত নরম ও উজ্জ্বল থাকে। ছড়ানো পাত্রে ফোটা পদ্মফুল বোঁটা কেটে জলে ভাসিয়ে দিলে ভারী সুন্দর দেখায় সঙ্গে সম্ভব হলে দু-একটি পাতা দিতে পারলে তো কথাই নেই। ফুলের অভাবে কেবলমাত্র পাতা দিয়ে পাত্র সাজানো চলে। তবে একটা দারুণ বাহারী পাতা না পেলেও সাধারণ ঘরের পাশের আটপৌরে পাতা, আমের মুকুল, বাঁশের ফুল ব্যবহারেও বেশ সুন্দর দেখায়।

যেখানে হাতের কাছে ফুলের গাছ নেই বা নিত্য বাজারে ফুল কেনা সম্ভব না, সেখানে টবে ফুলগাছ বা পাতাবাহার লাগিয়ে ঘর সাজানো চলে। মাটির টবকে নানা রঙে রং করে বসিয়ে দিলে আরও সুন্দর দেখায়। কাঠের ফ্রেমের বিচিত্র বর্ণের ঝুড়ি লোহার রেলিং জালি প্রভৃতি টবের আধার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। যে গাছ লাগানো হবে টবটি যেন তার সঙ্গে মানানসই হয়। অবশ্য যে গাছের চারা পরে তাড়াতাড়ি বড় হয় তার টব বড় হওয়া দরকার না হলে শীঘ্র টব বদল করার প্রয়োজন হতে পারে। একটি ছ' ইঞ্চি ব্যাসের টবে প্রায় ১৫০০ গ্রাম সার মেশানো মাটি লাগে আর লাগে টবের তলায় দেবার জন্য ইঁটের টুকরো পাথরকুচি বা ঐরকম আর কিছু যাতে টবে জল দিলে জল জমে না থাকে। মাটির উপরে এক আঙুল পরিমাণ জায়গা খালি রাখতে হবে জল দেওয়ার জন্য। মাটিতে পোকামাকড় থাকার সম্ভাবনা থাকলে রোদ দেখিয়ে নেওয়া উচিত। বিদেশে মাটি গরম করে নেওয়া হয় কিন্তু আমাদের রোদই যথেষ্ট। পাতার সার বা গোবরের সার যে কোনটা দিলেই হবে। বাজারে সার মেশানো মাটি পাওয়া যায় তবে নিজে হাতে মিশিয়ে নিলে ভালই হয়। কেবল দেখতে হবে মাটি একেবারে ভিজে বা শুকনো না হয়, মাটি থাকবে সামান্য

ভিজে ভিজে ভাবের। এই সামান্য ভিজে ভিজে মাটি প্লাস্টিকের থলিতে মুখ বন্ধ করে রেখে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা চলে।

লক্ষ্য রাখতে হবে কখন টব বদল করা দরকার। গাছের শিকড় যখন টবের মাটির চারপাশে জড়িয়ে যাবে তখন নতুন টবে গাছটি লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ন্ত গাছের জন্য ৩।৪ মাস অন্তর দেখা দরকার টব বদল করতে হবে কিনা। যে গাছ ধীরে ধীরে বাড়ে তা বছরে একবার হলেও হয়। গাছের গোড়ার শিকড়ে হাত না দিয়ে নতুন টবে মাটি রেখে তাতে সাবধানে বসিয়ে উপরে একটু মাটি দিতে হবে। আগের টবের চেয়ে খুব বেশী বড় হবার দরকার নেই বরং বেশী বড় হলে মাটি শুকিয়ে যাবার ভয় থাকে। টবের জল দেওয়ার ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। কোন গাছ বেশী জল চায় আবার ক্যাকটাস প্রভৃতি জল সঞ্চয় করে রাখে এজন্য অনেকদিন পর্যন্ত জলের দরকারই বোধ করে না। বড় টবে জল বেশী দরকার, ছোট টবে কম। টবের উপরের মাটি যখন শুকনো লাগবে তখন জলের প্রয়োজন। মনে রাখা উচিত জলের অভাবে যত গাছ মরে প্রায় ততটাই মরে জলের আধিক্যে। বেশী জলে গাছের গোড়া অক্সিজেন গ্রহণ করতে কষ্টবোধ করে আর ক্রমে ক্রমে পচে যায়। অনেক গাছেরই সূর্যালোক প্রয়োজন, বিশেষত ফুলগাছের। এজন্য খররৌদ্র বাঁচিয়ে সূর্যালোক যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায় তাও দেখা দরকার। সূর্যালোকের সাহায্যে গাছ তার পারিপার্শ্বিক হাওয়া ও জল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। পাম বা বাহারী পাতার কোন কোনটি অত সূর্যালোকে না রাখলে ভাল থাকে। মাটির টবের বদলে কাঠের বাক্স, লোহার আধার ব্যবহার করে গাছ রাখা যায় তবে জল জমে যেন না থাকে। গাছের যে অংশে ফুল থাকবে তার সংগে সামঞ্জস্য রেখে কাঠের বাক্স তৈরি করা যায়। ধরুন কোথাও একটু আড়াল করার জন্য ফুল বা পাতার গাছ লাগালেন। লম্বা করে কাঠের বাক্সের আধার তৈরি করলেন ভিতরে একটি আস্তরণ দিলেন যাতে বাক্সটি মাটিতে পচে না যায় তারপর সযত্নে রাখা যায় এরকম গাছ দিয়ে সাজালেন। বাক্সের সংগে বাঁশের জালি লাগিয়ে নিয়ে লতা গাছ যেমন money plant তুলে দিলেন বেশ চমৎকার আড়াল বা পার্টিশন হয়ে যাবে। কাঠের বাক্সে মুথা গাছ বা sanse viera দিয়ে, বাঁশের জালিতে money plant দিলেও সুন্দর হয়। নিজের রুচিমত রকমফেরের অভাব নেই। খুব সাধারণ জিনিসও এত চমৎকার দেখায় যে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। একবার একটি পাত্রে পাথরের কুচির সংগে পেঁয়াজকলি লাগানো দেখেছিলাম। স্থানবিশেষে বেশ মানায়।

money plant-এর বহুল প্রচলন হয়েছে। গাছের শুকনো ডালের গায়ে money plant জড়িয়ে দিয়ে ঘরের কোণে রেখে দেখবেন কত সুন্দর দেখায়। মাঝে মাঝে পাতাগুলি জলে ধুয়ে দেবেন। পাতায় যে সাদা ছাতার মত হয় তাতে সামান্য অ্যামকহল জলে মিশিয়ে তুলো দিয়ে ছুঁয়ে দেবেন কারণ ঐ সাদা ছাতা একটি কীটাণু—যা গাছ ধ্বংস করে দিতে পারে। money plant রাখার একটি সহজ ও সুন্দর ব্যবস্থাতে তাকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। লোহার জালি কেটে লম্বা ধরনের করে মুড়ে গোলস্তম্ভের মত করে বন্ধ করে দিন। ঐ জালির ভিতরটি পাহাড়ী শেওলা বা moss (বাজারে পাওয়া যায়) দিয়ে ভরে দিন। টবে money plant লাগিয়ে ঐ তারের নলের গায়ে তুলে দিন। নলের মাথায় ছোট একটি টব জলে ভরে লাগানো থাকবে আর টবের তলার ফুটোর মধ্যে একটি পলতে দেবেন যাতে ফোটা ফোটা জল সর্বদা ঐ মসকে ভিজিয়ে রাখে। এই ভিজে মসের সংস্পর্শে সুন্দর সতেজ হয়ে থাকবে money plant: আর ঘরের কোণে নিত্য ধরা থাকবে কিশলয়ের সবুজ দীপ্তি।

সত্যিই একজন আছে এবং সেই লোকটি আর-কেউ নন, স্বয়ং তিনি।

১৮৫৮ সালের গ্রীষ্মকালে লিয়র একবার গিল্ডফোর্ড যাবেন ব'লে লণ্ডনের এক স্টেশনে ফাঁকা দেখে রেলের এক কামরায় উঠে বসলেন; কামরায় ছিলেন লিয়র ছাড়া মাত্র আরেকজন যাত্রী, বৃদ্ধ—পলিতকেশের মধ্যে চকচকে একটি ইন্দ্রলুপ্ত শোভমান; কামরায় লিয়রকে উঠতে দেখে একবার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকিয়েই তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লিয়রও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না-ক'রে পকেট থেকে নাম-লেখা রুমাল বের ক'রে মুখ মুছে, মাথার টুপি ও ছড়ি পাশে রেখে দিয়ে এক ধারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে রইলেন। তারপর কী মনে ক'রে পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে নিয়ে আরেকবার প'ড়ে নিলেন—তাঁর

'কবে যে এক লোক ছিলো এই টিলায়'—

উদ্দেশে লেখা চিঠি, গিল্ডফোর্ডে যাঁর কাছে যাচ্ছেন তিনি লিখেছেন, সময়মতো পৌঁছানো যাবে কি না আন্দাজ করবার জন্য চিঠিটা থেকে তিনি ট্রেনের সময় মিলিয়ে নিলেন। নাঃ, কোনো গোল হয় নি। এই গাড়িতেই তাঁকে যেতে বলা হয়েছে: মোট-[illegible] ভদ্র এই গাড়িটা, টিকিয়ে-টিকিয়ে সবগুলো স্টেশনে থামতে-থামতে যায় না, মাঝে-মাঝে মফস্বলের স্টেশনের দিকে দৃকপাত না ক'রে কেবল বড়ো স্টেশন-গুলোতেই থামে।

ট্রেন যখন ছাড়ো-ছাড়ো, এমন সময়ে দুজন মহিলা দুটি বাচ্চা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে [illegible] এই কামরাটায় উঠে বসলেন। [illegible] ছেলে দুটি এডোয়ার্ড লিয়র নামে একজন লেখকের একটি সদ্য [illegible] আজগুবি বই উপহার পেয়েছে—[illegible] ফুর্তি, তাদের আর আনন্দ [illegible] একসঙ্গে—কাড়াকাড়ি ক'রে তারা ছড়া পড়ছে আর খিল খিল ক'রে হেসে উঠছে যেন গাড়ির পড়ে যাবে; বুড়ো ভদ্রলোকটি প্রথম দু-একবার খুব একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাদের দিকে তাকালেন কিন্তু ছেলে দুটি তাঁকে লক্ষই করলো না; চেঁচিয়ে তারা পড়তে থাকলো:

কবে যে এক লোক ছিলো এই টিলায়
আশ্চর্য আশ্চর্য বসন-ভূষণ [illegible]—
[illegible]
[illegible]
পরি-বসন-পোশাক করে লোকটা ছিলো টিলায়।
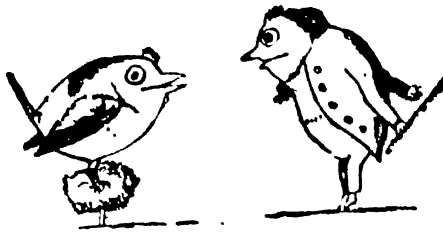
ছিলো এক যে বুড়ো, বললে : এই! কী হচ্ছে! চুপ! চুপ!

কিংবা

ছিলো এক-যে বুড়ো, বললে: 'এই! কী হচ্ছে!
চুপ! চুপ!
ঝোপের মধ্যে দেখছি তরুণ পক্ষীশাবক
অপরূপ!
[illegible] 'ক্ষুদ্র ধরন'
[illegible] উল্টো বরং—
[illegible] চতুর্গুণ তো বটেই'—জবাব হ'লো
[illegible]

আর তার পরেই চ্যাঁচামেচি : 'দেখি দেখি—কী ছবি আছে এই ছড়ার সঙ্গে!' ব'লেই দুজনে মিলে কাড়াকাড়ি ক'রে ছবি দেখেই আবার হেসে গড়িয়ে লুটিপাটি, শেষটায় এমন হ'লো যে, তাদের এই উচ্ছ্বসিত হাসা-রোলে ও মজায় পুরো কামরাটাই [illegible] দিয়ে বসলো—শুধু সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি ছাড়া। কেবল লিয়র জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে আপন মনেই হেসে ফেলতে লাগলেন।

পরে যখন আরো দুটি-চারটি ছড়া পড়া হ'লো:

বাউণ্ডুলের হদ্দ, ছিলো একেবারে সীমান্তে,
এমন উড়নচণ্ডী শ্রীমান, চাও মানতে না
না-মানতে।
[illegible]
টুপির মধ্যে [illegible]
কুঁচকে শুধু এ-সব কীর্তি দেখতো [illegible]
সীমান্তে।

না এই [illegible] আরো-কতগুলি, তখন বুড়ো ভদ্রলোকটি আর থাকতে পারলেন না, বেশ একটু সবজান্তার ভঙ্গি ক'রে বললেন, 'তা সেই লেখকের প্রতি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।' এই সব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে [illegible] চাপ [illegible] করতে-করতেও যিনি কিনা ছোটো-বড়ো নারীপুরুষ সকলের বিনোদনের জন্য এমন একটি উপাদেয় বই রচনা করবার সময় ক'রে নিলেন, তাঁকে উদ্দেশ ক'রে টুপি

'বাউণ্ডুলের হদ্দ, ছিলো একেবারে সীমান্তে'...

খুলে দিতেই হয়।'

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে এমন একটি বাচ্চা বক্তৃতার ভারিক্কি গলা শুনে মহিলা দুজন কিছুটা অবাক হলেন, আর কথঞ্চিৎ বিমূঢ় এডোয়ার্ড লিয়র চকিতে একবার জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে কৌতূহলের সঙ্গে ভদ্রলোকের আগাপাশতলা নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন, তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

বুড়ো ভদ্রলোক এবারও আবহাওয়া প্রসঙ্গ কিংবা অন্য কোনো আলোচনার সূত্র নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে মহিলা দুজনকে সরাসরি জিগেস ক'রে বসলেন, 'বইটির লেখক কে, তা জানেন?'

'কেন?' একজন মহিলা বললেন, 'এই তো বেশ গোটা-গোটা হরফে লেখা আছে "এডোয়ার্ড লিয়র কর্তৃক চিত্রিত ও প্রণীত।"'

'আহা! ও তো কেবল ছাপা কথা!' বুড়ো ভদ্রলোক বাধা দিলেন, 'ছাপা কথা মাত্রই তো আর মুদ্রিত-লিখিত সুসমাচার নয় এটাও আসলে লেখকের আরেকটা খাম-খেয়াল। পুরো বইটাই তো মজার ব্যাপার।' যেন কোনো গোপনীয় তথ্য ফাঁস ক'রে দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে বুড়ো ভদ্রলোক এবার নিচু গলায় বললেন 'লেখক আর কেউ নন, স্বয়ং ডার্বির আর্ল। এডোয়ার্ড তাঁরই অন্য নাম: আর এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আর্ল কথাটার হরফগুলো উল্টেপাল্টে ঠিকঠাক ক'রে নিলেই লিয়র কথাটা পাওয়া যায়। বইটার মধ্যে যেমন উল্টোপাল্টা এক জগতের কথা বলা হয়েছে তেমনিভাবে ই এ আর এল এই হরফগুলিকে এলোমেলো ক'রে দিয়ে এল ই এ আর অর্থাৎ লিয়র কথাটা তৈরি হ'লো।'

'কিন্তু' বলেই [illegible] মহিলাদুটি [illegible] সাংসারিক [illegible] মনে [illegible] কিন্তু এই দেখুন না বইয়ের উৎসর্গ-পত্র' এক মহিলা বলে উঠলেন '[illegible] প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী [illegible] এবং তাঁদেরও ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে গ্রন্থকার এডোয়ার্ড লিয়র এই ছবি ও ছড়ার বইটি উৎসর্গ করেছেন।"'

'এটা আর কিছু নয়,' তক্ষুনি সপ্রতিভ একটা উত্তর এলো, 'কেবল একটু ধাঁধা লাগিয়ে দেবার চেষ্টা, যাতে সকলের বেশ গুলিয়ে যায়। পুরো বইটা যে লর্ড ডার্বিরই আঁকা ও লেখা, তা অন্তত আমি ভালোভাবে জানি—জানার সুযোগ আছে আমার। সত্যি বলতে এডোয়ার্ড লিয়র নামে কোনো লোকই নেই।'

'কিন্তু', অন্য মহিলাটির প্রতিবাদ, 'আমার বন্ধুদের কেউ-কেউ যে বলেন তাঁরা এডোয়ার্ড লিয়রকে চেনেন।'

'নিশ্চয়ই ভুল করেছেন তাঁরা—', বাধা পেয়ে-পেয়ে বৃদ্ধ এবার কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ও উত্যক্ত, 'সম্পূর্ণ ভুল। খুব ভালো ক'রে কিছু না-জেনে আমি কক্ষনো কোনো কথা বলি না। তথ্য হিশেবে সেই সঙ্গে আপনাদের আরো জানাতে পারি যে, লিয়র নামে শেক্সপীয়রের পরিকল্পিত রাজা ছাড়া আর কোনো লোক এমনকি কল্পনাতেও কোনোদিন গজায় নি—এডোয়ার্ড লিয়র ব'লে কোনো লোক পৃথিবীতে নেই—কোনোকালে ছিলো না এবং সম্ভবত থাকবেও না কোনো দিন।'

এতক্ষণ লিয়র চুপচাপ ব'সে ব'সে এই বাদানুবাদ শুনছিল; ব্যাপারটা যত জ'মে যাচ্ছে, তত তাঁর মজা লাগছে। কৌতুকের ভঙ্গি ফুটে উঠলো চোখে, কয়েকবার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্যের ঈষৎ স্ফুরণ হ'লো; সম্ভবত আরেকটি পঞ্চপদাবলির প্রথম লাইনটি গুঞ্জন ক'রে উঠলো মনের মধ্যে, 'এক-যে ছিলো মজার বুড়ো রেল-গাড়িতে' কিংবা ওই রকম কোনো লাইন হয়তো আঙুলের ডগাও চঞ্চল হ'য়ে উঠছিলো আরেকটি ছবি আঁকবার জন্য; কিন্তু শেষটায় যখন বুড়ো ভদ্রলোক তিনি তুড়িতে তাঁকে বিলুপ্ত ক'রে দিলেন, তখন তাঁর কেমন একটু ছমছম ক'রে উঠলো। কুশলে থাকতে পারেন কি না একবার চেষ্টা ক'রে দেখলেন, পায়ের গোড়ালি উল্টে গেলো না কেন না কি তাঁর আর ছায়া পড়ে না আজকাল? এবার তিনি মর্মে-মর্মে বুঝতে পারলেন তাঁর এবং তাঁর রচনাকর্ম সম্বন্ধে কী পরিমাণ গুজব, গুজব আর আজগুবি কথা শোনা বলা হয়েছে। প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন হ'য়ে উঠলো। টুপির ভিতরে ব্যান্ডের কোনায়, ছড়ির ডগায় চিরকাল ভাগ্যিস তাঁর নাম লেখা থাকে। ভাগ্যিস সঙ্গে একাধিক চিঠি আছে—তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা। এক ফুৎকারে এই মন্ত্র তাঁকে যে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলো এবার তাকেই তিনি ঘায়েল করলেন: সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হতভম্ব ও ভ্যাবাচ্যাকা দৃষ্টির সামনে একটি-একটি ক'রে তিনি সব প্রমাণ দাখিল করলেন।

এই সত্য ঘটনাটি মনে হয় লিয়রেরই লেখা একটি ছোট্ট কৌতুকময় কাহিনী: আমাদের জীবনে যে মাঝে-মাঝে এমনি প্রায়-আজগুবি অথচ সত্য ঘটনা হরদম ঘটে যায় ও সোডার মতো পেট থেকে ভসভসিয়ে হাসি উঠিয়ে দেয়, তারই প্রমাণস্বরূপ লিয়র এই ঘটনাটি কলমের টানে-টানে এঁকে গেলেন—লক্ষ করলে দেখা যাবে তাঁর লিমেরিকের সঙ্গেকার ছবিগুলোর সঙ্গে এই ছবিটির জাতের কোনো তফাৎ নেই। আর তাতেই বোঝা যায় এই প্রতিটি লিমেরিকই কেমন ক'রে তাদের আপাত-রমণীয় ও হাস্যময় অসম্ভাবনার মধ্যে

টুপি, ছড়ি ইত্যাদি দেখিয়ে লিয়র নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছেন : তাঁরই আঁকা ছবি

আমাদেরই চেনাশোনা জগৎটাকে আস্ত ভ'রে দিয়েছে। ঠাট্টা আছে, বিদ্রূপ আছে, যেমন আছে মশকরা ও নেহাৎই রঙ্গব্যঙ্গ—এমনকি তির্যক ও ধারালো পরিহাসও মোটেই বাদ যায়নি, অথচ তবু এখানেই তার খামখেয়ালির গৌরব ও দিগ্বিজয়—তাৎপর্যময় হওয়া সত্ত্বেও তারা কখনো এবং কোনোখানেই শুদ্ধ ও নিছকই অসম্ভাবনা বা আষাঢ়ে কবিতার হাসখেয়াল ও হৈ-হুল্লোড় হারিয়ে বসে নি। যে-সমস্ত পাগল, দুর্ভাগা, নিষ্ঠুর, গম্ভীর, ঔদরিক, বোকা, বিষণ্ণ, হাসিখুশি, নিশ্চিন্ত, বেচারা, বিরক্ত, নির্বিকার, অসহায়, বিচলিত, হতবাক ও ষণ্ডাগুণ্ডাকে তিনি আমাদের সামনে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তারা কেউই একে-অন্যের পুনরাবৃত্তি, প্রতিমূর্তি বা পুনর্মুদ্রণ নয় ব'লে—প্রত্যেকেই এক এবং অদ্বিতীয় এবং অসামান্য ব'লে—আমাদের এমন তীব্র ও অন্তরঙ্গভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের শনাক্ত ক'রে নিতেও আমাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না; এই সংসারের মধ্যেই তাদের সঙ্গে হরদম দেখা-সাক্ষাৎ হয় আমাদের, এমনকি কখনো হয়তো এটাও মনে হয় যে, বুঝি নিজেকেই কোনো-এক উদ্ভট আয়নার মধ্যে দেখতে পেলাম। এই অনুভূতিটি—বলাই বাহুল্য—অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কিন্তু এই অস্বস্তিটুকু আছে ব'লেই এরা এমন উপাদেয় ও উপভোগ্য; এরই জন্যে এই পাঁচ লাইনের ছোটো ও সচিত্র কবিতাগুলি বারে-বারে ফিরে-ফিরে পড়বার ও দেখবার মতো।

বেঁচেছিলেন অনেকদিন; মৃত্যু হয়েছিলো ১৮৮৮ সালে কিন্তু জীবদ্দশাতেই এমন অনেকের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ছবি আঁকা শেখাতেন, আর টেনিসন যখন সভাকবি তখন 'ই এল-এর প্রতি' নামে তাঁর উদ্দেশে কবিতা লিখেছিলেন, আর জন রাস্কিন যে শুধু তাঁর পরম ভক্তই ছিলেন তা নয়, তাঁর প্রিয় একশো জন লেখকের তালিকার সর্বাগ্রে বসিয়েছিলেন এডোয়ার্ড লিয়রকে, যিনি এমনকি নিজেকে নিয়েও ছড়া কেটে বলেছিলেন:

আর এক বাগানের মালী তো হতভম্ব ও ভ্যাবাচ্যাকা—ভেবেছিলো চাবি দিয়ে খুলে এমন-এক দরজা দেখতে পাচ্ছে সামনে, কিন্তু ভালো ক'রে তাকিয়েই দ্যাখে মুহূর্তে তা হ'য়ে গেলো ত্রৈরাশিকের নিষ্ঠুর ও নির্বিবেক অঙ্ক। দু'জনেই এমন ভঙ্গিতে কথা বলেন যে, মনে হয় যেন কোনো গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে—অথচ সেই অর্থ খুঁজে না-বের করলেও উপভোগে ঘাটতি পড়ে না; শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও রুচি অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন লোক তাদের দু'জনকেই ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে উপভোগ করতে পারেন, তাতে বিন্দুমাত্র আটকাবে না। আয়নার দেশে অ্যালিসের প্রতিটি পদক্ষেপ ও সাক্ষাৎকার দাবার চাল অনুযায়ী হ'লো কি না, সেটা না-জানলেও যেমন সেই অভিযান আদ্যোপান্ত উপাদেয় থাকে, তেমনি উপাদেয় থাকে লিয়রের সেই লিমেরিক যেখানে একটা লোক ঘণ্টার দড়ি ধ'রে ঝুলে প'ড়েছে টানতে-টানতে, তবু কোনো সাড়া পাচ্ছে না কোথাও। ঘণ্টাটা আসলে কী, কেন কোনোই উত্তর নেই কোনোখানে, লোকটা কি ভাই বা বাতুল না সত্যি জিজ্ঞাসু, প্রশ্নগুলি সত্যি আসলে কোন জায়গা—এই সব প্রশ্নের উত্তর না

'ব্যাকুল হ'য়ে অনেক বুড়ো বললে শেষে : দূত্তোর!'

ভাবলেও ছড়া ও ছবির উপভোগ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় না :
ব্যাকুল হ'য়ে অনেক বুড়ো বললে শেষে :
'দূত্তোর!
ঘণ্টা কেবল নেড়েই যাচ্ছি পাচ্ছিনে তো উত্তর!
ঢং ঢং ঢং বাজিয়ে শেষে
পাক ধরেছে কৃষ্ণকেশে,
কেউ যে তবু গা করে না; কোনোই দি নেই
উত্তর?'

লিয়র তো এমনকি সেই সব চরিত্রেরও পরিকল্পনা করেছেন যারা কিনা ছাঁকনি চ'ড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে রওনা হ'য়ে গেলো। আর লিউয়িস ক্যারলের সেই বিখ্যাত আবিষ্কর্তা, শস্ত্র-সজ্জিত বীরপুরুষটি—যার অসম্ভবের সাধনা চিরকাল আমাদের মমতা ও সমবেদনা জাগ্রত করবে—সেও কি স্মরণীয়তায় এই জম্বুলিদের সমতুল্য নয়?

কিন্তু সমস্ত সত্ত্বেও সম্ভবত একটা ব্যবধান থেকেই যায়, চেস্টর্টন তাঁর উজ্জ্বল প্রবন্ধটিতে যাকে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। ব্যবধানটি—চেস্টর্টনের মতে—একেবারেই মৌল; দৈনন্দিন জীবনে লিউয়িস ক্যারল ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও ভারিক্কি, কলেজের মাস্টারমশাই, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও গম্ভীর, পণ্ডিত এবং ঈষৎ নিষ্ঠুর ও অনুদার। কাজেই স্বপ্ন আর বাস্তবের এই উল্টো জীবনযাত্রা অবশ্যত কল্পনার মূলে সত্যটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে—সেই সত্যটি হচ্ছে পলায়নের স্পৃহা : এমন-এক জগতে পালিয়ে যেতে হবে যেখানে ভয়ংকরভাবে সমস্ত কিছুই এক স্থির ও স্থানের যাথার্থ্যের অঙ্গীভূত নয়, যেখানে পাঁচগাছ আপেল ধরলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয় না কিংবা সেখানে তিন ঠ্যাংওলা কোনো অদ্ভুত লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেলেও চমকে যাবার কিছু নেই। সুকুমার রায়ের হযবরল-র জগৎ এটি কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনের দিক দিয়ে সুকুমার রায় লিউয়িস ক্যারলের নিকটআত্মীয় হলেও লিয়রও তাঁর দূর-একটা দূরবর্তী নন। তাঁর মধ্যে বলা যায়—এই দু'জনের মিলন ঘটেছে। এবং পলায়ন-স্পৃহা ও আত্মবিস্মৃত কৌতুকবোধের দিক থেকে লিউয়িস ক্যারল খাপছাড়ার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয়। কেউ যদি ভুল ক'রে রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর দিয়ে চ'লে যায় তাহ'লে দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক দিক থেকে লিউয়িস ক্যারল তাকে ধমকে আধমরা ক'রে দিতেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের মধ্যে এমন-এক জগৎ ছিলো, যেখানে অনায়াসে সূর্যকে বলা যায় সবুজ, চাঁদের টুকরোকে নীল, যেখানে 'ছেলেরা খায় ক্যাস্টরঅয়েল রসগোল্লা ছেড়ে' এবং যেখানে সুতোর হাতে পাটাই, শুনো মানুষ উড়ে চলে। অর্থাৎ তাঁর দুই পা ছিলো দুই জগতে—তাঁর মজার দেশে দেখা যায় উন্মাদ একদল গাণিতিক, যেন তিনি এক মুখোশপরা নাচের মজলিশ সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন: আধুনিক আবহে চাপনার দাঁড়াবার জায়গাই এই দু-টুকরো জমি—এডোয়ার্ড ক্রৌরিহিউ বেন্টলি, এ এ মিলনে, ডিলেয়ার বেলক কিংবা পরিমল রায়, অন্নদাশংকর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু—যাঁরাই পরবর্তীকাল কখনো-কখনো

আবোলতাবোলের জয়গান গেয়েছেন, তাঁরাই দুই পা দুখানে দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন—যদিও এটা ভুলছি না যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একবার 'রংমশালে' লিয়রের ছবি অবলম্বনে ছড়া লিখতে শুরু করেছিলেন, আর পরিমল রায় মাঝে-শাঝে এমনকি লিয়রের তর্জমাও করেছেন। এই পলায়নপন্থা এডোয়ার্ড লিয়রে অনেক কম; কেননা অদ্ভুতের জগতে তাঁর নাগরিকতা স্বভাবসুন্দর। তাঁর ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তাও তাঁরই রচনাবই অংশ :

His mind is concrete and fastidious,
His nose is remarkably big;
His visage is more or less hideous,
His beard it resembles a wig.
He has ears, and two eyes and ten fingers,
Leastways if you reckon two thumbs;
Long ago he was one of the singers,
But now he is one of the dumbs

[illegible] কাব্যের মজার দেশ যেখানে [illegible] লিয়রের মজার দেশ সেখানে অর্থ অনর্থের উপর নির্ভরশীল; তাঁর [illegible] দেশ কেবল যে [illegible] জগৎ তাই নয় এমনকি [illegible] কাব্যের [illegible] প্রতিক্রিয়া কিছু [illegible] মধ্যেই [illegible] আছে [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিক্রিয়ার [illegible] [illegible] কাব্যের [illegible] [illegible] [illegible] সহজ ও [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] আমরা [illegible] [illegible] সহজ ও সরল [illegible] করতে হয়েছিলো। এ-দিক থেকে আমাদের যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা অনস্বীকার্য; মিল কেবল এখানেই নিহিত নেই যে, দুজনেই বর্ণমালা লিখেছিলেন; আসল মিল এইখানে যে, দুজনেই প্রথম কল্পনায় দীক্ষা দেন। অথচ যোগীন্দ্রনাথ সরকার এমন একটা সময়ে কলম হাতে নিয়েছিলেন, যখন কল্পনার চাইতে জ্ঞানের কথা বলা বেশি জরুরি ছিলো; বেশি জরুরি ছিলো প্রকৃতির পাঠশালার দিকে ঔৎসুক্য জাগানো. সেইজন্য আজীবন উপদেশ, পরামর্শ, জ্ঞানবিজ্ঞান পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে রচনা করে গেলেও যেখানে তিনি নিজের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন সেখানেই তিনি অমরতাকে ছুঁয়ে এসেছেন। ছোটোদের ভিজিমাখাম্, পশুপক্ষী বা অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের টুকিটাকি বাদ দিয়ে যা ই তিনি লিখেছেন—হাসিরাশি কি আষাঢ়ে গল্প কিংবা মজার বই সেখানেই তিনি কল্পনা ও আষাঢ়ে ভাবনার স্বপ্নলোকে নিজের নাগরিকত্বকে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। 'সহজ পাঠ'-এর শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কবিতা ও মিলের পাশে দাঁড়িয়েও সেইজন্য এখনো হাসিখুশি কিছুতেই মলিন বা নিস্তেজ হয় না—সেইজন্য এখনো 'হাসিখুশি'ই আমাদের মুখে বুলি ও খুশি ফোটায়। নিছকই জ্ঞানের চর্চা হলে—এটা বলাই বাহুল্য—নিশ্চয়ই হাসিখুশি এই অমরত্ব অর্জন করতে পারতো না।

এটা সর্বস্বীকার্য যে লিয়রের এই আষাঢ়ে সর্বাঙ্গীণ: 'সর্বাঙ্গীণ' না বলে বোধ হয় সর্বগ্রাসী বলাই ভালো। কেবলমাত্র লিমেরিকই নয়, লিখেছিলেন আষাঢ়ে গান, আষাঢ়ে বর্ণপরিচয়—এবং শুধু তা-ই নয়, এমনকি রন্ধনবিদ্যারও আষাঢ়ে প্রণালী, যার তুলনা যে-কোনো ভাষাতেই দুর্লভ—'গগন-কুসুম গঙ্গোপাধ্যায় অলীকচুণ্ড,' ছদ্মনামে একবার যে-বইটির বাংলা করার চেষ্টা 'রংমশালের' আষাঢ়ে পাতায় হয়েছিলো। কেমন করে বানাতে হয় কাটলেট আর কেমন করেই বা বানায় শিঙাড়া? কেন, খুবই তো সহজ। বেশ তো, বানাবার ভাবনা

কী লিখবের রান্নার বই খুলে দেখলেই হয়। মাংসের শিঙাড়া বানাবার চটপটে ও লোভনীয় উপায় সেখানেই বলে দেয়া আছে:

নাও একটা বাচ্চা শূকর—বয়স ধরো তিন কি চার একটা খুঁটির গায়ে তার পেছনের ঠ্যাং আঁটো করে বাঁধো তারপর তার নাগালের মধ্যে রাখো আড়াই সের কিশমিশ, দেড় সের চিনি অনেকখানি মটরশুঁটি ১৮টা সেদ্ধ আখরোট একটা মোমবাতি ছয় ঝুড়ি পালংশাক যদি দ্যাখো যে শূকরটা তা গবগব করে খাচ্ছে তাহলে তাকে ক্রমাগতই এ-সব দিয়ে যেতে থাকো। তারপর নিয়ে এসো খানকটে ক্রীম চীশাযার-পনিরের কয়েক টুকরো চার দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ আর এক প্যাকেট কালো পিন। সব কিছু দিয়ে লেই বানিয়ে নিয়ে বাদামি রঙের ধবধবে রেশমি কাপড়ে ছড়িয়ে দিয়ে রোদে শুকোতে দাও—জলে ভেজে না এমন কাপড় কিন্তু হওয়া চাই। লেই যখন সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে—তার আগে কিন্তু কিছুতেই নয়—শূকরটিকে বেধড়ক পিটি দিতে শুরু করো—কোনো ঝাড়নের হাতল দিয়ে না-মারলে কিন্তু চলবে না। কয়েকদিন ধরে একবার তোমাকে ওই লেই নিরীক্ষণ করবে আরেকবার এসে ওই শূয়োরের বাচ্চাটিকে পেটাতে হবে: ভালো করে লক্ষ রেখো পরে। ব্যাপারটাই রগরগে মাংসের শিঙাড়া হয়ে গেলো কি না। যদি তখনো না হ'য়ে থাকে তাহলে ধরতে হবে যে কস্মিনকালেও হবার সম্ভাবনা নেই, সেক্ষেত্রে শূয়োরের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, এবং সম্পূর্ণ প্রণালীটিকেও শেষ বলে ধরতে তখন কোনো বাধা থাকবে না।'

৩

এ-পথ গেছে কোনখানে

অর্থহীনতাকেই চেস্টারটন সাহিত্যের নতুন অর্থ বলে গণ্য করেছিলেন। মহীয়ান

মতো সত্য আর কে? আর সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নকে আজগবির মতো আর কেই বা আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

এডোয়ার্ড লিয়রের এই পাগল লোকগুলি শুধু সেই সত্যকার জগতের দিকেই ইঙ্গিত করে না, তারা এই বাস্তব ও দৈনন্দিন জগৎকেও ভালো ক'রে চিনিয়ে দিয়ে যায়, সহ্য করতে শেখায় এই অনড় ও অবিচল—অথচ অর্থহীন—যুক্তি ও গণিতকে এবং সেই সঙ্গে আরো শেখায় কী ক'রে তাকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার ক'রে সৃষ্টির ভিতরকার রহস্য ও বিস্ময়কে অভিবাদন করতে হয়। যারা সহ্য করতে পারে না, তারা কেমন লোক যারা অস্বীকার করতে পারে না, তারা কেমন হাস্যকর—এটা যেমন ঝলমল ঠাট্টা ও কৌতুক ও ছন্দ-মিলে তিনি ব'লে দেন তা কি বারে-বারেই, এবং ফিরে-ফিরেই আমাদের মানে ক'রে নেয়া উচিত নয়?

এস্পানিতে ছিলো একটি হদ্দ বুড়ো কাপ্তেন—
[illegible], জ্বর ও দুঃখতাপের মুখে প্রবল
[illegible]'
[illegible] এই ব'লে সে
দু ঠ্যাং তুলে [illegible]
বসেই থাকে কাষ্ঠাসনে এমন বুড়ো কাপ্তেন।

এটা কি কেবল বিদূষকের ছ্যাবলামি নাকি গম্ভীরের ঝুঁটি ধরে কৌতুকের ক্ষণকালীন ছেলেখেলা? কিংবা

যদি ল্যাখো কথা তার
কোনো মানে [illegible]
[illegible] মাথা [illegible],
[illegible]
[illegible]
[illegible]
শুধাবো, [illegible] চাবিটা কী কারণ

আর এই প্রশ্ন ক'রে উত্তর দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে এক মুহূর্তও [illegible] হয়নি:

'একটাতে দর্শন [illegible]
একটু [illegible]
একটাতে কবিতা [illegible],
[illegible]
নিশ্চিত [illegible] একটাতে হো হো [illegible]
পাগলামি [illegible]।
[illegible]
[illegible]।'

এই হো হো রব ও পাগলামির মধ্য দিয়েই সত্যতর কোনো জগৎ এসে হঠাৎ আমাদের সমানে মুখোমুখি দাঁড়ায়, আলেকজান্ডার পোপ ড্রাইডেন গোল্ড-স্মিথ প্রমুখ আলোকপ্রাপ্তরা যাকে কালো একটা পর্দা টাঙিয়ে ঢেকে রাখতে চাচ্ছিলেন।

আসলে এই আষাঢ়ের সাধনা যে আমাদের সমস্ত গম্ভীর বিষন্ন ও হতাশ চেষ্টারই সম্পূরক ও পরিপূরক এটা আমাদের মেনে নিতে হবে। চার্লি চ্যাপলিন যে-জগৎটি আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছিলেন, লিয়রের এই মজার দেশের ভূগোলের সঙ্গে তার কোনোই তফাৎ নেই।

ভবঘুরে, অসহায়, হিতাখির, বাউণ্ডুলে, হাটাবরদার, অভিযাত্রী, কারখানার মজুর যুদ্ধক্ষেত্রের বেচারী সৈনিক, রোমান্টিক, হাস্যকর, খর্বাকৃতি ও কৃশকায় স্বৈরাচারী শাসক, ব্যর্থ ও সফল প্রেমিক—এই বহুরূপী মানুষটি যেমন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে একটি অট্টহাসির জগৎকে দেখিয়ে দেন, তেমনিভাবে লিয়রও আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত করেন, এক জীবন্ত ও উদ্দীপিত প্রহসনলোক। একটা লোক কারখানার চাকার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে পাক খাচ্ছে, খিদের চোটে একজন তার সঙ্গীকে মুর্গি ব'লে ভেবে ছুরি হাতে তাড়া করছে, একটা লোক বউকে এত ভালোবাসে যে তার অসুখ সারাবার টাকা রোজগারের জন্য একটা ক'রে প্রেম করছে আর প্রেমিকাদের বধ করছে, এক মস্ত পালোয়ানের সঙ্গে একটা ছোট্টখাটো লোক ভীতভাবে ঘুষি লড়ছে—এই সমস্ত স্ববিরোধী ও ভয়ংকর ব্যাপারের মধ্য থেকে মজা ও কৌতুক বের করেছিলেন চ্যাপলিন লিয়রও সমস্ত মজা ও ভয়ংকরের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন অফুরন্ত এক হাসির উৎস যে লিমেরিকটিকেই ধরি না কেন সেখানেই আমরা সেই মনকে উদ্ভাসিত হতে দেখবো যা পরে চ্যাপলিনের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

এক যে বুড়ো [illegible] ছিলেন ক্ষুদ্র পাহাড়ে
[illegible] 'ওহো'
আহ্লাদে!
[illegible]
[illegible]
[illegible] ক্ষুদ্র পাহাড়ে।'
এটাও যেমন তেমনি ধরা যাক –

নরমা এক [illegible] ছিলো কোনো বৃহৎ জংশনে,
[illegible] সংলগ্নে।
[illegible]
[illegible] এই [illegible]
[illegible] ব'লেই তিনি ব'সে পড়েন
জংশনে।

বা অন্য যে-কোনোটিই সর্বত্রই ওই একই মনকে উন্মোচিত হতে দেখবো যা বিশ্ব বিধানের সমস্ত ব্যর্থতা হতাশা কষ্ট নিষ্ঠুরতা উন্মাদনা লোভ হিংসা বিভীষিকা দুর্বলতা সার্থকতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের মধ্যেই হাস্যরসের এক অনর্গল ধারাকে উপচে পড়তে দেখেছে হয়তো আমরা সকলেই কোনো-কোনো সময়ে এই অভিজ্ঞতার অংশভাক হই, কিন্তু লিপ্ত জড়িত ও মগ্ন থাকি ব'লে কিছুতেই উচ্চরোলে হেসে উঠতে পারি না। সেই হাসির অধিকার ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য মাঝে-মাঝেই এ'দের কাছে যেতে হবে—অ্যারিস্টোফেনিস থেকে চ্যাপলিন, রাবেলে থেকে এডোয়ার্ড লিয়র, লরেন্স স্টার্ন থেকে লিউইস ক্যারল, এ'রাই আমাদের দেখিয়ে দেবেন কোন অদ্ভুত ও বিচিত্রের সন্ধানে এই পথ দূরকে লক্ষ্য ক'রে চ'লে গেছে; এ'রাই আমাদের দেখিয়ে দেবেন কোনখানে গেলো এই পথ: সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে অভিবাদন ও অভিনন্দন জানাবার জন্য কোন দিগন্ত লক্ষ ধ'রে রওনা হ'লো, তাও তাঁদের সান্নিধ্য থেকেই আমরা আস্তে-আস্তে জেনে নিতে পারবো।

আর সে-জানা কি কম কিছু হবে? পাঁচটি মাত্র পংক্তি, অথচ তারই ভিতর একেকটি আস্ত লোককে পুরে দিয়েছেন লিয়র—, পুরো মাপটা যে তাঁর প্রমাণসই হাস্যরসিকের ছিলো তারই প্রমাণ এই লঘু পদাবলি, সেখানে পাঁচটি মাত্র চরণের ভিতর লোকজনেরা তাদের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও অস্মিতা সুদ্ধু অনায়াসে ফুটে ওঠে। উপরন্তু আছে কথার খেলা ভাষা নিয়ে অদ্ভুত ব্যসন, যেখানে প্রায় প্রতিটি শব্দের সঙ্গেই নতুন ক'রে পরিচয় হয় আমাদের, সব পরিচয় হয় একেবারে তাঁরই দ্বারা সম্পন্ন সংবাক্ষিত কিছু শব্দের সঙ্গে—যে সব অদ্ভুত ও উদ্ভট শব্দের স্রষ্টা তিনি স্বয়ং তাঁর আত্মগারির অভিধান ছাড়া আর কোনোখানে যাদের দেখা মেলে না। সে-আদিম ও সর্বাঙ্গীণ স্বপ্নলোকের দরজা খুলে দিয়ে তিনি আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে যান তাকে আমাদের শৈশবের লুপ্ত দিনগুলির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যখন আমরা প্রত্যেকেই এক অদ্ভুত বিচিত্র ও আবোল-তাবোল জগতের অধিবাসী ছিলুম।

লিয়রের জন্মের দেড়শো বছর হ'লো, এই উপলক্ষে তাঁর লিমেরিকগুলির বাংলা তর্জমা করলে ভালো হবে। পরিমল রায় যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করেছিলেন, সম্প্রতি সত্যজিৎ রায়ের চেষ্টাও চোখে পড়েছে, তরুণ কবিদের মধ্যে কেউ এ-বিষয়ে ভাবছেন না কেন? লিয়র একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন, বাংলা কবিতায় তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান, এবং সর্বোপরি, তিনি আমাদের লুপ্ত শৈশবকে পুনরুদ্ধার করেছেন—এই সমস্ত তথ্য থেকেও যদি কেউ উদ্দীপিত না-হন, তাহ'লে তাঁকে আরেকবার লিয়রের আত্মপরিচয় পড়তে অনুরোধ করবো যা থেকে বোঝা যাবে তাঁর সান্নিধ্যে কিছুতেই ঠকবার কোনো অবকাশ নেই।

'How pleasant to know Mr. Lear
Who has writen such
volumes of stuff'
Some think him ill
tempered and queer.
But a few think him
pleasant enough

'নিজে করে তিনি few বলেছিলেন কিন্তু মাত্র কয়েকজনই শুধু নয় যাঁর সঙ্গেই তাঁর কোনোদিন পরিচয় হয়েছে তিনিই তাঁকে উপভোগ্য ব'লে মনে করেন। আপনার কি তা'ই মনে হয় না?

এই
শৌখীন
পাউডার
সবারই সাধ্যে কুলোয়
Pond's
Dreamflower talc
Dreamflower talc

কিন্তু দিল্লি বা কলকাতা যেমন ভারত নয়, ওয়াশিংটন বা নিউইয়র্ক-ও তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়। এবং এই 'নয়'টা এ দেশে অনেক বেশি পরিমাণে, অনেক ব্যাপক এবং অনেক গভীরভাবে সত্য। দিল্লি আর কলকাতার প্রকৃতিতে প্রভেদ থাকতে পারে কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বা অধিবাসীদের সমষ্টিগত জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মোটামুটি একই বিধি বিধানের আওতার মধ্যে তাদের স্থিতি। আর অত্যন্ত মূল কয়েকটি কেন্দ্রীয় অনুশাসন ছাড়া এ-দেশের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য—এমন কি একই অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন কাউন্টির নিজস্ব বিধান এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিশিষ্ট ধরনের আইন কানুনের কথা হয়তো অনেক পাঠকেরই জানা আছে।

ওয়াশিংটন-এ আজকাল সূর্যাস্ত হচ্ছে রাত সাড়ে আটটার পর। কিন্তু পাশের কোনও এলাকার ঘড়িতে তখনও সাড়ে সাতটা। তার মানে এ নয় যে, সূর্যদেব কোথাও কোথাও পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন।

'ক্যালকাটা টাইম' ছিল ভারত ছাড়া সময় কিন্তু সেদিন বহুকাল গত। **স্কুলজীবনে 'স্থানীয় সময়'** এবং **'মান সময়'** সম্পর্কে **ওয়াকিবহাল হতে** গিয়ে অনেক খেলার সময় কম করতে হয়েছে, কোনও দেশে সামগ্রিক একটা 'মান সময়' থাকা কেন দরকার পরীক্ষার খাতায় তার যৌক্তিকতা দেখাতে হয়েছে ফলাও করে।

বসন্তের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটন এবং আরও কয়েকটি জায়গায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হল দিনের আলো বাঁচাবার জন্যে DAYLIGHT SAVING TIME দেশের বেশ কটি বড় বড় শহরে, এটা একটা বার্ষিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া আরও দু-এক রকম সময়ের প্রচলন আছে সারা দেশে। তার ফলে রেল এবং বিমান চলাচল মায় 'বাস'-এর সময়সূচি সম্পর্কে যে একটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় জনসাধারণকে, তা নিয়ে বেশ খানিকটা সচেতনতা দেখা দিয়েছে ইদানীং। শোনা যায় এক ঘণ্টার সফরে বার সাতেক ঘড়ির কাঁটা ফেরাতে হয় এমন ঘটনাও নাকি ঘটতে পারে তেমন তেমন এলাকা অতিক্রম করে যেতে থাকলে। পূর্ব-পশ্চিমে যার বিস্তৃতি এক মহাসাগর থেকে আর এক মহাসাগর পর্যন্ত, এমন একটা মহাদেশে একটি মাত্র সময়ের নিরিখ প্রচলন করা যুক্তিযুক্ত হয়ত নয়, তাতে স্থানীয় প্রয়োজন এবং সুবিধা-অসুবিধাকে খানিকটা অবহেলাই করা হবে। তাই অনেকে প্রস্তাব করেছেন, যে সময়ের এই পার্থক্যটা যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করতে না দিয়ে কেন্দ্রীয় কোনও সংস্থা যদি বিভিন্ন সময় প্রবর্তনের ব্যাপারটা নির্ধারিত করে দেন, তা হলে বর্তমান জটিলতা খানিকটা হ্রাস পেতে পারে, স্থানীয় বা আঞ্চলিক সময়ের মধ্যে কিছুটা যুক্তিসম্মত সামঞ্জস্য আনা যায়। কথা উঠেছে, যে, এই 'জেট'-গতির যুগে ঘড়ির কাঁটা নিয়ে এই ধরনের যথেচ্ছ নাড়াচাড়া মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা?—অবশ্যই থাকবে তবে মোটামুটি একটা সময়-অঞ্চল যদি ভাগ করে দেওয়া যায়, সেই অনুযায়ী কোনও একটা সময়ের মাপকাঠি বেছে নেওয়ার খানিকটা স্বাধীনতা থাকতে বাধা নেই।

একই অপরাধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে। ছোটখাটো অপরাধ এবং তার শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নিয়ে মাথা না ঘামালেও, গুরুদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাতেও পার্থক্য রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া যেতে পারে, এমন অপরাধের যে তালিকা, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তার রূপ এক নয়। বর্তমানে অবশ্য সারা দেশেই মৃত্যুদণ্ড লোপ করার দিকে একটা সাধারণ চেতনা দেখা দিয়েছে, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কয়েকটি অঙ্গরাজ্য বেশ সক্রিয়ভাবেই মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগ আংশিকভাবেও অন্তত লোপ করতে সচেষ্ট।

অবশ্য মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলেও নানা কারণে এবং উপায়ে তা মকুব হয়ে থাকে, কাজেই দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যার সঙ্গে দাণ্ডিতের সংখ্যার প্রভেদ আছে। এবং সে-সংখ্যা ক্রমশই কমতির দিকে। কোথাও কোথাও হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার তোড়জোড় চলেছে। কোথাও মানুষ চুরি ছাড়া আর কোনও অপরাধেই মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগের বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে। নিউইয়র্ক রাজ্যে পূর্ব পরিকল্পিত নরহত্যার ক্ষেত্রে পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ লোপ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে মৃত্যুদণ্ডবিধানের যোগ্য অপরাধের নিরিখে প্রকারভেদ রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে। কিন্তু বিভিন্নতা থাকলেও, মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যে দেশব্যাপী চেতনা দেখা দিয়েছে, সেটাই বড় কথা।

যে সব অঙ্গরাজ্যে অত্যন্ত কঠোরভাবেই মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, সে সব অঞ্চলে নরহত্যার ঘটনা এখনও বেশিই হয়ে গেছে। আর অপরপক্ষে যে আটটি অঙ্গরাজ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রায়ই কার্যকর করা হয় না, সেখানকার হত্যাপরাধের সংখ্যা ত কই আর কোনও অঙ্গরাজ্যের চেয়ে বেশি নয়! তাই কোনও একটি কারা-আবাসের ওয়ার্ডেন—মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করাই যাঁর প্রধান দায়িত্ব এই নির্মম দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা এবং যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে

বলেছেন 'এটা শাস্তিবিধান নয় প্রতিহিংসাপরায়ণতা।' কোনও এক রাজ্যের গভর্নর বলতে বাধ্য হয়েছেন— আমি মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী, কারণ এ ব্যবস্থা মানুষকে নৃশংস করে তোলে। যে সমাজব্যবস্থায় মানুষের প্রাণ নেবার প্রথা থাকে, সে সমাজে জনসাধারণের মনে প্রাণের মূল্যবোধ সঞ্চারিত করা অসম্ভব।"

কোনও একটি মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের দণ্ডভোগ প্রসংগে এখানকার একটি পত্রিকা যা মন্তব্য করেছে, তার উদ্ধৃতি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না— মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিত কিছুটা অন্য ধরনের হলেও।—"বিচারক মহাশয় দণ্ডাদেশ উচ্চারণ করলেন এই বলে—'মারাত্মক বিষবাষ্পের প্রয়োগে তোমায় মৃত্যুবরণ করতে হবে।' তারপর চিরাচরিত বহু ব্যবহৃত সেই শব্দকটি উচ্চারিত হল তাঁর মুখ দিয়ে—তোমার আত্মার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হোক।' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এর পরের মন্তব্য:—"এই মরজগতে সেই কৃপাময় ঈশ্বরের অনুসরণে যদি তেমনি কোনও ক্ষমা এদের না দেখানো হয়, তাহলে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে কিন্তু আর কোনও বাধাই রইল না।"

দণ্ডাদেশ থেকে আসে, অপরাধের কথা। সম্প্রতি রব উঠেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে ওয়াশিংটন-এ অপরাধ অনুষ্ঠানের আনুপাতিক হার সম্ভবত সবচেয়ে বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানীং নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান থেকে দেখানো হয়েছে, যে কথাটা যথার্থ নয়। অপরাধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ওয়াশিংটন শহরের স্থান এখনও অনেক শহরের চেয়েই নীচে।—এ প্রতিযোগিতায় পরাজয়ই শ্রেয়। তবু অপরাধের সংখ্যা মোটেই নিশ্চিন্ত হবার মতো নয়, তাই সমস্যাটাকে লঘু করে দেখা যাচ্ছে না। বরং তার নিরসনের জন্যে সবাই উঠেপড়ে লেগে গেছেন। উঠে পড়ে লাগা হয়েছে এর মূল কারণ অনুসন্ধানে, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় হাতিয়ার নিয়ে।

অপরাধেরও হাতিয়ার আছে; বিশেষ করে খুন জখম, ডাকাতি-রাহাজানির হাতিয়ার হল প্রধানত বন্দুক। তাই নজর দেওয়া হচ্ছে বন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহারের দিকে। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাবে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার উপযুক্ত বয়স, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রকারভেদ এবং তার আনুষঙ্গিক আইনকানুনে পার্থক্য কম নয়। ওয়াশিংটন-এ এ সম্পর্কিত বিধিবিধান অপেক্ষাকৃত কঠোর বলেই জানা যায়। তবু, এখানেও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরতর করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলেই অনেকের ধারণা। বিশেষ করে ডাকযোগে বন্দুক কেনা বা আমদানী করার যে সহজ ব্যবস্থা বর্তমান, তার ফলে অননুমোদিত আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বিস্তৃততরই হয়ে চলেছে। কথা তোলা হয়েছে যে ঢালাও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তার হাতিয়ারটুকুও শেষকালে রেহাই পাবে না। অপরপক্ষে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাচ্ছে, ডাকযোগে যাঁরা বন্দুক কেনেন তাঁদের অনেকেরই পেছনে রয়েছে অপরাধের ইতিহাস। এবং এই ব্যবস্থায় এমন সব মারাত্মক অস্ত্র সাধারণ মানুষের হাতে গিয়ে পড়ছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও অতি ভয়ানক বলে তাদের চিহ্নিত করা হত। কাজেই হাতিয়ার সামলানো দরকার।

কিন্তু হাতিয়ার চালায় হাত। সেই হাতের মালিক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অপরাধের আসল কারণ। কাজেই এর সংগে আসে সমাজব্যবস্থার কথা, শিক্ষাব্যবস্থার কথা, জীবিকার কথা। অনুসন্ধানের আলো সকল ক্ষেত্রেই পড়েছে, এবং তাই বিশেষ করে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে জীবিকার্জনের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি বিষয়েও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে। কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা নিরাকরণের জন্য দীর্ঘ অবকাশের সময়ে স্কুলের ছাত্রদের সাময়িক জীবিকার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে সম্ভবমতো।

সমস্যা আছে, কিন্তু সেই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনযাত্রা, মানুষের মানসিক গঠনের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাগুলোকে ঢেলে সাজার সচেতন প্রয়াসটাও থাকা দরকার। শুধু বর্তমানের সমস্যাই নয়, অদূর এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যা নিয়েও এখন থেকে সাবধানবাণীর অন্ত নেই, আলোচনার অভাব নেই। তাই, শুধু অপরাধ অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতেই নয় সাধারণভাবেই শিক্ষার

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
AMAZING BLUE POWDER
WHITEST WASH!

পাশ্চাত্য পোশাক পরা হাবশী মেয়ে টাইপিস্ট

পি-এইচ-ডি-র কী ভাগ্য! ল্যুকস বলেছিল, সান্যাল সবচেয়ে ভাগ্যবান, হারার সেরা জায়গা।

রামচন্দ্র শর্মাকে পাঠাচ্ছে গন্ডারে, গন্ডার প্রাচীন রাজধানী টানা হ্রদের ধারে প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অপূর্ব। শর্মা ইংরেজীতে বি-এ-বি-টি, পড়াবে ইংরেজী। ও ইংরেজীতে কথাও বলছিল সবার চাইতে ভালো। কুরুবেল্লা চলল ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারার কাছে মেকেলে নামে এক জায়গায়। সাঠে নয় হাজার ফুট উঁচু আডিসের চেয়েও ঠান্ডা পাহাড়ে জায়গা ডেব্রা-মার্কসে। ওখানে চাল ও তরি-তরকারি পাওয়া যায় কি না সাঠে জিগ্যেস করাতে ল্যুকস নাকি থতমত খেয়ে বলেছিল 'চাল ও সবজি পাওয়া যায় কিনা জানি না তবে গরুর মাংস ও আলু খুব সস্তা'। ল্যুকসের মহাভাগ্য নিরামিষ মহারাষ্ট্রীয় ঐ কথা শুনে অফিসের মধ্যেই বমি করে বসে নি।

সবাই মাইনে পাবে মাসে ৫০০ ডলার করে, তার মধ্যে ১০০ ডলার কাটবে বাড়ি-ভাড়া হিসেবে। অর্থাৎ নগদ মাইনে হল মাসে চারশ ডলার অর্থাৎ আটশ টাকা। ইথিওপীয়ার ডলার ভারতের প্রায় দু টাকার সমান; ইথিওপীয়ার ২½ ডলারে এক আমেরিকান ডলার ইথিওপীয়ার ৭ ডলারে এক পাউন্ড স্টার্লিং। সবাইকে দু মাসের মাইনে আগাম দেওয়া হবে আসবাবপত্র কেনা ও সংসার পাতবার জন্য, এই টাকাটা এক বছর ধরে শোধ করতে হবে।

পুরোনো শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীসহস্রবুদ্ধে নামে জনৈক মরাঠী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। প্রথম ব্যাচের একজন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করে, এতদিনে লখপতি হয়ে গেছে। সাঠে ওদের অতিথি হয়ে গেল। সহস্রবুদ্ধে দম্পতী সাঠে জায়াপতিকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। শর্মা ও কুরুবেল্লাকে নিয়ে আমরা হাইলুর টার্মিতে ফিরতি পথে প্রথমে গেলাম জেনারেল পোস্ট অফিসে। সান্যাল ওর বম্বে নিবাসী ভাই তারাশঙ্করকে তার করে বেরিয়ে এল। বললাম, 'বাবাকে তার করলে?' সান্যাল বললে 'তারার Adair Dutt এর Laborind ঠিকানা ব্যবহার করায় খুব অল্পকথায় হল ওই তো আর বাবাকে বম্বে থেকে ও তার করে জানিয়ে দেবে।'

বেলা বারোটা বেজে গিয়েছিল। আমাদের পান্সিওঁর সামনেই এক ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ। ওখানেই আমরা ঢুকলাম। মেনু কার্ড নিয়ে এল, কিছুই বুঝলাম না ইটালীয় ভাষায় লেখা খাবারগুলো কি। শর্মা ওর মধ্যে থেকে দু-তিনটে আন্দাজে বেছে নিয়ে দেখাল। প্রথমেই এক এক থালা পাস্তা এল। কাটা-চামচ দিয়ে ওটা ম্যানেজ করতে গিয়ে হিমসিম খেলাম; আশে-পাশের সবাই হাসতে লাগল। শেষে পাশের টেবিলের এক বুড়ো ইটালীয়ান উঠে এসে কাটা দিয়ে কি ভাবে জড়িয়ে প্যাঁচিয়ে তুলতে হয় দেখাল। খেতে অখাদ্য। তবে পারিপার্শ্বিকটা বেশ বাড়ির মতোই মনে হচ্ছিল। ইতালীয়রা বেশ হইচই করে খায়। প্রত্যেকটি টেবিলে বিরাট বিরাট মদের বোতল ও মাংসের রাশি। শর্মা পাস্তা খেতে খেতে বললে, খাটার কাঠি সেদ্ধ খাচ্ছি। কুট্টুস বললে, না, কেঁচো! কিন্তু পরের কোর্সে যখন কাঁচা গোমাংস ও আধাসেদ্ধ ফাউল এল, তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ওদেরকে বললাম, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। হিন্দুত্ব খোয়ানোর ভয়ে আমরা মাংসের চেয়েও অধম সমুদ্রের মাছ, শাকপাতা, ফলমূল গিলে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে আগের দিনের মতোই আবার দুধ ও কেক খেয়ে থাকতে হল। সমস্যা হল এভাবে আর কতদিন চলবে।

আমাদের শোবার ঘরটার সংলগ্ন কোনও স্নানের ঘর ছিল না। প্রচন্ড ঠান্ডা থাকায় এই দেড় দিন ওয়াশ-বেসিনে হাতমুখ ধুয়েই কাজ সেরেছি। কিন্তু আর কতদিন স্নান না করে থাকা যায়। তাই পরদিন সকালে উঠেই ইশেতুকে বললাম স্নান করার কথা ও দূরের বাথরুম দেখালে। চার-পাঁচটা ঘরের জন্য একটা করে বাথরুম। দেখলাম লাইন লেগেছে। বাথরুমের ওপরে জলের ট্যাংক; চেম্বের মধ্য দিয়ে আগুন গিয়ে জল গরম করছে, নীচে কাঠের আগুন, সেজন্য ধোঁয়াও হয়েছে বেশ; কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে গাঢ় দেখাচ্ছে। স্নানার্থীর ভিড় কেন বুঝলাম। গরম জল সব সময় পাওয়া যায় না ইশেতু বললে, নটার মধ্যে শেষ। শ্রীমতী সাঠেও দেখি তোয়ালে ও সাবান হাতে দাঁড়িয়ে। আমাদের পালা এল। কুট্টুসকে স্নান করিয়ে নিজেও নেয়ে নিলাম।

সান্যালরা নিউ মার্কেট থেকে আপেল, আঙুর, তাজা কড়াইশুঁটি, ডিম, মাখন রুটি ও জ্যাম নিয়ে ফিরল। কিন্তু ইংরেজী ফলাহার একবেলা করেই দেখা গেল, বিকেলেরদিকে সকলের গাল ও চোখ বসে গেছে। জল-হাওয়া দারুণ ক্ষুধা-উদ্রেক-কারী! কুট্টুস 'ভাত খাব' বলে খুঁক-খুঁক করতে লাগল।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর এগোতেই এক আর্মেনিয়ানের দোকানে দেখলাম নানারকম বিস্কুট, কুকীজ, প্যাস্ট্রি। একটা তুলে নিয়ে ভেঙে মুখে দিতে যাচ্ছিলাম, দোকানী চার-পাঁচটা আমার হাতে দিয়ে বললে, তোমরা সবাই টেস্ট করে দেখ। এরকম সদাশয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিন-চার ডলারের নানাজাতীয় মিষ্টি কিনে ফেললাম

হোটেলে ফিরে দেখলাম বারান্দায় বসে শর্মা ও কুরুবেল্লা। শর্মা আমার হাতে বিরাট কাগজের বাক্স দেখে বললে খাবার জিনিস বলে সন্দেহ হচ্ছে' ওদের দুজনের হাতেই কয়েকটা ক'রে কয়েক জাতীয় কুকীজ দিলাম। শর্মা উৎফুল্ল হয়ে একটা মুখে পুরে দিয়ে চোখ বুজে বললে নাইস।

ভাগ্যক্রমে একটু পরেই কুরুবেল্লার দেশোয়ালী বন্ধু শ্রী পেত্রোস দেখা করতে এল। কুটুস ভাত খাবার জন্য ছটফট করছে জেনে শর্মা ও কুরুবেল্লার সংগে আমাদেরকেও রাত্রে খৃস্টমাস ঈভের ডিনারের নেমন্তন্ন ক'রে গেল।

সন্ধ্যা থেকেই খারাপ লাগছিল। অন্নের জন্য এ কী দেশে এলাম? চিন্তায় দিশাহারা হলাম। কেন এলাম মরতে, কিসের জন্য'

সাড়ে আটটার সময় মিঃ পেত্রোস আমাদেরকে নিতে এল ওর গাড়ি নিয়ে। বাড়ির কাছে পৌঁছে রাস্তাটুকু হেঁটে যাবার সময় কুটুস কাঁদতে শুরু করল। সবাই কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে বললে 'রাস্তায় সিংহ রয়েছে যাবো না।' ইথিওপীয়া আসবার কয়েকদিন আগে বোম্বেতে ইথিওপীয়া সম্বন্ধে কয়েকটা পুস্তিকা এনেছিল সন্যাল কনসার্ন্ট থেকে তার একটাতে পড়ছিলাম এ দেশের সব জায়গায় সিংহ ছড়িয়ে রয়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে কথাটায় কৌতুক অনুভব ক'রে আমরা কথাটার যথার্থ মানে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কথাটা কুটুস তাই মনে করে রেখেছে। সবাই হেসে লুটোপুটি।

পেত্রোসের বাড়িতে খাবার ও বসবার ঘর একসঙ্গে। দেখলাম আরও কয়েকজন অতিথি বসে রয়েছে। পেত্রোস পরিচয় করিয়ে দিল সবাই কেরলীয় বা মলয়ালী আর মেনন ছাড়া সবাই ক্রীশ্চানও। এই দুদিনেই রাস্তায় অনেক কেরলীয় ক্রীশ্চানের সাথে পরিচয় হয়েছে সবাই স্কুলমাস্টার। প্রায় সবক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী দুজনেই কাজ করে জীবনযাত্রার মান বেশ ভালো সেজন্য পেত্রোস দম্পতির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখলাম না। গভর্নমেন্টের বড় বাড়ি দুজন ঝি কাজ করে। ভদ্রমহিলা বেশ অমায়িক। বললে ঝি এখানে সুলভ সব রকম কাজ করাতে পারে মেথরানী থেকে সাময়িক স্ত্রী। পেত্রোসের ছোট মেয়েটা কুটুসের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। অনেকদিন পর ভারতীয় আবহাওয়ায় এসে বেশ স্ফূর্তি না হলেও স্বস্তি বোধ হচ্ছিল। মেনন হারিয়ে ছিল, আমাদের কাছে পারেরের জল-হাওয়ার খুব প্রশস্তি গাইল।

খাবার টেবিলে মাছ, মাংস, ডাল, ভাত, তরকারি প্রচুর পরিমাণে সাজানো। মনে হচ্ছিল না, এই কটা লোকের জন্য আয়োজন। আমরা মাংস সম্বন্ধে একটু গোঁড়া বলাতে শ্রীমতী পেত্রোস বললে, আমাদেরকে

নিষিদ্ধ মাংস দেওয়া হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। প্রথমে ড্রিঙ্ক দিল, আমরা মদ খাই না বলাতে লেবুর সরবৎ আনল। মেনন ড্রিঙ্ক করতে করতে আবেগ-ভরে গীতার শ্লোক ঝেড়ে ও নানারকম হাসির কথা আউড়ে আসর জমিয়ে তুলল; ভদ্রলোক সত্যিই রসালাপে ওস্তাদ। খেতে বসে দেখলাম সবাই পেটুক। অত খাবার নিঃশেষ হয়ে গেল। আমরাও যেন গোগ্রাসে গিললাম; বেশ কয়েকদিন ভাত পেটে পড়েনি; যদিও মাছটা নারকেল ও তেঁতুল সহযোগে রাঁধা হয়েছিল। আমাদের খাওয়ার অসুবিধার কথা শুনে মিঃ পেত্রোস বললে, এখানে গুজরাটী হিন্দু হোটেল আছে ভালো, সব্জি ও চাপাটি পাওয়া যাবে। মনে আশার সঞ্চার হল।'

কুরুবেল্লা কেরলীয় হওয়াতে ওর সাথে কোনও মালয়ালী শিক্ষক দেখা করতে এলেই আমরাও পরিচিত হয়ে যেতে লাগলাম। বিকেল বেলা এল একজন, ছোট ফিয়াট গাড়ি নিয়ে; নাম বলল, কুরুপ, যদিও বেশ সুরূপ; আডিস আবাবার একটা স্কুলে স্পোর্টস মাস্টার। বললে 'আপনাদেরকে গফারসি লেক দেখিয়ে আনি, বেশী দূর নয়, পঞ্চাশ মাইল, চমৎকার দৃশ্য।'

চললাম। রাস্তার দুপাশে খাদ, তার মধ্য থেকে ইউক্যালিপটাস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। দূরের নীল সুডৌল পাহাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, টুকরো টুকরো সাদা মেঘ ও হিমেল অথচ আরামদায়ক হাওয়া মনকে মাতিয়ে তুলল। মনে হচ্ছিল চলতেই থাকি। ঘণ্টা দেড়েক পর হ্রদে পৌঁছলাম। পাহাড় ও আকাশের ফ্রেমে মোড়া নীল ঝকঝকে লেক। জলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে কতকগুলো পাখি পানকৌড়ির মতো দেখতে। দু-একটা বকও দেখলাম। আমাদের আসতে দেখে ভয় পেয়ে দূরে সরে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে যেন কটমট করে তাকাতে লাগল। মনে হ'ল, ওদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য মোটেই খুশী হয়নি। জলের ধারে বসে আঙুল দিয়ে জল নেড়ে নেড়ে কুট্টুস কোনও মাছ বা কচ্ছপ দেখতে পেল না। লেক ইথিওপীয়ার এক সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্য। এতো লেক আর কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। আর অধিকাংশ হ্রদই রিফট্ ভ্যালির মধ্য।

ফেরবার পথে কুরুপ বললে, 'আডিস আবাবা' মানে নতুন ফুল। সূর্যের শেষ আভায় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রামধনু এঁকে দিল একপশলা বৃষ্টি; এলোমেলো হাওয়া বয়ে গেল। চলতি গাড়িতে বসে ওদেরকে গেয়ে শোনালাম, 'গানে মোর ইন্দ্রধনু।'

আডিস প্রবেশের আগে নগরপ্রান্তে কুরুপ ওর জানা-শোনা এক মাদ্রাজী খৃষ্টানের বাড়ি নিয়ে গেল। নামবার সময় কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে শীত জানাল তার প্রকোপ। জোসেফ দম্পতি আমাদেরকে চা ও কেক দিয়ে আতিথেয়তা জানালো। কিন্তু কুট্টুস বললে, ওর পেট কামড়াচ্ছে। শ্রীমতী জোসেফ ওকে বাথরুমে নিয়ে গেল। বড় আমাশা' কুরুপ জানাল প্রচণ্ড মাথা ধরেছে ওর। আরও অনেকটা ড্রাইভ করতে হবে ওকে। সান্যাল বলাতে আমি একটু 'বম' নিয়ে ম্যাসাজ করে দিতেই কুরুপ বেশ আরামবোধ করল এবং আমার মালিশ করবার পদ্ধতির প্রশংসা করল।

কুট্টুসের পেটের অবস্থা সংগীন হয়ে দাঁড়াল। কুরুপ তাই আমাদেরকে হোটেলে না নিয়ে গিয়ে ওর বাসায় নিয়ে গেল। মেনেলিক স্কুলের বিরাট কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাসা। কুট্টুসকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল কিন্তু ওর বার বার পায়খানা হতে লাগল, জ্বরও এল। কুরুপ বললে, জলে চুন খুব বেশী এখানে, ফুটিয়ে খেতে হয়; হোটেলে নিশ্চয় ফোটানো জল দেয়নি, তাই এই বিভ্রাট।

কুরুপ অবিবাহিত। এখানে ছ' বছর হল এসেছে। গাড়ি কেনা ওর হবি। বিরাট পদ্ম-ফুলের মত ক্যাকটাস জীবনে প্রথম দেখলাম ওর বাসায়। কাঁটাগাছে চমৎকার ফুল। ক্যাক-টাসের ফল নাকি খায় এ দেশের লোক; টি বি-র ওষুধ; খেতে অনেকটা বেলের পানার মতো। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। কুরুপ রাতের খাওয়াটা ওর ওখানেই সারতে বলল এবং আমাকেই রাঁধতে অনুরোধ জানাল। আলুর তরকারি, বেগুন ভাজা করলাম। দুধ জ্বাল দিয়ে ক্ষীরও খানিকটা করলাম। ভদ্রলোক রুটি সেঁকে টোস্ট করে
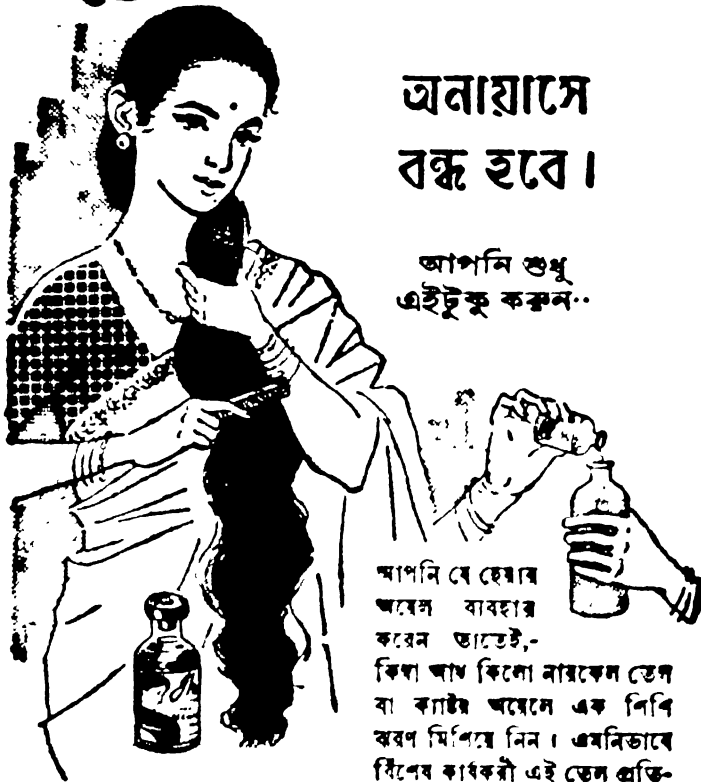
করল অনেকগুলো। কুটুসের এসব কিছুই খাওয়া হল না।

রাত দশটা নাগাদ হোটেলে ফিরে ওকে আমার হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলাম, মার্ক সল। 'ব্যাথিলে ওয়াটার' নামে টনিক ওয়াটার নিয়ে এসেছিলাম; হোটেলের জল খাওয়া বন্ধ রাখলাম।

সকালে ব্রেকফাস্ট সারবার পর ট্যাক্সি নিলাম। কুটুসের জ্বর ছেড়ে গেছে; আমাদের দুশ্চিন্তা তাই কম। পিয়াজার কাছে এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। (ইতালীয়রা পাঁচ বছর রাজত্বের মধ্যেই নিজেদের ছাপ রেখে গেছে। পিয়াজ্জার বাংলা চক বা চৌরঙ্গী বলা চলতে পারে)। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। বড় বড় দোকান। খৃস্টমাস বলে সব দোকানই সুন্দরভাবে সাজানো। [illegible] সাহেব সপরিবারে গাড়ি করে যাচ্ছিল। আমাদেরকে দেখে থামল। আমরা ভারতীয় খাবার খোঁজে যাচ্ছি শুনে বলল "Wish you good luck"

হেঁটে বেড়াতে ভালই লাগছিল। কিন্তু ভিখিরী ও মাছি এই দুটোর তাড়া খেয়ে হেঁটে বেড়াবার শখ ঘুচে গেল। আডিস-আবাবা নতুন ফুল বটে, কিন্তু ফুলের মধু আহরণের জন্য মধুমক্ষিকা নেই। শুধু মক্ষিকা ব্রণমিশ্রিত; সর্বত্র ব্রণযুক্ত ভিক্ষুক ও মক্ষিকা পরমব্রহ্মের মতো বিরাজমান। মাছিরা একবার অনুসরণ করলে ত্রিভুবন পালিয়ে বেড়ালেও রক্ষে নেই, [illegible] নাম সার্থক।

গুজরাটী হোটেলে এসে গেলাম। টিনের নীচু চাল দেওয়া ঘর, নোংরা ও অন্ধকারই বলতে হবে। বাংলা দেশের কোনও মফস্বল শহরের হোটেলগুলোর যে কোনও একটার মতো। কিন্তু ঘি মাখানো রুটি (ফুলকো) ও তার সাথে ডাল ও সবজি দেখে চোখ জুড়োলো। শর্মা বললে বাঁচলাম বাবা! সুবর্ণরেখা ওর কোন এক দেশোয়ালী বন্ধুর বাড়িতেই খেতে চলে গিয়েছিল। থালি এল, দেড় ডলার করে প্রতিটি কুটুসের ফ্রী। তা ছাড়া রুটি ও তরকারি যত খুশি খাও।

হোটেলের মালিক গুজরাটি বুড়ো [illegible] ভেতরের বারান্দায় বসে রুটি বেলছিল আর ওর হাবশী তরুণী ভার্যা আমাদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করে মাছি তাড়াচ্ছিল। পাখাটা রং-করা বাঁশের। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে কুটুসের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল; ওদের চেহারায় হিন্দী-হাবশী সংমিশ্রণ। হাবশী মেয়েটা স্বামীর সঙ্গে ভালোই গুজরাটী বলছিল, হে ...... শু...... ...!

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও কয়েকজন ভারতীয় এসে জুটলো থালি খেতে। আমাদের নতুন দেখে সবাই নানারকম হিতোপদেশ দিয়ে ফেলল। ওদের মধ্যে মেহতা বলে একজন গুজরাটী ভদ্রলোক এখানকার বড় এক ওষুধের দোকানের মালিক। বললে, কেন বৃথা এসেছি এদেশে, ছেলের কোনও শিক্ষাদীক্ষা হবে না, কোনও সোসাইটি পাব না, ইত্যাদি। নিজের জীবনের এক মর্মান্তিক ঘটনার কথাও বললে, স্ত্রী আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে কিছুদিন আগে। মেটা চলে গেলে শ' বলে আর একজন বলে উঠল 'আত্মহত্যা বলে ও, কিন্তু রহস্যময় ব্যাপার!' ভয়ে শিউরে উঠলাম।

রাস্তায় পরিচয় হল পিল্লাই নামে এক মাদ্রাজী হিন্দুর সাথে। ইন্দো-ইথিওপীয়ান টেক্সটাইলসে চাকরি নিয়ে এসেছে আডিস-আবাবার কাছে একাকী নামে এক জায়গায় বিড়লার সাথে যোগাযোগ করে এখানকার সরকার এক কাপড়ের মিল খুলেছে; ভারতীয়রা আসছে ট্রেনিং দিতে।

শুরু হল কুটুসের নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো। এক বুড়ো মালীর সঙ্গে দেখা-শুনা ভাব জমিয়েছে। বুড়ো ওকে শেখাচ্ছে: অণ্ড, হুলেৎ, সোস্ত—(অর্থাৎ এক দুই, তিন ...)। আমাদের দেখলেই [illegible] 'আমসগনালেহু' ঝুঁকে বলতো 'তেনাইস্তলিং' (নমস্কার)। আমারও এক সঙ্গী জুটল, পাসিওর বুড়ো 'জাবাইমা' (দারোয়ান); বুড়োর পোশাক আমাদের যোধপুরী ব্রীচেস ও লম্বা চুড়িদার কামিজ, কিন্তু এর উপর চাপিয়েছে এক পাড়ওয়ালা শাড়ির মতো মলমলের চাদর ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢেকে, শীতকালে গ্রাম্য বাঙালী যেমন করে। 'আমেসাগান' জাতয অনেক গল্প করত আমহারিক ভাষায় কিছুই বুঝতাম না, তবুও হুঁ হাঁ করে মাথা নাড়তাম।

ইশেতু আমাদের ঘরের চাকর, ডিম সেদ্ধ, রুটি টোস্ট ইত্যাদি করে দিত। কিন্তু তিন দিন পর ইতালীয় ল্যান্ডলেডির পছন্দ নয় বলে ও আপত্তি জানাল। সমস্যায় পড়লাম। পরদিন ভদ্রমহিলা আমাদের কাছে ভারতীয় স্ট্যাম্প সংগ্রহের জন্য এল। আমি কয়েকটা টিকিট দিয়ে এক বক্তৃতাও দিলাম, ও কেন বারণ করেছে ইশেতুকে আমাদের ফাই-ফরমাস খাটতে। বুঝল নিশ্চয়ই আমার ইংরেজী, কারণ পরদিন দেখলাম ইশেতু নিজেই এসে ডিম, ফল ইত্যাদি চেয়ে নিয়ে গেল।

ইরিত্রিয়া থেকে আসা ঠোঁটে রং মাখা উঁচু

হিলেব জ্বতো-পবা দ্বজন মেযে প্রাযই আসতো পাঁসিও'তে। এদেব ইংবেজী অদ্ভুত! 'T'।'কে থিটাব মতো উচ্চাবণ না কবে 'ট' এর মতো মোলাযেম কবে তাও। ইতালীয়বা এখানে কিছ্বদিন বাজত্ব কবে গেছে, তাই অনেকে কিছ্ব কিছ্ব ইতালীয শব্দ কথায় এখনও ব্যবহাব কবে এবং ওদেব বর্তমানে শেখা ইংরেজীটা ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে ইতালীয-ঘে'ষা। অনেক গ্রীক ও আর্মে'নীযানও এখানে ব্যবসাব খাতিবে স্থাযিভাবে বসবাস কবছে। ইথিওপীযানদেব সা'থ সংমিশ্রণ হযেছে প্রচুর অন্য জাতেব লোকদেব অতীত কাল থেকেই, ফলে এদেব চেহাবা বদলেছে। দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরীয় (হ্যামিটিক, সেমিটিক), স্বদানী নিগ্রো—এরা আগেই মিশেছিল; এখন মিশ্রণ হয়েছে উত্তর ভূমধ্যসাগরীয় (ইতালীয়, গ্রীক, আর্মেনিয়ান) লোকদের সাথে, যদিও বেশী নয়। পরে জানলাম, আবিসিনিযা মানে মিশ্র জাতেব দেশ। তাই 'নেশন'-বোধ জাগবার পর এরা গ্রহণ করেছে 'ইথিওপীয়া' নাম; এই নামটা রয়েছে বাইবেলে; যদিও উচ্চতব মালভূমি অংশটাই শ্বধ্ব বোঝাত ইথিওপীয়া বলতে। (ক্রমশ)

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ৮ ॥

রজব আলির গোয়েন্দা গিরি

বখৎ খাঁ বাদশার কানে তোলে যে, মীর্জা আবু বকরের লোকজন ইমানী-বেগমের কুঠি থেকে একজন আওরতকে লুট করে নিতে চেষ্টা করেছিল বলেছিল যে, এ সময়ে এমনভাবে প্রজার মন বিগড়ে গেলে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। বাদশা তখনি উজীর হাকিম আসানুল্লাকে ডাকিয়ে এনে দুজনকে হুকুম করে দেন যে, এখন থেকে শাহাজাদারাও আইন মাফিক চলবে শাহজাদা বলে তাদের যেন খাতির না করা হয়।

আসানুল্লা প্রবীণ দরবারী। শাহাজাদাদের উপর বাদশার ক্রোধের ইতিহাস তার অজানা নয় সে জানে যে, আজ বাদশার হুকুম অনুসারে কাজ করতে গেলে কাল বাদশা ও শাহাজাদাদের মিলিত অসন্তোষের মুখে পড়তে হবে। এরকম ক্ষেত্রে একমাত্র করণীয় মুখে হাঁ বলে কাজে কিছু না করা। কিন্তু বখৎ খাঁ ভাগ্যী আদমি, দরবারী রীতিতে অনভ্যস্ত। তোপ সহরবৎ বাদশার হুকুম প্রচার করে দিল শহরে। ফলে শাহাজাদার দল তার উপরে হাড়ে হাড়ে চটে গেলেও প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস করলো না। অধিকাংশ সিপাহী ও শহরের লোক, বখৎ খাঁর অনুগত—লড়াই করছে সে একা।

এই ঘটনার পরে মীর্জা মুঘল ও মীর্জা আবু বকর লালকেল্লার বাইরে এসে শহরের মধ্যে বাসস্থান নিলো। মীর্জা মুঘল গেল দরিয়াগঞ্জে সোনা মসজিদের কাছে এক বাড়িতে, সে দিকটা তার ফৌজের অধীনে। আর মীর্জা আবু বকর উঠে এলো চাঁদনী চকের উত্তরে লুণ্ঠিত দিল্লী ব্যাংকের কাছে দিল মঞ্জিল নামে প্রকাণ্ড পুরাতন প্রাসাদে। দেখতে দেখতে দিল মঞ্জিল বেগম, বাঁদী, বক্সী, আহেদি, পাইক, বরকন্দাজ ও নাচওয়ালীতে ভরে উঠল।

মীর্জা আবু বকর হেড বক্সী গোলাম খাঁকে ডাকিয়ে এনে ধমকালো তোমরা কোন কম্মের নও, একটা আওরতকে নিয়ে আসতে বললাম, পারলে না।

গোলাম খাঁ ডবল কুর্নিশ করে বলল, তোবা, তোবা! শাহাজাদার মেহেরবাণীতে আমাদের অসাধ্য কি! বাদশার আহেদি কটাকে মেরে হটিয়ে দিয়েছিলাম।

তবে আওরত পালালো কেমন করে?

ছিপকে চলে গেল। এক নম্বর শয়তানী।

শাহাজাদা রেগে উঠে বলে, ছিপকে চলে গেল। যাবেই তো। সে তো আর স্বেচ্ছায় আসছে না। তোমরা এতগুলো লোক থাকতে ছিপকে যেতে পারলো কেন?

জাদু জানে শাহাজাদা, জাদু জানে।

তোমরা কোন কর্মের নও বলে আল-বোলার নল তুলে নেয় আবু বকর।

গোলাম খাঁ বলে, জাঁহাপানা, ও আওরত যেখানেই থাক ধরে নিয়ে আসবোই তবে আমার নাম গোলাম খাঁ, বাপের নাম মেধম খাঁ, দাদার নাম আহেদিল খাঁ, পর দাদার নাম আলাউদ্দিন খাঁ, আমরা সব জাদুগিরের বংশ।

সেই কথা যেন মনে থাকে। ঐ আওরত শীগগির না আনতে পারলে তোমার ঘাড়ে মাথা থাকবে না, জাদুগিরের বংশ লোপ পাবে।

গোলাম খাঁ মাথায় হাত দিয়ে দেখলো তখনো সেটা যথাস্থানে আছে ভাবলো কতক্ষণ থাকে কে জানে, তবে কিনা জাদুগিরের বংশ। কুর্নিশ জানিয়ে দ্রুতপদে সে প্রস্থান করলো।

রজব আলি ঘরে প্রবেশ করলো। আবু-বকর নাচওয়ালীদের বিদায় করে দিল, বলল তোমরা এখন যাও। তারপরে খাস খানসামা চুনীলালকে বলল, এখন যেন কেউ না আসে।

ঘর খালি হয়ে গেলে বলল, তারপরে রজব আলি কিছু খবর আছে?

রজব আলি মাথা নেড়ে বলল, বিলকুল বেখবর।

বলো কি, তিন-তিনখানা চিঠি, একটারও জবাব এলো না।

তাই তো দেখছি।

আবু বকর কর গুণে হিসাব করে আর বলে যায়, পহেলা চিঠি লাট সাহেব লর্ড ক্যানিং সাহেবকে দোসরা চিঠি জেনারেল উইলসনকে, তেসরা চিঠি কর্নেল হডসনকে—একখানারও জবাব নাই। বড় তাজ্জব কী বাৎ।

চিঠি নিয়ে যাচ্ছে কে?

সব চিঠি তো একজনকে দিয়ে পাঠাই না।

পৌঁছেছে তো?

না পৌঁছবার কারণ তো দেখি না।

তবে জবাব আসছে না কেন?

হাতের অঙুলে দুর্জ্ঞেয়তার মুদ্রা করে রজব আলি বলে আল্লা জানে।

আল্লা জানুক নাই জানুক কেন যে উত্তর আসছে না, তার কারণ রজব আলি জানে।

সে বেশ জানে যে, কোম্পানী আর কোনমতেই বাদশা, বেগম বা শাহাজাদাদের সংগে পত্রাপত্রি করবে না। যাদের হাতে ইংরেজ নরনারীর রক্তপাত ঘটেছে, তাদের কলমের কালিও ইংরেজের চোখে রক্ত বই নয়। সন্ধি, শর্ত, চুক্তি করুণাভিক্ষা কিছুতেই ইংরেজের মন ভিজবে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবু বকর বলে, ইংরেজ কেমনতরো বেয়াদব লোক। ওরা আমাদের সংগে সন্ধি না করতে চায়, না-ই করলো, সে মীমাংসা না-হয় লড়াইয়ে হবে, কিন্তু শিষ্টাচার অবধি জানে না। মহারানীর কুশল কামনা করে যে চিঠি পাঠিয়েছিলাম বড়লাটের কাছে, তার উত্তর দেওয়া তো উচিত ছিল।

জবাব দিতে হলে অনেকগুলো রূঢ় সত্য বলতে হয়, তাই চুপ করে থাকে রজব আলি।

ভেবে দেখো না কেন, বাদশা আলমগীরের যখন লড়াই চলছে, ভাইদের সংগে, তখনো তাদের মধ্যে পত্রাপত্রি বন্ধ হয়নি।

রজব আলি ভাবে, তুমি বাদশা আলমগীর হলে তোমার সংগেও ইংরেজ পত্রাপত্রি করতো।

আমার আশংকা হচ্ছে কি জানো, কোম্পানী হয়তো মীর্জা মুঘলের সংগে পত্রাপত্রি করছে—বাদশার সে বড়ছেলে কি না।

রজব আলি প্রকাশ করে না যে, মীর্জা মুঘলের চিঠিও যায় তার হাত দিয়ে। তা হলে আর ঘাড়ে মাথা থাকবে না। সভাসদের শির সদাঃপাতী।

তোমার কি মনে হয়, রজব আলি।

মীর্জা মুঘল পত্রাপত্রি করলে আমার অজানা থাকতো না।

আলবোলার নলে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে

আব্দু বকর বলে উঠে. যাক, তবু মন্দের ভালো। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

রজব আলি ভাবে, অত নিশ্চিন্ত হয়ো না, শাহাজাদা। প্রত্যাখ্যাত চিঠিগুলো সব সযত্নে রক্ষা করেছি। এই বাদশাহী তামাশা মিটে গেলে আমার বাঁচবার কাজে লাগবে।

আব্দু বকর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করে নিয়ে বলে, আর-একখানা চিঠি পাঠাতে চাই জেনারেল উইলসনকে।

বহুৎ খুব বলে রজব আলি।

তাতে জানাতে হবে যে আমার জান ও জায়গীর রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলে কিছু ফৌজ নিয়ে আমি কোম্পানীর পক্ষে যোগ দিতে রাজী আছি।

ঘউস মহম্মদ কি রাজী হবে?

রাজী না-হয় ডাণ্ডায় তোলা মাস্তুর মতো একা পড়ে থাকবে, আমি ফৌজ নিয়ে চলে যাবো।

এ খুব ভাল মতলব শাহাজাদা।

কিন্তু এবার যে লোক দিয়ে পাঠাবে তার বুদ্ধিমান হওয়া চাই বুদ্ধু হলে চলবে না।

সেরকম লোক খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

দেখো দেখো খুঁজে দেখো নিশ্চয় মিলবে।

কি খবর চুনীলাল শুধায় আব্দু বকর।

চুনীলাল দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাবিলদার সাহেব কোম্পানীর একজন সিপাহীকে পাকড়েছে।

তোমার হাবিলদার সাহেব মস্ত বাহাদুর। কোম্পানীর আট হাজার সিপাহীর মধ্যে একটাকে পাকড়েছে। খুব করেছে এখন হাবিলদার সাহেব কি চায়? খেলাৎ নাকি?

না, জনাব শাহাজাদার সাথে দেখা করতে চায়।

ওঃ বুঝেছি আমার [illegible] খেলাৎ নিতে চায় বুঝি। আচ্ছা নিয়ে এসো।

চুনীলাল চলে যায়। রজব আলির দিকে তাকিয়ে আব্দু বকর বলে এই হাবিলদারটি একটু অল্প বুদ্ধু।

রজব আলি মনে মনে বলে তুমিও কম নও।

হাবিলদার মুসাহিব খাঁ এসে দাঁড়ায়— প্রকাণ্ড এক চাওড় মাংসপিণ্ড। কুর্নিশ করে।

কি খবর?

শাহাজাদা, কোম্পানীর একঠো সিপাহীকো পাকড় লিয়েছি।

বেশ করেছ খিলাৎ মিলবে।

মুসাহিব খাঁর ধারণা ছিল ঐ সিপাহীকেই বুঝি খিলাৎ দেবে শাহাজাদা। সে শঙ্কিত হয়ে বলে ওঠে, লোকটা কোম্পানীর গোয়েন্দা।

এই বললে সিপাহী, এখন বলছ গোয়েন্দা।

হাঁ জাঁহাপনা, সিপাহী লেকিন গোয়েন্দা সেজেছে।

গোয়েন্দার আবার সাজ-পোশাক আছে নাকি বলে আব্দু বকর তাকায় রজব আলির দিকে—ভাবটা এ-সব তোমার জানবার কথা বটে।

এবারে রজব আলি জেরা আরম্ভ করে।

কোথায় পাকড়ালে লোকটাকে?

ঐ যে দরিয়া আছে না, যাকে হিন্দুরা যমুনা বলে—

আব্দু বকর বাধা দিয়ে বলে, এতও জানো খাঁ সাহেব।

প্রশংসা মনে করে একজোড়া দন্তপংক্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ে মুসাহিব খাঁর, সে কুর্নিশ করে বলে, জী হুজুর জানি বইকি। আমার বহুৎ হিন্দু দোস্ত আছে, তারা হোলির পরবে গান করে "যমুনাকি নীরে তীরে গাব চড়াওয়ে। মিঠি তান শুনাওয়ে। আরও ভি জানি।

আচ্ছা এখন গান থাক তারপরে কি হল, বলে আব্দু বকর।

ঐখানে সাঁঝের নমাজ সেরে যখন উঠেছি, দেখি যে একটা কুর্তা-উর্তা-পরা কোম্পানীর সিপাহী ছিপকে ছিপকে আসছে—

বাপরে বাপ, বলে ওঠে শাহাজাদা, সিপাহী দেখেই বুঝলে কোম্পানীর! কেন নিমচা সিপাহী কি নেই।

আছে বইকি হুজুর। তবু বোঝা যায়।

কি করে?

নিমচবালার ফাটা কুর্তি ধোকড়া ফতুর্তি আর কোম্পানীর আঁটা কুর্তি বহুৎ ফুর্তি।

তারপরে?

আমি গিয়ে পাকড়ালাম।

লোকটা পালালো না?

প্রশ্নকর্তা রজব আলি হলেও শাহাজাদার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল মুসাহিব খাঁ। সে উচ্চবংশের লোক বাদশা ও শাহাজাদার নীচের ধাপের লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

সে বলল, পালাবে কি সাধ্য? রুস্তম যেমন করে সোরাবকে পাকড়েছিল, তেমনি করে পাকড়ে নিলাম।

তখন সোরাব কি বলল? শুধায় শাহাজাদা।

শালা বলে কি না—

রজব আলি ধমক দেয়, শাহাজাদার সামনে শালা বলছ, বেয়াদব।

মুসাহিব খাঁ দুই কান স্পর্শ করে বলে, কসুর হয়েছে। তখন সেই লোকটা, আমার জবাব ভাই-

ওর চেয়ে পালাটাই ভলো, বলো কি বলল?

বলল আমি শাহী সিপাহী।

আমি বললাম আমার সঙ্গে ধোকাবাজি চলবে না। শাহী সিপাহী তো এমন নয়া কুর্তি এমন জলুসদার কোমরবন্ধ মিলালো কেমন করে?

তখন?

তখন তাকে তল্লাশী শুরু করলাম আর অমনি জেব থেকে বেরিয়ে পড়লো—

কি পিস্তল?

ছোরা?

টাকা পয়সা? উঁহু, ওটা বের হলে আর এদিকে আসতে না।

না হুজুর এক চিঠি।

এই বলে সগর্বে জেব থেকে বের করে খামে বন্ধ সিলমোহর করা একখানা চিঠি।

বিরক্ত হয়ে আবু বকর বলে ওঠে, এই কথাটা বলতে এতক্ষণ সময় লাগালে, তাড়াতাড়ি সারলেই হতো।

মুসাহিব খাঁ বিজ্ঞ লোক, বলে—"হুজুর, জলদি কা কাম শয়তান কা কাম।"

রজব আলি চিঠিখানা নেয়।

শাহাজাদা শুধায়—তোমার সোরাব কোথায়?

নীচে পাহারাদারের জিম্মায় আছে।

আচ্ছা, তুমি এখন নীচে যাও, দরকার হলে ডাকবো।

মুসাহিব খাঁ চলে গেলে আবু বকর বলে—রজব আলি, পড়ে দেখো তো ব্যাপার কি? রাইকো পর্বত না সত্যই কিছু আছে।

রজব আলি সিল ভেঙে খাম খুলে পড়ে, তারপরে দেয় আবু বকরের হাতে। দুজনেই ইংরেজি জানে। চিঠিখানা পড়ে সে মন্তব্য করে সারা কোম্পানী পক্ষে যোগদান করতে চায় তাদের আহ্বান জানিয়েছে খোদ জেনারেল উইলসন।

রজব আলি গম্ভীর ভাবে বলে, এমন বেইমান নিশ্চয় কেউ নেই শহর শাহাজানাবাদে।

এ যে অতি স্পষ্ট খিজার বুঝতে পারে না শাহাজাদা।

আবু বকর বলে, পত্রবাহক লোকটা নিশ্চয় সাধারণ সিপাহী নয়, বড় কোন অফিসার হবে, নইলে জেনারেল সাহেব তার হাতে দিয়ে এমন জরুরি চিঠি পাঠাতো না।
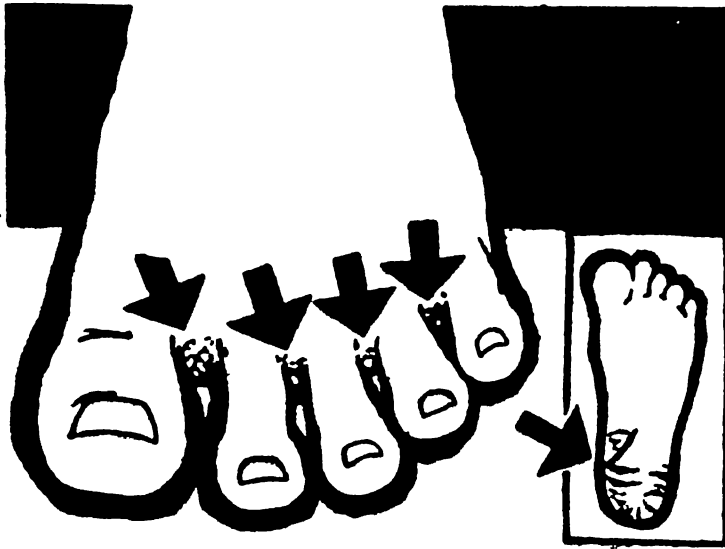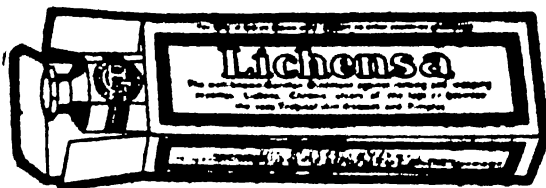
তাইতো মনে হয়, বলে রজব আলি।

তখন দুইজনে প্রায় এক সংগে বলে ওঠে, এই লোকটাকে দিয়ে আমাদের চিঠিখানা পাঠালে হয় না জেনারেল উইলসনের কাছে।

দুজনের বুদ্ধি এক খাতে বইছে দেখে পরস্পরকে তারিফ করে তারা। শয়তানে শয়তানে বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে মিল, দেবতায় দেবতায় গরমিল। তাইতো দেবতা কখনো পেরে ওঠে না শয়তানের সংগে।

কিন্তু লোকটা কি রাজি হবে?

সে ভার আমার উপর ছেড়ে দিন, শাহাজাদা।

বেশ তবে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আজকার রাতটায় লোকটাকে আয়েসে রাখবার ব্যবস্থা করে দাও। কাল সকালে সংগে করে নিয়ে এসো।

রজব আলি সম্মতি জানিয়ে বিদায় নেয়।

সকাল বেলায় হাবিলদারের সংগে বন্দী সিপাহী এসে দাঁড়ায়, শাহাজাদাকে কুর্নিশ করে।

আবু বকর তার দিকে তাকিয়ে ভাবে এতো নিতান্ত গাঁওয়ার সিপাহী নয় পোশাকে চেহারায় একে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

সিপাহী মনে মনে ভাবে জেনারেল উইলসনের চিঠিখানাই যত নষ্টের মূল। সেখানা না থাকলে সন্ধ্যাতেই [illegible] বাড়িতে যেতো আর মিস এলিয়টের খবর নিয়ে এতক্ষণ ফিরতে পারতো ছাউনিতে। কিন্তু [illegible] সে নিজের কাছে স্বীকার করে না, নিজের কাছেও নয় কেবল [illegible] এখানে আসবার অন্য কারণ ছিল তার।

এই চিঠিখানা সঙ্গে ছিল [illegible] চিঠিখানা নিয়ে জেরা করে আবু বকর।

হাঁ শাহজাদা।

জানো একাজ অত্যন্ত বেআইনী।

লড়াই ব্যাপারটাই তো বে-আইনী।

এবারে রজব আলি বলে গোপন চিঠি নিয়ে আসা গোয়েন্দার কাজ। লড়াইয়ের সময়েও একাজ বে আইনি, স্বীকার করো কি না?

রজব আলির মুখে গোয়েন্দাগিরির নিন্দায় কৌতুক অনুভব করে আবু বকর।

স্বীকার করি।

তবে কেন এনেছিলে?

সেনাপতির হুকুমে।

বিপদ আছে জেনেও?

হাঁ, বিপদ আছে জেনেও।

জানো তোমাকে গুলি করে মারতে পারি।

যুদ্ধক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারতো।

রজব আলি জেরা করে যায়, আবু বকর শ্রোতা। সিপাহীর কাজ আর গোয়েন্দার কাজ আলাদা।

সিপাহীর বিচার করবার অধিকার নাই।

তোমার নাম কি?

জীবনলাল।

কি পদ?

রেসালাদার মেজর।

রজব আলি ও আব্দু বকর এবারে নিশ্চিত বোঝে লোকটা সাধারণ সিপাহী নয়, হয়তো বা কোন রইস আদমি হবে, নইলে দেশী লোকের প্রাপ্য যে উচ্চতমপদ তা নিশ্চয় পেতো না। হাঁ একে দিয়েই কাজ হবে।

আব্দু বকর বলে, মুসাহিব খাঁ তুমি এবারে যাও।

মুসাহিব খাঁ গেলে বলে, তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।

শাহাজাদার সে ক্ষমতা আছে জানি।

কিন্তু কেবল এক শর্তে।

কি শর্ত?

তার আগে বলো জেনারেল উইলসনের কাছে তোমার যাওয়ার অধিকার আছে কি না?

আছে। এই চিঠিই তার প্রমাণ।

আমাদের একখানা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে জেনারেলের কাছে।

চিঠিতে কি আছে না জানলে পারি না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ উল্টে আব্দু বকর শুধায়, কাল রাতে খানাপিনার বন্দোবস্ত ভালো হয়েছিল তো?

হাঁ শাহাজাদা।

নীচের ঘরগুলোয় বড় মচ্ছর।

মচ্ছরদানি দিয়েছিল, আরেমে ছিলাম। শাহাজাদার খুব মেহেরবানি।

তাহলে রাজি আছ আমাদের চিঠি নিয়ে যেতে।

কি আছে জানলে।

এবারে রজব আলি বলে, কী আর এমন থাকবে? দুটো কুশল সম্ভাষণ।

আর কিছু নয়?

আর যা থাকবে দেখতেই পাবে।

শাহাজাদা শুধায়, কখন ফিরে যাবে?

আমার বহিন থাকে শহরে তার সঙ্গে দেখা করে।

চিঠি বেহাত হবে না?

শাহাজাদা বিশ্বাস করতে পারেন।

ঠিক জায়গায় পৌঁছবে?

জীবনলাল আবার বলে, শাহাজাদা বিশ্বাস করতে পারেন।

কখন জবাব নিয়ে আসবে?

তিন দিনের মধ্যে।

তারপরে একটু ভেবে বলে যদি জবাব দেন।

না দেবেন কেন?

জেনারেলের মনের কথা কেমন করে বলবো।

তাহলে তিন দিনের মধ্যে আসছ?

নিশ্চয় যদি না শাহাজাদার সিপাহীরা বাধা দেয়।

বাধা দিলেও এখানে ধরে নিয়ে আসবে।

যদি না শাহী গোলন্দাজের হাতে মারা যাই।

কোম্পানীর ছাউনিতে এখন সিপাহী সংখ্যা কত?

নিশ্চয় জানি না, আর জানলেও বলতাম না।

আব্দু বকর বলে হাঁ তুমি বিশ্বাসভাজন বটে। আচ্ছা এখন তুমি নীচে গিয়ে বিশ্রাম কর, চিঠি তৈরি হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো।

ঘণ্টা দুই পরে চিঠি [illegible] জীবনলাল উপরে এলো। চিঠি [illegible] এ চিঠি [illegible] অনাবশ্যক নাই। [illegible] চিঠি মোহরাঙ্কিত [illegible] জীবনলালের হাতে দেয় আব্দু বকর। জীবনলাল বিদায় নিতে উদ্যত হলে শাহাজাদা বলে, তাহলে তিন দিন পরে নিশ্চয় আসছ?

হাঁ শাহাজাদা।

জবাব নিয়ে।

যদি জবাব দেন।

তোমার কি মনে হয়?

সৈনিকের পক্ষে জেনারেলের মনোভাব অনুমান করবার চেষ্টা উচিত নয়।

শাহাজাদা বোঝে এ খাঁটি সোনা পেলাদার পদের নয়। নিশ্চয় চিঠি পৌঁছে দেবে ঠিকানায়। আশ্বাস পায় মনে।

কুর্নিশ করে বিদায় নেয় জীবনলাল।

(ক্রমশ)

* বিশ্বচিত্রা *

হাঙ্গেরির লোকশিল্প

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুডাপেস্টে ও অন্যান্য শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বিশেষ ধরনের দোকান, যেখানে বিক্রি হয় সূচী শিল্প, নক্‌শা-করা কাজ, কাঠ থেকে খোদাই করা জিনিস, চীনে মাটির জিনিস ইত্যাদি বস্তুশিল্প। এইসব দোকানের মাথায় সব জায়গায় একই সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া যাবে: "নেপমুভেজেটি বোল্ট", যার অর্থ হল "লোকশিল্পের দোকান।"

এসব দোকান একটা খুব বড়তর উদ্দেশ্য সাধন করে: লোকশিল্পী এখানে তাঁর খরিদ্দার খুঁজে বেড়ান না, কারণ এক দিক থেকে দেখতে গেলে খরিদ্দাররাই তাঁর কাছে আসে এইসব দোকানে রাখা তাঁর তৈরি জিনিসপত্র তারা সেখানে কিনতে পারে। এসব দোকানের সঙ্গে আরেকটি ব্যাপারও জড়িত সেটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ এই দোকানগুলি হল লোকশিল্পীর প্রতি সম্মান ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি আগ্রহের প্রমাণ।

হাঙ্গেরীর লোকশিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখানে বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হাঙ্গেরীতে দীর্ঘকাল ধরে 'এথনোগ্রাফি' বা জাতিবিজ্ঞান ও ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি-রীতিনীতির চর্চা হয়ে আসছে গভীরভাবে। এসব বিষয়ে বহু বইও লেখা হয়েছে।

দেশের পুরাতন লোকসংগীতগুলি এসেছিল এশিয়ার সমতলভূমিগুলি থেকে প্রাচীন মাগিয়ার জাতির সঙ্গে। অপেক্ষাকৃত আধুনিকতম লোকসংগীতগুলি কয়েক শত বছর আগে প্রধানত এইসব সুপ্রাচীন সংগীতের কাঠামোর ভিত্তিতেই রচিত হয়। ওই প্রাচীন গানগুলিতে তুর্কী আর মঙ্গোলদের গানের সঙ্গে আত্মীয়তার পরিচয় আছে; আর আধুনিকতর গানে আছে প্রতিবেশী জাতিসমূহের—বিশেষত রুমানীয়দের—গানের সঙ্গে সম্পর্ক। এই-সব লোকসংগীতে সুর ও কথা, দুই দিক থেকেই প্রতিফলিত হয়েছে হাঙ্গেরীয়দের ওপরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে যে নিপীড়ন তারই কথা। হাঙ্গেরীয়রা প্রথমে তুর্কীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বাধ্য হয়; পরে তাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয় অস্ট্রো-জার্মান বিজয়ীদের সঙ্গে আর তাদের নিজেদের নির্মম শাসকদের বিরুদ্ধে। এর থেকেই এসেছে এই অদ্ভুত রকম সত্য প্রবাদ বাক্যটি: "হাঙ্গেরীয়রা কাঁদতে কাঁদতে হাসে।" তাদের খুব উচ্ছ্বসিত গানেও থাকে এক ধরনের প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতা।

স্কুলে গাড়ি চালানো শিক্ষা—শিকাগোর একটি হাই স্কুলের কিশোরী ছাত্রীদের নকল ট্রাফিক ধরে গাড়ি চালানোর কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা আছে। সামনে একটা চলচ্চিত্র পর্দায় চলন্ত গাড়ির দিকে ছাত্রীদের দৃষ্টি রয়েছে এবং ওদের ওপর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। শিকাগোর গাড়ি-চালকরা এই শিক্ষার জন্য প্রতি বছর প্রায় পৌনে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেয়

অনেক দেশেই এই রকম একটা ধারণা চালু আছে যে হাঙ্গেরীয় লোকসংগীত আর "জিপসী সংগীত" একই জিনিস। ওদেশের সংগীতের ভাণ্ডারে জিপসী সংগীতের যে একটা স্থান আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রাচীন হাঙ্গেরীয় লোকসংগীতের সঙ্গে জিপসী সংগীতের কোনো মিল নেই। সেকালে কাফে বা শুঁড়িখানায় গিয়ে পয়সা দিয়ে জিপসী দলকে গান-বাজনার ফরমায়েস করবে, এমন পয়সা বা সুযোগ হাঙ্গেরীর কৃষকদের ছিল না। কৃষকরা নিজেরাই তাদের ঘরে তৈরি যন্ত্র সহযোগে গান-বাজনা করত। যন্ত্রটা দেখতে অনেকটা 'জিথার'-এর মতো। জিপসীরা সাধারণত থাকত কোনো ধনী পৃষ্ঠপোষকের বাড়িতে এবং তাদের কিছু কিছু সংগীতের সুর সরল চাষীদের ঘরে ঢুকে আসত।

অবশ্য হাঙ্গেরীর কিছু লোকসংগীত গায়ক ও রচয়িতা এমন সব মৌলিক লোক-সংগীত রচনা করে থাকেন, যার সঙ্গে

জিপসী সংগীতের কোনো সম্পর্ক নেই। এইসব লোকসংগীত-শিল্পীদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীন সকলেই আছেন। 'ফোকলোর ইনস্টিটিউট' নামে একটি জাতীয় সংস্থায় এ'রা সংঘবন্ধ। তাছাড়া আছে গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন শহরের ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন লোকসংগীত দল—যাঁরা প্রাচীন গান সম্পর্কে বিশেষভাবে উৎসাহী। অধিকাংশ জিপসী সংগীত দল-গুলিও মৌলিক লোকসংগীতের ধরন-ধারন আয়ত্ত করেছে এবং নিজেদের নৃত্য-গীতানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করেছে।

লোকসংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি নামের উল্লেখ অপরিহার্য। প্রথমেই বলতে হয় লোকসংগীতের অগ্রগণ্য সংগ্রহক বেলা ভিকার-এর কথা। বাকি দুজন হলেন বেলা বার্তক ও জোলতান কোদালি—যাঁরা অসংখ্য অপূর্ব লোকসংগীত রচনা করেছেন, হাঙ্গেরীর প্রাচীন লোকসংগীতের আধারে আধুনিক উপাদান সঞ্চারিত করেছেন।

লোককাব্যগুলির প্রধান ধারাটি হল দীর্ঘ গাথা বা ব্যালাড, যাতে একটা কোন বিয়োগান্ত প্রেম কাহিনী বলা হয়। যেমন, কড়া বাপের শাসনে দয়িতের সঙ্গে মিলিত হতে না পেরে মৃত্যুমুখী তরুণী, কিংবা, শোচনীয় অবস্থায় পড়ে তরুণীটির হাসাহতে রূপান্তর।

হাঙ্গেরীর লোকনৃত্য খুব ব্যাপকভাবে পরিচিত। গ্রামে শহরে অসংখ্য তরুণ-তরুণী আজ এই নাচের চর্চা করছে।

হাঙ্গেরীর লোক-ক্রীড়াগুলিরও যথেষ্ট প্রচলন আছে। জন্ম, বিবাহ, ফসল কেটে ঘরে তোলা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানে ও প্রধান প্রধান খৃষ্টীয় উৎসব উপলক্ষে এই সকল খেলা হাঙ্গেরীর জনসাধারণ খেলে থাকে।

লোক-শিল্পের দোকানগুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে খোদাই শিল্পীদের সূচীর কাজের কারু-দক্ষতার হরেক নমুনা: গৃহ-স্থালীর নানা জিনিস—নকশা তোলা মগ, প্লেট কাঠের মাত্র, হাড় আর শিং থেকে তৈরি বোতাম, চিরুনী, আংটি, মাছ ধরার টুকিটাকি। পুরনো দিনের শিকারীরা শিং-এর মধ্যে বারুদ ভরে নিত আর সেই-সব শিং-এর ওপর নানা রকম নকশা আর কারুকার্য করা থাকত। আজও সেই ধরনের শিং দোকানগুলোয় দেখতে পাওয়া যায়। প্রচীনকালে যে রক্ষাকবচ আর স্বস্তিকা ধরনের অলংকারগুলি ছিল জনপ্রিয়, সেগুলির নকশাকে হাঙ্গেরীর লোক-শিল্পীরা আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

চামড়ার ওপরে হাতে-তোলা নকশার ও অলংকরণের কাজ ওদেশে হাজার বছরেরও বেশি কাল ধরে চালু আছে। আধুনিক যন্ত্রোৎপাদিত শিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও, হাঙ্গেরীর হাতে নকশা-তোলা চামড়ার জিনিসের চাহিদা একটুও কমেনি।

সমস্ত রকম হস্তশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে আদরণীয় হল সূচীশিল্প। রং আর নকশার অপূর্ব আর অভিনব সমন্বয়ে হাঙ্গেরীর সূচীশিল্প বিশ্ববিখ্যাত। কৃষক রমণীর সুদক্ষ অঙ্গুলি কাব্যময় কল্পনার সঙ্গে বুনে তোলে নানারকম ফুল-লতাপাতা। মাতিও, রাবাকোজ আর সারকোজ অঞ্চলের মেয়েরা এই সূচী-শিল্পের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত। হাঙ্গরীর লেস ১৮০০ সাল থেকে সুবিখ্যাত এবং হালাস অঞ্চলের লেসের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। এই সূচীশিল্পী ও লেস-শিল্পীদের বহু সমবায় গড়ে উঠেছে হাঙ্গেরী জুড়ে।

লোকশিল্পের আরেকটি খুব উল্লেখযোগ্য দিক হল হাতে খোদাই করা বেতের ছড়ি আর আসবাবপত্র। কোনো কোনো দোকানে মডেল ঘর সাজানো আছে, যে-ঘরে আসবাব-পত্র, কম্বল, গৃহস্থালীর জিনিস থেকে সবকিছুই হল লোকশিল্পীদের সৃষ্টি। এই লোকশিল্পীরা গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পান এবং "মাস্টার অফ ফোক আর্ট" নামে একটা পদবী ও পুরস্কারও এ'দের জন্যে দেওয়া হয়। বিজ্ঞান শিল্পের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট দানের জন্যে হাঙ্গেরীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হল 'কোসুথ পুরস্কার।' বহু লোকশিল্পীও এই পুরস্কার পেয়েছেন।

মনোজ বসু

সাতচল্লিশ

চোরের কাজ নিশাকালে। নিশির কুটুম্ব তাই বলে। দিনমানে যারা করে তারা চোর নয় ছিঁচকে। চোরের সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়। দায়েপড়ে এবারে এদের বাদ-বিচার নেই। দিন চলে যাচ্ছে—দারোগার দাবি না মেটালে জুড়ে দেবে দশ ধারায়। একবার জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। দারোগা এখন নিজে বের করে দিতে লাগলেও সহজ হবে না।

যত দিন যায় মরীয়া হয়ে উঠছে ওরই। এক দুপুরে দেখা যায় ধেনাই ডিঙি নদীর কূল ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাত তুলে ডিঙি থামিয়ে কাদাজল ভেঙে সে উঠে পড়ল। খবর আছে, খবর আছে। কলাবুনিয়ায় ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি। কুণ্ডুমশায় ধনী-মানী গৃহস্থ। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার—রাবণের গোষ্ঠী বিশেষ। অবস্থা ভাল হলেও বাড়িতে দালানকোঠার হাঙ্গামা নেই মেটে ঘর। কতদিকে কত ঘর গুনে পারা যাবে না। গোলকধাঁধা বিশেষ। দিনেরবেলা কাজ-কর্মের নিয়ম কিন্তু সে নিয়ম এ বাড়ি চলবে না। যা কিছু দিনমানে। জোয়ান-পুরুষ আর কুড়ুল আছে সবাই এখন তুইঁক্ষেতের কাজে বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় ফিরবে। একক্রুড়ি দৈত্য সম মানুষ ঘরে এবং দাওয়ায় পড়ে ফোঁস ফোঁস করে কামারের হাপরের মতো নিশ্বাস ছাড়ছে—আওয়াজ কানে শুনেই চোরের হৃৎকম্প লাগে, কাজ-কর্ম হবে কেমন করে সেই অবস্থায়? ফিরে পালাবে সে উপায়ও নেই, গোলকধাঁধার মতো অন্ধকার আনাচেকানাচে শতেকবার পাক খেয়ে মরবে। অতএব যা-কিছু সেরে ফেলতে হবে সূর্যিঠাকুর পাটে বসবার আগে। মরদেরা ঘরে না ফিরতে। কি করবে, দেখ এবার সকলে ভেবেচিন্তে বিচার-বিবেচনা করে। সাহেব তুমিই তো একটা দিনমানের খবর চেয়েছিলে—খবর নিয়ে তাই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।

সাহেব বলে, শুনতে পেলি ওরে কেষ্টদাস?

গোপীবল্লভ হাতে কেষ্টদাস সঙ্গে সঙ্গে ছইয়ের নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। কণ্ঠি এসেছে মুঠোর ভরে সাহেব ওর গলায় বেড় দিয়ে বেঁধে দেয়। নৌকোয় বসে বসে [illegible] একটা [illegible] এখন।

[illegible] বাড়ি থেকে কেষ্টম [illegible] ছাড়ল: [illegible] বলল—ওরে তুই [illegible] কাঁদিস? ভিক্ষে পাই চাট্টি [illegible]—

[illegible] বড়গিন্নি [illegible] করে [illegible] ভিক্ষে [illegible] না [illegible]। ভিক্ষে দেয় লোকে সকালবেলা, সন্ধ্যায় এসে ভিক্ষে চায় এমন তো শুনিনি [illegible]। এই দেখ মাঠ-মাঠ করে একেবারে তুলসীতলায় চলে এসেছে। ওরে ভোলা—

[illegible] ডাকছেন হাঁকিয়ে দেবার জন্যে নিরুদ্বিগ্ন কেষ্টদাস তৎক্ষণে তুলসীমঞ্চের সামনে নিকানো উঠানের উপর বসে পড়ে গোপীবল্লভ [illegible] [illegible] চক্ষু বুজে পদাবলী কীর্তন ধরে এক্ষণে। আহা মরি [illegible] [illegible] কেউ নয়।

[illegible] বিকালবেলা সবে এখন। [illegible] ছেলেপুলে [illegible] [illegible] এসে জুটেছে [illegible] [illegible] বাসন মাজা [illegible] এ সময়কার [illegible] সাহেব লহরী খেলে যাচ্ছে [illegible] কণ্ঠে। পর পর তিনখানা হয়ে গেল—গোষ্ঠলীলা মানভঞ্জন আর রাই উন্মাদিনী—ফরমাস তবু থামে না: আর একখানা হোক বাবাজী।

বড়গিন্নিই এখন সকলকে সামলাচ্ছেন: হবে বই কি আবার হবে। জিরোতে দে একটুখানি তোরা। সেবা কিছু হবে না বাবাঠাকুর? বাবাঠাকুর না বলে বাছাঠাকুর বলতে ইচ্ছা করে। খই-চিঁড়ে-নারকেল-সন্দেশ আছে—দেবো?

বাবাজি কেষ্টদাস ঘাড় নাড়ে: দিনমানে একাহারী মা ঠাকরুন। ঠাকুর যা জুটিয়ে দিয়েছেন, এক পাট হয়ে গেছে। সাঁঝ গড়িয়ে গেলে আবার কিছু মুখে ঠেকাব। আমি বলি, আজেবাজে খেয়ে খিদে মারব না—যদি দুটো চাল ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দেন।

বড়গিন্নি লুফে নিয়ে বললেন, তাই হবে গো বাবা। ভাত ডাল আর একখানা তরকারি। শেষ পাতে একটু গব্যও দিতে পারব—ঘরের গাইয়ের দুধ, গাছের সবরি-কলা, ছাঁচবাতাসা—

অত হাঙ্গামায় কে যাচ্ছে মা-জননী। গরিব মানুষ—দু বেলা চাট্টি আলুনি ভাত জুটলে বর্তে যাই—

বড়াগিন্নি নাছোড়বান্দা ঃ অন্যখানে কি খাও বাবাজী, সে আমরা দেখতে যাইনে। গৃহস্থবাড়ির উপর আধ-উপোসি পড়ে থাকতে কেন দেবো?

সে যা হয় হবে—সন্ধ্যেটা আগে পার হয়ে যাক। গানও হবে, অনেক হবে—বিশ্রামের মধ্যে কেষ্টদাস ইতিমধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে। নিজের কথা—হাটে এসে এক বৈরাগির আখড়ায় গানে মজে গিয়েছিল। গানে বসলে আর হুঁশ থাকে না। সঙ্গীরা খুঁজেপেতে না পেয়ে নৌকো ছেড়ে চলে গেছে। হেঁটে হেঁটে ঘরে ফিরছে সে এখন। পয়সাকড়ি শূন্য, তা বলে ভাবনার কি! রাধাবল্লভের সংসার—মুখে দুটি অন্ন, রাতের একটু আশ্রয়

ঠিকই জুটিয়ে দেবেন। মা হয় না-ই দিলেন—গাছের তলায় মাঝগাঙে বসব, কোন দিক দিয়ে রাত পোহায়ে যাবে টেরই পাবো না।

হতে হতে অনেক পুরানো কথা—পথে-ঘাটে দিন কাটানো ও রাত পোহানোর নানান বিচিত্র কাহিনী। গানের গলা শুধু নয়, গল্প বাঁধতেও জানে বটে কেষ্টদাস। গল্প করে, আর সতর্ক চোখে বারম্বার ঠাহর করে দেখে, বাড়ির সকলে এসে জুটেছে তো এই জায়গায়—একটা কেউ ছিটকে পড়ে নেই কোনদিকে? টেনে রাখতে হবে আরও খানিকক্ষণ। গল্পে হোক গানে হোক, হাতে দড়ি পড়ার মতো আবদ্ধ হয়ে থাকবে এখানটা। শুনছে সকলে তাজ্জব হয়ে। কেষ্টদাস দেখে নিয়েছে, সাঁ করে একজন অনতিদূরের চোরিঘরে ঢুকে পড়ল। কে আবার—সাহেব ছাড়া অন্য কেউ নয়। কুটোগাছটা নড়লে যে আওয়াজ, সাহেবের চলাচলে সেটুকু নেই। পা ফেলে চলে না, মাটির গায়ে যেন নভনস বেড়ায়। সিঁধেল কাজে নারাজ এবারের যাত্রায়। বলে, ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছে, সে জিনিস কি আদাড়ে-আস্তাকুড়ে বের করব? তার জন্যে চাই ভাল ক্ষেত্র, উত্তম বন্দোবস্ত। এখানে বিনা সরঞ্জামে যন্তর যা হাতড়ে নেওয়া যায়। সেই মতলব নিয়ে এসেছে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি।

চোরিঘরে ঢুকে গিয়ে সাহেব পিছন-দরজা খুলে দিল। ক্ষিপ্র হাতে কাজ চলছে। গল্পের ঝোঁক আলগা হয়ে আসে বুঝে হঠাৎ কেষ্টদাস দরাজ গলায় গান জুড়ল আবার। নিমাই-সন্ন্যাস। বড় মোক্ষম পালা। শচীমাতার দুঃখে চোখের জলে ভাসবে না, এতদূর পাষাণহৃদয় অন্তত স্ত্রীলোকের মধ্যেই নেই।

গান শেষ করে পশ্চিম-আকাশে মুখ তুলে কেষ্টদাস বলে, এইবার মা ঠাকরুনেরা একটিবার ছেড়ে দেবেন। পুকুরঘাটে হাত-পা ধুয়ে জপটা সেরে আসি। এসে উনুন ধরাব। ভালই হল। কর্তারা সব এর মধ্যে এসে যাবেন। নামগান তাঁরাও শুনবেন দু-একখানা।

পুকুরঘাটের নাম করে কেষ্টদাস ছুটতে ছুটতে নৌকোয় এসে বলে, কষে বাও এবারে। গান গেয়ে গল্প করে বিস্তর খাটনি খেটে এসেছে, তা বলে উত্তেজনার মুখে ঠান্ডা হয়ে বসে থাকতে পারে না। লোপীযন্ত্র ফেলে নিজেও বোঠে তুলে নিল। যা কিছু লজ্জা হল নিষেধুরে দৌড় দাও এবারে। নৌকো নিয়ে দৌড়।

খাল দুই বাঁক পার হয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত কেষ্টদাস বলে, পড়ল কিছু জালে?

সবাই নিজেদের লোক, ঠারেঠোরে [illegible] প্রয়োজন নেই। কিন্তু অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, সহজ ভাবের কথা মুখে আসে না। [illegible], মাছটাছ হল কিছু?

সাহেবের সঙ্গে জেপ্টটি ছিল বংশী, পাহারাদার ধোনাই। রামদাস নৌকোর পাহারায় ছিল। গুরুপদ নেই, থাকবার কথাও নয়, ওপারের দিকটা খোঁজদারি করে বেড়াচ্ছে। বংশীই ঘাড় কাত করে কেষ্টদাসের কথার জবাব দেয়ঃ হ্যাঁ—

সাহেব দেমাক করে বলে, পালা তুলে পুকুর তুই সাফ সাফাই করে দিলি, আমি লোকটা খেওন ফেললাম, মাছ হবে না কি রকম!

তার মানে, বিস্তর জায়গায় বেকুব হয়ে এসে এইবারটা হয়েছে। পুলকিত কেষ্টদাস প্রশ্ন করে, রুই-কাতলা?

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, মনে তো লয় তাই—

সাহেব বলে, রুই হোক কাতলা হোক, একটাই। একের বেশি দুই নয়। পাঠার চালি উঁচু করে দেখ্।

দেখে নেয় কেষ্টদাস বস্তুটা। মাঝারি সাইজের কাঠের বাক্স—তিন জায়গায় তালা ঝুলছে। খোলা সহজ হবে না, ভাঙতে হবে।

বংশী বলে, [illegible] আরও কত কি ছিল, সেসব [illegible] যাইনি। এক জিনিস ঘরে আসতেই তিন তিনটে মরদ হিমসিম খেয়ে গেলাম—অন্য দিকে চোখ মেলে কি করব?

বাক্সের ভিতর না দেখা পর্যন্ত মনে কারো সোয়াস্তি নেই। কিন্তু আগ্রহভরে হয়ে উঠছে না। কাটাখালির মুখে সন্ধ্যার পর ডিঙি বেঁধে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা গুরুপদ ওপারের খবরাখবর নিয়ে এসে গেছে সেখানে এতক্ষণ। পথের মাঝে এই কাজটা পড়ে দেরি করিয়ে দিল। তাড়িয়ে চলো ভাইসব, দেরি হয়ে গেছে। গুরুপদকে তুলে নিয়ে, তারপর কোন নিরালা ঠাঁই খুঁজে নিয়ে তবে বাক্স খোলা।

বাঁক ঘুরে যেতে জোর পিঠেন বাতাস। গাঙেরও টান খুব। বড় আরামের বাওয়া এবারে—বোঠে একটুখানি ছুঁয়ে আছে, তরতর করে ডিঙি ছুটেছে। নিম্নকণ্ঠে

[illegible] বড় [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] কিনবে কি, ধোনাই [illegible] [illegible] ছাই দিয়ে তর্ক। ধোনাই বলে, লোহা-লক্কর—কুড়ুল-কোদাল, দা-বঁটি। ঐটুকু এক বার আসতে জীবন বেরিয়ে গেছে। লোহা ছাড়া এমন হয় না।

বংশী বলে, পাথরের জিনিস নয় কেন? শিল-নোড়া, জাঁতা—

সাহেবের কানে পড়তে সে ধমক দিয়ে উঠল : আচ্ছা ছোট মন তোমাদের! আনাজই যখন, সোনাদানা মনে আসে না কেন? লোহা বলো পাথর বলো সোনার চেয়ে ভারী কি আছে?

রামদাস তামাক খাচ্ছিল। হুঁকো থেকে মুখ তুলে বলে, তিন তিনটে তালা লাগিয়েছে—ঠিকই তো।—পাথর-লোহা তালা দিয়ে রাখতে যাবে কেন? বাক্স সোনায় ভরা, খোলা হলে তখন দেখবে।

[illegible] [illegible] আরও একবার [illegible] [illegible] : [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] থাকতে [illegible] কি?

বংশী বলে, দারোগা পুলিশ জমাদার সকলকে একবাটি দু-বাটি করে সোনা দিয়ে দেবো। দিয়ে থুড় [illegible] দেবো, কারো নামে কোন দিন দশধারার মামলা না গাঁথে। ওদের খুশি করে তারপর নিজেরা এক একতাল হাতে নিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠব। ইহজন্মে আর কাঠি ছোঁব না। উঠোনের বাইরেই যাব না মোটে, ছেলে কাঁধে করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াব।

মহানন্দে আগড়ুম-বাগড়ুম বকে চলেছে। রামদাস হুঁকো এগিয়ে ধরে বংশীর দিকে : তামাক খাও বংশী—

বংশী হাতও বাড়িয়েছে নেবার জন্য। ঠকাস করে হুঁকো-কলকে পড়ে যায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তামাক মাথায় উঠে গেছে এখন—কালো একটা রেখা

ছুটে আসছে না? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিয়েছে, এখানে বেগে আসছে। [illegible] বংশী বলে, দেখ না—ঐ দেখ—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, গাঙের উপর সোজাসুজি বেয়ে পারা যাবে না, ধরে ফেলবে এক্ষুনি—

হতে পারে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর লোক। অথবা পিটেল। পেট্রোল পুলিস নৌকো এবং মোটরলঞ্চ নিয়ে জলপথ পাহারা দিয়ে বেড়ায়—চলতি নাম পিটেল। ফাঁকা নদীতে পিটেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু দূরে সরু খাল কটা নজরে আসে। খালে ঢুকে পড়ে গা-ঢাকা দেওয়া—সেই একমাত্র উপায়। নতুন আমদানি হলেও কেষ্টদাসের এমন কিছু নয়—কিন্তু রামদাসের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তারও চেয়ে বেশি বংশীর। বমাল সমেত পেয়ে গেলে কত বছর ঠেসে দেবে, ঠিকঠিকানা নেই। বউকে বলে আসছে কুটুম্ববাড়ি চললাম—এখন যে কুটুম্বর বাড়ি পাকাপাকি ঘরবসতের গতিক। আবার যেদিন বাড়ি যাবে, বাচ্চা ছেলে বড় হয়ে গেছে তখন। বাপ বলে চিনবে না। পরিচয় দিলে তখনও চোর বাপকে চিনতে চাইবে না।

এত কথা লহমার মধ্যে মনে খেলে যায়। সেই পিছনের বস্তুটা জলের উপর একটা কালো ফোঁটার মতো দেখাচ্ছিল—এইবারে পুরোপুরি নৌকো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপ-নৌকো—বাইচ খেলায় যে বস্তু নামায়। বাতাসের আগে চলে। একটি লহমা—খালের মধ্যে ঢুকে পড়তে যেটুকু দেরি। হতে পারে, ছিপনৌকো তাদের ঠাহর করতে পারেনি, যেমন আসছে সোজা গাঙ ধরে বেরিয়ে যাবে। আশা করা যাক এমনি—আশা একটা তো চাই।

খালে ঢুকতে গিয়ে—কী সর্বনাশ!—দুই প্রকাণ্ড ভাউলে নৌকো দুই দিকে বেঁধে রেখেছে। জল-পুলিশের এই কায়দা—বাহির-গাঙে তাড়া করে খালে এনে ঢোকায়। ডিঙি যেই মাত্র ঢুকে যাবে, দুদিকের দুই ভাউলে আড়াআড়ি হয়ে সরু খালের মুখ আটকাবে। বনের হাতি তাড়িয়েতুড়িয়ে খেদায় ঢুকিয়ে যেমন মুখ আটকে দেয়। এমনিতরো কাজে মার্কা-মারা সরকারী সাদা বোটের কদাচিৎ ব্যবহার। দূরতে পেলে মানুষ তো সতর্ক হয়ে যাবে। সাধারণ নৌকো তাড়া করে পিটেল ওত পেতে থাকে, যেমন এই ভাউলে দুটো। পিছু নেয়—সে-ও সাধারণ নৌকো ছুটিয়ে। যেমন ঐ ছিপনৌকো। মাঝিমাল্লার সাজে যারা রয়েছে, জাঁদরেল পুলিশের লোক তারা। লোক-দেখানো দাঁড় টানে হাল বায়, পাশে গুলি-ভরা বন্দুক, দরকার হলে মুহূর্তে নিজমূর্তি নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠবে।

চোখাচোখি নিজেদের মধ্যে। মুক্তলায়

ঠিক হয়ে গেছে। ছুটেছিল ডিঙি, গতি থামিয়ে দিল। বোটে সবগুলো জলের উপর তুলে ধরেছে—নৌকো চলে কি না চলে। কাড়ালের দিকে ছইয়ের অন্তরালে বাক্সটা তুলে ধরে নামিয়ে দিল গহিন গাঙের জলে। বমাল লোপাট—আর এখন কি করতে পারিস? বংশী আর ধোনাই মিস্ত্রি দাগি দুটো লোক আছে বটে ডিঙিতে—কিন্তু তাদের কি অন্য কাজকর্ম থাকতে নেই? হাটবাজারে কিম্বা আত্মীয়-কুটুম্বর গাঁয়ে যেতে পারে না? ঠিক কথাই তো আছে—ধান কাটতে গিয়েছিলাম দক্ষিণের নাবালে কাজকর্ম শেষ হেলতে দুলতে এবার ঘরে ফিরছি। লেজা-সড়কির কথা যদি বলো—বাঘ-কুমিরের মুখে পড়ি না চোর-ডাকাতের হাতে পড়ি আপদবিপদের জন্য রাখতে হয় দু-এক-খানা। সবাই রাখে।

খালে না ঢুকে বড় গাঙ ধরেই চলল। [illegible] হালকা হয়েছে আর এখন [illegible] ভয় [illegible] ছিপ ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে সাহেব [illegible] সেদিকে তাকিয়ে। [illegible]

[illegible] ভুলতে পারছে না। [illegible] সময় [illegible] ফোটে [illegible] আঙুল। [illegible] দিকে তাকায় [illegible] বিড়বিড় করে [illegible] এমনি [illegible] দিয়ে [illegible] কি [illegible] পাও?

[illegible] কাছাকাছি [illegible] চোর [illegible] হচ্ছে না। [illegible] পারে কাঁচা-হাতের [illegible]।

বংশীর এক [illegible] চিন্তায় না [illegible] ছিল। আজকের এই বাক্স বিসর্জনের ব্যাপারটা সেদিনের মতোই সে [illegible] চোখ মেলে দেখেছে। এতক্ষণে হায়-হায় করে উঠল : মিছামিছি গেল জিনিসটা। ভাল করে চোখ দেখলে না, পাগল হয়ে উঠলে যেন তোমরা—

ধোনাই [illegible] করে বলে উঠল, সোনা বেচে পয়সার পাহাড় হত রে! গোলায় যদি রাখতাম, গোলা ভরতি হয়ে যেত। আঁ, কেষ্টদাস?

কেষ্টদাসকে সালিশ মানল। বাক্স ফেলার প্রধান উদ্যোগী সাহেব—তার দিকে কেষ্টদাস একবার তাকায়। লজ্জা পেয়ে হাসছে সাহেব মৃদু মৃদু। কেষ্টদাস উলটো কথা বলে : সোনা না ঘোড়ার ডিম! অত-গুলো বউয়ের কারো গায়ে সোনার গয়না দেখতে পেলাম না। সোনা কখনো কুন্ডুরা চোখে দেখেছে। শিলনোড়া বা-কুড়ুল এই সব। বাক্স খুলে আমরাই ফেলে দিতাম, একটু আগে ফেলা হয়ে গেছে।

ধোনাই গরম হয়ে বলে কী করে বুঝলি তুই? শিলনোড়া বয়ে আনতে গেছি—আমাদের কোন আন্দাজ নেই, আমরা বোকা?

কেষ্টদাস হেসে উঠে বলে এইরকম তুমিও বুঝে রাখ না। ঠান্ডা হবে মনটা।

ছিপ আরও কাছে এসে গেছে। এখন আর সন্দেহমাত্র নেই। সাহেব প্রবোধ দিয়ে বলে মুশড়ে গেলে যে তোমরা। বাজার ভান্ডার একটা [illegible] ভান্ডার বাক্স ছাড়ে। বাক্স গেছে [illegible] এসে পড়বে। ধন-সম্পত্তি যতদিন লোকের ঘরে আছে, আমাদেরও আছে। শুধু এনে ফেলার অপেক্ষা।

বংশীর পিঠে এক থাবা ঝেড়ে দিয়ে চাঙ্গা করে : [illegible] যখন তোমার দশ-থাবা [illegible]। [illegible] দেওয়া সবশুদ্ধ আমার গায়ে [illegible] জিনিস ছুঁয়ে কিরে [illegible]। [illegible] সাপের মাথার মণি যদি খুলে আনতে হয়, তাই নিয়ে আসব তোমার কাজে।

যে কথা বলল, সত্যি সত্যি করেও ছিল তাই। সদ্য বিয়ের বউ আলতায় পায়ের কাছে শুয়ে একটা একটা করে গয়না খুলে আনল। মন্ত্র পড়ে কালনাগের মাথার মণি নিয়ে আসা এর চেয়ে কঠিন কিছু নয়।

ছিপ এখন একেবারে কাছে। হঠাৎ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে : কারা যাও তোমরা? মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলে মজা করি একটু।

ছিপনৌকো থেকে মিনমিনে গলার জবাব আসে : ব্যাপারি—

কোন জায়গার ব্যাপারি? কি নাম? কিসের ব্যাপার-বাণিজ্য? সারবন্দি খাড়া হয়ে সব দাঁড়াও।

ডিঙির সাঙাতদের ফিসফিস করে বলে, ওরা চোর—আমরাই যেন পিটেল-পুলিশ। ছদ্মবেশ ধরে যাচ্ছি।

ছিপনৌকোর বাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

শলাপরামর্শ হচ্ছে ঠিক নিজেদের মধ্যে। হুকুম মাফিক কেউ উঠে দাঁড়ায় না।

চাপা গলায় বংশী তর্জন করে ঃ অবাক কাণ্ড, এই সময়টা রঙ্গরস লাগল তোমার! এত বড় লোকসানও মনে লাগে না, তুমি কি বলো দিকি—যোগীঋষি না কাঠপাথর?

সাহেব একমুখ হাসি নিয়ে ছিপের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দেয় ঃ হল কি তোমাদের, কথা কানে যায় না বুঝি?

দাঁড়িয়ে পড়ত তারা ঠিকই, কিন্তু বংশী মজাটা পুরোপুরি হতে দিল না। এরকম হাসিমস্করা বড় বিপজ্জনক। তুমি আজ করলে, ওরাও কোনদিন অন্য কারো সঙ্গে করবে। রীতিনিয়ম তো উঠে যাবে এমনি হলে। তাড়াতাড়ি বোঠে তুলে নিয়ে বংশী জলে বাড়ি দেয়। গাবতলির হাটের নিচে সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে যেমন করেছিল। এ কাজে বংশীর জুড়ি নেই।

বাড়ির পর বাড়ি। টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের টরে-টক্কার মধ্যে কথা—জলে বোঠে মেরে মাঝিমাল্লাও তেমনি কথার চালান দেয়। ঝিমিয়ে-পড়া ছিপ মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠল। তরতর করে ডিঙির পাশে এসে গায়ে গায়ে লাগায়। পরিচয় হয়ে গেলে, ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি এখন।

নিতান্ত উপমার কথাও নয়। বংশী আর চাঁদমিঞা একই দলে কাজ করে এসেছে। গোড়ার দিকে চাঁদমিঞার রাগ যে না হয়েছিল এমন নয়। পুরানো সাঙাত পেয়ে ভুলে গেল। পান-তামাকের লেনদেন এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। দশরকম সুখ-দুঃখের কথাবার্তা। থানের মুখের জোড়া ডাউলের বৃত্তান্তও চাঁদমিঞার কাছে পাওয়া গেল। ব্যাপারি-নৌকো সত্যি সত্যি। হাটে হাটে মাল গস্ত করে বেড়াচ্ছে। পরশুদিন গাবতলির হাট থেকে চাঁদমিঞা নজর ধরে আছে, ফাঁকায় পেলে একটু মোচড় দিয়ে দেখবে। কিন্তু হল না, হবার উপায় নেই—

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে চাঁদমিঞা বলে, এই আজ বিকেলেই পিটেলের নৌকো দেখলাম। বড্ড লেগেছে ওরা। পুলিসের দিকে এক চোখ এক কান আর মক্কেলের দিকে এক চোখ এক কান—ভাগাভাগি করে কাজকর্ম হয় কখনো! দূর, দূর! কারিগর না হতে গিয়ে যদি পুলিস হতাম, অনেক ছিল ভাল। অনেক বেশি রোজগার।

একটা গাঙের মুখে এসে চাঁদমিঞা ডাইনে ঘুরল। এরা ছুটেছে কাটাখালি মুখো। সন্ধ্যা থেকে গুরুপদ সেখানে। কাজের কিছু নয় মক্কেলের খবরাখবর নেই শুধু-শুধু হয়রানি। তার উপরে হোঁচট খেয়ে সে ভুঁইয়ের আল থেকে কাঁটাবনে পড়েছিল গণ্ডা দশেক কাঁটা ফুটে আছে পায়ে। মনমেজাজ তিরিক্ষি। বাক্স ফেলার বৃত্তান্ত শুনে এই মারে তো এই মারে। বলে বিধাতাপুরুষ হামেশাই মানুষকে দেয় না জন্মের মধ্যে একবার হয়তো দিল। হাতের লক্ষ্মী বিসর্জন দিয়ে এলে. আমি বাপু নেই আর তোমাদের সঙ্গে। অপয় তোমরা সব—তিলকপুরে সেবারে জান নিয়ে কেন গাঙকে ফিরেছিলাম এবারে আরও সাংঘাতিক হবে।

মক্কেলের অভাবে রাত্রে বেরুনো হল না, কাটাখালি খেজুরবনের পাশে চাপান দিয়ে রইল। গুরুপদ একটি কথা বলল না কারো সঙ্গে শেষরাত্রে নেমে চলে গেল।

কেষ্টদাস বলে, যাকগে, বয়ে গেল। বুড়োবয়সে কষ্ট করে পারব না, ঘরেও মন টেনেছে—তাই একটা ছুতো।

কিন্তু প্রধান উদ্যোগী বংশীও মিইয়ে গেছে। লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি আর নয়। মুনাফা নেই, বরঞ্চ পিটেল-পুলিসের যা খবর, বিপদ আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। দশধারার মামলা কাঁধে ঝুলছিল, দিন সংক্ষেপ হয়ে মাথার এসে পড়েছে। মরীয়া হয়ে এবারের সর্বশেষ চেষ্টা। ফুল-হাটায় যাই চলো, বলাধিকারী মশায়ের শরণ নিইগে। তিনি ছাড়া সুরাহা হবে না। বলাধিকারী মাথার উপরে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য খুঁজিয়াল। ক্ষুদিরামকে ধরে পড়ব গিয়ে, দায় জানাব। দয়া আছে মানুষটার। দয়ার চেয়ে বড়—দুঃসাহসের কাজে নামবার ঝোঁক। এখনো—এই বয়সে।

বলাধিকারী ডাকলেন, এরা কি বলছে শুনে যান একটু ভটচাজ মশায়। বড্ড ধরা-পাড়া করছে।

ডাকাডাকিতে ক্ষুদিরাম এলো। বংশীর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, টহলদারির শেষ হল—রেগ মিটেছে তো ভাল করে? রাত পোহাতে কাকের ডাকই লাগে, পেঁচার ডাকে হয় না, কি বলো?

অতএব দলের ভিতরের আজেবাজে কথাবার্তাগুলোও ক্ষুদিরাম জেনে বসে আছে। হাতের পাতায় বিধাতাপুরুষের হিজিবিজি গড়গড় করে পড়ে যায়—ও মানুষের সঙ্গে কে পারবে? কান পেতে শুনতে হয় না, মুখে তাকিয়েই সে বোঝে।

গুরুপদর উপর রাগটা বেশি। ক্ষুদিরাম বলে, ডাকো একবার চালিয় পোকে। এখন কি বলে শোনা যাক।

নেই সে কেটে পড়েছে। দায় উদ্ধার করতেই হবে ভটচাজ মশায়। পায়ে পায়ে এসে পড়েছি লাথি মারলেও নড়ব না।

বংশী সত্যি সত্যি পা ধরতে যায়। দু পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম বলে, একানি
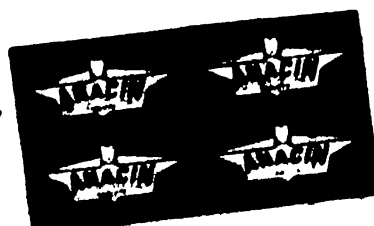
তার কি! তোমাদের দায় বলে কোষ্ঠীখানা অমনি তো আকাশ থেকে পড়ছে না। খুঁজেপেতে দেখব, সময় লাগবে।

জগবন্ধু বলাধিকারী, দেখা যায়, এদের পক্ষে আছেন। তিনি সুপারিশ করেন: রাখুন দিকি! আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলো নখের আগায় নিয়ে ঘোরেন, তাদের খবর টপাটপ বলে দেন। এইটুকু অঞ্চলের মধ্যে যেমন-তেমন একখানা কোষ্ঠীর খোঁজে আপনার এক যুগ বারো বছর লাগবে! ঘোষার কথা আর বলবেন না, হাসবে লোকে।

আর কথা না বাড়িয়ে ক্ষুদিরাম চোখ বুজে মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখস্থ বলার মতো বলে যায়, নবগ্রাম সেনদের বাড়ি। কাজখানা [illegible] নামতে পারে। উঁহু, আজ নয়। সেনদের সাবেকি দালানকোঠা—দেয়াল কমপক্ষে আড়াই হাত পুরু। দেয়াল কাটতেই রাত কাবার। কোন দরকার নেই, সবুর করো পাঁচটা সাতটা দিন। মক্কেল জাড়ুনপুরে চলে যাক। সেন্ট ঘর সেখানে—দো মহলা মাটি। একটু একটু জল ছিটোলে [illegible] মতো আপনি গলে যাবে।

সগর্বে বলাধিকারী সকলের দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখ, আমি কি মিথ্যে বলেছি? অথচ দু' তিন মাসের মধ্যে ভটচাজ মশায় উঠোনের বাইরে যাননি। না, তারও বেশি, [illegible] থেকেই নড়তে পারেননি।

ধোনাই মিস্ত্রি [illegible] বলে, [illegible] গণ্ডগোল বসে গিয়ে।

[illegible] হাসতে ক্ষুদিরামই তখন [illegible] আমি [illegible] গণ্ডগোল এসেছিল।

গণ্ডগোল এসেছিল এক মেয়েওয়ালা। পাত্র নবগ্রামের সেনবাড়ির শংকরানন্দ। প্রথম পক্ষ [illegible] ভাগাড়ে গরু মরলে [illegible] শকুনের যেমন ভয়, কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

[illegible] করে এক কন্যাপক্ষ উপস্থিত: পাঁচপাঁচি ওরা বড্ড মানে। রাজযোটক হলে এক পয়সা পণ লাগবে না। আপনি ব্যবস্থা করে দিন সামুদ্রিকাচার্য মশায়।

ক্ষুদিরাম বলে, পাত্রের কুষ্ঠি তো আনবেন। না মিলিয়ে যোটক-বিচার কেমন করে হবে?

যেতে না, ঘুঘু আছে সেদিক দিয়ে। পাত্রের কুষ্ঠি হাতে রেখে দিয়েছি। সেই জন্যেই তো আসা আপনার কাছে। মেয়ের কুষ্ঠি মেরামত করে পুরানো তুলট-কাগজে লিখে দেবেন, তাদের কুষ্ঠি যা-ই হোক খাপ খাবে।

ক্ষুদিরামের মুখ দেখে কি বুঝল কে জানে। জোর দিয়ে [illegible] কেন হবে না? রানী ভবানী, সুরেন বাড়ুয্যে চাই কি আকবর বাদশা—গোটা কয়েক দিকপাল মানুষের ছক থেকে জুড়েতেড়ে বসিয়ে দিন। কনের কুষ্ঠি দেখে ছেলেওয়ালারা হাঁ হয়ে যাবে, লগ্নপত্তোর করতে সবুর সইবে না।

দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র, কালোকুৎসিৎ চেহারা, দুটো গজদন্ত ওষ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, চুলও পেকেছে দু-চারটে। কিন্তু হলে হবে কি—শংকরানন্দ সেনবাড়ির ছেলে। আর এক মস্ত কথা, আগের বউ সন্তান রেখে যায়নি, অঢেল গয়না রেখে গেছে আপাদমস্তক পরেও যা শেষ করা যায় না।

ক্ষুদিরাম সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে দিল: কুষ্ঠি জাল করা আমার দ্বারা হবে না।

জাল কেন বলেন? সেয়ানা মেয়ে কাঁধে বসে নাচতে পারি, তার জন্য এদিক-সেদিক খানিকটা মেরামত করে দেওয়া। করে তো সবাই।

তাদের কাছে যান।

রাজী নিখুঁত চাই। সেনরা বড্ড ঘাড়েল, ধরে না ফেলে। আপনি ছাড়া কারো উপর ভরসা হয় না। দক্ষিণার যে রকম [illegible] সেজন্য আটকাবে না।

ক্ষুদিরাম হাত বাড়িয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দেয়: চলে যান, এক্ষুনি—

যেতে যেতে কন্যার পিতা কটু মন্তব্য করে: কী আমার ধর্মঠাকুর রে! কলি তরাতে এসেছেন—আরও যদি না জানতাম।

ক্ষুদিরাম নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, আমি লোকটা মেকি। কিন্তু সামান্য একটু বিদ্যে নিয়ে আছি, জেনেশুনে তার মধ্যে ভেজাল ঢোকাতে পারব না।

এই মানুষটির সংগেই কদিন পরে আবার দেখা হয়ে গেল। কৌতূহলী ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করে: কুষ্ঠি মেরামত হল আপনার?

এখন হয়ে কি হবে! আপনার জন্যেই তো মশায়! মর্মান্তিক ক্রোধে ক্ষুদিরামের উপর সে খিঁচিয়ে উঠল: আপনাকে না পেয়ে খুলনায় জ্যোতির্ভূষণ মশায় অবধি ধাওয়া করতে হল। ফিরে এসে শুনি, জাড়ুনপুরের কাজ এর মধ্যে গেঁথে ফেলে দিয়েছে। লগ্নপত্রের দিনক্ষণ নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ সারা।

বিয়ের তারিখ এগারোই—সেই লোকের কাছেই শুনেছিল। কর গুণে ক্ষুদিরাম এবার হিসাব করছে: আর আজকে হল ষোলই। পাঁচ দিন বিয়ে হয়ে গেছে। কনে এখন শ্বশুরবাড়ি—নবগ্রামে। বিয়ের যাত্রায় কদ্দিন আর থাকবে? আরও চারটে পাঁচটা দিন ধরো। তারপরে মক্কেল জাড়ুনপুর যাবে। কাজ সেইখানে।

বংশী আবদারের সুরে বলে, খোঁজ দিয়েই হল না। আপনাকে যেতে হবে ভটচাজ মশায়, সাথেসংগে থাকবেন। শিবে-সংক্রান্তি আমাদের, তাড়াহুড়ো ভাল কাজ নামাতেই হবে একখানা।

ক্ষুদিরাম লুফে নিয়ে বলে, যাবোই তো। জবর কাজ—হাজারে একটা আসে এমন। ঘরে বসে থাকতে মন মানবে কেন? কিন্তু কারিগরের বুকে বল আছে তো? ঢলঢলে ছুঁড়ি, ভরভরন্ত যৌবন—তার ঘরে ঢুকে গয়না নিয়ে আসা।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে ওঠে, ওস্তাদের যে দিব্যি দেওয়া রয়েছে—

ক্ষুদিরাম মুখ ঘুরিয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, তোমাদের নয়, আমি সাহেবকে বলছি। ঘর নয় সে, টাকশাল। রুপো-তামা নয়, শুধুই সোনা। বিয়ের কনের গা থেকে সোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেবে।

সাহেব জ্বল-জ্বলে চোখে তাকিয়ে। বংশী শিউরে উঠে বলে, ডবকা মেয়ের গায়ে হাত!

সাহেব মৃদু মন্তব্য করে: বিয়ে হয়েছে সে মেয়ের, বিয়ের সংগে সংগেই অর্ধেক-বুড়ি।

বলাধিকারী এতক্ষণে এইবার বললেন, কায়দাটা হল, বরের মতন ঠিক করে সেই মেয়ের পাশে শুয়ে পড়বে। মন দুলবে না, গা কাঁপবে না—বড্ড কঠিন কাজ। ধরো, ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সে তোমার গায়ের উপর টানল—

অবহেলার ভাবে সাহেব বলে, দীঘির পাড়ে কালকেউটে পায়ে উঠেছিল। তাতেও

গা কাঁপল না. মেয়েমানুষে কি হবে?

বলাধিকারী বলেন, জেগে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। ও বয়সের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

সাহেব বলে, বাইটা মশায়ের ব্যবস্থা আছে—নিদালি-পাতা, বড় মোক্ষম জিনিস। পাতার বিড়িও মুখে নেবো। সকলের উপরে এই আমার রয়েছে—

হাতদুটো তুলে ধরে দু-হাতের আঙুলে সগর্বে সঞ্চালন করে: দশ আঙুলে এই আমার দশ-দশটা কিংকর। আঙুল বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি। এ জিনিসও ওস্তাদের কাছে পাওয়া। পরখ হোক না বলাধিকারী মশায়, শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ওস্তাদের উদ্দেশে ঘন্তুকর কপালে ঠেকিয়ে সাহেব হাঁটুর কাপড় সরিয়ে পায়ে-বাঁধা কাঠিতে হাত ঠেকায়। বলে, ওস্তাদ হাতে তুলে দিয়েছেন, শত্ত কাজেই এ জিনিসের বউনি। আশীর্বাদ করুন বলাধিকারী মশায়, জিতে এসে আবার আপনার পায়ের ধুলো নেবো। (ক্রমশঃ)

* আলোচনা *

শিল্পীর স্বাধীনতা

মহাশয়,

শ্রীমনোজ বসুর লেখা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' পড়েছি, এবং তার কয়েকটি প্রতিবাদ দেখলাম। মনোজবাবু প্রতিবাদেরও প্রতিবাদ করেছেন। আমার ধারণা ব্যাপারটা ক্রমেই অবান্তর কথায় চলে যাচ্ছে। সাধারণ ভাবেই বোঝা যায়, কোনো লেখক যদি কোনো দেশ বেড়িয়ে এসে একটি বই লেখেন তবে সেই বইয়ে উৎসাহীরা সাহিত্যগুণ এবং তথ্যগুণ দুই গুণই পাবেন এমন কোনো কথা নেই। অনেক সময় উভয়ই থাকতে পারে, অনেক সময় হয়ত একটি গুণ, কোনো সময় কিছুই থাকে না। মনোজবাবু বলছেন—সাহিত্যগুণের জন্য বইটি পুরস্কৃত হয়েছে। খুবই ভাল কথা। সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ অমন বইটি তবে তিনি উঠিয়ে নিলেন কেন? মনোজবাবু বলেছেন, যদি ঢাক পেটানোই বলতে হয় তাঁর বইকে তবে সেটা চীন দেশ সম্বন্ধে, দেশটা কম্যুনিস্ট বলে নয়। খুবই ভাল কথা। তবে আবার প্রশ্ন ওঠে—কোনো দেশ সম্বন্ধে এক সময় ঢাক পেটালে কি অন্য সময় ঢাকের কাঠি বন্ধ করতে হয়? কেন হয়? ঢাক খারাপ না কাঠি খারাপ?

মনোজবাবু শ্রীনেহরু, পানিক্কর এঁদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। মুশকিল এই যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে। পানিক্কর কি তাঁর বই তুলে নিয়েছেন? মনোজবাবু কি ঠিক জানেন সে-কথা? আমার একমাত্র আপত্তি এই যে, যদি সত্যতা গুণে বইটি সিদ্ধ হয়ে থাকে, যদি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে—যদি চীন দেশের কথা তাতে লেখা হয়ে থাকে তবে মনোজবাবু কোন্ দুর্বলতা বশত বইটির প্রচার বন্ধ করলেন? যে শিল্পী নিজের শিল্প স্বাধীনতা সম্পর্কে এত বেশী সচেতন তাঁর পক্ষে এমন একটি গুরুতর বিষয়ে এ কি ধরনের সিদ্ধান্ত? কোন যুক্তিবশত, কোন নীতিবশত এটা হল?

বোধ হয় বিষয়টি নিয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ত্যাগ দ্বারাও অনেক সময় মানসিক শান্তি আসে না। স্বয়ং রামচন্দ্রেরই আসে নি। ইতি—

অশোক কাঞ্জিলাল

দমদম

২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনায় সার্থকতা সম্পর্কে দু'দল লোক প্রশ্ন

তোলেন, শুনি। একদল আমাদের পরিচিত, যাঁরা টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রদর্শনে বিশ্বাস করেন। অপর দল হচ্ছেন এই স্বাধীনতার স্বতঃসিদ্ধতার চরম বিশ্বাসী, সুতরাং তা নিয়ে বাগ্‌বিস্তারকে বাহুল্য মনে করেন।

যে-কোন প্রচার বা মতবাদকে ভ্রান্ত বলে মনে হলে তাকে উৎখাত করার দায়িত্ব সচেতন যুক্তিবাদী মানুষের। তার পন্থা কিন্তু যুক্তিহীন প্রচারমাত্র হওয়া উচিত নয়। মানুষের মৌল স্বাধীনতাকে যা চ্যালেঞ্জ করবে তাকে পরাভূত করতে গেলে প্রয়োজন গতিশীল, সুদৃঢ়, জীবন্ত মতবাদ যার ভিত্তি হবে শুধু শিল্পীরই নয়, সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি-মানুষের। আজ এ কথার গুরুত্ব আমরা এদেশে যতটা মূল্য দিয়ে বুঝলাম, এমনটি আর কখনো বুঝিনি। দেশে লেখার অনীহা যাদের অবিচল, ঠেকে শেখা ছাড়া তাদের গতি নেই।

একটা কথা, শিল্পীর স্বাধীনতা তো সেই স্বাধীনতারই অঙ্গীভূত যে স্বাধীনতা মানবত মানুষের চির-অন্বিষ্ট। এ স্বাধীনতা বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক—যে কোনো মুক্ত মানুষের স্বাধীনতা। নিরবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রকাশই সেই স্বাধীনতার দাবিদার।

আপনাদের কেবল অনুরোধ করব এই প্রয়াসের পরিপূরক হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং অর্থ-নৈতিক বিষয়ে গণতন্ত্রের সপক্ষে যুক্তিসহ আলোচনার সূত্রপাত করতে। শিল্পীর স্বাধীনতা তথা ব্যক্তির স্বাধীনতা যে কী মূল্যবান জিনিস তা সকলের চেতনায় প্রবিষ্ট করাতে গেলে টোটালিটারিয়ানিজম্ ছাড়া অর্থনৈতিক বৈষম্য, মুনাফাবাজি ও শোষণের প্রতীকার নেই—এই জনপ্রিয় ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা এখুনি দরকার। মানুষকে বোঝানো দরকার যে মনকে না বিকিয়েও পেটের ভাতের প্রতিশ্রুতি রাখতে গণতন্ত্রী সমাজ জানে।

অরুণোত সেনগুপ্ত
কলিকাতা-১

ছাপাকরে

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ কবিতায় মিল এবং শব্দের ব্যবহার নিয়ে একটি আলোচনা করেছিলেন। তারপরে এই বিষয়ে একাধিকবার দেশ পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীঅমিয় বসু তাঁর আলোচনায় যে উপমাগুলো হাজির করেছেন কিংবা সম্ভাবনাময় যে চমকপ্রদ মিলগুলির উল্লেখ করেছিলেন, সে সবই ছড়া বা লিমেরিকে গ্রাহ্য। সাধারণ কবিতায় তার ব্যবহার প্রায় অসম্ভব। অমিত্রাক্ষরের একশো বছর পরে মিলের অভাব নিয়ে এতো আক্ষেপ—কিন্তু কেন? ছড়ায়, খাপছাড়া কবিতায় উঁইথ কি'র সঙ্গে হুইস্কি মেলানো যেতে পারে, চাটুজ্যের সঙ্গে হাঁটুর যে মেলানোর জন্যে চাটার্জি জামাইকে ঘোড়া থেকে ফেলে হাঁটু ভেঙে দিতে হতে পারে এবং সত্যিই যখন মিল মেলে না, য র ল ব হ অনেক সার-বন্দী দাঁড় করিয়ে দিতে হয় তখন।

[illegible]।

আক্ষেপ ঠিক কবিতার ভালো মিল হচ্ছে না তা সম্ভবত নয়, আক্ষেপ এই যে, যাঁরা ভালো কবিতা লেখেন বা লিখতে পারেন, তাঁরা কেউই আজকাল আর ছড়া লেখেন না, লেখেন না হাল্কা হাসির কবিতা। কবিতার ব্যাপারটা এখন কেমন যেন থমথমে; কেউ ধীর, কেউ ক্ষিপ্ত, কেউ চতুর, আবার কেউ বা সরল, কিন্তু সকলেই ভীষণ গম্ভীর; যেন নিকট আত্মীয়ের গুরুতর অপারেশন হচ্ছে। আজকাল কবিতায় বড় সব গুরুগম্ভীর মুখের দেখা মেলে, বড় সব কঠিন চিন্তা। এমন কি, তরল ভালোবাসার কবিতাও যখন প্রায় লেখা হচ্ছে না, তখন কোথায়,

পরস্মাদনের knave, idiot কি কেবল
liar সে, bumbug, cad
unspeakeble—'

কিন্তু, জানাশুনো সমস্ত মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে একটি আটদশমাত্রিক চতুর্দশী-হা-হুতাশের চেয়ে দু লাইন ছড়া অনেক ভালো নয় কি?

অন্নদাশংকর, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত—এঁদের সঙ্গে এখন যাঁরা তরুণ কবি, তাঁদের বয়সের ফারাক মোটামুটি প্রায় তিরিশ বৎসরের—এই তিরিশ বৎসরে বাংলা কবিতা অনেক এগিয়েছে, অনেক গোলকধাঁধার ঘুরপাক, অনেক মারাত্মক ব্যাপার, কয়েকটি নাতিশীতোষ্ণ বিপ্লব। তবু 'দিদিমণি ভাদুড়ি নহ তুমি বোতলের'—এই-রকম কম্প্লিমেন্ট আর রচিত হলো না। ব্যাপারটা সত্যিই খুব আফসোসের।

বাংলা দেশে প্রতি মাসে এখন পত্র-পত্রিকাতে শতাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়। সুন্দর ঝকঝকে যাকে বলে নিখুঁত ছন্দ মিল, তেমন কবিতা এখন প্রায় সবাই লেখেন। কিন্তু এর মধ্যে হাল্কা, তরল কবিতা কটি? full fee'র সঙ্গে ফাজলামি মেশানো কবিতা—একটিও নয়। বিশেষ গাম্ভীর্য সহকারে একটির পর একটি কবিতা পাঠ করে তারপর একেকটি প্রকম্পিত দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করা। সাজানো-গোছানো-মেজানো কবিতা—তার অভাব ঘটেছে আজ আর কেউ বলবে না, কিন্তু বাস্তবিকই যার অভাব তা হলো,

'কোম্পানির কাবাবের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা সন্ধে।
দেহটা অমনি তার তাতাতে
যেতে হলো মেয়ে। হাসপাতালে।'

অথবা,

'আমি আর গদাদের মঙ্গল ঈশ্বর,
বিমির বাড়িতে গিয়ে খেলেম বিয়ার।'

ইতি—

বিনীত

তারাপদ রায়

কলকাতা—২৬

ট্রামে-বাসে

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমির অগ্নিমূল্য হইয়াছে এবং কোন কোন অঞ্চলে জমির দর দুইশত-গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"অতঃপর কোন কোন উপমন্ত্রীকে চাষের কাজে লাগানো হবে, সংবাদ প্রকাশিত হবার পরে চাষের জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে কি না তা অবশ্য বোঝা গেল না।"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

আগামী বৎসর হইতে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হইবার আশা আছে বলিয়া অন্য এক সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের শ্যামলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করিল "উদ্বৃত্ত শব্দটার অন্য অর্থ বাড়ন্ত।"

দুধে জল মিশ্রিত করার অপরাধে কোন এক গয়লার ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে।—"অনুমান করছি গয়লাটি কলকাতার নয়। এখানে ক্লোরিন মিশ্রিত বিশুদ্ধ গঙ্গাজল দুধের খাদ্য গুণের পক্ষে অতুলনীয়; এবম্বিধ দুগ্ধে যুগপৎ স্বাস্থ্য ও স্বর্গলাভ"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

তেলাপিয়া মাছ অন্যান্য মাছ খাইয়া ফেলে বলিয়া নাকি মৎস্য দপ্তর তেলাপিয়ার চাষ বন্ধ করার কথা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু জানা গেল তেলাপিয়া নাকি নিরামিষাশী। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এই জন্যেই হয়ত পটল ঢেঁড়স, বেগুন আর তেমন আমদানী হচ্ছে না, তেলাপিয়াই সব সাবড়ে দিচ্ছে। এমন মাছকে কি আস্কারা দিতে আছে!"

এক সংবাদে প্রকাশ জনৈক ছাত্র মাত্র সাত ঘণ্টায় একশত তিনবার করমর্দন করিয়া আগের রেকর্ড ভঙ্গ

করিয়াছেন।—"ছাত্রটির এলেম আছে স্বীকার করতেই হবে। তবে এ কথাও বলি মাথা তো ছাত্রী। করমর্দনের চেয়ে করপীড়নের রেকর্ড ভঙ্গের কৃতিত্ব অনেক বেশি"— বলে আমাদের শ্যামলাল।

ভারত হইতে কয়েকজন কবি নাকি নেপালে যাইতেছেন। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"জনাব আয়ুব খাঁ নাকি কবিয়াল হিসেবে তাদের আসর গরম করতে সম্প্রতি নেপাল গিয়েছিলেন, সত্য মিথ্যা সংবাদদাতাই জানেন!'

কলিকাতা পুলিশের লাল পাগড়ি বর্জন বুঝি চলিল না। শুনিলাম তাহাদের শিরস্ত্রাণ লইয়া আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। লাল পাগড়ি বর্জনের সময় জনৈক পুলিস নাকি গাহিয়াছিলেন—"এই dress-এ তে জন্ম যেন এই dress-এ তে মরি"—গানটা স্মরণ করাইয়া দিলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতায় সম্প্রতি 'কুকুর রেস' আরম্ভ হইতে চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল— একটা কিছু দিয়ে আসর গরম

রাখা ভালো। [illegible] খেলানের বিকল্প হিসেবে কুকুর খেলা চলতে পারে!!"

মধ্যভারত জিলার কর্তৃপক্ষ নাকি স্থির করিয়াছেন যে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি ব্যাপারে খরচ খরচা পঞ্চাশটি ইঁদুর জীবিত বা মৃত দিলেই চলিবে।—"আমরা বলি বিবাহের ব্যাপারে ইঁদুর দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদে ছুঁচো দিলেই মানানসই হত"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নাকি বলিয়াছেন যে মানবজাতিকে নিরাপদে থাকিতে হইলে তাহাকে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।—"অবশ্য সে সংগ্রামের জন্য ঢাল-তলোয়ারের প্রয়োজন নেই, শুধু পেটে চড়"—বলেন বিশুখুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ ৮ই জুন কলিকাতায় 'দর কমাও' দিবস পালন করা হইবে।—"উদ্যোক্তাদের কার্যসূচীতে চ্যারিটি ম্যাচের টিকিটের দর কমানোর ব্যবস্থাও যেন থাকে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক কিশোর সহযাত্রী।

রাশিয়ার সংবাদে জানা গেল সেখানে নাকি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচতলা বাড়ি নির্মাণ সম্ভব। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—'তাস-এর দেশের বাড়ি, তাই তাসের বাড়ির কথা আপনা থেকেই মনে আসছে!"

বিলাতের কোন কোন ক্রিকেট খেলায় এখন হইতে মহিলা আম্পায়ার নিযুক্ত হইবেন—"অর্থাৎ এল বি ডবলিউ

অর্থাৎ লেডী বিফোর উইকেট'—বলিলেন অন্য এক কিশোর সহযাত্রী।

একটি বৈদেশিক সংবাদে শুনিলাম স্কটল্যাণ্ডের কোন এক স্থান হইতে একটি 'রেল সেতু নিরুদ্দেশ। সম্ভবত চুরি হইয়াছে।'—'পুকুর চুরিতে যারা হাত পাকিয়েছে তাদের কাছে রেল সেতু চুরি কোন একটা সংবাদই নয়"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রীনেহেরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, তিনি 'করতালি' পছন্দ করেন না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বুঝলাম ক্ল্যাপ তার চলবে না। আশা করব ক্ল্যাপ না চললেও ক্ল্যাপস্টিক নিশ্চয়ই চলবে!!"

✻ চিত্র প্রদর্শনী ✻

বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও সমাজে শিল্পীরা রাজন্য, ভূস্বামী ও তদগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের রুচি, নির্দেশ ও খেয়ালের বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিকে চিত্রণে ও ভাস্কর্যে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। যে প্রভাবের ছাপ শিল্পীদের রচনায় ব্যাপকভাবে দেখা যায়, শিল্পীর স্বেচ্ছায় গৃহীত যুগধর্মী শিল্পভাবা হিসাবে তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। রাজন্য ও ভূস্বামী যাঁরা শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এখন তাঁদের তিরোধানে সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন যান্ত্রিক বাণিজ্যের অধিনায়ক ধনীজনেরা। পাশ্চাত্যে ও মার্কিন রাজ্যে এবং অন্যান্য দেশে এই ধনীজনেদের সমাদর ও অনুকূল্যে চিত্রণ ও ভাস্কর্যের প্রকাশ প্রচার ও উপলব্ধি সমাজের স্তরে স্তরে অপরিসীমভাবে প্রসারিত হয়েছে। ভারতে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বদলে গণতান্ত্রিক শাসনে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারে সৃষ্টি হচ্ছে পূর্বেকার মহারাজা ও জমিদার কুলের মত ব্যবসায়ী ধনী সম্প্রদায়ের। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের নবাগত ধনী সম্প্রদায়কে কলাশিল্পে অনুপ্রাণিত দেখা যায় না। ভারতের কোন কোন শহরে এই গোষ্ঠীর যে দু একজনকে শিল্পদরদীরূপে দেখা যায়, তাঁদের অনেকেরই আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিল্প পৃষ্ঠপোষক ও সমজদারের ভূমিকায় সমাজে ও দেশে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা। বোম্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের শিল্পীরা এই শিল্প-দরদীদের কবলমুক্ত হয়ে নিজেরা প্রতিষ্ঠান গড়ে সরাসরি গণতান্ত্রিক সরকার ও জনগণের নিকট আপন রচনাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কলিকাতা শহরেও পেশাদারী শিল্পীদের কয়েকজন কয়েক বৎসর আগে তথাকথিত শিল্পদরদী ধনীদের দ্বারা পরিচালিত সংস্থার বাইরে শুধু শিল্পীদের দ্বারা গঠিত "ক্যালকাটা গ্রুপ"-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু নানাভাবে কলাদরদী ধনীদের পরিচালিত সংস্থার প্রকোপে এই প্রতিষ্ঠানের আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই শহরের প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীরা মর্মে মর্মে অনুভব করেন এবং করছেন যে, যতক্ষণ না শিল্প রাষ্ট্রে এবং জাতীয় জীবনে একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্থানলাভ করছে ততদিন শিল্পের প্রকৃত বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রচার হওয়া সম্ভব হবে না এবং শিল্পের সেই প্রতিষ্ঠা ও সমাদরের জন্য শিল্পীদের

"নিউ কলোন" — অনিলবরণ সাহা

আসতে হবে সরাসরি জনগণের কাছে—অন্য কারুর তাঁবেদারির মারফতে নয়। ঠিক এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কলিকাতায় দুইটি মূলত তরুণ শিল্পীদের সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। ১৫৭বি ধর্মতলা স্ট্রীটে ছুতার কর্মকার প্রিন্টিং প্রেস প্রভৃতি কর্মশালার প্রতিবেশী সোসাইটি অব কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস বা সংক্ষেপে 'স্ক্যা' এবং দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্র স্টেডিয়ামের একটি ঘরে 'পেন্টারস্ অ্যান্ড স্কাল্পটরস অ্যাসোসিয়েশন' বা সংক্ষেপে 'পি এস এ'। এই দুই সংস্থার সভ্য ও সভ্যাদের অনেকে বাংলার বাইরে ভারতে ও বিদেশে শিল্পে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন।

গত ১লা জুন এ 'স্ক্যা'র নির্বাচনী অ্যাকাডেমি গ্যালারীতে এর সভ্য ও সভ্যাদের 'সামার শো'র প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। গ্যালারীর পরিসরের ক্ষমতাকে অনুধাবন করে দ্রব্যের সংখ্যা বেশ কম রেখে 'স্ক্যার' সভ্যগণ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

"লুনেট হেড" — অজিত চক্রবর্তী
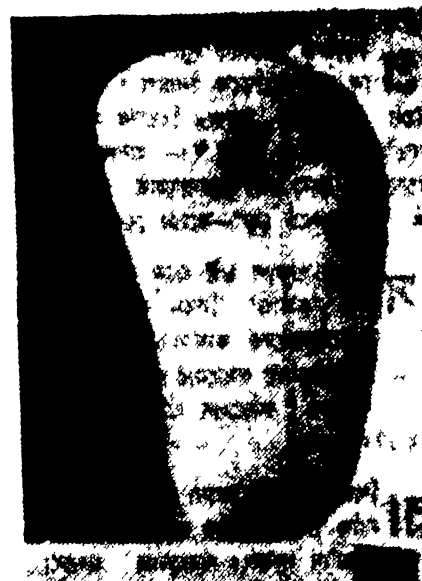
মাত্র দশখানি তেল ও জল রঙের ছবি, পাঁচটি গ্রাফিক ছবি ও ছয়টি ছোট আকারের মূর্তি এই প্রদর্শনীতে স্থানলাভ করেছে, রচনাগুলির সবগুলিই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট বা সেমি-অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ঢং-এর। শিল্পীদের প্রত্যেকের রচনা স্বীয় বিশেষত্বকে প্রকাশ করেছে এবং বেশ সন্ধানী মনের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। সনৎ কর এর পাসটোরাল (১নং) বেশ কবিত্বময় রচনা, সবুজের নানা টোন এর মাঝে সাদার নকশা বেশ মনোরম। শ্যামল দত্ত রায় এর উইংসড হর্স (৩নং) জলরঙ ছবি হলেও রঙের ছোপে ও [illegible] তেলরঙা ছবির সঙ্গে পার্থক্য [illegible] [illegible] ছবিতে সাদা ও [illegible] [illegible], কপাট বাসক (৯নং) এ [illegible] এক [illegible] সম্পূর্ণ নকশার তৈরী হয়েছে [illegible]। ছাপতে (মেসোনাইট, ৪) কাগজের [illegible] ছেঁড়া বক বসিয়ে নকশায় যে পরিশ্রম করা হয়েছে তা ইনটাগলিও ও অন্য প্রণালীতে করা এচিং এ তৈরী করলে [illegible] অবও জমকালো ছবি হতে পারত। সুকুমার দত্তের "স্ট্রীট ভিউ" (৬নং) বেশ সংযত রচনা, নীল কালো চৌখুপির মধ্যে ধরা সাদাটে জমি যেন রক্তের আভাবে শহরের গোপন কোঠাগুলিকে ও অলিগলিকে লুকোচুরি খেলাচ্ছে।

এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সোমনাথ হোড়ের দুটি অপূর্ব রঙিন এচিং। "আউল অন এক গ্রোভ" (১২) ও 'ড্রিম" (১৩)। এর হাল্কা রঙের নকশাগুলি বেশ নয়নরঞ্জন। ভাস্কর্যগুলির মধ্যে অজিত চক্রবর্তীর মাকরানা মার্বেল-এ তৈরী "লুনেট হেড" (১৭) ভাস্কর্য-সৃষ্টিতে উপাদানের প্রতি অনুরাগ ও রচনা দক্ষতার পরিচায়ক। মাধব ভট্টাচার্যের ধাতব "কম্পোজিশান" অনেকের ভাল লাগবে। শ্রীমতী রেবা হোড়, অরুণ বোস, দীপক ব্যানার্জি, সুহাস রায় ও সুধীরঞ্জন, ভুবন-এর রচনায় প্রতিভার ব্যঞ্জনা দেখতে পাওয়া যায়।

* পুস্তক পরিচয় *

ভারতীয় সেনা ও সৈন্যবাহিনীর পরিচয়

একদা যাহার বিজয় সেনানী। পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এস গুপ্ত ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড। ৫৮, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলকাতা—৬। তিন টাকা।

'একদা যাহার বিজয় সেনানী' একটি অত্যন্ত জরুরী দলিল। ভারতীয় সৈনিকদের সম্পর্কে অজস্র তথ্য একজন উৎসাহী সাংবাদিক-লেখক এই বইয়ে জড়ো করেছেন। এবং যেসব অসমসাহসী পলটন খাস যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুর পাঞ্জা-লড়া প্রত্যক্ষ করেছেন, কামানের গর্জন সঙিনের ভয়ংকর খোঁচা, হাতবোমার বিস্ফোরণ, এ-সবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ভীষণ দোদুল্যমান অবস্থায় বহু জ্বলন্ত-মুহূর্ত কাটিয়েছেন কুশলী লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায় হুবহু সেইসব সংগ্রাম-চিত্র তাঁর বইয়ে জুড়ে দিয়েছেন। ভারতীয় সৈনিক যে পৃথিবীর অন্যতম সেরা সৈন্য—মৃত্যু এদের কাছে ছেলেখেলা—ভয়ই যে এদের ভয় করে, তার হিসাব লেখক তাঁর এই বইয়ে অনেকবার উত্থাপন করেছেন।

বইটির দুটি ভাগ। একশ চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠাতে প্রায় আধাআধি চিরে একদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পল্টন রেজিমেণ্টের আলাদা-আলাদা শৌর্য-বিবরণ। এই অংশে পর পর এসেছে ডোগরা রাজপুত, শিখ, মারাঠী গোর্খা মাদ্রাজী জাঠ মাহার, গাড়োয়ালীদের উপর আলোচনা। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে এদের সাহসিকতার চূড়ান্ত স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা হয়েছে—পাঠক তাই সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তপ্ত বারুদ-গন্ধী স্বাদ পেয়ে যান—এবং রেজিমেন্ট সংক্রান্ত ও এইখানে। এইসব স্বদেশপ্রেমিক সৈনিকদের কাছে জয়লাভই একমাত্র লক্ষ্য, সামরিক আদর্শ একমাত্র ব্রত। তার জন্য যে-কোন মূল্য দিতে এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। লেখক বাঙালী যোদ্ধাদের সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন বিস্তারিত। বৈমানিক ইন্দ্রলাল রায় হাবিলদার এস গাঙ্গুলী, আর্টিলারি সৈনিক পরেশলাল রায়—এঁদের সৈন্য জীবনের স্মৃতিচিত্র আমাদের মুগ্ধ করে।

দ্বিতীয় অংশে 'পশ্চাৎপট'। এই অংশটিও অতিশয় মূল্যবান। আধুনিক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সূচনাপর্ব থেকে লেখক শুরু করেছেন। একে-এক প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের পরাক্রম সাহসিকতার শ্রেষ্ঠতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সহায়ক দুর্ধর্ষ ভারতীয় সৈন্যের অপ্রতিহত অগ্রগামিতা সবশেষে স্বাধীন ভারতবর্ষের কাশ্মীরে পাকিস্তানী হানাদারদের সঙ্গে নির্ভীক মোকাবিলা, গোয়ামুক্তি কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন ইত্যাদি বিষয় পাঠকচিত্তে এক গৌরবের দোলা পৌঁছিয়ে দেয়।

পরিশেষে একথা বলা যায়, লেখক পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপযুক্ত সময়ে একটি গুরু-দায়িত্ব পালন করেছেন। শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করবার কর্তব্যের দেওয়ালের মত ভারতীয় সৈন্যদের প্রতিজ্ঞা—অনন্ত পূর্ব-স্মৃতি আমরা যেন ভুলে না যাই। লেখককে

যাঁরা ভালোবাসেন—'একদা যাহার বিজয় সেনানী' নামক দেশের সামরিক গৌরব কাহিনী তাঁদের সবার পড়া কর্তব্য। ছাপা প্রচ্ছদপট ভিতরে জওয়ানদের ছবি, সব মিলিয়ে একটি রুচিশীল প্রকাশকের পরিচয় বহন করছে। ১১৬।৬৩

উপন্যাস

এপিডেমিক : সুনীলকুমার ঘোষ। বসুচৌধুরী : ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। সাড়ে তিন টাকা।

ফুলমোতিয়া : প্রশান্ত চৌধুরী। ক্লাসিক প্রেস : ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

সোনালী মাছ : বিজন ভট্টাচার্য। কথা-শিল্প : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

এই তিনটি উপন্যাস খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর প্রকাশিত হয়েছে, এবং লেখকদের মধ্যে কেউই একেবারে নবাগত নন বোধ করি। প্রশান্ত চৌধুরীর একাধিক উপন্যাস ও নাটক চোখে পড়েছে: বিজন ভট্টাচার্য শুনেছি নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অর্থাৎ একজন 'নামজাদা' নাট্যকার: সুনীলকুমার ঘোষ হয়তো এঁদের দুজনের মতো ততটা বিখ্যাত নন, তবে তাঁরও বহু লেখা পাওয়া যাবে।

বিজন ভট্টাচার্যের সোনালী মাছ অত্যন্ত সেণ্টিমেণ্টাল ও উচ্ছ্বাসভারাক্রান্তই শুধু নয় —দেখা গেলো বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও লেখকের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। জলভরা কাচের বাক্সের রঙিন মাছেদের গল্প লিখতে চাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু কী কদর্য তার ভাষা, আর কী মৃত তার সৃষ্ট নরনারী, আর কী অর্থহীন তার আখ্যানভাগ। এটা কি বাংলা ভাষার নমুনা, 'সোনালী মাছে'র আগাগোড়া যা ছড়িয়ে আছে? যে কোনো একটি অংশ উদ্ধৃত করবো? তবে দেখুন ৫৯ পৃষ্ঠার এই অংশটুকু : "ঝলকে পলকে বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গী নাভি-কটি-কুম্ভলে কটাক্ষে নেত্রপাত, সুস্বন মধুধ্বনি : শ্বাসে বসন্তের স্বাদু আস্বাদন। সারা দেহে সমুদ্রের ঊর্মিমালা যেন সফেন ল্যাসোর মালা হাতে করে শৃঙ্গারের একটি টানকে সুর ফাঁকতার পড়ছে তিতলের নয়েপারের জিজয়ার রেলা টানবার আগে।"

বড়লোকের মেয়ে দুলালীর সঙ্গে এক চালিয়াতের প্রণয় ও পরিণয়, চালিয়াতির আড়ালে যে ফাঁকা এটা বোঝার পর দুলালীটির বিরূপ এবং অতঃপর পুনর্মিলনের ইঙ্গিত—এই হলো বইটির কাহিনী।

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস সম্বন্ধে একমাত্র আপত্তি হতে পারে যে, এই-জাতীয় গল্প আমরা অনেক পড়েছি, কিন্তু তাঁর রচনা দুর্বোধ্য নয়, বরং সহজ ও সরলরীতি,

তাছাড়া গল্পের ভিতরেও একটি স্বতঃস্ফূর্ত গতি আছে। সুনীলকুমার ঘোষের উপন্যাস পড়ে অতৃপ্তি কাটে না বটে, তবু তিনি এঁদের ভিতর শক্তিমান, নিজে কিছু লেখার চেষ্টাও করেছেন—যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাসের প্রভাব একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এই প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে বরং আশা পোষণ করা যায়; প্রশান্ত চৌধুরীও মনে হয় পুরোনো গল্প না লিখে নতুন গল্প লেখার চেষ্টা করলে ভালো করবেন।

৩৫৬, ৪১৬, ৪৫৬।৬২

রহস্য কাহিনী

ছায়া-ছায়া রাতে : কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়। রোমাঞ্চ ভবন : ১২ হরিতকীবাগান লেন, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় ভালো রহস্যনির্ভর উপন্যাস আঙুলে গোনা যায়; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কিছু লিখেছিলেন—তাও ছোটো-দের জন্য; প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্য ছোটো-বড়ো সকলের জন্যই কিছু লিখেছিলেন; আর আছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বহু-বার সাহিত্যের এই বিভাগটিতে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্য অনেকেই মাঝে-মাঝে কখনো-সখনো শখ ক'রে এই বিভাগটিতে হাত দিয়েছেন, কিন্তু পুরো-পুরি কখনো গ্রহণ করেননি। এটা যেমন একদিক থেকে দুর্ভাগ্যের, তেমনি দুর্ভাগ্যের কথা এই তথ্যটি যে বাঙালী লেখককুল শার্লক হোমসকেই প্রায় একমাত্র গোয়েন্দা বলে মান্য করেন—যাঁরা একটু পড়াশুনো করেছেন তাঁরা জোর আগাথা ক্রিস্টির কথা বলবেন। কিন্তু চেস্টার্টন, ডরোথি এল সেয়ার্স, ই সি বেন্টলি, মাইকেল ইনেস, এডমন্ড ক্রিসপিন, জন ডিকসনকার, এলারি কুইন প্রভৃতি লেখক—যাঁরা রহস্য গল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা প্রায় অগোচরেই থেকে গেছেন। অথচ এখনকার কোনো রহস্যগল্পের সংকলন হাতে নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনান ডয়েল স্থান পাননি—কেননা তিনি ফেয়ারপ্লে মানতেন না, পাঠকের কাছে তথ্য গোপন করে তাকে ঠকাতে ভালোবাসতেন। আমরা কোনান ডয়েলকে এক ও অদ্বিতীয় বলে জানি বলে আমাদের রচনাও এই দোষ ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রহস্য উপন্যাসটি সেইদিক থেকে একটি সৎ প্রচেষ্টা বলে গণ্য হবে; কিন্তু এর মধ্যেই ভাব গল্প বলার ভঙ্গিতে নানা রকম ত্রুটি দেখা দিয়েছে বলে উৎসাহ ক্ষুণ্ণও হতে হলো। এই সম্বন্ধে সচেতন হয়ে লেখক উপকৃত হবেন বলেই বিশ্বাস করি।

৫৭৭।৬২

ভ্রম সংশোধন

গত ৩১ সংখ্যা দেশ পত্রিকার প্রচ্ছদ-বিজ্ঞাপনে ভ্রমক্রমে প্রিয়গোপাল বাঁড়ুজ্জের স্থলে প্রিয়গোপাল ভৌমিক ছাপা হয়েছে।

"ভারতীয়" ছবি

সম্প্রতি ভারত পরিভ্রমণকালে হলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আমেরিকায় ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য একটি শর্তে। ভারতীয় ছবি যদি পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় জীবনধারাকেই ফুটিয়ে তোলে, তবেই এই ব্যবসায়িক সাফল্য দেখা দিতে পারে। প্রসংগত তিনি আমেরিকায় সত্যজিৎ রায়ের ছবির জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তাঁর ছবি "প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়" বলেই তা সেখানকার চিত্রামোদীদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে।

আমাদের দেশে আজও এক শ্রেণীর চিত্রনির্মাতা রয়েছেন যাঁরা পরানুকরণে বিশ্বাসী। তাঁদের ছবিতে ক্যাবারে নাচ, নাইট ক্লাব এবং আধুনিকতার নামে অ-ভারতীয় জীবনধারার সযত্ন অক্ষম অনুকরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ধরনের ছবি এখানকার রুচিবান দর্শকদের বিরক্তির সৃষ্টি করে, বিদেশী দর্শকদের উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

রবার্ট ওয়াইজের উক্তি এই শ্রেণীর চিত্রনির্মাতাদের মনে সুবুদ্ধির সঞ্চার করতে পারবে কিনা জানি না। তবে তাঁর উক্তির মধ্যে ভারতীয় ছবির আত্মরক্ষার পথের ইংগিত রয়েছে। শিল্পের সার্থকতা এবং বাণিজ্যের বিস্তার— এই উভয় লক্ষ্যসাধনের জন্য ভারতের ছবিকে পরিপূর্ণভাবে "ভারতীয়" হতে হবে। ভারতের চিত্রনির্মাতারা এই সত্যটি যেদিন বিস্মৃত হবেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট রোধ করা সেদিন দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

হলিউডের ছবি প্রসঙ্গে রবার্ট ওয়াইজ

সম্প্রতি ভারত পরিভ্রমণকালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রযোজক-পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ হলিউডের চিত্রশিল্প সম্পর্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য এবং কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন। নীচে এগুলির সারমর্ম দেওয়া হল:

চিত্রনির্মাণ-ব্যয়: সিনেমাস্কোপ অথবা প্যানাভিসন প্রভৃতি কলাকৌশলের জন্যই যে হলিউডে চিত্রনির্মাণ ব্যয় বেড়ে চলেছে তা নয়। চিত্রতারকাদের মোটা অংকের পারিশ্রমিকও এর জন্য মুখ্যত দায়ী।

নতুন মুখ: অভিনয়ের ক্ষেত্রে "নতুন মুখ" আবিষ্কারের চেষ্টা যে হলিউডে নেই তা নয়। তবে চিত্রপ্রযোজক ও পরিচালকরা "জনপ্রিয় পরিচিত মুখে"র উপরই অতিমাত্রায় নির্ভরশীল।

কেনেডী সরকার ও চিত্রশিল্প: হলিউডের চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি কেনেডী সরকার খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন। চিত্রনির্মাণে সরকারের সামরিক ও অসামরিক বিভাগের সর্বপ্রকার সাহায্য চিত্রনির্মাতারা পেয়ে থাকেন। তবে চিত্রপ্রযোজকরা সরকারী

বি আর ফিল্মস-এর "গুমরাহ্" (প্রযোজনা-পরিচালনা : বি আর চোপরা) ছবিতে মালা সিংহ, অশোককুমার ও সুনীল দত্ত

সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যে দাবি উত্থাপন করেছেন।

হলিউড চিত্রে য়ুরোপীয় চিত্রতারকা: হলিউডে জনপ্রিয় শিল্পীর অভাব নেই। তবে অনেক সময় বক্স-অফিসের কথা ভেবে সোফিয়া লোরেন, জিনা লোলো-ব্রিজিডা প্রভৃতি শিল্পীদের ছবিতে নিতে হয়।

নবরীতি: ফ্রান্স ও ইতালিতে "নিউ ওয়েভ", "নিও-রিয়ালিজম" প্রভৃতি যে-সব রীতির প্রবর্তন হয়েছে, তার পরিমিত ব্যবহার সত্যিই ভাল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালির চিত্রনির্মাতারা এইসব রীতি-নীতি নিয়ে উগ্র উৎসাহ প্রকাশ করেন।

রঙ? না, সাদা-কালো?: আমি নিজে "ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট" পছন্দ করি। এতে ফটোগ্রাফি মুড প্রকাশের অনেক বেশী সুযোগ পায়। আলোকে অবও করে, সম্যক অবও সন্য করে দেখানো যায়। তা ছাড়া আমেরিকার দর্শকরা রঙিন ছবি চান। তা কলারে হল, না ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে তা নিয়ে ও'রা মাথা ঘামান না।

হলিউডের বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক-পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ

সন্তোষমারায় চিত্রে "সেকতলায়" ছবির মুখ-ভূমিকায় শিল্পী অনীতা গুহ

বর্তমান সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে **গুমরাহ্** (বি আর ফিল্মস)। একটি আবেগধর্মী সামাজিক কাহিনী ছবিটিতে রূপায়িত। বি আর চোপরা ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। অশোক-কুমার, সুনীল দত্ত ও মালা সিংহ ছবির প্রধান শিল্পী। রবি সংগীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

রূপকথা চিত্র

"কোবরা গার্ল"-এর (রেখা চিত্র) কাহিনী যেন ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা। এতে রাজা আছে রানী আছে, মন্ত্রী-সেনাপতি সকলেই আছে। সেই সঙ্গে আছে বজ্রকর্মী যুদ্ধ আর অলৌকিক শক্তির খেলা।

একটি কল্পিত নাগরাজ্য এবং তার নাগ-রানীকে নিয়েই রূপকাহিনীর বিস্তার। কোবরা গার্লই হল নাগরানী। নাগ এই রাজ্যের ইষ্টদেব, নাগদেবতার দুটি মণি। মণি দুটি একত্র করতে পারলেই নাগরাজ্য অপরাজেয়। এক দুর্বৃত্ত ওই দুই মণির লোভে নাগরাজ্য আক্রমণ করে এবং একটি মণি অধিকার করে। এমন সময়ে শোনা যায় নাগদেবতার অভিশাপ—তোমারে বাঁধবে যে সে হল নাগরানী অর্থাৎ কোবরা গার্ল। দুর্বৃত্ত রাজ্য দখল করার পর কোবরা গার্ল কোনরকমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। তারপর সে ছদ্মবেশে কেমন করে নাগরাজ্যে ফিরে আসে এবং তার প্রিয় সঙ্গীর সাহায্যে কেমন করে দুর্বৃত্তের হাত থেকে হৃত রাজ্য উদ্ধার করে তা নিয়েই চিত্রকাহিনী গঠিত।

আমোদের উপকরণ ছবিতে অজস্র। রহস্য ও রোমাঞ্চের উপকরণেরও অভাব নেই। তা বাদে, ইস্ট ম্যান কালারে রঞ্জিত এই ছবির কলাকৌশলের কাজেও চমক আছে। যুক্তি-বিচার খাটিয়ে যাঁরা আমোদের আস্বাদটি নষ্ট করতে চান না, ছবিটি তাঁদের ভালই লাগবে। এবং সেদিক থেকে চিত্রনির্মাতা এবং চিত্রপরিচালক নানাভাই ভাটের প্রয়াস সফল।

রাগিণী ও মহীপাল ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী। তাঁদের অভিনয় চরিত্রোচিত। তিওয়ারী, উল্লাস, সুরেখা, দুবে, মারুতি, রাজন হাকসার প্রভৃতি ছবির অন্যান্য প্রধান চরিত্রের শিল্পী।

সঙ্গীত পরিচালক এস এন ত্রিপাঠী সুরারোপিত গানগুলি জনপ্রিয় হতে পারে।

রূপছায়া চিত্র'র "দেয়া-নেয়া" ছবিতে অভিনয় করার জন্য তনুজা কলকাতায় এসেছিলেন—
হাসির বিভিন্ন ভঙ্গিতে অভিনেত্রী তনুজা

ফটো: দেশ

ইলোরা ফিল্মস-এর নির্মীয়মান বাংলা ছবি "প্রতিনিধি" (পরিচালক মৃণাল সেন) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

মদালসা উপাখ্যান

"দেবকন্যা" (সুরসাগর চিত্র) পৌরাণিক ছবিটি সতী মদালসার উপাখ্যান নিয়ে তৈরী। দেবকন্যা মদালসা পৃথিবী ভ্রমণে এসে ঋতুধ্বজের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। পৃথিবীতে তখন পাতাল সম্রাট পাতালকেতু অসুরের দৌরাত্ম্য চলছে। পাতালকেতুর হাত থেকে মদালসা রেহাই পেল না। প্রণয়ী ঋতুধ্বজের সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদালসা প্রায়ই দেবলোক থেকে পৃথিবীতে আসতেন। পাতালকেতু এই সুযোগে মদালসাকে বন্দিনী করে পাতালে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঋতুধ্বজ পাতালে গিয়ে কী ভাবে অসুরের বিনাশসাধন করে ও প্রিয়তমা মদালসাকে ফিরে পায় তা কেন্দ্র করেই "দেবকন্যা"র পৌরাণিক কাহিনী গঠিত।

পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে গিয়ে চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকার অনেক সময়ে অবাধ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এ ছবির পরিচালক এস এন ত্রিপাঠী এবং চিত্রনাট্যকার আর প্রিয়দর্শীও তা করেছেন। কিন্তু ছবির পৌরাণিক পরিবেশ তাতে ক্ষুন্ন হয়নি। মূল উপাখ্যানের রসহানিও ঘটেনি। চিত্রনাট্যকে অনাবশ্যক ঘটনা স্থান পেলেও ছবিটি ক্ষিপ্রগতি। শ্বাসরোধকারী ঘটনা প্রণয়মুহূর্ত রঙ্গরস প্রভৃতির জন্য ছবিটি উপভোগ্য। তবে জনমনোরঞ্জনই যে পৌরাণিক ছবির একমাত্র লক্ষ্য নয় তার যে একটি আধ্যাত্মিক বক্তব্যও আছে—সে ব্যাপারে চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকার আরও সচেতন থাকতে পারতেন।

নামভূমিকার শিল্পী অনীতা গুহর প্রাণস্পর্শী অভিনয় ছবির প্রধান সম্পদ। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁর অভিনয় খুবই সংবেদনশীল। চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়ে আর যাঁরা সু-অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে মহীপাল, ত্রিবেণী, বি এম ব্যাস, কৃষ্ণ-কুমারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চিত্রপরিচালক এস এন ত্রিপাঠী নিজেই সংগীত পরিচালনা করেছেন। এ ছবির সংগীত লক্ষণীয়। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক।

স্বর্গ হতে বিদায়

অভিনেত্রী মঞ্জু দে একটি বাংলা ছবি পরিচালনা করছেন। মহিলাদের মধ্যে প্রতিভা শাসমলই প্রথম "নিবেদিতা" নামে একটি বাংলা ছবি পরিচালনা করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল। তার পর মঞ্জু দে প্রথম চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অভিনেত্রী চিত্র-পরিচালিকা হিসাবে অবশ্য শ্রীমতী দে প্রথম। তাঁর প্রথম ছবির নাম স্বর্গ হতে বিদায়। চিত্রকাহিনী প্রণয় ও ক্রাইম উপাদানে গঠিত। বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য মঞ্জু দে রচনা করেছেন। ছবির প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্তা ও জহর রায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার। ১২ই জুন সকালে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে চিত্রজগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সাংবাদিক-সাহিত্যিক-দের উপস্থিতিতে ছবির শুভমুহূর্ত

জওলা প্রোডাকসন্স-এর "দুই নারী" (পরিচালনা : জীবন গঙ্গোপাধ্যায়) ছবিতে বিকাশ রায় ফটো—দেশ

সংগীত পরিচালনা করেছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধরমপত্নী

বেদান্ত ভেনচার্স নামে নবগঠিত একটি চিত্রপ্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি কলকাতায় "ধরমপত্নী" নামে একটি হিন্দী ছবির নির্মাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাবিত্রী, জেমিনী গণেশন, প্রবীরকুমার, অনুরাধা গুহ, প্রীতিকণা, সুভদ্রা দেবী, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এতে অভিনয় করছেন। চীনের সাম্প্রতিক ভারত আক্রমণের পটভূমিতে এই চিত্রকাহিনী রচিত। ভি পি গর্গ ছবির প্রযোজক। ছবিটি পরিচালনা করছেন এন এস নায়ক।

বৃটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাস

বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর যোজনায় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি কলকাতায় বৃটিশ চলচ্চিত্রের (১৮৯৫-১৯৬০) এক উৎসবের আয়োজন করেছেন। উৎসবে পুরনো ও হাল আমলের অনেক বৃটিশ ছবি দেখানো হচ্ছে। এবং কোন কোন বিশিষ্ট ছবির নির্বাচিত অংশও উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। সব ছবির ভেতর দিয়ে দর্শকরা বৃটিশ চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবন করতে পারবেন। গত সপ্তাহে হিন্দী হাই স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী বি বি মালিক। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটির সভাপতি শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন এবং বৃটিশ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। ১৫ই থেকে ১৯'শ জুন পর্যন্ত একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে ছবি দেখানো শুরু হয়েছে।

উচ্চাংগ সংগীতের আসর

গত রবিবার সকালে রসশ্রীতে উচ্চাংগ সংগীতের এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিলেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ ও তাঁর পুত্র মুনাব্বার খাঁ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা মিত্র। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ তাঁর প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী কণ্ঠসংগীতের সম্মোহনে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখেন। রাগ-সংগীতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তির পরিচয় শ্রোতারা আবার নতুন করে পেলেন। এবং সুচিত্রা মিত্রর কণ্ঠে শুনলেন রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসংগীত। শিল্পীদের সংগে তবলা সংগত করেন পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র। সারেংগীতে ছিলেন সাগিরুদ্দীন। এই পরিচ্ছন্ন সংগীত আসরের আয়োজন করেছিলেন রবীন ধর।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এবারকার কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেছে ভিসকন্তি পরিচালিত "দি লিওপার্ড" ছবিটি। একটি বহুপঠিত উপন্যাসের ভিত্তিতে এই ছবি তৈরি। বার্ট ল্যাঙ্কেস্টার ছবির প্রধান শিল্পী।

শার্লক হোমস-এর স্রষ্টা আর্থার কোনান ডয়ালের পুত্র অ্যাড্রিয়ান কোনান ডয়াল একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। পিতার জনপ্রিয় রচনা অবলম্বনে তিনি ছবি তৈরি করবেন।

ফিল্মভারতীর 'নর্তকী' (পরিচালনা : নীতীন বসু) হিন্দী ছবিতে নন্দা

লণ্ডনপ্রবাসী বাঙালী চিত্রপ্রযোজক [illegible] ব্রিজেন অ্যাণ্ড ট্রাম্পেট নামে [illegible] ভিত্তিতে যে ছবি [illegible] করছেন সেটা পরিচালনা [illegible]। ভারতে ছবিটির বহু দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। এই ব্যাপারের প্রস্তুতির [illegible] নিয়ে শ্রীমিত্রর আগামী অগস্ট মাসে ভারতে আসছেন।

১৯৬২ সনে জাপানে [illegible] ৬৬২ ২৭৯, ০০০ জন ব্যক্তি সিনেমা দেখেছেন এবং টিকিট ঘরে মোট সংগৃহীত হয়েছে ১০১,৩১,০৪,০০০ টাকা। সংবাদটি দিয়েছেন ন্যাশনাল ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এজেন্সী।

কাশ্মীরের ইতিহাস সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকৃতভাবে ছায়াছবিতে দেখানো হয় বলে সেখানকার লেখক সমাজ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ছবির দৃশ্য গ্রহণের আগে কাশ্মীর সংক্রান্ত স্ক্রিপট পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে লেখক ও ঐতিহাসিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের জন্য অভিযোগকারীরা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

বোম্বাই সমাচার

চিত্রপ্রযোজক কে আসিফ এবার নূরজাহানের জীবনকাহিনী অবলম্বনে একটি চাকচিক্যপূর্ণ ছবি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। সিনেমাস্কোপ ও রঙীন ছবিটি তৈরী হবে। ছবির নাম রাখা হয়েছে 'মালকা-এ-হিন্দুস্তান নূর-এ-জাহানা'। জুলাই মাসে ছবির শুটিং আরম্ভ হবে।

'আরতি'র পর অশোককুমার ও মীনাকুমারীকে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে দীশ প্রোডাকশন্স-এর "মেরি দাস্তান" ছবিতে। নরেশ সায়গল ছবিটির পরিচালক।

পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি নতুন ছবি মেরে হাম সফর এর শুটিং সবে আরম্ভ হয়েছে। মীনাকুমারী ও বলরাজের ছবির দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। রোশন সংগীত পরিচালক।

চীনের সাম্প্রতিক ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে চেতন আনন্দ একটি ছবি তৈরি করছেন। নামকরণ এখনো হয়নি। বলরাজ সাহনি শশী কাপুর ধর্মেন্দ্র ও প্রিয়া ছবিটির প্রধান শিল্পী। মদনমোহন সংগীত পরিচালক।

পরিচালকদ্বয় ভেদ ও মদনের নতুন ছবি গজল-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করার জন্য পৃথ্বীরাজ কাপুর চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। সুনীল দত্ত ও মীনাকুমারী ছবির নায়ক নায়িকা। গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ছবির বিশ দিনব্যাপী চিত্রগ্রহণের কর্মসূচী শুরু হয়েছে।

আর কে নায়ার ইয়েহ্ জিন্দগী কিতনি হাসিন হ্যায় নামে আরও একটি ছবি তৈরি করছেন। সায়রা বানু, অশোককুমার ও মতিলাল এই ছবির শিল্পী। রবি সংগীত পরিচালক।

একলব্য

শেষ পর্যন্ত আই এফ এ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে মতবিরোধের ফলে ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লীগের খেলা, যা চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল তা সাধারণ ম্যাচ হিসাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগের সপ্তাহেই বলেছি পৌরপিতাদের সঙ্গে সরকারের গোলমালের মত ফুটবল পরিচালকদের সঙ্গে রাজ্য-পরিচালকদের গোলমাল বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। এর প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল প্রচার ও আবগারী মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খেলাধুলো সম্পর্কীয় ক্যাবিনেট সাব কমিটির সদস্য শ্রীজগন্নাথ কোলে আই এফ এ-র সভাকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসায়। দ্বিতীয় পরিচয় মিলেছে—আই এফ এ কর্তৃক ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটি চ্যারিটির পরিবর্তে সাধারণ ম্যাচ হিসাবে খেলাবার সিদ্ধান্তে

সরকার ও আই এফ এ র মধ্যে গোলমালের কারণ সর্বজনবিদিত সরকার চান অন্যান্য খেলার মত চ্যারিটি খেলার পরিচালনা ভারও নিজেদের হাতে গ্রহণ করতে। আই এফ এ সেটা ছাড়তে নারাজ। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খেলাধুলো সম্পর্কীয় ক্যাবিনেট সাব কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ সভাও হয়ে গেছে। সে সভায় সরকার চ্যারিটি খেলার পরিচালনা ভার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সংবাদপত্রের [illegible] সরকারের প্রধান [illegible] প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং আই এফ এ র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে মিলিত হবার কথা ছিল।

ফুটবলের চ্যারিটি খেলার ব্যাপার নিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আলোচনার সংবাদে এক রসিক বন্ধুর উক্তি এখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিনে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সংবর্ধনার সময় শ্রীঘোষ নাকি বলেছিলেন—"আমাদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক তা হয়তো অনেকের জানা নেই। আমাদের কোন পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউণ্ট ছিল না। একই অ্যাকাউণ্টে দুজনের যা কিছু সামান্য পয়সাকড়ি জমা থাকত। প্রয়োজনমত দুজনেই সেটা খরচ করতাম।"

এই উক্তির জের টেনেই হয়তো রসিক-বন্ধু বললেন—"সমস্যার কি আছে? মুখ্যমন্ত্রী এবং আই এফ এ র সভাপতির নামে একটি অ্যাকাউণ্ট খুলে সেই অ্যাকাউণ্টে চ্যারিটির টাকা জমা রাখলে এবং দুজনে বসে চ্যারিটির টিকিটের ভাগবাঁটোয়ারা করে দিলে সব ল্যাঠা চুকে যায়। আই এফ এ এবং সরকার উভয়ের সম্মানও বজায় থাকে।"

না রসিকতা নয়। সত্যিই যদি শ্রী সেন ও শ্রী ঘোষ একসঙ্গে বসে চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত টাকা এবং চ্যারিটি খেলার টিকিটের বিলি-বাঁটোয়ারার একটা ব্যবস্থা করে দেন তবে কারো কোন আপত্তির কারণ থাকে না। সাধারণ ক্রীড়ামোদীর মনেও আস্থা ফিরে আসে। কারণ, চ্যারিটির টাকা এবং চ্যারিটি খেলার টিকিট নিয়ে আই এফ এ র ছিনিমিনি খেলা সম্পর্কে সবারই একটা অভিযোগ আছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ঘোষ যাঁরা [illegible] এবং দেশের বৃহত্তর কল্যাণের চিন্তায় সদাই চিন্তিত, তাঁদের পক্ষে আই এফ এ-র খুঁটি-নাটি ব্যাপারে মাথা গলানোর মত বেশী সময় হবে না। সুতরাং রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা যদি উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা সূত্র আবিষ্কার করে দেন তবে সেই সূত্র অনুযায়ী আপাতত সব কিছুর ব্যবস্থা হতে পারে। পরে স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্যারা ঠিকভাবে ভেবে-চিন্তে কোনটা উচিত এবং কোনটা উচিত নয় তা ঠিক করতে পারেন।

অবশ্য এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি—চ্যারিটি খেলার টিকিটের বিলি-বাঁটোয়ারা সম্পর্কে আই এফ এ গভর্নিং বডির ১৬ই মে তারিখের সভায় উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবে ছিল—আই এফ এ-র সভাপতি এবং সরকারের ক্রীড়াপরিচালক একসঙ্গে বসে চ্যারিটি টিকিটের বিলি-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করবেন।

আমার ধারণা, আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই বিলিবাঁটোয়ারার ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মত সময় পেতেন না। তাঁর পক্ষ থেকে হয় আই এফ এ র সহ-সভাপতি,

ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লীগের খেলায় মহমেডান গোলরক্ষক মুস্তাফা ইস্টবেঙ্গলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিকের সামনে থেকে একটি বল ধরছেন —ফটো: দেশ

জর্জ টেলিগ্রাফ ও মোহনবাগানের লীগের খেলায় টেলিগ্রাফ দলের স্টপার এম ঘোষ-দস্তিদার মোহনবাগানের লেফট আউট অরুময়ের কাছ থেকে একটি বল কেড়ে নিচ্ছেন —ফটো দেশ

না হয় আই এফ এ-র সম্পর্কে সরকারের স্পোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সংগে বসে বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে এই প্রস্তাবই নাকি পাস হয়নি। সরকার টিকিট ছেপে বিলি বাঁটোয়ারার জন্য আই এফ এ-র হাতে টিকিট ছেড়ে দেবে—এই প্রস্তাব নাকি পাস হয়েছে। ১৬ই মে তারিখের গভর্নিং বডির সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং শ্রীঅতুল্য ঘোষ। এ সম্বন্ধে তিনি এখনো মুখ খোলেন নি। সুতরাং প্রকৃত সিদ্ধান্ত জানার জন্য এখনও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কিংবা অনুমানের গোড়া মিলিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খেলাধুলা সম্পর্কীয় অ্যাডভাইসরি কমিটির পাঁচজন সদস্য হচ্ছেন শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত, শ্রীশৈলকুমার মুখার্জী, শ্রীবিক্রমসিং নাহার, শ্রীজগন্নাথ কোলে ও শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। এই পাঁচ সদস্যের সভায় চ্যারিটি খেলা সরকারের পরিচালনায় পরিচালিত হবার প্রস্তাব পাস হওয়ার একটা কথা উঠেছে—তা হলে আই এফ এ-র প্রয়োজন কি? আই এফ এ-র পরিচালকবর্গও মনোক্ষুণ্ণ। তাঁরা বলছেন—খেলাধুলার পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না—এটা কি সেই বিঘোষিত নীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

পরিচালনা কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। খেলাধুলার পরিচালনা আর খেলার অনুষ্ঠানের পরিচালনা এক কথা নয়। যেখানে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার প্রশ্ন, যেখানে দুর্নীতির পুঞ্জীভূত অভিযোগ সে ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সরকার তো আই এফ এ-র অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইছেন না। কোন খেলাটি কবে হবে কোনটি চ্যারিটি হবে, কার সংগে কে খেলবে কাদের অ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হবে কাদের হবে না, কোন ক্লাবের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, কাদের নিয়ে আই এফ এ-র দল গড়া হবে, কোন প্রতিযোগিতার কত প্রবেশ-দক্ষিণা, ট্রান্সফার ফি কত, কোন মাঠে কোন খেলার ব্যবস্থা হবে জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে কিনা কিভাবে কোচিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই আই এফ এ-র হাতে। শুধু খেলার অনুষ্ঠানের আর জনের পরিচালনা সরকারের। এটা কি খেলাধুলার হস্তক্ষেপ? আর সাধারণ খেলায় যদি হস্তক্ষেপ না হয় চ্যারিটি খেলায় হস্তক্ষেপ হবে কেন?

টিকিট বিলিবাঁটোয়ারার ব্যাপারে আই এফ এ-র অধিকারে সরকারের হস্তক্ষেপকে পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না সত্য। কারণ আই এফ এ-র অন্তর্ভুক্ত ক্লাবের মধ্যে কে কত টিকিট পাবে সেটা আই এফ এ-রই ঠিক করা উচিত। কিন্তু সরকার সে ক্ষেত্রে তো প্রতিবন্ধক হননি। অসম বণ্টন ব্যতীত টিকিটের ফলাও অপব্যবহার এবং নিমন্ত্রণ-পত্রের বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রেই সরকারের আপত্তি এবং তার জন্যই সুসমভাবে বিলি-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা। আপাতদৃষ্টিতে আই এফ এ-র আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এটা মোটেই হস্তক্ষেপ নয়। আর আংশিক হস্তক্ষেপ যদি মেনেও নেওয়া যায় তবে তার প্রয়োজনও আছে। যেখানে দুর্নীতির অভিযোগ, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মত, সেখানে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কে অস্বীকার করবে?

✻

চ্যারিটি খেলা নিয়ে আই এফ এর সংগে সরকারের মতবিরোধে ইস্টবেঙ্গল ও মোহমেডান স্পোর্টিংয়ের চ্যারিটি খেলাটি নাকচ হয়ে যাওয়ায় অনেকে এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করেননি। চ্যারিটি

ফুটবল ময়দানের বড় খেলার সময় দর্শকরা কিভাবে নানা উপায়ে খেলা দেখেন তার এক চিত্র ফটো—দেশ

উইণ্ডসর গ্রেট পার্কে পোলো খেলার সময় এডিনবরার ডিউক প্রিন্স ফিলিপের ঘোড়া থেকে পতনের দৃশ্য (উপরে)—প্রিন্স ফিলিপ ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছেন। (মাঝে)—পড়ে যাবার সময় মাটিতে কাঁধের উপর দেহের ভার রেখে পা উঁচু করে আছেন। (নীচে)—মাটি থেকে উঠে বসেছেন

মাঠের নিকট [illegible] এক [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] এই মনোবৃত্তির কারণ

সত্যি সত্যি যদি চ্যারিটি খেলা বন্ধ হয়ে যায় তবে ক্ষতি কি? ফুটবলের চ্যারিটি খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ কাদের প্রয়োজনে লাগে না, ছোট ছোট ক্লাব, সংস্থা, লাইব্রেরী, সেবা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতির প্রয়োজনে। কিন্তু অর্থের পরিমাণটা কেউ ভাল করে দেখেছেন কি? যেখানে ইডেন হাসপাতালে বছরে লাখ লাখ টাকা খরচ সেখানে আই এফ এর দান একশ কি দেড়শ টাকা। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের ভাগে পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশ। চ্যারিটি ডিসবার্সমেন্ট কমিটির হাত ধরা দুই একটি সংস্থা ছাড়া অধিকাংশের ভাগ্যেই ছিটেফোঁটা। সুতরাং এই ছিটেফোঁটা সাহায্যের জন্য চ্যারিটি খেলা নিয়ে এত হইচইয়ের প্রয়োজন কি? তাছাড়া চ্যারিটি থেকে বছরে দু-আড়াই লাখ টাকা সংগৃহীত হলে তার মধ্য থেকে এক দেড় লাখই বাদ চলে যায় আই এফ এর নানা খরচের খাতে। বাকী টাকার এই দাক্ষিণ্য দেখানোর মধ্যে মহত্ত্বের এমন কিছু পরিচয় নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে, যেমন জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য, সাইক্লোন বা ভূমিকম্পে কোন জায়গার ভীষণ ক্ষতি হলে সেই জায়গার জন্য বিশেষ চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। এবং এই ধরনের একটি খেলার সংগৃহীত সমস্ত টাকা চ্যারিটির প্রয়োজনে দিলে তার দ্বারা কিছু কাজও হয়।

বর্তমানে চ্যারিটি খেলার আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আরও কমে গেছে কারণ সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন লটারি থেকে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ খেলাধুলার প্রয়োজনেই ব্যয় করা হবে। একটি পয়সাও প্রশাসনিক কাজে ব্যয় করা হবে না। সুতরাং সরকারই ছোট ছোট ক্লাবকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন এবং তা করাও উচিত। সুতরাং চ্যারিটি ম্যাচ নিয়ে সরকার ও আই এফ এর মধ্যে এই মতবিরোধের চেয়ে চ্যারিটি ম্যাচের অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তার চাবিকাঠিও সরকারের হাতে। কারণ পুলিস কমিশনারের অনুমোদন ছাড়া কোন চ্যারিটি খেলা হতে পারে না। এটা আজকের ব্যবস্থা নয় চিরচরিত বিধি।

*

গত সপ্তাহে ফুটবল লীগের দুটি খেলার মধ্যে প্রধানত ময়দানের উৎসাহ উদ্দীপনা জাইয়ে ছিল। একটি জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা, অপরটি ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

জর্জ টেলিগ্রাফ যারা গত বছর লীগের দুটি খেলাতেই লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে পরাজিত করেছিল তারা অপরাজয়ের গৌরব নিয়েই মোহনবাগানের সঙ্গে মিলিত হয়। জর্জ টেলিগ্রাফের পেছনে আরও একটু গৌরব ছিল। তারা এ বছর ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করেছে। সুতরাং দুই অপরাজিত ক্লাব মোহনবাগান ও জর্জ টেলিগ্রাফের খেলায় কে হারে কে জেতে এই প্রশ্ন নিয়ে আগ্রহ স্বাভাবিক। খেলার শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানই ২—০ গোলে বিজয়ী হয়েছে এবং জর্জ টেলিগ্রাফকে মরসুমের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তবে পরাজিত হলেও টেলিগ্রাফ দলের খেলা মন্দ হয়নি। এবং প্রতিপক্ষের

তুলনায় কিছু বেশী আক্রমণ চালিয়েও নিজেদের রক্ষণভাগের দুর্বলতার জন্য হেরে গেছে।

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ইস্ট-বেংগলের ১—০ গোলে জয়লাভকে গুরুত্বপূর্ণ জয় বলে অভিহিত করা যায়। কারণ—এ খেলায় পরাজয় স্বীকার করলে ইস্ট-বেংগলকে লীগের দৌড়ে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়তে হত।

বর্তমান মহমেডান দলকে অতীত দিনের ছায়া বলা যেতে পারে। বিশেষ করে এ বছরের মহমেডান টীম বেশ দুর্বল। কিন্তু শক্তিশালী ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চিরদিন যে মহমেডান দলের সুনাম আছে সেই [illegible]ই বজায় রেখেছে ইস্টবেংগলের সঙ্গে [illegible]। সত্যি কথা বলতে কি প্রথমার্ধে মহমেডান দলের আক্রমণের সংখ্যাই ছিল কিছু বেশী যদিও ইস্টবেংগল এই সময়ে নিশ্চয়সূচক গোলটি করা ছাড়া আরও দুটি অবধারিত গোলের সুযোগ হারিয়েছিল [illegible] মহমেডান ও ইস্ট বেংগলের খেলাটিকে এই পর্যন্ত যতগুলি লীগের খেলা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা বলে অভিহিত করা যায়। বিশেষ করে প্রথমার্ধের খেলা ছিল খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। দুই দলই তীব্র গতিবেগ বজায় রেখে আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত খেলার আকর্ষণ বজায় রাখে।

গত সপ্তাহের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে শক্তিশালী বি এন আর এরিয়ানের কাছে মরসুমের তৃতীয় পয়েন্ট হারিয়েছে, পুলিস প্রথম একটি পয়েন্ট পেয়েছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছ থেকে। দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেংগল এবং ইস্টার্ন রেল ছাড়া আর কোন দলই পাবে পয়েন্ট পারেনি, আর একটিও পয়েন্ট পায়নি বালী প্রতিভা।

জর্জ টেলিগ্রাফের পরাজয়ের পর প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগানই এখন পর্যন্ত অপরাজিতের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। (১০।৬।৬৩)

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

আইনের অনুবাদে ভাষা নিয়ে এক বড় সমস্যা। ফুটবলের আইন বইয়ের ভাষা ইংরাজী। অর্থ ঠিক রেখে তার যথাযথ বাংলা অনুবাদ একটু কষ্টসাধ্য। তাছাড়া ইংরাজী ভাষা যেমন তেমন ব্যবহার করা যায়। এক কথার নানারকমের অর্থ হয়। দুই অক্ষরের একটি প্রিপোজিশনের একটু হেরফেরে অর্থ বদলে যায়। কিন্তু বাংলায় সে সুযোগ নেই।

এই প্রসঙ্গে আইনের মহাপণ্ডিত পরলোকগত ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষের একটি গল্প মনে পড়ছে। শোনা গল্প এবং ভাল লোকের কাছ থেকেই শোনা।

ডঃ ঘোষের শেষ অবস্থা। পুত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পত্তির 'উইল' লিখছেন মনীষী হীরেন দত্ত। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যার পরিবর্তিত রূপ) ডঃ ঘোষ দান করছেন ১০ লাখ কি সাড়ে ১৩ লাখ টাকা।

ইংরাজীতে 'উইল' লেখা হয়ে গেলে ডঃ ঘোষ বললেন—'হীরেন উইলখানা ভাল করে পড়তো'।

হীরেন দত্ত 'উইল' পড়তে আরম্ভ করলে ডঃ ঘোষ—'উঁহু', 'আহা' করে কয়েক যায়গায় পরিবর্তন করতে বললেন।

আবার 'উইল' পড়তে আরম্ভ করলেন হীরেন দত্ত। এবারও ডঃ ঘোষের উপদেশ মত কয়েক যায়গায় ভাষার পরিবর্তন করা হল। তবু সবটা শুনে ডঃ ঘোষ সন্তুষ্ট নন। বললেন—এখনো গোলমাল রয়ে গেছে ইংরাজী ভাষা বড় স্লেপারী। নানাভাবে অর্থ করা যায়। আমিই কত উইল নাকচ করে দিয়েছি। টাকাটা দিচ্ছি জাতির সংগঠনের জন্য। লেখাকে অন্যর পক্ষের কেউ ফ্যাকড়া তুলে কোর্ট কাছারী করবে আর টাকাটা মারা যাবে। দরকার নেই হীরেন তুমি সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় উইলের বয়ান লেখ।"

মনীষী হীরেন দত্ত দ্বিমত করলেন না। তাই নাকি আইনের মহাপণ্ডিত ডঃ রাসবিহারী ঘোষের 'উইল' বাংলা ভাষায় লেখা।

ফুটবলের আইনের বই যদি বাংলা ভাষায় লেখা হত তবে আইনের ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্তও হত প্রাঞ্জল। কিন্তু মৌলিক আইনের ভাষা ইংরাজী তার এক অর্থের জন্য অর্থ করে না পারলাম। তবু ধারাবাহিক ভাবে সহজ আইনের মর্ম ও উপদেশ বক্তব্য বলবার চেষ্টা করছি। যদি কারো কাছে কোনটি দুর্বোধ্য মনে হয় জানালে উপকৃত হব।

তিন নম্বর আইন—খেলোয়াড়ের সংখ্যা

মূল আইন (১) দুই দলের মধ্যে খেলা হবে। কোন দলে ১১ জনের বেশী খেলোয়াড় থাকবে না। এই ১১ জনের মধ্যে একজন হবে গোলকিপার। খেলার সময় গোলকিপারের সঙ্গে দলের অন্য যে কোন খেলোয়াড় জায়গা বদল করতে পারে। কিন্তু এই বদলের আগে রেফারীকে বদলের কথা জানাতে হবে।

(২) জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংঘের যদি অনুমোদন থাকে তবে প্রতিযোগিতার খেলার সময় আহত বা আর খেলতে অশক্ত খেলোয়াড়ের জায়গায় বদলী খেলোয়াড় হিসাবে নতুন খেলোয়াড়কে খেলাবার অনুমতি দেওয়া হবে।

(৩) প্রতিযোগিতার খেলা ছাড়া অন্য খেলায় খেলার সময় আহত খেলোয়াড়ের বদলে অন্য খেলোয়াড় খেলতে পারে, যদি খেলা আরম্ভের আগে দুই দল এমন ব্যবস্থায় রাজী হয়ে থাকে।

দণ্ড—যদি রেফারীকে না জানিয়ে খেলার সময় কোন খেলোয়াড় গোলকিপারের সঙ্গে জায়গা বদল করে তারপর পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল খেলে তবে তার বিরুদ্ধে পেনাল্টি কিকের নির্দেশ দেওয়া হবে। খেলা চলার সময় যদি কোন খেলোয়াড় রেফারীর সম্মতি ছাড়া মাঠ থেকে বেরিয়ে যায় (দুর্ঘটনা ছাড়া) তবে সেই খেলোয়াড় অভদ্র আচরণের দোষে দোষী হবে।

আন্তর্জাতিক সংঘের সিদ্ধান্ত

(এ) সর্বনিম্ন কজন খেলোয়াড় একটি দলে থাকতে পারে সেটা জাতীয় সংঘ অর্থাৎ যে অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় খেলা হয় তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

(বি) আন্তর্জাতিক সংঘের অভিমত: কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে সে খেলা নিয়মমাফিক খেলা বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়।

(সি) যদি হাফ-টাইমের বিরতির সময়ও কোন দল গোলকিপার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত করে তবে আবার খেলা আরম্ভের আগে অবশ্যই এই পরিবর্তনের কথা রেফারীকে জানাতে হবে।

(ডি) যদি ৩ নম্বর আইনের ২ ও ৩ ধারা অনুযায়ী কোন জাতীয় সংঘ অতিরিক্ত খেলোয়াড় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের পরিবর্তন অনুমোদন করেন তবে আন্তর্জাতিক সংঘের পরামর্শ হচ্ছেঃ খেলার যে কোন সময় গোলকিপার পরিবর্তন করা যাবে এবং আর মাত্র একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে প্রথমার্ধ শেষ হবার আগে পর্যন্ত, যাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে সে যদি আহত বা আর খেলতে অশক্ত হয়। যাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে সে সত্যি সত্যিই আহত হয়েছে কিনা বা আর খেলতে অক্ষম কিনা সেটা রেফারীর অনুমোদনসাপেক্ষ।

(ই) এই নিয়মে পরিচালিত আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদানকারী জাতীয় সংঘ খেলা আরম্ভের আগে গোলকিপার হিসাবে যারা পরিবর্তিত হবে তাদের নাম বিনিময় করবেন।

(এফ) যদি নিয়মমাফিকভাবে খেলা আরম্ভের আগে কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তার জায়গায় নতুন একজন খেলোয়াড়কে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু কিক-অফের জন্য দেরি করা হবে না।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ

খেলা আরম্ভের সময় দুই দলে কে কে গোলকিপার হিসাবে খেলছে তা নোটবুকে লিখে রাখুন। গোলকিপার বদল করার সংবাদ না জানা পর্যন্ত অন্য কোন খেলোয়াড়কে গোলকিপারের সুযোগ সুবিধা নিতে দেবেন না।

স্থানীয় ক্লাব ও সংস্থা প্রাদেশিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমতি ছাড়া ছদ্মনামে খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিযোগিতার খেলা, সিক্স এ সাইড গেম বা অনির্দিষ্ট প্রতিযোগিতার খেলা যেখানে প্রবেশমূল্য নেওয়া হয় সেসব খেলায় রেফারী হবেন না।

সম্পাদকের প্রতি উপদেশ

প্রতি ক্লাব তার খেলোয়াড়দের আচার-ব্যবহারের জন্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে দায়ী থাকবে।

সম্ভবপর হলে পোশাক-পরিচ্ছদ পরবার ঘর (ড্রেসিং রুম) থেকে মাঠ পর্যন্ত খেলোয়াড় ও খেলার পরিচালকদের জন্য একটি পৃথক রাস্তা রাখার ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাবগুলো যেসব প্রতিযোগিতায় খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেইসব প্রতিযোগিতা নিয়মমত অনুমোদিত কিনা তা নিশ্চিন্ত-ভাবে জানবার দায়িত্ব ক্লাব সম্পাদকদের।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

মনে রাখবেন খেলার সময় যদি গোলকিপার বদল করতে হয় তবে বদলের আগে অবশ্যই সে কথা রেফারীকে জানাতে হবে।

এখন তিন নম্বর আইন সম্পর্কে রেফারীকে যেসব বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তা হচ্ছে—

(১) কোন দলে যেন ১১ জনের বেশী খেলোয়াড় না থাকে।

(২) গোলকিপারের জামার রঙের সংগে অপর দলের কিংবা নিজ দলের খেলোয়াড়দের জামার রং মিলে না যায়।

(৩) দুটি দলের জামার রঙেও যেন পার্থক্য থাকে।

(৪) গোলকিপার পরিবর্তন হলে নতুন গোলকিপারকে ভালভাবে চিনে রাখতে হবে।

(৫) কোন দলে খেলোয়াড় কম থাকলেও 'কিক অফে' যেন দেরি না হয়।

(৬) দলের একজনকে গোলকিপার হতেই হবে। যদি খেলোয়াড়রা কে কে হয়ে দাঁড়াবে তার জন্য রেফারীর মাথা ব্যথা নেই।

কোন খেলোয়াড় মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে কিনা, নতুন কোন খেলোয়াড় তার জায়গায় খেলছে কিনা সেদিকেও রেফারীর চোখ রাখতে হবে।

বিশ্রাম সময়ের মধ্যে কোন খেলোয়াড় আহত হলে বা আর খেলতে না পারলে তার জায়গায় এবং সর্ব-সময়ের জন্য আহত গোলকিপারের জায়গায় নতুন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার আইন আই এফ এ ও স্বীকার করে নিয়েছে। এই আইন চালু করা না করা জাতীয় সংস্থার ইচ্ছাধীন। কিন্তু আইনের মধ্যে একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। খেলোয়াড় সত্যি সত্যিই আহত হয়েছেন কিনা, কিংবা আর খেলতে সক্ষম কিনা সেটি বিচার বিবেচনার অধিকারী রেফারী। কিন্তু রেফারী তো ডাক্তার নন। আর ডাক্তার হলেও নানা অক্ষমতার 'ভান' করেন তাঁদের অক্ষমতাসম্পন্ন করার ক্ষমতা ডাক্তারেরও নেই। সুতরাং প্রতি খেলাতেই দেখা যায়, বিশ্রামের আগে একজন দুর্বল খেলোয়াড়ের বদলে আর একজন নতুন খেলোয়াড় নতুন উদ্যম নিয়ে মাঠে নামেন। রেফারীর কিছুই বলার থাকে না। আইনের ছিদ্রপথেই এই ফাঁকি চালু হয়ে গেছে।

কিন্তু আইনের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। যদি সত্যিই সত্যিই কেউ আহত হন এবং প্রথম মিনিটেই আহত হন তবে সারাক্ষণ তাদের ১০ জনের উপর নির্ভর করে খেলা খুবই অসুবিধাজনক। আর গোলকিপারের মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আহত হলে তো বিপদের অন্ত থাকে না। তাই বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যই খেলোয়াড় পরিবর্তনের আইন চালু হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ক্লাব সুযোগ পেয়ে সেই আইনের অপব্যবহার করছে। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই আইনেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর

(১) পেনাল্টি এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা ঃ

(ক) ইচ্ছাকৃত যে নয়টি অপরাধে পেনাল্টি দেবার বিধান আছে সেই অপরাধ করার সীমা নির্দেশক।

(খ) শুধু পেনাল্টি-এরিয়াই গোলকিপারের হাত দিয়ে বল খেলার অধিকারের চৌহদ্দি।

(গ) এই এরিয়ার মধ্য থেকে রক্ষণকারী দলের যে কোন কিক এরিয়ার বাইরে বের করে দিতে হবে।

(ঘ) পেনাল্টি কিক করার সময় গোলকিপার ও যিনি কিক করছেন তিনি ছাড়া আর সবাইকে এরিয়ার বাইরে থাকতে হবে।

(ঙ) গোল কিক করার সময় প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় এই এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারবে না।

দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কাজ করুন
জাতীয় দক্ষতা বাড়িয়ে তুলুন

(২) গোল এরিয়ার প্রয়োজন দুটি ক্ষেত্রে।

(ক) গোলকিপার যদি বল ধরে না [illegible] তবে এই এরিয়ার [illegible]।

(খ) [illegible] গোল কিকের সময় এই এরিয়ার মধ্যে বল বসিয়েই কিক করতে হয়।

(৩) পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে পেনাল্টি স্পট থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তের চাপ আঁকার প্রয়োজন শুধু পেনাল্টি কিকের সময় বল থেকে ১০ গজ দূরে দাঁড়াবার সীমা নির্দেশের জন্য।

(৪) নিয়মে বর্ণিত ১৮×৪৪ গজ। মাঠের লম্বা ও চওড়ার মাপ যাই হোক না কেন, পেনাল্টি-এরিয়া বা গোল-এরিয়ার মাপজোকের কোন হেরফের হবে না।

(৫) বল মারার সুবিধার জন্য মাঠের মধ্যরেখার দু পাশের কর্নার পতাকা সরানো যেতে পারে। কারণ, ও দুটি পতাকা বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু ৪ কোণের ৪টি পতাকার কোন একটি সরানো বা হেলানো যায় না। কিক করার সুবিধার জন্য কোন একটি পতাকা তুলে ফেললে বা হেলিয়ে রাখলে আবার ঠিকভাবে রাখবার নির্দেশ দিতে হবে।

(৬) গোল-পোস্ট চার কোনা আর ক্রসবার গোলাকার হলে নিয়মমত বল গোল-লাইন অতিক্রম করে গেলে গোল দিতে হবে। গোল-পোস্ট চতুষ্কোণ আর ক্রসবার গোলাকার করে তৈরি করার ক্ষেত্রে আইনে কোন বাধা নেই। তবে দেখতে হবে, গোলাকারই হোক আর চার কোনাই হোক, গোল-পোস্ট ও ক্রসবার চওড়ায় যেন ৫ ইঞ্চির বেশী না হয়।

(৭) খেলা আরম্ভ করার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? কারণ, গোলে জাল খাটানো বাধ্যতামূলক নয়।

(৮) শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই বল গোল-লাইন অতিক্রম না করলেও গোল দেওয়া যেতে পারে যদি রেফারী মনে করেন গোল-পোস্ট যথাস্থানে থাকলে বল গোলে প্রবেশ করত। ক্রসবার ধরে ঝুলে পড়া গোলকিপারের পক্ষে অন্যায় আচরণ।

(৯) যদি গোল-লাইনের বাইরের দিকের প্রান্তের সংগে ক্রসবারের বাইরের প্রান্তের সমতা থাকে তবে গোল দেবার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই নেই। সমতা না থাকলে খেলা আরম্ভের আগে ক্রসবার ও গোল-লাইনের চওড়া সমান সমান করে নেওয়া উচিত।

(১০) গোল হতে পারে না। গোল কিক আবার করার নির্দেশ দিতে হবে। কারণ গোল কিক বা পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যকার রক্ষণকারী দলের যে কোন কিক পেনাল্টি এরিয়া অতিক্রম করে না গেলে বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে না।

দেশী সংবাদ

৩রা জুন—বাজারে চিনির অভাব। অথচ কাটাপুকুরে পোর্ট কমিশনার্সের গুদামগুলিতে নাকি প্রচুর চিনি জমা আছে। অভিযোগে প্রকাশ, কিছু পুলিস, কিছু পোর্ট কর্মচারী ও কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর যোগসাজশে বেশ কিছু চিনি বাজারে না গিয়া সুড়ংগপথে রোজ পাচার হইতেছে।

অমৃতসর হইতে শ্রীনগর যাওয়ার পথে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রিবাহী ডাকোটা বিমান আজ বেলা ১টা ২ মিনিটের সময় পাঠানকোটের মাইল পাঁচেক পশ্চিমে [illegible] রেল স্টেশনের নিকটে বিধ্বস্ত হয়। ফলে বিমানের ২৯ জন আরোহীরই জীবনান্ত ঘটে।

৪ঠা জুন—বিদেশী মুদ্রা ফাঁকির দায়ে অদ্য কলিকাতার দুইটি বাণিজ্য সংস্থা এবং দশ ব্যক্তির এক লক্ষ দশ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রায় কুড়ি হাজার টাকার আমেরিকান ডলার (ভ্রমণকারীর চেক)-ও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

উইং কম্যাণ্ডার পি এন মুখার্জি, ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট পি ডি কাউরা, অফিসার ভি পি এস লর্চা, ও এস শেঠ এবং সার্জেণ্ট সত্যপাল কাল রাত্রে আগ্রার নিকট এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। আগ্রার প্রায় ৬০ মাইল উত্তর-পূর্বে এই দুর্ঘটনা হয়।

৫ই জুন—গতকাল সকালে ধানবাদ হইতে ৪০ মাইল দূরে একটি কয়লাখনির ছাদ ধ্বসিয়া ১৭ জন খনি শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে। এ পর্যন্ত তাহাদের আটজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

নবদ্বীপ সমাজসেবা সমিতি কর্তৃক দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি হইতে প্রাপ্ত ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের গুঁড়া দুধ আত্মসাতের অভিযোগে এক-জন [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে।

৬ই জুন—অক্টোবর মাসের ২১শে হইতে ২৭শে পর্যন্ত এই সপ্তাহের দুর্গাপূজার ছুটি দিবার যে সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ ও ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাই বজায় থাকিতেছে। এই সম্পর্কে সরকার যে কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহারাও এ বিষয়ে একমত বলিয়া জানা গিয়াছে।

দেশে যখন চিনির আকাল, ঠিক সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হাজার হাজার বস্তা চিনি পাকিস্তানে পাচার হইতেছে। [illegible] প্রভৃতি এলাকায় এই চোরাকারবারীদের কয়েকটি ঘাঁটির সন্ধান সম্প্রতি পুলিসের গোচরে আসিয়াছে।

৭ই জুন—নাগা খণ্ড জাতীয় একদল সশস্ত্র লোক গত ৩১শে মে নেফার কামেং ডিভিশনের উত্তর-পূর্বে [illegible] নামক স্থানে এক প্রশাসন কেন্দ্র আক্রমণ করিলে ১২ জন লোক

নিহত হয়। ইঁহাদের মধ্যে নেফার কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ও কয়েকজন স্থানীয় খণ্ড-জাতীয় লোক আছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালের শেষ নাগাদ সমগ্র দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর সমস্ত রাজ্যকে এখনও না করা হইলে এই উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন।

৮ই জুন—অদ্য এখানে কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারি শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনাম কর্তৃক [illegible] মেল্টিং শপের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সংগে সংগে ৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মিশ্র ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য শুরু হয়।

চীনা আক্রমণ সম্পর্কে সরকারের দোদুল্যমান নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সারা দেশে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য প্রজা সমাজতন্ত্রী দল আজ এক প্রস্তাবে সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

৯ই জুন—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য মাদ্রাজে বলেন যে অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনা যদি সফল হয়, তবে দেশে [illegible]মূলক [illegible] পরিকল্পনা চালু করা হইবে।

চিনি চোরাকারবারের অভিযোগে ২৪ পরগনার এনফোর্সমেণ্ট পুলিস অদ্য টালিগঞ্জ ও খড়দহ থানা এলাকায় ব্যাপক তল্লাসী চালাইয়া মোট ১৩ জন ব্যবসায়ী দোকানদারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

[illegible]

পোপ ত্রয়োবিংশ জন আজ ৮১ বৎসর বয়সে সন্ধ্যা ৭টা ৪৯ মিনিটের সময় ভ্যাটিকান সিটিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পোপ জন চার বৎসর সাত মাস ছয় দিন পোপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৬ঠা জুন—আজ সরকারীভাবে [illegible] হয় যে গতকাল [illegible] ১৩০ জন [illegible] ও ২৬ জন আহত হয়। [illegible] হইতে চার মাইল দূরে।

ওয়াশিংটনের পর্যবেক্ষক মহলের সংবাদে প্রকাশ, একদিকে চীনা আক্রমণ [illegible] ভারত সামরিক সাহায্য চাহিতেছে অন্য দিকে সামরিক চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ পাকিস্তান তাহাতে আপত্তি জানাইতেছে—এ অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন হইয়া উঠিতেছে।

৫ই জুন—সরকার বিরোধী দাঙ্গাকারীদের সহিত পুলিস ও সৈন্য দলের সংঘর্ষের ফলে গবর্নমেণ্ট আজ তেহারানে সামরিক আইন জারী করিয়াছেন। পুলিসের কর্তা জেনারেল আজাউল্লা নাসিরী সামরিক গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন।

চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতিরক্ষার আমেরিকা সর্বতোভাবে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে সম্মত হইয়াছে। আমেরিকা নতুনভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, কেবলমাত্র ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নহে, চীনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায়ও কার্যকরী সাহায্য দেওয়া হইবে।

৬ই জুন—[illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible] প্যারিসে ভারতকে সাহায্যদানকারী সংস্থা ঘোষণা করিয়াছে যে, এই সংস্থা ভারতের তৃতীয় যোজনার তৃতীয় বৎসরের জন্য প্রায় ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি বিশেষত কম্যুনিস্ট চীনই একদিন দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রধান শত্রু হইয়া দেখা দিবে। [illegible] পরিষদের [illegible] দিনব্যাপী বৈঠকের শেষে এক যুক্ত ইশতাহারে আজ এই হুঁশিয়ারী জারি করা হয়।

৭ই জুন—করাচী হইতে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান কোন উর্ধ্বতন রাজপুরুষের নিকট হইতে জানিয়া প্রচার করিতেছেন যে, প্রতিবেশীর নিকট হইতে আক্রমণের [illegible]

[illegible]

[illegible]

৯ই জুন—সাইগন কর্তৃপক্ষ রাজধানীর কেন্দ্র-স্থলে [illegible] বৌদ্ধদের [illegible] পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

[illegible] সংবাদে প্রকাশ [illegible] গত সেপ্টেম্বর মাসে [illegible] আক্রমণের [illegible] তাহাই করিয়াছিল।

সম্পাদক- শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক ২২ ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮৩ ও ২৩-৮০৫১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ মিত্র ও ঘোষের গ্রন্থ নিবেদন ॥

কিরীটী রায় কাহিনীর প্রথম ওম্‌নিবাস ভল্যুম

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী রায় ১০৲

প্রকাশিত হইয়াছে

মুখোশ ৫৷৷ রাতের রজনীগন্ধা ৪৷৷ উত্তরফাল্গুনী ৬৷৷ মধুমিতা ৫৷৷

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের কয়েকটি রমণীয় অঞ্চলের ভ্রমণ কাহিনী

হিমালয়ের পথে পথে ৬৷৷

জরাসন্ধের

ছায়াতীর

॥ তৃতীয় মুদ্রণ—পাঁচ টাকা ॥

অবধূতের

হিংলাজের পরে

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ — পাঁচ টাকা ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী

মহাপ্রস্থানের পথে ৫৲

আঁকাবাঁকা ৪৷৷৹ তুচ্ছ ৪৷৷৹ দেশ দেশান্তর ৩৷৷

বাণী রায়ের

প্রেম

শঙ্কু মহারাজের অসামান্য ভ্রমণকাহিনী

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

॥ চতুর্থ মুদ্রণ — সাড়ে ছ টাকা ॥

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

বহুবিশ্রুত গ্রন্থ

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ

প্রথম খণ্ড—৭৲
দ্বিতীয় খণ্ড—৭৲

মৈনাকের

অগ্নিগর্ভ লেখা

মননশীল উপন্যাস

বহ্নিবলয়

॥ সাড়ে আট টাকা ॥

প্রশান্ত চৌধুরীর নূতন উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৮৲

সমরেশনাথ ঘোষের

রোশনাই ৩৷৷

বিমল করের

পান্থশালা ৩৷৷

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সন্ধ্যার কুয়াশা ৫৷৷

২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

তরঙ্গের পর ৫৲ চন্দনবাটী ৫৲

মনোজ বসুর

বন কেটে বসত ৯৲

গল্প-পঞ্চাশৎ ১০৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

পা বাড়ালেই রাস্তা ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

কয়েকটি
বইয়ের মত
বই
আশাপূর্ণা দেবীর
অতলান্তিক
৫,
৪,
বিশ্বনাথ রায়ের
২৫০
সুরাজ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের
২৫০
বিশ্বনাথ রায়ের
নানা রঙ
২৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প
সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
৪,
এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স

নিমল
আয়ুর্ব্বেদীয়
দাঁতের মাজন
নিয়মিত ব্যবহারে
দন্ত ও মাড়ি
সুস্থ রাখে-
আর্য্য ঔষধালয় - ঢাকা
কলিকাতা-১৭

ইউনাইটেড
ব্যাঙ্ক
অব ইণ্ডিয়া লিঃ

এর মধুর
সৌরভের আবেশ
আপনাকে
ঘিরে থাকে

রেকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার

বক্ষ আবরনী
BRASSIERE

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সর্দ্দি দূর করুন

সেবন করুন

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড | লাল লেবেল

— শুধু প্রতিষেধকই নয়, নির্ভরযোগ্য টনিকও বটে !

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ডের ওপর বহু পরিবারের পুরুষানুক্রমে আস্থা ও নির্ভর স্থাপনের বহু বিশেষ কারণের মধ্যে চারটি হচ্ছে :

১ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ডে ক্রিওসোট ও গয়কল থাকায় শ্বাসপ্রণালী পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

২ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড অতি অল্প সময়ে ফলপ্রদ-ভাবে কাশিকে তরল করে দেয়।

৩ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড প্রতিষেধক এবং নির্ভরযোগ্য টনিকও। দেহে রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৪ ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড খিদে বাড়িয়ে তোলে, হজমে সাহায্য করে, রক্ত পুষ্ট করে এবং দেহে খনিজ পদার্থের ঘাটতি পূরণ করে।

ওয়াটারবেরিজ কম্পাউণ্ড | লাল লেবেল

ওয়ার্নার-ল্যাম্বার্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী (সীমিত দায়িত্বসহ যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাপিত)

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গানের আসর—শার্ঙ্গদেব	... ...	৮৩৯
আলোচনা—	... ...	৮৪১
সাহিত্য সংবাদ—বিদুর	... ...	৮৪৪
পুস্তক পরিচয়—	... ...	৮৪৫
রংগজগৎ—	... ...	৮৪৯
খেলার মাঠে—একলব্য	... ...	৮৫৬
ফুটবলের আইন-কানুন—মুকুল	... ...	৮৬১
সাপ্তাহিক সংবাদ—	... ...	৮৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীদেবী ভট্টাচার্য (নতুন দিল্লী)

হরলিক্স-এর একটি বিশিষ্ট নজির···

"ছেলের চিঠি
পেয়ে কোথায়
বেড়াতে এলাম
আর
এখন কিনা
সারাক্ষণ
রান্নাঘরেই
কাটাতে হচ্ছে!"

হরলিক্স অতিরিক্ত শক্তি গড়ে তোলে!

DESH ।। 40 Naye Paise
Saturday, 22nd June 1963.

৩০ বর্ষ ।। ৩৪ সংখ্যা ।। ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৭ আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বিনোবাজীর সাহিত্য-চিন্তা

তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক রকমারি মুষ্টি যোগের মত এ-দুর্ভাগ্য দেশে তত্ত্বকথারও ছড়াছড়ি সর্বত্র এবং নিত্য। আচার্য বিনোবা ভাবে বর্তমানে এ-দেশে একজন বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ হিসাবে সুপরিচিত। সুপরিচিত বলাই যথেষ্ট নয়, কারণ দেশের রাষ্ট্রশাসন ক্ষমতা যাঁদের হাতে তাঁরা অনেকে আচার্য ভাবের ভক্ত বা তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। সাধারণ জ্ঞানে অবশ্য বিনোবাজীর চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র নেতাদের আচার আচরণ এবং কাজকর্মের মিল খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। তবুও রাষ্ট্রনেতাদের অনুকূল্যে এবং সমর্থনেই গত কয়েক বছরে বিনোবাজীর মহাসম্মানিত ভূমিকাটা প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হয়েছে। বিনোবাজীর জীবনদর্শন বাস্তব বিচারে কতখানি যুক্তিসহ এবং কার্যকর সে-প্রশ্ন স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নভাবে আলোচিত হয়েছে সামান্যই, প্রভাবশালী মহলে ভক্তির আতিশয্যের ফলে প্রচারিত হয়েছে বিনোবাজীর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য। বিনোবাজীর আন্তরিকতা বা আদর্শ নিষ্ঠার উপর কোন রকম কটাক্ষপাত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ দেশে সাধু সজ্জন ব্যক্তিরা স্বতই যে শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন সে-শ্রদ্ধা তাঁরও প্রাপ্য। কিন্তু বিনোবাজী এক এবং অদ্বিতীয় চিন্তানায়ক, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তাঁর অধিকার প্রশ্নাতীত, যাবতীয় সমস্যার সমাধান তাঁর নখাগ্রে, এমন কোন অদ্ভুত ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া আমরা কোনমতে সমর্থন করি না। গান্ধীজির মতামতের বিশিষ্টতা ছিল। কিন্তু অতিভাষণের প্রগলভতা ছিল না। তিনি চিন্তাশীল হলেও পরম বিনয়ী, অনধিকার চর্চায় অনুৎসাহী। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং অনুরাগের সীমা ছিল না, কিন্তু গান্ধীজি কখনও সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে উপদেশ বা পরামর্শ দিতে যাননি। গান্ধীজির চিন্তাধারায় ফাক হয়ত ছিল, কিন্তু ফাঁকি ছিল না। গান্ধীজির সঙ্গে গান্ধী শিষ্যরূপে পরিচিত আচার্য ভাবে এ-ক্ষেত্রে মস্ত ব্যবধান।

ভূদান-গ্রামদানের তত্ত্ব এবং কর্মকাণ্ড থেকে আচার্য ভাবে সম্প্রতি সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের কর্তব্যের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। ভূদান গ্রামদানের সার্থকতা সম্পর্কেই লোকের মনে সন্দেহ প্রবল হয়েছে, পদযাত্রা এবং প্রচারের মহাপ্রয়াসত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে ভূদান এবং ততোধিক উদ্ভট গ্রামদানের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোনও অব্যর্থ পথের সন্ধান নেই। কিন্তু বিনোবাজী প্রফেট তথা দিব্যজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বক্তার পদাধিকারী। প্রফেটের বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বিষয়ে নিঃসংশয় সমাধানের নির্দেশ। বিনোবাজীও সে কারণে 'প্রফেটের' আসন থেকে ঘোষণা করেছেন, গ্রামদানে সব মুশকিল-আসান, গ্রামের সমস্যা, দুর্ভিক্ষের দুর্ভাবনা গ্রামদানে সবই খতম। কলকাতা মহানগরীর সমস্যা সমাধানের মোক্ষম উপায়ও বিনোবাজী অনায়াসে আবিষ্কার করেছেন। বিনোবাজী নির্ধারিত পন্থায় কলকাতাকে সংকটমুক্ত করার জন্য প্রয়োজন আর কিছু নয় শান্তিসেনার। বিনোবাজীর বাণী অতীব সহজ ও সরল। গ্রামদান এবং শান্তিসেনার সর্বসিদ্ধিদায়ী অলৌকিক শক্তির মহিমা যদিও সাধারণ জ্ঞানে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে কথা কী, দিব্যজ্ঞানী নির্দেশ বোঝা না বোঝার প্রয়োজন বড় একটা হয় না, কেন না সবই নাকি "বিশ্বাসে মিলয়ে"। বাস্তবে অবশ্য ভূদান-গ্রামদানে বিনোবাজীর বাণী ছাড়া আর কিছুই মেলে না।

বিনোবাজী তাই অবশেষে সাহিত্যিকদের দিব্যজ্ঞান দানেও তৎপর হয়েছেন। কলকাতায় একটি সাহিত্যিক সমাবেশে বিনোবাজী বলেছেন, সাহিত্যিকদের সামনে বিরাট কাজ এবং সে-কাজ হল আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন। উপদেশ এমন কিছু অভিনব নয়। তবে সাহিত্য ধর্মের প্রকৃতি এমন যে আত্মজ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে কোন রাসায়নিক ফর্মুলা প্রয়োগ করা সাহিত্যিকের কাজ নয়। একান্ত অনুভব ও মননের অলক্ষ্য যোগাযোগে সাহিত্য সৃজন ধারার বিচিত্র গতি। সাহিত্যিকদের বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী অনুশীলনের জন্য বিনোবাজী যে ফরমায়েস করেছেন সেটিও অবান্তর। সাহিত্য তার নিজস্ব প্রাণধর্মে, শিল্পগৌরবেই সর্বজনীন, দেশ-কালে সীমাবদ্ধ হয়েও এই মানবিকতাই সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা। বিনোবাজী বিস্মৃত হয়েছেন সাহিত্য তত্ত্বপ্রধান নয়।

বিশ্বব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী অনুশীলনের গাল-ভরা উপদেশ দিতে গিয়ে বিনোবাজী দেশকালের সঙ্গে সাহিত্যিকদের যোগসূত্রটিও যেন ছিন্ন করার পক্ষপাতী। তাঁর সংকীর্ণ তত্ত্ব বিচারে সাহিত্যিক যেন নির্গুণ ব্রহ্ম, দেশ-কাল ও সমাজের দায় দায়িত্ব চিন্তা ভাবনামুক্ত। বিনোবাজী স্বয়ং সম্ভবত উচ্চ গ্রামে বিচরণ করেন তাই সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে দেশের সংকটের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজন কিম্বা নিকৃষ্ট ধরনের কর্তব্য গণ্য হয়। বিনোবাজী উপদেশ দিয়েছেন সাহিত্যিকরা সংসারে থেকেও সংসারের ঊর্ধ্বে বিচরণ করবেন, নির্লিপ্তভাবে সাহিত্যসেবা করবেন। এই নির্লিপ্ততার পরামর্শে সাহিত্যিক মাত্রেই আপত্তি করবেন বিশ্বাস করি। নির্লিপ্ততা গত্য সাধন ভজনের অঙ্গ হতে পারে, সাহিত্য সৃজন ধর্মের স্বভাবানুগ কখনই নয়।

জীবনের সাযুজ্যই সাহিত্যের ধর্ম, সাহিত্যের প্রাণ, তার বিচিত্র সমারোহ। বিনোবাজী কি বলতে চান দেশের এই সংকট সময়ে সাহিত্যিকরা নির্লিপ্ত থাকবেন জাতি ও জনতাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার মহান কর্তব্য পালনে বিরত হবেন? বিনোবাজী উপদেশ দিয়েছেন, কোন একটি বিশেষ বুদ্ধি বা সংস্কার যেন সাহিত্যিকদের বিচারকে আচ্ছন্ন না করে। বিশেষ বুদ্ধি বা সংস্কার বলতে বিনোবাজী কী বোঝেন সেটা পরিষ্কারভাবে জানা প্রয়োজন। চৈনিক কম্যুনিস্ট আক্রমণে দেশময় যে ভাবের আলোড়ন ঘটেছে সাহিত্যিকরাও স্বতই তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, স্বদেশ-চিন্তার নতুন স্পন্দন তাদের সৃজনী আবেগকে বলিষ্ঠ রূপ দিয়েছে। নির্লিপ্ততা এক্ষেত্রে অসম্ভব, দেশপ্রেম যদি বিনোবাজীর দিব্যজ্ঞানী বিচারে একটা বিশেষ সংস্কারও হয়, তবু বলি সে-সংস্কারের প্রেরণায় পরিচালিত হওয়া সাহিত্যিকের পক্ষে নিন্দনীয় নয়, মহত্তম কর্তব্য।

অসুখের ছড়া

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না
চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না চোখের আলো মনে পড়ে না
ব্রেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিখ্যাত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল
কত পাখির ডাক থামেনি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
কারুর মুখ মনে পড়ে না, মনে পড়ে না মনে পড়ে না।

এত মানুষ ঘুমোয় তবু আমার ঘুমে স্বপ্ন নেই
স্বপ্ন না হয় স্মৃতি না হয় লোভ কিংবা প্রতিহিংসা
যেমন ফুলে প্রতিশোধের স্পৃহায় আনে ঔদাসীন্য
রমণী তার বুক দেখায়, ভালোবাসায় বুক ভরে না
শরীর নাকি শরীর চায়, আমার কিছু মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মেঘলা মত বিস্মরণ
যেমন পথ মুখ লুকিয়ে ভিখারিনীর কোলে ঘুমোয়।

বুক তোমার মুখ দেখাও, দেখি আকাশ তোমার মুখ
এসো আমার গত জন্ম তোমায় চেনা যায় কি না
কোথাও নেই মুখচ্ছবি এ কি অসম্ভব দৈন্য -
আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি
জানলা ভেঙে [illegible] ঈশ্বরেরও মনে এলো না
আমায় কেউ মনে রাখেনি, না ঈশ্বর না প্রেমিকা।

শনিবারের ভাবনা

আনন্দ বাগচী

ছাদের আলসেয় সেই একই রোদ শাড়ির মতন ঝুলে থাকে।
একই ঘনঘটা করে মেঘ নামে,
অলসগমনা সন্ধ্যাকাশ
জানলায় চেয়ে থাকে ট্রাফিক কলকাতা কাঁকড়াবিছে,
চৌবাচ্চার করতলে পিপাসার জল শব্দ করে,
ক্লান্ত পরাভূত দিন চলে যায় অপরাহ্ণ পাপোশে পা মুছে
জাগরণে যায় আজো সপ্তাহ শেষের বিভাবরী।

ডেলি প্যাসেঞ্জারবৃন্দ ফিরে যায় দিগ্বিদিকে উৎকর্ণ কুটীরে।
সন্নিকট মফস্বলে পলাতক আসমুদ্র [illegible]
ফুলকপি ঝুলিয়ে হাতে
স্পেশাল রুমালে বেঁধে সস্তার ইলিশ
লোকাল কীর্তন শুনে: হাতকাটা তেল কিংবা আশ্চর্য মলম
টক ঝাল মিষ্টি, আর [illegible], মেট্রিক ওজন
হাড়ের চিরুনি, সস্তা মনভোলানো ফাউন্টেন পেন
মুখস্থ স্টেশনগুলি কিম্ভুতবন্দী ঘুম ছুঁয়ে যায়।
লোকাল কিউল ছোটে আযৌবন
নিয়ন আলো থেকে অন্ধকারে
কাঁধের চাদরে জমে কেরানীকুলের ক্লান্তি তাস
প্রসূতিসদন আর কিশলয়, বড়বাবুর কল্পিত জবাব
চুলে রঙ ধরে, চোখে চশমা, ছোটখাটো দুর্ঘটনা
চলন্ত সংসার ঘোরে, মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যায়
ছেলের বে-ফয়দা পাস, অ্যাপ্রেন্টিস
ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি

ডেলি-প্যাসেঞ্জারবৃন্দ ফিরে যায়
দিগ্বিদিকে উৎকর্ণ কুটীরে॥

বৈদেশিকী

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ন এবং মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদার রহমানের মধ্যে পাঁচ বছর দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। মাঝে মাঝে পরস্পরের মধ্যে দূরপাল্লার নিন্দা বিনিময় হত। অনেক সময়েই দেখা যেত যে বৈদেশিক নীতিতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয় বিপরীতমুখী। "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা নিয়ে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি চরমে ওঠে।

মালয়, সিংগাপুর এবং ব্রুনি, সারাওয়াক প্রভৃতি উত্তর বোর্নিওস্থ বৃটিশ ঔপনিবেশিক জায়গাগুলি নিয়ে "মালয়েশিয়া" সংগঠনের পরিকল্পনা। এ বিষয়ে টুংকুর সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেন্টের কথাবার্তা হয়ে গেছে এবং আগামী ৩১এ আগস্টের মধ্যে "মালয়েশিয়া" উদ্বোধন করার কথাও স্থির হয়। ইন্দোনেশিয়ার সরকার কিন্তু এই পরিকল্পনার ঘোরতর বিরোধিতা আরম্ভ করেন। উত্তর বোর্নিওস্থ জায়গাগুলিকে "মালয়েশিয়া"তে যোগদান করতে দিতে ইন্দোনেশিয়া বিষম আপত্তি প্রকাশ করে। এমন কি এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্রুনিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাও চলে। ফিলিপিন সরকার "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা সম্পর্কে উদাসীন নন, এ বিষয়ে ফিলিপিন সরকারেরও কিছু বক্তব্য আছে, দাবিও আছে।

পরিকল্পিত "মালয়েশিয়া", ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিন নিয়ে একটি অঞ্চল বলা যায়। এদের প্রত্যেকের এবং সমগ্র অঞ্চলের স্বার্থ পারস্পরিক সদ্ভাবের উপর নির্ভর করছে। এক দিকে কম্যুনিস্ট চীন এবং অন্য দিকে পশ্চিমী প্রভাব থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বাঁচাতে হলে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ফিলিপিনস্ প্রথমে স্পেন, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন ছিল। ইন্দোনেশিয়া ডাচ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যে জায়গাগুলি নিয়ে "মালয়েশিয়া" গঠিত হবে সেগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সুতরাং তিন রাষ্ট্রের "ব্যাকগ্রাউন্ড" তিন রকমের কিন্তু বর্তমানে এদের মধ্যে সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মিলিয়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। স্বাতন্ত্র্যবোধের দিক থেকেও ইন্দোনেশিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইন্দোনেশিয়া ডাচ রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। কিন্তু মালয় থেকে বৃটিশ প্রভাব এবং ফিলিপিনস্ থেকে মার্কিন প্রভাব অন্তর্হিত হয়নি। জনবলে ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় মালয় বা প্রস্তাবিত "মালয়েশিয়া" অনেক খাটো কিন্তু "মালয়েশিয়া" যদি গঠিত হয় তবে প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে তার গুরুত্ব কম হবে না। এমন বিষয়ে ফিলিপিনস্ খাটো হলেও "স্ট্র্যাটেজিক" এবং অন্য কয়েকটি দিক থেকে তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মোট কথা, এই তিনটি রাষ্ট্র যদি পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে তবে এদের সম্মিলিত শক্তি এবং উন্নতির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

এতদিন এই সহযোগিতার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল প্রেসিডেন্ট সুকর্ন ও টুংকু

টোকিওতে সুকর্ণ ও আবদার রহমান

আবদার রহমানের মধ্যে অসদ্ভাব। সেই অসদ্ভাবের মেঘ কেটে গেছে বলে বোধ হয়, অবশেষে তাতে যে একটা বড়ো সুবিধা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট সুকর্ন হয়ত উপলব্ধি করেছেন যে চীনা প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর হবে না এবং ইন্দোনেশিয়া কম্যুনিস্ট পার্টিকে উপেক্ষা করতে না পারলেও ইন্দোনেশিয়ান জনমতের সমর্থন পেতে হলে তাঁর পক্ষে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট চীন ঘেঁষা নীতি চালানো সম্ভব নয়। কম্যুনিস্ট চীনা প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ না করে থাকতে হলে অঞ্চলের অন্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সদ্ভাব এবং সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় করা আবশ্যক। টুংকু আবদার রহমানও হয়ত বুঝেছেন যে ইন্দোনেশিয়াকে শত্রু করে রেখে "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা অত্যন্ত কঠিন হবে।

ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনস্-এর সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায় তবে "মালয়েশিয়া" জন্মলাভ করলেও বৃটিশ শক্তির উপর তাকে অতিরিক্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে, তাতে মালয়েশিয়ার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা যাবে না। টুংকুর "চৈনিক সমস্যা" ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে অনেক বেশী গুরুতর। মালয়ে চীনা-বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা খুব বেশী, তার উপর সিঙ্গাপুর যোগ হলে এবং সিঙ্গাপুর থেকে মালয়কে আলাদা করে রাখা বেশী দিন সম্ভব নয়—মালয়ে চীনা বংশোদ্ভূতদের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। ব্রুনি, সারাওয়াক প্রভৃতি যুক্ত হলে সেই আশঙ্কা কিছুটা প্রশমিত হবে। "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনার পিছনে এটাও একটা বড় উদ্দেশ্য রয়েছে। অবশ্য "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা যে বৃটিশ স্বার্থের অনুকূল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৃটিশ স্বার্থ থাকলেও মালয়দের স্বার্থও কম নয়। তবে মালয়ী স্বার্থের দিক থেকেও "মালয়েশিয়া" সার্থক করে তুলতে হলে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপিনস্-এর সহানুভূতি ও সহযোগিতা আবশ্যক। সুতরাং যখন খবর বেরুল যে ৩১এ মে টোকিওতে প্রেসিডেন্ট সুকর্ন ও টুংকু আবদার রহমানের মধ্যে সাক্ষাৎকার এবং কথাবার্তা হবে তখন সেটা কেবল ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের পক্ষে নয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পক্ষেই একটা সুসংবাদ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

ডঃ সুকর্ন এবং টুংকু আবদার রহমান টোকিওতে ৩১এ মে এবং ১লা জুন মিলিত হন। তাঁদের কথাবার্তার পরে যে বিবৃতি প্রচারিত হয় তাতে বলা হয় যে ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় পরস্পরের নিন্দাবাদ বা দোষারোপ থেকে বিরত থাকবে। তারপর ম্যানিলাতে ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং ফিলিপিনস্-এর বৈদেশিক মন্ত্রীদের সম্মেলন হয়েছে এবং অচিরে তিন রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন হবে বলেও আশা করা হয়। ম্যানিলা সম্মেলনে বৈদেশিক মন্ত্রীরা একমত হয়েছেন যে ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং ফিলিপিনস্ মিলে একটি কনফেডারেশন গঠিত হওয়া উচিত। কনফেডারেশনের ঠিক কী রূপ হবে সে বিষয়ে অবশ্য বৈদেশিক মন্ত্রীরা সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি, বলার কথাও নয়। এটা একটা প্রস্তাব মাত্র, এই নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হবে এবং শেষ ফলাফল কী হবে তাও এখন বলা যায় না। কিন্তু তিন রাষ্ট্রের বৈদেশিক মন্ত্রীরা যে কনফেডারেশন প্রস্তাব করেছেন এটাই খুব একটা বড়ো কথা। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তিন রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যেই সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে।

"মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিন বৈদেশিক মন্ত্রীর মধ্যে একটা আপোস-নিষ্পত্তির ভাবের কথা হয়েছে। মনে হচ্ছে,

ইন্দোনেশীয় সরকারের মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে। তাদের মতো বিরূপতা নেই। অন্য দিকে মালয় সরকারকেও নরম হতে হয়েছে। ব্রুনি, সারাওয়াক প্রভৃতির লোকমত "মালয়েশিয়া"তে যোগদানের পক্ষে কিনা সে বিষয়ে একটা অনুসন্ধান করা হবে, যদিও ঠিক গণভোট নেওয়ার কথা হচ্ছে না। শুনো যাচ্ছে, "মালয়েশিয়া"তে যোগদান সম্পর্কে উত্তর বোর্নিওস্থ জায়গাগুলির লোকমত কী সেটা নির্ধারণ করার ভার ইউ-এন-এর সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থান্তের সহকারী শ্রীনরসিংহনকে দেওয়া হচ্ছে। তিন রাষ্ট্রের সরকারই নাকি শ্রীনরসিংহনকে এ কাজের জন্য মনোনীত করতে প্রস্তুত। তা হলে বুঝতে হবে যে, সকলেরই শ্রীনরসিংহনের ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতায় আস্থা আছে।

তিনটি রাষ্ট্র যদি এক কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে "মালয়েশিয়া" সম্পর্কে অন্য দুটি রাষ্ট্রের সন্দেহ বা আশংকার কারণ স্বভাবতই অনেকটা কমে যাবে, কারণ তখন "মালয়েশিয়া" কী করছে না করছে সেটা অপর দুটি রাষ্ট্রের সব সময়েই জানা থাকবে এবং তখন একের দ্বারা অপরের ক্ষতিকর কিছু করার সম্ভাবনাও কম হবে। মনে হয় যে, "মালয়েশিয়া" এবং কনফেডারেশনের প্রস্তাব পরস্পর-নির্ভরশীল। যেভাবেই হোক ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনস্‌ এবং মালয় যদি সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে তবে সেটা যেমন তাদের পক্ষেও তেমনি সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পক্ষেও মঙ্গলকর হবে। তাতে এক দিকে কম্যুনিস্ট চীনা প্রভাব এবং অন্য দিকে পশ্চিমা শক্তির প্রভাব উভয়ই অনেকটা সংযত হতে বাধ্য হবে। অবশ্য আপাতত "মালয়েশিয়া" পরিকল্পনা এবং ইন্দোনেশিয়া-ফিলিপিন-মালয় কনফেডারেশনের প্রস্তাবে কম্যুনিস্ট চীনেই বেশী বিরাগ ও আশংকার সঞ্চার হবে।

*

পোপ জন তেরো জুন পরলোকগমন করেছেন। রোমান ক্যাথলিক চার্চের কার্ডিনালগণ দেশ বিদেশ থেকে রোমে একত্রিত হচ্ছেন নূতন পোপ নির্বাচনের জন্যে। ১৯ তারিখে ভ্যাটিকান প্রাসাদের 'সিসটাইন শ্যাপেলে' তাঁরা মিলিত হচ্ছেন। ২০ তারিখে 'ব্যালট' নেওয়া আরম্ভ হবে এবং পোপ নির্বাচনের যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে নির্বাচন-ক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্ডিনালরা কেউ ঘর থেকে বেরুতে পারবেন না। এজন্য দু-তিন দিনও লেগে যেতে পারে। তবে আশা করা যায় যে, বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই নূতন পোপ কে হলেন জানা যাবে।

পোপ জন

নূতন পোপ কে হলেন তা জানবার জন্য রোমান ক্যাথলিকরা বা খৃস্টানরাই কেবল উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন তা নয়, পৃথিবীর সকল দেশের সরকারী কর্তারাও উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন। কারণ প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে পোপের রাজনৈতিক প্রভাব সামান্য নয়। পরলোকগত পোপ জনের কোনো কোনো ঘোষণা এবং কার্য কম্যুনিস্ট এবং অ-কম্যুনিস্ট জগতের মধ্যে কোল্ড-ওয়ার প্রশমনের সহায়ক হবার মতো বলে অনেকে অনুভব করছিলেন। এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কও আরম্ভ হয়েছিল। পোপ জনের কথা অ-কম্যুনিস্ট জগতে সকলের কাছে ভালো লেগেছিল তা নয়। আবার কম্যুনিস্ট জগতেও পোপ জন বিতর্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। "ইজভেস্তিয়ার" সম্পাদক (শ্রীক্রুশ্চফের জামাতা) পোপ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্তাদের মুখেও পোপ জন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ শোনা যায়। সেজন্য কম্যুনিস্ট চীনের কাগজে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট কর্তাদের প্রতি ধিক্কার ও বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নূতন পোপ নির্বাচিত হলে এ বিষয়ে অনেকটা বোঝা যাবে যে, ভ্যাটিকানের নীতি কোন ধারায় যাবার সম্ভাবনা। কারণ, যিনি পোপ নির্বাচিত হবেন তাঁর জীবনী থেকে তাঁর মতামত অনেকটা আঁচ করা যাবে।

*

এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার আগেই বোঝা যাবে, প্রফুমো-কেলেংকারির ধাবে

প্রফুমো-কেলেঙ্কারীর নায়িকা ক্রিস্টিন

ম্যাকমিলান সরকার কাত হলেন কি না। পার্টিকে বাঁচাবার জন্য কনজারভেটিবরা নাকি আপাতত শ্রীম্যাকমিলানকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। কারণ এখনই যদি ম্যাকমিলান সাহেবকে সরাতে হয় এবং ফলে এখনি সাধারণ নির্বাচন হয় তা হলে কনজারভেটিব পার্টি গো-হারান হারবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আপাতত শ্রীম্যাকমিলানকে কোনো রকমে যদি রক্ষা করা যায় তা হলে মাস দুই পরে তিনি অন্য কোনো কনজারভেটিব নেতার হাতে গভর্নমেন্টের ভার দিয়ে সরে দাঁড়াবেন। ঐ নূতন নেতা নির্বাচনের সময় স্থির করবেন এবং তাঁর নেতৃত্বে কনজারভেটিব পার্টি নির্বাচন যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তা হলে পার্টির কিছু সুবিধা হতে পারে। কনজারভেটিবরা নাকি এই পথ নেওয়া স্থির করেছেন। তবে পার্লামেন্টে যে বিতর্ক আগামী কাল (১৭ই জুন) আরম্ভ হবে তাতে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা যায় না।

১৬-৬-৬৩

ঘুণাক্ষরে

শিল্পী স্বাধীনতা' পর্যায়ে জবানবন্দী দাখিল করার পরই মনে হয়েছিল কী-যেন বাকী থেকে গেল। আরও কিছু স্পষ্ট করে বলার দরকার ছিল। কিন্তু ঠিক কোন্ কথাটা, ধরতে পারছিলুম না।

ধরিয়ে দিয়েছে গৌরকিশোর। তার স্বাক্ষরিত জবানবন্দীতে। আমাদের অনেকের লেখাতেই দোষ একদেশ-দর্শনের।

কথাটা বিশদ করে বলা আবশ্যক। "কহ, তোমাকে কেন বাতিল করা হবে না" কম্যুনিজমের উপর এই শো কজ নোটিশ জারি করেছি প্রধানত তার ফলিত রীতির বিচ্যুতির নজির দেখিয়ে। কিন্তু রুশদেশ অথবা চীন কম্যুনিজমের প্রয়োগক্ষেত্রের বহু [illegible] গেছে তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত দাখিল করলেও একটি সংশয় ঘুচবে না যে মতবাদ হিসাবে কম্যুনিজম্ সত্যই গ্রহণীয় কি না। সমতলে হয়ত নদী সর্বনাশা, তবু তাতে এ কথা আদৌ প্রমাণ হয় না যে গোমুখীতেই কোনও ভয়ংকরী সম্ভাবনা সুপ্ত ছিল। টাকা নিয়ে সেই পুরনো তর্কটা আমরা শুনেছি। অযোগ্যের হাতে অর্থের অপচয় বা অপব্যবহার ঘটে বটে তাই বলে অর্থ বস্তুটা অনর্থক কিছু নয় এবং বিবিধ কল্যাণের আকর।

এই যুক্তিটা আমরা [illegible] কম্যুনিস্টদের [illegible] তুলে দিয়েছি। এদের কেউ কেউ [illegible] চীন [illegible] হিসাবে সাচ্চা কম্যুনিস্ট।

[illegible] প্রাচীন শাখার। মহাচীন কিন্তু [illegible] এই [illegible]

দুই নং কথা চীন মন্দ হতে পারে কিন্তু যান তো রুশ দেশে। তিন রুশদেশেও মানি, কিছু কিছু অনাচার ঘটেছে (এটুকু কবুল না করে উপায় নেই, কেননা, শ্রীক্রুশ্চফ স্বয়ং যখন কালাপাহাড় উৎফুল্লতায় বিগ্রহ বিচূর্ণ করেছেন) তবু মার্কসীয় বাইবেল লেনীনীয় গসপেল সমেত অদ্যাপি শিরোধার্য।

এই তর্কশৃঙ্খল অক্ষুণ্ণ আছে কারণ কম্যুনিজমের মূল দুর্গের পরিখা লঙ্ঘন করতে কেউ এগোননি।

আমাদের অনেকের ত্রুটি নং দুই ফলিত কম্যুনিজমের কদাচারের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছি, বিশুদ্ধ, এইচ টু ও মার্কা গণতন্ত্রকে। ন্যায়শাস্ত্রের হকে এ-রীতি অচল। হতে পারে, একটি হেয় অপরটি শ্রেয়। অভ্যাসের পাল্লাটা পাল্লায় তা হলে বসাতে হবে অভ্যাসকেই। বিশ্বাসকে নয়। ফলিত কম্যুনিজম না-হয় সহস্রেক দোষে দোষী, ফলিত ডিমোক্রাসিরও তো খাটের অন্ত নেই। ফলিত ডিমোক্রাসির স্খলনের সংখ্যা কম, কম্যুনিজমের বেশি, ক্ষীণ কণ্ঠে এই যুক্তির অবতারণা ধোপসই হবে না। ও-যুক্তি দুর্বলের, কাপুরুষের। প্রমাণ করতে হবে প্রভেদ শুধু আকারের নয় প্রকারের।

এই দ্বারের দিকে গৌরকিশোর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

*

প্রথমত মনে রাখতে হবে গণতন্ত্র বলতেও একালে আর নৈকষ্য, লেসে ফেয়ার অ্যাজ-য়ু লাইক-ইট স্বরাজ্য বোঝায় না। জনসংখ্যার চাপে হোক প্রতিবেশী শক্তিকে ঠেকা দিতে হোক, বৈষয়িক কল্যাণের তাগিদে হোক, গণতন্ত্রও ধীরে-ধীরে তার ধরনধারণ বদলেছে। জনজীবনের যে নিভৃত প্রদেশে হস্তক্ষেপ কম্যুনিজমের স্বভাব সার্বিক না হলেও তার আংশিক লক্ষণ গণতন্ত্রেও সঞ্চারিত।

প্রতিরোধ হয়নি। উদ্দেশ্যের মধ্যে উপায়ের সাফাই পেয়েছি। ধরা যাক শিশুদের অবশ্যিক শিক্ষাদান রাষ্ট্রীয় এই কানুনের বিরুদ্ধে কোনও দেশে কেন প্রতিবাদ হয়নি [illegible] অমুক ছেলেকে মূর্খ রাখার [illegible] এই [illegible] অনুরূপ আরও বিবিধ কল্যাণের নজির আছে। [illegible] যখন অভাব তখন উৎসব-ব্যসন [illegible] চর্বচোষ্য ইত্যাদি [illegible] সকলের মুখ চেয়ে এ সব বিধানই বিনাবাক্যে মানা হয়েছে। এই ছিদ্রপথেই এসেছে কণ্ট্রোল, অবশেষে প্ল্যানড ইকনমি। ব্যবহারিক জীবনের সর্বভূতে খবরদারি অধুনা সব রাষ্ট্রেরই স্বভাব—কী গণতন্ত্রে, কী স্বৈরতন্ত্রে।

বাকী থাকে কী, অন্তরঙ্গ জীবন? নিকষে যাচাই করে দেখা যাক, এই সান্ত্বনার খনির গভীরতা কতখানি। শরীরকে যে নানা কারণে কিংবা প্রয়োজনে বাহুপাশে বেঁধেছে সে কি মনকে [illegible] করে চলবে? অভিজ্ঞতা বলে না। ভবলীলার দোলনা থেকে শেষ খাটিয়া তৈরি করার সব ঠিকে সরকারকে যদি সমর্পণ করে থাকি, তবে এ আশা লালন করে লাভ নেই যে সরকারী কর্তারা কেবল সদরে কণ্ট্রোলের [illegible] দিয়েছেই [illegible] করবেন, অন্দরের [illegible] দেবেন না [illegible] নিয়েছেন। বিবিধ কলার আকাদেমি ইত্যাদি স্ফীয়মান রাষ্ট্রীয় লোলুপতারই প্রতীক। পাবলিক সেক্টর কেবল ইন্ডাস্ট্রিতেই নয়, মননজ শিল্প-কলাক্ষেত্রেও গড়ে উঠছে। স্টেট পেট্রনেজ শুধু কি হাতের তেলোয় তুলে প্রশ্রয় দিতে নাচায়, সময়ে সময়ে মুঠি বন্ধ করে টিপে মারতেও চায় যে!

*

ডেমোক্রেসির পরাভবের আর-একটা কারণ প্রচারলোলুপতা। সঙ্গীত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন মন্ত্রী, কেননা পাবলিসিটি ভাল হবে। চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন রাজ্যপাল নইলে চলে না। কী বিজ্ঞান কী দর্শন, কী ইতিহাস, সালিয়ানা কংগ্রেসের পর কংগ্রেস বসে। মুখ্যত রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সারগর্ভ ভাষণটি মুদ্রণের পর সংবাদপত্রের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। প্রাজ্ঞ পাঁচজন অতঃপর কী আলোচনা করলেন, বিনিময় করলেন কোন্ সদ্য-লব্ধ জ্ঞান অথবা তথ্য, উপনীত হলেন কোন্ সিদ্ধান্তে, এ-সব বিবরণ সাধারণের অগোচর থাকে। হেতু, অজ্ঞানিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের যন্ত্রীদের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা স্বীকার করে নিয়েছি।

অতঃপর নির্বাচনী স্বাধীনতা। কম্যুনিস্ট দেশে একমেব পার্টি, একমেব প্রার্থী-তালিকা গণতন্ত্র তো পার্টিতন্ত্র—[illegible] যত খুশি দল থাকে থাক [illegible] এই স্বাধীনতা তলিয়ে দেখি, [illegible] হয়ত এক হাঁটু পানিও না। [illegible] এমন তালপুকুর। একটি [illegible] তিন দলের তিলক মেখে দাঁড়ালেন তিন প্রার্থী ছিদাম মুদি, হরিদাস পাল আর রামচন্দ্র দাঁ। এই তিনের মধ্যে যে কোন একজনকে ভোট দিতে পারি এই তো আমার স্বাধীনতা! আমার যিনি মনোমত তাঁকে মনোনীত করি, এমন সাধ্য কই। তিনি হয়ত দাঁড়ানইনি। প্রার্থীতালিকার বহির্ভূত কাউকে পছন্দ করার অধিকার নেই অতএব হয় ঢোঁক গিলে তিন অযোগ্যের একজনকে ভোট দেব, নয়, আমার শেষ স্বাধীনতাটিকে প্রয়োগ করব।—ভোট আদৌ না দেবার স্বাধীনতা! সাধারণ নির্বাচনের পর সাধারণ নির্বাচন ঘনঘটা করে আসে, ঢাক-ঢোলক বাজে, আর আমাদের মত নিরুপায়, সিনিক, অলস নাগরিকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ে।

ট্রামে-বাসে

আচার্য বিনোবা ভাবে নাকি বলিয়াছেন যে দেশকে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী করিয়া তোলা চীনা চ্যালেঞ্জের যোগ্য প্রত্যুত্তর নহে। "তাহলে কি বুঝব যে

চীনারা যে 'ভূ'-এর ওপর দাবি জানিয়েছে তা দান করে দিলেই যোগ্য প্রত্যুত্তর হবে ?" —প্রশ্ন করেন বিশুখুড়ো।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সেখানে শ্রোতার অভাবে কমিউনিস্ট পার্টির একটি সভার কাজ বন্ধ রাখিতে হয়। —'হেথাও এ ফল মই কাপ্তেমান' কিন্তু সভার কাজ বন্ধ না করে কোন একটা আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে 'জনগণ' দলে দলে সভায় যোগ দিতেন; জনযুদ্ধের বদলে জনরঞ্জতামাশা নিশ্চয়ই বিকল্প হিসাবে চলতে পারে"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় পিছাইয়া পড়িয়াছে বলিয়া পরিবেশিত একটি সংবাদের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে শুনলাম, ভারতীয় সংবিধানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু মেয়েরা এই মর্যাদা কাজে লাগাইবার যোগ্যতা অর্জন করেন নাই। —কিন্তু কথাটা বোধ হয় সত্য নয়। ট্রামে-বাসে পৃথক সীটে বসার যোগ্যতা মেয়েরা নিশ্চয়ই অর্জন করেছেন" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম অতিরিক্ত আহার নাকি অপুষ্টির কারণ হইয়া থাকে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন— আমরা নেহাত নিরেট বলেই আগে বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি কেন সরকার 'মিস্ এ মিল' অভিযান চালিয়েছিলেন!"

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে কেহ যদি কোন মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে-ব্যক্তি ঈশ্বরেরই সহকর্মী। —"হতে পারে তাই। কিন্তু সহকর্মী হলেও ঈশ্বরের গ্রেড্ আর সাধারণ মানুষের গ্রেড্ এক নয় এবং ঈশ্বরের প্রমোশন স্পেশাল ইনক্রিমেণ্টও সহকর্মীদের সঙ্গে তুলনীয় নয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল, পরম্পর পরম্পরে শুনিলাম এ বছর সে ইনক্রিমেণ্ট পায় নাই, সুতরাং।

শব্দ ও শিল্প-উৎপাদন সম্বন্ধে এক সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে অনেকে শব্দ সম্বন্ধে সংবেদনশীল তাঁদের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হয় অনেকের কানে শব্দের কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না তাঁদের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজ অব্যাহত থাকে। বিশুখুড়ো বলিলেন এটা আমরাও লক্ষ করেছি চেঁচানি-নিঃসৃত শব্দতরঙ্গ অনেকেরই কাজ ভুলিয়ে দিয়েছে অনেকে কানে তুলো দিয়ে নিজেদের বাঁচিয়েছেন বাঁচিয়ে রেখেছেন শিল্প প্রজেক্টকে।"

সংবাদে শুনিলাম চীনের শত্রু মিষ্টি। "সেই জন্যই চিনি বাজার থেকে উধাও হতে দেওয়া হচ্ছে কি না সে সংবাদ অবশ্য আমরা পাইনি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

তরুণ ক্রিকেটারের সন্ধানে সি-এ বি — একটি সংবাদ শিরোনামা। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন— আমরা অবশ্য ক্রিকেটবিশারদ নই তবু বলি রেস্তরাঁয় বা সিনেমার লাইনে খোঁজ নিলে সি এ বি-র খোঁজাখুঁজির কাজ সহজ হবে।"

বিভিন্ন অঞ্চলে বাৎসরিক বড় বড় ক্রিকেট খেলায় যোগদানের জন্য খেলোয়াড়দের যাতায়াতের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ কনসেশন দিতেন। সংবাদে শুনিলাম এ বৎসর সেই কনসেশন প্রত্যাহার করার ফলে ঐ খেলাগুলি আর অনুষ্ঠিত হইবে না। শ্যামলাল বলিল—"বিনা টিকিটে ভ্রমণজনিত ক্ষতি কনসেশন প্রত্যাহারে কতটা পূরণ হবে রেল কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে একটা বিবৃতি দিলে ক্রীড়ারসিকগণ তবু কতকটা সান্ত্বনা লাভ করতেন!"

বর্তমান বৎসরে মোহনবাগানের প্রথম পরাজয় হয় বি এন রেলওয়ে টীমের কাছে। আমাদের এক ফুটবল-রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"সংবাদটা একটা বড় রকমের রেলওয়ে দুর্ঘটনারই সামিল।"

ক্রিস্টিন কিলার-এর প্রসঙ্গ লইয়া বিলাতে তথা সমস্ত পৃথিবীতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার চলিতেছে, অনেকে বলিতেছেন এই 'সংহারিণী' অর্থাৎ কিলার ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভা টলটলায়মান করিয়া দিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু তার চেয়েও বৃটেনের ওপর বড় আঘাত যিনি হেনেছেন তিনি কিলার নন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গিবস্, যার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে দশ উইকেটে জিতে গেল।"

ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী এবং বেলজিয়াম হইতে ৩৫ জন কুমারী এবং ১৫ জন কুমার একটি প্রমোদতরী করিয়া সমুদ্র যাত্রা করিয়াছেন। সংবাদ-

দাতা বলিয়াছেন তাঁহারা যদি প্রমোদ-তরীতে জীবনের জুটি জুটাইতে পারেন ভাল না হইলে নানা বিষয়ে গলাবাজি করিয়া তাঁহারা জীবন কাটাইয়া দিবেন। বিশুখুড়ো বলিলেন— গলাবাজি করার বিষয়বস্তুর অভাব অবশ্য পৃথিবীতে নেই, কিন্তু মনে হয় যাঁরা জুটি জোটাতে পারবেন না তাঁরা হয়ত চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে বিয়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই জীবন কাটাবেন।"

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে চাঁদা উপহার প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যাপারে মন্ত্রী ও কংগ্রেসের গুরুত্ব-পূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তিদের জন্য শুনিলাম আচরণ বিধি রচনার প্রশ্ন আলোচনা করা হইতেছে। অন্ততঃ ফুলের মালা এই বিধি-নিষেধের আওতায় পড়বে না বলেই আশা করে আছি বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ পাকিস্তানে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"সীমান্ত থেকে

ছিনতাই ছাগল গরু সম্বন্ধে পাক সরকার উদার নীতি পোষণ করে আসছেন!!"

শিল্পীর স্বাধীনতা

/ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় /

অনেকদিন আগের ঘটনা। তখন স্কুলের গণ্ডি পার হইনি। মৌবয়মের সন্ধানে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম. হঠাৎ নারীকণ্ঠের চীৎকারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শব্দটা কো মণ্ডের আটচালার দিক থেকেই যেন আসছে। ছুটে গেলাম। বেশীদূর যেতে হল না। উঠোনের ওপরই করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্য। কো মণ্ডের বছর তিনেকের ছেলেটা পড়ে রয়েছে মাটির ওপর। সারা মুখ নীবক্ত। নিমীলিত দুটি চোখ। পাশেই তার মা আছড়ে পড়ে চেঁচাচ্ছে।

চীৎকারের মধ্য থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করলাম। পরের পুকুরের মাছ নষ্ট করার জন্য দুর্বৃত্তরা বুনোলেদি ফল ব্যবহার করে। অতিবিষাক্ত ফল। অসাবধানে কি করে এই ফল কো মণ্ডের ছেলে উদরস্থ করেছে।

কো মণ্ডের বউ আমাকে দেখে ছুটে এসে ঝাপটা জড়িয়ে নিয়ে বলল একটা কাজ করতে পারবে? স্টেশনের ওপারে পল্টনের মাঠে পোয়া নাচের আসরে কো মণ্ড রয়েছে তাকে একবার বিপদের খবরটা দাও। এখনই যেন চলে আসে।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছুটলাম। পল্টনের মাঠে ঠাসবোঝাই লোক। এগিয়ে যাওয়াই দুষ্কর অথচ এগিয়ে যেতেই হবে না হলে কো মণ্ডের নাগাল পাব না। কো মণ্ড শুধু আসরের নয় একেবারে বাসরের লোক। সামনে নানা রংয়ের নানা আকারের পাত্র নিয়ে বসেছে। হাতের কাঠির বাদ্যযন্ত্রে অপূর্ব শব্দ লহরীর সৃষ্টি হচ্ছে। জলতরঙ্গের বিচিত্র সুর।

ভিড় ঠেলে বহুকষ্টে তার কাছে গেলাম। তখন আসরে দুটি মেয়ে লীলায়িত ভঙ্গীতে নেচে চলেছে। পিছনে করতাল, বাজো আর জলতরঙ্গের-সুর-সমারোহ।

বার দুয়েক চেষ্টা করলাম। সুবিধা হল না। কো মণ্ড তন্ময়। একেবারে পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কানের কাছে বিপদের কথাটা বললাম. কো মণ্ড আরক্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে ধমকের সুরে বলল. চুপ বেয়াদব ছেলে. তাল কেটে যাবে।

ভাবলাম সর্বনাশের মাত্রাটা সম্বন্ধে বুঝি সচেতন হয়নি। আবার বললাম কথাটা। এবার আরো জোরে. মুখটা কানের আরো কাছে নিয়ে গিয়ে।

নাচের ঘূর্ণি তখন চরমে। মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কো মণ্ড বাজিয়ে চলেছে। মাথা দোলাতে দোলাতেই আমার দিকে চেয়ে বলল দূর পাগলা দুনিয়া রসাতলে যাক। এমন জিনিস ছেড়ে এ সময় কখনও ওঠা যায়।

কো মণ্ড ওঠেনি। বিকেলের দিকে কো মণ্ডের বউয়ের বুকফাটা আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারলাম সব শেষ। এদিকের জানলায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে ভেসে আসা জলতরঙ্গের সুরও কানে এল।

পরে বাড়িতেই শুনেছি।

নিজের ছেলেটা বিষফল খেয়ে মারা গেল লোকটা বাজনা ছেড়ে একবার উঠল না।

ওরা যে শিল্পীর জাত। মায়ার বাঁধন তাদের বাঁধতে পারে না। ছোট খাটো লৌকিক সুখ দুঃখ ক্ষয় ক্ষতির ওরা অনেক ঊর্ধ্বে। যে রসের খোঁজ ওরা পেয়েছে তার কাছে অন্য সবকিছু আকর্ষণ ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

সেদিন কথাগুলো শুধু শুনেছিলাম মানে বুঝিনি। শিল্পী বলতে সে সম্বন্ধেই কোন সম্যক জ্ঞান ছিল না।

পরে বয়স বেড়েছে। পৃথিবীকে চেনার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি। মনে হয়েছে শিল্পীরা বাঁধনহারা তো নয়ই বরং নানা বাঁধনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিজের শিল্পসত্তা ঘিরে অসংখ্য বন্ধনহীন গ্রন্থি। শুধু নিজের মনের কাছেই নয়, দেশের কাছে, দশের কাছে তার দায়িত্বের বন্ধন। সত্য শিব আর সুন্দরের উপাসনাই কেবল নয় কতটুকু কি ভাবে বললে তার রচনা সত্য. শিব আর সুন্দরের প্রকৃষ্টতম প্রকাশ হতে পারে, সে কথাও বিবেচনা করার দায়িত্ব তার।

কিন্তু যেখানে দেশের বিকাশ শুধু অন্য প্রাতিবেশী দেশের কুৎসা প্রচারে, স্বাধীনতা-হীন দেশের রূপ পরিস্ফুট স্বৈরাচারী একনায়কত্বে বিবেক যেখানে অবহেলিত, প্রতিহত শিল্পীদের চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ সেখানে শিল্পীর দায়িত্ব বিরাট।

প্রকৃত শিল্পী এই রাষ্ট্রীয় স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় পরমুহূর্তে তার সে মাথা ধুলায় লুণ্ঠিত হবে জেনেও। তার শিল্পীসত্তার অবমাননা সহ্য করা তার পক্ষে আত্মহননের সামিল। তার সঙ্গীত ও কবিতা রাজস্তুতির নামান্তর, তার সাহিত্য

শুধু রাষ্ট্রমুখী, এই অবাঞ্ছিত অবস্থার কাছে নতিস্বীকার যে কোন জাত শিল্পীর কাছে অকল্পনীয়। Regimentation of thought-এর ফলশ্রুতি ব্যাভিচারের ঔরসজাত জারজ-সন্তানের মত। স্নেহ, মায়া, মমতা, বুদ্ধির দীপ্তি, প্রেম, প্রীতি সবকিছু নিঃশেষিত। পরিবর্তে কেবল ভয়। কোন রকমে দু মুঠো ফুল ছুড়ে দিয়ে বলা, ভগবান তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। এ সৃষ্টি যেন বনিতার বারবনিতার বেশের অনুকল্প।

নির্ঝঞ্ঝাট সুস্থ পরিবেশ প্রতিটি মানুষের সমানাধিকার অর্থনৈতিক গ্লানি থেকে মুক্তি সাধারণ লোকের মত শিল্পীরও এই অবস্থাই কাম্য। শান্ত সুখী আবেষ্টনী তার সাহিত্য রচনায় অনুপন্থী। তাই জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে সংহত তার কাম্য নয় একমাত্র সংহত কাম্য নিস্কুব [illegible] প্রেরণায়। যে সংহত চিন্তার নতুন [illegible]

ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদের প্রলোভন তার সর্বাধিক। কিন্তু এই সাম্যবাদের জন্য তাকে পরমুখাপেক্ষী হতে হবে কেন? এ চিন্তাধারা তো এদেশেরই মাটির জিনিস। বেদে, উপনিষদে, রামায়ণে মহাভারতে বৌদ্ধশাস্ত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্ক স্বীকৃত। তার চেয়ে বড় কথা, এদেশে জীব আর শিব সমার্থবাচক। জড় সাম্যবাদ নয় সে সাম্যবাদ উদ্দেশ্যমূলক সে সাম্যবাদের মৌল সুর আমি দেব অর্থনৈতিক মুক্তি তার পরিবর্তে তোমাদের সব চিন্তা চিন্তার ফসল রাষ্ট্রের পারপোষক হক। রাষ্ট্র নামক এই বিরাট যন্ত্রে তোমরা প্রত্যেকে এক একটি সমান মাপের সমান ওজনের অংশ বিশেষ। এদেশের সাম্যবাদের মূল [illegible] ভিন্ন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের বন্ধনের [illegible] অনেক গভীর। [illegible] ভক্তদাসী তোমার ভাই। ভুলিও না মুচি মেথর, হাড়ি চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতি তোমার রক্ত তোমার ভাই।"

সারমেয়কে রুটির টুকরোর লোভ দেখিয়ে তাকে প্রভুভক্তি শেখানো, প্রভুর গৃহস্থালী রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া কিংবা শত্রুকে আক্রমণ করার শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে যে জাতের আনুগত্যের ইঙ্গিত আছে, অন্য তথাকথিত সাম্যবাদী দেশের প্রজাসাধারণের আনুগত্যের স্বরূপ তারই সমগোত্রীয়।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষকে কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি। মাঝে মাঝে সে অত্যাচার বর্বরতার সীমারেখা স্পর্শ করেছে। তবু সে সময়ের শাসনপ্রণালী কিছুটা গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বন্দে মাতরম বলেও নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন শুধু তাঁর আনন্দমঠ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সরকারী কর্মচারীকে [illegible] রচনা [illegible] সত্যবাদিতার [illegible] দিতে হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিশ্বকবি তাঁর শিরোপা ত্যাগ করার জন্য শিরশ্ছেদের হুকুম পাননি। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর অগ্নিস্রাবী [illegible] হয়ে ছিলেন প্রাণদিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। [illegible] এই সমস্ত [illegible] কম প্রার্থী। ঠিক এই ধরনের লেখার জন্য সাম্যবাদী দেশে এদের কি শাস্তি পেতে হত তা কল্পনা করার প্রয়োজন নেই অতীত ইতিহাসই যথেষ্ট সাক্ষ্য দেবে।

হিউয়েন সাং হ্যাং সিং লাও জে, কনফিউসিয়াসের জন্মভূমির আজ রূপান্তর ঘটেছে। [illegible] বার্তা আর নয় [illegible] নতুন দিগ্বিজয় শুরু। চেঙ্গিস আর চৌ-য়েন [illegible] নীতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য সামান্যই। দুজনেরই রাজ্যলিপ্সার রথ মানুষের বিবেক, মনুষ্যের সংবৃত্তি সবকিছু চূর্ণ করে এগিয়ে চলার প্রয়াসী।

—এদের স্লোগান রাষ্ট্রই একমাত্র দেবতা, বিবেক প্রকৃতিস্থের দাস।

যে দেশে অর্থনৈতিক দুর্দিনের দোহাই দিয়ে শুধু রাষ্ট্রের লেখনী বুলিই কপচাতে হয় সেখানে কোথায় শিল্পীর স্বাধীনতা! নীলাকাশে পক্ষবিস্তার করে স্বেচ্ছাচারী হওয়া উন্মাদ কল্পনা মাত্র। বার বার পিঞ্জরের লোহায় চঞ্চুই আহত হয়।

২৬শে জানুয়ারি ১৯৩০। সাধারণ প্রজাতন্ত্র দিবস। সমস্ত জাতি নতুন এক শপথ গ্রহণ করল। সে শপথের প্রতি ছত্র স্বাধীনতার দ্যোতক। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, ব্যক্তি স্বাধীনতাও।

"We believe that it is the inalienable right of the Indian

people, as of any other people, to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life, so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives a people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it."

আশার কথা, আনন্দের কথা, প্রতি বছর এই শপথবাণী আজও জাতির জীবনে নতুন প্রেরণা, নতুন চেতনা জাগায়।

যে স্বাধীনতা ভ্রূকুটি-সর্বস্ব, পরশ্রী-কাতর, সন্দেহাকীর্ণ, নিজের সমালোচনা-শ্রবণে অসহিষ্ণু, অপরকে নিরাপত্তা দেবার ক্ষমতা তাদের সীমাবদ্ধ। প্রজাসাধারণকে স্বাধীনতা দিতে যারা দ্বিধাগ্রস্ত পরাঙ্মুখ, শিল্পীকে স্বাধীনতা দেওয়া তাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত। অথচ মুক্ত স্বাধীন আবহাওয়া ছাড়া শিল্পীর পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব।

সাম্যবাদী দেশের আর এক সম্বল অসত্যের বেসাতি। তাদের অভিধানে পর-রাজ্যলিপ্সা পাপ, কিন্তু বার বার স্বার্থের প্রয়োজনে অত্যাচারের লেলিহান শিখায় এ অভিধান তারা ভস্মীভূত করেছে। আগ্রাসী পীত জাতির লোভের সীমা অপরিসীম। বহুবার শান্তিকামী নির্বিরোধ প্রতিবেশীদের বুকে হানা দিয়ে তাদের শান্তি-অভিযান চলেছে। সোভিয়েটের ইতিহাসের পাতাতেও একই রক্তের ছিটে। ব্যক্তি তাদের কাছে রাষ্ট্রপ্রধানের বাণীবাহক মাত্র. সৈনিক শুধু cannon-fodder মধ্যযুগীয় divine rights of kings-এর পরিবর্তে divine rights of doctrines. অবশ্য এ doctrines শুধু তাদের নিজের মাপে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রয়োজনে বার বার বদলায়।

এমন একটা অনিশ্চিত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রকৃত শিল্পীর উদ্ভব সম্ভব নয়। তাদের স্বাধীনতার কথা তো অবান্তর। সমরাঙ্গনের পাশে বাবুইয়ের বাসা বাঁধার মতন।

শিল্পীর স্বাধীনতা আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে কতটা তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সোভিয়েটের শিল্পী-স্বাধীনতার কথা জানলাম সেদিন কলকাতার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কোচেতভের বিবৃতিতে।

কাজেই ব্যক্তিস্বাধীনতা, যার সঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের দেশে যতটা মর্যাদা পায় অন্য সাম্যবাদী দেশে, রাজনৈতিক কারণেই ততটা পায় না, পাওয়া সম্ভব নয়।

তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার কামনা, 'এই দেশেতেই জন্ম যেন, এই দেশেতেই মরি।' শিল্পীর অস্তিত্ব নিয়ে, শিল্পীর সম্মান নিয়ে, শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে।

বন

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য্য

দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড এক মাঠের সামনে এসে দাঁড়াল গোকুল।

ধরতে গেলে রাস্তাটা এইখানেই শেষ। আবার এখান থেকেই ঘুরে, বেঁকে গেছে ধরা যায়। বাঁকা তলোয়ারের মতই শহর কিংবা গাঁয়ের ভেতরে ঢুকে গেছে কোথাও।

অবশ্য আপাতত থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে গোকুলকে। চোখের সামনে পথ বলতে কিছু নেই তার।

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। সবুজের ছিটেফোঁটা চিহ্ন যদি লেগে থাকে কোথাও। যতদূর চোখ যায় ফাঁকা বিষণ্ণ মাঠ। দূরে একটু রুক্ষ টিলা। আর কাশ কুশ শরের সীমানায় নিশ্চিহ্ন অতীত হয়ে আছে সব।

মাঝে মাঝে বিবর্ণ ঘাস। পুড়ে খড় হয়ে আছে। মরে মরে মাটি [illegible] বয়সের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশাল প্রান্তর। [illegible] থাকতে অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক চোখ জ্বালা করে।

গোকুল একটা পাখি দেখতে পেয়েছিল। সবুজ নরম কিছু ঘাস। [illegible] শীতল ছায়া। আর ক্ষুদ্র কিন্তু মনোরম একটি জলাশয়। যার জল [illegible] চোখের মত কালো। [illegible] চেয়ে [illegible] চেয়ে গভীর [illegible] চেয়ে স্বচ্ছ [illegible] চেয়ে সুন্দর।

অথচ গোকুল এখানে এত সব দেখবে ভেবে নিয়ে তার আসা নয়।

সামনে পেছনে কোনো মানুষের দেখা নেই। কাক পক্ষীটির সাড়া নেই।

এ-হেন অবস্থায় নিজেকে এই নির্জনে নিঃশব্দ চরাচরের একমাত্র সম্রাট ভাবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আনমনা উদাস চোখে চেয়ে থাকে গোকুল। নির্বাসিত ঈশ্বরের ন্যায় সর্বঅবয়বে এক অসামান্য হতাশা আর অলৌকিক বিষাদ ফুটিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকাই হয়তো যথাযথ মনে হল তার। কারণ এই তার নিয়তি।

শুনো নাক তুলে শুকনো ঘাস ধুলো আর রোদের ঘ্রাণ নিতে চাইল গোকুল। ঝড় উঠবার আগে মাঠের রাখাল ঠিক এইভাবে চেয়ে থাকে। ধুলোর গন্ধে গাভীরা টের পায়।

ঠাণ্ডা, মৃদু এক ঝলক বাতাস চেয়েছিল গোকুল। যা পেলে শরীর জুড়োয়। প্রাণ মন স্থির, শান্ত হয়ে থাকে।

আশ্চর্য! এই গোকুল কিনা তার সুন্দরীকে খুঁজতে বেরিয়েছে!

এখন নিরর্থক মনে হয়। এ যেন নিজেকে সাক্ষী রেখে অকারণে নিজের পেছনে ছোটাছুটি। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দায় ভুলে অযথা বিব্রত হওয়ার কোনও মানে নেই। টের পেলে পাগল ভাবে লোকে। বিশ্বাস করতে কে চায়, তার সুন্দরী নেই? এমন নিশ্চল নিবিষ্ট ভঙ্গী গোকুলের। সুখ-দুঃখ ইত্যাদি মানবিক অনুভূতি আর যেন স্পর্শ করে না তাকে। এমনি নির্বিকার।

'কী গো এখানে দাঁড়িয়ে যে?'

বুড়ো মনোহর এগিয়ে এসে হাত ধরে।

'এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি একটু।'

গোকুল হাসে। হাসিটা বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। কেমন বোকা-বোকা দেখায়। এত দূরে এসেও মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে জানা ছিল না। বড্ড [illegible]। মনোহর [illegible] পড়লে [illegible] বাঁচে। [illegible] হাসি কি লোকটার [illegible]?

'বেশ [illegible] জায়গাটা বেড়াবার পক্ষে মন্দ না বলো।'

গোকুল আবার হাসে। লোকটা তাকে রসিক ঠাউরেছে। প্রকৃতিপ্রেমিক!

'তবে কি জানো, দায়ে না পড়লে এখানে কেউ আসে না।'

চমকে ওঠে গোকুল। টের পেয়ে গেছে তা হলে। তার বিপদের কথা মুখে চোখে লেখা আছে নাকি? নইলে কেমন করে বলে! শ্বাপদের মত হিংস্র কুটিল চোখ মনোহরের। দেখে ভয় হয়।

'বিয়ে করেছো শুনলাম। বউ কেমন?'

'ভালো।'

ঢোক গিলে কোনরকমে জবাব দেয় গোকুল। এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। না টের পায়নি মনোহর। সে যে বিষম দায়ে পড়েই এখানে এসেছে, জানে না।

'কাজ নেই বুঝি?'

গোকুল মাথা নাড়ে।

'দিনকালের এমন অবস্থা।' মনোহর সহানুভূতির সুরে কথা বলে। 'যার হাত আছে তার কাজ নেই।'

কথায় কথায় আরো অনেক দূরে চলে এসেছে গোকুল।

ডাইনে পুকুর। বাঁয়ে কাদের পুরনো বাগান। মনোহর চলে গেলে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল আরো কিছুক্ষণ। জলে গা ডুবিয়ে সাঁতার কাটছে মেয়েরা। তার সুন্দরীর মত কেউ না। কথাটা ভাবলে এখনো অহংকারে বুক ফুলে ওঠে।

গোকুল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েদের মুখ দেখে। মুখ-চোখ-নাক। জলের তলায় নগ্ন বাহুর আস্ফালন। তাকে মুগ্ধ করতে পারে না কেউ। স্বপ্ন দেখতে-দেখতে ভয় পেলে নরম লতার মত দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরতো সুন্দরী। পদ্মের কলির মত বুক তার! মুঠিতে ধরা যায় এমনি কটি! আর চোখ, নাক! তুলনা কিসের? কার সঙ্গে? তেমন কেউ নেই। অন্তত চোখে পড়ে না গোকুলের।

একটি মেয়ে গোকুলকে দেখে অবাক হল। এমন সময় তাকে যেন প্রত্যাশা করেনি এখানে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গীটা মনোরম হলেও সুন্দরীর মত না। মনে-মনে মেয়েটিকে সুন্দরীর সঙ্গে মেলাতে গিয়ে বাস্তবিক হতাশ হল গোকুল। ওর বুকের আধখানা জলের ওপরে ভাসছে। মুখের ছায়াটা বুকের স্নিগ্ধ, মসৃণ শুভ্রতার দিকে চেয়ে মুগ্ধ। একটুখানি হাওয়া পেলে পদ্মের মৃণাল যেমন ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে, লজ্জায় আনত মেয়েটির মুখশ্রী ঠিক তেমনি। তবু পুরোপুরি সুখী কিংবা তৃপ্ত হতে পারে না গোকুল। কারণ প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে সুন্দরীকেই ভয়ংকরভাবে স্মরণ করার সাধ তাকে ব্যাকুল, বিভ্রান্ত করে। যে কারণে হতাশায়, অভিমানে তার দেহ মন ভেঙে পড়তে চায়।

ওরা কেউ দেখেনি। দেখলে অবাক হত আরো। এমন করে ঠিক এতখানি সংস্কার ভাঙার সাধন হত না।

গোকুল দেখল, কপালে ভিজে চুলের রাশ। গাল আর চিবুক বেয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় জল ঝরছে মেয়েটির। চোখের পালক ভিজে ফুলে উঠেছে খানিক। মেয়েটি তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিক করে হেসে আবার জলের তলায় তলিয়ে গেল। মাছের মত পাখনায় জল কেটে-কেটে বেশ মৃদু অথচ সতর্কতার সঙ্গে ওকে আরো গভীরে ডুবে যেতে দেখল গোকুল। ওর পিঠের নরম রেখাটা জলের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে দেখা যায়। সেই সব পৌরাণিক মৎস্যকন্যাদের কথা ভাবতে আর কষ্ট হয় না, নাভির নিচে যাদের কামনার শান্ত, সোনালী সরোবর ছিল না কোনদিন। ক্ষণিকের জন্যে গোকুল সেই বিস্মৃতির পরপারে দাঁড়িয়ে জলকন্যাদের মুগ্ধ, অচপল লীলা দেখতে দেখতে মোহে আবিষ্ট তন্ময় হয়ে রইল। ভুলে গেল তার সমাজ, সংসার, এমন কি তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর পবিত্র সুন্দরীকে খুঁজে পাওয়ার দায়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল জানে না। এক সময় দল বেঁধে উঠে এল মেয়েরা। গোকুল সম্বিৎ ফিরে পেল। আর তার ভুল তাকে লজ্জা দিল, বিব্রত করে তুলল। কিন্তু অন্যদিকে চোখ ফেরাবার শক্তি অথবা সাধ্য যেন ছিল না। ওদের ভেজা শাড়ির আড়ালে অপার্থিব রূপ আর লাবণ্যের মিছিল তাকে লোভী, চঞ্চল করে।

কিন্তু সুন্দরী জলে প্রশ্রয় দিত কিনা, আর দিলে এমন করে নিশ্চল, মুগ্ধ চোখে

চেয়ে থাকার সাহস অথবা ইচ্ছে আর কোন-দিন হয়েছে কিনা মনে নেই। মনে করতে পারবে না বলেই আপাতত সেকথা ভাবে না গোকুল। ভাবে না, সুন্দরীকেই খুঁজতে বেরিয়েছে সে।

ভেজা-ভেজা শরীরের ঘ্রাণ তাকে আচ্ছন্ন, আতুর করে তোলে। কত পরিচিত এই গন্ধ তার। বুকের ভেতরে হিম হয়ে আসে। পিপাসার কথা মনে পড়ে। গোকুলের কান্না পায়। ইচ্ছে হয় খুব জোরে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকে। যদি কাছে আসে কেউ। কী নামে ডাকা যায় তাকে?

একটি নামই জানা আছে গোকুলের। সেই নাম প্রাণের ভেতরে বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু সুন্দরী যদি না ফেরে? কোনদিন যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাকে।

সেইসব সুন্দর সুন্দর মেয়েদের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে ফেলার আগে গোকুল একটা প্রাচীন মন্দিরের ভাঙা-চোরা উঠোনের গা ঘেঁষে আরো প্রবীণ অথচ পত্র-পল্লবে আচ্ছন্ন শিরীষ আর বকুলের বনে গেল। এইখানে দাঁড়িয়ে বিচিত্র সব পাখিদের কলরব শোনা যায়। শিরীষ-বকুলের গন্ধে বাতাস এখানে ভারি আর স্নিগ্ধ। বৃষ্টি পড়ার মত শিরীষ কিংবা বকুলের পতন শব্দ কি গভীর! মৌমাছিদের গুঞ্জন স্মৃতির মত তীব্র তীক্ষ্ণ আর মনোরম মনে হয়। এইসব দেখে-শুনে সুন্দরীর অভাবের বেদনাকে তুচ্ছ করে আবার এক অপরূপ সুখ দুঃখের গভীর গভীরতর বোধ তাকে যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়! অসংখ্যরকম পাখি হাতছানি দিয়ে ডাকে। তার চতুষ্পার্শে সেই ভাঙা টুকরো স্মৃতির সম্ভার। অভিভূত চোখে গোকুল এইসব দেখে।

নাচতে নাচতে একটা ফিঙে তার পায়ের কাছে এসেছিল। কেমন নির্ভয় নিঃশঙ্ক। গোকুলের মুখের দিকে চেয়ে পাখিটা সুস্বর ডাকল। অদূরে গাছের ডাল থেকে আরেকটা পাখি নিচে মাটিতে নেমে এল। গোকুল জানে, এইবার অনর্গল কথা বলবে ওরা। তাকে উপেক্ষা করেই পরস্পর গান গেয়ে উঠবে। যেন সে নেই। অথবা তার অস্তিত্ব গাছ কিংবা ভাঙা মন্দিরের অংশ-বিশেষের সামিল।

এইখানে পাখিদের সংগে সুন্দরীর দুস্তর মিল খুঁজে পেলেও তাদের আন্তরিক অমিল বোঝেন পরিমাণ। কারণ সুন্দরীর শরীরে সুখের, আনন্দের, আহ্লাদের চিহ্নমাত্র ছিল না কোথাও। পাখিদের হৃদয় সুতরাং স্পর্শ করা তার কাছে স্বপ্নের অতীত। কারণ পাখিদের শরীরে সতত প্রেম আর পুলকের অনন্ত শিহরণ।

এতক্ষণে আঘাত কঠিন মনে হয়। বিষম

ভাবনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই মন বুঝি বিরূপ হতে চায়।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে যেতে-যেতে নিজের পায়ের শব্দে চমকে ওঠে গোকুল।

দ্রুতপায়ে, কারণ অভিমানে, বিষাদে বিরক্ত, পরাজিত গোকুল এই মুহূর্তে তার সুন্দরীকে ভুলে যাবার প্রবল ইচ্ছা আর বাসনার তাড়নায় ব্যস্ত। উদ্‌ভ্রান্ত কিছুবা।

জারুলের ছায়ায় একটি মনোরম সাপ দেখা গেল। গোকুল ভয়ে, বিস্ময়ে পাথর। ছায়া এখানে গভীর। অন্ধকার বলে ভ্রম হয়। মাঝে-মাঝে ক্বচিৎ রোদ্দুর রেখা আদিম অরণ্যের স্মৃতি স্মরণে জাগায়।

নিঃশব্দে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোকুল সাপ দেখে। আর কখনো দেখেনি এমন নয়। কিন্তু নতুন করে দেখে। কতদিন এই সাপটাকেই তার ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। সুন্দরীর মনে ভয় ছিল না কখনো। কেন ছিল না গোকুল এবার বোঝে।

মনোহর বলেছিল, দায়ে পড়ে এখানে আসে সবাই।

সাপ-ও আসে।

এতক্ষণে বোঝা যায়। গোকুল মনোহরের কথাটা যথার্থ উপলব্ধি করতে পারে।

'এইখানে যে?'

হকচকিয়ে গেছে ত্রিনাথ। বোধ করি ভাবে নি, সে ছাড়া এ অরণ্যে গতি-গম্য আছে কারো।

'দেখতে এসেছি।'

'কি?'

'এই বন, বনের গাছ, পাখি এইসব আর কি।'

ভাবের ঘোরে কথা বলে যায় গোকুল। বড় অচেনা, নতুন-নতুন ঠেকে। ত্রিনাথ ভাবে, বিগড়ে গেছে লোকটা। বউয়ের শোকে পাগল হয়ে গেছে। তাতো হবেই' অমন সুন্দরী যার বউ। আর অতবড় দাগা কার সয়' গোকুলের জন্যে মায়া হয়। আফ-সোসের অন্ত আর থাকে না।

'বউ এল?'

গোকুল হাসে। নিস্পৃহ নির্বিকার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। যেন তার কোন শোক নেই। ধরে নাচে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। অন্তত সুন্দরীর কথা ভেবে দুঃখ করার সময় নেই তার। ঘুলঘুলি চিত্রার মত আলো আর ছায়ার দিকে চেয়ে গোকুল অভিভূত হয়। সেই সোনালী মাছটাকে গিলে সাপটা কোথায় উধাও হল কে জানে' ভেবে কূল পায় না গোকুল।

[illegible]

[illegible]

'কী, [illegible] এখানে।'

'এইমাত্র একটা সোনালী মাছকে গিলে খেয়ে ফেলল দেখলাম।'

'তাই তো করে।' অভিজ্ঞতার হাসি হাসে ত্রিনাথ। ঘৃণায় চোয়াল শক্ত করে বলে, 'দেখে-দেখে চোখ পচে গেল আমার।'

'আমার জানা ছিল না এসব।' গোকুলের কণ্ঠস্বর অপরাধীর মত শোনায়।

'বনে বাস করলে বনের নিয়ম জানা দরকার।'

[illegible] ত্রিনাথ [illegible] ধিক্কার দিতে চাইল [illegible]। সাপের কবলে সুন্দরীকে যেন ফেলে দিয়েছে গোকুল নিজে।

খড়ি আর কাটারি হাতে চোখের আড়ালে চলে গেল ত্রিনাথ।

গোকুলের ভয় পাচ্ছিল। একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল সে। যেন নিশ্চিন্তে নিস্তরঙ্গ বাকি জীবন এইখানে শুয়ে, ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে।

হঠাৎ তীব্র চীৎকার করে জেগে উঠল গোকুল। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে দেখতে পেল অসংখ্য পিঁপড়ের সার তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। এবং প্রত্যেকেই তাকে দংশনে উদ্যত। কারণ তাদের মুখের দুটি দাঁড়ার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তারই সন্ধানে লোলুপ। কারণ, তারা

পরস্পর আলাপে মগ্ন। কারণ গোকুলের শরীরে সভ্যতার অভিমান আর অহমিকা, অসত্য আর হিংসা তখন আপন-আপন গন্ধে বনের সমস্ত শুচিতা বিনষ্টে উদ্যত। অন্ততঃ তাদের নিঃশব্দ এবং অকপট আচরণে এই একমাত্র ধারণাই প্রকট হয়ে উঠেছিল।

কথাটা ভেবে গোকুল লজ্জিত হল। আবার ততোধিক দুঃখ তাকে পীড়িত করে। সমাজে কিম্বা সংসারে তার স্থান এখনো অনির্দিষ্ট অথচ তার আত্মীয় বান্ধব অগণন। এ হেন পরিহাস রক্ত-মাংসে অসহ্য।

দ্বিতীয়বার চীৎকার করে ওঠার বদলে স্তম্ভিত হতে হয়। আগে পিছে লক্ষ-লক্ষ, কোটি কোটি পিঁপড়ের মিছিল। মাঝখানে একটি পতঙ্গের চিত্রিত শব কোন অজ্ঞাত অন্ধকার সুড়ঙ্গের কাছে বহন করে নিয়ে চলেছে তারা। বিত্তবান বৃদ্ধের শব-যাত্রা মনে পড়ে; ফুল খই ভিখারি আর পয়সার ছড়াছড়ি। আর শোকের বদলে ঘৃণ্যতম উল্লাস। সুতরাং অমিল আদৌ নেই। সুতরাং স্বপক্ষে যুক্তির সন্ধান বৃথা জেনেই গোকুল আর নিজেকে আহত কিম্বা পীড়িত করে তোলে না। বরং নীরবে লক্ষ করাই সমীচীন মনে হল তার। আপাততঃ গোকুল সেই অদৃশ্য সুড়ঙ্গ খুঁজে পেতে তৎপর। নতুন সুন্দরীর দেখা মেলা ভার।

একদিন অজস্র বর্ষণে শ্রাবণের সন্ধ্যা মৃতপ্রায় মনে হলে শহরে আশ্রয়ের চিহ্নমাত্র খুঁজে পেল না গোকুল। অনন্যোপায় একটি অখ্যাত চায়ের দোকানে একমাত্র পতঙ্গের সংগী হয়ে ঢোকে সে এক কাপ চায়ের প্রত্যাশায়। অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে পতঙ্গের উদ্বাস্তু আনন্দ দেখে তৃপ্তি বোধ করেছিল। কিন্তু প্রায় এক সংগে দেয়াল আর ছাদের বিভিন্ন গোপন রাজপথ থেকে পাঁচ পাঁচটি ক্ষুদ্র আদিমতম জীবের নিষ্ঠুর, নিঃশব্দ আক্রমণ তাকে আচম্বিতে ক্রুদ্ধ, আহত করে তুলেছিল। সেই প্রবল দুর্যোগে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সংগীটিকে বিপুল অন্ধকারের পথ না দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি গোকুল। অবশেষে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে

মিনোয়ান লিপি ও মাইকেল ভেন্ট্রিজ

সুবোধকুমার মজুমদার

খৃস্টের জন্মের আনুমানিক তিন হাজার বছর আগে গ্রীকরা কোন এক অজ্ঞাত আস্তানা ছেড়ে ঈজিয়ান্ সাগরের দ্বীপগুলিতে তাদের বসতি স্থাপন করে। বহিরাগত এই জাতি সঠিক কোন্ সময়ে গ্রীস দেশে প্রবেশ করেছিল এবং কাদের হটিয়ে এখানে নিজেদের জায়গা করে নিল—সে খবর আজও ইতিহাসের অজানা। গ্রীসের সাবেকী অধিবাসীরা আক্রমণের চাপে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হল—উন্নততর গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করল এবং কালক্রমে আক্রমণকারীদের সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্গীভাবে এমন মিশে গেল যে তাদের চিনবার আর কোন উপায় রইল না। প্রাগৈতিহাসিক গ্রীসে যেসব জাতি ও উপজাতি বসবাস করত তাদের ইতিহাস গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকার ভেদ করে আলোর সন্ধান যে একেবারেই পাওয়া যায়নি, তা নয়। হোমারের মহাকাব্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা—এই দুই চাবিকাঠির সাহায্যে সুদূর অতীতের অনেক রহস্যের সন্ধান আজ পাওয়া গিয়েছে। হোমারের কাব্যে যেসব বিস্মৃতপ্রায় প্রাচীন দেশ-নগর, জাতি-উপজাতি, রাজারাজড়ার কথা আছে তারা যে নেহাত অলীক বা কাল্পনিক নয় তার প্রমাণ দিয়েছেন শ্লীম্যান, যিনি কেবল হোমারের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে মাটি খুড়ে ট্রয়নগরীর ধ্বংসাবশেষ বার করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় যে গ্রীক জগতের সন্ধান পাওয়া যায় না—পৃথিবীকে সেই অদৃশ্য জগতের সন্ধান দেবেন—এই সংকল্প নিয়ে শ্লীম্যান কোদাল ও গাঁইতি হাতে নিয়েছিলেন। জীবন-সায়াহ্নে গ্রীসের অন্তর্গত মাইকেনীতে তিনি খননকার্য শুরু করেন। কিন্তু এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের শেষ তাঁর দেখা হল না—কারণ ১৮৯০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্লীম্যানের অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নেন (স্যার) আর্থার্ এভান্স্। ইনি অক্সফোর্ড ও গটিনগেনের কৃতী ছাত্র—ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রখ্যাত প্রত্নগবেষক। একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষ্যে গ্রীসে তাঁর প্রথম আগমন; ইচ্ছা ছিল যতশীঘ্র পারেন কাজটি সেরে ইংলণ্ডে ফিরবেন। কিন্তু অতশীঘ্র গ্রীসের মায়া কাটিয়ে দেশে ফেরা তার ভাগ্যে ছিল না। পরবর্তী সুদীর্ঘ পঁচিশটি বছর তিনি গ্রীসের পুরাতত্ত্ব

গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত তাতেও তাঁর জ্ঞান পিপাসা মেটেনি।

মাইকেনীতে শ্লীম্যান পোড়ামাটির তৈরি অনেক পাত্র, রঙিন ফুলদানি, পুতুল নারী মূর্তি ইত্যাদি খুড়ে বার করেছিলেন। এগুলির উপরকার কারুকার্য এবং মাঝে মাঝে পালিশও অতি সুন্দর। এই অপূর্ব নিদর্শনগুলির দিকে তাকিয়ে এভান্সের মনে এক প্রশ্নের উদয় হয়। মাইকেনীর অধিবাসীরা এগুলি তৈরি করে তাদের

মাইকেল ভেন্ট্রিজ (১৯২২-৫৬)

শিল্পপ্রতিভা ও কলাকৃতির পরিচয় দিয়েছে—কিন্তু এরা কি নিরক্ষর ছিল? এমন একটিও নিদর্শন এখানে পাওয়া গেল না কেন যার মধ্যে তাদের ভাষাজ্ঞান ও লিখন-পদ্ধতির পরিচয় আছে? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পেলেন না এভান্স্। সমস্ত গ্রীস তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলেন তিনি—যদি কোন প্রাগৈতিহাসিক গ্রীক-লিপির সন্ধান পান। অ্যাথেন্সের এক দোকানদার পুরাতত্ত্বের জিনিসপত্র বিক্রি করত। তার কাছ থেকে অদ্ভুত চিহ্নাঙ্কিত কয়েকটি সীলমোহর তিনি সংগ্রহ করেন। চিহ্নগুলি এমন সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্যবহৃত যে এভান্স্ ভাবলেন যে হয়ত এরই মধ্যে কোন অজ্ঞাত লিপির বর্ণমালা আত্মগোপন করে আছে। তারপর চলল তার অক্লান্ত অনুসন্ধান। বহুজনকে জিজ্ঞাসা করেও যখন এই সীলমোহরগুলির উৎপত্তি

ঘুরতে যখন তিনি ক্রীট দ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন। নানা কারণে তাঁর মনে হয়েছিল এই দ্বীপটিতে অতীতে এক সুসভ্য জাতির বসবাস ছিল। ক্রীটদ্বীপ সেই সময়ে তুরস্ক সরকারের অধীনে। তুর্কীরা কখনই বৈজ্ঞানিক-গবেষকদের সুনজরে দেখত না—তাই পদে পদে এভান্সকে বাধা পেতে হল। কিন্তু কিছুতেই তিনি নিরুৎসাহ হননি। সুযোগ্য সহচর জন্ মায়ার্সকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সমগ্র দ্বীপটি পদব্রজে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করলেন। অবশেষে সেই দুঃসাহসিক অভিযান সফল হল। যে সীলমোহর তিনি খুঁজছিলেন, ক্রীটের গ্রামবাসী অনেক কৃষকরমণীর কাছে তার সন্ধান পাওয়া গেল। গ্রামের মেয়েরা এগুলি তাবিজ বা মাদুলির মত অঙ্গে ধারণ করত। তাঁর সন্দেহ রইল না, ক্রীটেই কোন অজ্ঞাত লিপির সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাবে। ১৯০০ সালে, এই দ্বীপটি ইংরেজ-অধিকারভুক্ত হয় এবং সেই বছর থেকেই নসাস্ (Knossos) নামক স্থানে খননের কাজ শুরু করে দেন স্যার্ আর্থার এভান্স্। মাত্র এক সপ্তাহ কাজ চলার পরই এভান্স প্রাচীন উপকথায় বর্ণিত রাজা মিনসের প্রাসাদটার সন্ধান পেলেন। এযুগের একটি বিস্ময়কর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এটি। গ্রীক উপকথায় জানা যায় যে রাজা মিনস ক্রীটে দোর্দণ্ড প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করতেন। সমুদ্রবক্ষে তাঁর ছিল অপ্রতিহত প্রাধান্য। প্রতিযোগিতা মূলক ক্রীড়াদিতে অংশ গ্রহণ করবার জন্যে মিনস্ তাঁর ছেলেকে গ্রীসে পাঠিয়েছিলেন। সুপুরুষ ও বীর রাজপুত্র প্রতিটি খেলায় জয়ী হয়ে গ্রীকদের বিরাগ ভাজন হন। এবং পরে ঈর্ষান্ধ গ্রীকরা তাকে হত্যা করে। এই সংবাদ ক্রীটে পৌঁছানমাত্র পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মিনস্ গ্রীস আক্রমণ করলেন। গ্রীকরা শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল। প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছায় তিনি পরাজিত গ্রীকদের উপর এক চরম শর্ত চাপিয়ে দিলেন। ঠিক হল প্রতি ন'বছর অন্তর গ্রীকরা তাদের সাতজন শ্রেষ্ঠ বীর যুবক ও সাতটি রূপসী তরুণী ক্রীটে পাঠাবে। রাজপ্রাসাদের দুর্গম গোলকধাঁধার আবর্তে মিনোটর নামক যে নরমাংসাসী রাক্ষসকে লুকিয়ে রেখেছিলেন রাজা মিনস্ গ্রীক তরুণ-তরুণীরা তারই বলি হবে। এই ব্যবস্থা বেশ কিছুদিন চলার পর একবার অন্যান্য তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ক্রীটে এলেন রাজপুত্র থীসিয়াস্। মিনসের কন্যা অ্যারিয়াডনি তাকে দেখামাত্র ভালবেসে ফেলেন। এই রাজকন্যার কাছ থেকে থীসিয়াস্ রাক্ষস-বধের জন্য এক তরবারি লাভ করেন। শুধু তাই নয়,

গোলকধাঁধা থেকে ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে একলাছি সুতোও পেলেন—যার এক প্রান্ত ধরা রইল অ্যারিয়াডনির হাতে। বীর থীসিয়াস্ মিনোটরকে হত্যা করে সেই সুতো ধরে যথাসময়ে দুর্গম আবর্তের বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর রাজকন্যাকে বিবাহ করে বিজয়ী বীর আবার ফিরে গেলেন গ্রীসে।

রূপকথার খোলস ছাড়ালে এই উপাখ্যান থেকে দুটি তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত, সুদূর অতীতে একটি সামুদ্রিক শক্তি গ্রীস আক্রমণ করে অ্যাথেন্স বিধ্বস্ত করেছিল। দ্বিতীয়ত মিনস্ ছিলেন নিষ্ঠুর ও নৃশংস প্রকৃতির রাজা। রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষস মিনোটর কি রাজা মিনস্ নিজে নন? এভান্স মাটি খুঁড়ে সমস্ত প্রাসাদটি উদ্ধার করেছিলেন। মোট পাঁচ একর জায়গা জুড়ে এটি দাঁড়িয়েছিল। প্রাসাদের প্রশস্ত অলিন্দ, বিরাট বিরাট প্রকোষ্ঠ ও অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ—রাজা মিনসের ঐশ্বর্য ও বৈভবের পরিচয় বহন করছে। এভান্স অনুমান করেছেন সমগ্র নসাস্ শহরটিতে সম্ভবত লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল।

এভান্সের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার অসংখ্য লিপিমালার সন্ধান। ক্রীটে তিনি যে বিভিন্ন ধরনের লিপি খুঁজে পেয়েছিলেন সেগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথমত ছবি-আঁকা সীল—যার সঙ্গে মিশরীয় চিত্রলেখ বা hieroglyphics-এর নিকট-সম্পর্ক আছে। এগুলির সংখ্যা বেশী নয় এবং এদের পাঠোদ্ধার ও সময় নির্ণয় কোনটাই এখনও সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়ত সাংকেতিক চিহ্নবিশিষ্ট মাটির চৌকো-'ট্যাবলেট', এভান্স যার নাম দিয়েছেন—"লিনীয়ার এ"। সমগ্র দ্বীপেই এগুলি ছড়ান অবস্থায় পাওয়া গেলেও একমাত্র "হেগিয়া ট্রিয়াডা"তেই দেড়শ' ট্যাবলেট এক সঙ্গে এক জায়গায় পাওয়া গেছে। তৃতীয়ত নসাসের রাজপ্রাসাদে এ ধরনের আরও তিন চার হাজার ট্যাবলেট পেয়েছেন এভান্স। এগুলির তিনি নাম দিয়েছেন—"লিনীয়ার বি" এগুলিতে কতগুলি চিত্র-সমষ্টি লক্ষ্য করা যায় এবং স্থানে স্থানে লম্বা দাঁড়ি দিয়ে চিহ্নগুলি ভাগ করা থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে সবসুদ্ধ প্রায় ঊননব্বইটি চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে লিনীয়ার বি লিপিতে। এই প্রধান তিনটি লিপির মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা এবং একটি থেকে অপরটি উদ্ভূত কিনা এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন অভিমত দেওয়া সম্ভব নয়।

সমগ্র ক্রীটে একমাত্র নসাস্-প্রাসাদেই এত অসংখ্য লিনীয়ার বি ট্যাবলেট পাওয়ার ব্যাপারসঙ্গত কারণ থাকতে পারে কিনা পণ্ডিতরা অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের মতে মিনসের প্রাসাদটি একটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিল। অগ্নিকাণ্ডে প্রাসাদটি বিনষ্ট হয়ে যায়—কিন্তু মাটির ঐ চৌকো-ট্যাবলেটগুলি অগ্নিদগ্ধ হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে এবং তিন হাজার বছর ধরে সেগুলি ঐ অবস্থাতেই মাটির তলায় অক্ষতভাবে থেকে যায়। যে অগ্নিকাণ্ড মিনসের সর্বনাশ ডেকে আনল, তাকেই ভাবীকালের ঐতিহাসিক অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দিয়েছেন—কেননা আগুনে না পুড়লে 'লিনীয়ার বি" কখনই টিঁকে থাকত না। যেহেতু এই ট্যাবলেটগুলি সংখ্যায় এত প্রচুর—সেজন্য পণ্ডিতরা বরাবরই এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন পাঠোদ্ধারের আশায়। অপর দুই প্রকার লিপির সংখ্যাল্পতা সাফল্যের সম্ভাবনাকে সুদূর-পরাহত করেছে।

কোন অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধারকালে প্রত্নতাত্ত্বিক তিনটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রথমেই ধরা যাক এমন লিপি যার ভাষা আংশিকভাবে জানা কিন্তু বর্ণমালা অজ্ঞাত। উদাহরণ স্বরূপ 'কিউনিফর্ম" লিপির কথা বলা চলে। জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক Grotefend ১৮০২ সালে যখন কিউনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার করেন তখন দেখা গেল যে এর ভাষা প্রাচীন পারস্য দেশীয় ভাষা যা একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বর্ণমালা এ যাবৎ সম্পূর্ণ অজানা ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এমন লিপি প্রত্নতাত্ত্বিকের হাতে আসে যার বর্ণমালা সহজে চেনা যায় অথচ ভাষা অজ্ঞাত। যেমন ইট্রাস্কান্ লিপি। এর হরফগুলি গ্রীক কিন্তু ভাষা জানা না থাকায় অর্থোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। তৃতীয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিল সমস্যার উদয় হয় সেইখানে যেখানে ভাষা ও বর্ণমালা কোনটাই জানা থাকে না। অজ্ঞাত বর্ণমালা ও ততোধিক দুর্বোধ্য ভাষার গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ব-বিদদের। কিন্তু ঐ একটি লিপির যদি অন্য ভাষায় একাধিক অনুলিপির সন্ধান পাওয়া যায় তো হ'লে হয়ত পাঠোদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে। যেমন রোজেটা স্টোন। নীলনদের বদ্বীপে প্রাপ্ত এই মিশরীয় চিত্রলেখটির সঙ্গে যদি একটি গ্রীক ভাষ্য না থাকত তাহলে মিশরীয় চিত্রলেখ বা hieroglyphics-এর রহস্যোদ্ঘাটন হ'ত কি না সন্দেহ। ক্রীটে লিনীয়ার বি লিপি ও ভারতে মহেঞ্জোদরো লিপি—এই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

ক্রীটে মিনোয়ান বা লিনীয়ার লিপির আবিষ্কারক স্যর আর্থার এভান্স ১৯০৯ সালে তাঁর Scripta Minoa নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। এতে তিনি ক্রীটের চিত্রলেখগুলির পরিচয় দিলেন।
[illegible]

পাইলোস্-এর পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রক্ষিত (বি) টেবলেট

করবে? তাদের কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হয়নি। অর্ধশতাব্দীর স্বপ্ন ও সাধনাকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন মাইকেল ভেণ্ট্রিজ। বালক বীরের বেশে তিনি বিশ্ব জয় করলেন। গভীর সুড়ঙ্গপথের আবর্তে যে বিস্ময় লুকিয়েছিল, "লিনীয়ার বি"র পাঠোদ্ধার করে তিনি তার সন্ধান দিলেন জগৎকে।

১৯৩৬ সালে লণ্ডনে এক সভায় স্যার আর্থার এভান্স মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে এক ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেদিনকার সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন—চোদ্দ বছর বয়স্ক ইস্কুলের ছাত্র মাইকেল ভেণ্ট্রিজ। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে বালক সেদিন প্রত্নতাত্ত্বিকের বক্তৃতা শুনেছিল। প্রাচীন সভ্যতার বিস্মৃত অধ্যায়গুলি তার মনসপটে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছিল। স্বপ্নাবিষ্ট মন নিয়ে সে বাড়ি ফিরল। সেইদিনই তার মনে নিহিত হল এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ। সাত বছর বয়সে শ্লীম্যান যেমন স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বড় হয়ে তিনি ট্রয়নগরী আবিষ্কার করবেন, ভেণ্ট্রিজও তেমনি সংকল্প করেছিলেন বড় হয়ে তিনি মিনোয়ান লিপির রহস্যোদ্ঘাটন করবেন। অতি অল্প বয়সেই প্রত্নতত্ত্ব তাকে আকর্ষণ করেছিল। বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখনই তিনি মিশরীয় লিপি সম্বন্ধে একটি দুরূহ জার্মান বই আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করেন। সুখী ও সচ্ছল এক পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন ভারতীয় সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী—মা ছিলেন বিদুষী মহিলা। মায়ের প্রভাব তাঁর জীবনে বিশেষ করে অনুভূত হয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন শিল্পিসুলভ সূক্ষ্ম রসবোধ এবং সজীব একটি মন। অন্য সব অভিজাতবংশীয় ছেলের মতই তাঁকে গৃহশিক্ষা শেষে পাঠানো হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ডের এক বিদ্যায়তনে। এখানে অবস্থান কালে দুটি ভাষা—ফরাসী ও জার্মান, তিনি ভাল করে শিখে ফেলেন। পরবর্তীকালে পোলিশ ও সুইডিশ ভাষাও তাঁর আয়ত্তে আসে। ইংলণ্ডে ফিরে এক সময়ে তিনি সামান্য গ্রীকও শিখেছিলেন—পরবর্তীকালে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে নিজের এই ক্রটিকে কথা উচ্চারণ করতে শোনা গিয়েছিল। ভাবী যুগের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক-গবেষক কিন্তু কোনদিনই অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে ইতিহাস বা ক্লাসিক্স চর্চায় নিজেকে উৎসর্গ করেন নি। নিয়তি তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্নপথে টেনে নিয়েছিল। জীবনের লক্ষ্য হিসাবে তিনি বেছে নিলেন স্থাপত্য শিল্পকে। লণ্ডনে অবস্থিত স্থাপত্য-চর্চার প্রধান কেন্দ্রে ভর্তি হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং সাময়িকভাবে পড়াশোনা তাকে বন্ধ রাখতে হল। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিমান-বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি দেশরক্ষার কাজে নামলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর সহকর্মী জন চ্যাডুইকও ঠিক এই সময়ে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে দুজনই আবার ফিরে এলেন তাঁদের পূর্বতন কাজে—ভেণ্ট্রিজ স্থাপত্যশিল্প কেন্দ্রে, এবং চ্যাডুইক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৮ সালে সম্মানের সঙ্গে স্থাপত্যের ডিগ্রী নিয়ে পাশ করে বেরোলেন মাইকেল ভেণ্ট্রিজ। কিন্তু যিনি নামকরা স্থপতি হিসাবে বিশ্ববরেণ্য হতে পারতেন, তিনি তাঁর অক্ষয় কীর্তি রেখে গেলেন সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে। যে কৌতূহল বাল্যকাল থেকে তাঁর মনে সঞ্চিত হচ্ছিল, সেই কৌতূহলই তাঁকে টেনে নিয়ে চলল মিনোয়ান লিপির পাঠোদ্ধারের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার পথে। মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে প্রতি বছর যেসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত—তার সব খবরই রাখতেন তিনি। কোন্ পণ্ডিতের কি মত, নূতন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হল কিনা, গবেষকরা নূতন কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছেন কিনা—এ-সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় মিনোয়ান লিপির উপর একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠান। সম্পাদকমণ্ডলীর কেউ এ যাবৎ ভেণ্ট্রিজের নাম শোনেননি, তাঁর বয়স ও পরিচয় কিছুই তাদের জানা নেই—তবু প্রবন্ধে দু-একটি নূতন কথা ছিল বলে এটি ছাপা হল। মাইকেল ভেণ্ট্রিজের বয়স তখন ১৮ এবং প্রবন্ধটি পাঠাবার সময় নিজের বয়সটি তিনি গোপন করেছিলেন। মিনোয়ান লিপির রহস্যোদ্ঘাটনে এটিই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। পরবর্তীকালে ভেণ্ট্রিজ বলেছিলেন যে, প্রবন্ধটিতে তাঁর অপরিণত মনের ছাপ রয়ে গেছে—এবং সব মিলিয়ে এটি তাঁর ছেলেমানুষির এক নিদর্শন। কিন্তু ভেণ্ট্রিজ এই প্রবন্ধে যা বলতে চেয়েছিলেন তা নেহাত অর্বাচীন বলে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তাঁর মতে মিনোয়ান লিপি—মূলত ইট্রাস্কান। ইট্রাস্কানদের সম্বন্ধে একটি মত এই যে, এরা আসলে গ্রীসের অধিবাসী, পরে ইটালীতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। যদি এই ধারণা আংশিকভাবেও সত্য হয়, তা হলে বালক ভেণ্ট্রিজের অনুমানকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা চলে না।

১৯৫০ সালে মাইকেল ভেণ্ট্রিজ একটি বিস্তারিত প্রশ্নমালা তৈরী করেন এবং এটি সবসুদ্ধ বারোজন বিশেষজ্ঞ-পণ্ডিতের কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁদের উত্তর ও মতামত জানার আশায়। ভেণ্ট্রিজের মনে মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে যত প্রশ্ন ও সমস্যার উদয় হয়েছিল সবই এই প্রশ্ন তালিকায় স্থান পেল। দশজন পণ্ডিতের কাছ থেকে উত্তর এসেছিল। এগুলি আবার প্রয়োজনমত অনুবাদ করিয়ে এবং নিজস্ব ব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে বিলি করেন। গবেষণা ক্ষেত্রে ভেণ্ট্রিজ কতখানি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী ছিলেন—এটি তারই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। মিনোয়ান লিপির প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে কি বিরাট মতভেদ ছিল তা এই প্রশ্নোত্তরগুলি থেকে জানা যায়। আমেরিকার ডাঃ অ্যালিস কোবার তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তরে মৃদু তিরস্কার জানিয়েছিলেন ভেণ্ট্রিজকে। তাঁর মতে এ ধরনের প্রশ্ন ও উত্তরের আদান প্রদানে এরকম দুরূহ সমস্যার কোন কূলকিনারা হবে না। শ্রীমতী কোবার একজন অসাধারণ মহিলা—যিনি গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করলেও, ক্লাসিক্স ও প্রত্নতত্ত্বে গবেষণা চালাতেন। তাঁর একটি বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করে ভেণ্ট্রিজ উপকৃত হয়েছিলেন এবং সেটিকে দিয়ে বিবেচনা করলে এই অজ্ঞাত লিপির পাঠোদ্ধারের কাজে তাঁর

দানও নেহাত সামান্য নয়। দুঃখের বিষয়, ১৯৪৩ সালে তাঁর মৃত্যু একটি সম্ভাবনা-পূর্ণ জীবনের উপর যবনিকা টেনে দেয়। ভেন্ট্রিজের এই প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে গত পঞ্চাশ বছর মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে যে গবেষণা হয়েছিল তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া গেল। এই বছরই নিজস্ব মতামতসহ তিনি প্রশ্নোত্তরগুলি একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেন, যার নাম দেওয়া হয় "মিড্-সেঞ্চুরি রিপোর্ট।" "লিনীয়ার বি'র চিহ্নগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাজিয়ে, ধীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা তার মধ্যে কোন ভাষার প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই সময়ে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর অবসর সময় অল্পই ছিল। রিপোর্টের শেষাংশে তাই আক্ষেপ করে তিনি লিখেছিলেন যে, এই দুরূহ গবেষণা কাজে নিজস্বভাবে তাঁর আর কিছুই দেওয়ার নাই—কেননা জীবিকা-র্জনের নিমিত্ত তাঁকে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে—তবে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস তিনি যে পথের সন্ধান পেয়েছেন সে পথে অগ্রসর হলে সফলতা অনিবার্য। কিন্তু মুখে যাই বলুন না কেন, ভেন্ট্রিজ মিনোয়ান লিপির গবেষণা থেকে নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। যিনি একবার পাথরের প্রেমে পড়েছেন তাঁর আর সহজে মুক্তি নেই। সমস্ত কাজকর্ম সেরে তাই ভেন্ট্রিজ ফিরে আসতেন তাঁর নিজস্ব জগৎ—প্রত্নতত্ত্বের যাদুপুরীতে। সেখানে চলত তাঁর অক্লান্ত গবেষণা। যে কাজে তাঁর এত উৎসাহ, এত আনন্দ তাতে তাঁর অবসর কোথায়? দুবছর পর তাঁর কাজের নমুনা পাওয়া গেল ১৭৬ পাতার এক 'ওয়ার্ক নোটস্'-এ। এটিও তিনি নিজস্ব ব্যয়ে ছাপিয়ে সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করলেন। সকলেই জানলেন কিভাবে ধীরে ধীরে ভেন্ট্রিজ এগিয়ে চলেছেন এক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের দিকে। কোন কিছু গোপন করেননি তিনি। ওয়ার্ক নোটস্-এর পাতায় তাঁর ভাল-মন্দ, দোষ-ত্রুটি সবই দেখিয়ে দিলেন। যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর দৃঢ় মতামতের মধ্যে কাল্পনিক বা মনগড়া কোন তথ্যের স্থান ছিল না। এভান্স মিনোয়ান লিপি সম্বন্ধে রায় দিয়েছিলেন, এগুলি গ্রীক সম্পর্কশূন্য এবং তাঁর মতই এতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এতদিন পর এভান্সের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভেন্ট্রিজ প্রমাণ করলেন "লিনীয়ার বি'র ভাষা গ্রীক্—যদিও তার ধরনটি খুবই প্রাচীন। ক্রমশই ভেন্ট্রিজ একটি বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন—সেটি হচ্ছে, প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও উপভাষাদি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা। এখন থেকে তিনি গ্রীক ভাষাবিদ্ একজন পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞের সাহায্যের উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। এ-বিষয়ে স্যার্ জন্ মায়ার্স তাঁকে সাহায্য

(ক) (খ)

মিনোয়ান লিপির প্রধান দুই নিদর্শন—(ক) "লিনীয়ার এ"—যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। (খ) "লিনীয়ার বি"—ভেণ্ট্রিজ যার রহস্য ভেদ করেছেন

করতে এগিয়ে এলেন। কেম্ব্রিজের এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি ভেণ্ট্রিজের পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। ইনি ক্লাসিক্সে সুপণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কিছুকাল পূর্বে Oxford Latin Dictionary সম্পাদনা কাজে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি কেম্ব্রিজে ক্লাসিকাল ফিললজিতে রীডার নিযুক্ত হন। জ্ঞানবৃদ্ধ মায়ার্সের প্রচেষ্টায় দুটি নবীন প্রাণ মিলিত হল এক কঠিন সাধনায়। শুরু হল, ভেণ্ট্রিজ-চ্যাডুইক-এর বিস্ময়কর সহযোগিতা বা যৌথ-তপস্যা যার ফলে তিন হাজার বছরের সুষুপ্তি কাটিয়ে মিনোয়ান লিপি সরবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল—সুস্পষ্ট গ্রীক ভাষায়। ভেণ্ট্রিজ ও চ্যাডুইক মিনোয়ান লিপির গ্রীক উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেন সেগুলি তাদের এক নিবন্ধে প্রকাশিত হল। এর নাম দেওয়া হয়েছে "এভিডেন্স।" কিন্তু সাফল্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না—বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি পাওয়াও সহজ হয়নি। ইংলণ্ড ও সুইডেনে কিছু সংখ্যক প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁদের মতকে স্বীকার করে নিলেও, প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা যাঁরা করেছিলেন, এমন লোকের সংখ্যাও নগণ্য নয়।

কিন্তু পরের বছর ১৯৫৩ সালে আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক কার্ল ব্লেগেনের আবিষ্কার সব সন্দেহের নিরসন করল। ১৯৩৯ সালে ইনি মাইকেনীর অন্তর্গত পাইলসে খননকার্য চালিয়ে প্রায় ৬০০ লিনীয়ার বি ট্যাবলেটের সন্ধান পান। যুদ্ধের মধ্যে কাজ বন্ধ ছিল। যুদ্ধ শেষে আবার তিনি খনন কাজ শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি আরও ৩০০ ট্যাবলেট আবিষ্কার করেন। এগুলির মধ্যে এমন একটি নিদর্শন ছিল যেটি ভেণ্ট্রিজ পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি নিজেই পড়ে ফেলতে পারলেন। লিনীয়ার বির রহস্য ভেদ হয়েছে—এ সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। উল্লসিতচিত্তে তিনি ভেণ্ট্রিজ ও চ্যাডুইককে অভিনন্দন জানালেন। এবার অবিশ্বাসীর দলকে হার মানতে হল। খ্যাতির দরজা খুলে গেল সেই সঙ্গে সৌভাগ্যেরও। যদিও এখনও কেউ কেউ বললেন যে, পাইলসের ট্যাবলেটগুলি আসলে গ্রীসের নিজস্ব সম্পদ নয়—এগুলি ক্রীট থেকে লুট করে আনা হয়েছিল কোন সময়ে। কিন্তু গ্রীসের কোন আক্রমণকারী কতকগুলি চৌকো-মাটির ট্যাবলেট কেন ক্রীট থেকে লুট করে আনবে—এবং কি তাদের লাভ হবে—তার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল না। তাই সেই মতও পরিত্যক্ত হয়েছে। স্বদেশে বিদেশে বহুস্থানে বিদ্বৎমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়ে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তরুণ গবেষকদ্বয়। ২৪শে জুন ১৯৫৩ সালে ভেণ্ট্রিজ লণ্ডনে তাঁর ভাষণ দেন। পরের দিন "টাইমস" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হল। ঠিক ঐদিনই এভারেস্ট বিজয় সম্বন্ধে একটি খবর সংবাদপত্রের অপর স্তম্ভে ছাপা হয়েছিল। একই পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুই শীর্ষে দুটি আবিষ্কার কাহিনী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হয়ত এমন নাটকীয়ভাবে সংবাদ দুটি পরিবেশন করার মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ ছিল না। তবু দেখা গেল, কিছুকালের মধ্যে সাংবাদিকরা লিনীয়ার বি-র পাঠোদ্ধারের কাহিনীকে "The Everest of Greek archaeology" বলে বর্ণনা করছেন।

প্রাচীন গ্রীক কবি গেয়েছেন—ঈশ্বর যাদের ভালবাসেন তাদের তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর স্নেহময় কোলে টেনে নেন। ভেণ্ট্রিজ সম্বন্ধে একথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রে তিনি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। লণ্ডনের অদূরে হ্যাটফিল্ডের কাছে তাঁর গাড়ির সঙ্গে এক লরির সংঘর্ষ লাগে এবং এই দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌত্রিশ বছর। গত শতাব্দীতে ঠিক এই বয়সেই দেহাবসান ঘটেছিল আর একজন পৃথিবী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের—তাঁর নাম শাঁপলিয়ঁ—যিনি মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করে অমর কীর্তি রেখে গেছেন।

জন চ্যাডুইক* তাঁর স্বর্গত বন্ধুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন যে, ভেণ্ট্রিজের দুটি গুণ তাকে মুগ্ধ করেছিল। একটি হচ্ছে তাঁর অসাধারণ ধী-শক্তি। তাঁর মন এত দ্রুত কাজ করে যেত যে, তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তার নিজের পক্ষে সহজ হত না সব সময়ে। গবেষণা কাজে লক্ষ্য করা গেছে যে কোন একটি নূতন সূত্র বা সম্ভাবনার ইঙ্গিত এই প্রত্নগবেষকের কাছে উপস্থাপিত হলেই তড়িৎগতিতে তাঁর মন কাজ করে চলত এবং অতি অল্প সময়ে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব দিক বিবেচনা করে প্রশ্নের সমাধানেও তিনি পৌঁছাতে পারতেন। ভেণ্ট্রিজের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর সুশৃঙ্খল মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি যা অসংখ্য এলোমেলো ঘটনা ও হাজার হাজার সাংকেতিক চিহ্নের অরণ্যে পথ না হারিয়ে একটা প্যাটার্ন খুঁজে পেত। স্থাপত্যচর্চায় তিনি সম্ভবত এই শক্তি পুরোমাত্রায় অর্জন করেছিলেন এবং সেই শক্তিই তাঁকে লিনীয়ার বির রহস্যোদ্ঘাটনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। স্থপতির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সৌধের বহিরাবরণ বা আলংকারিক সৌষ্ঠবে নিবদ্ধ না থেকে তার মূল কাঠামো বা ভিত্তি-প্রস্তর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

এই আবিষ্কারের গুরুত্ব কতখানি এখনও তা নির্ণয়ের সময় আসেনি। লিনীয়ার বির মধ্যে কোন মহৎসাহিত্য বা শিল্পকর্মের প্রেরণা নাই। যারা ভেবেছিলেন এই আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের কোন বিলুপ্ত কীর্তির সন্ধান পাওয়া যাবে, তারা নিরাশ হয়েছেন। এই ট্যাবলেটগুলিতে মানুষের নিত্যব্যবহার্য কতগুলি অতি-সাধারণ দ্রব্যোপকরণের তালিকামাত্র পাওয়া গেছে। এগুলি থেকে প্রাচীন গ্রীসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। তবে এই আবিষ্কারকে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী আখ্যা দেওয়া যায়, এই কারণে যে হোমারের সাত শ' বছর পূর্বে গ্রীসে যে ভাষায় কথা বলা হত তার একটা রূপ আমরা জেনেছি। আজ পর্যন্ত অতি প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও উপভাষার নিদর্শন যতগুলি আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে লিনীয়ার বি-র লিপিমালা প্রাচীনতম।

---

* John Chadwick : The decipherment of Linear B.)cambridge, 1958)

প্রমথনাথ বিশী * লালকেল্লা *

॥ ১ ॥

মাধবীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা

জীবনলাল যখন তুলসীর বাসায় এসে উপস্থিত হল তখন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার মুখে। সে দোতালায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা বন্ধ। দু'তিনবার ধাক্কা দিয়ে দরজা যখন খুললো না তখন মুমোলীর নাম ধরে ডাকলো। এবারে দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল তুলসী।

একি আপনি!

হাঁ, আমিই। বাকিরা কোথায়?

মুমোলীদি বেরিয়েছেন।

সন্ধ্যা হওয়ার মুখে!

না, সকাল বেলা থেকেই বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেননি।

এমন কি প্রত্যেক দিন হয়?

না আজকে বিশেষ কারণ আছে।

কি হয়েছে খুলে বলো।

তুলসী বলে, কিছু মনে করো না, তোমাকে তুমি বলেই বলি।

আপনি মুমোলীদির ভাই, আমি তার চেয়ে বয়সে অনেক কম, আমাকে আপনি বললে যে হাসি পেতো।

ওঃ, ভালো যে, রাগ করোনি। কি হয়েছে ব্যাপার বলো তো।

এলিয়ন বিবিকে পাওয়া যাচ্ছে না।

চমকে উঠে জীবনলাল, বলে, কখন থেকে?

তুলসী বলে কাল।

ভোরবেলা উঠে দেখা গেল যে, তার বিছানা খালি। প্রথমে সন্দেহ হল। এলিয়ন বিবি তো কখনো গাড়ির বাইরে যায় না। তবে কোথায় গেল? কিছুক্ষণ পরে সব সন্দেহ নিরসন করে বালিশের তলা থেকে চিঠি বের হল। তার নিজ হাতে লেখা। লিখেছে আমার দেশের লোক কাছে এসে পড়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নিশ্চয় তারা দিল্লী দখল করবে। তাদের কাছে আমার কলঙ্কিত মুখ দেখাতে পারবো না। চললাম। আমাকে সন্ধান করো না। করলেও পাবে না। তোমার সেবা ও ভালোবাসার ঋণ আমার জীবনের শেষ সম্বল। ধন্যবাদ দিয়ে তাকে লঘু করতে চাই না। তোমার হতভাগ্য বোন এলিয়ন বিবি।

জীবন বলে, তোমার যে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

হবে না! সকাল থেকে অন্ততঃ পঞ্চাশবার পড়েছি।

চিঠিখানা কোথায়?

মুমোলীদি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে।

পুরাতন অভ্যাস বশে জীবন বলে ওঠে, কোতোয়ালীতে বুঝি?

তারপরে সেটা অসম্ভব বুঝে সংশোধন করে নেয় বলে, না তা তো সম্ভব নয়।

তুলসী বলে যমুনার দিকে গিয়েছে মুমোলীদিরা।

আর কে?

মুমোলীদি, পল্টন আর তার দলবল। তাদের সকলেরই ধারণা এলিয়ন বিবি যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছে।

জীবনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, অসম্ভব নয়। যমুনা তো এই জন্যেই আছে সেই অনাদি কাল থেকে।

তারপরে ভাবে কাল সন্ধ্যায় হাবিলদারের হাতে গ্রেপ্তার না হলে হয়তো বাঁচাতে পারতো মিস এলিয়নকে। তখনি মনে হয়, না, তাতেও রক্ষা করা সম্ভব হতো না তাকে। কলঙ্কিত জীবন নিয়ে কিছুতেই উপস্থিত হতো না সে দেশের লোকের সম্মুখে। কলঙ্কের কালো যমুনায় কালোয় ডুবিয়ে দিয়েছে সে। এমন অনেক কলঙ্কের কালিমা গ্রাস করেই যমুনা কালো।

যখন সে চিন্তা করছিল তুলসী ভিতরে চলে গিয়েছিল এবারে খাবার কয়েকটা পেড়া আর কিছু দই নিয়ে এসে বলল, অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি নিশ্চয়, খেয়ে নিন।

জীবন বলে, খাওয়া হয়েছে বইকি। একেবারে রাজভোগ।

সে আবার কি রকম।

সে কথা না হয় পরে শুনো।

তবে এখন খেয়ে নিন।

জীবন খেতে খেতে বলে এ যে হচ্ছে ঘণ্টেওয়ালার দোকানের মিঠাই।

ঠিক ধরেছেন। কাল বাবা এসেছিলেন, নিয়ে এসেছেন।

তিনি প্রায়ই আসেন বুঝি?

মাঝে মাঝেই।

নিয়ে যেতে চান না?

খুব বেশি আগ্রহ করেন না। বলেন, গদর মিটে যাক। মুমোলীদিও আপত্তি করেন। সবচেয়ে বেশি আপত্তি পল্টনের।

সে আবার আপত্তি করে কেন?

সে বলে একবার তোমাকে লুঠে নিয়ে

কেন?

রক্ষকের বীরত্ব না জেনেই বেতন দেওয়া বাজে খরচ নয়? এই নিন খেয়ে ফেলুন।

আর গোটাকয়েক পেড়া পড়ে জীবনের পাতে।

রক্ষকের বীরত্ব সম্বন্ধে বোধ করি নিঃসন্দেহ হয়েছ?

মারামারির সময়ে কাজে লাগবে ভেবেই লোকে তেল মাখায় লাঠিতে।

তবে বাধুক লাঠালাঠি তখন না হয় পরীক্ষা হবে। কিন্তু ভাবছি এমন সৈরিন্ধ্রী সেজে আর কতকাল থাকবে?

অজ্ঞাতবাসের পর্ব শেষ না হওয়া অবধি।

তুলসী, এমন কথা বলা শিখলে কি করে?

হাঁস সাঁতার শেখে কেমন করে? জন্ম থেকেই। বাবা আমাকে ছেলেবেলায় ডাকতেন হরবোলা বলে।

এখন বুঝি বড়ো হয়ে পড়েছ?

আপনার বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে তাই মনে হচ্ছে।

দুজনের মনের মধ্যে যখন আলোড়িত হচ্ছে অগ্নিগর্ভ বাণী তখন মুখে যত সব তুচ্ছ কথা। আগ্নেয়গিরির শিখরে নামগোত্রহীন ফুল। দুজনেই ভাবে মনের কথা মুখে বলা যায় না কেন? আর বললেও তা এমন অকিঞ্চিৎকর শোনায় কেন? আকাশভরা যে বাষ্প ইন্দ্রধনু রচনা করে কেন তার পরিণাম এক বিন্দু শিশিরকণা? তাদের বাণীদের হংসমিথুন। গগন বিহার ছেড়ে মাটিতে নেমে এসে কতই না অসহায় তারা।

জীবনের খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় রুমালী আর পল্টন ফিরে এলো। জীবন তখন মুখ ধুচ্ছিল রুমালী বলল জীওন ভাই কখন এলে?

তারপরেই কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, আতিথ্যেরও অভাব হয়নি দেখছি।

কেন হবে, তুমি তো শামুকের মতো বাড়িটা পিঠে বয়ে নিয়ে যাওনি, বলে জীবন।

তারপরেই আসল প্রসঙ্গে আসে, শুধায় এলোকেশী বিবির সন্ধান মিলল?

রুমালী বুঝল, সকল কথাই শুনেছে তুলসীর কাছে, তখন সে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে ভেঙে বসে পড়তে পড়তে বলল, সন্ধান পাওয়ার আর কি আছে! যা হওয়ার তাই হয়েছে।

ভালো করে খুঁজেছিলে? শুধায় জীবন। এবারে পল্টন উত্তর দেয়—খুঁজতে বাকি রাখিনি জীওন ভাই। উত্তরে তোপখানা দক্ষিণে খয়রাতি দরবাজা পর্যন্ত চষে ফেলেছি।

কারো চোখে পড়োনি?

চোখে পড়লে কি আর রক্ষা ছিল, ফিরিঙ্গি মেরে যে।

রুমালী বলে, আমার বিশ্বাস সেই ভয়েই ভোর রাতে অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ এমন করতে গেল কেন?

খুব হঠাৎ নয়রে জীওন, তুমি আসবার আগেও মাঝে মাঝে বলতো বাঁচবার ইচ্ছা নাই। তারপরে তুমি এলে বুঝলো যে তার দেশের লোকে তার সন্ধান পেয়েছে এবারে হয়তো আত্মীয়স্বজনে পারে।

তুলসী বলে ওঠে, তাই বলে মরতে যাবে। মরাটাকে এত কঠিন ভাবো কেন তুলসী? কঠিন নয়? কী যে বলো রুমালীদি।

কঠিন ভেবে ভেবেই লোকে কঠিন করে তুলেছে। প্রতিদিন সকালে উঠে যদি লোকে ভাবে যে আজ মরতে হবে তবে দেখো মরাটা সহজ হয়ে আসবে।

প্রসঙ্গ পাল্টে তুলসী বলে, ও দিদি এখন হাত মুখ ধোও। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি তোমাদের।

সে রাতে বাড়িতে আর হাঁড়ি চড়লো না। পল্টন গিয়ে ঘাতেওয়ালার দোকান থেকে কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে এলো তাই খেয়ে চারজনে শুয়ে পড়ল।

শোওয়ার আগে জীবন বলল, কাল ফিরে গিয়ে কি বলবো তাই ভাবছি।

রুমালী বলল, কালকের দিনটা থেকে যাও পরশু যেও।

দেখা যাক বলে জীবন শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে স্থির করলো যে আমুবকর সম্পর্কিত ঘটনা এদের কাছে প্রকাশ করবে না, এমনিতেই এদের জীবন জটিল তার উপরে আর নূতন সমস্যার ভার চাপানো উচিত হবে না ভেবেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো সে।

তুলসী ঘুমিয়ে পড়েছিল তারপরে মাঝরাতে জেগে উঠতেই আজ দিনের বেলাকার নিজের আচরণে সে বিস্মিত হয়ে গেল। সে ভেবে পায় না জীবনলালকে দেখলে, জীবনলালের কথা শুনতে পেলে এমন কি তার বিষয় চিন্তা করলে তার মনে এমন অদ্ভুত একটা ভাবের উদয় হয় কেন? আর শুধুই কি মনে, দেহেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। সে ভেবে পায় না ব্যাপারটা কি, আর কেন? এই কমাস দুর্ভাগ্যের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা পেয়েছে সে। ফুলকি মণ্ডীর এই সেদিনকার ছোট্ট মেয়েটি, এক দমকায় বেড়ে উঠেছে। আগে যে মেয়েটি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কখনো কথা বলেনি বললে অন্যায় হয় না, দুঃসময়ের বাদশার সিপাহীদের হুকুম করে কথা বলেছে সে, দুদুজন শাহাজাদাকে কথার ধারে ঘায়েল করে মুক্তি আদায় করে নিয়েছে সে, ইমানী বেগমের বাড়ি থেকে যাওয়ার সময়ে আক্রান্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়নি,

কম শিক্ষা তো হয়নি তার আর সেই অনুপাতে সাহসটাও কিনা গিয়েছে বেড়ে। সে এখন আর আগের সেই খুকীটি নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই লোকটির সম্মুখে পড়লে হঠাৎ এমন জড় বস্তুতে পরিণত হয়ে যায় কেন সে? ছিঃ ছিঃ জীবনলাল না জানি কি ভাবে? হয়তো খুকী ভাবে, হয়তো বোকা ভাবে, হয়তো একটা মূর্খ গাঁওয়ার মেয়ে ভাবে! কি করে সে নিজের পরিচয় দেবে! সে যে লেখাপড়া জানে, গান করতে পারে, নাচতে পারে, এমন কি উল বুনতে পারে, সূঁচ সুতো দিয়ে নক্শা তুলতে পারে, দাদার আপত্তি সত্ত্বেও লেসের কাজ দুটো শিখেছিল মিস মার্টিন ডেল নামে এক পাদ্রীবুড়ীর কাছে। এত সব জানা সত্ত্বেও কিছুই কাজে আসে না। জীবনলালকে দেখলেই তার পা ভারি হয়ে ওঠে, চোখ নত হয়ে পড়ে, গলার স্বর বসে যায় আর বুকের ভিতরই অবাধ্য হৃৎপিণ্ডটা মাথা কুটতে শুরু করে দেয়। তবু যখন দূরত্বে আলাদা থাকে তখন একরকম চলে। নানারকম প্রশ্নোত্তরের টুকরো পাথর দিয়ে প্রাচীর তুলে নিজেকে আড়াল করা যায় কিন্তু ভদ্রলোক উপস্থিত হলেই অসহায় হয়ে পড়ে। তখন বৌরাণীর কেমন চাপা কথা বলে মন হাসি ঠাট্টা উত্তর প্রত্যুত্তরের ফিনকি ছোটে আর সে কিনা জড়সড় দাঁড়িয়ে থাকে। কেন এমন হয় বুঝতে পারে না সে।

তুলসী তার সন্ন্যাসীদাকে তো অনায়াসে পেরেছে কিছু কষ্ট তার কাছে থাকলে তো এমন বৈকল্য উপস্থিত হয় না তখন। কাউকে না জানিয়ে অসংকোচে চলে গিয়েছিল সন্ন্যাসীর সাথে সে। জীবনলালও অনাত্মীয়—তবে দুয়ে এমন প্রভেদ ঘটল কেন? এখন যদি জীবনলাল প্রস্তাব করে সে, চলো তুলসী, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি—তবে কি তার সাথে যেতে পারে সে। না কিছুতেই সম্ভব নয়। যদিচ সেদিন রাতে লোকের মতো এইরকম একটা প্রস্তাব নিজেই করে বসেছিল। না, কিছুতেই যেতে পারবে না সে এমনকি বৌরাণী হুকুম করলেও না।

কিন্তু বৌরাণীর সে কী! কেবলই মাঝখানে এসে পড়ে দুই সংখ্যাকে তিনে পরিণত করে। কেমন যেন স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। আড়ালে গেলে দেখতে ইচ্ছা করে, সম্মুখে এলে পালাতে পথ পায় না, পালালে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয়। ফিরে এলেই মনে হয়, পালাই পালাই, চোখে চোখে পড়লেই অবাধ্য চক্ষুতারকা অন্যমনস্কতার ভান করে। সে জানে ভাগ্যে কান ছিল, তার ভান করতে হয় না, উৎকর্ণ হয়ে থাকলেও বুঝতে পারে না অপরে। জীবনলাল যেন তপ্ত মানিক, হাতে ধরে রাখা কঠিন, ফেলে দেওয়া আরও কঠিন। কেবলি এ হাত ও হাত করতে হয়।

এ কি অস্বস্তি, এ কি আরাম! এ কি জ্বালা, এ কি মাধুর্য! ঘুম আসে না।

এমন সময়ে শুনতে পায় কোন্ নিদ্রিতের নিয়মিত নিঃশ্বাসের ছন্দ! কার? না, পল্টন তো সন্ধ্যাবেলাতেই চলে গিয়েছে। রমালীদির? না, তার চারপায়া তো বাঁদিকে। ও শব্দ ডানদিকে, আর আসছে পাশের ঘর থেকে। আর সন্দেহ থাকে না। দীর্ঘ লয়ে উচ্ছ্বসিত নিয়মিত নিঃশ্বাস প্রমাণ করে সুখসুপ্তির আরাম। তখনি তার মনে হয় লোকটা তো ভারি স্বার্থপর। যার কথা ভেবে তার ঘুম নেই সে কিনা আরামে ঘুমোচ্ছে। এতটুকু লজ্জা নেই, বিবেচনা নেই লোকটার। না, এমন করে নির্বিঘ্নে কিছুতেই তাকে ঘুমোতে দেওয়া যেতে পারে না। আচ্ছা, চুপি চুপি উঠে গিয়ে চারপায়ায় ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কেমন হয়। আচমকা জেগে হাউমাউ করে চীৎকার করে উঠবে। সে ভারি মজা হবে। ভাবতেই তার হাসি পায়। রমালীদি আবার না জানতে পায়। না সে খুব ঘুমোচ্ছে।

তখন তুলসী ধীরে ধীরে চারপায়ার উপরে উঠে বসে। কোথাও জাগরণের এতটুকু লক্ষণ নেই। চমৎকার সে পা টিপে টিপে এগোয় জীবনের ঘরের দিকে। ঢোকে জীবনের ঘরে। তৎপরে সজোরে চারপায়ায় দেয় গোটা দুই ঝাঁকুনি। তুলসী পালিয়ে আসবে ভেবেছিল এবং ও হয়েছিল কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল। জীবন লাফিয়ে উঠে চোর চোর চীৎকার করে তুলসীকে সজোরে জাপটে ধরলে।

চোর চোর।

চীৎকার শুনে জেগে উঠল রমালী। ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারলো না কোথা থেকে আসছে চোর চোর আওয়াজ, দরজা খুলে বাইরে গিয়ে চীৎকার করে উঠল চোর চোর। নীচের তলার মহল্লার বাসিন্দা মুসলমানেরা রমালীর গলা শুনে চোর চোর রব করতে করতে উপরে উঠে এল।

কোথায় চোর, বহিন।

কি জানি কোথায়?

বাইরের দরজা বন্ধ কাজেই ভিতরেই হবে। সকলে এক সঙ্গে ঢুকে পড়ে। হঠাৎ এতগুলো লোক এক সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়ায় হকচকিয়ে গেল জীবন। সেই সুযোগে তার বাহুপাশ মুক্ত হয়ে তুলসী এসে শুয়ে পড়লো বিছানায়। এত কাণ্ড ঘটে গেল এক নিমেষে।

কোথায় চোর পরস্পরকে সবাই শুধায়। কেউ কেউ চোরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে।

জীবন বলে ওঠে, না, না, চোর নিশ্চয়। আমার চারপায়া নাড়া দিয়েছিল। মতলব ভালো ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম।

তবে গেল কোথায়?

জীবন ব্যাখ্যা দেয়, তোমরা সবাই এক সঙ্গে ঢুকতেই হকচকিয়ে গিয়েছি সেই সুযোগে আলগা পেয়ে পালিয়েছে।

কি হয়েছে রমালীদি, ঘুমভাঙা কণ্ঠে শুধায় তুলসী।

ধনী মেয়ের ঘুম! পাড়া জেগে গেল আওয়াজে আর এতক্ষণে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কি হয়েছে রমালীদি।

তবুতো বললে না, কি হয়েছে?

কি আর হবে। চোর এসেছিল।

চোর আসবে যাবে কেন?

তবে তোমার বর এসেছিল। হল তো।

কি আছে যে, সেই লোভে চোর আসবে।

সেইজন্যই তো বললাম তোমার বর এসেছিল তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার মতলবে।

একজন বলে ওঠে, ভাগ্যে জীবনলালজী ছিল নইলে কী হতো কে জানে।

ইতিমধ্যে বাতি জ্বালা হয়েছে। না, চোর কোথাও নেই। তুলসী বালিশে মুখ গুঁজে হাসির দমকে দুলে ওঠে। শব্দ শুনে রমালী ভাবে সে কাঁদছে হয়তো চোরের ভয় নয় তো? এইমাত্র যে ঠাট্টা করলে তাইতেই হলো।

সান্ত্বনা দিয়ে রমালী বলে ওঠে, ভয় নাই ভয় নাই। চোর এসে থাকলেও পালিয়েছে। আর এলেই বা কি, এতগুলো লোক আছে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে তুলসী বলে নিশ্চয়ই ঘরেও লুকিয়ে আছে ভালো করে দেখো।

আর একবার ভালো করে দেখা হয়। না, কেউ ও নেই।

কিছু কি নিয়েছে?

কিছু নিয়েছে বলে তো মনে হয় না।

মহল্লার বাসিন্দারা চলে যায়। ওরা দু'জন দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ে।

জীবন বলে, রমালী চোরটা নিতান্তই ছেলেমানুষ।

কি করে বুঝলে?

বুকে চেপে ধরেছিলাম কিনা, এখনো গোঁফদাড়ি ওঠেনি।

তুলসী বলে, সেটাও কি পরীক্ষা করেছিলেন নাকি?

তার ঠাট্টা কেউ ধরতে পারে না। রমালী বলে তোমার কথা সত্য হতে পারে। শুনেছি ছোট ছোট ছেলেদের আগে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় চোরের দল।

তাই বলো, বলে ওঠে জীবন।

তুলসী বলে, দিদি, আমি শুনেছি যে, চোরের দল অনেক সময়ে আগে মেয়ে-ছেলেকে ঢুকিয়ে দেয়।

অসম্ভব নয় তুলসীদিদি বলে জীবন। বলে, বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিলাম কেমন নরম ঠেকলো।

ওঃ নানাভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছেন দেখছি। মনে হচ্ছে আপনি খুব হুঁশিয়ার পাহারাওয়ালা।

এতে আবার পরীক্ষা করার কি আছে। একটা লোককে বুকে জড়িয়ে ধরলে বোঝা যাবে না।

বুকে জড়িয়ে ধরেই বুঝতে পারেন চোর কি সাধু।

তুলসী অন্য ঘরে গিয়ে বসলো জানলার ধারে। সেখানে এক টুকরো আলো তির্যক-ভাবে এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে অশথ গাছের পাতার আগায় আগায় দুলছে আলোর বিন্দু। সমস্ত অশথ গাছটা যেন এই মাত্র ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, এখনো আড়মোড়া ভেঙে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে তার কাণ্ড আর ডালপালা। হাজার হাজার পাতায় কাঁপন লেগে শিরশির ঝির ঝির বর উঠছে। ছবি ভালো লাগলো তার। এমন-ভাবে প্রকৃতির দিকে কখনো তাকায়নি সে, মুগ্ধ হয়ে সে বসে রইলো। এই অশথ গাছটা কত বার না সে দেখেছে, কই কখনো তো এমন সুন্দর মনে হয়নি।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো কুলুঙ্গির উপরে একখানা আয়নার দিকে, কি ভেবে তুলে নিয়ে তাকালো আয়নার মধ্যে আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে পুলকে কৌতূহলে চমকে উঠল। কে এই নারী? আশ্চর্য সুন্দরী তো। কাচের সরোবরে যেন পদ্ম ফুটেছে। অবাক হয়ে যায় তুলসী। কতবার এই আয়নাখানা সামনে ধরেই সে মুখ দেখেছে, চুল বেঁধেছে, চলনসই রকম সুন্দরী বলে তার ধারণা ছিল। কিন্তু এ যে আলাদা। আজ যেন আকাশের সব আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপরে, আলো চোখে দেখা যায় না, মনের মধ্যে যার ঝরণা সেই আলোটিও যেন মিশ্রিত হয়েছে আকাশের ঐ আলোর সঙ্গে। তার চোখের পলক পড়তে চায় না। তখনি মনে হল এমন করে আগে কখনো তাকায়নি নিজের দিকে, যেমন আগে তাকায়নি এমন করে অশথ গাছটার দিকে। আয়না হাতে করে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকে সে।

তুলসী নিতান্ত অবোধ না হলে বুঝতে পারতো মাঝে মাঝে দুর্লভ অমৃতযোগ আসে মানুষের জীবনে, তখনি সৌন্দর্যের আরোপ হয়ে বস্তু হয়ে ওঠে সুন্দর। চার চোখের দেখা সেই অমৃতযোগ। দু চোখের দেখায় পৃথিবী নশ্বর, চার চোখে দেখায় সুন্দর। তুলসী জানে না যে তার চোখের সঙ্গে [illegible] [illegible] তার মুখের দিকে

[illegible] কিন্তু [illegible] তাকালো [illegible]। সমস্ত দিন ঐ [illegible] আয়নার তাকানোর অকারণ [illegible] ভিতরে খোঁচাতে লাগলো। বিকেল বেলায় [illegible] আয়নাখানা [illegible] দেখলো সেখানা শত খণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

তুলসী চমকে ওঠে, [illegible] কি করে? একটা [illegible] কিন্তু এমন টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গলে কেন?

[illegible] আয়নাখানা ভাঙলো কে?

কেমন করে জানবো? [illegible] চোখের সামনে ধড়ফড়িয়ে [illegible] হয়ে গেছে।

কথাগুলো বলবার সময়ে [illegible] মুখে [illegible] হাসি ফুটে ওঠে। তুলসী দেখতে পায় না, [illegible]।

[illegible] কি করে হবে। আজ সকাল-বেলায় যে আমি মুখ দেখেছি।

হঠাৎ এত মুখ দেখবার ধুম পড়লো কেন রে?

[illegible] আঁচড়াতে হবে না?

তার জন্যে তো কাঁকইখানাই যথেষ্ট। আয়নায় কি হবে?

কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না তুলসী, চুপ করে থাকে। তারপরে খুঁটে খুঁটে কুড়োতে থাকে ভাঙা টুকরোগুলো।

কি করছ তুলসী, বলে ঘরে ঢোকে মুন্নালী।

মালা সিন্‌হার সৌন্দর্য্যের গোপন কথা

'লাক্স আমার ত্বক আরও রূপময় ক'রে তোলে'

— উনি বলেন

সুন্দরী মালা সিনহা বলেন: লাক্স দিয়েই আমার দৈনন্দিন রূপচর্চা শুরু করি। লাক্সের বিশুদ্ধ নরম ফেনা আমি ভালবাসি. আপনার ও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে। সুগন্ধি লাক্স আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক।

লাক্স টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের প্রিয় বিশুদ্ধ, কোমল সৌন্দর্য্যসাবান

সাদা ও রামধনুর চারটি রঙে

LTS. 145-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

টোকিওর ভিতরের কথা কিছু কিছু বলেছি, শহর সম্বন্ধে অল্প কিছু বলেছিলাম, আজ আবার টোকিও শহর সম্বন্ধে আরও কিছু বলি। পৃথিবীর এই বৃহত্তম শহরের কথা কি আর একদিনে শেষ হয়? জনসংখ্যার দিক দিয়েও এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সে কথাও আগে বলেছি। এর বর্তমান জনসংখ্যা এক কোটি পঁচিশ হাজারেরও বেশী আর সাম্প্রতিক একটি হিসাব অনুযায়ী এই লোকসংখ্যা নাকি গড়ে ৩৬৫টি করে প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। এ ছাড়াও আছে ভাসমান জনতা অর্থাৎ যারা প্রতিদিন নানা কাজে টোকিওর বাইরে থেকে যাতায়াত করে তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। সরকার ও পৌরসভার এটি একটি বেশ বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধের আগের টোকিও শহর এত বড় ছিল না, এর আকর্ষণও এত বেশী ছিল না। কিন্তু জাপানী জাতের একটা ঝোঁক যে, তার দেশ পৃথিবীর মধ্যে ইচিবান্ অর্থাৎ পয়লা নম্বর হবে, সবদিক দিয়ে, আর এই ঝোঁকটা আরও বেড়েছে গত যুদ্ধের পর থেকে। যখন থেকে জাপান তার শিল্প বাণিজ্য সবকিছুর একটা প্রচণ্ড উন্নতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এবং ফলে, টাইফুন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া ও স্থানাভাব ইত্যাদি নানা অসুবিধার বিরুদ্ধে আগেকার টোকিও শহর তার আশেপাশের গ্রাম ও শহরগুলিকেও বৃহত্তর টোকিওর আওতায় নিয়ে এসে পৃথিবীর বৃহত্তম শহরে দাঁড় করিয়েছে। পৃথিবীর উচ্চতম টাওয়ার, টোকিও টাওয়ারও এই টোকিওর বুকেই অবস্থিত। এর সবচেয়ে উপরের চূড়াটাকে খুব উঁচু করার ফলেই নাকি এটি প্যারিসের ইফেল টাওয়ার এর উচ্চতার রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। এটি টেলিভিশন প্রেরণ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, দুই কাজই করে।

প্রাক্‌যুদ্ধ কালে টোকিও শহর, সরকারী কাজেরই কেন্দ্রস্থল ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল টোকিও থেকে বেশ কিছু দূরে, ওসাকায়। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সংস্থারই হেড-কোয়ার্টার্স টোকিওতে স্থানান্তরিত হয়েছে, তার ফলে টোকিও শুধু সরকারী নয় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থলও হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই আকর্ষণই প্রতিদিন দলে দলে নরনারীকে টেনে আনছে এই রাজধানীতে। টোকিওর আকর্ষণ যে কত বেশী, তা একালে রচিত অনেক গানের মধ্যেও বুঝতে পারা যায়। এইসব গানের অর্থ হচ্ছে টোকিওতে চল, সেখানে গেলে আর চিন্তা করার কিছু নেই, একটা কিছু জুটেই যাবে। সম্প্রতি টোকিওর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এক অনুসন্ধান চালান হয়েছিল টোকিওর এই আকর্ষণের হেতু কি জানতে। তাতে জানা যায় যে টোকিও শহরের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তিনটি। চাকরি, শিক্ষা ও বিবাহ। তা ছাড়া শহরের অন্যান্য মোহ ও আছেই। এদেশের প্রেম যদিও নিতান্তই প্রেমপদবাচ্য নয়, তবু সেখানেও এত [illegible] বাধাবাধি নেই, ছেলেদের [illegible] থাকতে পারে। যাই হোক, শতকরা ৫০ জন লোক প্রতি বছরে আসে চাকরির সন্ধানে, শতকরা ১৩জন আসে উচ্চশিক্ষার জন্য। আর শতকরা ১৯জন মেয়ে হয় বধূরূপে বিয়ে করতে আসে অথবা বিয়ে করে স্বামীর ঘরে আসে। প্রতি বছরের এই বাড়তি লোকসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই চায় বরাবরের জন্য এই শহরে বাস করতে, এবং যারা শহর থেকে দূরে থাকতে চায় তারা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই থাকে। শহরের জীবনযাত্রা দিন দিন অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। এই কারণে তারা শহর থেকে অল্পেই দূরে প্রতিদিন যাতায়াতের দূরত্বের মধ্যেই থাকতে চায়। এদেশের যানবাহন বিশেষত ট্রেনের সুবিধার জন্য বেশ কিছুটা দূর থেকেও রোজ শহরে পড়াশুনা বা কাজকর্ম করতে আসা যাওয়া মোটেই অসুবিধাজনক নয়। সুতরাং বহু লোক বহু দূর থেকে প্রতিদিন টোকিও শহরে কাজের জন্য যাতায়াত করে থাকেন।

টোকিও শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বাসস্থানের সংখ্যাল্পতা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণ। এর পরেই আসে জল সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী, কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি। এদেশে বসবাসের বাড়িগুলি অধিকাংশই কাঠ, কাচ, কাগজ, কাঠের গুঁড়ো জমান তক্তা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হয়। তাসের বাড়ির মত বাড়িগুলি দেখতে বেশ ছবির মত লাগে, কিন্তু আমাদের দেশে হলে হয়ত ততটা নিরাপদ হত না। ধীরে ধীরে নানারকম অপরাধের
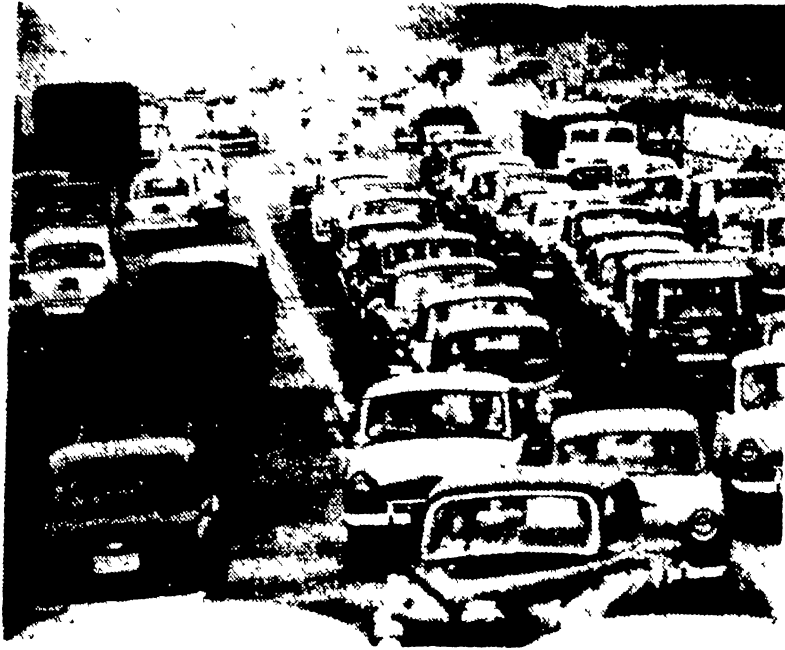
টোকিওর যানবাহন সম্বন্ধে এর আগে একবার বলেছিলাম যে, এত বড় ও ছড়ান শহর হলেও যানবাহনের সুবিধার জন্য লোকের যাতায়াতে খুব অসুবিধা হয় না, যদিও সকাল বিকালের অফিস টাইমে ভিড়ের জন্য একটু কষ্ট হয়। আমাদের দেশে গরু বা মোষের গাড়ির মত মন্থরগতি গাড়ি যদিও ঐ সময় বড় রাস্তায় চলে না তবু অনেক সময় ঐ জাতীয় গাড়িতে অন্যান্য গাড়ির গতি বেশ বাধা পায়। এদেশে ঐরকম কোন গাড়ি যদিও একেবারেই নেই রিকশ একরকমে চলত বটে কিন্তু এখন প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না—কিন্তু মোটর ট্যাক্সি বাস, লরী, ট্রাক ইত্যাদির সংখ্যা এত বেশী যে, এই যানবহন নিয়ন্ত্রণও এদেশের পৌরসভার এক মস্ত সমস্যা। সবদেশের বড় বড় শহরের মত এখানেও শহরের মধ্যে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রিত আছে, আর তার তদারক করার জন্য পুলিস বাহিনীও সর্বদা তৎপর কিন্তু কর্মব্যস্ত সময়ে গাড়ির ভিড় এত বেশী যে এক ঘণ্টার পথ যেতে প্রায় দেড় দু ঘণ্টা লেগে যায় পথে যেন গাড়ির লম্বা 'মিছিল'। ট্রেনের পথে বাধা নেই নিজস্ব লাইন ধরে চলে, তাই শীঘ্র যাওয়ার জন্য লোকে ট্রেনে যাওয়াই পছন্দ করে তবু এ সময় সর্বত্রই ভিড়। পথে গাড়ির ভিড় সত্ত্বেও কিন্তু বড় [illegible] গাড়ি ঝকঝকে চকচকে। পুরোনো গাড়ি একটাও দেখা যায় না। এদেশের লোকেরা খুব অল্প দিন ব্যবহারেই গাড়ি বদল করে ফেলে, [illegible] পর্যন্ত দু-এক বছরের বেশী [illegible] চলে না। ফলে এদেশের ট্যাক্সিগুলি ভারী চমৎকার। প্রাইভেট গাড়ির তো কথাই, অধিকাংশ ট্যাক্সিতেও রেডিও লাগান আছে আরোহী উঠলেই ট্যাক্সিওয়ালা রেডিও চালিয়ে দেয়, গান শুনতে শুনতে গাড়ির আরাম চলুন। ট্রাফিক সিগন্যালে বারবার গাড়ি দাঁড়ালেও ততটা বিরক্তিকর লাগে না, যদি না নিজেরই তাড়াতাড়ি কোথাও যাবার তাগাদা থাকে। ছোট বড় ট্যাক্সি অনুযায়ী প্রতি দুই কিলোমিটার ৭০ বা ৮০ ইয়েন অর্থাৎ আমাদের প্রায় এক টাকা বা কিছু বেশী। ট্যাক্সিওয়ালারা অধিকাংশই অত্যন্ত ভদ্র, বিশেষত বিদেশীর [illegible] জাপানী ভাষা বলতে পারলে তো তারা খুব খুশী হয়ে নানারকম গল্প করে। তবে ইণ্ডিয়াটা যে কোথায় সেটা, এদেশের ট্যাক্সিওয়ালা, সবজিওয়ালা, সকলেরই বেশ ভাল জানা আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে এই ট্যাক্সিওয়ালাদের সম্বন্ধে একটু অভিযোগ শোনা যায় তারা নাকি বিদেশীদের নিতে চায় না। আমার যদিও দু-একবার এমনি অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু সেটা ঠিক বিদেশী বলে বা অন্য কোন কারণে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই। যাই হোক, যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কথা বলছিলাম। এদেশের কতকগুলি রাস্তা বেশ বড় হলেও অধিকাংশ রাস্তাই যানবাহন চলাচলের পক্ষে খুব প্রশস্ত নয়। গত যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে টোকিও শহরের অধিকাংশই প্রায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর যখন নতুন করে শহর গড়ে তোলা হয় তখন বাড়িগুলি সেই জায়গাতেই আবার তৈরি করা হয়, রাস্তাগুলি আর চওড়া করা হয়নি, ফলে ক্রমবর্ধমান গাড়ির ভিড়ে রাস্তাগুলি সবসময়ই ভর্তি। এখন এর রাস্তাগুলি চওড়া করা সম্ভব নয়, রাস্তার চাহিদাও বেড়েই চলেছে, কাজেই পৌরসভা অন্য পথের কথা চিন্তা করছেন। এঁরা এক শহরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দশ বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বছর দুই আগে। তার কাজও বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে, বিশেষত সামনের বছর অলিম্পিকের আগে এঁরা অনেকটা কাজ সারতে চান। এই পরিকল্পনার একটি বিষয় হচ্ছে সারা টোকিও ও বৃহত্তর টোকিও জুড়ে আটটি প্রথম শ্রেণীর ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ রেলপথও বেশ কয়েকটি আছে। আরও কয়েকটির কাজ চলছে। প্রতি রাত্রে যখন শহরের ওপরে যানবাহনের ভিড় কমে যায় তখন শত শত কর্মী নিঃশব্দভাবে সারারাত ধরে মাটির নীচে রেলপথ তৈরীর কাজ চালিয়ে যায়। ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজও অনেকটা এগিয়ে গেছে ও ইতিমধ্যেই তার ওপর দিয়ে গাড়ি চলাচলও শুরু হয়ে গেছে। এই ন্যাশনাল হাইওয়েগুলি হবে ১৬ মিটার চওড়া ও সবসুদ্ধ এর দৈর্ঘ্য হবে ৭১০০ কিলোমিটার, এবং এর ওপর দিয়ে গাড়ি ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে গাড়ি যেতে পারবে। অলিম্পিকের আগেই এইসব রাস্তা শেষ হবার আশা করা যায়। প্রতি বছর যে হারে গাড়ির সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে ১৯৬৬ সালে টোকিওতে যানবাহনের সংখ্যা ১,১৬০,০০০ও ছাড়িয়ে যাবে বলে পৌরসভার অনুমান। সেজন্য রাস্তা বাড়ানো আরও বিশেষ প্রয়োজন। আর একটি জিনিস, যেটি অলিম্পিকের আগেই তৈরি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে শহরের মাথার উপর দিয়ে একটি রেলপথ, যেটি হানেদাতে অবস্থিত টোকিও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সঙ্গে শহরের মধ্যস্থ শিমবাসী স্টেশনকে যুক্ত করবে। এটি তৈরি সম্পূর্ণ হলে, শিশুদের প্রমোদ উদ্যানে শিশুদের ব্যবহার্য মনোরেল ছাড়া, সাধারণের ব্যবহার্য মনোরেল জাপানে এটিই প্রথম হবে। এই মনোরেলটিও টোকিও ও ইয়োকোহামা বন্দরের মধ্যবর্তী যে হাইওয়ে তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে, সেটি যুক্তভাবে টোকিও ও হানেদা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যে যাতায়াতের সময় অনেকটা সংক্ষেপ করে দেবে।

সুধীরা দাশগুপ্ত

রোজপরার কাপড়
সানলাইটে কেচে
কত ফরসা, ঝলমলে !
SUNLIGHT SOAP
পরিষ্কার, ঝলমলে, ধব্‌ধবে ফরসা কাপড় !
সানলাইটে কাপড় কাচার এই গুণ!
সব কাপড়জামা বাড়ীতে সানলাইটে কাচুন...

ড্রাগনের দাঁতে বিষ

গৌরকিশোর ঘোষ

॥ ছাব্বিশ ॥

স্থলসৈন্যের পরেই চীনা লালফৌজের বিমান বাহিনীর স্থান। লালচীনের বিমান বহরের 'ফাইটার' বিমানের সংখ্যা তিন হাজার হবে বলেই পশ্চিমী পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন। এবং তাঁদের আন্দাজে জেটচালিত লঘু বোমারু এবং মালবাহী বিমানের সংখ্যা হবে 'কয়েক শত', কারো কারো মতে, প্রায় হাজার। এ ছাড়া কিছু পর্যবেক্ষক বিমান এবং হেলিকপ্টারও আছে।

বলাই বাহুল্য, চীনের বিমান মাত্রেই রুশ বিমান। চৈনিক বিমানবহরের ফাইটারগুলোর অধিকাংশই মিগ ১৫। মিগ ১৭ এবং মিগ ১৯-ও কেটা কয়েক আছে। বোমারু এবং মালবাহী জেটগুলো হচ্ছে ইলিউসিন-২৮ টাইপের।

চীনের জেট পাইলটের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার এবং সবরকম কর্মী মিলিয়ে বিমানবহরে মোট পাঁচ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। এ ছাড়া 'ওয়েটিং লিস্টে' আছে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের সুদীর্ঘ এক তালিকা।

এখানেও দেখা যাচ্ছে যন্ত্রের সংখ্যা থেকে জনের সংখ্যা অনেক বেশি। আরও একটা জিনিস লক্ষ করবার আছে চীনা বিমানবহর সর্বাংশভাবে রুশিয়ার উপর নির্ভরশীল। রুশিয়ার মদত ছাড়া ড্রাগনের পাখা মেলবার সাধ্য নেই। রুশিয়া চীনকে শুধু নতুন বিমানই জোগায় নি, উঁচু দরের তেলও তাকেই জোগাতে হয়। বিমানচালনা শিক্ষা দেবার জন্য ইনস্ট্রাক্টর, বিমান মেরামতের কারিগর স্পেয়ার পার্টস — সবই রুশিয়া থেকে আসছিল। চীনের অভিযোগে প্রকাশ, রুশিয়া এখন হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

ফরমোজার ভয়ে লাল চীনকে তার বিমানবহরের বড় অংশটাকেই ঐ সীমান্তেই মোতায়েন রাখতে হয়েছে। ফরমোজার মহড়া নেবার জন্য লাল চীন ৪০টি জেট বিমান ঘাটি তৈরি করেছে। তার হাতে এখন মজুত যা তেল আছে, তাতে চীন এই একটা ফ্রন্ট হয়ত কোন রকমে সামাল দিতে পারে। ফ্রন্ট নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লে তার পক্ষে রুশিয়ার নতুন মদত ছাড়া বিমান বাহিনীর সদ্ব্যবহার করা মুশকিল। এবং এই কারণেই চীন ভারতের বিরুদ্ধে বিমানবহর নিয়োগ করেনি। (ব্রহ্মদেশ এবং আসামের তেলের উপরও এই একই কারণে চীনের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে।)

গৃহযুদ্ধের অবসানে কমিউনিস্ট পার্টি যখন পিকিং-এর তখতে এসে অধিষ্ঠিত হল, তখন হিসাব নিয়ে দেখা গেল, কমিউনিস্টদের হাতে ৫০০ খানা জংগী বিমান এসে গিয়েছে। গৃহযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ২০০ খানা বিমান ছিল। চিয়াং কাইশেকের কাছ থেকে বাকি তিনশ বিমান কমিউনিস্টরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই ৫০০ খানা জংগী বিমান নেড়েচেড়ে দেখা গেল, অর্ধেকই অকেজো হয়ে পড়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত করতে না পারায়, স্পেয়ার পার্টসের অভাবে মেরামত করতে না পারায়, শেষ পর্যন্ত সচল বিমানের সংখ্যা এসে দাঁড়াল (১৯৪৯ সালে) ২২৫ খানায়—১৭৫ খানা ফাইটার আর ৭৫ খানা বোমা ও মালবাহী বিমান।

১৯৫১ সালে চীন কোরিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। চীনে রুশ বিমান পাইলট, কারিগর এসে পৌঁছাতে লাগল। প্রথম দিকটাতে রুশিয়া শুধু ফাইটারই পাঠিয়েছিল। কোরিয়ার যুদ্ধেই প্রথম চীনা পাইলটদের মিগ বিমান চালাতে দেখা গেল। (ভিয়েৎনামেও কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের সাহায্য করবার কাজে চীনারা রুশ বিমান ব্যবহার করেছে।) ১৯৫৩ সাল থেকে চীন বোমারু বাহিনী গঠনে মন দেয়। চীনা পাইলটরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিগ চালনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়ে পশ্চিমী, বিশেষ করে মার্কিনী সামরিক পর্যবেক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

কোরিয়ার যুদ্ধের পর চৈনিক লালফৌজ অতি দ্রুত বিমানবহর বাড়িয়ে ফেলল। মজা হচ্ছে এই, এত করেও মাও-এর বিমানবহর চিয়াং-এর বিমানবহরের (মার্কিনী মদতে তৈরি) সংগে এঁটে উঠতে পারেনি। ১৯৫৭ সালে এই দুপক্ষে যে-কটা বিমানযুদ্ধ হয়েছে, তার সব কটাতেই মাও-কে পিছু হটতে হয়েছে।

লালচীন রুশিয়ার সাহায্যে কয়েকটা বিমান-তৈরির কারখানা বানিয়েছে। এইসব কারখানায় বিমানের বিভিন্ন অংশ এনে জোড়া হয়। অংশগুলো তৈরি হয় রুশিয়ার কারখানাতেই। বিখ্যাত মার্কিন সামরিক পর্যবেক্ষক মেজর এড্‌গার ও ব্যালান্স এই সম্পর্কে বলেছেন:

Red China is entirely dependent upon Russia both for aircraft and for aviation fuel. Some Russian types are now assembled in China, but Red Chinese industry is not yet capable of producing modern aircraft in quantity, nor the necessary precision instruments that go with them It has been estimated that a probable ceiling number of aircraft

may not be more than 7,000—but the exact figure will ultimately depend completely upon Russian generosity. A vital point which should not be overlooked, is that Red China possesses no high-grade aviation fuel, and that every single drop comes all the way from Russia. Russia pull the string that manipulate the Red Chinese air force and will continue to do so for some time to come.—(The Red Army of China, p.217-218).

তেল এবং বিমানের জন্য রাশিয়ার উপর চীনকে নির্ভর করতে হচ্ছে বলেই লাল-ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশকে সে ইচ্ছে মত কাজে লাগাতে পারছে না। তাই একদিকে চীন গ্লাইডার বাহিনী গড়ে তোলার দিকে ঝুঁকেছে এবং অন্যদিকে বৃটেনের মত (পুঁজিবাদী) দেশের দুয়ারে গিয়েও মালবাহী বিমান কেনার জন্য ধর্ণা দিচ্ছে।

চীনের স্থল এবং বিমান বাহিনীর তুলনায় নৌবাহিনী অনেক ছোট। কিছুটা উপেক্ষিতও বটে।

লালফৌজের নৌবহরে নানা ধরনের জাহাজের সংখ্যা ৩৪০, লোক-সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। ৩৪০ খানা জাহাজের মধ্যে ক্রুজার আছে দুখানা, ডেস্ট্রয়ার প্রায় ২০ খানা, এবং ফ্রিগেট ৩০ খানারও উপর। বাকিগুলো উপকূলে এবং নদীতে ভেসে বেড়াবার উপযোগী ছোট ছোট সব জলযান। এ ছাড়া আছে সমুদ্রে চলার উপযোগী ৩০০ খানা ল্যান্ডিং ক্রাফ্‌ট আর আছে অন্তত ২৮ খানা দূরপাল্লার ডুবোজাহাজ। সব কটা ডুবোজাহাজ এবং অন্যান্য রণতরীর তিন ভাগের দু ভাগই রাশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া।

সাংহাই এবং ক্যান্টনের জাহাজ তৈরির কারখানায় আরও ডেস্ট্রয়ার এবং ফ্রিগেট তৈরি এবং অন্যান্য কারখানায় ছোট ছোট জাহাজ তৈরির যে-সব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে সেই সব পরিকল্পনার কাজ মন্থর হয়ে এসেছে। বছরে ২৫ খানা করে ডুবো জাহাজ তৈরি করা শুরু হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। চীনের উদ্দেশ্য ছিল এই সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ১০০তে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু 'মহাবেগে লাফ' দিতে গিয়ে চীন সব লক্ষ্যই পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে ১০০টি ডুবো-জাহাজ বানাবার বাসনাও বাতিল করতে হয়েছে। ডুবোজাহাজ চালাবার মত দক্ষ অফিসার এবং মাল্লারও ঘাটতি আছে। লালচীনের নৌবহর সম্পর্কে লেখক ও সাংবাদিক মন্তব্য করেছেন:

One can venture the thought that although the navy is the poor relation of the Red Chinese armed forces and has limited defensive ability, it is developing far-reaching nuisance value capabilities.—(The Red Army of China, p. 218).

চীনের এই বিরাট ফৌজের রসদ সরবরাহ এবং যোগাযোগের জন্যও তাকে আধুনিক যন্ত্রপাতির চাইতে মানুষের পেশী-শক্তির উপরই বেশি নির্ভর করতে হচ্ছে। কারণ এই বিরাট ফৌজের জন্য সরবরাহ এবং যোগাযোগ গড়ে তুলতে যত মোটর গাড়ি দরকার, চীন আজও তা তৈরি বা সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি।

সেই কারণেই মাল বইবার জন্য চীনকে বিপুল এক বাহক বাহিনী বা 'ট্রান্সপোর্ট কোর' গড়ে তুলতে হয়েছে। এরও সদর দপ্তর হচ্ছে পিকিং-এ। প্রথম দিকে এই 'ট্রান্সপোর্ট' কোরকে ৪০টি আঞ্চলিক

ডিভিশনে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। এক সময় এই বাহিনীতে কুড়ি লক্ষ লোক ছিল। এখন, রাস্তাঘাট যত উন্নত হচ্ছে, মোটর গাড়ির সংখ্যা ক্রমশ যত বাড়ছে, এই বাহিনীর আয়তন ততই সংকুচিত হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে এই বাহিনীর পুনর্গঠন করে এটাকে ২২টি আঞ্চলিক ডিভিশনে ভাগ করা হয়। তারপর থেকে লোকের সংখ্যা কমতে থাকে, এখন এই সংখ্যা দশ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনেক গাল-গল্পের মত চীনা ফৌজ সম্পর্কে এই গল্পটাও চালু হয়েছে যে, চীনা সৈন্য ঈশ্বরের (বা কমিউনিস্টদের) এমনই এক আজব সৃষ্টি যে, তারা নিজের "কার্তুজ রাখবার পেটিতে" চাল বেঁধে লড়াই করতে বেরিয়ে পড়ে, তারপর অনির্দিষ্টকাল ঐ খাদ্যে জীবনধারণ করে লড়াই চালায়, তাদের আর আলাদা করে রসদ সরবরাহ করতে হয় না। এই কাহিনী যে অলীক, বাস্তব ঘটনাই তা প্রমাণ করেছে।

গেরিলা বাহিনীর সিপাইরা অনেক সময় নিজের রসদ নিজেরাই বহন করে এগিয়ে যায়। কিন্তু অনির্দিষ্টকাল তার সেই রসদ সম্বল করে যুদ্ধ চালাতে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের 'কার্তুজ রাখবার পেটিতে' রাখা রসদ নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন পেছন থেকে আবার নতুন রসদ পাঠাতে হয়। সেই কারণেই গেরিলা দল সরবরাহ শিবির ছেড়ে খুব দূরে গিয়ে অনেকদিন ধরে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে পারে না।

(এই প্রসঙ্গে আমার ভারতীয় বাহিনী বিশেষ করে যাঁরা পার্বত্য যুদ্ধে নিরত আছেন, রসদ সরবরাহের একটা দুর্বলতার কথা মনে পড়ছে। গত নভেম্বরে (১৯৬২) নেফাতে চীনা আক্রমণের সময় আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তখন আমাদের সেনাবাহিনী চীনাদের ঠেকাতে [illegible]। সেই সময়েও আমি দেখেছি আমাদের লড়ুয়ে ফৌজকে রান্না করে খেতে হচ্ছে। সে-সব উচ্চতায় (প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট) ডাল রুটি নিতান্ত সহজে যে পাকানো যায় না, তা আমার পর্বতারোহণের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেই মালুম পেয়েছি। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম, 'ফরওয়ার্ড এরিয়া' বা অগ্রবর্তী ঘাটিতেও আমাদের ফৌজকে ফিল্ড র‍্যাশন হিসাবে চাল ডাল আটা, মাংস ইত্যাদি কাঁচাই সরবরাহ করা হয়। এ সংবাদে বিস্মিতই হয়েছিলাম। আমরা এখনও কত পিছিয়ে আছি। সমতল ভূমিতে রান্নাবান্নার অসুবিধে বিশেষ নেই। কিন্তু উঁচু অল্টিচিউডের যুদ্ধে সামরিক রসদ সরবরাহে আমাদের যথোপযোগী বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করাই সমীচীন বলে বিবেচনা করি। আজকাল উন্নত দেশগুলো এসব ক্ষেত্রে ফৌজকে রান্না-করা ডিহাই-ড্রেটেড টিনে বন্দি খাবার দেয়।)

চীনা গেরিলার 'কার্তুজ রাখবার পেটিতে' রসদ নেওয়ায় দূরপাল্লায় আক্রমণ চালাতে তার অসুবিধে ঘটে সন্দেহ নেই, কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে (রান্নাবান্নার ঝামেলা না থাকায়) তার তৎপরতা যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং দ্রুতগতিতে অতর্কিত হানা মারার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, লালফৌজকেও রসদ যোগান দেবার ব্যাপক আয়োজন করতে হয়। একটা হিসেবে দেখা গিয়েছে যে শান্তির সময়েও প্রতি তিনজন সৈনিক সৈন্যের জন্য একজন করে রসদবাহী লোক মোতায়েন রাখতে হয়। আরও জানা গিয়েছে শান্তিপর্বে চীনা বাহিনীকে নিজের রসদের অন্তত বারো আনা নিজেকেই উৎপাদন করতে হয়। চীন সরকার সেই কারণেই এক অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী অন্যত্র বদলি করতে চায় না। কারণ তাতে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবার আশংকা দেখা দিতে পারে।

সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে এবং অন্যান্য কাজে যথা 'বেসে'র কারখানায়, সরবরাহ ঘাটিতে, হাসপাতালের ক্যাম্পে, বিভিন্ন সামরিক দপ্তরে অন্তত পাঁচ লক্ষ লোককে নিয়োগ করা হয়েছে।

সামরিক পর্যবেক্ষকরা এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, চৈনিক লালফৌজ লোকবলে যত বলী, অস্ত্রবলে তত নয়। এখনও লাল-ফৌজকে প্রধানত মামুলী ধরনের ছোট ও মাঝারি অস্ত্রের উপর, যথা রাইফেল, সাব-মেশিনগান, মেশিনগান, মর্টার, বাজুকা, অ্যান্টি-ট্যাংক, অ্যান্টি-পারসোনেল মাইন প্রভৃতি ইনফ্যান্ট্রির উপযোগী অস্ত্রের উপরই নির্ভর করে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আর

আছে ছোট ছোট বি-কয়েললেস আন্টি-ট্যাঙ্ক গান। এইসব অস্ত্রও আবার এক টাইপের নয়। আমেরিকা, জাপান, রুশ এবং কিছু কিছু জার্মান মডেলে তৈরি। রুশ মিলিটারি মিশন একবার এইসব অস্ত্রশস্ত্রের অন্যান্য মডেল বাতিল করে রুশ মডেল তৈরি করার পরামর্শ লাল চীনকে দিয়েছিল, কিন্তু চীন সে-কাজ করে উঠতে পারেনি।

লঘু সাঁজোয়া গাড়ি ছাড়া চীন এখনও পর্যন্ত ট্যাঙ্ক বানাতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের পরাজয় ঘটলে লালফৌজ যে-সব জাপানী ট্যাঙ্ক হাতিয়ে নিয়েছিল, এখন আর সেগুলোর কর্মক্ষমতা নেই। তার কাছে এখন যে-সব ট্যাঙ্ক বা সাঁজোয়া গাড়ি আছে, সেগুলোর বেশির-ভাগই কোরিয়ার যুদ্ধে রুশিয়ার কাছ থেকে পাওয়া। এর মধ্যে আছে প্রথম যুগের কিছু স্ট্যালিন ট্যাঙ্ক, কিছু 'এস ইউ' এবং কিছু 'বি-৩৪' ট্যাঙ্ক। ১৯৫৪ সালের পর রুশিয়া এ-সব জিনিসও আর বেশি পাঠায় নি। এ-সবের মডেলও রুশিয়া বদলে ফেলেছে। চীনের প্রয়োজনের তুলনায় এগুলো তো নস্যি।

প্রথম দিকে লালফৌজ কিছু বিদেশী কামানও কেড়ে কুড়ে নিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে প্রচুর পরিমাণে জাপানী গোলন্দাজ বাহিনীর পরিত্যক্ত সাজ-সরঞ্জামও তার দখল করে ফেলে। লালফৌজের সেনাপতিরা এইসব অস্ত্র গৃহযুদ্ধের সময় চিয়াং কাইশেককে ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করায় জাপানী আর্টিলারি চালাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কাজেই চীনের শিল্প উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনের সমরনায়কেরা এইসব অস্ত্র উৎপাদনের ফরমায়েশ দিতে থাকেন। চীন এখন এইসব ছোট কামান তৈরিতে দিব্যি হাত পাকিয়ে ফেলেছে। বড় কামান এখনও দুষ্প্রাপ্য।

মেজর ওয়ালাস এই সম্পর্কে বলেছেন:

As far as equipment is concerned, it can be broadly said that the Red Army, basically infantry as it is, is only equipped as such and lacks the required balance of heavy armaments. Red China, an agricultural country, has barely touched the fringe of industrialisation and it must necessarily be some time before modern military material and heavy armaments are produced in a sufficient quantity to put her in the same category as, let alone on a par with, other Westernized armed forces of the world power.

'মহাবেগে লাফ' মেরে চীন তার শিল্পোৎপাদনকে যেভাবে জখম করেছে তাতে আধুনিক মারণাস্ত্র উৎপাদনের গতিও মন্থর হতে বাধ্য। এবং আধুনিক মারণাস্ত্রের ঘাটতি নিয়ে চীনের পক্ষে বড় কোন দেশ জয় করা সম্ভব নয়। তবে পঞ্চম বাহিনীর সহায়তায় অনেক অসম্ভবও তো সম্ভব হয়। আশংকা সেইখানে।

লালফৌজের অফিসারদের সম্বন্ধে পশ্চিমীদের ধারণা ভাল। মেজর ওয়ালাসের মতে:

Generally speaking, the average regular officer is patriotic, hard-working and capable of doing his job in the field, but his horizon tends to be narrow, and he lacks the high standard of formal education and technical training looked for in an officer in a modern, Westernized army today. He inclines to withdraw himself whenever he can and devote himself entirely to his military work, frequently to the neglect and detriment to party politics. The possibility that a military junta may arise one day..

কম্যুনিস্ট চীন মিলিশিয়া বলে একটা আধা সামরিক সংস্থা গড়ে তুলেছে। এবং ২৫ কোটি নরনারীকে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সংস্থাটি মাও সে-তুঙের গর্বের বস্তু। ২৫ কোটি লোককে নয়া চীন একটা আধা সামরিক সংস্থার মাধ্যমে সংগঠিত করে তুলেছে, এই কথাটি শুনেই বহু লোক ভিরমি খেয়ে পড়তে পারেন। আমাদের কথা বলছি নে, বহু লড়াই-এ অভিজ্ঞ পশ্চিমী দেশগুলোর পিলেও এই খবরে চমকে উঠেছিল। পরে নানা রকম খোঁজখবর করে মিলিশিয়ার স্বরূপটি বুঝবার পর তারা আশ্বস্ত হয়েছে।

বিভিন্ন বিবরণ থেকে জানা গিয়েছে, মিলিশিয়ার লোকসংখ্যা যতই হোক সামরিক উপযোগিতার দিক থেকে ওটা প্রায় গোদা
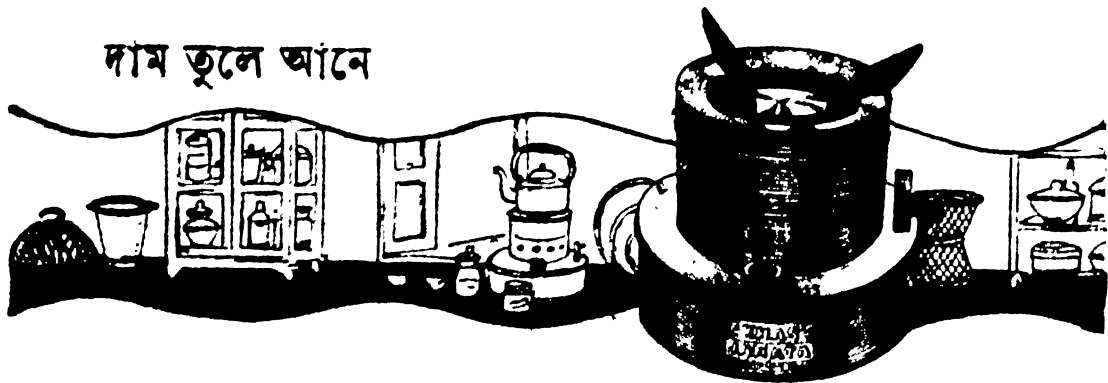
পায়ের লাথি"রই সামিল। গ্রামে ও শহরে যে-সব কৃষক ও শ্রমিককে মিলিশিয়ায় ভর্তি করা হয়েছে, তাদের কাজ হচ্ছে কাজে যাবার আগে নিয়মিত ড্রিল করা—যে ধরনের ড্রিল গত যুদ্ধের সময় আমাদের এখানে সিভিক গার্ডদের করানো হত। সে আমলের সিভিক গার্ডের কুচকাওয়াজ দেখে এদেশের সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত কি? চীনের মিলিশিয়াও অনেকটা তাই। একজন সামরিক পর্যবেক্ষক মিলিশিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

It may be true that 250 million people are regimented and drilled each day before being marched off to their work, but their military value as a whole is another matter. Only a small proportion is adequately trained, and a smaller proportion armed.

মিলিশিয়ার যে সামান্য অংশ সামরিক শিক্ষা পেয়েছে এবং সশস্ত্র, তারাও সংখ্যায় কম হবে না। ২৫ কোটির ২৫ ভাগের এক ভাগও যে এক কোটিতে দাঁড়ায়। এরাই চীনের "সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্স।" এরা হোম-গার্ডের কাজ করে, নিয়মিত সেনাদলের রিজার্ভ হিসেবেও এদের গণ্য করা হয়। আবার এদের দিয়ে মাল বহন, পাহারাদারী, এমন কি গুপ্তচরের কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। মিলিশিয়ার এই শিক্ষিত অংশটির সংগে আমাদের প্রাথমিক বাহিনীর সাদৃশ্য আছে।

চীন-জাপান যুদ্ধের সময় মাও সে-তুং আর্থিক কারণে নিয়মিত ফৌজের সংখ্যা বিশেষ বাড়াতে পারেন নি। কম খরচে হয় বলে মিলিশিয়ার সংখ্যা বাড়িয়ে গিয়েছিলেন। গৃহযুদ্ধের শুরুতেই মিলিশিয়ার সংখ্যা ৬০ লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। গৃহযুদ্ধের শেষে পাইকারি বহিষ্কার এবং সাজা দেবার ফলে মিলিশিয়ার সংখ্যা কিছুকালের মত বেশ কমে গিয়েছিল। তারপর আবার মিলিশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৯৫৩ সালেই মিলিশিয়ার সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষে পৌঁছে গেল। কমিউন প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে এই সংখ্যা দাঁড়াল দেড় কোটিতে। কমিউন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে প্রত্যেকটা সুস্থ ও সবল নরনারীকে মিলিশিয়ায় অবশ্য যোগ দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হল। দেখতে দেখতে মিলিশিয়ার আকার (২৫ কোটি লোক তৎক্ষণাৎ যোগ দিয়েছে) বিরাট দৈত্যের মত বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠল। এরপর এক বছর দেড় বছর চীনের কম্যুনিস্ট নায়কেরাও এই লোক নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। ১৯৬০ সালের পর থেকে তারা এই সংস্থাটি ভালভাবে গড়ে তুলতে থাকেন।

এই সময় মিলিশিয়াকে দুটো শ্রেণীতে—আর্মি মিলিশিয়া এবং সিটিজেন মিলিশিয়া—ভাগ করে ফেলা হয়। আর্মি মিলিশিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিয়মিত বাহিনীতে সৈন্য যোগান দেওয়া। ১৮ থেকে ২৫ বছরের লোককে এতে ভর্তি করা হয়। এদের দু-মাস মাত্র প্রাথমিক ইনফ্যান্ট্রি ট্রেনিং দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়, তারপর এদের কাজ হচ্ছে রোজ দু-ঘণ্টা ড্রিল করা। সিটিজেন মিলিশিয়াতে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষ এবং ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত নারী যোগ দিতে পারে। এদের দিয়েই হোমগার্ড, পাহারাদারী, গুপ্তচরবৃত্তি ও মাল বহন বা অন্যান্য কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। অধিকাংশ সময়েই এরা কাঠের রাইফেল নিয়ে (প্রয়োজনীয় সত্যিকারের রাইফেলের অভাব থাকায়) কুচকাওয়াজ করে। আর চীনের প্রচার-পুস্তিকায় এই ধরনের কোটি কোটি লোকের কুচকাওয়াজের ছবি প্রকাশিত হতে দেখে আমাদের দাঁতকপাটি লেগে যায়। মেজর ও বালান্স লিখেছেন:

Of the Militia as a whole only about 30 million, as far as can be deduced, are in anything like a reasonable state of training, and this includes the 20-odd million ex-regular army reservists. All of these are not armed .... It is doubtful whether more than that proportion, 30 million or so, will be armed at present. .... The masses in Red China cannot yet be completely trusted with arms, and there have been rumblings and small revolts against the idea of being harded into communes.

প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাব, আর্টিলারির দুষ্প্রাপ্যতা এবং বিমানবহর ব্যবহারের ব্যাপারে পরনির্ভরতার জন্য চীন তার রণনীতি এবং আক্রমণ-কৌশলে এখনও গেরিলা পদ্ধতিই অধিকতর প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এখনও তার মস্ত ভরসা তার অগণিত লোকবল। চীনা ফৌজ সেই কারণেই জংগল ও পার্বত্য যুদ্ধে বেশি সফলতা অর্জন করেছে। যেখানে আত্মগোপন করে অতর্কিত হানার সুযোগ কম, বিশেষত নির্বান্ধব দেশে, সেখানে চীনা ফৌজকে কাবু করা আদৌ শক্ত নয়, একথা ভারতীয় সমর বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন।

ভারত-সীমান্তে চীনা ড্রাগনের আক্রমণ-কৌশল যাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন তাঁরা কিন্তু কখনোই একথা বলেন নি যে ভারতীয় বাহিনী চীনা বাহিনীর চেয়ে দক্ষতায় কম। দু-একটা খণ্ডযুদ্ধের ফলাফল দিয়ে সামরিক শক্তির বিচার করতে যাওয়া মূর্খামি বলেই সমর বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

একথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার, লোকবলে ভারত কখনোই চীনের সংগে এঁটে উঠতে পারবে না। তবে সে ঘাটতি ভারতের সুদক্ষ সেনাবাহিনী পূরণ করতে পারে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারে নিজেদের রপ্ত করে।

আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা চীনের অভিসন্ধি সম্পর্কে যদি সময় থাকতে সতর্ক হতেন, এখন যে সামরিক সচেতনতা তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এটা যদি আরও কয়েক বছর আগে হত, তাহলে কমিউনিস্ট চীন এই "ট্যাকটিক্যাল" জয়টাকে পুঁজি করে বিশ্বে ভারতের সম্মান নিচু করার সুযোগটি পেত না।

তেজপুরের কোর হেডকোয়ার্টারে বসে আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন অতি দুঃখে যে-কথা আমাদের গত নভেম্বর মাসে বলেছিলেন, সে-কথা এখনও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন, "আমাদের গাফিলতিই আমাদের এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের মূলে।"

আর এই মারাত্মক গাফিলতির জন্য যদি একক কোন ব্যক্তিকে ইতিহাস দায়ী করে তার করবে ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কমিউনিস্ট বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মেননকে। ভারতবাসী কবিতকর্মা এই কলির কেষ্টকে কখনোই ভুলবে না। (ক্রমশ)

পর্যন্তই করেন। নদীর ধারে ছোট্ট লাঠি দিয়ে ছোবড়া ঝেড়ে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে ঘরে বসে ছোবড়ার সুতো বা দড়ি পাকানো পর্যন্ত তারাই করেন। এ দড়ি কিনে নিয়ে যান বেপারিরা নানারকম জিনিস তৈরির জন্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গালা, কাজুবাদাম ইত্যাদির শিল্পেও প্রচুর মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। এইসব শিল্প থেকে আমাদের অনেক বৈদেশিক মুদ্রা আসে। কাজুবাদাম পর্তুগীজরা আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে আনেন প্রায় চারশ বছর আগে। আজ কাজু ভারতের একান্ত নিজস্ব। বড় বড় কলকারখানা, চা, কফি, রবারের আবাদ, ছোটখাটো শিল্প ছাড়াও মেয়েরা কৃষিকার্যে ও ক্ষেত খামারের কাজে প্রচুর সাহায্য করেন। আমাদের কর্মী মেয়ের (ওয়ার্কিং উওমেন) সবচেয়ে বড় অংশই পল্লী অঞ্চলের চাষ আবাদের মধ্যে। বছর বারো আগে, ১৯৫১ সালের আদমসুমারিতে দেখা গেছে প্রায় চার কোটি কর্মী মেয়ে বা ওর্য়ার্কিং উওমেন আছে সারা ভারতবর্ষে। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলে পুরোপুরি স্বাধীন জীবিকা অর্জন করেন প্রায় দেড় কোটি, আর ২০।২৫ লক্ষ মাত্র শহরে। পুরোপুরি স্বাধীন নয় অথচ সংসারের খাতে কিছু সাহায্য করেন, যাদের বলা হয় আর্নিং ডিপেন্ডেন্ট তাদের সংখ্যাও গ্রামাঞ্চলে দু কোটির উপর, আর শহরে ১৪।১৫ লক্ষের বেশী নয়। সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫১ সালের পর থেকে আরও প্রায় দু কোটি মহিলা উপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছেন। কলকারখানা, অন্য ব্যবসা, যানবাহন প্রতিষ্ঠানে এসব তো আছেই সংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশী হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে বা প্রাইমারী সেক্টর-এ। ১৯৫১ সালে এক্ষেত্রে মেয়ে কর্মীর সংখ্যা ছিল ১৮·৪ আর আজ সেখানে হয়েছে ৩৩·১। পল্লী অঞ্চলে মহিলাকর্মী সবসময় ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রম আইনের আওতায় আসে না সত্য, কিন্তু

ডালহৌসি স্কোয়ারে পানবিক্রী করছে উদ্বাস্তু নারী

ফটো : দেশ

তারা জাতীয় অর্থনীতির অচ্ছেদ্য অংশ। সাহায্যকারিণী হিসাবেও তার মূল্য কম নয়।

এভাবেই শ্রমসংস্থা আর শ্রম আইনের সীমানার বাইরে আছে কত ছোট বড় পসারিনী বা ব্যবসায়ী মেয়ে। প্রয়োজনের দিক থেকে প্রয়োজন তাদের কারও চেয়ে কম নয়। তারাও জীবনবিমুখ নয়, জীবনের কঠিন সংগ্রামে তারা পিছিয়ে যায়নি। এরা কেউ বা বাজারে মাছ নিয়ে আসে, তরকারী নিয়ে আসে। ক্রেতা হিসাবে আমরা তাদের তীব্র সমালোচক। একটি মৎস্য ব্যবসায়িনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার কত আয়। মাছের দাম আর তার পণ্যসম্ভার দেখে ভেবেছিলাম তার উপার্জন বোধহয় অনেক। সে বলেছিল টাকা তো আড়তদারের। আমরা কিনে আনি ভেরী থেকে, আড়তদারের কাছ থেকে আর সারাদিন বেচাকেনার পর পড়ে থাকে সামান্য সম্বল। অভাব বেশী, পোষ্য অনেক, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধা মা সকলেই অসহায়, একমাত্র তার উপার্জনের পথচেয়ে বসে থাকে।

এমনি করে আমার আসা যাওয়ার পথের ধারে আলাপ হয়েছিল একটি পসারিনীর সঙ্গে। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু মেয়ে নাম সুবর্ণলতা চক্রবর্তী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। আজ সে এই গতিবহুল শহরের জীবনধারার ভগ্নাংশ, অফিস বাড়ির সদর ফটকের পাশে বসে পান সিগারেট বিক্রি করে। কোনদিন উপার্জন ভাল হয় কোনদিন বা সামান্য নিয়েই ঘরে ফিরতে হয়। মাইলের পর মাইল জনসমুদ্রের মধ্যে পায়ে হাঁটতে হয়, বাসে ট্রামে চড়তে গেলে খাবার পয়সা বাঁচে না। তাকে একবেলা একমুঠো অন্ন দেবার কেউ নেই। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের আচ্ছাদন একটি শতচ্ছিদ্রযুক্ত ছাতা, দারুন বর্ষায়ও তাই। নিজেকে বাঁচাতে গেলে পসরা বাঁচে না তাই দেখেছি কখনও বা পসরাকে আড়াল দিয়ে বসে আছে রোদ-বৃষ্টি ঝড় মাথায় করে। দুর্ঘটনায় একটি পা ভেঙেছিল, ভাল করে চলতে পারে না। কখনও বা তার চোখের সামনে থেকে চোর ছেলে জিনিস তুলে নিয়ে ছুটে পালায়, সুবর্ণলতা দৌড়তে পারে না তার পিছনে, কিছুদূর গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে তাকেই বিদ্রূপ করে। চোখ দুটো জ্বলে ওঠে সুবর্ণর কিন্তু জল পড়ে না, ভেঙে পরে না তার কাজের উৎসাহ। কোনও দিনও তাকে দমতে দেখিনি। আরও সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রক্ষা করে তার সামান্য পণ্য।

মার্গারেট মিচেলের গন উইথ দি উইন্ড-এ স্কার্লেট ওহারার কথা লেখিকা বলেছেন, অদ্ভুত ছিল তার জীবনীশক্তি। যে বিপর্যয়ে শত শত লোক ধুলোয় মিশে গেল সে বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত স্কার্লেট বেঁচে রইল প্রাণশক্তির জোরে। এই প্রাণশক্তি যেন মনে হয় প্রত্যেক কর্মী মেয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। অন্তঃপুরের যে নিশ্চিন্ত আরাম তা তাদের নাগালের বাইরে, বাইরের জগতের অনেক আনন্দ উৎসব থেকে তারা বঞ্চিত, তবু তারা পরনির্ভর নয়, কারও দয়ার প্রত্যাশী নয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে বিধবারা বা আশ্রয়হীনারা উপার্জন করবেন তবেই সফল হবে জাতীয় অগ্রগতি। এই অগ্রগতির পথেরই পথ-প্রদর্শক আমাদের কোটি কোটি কর্মী মেয়ে,

মনোজ বসু

॥ আটচল্লিশ ॥

কাজের মতো কাজ একখানা—আশালতার গায়ের গয়না খুলে আনা। আগে যেসব হয়েছে তার কোনটি কাজ নয়, খেলা-কাজের নিয়মকানুন না মেনে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়া কেবল একবার। সিঁধকাঠি যদি হয় রাজদণ্ড, রাজদণ্ড হাতে সাহেবের প্রথম প্রবেশ উড়ুনপুরে আশালতার ঘরে। নিজের কাজও এই প্রথম।

কাজে লেগেই উল্লসিত। বলাধিকারী শতকণ্ঠে তারিফ করছেন। তাবড় তাবড় পাকাপোক্ত কারিগরের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেছে। হিংসা করছে : ছোকরা মানুষ লাইনে এসেই কী তাজ্জব দেখাল! বাবা, এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম, তবু এমন জিনিস ভাবতে পারলাম না। বিশ্বাসই হবে না অনেকে। বলে, হতে পারে না, বাজে কথা।

কিন্তু [illegible] কেমন [illegible] হয়ে আছে। [illegible] গায়ে দিল, সে [illegible] জলুনির সেই থেকে বিরাম নেই। পুরুষ যৌবনের জলুনি। ছুতো করে সাহেব উড়ুনপুর গেল—রাতে সে [illegible] দিনমানে নবীন রূপে দেখবে তাকে। গিয়ে এক নতুন [illegible]—রেলের কামরার সেই [illegible] সর্বনাশ তাদেরই করে গেছে। সবিস্তারে না গয়না-চুরির কথা বলতে লাগলেন : রাজরানীর সাজে তারা বউ পাঠাল—ভাবলে, বাপের বাড়ির লোক অভাবে পড়ে গয়না বেচে খেয়েছে। সেই মুহূর্তে এক মতলব আসে সাহেবের মনে : বলাধিকারীর বাক্সভরা গয়না তো এতক্ষণে গলে টাকা হয়ে গেছে। আবার এক রাতে চুরি করে এসে টাকা রেখে গেলে কেমন হয়? চোর মানুষের কাজ হরণ করে নেওয়া। সাহেব উল্টো ভাবছে : দিয়ে যাবে টাকা এখানে এসে। দশকুমার-চরিতের রাজপুত্র অপহারবর্মণ যা করতেন—

সে কাহিনীও বলাধিকারীর কাছে শোনা। চম্পা শহরে বিস্তর ধনী। কৃপণের রাজা তারা, হাতে জল গলে না। অপহারবর্মণের রোখ চাপল : ধন-ঐশ্বর্য নিতান্তই নশ্বর, ধনের অহঙ্কার অবিবেক—এই সত্য প্রমাণ করে দেবেন তিনি। যুক্তিতে নয়, কাজে খাটিয়ে। রাজপুত্র যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, চোরকলার অনুশীলনে খুদে-চোরও তেমনি। ধনীর টাকাকড়ি চুরি করে ভিক্ষুকদের দিলেন। পাশা উল্টে গেল—ভিক্ষুকরাই ধনী এখন, আগের দিনের ধনীজন ভিক্ষাপাত্র হাতে আগের দিনের ভিক্ষুকের কাছে যায়। অপহারবর্মণ মজা দেখেন। সাহেবও করবে তাই—বড়লোকের বাক্স বাক্স টাকা অভাবী জনের ঘরে পৌঁছে দেবে। এবং আশালতার বাপের ঘরে সকলের আগে দু-চার বাক্স।

উড়ুনপুর থেকে সাহেব ফুলহাটা ফিরছে উলুখড়ের আঁটি মাথায় নিয়ে। লোকে দেখে নিরীহ খড়—আঁটির ভিতরে লেজা-সড়কি-কাঠি। সারাপথ এখন এইসব চিন্তা : টাকা রেখে আসব চুপিসারে নিশিরাত্রে গিয়ে। টাকা হলেই গয়না—আশালতার হাতে কঙ্কন উঠবে আবার, গলায় নেকলেস। সর্বঅঙ্গে গয়না পরে যুবতী মেয়ে আরও কত ঝকমক করবে।

ফুলহাটা এসে সুধামুখীর চিঠি। সুধামুখী গলা ফাটিয়ে 'সাহেব' 'সাহেব' করে ডাকছে যেন চিঠির লেখায়। সেই এক সময়ে লণ্ঠন হাতে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যেমন ডেকে বেড়াত। চিঠিতে সুধামুখী টাকা চায়নি, তবু কিন্তু সাহেব বখরার টাকা-আনা সমস্ত তার নামে পাঠিয়ে এলো। নতুন বাসা ভাড়া নিতে যাচ্ছে—বিস্তর খরচ যে তার এখন। বাসা নেবে বরানগরের দিকে, ফণী আঁস্তুর বস্তির মানুষ যে জায়গার হদিস পাবে না। গণ্ডা গণ্ডা কনে দেখে বেড়াচ্ছে—কত রূপের কত ঢঙের সব কনে—সাহেবকে পেলেই কনে একটা পছন্দ করে ঘরে এনে তোলে। সে ঘরে বুঝি গোলপাতার ছাউনি আশালতাদের মতো, সে বাড়ির উঠানে লাউয়ের মাচা, সে উঠানের পাশে ডোবার কলমিঝাড়ের মধ্যে পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়ায়।

সাহেবের কাজ দেখে ক্ষুদিরামের নতুন উৎসাহ। নিজে উদ্যোগ করে বার কয়েক

ইতিমধ্যে বাইরে চক্কোর দিয়ে এলো। ভাল ভাল সব খবর। একটা দুটো তার মধ্যে বাছাই করে ভাল দিনক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাক। পার হচ্ছে এ সময়টা, যা করতে হয় এখনই।

সাহেবের কিন্তু স্ফূর্তি নেই। চুপচাপ শুনে যায়। চাপাচাপি করো তো 'হু' দিয়ে সরে পড়ল।

কেষ্টদাসও মেতে গিয়েছে। বাবুপুকুর থেকে ছুটে ছুটে সাহেবের কাছে এসে পড়ে। বলে, জলে দাঁড়িয়ে ধান কেটে কেটে হাত-পা সব হেজে গিয়েছিল, কাজ এসে বাঁচলাম। মটকায় চড়তে বলো, গাঙ ঝাঁপাতে বলো, কোন কাজে পিছপাও নই। চলো বেরিয়ে পড়ি।

সাহেব হাঁকিয়ে দেয় : নিত্যি নিত্যি কেন এসে জ্বালাতন করো? সময় হলে খবর পাবে।

বলাধিকারী একদিন বললেন, জল-পুলিস বড্ড লেগেছে। জলের কাজ বাদ দিয়ে ডাঙার কাজ ধরো। ডাঙার মানুষ দু-চারখানা খেল দেখে নিক। উচিতও বটে। গাঙ-খাল নেই বলেই সে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকবে, এ কেমন কথা! আবার ডাঙায় যখন কড়াকড়ি হবে, জলে নেমে পোড়ো। হতে হতে মরশুম এসে যাবে, কেনা মল্লিকের দলে ভিড়ে যাবে তখন।

আবার বলেন, যে দরের কাজকর্ম তোমার, দলে গিয়ে নতুন কি শিখবে? দু-এক মরশুম তবু ঘুরে আসা ভালো। বহুজন নিয়ে মিলেমিশে কাজকর্ম—সে-ও একটা দেখবার বস্তু বইকি।

বংশী এসে এসে তাগাদা দেয় : বেরিয়ে পড়া যাক সাহেব-ভাই। পায়ে হেঁটে ডাঙায় ডাঙায় ঘুরব। ভটচাজ বলছিল গুণরাজকাটি গাঁয়ের কথা। খুনখুনে এক বুড়োমানুষ যক্ষির মতো রাজার ভাণ্ডার আগলে আছে—

সাহেব ধমক দিয়ে ওঠে : এত যে দিব্যিদিশেলা, দায় মিটলে ঘরের বার হবো না। দায় মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আবার উসখুস করো কেন? তোমার বউকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে বলাধিকারীর দুই পায়ে হাত রাখল : আমি চলে যাচ্ছি—

কোথায়?

কালীঘাটে মন টেনেছে।

সে কি, পাকাপাকি চললে—আর আসবে না?

সাহেব বলে, তা-ও হতে পারে। এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না।

বলাধিকারী বিমর্ষ হলেন : কিন্তু তোমার বিদ্যা তো শহুরে-বাজারে খাটাবার নয়।

শহরে হল তাস-পাশা খেলার মতো—দু-পাঁচ হাত জায়গার মধ্যে একঘণ্টা দু-ঘণ্টার ব্যাপার। তুমি যে দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ডাঙা-ডহর গাঁ-গ্রাম তোলপাড় করে বেড়াবে।

সাহেব চুপ করে আছে।

মৃদু হেসে বলাধিকারী এবার বলেন, মনটা টানল কে? সেই কোন রানী বুঝি।

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলে, মা—

কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী। বলাধিকারীর হাত দুটো আপনি কপালে উঠে যায়: বেশ বেশ। কাজে নেমে মায়ের পাদবন্দনা করবে, এই তো উচিত। মা তোমার মঙ্গল করুন। আবার এসো।

সাহেব বলে চিঠি মার কাছ থেকে এসেছে—সুধামুখী দাসী। আমার সেই মায়ের কাছে যাচ্ছি।

মা যে নেই তোমার?

সাহেব গাঢ় স্বরে বলল, মা না থাকলে এত বড়টা হলাম কি করে? মা ছাড়া কে এমন আনচান করে চিঠি লেখে?

চাকরিতে আছি ভাবনাচিন্তা কোরো না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। টাকা পাঠাচ্ছি [illegible] নিতে হয় তো দিও—।

আর কি [illegible] কোম্পানির এই চিঠি [illegible] প্রমাণ। ইংরেজি ঠিকানা [illegible] সাহেবের। চিঠি সুধামুখী আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায় [illegible] চিঠি [illegible]: পড়ো দিকি কি লিখেছে [illegible] ঠিক [illegible] করতে পারি নে।

যাকে পড়তে দিয়েছে সে [illegible] পড়তে [illegible] পড়তে [illegible] তুমি

[illegible] অন্ধকারে এখন [illegible] চোখেও জোর নেই তেমন। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না

সে লোক [illegible] সাহেবের [illegible] কিছু জানে না। জিজ্ঞাসা করল কে লিখেছে?

ছেলে—চাকরে ছেলে আমার। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনছি এর পর নাতিপুতি আসবে। বলছি তো তাই—চোখ এখন অন্ধ হয়ে গেলেই বা কি।

সাহেব চাকরি করছে, ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছে—লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ুক। জানুক সর্বজনে। শত্রু হিংসায় জ্বলুক। চিঠি পড়িয়ে পড়িয়ে সুধামুখী সৌভাগ্য জাহির করে বেড়ায়।

সেই চাকরে ছেলের আসলে কোন লাট-সাহেবের চাকরি, বুঝতে সেটা বাকি নেই। মা-ছেলের সম্বন্ধ যখন, মায়ের মন আপনা-আপনি সব টের পায়। তার উপরে নফরকেষ্ট—আলাভোলা মানুষ ঐ লোকের কাছে হেঁয়ালি দিয়ে কথা বের করা কঠিন না।

বড় দুঃসময় যাচ্ছে নফরা হতভাগার—একলা পড়ে গিয়ে রোজগারপত্তর বন্ধ। অতএব আবার সে ভাল হবার চেষ্টায় লেগেছে, নিমাইকেষ্টর বাসায় যাতায়াত করে। কিন্তু মুশকিল সে পথেও—নিমাইয়ের শ্বশুর রিটায়ার করেছেন, কথার তেমন ধার-ভার নেই। তবু চেষ্টা হচ্ছে চাকরির। আপাতত নফরার ভাতের মাকুর দশা। হাওড়ার বাসায় আছে, খরচার জন্য চাপাচাপি করলে কালীঘাট সরে পড়ল। সুধামুখীই বা কাঁহাতক খাওয়াতে পারে? পুনশ্চ হাওড়ায়। এই চলেছে। সাহেব এলে সুধামুখী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে নফরার এই পরিণাম। নতুন বাসায় যাবার দিন সাহেবও গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। ভাল হবে সাহেব, গৃহস্থমানুষ হবে।

বিগ্রহের জায়গাটুকু ধোয়ামোছা করতে করতে সুধামুখী একলাই পাগলের মতো বকবক করে: ও ননীচোরা ঠাকুর, তুমি যা আমার সাহেবও ঠিক তাই। আমি যে কী করি! চোর তোমরা দু-জনেই। চোরের মা আমি।

সংসারের লোভে জীবন ভোর সে আকুলিবিকুলি করেছে। মর মরে গেল—তারপরে যে এলো, সেই মানুষে বিষ খাবার ব্যবস্থা দিল। বিষ না খেয়েই মারা পড়ল সুধামুখী।

উঁহু, মরেছে কোথা? বেঁচে মরে গেছে, কিন্তু সহজ নয় মরা জিনিসটা। প্রাণের ধুকধুকোনি কিছুতে থামতে চায় না। এক পাগল আসত সুধামুখীদের বেলেঘাটার পাড়ায়। কী রকম তার বদ্ধ বিশ্বাস, মরবে না কিছুতে। জনে জনের কাছে কান্নাকাটি করত: কী সর্বনাশ, চিরকাল আমায় বেঁচে থাকতে হবে। কলির শেষে পৃথিবী লয় হবে, আমি তবু থেকে যাব। ডাক্তার-কবিরাজের কাছে গিয়ে ধর্না দিত: কি খেয়ে কেমন করে মরতে পারি বলে দাও। পাগলের কথায় লোকে হাসাহাসি করত। ডাকত: ও পাগলা, শোন, আমি মরার কায়দা বলে দেবো। তার আগে
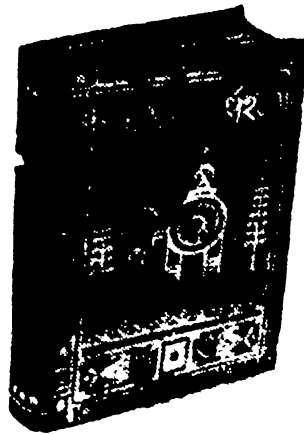
এই চালের বস্তাটা আমার বাড়ি পৌঁছে দাও দিকি। মরবার লোভে তাই সে করত। সেই গতিক সকলের। বুঝতে পারিনে তাই—নইলে পাগলের মতোই আতঙ্ক হবার কথা। দেখ না, ঠান্ডাবাবুর সেই আমের অংকুর কত বড় হয়ে ডালে ডালে এবার আম ফলেছে। এ নিয়তি সর্বজীবের—বেঁচে থাকবার জন্য ছটফটানি। একটু আলোর রেখা পেলে সেইদিকে মুখ বাড়ায়।

গোপাল, তুমি আমার ঘর-জোড়া হয়ে আছ। সাহেব আমার বুক-জোড়। সে আবার ঘরে আসবে, চিঠি লিখেছে। ভয় করে, রেশারেশি না হয় দু-ভায়ে। বাইরে তার নিন্দে, কিন্তু আসলে সে ভাল মানুষ। দেবতার মতন মানুষ।

সাহেবের চিঠির পরে সুধামুখীর তিলেক সোয়াস্তি নেই। ঘোর বেগে আবার পাত্রী দেখতে লেগেছে। কুমারী মেয়ে চোখে পড়লেই সাহেবের পাশে মনে মনে দাঁড় করিয়ে দেখে।

ফুটফুটে এক মেয়ে ঘাটে দেখল একদিন। সঙ্গে বর্ষীয়সী বিধবা। বিধবা গঙ্গাস্নান করছে, মেয়েটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। সুধামুখী পুঁথিপড়ার মতো করে দেখে। আহা, লক্ষ্মীঠাকরুনটি! কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নামটা কী তোমার মা?

মেয়েটা বলল, সুশীলা।

সুশীলা—কি? কোন জাত, পদবি কী তোমাদের মা?

মৃদুকণ্ঠে মেয়েটা বলে, কায়স্থ—

সুধামুখী ভাবে, অকাট্য প্রমাণ সহ একজনে, ধরো, উদয় হল সাহেবের বাপ হয়ে। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা,—এবং সেই লোক জাতে কায়স্থ। সুশীলার বাপের কাছে সাহেবের বাপ চলে যাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে: ছেলের এই চেহারা, রোজগারপত্তর এই, বাড়ির অবস্থা এই রকম—নগদে গয়নায় কত দেবেন বলুন? মেয়ে ভাল আপনার, কমসম করেই নেওয়া যাবে—

কদিন পরে আর একটা মেয়ে চোখে ধরল। মুখের গড়ন বোধকরি আগের সেই সুশীলার চেয়েও ভাল। মুখের হাসি আরও ভাল—আহা-হা, কী সুন্দর হাসিটুকু!

কি নাম তোমার মা? কোন্ জাত?

জাতে সুবর্ণবণিক।

সাহেবের বাপ অতএব কায়স্থ না হয়ে সুবর্ণবণিকই হোক তবে। ঠিকঠাক একজন বাপ না থাকায় এই বড় সুবিধা। যে মেয়েটা সকচেয়ে পছন্দসই, তার জাতকুল মিলিয়ে বাপ হোক না কেন সাহেবের!

আদিগঙ্গার কিনারে ফণী আঢ্যির বসতে এখন মদনকুমারের বস্তি। আর দুদিন পরেই তো রানী-মদনের বস্তি আইন-সম্মত ভাবে। নতুন নতুন সব বাসিন্দা—পুরানোর মধ্যে রানী-পারুল তো থাকবেই, আর আছে সুধামুখী। সে-ও খুই খুই করছে। যেতে হত অনেক আগেই, না গিয়ে উপায় ছিল না—শুধু গলাখানির জোরে আছে। ঠাকুরের ভজন ও কীর্তন গেয়ে গেয়ে সে গলার আরও যেন বাহার খুলেছে। এই-টুকু না থাকলে ঘর ছেড়ে দিয়ে কবে এদ্দিন গৃহস্থবাড়ি বাসন-মাজার কাজ করত। অথবা মন্দিরের বাইরে কাঙালিদের মধ্যে গামছা পেতে ঠাঁই নিত। এ লাইনে বয়স হয়ে যাবার পরে যা দস্তুর।

কিন্তু গান শুনবার লোকও দিনকে দিন কমে এসে শূন্যে দাঁড়াবার গতিক। নতুন বাঁধুনির গান চলে আজকাল, নতুন সুর, নতুন ঢঙ। এমনও হয়েছে, সুধামুখী তন্ময় হয়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখে, হাসছে শ্রোতাদের কেউ কেউ। একবার দেখেছিল, একজনে কানে হাত চাপা দিয়েছে—গান শুধু নয় কান্নার মতো পেতনির গলায়।

অসম্ভব কিসে. আশ্চর্য হবার কি আছে? নিয়েছে অস্বাভাবিক উদ্ভট জীবিকা— মৃত্যু স্বভাবের নিয়মে না-ই যদি আসে, সে নালিশ কে শুনতে যাবে?

ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে এলো পুলিসের তরফ থেকে। শাড়ির উপরে ছিটের চাদর জড়িয়ে পারুল বেরিয়ে এলো। সে যাবে। নফরকেষ্টও ধুঁকতে ধুঁকতে পারুলের গায়ে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। রানীও চলল সেই মোড় অবধি। পারুল বলে, তুই কেন আবার, ছেলেমানুষ তুই কি দেখতে যাবি? চলে যা মা, রাস্তার উপর দাঁড়াবি নে এমন। মলয় কখন এসে যাবে, সে রাগ করবে।

রানী নিরুত্তরে বাড়ি ফেরে। দোতলায় নিজের ঘরে যায় না। সুধামুখীর ঘরের সামনে অন্ধকার নির্জন দাওয়ায় অনেক রাত্রি অবধি একাকী বসে রইল।

লাসঘরের বারান্ডার উপর কাপড়-ঢাকা রয়েছে। মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। সুধামুখীই বটে। মুদিত চোখ। গলায় কোপ মেরেছিল আচমকা পিছন দিক থেকে। পুলিশের একজন নিরিখ করে দেখে তাই বললেন।

বললেন, চিঠি নিয়ে লোক গিয়েছিল, সেই চিঠি খুঁজে বের করতে হবে। তাতে যদি কিছু হদিস মেলে। আংটি নাম কারো হয় না। পুরানো যাতায়াত বলছ—আসল নামটা কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করো নি?

পারুল বলে, খাঁটি নাম আমাদের কাছে কেউ বলে না। মেকি নাম বানিয়ে বলবে, কী হবে শুনে? চেহারায় চিনতে পারব। আর এক নিশানা বলতে পারি, বাবুর দু-হাতে এক গাদা আংটি।

আংটি কী আর আঙুলে রেখেছে? বাগানের মধ্যে কতকগুলো আংটি পাওয়া গেল। মজাটা হল, সবগুলোই মেকি। সোনা নয়, গিল্টি। হীরে নয়, কাচ। ঝকমকিয়ে তোদের কাছে পশার জমাত।

একটুখানি চিন্তা করে তিনি আবার বলেন, ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিছু জানিস? কিম্বা প্রণয়ের রেশারেশি? পুরানো জানা-শোনার মধ্যে খুনখারাপি—উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

পারুল বলে, দিদির এক-গা গয়না পরা ছিল। চেয়ে দেখুন, হাত-গলা নাক-কান এখন সব ন্যাড়া। গয়নার লোভে মেরেছে।

লুকে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে সে-ও মেকি হুজুর। আমি কিনে দিয়েছিলাম। গিল্টি পরে ঠসক করে বেড়াত। ব্যবসাই এই। মানুষটা কিন্তু মেকি ছিল না।

এরই দিন দশেক পরে সাহেব এসে উপস্থিত। ফিরল কতদিন পরে কত অশুভ ঘুরে। পারুল দেখতে পেয়ে উঠানের উপর এসে কেঁদে পড়ে: সাহেব এসেছিস—কটা দিন আগে আসতে পারলি নে? ওদিক নয়। কেউ নেই ওঘরে তালা দেওয়া। তালা দিয়ে নফরকেষ্ট সেই বেরিয়েছে আর আসেনি। শুনিস নি কিছু? আমার ঘরে আর বাবা—

আঁচলে পারুল চোখ মোছে আর ভরে যায়। বলে সংসারের দুয়োরে চিরদিন দিদি মাথা ঠুকে ঠুকে গেল, দুয়োর খুলল না। আমায় সব বলত, আমার মতন কেউ তাকে জানে না।

সাহেব পাষাণমূর্তির মতো শুনছে। কান্না দেখে তারও চোখে জল। চিরকেলে প্যাচপেচে মন—এ মনের কিছুতে শাসন হল না। এতক্ষণ রানী দেখছে, তরতর করে নেমে এসে সে হাত জড়িয়ে ধরল। মায়ের দিকে ভ্রুকুটি করে বলে, হেঁটেপড়ে এলো, থাম তুমি এখন মা। উপরে চলো সাহেব-দা, হাত-পা ধুয়ে জিরোবে।

শুনতে কিছুই আর বাকি নেই। চোখের জল পড়ো-পড়ো, ঠিক সেই সময়টা রানী এসে পড়ল। হঠাৎ কী রকম হয়ে যায়, খল-খল করে সাহেব হেসে ওঠে। বলল, জানিস রানী, কষ্টিপাথর নিয়ে ঠিক ওরা গয়না কষতে গিয়েছিল। পাথরে দাগ ওঠে না। কী বেকুব, কী বেকুব! নিজের গাল চড়াচ্ছিল বোধহয়—কী বলিস, অ্যাঁ?

রানী ব্যাকুল হয়ে হাত চাপা দেয় সাহেবের মুখে: থাক, থাক—আমার ঘরে চলো। [illegible]

পায়রার উপদ্রব রোধের উপায়

পৃথিবীর বহু শহরই অগণিত পায়রার উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত এবং উত্যক্ত। ইওরোপেরও বড় বড় অনেকগুলি শহরেই পায়রার ঝাঁক দেখা যায়। আমাদের দেশে পায়রা পোষা নবাবী ও বাবু আমলে একটা বড় দরের সখ ছিল। এখনও বহু বাড়ির ছাদে পায়রার ঝাঁক বসার মাচা দেখা যায়। অনেকে প্যাকিং বাক্সে ওদের থাকবার বাসাও তৈরি করে দেয়। প্রধানত কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে মুদিরা ভোর বেলা দোকানের ঝাঁপ খোলার পর রাস্তায় গম আদি শস্যের দানা ছড়িয়ে দেয় প্রতিদিন কয়েক সহস্র পায়রাকে খাওয়াতে। পায়রা উৎপাতও বড় কম করে না কিন্তু তবুও ওদের নিধনের কথা কেউ ভাবে না—বরং পায়রা মারা একটা পাপ বলেই গণ্য হয়।

ইওরোপের লোকের মনে সে দুর্বলতা নেই এমন বলা যায় না। প্যারিসের বিখ্যাত স্মৃতিসৌধগুলি এবং শহরের অট্টালিকাসমূহ পায়রাদের উৎপাতে নোংরা হয় বলে ওদের খাবার দিতে ধরা পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকি বারান্দা ও জানলার আলসেতে পর্যন্ত খাবার রেখে দেওয়া চলবে না।

পায়রা নিধনের অন্যান্য সবরকম উপায়ই প্যারিসে ব্যর্থ হয়েছে। এক সঙ্গে একশ পায়রা ধরে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেবার মতো বিরাট জালের ব্যবস্থা হয় কিন্তু সে-উপায়ও সফল হয়নি। কারণ পায়রাদের ধরে বহুদূরবর্তী গ্রামে ছেড়ে দিয়ে এলেও বস্তুত দিন তারা ঠিক ফিরে আসে। পায়রাদের গুলী করে মারার একটা প্রাচীন আইন পুনর্প্রবর্তিত হয়। কিন্তু তাতে লোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অনর্থ সৃষ্টিই করতো। পায়রাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর লাগবে এমন এক প্রলেপ অট্টালিকাসমূহে মাখিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল ওরা সে বস্তুটি বরং পছন্দই করে।

পুলিসের মত হচ্ছে পায়রাদের খাদ্য সরবরাহকদের ধরা সহজ। কেউ খেতে দিলেই ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে তার কাছে উপস্থিত হবেই—আর পুলিসও সে ব্যক্তিকে ধরতে পারবে।

মেয়েদের ফুটবল দল

মেয়েদের ফুটবল খেলা যে সত্যিই মেয়েলী ব্যাপার নয় সেটা ইংলণ্ডে সংযুক্ত ম্যানচেস্টার কোরিন্থিয়ান-নোমাডস ক্লাবের খেলা থেকে প্রতীয়মান হয়।

বরং মেয়ে ফুটবল খেলোয়াড়রা পেশাদার পুরুষদের চেয়ে কষ্টসহিষ্ণু এবং মাঠেও তাদের আচরণ অনেক ভাল। ফুটবলে খুটেকো সবচেয়ে সফল ওই দুটি মহিলা

দলের ম্যানেজার, তিয়াত্তর বৎসর বয়স্ক পারসী অ্যাশলে এই দাবি করেন।

ওরা যে কি পরিমাণ কষ্টসহিষ্ণু সেটা ওদের এক টুরের সম্পর্কে মিঃ অ্যাশলের বিবরণ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এক শুক্রবার বিকেল চারটেয় মেয়েরা ট্রেনে ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়ে মাঝরাতে লণ্ডন থেকে জর্মানীগামী বিমান ধরার জন্য। বিমান থেকে নেমে এসেনে বাসে করে যাবার পথে আড়াই ঘণ্টা ওরা ঘুমিয়ে নেয়। তারপর বোশামে একটা ম্যাচ খেলে যেটা ড্র হয়।

রাত একটার মধ্যেই সেদিন শয্যা-গ্রহণ করে ভোর ছটায় উঠে আড়াইশ' মাইল দূরে স্টুটগার্টে আর একটি ম্যাচ খেলতে যায়। তারপর আবার দৌড় লণ্ডন ফিরতে ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়ে বিমান ধরার জন্য এবং লণ্ডন বিমানঘাঁটি থেকে বাসে ওরা ম্যাঞ্চেস্টার পৌঁছল সোমবার সকাল অটটায়।

তিন দিনে দু হাজার মাইল ঘুরে দুটি ম্যাচ খেলা মিঃ অ্যাশলে বলেন 'প্রভূত পরিশ্রমিক পায় এমন পেশাদার খেলোয়াড় ত আমার চোখে বেশী পড়ে না যারা এত পরিশ্রম সহ্য করে কিন্তু আমার দলের মেয়েরা হাসিমুখেই তা করেছে।'

তের থেকে সাতাশ বৎসর বয়স্কা চল্লিশ জন মেয়ের এই দল এত চমৎকার স্পোর্টস' যে রেফারীরাও ওদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিঃ অ্যাশলে বলেন, "আমাদের দলে কোন নায়িকাসুলভ বদমেজাজি কেউ নেই এবং রেফারীরা আমাকে জানিয়েছেন মেয়েদের ফুটবল খেলা পরিচালনা করা বড় আনন্দের কাজ।"

আর এই মেয়েরা খেলে কেমন? কোরিন্থিয়ান দল ৩১৬টি ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ২১৫টি খেলায় এবং ড্র হয়েছে ১৭টি ম্যাচ। ওরা মোট গোল দিয়েছে ২,১৫৫ এবং গোল খেয়েছে ৪০২।

নোমাড দলটি ১৯৫৭ সালে পর্তুগালে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য গঠিত হয় এবং ৫৮টির মধ্যে ৪৪টি ম্যাচে জয়লাভ করে, আর সাতটি খেলা ড্র ও সাতটিতে পরাজিত হয়। ওরা গোল দিয়েছে ৩১২ এবং খেয়েছে ৯৪।

এই দুটি দল চ্যারিটি বাবদ খেলে এ পর্যন্ত টাকা তুলেছে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে অর্ধেক প্রাপ্ত হয়েছে বিদেশে।

দেশে বা বিদেশে, খেলার জন্য ভ্রমণকালে এরা কঠিন নিয়মানুবর্তিতা পালন করে। কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেশা নয়, এক সঙ্গে পাঁচজনের কমে বেড়াতে বের হওয়া নয় এবং কেবলমাত্র বয়স্কা মেয়েদের ক্ষেত্রে রাতে একবার মাত্র সুরা পান।

দলের ম্যানেজার বলেন, "ওরা এই নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে কারণ, ওরা জানে, আমি এক কথার

এই বেতারবীক্ষণ-টেলিফোন ব্যবস্থায় অফিসের সেক্রেটারিদের আড়ালে ফাঁকি দেবার আর উপায় থাকবে না। লণ্ডনের হোটেলে বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক অফিস সরঞ্জামের এক প্রদর্শনীতে এটি দেখা যায়।

মানুষ। ওরা যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তা হলে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

'মৃত' থেকে জীবিত হওয়ার সমস্যা

'মৃত' বলে ঘোষিত হবার পর নিজেকে জীবিত বলে সরকারিভাবে স্বীকৃতি লাভ সহজ নয়।

আন্তোনিও উর্বিনার বাড়ি ফিরতে দেরি হল এবং তার বাপ-মাকে সেটা সে জানাতেও পারেনি।

তারপর দু সপ্তাহ পার হতে একদিন দরজা খুলেই তাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আন্তোনিওর মা অচৈতন্য হয়ে যান।

দু সপ্তাহ আগে যাকে মৃত বলে জেনেছেন, সেই আন্তোনিওই তো!

মেক্সিকোর অন্তর্গত সিউদাদ দেলিসিয়াসে উর্বিনার গ্রামের কাছেই এল পোরভেনির নামক এক স্থানে এক কৃষক যুবক লরি চাপা পড়ে মারা যায়।

দেহটা এমনি বিকৃত হয়ে যায় যে, লোকটি যে কে, তা চেনাই অসম্ভব হয়। তবে উর্বিনার যেহেতু ভাম্পিগো থেকে ফিরবার কথা ছিল, সে কারণ ওর বাপ-মাকে ডেকে আনা হয় নিহত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণে সহায়তা করার জন্য।

পোশাক, দুটো আঁচিল এবং দৈহিক গঠনে মিল থেকে রোরুদ্যমান বৃদ্ধ উর্বিনা দম্পতি মৃতদেহটি তাঁদের একুশ বৎসর বয়স্ক পুত্রেরই বলে সমর্থন করেন।

স্থানীয় বিচারপতি সানসেজ্জং রড-রিগোয়েজ্জং আন্তোনিও উর্বিন লরি দুর্ঘটনায় নিহত বলে সাব্যস্ত করে মৃতদেহটি কবরস্থ করার অনুমতি দেন।

তারপর আন্তোনিওর একেবারে সশরীরে আবির্ভাব! উর্বিনা পরিবারের সকলে প্রথমে ভয়ে হতবাক এবং সত্যিই সে জীবিত, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার আগে পর্যন্ত নানা সংশয় দেখা গেল।

শেষে আন্তোনিওর মা, কোন খবর না দিয়ে ফিরতে দেরি করার জন্য খুব একচোট বকাবকি করলেন।

কিন্তু বিচারপতি রডরিগোয়েজ্জংকে বিষম দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছে। তিনি বলছেন, "ওর বাপ মা সনাক্ত করার পর তবেই তো আন্তোনিওকে মৃত বলে সাব্যস্ত করে কবরস্থ করা হয়েছে।

"এখন ওকে সিভিল রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে সরকারিভাবে জীবিত বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে কি না।"

মৃতদের আবাসগৃহ

"মৃতদের হস্টেল"—শুনতে যতোই অদ্ভুত মনে হোক, হংকংয়ের এক দাতব্য হাসপাতাল পরিচালিত সত্যিই এমন একটি গৃহ রয়েছে, যেখানে সাড়ে সাত হাজার শব খাস চীনে প্রত্যাবসানের অপেক্ষায় রয়েছে।

মৃতদের শেষ ইচ্ছা অনুসারে শবদেহগুলি পাঠাবার সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু, তাদের আত্মীয় পরিজনদের অনেকে বলেন যে, গত দশ বছর ধরে অপেক্ষা করা সত্ত্বেও চীনা গভর্নমেণ্ট শবদেহগুলির প্রবেশের অনুমতি ঠেকিয়ে রেখেছে।

এই হস্টেলের একখানি ঘর সিলিং পর্যন্ত কফিন ঠাসা। শবদেহগুলিতে পচনরোধক ইঞ্জেকশন মাঝে মাঝে দেওয়া হয়। এই হস্টেলের মাসিক চার্জ হচ্ছে কফিন পিছু ২·৩৮ নয়া পয়সা।

তবে মৃত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠাবান কেউ হলে এবং যদি তার ধনী আত্মীয় থাকে, সেক্ষেত্রে তার জন্য একখানি স্বতন্ত্র ঘরই দেওয়া যেতে পারে বিশেষভাবে তৈরি প্রাইভেট উপগৃহে, যার মাসিক চার্জ হচ্ছে ২০·৮০ নয়া পয়সা।

এই রকম অসাধারণ "অতিথি" থাকে বলে হস্টেলের তত্ত্বাবধায়ক জনৈক মিঃ লি তুং মোটেই নার্ভাস নন।

প্রত্যহ প্রথম আলোকপাতের সঙ্গেই তার প্রথম কাজ হচ্ছে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে মৃতদের প্রেতাত্মাগুলোকে নৈশ বিচরণের পর স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া।

এমন একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, প্রেতাত্মাগুলি সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গেই দেহ থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর যেখানে যার কোন বন্ধু বা আত্মীয় পরিজন আছে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে যায়।

ওদের স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের জন্য ডেকে না পাঠালে, মিঃ তুংয়ের বিশ্বাস, ওরা বিপথগামী হবে।

যে কোনও রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে চর-প্রথা। এটি মানুষের সমাজের একটি আদিম প্রবৃত্তি। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে যেদিন, চর-বৃত্তির উদ্ভব হয়েছে সেইদিন। এর উল্লেখ পাওয়া যায় বেদ, বাইবেল ও পুরাণে; ইউরোপ ও ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে। ভারতে এর আধুনিকতম রূপ হচ্ছে অপরাধ অনুসন্ধান শাখা ও চারশাখা। যার অন্য নাম সি আই ডি ও আই বি।

ভারতে এই দুই শাখার প্রবর্তন হয়েছে এই শতকের একেবারে শুরুতে।

মুসলমান রাজত্বে এই দুই শাখার অস্তিত্ব ছিল সাম্রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর সংবাদ সরবরাহকারী একটি ব্যাপক প্রতিষ্ঠানরূপে। এ দেশের মুসলমান শাসকগণ রাজ্যশাসনে বাগদাদের খলিফাদের শাসনপদ্ধতির অনুকরণ করতেন। খলিফাদের শাসনব্যবস্থায় উন্নত এক সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সাম্রাজ্যব্যাপী গুপ্তচর ব্যবস্থার স্থান ছিল সর্বাগ্রে। এই ব্যবস্থাপনার প্রধানের নাম সাহিব-উল-বারিদ। এই সাহিব-উল-বারিদ একাধারে ছিলেন সাম্রাজ্যের পোস্ট-মাস্টার জেনারেল বা ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ আবার অন্য দিকে তিনিই ছিলেন সাম্রাজ্যের চার বিভাগের (ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ) প্রধান। তাই তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল—সাহিব-উল-বারিদ ওয়া আখবার। ব্যবসায়ী, ফেরি-ওয়ালা, পথিক-পর্যটক, এমন কি, বারাঙ্গনা মহিলারাও তখন গোপনে গোয়েন্দাগিরি করতেন। এই চারবিভাগ এতদূর দক্ষতা

শাসনকর্তা যখন সরকারী কাজে অবহেলা করে বাঁদী নিয়ে স্ফূর্তি করছেন, সে খবর স্থানীয় চর-প্রধানের মারফত বাগদাদের খোদ খলিফার কানে পৌঁছতে মোটেই দেরি হত না। একদা বাগদাদের খলিফা তাঁর এক অধীনস্থ শাসনকর্তা মিশরের ইবন্ তুলুনকে এমন একটি বস্তু উপহার পাঠালেন যা পেয়ে মিশরের আমীর তো একেবারে তাজ্জব! বস্তুটি ছিল সেই আমীরেরই ব্যবহৃত এক-পাটি জুতো যা তিনি ভুলক্রমে তাঁর রক্ষিতার গৃহে ফেলে এসেছিলেন! এ খবর এক খোদ আমীর আর তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারোই জানবার কথা নয়।

সাহিব-উল-বারিদ-এর উপর সাম্রাজ্যের

খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁর কাজ ছিল—যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সব সময়ই পুরো ওয়াকিবহাল করানো। সাধারণত সমাজের উচ্চশিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তিকেই এই পদে বহাল করা হত।

ভারতের মুসলমান শাসকগণই এ দেশে এই ধরনের চরপ্রথার আমদানি করেন। প্রাক্-মোগল যুগে এই চার-সংস্থার প্রধানের নাম ছিল বারিদ-ই-মুমালিক। তিনি চরের মারফত রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে ওয়াকিবহাল থেকে সুলতানকে সব খবর সরবরাহ করতেন।

প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সদরে একজন করে স্থানীয় চর-প্রধান থাকতেন, যাঁর কাজ ছিল সাম্রাজ্যের চার বিভাগের অধ্যক্ষকে নিয়মিত সংবাদ দিয়ে গোপনে পত্র পাঠানো। বারিদ বা চর-প্রধানের দায়িত্ব ছিল খুব বেশী। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী লিখেছেন, একবার কোন এক চরপ্রধান কোন এক প্রাদেশিক শাসকের কুকীর্তির খবর যথাসময় পেশ করতে না পারায়, সম্রাট তার গর্দান নিয়েছিলেন। চর-প্রধানের নজরের আওতায় পড়ত না এমন বিষয় খুব কমই ছিল। তার রিপোর্টে থাকত স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সাধারণ অবস্থার খবর, কৃষিকর্মের তথা কৃষককুলের অবস্থা-দুরবস্থার খবর। কাজেই দেখা যাচ্ছে মুসল-মান আমলে ভারতের চারসংস্থার কাজ এখনকার সি আই ডি বা আই বি-র চাইতেও অনেক বেশী ছিল।

বারিদ বা চর-প্রধানেরা সবরকমের খবর যোগাড় করতেন, তবে সেইগুলিকে যাচাই করে শ্রেণীবিভাগ করে সাজিয়ে তবে তা বিভিন্ন বিভাগে চালান দিতেন। এই সব সংবাদদাতা-দের বিশেষ নজর থাকত যে কোনও বিদেশীর প্রতি। তাঁদের রিপোর্টে

চেহারা-আকৃতি, পোশাক-আশাক, তাদের সঙ্গীসাথী বা অনুচরের সংখ্যা, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুজানোয়ারের সংখ্যা। তাদের প্রতিটি আচরণের প্রতি এরা খুঁটিয়ে নজর রাখত আর তার বিস্তৃত লিখিত বিবরণ দাখিল করত। বারিদ-এর কাজকে তখন খুব পবিত্র কর্মরূপে ধরা হত। অনেক সময় জনকল্যাণের খাতিরে শিক্ষিত লোকদের বাধ্য করা হত এই পেশা গ্রহণ করতে। ঘুষ নেওয়ার প্রলোভন থেকে দূরে রাখবার জন্য বারিদ-ই-মুমালিক আর তার অধীনস্থ বারিদদের পারিশ্রমিক দেওয়া হত প্রচুর পরিমাণে।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন স্থানীয় শাসনকর্তা কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করতে চাইতেন, মাত্র সেই ক্ষেত্রেই এই সংবাদ প্রতিষ্ঠান ব্যর্থকাম হত। বিদ্রোহী শাসন সে ক্ষেত্রে স্থানীয় চর-প্রধান বা বারিদকে মিথ্যা রিপোর্ট দিতে বাধ্য করত, নয়ত বার্তাবাহককে পথিমধ্যে হত্যা করাত, অথবা তার কাগজপত্র সব নষ্ট করে দিত। এ সব ক্ষেত্রে বারিদকে খবরাখবর পাঠাতে হত গুপ্তচরের মারফত।

বাস্তবক্ষেত্রে বারিদ ছিলেন একটি ব্যাপক গুপ্তচর সংস্থার প্রধান ও তাঁর অধীনে কাজ করত বিভিন্ন ধরনের গুপ্তচর। তাদের কেউ বা পর্যটক, কেউ বা ব্যবসায়ী আবার কেউ কেউ বা সাধু-সন্ন্যাসী বা ফকিরের ছদ্মবেশে বেসামরিক ও সামরিক জনসাধারণের মধ্যে অবাধে মেলামেশা করে তাদের সম্বন্ধে যাবতীয় বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করত। তাদের রিপোর্ট যেত ক্রমশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে খোদ বারিদ-ই-মুমালিকের কাছে। ইবনে বতুতা নামে একজন মরোক্কো-

ফকিরের বেশে ঘুরে বেড়াত গোপন সংবাদ সংগ্রহের আশায়

বাসী পরিব্রাজক মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এখানকার সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও গুপ্তচর বিভাগের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। যে কোনও উচ্চ বা নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারীর গৃহেই গুপ্তচর মোতায়েন রাখা হত। মহিলাদের হারেমে এই কাজে নিযুক্ত থাকত দাসী বা পরিচারিকারা। হারেমের ঘটনাবলী তারা জানাত জমাদারনী বা কর্তৃদার রমণীকে। সে আবার গিয়ে তা জানাত বারিদকে। এইভাবে সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রান্তের যাবতীয় খুঁটিনাটি খবরাখবর পেতেন। এই ব্যবস্থাটা এত সুন্দরভাবে চালু ছিল যে, সাম্রাজ্যের প্রতিটি কর্মচারীকে সব সময়ে সতর্ক হয়ে চলতে হত। সাম্রাজ্যের বাইরেও প্রায়ই গুপ্তচর পাঠানো হত প্রতিবেশী রাজ্যের গোপন সংবাদ আদায়ের জন্য। গুপ্তচর বৃত্তিতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক নিয়োগের একটা অনিবার্য কুফলও আছে। একজন মনীষী বলেছেন, "গুপ্তচর বৃত্তিকে সহ্য করা সম্ভব হত যদি তা সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা করানো হত।"

মোগল আমলে এই সংবাদ প্রতিষ্ঠান তথা চরপ্রথা সব চাইতে ব্যাপক, সুবিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত রূপ ধারণ করে। সারা সাম্রাজ্য জুড়ে এটা জালের মত শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যের গোটা সংবাদ সংস্থাটাই ছিল একজন দারোগা-ই-ডাক চৌকী বা ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ পোস্টমাস্টার জেনারেলের অধীনে। আধুনিক যুগের এই সংস্থা এখন চলে গেছে পুলিস বিভাগের অধীনে।

সে সময়ে চার রকমের সংবাদ সরবরাহকারী ছিল। যাদের সাধারণ নাম আখবারনবীস। (১) ওয়াকীনবীস, (২) সওয়ানীনবীস, (৩) খুফিয়ানবীস, (৪) হরকরা।

ওয়াকীনবীস হচ্ছে সাধারণত খবরদাতা। প্রাদেশিক বক্সী বা বেতনদাতা সেই প্রদেশের ওয়াকীনবীসের কাজও করতেন। তিনিই সেখানকার পরগনায় পরগনায় সংবাদদাতা নিযুক্ত করতেন। এইসব সংবাদদাতার কাজ ছিল তাঁর কাছে স্ব স্ব স্থানের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ পৌঁছানো। শহর, গুরুত্বপূর্ণ পরগনার সদর থেকে আলাদাভাবে সরকারী সংবাদদাতা নিযুক্ত হত। ওয়াকীনবীস তার অনুচরদের মোতায়েন রাখতেন

কিছু প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারের দপ্তরে বা কুঠিতে, কিছু দেওয়ান অর্থাৎ প্রাদেশিক আয়-ব্যয় বিভাগের প্রধানের দপ্তরে, আবার কিছু বা প্রাদেশিক সেনাধ্যক্ষ বা ফৌজদারের দপ্তরে, কিছু আবার কাজীর আদালতে ও কোতোয়ালের দপ্তরে—এইভাবে। এরাই তাঁকে সেসব জায়গার দৈনন্দিনের ঘটনাবলী জানাত। সেনাদলেও ওয়াকীনবীস থাকত। সেখান থেকে রিপোর্ট পাঠাত সেনাধ্যক্ষ মারফত। ওয়াকীনবীসের উপর নির্দেশ থাকত—কোন রকম সত্য গোপন না করে বা প্রধানদের ক্ষুন্ন না করে রিপোর্ট দেওয়া—আর রিপোর্ট দেবার আগে নিজেদের খবরগুলি ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া। ওয়াকীনবীস সাধারণত প্রতি সপ্তাহে এক বার করে রিপোর্ট পাঠাত। তার রিপোর্ট বাদশার দরবারে পাঠানো হত প্রাদেশিক ডাক প্রধানের মারফত। কোন কারণে প্রাদেশিক শাসনকর্তা সম্রাটের বিরাগভাজন হলে তার জন্য ডাক-প্রধানকেই দায়ী মনে করা হত ও ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার যত রাগ গিয়ে পড়ত তারই উপর। রবেবাক্ত সেপ্রিম একবার এক প্রাদেশিক ডাক-প্রধানের জামাত চাবুক ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর পিতার কাছে রিপোর্ট করার জন্য।

আওরংজেবের রাজত্বকালেও আমরা ওয়াকীনবীস আর প্রাদেশিক শাসনকর্তার মধ্যে অহরহ কলহ ও সংঘর্ষের বিবরণ পাই। ওয়াকীনবীসের বিবরণ প্রায়ই হত খুবে ঘটনাবহুল। যে কোন সাধারণ ঘটনা-দুর্ঘটনাও তাতে স্থান পেত। লাহোরের কাছে আকস্মিক ঝড়ের কবলে পড়ে কতিপয় পথিকের মৃত্যুর খবরও যেমন তাতে থাকত তেমনি থাকত অতি সাধারণ নগণ্য ঘটনা। যেমন কোথায় একটি অদ্ভুতদর্শন খচ্চরের জন্ম হল, সে খবরও বাদ যেত না।

সওয়ালানীনবীসের খবর হত আরও গোপনীয় ও জরুরী। ওয়াকীনবীস বা সাধারণ সংবাদ সরবরাহকারী প্রাদেশিক শাসক বা অনুচরদের প্রভাবে পড়ে তাদের জানানিতে তাদের বিরুদ্ধে ঠিকঠাক খবর দিতে সাহস না করতে পারে অথবা খবর চেপে যেতে পারে—এই আশংকায় এই সওয়ানীনবীস নামক গুপ্ত-সংবাদ সংস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই গুপ্ত সংবাদদাতারা নিজ নিজ প্রদেশে তাঁদের বৃত্তি গোপন রেখে বাস করতেন। তাঁদের রিপোর্টে শুধু সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধেই গোপনীয় রিপোর্ট থাকত না, যে কোনও ঘটনা তথা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধেও তাতে আভাস দেওয়া থাকত।

এইসব সওয়ানীনবীসদের কিন্তু যত্র-তত্র রাখা হত না। তাদের মোতায়েন করা হত বিশেষ বিশেষ সময় ও বিশেষ বিশেষ জায়গায়। তারা সপ্তাহে দুবার রিপোর্ট পাঠাত। তাদের নিযুক্ত করতেন প্রদেশের ভারপ্রাপ্তরাও অবশ্য।

আস্তে আস্তে যখন এদের উপর প্রদেশের ডাকবিভাগের কাজের তদারকির ভারও এসে পড়ল তখন আর এরা অপ্রকাশ্য রইল না—চার বিভাগের গোপন শাখা থেকে এরা নেমে এল সাধারণ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের স্তরে। এর ফলে একটি সত্যিকারের গোপন কার্যসংস্থার প্রয়োজন দেখা দিল।

খুফিয়ানবীস আর হরকরাদের নিয়ে এই গোপন কার্যসংস্থা গঠিত হয়। খুফিয়া-নবীস সত্যিকারেরই গোপন সংবাদদাতা। এরা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই সরাসরি গোপনীয় বার্তা পাঠাতে পারত খোদ বাদশার দরবারে।

ওয়াকীনবীস, সওয়ানীনবীস আর খুফিয়ানবীস—এই তিন শ্রেণীর সংবাদদাতা লিখিত সংবাদ পাঠাত, কিন্তু হরকরারা সাধারণত নিজেরাই গিয়ে দিত মৌখিক সংবাদ, কিন্তু কখনও কখনও তারাও লিখিত এত্তালা পেশ করত।

এরা বহাল হত রাজধানীতে হরকরাদের 'দারোগা' দ্বারা। এদের চরেরা প্রাদেশিক শাসকের দরবার ও অন্যান্য দপ্তরে নিযুক্ত হত। এরা প্রাদেশিক শাসককে স্ব স্ব এলা-

হরকরারা নিজেরাই এত্তালা দিত বাদশার দরবারে

কার ঘটনা ও অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখত আর তার কাছে খামে মোড়া চিঠি পাঠাত সম্রাটের দরবারে অন্যান্য ডাকের সঙ্গে যাবার জন্য।

উপরি উল্লিখিত চার শ্রেণীর সংবাদদাতার এত্তেলাই পৌঁছাত গিয়ে সদরে গোটা সাম্রাজ্যেরই ডাকবিভাগের অধ্যক্ষ আর গোটা সংবাদ সংস্থারই ভারপ্রাপ্ত উপরওয়ালার কাছে—যার নাম দারোগা-ই-ডাকচৌকি। তিনি সেগুলো না খুলেই পাঠিয়ে দিতেন প্রধান উজিরের কাছে। উজির সেগুলো পেশ করতেন বাদশার সমীপে। ওয়াকীনবিস বা সাধারণ সংবাদদাতার সংবাদ যেত মীর বক্‌শী ব সাম্রাজ্যের প্রধান বেতনদাতার হাত ঘুরে। ইটালীর পর্যটক মানুচ্চী লিখেছেন, ওয়াকীনবীসের রিপোর্টগুলি সম্রাটকে পড়ে শোনান হত রাত্রে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় এই প্রথা বদলে গিয়ে সংবাদ প্রকাশ্য দরবারে পড়ে শোনাবার রেওয়াজ চালু হল।

মোগল আমলের দারোগা-ই-ডাকচৌকির সঙ্গে বাগদাদের আব্বাস্‌বংশীয় খলিফাদের সাহিব-উল-বারিদ ওরা আখবার নামক কর্মচারীর সঙ্গে সব দিক দিয়েই যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ এঁরা উভয়েই ছিলেন একাধারে ডাকবিভাগ আর সংবাদবিভাগ তথা চারশালার উর্ধ্বতন কর্মচারী। এঁদের স্থান ছিল খুব উঁচে, বিশেষ করে সম্রাট আওরাঙ্গজেবের সময়ে। কারণ এই সম্রাট প্রাচীন পারসিক সম্রাটদের মত চরদের মনে করতেন নিজের চোখ-কান।

নগর আরক্ষা বা পুলিস বাহিনীর প্রধানের নাম ছিল কোতোয়াল। তার অধীনেও থাকত একদল চর যাদের কাজ ছিল নগরের প্রতিটি পল্লীর প্রতিটি আগন্তুক অতিথি ও বিদায়ী লোক সম্বন্ধে কোতোয়ালকে খবরাখবর জোগানো। কোতোয়াল এই সব রিপোর্টের সঙ্গে সেই সেই পল্লীর পাহারাদার চৌকিদারের রিপোর্ট মিলিয়ে দেখতেন। মানুচ্চী বলেন কোতোয়াল এই কাজে নিযুক্ত করতেন বাড়ির ধাঙড় ও ঝাড়ুদারদের। এরা সপ্তাহে দুবার করে প্রতিটি বাড়ি ঝাঁট দিত আর সেই সঙ্গে সংগ্রহ করে নিত সব রকমের খবরাখবর। সেইসব খবর তারা কোতোয়ালকে দিত। আর কোতোয়াল সেইসব খবর দিত বাদশাকে।

মোগল সম্রাটদের সংবাদ সংস্থা তথা চারশাখা ছিল খুব উন্নত। এরই সাহায্যে তাঁরা বিশাল সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত খুব সুনিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে তাঁদের গোপন সংবাদ সংস্থা—খুফিয়া-নবীস আর হরকরা, স্থানীয় শাসকদের আয়ত্তে রাখতে যথেষ্টই সাহায্য করত। স্থানীয় শাসকরাও এদের খুব ভীতির চক্ষে দেখতেন।

বহু ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মোগল সাম্রাজ্যের চার সংস্থার দক্ষতার প্রশংসা করে গেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর ওয়াকীনবীস-এর রিপোর্টের উপর নির্ভর করে গুজরাটের শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করেন। হকিন্স নামে এক ইউরোপীয় পরিব্রাজক দেখে অবাক হয়ে যান যে, তিনি কোন কারণে সুরাটের এত-দেশীয় লোকের কাছে যে দুর্ব্যবহার পান সে অভিযোগ তিনি সম্রাটের দরবারে পেশ করবার বহু আগেই সম্রাট তাঁর ওয়াকী-নবীসের মারফত সে খবর রাজধানীতে বসেই পেয়ে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছেন। মানুচি নামে আর এক-জন ইউরোপীয় পর্যটক লিখেছেন যে, আত্ম-গোপন করে থাকার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কি করে যেন কোতোয়ালের চরেরা তাঁর সম্পর্কে

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

আধুনিক

এক ভদ্রলোক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিতে বলেছেন—"আধুনিক গান সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল"। কথাটা নিরতিশয় অবজ্ঞাসূচক। আরও নানা পত্র-পত্রিকায় যে অভিমত প্রকাশিত হচ্ছে তাতেও এক মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এইরকম মন্তব্যের মধ্যে দায়িত্ব নেই কিন্তু কথা হচ্ছে 'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো।" আধুনিক গানকে যাঁরা চুটিয়ে নিন্দা করেন আধুনিক গান সম্বন্ধে তাঁরা কিছুমাত্র চিন্তা করেন কি? কখনো কি বুঝতে চেষ্টা করেছেন কেন এ গানের এই দশা এবং এ সম্বন্ধে কোন দায়িত্বশীল প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন কি?

এইরকম তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে একটা প্রধান শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতি অবমাননায় আমাদের উৎসাহ নেই কেননা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে আধুনিক গানের উন্নতি অর্থাৎ ভাল কাব্যসংগীত কিভাবে পাওয়া সম্ভব সেটা একটা কঠিন প্রশ্ন। কবি বা সুরকার চাহিদা অনুসারে যোগান দেন। এঁরা আসল [illegible]। আজ আমাদের ভাগ্য যেমন সুপ্রসন্ন নয় তাই এমন গীত দুর্লভ হয়ে পড়েছে যা যথার্থ সাহিত্য এবং সংগীতে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। কিন্তু এত বছর ধরে একজন গীতিকার এবং সুরকার যে এই সংগীত সৃষ্টি করে চলেছেন তার কি কোনও মূল্য নেই? এতখানি অশ্রদ্ধা মনে পোষণ করতে দ্বিধা হয়। আধুনিক সংগীত জগতে এমন কোন কো ব্যক্তিকে জানি যাঁদের সংগীত বোধ প্রখর। তাঁদের বিদগ্ধ বলতে দ্বিধা নেই। আধুনিক গায়ক গায়িকাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁদের সংগীতে অধিকার আছে। তাঁদের কণ্ঠ সম্বন্ধে অভিযোগ করা চলে না। এ কথাও অকপটে বলব যে কম হলেও কিছু আধুনিক গান মনকে আকৃষ্ট করে এবং এক একটি গান রীতিমত চমক লাগায়। অতএব একেবারে অযোগ্যতার ছাপ দিয়ে এতজনের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়াটা ঔদাসিকতার প্রশ্রয় প্রদান বলেই মনে করি। একথাও মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের পরে সংগীতে স্বকীয়তার ছাপ রাখা কঠিন না পারে। তবু চেষ্টা একটা চলেছে নিছক অনুসরণকে পরিহার করে নতুন ধরনের প্রবর্তনকল্পে। এই প্রয়াসকে অস্বীকার করা যায় না। এক সময় নিধুবাবুর মত গীতিকারও নিন্দিত ছিলেন। টপ্পা, পাঁচালীর গানকে একটা যুগে গান বলেই স্বীকার করত না। কিন্তু আজকে এইসব গানের উপর থিসিস লিখে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ ডক্টরেট অর্জন করছেন। টপ্পা, পাঁচালীর যুগেও বহু বাজে গান ছিল কিন্তু যুগের বিচারে কোনটা শ্রেষ্ঠ কোনটা নিকৃষ্ট তা নির্ধারিত হয়েছে। ঠিক এমনি করেই এ যুগকে পরের যুগে বিচার করবে এবং হয়তো এইভাবে একটা নির্বাচনের পর প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

আসলে আধুনিক গানের ওপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করিনি। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর নূতনতর সার্থক সৃষ্টির যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তা বোধ করি এখনও অনেকের ধারণায় আসেনি। বাংলার সুধীসমাজ যদি বর্তমান সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্যর পরিচয় দিতেন তাহলে আধুনিক সুরস্রষ্টা এবং গীতিকারগণ প্রেরণালাভ করতেন। কিন্তু, তারা জানেন রেডিও তাঁদের দিয়ে কেবলমাত্র শূন্যস্থান পূর্ণ করেন, গ্রামোফোন কোম্পানী সাধারণের হালকা চাহিদা মেটান আর সিনেমা কোম্পানী ততোধিক লঘুজনের সন্তোষবিধানার্থে তাঁদের নিযুক্ত করেন। গায়ক গায়িকাগণ জানেন সোসাইটিতে তাঁদের স্থান নেই। তাঁদের প্রয়োজনীয়তা পেশাদারি মিউজিকে আর বারোয়ারী অনুষ্ঠানে। এই পরিস্থিতিতে আধুনিক কাব্যসংগীত যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে কেমন করে? একসময় ছিল যখন কাব্যসংগীত যে রকমই হোক না কেন বাংলায় ব্যাপকভাবে গৃহীত হত। এই সমাদর ছিল বলেই কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মণ সব মহলেই অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। আজকের সমাজমনে সেই ব্যাপকতার অভাব দেখা দিয়েছে। সেই সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা আর নেই। এমনকি আমরা জানি কোনও কোনও রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ আকাশবাণীর কাছে এই মর্মে অনুরোধ করেছিলেন যে, রবীন্দ্রসংগীত যাঁরা গেয়ে থাকেন তাঁদের যেন আধুনিক গান গাইতে দেওয়া না হয়। এর উদ্দেশ্য আধুনিক গানকে বিদগ্ধ সমাজ থেকে বয়কট করা। কিন্তু এইরকম দলাদলির প্রশ্রয় না দিয়ে আমরা বর্তমান বাংলার সুধীসমাজের কাছ থেকে বাংলার কাব্যসংগীত সম্পর্কে সংগঠনমূলক উপদেশ এবং উৎসাহ দাবি করি। আকাশবাণীর একটি উপদেষ্টা

মণ্ডলী আছে জানি। তাঁরা থাকা সত্ত্বেও যদি এমন গান প্রচারিত হতে থাকে যা কাব্য এবং সঙ্গীত দু-দিক দিয়েই পঙ্গু তাহলে তাঁদের কর্তব্যপালনে ত্রুটি হচ্ছে এইটাই আমাদের ধারণা করতে হয়। বেতার কর্তৃপক্ষকে আর একটি অনুরোধ আমরা করব। "আধুনিক"—এই আখ্যাটি তাঁরা পরিহার করুন এবং এর পরিবর্তে "কাব্য-সঙ্গীত" আখ্যাটি ব্যবহার করুন। যে আখ্যার কোন সার্থকতা নেই তার প্রয়োগ অযৌক্তিক।

বাংলার সঙ্গীতসম্পর্কিত গৌরবরক্ষা করতে হলে বর্তমান সঙ্গীত যাতে সার্থক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কঠিন সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না কিন্তু হিতচিন্তাও সেই পরিমাণেই প্রয়োজন। যাঁরা আধুনিক কাব্যসঙ্গীতে মননশীলতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁদের বলব তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে চলুন। যাঁরা পতাকা তুলে ধরেন তাঁদের পতাকা বহন করবার শক্তির অভাব হয় না। কাব্যসঙ্গীত যেন কাব্য এবং সঙ্গীতে যথার্থই সার্থক হয়ে ওঠে।

নিউ এম্পায়ারে রবিশঙ্কর

গত ১লা জুন নিউ এম্পায়ারে স্বনামধন্য রবিশঙ্করের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি মারোয়া, ইমন-মাজ দরবারি কানাড়া এবং পাহাড়ী ধুন বাজিয়ে শোনান। আমাদের শাস্ত্রে শিল্পী তথা বাগ্গেয়কারের যে গুণ-গুলি দেওয়া আছে তা তাঁর মধ্যে প্রচুরভাবে

পণ্ডিত রবিশঙ্কর
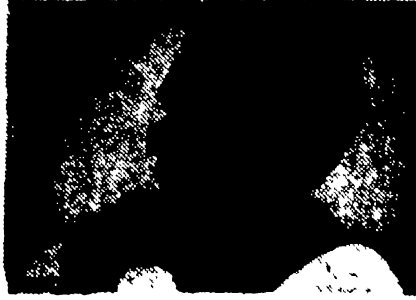
বর্তমান। বাদনচাতুর্য এবং দক্ষতর সঙ্গে পরম তৃপ্তিদায়ক মিষ্টতার মধুর সমন্বয় তাঁর অনুষ্ঠানকে সার্থকতা প্রদান করেছে। তাঁর সম্বন্ধে অধিক উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবলায় কানাই দত্ত কুশলতার পরিচয় প্রদান করেছেন। রবিশঙ্কর Edinburgh Music Festival-এ যোগদান করছেন। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

একটি চিঠি

রাগরাগিণীর ধ্যানমূর্তি

মাননীয়েষু,

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের দেশ পত্রিকায় "গানের আসর" বিভাগে শার্ঙ্গদেব একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

সঙ্গীতরস পরিপূর্ণভাবে অনির্বচনীয় ও নির্বিশেষ; কোনও প্রত্যক্ষ অবজেকটিভ ও স্ট্যাটিক মাধ্যম দিয়ে তার গহন অন্ত-র্লোক প্রকাশিত করা কিম্বা কোন স্থায়ী পরিকল্পিত কৃত্রিম রূপায়ণের দ্বারা তার অতলান্ত রসজগৎকে সম্ভোগ করা—এ যেন কোনও গাণিতিক মানস জটিলতার ব্যাপার; ভাববিগলিত সুরের রসমধুর ব্যঞ্জনাকে অস্বীকার করা। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে রাগরাগিণীর যে পরি-কল্পিত দেবময় মূর্তি তাকেই যদি "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" বলে ধরে দেওয়া হয় তাহলে সঙ্গীতের রসমধুর ভাবব্যঞ্জনার উপর অপ্রত্যাশিত যান্ত্রিক আঘাত করা ভিন্ন আর কিছু করা হয় না। আমাদের মানস গহনে সঙ্গীত যে প্রবহমান ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করছে তাকে কোন নির্দিষ্ট স্ট্যাটিক প্রত্যক্ষ কোন কিছুর দ্বারা নিটোলভাবে রূপায়ণ করতে যাওয়া স্থূল মনেরই পরিচয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানেই আর্ট ও নন্দনতত্ত্বের কথা এসে পড়ে। একটি সাবজেকটিভ ও অন্তর্লীন ভাবগহন রসমাধুর্যকে অবজেকটিভ কোন মাধ্যম দ্বারা পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত করতে গেলে তাতে সেই সাবজেকটিভ রসমাধুর্যের মৌল ভাব-গহনতাকে খর্ব করা হয় নাকি? বিশেষ করে সংগীতের মত অতলান্ত ভাবগহন একটি সাবজেকটিভ আর্ট? এ প্রশ্ন বিশেষ করে তাঁদের কাছে যাঁরা রাগমালাচিত্রের পরিকল্পনাকে সঙ্গীতে প্রবেশ করিয়ে সঙ্গীতের দার্শনিক প্রতিষ্ঠার সমৃদ্ধি সাধন করতে চান। আর একথা অত্যন্ত সত্য, রসকে আমরা রূপ দিয়ে কতটাই বা ব্যাখ্যা করতে পারি বিশেষ করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধ্যানতন্ময় চিন্ময়, সান্দ্র সেই অনির্বচনীয় মিস্টিক রস?

—নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, রামপুরহাট।

দ্রুণাঙ্করে

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৫শে'র 'দেশ' পত্রিকায় 'দ্রুণাঙ্করে' পড়ে কয়েকটি কথা মনে হয়েছে। প্রসঙ্গটা ইংরেজ কবি ওঅর্ডস্বর্থ সম্পর্কে। আমার মনে হয়, লেখক কবির প্রতি একটু অবিচার করে ফেলেছেন। প্রথম কথা—লেখক বলেছেন, ওঅর্ডস্বর্থ প্রকৃতির সোচ্চার সুখ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার কাহিনীকে নিশানের ডগায় পতপত করে ওড়াতেই তিনি পছন্দ করতেন। মূক সুখ উপলব্ধি করতেন না।

এ ক্ষেত্রে আমার প্রথম কথা হল, যিনি কবি তিনি যখনই তাঁর সুখের কথা, উপলব্ধির কথা বলতে যাবেন, তখনই তো তিনি মুখর হয়ে উঠবেন. আর তখনই মনে হবে, তাঁর সুখ আর মূক রইল কই! একমাত্র Mute inglorious Milton যাঁরা তাঁরাই পারেন মূক সুখকে মূকই রেখে দিতে। কিন্তু যাঁরা mute Milton নন, তাঁরা তো মুখর হবেনই। রবীন্দ্রনাথও তো মূক সুখ বলতে গিয়ে মুখর হয়েছেন। হাক্সলি সাহেব ওঅর্ডস্বর্থকে কংগোর জঙ্গলে নিয়ে যেতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির ভীষণ রুদ্র রূপকেও তো ওঅর্ডস্বর্থ বাতিল করেননি। Ruth ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। ওঅর্ডস্বর্থের এই কবিতাটি পড়লে বোঝা যায় তিনি প্রকৃতির নখদাঁত, অস্লো-কাস্লোকেও অস্বীকার করতে পারেননি।

দ্বিতীয় কথা—লেখক Prelude-এর একটি ঘটনা তুলে বলেছেন কবি প্রকৃতিতন্ময়গত নয়, ভীত (যে জায়গায় বর্ণনা আছে, তিনি অনুভব করছেন, পাহাড় তাঁকে তাড়না করছে)। তবে এখানেও দেখতে হবে যে এই অনুভূতি তাঁর অপরিণত বয়সের। এক অপরিণত বালকের এই ধরনের অনুভবকে ভীতি বলতে পারা যায় হয়ত কিন্তু এই ভীতির মধ্যে দিয়েই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তর্নিহিত রূপটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। প্রকৃতি-তন্ময়গত বালকেই তো ভাবতে পারে যে, পাহাড় তাকে তাড়না করছে। সেই বয়সের এই অনুভব তো প্রকৃতিময়ই। এখানে তিনি সান্ধ্য-ভয়ংকরতায় পীড়িত না হয় বরং সম্পৃক্ত। ইতি—

শ্রীমনুজেশ মিত্র
সিউড়ী, বীরভূম।

চেঙ্গিস খাঁর সমাধি

সবিনয় নিবেদন,

১০ই জ্যৈষ্ঠের 'দেশ' পত্রিকায় "চেঙ্গিস খাঁর সমাধি" প্রবন্ধটি থেকে মনে হলো লেখক মাও সে-তুং-এর চেঙ্গিস-ভক্তির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে পারেননি। চেঙ্গিস খানের জন্মস্থান বহির্মঙ্গোলিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খেনতাই পর্বতমালার এলস্ত বর খনিজ ঝরনার নিকট। এই অঞ্চলটি স্বাধীন বহির্মঙ্গোলিয়ার অন্তর্ভুক্ত, চীনের অধিকারভুক্ত অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় অবস্থিত নয়। মঙ্গোল জাতির প্রধান পুরুষ চেঙ্গিস খান। বর্তমান বহির্মঙ্গোলিয়ায় চেঙ্গিস খানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। আমার মনে হয় বহির্মঙ্গোলিয়া হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের মঙ্গোলদের প্রীতিভাজন হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মাও সে তুং চেঙ্গিস-পূজোর আয়োজন করেছেন। রুশ-প্রভাব হতে বহির্মঙ্গোলিয়াকে টেনে আনার জন্য এটি তাঁর বহু চালের অন্যতম। চেঙ্গিস খান সম্বন্ধে চীনাদের যে জাতবিদ্বেষ আছে, বর্তমানে চীনা সরকারী তরফ থেকে সুবিধাজনক-ভাবে তা চাপা দেওয়া হয়েছে, এটাই নতুনত্ব।

ভারতে চেঙ্গিস খানের সম্বন্ধে প্রবল ঘৃণার সম্ভাব্য মূল হলো এ দেশে বহুল-প্রচলিত পারস্য সাহিত্য। মানব-ইতিহাসে চেঙ্গিস এক বিপ্লব, এজন্য ব্যক্তিগত নিন্দায় লাভ নেই। মধ্য এশিয়ার স্টেপস্ অঞ্চলে ও তুরানের মালভূমি দিয়ে সুদূর প্রাচ্যে পৌঁছাবার জন্য অনেক অভিযানই পরি-

বিদুর

জীবনচরিত

একজন বিদেশী লেখকের সঙ্গে মাস কয় আগে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল: তিনি কোনো একটি বই-মেলা দেখেছিলেন দিন কয়েক আগে। প্রসঙ্গত বললেন, 'আপনাদের লেখকদের কোনো ছবি দেখতে পেলাম না বইয়ের মেলায়। এখানকার সাধারণ মানুষ কি লেখকদের ছবি দেখতে চায় না?' কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করলাম, তারপর নিতান্ত ঠাট্টার সুরে বললাম, 'আজ্ঞে না। তারা মন্ত্রীদের ছবি দেখতেই অভ্যস্ত।' বিদেশী ভদ্রলোক রসিকতাটা কতদূর উপভোগ করলেন জানি না। পরে বললেন, 'আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আপনাদের সংস্কার কিংবা লজ্জা আছে।' প্রায় পরাজয় ঘটলে মানুষ যেমন বেখাপ্পা কাজ করে বসে, আমিও সেইরকম এক অদ্ভুত কথা বলে বসলাম, বললাম, 'আমরা ভারতীয়, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমরা সবই মায়া মনে করি। সামান্য ছায়া রেখে বা কি সুখ, বলুন।'

কী জানি কেন হাস্য-পরিহাস দ্বারা সেদিন কথাটা চাপা দেওয়ার যতই না চেষ্টা করে থাকি, একটি মহৎ সত্য তাঁর কথার ইঙ্গিতে লুকোনো ছিল। পরে কথা প্রসঙ্গে সেটা অনুমান করে নিয়েছি। আর আপাতত বিশেষ প্রয়োজনে কোনো একজন বিগত লেখকের সম্পর্কে জানতে গিয়ে বুঝলাম, আমাদের সংস্কার এবং লজ্জা নিজেকেও নিজে দেখতে দেয় না, লুকিয়ে রাখে।

আমাদের সাহিত্যে জীবনচরিত ও আত্মজীবনীর এত যে অভাব তার অন্যতম কারণ এই আত্মগোপনের ইচ্ছা ও অভ্যাস। অন্যান্য কারণও আছে অনেক—যেমন পাঠকদের জীবনী-সাহিত্য পাঠে অনিচ্ছা, প্রকাশকদের পুস্তক প্রকাশে অনাগ্রহ ইত্যাদি—কিন্তু পূর্বোক্ত কারণ যে সবচেয়ে প্রধান কারণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জীবন-চরিত কি আত্মজীবনী, বা স্মৃতি-কথা ইত্যাদির মূল্য আমরা একেবারে দিই না এমন নয়। আমাদের বাংলা দেশে সাধু-সন্ত ধর্মপ্রচারক-বাবা-মায়েদের জীবন বিষয়ে কত যে গ্রন্থ লেখা হয় তা কল্পনার অতীত; কত যে শিষ্য-সংবাদ ছাপা হয়, কত যে গুরুবন্দনা গীত হয় একমাত্র কোনো পত্রিকা দপ্তরই তা জানেন। ধর্মীয় সীমানার বাইরে ওই ধরনেরই কিছু জীবন-কথা পাওয়া যাবে অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু তার অধিকাংশই হয় স্তুতিগীতি না হয় আত্মগীতি।

আমরা, যারা সাধারণ পড়ুয়া যাদের উৎসাহ পুরাবিদ্যায় নয়, যোগবিদ্যায় নয়, যারা সাহিত্যিক বা শিল্পীদের ও কীর্তিমানদের জীবন বৃত্তান্ত পড়তে আগ্রহী তারা বস্তুত বঙ্গভাষায় কি পাই? পাঁচ সাত কি বড় জোর দশটি বই। তাও অধিকাংশ বয়সে প্রাচীন হয়ে এল। অথচ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, শুনেছি, আত্মকথা ব্যক্ত করার রেওয়াজ কিছু কিছু ছিল।

মাঝে মাঝে এ বিষয়ে কোনো কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর সঙ্গে যে কথা না হয় এমন নয়। কিন্তু আশ্বাস দেবার মতন বাণীও তাঁদের মুখে ফোটে না। জগতের অধিকাংশ সভ্য দেশে, সাহিত্যের চর্চা চলছে এমন ভূখণ্ডে নিতান্ত দীন লেখকেরও ক্ষীণ একটি জীবনী পাওয়া যায় সচরাচর; অত্যন্ত মাঝারি লেখকের জীবন ও সাহিত্য, অথবা শুধুমাত্র জীবন অবলম্বন করেই দু একটি বই লেখা হয়েছে এ তো স্বাভাবিক ঘটনা। আর লেখক যদি উচ্চ শ্রেণীর হন তবে তাঁর নিজের লেখা বইয়ের সংখ্যাকে ছাপিয়ে যায় তাঁর উপরে লেখা বইয়ের পরিমাণ।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী ও জীবন-চরিত জাতীয় গ্রন্থের দীনতা যে কী অবিশ্বাস্য রকমের তা বর্ণনা করা যায় না। আর এও সত্য, আত্মজীবনী লেখা বলতে আমরা যা বুঝি তা নিছক আত্ম-তুষ্টি জীবনী গ্রন্থ লেখা বলতে যা দেখি তা নিতান্ত থিয়েটারের বক্তৃতার সীন আঁক।

ধরে নিতে হবে, কোনো মানুষ সাধারণ থেকে কোনো কোনো বিশেষ দোষে গুণে কিছুটা পৃথক হয়ে গেলে তার সম্পর্কে সাধারণত একটা কৌতূহল জাগে। পাকা চোর বিখ্যাত গুণ্ডা এদের সম্পর্কে আমাদের যে নীচু শ্রেণীর কৌতূহল, মাঝারি লেখক বড় গাইয়ে তাঁদের সম্পর্কে আমাদের সে শ্রেণীর কৌতূহল হয় না অবশ্য, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কৌতূহল হয়। অধম কৌতূহল কেবল মাত্র কৌতূহল উত্তম কৌতূহল তা যা মানুষকে অন্য একটি বিশেষ অনুভূতি দেয় কৌতূহল নিবৃত্তির পরও অন্য স্বাদ। এ-স্বাদ নানা ধরনের হতে পারে, কখনও দুঃখের কখনও সুখের কখনও বা বিহ্বলতার।

শেলীর বিখ্যাত জীবন-কাহিনীটি অধিকাংশ শিক্ষিত পাঠকই পড়েছেন, কিন্তু এই জীবনী পড়ার যে স্বাদ বায়রণের জীবনী পড়ার সে স্বাদ নয়। উভয় গ্রন্থই অবশ্য পাঠের আনন্দ দেয়, কিন্তু পাঠের আনন্দের কথা আমি বলছি না, বলছি পাঠকালে ও পাঠশেষে পাঠকের মনোভাবের কথা। ব্যক্তিগত ভাবে বায়রণের জীবনী আমায় অনেক বেশী আকৃষ্ট করেছিল। বছর দুই আগে প্রায় একই সাথে দুটি জীবনী পড়েছিলাম, একটি বালজাকের, অন্যটি সুরকার ম্যান্ডেলসনের। বালজাকের জীবনী আমায় বার বার একটি অসহায় শিশু ও সেই শিশুর দৈত্য-সুলভ জীবন-স্পৃহার কথা ভাবাত, আর ম্যান্ডেলসনের জীবনী যেন উদারহৃদয় বন্ধুবৎসল কোনো শিল্পীর সংগীতাবেগের কথা মনে করাত।

আত্মজীবনী বলি, কি জীবনচরিতই বলি—এই জাতীয় গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বড় মূল্য এগুলি জীবন্ত, এগুলি শুধু মাত্র একটি মানুষকে কনে দেখানোর মতন করে প্রকাশ করে না—সেই মানুষটির পূর্ণাঙ্গ জীবনকেই প্রকাশ করে। কথাটা 'পূর্ণাঙ্গ'; —না বলে দিলেও বুঝে নিতে নিশ্চয় পাঠকের কষ্ট হবে না যে, এই শব্দটির অর্থ কি।

আমরা যখন সাধুসন্তদের কাছে যাই পুণ্য কথা শোনার পিপাসা নিয়েই যাই। তা সত্ত্বেও অনেক সময় অনেক গুণবান সাধু পুণ্যকে প্রকাশ করার জন্যে পাপের কথাও বলে থাকেন কেননা জীবনের শিক্ষাগুলি নিখাদ সোনা হয়ে ওঠার আগে মালিন্যাক্ত পুড়েছে বই কি। শিল্পী সাহিত্যিকের জীবনে স্বভাবতই আশা করা যায়, জীবনের এই আলোছায়া সাদাকালোর রূপটি আরও তীব্র, আরও তাৎপর্যময় হয়ে দেখা দেবে। অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই সম্ভব যে একটি লেখকের জীবন তরী শান্ত নদীতে নির্বিঘ্নে বয়ে যায় নি তাকে ঘাটে ঘাটে থামতে হয়েছে ভাঙতে হয়েছে পেতে হয়েছে হারাতে হয়েছে। অভিজ্ঞতা আলাদীনের প্রদীপ নয় বলে আমার বিশ্বাস তাকে হুট করে হাতের কাছে পাওয়া যায় না চলতে চলতে একটু একটু করে কুড়িয়ে নিয়ে পুঁজি বাড়াতে হয়। অথচ হালে এমন একটি আধা আত্মজীবনী দেখেছিলাম যাতে মনে হল লেখক কখন কোন বইটি লেখার পর কত লোক তাঁকে পিঠ চাপড়েছেন তারই বিবরণ—শুধু তারই বিবৃতি যেন।

আমরা সকলেই সমাজের কাছে পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ে থাকতে চাই, কোনো নিন্দা যাতে স্পর্শ না করে তেমন করে জীবনী তৈরী করে নিয়ে লিখি, অন্তরকে কাঁথা কম্বলে মুড়ে চিলে কোঠায় রেখে এসে ধ্যানীবেশে জীবনী লিখি। সাচ্চা সন্তরাও সেই জীবনের কাছে হার মেনে যাবে। অপাপ-বিদ্ধ কিশোরীও সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কাছে লজ্জা পাবে।

এসব কেন যে করি তার আসল কারণ বিদেশী বন্ধুটিই ইঙ্গিতে বলে দিয়েছিলেন, 'নিজের চেহারা দেখতে আমরা লজ্জা পাই, তাই গোপন করি।'

* পুস্তক পরিচয় *

দেহ-মনের সমস্যা : একটি সার্থক উপন্যাস

এই দাহ। গৌরকিশোর ঘোষ। পরিবেশক : মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুর্য্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ : সাড়ে তিন টাকা।

রুচিবাগীশরা বলেন দেহটা স্থূল, সৌন্দর্য মনে। কিন্তু দেহকে বাদ দিলে মনের অস্তিত্ব কোথায়? মন তো দেহাশ্রয়ী; তার জ্বালা আছে। এটি নিতান্তই জৈবিক সত্য। তাকে গোপনে লুকিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা তো সত্যকেই অস্বীকার করা।

সেই সত্যকে এড়াতে গিয়েও পারেনি গোলক, এই কাহিনীর নায়ক—যে যক্ষ্মা-হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে শিল্পকে নিয়েই ভুলে থাকতে চেয়েছিল। পারেনি, তার কারণ মনোরমা। গোলক একা। মনোরমাও একা। অজস্র অর্থব্যয় করে যক্ষ্মাক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়েছেন মনোরমার স্বামী। আদর যত্নের ত্রুটি নেই। কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপনে মনোরমা সমর্থ এ বিশ্বাস তার নেই। মনোরমার দেহের দাবিকে তাই তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। এইখানেই গোলকে আর মনোরমার নৈকট্য।

গোলক মনোরমার জন্য সব নিয়ে তৈরী। কিন্তু মনোরমা তাকে কেবল দেহছাড়া কিছু দিতে পারে না। তার মনের রাজ্যে আছে স্বামীর ছায়া।

অথচ দেহকে যে নিতান্ত দেহ ছাড়া আর কিছু মনে করবার সুযোগ পায়নি সেই চারুলতাই নিয়ে এলো গোলকের কাছে জীবনের নতুন স্বাদ, ভালবাসার নতুন আকাশ। নতুন এক প্রত্যয়ের অস্তিত্বে অবগাহন করেছিল চারুলতা গোলকের বাড়িতে চাকরি করতে এসে। অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ের সামগ্রী দেহের মধ্যে এই প্রথম একটা মনকেও খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু সে ক্ষণস্থায়ী। মনোরমার দেহের দাহে পুড়ল চারুলতার নতুন বিশ্বাস গোলকের নীড়ের স্বপ্ন। তারপর বোধ হয় আর কিছুই থাকে না। অন্তত চারুলতার তাই মনে হয়েছে। না হলে স্বপ্নভঙ্গের পর বিয়ের কনে সেজে সে আত্মহত্যা করবে কেন? কোন্ দাহ জুড়াতে ক্লোরোফর্ম্-এর শিশি গোলক উপুড় করে দেবে নিজের গলায়? তার দেহের দাহ তো মিটিয়েছিল মনোরমা। তবে এ কোন্ দাহ জুড়োবার ডাক অন্ধকারে হাতছানি দিল গোলককে?

দেহের দাহকে ছাড়িয়ে আর একটি এষণা সোচ্চার হয়ে উঠেছে এই কাহিনীর সমাপ্তিতে। এই এষণাই কাহিনীকে বিশেষ এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দেহের অস্তিত্বকে স্বীকার করেও, স্বীকার করেই, আরও এক দাহ মনকে দগ্ধ করে। সে দাহ মনের সে দাহ ভালবাসার। দুঃসাহসিক নৈপুণ্যে সেই যন্ত্রণার ইঙ্গিতটি দিতে পেরেছেন বলেই গৌরকিশোর ঘোষের এই কাহিনী সার্থক।

৩৩৭।৬২

গল্পগ্রন্থ

সুধা হালদার ও সম্প্রদায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা—৬। তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

দুটি বড় ও দুটি ছোট গল্পের সমষ্টি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই নতুন গ্রন্থ। যে-সব গুণের জন্য নরেন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র—নিরাভরণ সারল্য, অকুণ্ঠ বিষয় নির্বাচন ও স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে অসাধারণ তাৎপর্য আবিষ্কার এবং চরিত্রগুণের প্রাচুর্য—প্রতিটি গল্পেই তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তবে গল্পগুলি (সম্ভবত) একই সময়কালে রচিত নয়; ফলত, 'বিলম্বিত লয়' গল্পের—নাটকীয় ঘটনা প্রাধান্যের সঙ্গে 'ঝড়ের পরে' গল্পের সরল মাধুর্যের প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে। তুলনামূলক বিচারে 'ঝড়ের পরে' এই সংকলনের সেরা ও সর্বাধিক সার্থক রচনা।

"সুধা হালদার ও সম্প্রদায়" গল্পটি সুধা

ও পত্নেরের দাম্পত্য জীবনের বিবরণ রয়েছে; সুখদুঃখ ও প্রেমের মধ্যে কোনোরূপ আকস্মিকতার প্রকোপ ঘটেনি বলেই সুন্দর। 'বিলম্বিত লয়', আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ঈষৎ মেলোড্রামাটিক। এই গল্পটিও দাম্পত্য জীবন-নির্ভর, যে-জীবনের ব্যর্থ পরিণতি পাঠককে মুহ্যমান করে তোলে। প্রেমের আকর্ষণে মৃগাঙ্ক ও অদিতির মিলন ঘটল; কিন্তু সেই আপাতমধুর জীবনে বিচ্ছেদ ডেকে আনলো তাদের শিল্পৈষণা, সে-বিচ্ছেদ করুণ ও ক্লেদাক্ত। গল্পের শেষে পুনর্মিলনের ইঙ্গিত থাকলেও তা নতুন কোনো উদ্দীপনার সঞ্চার করে না। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এই গল্পের ঘটনা সংস্থাপনের অন্যমনস্কতা পাঠককে বিস্মিত করে। 'কয়েক মাস বাদে হাসপাতালে একটি মৃত মেয়ে প্রসব করে এডিথ মারা গেল' (পৃঃ ৯৬), লেখকের এই ঘোষণার পরেও ১০২ পৃষ্ঠায় চোখে পড়ে 'মেয়েকে দেখবার জন্যে একটি বুড়ি আয়াকে রেখে দিয়েছে মৃগাঙ্ক!' এই অসতর্কতায় গল্পের কোনো ক্ষতি হয়নি ঠিকই; কিন্তু পাঠক কিছুটা বিমূঢ় হতে বাধ্য।

'ঝড়ের পরে' গল্পে নন্দলালের আকস্মিক মৃত্যুর পর বিপদগ্রস্থ পরিবারে শক্তিপদের আগমন ও তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। শক্তিপদের অভিজ্ঞতা যে-কোনো মানুষের অভিজ্ঞতা, তা যেমন করুণ, তেমনি স্নিগ্ধ। এমন মানবিক গুণসমৃদ্ধ রচনা আজকাল খুব কমই চোখে পড়ে।

১২০।৬৩

এমন দিনে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। ৩·৭৫ নঃ পঃ।

সকল দেশেই সব কালেই এমন কয়েকজন লেখক থাকেন যাদের হাতে গল্প-রস স্বতঃস্ফূর্তভাবে জমে ওঠে, অন্তরঙ্গ প্রসাদগুণে বিষয় নির্বিশেষেও প্রতিটি গল্প হয়ে ওঠে সুখপাঠ্য। এবং উপভোগ্য। বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শ্রেণীর লেখক; রম্যতা ও সুখপাঠ্যতা তাঁর রচনার অন্যতম গুণ। পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর জুড়ি অল্প। তা ছাড়া ছোট গল্পের মধ্যে অনেকেই আজকাল স্বীকার করতে প্রস্তুত, গল্প-বস্তুটা প্রধান নয়, আসল কথা চরিত্র-চিন্তা। মানবচরিত্রের জটিলতা রহস্যময় অংশকে আকস্মিক পরিবেশ-প্রতিক্রিয়ার নিকষে যাচাই করে দেখাই ছোট গল্পের লক্ষ্য। শরদিন্দুবাবু মানবচরিত্রের এই জটিল অংশের জট খোলাতে সিদ্ধহস্ত।

"এমন দিনে" গল্পগ্রন্থের মধ্যে দশটি বহুরূপী গল্প আছে। গল্পগুলির প্রত্যেকটিই যে সার্থক ছোট গল্প হয়ে উঠেছে এবং একটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হবার পক্ষে যে অপরিহার্য ছিল, এমন নয়।

শুধু নায়কদের সাহায্যে যে পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা লেখক করেছেন তাতে সবগুলিই মামিয়ে গেছে। সাক্ষী, পতিতার পত্র, সুত-মিত-রমণী এই তিনটি গল্প এর মধ্যে অবিস্মরণীয়। ২৮৬।৬২

কবিতা

মৃত্যুহীন জন্মহীন। আশিস সান্যাল। সম্প্রতি প্রকাশনী, সালকিয়া, হাওড়া। দু' টাকা।

অন্য দ্বীপ : দ্বীপান্তর। শেখর নাহা। মানস প্রকাশনী, কলিকাতা-৬। দেড় টাকা।

দুজন তরুণ কবি। এ'দের মধ্যে আশিস সান্যাল কিছুটা পরিচিত, ইতস্তত পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে। পৃথকভাবে শেখর নাহার কবিতা বর্তমান সমালোচকের চক্ষুগোচর হয়নি; সম্ভবত এই শীর্ণকায় কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। মোটামুটিভাবে দুটি গ্রন্থই সুখপাঠ্য।

কিন্তু শুধুমাত্র সুখপাঠ্য হওয়ার মধ্যে বোধ হয় সাম্প্রতিক কবিদের গুণপণা ধরা পড়ে না। 'কবিতাকে স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষপাতী'—কবি আশিস সান্যালের চর্চার উদ্দেশ্য যদি এই ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনের মধ্যেই নিহিত থাকে, তাহলে বলা যায় তিনি সফল হয়েছেন। তাঁর কবিতা সরল ও নির্ভার--এক্সপেরিমেন্টের কোনো প্রয়াস নেই, এবং এইসব কারণেই 'স্বাভাবিক।'

শেখর নাহার কবিতার ধরন আলাদা। ছন্দ নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবেননি; প্রায়ই গদ্যে লেখা তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে উজ্জ্বল হবার প্রয়াস চোখে পড়ে। বিষয়ের নির্বাচনে ও পংক্তি রচনায় তিনি অত্যন্ত স্মার্ট। এবং এখনো তাঁর কাব্যচর্চা কৌতূহলের ঊর্ধে উঠতে পারেনি বলে কবিতাগুলি যুগপৎ তীব্র ও এলানো, ভারসাম্যের অভাব বড় বেশি চোখে পড়ে।

কিছু কিছু অংশ যেমন:

> ছেলে জুটেলো অনেক।
> হলেও মড়া শরীরটাতো
> আঠারো বছরের।'

কিংবা 'সিঁদুরটা বাড়ে হবচ
অতএব কৃষ্ণচূড়ার রঙেই চলুক।'

পড়তে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু পাশাপাশি চোখে পড়ে শুধু-চতুর, অসংখ্য বিবর্ণ পংক্তি, দুর্বোধ্যতা-ক্লিষ্ট উপমা। যেমন : 'সধবাদের আরো বেশি জ্বালা। বুকগুলো তো আর টোলখাটা নয়।'

শেখর নাহার কবিতা সম্ভাবনাময়। কিন্তু গভীরতা ও চাতুর্য এক জিনিস নয় এই ছোট্ট তথ্যটুকু স্বীকার করে নিলে ক্ষতি কী। ১৪৬।৬৩, ৭৩।৬৩

কিশোর সাহিত্য

ছোটদের বৌদ্ধ গল্প—সুলতা কর। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। ১·৫০ নঃ পঃ।

আলোচ্য গ্রন্থটি বৌদ্ধ সাহিত্যের পনেরটি ছোটগল্পের সংকলন এবং বলা বাহুল্য, সব কটিই নীতিগল্প। সংস্কৃত "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশ"-এর গল্পের মত এই নীতি-গল্পগুলির একটি শাশ্বত মূল্য আছে—বিশেষ করে অল্পবয়স্ক কোমলমতি শিশুদের কাছে।

এর আগে ছোটদের জন্য বৌদ্ধ জাতকের গল্পের একাধিক সংকলন চোখে পড়লেও

বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে নির্বাচিত গল্পের সংকলন চোখে পড়েনি; সে হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থটির পরিকল্পনা অভিনন্দনযোগ্য।

শিল্পী সূর্য রায় অঙ্কিত ছবিগুলি বইটিকে শিশুদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলবে—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বইটির মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতিও প্রকাশকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে।

৩৮১।৬২

বিবিধ

কর্মনির্দেশ—এস ব্যানার্জি ও আর এন খাঁ। সাহিত্য কেন্দ্র এ-১৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। ২·০০ নঃ পঃ।

সামান্য লেখাপড়া জানা থেকে স্কুল ফাইনাল পাস ছেলেদের পশ্চিমবঙ্গের যেসব প্রতিষ্ঠানে কারিগরি দক্ষতা লাভের সুযোগ আছে, এই গ্রন্থটি সেইসব প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকাবিশেষ। কোন্ কোন্ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কি কি কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হয়, তার শিক্ষাকাল কত দিন বেতন কত, কবে থেকে শিক্ষা-বর্ষ শুরু, সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সর্বোর্ধ্ব বয়স প্রভৃতির বিবরণ এবং কোন্ কোন্ কারখানায় শিক্ষানবিস নেওয়া হয় ও তারই বা শর্তাদি কি ইত্যাদি এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যাবে। বাংলা ভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ এই প্রথম, সে কারণে তো বটেই, উপরন্তু সাধারণের এটি বহু উপকারে লাগবে বলেও প্রকাশক ধন্যবাদের পাত্র। তবে বইটি বর্তমান সমালোচকের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে নানা কারণে। যেমন—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পলিটেকনিক আছে, অথচ সেগুলির (দু-তিনটি বাদে) উল্লেখ নেই গ্রন্থটিতে। তা ছাড়া, যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা এ বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সরকার অনুমোদিত (বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) কিনা অথবা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত কিনা তারও উল্লেখ নেই।

৩০০।৬২

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে 'সোনালী মাছ' গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে যে উদ্ধৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে। উদ্ধৃতিটি এইরূপ হবে : "জলকে পলকে [illegible] মুক্তপাঁতি, মাছি-কাটি-ঝলকে [illegible] সেতপদ্ম, সুন্দর মন্দাকিনীসলিলে [illegible] অবাধ আন্দোলন। মাঝখানে সমুদ্রে উর্মিমালা [illegible] লাগোয়া মালা হবে করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

অন্যতম কর্তব্য
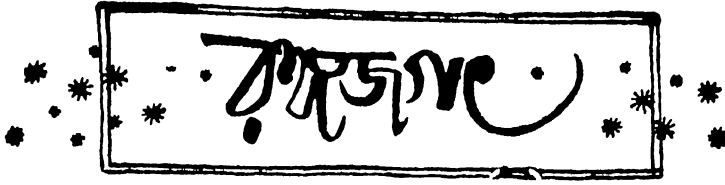
ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি সম্প্রতি বৃটিশ চলচ্চিত্রের এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে চিত্রামোদীদের সাধুবাদ অর্জন করেছেন। দর্শকরা এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে অল্পাধিক অর্ধশতাব্দীর বৃটিশ চলচ্চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এবং উৎসবের সঙ্গে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের ভেতর দিয়ে বৃটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য আহরণ করেছেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুবর্ণ-জয়ন্তী বছরে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় ছবির একটি অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন, এই আশা পোষণ করা অন্যায় নয়। অবশ্য এই দায়টি শুধু ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি অথবা সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটারই নয়। পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শকদের সম্যক পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজে চলচ্চিত্র শিল্পমহলেরই সর্বাগ্রে অগ্রণী হবার কথা। হয়ত এ ব্যাপারে চলচ্চিত্র-শিল্পমহল তাঁদের কর্তব্য যথাসময়ে পালন করবেন।

কিন্তু ফিল্ম সোসায়েটি জাতীয় সংস্থারও এ ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে। বিদেশের সঙ্গে যে ভারতে প্রায় একই সময়ে চলচ্চিত্রের উদ্ভব ঘটেছিল এবং অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে অন্যান্য সভ্যদেশের চলচ্চিত্রের মত ভারতীয় ছবিও যে আজ বিশ্বচলচ্চিত্রের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করেছে, এই তথ্য সাধারণ চিত্রামোদীদের অজানা নয়। কিন্তু ক্রমবিবর্তন কী-ভাবে ঘটল, রক্ষণশীলতার সঙ্গে বৈপ্লবিক চেতনার সংঘর্ষ কখন কেমন করে দেখা দিল, এই নিয়ে গবেষণা এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাস-পর্যালোচনা প্রভৃতি কাজে চিত্রামোদীদের সঠিক পথে পরিচালনা করার ক্ষমতা ফিল্ম সোসায়েটি জাতীয় সংস্থার যতটা রয়েছে, ততটা হয়ত আর কোন মহলেরই নেই। এমন আশা করা তাই অযৌক্তিক নয় যে, পঞ্চাশ বছরের ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং তার ইতিহাস সম্পর্কে জনসাধারণকে যাবতীয় তথ্য পরিবেশনের কাজে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি অথবা সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা অনতিবিলম্বেই সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

(বাঁয়ে) বৃটেনের প্রথম সবাক কাহিনীচিত্র "ব্ল্যাকমেল"-এর (পরিচালনা : আলফ্রেড হিচকক) একটি দৃশ্য (ডাইনে) বৃটিশ চলচ্চিত্রের নবযুগের (১৯৫৬) একটি ছবি "[illegible] অ্যালাও"-এর (পরিচালনা : ক্যারেল রেইজ ও টনি রিচার্ডসন) একটি দৃশ্য

সন্ধানী প্রোডাকশন্স-এর নির্মীয়মাণ প্রথম চিত্রপ্রয়াস "অরণ্যান্ত"-র (পরিচালনা : সন্ধানী) একটি দৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

"বৃটেন এতদিনে তার সত্যকার নিজস্ব চলচ্চিত্রকারদের পেয়েছে" শ্রীসত্যজিৎ রায়

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গত ৮ই জুন থেকে বৃটিশ চলচ্চিত্রের চার দিনব্যাপী যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, তার উদ্বোধন দিবসে বৃটেনের চলচ্চিত্র সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। এবং বৃটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাস সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর রিজিওনাল ইনফরমেশন অফিসার মি [illegible]। বৃটিশ চলচ্চিত্রের স্বধর্ম ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রী রায় তাঁর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় [illegible]

চলচ্চিত্র প্রকাশ সংস্থার নবতম চিত্রোপহার "কাঞ্চন-কন্যা"-র দুটি দৃশ্যে অনুপ মুখোপাধ্যায় ও অনুপকুমার এবং রুমিকা মজুমদার ও সুমিতা সান্যাল

সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। বৃটিশ চলচ্চিত্রের ব্যর্থতা ও সাফল্যের মূলে বৃটিশ মানসিকতার সক্রিয় প্রভাবের কথা শ্রী রায় তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বৃটিশ চলচ্চিত্র সৃজনীশক্তির পরিচয় কেন দিতে পারেনি, সে সম্পর্কে শ্রীরায়ের অভিমত হল: "ইংরেজ হওয়াটাই হয়ত ইংরেজ চলচ্চিত্রকারদের পক্ষে সবচাইতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুভী ক্যামেরার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার মত মানসিক গঠন ইংরেজদের নেই বলে আমি মনে করি। ক্যামেরা বাস্তবের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, জীবন ও বস্তুর অন্তরটি তন্নতন্ন করে দেখে, তাকে প্রকাশ করে, জনতার কাছাকাছি নিয়ে আসে। ইংরেজ-প্রকৃতি কিন্তু এর বিপরীত, তার স্বভাব হল সব কিছু থেকে দূরে দূরে সরে থাকা, জীবনের নির্মম সত্যগুলোকে শালীনতার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা। মনের মধ্যে যদি এমনিভাবে নিষেধের ভাব ক্রিয়া করতে থাকে, তবে কারোর পক্ষে মহৎ ছবি তৈরি করা সম্ভব নয়। ....কিন্তু সৃষ্টির ক্ষমতা বৃটিশ চলচ্চিত্রকারদের কম থাকলেও আর্ট হিসাবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করার মত রসবোধ তাঁদের ছিল। তাই বৃটেনে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন এত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠতে পেরেছে।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই বৃটিশ চলচ্চিত্রে নবযুগের সূচনা দেখা দেয় বলে শ্রী রায় অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "যুদ্ধ নিস্তরঙ্গ জীবনকে উদ্বেলিত করে তুলল, পুরনো অভ্যাস ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত করল। সেই সঙ্গে এল কিছু বলবার ব্যগ্রতা; স্পষ্ট করে, তাড়াতাড়ি করে কিছু বলার প্রেরণা।"

নবযুগের অবসান ঘটতে কিন্তু বিলম্ব হয়নি। শ্রী রায় বলেন, "অল্প কিছুকালের মধ্যেই দেখা গেল, রীড প্রমুখ চিত্র-পরিচালকদের নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই।... ডেভিড লীন যেন বাইরের চাকচিক্যের দিকেই ঝুঁকে পড়লেন বেশী করে, রীড ইংরেজের সমাজ-জীবন ছেড়ে গ্রাহাম গ্রীনের জগতে গিয়ে প্রবেশ করলেন। চলচ্চিত্রকলার দিক থেকে উল্লেখ্য হলেও "ফলেন আইডল" এবং "দি থার্ড ম্যান" পরিপূর্ণ 'বৃটিশ' চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি।"

বৃটিশ চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করে শ্রী রায় বলেন, "এই সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার পরই দেখা গেল এক নতুন আলোড়ন। চলচ্চিত্র শিল্পের আভ্যন্তরীণ সংঘাত শুরু হল। প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হল। এই নব-উন্মেষের (এই পর্যবেক্ষণী রচনাকালে যা চরমে উঠেছে) উৎস "অ্যাংরি ইয়াং ম্যান" আখ্যায় অভিহিত লেখকদের (যথা জন অসবোর্ন, জন ব্রেইন, অ্যালান সিলিটো, কিংসলে অ্যামিস প্রভৃতি) তৈরি সাহিত্য-আন্দোলন। নতুন চিত্র-পরিচালক, কাহিনীকার ও শিল্পীরা আজ পুরোভাগে এসেছেন। নতুন যুগের চিত্র-পরিচালকরা—যেমন, কারেল রেইজ, টনি রিচার্ডসন, লিন্ডসে অ্যান্ডারসন, জ্যাক ক্লেটন প্রভৃতি—শুধু প্রয়োগ-কর্মের কুশলতার প্রমাণই যে দিয়েছেন, তা নয় বিষয়বস্তুর সমাজ-জিজ্ঞাসা সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন।" শ্রী রায় মনে করেন, "বৃটেন এতদিনে তার সত্যকার নিজস্ব চলচ্চিত্রকারদের পেয়েছে। তাই অন্যান্য দেশের ছবির মত বৃটেনের চলচ্চিত্রের প্রতিও তাঁর সমান আগ্রহ।

চিত্রামোদীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে [illegible] ছবিটি। [illegible] ছবিটির প্রযোজক; পরিচালনা করেছেন [illegible]-গোষ্ঠী। মনোজ বসুর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, [illegible] [illegible] [illegible], ভারতী

দেবী, জহর রায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা গুপ্তা ও স্মিতা সিংহ। সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

পুষ্প পিকচার্স-এর তাজমহল হিন্দী ছবিটিও এ-সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে। ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত এ-ছবির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বীণা রায়, প্রদীপকুমার, রেহমান, জবীন, জীবন, লতা সিংহ প্রভৃতি। এম সাদিক ছবিটি পরিচালনা করেছেন। রোশন সংগীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

স্বৈরিণীর কাহিনী

বনবাসকালে পর্ণকুটীরে সীতাকে একা ফেলে রেখে যাওয়ার সময় লক্ষ্মণ কুটীরের চারদিকে গণ্ডী কেটে ভ্রাতৃজায়াকে বলে গিয়েছিলেন, তিনি যেন এই গণ্ডী পার হয়ে বাইরে না যান। গার্হস্থ্যধর্মের এমনি একটি অদৃশ্য গণ্ডীর ভেতরে কুলবধূদের বাস করতে হয়। গণ্ডী অতিক্রম করলেই অধর্ম এবং সর্বনাশ দেখা দেয়।

আর ডি বনসলের আগামী চিত্রোপহার "ছায়াসূর্য" (পরিচালনা ঃ পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ছবিতে বেবী মিতা

বি আর চোপরা প্রযোজিত এবং পরিচালিত "গুমরাহ্" (বি আর ফিল্মস) ছবির এটাই বক্তব্য। চিত্রকাহিনী শুরু হওয়ার আগে অবশ্য চিত্রপরিচালক ত্রেতা-যুগের সেই ঘটনাটি দর্শকদের দেখিয়ে দিয়েছেন—যেখানে সীতার অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র সোনার হরিণ ধরতে ছুটেছেন, এবং কিছুক্ষণ বাদে পতির আর্তনাদ শুনে সীতা লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র সমীপে যাওয়ার জন্য আদেশ করছেন। সীতাকে কুটীরে একা রেখে যাওয়ার আগে লক্ষ্মণের গণ্ডী কাটার সঙ্গে সঙ্গেই "গুমরাহ্" কাহিনীর সূত্রপাত।

চিত্রকাহিনীর নায়িকা গার্হস্থ্যধর্মের গণ্ডী পার হয়ে পরপুরুষের সম্ভোগে পথভ্রষ্টা হয়ে পড়ে। পরপুরুষ তার পূর্বপ্রেমিক। ঘটনাচক্রে নায়িকাকে তার সদ্য বিপত্নীক ভগ্নীপতিকেই বিয়ে করতে হয়েছিল। কিন্তু মন তার পড়ে ছিল পূর্বপ্রেমিকের কাছেই। এবং কুলধর্ম ও সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে সে পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে উঠতে দ্বিধা বোধ করেনি। নায়িকা অবশ্য অনেক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে পরে বুঝতে পারে যে দেবতার মত স্বামীকে এতকাল প্রবঞ্চনা করে সে কী পাপ করেছে। তার দেবোপম স্বামী যে আগে থেকেই স্ত্রীর গতিবিধি লক্ষ করার জন্য নিজের তরুণী প্রাইভেট সেক্রেটারিকে চর নিযুক্ত করেছিল সেটা অবশ্য নায়িকার পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। গুপ্তচর কার্যে নিযুক্ত এই তরুণী পদে পদে নায়িকার অসামাজিক গতিবিধির এবং দুর্বলতার জন্য

হার এস দাশগুপ্ত প্রোডাকশন্স-এর প্রথম কাহিনীচিত্র "একই অঙ্গে এত রূপ" (প্রযোজনা: পরিচালনা—হরিসাধন দাশগুপ্ত) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী

সাসপেন্স সৃষ্টি করেছে। শেষ পর্যন্ত নায়িকার অশান্তি ও দর্শকের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটে এবং নায়িকার প্রতি (নাকি দর্শকের প্রতি?) তার স্বামীর উপদেশ-বর্ষণের ভেতর দিয়ে ছবি শেষ হয়।

বি আর ফিল্মস-এর "স্টোরি ডিপার্টমেন্ট"-এ চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্যটি তৈরী হয়েছে। ছবির আখ্যানবস্তুতে বলিষ্ঠ চিন্তাধারার লক্ষণ আছে। এই গল্পে বর্তমান আধুনিক সমাজ-জীবনের একটি মৌল সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, এবং বিবাহিত রমণীর পক্ষে কী ন্যায়, কী অন্যায়, তাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বৈরিণী কুলবধূ আমাদের সমাজে হয়ত আছে। কিন্তু তাদের বিপথগামিতার কাহিনী যদি ছায়াছবিতে বিশ্বাসযোগ্য ও রসসমৃদ্ধ করে তোলা যায় তবে তা দর্শকের অস্বস্তির কারণ ঘটায় না। এ-ছবির কাহিনীতে জীবনবোধ ও জীবনযন্ত্রণার স্পর্শ যদি থাকত এবং এর কাহিনী যদি অতিমাত্রায় সোচ্চার না হত, তবে ছবিটি দর্শকমনকে অনিবার্যভাবে আকৃষ্ট করতে পারত।

অবশ্য ছবিতে কতকগুলো সুন্দর নাট্যমুহূর্ত আছে—যা দর্শক মনকে নাড়া দেয়। এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে চিত্র-পরিচালকের। চিত্রকাহিনীর সুষ্ঠু বিন্যাস ও প্রয়োগ-কর্মের উৎকর্ষ ছবিটিকে ক্ষিপ্র-গতি করে তুলেছে। চিত্রকাহিনী যাই হোক, এর একাধিক চরিত্র যত অবিশ্বাস্যই হোক ছবিটি কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। ছবিতে পরিচালক নাট্যকৌতূহল সৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এ-কারণেও ছবিটি উপভোগ্য। তা-ছাড়া এতে আমোদের উপকরণ যথেষ্ট আছে।

নায়িকা মালা সিংহ'র প্রাণোচ্ছল ও মর্মস্পর্শী অভিনয় ছবিটিকে অনেকটা চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। তার স্বামীর চরিত্রে অশোককুমারের অভিনয় অতি মনোজ্ঞ এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ। নায়িকার প্রণয়ীর চরিত্রে সুনীল দত্ত প্রাণবন্ত অভিনয় করলেও রোমান্টিক নায়ক হিসাবে তিনি যেন কিছুটা নিষ্প্রভ।

অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়ে অভিনয় করেছেন নানা পালসিকার, শশীকলা, করণ দেওয়ান, শ্যামা ও নিরূপা রায়।

সংগীত পরিচালক রবি সুরারোপিত ছবির গানগুলি সুশ্রাব্য। অবহ সুর-রচনায়ও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ এম এন মালহোত্রা কৃত। খুবই উঁচুদরের। সম্পাদনা (প্রাণ মেহরা), শব্দগ্রহণ (যশান্ত মিতকার) ও শিল্পনির্দেশনা (সন্ত সিং) সন্তোষজনক।

একই অঙ্গে এত রূপ

প্রামাণিক চিত্রের স্রষ্টা হিসাবে হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রভূত যশ অর্জন করেছেন। এবার তিনি একটি কাহিনীচিত্র তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। ছবির নাম: "একই

বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মারক উৎসবে "বিশ্বরূপা পুরস্কার" গ্রহণ করছেন (বাঁদিক থেকে) জলধর চট্টোপাধ্যায়, নিভাননী দেবী ও জহর গাঙ্গুলী
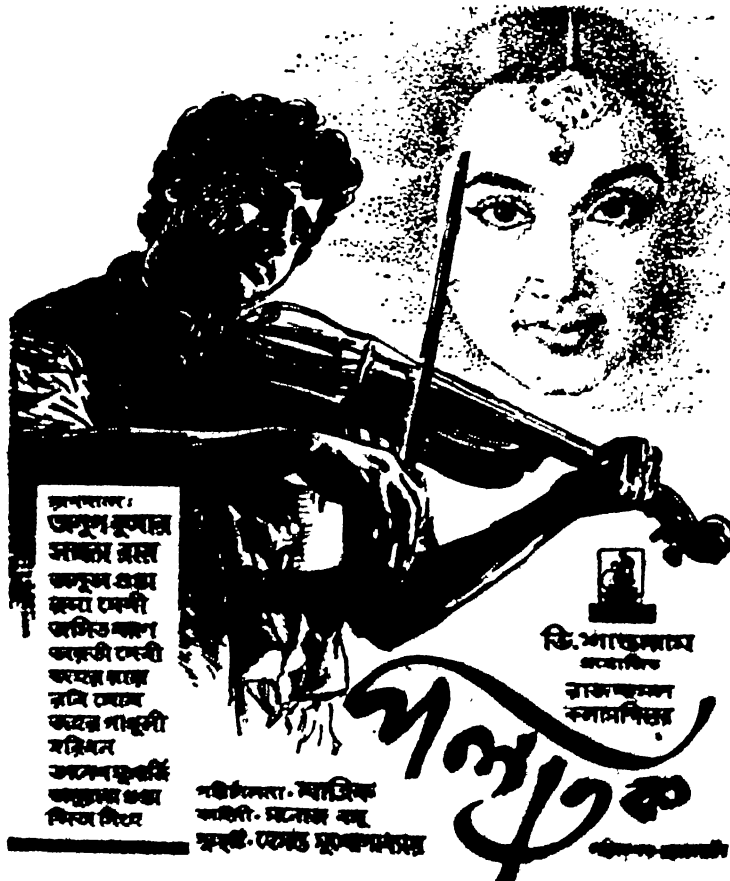
অপো এত রূপ"। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি ছোটগল্প অবলম্বনে প্রযোজক-পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী ছবির প্রধান শিল্পী। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ছবির সুরকার।

কাঞ্চন-কন্যা

চলচ্চিত্র প্রসার সংস্থার নবতম চিত্রে হারের পূর্বঘোষিত "বিপত্তি" নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ছবিটির নাম রাখা হয়েছে "কাঞ্চন-কন্যা"। অমিত মৈত্র ও শম্ভু মিত্র "কাঞ্চন-কন্যা"র কাহিনী রচনা করেছেন। ছবির রোমান্টিক জুটিরূপে চিত্রাবতরণ করেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার। অন্যান্য প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, সুমিতা সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, কুমার রায় ও শান্তি দাস। ভি বালসারা ছবির সংগীত পরিচালক।

বিশ্বরূপা পুরস্কার

গত শনিবার বিশ্বরূপা থিয়েটারের অষ্টম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মারক-উৎসব সম্পন্ন হয়। বিশ্বের নাট্য সংস্কৃতির ঐক্য ও সংহতির নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পতাকাগুলি মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার পতাকামূলে পুষ্পস্তবক প্রদান করেন ও আজীবন নাট্যসেবী শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী নিভাননী দেবীকে "বিশ্বরূপা পুরস্কার"স্বরূপ মানপত্র, বস্ত্র ও মিষ্টান্ন প্রদান করেন। পাশ্চাত্যের নটসম্রাট স্যার গর্ডন ক্রেগ বিশ্বরূপার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন-বাণী পাঠান।

উৎসবে শ্রীরাসবিহারী সরকার ঘোষণা করেন যে, শতাব্দীব্যাপী নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে বিশ্বরূপা সর্বপ্রথম "প্রভিডেন্ড ফান্ড স্কীম" বর্তমান মাস থেকে চালু করেছেন। অনুষ্ঠানের শেষে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে "সেতু"র ৮৭৪তম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

'ট্যাক্স কমবে যদি ব্ল্যাক মানি...'
অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি মাদ্রাজে চিত্রপ্রযোজকদের বলেছেন যে, তিনি তাঁদের ট্যাক্সের বোঝা আশাতীত পরিমাণে কমিয়ে দেবেন, যদি চিত্রতারকাদের যে ব্ল্যাক মানি দেওয়া হয়, তার উপর আয়কর আদায় করতে তিনি সক্ষম হন। সম্প্রতি মাদ্রাজে সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্ম চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক আয়োজিত এক ভোজসভায় অর্থমন্ত্রী এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

চিত্রতারকাদের ব্ল্যাক মানি দেওয়া হয় বলে তিনি চিত্রপ্রযোজকদের দোষারোপ করেন, এবং তাঁদের কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন দলবদ্ধ হয়ে এই দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট হন এবং ব্যবসায়ের পরিষ্কার ও সঠিক হিসাব রাখেন, যাতে চিত্রতারকারা জোর করে তাঁদের দাবি পেশ করতে না পারেন।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব প্রসঙ্গে

সেলজ্নিক সিলভার লরেল-এ ভূষিত "দুই কন্যা"

এবারকার বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (৩০শে জুন) সেলজ্নিক পুরস্কার বিচারক কমিটি মোট ছ'টি ছবি পাঠাচ্ছেন। ছ'টি ছবিই সেলজ্নিক সিলভার লরেল-এ ভূষিত হয়েছে। ছবিগুলি হল: "দুই কন্যা" (পোস্টমাস্টার ও সমাপ্তি), "বিলি বাড" ও "এ টেইস্ট অব হানি" (ব্রিটেন), "স্যান্ডেজ অ্যান্ড সাইবেলি" (ফ্রান্স), "ইলেকট্রা" (গ্রীস) এবং "দি আইল্যান্ড" (জাপান)।

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সিলভার লরেল দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি শ্রীএরিক জনস্টন গোল্ডেন লরেল বিজয়ী ছবির নাম ঘোষণা করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে ভাববিনিময়ের উদ্দেশ্যে সেলজ্নিক সিলভার লরেল চিহ্নিত ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

এডিনবরা উৎসবে "আরতি"

আগামী এডিনবরা উৎসবে (১৮ই আগস্ট ১লা সেপ্টেম্বর) ফণী মজুমদার পরিচালিত রাজশ্রী পিকচার্স এর "আরতি" হিন্দী ছবিটি উৎসবের প্রতিযোগী চিত্র হিসাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। উৎসবের জন্য প্রামাণিক চিত্র হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে ফিল্মস ডিভিসনের "কেইন টেম্পলস অব ইন্ডিয়া", "সঙ অব দি স্নেক", "বোধপুর" এবং "কল অব দি খেদা"।

বার্লিন এবং মস্কো উৎসব

এবারকার বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে (২১শে জুন) মোট চল্লিশটি দেশের ছবি দেখানো হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এবার বহু-সংখ্যক ছবি বার্লিন উৎসবে পাঠানো হয়েছে। উৎসবে ভারতের প্রতিযোগী কাহিনী চিত্র: "সাহিব বিবি ঔর গুলাম" এবং প্রামাণিক চিত্র ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত "সঙ অব দি স্নেক" (ফিল্মস ডিভিসন)।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে (৭ই জুলাই) যোগদান করছে মোট ৪৩টি দেশ। ইতিমধ্যে মোট ৩০টি কাহিনী চিত্র প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উৎসবের জন্য নির্বাচিত ভারতের কাহিনী চিত্র: "সাত পাকে বাঁধা" এবং প্রামাণিক চিত্র "কল অব দি ফ্লুট" (ফিল্মস ডিভিসন)।

রূপছায়া চিত্র'র 'দেয়া-নেয়া' (পরিচালনা: সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে উত্তমকুমার ও তনুজা ফটো—দেশ

"শ্যামা" নৃত্যনাট্যাভিনয়

এ-বি-ডি সংস্থার উদ্যোগে আগামী ৭ই জুলাই রবির প্রেক্ষাগৃহে সকাল সাড়ে দশটায় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "শ্যামা" মঞ্চস্থ হবে। নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করবেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নৃত্যাংশে থাকবেন অনাদিপ্রসাদ ও তাঁর সম্প্রদায়।

বোম্বাই সমাচার

শিল্পী-দম্পতি **সুনীল দত্ত ও নার্গিস,** তালাত মাহমুদ, প্রেম ধাওয়ান, শাম্মি, মধুমতী, মনোহর দীপক এবং আনোয়া[র] হোসেন গত সপ্তাহে লাডক অভিমু[খে] রওনা হয়েছেন। বোম্বাই-এর ফিল্ম ইন্ডাস[্ট্রি] ডিফেন্স কমিটির আহ্বানে শিল্পীরা ভারতীয় জওয়ানদের আনন্দদানের উদ্দেশে সীমান্ত অভিমুখে রওনা হয়েছেন।

'ইয়েহ্ রাস্তে হ্যায় প্যায়ার কে'-খ্যা[ত] আর কে নায়ারের পরবর্তী ছবির না[ম] ইক গুনাহ্ ঔর সাহি। পরিচালক নায়া[র] নিজেই ছবিটি প্রযোজনা করবেন। ছবিটি একটি দুঃসাহসিক প্রয়াস। এতে চরি[ত্র] থাকবে মাত্র একটি। তাকে নিয়েই এ[ই] কাহিনীচিত্র। জয় মুখার্জি ছবির একমা[ত্র] শিল্পী। হরিশ মেহ্রা চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন। সংগীত পরিচালনা করবেন ও পি নায়ার।

এইচ জি প্রোডাকশনস-এর "[illegible]" (পরিচালনা: সুধীর মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অনুভা গুপ্তা, ভারতী দেবী, অনুপ রায় ও [illegible]

একলব্য

মে মাসের ২৭ তারিখে ইংলণ্ড থেকে খবর এল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টীম বিপর্যয়ের মুখে। কারণ, দলের সাত-আটজন খেলোয়াড় অসুস্থ। উইলি রডরিগসের হাটুতে অস্ত্রোপচার করতে হবে, স্পিন বোলার আলফ ভ্যালেন্টাইনের উরুর শিরায় টান ধরেছে, ল্যান্স গিবসের হাতের আঙুল ভেঙে গেছে, সেমুর নার্সের হাতের শিরায় টান, ফ্রাঙ্ক ওরেল এবং রোহান কানহাইয়ের হাটুতে দরদ, হান্টের মাথার কাটা জায়গায় সেলাই করা হয়েছে, উইকেট কিপার ডেভিড এলান ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে বিছানা নিয়েছেন। জুনের ৬ তারিখে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ। সুতরাং বিপর্যয় ছাড়া কি?

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের অসুস্থ সংবাদের সঙ্গে আরও একটু খবর এলো। দলের ম্যানেজার মিঃ গাস্কিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে নতুন খেলোয়াড় পাঠাবার জন্য তার করেছেন এবং কারো কারো আসবারও সম্ভাবনা আছে।

যখন এই খবর আসে তখন ওভালে সারের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা চলছে। ভাবলাম, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হার অনিবার্য। কিন্তু হারল না ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। খেলা অমীমাংসিত রইল।

মের ৩১ তারিখে খবর এল, বাথে সামারসেট দলকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারিয়েছে এক ইনিংস ও ৪০ রানে, যে সামারসেট দল এই মরসুমে আর কারো কাছে হার স্বীকার করেনি। আবার জুনের ৩ তারিখের খবর, কার্ডিফে গ্লামোরগানকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১১৮ রানে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

তারপর আরও বড় খবর এবং প্রত্যাশিত খবর : ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে অতি সহজেই হারিয়েছে ইংলণ্ডকে এবং নতুন কোন খেলোয়াড়ের সাহায্য না নিয়ে।

পাঁচ দিনের টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডকে হারাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চার দিনের বেশী সময় লাগেনি এবং মাত্র এক রানের জন্যে ইংলণ্ড ইনিংসে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। অর্থাৎ ৬ উইকেটে যে

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরীর একমাত্র অধিকারী কনরাড হান্ট

রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে সেই রান সংগ্রহ করেছে ইংলণ্ড দুই ইনিংসের ২০ উইকেটে। সুতরাং ইনিংসে পরাজয় থেকে অব্যাহতি শুধু নামে। আসলে ১০ উইকেটে হার প্রায় ইনিংসে পরাজয়ের নামান্তর।

ভাবছি, ভাঙা-চোরা এবং চোট-খাওয়া খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যদি এত সহজে ইংলণ্ডকে হারাতে পারে তবে সব খেলোয়াড় সুস্থ থাকলে তাদের জয় কি আরও সহজ হত? শ্রী চাঁরণের মত অজ্ঞাত ক্রিকেট চরিত্রে অবশ্য সেটা বলা সাজে না। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই অনায়াস জয় ক্রিকেট খেলায় তাদের অসাধারণ ক্ষমতারই পরিচয়।

ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং সর্ব বিভাগে ইংলণ্ডের উপর পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে জিতে ১—০ খেলায় এগিয়ে আছে। কোন বিষয়েই ইংলণ্ড তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি।

বিগত শীত মরসুমে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাদের নিয়ে ইংলণ্ডের দল গড়া হয়েছিল এ টেস্টে তাদের মাত্র ৭ জনকে দলভুক্ত করা হয়। বাকী ৪ জনের মধ্যে ইয়র্কশায়ারের উইকেট কিপার কিথ এণ্ড্রু ৯ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে সরে থাকবার পর দলে আসেন ব্রায়ান ক্লোজও আগের বাতিল খেলোয়াড় সারের ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ টেস্টে আনকোরা নতুন। অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দলের বহির্ভূত খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্লোজ দু ইনিংসে ৩০ ও ৩২ রান করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নবাগত এডরিচের ৩৮ প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু সবচেয়ে প্রশংসার দাবি রাখে সারের মিকি স্টুয়ার্টের খেলা। প্রধানত দ্বিতীয় ইনিংসে তার প্রশংসনীয় ও দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং-এর জন্যই ইংলণ্ড ইনিংসে পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। ইংলণ্ডের পক্ষে দুই ইনিংসে তিনিই করেছেন সবচেয়ে বেশী ৮৭ রান। অবশ্য প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের অধিনায়ক এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ডেক্সটারের ৭৩ রান ইংলণ্ডকে শোচনীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে উদ্ধার করে। যতক্ষণ ডেক্সটার উইকেটে ছিলেন তখন ইংলণ্ডের ভরসাও ছিল। ডেক্সটার আউট হবার পর মাত্র ২৪ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের বাকী পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়।

টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাট করে ৬ উইকেটে ৫০১ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সহ-অধিনায়ক এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান কনরাড হান্ট প্রথম দিনই সেঞ্চুরী করে এবং নট আউট থেকে ইনিংসের ভিত শক্ত করে রেখেছিলেন, কানহাই নিপুণ হাতের ৯০ রানে সে ভিতকে আরও পোক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন সোবার্সের ৬৪, অধিনায়ক ওরেলের নট আউট ৭৪ এবং হান্টের আরও ৭৮ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫০১ রানের স্তূপ গাঁথা হয়েছিল। এই স্তূপকে জয় করার পক্ষে ইংলণ্ডের [illegible]

ছিল না তেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বলের গোলা আটকাবার পক্ষেও ছিল না যথেষ্ট মজবুত।

ব্যাটে হাণ্ট এবং বলে ল্যান্স গিবস এই টেস্টের দুই প্রধান নায়ক। প্রথম ইনিংসে ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হলের বলও মারাত্মকভাবে ইংলণ্ড ব্যাটসম্যানদের কাছে হাজির হয়েছিল।

কনরাড হাণ্টের ১৮২ রান ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রানের সবচেয়ে বেশী রান। ১৯৩৩ সালে এই ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে টেস্টেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'ব্ল্যাক ব্র্যাডম্যান' জর্জ হেডলী ১৬৯ রান করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর কোন খেলোয়াড় ইংলণ্ডে টেস্ট খেলায় এত বেশী রান করতে পারেননি। তবু হাণ্টের দুর্ভাগ্য, মাত্র ১০ রানের জন্য ব্যক্তিগত বেশী রানে তিনি এই মাঠের রেকর্ড করতে পারেননি। ১৯৪৭ সালে এই মাঠে ইংলণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের বিল এডরিচের ১৯১ রান এখন পর্যন্ত এই মাঠের ব্যক্তিগত বড় রানের রেকর্ড।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের মূলে স্পিন বোলার ল্যান্স গিবসের কৃতিত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ল্যান্স গিবস, যিনি ১৯৬০-৬১ সালে এডেলেডে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চতুর্থ টেস্ট খেলার সময় কেন ম্যাকে, ওয়ালী গ্রাউট ও ফ্রাঙ্ক মিশনকে পর পর আউট করে হ্যাট্রিক করেছিলেন, তিনি একাই দুই ইনিংসে এগারটি উইকেট পেয়েছেন।

ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এটি ছিল ৪১তম টেস্ট খেলা। এর আগের ৪০টি টেস্ট খেলার মধ্যে ইংলণ্ড জিতেছে ১৫টি খেলায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০টিতে; ১৫টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে।

নীচে প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হল:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস (৬ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ৫০১ (কনরাড হাণ্ট ১৮২, রোহন কানহাই ৯০, ফ্রাঙ্ক ওরেল নট আউট ৭৪, গারফিল্ড সোবার্স ৬৪, জো সলোমান ৩৫; ফ্রেড ট্রুম্যান ৯৫ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২০৫ (টেড ডেক্সটার ৭৩, ব্রায়ান ক্লোজ ৩০, মিকি স্টুয়ার্ট ৩৭; ল্যান্স গিবস ৫৯ রানে ৫ উইকেট, ওয়েসলী হল ৫২ রানে ৩ উইকেট, গারফিল্ড সোবার্স ৩৪ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২৯৬ (মিকি স্টুয়ার্ট ৮৭, জন এডরিচ ৩৮, টেড ডেক্সটার ৩৫, ব্রায়ান ক্লোজ ৩২; ল্যান্স গিবস ৯৮ রানে ৬ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস (নো উইকেট) ১।

[ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে বিজয়ী]

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেলের এক বিশেষ ব্যাটিং ভঙ্গী

*

ফুটবলের বিজ্ঞ কোচ সৈয়দ আব্দুল রহিমের মৃত্যু ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রের এক অপূরণীয় ক্ষতি। মাত্র ৫৪ বছর বয়স নিশ্চয়ই পরিণত বয়স নয়। এই বয়সেই রহিমকে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে।

ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে হায়দরাবাদ পুলিস এবং পরে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিস এবং অন্ধ্র দলের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রহিমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যেমন প্রশংসনীয় তেমন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের সম্মান অর্জনের ক্ষেত্রেও 'কোচ' রহিমের দান স্মরণীয়।

ফুটবলের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি শুধু খেলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং নিপুণ ছলা-কলার অন্তর্ভুক্ত নয়। এর সঙ্গে স্ট্র্যাটেজীও আছে। অনেকটা ... স্ট্র্যাটেজীর মত। কোন্ দল কিভাবে খেলে, সেই দলের বিরুদ্ধে কি পদ্ধতিতে খেললে তাদের আক্রমণের ধার ভোঁতা ... যাবে, কাকে কোথায় খেলালে ... কার্যকরী হবে, রক্ষণভাগ ... খেলার সময় খেলোয়াড়দের ... একটু হেরফেরে কিভাবে ... ধৈর্য নষ্ট হবে, এই ... কোচিং-এর উন্নত ছলা-কলা ... খেলোয়াড়কে নিপুণ ... সঙ্গে সঙ্গে রহিম ... করেছেন বেশী। ...

হাতেনাতে। সব ক্ষেত্রেই যে সফল হয়েছেন, এমন কথা বলব না। যেমন টোকিওর এশিয়ান গেমে তাঁর উইথড্রন সেণ্টার ফরোয়ার্ড সিস্টেম'-এর খেলা ফলপ্রসূ হয়নি, আবার রোম অলিম্পিকে তাঁর প্রবর্তিত 'টুইন সেণ্টার ফরোয়ার্ড সিস্টেম' খুবই কার্যকরী হয়েছে। রাশিয়ান দলের ভারত সফরের পর তিন ব্যাক প্রথার খেলা ভারতে প্রবর্তনের ক্ষেত্রে রহিমই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। তাই ভারতে এখন তিন ব্যাক প্রথায় খেলার এত কদর। অন্ধ্র প্রদেশকে দিয়ে '৪-২-৪' সিস্টেমের খেলারও তিনি রেওয়াজ করিয়ে গেছেন।

মেলবোর্ন অলিম্পিকের ফুটবল খেলায় ভারতের চতুর্থ স্থান লাভের ক্ষেত্রে এবং বিগত জাকর্তা এশিয়ান গেমে ভারতের জয়ের মূলে রহিমের কোচিং-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মেলবোর্নের খেলা সম্পর্কে

দুই ইনিংসে ১১টি উইকেটের অধিকারী ল্যান্স গিবস

পৃথিবীখ্যাত ফুটবল সমালোচক ডঃ উইলি মিজল অলিম্পিক গেমস এর অফিসিয়াল রিপোর্টে রহিম সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন এখানে তা তুলে দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ডঃ মিজল বলেছিলেন:—

India's coach, Rahim, must have studied European soccer closely. For a side not used to wearing boots or playing for 90 minutes at a time (an hours play is normal in India's heat), they showed good ball control and a neatness which was almost up to central European standard. An up-and-coming side, they were not disgraced either by their 1-4 defeat by Yugoslavia in the semi-finals or the 0-3 defeat by Bulgaria in the play-off for third place.

ভারতের পরলোকগত ফুটবল কোচ এস এ রহিম

বিশ্ব ফুটবলের বিজ্ঞ পুরোহিতের কলমে রহিমের এই প্রশংসা নিশ্চয়ই ফুটবল সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান এবং অশেষ গুণের পুরস্কার। কিন্তু দুঃখের কথা, স্বদেশে রহিমকে বহুক্ষেত্রে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বলতে গেলে সারা জীবনই রহিম ফুটবলের সাধনা করেছেন। ফুটবল ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। কলকাতার অলিম্পিক ক্যাম্পের ফুটবল ট্রেনিং-এর সময় খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে তাঁর যে আগ্রহ, আন্তরিকতা ও দরদ দেখেছি, নিয়মনিষ্ঠার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখেছি, অন্য ক্ষেত্রে তা সত্যিই বিরল।

রহিম নিজেও একজন ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। মিডল স্কুলে পড়বার সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক মন্তব্য করেছিলেন—যেহেতু রহিম খর্বাকৃতি সেহেতু তিনি কোনদিন ভাল খেলোয়াড় হতে পারবেন না। এই বিরূপ মন্তব্যই হয়তো রহিমের মনে ভাল খেলোয়াড় হবার অনুপ্রেরণা এনে দেয়। ফুটবল খেলার গুণে স্কুলেই তিনি স্কলারশিপ পান। চাদরঘাট হাইস্কুলে ফুটবল খেলার জন্য পান স্বর্ণ পদক। 'ইলেভেন হান্টার্স' দলের রাইট ইন হিসাবে দক্ষিণ ভারতের বহু মাঠে খেলে সুনাম অর্জন করেন। বাঁ পায়ের শুটিংএ তাঁর ছিল বিশেষত্ব। এই মাঠে বহু গোল, এমন কি একটি খেলায় একা ১০টি গোলও করেছেন।

কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে রহিমের প্রতিষ্ঠার চেয়ে কোচ রহিম হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনেক বেশী। ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান এই কলকাতার মাঠে হায়দরাবাদের বহু খেলোয়াড় খেলে গেছেন, এখনো খেলছেন, অন্যান্য রাজ্যেও হায়দরাবাদের কিছু কিছু খেলোয়াড় ছড়িয়ে আছেন। এর বেশীর ভাগই রহিমের ফুটবল স্কুলের ছাত্র। রহিম আর ইহজগতে নেই, কোচ হিসাবে তাঁর শূন্য স্থানও সহজে পূরণ হবে না। কিন্তু তাঁর ছাত্রদের খেলার মধ্যে অন্তত কিছুদিন তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

*

চ্যারিটি ফুটবল খেলার ব্যাপার নিয়ে আই এফ এ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া পরিচালকদের বিরোধ সম্পর্কে গত সপ্তাহে ছোট্ট একটু মন্তব্য করেছিলাম—কিংবা আমাদের গোঁজামিলে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আশা করি, যেভাবে এই বিরোধের অবসান হয়েছে তাতে আমার মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা শক্ত হবে না।

আই এফ এ-র সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান পরামর্শদাতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের ব্যবস্থাপনায় আই এফ এ চ্যারিটি খেলার পরিচালনার ভার পেয়েছেন সরকারের ক্রীড়া পরিচালকরা পেয়েছেন সেই ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করবার কনসোলেশন প্রাইজ। কনসোলেশন প্রাইজে কেউ বড় উৎফুল্ল হয় না প্রায় গোমড়া মুখ করেই তা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা। যাই হোক আসছে শনিবার ফুটবল মরসুমের প্রথম চ্যারিটি খেলা। পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা ফুটবলের দুই প্রধান দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। সুতরাং ফুটবল রসিকদের মধ্যে 'টিকিট' টিকিট রব আরম্ভ হয়ে গেছে। স্টেডিয়াম তৈরির প্রয়োজনের কথাটাও আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলাটি কোন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়েও কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান মাঠে খেলা হবে। পরে ঠিক হয়েছে ক্যালকাটা-মোহনবাগান মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। যে মাঠেই হোক 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা সে হবেই। স্টেডিয়াম না হলে কলকাতার বড় খেলার প্রয়োজনের তুলনায় দর্শকদের টিকিটের চাহিদা মেটানো অসম্ভব।

*

গত সপ্তাহে প্রথম ডিভিসন লীগ খেলার সব দলই পূর্ণ হয়ে গেছে। এতদিন মোহনবাগানের পরাজয়ের ফলে, রাজস্থান ও পুলিসের জয়ের ফলে এবং ইস্টবেঙ্গলের ড্র-র ফলে শূন্য অঙ্ক ছিল। গত সপ্তাহে সব দলই পূর্ণ হয়েছে। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে বি এন রেলের কাছে। ইস্টবেঙ্গল প্রথম খেলা ড্র করেছে ইস্টার্ন রেলের সাথে। রাজস্থান বাটাকে হারিয়ে এবং পুলিস পোর্ট কমিশনার্সকে হারিয়ে মরসুমে প্রথম বিজয়ী হয়েছে।

প্রতি সপ্তাহে প্রতি ক্লাবকে দুটি করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। আপাতত সপ্তাহে বি এন আর ও মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়া আর সকল দল পুরো পয়েন্ট পায়নি। আর একটিও

পি হাজদানকার
আর চাচাদ
উষা আয়েজার
মীনা পরাণ্ডে
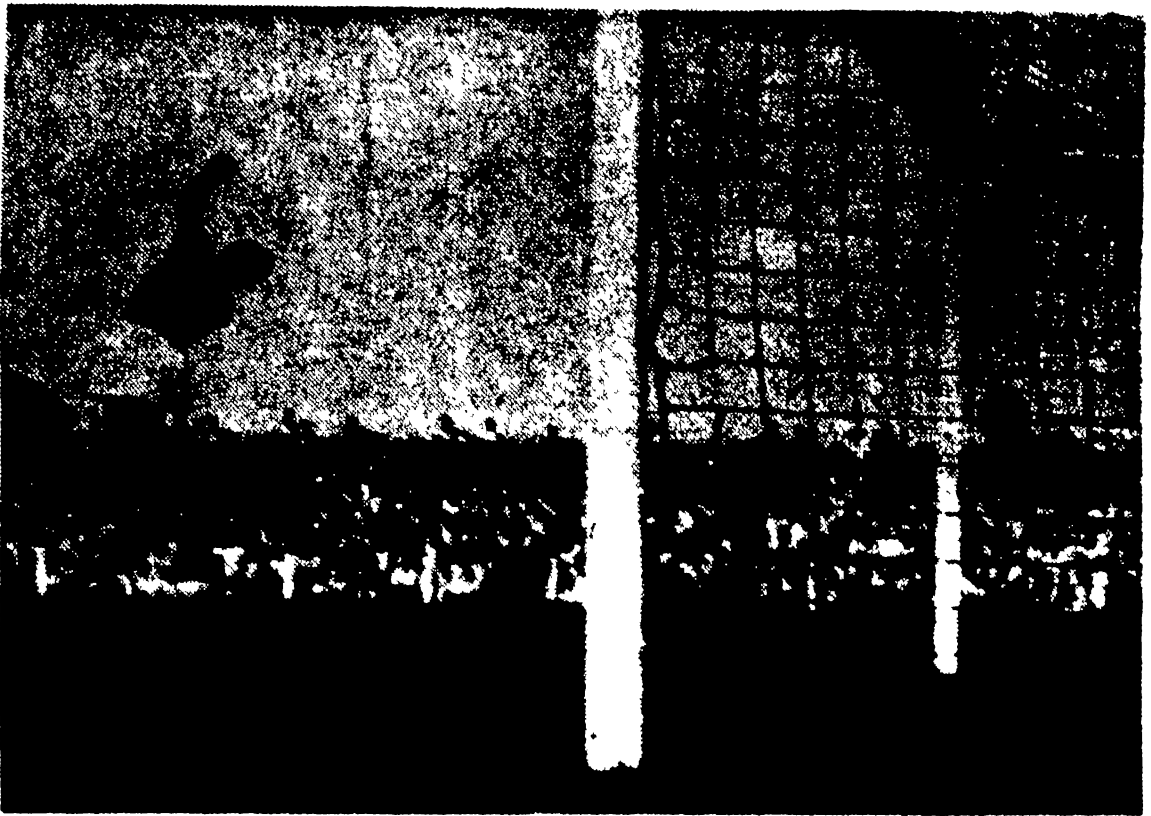
মোহনবাগান ও বি এন রেলের লীগের খেলায় রেলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজুর সটে মোহনবাগান গোলরক্ষক থঙ্গরাজের পরাজিত হবার দৃশ্য। —ফটো দেশ—

পরেন্ট পায়নি স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও পোর্ট কমিশনার্স।

মোহনবাগানের সঙ্গে বি এন রেলের এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ইস্টার্ন রেলের খেলা দুটিই গত সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ ছিল। দুটি খেলাতে এত বেশী দর্শকসমাগম হয়েছিল যে, মাঠের কোন জায়গায় তিল ধরাবার জায়গা ছিল না বলা চলে। অন্যের কথা কি বলব, স্বয়ং শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং কয়েকজন মন্ত্রীও বি এন আর ও মোহনবাগানের খেলা দেখতে মাঠে এসেছিলেন।

দুটি খেলার কোন খেলাই অবশ্য উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিক দিয়ে দর্শকদের খুব খুশী করতে পারেনি। তবে মোহনবাগান ও বি এন রেলের খেলার তিনটি গোল এবং ইস্টবেঙ্গল ও ইস্টার্ন রেলের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড অসীম মৌলিকের একটি গোল দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক হয়েছিল।

অনেকটা ভাগ্যের পরিহাসে এবং যথাসময়ে যথাযথভাবে গোলে শট করবার অক্ষমতায় মোহনবাগানকে বি এন রেলের কাছে ২—১ গোলে হার স্বীকার করে মরসুমের প্রথম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। অপর দিকে শুটিং ক্ষমতার চমৎকার নিদর্শন রেখে বি এন রেল খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। যদিও দুটি গোলের ক্ষেত্রে মোহনবাগানের লম্বা চেহারার গোলরক্ষক থঙ্গরাজের ত্রুটি অনস্বীকার্য, তবুও রেল দলের বলরাম এবং সেণ্টার ফরোয়ার্ড আপ্পালারাজু যেভাবে প্রায় ২০ গজ দূরে থেকে সুন্দর শট করে গোল করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে আপ্পালারাজুর গোলের মত এমন দর্শনীয় গোল সারা মরসুমেই কদাচিৎ দেখা যায়। দুটিই উঁচু শটের গোল এবং বেশ দূরে থেকেই শট। আগেই বলেছি, খুবই ভাল শট। তবু থঙ্গরাজের পরাজিত হওয়া উচিত হয়নি। তিনি কোন ক্ষেত্রে কিছু করবারও চেষ্টা করেননি।

ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেলের ১—১ গোলের অমীমাংসিত খেলাতেও রেল দলের পরিশোধমূলক গোলটির জন্য ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক কে সরকারকে দায়ী করা যায়। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকার জন্যই কাজল মুখার্জির দূরের নীচু সটে তিনি পরাজিত হয়েছেন। অসীম মৌলিকের গোলের কথা আগেই বলেছি। অত্যন্ত দুরূহ কোণ থেকে দর্শনীয় গোল করে তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে অগ্রগামী করেছিলেন।

মোহনবাগানের স্টপার জারনেল সিং পাঞ্জাব থেকে আসবেন কি আসবেন না এই নিয়ে ময়দান পাড়ায় আলোচনার অন্ত নেই। গুজব কি না জানি না আগে খবর রটেছিল, জারনেলের কাকা মারা গেছেন। কথাটা সত্যি হলেও অনেকদিন আগে আলোচ্যান্ত হবার কথা। এখন শোনা যাচ্ছে, জারনেল সিং জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এখনো খুব দুর্বল, তাই আসতে পারছেন না।

যতদূর জানি, মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে জারনেলকে আনার জোর চেষ্টা চলছে। এবং শনিবারের চ্যারিটি খেলার আগেই। তবে না আসলে কিছু বলার নেই।

লীগের এখন বেশ আকর্ষণীয় অবস্থা। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং বি এন আর—এদের লীগশীর্ষে তিনটি দলই এ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট করে নষ্ট করেছে, তিনটি দলের মধ্যেই চলছে লীগ জেতার আশা। [illegible]

মুকুল

গত সপ্তাহে ফুটবল আইনের ৩ নম্বর ধারা সম্বন্ধে বলেছি অদূর ভবিষ্যতে এই আইনের কিছু রদবদল হতে পারে। শুধু আহত খেলোয়াড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই আইনের গলদ নয়, ভাষায়ও কিছু গলদ আছে।

খেলোয়াড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আন্ত-র্জাতিক বোর্ডের সিদ্ধান্তের ভাষা হচ্ছে:-

"If National Associations decide to allow substitutes in accordance with clauses 2 and 3 of Law III, the Board advises the replacement of the goalkeeper at any time during the match and of one other player before the end of the first half, if they are injured and unable to take part again in the match this fact having been confirmed by the referee."

এর মর্মার্থ—রেফারীর অনুমোদন—সাপেক্ষে আহত গোলকিপারের পরিবর্তে সর্বসময়ে নতুন গোলকিপারকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে, আর শুধু প্রথমার্ধে একজন আহত খেলোয়াড়কে পরিবর্তন করা চলবে।

এখন কথা হচ্ছে, প্রথমার্ধে গোলকিপার ছাড়া আর একজন আহত খেলোয়াড়কে পরিবর্তন করা যাবে আইনে তার উল্লেখ আছে; কিন্তু কজন গোলকিপার পরিবর্তন করা যাবে তার ভাষা খুব পরিষ্কার নয়। অন্তত তর্কের অবকাশ আছে।

ধরুন, একজন গোলকিপারের পরিবর্তনের পর দ্বিতীয় গোলকিপারও যদি আহত হন তবে তাঁর পরিবর্তন চলবে কি? মাত্র একজন গোলকিপারকে একবার পরিবর্তন করা যাবে, আইনে এমন কিছু উল্লেখ নেই। যদি দ্বিতীয় গোলকিপারের পরিবর্তন চলে তবে তৃতীয় গোলকিপারের পরিবর্তন চলবে না কেন? আইনের ছিদ্র-পথে অপর খেলোয়াড়কে গোলে রেখেও তাঁরও তো পরিবর্তন চলে।

আর একটি কথা মনে এসেছে সেদিন ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর লীগের খেলার একটি ঘটনা দেখে। মহমেডান দলের নির্ভরযোগ্য লেফট আউট সালাউদ্দিন খেলা আরম্ভের পর কয়েক মিনিটের মধ্যে সামান্য আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে যেতেই তড়িঘড়ি তাঁর পরিবর্তে নতুন খেলোয়াড় গাজীকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হল। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর সালাউদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেন, তাঁর জন্য মাঠে আর জায়গা নেই। সে জায়গা আগেই পূরণ হয়ে গেছে। মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েই সারাক্ষণ মাঠের পাশে বসে থেকে সালাউদ্দিন নিজ দলকে পরাজিত হতে দেখলেন।

যদি সালাউদ্দিন গাজীর পরিবর্তে প্রথমার্ধেই আবার খেলায় যোগ দিতে চাইতেন তবে রেফারী কি সালাউদ্দিনকে খেলার অনুমতি দিতেন? নিশ্চয়ই না। [illegible] কারও জিজ্ঞাসা করেননি, তিনি আর খেলতে পারবেন কিনা। গাজীর অংশ গ্রহণেও বাধা দেননি। অথচ আইনের বিধানে আহত খেলোয়াড় সত্যি সত্যিই আহত হয়েছেন কিনা কিংবা আর খেলতে সক্ষম কিনা সেটা রেফারীরই জানার কথা। এবং আহত কিংবা আর খেলতে অশক্ত খেলোয়াড়ের না খেলার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে রেফারী নিঃসন্দেহ হবার পর পরিবর্ত খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণের অধিকার।

সালাউদ্দিন যদি সত্যিই খেলবার দাবি জানাতেন তবে রেফারী একটু মুশকিলেই পড়তেন। বদলী খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেফারীর অনুমতি নেওয়া হয় না। সালাউদ্দিনের বদলে গাজীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও অনুমতি নেওয়া হয়নি। অনুমতি নেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল এবং রেফারীরও উচিত ছিল সালাউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করা, তিনি আর খেলতে পারবেন কিনা?

ইংলিশ টাইপ বুট। ইংলণ্ডে সাধারণ এই বুট ব্যবহার করা হয়

খেলোয়াড় পরিবর্তনের আইনে ক্লাবরা কিছু সুবিধা পাচ্ছে ঠিক কথা। আবার অসুবিধাও তৈরী করছে নিজেদের ভুলে। নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় সালাউদ্দিনের জায়গায় গাজীর পরিবর্তন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এমন আরও অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত খেলোয়াড়দের সন্তুষ্ট রাখবার জন্য প্রথমার্ধে ১—০ বা ২—০ গোলে এগিয়ে থাকা সময়ে নিয়মিত খেলোয়াড়ের পরিবর্তে অনিয়মিত খেলোয়াড়কে দলে ঠেলে দেওয়া হয়। ফল যে সব সময় শুভ হয়, তা নয়। বিপদও আসে বহু ক্ষেত্রে।

আরও একটি প্রশ্ন। ধরুন, বিশ্রামের একটু আগে দলের সেরা খেলোয়াড় আঘাত পেলেন। তিনি আর খেলতে [illegible] কি পারবেন না, তা [illegible] বিশ্রামের বাঁশী বেজে গেল। ইতিমধ্যে দেখা গেল, তাঁর আর খেলার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু তাঁর জায়গায় নতুন কোন খেলোয়াড়কে খেলাবার বিধান নেই। অথচ প্রথমার্ধ শেষ হবার কয়েক সেকেণ্ড আগে নতুন খেলোয়াড় মাঠে নামলে দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর খেলার অধিকার থাকত। আইনের এই বিধানও একটু বেয়াড়া বলে মনে হয়। অন্তত যে উদ্দেশ্যে এই আইন তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অবশ্য বদলী খেলোয়াড়ের নিয়ম ফুটবল আইনে বাধ্যতামূলক নয়। আইন প্রয়োগ করা না-করা জাতীয় সংস্থার ইচ্ছাধীন। তবু মনে হয়, নানা সমস্যা দেখা দেওয়ায় আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের রেফারীজ কমিটিকে ৩ নম্বর আইনের ধারা-উপধারার আরও কিছু রদবদল করতে হবে।

এখন ৪ নম্বর আইনের ধারাগুলির দিকে নজর দেওয়া যাক।

৪ নম্বর আইন—খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম

মূল আইন—কোন খেলোয়াড় এমন কোন জিনিস পরবেন না যা অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে। নীচে যেমন লেখা আছে, খেলার বুট অবশ্যই এই নিয়মমত তৈরি করতে হবে।

(এ) বুটের বার (বাট) চামড়া বা রবার দিয়ে তৈরি করতে হবে। এগুলো চ্যাপ্টা ধরনের হবে এবং বুটের তলায় আড়াআড়িভাবে আঁটা থাকবে। বারের চওড়া আধ ইঞ্চির কম হবে না এবং বুট যতটা চওড়া লম্বালম্বিভাবে বার ততটা চওড়া জুড়ে থাকবে। বারের কোণগুলি থাকবে গোলাকার।

(বি) বুটের স্টাডগুলি (গুটিকা) চামড়া, রাবার, এলুমিনিয়ম, প্ল্যাস্টিক এবং এই ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরি হবে। স্টাডগুলি গোলাকার হবে কিন্তু ভেতরে ফাঁপা হবে না এবং ব্যাস আধ ইঞ্চির কম হবে না। যখন স্টাড ক্রমশ সরু করে তৈরি করা হবে তখনও স্টাডের সবচেয়ে সরু জায়গায় ব্যাসের মাপ আধ ইঞ্চির কম হবে না। যখন ধাতুনির্মিত পীঠিকার উপর স্ক্রু ধরনের স্টাড ব্যবহার করা হবে তখন বুটের তলার চামড়ার সঙ্গে এই পীঠিকা (চাকতি) এমনভাবে জুড়তে হবে যে, এর কোন স্ক্রু যেন স্টাডেরই অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। স্ক্রু ধরনের স্টাড লাগাবার জন্য ধাতুর চাকতি ব্যবহার করা ছাড়া কোন ধাতুর পাত, যদি তা চামড়া বা রবার দিয়ে মোড়াও থাকে তবে তার ব্যবহার চলবে না। [illegible] বুটের তলায় [illegible]

অন্য কোনভাবে পায়ের স্ক্রুর (বেস স্ক্রু) সঙ্গে লাগানোও নিষিদ্ধ। স্টাডকে ধারওয়ালা চাকতির আকার করা বা স্টাডে কোন কারুকার্য করাও চলবে না।

(সি) বুটে "বার" ও "স্টাড" এক-সঙ্গে ব্যবহার করা চলে কিন্তু সেগুলো নিয়মমাফিক এবং আইনের অনুবর্তী হওয়া চাই। বুটের তলায় বা গোড়ালিতে বার এবং স্টাড ¾ ইঞ্চির বেশী পুরু হবে না। যদি লোহার পেরেক ব্যবহার করতে হয় তবে সেগুলো চামড়া বা রবারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

[খেলোয়াড়দের সাধারণ পোশাক হচ্ছেঃ— জার্সি (গেঞ্জি) অথবা শার্ট, হাফপ্যান্ট, মোজা ও বুট। গোলকিপার এমন রঙের পোশাক পরবেন যাতে অন্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে।]

দণ্ডঃ—এই আইনের কোন কিছু লঙ্ঘন করা হলে আইন লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে

কন্টিনেন্টাল টাইপ বুট। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং ভারতে এই ধরনের বুট প্রচলিত

যথাযথ সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দেবার জন্য খেলার মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে এবং দোষী খেলোয়াড় রেফারীকে না জানিয়ে মাঠে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবেন না। সাজ-পোশাক যে নিয়মমত হয়েছে এ বিষয়ে রেফারী নিজে সন্তুষ্ট হবেন। খেলা চলার সময় ঐ খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ করবেন না, খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকবে কেবল তখনই মাঠে ঢুকতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত

(১) আন্তর্জাতিক খেলায় গোলকিপারের জার্সির রঙের সঙ্গে খেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য খেলোয়াড়দের জার্সির রঙের পার্থক্য থাকবে।

(২) যদি রেফারী দেখেন, কোন খেলোয়াড় এমন ধরনের জিনিস ব্যবহার করছেন যা আইনমাফিক নয় এবং যার দ্বারা অন্য খেলোয়াড়দের বিপদ হতে পারে তবে রেফারী সেই খেলোয়াড়কে অপত্তিজনক জিনিসপত্র ত্যাগ করতে আদেশ দেবেন। যদি খেলোয়াড় রেফারীর উপদেশ গ্রহণ না করেন তবে তিনি খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(৩) আইনে এমন কোন বিধান নেই যে, বুট পরতেই হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক খেলায় [illegible] ঃ প্রতিযোগিতায় খেলায়
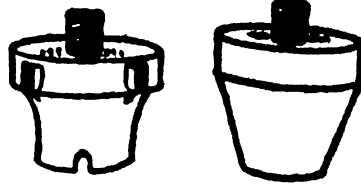
স্ক্রু-ওয়ালা গুটিকা — এল্যুমিনিয়াম বা রবারের গুটিকা

যখন প্রায় সমস্ত খেলোয়াড় বুট পরে খেলে তখন একজন বা দুই একজন খেলোয়াড়কে খালি পায়ে খেলার অনুমতি দেওয়া রেফারীর পক্ষে উচিত নয়।

(৪) ৪ নম্বর আইন লঙ্ঘনের ফলে যদি কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং খেলা চলার সময় যদি সেই খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ করেন তবে রেফারী খেলা বন্ধ করে দোষী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন এবং ১২ নম্বর আইনের ৩(জে) উপধারা অনুযায়ী বল ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন।

(৫) বিভিন্ন জাতীয় দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক খেলা, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার খেলা এবং আন্তর্জাতিক প্রীতি খেলা আরম্ভের আগে রেফারী খেলোয়াড়দের বুট পরীক্ষা করবেন এবং যদি কোন খেলোয়াড়ের বুট ৪ নম্বর আইন-মাফিক না হয় তবে সেই খেলোয়াড় যতক্ষণ না আইনমাফিক বুট পরেন ততক্ষণ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেবেন না। লীগ এবং প্রতিযোগিতার খেলার নিয়মে এই ধারা সংযোজন করা যেতে পারে।

(৬) খেলা আরম্ভের পর কোন খেলোয়াড়ের খেলায় যোগদান বা পুনরায় যোগদান সম্পর্কে ১২ নম্বর আইনের বিধান ৪ নম্বর আইনের লঙ্ঘন নয়। ৪ নম্বর আইন লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়, যাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তিনি অবশ্যই খেলা বন্ধ থাকা সময়ে রেফারীর সামনে উপস্থিত হবেন এবং রেফারী তাঁর আইনমাফিক সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে অনুমতি দেবার পর তিনি মাঠে পুনঃপ্রবেশ করবেন।

[illegible]
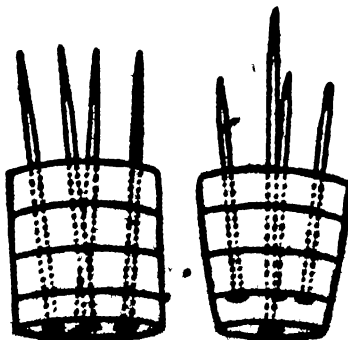
রেফারীদের প্রতি উপদেশ

কেউ অনুরোধ করলে, খেলা আরম্ভের আগে এবং বিরতির সময় খেলোয়াড়দের বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করবেন। যদি সন্দেহের কারণ থাকে তবে যে কোন সময়ে আপনি খেলোয়াড়দের বুট এবং অন্য সাজ-সরঞ্জাম পরীক্ষা করতে পারেন।

এই আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন অনুরোধ-উপরোধের জন্য অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। দোষত্রুটি দেখলে তখনই শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এই দোষত্রুটির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে কোন রিপোর্ট পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

সম্পাদকের প্রতি উপদেশ

আপনার ক্লাবের সমস্ত সভ্যের যাতে খেলোয়াড়দের সাজসরঞ্জামের নিয়ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকে, সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন। খেলোয়াড়দের সতর্ক করে দেবেন যে, যে সমস্ত বুট বিক্রি করা হয় তার মধ্যে অনেক বুটই ঠিক নিয়মমত তৈরি করা নয়।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

আপনার বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম নিয়মমত আছে এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকবেন। কারণ, খেলার সময় সাজসরঞ্জামের ত্রুটির জন্য যদি রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তা হলে আপনাকে হয়তো মাঠের বাইরে পাঠানো হতে পারে এবং আপনার দল কিছুক্ষণের জন্য আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে পারে। স্টাডের খুঁত মেরামতের দিকে নজর রাখবেন, যদি সেগুলো ক্ষয়ে যায় এবং তার পেরেক বেরিয়ে পড়ে তবে ৪ নম্বর আইনের ব্যতিক্রম ঘটবে।

চিঠি-পত্র

(১) বিজেন্দু দেব, লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান, বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

প্রশ্ন ঃ (ক) গোলরক্ষক বল ধরে মাটিতে না ছুঁইয়ে ৪ ধাপের বেশী এগোলে ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া হয়। এ ছাড়া রেফারীর মাঝে মাঝে ইন্ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিয়ে থাকেন (গোল কিক ও অফ্‌সাইড ছাড়া)। কখন কোন্ অবস্থায় এগুলি প্রযোজ্য? আর ইন্ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ কি মুখে বলে দিতে হয়? না, বাঁশী বাজানোর রকমফের আছে।

(খ) অফসাইড ট্র্যাপ কিভাবে বিচার করা হয়?

উত্তর (ক) বহু ক্ষেত্রেই ইন্ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেওয়া যায়। যেমন ঃ (১) বিপজ্জনকভাবে খেলা, (২) বল ধরে না থাকা সত্ত্বেও গোলকিপারকে চার্জ করা, (৩) প্রতিপক্ষকে অন্যায়ভাবে বল খেলতে বাধা দেওয়া, (৪) বার বার নিয়মভঙ্গ করা, (৫) কথায় ও কাজে রেফারীর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করা, (৬) [illegible] (৭) [illegible] ফ্রি-কিক, পেনাল্টি-কিক, [illegible]

কেউ স্পর্শ করবার আগে দ্বিতীয়বার বল খেলা, (৮) পেনাল্টি কিক সামনের দিকে না মারা প্রভৃতি অপরাধের জন্য ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দেবার বিধান আছে। পরে আইনের আলোচনার সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে।

ইন্‌ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবার সময় প্রথমে হাত তুলে এবং পরে বাঁশী বাজিয়ে নির্দেশ দিতে হয়। বাঁশী বাজানোর মধ্যে কোন রকমফের নেই।

(খ) (১) থ্রো-ইনের সময় অবশ্যই মাঠকে সামনের দিকে রেখে দাঁড়াতে হবে। (২) দু'খানি পা অবশ্যই টাচ-লাইনের উপরে বা টাচ-লাইনের বাইরে (মাঠের বাইরে) থাকবে; (৩) অবশ্যই দু' হাত ব্যবহার করতে হবে; (৪) অবশ্যই মাথার উপর দিয়ে বল ছুঁড়তে হবে।

অনেকে দু'হাতে বল ধরলেও এক হাতে জোর দিয়ে বল ছোঁড়েন টাচ-লাইনের উপর দাঁড়ালেও আঙুলে ভর দিয়ে বল ছোঁড়ার সময় টাচ-লাইন থেকে পা তুলে ফেলেন—এ সবই আইনবিরুদ্ধ।

(২) অরবিন্দ ঘোষ, রাঁচি।

প্রশ্ন : হ্যান্ডবল নিয়ে প্রায়ই দ্বিমত দেখা যায়। অনেকের ধারণা কনুইয়ের উপর বল লাগলে হ্যান্ডবল হয় না। আপনার মত কি?

* উত্তর : আমার মত : কনুইয়ের উপর বল লাগলে নিশ্চয়ই হ্যান্ডবল হবে না তবে কনুইয়ের উপর দিয়ে বল খেললে অবশ্যই হ্যান্ডবল হবে। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল না খেললে হ্যান্ডবল হয় না। আর হাতের কোন্ অংশ দিয়ে বল খেললে হ্যান্ডবল হয় তা নকশায় দেখুন।

(৩) সুজিত গুহঠাকুরতা, ঈশ্বর গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-২৬।

প্রশ্ন : (ক) ফুটবল খেলার যে অফ্-সাইড নিয়ে এত গোলমাল হইচই, সেই অফ্-সাইড কখন সংঘটিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর আমি কিছু কিছু জানলেও মনের সন্দেহ দূর হয় না।

(খ) গোলরক্ষকের গোল কিক, পেনাল্টি কিক মারবার স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিক করবার অধিকার আছে কি? (যেমন: হ্যান্ডবল, ফ্রি কিক্ ইত্যাদি)।

* উত্তর : (ক) অফ্-সাইডের সমস্ত খুঁটিনাটি অল্প কথায় বলা সম্ভব নয়। বেশী কথায় বলবার সময় ও তারগ্রামের সাহায্য দরকার। পরে নিশ্চয়ই আলোচনা করব। অফ্-সাইড নিয়েই তো বেশী গোলমাল। আর মনের সন্দেহ? আপনি তো শুধু জানতে চান। যাঁদের মনের মধ্যে আছে ক্লাব-মোহ তাঁরা তো মনের ব্যাধিতে চোখেও ঝাপসা দেখেন। সুতরাং অফ্-সাইড নিয়ে হইচই থাকবেই। তবে ফুটবল ক্রীড়ামোদীরা এ সম্বন্ধে যত ওয়াকিবহাল হবে ততই মঙ্গল।

(খ) গোলকিপারের সব কিকই মারবার অধিকার আছে। গোলকিপারের সঙ্গে দলের বাকি দশজনের মোটামুটি পার্থক্য : গোলকিপারের তার এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল ধরার অধিকার আছে, বাকি দশজনের সে অধিকার নেই। সুতরাং হ্যান্ডবল বা ফ্রি কিক করায় গোলকিপারের বাধা কোথায়?

ভুল সংশোধন

'দেশ'-এর গত সংখ্যায় (৩৩ সংখ্যা) ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে একটু ভুল আছে।

"শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই বল গোল-লাইন অতিক্রম না করলেও গোল দেওয়া যেতে পারে, যদি রেফারী মনে করেন, গোলপোস্ট যথাস্থানে থাকলে বল গোলে প্রবেশ করত"—এই অনুচ্ছেদে গোলপোস্টের পরিবর্তে ক্রসবার হবে। অনবধানতাবশত গোলপোস্ট লেখা হয়েছে।

কিন্তু গোলকিপারের দ্বারা টেনে নামানো ক্রসবারে বল লেগে ফিরে এলে এখন গোল হবে কিনা সে বিষয়ে ফুটবল আইনের নতুন বইয়ে আন্তর্জাতিক বোর্ডের সুস্পষ্ট
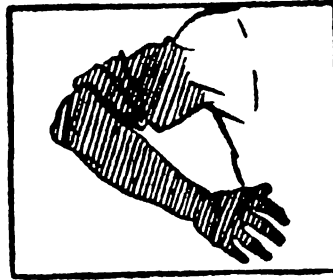
হাতের এই অংশ দিয়ে ইচ্ছে করে বল খেললে হ্যান্ডবল হয়

নির্দেশ নেই। আগে যে সিদ্ধান্তের বলে এ ক্ষেত্রে গোল দেওয়া যেত, আন্তর্জাতিক বোর্ডের সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে:—

"If the cross-bar of the goal, by falling exactly at the moment the ball would have passed into goal, prevents the ball from passing over the goal-line, the referee should allow the goal, if, in his opinion, the ball would have passed the goal-line under the bar, had it stayed in its normal position." (Law-10; Method of Scoring; decision of the International Board).

এর মর্মার্থ—গোলকিপারের দ্বারা টেনে নামানো হোক আর অন্যভাবেই হোক, স্থানচ্যুত ক্রসবারে বল লেগে ফিরে এলে রেফারী যদি মনে করেন, ক্রসবার যথাস্থানে থাকলে বল গোলে প্রবেশ করত তবে তিনি গোল দিতে পারেন।

কিন্তু ফুটবলের নতুন বইয়ে এই সিদ্ধান্তটি আর নেই। উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূল আইনে আগেও যা ছিল এখনো তাই আছে। তার অর্থ—কোন কারণে ক্রসবার স্থানচ্যুত হলে বল যদি গোল-লাইন অতিক্রম করে এবং রেফারী যদি মনে করেন, নীচের দিকে নামানো ক্রসবার ঠিক জায়গায় থাকলেও বল গোলে প্রবেশ করত তবে তিনি গোল দিতে পারেন। এই সম্বন্ধে মূল আইনের ভাষা নিম্নরূপ:—

"....Should the cross-bar become displaced for any reason during the game, and the ball cross the goal-line at a point which, in the opinion of the Referee, is below Where the cross-bar should have been, he shall award a goal. (Law-10; Method Of Scoring).

বল গোল-লাইন অতিক্রম না করলেও আন্তর্জাতিক বোর্ডের যে সিদ্ধান্তের বলে মাত্র একটি ক্ষেত্রেই গোল দেওয়া যেত, নতুন আইন বই থেকে সে সিদ্ধান্ত তুলে দেওয়ায় মনে হয় বল গোল লাইন অতিক্রম না করলে কোন ক্ষেত্রেই আর গোল দেওয়া চলে না। তবুও এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বোর্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া দরকার।

এ সপ্তাহের প্রশ্ন

[ভেবে উত্তর ঠিক করে রাখুন, আগামী সপ্তাহের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা?]

(১) জলকাদার মাঠে খেলা হচ্ছে। হাফটাইমের পর দেখা গেল, বলের ওজন ১৭ আউন্সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি দল, যারা ৩—১ গোলে পিছিয়ে আছে, তারা বেশী ওজনের বলে খেলতে আপত্তি জানাল। রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন? বল বদল করবেন কি?

(২) গোলে বল ঢুকছে, বল যখন গোল লাইনের উপরে তখন গোলকিপার বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই বলটি ফেটে গিয়ে গোলকিপারের বুকের নীচ দিয়ে গোল লাইন অতিক্রম করে গেল। রেফারী হিসাবে আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং কিভাবে আবার খেলা আরম্ভ করবেন?

(৩) ধরুন, কড়া রোদের মধ্যে বা রাত্রিকালে ফ্লাডলাইটে খেলা হচ্ছে। কর্নার কিকের সময় লাইন্সম্যানের উজ্জ্বল লাল সাটিনের পতাকার রিফ্লেকশন গোলকিপারের চোখে পড়ল আর কর্নার কিক সরাসরি গোলে ঢুকে গেল। গোলকিপার রেফারীর কাছে প্রতিবাদ করল। রেফারী কি সিদ্ধান্ত নেবেন?

(৪) খেলা আরম্ভের সময় দেখা গেল, বলের পরিধি সাড়ে ছাব্বিশ ইঞ্চি। হাতের কাছে আর কোন বল নেই। রেফারী খেলা আরম্ভ করবেন কি?

(৫) মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল একটি লীগের খেলায় তৃতীয় ক্লাবের মাঠে হাজির হয়েছে। দুই পক্ষই তাদের বলে খেলা আরম্ভের দাবি জানাল। কাদের বলে খেলা আরম্ভ হবে?

দেশী সংবাদ

১০ই জুন—কলিকাতা ও শহরতলির বিস্তীর্ণ এলাকাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনবসতি-শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বেপরোয়াভাবে নলকূপ খননের ফলে অদূরভবিষ্যতে জমির উর্বরতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তো আছেই, লক্ষ লক্ষ লোকের পানীয় জলের চরম সংকটের সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের সাম্প্রতিক হুমকির কিছুদিন আগে হইতেই বনগাঁ-বসিরহাট সীমান্তের সুবিস্তৃত এলাকা পাকিস্তানী গুপ্তচরদের অবাধ লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

১১ই জুন—ভারতে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধানত ইংরেজ পরিচালিত একটি খ্যাতনামা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এইবার বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছে। অদ্য কলিকাতা কাস্টমস ডালহৌসি পাড়ার কোম্পানীটির সদর দপ্তরে অতর্কিতে হানা দিয়া হিসাব-বই ও অন্যান্য কাগজপত্র তল্লাসী করে।

দিনের পর দিন অবর্ণনীয় অত্যাচারের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া নোয়াখালী ও কুমিল্লা এই দুই জেলা হইতে গত তিন মাসে প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু নরনারী পাক-ত্রিপুরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছে।

১২ই জুন—কাস্টমসের সোনাদৃষ্টিতে পতিত কলিকাতার সেই সুপরিচিত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের নাম বার্ড অ্যাণ্ড কোম্পানী। কোম্পানীটির বিরুদ্ধে অভিযোগ—বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি। ফাঁকির পন্থা—আণ্ডার ইনভয়েসিং।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কলেকশন বিভাগের কর-আদায়কারীদের (বেলিফ) এক ওয়ার্ড হইতে অন্য ওয়ার্ডে বদলির প্রশ্নে পৌরসভার কমিশনার এবং কালেক্টরের মধ্যে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে। একজন পদস্থ অফিসারের সঙ্গে কমিশনারের সরাসরি মতবিরোধ কর্পোরেশনের ইতিহাসে সম্ভবত ইহাই প্রথম।

১৩ই জুন—খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং খনিজাত দ্রব্য রপ্তানির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী পরিচালনাধীন তিনটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে বেশ কিছুদিন যাবত যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি দিতেছেন, সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

সম্ভবত বিচারপতি শ্রী এস কে দাসের তদন্তের ফলাফলের আভাস পাইয়া কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কলিকাতার সিরাজুদ্দীন কোম্পানীর সহিত মন্ত্রী মহাশয়ের অবৈধ লেনদেন সম্পর্কে যে অভিযোগ ওঠে, বিচারপতি দাসকে সেই সম্পর্কে তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছে।

১৪ই জুন—অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য শ্রী শ্রীমন নারায়ণ জানান যে, মার্কিন সরকার পি এল ৪৮০ চুক্তি অনুসারে ভারতকে অবিলম্বে দেড় লক্ষ টন চাউল সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

উপনির্বাচনে কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনার্থে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বানের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রীসহ কংগ্রেস দলের পঞ্চাশজনেরও অধিক সদস্য কংগ্রেস সভাপতির নিকট লিখিতভাবে এক যুক্ত আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন।

১৫ই জুন—আন্তর্জাতিক সীমারেখা ও প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া লালচীন লাদকে ভারতীয় এলাকায় ছয়টি ঘাটি স্থাপন করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

কলিকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই জুন—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, পশ্চিম দিনাজপুরের পুলিস কর্তৃপক্ষ গত ১৩ই জুন এই জেলার ইসলামপুরে এক পাকিস্তানী গোয়েন্দা-চক্রের অস্তিত্বের সন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুলিস দল দুইজন বিশিষ্ট মুসলমানের গৃহে হানা দিয়া দুইটি বেতার-সংবাদ-প্রেরণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উহা আটক করিয়াছেন।

রেওয়ার মহারাজার নিকট হইতে লণ্ডনের চিড়িয়াখানা ২০ হাজার স্টার্লিংয়ের বিনিময়ে একজোড়া বাঘের বাচ্চা কিনিয়াছেন। বাচ্চা দুইটির গায়ের রং সাদা, মধ্যে মধ্যে কাল ডোরা দাগ আছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই জুন—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান তাঁহার রাজনৈতিক জীবনকে "ওয়াটারলু" হইতে রক্ষা করার জন্য অদ্য লণ্ডনে ছুটিয়া আসিয়াছেন এবং প্রফুমো কেলেঙ্কারির ফলে বৃটেনের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হইয়াছে কি না, সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ঘোষণা করিয়াছেন যে, পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধের চুক্তি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে শীঘ্রই আলোচনা আরম্ভ হইবে। আলোচনা মস্কোতে অনুষ্ঠিত হইবে।

১১ই জুন—আগামী অক্টোবর মাসে পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের বৃটেন পরিদর্শনের কথা আছে, কিন্তু প্রফুমো কেলেঙ্কারি তাহাতেও এক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ভূতপূর্ব বৃটিশ সমর সচিবের অবৈধ প্রণয়কাহিনী সম্পর্কে তদন্ত চলিতে থাকাকালে আয়ুব খানের এই সফর উচিত হইবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী আজ আলাবামার বর্ণবিদ্বেষী গভর্নর জর্জ ওয়ালেসের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাবাণী জারি করেন। উহাতে বলা হয়, গভর্নর যেন আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে কোনরূপ বাধা না দেন। দিলে বে-আইনী কাজ করিবেন।

১২ই জুন—আজ লণ্ডনে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের পদার্পণ, লণ্ডনে রাষ্ট্রপতির বিপুল সংবর্ধনা এবং ভিক্টোরিয়া স্টেশনে রাজদম্পতির অভিনন্দন জ্ঞাপন এক নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে। এই ইতিহাস শুধু ভারত বা বৃটেনের নয়, সমগ্র কমনওয়েলথের স্মরণীয়।

মার্কিন সমাজজীবনে বর্ণবৈষম্যের অবসান ঘটাইবার জন্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডী আবেদন জানাইয়াছেন এবং এ সম্পর্কে আইন প্রণয়নের সংকল্পও তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আরও কয়েকটি অঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

১৩ই জুন—প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নূতন শক্তিগোষ্ঠী গঠনের খোয়াব দেখিয়াছেন। তিনি মনে করেন, পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও ইরান এবং সম্ভব হইলে তুর্কীকে লইয়া এই শক্তিগোষ্ঠী গঠন করা দরকার।

গতকাল বর্ণবৈষম্যের উচ্ছেদকামী নিগ্রো নেতা মেডগার এভার্সের হত্যাকাণ্ডের পর আজ জ্যাকসনে (মিসিসিপি) স্থানীয় নিগ্রোদের মধ্যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয় এবং মিসিসিপি রাজ্যের এই রাজধানীতে নূতন করিয়া জাতিগত সংঘর্ষ বাধিবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

১৪ই জুন—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাস জা না ই তে ছে—মানব-আরোহীসহ একখানা সোভিয়েট মহাকাশ-যান পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। মহাকাশচারীর নাম কর্নেল বিকোভস্কী—তিনি ৮৮ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক আকাশে একটা অস্বস্তিকর থমথমে ভাব। প্রফুমো-কেলেঙ্কারি সম্পর্কে লর্ড চ্যান্সেলারের রায় বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ঐ ঘটনার উপর যবনিকাপাত ঘটে নাই।

১৫ই জুন—কাতাঙ্গার অর্থ ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীকিম্বা আজ প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট চিসোম্বে গতকাল প্যারিস অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন, সেখানেই তিনি সাময়িকভাবে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করিয়াছেন।

হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞান আকাডেমির শব্দবিজ্ঞান শাখার গবেষণায় প্রকাশ, প্রতিটি মানুষ প্রত্যহ এক ঘণ্টা কথা বলিয়া কাটায়—সারাজীবনে সে কথা বলে প্রায় পৌনে তিন বছর। সারাজীবনে যে পরিমাণ কথা বলা হয় তাহা লিখিয়া রাখিলে ৪০০ পাতার ১ হাজারখানা পুঁথি পূর্ণ হইয়া যায়।

১৬ই জুন—সুদর্শনা সুহাসিনী, সুভাষিণী ভ্যালেণ্টিনা তেরেসকোভা পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী বৃদ্ধ মহাকাশচারী বিকোভস্কির সহিত একযোগে দুইখানা স্বতন্ত্র মহাকাশ-যানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ভ্যালেণ্টিনার সাংকেতিক নাম "শঙ্খচিল", বিকোভস্কির নাম "বাজপাখী।" উভয়ে একযোগে পৃথিবীতে বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট মহাকাশচারীরা জানাইয়াছেন, ভারহীনতার দরুন টুথব্রাশ বা পেস্ট ব্যবহার করা সম্ভব হইতেছে না। সেইজন্য কেবলমাত্র মুখ ধুইয়া ফেলা হইতেছে। ইতিমধ্যে এমন ধরনের টুথপেস্ট তৈয়ারি করা হইতেছে, যাহা গিলিয়া ফেলিতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible]
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
[illegible] : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
[illegible]
[illegible] : ৩৩-২২৫০ ও ৩৩-৬৩০১। [illegible]

নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী রায় কাহিনীর প্রথম ওম্‌নিবাস্‌ ভল্যুম "কিরীটী রায়" প্রকাশিত হ'ল

॥ দাম দশ টাকা ॥

—ঃ নীহারবাবুর অন্যান্য বই ঃ—

রাতের রজনীগন্ধা ৪॥৹ মুখোশ ৫॥৹ উত্তর-ফাল্গুনী ৬॥৹ ঘুম নেই ৫৲ অস্তিভাগীরথী তীরে ৭॥৹ মধুমিতা ৫॥৹ কালো ভ্রমর (১ম ও ২য়) ৫৲ (৩য় ও ৪র্থ) ৫॥৹

কিরীটী রায়
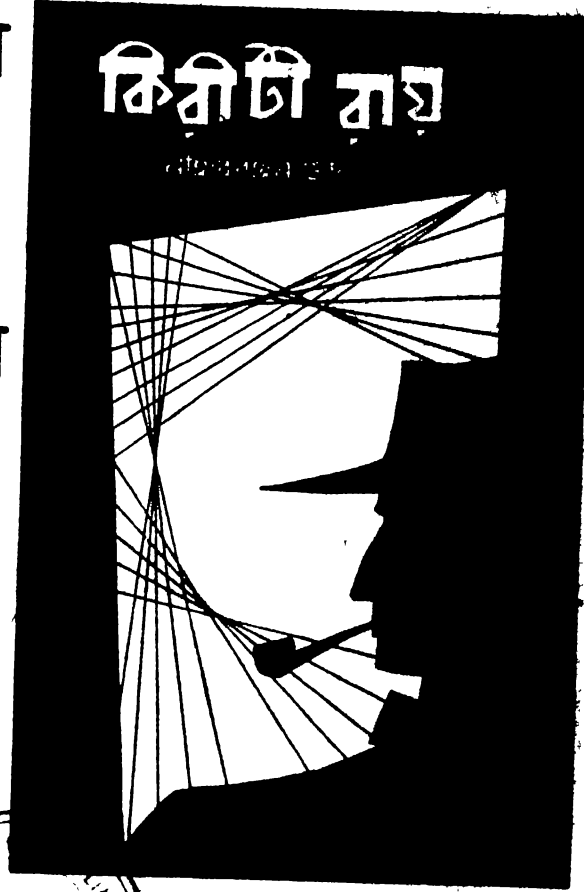
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲

প্রমথনাথ বিশীর
গল্প পঞ্চাশৎ ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
গল্প পঞ্চাশৎ ৯৲

মনোজ বসুর
গল্প পঞ্চাশৎ ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর
গল্প পঞ্চাশৎ ৮৲
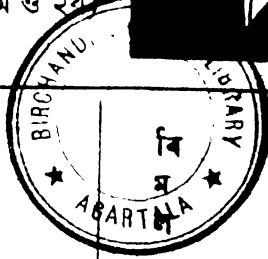
বিমল মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প
(যন্ত্রস্থ)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫॥৹

সন্মথনাথ ঘোষের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

প্রমথনাথ বিশীর
নিকৃষ্ট গল্প ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন রহস্যঘন উপন্যাস

উড়ো পাখী ৫৲

আশাপূর্ণা দেবী তাঁহার সমস্ত ঐতিহ্যকে অতিক্রম করিয়াছেন এই নূতন উপন্যাসে

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিধানচন্দ্র-স্মরণে—		৮৭৫
ব্যঙ্গচিত্র—কুট্টি		৮৭৬
বৈদেশিকী—		৮৭৭
দ্রুণাক্ষরে—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ		৮৭৯
শিল্পীর স্বাধীনতা—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী		৮৮১
লক্ষ্মীর তপস্যা—শ্রীসতীকান্ত গুহ		৮৮৫
অন্য হ্যারল্ড—সমুদ্রগুপ্ত		৮৯১
ভিক্টোরিয়া পার্ককে: পুনরুজ্জীবন (কবিতা) —শ্রীকেতকী কুশারী		৮৯৬

feel easy with
CALYX
SANITARY TAMPONS
WITH SAFETY DEVICES
AND
CALYX SANITARY TOWELS
(Soluble)
FAIRWAY TRADING CO.
CALCUTTA-11 PHONE : 35-4145

আঃ
কি
আ
রা
Gopal

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শ্রীকান্তিময় রায়চৌধুরী

DESH 40 Naye Paise
Saturday, 29th June 1963.

৩০ বর্ষ ॥ ৩৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৪ আষাঢ়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

বিধানচন্দ্র-স্মরণে

গত বছর পয়লা জুলাই রবিবার—জন্মবার্ষিকীর আনন্দলগ্নে বিধানচন্দ্র রায়ের মহাপ্রয়াণ। দিনটি ভুলবার নয়। গত বছর পয়লা জুলাই বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের অপ্রত্যাশিত, অকল্পনীয় আকস্মিক একাত্মতার আনন্দ ও বেদনাময় বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা জনচিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার স্মৃতি আজও এক অপরূপ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। এককালের অভিযোগ ছিল, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। কিন্তু গত এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান যাঁরা পৌরুষে, বীর্যে, ত্যাগে, কল্পনায়, কর্মকুশলতায় দেশ ও জাতির জীবনে রূপান্তর ঘটিয়েছেন বাঙ্গালী তাঁদের কখনও চিনতে ভুল করেনি, প্রতিভা এবং পরাক্রমের যোগ্য স্বীকৃতি-দানে কুণ্ঠিত হয়নি। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে বাঙ্গালী সর্বদাই শ্রদ্ধাবনত। বিধানচন্দ্রের অস্তিত্ব, তাঁর অসামান্য প্রতিভা এবং বহুমুখী কর্মধারার সার্থকতা অর্ধশতাব্দীরও বেশী বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনেতিহাসে প্রতি মুহূর্তে অনুভূত হয়েছে। অবিস্মরণীয় তাই এই সার্থকনামা ব্যক্তির জীবনসাধনা, কেবল তাঁর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে নয়, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তাঁর বিচিত্র কর্মময় জীবনের কীর্তিকথা প্রতি নিয়ত আলোচনার বস্তু।

প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা, অভিনব সৃজন-প্রেরণা এবং আদর্শ নিষ্ঠার অভাব রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে বাংলাদেশে কখনও ঘটেনি। দেশবন্ধু, নেতাজী এবং শ্যামাপ্রসাদের মত বলিষ্ঠ নেতৃত্বেও বাঙ্গালী নিঃসন্দেহে সারা ভারতের আদর্শস্থল। অদ্ভুতকর্মা বিধানচন্দ্র এই ঐতিহ্যের ধারাবাহী হয়েও আপন শক্তিমত্তাবলে স্বতন্ত্র এবং সার্থকতর পীঠভূমিতে প্রতিষ্ঠ। যুগধর্ম এবং জীবনকালের তারতম্যে প্রতিভার সম্যক বিকাশ ও সার্থকতার প্রভেদ ঘটা অবশ্য অনিবার্য প্রায়। দেশবন্ধুর আদর্শ সংকল্প এবং প্রয়াস তুলনাহীন কিন্তু অকালমৃত্যুবশত অসমাপ্ত। নেতাজীর তিরোধানে এবং শ্যামাপ্রসাদের স্বল্পায়ু নেতৃত্বেও তেমনি অসামান্য বজ্রগর্ভ সম্ভাবনার চমকপূর্ণ-তার সুযোগবঞ্চিত। দীর্ঘায়ু বিধানচন্দ্র সে-হিসেবে দুদিক দিয়ে বিধাতার আশীর্বাদধন্য। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের

শুরু গান্ধীজি ও দেশবন্ধুর সাহচর্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে; তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বচ্ছন্দ সার্থক পরিণতি স্বাধীন ভারতে নবীন বাংলার ইতিহাস রচনায়, নির্মাণে ও রূপায়ণে। বিধানচন্দ্র যেমন অসামান্য প্রতিভাধর তেমনি ভাগ্যবান, তাই তাঁর কল্পনা ও কর্মৈষণার সঙ্গে সময় এবং সুযোগের মিলন ঘটেছিল চমৎকার।

কর্মীপুরুষ বিধানচন্দ্র, দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলীতে স্থান অধিকার করা তাঁর পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছিল। অসাধারণ শক্তিমান একজন ইংরেজ রাষ্ট্রবিদ সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি টেবিলের যে কোনখানেই উপবিষ্ট হোন না কেন সেটাই শীর্ষস্থান। জাতীয় নেতৃ-মণ্ডলীতে বিধানচন্দ্রের স্থানও ছিল সেইরকম সর্বজনবন্দিত, সর্বাগ্রগণ্যপ্রায়। তবু তিনি বাংলা ও বাঙ্গালীকে ছেড়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা কখনও ভাবতেই পারেন নি। মনে প্রাণে বাঙ্গালী, বাংলার সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দিনে তিনি বাংলা ও বাঙ্গালীর সেবাতে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন কর্মজীবনের শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত।

দেশ বিভাগের পর বাংলা ও বাঙ্গালীর কঠিন দুর্দিনেই এই সমস্যাকণ্টকিত অভাবপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করেছিলেন। অনেক বাধা ও বিপত্তি, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে কর্মী-পুরুষ অসাধারণ দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নবীন বাংলার সমৃদ্ধি সৃজনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। নিষ্ফল হয়নি বিধানচন্দ্রের সেই নিরলস কর্মপ্রয়াস। বিধানচন্দ্র নেই, কিন্তু নবীন বাংলার শিল্পায়নে, কলামন্দিরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, সেবায়তনে যাবতীয় উদ্যোগে কর্মযোগী বিধানচন্দ্রের পরিচ্ছন্ন সংগঠননিপুণতা ও অনুপম মমত্ববোধের স্বাক্ষর আজও উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত।

তারুণ্যে, মেধায়, স্পষ্টভাষণে, স্বাধীন-চিত্ততায়, নির্ভীক আত্মনির্ভরতায় ভরপুর বিধানচন্দ্রের মত বিশাল পৌরুষসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের কালে অন্তত সুদুর্লভ। তাঁর অনুরাগী এবং অনুগামী যাঁরা তাঁরা বিধানচন্দ্রের সার্থক কর্মময় ঐতিহ্যকে যথাসাধ্য লালনে এবং পোষণে যত্নবান হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধানচন্দ্রের ঐতিহ্য কেবল স্মৃতিসৌধে রক্ষিত হওয়ার বস্তু নয়। নবীন বাংলার সুবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রই তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি, বাঙ্গালীর নবজীবনধারার প্রেরণাস্থল। পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু অমিতবীর্য কর্মীপুরুষ দেখা দেন যাঁদের অসামান্য ব্যক্তিত্বকে কেবল স্মৃতি-ফলকে কিম্বা ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা যায় না। বিধানচন্দ্র সেইরকম একজন মানুষ যাঁর আদর্শে ঐকান্তিকচিত্তে দীক্ষিত হওয়া, যাঁর কর্মপ্রয়াসকে শতমুখে সার্থক করাই তাঁর প্রতি, তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শনের প্রকৃষ্টতম উপায়।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলেছেন জরুরী অবস্থা এখনও চলবে।
খুবই স্বাভাবিক। শিশি থেকে বেরিয়ে আসা ভৃত্যকে যা হুকুম করছেন তাই সে এনে দিচ্ছে যে!
জরুরী অবস্থা
ঝাড়খণ্ড পার্টি বিহারের কংগ্রেসদলে যোগ দিয়েছে'
মোরগটাকে ধরা হয়েছে খাবার জন্যে নয়, সংখ্যা বাড়াবার জন্যে।
ঝাড়খণ্ড পার্টি
ক্রিস্ কীলার স্বীকার করেছেন যে আয়ুব খাঁও তাঁর অন্যতম মক্কেল ছিলেন।
কিন্তু ও ভয়ে কম্পিত নহে খাঁ-এর হৃদয়।
স্বর্গ হইতে বিদায়!
Kutty
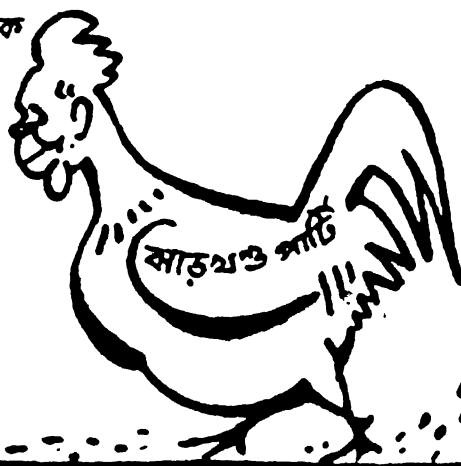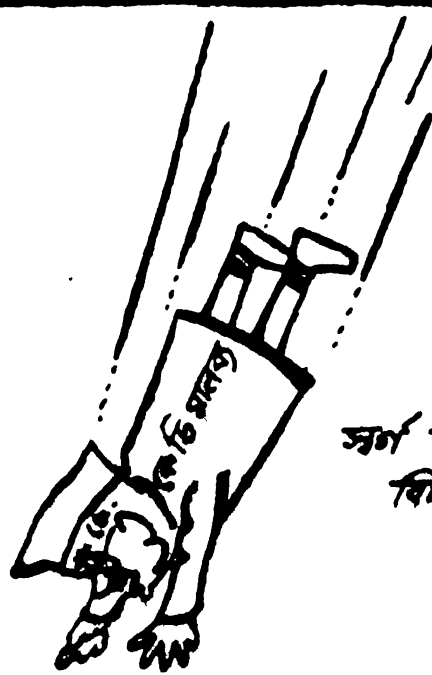
চীনারা লাদাকে নূতন করে ভারতীয় সীমানার মধ্যে অনেকখানি এগিয়ে এসে একটা সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত বছরের বড়ো আক্রমণের পরে চীনদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এটাই সবচেয়ে গুরুতর আক্রমণাত্মক ঘটনা। চীনারা তো একটার পর একটা নূতন মানচিত্র বার করে তাদের দাবির বহর বৃদ্ধি করে চলেছে। কিন্তু সম্প্রতি চীনারা যে সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেটা ১৯৬০ সালে তারা যে-মানচিত্র উপস্থিত করেছিল, তারও বাইরে। গত বছরের বড়ো আক্রমণের পরে চীনারা যে একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত ঘোষণা করে, তাতে তারা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ সালের 'অ্যাকচুয়াল লাইন অব কণ্ট্রোল' বলে একটা সীমানার কথা উল্লেখ করে, যদিও সেটাও অনেকটা চীনাদের মনগড়া ব্যাপার। সম্প্রতি চীনারা যে সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেটা চীনাদের সেই স্বকল্পিত 'লাইন অব অ্যাকচুয়াল কণ্ট্রোল' এরও অনেকখানি এদিকে। কলম্বো, কনফারেন্সের প্রস্তাব যে লঙ্ঘিত হয়েছে, সে কথা তো বলাই বাহুল্য।

তবে এই ঘটনাতে আশ্চর্য হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই। কিছুদিন থেকে ভারতীয় সরকারী বিবৃতিগুলিই জনসাধারণের মন এবিষয়ে অনেকটা প্রস্তুত করে রেখেছিল। চীনারা ভারত সরকারে বিরুদ্ধে কিছুদিন ধরে নানা অভিযোগ করছিল। সেগুলির উল্লেখ করে ভারতীয় সরকারী মুখপাত্রগণ বলে আসছিলেন যে অতীতে দেখা গেছে যে, চীনারা যখন নিজেরা কোনো একটা আক্রমণাত্মক কাজের জন্য প্রস্তুত হয় তখন তারা আগে থাকতে ভারতের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে অপপ্রচার শুরু করে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে লাদাকে ভারতীয় এলাকার মধ্যে নূতন করে চীনারা যে সামরিক ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে জানা গেছে আপাতত কেবল এটার জন্যেই চীনারা প্রস্তুত হচ্ছিল অথবা এটা ছাড়া শীঘ্র আরো কোনো গুরুতর আক্রমণাত্মক ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই। সবচেয়ে মুশকিল এই যে, চীনা আক্রমণের প্রতিরোধ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি এবং সামরিক পরিকল্পনা ঠিক যে কী তা জনসাধারণের নিকট এখনো সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চীনাদের মতলব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মতপ্রকাশ করেন যাতে প্রকৃত অবস্থা এবং সরকারী নীতি বুঝবার পক্ষে সাধারণ লোকের বিশেষ কোনো সাহায্য হয় না। আপাতত চীনারা কোনো একটা বড় রকমের আক্রমণ শুরু করবে বলে পণ্ডিত নেহরু মনে করেন না, একথা কিছুদিনের মধ্যে পণ্ডিতজী কয়েক বার বলেছেন। চীনারা বড় রকমের আক্রমণ কালে ভারতবর্ষ যে বাধা দেবে সে কথা বলা বাহুল্য, কারণ বাধা না দিয়ে করবে কী সে সম্বন্ধে কেবল প্রশ্ন হতে পারে, বড় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য কী রকম ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং তার জন্যে ঠিক পথে চেষ্টা চলছে কিনা। কিন্তু বড় আক্রমণ যাকে "ইনভেশন্" বলা যায় তা না করে চীনারা ওই লাদাকে যেমন করল যদি এইরকমই করতে থাকে তাহলে সরকার কী নীতি অবলম্বন করবেন সেটাই দেশের লোকের কাছে অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে, অথচ রাজনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে এই রকমের আক্রমণগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। কারণ বিনা প্রতিরোধে যদি চীনারা এই রকম করে যেতে পারে তবে তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য—চীনা প্রভাবের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের অবমানন—সেটা সিদ্ধ হবে। সুতরাং এই ধরনের আক্রমণ সম্পর্কে চীনা সরকারকে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কোনো সক্রিয় নীতি ভারত সরকারের আছে কিনা, চীনা জবরদস্তির বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো সামরিক প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে কিনা সেটা জনসাধারণ জানতে চায়।

কোনো সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে অবশ্য সেটা সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হবে। কোনো সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হলে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব সুবিধা-অসুবিধার হিসাব করেই কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে, সন্দেহ নেই। প্রত্যাঘাতের রকম এবং সময় সম্পর্কে সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতের উপর নির্ভর করতেই হবে। কিন্তু সামরিক বিশেষজ্ঞেরাও সরকারী নীতির
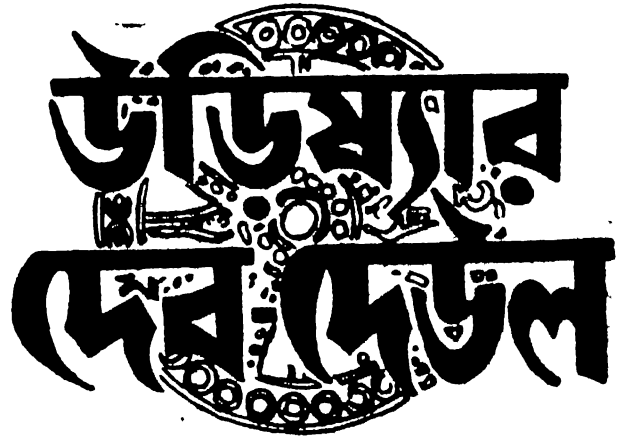
মুখ্য উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রেখেই তাদের স্ট্র্যাটিজি বা ট্যাকটিক্স ঠিক করবেন। এক্ষেত্রে সরকারী নীতি ঠিক কী সেটা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। চীনারা সম্প্রতি লাদাকে যে-ধরনের আক্রমণাত্মক কাজ করছে সেরূপ কাজের বিরুদ্ধে কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কিনা, অর্থাৎ চীনারা ভারতভূমিতে যে নূতন সামরিক ফাঁড়ি বসালো সেখান থেকে তাদের হটিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো সামরিক পন্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, এইটাই প্রশ্ন।

যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যে কারণেই হোক ভারত সরকার চীনাদের একতরফা যুদ্ধ-বিরতি শর্ত এখন পর্যন্ত কার্যত মেনে চলেছেন, তাতে চীনারা বলপ্রয়োগের দ্বারা যা লাভ করেছিল তা পাকা করে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এখন চীনারা তাদের নিজেদের আরোপিত একতরফা যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করে ভারতের ভিতরে আরো এগিয়ে এসে গেড়ে বসছে। এসবের বিরুদ্ধে সক্রিয় বাধাদানের চেষ্টা কি ভারত সরকারের বর্তমান নীতির বহির্ভূত?

কলম্বো কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করার সময়ে পণ্ডিতজী বলেছিলেন যে, ভারত সরকার যদি ঐ প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেন এবং চীনা সরকার যদি সেগুলি গ্রহণ না করেন তবে ভারত সরকারের কূটনৈতিক লাভ হবে, কারণ তাতে কলম্বো কনফারেন্সে যাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তাঁরা চীনের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে ভারতের পক্ষাবলম্বন করবেন। চীনা সরকার কলম্বো কনফারেন্সের প্রস্তাবগুলি 'ইন প্রিন্সিপল' স্বীকার করার ভাঁওতা দিয়ে কার্যত সেগুলিকে নাকচ করে দিয়েছেন; কিন্তু তার দ্বারা ভারত সরকারের বিশেষ কোনো কূটনৈতিক লাভ হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই, কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারা চীনাদের অসন্তুষ্ট করতে আগের মতোই এখনো অনিচ্ছুক। চীনারা যে আবার লাদাকে নূতন করে "অ্যাগ্রেশন" করল তার বিরুদ্ধে ভারত সরকার যদি প্রতিবাদ মাত্র করে থেমে যান তাহলে কলম্বো কনফারেন্সওয়ালারাও চুপ করেই থাকবেন, কারণ শান্তি তো রক্ষা হোল, সংঘর্ষ তো হোল না!

*

প্রফুমো কেলেঙ্কারীর ঝড়ে বৃটিশ রাজনৈতিক জগৎ এখনো আন্দোলিত হচ্ছে। সে আন্দোলন সহজে থামবে না। পার্লামেন্টে ম্যাকমিলান সাহেব ভোটে জয়ী হয়েছেন কিন্তু মোটেই অক্ষত অবস্থায় নয়। তাঁর দলের কিছু লোকও সরকারের পক্ষে ভোটদানে বিরত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে ম্যাকমিলান সাহেবকে কেলেঙ্কারী স্পর্শ করেনি, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরাও মনে করেন দেশের নিরাপত্তা রক্ষার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বপালনের ত্রুটি ঘটেছে। কিন্তু বিষয়টা কেবল সরকারী শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সমস্ত ব্যাপারটা বৃটিশ রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনকে মূল পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। শাসক-শ্রেণী এবং সমাজের তথাকথিত উচ্চতর মহলের একটা দিকের এমন একটা কুৎসিত চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, মানুষ সহজে চুপ করবে না।

কনজারভেটিভ পার্টির মধ্যেও অনেক লোকের মত ম্যাকমিলান সাহেবের পদত্যাগ

নবনির্বাচিত পোপ ষষ্ঠ পল

করা উচিত, তবে একটু দেরী করে। কিন্তু ম্যাকমিলান সাহেব নাকি তাতে রাজী নন, তিনি পার্টিকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, তাঁর পদত্যাগের কথা যদি চালু থাকে তাহলে দু-মাস পরে তাঁর জায়গায় অন্য কেউ পার্টির নেতা হলেও ইলেকশনে কনজারভেটিবদের কোনো সুবিধা হবে না, সুতরাং শ্রীম্যাকমিলানের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টার ভিতর দিয়ে পার্টির স্বার্থরক্ষা হতে পারে। ম্যাকমিলান সাহেবের পক্ষে হয়ত এই যুক্তিও দেওয়া হচ্ছে যে এখন অথবা কিছু দেরীতে হলেও এই ব্যাপারের জন্য যদি শ্রীম্যাকমিলানকে পদত্যাগ করতে হয় তবে প্রফুমো কেলেঙ্কারীর কাদা কনজারভেটিব পার্টির কেবল রাজনৈতিক জীবনের গায়ে নয়, সামাজিক জীবনের গায়েও লেগে থাকবে এবং কনজারভেটিব পার্টির সামাজিক নেতৃশ্রেণীর চিত্রটা লোকের মনে একটু বিশ্রী রূপ নিয়ে গাঁথা হয়ে যাবে।

কনজারভেটিব পার্টির স্বার্থ রক্ষার দিক থেকে শ্রীম্যাকমিলান যে-পথ নেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা ঠিক পথ কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ থাকলেও কনজারভেটিব পার্টিকে সেই পথে চালিত করতে ম্যাকমিলান সাহেব সমর্থ হতেও পারেন; কিন্তু তাতে কনজারভেটিব পার্টির উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা বলা যায় না। কারণ কনজারভেটিব পার্টি এখন যে-পথ নেওয়ারই চেষ্টা করুক না কেন, দেশের মধ্যে আন্দোলন থামবে না। শ্রীম্যাকমিলান ও তাঁর গভর্নমেন্টের পদত্যাগ এবং অচিরে সাধারণ নির্বাচনের যে দাবি উঠেছে তার তীব্রতা কনজারভেটিব পার্টির কোনো কৌশলের দ্বারা বিশেষ প্রশমিত হবে না। লেবার পার্টি ম্যাক-সরকার বিরোধী অভিযানে একটুও ঢিলে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রফুমো কেলেঙ্কারীর নিরাপত্তা-সম্পর্কিত দিকটা সম্বন্ধে একজন জজের দ্বারা অনুসন্ধান করার প্রস্তাব শ্রীম্যাকমিলান করেছেন; কিন্তু সে অনুসন্ধান অনেকটা ঘরোয়া গোপন অনুসন্ধান হবে। লেবার পার্টির নেতা শ্রীউইলসন তাতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন, তিনি প্রকাশ্য তদন্ত দাবি করেছেন এবং জনমতের ভাব থেকে মনে হয় যে, শেষ পর্যন্ত শ্রীম্যাকমিলান প্রকাশ্য তদন্তের দাবি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত ম্যাকমিলান সরকার টিকে থাকতে পারবেন বলে মনে হয় না। এই ব্যাপার বৃটেনে সকলের মন এরূপভাবে অধিকার করে রয়েছে যে, কোনো কোনো বিলাতী কাগজ এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে যে, ঠিক এই সময়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি বৃটেনে এলেন, লোকেরা তাঁর প্রতি যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারল না, যদিও তাঁর সফর-সম্পর্কিত সরকারী অনুষ্ঠানগুলি সবই সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে।

*

কার্ডিনাল মন্টিনি নূতন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে উত্তর ইতালীর শিল্পপ্রধান অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল মিলানের আর্কবিশপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লোকে তাঁকে "শ্রমিকদের আর্কবিশপ" এই আখ্যা দিয়েছিল। পোপ নির্বাচিত হবার পরে কার্ডিনাল মন্টিনি "পল" নাম ধারণ করেছেন। তাঁর পূর্বে পাঁচজন পোপ "পল" নাম নিয়েছিলেন। ইনি পোপ ষষ্ঠ পল হলেন। পোপ পলের প্রথম বাণী থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি পোপ জনের প্রদর্শিত পথেই চলবেন। যাবতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে ঐক্য আনা এবং পৃথিবীতে দ্বন্দ্বের অবসান ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টার উপর তিনি জোর দেবেন। পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বর্তমানে যে নিদারুণ বৈষম্য রয়েছে তার উপশম আবশ্যক, একথাও তিনি বলেছেন।

২৬-৬-৬৩

মুদ্রাক্ষরে

এবারের বিষয় "অনুবাদ।" শুনে উচ্চভ্রূ কিছু-কিছু পড়ুয়ার চোখের মধ্যস্থিত নাসা কুঞ্চিত হবে জানি, পরোয়া করিনে। যার যা পাওনা, মিটিয়ে দেব না। এই লেখকের কাছে 'অনুবাদ'-নামক কর্মটির পাওনা অশেষ, কারণ এই কাজে হাত মকশো করেই তার চাকরিতে হাতেখড়ি।

ইস্কুলের নীচু-উঁচু নানা ক্লাসে প্রশ্নপত্রে "ট্রানস্লেট" আর "রিট্রানস্লেট" এই দুই ফরমাসে যখন হিমসিম হতুম তখন কি জানি বহু বিদ্যা তল যাবে শেষ তক এই বিদ্যাই রুজিরোজগারে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে? খবরের কাগজে অনুবাদ অন্নের নাড়ি।

বাংলাকে ইংরাজী করার কৌশলকে 'রি' উপসর্গে চিহ্নিত করা হত কেন সে-রহস্য আজও জানিনে। কিন্তু প্রথমে ওই 'অনুবাদ' শব্দ নিয়ে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ করি। আক্ষরিক বিচারে অনুবাদ অর্থ বোধ হয় 'পাছের কথা'। তবে ভাবগতিক এই বক্তব্য তাতে খুব স্পষ্ট হল কি? 'অনু'-উপসর্গটি এখানে ধাতুগত অর্থ সবলে পগার-পার করেছে। 'তর্জমা' শব্দটি আমার কাছে বরং ঢের বেশি সপ্রতিভ, চটপটে ঠেকে। যাক অনুবাদ যখন প্রয়োগসিদ্ধ, তখন অনুবাদই সই। হোয়াট'স ইন্ এ নেম, ইত্যাদি।

নাম নিয়ে তর্ক অতএব মুলতুবি রেখে নমুনা নিয়ে পড়তে পারি। প্রথম কাণ্ডের নমুনা খবরের কাগজের, দ্বিতীয় কাণ্ডের নমুনা সাহিত্যের।

খবরের কাগজের বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কটাক্ষ-ঈক্ষণে বিড়ম্বিত করেছেন, তবু আধুনিক পাঠককে বলি 'বাঙাল বলিয়া করিও না হেলা'—। বাংলা গদ্যের শরীর-সংগঠনে সাংবাদিকের অনুবাদ-চর্চার দান নেহাত কম নয়। সেখানে ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিশব্দ তৈরি করতে হয়, ভারীভারী ডিকসনারি সব সময় কাজে লাগে না। স্বীকার করব, প্রমাদও ঘটে প্রচুর—স্লিপারে লেগে গাড়ি বেলাইন হল, কাগজে বের হল চটিজুতোর লেগে, এ-রকম লজ্জাকর নজির অবশ্যই আছে। এ-সব কাণ্ড ইংরাজী ভাষা, বিশেষত বানানের সঙ্গে অল্প পরিচয়জনিত। আবার এ-ও সত্য, কী রণশাস্ত্র, কী বিজ্ঞান, তাড়াহুড়ো নিত্য নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষাকে সম্পন্ন করেছে সংবাদপত্রই। (এ-জাতীয় শব্দের একটি সম্পূর্ণ পঞ্জী তৈরি হলে ভাল হয়)।

অর্থ-অনর্থ অনুবাদে [illegible] বিপরীত কাণ্ডই ঘটে। ... হর্স ইজ এ নোব্‌ল এনিমেল—নোব্‌ল মানে কী "মহান?" রাশি রাশি অভিধান হাতড়ালেও কলমের মুখে যথাযথ শব্দটি লাগে না। "উইথ ডীপ্ রিগ্রেট"—বাংলায় অক্ষমভাবে কেন বলব, "গভীর দুঃখের সহিত", বিশেষ করে "বড় দুঃখ" এই খাঁটি দেশজ ইডিয়মটি যখন রয়েছে। 'হান্‌ড্রেড পারসেন্ট পিওর' শতকরা একশত ভাগ পবিত্র না বোল আনা খাঁটি?

তবের সার্থক শব্দসৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেখুন 'ধোঁয়াশা'। ইংরাজীতে আছে "স্মগ্"। স্মোক আর ফগ্-এর সমাহার। বাংলা কাগজের কলমনবিশ অনুপ্রাণিত হয়ে লিখলেন—ধোঁয়াশা। ধোঁয়া+কুয়াশা। শব্দটি ক্রমে ক্রমে লোকের মুখে মুখে স্বীকৃত হয়ে গেল।

একদা সংবাদপত্রে Column-কে বলা হত 'স্তম্ভ' এখন আর আমরা কেউ তা বলিনে। স্পেড্‌কে স্পেড্, 'কলম'কে কলমই বলি, পাঠকও নিজগুণে ঠিক বুঝে নেন। ওই 'স্তম্ভ' শব্দটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তর হাসিঠাট্টা করেছেন, 'তাসের দেশে'। সম্পাদক রূপে বর্ণিত কাহিনীর পক্ষে অবান্তর এবং প্রক্ষিপ্ত চরিত্রটি সপ্তরথীর মার খেয়েছে। তবু, রবীন্দ্রনাথের প্রবল টিটকিরি সত্ত্বেও, 'বাধ্যতামূলক' পুরোপুরি বরবাদ হল কি, 'আবশ্যিক'-এর পাশাপাশি দিব্য বহাল রইল। অপ্‌সনাল অর্থে 'ঐচ্ছিক' শব্দকে একমাত্র করে নিতে কারও ইচ্ছে হল না। তিনি 'ইনটার্ন' কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে চেয়েছিলেন "অন্তরায়ণ", এবং 'ইনটার্নড'-এর বাংলা, বলেছিলেন, "অন্তরায়িত।" তবু, ব্যা ক র ণে র আশীর্বাদের অপেক্ষা না রেখেই "অন্তরীণ" এখনও জানি ওয়াকারের বিজ্ঞাপনের ভাষায় "সজোরে চলছে।"

অবাক কাণ্ড, সহস্রেক ব্যস্ততার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ নিয়ে এত ভেবেছেন, তাঁর "অনুবাদ-সোপান" এবং "অনুবাদ-চর্চা" গ্রন্থ দুটি তাদৃশ পরিচিত নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়। ইতস্তত চমৎকার তর্কের সূচনাও আছে। যেমন ধরুন, 'ওরিজিন্যালিটি'—বাংলা কী? রবীন্দ্রনাথ বললেন "মৌলীন্য", কৌলীন্যের আদলে। "কুল থেকে যদি কুলীন, মূল থেকে তবে 'মূলীন' শাস্ত্রীয় আপত্তিতে শব্দটি নাকচ হ[illegible] গেল। "মূলীন"? নৈব-নৈব চ, ব্যাকরণে[illegible] স্যাংসন নেই। তখন এল দাবিদার আর-এ[illegible] শব্দ—"অপূর্ব"। কিন্তু অন্তত বাংলা প্রয়োগে 'অপূর্ব' অর্থ তো [illegible]। সুতরা[illegible] এই মনোনয়নপত্রটিও পত্রপাঠ খারিজ। রবীন্দ্রনাথ বললেন 'ওরিজিন্যাল' মানে [illegible] "আদিম"। নজিরও দেখালেন। ওরিজিন্যা[illegible] বিউটি আদি সৌন্দর্য ওরিজিন্যাল বুদ্ধ আদি বুদ্ধ ইত্যাদি।

তবু এই আর্ষ পরামর্শ চালিত হয়নি[illegible] রবীন্দ্রনাথ নিজেই অতঃপর আক্ষে[illegible] করেছেন, 'আদিম' বলতে বাংলায় প্রিমিটি[illegible] ভাবটাই প্রকট, আদিম শব্দটিকে আদি[illegible] অর্থে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আর অসম্ভব।

শব্দনির্মাণে সংস্কৃত রূপের দিকে সত[illegible] দৃষ্টিপাত নিশ্চয়ই জরুরী, কিন্তু [illegible] সঙ্গে প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধর[illegible] উপেক্ষণীয় নয়। উপেক্ষা করলে কী [illegible] তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বাংলা বাইবেল। যেখ[illegible] ঈশ্বর জগৎকে প্রেম করে তাঁর এক[illegible] পুত্রকে প্রদান করেছেন, পাপের বে[illegible] মৃত্যুরূপে নির্ধারিত হয়ে আছে। পাদ্রী[illegible] প্রতি অনুজ গদ্যকার হিসাবে আ[illegible] কৃতজ্ঞতার অবধি নেই তবু অনু[illegible] হাস্যকরতার শেষ কথা হিসাবে মুখে [illegible] ফেরা বাক্যাংশ দুটি উদ্ধৃত করার লো[illegible] সামলান গেল না।

সংবাদপত্র-প্রসঙ্গ থেকে [illegible] অনুবা[illegible] আলোচনায় ক্রমশ সাহিত্যের চৌহদ্দি[illegible] প্রবেশ করছি। সবিশেষ সঙ্কোচসহকা[illegible] জানি কিনা, সাহিত্যের শ্রেণীবি[illegible] গোয়েন্দা-গল্প আর অনুবাদের একই [illegible] নইলে চলে না, রচিতও হয় ভূরি ভূরি [illegible] মর্যাদায় যেন পাকিস্তানের হিন্দু—সেক[illegible] ক্লাস নাগরিক। সংস্কারবশে সব[illegible] পাদার্ঘ্য অদ্যাপি তথাকথিত "মৌলি[illegible] রচনার চরণেই নিবেদিত করে থাকি।

এ-প্রসঙ্গে আ র-কি ছু আলো[illegible] বারান্তরে। ইতি-কথায় এবার একটা [illegible] পেশ করি। শুধু ভাষান্তরই কি অনু[illegible] মনের বায়বীয় ভাবকেও তো আমরা [illegible] দিয়ে থাকি, এক অর্থে সেই প্রক্রিয়া[illegible] অনুবাদ নয়!

শিল্পীর স্বাধীনতা

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

জাতীয় দুর্যোগের বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা 'শিল্পীর স্বাধীনতা' শীর্ষক বিভাগটি প্রকাশের ব্যবস্থা করি। কয়েক মাস যাবৎ বাঙলা দেশের প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেরই রচনা এই বিভাগে আমরা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। বলা বাহুল্য, 'শিল্পীর স্বাধীনতা' বিষয়ে আরও অনেকে লিখিতে সম্মত ছিলেন, প্রতিশ্রুত ছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এই বিভাগটি আর অধিকদিন প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে না। অন্যান্য রচনার চাপ: স্থানাভাব প্রভৃতি কারণে এই বিভাগটির প্রকাশ আপাতত স্থগিত রাখিতে হইল। অসংখ্য পাঠক এই বিভাগের রচনাগুলির জন্য আমাদের দপ্তরে যে পরিমাণ পত্র দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় উক্ত বিভাগের প্রকাশ স্থগিত হওয়ায় তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন। তাঁহাদের প্রতি নিবেদন অবস্থা বিবেচনায় আমাদের অক্ষমতার জন্য যেন মার্জনা করেন। —সম্পাদক

শিল্পী স্বভাবতই মুক্ত পুরুষ, সংসার থেকে মুক্ত না হলে রসের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে না, এদিক দিয়ে বিচার করলে শিল্পী আর যোগীতে প্রভেদ নেই। তবে পথে প্রভেদ আছে বটে। শিল্প ও যোগের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে মীরা সচেতন ছিলেন,

"জোগী আরা জোগ করণ কু,
তপ করেন সন্ন্যাসী।
হরী ভজন কু সাধু আরা,
বৃন্দাবনকে বাসী।"

বৃন্দাবনে যোগী এসেছেন, সন্ন্যাসী এসেছেন, সাধু এসেছেন ধ্যান ধারণার পথ অনুসরণ করতে, কিন্তু মীরা ওসবের মধ্যে নেই, তিনি এসেছেন গানের অঞ্জলি নিয়ে। লক্ষ্য এক বই নয়— অর্ধ রাত্রে প্রেম নদীর তীরে প্রভুর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা।

উচ্চাঙ্গের শিল্প মানেই স্তব, সে স্তব পাথরে গড়া হলে কোনারকের মন্দির, রেখায় গাঁথা হলে নন্দলাল বসুর শিবের হলাহল পান, আর কথায় গাঁথা হলে মেঘনাদ বধ কাব্য বা বলাকা কাব্য। বিষয় যাই হোক সর্বত্র একটি মুক্ত মনের বিহার। এই মুক্তিই শিল্পীর লক্ষ্য, কাজেই অনায়াসে বুঝতে পারা যাবে যে এ বস্তু পড়ে পাওয়া নয়, কঠিন সাধনায় আয়ত্ত করতে হয়। মধুসূদন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে যে পরিমাণে মুক্ত তার চেয়ে অধিকতর মুক্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে: —আর কিছুই নয় মুক্তি সাধনার পথে অনেকটা এগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা সঙ্গীত কাব্যে যতটা মুক্ত বলাকা কাব্যে তার চেয়ে অধিকতর মুক্ত, আর কিছুই নয় মুক্তি সাধনার পথে অনেকটা এগিয়েছেন। শিল্পী মানুষটা যতই বদ্ধ জীব হোক, ভিতরের মানুষটার মুক্ত হতে বাধা নেই। গুটির মধ্যে প্রজাপতি রেশমের জালে জড়িয়ে আছে —কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার চলছে জাল কাটিয়ে মুক্ত হওয়ার সাধনা, আকাশে যখন সে উড়লো তখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত। শিল্পীর মনের মধ্যে চলছে, অনেক সময়ে তার অগোচরে চলছে, মুক্তির সাধনা, তাই বলেছি স্বভাবতই সে মুক্ত।

শিল্পীর মুক্তিস্বাদের পরিণামে যে শিল্প রচিত হয়ে ওঠে তা পাঠ করবার ফলে পাঠকেও মুক্তির স্বাদ পায়। পাঠকের চিত্তে নানা রকম সংস্কারের নাগপাশ, সার্থক সাহিত্য পাঠে ক্রমে ক্রমে আলগা করে দেয় সেই বাঁধনগুলো। আর তখন "tease us out of thought", যে-লোকে সহৃদয় পাঠকের সত্তাকে নিয়ে যায় তা হচ্ছে রস-লোক। রসলোকের বার্তা সংসারের অভ্যস্ত ভাষায় প্রকাশ বোধ করি সম্ভব নয়; তাই ইশারায় বলা হয়েছে ব্রহ্ম স্বাদ সহোদর। যোগীর উপলব্ধি ও কবির উপলব্ধি ভিন্ন পথে যাত্রা করে মিলিত হয়েছে এই রস-লোকে। একে বলা যেতে পারে উপলব্ধির বৈকুণ্ঠলোক—মুক্তিলাভের পরিপূর্ণ আসর। প্রাচীনকাল থেকে এতাবতকাল দেশে বিদেশে যে-সব মনীষী সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন আরিস্টটল থেকে অতুল গুপ্ত পর্যন্ত—এই হচ্ছে তাঁদের সিদ্ধান্ত।

এমন সময়ে মার্কসবাদ এলো নূতন শিল্প তত্ত্ব নিয়ে। মার্কসবাদের কাছে শিল্প শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার, শ্রেণী সংগ্রামে জয়লাভ করে তথাকথিত সর্বহারার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার রূপেই শিল্পের সার্থকতা। যে-শিল্প সে কাজে সহায় মার্কসবাদের কাছে সেই শিল্পই বরণীয়, যে-শিল্প সে কাজ পারে না তা বুর্জোয়া সংস্কার মাত্র, ধর্ম চিন্তার মতোই একটা আফিমের নেশা।

মার্কসবাদীর কাছে বোমা, বন্দুক, ধর্মঘট, লক-আউট, লিকুইডিশেন, প্রভৃতির ন্যায় শিল্প একটা অস্ত্র। কাজেই শিল্পী অস্ত্রধারী সৈনিক। এবারে চোখে পড়বে প্রভেদ কি দুস্তর।

অমার্কসীয় শিল্পী যোগী, মার্কসীয় শিল্পী সৈনিক, একজনের সাধনা মুক্তির আর একজনের সাধনা সামরিক শৃঙ্খলার, একজন যত মুক্ত তত সার্থক, অপর জন যত শৃঙ্খলিত তত সার্থক, একজনের লক্ষ্য রস-লোক, অপর জনের লক্ষ্য Writers union (রাশিয়ার কি নাম জানি না, তবে ব্যাপারটা একই), একজন মুক্ত পুরুষ, অপর জন বদ্ধ জীব। এখন, এ-দুয়ে মিলের সম্ভাবনা কোথায়। মার্কসীয় শিল্পী মানুষের মনের মুক্ত ধারা বাঁধবার কাজে সিদ্ধ হস্ত যন্ত্ররাজ বিভূতি, অমার্কসীয় সাহিত্যিক সেই বাঁধ ভাঙবার কাজে আত্ম-

বিসর্জনকারী সিখ পুরুষ যুবরাজ অতিজিত। আজ পৃথিবীর সাহিত্যিক সমাজের কাছে বিচারের সময় এসেছে তাঁরা কার দলে যোগদান করবেন।

এবারে তত্ত্ব ছেড়ে দৃষ্টান্তের কঠিন ভূমিতে নেমে এসে দেখা যাক ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। একটু ঠাহর করে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে না যন্ত্ররাজ বিভূতির নাগপাশ শিল্পীর মনকে আজ বেঁধে ফেলতে বড়ই উদ্যত হয়ে উঠেছে।

একটা বিশেষ রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শিল্পীর মনকে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করলে পরিণাম যে কি শোচনীয় হয়ে পড়ে তার ব্যাপক ও ব্যক্তিগত দুই রকম দৃষ্টান্তই আছে। ব্যাপক দৃষ্টান্ত খাস রাশিয়া, ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত সব দেশেই আছে. হাতের কাছে বাংলা দেশও ব্যতিক্রম নয়।

পৃথিবীর কম্যুনিস্ট সমাজের কাছে মনুষ্যের ইতিহাসের বিষুব রেখা হচ্ছে ১৯১৭ সাল, যখন নাকি নয়া দুনিয়া পত্তন হল। তাদের মতে ১৯১৭ সালের এদিকে আলোক ও প্রগতি, সংস্কৃতি ও শান্তি, যদিচ শুভকর্মের মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ বেরোসকেরও অভাব নাই। এই পিওরিটি বেশ কাজ চলছিল, কিন্তু পীত চীন লাল হয়ে যাওয়ার পরে বোধ হয় গোল বেধেছে। চীনপন্থীদের মতে নয়া দুনিয়ার সূত্রপাত ১৯৪৯ সালে। যাই হোক শারিক সূক্ষ্ম হিসাবে আমাদের প্রয়োজন নাই। ১৯১৭ সাল ধরলেই কাজ চলবে। কম্যুনিস্টদের মতে ১৯১৭ সাল মানব ইতিহাসের water shed বা জলবিভাজন রেখা, তার দুদিকে দু'রকম চেহারা, সব বিষয়েই, সাহিত্যেও। কিন্তু সম্ভূত চেহারাটা কি রকম? সাহিত্যের কথাই হচ্ছে। একদিকে পুশকিন থেকে চেকভ, মাঝখানে আছেন টুর্গেনিভ, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি। এ'রা প্রত্যেকেই বিশ্ব সাহিত্যের মাপকাঠিতে দিকপাল। মনে রাখতে হবে সময়টা ঘোরতর বুর্জোয়া গন্ধী, তার সংগে আছে সাম্রাজ্যবাদ। টলস্টয়ের রচনার সংগে প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়ে ম্যাথু আর্নল্ড বলে উঠেছিলেন—

"If fresh literary productions maintain this vogue and enhance it, we shall all be learning Russian"

উক্তিটির মধ্যে একাধারে আশা ও আশংকা দুই ছিল আশা সফল হয় নি সাহিত্যের সে ধারা লোপ পেয়েছে বললেই হয়। অবশ্য এখন কিছু কিছু লোক রুশ ভাষা শিখছে, তবে তা সাহিত্যের আকর্ষণে নয়। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে রুশ ভাষা শিক্ষায় আগ্রহ আদৌ নেই। ও ভাষার অক্ষরগুলো অবধি আলাদা একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করতে হয়, তার চেয়ে স্লোগান হাঁকা অনেক সহজ। আর ১৯১৭ সালের এদিকে রুশ সাহিত্যের চেহারাটা কি রকম? এখন ও-দেশে বিশ্ব সাহিত্যের মাপকাঠির বদলে চলছে মাকর্সবাদের মাপকাঠি। দুটো আলাদা, বিচারের ফলও আলাদা। মাকর্সবাদের মাপকাঠিতে সেরা সাহিত্যিকের রচনা অপরের কাছে অপাঠ্য। তার উপরে আবার মাকর্সবাদের নূতন নূতন ভাষ্যের কৃপায় মাপকাঠির হ্রাসবৃদ্ধি হচ্ছে। কে যে কত দিন বড় থাকবে কেউ জানে না। এরেনবুর্গ বরফ গলার পালা বর্ণনা করে প্রশংসা পেলেন কিন্তু সে প্রশংসা হজম করবার আগেই ধমক খেলেন: অতটা ভাল নয়। এই কিছুকাল আগে ক্রুশ্চেভ এক সংগে ধমক ও ধিক্কার দিয়ে বললেন আধুনিক চিত্রকলা খচ্চরের লেজ দিয়ে আঁকা। খবর নিলেই জানতে পারা যাবে যে ওদেশের চিত্রকরগণ রাতারাতি তুলি বদলে ফেলেছেন। পাস্তেরনাক নোবেল পুরস্কার পেলেন ডক্টর জিভাগো নামে উপন্যাস লিখে। পাস্তেরনাক বড় কি ছোট, ডক্টর জিভাগো ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। সর্বজন কাম্য পুরস্কার পাওয়ার পরে লেখক গিয়ে পড়লেন ক্রুশ্চেভের কাছে বললেন, লাল দুনিয়ার দুশমনের অপদস্থ করবার জন্যই আমাকে পুরস্কৃত করেছে। দেশ থেকে আমি যেন নির্বাসিত না হই। Peace Strategy-তে অভ্যস্ত ক্রুশ্চেভ লেখকের অপরাধ মাপ করলেন, তবু তাঁকে একঘরে হয়ে বইতে হল। Writers union থেকেও নামটা কাটা গেল। ডক্টর জিভাগো বইখানা রুশ ভাষাতে লিখিত হলেও সে ভাষায় ছাপা হতে পারে নি। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। ১৯১৭ সালের পর থেকে রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বন্দী হতে গিয়ে পুশকিন-[illegible] প্রণালীতে পরিণত।

সরস্বতী নদী সত্য সত্যই যদি কোথাও লুপ্ত হয়ে থাকে তবে তা ওদেশে এবং এখনই। আর লুপ্ত সরস্বতীর শুকনো ডাঙায় বসে নন্দীভৃঙ্গীর দল এখন সাহিত্যের নামে রাজনৈতিক প্রচারপত্র লিখছে। পুরস্কার ও প্রশংসার বাঁধা বরাদ্দের অভাব হয় না, কারণ যিনি দেশের সর্বময় কর্তা তিনিই পুরস্কার দাতা ও প্রশংসা কর্তা। টলস্টয়ের পাণ্ডুলিপির উপরে এখন পার্টির কলমে দাগা বুলোনো চলছে। ম্যাথু আর্নল্ডের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এই তো গেল ব্যাপক দৃষ্টান্ত। এবার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত আর সে দৃষ্টান্ত একেবারে ঘরোয়া।

সমালোচনার বারো আনা অংশ দৃষ্টান্ত

আর দৃষ্টান্তের বারো আনা অংশ ব্যক্তির নাম। এক্ষেত্রে আসল বারো আনাই বাদ দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, বিদেশী লেখকের নামোল্লেখ সহজ, কিন্তু দেশী লেখকের, যারা ধারে কাছে রয়েছে তাদের নামোল্লেখ শিষ্টাচারসম্মত নয়, বিশেষ প্রশংসা যখন করতে যাচ্ছি না। তবে নাম করতে পারলে বক্তব্য স্পষ্টতর হয়ে উঠত, স্বভাবত মুক্ত শিল্পী কিভাবে কম্যুনিস্টদের প্ররোচনায় বন্দী বিহঙ্গে পরিণত হয়, দানাপানি ও দণ্ড-পুরস্কার মাফিক ডাক ছাড়তে শুরু করে—কম্যুনিস্টদের শিল্পী-ধরা জাল কত ব্যাপক, কত সূক্ষ্ম, কত মনোরম—এ সব কথাই যদি খুলে বলতে না পারলাম তবে এ প্রবন্ধ লিখবার আসল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হল।

কম্যুনিস্টদের কাছে শিল্পের নিজস্ব মূল্য বলে কিছু নেই শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়াররূপেই তার যা কিছু মূল্য। এখন এই আদর্শ নিয়ে শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে হুকুম এলো রাজ্যের কম্যুনিস্ট পার্টির উপরে। পার্টি কাজে লেগে গেল দিকে দিকে আড়কাঠি পাঠালো, সাহিত্যিক সংগ্রহ করবার কাজে। আড়কাঠিদের উপরে কড়া হুকুম ব্যাপারটার সংগে যে কম্যুনিস্ট পার্টির যোগাযোগ আছে প্রকাশ করা চলবে না, আর দাগী কম্যুনিস্টকে দলে টানা চলবে না। তা হলে জানাজানি হয়ে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে তারা আসরে না নেমে দূরে থেকে গেলেন। কাজেই আড়কাঠি এমন সব লোকের কাছে গেল রাজনীতির চলাচল সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণা নেই। লোক নির্বাচন হয়ে গেলে আড়কাঠি আমড়াগাছি শুরু করে দিল। নামটা আমড়াগাছ হলেও আসলে শ্যাওড়াগাছ, আর সে গাছে বাস করে দুটো পেত্নী—'শান্তি' ও "প্রগতি" ই শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ। যা-ই হোক পার্টির অভিধানে এদের অর্থ আলাদা। কিন্তু এত কথা তো জানে না সাহিত্যিক, এতক্ষণ তার নাম নিয়ে পার্টি ঢাক ঢোল ও ঢোক্কা ফুকতে শুরু করেছে। হাতী দিয়ে হাতী ধরা। ঐ সাহিত্যিক দেখে আরও কিছু কিছু সরলস্বভাব সাহিত্যিক এসে জুটলো। প্রতিষ্ঠিত হল প্রোগ্রেসিভ রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু আপনার সাধ্য কি একে কম্যুনিস্ট সংস্থা বলেন, অমুক সভাপতি, অমুকে তমুক। সবাই জানে এরা কম্যুনিস্ট নয়। কাজেই আপনাকে নিরস্ত হতে হল, যেমন মধ্যযুগে কখনো কখনো নিরস্ত হতো রাজপুত বাহিনী শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে হিন্দুর অবধ্য গোরুর পাল দেখে। পিছনে থাকতো সেই সৈন্য গোরু যাদের কাছে অবধ্য নয়। এখানেও

আছে, তবে গা-ঢাকা দিয়ে। নানা ধাপের সভাপতিগণ ভাবছে তারাই বাজাচ্ছে বাঁশী, কিন্তু আসলে 'যে-জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানে।'

আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন কম্যুনিস্ট পার্টির এত উদ্যম কেন? কেন নয়? বিদেশী ইংরেজ যে ভুল করেছিল এবারকার বিদেশীগণ আর তার পুনরাবৃত্তি করবে না। ইংরেজ আমাদের মনের দরজা জানলা বন্ধ করেনি, সেই দরজা জানলা দিয়ে বাইরের আলো বাতাস বয়ে এনেছিল মুক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা। এখন মনের দরজা জানলা বন্ধ করতে হলে শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, শিক্ষা সমস্তকে পার্টির ছাঁচে ঢালাই করে ফেলতে হবে। "মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা"—সেই কারখানার প্রসার বৃদ্ধি করতে করতে দেশব্যাপী করে তুলতে হবে। ও সব অহৈতুক আনন্দ, রসোবৈসঃ, ব্রহ্মস্বাদ সহোদর চলবে না। সাহিত্যকে হতে হবে পার্টির ইস্তাহার, ধর্মঘট ও লক-আপের মতোই পার্টির অনুকূলে সক্রিয়। এর উপায় দুটি। এক হুকুমমাফিক লেখানো। প্রোগ্রেসিভ রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন সেই কাজে হাত দিয়েছে। দুই, সাহিত্যের পুরাতন আদর্শকে বানচাল করে দেওয়া। রবীন্দ্রসাহিত্য কিছু নয়, এ কথা বলবার সময় এখনো আসেনি, তবে পার্টির চিহ্নিত সাহিত্যিককে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বলে প্রচার করতে আরম্ভ করলে পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথকে পার্টির সমতলে নামিয়ে আনা হল। তাতেই আপাতত কাজ চলবে। (অবশ্যই চিহ্নিত সাহিত্যিকটি মৃত হলেই নিরাপদ, নতুবা মত বদলাতে পারে। মত বদলিয়ে পার্টিকে বিব্রত করেছে এমন নজির আছে।) বাংলা দেশের সাময়িকপত্রে ছাপার অক্ষরে (ছাপার অক্ষর তো আর মিথ্যা হতে পারে না) রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সমান মূল্যে পার্টির চিহ্নিত কবির (মৃত) নাম বের হয়েছে; এদের জন্মদিন পালনীয়, কেননা, এরাই দেশের শ্রেষ্ঠ কবি। ভেবেছিলাম এখানেই বুঝি মতলববাজির সীমা। কিন্তু, না তখনো শেষের বাকি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাময়িক পত্রিকায় উক্ত চিহ্নিত কবির নামের সঙ্গে শেক্সপীয়রের নাম উচ্চারিত হয়েছে দেখলাম। শেক্সপীয়র ছাড়া আর কেহ ও উক্ত কবির সমকক্ষ থাকতে পারেন না [illegible] লেখক। খবর নিয়ে জানলাম যে, লেখক একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। হতেই হবে। মুচিরাম গুড়ের ধারা তো লোপ পেতে পারে না।

ইতিমধ্যে প্রোগ্রেসিভ রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি গেছেন সরে, হয়তো তিনি এদের মতলব বুঝতে পেরেছেন এতদিন পার্টি বেনামে যার প্রশংসা করছিল এবার স্বনামে তাকে গাল পাড়তে শুরু করলো। যাই হোক, যথাসময়ে যথারীতি, নূতন সভাপতি নির্বাচিত হল। আর যে-সব "শান্তি ও প্রগতিবাদী" সাহিত্যিক রয়ে গেল অ্যাসোসিয়েশন-এর মধ্যে, কিছুকাল পরে তারা রক্তকরবীর 'রাজার এঁঠোর' মতো অন্তঃসারশূন্য হয়ে বেরিয়ে এসেছে। নামোল্লেখ করবার সৎসাহস থাকলে দেখাতে পারতাম বাংলা দেশের কত শক্তিমান লেখক কম্যুনিস্ট পার্টির ফাঁদে পড়ে রাজনৈতিক ইস্তাহার লিখে জীবন শেষ করতে বাধ্য হয়েছে, সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনাবসান ঘটিয়েছে। সাহিত্যিক শক্তির অপমৃত্যুর শ্মশান এই অ্যাসোসিয়েশনটি। মুক্ত সাহিত্যিককে বন্দী করবার কৃতিত্ব এর অপরিসীম।

মানুষের সেই মন ও সমাজকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবার সুপরিকল্পিত সর্বাত্মক কোনো ষড়যন্ত্র পৃথিবীতে আর কখনো ঘটেনি। [illegible] প্রথম রাজ-শক্তি ও বিজ্ঞানশক্তি। এই দুই শক্তির [illegible] সর্বাত্মক বিস্তৃত [illegible] অবাধ [illegible] পৃথিবীর সর্বদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের [illegible] তো আছেই [illegible]। বেতনভুক হাততালি দেওয়ার লোক আছে, স্বনামে বেনামে প্রবন্ধ লিখবার লোক আছে, [illegible] হাজার হাজার বই ছাপা হচ্ছে সংবাদ আছে, সংগঠন আছে প্রচুর [illegible]। [illegible] ও কত্যো স্বাধীনতার ভাবে [illegible] পীড়িত। সেই কাল্পনিক [illegible] বাস্তব প্রতিনিধি [illegible] শিল্পীর প্রতিরোধশক্তি কমে যায়। ক্রমে সে [illegible] বাইরের Suggestion ক্রমে Auto-suggestion এ পরিণত হয়, গোড়ায় যা ছিল লেখকের বন্ধন, ক্রমে তা পরিণত হয় মোহের বন্ধনে। গোড়ায় যে ছিল মুক্ত শিল্পী ক্রমে সে পরিণত হয় পার্টির বেসরকারী কর্মচারীতে। এ ষড়যন্ত্রের ফাঁদ এমন ব্যাপক, এমন সূক্ষ্ম, এমন মনোরম যে পা বাঁচিয়ে চলা প্রায় অসম্ভব। পূর্বজন্মের সুকৃতি বা ইহজন্মের কাণ্ডজ্ঞানের ফলে যদি কেউ এ ফাঁদে পদার্পণ না করেন তবে তিনি পার্টির দীক্ষিত ও গৃহী শিষ্যগণের চোখে অপ্রগত ও প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভরসা পার্টিনিন্দিত এই সব শিল্পীদের উপরেই। তারাই মুক্তপুরুষ, তারাই রসলোকের সার্থক যাত্রী।

লক্ষ্মী একদিন তাকে গ্রহণ করবে এই আশায় অনেক প্রলোভন অনেক আকর্ষণ উপেক্ষা করে সে পাহাড়ী গাঁয়ে পড়ে আছে।

সে বলল, "কোনোদিন মুখ খুলে তোমাকে মনের কথা বলিনি। আজও বলার সাহস নেই। কিন্তু এমন করে তুমি আমাকে ভাসিয়ে যেও না।"

লক্ষ্মী ধীরকণ্ঠে বলল, "যিনি জীবনের দেবতা, তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। যদি ইচ্ছা করে না-ভাসো, তোমাকে ভাসায় কার সাধ্য। আমায় বাধা দিও না।"

সকলের চোখের জল, কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে লক্ষ্মী দেবতার আদেশে সংসার ছেড়ে গেল।

চেইসিং চোখের জল মুছতে মুছতে আবার তার চোখে জল এসে গেল।

আমি আশ্বাস দিয়ে বললুম, "চেইসিং, ঈশ্বরকে ডাকো। তিনিই লক্ষ্মীকে সংসার থেকে বার করেছেন, তিনিই তাকে রক্ষা করবেন।"

চেইসিং হাহাকার করে বলল, "বাবুজী! আমাদের মেয়েরা মানছে না। আমরা খেতে-শুতে যে কোনো শান্তিই পাচ্ছি না। আর ওর ভাইবোনেরা? ওরা যে কেঁদেকেটে একখানা করছে!"

আমি চেইসিংয়ের হাতে সস্নেহে একটা চাপ দিয়ে বললুম, "ধৈর্য ধরো চেইসিং। ঈশ্বরকে ডাকো।"

এই ঘটনার পর চেইসিং একেবারে নীরব হয়ে গেল। কাজে তার কোনো ত্রুটি ছিল না। সে ঠিক ঘড়ি ধরে হাজিরা দিত। কিন্তু তার ভিতরটা যেন ধসে পড়েছিল। তার জীবনের সব সুখ সব আনন্দ এই সর্বনেশে দুর্ঘটনার প্রচণ্ড ফুৎকারে নিবে গিয়েছিল। চেইসিংয়ের পারিবারিক অঘটনের খানিকটা প্রভাব আমারও উপর এসে পড়েছিল। পাহাড়ী শহরে যে আনন্দের উৎস খুঁজে পেয়েছিলুম তা যেন খানিকটা চাপা পড়ে গেল। ছুটি ফুরোবার আগেই কলকাতা ফিরে যাবার একটা সংকল্পও মনে উঁকি দিল।

একদিন চেইসিং আমাকে সেলাম করে দাঁড়াল। তার দিকে তাকাতে বুঝলুম, সে কোনো একটা কিছু বলতে চায়, ইতস্তত করছে।

বললুম, "কোনো খবর আছে, চেইসিং?"

চেইসিং বললে, "বাবুজী, লক্ষ্মীর একটা খবর আছে। কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে চেইসিং বলল, "আমাদের গাঁয়ের পূর্বে যে মঠ আছে, তার মোহান্ত আমার ঘরে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শুনলুম, লক্ষ্মী যখন মঠের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর দেখা। লক্ষ্মীর মুখে সব শুনে তিনি বললেন, 'দেবতার কাজে যাচ্ছো, কিন্তু মহাদেবী গৌরীকে জানিয়ে যাও। কুমারী মেয়েদের পক্ষে এই বিধান।' লক্ষ্মী তখন মহাদেবী গৌরীর বিগ্রহের সামনে মোহান্তকে বলে সে স্বপ্নে আদেশ পেয়েছে যে পূবের সাতটা পাহাড় পার হয়ে যে-ঝরনা নদী গুহায় ঢুকে তার উৎস থেকে জল নিয়ে পাহাড়চূড়ায় উঠে দেবতাকে উৎসর্গ করে দিতে হবে। তারপর দেবতার আদেশ পেলে সে সংসারে ফিরবে, নইলে দেবতার উপাসনায় সেই পাহাড়চূড়াতেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবে।"

একটু থেমে চেইসিং আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবুজী! লক্ষ্মীর মত মেয়ের পক্ষে এই কঠোর তপস্যা সম্ভব?"

চেইসিংয়ের কথা শুনতে শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম। সেই [illegible] মনে [illegible] উপেক্ষা করতে না পেরে [illegible] সুখের [illegible] ছেড়ে দুশ্চর তপস্যার পথে পা বাড়ায়।

চেইসিং বলল, "আমার এক একবার ইচ্ছে হচ্ছে, বাবুজী, [illegible] ফিরিয়ে নিয়ে আসি। [illegible] আমায় শাসিয়ে বলেছে, [illegible] যাবো না। দেবতা [illegible] ডেকেছেন। [illegible] দেবতার উপর নির্ভর করে থাকব। তাঁর ইচ্ছার [illegible] সংসারের অমঙ্গল [illegible] কি করি বাবুজী ভেবেই পাই [illegible]" হতাশকণ্ঠে চেইসিং বলে।

চেইসিংয়ের কথার কোনো জবাবই [illegible] খুঁজে পেলুম না। [illegible] কণ্ঠে বললুম "উপায় কী চেইসিং! মোহান্তর কথামতই চলো। দ্যাখো, কী হয়।"

কলকাতায় ফিরে এসে কাজে ডুবে গিয়েছিলুম। চেইসিংয়ের ট্র্যাজেডির প্রচণ্ডতা ক্রমশ সয়ের ভিতরে এসে গিয়েছিল। তবু চেইসিংয়ের করুণ মুখ আমার ব্যস্ত জীবনের পর্দা তুলে এক একবার আমাকে দেখা দিত। প্রথম একটা দূর থেকে দেখা ছবির মত পাহাড়ী গাঁয়ের ঘটনাটা আমার

চোখের সামনে ফুটে উঠত। লক্ষ্মীকে চোখে দেখিনি। কিন্তু চেইসিংয়ের মুখে তার যে বর্ণনা পেয়েছিলুম তাতে করে তার একটা মূর্তি কল্পনায় গড়ে ফেলেছিলুম। মাঝে মাঝে একা ঘরে বসে কল্পনায় দেখতুম, লক্ষ্মী দেবতার অভিসারে চলেছে। তার মুখে পাহাড়ী রোদের শুভ্র আশীর্বাদ। সাত পাহাড় পার হয়ে সে গুহার অন্ধকারে ঢুকছে। কখনো দেখতুম, গুহা থেকে কমণ্ডলুতে ঝরনা নদীর উৎসের পবিত্র জল ভরে নিয়ে সে পাহাড় বেয়ে উঠছে। পাহাড় চুড়োয় কারা যেন নিঃশব্দে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। কখনো দেখতুম পাহাড়-চুড়োয় অনন্ত আকাশের নীচেয় নিঃসঙ্গ লক্ষ্মী। মহাশূন্যে কোন্ দেবতার উদ্দেশে কমণ্ডলুর পবিত্র জলের সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করে দিচ্ছে।

এমনি করে প্রায় দশ বছর কেটে গিয়েছিল। নানা দেশে নানা তীর্থে গিয়েছি। নানা মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বিচিত্র নানা অভিজ্ঞতায় জীবনের নকশা রঙে ও রেখায় ভরে উঠেছে। কিন্তু সেই পাহাড়ী শহর পথের একধারেই থেকে গিয়েছে। দশ বছর বাদে একদিন তাই দূর থেকে তার হাতছানি দেখতে পেয়ে চমকে উঠলুম।

সেই হোটেল ইতিমধ্যে হাত বদলেছে। নতুন মালিকের তরফ থেকে একখানা চিঠি পেলুম। অতীতে ওই হোটেলের শৌখিন স্যুইট থেকে যাঁরা কর্তৃপক্ষকে চিরকৃতজ্ঞ করে রেখেছেন, আমি তাঁদের অন্যতম। সুতরাং কর্তৃপক্ষ আর একবার ওই স্যুইটে আমাকে স্বশরীরে দেখতে পেলে কৃতার্থ হবেন। তাঁদের এই আশা ফলবতী করার পক্ষে কোন বাধা নেই। কারণ পাহাড়ী শহরের আকাশ তখন নীলার মত গাঢ় নীল এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা ইস্পাতের ফলার মত ঝকঝকে রোদ। কোথা থেকে নিশার ডাকের মত পাহাড়ী শহরের হাতছানিটা আমাকে চঞ্চল করে দিল।

হোটেলে এসে আদর আপ্যায়নের পর চেইসিংয়ের খোঁজ করলুম। শুনলুম, বছর দুয়েক আগে সে হোটেলের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সঞ্চিত অর্থে ধানের জমি কিনে সে এখন স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেছে। গাঁয়ে তার কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিও হয়েছে।

চেইসিং নেই শুনে মনটা মুষড়ে পড়ল। চেইসিং না থাকলে এ শহরের রইল কী! বুঝতে পারলুম, এখানে আসার জন্য যে একটা গভীর আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, তার মূলে ছিল চেইসিং।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরে নতুন বেয়ারা বললে, "হুজুর! চেইসিংয়ের গাঁও দুক্রোশ পথ। খবর দিলে ও এসে যাবে। বেশ ভালো পথ।"

বার হয়ে এলুম। কিন্তু তাহলে হবে কি। আমার পিছন পিছন সন্তানকে বুকে আঁকড়ে লক্ষ্মী ছুটে এলো। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ক্ষেপে গিয়ে একবার আমি মুঠো মুঠো ধুলো ওর গায়ে মুখে ছুঁড়ে দিলুম। ও একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইল। এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলল না, একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করল না। অভিশাপে, অভিসম্পাতে আমি আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিলুম। কিন্তু ওকে ফেরাতে পারলুম না।

তখন আমাদের মাত্র একটা ঘর। কোনো-রকমে মাথা গুঁজবার জায়গা ছাড়া কিছু ছিল না। লক্ষ্মী আমার পিছন পিছন সেই একখানা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমার স্ত্রী দূর থেকেই আমাকে ও লক্ষ্মীকে দেখতে পেয়েছিল। সে উন্মাদের মত দৌড়ে এসে সন্তানসুদ্ধ মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। আমি চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ধিক্কার দিয়ে বললুম, 'কাকে তুই জড়িয়ে ধরেছিস্' ও কুলটা। আমাদের কলঙ্ক! ঐ ছেলেটা হচ্ছে পাপের ফল! ভালো চাস তো ওকে তাড়িয়ে দে।"

আমার স্ত্রী কেঁদে বলল, "আমি সবই বুঝেছি। তবু লক্ষ্মী আমার মেয়ে। ওর ছেলে আমার নাতি, তেমনও নাতি। ওর পাপে আমাদের কম লজ্জা! ওর যদি কোনো পুণ্য থাকে তাতে আমাদের মঙ্গল হবে। একপাশে ঘরের বাইরে বারান্দায় ও থাক। ওকে এভাবে তাড়িয়ে দিও না।"

এখন কাহিনীর শেষ দিকে চেইসিং বললে, "এখনো সেই লক্ষ্মী এখানে আছে। কিন্তু আমার ভয়ে আমার স্ত্রী ওকে অন্দরে জায়গা দিতে পারে নি। সংসারের যাবতীয় কাজ ও করে। ওই যে সবচেয়ে ছোট ঘরখানা, ওখানে ও সন্তানকে নিয়ে থাকে।"

আমি বললুম, 'লক্ষ্মীর ছেলের বাপ কে, খোঁজ করোনি?"

চেইসিং দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে 'না। তবে আমি আন্দাজ করতে পেরেছি।"

আমি সভয়ে প্রশ্ন করলুম, "কাকে তুমি সন্দেহ করো? এর জন্য দায়ী কি শ্যামলাল?"

গভীর দুঃখে মাথা নেড়ে চেইসিং বলল, "তাহলে তো জোর করে শ্যামলালের সঙ্গে ওর বিয়েই দিতুম। শ্যামলাল নয়, রাজা-বাহাদুর, শ্যামলাল নয়।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সে বলল, "এই কলঙ্কের জন্য দায়ী ওই মোহান্ত। লক্ষ্মী গোবীপুজোয় মঠে যেত। কোন্ ফন্দিতে ও লক্ষ্মীকে বিপথে টেনেছিল, ওই জানে। রাজাবাহাদুর! দেবতার আদেশ, সাতপাহাড়ের শেষে ঝরনা নদীর জল—এ সব মোহান্তর শেখানো কথা। কিন্তু এ কথা তো কাউকে বলার নয়। বললেও লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হত। মোহান্তর সম্বন্ধে এ কথা

কেউ বিশ্বাস করত না। মাঝ থেকে আমি একঘরে হতুম।"

আমি বললুম, "শ্যামলাল এখন কোথায়? আমি থাকলে তার সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে দিতুম। সে তো লক্ষ্মীকে ভালো-বাসত।"

চেইসিং শুষ্ককণ্ঠে বলল, "শ্যামলাল লক্ষ্মীর কথা শোনার পর একদিনও এ মুখো হয়নি। এখন সে বিয়ে করেছে। দুটি ছেলেও হয়েছে। ওর ছেলেকে লক্ষ্মী একদিন আদর করতে গিয়েছিল শুনে, ওর স্ত্রীকে দিয়ে লক্ষ্মীকে শাসিয়েছে।"

লক্ষ্মীর কলঙ্ক কাহিনীর কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে, আমার মনে হচ্ছিল। আমি চেইসিংকে বললুম, "লক্ষ্মীকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। যদি আপত্তি না থাকে, তাকে ডেকে পাঠাও।"

চেইসিং আমার কথার কোনো জবাবই দিল না। তাকে নিরুত্তর দেখে আমি আবার কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম। দূর থেকে চেইসিংয়ের স্ত্রী ব্যাপারটা অনুমান করে সসঙ্কোচে এগিয়ে এসে বলল, "রাজাবাহা-দুর, ও মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, মুখ দেখে না। আমাদের ঘরের ত্রিসীমায় আসা ওর বারণ। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

চেইসিংয়ের স্ত্রী লক্ষ্মীর ঘরে আমায় পৌঁছে দিয়ে সরে গেল।

লক্ষ্মী দুহাতে মুখ ঢেকে বসেছিল। বুঝলুম, অপমানে লজ্জায় ও চোখের জল ফেলছিল। আমি নাম ধরে তাকে ডাকলুম। লক্ষ্মী চোখের জল মুছে অসঙ্কোচে আমার পানে তাকালো।

বললুম, "মোহান্ত যে অন্যায় করেছে, তার প্রতিবাদ তুমি কর নি কেন?"

দুঃখে বেদনায় ভরা কণ্ঠে লক্ষ্মী বলল, "দেবতার পায়ে আমি অপরাধ করেছিলুম বলেই তো দেবতা মোহান্তকে দিয়ে আমায় পথের ধুলোয় টেনে রাখলেন। প্রতিবাদে কি লাভ হত রাজাবাহাদুর? এখন যে ধুলোয় নেমেছি সেখান থেকে উঁচুতে উঠতে পারি, অহোরাত্র সেই তপস্যাই করছি।"

লক্ষ্মীর কথায় আমি যেন নিজের চোখে ছোট হয়ে গেলুম। তবু না বলে পারলুম না, "পরের গ্লানি তুমি কেন নিজের উপর টেনে আনছো লক্ষ্মী? পাপকে প্রশ্রয় দেওয়াও একরকম পাপ।"

লক্ষ্মী শান্তস্বরে বলল, "সেই জন্যই তো নিজের পাপকে আমি প্রশ্রয় দিইনি। ওই শিশুকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে কে আমার কলঙ্কের কথা জানতো? মোহান্ত আমাকে ঐ পরামর্শই দিয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি কান দিইনি। পাপের শাস্তি নিজের হাতে আমি নিজেকে দিচ্ছি। তাই ধুলোর মাটির সঙ্গে মিশে এ সংসারে আছি।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, "রাজা-বাহাদুর, মঠে পুজো দিতে গিয়ে গৌরীর পাশে ভোলানাথকে দেখে মনে মনে কামনা করতুম, তাকে যেন একদিন পাই। কিন্তু এই কামনায় একটা অন্যরকমের আকাঙ্ক্ষা এসে ঢুকলো। পুজো দিতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যেতুম, ভাবতুম কবে পৃথিবীতে মানুষের ভিতর ভোলানাথের দেখা পাবো। এই ভাবনাটা আমার চোখে নেশা ধরিয়ে দিল।

একদিন আরতির সময়, মোহান্তের সুন্দর মুখের পানে তাকিয়ে আমার মনে একটা ঝড় উঠল। আমার হাত থেকে পুজোর ডালা মাটিতে পড়ে গেল। আমার সর্বশরীর থর-থর করে কেঁপে উঠল। তারপর নির্জন মন্দিরে যখন মোহান্ত এসে আমার হাত চেপে ধরল, আমার তখন বিচার করার শক্তি ছিল না। ভেবেছিলুম, দেবতা মানুষের বেশে এসে আমায় গ্রহণ করেছেন।"

লক্ষ্মীর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে একটা খটকা জন্মালো, জীবনে যে আদৌ হোঁচট খেল না, তার অভিসারের অর্থ কী! যে পুণ্যের পথ আর পাপের পথকে দূরে তফাতে রেখে চলে সে পথ কি মানুষকে দেবতার মন্দিরে পৌঁছে দেয়?

লক্ষ্মী আমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। আমি তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললুম, "সুখী হও। সার্থক হও।"

আমি বেরিয়ে আসতে চেইসিং শশ-ব্যস্তে প্রায় ছুটে এলো। তাকে বিস্মিত করে দিয়ে আমি বললুম, "চেইসিং। দেবতার আদেশ মিথ্যে নয়। লক্ষ্মী এখন গুহায় ঢুকেছে, ঝরনা নদীর উৎসের সন্ধান পেল বলে। তুমি ধন্য! ও একদিন ঝরনা নদীর জল নিয়ে পাহাড় চূড়োয় উঠবে। দেবতা ওর পুজো গ্রহণ করবেন।"

হ্যারল্ড উইলসন। প্রার্থনার ভঙ্গিতে

অন্য হ্যারল্ড

সমুদ্রগুপ্ত

"আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর চাই। মিঃ ম্যাকমিলান কেন মিঃ প্রোফুমোর পদত্যাগ সম্পর্কে দেশকে… মিঃ প্রোফুমো কি সত্যিই পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, যদি না চেয়ে থাকেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেননি কেন।

কমন্স সভায় সেদিন এই প্রশ্ন যিনি তুলেছিলেন উত্তরের জন্য তিনি অপেক্ষা করেননি। বলেছিলেন কেন তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়নি 'তা আমরা জানি। আজ আর আমাদের এই সিদ্ধান্তে না পৌঁছে উপায় নেই যে দেশের নিরাপত্তার চাইতে রাজনৈতিক স্বার্থই বড় হয়ে উঠেছিল। জন্ম-জুয়াড়ীদের স্বভাবই এই রকম।'

সেইখানেই তিনি থামেননি। আঙুল তুলে ধিক্কার জানাবার ভঙ্গিতে, তিনি বলেছিলেন 'কাগজে যতই বিবৃতি দেওয়া হক, মন্ত্রিসভার বৈঠক যত ঘনঘনই বসুক এবং পার্টি কমিটী যা-ই করুন না কেন, এই উলঙ্গ সত্যকে আর আজ কিছুতেই চেপে রাখা যাবে না যে, ক্রমাগত যে সব বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে, ওই মানুষটিই তার জন্য দায়ী।'

বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মিঃ উইলসন, এবং তিরস্কারের তর্জনীকে তিনি মিঃ ম্যাকমিলানের দিকে তুলে ধরেছিলেন। হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের মুখে সেদিন হাসি ছিল না। স্থির গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে সেই ভর্ৎসনাকে তিনি শুনছিলেন, যাঁর সঙ্গে শুধু একটা ব্যাপারে তাঁর মিল আছে। লেবার পার্টির নতুন নেতা মিঃ উইলসনেরও নাম হ্যারল্ড।

হ্যারল্ড উইলসনের বয়স এখন সাত-

ম্যাকমিলান। ...নেভার হ্যাড ইট সো গুড

চল্লিশ। আসন্ন নির্বাচনে যদি লেবার পার্টি জেতে, তাহলে উইলসনই হবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। এখানে উল্লেখ করা ভাল যে, বিংশ শতকের ব্রিটেনে এত অল্প বয়সে আর-কেউ প্রধানমন্ত্রী হননি। প্রশ্ন হচ্ছে, উইলিয়ম পিটের পরে কি আর-কেউ উইলসনের মতন এত অল্প বয়সে মন্ত্রী হতেই পেরেছিলেন? তাও বোধ হয় কেউ পারেননি। অ্যাটলির মন্ত্রিসভায় উইলসন ছিলেন প্রেসিডেন্ট অব দি বোর্ড অব ট্রেড; তাঁর বয়স তখন একত্রিশ।

বয়স অল্প হলেও তাঁর অভিজ্ঞতা অতএব নেহাত অল্প নয়। তা ছাড়া তিনি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মানুষ। লেবার এম-পি রিচার্ড ক্রসম্যানের মতে "বুদ্ধির বিচারে যদি লয়েড জর্জের পরে আর মাত্র একজন রাজনীতিকের নাম করতে হয় ত আমি হ্যারল্ড উইলসনের নাম করব।' নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক বলেন 'দি শার্পেস্ট ফাস্টেস্ট ব্রেন ইন পার্লামেন্ট।" এ-সবই প্রশংসার কথা। এদিকে হ্যারল্ড উইলসনের প্রশংসায় যাঁরা পরাঙ্মুখ তাঁদের সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। সত্যি বলতে কী বিস্তর বিরোধী আছে তাঁর আপন দলের মধ্যেই। তাঁদেরই একজন সম্প্রতি নাকি দুঃখ করে বলেছেন যে গেটস্কেল যাঁকে দু চক্ষে দেখতে পারতেন না সেই হ্যারল্ড উইলসনের হাতেই কিনা লেবার পার্টির ভার পড়ল'

ভাবতে সত্যিই দুঃখ হয় যে দীর্ঘদিন বাদে আবার যখন লেবার পার্টির হাতে ক্ষমতা আসবার একটা প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে হিউ গেটস্কেল তখন বেঁচে নেই। অথচ এই একটি মানুষের দৃষ্টি সব সময়ে সজাগ ছিল বলেই হয়ত লেবার পার্টির ঐক্যে আজও ফাটল ধরেনি। কিংবা বলতে পারি ফাটল ঠিকই ধরেছিল কিন্তু গেটস্কেল তাঁর পার্টিকে তবু ধসে পড়তে দেননি। বিপদকে তিনি গ্রাহ্য করেননি; বিপর্যয়ে তিনি স্থির থেকেছেন এবং—শুধুই বাইরে থেকে নয়—ভিতর থেকেও যখন বার বার আঘাত এসেছে তখনও তিনি অটল মমত্বে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁর পার্টিকে পরম যত্নে অসীম ধৈর্যে তাকে দৃঢ় সংহত করে তুলেছেন।

রক্ষণশীল দলের আজ বড়ই দুর্দিন। ম্যাকমিলান-সরকারের দুর্গ আর আজ দুর্ভেদ্য নয়। সারা ব্রিটেন জুড়ে আজ সমালোচনার ঝড় উঠেছে এবং—এমন কী—টাইমস পত্রিকার রসনাও আজ নিন্দায় মুখর। একটার-পর-একটা উপনির্বাচনে রক্ষণশীল দলের হার হয়েছে। হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, ব্রিটেনের সামনে আজ যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, রক্ষণশীল দল তার সমাধান করতে পারবেন কি না

ব্রাউন। ডেপুটি

মার্কিন তার অন্যতম কারণ। নেতা হলেন হ্যারল্ড উইলসন: নাই বিভানের শিষ্য। আসন্ন নির্বাচনে যদি লেবার পার্টি জেতে, নাই বিভানের এই শিষ্যটিই তাহলে দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে ঢুকবেন। ছেলেবেলা থেকেই কি হ্যারল্ড সে কথা জানতেন?

বলা সম্ভব নয়। [illegible] কত স্বপ্ন দেখে। কেউ বা লেখক হবার [illegible] পাইলট হবার। হ্যারল্ড উইলসন কি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ইয়র্কশায়ারের এক [illegible] পরিবারে জন্ম সেই ছেলেটি কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন দশ-নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের দরজা একদিন তার সামনে খুলে যাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে। সেটা এই যে হ্যারল্ডের বয়স যখন মাত্র আট, তখন ডাউনিং স্ট্রীটের সেই বিখ্যাত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একটা ছবি তুলিয়েছিলেন। আর একটা কথাও উল্লেখ করা দরকার। 'পঁচিশে আমি কী হব' এই বিষয়ে তিনি বারো বছর বয়সে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, পঁচিশে তিনি মন্ত্রী হবেন, এবং গ্রামোফোন-রেকর্ডের উপরে ট্যাক্স বসাবেন। বলা বাহুল্য, হ্যারল্ড-পরিবারে তখন গ্রামোফোন ছিল না।

পঁচিশে নয়, একত্রিশ বছর বয়সে তিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন। তার আগে, দর্শন রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে, তিনি অক্সফোর্ডের পাঠ সাঙ্গ করেছেন। কয়লা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্পর্কে একখানি বইও লিখেছিলেন তিনি। সেই বইয়ের সূত্রেই তিনি অ্যাটলির সান্নিধ্যে আসেন।

গ্রোমিকো। বিদায়

অ্যাটলি তাঁকে স্নেহ করতেন [illegible] বিভান তাঁর সহায় ছিলেন শ্রমিক সরকারে একটা ছোটখাটো মন্ত্রীর পদও জুটে গিয়েছিল হ্যারল্ড উইলসনের। কিন্তু দলের [illegible] প্রভাব বিস্তার করা তখনও সহজ হয়নি।

অনুরাগী অনেক ছিল, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। বিভানের এই তরুণ শিষ্যকে ওঁরা ঠাট্টা করে বলতেন [illegible]। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫১ সনে নাই বিভান যখন অ্যাটলি-সরকার থেকে বেরিয়ে আসেন তখন হ্যারল্ডও ওঁর [illegible] সঙ্গে [illegible] নিয়েছিলেন। বিরোধের বিষয় ছিল [illegible]। পুনরস্ত্র-সজ্জা এবং জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিধির [illegible] নিয়ে মতান্তর ঘটেছিল। বামপন্থী বিভান এবং তাঁর শিষ্য উইলসন সেদিন মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেননি।

বছর কয়েক বাদেই কিন্তু উইলসন [illegible] ক্যাবিনেটে ফিরে এলেন। দলের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। বললেন, দলের ঐক্যই হচ্ছে সবচাইতে বড় কথা। হয়ত তাই, কিন্তু অনেকের মনেই সেদিন এই প্রশ্ন জেগেছিল যে ঐক্যই যদি সবচাইতে বড় কথা হবে তাহলে মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি সরকার থেকে বিদায় নিয়েছিলেন কেন? ঐক্যের কথা কি সেদিন তাঁর মনে ছিল না?

প্রশ্ন জেগেছে সাংবাদিকদেরও। লেবার পার্টির নেতা নির্বাচিত হবার পরে উইলসনকে নিয়ে ফ্লীট স্ট্রীটে একটি ছড়া বাঁধা হয়েছে। সপ্রশ্ন ছড়া। তার ভাবানুবাদ অনেকটা এই রকম:

ক্রুশ্চেফ চায় টাইটাকে লাল রং,
ম্যাক ত নীলের ভক্ত!
তুমি কোন্ রং চাইছ উইলসন?

প্রশ্নটা একেবারে অকারণ নয়। বস্তুত, একাধিকবার বাঁ থেকে ডাইনে ঘুরেছেন বলেই হ্যারল্ড উইলসনকে নিয়ে আজ এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নাই বিভানের এই শিষ্যটি যে কখন কোন্ পথে মোড় নেবেন, তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না। পার্টির মধ্যে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, তাঁরাও না। বন্ধু না-বলে 'ঘনিষ্ঠ সহকর্মী' বললাম এইজন্যে যে ঠিক 'বন্ধু' বলতে যা বোঝায়, হ্যারল্ডের তা নেই বললেই হয়। অন্তত রাজনৈতিক জীবনে নেই। কে জানে খুব বেশী অন্তরঙ্গতায় তাঁর আপত্তি আছে কিনা। তবে, তাঁর হ্যাম্পস্টেড গার্ডেনের বাড়িতে যাঁরা নেমন্তন্ন পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা নাকি আঙুলে গুনে বলে দেওয়া যায়। বাড়িতে আছেন তাঁর স্ত্রী মেরি, আর দুটি ছেলে।

বিদেশের এক পত্রিকায় [illegible] হ্যারল্ড উইলসন সম্পর্কে [illegible] হয়েছে। [illegible] হ্যারল্ডের এক সহকর্মীর [illegible] তিনি বলেছেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হ্যারল্ডের [illegible] তাঁর বন্ধু নেই। তিনি [illegible] তিনি [illegible] এবং [illegible]।

প্রশ্ন হচ্ছে [illegible] তিনি [illegible] হবেন, [illegible] উইলসনের [illegible] বিদেশ নীতি [illegible] সন্দেহ নেই। [illegible] শিক্ষা এবং অন্যান্য [illegible] কিছু কিছু [illegible] হবে। পার্টির নেতারা [illegible] এই [illegible] প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে সব সমস্যার এখানে উল্লেখ করা হল সেগুলি ব্রিটেনের নিজস্ব সমস্যা। ঘরোয়া সমস্যা। সেগুলি [illegible] ঘরোয়া সমস্যা নয় অর্থাৎ [illegible] পাঁচটা দেশের স্বার্থও যার সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে কমন মার্কেট এবং পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার উল্লেখ করতে পারি। লেবার পার্টি এই দুইয়েরই বিরোধী।

লেবার পার্টির কর্মপন্থার কিছু আভাস এখানে দেওয়া হল। কিন্তু প্রশ্নটা তবু থেকেই যাচ্ছে। উইলসনের নেতৃত্বে ব্রিটেন এই কর্মপন্থাকে আঁকড়ে থাকবে কিনা? রাষ্ট্রতরণীকে শেষ পর্যন্ত কোন্ পথে চালাবেন তিনি? আপোসের প্রয়োজন দেখা দিলেও কি তিনি তাঁর আপন নীতিতে অটল থাকবেন?

নেতা অ্যাটলি, গয়্ন্ বিভান

করি। সেদিনকার কথাই ধরা যাক।

"লণ্ডনের এক রহস্যময় অন্ধকার জগতের দরজা আজ আমাদের চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেল। এমন এক ন্যক্কারজনক জীবনের পরিচয় পেলাম আমরা, যা পাপে পরিপূর্ণ। নিষিদ্ধ নেশা, ব্ল্যাকমেল, পাল্টা-ব্ল্যাকমেল, হিংসা এবং যাবতীয় অন্যায়ের লীলা সেখানে অবাধে চলেছে।

"এই রকমের কেলেঙ্কারির খবর কি আরও পাওয়া যাবে নাকি? সরকার যা যা জানেন, তার সবই কি তাঁরা আমাদের জানিয়েছেন? নাকি মরিয়া হয়ে তাঁরা আরও অনেক খবর চেপে যাচ্ছেন, আর ভাবছেন যে সে-সব খবর কখনও প্রকাশ পাবে না?"

কমন্স সভায় দাঁড়িয়ে, ধিক্কারের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে, এই কথাগুলি যিনি সেদিন উচ্চারণ করেছেন, কী করে আর বিশ্বাস করব যে, তিনি একজন পাকা বক্তা নন?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় শক্ত। তার কারণ, নীতির প্রতি তাঁর প্রীতি খুবই গভীর বটে, কিন্তু তাই বলে তিনি চরমপন্থী মানুষ নন। নীতিগত কারণে নাই বিভানের সঙ্গে তিনি মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ঠিক কথা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি আপোস করতে জানেন না। আপোস তিনি এর আগেও করেছিলেন। ১৯৬০ সনের কথা। শান্তিবাদী আর বোমাবিরোধীদের সমর্থন নিয়ে লেবার পার্টির নেতৃত্বের জন্য তিনি গেটস্কেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন তিনি শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন, তখন নিজের সমর্থকদের পরিত্যাগ করে গেটস্কেলের সঙ্গে হাত মেলাতে তাঁর আপত্তি হয়নি।

অনেকে বলবেন 'সুবিধাবাদী'। কিন্তু কথাটা হয়ত সত্য নয়। আসলে 'বাস্তববাদী' হওয়াকেই অনেকে সুবিধাবাদী হওয়া বলে মনে করেন। তাঁরা জানেন না যে যিনি কাজ করতে চান অনেক সময়েই তাঁকে আপোস করতে হয়। না করে উপায় থাকে না।

উইলসনের যাঁরা বিরোধী লেবার পার্টির এই তরুণ নেতার অন্তত আরও-একটা সমালোচনা তাঁরা করে থাকেন। তিনি নাকি ভাল বক্তা নন। ঠাট্টা করে একটা কাগজে লেখা হয়েছিল, "স্বয়ং চার্চিলও যদি উইলসনের হয়ে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা লিখে দেন, তবু তিনি সেই বক্তৃতাটা ঠিকমত পড়ে উঠতে পারবেন না। এমনভাবে পড়বেন যে, মনে হবে যেন ওটা বক্তৃতা নয়, কারও কবরের উপরে উৎকীর্ণ একটা স্মৃতিফলক মাত্র।"

কথাটা কি সত্যি? এককালে হয়ত সত্যি ছিল, কিন্তু এখনকার উইলসন সম্পর্কে এই নিন্দাটা আর খাটে কিনা, তাতে সন্দেহ

ভিক্টোরিয়া পার্ককে : পুনরুজ্জীবন

কেতকী কুশারী

সারাদিন জমে আছে আকাশের গায়ে অন্ধকার,
ভারাক্রান্ত অপরাহ্ণ, বৃষ্টি তবু এখনও এলো না,
তোমাকে অনেক দিন ভুলে আছি এ-কথা ভেবো না,
বর্ষালীন, তন্দ্রামগ্ন, ঘনশ্যাম হে পার্ক আমার।

যখন করি না চিন্তা তখনও তো চৈতন্য-গভীরে
তুমি থাকো সংগোপনে, আত্মীয়ের স্নেহের মতন,
দৃষ্টি-অগোচরে কত হয়ে যায় নিবিড় বর্ষণ
কচিকলাপাতারঙ ধৈর্যশীল তোমার শরীরে।

অজস্র হারানো দুঃখ, বাধাহীন পুরোনো সংরাগ
তোমার রেলিং ঘিরে শৈবালের মত জমে আছে,
কানায় কানায় ভরা পুকুরের কিনারার কাছে
নক্ষত্র-লিলির ঝাড়ে সৌরভের কীর্ণ দায়ভাগ।

দুর্মর নেশায় করি গরীয়ান পুনরুজ্জীবন,
আবার জাগ্রত হও, হে জুলাই, বর্ষণমন্থর,
ধূমল শার্সির কাচে মুছে যাক ধূলির অক্ষর,
ভিজুক নীরবে ঘাস, রাজপথে আসুক প্লাবন।

লুকোক সবুজ সাপ, পূর্ণ হোক কর্ম-অবকাশ,
আজ কতদিন হলো আমাদের দরজায় আসো না,
জলঝরা এলো চুলে তোমাদের মিলিত বাসনা
কতদিন দেখি না যে, দৃঢ় তবু রয়েছে বিশ্বাস।

কখনও মুহূর্তে যেন কম্পমান কর্ণ-আভরণ
বিদ্যুতের মত দেখি, আবার অঝোরে বর্ষা নামে,
মনে হয় পোর্টিকোয় যেন কোনো গাড়ী এসে থামে,
কেবল শোনার ভুল। অন্তরীক্ষে স্তিমিত গর্জন।

এই বর্ষা চিরন্তন। বিরহের পুনরাবৃত্তিতে
তোমার চোখের ছায়া অন্যমনা করে বারবার,
যদিও সংবাদ পাই সুখে আছো বন্ধুরা আমার,
বিগত দিনের জন্য দাগ কাটি তবুও ভিত্তিতে।

আমার সমস্ত মন বুঝি ভিক্টোরিয়া পার্ক হতে চয়,
তোমাকে মিনতি, বোন, জানালার শিকে হাত রেখে,
আমাকে একটু বলো, কাদের ওখানে এলে দেখে,
এ দুর্দিনে কারা গেল ঐ পথে পার্কের মায়ায় ?

অশরীরী

বিমান ভট্টাচার্য

ফাল্গুন দিয়েছে ফুল অনেক আগেই-
মুকুল কৈশোর-প্রান্তে ফল;
মাটির কামনা, এক ভ্রূণ।
কোন কোন গাছ
সজ্জিত আনতমুখ মুখচোরা ফুলে।

বিছানার পারিপাট্য সাধু;
কিন্তু নিতান্ত ক্লান্তির অভাবেই ঘুম নিরুদ্দেশ।
যেহেতু এ রোগের চিকিৎসার নেই কোন শেষ,
অতএব কিছু মুক্ত বায়ু দিয়ে মনটাকে তাজা করা চাই:
(শুনেছি যেহেতু হামেশাই—
মন দেহ চিরদিনই অহি ও নকুল।)

চিন্তাশেষে সিঁড়ির দরজা খুলে বাঁধানো চত্বরে চলে যাই;
সহজ প্রেক্ষণে ধরা পড়ে:
গলিটার মোড়ে
হাস্নাহানা ফুটেছে অনেক,
রুপালী-জোনাকজ্বলা ফুল।

গন্ধ তারই দূতী,
বিশাখার কোল ঘেঁষে বাতাস মাতাল...
বাতাস বেহুঁশ—
সে এক ব্যাকুল
উথালিপাথালি।

ঘড়িতে সময় বাধা · পূর্বাকাশ আবীরে রক্তিম।
রাতজাগা ফুলসব প্রভাতশিশিরে স্নানশেষে
মুদ্রিতনয়ন—ক্লান্তিহীন
তখন ভোরের ফুলগুলি
যত ছিল গন্ধ তার সব
নিয়েছে ফেরত,

কিশোরী সন্ধ্যার জন্য রেখে গেছে একটি শপথ-
ফেরার শপথ।

দুজনে

ইরা সরকার

দুজনে দুয়ার ধরে কড়া নাড়তে ভেতরের স্বর
অকস্মাৎ ভেসে এল
"কারা এই কঠিন দুর্মর শীতে
উনুনের তপ্ত হাওয়া ছেড়ে?"
দুজনকণ্ঠে মমতার স্রোত॥
[illegible] বুকে নিয়ে সন্ধ্যার কবরে
দুজনে দাঁড়িয়ে একা
[illegible] উত্তাপাকাঙ্ক্ষী॥

ঘরে ঘরে আলো জ্বলে।
তারই কোন অপচয়ী কণামাত্র এসে
তারায় তিমির আনে সুন্দর নীলাভ॥
দুরাশায়, ক্ষুরধার, নিশ্চিত জিজ্ঞাসা
শেষ করে এই পৌষে অন্ধকারে অসময়ে
কারা আসবে? কোন্ হাতে খুলে দেবে ঘর?
বন্ধ দরজায় কোথা দুজনায় [illegible] এরাই উত্তর॥
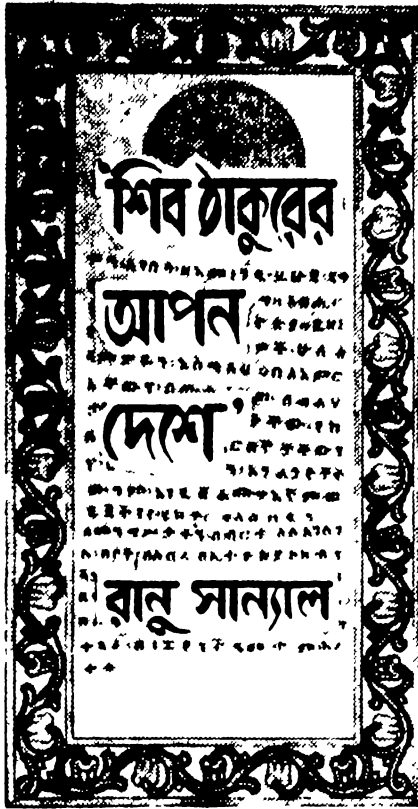
(৫)

'ভাসতে ভাসতে আমি হারিয়ে গেলাম'

ভোর চারটেয় রওনা হতে হবে। কুরুভেল্লা ও আমরা একটা ট্যাক্সিতে রওনা হব ঠিক হল। ও মেকেলে যাবার বাস স্ট্যান্ডে নেমে যাবে। আমরা যাব এয়ারপোর্টে।

কুরুভেল্লা ১৫,০০০ ডলারের একতাড়া নোট দেখিয়ে বললে, ওকে অত টাকা আগাম দিয়েছে। আমরা হতবাক্। ব্যাপার কী! শর্মা নেড়ে চেড়ে দেখে বললে, 'হাইলে সেলাসীর ছবি রয়েছে ঠিকই, তবু নোটগুলো জাল বলেই মনে হচ্ছে।' কুরুভেল্লা কৌতুক হেসে বললে, 'নোটগুলো আসলই, হাতসাফাই করেছি, আমি কেরালায় পকেটমার ছিলাম।' শর্মা বললে, 'তোমার পকেটটা মেরে দিতে ইচ্ছে করছে।' সান্যাল বললে, 'ঠাট্টা রাখ, সত্যি করে বল দেখি এত টাকা কোথায় পেলে?' আমি বললাম, স্কুলের জন্যে নিয়ে যাচ্ছে মিনিস্ট্রি থেকে, এটাও বুঝলে না!' কুরুভেল্লা বলে উঠল, সাবাশ, মেয়েদের সাধারণ বুদ্ধি প্রখর।' সান্যাল বললে 'লোভ ও ঈর্ষা কত সহজেই না বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়।' 'দার্শনিকের উপযুক্ত কথা বটে'—শর্মার এই টিপ্পনীতে সবাই হেসে উঠলাম।

সাঠে দম্পতী রাত্রেই বিদায় নিয়ে সত্যব্রবুদ্ধের বাসায় চলে গেল। মিনিস্ট্রিতে অনেক অপ্রিয় সত্য বলে এসেছিল ও। এরা নিজেরা কৃষ্ণ হয়েও গৌরাঙ্গের পুজো করছে, লণ্ডনের জি সি ই বা হাই স্কুল পাস শুধু ধলা-চামড়া বলে ওকে দেবে দশ ডলার করে আর একজন ভারতীয় এম-এ পি এইচ ডি হলেও পাবে পাঁচশ ডলার' এদের যারা এখনও বোকা গ্রাম্য ও অসভ্য ভেবে তুচ্ছ করে ঘৃণা করে, শোষণ করে, তাদেরকেই এরা মনে করছে ত্রাণকর্তা।

জবাবে ইথিওপীয়ান ডিরেক্টর জেনারেল মিখাইল দিল্লনেশাহু বলেছিল, চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী ওদের বেশী টাকা দিতে হয়। সাঠে বলেছিল, 'কম মাইনেয় আপত্তি নেই, ওদের সবাইকে ভাগিয়ে দিয়ে কেবল আমাদের নিয়ে এলেই ত হয়।'

কি জবাব পেয়েছিল সাঠে জিগ্যেস না করেই শর্মা বললে, 'আমরাও কি ওদের সাহায্য নিচ্ছি না? আর যারা ওদের সাহায্য নিতে নারাজ, তারা রুশের খপ্পরে পড়ছে; রুশীয়েরাও সাদা চামড়া।' সান্যাল যোগ দিল, 'বৃটিশ ফরাসী প্রভৃতিরা যদি বলে তোমরা গ্রাম্য বোকা অসভ্য অতএব হীন হয়ে থাক, রুশ বলছে তোমরা অসহায় অজ্ঞান অনুন্নত অতএব চীনের মতো আমার গোয়ালে ঢুকে পড়। তাছাড়া, কম্যুনিস্টরা শুধু আমাদেরকেই নয়, আমেরিকা, জাপান, জার্মানীর মত সমৃদ্ধ দেশকেও উদ্ধার করবার জন্য উদ্‌গ্রীব।' ফলে, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৃটীশের মাপকাঠির খোঁচা খেয়ে হয় সবর হও, নইলে রুশের-মাপকাঠির বাড়ি খেয়ে চোপ রও।'

সাঠে কচকাচ বেড়ে চলেছে দেখে নমস্তে করে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল। রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেজন্য কন্‌কনে ঠাণ্ডা। রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। পাহাড়ের বুকে মাঝে মাঝে এক একটা আলো জ্বলছে; তাতে করে সৃষ্টি হয়েছে এক বিভীষিকার মায়া। আমার মনের অসহায়তার জন্যই হয়ত সব কিছুর মধ্যে একটা অশুভ ইঙ্গিতের আভাস পাচ্ছিলাম। কাটিহার ছেড়ে আসার সময় মায়ের হাতের নির্মাল্য-টুকু ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম। সযত্নে সেটা কপালে ছুইয়ে 'দুর্গা দুর্গা' বলে যাত্রা করলাম।

দেখতে না দেখতেই ট্যাক্সি পিয়াজা ছাড়িয়ে মেকেলে যাবার বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। কুরুভেল্লা নেমে গেল। ইরিত্রিয়া-গামী বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে তৈরী হয়ে। প্রায় দুদিনের সফর, রাস্তাও ভাল না; বাসের

ইথিওপীয় শিল্পীর আঁকা শহর হারার

যাত্রীদেরকেও আধো আলো আধো আঁধারে কিম্ভূত দেখাচ্ছিল।

ইথিওপীয়ার মালভূমিই নাকি সুনীল-জলধি থেকে বেরিয়ে আসা প্রথম ভূখণ্ড এবং এখানেই নাকি সর্বপ্রথম গাধার জন্ম। সেই সময় থেকে মুসোলিনীর মুহুকাঘাত অবধি এখানকার লোকেরা গাধার পিঠে চড়েই বেড়িয়েছে। একটিমাত্র রেলপথ জিবুটী থেকে আডিস; কিন্তু সে পথে চলে যে গাড়ি তার শম্বুকগতি। ভাগ্য আমাদের যে প্লেনে যাচ্ছি হারারে, যদিও হারারের হাওয়াই বন্দর হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল দূরের ডিরেডাওয়া!

চার্চিল রোড, ওয়েভেল রোড দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল। বৃটীশদের নামে রাস্তার নামকরণের কারণ হচ্ছে সম্রাট্ হাইলে সেলাসীর কৃতজ্ঞতা। মুসোলিনী হাবশীর বগলে যে সাবান মাখাতে এসেছিল, সেই সাবান এখন বৃটীশরা মাখাচ্ছে; আমরা যাচ্ছি বোধ হয় এক ঘটি জল ঢালতে।

আডিস আবাবা ঘুমে মগ্ন। ফাঁকা রাস্তা, দুধারের লম্বা লম্বা পাইন ও ইউক্যালিপটাস আলোছায়ায় ভূতের মতো দেখাচ্ছিল। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলাম এবং মনটায় শিরশিরে একটা নাম-না-জানা ভয় উঁকি দিচ্ছিল। কোথায় চলেছি, এ পথের শেষ কোথায়! পথের শেষে যেখানে থামব সেখানে তিন বছর কাটাতে হবে।

মোটর থামল বিমানবন্দরে। একজন বিশালদেহ কুলি আমাদের জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে গেল। আমরা ট্যাক্সিবালাকে পাঁচ ডলার দিয়ে বিদায় দিলাম। এয়ারপোর্টের কাচের জানলা দিয়ে ভোরের লাল সূর্য দেখা দিল; দূরের নীলপাহাড় জেগে উঠল এবং উঠেই জাগিয়ে দিল তার বুকে শুয়ে থাকা পাখিগুলোকে। ইউক্যালিপটাস ও ঝাউবন আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল। সূর্যের নরম গরমে আমাদের মনেও সঞ্চার হতে লাগল একটু একটু সাহস।

চায়ের স্টলে চা খেলাম। চা ভালো না এবং দাম বেশী। আমাদের প্লেন ছাড়ার কিছু আগে লালমুখো কতকগুলো শ্বেতাঙ্গ এসে নিস্তব্ধতা ভাঙল। প্লেন এল সাড়ে ছটায়। E A L-এর ছোট্ট বিমান। ভিতরটা বেশ চমৎকার। দুজন ইতালীয় হাওয়াই সেবিকা আমাদের আসন দেখিয়ে দিল। আকাশে ওঠবার কিছু পরেই এল প্রাতরাশ।

হঠাৎ কুট্টুস বলে উঠল, 'মা মেঘের মধ্যে দাদুর মুখ দেখলাম। দাদু হেসে আবার মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল।' বুকের মধ্যে 'ধক' করে উঠল। কী যেন একটা অশুভ-বার্তা আমার মনে হল। ও কিছু না, এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

(৬)

হাজারো শহরে

ডিরে ডাওয়া। বেলা সাটা কিন্তু তখনই দুঃসহ গরম দু হাতে পুড়ে করেছে।

মালপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ডাকলাম। ত্রিশ ডলার হেঁকে বসল। চেপে বসে বললাম, পঁচিশের বেশী দেব না। ড্রাইভার হেসে বললে, 'ইয়েশ্‌শিশ' অর্থাৎ বহুৎ আচ্ছা। তখন জিজ্ঞাসা করলাম হারার কতদূরে যে পঁচিশ ডলার হাঁকছ, বিশ ডলারের বেশী দেব না। ড্রাইভারটা একটু আপত্তি করে তাতেই রাজী হল। ট্যাক্সি চলতে শুরু করেছে। সন্দেহ হল হয়তো খুব বেশী দেওয়া হচ্ছে। সান্যাল আরও কমাবার চেষ্টা না করে চুপ করে রইল।

দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে রাস্তা পার হয়ে এল শহর। ডিরে ডাওয়া শহরটা বেশ বড় এবং পরিচ্ছন্নও। অনেকেই বলেছিল এখান থেকে জিনিসপত্র কিনে নিতে সংসার পাতবার জন্য। কিন্তু আবার নেমে জিনিসপত্র কেনার ঝামেলা পোয়াতে মন সরল না।

শহর পেরিয়ে গেলাম। রাস্তা পাহাড়ের উপরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে গেছে। নীচের বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো। খদের মধ্য থেকে ইউক্যালিপটাস ও বাবলা মাথা তুলেছে কিন্তু আস্তাসের মতো অতো সবুজ নয়। মাঝে মাঝে ব্যাক চাস। এদিকে বৃষ্টি অনেক কম ঠাণ্ডাও কম।

ট্যাক্সি বিরাট প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো এক একটা পাহাড়ের কাঁধ বেয়ে ছুটে চলল। মধ্যে মধ্যে এক একটা গ্রাম আসছিল। পাহাড়ের ঢালু গায়ে খড়ের চাল দেওয়া কুঁড়ে লাউগাছ লতিয়ে রয়েছে চালের গায়ে। ছোট ছোট চোখের মতো জানালা। চালাগুলো দেখতে আমাদের দেশের মুসলমান চাষীদের টোকার মতো। দোরের সামনে ছাগল ভেড়া চরছে। ড্রাইভার জানালে—বেশীর ভাগ লোকই এক শ্রেণীর। কিছু ছাগল ও গরু পোষে আর একটু করে জমি নাড়ে হাল বলদ (ভুট্টা ও টেফ ইথিওপিয়ার জাতীয় শস্য) ফলায়। গরু যার ঘরে আছে তার অবস্থা বেশ ভালো। দুধ বিক্রী করে আর যখন দুধ দেয় না—কেটে খেয়ে ফেলে। মাঝে মাঝে উটের পীঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে যাযাবর চলেছে নজরে এল।

ঘড়ির ওপর চোখ পড়তেই দেখলাম এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। হারার এখনও এল না। কুটুস প্রায়ই প্রশ্ন করতে লাগল, আর কতদূর? আমাদের নিজেদের মনও একটু ঠাঁই-এর জন্য ছটফট করছিল। চলার আনন্দ স্তিমিত হয়ে এল। যদিও রাস্তাটা শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং কিংবা ব্যাঙ্গালোর থেকে উটীর রাস্তার চেয়ে কম সুন্দর নয়। এমনকি এক একবার মনে হচ্ছিল আমার গায়ের সোনার গয়নার লোভে ড্রাইভারটা কোন অস্থানে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে না তো! সন্দেহটা কেঁচোর মতো কিলবিল করতে লাগল।

ডিরেডাওয়া শহর পেরিয়ে উপত্যকা থেকে অধিত্যকায় উঠেছিলাম। এখন

অধিত্যকা থেকে আবার উপত্যকায় নামতে লাগলাম। সমতল ভূমিতে পড়তেই এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। বাংলাদেশের বিলের মতো জংলী নয়; তকতকে হ্রদের মতো যদিও অগভীর। ফেলেহাঁসের মতো হাজার হাজার পাখি তার জলে; আর ডাঙায় তীর অবধি চরে বেড়াচ্ছে ও জল খাচ্ছে গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়ার পাল। হাঁসদের মধ্যে কয়েকটা পেট-সাদা কাক ও জন্তুদের মধ্যে কয়েকটা ঘোড়াও চোখে পড়ল।

খানিকটা এগোতেই ট্যাক্সি প্রবেশ করল এক সুদীর্ঘ স্নিগ্ধ ইউক্যালিপটাস বীথির মধ্যে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে এবার দেখলাম সত্যিই এক হ্রদ, নীল-চক্ষু টলটলে জল। নারকেলকুঞ্জ ঘেরা দাম-কলমীতে ঢাকা, পদ্মভরা বাঙলা দীঘি নয়। রাস্তার পঞ্চাশ গজ দূরে ছোট ছোট ঢেউ এসে লাগছে। ট্যাক্সি থামাতে বলে একটু নামলাম। দেখলাম সূর্যের ঝকঝকে আলোয় ঝিলিমিলি হ্রদের বুক। দূরে ওপারে পাড় ঘেঁষে শুরু হয়েছে আলামায়া কৃষি কলেজের সীমানা। ড্রাইভার জানাল মার্কিনরা চালাচ্ছে ঐ কলেজটা।

গাড়িতে গিয়ে বসতেই ও বললে, হারার আসতে আর মিনিট বিশেক লাগবে। সান্যাল সাহস করে বলে ফেলল, 'দেড় ঘন্টার রাস্তা বিশ ডলার কি করে হয়, পনেরর বেশী দেবো না।' আশ্চর্য, ড্রাইভারটা কোন উচ্চবাচ্য না করে তাতেই রাজী হল। আমার খুড়শাশুড়ী, শুধু তিনি কেন, বাংলাদেশের অনেক মেয়েই, মুসলমান জোলাদের কাছ থেকে শাড়ী কিনতে গিয়ে এইভাবেই দাম করেন।

ট্যাক্সি ছুটে চলল। দুপাশে হাট বসেছে। পসারিনীদের পরনে রংবেরং-এর মখমলের জলুস। ময়নামতীর হাট নয়, আলা-মায়ার 'পবারা'। নতুন ধানের গন্ধ নিয়ে বাতাস ছুটে এসে মুখে চোখে লাগছে না; কিন্তু পিছনেই সর্ষেফুলের বনে উড়ে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট পাখি ও প্রজাপতিরা। ফুলের মুকুট মাথায় পরে ফণি-মনসার ঝাড়। সান্যাল বললে, 'আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।'

'হামারেসা' নামাঙ্কিত বোর্ড পার হল। ইউক্যালিপটাসের ঘন নার্সারির মধ্যে দেখা গেল এক বিরাট চালাঘর। ট্যাক্সি ড্রাইভার বললে, ওটা হচ্ছে হারার প্রদেশের পুলিস ট্রেনিং সেন্টার। দুজন পুলিসও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। একজন দেখতে কালো-কুলো হুলো বেড়ালের মতো, আর একজন তালপাতার সেপাই গাট্টা তেওয়ারী যেন। ডাকত কেমন কে জানে!

হারার এসে যাচ্ছে। মৃদু উত্তেজনা অনুভব করতে লাগলাম। এই আমাদের পথের শেষ, গতির অবসান; তিন বছর এক জায়গায় থেকে হয়ত স্থাবির হয়ে যাব। মোড় ঘুরতেই উপত্যকায় হারারের অস্তিত্ব প্রকট হল। শিবের মাথার চাঁদের মতো এর আকাশ বেঁকে গেছে। দূরের নীলাভ কুঞ্জভ্রূ পাহাড় ও সবুজ ঘন বন। মাঝে মাঝে কফির জঙ্গল। রোদ ঝলমল দিন। আকাশে একটুও মেঘ নেই, পরিষ্কার ঝকঝকে নীল। লাল মাটি। আঁকাবাঁকা পথ। মোটাসোটা গরুগুলো ঘাস খাচ্ছে। এদেশে গরুর সংখ্যা গোখাদকের দেড়গুণ। বাবলা, ক্যাকটাস। সন্ধ্যামালতীর বন। T T S। হায়রে!

হারার এসে গেল।

(ক্রমশ)

॥ ১০ ॥
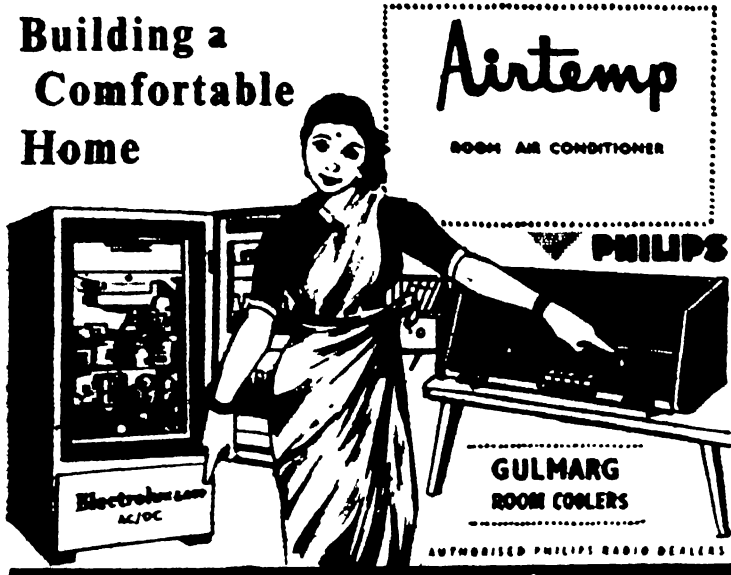
স্বরূপ—জীবনলাল সংবাদ

জীবনলাল গিয়ে স্যালুট ক'রে দাঁড়ালো **কর্নেল** ব্রিজম্যানের কাছে। কর্নেল তাকে দেখে খুশী হ'ল, শুধালো, জীবন কি খবর খুলে বলো।

জীবন বলল, স্যার খবর ভালো নয়।

উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে ব্রিজম্যান শুধালো, কি ব্যাপার?

সেই মেয়েটি, যাকে ওরা মিস এলবিয়ন বলে ডাকতো, বাড়ি থেকে উধাও হ'য়ে গিয়েছে।

কবে?

পরশু শেষ রাতে।

কেন গেল কিছু জানা গিয়েছে কি?

এই চিঠিখানা ছাড়া আর কিছুই জানা যায়নি।

এই বলে সে এগিয়ে দিল মিস এলবিয়ন লিখিত চিঠিখানা। রুমালী আসবার সময়ে জীবনের হাতে দিয়েছিল বলেছিল নিয়ে যাও আমরা রেখে আর কি করবো? ওর আত্মীয় স্বজন দেখলে হাতের লেখা চিনতে পারে।

ব্রিজম্যান চিঠিখানা ধীরভাবে বারকয়েক প'ড়ে গম্ভীর হ'য়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে বলল, কোথায় গেল, ওরা কি অনুমান করে?

যমুনায় ডুবে মরেছে আশঙ্কা করে নদীর ধারে ধারে অনেক অনুসন্ধান করেছে।

অনুসন্ধানের ফল কি?

কিছুই নয় স্যার, কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

ব্রিজম্যান বলে I am afraid the worst has happened.

ওদেরও তাই ধারণা।

মেয়েটি মিস ক্লিফোর্ড বলেই মনে হয়, কি বলো?

জীবন উত্তর দিল না, পকেট থেকে কাগজের মোড়ক বের ক'রে এগিয়ে দিল ব্রিজম্যানের দিকে।

কি আছে এর মধ্যে—বলতে বলতে খুলে ফেলল ব্রিজম্যান, বের হ'য়ে পড়লো ছোট একখানা লেডিজ রুমাল, এখানে ওখানে রক্তের ছোপ-লাগা। রুমালী এই রুমালখানাও দিয়ে দিয়েছিল জীবনের হাতে বলেছিল ওর আর সব কাপড় চোপড় ছিঁড়ে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে—আছে এই রুমালখানা, নিয়ে যাও যদি কিনারা হয় কিছু।

ব্রিজম্যান বলে মেয়েদের রুমাল, রক্তের দাগ-লাগা। এ কি, এই কোণে যে নামের আদ্যাক্ষর E C! তারপরে আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে, এলিনা ক্লিফোর্ড। সমস্ত সংশয়ের নিরসন ঘটলো।

আদ্যাক্ষর দুটো দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে। ওদের কিছু বলেছ?

না।

ভালই করেছ।

রুমালখানা মিস্টার ক্লিফোর্ডকে দেবেন না?

দেবো, তবে এখন নয়। দিল্লী আক্রমণের ঠিক আগে দেবো, এখন দিলে হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে।

একটু থেমে থেকে বলে, থ্যাঙ্ক ইউ, জীবন, তোমার বিচক্ষণতা ও সাহসের জন্যেই একটা সমস্যার সমাধান হল, যদিচ সমাধানটা সমস্যাটার চেয়েও অধিকতর শোকাবহ। এখন যেতে পারো।

জীবন যাওয়ার উদ্যম করে না, দাঁড়িয়ে

থাকে দেখে ব্রিজম্যান শ্বধায়, আর কিছু বলবার আছে?

জীবন বলে, এবারে দিল্লী শহরে ঢোকবার পথে সিপাহী হাবিলদারের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলাম।

কৌতূহলী হ'য়ে উঠে ব্রিজম্যান, শ্বধায় ওয়েল, তারপরে।

জেনারেল উইলসনের চিঠিখানা ছিল বলেই ধরা পড়লাম, নইলে ব্ঝতে পারতো না, আগেও তো গিয়েছি।

তারপরে, তারপরে?

আমাকে নিয়ে গেল শাহাজাদা মীর্জা আব্বকরের কাছে।

হাঁ, লোকটার নাম জানি।

তখন জীবন আদ্যান্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে শাহাজাদার চিঠিখানা বের করে এগিয়ে দেয় কর্নেলের দিকে, কিন্তু কর্নেল নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না। উল্টে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

আমি কোন প্রতিশ্রুতিই দিইনি, বলেছি, চিঠি পড়ে যদি নির্দোষ মনে হয় তবে নিয়ে যেতে পারি, তবে গ্রহণ করা বা উত্তর দেওয়া সম্প্র্ণভাবে নির্ভর করে খোদ জেনারেল সাহেবের উপরে।

জীবন, এ রকম ক্ষেত্রে যা বলা উচিত তাই বলেছ, তবে নিশ্চয় জেনো যে, জেনারেল এ রকম চিঠির উত্তর দেবেন না।

জীবন আরও কিছ্ উত্তর প্রত্যাশা করে যদিচ ম্বখে কিছ্ বলে না। সেটা অন্মান ক'রে নিয়ে ব্রিজম্যান বলে—কিছ্দিন থেকে এই রকম সব চিঠি আসতে শ্বর্ করেছে শাহাজাদাদের কাছ থেকে, এমন কি বেগম সাহেবার খান দ্বই চিঠিও এসেছে। কিন্তু

গভর্নমেণ্টের পলিসি হচ্ছে এসব চিঠি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা। জীবন, যাদের হাত ইংরেজ নরনারীর রক্তে কলঙ্কিত তাদের সঙ্গে কিছুতেই, কোন শর্তেই আপোস সম্ভব নয়।

এই রকমটিই আশঙ্কা করেছিল জীবন তাই বলল, এ চিঠিখানা আমি কি করবো?

তোমার কাছেই থাকুক। ও কিছুতেই ফরওয়ার্ড করতে পারি না জেনারেলের কাছে। তুমিই রাখো, যুদ্ধ শেষে যুদ্ধের স্মারক হিসাবে রয়ে যাবে তোমার কাছে।

স্যার, শাহাজাদাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে চিঠির কি গতি হয় তাকে জানিয়ে আসবো।

কিছুক্ষণ ভেবে ব্রিজম্যান বলল আচ্ছা, যাও। আর কিছু না হোক গভর্নমেণ্টের মনোভাব জানতে পারলে ঐ ভদ্রলোকেরা ঘন ঘন চিঠি লেখার ঝামেলা থেকে অব্যাহতি পাবেন। যাওয়াই ভালো, তবে চটপট ফিরে এসো।

জীবন বিদায় নিয়ে বের হয়ে আসে। বাইরে এসে দেখে যে দরজার কাছে অপেক্ষা করছে ক্যালিবান। দুজনে ফিরে আসে হিন্দুরাও কুঠিতে।

অনেকদিন পরে বৃষ্টিবাদল মেঘ কেটে গিয়ে নির্মল আকাশে চন্দ্রোদয় হয়েছে অন্তরীক্ষ পৃথিবী চারিদিক [illegible]। পাহাড়, পাহাড়ের উপরকার কুঠি ঐ দূরে শাহাজানাবাদের প্রাচীর বুরুজ সমস্তই কেমন অপার্থিব দেখাচ্ছে। দিনের বেলাতে যে খণ্ড যুদ্ধ চলেছিল বন্দুকের শত সহস্র আয়োজন জ্যোৎস্নার সার্বজনীন নেশায় যেন আত্মবিস্মৃত। এমন রাত বুঝি ঘুমিয়ে কাটাবার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। ঘুম আসে না জীবনের চোখে। সে উঠে বসলো দেখলো যে স্বরূপ তখনো জেগে।

জীবন বলল, স্বরূপ ভাই চলো না একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক

স্বরূপ সংক্ষেপে উত্তর দিল চলো।

দুজন বাইরে এসে দাঁড়ালো সঙ্গে উঠে এসে দাঁড়ালো ক্যালিবান। ওরা খানিকটা হেঁটে দাঁড়ালো। জীবন বলল, চলো বসা যাক।

ওরা একখানা পাথরের উপরে পাশাপাশি বসলো, পাশে মাটির উপরে বসলো ক্যালিবান।

জীবনের সমস্ত মন এই ক'দিনের সুখকর অভিজ্ঞতার এমন কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে যে, এখন বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। কোন বন্ধুর কানে এই অভিজ্ঞতা না ঢালতে পারলে তার স্বস্তি নাই। দুঃখী সঙ্গী চায়, সুখী নিঃসঙ্গতা।

মনের গভীর গোপন কথা, সুকুমার অনুভূতি প্রকাশ তো সহজ নয়, দিনের নিষ্ঠুর আলোয় প্রায় একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু জ্যোৎস্না যখন অকৃপণ হাতে সোমরস ঢালছে তখন নিতান্ত সাদাসিধে মানুষেও কবির ভাষা পায়—এক রকম ক'রে প্রকাশ করতে পারে আপনাকে। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে আরম্ভ করবে ভেবে পায় না জীবন। উসখুস করতে থাকে।

স্বরূপ অনুমান করে যে জীবন কিছু বলতে চায়, বোঝে তার মনে এমন একটা কিছু আছে যা ব'লে ফেলতে পারলে, সমবেদনার কানে না ঢালতে পারলে স্বস্তি নাই। সুখের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলে বাড়ে, দুঃখের অভিজ্ঞতা কমে। এ পর্যন্ত জীবন অবশ্য কিছু বলেনি, কিন্তু সেই প্রথমবার দিল্লী থেকে ফিরে আসবার পরে তার মুখ দেখে স্বরূপ অনুমান করেছিল, কোথাও একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটেছে তার মনের মধ্যে। এবারে সেটা আরও বেড়েছে সে লক্ষ্য করেছে। কী জানে না, তবে অপূর্ব আভায় তার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। মেঘ চাপা চাঁদ দেখা না গেলেও জ্যোৎস্নাই তার প্রমাণ।

কিছুক্ষণ পরে জীবন হঠাৎ সচেতন হয়ে ওঠে যে, কথাটা কখন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। জীবন নিঃশব্দ সমর্থনে গ্রহণ করছে সব। সংসারে সমবেদনার কান দুর্লভ।

স্বরূপ বলে মেয়েদের মন সহজে জয় করতে সক্ষম যে পুরুষ, ইংরাজিতে তাকে বলে Lucky dog

জীবন বলে জয় করতে যে পেরেছি কেমন ক'রে জানবো? আমার মনের কথা জানি। কিন্তু তার মনের কথা!

দেখো জীবন, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প, তারপরে শাস্ত্রে বলে, মেয়েদের মনের কথা দেবতারাও জানতে পারেন না।

তবে? শুধায় জীবন।

তবু তো সংসারে মন জানাজানি, মন দেওয়া-নেওয়ার বিরাম নেই।

তবে কেমন ক'রে জানবো যে মেয়েটি ভালোবাসে আমাকে?

তার শেষ বিচারক মন।

সেই মনটাই যে সংশয়ে কণ্টকিত, দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলে জীবন।

ওতেই অনুমান হয় যে মেয়েটির মন তোমার প্রতি বিমুখ নয়—যদিচ ওটা প্রমাণ নয়।

জীবন স্বগতোক্তি করে, শেষে কিনা এমন জায়গায় মন বাঁধা পড়লো যেখানে সব অবস্থাই প্রতিকূল।

প্রতিকূল কেন বলছো?

প্রতিকূল নয়! শত্রুপুরীর মধ্যে যার অবস্থান, এখনো সম্মুখে দীর্ঘ অনিশ্চিত সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত কি হবে কেউ জানে না।

স্বরূপ বলে, অনুকূল অবস্থার মধ্যেই কি সব সময়ে মন পাওয়া সুলভ?

কেন এমন বলছ, স্বরূপ?

কিছুক্ষণ নীরব থেকে, মনটাকে রাজি করিয়ে নিয়ে স্বরূপ বলে, দেখো জীবন, আমার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা এ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। আমার মৃতদেহের ভার বয়ে আমি ক্লান্ত। আজ না হয় তোমার কাছেই সে ভার নামাই।

নামাও ভাই নামাও, মনটা হাল্কা হোক।

স্বরূপ বলে, আমিও ভালো বেসেছিলাম একটি মেয়েকে।

জীবন শুধায়, সে?

সে? ঐ তোমার কথারই প্রতিধ্বনি করতে হয়। নিজের মনের কথা জানি, কেমন করে জানবো তার মনের কথা।

মুখে কখনো বলে মেয়েরা? চোখে, আচারে ব্যবহারে, পোশাকে পরিচ্ছদে সব রকমেই বলে কেবল মুখে ছাড়া।

সে কি লজ্জায়?

লজ্জায়? হবেও বা! কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো, ইচ্ছা করেই ঐ একটু-খানি ফাক রেখে দেয় তারা, ঐখানেই জমে লীলার আসর। ঐ ফাকা জায়গাটুকুতে হাঁসফাঁস ক'রে মরে অবোধ পুরুষ। ক্লান্ত না হওয়া অবধি তো সে ধরা দেবে না।

অধীর আগ্রহে জীবন শুধায়, তারপরে বলো কি হল?

আগে আগের কথা শোনো, দীর্ঘকালের ছিল আমাদের পরিচয়, সে যখন বালিকা, আমি যখন কিশোর।

তখন থেকেই?

না। পরিচয়ের দীর্ঘতাই প্রেম নয়। দীর্ঘ সন্দেশের আগাটুকু শুধু জমলে, বাকি পনেরো আনা অংশে তো শুধু ছেনা আর ন্যাকড়া।

জীবন বলে, একদিন বুঝি জমে উঠল সন্দেশের আগাটুকু? কিন্তু ভাই স্বরূপ, আমার পরিচয় তো দীর্ঘ নয়।

না-ই হ'লো। দীর্ঘ পরিচয় হতেই হবে এমন কথা নেই। আমি সন্দেশের নীচের দিক থেকে উঠেছি, অনেকটা সময় লেগেছে। তাঁর [illegible] দিবার দিকে এসে

পৌঁছেছ। সেই জন্যই তোমাকে বললাম Lucky dog.

শিখার দিকে পৌঁছেছি বলেই বুঝি এত জ্বালা।

হ'তেই হবে। কিন্তু শুধুই কি জ্বালা? না ভাই, আনন্দও আছে।

তবে?

সেই কথাই তো ভাবছি। এ রকমটি আগে কখনো ঘটেনি জীবনে।

পরেও আর ঘটবে না।

বিস্ময়ের সঙ্গে শুধায় জীবন, কেন?

প্রথম, প্রেম যে বজ্রাগ্নি, তেমনি মনোহর, তেমনি অতর্কিত, তেমনি দৈবপ্রেরিত।

জীবনের কাছে এসব কথা একেবারেই নূতন, তার কৌতূহলের অন্ত থাকে না, শুধায়—কিন্তু প্রথম তো শেষ প্রেম না হতেও পারে।

কে বলল হতে পারে। পরেও মানুষে পড়তে পারে প্রেমে, কিন্তু তাতে প্রথম প্রেমের অপূর্ব মাধুর্য নেই। তখন পথ-ঘাট যে অনেকটা পরিচিত হয়ে গিয়েছে।

দেখো স্বরূপ ভাই, এখন বুঝতে পারছি এই প্রথম ভাল বাসলাম। কিন্তু কিছুকাল আগেকার এক অভিজ্ঞতায় মনে হ'য়েছিল বুঝি ভালবেসেছি তাকে।

খুলে বলো না।

এখানে আসবার পথে বেরিলি শহরে পান্না নামে এক বাঈজীর ঘরে কিছুকাল লুকিয়ে থাকতে হ'য়েছিল। তখন মনে হ'য়েছিল তার প্রতি আমার যে মনোভাব তা বুঝি ভালবাসা।

সেটা ভালবাসা নয়, ভালবাসার দেয়ালা। শিশুরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসে কাঁদে দেখেছ? সে হাসি কান্না পূর্বজন্মের সুখ দুঃখের জের। তখনো যে লেগে আছে সেই সব স্মৃতির বেশ তার মনে।

আবার স্বগতোক্তি করে যায় জীবন জানি না কাকে ভাল বাসলাম কী তার পরিচয়!

সব মেয়েরই এক পরিচয়।

কি সেটা?

সর্বনাশের ভিয়ানে মাধুর্যের পাক।

বুঝতে পারে না জীবন। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়ে শুধায়, আচ্ছা স্বরূপ, কি হ'ল সেই মেয়েটির যাকে তুমি ভালবাসতে?

অপ্রিয় সত্যটা যত সত্বর সম্ভব চুকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছায় এক নিশ্বাসে বলে ফেলল, সিপাহীদের হাতে মারা গিয়েছে।

চমকে উঠে জীবন শুধায়, কেন?

মেম সাহেব মনে করেছিল।

জীবন কিছু বলতে উদ্যত হ'য়েছিল বাধা দিয়ে স্বরূপ বলল, আর প্রশ্ন করো না।

এমন সময়ে একটা বাদুড় পাখা ঝাপটে চলে যায় ঠিক মাথার উপর দিয়ে, চটকা ভেঙে যায় সকলের, সবচেয়ে বেশি সজাগ হ'য়ে ওঠে ক্যালিবান। অস্পষ্ট গর্জনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে সে বাদুড়টাকে।

জীবন তার মাথায় বার কয়েক থাবা দিয়ে বলে, বস, বস, ভয় নেই।

ক্যালিবান চোখ তুলে তাকায় জীবনের দিকে, সেই জ্যোৎস্নার আলোতেও জ্বল জ্বল ক'রে ওঠে চোখ দুটো।

স্বরূপ বলে, ওর যদি সুখ দুঃখের কথা বলবার ক্ষমতা থাকতো তবে বুঝি মানুষের সুখ দুঃখ ফিকে হয়ে যেতো তার কাছে। মানুষ হ'য়ে জন্মেও পশুজীবন যাপন এ কি নিদারুণ পরিহাস বিধাতার।

কেমন ক'রে হ'ল তাই ভাবছি।

স্বরূপ বলে, এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সব বাইরে শোয় তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে প্রায়ই নিয়ে যায় নেকড়েতে।

ওকেও নিয়েছিল তা হলে?

নিশ্চয়।

তখনি জীবনের মনে পড়ে পান্নার সেই গল্প, বলে সেই যে মেয়েটির কথা এইমাত্র বললাম, তাদের বাড়িতে ঘটেছিল এমনি ঘটনা। ওদের এক ভাইকে শিশুবেলায় নিয়ে গিয়েছিল নেকড়েতে।

স্বরূপ বলে, আমিও এমন তিন চারটি পরিবার জানি দিল্লীর যাদের বাড়িতেও এমন কাণ্ড ঘটেছে। ঘরে ঘরে দুঃখ, কাঁটা বাঁচিয়ে পা ফেলাই মুশকিল।

তখন জীবন পান্নাদের পরিবারের সেই শিশু কন্যা বদলের কাহিনী বলে, বলে সে মেয়েকে যারা নিয়েছিল টাকার লোভে বেচে দিয়েছিল তারা। অবশ্য তারা বলে যে মারা গিয়েছে, তবে সে কথা পান্নারা কেউ বিশ্বাস করে না।

তবেই দেখো অদৃষ্টের কি লীলা। ছেলেও গেল মেয়েও গেল, কে কোথায় গেল কেউ জানে না। এ যেন রঙ অনুসারে সুসজ্জিত তাস খেলুড়ির হাতের ফাটানোয় সব ওলট-পালট হ'য়ে গেল।

বড় বড় দুটো চোখ মেলে অবাক হ'য়ে শোনে ক্যালিবান।

জীবন বলে, ও কি বুঝতে পারছে আমাদের কথা।

এমন সময়ে স্বরূপের চোখ পড়ে শাহাজানাবাদের প্রাচীরের দিকে। জ্যোৎস্নার আলোয় দিনের বেলাকার প্রবালের প্রাচীর এখন চুনীর আভার মতো জ্বলছে। অব্যক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সে।

কি হ'ল ভাই?

আমি তাকাতে পারিনে ঐ শহরটার দিকে।

জীবন বোঝে স্বরূপের কোম্পানী পক্ষে যোগ দেওয়ার কারণ।

স্বরূপ উঠে দাঁড়ায়, বলে, নাও ওঠা যাক, কাল আবার তোমাকে দিল্লীতে যেতে হবে।

দুজনে হিন্দুরাও কুঠির দিকে রওনা হয়, পিছনে পিছনে চলে ক্যালিবান।

॥ ১১ ॥

অনুপ সিং-এর প্রতিজ্ঞা

যেদিন সকালবেলা জীবনলাল দিল্লীতে এলো মীর্জা আবু বকরের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে, সেদিন বিকালে ঘণ্টে-ওয়ালার মিঠাই-এর দোকানে এসে উপস্থিত হ'ল সুখানন্দ পণ্ডিত। রমলাীর বাড়িতে যাবে তুলসীকে দেখতে কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে যেতে চায়। তখন দোকানে মালিক মখ্খনলাল, একজন কারিগর ছাড়া আর একজন প্রৌঢ় লোক উপস্থিত ছিল। তার কাঁচা পাকা চাপকান দাড়ি, মাথায় জয়পুরী ধরনে বাঁধা মখমলের পাগড়ী, হাতে বাঁশের পাকা লাঠি। লোকটির নাম অনুপ সিং, মখ্খনলালের দেশের লোক। দিল্লীতে এলে মখ্খনলালের দোকানে থাকে, এবারে অনেকদিন পরে এসেছে। দুজনে ব'সে দেশের গল্প করছিল। এমন সময়ে প্রবেশ করলো সুখানন্দ পণ্ডিত।

তাকে দেখে হালুইকর অভ্যর্থনা ক'রে বলল, রাম, রাম পণ্ডিতজী, আসুন, তার-পরে তবিয়ং ভালো তো।

পণ্ডিত হওয়ার জন্যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না, বেশভূষা ও প্রকাণ্ড পাগড়ীটাই যথেষ্ট। পাগড়ীর বোঝাতেই পাণ্ডিত্য বোঝা যায়।

ক'বার যাতায়াতে, ও প্রচুর মিঠাই খরিদে দুজনের মধ্যে পরিচয় হ'য়ে গিয়েছিল।

সুখানন্দ বলল, যে দিনকাল পড়েছে তবিয়ং ভালো থাকলেও মেজাজ ভালো থাকে কই।

মখ্খনলাল বলল, ও সব হাঙ্গামায় আমাদের দরকার কি। আপ ভলা তো জগ ভলা। আমি মিঠাই তৈরি করি আপনি তুলসীদাসজীর রাম চরিত মানস পড়ুন। আমরা সিপাহীর দিকেও নই, কোম্পানীর দিকেও নই, যে জিতবে তার দিকে।

এই কদিনের পরিচয়ে হালুইকর বুঝে-ছিল যে, সুখানন্দ সিপাহীদের প্রতি অনুরক্ত নয়—তাই সাহস ক'রে কথাগুলো বলল।

তা বটে। দাও, ভালো মিঠাই কি আছে, সের দুই দাও।

এই বলে সুখানন্দ জেব থেকে টাকা বের করলো।

এতক্ষণ অনুপ সিং উদাসীন ছিল এবারে সুখানন্দ পণ্ডিতের হাতের দিকে চেয়ে সচেতন হ'য়ে উঠল, পণ্ডিতজী, আঙুল কাটলো কি ক'রে?

সুখানন্দও সচেতন হয়ে ওঠে, হাতটা সরিয়ে নিতে নিতে একটু হেসে বলে বয়স-কালে জঙ্গী আদমি ছিলাম, ওটা তারই চিহ্ন।
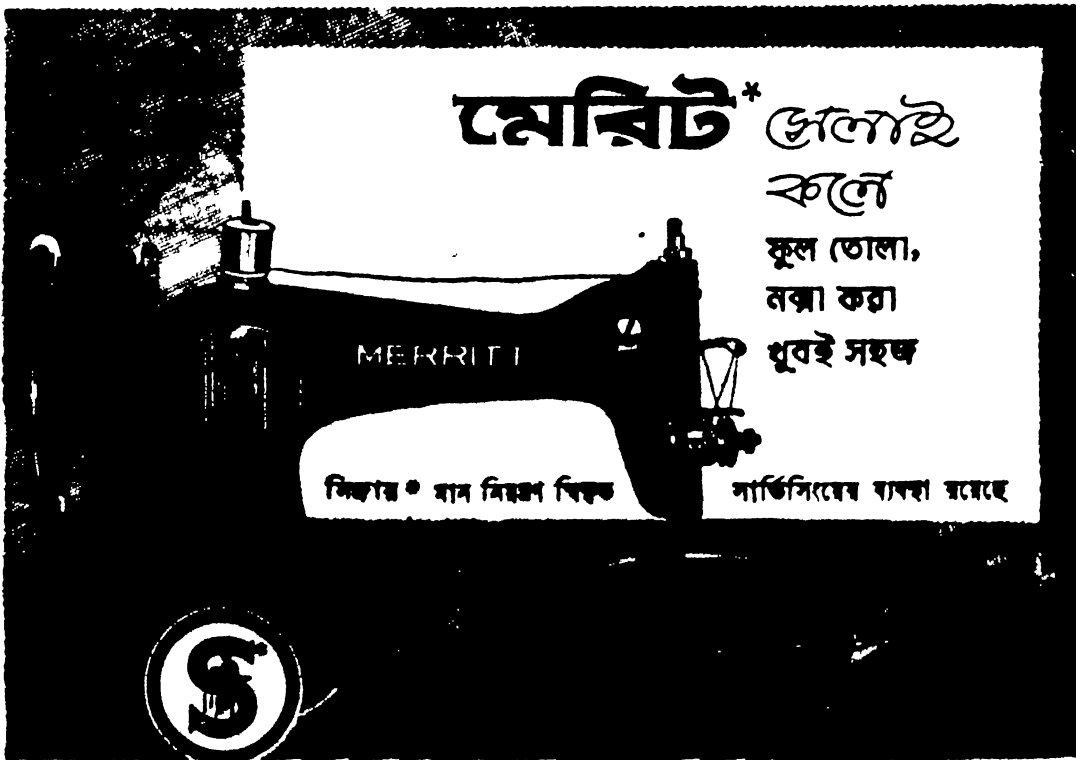
তা বটে, বলে গম্ভীর হয় অনুপ সিং।

মখ্খনলাল বলে, পণ্ডিতজী একটু বসুন, এই পাকটা নামলেই আপনাকে দেবো—আচ্ছা মিঠাই বনছে।

তখন হালুইকর ও সুখানন্দ গল্পগাছা শুরু ক'রে দেয়—শহরের হালচাল, দিল্লীর

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা হ'তে থাকে তাদের মধ্যে। অনুপ সিং যোগ দেয় না সে আলোচনায়, অন্যের অগোচরে এক মনে সে দেখতে থাকে সুখানন্দকে। কিছুক্ষণ পরে সে আপন মনে গুণ গুণ ক'রে গান ধরে—

কোম্পানী বাহাদুর বড়া জুলুম কিয়া
মেরা মাল মুলুক সব ছিন লিয়া।

ঘুরে ঘুরে ঐ দুটো ছত্র গুন গুনিয়ে গান ক'রে যায় অনুপ সিং।

হঠাৎ অনুপ সিং এর দিকে মুখ ফিরিয়ে সুখানন্দ ব'লে ওঠে, গানের কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না।

উৎসাহ প্রকাশ ক'রে অনুপ সিং বলে, আপনি কি অন্য রকম জানেন নাকি?

আমি তো এই রকম জানি বলে সুখানন্দ গুন গুন স্বরে আরম্ভ করে—

কোম্পানী বাহাদুর বড়া জুলুম কিয়া
লখনউ নগরী মেরী ছোড়ায় লিয়া।

মথুখনলাল বলে পণ্ডিতজীর গানের কথাগুলোই ঠিক মনে হয় লখনউ নগরী মেরী ছোড়ায় লিয়া।

হাঁ, জী, এ গজল তো খাস ওয়াজেদ আলি শার রচনা তাই তিনি লিখছেন লখনউ নগরী মেরী ছোড়ায় লিয়া—বলে সুখানন্দ।

অনুপ সিং এই রকম একটা সিদ্ধান্তের দিকেই ঠেলছিল আলোচনাকে তাই এবারে বলল তা হবে, আপনার কথাগুলোই হয় তো ঠিক।

তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো আপনি বুঝি লখনউ-এ ছিলেন

ছিলাম বই কি, অনেকদিন ছিলাম।

অনুপ সিং-এর মুখের মাংসপেশীর রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে, অবশ্য কেউ লক্ষ্য করে না।

আচ্ছা পণ্ডিতজী আপনি কি অমর সিং-কে জানতেন, শুধায় অনুপ সিং।

সুখানন্দ বলে সাহেব লখনউ শহরে তিন লাখ লোকের বাস, কে কার খবর রাখে।

নবাবের তহশীলদার অমর সিং একজনই ছিল।

এবারে যেন মনের মধ্যে ধাক্কা খায় সুখানন্দ, সচকিত ভাবে বলে ওঠে আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকি, তহশীলদারের খোঁজ কি রাখি।

অনুপ সিং ছাড়ে না বলে এক সময়ে তো জবর আদমি ছিলেন আহ্নল কাটা গিয়েছে।

তা বটে, তা বটে বলে হাতখানা লুকোয় সুখানন্দ।

হালুইকর হেসে উঠে· এই দুই বাক্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন ক'রে দেয়, বলে নৌ শো চুহা খাকে বিল্লি চলী হজকো।

তারপরে ব্যাখ্যা ক'রে বলে, জোয়ান বয়সে সবাই জবরা, বুড়ো হলেই কেতাব আর তসবী নিয়ে পড়ে।

সুখানন্দ কিছু অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করে হালুইকরকে, তবে অনুপ সিং-এর মনে লাগে না যেন কথাটা। তার চোখে আগুনের জ্বালা ফুটে ওঠে।

কারিগরের উদ্দেশ্যে সুখানন্দ বলে ওঠে, দাও দাও যা হয়েছে বেঁধে ছেঁদে দাও, অনেক দেরী হয়েছে, আর বসতে পারি না।

দাম চুকিয়ে দিয়ে মিঠাই-এর ভাঁড় নিয়ে তাড়াতাড়ি বের হ'য়ে পড়ে সুখানন্দ।

অনুপ সিং শুধায়, পণ্ডিজী কোথায় থাকেন জানো?

মথুখনলাল বলে না, আগে তো পরিচয় ছিল না। মাস দুই হ'ল পরিচয় হ'য়েছে, মাঝে মাঝে আসেন মিঠাই নিয়ে যান কাছেই বোধহয় কুটুম্ব সাক্ষাৎ কেউ থাকে।

তারপরে উল্টে শুধোয়, কেন বলো তো? কুস্তি দেখাবে নাকি? তা যদি হয় এমন এলেমদার লোক আর পাবে না। ভবিষ্যৎ গুণতে অতীত গুণতে পণ্ডিতজীর জুড়ি নাই।

তেমন উৎসাহ প্রকাশ করে না অনুপ সিং কেবল সংক্ষেপে বলে অতীতের একটা রহস্য গণনা করাতে চাই।

তবে একদিন দেখা করো না কেন?

সেই জন্যই তো বাড়ির ঠিকানা খোঁজ করছিলাম, বলে অনুপ সিং।

সুখানন্দ পথে বের হ'তেই জীবন লালের দেখা পেলো যদিচ দুজনেই একই পথের, একই লক্ষ্যের পথিক তবু কেউ কাউকে চেনে না, তাই নীরবে কখনো পাশাপাশি কখনো আগু পিছু তারা চলতে লাগলো। জীবনলাল অন্যমনস্ক ছিল নতুবা ঘণ্টে-ওয়ালার দোকান থেকে কিছু মিঠাই কিনে নিয়ে যেতো। শাহাজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারের অভিজ্ঞতা সে মনে মনে পুনরাবৃত্তি করছিল। সে ভাবছিল লোকটা খুব হতাশ হ'য়ে পড়েছে। সে গিয়ে কুর্নিশ ক'রে দাঁড়াতেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল মীর্জা আবু বকর বলল তুমি খুব সাচ্চা আদমি, তোমার কথায় কাজে এক, কী জবাব দিল জেনারেল সাহেব? কিন্তু যখনি শুনলো যে জবাব দূরে থাক চিঠিখানা অবধি গ্রহণ করেন তখনি এক ফুঁয়ে উৎসাহের বাতি নিবে গেল তার মুখে। ব্রিজম্যান বলে দিয়েছিল যে, শাহাজাদাকে যেন জানায় যে কোন শর্তেই কোম্পানী আর ক্ষমা করবে না শাহাজাদাদের। ঐ নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলতে তার মন সরলো না—অথচ কিছু না বললেও নয়। তাই ইতস্ততঃ করে জানালো যে, কোম্পানীকে আর চিঠি লিখে লাভ নাই, লিখলেও উত্তর দেবে না কোম্পানী পক্ষ। মুষড়ে পড়লো লোকটা। অনেকক্ষণ কথা বের হ'ল না তার মুখে। অবশেষে বলল, তুমি আর কি করবে? তোমার কথা রক্ষা করেছ, তোমাকে আমি কিছু বকশিশ দিতে চাই। সে বলেছিল শাহাজাদার বহুৎ মেহেরবানি, তবে বকশিশ নিতে পারবো না, তবে যদি তিনি খুশী হ'য়ে থাকেন তবে পাহারাওয়ালাদের যেন হুকুম ক'রে দেন, আমার বহিনকে দেখতে আসবার সময়ে যেন ধরপাকড় না করে। মীর্জা আবুবকর তখনি সে রকম হুকুম দিয়ে দিল। বিদায় নিয়ে কুর্নিশ ক'রে চলে এলো জীবনলাল। তারপরে পথে চলতে চলতে এই সব কথাই উল্টে পাল্টে চিন্তা করছিল সে।

মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে যায় জীবনলাল, ঐ শাহাজাদার জন্যে এত করুণা কোথায় সঞ্চিত ছিল তার হৃদয়ে? শাহাজাদাদের ইতিহাস কারো অজ্ঞাত নয়, বিশেষ বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে তারা যে নারকীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা আজ কে না জানে! হত্যা, লুঠতরাজ কি না করেছে তারা। তা ছাড়া কদিনেরই বা পরিচয় মীর্জা আবু বকরের সঙ্গে তার। জীবনের কাছে সে একটি নাম বই তো নয়। তবে? আর এমন কীই বা দুঃসংবাদ বহন করে গিয়েছে? কোম্পানী পক্ষ তার চিঠির

জবাব দেবে না। এ আর এমন কি গুরুতর সংবাদ। অথচ, সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না শাহাজাদার বিস্ময়-খিন্ন মুখ মণ্ডল। "কোম্পানী বাহাদুর কোন চিঠির জবাব দেবে না! এমন কি চিঠি গ্রহণ করতেও, পাঠ করতেও রাজি নয়! হা, আল্লা।" ঐ সখেদ আল্লা উচ্চারণ প্রচণ্ড মোচড় দেয় জীবনের মনে। পাপী যখন দুঃখে পড়ে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তখন তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করা উচিত নয়। মানুষ বুঝুক, নাই বুঝুক ভগবান বোঝেন, সরল হৃদয় ব্যক্তির মন দিয়ে তিনি বোঝেন। জীবন বুঝল। মনের মধ্যে এক রাশ অন্ধকার নিয়ে সে চলতে লাগলো।

হঠাৎ কোথা হ'তে এক ঝলক আলো এসে পড়লো জীবন তাকিয়ে দেখে মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তুলসী সেই চাঁদ। অল্প বয়সের দুঃখ বানের চলতি জল যেমন আসে তেমনি যায়, যেমন মাটি ধুয়ে নিয়ে যায় তেমনি নূতন মাটির পলি ফেলে রেখে যায়, হরণে পূরণে মোটের উপরে লাভ। হ'লও তাই। শাহাজাদার দুঃখের পটে তুলসীর জ্যোৎস্না ফুটলো উজ্জ্বলতর। মেঘ যত কালো বিদ্যুৎ তত উজ্জ্বল। তুলসী এখন কি ভাবছে? তাকে দেখে নিশ্চয় অবাক হ'য়ে যাবে, এরই মধ্যে এলেন?' যার মুখে 'তুমি' শব্দটাই শোভন-তম তার মুখে আপনি' বড় বিচিত্র মধুর ঠেকে বুঝতে বাধে না যে 'তুমিই এসেছে 'আপনি'র মুখোশ পরে। ঐ নূ্যনতম ব্যবধানটি কত মাধুর্যে, কত রহস্যে পূর্ণ। এ যেন বাসর শয্যায় বরবধূর সংকোচের ব্যবধান। "কেন, তুমি কি ভেবেছিলে আসবো না। বেশ, তাই যদি ইচ্ছা হয় তবে এর পরে আর না এলেই চলবে।' কিন্তু কতক্ষণ এমন কৃত্রিম অভিনয় চলে যখন দুজনেরই মনে চাপা ভালোবাসা দুজনেরই মুখে চাপা হাসি। "আপনি মানুষটি বড় ভালো নন।" 'কেন বলো তো " "আপনার চোখ দুটো বড় বেয়াড়া।" 'হতেই হবে চকোর যে চাঁদ দেখতে পেয়েছে।" এমনভাবে মনে মনে উতোর চাপান চলতে থাকে। প্রিয়জনের সঙ্গে মনে মনে ঝগড়া করা ভালোবাসার একটি প্রধান সুখ।

হঠাৎ সম্বিত হয়, এসে পড়ছে রূপোলীর বাসার সম্মুখে। কিন্তু একি, প্রকাণ্ড পাগড়ী-পরা এই লোকটা কেন? সে-ও কি এখানে যাবে নাকি? বাদশার চর নয়তো? সুখানন্দ ভাবে, এ ছোকরা কে? তুলসীর উপরে চোখ নেই তো? দুজনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় পরস্পরের দিকে।

জীবন বলে, আমি রূপোলীর দাদা।

সুখানন্দ বলে, আমি তুলসীর পিতাজী।

জীবন নত হ'য়ে সুখানন্দের পায়ের ধুলো নেয়।'

(ক) পাইকারী হত্যা,

(খ) পাইকারীভাবে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন,

(গ) পুরোপুরি বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সুচিন্তিতভাবে পরিবেশ সৃষ্টি,

(ঘ) জবরদস্তিভাবে জন্ম নিরোধ,

(ঙ) শিশুদিগকে বাপ-মায়ের কাছ থেকে জবরদস্তি করে সরিয়ে ফেলা, এবং

(চ) ধর্মাচরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি।

আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের সামনে উদ্বাস্তু তিব্বতীরা যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাতে এর প্রত্যেকটি অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। এখানে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল।

দের্গে জংসার মঠের একজন ছোট ব্যবসায়ীর সাক্ষ্য : সাক্ষী যে মঠে কাজ করত সেখানে ৪৫০ জন ভিক্ষু থাকতেন। চীনারা এসেই প্রথমে তাদের সম্পত্তির একটা তালিকা বানালো। কিন্তু অস্ত্র ছাড়া প্রথমে আর কিছু নিয়ে গেল না। ১৯৫৬ সালে মঠের সমস্ত শস্য চীনারা নিয়ে গেল। তার বাড়িতে যে শস্য ছিল, তাও। একটা কণাও রেখে গেল না। ১৯৫১ সালে চীনাদের দু হাজার ভারবাহী পশুর দরকার পড়েছিল। সাক্ষীর তিরিশটি পশু ছিল, কুড়িটি চীনাদের দিয়ে দিতে হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই পশুগুলো মরে গেল। তারপর চীনারা মাল বইবার জন্য মানুষদের ধরে নিয়ে যেতে লাগলো। তাকেও যেতে হল, সঙ্গে তার বড় ভাই এবং ছোট বোন। ষোল মাস ধরে তাদের মাল বইতে হয়েছিল। গুরুতর পরিশ্রমে তারা কাতর হয়ে পড়েছিল। পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছিল। এক একজনকে দেড় মণের উপর বোঝা বইতে হোত এবং চব্বিশ দিনে প্রায় ১২০ মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে হোত। দের্গে খোলোডো থেকে মাল নিয়ে তাদের দের্গে কামটকায় পৌঁছে দিতে হোত। এই সময়ের মধ্যে দশটি লোক পরিশ্রমে কাতর হয়ে মারা যায়। তাদের মধ্যে ৎসেতুন, বয়স আটচল্লিশ, যিসেওয়াং দর্জি বয়স পঞ্চাশ, চো ডুন বয়স তিরিশ ৎসেরিঙ ডোলমা বয়স চল্লিশ এদের নাম কটা সাক্ষীর মনে আছে। তিনটে মেয়েছেলেও মরেছিল এও তার মনে আছে।

১৯৫৬ সালে দের্গে জংসার-মেক্ছেতে একটা মিটিং ডাকা হল—মঠের প্রতিনিধিদের সেই মিটিংএ আসতে বলা হল। মিটিংটা হয়েছিল গ্রামের মঠের ঠিক নীচেই। সাক্ষী নিজে এবং মঠের দুজন ভিক্ষু সেই মিটিং-এ যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে প্রায় দুশো লোক উপস্থিত ছিল। বেশীর ভাগ লোকই নীচু স্তরের। কমিউনিস্টরা তাদের দলে টেনেছিল। জমিদার শ্রেণীর কয়েকজন এবং কিছু পয়সাওয়ালা লোকও ঐ মিটিংএ হাজির হয়েছিল। চীনারা সেই মিটিংএ বলল, ভিক্ষু, লামা, জমিদার এবং পুঁজিপতিদের খতম করে ফেলা হবে। সাক্ষী বুঝতে পারল, তার মানে তাদের মেরে ফেলা হবে। চীনাদের দলে স্থানীয় গুণ্ডা প্রকৃতির যে সব লোক ভিড়েছিল, তারা সবাই সেখানে হাজির ছিল। ওদের মধ্যে চোর বদমায়েসও কিছু ছিল। সাক্ষীদের জানান হল, আজকের মত মিটিং শেষ হল, অদূর ভবিষ্যতে আবার মিটিং হবে। সাক্ষী জানায়, তারপর থেকে তাকে এবং অন্যান্যদের দুদিন নিজ নিজ বাড়িতে আটক করে রাখা হয়। তারপর দ্বিতীয় সভায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। সেই মিটিংএ গ্রামের ইতর শ্রেণীর লোকেরা এবং চীনারা প্রকাশ্যে সর্ব- [illegible]

তারপর সবাই মিলে তাদের লাথি, কিল, চড় মারতে থাকে। মুখে থুথু দেয়। চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারতে থাকে। সবচেয়ে বেইজ্জত করে গ্রামের মোড়লের মেয়ে সাকারমাকে। এই মেয়েটির বয়স চল্লিশ। প্রথমে সবাই মিলে তাকে নানা-রকম গালি দিতে লাগল। তারপর তার মুখে খড় গুঁজে তাকে চার পায়ে হাঁটতে বাধ্য করে, তার মুখে লাগাম দিয়ে চীনারা এবং তাদের সাগরেদ ঐ গুন্ডা বসমায়েস-গুলো তার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভিক্ষুদেরও তারা এইভাবে বেইজ্জত করে। —(পাঁচ নম্বর সাক্ষীর বিবরণ, আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ২২৬)

৪৮ নম্বর সাক্ষী, (দেগেঁ জেলার মেশে গ্রামের এক চাষী, বয়স প'য়ত্রিশ) জানায়:

চীনা কমিউনিস্টরা তাদের এলাকায় আসে ১৯৫০ সালে। সে দেগেঁ গনসেন মঠের কাছে চীনা কমিউনিস্টদের সংগে তাদেরই অফিসে কাজ করত।

সাক্ষী বলে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত চীনারা ভাল ব্যবহারই করেছে। তারা তিব্বতীদের আশ্বাস দিয়েছিল যে, তিব্বতীদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহারকে তারা সম্মান দেখাবে তাদের ধর্মকেও রক্ষা করবে। ১৯৫৬ সালে সাক্ষীর এলাকায় হঠাৎ দু হাজার চীনা ফৌজ এসে গেল। চীনারা গরীব এবং ইতর শ্রেণীর তিব্বতীদের উস্কানি দিতে লাগল। একদিন তারা মিটিং ডাকল। সমস্ত মঠের প্রধান লামা বিত্তশালী লোক এবং ঐ অঞ্চলে গ্রাম ও ছোট ছোট শহরের সমস্ত মাতব্বরদের চীনারা সেই মিটিংএ ধরে নিয়ে এল। সেই মিটিংএ জানান হল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার করা হবে। সকলে যেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র এনে জমা দিয়ে যায়। যে সব অস্ত্র মঠে ধর্মের প্রতীক হিসাবে রক্ষিত ছিল সেগুলোকেও চীনা কমিউনিস্টরা রেয়াত করল না। খাদ্য, বস্ত্র, ঘোড়া অশ্বতর এমন কি লাগাম জিন পর্যন্ত কমিউনিস্টরা দাবি করে বসল। তিব্বতীরা তাদের জানালো, খাদ্য-শস্য এবং ধর্মীয় প্রতীকগুলো চীনারা যেন না নেয়। ফল হল এই, চীনা কমিউনিস্টরা গ্রামকে গ্রাম ঘিরে ফেলল এবং সর্বস্ব ছিনিয়ে নিল।

সাক্ষী অতঃপর জানায়, চীনা কমিউনিস্টরা এতেও সন্তুষ্ট হল না, তারা বলতে লাগল, যা লুকিয়ে রেখেছ বের করে দাও। তিব্বতীরা যখন জানালো, তাদের লুকানো আর কিছুই নেই, তখন চীনারা ব্যাপকভাবে ভিক্ষু, লামা, সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের লোকদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। সাক্ষীর হিসাবে পাঁচশজন লামা এবং ভিক্ষুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দেগেঁর বড় মঠটায় সাতের শ অধিবাসী ছিল। এই মঠ ছাড়া দেগেঁ জেলায় আরো চারশ মঠ ছিল। [illegible] জমিদারী, ব্যবসায়ী এবং সজ্জন ব্যক্তিদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। সর্বসাধারণের সামনে এই সব লোকদের হেনস্তা করা হল। ঘরের বৌদের টেনে এনে প্রকাশ্যে বেইজ্জত করা হল। চীনা কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় সে অঞ্চলের সমাজবিরোধী ইতর লোকেরা সম্ভ্রান্ত সব মহিলাদের পাঁচজনের সামনে পশুর মত চার পায়ে হাঁটতে বাধ্য করল। তারপর তাদের পিঠে জিন ও মুখে লাগাম পরিয়ে তার উপর সওয়ার হয়ে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ল। প'ঞ্চাশ জন ভিক্ষু এবং লামাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। কাউকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে মারা হল, কাউকে গুলী করে কাউকে বা ফাঁসিতে লটকিয়ে। সাক্ষী জানায় ঐ অঞ্চলে মোট দু হাজার আটশ সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার মধ্যে আটশজনকে কোতল করা হয়। নিহত নরনারীর মধ্যে চল্লিশ জনের বয়স ছিল প্রায় সত্তর বছর। সাক্ষী এমন অনেক মঠ দেখেছে যার ভিতর থেকে পুঁথি ও প্রতিমা হয় সরিয়ে ফেলা হয়েছে, নয় ধ্বংস করা হয়েছে।

সাক্ষী বলে, পনের থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের তিন-চার হাজার লোককে দেগেঁ জেলা থেকে চীন দেশে পাচার করে দেওয়া হয়। তার মধ্যে চীনাদের বিশ্বাসভাজন এবং 'নতুনভাবে দীক্ষিত' ত্রিশ কি চল্লিশজন কিছুদিন পর ঐ অঞ্চলে ফিরে আসে। পঞ্চাশ বছরের নিচে যাদের বয়স, তাদের ধরে ধরে কুলি ফৌজে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বাপমায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুদের চীন দেশে চালান করে দেওয়া হয়। অত্যাচারের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি। সাক্ষীর দুটি মেয়েকেও, একটির বয়স সাত, অন্যটির নয়, ১৯৫৬ সালে চীনারা ধরে নিয়ে যায়। সাক্ষী আজ পর্যন্ত তাদের সন্ধান পায়নি।

সাক্ষী বলে, যদিও সে চীনাদের অফিসেই কাজ করত, তবুও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। লুকানো সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র বের করে দেবার জন্য তার উপর উৎপীড়ন
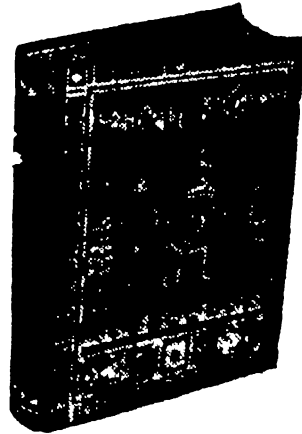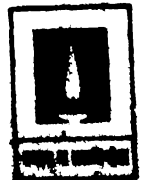
চালানো হয়। ১৯৫৭ সালের তার দ্মাস জেলও হয়। এই সময় প্রত্যেক দিন তাকে জেল থেকে বের করে এনে জনতার সামনে নিয়ে গিয়ে নানারকমে বেইজ্জত করা হোত। বলা হয়, এই সময়ের শেষে সে যদি কমিউনিজম গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে কঠোর সাজা দেওয়া হবে। ধর্ম খোয়াবার ভয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। তারপর একদিন সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়। সাক্ষী জানায়, তাদের জেলায় চীনা ফৌজের সঙ্গে তারা এক বছর ধরে ক্রমাগত লড়াই করেছে। পরে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। সে খাম্পাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছা-বাহিনীতেও যোগ দিয়েছিল। ১৯৫৯ সালে ভারতে পালিয়ে আসে।—(আন্ত-র্জাতিক বিচার কমিশনের তদন্তের রিপোর্ট, পৃ ২৮০)

৫০ নম্বর সাক্ষীর বিবরণ (সাক্ষী চীন অধিকৃত যে চুয়ান প্রদেশের চামলিং মঠের ভিক্ষু, বয়স একত্রিশ) ঃ

সাক্ষী জানায়, ১৯৫৪ সাল থেকে চীনা কমিউনিস্টরা দরিদ্র ও গুণ্ডা শ্রেণীর লোকেদের মঠের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। প্রচার করা হতে থাকে ধর্মটা বুজরুকি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যবসা বাণিজ্য আর থাকবে না। চীনারা ঐ অঞ্চলের সমস্ত মঠ ও লোকেদের জানায়, তাদের কাছে যে সব অস্ত্রশস্ত্র আছে তা চীনাদের হাতে তুলে দিতে হবে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সবাই প্রতিবাদ জানায়, এবং মহামান্য দলাই লামা সে সময় পিকিংএ থাকায় তার কাছে এক প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। প্রতিনিধিদল পিকিং গিয়ে অভিযোগ করেন, চীনারা যে সতের দফা চুক্তি করেছিল তা অমান্য করছে। প্রতিনিধিদল ফিরে এসে জানান যে, চীনা কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন, এরকম কাজ আর হবে না। স্থানীয় কমান্ডারদের ভুলের জন্যই এই কাণ্ড ঘটেছে। তিব্বতীদের ধর্ম এবং রীতি-নীতি মান্য করা হবে। সাক্ষী জানায় এই আশ্বাস পাওয়ার পর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। চীনারা ভিক্ষুদের লাল পোশাকপরা চোর, আর লামাদের হলদে পোশাক পরা দস্যু বলে প্রকাশ্যে গালি-গালাজ করতে থাকে।

সাক্ষী বলে, ১৯৫৬ সালে তিন হাজার চীনা কমিউনিস্ট ফৌজ এসে তাদের মঠের সামনে আস্তানা গাড়ে এবং মঠের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে। তারপর অস্ত্রশস্ত্র চীনাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ পাঠায়। তাদের প্রথম নির্দেশ অমান্য করা হয়। দ্বিতীয় নির্দেশও অমান্য করা হলে সেই তিন হাজার চীনা সৈন্য মঠটিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। মঠকে এই বলে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয় যে, অবিলম্বে মঠের ধনসম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র চীনাদের হাতে তুলে না দিলে বলপ্রয়োগ করা হবে। চীনা ফৌজের কাছে মঠ থেকে এক প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। চীনারা তিব্বতীদের ধর্ম-কর্মে হস্তক্ষেপ করবে না বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করবার জন্য প্রতিনিধি-দল অনুরোধ জানান। চীনারা অবিলম্বে তাদের নির্দেশ পালন করবার জন্যে হুমকি দেয়।

সাক্ষী বলে, সেই রাত্রেই চীনা ফৌজ মঠের উপর গোলা বর্ষণ শুরু করে। চৌষট্টি দিন ধরে উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলে। তারপর চীনারা বিমান থেকে মঠের ভেতরে বোমা ফেলতে শুরু করে। তখন মঠের লোকেরা চারদিকে পালাতে থাকে, দু হাজার নরনারী এই বোমা বর্ষণে নিহত হয়। আরো হাজার দুয়েককে চীনারা বন্দী করে। সাক্ষী কোনক্রমে পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়। কিছুদিন পরে এক মঠবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে জানতে পারে মঠের [illegible] চীনারা গ্রেপ্তার

করেছে। আর তার মধ্যে একজনকে জীবন্ত পুঁতে ফেলেছে। সেই মঠে গাই সি তিমি নামে এক প্রধান সাধু ছিলেন। সে অঞ্চলে সবাই তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। চীনারা তাকে ধরে এনে ২২০ মণ চাল একদিনের মধ্যে তিন মাইল দূরে একটা জায়গায় রেখে আসতে বলে। একা এ কাজ করা কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব নয়, সাধু একথা জানালে চীনারা তাকে তপোবলে এ কাজটা হাসিল করবার জন্য উপহাস করতে থাকে। তারপর সাধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাক্ষী তার আর কোন খোঁজ পায়নি।—(আন্তর্জাতিক বিচার কমিশনের তদন্তের রিপোর্ট, পৃ ২৮২)

৪৪ নম্বর সাক্ষীর বিবরণ (সাক্ষী আমদো অঞ্চলের দোই গ্রামের সচ্ছল চাষী, বয়স আঠাশ), সাক্ষী জানায়:

দোইএ দেড় হাজার পরিবার বাস করত তেরশো ভিক্ষু ছিল আর ছিল বারটা মঠ। একটা বড়, বাকীগুলো ছোট। ১৯৪৯ সালের আগে ঐ অঞ্চলে চীনা ফৌজের নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু ঐ বছর প্রায় তিরিশ হাজার কমিউনিস্ট ফৌজ এসে হাজির হয়। কুড়ি দিন পর এক হাজার ফৌজ সেখানে থাকে ও অন্যেরা চলে যায়। ঐ সমস্ত ফৌজের রসদ সাক্ষীর গ্রামকে সরবরাহ করতে হয়েছে। মূল্য প্রায় কেউই পায়নি। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চীনাদের ব্যবহার মোটামুটি ভালই ছিল।

সাক্ষী বলে, ১৯৫২ সালে চীনারা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে দিল: (১) পুঁজিপতি, (২) জমিদার, (৩) মধ্যবিত্ত (৪) ছোট চাষী এবং (৫) ভৃত্য ও কৃষি শ্রমিক। সময় সময় উপরের দুই শ্রেণীর লোককে গ্রামের লোকজনদের সামনে ডেকে আনা হোত এবং জনতার মধ্য থেকে দু-একজনকে বেছে নিয়ে চীনারা তাদের দিয়ে জমিদার ও পুঁজিপতিদের গালি দেওয়াতো। এই দুই শ্রেণী থেকে

পাঁচশ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের তিনশজনকে কোতল করা হয়। নিহতদের সকলেই পুরুষ। বাকী দুশ জনকে সর্বতোভাবে বেইজ্জত করা হয়। স্থানীয় গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা তাদের পিঠে চড়ে ঘোড়ায় চড়ার শখ মিটিয়ে নিত। সাক্ষীর দাদাও ঐ দুশজনের একজন ছিলেন। সাক্ষীর বয়স কম ছিল তাই তাকে রেহাই দেওয়া হয়। ১৯৫৪ সালে তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের পরিবারের লোকদের দিয়ে দিন-মজুরী করানো হয়। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত মঠের গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। তবে জনসাধারণকে মঠে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

সাক্ষী জানায়, ১৯৫৫ সাল থেকে নতুন ধরনের প্রচার চীনা কমিউনিস্টরা শুরু করে। এই প্রচারের বিষয় ছিল তিনটি:

(১) জনসাধারণকে বুদ্ধিমান বানাবার জন্যে বিশেষ ধরনের চিকিৎসা চালানো হবে,

(২) ধর্ম হচ্ছে মূর্খামী, ক্ষতিকর বস্তু এবং ভিক্ষুদের খেটে খেতে হবে,

এবং (৩) ১৯৫২ সালে যে জমি চাষীদের দেওয়া হয়েছিল তা দিয়ে কালেকটিভ ফার্ম তৈরি করা হবে, চাষীরা সেখানে মাইনে নিয়ে মজুরী খাটবে মাত্র।

কমিউনিস্টদের যে কথা সেই কাজ। সমস্ত ভিক্ষুদের ধরে ধরে তারা শ্রম শিবিরে পাঠাতে লাগল, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। প্রধান লামাদের গ্রেপ্তার করা হল এবং চীনা সৈন্যরা তাদের পিঠে চড়ে চড়ে সকলের সামনে তাদের বেইজ্জত করল। সাক্ষী ১৯৫৭ সালে যখন পালিয়ে আসে, তখনও পর্যন্ত লামারা ফাটকে আটক ছিলেন। সাক্ষী এও দেখেছে, চীনারা এক এক জোড়া ভিক্ষুর কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে চাবুক মেরে তাদের দিয়ে লাঙল টানাচ্ছে।

সাক্ষী বলে, ১৯৫৬ সালে চিকিৎসকের

ল তাদের গ্রামে হাজির হল, চীনারা চাদের জানালো, এইবার তাদের বিশেষ-ভাবে চিকিৎসা করা হবে। এই 'বিশেষ চিকিৎসায়' তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়বে, তারা অনেক লম্বা ও শক্ত সমর্থ হবে। চীনারা হুকুম জারী করল এই চিকিৎসা সবাইকে নিতে হবে। যে না নেবে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। সাক্ষী যে বাড়িতে বাস করত সেখানে তাকে একখানা ছোট ঘরে ঠেলে দিয়ে গোটা বাড়িটা এই চিকিৎসকের দল দখল করে ফেলল। এই দলে সাতজন ডাক্তার ছিল। চারজন পুরুষ, তিনজন স্ত্রীলোক।

সাক্ষী জানায়, তার চিকিৎসাই সর্বপ্রথম শুরু হল। একদিন তার বাহু থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয। পরদিন আবার তার তলব পড়ল। ডাক্তার তাকে একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। তাকে বিবস্ত্র করে একটা কোচের ওপর শুইয়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলা হল। তাকে বলা হল, চীনারা যা করতে যাচ্ছে তাতে তার হয়ত একটু ব্যথা লাগতে পারে। সে যেন চেঁচামেচি না করে। সাক্ষী দেখল, একরকম সার্জিকাল যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। তার একটা দিক ঠোঁটের মত বাঁকানো আবার কাঁচির মত খোলা যায়। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণার মধ্যেও সাক্ষীর মনে হল ভিতরে কি একটা যেন কেটে দেওয়া হল। অতঃপর অসহ্য ব্যথায় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। যখন জ্ঞান হল তখন সাক্ষী দেখে সে নিজের ঘরেই শুয়ে আছে। তাকে দশদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে বলা হল। এবং রোজ তাকে ইঞ্জেকসান দেওয়া হতে লাগল। চীনারা এই কথা তাকে কাউকে বলতে নিষেধ করে দিল। সাক্ষীর স্ত্রী সে সময়ে গর্ভবতী থাকায় এই 'বিশেষ চিকিৎসা'র হাত থেকে তাকে কিছুদিনের মত রেহাই দেওয়া হয়। বলা হল, খালাস হবার পর তার চিকিৎসা শুরু হবে। চীনারা জানাল, গ্রামে পনের থেকে চল্লিশ বছর বয়সের যত মেয়ে আছে, সবাইকেই চিকিৎসা করা হবে। চীনারা সাক্ষীকে এই বলেও শাসিয়ে দিয়েছিল যে, সে যদি এ কথা কারো কাছে ফাঁস করে তবে তাকে গুলি করে মারা হবে। তা সত্ত্বেও সাক্ষী তার এক বন্ধুকে এই চিকিৎসার কথা বলে দেয় এবং এও বলে তার পালা আসবার আগেই সে যেন পালায়। সাক্ষীও এক বছর পরে পলায়ন করে।

সাক্ষী জানায় যে, তিনশজন লোককে এই 'বিশেষ চিকিৎসা' করা হয়েছে বলে সে জানে। মেয়েদের কিভাবে চিকিৎসা করা হয় তাও সে জানতে পেরেছে। সাক্ষী বলে, স্ত্রীলোকদের চিরতের বন্ধ্যা করে দেবার জন্য তাদের উপর পৈশাচিক প্রক্রিয়ায় অস্ত্রোপচার চালানো হয়। *

সাক্ষী জানায়, এই ধরনের অস্ত্রোপচারে তার গ্রামের পাঁচটি স্ত্রীলোক মারা গিয়েছে। সেই পাঁচজনের নামও সাক্ষী জানিয়েছে। তাদের নাম : (১) ওহ্‌ছো, (২) খার্মোলা, (৩) পামো, (৪) জিমোচি এবং (৫) খাডো।

সাক্ষী আরো বলে, ১৯৫০ সালের পর থেকে চীনারা তাদের গ্রামের ছেলেমেয়েদের ছিনিয়ে নিতে থাকে। প্রথম প্রথম একটু বড়দের নিয়ে যায়। চীনারা বলে, এই সব ছেলে-মেয়েদের বাপ-মায়ের কুসংস্কার ও ধর্মের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাবার জন্যেই আলাদা করে রাখা হচ্ছে। ছ' বছর পর্যন্ত শিশুকে কাছাকাছি শহরেই আলাদা করে রেখে দেওয়া হত, সাত থেকে পনের বছরের ছেলে-মেয়েদের চালান করা হত চীনে। সাক্ষীর চার বছরের মেয়েটাকে ১৯৫৪ সালে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। যদিও তাকে সেই শহরেই রাখা হয়েছিল তবুও তিন বছরের মধ্যে সাক্ষীকে বা স্ত্রীকে তাদের মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সাক্ষী জানায়, ১৯৫৬ সাল থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনারা নিয়ে যেতে থাকে।

(ক্রমশ)

* (I) A description of the treatment of the women was given to him This treatment consisted of inserting some kind of bladder into the vagina which pulled out when removed something which looked like flesh This was snipped off and the woman became unconscious - (Statement No 44, A Report to the International Commission of Jurists by its Legal Inquiry Committee on Tibet, p. 277).

একটা প্রবাদ আছে, বার্লিনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়লে, হয় সেটা Dog নয়ত কোন Doctorate-এর গায়ে গিয়ে পড়বে। এই প্রবাদটির সঙ্গে আমার মতে আজ স্থাপত্য-শিল্পীদের জুড়ালেও ভুল হবে না। কেবল পশ্চিম-বার্লিন নয়, সমগ্র পশ্চিম-জার্মানীতেই যুদ্ধোত্তরকালে রাতারাতি হাজার হাজার স্থপতিদলের বেরিয়ে আসাটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার. ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬২ সন -মাত্র ১৬ বৎসরের দ্রুত গঠনকার্যের মধ্য দিয়ে এঁরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন একটা দেশের স্থাপত্যশৈলী। ঘর সাজিয়ে দিয়েছে কোটি কোটি মানুষের। যে দেশে রূপের এত ছড়াছড়ি সে দেশের অধিকাংশ রূপসী মেয়ের মতই গর্বিত গ্রীবা তুলে ধরে আজকের জার্মানী পৃথিবীর মানুষকে ডেকে যেন বলছে দেখ আমি কত সুন্দর!

আর যতই আমি আমার দুচোখ মেলে ধরছি এই তন্বী ষোড়শী নগরীর বুকে, দিনে দিনে আমার মুগ্ধ দৃষ্টি এক বিমুগ্ধ আত্মার স্পর্শে যেন ততই উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বার্লিনের গড়ে-ওঠা স্থাপত্য-শৈলীর উজ্জ্বল চূড়ায় চূড়ায়। সন্ধ্যার স্বপ্নময় আর্নস্ট রয়টার প্লাৎজ, ঘনপত্র-পল্লবিত সবুজ সরোবরের মত যে টিয়ের গার্টেন, যেখানে পৃথিবীর বহু নামকরা স্থপতির বাড়ি আজ রাজহংসের মত সুদীর্ঘ গ্রীবা আকাশের দিকে তুলে ধরেছে, সেই হানসা ভিয়েরতেল, কংগ্রেস হল, গ্রোপিয়ুস নগর, Spandau-এর দিকে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের পাশে লে কর্বুজিয়েরের Hoch-haus—বার্লিনের কোন দিকে তাকাবে মানুষ? যেদিকে তাকাবে, সেদিকেই চোখে পড়ে অজস্র দৃষ্টান্ত। বার্লিনের নর-নারী আর ঘর-বাড়িগুলিকে ভাল লাগে নি, এমন একটি মানুষের কথাও আমি শুনিনি। তাইত অনেক সুন্দর যানবাহন, রাস্তাঘাট, বাড়িঘরের মাঝে বিপুল ভিড়ে দাঁড়িয়ে সব [illegible]

ছড়িয়ে পড়ছে. পার্কে পার্কে ফোয়ারার মত হিরনার হুল্লসা নাচছে. আর হাসছে সেই দিগ্বিজয়ী হাসি, যে হাসি কাঁটাতার আর প্রাচীরের অনেক উর্ধ্বে. এ দেশের উজ্জ্বল গ্রীষ্মের মেঘের মত ছিমছাম প্রাসাদ-গুলির চূড়ায় ভেসে ভেসে লুকিয়ে বেড়ায়। তাই আমি দেখি সেই মেয়ের মধ্যে সমগ্র বার্লিন নগরীর অঢেল রূপ!

জীবনের কি অসীম প্রাণস্পন্দন থাকতে পারে, কী অশেষ ঐশ্বর্য গড়ে তুলতে পারা যায়; কী এক অন্তহীন কল্পনাশক্তি রয়েছে মানুষের মধ্যে—সত্যদ্রষ্টা শিল্পী আর বিজ্ঞানী সে ভবিষ্যতকে দেখতে পায় বলেই তো এগিয়ে চলে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় আর স্থাপত্যশিল্প হচ্ছে একমাত্র নন্দনবন—যেখানে বিজ্ঞান আর শিল্প [illegible]

Erika Schroer-এর কথা। যে ডেকে নিয়ে যেত Dahlem আর Pergamon-Museum-এর অতীত আত্মায়, ডয়েশ ওপের, শিলার থিয়েটার এবং কনসার্ট-এর সমুদ্র-সুর আর কণ্ঠস্বরে, ডেকে নিয়ে গেছে আপন ঘরে, যেখানে মা-বাবা আর মেয়ের শান্ত পরিবার। ওস্ট পয়ঞ্জন থেকে ভেসে আসা উদ্বাস্তুজীবন; যখন তাঁরা বার্লিনের বিভিন্ন অঞ্চলের পটভূমিকায় এরিকার বিভিন্ন বয়সের ছবিগুলি সামনে মেলে ধরত, তখন মনে হত যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে বসে সেদিন যে ছোট্ট মেয়েটি অসহায় সুরে আর্তনাদ করে কাঁদছিল, আজ সেই মেয়েই যেন উর্বশীর মতন বার্লিনের রূপসী সন্ধ্যার কলহের পরে এক মধুর মিলন। [illegible] আজকের দিনে স্থাপত্যশিল্পই বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি আর বিভিন্ন সংস্কৃতিকে এক আন্তর্জাতিক মহান চেতনায় অতি আপন করে টেনে আনছে। তাইত পৃথিবীর কোন এক অচেনা প্রান্তরে প্রবাসজীবনের প্রথম ঊষার আলোকে কোন এক বিদেশিনীর শান্ত নির্জন কণ্ঠে যেন সেদিন ভেসে এসেছিল অন্য এক পৃথিবীর ঠিকানা, একটা বিশাল বাড়ি, একটা মহান শিল্পের পরিচয়। ফ্রয়লাইন শ্রোয়ার বলেছিল—বার্লিনে নেমে একটা অন্ধকেও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, লে-কর্বুজিয়ে হাউসটা কোথায়, সে পথ বলে দেবে। আমাদের এই বাড়িটার কোন ঠিকানার প্রয়োজন হয় না। লে-কর্বুজিয়ে (Le Corbusier) নামটাই আজ সারা বিশ্বে একটা ঠিকানা হয়ে গেছে। আমি অবাক দৃষ্টিতে এই বাইশ বছরের জার্মান মেয়েটির একজোড়া শিল্পমুগ্ধ নীল চোখের দিকে তাকালাম। ওপরে গ্রীষ্মের ঝকঝকে নীলাকাশ, সাদাসাদা মেঘের ব্যালকনি; বাতাসে উড়ছে সবুজ পাতা আর সোনালী চুল, সামনে সুবিস্তীর্ণ নির্জন [illegible] পাহাড়ের মত উঁচু বনভূমিতে ধ্যানগম্ভীর বিশাল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে লে-কর্বুজিয়ে হাউস। এক মহান শিল্পীর তপস্যাকঠিন মৌন স্বাক্ষর। "একটা সবুজের সমুদ্র...... দৃঢ়তা, সুঠাম নিশ্চলতা, নির্জনতা, বিস্তীর্ণতা, আকাশ, আলো, [illegible]"— [illegible]

যুদ্ধবিধ্বস্ত কবর নগরী বার্লিনের হানসা কোয়ার্টারের বীভৎস দৃশ্য
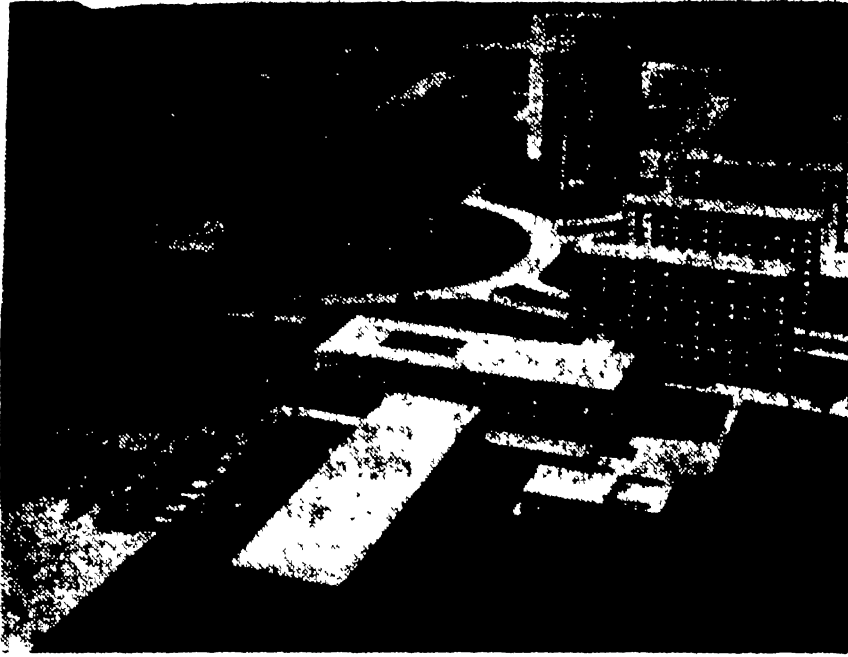
গ্রীষ্মের যে-কোনো দুপুরে বা সন্ধ্যায় এই আর্নস্ট-রয়টার-প্লাৎস-এর মাঝখানে মুক্তাধারী ফোয়ারার পাশে এসে বস লে মনে হবে কোনো স্বপ্নরাজ্যে এসেছি

কল্পনার বর্ণনা দিচ্ছেন লে-কর্বুজিয়ে। কথাগুলি যেন বিচিত্র প্রস্তর খণ্ড হয়ে গেঁথে গেছে জার্মানীর সমকালীন স্থাপত্য শিল্প-দর্শনের দেহলীদিগন্তে। তাইত লে-কর্বুজিয়ে আজ সেই নাম, বর্তমান জার্মানীর কেবল একজন সাধারণ মানুষ নয়, একজন আর্কিটেক্টও তাঁর আদর্শ স্থপতি হিসাবে নামোচ্চারণ করেন। আর আমি ভাবছিলাম, প্যারিসের উপকণ্ঠে স্যাভয় ভিলার (১৯২৯-৩০) খ্যাতি দিয়ে যিনি এক মহান স্থপতি-জীবন শুরু করেছিলেন, সেই লে-কর্বুজিয়েকে আমরা পেয়েছি পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে। চণ্ডীগড়ের রূপ দিয়ে লে কর্বুজিয়ে ভারতবর্ষকে আজ বিশ্বের চোখে আরো অনেকখানি তুলে ধরেছেন। কত মানুষ চণ্ডীগড়ের কথা, তার গঠনশৈলী আর রূপের কথা জিজ্ঞাসা করে! ইউরোপের শিক্ষিতসমাজে চণ্ডীগড়ের আজ এক বিশেষ স্থান। এ দেশে সংস্কৃতির সব চাইতে জনপ্রিয় অংশ বোধ হয় স্থাপত্য—এই স্থাপত্য বিষয়ে এ দেশে অজস্র পত্র-পত্রিকা আর আলোচনার অন্ত নেই। তাই গড়ে উঠছে একটা জাতির স্থাপত্যশিল্পের রুচি। ওরা আলোচনা করে নানান দেশের স্থাপত্যশিল্প নিয়ে। এইসব পত্র-পত্রিকায় চণ্ডীগড় নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। চণ্ডীগড়ের পরিকল্পনা ও তার বিভিন্ন সরকারী ভবন-গুলির কথা ছেড়ে দিলেও, কেবল তার "মুক্তহস্তের স্মরণস্তম্ভ" নিয়ে ওরা কত আলোচনা করে। স্থাপত্যবিষয়ে ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজের অজ্ঞানতার অন্ত নেই। সব চাইতে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন আমাদের নিজেদের সম্পদ বিদেশে এসে জানতে হয়। স্থাপত্য সম্পর্কে আমাদের সমাজের একটা ক্ষমাহীন ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির দিকে তাকালে। এদেশের টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটি আর Hochschuleগুলিতে ছেলেমেয়েদের সবচাইতে ভিড় স্থাপত্য বিভাগে। গত বছর বার্লিনের টেক্‌নিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপত্য বিভাগে দরখাস্ত পড়ে ৮০০। ভর্তি করা হয় মাত্র ২৫০ জনকে। যদিও এই বিভাগেই সব চাইতে বেশী আসন, তবু কেবল এই একটি বিভাগ থেকে ছেলেমেয়েদের বিফল মনোরথে ফিরে যেতে হয়। আজ জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা গ্রীক আর তুর্কী ছাত্রদের পরেই—প্রচুর। সেখানে ভারতীয় ছাত্রদের আর সব বিভাগে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়, যায় না কেবল স্থাপত্য বিভাগে। অথচ এদেশের স্থাপত্যবিদ্যার অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মুখেই শোনা যায় "তোমাদের ভারতবর্ষে স্থাপত্যশিল্পের কী বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। তোমাদের নিজস্ব গঠন-শৈলীর সাথে আমাদের পাশ্চাত্য ধারাকে মিশিয়ে দিয়ে তোমরা তো আবার এক নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করতে পার। যেমন দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল আজ এক নতুন স্থাপত্য-সভ্যতা গড়ে তুলছে।" আমার ওপরের ঘরে থাকে ওর্থা স্লাথ্। দুদিন বাদে স্থাপত্য-শিল্প পরীক্ষা দেবে। ওর ভাবী স্বামী আমার এক বাঙালী বন্ধু। ওর আদর্শ স্থপতি হচ্ছে আলভার আলতো। ফিনল্যান্ড থেকে গত বছর ঘুরে এসে বলছিল— "ফিনদের জীবনে আলভার আলতো যে কী, ওদেশে না গেলে জানতে পারতাম না। আলতোকে নিয়ে ফিনদের গর্বের অন্ত নেই।" আর ওর্থার স্বপ্ন ভারতবর্ষ। ভারতের ডকুমেন্টারী ফিল্ম দেখতে দেখতে ও কল্পনা করতে থাকে, কোথায় কোন্ শহরে, কোন্ পাহাড়ে, কোন্ সমুদ্রোপকূলে কি ধরনের ভিলা আর ভবন তৈরি করা যায়। অথচ অবাক হয়ে যাই, ওর নারীসুলভ গিন্নীপনা দেখলে। কি খেলায়, না খেলায় সে খবর রেখে। রান্না করে ডেকে দিয়ে দিয়ে খাওয়াবে; সাহেব জামাই কখন খোয়াব [illegible] হয়েছে—সেটা ডেকে দিয়ে দিয়ে [illegible] ধরে দিয়ে [illegible]

লে কর্বুজিয়েরের নির্মিত ১৭ তলা বাড়ি। ৫০০টি ফ্ল্যাট, [illegible] পাওয়ার স্টেশন, [illegible], পোস্ট অফিস আছে। স্থাপত্য শিল্প [illegible] কর্বু-[illegible]

তখন ওর চোখে মুখে নেচে বেড়াবে এক অব্যক্ত অভিব্যক্তি। একটু প্রশংসা করে ফেললেই লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যাবে। আমি এদের যত দেখি, তত অবাক হই। চোখে যার পৃথিবীর বিশাল বিশাল প্রাসাদের স্বপ্ন, ছাত্র জীবনের Practical Training-এর সময়ে পাঁচ সাত তলার ওপর দাঁড়িয়ে জীবনের ভয়কে দূরে সরিয়ে দিয়ে যে সাধারণ রাজমিস্ত্রীদের সাথে চুন বালি ঘাটে, সে মেয়ের ভেতরেও রয়েছে নারীর সেই চিরন্তন মন। হয়ত বাইরের কঠোর জীবনের এত মুখোমুখি বলেই ওদের ভেতরের সত্তা এত কোমল নারিকেলের মিষ্টি জলের মত।

জার্মানীর সমকালীন স্থাপত্য শিল্পান্দোলনের ঐতিহ্য আজ বিশ্ববাসীর কাছে অজানা নয় সেই বিরাট ইতিহাস আলোচনা করবার মত স্থান এখানে নেই। তবে ত্রিবিংশের যুগে আর সব শিল্পী-সাহিত্যিকদের মত জার্মানীর সমকালীন স্থাপত্যশিল্পের পিতা অধ্যাপক ওয়ালটার গ্রোপিয়ুস মিস ফান ডেয়ার রোয়েব মত স্থপতিবৃন্দও দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়ে যায় জার্মানীর ‘ইউগেণ্ডষ্টিল’ এর আন্দোলন লুপ্ত হ'ল গ্রোপিয়ুসের বাউহাউসের পরিকল্পনা উচ্ছেদিত হল ‘চার্টার অফ এথেন্সের’ মূল নীতিগুলি। বরবর্তী হিটলারী পরিকল্পনায় যে বাড়িগুলো তৈরী হল সেদিকে তাকালেই এক স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের অচলায়তন রূপ চোখে পড়ে। আজ
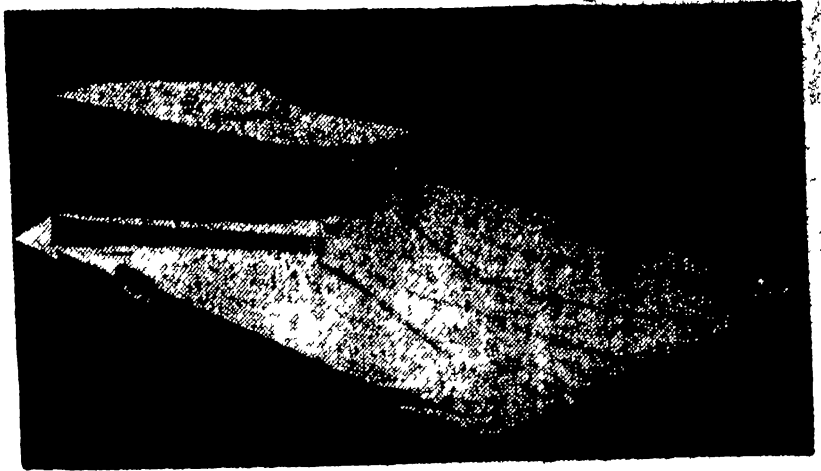
পশ্চিম জার্মানীর এস্সেন শহরে স্থপতি আলভা আওতোর পরিকল্পনায় নির্মিত অপেরা ভবন

আমেরিকা থেকে অধ্যাপক গ্রোপিয়ুস আবার নিজের দেশে নতুন নতুন নগর আর বাসভূমির পরিকল্পনার ডাকে বার্লিনে আসছেন—যে পরিকল্পনা কেবল ঘর বা বাসগৃহকে নয় জীবনকে, জীবনের মৌল প্রয়োজনগুলিকেও নতুন দর্শনে, নতুন আলোকে সঞ্জীবিত করে তোলে। একালের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘরের গঠন রূপ নিয়ে আলাপ-আলোচনায় তা সহজেই ধরা পড়ে. ওদের ঘরে ঢুকলে অনুভব করা যায়, একটা নতুন পরিবেশে প্রবেশ করেছি—যেটার আমাদের বড় করুণভাবে অভাব। জার্মান ছেলেমেয়েদের সহজ সুঠাম ছন্দে গৃহসজ্জা আমাকে প্রতি পদক্ষেপে মুগ্ধ করে। জীবনের শুরুতেই এদের এই শিক্ষা ও নেশা। বাড়ির গঠনশৈলী নিয়ে চিন্তা আজ এদের যেন সহজাত জীবনধর্ম। ঘর বা বাড়ি কেবল মাথা গোঁজবার নিরাপদ আশ্রয় নয়, একটা সৃষ্টিশীল চিন্তা, কল্পনা আর সেই সঙ্গে চারদেয়ালের সসীম ক্ষুদ্র পরিধিতে অসীম আত্মাকে বিস্তৃত করে দেওয়া—ঘর ত তারই জীবন্ত প্রতীক।

বার্লিনে আমার অন্তত কয়েক গণ্ডা বন্ধুস্থানীয় জার্মান ছেলেমেয়ে রয়েছে, যারা আগামীকালের স্থপতি। তাদের মধ্যে ডিটারের কথা না বললে, জার্মানীর
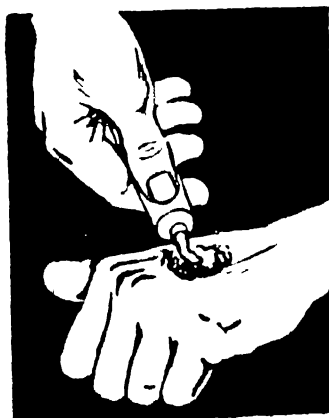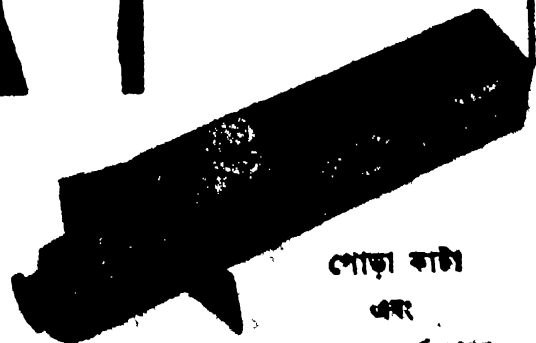
বার্লিনের টিয়ার গার্টেন-এর সবুজে অবস্থিত কংগ্রেস ভবন। মার্কিন স্থপতি স্টাবিন দুজন জার্মান স্থপতির সহায়তায় এর রূপ দান করেন

আগামীকালের স্থপতিরা হয়ত একটু অজানা থেকে যায়। ডিটার-এর বাবা একজন সর্বসম্পন্ন সার্জেন যশ আর অর্থের চরম চূড়ায়। ছেলেও ডাক্তারী পড়ে, এই হল তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ছেলের নেশা নাটক আর কবিতা লেখায়। ইতিমধ্যে ওর কয়েকটা নাটক ছাত্র মহলে অভিনীতও হয়ে গেছে। বৃত্তি হিসাবে ও আজ বেছে নিয়েছে স্থাপত্য। আমি যখন ওকে প্রশ্ন করি—"আচ্ছা, তুই ডাক্তারী পড়লি না কেন তোর বাবার যখন এমন পসার রয়েছে?" তখন ডিটার বলে—"শেষ রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে যায় কবিতার লাইন এসে গেলে স্বপ্ন দেখি বাড়ির বিচিত্র সব মডেলের নেশা ছবি আঁকার, ডাক্তারী পড়ে কি করবো বল? আমার মনে হয়, আমি ভুল করিনি। যে অনুভূতি রয়েছে আমার কবিতা লেখার জন্যে, তার চাইতে বেশী ছাড়া কম অনুভব করি না স্থাপত্যশিল্পের জন্যে।" সঙ্গে সঙ্গে ডিটার তার পরিকল্পনা পেশ করে—আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে ওর মোটর রোলারে ছোট্ট একটা তাঁবু আর কিছু বস্ত তুলি চাপিয়ে প্যারিস, রমা, রোম, আথেন্স-এ কিভাবে পাড়ি দেবে। এমনি অনুভব নিয়েই হয়ত আমাদের বহু পূর্বে হুগো আর বালজাকের মত মনীষীরা মানুষের ইতিহাসে স্থাপত্য শিল্পই যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি—এ কথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন।

তারই ব্যাপক আবেদন আজ অনুভব করা যায় বার্লিনের চারিদিকে তাকালে। জার্মানীতে এখন এমন শিক্ষিত পরিবারের সংখ্যা খুব কমই আছে, যাঁদের কোন ছেলে বা মেয়ে স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কিত কোন না [illegible]

সুলতানী ভাবু [illegible] পরিকল্পনায় নির্মিত ভবন বাড়ি
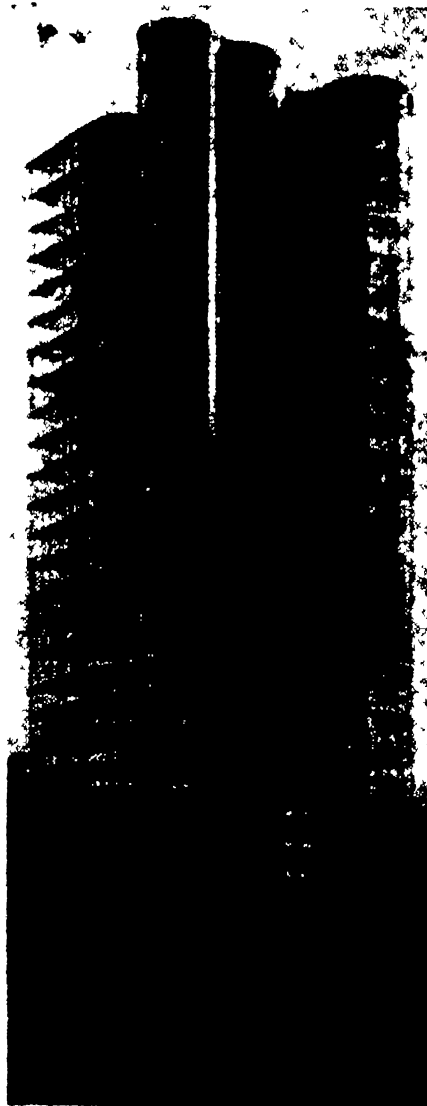
কোন কার্যে লিপ্ত। অন্তত স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কিত নানা সংগ্রহে। তাই হানসা ফিয়ারটেল-এর "ভুবন মনোমোহিনী" পরিবেশে দাঁড়িয়ে কোন ছুটির বিকেলে আমার সহকর্মিণী এরিকা গ্রোয়ারের মত মেয়েকে বলতে শুনেছিলাম—বার্লিনের সব চাইতে বিধ্বস্ত এই অঞ্চলে এক আন্তর্জাতিক স্থাপত্যশৈলী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী ১৪টি দেশের স্থপতিবৃন্দ ১৯৫৭ সালে কীভাবে দুদিনে এই স্বপ্ন-পুরী গড়ে তোলে, যা আজ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে দর্শনীয়। যদিও এত বিদেশী স্থপতি সমাবেশের বিরুদ্ধে এখানে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব জেগে উঠেছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ কথা, যখন ফ্রয়লাইন গ্রোয়ার জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে বলেছিল—"আমরা এই বিদেশী স্থপতিদের কাছে নানাভাবে ঋণী। এ'রা আমাদের ধ্বংসস্তূপে রোপণ করে গেছেন সমকালীন স্থাপত্যশিল্পের এক বিশ্বচেতনার বীজ, যা আমাদের আগামীকালের তরুণ স্থপতিদের মধ্যে মহীরুহ হয়ে দেখা দেবে।" আজ এরিকা গ্রোয়ার নেই, আমিও আমার সেই পুরনো ফিজিওলজি ইনস্টিটিউট ছেড়ে দিয়েছি, যেখানে ছুটির অবসরে ও'কে প্রায়ই

জিজ্ঞাসা করতে আনন্দ পেতাম— আচ্ছা, আপনি স্থাপত্য নিয়ে এত পড়াশুনা করতে ভালবাসেন যখন, তখন ত এ বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারতেন। জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন এ শিল্পকে''

না।"—ফ্রয়লাইন গ্রোয়ারের চোখে সেই গভীর রেখা, "স্থাপত্যশিল্প নিয়ে ভাবতে বা পড়াশুনা করতে সত্যি ভালবাসি, ছবিও আঁকি মনের খেয়ালে—তবু জানি না কেন, এই বিজ্ঞানক্ষেত্রে আপনাদের অ্যাসিস্টান্টিন হয়ে এলাম? বিশুদ্ধ বন্ধুর আমি বিশ্বাস করি সেটা খাঁটি, স্থায়ী। স্থাপত্যের সঙ্গেও যোগ হয় আমার সেই বন্ধুর।" আশ্চর্য এই মেয়ে এরিকা গ্রোয়ার। স্থাপত্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এ'র সম্বন্ধে এত কথা না লিখে পারছি না। জার্মানী বা বার্লিন সম্বন্ধে লিখতে গেলে, বারবার ও'র কথা এসে যাবে—যে আমাকে একটা জাতির গভীর আত্মার নন্দন কাননে ঢোকবার পথ দেখিয়ে দিয়েছে, নীরবে—যা এদেশের অতি অল্প সংখ্যক মানুষ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে। সার্থক ও'র এরিকা (বনফুল) নাম। এই মেয়েটিও সেই বনফুলের দলে। খুঁজে বের করলে যার স্নিগ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়। কাজ, জীবন, জীবনদর্শন—প্রত্যেকটির জন্যে এঁদের আলাদা সত্তা। কাকে কোথায় স্থাপন করতে হবে, কিভাবে রূপ দিতে হবে, এরা ছোটবেলা থেকেই Innerarchitektur-এর মত এই শিল্প-

বোধের চর্চা করে যায়। ইনস্টিটিউটে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচেই যে জীবদেহের শেষ পরিচয় নয়, জীবন আর আত্মার পরিচয় যে জড়িয়ে রয়েছে মাইকেল এঞ্জালো আর ফিডিয়াসে, অ্যাথেন্সের পার্থেননে, সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই ত, এদেশের উগ্র জীবনযাত্রার বাইরে প্রতি ছুটিতে অনেকের মত এরিকাও রোম, পম্পাই আর গ্রীসের প্রস্তর খণ্ডে খুঁজে বেড়ায় ঈশ্বরের শিলালিপি। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন জাগে, শেষ পর্যন্ত এদেশে আত্মার মুক্তি খুঁজে পায় কি এ'দের শিল্পীসত্তা?

এখানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থপতি আর চিত্র-শিল্পীদের প্রদর্শনী লেগেই আছে। সেদিন অধ্যাপক গ্রোপিয়ুস তাঁর প্রদর্শনীর উদ্বোধনে করুণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন—"আজ আমরা শিল্পীরা এই পৃথিবীতে বড় অসহায়। পৃথিবীটা চলে গেছে কিছু-সংখ্যক প্রচারকের হাতে।" আর বলেছিলেন, যুদ্ধ-পূর্বকালের জার্মানীর স্থাপত্য আন্দোলনের কথা। সেই বিরাট বক্তৃতার অংশ তুলে ধরার মত স্থান এখানে নেই। তবে Werkbund ও তার নতুন কৃতী স্থপতিদল তথায় প্রাচীন-নবীনের মধ্যে মতবাদের সংঘর্ষ, ১৯১৪ সালের কোলনের প্রদর্শনী, Peter Behrens, পরবর্তী-কালে তাঁর (Walter Gropius) একক স্থপতি সংঘ Fagus Works এর কাজ ১৯১৯ সালে Weimar এ তার Bauhans-এর প্রতিষ্ঠা (যেখানে জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী Paul Klee-র মত প্রতিভা পর্যন্ত যোগদান করেছিলেন) যা পরে ১৯২৬ সালে Dessau-তে স্থানান্তরিত হয়, প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলে ধরে অতি বৃদ্ধ অধ্যাপক গ্রোপিয়ুস বলছিলেন—"সেদিন আমরা আমাদের যুগের ধারা থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিলাম কেবল সাধারণ মানুষ নয় অনেক শিল্পীও আমাদের সাথে সমান তালে এগিয়ে আসতে পারেনি। আমাদের সেই Bauhans-এর পরিকল্পনা-গুলিই এতদিন পর আজ মানুষ গ্রহণ করছে। জাতির জীবনে নতুন স্থাপত্য চিন্তা আনতে গেলে চাই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু, যেই গুরু তার সারা-জীবনের সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্পন্দন করবার চেষ্টা করবে এক নতুন ভাবনা ধ্যান ধারণা আর আদর্শকে। তৈরি করে দিয়ে যাবে নতুন স্থপতিবৃন্দ।"

যুদ্ধোত্তরকালে জার্মান স্থপতিদের মধ্যে হানস্ শারোউন-এর নাম সর্বাধিক উচ্চারিত। তাঁরই রচিত উপরের মডেলটি পৃথিবীখ্যাত সংগীত সংস্থা বার্লিনার ফিলহার মোনিক ভবনের। আগামী অক্টোবরে সংস্কৃতি উৎসব সপ্তাহে এই ভবনের উদ্বোধন হবে

মানুষের পরমসত্তা কেবল দেহের প্রাচীরে বেঁধে রাখার বস্তু নয়, তাকে শিল্পময় ঘরের আত্মার সাথে মিশিয়ে দেবার চর্চা রয়েছে মানুষের সংস্কৃতিতে—নতুন আর্কিটেক্টের তৈরী আমার এই ঘর, আলভার আলতোর পরিকল্পিত আমার আসবাবে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিতে গিয়ে আজ বার বার একথা মনে হচ্ছে। এইখানে বসে আমি যখন আগামীকালের জার্মানীর স্থাপত্যশিল্পের কথা কল্পনা করি তখন অজান্তে মনের কোণে ভেসে ওঠে

কারো একজোড়া গভীর নীল চোখ, আর আমারই প্রতিদিনের আসা-যাওয়ার পথের ধারে দূরে অন্ধকার রাত্রে সবুজ বনের গভীরে লে-কর্বুজিয়ের হাউসটা, যেন আকাশ থেকে খসে পড়া এক বিশাল নক্ষত্র, হীরক খণ্ডের মত জ্বলজ্বল করতে থাকে কোন এক মহৎ স্পন্দনে, আর তখন লে-কর্বুজিয়ে জার্মান স্থপতিদের উদ্দেশ্যে Magnum-এ লিখছেন—"যৌবনের সে-ই কর্তব্য, যার সেই আর্তির মধ্য দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে বস্তুর যুক্তিকে, যাতে স্থপতিরা আপনা থেকেই তার ফলস্বরূপ সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। বিচ্ছুরিত আত্মার হাস্যদীপ্ত মনোমুগ্ধতার মধ্য দিয়েই আজকের স্থপতিরা আমাদের-কালের যন্ত্রসভ্যতাক্লিষ্ট মানব-জাতির জন্যে অপার আনন্দ বহন করে আনবে। কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ব্যবহারিক যুক্তিই সব নয়। আজ-কাল-পরশুর মানুষ নিশ্চয়ই এক নতুন আলোর রশ্মি বহন করে আনবে। শেষ হক স্থবির যুক্তির কাল।"

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

মনোজ বসু

উনপঞ্চাশ

উপরের ঘরে রানী খাটের উপর ধবধবে বিছানায় নিয়ে বসাল। বলে কন্দূরে থেকে কত কষ্ট করে এলে সাহেব-দা। খেয়েদেয়ে সারা বেলাটা গড়াও।

জানলাগুলো খুলে দিল। ছত্রাকার আমগাছ। সেই একফোঁটা অংকুর বড় হয়ে আজ আকাশ ঢেকেছে—দোতলার উপর বসে সেটা আরও ভাল বোঝা যায়। থোলো থোলো গুটির ভারে ডাল বুঝি ভেঙে পড়ে। আর ও-পাশের জানলায় একবার তাকিয়ে দেখ না। গঙ্গা। ভরা জোয়ার এখন গঙ্গায় কানায় কানায় জল।

রানী চোখ বড় বড় করে বলে তবু তো গুটি কত ঝরে পড়েছে। ছোঁড়াগুলো পাঁচিলের ওদিক থেকে ঢিল ছোঁড়ে, কখনো বা পাঁচিলে উঠে ডাল ঝাঁকায়। অন্যের কথা বলি কেন, আমিই কি কম? জানলার গায়ের এই ডালখানায় পাতা দেখবার যো ছিল না। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সব শেষ করেছি। নুন আর লংকা দিয়ে কাঁচাআম খেতে বড় মজা।

হাসে একটু রানী। হাসলে দুই গালের উপর ছোট্ট দুটি টোল পড়ে সুন্দর দেখায়। বলে, সেই সময় তোমার কথা বড্ড মনে হত সাহেব-দা। কোন্ দেশে কোথায় আছ—গাছে প্রথম ফল ধরল, তুমি দেখলে না। ভাবতাম পাকবার আগে যেন এসে পড়। হল তাই সত্যি সত্যি। আমি খাটিয়ে দেখেছি সাহেব-দা, খুব একমনে যদি কিছু চাও ঠিক তাই পেয়ে যাবে।

না—। ঝাঁকি দিয়ে সাহেব ঘাড় তুলে তাকাল রানীর দিকে। বলে তুমি পাও রানী তাই বলে সকলে নয়। মা তো চেয়েছিল আমায় কাছে কাছে রাখবে, বিয়ে দিয়ে সংসারী করবে ছেলে-বউ নিয়ে সংসারের গিন্নি হয়ে থাকবে। বিধাতার কাছে মাথা কুটে কুটে চেয়েছে—চিরকাল ধরে ঐ তার সাধ। কিন্তু কী পেয়ে গেল তার জীবনে?

গর্জন করে উঠল যেন অলক্ষ্য ক্রূর ভাগ্য-নিয়ন্তার উপর। চিড়িয়াখানার খাঁচার বাঘ যেমন গরাদের বাইরে থেকে উত্যক্তকারী নিরাপদ মানুষের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে। সর্বনাশ, রানীর এতক্ষণের এত সব বুর্কোন বৃথা? সুধামুখীর প্রসঙ্গ আবার না ওঠে, একথা-সেকথায় রানী ভুলিয়েভালিয়ে রাখছিল। ছোট শিশুকে নিয়ে মা যেমন করে। সাহেবকে যেন এখন অসহায় শিশুর বেশি ভাবতে পারছে না।

চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেব ঐশ্বর্য দেখছিল। লঘুকণ্ঠে এবার বলে, ঝকঝকে এমন কোঠাঘর খাটপালঙ্ক গয়না-গাটি একমনে চেয়েছিলে তুমি রানী ঠিক তাই পেয়ে গেছ। তাই বলে কি সকলে? তোমার এই বয়সে ক'টা দিনের মধ্যে কার এত ভাগ্য খোলে বলো। জন্ম থেকে মাট-কোঠার ঘরে—দেখেছি তোমাদের তো কম নয়।

ঘুরে এসে কথাটা তারই উপর পড়বে, রানী ভাবতে পারে নি। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। লজ্জা সে গায়ে মাখে না, জোরে জোরে ঘাড় দুলিয়ে সমস্ত মেনে নিল। বলে, বয়সের কথা কি বলো সাহেব-দা, ভাগ্য আমার কি আজ নতুন খুলেছে? কত-টুকু তখন—তুমিই মন্তোর শিখিয়ে দিলে, ইচ্ছা-বর পেয়ে গেলাম আমি। যেটা ইচ্ছে করব, তক্ষনি তাই পেয়ে যাই। মা-কালী জোগাচ্ছেন। চুলের ফিতে, কাঁটা, গন্ধতেল—জোগাতে জোগাতে দেবীর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ।

রানী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগে যায় সাহেবের ঠোঁটে। বলে, মা-কালীকে দিয়ে শেষটা পায়ের জুতো বইয়ে ছাড়লে—রানী, তুমি কম পাষণ্ডী!

রানী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: আচমকা তুমি-তুমি শুরু করলে কি জন্যে বলো তো? যেন আমি কেষ্টবিষ্টু মানুষ। আগের মতো তুইতোকারি করবে তো করো, নয় তো আমি চলে যাচ্ছি। কান জ্বালা করে।

রানীর মুখে চেয়ে একটু হেসে সাহেব আগের কথার জের ধরে বলে তোর গয়না চুরি করেছিলাম রানী পাইনে সেই আমার হাতে-খড়ি। তোর কানের ইহুদি-মাকড়ি।

বড়ো গয়না, দাম পনেরো টাকাও নয়। হলে হবে কি—ছোট্ট মানুষের সাধের জিনিসটা নিয়ে আমার উপর অভিশাপ লেগে গেল। চোর আমি সেইদিন থেকে।

চোর না আরো-কিছু! ভ্রুভঙ্গি করে রানী সাহেবের কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়। বলে, চুরি করলে বটে সাহেব-দা, কিন্তু চোর হতে পারো নি। হয়ে গেলে দেবতা। সত্য-যুগের মতন জাগ্রত দেবতা—চাইতে না চাইতে ভক্তের বাঞ্ছাপূরণ। এ কালের মতন কানা-দেবতা কালা-দেবতা নয়।

সাহেব বলে, জাগ্রত দেবতা কী নাকালটাই হলেন জুতো চুরি করতে গিয়ে। প্রাণ যাবার দাখিল। তোর আবদার কুলোতে গিয়ে কী করেছি আর না করেছি রানী। কারো কাছে সে-সব বলবার কথা নয়, ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা করে।

মুচকি মুচকি হাসে রানী। দেমাক করে বলে, বোকা [illegible]। বছরে-বছরে এরাই সব নতুন মেয়ে, তারা [illegible]। [illegible], নাতিকনাতনীকে সাথে দাঁড় দিয়ে যোগাও, তাজ্জব কাণ্ডকারখানা তোমার। মনে মনে হাসি আমি—ওরাই নতুন দেখছে, আমার কাছে নতুন-কিছু নয়। খাটপালঙ্ক কোঠাবাড়ি গয়না-গাঁটির খোঁটা দিলে, কিন্তু সেই একফোঁটা বয়সে তুমিই তো অভ্যাস ধরিয়ে দিয়েছ সাহেব-দা। যা-কিছু চেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে।
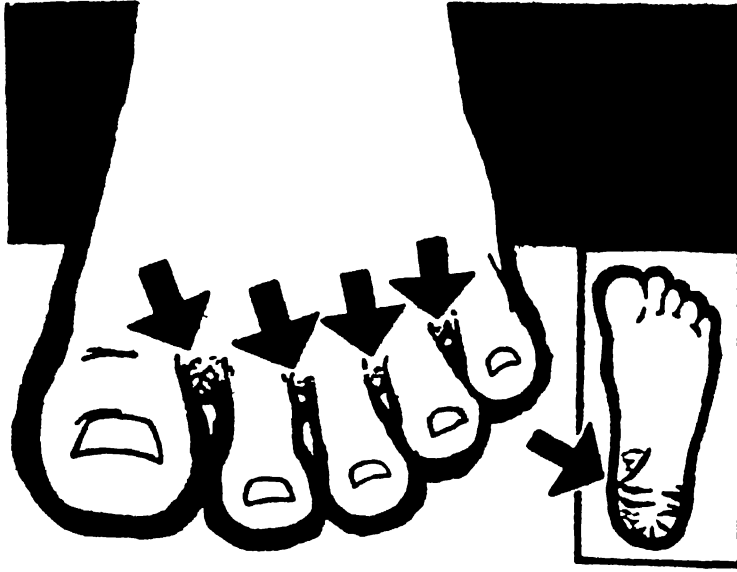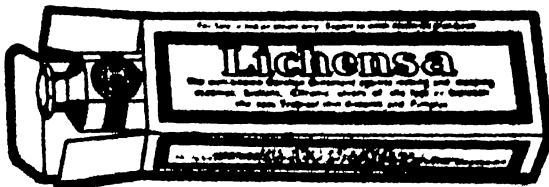
সমস্তটা দিন সাহেব পড়ে আছে। কত-কাল পরে আরামের একটু নিশ্চিন্ত বিছানা পেল। নিচে পারুলের ঘরে রানী। পা টিপে টিপে এসেছে দু-একবার, দরকার সেরে তক্ষুনি আবার চলে গেছে। সাহেবকে ডাকে নি। বিভোর হয়ে সে ঘুমুচ্ছে, দেখলে কষ্ট হয়। আহা ঘুমাক।

সন্ধ্যার পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে কে যেন চাপা গলায় রানী রানী করে ডাকছে। ডাকছে বাইরে থেকে, মানুষটা ঘরে আসে নি। সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। কখন আলো দিয়ে গেছে ঘরে, জোর কমানো। তাই তো, কাজকর্মের সময় ওদের। তাড়া-তাড়ি জামা গায়ে চড়াচ্ছে, কোন এক দিকে বেরিয়ে পড়বে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। এই বাড়ি ছিল, শিশুকাল থেকে এই তো বরাবর করে এসেছে। অভ্যাস আছে।

রানী রানী করছে—নিচের ঘর থেকে ছুটে এসে রানী লোকটাকে ধরল। বিরক্ত স্বরে বলে, ভাই এসেছে আমার—বলে দিলাম তো। মায়ের এক বোনের ছেলে। সংসারধর্ম থাকতে নেই বুঝি আমাদের, মানুষ নই আমি? আজকের দিনটা ছাড়ো।

লোকটা এর পর কি বলল, শোনা যায় না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। অনতিপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে রানী ঘরে উঁকি দেয়। সাহেব বেরিয়ে যায় তো দু-হাতে দুই পাল্লা ধরে পথ আটকে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ সুরে সাহেব বলে, রাত হয়ে গেছে, টের পাই নি। রোজগারপত্তর আজ তোর চুলোয় গেল। সরে যা, পথ ছাড়।

রীতিমতো লড়াইয়ের ভঙ্গি মেয়েটার। বলে, এক পা নেমেছ তো মাথা খুঁড়ে মরব আমি। সিঁড়ির উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। জানো, তা আমি পারি। গলায় দড়ি দিয়েছিলাম শোন নি, দরকার হলে আবার তেমনি পারব। সেবারে হেরে এসেছি বলে বারবার হারব না। দয়া হবে কিন্তু যমরাজের।

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। সুখাদ্যেখীর পরেও আবার তবে পথ আটকানোর মানুষ! রানীর রাগ দেখে হাসে মিটমিট। বলে, জামা-জুতো পরে মাথায় টেড়ি কেটে তৈরি হয়েছি যে! জামা খুলব না, টেড়িও ভাঙব না। একটা রাত ভোর তো

গেছে—চল্ তা হলে দু-জনে যাই। মা-কালী দর্শন করে আসি। কালীঘাট এসে সকলের আগে মা-কালী দর্শনের কথা। আমাদের লাইনের তাই নিয়ম, না করলে দোষঘাট হয়। আমি তা মানি নি—মা-কালীর আগে মা দর্শন করতে এসেছিলাম।

আমি যাব, রোসো একটুখানি—রানী ঝলকিত হয়ে উঠল। বলে, মায়ের আরতি কতদিন দেখিনি সাহেব-দা। নর্দমার পাঁকে ডুবে থাকি সে সময়টা, মন্দিরে যাই কেমন করে? আজকে যখন ছুটি করে দিলে তুমিই সঙ্গে করে নেবে।

নিচের ঘরে সাহেব গিয়ে বসল। পারুল শতকণ্ঠে মলয়কুমারের ঐশ্বর্য ও দরাজ মেজাজের কথা বলছে। মলয়কুমার অর্থাৎ ঝিঙে। এমনি সময় রানী নেমে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কী সাজ সেজেছে মরি মরি! পলক পড়ে না চোখে। সাহেব বলে, শুধু রানী ডাকলে মানাবে না রে! মহারানী—রাজরাজেশ্বরী। কত সুন্দর হয়েছিস তুই, কী জৌলুস! সাজগোজ করে এলি—রূপ তাই বেশি করে মালুম হচ্ছে।

উঠান পার হয়ে গলিতে পড়েছে তখন। রানীর মুখে ছলাৎ করে রক্ত নেমে এলো। মুখ-ভরা হাসি নিয়ে বলে, পা চালিয়ে চলো সাহেব-দা, কুচ্ছো করতে হবে না ইনিয়ে-বিনিয়ে।

সাহেব বলে, তোর গোলাপফুলের মুখ রাঙা হয়ে একেবারে রক্তজবা হয়ে উঠল যে। সত্যি রানী, অপরূপ হয়েছিস তুই। ডিগডিগ করে বেড়াতিস, তখন কি জানি একদিন এমনি হয়ে উঠবি!

রানী এবার ঝগড়া করে: বড্ড হয় রাগে—তোমার মুখেও এই সমস্ত শুনে। নিত্যি-দিন কত জনাই বলে থাকে। তুমি কেন তাদের দলে হবে সাহেব-দা? তুমি বলছ—তখন মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হোক, ঢুকে পড়ি তার মধ্যে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে বড্ড ভিড়। সেই একবয়সে কত ঘোরাঘুরি করত এইসব জায়গায়। ভিড় ঠেলে চলেছে। লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে রানী বলে, কি ভাবছে ওরা সব বলো তো?

নিরীহভাবে সাহেব বলে, ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি—আবার কি!

রানী খিলখিল করে হাসে: কী বোকা তুমি সাহেব-দা! আমি বুঝি তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তোমার আমার কী সম্পর্ক ভাবছে ওরা বলো—

ভাবছে, চাকর সঙ্গে নিয়ে কোন মহারানী যাচ্ছেন। মা-কালী দর্শনের পর দোকানে কেনাকাটা হবে, চাকরে বয়ে নিয়ে আসবে।

যাও—। রাগ করে রানী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অন্যায়টা কি বলেছি। তোর ঝলমলে

সাজগোজ গা-ভবা গয়না, তাব পাশে আমার এই আধ-ময়লা ছেঁড়া কামিজ তালি-দেওয়া জুতো—লোকে অন্য কি ভাবতে পারে?

রানী বলে, যে রূপে নিয়ে এসেছ সাহেব-দা, [illegible] যে [illegible] যায় তোমার গায়ে [illegible]। [illegible] বঞ্চিত করেছে, নিজের হাতে তাই পূরণ করি। তোমার চাকর ভাববে, হায় আমার কপাল!

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বলে, ওরা যা ভাবছে, তাই তো সত্যি সত্যি হবার কথা ছিল। নজর করেছ বোধহয়—ভিড় কাটাতে কতবার আমি তোমার গায়ের উপর পড়লাম। দেখিয়ে দেখিয়ে—ইচ্ছে করেই। মানুষে কাছাকাছি হলেই তোমার দিকে এলিয়ে পড়েছি। যা হতে পারল না, কোনদিন আর হবে না, একটুখানি আমি সেই সাধ মিটিয়ে নিলাম। দেখুক লোকে—গৃহস্থঘরের আর দশটা ছেলে-বউর মতো আমরাও যেন একজোড়া। আমার এই হ্যাংলাপনায় রাগ করো না সাহেব-দা। পথের পাশে ঐ যত কাঙালি দেখছ, ছেঁড়া ন্যাকড়া সামনে বিছিয়ে বসে আছে—আমি ওদেরই একটি।

দু-হাতে মুখ ঢাকল রানী। বলে ফেলে লজ্জা হল? কিম্বা বুঝি জল এসে গেছে চোখে। এত দুঃখকষ্ট দিয়েও বিধাতার যেন তৃপ্তি নেই, জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে দুঃখ আরও শাণিত করে দেন।

মন্দিরের আরতি দেখে তারপরেও এক-জুটি হয়ে বেড়াচ্ছে দু-জনা। ফিরতে মন নেই, ঘরসংসার-পালানো একজোড়া ছেলে-মেয়ে। ঘুরে ঘুরে তারপরে পাড়ার ঘাটের চাতালে এসে বসল। নির্জন, আবছা অন্ধকার।

সাহেব বলে, মনে পড়ে রানী, এই [illegible] নৌকো [illegible] এসে বসতিস। [illegible] মাঝিমাল্লার মধ্যে। কপালে ছিল তারপরে সেই দেশেই গিয়ে পড়তে হল।

রানী কি ভাবছিল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, সেই সেই এসেছ সাহেব-দা, আগে কেন এলে না?

সাহেব বলে, সেই তো দুঃখ আমার ভাই। দুনিয়ায় লক্ষকোটি মানুষ, কিন্তু ভাল-বাসার মানুষ একটি-দুটি। দুটো হপ্তা আগেও যদি আসতাম। মা চলে যাবার আগে।

রানী বলে, তারও আগে সাহেব-দা, আমি মরে যাবার আগে।

হেঁয়ালির মতন লাগে। রানীই আবার বলছে, শাড়ি গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েছিলাম। গিঁঠ খুলে গেল, তবু আমার বাঁচা হল না। ঘরে গিয়ে পেত্নী-শাকচুন্নি হয়ে বেড়াই। যে রানী তখন দেখতে, সে আর নেই। আজকে সব বলি সাহেব-দা, অনেক কেঁদেছি তোমার জন্যে। অনেক করে ডেকেছি। একমনে ডাকলে নাকি পাওয়া যায়—ছাই ছাই' সেই মিথ্যে আমি আবার নিজের মুখে বললাম' মিথ্যের পেশা নিয়েছি কিনা, মিথ্যে বলে যেতে বাধে না।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, তুমি যদি থাকতে সাহেব দা, একচোট ঝগড়া করা যেত সুধা-মাসিমার সঙ্গে। কনে খুঁজে খুঁজে হয়রান, সকলকে বলছেন ভাল মেয়ের জন্য। আর একটা যে মেয়ে একই বাড়িতে পায়ে পায়ে ঘুরছে, তার দিকে চোখ পড়তে না। পিসিমাদের দিকে অন্ধকার। কেন তা-ও জানি। এমন মেয়ে চাই কুলেশীলে রূপে-গুণে কোন বিচারে যায় খুঁত বেরুবে না। কিন্তু ছেলেটাই বা কি—জাতে বুঝি সে নৈকষ্যকুলীন, পেশায় বুঝি টুলোপণ্ডিত?

কণ্ঠস্বরে রীতিমত উত্তাপ। সাহেব সায় দিয়ে বলে, ঠিকই তো! কিন্তু ঝগড়াটা আমার জন্যে আটকে রইল কেন? করলেই তো হত।

গালে হাত দিয়ে রানী বলে, ওমা, নিজের বিয়ের কথা মেয়ে বুঝি বলতে পারে! বলতাম তোমার দিয়ে। আমাদের ছোট্ট-বেলায় বর-বউ বলে কি জন্য ওরা ক্ষেপাত! তোমায় দলে পেলে দাবি ঠিক আদায় করে ছাড়তাম। তা হলে আমি কি মরতাম সাহেব-দা, না সুধা-মাসিমার অমনধারা বেঘোরে প্রাণ যেত? ছেলে, ছেলের বউ আর সংসার নিয়েই মজে থাকতেন জলসায় নাম করে খুনেরা তাঁকে ফাঁসে নিয়ে ফেলতে পারত না।

সাহেব স্তব্ধ হয়ে শুনল। তার পরেও কী ভাবে একটুখানি। বলে উঠল দু-জনে কি সংসার হয় না রানী। কপালে নেই—মায়ের চোখে দেখা হবে না। আমরাই গিয়ে ঘর বাঁধিগে।
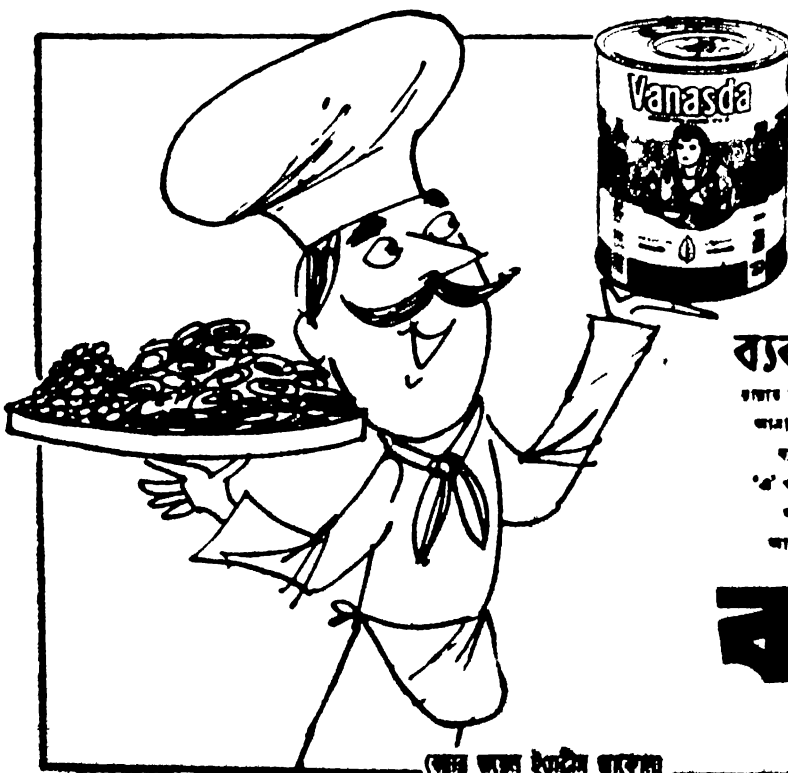
ছিঃ! রানী ঘাড় নাড়ল : হয় না সাহেব-দা। বোলো না ও-কথা, শুনলেও পাপ। কাকে-চিলে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে, সে জিনিসে দেবতার নৈবেদ্য হয় না।

সাহেব বলে, কে বলে দেবতা? মিথ্যে কথা। মিথ্যে বদনাম দিচ্ছিনে রানী, মানা করছি।

চোখের জলের মধ্যে হেসে রানী বলে, দেবতা তুমি আজ হয়েছ! আমার ছেলে-বয়সের সেই বিধাতাপুরুষ তুমি। চোখ পাকিয়ে যতই হুংকার দাও, সে আসন কেড়ে নেবার ক্ষমতা নেই তোমার।

অধীর কণ্ঠে সাহেব বলে, দেবতা আমি নই, চোর। লোকে ঘেন্না করে, পুলিশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। চোরের সেরা চোর—একালের চোর-চক্রবর্তী।

রানী বলে, আমি মানি নে—

চোর-চক্রবর্তী রাজার পালঙ্ক থেকে রাজরানী চুরি করে নিয়েছিল। ঝিঙের খাট থেকে তোকেও চুরি করব। মানিস কি না দেখা যাবে তখন।

করবে? করো না তাই সাহেব-দা—

কৌতূহলে মেতে উঠল রানী সেইসব দিনের ছেলেমানুষ রানীর মতন। মেকি ইহুদি মার্কেট নয় পাথর বসানো দামি ইয়ারিং দুটো ঘরের ক্ষীণ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ঝলমলিয়ে ওঠে। বলতে হল চোর-চক্রবর্তীর গল্প ঘুমন্ত রাজরানীকে চুরি করে নিয়ে চিড়িয়াটির ঘরে শুইয়ে দেওয়া। ছোট্ট খুকীর মতো রানী হাততালি দিয়ে ওঠে : পারো যদি ক্ষমতা বুঝব তোমার সাহেব-দা। চোর বলো যা বলো ঘাড় হেঁট করে তখন মেনে নেবো। করো দিকি তাই। কালীমন্দিরের পিছনে বটতলায় কুটে বুড়ি একটা বসে থাকে তাকে এনে শুইয়ে দেবে ঝিঙের পাশে। সকালবেলা ঝিঙে দেখে আঁতকে উঠবে।

সাহেব হেসে বলে, কুটে বুড়ি না হয় রইল কিন্তু তোমায় কোথা যেতে হবে ভাবতে পারো? এই শহর দেওয়ালে সাজানো কোঠাঘর গদির পালঙ্ক থেকে চোর চক্রবর্তী নিয়ে চলল কত গাঙ-খাল গাঁ গ্রাম বিল মাঠ পার হয়ে ভাটির দেশে—জঙ্গলের পাশে ছোট্ট কুঁড়েঘর বাঁধল। কুমির রোদ পোহায় চরের উপর সন্ধ্যার পর বাঘে হামলা দেয় চোত-বোশেখের ঝড়বাতাস যখন তখন ঘরের খুঁটি ধরে ঝাঁকায়। জলের সমুদ্দুর চারিদিকে, সে জলের এক ফোঁটা মুখে দেবার উপায় নেই। কলসিতে চাল থেকেও হয়তো বা রান্না হল না মিঠাজলের অভাবে।

রানী আকুল হয়ে বলে, অমন করে লোভ দেখিও না সাহেব-দা। আমি পাগল হয়ে যাবো।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, সেও কি বলিস রে! আমি তো ভয় দেখাচ্ছি। ভয় পাস না, কী দুঃসাহসী মেয়ে তুই!

জবাবে রানী একটি কথাও না বলে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল। অন্ধকারে যেন চাপা কান্নার আওয়াজ।

রানীর পিঠের উপর হাতখানা রেখে সাহেব মৃদু স্বরে ডাকল : রানী—

সাড়া মেলে না।

কী আমি বললাম তোকে? এই হাসিস, এই কাঁদিস, হয়েছে কি তোর শুনি?

মুখ তুলে রানী যেন হাহাকার করে উঠল : ভাড়াটে-ঘরের মেয়েগুলো হিংসা করে—কিন্তু কী আমি পেলাম, বলো তো সাহেব-দা। খাট আর কোঠাঘর আর গয়না-গাঁটি আর আস্তাকুড়ের ময়লা আর উনুনের ছাই? এই নিয়ে তুমিও আমায় খোঁটা দিলে। কিন্তু একটা ভিখারী মেয়ের যা আছে, তা-ও যে আমার নেই। আমার বয়সের কত মেয়ে মন্দিরে দেখলে। শাশুড়ি-ননদ জা-জাউলিরা সঙ্গে করে এনেছে। কিম্বা বরকে নিয়ে একলা চলে এসেছে, কোলে হয়তো দুধের বাচ্চাটা। চোখের সামনে ফরফর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—আমি কখনো ওদের একজন হতে পারব না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রানী। পাড়ার [illegible] একটাও মানুষ নেই—রানী [illegible] হঠাৎ সাহেবের কি [illegible] জঙ্গলপুরের যুবতী নারীর [illegible] নিয়ে এসেছিল, তাই বুঝি দপ করে [illegible]-মনে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে। গভীর আলিঙ্গনে রানীকে সে বুকের মধ্যে তুলে ধরল।

রানী বোধকরি আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ক্ষণেকের জন্যে। সম্বিত পেয়ে নড়েচড়ে ওঠে : ছি সাহেব-দা, তুমি এই?

ভর্ৎসনা সাহেব গায়ে মাখে না। অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, দেবতা বানাচ্ছিনে আমায়, খবরদার! আমি মানুষ।

ততক্ষণে ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আলিঙ্গন-

হয়ে রানী উঠে পড়েছে। কাঁপছে সর্বদেহ থরথর করে ঃ ছি-ছি!

উদ্যতফণা সাপের মতন সাহেব গর্জায় ঃ কেন, তোমায় তো পয়সা ফেললে কেনা যায়। যে না সে-ই কেনে। ঝিণ্ডে কিনেছে, আমি কিনতে পারিনে? কত টাকা দাম তোমার?

সাহেব যেন পাগল হয়ে গেছে। পকেটে টাকাপয়সা নোট যা ছিল, মুঠো করে ছুঁড়ে দেয়। বাঁধানো চাতালে ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, কত? দাম কত তোমার শুনি?

রানী কেঁদে সাহেবের পায়ের উপর পড়ল। বলে, রাগ কোরো না সাহেব-দা। তুমি যে আপন আমার, পথের খদ্দেরে যা করে আপন লোকে কেন তা করবে?

ঢিবঢিব করে মাথা খোটে। মুখ তুলল, দু-গালে মেয়ের ধারা নেমেছে। রাগ গিয়ে সাহেবের অনুতাপ আসে। আর লজ্জা। চুপচাপ রইল খানিকক্ষণ। বলতে হয়, তাই কৈন অবশেষে বলে, কে আমি তোর রানী, কিসে আপন হলাম?

শুনতে চাও? বর—ছোটবেলায় যা সবাই বলত। তুমি বর, কলঙ্কিনী বউ আমি তোমার। আমায় ঘেন্না করো। ঝাঁটা মারো তো পিঠ পেতে দেবো, আদর আমি কেমন করে সইব?

ঢং ঢং করে ওপারের জেলখানার পেটা-ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজে। বেজেই চলেছে—বোধকরি বারোটা। উঠে দাঁড়িয়ে রানী সাহেবের হাত ধরল ঃ চলো, বাড়ি যাই। যা তোমার হকের দাবি, চোরের মতন তাই চুরি করে নেবে খদ্দের হয়ে পয়সা দিয়ে কিনবে, এ আমার সহ্য হয় না সাহেব-দা।

বাড়িতে পারুলের ঘরে ছোটখাট এক কুরুক্ষেত্র। উঠানে পা দিতেই বীররস কানে এসে গেল। রানী ফিসফিস করে বলে, ঝিণ্ডে এসে পড়েছে। তুমি এসেছ, টের পেয়ে গেছে কেমন করে। অনেক করে ছুটি চেয়ে নিয়েছিলাম, সে ছুটি বাতিল।

পায়ের শব্দ পেয়েই ঝিণ্ডে দ্রুত বেরিয়ে এলো। কটমট করে একনজর সাহেবের দিকে চেয়ে রানীর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলল। একবার রানী তাকিয়েছে বুঝি নিচের দিকে—হেঁচকা টানে ঘরের মধ্যে নিয়ে দড়াম করে দরজা এঁটে দিল। সাহেবের শৈশবের পরমবন্ধু ঝিণ্ডে, এত দিনের পরে দেখা—যা-কিছু মোলাকাত একবার ঐ চোখের দৃষ্টি হেনেই সারা করে গেল।

পারুল সজল চোখে ডাকে ঃ ঘরে আয় বাবা সাহেব। আমাদের খোয়ারটা দেখলি? মলয়কুমার ক্ষেপে গেছে। মলয়কুমার না কচুপোড়া—সেই ঝিণ্ডে শয়তানটা। বাপের টাকা পেয়ে কপালের নিচে ঠিক শিং গজিয়েছে কথায় কথায় গুঁতো মারতে আসে। সন্ধ্যাবেলা রানী বলেকয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সন্দ করে আবার এসেছে। হেনস্থা আছে আজ আমার রানীর কপালে।

সাহেব বলে ঃ দু চার কথা আমারও কানে গেছে. তোমাদের যেন গরু-ছাগলের মতো পুষেছে। ঘাড় ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল। কিন্তু দেখলাম, বড্ড আপন মানুষ তোমাদের। বিস্তর কষ্টে নিজেকে সামলেছি।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল ঃ এক-দলের মানুষ ছিলাম দেখাসাক্ষাৎ না করে কি ছাড়ব? বেরুবে তো সকালবেলা—তোমাদের বাড়িতে কিছু নয় পিছন পিছন গিয়ে পথের উপরে ধরে জিভখানা একটানে উপড়ে নেবো। নিয়ে বরঞ্চ সেই জিভ দেখিয়ে যাব তোমাদের।

শিউরে উঠে পারুল না না—করে উঠল। লাঞ্ছনার জ্বালা নিভে গিয়ে এখন ভয়। বলে, না রে সাহেব ঝগড়াঝাঁটি করতে যাস নে। দেখা করেও কাজ নেই ওর সঙ্গে।

সাহেব বলে, ভয় কিসের মাসি? দুনিয়ার উপর কি আছে আমার শুনি, কে ই বা আছে? যাদের কিছু নেই তাদের ভয়ও নেই। আমার সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ক্ষতি তোর নয় বাবা রানীর। বাড়িটা করে দিয়েছে। দলিল লেখাপড়া হয়েছে—এখনো সই হয় নি, রেজেস্টি করে দেয় নি। পড়শি তো কখনো অন্যের ভাল দেখতে পারে না—সকলে কান ভাঙানি দিচ্ছে। এই যে তোর সঙ্গে একটু বেরিয়েছিল—ঠিক কেউ খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, নয়তো টের পাবে কেমন করে?

খেতে দিয়েছে সাহেবকে। তার মধ্যে পারুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ঃ থাকবি দিন-কতক, না যে-দেশে ছিলি সেখানেই ফিরে যাবি?

সাহেব তো পা বাড়িয়েই আছে—যত তাড়াতাড়ি পোড়ায় সেই অপেক্ষা। মুখে উল্টো কথা শুনে মজা করে। ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ মাসি, এমন শহর-জায়গা ছেড়ে

ভোগরাজ্যে কে মরতে যায়! কাঁধে শনি চেপে আমায় তাড়িয়ে বের করেছিল। ভোগান্তি অনেক হয়েছে, আর নয়।

যেমনটা ভেবেছে ঠিক তাই। পারুলের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। মুখে তবু হাসির ভাব করে বলে, নিজের জায়গা তোর। এসে পড়েছিস তো থাক্‌ যে ক'টা দিন ভালো লাগে। আমি বলি, দিদিই যখন নেই বস্তিতে কেন পড়ে থাকতে যাবি? জায়গার এমন মহিমা, সাধু-পরমহংসে থাকলেও বদমায়েস বলে নাম পড়ে যায়। ভালো পাড়ায় কত ঘরবাড়ি রয়েছে, বড়রাস্তার উপর ভালো ভালো সব হোটেল—

সাহেব নিরুত্তরে খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে ভালমানুষের ভাবে বলে, তোমার চাবির থোলোটা একবার দাও মাসি—

কেন রে?

আমাদের ঘরটায় তালা দিয়ে গেছে, কোন চাবি যদি খেটে যায়। নয় তো তালাই ভাঙব। ঘর যখন রয়েছে, হোটেল খুঁজতে যাই কেন?

পারুল মরমে মরে যায়: আমি কি তাই বললাম রে, এই বুঝলি শেষটা? তালা খুলতে হয় যা করতে হয়, এক্ষুনি তার কি? ঐ দেখ্‌, রানী মাদুর-বালিশ পেতে রেখে গেছে তোকে উপরের ঘরে দিয়ে এইখানে আমার ঘরে সে শুত। ঝিঙে এসে পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল।

গভীর নিশ্বাস ফেলে পারুল বলে এই-টুকু বাচ্চা থেকে এত বড়টা হলি চোখের উপর। কপালে হল না—আমিই তো ছেলে করে নিতে চেয়েছিলাম। এমন খাসা ঘর থাকতে আমিই কি তোকে বাইরে ছাড়তাম? কিন্তু যে-কথা বললি তুই—গোয়াল করে দিয়ে গরুর মতন রেখেছে আমাদের। দলিলটা ভালয় ভালয় হবে যাক জবাব তারপরে। সেদিন তোকেই লাগবে বাবা। জিভে অনেক বিষ ছড়িয়েছে সত্যি সত্যি জিভ উপড়ে শোধ দিয়ে দিবি। এই ক'টা দিন চেপেচুপে থাক— তা ছাড়া উপায় নেই

পরম দার্শনিক তত্ত্ব পারুলের মুখে: বুঝে দেখ্‌, মানুষের বলশক্তি রূপযৌবন দু-দিনের, কিন্তু ঘরবাড়ি বিষয়আশয় চিরকালের। দিদির হাতে-গাঁটে যদি জোর থাকত, জলসায় নামে অমন ছুটে গিয়ে পড়ত না। আমার কপালেও একদিন তাই হবে যদি না আখের গুছিয়ে চলি। আমার রানীরও তাই।

সাহেব তখন বলে, ভোরে চলে যাচ্ছি মাসি। এ-বাড়ি বলে নয়, কালীঘাটেই থাকব না।

পারুল আন্তরিক দুঃখে বলল, কালী-ঘাট ছাড়তে তো বলিনি বাবা। কাছাকাছি থাকলে এক-আধ দিন তবু চোখের দেখা দেখতে পাবো। এই পাড়া ছাড়া কি জায়গা নেই, এই ছাড়া কি বাড়ি নেই? ঝিঙেটার সামনাসামনি না গেলেই হল। দৈবাৎ যদি দেখা হয়, রানীকে আর আমাকে আমরা

বয়ে গালমন্দ করবি। বলবি যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ভালই হবে আমার রানীর।

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, ক্ষমা করো মাসি। তোমাদের কালীক্ষেত্র ঠাকুর-দেবতার জায়গা—মা-কালীর আশেপাশে ঊনকোটি দেবতা। আমাকেও এক দেবতা বানানোর রোখ পড়েছে, মানুষ থাকতে দেবে না। এত দেবতার ভিতর ভিড় বাড়িয়ে কি হবে? কালীঘাটে নয়, কলকাতা শহরেই আর নয়। সাহেব বলে মানুষটা মরে গেছে, ঝিঙেকে তাই বোলো।

পায়ুলের নিচের ঘরে রানীর পাতা মাদুরে শুয়েছে সাহেব। একঘুমের পর উঠে পড়ল। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরোয়। পারুল জানতে পারে না—জানবে তো ওস্তাদের কাছে কোন ছাই শিখেছে এত-দিন ধরে। দোতলার বন্ধম্বার ঘরের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে বলে, চললাম ভাই রানী। আমি মরে গেছি—পারুল-মাসি ঝিঙেকে বলবে। তুইও তাই সত্যি বলে জেনে রাখ। তোর ঘরবাড়ি হোক, সুখশান্তি হোক। কাল রাতের মতো চোখে বেনঃ আর কখনো জল না পড়ে।

চোখ বুঝি ভিজে আসে। কড়া হয়ে মনের উপর চোখ রাঙায়ঃ খবরদার!

নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে লম্বা উঠানের ফালি পার হয়ে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়ল। 'চলনে বিড়াল—' সারি সারি খুপরিঘরের ভাড়াটে বাসিন্দা ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায় না।

গলির শেষে বড়রাস্তায় না গিয়ে উল্টো-দিকের আস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে আদি-গঙ্গার কিনারে পড়ে। বড়রাস্তা এড়িয়ে চলাই ভাল। কনস্টেবলরা এসময়টা যদিচ চোখ বুজে বুজে পাহারা দেয়, তা হলেও দুর্জনের মুখোমুখি হবার কি দরকার?

ঘরবাড়ির বাধা পেয়ে গঙ্গার গর্ভ দিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ে পায়ে মাটি বসে যায়। অন্ধকার। জোয়ার এসেছে, জল বাড়ছে। পায়ের কাছে জল খলবল করে। একদিন বা দু-দিন বয়সের শিশুকে এই নদীস্রোতে বেটাছেঁড়া পাতার মতন কে ভাসিয়ে দিয়ে-ছিল। বড় হয়েও ভাসছে। রানী ও অন্যদের সঙ্গে কুমির-কুমির খেলত, উঠানটুকু হত নদী—ঠিক তেমনি ডাঙায় নদীতেই সাহেব জীবনভোর ভেসে ভেসে চলল। পায়ে মাটি পেল না।

একটা ঘরের পিছনে এসে থমকে দাঁড়ায়। খিলখিল খিলখিল তরঙ্গিত হাসি—হাসি স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। যে কণ্ঠের হাসি, সে মেয়ে ঠিক যুবতী, আর রূপবতী। আশালতা আর রানীর দোসর। চোখে না-ই বা দেখি, রূপসী না হলে হাসি এত মিষ্টি হয় না। অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি না ঘুমিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে গলাগলি শুয়ে সেই মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। ঘরে ঘরে কত জনা এমনি—কত পুরুষ কত মেয়ে গায়ে-গায়ে এক হয়ে আছে!

মনকে তাড়া দেয়ঃ খবরদার, খবরদার! দ্রুত পা চালিয়ে দেরিটুকু পুষিয়ে নেয়। সবজি-গাড়ি ধরবে কালীঘাট-স্টেশনে গিয়ে। শেষরাত্রে গাঁ-গ্রাম থেকে মাছ ও শাক-সবজি বয়ে এনে হাজির করে, শহরের মানুষ চক্ষু মুছে বাজারে গিয়ে যাতে টাটকা জিনিস পায়। নাম সেইজন্যে সবজি-গাড়ি। ঐ ট্রেনে শিয়ালদা—পিঠ পিঠ আবার খুলনার ট্রেন। শহর আজ যেন চাবুক উঁচিয়ে সাহেবকে তাড়া করেছে।

তারার ঝিকিমিকি আকাশে। অনেক দূরে অস্পষ্ট কালীমন্দিরের চূড়া দেখা গেল। হাতজোড় করে সাহেব কপালে ঠেকায়ঃ যাচ্ছি মা, আর আসব না—

আর্তনাদ শুনে হঠাৎ চমক লাগল। মহা-শ্মশান—সেই শ্মশানে কে-একজন মাথা কুটে কুটে কাঁদছেঃ ওগো তুমি কোথায় গেলে, তোমায় ছেড়ে থাকব কেমন করে? কত রাত্রি কাটিয়েছে এইখানে, এমন কত কান্না শুনেছে! সুধামুখীকে লাসঘর থেকে এই শ্মশানে এনে দাহ করেছিল। গরীব নফরকেষ্ট ধারধোর করে এবং নিজের সামান্য সম্বল খরচ করে সুধামুখীর শেষ-কাজ করেছে, তাতে কোন ত্রুটি হতে দেয়নি। মন্দির উদ্দেশ করে যা বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই কথাগুলো আবার সাহেবের মুখে এসে যায়ঃ চলে যাচ্ছি মাগো—

ঘরগৃহস্থালীর আনাচকানাচ দিয়ে মানুষের হাসিকান্নার পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে সাহেব ছুটেছে। তারপরে ট্রেন। দিন-মান এখন, রোদ চড়ে উঠেছে। দু-পাশের জীবনযাত্রা সড়াক-সড়াক করে অন্তরালে চলে যায়। মাঠে লাঙল চষছে। মাল বোঝাই গরুর-গাড়ি চলেছে কাঁচারাস্তায়। ঘাটে চান করছে বউঝিরা। খোলা আটচালায় পাঠশালে পড়ুয়ার দল। সাহেব এদের কেউ নয়, চোখে দেখে যায় শুধু। দেখলেই কেবল সারা জীবন—নিষিকুটুম্ব হয়ে গেল, দিনমানের ক্লান্তি কখনো ফুরোনো হল না। (ক্রমশ)

ঘরে-বাইরে

॥ শ্রীমতী ॥

বর্তমান বিশ্ব-নারীসমাজের গৌরব, তাদের সবচেয়ে বড় গর্ব হচ্ছেন ছাব্বিশ বৎসর বয়সের তরুণী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা। অপর মহাকাশচারী তরুণ ভ্যালেরি বিকোভস্কির সঙ্গে মহাকাশের অসীম পারাবারে তাঁর যাত্রা ও সফল হয়ে ফিরে আসা তাই বিজ্ঞানের জয় শুধু নয়, জয় সেই মহিমময়ী মেয়ের, যে আপন অধিকারে বিশ্বের বিস্ময়! এমন কি একজন ব্রিটিশ মহাকাশ বৈজ্ঞানিক বলেছেন, নারীই হয়তো ভবিষ্যৎ মহাকাশ অভিযানে অধিকতর যোগ্য বলে প্রমাণিত হবেন। মহাকাশের প্রান্ত থেকে সুন্দরী ভ্যালেণ্টিনা মর্ত্যের মানুষের সঙ্গে যে আলাপ করেছেন তা শুনেও দেশদেশান্তরের লোক ধন্য হয়েছে। নারী আজ সত্যই পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সাহসে, ধৈর্যে, দায়িত্বপালনে কঠিন কর্মসাধনে সে সমান অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রসর হতে প্রস্তুত। অতুলনীয়া ভ্যালেণ্টিনা তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সকল দেশের সকল কালের নারীর সে প্রেরণা ও উৎসাহের উৎস হয়ে থাকবে।

ভ্যালেণ্টিনা আজ সকলের সব আলোচনার কেন্দ্র। তাঁর কথা বলতে গেলে অন্য সব কথার খেই হারিয়ে যায়। ঘরের কাছের খবরে আসতে গেলে মনে হয় অল্পদিনের সাধ্য আমাদের মেয়েদের, তবুও অগ্রগতির পদক্ষেপ কম হয়নি কোথাও। প্রতিবেশী শত্রুর প্রতারণায় যেদিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ একযোগে বদ্ধপরিকর হয়েছিল স্বদেশের সম্মানরক্ষার সেদিন দেশের মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেন নি, হাতে তুলে নিয়েছিলেন শত-শত দায়িত্ব ও কর্মভার। সর্বত্র গড়ে উঠেছে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার। আজও সে প্রচেষ্টা পূর্ণ উদ্যমে চলছে। উইমেন্স ভলাণ্টারী সার্ভিসেস বা ডবলিউ ভি এস-এর সভ্যাদের অসামরিক প্রতিরক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ এই প্রচেষ্টার নবতম অধ্যায়। ৩০টি কর্মী সম্প্রতি শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। ভারতবর্ষে অন্তত এই প্রথম মহিলাদলের অসামরিক প্রতিরক্ষার বিভিন্ন কার্যকরী শিক্ষাগ্রহণ। ট্রেনিং-এর তত্ত্বাবধান করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিরক্ষা নিয়ন্তা বা কণ্ট্রোলার অব সিভিল ডিফেন্স। এই সংস্থার শিক্ষকেরা মহিলা-শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও নিষ্ঠার প্রশংসায় বলেছেন, অল্পভাষী ঘরের ঘরণীরও উৎসাহ অপরিসীম, তাঁরাও মুখর হয়ে উঠেছিলেন

অসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ের ক্লাসে মহিলা শিক্ষার্থীর দল

প্রতিরক্ষার বিভিন্ন দিকের আলোচনায়। অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে ছিল অনেক কিছু। যেমন নানারকম শরণগৃহ বা এয়ার রেড সেন্টার, যুদ্ধবিগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক ও বোমা, আণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে সতর্কতা, বালির বস্তার ব্যবহার ইত্যাদি। ক্লাসে শিক্ষাদানের পর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অধীত বিষয়ের মহড়া দিয়েছেন। ১৩ দিন ক্লাশ হয়েছে। দু'দিন করে সপ্তাহে প্রায় সাড়ে ছ সপ্তাহ।

এই শিক্ষাগ্রহণের শেষে সেদিন শনিবার ১৫ই জুন লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ পুলিস ট্র্যাফিক ট্রেনিং স্কুলের প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ৬টায় প্রদর্শনীর শুরু, কিন্তু পাঁচটা থেকে উৎসাহী মহিলা কর্মীরা একে একে এসে জড়ো হলেন তাঁদের ক্লাসঘরে—এখানেই তাঁদের শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব স্বল্পসংখ্যক দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সন্দেহ নেই।

প্রথমেই প্রবেশপথের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বালির বস্তার দেওয়াল তৈরির দল। ক্ষিপ্রহস্তে কেমন করে ছোট ছোট বস্তায় বালি ভরে দেওয়ালের মত করে একটির পর একটি

সাজিয়ে দেওয়া যায় তাই তাঁদের করণীয় [illegible]। বাড়ির দেওয়াল নিরাপত্তার নয়ার [illegible] বিশেষজ্ঞদের [illegible] হয়েছে [illegible]। [illegible] দলে [illegible] নিরাপত্তাকার্যে যোগ দিয়েছেন। [illegible] অগ্নিকাণ্ডই সবচেয়ে বড় সমস্যা। [illegible] ও বিমান-সম্পর্কিত ক্ষতির অনেকটাই অগ্নিকাণ্ড থেকে হয়। আগুনের সম্মুখীন হতে হলে সাহস দরকার সত্য, সঙ্গে সঙ্গে দরকার সাবধানতা ও নিপুণ শিক্ষা। বোমার আগুন হলে জানতে হবে বোমা কী জাতীয়। নির্বাপক হিসাবে অনুপযুক্ত জিনিসের ব্যবহার ক্ষতির কারণ হতে পারে। কর্মী দলেরা সব শিক্ষাই পেয়েছেন। অবলীলাক্রমে অল্পসময়ের মধ্যে স্টিরাপ পাম্প, হোসপাইপ ইত্যাদির সহায়ে অগ্নিনির্বাপণ সমাপ্ত হ'ল। নিয়মিত পদক্ষেপে মার্চ করে শিক্ষার্থীরা ক্লাসঘরে ফিরে এলেন। অসামরিক প্রতিরক্ষা অধিকর্তা এ'দের প্রশংসাপত্র বিতরণ করলেন।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ উন্নততর শিক্ষার যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন। উন্নততর শিক্ষাগ্রহণের পর তাঁরা নূতন নূতন শিক্ষার্থী দলের ইনস্ট্রাক্টর নিযুক্ত হবেন। অসামরিক প্রতিরক্ষার শিক্ষকের কাজেও এ'রাই প্রথম ভারতীয় নারীদল। শীঘ্র ডবলিউ ভি এস-এর নূতন দলের শিক্ষা শুরু হবে। শিক্ষার্থী মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীও একযোগে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। অসামরিক প্রতিরক্ষায় শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু মহিলা ডবলিউ ভি এস-এর অফিস ৩৭নং থিয়েটার রোডে সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে বিশদ বিবরণ পেতে পারেন।

স্প্রেয়ার অগ্নিনির্বাপণের প্রথম ও প্রধান পথ

টুকিটাকি

এবার কয়েকজন অনুরাগী পাঠিকার প্রশ্ন পেয়েছি। তাঁরা ঠিকানা দেননি। কাজেই টুকিটাকির মাধ্যমে তাঁদের কাছে পৌঁছোবার চেষ্টা করছি। চিঠিপত্র, প্রশ্ন ইত্যাদি পেলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। মনে হয় না দেখা বান্ধুর সঙ্গে যোগ যেন কত ঘনিষ্ঠ।

কেউ কেউ 'অতিলোম' সম্বন্ধে প্রতিকারের উপায় জানতে চেয়েছেন। 'অতিলোম' সম্পূর্ণ দূর করবার কোন সহজ, সাধারণ উপায় আছে কিনা জানিনে। অনুরোধের [illegible] [illegible] [illegible] লোমের রং বিশেষ হাল্কা হয়ে যায় ও তাতে লোম সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না। সম-পরিমাণ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিনে একবার অন্তত লাগাবেন। কিছুদিন পরে লোমের রং হাল্কা হয়ে যাবে। মুখে মাখবার সময় চুল বাঁচিয়ে চলবেন। চুলে লাগলে চুলও হাল্কা রং হয়ে যাবে। সেটা নিশ্চয়ই কারও পছন্দ হবে না।

অনেকে কাঠের আসবাবে দাগের কথা আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। কাঠের আসবাবের প্রায় সবরকম দাগই ভিনিগার দিয়ে ওঠানো যায়। ভিনিগারের পরিমাণ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। এক পেয়ালা জলে চায়ের এক চামচ ভিনিগার যথেষ্ট। তাতে নরম ছেঁড়া কাপড় ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে দাগের স্থান মুছবেন। অনেক দাগই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তবে হাল্কা রং-এর কাঠে যদি গাঢ় দাগ হয় তবে বাজার থেকে অক্সালিক অ্যাসিডের গুঁড়ো আনিয়ে চায়ের চামচের এক চামচ গুঁড়ো দু'পেয়ালা জলে গুলবেন। ফোঁটা ফোঁটা করে দাগের উপর দেবেন আর একটু পরই ব্লটিং কাগজ দিয়ে শুষে নেবেন। এর পর সামান্য এমোনিয়া দাগের উপর লাগিয়ে বেশ করে মুছে নেবেন।

বর্ষাকালে আরশুলার উপদ্রব সত্যিই অসহ্য হয়ে ওঠে। সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ) বাড়ির সমস্ত ফাটল, ড্রেন, নর্দমায় ছড়িয়ে দেবেন। উপদ্রব বেশ কিছু কমবে।

অগ্নিনির্বাপকদলের মহিলা কর্মীরা যে-কোন সংকটের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত

মহাকাশ বিচরণে প্রথম নারী

গত ১৯শে জুন সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার কাজাকস্তানের অন্তর্গত কারাগান্ডার ৫৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভোস্তক-৫ এবং কারাগান্ডার ৬২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভোস্তক-৬'এর মহাকাশ বিচরণ অন্তে পরস্পরের মধ্যে তিন ঘণ্টার ব্যবধানে অবতরণের সংগে রাশিয়া দুটি নতুন রেকর্ড স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। একটি রেকর্ড হচ্ছে মহাকাশে দীর্ঘকাল বিচরণ এবং

ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা

অপরটি হল সর্বপ্রথম [illegible] [illegible] মহাকাশ বিচরণ [illegible]।

১৪ই জুন বেলা ৩-০০ মিনিটে কর্ণেল ভ্যালেরি [illegible] মহাকাশযান ভোস্তক-৫ উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাশে দীর্ঘকাল থাককালে মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া এবং মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি ও সংযোগ ব্যবস্থাদি পরীক্ষার জন্য একজন মহাকাশচারী [illegible] ভূপৃষ্ঠ হতে ১৮১ থেকে ২৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব বজায় রেখে প্রতি ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৭ সেকেন্ডে পৃথিবীর কক্ষপথ একবার করে পরিক্রমা করতে থাকেন। সেইদিন থেকেই মস্কোতে একটা গুজব রটে যে [illegible] মহাকাশে বিকোভস্কীকে একজন সঙ্গিনী দেওয়া হতে পারে। ১৬ই জুন ভোস্তক ৫ ভোর পাঁচটায় আঠারশবার কক্ষপথ পরিক্রমা করার সংবাদ প্রচারের সংগেই জানা গেল বিকোভস্কীকে সংগ দেবার জন্য মহাকাশযান ভোস্তক-৬ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে তার আরোহী হলেন ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা। এই দিনই মস্কো সময় সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই ভ্যালেন্টিনা পাঁচবার পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেন। ভ্যালেন্টিনার সাংকেতিক ডাকনাম "শংখচিল" এবং বিকোভস্কীর "বাজপাখি।" এক রেডিওগ্রামে ওরা প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চভকে জানিয়ে দিলেন: "যুক্তভাবে মহাকাশ পরিক্রমা আরম্ভ করেছি। আমাদের মহাকাশযানের পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্য সংযোগ স্থাপন হয়ে গিয়েছে। বেশ ভালই লাগছে।" মস্কো সময় বেলা একটার সময় ওরা পরস্পরের সংগে সংযোগ স্থাপন করেন। তেরেস্কোভা ভূপৃষ্ঠ হতে ১১৩ মাইল থেকে ১৪৪ মাইল দূরত্ব বজায় রেখে প্রতি ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ২ সেকেন্ডে একবার কক্ষপথ পরিক্রমা করতে থাকেন।

১৭ই জুন জানা গেল বিকোভস্কী ও তেরেস্কোভার মহাকাশযান দুটি পরস্পরের সান্নিধ্যে তিন মাইল দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। বিকোভস্কীর ওটা চতুর্থ দিন [illegible] পরিক্রমা এবং তেরেস্কোভার দ্বিতীয় দিন। [illegible] হয় এবং [illegible] ওদের দেখাচ্ছিল [illegible] প্রফুল্ল। ওই দিনই [illegible] গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডঃ [illegible] ঘোষণা করেন যে, ভোস্তক ৫'এর কক্ষপথ পরিক্রমার সময় ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিটে কমিয়ে আনার ফলে [illegible] আর উড়ন্ত রাখা [illegible] হবে না এবং [illegible] হবে।

কিন্তু ১৮ই জুন দেখা গেল বিকোভস্কী সেদিনও পরিক্রমা করে চলেছেন শুধু নয়, ওই পাঁচ দিনে কক্ষপথ পরিক্রমার সংখ্যায় এবং দীর্ঘক্ষণ মহাকাশ বিচরণে পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছেন। এমন কি ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভাও ২১ বার কক্ষপথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে কিছু দিন আগে মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপারের কৃতিত্বও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। ওই দিন বেলা সাড়ে বারোটায় দিল্লির অনতিদূরে তোড়াপুরে অবস্থিত আকাশবাণীর গবেষণাগার ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে সারা ভারতে প্রচার করেন। ভারতসহ মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ভ্যালেন্টিনা বলেন: 'ঊর্ধ্বাকাশ থেকে বলছি। আমি হচ্ছি শংখচিল। নির্দেশক যন্ত্র অনুসারে এটা ৩২তম পরিক্রমা। পরিক্রমার সংখ্যা হচ্ছে ৩১।" তবে ভারতীয় সময় সাড়ে বারোটার দেখা গেল বিকোভস্কীর মহাকাশযানটির পৃথিবী থেকে দূরত্ব কমে সর্বাধিক হয়েছে ৪২ কিলোমিটার এবং ন্যূনতম দূরত্ব ২২ কিলোমিটার কমে গিয়েছে। ভ্যালেরির ভোস্তক-৫ তার পরিক্রমা অব্যাহত রাখে।

পরীক্ষা করে দেখার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে মহাকাশচারি দু'জনকে তাদের কেবিনের তাপমাত্রা কমিয়ে নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিকোভস্কী তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রী কমিয়ে দাঁড় করান ৫৯ ডিগ্রী ফারেনহাইটে এবং ভ্যালেন্টিনা ১৮ ডিগ্রী কমিয়ে দাঁড় করান ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটে।

লেঃ কর্নেল ভ্যালেরি বিকোভস্কী

সাড়ে ছটার সময় মস্কোর বেতারবীক্ষণ মহাকাশযান দুটির সংগে সংযোগ স্থাপন করে। পৃথিবীর অগণিত দর্শকদের আমোদ দিতে বিকোভস্কী সামান্য একটু জল ঢাললেন আর সেই বারিবিন্দুগুলি কেবিনের চতুর্দিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। বিকোভস্কী খেলাচ্ছলে সেই ভাসমান বারিবিন্দুগুলি ধরবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

বেতারবীক্ষণ ক্যামেরা তারপর ধরলো তেরেস্কোভার কেবিন। দেখা গেল মহাকাশচারিণী গভীর মনোনিবেশে বিবরণ লেখার খাতা (লগবুক) দেখছেন। তাঁর চোখের নিচে কালো দাগ স্পষ্ট দেখা গেল। অল্পক্ষণ বন্ধ থাকার পর আবার তাঁকে দেখা গেল। এবার, পৃথিবীর অগণিত লোকের দৃষ্টির সামনে রয়েছেন বুঝতে পেরে, তিনি খাতাখানি পাশে সরিয়ে মুচকে হেসে অভিবাদন জানালেন। সেইদিনই আর এক খবরে জানা গেল যে ওরা একত্রে পরিক্রমার পরস্পরের মাত্র তিন মাইল ব্যবধানে রয়েছেন।

মহাকাশ বিচরণের পৃথিবীর ইতিহাসে নারী ও পুরুষের একত্রে পরিক্রমা এই প্রথম। বিকোভস্কী মোট ৮২ বার কক্ষপথ পরিক্রমা করেছেন অর্থাৎ চার দিন তেইশ ঘণ্টা চুয়ান্ন

মিনিটে ২০,৬০,০০০ মাইল পথ। তেরেস্কোভা ৪৯ বার কক্ষপথ পরিক্রমা করে দু'দিন বাইশ ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটে অতিক্রম করেছেন ১২,৫০,০০০ মাইল। মাত্র সাত মিনিটের জন্য তেরেস্কোভা একত্রে মহাকাশ বিচরণে প্যাভেল পোপোভিশ ও নিকোলাইভের দু'দিন বাইশ ঘণ্টা সাতাশ মিনিটের রেকর্ড অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু তাহলেও মহাকাশ বিচরণের ইতিহাসে প্রথম নারী হিসেবে তেরেস্কোভার এই কৃতিত্ব স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবার যোগ্য। পুনরাবতরণের সময় কয়েক মাইল থাকতে তেরেস্কোভা প্যারাসুটে ভূপৃষ্ঠে ঝাঁপ দেন। কি কারণে আকাশযান ছেড়ে দিতে হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে মাটিতে পা রেখেই তিনি সমবেত কৃষকদের কাছ থেকে সাই-বেরিয়ার আলু অর কাঁচা পিঁয়াজ খেতে চান।

ভ্যালেণ্টিনা ভ্লাদিমিরোভা তেরেস্কোভার জন্ম ১৯৩৭-এর ৭ই মার্চ। ওর বাবা মারা যান গত মহাযুদ্ধে। ওর মা ইয়েলেন সুতাকলে কাজ করতেন। সতের বছর বয়সে ভ্যালেণ্টিনা এক টায়ার কোম্পানিতে কাজে ঢোকেন এবং ১৯৫৫ সালে তাঁর মার কর্মস্থল ক্রাসনি পেরেকপ সুতাকলে যোগদান করেন। পরের বছরই ওর মা অবসর গ্রহণ করেন। সাত বছর সুতাকলে কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়াশুনাও চালান। ১৯৬১ সালে বস্ত্রবয়ন বিদ্যায় স্নাতক হয়ে স্পিনিং-প্রযুক্তিবিদ হন। মহাকাশচারিণী হওয়ার সহায়ক হয় প্যারাসুট ঝাঁপে তাঁর কৃতিত্ব। ১৯৫৯ সালে তিনি ইয়ারোস্লাভ্ল বিমান-ক্রীড়া সংঘের সদস্যা হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ১২৬ বার ঝাঁপ দেবার কৃতিত্ব দেখিয়ে পেরেকপ মিল-এ এক প্যারাসুট-ঝাঁপ দলের নেত্রী নির্বাচিতা হন।

আঠাশ বৎসর বয়স্ক ভ্যালেরি ফিওদোরোভিশ বিকোভস্কীর পিতা পরিবহণ বিভাগের এক উচ্চপদস্থ কর্মী। ওর মাও দীর্ঘকাল সুতাকলে স্পিনারের কাজ করেন। ভ্যালেরি ছেলেবেলায় ছিলেন অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। ফুটবল, হকি, ভলিবল, স্কেটিং, বাস্কেটবল, সাঁতার, অসিযুদ্ধ প্রভৃতি খেলা-ধূলায় অল্প বয়স থেকেই কুশলী। লেখা-পড়ার দিকে তাঁর তেমন ঝোঁক ছিল না। অ্যাডভেঞ্চারের গল্প আর চলচ্চিত্রে রোমাঞ্চকর কাহিনী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বাল্যে স্বপ্ন ছিল নাবিক হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার: কৈশোরে আকৃষ্ট হন বৈমানিক-জীবনের প্রতি। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য হন এবং ১৯৫৫ সালে সামরিক বিমানবিদ্যায় স্নাতক হন। তাঁর কর্মজীবন সুরু হয় জেট জঙ্গী বিমানের পাইলট হিসেবে। ১৯৫৯ সালে তিনি এক জঙ্গী বিমান স্কোয়াড্রনের নেতা হন। কর্তব্যপরায়ণতার জন্য তিনি সামরিক পদক লাভ করেছেন এবং "অর্ডার অফ দি রেড স্টার" সম্মানেও সম্মানিত হয়েছেন। এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ উভয়কেই 'মাস্টার অব স্পোর্টস' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এ তাঁদের বিধি-দত্ত অধিকার।

আমার শুধু একটি প্রশ্ন—গণতন্ত্রের উদ্গাতা এই কবিদের কণ্ঠ যে স্বাধীন গণতন্ত্র আইন করে রোধ করতে চায়, আধুনিক সভ্য সমাজে গণতন্ত্র বলে পরিচয় দেবার তার কি কোনও অধিকার আছে?

—বনফুল

শিল্পীর স্বাধীনতা

সবিনয় নিবেদন,

গত ৩১শ সংখ্যায় বিমল কর লিখিত 'শিল্পীর স্বাধীনতা' আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে। বস্তুত, উক্ত প্রবন্ধ সুস্থ চিন্তার এক প্রতিফলন অথবা শিল্পসম্মত একটি প্রস্তাবনা। এ সূত্রে আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

যে-কোন শিল্প, তা সে সাহিত্য হোক, অথবা কোনও চিত্রকলাই হোক তার প্রতিটি নির্মাণে শিল্পীর নিজস্ব অনুভূতি, নিজস্ব একটা মানসিক চেতনা অন্তর্নিহিত থাকে। যাকে সক্রেটিস বলেছেন "প্রেরণা"। কেননা, শিল্পের প্রকৃত উৎসটিই সেই মানসিক চেতনা থেকে, সেই প্রেরণা থেকে। এডওয়ার্ড বুলোর মন্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, artistic production comes of a distanced mental content!

শিল্পী যে শিল্প নির্মাণ করেন তার দৃষ্টিও প্রধানত বাস্তবের অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে নির্ধারিত হয়। অন্যত্র বুলো বলেছেন,

"That all art requires a distance-limit beyond which, and a distance within which only, aesthetic appriciation becomes possible, is the psychological formulation of a general characteristic of art, viz. its anti-realistic nature"

এই তাৎপর্যকে বিশ্লেষণ করলে মনের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় প্রত্যেকের। অথচ তা সত্ত্বেও যে-সমস্যা শিল্পীকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করে, তা হলো সেই অনুভূতিকে, সেই চেতনাকে বাস্তবে প্রতিফলিত করায়। তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে শিল্পীকে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার সম্মুখীন হতে হয়, যা মূলত দেশ, কাল, পরিবেশ এবং লোকের নিজস্ব প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল, যাকে ভিন্নার্থে আমরা রাজনীতি আখ্যা দিয়েছি। এখানেই শিল্পীর আদর্শের সাথে পারিপার্শ্বিকতার ঘটে সংঘর্ষ। রাশিয়ার কম্যুনিজম লেখকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে মেনে নেয়নি। য়ুরোপেও নবজাগরণের উৎপত্তির আগে খৃষ্টধর্ম প্রভুর আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। সাম্যবাদকে বিদূরিত করে বিশপ এবং সাধারণের (Bishop and Laity) মধ্যে স্থাপিত হয়েছিলো ভেদ,
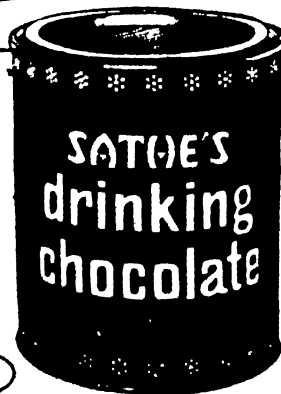
ফলত রাজনীতির আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট তৎকালীন রক্ষণশীল সংস্কার শিল্পীর ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত হানতে দ্বিধা-বোধ করেনি। জিওর্দানো ব্রুনো (Giordano-Brune) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। সক্রেটিসকেও পান করানো হয়েছিলো হেমলক।

অথচ এমন কি বলতে পারা যায়, পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংঘাতে শিল্পীর স্বাধীন সত্তা প্রতিনিয়ত হয়েছে বিধ্বস্ত? আসলে শিল্পীর মানসিক চেতনাও এমন একটা সময় নিয়ে আসে, যখন শিল্পীর বলিষ্ঠতা, গভীর আত্মপ্রত্যয়ে স্বতঃসিদ্ধ তার প্রজ্ঞা, পারিপার্শ্বিকতার প্রতিকূল অবস্থাকে অনেক সময় উপেক্ষা করে। রাজনীতির স্থান তখন সেখানে হয় গৌণ।

উনিশ শতকে ফ্রান্সে সিম্বলিস্ট আন্দোলনের সময় মালার্মে, ভের্লেন প্রমুখ নিজস্ব চিন্তাধারার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটা আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন যা তৎকালীন সকল প্রকার অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে কবিতাকে এক নূতন পথে, নূতন দৃষ্টিসম্পাতে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিলো। তারও আগে লক্ষ করা গিয়েছিলো ভলতেয়ারের চরম রোমান্টিসিজম। য়ুরোপের নবজাগরণ (Renaissance) অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের জীবনকে বিধ্বস্ত করেছিলো। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা। সাহিত্যের শিল্পের হয়েছিলো পরিপূর্ণ বিকাশ।

দান্তে, বদলেয়র, ফ্লবেয়র, গোগোল— এঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন নীতির ঘোর বিরুদ্ধতা করেছেন। বের্টোল্ড ব্রেখ্ট ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে নিজস্ব বিশ্বাস উপস্থাপনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

আসলে যে-কোন সৃষ্টিই মহৎ নয়। এবং তা নয় বলেই যে সৃষ্টি মহৎ তাকে আমরা শিল্প বলি। এই শিল্প রচনায় শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। এই নৈতিক মূল্যকে মেনে নেবার দায়িত্ব শিল্পী যে পারিপার্শ্বিকতায় বাস করেন সেই সমাজ-ব্যবস্থার।

বর্তমান কম্যুনিজমে আমরা শিল্পীর সার্বিক সত্তাকে বিসর্জন দিতে দেখেছি। জীবন-সর্বস্ব কম্যুনিজম, জীবন ব্যতীত অন্য কোন পরমসত্তা মানতে রাজী নয়। এবং শিল্পীকেও তাই সেই কম্যুনিজমের নির্দিষ্ট রীতি, নির্দিষ্ট আদর্শ প্রতি পদক্ষেপে মেনে চলতে হয়েছে। অথচ কই, গণতন্ত্র সেই নৈতিক মূল্যকে তো অস্বীকার করেনি, অস্বীকার করেনি তার শিল্প-সত্তাকে, গভীরতম বক্তব্যে নিজস্ব বিশ্বাস বিস্তৃত করবার স্বাধীনতাকে।।

কম্যুনিজমের ফাঁকা বুলি কতদিন চলবে? তার কুটিল আদর্শবাদ অক্ষুণ্ণ থাকবে কতদিন? শিল্পীর শাশ্বত দাবি কি সেই প্রচলিত রীতিকে, সেই আদর্শকে বিধ্বস্ত করবে না?

এ প্রশ্ন অবশ্য আমি উত্থাপন করতে চাইছি না। এবং বর্তমান কম্যুনিজমের যুগ প্রত্যক্ষ করে, সে প্রশ্নের অবকাশও কারও হবে না। আমি বলতে চেয়েছিলাম, শিল্পীর স্বাধীনতা চিরদিনই ন্যায়সঙ্গত। যুক্তিসঙ্গত।

বিমল করকে ধন্যবাদ, এসব কথা অনেকাংশে তিনি সূত্রাকারে আলোচনা করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রাতিস্বিক চিন্তা-ধারার সাথে কিছুটা দ্বি-মত হলেও। নমস্কার।

জয়দেব দাশগুপ্ত
শিবপুর, হাওড়া।

সবিনয় নিবেদন,

'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে আর কিছু লিখব না, ঠিক করেছিলাম। কিন্তু অশোক কাঞ্জিলাল মশায়ের চিঠিতে (দেশ—

১৫-৬-৬৩) প্রশ্ন রয়েছে—'যদি সততা-গুণে বইটি (চীন দেখে এলাম) সিদ্ধ হয়ে থাকে, যদি সাহিত্য-গুণে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে—যদি চীন দেশের কথা তাতে লেখা হয়ে থাকে তবে মনোজবাবু কোন দুর্বলতাবশত বইটির প্রচার বন্ধ করলেন?'

আমার জবাবঃ দুর্বলতাবশত নয়, কর্তব্য বিবেচনা করে। চীন ভারত আক্রমণ করলে সার্বিক প্রতিরোধের প্রয়োজন দেখা দিল। আমি স্থির করলাম, এ সময়টা দেশের লোকের সামনে এমন কিছু থাকা ঠিক হবে না, যাতে শত্রুর প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আসতে পারে। সাধারণ অবস্থায় যা অনুচিত, দেশের সংকট-সময়ে, জরুরী প্রয়োজনে সাময়িকভাবে তা গ্রহণ করতে হয়। এও তেমনি। পানিক্কর এবং অন্য যাঁরা চীনের কথা লিখেছেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কিছু করিনি, তাঁদের বইয়ের কি অবস্থা আমি জানিনে। জানার প্রয়োজনও নেই। আমার যা অভিমত, তাঁদেরও তাই হবে এমন প্রত্যাশা করিনে।

মনোজ বসু
১৫।৬।৬৩

[শ্রীমনোজ বসুর চিঠির জবাবে অথবা এই বিষয়টি নিয়ে আর কোনো আলোচনা প্রকাশিত হবে না।]

৩

মহাশয়,

শ্রীসুবোধ ঘোষের লেখা "শিল্পীর স্বাধীনতা" এই সংখ্যা দেশে (৩০ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা) পড়লাম এবং এ সম্বন্ধে দু-একটি কথা জানাচ্ছি।

এর আগে যে সকল লেখা এ সম্পর্কে বেরিয়েছে সেগুলি ধৈর্যসহকারে পড়েছি এবং তাঁদের বক্তব্যগুলি উপলব্ধি করেছি।

সুবোধবাবুর এই সংখ্যার লেখাটা আমার অন্তরে অপূর্ব আলোড়ন জাগিয়েছে, তার কারণ "শিল্পীর স্বাধীনতা" বলতে যা বোঝায় তিনি ঠিক ততটুকু তাঁর প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। আমার নিজস্ব মতও তাই, শিল্পী হল স্রষ্টা তিনি কারো আদেশ বা ফরমাইস মত শিল্প সৃষ্টি করবেন না—তিনি অন্তরে যা উপলব্ধি করবেন সেই উপলব্ধ বস্তু ভাষায় রূপায়িত করে সকলের সমক্ষে তুলে ধরবেন। পাত্রাপাত্র বিভেদ ভুলে গিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবেন না। তাতে তাঁকে রাজরোষেই পড়তে হোক বা জনসাধারণের নিন্দা স্তুতির মধ্যেই পড়তে হোক সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকবে না অর্থাৎ তাঁর চিন্তার, কল্পনার ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা থাকবে।

সুবোধবাবু কয়েকটি উপমা দিয়ে তাঁর বক্তব্য আরও স্পষ্টীকরণ করেছেন।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার
কলকাতা।

এডওআর্ড লিয়র

সবিনয় নিবেদন,

এডওআর্ড লিয়র প্রসঙ্গে লেখক সকলের নাম করেছেন—আর দুজনের নাম করলে পারতেন। একজন জর্মানীর হিলেল্ম বুশ। ও'র সম্পর্কে মুজতবা আলী সাহেব একবার লিখেছিলেন, কিন্তু বিশদ আলোচনা করেন নি। ইনি সম্ভবত গোড়ার গোড়ায় মুনিক-এর কোন পত্রিকায় অদ্ভুত ধরনের সব ছবি এঁকেছেন তারপর একদিন কমিক ভার্স লিখিয়ে হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তবে ও'র সবটাই কিছু অবোধ-তাবোল ছিল না, কেননা তাঁর কৌতুক বা শ্লেষের পেছনে একটা সচেতন মন কাজ করত, যা নাকি মাঝে মাঝে শোপেনহাওআরে আশ্রয় পেয়েছে—এমন কথা সমালোচকরা বলে থাকেন। জর্মানীর ছেলে-বুড়ো সবাইয়ের কাছে তাঁর আঁকা ও লেখা গ্রন্থগুলির একসময়ে অসামান্য প্রভাব ছিল। বুশ-এর ইংরিজী অনূদিত গ্রন্থের নাম 'অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টু নটী বয়েজ' ইত্যাদি। সুকুমার রায়ের সঙ্গে ও'র আত্মীয়তা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয়জনের নাম নর্মান হান্টার। এ নামটি খুব চালু কিনা জানিনে, তবে তাঁর 'দি ইনক্রেডিবল অ্যাডভেঞ্চার অফ প্রফেসর ব্রেনস্টর্ম' নামে যে ক্ষুদ্র বইটি আমার কাছে রয়েছে তার আঁকাগুলির সঙ্গে (হীথ রবিনসন অঙ্কিত) সুকুমার রায়ের এমন আশ্চর্য মিল যে, প্রথম দর্শনে তফাত করাই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। হান্টার অবশ্য লিমেরিক করেননি, বেশ খোলামেলা গদ্যে লিখেছেন। তাঁর বইটির নায়ক যে আত্মভোলা অধ্যাপক তাঁর বৈশিষ্ট্য হল পাঁচটি চশমা ব্যবহার এবং সংসারের বড় থেকে তুচ্ছ তাবৎ জিনিসের মধ্যে স্বীয় প্রতিভাকে জাহির করে তোলার চেষ্টা।

আর নিবন্ধকার, চেস্টার্টন-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অ্যাবসার্ড, কমিক বা প্রতীকী লেখার বিশ্বজনীন তাৎপর্য সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন বোধ হয়, নইলে বয়স্ক-সাহিত্যেও এমন প্যাটাফিজিক্স নামের তত্ত্বটিকে ঘনিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে কেন! উদাহরণ? আয়োনেস্কোর নাটক।

অসিত গুপ্ত
কলকাতা।

বাংলা শব্দের ব্যবহার

সবিনয় নিবেদন,

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তরগণের শুরু থেকেই শব্দের প্রয়োগে, অর্থপ্রতীতি-রচনায় এবং উদ্ভাবনে অভিনবত্ব সম্পাদনের প্রয়াস লক্ষণীয়। কথ্যরীতি, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যবহার, ইংরেজী ছাঁদে শব্দ-নির্মাণ ইত্যাদি সাধু প্ররোচনায় ব্যাকরণ-শৈথিল্যকে অনায়াসে মার্জনা করা হয় অনেক সময়ে। কিন্তু অভিনব শব্দের নির্মাণে যিনি আগ্রহী হবেন ব্যাকরণের বিধিনিষেধ তাঁর কাছে উপেক্ষিত হবে না বলেই উপেক্ষণীয়ও হবে না। ভাষাগত সতর্ক শুচিতাকে অতএব যাঁরা অনুদার রক্ষণশীলতা বলে মনে করেন না অভিনবত্ব সম্পাদনের নামে প্রশ্রিত সেইসব ব্যাকরণ-বিচ্যুতি তাঁদের পক্ষে সুসহ নয়।

উদাহরণত বলা যাক—গত সংখ্যার 'দেশ'-এ শ্রীসত্যেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অনশ্বর' কবিতাটির প্রথম শব্দ 'ফুলন্ত' হয় সম্ভবত 'ফলন্ত' শব্দের সাদৃশ্যে (analogy) গঠিত হয়েছে—হয়তো শ্রুতিসৌকর্যের আশ্বাসে।

কিন্তু 'ফুলন্ত' শব্দটি ভ্রমাত্মক। কেননা, সংস্কৃত শতৃ-প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত বাংলা '-অন্ত' প্রত্যয়টি কৃৎপ্রত্যয় এবং সেই হিসেবে কেবলমাত্র ক্রিয়ার উত্তর ব্যবহার্য—যথা, ফলন্ত, জ্বলন্ত ইত্যাদি। কিন্তু 'ফুল' বলে দেশী-বিদেশী কোন ক্রিয়াপদ আমাদের জানা নেই তাই 'ফুল'-নামক বিশেষ্য শব্দটির উপরে নিতান্তই এক কৃৎপ্রত্যয় '-অন্ত'-এর ব্যবহার অসমীচীন।

এক প্রবীণ কবির কলমের এই বিশেষ স্বাধীনতাটিকে স্বাগত জানাতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

অসিতকুমার বিশ্বাস
কলকাতা।

শিবঠাকুরের আপন দেশে

শ্রদ্ধেয়,

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকা। বিশ-শতকের প্রারম্ভে এমন কি প্রাক-ত্রিশ যুগেও বহির্বিশ্বের আলো পৌঁছায়নি সেখানে। আফ্রিকাও অজ্ঞাত ছিল বাইরের জগতের কাছে। দুঃসাহসী ভ্রমণকারীদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে জানা যায় আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান দুস্তর মরুভূমি আর দুরধিগম্য জঙ্গলে পূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে অথবা আরও বিশেষ করে বলতে হলে উনিশ-পঞ্চাশের কালে আফ্রিকা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অতি সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্র-সংঘের আসন পেয়েছে এই বিরাট মহাদেশের অনেক রাষ্ট্র। কয়েকজন রাষ্ট্রনেতারও বিশেষ স্থান আছে আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্যই জানতে পারি বিদগ্ধজনের প্রচুর রচনা ও ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে। সে তুলনায় আফ্রিকা সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের অত্যন্ত সীমিত বললে অত্যুক্তি হয় না। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে "দেশে" প্রকাশিত "শিব ঠাকুরের আপন দেশে" খুব সময়োচিত রচনা। ইথিওপিয়া আফ্রিকার এক স্বল্প-পরিচিত দেশ। এই দেশের মানুষদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাদের স্বভাবত প্রবল। "শিব ঠাকুরের আপন দেশে"র লেখিকা স্বয়ং সেখানে আছেন। সমাজের সাথে মেশার সুযোগও তাঁর আছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর রচনাকে সার্থক এবং আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এর বর্ণনা রচনাটি চমৎকার।

মণিমোহন সরদার,
হাওড়া।

ক্ষমতার অধিকারী শাসক

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ "দেশে"র (৩১নং সংখ্যা) "বৈদেশিকী" বিভাগে বলা হয়েছে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি বর্তমান পৃথিবীতে একচ্ছত্র শাসক যিনি ত্রিশ দশকেও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, জাপানের বর্তমান সম্রাট হিরোহিতো ১৯২৬ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন—আর হাইলে সেলাসি সম্রাট হন ১৯৩০ সালে। অবশ্য একথা বলা যেতে পারে, হিরোহিতো ইথিওপিয়ার সম্রাটের মত বাস্তব প্রকৃত শাসক নন—তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান মাত্র। কিন্তু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানের সম্রাটকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হত। অবশ্য তাঁর চেয়েও পুরাতন রাষ্ট্রপ্রধান এখনও আছেন—তিনি হচ্ছেন ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাজ্য (Grand Duchy) লুক্সেমবার্গের গ্র্যান্ড ডাচেস Charlotte। ১৯১৯ সাল থেকে তিনি রাজত্ব করছেন।

অন্যান্য শাসকদের মধ্যে (যারা রাজা অথবা রানী নন) পর্তুগালের ডিক্টেটর সালাজারের নাম করা যেতে পারে। ১৯২৮ সালে অর্থমন্ত্রী হবার পর থেকেই সালাজার প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন, এবং ১৯৩২ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিনি প্রধান-মন্ত্রীর পদ অধিকার করে আছেন। স্পেনের বর্তমান ডিক্টেটর ফ্রাংকো ১৯৩৬-৩৯ সালের গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়ে ক্ষমতার অধিকারী হন।

১৯২৩ সালে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসমত ইনোনু, মুস্তাফা কামালের প্রধান সহযোগী হিসাবে ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ বৎসর কামালের মৃত্যুর পর তিনি রাষ্ট্রপতি হন, এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫০-৬০ এই সময়ে তাঁর বিরোধী দল ক্ষমতা ভোগ করে, কিন্তু আবার ১৯৬০ সাল থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করে আছেন।

অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
কেম্ব্রিজ, ইউ কে।

বিদুর

প্রকাশকের দূরদৃষ্টি (!)

খাস লণ্ডন শহরে সাতমহলা বাড়ি, তিন চার পুরুষের ব্যবসা। হিসেব করলে দেখা যাবে কম করেও হাজার কয়েক বই ছেপেছে এই প্রতিষ্ঠানটি গত পঞ্চাশ বছরে; তার মধ্যে মহামান্য লেখক আছেন, আছেন কয়েক শ নগণ্য লেখকও। ব্যবসায় বনেদী, সম্মানে কিছু কম নয় কারও চেয়ে। আর অধঃস্তন পুরুষরা যদি আর একটিও নতুন বই না ছেপে বাপ ঠাকুর্দার গদি ঝাড়ে সকাল বিকেল, বলা বাহুল্য, ঘোড়ার বাজি খেলার মতন কয়েক পাউন্ড পকেটে জুটে যাবে।

কিন্তু, ব্যবসাদার ত বাঙালী নয়, বৃটিশ। বাণিজ্য ব্যাপারটাকে তারা কখনও পারিবার পরিকল্পনার মতন গুটিয়ে ফেলতে শেখে নি। বরাত নিতান্ত মন্দ হলে অন্য কথা—নয়ত বাণিজ্য হচ্ছে বহু প্রসবিনী নারীর আন্তর-গুণে ও সম্ভাবনাযুক্ত, বংশ বৃদ্ধি করতে চাইলে কে ঠেকায়।

ফলে, তিন পুরুষের ব্যবসাকে সোনার হাঁসের মতন গলা টিপে না মেরে সেই স্বর্ণহংসকে যথেষ্ট তোয়াজে রেখে এ-পুরুষের কর্তারা সোনার ডিম ঘরে তুলছেন। ছিল বুঝি পাঁচ কি সাত বিষয়ের বই-প্রকাশক; এখন অসংখ্য বিষয়ের বই বের করে—সাহিত্য থেকে শুরু করে আইন, উদ্যান বিষয়ক বই থেকে শুরু করে দাবা শিক্ষা, মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে শুরু করে হালের আণবিক সূত্রের ভয়াবহ ব্যাখ্যা।

এই রকম এক প্রকাশকের অফিস-বাড়িতে বিকেল গড়াতে তর সইল না, ছোট কর্তা হন্তদন্ত হয়ে তেতলার হল ঘরে হাজির হলেন। আর পাঁচ মিনিটটাক, তারপর, অতিথিবৃন্দে এই ঘর পূর্ণ হবে; কিঞ্চিৎ পান ও আহারাদি হবে। বলা যাক, চায়ের আমন্ত্রণ রাখতে পঞ্চাশ ষাট জন অতিথি আসবেন, সবাই লেখক, সকলকেই সমান খাতির দেখাতে হবে, ছোট বড় বিচার এ-ক্ষেত্রে অন্তত চলবে না।

এ-রকম ঘটনা নতুন নয়, মাসে একবার দুবার হয়েই থাকে; বৎসরান্তে আরও জব্বর গোছের হয়। এই কোম্পানীর বিভিন্ন বিষয়ের লেখকদের নিজেদের এক একটি লীগ গোছের আছে, এই কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় অবশ্য তাদের ডিনার টিনার হয় মাঝে মধ্যে। আজকের ঘটনা একটু বিশিষ্ট, বিশিষ্ট এই জন্যে যে, যে-সব লেখকরা ক্রাইম ফিকসান লেখেন তাঁদের এ-ধরনের মাসান্তিক বৈঠকে এবারে কয়েকজন ভিনদেশী ক্রাইম ফিকসান-এর লেখকও উপস্থিত থাকছেন। বৃটিশ লেখক অবশ্য সংখ্যায় ভারী, কিন্তু আছেন আমেরিকান লেখক, আছেন ফরাসী লেখক, ইটালী থেকেও দুজন এসেছেন, এমন কি গ্রীস থেকেও। বলা বাহুল্য, য়ুরোপের অন্যভাষী আমন্ত্রিত লেখকদের গ্রন্থ তর্জমা করার সত্ত্ব হয় আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির কেনা হয়ে গেছে, না হয় হবে; প্রকাশক তেমন কোনো উদ্বেগ বোধ করছেন না আপাতত।

নিমন্ত্রিত লেখকরা আসতে শুরু করলেন। ছোট কর্তা, তাঁর সেক্রেটারী, এজেন্ট এবং অন্যান্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'আসুন মিস্টার......', 'আহা, আজ কী সুন্দর আবহাওয়া মিস ....', 'আপনার নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমরা পড়েছি মিসেস .....'। তেতলায় যখন এই রকম অতিথি অভ্যাগতদের ভিড় বাড়ছে তখন দোতলা থেকে 'রোমান্স ডিপার্টমেণ্টে'র এক এজেন্ট লুকিয়ে একটি পাপ কাজ করে বসল: নিছক মজা করতে, না স্বাভাবিক ঈর্ষাবশত তা বোঝা মুশকিল। তবে, গত সপ্তাহে রোমান্স-লেখকদের যে চায়ের আসর হয়েছিল (ওই তেতলার হল ঘরেই) সেখানে মেজকর্তা দুঃখ করে বলেছিলেন, তাঁর রোমান্স ডিপার্টমেণ্টের বেচা-কেনায় তেমন উন্নতি হচ্ছে না। আজকাল লোকে রোমান্স আর তেমন পড়তে চায় না। কি ভাবে কি করলে উজবুক পাঠকগুলো থ্রিলার ছেড়ে রোমান্স পড়তে হুমড়ি খেয়ে পড়বে তার একটা উপায় বের করা দরকার। বলা বাহুল্য, 'রোমান্স'-দপ্তরের কর্মচারী এবং লেখকদের কথাটা বড় প্রাণে বেজেছিল।

আপাতত আবার আমরা আমাদের গল্পে ফিরে যাই। তেতলার হল জমজমাট, বিখ্যাত অর্ধবিখ্যাত স্বল্পখ্যাত গোয়েন্দা লেখকরা (লেখিকারাও—। হায়, বাংলা দেশে গোয়েন্দা লেখিকা নেই কেন?) আসর জমিয়ে বসেছেন, নানা গাল গল্প হচ্ছে; ছোট কর্তা এবং তাঁর দপ্তরের লোকরা অতিথিদের দেখা শোনা করছেন, এমন সময় পোশাকি একটা সভার আয়োজন করা হল, সভাপতি হলেন বিখ্যাত ফরাসী গোয়েন্দা লেখক।

সভাপতি তাঁর ছোট্ট ভাষণে বললেন, "আমরা গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকরা সব চেয়ে নিরেট, নয়ত বুঝতে পারতাম আমাদের স্ত্রীদের কটা করে প্রেমিক আছে?"

রসিকতা ভেবে অন্য লেখকরা হা হা হি হি করে হেসে উঠল, কয়েকটি গোঁড়া গোয়েন্দা-লেখিকা বিরক্ত হয়ে কাশল খুক খুক করে। একজন লেখক বলল, 'যথার্থ বলেছেন। আমি সারাদিন আমার গোয়েন্দাটাকে এত বেশী নিজের লেখার কাজে ব্যস্ত রাখি যে, তাকে আমার স্ত্রীর পিছনে লাগাতে সময় পাই না। সময় পেলে ইচ্ছে আছে এই সং কাজে তাকে জুতে দেব।'

ফরাসী সভাপতি বোধ হয় প্রীত হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমাদের আরও একটি কাজ করা দরকার। নিরেট মূর্খ বলে আমরা কোনোদিন দেখতে পাই না আমাদের পিঠের পেছনে কি হচ্ছে? কত রকম জালিয়াতি চলছে আমাদের মতন নিরীহদের ওপর? কত ঠগ বাটপাড় ক্রিমিন্যাল আমাদের গলা কাটতে ছুরি শানাচ্ছে।'

আবার এক দফা হাসি হুল্লোড়। তারপর সমস্বরে প্রশ্ন হল, 'আমাদের ওপর বাটপাড়ি করছে এমন লোক কে?'

সভাপতি মুচকি হেসে প্রকাশক ছোট-কর্তাকে দেখিয়ে দিলেন আঙুল দিয়ে। সবাই হতভম্ব, যেন একটি বজ্রাঘাত হবে গেল ঘরে। বৃটিশ লেখক, যাঁরা এই কোম্পানীর সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত তাঁরা লজ্জায় কাঠ।

তারপর ক্রমে ধিক্কারের শব্দ ও কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল।

ফরাসী সভাপতি বললেন, "আমি এখানে বসে জানালা দিয়ে নীচের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে চার গাড়ি ফৌজ এসে পৌঁছেছে কোনো কারণে। কারণটা কি আমি জানি না। তবে অনুমানে বলতে পারি, আমাদের চায়ের আসরে কোনো গুপ্ত কিছু ঘটছে এই রকম সংবাদ পেয়ে ওরা এসেছে। আমরা এ-বাড়িতে এসে প্যাঁচে পড়ে গেছি।"

বলা বাহুল্য, ছোট কর্তা তৎক্ষণে সামলে নিয়েছেন। তুখোড় ব্যবসাদার এবং ততোধিক রসিক ব্যক্তি। কর্তা বললেন, "ফরাসীরা যথার্থ ভাল জাতের গোয়েন্দা-লেখক। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, ঠিকই ধরেছেন। আপনার বই আমি প্রায় সবকটাই নামধাম পালটে ইংরিজীতে তর্জমা করিয়ে বের করেছি। আশা করি এতে আপনার ক্ষতি বই লাভ হয়নি। যদি কণ্ট্রাক্ট করতে রাজী থাকেন—আপনারই নামে এবার থেকে আপনার বই তর্জমা করে বের করি, তাতে আপনার কিছু অর্থ প্রাপ্তি হবে। কি বলেন, রাজী?"

"রাজী।" ফরাসী সভাপতি তৎক্ষণাৎ স্বীকার গেলেন।

"তা হলে এই সভা ভেঙে দেওয়া যাক। আপনারা কেউ পুলিসের জন্য চিন্তা করবেন না। ওটা রোমান্স ডিপার্টমেণ্টের কাজ। ওরা বেজায় মূর্খ। আমি এই ব্যাপারটাকে বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করব। গোয়েন্দা-লেখকদের সভায় পুলিসের হানা। বোধ হয় এর ফলে রোমান্স লিখিয়েদের চেয়ে আপনাদের সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল আরও বাড়বে।"

সাধু সাধু রবে সভা ভঙ্গ হল।

এই গল্পটি সত্য হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে; কিংবা অর্ধসত্যও হতে পারে।

পুস্তক পরিচয়

কয়েকটি সাম্প্রতিক উপন্যাস

পরিশোধ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য জগৎ ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ছয় টাকা।

এক ঝড়-দুর্যোগের রাতে রেল-কলোনীর ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্ত এমন এক বাড়িতে আশ্রয় নিল যেখানে স্বাতী দ্বারকেশ্বর লাহিড়ী এবং অনাথকাকা অজ্ঞাতবাস করছে। সেই এক রাত্রির আশ্রয়কে কেন্দ্র করে প্রশান্ত ঘনিষ্ঠ হল এই তিন মানুষের পরিবারের সংগে। পুরোনো চাকর অনাথ কাকার কাছ থেকে অজ্ঞাতবাসের কারণ শুনল। দ্বারকেশ্বর লাহিড়ী খুব বড় জমিদার ছিলেন। জমিদারি উচ্ছেদের সময়ে বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় নেমে এবং তারই বিশ্বাসঘাতকতার সর্বস্বান্ত হয়ে অচেনা রাজ্যে এসে অজ্ঞাতবাস করছেন। প্রশান্ত এবং স্বাতী পরস্পরকে ভালোবাসল। এদের অহংকারে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রশান্ত সাহায্য করতে থাকল নানাভাবে। লাহিড়ী মশায় স্বপ্নে চাকরি পেলেন। এদের সংসার থেকে একটু একটু করে সব [illegible] বিদায় নিচ্ছে [illegible] সব ঠিকঠাক [illegible] প্রশান্ত জানতে পারল লাহিড়ী মশায়ের সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু তারই বাবা। তারপর সাধারণত যা হয়ে থাকে তাই। একটা ঘনঘোর মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সেইসব রচনার তুলনা নেই যেখানে তিনি নিজেও একজন চরিত্র হয়ে থাকেন। পরিমিত সময়ের মধ্যে কত অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার জাল তিনি বোনেন এবং কি বিরাট করে সেগুলি পাঠককে দেখান। এটি অবশ্য সে ধরনের রচনা নয় এবং এর কোথাও তিনি নেই। তা সত্ত্বেও তাঁর লেখার যা প্রধান আকর্ষণ, পাঠককে টেনে রাখা, তাতে তিনি এখানেও সফল হয়েছেন। বইটি পড়তে বসে কোথাও বাধা পেতে হয় না। যদিও মনে হয়, সব চরিত্রগুলিই চেনা, আগে কোথাও দেখেছি, এই মেলোড্রামা, এই মিলন ভালোবাসা, এই শেষ মুহূর্তের বিপর্যয়—এ সবই কতকাল ধরে জানি এবং যদিও শেষাংশ ভীষণভাবে ক্লান্ত করে তা সত্ত্বেও যাঁরা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ভালোবাসেন তাঁদের নিঃসন্দেহে বইটি ভালো লাগবে।

৫৯৮।৬২

এলেম নতুন দেশে। জ্যোতির্ময় রায়, ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

বাস্তবিক কল্পনার মতই কাল্পনিক বাস্তবতার অস্তিত্বও সাহিত্যে আছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত-নিম্ন জীবনের ভাব অভাব ও স্বপ্নাকাংক্ষা, বস্তিজীবন, কারখানার জগৎ এবং জীবনের শত-সমস্যার পরম দাওয়াই হিসাবে নিষিদ্ধ নেশাকে গ্রহণ ইত্যাদি সুলভে চিত্রিত করে তোলা সাহিত্যের একটি লোভনীয় অনুশীলন। বিদেশে এবং আমাদের দেশেও অন্য জগৎ ও জীবনের প্রতি আকর্ষণ, অভিসার এবং অধ্যবসায় লক্ষ্য করেছি। জীবনের বিরাট ব্যাপ্তিতে মানুষের প্রতি-বিন্দু বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে সেখানে অক্ষরে-অক্ষরে আঁকা হয়েছে। অবক্ষয় এবং অপরাজয়ের অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব সেখানে জটিল হয়ে উঠেছে।

"এলেম নতুন দেশে" প্রথম রীতির অর্থাৎ কাল্পনিক বাস্তবতার উপন্যাস। উদ্বাস্তু, বস্তি এবং শ্রমিক জীবনে যেখানে অনেকখানি গল্পাংশ জুড়ে আছে। জীবনকে দেখে চেনার জন্য যে নায়ক নতুন দেশে এসেছেন তিনি একদিকে যেমন [illegible] অপর দিকে তেমনি [illegible] তাঁর কথাগুলি বেশ শাণিত

এবং চমকপ্রদ। তাঁর জীবনের কাহিনী রীতিমত নাটকীয়। এবং সব মিলে, পার্থ, বংগ ও অঞ্জনা এই তিনটি চরিত্র মিলে যে সুখপাঠ্য মধুরান্তিক উপাখ্যান গড়ে উঠেছে তাকে সিনেমার জন্যে একটি সুন্দর সাজানো গল্প বলতে বাধা নেই।

৩৭৮।৬২

সমুদ্র পাখির কান্না। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আধুনিক সাহিত্য ভবন, এ/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সম্পন্ন মুষ্টিমেয় তরুণ লেখকদের অন্যতম। ইতস্তত প্রকাশিত কয়েকটি গল্পে এবং এই উপন্যাসে তাঁর অ্যাম্বিশন-এর পরিচয় আছে। তিনি যে কেবল বাদু এবং ধাধা লাগিয়ে রাতারাতি সাহিত্য-জগতে বীর-পদে হেঁটে বেড়াতে আসেননি, তার হাতে যে ঝকঝকে ধারাল, বাঁকানো তলোয়ার আছে, তাঁর লেখাগুলি পড়লে সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সাধারণত যে ধরনের বিষয় নিয়ে তরুণ সাহিত্যিকরা

উপন্যাস রচনা করেন, "সমুদ্র পাখির কান্না" সে ধরনের বিষয় নিয়ে লেখা না। কতকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল বাড়ানোর কাজ চলছে। কত আদিবাসী, কত নাগা-বেদেদের আমরা জানলুম। এই উপন্যাসে যদিও ভূগোল আছে কিন্তু মানুষগুলো আমাদের খুবই পরিচিত। আমাদেরই দাদা, বাবা কি কাকাকে একটি ভিন্ন জগতে একটি ভিন্ন পরিবেশে তিনি দেখিয়েছেন। এই জগৎ—জাহাজের জগৎ। হাজার দু হাজার মাইল দূরের কোন বন্দরের উদ্দেশে অকূল সমুদ্রের বুকে দিনরাত একটি মালবাহী জাহাজ ভেসে চলেছে। একদিন কলকাতা বন্দর থেকে তেরজন ডেক ক্রু, পঁচিশজন এঞ্জিন ক্রু, মেসরুম বয়, মেটবাটলার, ডেক অফিসার, ক্যাপ্টেন, পাঁচজন এঞ্জিনিয়ার, দুজন অ্যাপ্রেন্টিস এঁদের নিয়ে এই জাহাজ রওনা দিয়েছিল। প্রথম বন্দর ছিল কলম্বো। জায়গার অভাবে সেখানে জাহাজ ভিড়তে পারল না। দ্বিতীয় বন্দর ডারবান। সকলে যখন পায়ের তলায় মাটির পরিচিত স্পর্শের জন্য আকুল, তখন খবর এল, জাহাজ ডারবান বন্দরেও ধরবে না। তারপর পানামা। জাহাজ কিন্তু সেখানেও ভিড়তে পারেনি। এইভাবে বন্দর পার হয়ে হয়ে জাহাজ এগিয়ে চলল। কোথাও আশ্রয় পেল না। সেকেন্ড অফিসার, ক্যাপ্টেন থেকে আরম্ভ করে মেসরুমবয় পর্যন্ত সকলেই যখন নারীর শরীরের গন্ধ এবং মাটির স্পর্শের জন্য ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে তখন জাহাজ কখনও স্থানাভাব-বশত, কখনও বা ঈশ্বরতুল্য হেড-অফিসের হঠাৎ পরিবর্তিত নির্দেশে দূরে বন্দর রেখে এক অকূল থেকে আর এক অকূলে ছুটে চলল। এবং এইভাবে নিরাশ্রয় এই জাহাজ পাঠকের অজান্তেই একসময়ে প্রতীক হয়ে যায়। এক দিকে আছে নিষ্ঠুর নিয়মিত কত কোম্পানী, অন্য দিকে জাহাজ চালিয়ে নেবার জন্য মানুষগুলির প্রতিদিনের অমানুষিক পরিশ্রম। মজিদের মৃত্যু, মেজ মিস্ত্রীর লাথি খাওয়া রক্তাক্ত চেহারা। অনুত্তমকে মৃত ভেবে নিয়ে মানুষগুলোর প্রায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠা, একটি পুরুষ ও স্ত্রী চড়ুইয়ের আলাদা গল্প, অ্যালবাট্রস পাখি, কী করুণ প্রতিদিনের এই একঘেয়ে, অবিরাম, নীল বিপুল জলরাশি, নবীর জন্যে হাহাকার। হাল ভেঙে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা—মজিদের মৃত্যুর সময় উচ্চারিত এই লাইন সমস্ত গ্রন্থটিতে একটি আবহসংগীতের কাজ করে। পড়তে পড়তে মনে হয়, কেউ যেন অনবরত এই লাইনটি খুব করুণ সুরে, খুব নিকট থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছে। কান্নার মত শোনায়। সম্পূর্ণ একটি নতুন বিষয় নিয়ে লিখে যাবার মত সাহস এবং ক্ষমতা যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রাখেন, এই গ্রন্থই তার প্রমাণ। আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে আমাদেরই ঘনিষ্ঠ বা নিকট আত্মীয়দের একটি ভিন্ন জগতের মধ্যে রেখে তাদের দুঃখ, সুখ ঘৃণা, ভালোবাসা, কাম, হিংসা ও ক্রোধের কথা তিনি যেরকম নিপুণতার সঙ্গে বলেছেন, যে দক্ষতার সঙ্গে তিনি সীমাহীন সমুদ্রের বুকে ভাসমান নিরাশ্রয় জাহাজটিকে প্রতীক করে তুলেছেন, তাতে করে অবাক না হয়ে উপায় থাকে না।

পরিশেষে একটি কথা বলার আছে। গ্রন্থের শেষে অনুত্তমের মৃত্যু বড় আকস্মিক মনে হয়েছে। গ্রন্থের কোথাও এর কোন প্রস্তুতি ছিল না। আর এই মৃত্যু কোন নতুন উদ্দেশ্যও সাধিত করে না। তা ছাড়া বিকৃত উচ্চারণের প্রচুর ইংরাজী এবং বাংলা টেকনিকাল শব্দ আছে, যেগুলোর কোন ব্যাখ্যাও লেখক করেননি। খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।

৭৮।৬৩

শ্রাবণী। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য নয় টাকা।

১৯৯ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, 'বর্তমান উপন্যাসখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ' এবং পরের লাইনেই তিনি লিখেছেন, "অবশ্য শ্রাবণীর চরিত্রগুলি পরবর্তী কালে অন্য উপন্যাসে উপস্থিত হবে।" এতে করে এই বোঝা যায় যে, উপন্যাসটি যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ তেমনি স্বয়ং অসম্পূর্ণও বটে। "শ্রাবণী" যথারীতি একটি প্রেমমূলক উপন্যাস। ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া শ্রাবণী এই উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা। অপ্রধানাদের মধ্যে আছে অনীতা, ইলা, মিনতি, কমলা, রমলা ইত্যাদি। আরও আছেন দুজন, থাকেন শিলিগুড়িতে। কোন মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। নিরুপমাদি এবং নমিতাদি। এইসব মেয়েদের প্রেম, ভালোবাসা, ব্যর্থ প্রেম, হিংসা, প্রতিহিংসা এই উপন্যাসের উপজীব্য। নায়ক তিনজন—হর্ষ, বিজয়ব্রত এবং ভবেশ। বিজয়ব্রত সাংবাদিক। ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে। এবং তা সত্ত্বেও কাঁচা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে তাদের ফাঁসানো এবং সেই চিন্তা ও অন্তর্দাহে ও সেই সমস্যায় তিনি প্রতি মুহূর্তে ক্লিষ্ট। হর্ষ ছাত্র। এই উপন্যাসে সে দ্বিতীয় নায়ক। হর্ষ পুরোপুরি একটি চরিত্র হয়েই উঠতে পারেনি। বাকি রইল ভবেশ। কালিম্পং-এর দিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। আদর্শবাদ, পাণ্ডিত্য, সপ্রতিভতা—এইসবের মিশ্রিত একটি সিনেমা-টাইপ। উপন্যাস শেষ হয়েছে দীর্ঘদিনের একটি পারিবারিক কলহের অবসানে। একটানা পড়ে যেতে বেশ লাগে। উপন্যাসে যাঁরা ভাবালুতা, বড় বড় কথা, প্রেম, ব্যর্থতা এইসব "গুপ্তাস্ত্র" চান, উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে তাঁদের আনন্দ দেবে। উপন্যাসে কয়েকজন জীবিত এবং মৃত খ্যাতিমান ব্যক্তির উল্লেখ আছে। যেমন, তোমাদের তারাশঙ্কর তো বলেছেন—বলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন গানের একটি কলির উল্লেখ আছে। অথবা বিজয়ব্রত এক জায়গায় শ্রাবণীকে বলেছেন, এইমাত্র হরেন মুখুজ্যে মারা গেলেন। কিংবা ডাঃ নীহার রায় হাসলেন এবং শ্রাবণী তাঁকে ছুটে প্রণাম করল। এ ধরনের বাক্য-বিন্যাসে কিঞ্চিৎ মজা লাগে। সুন্দর মুদ্রণ এবং [illegible] অলংকরণের জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

১৩।৬৩

অসামান্য চরিত্রচিত্র

ছায়াময় অতীত। মহাদেবী বর্মা। অনুবাদিকা—মলিনা রায়। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

মহাদেবী বর্মা মূলত কবি। হিন্দী সাহিত্যে কবি হিসেবেই তাঁর প্রসিদ্ধি। "ছায়াময় অতীত" যদিও তাঁর গদ্য রচনা কিন্তু এই লেখাগুলির সর্ব অবয়বে গীতি-কবিতার ললিত ভাব ছড়ানো আছে। মোট এগারোটি চরিত্র নিয়ে লেখিকা তাদের স্মৃতিচিত্র এঁকেছেন। এই চরিত্রগুলিকে তিনি তাঁর শৈশব থেকে নানা সময়ে দেখেছেন। প্রতিটি চরিত্রই জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত। অথচ ক্ষতবিক্ষত এই চরিত্রগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই মহৎ, সরল, ভালো এবং উদার। এ সংসারে কোথাও কারও বিরুদ্ধে তাদের কোন নালিশ, কোন উষ্মা রাগ বা বিরাগ নেই। যতদিন সক্ষম ছিল,

বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই করে করে একদিন শেষ হয়ে গেছে। পড়া শেষ হলে মনে হয়, যেন এতক্ষণ কোন বিচিত্র চিত্রশালায় বসে ছিলাম। যেন ধুলো-ঝুল-কালি-মাখা প্রাচীন ঘর থেকে এই চিত্রগুলিকে কেউ উদ্ধার করে কোনও নতুন, সুন্দর ঘরে সাজিয়ে রেখেছে, অথচ চিত্রগুলির শরীরের পুরাতন গন্ধে সেই ঘর ভরে আছে। হঠাৎ দিবানিদ্রার পর জানলা দিয়ে অপরাহ্ণের আকাশে মেঘ দেখলে যেমন মন উদাস হয়, এই চরিত্র-গুলি মনকে তেমনি ব্যথিত করে। যেহেতু লেখিকা গল্প লিখতে চাননি তাই গল্প-লেখকের সতর্কতা, চাতুর্য, আত্মগোপনতা—এ সব তাঁর লেখায় নেই। তিনি প্রায় প্রতিটি রচনাতেই অত্যন্ত সহজভাবে নিজের কথাও বলেছেন। ফলে এই হয়েছে যে, হয়ত পাঠকের মনে হতে পারে, এই চরিত্রগুলি তাঁর নিজেরই স্মৃতি। সরল প্রকৃতির সেই নিরক্ষর রামা যেন ও রেই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিল। কিংবা সেই মারোয়াড়ী বৃদ্ধ দোকানদারের নিঃসন্তান পুত্রবধূ যেন ওঁরই পুতুল খেলার সঙ্গী। তবে বেশ ঘরোয়া গড়নে বাঙালি বালক বালিকাদের জীবন তিনিই বেশ [illegible] সাদের কথা লেখেছেন। অনুবাদ ভালো হয়েছে। মনে হয় না, অনুবাদ পড়ছি। হিন্দী সাহিত্যের নামেই যাঁদের নাক সিঁটকানোর অভ্যেস আছে এই "ফেলে আসা অতীত" তাঁদের পড়তে অনুরোধ করব।

৩৬১।৬২

সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আমরা উপকৃত হব। শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে আলোচ্য জীবনী গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন ছোটদের জন্যে। পড়তে পড়তে সময় কেটে যায় মন আনন্দে ভরে ওঠে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিত ভূমিকাটি মূল্যবান।

(৫২১।৬২)

বিবিধ

ভারত-জিজ্ঞাসা : শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন। ১৩৩।এ, রাসবিহারী অ্যাভেনু, কলকাতা-২৯। মূল্য তিন টাকা।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন। অনেক সময়েই তাদের কর্মপন্থা অবলম্বন করে এক-একটি দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। এদের সকলের পন্থা এক ছিল না। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে মতবাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও কোথাও যেন একটা ঐক্য রয়েছে। সেই ঐক্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। মেটে [illegible] উপনিষদ হিসেবে ভারতীয় [illegible] স্বরূপ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থকারের পক্ষে নূতন ব্যাখ্যা না থাকলেও লেখকের উপলব্ধির স্পর্শ আছে।

৩২৩।৬২

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১·২৫ নঃ পঃ।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে গীতার স্থান অতি উচ্চে। তার কারণ গীতার মধ্যেই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির রস পরিপূর্ণ।

আলোচ্য পুস্তকটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গীতার অনুবাদ। অনুবাদক যত্নের সহিত সরল ভাষায় পদ্যে অনুবাদ করেছেন। যাদের সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দখল নেই তারা এ বইখানি পড়ে অতি সহজে বুঝতে পারবেন।

২০৫।৬৩

কিশোর সাহিত্য

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। ক্যাথেরিন ওয়েল্স পেয়ার। অনুবাদক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

আইনস্টাইন শুধু বিজ্ঞানী নন এ যুগের একজন বরেণ্য পুরুষ। নিছক বিজ্ঞানী ও কীর্তিমান পুরুষরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বিরাজ করলেও পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে সাধারণত তাঁর আত্মিক আবেদন থাকে না, কিন্তু কোনো কোনো সময় এক একজন নমস্য ব্যক্তি তাঁর বিশেষ সীমার বাইরেও জগতের মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। এর কারণ এই যে, প্রতিভা শুধু নয় মানবিক কল্যাণ-চিন্তার দ্বারা তাঁরা বিশ্ব-বাসীর আত্মীয় হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ছিলেন প্রপীড়িত মানুষের আত্মীয়তুল্য, মানব হিতৈষী, সর্ব জাতির ভবিষ্যতের জন্য আকুল। তাঁর ব্যক্তি চিন্তা কল্যাণ বোধ-এর

শুভ লক্ষণ

বাংলা, এবং বাংলার ছবি দেখুন—দর্শকদের কাছে এই আবেদন আমরা বহুবার জানিয়েছি। এই আবেদনের মধ্যে প্রাদেশিকতার গন্ধ আছে বলে অনেকে হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, এই আবেদনের মধ্যে আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধির লেশমাত্র নেই। প্রতি অঞ্চলের চলচ্চিত্রশিল্প যদি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে তবে মূলত ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পই লাভবান হয়ে উঠবে। তা ছাড়া আঞ্চলিক ছবির সংকট যে কত বেশী তা সকলেরই জানা। এই সংকট কেন দেখা দিল, এবং তার প্রতিকারের উপায় কী—তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সুতরাং পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সুখের কথা এই, দর্শকরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। সম্প্রতি দেখা গেছে, এবং যাচ্ছে যে, বাংলা ছবির প্রতি দর্শকদের অনুরাগ বেড়েই চলেছে। বাঙালী দর্শকরা বাংলা ছবির প্রতি দিনের পর দিন অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছেন। এবং বর্তমানে একই সংগে কয়েকটি বাংলা ছবি উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করে চলেছে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সংকটকালে এই ঘটনা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। এর জন্য ধন্যবাদ যদি কারো প্রাপ্য হয় তবে তাঁরা হলেন রুচিবান ও বিচারশীল দর্শকসমাজ।সব ছবিই যে দর্শকদের সমান আনন্দ দেবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু বাংলা ও বাংলার ছবির প্রতি এই অঞ্চলের দর্শকদের অনুরাগের অভাব কোনদিন হবে না, এই আশা আমরা পোষণ করতে পারি। এবং অনুরাগের অভাব যদি না ঘটে, তবে এই অঞ্চলের চলচ্চিত্রশিল্পের সংকট দূর হতেও বিলম্ব ঘটবে না।

"ক্লিওপেট্রা"র একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর

এলিজাবেথ টেলর

বার্টন-টেলর প্রসংগ

[আজ পর্যন্ত সর্বাধিক অর্থব্যয়ে তৈরি (চার কোটি ডলার) টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের "ক্লিওপেট্রা" বিদেশে মুক্তিলাভ করেছে। এর চেয়ে বড় সংবাদ হল রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। এলিজাবেথ টেলরের সেক্রেটারী রিচার্ড হ্যানলে জানিয়েছেন, তাঁর (টেলর) সংগে আমি কথা বলেছি, এবং উনি বলেছেন বিয়ের সংবাদ সত্যি। কবে নাগাদ তাঁদের বিয়ে হবে বলা মুশকিল। কারণ ও'রা উভয়ে এখন'ও বিবাহিত। এলিজাবেথ টেলরের স্বামী আমেরিকান গায়ক এডি ফিশার। বার্টনের স্ত্রীর নাম : সিবিল উইলিয়ামস বার্টন। বার্টন যদি এলিজাবেথ'কে বিয়ে করেন তবে ইনি হবেন তাঁর পঞ্চম স্বামী।]

বার্টন টেলরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে কিছুকাল ধরে চিত্রামোদী মহলে জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিণতি কী এ নিয়ে চিত্রামোদী মহলে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কেউ কেউ বলেছেন টেলর যদি শেষ পর্যন্ত বার্টনকে জীবনসংগীরূপে না পান তবে বিংশ শতাব্দীর "ক্লিওপেট্রা" বলে তাঁকে আর কেউ ডাকবে না।

টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের প্রধান কর্তা জানুক বলেছিলেন, "আমার মনে হয়, বার্টন টেলরের সম্পর্ক আমাদের সংস্থার পক্ষে গঠনমূলক হয়েছে।" তিনি "কনস্ট্রাকটিভ" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। বার্টন-টেলরের প্রণয় ও'দের জীবনে যে "কনস্ট্রাকটিভ হতে চলেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। জনৈক বিদেশী সংবাদদাতা বলেছেন, লণ্ডনের ডরচেস্টার

এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টন

হোটেলে বার্টন ও টেলরের অবস্থানকালে মাঝে মাঝে টেলরের পিতা-মাতা তাঁদের "ফান-ইন-ল"-র সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বার্টন এখন তাঁদের সন-ইন-ল হতে চলেছেন।

টেলরের জনক-জননীর জামাই-ভাগ্য যে খুব ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। অভিনেতা হিসাবে বার্টনের জুড়ি কম। অনেকের মতে, ইংরিজীভাষাভাষী দশজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মধ্যে বার্টন একজন। তিনজন বিখ্যাত অভিনেতা—স্যার জন গিলগাড, পল স্কোফিল্ড ও লরেন্স অলিভিয়ার—বার্টন সম্বন্ধে তিনটি উক্তি করেছেন। চলচ্চিত্রে বার্টনের অভিনয়-প্রতিভা পূর্ণ বিকাশলাভ নাও করতে পারে এই আশঙ্কা ছিল গিলগাডের। তিনি বলেছেন, তাঁর "মুভী ক্যারিয়র" যেদিন শেষ হবে, সেদিন হয়ত সে তার রোমান্টিক দিনগুলিও হারিয়ে ফেলবে—হারাবে তার প্রাণোচ্ছল দিনগুলি। পল স্কোফিল্ড বলেছেন, যুদ্ধের পর যতজন অভিনেতার আবির্ভাব ঘটেছে তাদের মধ্যে রিচার্ডই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। লরেন্স অলিভিয়ার তাঁকে বলেছিলেন, "নিজের মন ঠিক কর। তুমি কি শুধু নাম করতে চাও, না একজন বড় অভিনেতা হতে চাও।" চলচ্চিত্রের দিকে বার্টন ঝুঁকেছিলেন বলেই অলিভিয়ার এ কথা তাঁকে বলেছিলেন।

মঞ্চাভিনেতা হিসাবেই বার্টনের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। ব্রডওয়ে মঞ্চে তিনি প্রথম অবতরণ করেন। "দি লেডিজ নট ফর বার্নিং" নামক একটি নাটকের ছোট ভূমিকায়। অল্পকালের মধ্যে তাঁর যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একই নাটকে এক শো রজনীরও বেশী হ্যামলেটের ভূমিকায় যে চারজন বিখ্যাত শিল্পী অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে বার্টন অন্যতম। বাকী তিনজন হলেন স্যার হেনরি আরভিং, স্যার হার্বার্ট বীরবম ট্রী এবং স্যার জন গিলগাড। ওল্ড ভিক সম্প্রদায়ের নাটকে হ্যামলেটের ভূমিকায় বার্টন অভূতপূর্ব যশ অর্জন করেছিলেন। একদিন অভিনয়ের পূর্বে তাঁর ড্রেসিং রুমে থিয়েটারের ম্যানেজার হঠাৎ ঢুকে এসে তাঁকে বললেন, "একটু ভাল করে অভিনয় করো। বৃদ্ধ কিন্তু সামনেই বসে রয়েছেন।"

"কে বৃদ্ধ?"—জিজ্ঞেস করলেন বার্টন।

"ইনি বছরে একবার আসেন এবং একটি

এ-যুগের ক্লিওপেট্রা এলিজাবেথ টেলর
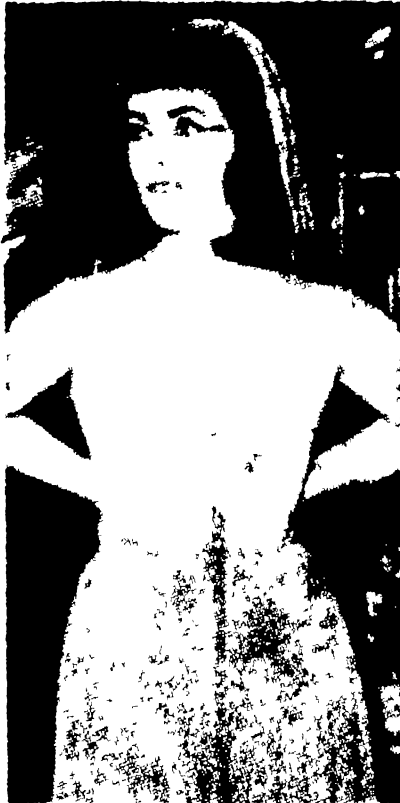
অংক দেখেই চলে যান।" —বললেন ম্যানেজার।

"কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কে?"

"চার্চিল।"

মঞ্চে এসে বার্টন যখন তাঁর প্রথম সংলাপটি বলতে শুরু করলেন, "এ লিটল মোর দ্যান কিন অ্যান্ড লেস দ্যান কাইন্ড" —তখনই তিনি শুনতে পেলেন প্রথম সারিতে বসে যেন একই রকম সুরে তাঁর সংলাপটি মৃদু স্বরে আবৃত্তি করে চলেছেন। পরে বার্টন বলেছিলেন, আমি তাঁকে থামাতে চেয়েছিলাম। কখনও খুব তাড়াতাড়ি, কখনও খুব ধীরে ধীরে আমি সংলাপ বলে যেতে লাগলাম। কিন্তু তাঁকে হারাতে পারলাম না।

এর কয়েক বছর পর যখন ঠিক হল যে "উইনস্টন চার্চিল—দি ভ্যালিয়েণ্ট ইয়ার্স" টেলিভিসনে অভিনীত হবে, তখন প্রযোজকরা চার্চিলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর কথাগুলো টেলিভিসনে কাকে দিয়ে বলানো হবে। চার্চিল এক কথায় বলেছিলেন, ওল্ড ভিকের সেই ছেলেটিকে নিয়ে এসো, অর্থাৎ বার্টনকে।

শিল্পী জীবনে বার্টন অনেকের কাছ থেকেই অভিনন্দন পেয়েছেন। তাঁর বাবার কাছ থেকেও তিনি উৎসাহ পেয়েছেন। কিন্তু উৎসাহ পাওয়ার ঘটনাটি বলবার মত। তাঁর বাবা রিচার্ড জেনকিনস্-এর শখ হল ছেলের অভিনয় দেখবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রওনা হলেন একটি ছবি দেখতে। ছবিটির নাম "মাই কাজিন র‍্যাচেল"। সিনেমায় যাওয়ার পথে একের পর এক সতেরোটি মদের দোকানে জেনকিনস্ থামলেন এবং শেষ পর্যন্ত সিনেমায় তিনি সময়মতই গিয়ে পৌঁছলেন। ছবি শুরু হল। ছবিতে পুত্রকে প্রথম যে কাজটি তিনি করতে দেখলেন তা হল গ্লাসে মদ ঢালা। "এই তো ঠিক আছে।"—বলেই জেনকিনস উঠে দাঁড়ালেন এবং সিনেমা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সতেরোটির পর আঠার নম্বর মদের দোকানে গিয়ে ঢুকলেন।

চল্লিশ দশকে "দি লাস্ট ডেইজ অব ডলউইন" ছবিতে অভিনয় করার কালে তিনি ওয়েলশ অভিনেত্রী সিবিল উইলিয়মস-এর সঙ্গে পরিচিত হন, এবং পরিচয়ের পাঁচ মাসের মধ্যেই ও'দের বিয়ে হয়। সিবিল ও বার্টন একই দেশের লোক। বার্টন নিজেও ওয়েলশ। বিবাহিত জীবনে ও'রা সুখীই হয়েছিলেন। ওয়েলশ কথা-ভাষায় ও'রা পরস্পরকে "বুট" বলে ডাকতেন। "বুট" মানে "সুন্দর"। বার্টন-সিবিলের দুই কন্যা।

ব্যক্তিগত জীবনে বার্টন সুপণ্ডিত, গল্প বলতে পারেন, [illegible] মুহূর্তে'ও কাব্যরসিক সদালাপী। নিজে তিনি খুব

ডিবিডি ফিল্মস-এর "স্বর্গ হতে বিদায়" -এর প্রথম দিনের শ্যুটিংয়ে চিত্রপরিচালিকা ম ঞ্জু দে একটি দৃশ্যগ্রহণের আগে পাহাড়ী সান্যালকে নির্দেশ দিচ্ছেন (ডাইনে) সেটে ভিউ-ফাইণ্ডার-এর ভেতর দিয়ে দেখছেন ম ঞ্জু দে —ফটো দেশ

যে কোন ব্যক্তিকে মর্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না। ফ্রেড্রিক মার্চ বলেন, মেয়েদের কাছে তাঁর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। অনেকে বলেন, গত বিশ বছরে বার্টনের সংস্পর্শে এমন প্রায় ৭৫,০০০ নারী এসেছেন যাঁরা আজীবন তাঁর স্মৃতি লালন করে যাবেন। ট্যামি গ্রিমস নাম্নী এক তরুণী বলেছেন, "চার দিনের জন্য আমি তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম। ইনি সব মেয়েকেই বুঝতে দেন, সে সুন্দরী। ইনি একজন সত্যিই প্রতিভাধর পুরুষ।"

সাহিত্য-আলোচনায় বার্টনের সমকক্ষ খুব কম অভিনেতাই আছেন। কাব্য, উপন্যাস ইনি প্রচুর পাঠ করেন। এ নিয়ে আলোচনা করতেও তাঁর ক্লান্তি নেই। বার্টন খুব তাড়াতাড়ি পড়তে পারেন। "অ্যাংলো-স্যাক্সন অ্যাটিচিউডস" পড়তে লাগে তাঁর মাত্র দু ঘণ্টা সময়। ঘরে পায়চারি করতে করতে ইনি শেক্সপীয়রের রচনা অথবা অন্য কোন কবির কবিতা আবৃত্তি করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সুমধুর, তাঁর হাসি প্রাণ-খোলা। অন্যকে হাসাতেও তিনি পারেন খুব।

সর্বগুণান্বিত বার্টন সুদর্শন। বয়স তাঁর ৩৫। দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি। তাঁর মাথা আয়তনে বৃহৎ। এলিজাবেথ টেলরের কোমরের যা পরিধি, তাঁর মাথারও তাই। ইনি অনেক সময় টেলরের কোমরের বেল্ট নিয়ে মাথায় বেঁধে তা দেখিয়ে দেন। তাঁর চাহনির মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনার ভাব লুকিয়ে আছে। ওই চোখ দুটিই নাকি মেয়েদের আকর্ষণ করে।

এলিজাবেথ টেলরকে হয়ত ওই দুটি চোখই মুগ্ধ করেছিল। এলিজাবেথ টেলরকে অনেক সময় নীল নদের রানী ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

ক্লিওপেট্রা রোমকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন এলিজাবেথ টেলর বাঁচাতে চেয়েছিলেন টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স স্টুডিয়োজকে। ক্লিওপেট্রার প্রথম বিয়ে হয়েছিল আঠার বৎসর বয়সে। টেলরেরও তাই। আঠার বৎসর বয়সে টেলর বিয়ে করেছিলেন নিকি হিল্টনকে (ছোট)। বিশ বৎসর বয়সে টেলর বৃটিশ অভিনেতা মাইকেল ওয়াইল্ডিংকে বিয়ে করেন। ক্লিওপেট্রাও বিশ বছর বয়সেই ত্রয়োদশ টলেমিকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল দ্বাদশ টলেমির সঙ্গে। ক্লিওপেট্রা এবং এলিজাবেথ উভয়েরই প্রথম দুটি বিয়ে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

লোকে বলে, মাইকেল টডই প্রথম পুরুষ যাকে টেলর সত্যিই ভালোবেসেছিলেন। টড ছিলেন টেলরের তৃতীয় স্বামী। ক্লিওপেট্রার ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই ঘটনা। ক্লিওপেট্রার জীবনে জুলিয়স সীজার ছিলেন তৃতীয় পুরুষ। এবং জুলিয়স সীজার ও মাইকেল টড—উভয়েই প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসেছিলেন তাঁদের প্রণয়ীদের। ক্লিওপেট্রার গর্ভে এসেছিল সীজারের পুত্র, টেলরের গর্ভে টডের কন্যা।

পদ্ম পিকচার্স-এর "তাজমহল" ছবিতে বীণা রায়

১৯৫৮ সালে মার্চ মাসে টড নিজের প্লেনে করে অন্য এক শহরে গিয়েছিলেন এক কাজে। তিনি আর ফেরেননি। বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

খৃষ্টপূর্ব ৪৪ সালে মার্চ মাসেই সীজার "ফোরাম"-এ গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে তিনি নিহত হন।

শোকে মুহ্যমান হয়ে ক্লিওপেট্রা সীজারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এণ্টনির কাছে সান্ত্বনা খোঁজেন। তারপর ও'রা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন।

সীজারের বন্ধু ছিলেন যেমনি এণ্টনি, এডি ফিশার তেমনি ছিলেন টডের বন্ধু। এডি সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলেন টেলরকে। তারপর একদিন ও'রাও পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেন।

এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রণয়-সম্পর্কে জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর অক্টেভিয়া কাঁদতে কাঁদতে রোমে ফিরে আসেন। সবাই নিন্দা করতে লাগল এণ্টনিকে। টেলরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পর ফিশারও এমনিভাবেই নিন্দার পাত্র হয়ে উঠলেন। কারণ তখনও তিনি বিবাহিত ছিলেন। স্ত্রী ছিলেন ডেবি রেনোল্ডস।

ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করার পর এণ্টনি স্ত্রীর দাসত্ব করেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেন। টেলরকে বিয়ে করার পর এডি ফিশার গান ছেড়ে দিলেন। "ক্লিওপেট্রা"র শ্যুটিং-এর সময় স্ত্রীর পাশে পাশে থাকবার ও তাঁর ব্যক্তিগত কাজে লাগবার জন্য রোমে চলে গেলেন। এর জন্য টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স থেকে তিনি বেতন হিসাবে পেতেন ১৫০০ ডলার।

অনেকে বলেন, এলিজাবেথ টেলর ক্লিওপেট্রার মতই প্রেমের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছেন। ক্লিওপেট্রা ও টেলরের মধ্যে মিল খুঁজতে গিয়েই হয়ত এ কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। টেলরের অনুরাগীরা চাইবেন, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে ও'দের মধ্যে অমিল ঘটুক।

শুভমুক্তি

এ সপ্তাহে দুটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। একটি বন্‌জা, অপরটি রুস্তম-এ-বগদাদ।

পি পুল্লিহা পরিচালিত রোমাঞ্চপূর্ণ ছবি "বন্‌জা"র প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জলি দেবী, এন টি রামা রাও, দেবিকা। জামাল সেন সংগীত পরিচালক। "রুস্তম-এ-বগদাদ" পরিচালনা করেছেন বি জে প্যাটেল। দারা সিং, চন্দ্রশেখর, বিজয়া চৌধুরী, ভগবান ও প্রিন্স কুমারী ছবির প্রধান শিল্পী। এস দত্ত সংগীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

অবধূতের গল্প

যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছেন, ছায়াছবিকে তাঁরা প্রয়োগ-শিল্পের অন্তরঙ্গ প্রসাদগুণে বিষয় নির্বিশেষেও সুখভোগ্য করে তুলতে পারেন। এবং গত ছবিতে তাঁরা এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসেরও প্রমাণ দিয়েছেন, ছায়াছবিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে স্টার-সিস্টেম-এর কাছে নতিস্বীকার অপরিহার্য নয়। যাত্রিকের সর্বাধুনিক ছবি "পলাতক" (রাজকমল কলামন্দির নিবেদিত) পরিচালক গোষ্ঠীর এই আত্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাসের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে। "পলাতক" মনোজ বসুর "আংটি চাটুজ্যের ভাই" নামক একটি ছোটগল্পের ভিত্তিতে তৈরী। ছবিতে যে গল্প রূপ নিয়েছে, তার নায়কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "অতিথি" গল্পের কিশোর-নায়কের মিলটুকু অনুধাবন করতে দর্শকদের অসুবিধে হয় না। তবে চিত্রকাহিনীর নায়ক-চরিত্রে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য আরোপ করে চিত্রনাট্যকার পরিচালক-গোষ্ঠী দর্শকদের নতুনত্বের আস্বাদ দিতে চেয়েছেন। এই প্রচেষ্টাকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা গতানুগতিকতার প্রলোভন অনেকাংশে জয় করেছেন, এবং জনমনোরঞ্জনের নির্ভরযোগ্য অতিব্যবহৃত শর্তগুলিও যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। এ ছবিতে আমোদের উপকরণের সঙ্গে শিল্পের রম্যতার এক সুন্দর যুক্তবেণী রচিত হয়েছে। দুই বিপরীতধর্মী উপাদানের সংমিশ্রণে কোথাও কৃত্রিমতার ছাপ নেই। আর্টের সঙ্গে আমোদের হরপার্বতী মিলন ঘটেছে ছবিতে।

প্রমোদের যে-সব উপকরণ ছবিতে থরে থরে সাজানো রয়েছে তার আস্বাদটিও যেন স্বতন্ত্র। ঝুমুরদলের মেয়েদের নাচ-গান ছবির উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে। এ ধরনের

(উপরে, বাঁয়ে) রূপছায়া চিত্রর "দেয়া-নেয়া" ছবিতে উত্তমকুমার (ডাইনে) "মহানগর"-এর একটি দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে মাধবী মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায় (নীচে বাঁয়ে) "মহানগর"-এর একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও ভিকি রেডউড (ডাইনে) উত্তমকুমার ফিল্মস-এর "জতুগৃহ" ছবির নায়িকা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় —ফটো দেশ

কালরূপ চিত্র অর্পজিয়া ছবি "প্রতিধ্বনি"র শুভমুহূর্ত অনুষ্ঠানে পরিচালক-সংগীত পরিচালক ভূপেন হাজারিকা, মহরৎ শিল্পী বিভা ও তপন সিংহ

নাচ ও গান বাংলা ছবিতে সহজলভ্য নয়। ঝুমুরদলের মেয়েদের নাচ-গান শুধুই যে দর্শকদের মনোরঞ্জন সাধন করে তা নয়, বাংলার এক বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির আনন্দধারার সঙ্গেও বুঝি নতুন করে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এই আখ্যান-অংশ কিন্তু ছবিতে প্রক্ষিপ্ত নয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। এর ফলে ছবিটি বাংলার পল্লীজীবনের এক মৃত্তিকা-শ্রয়ী পরিবেশ ও মাধুর্যে ভরে উঠেছে।

তা ছাড়া ছবিতে রয়েছে নাটকীয় আবেগ এবং এক মর্মভেদী ট্র্যাজেডি। চিত্রনাট্যকার পরিচালক গোষ্ঠী ছবি শুরু হওয়ার আগেই জানিয়েছেন যে, চিত্রকাহিনী অবাস্তব ও অতিনাটকীয়। এর জন্য চিত্রকাহিনীর বিচার ও বিশ্লেষণের অবকাশ কমে গেছে এমন মনে করা ভুল। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, এ ছবির গল্প-বস্তুটা প্রধান নয়, প্রধান হল চরিত্র-চিন্তা। নায়কই আখ্যানবস্তুর প্রধান চরিত্র। এমন একজন নায়ক চিত্রনাট্যকার পরিচালক গোষ্ঠী ছবিতে উপস্থিত করেছেন, যে পরস্পরবিরোধী ভাব ও চিন্তাকণার জীবন্ত সমষ্টিমাত্র। এমনটি হওয়ার কারণ হয়ত নায়ক-চরিত্রের সদা-অস্থিরতা। সে নিজেই জানে না কী সে চায়, কী পেলে সে সুখী হবে। তাই তার চরিত্রের মধ্যে এক মুহূর্তের চিন্তা ও বিশ্বাসের সঙ্গে পরমুহূর্তের চিন্তা ও বিশ্বাসের বিরোধাভাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হয়ত এমন চরিত্রের উদাহরণও বাস্তবক্ষেত্রে আছে। কিন্তু ওই ধরনের চরিত্রের আপাতবিরোধী চিন্তারাজির অন্তরালেও একটা সংগতি খুঁজে পাওয়া যায়। তা হল অসংগতির সংগতি। অসংগতি যদি কোথাও কম দেখা যায় তবেই যেন সে চরিত্রটি সংগতিহীন হয়ে পড়ে। আলোচ্য চরিত্রটির কথাই ধরা যাক্। ছবিতে বলা হয়েছে, নায়ক তার হৃদয়টুকুই বয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়ত কারো কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। পৌঁছে সে দেয়। এমনকি, তার গর্ভধারিণীর চোখের সঙ্গে এক জনতোষিণী ঝুমুর মেয়ের চোখের মিল আছে বলে সে তাকে মা বলে ডাকতেও দ্বিধা করে না। তার জন্য নায়কের মন উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু এই হৃদয়বান নায়ক কই তার পরম স্নেহশীলা বৌদি ও স্নেহ-পরায়ণ দাদার জন্য তো কখনও উতলা হয় না? ঘরের বাঁধন নায়কের সহ্য হয় না। সে সর্ববন্ধন-অসহিষ্ণু। বার বার সে ঘর ছেড়ে পালায়। বাইরের লোকের কাছেই সে মুহূর্তের জন্য তার হৃদয়টি পৌঁছে দেয়। কিন্তু অসংগতিসর্বস্ব এই চরিত্র ঘরছাড়া হয়েও যদি মুহূর্তের জন্য তার দাদা-বউদির স্নেহের বন্ধনে ধরা দিত, তবে এই অসংগতির ভেতর দিয়েই চরিত্রটি সংগতিসম্পন্ন হতে পারত। "অবাস্তব, অতিনাটকীয়" কাহিনীরও কতগুলি বিশ্বাস-যোগ্য সূত্র থাকে যার উপর উপাখ্যানটি দাঁড়িয়ে থাকে। নায়ক-চরিত্রকে কেন্দ্র করে এ ছবির নানা ঘটনার আবর্তনে সে-সব গ্রহণযোগ্য সূত্র যেন খুঁজে পাওয়া কঠিন।

ছবির নায়ক চরিত্রকে বিশেষ কোন ছাঁচে ফেলা যায় না। মৌলিকত্ব এই চরিত্র-কল্পনায় কিছুটা রয়েছে। কিন্তু চরিত্রটি আরও বোধগম্য হতে পারত। মৃতা স্ত্রীর ছবি দেখে সে হাসতে হাসতে না কেঁদে যদি কাঁদতে কাঁদতে হাসত তবে চরিত্রটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়ত রক্ষা পেত। যে স্ত্রীকে ঘাটে ফেলে রেখে নৌকোয় উঠে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে, হাসিই তো তার জীবনের আশ্রয়, কান্না নয়। এবং তার মানসিকতার বিচারে এই শোকোচ্ছ্বাস অস্বাভাবিক, পূর্ব-ঘটনার বিচারে প্রস্তুতি-নিরপেক্ষ। আকস্মিক পরিবেশ ও নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ার নিকষে চিত্রনাট্যকার পরিচালক-গোষ্ঠী নায়ক-চরিত্রের জটিল উপাদানের অঙ্ক মেলাতে চেয়েছেন। অঙ্কে যদি গরমিলও থেকে যায়, তবু বলব, কাহিনী বিন্যাসের নিরাভরণ রমণীয়তা ও হার্দ্যগুণ ছবিটিকে একটি সার্থক শিল্প-সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। অকারণ জটিল ব্যঞ্জনার প্রশ্রয় নেই ছবিতে, এতে আছে গল্প বলবার এক অকুণ্ঠ সারল্য। যে কারণে ছবির পাত্র-পাত্রীরা সকলেই মনে দাগ কেটে যায়, এবং সবাই অল্প অবকাশের মধ্যে একটি চরিত্র হয়ে ওঠে।

ছবির বিভিন্ন ঘটনা বিন্যাসে পরিচালক-

নায়কের জীবনের সান্নিধ্যে একটি বাক্‌শক্তি-হীনা বালিকার উপাখ্যান উপস্থাপনে পরিচালকরা আশ্চর্য সুন্দর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই বালিকা সত্যজিৎ রায়ের "পোস্ট মাস্টার" ছবির রতনের কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়কের স্ত্রী হরিমতীর চরিত্র বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় পরিচালক-গোষ্ঠীর কল্পনাশক্তি ও রসজ্ঞান ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। পরিমিতি-বোধ ছবির অংশে অংশে লক্ষণীয়। গ্রাম্য-পরিবেশ রচনা এবং ঘটনা থেকে ঘটান্তরে ছবির গতিকে স্বচ্ছন্দ করে তোলার কাজেও তাঁদের প্রয়োগ-নৈপুণ্য দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে। সর্বোপরি, সংগীত ও গান এবং কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর রসমুহূর্তের ভেতর ছবিটি সুখভোগ্য করে তোলার অনায়াস ক্ষমতা দেখিয়েছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। সবশেষে বলি ঝুমুর মেয়ে গোলাপের প্রতি জীবনপ্রেমিক ও সংগীতরসিক নায়কের আকর্ষণের মূলে জননীভাব এনে ফেলাটা সত্যিই অতিনাটকীয় কিছুটা কৃত্রিম। এই অতিনাটকীয়তা পরিচালক-গোষ্ঠী বর্জন করতে পারতেন।

নায়ক-চরিত্রের অস্বাভাবিকতা যদি কিছু থাকে তা অনুপকুমারের মর্মস্পর্শী অভিনয়ে ঢাকা পড়ে যায়। অনুপকুমার তথাকথিত "গ্ল্যামার স্টার" না হয়েও যে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিতে পারেন সে প্রমাণই তিনি ছবিটিতে দিয়েছেন। এমন প্রাণোচ্ছল সংবেদনশীল অভিনয় বাংলা ছবিতে খুব কমই দেখা গেছে। যেখানে তিনি মৃতা স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলছেন ওই মুহূর্তে তাঁর অভিনয় অবিস্মরণীয়। সত্যিই, বাংলা চলচ্চিত্র এমন একজন অভিনেতা পেয়ে ধন্য। অনুপকুমারকে নায়ক চরিত্রে নিলে ছবি চলবে না এমন সংশয় কেউ কেউ প্রকাশ করে ছিলেন। এখন তাঁদের সংশয় কেটে গেছে আশা করি।

ছবিতে সবাই চমৎকার অভিনয় করেছেন। জহর রায়, সন্ধ্যা রায় রুমা গুহঠাকুরতা অনুভা গুপ্তা—কেউ কারো চেয়ে কম যান না। যে জহর রায়কে দেখা মাত্রই দর্শকরা হেসে ফেলেন, এ ছবিতে তাঁর মনোজ্ঞ চরিত্রাভিনয় তাঁদের মুগ্ধ করবে। সন্ধ্যা রায়ের হরিমতী সরলা, চঞ্চলা পল্লীবালা, মাধুর্যের প্রতিমা। রুমা গুহঠাকুরতার ময়না তাঁর শিল্পীজীবনের এক অন্যতম কীর্তি। অনুভা গুপ্তার গোলাপ মনে দাগ রেখে যায়।

অন্যান্যদের মধ্যে সংযত, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর অভিনয় করেছেন অসিতবরন ভারতী রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ ও জহর গাঙ্গুলী। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে হরিধন মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন বসু, গঙ্গাপদ বসু ও জোছাদাশিসের অভিনয় চরিত্রোচিত। পার্শ্বচরিত্রে যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন শ্যাম লাহা, খগেশ চক্রবর্তী,

কে জি প্রোডাকশন্স-এর "কিনু গোয়ালার গলি"র গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে (বাঁ-দিক থেকে) কণ্ঠশিল্পী সবিতা চৌধুরী, চিত্রপ্রযোজক কমল ঘোষ, কণ্ঠশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, চিত্রপরিচালক ও সি গাঙ্গুলী এবং সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরী
—ফটো দেশ

সোমনাথ মণ্ডল, সুশীল দাস, ভানু, সংগীতা মুখোপাধ্যায়, স্মিতা সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবিতে সুরকার হিসেবে তাঁর সুনাম ও জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রেখেছেন। আবহসুর রচনায় সংগীত পরিচালক এ ছবিতে অসামান্য রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। গানের সুরারোপে—বিশেষ করে তরজা গান এবং ঘুমুর মেয়েদের গানে—তিনি স্মরণীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যে সুর আমরা ভুলতে বসেছিলাম, তাই যেন তিনি নতুন করে শোনালেন এবং আমাদের অন্তর জয় করলেন। ছবির সব ক'টি গানই লোকের মুখে মুখে ফিরবে। গানের কথাগুলিও সুন্দর। (মুকুল দত্ত ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)। গানের এমন রসমধুর কথা বাংলা ছবিতে আজকাল কমই শোনা যায়।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ নিখুঁত, এবং খুবই উঁচুদরের। সৌমেন্দু রায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ এ ছবির অন্যতম প্রধান সম্পদ। বংশীচন্দ্র গুপ্ত'র শিল্প-নির্দেশ এবং দুলাল দত্তের সম্পাদনা ছবিটিকে বহিরঙ্গ রূপে ও গতিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সংগীতানুলেখন (গান ও আবহ) সন্তোষজনক।

অমর প্রেমের কাহিনী

মমতাজের মৃত্যুর পর শোকার্ত শাহজাহান যদি একটি গান গেয়েই থাকেন, তাতে ক্ষতি কী। নূরজাহানকে যদি "অতিমাত্রায়" খলচরিত্রা মনে হয়, তাতেই বা কী আসে যায়। রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও কুচক্রীর পাপাচার না-হয় রইলই বা একটু বেশী মাত্রায়। "তাজমহল" (পুষ্প পিকচার্স নিবেদিত) হিন্দী ছবিটি কিন্তু তবু দর্শকদের ভাল না লাগবার কথা নয়।

ইস্টম্যান কালারে রঞ্জিত এই ছবির মাধ্যমে দর্শকরা শাহজাহান ও মমতাজের অমর প্রেমের উপাখ্যানটি আবার নতুন করে স্মরণ করবেন। কালের কপোলতলে তাজমহল একবিন্দু নয়নের জল হয়ে রইল কেমন করে, সেই উপলব্ধির কণামাত্র হয়ত ছবিটিতে নেই। কিন্তু একটি প্রেমোপাখ্যানের সুখস্বাদ ছবিটিতে রয়েছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রণয়-কাহিনীর চিত্রায়ণে শূন্যতা যদি কোথাও থেকে থাকে, রসপিপাসু দর্শক আপন মনের কল্পনা দিয়ে সেই শূন্য অংশটুকু সহজেই পূর্ণ করে নিতে পারেন।

আর যাঁরা শুধু আমোদেরই প্রত্যাশী, তাঁদের প্রত্যাশাও ছবিটি যথাসম্ভব পূর্ণ করতে সক্ষম। এতে রয়েছে নানা রঙের খেলা নাচ, গান ও কৌতুক। এবং কিছুটা রোমাঞ্চের উপকরণ। চিত্র-পরিচালক এম সাদিক এইসব উপাদানের সাহায্যে ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

বীণা রায় মমতাজের ভূমিকায় মরমী ও সংবেদনশীল অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন। প্রদীপকুমারের শাহজাহান রূপমুগ্ধ প্রেমিক, প্রাণোচ্ছল এবং সংযত। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন রেহমান, বীণা জীবন, জবীন জলিল ও মিনু মমতাজ।

সব ক'টি চরিত্রের রূপসজ্জা প্রশংসনীয়। মোগল দরবার ও রাজপ্রাসাদের আঙ্গিক-গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রোশন ছবির রাগাশ্রয়ী আবহ সুর-রচনায় কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সুরারোপিত গানগুলি জনপ্রিয় হবে। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উঁচুদরের।

কিনু গোয়ালার গলি

সন্তোষকুমার ঘোষের বহুপঠিত উপন্যাস "কিনু গোয়ালার গলি"র চিত্ররূপ প্রযোজনা করেছেন কমলা ঘোষ। কে জি প্রোডাকশনস-এর এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন ও দি গাঙ্গুলী। [illegible]
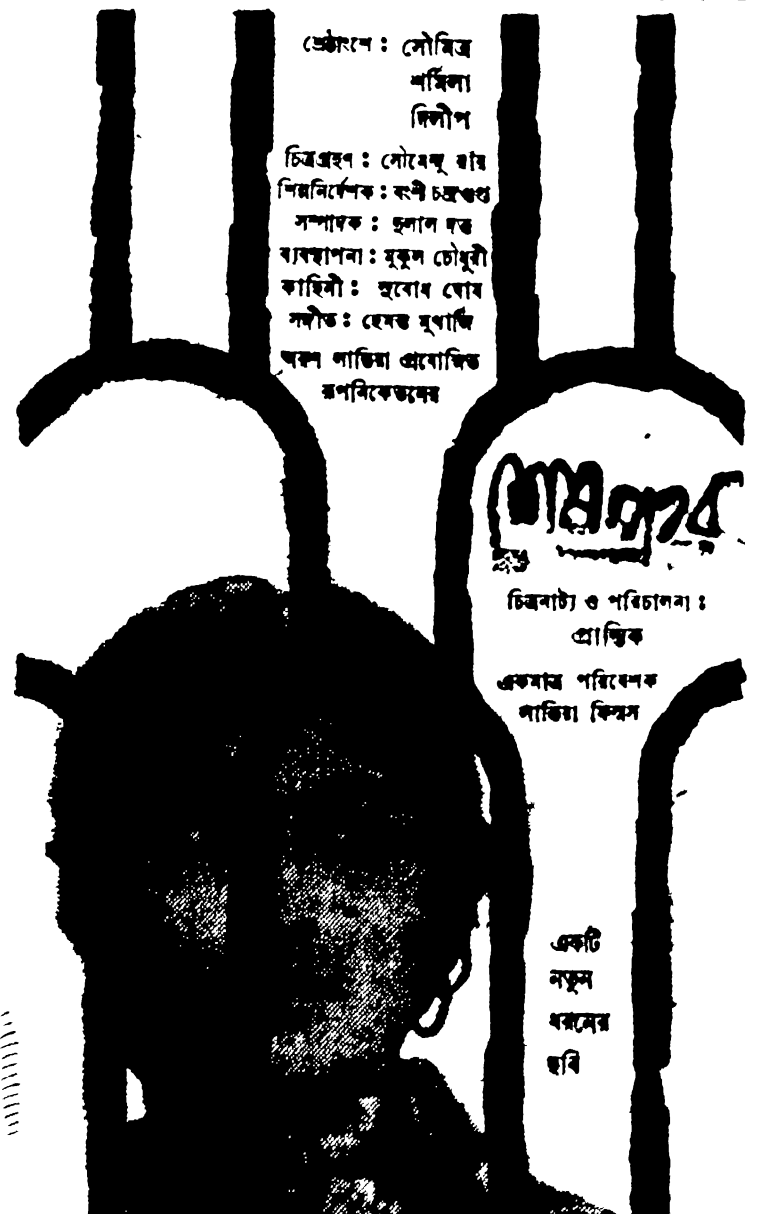
রচনা। গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ছবির সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরীর সুরে ও কথায় দুটি গান রেকর্ড করা হয়। গান দুটি গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সবিতা চৌধুরী। সুমিত্রা দেবী, শর্মিলা ঠাকুর, বিকাশ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দেবেন। আগামী মাসে নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে।

প্রতিধ্বনি

"শকুন্তলা"-খ্যাত কামরূপ চিত্রর নতুন অসমীয়া ছবি "প্রতিধ্বনি"র শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান গত ১১ই জুন ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে সম্পন্ন হয়। চেবাপুঞ্জী অঞ্চলের একটি লোকবিশ্রুত উপাখ্যানের ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হচ্ছে। ভূপেন হাজারিকা ছবিটির চিত্রনাট্যকার পরিচালক ও সংগীত-পরিচালক। ইভা আচাও পবিত্র, বরকাকতি, বিদ্যা প্রভৃতি প্রধান শিল্পী। ছবির শুভ-মুহূর্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং ক্ল্যাপস্টিক দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তপন সিংহ।

শেষ প্রহর

রূপনিকেতনের "শেষ প্রহর" অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করছে। সুবোধ ঘোষের গল্পের ভিত্তিতে ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রান্তিক গোষ্ঠী। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর ছবির তিন প্রধান শিল্পী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

"ভাগ্যই সব, প্রতিভা কিছু নয়"

সাংবাদিক বৈঠকে অভিনেত্রী তনুজা

রূপছায়া চিত্রর "দেয়া-নেয়া" ছবির প্রযোজক শ্যামল মিত্র পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিবেশক ভোলানাথ রায় আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে গত সপ্তাহে অভিনেত্রী তনুজা কলকাতার চিত্র-সাংবাদিকদের সংগে মিলিত হন। তনুজা "দেয়া-নেয়া" ছবির নায়িকার ভূমিকার অভিনয় করার জন্য প্রায় এক মাস কলকাতায় ছিলেন।

সাংবাদিকদের তনুজা বলেন, কলকাতার স্টুডিওতে শুটিং খুব দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বোম্বাইয়ে এমনটি দেখা যায় না। সেখানে একটা শট নেওয়া হয়ে যাবার পর শিল্পীদের বহুক্ষণ বসে থাকতে হয়। সকালের দিকে হয়ত একটি শট নেওয়া হল আর একটি বিকেলের দিকে। কলকাতার ঠিক উল্টো। প্রতি আধ ঘণ্টা পরেই একটি করে শট এখানে নেওয়া হচ্ছে।

কলকাতার স্টুডিও সম্পর্কে তনুজা বলেন, এখানকার স্টুডিও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো। এখানে এসে কাজ করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

কথাপ্রসংগে তিনি বলেন, কলকাতায় আমি এই প্রথম এলাম। আমাকে কেউ কেউ বলেছিলেন, বাঙালীরা খুব রাশভারী লোক এবং আত্মকেন্দ্রিক। আমার এই ধারণা কিন্তু এখানে এসে একেবারেই পাল্টে গেল। স্টুডিওতে এবং সেটে সবাই কত হাসি-খুশী মেজাজে কাজ করেন, আপনজনের মত আমার সংগে ব্যবহার করেন। আমি যে নতুন জায়গায় এসেছি, তা মনেই হয় না।

চিত্রজগতের নানা বিষয়ে আলোচনাকালে তনুজা বলেন আমি মনে করি, অন্তত চিত্রজগতে ভাগ্যই সব, প্রতিভা কিছু নয়। শিল্পীদের ক্ষেত্রেই ভাগ্যের খেলা খুব বেশী দেখা যায়। আমার তো মনে হয়, কপালে লেখা থাকলেই শিল্পী উন্নতি করেন, প্রতিভার জোরে নয়।

বাংলা ছবির প্রতি তনুজা তাঁর অনুরাগের কথা বলেন। ফাঁকে ফাঁকে এখানে কয়েকটি বাংলা ছবি তিনি দেখেছেন। বাংলার চিত্র-পরিচালক এবং শিল্পীদের প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ছবি বিশ্বাস একজন মহৎ শিল্পী ছিলেন বলে তিনি মনে করেন। আর উত্তমকুমার সম্বন্ধে বলেন, আমি তো তাঁর ফ্যান।

ভবিষ্যতেও বাংলা ছবিতে অভিনয় করার ইচ্ছা তাঁর আছে। তনুজা ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখেছেন। বাংলাও শিখতে শুরু করেছেন। ছবিতে বাংলা সংলাপ বলতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। বাংলা ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ যদি তিনি এর পরেও পান, তবে সানন্দে তার সদ্ব্যবহার করবেন বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

সাংবাদিক বৈঠকে অভিনেত্রী তনুজা
—ফটো দেশ

দ্বিজেন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত দ্বিজেন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি আগামী ১৯শে জুলাই থেকে মহাজাতি সদনে এক সপ্তাহব্যাপী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্র-গীতি পরিবেশন করবেন কবি-পুত্র স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় এবং কলকাতার অন্যান্য কৃতী কণ্ঠশিল্পী। দ্বিজেন্দ্র-কাব্য আবৃত্তি করে শোনাবেন দিলীপকুমার রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র ও তরুণ রায়। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের চারটি জনপ্রিয় নাটক

দীপান্বিতা প্রোডাকশন্স-এর "বিনিময়" (পরিচালনা : দিলীপ নাগ) ছবিতে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও কাজল চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হবে। অভিনেতৃ সঙ্ঘ নিবেদন করবেন "চন্দ্রগুপ্ত", মুখোশ সম্প্রদায় অভিনয় করবেন "সাজাহান", বিচিত্রা পরিবেশন করবেন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন "বিরহ"। তা ছাড়া তাঁর "পরপারে" নাটকটিও মঞ্চস্থ হবে। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন মহারাষ্ট্রের নাট্যকার মামা ওয়ারেরকার, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশী, গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দ্বিজেন্দ্র স্মৃতিরক্ষার্থে ব্যয়িত হবে, এবং কমিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিজেন্দ্র বক্তৃতাবলী প্রবর্তনের ব্যবস্থা করছেন।

চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীর বিদেশ যাত্রা

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী এবং দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর কর্ণধার শ্রী ভি এ পি আয়ার গত সোমবার লণ্ডন যাত্রা করেছেন। ইংলণ্ডে তাঁর স্বল্পকালব্যাপী অবস্থানকালে শ্রী আয়ার সেখানকার স্টুডিওগুলি পরিদর্শন করবেন, এবং প্রখ্যাত চলচ্চিত্রসেবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

চলচ্চিত্রে মহাত্মা গান্ধী

বৃটিশ অভিনেতা-প্রযোজক রিচার্ড অ্যাটেনবোরো ভারতে মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করবেন। শ্রী অ্যাটেনবোরো ভারত সরকারের কাছ থেকে চিত্রনির্মাণের অনুমতি পেয়েছেন। দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ছবিটি তৈরী হবে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডি এই তথ্য প্রকাশ করে বলেছেন যে, ভারত সরকার ছবির স্ক্রিপট বিশেষ যত্ন সহকারে দেখেছেন। মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের ঘটনা ছবিতে প্রথমে দেখানো হবে এবং পরে ফ্ল্যাশব্যাকে তাঁর কর্মময় জীবনের ঘটনা চিত্রায়িত হবে।

"অন্যতম কর্তব্য"

সবিনয় নিবেদন,

"দেশ"-এর গত ৭ই আষাঢ় সংখ্যায় "অন্যতম কর্তব্য" শিরোনামায় কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের ইতিহাসজ্ঞাপক স্থিরচিত্র প্রদর্শনী প্রসঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সুবর্ণজয়ন্তী বৎসর ও সে বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে বক্তব্য করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেননা, এ ব্যাপারে গত বৎসর থেকেই আমরা উদ্যোগী হয়েছি। এই ব্রিটিশ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীরই শেষ অনুষ্ঠানে বর্তমান লেখকের ভাষণে এ ব্যাপারে আমাদের উদ্দেশ্য ও তাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করার সমস্যা বিষয়ে বলা হয়েছিল, "ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই সুবর্ণ-জয়ন্তী বৎসরে একটি ভারতীয় প্রদর্শনী করতে পারলে তা সময়োপযোগী ও সুষ্ঠু হত। কিন্তু সমস্যা এই যে, ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্প তার নিজের ইতিহাস সংরক্ষণ করেনি। আজ ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের এই যে পরিচয় উপস্থিত করা সম্ভব হল, তার কারণ ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট শুধু নিজের দেশের ইতিহাস নয়, অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট অবদানগুলিকেও জাতীয় চলচ্চিত্রশালাতে সংরক্ষিত করেছেন।"

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রানুরাগীদের ও সরকারের মনোযোগ এই জাতীয় প্রচেষ্টার দিকে আকর্ষণ করার জন্যই কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির প্রচেষ্টা। ভারতীয় এবং বিশেষত বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসসূচক ১৬ মিঃ চলচ্চিত্র তৈরির পরিকল্পনা গত বৎসরে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এর জন্য চলচ্চিত্র সংগ্রহ অত্যন্ত দুঃসাধ্য বলেই বোধ হয়। কারণ, কোনো কোনো পর্যায়ের কোনো নমুনাই নেই, অন্তত আমাদের জ্ঞাতসারে। এবিষয়ে কোনো পাঠক যদি সহযোগিতা করতে পারেন, তাহলে বি-৫ ভারত ভবন, ৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা—১৩ ঠিকানায় পত্রালাপ করলে অনুগৃহীত হব। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রের অভাবপক্ষে আমরা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসজ্ঞাপক স্থিরচিত্রের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব ইণ্ডিয়ার অন্যতম কর্মী ও তার মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কালচার'-এর অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি গর্গ সংকলিত এই প্রদর্শনী বর্তমানে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং পরেই কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির মারফত এখানে প্রদর্শিত হবে। দাদাভাই ফালকের চলচ্চিত্র থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতিও এই কার্যসূচীর অন্তর্গত।

প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কিছুকাল আগে কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ভারতীয় চলচ্চিত্রের অনুষ্ঠানে "কল্পনা", "ধরতী কী লাল" ও "মোপাসাঁর"—এই তিনটি ছবি প্রদর্শিত হয়।

ইতি—

[illegible]

খেলার মাঠে

একলব্য

বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী মহিলা সোভিয়েট রাশিয়ার কুমারী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা এবং মহাকাশচারী ভ্যালেরি বিকোভস্কিকে অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

'মাস্টার অব স্পোর্টস' অর্থাৎ খেলাধুলোর মাস্টার, খেলাধুলোর যিনি অশেষ গুণের অধিকারী বা অধিকারিণী। কথা উঠতে পারে, মহাকাশযানে করে মহাকাশ ভ্রমণ কি খেলাধুলোর অন্তর্ভুক্ত? আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ক্ষেত্রে যাদের অনন্য ভূমিকা, তাঁরা কি শুধু মহাগুণান্বিত খেলোয়াড়ের সম্মান পাবেন? আর কিছু পাবেন না?

নিশ্চয়ই পাবেন। পেয়েছেনও। 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' উপাধি দেওয়ার পর মস্কোর রেড স্কোয়ারে ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভা ও ভ্যালেরি বিকোভস্কির নাগরিক সংবর্ধনার সময় রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফ জানান যে, সোভিয়েট সরকার দুজনকেই 'অর্ডার অফ লেনিন' সম্মানে ভূষিত করেছেন, আর প্রথম মহাকাশচারিণী কুমারী তেরেস্কোভার একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি মস্কোতে স্থাপন করা হবে।

সত্যি কথা বলতে গেলে মহাকাশ পরিক্রমা ঠিক খেলাধুলোর গণ্ডির মধ্যে পড়ে না, যেমন পড়ে না পর্বত আরোহণের কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা বা দুর্গম মরু অভিযান। আবার আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে এইসব অভিযান উৎকৃষ্ট ধরনের ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং ক্রীড়া কুশলতার সমগোত্রীয়। অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা, অসাধ্য সাধনের আগ্রহ এবং নতুন কিছু সৃষ্টির প্রলোভন চিরদিন মানুষের মনে বাসা বেঁধে আছে। তাই অভিযানের শেষ নেই। দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার পার, আর মহাকাশের মহা-বিস্ময় আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যেমন খেলোয়াড়ের মানসিক গঠনের প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন খেলোয়াড়ের দৈহিক পটুতা এবং খেলোয়াড়ের কলাকৌশল। খেলোয়াড়ের মন ছাড়া এ জিনিস অসম্ভব।

কুমারী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভাও মহাকাশ পরিভ্রমণের আগে ক্রীড়াপটু হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই সোভিয়েট সরকার তাকে 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' উপাধি দিয়ে সুবিবেচনার কাজই করেছেন।

এদের 'মাস্টার অব স্পোর্টস' উপাধি দেবার দ্বিতীয় কারণ বোধ করি, ওদেশের মানুষের প্রবল ক্রীড়া-প্রীতি। মনে পড়ে গতবছর মহাকাশ পরিক্রমার সময় গাগারিন প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা খেলা সম্পর্কে। মহাকাশে উঠে পৃথিবীর সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের সময় প্রথম তিনি জানতে চেয়েছিলেন মস্কোর ফুটবল খেলার ফলাফল। খেলাধুলো ওদের মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে। সুতরাং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এবং ইংলণ্ডের রাণী থেকে আরম্ভ করে সারা বিশ্বের বিজ্ঞজন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, সোভিয়েট সরকার তাকে দিয়েছেন 'মাস্টার অফ স্পোর্টস' খেতাব। দাতা এবং গ্রহীতার কাছে এ খেতাব অনন্য সম্মান হিসাবেই বিবেচিত।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলছি। আমাদের দেশেও খেলাধুলোর জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে। কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারও খেলাধুলোর উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য করছেন, শিক্ষামূলক পরিকল্পনার রূপায়নে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, মাঠ ও স্টেডিয়াম তৈরীর ব্যাপারে দিচ্ছেন নানা-ভাবে উৎসাহ। এ ছাড়া জ্ঞানী-গুণী খেলোয়াড়দের নানাধরনের সম্মানজনক উপাধি এবং অর্জুন পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করছেন। এক কথায় দেশে খেলা-ধুলোর উন্নতি সম্পর্কে তারা আর নিশ্চেষ্ট নন।

আমাদের দেশে সম্ভাবনাময় ছেলে-মেয়েরও অভাব নেই। আজ কুমারী ভ্যালেণ্টিনা তেরেস্কোভার অসাধারণ কৃতিত্বকে কেন্দ্র করে সারাপৃথিবী তোল-পাড়। কিন্তু কয়েক বছর আগে আকাশ-চারিণী হিসাবে দুটি বাঙালী মেয়ে যে মানসিক দৃঢ়তা এবং অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদের নিয়ে কিন্তু আমরা খুব হই-হই করিনি। বাঙালী ঘরের মেয়ে,

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলা আরম্ভের কিছু আগে গ্যালারি ভেঙে মাটিতে পড়ে ৪জন অত্যুৎসাহী দর্শক আহত হওয়ায় পুলিশ উৎসাহীদের গ্যালারি থেকে উৎসাহী দর্শকদের সরিয়ে দিচ্ছে

ঘরকুনো হিসাবে যাদের অপবাদ, তাদের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়, অন্তত বাঙালী ও ভারতবাসীর কাছে। আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, প্রথম প্রফেশনাল বিমান চালিকা কুমারী দূর্বা ব্যানার্জী এবং ভারতের প্রথম মহিলা প্যারাসুট জাম্পার ডাঃ গীতা চন্দ রায় বা রাজ্যের কাছ থেকে আজও কোন খেতাব পাননি। সুযোগ-সুবিধা পেলে এরাও যে মহাকাশ পরিক্রমায় অংশ নিতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

*

ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে বাংলা দেশ ১৯৬৪ সালের জাতীয় খেলাধুলো পরিচালনার ভার পেয়েছে, এটা সুখবর। আরও সুখবর, এখন থেকেই তার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে এবং আই এফ এ-র সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি স্বনামধন্য সংগঠক শ্রীঅতুল্য ঘোষ জাতীয় খেলাধুলো পরিচালনার জন্য পরিচালক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরই পরামর্শে কার্যকরী সমিতি এবং বিভিন্ন সাব-কমিটিও গঠিত হয়েছে, যার মধ্যে আছেন খেলাধুলোর পরিচালক এবং শহরের বহু গণ্যমান্য সংগঠক। আশা করা যায় এবার সুষ্ঠুভাবে এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় দেড় লাখ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের সাধ্যমত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ঠিক হয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ থেকে মার্চের ১লা তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে জাতীয় খেলাধুলো অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত অ্যাথলেটিকস, ভলিবল, কাবাডি, খোকো, মল্লযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা, জিমন্যাস্টিকস ও মুষ্টিযুদ্ধ, এই ৯টি খেলাধুলো জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিন্তু পরিচালক সমিতির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের কথা: যখন নামে 'জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান' তখন সব খেলাধুলো এর অন্তর্ভূক্ত হবে না কেন? ফুটবল এবং হকি কেন বাদ যাবে?

সেই অনুসারে জাতীয় ফুটবল এবং জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা, জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচালনা করবার এক পরিকল্পনা আছে। এই মর্মে ফুটবল এবং হকি সংস্থার কাছে চিঠিও পাঠান হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, অন্যান্য খেলাধুলোর সঙ্গে ফুটবল এবং হকির জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হলে যে মাঠের প্রয়োজন হবে ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রিকেট মরসুমে সে মাঠ পাবার পক্ষে নানা অন্তরায় দেখা দেবে। অবশ্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন তবে তাও সম্ভব হতে পারে। এখন ফুটবল ফেডারেশন রাজি হলে হয়। এই সপ্তাহেই কলকাতায় ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভা। সেই সভাতেই জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার স্থান কাল সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সঙ্গে যদি ফুটবল এবং হকি দুটি বড় খেলার ব্যবস্থা নাও করা যায় তবে অন্তত একটির ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং সেটি ফুটবলের জাতীয় অনুষ্ঠান হলেই ফুটবল-প্রিয় বাংলার জনসাধারণ সন্তুষ্ট হয়।

১৯৬৪ সালের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদদের গুণাগুণের ভিত্তিতে টোকিও অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে। তা ছাড়া বাংলার দিক দিয়েও এর গুরুত্ব কম নয়। দীর্ঘ ২৫ বছর পরে বাংলায় জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসছে। ১৯৩৮ সালে কলকাতার টেলা পার্কে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর মাত্র একবার অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে কলকাতার ইডেন উদ্যানে শুধু জাতীয় অ্যাথলেটিকসের আসর বসেছে। সামগ্রিকভাবে জাতীয় খেলাধুলোর আসর বসেনি।

অ্যাথলেটিক স্পোর্টস বাংলায় মোটেই জনপ্রিয় নয়। তার কারণ প্রধানত দুটি। প্রথম কারণ এখানে অ্যাথলেটিকসের চর্চা কম। ফুটবল ক্রিকেটের দিকেই ঝোঁক বেশি। দ্বিতীয় কারণ, সম্ভাবনাপূর্ণ অ্যাথলীটের অভাব। ১৯৬৪ সালের জাতীয় অ্যাথলেটিকস বাংলার অ্যাথলীটদের মধ্যে কিছুটা অনুপ্রেরণাও আনতে পারে।

হিসাব ধরা হয়েছে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সময় কলকাতায় আড়াই হাজারের মত ক্রীড়াবিদের সমাগম ঘটবে। ফুটবল বা হকি অন্তর্ভুক্ত হলে প্রতিযোগীদের সংখ্যা হবে আরও বেশি। এর জন্য খরচ হবে প্রায় দেড় লাখ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁদের সাধ্যমত সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের স্থানও উপযুক্ত, এখানে প্রায় ৩০ হাজারের মত দর্শকের বসবার ব্যবস্থা আছে। ইতিপূর্বে নিখিল ভারত স্কুল গেমস এবং গত শীতকালে ভারত জার্মান অ্যাথলেটিক টেস্ট ছাড়া রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এ পর্যন্ত কোন বড় ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসেনি। ১৯৬৪ সালের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানই হবে ঐ সুন্দর স্টেডিয়ামের সর্বপ্রথম বড় অনুষ্ঠান।

*

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম সম্বন্ধে আরও একটি কথা। কলকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এত টাকা ব্যয় করে অমন সুন্দর একটি স্টেডিয়াম তৈরী করলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত ব্যবহার নেই। অথচ স্টেডিয়াম স্টেডিয়াম করে আমরা সব সময় চীৎকার করে মরছি।

এই যে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল লীগের চারিটি খেলা দেখার টিকিটের জন্য এত হাহাকার। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে এই খেলার ব্যবস্থা করলে তো প্রায় দ্বিগুণ দর্শক খেলা দেখার আশা মেটাতে পারতেন। ময়দানের মাঠে সতেরো, সাড়ে সতেরো হাজারের বেশি দর্শকের স্থান নেই। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার ঐ সুরম্য স্টেডিয়ামে ৩০ হাজার দর্শক বসে খেলা দেখতে পারেন। তাছাড়া ময়দানের খেলায় দুর্ঘটনা তো লেগেই আছে। কয়েক বছর আগে খেলা দেখার সময় অত্যুৎসাহী দর্শকদের মধ্যে একজন গাছ থেকে পড়ে গিয়ে জীবনের খেলা শেষ করেছেন। এই সেদিনও ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলা আরম্ভের আগে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে ৪ জন দর্শক আহত হয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার ঐ স্টেডিয়ামে বড় খেলার ব্যবস্থা করলে এসব বিপদ কমে যায়। বেশি লোক খেলাও দেখতে পারে। অবশ্য গাছে চড়া যাদের স্বভাব তাদের ঠেকিয়ে রাখা দায়। স্টেডিয়াম তৈরী হলেও তারা গাছে চড়বে তবু আশঙ্কা কমে যাবে।

শুধু বড় খেলা কেন, মাঝারি ধরনের

ফুটবলের কয়েকজন ফুলব্যাকের খেলায় বিশিষ্ট ভঙ্গি
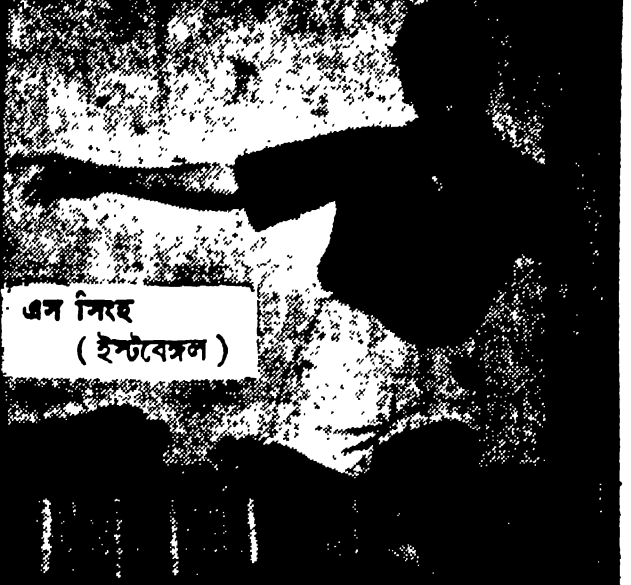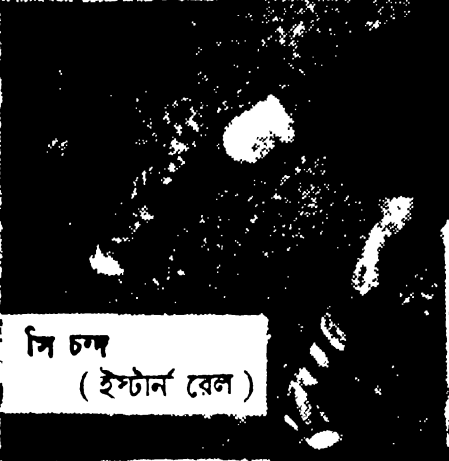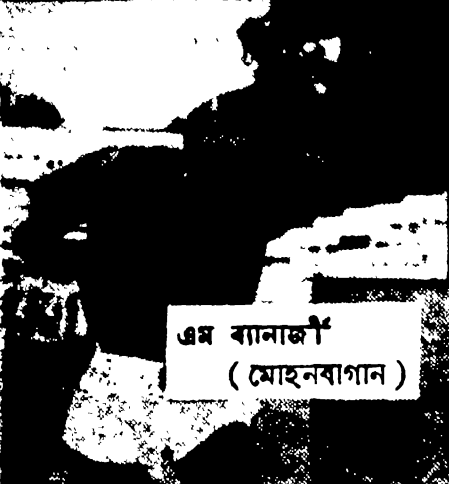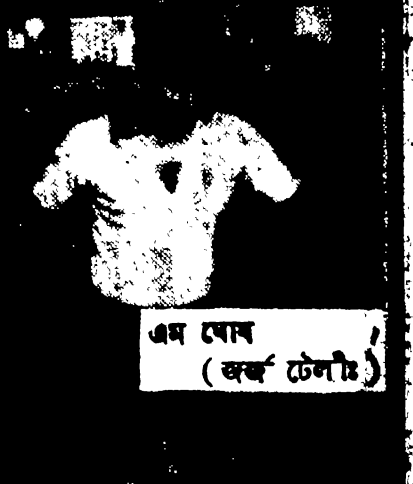
ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলায় অমিয় ব্যানার্জী ও অরুময়কে একটি বল আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে —ফটো দেশ

কিছু কিছু লীগের এবং নক আউটের খেলাও তো রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে হতে পারে। তাতে মাঠের সুরাহা হয়, আর একটি কেন্দ্রে খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ে, মেয়েরাও বিনা সঙ্কোচে মাঠে হাজির হতে পারে খেলা দেখবার জন্য। কিন্তু তা নাকি হবার নয়।

কারণ আই এফ এ-র সংবিধান। আই এফ এ-র সংবিধানে নাকি আছে কলকাতা ময়দানে খেলা হবে।

হায়রে সংবিধান! যে সংবিধানকে প্রতি-নিয়ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হচ্ছে। উঠা-নামার বিধান থাকা সত্ত্বেও অতীতে সংবিধানকে সংহার করে অবাঞ্ছিতকে প্রথম ডিভিসনে স্থান দেওয়া হয়েছে তার আবার সংবিধানের বড়াই।

কে না জানে, কলে কৌশলে ছলে বলে একাধিক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিতকে প্রথম ডিভিসনে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কলকৌশল নানা ধরনের। মাঠের বাইরে খেলার ফলাফল গড়া-পেটা করা, যাদের কাছ থেকে প্রয়োজনমত পয়েন্ট পাওয়া যাবে তাদের সঙ্গে পরে খেলার ব্যবস্থা রাখা, রেফারীর পোস্টিং ইত্যাদি। ছলেরও অন্ত নেই। নীচের দিকে তিনটি ক্লাবের সমান পয়েন্ট। কে নামবে তার জন্য আবার খেলার প্রয়োজন। সুতরাং গড়িমসি করতে করতে মরসুম কাবার। শেষ পর্যন্ত সংবিধান পরিবর্তন। প্রথম ডিভিসনে একটি ক্লাবের সংখ্যাধিক্য। আর বল? সব সময়ই ভোটের জোর। দিনকে রাত, রাতকে দিন করার বাধা কোথায়? এদের আবার সংবিধানের প্রতি সম্মান! সব ক্ষেত্রেই দেখেছি ভালর ব্যাপারে কুণ্ঠা, মন্দের ক্ষেত্রে আগ্রহ।

*

লীগের একটি খেলা এবং প্রথমার্ধ লীগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ খেলার আলাপ আলোচনা, গুজব গবেষণা এবং ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করেই গত সপ্তাহে ফুটবল উৎসাহীদের সময় কেটেছে

আপনার যা কিছু প্রিয়
সেগুলি বাঁচানোর জন্যই
আরও সঞ্চয় করুন।

এবং খেলার ফলাফল মীমাংসার পরও তার জের মেটেনি। বলা বাহুল্য, দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলাকে কেন্দ্র করেই এই গবেষণার সৃষ্টি হয়েছিল।

খেলাটিতে মোহনবাগান ৩—০ গোলে জয়ী হয়ে লীগ কোঠায় এক ধাপ এগিয়ে গেছে। মরসুমের দ্বিতীয় পরাজয় এবং মোট পাঁচটি পয়েন্ট নষ্ট করে ইস্টবেঙ্গল বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে।

খেলায় মোহনবাগানের জয় ক্রীড়াধারার সঙ্গতিসূচক ফলাফল, কিন্তু তিন তিনটি গোলে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় তাদের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। অপ্রত্যাশিত ফলাফলও ঘটে। তিনটি গোলের মধ্যে দুটি গোলের জন্য ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক কে সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা চলে। প্রথম গোলের ক্ষেত্রে চুণী গোস্বামীর বিশ বাইশ গজ দূরের সাধারণ সটে গোল লাইনের উপর স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে থেকে পরাজিত হন। তৃতীয় ও শেষ গোলের সময় তার হাত থেকে মাটিতে বল পড়ে যাবার পর জারনেল সিং অতি সহজে এবং বিনা বাধায় গোলের মধ্যে বলটি ঠেলে দেন।

এর আগে ইস্টার্ন রেল ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার সময় কে সরকারকে একই ধরনের দূরের সটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেতে দেখা গিয়াছে। সে ক্ষেত্রেও তিনি যেমন দৃষ্টি অবরোধের নজির দেখিয়েছিলেন, মোহন-বাগানের সঙ্গে খেলায় ক্ষেত্রেও সেই ওজর দেখান। অর্থাৎ গোল হবার পর বেশ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাক এস সিংহের দিকে আঙ্গুল তুলে বলবার চেষ্টা করেন তার দ্বারা সরকারের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। বলি-হারি ওজর। গোলকিপার কি বলতে চান প্রতিপক্ষ বল নিয়ে এগিয়ে আসার সময় তাকে কেউ বাধা না দিয়ে দূরে সরে থাকবেন? সামনে মাত্র একজন খেলোয়াড়, তাও বিশ বাইশ গজ দূরে। এক্ষেত্রে যদি দৃষ্টির সাময়িক অবরোধ ঘটেও তবে গোল-কিপারেরই সরে গিয়ে ভাল জায়গায় দাঁড়ান উচিত, যাতে ভালভাবে বল দেখতে পান। কিন্তু কে সরকারকে সে চেষ্টা আদৌ করতে দেখা যায়নি।

মোহনবাগান ৩—০ গোলে জেতার পর ওদের ভুল-ত্রুটি ধরা একটু বে-মানান ঠেকতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ক্রীড়ানৈপুণ্যে মোহনবাগানও দর্শকদের খুশী করতে পারেনি। আমার নিজের ধারণা লেফট আউট অরুময় মোহন-বাগানের সব চেয়ে বিপজ্জনক এবং ক্ষিপ্রগতি খেলোয়াড়। কিন্তু অরুময়কে দিয়ে মোহন-বাগান এইদিন আক্রমণের চেষ্টা করেনি। মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটিও ইস্ট-বেঙ্গল ব্যাক এস সিংহের ভুলের খেসারত জারনাল সিংয়ের পাস করা বল এস সিংহ ভুলভাবে হেড করায় বলটি এস নন্দীর আয়ত্তে যায় এবং তিনি দর্শনীয় সটে গোল করেন।

আমি বহুবার বলেছি খেলায় জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে একটু ভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য জড়িত থাকে। মোহনবাগান যোগ্য দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে মোহন-বাগান যেমন খেলেছে বি, এন রেলের সঙ্গে তার চেয়ে অনেক ভাল খেলেও হেরে গেছে। সেখানে ছিল মোহনবাগানের দুর্ভাগ্য।

ফুটবলের আইন-কানুন

মুকুল

রেফারীদের কর্তব্য, করণীয় এবং ক্ষমতা সম্বন্ধেই ফুটবল আইনের ৫ নম্বর ধারা। আগেই বলেছি, খেলার মাঠে তাঁদের সম্রাটের সম্মান। কিন্তু রেফারীদের মানসিক দৃঢ়তা, শারীরিক পটুতা, ন্যায়-পরায়ণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সর্বোপরি তীক্ষ্ম সাধারণ জ্ঞানের উপর তাদের সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে। কোনটি ইচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবল, কোনটি নয়; কোন ক্ষেত্রে শাস্তি দিলে অপরাধীপক্ষই লাভবান হয়, কোন খেলোয়াড়ের অফসাইডে অবস্থান প্রতিপক্ষের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে কিনা কিংবা অফ্‌সাইডে থেকে তিনি কোন সুযোগ নিচ্ছেন কিনা—এ সবই রেফারীকে নিজ বিচারবুদ্ধিমত ঠিক করতে হয়। এবং সেই বিচারবুদ্ধির উপরই তাঁর সুনাম নির্ভর করে। রেফারীদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই লেখার আছে। পরে লেখা যাবে। এখন ৫ নম্বর আইনের ধারাগুলি আলোচনা করা যাক।

৫ নম্বর আইন—রেফারী

মূল আইন—প্রতি খেলার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবার জন্য একজন রেফারী নিযুক্ত হবেন। তাঁর করণীয় কাজ হচ্ছে:—

(এ) তিনি আইনগুলো কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এবং কোন বিতর্কমূলক বিষয়ের উদ্ভব হলে তার মীমাংসা করবেন। খেলার ফলাফল নির্ধারণে খেলা সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 'কিক-অফের' সঙ্কেত দেবার সময় থেকে খেলার উপর তাঁর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় এবং খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকে কিংবা বল খেলার বাইরে চলে যায় তখনও তাঁর শাস্তি দেবার ক্ষমতা থাকে। তিনি অবশ্য সেসব ক্ষেত্রে দণ্ড দেবেন না, যেসব ক্ষেত্রে ঠিকভাবে বুঝবেন যে, দণ্ড দিলে অপরাধী পক্ষই সুযোগ-সুবিধা পাবে।

(বি) তিনি খেলার একটা হিসাব (রেকর্ড) রাখবেন; সময়-রক্ষকের কাজ করবেন; পুরো সময় বা চুক্তিমত সময় খেলা চালাবেন এবং আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা অন্য কারণে সময় নষ্ট হলে খেলার সঙ্গে সে সময়টা যোগ করবেন।

(সি) কোন নিয়মভঙ্গের জন্য খেলা থামাবার এবং অপরিহার্য কারণে, দর্শকদের বাধাদানে বা অন্য কোন কারণে যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার বা একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্য নিজ বিবেচনামত তাঁর কাজ করবার অবাধ অধিকার থাকবে। এসব ক্ষেত্রে যে জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন বা যে অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে খেলা হচ্ছিল সেই অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ঘটনার দুই দিনের মধ্যে (রবিবার বাদে) রেফারী ঐ বিষয়ে বিবরণ (রিপোর্ট) পেশ করবেন। সাধারণ ভাকে পাওয়া গেলেও রিপোর্ট ঠিকমত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

ইন্‌-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের ক্ষেত্রে রেফারীর সঙ্কেত দেবার পদ্ধতি। কোনদিকের কিক সেটা নির্দেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে ইনডিরেক্ট কিকের সঙ্কেত জানিয়ে পরে বাঁশী বাজিয়ে কিকের নির্দেশ দিতে হয়। ডিরেক্ট ফ্রি কিকে সঙ্কেতের প্রয়োজন নেই। (চিত্র—ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গাইড ফর রেফারীজ এণ্ড লাইন্সমেন)

(ডি) খেলার মাঠে প্রবেশ করবার সময় থেকে, অসৎ আচরণ বা অভদ্র ব্যবহারে দোষী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবার ক্ষেত্রে এবং ঐ খেলোয়াড় যদি আবার অসৎ আচরণ বা অভদ্র ব্যবহার করে তবে তাঁকে খেলায় অংশ গ্রহণে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে রেফারীর নিজ বিচারবুদ্ধিমত কাজ করবার অবাধ অধিকার থাকবে। এসব ব্যাপারেও রেফারী ঘটনার পর দুই দিনের মধ্যে (রবিবার বাদে) জাতীয় অ্যাসোসিয়েশন বা সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে অপরাধী খেলোয়াড়ের নাম পাঠিয়ে দেবেন। সাধারণ ভাকে পাওয়া গেলেও রিপোর্ট ঠিকমত করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(ই) খেলোয়াড় ও লাইন্সম্যান ছাড়া বিনা অনুমতিতে রেফারী আর কাউকে খেলার মাঠে ঢুকতে দেবেন না।

(এফ) কোন খেলোয়াড় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বলে যদি রেফারী মনে করেন তবে তিনি খেলা থামাবেন; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আহত খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে সরাবার ব্যবস্থা করবেন এবং একটুও দেরি না করে তখনই আবার খেলা আরম্ভ করবেন; যদি কোন খেলোয়াড় সামান্য রকমের আঘাত পান তবে যতক্ষণ খেলায় ছেদ না পড়ে অর্থাৎ বল 'আউট অফ প্লে' না হয়, ততক্ষণ খেলা বন্ধ হবে না; যে খেলোয়াড় সাহায্য বা কোন রকমের শুশ্রূষার জন্য টাচ-লাইন বা গোল-লাইনের বাইরে যেতে সক্ষম, মাঠের মধ্যে তার শুশ্রূষা করা হবে না।

(জি) মারাত্মক ধরনের আচরণে অভিযুক্ত খেলোয়াড়কে আগে সতর্ক করা ছাড়াই, রেফারীর নিজ বিবেচনামত, তার খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার অবাধ ক্ষমতা থাকবে।

(এইচ) সমস্ত ক্ষেত্রে খেলা থামাবার পর আবার খেলা আরম্ভের আগে রেফারী খেলা আরম্ভের নির্দেশ দেবেন।

(আই) খেলার বলটি ২ নম্বর আইন অনুযায়ী নিয়মমাফিক আছে কি না, রেফারী সেটা ঠিক করবেন।

৫ নম্বর আইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত

(১) আন্তর্জাতিক খেলায় রেফারীকে এমন রঙের ব্লেজার বা জ্যাকেট পরতে হবে, প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের পরা জামার রঙের সঙ্গে যার যথেষ্ট পার্থক্য থাকবে।

(২) যদি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ নিজ নিজ দেশের রেফারী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সম্মত না হয়, তবে আন্তর্জাতিক খেলায় নিরপেক্ষ দেশ থেকে রেফারী নির্বাচন করতে হবে।

(৩) আন্তর্জাতিক রেফারীর তালিকা-ভুক্ত এবং অনুমোদিত রেফারীদের মধ্যে থেকে অবশ্যই একজনকে নির্বাচন করতে হবে। এই ধারা অ্যামেচার এবং আন্ত-র্জাতিক যুব উৎসবের খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(৪) ফুটবল আইন খেলার মাঠে রেফারীকে যে ক্ষমতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের যে অধিকার দিয়েছে 'কিক-অফে'র সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিকার আরম্ভ হয়। তাঁর নিজ বিবেচনামত কাজ করবার ক্ষমতা আরম্ভ হয় যখন তিনি মাঠে প্রবেশ করেন তখন থেকে। ফলে দোষী খেলোয়াড়কে খেলা আরম্ভের আগে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে।

(৫) লাইন্সম্যানরা রেফারীর সাহায্য-কারী। এমন কোন ক্ষেত্রে রেফারী লাইন্স-ম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করবেন না, যে ক্ষেত্রে রেফারী নিজেই ঘটনাটি দেখেছেন এবং মাঠের মধ্যে তিনি যেখানে ছিলেন সেখান থেকে ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করতে পেরেছেন। এ সত্ত্বেও রেফারী লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করতে পারেন, যদি লাইন্সম্যান নিরপেক্ষ হন এবং রেফারী গোলও নাকচ করতে পারেন, যদি গোল হবার অব্যবহিত আগের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা লাইন্সম্যান রেফারীকে জানান।

(৬) রেফারী অবশ্য আবার খেলা আরম্ভ করার আগেই কেবল তাঁর প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন।

(৭) অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্তের নির্দেশ দিলে যেখানে প্রতিপক্ষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন সেখানে রেফারী যদি অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ না দিয়ে খেলা চলতে দেন এবং প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ (অ্যাডভান্টেজ) গ্রহণ না করেন তবে রেফারী আবার কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। এমন কি, হাবেভাবে প্রতি-পক্ষকে এই সুযোগ দেবার সঙ্কেত না জানানো সত্ত্বেও আগের না-দেওয়া শাস্তি পরে দেওয়া চলে না। তবে অপরাধী খেলোয়াড় কিন্তু রেফারীর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না।

[একটা উদাহরণ দিচ্ছি : মোহনবাগানের চুনী গোস্বামী সব বাধা কাটিয়ে গোল করতে যাচ্ছেন, এমন সময় ইস্টবেঙ্গলের ব্যাক দেবনাথ পেনাল্টির বাইরে চুনীকে মারাত্মক ফাউল করলেন, যা ধরুন, ঘুষি মারলেন, কিন্তু বল রইল চুনীর দখলে—গোলের সম্ভাবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রেফারী দেবনাথের বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দিলেন না, গোল করার অ্যাডভান্টেজ দিলেন; কিন্তু চুনীর পা থেকে বলটি বেরিয়ে গেল গোলেরও সুযোগ চলে গেল।

এ ক্ষেত্রে কি রেফারী দেবনাথের বিরুদ্ধে না-দেওয়া ফাউলের সিদ্ধান্ত পরে দেবেন? নিশ্চয়ই না। তবে মারাত্মক ফাউল করার জন্য দেবনাথকে তিনি মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন।]

(৮) খেলার আইনগুলির উদ্দেশ্য : যত-টুকু সম্ভব কম হস্তক্ষেপে খেলা চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই কথা মনে রেখে রেফারীদের উচিত কেবল ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে দণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়া। তুচ্ছ খুঁটিনাটি কারণে এবং সন্দেহজনক নিয়মভঙ্গের ব্যাপারে প্রতিনিয়ত বাঁশী বাজালে খেলোয়াড়দের মন্দ ধারণা জন্মে, তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় এবং দর্শকদের আনন্দ নষ্ট করে।

(৯) ৫ নম্বর আইনের 'সি' প্যারা অনুযায়ী, বড় রকমের বিশৃংখল ঘটনার সময় রেফারীকে খেলা বন্ধ করে দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন দলকে নাকচ করে দেওয়া বা সেই কারণে খেলায় পরাজিত করার ক্ষমতা বা অধিকার রেফারীর নেই। রেফারী অবশ্যই বিশদ বিবরণ দিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন। এ সম্পর্কে যা কিছু ব্যবস্থা অব-লম্বনের অধিকার একমাত্র উপযুক্ত কর্তৃ-পক্ষের।

(১০) যদি কোন খেলোয়াড় একই সময়ে ভিন্ন রকমের দুটি আইন ভঙ্গ করে তবে যে অপরাধ বেশী গুরুতর, রেফারী তার জন্য দণ্ড দেবেন।

(১১) যে-সমস্ত ঘটনা রেফারীর নিজের দৃষ্টিতে না আসে সেসব ক্ষেত্রে রেফারীর নিরপেক্ষ লাইন্সম্যানের নির্দেশমত কাজ করা উচিত।

(১২) রেফারী না ডাকলে খেলা চলার সময় ট্রেনাররা কোন ক্ষেত্রেই মাঠে প্রবেশ করবেন না। এবং ট্রেনাররা বা ক্লাবের কর্ম-কর্তারা মাঠের সীমারেখার পাশ বরাবর খেলোয়াড়দের শিক্ষা বা নির্দেশ দেবেন না।

রেফারীদের প্রতি উপদেশ

আপনি এমনভাবে খেলা পরিচালনা করবেন যে, খেলোয়াড় ও দর্শকদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন :—

(এ) প্রত্যেক নিয়ম খুব ভালভাবে শিখুন ও বুঝুন।

(বি) প্রত্যেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ হবেন।

(সি) শিক্ষা, অনুশীলন এবং শারীরিক পটুতা বজায় রাখবেন।

কোন কোন সময়ে খেলোয়াড় ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করে; তাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

[একটি উদাহরণ : যেমন দলটি ১—০ গোলে জিতছে, গোলরক্ষক বল হাতে নিয়ে মাটিতে ড্রপ দিচ্ছেন, আবার হাতে নিয়ে টালবাহানা করছেন। এ ক্ষেত্রে গোলরক্ষককে সতর্ক করা যেতে পারে। কিংবা ফ্রি কিক করবার সময় এখানে ওখানে বল বসিয়ে ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং বার বার বিনা কারণে বাইরে বল মারার ক্ষেত্রেও সতর্ক করা যেতে পারে।]

খারাপ আবহাওয়ার দরুন খেলা সাময়িক স্থগিত রাখা বা একেবারে বন্ধ করে দেবার ক্ষেত্রে খুব ভালভাবে বিচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

যখন কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করবেন তখন তার নাম জেনে নেবেন এবং সহজভাবে বলবেন যে, "আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে, এবং আবার যদি আপনি অসৎ ব্যবহারের জন্য দোষী বিবেচিত হন, তবে আপনাকে মাঠের বাইরে যাবার জন্য আদেশ দেওয়া হবে।"

কোন খেলোয়াড়কে যদি সতর্ক করেন তবে কি জন্য কি করেছেন তা লিখে রাখবেন। রেফারী যদি তাঁর দেখা কোন অসৎ আচরণের রিপোর্ট না পাঠান এবং কাউন্সিল যদি ঠিকভাবে প্রমাণ পান যে, এই অসৎ আচরণ সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন তবে রেফারীই সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতে পারেন।

খেলার আগে এবং হাফ-টাইমে লাইন্স-ম্যানের সঙ্গে আপনার ঘড়ি মিলিয়ে নেবেন।

খেলার রেকর্ড রাখবার জন্য কেবল আপনার স্মৃতিশক্তিকে বিশ্বাস করবেন না। খেলা আরম্ভের সময় এবং যদি অতিরিক্ত সময় খেলানোর প্রয়োজন না হয়, তবে কখন হাফটাইম হবে, কখন খেলা শেষ হবে, এসব কাগজে টুকে রাখবেন।

যেমন যেমন গোল হবে তাও লিখে রাখবেন।

এই আইনের 'এফ' ধারা ঠিকভাবে পালন করতে হবে।

সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ

যাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাব খেলার আগে, খেলার সময়, খেলার পরে এবং রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মাঠ ছেড়ে যাবার সময় রেফারী ও লাইন্সম্যানদের ভালমন্দ এবং নিরাপত্তার জন্য দায়ী।

কুখ্যাত চরিত্রের লোকদের মাঠে প্রবেশ-অধিকার দেওয়া উচিত নয়। এই মর্মে পোস্টার প্রভৃতি টাঙাবেন যাতে লেখা থাকবে—"কোন দর্শক রেফারীর প্রতি কোনো রকম অসৎ ব্যবহার করলে তাকে তখনই মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হবে।"

বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ জরুরী অবস্থা ছাড়া অবশ্যই তালিকাভুক্ত রেফারী-দের মধ্য থেকে রেফারী নির্বাচন করবেন।

রেফারীর বিশেষ অনুমতি ছাড়া ট্রেনাররা খেলার মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবেন না।

খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ

রেফারীর সিম্ধান্তের উপর কখনও প্রশ্ন করবেন না। কারণ খেলা সম্পর্কীয় ঘটনার যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁর সিম্ধান্তই চূড়ান্ত।

যদি কোন বিতর্কের উদ্ভব হয় তবে রেফারীর মতকেই সমর্থন করবেন।

খেলার মাঠের বাইরে রেফারীর প্রতি কোন রকমের অসৎ ব্যবহারকে খেলার মাঠের মধ্যেই করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

যদি আপনি সামান্য ধরনের আঘাত পান তবে নিজের প্রতি রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন না। কোন গুরুতর-রকমের দুর্ঘটনায় আপনার যাতে শুশ্রূষা হয় সেটা রেফারীই দেখবেন।

চিঠিপত্র

(১) **সজল ভট্টাচার্য,** শশিভূষণ চ্যাটার্জি লেন, টালা, কলকাতা—২।

প্রশ্ন : পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে গোলকিপার বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে ফাউল করলে পেনাল্টি হয় না, ফ্রি কিক হয়?

*** উত্তর :** পেনাল্টি-যোগ্য ফাউল হলে পেনাল্টি হয়।

অন্যান্য খেলোয়াড়ের সঙ্গে গোলকিপারের আর কোনই পার্থক্য নেই, শুধু গোলকিপার নিজের পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বল খেলতে পারেন, আর নিজের গোল এরিয়ার মধ্যে তাঁর কিছু রক্ষাকবচ আছে।

আপনার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর আইন-কানুনের আলোচনার মধ্যে পাবেন। তবে মোটামুটি জেনে রাখুন : পেনাল্টি কিক না হওয়া পর্যন্ত গোলকিপারের পদচালনা করবার বিধান নেই। আর মাটির উপর দিয়েই হোক বা শূন্যেই হোক, বল মাঠের সীমারেখা অতিক্রম করলে সে বলকে খেলার বাইরে অর্থাৎ 'আউট অফ প্লে' বলে গণ্য করতে হবে।

(২) **ননী দাস,** পাথারকান্দি কাছাড়।

প্রশ্ন : গোলকিপার একটি শট ধরলেন, তারপর ৪ স্টেপ গিয়ে বল ড্রপ দিয়ে কিক করলেন। এটা কি ফাউল? যদি পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে এ রকম ঘটে তা হলে পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া যায় কি?

*** উত্তর :** আপনার হাতের লেখা দেখে মনে হয় না আপনার বয়স কম। কিন্তু প্রশ্নটি নেহাত ছেলেমানুষের।

কেন ফাউল হবে? বল ধরে গোলকিপারের ৪ স্টেপ যাবার অধিকার আছে, অবশ্যই পেনাল্টি সীমার মধ্যে। পঞ্চম স্টেপ বে-আইনী।

গোলকিপার বল ধরে ৪ স্টেপের বেশী গেলে পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়ার বিধান নেই। ইনডিরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দিতে হবে।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আইনের আলোচনার মধ্যেই পাবেন। হ্যাঁ, রেফারী প্রথমে হাত তুলে এবং পরে বাঁশী বাজিয়ে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবেন। ডিরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। সাধারণভাবে বাঁশী বাজিয়ে নির্দেশ দিতে হবে।

(৩) **পাথিকরঞ্জন রায়,** হিজলপুকুরিয়া, ২৪ পরগণা।

প্রশ্ন : কোন খেলোয়াড় গোল দেবার উপক্রম করছেন, তখন রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড় তাঁকে ধরে রাখা বা ধাক্কা মারা সত্ত্বেও যদি গোল হয় তবে রেফারী গোল দেবেন, না, রক্ষণকারী দলের বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দেবেন?

*** উত্তর :** গোল দেবেন।

এ ক্ষেত্রে রক্ষণকারী দলের বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দিলে দোষী পক্ষই লাভবান হবে। তাই রেফারী এমন কোন নির্দেশ দেবেন না যাতে দোষী পক্ষ লাভবান হয়।

(৪) **প্রশান্ত রায়,** আসানসোল।

প্রশ্ন : ধরুন, একজন খেলোয়াড় বিপক্ষ গোলে শট করল কিন্তু বলটি রেফারীর গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করল। এ ক্ষেত্রে কি হবে? গোল হবে কি?

*** উত্তর :** গোল হবে। রেফারীর গায়ে, এমনকি, লাইন্সম্যান যদি মাঠের মধ্যে থাকেন তবে তাঁর গায়ে বল লাগলেও আইনে খেলা থামাবার বা কোন নির্দেশ দেবার বিধান নেই।

(৫) **হৃষীকেশ ঘোষ,** গুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ।

*** উত্তর :** প্রতিবাদপত্র অথবা গোল, কোনটা নাকচ করবেন সেটা আপনাদের সিম্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

আমি তো এক্ষেত্রে রেফারীর কোন ত্রুটি দেখছি না। তিনি বাঁশী বাজিয়ে ডিরেক্ট ফ্রি কিক করার সংকেত দিয়েছেন। ইন-ডিরেক্ট ফ্রি কিক হলে প্রথমে হাত তুলে পরে বাঁশী বাজিয়ে কিক করার সংকেত দেবার নিয়ম। আপনাদের ওখানে যদি সে নিয়ম চালু না হয়ে থাকে আর কোন ধরনের কিক সে সম্বন্ধে যদি কোন পক্ষের সন্দেহ থাকে তবে তাঁরা রেফারীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। জিজ্ঞাসা করা না হলে রেফারী কোন কিক দিচ্ছেন, ডিরেক্ট কি ইন-ডিরেক্ট তা বলার দায়িত্ব রেফারীর নেই।

গত সপ্তাহের প্রশ্নের উত্তর

(১) জলকাদার মাঠে বলের ওজন ভারী হওয়া স্বাভাবিক। খেলা আরম্ভের সময় যদি বলের ওজন ১৬ আউন্সের মধ্যে থেকে থাকে তবে বল বদল হবে না।

(২) গোল হবে না। বল যখন গোলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেটি বল নয়, বলের বিকৃত রূপ। গোল-লাইনের উপর যেখানে বল ফেটে গিয়েছিল সেখানে নতুন বল ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে।

(৩) রেফারী গোলের নির্দেশ দেবেন। কারণ লাইন্সম্যানের উজ্জ্বল লাল রঙের পতাকা ব্যবহারের অধিকার আছে। শুধু মাঠের ৬টি পতাকা হাল্কা রঙের হওয়া উচিত।

(৪) খেলা আরম্ভ করবেন না। সাড়ে ছাব্বিশ ইঞ্চি পরিধির বল আইনমাফিক নয়।

(৫) তৃতীয় ক্লাবের বলে। তা না পাওয়া গেলে রেফারী যাদের বলকে উপযুক্ত মনে করবেন তাদের বলে খেলা আরম্ভ হবে।

এই সপ্তাহের প্রশ্ন

(১) একজন খেলোয়াড়ের পায়ের বুট ৪ নম্বর আইন অনুযায়ী ত্রুটিপূর্ণ। রেফারী তাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে নিয়মমাফিক বুট পরে সেই খেলোয়াড় রেফারীকে না জানিয়ে মাঠে ঢুকে হ্যাণ্ডবল করল। রেফারী কি শাস্তি দেবেন?

(২) খেলোয়াড়ের ড্রেসিং রুমে গিয়ে রেফারীর বুট পরীক্ষার অধিকার আছে কি?

(৩) খেলার সময় একজন খেলোয়াড় রেফারীর কাছে অভিযোগ করল, কিসে যেন তার পা কেটে গেছে। তখন রেফারীর কর্তব্য কি?

(৪) কারো একখানা হাত যদি কাঠের হয়, কেউ যদি চশমা পরে, কারো হাতে যদি লোহার বালা থাকে তবে রেফারী তাদের খেলতে অনুমতি দেবেন কি?

(৫) কর্নার পতাকার দণ্ডে বল লেগে মাঠের মধ্যে ফিরে এলে রেফারী কি বল 'আউট অফ্ প্লে' বলে বাঁশী বাজাবেন?

(৬) অনেক সময় দেখা যায়, পেনাল্টি কিক করার আগে গোলকিপার এসে বল যেভাবে রাখা হয়েছিল সেভাবে কিক করতে না দিয়ে বলের লেস মাটির দিকে রেখে বলটিকে উল্টিয়ে দিল। গোলকিপারের এরকম করার অধিকার আছে কি?

(৭) এক দলে ১১জন খেলোয়াড় আছেন, অপর দলে ৬জন। রেফারী হিসাবে আপনি খেলা আরম্ভ করবেন কি?

(৮) নির্ধারিত ৫৫ মিনিটের মধ্যে কোন গোল হয়নি অতিরিক্ত সময়ের খেলা চলছে। একটি দল সাবাক্ষণ ১০জনে খেলছিল। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হবার ২ মিনিট আগে তাদের একাদশ খেলোয়াড় খেলতে চাইল। আপনি অনুমতি দেবেন কি?

(৯) খেলা আরম্ভের সময় একটি দল একজনকে গোলকিপার হিসাবে এবং একজনকে ব্যাক হিসাবে দাঁড় করিয়ে বাকি ৯জন ফরোয়ার্ড হিসাবে দাঁড়াল। আপনার পক্ষে খেলা আরম্ভ করা যুক্তিসঙ্গত হবে কি?

(১০) খেলা আরম্ভের সময় আর একটি দল বলল, আমাদের গোলে কোন বল যাবে না, আমরা এমন শক্তিশালী, সুতরাং আমরা গোলকিপার হিসাবে কাকেও খেলাব না। রেফারী হিসাবে আপনি কি খেলা আরম্ভ করবেন?

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৭ই জুন—দুইশতের এক চীনা ফৌজ ৮০টি কি তারও বেশী ঘোড়া লইয়া গত ৩রা জুন ভারতীয় এলাকা লাদকের রেজাংলায় প্রবেশ করিয়া "প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ" চালায়। রেজাংলা স্পাংগুরে লেক এলেকার দক্ষিণে অবস্থিত।

ভারতের প্রাপ্য বিদেশী মুদ্রা ফাঁকি এবং চোরাই চালানের জন্য সিঙ্গাপুর হইতে পরিচালিত একটি বিরাট আন্তর্জাতিক চক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কক, হংকং, কুয়ালালামপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ইহাদের জাল পাতা।

১৮ই জুন—লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতিতে এইরূপ দাবি করেন যে, রাজ্যের ত্রাণমন্ত্রী যাহাই বলুন না কেন, পুরুলিয়া জেলার অনেকখানি অংশ আজ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে এবং সারা জেলা আজ এক সাংঘাতিক খাদ্য সঙ্কটের মধ্যে।

আশুতোষ ভবনের নিরীহ পরীক্ষার্থীরা পুনরায় পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পত্রে পরীক্ষা দিতে পারিবে। তবে এখন নয়, আগামী বছর তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্সের 'পার্ট-টু' পরীক্ষার সময় সেই সুযোগ মিলিবে।

১৯শে জুন—রাজ্যের মৎস্য দপ্তর কলিকাতার বাজারে মাছ বিক্রয় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি পাকা করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। মৎস্য বিক্রয় লাইসেন্স অর্ডার জারির ব্যবস্থাও নাকি চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায়, জুন মাসের মধ্যেই উহা জারি করা হইবে।

শ্রীগোবিন্দরাও দেশপাণ্ডে গতকাল গৌহাটিতে সাংবাদিকদের জানান—চৌদ্দজনের যে-মৈত্রী পদযাত্রী দল চীনে যাইতেছেন চীনকে তাঁহারা ভারত-আক্রমণকারী বলিয়া মনে করেন না। শ্রী দেশপাণ্ডে নিজেও চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিহিত করেন না। তাঁহার ভাষায় চীন সরকার "ভারতের সহিত বিরোধে লিপ্ত।"

২০শে জুন—প্ল্যানিং-এ সহকর্মের অভাব, পরিচালনার অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অযোগ্যতার ফলে রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুর এই তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ভারি ইস্পাতশিল্প কারখানার এ-যাবৎ ৪০ কোটি টাকার উপর লোকসান হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন স্বয়ং পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। অভিযোগে প্রকাশ হিসাবপত্র নাকি অনেক গণ্ডগোল আছে। আরও প্রকাশ, অন্তত দুই লক্ষ টাকার হিসাবে গরমিল আছে।

২১শে জুন—কলিকাতা মহানগরীর [illegible] সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূগর্ভস্থ [illegible] এবং পৌরসভার শ্রমিক- [illegible] গৃহাদি নির্মাণের জন্য কর্পোরেশন [illegible] ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার [illegible] পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া [illegible]

[illegible] এই [illegible] পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভা পর্যদের

উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ১৪শত ছাত্র-ছাত্রী অভিযুক্ত হইয়াছে। গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৬৩০।

২২শে জুন—কারাকোরাম গিরিপথের দিকে ভারতের চিরকালের পথের উপর দেপসাং গিরিপথের প্রায় ১২শত গজ উত্তর-পূর্বে একটি বাড়ি ও একটি ঘাটি নির্মাণ করিয়া চীনারা লাদকে নূতন আক্রমণাত্মক কাজ করিয়াছে।

কলিকাতার দুইজন ব্যবসায়ী মহম্মদ সিরাজুদ্দিন, এম ই বোজেন বার্গ, সিরাজুদ্দিন সংস্থাগুলির অপর তিন ব্যক্তি, অন্যান্য চারজন এবং সাতটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এস পি চ্যাটার্জির আদালতে অদ্য দুইটি নালিশ দায়ের করা হইয়াছে।

২৩শে জুন—কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ সিরাজুদ্দিন কোম্পানী হইতে কিছুদিন পূর্বে কিছু কাগজপত্র উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ সকল কাগজপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-দপ্তরেই থাকা উচিত ছিল।

কেরলের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শঙ্কর এবং শিল্পমন্ত্রী শ্রীদামোদর মেননের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের যে দাবি করিয়াছেন উহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবেচনার জন্য অর্পণ করা হইবে। তদন্ত প্রয়োজন কিনা তাহা প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই জুন—পৃথিবীর সমগ্র বিজ্ঞানী জগৎকে বিস্মিত করিয়া রুশ অদ্য মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে মহাকাশে দুই [illegible] ততোধিক যানের মিলনের স্থান ও সময় নিভুলভাবে স্থির করিয়া দেওয়া সম্ভবপর।

জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য শ্রীরমিজুদ্দিন আহমেদ আজ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে এই মর্মে এক নোটিস দেন যে, "রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।"

১৮ই জুন—গতকাল ব্রিটিশ কমন্সসভায় প্রফুমো-কীলার "কেলেঙ্কারী লইয়া তুমুল বিতর্কের পর যে ভোটাভুটি হয়, তাহাতে সরকার পক্ষে ৬৯টি বেশী ভোট পড়ায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আপাতত ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান [illegible] কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ [illegible] সকালে যশোহর জেলায় অন্তর্গত বাগারা ইছামতি নবগঙ্গা ও ভাকুরা নদীর উপর নির্মিত বাঁধের নিকট

পুলিসের গুলী বর্ষণে ৪ ব্যক্তি ঘটনাস্থলেই নিহত এবং ৫০ ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

১৯শে যে জুন—গতকাল পূর্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে প্রায় তিন ঘণ্টা অন্তর ভোস্তক-৫ ও ভোস্তক-৬ রাশিয়ার মহাকাশযান দুইটি কাজাকস্থানের কারাগান্ডা শহরের উত্তর-পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে নিরাপদে অবতরণ করিয়াছে।

হোটেল, রেস্তোরা, আমোদ-প্রমোদের স্থান এবং খুচরা দোকানগুলিতে বর্ণগত পৃথকীকরণের ব্যবস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী আজ কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন।

২০শে জুন—জেনেভায় সংবাদে প্রকাশ হোয়াইট হাউস ও ক্রেমলিনের মধ্যে সরাসরি জরুরী সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন সম্পর্কে আজ একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। জরুরী সঙ্কটকালে এই ব্যবস্থা অনুসারে কথা ও বার্তা বিনিময় চলিবে।

হাউস অব কমন্স আজ প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রফুমোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি হাউস অব কমন্সে ক্রিস্টিন কিলারের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে মিথ্যা ভাষণের দ্বারা পার্লামেন্টের অবমাননা করিয়াছেন।

২১শে জুন—আজ ঘোষণা করা হয় যে, মিলানের ৬৫ বৎসর বয়স্ক আর্চ বিশপ কার্ডিনাল জিওভানি বাতিস্তা মন্তিনি নূতন পোপ নির্বাচিত হইয়াছেন। নূতন পোপ ষষ্ঠ পল নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রফুমোকে কেন্দ্র করিয়া আজ পার্লামেন্টে নূতন করিয়া আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান এ-সম্পর্কে নূতন তদন্তের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন। তৎক্ষণাৎ বিরোধী দলনেতা শ্রীউইলসন ঐ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত বলিয়া তাঁর আপত্তি জানান।

২২শে জুন—আগামী ৫ই জুলাই মস্কোতে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত বিরোধ সম্পর্কে যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইবে তাহাতে যুগ্মভাবে [illegible] চীনদেশ [illegible] করিবে [illegible] জন্য সোভিয়েট কমুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি [illegible] [illegible] আলোচনাকারীদিগকে নির্দেশ দিয়াছে।

২৩শে জুন—গতকাল পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের মৌলবী ফরিদ আহমেদ ও অন্যান্য বাঙালী সদস্যগণ সরকারের সামরিক নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁহারা এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, সেনাবাহিনীতে অফিসার ও লোক সংগ্রহের ব্যাপারে পাক সরকার সাম্প্রদায়িক জাতি নীতি অনুসরণ করিতেছেন। এইভাবে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের প্রতিরক্ষা কার্যকলাপ হইতে সম্পূর্ণ দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে।

ক্রিস্টিন কিলার ক্রাইস্টডেনস্ আন্টোর সাক্ষ্যদানে সুপ্রীম কোর্টে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর সহিত তাহার জনৈকের যে কাহিনী প্রকাশ করিয়াছে, পাকিস্তানে দুই কমিশন কিংবা লর্ড আস্টর কেহই তাহা নিশ্চিতরূপে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীনারায়ণ [illegible]

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—[illegible] টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ [illegible] আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২০-২২৮০ ও ২০-৮৩৯১। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।